"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

সচিত্র মাসিক পত্র

মালঞ্চ

৬ষ্ঠ বর্ষ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

১৩২৬ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ১৩২৬

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম. এ

প্রকাশক

সাহিত্য প্রচার সমিতি লিমিটেড

২৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

[বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ আনা

মালঞ্চ

দ্বিতীয় যাণ্মাসিক বিষয় সূচী

(কার্ত্তিক ১৩২৬ হইতে চৈত্র ১৩২৬)

গল্প-উপন্যাস

প্রবন্ধ

কবিতা

চিত্র

শিবাজী ও রামদাস স্বামী।

গৈরিক-রঞ্জিত র'বে পতাকা তোমার ;
হেরিবে যখন, তব পড়িবে স্মরণে,
এ রাজ্য ভোগীর নয়, যোগী সন্ন্যাসীর।

শিবাজী কাব্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসু কবিভূষণ মহাশয়ের সৌজন্যে)

প্রবাসী(?)
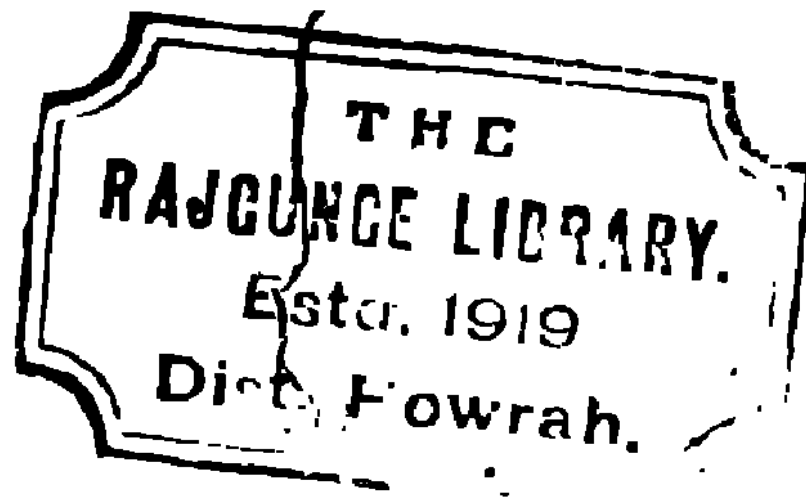
৬ষ্ঠ বর্ষ | বৈশাখ—১৩২৬ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সত্যাগ্রহ ও বর্ত্তমান অশান্তি।

রাউলাট আইন যখন পাশ হইল এবং ইহার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ বা passive restistance অবলম্বনের প্রস্তাব শুনিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, সত্যাগ্রহ বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে চলিবে বলিয়া মনে হয় না। সত্যাগ্রহ অবৈধ নয়,—রাজশাসন যেখানে প্রজাশক্তির আয়ত্ত নহে, সেখানে কোনও আইন উৎপীড়ক বলিয়া প্রজারা মনে করিলে এবং তাহাদের ঘোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট সেই আইন পাশ করিলে, এক সত্যাগ্রহের বলেই প্রজা ক্রমে গবর্ণমেণ্টকে এই আইন তুলিয়া নিতে বাধ্য করিতে পারে। প্রজার হাতে বড় প্রবল অস্ত্র এই সত্যাগ্রহ যাহা অবৈধ বলিয়া কোনও গবর্ণমেণ্ট প্রজার হাত হইতে কাড়িয়া নিতে পারেন না,—পরন্তু এই অস্ত্রের প্রয়োগে যারপরনাই বিব্রত হইয়া পড়েন। হাল না ছাড়িয়া দৃঢ়ভাবে প্রজা যদি এই অস্ত্র চালাইতে পারে, তবে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শেষে প্রজার মতের অনুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন আর গতি থাকে না। কিন্তু তবু বলিয়াছিলাম, সত্যাগ্রহ আমাদের দেশে এখন চলিবে না কেন।

সত্যাগ্রহে বড় কঠোর ত্যাগ, অসাধারণ সহিষ্ণুতার আবশ্যক,—এই ত্যাগ এই সহিষ্ণুতা মাত্র দুই চারিদিনের জন্য নয়, দীর্ঘকাল ধরিয়া দেখাইতে হইবে। পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত সত্যাগ্রহীদের পরিবারবর্গের প্রতিপালনের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। সত্যাগ্রহের প্রভাব কার্য্যকর করিতে হইলে, দুইচারিজনে কিছুই হইবে না,—বহু লোককে সত্যাগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। গভীরতায় ও বিস্তারে ইহা নগণ্য নহে, এইরূপ বুঝাইতে হইবে। নানা অবস্থার বিবেচনায় অধুনা ইহা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হইবে, এরূপ ভরসা করি নাই। আরও একটী কথা আছে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের স্বখ-স্বচ্ছন্দতা ও মান ইজ্জৎ ব্যাহত হইলে সকলেই পদে পদে যেরূপ তীব্রভাবে তাহা অনুভব করে, রাষ্ট্রীয় জীবন সংক্রান্ত এরূপ কোনও আইনের ততটা করে না। বিশেষ রাষ্ট্রীয় জীবনে কঠোরতায় আমরা এমন উন্নত কোনও মানবোচিত অধিকার ভোগ করিতেছি না, যাহাতে তাহার বিরুদ্ধে কোনও আইনের অসুবিধা আমরা সর্ব্বদা অতি তীব্রভাবে অনুভব করিব। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে যে অবস্থায় যে সব আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ কতক সম্ভব হইয়াছিল, এদেশে এখন[illegible]স্থায় এই সব আইনের বিরুদ্ধে তাহা হওয়া অ[illegible]ঠিন। তাই বলিয়াছিলাম বৈধ কার্য্যকর পন্থা হউক, সত্যাগ্রহের চেষ্টা ভারতে সফল হইবে না।

কিন্তু তখন আমরা এরূপ মনেও করিতে পারি নাই যে এই সত্যাগ্রহের নামে অথবা ইহার কোনও সূত্র ধরিয়া এরূপ সাংঘাতিক দাঙ্গাহাঙ্গামা দেশময় উপস্থিত হইবে বা হইতে পারে—যাহাকে গবর্ণমেণ্ট একেবারে বিদ্রোহ নাম দিতে পারেন।

বিদ্রোহ হইল active risistance—গবর্ণমেন্টের শাসনশক্তিকে প্রজার বিরোধী শক্তিপ্রয়োগে অতিক্রম করিবার চেষ্টা। আর সত্যাগ্রহ হইল passive resistance গবর্ণমেণ্টের শাসনশক্তির বিহিত সকল দণ্ড ধীরচিত্তে শির পাতিয়া নিয়াও অন্যায় আইন লঙ্ঘন করিয়া, তাহা যে আমাদের গ্রহণীয় নয় তাই দেখাইবার প্রয়াস। এ দুয়ের প্রকৃতি ও রীতি একেবারে পৃথক্। অসহিষ্ণু বিদ্রোহী আঘাত করিয়া ভাঙ্গিতে চায়, তার শক্তি পাশব বা পার্থিব অস্ত্র প্রয়োগ। আর সত্যাগ্রহী সকল ক্লেশ সকল লাঞ্ছনা ধীর প্রশান্ত চিত্তে সহিতে চায়, তার শক্তি তার ত্যাগে তার প্রাণের বলে তার হৃদয়ের মহত্ত্বে। কিন্তু তবু সত্যাগ্রহের সঙ্গে এই দাঙ্গাহাঙ্গামা, এই ভীষণ অশান্তির অগ্নি, এই শোণিতপাত, গৃহদাহ—এ সবের যোগ হইল কিসে?

অনেকে সত্যাগ্রহের নামে এখন চমকিয়া উঠিতেছেন, সত্যাগ্রহ ও এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামা এক করিয়া দেখিতেছেন। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তারের বিপক্ষ এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় এই যোগ দেখাইয়া ইহার বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করিতেছেন। সত্যাগ্রহের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত যার পর নাই পরিতপ্ত হইয়া দীর্ঘ দিন-ত্রয় উপবাসে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন,—তাঁহার অনুগামীবর্গকেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিতেছেন। হয়ত সত্যাগ্রহই তিনি ত্যাগ করিবেন।

কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই দাঙ্গা হাঙ্গামা—যাহাকে বিদ্রোহ বলিয়াই কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, যাহা দমনের জন্য এরোপ্লেন, মেসিন কামান পর্য্যন্ত নাকি তাহাদের ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সত্যাগ্রহের বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ নাই। এই অশান্তির আগুন বস্তুতঃ সত্যাগ্রহ হইতে জ্বলিয়া উঠে না[illegible]র মূল পৃথক্। দুর্ভাগ্যক্রমে সত্যাগ্রহের আন্দোলন[illegible] এই অশান্তি [illegible] সময়ে ঘটিয়া বাহিরে দুই[illegible] এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে,—যাহাতে মনে হয়, সত্যাগ্রহই এই অশান্তি ঘটাইয়াছে, অথবা সত্যাগ্রহ এই অশান্তিরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে।

রাউলাট আইন যতদিন রদ না হয়, ভারতীয় প্রজা যতদূর সাধ্য ও সম্ভব সত্যাগ্রহ অবলম্বন করুন, মহাত্মা গান্ধী এই অভিমত প্রচার করেন, এবং নিজে অগ্রণী হইয়া সত্যাগ্রহীর দল গঠন করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু এ কথা তিনি জানিতেন, যে সত্যাগ্রহ ব্রত অতি কঠোর, সকলে ইহা পারিবে না, যাহারা পারে, তাহারা এই দলভুক্ত হউক।—সত্যাগ্রহীর দলভুক্ত সকলেই হইতে পারে না,—তবে দেশবাসী সকলেই সর্ব্বত্র কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট একটা প্রণালীতে এই আইনের বিরুদ্ধে তাহাদের আপত্তি ও প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে পারে।

গত ৬ই এপ্রিল—এই দিন নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে ব্যবসায়াদি সব বন্ধ রাখিয়া উপবাস করিয়া এই আইন রদ যাহাতে হয় তার জন্য দেবতার কৃপা প্রার্থনা করুন এবং সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া তাঁহাদের আপত্তি ঘোষণা করুন, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দেশবাসীগণকে এই অনুরোধ করেন। দেশভক্ত মহাপ্রাণ বীরের এই আহ্বানে জাতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দেশবাসীগণ প্রায় সকলেই সেই দিনকার এই ব্রত পালনে উদ্যত হইলেন। বস্তুতঃ সেদিন এই কলিকাতায় যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা আর কখনও দেখি নাই, দেখিব বলিয়া আশাও করি নাই। বিশাল এই নগরে সর্ব্বত্র দোকান পাট বন্ধ, গাড়ী বন্ধ, বৈকাল পর্য্যন্ত জনসঙ্কুল রাজপথ সমূহ প্রায় জনশূন্য। বৈকালে আবার জনস্রোত বহিল,—গড়ের মাঠ লোকে লোকারণ্য হইল। ধনী দরিদ্রে ভেদ নাই, হিন্দু মুসলমানে ভেদ নাই, বাঙ্গালী মাড়োয়ারী ভাটিয়া গুজরাটী মান্দ্রাজীতে ভেদ নাই,—সে এক অপূর্ব্ব অভাবনীয় দৃশ্য! চারিদিকে সহস্র সহস্র কণ্ঠে নিনাদিত গগনভেদী ধ্বনি 'জয় মহাত্মা গান্ধী কি জয়!' ''জয় হিন্দু-মুসলমানকি জয়!' বাঙ্গলার বন্দেমাতরম্ ধ্বনিও এই ধ্বনিতে ডুবিয়া গিয়াছিল। অথচ কোনও অশান্তি ঘটে নাই, গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ বড় বাহির করেন নাই। এমন জনসমাগম—এত উত্তেজনা—কিন্তু তবু শান্তি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সত্যাগ্রহ এমনই হওয়া উচিত বটে। কিন্তু সেদিনকার

লোকমতের এই বিরাট অভিব্যক্তি সত্যাগ্রহ নয়। সত্যাগ্রহের বা passive resistance এর কোনও ঘটনাই ইহার মধ্যে ঘটে নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ লোক সেদিন সমবেত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সত্যাগ্রহের পণ অতি অল্প লোকেই করিয়াছিল। ইহা সত্যাগ্রহ নয়, একদিনের জন্য লোক-মতের একটা সমবেত প্রকাশ মাত্র।

দিল্লীতে ইহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ একটা অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তাহাতে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও শোণিত-পাতও কিছু হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও সত্যাগ্রহ বা প্যাসিভ রেজিষ্টান্স নয়। সে দাঙ্গা কেন হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ আমরা করিব না, করাও অতি কঠিন। জননায়কগণ একরূপ বলিতেছেন, কর্তৃপক্ষ আর একরূপ বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ বড় সহজ নহে।

তার পর ১১ই এপ্রিলের কথা। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ পালনের জন্য পঞ্জাবে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, এইরূপ সংবাদ আসিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তখন সর্ব্বসাধারণের অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি, গুরুর মত সকলে তাঁহার নামে শির নত করে। বস্তুতঃ গান্ধী এই অল্পদিনে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর প্রাণ যে ভাবে অধিকার করিয়াছেন, এ যুগে এ পর্য্যন্ত আর কোনও জননায়ক তাহা পারেন নাই। সেই গান্ধী দেশসেবা-ব্রতপালন করিতে নিগৃহীত হইয়াছেন, এই সংবাদে সর্ব্বত্র সেদিন যারপরনাই একটা ক্ষোভের উত্তেজনা স্বভাবতঃই হইল। আবার দোকানপাট সব বন্ধ হইল। রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেরা—বেশীর ভাগই অশিক্ষিত সাধারণ শ্রেণীর ছেলেরা—যারা রাজনীতি রাষ্ট্রীয় অধিকার এ সব কিছুই বোঝেনা বা জানেনা—কেবল এইমাত্র জানে মহাত্মা গান্ধী দেশের গুরু, সকলের পরম ভক্তির পাত্র একজন মহাপুরুষ—বেশীরভাগই এইসব ছেলেরাই গাড়ী ও ট্রামে চড়িয়া যাহারা যাইতেছিলেন, তাঁহাদের হাঁটিয়া যাইতে অনুরোধ করে। অবশ্য তাদের ভাবে সাবে এটুকু বুঝা যায় যে গান্ধীর নামে সকলকে এইটুকু ক্লেশ স্বীকার করিতে বলায় তাহাদের বড় একটা দাবী আছে। ইহার বেশী কোনওরূপ অশিষ্টতা বা ঔদ্ধত্য আমরা সেদিন দেখি নাই। ইহাও দেখিয়াছি, সকলেই একটু হাসিয়া একটু যেন লজ্জা পাইয়া গাড়ী ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িয়াছেন। এইসব ছেলেরাও গান্ধীর নামে এমন মাতিয়া উঠিয়াছে, ইহা দেখিয়া আনন্দ ও গৌরব বোধও করিয়াছেন। এই শুক্রবারেও কোনও অশান্তি কলিকাতার কোথাও ঘটে নাই,—পুলিশ এই বালকদের কার্য্যেও কোনও বাধা কোথাও দেয় নাই। কিন্তু শুক্রবারে এই যে ব্যাপার—এ কথা বলা বাহুল্য যে ইহাও সত্যাগ্রহ নয়। গান্ধীর প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধার একটা প্রবল উচ্ছ্বাস মাত্র।

শনিবারেও এই উচ্ছ্বাসের বেগ শমিত বড় হয় নাই। দোকানপাট অনেক বন্ধ ছিল, ছেলেরা ট্রাম ও গাড়ী হইতে আরোহীদের নামিতে বলিতেছিল,—কোথাও কোথাও ছোট ছেলেরা ট্রাম লাইনের উপর আড় হইয়া পড়িয়াও বহুক্ষণ ট্রাম বন্ধ রাখিয়াছিল। চৈত্রের মাথাফাটা রৌদ্র, আফিস কাছারীর সময়, অনেকের ইহাতে যথেষ্ট ক্লেশ ও অসুবিধা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনও হাঙ্গাম হুজ্জতের কথা দুপুরবেলা পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। বৈকালের দিকে বড়বাজার অঞ্চলে হাঙ্গামা উপস্থিত হয়,—শান্তিরক্ষার জন্য শেষে গবর্ণমেণ্টকে গুলি চালাইতে হয়, লোকও কতক কতক মারা যায়। একেবারেই দাঙ্গা করিতে যায় নাই, কার্য্য উপলক্ষে ঐ সময় পথে ছিল, এরূপ লোকও দুই একজন নিহত হইয়াছে শুনিতে পাই।

এখন এই দাঙ্গা কেমন করিয়া বাধিল? ৬ই এপ্রিল রবিবার, ১১ই এপ্রিল শুক্রবার এত জনসমাগমও উত্তেজনার মধ্যেও দাঙ্গা অশান্তি কোথাও ঘটিল না। শনিবার বৈকালে হঠাৎ এমন দাঙ্গা কেমন করিয়া ঘটিল, যে গুলি চালাইয়া শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পর্য্যন্ত হইল?

শুনিতে পাই, লোকে পুলিশের উপরে এবং শান্তিরক্ষার্থ আগত সৈনিকদের উপরে ঢিল ছুড়িয়াছিল—আরও নানারকম উপদ্রব করিতেছিল। এ কয়দিন এত ধীরতা দেখাইয়া তারাই বা হঠাৎ এরূপ করিল কেন? এ সম্বন্ধেও নানারকম বিবরণ বাহির হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের উত্তেজনা ঠিক কখন কি ভাবে যে সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়া পুলিশ মিলিটারীর প্রতি উপদ্রব করিতে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিল, তাহা স্পষ্ট তেমন বুঝা যায় না। যাহা হউক, এই শোচনীয় ব্যাপারে এই 'দুরন্তদের'

পরিসমাপ্তি হইল,—এদিকে সংবাদও আসিল যে গান্ধীকে গ্রেফ্তার করা হয় নাই, পঞ্জাবে যাইতে না দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বোম্বে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেদিন বিডন উদ্যানে সন্ধ্যায় ইহা ঘোষিত হইল যে, গান্ধী যখন মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তখন 'হরতাল' বন্ধ হউক। কলিকাতায় যাহাই ঘটুক, পঞ্জাবে এবং বোম্বে প্রদেশের স্থানে স্থানে যে ভীষণ অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। বস্তুতঃ কলিকাতার দুর্ঘটনা একেবারেই তাহাতে চাপা পড়িয়াছে।

এই সব অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্ট সামরিক আইন পর্য্যন্ত জারী করিয়াছেন। সংবাদ যাহা পাওয়া যাইতেছে, অতি ভয়ঙ্কর! সত্যাগ্রহ ত নহেই, ইহা active resistance বা বিদ্রোহের মতই বাস্তবিক মনে হইতেছে। কেন এরূপ হইল? রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশের নির্দ্দিষ্ট শান্ত প্রণালী, সত্যাগ্রহ-পালনে মহাত্মা গান্ধীর সকল উপদেশ, তাঁহার নিজের ধীরতার দৃষ্টান্ত — সব তল করিয়া অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় এই অশান্তির অগ্নি কেন কিভাবে জ্বলিয়া উঠিল?

টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া বলিতেছেন—"যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে প্যাসিভ রেজিষ্টান্‌স্ বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সেই সব লোকের কোনও সম্বন্ধ নাই যাহারা এই হত্যা গৃহদাহ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা যেন একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ধরিয়া পরিচালনা করিতেছে। সত্যাগ্রহীদের এই আন্দোলনে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এমন একটা অধীর উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে এই বিষ সহজে লোকে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু এই বিপ্লব ঝঙ্কার পরিচালক তাঁহারা নহেন, যদিও তাহাদের কার্য্যে ইহার সহায়তা হইয়াছে। তলে তলে কূটবুদ্ধি দুরভিসন্ধি পরায়ণ লোক আছে, যাহারা এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটাইতেছে, — একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটানই ইহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহার ফলাফল ইহারা চিন্তা করিতেছে না। ভারতের বাহিরে যে বিপ্লব-বাদীরা সমাজ ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইতেছে,—তাহারাই ইহাদের সহায়। যদি আমরা অন্য সকল সমস্যা সকল স্বার্থের কথা আপাততঃ চাপা রাখিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠায়, গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় না দাঁড়াই, তবে নিশ্চিত বোল্‌শেভিক বিপ্লব ভারতে আরম্ভ হইবে।"

এই উক্তির মধ্যে বাস্তবিক কি সত্য কিছু রহিয়াছে? শুনিতেছিলাম, রুষ বোলশেভিকগণ ভারতে তাদের সেই ভয়াবহ বিপ্লব প্রসারে প্রয়াস পাইতেছে। সত্যই কি তবে তাহাদের চরেরা এই আন্দোলন ও উত্তেজনার সুযোগ পাইয়া বোলশেভিক্ বিপ্লব-তরঙ্গ ভারতে তুলিতে চেষ্টা করিতেছে?

জাতীয় শিক্ষা অষ্টাহ।

সম্প্রতি কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা অষ্টাহের অনুষ্ঠান হইয়া গেল। বৎসরে নির্দ্দিষ্ট এক অষ্টাহকাল বিশেষভাবে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রয়োজন দেশবাসীর সমীপে বিবৃত করা হইবে, এই দিকে তাহাদের অনুকূল দৃষ্টি ও সহায়তা আকৃষ্ট করা হইবে, এই উদ্দেশ্যই এই জাতীয় শিক্ষা অষ্টাহের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গত ৮ই এপ্রিল হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত অষ্টাহের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই দেশ-ব্যাপী অশান্তি উপস্থিত হওয়ায়—এই আন্দোলন আশানুরূপ ভাবে এবার পরিচালিত হয় নাই। মধ্যে দুইদিন বন্ধ ছিল,—৮ই হইতে ১৭ই পর্য্যন্ত কয়েকটি সভা হয়।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ গত ১৩ বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন।—বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কোনও কোনও দিকে বিশেষতঃ ব্যবসায়িক শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টায়—বেশ সফলতাও ইহার দেখা যাইতেছে। গত বৎসর বৈশাখের মালঞ্চে আমরা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সমগ্র ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছি;—গত এই ১৩ বৎসরে শিক্ষা পরিষদের জীবনসংগ্রামের কথা—তার সকল চেষ্টার সকল সফলতা ও বিফলতার কথা—বিশদভাবে তাহাতে বিবৃত হইয়াছে। তাহার পুনরাবৃত্তি মালঞ্চের পাঠকবর্গের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে—ভবিষ্যতে দেশে তাহার কি স্থান হইতে পারে ও হওয়া প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে—অনেক কথা বলিবার এবং ভাবিবার আছে। এবার স্থান হইল না। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিব। তবে মূল একটি কথার উল্লেখ এখন করিতে পারি। দেশের লোক

আমরা, দেশের ছেলেপিলেরা সব আমাদের সন্তান। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার লক্ষ্য ও ব্যবস্থা নির্দ্দেশে এবং পরিচালনায় আমাদের কোনও অধিকার বড় নাই, সে ভার বিদেশী রাজপুরুষগণের হস্তে। ইহা স্বাভাবিক অবস্থা ও ব্যবস্থা নহে। আরও অস্বাভাবিকতা এই যে আমরা মনে করি, ইহাই স্বাভাবিক এবং অন্য ব্যবস্থা কিছু হইতে পারে না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সকল দিকে সুফল প্রসব করিতেছে না। একে যে জীবিকার উপযোগী বৃত্তি গ্রহণের যোগ্যতা লাভের আশায় সকল অসুবিধা স্বীকার করিয়াও এই শিক্ষা ছেলেদের সকলে দেওয়াইতেছেন, সেই যোগ্যতা-লাভের হিসাবেও এই শিক্ষা সাধারণের পক্ষে একরূপ ব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে। অন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন; সে ব্যবস্থা দেশের লোক আপনারাই ভাল করিতে পারেন। দেশের লোকের দ্বারা বিহিত ও পরিচালিত দেশের উপযোগী যে শিক্ষা, তাহাই জাতীয় শিক্ষা।

ভাবিবার কথা

জাতীয় অষ্টাহে যে সব সভা হয়, কতিপয় চিন্তাশীল বক্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে অতি গুরু কয়েকটি ভাবিবার কথা উত্থাপন করেন। নিম্নে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।—

ইন্দ্রজাল

কলেজস্কোয়ারে এক সভায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এক যাদুকরের অদ্ভুত কুহকের কথা উল্লেখ করেন। কথাটি এই—

মায়াকে অঘটনঘটন-পটীয়সী বলিয়া পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—এক যাদুকর তেমনই মায়াবলে যেন নানারূপ অঘটনঘটন করিতেছিল। এক সময় অনেক মণিমুক্তা জহরৎ সৃষ্টি করিয়া সে দর্শকবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়া কহিল, 'এই গুলি বাড়ীতে লইয়া যান বাক্সে তুলিয়া রাখুন, তিন দিন পরে খুলিয়া দেখিবেন, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!' মুগ্ধ দর্শকগণ সেই সব মণিমুক্তা জহরৎ লইয়া ঘরে আসিল,—সাবধানে বাক্সে তুলিয়া রাখিল।—এই সব রত্নলাভই আশ্চর্য্য,—তিন দিন পরে আরও কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিবে! অধীর আশায় এই তিনটা দিন কাটাইয়া সকলে বাক্স খুলিল,—দেখিল—ব্যাপার অতি আশ্চর্য্যই বটে,—অভাবনীয় রূপ আশ্চর্য্য—জহরৎ নাই, কি হিজিবিজি লেখা কয়েকখণ্ড কাগজের টুকরা মাত্র তার স্থানে রহিয়াছে।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা ও উপাধি কি এখন এমনই কুহকের খেলা নয়? যখন লোকে পায়, যেমন মনোহর,তেমনই মূল্যবান্ মণিমুক্তা জহরতের মতই তাহা মনে হয়। কিন্তু দুই চারি দিন যাইতে না যাইতে দেখা যায়, সব একেবারে হিজিবিজি লেখা গোটা এক এক টুকরা কাগজ মাত্র,—আজকার জীবন সংগ্রামে, জীবিকার বাজারে তার কোনই মূল্য নাই!"

তিন আর (R) না তিন এইচ্ (H)

আর একদিন থিওসোফিকাল সোসাইটীর গৃহে একটি সভা হইয়াছিল। অধ্যাপক এস্, পি ভাস্বামী এম্ এ মহাশয় বক্তৃতা করেন। ইনি সি, এম্, এস (C. M. S.) কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সরস্বতী প্রতিমার লাঞ্ছনার ব্যাপারে পদত্যাগ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকখানি পত্র বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।—সেইগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন—ইহাঁর গভীর চিন্তা ও তাত্বিক দৃষ্টির পরিচয় পাইয়াছেন। জাতীয়শিক্ষা সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতার প্রসঙ্গে সেদিন ইনি বলেন, "ইংরেজিতে প্রাথমিক শিক্ষার নাম 'The Three R's বা তিনটি 'আর' অর্থাৎ রিডিং (Reading) রাইটিং (Writing) এবং রিথ্‌মেটিক (Rithmatic or Arithmatic)। ছেলেদের কিছু পড়িতে কিছু লিখিতে এবং কিছু আঁক করিতে শিখালেই দস্তুরমত কিছু শিক্ষা তাদের হইল। ইহাই হইল সে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য।—কিন্তু বড় ভুল লক্ষ্য, দস্তুরমত কিছু শিক্ষা এই তিনটি 'আর' (R) এ মাত্র হয় না,—এরূপ মনে করাও বড় ভুল। যদি এইরূপ তিনটি অক্ষর দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে তাহা তিনটি 'আর' (R) নয়, তিনটি এইচ্ (H) যথা—Head (মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি), Heart (হৃদয় বা ভাব) এবং Hand (হাত বা কর্ম্মকুশলতা)। প্রথমেই শিক্ষার লক্ষ্য হইবে, যে ছেলে পিলেগুলি সু-বুদ্ধি হয়, সাধুভাব তাদের চিত্তে জাগ্রত হয়, আর নিপুণভাবে কাজ করিতে তারা শিখে। তিনটি আর (R) অবশ্য অবজ্ঞার বস্তু নহে। এই লক্ষ্য সাধনের অন্যতম উপায় তাহা হইতে পারে,—কিন্তু তাহাই লক্ষ্য নয়,—লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া নিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। লক্ষ্য ঐ তিনটি 'এইচ' (H), তিনটি 'আর' (R) নহে।"

ভারত-ভারতীর মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা

স্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, ভারত ভারতীর মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। পার্থিব সম্পদের সম্ভোগ অবজ্ঞা করিয়া, আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে মানবত্বের চরম সার্থকতা লাভ কিসে হইতে পারে, ভারতীয় বিদ্যা ও জ্ঞানের তাহাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। জগতকে দিবার মত ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদও ইহাই। কিন্তু ভারতের বিদ্যা ও জ্ঞান পাশ্চাত্য বিদ্যা ও জ্ঞানের চাপে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। আমাদের শিক্ষার বড় একটি লক্ষ্য এই হওয়া চাই যে ভারত-ভারতীকে আমরা এই চাপ—এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিব, জগতের ভারতী ক্ষেত্রে তাহার যোগ্য অধিকার ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিব। যত দিন তাহা না পারিব, ভারতের বাণী জগতের সমক্ষে ঘোষিত হইবে না। ভারত তাহার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য সাধন করিতে পারিবে না।

এই মুক্তি লাভ ও এই অধিকার প্রতিষ্ঠা ভারতবাসীর স্বায়ত্তসাধনার সাপেক্ষ, বর্ত্তমান পরায়ত্ত শিক্ষাপদ্ধতিতে তাহা হইবে না। জাতীয়শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ইহাই বড় একটি প্রয়োজন।

নিম্নতর শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন, এই শিক্ষা এ দেশী সরল অনাড়ম্বর সর্ব্ববিধ বিলাস-ব্যসন-বর্জ্জিত প্রণালীতে হইবে, অনাবশ্যক রাশি রাশি পুস্তকের ভার ত ইহাতে প্রয়োজন নাই। মুখে মুখে অনেক তত্ত্ব বালকদের শিখান যায়,—পুস্তক তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিতে জানে না, বরং ঝাপসা করিয়াই দেয়।

দেশীয় ভাষা ও তার শিক্ষার প্রয়োজন

অধ্যাপক শ্রীযুত আই, জি, এন্ তারাপুরওয়ালা পি, এইচ, ডি, জাতীয় শিক্ষা অষ্টাহের শেষ দিন এই সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনিও কতকগুলি গুরুতর কথার অবতারণা করেন। কথাগুলির সংক্ষিপ্ত চুম্বক এই।—

মনের সকল চিন্তা সকল ভাব সকল কথা—নিজের ভাষায় যে জাতি প্রকাশ করিতে পারে না বিদেশীর ভাষায় প্রকাশ করিতে হয়, তাহার জাতীয়ত্বের কি মর্য্যাদা থাকিতে পারে?

শিক্ষিত জন-নায়কগণ দেশের রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব দাবী দাওয়ার কথা আলোচনা করেন, রাজপুরুষগণ তাহা মুষ্টিমেয় লোকের কথা—জনসাধারণের কথা নয় বলিয়া উড়াইয়া দেন। এই সব আলোচনা ইংরেজিতে হয়, জনসাধারণ তাহা বুঝে না। ইহার প্রতিধ্বনি তাহারা করিতে পারে না,—রাষ্ট্রীয় শিক্ষাও তাহাদের হয় না। তাই অনেক সময় জননায়কগণের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ট একটা যোগ বড় কমই দেখা যায়।—দেশীয় ভাষা এই সব আলোচনা আন্দোলনের বাহন হইলে অবস্থা এইরূপ থাকিত না,—জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নায়কগণের ঘনিষ্ঠ একটা যোগ হইয়া যাইত।

আমাদের অনেক ভাষা, সুতরাং একজাতি আমরা হইতে পারি না,—এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন।—কিন্তু উপর উপর ভারতীয় ভাষা সমূহে যত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়,—প্রকৃত পক্ষে সেরূপ বিভিন্নতা নাই।—

ভারতীয় ভাষা সমূহকে মোটের উপর দুইটি ভাগে ফেলা যায়,—আর্য্য ও দ্রাবিড়ী। ইহার প্রত্যেকের মোটামুটি ৯টি করিয়া মাত্র শাখা আছে। ভারতের ন্যায় বৃহৎ দেশে এইরূপ আটদশটি মাত্র ভাষার অস্তিত্ব অতি স্বাভাবিক।

আর্য্য ও দ্রাবিড়ী ভাষাদ্বয়ের প্রকৃতি যতই পৃথক রকমের হউক, একটি একটি ভাষার শাখা কয়েকটির মধ্যে শব্দ ও বাক্য রচনা পদ্ধতি-গত এরূপ সাদৃশ্য আছে যে একভাষা-ভাষী অন্য ভাষা সহজেই শিখিয়া ফেলিতে পারে, শিক্ষা প্রণালীতে যদি সেরূপ ব্যবস্থা থাকে।—দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রকৃতি ভিন্নরূপ হইলেও বহু আর্য্য শব্দ সেই ভাষার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে একেবারে তাহা ভিন্ন বলিয়া কাহারও মনে হইবে না

তার পর শব্দ ও বাক্য রচনা পদ্ধতি ভাষার বহিরাবয়ব মাত্র। চিন্তার ও ভাষার যে ধারা সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়, তাই ভাষার প্রাণ।—এই প্রাণের দিকে লক্ষ করিলেও আমারা দেখিতে পাইব যে সকল ভাষার এই প্রাণ এক। আর্য্য দ্রাবিড়ী ও তাহাদের শাখাসমূহ—সকল ভাষার সাহিত্যেই একই চিন্তার একই ভাবের ধারা প্রবাহিত হইতেছে -ইহা কেবল কোনও এক যুগ-বিশেষের পক্ষে সত্য নহে ঐতিহাসিক ভাবে সব

সাহিত্যের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যুগে যুগে একই চিন্তার ও ভাবের ধারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এইখানেই বাহ্যিক বহুবৈষম্যের মধ্যে ভারতের একত্ব—ভারতবাসীর একজাতীয়ত্ব। দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য সমূহের আলোচনা করিলেই এই আশ্চর্য্য একত্ব আমরা অনুভব করিতে পারিব।—আমাদের শিক্ষা প্রণালীর বড় একটি লক্ষ্য এইদিকে হওয়া আবশ্যক। আমাদের একজাতীয়ত্বের ভিত্তি ইহাতেই বিশেষ ভাবে দৃঢ় হইবে।

'ইতর'

ইহার পূর্ব্বে আর একদিন ঐ থিওসোফিকাল সোসাইটীর গৃহে লেফটনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন।

তিনি বলেন, জাতীয়তার (nationalityর) আসল মূল কথা হইতেছে আপন বোধ। দেশের অধিবাসীবৃন্দ সকলেই সকলকে আপন বলিয়া অনুভব করিলে তাহারাই প্রকৃতপক্ষে একটি জাতি বা 'নেশন' হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালায় এই 'আপনত্বের' অনুভূতিটা কত কম দেখা যায়। তাহার বড় একটি প্রমাণ এই যে দরিদ্র অশিক্ষিত শ্রমজীবি সম্প্রদায়কে ইতর বলিয়া বিশিষ্ট করা হইয়াছে। 'ইতর' কথাটির মৌলিক অর্থ অপর অর্থাৎ যাহারা আমাদের মধ্যে নয়, বাহিরে। বাঙ্গালার সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি শিক্ষিত ও উন্নত সম্প্রদায় সমূহের লোক সংখ্যা শতকরা ১৩ জন, আর ইঁহারা যাঁহাদের 'ইতর' নাম দেন তাঁহাদের সংখ্যা শতকরা ৮৭ জন। শতকরা ৮৭ জন লোককে যাঁহারা 'ইতর' বা "আমাদের নয়" বলিয়া দূরে রাখিবে তাহাদের জাতীয়তার আশা কোথায়? এই অর্থে 'ইতর' কথার ব্যবহার প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে নাই—ভারতের আর কোনও প্রদেশের ভাষাতেও নাই, কেবল এই বাঙ্গালাতেই আছে।

তিনি আরও বলেন, এই ভারতে সমাজকে "বিরাটপুরুষ" নাম দেওয়া হইয়াছে। এই বিরাট পুরুষের প্রধান চারি অঙ্গ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। কিন্তু বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ও শূদ্র—মাত্র এই দুইটি অঙ্গ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু শুধু ল্যাজা ও মুড়া লইয়া পূর্ণাঙ্গ কোনও জীব হয় না। বৈদ্য জোর করিয়া ব্রাহ্মণের অধিকার কতক গ্রহণ করিয়াছেন। কায়স্থরাও করিতেছেন। কিন্তু বাকী আর সব শূদ্রত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সেই শূদ্রকেও আবার 'ইতর' নামে 'পর' করিয়া ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাগুলি বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়। তবে এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথাও আছে। অবশ্য এই 'ইতর' কথাটি যে ভাবেই এই প্রয়োগে আসিয়া থাক্, আমাদের একেবারেই ত্যাগ করা উচিত। এক দেশের অধিবাসী কেহ কাহারও 'পর' হইতে পারেনা। কিন্তু সকল দেশেই শিক্ষিত, উন্নত ও পরিমার্জ্জিত এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা সাধারণতঃ 'ভদ্রলোক' নামে অভিহিত। ইংরেজীসমাজেও এই অর্থে জেণ্টলম্যান (gentleman) কথাটি ব্যবহৃত হয়। কেবল gentleman নয়, সেদেশে তারও উপরে nobleman (অভিজাত জন) নামে এক সম্প্রদায় আছেন। এই noblemanরা সমানভাবে সাধারণ gentlemanদের সঙ্গেই সামাজিক ব্যবহার করেন না। যাহাহউক শিক্ষিত উন্নত ও পরিমার্জ্জিত এই দুই সম্প্রদায়ের নিম্নে অশিক্ষিত দরিদ্র অপরিমার্জ্জিত দৈহিক শ্রমজীবী-জনবহুল সম্প্রদায় সেদেশেও আছে। সকল দেশেই সকল যুগে ছিল, এবং এখনও আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই সম্প্রদায় 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত। প্রাকৃত কথাটির অর্থ (natural) অর্থাৎ আপনা হইতেই যেমন হইয়াছে, তেমনই যাহা আছে, শিক্ষায় তাঁদের সংস্কার বা পরিমার্জ্জনা হয় নাই। ইংরেজিতে ইহাদের নিম্নতর বা দরিদ্র শ্রেণী—(the lower or the poorer classes) এই নাম দেওয়া হয়। কখনও vulgur কথাটিও ব্যবহৃত হয়। এই কথাটি 'ইতরের' মত 'পরত্ব' বা 'আমাদের নয়' এই ভাবটি সূচিত না করিলেও, ইহাদের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাব সূচিত করে। 'নীচ' 'অভদ্র' 'অশিষ্ট' 'বর্ব্বর'—'ভলগার' (vulgur) কথাটিতে এইরূপ একটা ভাবই প্রকাশ পায়। এই সম্প্রদায়কে বিশিষ্ট করিবার পক্ষে বোধ হয় 'প্রাকৃত' কথাটির মত এমন আপত্তিবিহীন কথা আর পাওয়া যায় না।

যাহাহউক, যদিও 'ইতর' কথাটি সকলেই ব্যবহার করেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ—'ইহারা আমাদের হইতে পৃথক' এই ভাবেই এই কথাটির প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু লোকে সাধারণতঃ vulgur ব্যতীত 'পর' বা 'আমাদের নয়' এরূপ ভাবে ইহা গ্রহণ করে না। 'ইতরামি' এই

বিশেষ্যটি ইংরেজি করিলে ঠিক vulgarity হয়। এই vulgar অর্থও অবশ্য আপত্তিজনক। কিন্তু জাতীয়ত্বের হিসাবে 'পরের' মত অত আপত্তিজনক বোধ হয় নয়। শত পুরুষ-পরম্পরা সামাজিক সংস্কার এবং রীতির অভ্যাস বশতঃ 'জল খাওয়া' কি 'ছোঁয়া ছুঁয়ির' একটা বাধা অনেকেই মানিয়া চলেন বটে —কিন্তু গ্রাম্য সমাজে তথাকথিত অস্পৃশ্য বা জল 'অনাচরণীয়' জাতীয় লোকদের ভদ্রসম্প্রদায়-ভুক্ত গৃহস্থেরা 'পর' বলিয়া মনে করেন না, আপনজনের মত স্নেহ ও শ্রদ্ধাও —যথাযোগ্য ক্ষেত্রে করিয়া থাকেন। এই পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পর বেশ একটা মধুর সৌহার্দ্দের ভাবও দেখা যায়।

শিক্ষিত উন্নতশীল এবং কুসংস্কারমুক্ত বলিয়া গর্ব্বিত নাগরিকদের গৃহে পাচক ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত যেরূপ হীন ও অবজ্ঞাত অবস্থায় থাকে, গ্রাম্য ব্রাহ্মণ গৃহস্থের ঘরে নমঃশূদ্র ভৃত্যও সেরূপ হীন ও অবজ্ঞাত অবস্থায় কখনও থাকে না। নাগরিক সমাজে গৃহ-কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত ভৃত্যগণ কতকটা সাহেবদের গৃহে দেশীয় খানসামাদের মতই পৃথক নীচ একশ্রেণীর জীবের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গ্রাম্য গৃহস্থের ঘরে ভৃত্যগণ ঘরের লোকের মত আদর যত্ন পায়,— দাদা, কাকা, জ্যাঠা, মামা, ঠাকুরপো ইত্যাদি আত্মীয়ের সম্বোধনে তারা অভিহিত হয়। অনেক পরিবারে বধূরা গৃহের পুরাণ ঝি চাকরদের 'আপনি' ছাড়া 'তুমি' বলিয়া কখনও কথা বলে না। শিক্ষিত নাগরিক পরিবারের কেহ সহজে একথা বিশ্বাস করিতেও পারিবেন না। তবে উন্নতশীল নাগরিক পরিবারে যে কোনও জাতিরই হউক্ ভৃত্যাদির পৃষ্ট অন্ন ভোজনে বাধা নাই, গ্রাম্য সমাজে তাহা আছে। কিন্তু মনে না আপন বলিয়া ধরিলে কেবল পৃষ্ট অন্ন ভোজনেই লোক আপন হয় না। সাহেবরাও ত এ দেশীয় খানসামাদের পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন।

একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের মুখে একবার শুনিয়াছিলাম, 'ওদের পাতে ভেদ নাই, আঁতে ভেদ আছে। আর আমাদের পাতে যতই ভেদ থাক, আঁতে ভেদ বড় নেই।' কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য। ইয়োরোপে আমরা যে সাম্যের কথা শুনিতে পাই,—তাহা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই কতক দেখা যায়। সামাজিক সাম্য সেখানে নাই, এবং কেবল, আঁতের ভেদ কেন, পাতের ভেদও সেখানে যথেষ্ট আছে। তবে কারও পৃষ্ট অন্ন গ্রহণে কোনও বাধা কাহারও নাই। তা ছাড়া আর্থিক বা ব্যবসায়িকক্ষেত্রে উচ্চতর সম্প্রদায়ের চাপ নিম্নতর সম্প্রদায়ের উপরে এত বেশী যে সামান্য বেতনভোগী কুলী ভিন্ন দেশে ইহাদের আর কোনও স্থান সেখানে নাই। বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির বিভাগ এখনও এদেশে যেরূপ আছে, তাহাতে নিম্নতর বর্ণের মুখের অন্ন উচ্চতর বর্ণের লোকেরা কাড়িয়া নিতেছে না। সামাজিকক্ষেত্রে এই 'আঁতে'র ভেদ' আর ব্যবসায়িকক্ষেত্রে এই কঠোর দাসত্ব ও অন্নবস্ত্রের অসহনীয় ক্লেশই বর্ত্তমানে ইউরোপে বল্শেভিক্ বিপ্লব আনিয়াছে, যাহার শান্তি না হইলে ইয়োরোপীয় সমাজ একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রে অধিকারের ভেদ এদেশে এত বেশী বাস্তব দুঃখের সৃষ্টি করে নাই, যাহাতে এরূপ উৎপাত সহজে ঘটিতে পারে।

সুশ্রীবচন

স্থান এব নিযোজ্যন্তে ভৃত্যাশ্চাভরণানি চ।
নহি চূড়ামণি পাদে নূপুরং মূর্দ্ধ্নি ধার্য্যতে॥

ভৃত্য ও অলঙ্কার যথাস্থানে নিয়োগ করিবে. নূপুর মাথায় আর চূড়ামণি কেহ পায়ে ধারণ করে না।

বালাদপি গ্রহীতব্যং যুক্তমুক্তং মনীষিভিঃ।
রবেরবিষয়ে কিং ন প্রদীপস্য প্রকাশনম্॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি. বালকেরও যুক্তিযুক্ত কথা গ্রহণ করিবে—সূর্য্য যেখানে নাই সেখানে প্রদীপের কি বিকাশ হয় না?

পাত্রাপাত্র বিবেকোঽস্তি ধেনুপন্নগয়োরিব।
তৃণাৎ সংজায়তে ক্ষীরং ক্ষীরাৎ সংজায়তে বিষম্॥

গাভী তৃণ ভক্ষণ করিয়াও দুগ্ধ দান করে, কিন্তু সর্প দুগ্ধাহার করিয়াও বিষ উদ্গীরণ করিয়া থাকে। পাত্রাপাত্র [illegible] দয় হইতা হইয়া থাকে।

শনৈর্বিদ্যা শনৈরর্থানারোহেৎ পর্ব্বতং শনৈঃ।
শনৈরধ্বসু বর্ত্তেত যোজনান্ন পরং ব্রজেৎ॥

বিদ্যা ও অর্থ শনৈঃ শনৈঃই অর্জ্জন করে, পর্ব্বত ও অল্প অল্প করিয়াই আরোহণ করে, পথ চলিতেও লোক ক্রমশঃই অগ্রসর হয়।

আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিম্।
ভার্য্যাং ক্ষীণেষু বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্॥

মিত্রের পরীক্ষা আপদে, বীরের পরীক্ষা যুদ্ধে, সততার পরীক্ষা ঋণশোধে, স্ত্রীর পরীক্ষা দুরবস্থায়, আর বান্ধবের পরীক্ষা বিপদ কালে।

দীপনির্ব্বাণগন্ধং চ সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥

যাহাদের আয়ুঃশেষ হইয়াছে তাহারাই দীপনির্ব্বাণের গন্ধ পায় না, সুহৃদের কথা শুনে না আর অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে পায় না।

কবির গৃহ

নগরের উপকণ্ঠে পূর্ব্ব সীমানায়
ক্ষুদ্র এক শৈলোপরে তরু লতিকায়
বেষ্টিত নিকুঞ্জ হেন কবির কুটীর
বিরাজে সুন্দরতর! প্রভাতে মিহির
প্রথম--কনক--রশ্মি সেথায় বিলায়
দেব-নির্ম্মাল্যের সম, বিহঙ্গ জানায়
সুধামাখা সম্ভাষণ, আঁখি মেলে চায়
বিচিত্র প্রসূন দল, ধীরে বয়ে যায়
কি সুস্নিগ্ধ সমীরণ!

কবি মুগ্ধ হিয়া
মুক্ত বাতায়ন পাশে একাকী বসিয়া
চেয়ে রয় অনিমেষ! স্তরে স্তরে স্তবে
অমুন্নত গিরিশ্রেণী লীলা রঙ্গ ভরে
নেমে গেছে সমতলে স্বচ্ছ সরসীর
তরল কোমল-অঙ্কে সোহাগে গভীর
বিসর্জ্জিতে আপনায়! প্রতি শৈল স্তবে
গন্ধরাজ শেফালিকা কোলাকুলি করে
করবী অতসী সনে উঠে গো ফুটিয়া
প্রকৃতির হাসি যেন! সোহাগ মাখিয়া
সরসীর বুকে ফুটে কুমুদ কহ্লার
মধুপে ব্যাকুল করি। আনন্দে অপার
মরাল মরালী মিলি ক্রীড়া করি ফিরে
মৃণাল অন্বেষি, বুঝি! সরোবর তীরে
সারি সারি গুয়া আর কদলীর বনে
সরসীর নিরমল হৃদয় দর্পণে
মাথা নোয়াইয়া হেরে শ্যামল আনন
শ্যামল লহর তুলি'!

রাজ সিংহাসন
তুচ্ছ করি সুষমায়, চুমি' তীর ভূমি
প্রসারিত শ্যাম ক্ষেত্র রমা যেথা ঘুমি'
রহে হর্ষে বারমাস! ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী
বয়ে যায় তার পরে করুণ রাগিনী
দিবস যামিনী গাহি'! সে সুরে মিশায়ে
মাঝি ধরে সারী গান, তরী যায় বেয়ে
দূর দেশান্তর পানে! উন্মুক্ত প্রান্তর
মিশে গেছে অবশেষে সুদূরে ধূসর
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত প্রান্তে, যেথা দিগন্তলে
আলিঙ্গিয়া শৈলশ্রেণী অম্বরে অচলে
করে দিল একাকার!

আত্মহারা কবি
নিরখিয়ে অনুক্ষণ সে অপূর্ব্ব ছবি
ডুবে যেন কার ধ্যানে, অন্তর-অন্তরে
খুঁজে যেন কারে হায়! আসে চরাচরে
কত উষা, কত সন্ধ্যা, চাঁদের বাসর
বসে নভে কতবার—জ্যোছনা লহর
কবির অঙ্গনে খেলে! উদাসী পাগল
কবি মত্ত আপনাতে, হাসি-অশ্রুজল
গাঁথে শুধু আনমনে, কভু বা বীণায়
তুলে তার প্রতিধ্বনি, জগৎ মাতায়
আপনি মাতিয়ে তায়!

নিষ্ঠুর ভুবনে
স্নেহময়ী কাব্যমাতা অক্ষম নন্দনে
স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি' শত বজ্রাঘাত
সহেন হৃদয় পাতি! কবির সাক্ষাৎ
প্রত্যক্ষ দেবতা সে যে, কবি আর কারে,
জানে না মানে না কভু! চিত্ত-সুধা ধারে
কবি চিত্ত পূর্ণ করি' কবির প্রেয়সী
মূর্ত্তিমতী কল্পনার সঙ্গীত উচ্ছসি
কবিরে তুষিতে চায়! কবি ভাবে মনে
বিশ্বের সৌন্দর্য্য বুঝি বেঁধেছে গোপনে
কবির কুটীরে বাসা, ধূ ধূ সাহারায়
বিরচিয়ে কুঞ্জবন! কে বুঝিবে হায়,
নিরমম সংসারের কি কঠোর রণে
কত তীব্র সাধনার উদগ্র স্পন্দনে
পেয়েছে এ জয়মালা হোমানল হ'তে
সমুত্থিত চরু হেন!

দীর্ঘ ধরা পথে
নিরাশ্রয় নিঃসম্বল উপেক্ষা লাঞ্ছিত
আত্মীয়-স্বজন হীন, জীবিকা বর্জ্জিত,
যদিও ভিখারী কবি, তবু কোন দিন
উদার প্রেমার্ত্ত হৃদি হয়নি মলিন
ঘুচে নাই হাসিটুকু! স্নেহে জননীর,
অপার্থিব প্রিয়া-প্রেমে, নিসর্গ লক্ষ্মীর
অজস্র মাধুরী মাঝে হ'য়ে মগন
নিশি দিন আত্মহারা, অভাব কেমন,
নাহি জানে কবি কভু! ক্ষুদ্র গৃহখানি
সহস্র অমরা হ'তে শত শ্রেষ্ঠ মানি
কি আনন্দে আজি কবি আপনারে হায়
উৎসর্গিলা বাণীপদে! সিদ্ধি তপস্যায়
হবে সত্য একদিন, প্রাণের প্লাবন
রচি সেথা নবতীর্থ ভক্ত অগণন
আসিবে সে দিন লয়ে, জানাতে কেবল
ব্যর্থ নহে কভু বিশ্বে তপ্ত আঁখি জল!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

কলি মাহাত্ম্য

গরুর দুধে কুত্তা বাড়ে—বাছুর অনাহারী
বাপ্ উপসী পায়না খেতে—শালা খাবে ভারি;
ঘরের বউ সে পায় না আদর—মাথায় থাকে দাসী,
ধন্য কলি তোর তামাসা! দুখ্ লাগে আর হাসি।

(তুলসী দাস) শ্রীনরেন গাঙ্গুলী

মহত্ত্বের মূল্য

ঘাস কহে "গাছ ভাই, এ কেমন ধারা?
আমরা স্বচ্ছন্দে আছি, তুমি ঝড়ে মারা!"
—মহত্ত্বের এ দুর্গতি চিরদিন ভবে,
নতশিরে পদতলে ক্ষুদ্রেরাই রবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সে

ষ্টীমার ক্লার্ক

একুশ দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিয়া বাইশ দিনের দিন অন্নপথ্য করিয়া শীতের রৌদ্রে কৌচে বসিয়া একটু আরাম পাইতেছিলাম, এমন সময় ঝি আসিয়া ডাকের চিঠি দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম, মেজদাদা সস্ত্রীক রাজসাহী যাইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দাদা সেখানে বাগাতীপাড়া থানার বড়বাবু। বিবাহের পর নানান বিভ্রাটে শ্রীমতীকে এযাবৎ দাদা তাঁহার রাজসাহীর বাসায় লইয়া যাইতে পারেন নাই, তাই এবার আমাকে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন যে "এই অসুস্থ দুর্ব্বল শরীর লইয়া কলিকাতায় না থাকিয়া শ্রীমতী ছোটবধূকে পিত্রালয় হইতে সঙ্গে করিয়া যত শীঘ্র পার এখানে চলিয়া আসিও।" লেখা পড়ার তাড়া তেমন ছিল না, সবেমাত্র পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া দিনগুলি মাসিকের পাতা উল্টাইয়া ও থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়াই মহাসুখে কাটাইয়া দিতেছিলাম. এবার আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিবার জন্য আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। কিন্তু অছিলা অভাবে কোথাও আর যাওয়া হয় নাই। কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা যখন তেমন ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে নাই, তখনই মেজদাদা রাজসাহী যাইবার চিঠি দিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হয় নাই। যখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলাম, তখন অকস্মাৎ একদিন নিজেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যা লইলাম, আর যাওয়া হইল না।

বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দাদার চিঠির জবাব দিলাম, লিখিলাম যে আজকাল বড়ই দুর্ব্বল আছি একটু সুস্থ হইলেই ওখানে চলিয়া যাইব, ইত্যাদি। তারপর সতের দিন কলিকাতায়ই ছিলাম, কলেজ বন্ধ হইল, নিজেও একটু গা ঝাড়া দিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম এইবার রাজসাহী যাইবার উদ্যোগ করা যাক্। শ্বশুরালয় হইতে আশাকে সঙ্গে করিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং একদিন শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, তারপর দিন তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যায় আশাকে লইয়া রাজসাহী রওনা হইলাম।

ষ্টীমারে উঠিয়া স্ত্রীলোকের মধ্য শ্রেণীতে আশাকে রাখিয়া বাহির হইতেই আশা কাপড় টানিয়া ধরিল, ফিরিয়া বলিলাম—"ওকি টানচ যে ?" আমাকে আরও কাছে টানিয়া কহিল, "বেরিয়ে যাচ্চ আমাকে একলা ফেলে, ভয় করে না বুঝি ?" আমি হাসিয়া কহিলাম, "এটা যে মেয়েদের বসবার জায়গা ; আমি বসব কি করে ? ভয় কিসের ? আমি কাছেই থাকব, দরকার হলে দরোজার গায় চাবি দিয়ে শব্দ করো, চলে আসব। আশা মুখ ভার করিয়া কহিল, "একলাটি বুঝি থাকা যায় ? এখানে ত অন্য মেয়ে কেউ নেই যে তুমি থাকতে পারবে না—না, তুমি যেতে পারবে না।" বলিয়াই দরজার উপর পিঠ ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "ওরে পাগলী সে হয় নারে, লোকে কি ভাববে ?" 'না না ; কিছু ভাববে না লোকে, তোমাকে থাকতেই হবে। এমন সময় দরোজার উপর মৃদু আঘাত পড়িল, আশা সভয়ে আমার কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল "কৈ ও !" কহিলাম, "ওখানে বসে থাক, ভয় কি ? বোধ হয় অন্য কেউ মেয়েছেলে নিয়ে এসেছে" বলিয়া দরোজা খুলিতেই একটি তরুণী একটি বালকের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি নিঃশব্দে পাশ কাটিয়া বাহির হইয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিলাম, ভালই হইল আশার জোড়া মিলেছে এখন আর বোধ হয় আমাকে প্রয়োজন হবে না। আশাকে রাখিয়া আসিয়া বয়লারের কাছে একটু সুবিধা মত স্থান খুঁজিয়া কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। কখন যে ঘুমাইয়া পড়েছিলাম জানি না, কিন্তু যখন জাগিলাম, দেখিলাম ষ্টীমার নদীবক্ষে পূর্ণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, অদূরে আমার বালক ভৃত্য নারায়ণ রেলিং ধরিয়া নদীর দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি উঠিয়া বসিতেই নিকটে আসিয়া কহিল—"আমার টিকিস্ আনলেন না বাবু ?" তাহার জন্য হাফ টিকেট কিনিয়া ছিলাম, চেক করিবার সময় কেরানী সেটা নিয়া গিয়াছিল, ফিরাইয়া দেন নাই। "হাঁ তুই এখানে থাকিস" বলিয়া নীচের ডেকে নামিয়া গেলাম। যে কামরাটায় কেরানী থাকে, সেটাকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম, কিন্তু দেখিলাম দরোজা বন্ধ রহিয়াছে। দরোজায় ধাক্কা দিয়া ডাকিলাম "কেরানীবাবু দরোজা খুলুন।" কিন্তু কেহই দরোজা খুলিল না। আবার দরোজায় করাঘাত করিয়া ডাকিলাম, "দরোজা খুলুন, প্রয়োজন আছে।" যেমন দরোজা তেমনই রহিল, কেহই খুলিয়া দিতে আসিল না, বড়ই রাগ হইল, কেমন ভদ্রলোক সে! দৃঢ়মুষ্টিতে দরোজায় আঘাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে

হাঁকিলাম, "দরোজা খুলুন মশাই! প্রয়োজন আছে।" ভাঙ্গা গলায় ভিতর হইতে জবাব আসিল—কে? উত্তেজিত হইয়া কহিলাম "আধ ঘণ্টা ধরে চিৎকার কচ্ছি, শুন্‌তে পাননি? একটা হাফ টিকেট আছে, সেটা দিতে হবে।" 'ওঃ'—বলিয়া দরোজা খুলিয়া কেরানী কহিল, "আসুন, এখানে।" ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, অতি ক্ষুদ্র একটি টেবিলের উপরে কতগুলি অর্দ্ধছিন্ন টিকেট ছড়ান রহিয়াছে, আর তারই এক পার্শ্বে সেই S. C. অক্ষর চিহ্নিত টুপিটি পড়িয়া রহিয়াছে। আমার টিকেটখানা বাহির করিয়া আমার কাছে আসিয়া কেরানী কহিল, "এই নিন আপনার টিকেট।" হাত বাড়াইতেই তাহার সঙ্গে আমার একবার চোখোচোখি হইয়া গেল। তাহার চক্ষে উচ্ছ্বসিত অশ্রু দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। এমন কি কারণ হইতে পারে যাহার জন্য এই ষ্টীমার কেরানী তাহার ক্ষুদ্র কক্ষটিতে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিল? ষ্টীমারের পনর টাকার কেরানী ও ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার এই দুইটি জীবকেই আমি পছন্দ করিতাম না। পছন্দ না করিবার কারণও যথেষ্ট আছে; তাহারা তাহাদের ক্ষমতার কোন হিসাব রাখে না, নির্ব্বিচারে ছোট বড় সবাইয়ের মাথায় ছড়ি ঘুরাইয়া চলিতে চাহে, এইটেই তাহাদের প্রধান দোষ, এবং এদোষ অমার্জ্জনীয়। কিন্তু এই কেরানীটিকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। ঐ যে তাহার চক্ষুর কোণে দুই ফোটা জল দেখিয়াছিলাম, কি যেন কেন সেই তুচ্ছ দুই ফোটা জলই আমার হৃদয়ের বহুদিনের বিদ্বেষ ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ করিয়া তাহারই দিকে সমগ্র অন্তঃকরণটাকে ব্যথার কানায় কানায় পরিপূর্ণ করিয়া উন্মুখ করিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "মশায়ের নাম জিজ্ঞেস করতে পারি কি?" লোকটা একবার করুণ-নেত্রে আমার দিকে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "নৃত্যলাল গাঙ্গুলি",—বলিয়া খোলা জানালার মধ্য দিয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল, আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার কি কোন অসুখ করেছে?" লোকটা যেমনভাবে দাঁড়াইয়াছিল তেমন ভাবে দাঁড়াইয়াই কহিল, "কি করে বুঝলেন?" বলিলাম, "আপনার মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হয় আপনার কোন অসুখ করেছে, বোধ হয় আমার অনুমান ভুল হয় নি।" লোকটা কথা কহিল না। কেবলমাত্র একবার মাথা নিচু করিয়া কোঁচার খুঁটে মুখ চোখ মুছিয়া ফেলিল। বুঝিলাম সে কাঁদিতেছে, কহিলাম "মনে বোধ হয় কোন আঘাত পেয়েছেন?" সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, সে যে কাঁদিতেছিল, তাহা স্পষ্টই দেখিলাম, কহিল "আঘাত! না, তা পাইনি। শরীর ভাল নেই অসুখ করেছে, দয়া করে আমাকে একটু একলা থাকতে দিন, ঘুমোব।" বলিয়া দরোজা ধরিলেই আমি বাহিরে আসিলাম।

উপরের 'ডেকে' উঠিতেই সে ছুটিয়া আমার নিকট আসিয়া কহিল, "একবার নীচে চলুন," আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "নীচে কেন?" সে আমার ডান হাতটি চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"আজ আর মিথ্যে বলে পাপের বোঝা আরও ভারী কর্‌তে চাইনে। আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আঘাত পেয়েচি কিনা, হাঁ তা অতি বড় আঘাতই পেয়েছি; যা'তে মন প্রাণ ভেঙ্গে চুরে ধসে গিয়েছে। ভেবেছিলুম কাউকে বলব না, কিন্তু শেষের দিনে আজ আপনাকে সব কথা প্রাণ খুলে শোনাতে ইচ্ছে হচ্চে। সে সব কথা এই বুকের মাঝে জমাট বেঁধে পাহাড় হয়ে আছে। মনে পড়লে আগ্নেয়গিরির মতন অগ্ন্যুৎপাত হয়, আজকে আর কোন ভয় নেই, সে গৈরিক নিস্রাবে আজ নিজকে তলিয়ে দেব ভেবেই প্রাণ খুলে সব কথা আপনাকে শোনাতে চাই।" আমি এই অশিক্ষিত কেরানীটির মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিলাম। সে চক্ষে এখন আর অশ্রু নাই, কিসের উত্তেজনায় যেন বিস্ফারিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আমাকে কথা কহিবারও অবসর না দিয়া একটা হাত ধরিয়া সে আমাকে নীচের 'ডেকে' তাহার কামরায় টানিয়া লইয়া গেল। দরোজা বন্ধ করিয়া সে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সে কোন কথা কহিল না, তারপর একটা চাপা-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "একটা গল্প শুনবেন?" আমি কহিলাম "কিসের গল্প?" লোকটা কহিল "বড় দুঃখের গল্প, সে গল্পের প্রতি অক্ষরে অশ্রু সঞ্চিত রয়েছে। শুনবেন ত?" "বলুন।" লোকটা বলিতে লাগিল,—"এম এ পরীক্ষার দু'মাস আগে নৃত্যলালের বাবা মারা গেলেন, মা-ও তার বছরখানেক আগে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। বিধবা পিসিমা, স্ত্রী হেমপ্রভা

এবং কন্যা কল্যাণী ছাড়া নৃত্যলালের সংসারে আর কেউ রইল না। এম, এ পরীক্ষা আর দেওয়া হল না, সংসারে চৌদ্দ আনা অভিভাবকহীন ধনী সন্তানের যে অবস্থা ঘটে, পিতার মৃত্যুর পর নৃত্যলালেরও সেই অবস্থা ঘটল। দেখতে দেখতে তার বৈঠকখানা ইয়ারদলে ভ'রে উঠল। ক্রমে সে অন্দর ছেড়ে বৈঠকখানায় রাত কাটাতে সুরু করলে। তারপর বৈঠকখানা ছেড়ে বাহিরেই রাত কাটাতে লাগল। পিসিমা সকল বুঝে বিপদ গণিলেন, হেমলতা অনুনয় করতে এসে চক্ষের জলে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। শনির দৃষ্টি পড়লে লোক যেমন ভিটে ছাড়া, গ্রাম ছাড়া পর্য্যন্ত হয়, নৃত্যলাল তেমনি একদিন স্ত্রী কন্যা বাড়ী ঘর সব ছেড়ে কোথায় উধাও হ'য়ে চলে গেল। কত দিনে শোনা গেল পশ্চিমের একটা সহরে একটা নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোক লইয়া নৃত্যলাল দিন কাটাচ্ছে। শুনে হেমলতা স্বামীর নিকট ছুটে এল,—অনেক কাঁদল অনেক অনুনয় করিল। কিন্তু নৃত্যলাল স্ত্রীর দিকে ফিরেও চাইলে না। সেদিন সারাটাদিন হেম অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে রইল, নৃত্যলাল একবারটি চোখের দেখাও দেখলে না",—

কহিতে কহিতে তাহার গলা ধরিয়া আসিল, লোকটা চুপ করিয়া নিজের উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া কহিল—"আপনি পরকাল মানেন?" কহিলাম, "না মেনে উপায় কি? আগে মানতুম না, এখন মানি।" "আচ্ছা আপনি নরক বিশ্বেস করেন?" আমি কহিলাম, "না, নরক বলে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না", সে কহিল "নরক যদি না থাকবে ত পাপীর শাস্তি হবে কোথায় বলুন দেখি?" কহিলাম, "মানুষ যে পাপ করে তার শাস্তি সে ইহজন্মেই ভোগ করে যায় এই আমার বিশ্বাস, নরক বলে যে কিছু আছে সে আমার বিশ্বাস হয় না।" খানিক সময় চুপ করিয়া থাকিয়া লোকটা বলিল, "তাই হবে, বুঝতেই ত পারছি। নরকে শুনেছি আগুনের কুণ্ডে পাপীকে পুড়িয়ে মারে। তা'তে মারছেই, এই যে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে" বলিয়া তাহার বুকের উপর দুইহাত চাপিয়া ধরিল। আমি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তারপর দশমিনিটের মধ্যে সে কোন কথা কহিল না। দুই বাহু বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নিমীলিতনেত্রে মাথা নীচু করিয়া কি যেন ভাবিয়া রহিল। তার পর কহিল, "হাঁ, সব ত বলা হয়নি, কোন পর্য্যন্ত বলেছি বলুন দেখি" আমি বলিলাম, "ওই যে হেমলতা মূর্চ্ছা গেল, তার স্বামী তাকে একটিবারও দেখা দিলে না।" "হাঁ, তারপর শুনুন, সারাদিন এইভাবে কেটে গেল, রাত্রে নৃত্যলাল সে বাড়ী ছেড়েও পালিয়ে গেল, হেম বাড়ী ফিরে এসে স্বামীর শেষ চিহ্ন কল্যাণীকে বুকে চেপে চক্ষের জলে দিনগুলি কাটাতে লাগল।"

"তারপর আট বছর কেটে গেল, এই সুদীর্ঘ আট বছরের মাঝে হেম স্বামীর কোন সংবাদ পায়নি, হঠাৎ একদিন শীতের সন্ধ্যায় নৃত্যলাল অশেষ রকম কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্থ ভগ্নস্বাস্থ্য দেহটা নিয়ে দেশের কাছে ফিরে এল, পিসিমা ছুটে এসে নৃত্যর মাথায় মুখে পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন, রাত্রে হেম কাঁদল না কাটল না স্থির ধীরভাবে স্বামীর কাছে গিয়ে বলল,—"শরীর বড় রোগা দেখছি যে।"—নৃত্য জবাব দিল—'অসুখ'—তারপর একে একে সেই আট বছরের সকল কথা হেম স্বামীর কাছ থেকে আদায় করে নিল। তার দিন তিনেক পরে একদিন হেম স্বামীর কাছে গিয়ে বলল, "এখন চল!" নৃত্য জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"—হেম জবাব দিল, "পুরী যেতে হবে চেঞ্জে, তোমার শরীরে কি আছে দেখ দিকি একবার—"

নৃত্যলাল বিনা আপত্তিতে একদিন সন্ধ্যায় স্ত্রী-কন্যাসহ ষ্টীমারে উঠিলেন, ইচ্ছা গোয়ালন্দ লাইনে কলকাতা গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে পুরী রওনা হবে। সেদিন ছিল ১৩১৬ সনের আশ্বিন মাস। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আকাশে একটু মেঘ করে এসেছিল, রাত্রিতে সারা আকাশে মেঘের উপর মেঘ জমাট বেঁধে উঠল তারপর ঝড় উঠল, ষ্টীমার তখন "নরিয়া" ষ্টেশন ছেড়ে সবে মাত্র পদ্মার মাঝে এসে পড়েছিল। সেই ভীষণ ঝড়ে ষ্টীমার বাঁচান দায় হয়ে উঠল। অসংখ্য যাত্রীর কাতর আর্ত্তনাদ ঝড়ের প্রমত্ত গর্জ্জনে ডুবে গেল। তারপর এক সময়ে সব শেষ হয়ে গেল। নৃত্যলাল এক হাতে স্ত্রী অন্য হাতে কন্যার হাত ধরে পদ্মার বুকে ঝাঁপ দিল। নৃত্য শীঘ্রই দুর্ব্বল হয়ে পড়ল দেখে হেম নিজেকে স্বামীর বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত করিয়া কহিল,—"কল্যাণীকে দিয়ে গেলুম, ওকে দেখো, ভালবেসো, সৎপাত্রে বে দিও, আর আমি এগিয়ে রইলুম! শাস্ত্র যদি সত্য হয় তবে তোমায় আমায় আবার দেখা হবে—" আর বলতে পারল না একটা পাহাড় প্রমাণ ঢেউয়ের নীচে সে তলিয়ে গেল।

কতক্ষণ সে নদীরদিকে চাহিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। সহসা আবার আমার দিকে ফিরিয়া কহিল,—"অনেক সময় বসিয়ে রাখলুম বলে কিছু মনে করবেন না, ক্ষমা চাচ্ছি।" আমি বলিলাম, "ওকি বলছেন, আমি নিজেই যে গল্প ভালবাসি, একবার গল্প পেলে আর উঠতে ইচ্ছে হয় না। হাঁ, ওর শেষটায় কি হল তা ত বল্লেন না। নৃত্যলাল আর তার মেয়ে কি বেঁচেছিল না হেমলতার মত ডুবেই মারা গেল।" লোকটা বলিল,—"হাঁ সে বেঁচেছিল, মেয়েকে বুকে জড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন চোখ মেললে, দেখলে জেলেদের নৌকায় শুয়ে আছে, আর কল্যাণী কাছে বসে কাঁদছে। তারপর নৃত্যলাল সেখান থেকে বাড়ী চলে আসে, সে যদি নাই বাঁচত ত তার পাপের শাস্তি ভোগ করত কি করে? সেই হতে সারা জীবনটা ত সে তিল তিল করে পুড়েই মচ্ছে। তখন যদি মরে যেত, তাহলে হয়ত নরকেও এমন যন্ত্রণা সে পেতনা যেমনটি সে বেঁচে থেকে পাচ্ছে। যাক্ বাড়ী গেলে পিসিমা আবার বে'র যোগাড় করলেন কিন্তু নৃত্য আর বে করলে না। কন্যাকে লইয়া দিন কাটাতে লাগল। তার পর মাস তিনেক পরে একদিন পিসিমার হাতে হাতে কন্যাকে দিয়ে নৃত্য বলল,—"ওকে দেখো পিসিমা, আমি চাকরী নিয়ে চল্লুম।" পিসিমা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—"কি চাকরী?" নেত্য জবাব দিল, "ষ্টীমারের কেরাণী হয়ে যাচ্ছি পিসিমা।" তিনি অবজ্ঞা ভরে বল্লেন,—"আরে রাম, ভদ্রলোকে কি ষ্টীমারের কেরাণী হয় নেত্য? তুই যে তিন তিনটে পাশ দিয়েছিস্, তোর চাকরী দিয়ে কি হবেরে বাবা? তোর যে সিন্দুক ভরা টাকা রয়েছে।" নৃত্য হেসে বল্ল,—"সিন্দুকে যে টাকা রয়েছে সে ত আমার নয় পিসিমা, ও সব কল্যাণীর আমি ওর একটি পয়সাও ছুঁতে পারছিনে।"

পিসিমাকে প্রণাম করে কন্যার মাথায় ও কপালে চুম্বন স্পর্শ করে নৃত্য ঘরের বাহির হয়ে গেল। সেই হতে সে এই মাদারীপুর সার্ভিসে কেরাণী হয়ে এল, এই যে কামরা দেখ্চেন এইখানে এই জানালার সম্মুখে বসে বসে সে কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিয়েছে। 'নরিয়া' ষ্টেশনের পর থেকেই সে তার হেমের প্রেতমূর্ত্তি দেখতে পেত, দেখত হেম যেন নদীর উপর দিয়ে ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ গতিতে ছুটে চলেছে! রোজ সে এই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেছে, একদিনও বাদ যায় নি, আজ দু'মাস হ'ল সে ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে গিয়েছিল মেয়ের বে দিতে, সকল ঐশ্বর্য্য লুটিয়ে মেয়েকে সৎপাত্রস্থা করে, স্ত্রীর অন্তিমকালের শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে আজ তিন দিন হল সে আবার ফিরে এসেছে। হেম বলেছিল যত শীঘ্র পার চলে এসো। সে ত এখন বেশ তার হেমের কাছেই ফিরে যেতে পারে।"

এমন সময় আমার বালক ভৃত্য আসিয়া ডাকিল,—"কতক্ষণ নেমে এসেছেন, উপরে চলুন, বৌঠাকরুণ ডাক্‌ছেন।" আমি উঠিয়া কহিলাম,—"নমস্কার, তবে আসি মশাই, বড় কষ্ট পেলাম, আপনার গল্প শুনে।" সেও প্রতিনমস্কার করিয়া জানালার কাছে গিয়া দাড়াইল। দেখিলাম তখনও তাহার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে।

উপরে আসিয়া নিজের বিছানায় বসিতে যাইতেই নারায়ণ কহিল—"মা ডাকৃচে যে।" কহিলাম "ওখানে আরও মেয়েলোক রয়েচে, যাব কি করে? কেন ডাকৃচে জিজ্ঞেস করে আয়।" নারায়ণ কহিল "কেউ নেই, তারা নেমে গেছে।" আমি যাইয়া দেখিলাম আশা রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া নদীর দিকে মুখ করিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছে। আমি কামরায় ঢুকিতেই সে ফিরিয়া কহিল "বেশ লোক যা হোক্, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" বলিলাম—"নীচে গল্প শুনছিলুম।" অভিমানের সুরে আশা বলিল, "গল্প ত' একটা আমরাও জানি, ঘণ্টা দুই ধরে নীচে বসে না থাকলেও চলত।" কহিলাম, "না আশা, তেমন গল্প শুনলেই হয়, সত্যি ঘটনা, বড় দুঃখের ঘটনা, শুনতে শুনতে চক্ষে জল আসে।" আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল—"সত্যি ঘটনা? কি হয়েছে বলনা।" আমি একে একে ঘটনাটা বলিলাম, একথাও বলিলাম যে সেই নৃত্যলাল এই ষ্টীমারেই আছে। সেই কেরাণী, তার কাছ থেকেই এই গল্প শুনিয়াছি। দেখিলাম আশা আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতেছে। সে রাত্রির গভীর অন্ধকার যেন শোকাচ্ছন্ন হইয়া আরও গভীর হইয়া আমাদের চতুর্দ্দিকে জমাট বাঁধিয়া উঠিল। আশা রেপারটা মুড়ি দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে আমি নিজের বিছানায় ফিরিয়া আসিয়া ঐ মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

* * * *

রাত্রি তখন প্রায় চারিটা। হঠাৎ নীচের ডেকে খালাসী-

দের চীৎকারে জাগিয়া উঠিলাম। ব্যস্ত হইয়া সকলে নীচে নামিয়া গেলাম। সেখানে গিয়া একটা খালাসীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "বাবু, নয়িয়া ষ্টেসন হতে যে সব যাত্রী উঠেছিল তাদের টিকেট চেক করে কেরানী বাবু ঐ 'গাংমারী'র কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছিল, কামরায় ফিরে যায়নি, ষ্টীমার পদ্মার মাঝামাঝি এলে হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠে নদীর ভিতর লাফিয়ে পড়েছে।" আমি দৌড়াইয়া সেইখানে গেলাম, কিন্তু কিছু দেখিলাম না, শুধু প্রভাতি তারার অস্পষ্টালোকে পদ্মার ফেনিল উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইল, আর কিছু দেখা গেল না। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "লোকটা গরীব, মেয়ের বে' দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, তাই আত্মহত্যা করল।" কিন্তু আসল কথাটা আমি ছাড়া বোধ হয় এসংসারে আর কেহই জানিতে পারিবে না। অলক্ষ্যে আমার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। উপরে আসিতেই আশা ডাকিয়া পাঠাইল। আশা কহিল—"নীচে অত গোলমাল কিসের?" আমি কহিলাম, "সেই যে নৃত্যলালের কথা বলেছিলাম সে ষ্টীমার থেকে নদীর মাঝে লাফিয়ে পড়েছে।" আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বেঁচেছে ত—কে উঠালে তাকে?" আমি কহিলাম—"বেঁচেছে স'ত্যি কিন্তু কেউ উঠাতে পারেনি, এ যে পদ্মার মাঝখানটা।" আশার চক্ষু সজল হইয়া আসিল, ধরা গলায় কহিল, "তবে বাচল কি রকম?" বলিলাম, "শেষ জীবনটা অনুতাপের আগুনে পুড়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, সংসারের হিসেব নিকেশ বুঝিয়ে দিয়ে পরলোকে প্রতীক্ষমানা পত্নীর সঙ্গে এমন করে মিলিত হয়ে সে নিজের অসংযত মন ও কলুষিত চরিত্রের হাত হ'তে নিজকে রক্ষা করেছে সে মরেনি—সে বেঁচেছে। এ মরণকে আমি মরণ বলিনে, এ যে মস্ত বড় বাঁচোয়া।" আশা কাঁদিতেছিল, সে ধীরে ধীরে আমার বুকের কাছে মুখ রাখিয়া চক্ষু বুজিল, কহিল, "আজ আর কোথাও যেতে পাবে না তুমি আমাকে ফেলে।" বলিয়া আমার ডান হাতটা তাহার ক্ষুদ্র দুইটি হাতের মধ্যে সজোরে চাপিয়া ধরিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

বঙ্গমাতা

(সঙ্গীত)

'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' অমল কিরণ রঙ্গ,
প্রণমি জননী জনমভূমি মোদের সাধের বঙ্গ।

মৃদুল মধুর মলয়মন্দ কুসুম গন্ধ লুটিয়া,
কুঞ্জ কুটীর দুয়ারে যাহার বহেরে বিহ্বল হইয়া,
নিত্য মুখরিত যাহার ভবন বিহগ কাকলি গানে
শশী তারকা খচিত যাহার নীলিম নভ-বিতানে,
ভূধর অর্ণব মহিম মণ্ডিত পাইয়া যাহার সঙ্গ,
প্রণমি জননী জনমভূমি মোদের সাধের বঙ্গ।

রাজর্ষি ঋষির পরশে যাহার পবিত্র হইল গেহ,
গঙ্গা যমুনার পুণ্য প্রবাহে শুদ্ধ করিল দেহ,
শাস্ত্র আলাপনে কাব্য ঝঙ্কারে ধ্বনিল যাহার কুঞ্জ,
শিল্প-বাণিজ্যের গৌরব গাহিল যাহার বিপণী পুঞ্জ,
যতনে রতনে সুসন্তানগণে সাজাল যাহার অঙ্গ,
প্রণমি জননী জনমভূমি মোদের সাধের বঙ্গ।

পাপীর দুঃখেতে গলিয়া যেথায় উদিলা নিমাই চাঁদ,
মুক্ত করিলা মোক্ষ দুয়ার দিয়ে সবে হরিনাম,
চণ্ডীদাস জয়দেব যেথা বাদিলা বাণীর বীণা,
প্রতাপ হুঙ্কারে কাঁপিল যেথানে ভয়েতে দিগঙ্গনা,
(যেথা) পঞ্চদ্বিজে স্থাপিয়া বল্লাল রাখিলা কীরতি তুঙ্গ,
প্রণমি জননী জনমভূমি মোদের সাধের বঙ্গ।

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়

রামায়ণের সমসাময়িক ভারতবর্ষ

(৫ম বর্ষ মালঞ্চের ৮৪৮ পরে)

অসবর্ণ বিবাহ

রামায়ণের যুগে দেবতা (স্বর্গ বা মধ্য এসিয়া নিবাসী আর্য্য) মনুষ্য (ভারতীয় আর্য্য) রাক্ষস (দাক্ষিণাত্য নিবাসী কৃষ্ণবর্ণ দ্রাবিড় জাতি), দানব (পশ্চিম এসিয়ার অধিবাসী) প্রভৃতি নানাবিধ মৌলিক জাতির মধ্যে যে কন্যার আদান প্রদান চলিত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি (*১)। যাঁহারা বিভিন্ন প্রকার মৌলিক জাতির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, তাঁহারা যে আবশ্যক মত চাতুর্ব্বর্ণ্যবিধান অতিক্রম করিয়া যৌন সম্বন্ধ স্থাপনে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। রাক্ষসোপদ্রুত তৎকালিন আর্য্য-সমাজে যাহাতে প্রজাবৃদ্ধি হয়, প্রজাপতিদিগের বিধানাবলী তদনুকূলই ছিল। তখনও আর্য্য সমাজপতিগণ ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন অনুমোদন করেন নাই, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের বহুল প্রচলন করিয়া দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপায় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণ কুলীনগণ যেমন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণকে কন্যাদান না করিলেও তাঁহার কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি করেন না, বরং এরূপ সম্বন্ধ সন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন, রামায়ণের যুগে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ লোকেও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কন্যা-দিগকে তদ্রূপ অকুণ্ঠিতচিত্তে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিতেন। এরূপ অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তানগণ প্রায়ই পিতৃজাতিত্ব প্রাপ্ত হইত। তাই "ঋচীক" মুনির (ভৃগু মুনির) ঔরস পুত্র "জমদগ্নি", বিশ্বামিত্রের ভগিনী সত্যবতীর (কৌশিকীর) গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। ব্রহ্মণ্যাভিজাত্যের অবতার স্বরূপ পরশুরাম এই সঙ্কর জমদগ্নিরই পুত্র। আবার বিশ্বামিত্রের পিতৃস্বস্গণ যে কাম্পিল্যরাজ ব্রহ্মদত্তের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন, সেই রাজা "ব্রহ্মদত্ত" "চূলী" নামক জনৈক ব্রহ্মর্ষির পুত্র। ব্রহ্মর্ষি "চূলী"র "সোমদা" নাম্নী গন্ধর্ব্ব জাতীয় ভার্য্যার গর্ভে জন্ম হইয়াছিল। "কুশ" বংশ তৎকালে মহাকুলীন ক্ষত্রিয় রাজবংশ ছিল। অসবর্ণ বিবাহ নিন্দনীয় হইলে ঐ বংশজাত মহারাজ "কুশনাভ" কদাপি সঙ্কর ব্রহ্মদত্তের হস্তে কন্যাগণকে সমর্পণ করিতেন না, অথবা মহর্ষি "ঋচীক"ও ক্ষত্রিয় কন্যা "সত্যবতী" কে পরিণীত ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতেন না। (আদিকাণ্ড ৩৩ ও ৩৪শ সর্গ)। ক্ষত্রিয়দ্বেষী দাম্ভিক পরশুরাম উক্ত কালে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রশিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে আক্রমণ করিলে বিনয়াবতার রামচন্দ্র নতমস্তকে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

> "ব্রাহ্মণোঽসীতি পূজ্যো মে বিশ্বামিত্র কৃতেন চ।
> তস্মাচ্ছক্তো ন তে রাম মোক্তুং প্রাণহরং শরম্॥"

অর্থাৎ, একে তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার পূজ্য, দ্বিতীয়তঃ তুমি বিশ্বামিত্রের ভগিনী পৌত্র, অতএব তোমার প্রতি প্রাণ নাশক শর আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

(আদিঃ ৭৬ তম সর্গ

কেবল ব্রাহ্মণ নহেন ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গও অন্যশ্রেণী হইতে কন্যা গ্রহণে সঙ্কুচিত হইতেন না। সূর্য্যবংশী মহারাজ "সগর" পক্ষীশ্বর বৈনতেয় সুপর্ণের ভগিনী "সুমতি" কে বিবাহ করিয়াছিলেন, (আদি ৩৮ শ সর্গ এবং এই সুমতিনন্দনগণই পরে "কপিল" শাপে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ দশরথেরও নানাজাতীয়া পত্নী উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল বিবাহের জন্য তাঁহাদের কোনও কলঙ্ক হয় নাই। মহাভারতের সময় ক্ষত্রিয় রাজন্য বর্গের বিবাহ ক্ষেত্রের পরিধি আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) মাত্রেরই এই প্রকার "অনুলোম" বিবাহের দ্বার অবারিত ছিল। ইহাতে তাঁহাদের দ্বিজত্ব বা তপস্যার অধিকারাদি নষ্ট হইত না।

*১ মালঞ্চের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের মালঞ্চ দ্রষ্টব্য।

যে অন্ধ মুনির পুত্র হত্যা করিয়া দশরথ ভীষণ শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই অন্ধমুনি বৈশ্যজাতীয় এবং তৎপত্নী শূদ্রকন্যা ছিলেন। যখন "শব্দভেদী" বাণে আহত মুনি-পুত্রকে দেখিয়া দশরথ ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়েন, তখন ঐ মুনিপুত্র দশরথ রাজাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন -"আমি ব্রাহ্মণ নহি"—পরন্তু

"শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ।"

(অযোধ্যা ৬৩ শ সর্গ)

"আমি শূদ্রা গর্ভোৎপন্ন পুত্র।" ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে তৎকালে দ্বিজাতি অনেকেই অসবর্ণ বিবাহ করিতেন। এ সময়ে ক্ষত্রিয়গণ উন্নত হইয়া সর্ব্ব বিষয়েই ব্রাহ্মণগণেরই সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। শূদ্রতপস্বীর বিচার কালে বশিষ্ঠ, জাবালি, মৌদ্গল্যাদি ঋষিবর্গ রামের নিকট চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম বর্ণন প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন—

"ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং যৎপূর্ব্বমবরঞ্চ যৎ,
যুগয়োরুভয়োরাসীৎ সমবীর্য্য সমন্বিতম্।" ১৪

(উত্তরকাণ্ড ৭৪তম সর্গ)

"পূর্ব্বে তপস্যা ও বীর্য্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় হীন থাকিলেও বর্ত্তমান ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি কি তপস্যা কি বাহুবল সর্ব্ববিষয়েই সমান।"

জাতিভেদ—

বিবাহাদি ব্যাপারে আদান প্রদান থাকিলেও ক্ষত্রিয়ের এই উন্নতি ব্রাহ্মণবর্গ বড় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন বলিয়া বোধ হয় না, বরং অনেক সময়ে যে তাঁহারা রোষ-কষায়িত লোচনে এই উদীয়মান ক্ষত্রজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, বশিষ্ঠ বংশের নিকটে বিশ্বামিত্রের এবং পরশুরামের নিকটে শ্রীরামচন্দ্রের লাঞ্ছনাই তাহার প্রমাণ। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত স্বর্গার্থী ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে বিশ্বামিত্রের পৌরোহিত্য গ্রহণ, দেব-ঋষিগণ কর্ত্তৃক ত্রিশঙ্কুর স্বর্গচ্যুতি, অম্বরীষ রাজার যজ্ঞীয়পশুরূপে গৃহীত ভাগিনেয় শুনঃশেফকে পুরোহিতগণের কবল হইতে রক্ষা ইত্যাদি পৌরাণিক ঘটনাগুলি তৎকালীন হিন্দুসমাজের জাতি দ্বেষের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করে। পুরুষকারের অবতার স্বরূপ বিশ্বামিত্র বা শ্রীরামের প্রতিই যখন এইরূপ ব্যবহার, তখন "শূদ্রতাপসের" প্রতি যে অনধিকার চর্চ্চার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রাজনৈতিক কারণে নিষাদ গুহক বা পক্ষী অভিহিত অনার্য্য সর্দ্দার "জটায়ু"র সহিত মৈত্রী স্থাপনে আপত্তি না থাকিলেও ত্রেতা যুগে দ্বিজাতিগণ শূদ্রের প্রতি কোনও সামাজিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। রাবণোৎপীড়িতা জানকী অশোক বনে অবরুদ্ধা থাকিয়া এক সময়ে মনে মনে ভাবিতেছিলেন,— * * *

"নৈবাস্তি নূনং মম দোষ মত্র,
বধ্যাহমস্যা প্রিয়দর্শনস্য;
ভাবং ন চাস্যাহমনু প্রদাতুং
অলং দ্বিজো মন্ত্রমিবা দ্বিজায়।

(সুন্দর ২৮শ সর্গ)

"এই অপ্রিয়দর্শন রাবণ নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করিবে। সুতরাং মৃত্যু হেতু আমায় আত্মহত্যার পাপ হইবে না। ইহাকে আত্ম সমর্পণ করিলে প্রাণ রক্ষা হয় বটে, কিন্তু দ্বিজগণ যেমন অদ্বিজ (শূদ্র) কে কখনও মন্ত্র দান করিতে পারে না, আমিও তেমনই আমার হৃদয় ইহাকে প্রদান করিতে পারি না।"

এ সময়ে বৈশ্যগণ হীনদশায় ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বৈশ্য অন্ধমুনি অজ্ঞাত বনপ্রদেশে অজ্ঞাতভাবে থাকিয়াই তপস্যা করিতেন। মুনি সমাজে তাঁহার পরিচয়ও ছিল না। কেবল দশরথ কর্ত্তৃক হতপুত্র হইয়াই ইনি লোকসমাজে পরিচিত হন। কেননা এ সময়েও ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যর তপশ্চর্য্যায় অনুমোদন করেন নাই। বরং সমাজ পতি ঋষিগণের মুখে শুনিতে পাই যে,—

"ত্রেতা যুগে চ বর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ যে।
তপোহতপ্যন্ত তে সর্ব্বে শুশ্রূষা মপরে জনাঃ॥ ২০
স্বধর্ম্মঃপরমস্তেষাং বৈশ্যশূদ্রং তদাগমৎ।
পূজাঞ্চ সর্ব্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্বিশেষতঃ॥ ২১

(উত্তরঃ ৮৭ তম সর্গ)।

অর্থাৎ—"ত্রেতাযুগে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞাদি দ্বারা শুদ্ধমনা হইয়া তপস্যা করিতেছেন। বৈশ্যশূদ্রগণ এই দুইজাতির সেবায় নিযুক্ত আছেন। ইহাই বৈশ্য শূদ্রের স্বধর্ম্ম, সুতরাং শ্রেষ্ঠকার্য্য, বিশেষতঃ শূদ্রের পক্ষে ইহা পরমধর্ম্ম।" তবে সুখের বিষয় এই যে তদানিন্তন সমাজ-

পতিগণ কাহারও জন্যই অনন্ত নিরয়ের বন্দোবস্ত করেন নাই। যুদ্ধে রত ক্ষত্রিয়দিগের "পরাবিদ্যায়" অভূতপূর্ব্ব উন্নতি দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, মানবমাত্রেই অনন্ত উন্নতির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং অনুকূল অবস্থায় ক্রমে হীনজাতির মধ্যেও ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হয়। তাই তাঁহারা ত্রেতার শেষঅংশে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে—

"অস্মিন্ দ্বাপর সঙ্খ্যাতে তপো বৈশ্যান্ সমাবিশৎ॥ ২৫
এবং—"ভবিষ্যচ্ছূদ্র যোন্যাং হি তপশ্চর্য্যা কলৌ যুগে। ২৭
(উঃ কাঃ ৮৭তম সর্গ)

অর্থাৎ—বৈশ্যগণ দ্বাপর যুগে এবং শূদ্রগণ কলিযুগে তপস্যা করিতে পারিবে

"গাঁয়ের যুগী ভিক্ পায় না"—এ নীতি সকল কালেই বলবৎ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই আমরা দেখিতে পাই ভারতীয় অন্ত্যজ শ্রেণী বৈদেশিক অতি হীন লোক অপেক্ষাও সমাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হয়। আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ উচ্চশ্রেণীর নিকটে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তদপেক্ষা সম্মানজনক ব্যবহার পাইয়া থাকে। তাই চিন্তাশীল সমাজ-হিতৈষী গাহিয়াছেন — "নন্দ কামায় না শ্রোত্রীয়ের নাপিত, মুসলমান কামা'তে পারে।" বোধ হয় রামায়ণের যুগেও হিন্দু সমাজপতিগণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে এই দোষে দোষী ছিলেন। এজন্যই তখন অনেক দৈত্য, রাক্ষস বা গন্ধর্ব্বাদি জাতীয় তীক্ষ্ণদর্শী বীরপুরুষ তপস্যাদি দ্বারা দেবতা বিশেষকে সন্তুষ্ট ও নিজ পক্ষাবলম্বী করিয়া স্বকার্য্য সাধনের সুবিধা করিয়া নিয়াছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বহির্ভূত ছিলেন বলিয়া শূদ্রতাপস শম্বুকের মত অনধিকার চর্চ্চার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন নাই!

যাগ, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যাদি লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও "বর্ত্তমানকালের মত আহার বিহারাদি সকল বিষয়েই দ্বিজ ও অদ্বিজ জাতির মধ্যে তৎকালে পার্থক্য ছিল" অর্থাৎ হীনজাতির স্পৃষ্ট অন্ন উচ্চ জাতির অভোজ্য ছিল এমন কথা সকল সময়ে বলা যায় না। বরং রামায়ণে ইহার বিপরীত প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বনযাত্রা কালে রামচন্দ্র নিষাদপতি গুহকের রাজ্যে উপস্থিত হইলে গুহক তাঁহাকে স্বাগত মনে করিয়া যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন; এবং—

"ততো গুণবদন্নাদ্য মুপাদায় পৃথক্ বিধম্।
অর্ঘ্যঞ্চোপানয়চ্ছীঘ্রং বাক্যঞ্চেদ্ মুবাচ হ॥

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যঞ্চৈতদুপস্থিতম্॥"

"পরে গুহ সত্বরতা সহকারে শ্রীরামচন্দ্রকে নানা গুণ-বিশিষ্ট অন্ন এবং বিবিধ ভোজ্য, অর্ঘ্যাদি প্রদান করিয়া কহিলেন—"আপনার জন্য চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছি।"

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "মিত্র, তুমি যাহা প্রদান করিয়াছ তাহার সকলই স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে পারিব না। কেন না এখন আমি তাপসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। সুতরাং ফলমূল মাত্র আমার ভক্ষ্য।" (অযোধ্যা—৫০শ সর্গ।) ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় গুহক ফলমূল ভিন্ন অপর বিবিধ (পক্ব) খাদ্যই শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালে প্রচলিত জাতি ভেদে এক জাতি অপর জাতির শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না এমন কি কোনও অন্ত্যজ জাতির শবদেহ স্পর্শ করিলে বা দাহ করিলেও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ রামায়ণের যুগে এমন "ছুঁত মার্গের" জাতিভেদ ছিল না। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের হীন জাতীয় আত্মীয় "জটায়ু"র শব সৎকার করিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন নাই, পরন্তু তাঁহারা বনে যাইয়া স্থূলকায় মৃগসকল বধ করিয়া, এবং মৃত্তিকায় কুশ আস্তীর্ণ করিয়া সেই জটায়ুর উদ্দেশ্যে ঐ কুশোপরি মৃগমাংসের পিণ্ড সমর্পণ করিলেন। তৎপর—

"যত্তৎ প্রেতস্য মর্ত্যস্য কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ
তৎস্বর্গগমনং ক্ষিপ্রং তস্য রামো জজাপ হ॥
(আরণ্য ৬৮ তমঃ সর্গ)

"ব্রাহ্মণগণ যে মন্ত্রজপ প্রেতের স্বর্গ সাধন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন সেই মন্ত্র জপ করিলেন।" পরে

দুই ভাই গোদাবরী নদীতে গিয়া পক্ষিরাজের "উদকক্রিয়া" সম্পাদন করিলেন। এই উদারতার সহিত বর্ত্তমান জাতি-ভেদের কি লজ্জাকর পার্থক্য!

স্ত্রীজাতির অবস্থা

রামায়ণের সমকালে ভারতীয় আর্য্যসমাজে স্বয়ম্বর বা গান্ধর্ব্ব বিবাহের তেমন প্রচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আর্য্য সমাজে বিধবা বিবাহের উদাহরণও দেখা যায় না। তৎকালে আর্য্যসমাজে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের প্রথাও ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বহু বিবাহের বহুল প্রচারই ছিল। বিলাসোপভোগার্থে রাজগণ শত শত রূপবতী রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে স্থান দিতেন। রাজা মহারাজারা জামাতার হাতে কন্যা সম্প্রদান কালে তৎসহ শত শত সুরূপা সুবেশা সখী যৌতুকরূপে প্রদান করিতেন। রাজর্ষি জনকও তৎকাল-প্রচলিত এই সামাজিক রীতি লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। তিনিও কন্যা ও জামাতৃগণকে যেমন বহুসংখ্যক গাভী, হস্তী, অশ্ব ও বোঝায় বোঝায় ক্ষৌম বস্ত্র, প্রচুর কম্বল এবং বহু ধন রত্ন দিলেন তেমন আবার—

"দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাস মনুত্তমম্"

(আদি ৭৪ তম সর্গ)

বলাবাহুল্য যে অনেক স্থলেই সখী বা দাসীগণ রাজপত্নী-রূপেই পরিগণিতা হইতেন। এরূপ অবস্থায় যে রাজান্তঃ-পুরগুলিও মোগলান্তঃপুরের মত পাহারওয়ালাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইবে আশ্চর্য্য কি? তবে এসব অন্তঃপুরে "হাবসী" বা "তাতারিণী"দের ন্যায় দুর্দ্দান্ত রক্ষিসৈন্য থাকিত না, কুব্জ বা বৃদ্ধ দাসগণই ঐ সকল অন্তঃপুর রক্ষা করিত। অনেক স্থলে বৃদ্ধ কঞ্চুকী বা কুব্জ দাস রাখা প্রথা স্বরূপ হইয়াই দাঁড়াইয়াছিল। তাই আমরা এক-পত্নীক শ্রীরামচন্দ্রের শুদ্ধান্তও—

"নানারত্ন সমাকীর্ণকুব্জকৈরপি চাবৃতম্" দেখিতে পাই।

নারীগণ স্বতন্ত্র ভাবে অন্তঃপুরেই বাস করিতেন বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সম্ভ্রান্ত মহিলারা রাজপথে বাহির হইতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। মুসলমানদিগের মত অবরোধ প্রথা কখনও আর্য্য সমাজে ছিল না। রামায়ণের সময়ে ঐ প্রকার সুদৃঢ় অবরোধ ছিল না। লঙ্কা সমরাবসানে বিভীষণ প্রেরিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া পত্নী সন্দর্শনোৎ-সুক রামচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইলে কৌতূহল পরবশ ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষস সৈন্যগণ জানকীকে দেখিবার জন্য শিবিকাসম্মুখে বড়ই ভিড় করিতে লাগিল। তখন বিভী-ষণের আদেশানুসারে বেত্রধারি কঞ্চুকীরা তাড়না করিয়া ঐ সৈন্যদলকে সরাইয়া দিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র ঐ তাড্যমান জনসঙ্ঘের নৈরাশ্যে এবং নিপীড়নে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন আমার এই স্বজনগণের প্রতি দুর্ব্ব্যহার করিতেছ?"

"ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারাস্তিরস্ক্রিয়া।
নে দৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়ঃ॥ ২৭॥

অর্থাৎ "গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর অথবা লোকাপসারণ বা পর্দ্দার মধ্যে রক্ষা করাই স্ত্রীলোককে আবৃত রাখার সুপন্থা নহে। তাঁহাদের স্বামী কর্ত্তৃক সৎকৃত হওয়াই তাঁহাদের প্রকৃষ্ট আবরণ।" সুতরাং—

"দর্শনে নাস্তি দোষোহস্যা মৎসমীপে বিশেষতঃ॥" ২৯

অর্থাৎ—"জানকীকে এ সময়ে বিশেষতঃ আমার সম্মুখে সকলে দেখিলে কোন দোষই হইবে না।" অতএব—

"বিসৃজ্য শিবিকাং তস্মাৎ পদ্ভ্যামেবাত্রা গচ্ছতু।
সমীপে মম বৈদেহী পশ্যন্ত্বেতে বনৌকসঃ॥ ৩০।

লঙ্কা—১১৬ তমঃ সর্গ।

"বৈদেহী শিবিকা ত্যাগ করিয়া হাঁটিয়াই আমার নিকট আগমন করুন এবং আমার বানর সৈন্যগণ তাঁহাকে দেখুক।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ সময়ে প্রয়োজনানুসারে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ রাজমার্গে বাহির হইতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। রামায়ণে উৎসবোপলক্ষে সম্রাট মহিষীকেও অন্যান্য মহিলাগণ সহ শোভাযাত্রায় বাহির হইতে দেখা যায়। নিম্নে ঐ প্রকারের একটি চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে রাক্ষসবিজেতা রামচন্দ্র মিত্ররাজগণ সহ বনবাস হইতে মহাড়ম্বরে স্বরাজ্যাভিমুখে আসিতে

লাগিলেন। নন্দিগ্রাম হইতে ভরত ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করিলেন। শ্রীরাম ও জানকীকে তথা হইতে মহাসমারোহসহকারে শোভাযাত্রা করিয়া রাজধানীতে নিয়া অভিষেকের বন্দোবস্ত হইল। রাজ্যদেশে এবং রামের প্রতি অনুরাগবশতঃ পত্রপুষ্পপতাকায় প্রজাগণ স্বীয় গৃহাবলী ও রাজপথ সজ্জিত করিল। লক্ষ চক্ষু নির্নিমেষে নন্দিগ্রামের দিকে তাকাইয়া রহিল। শ্রীরাম কটক সহ নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলে ভরত তাঁহাকে রাজবেশে সজ্জিত করিলেন। পুরাঙ্গনাগণ জানকীকে বহুমূল্য কৌষেয় বস্ত্র ও মণিময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন। পুত্রবৎসলা কৌশল্যা রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া স্বর্ণময় অলঙ্কার দ্বারা সমস্ত বানরকামিনীগণকে মনের মত করিয়া সাজাইলেন। শ্রীরাম পুরাতন সারথি সুমন্ত্রের সজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। ভরত অশ্বরজ্জু, শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ জ্যোতির্ম্ময় চামর ধারণ করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। এবং

"সর্ব্বাভরণ জুষ্টাশ্চ যযুস্তাঃ শুভকুণ্ডলাঃ।
সুগ্রীব পত্ন্যঃ সীতা চ দ্রষ্টুং নগর মুৎসুকাঃ" ॥ ২২

(লঙ্কা ১৩০ সর্গ)

"সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা শুভ কুণ্ডল ধারিণী সীতাদেবী ও সুগ্রীবপত্নীগণ নগর দর্শনে সমুৎসুক হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। তৎপশ্চাতে সুগ্রীবের শত্রুঞ্জয় নামক মহাকুঞ্জর,সচল পর্ব্বতের ন্যায় চলিতে লাগিল। নয় হাজার হাতী সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করিল। লক্ষ বানর সৈন্য সেই সকল হাতীর উপর চড়িয়া বসিল।

"অক্ষতং জাতরূপঞ্চ গাবঃ কন্যাঃ সহদ্বিজাঃ।
নরা মোদকহস্তাশ্চ রামস্য পুরতো যযুঃ ॥ ৩৮

"গাভী, কুমারী কন্যা, অক্ষত ও সুবর্ণহস্ত ব্রাহ্মণগণ এবং মোদকহস্ত নরগণ ঐ শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। মহা কোলাহল, জয় নিনাদ, সহস্র সহস্র শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি সহকারে ঐ শোভাযাত্রা অযোধ্যায় প্রবেশ করিল। তৎপর—

"ঋত্বিগ্‌ভি র্ব্রাহ্মণৈঃ,পূর্ব্বং কন্যাভির্মন্ত্রিভিস্তথা।
পৌরৈশ্চৈবাভ্যষিঞ্চংস্তে সম্প্রহৃষ্টৈঃ সনৈগমৈঃ ॥" ৬২

"ক্রমে ক্রমে ঋত্বিক্‌ ব্রাহ্মণ, কন্যা (কুমারী), মন্ত্রী, বণিক এবং পুরবাসিগণ হৃষ্টচিত্তে তাহার অভিষেক করিলেন।"

সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বহু গাভী, সুবর্ণ ও বস্ত্র বিতরিত হইল। অভিষেকোৎসবোপলক্ষে সুগ্রীব এক ছড়া বহুমূল্য মণিময় হার, অঙ্গদ বৈদূর্য্যজড়িত কেয়ূর, বিভীষণ বহুধনরত্ন সহ লঙ্কারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ভরত যুবরাজ পদে বৃত হইলেন। জানকী চন্দ্ররশ্মিপ্রভাবিশিষ্ট স্বামিপ্রদত্ত এক ছড়া মুক্তাহার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। হনুমানাদি সমুদয় কপিদলপতি যথাযোগ্য উপহার প্রাপ্ত হইলেন। জানকী সমুদয় বানর সৈন্যগণকে নববস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন বটে, তথাপি তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ হনুমানের উপকার স্মরণ করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন—

"অবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠাদ্ধারং জনকনন্দিনী ॥৭৯
অবৈক্ষত হরীন সর্ব্বান্‌ ভর্ত্তারঞ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
তামিঙ্গিতজ্ঞঃ সম্প্রেক্ষ্য বভাষে জনকাত্মজাম ॥ ৮০
প্রদেহি সুভগে হারং যস্য তুষ্টাসি ভামিনি।"

(লঙ্কা—১৩০ সর্গ)

"জনকনন্দিনী আপনার কণ্ঠ হইতে স্বামী প্রদত্ত ঐ হার উন্মোচন করিয়া একবার স্বামীর দিকে আর একবার বানরগণের দিকে চাহিতে লাগিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র জানকীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া কহিলেন, 'ভামিনী! তুমি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এই হার দেও।' তখন জানকী স্বামীকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে হনুমানকে ঐ অপূর্ব্ব হার প্রদান করিলেন. বানর দলে আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল।" কি মধুর দৃশ্য কেমন সুন্দর অনাবিল স্ত্রী-স্বাধীনতা !! ইহাতে উচ্ছৃঙ্খলা বা বিন্দুমাত্র পারুষ্য নাই,প্রত্যুত ইহা একমনোমোহন চিত্র ! সংস্কৃত নাটক "মালতী মাধব "এবং রত্নাবলী" প্রভৃতিতে এতদপেক্ষাও উগ্রতর স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বর্ণিত আছে। *

বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপীয় মহিলাদিগের ন্যায় রামায়ণের যুগেও কুমারী কন্যাগণ দলে দলে বায়ুসেবনার্থে উদ্যান ভ্রমণে যে বাহির হইত তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। অরাজক রাজ্যের দোষ বর্ণন প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণগণ এক সময়ে বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন—

* ১৩২৩ সালের "গৃহস্থ" পত্রে মল্লিখিত সংস্কৃত নাটকে "প্রাচীন ভারতের পরিচয়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"নারাজকে জনপদে তৃদ্যানানি সমাগতাঃ।
সায়াহ্নে ক্রীড়িতুং যান্তি কুমার্য্যো হেমভূষিতাঃ॥ ১৬"
(অযোধ্যা ৬৭তম সর্গ)

"অরাজক দেশে স্বর্ণালঙ্কার শোভিতা কুমারীগণ সন্ধ্যা কালে ক্রীড়ার্থে উদ্যানে যাইতে পারে না।" বিশ্বামিত্রের পিতামহ "কুশনাভের" কন্যাগণের প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

"তাস্ত যৌবন শালিন্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
উদ্যানভূমি মাগম্য প্রাবৃষীব শতহ্রদাঃ॥ ১২
গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব।" ইত্যাদি
(আদি ৩২শ সর্গ)

"হে রাঘব! সেই রূপবতী কন্যাগণ যৌবন শালিনী হইয়া একদা সুন্দর বেশভূষা করিয়া উদ্যান ভ্রমণে গিয়া বর্ষাকালের বিদ্যুতালোকের ন্যায় রূপজ্যোতিতে উদ্যান আলোকিত করিতেছিল এবং নৃত্যগীত বাদ্যধ্বনি করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিল।" এই সকল বর্ণনা পাঠ করিয়া আমাদের বোধ হয় যে মুসলমানাধিকারের সময়েই বর্ত্তমান ধরণের অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের অন্তঃপুর ছিল, কিন্তু সর্ব্বত্র অবিশ্বাসমূলক অবরোধ ছিল না। এইরূপে নৈতিক স্বাস্থ্যকর মুক্তির আলোক বাতাসেই প্রকৃতি-দুহিতা সীতার অতুলনীয় নারীত্বের বিকাশ হইয়াছিল।

এ সময়ে আর্য্যসমাজে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল শ্রীরামের বিবাহই তাহার প্রমাণ। রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হওয়ার সময়ে সন্ন্যাসি-বেশধারী রাবণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া আত্মপরিচয় প্রদানকালে জানকী তাহাকে বলিয়াছিলেন—

"সীতা নাম্নাস্মি ভদ্রং তে রামস্য মহিষী প্রিয়া॥১
উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকুনাং নিবেশনম্।"

অর্থাৎ—"আমি রামের প্রিয় মহিষী। আমার নাম সীতা। আমি দ্বাদশবৎসর কাল পরম সুখে ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের গৃহে (বধূরূপে) বাস করিয়াছি। হে ভদ্র সন্ন্যাসিন্! তোমার মঙ্গল হউক।" তৎপর স্বীয়জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে করিতে কেকৈয়ীর বর-প্রার্থনা, স্বামী-সহ বনযাত্রার ঘটনা বলিয়া বলিলেন—

"মমভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মানি গণ্যতে॥১০" (আরণ্য ৪৭ সর্গ)

"আমার স্বামী মহাতেজা শ্রীরামের বয়স তখন পঞ্চবিংশ বৎসর ও আমার বয়স অষ্টাদশ বৎসর।" সুতরাং দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ কালে শ্রীরামচন্দ্রের বয়স ১৩ বৎসর এবং সীতাদেবীর বয়স ৬ বৎসর মাত্র ছিল। বলা বাহুল্য যে শ্রীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূগণের বয়স বিবাহ কালে আরও কম ছিল। সীতা দেবীর উক্তিতেই বোধ হয় যে ঘটনাক্রমে এই বিবাহ হয় নাই। পরন্তু সীতা-দেবীর ৬ বৎসরের সময়েই যোগ্য বর মিলিতেছে না বলিয়া রাজর্ষি জনক চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বনবাস কালে মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া দেবীর সহিত সম্ভাষণ কালে কথা প্রসঙ্গে জানকী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"পতিসংযোগ সুলভং বয়োদৃষ্ট্বা তু মে পিতা।
চিন্তামভ্যগমদ্দীনো বিত্ত নাশাদি বাধনঃ॥ ৩৪

"বিনবাক্তি ধনহানি হইলে যেমন দুশ্চিন্তায় পতিত হয় আমার পিতা জনকও তেমনিই আমার বিবাহ যোগ্য বয়ক্রম দেখিয়া আমার বিবাহার্থে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন।" কেন না—

"সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাচ্চ লোকে কন্যাপিতা জনাৎ।
প্রধর্ষণ মবাপ্নোতি শক্রেণাপি সমো ভুবি॥ ৩৫

"কন্যার পিতা সংসারে ইন্দ্রতুল্য হইলেও নিজের সমকক্ষ এমন কি নিজ হইতে নিকৃষ্ট (বর পক্ষের) লোকের নিকটও অপমানিত হয়।" তাই—

"তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্যাত্মনি পার্থিবঃ।
চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা॥ ৩৬
(অযোধ্যা ১১৮তম সর্গ।

"মদীয় পিতা মহারাজা (জনক) পোত যেমন মহাসাগরে পড়িয়া কূল পায় না, তেমনই আপনার অপমান সন্নিহিত দেখিয়া চিন্তা সাগরের পর পার পাইতেছিলেন না।" যে সময়ে ছয় বৎসরের মেয়ের বিবাহ-চিন্তায় মিথিলা-ধিপতির ন্যায় ব্যক্তি বিব্রত হইয়াছিলেন, সে সময়ে এদেশে যে বাল্যবিবাহই প্রশস্ত ছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। সম্ভবতঃ এ সময়ে সাধারণে "কন্যাদায়ে বিব্রত হইত বিলক্ষণ"। তখন সংক্ষেপেই ফর্দ্দ সমাপন হইত বটে, তথাপি উচ্চকুলে কন্যাদানের আকাঙ্ক্ষায় এই প্রকার কন্যাদায় উপস্থিত হইত।

শ্রীনীলকণ্ঠ দে

'বিনুদা'

(উপন্যাস)

(১)

নিতান্তই কাতর হৃদয়ে বিনয় যেদিন অনশনক্ষীণ হাত দু'খানি তুলিয়া, করুণাময়কে প্রণাম ক'রিয়া দাঁড়াইল, করুণাময় বিনয়ের সজল চক্ষু দু'টীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার নাম কি বাবা ?"

"বিনয়। আমায় ছুটি দেবেন ? আমি আজ দু'দিন কিছুই খাইনি," বলিয়া বিনয় দুই হস্তে চক্ষু মুছিল।

"তোমার আর কে আছে বাবা ?"

"আমার কেউ নেই। মা ছিল, অনেক দিন গেছেন।" করুণাময় বিনয়ের হাত দু'খানি ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন।

সংসারে সেদিন বিনয়ের কোনই বন্ধন ছিল না।

(২)

বহুদিনাবধি শয্যাগত থাকিয়া, শেষে একদিন পত্নী হরকামিনীর হস্তে পাঁচ বৎসরের বিনয় ও মাথায় এক রাশি দেনার বোঝা চাপাইয়া দিয়া বিনয়ের পিতা যেন মরিয়া বাঁচিলেন। হরকামিনী অত বড় বিপদ মাথায় করিয়াও বিচক্ষণ মাঝির মত শোক সাগরের ঘাত প্রতিঘাতে অদম্য বলে বিনয়কে মানুষের পথে টানিয়া আনিতেছিলেন। নিত্য দেনার তাগাদা এড়াইতে তিনি শ্বশুরের ভিটা বাড়ী বিক্রয় করিয়া পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইলেন। বিনয় মানুষ হইয়া উঠিলেই কুঁড়ের খুঁটী সোনার হইবে।

সে'বার দেশে দুর্ভিক্ষ আসিল। হরকামিনী আধপেটা খাইয়া, না খাইয়া বিনয়কে কিছুই জানিতে দিলেন না।

দারুণ দুর্ভিক্ষের ফল মহামারীর ভয়ে পাড়া-প্রতিবাসীগণ যারা পারিল দেশ ছাড়িয়া পলাইল। হরকামিনী রুগ্ন মুমূর্ষু বিনয়কে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া কবিরাজ হরিধন মণ্ডল মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া, দৈনিক ॥০ ভিজিটে বিনয়কে দেখিতে রাজি করাইলেন।

কত দীর্ঘ দিন রাত্রিগুলি অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়া দিবার পর বিনয় রোগজীর্ণ শীর্ণকায় লইয়া মায়ের বুকের কাছে উঠিয়া বসিল; হরকামিনী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গুরুদত্ত মন্ত্রের মাদুলীটা বিক্রয় করিয়া আসিয়া বিনয়ের মুখে দু'টী অন্ন দিলেন। এত অভাবের মধ্যেও মাদুলীটা তাহার বিনয়েরই মতন বুকের কাছে ছিল। বিনয়ের চিকিৎসায় সর্ব্বস্বই ব্যয়িত হইয়াছে, বাকী এইই শেষ সম্বল। হরকামিনী বিনয়কে আহার করাইয়া, শয্যায় পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—বিনয় "মা মা" বলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। হরকামিনী তখন প্রবল জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। সেই অচৈতন্য অবস্থাতেই প্রলাপ বকিতে বকিতে, শেষ মর্ত্তেও সন্তানের হিত কামনা করিয়া আবার কোন অজানা দেশে স্বামীর সংসার মাথায় পাতিয়া লইতে চলিয়া গেলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কত বৎসরের অব্যক্ত বেদনারি বোঝা বহিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীর প্রকম্পিত করিয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল।

পারিবারিক হিতোপদেশ প্রদানানন্তর প্রতিবেশী অনাদি মোহন, সেই সম্বলশূন্য, ভাঙ্গা কুঁড়েখানি জমী সমেত বিক্রয় করাইয়া মৃতাত্মার সদ্গতি করাইলেন। নিশ্চিত অনশনের পর লুটাইয়া কাঁদিবার ঠাঁই, মায়ের বুকের মত স্নেহোষ্ণ কুটিরতল ছিল একটুকু,—অল্পতেই পাইলেন,—অনাদিমোহন বিনামায় ক্রয় করিয়া স্বীয় ভদ্রাসন বাটীর অন্তর্গত করিলেন। আত্মীয়ের জমীটুকু অন্যে ঠকাইয়া লইবে !—অনাদি মোহন বিনয়ের দূরসম্পর্কিত এক মাতুল-পুত্র।

কলিকাতায় কোন স্কুলে অনাদিবাবু শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। গ্রীষ্মাবকাশে সপরিবারে বহুদিন পরে একবার বাড়ী আসিয়াছিলেন, বন্ধ ফুরাইল, আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বিনয়কেও সঙ্গে লইয়া আসিলেন। লোকটা তিনি একেবারেই মন্দ ছিলেন না,—তবে বিষয়

বুদ্ধি কাহার না থাকে! কলিকাতায়ও অনাদিমোহনের পৈতৃক একখানি বাড়ীর মতন ছিল,—ঠিক বাড়ী বলা যাইত না

'এই মাতুলপুত্র-গৃহে বিনয়েরও দিনগুলি বড় কষ্টেই কাটিতেছিল। অনাদিমোহনের পত্নী মঙ্গলা ও দু'ই বৎসরের পুত্র নিশিকান্ত ব্যতীত আর কেহই ছিলনা। মঙ্গলাকে তিনি বরং একটু ভয় করিয়াই চলিতেন, মঙ্গলা মুখরা। 'এটা আন্' 'ওটা আন্' 'বাজার করে নিয়ে আয়' 'খোকাকে রাখ' ইত্যাদি হুকুম তামিল করিতেই বিনয়ের সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত,—মাঝে মাঝে আহার করিবার সময়টুকুও হইয়া উঠিত না। মঙ্গলা বলিত,—রাজপুত্তুর ত আর নয় গৃহস্থের ঘরে, অমন হয়।"

প্রতিপালিত আশ্রিত ভাবিয়া মঙ্গলা বিনয়কে নিতান্ত নির্দ্দয়ার মতনই ব্যবহার করিত।

সমস্ত দিন খাটিয়া, এটা ওটা করিয়া দিয়া নিশিকান্তকে স্নান করাইয়া আনিয়া অনাদির তামাক সাজিয়া দিয়া জামাটা জুতাটা ঝাড়িয়া দিয়া,—সবেমাত্র বিনয় ঠাঁই করিয়া বসিয়াছে, মঙ্গলা আসিয়া বলিল—"ওরে বিনয় ও নবাবপুত্তুর বলি শুনছো? খোকাকে রাখতে বল্লুম না—?' আমার নাওয়া খাওয়া নেই, না আমি মানুষ নই?

ক্ষুধায় বিনয়ের অন্তরাত্মা জ্বলিয়া যাইতেছিল, বলিল—আমায় দু'ট ভাত দিন বঠান; আমি চটকরে খেয়ে নেই।"

"বাঃ! বাঃ! আমার শিরের ঠাকুর রে। উঠে আয়, খোকা কাঁদচে, যা শীগ্‌গির! আমি চান্ করে আসি, তার পর গিলো তখন। দু'বেলা দুটী মন গিলতেই তো এসেছো।"

বিনয় সভয়ে উঠিয়া গেল। মঙ্গলা স্নানান্তে ফিরিয়া আসিল।

"এবার দুটী দেবে বৌ-ঠান?"

এই ত দিচ্চি, বাপ্‌রে বাপ! এমন ছেলেও কোথাও দেখিনি, একটু তর সয় না।"

হেঁসেলে সশব্দে একখানি কাষ্ঠাসন মেঝেয় ফেলিয়া গন গন করিয়া মঙ্গলা হেঁসেলে গিয়া ঢুকিলেন। থাবলা থাবলা কয়েক মুঠা ভাত আর একটুকু ডাল আর তরকারী তার উপরে ফেলিয়া ঠাস করিয়া কানাফাটা সানকী থালাখানি সেই পীড়ির সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। বিনয়ের চক্ষে জল আসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া একটা ঘটিতে খানিকটা জল ভরিয়া সে আহারে বসিল। তার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল। আজ দুদিনের জ্বরে উপবাসের পর অন্নপথ্য করিবে বলিয়া বিনয় উঠিয়া বসিয়াছিল। এ দু'দিন কিছু পায়ও নাই, খায়ও নাই।

মঙ্গলা বলিয়াছিল,—"এ সব জ্বরে লঙ্ঘনই একমাত্র ঔষধ।"

অনাদি বলিয়াছিলেন,—"একটু সাবু রেঁধে,—তা থাক্, দেখা যাক্ কি রকম হয় কাল।"

মঙ্গলা আসিয়া বলিল,—"ওগো, সকালে ভাত চাওতো যাও একবার বাজারটা ঘুরে এসো,—দুদিন পড়েছিলে, আমি কত করে ওবাড়ীর ভাড়াটেদের মোধোকে ধরে সংসার চালিয়েছি। পরকে কাহাতক কত বলা যায়!"

"আগে কি কর্ত্তে বৌ-ঠান?"

"আগেতো চাকর ছিল,—তুমি আসতেই তাকে তুলে দিতে হ'য়েছে। ক'টা পুষ্যি পালা যায়? আমাদের রাজার সংসার নয়?"

"আমিও তাহলে চাকর বল,"—বলিয়া বিনয় ধীরে ধীরে বাজারের দিকে চলিয়া গেল।

অনাদিমোহন আহারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার স্কুলের বেলা হইয়াছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া বিনয় বলিল,—'আমায় দুটী দাওনা বৌঠান, আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।'

আহার করিতে করিতে অনাদি বলিলেন,—"কেরে বিনয়,—আয় আয়। দু'দিন খায়নি। দাও, দাও, ওকে দাও আগে।"

মঙ্গলা বলিল,—"এই দেবো এবার। বিনয়! যা দাদা এই দোকানটা থেকে এক পয়সার তেঁতুল নিয়ে আয়তো, এসেই বোস্।"

অনাদি উঠিয়া চটি জুতাটায় পা গলাইতে গলাইতে বলিলেন, না—"না ওকে দাও আগে।"

বিনয় বিনা বাক্যব্যয়ে তেঁতুল লইয়া আসিল।

মঙ্গলা বলিল,—"যা বা শীগ্‌গীর কর্ত্তার তামাক সেজে দিয়ে আয়। বেলা হ'য়ে গেছে।"

বিনয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলিকায় তামাক সাজিয়া, জ্বলন্ত উনান হইতে টিকা ধরাইয়া তুলিতে হঠাৎ টকের কড়াটা ফেলিয়া দিল। ক্ষুৎপিপাসায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল,—দুধের সস্প্যানটার উপর পড়িয়া গেল। সস্প্যান্‌টা উল্‌টাইয়া পড়িল। মঙ্গলা ছুটিয়া আসিয়া বিনয়ের গালে এক চড় কষাইয়া দিয়া বলিল, "হতভাগা ছেলে, টক্‌টা রেঁধেছিলুম্ একটু খাবো বলে!"

"আমি দেখতে পাইনি বৌঠান, আমার মাথা ঘুরছিল।" বলিয়া বিনয় পতিত দুধগুলির দিকে আক্ষেপ সূচক দৃষ্টিতে চাহিল। মঙ্গলা এতক্ষণ তাহা দেখিতে পায় নাই, সেই দিকে নজর পড়িতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষেরজ্বালা ধরিয়া গেল।

"দেখেছো! এক সস্প্যান দুধ। ওরে নিশি যে এখনও খায়নি রে, হতভাগা", বলিয়াই লোহার হাতাটা তুলিয়া বিনয়ের গায়ে ছুড়িয়া মারিল, হাতাটা বিনয়ের গায়ে না লাগিয়া একটা মৃৎ কলসীর উপরে গিয়া পড়িল,—কলসীটী ভাঙ্গিয়া ঘরময় জল ছড়াইয়া দিল।

রান্নাঘরে একটা কিছু তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়াছে, ভয়ে অনাদি তামাক না খাইয়া ইস্কুলে চলিয়া গেলেন। মঙ্গলা যখন রাগিত তখন তাহার লঘু গুরু জ্ঞান থাকিত না। তিনি নিজেই একদিন তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

অতি ক্রুদ্ধা মঙ্গলা বিনয়কে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। বিনয়ের আর সহ্য হইল না। সাশ্রু নয়নে সে মঙ্গলার মুখের উপর বলিল,—

"এর চেয়ে আমায় একেবারে মেরে ফেল বৌঠান। এমন করে আমায় তিলে তিলে বধ কোরোনা।"

একেবারে আরও আগুন হইয়া মঙ্গলা বলিল—"কি! কি বল্‌ছিস্? এত বড় কথা? আমরা ওকে তিলে তিলে বধ কর্‌ছি! এক সস্প্যান দুধ ফেলে দিলেন, তা কিছু বলবার জো নেই। কি আমার আদরের মানিক রে? ভালোর নাম নেই, কলিকাল—কলিকাল। ওমা কোথায় যাবো,—ঐ টুকু ছোড়া তার কথা শোন। না বাবু, তুমি সরে পড়,—পথ আথ তোমার, কোন দিন কি করে বস্‌বে, আমরা নিমিত্তের ভাগী হ'ব। কাজ নেই, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।"

"তাই ভাল বৌঠান,—এত সুখ আমারও সহ্য হ'বে না।"

বিনয় বাহির হইয়া গেল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মঙ্গলা বলিল,—"যাও মরগে। তিন কুলে কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করতে নেই, তার আবার এত মান।"

অনাদি আসিলে বলিল,—"ওগো! তোমার গুণের ভাইটী চলে গিয়েছেন।"

"চলে গিয়েছে!!! কোথায় গেল?"

"কে জানে,—কোথায় তার কে আছে, আমার মত বদ্ বৌঠানের সঙ্গে তার পোষাল না।"

"আহা ছেলে মানুষ। কেও নেই"

"মানটুকুতো আছে ষোল আনা।"

"যাই দেখে আসি একবার,"—বলিয়া অনাদি ছাতাটা লইয়া উঠিতেই প্রবল বেগে জল আসিয়া পড়িল।"

মঙ্গলা বলিল—"জলে কোথায় যাচ্ছ তুমি? কোথায় যাবে? আস্‌বে ফিরে আপনি।"

অনাদি আর বাক্যব্যয় নিষ্ফল ভাবিয়া নিজেই তামাক সাজিয়া টানিতে লাগিলেন। বিনয় আর ফিরিল না। কয়েকদিন এদিক ওদিক দেখিয়া অনাদিও বিনয়ের কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গেলেন। অমন গৃহ হইতে মুক্ত আকাশতল বাছিয়া লইয়া বিনয় পথে পথে ঘুরিতে লাগিল।

এমনি একদিন লক্ষ্য শূন্য ভাবে চলিতে চলিতে, বিনয় হঠাৎ করুণাময়ের গাড়ীর সম্মুখে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। নিপুণ কোচওয়ান অশ্বের গতি সংযত করিয়া ফেলিল। গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া করুণাময় বলিলেন,—"কেহে ছোক্‌রা? কই? দেখি, এদিকে এসোতো বাবা। আহা, কচি ছেলে, পড়লেই মরেছিল। দেখে চালাস্ না গাড়ী?"

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক সব প্রথমেই তাহা অবগত হইয়াছেন।

(৩)

করুণাময় ঘোষ কলিকাতার কোন বিশিষ্ট জমিদার—ধনী। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বুঝি ভগবান কাহাকেও দেন না। করুণাময়ের সুবৈশ্বর্য্য সম্পদের আনন্দ একটা অভাবেই নিরানন্দময় হইয়াছিল। করুণাময় নিঃসন্তান।

পত্নী মনোরমা বলিতেন,—"তুমি আর একটী বিয়ে কর।" আমিই অভাগিনী, আমার অদৃষ্টেই সন্তান নাই।"

করুণাময় হাসিয়া বলিতেন,—"সেটা কি তোমার অদৃষ্টে না আমার অদৃষ্টে তা তো ঠিক জানা যাচ্ছে না মনো।

"ত্যাখই না তুমি।"

সহাস্যে করুণাময় বলিতেন,—"ভগবান দেননি, জোর করে কোথায় পাব মনো!"

ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হইয়াও করুণাময়ের মাতা বহুবার বহু শৈব শাক্তের মন্দির দ্বারে মানত করিয়াছেন,—"ঠাকুর! না হয় তোমরাই আমার করুণার কোলে একটী ছেলে দাও।" দেবতার বোধ হয় একটু দয়া হইয়াছিল,—তাই সেবার স্বামীবিয়োগের পর পুত্র করুণাময় ও পুত্রবধূ মনোরমাকে লইয়া তাহাদের ৬কাশীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন—সেবারই বিশ্বনাথের দ্বারে প্রণাম করিতে গিয়া আশীর্ব্বাদক পুষ্পটীর মত,—একবোঝা গোলাপের মত সুন্দর মেয়েটীকে কোলে তুলিয়া আনিলেন। স্নেহপরণ সন্তান শূন্য বুকে মনোরমা অসামান্য নিঃসহায় বালিকাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "এটীই আমার মেয়ে,—আমার বুক জোড়া ধন।"

করুণাময় আসিয়া বলিলেন, "কোয়াসায় পড়ে কাঁদ্‌ছিল, দেখতেও পাওয়া যায়নি,—তারপর স্বর শুনে মা তুলে নিয়ে এলেন।"

মনোরমা বালিকার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন,—"তাহলে মা তোর নাম রইল,—নীহার।"

তিন বৎসর বয়সের সময় নীহার মনোরমার বুকে আশ্রয় লইয়াছে আরও চারিবৎসর সে বুকেই বড় হইয়া উঠিয়াছে। একদিনের তরেও মনোরমা জানিতে দেন নাই, কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিয়া নীহার তাহার মাতৃত্বের অধিকারে এতখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল। প্রকৃতির কোলে ফোটা ফুলটীর মতই নীহার বড় হইতে লাগিল।

করুণাময় নীহারকে কন্যার মতই ভাল বাসিতেন কিন্তু মাঝে মাঝে সেই অভাবটাই তাহার মনে উঁকি মারিয়া যাইত। অনেক সময় তিনি বলিয়াও ফেলিতেন,—"এমনি একটী আদরের দুলাল- নীহার"

"বাবা।"

"দেতো মা—আয় আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিবি আয়।"

বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া নীহার ছোট দু'খানি গোলাপের মত হাতে করুণাময়ের বুকের উপরটা বুলাইয়া দিয়া আদরের দুলালটীর মতই তাঁহার প্রশস্ত বক্ষের উপর ঘুমাইয়া পড়িত। নিদ্রিতা নীহারের দিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে বলিতেন—"এ বুকে ছোবল মেরে তুইও যেদিন চলে যাবি মা,—না—আমি তোকে যেতে দেবোনা। তুই মেয়ে—তোর বিয়ে! তোর বর আমি ঘরে তুলে আনবো মা।"

গৃহিনীকে ডাকিয়া বলিতেন—"জানো মনো—"

সহাস্যে মনোরমা বলিতেন—"আমিও তোমায় বল্‌বো ভেবেছিলুম।"

সেদিন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে করুণাময় বিনয়কে পাইয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিনয় সমস্তটা পথে নীরবে বসিয়াছিলেন,—তাহার পর দাস দাসীরা যখন তাহার ছিন্ন মলিন পরিধেয় বস্ত্র টানিয়া ফেলিয়া, তাহাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল,—বিনয় সভয়েই ভয়েবিস্ময়ে কাঁদিয়া ফেলিল।

করুণাময় সেই অশ্রুসিক্তানন চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"ভয় কি বাবা?—মনো! মনো! পেয়েছি, আর আমার কোন দুঃখ নাই। মা বেঁচে থাকলে, তাঁকে বল্‌তাম্ এবার তাঁর মানতগুলো দিয়ে আস্‌তে।"

মনোরমা কহিলেন, "আহা!—এতদিন কোথায় ছিলে বাবা?"

বিনয়ের সমস্ত হৃদয় আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত প্রাণের অনুভূতি তাহাতেই ডুবিয়া গিয়াছিল। এমন মধুর ডাক সে যে বহুদিন শোনে নাই। এমন মায়ের মত মা সে যে বহুদিন দেখে নাই। একটা উচ্ছ্বাসের স্বরে সেই স্নেহের স্বর্গ মাতাইয়া বিনয় শুধু বলিল,—"মাগো।"

"এই যে আমি বাবা" বলিয়াই মনোরমা বিনয়কে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

বিনয় দুই হস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। যেন সে আশ্রয়ে কত শান্তি, সে ক্রোড়ে যেন জন্ম জন্মান্তরের চির অধিকার, সে বুকে লুকানো যেন তাহারই সমস্তটুকু।

করুণাময় পরম সুখী হইয়াছিলেন! কিন্তু ইহারই দুই বৎসর পরে মনোরমা সকলকে কাঁদাইয়া কোন অজানা জায়গায় লুকাইয়া গেলেন।

বিনয় বলিল—"মা আমার অদৃষ্টে নেই। মা হারিয়ে মা পেয়েছিলুম—তাও আমার বড়াতে রইলো না।"

বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া করুণাময় বিনয় নীহারকে লইয়া মত্ত হইয়া পড়িলেন—। আত্মীয় প্রাচীনারা বলিলেন,—

"করুণা! এবার আর একটা বিয়ে কর।"

করুণাময় বলিলেন—"এই বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে?

"বুড়ো—বুড়ো—কিয়ে—এইতো সবে—কত রে?"

"ওর গাছপালা নেই। আর আমিত বিপত্নীক হইনি।"

"সে কি রে?"

"মনোর দু'টী চোখ যে রয়েছে গো মনোর দু'টী চোখ,—দু'টীর স্নেহের পুতুল,—আমার দু'টী ছেলে আর মেয়ে—" বলিয়াই নীহার বিনয়কে কোলে তুলিয়া লইতেন।

বিনয় জানিত, বুঝিতও;—কষ্টে সঙ্কোচে তাহার মাথা নুইয়া পড়িত।

নীহার জানিত না; বুঝিতও না,—নীহার বলিত,— "ইস্ ও বুঝি ছেলে—"

বিবাহের প্রস্তাব যিনি লইয়া আসিতেন—তিনিও ক্ষণকাল বিস্মিত নয়নে চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া যাইতেন।

করুণাময় বলিতেন,—"বিয়ে করবি ওকে?"

নীহার করুণাময়ের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিত,—"ইস্—কখনোও না।—বল্‌বে—বল্‌বে—?"

করুণাময় তখন মৃদু হাসিয়া বলিতেন,—"আচ্ছা করিস্‌নি করিস্‌নি—আর বল্‌বো না।"

নীহারকে বিনয় তাহার আশ্রয় দাতার কন্যা বলিয়াই জানিত। অন্তরে অন্তরে তাহার প্রতি একটা মধুর স্নেহের আকর্ষণ থাকিলেও, মুখ ফুটিয়া কিছু বলা দূরে থাকুক, চোখ তুলিয়াও বিনয় নীহারের দিকে তাকাইতে পারিত না। সমস্নেহে লালিত পালিত দু'টীই সম আদরের হইলেও সমভাবে সে কিছুতেই তাহার সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতে পারিত না। হৃদয়ের অন্তঃস্থল আলোড়িত করিয়া যতই সে তাহার নিজের সঙ্গে নীহারকে জড়াইতে যাইত, ততই তাহার হৃদয় শ্রদ্ধার সম্ভ্রমে হটিয়া আসিত। সেনা নায়কের সম্মুখে সৈনিক সবিনয়ে শির নত করিয়া আদেশ বাণীর অপেক্ষায় যেভাবে কান পাতিয়া থাকে তেমনি সঙ্কোচে তেমনি বিনীত ভক্তিতে বিনয় নীহারের পথে সরিয়া দাঁড়াইয়া উদ্‌গ্রীব শ্রবণে নীহারের মুখের কথাটী শুনিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। আদেশ পালনই যেন তাহার কর্ত্তব্য, সসম্ভ্রম তাহার সাধনা। "নীহার" বলিয়া ডাকিতেও যেন কুণ্ঠায় তাহার স্বর আট্‌কাইয়া যাইত।

দ্বিতলের সোপান বাহিয়া বিনয় উপরে উঠিতেছিল,—নীহারও তখনই নিজের কাজে নীচে নামিতেছিল। হঠাৎ সম্মুখে পড়িয়া বিনয় কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল,—"আমি দেখ্‌তে পাইনি।" যেন তাহার কত অপরাধ। "বেশ করেছো—চোখ নেই সাথে।" বলিয়া নীহার পাশ কাটাইয়া নামিয়া গেল। সে তখন প্রায় তাহার বুকের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল—নিঃশ্বাস আসিয়া বুকের উপর ঠেকিয়াছিল—। বিনয় সেইখানে,—সেই "গন্ধ-বিধুর সমীরণে"—কত সঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল।—যেন কত অন্যায়ই সে করিয়া ফেলিয়াছে। নীহারের সহিত বিবাহের কথাটা হৃদয়ে জাগিলেই তাহার নিজেকে বিনয়ের এত ছোট বলিয়া মনে হইত, এত হীন, এত অযোগ্য বলিয়া তাহারই হৃদয় তাহাকে বলিয়া দিত, নিজেই সে সঙ্কোচে জড়তায় কতদিন তাই বলিয়া ফেলিয়াছে, "না না, এ অসম্ভব।"

যে টুকু সে পাইয়াছে, যতটুকু আদর তাঁহারা দিয়াছেন তাহাই যে তাহার বড় বেশী পাওয়া। সেদিনও যে সংসার তাহার চতুর্দ্দিকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার প্রদাহের মত প্রাণান্তক জ্বালা ছড়াইয়া দিয়াছে। সে দিনও যে সে এতটুকু করুণা, এতটুকু সহানুভূতির জন্য দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া ফিরিয়াছে। সেকি কষ্ট তখন! সমস্ত দিন অনশনের পর হয়ত কাহারও রকে পড়িয়া একটু ঘুমাইবে, কুকুরের মত গৃহস্বামী তাড়াইয়া দিয়াছেন, চোর কোকেন্ খোর বলিয়া উপহাস করিয়াছেন,—একমুষ্টি তণ্ডুলের জন্য হাত পাতিয়া "ওগো দাও, এক মুঠো খেতে দাও," বলিয়া কত ধনীর দুয়ারে ফিরিয়াছে কেহ চোখ তুলিয়াও চাহে নাই। কত দীর্ঘ রজনী শূন্য আকাশের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; নির্ম্মল আকাশের গায় নিশ্চল তারকার মত তাহারও গণ্ড প্রবাহিনী অশ্রুকণাগুলি দিনের আলোর শুকাইয়া গিয়াছে। কত

বর্ষার অজস্র ধারায় তাহারও চোখের জল মিশাইয়া দিয়া—মত্ত ঝঞ্ঝার সঙ্গে তাহারও করুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাস-শ্বাস নিঃশেষে, আকুল আর্ত্তনাদে "মা" "মা" রবে মাটীর বুকে আছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি প্রলয় গর্জ্জনে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিয়াছে,—শুষ্ক কণ্ঠের অর্দ্ধস্ফুট-ধ্বনি মৃত্যু মুখরিত সময় প্রাঙ্গনে আহতের আর্ত্তনাদের মত ডুবিয়া গিয়াছে, অন্তরে বাহিরে তাহার নিরাশার দৃপ্ত জ্বালাগ্নি ধূ—ধূ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর আজ এতটা পরিবর্ত্তন,—এতটা ঐশ্বর্য্যের সাথে এমন স্নেহের সম্ভাষণ, একটা অতি বিশ্রী বাদলার পর প্রথম প্রভাত সূর্য্যের রশ্মি বিকীরণের মত, একটা অতি ঘোর অমাবস্যা রজনীর সহস্র বিপদ-সঙ্কুল পথের শেষে পরমাত্মীয়ের গৃহের আলোর মত, এই এতখানি, কেমন করিয়া কিসে কোন পুণ্যফলে তাহার হইয়া গেল, ইহাই সে মনের সহিত মীমাংসা করিতে পারে না, ইহাকেই যে ঠিক বাস্তবী বলিয়া কল্পনা করিতে না পারিয়া অনেক সময় চমকিয়া উঠে;—আরও দুরাশা সে কেমন করিয়া করিবে। এতটাই সে আশা করে নাই—আর সে চাহে না।

স্বভাব-দাম্ভিকা অভিমানিনী নীহার বিনয়ের এই সপ্রলজ্জ ভাব দর্শনে উপহাসও করিত,—আশ্রিত বোধে করুণাও করিত,—বিনয়ের সহিত তেমন মিশিতেও চাহিত না।

সেদিনও—প্রথম যেদিন বিনয় এ বাড়ীতে প্রবেশ করিল,—ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত বিনয়কে লইয়া করুণাময় অন্দরে যাইতেছিলেন, -বহুমূল্য পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নীহার ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল,—

"এ কে বাবা,—বেয়ারা ?"

করুণাময় বাবু সহাস্যে বলিলেন,—"নারে।"

নীহার বলিল,—"তবে,—ভিখিরী ?"

করুণাময় তেমনি হাসিয়া বলিলেন,—"নারে মা—ও তোর বর।"

মুখ বাকাইয়া নীহার সেদিন বলিয়াছিল,—"ইস্—ভিখিরী বর ?"

৬

এমনই করিয়া আরও দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। পনেরো বৎসরের নীহার নব বসন্তের মত তরুণ যৌবনের ললিতসৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। বিনয়েরও অনেকটা পরিবর্ত্তনে হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানাভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আরও বেশী অভিভূত, আরও বেশী ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। এতখানি দয়ার প্রতিদানে সে কি দিবে; কি আছে তাহার যাহার বিনিময়ে এ ঋণ সে পরিশোধ করিবে! অগাধ ঐশ্বর্য্যের আবরণে যখনি তাঁহারা তাহাকে সাজাইয়া দেয়, অমনি তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে তাহার নিজস্ব যাহা, প্রস্থিত দিনের সেই নিখিল অভাবের মূর্ত্ত দীনতা। হাস্য পরিহাসের কোলাহলে কক্ষে যখন পরমানন্দের বন্যা বহিয়া যায়, স্মৃতির তারে তখনিই ঝঙ্কারিয়া উঠে তাহার অন্তরের নিভৃত বেদনা, সেই শ্রাবণের সিক্ত শয্যায় রুগ্না মুমূর্ষু জননীর যন্ত্রণাতুর মর্ম্মোচ্ছ্বাস। রহস্যের প্রত্যুত্তরে অন্যমনস্কতায় অনেকদিন বিনয় তাই সাশ্রুনয়নে তাহার পুরাতন জীবনের বড় একটা দুঃখের ইতিহাস বলিয়া ফেলিত। অপ্রাসঙ্গিক ভাবান্তরে নীহার বিরক্ত হইয়া যাইত। করুণাময় মুক্ত বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া শূন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, পূর্ব্বারুণের হিরকোজ্জ্বল ভাতি দেবাশীর্ব্বাদের মত কক্ষের চতুর্দ্দিকে লুটাইয়া পড়িত, সেই উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহারও নয়ন প্রান্তে দুটী অশ্রুকণা চক্ চক্ করিতে থাকিত। নীহার গাহিত, প্রাণের উল্লাস, আনন্দের উচ্ছ্বাস, গর্ব্বের পরিতৃপ্তি; -করুণাপ্লুত ভগ্ন কণ্ঠে বাধা দিয়া করুণাময় বলিতেন,—

"হাসির গান আর গাস্‌নে নীহার। পারিস্ ত গা মা এমন গান, বিশ্ববাসীর প্রাণে যাতে বিশ্ব প্রেমের সঞ্চার হয়। একের সৃষ্টিতে যাতে তারা এক সত্তা অনুভব করে, পরের দুঃখে সবাই যাতে কাঁদতে শেখে,—পরের সুখে ত্যাগ কর্ত্তে পারে। মানুষ এত নিষ্ঠুর,—এতখানি স্বার্থপর তারা!! নিজের দিক্‌টাই তারা এত বেশী ভাবে!!!"

৭

সমস্ত আকাশটা ব্যাপিয়া বর্ষণোন্মুখ কালো মেঘগুলি যেন কান পাতিয়া একটা ঝড়ের অপেক্ষায় ছিল। এক পশ্‌লা খুব বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছে। ট্রামের লাইনের উপর এক হাঁটু জলে উপরের অন্ধকারের ছায়া যেন জমিয়া বসিয়াছিল। কর্ম্ম কোলাহল পূর্ণ অস্থির কলিকাতা

অলস ভুজঙ্গের মত অবশাঙ্গে এলাইয়া পড়িয়াছিল। আও আর একটা বড় রকমের ঝড় হইবে, সাহস করিয়া কেহই ঘরের বাহির হইতেছিল না।

দোতলায় বসিবার ঘরে একখানি আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত করুণাময় বাবু নিমীলিত নেত্রে পার্শ্বোপবিষ্ট বিনয়ের মুখে "মেঘদূত" শুনিতেছিলেন। এই কয়বৎসর অনুদ্বিগ্ন মনোযোগে বিনয় অনেক কিছুই পড়িয়া ফেলিয়াছিল।

অদূরে জানালার ধারে নীহার 'অর্গ্যান' বাজাইয়া রবীন্দ্রের গানে বিভোর হইয়া গাহিতেছিল :—

আজি, শ্রাবণ ঘন গহন মোহে,
গোপন তব চরণ ফেলে।

হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়োনা মোরে হেলায় ঠেলে॥

গান বন্ধ করিয়া নীহার বাহিরের এই বিপর্য্যস্ত প্রকৃতির দিকে চাহিতেই বলিয়া উঠিল—"বাবা! বাবা! দেখ'সে—একখানি গাড়ী হাওয়ার মত ছুটে আস্‌চে,—এই পড়্‌লো!!"

করুণাময় বাবু উঠিয়া গিয়া কহিলেন,—"কোথায় রে?"

নীহার বাহিরের দিকে চাহিয়াই বলিল,—"এই যে, আমাদের সদর দরজার সাম্‌নে।"

করুণাময় লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া বলিলেন,—"গাড়ীতে লোক যে,—এই দুর্য্যোগে আবার বেরোয় কেউ।" বলিতে বলিতেই গাড়ীখানি উলটাইয়া পড়িল,—আরোহী নীরদকান্তি ছিট্‌কাইয়া জলের উপর পড়িয়া গেলেন।

আক্ষেপের স্বরে নীহার কহিল,—"আহা-হা,—বড্ড লেগেছে! ভদ্রলোক,—দেখেছো বাবা,—বিনুদা!—"

"যাচ্ছি আমি", বলিয়াই বিনয় নীচে নামিয়া গেল।

মেঘগর্জ্জন-ভীত অশ্বদ্বয় তীব্র বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। চালক স্বয়ং নীরদ-কান্তি,—আকাশের অবস্থা দেখিয়া তিনিও পুনঃ পুনঃ অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিতেছিলেন,—অশ্ব বর্দ্ধিততর বেগে দৌড়াইতেছিল। হঠাৎ মোড়ের মাথায় ফিরিতে গিয়া গাড়ী ফুটপাথের উপর লাগিয়া উলটাইয়া গেল। জলে সব একাকার হইয়া গিয়াছিল, কেহই দেখিতে পায় নাই।

আবার আকাশ ভাঙ্গিয়া জল আসিল। বিনয় নীরদকে লইয়া উপরে আসিল।

করুণাময় কহিলেন,—"কোথায়ও লাগেনি ত?"

নীরদ হাতের জল ঝাড়িয়া বলিলেন, "না, :—লাগেনি তেমন,—রাস্তায় জল দাঁড়ানতেই বেঁচে গিয়েছি।"

করুণাময়, "যাক্‌,—তা এই ভিজা কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলুন, মাথাটা পুছুন,—ভোগালে আপনাকে খুব।"

নীরদ সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন,—"কেন আপনারা ব্যস্ত হচ্চেন,—বাড়ী গিয়েই হবে এখন,—অযথা আপনাদের কষ্ট দিলুম এসে।"

"কষ্ট কিসের! আপনি কিছু নিতেও আসেন নাই, খেতেও আসেন নাই; রাস্তায় দুর্য্যোগে পড়েছেন, ভদ্রলোক আমারই বাড়ীর সাম্‌নে—"

বিনয় কহিল,—"আসুন, এই কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলুন, অসুখ করবে যে। সমস্ত গায়ে কাদা।"

টেবিলের উপর বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম দিয়া গিয়াছিল। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নীরদ বিনয়ের পশ্চাত পশ্চাত আসিয়া বসিল।

করুণাময় ডাকিলেন,—"নীহার!"

দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া নীহার অর্দ্ধাবরিত ভাবে নবাগতের দিকে চাহিয়াছিল। দেখিতেছিল—কে বেশী সুন্দর,—বিনুদা, না বিনুদা যাহাকে লইয়া আসিল সে—নীরদকান্তি।

বোধ হয় শুনিতেছিল—কাহার স্বর মরমের তারে আঘাত করিয়া বেশী ঝঙ্কার দিয়া শিহরায়,—বিনুদা'র, না সুন্দর সুগঠিত সুপুরুষ নীরদের।

সচকিতা নীহার বলিল,—"এই যে বাবা,—যাচ্ছি।" বলিয়াই নতমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে লাগিল।

নীরদ কহিলেন,—"এ দুটী বুঝি ভাই বোন।"

করুণাময় বলিলেন, "ভাই বোন নয়,—তবে আমার দু'টী ছেলে আর মেয়ে।"

বিনয় সম্মুখের দিকে বড় বেশী ঝুকিয়া পড়িল। নীরদ

ভাবিতে লাগিল,—"এ কেমন কথা, ভাই বোন নয়, অথচ ওঁর দুটি ছেলে আর মেয়ে।"

হঠাৎ নীহারের দিকে চাহিতেই তাহার চোখে চোখ পড়িল,—নীহার একটু কাঁপিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল,—"বিনুদা তোমার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে যে।"

নীরদকান্তি তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালাটা উঠাইয়া মুখ ঢাকিলেন।

অনেক সৌজন্য প্রকাশ করিয়া নীরদ বিদায়গ্রহণ করিলেন।

করুণাময় কহিলেন,—"আসবেন মাঝে মাঝে, একা একাই আমাদের সময় গুলো কাটে,—বিনু তো বই মুখেই পড়ে থাকে।"

বিনু কহিল,—"আপনার কাপড়গুলো কোথায় পাঠাব?"

"ঐ যা, দেখুন আমরা একেবারেই সাহেব হয়ে গেছি,—এত আলাপ হয়ে গেল তবু আমার নামটাও জিজ্ঞাসা কল্লেন না; বাড়ীটারও খোঁজ নিলেন না। আমিও এতই অভদ্র, আমিও বল্লুম না। কষ্ট করে আপনাকে পাঠাতে হবে না বিনুবাবু, আমিই বেয়ারা পাঠিয়ে দেবো এখন। আপনার কাপড়ইতো পরে চল্লুম। বড় উপকার করেছেন আপনি, আপনাকে ভুলতে পারবো না, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন।" বলিয়াই নীরদ অগ্রসর হইতেছিলেন।

সহাস্যে করুণাময় বলিলেন, "নামটা কিন্তু এখনও জানলুম না—"

নীরদ একটু উচ্চ হাস্যে ফিরিয়া কহিলেন,—"আজ্ঞে নীরদকান্তি রায়।"

"বিনোদ বাবুর ছেলে তুমি?"

"আজ্ঞে,—আপনি তাঁকে জানতেন।"

"আরে বোসো বোসো আর একটু শুনি, বিনোদকে জানতুম না? খুব জানতুম! তুমিই বিলাত গিয়েছিলে না, ব্যারিষ্টারী পড়তে?"

"আজ্ঞে হাঁ, গিয়েছিলুম,—কোন কাজই ক'রে আসতে পারিনি, বাবা যেবার মারা যান, চলে এসেছিলুম,—আর যাইনি।"

"হুঁ!—তা আগে বলতে হয়,—তুমি বিনোদের ছেলে।"

"আজ্ঞে আমি ত জানতুম না; বাবা কোলকাতায় আসবার পরেই আমি বিলেত চলে যাই,—পাঁচ বছর সেখানে ছিলুম, ফিরে আসতেই বাবা গেলেন,—দু'বছরে মাও মারা গেলেন, দুটী বোন বাবা থাকতেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল; বড়ই একা পড়ে গেলুম,—ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছি। মাস দুই হ'ল কোলকাতায় এসেছি; তা এবার মনে করেছি এখানেই থাকবো কিছুদিন।"

করুণাময় তেমনি ভাবে বলিলেন,—"বিনোদের ছেলে তুমি।"

বাল্য বন্ধুর স্মৃতি তাহার মনে মৃদু আঘাত করিতেছিল। শেষে কহিলেন,—আচ্ছা "এসো তবে বাবা! সর্ব্বদাই 'এস কিন্তু।" "আজ্ঞে তা আসব বই কি?"

নীরদ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরের দিন কাপড় ফিরাইয়া দিতে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প চলিল। বিনোদের কথা, বিলাতের কথা, নিজের কথা, অনেক কথাই করুণাময় নীরদকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

বাঁকীপুরে ওকালতী করিয়া বিনোদকুমার রায় মহাশয় অগাধ বিষয় সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন, নীরদকে তিনিই ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রথম বার অকৃতকার্য্য হইয়া নীরদ যখন দ্বিতীয় বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় হঠাৎ তারের খবরে অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া নীরদ কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিলেন।

সম্প্রতিক নীরদ সাহিত্য চর্চ্চার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। লিখিতেনও মন্দ নয়—ধনীর সন্তান বিলেত ফেরৎ, খাতিরও ছিল—অনেকেই ভালো বাসিত—তাহার উপর আবার নীরদ গাহিতে পারিতেন সুন্দর। কথাইতো নাই।

কেহ কেহ বলিত নিরদ বিলাতে এক সাহেবার প্রণয়-মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, তাই বিবাহ করিতেছেন না। কিন্তু এ যাবৎ কোন মিসেস্ রায় সাহেবার আবির্ভাব না হওয়ায় অনেকেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। কথাটা কতদূর সত্য নীরদ বলিতে পারেন, কিন্তু তিনি মাস মাস দুইশত করিয়া টাকা বিলাতে কোন বন্ধুর নামে পাঠাইতেন সত্য। পোঃ আফিসে কে একজন তাহার বেয়ারার হাতে দেখিয়াছেন, 'ফরেন মনিঅর্ডার লেখাও নাকি ছিল—your monthly allowance (তোমার মাসোয়ারা) - তা যাক।

আজ নীরদ অনেক কথা বলার পর যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তাহার মনের ভিতর কি একটা যেন বড় জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছিল। "এ বাড়ীতে আসা যাওয়াটা খুবই সুবিধায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটা, এযে বিষম একটা—"

"আচ্ছা তবে আসি আজ", বলিয়া উঠিতেই সম্মুখে একটু দূরে দরজার অন্তরালে দেখিলেন, কাহার দুইটী নয়ন-নীলোৎপল অতৃপ্ত বাসনা লইয়া তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

গাড়ীতে উঠিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিতেই চক্ষে পড়িল, উপরে মুক্ত বাতায়নে তেমনি চাহনী—তেমনি করুণ, রক্তিম মুখখানা।

নীরদ চলিয়া গেলেন। বিনয়ও দেখিয়াছিল বুঝিয়াও ছিল। খুব একটা আঘাত অনুভব করিয়াও সে যেন জীবনে প্রথম আজ একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল। নীহারের সহিত তাহার বিবাহের সম্ভাবনায় সে যেন বিশেষ অস্বস্তিতেই ছিল। "অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী করুণাময়ের একমাত্র কন্যা নীহার—আর নিঃস্ব দরিদ্র পরান্ন পালিত মাতৃ পিতৃহীন অভাগা বিনয়,—এ বিবাহ,—এ যেন অনেকটা দূর দিগন্তের পারে আলো ছায়ার সম্মিলন; বিলাসীর প্রমোদোদ্যানের দ্বারে দুঃখীর পর্ণ কুটির,—না—না—নাযেলাই ভাল,—অস্বাভাবিকতায় অশান্তিই বাড়ে বেশী।" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅতুলানন্দ রায়।

বর্ষ-শেষে

অনন্ত কালের চোখে একটি নিমেষ—
দিবা শেষ হয়ে' আসে; আলোকের শেষ।
শেষ হ'ল মধুমাস। ধরার নয়ন
মুদি' আসে ধীরে; শেষ বিদায়-চুম্বন
ভাতিছে ললাটে তার সন্ধ্যা-তারা-রূপে
জীবনের শেষ-সাধ চলে গেছে চুপে!

শেষ দিন বরষের। এই শেষ বার
খেয়া-তরী লয়ে' নেয়ে চলিল ওপার
শেষ শিখা শ্মশান বহ্নির, নদী তীরে,
নিবে' আসে। সর্ব্বশেষে চলিয়াছে ধীরে
মুছি শেষ অশ্রুনীর আপনার জন
শেষ করি উচ্চকণ্ঠে করুণ ক্রন্দন।

কি ভাবিছ বসি'? সব শেষ হয়ে' আসে
শুধু শেষ হয়নি' পথের! পথ-পাশে
কেন চাহো বিছাতে শয়ন; উঠ যাত্রী
অন্তহীন অজানিত পথে আসে রাত্রি।
লক্ষ্য নাই, অবিশ্রাম হইবে চলিতে
ক্লান্ত দেহে রিক্তকরে দ্বিধাপূর্ণ চিতে!
দূর কর অসার কল্পনা, মিথ্যা আশা
কোথা গৃহ? বুক ভরা লয়ে' ভালবাসা
রয়নি' বসিয়া কেহ তব প্রতীক্ষায়
জ্বালি দীপ, রচি শয্যা নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়।

কি দেখিছ উর্দ্ধে চাহি? অনন্ত আকাশে
কি অর্থ খুঁজিয়া মরে হতাশে তরাসে
শ্রান্ত-পক্ষ আঁখি-পাখী তব? চিরস্থির—
মানবের সুখে দুঃখে অটল গম্ভীর
আসিবে না হোথা হ'তে সদয়-আশ্বাস
ওযে এক অট্টহাস্য, মহা উপহাস!
আছে পথ, লক্ষ্য তার নাহি। আছে কাল
নাহি শেষ। বুনিতেছি কল্পনার জাল
জীবন-উদ্দেশ্য সম বর্ষ শেষ সবে
এ যে চির বর্ত্তমান কোথা শেষ হবে
কে করিছ হিসাব-নিকাশ? না জানিয়া
শেষ ফল, কিবা হবে ভালোমন্দ দিয়া?
নাহি সুখ, নাহি দুঃখ, পাপপুণ্য নাহি!
নাই কিছু নাই! কালার্ণবে অবগাহি
চলেছি অতলে। এই সত্য—চলিয়াছি
আর কিছু নাই থাক্, আমি কিন্তু আছি।

কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

মানুষের শক্তি ও সাধনা

"Fools give feasts and wise men eat them" নিতান্ত materialistic (বিষয়ভোগ সর্ব্বস্ব) রাজ্যের ব্যক্তি ব্যতীত এমন নিছক কথা কেহ বলিতে পারে না—"মূর্খেরা ভোজ দেয় আর বুদ্ধিমানেরা পেট ভরিয়া খায়।" ভারতীয় হিন্দু সমাজে এমন কথা সগর্ব্বে বলিবার মত সুবুদ্ধি অনেকেরই নাই। না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ ভারতের মানুষ "ত্যাগধর্ম্ম সার ভুবনে" এই কথাকেই বেশী রকম শ্রদ্ধায় পূজা করিয়াছে। ইংরাজীতে আর একটি কথা আছে— "give not thy friend so much power that he may turn your foe" অর্থাৎ "বন্ধুকে এমন কোন ক্ষমতা দিওনা যে সে তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে।" একথাটা ভারতের হিন্দুসমাজে কল্পনার অতীত ছিল। কারণ বিপদের সময়ে শত্রুকে মিত্রবৎ স্বগৃহে আশ্রয় দান করাই ভারতবাসী অধিকতর-পুণ্য এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু বন্ধুকে খুব বেশী বিশ্বাস করা সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার কিছু ইসারা আমাদের দেশের রাক্ষসের উপকথায় পাওয়া যায়। যে রাজকন্যা বৃদ্ধা রাক্ষসীর পায়ে সারা দুপুর বসিয়া তেল মালিস করিত—তাহার কাছে রাক্ষসী সব কথাই বলিয়াছিল; কেবল দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত গোপন রাখিয়াছিল দিঘীর তলে কোথায় অগাধ জলে এক ইমারতের বিজন কক্ষে, কোন পিঞ্জরায় রাক্ষসের প্রাণ-পাখী ছিল। যে দিন রাজকন্যার সরলতায় বিশ্বাস করিয়া রাক্ষসী সেই গোপন কথাও প্রকাশ করিল, সেই দিনই রাজ কুমারীর প্রণয়প্রার্থী রাজকুমার দিঘীর জলে এক নিঃশ্বাসে ডুব দিয়া সেই পাখীকে মারিলেন। রাক্ষসকুলকে এইরূপে নিধন করিয়া রাজকুমার রাজকন্যাকে বুকে জড়াইয়া ঘোড়ায় তুলিয়া মনুষ্যরাজ্যে উপস্থিত হইলেন! তারপর অবশ্য গল্প অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত যাওয়ার আপাততঃ আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ উপকথার এইটুকু অংশ হইতে বুঝিতে পারি যে উপকথার সৃষ্টিকর্ত্তা, এইটুকু বলিতে চাহিয়াছেন, যে সব কথাই বন্ধুকে বলিবে, কেবল বলিবে না সেই কথা যাহাতে সে ইচ্ছা করিলে তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। এই উপদেশও practical বস্তুগত বা জড় জগতের একটি সেরা কথা। কিন্তু এ সব সত্য যেমন খাঁটি, তেমনিই অত্যন্ত অনিষ্ট-কর। কতগুলি খাঁটি সত্য আমরা চোখের উপর প্রত্যহ দেখি। সেই সঙ্গে ইহাও দেখি যে, কতগুলি খাঁটি সত্যকে মানুষ উপেক্ষা করিয়া চলে। কেন উপেক্ষা করিয়া চলে সেইটাই আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ঘটী, বাটি, তেল, লবণ, ডাল, চিনি, গাধা, গরু, কাঠ এবং লোহা, মেয়ে কি পুরুষ জড়জগতে যতদিন মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে তত দিন এ সব প্রয়োজন। এই গুলিকে বাদ দিলে মানুষ মর্ত্তারাজ্যে এক মুহূর্ত্তও টিকিয়া থাকিতে পারে না। নিছকভাবে এই সব লইয়া কারবার করাই Practical (অতি সাবধানী) মানুষের কাজ। যে ব্যক্তি এই সব লইয়া কারবার করিতে যত বেশী অপটু, সে তত বেশী unpractical (অপটু)। অপটু অর্থে নিজের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে যে এই সবকে ঠিক মত না লাগাইতে পারে। জগৎ সংসারে বস্তু লইয়া ঠিক মত কাজ করা সকলের বুদ্ধিতে ঘটে না। ঘটিলে নিশ্চয়ই ভাল হইত না। কারণ সকলে বুদ্ধিমান হইলে বুদ্ধিহীনের নীচের আসন কে লইত, আর বুদ্ধিমানেরই বা পরিচয় কে পাইত? কাজেই জগতে unpractical এর অর্থাৎ অপটুরও মূল্য আছে। 'অতি' জিনিষটার প্রতি আমাদের দেশের লোকের শ্রদ্ধা একটু কম আছে বলিয়া মনে হয়। কথায় বলে "অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি"—সেই সঙ্গে পণ্ডিতেরাও বলেন "অতি দর্পে হতালঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।" কাজেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাই ভারতবর্ষে অন্ততঃ বস্তুরাজ্যে "অতির" বাড়াবাড়ি প্রশ্রয় পায় নাই।

(২)

কেবলমাত্র যাহা দেখি আর যাহা শুনি তাহাই সত্য বাদবাকি সব মিথ্যা,—একথা জোর করিয়া বলিবার সাহস খুব কম লোকেরই আছে। কারণ এই জগতে যাহা কিছু দেখার আছে তাহার সিকির সিকিও দেখিবার সুযোগ মানুষের নাই। যাহা শুনিবার আছে তাহার কতটুকু

কখন শুনিতে পায়? কেহই পায় না। যেখানে দেখা এবং শোনার মধ্যে যথেষ্ট অভাব রহিয়া যায় সেখানে চট্ করিয়া কে বলিতে পারে—"এই জগতই শেষ, কাজেই জীবনটাকে যত রকমে পার ভোগ করিয়া লও।" এই জগতেই যে মানুষের জীবন শেষ, জোর করিয়া কে এমন কথা বলিতে পারেন? কাজেই মানুষ যাহা দেখিতেছে যাহা শুনিতেছে, তার চেয়ে বেশী চিন্তা করিতেছে যাহা শোনে নাই। এই যে অধিকের প্রতি আকর্ষণ এই যে ক্ষণিকের প্রতি বিতৃষ্ণা, এই তো মানুষের জীবনকে এত সরস করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যইত মানুষ বর্ত্তমানের উপর কায়েমি খোঁটা গাড়িতে পারে না, কিম্বা অতীতের দিকে ফিরিতে চায় না। এই জন্যই মানুষের গতি সম্মুখে, এই জন্যই মনুষ্যজাতির তীব্র ব্যাকুলতা কবির কণ্ঠে সচ্ছন্দে ধ্বনিত হইয়া উঠে—"আগে চল আগে চল ভাই।" এই জন্যই বড় বড় practical (অতিসাবধানী) মানুষ বড় বড় সার কথা বলিয়াও জগতের unpractical (অপটুর) সংখ্যা কমাইতে পারে নাই। যাহা দেখিতেছে, আর যাহা শুনিতেছে—সেই চরম সত্য, আর কিছু জানিবার নাই, এই কথা মানুষ বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না বলিয়া যুগে যুগে—মনুষ্যসমাজে মহাপুরুষদের উদয়। এক মহাপুরুষ যাহা বলেন আর একজন তার চেয়ে আরো কিছু নূতন বলেন, এই রকম করিয়াই মনুষ্যসমাজ চিরকাল নদীর স্রোতের মত কেবলি দৌড় চলিতেছে। সে প্রবহমান স্রোতে কখনো ময়লা আসে, কখনও ময়লা ঘোচে। কিন্তু মানুষের জীবনযন্ত্রের এই বেগ দুর্দ্দমনীয়। এ পর্য্যন্ত কেহ ইহাকে দমন করিতে পারে নাই। কতবার কত প্রতিভাশালী জ্ঞানী চেষ্টা করিয়াছেন, মানুষকে বিশেষ এক ভাবে এক পথের পথিক করিবেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। শীল গ্রহণ, আর মন্ত্রোচ্চাচরণের কঠিন কঠিন শাসন অগ্রাহ্য করিয়াই মানুষ নব নব পথে নব নব চিন্তায় নব নব কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছে!

যদি বস্তুকেই এবং চোখে যাহা দেখে তাহাকেই খাঁটি মনে করা মানুষের স্বভাব হইত তাহা হইলে জগতের এত বিচিত্র উন্নতি লুপ্ত হইয়া যাইত। কারণ মৃত্যু—এটা বড়ই নিদারুণ সত্য, বড়ই অমোঘ সত্য। তবু কেন মানুষ এই জীবনের জন্য এত ব্যাকুল? এই বস্তুময় জগতের অন্তরালে—যেখানে বস্তু-অতীত শক্তি, সেই শক্তিকেই মানুষ জানিতে চায়। এই জানিতে চাওয়াই মানুষের সাধনা। জানাটাই মানুষের লাভ। সূর্য্য ওঠে না নামে না—পৃথিবীই সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে—কিম্বা শূন্যে কত কোটি তারা আছে—এসবের খোঁজ লইলে, মানুষের ঘরে একপয়সার জায়গায় দুই পয়সা হয়না, কিম্বা বুড়ী যুবতী কি যুবক বুড়া হয় না, তবু কেন এত চেষ্টা এত সাধনা ঐ সব জানার জন্য? কারণ কেবলমাত্র জানাতেই মানুষের আনন্দ, না জানাতেই মানুষের ব্যাকুলতা। বন্ধুকে বিশ্বাস করিলে কি হয়—এটা বন্ধু জানিতে চায়, প্রত্যেকেই জানিতে চায়। তুমি কি জোর করিয়া বলিতে পার সকল বন্ধুই আঘাত দেয় সকল বন্ধুই বিশ্বাসঘাতক? না, পার না। মানুষের বাহ্য প্রকৃতি তুমি কতটুকু জান? অন্তর প্রকৃতি যে আরো গভীর আরও রহস্যময়। অন্যকে খাওয়াইলে নিজের মনে যে তৃপ্তি হয়, সে তৃপ্তির কাছে ধনরত্ন তুচ্ছ—এসত্য তুমি পাও নাই তাই বলিতেছ, "Fools give feasts and wisemen eat them!" কেবল খাইয়াই কি আনন্দ, খাওয়াইয়া কি আনন্দ নাই? তা যদি না থাকিত, তবে রক্তজলকরা অর্থ দিয়া কেন একজন দশজন বন্ধুকে খাওয়ায়।

(৩)

মানুষের শ্রেষ্ঠ লাভ, মনের আনন্দ, এই মন কেবল বস্তুতে নাই—কেবল ভাবেও নাই। এই মন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বস্তুর অতীত অজানার সন্ধানে ছুটিয়া চলার রাজ্যে, যুবক যখন কোন যুবতীর স্বচ্ছ সুন্দর চোখের স্বপ্নে মুগ্ধ হয়, গোলাপরঙ্গীন অধর দুটির রক্তিম আভায় বিভোর হয়—তখন তার মনের ভিতরে যে আনন্দ সঙ্গীত বাজিয়া উঠে সে সঙ্গীত কি লক্ষ টাকায়ও বাজারে মেলে? মেলে না। কেন মেলে না? কারণ এই সঙ্গীত, রূপকে আশ্রয় করিয়া মনোরাজ্যে অনুরাগের রাঙাপথে আপন বাঁশরী বাজায়। মন যে কোনদিন বর্ত্তমানকে চায় না। অতৃপ্তির চোটে সে অস্থির। কবি গাহিয়াছেন,—

"তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর"

তাই ত! মানুষের মনের অতৃপ্তিই তার তৃপ্তি অর্থাৎ সুখ।

যেখানে মন চুপ করিয়া তৃপ্তির বস্তুগত অর্থে খোঁটা গাড়িয়া বলে—"হয়ে গেছে পাওয়া আর কিছু চাই না," তখনি সে মরে। তখনি সে জড়। কিন্তু মানুষ নিজের সম্বন্ধে সমাপ্তিটাকে স্বীকার করিতে চায় না। কারণ মানুষ ছুটিয়া চলিতেই রস পায়, আনন্দ পায়। পূজার উৎসব আসিবে, আমাদের প্রতিদিনগুলি ধীরে ধীরে কল্পনার রঙে রঙীন হইয়া সেই দুর্গার পূজা-উৎসবের তিথির সমীপবর্ত্তী হইতেছে; এই আনন্দ আমাদের যতটা চঞ্চল করে—যখন সাক্ষাৎ দশভূজার মূর্ত্তি দেখি তখন ঠিক সেই আনন্দ পাই না। তখনকার আনন্দের তলে তলে বিজয়া দশমী সমাপ্তির করুণ সুর, আমাদের অন্তরকে ক্ষণে ক্ষণে ব্যথিত করিতে থাকে, এই জন্য কোন পারস্য কবি গাহিয়াছেন

"প্রতীক্ষায় তব সখী, যেই সুখ মিলে—
মিলনের পর্ব্বে সেই সুখ নাহি দিলে"

কবি যে খাঁটি মনের কথা বলেন—তাই তো প্রিয়তমার মিলনকে, বিরহে প্রতীক্ষায় আনন্দের কাছে ছোট করিয়া দিলেন। আমাদের দেশের কবিও এই পথ চাওয়াকেই বড় আনন্দ বলিয়াছেন। তাই গাহিয়াছেন,—

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।
ততক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই আপন মনে
বাতাস বহে সুমন্দ"—

কবিরা আপনাদের প্রেমের সৌন্দর্য্য পথে কাম্যসম্বন্ধে কল্পনার বনে বনে সন্ধান করিতেই ভাল বাসেন। বৈজ্ঞানিকেরাও তাই হাতের কাছে একটা কিছুকে পাওয়া যেন চরম আনন্দ নয়—পাওয়ার সন্ধানে বিঘ্ন বাধার মধ্য দিয়া চলাই যেন আনন্দ। মৃত্যু স্থির জানিয়া এবং মৃত্যুর পারে কি আছে তাহা না জানিয়াই, ভবিষ্যতের কল্পভূমিতে আশার নব নব রঙ মহল গড়িয়া তোলাই মানুষের সাধনা

(৪)

সম্মুখের দিকে, পরীক্ষার দিকে, অভিজ্ঞতার দিকে চলাই মানুষের ধর্ম্ম। কলের গাড়ীকে রাম শ্যাম যদু যে ইচ্ছা সে চালাইতে পারে। কিন্তু মানুষ ত আর কলের গাড়ী নয় যে—যে ইচ্ছা তাহাকে যেমন খুসী চালাইয়া দিবে? বস্তুকে কতকটা যেমন খুসী চালান যায়—তাহাতে অবশ্য জন্তুর জীবনগত উপকার হয়, না অপকার হয় এ কথা বলা কঠিন। গরু আমাদের দুধ দেয় বলিয়া সে আমাদের মা, অথবা তাহার পায়ে ছাদন দড়ি দিয়া দুধ দোহাইয়া লই বলিয়া সে আমাদের মা, এ কথার মীমাংসা একটু শক্ত। যা হোক, অন্ততঃ এটা ঠিক মানুষ এ রকম ভাবে কারো মা হয় না। মানুষ ছাঁদন এবং বাঁধনের বড়ই বিপক্ষে। এসম্বন্ধে মানুষের আপত্তি বড়ই কঠোর। অবশ্য মনুষ্যসমাজে বাঁধন আর ছাঁদনের কোন মূল্য নাই, একথা বলাই বাতুলতা। নদীর দুইধারে তটের বন্ধন থাকে বলিয়া যে এমন কল সঙ্গীতের সৃষ্টি করে। এস্রাজের তারে যখন ওস্তাদ কাণ ডলা দিয়া তার কসেন, তখনি সুমধুর সঙ্গীত এস্রাজ হইতে উত্থিত হয়। কাজেই মনুষ্যজীবনের উপর কোন রকমের বিধি নিষেধ না থাকিলে মানুষ—মানুষ না হইয়া উশৃঙ্খল জন্তুতে পরিণত হইয়া যায়।

কাজেই মানুষের পক্ষে অধীনতা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিধান। অবশ্য সেই অধীনতার পূর্ব্বে বুদ্ধিমানেরা—"স্ব" এইটুকু যোগ করিয়া দেন। নিজের উপর যখন আমি স্বেচ্ছায় একশত আইন এবং শাসনবিধি চাপাই, তখন তাহা আমার পক্ষে নিদারুণ হয় না—অসহ্য হয় না। কিন্তু যখন আর একজনে বলে আজ হইতে তুমি চারবার উঠিবে আর চারবার বসিবে, তখনি আমার পক্ষে তাহা বিরক্তিকর হয়। এবং ক্লেশকর হয় যখন সে আমাকে আটবার উঠ্ বস করাইয়া ছাড়ে। কাজেই মানুষের উপর imposed law" (অনিচ্ছায় চাপান আইন) এর জোর কল্যাণকর না হইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা অকল্যাণকর হয়। এই জন্যই মানুষের কাছে মানুষ বন্ধু হওয়াই শ্রেয়। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ বিশেষ একটি বয়স পর্য্যন্ত থাকা ভাল—অধিক বয়সের ছাত্রের উপর গুরুগিরি কিম্বা কঠোর অভিভাবকতা খাটাইতে যাওয়া ভাল না। বুদ্ধিমানেরা এই জন্যই বলিয়াছেন, "প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ" অর্থাৎ পুত্র ষোল বছরের হইলে পিতার কর্ত্তব্য তাহাকে মিত্রবৎ গ্রহণ করা। আজ কাল দেখিতে পাই সমাজে, বস্তুগত দাবী দাওয়া বাড়ীয়া চলিয়াছে—পক্ষান্তরে নিঃস্বার্থ হইয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার

করিবার দিক্‌টা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে মানুষের জীবনের লক্ষ্য কেবল মাত্র আপনাকে মানিয়া চলে। যে আপনাকে খাঁটি ভাবে মানিতে শিখিয়াছে, সে কোন দিন অন্যকে অমান্য করিতে পারে না। যে নিজের ক্ষুধাকে সত্যকার জ্ঞানের ভিতর দিয়া বুঝিয়াছে সে অন্যের মুখের গ্রাস কাড়িতে পারে না।

(৫)

শক্তির অপব্যবহার করাতেই মানুষ অমানুষ হয়। স্বজাতি বিদ্বেষ, কুক্কুর এবং ঐ শ্রেণীর হিংস্র জন্তুর মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু মানুষের রাজ্যেও যদি এই নিয়ম চলিতে থাকে, তাহা হইলে উন্নতির কোন অর্থ পাই না। আমার শরীরের কোন একটি অঙ্গকে পঙ্গু করিয়া অন্য অঙ্গ পুষ্ট হইতে পারে না—তেমনি সমাজ শরীরের প্রত্যঙ্গ প্রতি মানুষ। কাজেই একটি মানুষও যদি সমাজে পীড়িত হয়, সে পীড়া সমাজের বুকে নিশ্চয়ই বাজিবে,—না বাজিয়া উপায় নাই। সমস্ত মনুষ্য জাতির পূর্ণত্ব প্রত্যেক মানুষের পূর্ণত্বের উপর নির্ভর করে। মানুষের পূর্ণত্বের সাধনা—শিক্ষায়, নব নব চিন্তায়—নব নব জ্ঞান আহরণের পথে বেগে ছুটিয়া চলায়। মানুষ যখন এই সাধনা করিতে পারে না, যখন তার মনের শক্তিকে এই রকম স্বাধীন ভাবে চালনা করিতে পারে না, তখনি তার সর্ব্বনাশ। মানুষের এই সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা সর্ব্বদেশে সর্ব্বসমাজেই অল্প বিস্তর আছে। আছে বলিয়া নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার উপায় নাই। কেমন করিয়া সমাজের মধ্যে এই মনুষ্যত্বের সাধনা অমর হইতে পারে—আজ সভ্য জগতের চিন্তাশীলেরা সেই পথ খুঁজিতেছেন। আজ বস্তুতন্ত্র প্রধান য়ুরোপেও, এমন কয়েকজন পণ্ডিত দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা মিথ্যা সংস্কারের "অচলায়তন" হইতে মানুষকে মুক্তির রাজ্যে ছুটিয়া চলিবার পথের সন্ধান করিতেছেন। অন্ততঃ তাঁহারা বলিতে সুরু করিয়াছেন যে তোমরা যাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছ এবং যে আড়ম্বর তোমাদের চক্ষু এবং মনকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহাই একমাত্র লাভ নহে। এর ঊর্দ্ধে প্রীতির রাজ্যে অধিক লাভের দিকে অগ্রসর হও। এই যে অতৃপ্তির বাণী, এইত মানুষের অন্তরের বাণী। আমাদের দেশে সাবেকী মতকে নির্ব্বিচারে অন্ধের মত মানিয়া চলায়, আর মানুষের তৃপ্তি নাই। চারিদিকেই অতৃপ্তি জাগিয়াছে। ভাল লক্ষণ। অতৃপ্তিই মানুষের সাধনার প্রধান অঙ্গ। যতদিন অতৃপ্তি ততদিনই জীবন। মোক্ষলাভের আস্বাদ আছে শাস্ত্রজ্ঞেরা এই কথা বলেন—যেমন মৃত্যুর পরপারে স্বর্গ আছে বলেন। থাকিতে পারে মোক্ষ—থাকিতে পারে স্বর্গ। কিন্তু সেখানে যদি মানুষের তৃপ্তি হয়—সে তৃপ্তি কেমন? কে জানে সে তৃপ্তি কেমন। আপাততঃ অতৃপ্তিই আমাদের তৃপ্তি। কারণ সেই জন্যই জীবন মধুর। চিত্তের নিবৃত্তি অথবা আত্মার তৃপ্তি না হইলে মানুষকে বারবার জন্ম লইতে হয়, শুনিতে পাই শাস্ত্রে এমন কথাও আছে। জন্ম মানেই জীবন, অজন্ম মানেই মৃত্যু। মানুষ ত কোনদিন মৃত্যু চায় না—চায় জীবন। সেইজন্যই তো লোকে জন্মের পর জন্মান্তর লাভেই মানুষের সার্থকতা ছুটিয়া চলাই যখন আনন্দ, সেই আনন্দেই যখন মাধুর্য্য, তখন চিত্ত-নিবৃত্তি, সাধ করিয়া কে চায়?

রহস্যময় জগতের মধ্যে এ রহস্যের পান্থশালা হইতে অন্য রহস্যের পান্থশালায়, তীর্থযাত্রীর মত, হাঁটিয়া চলাইত মানুষের ধর্ম্ম। ক্রমাগত একভাবে চলার মধ্যে একটা জড়তা আসে, একটা অবসাদ আসে। কাজেই মানুষ ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায়, কাঁদিয়া এবং হাসিয়া নূতন নূতন ভাবে জীবন যাত্রায় পাড়ি দেয়।

(৬)

নিজের প্রতি নিজের অটল বিশ্বাস মানুষের সব চেয়ে বড় শক্তি, এই শক্তির কাছে ভগবান হারিয়া যান। এই স্ব-বিশ্বাস যার নাই সে কোন দিন জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। এই বিশ্বাসেই মানুষ ব্যবহারিক জীবনে ন্যায় এবং অন্যায়ের বিচার করিয়া বস্তু-লোকের অতীত চিন্তা-লোকেও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে। যার মধ্যে আত্মবিশ্বাস নাই—আত্মশক্তি সে লাভ করিতে পারে না। আত্মশক্তি লাভ করিতে না পারিলে, কোন শক্তিই লাভ করা যায় না। স্বাধীন ভাবে চলা খুব সহজ নহে। বরং পরাধীন ভাবেই চলা

সহজ। নিজের অধীন হইতে গেলে বড় বেশী সংযম প্রয়োজন, বড় বেশী ধৈর্য্য থাকা দরকার। যথেচ্ছা-চারকে স্বাধীনতা বলা চলে না। বস্তুতঃ পক্ষে আমরা সাধারণতঃ যথার্থই স্বাধীনতাকে, যথেচ্ছাচার বলিয়া টুঁটি চাপিয়া মারি, আর যথেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা নাম দিয়া তাহাকে সময় সময় অযথা প্রশ্রয় দেই। যখন কোন ব্যক্তি, নিজের কোন ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিতে যাইয়া অন্যকে সাক্ষাৎ ভাবে কোন আঘাত দেয় না, তখনি তাহা স্বাধীনতা। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিতে যাইয়া অন্যকে সাক্ষাৎ ভাবে আঘাত করে, তখনি তাহা যথেচ্ছাচার।

মানুষের আসল সাধনাই পরের স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণ অনাহত রাখিয়া নিজের জীবনের গতিকে স্বতন্ত্র রাখা, যেখানে একটি স্বাতন্ত্র্য অন্য স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করিতে চায়, সেইখানেই তাহা দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়! কোন কোন সমাজে লাঠি এবং জুতা ব্যবহার না করিয়াও কেবল মাত্র কতগুলি সমাজ-পাণ্ডা শাস্ত্র আর বিধিনিষেধের সংস্কারে অশিক্ষিত জনসমাজকে উচ্চবর্ণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, একেবারে নির্ব্বোধ করিয়া রাখে। কয়েক বছরের কথা, আমি তখন বরিশাল জেলার অন্তর্গত উজীরপুর গ্রামে ছিলাম। সেখানকার এক নমঃশূদ্রের কাছে এক গেলাশ জল চাহিয়াছিলাম। ধর্ম্মে সে পতিত হইয়া নরকে যাইবে সম্পূর্ণ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে সে আমাকে জল দিল না! এইরকম ধর্ম্ম আর শাস্ত্র দেখাইয়াও অপরোক্ষ ভাবে, কি রকম করিয়া মানুষকে সম্পূর্ণ অমানুষ করে—তাহার জলন্ত নজির এই। ব্রাহ্মণ কিম্বা শূদ্র—কিম্বা মুচী সকলেই নিজের স্বাতন্ত্র্যের জন্য ইচ্ছামত যৌক্তিক হউক অথবা অযৌক্তিক হউক পরের ছোঁয়া জল কিম্বা অন্নগ্রহণ না করিতে পারে। কিন্তু রাম কোন দিনও শ্যামকে এমন ধর্ম্ম শিখাইতে পারেন না, ওহে শ্যাম, তুমি মধুকে জল দিও না—সে চাহিলেও দিও না, দিলে নরকে তোমার ঠাঁই। দুর্ভাগ্যের বিষয়—আমাদের পুরহিতেরা—এমনতর কু উপদেশ বিতরণে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না!

যে জিনিষটায় বেশী উত্তাপ সহ্য হয় না তাহাকে বেশী গরম করিলে ফট্ করিয়া তাহা ফাটিয়া যায়—অনেক সময় বিপদের সৃষ্টি করে। যাঁহারা কেরোসিন তৈলের দেওয়াল-গিরি কিম্বা হ্যাণ্ডিং ল্যাম্প ব্যবহার করিয়াছেন—তাঁহারা চিমনি ফাটার তাৎপর্য্য কি তাহা অবশ্যি জানেন। তেমনি মানুষের প্রকৃতিগত স্বাধীনতায় যে সম্প্রদায় শাস্ত্রের অনুশাসন চাপাইয়া তাহাকে দেহ মনে শৃঙ্খলিত করে—সেই সম্প্রদায়কে এক সময় সুদে আসলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বড় বড় চিন্তা, বড় জ্ঞানের কথা যখন মানুষকে উন্নতির দিকে না টানিয়া—অবনতির অধো-মুখে ঠাসিয়া ধরিবার অস্ত্ররূপে প্রয়োগ হয় তখন অচিরে সে সব বড় বড় কথার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। সেই জন্য আজ আর কেহ শাস্ত্রের দোহাই স্বীকার করিতে চায় না।

অতীত সময়ে শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন মানুষকে উন্নতির পথ দেখাইয়া ছিলেন সকলে না হোক অনেকেই তখন শাস্ত্রে ভক্তি করিত। এখন যখন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুরে ব্যাখ্যা দিয়া মানুষকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন এবার শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞদের প্রতি অভক্তি দেখাইবার সময় আসিয়াছে। যখন অনেক দিনের পর সুপ্তির মধ্যে হঠাৎ জাগরণের জয়শঙ্খ বাজিয়া উঠে, তখন সেই হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের চাঞ্চল্য চারিদিকে বেশ একটু বিপত্তি ঘটায়। আমাদের হিন্দুসমাজে ইদানিং বিপত্তির এই ঝড় উঠিয়াছে। যাহারা বিপত্তির বীজ এত দিন বেশ বুদ্ধিমানের মত বপন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের চোখে ধূলা এবং বালি সর্ব্বাগ্রে পড়িবে। একশ বার সভা এবং সমিতি করিয়া মনু পরাশরের বিধিবিধানকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা দিলে কিম্বা শিখা নাড়িলেও এ ঝড় থামিবে না।

নিশ্চয়ই যাহারা এ ঝড় তুলিবে, হয়ত আপাতত তাহাদের অনেক বিঘ্নের সঙ্গে কোলাকুলি করিতে হইবে। কারণ অনভ্যস্ত জাগরণকে অভ্যাসের অনুবর্ত্তী করিতেও কিছু সময় লাগে। তত্রাচ এইটাই মঙ্গলের লক্ষণ। কারণ, যাহারা এই বিপত্তির ঝড় তুলিতেছে, তাহারা সকলেই মানুষ। মানুষ কোন দিন এক ভাবে এক ধরণে জীবন যাত্রার পথে চালনা। বিচিত্রভাবে, বিচিত্র কৌশলে, বিচিত্র বিধানে, সম্মুখ পথে অগ্রসর হইয়া চলাই মানুষের

সাধনা। এই সাধনাকে বজায় রাখাতেই মানুষের জীবনী শক্তির সার্থকতা। একভাবে, এক রীতিতে জীবন-যাপন মনুষ্যের স্বভাব নহে এই সত্যের ব্যতিক্রমে আমাদের হিন্দু সমাজে হয় নাই। চার্ব্বাক হিন্দু ছিলেন; বৃহস্পতি ছিলেন নাস্তিক্যদলের পাণ্ডা; তিনিও হিন্দু ছিলেন! কাজেই বোঝা যাইতেছে, একজন আর একজনের বক্তৃতা খামকা স্বীকার করিবে হিন্দুর স্বভাব এমন নহে। যদি সকলেই একমতে চলিত, তবে শঙ্কর, বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইত না।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

একা আমি দুই

নাহি মোর রূপ স্বর—না আছে যৌবন
রসহীন গন্ধহীন অভাগা জীবন।
কেহ নাহি ভালবাসে—কেহ নাহি চায়
সারাটি পরাণ মোর কাটে উপেক্ষায়।

শুধু প্রিয়! ভালবাস তুমি চিরদিন
তাই রূপ—অপরূপ নিয়ত নবীন!
তব চক্ষে সবি মোর চির অতুলন
একেলা আমাতে তাই—আমি দুই জন!

শ্রীঅবনীকুমার দে।

আপন পর

"আর কি ভাই, নিজের ঘর কন্না এখন নিজেই বুঝে নেও।"

সুনন্দা একটু হাসিয়া মুরলার দিকে চাহিল। সকালে সকলকে চা ও খাবার দিতে হইবে। সুনন্দা আজ আলস্য থাকিয়া নবীনা ভ্রাতৃবধু মুরলার উপরেই কাজের ভার দিয়াছিল। মুরলা বেশ পরিপাটি ভাবে চা প্রস্তুত করিয়া পেয়ালায় পেয়ালায় তাহা ভাগ করিয়া রাখিল। রেকাবে রেকাবে খাবার গুছাইল। দেখিয়া সুনন্দার বড় আনন্দ হইল। উৎফুল্ল হাসিমুখে সে কহিল, "আর কি ভাই, নিজের ঘর-কন্না এখন নিজেই বুঝে নেও।"

মুরলা যেন একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "যাও ভাই! ঐ সব কথা যদি বল বলছি, আমি কিচ্ছু আর ক'রব না।"

"কোন অন্যায় কথা কি ব'ল্লাম? সব ঘরকন্না ত তোমারই। তুমি করবে না কে ক'রবে?"

"কেন, তুমি। তুমিই ত সব ক'চ্চ ভাই।"

সুনন্দা উত্তর করিল, "এতদিন করেছি। তা মা নেই—তুমিও নতুন—কে আর ক'রবে, তাই করেছি।' এখন তুমি যদি এমন গুছিয়ে সব পার, কেন ক'রব? ঘর সংসার হ'ল তোমার, আমি ত পর—"

"হাঁ, পর বইকি? কথা শোন। আমিই বরং পরের মেয়ে—"

"পরের মেয়েই ত ঘরে এনে সব চেয়ে আপন হ'য়ে বসে। আর ঘরের মেয়ে পর হ'য়ে পরের ঘরে যায়। এই হ'ল সৃষ্টিসংসারের নিয়ম। তা চা জুড়িয়ে যায় যে। চল, নিয়ে যাই।

মুরলা জিভ কাটিয়া কহিল, "ওমা, আমি কোথায় নিয়ে যাব? ছি ভাই বড় লজ্জা করে। তুমি নিয়ে যাও। একা না পার বরং আর কাউকে ডাক, সেও কতক নিয়ে যাবে।"

"সে হবে না, তোমাকেই যেতে হবে। এসবও ত শিখ্‌তে হয়। ঐ যে তাকের উপর ট্রে দু'খানা র'য়েছে, নামিয়ে আন।"

মুরলা ট্রে দুইখানি নামাইল।

একখানির উপরে খাবার, আর একখানির উপরে চায়ের পেয়ালা কয়টি রাখিল। তার পর দুইজনে দুইখানি ট্রে লইয়া বাহির হইল।

সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া সুনন্দার পিতা দেবেন্দ্রবাবু পুত্রদের এবং গৃহাগত আত্মীয়বন্ধুদের লইয়া চা পান করিতেন। সেই বারান্দাতেই চায়ের অপেক্ষায় তিনি খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রমেন্দ্রও ঠিক তখন প্রাতঃক্ষৌরাদি সমাধা করিয়া একটা ঢিলা জামা ও পায়জামা পরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চায়ের ট্রে হস্তে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা সলজ্জা স্মিতমুখী পুত্রবধূকে দেখিয়া দেবেন্দ্র বাবু উৎফুল্লমুখে হাসিয়া কহিলেন, "বাঃ—বাঃ—এই যে মা লক্ষ্মী আজ নিজেই যে। বেশ, বেশ, এই ত চাই! এই রকম ক'রে গুছিয়ে সব নিজে এখন ক'ত্তে পাল্লেই ত হয়।"

মুরলার সুন্দর মুখখানি ভরিয়া সুন্দর হাসিটুকু আরও ফুটিয়া উঠিল। রমেন্দ্র মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিল।

টেবিলের উপরে হাতের ট্রেখানি রাখিয়া মুরলা একটু পিছনের দিকে সরিয়া স্বামীর মুখপানে একবার চাহিয়া মুখপানি একটু ফিরাইয়া নিতে নিতে ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিল। সুনন্দা হাসিয়া কহিল, "হ'য়েছে, আর কলাবউ সাজ্‌তে হবে না। রকম দেখ না? যেন কি!"

দেবেন্দ্র বাবুও পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তাই ত, অত লজ্জা কি মা? বেশ সম্ভ্রম রেখে সপ্রতিভ ভাবে সবার সাম্‌নেই চ'ল্‌বে ফিরবে, সহজভাবে কথাবার্ত্তা ব'ল্‌বে, এই যে আমি চাই। তুমি হ'লে এখন বাড়ীর গিন্নী।"

সুনন্দা কহিল, "আমিও তাই বল্‌ছিলাম বাবা। তুমি হ'লে গিন্নী, এখন নিজের ঘরকন্না নিজে দেখে শুনে কর।"

"তা ত ক'ত্তেই হয়—কত্তেই হয়। নিজের সংসার এখন নিজেই দেখে শুনে চালিয়ে নিতে হবে। কেমন মা, পারবে না? না পারলে চ'ল্‌বে কেন? সুনু ত আর চিরকাল ক'রে দেবে না?"

তখন ছোট ছেলেরা এবং বাড়ীতে আত্মীয় বন্ধু দুই এক জন যাঁহারা ছিলেন, সকলে আসিয়া চা-পান আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সুনন্দা কহিল, "চা টা আজ কেমন হ'য়েছে বাবা?"

"খাসা হ'য়েছে। কেন।"

"বৌদি আজ চা ক'রেছে। খাবার টাবারও সব নিজে গুছিয়েছে, আমি কিছু দেখিয়ে দিইনি।"

"বটে! খাসা হ'য়েছে ত! এই ত মা, নিজেই সব পারছ। আর কি? এম্‌নি ক'রে এখন সব ক'ত্তে পাল্লেই ত হয়।"

"আমিও ত তাই বলি বাবা। তা ওর ভয়ই যেন ভাঙে না।"

শ্বশুর আদর করিয়া কহিলেন, "ভয় কি মা? ভয় কি?—তোমার ঘর, তোমার সংসার নাহয় দুটো ভুলই হবে। তার জন্যে আর কি?"

চা খাওয়া হইল। চায়ের মজলিসও ভাঙ্গিল। রমেন খবরের কাগজটা লইয়া দেখিতেছিল। দেবেনবাবু কহিলেন, "হাঁ রমেন্, হেমের এখন—কি করা যায় বল ত?"

রমেন উত্তর করিল, "কি ক'রবেন,তা ত বুঝিনে। ক'বছরে বিএটাই পাশ ক'ত্তে পাল্লে না—একেবারে অপদার্থ! কোথায় কি চাকরী আপনি জোগাড় করে দিতে পারবেন? হদ্দ বিশ পঁচিশ টাকার একটা কেরাণী গিরি যদি জোটে। তাতে কি হবে?"

"তা চেষ্টা ত একটা ক'ত্তে হয়—"

"এক প্লিডারসিপ প'ড়া। তাও পাশ ক'ত্তে পারবে ব'লে মনে হয় না। সে আরও শক্ত। আবার দুতিন বছর পড়ার খরচ—সেও ত নেহাত কম পড়বে না। কে চালাবে?"

দেবেন বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন,—"বাপ মরে গেল—কিছু রেখেও যায়নি—দেনাই বরং কিছু আছে। তা করা যায় কি? মুনু দুঃখ পাবে, ওর দায়টা কাজেই এখন তোমাদেরই নিতে হচ্চে।"

রমেন একটু ভ্রূকুটি করিল। কহিল—"এ দায় এখন আমাদেরই কেন নিতে হবে, বুঝিনে। বিয়ের সময় টাকা ত তার বাপ কম নেয়নি। তখন এমন কথা ছিল না যে আমাদের কোনও দায় আর ওদের দিতে

হবে।—পড়ার খরচাটরচা সব হিসেব ক'রে কড়ায় গণ্ডায় তখন বুঝে নিল। এই বিয়ে দেয়াই আপনার বড্ড ভুল হয়েছিল, এই টাকায় ওর চাইতে অনেক ভাল ঘরের ভাল ছেলে পাওয়া যেত।—"

"তা ত যেতই বাবা, তা ত যেতই। তবে বড় ভাল লাগল হেমকে। ওদের পড়াতে রোজ আস্‌ত,—দেখতে অমন সোনার চাঁদের মত—বেশ চালাক চতুর,—আবার অমন মিষ্টিস্বভাব—তোমার মাও একেবারে ধ'রে প'ড়লেন। বি এ পড়ত—আবার শুনেছিলাম বাপও বেশ দুপয়সা রোজগার ক'চ্চে—"

রমেন বলিয়া উঠিল, "হাঁ ভারী রোজগার ক'চ্ছিল। তাহ'লে ছেলে টুইসনী ক'রে পড়ত?"

"তা অনেক ছেলে করে থাকে। একটু খাটলে যদি বাপের দুটো পয়সা বাঁচে—"

"ওসব কিছুনা বাবা। সব ফাঁকি। আসলে বাপ কলকেতার পড়ার খরচ চালাতেই পারত না, রোজগার যাই করুক, দেনায় ডোবা ছিল। এতগুলি টাকা নিল—দেনা শুধতেই কুলোল না। ছেলের কবছরের পড়ার খরচা হিসেব ক'রে দুহাজার টাকা গণে নিল একটি পয়সা রেখে গেল না।"

"তাই ত ওর ভারটা এখন তোমাদেরই নিতে হয় রমেন্—"

"কেন নিতে হবে? সব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেওয়াই হ'য়েছে। তবু যদি আশা কিছু থাক্‌ত, নাহয় খরচ কিছু আর করা যেত। কিন্তু প্লিডারসিপ ও পাশ ক'ত্তে কখনও পারবে না। বিএই পাশ ক'ত্তে পাল্লে না! এমন জলের মত পরীক্ষে আজ কালকার হাজার হাজার ছেলে পাশ ক'রে যাচ্ছে! পড়ায় আর ওর পিছনে কিছু খরচ করা সে টাকা জলে ফেলে দেওয়ার মত হবে। সে টাকা দিয়ে ব্যবসা ক'ল্লেও বরং কাজ কিছু হতে পারে

"তা হ'লে কি সেই চেষ্টাই দেখ্‌ব? কিছু মূলধন ওকে দিয়ে দিই—যদি ব্যবসা ট্যাবসা কিছু ক'ত্তে পারে"—

রমেন্ কহিল, "কি ব্যবসা ও ক'রবে? ব্যবসার কি অভিজ্ঞতা ওর আছে? কতকগুলি টাকা দিয়ে দেবেন, দু'দিনেই সব নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে।"

"তা হ'লে কি করা যায় বল ত? একেবারে ত ছেড়ে দেওয়া যায় না। যা হো'ক তোমাদেরই একটা গতি ত ওর ক'রে দিতে হবে। সুনু আমার দুঃখ পাবে, তাও ত বরদাস্ত করা যায় না।"

রমেন্ একটু ভাবিয়া কহিল, "তা বরং লিখে দিন,—আসুক ত এখানে—তার পর দেখা যাবে কি করা যেতে পারে। তবে মিছে টাকা নষ্ট ক'ত্তে আমি ব'ল্‌তে পারি না। পড়ার কথা ছেড়েই দিন। তবে ব্যবসা—তা কোন ব্যবসার মধ্যে বরং কিছুদিন এপ্রেন্টিসী করুক। দেখা যাক যদি যোগ্যতা হয় তখন যা হয় বোঝা যাবে।"

"আচ্ছা, তাই হবে লিখেদি।"

দেবেনবাবু উঠিয়া তাঁহার ঘরে গিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন। রমেন ভিতরে মুরলাকে ডাকিয়া অর্গ্যানটার কাছে গিয়া বসিল। সকালে সে নিজেই কিছুকাল মুরলাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিত

(২)

পিতা যাই রোজগার করুন, দেনা অনেক ছিল, খরচের হাতও বড় কিছুতেই কুলাইত না। হেমকুমার আই এ পাশ করিয়া যখন কলিকাতায় পড়িতে আসিল, পিতার দায় কিছু লঘু করিবার উদ্দেশ্যে একটি টুইসন সে খুঁজিতেছিল।

মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে দেবেন্দ্রবাবুর ছোট ছেলে মেয়েদের গৃহে পড়াইবার ভার সে লইল। সকালে আর বৈকালে দুই বেলাই সে আসিত। সুন্দর চেহারায় আর বেশ সপ্রতিভ সরল মিষ্ট ব্যবহারে শীঘ্রই কর্ত্তা ও গৃহিণীর বড় প্রিয়পাত্র সে হইয়া উঠিল। গৃহিণী বায়না ধরিলেন হেমের সঙ্গে সুনন্দার বিবাহ দিতে হইবে। পড়া শুনায়ও ত ছেলেটী ভাল। কর্ত্তা বড় চাকরী করেন—সম্পত্তিও বেশ আছে। জামাইটিকে কি তিনি মানুষ করিয়া দিতে পারিবেন না? অবশ্য পারিবেন প্রচুর টাকা আর এত বড় মুরুব্বি পাইয়া বৈবাহিকও বাধ্য থাকিবেন। সুনন্দাকে তাঁহারা যখন যতদিন ইচ্ছা কাছেই রাখিতে পারিবেন। বড়লোক কেহ এত খাতির করিবে না। হয়ত দু'টি দিনের জন্যও তিনি তাঁর সুনন্দাকে কাছে আনিয়া রাখিতে পারিবেন না। দেবেন্দ্রবাবুও গৃহিণীর কথায় শেষে রাজি হইলেন। হেমের পিতা

অভয়বাবুও সত্যই এমন সম্বন্ধ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। আপাততঃ প্রচুর নগদ টাকা ও অনেক জিনিষ পত্র পাওয়া যাইবে,—ভবিষ্যতে ছেলেরও বড় একজন মুরুব্বি হইবে। পণ ও এবং ছেলের এম এ বি এল পর্য্যন্ত পড়ার খরচ বাবদ ৪ হাজার টাকা তিনি দাবী করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া হেমের সঙ্গে সুনন্দার বিবাহ দিলেন। সব টাকাই অভয়বাবু ঋণপরিশোধে ব্যয় করেন, হেমের পড়ার জন্য কিছুই রাখেন না। রাখিবার বস্তুতঃ উপায়ও কিছু ছিল না। হয়ত তিনি মনে মনে এরূপ ভরসাও করিয়া ছিলেন যে, নিতান্ত না চলিলে ধনী বৈবাহিক হেমের পড়ার খরচটা, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, দিবেনই। কিন্তু হেম নিজে সেরূপ কোনও সাহায্যের প্রার্থী হইতে চায় নাই। পিতা বেশী কিছু দিতেন না বা দিতে পারিতেন না। হেম পিতার উপরে একেবারে নির্ভর না করিয়া দুইটি টুইসন নিল। সে মেসে থাকিত এবং শ্বশুর এই সব টুইসনের কথা কিছুই না জানিতে পারেন, এজন্য বিশেষ সতর্ক হইয়াও চলিত। কিন্তু ইহাতে পড়ার বড় ব্যাঘাত হইত। তা ছাড়া খেলা—ও গান, বাজনার একটা নেশা তার ছিল। বাহিরে ক্রিকেট ফুটবল হকি, ঘরে তাস পাশা দাবা খেলা, আর খুব জমকাল আড্ডা করিয়া গল্প গুজব করা, ঘন ঘন থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা—কিছুরই লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিত না। এজন্য কে.ব্যয় হইত, তাও সে মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত টুইসনের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া লইত।

স্ত্রীকেও বড় ভাল বাসিত,—থিয়েটার দেখার খাতিরে বাধা না পড়িলে প্রায় প্রত্যেক শনিবারে সে ভবানীপুরে শ্বশুরবাড়ীতে যাইত, রবিবারটা সেইখানেই কাটাইত। ইহাতে পড়াশুনা কাহারও হয় না। হেম বি এ পরীক্ষায় ফেল হইল। দ্বিতীয় বারেও বিশেষ শোধরাইল না। আবার ফেল হইল। শেষে বাজে সকটক্ অনেকটা সংযত করিল বটে, কিন্তু মনটা কেমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, বই লইয়া বসিত, কিন্তু পড়ায় তেমন মনঃসংযোগ করিতে পারিত না। আরও একবার ফেল হইল। শেষে বুঝিল, পড়ায় আর কিছু হইবে না। চাকরীর চেষ্টা কিছু করিবে। ইতিমধ্যে তার পিতার মৃত্যু হইল। তখনও কিছু ঋণ ছাড়া সঞ্চয় তাঁহার কিছু ছিল না। সহরের বাসা বিক্রয় করিয়া মাতা ও ছোট ভাইবোন্ যাহারা ছিল, তাহাদের নিয়া সে দেশের বাড়ীতে গেল। জমা জমি কিছু ছিল,—একবার মনে করিয়াছিল, চাষ বাসের চেষ্টা করিবে। কিন্তু কিছুদিন দেখিয়া শুনিয়া গাঁয়ে থাকিতে তার ভাল লাগিল না,—চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইল। মাতা বলিয়াছিলেন, শ্বশুরের কাছে যাও, তিনি একটা হিল্লা অবশ্য করিয়া দিবেন। কিন্তু হেমের বড় লজ্জা করিল,—শ্বশুরের কাছে এজন্য অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া যাইতে পারিল না। পিতা যে সহরে ওকালতী করিতেন, সেই খানেই গিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিবাহের পর সুনন্দা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া বেশীদিন কখনও থাকে নাই। মাতা তাকে কাছছাড়া করিতে চাহিতেন না; কখন পাঠাইলেও পনের কুড়ি দিনের মধ্যেই আবার লোক পাঠাইয়া তাকে আনাইতেন। হেমের পিতা অভয়বাবুও ইহাতে কখনও আপত্তি কিছু করেন নাই। ছেলের অতবড় একজন মুরুব্বি, সকল দায়ে বড় একজন সহায় ধনী বৈবাহিকের বিশেষ খাতির করিয়া তিনি চলিতেন। সুনন্দার মাতার মৃত্যু হইলে, পিতার সংসারের সমস্ত ভারই তার হাতে পড়িল। তারপর সে শ্বশুরগৃহে একরূপ যাইতেই পারে নাই। শ্বশুরের শ্রাদ্ধের সময় মাত্র কয় দিন থাকিয়াই আবার আসিয়াছে। সংসারে এখন নানা অভাব, ধনীর কন্যা, বহু সুখে প্রতিপালিতা বধূর অনেক ক্লেশ হইবে,—আছে থাক বাপের ঘরে, হেম মানুষ হউক তখন আসিবে। তাই শাশুড়ীও বধূকে আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই।

রমেন্দ্র এম্ এ, বি এল্, পাশ করিয়া হাইকোর্টে উকিল হইয়াছে। কলিকাতায় বাড়ী আছে, নগদসম্পত্তিও বেশ আছে, তার জন্য কোনও চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু জামাতা মানুষ হইল না, সুনন্দা দুঃখ পাইবে, এজন্য দেবেনবাবু যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। গৃহিণীর মৃত্যুর পর হইতে রমেন্দ্রের শাসনের বাধ্যও তিনি অনেকটা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার মতের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে ভরসা পাইতেন না। রমেন্দ্র স্বভাবতঃই কিছু স্বার্থপর ও কড়ামেজাজের লোক। সে খোঁজ নিয়া জানিয়াছিল হেম কি করিত এবং কেন বারবার এমন বিএ ফেইল করিল। হেমের উপরে তার মনটা বড়

বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল। দেবেন্দ্রবাবুও ইহা বেশ বুঝিতেন। কারণ রমেন্দ্র কোনও বিষয়ে তার মনের ভাব সঙ্কোচ করিয়া চলিত না। তাহার যাহা কিছু অভিমত, যাহা কিছু ইচ্ছা, বেশ জোর জিদ করিয়াই প্রকাশ করিত। দেবেন্দ্র বাবু তার সিকি জিদেও তাহার কোনও প্রতিবাদ কখনও করিতেন না। চিত্ত যার দুর্ব্বল, প্রবলের নিকট চিরদিন সে এমনই হার মানিয়া চলে, যদিও এই হার মানা স্পষ্ট কেহ আপনার কাছেও স্বীকার করেন না। রমেন্দ্র ত যোগ্য পুত্র,—ভৃত্যের নিকটও অনেক প্রভু এরূপ অবস্থায় এমনই হার মানিয়া চলেন। তাহার কোন অসঙ্গ ঔদ্ধত্য পর্য্যন্ত শাসন করিতে ভরসা পান না। কোনও মতে মানাইয়া বনাইয়া চলিতে চেষ্টা করেন।

জামাতাকে যেরূপ প্রয়োজন সাহায্য করিতে মনে মনে তাহার যত ইচ্ছা হউক, রমেন্দ্রের সম্মতি ব্যতীত কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার ছিলনা। অগত্যা জামাতা আসুক তারপর বুঝিয়া যাহা হয় করা যাইবে, ইহাতেই রমেনের সম্মতি পাইয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন এবং তখনই জামাতাকে আসিবার জন্য চিঠি লিখিলেন।

(৩)

সুনন্দা বলিয়াছিল, "আজ ভাই আমি কিছুই দেখ্‌ব না। যা দরকার তুমি নিজেই সব দেখে শুনে কর।"

মুরলাও গৃহিনীপণার কাজ সব বেশ নিপুণ ভাবেই করিয়া তুলিল, কোথাও কোনও ত্রুটী হইল না। সুনন্দা দেখিয়া বেশ আনন্দিত হইল। কিন্তু তাহার কাজকর্ম্ম দেখিয়া সুনন্দা তুষ্ট হয় কি না, প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে কি না, প্রশংসার দুটি কথা বলে কি না তার দিকে কোনও আগ্রহ মুরলার প্রকাশ পাইল না। সুনন্দার সম্মতি বা মতামতের কোনও অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কিছু তার হইতে পারে, এরূপ কোনও ভাবেরও কোনও আভাস সেদিন তার কোনও কার্য্যে, কোনও কথায়, কোনও ব্যবহারে দেখা গেল না।

সুনন্দার মনটা যে একটু ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু নিজের মনে নিজেও এ ক্ষুণ্ণতা সে স্বীকার করিতে চায় নাই। হাসিমুখে ভ্রাতৃবধূর কুশলতার প্রশংসাই করিয়াছে।

বৈকালে সুনন্দা একবার বলিল, "এই ত বেশ পার সব, তবে আর কি? আমার আর কিছু না দেখলেও বোধ হয় এখন চল্‌বে।"

মুরলা উত্তর করিল, "তা একেবারে না পারলে চ'লবেই বা কেন? এতদিন দেখ্‌লাম ত, পারবই না কেন? আর তুমি সত্যি কদ্দিনই বা কব্‌বে? নিজের ঘর সংসার ত গিয়ে বুঝে নিতে হবে।"

সুনন্দা একটি নিশ্বাস ছাড়িল। হায়, তার কি ঘর সংসার আছে বা হইবে? পিতার এই সংসার ছাড়া তার পৃথক একটা সংসার যে হইতে পারে, একথা তার মনেও কখনও উঠে নাই। এই সংসারেই সে অভ্যস্ত, এই সংসারে সে এতদিন নিজের সংসারের মতই রহিয়াছে, কাজকর্ম্ম সব করিয়াছে। কিন্তু এটা যে তার নয়, আলাদা সংসারে তার যাইতে হইবে, এই সম্ভাবনা বোধ হয় আজ প্রথম সুনন্দা মনে অনুভব করিল। করিয়া মনে মনে একটু যেন ব্যথিতও হইল। তার নিজের সংসারের যে চিত্র তার কল্পনায় সহসা ভাসিয়া উঠিল, তাহাও সুনন্দাকে তেমন আনন্দিত করিতে পারিল না। এই সংসার—আর সেই সংসার! তাইত, সে কোথায় আছে!—কোথায় তাকে যাইতে হইবে। মুখে সে হাসিয়া মধ্যে মধ্যে অবশ্য বলিত, আমি ত পর। কিন্তু বাস্তবিক পিতার এই সংসার হইতে বাহিরে তার সেই 'পরত্ব' যে কি,—তাহা আর কখনও সে ঠিক অনুভব করে নাই। আজ প্রথম করিল, করিয়া সত্যই কেমন একটা তীব্র বেদনা তার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া মুরলা নিঃসঙ্কোচে তার গৃহিনীপণার কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিল। ভাঁড়ারের চাবিটি আনিয়া সুনন্দার হাতে দিতে চাহিল না,—তাকে কিছু বলিল না, কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না। সুনন্দাও সকালে উঠিয়া কোনও খোঁজ খবর নিল না, নিজের ঘরে বসিয়া কি একখানা বই দেখিতেছিল। বইএর দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু মন যেন তাহাতে বসিতেছিল না। মধ্যে মধ্যে কেমন উৎকণ্ঠিত ভাবে দরজার দিকে মুখ তুলিয়া তুলিয়া চাহিতেছিল। কতক্ষণ পরে ঝি আসিয়া ডাকিল,

"হাঁ, দিদিমণি, বৌমা, বল্লেন তোমার খাবারকি এইখেনে দিয়ে যাব না উঠে আস্‌বে ?"

সুনন্দা একটু চমকিয়া চাহিল,—মুখখানি যেন একটু লাল হইয়াও উঠিল। ললাটে একটু ভ্রূকুটি দেখা দিতে দিতে মিলাইয়া গেল। সুনন্দা জিজ্ঞাসিল, "কি ? কি ব'ল্লেন বৌমা ?" ঝির মনে হইল, দিদিমণির কণ্ঠস্বরে একটু যেন উষ্ণতার ভাব রহিয়াছে। কিছু অপ্রতিভ হইয়া সে বলিল, "খাবার টাবার সব তৈরী হ'য়েছে কি না, তা তুমি ত এখন ও বেরোওনি—হয়ত শরীরটা তেমন ভাল নেই—বৌমা হাত খালি নেই, তাই বল্লেন ঠাকুরঝিকে সুধিয়ে এস, খাবার ঘরে পাঠিয়ে দেব, না এইখানেই এসে খাবেন। হাঁ, তোমার কি অসুখ ক'রেছে কিছু দিদিমণি ?"

"না, অসুখ আবার কি হবে ? আমি না, ব'লোগে, যাচ্চি ; খাবার আর এখানে পাঠাতে হবে না।"

সুনন্দা সহসা উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ছিঃ ! ইহাতে কোন চক্ষের জল আসে তার ? বেশ ত, সে ত ইহাই চায়। বৌ যদি সংসারের সব কাজ নিজে গুছাইয়া করিতে পারে, তবে সে ত খুব ভাল কথা অবশ্য গরীবের মেয়ে, এ সব সংসারের কাজকর্ম্ম কিছু বুঝিত না এই একবৎসর যাবৎ সে তাকে দেখাইয়াছে, শিখাইয়াছে এখন নিজের সংসারের কাজ সব নিজেই হাতে নিতেছে, তার শিক্ষাদান যে সার্থক হইল। সত্যই ত ! বাপের ঘরে সে কি চিরকাল থাকিয়া গৃহিণীপণা করিতে পারিবে ? কে তা করিতে পারে ? বেশ ত, মুরলা আজ তার সংসার বুঝিয়া নিল, কেন সে সুখী হইবে না ?. কিন্তু অবোধ বিদ্রোহী অশ্রু তবু যেন বশ মানিতে চায় না। ছি ছি ছি, একি ক্ষুদ্রতা তার ! দুইহাতে খুব জোরে রগড়াইয়া সুনন্দা অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। গেলাসে খানিকটা জল নিয়া চোখে মুখে দিল। তার পর দৃঢ় পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

"এই যে, খাবার টাবার সব তৈরী হ'য়ে গেছে ! বেশ বেশ ! লক্ষীটি ! এই ত চাই !"

জোরে মন বাঁধিয়া হাসিয়া সুনন্দা ভ্রাতৃবধুকে এই সম্ভাষণ করিল।

মুরলা কহিল, "তোমার কি অসুখ করেছে কিছু ঠাকুরঝি ? এতক্ষণ বেরোও নি।"

"অসুখ ! না, অসুখ কি হবে ? একটা বই দেখ্‌ছিলাম, খুব ভাল লাগ্‌ছিল। তা কই, কি খাবার রেখেছ আমার জন্যে ?"

"এই যে, এস।" মুরলা খাবারের একখানি প্লেট ও চায়ের একটি পেয়ালা সুনন্দার দিকে সরাইয়া দিল।

"কই, তোমার খাবার কই ?"

"আমি—এখন থাক্‌। পরে ক্ষিদে পায় ত যা হয় কিছু খাব এখন।"

"বাঃ, পরে কেন আবার ? গিন্নী হ'লে বুঝি নিজে খেতে নেই। কেবল পরিজনদেরই খাওয়াতে হয়। না না, পরে আবার কি ? এস দুজনেই খাই। আর কিছু নাই নাকি ? তা, এতেই হবে। এস।"

সুনন্দা মুরলার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। অগত্যা মুরলা সুনন্দার সঙ্গে বসিয়া কিছু খাইল।

সুনন্দাকে পাণ দিয়া এবং নিজেও গোটা দুই পাণ মুখে দিয়া মুরলা ভাঁড়ারে গিয়া ঢুকিল। জিনিসপত্র সব নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া নিজের ঘরে গিয়া বাজারের একটা ফর্দ্দ করিয়া শ্বশুরের কাছে পাঠাইয়া দিল। সুনন্দা জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। মুরলা তাকে কিছু বলিল না, কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সুনন্দা তার ঘরে গিয়া বইখানি হাতে লইয়া শুইয়া পড়িল,—আনমনে তার পাতা উল্‌টাইতে লাগিল

হায়, কর্ত্তৃত্ব যতদিন হাতে থাকে, ততদিন বলা সহজ তুমি কর্ত্তৃত্ব নেও, আমাকে রেহাই দেও। কিন্তু সত্যই যখন সে রেহাই দিয়া কর্ত্তৃত্ব হাতে লইল, তখন তাহা সহ্য করা তত সহজ হয় না। সুনন্দা বেশ অনুভব করিল, পিতৃগৃহের কর্ত্তৃত্ব আজ একেবারেই তার হস্তচ্যুত হইয়া ভ্রাতৃবধূর হস্তে গিয়া পড়িল। তার শিষ্যা নিতান্ত অনুগতা ভ্রাতৃবধূ—সকরুণ স্নেহে সেই যাকে এতদিন যেন আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল, আজ সহসা তারই আশ্রিত তাকে হইতে হইল। এই সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন বড় অকস্মাৎ—বড় অপ্রত্যাশিত ভাবেই যেন হইয়া গেল। সুনন্দা ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। ধীরভাবে ইহা গ্রহণ করা, শান্তচিত্তে ইহাই রীতিসঙ্গত বলিয়া ইহার সঙ্গে আপনার মনটা বনাইয়া নেওয়া বড়ই কঠিন তার

পক্ষে হইয়া উঠিল। এক একবার দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুর উচ্ছ্বাস তার উঠিতেছিল। কিন্তু দুর্ব্বল চিত্তকে শত ধিক্কার দিয়াও সে যথোচিত ভাবে সবল করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

(৪)

আহারাদির পর সুনন্দা গিয়া তার ঘরে শুইয়াছিল,—বৈকাল পর্য্যন্ত ঘরেই শুইয়া রহিল। মুরলা বৈকালে জলখাবার প্রস্তুত করিয়া সকলকে দিল, তারপর সুনন্দার খাবারের রেকাবখানি হাতে লইয়া তার গৃহে আসিল।

"কি হ'য়েছে ভাই তোমার ঠাকুরঝি? সারাদিন যে শুয়েই আছ। সত্যিই অসুখ টসুখ ক'রেছে নাকি কিছু?"

সুনন্দা উঠিয়া বসিয়া কহিল, "হাঁ, মাথাটা ধ'রেছে, বুকটার মধ্যেও যেন কেমন ক'চ্চে। উঠে আর বসতে মোটে ইচ্ছে হ'চ্চে না।"

"কিছু খাও, খেয়ে হাওয়ায় একটু বেড়াওগে না? তাহ'লেই ভাল হয়ে যাবে।"

এই বলিয়া খাবারের রেকাবখানি তার কাছে রাখিল। রাখিয়া কহিল, "বাবাকে কি ব'লব ডাক্তার কাউকে এনে দেখাতে?"

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, "পোড়াকপাল! ডাক্তার কি হবে। একটু মাথা ধরেছে, আর অমনি ডাক্তার ডাকতে হবে? তোমার শ্বশুর কি এত বড়ই বড়লোক ভাই?"

"কি যে বল ঠাকুরঝি! আমার শ্বশুর না তোমার বাবা? কোনটা আগে?"

সুনন্দা তেমনই হাসিয়া উত্তর করিল, "তোমার শ্বশুরই আগে। আমার বাবা—তা আমি ত পর হ'য়ে পরের ঘরেই গিয়েছি। তুমি যে একেবারে আপন হ'য়ে তাঁর ঘরে এসেছ। তা দেও খাবারটা এনেছ, খাই। তুমি খেয়েছ?"

"তা খাব এখন—তুমি খাও—"

সুনন্দা কহিল, "তা খাবারটার বেলায় আর অতখানি গিন্নী নাই হ'লে। এস, দুজনেই খাই।" সুনন্দা মুরলার হাত ধরিয়া টানিল। মুরলা কহিল, "ওইত খাবার, কম হবে যে তোমার।"

"কম কি একলা আমারই হবে? তা তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—বালাই—খালি হয়ে ত যায়নি। আর কিছু আনাও না?"

মুরলা ঝিকে ডাকিয়া বলিল, ঝি আর একখানি রেকাবে আরও কিছু খাবার লইয়া আসিল।

খাবার খাওয়া হইলে মুরলা কহিল, "এসনা, তোমার চুলটা বেঁধে দিই ঠাকুরঝি।"

সুনন্দা মাথায় হাত দিয়া কহিল, "না, চুল আর এখন বাঁধতে হবে না। আছে এমনিই থাক। তুমি তোমার কাজ দেখগে। বেলা গেল, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা ত ক'রে দিতে হবে। আমি যাই, বাগানে গিয়ে একটু বসিগে বরং।"

বাড়ীর এক পাশেই ছোট একটি ফুলের বাগান ছিল। সুনন্দা নিজেই তত্ত্বাবধান করিয়া বাগানটুক সাজাইয়াছিল, নিজের হাতের ফুলগাছগুলির মূলে রোজ জল ছিটাইত। বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া আনিয়া পিতার ও ভ্রাতার টেবিলের উপরে ফুলদানিতে সাজাইয়া রাখিত। একটি ফুলের ডাল শুকাইলে, একটি ফুল কেহ অনবধানতা বশতঃ অযথা ছিঁড়িলে প্রাণে বড় ব্যথা পাইত।

আজ বাগানে আসিয়া ফোটা ফোটা সুন্দর সেই ফুলগুলির দিকে সুনন্দা চাহিল, তার চোখে জল আসিল। এই বাগান—ওই সব ফুল—কালও তার ছিল। কিন্তু আজ সে কে? কি অধিকার তার এই ফুলগুলির উপরে আছে? দুদিন বাদেত ত পিতার এই ঘর ছাড়িয়া তাকে যাইতে হইবে,—কে এ বাগান দেখিবে? মুরলার ত ফুলের সখ তেমন নাই। থাকিলেই বা কি? সে তার পছন্দ মত সব করিবে,—সুনন্দার পছন্দের অপেক্ষা করিবে কেন? সে যদি কালই এই সব ফুলের গাছ তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়ালী টগর ঘেঁটুফুলের জঙ্গল এখানে করে, সুনন্দা কি বলিতে পারে? রামা মালী ঘর ঝাঁটপাট দেয়, আর বাগানের কাজ করে। সুনন্দা যদি একদিন বলে, রামা বাসন মাজিবে; জল তুলিবে, বাগানের কাজে যাইতে পারিবে না,—একটি একটি করিয়া ফুলের গাছ গুলি মরিয়া গেলেও, বাগানখানি আগাছায় ভরিয়া উঠিলেও সে কি জোর করিয়া কখনও বলিতে পারিবে—না, রামাকে বাগানের কাজেই যাইতে হইবে. বাসন আর কেহ মাজুক, জল কেহ

তুলুক? বলিতে গেলেও ঝগড়া হইবে। দাদা কি তাহা সহিবেন? পিতাই কি তাহাতে সুখী হইবেন? তার আবদার কে শুনিবে, কে রাখিবে? হায়, আজ যদি তার মা থাকিতেন! তাহা হইলে পিতার ঘরেও সে কি এমন করিয়া পরের মত হইয়া পড়িত! তার দাবী দাওয়ার উপরে কি কেহ কোনও কথা বলিতে পারিত? একফোটা দুইফোটা করিয়া দুইটি অশ্রুধারা সুনন্দার দুটি কপোল বহিয়া নামিল।

ছিঃ! কেহ যদি আসিয়া দেখে! মুরলাই যদি আসিয়া পড়ে! ছি—ছি—ছি! সে কি ভাবিবে? তার সংসারের কর্ত্তৃত্ব সে হাতে নিয়াছে, ননদ তাই হিংসায় দুঃখে কাঁদিতেছে, ইহাই সে মনে করিবে? মুখে কিছু না বলুক, মনে মনে হাসিবে, অথবা তার দুঃখে করুণা করিবে! ছি—ছি! তার চেয়ে মরণও দু'শবার ভাল। সুনন্দা চোক মুছিয়া ফেলিল। কাছেই একটা জলের কল ছিল, তাহা খুলিয়া দিয়া মুখ ধুইয়া আঁচলে বেশ করিয়া পুছিল। তার পর টপটপ করিয়া অনেক গুলি ফুল তুলিল যেন সেই মুহূর্ত্তেই সে গাছগুলি সব একেবারে উজাড় করিয়া ফেলিবে!

"ওমা, আঁচল ভরে ফুল তুলছ যে ঠাকুরঝি! কি হবে এত ফুল?"

"সুনন্দা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, মালা গাঁথব।"

"কেন?"

"তুমি পরবে।"

"আমি! পোড়া কপাল—আমি পরব মালা!"

"কেন, পরবে না কেন? ব'সোনা, মালা গেঁথে তোমায় সাজিয়ে দিচ্ছি। দাদা দেখে কত খুসী হবে। আমার এই ফুলের বাগান—তা হ'কনা উজোড়, তাতেই সার্থক হবে। হবে না?"

মুরলা একটু হাসিয়া কহিল, "পাগল যেন। আমি যাব ফুলের মালায় সাজতে? কি যে ব'লছ ঠাকুরঝি!"

"কেন সাজবে না কেন? এতই কি বুড়ো হ'য়েছ?"

মুরলা একটু গম্ভীরভাবে একটু নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "তা দায়ে প'ড়লে হ'তে হয় বই কি? ফুলের মালায় সেজে কেবল সাজান ঘরে ব'সে থাকলে চলবে কেন ভাই? এস বরং মালা গেথে তোমাকেই সাজিয়ে দিই।"

সুনন্দা উত্তর করিল, "হাঁ, আমার তা চলে বটে। কিন্তু সখ যে তাতে, মোটেই নেই।"

মুরলা একটু হাসিয়া কহিল, তা যা ব'ল্লে ঠাকুরঝি। খালি খালি ফুলের মালায় সেজে কার ব'সে থাকতে ইচ্ছে হয়? ফুলগুলি আজ না তুলে দিন দুই পরে যদি তুলতে, তা হ'লে কাজ হ'ত।"

"কেন?"

"কেন! কেন, শোননি তুমি কিছু? ঠাকুরজামাই যে আসছেন।"

"কই, তা ত শুনিনি কিছু। কে ব'ল্লে?"

"তোমার দাদা কাল ব'লছিলেন, বাবা তাঁকে আসতে চিঠি লিখেছেন। এস না, বসা যাক ঐ বেঞ্চিটার উপরে।"

মুরলা গিয়া বেঞ্চির উপরে বসিল, সুনন্দাও পাশে গিয়া বসিতে বসিতে কহিল,—"কেন, কি হ'য়েছে? হঠাৎ তাকে আসতে লিখলেন কেন?"

"লিখেছেন আসতে—একটা কিছু কাজ কর্ম্মের সুবিধে ক'রে দেবেন বলে। বি এ ফেল ক'রে বেকার ব'সে আছেন, বাপ নেই, কি করে চ'লবে? এখন এঁদেরই ত এ সব দেখতে হবে, আর কে আছে?"

কথাগুলি মুরলা বেশ একটু গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল। একটু যেন মুরুব্বিয়ানার ভাবও কথার ভঙ্গীতে ছিল,—অথবা সুনন্দারই তাই মনে হইল। আজ নবীনা গৃহিণী ভ্রাতৃবধূর প্রতি তার মনটা যে খুব প্রফুল্ল ছিল, তা নয়। সুতরাং এরূপ কোনও ভাব মুরলার মনে না থাকিলেও সুনন্দা সহজেই মনে করিয়া লইতে পারে যে আছে। কথাগুলি বলিতে বলিতে মুরলা সহসা একটু বেশী গম্ভীর হইয়াও উঠিয়াছিল। যাহা হউক, সুনন্দা কোনও উত্তর করিল না। হাতে একটী ফুল ছিল, আনত মুখে তাঁর পাপড়িগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া ছিঁড়িতে লাগিল।

মুরলা আবার কহিল, "প'ড়লে যদি সুবিধে হ'ত, তবে পড়ার খরচও ওঁরা চালাতেন। তবে তাতে বোধ হয় সুবিধে আর কিছু হবে না। তুমি কি বল? হবে?"

"জানিনে।" গভীর একটী দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে উঠিতে সুনন্দা চাপিয়া দিল।

মুরলা কহিল, "তবে তোমার দাদা বলছিলেন, বাবারও

তাই মত, তিনবার বি এ ফেল ক'রেছেন, পাশ আর ক'ত্তে পারবেন না। মিছে সময় নষ্ট আর পয়সা খরচ—"

সুনন্দা একবার নড়িয়া উঠিল। বসিয়া এসব কথা শোনা তার অসহ্য বোধ হইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ উঠিলে যদি মুরলা মনে করে, তার এই সব কথায় তার মনে আঘাত লাগিয়াছে। ধিক্! দরিদ্রের কন্যা মরলা, সেই তাকে করুণা করিয়া কত শিক্ষা দিয়াছে, আজ তারই পিতৃগৃহে সে তার প্রাণে আঘাত দিতে পারে,—এ ক্ষমতা তার আছে, মুরলা তা বুঝিবে! না না, তার চেয়ে নীরব উপেক্ষায় তার এই সব নীচ গর্ব্বের কথা ত শোনাও ভাল। তাই উঠিবে বলিয়া একটু নড়িয়াই সুনন্দা আবার চাপিয়া বসিল।

মুরলা তেমনই গম্ভীর ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল, "বিএ পাশ ক'র্ত্তে পারেননি, আজকালকার দিন চাকরীতেও ত তেমন সুবিধে কিছু হবে না। তাই ওঁরা ঠিক ক'রেছেন, কোনও ব্যবসা ট্যাবসা শিখ্‌তে দেবেন। শিখ্‌তে যদি পারেন, আর তাই ক'র্ত্তে চান, তবে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে তাতে বসিয়ে দেবেন!"

সুনন্দা হাতের ছেঁড়া ফলটি ফেলিয়া দিয়া আর একবার নড়িয়া উঠিল।

মরলা কহিল, "তবে যাই ক'র্ত্তে হ'ক, তার মনের ভাবটা বোঝা ত দরকার। তাই তাড়াতাড়ি ক'রে আসতে লিখে দিয়েছেন বাবা। দু তিন দিনের মধ্যেই বোধ হয় এসে প'ড়বেন। তাই ত, বলছিলাম ঠাকুরঝি, ফলগুলি আজই তুলে নষ্ট ক'ল্লে—"

সুনন্দা আর পারিল না। সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। আঁচলের ফলগুলি সব ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, "সন্ধ্যে হ'য়ে এল বৌ, চল ঘরে যাই এখন।"

"ফল গুলি যে সব ফেলে দিলে ঠাকুরঝি,—তুলে নেবে না?"

"কি হবে আর? তুমি ত পড়বে না।" সুনন্দা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে হাসি হাসির মত ফুটিল না।

সুনন্দা দ্রুত পদক্ষেপে তার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। ধনী পিতার বড় আদরের কন্যা সে, কিন্তু আজ তার মনে হইতেছিল, অতি দরিদ্রের অতি অনাদৃতা কন্যা হইলেও সে বুঝি এমন গ্লানিকর মর্ম্ম বেদনা কখনও পাইত না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, ভ্রাতার গৃহে অর্গেনের সুরে মুরলার কাঁচা গলার বেসুরা সঙ্গীতধ্বনি উঠিতেছিল, কতক্ষণ পরে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর উচ্চ হাস্যধ্বনিও সে শুনিল। শয্যায় বার দুই এদিক ওদিক করিয়া মুরলা উঠিয়া বসিল, উঠিয়া গিয়া জানালাটির কাছে বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল।

(৫)

আরও কয়েকদিন গেল। সকালে বিছানায় শুইয়া সুনন্দ কি একখানা পত্র লিখিতেছিল। হঠাৎ দোয়াতটা কাত হইয়া কালী ঢালিয়া পড়িল।

সুনন্দা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "ঝি, ঝি! শীগগির এস ত উপরে।"

ঝি মাছ কুটিতেছিল, মুখ তুলিয়া উত্তর দিল "এই যাচ্চি গো দিদিমণি!"

গৃহমধ্যে ফিরিয়া বিছানার উপরকার জিনিসপত্র সব সরাইয়া রাখিয়া চাদরটা সুনন্দা তুলিয়া ফেলিল, এখনই না ধুইয়া দিলে কালীর দাগ উঠিবে না। ঝির বিলম্ব দেখিয়া সুনন্দা আবার জানালার কাছে গিয়া দেখিল, ঝি তেমনই নিরুদ্বিগ্ন ভাবে বসিয়া ধীরে ধীরে মাছ কুটিতেছে, তার ডাক যে তার কাণে পৌছিয়াছে, এমন লক্ষণও কিছু দেখা যায় না। সুনন্দার বড় রাগ হইল,—তীব্র স্বরে ডাকিল, "ঝি!"

ঝি উত্তর করিল, "এই ত যাচ্চি দিদিমণি! একটু কি তর সয়না? হাতের কাজ ত ফেলে যেতে পারিনে। মাছ কুটে ধুয়ে দেব, তবে ঝোল হবে—দাদাবাবুর কোর্টে যাবার বেলা হ'য়ে উঠ্‌ল যে—"

ঝি খুব আস্তে আস্তেই বসিয়া মাছ কুটিতেছিল। বামুন আসিয়া পাকের ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল,—তার দিকে ফিরিয়া হাতের কাজ হাতে রাখিয়া হাসিয়া বসিয়া আবার গল্পও কিছু করিল। সুনন্দা ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিল। ঘরের মধ্যে আসিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। আধ ঘণ্টার অধিক কাল অতীত হইল,—ধীরে ধীরে ঝি আসিয়া সুনন্দার গৃহদ্বারে দাঁড়াইল।

"কি দিদিমণি। কি হ'য়েছে, ডাকছিলে কেন?"

সুনন্দা কহিল "কিছু হয়নি তুমি যাও।"

"তা অত রাগ ক'র্লে কি আর চলে দিদিমণি? ওদিকে তাড়াতাড়ি, হাতের কাজ সেরে ত'আস্‌ব। বউমা তাড়াদিয়ে ব'লে এলেন, উনুন খালি র'য়েছে—মাছগুলো চটপট্‌ করে কুটে ধুয়ে দিতে। তা কি ক'র্ত্তে হবে বলনা?"

সুনন্দা ধমক দিয়া বলিল "কিছু ক'র্ত্তে হবে না তোমার। যাও, এখন দেক ক'রো না।"

ঝি চলিয়া গেল। চাদর খানি নিজেই ধুইয়া আনিবে বলিয়া সুনন্দা হাতে করিয়া তুলিল। কিন্তু সাবান কোথায়? বউএর কাছে চাহিতে হবে যে। একটু কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুনন্দা চাদর খানি গৃহতলে নিক্ষেপ করিল, দুটি হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে, বাড়ীর দাসদাসীরা তা সহজেই ধরিতে পারে, এবং সেই হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা চলে। সুনন্দাকে গৃহের কর্ত্রী জানিয়া এতদিন সকলে তার ইঙ্গিতে উঠিত বসিত। সুনন্দার কিছু তেজও ছিল, তাহাতেও তাকে ভয় তারা করিত। বউমা গরীবের মেয়ে, বড়ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, এজন্য যেন কিছু করুণার চক্ষেই সকলে তাকে দেখিত। কিন্তু দুইদিনেই সব বদলিয়া গেল। বউমার ইঙ্গিত ধরিয়া তার মন যোগাইয়াই সকলে চলিতে আরম্ভ করিল,—সুনন্দাকে যেন অবজ্ঞাই করিতে লাগিল। বউমা যে দিদিমণিকে চাপিয়া রাখিয়া নিজের ইচ্ছা মতই গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিতে চায়, এই তথ্যটি তারা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিল। বউমা আবার কর্ত্তার এমন আদরের বউ,—আর দাদাবাবু —যে ত মাথায় তুলিয়া নাচায়। কেন নাচাইবে না? হকনা গরীবের মেয়ে, রূপে যে একেবারে রূপকথার রাজকন্যে গো! ঐ যে লোকে বলে গোবরে পদ্মফুল—এ ঠিক তাই ফুটিয়াছিল। তা গোবরেই ফুটুক আর পাঁকেই ফুটুক, পদ্মফুল ত? লক্ষ্মীর ঘরেই এসেছে

(৫)

হেমকে তাড়াতাড়ি করিয়াই আসিতে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু একটা চাকরীর আশায় সে ঘুরিতেছিল। কয়েকদিন দেখিল, শেষে যখন বুঝিল, চাকরী হইবার কোনও আশা তার নাই,—৫০।৬০ জন বিএ, ২।৩ জন এম এ পর্য্যন্ত তার জন্য আবেদন করিয়াছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাকে শত ধিক্কার দিয়া সে কলিকাতায় শ্বশুরগৃহে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিল। কিন্তু কাপড়চোপড় সব ময়লা হইয়া গিয়াছিল। বড় লোক শ্বশুর, সাহেবী ধরণের আদব কায়দা তাঁদের, স্ত্রীও সেই গৃহের অতি আদরে পালিতা কন্যা,—এই মলিন বেশে—ঠিক্‌—কেমন করিয়া গিয়া সেখানে উঠিবে? বড় লজ্জা করিতে লাগিল, কাপড় চোপড় সে ধোপাবাড়ী পাঠাইল। দ্বিগুণ মজুরী কবুল করিয়াও ৭ দিনের কমে সে তাহা ফেরৎ পাইল না। তখন সে কলিকাতা যাত্রা করিল। শ্বশুরের পত্র পাইবার পর ১৫।১৬ দিন তখন গত হইয়াছে।

জামাতা হইলেও, এই বাড়ীতে যে সে একদিন টুইসন করিয়াছে, সে স্মৃতি সে কখনও একেবারে ভুলিতে পারে নাই; বিবাহের পরেও তার পিতা পর্য্যন্ত ধনী বৈবাহিককে খাতির করিয়া চলিতেন। তার প্রভাবও সে এড়াইতে পারে নাই। শ্যালক সমবয়স্ক হইলেও উচু মেজাজের লোক; বরাবরই তাকে একটু ভয় ভয় করিয়া, কিছু সম্ভ্রম দেখাইয়া সে চলিয়াছে—সমান খোলাখুলিভাবে কখনও মিশে নাই, মিশিতে পারে নাই। তবু এতদিন তার পিতা ছিলেন,—সাক্ষাৎভাবে ইহাঁদের কোনও অনুগ্রহপ্রার্থী তাকে হইতে হয় নাই। কিন্তু এবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া অবধি তার কেমন বাধ বাধ ঠেকিত। সর্ব্বদাই কেমন একটা সঙ্কোচ সে অনুভব করিত। শ্বশুর ও শ্যালক বলিয়াছিলেন, কিছুদিন থাক দেখা যাউক, পরিচিত কোনও ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ শিখিবার কোন ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি কি না। হেম বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাতেই সম্মত হইয়া রহিল। কিন্তু কিছুই তার ভাল লাগিত না। বাহিরেই প্রায় ঘুরিত, বাড়ীতে যখন থাকিত, না ডাকিলে নিজে বড় কখনও অন্তঃপুরে যাইত না। নিজের কোনও কাজকর্ম্ম নিতান্ত নিজে না পারিয়া উঠিলে সুনন্দাকে জানাইত,—চাকর বাকরদের সহজে কোনও আদেশ করিত না।

এইভাবে প্রায় ১৫।২০ দিন কাটিয়া গেল। হেমের কাপড় চোপড় খুব বেশী ছিল না। যা ছিল, তাও পুরাতন। কলিকাতায় সর্ব্বদা যারা বাহিরে পথে পথে ঘোরে, একসুট কাপড়ে ২।৩ দিনও তাদের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা হয় না,—আরও

এই বাড়ীর মাপের পরিচ্ছন্নতা। এজন্য হেম সর্ব্বদাই বড় অস্বস্তি বোধ করিত। নিজে সাবান দিয়া কিছু ধুইয়া নিবে, তা পারিত না। স্ত্রীকেই বা কোনমুখে বলে, আমার কাপড় কাচিয়া দেও! হাতে এমন পয়সা ছিল না, যাহা দিয়া আরও কিছু ধোয়া কাপড় জামা সে কিনে।

সেদিন ধোপা আসিয়াছে,—হেমের তিনখানি কাপড়, দুইটি জামা একটি উড়্‌নি, ও খান দুই রুমাল ঝি তার ঘরে দিয়া বলিয়া গেল, "কাপড় ছেড়ে রাখুন, জামাইবাবু আমি নিয়ে যাচ্ছি এসে।" হেম খুলিয়া দেখিল, দুটি জামা আর দুইখানি কাপড়ই একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে তাইত, এখন কি করে?

কতকক্ষণ পরে ঝি আসিয়া কহিল, "কই, জামাই বাবু কাপড় ছেড়ে দিন, ধোপা ব'সে আছে। বউ মা তাড়াতাড়ি ক'চ্চেন, ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে তবে আবার কাজে যাবেন। কাজ কি সংসারে কম? এত লোকজন আমরা র'য়েছি, তবু কি বউমা একটু জিরোতে পান। তা উঠুন, উঠুন, কাপড়টা ছেড়ে দিন। আর ওই আলনায় সব কাপড় জামা ত' আমিই নিচ্ছি।"

হেম থতমত খাইয়া বলিল, "না না, থাক্, কাপড় ময়লা তেমন হয়নি। এ ধোপ যাকনা এমনি।"

"ময়লা হয়নি, বলেন কি? এই কাপড় পরে কি করে বেরোবেন। দাদাবাবু দেখ্‌লে কি ব'লবেন? না না, কেন দেবেন না? এরা কি আর ধোপার পয়সা বাঁচাতে চান, গরীব গেরস্তর মত? হাঁ তাদের ওরকম কাপড়েও চলতে পারে বটে। তা এখানে যদ্দিন আছেন, নোংরা কাপড়ে কেন থাক্‌বেন।"

ঝি অগ্রসর হইয়া আলনার কাপড় নামাইতে আরম্ভ করিল। হেম বাধা দিয়া কহিল, "না না, থাক ঝি,—. কাপড় এবার আর আমি দেব না, তুমি যাও।"

হেম কাপড়গুলি তুলিয়া ঝাড়িয়া আলনায় রাখিতে লাগিল।

"কেন, দেবেন না কেন? ওইত ধোবাবাড়ীর কাপড় এসেছে। ওমা! সব ছিড়ে গেছে নাকি? তাই বলুন। তা ছিঁড়েগেছে, কর্ত্তাকে বলেননি কেন? মুখের কথা বের ক'ল্লেই এক্ষুণি যত দরকার কাপড় জামা আসবে এখন। যাই দেখি।"

হেম ব্যস্তভাবে কহিল "না না, ঝি, দোহাই তোমার, ওঁদের কিছু বলো না। ওঁদের ব'লতে হবে কেন? ওবেলা আমিই কাপড় কিনে আন্‌ব এখন। না হয় কাল ধোপাবাড়ী পাঠান যাবে।"

"আচ্ছা, তাই ব'লব।"—এই বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।—

হেম ছেঁড়া জামা ও কাপড়গুলি তাড়াতাড়ি তার ট্রাঙ্কে তুলিয়া ফেলিল। থলেটি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে মাত্র ৭॥১০ আছে। ট্রাম খরচা লাগিত, চিঠি পত্র লিখিতে হইত, আরও এটা ওটা কত খুচরা খরচের দরকার হইত। কাপড় জামা কিনিলে হাতে বড় কিছু থাকে না। হঠাৎ কিছু খরচের দরকার হইলে সে কি করিবে? পরিচিত কাহারও কাছে, গুটিদশেক টাকা যদি হাওলাত পাওয়া যায়। কিছু কাল সে বসিয়া ভাবিল। তারপর জামা উড়নী গুছাইয়া পরিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি কি বেরুচ্ছ এখন?"

হেম চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল পাশের দিকের একটি দরজার কাছে সুনন্দা দাঁড়াইয়া।

"হাঁ একটু বেরুচ্ছি কাজ আছে। কেন?"

"ভিতরে এস, একটা কথা ব'লব।"

"কি?"—হেম ঘরে ঢুকিয়া একখানি চৌকিতে বসিল। সুনন্দা সঙ্কুচিত ভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "হাঁ, কোথায় যাচ্ছিলে?"

হেম একটু হাসিয়া কহিল, "কি এই কথা নাকি? যাচ্ছি একটু কাজে বাইরে। কেন, কি হ'য়েছে?"

"হাঁ তাইত ব'লতে এলাম। তা তোমার কাপড় চোপড়—কিছু নেই নাকি?"

কথাটা যেন ভারী একটা সঙ্কোচের চাপ ঠেলিয়া দিয়া সুনন্দা বলিয়া ফেলিল।

হেম একটু ভ্রূকুটি করিল। কহিল "কাপড় নেই কেন, কে ব'ল্লে?"

"তবে ধোপাবাড়ী কাপড় দিলে না কেন? আর কাপড় যদি নাই থাকে, ঝিকে কেন তা ব'লতে গেলে?"

"কই, ঝিকে ত আমি তা কিছু বলিনি! কি ব'লেছে সে?"

"তবে সে কি ক'রে জানলে তোমার কাপড় জামা

সব ছিঁড়ে গেছে, কি প'রবে, তাই ধোবাবাড়ী ময়লা কাপড় ছেড়ে দিতে পাল্লে না ?"

রাগে অপমানে ও লজ্জায় হেমের মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। সুনন্দা আবার কহিল, "বৌ তাই শুনে দাদাকে গিয়ে বল্লে, তোমার কাপড় জামা সব ছিঁড়ে গেছে, বদ্‌লে ধোবা বাড়ী ময়লা কাপড় পাঠাতে পারছ না, এক্ষুণি বাজারে লোক পাঠিয়ে কাপড় জামা সব আনিয়ে দিতে। ছি—ছি! আমার এমন লজ্জা ক'চ্চে! না হয় আমাকেই বলতে আমি টাকা দিতাম, কিনে আন্‌তে, ঝিকে কেন বলতে গেলে ?"

লজ্জা অপেক্ষাও অপমানের রাগটা তখন হেমের মনে বেশী প্রবল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "ঝিকে আমি কিছু বলিনি, তবে ধোবাবাড়ী কাপড় দিতে চাইনি বটে। ধোবা কাপড় জামা ছিঁড়ে দিয়েছে আগে বুঝ্‌তে পারিনি। চৌকির উপর ছিল, ঝি বোধ হয় দেখেছে। কাপড় জামা কিন্‌তেই ত আমি যাচ্ছি।"

"টাকা আছে তোমার হাতে ?"

"কাপড় জামা কিনতে যাচ্ছি সুনন্দা, ভিক্ষে ক'রে আনতে যাচ্ছিনে। টাকা তোমার কাছে যখন চাই দিও, এখনও অত দুঃখে পড়িনি।"

সুনন্দা যেন এতটুকু হইয়া গেল, কহিল "তা আমি ত জানিনে। অত চট কেন ? এখানে এসব নিয়ে কোনও কথা হয়, এটা আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

"আমারও লাগে না। তা ওঁদের ব'লো কাপড় জামা আমি নিজেই কিন্‌তে যাচ্ছি— তাঁদের কিছু আনাতে হবে না।"

এই বলিয়াই সে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। সুনন্দা চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিল।

বড়ই অপমান বোধ হইয়াছিল, তাই সে জোর করিয়া বলিয়াছিল, কাপড় জামা সে কিনিতে যাইতেছে, ভিক্ষা করিতে যাইতেছে না। কিন্তু কি দিয়া কিনিবে, তার সংস্থান ছিল না। সামান্য যা খরচ হাতে ছিল,—কাপড় জামা কিনিলে কিছুই আর থাকিবে না। যদি হাওলাত কারও কাছে না পায় তবে কি হইবে ? কিন্তু এসব তেমন করিয়া ভাবিবার মত মন তখন তার ছিল না। অভিমান ভরে হন্ হন্ করিয়া সে ছুটিয়া চলিল। কতকদূর গিয়া একটা বারান্দার নীচে সে ছায়ায় দাঁড়াইল। কোথায় যাইবে ? কার কাছে হাওলাত চাহিবে। কেহ যদি না দেয় ? এই গ্লানির পর গ্লানিই কেবল আবার বাড়িবে। না, আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই। যাই কপালে থাক্, বাড়ী চলিয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু আজ যে এ মুখ তাকে রাখিতেই হইবে। কাপড় নাই বলিয়া শ্বশুরবাড়ী হইতে পলাইয়া বাড়ী যাইবে ছি! তাও কি হয়! সুনন্দা কি মনে করিবে! তার যে বড় মুখ ছোট হইবে। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়িল আঙ্গুলে একটা আংটি আছে। বস্ আর চাই কি ? এই আংটি বেচিয়া সে কাপড় জামা কিনিয়া নিবে। হাতে আরও কিছু থাকিবে। হেমের যেন দারুণ একটা দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। আনন্দে একটা স্বস্তির নিশ্বাস সে ফেলিল। অবিলম্বে এক পোদ্দারের দোকানে গিয়া আংটিটি সে বিক্রী করিল। প্রয়োজন মত কাপড় জামা কিনিয়া নিয়া অনেক বেলায় বাসায় ফিরিল।

কেবল শ্বশুর ও শ্যালকের উপর নিভর করিয়াই হেম নিশ্চিন্ত থাকিত না। নিজেও কাজকর্ম্মের খোঁজে বাহির হইত। আহারাদির পর এক দিন সে এইরূপ বাহির হইয়াছিল। অনেক ঘুরিয়া বেলা প্রায় ৩॥টা ৪টার সময় বড় হয়রান হইয়া বাসায় ফিরিল। তার ভূতপূর্ব্ব ছোট ছাত্র ছাত্রী—বর্ত্তমান শ্যালক শ্যালিকা কয়টি—তার কাছেই থাকিতে, তার সঙ্গে হাসি গল্প খেলা করিতে বড় ভাল বাসিত। শ্যালকরা তখন ইস্কুলে ছিল, শ্যালিকা সুপ্রভা ছুটিয়া তার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমের গায়ে হাত দিয়া কহিল, "ইঃ! ঘেমে যে একেবারে জল হ'য়ে গেছ জামাই বাবু! তোমাকে আমি একটু হাওয়া ক'রব ?"

হেম হাসিয়া কহিল, "নারে পাগল না, হাওয়া ক'ত্তে হবে না।"

"একটা লেমনেড কি সরবৎ টরবৎ খাবেন বরফ দিয়ে ?"

হেম আরাম কেদারাখানির উপরে একটু কাত হইয়া পড়িল, একটু হাসিয়া কহিল, "না, ও সব কিছু চাইনে। তবে—"

"কি তবে? বলুন না? চা খাবেন? আপনি ত চা খুব ভাল বাসেন।"

হেম একটা হাই তুলিয়া কহিল, —"হা, এক পেয়ালা চা পেলে মন্দ হ'ত না। গাটা কেমন ছেড়ে দিয়েছে—একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ত।"

সুপ্রভা ছুটিয়া অন্তঃপুরে গেল। ডাকিয়া কহিল, "দিদি! দিদি! জামাই বাবু বড্ড হয়রান হ'য়ে এসেছেন, একটু চা খাবেন।"

আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সুনন্দা নিজেই ষ্টোভটি জ্বালিয়া জল তুলিয়া দিল। এ বাড়ীতে সকালে ও সন্ধ্যায় সোপচারে সকলেই চা পান করিতেন, অসময়ে এ সব উৎপাত কাহারও কিছু ছিল না। ছুটির দিনেও রমেন্ পর্য্যন্ত অসময়ে চা চাহিত না। কিন্তু হেমের কিছু-বেশী চা খাইবার অভ্যাস ছিল। ক্লান্তির সময় একটু চা পাইলে তার যেন পরমার্থ লাভ হইত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে এরূপ অসময়ে চা খাইবার প্রয়োজন তার হয় নাই। আজ যখন বড় ক্লান্ত হইয়া আসিয়া বসিল, একটু চার জন্যই তার মন বড় ছিন্ ভিন্ করিতেছিল। কিন্তু সুপ্রভা আপনা হইতে কথাটা না তুলিলে সে বোধ হয় মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিত না, একটু চা দেও। অসুবিধা হইলেও সহজে সে কাহাকেও বড় কিছু বলিত না।

সুনন্দা জল নামাইয়া চা ভিজাইল। মুরলা কি কাজে তখন সেখানে আসিল। কিছু বিস্মিত ভাবে সে কহিল; "একি ঠাকুরঝি? চা কেন এখন?"

সুনন্দা উত্তর করিল, "উনি বড় হয়রান হ'য়ে এসেছেন, সুধু এসে বল্লে একটু চা খাবেন।"

"তা তুমি নিজে কেন ক'চ্ছ? আমাকে ব'ল্লেই ত হ'ত। তা, খাবার টাবার কিছু—"

"না, খাবারের কথা ত কিছু বলেন নি।"

মুরলা একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "ঠাকুরজামাই বুঝি চা খান খুব। নইলে, এই অসময়ে—কই, এ বাড়ীতে ত কাউকে চা খেতে দেখিনি।"

সুনন্দা কিছু উত্তর করিল না। ভিজান চায়ে চামচ দিয়া একটা নাড়া দিয়া ছাঁকিতে আরম্ভ করিল।

ঝিও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, "আমাদের দাদাবাবু, ঐ যে সন্ধ্যে বেলায় বাঁধা নিয়ম—তার আগে কক্ষনো চা চাইবেন না। সব কাজে অমন বাঁধা নিয়মে চল্‌তে আর কাউকে বড় দেখিনি। নিজের বাড়ী ঘর ত—তা নাওয়া বল, খাওয়া বল, শোওয়া বল, যখন যা নিয়ম আছে—একটু এদিক ওদিক কখনও করবেন না।"

সুনন্দা মুখ তুলিয়া ঝির দিকে একবার চাহিল। দৃষ্টিতে বিশেষ একটু অপ্রসন্ন ভাব ছিল। মুরলা পিছনের দিকে সরিয়া ঝিকে ইসারা করিল। ঝি বাহিরে চলিয়া গেল। মুরলাও আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেল। সুনন্দার সত্যই বড় রাগ হইতেছিল। একটু চা—তার জন্যে ঝি এমন কথাটা শুনাইল, আর বউ তাহাতে চুপ করিয়া গেল! একবার তার মনে হইল, চা সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু এখনও ত তার পিতা বর্ত্তমান আছেন, গৃহ ও গৃহের সম্পদ তাঁরই, ভ্রাতারা কি পাচবধূর নয়। কর্তৃত্ব সে কিছুতে নাই করিল, কিন্তু স্বামীকে কি এক পেয়ালা চাও প্রয়োজন মত করিয়া দিতে পারিবে না? তার জন্যেও আবার সময় অসময় তাকে ভাবিতে হইবে? কেন, এমন কি হইয়াছে? হাঁ, একেবারে ভাইএর সংসার যখন হইবে, সে এখানে আসিবেও না কখনও। কিন্তু তার পিতার সংসারে এটুকু দাবী কেন তার থাকিবে না?

একটা সস্‌প্যানে জল ঢাকা ছিল, কিন্তু চিনির কৌটায় চিনি নাই। চিনি আনিতে সে ভাঁড়ারের দিকে গেল। ভাঁড়ারে ঝি আর মুরলা কলাবলি করিতেছিল। সুনন্দা থমকিয়া দাঁড়াইল।

ঝি বলিতেছিল, "তা যাই বল বউমা। এত অনিয়ম দেখলে দুটো কথা না বলে পারিনে! বাবুর লাগে না দাদাবাবুর লাগে না, আর উনি এমন বড় মানুষ যে একটু বাইরে ঘুরে এসেছেন, অমনি চার হুকুম ক'রে পাঠালেন! মুরোদ ত কত! পরতে কাপড় জোটে না—দিদিমণি লুকিয়ে টাকা দিয়ে এল—তবে গে লজ্জা রক্ষে হ'ল।"

মুরলা একটু হাসিয়া কহিল, "সত্যি সেদিন এমন হাসি পাচ্ছিল আমার! আর ঠাকুরঝি তার দেরাজ খুলে নোট নিয়ে এমনি ছুটে গেল। তা যাকগে, তোমার ওসব কথা বলা ভাল দেখায় না। একটু চা খেতে চেয়েছেন, হাজার হ'ক্ বাড়ীর জামাই ত। সাবাশ্চ এসব অনিয়ম ওঁর পছন্দ

করেন না। আর সময় নেই অসময় নেই যখন তখন চা খাওয়া—এসব অভ্যাসও ভাল নয়। গরীবের ঘরে ত চলেই না। তবে এখানে আছেন—"

"হাঁ, তাইত ষ্টোভ ধরিয়ে জল তুলে দেওয়া হ'ল। হ'ত আজ নিজের ঘর, দিদিমণি অমনি উনুনে কয়লা ধরিয়ে চা ক'রে দিতে পাত্ত কিনা।"

"হাঁ, তাই কি কেউ পারে? এইখানে যদ্দিন আছেন চলবে। এর পর আর চলবে না। তখন যদি এ সব বদ্ অভ্যেস একটু শোধরায়। তা যাক্, এসব কথা ওঁদের সাম্‌নে কিছু তুলো না। কাজ কি? কদিন আর! তুমি বরং যাও, আমার উপরে খাবার আছে, ঠাকুর জামাইকে কিছু দিয়ে এস,—ঠাকুর ঝিরও চা এতক্ষণ হ'ল।"

ঝি বাহির হইয়াই দেখিল, সুনন্দা দাঁড়াইয়া!

যার সম্বন্ধে গোপনে অতি অসঙ্গত অপ্রিয় কোনও আলোচনা হইতেছে, সে যদি দৈবাৎ আসিয়া তাহা শোনে, আর ঠিক তখন চোখো চোখি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে সেই আলোচক পক্ষ যে কি পরিমাণ অপ্রতিভ হইয়া পড়ে, তাহা কি আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে? ঝি একমাত্র ক্ষীণ আশা ধরিল, যদি দিদিমণি এই মুহূর্ত্তে আসিয়া থাকে আর তাদের আগের কথা কিছু না শুনিয়া থাকে! সেই আশা ধরিয়া আপনাকে যথাসাধ্য সামলাইয়া নিয়া সে কহিল, "এই যে দিদিমণি চা তৈরী হয়ে গেছে? এই যে বৌমা ব'ল্লেন আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

বলিতে বলিতে মুরলাও আসিয়া বাহির হইল। উভয়েই উভয়ের দিকে একবার চাহিল। সুনন্দার দৃষ্টি আহত অভিমানের সতেজ দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এমনই তীব্র একটা ধিক্কার সেই জ্বালার সঙ্গে মুরলার দৃষ্টিকে আহত করিল যে মুরলার সাধ্য ছিল না, তখন তার সম্মুখীন হইতে পারে! ত্রস্ত ফিরিয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইল। সুনন্দা সাভিমান গুরুপদক্ষেপে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই পেয়ালা হইতে চা ছুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল! মুরলা আড়াল হইতে উঁকি দিয়া দেখিতেছিলেন,—ত্রস্ত আসিয়া সুনন্দার হাত দুটি ধরিয়া কহিল, "আমায় মাপ কর ঠাকুরঝি, আমি দোষের ভেবে কিছু বলিনি—"

সুনন্দা তার বুকভরা আবেগ চাপিয়া দিয়া কহিল, "মাপ কিসের ক'রব বউ?—এতে দোষ ধরবার কি অধিকার আমার আছে?"

মুরলা যারপরনাই লজ্জিত ও ব্যথিত দৃষ্টিতে সুনন্দার মুখের দিকে একবার চাহিয়া আবার মুখ নত করিল। কহিল, দোহাই তোমার ঠাকুরঝি, আমি দিব্যি ক'রে ব'লছি, দোষের ভেবে কিছু বলিনি। দোহাই তোমার আমায় মাপ কর। ছি ছি! সবাই শুনলে আমি যে লজ্জায় মরে যাব—"

সুনন্দা উত্তর করিল, "সে ভয় তোমার কিছু নেই। আমি কাউকে বলতে যাব না। যদি বলে, তোমার ঝি চাকররাই ব'লবে। এইটে মনে রেখো, ওরা দোমুখ সাপ —দুই মুখেই কামড়াতে পারে।"

মুরলা নীরবে একটুকাল নতমুখে বসিয়া থাকিয়া ষ্টোভটা ধরাইতে গেল।

সুনন্দা একটু চাহিয়া দেখিয়া কহিল, "কি হবে ওতে?"

মুরলা সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, "চাটা ফেলে দিলে— ঠাকুর জামাই বসে আছেন—"

"না, চা আর তৈরী ক'ত্তে হবেনা।" সুনন্দা টানদিয়া ষ্টোভটা সরাইয়া দিল।—মুরলা কহিল, "আমার উপর রাগ ক'রে তাকে কষ্ট দিবে ঠাকুরঝি, আমার শত অপরাধ আজ একটিবার মাপ কর তোমার দুটি পায় পড়ি ঠাকুরঝি!"

"তোমার কোনও অপরাধ আমি নিচ্ছিনে বউ কোনও অশান্তি তোমার আমি ঘটাব না।—তবে— চা এখন হবে না। যদি জোর ক'রে কর, টেনে নিয়ে আমি ফেলে দেব।"

মুরলা আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেল। ঝির হাতে দুইটি পয়সা দিয়া কহিল, "যাও, এক্ষুণি ছুটে যাও। কাছে কোনও দোকান থেকে এক পেয়ালা তৈরী চা এনে জামাই-বাবুকে দিয়ে দেও। আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ঝি ছুটিয়া গেল। মুরলা একখানি রেকাবে কিছু খাবার গুছাইয়া চাকরের হাতে নীচে হেমের জন্য পাঠাইয়া দিল। ঝিও একটু পরেই চা আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল।

হেম উঠিয়া গিয়া কেবল চায়ের পেয়ালায় হাত দিয়াছে, এমন সময় ঝড়ের মত সুনন্দা গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আবার কে দিলে চা এনে! আমি বারণ ক'রলুম তবু!"

বলিতে বলিতে সুনন্দা হেমের হাত হইতে চায়ের পেয়ালাটি ছিনাইয়া নিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

হেম অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! সুনন্দা তেমনই উত্তেজিত ভাবে কহিল, "তোমার একটু লজ্জা করে না? যখন তখন যদি এমনই চার তেষ্টা পায়, পয়সা থাকে,—দোকানে গিয়ে খেয়ে আস্তে পার না? এখানে প'ড়ে আছ,—এঁরা খাওয়াবে পরাবে, তবে দুটি ভাত ক'রে খাবে আবার যখন তখন চায়ের হুকুম ক'রে পাঠাও! ছি ছি ছি! একটু লজ্জা হয় না তোমার? কি মনে কর তুমি?"

আরক্ত চক্ষে সুনন্দার দিকে চাহিয়া হেম সদর্পে উত্তর করিল, "আর কিছুই মনে করিনা সুনন্দা,—কেবল ওঁদের কথামত এখানে এসে, আর এদ্দিন থেকে কত বড় ঝকমারী ক'রেছি, তাই; তবে এটা বুঝতে পারিনি যে তোমার এই বড়লোক বাবার বাড়ীতে এক পেয়ালা চা খেতে চাইলে এত বড় একটা বেয়াদবী আমার হবে। তাও নিজে চাইনি, তোমারই বোন্ সুপ্রভা এসে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। আচ্ছা ভাল। শিখিয়ে দিলে আর বেয়াদবী হবে না।"

হেম উঠিয়া বাহিরের বারান্দার ওধারে গিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার চক্ষে জল আসিল। একটু কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে তার ঘরে ফিরিয়া গেল, বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাঁচটার পরেই দেবেন্দ্র বাবু বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। বেয়ারা আসিয়া একটু কাগজ তাঁহার হাতে দিল। তাহাতে এই কয়টি কথা লেখা ছিল,—

শ্রীচরণ কমলেষু—

বিশেষ প্রয়োজনে এখনই আমাকে কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইল। সময় নাই, তাই সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় নিতে পারিলাম না। মার্জ্জনা করিবেন।

সেবক—হেম।

(৭)

সুনন্দা কিছু বলিল না। পরদিন সকাল বেলা হইতেই এমন একটা শান্ত সংযত ভাব তার দেখা গেল, যেন এমন একটা অপ্রিয় ঘটনা একেবারেই ঘটে নাই। কিন্তু অন্তরে সে পুড়িয়া খাক্ হইতেছিল। পনর কুড়ি দিন আরও চলিয়া গেল, আর সে পিতৃগৃহে তিষ্ঠিতে পারে না! একদিন পিতাকে সে বলল, "বাবা, আমায় একবার শিবতলীতে পাঠিয়ে দেও না?"

"শিবতলীতে! কেন রে?"

"একবার যাব সেখানে!"

সুনন্দার শ্বশুরালয় এই শিবতলী গ্রামে। দেবেনবাবু কিয়ৎকাল কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কি হয়েছিল রে সুনু?"

"কি হবে বাবা, কিছু হয়নি।"

দেবেনবাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, "হেম হঠাৎ চ'লে গেল—তুই আবার যেতে চাচ্ছিস্—তারা ত পাঠাতে লেখেনি কিছু—"

"না লিখলে কি যেতে নেই? একবার না গিয়ে পারব না বাবা, আমায় পাঠিয়ে দেও।"

দেবেনবাবু একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "তা তোর যদি খুব ইচ্ছে হয়ে থাকে, পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আবার আসিস্ মা, শীগিগরই আসিস্। একটা কথা ভুলিসনি সুনন্দা, আমি এখনও বেঁচে আছি, এ তোরই বাবার বাড়ী।"

"তাহ'লে কাল পাঠিয়ে দেবে?"

"কালই! আচ্ছা যাস্ তাই!"

পিতৃদত্ত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার সব পিতার গৃহে রাখিয়া কয়খানি আটপৌরে কাপড়, হাতে দুগাছি আটপৌরে বালা মাত্র লইয়া সুনন্দা পরদিন স্বামীর গৃহে চলিয়া গেল।

যাত্রার সময়ে খামে আঁটা একখানি চিঠি মুরলার হাতে সে দিয়া দিল। মুরলা খুলিয়া পড়িল,—

"বউ, এই ধনীর ঘরের কোনও চিহ্ন লইয়া আমি আমার স্বামীর সংসারে যাইতে চাই না। বাবা যে সব অলঙ্কার আর কাপড় চোপড় আমাকে দিয়াছিলেন, সব রহিল। বাবা যেন কখনও জানিতে না পারেন। যদি জানিতে পারেন, বাধ্য হইয়া সব তাঁকে বুঝাইয়া আমাকে বলিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখে থাক! কোনও ক্ষোভ যদি হয়, মনে রাখিও না। যাহা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে,—আমি আমার আপন পর চিনিয়াছি। আপন বলিয়া আজ সেখানে গিয়া উঠিতেছি। আমার স্বামী আমার এ দাবী ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবেন না।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী সুনন্দা।"

সম্পূর্ণ।

পূজারি

বিশ্ববাণীর মন্দির-তলে ভক্তের শুধু ঠাঁই,
নাই সেথা নাই ধনী-নির্ধন ছোট-বড় ভেদ নাই;
নাহি থাকে যদি কাঞ্চনথালা,
মণিমুক্তার মঞ্জুল-মালা,
দুঃখ কি তাহে—ভরি আন্ ডালা ভক্তির ফুলে ভাই,
সুন্দর-মধু অন্তর যার মন্দিরে তারি ঠাঁই।

লক্ষ্মী-চরণ সেবে ধনীগণ লক্ষ রতন-ভারে,
জননীর রূপ ঢেকে দেয় সবে তুচ্ছ রতনভারে।
বিশ্বভুবন রূপে যাঁর আলা—
গলে তাঁর দিতে মুক্তার মালা
কণ্টকসম দেয় যে গো জালা অন্তরবীণা-তারে;
মুক্তার হার কণ্ঠের ভার কেমনে দিব তা মা'রে।

বিশ্বে আমরা নিঃস্ব সমান— শঙ্কা কিসের ভাই,
সত্য রহুক্ চিত্ত ভরিয়া বিত্ত কভু না চাই।
নাই থাক্ তোর ভূষণ-শয্যা,
দুঃখ কি তাহে—কিসের লজ্জা,
ব্রহ্মচারীর সুচারু সজ্জা - লজ্জার কথা ভাই,
ধ্যাননিরত তাপসনয়নে সম্পদ যেরে ছাই।

দেবজনচিরবাঞ্ছিত সে যে জ্ঞান-কমলধারী,
বিশ্ব ভুবন বন্দন ধন—দুঃখ দহনকারী।
নন্দিত বীণা ঝঙ্কারে যাঁর
সঙ্গীতধারা ঝরে অনিবার,
গুঞ্জরে ভাষা—মুঞ্জরে আশা—নির্ঝরে রস-বারি;—
দেবতা-মানব-বন্দিত সে যে -বন্দনা গাহ তাঁরি।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

আর্করাইট্

নিরক্ষর দরিদ্র সন্তানও যে নিজ প্রতিভাবলে জগতের মহদুপকার সাধন করিতে পারে এবং নিজের কর্ম্মগুণে পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইতে পারে, তাহা আমরা আর্ক-রাইটের জীবনী আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারি। আজ ইংলণ্ডের বয়নশিল্পের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আর্ক রাইটের স্মৃতি আমাদিগের মনে উদিত হয়। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধির ভিত্তি গঠনে অতুলনীয় সাহায্যকারী আর্করাইট জীবনের অপরাহ্ন পর্য্যন্ত নিরক্ষর ও দরিদ্র ছিলেন।

আর্করাইট্ ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ল্যাঙ্কাশায়ার প্রদেশে প্রেষ্টন্ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তেরটী ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে আর্করাইট্ সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনি আদৌ শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই। দুঃসময়ে পিতাকে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অতি অল্প বয়সেই তিনি বোলটন্ নগরে একটী ছোট ঘর ভাড়া লইয়া নরসুন্দরের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে ঐ ব্যবসায়ের আরও কয়েকখানি দোকান ছিল। সকল দোকানেই ঐ কার্য্যের পারিশ্রমিক এক পেনি করিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহা দেখিয়া আর্করাইট্ ব্যবসায়ে উন্নতি করিবার মানসে ঐ কার্য্যে অর্দ্ধপেনি পারিশ্রমিক লইতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে তাঁহার যে আয় হইতে লাগিল, তাহাতেই তিনি পিতার সংসার একরূপ সচ্ছলভাবেই প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তেইশ বৎসর বয়সে আর্করাইটের প্রথম বিবাহ হয়; অল্পদিন মধ্যে তাঁহার স্ত্রী পরলোকগমন করেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয়দার পরিগ্রহ করিলেন। আমরা পূ

সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে বিলাতের সর্বস্থানের লোকেই পরচুল ব্যবহার করিতেন। নরসুন্দরের ব্যবসায়ে সামান্য আয় হইতে তাঁহার নূতন সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন দেখিয়া তিনি ঐরূপ পরচুলের ব্যবসা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে চুল সংগ্রহ করিতেন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর রং প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল পরচুল নানা রঙে রঞ্জিত করিতেন। সেই রং স্থায়ী হইত বলিয়া তাঁহার চুল প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইত।

তিনি যে কি প্রকারে সূতাকাটা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ঐ সময়ে লাঙ্কাশায়ার প্রভৃতি দেশের লোকেরা সূতা তৈয়ারী করিয়াই সাধারণতঃ জীবিকানির্ব্বাহ করিত। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হারগ্রীভস্ সাহেব যে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ঐ যন্ত্রে একটা করিয়া সূতা প্রস্তুত হইত। হারগ্রীভস্ সাহেবের যন্ত্রের দ্বারা যে সূতা প্রস্তুত হইত তাহা ব্যবহারোপযোগী শক্ত হইত না। সেইজন্য লোকের নিকট উহা প্রথম প্রথম মোটেই আদরণীয় হয় নাই। সেই সময়ে ম্যান্‌চেষ্টারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সূতা তৈয়ারী করিবার জন্য মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে টানা এবং পোড়েনের শক্ত সূতা সংগ্রহ করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর হারগ্রীভস্ সাহেব তাঁহার যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেন। ইহাতে আটটি পর্য্যন্ত সূতা একসঙ্গে প্রস্তুত হইত।

এই সময়ে ইংলণ্ডে কোন পশমের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে টানা এবং পোড়েনের জন্য দুই প্রকার সূতা ব্যবহৃত হইত। টানা দিবার জন্য পশমের শক্ত সূতা প্রস্তুত না হওয়াতে ঐ সূতা তুলায় প্রস্তুত হইত এবং পোড়েনের সূতা পশমের দ্বারা প্রস্তুত হইত। ঐ সকল সূতা আয়র্লণ্ড হইতে আসিত এবং ইহার দাম অধিক লাগিত বলিয়া আর্করাইট্ পশমের শক্ত সূতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিবার জন্য অনেকদিন হইতেই চিন্তা করিতেছিলেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহার প্রতিভা সেই সামান্য কার্য্যেই তাঁহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে দেয় নাই। কোনরূপ শিক্ষা না থাকিলেও তিনি দেশের অভাব ও উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

একদিন আর্করাইট্ কোন এক লৌহকারখানায় গিয়া দেখিলেন যে, দুই জোড়া চাকা প্রবলবেগে ঘুরিতেছে, একজোড়া অপর জোড়ার বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে এবং উহার মধ্যে উত্তপ্ত লৌহ দেওয়াতে খুব সরু হইয়া বহির্গত হইতেছে। ঐ সকল দেখিয়া আর্করাইটের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে তুলাকে ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া চিরুণীর দ্বারা আঁচড়াইয়া দুইখানি চাকাওয়ালা কলের সাহায্যে উত্তমরূপে সূতা তৈয়ারী করা যাইতে পারে। ইহার পর হইতেই আর্করাইট্ পরচুলের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিয়া এই নূতন কার্য্যে একাগ্রভাবে নিযুক্ত হইলেন।

তিনি লৌহ এবং কাষ্ঠের কার্য্য করিতে পারিতেন না বলিয়া Kay (কে) সাহেব নামক একজন লোককে নিযুক্ত করিলেন। এই লোকটী ঘড়ির কার্য্য করিত। আর্করাইট 'কে' সাহেবের সাহায্যের জন্য একজন কর্ম্মকার ও একজন সূত্রধর নিযুক্ত করিলেন। যন্ত্রনির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ এমন কি গৃহস্থালীর দ্রব্য পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বসনভূষণের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল, শত তালিযুক্ত জামা পরিয়া যখন আর্করাইট্ যন্ত্র নির্ম্মাণে তাঁহার নিযুক্ত লোকদিগকে সাহায্য করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া কে বলিতে পারিত যে, ইঁহারই প্রস্তুত এই যন্ত্র একদিন ইংলণ্ডের বয়ন ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আর্করাইটের যন্ত্র প্রস্তুত হইল, ঐ বৎসর তিনি 'কে' সাহেবকে সঙ্গে লইয়া প্রেষ্টন নগরে যাইয়া এক বিদ্যালয়ের একটী ঘর লইয়া প্রথম ঐ যন্ত্রের পরীক্ষা করিলেন। যখন যন্ত্র চলিতে লাগিল, তখন এক ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। যে বিদ্যালয়ে ঐ পরীক্ষা হইতেছিল, সেই স্থানে দুইটী বৃদ্ধা রমণী বাস করিতেন। তাঁহারা ঐ সকল শব্দ শুনিয়া এবং দরজা জানালা বন্ধ দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে কোন এক ভৌতিক শক্তিবলে ঐ যন্ত্র চলিতেছে।

ইহার পর আর্করাইট্ তাঁহার সমস্ত যন্ত্র নটিংহাম সহরে

লইয়া গেলেন। তথায় তিনি কতিপয় উদ্যোগী লোকের সাহায্যে ঐ যন্ত্র অশ্বদ্বারা চালাইতে আরম্ভ করেন। অল্প দিন ঐরূপ যন্ত্র চালাইয়া তিনি দেখিলেন ইহাতে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হয়। ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য তিনি ডারবিসায়রে ক্রমফোর্ড নগরের সহরে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যন্ত্র লইয়া নদীর স্রোতের দ্বারা যে জলশক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন। সেইজন্য ইহার নাম হইল Water frame. কিন্তু লাঙ্কাসায়ারে, যেখানে ইহা বেশী ব্যবহৃত হইত, ইহার নাম হইল—Throstle.

এই যন্ত্রে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, আর্করাইট্ তাহা লাঙ্কাসায়ারের ব্যবসায়িদিগকে বিক্রয় করিতে দিলেন। কিন্তু তাহারা ঐ সকল জিনিষ লওয়া দূরে থাকুক, আর্করাইটের কার্য্যে বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পশমী দ্রব্যে টানা এবং পোড়েন উভয় সূতাই পশমের প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রস্তুত দ্রব্যের বিক্রয় বেশী হইতে লাগিল। তিনি যে এত সংক্ষিপ্ত উপায়ে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া লাঙ্কাসায়ারের লোকেরা এক সভা করিয়া ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টকে এক আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য করিল। সেই আইনের বলে স্থির হইল যে ইংলণ্ডে পশমের ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য ইহার পর হইতে পশমী দ্রব্য রপ্তানী করিতে হইলে প্রতি গজে তিন পেন্স করিয়া মাশুল লাগিবে এবং ঐরূপ কাপড় টানা এবং পোড়েন দুই-ই পশমী সূতা দেওয়া থাকিলে বিলাতের লোকেরা তাহা ব্যবহার করিবেন না। এই আইনে আর্করাইটের মহাক্ষতি হইতে লাগিল। দেশ বিদেশে তাঁহার কারখানার প্রস্তুত দ্রব্যের বিক্রয় কমিয়া গেল; তিনি বিপদে পড়িলেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য্য না হারাইয়া অসাধারণ অধ্যবসায়ে বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আর্করাইট্ যখন দেখিলেন যে, লাঙ্কাসায়ারের লোকেরা প্রতিপদে তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল, এখন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে এক অভিযোগ করিলেন। সেই বৎসরে তাঁহার অসীম চেষ্টার ফলে উক্ত আইন রদ হইল এবং ঐ সকল বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি তাঁহার যন্ত্রের প্রচুর পরিমাণে উন্নতি সাধন করিলেন। ইংলণ্ডে তুলার ব্যবসায়ীরা তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত যন্ত্র দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। তখন হইতে আর্করাইটের যন্ত্রে সকল রকম কাপড় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং ঐগুলি এত বেশী পরিমাণে চারিদিকে রপ্তানী হইতে লাগিল যে, চারিদিকে ঐ সকল দ্রব্যের এবং পশমী সূতার দর অনেক কমিয়া গেল।

এখন হইতে তিনি তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রকে "পেটেণ্ট রেজিষ্টী" করাইয়া কারখানা স্থাপন পূর্ব্বক কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, দেশের চতুর্দ্দিকে ঐরূপ কারখানা বিস্তৃত হউক। কিন্তু কোন শুভকার্য্যই বিনা বাধায় নিষ্পন্ন হয় না। ইহার পূর্ব্বে যদিও তাঁহাকে অনেক বিপদে পতিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু এখন তাঁহাকে যে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল, তাহার তুলনায় পূর্ব্বের বিপদ কিছুই নয় বলিলেও হয়।

ইংলণ্ডের, বিশেষতঃ ম্যানচেষ্টার, লাঙ্কাসায়ার প্রভৃতি প্রদেশের লোকেরা ইহার পূর্ব্ব হইতেই যন্ত্র অর্থাৎ কারখানা স্থাপন করিয়া অশ্ব বা স্রোত বা বাষ্পবলে যন্ত্র চালাইবার একান্ত বিরোধী ছিল; এখন ইহারা আর্করাইটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। এই সময়ে 'কে' সাহেবের সহিত আর্করাইটের মনোমালিন্য ঘটে। 'কে' তাঁহার নিকট যতটা আশা করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ না হওয়াতে সাধারণে প্রচার করিতে লাগিল যে ঐ নূতন অদ্ভুত বয়ন যন্ত্রটী আর্করাইটের আবিষ্কৃত নহে, 'কে' সাহেব অন্যের নিকট ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণ প্রণালী জানিয়া আসিয়া আর্করাইটকে তাহা বলাতে তিনি ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন মাত্র। নীচ প্রকৃতি লোকের কথা পরে মিথ্যা প্রমাণিত হইলেও তখন উত্তেজিত সাধারণ লোকের ইহাতে সুবিধাই হইয়াছিল। একদিন তাহারা সদলবলে আর্করাইটের কারখানা, যন্ত্রগৃহ প্রভৃতি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভস্মসাৎ করিল, এমন কি যে সমস্ত পুলিশপ্রহরী এবং সৈন্যদল তথায় শান্তিরক্ষার জন্য উপস্থিত ছিল, তাহারা সাধারণের এই কার্য্যে কিছুমাত্র বাধা দিল না, উপরন্তু তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। কেবলমাত্র ইহাই নয়; যে সকল ব্যবসায়ী আর্করাইটের আবিষ্কৃত যন্ত্র ব্যবহার করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া জনসাধারণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল,—

তাহারাই গোপনে তাঁহার যন্ত্রের অনুকরণে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া কারখানা চালাইয়া লাভবান্ হইতে লাগিল। এই সকল অত্যাচারে আর্করাইটের যে কত ক্ষতি হইতেছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অন্য কোনও দুর্ব্বল চিত্ত লোক হইলে এত অত্যাচার সহ্য করিয়া দেশে বাস করিতেই পারিত না। কিন্তু আর্করাইট্ বিপদে অটল। তিনি নির্ভিকচিত্তে এই সকল বিপদের সম্মুখীন হইলেন। যে সকল লোক চুরি করিয়া তাঁহার যন্ত্র লইয়া কার্য্য করিতেছিল, তাহাদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যে কত মোকদ্দমা করিতে হইয়াছিল; তাহার বর্ণনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, প্রত্যেক মোকদ্দমায় তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে শত্রুপক্ষ হ্রাস হইয়া তাঁহার মিত্রপক্ষের বৃদ্ধি হইল, ইংলণ্ড এই প্রতিভার দান সাদরে গ্রহণ করিল। সূতা ও পশমদ্রব্য সম্পর্কিত বয়ন-শিল্পে এত উন্নতি সাধিত হইল যে; তাঁহার জীবিত অবস্থাতেই তিনি দেখিলেন ইংলণ্ডজাত সূতা এবং পশমের নানাবিধ দ্রব্য দেশবিদেশে রপ্তানি হইতেছে, দেশের ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

একান্ত দরিদ্রের সন্তান আর্করাইটের শেষ জীবনে প্রচুর ধন-সংস্থান হইয়াছিল। বাল্যে শিক্ষালাভ তাঁহার হয় নাই, কিন্তু পঞ্চাশবৎসর বয়সে তিনি অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বিপদে সম্পদে তাঁহার ধৈর্য্য, তাঁহার বিনয়, তাঁহার নম্রতা অতুলনীয় ছিল। জীবনের সন্ধ্যায়, সমগ্রদেশে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর ছয়বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় জর্জ্জ মহোদয় "নাইট" উপাধিদানে তাঁহাকে রাজসম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন।

যে দরিদ্রসন্তান অর্দ্ধপেনি মাত্র লইয়া ক্ষৌর কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, আজ সমগ্র মানবজাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। যতদিন জগদীশ্বরের এই সৃষ্টি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন মানব বংশপরম্পরায় আর্করাইটের স্মৃতির পূজা করিবে। তিনি যে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহার কল্যাণে কোটী কোটী লোক জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। স্বর্ণখনিযুক্ত দুই চারিটী জনপদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য থাকিলেও ইংলণ্ড যত না উপকৃত হইত, আর্করাইটের দান দ্বারা তাহার অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক উপকৃত হইয়াছে। কেবল ইংলণ্ড কেন, তাঁহার এই কল্যাণকর সৃষ্টির প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীর ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীমদনমোহন পাল

বিধুরা

(কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গ পাঠে লিখিত)

মূর্চ্ছা-অন্তে কামবধূ মেলিল নয়ন,
(মেঘমুক্ত ম্লান শশী যেন দ্বিতীয়ার)
আলুথালু কেশদাম, বিশ্লথ বসন,
উন্মাদ চাহনি চক্ষে নির্জ্জ্যোতি তারার।
নিশীথে নলিনী সম ম্লান মুখ ছবি,
লুপ্ত সে অরুণাধরশোভী চিরহাসি
জাগাত যা প্রেমাকাশে নিত্য নব রবি
মন্মথের হৃদে হায়! সুষমা বিকাশি।

ভেঙ্গেছে জনম তরে সুখের স্বপন,
থেমেছে হৃদয় বীণে প্রেমের ঝঙ্কার,
আর ত ওঠে না তাতে ভ্রমর গুঞ্জন,
ছিঁড়ে গেছে একেবারে, হায়, তার তার।
হরক্রোপে মুহূর্ত্তেকে সর্ব্ব-সুখাশার
অকাল সমাধি, মরি, বিধুরা বালার

শ্রীপ্রমথনাথ দে, বি. এল্

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম দৃশ্য

ছিরে ডোম ও হিরে হাড়ি

ছিরে। মিতে শুনচো হে, তার পর ত ওপাড়ার নেপাল দাদা ঠাকুর আর বাণী চাচা এরা সবাই ত ভাই তাড়ি টানল। পেল্লাই ফুর্ত্তি,—জমাট বটে। দা'ঠাকুর ত দু'হাত তুলে তাড়ির মহিমে গাইতে লাগল। হা—হা—হা (হাস্য) ভারি মজার গানটা মোটে দু'কলি মনে আছে—

(গুণ্ গুণ্ স্বরে গীত)

তাড়ি তোরে যাই বলিহারি,

তোরি নিন্দে করে মুখ্যু লোকে—যত আনাড়ি।

আহা ভুলেগেলাম যেহে। হাঁ—হা—আর এককলি এই বটে—

আবার টানলে পরে ফুর্ত্তি ধরে,গায়ে সুড়সুড়ি।

হা—হা—(হাস্য)

হিরে। মিতে, এ সব কি তোমার ভাল হচ্ছে? গরীব দুঃখী লোক আমরা, মা বাপ বউ ছেলে খেতে পায় না, আর আমরা তাড়ি খেয়ে মাতলামি করি, এটা কি ভাল?

ছিরে। কেন দা'ঠাকুর ত বলে এতে অন্যায় কিছু নেই,—চার পয়সায় এক ভাঁড় তাড়ি, তাতে যদি কাজের পর খেটে খুটে মনটায় একটু ফুর্ত্তি পাই—

হিরে। (বিরক্ত স্বরে) রেখে দাও তোমার ফুর্ত্তি পাপ পুণ্যিটা ত মান, মদ খাওয়া, অজায়গায় কুজায়গায় যাওয়া, এ সব পাপের ফল একবার ভেবেচ কি? দা'ঠাকুর ত তোমায় সে সময় নরক থেকে সঙ্গে তুলে নিয়ে আসবে না?

ছিরে। কেন দা'ঠাকুর ত সে দিন বল্ল—যদি এ রকম পাপ করলে নরকে যেতে হয়, তবে আমাদের ন বাবুও ত যাবে, মনি গয়লানী ও ত যাবে, আর রামধন সুঁড়ি সেও ত যাবে,—নরক তখন ত একেবারে গুলজার হবে,—হরদম ফুর্ত্তি! নরক কি তখন নরক থাকবে রে, সগ্গকে টেক্কা দেবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছিরে ডোম ও হিরে হাড়ি

ছিরে। ভাই মিতে, তোমার কাছে মু' দেখাতে আজ আমার বড্ড সরম লাগচে। দু'দিন না খেয়ে আছি। চার আনা পয়সার জন্যে দা'ঠাকুর, নেপাল, বাণী সেখের কাছে কতবার হাত পেতেছি,—কেউ কিছু দিলে না। তারাই ত আমায় তাড়ি খাইয়ে পেল্লাই মাতাল করে দিয়েছিল, তাই ত দু'দিন 'জন' খাটতে যেতে পারিনি। গা হাত পায় এখনও ব্যথাও রয়েছে। কোন রকমে টলতে টলতে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি।

হিরে। আমার কাছে আসনি কেন ভাই?

ছিরে। তোমার কাছে আসতে পারিনি মিতে—লজ্জায়।

হিরে। তাই এখনও বোঝ। যা হবার তা ত হয়েছে, এখন ওসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ধম্মে থেকে কোন রকমে দিন গুলো চালাও। হাঁ, শুনলাম ন' বাবু নাকি তোর জমিটা কেড়ে নিয়েছে, খাজনা দিতে পারিস নি বলে?

ছিরে। (সলজ্জে) হা! কোথা থেকে খাজনা দেবো,—বাড়ী থেকে চাল ধান বিক্রি করে, বউএর হাতের পৈছে বাঁধা দিয়ে পাগলের মত ওদের ফুর্ত্তির খরচ যুগিয়েছি,—বউএর কান্না, মায়ের শুকনো মুখ, ছেলে দুটির পেটের দিকে একেবারে তাকাইনি,—ক্ষেপা কুকুরের মতো ওদের পিছু পিছু ঘুরেছি।

হিরে। (ভাবিয়া) মিতে এক কাজ কর্—আমার শাউড়ি মরবার সময় আমায় কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিল। সে টাকা আমার আর কি হবে বল? কে আর ভোগ করবে?—বউটা ছিল, সেও মরে গিয়ে আমায় খোলসা করে দিয়েছে (দীর্ঘ নিশ্বাস)। জমিদারের পাওনা কত?

ছিরে। দু'গণ্ডা দু'টাকা পাওনা হয়েছে। মিতে সে টাকা তোকে দিতে হবে না। আমি এবার থেকে সৎপথে চলব। খেটে খুটে টাকাগুলো মিটিয়ে দিয়ে সে জমিটার

একটা কিনারা করে নেব। যা রোজগার করি তাতে ত কোন কষ্ট হবার কথা নয়,—কি যে ভূত ঘাড়ে চাপে, আমার মাথাটা একেবারে বেতাল ক'রে দেয়। নয় ত আমার পয়সা খায় কে?—দফাদারী করে, জন' খেটে যা পাই তাতে ত দুখখু থাকবার কথা নয়—

ছিরে। যাক্‌গে সেসব; এখন একটা কথা শোন্,—আমার টাকা নিয়ে তোর জমিটা আপাততঃ খালাস ক'রে নে,—যদি বেহাত হয়ে যায়, তোর যদি বন্ধুর দান বলে নিতে ইচ্ছে না হয়, যখন পারিস ফিরিয়ে দিবি। অমত করিস্ নে, আয়—আমার সঙ্গে আয়—

তৃতীয় দৃশ্য

ছিরে ডোম

ছিরে। (মত্ত অবস্থায়) শালারা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে,—হাতে টাকা নেই, তাই ত? শালাদের একবার জব্দ করতে পারতাম! ঐ মণি গয়লানীকে আট গণ্ডা পয়সা দিলেই, শালি ওদের লাথি মেরে আমার সঙ্গে চলে আসবে। শালারা তা'লে বেশ জব্দ হয়! তাই ত, আট গণ্ডা পয়সাই বা পাই কোথা?—মিতের কাছে যাব? না—না, এই সে দিন জমি খালাস করবার জন্য টাকা দিয়েছিল—আমি তাড়ি খেয়ে সে সব উড়িয়ে দিয়েছি। যাক্‌গে চুলয়;—এখন আট গণ্ডা পয়সা পাই কোথায়। উঃ—শালারা করবে ফূর্ত্তি, আর আমি এই বাঁশতলায় বসে থাকব?—কি করব? না—না, চাইই আমার আট গণ্ডা পয়সা। বউএর ফাঁদি নথটা ত বিক্রি করে কাল পেট চালিয়েছি, আজ কি করব? হাঁ হয়েছে,—মিতের পোতা টাকা গুলো চুরি করব। না—না। তা'লে কি করব? শালার ফূর্ত্তি! না তাই করব—মিতের টাকাই চুরি করব।

(হিরের কুটীরের দ্বারে ছিরের আগমন, দ্বারের ছিদ্রে চক্ষু স্থাপন করিয়া)

ছিরে। মালুম হচ্ছে—ঘুমিয়েছে। খেটে খুটে এসে ঘুমিয়েছে। বড় অন্ধকার! বেশ হয়েছে, সেই ত ভাল।

(কাঠীর সাহায্যে গৃহের অর্গল খুলিয়া প্রবেশ, নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁড়িয়া টাকাপূর্ণ ঘটি উত্তোলন)

হিরে। (ঘুমের ঘোরে) কে—কে?

ছিরে। তাইত! না—না, তা হবে না! চাইই আমার আট গণ্ডা পয়সা। শালার—।

(হিরে জাগ্রত হইয়া উঠিল। অন্ধকারেই ছিরের ঘটি সমেত হাত চাপিয়া ধরিল। ছিরে সজোরে ধাক্কা মারিয়া হিরের হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিল। হিরে চৌকাটের উপর পড়িয়া মাথায় বড় আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল)

চতুর্থ দৃশ্য

হিরের মৃতদেহ। আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবাসী সমবেত। ইন্‌স্পেক্টার ও জমাদার

(ছিরের দ্রুত প্রবেশ)

"জানতে চাও কে চুরি করেছে? কে খুন করেছে? আমি—আমি,—ওগো আমি। প্রমাণ চাও? একটু দাঁড়াও।"

দ্রুত প্রস্থান।

(হস্তে মুদ্রাপূর্ণ ঘটি লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

"এই নাও, এই মাল নাও—এই আসামী নাও। সব টাকাই ঠিক আছে—কেবল আট গণ্ডা পয়সা কমে গেছে। হাঁ, শোন—শোন—এই মাত্র আর একটা খুন করে আসছি,—ওই মণি গয়লানীকে! শালির কাছে মিতের টাকাগুলি জিম্মে রেখেছিলাম, শালি টাকাশুদ্ধ ঘটিটা লুকিয়ে রেখেছিল, আমি গলাটিপে মেরে—সব কেড়ে নিয়ে এসেছি।"

(মৃতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)

"মিতে! একবার কথা ক'। বল—বল—এ পাপের প্রাচিত্তিটা কি?"

শ্রীনরেন গাঙ্গুলী

চাটনী

বনের ফড়িং ধ'রে খা

এক দরিদ্র একমাত্র পুত্রের কঠিন পীড়ায় ভীত হইয়া ইষ্টদেবীকে এক জোড়া মহিষ মানত করিয়াছিল। পুত্র আরোগ্য লাভ করিল,—কিন্তু দেবীকে মহিষ দিবার সামর্থ্য তার ছিল না। দেবী একদিন দেখা দিয়া কহিলেন, "ওরে, তোর ছেলের ব্যামো সারিয়ে দিলাম, একটা মোষ দিবি ব'লেছিলি, তা কই ?"

ভক্ত গলবস্ত্রে দেবীকে প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া "মা, প্রাণের দায়ে মানত ক'রেছিলাম, কিন্তু পয়সা ত নেই। তুমি দেওনি কোথায় পাব ? তা যদি দয়া কর, মোষ পারব না জোড়া পাঠা তোমায় দেব। কি বল মা ?"

দেবী হাসিয়া কহিলেন. "আচ্ছা তাই দিস্।"

কিন্তু পাঠার দাম কম নয়, সে তাও পারিল না। দেবীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন,—তিনি আবার আসিয়া কহিলেন, "কইরে পাঠা ত দিলিনে ?"

ভক্ত দেবীর পায়ে লুটাইয়া প্রণাম করিল ; কহিল, "মা, পাঠা কিন্‌বার কড়িও যে জোটাতে পারিনে। এক জোড়া হাঁস দিলে কি হয় না মা ?"

"আচ্ছা, তাই দিস্।"

হাঁসও সে দিল না,—দেবী তাড়া দিলেন,—তখন সে পায়রা দিতে চাহিল দেবী তাতেই রাজি ; সে পায়রাও না পাইয়া দেবী উপস্থিত হইলেন। ভক্ত গদগদ স্বরে কহিল, "মাগো, তোমার দয়ার পার নেই। পায়রাও ত পেরে উঠ্‌ছিনে। মা, সকল জীবই তোমার কাছে সমান.—দুটো ফড়িং দিলে হয় না ?"

দেবী হাসিয়া কহিলেন "দিস্ তবে ফড়িংই দিস্।"

তাও করিয়া সে ফড়িংও দিল না। দেবী আবার আসিলেন,—কহিলেন—"দুটো ফড়িং, তাও দিলিনেরে ?"

ভক্ত তখন নিবেদন করিল—

"আহা, এতই যদি ক'র্‌লি মা,
বনের ফড়িং, ধ'রেই খা না।"

"এই যে ভটচাজ "মশাই"—তা আমার দাদা কেমন আছেন ?"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা অগ্রজমহাশয়ের পীড়া অতীব কঠিনই হইয়াছিল—কিন্তু বৈদ্যের সুন্দরী চিকিৎসায় তাঁহার মুক্তি অধুনা আসন্ন দৃষ্ট হইতেছে।"

শিক্ষক।—দুর্গ কাকে বলে ?

ছাত্র।—আজ্ঞে শিবকে স্ত্রীলিঙ্গে 'দুর্গা'—পুংলিঙ্গে 'দুর্গ'—কি না শিব।

"চারটে এম এ পাশ ক'রে পাচু এবার আবার একটা এম এ দিচ্ছে।"

"বটে পাঁচুর তাহ'লে এবার ঠিক 'পঞ্চত্ব' প্রাপ্তই হবে দেখ্‌ছি।"

গান

আর কি এমন করে, থাকা যায়
উড়েছে চকোর মন আকাশেরি নীলিমায় ;
কোথা সে পেয়েছে কারে জ্যোছনা আভাসখানি,
পেয়েছে দখিন হাওয়া, শুনেছে আশার বাণী;
কি দেখেছে মেঘে মেঘে,
ছুটেছে বিজলী বেগে,
জীবন উঠেছে জেগে,
মরণ খেলায়।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন

গীতা কি ?

(জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট প্রাপ্ত) *

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

পূর্ব্বে যে দুই প্রকার অবতারবাদ উক্ত হইয়াছে তাহা সমন্বিত হইতে পারে। বুদ্ধির সাত্ত্বিক গুণ চারিটি—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরে ঐ সমস্ত পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ প্রাণিদের মধ্যে কাহারও ভিতর ঐ সকল গুণের অসাধারণ বিকাশ থাকিলে, তাহাকে ঈশ্বর অংশ বলিয়া মনে করাই গীতোক্ত প্রথম প্রকারের অবতারবাদ। উহা "বিভূতি যোগে" বা ১০ম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—বৃষ্ণিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বাসুদেব, সিদ্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপিল, মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা, ইত্যাদি সমস্তই "আমি" বলিয়া জানিবে। ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে শত শত রাজা, যাহারা পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে তাহারা সকলেই পরমেশ্বর-স্বরূপ। এই সকলে ঈশ্বরের কিঞ্চিৎ বিকাশ আছে," এইমাত্র বুঝায়। আর সেই বিকাশ দেখিয়া পূর্ণ ঈশ্বরত্ব বোঝায় না। সুতরাং "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি" "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ," "নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ" ইত্যাদি বাক্যসমূহের মধ্যস্থ "অহং" পদের বাচ্য, এবং বাসুদেব, কপিল, নরাধিপ আদি পদসমূহ দ্বারা লক্ষিত ব্যক্তিদের "অহং" পদবাচ্য "অহংভাব" কখনও এক হইতে পারে না। একটী পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত, অন্যগুলির অপূর্ণ ঐশ্বর্য্য-যুক্ত। সুতরাং বক্তার এই "অহং" এবং "অহং"এর কার্য্য সমস্তই মুখ্য নহে, পরন্তু গৌণ। গীতা-বক্তার "আমিত্ব" যেরূপ রূপক, সেই আমিত্বের কার্য্যও সেইরূপ রূপক। বক্তার আমিত্ব যেরূপ যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ আছে তাহাতে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কার্য্যও ঐ আমিত্বের কার্য্য বলিয়া মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেরূপ প্রত্যেক "নরাধিপ," "অশ্বত্থ," প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ জীব, সেইরূপ তাহাদের কার্য্য আপনার আপনার—ঈশ্বরের নহে।

আরও দ্রষ্টব্য এই যে কর্ম্মবাদে প্রত্যেক জীব কর্ম্ম করিয়া স্বাভাবিক নিয়মে ফলভোগ করে। কিন্তু ঈশ্বর জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জ, যোগস্থ মহাপুরুষ। সুতরাং গীতোক্ত ঐ সকল ঐশ কার্য্য গৌণ, মুখ্য নহে। সর্ব্বভাবে ঐশীসত্তার অনুধ্যান করার জন্যই উহার উপদেশ। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অভিব্যক্ত এই জগতে আমরা কর্ম্ম করিয়া ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ করিতেছি। সুতরাং আমাদের ভিতরে ও বাহিরে ঐশী সত্তার অনুভব করা সমীচীন মত এবং ঐরূপ অনুভবপূর্ব্বক ঈশ্বরপ্রণিধান করাও সমীচীন প্রথা। অতএব গৌণ হইলেও, তাত্ত্বিক না হইলেও, গীতার ঐ উপদেশ (ঈশ্বরের কার্য্যের সহিত মিলিত হওয়া ভাব) ব্যর্থ নহে।

এইরূপভাবে বুঝিলে "সম্ভবামি যুগে যুগে" বাক্যোল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের অবতারবাদ প্রথম প্রকারের বাদের অনুগত হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে প্রভূত বাহ্য-শক্তিশালী ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। সেইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিশালী মহাপুরুষগণ সময়ে সময়ে ধর্ম্মস্থাপন করিয়া থাকেন। উঁহারা সকলেই শ্রীমান্, বিভূতিমান্ ও ঊর্জ্জিত-মহাপুরুষ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত হেতুবশতঃ গীতার "অহং" পদের লক্ষ্য পরমেশ্বরের যে কথঞ্চিৎ সদৃশ এইরূপ ব্যাখ্যাই সম্যক্ ন্যায্য। নচেৎ পূর্ণ ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র ২১০টী বা ২ কোটী ১০ কোটী দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য এবং মানব-সমাজে প্রচলিত নানা অপূর্ণতা-যুক্ত লৌকিক-ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, পুনঃ পুনঃ জীবরূপে অবতীর্ণ হইতে হয় না। এইরূপ কল্পনা করা ঈশ্বরের নিন্দা করা মাত্র। এইরূপ দৃষ্টিতে "খৃষ্টানানামহং খৃষ্টঃ, মুসলমানানাং মোহম্মদঃ, শীখানাং নানকগুরুঃ" ইত্যাদি প্রকারেও চিন্তা করা যাইতে পারে।

গীতার মত সম্বন্ধে আরও বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গীতায় দুই প্রকার মাত্র যোগের কথাই উক্ত হইয়াছে। "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা-

* এই প্রবন্ধগুলি কোন পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য স্বামীজির দ্বারা লিখিত হয় নাই। উঁহার অনুগত কয়েকটি শিক্ষার্থীর জন্য সহজ ভাষায় পত্রভাবে লেখা হইয়াছে। সুতরাং লিপি কারুকার্য্যের কোন চেষ্টাই হয় নাই (ছাপাইবার পূর্ব্বে লেখক দ্বারা সংশোধন (revise) করাইবারও সুযোগ নাই। পাঠক যেন এই কথাগুলি মনে রাখেন।—পত্রবাহক, শ্রীঅমৃতলাল রায় সাহেব।

প্রোক্তা ময়ানঘ। জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগীনাং॥" (৩য়—৩) এতদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত যোগই এই দুই প্রকার যোগের অন্তর্গত, যথা বিভূতিযোগ, সন্ন্যাস-যোগাদি। বিভূতিযোগ এক প্রকার ভক্তিযোগ বা কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরের বিভূতি স্মরণ করিয়া ভক্তি করাই বিভূতিযোগ। সন্ন্যাসযোগ ও (১৮ অঃ) সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান বা জ্ঞানযোগ। গুণত্রয়ের দ্বারাই সমস্ত জগৎ নির্ম্মিত, এই মহাসত্যের উপলব্ধি করিয়া চিত্ত নিবৃত্তি করাই সন্ন্যাসযোগ। এইরূপ সমস্ত প্রকার যোগই জ্ঞানযোগ বা ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত দেখান যাইতে পারে।

গীতার আখ্যায়িকার উপনায়ক অর্জ্জুন একজন ক্ষত্রিয় এবং নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের সহিত "সোঽহং" ভাবে ভাবিত একজন বিভূতিমান্ মহাপুরুষ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির প্রকৃতি যেরূপ, সে সেইরূপ মানসিক অবস্থায় আছে, সে তদবস্থা হইতে স্বপ্রকৃতির অনুকূলভাবে যথাযোগ্য কর্ত্তব্যপালন করিলে, ক্রমশঃ পরমপদ যে "শাশ্বতী শান্তি" বা ব্রাহ্মীস্থিতি" তাহা লাভ করিতে পারে; কিন্তু উপদেশ্য ব্যক্তি এস্থলে ক্ষত্রিয় হওয়াতে, ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অধিক কথাই বলা হইয়াছে। তাহাতে কেহ কেহ বলেন 'গীতাতে আছে—যত খুসি মানুষ মার, কিছু পাপ হইবে না। * বলাবাহুল্য গীতাকার এরূপ কোনো লেখক ছিলেন না যে ওরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ বা প্রচার করিবেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাজের সনাতন ও অপরিহার্য্য ব্যবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকেরা অবশ্য বিশুদ্ধ ধর্ম্মাচরণ করাই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানব-সমাজে চিরকালই এরূপ দুষ্ট প্রকৃতির লোকের বাহুল্য যে সকল সমাজেই অহিংসা সত্যাদি বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আচরণ-কারী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। অধিকাংশ মনুষ্যই মিশ্র (পুণ্য ও পাপ) ধর্ম্মের সেবী। পরন্তু যদি কোনও জাতি কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আচরণ করিতে যায়, তাহারা অবশ্যই দুষ্ট জাতির দ্বারা শীঘ্রই লুপ্ত হইবে। অপকারীর প্রতি মৈত্রী বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু আততায়ীর প্রতি যদি এরূপ আচরণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে সন্ন্যাসী হইতে হইবে, সামাজিক হওয়া চলিবে না। এজন্য বুদ্ধ খৃষ্টাদির অনুবর্ত্তিগণ ঐরূপ ধর্ম্মের বিধি নিষেধ উল্টাইয়া তবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন।

গীতাকার এই সনাতন নিয়ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া কর্ত্তব্যস্থির করিয়া দিয়াছেন। ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। অর্জ্জুন বা ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি কিরূপ? ১৮ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে উহা উক্ত হইয়াছে। যথা—শৌর্য্য, সহিষ্ণুতা, দক্ষতা, তেজ, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, ঈশ্বরভাব (বল ও ধনাদির দ্বারা প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা), স্বাভাবিক অদমনীয় প্রবৃত্তি। এইরূপ প্রকৃতির লোক শোক মোহে বৈরাগ্য লইয়া হঠাৎ নিবৃত্তিমার্গী হইতে গেলে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পরন্তু নানা প্রকারে আশ্রমসঙ্কর করে। ঐ ব্যক্তির শোকমোহ কিছুকাল পরে কমিয়া গেলে, তখন সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রকৃতি আচরণ যে নিস্পৃহতা, ত্যাগ, সদা ধ্যানাদি সাধন প্রভৃতি নিবৃত্তিকর ধর্ম্ম তাহাতে তাহার রতি থাকে না। পরন্তু হয়ত মঠনির্ম্মাণ, মঠ লইয়া মোকদ্দমা করা, চাঁদা তুলিয়া সদাব্রত স্থাপন ইত্যাদি রাজস কর্ম্মেই জীবনযাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়। ঐ সকল কার্য্য করার জন্য সন্ন্যাস-ধারণের আবশ্যকতা নাই। উহা গৃহীদেরই কার্য্য। ঈদৃশ ধর্ম্মসাঙ্কর্য্যের নিমিত্ত তাই গীতা-কার পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন। তাঁহার আখ্যায়িকার উপদেশ্য ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হওয়াতে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। তাহা করা অর্জ্জুনের পক্ষে অপরিহার্য্য। শোক মোহ অপগত হইলে অর্জ্জুন পুনশ্চ তাহাই করিতেন। কিন্তু তখন হয়ত ধর্ম্মযুদ্ধের সুযোগ অপগত হইত এবং তিনি আজীবন অনীশ্বরতা, অযশ, অকীর্ত্তি আদির শোকে ম্রিয়মান হইয়া থাকিতেন; এবং ঐ সমস্তের প্রতিকারের ব্যর্থ সঙ্কল্পে তন্ময় হইয়া অহিংসাদি ধর্ম্মের কথা যাহা বলিয়া-ছেন ("প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে") তাহা ভুলিয়া যাইতেন। ঐরূপ প্রকৃতির লোককে রাজ্যলোভ, স্বর্গলোভ, অকীর্ত্তি ও নিন্দার ভয় (২য় অঃ) দেখাইলেই তাহাদের কর্ত্তব্য মোহ কাটিয়া যায়।

কিন্তু ব্রহ্মপ্রকৃতির লোককে ঐ সব লোভ ও ভয় দেখান বৃথা। তাঁহাদিগকে রাজ্যলোভ, এমন কি স্বর্গলোভও দেখা-ইয়া তাঁহারা বলিলেন—"ব্রহ্মাণ্ডং মণ্ডলীমাত্রং কো লোভোহত্র মনস্বীনাং।" তাঁহাদিগকে নিন্দা অপবাদাদির ভয় দেখাইলে তাঁহারা বলিবেন—"মানাবমানৌ যাবতৌ প্রীত্যুদ্বেগকরৌ

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে ৺অক্ষয় কুমার দত্ত

নুণাং। তাবের বীপরীতার্থে যোগিনাং” ইত্যাদি। তাঁহা-দিগকে “উৎসীদেয়ুরিমা লোকাঃ” বলিলে তাঁহারা বলিবেন—“যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী” ইত্যাদি। ফলে ব্রহ্ম প্রকৃতির লোককে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে শান্তির লোভ দেখাইতে হইবে, সংসারের (অর্থাৎ জন্মপরম্পরার) বিরসতার ভয় দেখাইতে হইবে। সেইরূপ বৈশ্যপ্রকৃতিকে ধনধান্য ও ব্যবসাবাণিজ্যের লোভ ও ক্ষতি, দারিদ্র্যের ভয় দেখাইতে হইবে এবং শূদ্রপ্রকৃতিকে বড় চাকুরির লোভ ও ডিসমিসের ভয় দেখাইতে হইবে। এই সমস্তই গীতার যুক্তি-প্রণালীতে উহ্য আছে। আখ্যায়িকার উপনায়ক অর্জ্জুনকে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে বলিয়া যে গীতার মত “যত খুসি মার কাট, তাহাতে পাপ নাই” এরূপ নহে।

আরও দেখা যায় যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করাইবার জন্য আত্মার অবিনশ্বরত্ব, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ইত্যাদি তত্ত্বকথারও অবতারণা করা হইয়াছে। উহাও প্রকৃতি অনুসারে লোককে স্বকর্ত্তব্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অনুকূল। “অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ, নহন্যতে হন্যমানে শরীরে” ইত্যাদি কথায় ব্রহ্মপ্রকৃতির লোক অভি-নিবেশ, ক্লেশ বা মরণভয় ত্যাগের জন্য ধ্যান করিবেন। ক্ষত্র-প্রকৃতিক যুদ্ধে উৎসাহিত হইবেন। বৈশ্য শূদ্র প্রকৃতিকও যথাযোগ্য দানপুণ্যাদি কার্য্যে প্ররোচিত হইবেন। ফলে উহাও মানুষমারার তাত্ত্বিক যুক্তি নহে। সূর্য্যের রশ্মি যেমন নানা দ্রব্যে পড়িয়া নানা বর্ণও প্রাপ্ত হইয়া সকলকে প্রভাসিত করে, উহাও সেইরূপ নানা প্রকৃতির লোককে স্ব স্ব কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে। *

এই উপদেশই গীতার সার। উহা ব্যতীত দার্শনিক ও ও পরমার্থ সাধন (নির্ব্বাণ মোক্ষ) সম্বন্ধীয় যে উপদেশ আছে তাহা সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থে ঐ সকল দুরূহ বিষয় বিশেষভাবে থাকার কথাও নহে। উহা সাংখ্য, যোগ, বেদান্তাদি দার্শনিক গ্রন্থ হইতে শিক্ষণীয়। গীতা সেই সেই গ্রন্থের মর্ম্ম কতক প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। কতকগুলি লোক মনে করেন যে, গীতার মধ্যে সমগ্র সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত আছে, এবং তাহা মনে করিয়া তাঁহারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধি দৈবিক, যৌগিক, ভৌগিক প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিতে যান ও লোকের বুদ্ধি বিপর্য্যয় করেন। এক “রাম” শব্দ ব্যাখ্যা করিতে সমস্ত পাণিনি ব্যাকরণ উদ্ধৃত করা যায়। “রম” ধাতুতে ঘঞ প্রত্যয় হইয়া রাম শব্দ হয়। রম ধাতুর ব্যাখ্যায় সমস্ত আখ্যাত প্রকরণ ও “ঘঞের” ব্যাখ্যায় সমস্ত কৃৎ প্রকরণ লিখিয়া বিশাল ব্যাখ্যা করা যেরূপ অর্ব্বা-চীনতা, গীতার বড় বড় ব্যাখ্যা করিয়া তাহার মাহাত্ম্য দেখা-ইতে যাওয়াও তদ্রূপ বৃথা চেষ্টা। গীতাতে সাংখ্য যোগ বেদা-ন্তাদি মূলশাস্ত্রের ছায়া অবলম্বন করিয়া মানুষের কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝান হইয়াছে।

বিশেষ রূপে জানিতে হইলে সাংখ্য, যোগ, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদাদি অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে, গীতাতে ঐ সব শাস্ত্রের কথা অতি সাধারণভাবেই উল্লিখিত আছে। সুতরাং অর্ব্বাচীন ব্যখ্যাকারদের কথায় উহা শিখিতে না প্রয়াস পাইয়া মূলশাস্ত্র হইতেই শিক্ষা করা সুবুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু যোগাদি সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের উপদেশও গীতাতে অতি সামান্য ভাবে দেওয়া আছে, উহা সাধনের শিক্ষা করিতে হইলে অবশ্য যোগাদি শাস্ত্র সম্যক্ অধ্যয়ন করিতে হয়, গীতার ব্যাখ্যা পড়িয়া তাহা শিক্ষণীয় নহে। ফলতঃ গীতার ন্যায় শাস্ত্র সকল রণভেরীর ন্যায় যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত

* গীতার এই উপদেশের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া অনেকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়। কেহ পরমর্ষি কপিল, কেহ রাজর্ষি জনক, কেহ বা শঠ, লম্পট, চোর, ডাকাত হইতে যায়। এ বিষয়ে সাধুদিগের মধ্যে প্রচলিত একটি গল্প আছে। পঞ্জাবপ্রদেশে কোন এক দম্পতি গুরুর নিকট গীতা অধ্যয়ন করিত। ক্রমে স্ত্রীর কাহারও সহিত চরিত্রদোষ ঘটিল। স্বামী প্রতিবাদ করাতে স্ত্রী বলিল, ‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।’ অতএব ইহাতে আমার কোন দোষ নাই। স্বামী ইহাতে দুঃখিত হইয়া গুরুর নিকট যাইয়া বলিল যে, গীতা পড়িয়া আমার এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, অতএব আর গীতা পড়িতে চাই না। গুরু তাহাকে উহার ঔষধ শিখা-ইয়া দিলেন। স্বামী ঘরে আসিয়া স্ত্রীকে পুনঃ প্রবোধ দিতে গেলে, স্ত্রী পুনশ্চ উক্ত শ্লোক আওরাইয়া স্বকর্ম্মের সমর্থন করিতে লাগিল। তখন স্বামী তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া তরবারি লইয়া কাটিতে উদ্যত হইল। স্ত্রী ভয়ে প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিল। স্বামী তখন গম্ভীর স্বরে বলিল—“অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।” স্ত্রী তখন ঘাট মানিয়া দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরতির প্রতিজ্ঞা করিল।

গীতাতে জ্ঞান-কর্ম্মের সামঞ্জস্য করা আছে। নৈষ্কর্ম্ম্য ও জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনেকেরই পক্ষে তাহা আপাততঃ শ্রেয়স্কর নহে, কাহারও কাহারও পক্ষে হইতে পারে। সন্ন্যাস চরম ধর্ম্ম হইলেও অধিকাংশ লোকের পক্ষে তাহা অধর্ম্ম, ও গার্হস্থ্য আশ্রমই স্বধর্ম্ম।

করে মাত্র। সবিশেষ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার প্রণালী অন্যরূপ। তাহা বন্দুকাদি লইয়া বিশেষজ্ঞদিগের নিকট শিখিতে হয়।

গীতার আর এক বিশেষত্ব (যাহা হইতে উহার সর্ব্ব-সম্প্রদায় মধ্যে সমাদর) ইহার মতের (বিশেষতঃ দার্শনিক মতের) অবিশদতা।* দার্শনিক মত যত উন্নত হয়, ততই অন্যান্য মত হইতে বিলক্ষণ, বিবিক্ত, বা বিশদ (differentiated) হয়। দর্শনিক উৎকর্ষের উহাই লক্ষণ, কিন্তু তাহা দ্বারা অতি অল্প লোকেরই ঐ মত সকল গ্রাহ্য হয়, সুতরাং উহার বিরুদ্ধবাদী অনেক হয়। কিন্তু দার্শনিক মত যদি (শ্লথ) ভাবে বিবৃত হয়, যাহাতে সকলেই নিজের নিজের মতানুসারে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বজনের বা সর্ব্বসম্প্রদায়ের গ্রাহ্য হইতে পারে। গীতার সার্ব্বজনীনত্বের কারণ ইহাই। এ বিষয়ের উদাহরণ দেখান যাইতেছে। "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য-মামেকং শরণং ব্রজ" এই বাক্যের "মাম্" শব্দের অর্থ বৃন্দাবন-বিহারী কৃষ্ণ ধরিয়া বৈষ্ণবেরা উহার সমাদর করেন, আর দার্শনিকেরা উহার অর্থ আত্মা অথবা ঈশ্বর ধরিয়া সমাদর করেন। সেইরূপ সাংখ্যের কিছু তত্ত্ব থাকাতে গীতা সাংখ্যবাদীদেরও প্রিয় হইয়াছে। বেদান্ত প্রভৃতিরও কথা কিছু কিছু থাকাতে উহা সেই সেই সম্প্রদায়ের প্রিয় হইয়াছে। এই সকল মত এরূপ অবিশদ ভাবে নিবদ্ধ আছে যে কোন সম্প্রদায়েরই তাহা তত বাধে না। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী আদি সকলেই উহা স্বপক্ষে টানিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই গীতার স্বপক্ষ সমর্থন-কারী ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। গীতাতে সাংখ্যমত আছে, কিন্তু ঐ মত এরূপ অবিশদ (rounded) ভাবে দেওয়া যে উহা প্রকৃত কপিল মতকে লক্ষ্য করিলেও, বৈদান্তিকেরা ঐ সাংখ্যশব্দের অর্থ বেদান্ত ধরিয়া নিজেদের মতে ব্যাখ্যা করেন।

জাতিভেদ সম্বন্ধেও গীতার উক্তি এইরূপ। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" ঐ কথা লইয়া বহুকাল বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। একদল বলেন যে, ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তিরূপ মিথ্যা গল্প ইহার দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। উল্টাদল তাহা স্বীকার না করিয়া ঐ উক্তিকে স্বপক্ষে ব্যাখ্যা করেন ও ভগবান্ হইতে সাক্ষাৎ জাতির উৎপত্তি প্রমাণ করেন। সেইরূপ "সমোদমস্তপ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেচ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্মস্বভাবজম্।" এই বাক্য দেখিয়া একদল বলেন যে বিদ্যাদিগ্‌গজ দেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রের স্বভাবে শমদমাদির বিপরীত গুণ সকল অতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইয়াছে। অতএব নীচজাতীয় গুণ্ডার সহিত অভিন্নহৃদয়, সর্ব্ব-প্রকার দুষ্ক্রিয়াকারী ঐ দেবশর্ম্মার পুত্র "ইয়ার শর্ম্মা" কখনই ব্রহ্মজাতীয় নহে। আর এই হরিধোবা যে এখন হরিদাস বাবাজী হইয়াছে, সর্ব্বদা হরিনাম করে ও প্রাণি-হিংসা করে না, সত্য বলে, ব্রহ্মচর্য্য তপস্যাদি করে, বালককাল হইতেই তাহার স্বভাব এইরূপ, সে নিশ্চয় ব্রহ্ম-প্রকৃতির লোক। পুনশ্চ, "শৌর্য্যং তেজো ধৃতি দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্য পলায়নম্। দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্।" ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন; যে ঐ বলবন্ত সিংহের পুত্র দুর্ব্বল-সিংহ যাহার স্বভাব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চোঁচা দৌড় দিয়া পলায়ন করা, সে কখন ক্ষত্রজাতীয় নহে, আর ঐ বীর চণ্ডাল যে একাকী সশস্ত্র করিয়া দশজন ডাকাতকে তাড়ায়, কদাপি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না, যে শৌর্য্য তেজাদি ধর্ম্মসম্পন্ন সে ক্ষত্র-প্রকৃতিক ব্যতীত আর কিছু নহে। কিন্তু গোঁড়ার দল বলিলেন যে "ঐ ইয়ার শর্ম্মা" ও দুর্ব্বলসিংহের ভিতর ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষত্রিয়ত্ব ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় নিশ্চয়ই আছে, আর ঐ হরেধোবা যতই ধার্ম্মিক হউক না কেন, সে ধোবা বই আর কিছুই নয়।

এইরূপ গুণানুসারে জাতি (যাহা সমগ্র মানব-সমাজে পরিদৃষ্ট হয়) কি কুলানুসারে জাতি (যাহা আধুনিক হিন্দু-সমাজে প্রায় একমাত্র জাতির চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে), গীতার কথায় তাহা স্পষ্ট না থাকায়, উভয়দলই স্বপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভস্মাচ্ছাদিত অনুমেয় বহ্নিকে বহ্নি বলা বিধেয়, কি বহ্নি আচ্ছাদিত অনুমেয় ভস্মকে বহ্নি বলা বিধেয়, তাহা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকাতে যুক্তিবাদী ও অযুক্তিবাদীর মধ্যে মহা বিতণ্ডা চলিতেছে ও উভয়পক্ষই গীতার দোহাই দিয়া স্ব স্ব মতের সমর্থন করেন। অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ,—

* অবিশদতা অর্থে অপরিস্ফুটতা—"ঝাপসাভাব" নহে। "বিশদ" শব্দের প্রকৃত অর্থ যাহার সুতীক্ষ্ণ প্রকটিত ভাব (sharp outline) আছে। "অবিশদ" যাহার তাহা নাই, অর্থাৎ যাহা "চাঁচা ছোলা" নয়। কাব্যের ভাষায় "চাঁচা ছোলা" দার্শনিক তত্ত্ব দেওয়া অসম্ভব।

জাতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান আন্দোলন দেখিয়া এ বিষয়ে আর দু'একটী কথা বলা আবশ্যক। অধুনাতন হিন্দু-সমাজে যে সব বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, যাহার দ্বারা সমাজ জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহার সুচিকিৎসা করাই সুবুদ্ধির কার্য্য। হাতে ঘা হইয়াছে বলিয়া হাতটা কাটিয়া ফেলা যেমন দুষ্য, ঘাটা পুষিয়া রাখাও সেইরূপ দুষ্য। মধ্যপথ শ্রেয়। জাতির বিষয়ে কুল অপেক্ষা গুণের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিন্তু কুল একেবারে ত্যজ্য নহে। কুলের উপরই গুণের সম্যক্ বিকাশের চেষ্টা করা আবশ্যক। কুল ও গুণের সামঞ্জস্য করাই সুচিকিৎসা। অধুনা হিন্দু-সমাজে মহাবিপ্লব উপস্থিত। তাহাতে শত সহস্র লোক চিরন্তনপ্রথা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। গোঁড়া বা সংস্কারক উভয় দলের এক পক্ষের নীতি ধরিয়া চলিলে সর্ব্বনাশ হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে—"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অৰ্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" এই নীতি অনুসারে কার্য্য করা উভয়পক্ষেরই সুবুদ্ধি পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য। একদিকে কুলের অভিমান খর্ব্ব করিয়া গুণের দিকে অধিকতর লক্ষ্য করা যেমন কর্ত্তব্য, সেইরূপ অন্য পক্ষে গুণ যত হউক্ না হউক্ কুলটা নাশ করাই প্রধান উপায় বিবেচনা করা অকর্ত্তব্য। কুলাভিমানিরা যেরূপ গুণের দিকে দৃষ্টি রাখেন না, গুণাভিমানী সংস্কারকেরা গুণের পরাকাষ্ঠাই বা কোথায় দেখাইতেছেন? কুসংস্কারকে গালি দেওয়াই সুসংস্কারের পরিচায়ক নহে। এই জন্য বলিতেছি যে, কুল ও গুণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মধ্যপথ রক্ষা করাই শ্রেয়। ইহার দ্বারা Order ও Progress দুইটিই সাধিত ও রক্ষিত হইবে। কিন্তু গুণকে প্রধান স্থান দিতে হইবে, এজন্য গুণভূষিত নীচ জাতিও সম্পূর্ণরূপে সম্মানার্হ।

পরিশেষে "গীতা মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য। কোন এক চাটুকার রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজকুলের প্রশংসা করিতে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ ভূপতিদের মধ্যে যেরূপ মহাগজেন্দ্র, মহারাণী রমণীকুলের মধ্যে সেইরূপ মহাহস্তিনী।" ইহাতে ঐ ব্যক্তি যে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বিদূরিত হইলেন তাহা বলাই বাহুল্য। গীতার প্রশংসাকারীরাও গীতামাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া ঐরূপ গলদ করিয়াছেন। ফলতঃ অনেক সময় তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা গীতার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন কি কুৎসা করা হইয়াছে তাহা বিবেচ্য। ঐরূপ অসত্য, অলীক প্রশংসা গীতার ন্যায় উচ্চ জিনিশের আবশ্যক নাই। হেয় জিনিশেরই ঐরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের আবশ্যক হয়।

মায়ের কোলে

(.)

ছেলেবেলায় যখন পাড়াগাঁয়ে ছিলাম, দল বাঁধিয়া মাঠে মাঠে দুপুর রোদেও ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতাম,—কেবল পুকুর দীঘিতে নয়, আমাদের গাঁয়ের সম্মুখের নদীটিও সাঁতার দিয়া পার হইতাম, জেলেদের ও অন্যান্য ব্যাপারীদের ডিঙ্গী চাপিয়া নিয়া বাইচ খেলিতাম। বড় বড় গাছের ঘন জঙ্গলের মধ্যে কখনও পাখীর ছানা কখনও বা ডালে ঝোলা বা তলায় পড়া আম, জাম, গাব প্রভৃতি বনের কত ফল খুঁজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম।—বাঁশের লাঠি বা সড়কি লইয়া শিয়াল, খাটাশ, বনবিড়াল প্রভৃতি বনের ছোট ছোট জীবগুলিকে শিকার করিতেও যে মাঝে মাঝে দুঃসাহস করিতে যাই নাই, তা নয়। ১৬।১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই ভাবে পল্লীমায়ের বনের ঘরে, মাঠের উঠানে, নদীর জলে, খোলা প্রাণে খালি পায় খালি গায় সেই পল্লী-মায়ের আপন ছেলেটির মত খেলা করিয়া বেড়াইয়াছি।

নদীর ওপারেই বড় একটি গ্রামে ভাল স্কুলও একটি ছিল। খেয়া পার হইয়া সেখানে পড়িতে যাইতাম,—খেলার অবসরে পড়িতে ফাঁকিফি বড় করিতাম না। বাড়ীতে মা, আর স্কুলে মাষ্টার মহাশয়েরা পড়াটা তৈয়ারী করিয়া দিতে পারিলে, খেলার বাধা দিতেন না। মা বলিতেন, সকালে প'ড়ো, সন্ধ্যার পরেও কিছু প'ড়ো, বৈকালে আর ছুটীর দিনে যত পার খেলা করিও, কিছু বলিব না। মাষ্টার মহাশয়েরাও সেই

রকম বলিতেন। সেবার এতটা খোলা হুকুম পাইয়াছিলাম, স্কুলের দিনে সকালে সন্ধ্যায় কিছুকাল করিয়া পড়িতে আলস্য কখনও করিতাম না। সেবার তাই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাও পাশ হইলাম।

বাবা কলিকাতায় ওকালতি ব্যবসা করিতেন, সেবার ব্যবসায়েও বেশ উন্নতি আরম্ভ হইল। কলিকাতায় বাসা করিয়া তিনি পরিবার সেখানে নিয়া রাখিলেন। সরিকরা বাবার জায়গা-জমি সামান্য যা ছিল, ফাঁকি দিয়া দখল করিল, নানারকম জটিল মোকদ্দমার সৃষ্টি করিল, মিথ্যা দুই একটা অপবাদ তুলিয়া সামাজিক নিগ্রহেরও কিছু ব্যবস্থা করিল। বাবা বড় চটিয়া গেলেন। দেশ গাঁ একেবারে ছাড়িয়া দিলেন,—কলিকাতায় একখানি বাড়ী করিয়া সেইখানেই স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইবার পর গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ একরূপ রহিত হইয়া গেল। কিন্তু আমার ভাল লাগিত না। আমাদের গাঁয়ের সেই রং বেরঙে আলো করা, ফুলের গন্ধে ভরা, ফলের মনলোভা শোভায় পোরা, কত সুরের পাখীর গানে মন মাতোয়ারা, ঘন শ্যামল বন,—শপ্ শপে হাওয়ার ফুর্ত্তিতে মত্ত খোলা মাঠ, ছোট ছোট ঢেউয়ে নাচা তরতরে মুক্ত-স্রোতে বহা নদীর শীতলনির্ম্মল জল, আর খালি গায়ে খালি গায়ে আমাদের সেই খেলা, নদীতে সেই সাঁতারের মেলা, খেয়া পারাপার আর সেই বাইচের বাজি—সব যখন মনে পড়িত, প্রাণমনটা কাঁদিয়া উঠিত। মনে হইত যেন রুদ্ধ বায়ু কোনও বৃহৎ কারাগারে আমাকে কেহ বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বাবা আর গ্রামের নামই শুনিতে পারিতেন না। উপায় ছিল না, নিরবচ্ছিন্নভাবে কলিকাতার এই বিরাট কারাগারেই ৫৬ বৎসর কাটিয়া গেল।

অখিলদের মেসে সর্ব্বদা যাইতাম, সমবয়স্ক সমপাঠী অনেক বন্ধু সেখানে জুটিয়াছিল। গ্রীষ্মের ছুটী নিকটে আসিয়াছে, অখিলরা বাড়ী যাইবে, কতই না আনন্দে সেই সব কথা বলিত। আমি একদিন দুঃখ করিয়া বলিতেছিলাম, আমার ছুটী অছুটী সব সমান, এই কারাগার ছাড়িয়া খোলা হাওয়ায় কোথাও একটু যাইবার স্থান নাই।—বাবা বলেন, পুরী যাও, দার্জ্জিলিঙ্গ যাও, কিন্তু হাওয়া সেখানে যতই থাক্ যতই সাগর পাহাড়ের একটা নূতনতর বৈচিত্র্য থাক্,—আমাদের পাড়াগাঁয়ের মত অমন মিঠা আমার কিছুই লাগে না। ম্যালেরিয়া কলেরা আছে, ঝগড়াঝাটি আছে, দলাদলি আছে, তা থাক্ না। তবু আমাদের গ্রাম—সে যে আমাদের। বড়লোকের বাড়ী যতই জাঁকাল হ'ক্, যতই সেখানে আরাম বিরাম বিলাসের অফুরন্ত আয়োজন থাক্, নিজের বাড়ীর কাছে তা কি? খড়ের চাল, ভাঙ্গা বেড়া, নোংরা মাটীর মেঝেয় ছেঁড়া মাদুর বিছান—সেখানেও যে আরাম,—বড়লোক পরের বাড়ীর খাট পালঙ্কে তুলতুলে নরম গদীতে শুইয়া কি সে আরাম কেহ পায়?—নিজের মা গরম গরম ডাল ভাত মাছের ঝোল রাঁধিয়া দেয়, হেঁসেলের কোণে মাটিতে বসিয়াও তা খাইতে পাইলে যত তৃপ্তি হয়, বড়লোক পরের বাড়ীতে পোলাও কারী, মোণ্ডা মিঠাই, ক্ষীর দই, যত কিছু সুখাদ্য হইতে পারে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা উদরস্থ করিয়াও সেই তৃপ্তি কেহ পায়? পুরী দার্জ্জিলিঙ্গ—তার সাগর পাহাড়ের মনোহর দৃশ্য—হাঁ, মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতে পারি। কিন্তু আমাদের সব গ্রাম মন্দ যতই থাক—কত ভাল, কত সুখ, কত তৃপ্তি, কত আনন্দের কত কি সেখানে রহিয়াছে, তা একেবারে ছাড়িয়া কেবল কি পুরী দার্জ্জিলিঙ্গের বিলাস কারও ভাল লাগে?

অখিল আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কহিল, "তা চল না আমাদের গাঁয়ে একবার। সারাটা ছুটি না থাক,—যত দিন পার থাকবে, খোলা মাঠে বনে বনে বেড়াবে, নদী খালে সাঁতরাবে। কিছুরই অভাব নাই সেখানে। তোমাদের গাঁয়ের উপরে তোমার বাবা যতই চটে থাকুন, আমাদের গাঁ বেচারী ত তাঁর কাছে কোনও অপরাধ করে নি। ব'লে দেখ, বোধ হয় যেতে দেবেন, আপত্তি ক'র্‌বেন না।"

বাড়ীতে গিয়া মাকে বলিলাম,—মা বাবাকে বলিলেন। বাবা একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—'তা বেশ ত! এতই যদি বাতিক হ'য়ে থাকে, যাক্ না,—বেড়িয়ে একবার আসুক্ না! তবে ব্যামো পীড়ে একটা না বাধিয়ে ফেলে।'

মা কহিলেন, "তা এই ব'শেখ মাস, পাড়াগাঁয়ের আব-হাওয়া এখন ত ভালই।"

বাবা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ, জলওয়াটা ভাল বটে, তবে 'আবে'র কথা আর ব'লো না।—ওটা যদ্দুর খারাপ হ'তে পারে তা এই চ'ত ব'শেখেই হ'য়।"

মা প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "তা নদীর মিঠে জল যেখানে আছে, সেখানে আর মন্দ কি ? এই কলের জলের চাইতে বরং তা এখন অনেক বেশী মিঠে।"

"হুঁ—! তা যেতে চায়, যাক্, আসুকগে, বেড়িয়ে। একটু সাবধানে যেন থাকে, আর সকালেই যেন ফিরে আসে।"

বাবার অনুমতিতে আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। এক সপ্তাহ পরেই কলেজ সব ছুটী হইল। মহা আনন্দে অখিলদের সঙ্গে তা'দের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

(২)

বুভুক্ষু খাবার পাইলে—বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত খাবার—একবার পাইয়াছে, আর কতদিনে পাইবে, মোটেই পাইবে কিনা তার স্থির নাই—এমন খাবার বুভুক্ষু পাইলে যেমন আগ্রহে আকণ্ঠ পুরিয়া খায়—পল্লীর সকল সম্পদ সকল সৌন্দর্য্য তেমনই আগ্রহে আমি লুটিয়া ভোগ করিতে লাগিলাম। অখিলদের সর্ব্বদা পাইতাম না। তারা ত আমার মত কাঙ্গাল নয়—বুভুক্ষু নয়,—তাদের ত এমন অবস্থা নয় যে আজ একদিন পাইয়াছে—আর হয়ত পাইবে না। তাই এমন সকল ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া কেবলই কেন এই ক্ষুধার সুস্বাদু অন্ন মুখে তুলিবে। এই ভাণ্ডার শীতল মিষ্ট রস গলায় ঢালিবে ? খাইয়া গিলিবে—আবার খাইবে—আবার গিলিবে,—যেমন নাকি একবার আমার মাতামহের গুরুস্থানীয় কোনও তান্ত্রিক সাধকের মুখে শুনিয়াছিলাম,—

"পীত্বা পীত্বা পুনঃপীত্বা পতিত্বাপি মহীতলে।
উত্থায় চ পুনঃপীত্বা কৈবল্যং লভতে নরঃ॥"

অনেকদিন আগে এই শ্লোকটি ও তার ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। শুনিয়া হাসিয়াছিলাম, ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ এই বৈশাখে বঙ্গপল্লীর হিন্দোল-প্রমত্ত সমীর-সেবিত স্নিগ্ধশ্যামল শোভা, 'ছায়ায় ঢাকা পাখী ডাকা পল্লীবাটে'র অতুল মাধুরী আমি কি ঠিক তেমনই 'পীত্বা' পীত্বা পুনঃপীত্বা 'মহীতলে পতিত্বা'ও 'উত্থায়' আবার 'পুনঃপীত্বা' কৃতার্থ হইতেছি না ?

অখিলরা সর্ব্বদা যাইত না। কিন্তু আমি গ্রাহ্য করিতাম না,—তাদের সঙ্গও সর্ব্বদা চাহিতাম না। সকালে দুপুরে বৈকালে—তাদের সঙ্গ পাই না পাই, যে দিক যে দিন চোকে পড়িত ঢুকিয়া যাইতাম।

গ্রাম হইতে নদীর পার দিয়া মাইল ৩৪ পথ পূবের দিকে ওপারে বড় ঘন একটা আঁধার বন দেখা যাইত। এতখানি যায়গা এমন জঙ্গল—লোকালয়ের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না, দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। অখিলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "ওখানে একটা গাঁ ছিল, তা প্রায় সব এখন সবে ছেড়ে গেছে, জঙ্গল হ'য়ে সব পড়ে আছে।"

"একটি লোকও কি ওখানে নেই ?"

"কই, আছে ব'লে ত শুনি নি। তবে ঠিক ব'লতে পারিনে, এক আধ ঘর লোক হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু কি ক'রে থাকে জানিনে। ও পোড়ো গাঁয়ের দিকে আমরা কখনও যাইনি। লোকে কেমন একটা ভয় পায় ওখানে যেতে।"

"কিসের ভয় ? বাঘ টাঘ আছে নাকি ?"

"না! বাঘ টাঘ—বড় —একটা শেয়ালও ত কেউ কখনও শোনেনি। তবে একটা ভুতুড়ে ভাবের সংবাদ সবার মনে আছে। আমরা তখন সব ছোট—একবার নাকি একটা মহামারী হয়ে অনেক লোক ম'রে যায়। বাকী যারা ছিল, গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেল। সেই অবধি ও গাঁয়ের কথা কেউ তুলেও লোকে ভয় পায়।"

"বটে!—কেউ কখনও ওখানে যায় না।"

"যাবে না কেন, যায়। একটা বট গাছ আছে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে বুড়ীরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে পূজো দিতে যায়। সেই গাছতলায় নাকি 'বন কালী' দেবতা আছেন,—তিনিই নাকি ঐ গ্রামটিকে খেয়ে ওখানে আসন গেড়ে ব'সেছেন।"

"বাবা! এমন দেবতা তিনি ? তবু লোকে পূজো দিতে যায় ?"

"যায়, পাছে তাঁর করাল কাল মুখখানি হাঁ ক'রে এদিক পানেও এগিয়ে দেন। তাই গাঁয়ের বুড়ীরা তাঁকে শান্ত রাখতে বড় ব্যগ্র। ভয় টয় সব চেপেও তাঁকে পূজো দিতে যায়। তাও বেশী নয়, বছরে এক বার দিনেক। কেন, গ্রামটির বা জঙ্গলটির প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রতে যাবে নাকি ?"

"গেলে মন্দ কি ?"

"সাবধান! বনকালীর পূজো নিয়ে যেও কিন্তু ... কি

কে জানে—তোমার বাবার কাছে শেষে একটা জবাব-দিহি ক'র্ত্তে হবে!"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "দাদা মহাশয়ের কাছে শুনেছিলাম,—সব 'কলন' না গ্রাস করেন ব'লেই তিনি 'কালী'। তা লোকে ভরা সহরের মাঝান মন্দিরেই তিনি থাকুন, আর ওই জনশূন্য বনের গাছতলায়ই থাকুন, সময় যখন যার হবে 'কলন' তাকে তিনি ক'রবেনই! দুটো ফুল পাতা, চাল কলা, কি দুটো হাঁস মোষ পাঠা দিলেই তিনি রেহাই দেবেন, এই ভরসা যদি কেউ করে, তবে গেঁয়ে বুড়ারাই ক'রবে, একটু বুদ্ধি যার আছে, সে ক'র্ত্তে পারে না।"

অখিল হাসিয়া কহিল, "এতই যদি তত্ত্ব জান আর মান, তবে পূজো না হয় নিষ্কাম ধর্ম্মেই দিয়ে এসো।"

"দেখা যাক্ ত, পূজো যদি তিনি চান ত নেবেনই। দেব কি দেব না, সে ভাবনা আমাদের মিছে।"

পরদিন খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করিবার অছিলায় বাহিরে গিয়া একটু শুইলাম,—অখিলও একখানা বইএর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন উঠিয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া পড়িলাম। বনকালীর সেই জনশূন্য বনে যাইব। আমার ইচ্ছা ছিল না যে অখিল বা আর কেউ আমার সঙ্গে যায়। বাল্যকাল হইতে অনেক বিভীষিকার কথা শুনিয়া উহাদের মনে বড় একটা ভয়ের সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। বন্ধুত্বের ও আতিথ্যের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া একা আমাকে ছাড়িয়া দিবে না, সঙ্গে যাইবে। তাতে অবশ্য আর কোনও আপত্তি আমার ছিল না। তবে কে জানে, আধা পথ গিয়াই তারা ভয়ে হয়ত আর অগ্রসর হইতে চাহিবে না, আমাকে শুদ্ধ টানিয়া নিয়া ফিরিয়া আসিবে। শুনিয়াছিলাম, বাঘ ভালুক ওখানে নাই। বস্তুতঃ চারিদিকে ঘন লোকালয় যেখানে, সেখানে কোনও বনের মধ্যে বাঙ্গলায় বাঘ ভালুক বড় দেখা যায় না। আর থাকিলে গ্রামের বুড়ীরা ভরসা করিয়া পূজা দিতে যাইত না। বনকালিকা কবে পুত্রপৌত্রদের গ্রাস করিবেন, মাত্র ধর্ম্মবিশ্বাসের এই আশঙ্কায় সত্য কেহ বাঘের গ্রাসে গিয়া আত্মদান করে না। এরূপ সম্ভাবনা দেখিলে, ঘরে বা ঘরের বাহিরে চালা তুলিয়া তাঁরা দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিতেন। বাঘ ভালুক নাই, তবে সাপখোপ থাকিতে পারে। মোটা একটা শক্ত লাঠি লইয়াই আমি বেড়াইতাম। একটু সাহস থাকিলে সাপের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

খেয়া পার হইয়া বরাবর পূবের দিকে নদীর পাড় দিয়া ঘণ্টাখানেক চলিলাম,—বনের প্রান্তে আসিয়া পৌছিলাম! পথের চিহ্ন কিছু পাইলাম না, আর সম্মুখে সেই বনের শ্যামল আঁধার নিবিড়তা! গাটা একটু যেন ছম্ করিয়া উঠিল, মনটাও যেন একটুখানি দমিয়া গেল। কিন্তু আসিয়াছি যাইব বলিয়া, দেখিব বলিয়া, কিন্তু এখন কি কাছে আসিয়াই ভয়ে ফিরিয়া যাইব? শিক্ষিতসম্পন্ন নাগরিক বাঙ্গালীর দলের একজন বটি, কিন্তু পুরুষ ত? ছি! এখন কি ফিরিয়া যাওয়া যায়? গাঁয়ের বুড়ীরা এত ভয় লইয়াও ভরসা করিয়া যায়, আর আমি পারিব না? একটু দাঁড়াইলাম, মনটা দৃঢ় করিয়া নিলাম। তারপর দুই হাতে ঘন গুল্ম ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। উপরে বড় বড় গাছের মাথায় উবা ছড়ান ডালপালা, নীচে অসংখ্য গুল্মের ঝোপ। মাঝে অল্প ফাঁক আছে, সকল গাছের নীচে গুল্ম জন্মায় না। যেখানে উপরে পাতার দুই একটি ফাঁক দিয়া রোদের দুই একটি রেখা আসিয়া পড়িয়া বনের সেই অন্ধকারে বিচিত্র এক বিভীষিকার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে। মনে হইল, সত্যই যেন ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনকালিকা উজ্জ্বল দুই একখানি অলঙ্কার অঙ্গে ধারণে আরও বিভীষণা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন!

আরও কতদূর যাইতে দেখিলাম, দুধারে গুল্মের সারির মধ্য দিয়া সরু একটু ফাঁক যেন বাহিরের দিক্ হইতে আসিয়া বনের কেন্দ্রের দিকে গিয়াছে। এই বোধ হয় পথ—যাহা বাহিয়া পূজারিণীরা বনকালীর গাছতলায় যায়। সমস্ত শরীরটা মনটা কাঁপিয়া উঠিল! ভয় ত একটু করিবেই, আবার আনন্দও একটু হইল,—এই পথ ধরিয়া তবে সেই গাছতলায় পৌছিতে পারিব,—আবার সেখান হইতে বাহিরে যাইতে পারিব। নহিলে কোনও উপায়ই ত আর ছিল না, সারাদিন হয় ত বনের একাংশেই ঘুরিতাম,—না পাইতাম, বনকালীর গাছতলা, না পাইতাম বাহির হইবার পথ।

মনটাকে একবার শক্ত করিয়া নিয়া লাঠি দিয়া দুই ধারের বনে আঘাত করিতে করিতে সেই ফাঁক ধরিয়া চলিলাম।

এই যে! এই বুঝি বনকালীর গাছতলা, চারিদিকে কতদূর পর্য্যন্ত ঘন-পল্লবিত শাখাগুলি বিস্তৃত, মধ্যে মধ্যে মোটামোটা ব নামিয়া স্তম্ভের মত সেই শাখাগুলিকে মাথায় ধরিয়া রাখিয়াছে! বটগাছের নীচে এখানে ওখানে দুই একটি ছোট গাছ মাথা তুলিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে,—তলায় ঘাস ও খড় নাই, এখানে ওখানে শুকনা বটের পাতা ছড়ান রহিয়াছে। গাছের গুঁড়িতে বিবর্ণ সিন্দূরের দাগ, কিন্তু নিম্নভাগটি চারিদিকে কিছুদূর পর্য্যন্ত বেশ পরিচ্ছন্ন, নূতন বহুবিধ বন্য পুষ্প ফল ও বিল্বপত্র গাছের গোড়ায় রহিয়াছে! দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম!—কোনও লোক নাকি এখানে নাই,—কে এই দেবীর গাছতলা এমন পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে, কে দেবীকে এমন সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প, সদ্য-চয়িত বিল্বপত্র ফল উপহার দিয়াছে। স্থানটা আবার কিছু জলে ভিজা,—তা ছাড়া পূজার উপকরণের আর কোনও চিহ্ন নাই। মনটা কেমন একটা কুসংস্কারজনিত ভয়ে যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিল,—শিহরিত দেহ রোমাঞ্চিত হইল! কে এ! বলিতে লজ্জা করে, মনে হইল—দেবীর কোনও ভৈরবী বা ঐরূপ কোনও অপার্থিব জীব নয় ত! চারিদিকে একবার চাহিলাম! অতি বিকট কর্কশ স্বরে কি একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল, আমি একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। আবার ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিলাম। ঠিক গাছের উপরে আবার তখন বড় মধুর শিস্ তুলিয়া আর একটা কি পাখী ডাকিল। যেন আমাকে ভরসা দিয়া কহিল, 'ভয় নাই—ভয় নাই! ভয় কি তোর! আয়—আয়!'—

পাখীটির দিকে চাহিলাম, আমারই মুখ পানে চাহিয়া যেন পাখীটি আবার ডাকিল—"ভয় কি—ভয় কি—আয়—আয়—আয়!"

কি যে এক অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে আমার প্রাণটা ভরিয়া উঠিল—আশা কি হর্ষ কি ভয় কি ভক্তি—ঠিক করিয়া তা আমি এখনও বলিতে পারি না। পাখীটি হঠাৎ উড়িয়া একদিকে চলিয়া গেল,—আমি পাখীর অনুসরণ করিয়া ছুটিলাম, কিন্তু পাখীটি যে ঘন বনের মধ্যে কোথায় গেল, আর দেখিতে পাইলাম না! হঠাৎ দেখি এক গাছ তলায় এক বুড়ী কয়েকখানা শুকনা কাঠ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাঁচা পাকা চুলগুলি মাথার এদিকে ওদিকে এলাইয়া পড়িয়াছে, পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, বুড়ী আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! অতি ভয়ের একটা বিকটধ্বনি উঠিতে উঠিতেই কণ্ঠেই বদ্ধ হইয়া গেল, একেবারে স্তব্ধ আড়ষ্ট হইয়া আমি বুড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম! বুড়ী একটু হাসিয়া কহিল, "ভয় পেয়েছ বাবা? ভয় কি, আমি পেত্নী দানা নই,—এই তোমাদের মত মানুষই বটি, এই বনে থাকি? ঐ যে কাছেই আমার ঘর আছে। এস বাবা, এস! বড্ড হয়রান্ হ'য়েছ, একটু জিরোবে এস!"

আমার গাটা যেন কেমন করিয়া উঠিল,—নড়িতেও পারিলাম না। বুড়ী আবার হাসিয়া কহিল, "ও বাবা, তোমার ভয় নেই, একা এই থাকি বলে, সত্যি আমি পেত্নী দানা নই। ব্যাটাছেলে, ভয় কেন পাচ্ছ? পেত্নীদানা হ'লে ডেকে তোমায় নেব কেন? কেউ ত আর নেই, বালাই! তোমার মন্দ চাইলে কি এখানেই ক'রে পাত্তাম না?"

বুড়ী যা বলিতেছে, তা ঠিক। আমারও একটু হাসি পাইল। কহিলাম, "তুমি কে?"

"আমি কে! আমি আর কে বাবা? অভাগী একটা বুড়ী—কোথাও আর কেউ নেই—একা এই বনে প'ড়ে আছি। নাম পরিচয় আর কি দেব? দিলেই কি চিনবে! এস, বাবা, এস! যদি এসেছ এই বনে, দুঃখীর কুঁড়েয় এসে একটু ব'স, একটু জিরিয়ে আবার যেও এখন? এখানে এসেছিলে কেন? মাকে দেখতে?"

আমি বলিয়া ফেলিলাম 'হঁ'।—আর কোনও উত্তর মুখে যোগাইল না। বুড়ী কহিল, "কেউ আর নেই,—মা আছেন, আর অভাগী মেয়ে আমি তাঁর পায়ের তলে প'ড়ে আছি। কেউ আসেও না বড়। ঐ ওদিকের গাঁ থেকে কালেভদ্রে কেউ কখনও পূজো দিতে আসে।—পুরুত কেউ নেই, মার পূজো হয় না,—কি কর্‌ব বাবা? বনের ফুল পাতা কুড়োই, মার পায়ে দিয়ে আসি,—আর এক ঘটি ক'রে জল ঢেলে দিই।—মন্ত্র পূজো ত জানিনে বাবা, ডেকে বলি, 'মা, সব পেয়েছিস্, একটা অভাগী মেয়েকে এখনও দয়া ক'রে নিস্‌নি'—তা যদি রেখেছিস্, এই ফুল পাতা আর এই ফল-জলটুকু তোর পায়ে ঢেলে দিচ্ছি। যদ্দিন রাখবি, দেব। আর ত কেউ নেই, আমাদের এই

খেলার পূজোই তুই নিস্।—তা এস বাবা, এস! ভয় নেই, এস।"

আপত্তি আর চলে না। কেনই বা আপত্তি করিব? বুড়ীর সঙ্গে তার কুড়ে খানির সম্মুখে আসিয়া উঠিলাম,—পুরাণ জীর্ণ কুঁড়ে—লতা পাতা দিয়া বাঁধিয়া জড়াইয়া বোধ হয় বুড়ী নিজেই কোনও মতে খাড়া রাখিয়াছে। কুঁড়ের সম্মুখের ভাগটি নিপুণ হস্তের নিয়ত মার্জ্জনায় অতি পরিচ্ছন্ন—যেন ফুট্ ফুট্ করিতেছে। একটি গাছের তলায় বুড়ী তালপাতার একখানি আসন আমাকে পাড়িয়া দিল,—আমি বসিলাম।—বনের কয়েকটি ফল, একটু গুড় আর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল আমাকে আনিয়া দিল,—এই জলযোগে বাস্তবিকই তখন বড় পরিতৃপ্ত হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিয়া ক্রমে বুড়ীর জীবনের ইতিহাস সব শুনিলাম। সে আর ইতিহাসই বা কি? দরিদ্র এক শ্রমজীবীর গৃহিনী সে ছিল,—বলিষ্ঠ কয়েকটি পুত্রও হইয়াছিল। মহামারীতে সব মরিয়া গিয়াছে,—বুড়ী একা কেবল বাঁচিয়া আছে। বুড়ী শেষে কহিল, "যারা ছিল, সবাই গা ছেড়ে চলে গেল, আমাকেও যেতে বল্লে। কিন্তু গেলাম না। কেন যাব? কোথাই বা যাব? সোয়ামী এইখেনে রইল, পেটে যাদের ধ'রেছিলাম—তারা সব এখানে রইলো,—এ ঠাঁই ছেড়ে কোথায় আর যাব?—কেনই বা যাব?"

"কেন যাবে? কি ক'রে একলা এই বনে আছ? ভয় করে না?"

"ভয়! ভয় কিসের! মার কোলে আছি, ভয় কি?"

'ধন্য! এমন ভরসা যার, বনে গহনে শ্মশানে মশানে কোথাও কি তার ভয় কিছু থাকে? বৃথা আমরা লেখাপড়া শিখিয়াছি, বৃথা বিদ্যার আর জ্ঞানের গর্ব্ব করি! কই, এই বুড়ীর মত, কোনও দিন কোথাও ত এ জীবনে মার কোলের সাড়া পাই নাই!

বুড়ী কহিল, "কি ভাবছ বাবা? ভয়ের কথা? এই বন থেকে মাঝে মাঝে হাট বাজার ক'ত্তে বেরোই, যারা চেনে তারাও সুধোয়, ভয় করে না? পূজো দিতে যারা আসে, তাদের সাথেও মাঝে মাঝে দেখা হয়—তারাও বলে, ভয় করে না? আমি বুঝিনে বাবা, ভয় কেন ক'রবে। মার কোলে কি মেয়ে কখনও ভয় পায়? তাদের একদিন ব'লেছিলাম,—হাঁগো, তোমরা যে পূজো দিতে এসেছ—কাকে? তারা একমুখে ব'ল্লে, কেন, মাকে! আমি তখন ব'ল্লাম, তবে ভয়ের কথা কেন ব'লছ? তোমরা অদ্দূর থেকে মাকে পূজো দিতে এসেছ,—আর আমি যে একেবারে মার কোলে আছি। ভয় কেন ক'রবে? আরও দেখ বাবা, আমার যারা ছিল—সবাই ত এইখেনেই আছে। মা সবাইকে খেলেন, হেলা ক'রে আমায় বাইরে ফেলে রাখলেন। তা রাখুন, খাবেন ত একদিন। খেতেই হবে যে! দেখি কতদিনে খান,—পালিয়ে যাব কেন? তাদের খেয়েছেন, আমাকেও খাবেন,—খেলেই ত তাদের সঙ্গে এক যায়গায় গে এক সাথ হব।"

আমার চক্ষে জল আসিল। তবু একটু হাসিয়া কহিলাম "কেবলই খান, কেমন মা তোমার বুড়ী? মা না রাক্ষসী?"

"ওই যে মা, সেই রাক্ষসী বাবা—একই কথা। মার পেটে জন্মি,—আবার সময় হ'লে মাই গিলে তাঁর পেটে সবাইকে পুরে রাখেন। তা যদি রাক্ষসী বল ত বল।—মা যদি না খাবেন ত কে খাবে? কোন্ অসুর দানবের পেটে সবাই যাবে? এ কি রকম জ্ঞান বাবা? ওই যে নদীতে ঢেউ ওঠে নামে না? ঢেউগুলো যে ওঠে—নদী থেকেই নদীর ওপরে ওঠে,—আবার নদীর মধ্যেই মিলিয়ে চলে যায়।"

"এ কথা তোমায় কে শেখাল বুড়ী?"

"কথাই বা কি বাবা, আর শেখাবেই বা কে? লেকাপড়াও জানি নে, ইষ্টি গুরুও নেই। একদিন হাটে গেলাম,—ফিরতে দেরী হ'ল, পথে হয়রান্ হ'য়ে প'ড়লাম,—ওই নদীর পাড়ে গাছতলায় কতক্ষণ বসে জিরোলাম। নদীর দিকে চেয়েছিলাম—বেশ হাওয়া উঠেছিল—ঢেউগুলো উঠ্ছে আর প'ড়ছে, উঠ্ছে আর প'ড়ছে। দেখে দেখে আমার মনে হ'ল—বাঃ! এই যে মানুষ আসে আর যায়—আসে আর যায়—ঠিক ত এই রকম! নদী হ'ল যেন মা,—আর মানুষগুলো যে হ'চ্চে আর ম'চ্চে—সে যেন নদীর গায় ঢেউগুলো উঠ্ছে আর প'ড়ছে,—মা যেন ঠেলে ঠেলে তুলে দিচ্ছেন, আবার গিলে গিলে খাচ্ছেন। তা বাবা, বেরিয়েই আসি কি আবার মার পেটেই চলে যাই—মা ছাড়া ত নই। ভয় কেন পাব?"

আমি কহিলাম, "অতটা বুঝ্লে বুড়ী ভয় কি আর কেউ পায়?"

"এটা কি বড় শক্ত কথা বাবা? আর এই ত কথা। বুঝ্‌তেই বা লাগে কি? তা তোমরা কি ভয় পাও? হাঁ, তা পাও বই কি? আমাকে দেখেই ত আঁৎকে উঠেছিলে? হা—হা—হা!—ভেবেছিলে বুঝি পেত্নীটেত্নী একটা কেউ হব—হা—হা—হা!—তা ধর যদি হ'তামই, একটা পেত্নী তাতেই বা ভয় পাবে কেন?—"

আমিও একটু হাসিয়া কহিলাম "তুমি একেবারে নির্ভয় হ'য়ে আছ। তা ভূতপেত্নী মুখে মানি না মানি, ভয় কিছু পাই বই কি?"

"কেন, ভয় পাবে কেন বাবা? ভূতপেত্নীরা কি তোমরা আমরা ছাড়া আর কেউ? তারা এই গতরটা ছেড়ে আলগা হ'য়ে গেছে, আর আমরা এখনও আলগা হ'তে পারি নি—এই যা তফাৎ। নইলে তারাও যা, আমরাই ত তাই বাবা। লোকে যে ভূতপেত্নীর নামে ভয় পায়, পাছে চোকে দেখে এই ভেবে যে একেবারে আঁৎকে ওঠে আমার বড় হাসি পায়। আগে আগে আমিও ভয় পেতাম,—এখন তা ভাবি আর হাসি। খাঁচার পাখী আর বনের পাখী—আমরা এই গতরের খাঁচাটায় বাঁধা আছি, আর তারা এটা ছেড়ে বাইরে উড়ে গেছে। তাই বলে কি খাঁচার পাখী বনের পাখীকে দেখে ভয় পায়?"

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিলাম "এই বনে থাক বুড়ী, তা এই সব বনের পাখী কি কখনও দেখেছ?"

"না বাবা, দেখিনি। বড় নিরেট শক্ত খাঁচা, আর সব আঁধার করে রেখেছে। কত ভেবেছি, কিন্তু এমন একটু ফাঁক পাইনে যে তাদের চোখে দেখি। তবে তারা এই বন ভরে আছে। কাছে কাছেই ঘোরে ফেরে এটা যেন টের পাই, কিন্তু তবু ছাই দেখ্‌তে পাইনে। তা পাব, একদিন ত পাবই: খাঁচাটা যেদিন ভাঙ্গবে আর ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে যাব, সে দিন তাদের সঙ্গে গে মিলব।"

উপরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম—বোধ হইল বেলা গিয়াছে। কিন্তু তবু উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। মনে হইতেছিল, এই বুড়ীর ছেলে হইয়া বুড়ীর কোলেই থাকিয়া যাই। আর বুড়ীর যিনি মা তাঁর কোল যদি পাই, এই বুড়ীর কোলেই পাইব। আর কোথাও নয়। বুড়ী কহিল, "বেলাটা প'ড়ে গেছে বাবা। তা হ'লে এখন ঘরে যাও। আবার এসো, আস্‌বে ত? ছোট লোকের মেয়ে আমি তা বুড়োমানুষ ত—তোকে আমার ছেলে ব'ল্লেও এমন দোষ কিছু হয় না।"

"দোষ! তুমি আমার মা বুড়ী, আমার মার চেয়েও বড় মা!—তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ছি। একটু পায়ের ধুলো আমার মাথায় দেও—জীবন আমার সার্থক হ'ক!"

বলিতে বলিতে বুড়ীর পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িলাম। বুড়ী চমকিয়া উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল,—কহিল, "এই দেখ, পাগল ছেলে করে কি?—আমরা ছোট জাত, আর তোরা হয়ত বামুন। ছি, গড় ক'রে পায়ের ধুলো নিতে আছে? ওতে যে পাপ হয়।"

"আমি বামুন,—তুমি যে বামুনের উপরে বামুন—আরও আমার মা, কেন পায়ের ধুলো দেবে না?"

"না, না! ছি, তা কি হয় বাবা? আমি যে ছোট জাত। ধর্ম্ম একটা মান্‌তে হয় না? দয়া করে মা বলে ডাক্‌লি বাবা, সেই যে আমার কত পুণ্যি! তা চল্‌ বাবা—এই বনে কি পথ খুঁজে পাবি? তোকে বাইরে দিয়ে আসি।"

বুড়ী আগে আগে চলিল,—আমি পিছনে পিছনে আসিলাম,—আর একদিকে সহজ এক পথে বা জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বুড়ী আমাকে অল্প সময়ের মধ্যেই বনের প্রান্তে মাঠে আনিয়া পৌঁছিয়া দিল।

বুড়ীর বড় আপত্তি, প্রণাম আর করিলাম না। আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া মাথায় হাত দিয়া বুড়ী আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিল।

(৪)

বাড়ীতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, দেখি অখিল বড় উৎকণ্ঠিত ভাবে আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, "আর বাঁচা গেল! তোমাকে নিয়ে যে ভারী জালায় পড়্‌লাম বিভূতি। কোথায় গিয়েছিলে? ওই বনকালীর বনে নাকি?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "তীর্থে গেলে, সে কথা এসে যে ব'লতে নেই ভাই।"

"বটে! তা কালী দেখলে কেমন?"

"কালী দেখিনি, তবে তাঁর মেয়েকে দেখ্‌লাম, ... কাছে তিনি কালীর চাইতেও বড়।"

"মেয়ে! সে আবার কেরে!"

তোমাদের গাঁয়ের কাছেই ত, ইচ্ছা হ'লে দেখে আসতে পার।"

ওহো, শুনেছিলাম বনে এক বুড়ী নাকি থাকে।"

"হবে।"

"বুড়ী কি বল্লে।"

"গিয়ে, একদিন শুনে এলেই পার।"

"শুনেছি বুড়ি নাকি আধপাগলা।"

"আধ নয় একেবারে পুরো পাগলা। তাইত পাগলী মায়ের কোলখানি একেবারে পুরো দখল ক'রেই ব'সে আছে।"

সম্পূর্ণ।

অচেনা ছেলে

ষাট বছরের বুড়া অনেক মালদা জেলা হতে
ছিল দিনেক এই গাঁয়েতে আসি,
লোকটা বোধ হয় মাথা পাগল, গ্রামের পথে পথে
ফিরতো মেখে কেবল ধূলারাশি।

গ্রামটী ঘুরে বিকাল বেলা জমিদারের বাড়ী
বল্লে আমি ভিক্ষা কিছু চাই,
অন্য কারো হস্তে আমি ভিক্ষা নিতে নারি
দেন যদি নিই—সৌদামিনী মাই।

সৌদামিনী জমিদারের কন্যা আদরিণী
সোহাগ করে সবাই ডাকে 'সদু'।
রূপে গুণে আলো করে বেড়ায় গরবিনী
হয়েছে সে রাজার বাড়ীর বধূ।

অনেক ওজর আপত্তিতে চাকর বাকর তারে
দুয়ার হ'তে ফিরিয়ে দিতে চায়,
শুনে সদু চাউল লয়ে আপনি এসে দ্বারে
নিজের কাছে আনলে ডেকে তায়।

দেখেই বুড়া তাড়াতাড়ি বসলো কাছে গিয়ে
মিনতি তায় করলে কত শত,
রুক্ষ সাদা কেশগুলি তার চরণতলে দিয়ে
উঠলো কেঁদে ছোট ছেলের মত।

বালিকারে বললে মাগো অনেক খুঁজে পেতে
সাধুর কৃপায় পেলাম তোমার দেখা,
তোমার লাগি বিশটী বরষ কাঁদছি দিনে রেতে
পালিয়ে এলে আমায় ফেলে একা।

ভুললে তুমি সবটী তোমার হাতের রোয়া গাছে
ঘরের পূবে সেই তুলসী তল,
ভাবছি আমি মাগো আমার কেমন করে আছে
দেখছে নাকি কাতর আঁখি জল।

এই দেখ মা চিনবে নাকি তোমার জপের মালা
বক্ষে করে ফিরছি দেশ দেশ,
তোমায় ধনীর ঘরে এসে ভুললে সকল জ্বালা
নেই কি মাগো নেই কি মায়া লেশ!

গিন্নী ডাকি বলেন তবে 'আয়লো সদু আয়'
'কাজ কি বাপু এ সব কথা বলে'?
ছলছলিয়ে চেয়ে বুড়া ছেলের মত হায়
ভিক্ না নিয়ে কোথায় গেল চলে।

'সদু' সে দিন অসুখ বলে আর খেলে না ভাত
অচিন সুতের বাজলো ব্যথা বুঝি,
চোখের জলে ভিজলো বালিস কাঁদলো সারা রাত
প্রাতে বুড়ার খোঁজ পেলে না খুঁজি।

ক'দিন পরেই সদুর আহা হল বিষম জ্বর
চায় না সে যে চায় না আঁখি মেলে,
বিকারেতে বলছে—"আমি" যাবই যাব ঘর
আমার লাগি কাঁদছে আমার ছেলে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

রাজনীতি ক্ষেত্রে

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

[মুখবন্ধ :—অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় সকলজনপরিচিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ অবগত ছিলেন, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান যুবকগণের মধ্যে অনেকেই তাহা জানেন না। যশোহর হইতে কলিকাতায় আগমনের পর শিশিরকুমার তাঁহার অমৃত বাজার পত্রিকার ভিতর দিয়া দেশের যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে আমরা তাহাই বিবৃত করিব। এসব ঘটনা উপন্যাসের মতই চিত্তগ্রাহী ও কৌতূহলোদ্দীপক। তা ছাড়া, জানিবার ও শিখিবারও অনেক তথ্য ইহাতে সকলে পাইবেন। লেখক]

(১)

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ লোকদিগের উচ্চ শিক্ষার পথ যে পরিমাণে মুক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহাও লর্ড মেয়ো ও স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের শাসনকালে রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। এই উদ্ভমটী মিষ্টার ষ্ট্রাচির মস্তিষ্ক হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। ইনি বড়লাট বাহাদুরের কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। লর্ড মেয়ো ঘাতক-হস্তে নিহত হইলে ইনি কয়েকদিনের জন্য বড়লাটের কার্য্য করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাচির প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে বাবু কৃষ্ণদাস পাল তৎসম্বন্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেশবাসিগণকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ইংরাজদিগের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। ইংরাজেরা যে কোনও অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় মনে করিতেন। কিন্তু মিষ্টার ষ্ট্রাচি যখন উচ্চশিক্ষার পথরুদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন, দেশের যে দুর্দ্দশা হইবে তাহা স্মরণ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইংরাজজাতির প্রতি তাঁহার যে বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, তাহা যেন এই সময় একটু হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। ষ্ট্রাচির প্রস্তাবের প্রতিবাদের জন্য কলিকাতায় এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। হিন্দু-প্যাট্রিয়ট পত্রিকার ন্যায় অমৃতবাজার পত্রিকাও উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। শিশির কুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার মফঃস্বলে বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে বহু সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারও অমৃতবাজার পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণ দেশের জন্য কিরূপ আকুল হইত—পাঠকগণকে তাহা অবগত করাইবার জন্য আমরা ১২৭৯ সালের ৭ই বৈশাখের অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে "উচ্চতর শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম :—

"যদ্যপি উচ্চশিক্ষা উঠিয়া গেলে আমরা উচ্চ রাজকার্য্যের অনুরোধে ইংলণ্ডে গমন করিব, অথবা কখন ইহা দ্বারা দেশীয় লোকের অন্তর্নিহিত উৎসাহ ও কার্য্যের উদ্দীপন হইবে এবং আমরা নিজ ব্যয়ে দেশে উচ্চ-শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করিব। কিন্তু ইংলণ্ড আমাদের না, উহা ইংরাজদিগের। যদি আমাদিগকে পুনর্ব্বার অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন করা তাঁহাদের অভিপ্রায় হইয়া থাকে, যদি আমাদিগকে তাঁহারা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহাদের পদানত করিয়া রাখিতে প্রকৃত অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে ইংলণ্ডেই বা আমরা কেমন করিয়া যাইব। যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে উচ্চশিক্ষার ফলভোগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিলেন, তাঁহারা কি আমাদের ইংলণ্ড গমনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতে পারিবেন না? এ দেশেই বা আমরা কাহার বলে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিব? আমাদের ধন কোথায়? ইংরাজেরা যে আমাদিগকে নির্ধন করিয়া তুলিয়াছেন। আবার আর দুই চারিটি ট্যাক্স বসিলেই আমাদের হা অন্ন, হা অন্ন, করিয়া বেড়াইতে হইবে। আমরা আর একবার ভাবি যে উচ্চশিক্ষা যদিও অন্তর্হিত হয়, উচ্চ রাজকার্য্য হইতে যদিও আমরা বিচ্যুত হই, কিন্তু ফলশস্য প্রসবিনী ভারতভূমিকে কেহই অনুর্ব্বর করিতে পারিবে না। আমরা কৃষক হইব এবং দেখি সে পথে অগ্রসর হইতে কে আমাদিগের প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু সত্যসত্যই কি

আমাদের দেশে এই দুর্গতি হইবে? বাঙ্গালীর অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির পরিণাম কি এরূপ হইবে? আমাদের সকল আশা ভরসার পরিতৃপ্তি কি বাক্যের ক্ষেত্রে পরিসমাপ্ত হইবে? আমরা কি বঙ্গদেশীয় যুবকগণের বিদ্যা-বুদ্ধি বিকশিত মুখশ্রী আর দেখিব না? আমরা কি বিদ্যার আলোচনায় বিপুল সুখের আস্বাদন আর পাইব না? হা জগদীশ্বর! কি অপরাধ করিয়াছি যে আমাদের শেষে এইরূপ দুর্গতি হইবে!

"গভর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষা উঠান, আমরা আর কি করিব? কিন্তু একবার তাঁহাদিগকে আমাদের দেখান কর্ত্তব্য আমরা উহা কত ভালবাসি, উহা আমাদের কত যতনের ধন। আমরা যদি চারি কোটী লোক একস্বরে চীৎকার করি, তাহা হইলে সে রবে ক্যাম্বেল সাহেব কর্ণপাত না করুন, বিদ্যা রসাস্বাদী ইংরাজ জাতি কখনই বধির থাকিবেন না।"

সৌভাগ্যক্রমে লর্ড নর্থব্রুক্ ভারতের বড়লাট ও সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গের ছোটলাট হইয়া আসিলেন। তাঁহাদেরই অনুগ্রহে এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের সমবেত যত্নে ও চেষ্টায় মিষ্টার ক্লাচির প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের পল্লী মিউনিসিপাল বিল এর (Village Municipal bill) প্রস্তাব উত্থিত হইলে শিশিরকুমার তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারের সহিত মফঃস্বলে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার বলিতেন যে, পল্লীবাসিগণকে রাজনীতি শিখাইতে না পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হওয়া অসম্ভব। এই মহাসত্য আমাদিগের দেশের তথাকথিত রাজনীতি-ব্যবসায়ীগণ আজও বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করেন, কয়েকটী নগর লইয়াই বঙ্গদেশ। কিন্তু বঙ্গদেশ যে কামার কুমারের, জেলে জোলার, চাষা লাঙ্গলিয়ার আবাস-স্থান, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। শিশিরকুমার ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এ সম্বন্ধে লোকমতের প্রথম শিক্ষক ছিলেন। পল্লীগ্রামে যখনই কোন বিষয়ের আন্দোলন করা আবশ্যক হইত, হেমন্তকুমারই অগ্রণী হইয়া তাহার ভার গ্রহণ করিতেন। রোড্‌সেস্ দ্বারা গভর্ণমেণ্ট রাস্তা ঘাট ইত্যাদির অনেকটা ভার দেশবাসীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং মফঃস্বলে মিউনিসিপ্যালিটী প্রবর্ত্তিত হইলে গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুলিশের ব্যয়ভার দেশবাসীর উপর দিবেন, শিশিরকুমার ও তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার মফঃস্বলবাসিগণকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। লর্ড মেয়োর পর লর্ড নর্থব্রুক্ যখন ভারতের বড়লাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তিনি প্রস্তাবিত পল্লী মিউনিসিপ্যাল বিলের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন নাই। বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল এইজন্য পদত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গুণবান্ পুরুষ হইলেও বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার শাসন-পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় বহু বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত Political Geometry শীর্ষক প্রবন্ধটীই ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

POLITICAL GEOMETRY.

CHAPTER I—DEF.

1. A political point is that which is visible to the Government but invisible to the people.

2. A line of policy is length without breadth of views.

3. A political figure is that which is enclosed in one side by ambition and another by hypocricy.

4. A political circle is a plane figure contained by one line of policy and is such that a certain point within this figure keeps the circumference firm and united.

5. And this point is called interest.

6. A political triangle is a wedge which is usually gently introduced at the beginning of any new impost,

7. Parallel lines are lines of policy which though they never meet always tend to the same direction.

CHAPTER II—Postulates.

1. Let it be granted that any tax may be imposed upon any section. or class of people without their permission.

2. Let it be granted that any measure may be introduced or withdrawn at the pleasure of the Government.

3. Let it be granted that any promise may be made or broken provided there be a nominal pretext.

4. Let it be granted that a deficit may be shewn where there is a surplus.

CHAPTER III.—Axioms.

1. Might is always right.

2. England governs India for the good of the latter.

3. Things which have a black cover have also a black interior.

4. Things which have a white cover have a white interior.

5. Black can never be white, neither white black.

6. The promise or opinion of one individual is equal to the promise or opinion of the whole nation.

PROP. I.—Problem.

Given a permanently settled revenue on land to draw a roadcess from it.

From the southernmost point of Bengal to the northernmost point describe the condition of the Zamindars. Promise 19 guns to Maharaja of Burdwan (post 3) and impose (post 1) an income-tax. Take this point from which draw the cess and produce it to the ryots. For one Zamindar, the Rajah of Burdwan, promised to pay the incometax and it is therefore binding on all Zamindars, (Ax. 6) Then because as the roadcess is drawn from a point where the incometax intersects the permanent settlement, they are therefore parallel and the roadcess is therefore drawn etc. etc. Q. E. F.

Obs. Latterly Stifel attempted to prove this proposition by axiom 1st only.

EXERCISES ON PROP. I.

Given Roadcess to find the Educational cess, the Medical cess and other cesses

প্রবন্ধটী বিদ্রূপাত্মক হইলেও, পাঠক, ইহা হইতে শিশির-কুমারের রাজনৈতিক জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ক্রমশঃই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসার ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইংরাজ-সম্প্রদায় মধ্যে পত্রিকা এক অতি অদ্ভূত ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে বোধ হয় আবার একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। বেনারসে মিষ্টার আয়রণ সাইড যখন জজ ছিলেন, তখন তিনি একবার চক্ষুঃ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। নানা চিকিৎসায় যখন কোনও ফল হইল না, তখন তিনি হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়কে ডাকিয়াছিলেন। ডাক্তার মৈত্রের * চিকিৎসা-নৈপুণ্যে মিষ্টার আয়রণ সাইড আরোগ্য লাভ করেন। এই চিকিৎসার সময় জজ সাহেব একদিন বলিয়াছিলেন, "ডাক্তার মৈত্র, আপনি কি অমৃতবাজার পত্রিকা ও তাহার পরিচালক শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার সহোদরগণকে জানেন? শুনিতে পাই তাঁহারা নাকি এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন?"

আর একবার দ্বারভাঙ্গায় একটী বাঁধ কাটা লইয়া মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হয়। নীলকরগণ বাঁধটী কাটিয়া দিয়া চেষ্টা করিলে রাইতগণ তাহাতে আপত্তি করিয়াছিল। বাঁধ কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিলে নীলকরদিগের নীল চাষের সুবিধা হইত বটে, কিন্তু তাহাতে রাইয়তগণের ধান চাষের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। বাঁধ কাটা লইয়া শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় রাইয়তগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট বাঁধ রক্ষার সম্বন্ধে আবেদন করিলে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জনৈক পুলিশের ইন্‌স্পেক্টরকে নীলকরগণ যাহাতে বাঁধ কাটিয়া দিয়া জল বাহির করিয়া না দেয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বাঁধের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নীলকরদিগের বড় সাহেব বহুসংখ্যক লোক লইয়া বাঁধ কাটিবার উপক্রম করিয়াছেন। তিনি সাহেবকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন— "বলপূর্ব্বক বাঁধ কাটিলে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিব। বাঙ্গালী ইন্‌স্পেক্টরের মুখে এই কথা শুনিয়া সাহেব ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। "কি? একজন বাঙ্গালী ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে গ্রেপ্তার করিবে?—"অতি কর্কশস্বরে কথা গুলি বলিয়া সাহেব কোদাল লইয়া, স্বহস্তে বাঁধ কাটি...

* ইনি মেয়ো হাসপাতালের চিকিৎসক এবং Social Service League এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের পিতা।

দিন কার্য্য করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে কোন ফলই হইতেছে না, তখন তিনি স্বীয় সংকল্প সাধনে ব্যস্ত হইয়া এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। আনন্দমোহনের অজ্ঞাতে তিনি কলিকাতায় কেন্দ্রসমিতি প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সমিতি গঠন-কার্য্য শেষ করিয়া আনন্দমোহনের নিকট তাহা ব্যক্ত করিলে তিনি নিশ্চয়ই সমিতির কার্য্যে যোগদান করিবেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে সেপ্টেম্বর তারিখে সমিতি প্রতিষ্ঠান জন্য ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্র কিছুকাল হিন্দু পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। 'সমাচার হিন্দুস্তানী,' 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন,' 'রেইস ও রায়ট' প্রভৃতি পত্রিকাও তিনি দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। আমেরিকার একটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডাক্তার উপাধি পাইয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্রের গুণে আকৃষ্ট হইয়া ত্রিপুরাধিপতি তাঁহাকে আপনার মন্ত্রীপদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সভায় সমাগত সভ্যমণ্ডলীর সম্মতি অনুসারে সাধারণ লোকদিগের জন্য একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল; ইহার নাম হইল "ইণ্ডিয়ান লীগ।" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদারদিগের ও ইণ্ডিয়ান লীগ সাধারণ জনসম্প্রদায়ের রাজনীতি চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল হইল। লাল-বাজারে পুরাতন পুলিশ কোর্টের ঠিক দক্ষিণে যে বাড়ীতে বেরিনি কোংর ঔষধের দোকান ছিল, ইণ্ডিয়ান্ লীগের আফিস প্রথমে সেই বাড়ীতে হয়। শেষে আফিস সেখান হইতে চিৎপুর রোডে বর্ত্তমানে আলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স যে বাড়ীতে আছে সেই বাড়ীতে আনা হইয়াছিল। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান্ লীগের সভাপতি; হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল বাবু কালী-মোহন দাস সম্পাদক; বউবাজারের বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত সহযোগী ও শিশিরকুমার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইলেন। বলা বাহুল্য, পদগুলি অবৈতনিক। কলিকাতা ও মফস্বলের বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তিকে লইয়া একটী কার্য্য পরি-চালন সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু শিশিরকুমার যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। আনন্দমোহন ইণ্ডিয়ান্ লীগ প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সহচরগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ক্রমে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আরব্ধ হইল। যে মহৎ উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান্ লীগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া শিশিরকুমারের বিপক্ষদল তাহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু তাঁহারা শিশিরকুমারকে লীগ হইতে তাড়াইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তাঁহারা একটী সভা আহ্বান করিয়া স্থির করিলেন যে, লীগের সহকারী সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস না থাকায় তাঁহারা শিশির-কুমারকে লীগের সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ করিতে অনু-রোধ করিবেন। শিশিরকুমার তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা না করিলে তাঁহারা লীগের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবেন। লীগের সভাপতিকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। শুনিবামাত্রই শিশিরকুমার সহকারী সম্পাদকের পদ পরি-ত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরক্ত সহচরগণ কিছুতেই তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে দিলেন না। যাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমে ইণ্ডিয়ান্ লীগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যিনি লীগের প্রাণস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, বিনা-কারণে তাঁহাকেই সমিতি হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। শিশির-কুমার যখন লীগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদস্যগণের বিশেষ অনুরোধে লীগের সহকারী সম্পাদকের পদপরিত্যাগ করিলেন না তখন আনন্দমোহন ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ লীগের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। শিশিরকুমার ইহাতে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন।

যে স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য আজকাল আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে শিশিরকুমারের এবং তাঁহার ন্যায় দুই একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার ইণ্ডিয়ান্ লীগের ভিতর দিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য আন্দোলন করিয়া, ইণ্ডিয়ান লীগকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হন। স্যার ষ্টুয়ার্ট হগের নাম অনেকেই অবগত আছেন। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ইঁহারই নামানুসারে হগ সাহেবের বাজার নামে পরিচিত। স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান এবং কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তিনি একজন জবরদস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে হগ সাহেব কি এদেশীয়, কি ইউরোপীয় সকলেরই চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। শিশিরকুমার কলিকাতাবাসিগণকে স্যার ষ্টুয়ার্টের অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণের ও স্বার্থান্বেষিগণের এক-চেটিয়া আধিপত্যের হস্ত হইতে করদাতৃগণ যাহাতে অব্যাহতি-লাভ করিতে পারেন, সেই চেষ্টায় শিশিরকুমার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই সময় স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়া এক নূতন বিধি প্রণয়নে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন। স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে শিশিরকুমার ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে একটি সভা আহ্বান করিবেন স্থির করিয়া সভাপতি শম্ভুচন্দ্রের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেও শম্ভুচন্দ্র নির্ব্বাচন প্রথার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া শেষে

শিশিরকুমারকে সভার অধিবেশনের প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছিলেন। এই স্বায়ত্তশাসন লাভের চেষ্টায়ও শিশিরকুমারকে তাঁহার বিপক্ষ সম্প্রদায় বাধা প্রদান করিয়াছিলেন।

সভার অধিবেশন হইবে স্থির হইল বটে, কিন্তু কাহাকে সভাপতি মনোনীত করা হইবে, তাহা লইয়া বড় গণ্ডগোল চলিতে লাগিল। শম্ভুচন্দ্র কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু হীরালাল শীলকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু হীরালালবাবু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কাহাকে সভাপতি করা হইবে ইহা লইয়া মহা গণ্ডগোল চলিতে লাগিল। শেষে লীগের অন্যতম সদস্য বাবু প্রাণনাথ দত্ত ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রিকার তাৎকালিক সম্পাদক মিষ্টার জে, উইলসনের (Mr. J. Wilson) নাম উল্লেখ করিলেন। শম্ভুচন্দ্র কোন বিশেষ কারণে উইলসনের পর বড় প্রসন্ন ছিলেন না; তিনি তাঁহার নির্ব্বাচনে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আপত্তিসত্ত্বেও শিশিরকুমার অন্যান্য সদস্যগণের অভিপ্রায় অনুসারে মিষ্টার উইলসনকেই প্রস্তাবিত সভার সভাপতি মনোনীত করিলেন। এই হইতে শম্ভুচন্দ্র ও শিশিরকুমারের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। ১৮৭৫ খৃঃ অঃ ২৫শে অক্টোবর তারিখে বিডন ষ্ট্রীটের রঙ্গমঞ্চে এক সভার অধিবেশন হয়। [illegible] কলেজের অধ্যাপক বাগ্মীবর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকিল বাবু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কালীচরণের বক্তৃতায় সভায় তড়িৎপ্রবাহ উঠিয়াছিল। কালীচরণ অতি ধীর, স্থির ও শান্ত-প্রকৃতির লোক ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া অনেক ইংরাজও মুগ্ধ হইতেন। অধ্যাপকতা করিয়াই তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন; রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিবার তাঁহার বড় আগ্রহ ছিল না। কিন্তু শিশিরকুমার তাঁহাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়াছিলেন। কালীচরণ শিশিরকুমারকে তাঁহার রাজনৈতিক গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। তিনি যাহাতে সভায় যোগদান না করেন, তাহারও বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। এই সভার অধিবেশনের পর শিশিরকুমারের বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে ইণ্ডিয়ান লীগ দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সভা সম্বন্ধে ২৬শে অক্টোবর তারিখের ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখিয়াছিলেন,—

"The monster gathering of the middle classes of the Native Community at the Beadon Street Pavilion on Saturday last is a sign of the times, the significance of which it would be difficult to over rate. The meeting shows two things at least. It shows that a strange desire to be heard arising more or less out of the dissatisfaction with the existing order of things in this city, animates what in all civilised communities is the most important section of the public; and it shows that the section of the public in question are not contented to have the care of their Interests in the hands of a self-seeking plutocracy. The meeting of Saturday is, in fact, the first marked sign of the awakening of the people on this side of India to political life. We have received several letters from natives, calling in question both the representative character of the meeting and the motives of those who called it. To one thinking, the manner and character of the attendance afford a sufficient answer to these insinuations."

ভাবার্থ—"গত শনিবার বিডন ষ্ট্রীটের সভামণ্ডপে এ দেশীয় মধ্য-শ্রেণীর লোকদিগের যে বিশাল সম্মিলন হইয়াছিল, [illegible] হইতে [illegible] বিষয় বুঝিতে পারা যায়। প্রথম এই যে, বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে অবস্থা আছে, তাহাতে সাধারণ জনসম্প্রদায়ের আস্থা নাই, এবং দ্বিতীয় এই যে তাঁহারা তাঁহাদের মঙ্গলকর কার্য্যের ভার স্বার্থান্বেষী ধনী সম্প্রদায়ের হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত নহেন। গত শনিবারের সভা এদেশীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের উদ্বোধন স্বরূপ। এ দেশের অনেকে সভা আহ্বানকারিগণের প্রতিনিধিত্ব ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সন্দিহান হইয়া আমাদিগকে কতিপয় পত্র পাঠাইয়াছেন। কিন্তু সভার জনতা লক্ষ্য করিলে তাঁহারা তাঁহাদের সন্দেহ অমূলক কিনা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।"

উক্ত সভার অধিবেশনের সময় বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর সার রিচার্ড টেম্পল কলিকাতায় ছিলেন না তিনি তখন পরিদর্শন কার্য্যে মফঃস্বলে ছিলেন। এই সময় অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দু পেট্রিয়টের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষিত হইত। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্যে রাজদ্রোহিতার গন্ধ আঘ্রাণ করিতেন সার রিচার্ডও শিশিরকুমারকে প্রথমে রাজদ্রোহী বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু এই মফঃস্বল পরিভ্রমণের সময় তাঁহার সে ধারণা দূর হইয়াছিল। মফঃস্বলের অধিকাংশ লোকই যে অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষপাতী এবং ইহার সম্পাদক শিশিরকুমারের ভক্ত, ইহা সার রিচার্ড লক্ষ্য করিয়াছিলেন। [illegible] দেশের জনসাধারণ ভালবাসে ও ভক্তি শ্রদ্ধা [illegible]

শিশির কুমারকে ছোটলাট বাহাদুর একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন। সার রিচার্ড মিউনিসিপ্যালিটীর সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন শুনিলেন যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের উদ্যোগেই নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনের জন্য ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, তখন শিশিরকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। সার রিচার্ড একদিন তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া গ্রোটাস্ নামক ষ্টীমারে নদীবক্ষে প্রমোদ যাত্রা উপলক্ষে শিশিরকুমারকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া শিশিরকুমার আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি প্রথমে নিমন্ত্রণে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু যখন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, লাট বাহাদুর যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন শিশিরকুমার লাট বাহাদুরের প্রমোদ যাত্রায় যোগদান করিলেন। তিনি ষ্টীমারে গিয়া একদিকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, সাররিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। লাট সাহেব নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমারকে তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ কি আসিয়াছেন?"

নরেন্দ্র—"হাঁ, তিনি আসিয়াছেন।"

সাররিচার্ড—"আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই। আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করি।"

নরেন্দ্র—"আমি তাঁহাকে আপনার নিকট আনিতেছি।"

নরেন্দ্রনাথ শশব্যস্তে শিশির কুমারের নিকট গিয়া বলিলেন,—"বেশ, তুমি এ দিকে চুপ করিয়া বসিয়া আছ, আর লাটসাহেব তোমার সহিত আলাপ করিবার জন্য তোমাকে খুঁজিতেছেন। চল, চল, শীঘ্র চল।" শিশিরকুমার একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; নরেন্দ্রনাথ তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া সার রিচার্ডের নিকট লইয়া গেলেন। যথারীতি অভিবাদনান্তর লাটসাহেব ও শিশিরকুমারের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সার রিচার্ড বলিলেন,—"শিশিরবাবু, আমি আপনার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। আপনি ত কই কখনও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন না?"

শিশির—"আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি লাটবাহাদুরের সহিত সাক্ষাতের যোগ্য নয়। সেই জন্যই আমি আপনার নিকট আসি না।"

সাররিচার্ড—"আপনি যে সামান্য ব্যক্তি নহেন, তাহা আমি মফঃস্বল পরিদর্শনের সময় জানিতে পারিয়াছি। মফঃস্বলের সাধারণ জনসম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন সহকারে আপনার পত্রিকা পাঠ করে এবং তাহারা আপনাকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দর্শন করে। আপনার সহিত আলাপ হওয়ায় আমি বিশেষ সুখী হইলাম।"

শিশির "সেটা আমার পক্ষে যথেষ্ট সৌভাগ্যের কথা

সাররিচার্ড—"আচ্ছা শিশিরবাবু, আমার শাসনকালে আপনাদের দেশের কি কোন ক্ষতি হইয়াছে? প্রজাসাধারণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে ত?"

শিশিরকুমার উত্তর করিলেন,—"যতদিন দশ আইন (Rent Law) প্রচলিত থাকিবে, ততদিন প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে সদ্ভাব থাকিতে পারে না। কাজেই দেশবাসিগণ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে না।"

সার রিচার্ড—"দেশবাসীকে সুখী করিতে হইলে আপনার বিবেচনায় কি করা আবশ্যক?"

শিশির—"আপনারা যদি দেশবাসিগণের মধ্যে সুখ, শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথমে দশ আইন উঠাইয়া দিন। ইহা ব্যতীত অবিলম্বে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করা কর্ত্তব্য।" শিশিরকুমারের উত্তর শুনিয়া সাররিচার্ড একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, "মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনের জন্য আপনি মহা আন্দোলন করিতেছেন দেখিতে পাই। কিন্তু আপনারা কি বাস্তবিকই ইহার উপযুক্ত?"

শিশিরকুমার বিনয়পূর্ণ স্বরে উত্তর করিলেন, "আমরা যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

এইরূপ কথোপকথন হইতে সাররিচার্ড টেম্পল শিশিরকুমারের সরলতা, দৃঢ়তা ও আন্তরিক স্বদেশসেবার আকাঙ্ক্ষা ও অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। জলবিহার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তিনি শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন, "শিশিরবাবু, আপনি বেলভিডিয়ারে একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আপনার সহিত আমার অনেক কথা আছে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

দেশের ও দশের কথা।

বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়।

(ঢাকা জিলা-সমিতি কর্ত্তৃক প্রচারিত)

ঢাকা নগরীর নরনারীগণ বর্ত্তমানে বসন্ত রোগের প্রবল আক্রমণে নিতান্তই চিন্তিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমরা আশা করি নিম্নলিখিত সহজ নিয়ম কয়টি যত্নপূর্ব্বক প্রত্যেক পরিবারে প্রতিপালিত হইলে, এই রোগের ব্যাপকতা শীঘ্রই অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বিপরীত ভোজন ও স্বেচ্ছাচারমূলক আহার বিহার দ্বারা মানব দেহ রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, যে কোন রোগই অনায়াসে উহাতে প্রবেশ করিতে পারে। ওলাউঠা, বসন্ত, জলবসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগসমূহ সচরাচর উপরোক্ত কারণেই যে এক দেহ হইতে অন্য দেহে অতি সহজে সংক্রামিত হয়, তাহা জগতের বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসকগণ সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহাতে আহারবিহার বিষয়ে সংযত হইয়া নিদারুণ সংক্রামক ব্যাধিসমূহের আক্রমণ হইতে মানব দেহ রক্ষিত হইতে পারে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। এরূপ আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, ঢাকাবাসী জনসাধারণ নিম্নবর্ণিত নিয়মসমূহ প্রতিপালন দ্বারা আপনাদিগকে দারুণ বসন্ত রোগের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সাবশেষ যত্নবান হইবেন।

নিয়মাবলী।---

১। নিরামিষ আহার। ২। তিক্ত জিনিষ (হেলেঞ্চা, করলা, উচ্ছে, নিমপত্র পটল পত্র প্রভৃতি) প্রত্যহ ভোজন করা। ২। প্রত্যহ প্রাতে অল্প পরিমাণ কাঁচা হরিদ্রা ও ইক্ষুগুড় সেবন অথবা এক কাঁচ্চা উচ্ছে পাতার রস এবং এক কাচ্চা কাঁচা হরিদ্রার রস গরম করিয়া সেবন করা। ৪। গাধার দুগ্ধ পান। ৫। কণ্টকারীর মূল গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন। ৬। প্রত্যহ অল্প পরিমাণে জৈন (জমানি) সেবন। ৭। হোমিওপ্যাথিক মেলেণ্ড্রিয়াম (২০০ ডাইলিউসন্) প্রত্যেক ৭ দিন অন্তর এক মাত্রা সেবন। ৮। যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যেকের টিকা লওয়া। ৯। মাংস, মাছ, ডিম, মসুর, লঙ্কা, পিঁয়াজ ও বেশী মসলাযুক্ত খাদ্য নিষিদ্ধ ও মাদকদ্রব্য সেবন সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

রোগের সংক্রামকতা নিবারণ।--

১। বাড়ী ঘর পরিষ্কার রাখা। ২। দুইবেলা বাড়ীতে ধুপ ও গন্ধক পোড়ান এবং নর্দ্দমায় (ড্রেনে) আলকাতরা ছড়ান। ৩। বাড়ী ঘর এবং ড্রেন ২।১ দিন অন্তর ফিনাইল দ্বারা ধৌত করা এবং প্রত্যহ দুই বেলা ফিনাইল বা টাটকা গোময় ছড়াইয়া দেওয়া। ৪। যে কোন খাদ্যদ্রব্যই ধৌত করিয়া ঘরে নেওয়া। ৫। খাদ্যবস্তু সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা। ৬। বাহির হইতে বাড়ীতে গিয়া গা, হাত, পা ভাল করিয়া ধৌত করিয়া এবং গায়ে একটু গন্ধকের ধোঁয়া লাগাইয়া আহার করা। ৭। ধোপা বাড়ীর কাপড় আসিলে তাহাতে ভালরূপ গন্ধকের ধূয়া লাগাইয়া ব্যবহার করা। ৮। বাহিরের জুতা নিয়া ঘরে যাইবার পূর্ব্বে চূন মাড়াইয়া ঘরে যাওয়া। ৯। সম্ভব হইলে বাহিরের কাপড় স্বতন্ত্র রাখা। ১০। যে পর্য্যন্ত বসন্তের চুমটি (Crust) শরীর হইতে পড়িয়া না যায় সে পর্য্যন্ত শরীর তৈলাক্ত জিনিষে সিক্ত রাখা এবং যাহাতে ঐ চুমটি বাতাসের সহিত মিশিতে না পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা এবং চুমটি না সারা পর্য্যন্ত রোগীকে অন্যের সহিত মিশিতে না দেওয়া ও স্বতন্ত্র রাখা। যাহাদের বাড়ীতে বর্ত্তমানে বসন্তের রোগী আছে, তাহাদের বাড়ীর অন্য লোকদিগের টিকা লওয়া। পরিচর্য্যা

১। রোগীকে সর্ব্বতোভাবে সাধারণের সহিত স্বতন্ত্র রাখা। ২। রোগীর ঘরের দরজায় লাল রংএর একখানা কাপড় দ্বারা পরদা দেওয়া এবং তাহা রসকর্পূর দ্রব (১-৫০০০) দ্বারা বা ফিনাইল দ্রব দ্বারা ভিজাইয়া রাখা। ৩। রোগীর সেবকগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন যেন তাঁহার পরিবারের অন্য লোকের মধ্যে বসন্ত বীজ সংক্রামিত না হইতে পারে। রোগের কথা।—

রোগীর শরীরে সাধারণতঃ জ্বরের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম দিনে বসন্তের গুটি দেখা দিয়া থাকে। কোন অবস্থায়ই বসন্তের গুটি বসাইয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। বসন্ত প্রকাশ পাইলে যত শীঘ্র সম্ভব সমস্ত গুটি বাহির করিতে এবং পাকাইতে চেষ্টা করিতে হয়। গুটি বাহির হইয়া গেলে কনভালসনে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। গুটি পাকিয়া গেলে ১৩।১৪ দিনে গুটি স্বাভাবিক নিয়মে শুকাইয়া যায়। বসন্তের সাধারণতঃ চারিটী অবস্থা :--

১। জ্বর--কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। তবে, স্থলবিশেষে কণ্টকারির সিদ্ধ জল মাত্র।

২। গুটি প্রকাশ---এই সময় জ্বর সাধারণতঃ কমিয়া যায়। চিকিৎসা—মাথা ও পেসারী চাউল ভিজান জল দ্বারা সিক্ত করা। পথ্য—অন্নমণ্ড, সাবুদানা জল এবং কাঁচা মুগের যুষ। ৩। গুটি পাকিবার অবস্থা—সাধারণতঃ ৭ম দিন হইতে ১২শ দিনের মধ্যে বসন্তের গুটি পাকিয়া থাকে। এই সময় একটু জ্বর হয় এবং মাথা খুব গরম থাকে। রোগীর মস্তক খুব ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। তজ্জন্য মাথায় বরফ, বা পুরাতন ঘৃত বা বরাহচর্ব্বি ব্যবহার করিতে হয়। শরীরে তৈল জল মিশ্রিত কোন মলম বা সংযুক্ত

ঘৃত মালিস করিতে হয়। শত-ধৌত ঘৃতই উত্তম। ৪।—গুটি শুকানের অবস্থা—ত্রয়োদশ দিবস হইতে বিংশতি দিবস। চিকিৎসা—রোগীর দেহ তিল তৈল দ্বারা সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখা ও তাহার মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করা। ঔষধ সেবন করা—ঐ সময় রোগীর পক্ষে স্বর্ণসিন্দূর ও বৃহৎ বাতচিন্তামণি বটি বিশেষ উপকারী। কোন সময় দাস্তের ঔষধ না দেওয়া। অতিরিক্ত শৈত্য সেবনে নিউমোনিয়া রোগ জন্মিতে পারে। সুতরাং সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় যাহাতে কনভাল্‌শন ও ৪র্থ অবস্থায় যাহাতে মাথা গরম না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কোন কোন চিকিৎসক গুটি পাকিলে কাঁটা দিয়া ঘা করিয়া দেন। কিন্তু অধিকাংশ রোগীর পক্ষেই কাটা দিয়া ঘা করা সঙ্গত নহে। বিশেষ কাঁটার প্রয়োগ করিলে বসন্তের দাগ রোগীর দেহে চিরদিনের জন্য থাকিয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ এই রোগের আক্রমণ হইতে ২৬ দিনের মধ্যে ইহা অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। বিশেষতঃ রোগের ৩য় ও ৪র্থ অবস্থায় উহার সংক্রামক শক্তি খুবই প্রবল হয়। সুতরাং এই সময় রোগীকে এমনভাবে রাখিতে হয় যে, তাহার সহিত অন্যের সংস্পর্শ না ঘটে এবং রোগীর গায়ের মশা মাছি প্রভৃতি অন্যের গায়ে গিয়া বসিতে না পারে। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে বসন্তরোগগ্রস্ত রোগীকে সর্ব্বদা মশারির নীচে রাখাই একান্ত সমীচীন।

রুগ্নব্যক্তির আর্থিক অবস্থা খারাপ না হইলে তাহার বাসগৃহের চারিদিকের প্রাচীর রক্তবর্ণ বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া খুবই সঙ্গত। কারণ তাহাতে রোগের সংক্রামক শক্তি বিনষ্ট হয় এবং তাহার ফলে শুশ্রূষাকারিগণ নির্ভয়-চিত্তে তাহার সেবা করিতে পারেন।

সম্পাদকের নিবেদন।—

'ঢাকা জিলা সমিতি' এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, নিঃস্ব বসন্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ উক্ত সমিতির সম্পাদকের নিকট সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি তাহাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিবেন, এবং এজন্য তাহাকে অর্থব্যয় করিতে হইবে না।

নিবেদক—

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক।

(ঢাকা প্রকাশ)

টিপ্পনী।—বসন্তের প্রকোপ সর্ব্বত্রই আছে। এই নিয়ম গুলি স্মরণ রাখিলে সকলেই উপকৃত হইবেন। স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও জ্ঞান অতি অল্প,—অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই। দেশের বিদ্যালয়ে অতি প্রয়োজনীয় এই বিষয়টি শিখাইবার সুব্যবস্থা কিছুই নাই! বসন্ত, কলেরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ প্রভৃতি যখনই কোনও মহামারী দেখা দেয়, জিলা সমিতি সমূহ অন্ততঃ এইরূপ প্রতিষেধক নিয়মাবলী প্রচার করিলে, লোকের কত উপকার হয়, তাহা বলিবার নয়।

রায়ত কন্‌ফারেন্স।

দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ বাঙ্গালার কৃষক ও জোতদার-শ্রেণীর দুঃখ দুরবস্থার কথা কাহারও অবিদিত নাই। এই বিরাট সম্প্রদায় জমিদার ও মহাজন প্রভৃতির অন্যায় অত্যাচার লাঞ্ছনায় যেরূপ জর্জ্জরিত নিঃস্ব ও দুর্ব্বল হইতেছেন তাহা চিন্তা করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। যাহাতে উদার গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের সম্পদ ও আহার্য্য অর্জ্জনের সহায় এই রায়ত শ্রেণীকে সর্ব্বপ্রকার অভাব অভিযোগ ও অত্যাচার অবিচারের হাত হইতে রক্ষা করেন তাহার জন্য তীব্র আন্দোলন করিবার জন্য মৌলবী এম, নাজিরউদ্দিন আহম্মদ ও বাবু কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় শুভ ফ্রাইডের বন্ধে আগামী ১৮ই এপ্রেল শুক্রবার তারিখে ময়মনসিংহ টাউনে প্রাদেশিক রায়ত কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিয়াছেন। এই কন্‌ফারেন্সে যাঁহারা ডেলিগেটস্বরূপ যোগদান করিবেন তাঁহাদিগকে দুই টাকা ফি দিতে হইবে। অবশ্য তাঁহারা আহার ও বাসস্থান পাইবেন। সম্প্রতি শাসন-সংস্কার ব্যাপারে দেশে নূতন ভাবের স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ সময় বঙ্গদেশীয় কৃষক ও জোতদারবর্গ যদি নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব অভিযোগ অত্যাচার অবিচারের প্রতিকারকল্পে বীরের ন্যায় সমবেত শক্তিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন, তবে আর উপায় নাই। তাই আমরা এই শুভ অনুষ্ঠানে বঙ্গপল্লীর প্রত্যেক স্থান হইতে দলে দলে রায়ত ও জোতদারশ্রেণীকে এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছি। দেশের বহু কৃতিসন্তান এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই কন্‌ফারেন্সের সাফল্য কামনা করিতেছি।

(রাঃ সঃ) (ঢাকা প্রকাশ।)

বিদুষী হিন্দুনারী

সারস্বত সমাজাধীন সাহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় এবার একটী স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন; ইঁহার নাম শ্রীমতী যোগেশ্বরী সাংখ্যতীর্থা। চট্টগ্রামে শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের জগৎপুর আশ্রমে ইনি শিক্ষালাভ করিয়া ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষায় ব্যাকরণ ও সাংখ্যে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম হইয়াছিলেন। আজীবন ব্রহ্মচারিণী এই বালিকাকে দেখিলে প্রাচীনকালের সেই গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির পুণ্যস্মৃতি সহসা চিত্তে জাগিয়া উঠে। (ঢাকা প্রকাশ।)

ইউনিয়ন কমিটীর কার্য্য।

খুলনা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অধীন কয়েকটী ইউনিয়ন কমিটী নূতন স্থাপিত হইয়াছে। বোর্ড এই সমস্ত ইউনিয়নে ৪৫১৲ টাকা করিয়া বাৎসরিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। প্রায় সমস্ত ইউনিয়নই ১৪ ১৫ খানি গ্রাম হইয়া গঠিত হইয়াছে। যখন ইউনিয়ন ছিল না, তখনও প্রায় সর্ব্বত্রই রাস্তা ঘাট ইত্যাদির বাবদ ৫০০৲, ৬০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইউনিয়ন কমিটী হইয়া লোকালবোর্ডের সমস্ত রাস্তা, গ্রাম্য রাস্তা প্রভৃতি সমস্তই ইউনিয়ন কমিটীর আয়ত্তে আসায় গ্রামে বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র। যাঁহারা কমিটীর মেম্বর, তাঁহাদের স্ব স্ব বাটীর ধারের রাস্তা ভিন্ন অন্য রাস্তা, যেখানে সর্ব্বসাধারণের সুবিধা হয়, এমত রাস্তায় কদাচিৎ মাটি পড়িয়াছে। সেই মাটির টাকাও যাহা খরচ হইয়াছে, তাহা বর্ষার প্রারম্ভেই ধুইয়া যাইবে। যে স্থানের মাটি সেই স্থানে পড়িল কিন্তু লাভের মধ্যে গ্রামে একটা ভীষণ অনর্থ সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল। গ্রামে সেনিটেশন সম্বন্ধে একটা নূতন ট্যাক্স হইল, যে দিতে না পারিল তাহার থালা বাটী বিক্রয় হইল। আর সাধারণের অর্থে ২।৫ জনের বাটীর ধারের জল সরিয়া গেল। ইউনিয়ন হইয়া একটা উপকার এই দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক স্থানে ঘোঁট করিয়া দল সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহাদের সহিত বোর্ডের একটু আলাপ পরিচয় আছে, তাঁহাদের কার্য্য অন্যায় হইলেও তাহা সমর্থিত হইতেছে, আর যাহাদের কথা বলিবার কেহ নাই, তাহারা সোজা হইয়া চলিলেও বোধ হয় যেন তাহাদের চলন বক্র। অনেক ইউনিয়নের কর্ত্তারা পরিপার্শ্বস্থ মানবের অশ্বত্থ বৃক্ষগুলি নিজে নিজের আত্মীয়দিগকে নাম মাত্র মূল্য লইয়া বরোয়া বিক্রী করিতেছেন, অথচ কেহ সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। এই যে রাস্তা ঘাট প্রভৃতিতে মাটি দেওয়া হইল, বোর্ড হইতে কি ঐ মাটি মাপিয়া পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে, না ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন? তাহা আমাদিগকে কেহ বলিয়া দিবেন কি? ইউনিয়ন কমিটির মেম্বরগণ নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য না করিলে নিজের দুঃখ সহ্য করিয়া পরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে পরের দুঃখে দুঃখিত হইতে অভ্যাস না করিলে আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশ্যে উহা করিয়াছেন তাহা সমস্তই পণ্ডশ্রম হইবে। বোর্ডেরও কর্ত্তব্য প্রথম প্রথম ইউনিয়নের কার্য্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া দোষসকল দেখাইয়া দেওয়া, তাহা হইলে কর্ম্মচারীদের মনে ভয় থাকিলে কেহই মন্দ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। আমরা বলি, বোর্ডের সুযোগ্য ভাইস-চেয়ারম্যান যদি দেশের অবস্থা বুঝিয়া দেশের লোকদিগকে ডাকিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিয়া তাহাদের আপত্তি মীমাংসা করিয়া দেন, তবেই ক্রমে স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাত হইবে। আশা করি, ইউনিয়ন কমিটির মেম্বরগণ এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন ও কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া দেশের ও দশের শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাসভাজন হইবেন। শ্রীভবনাথ স্মৃতিরত্ন (খুলনা নিবাসী।)

চট্টগ্রামে ডাকাতির মরসুম।

আমরা কিছু দিনের মধ্যে সাতকানিয়া অঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব ও পুলিশের শৈথিল্য সম্বন্ধে অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি। নিম্নে একখানির বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি কর্তৃপক্ষ এই দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন এবং সাতকানিয়ার পুলিশ এই সমস্ত ডাকাতির কিরূপ অনুসন্ধান করিয়াছে তাহারও খবর লইবেন।

১। কলিকাতায় মোটরগাড়ী করিয়া যে সকল ডাকাতি হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি সাতকানিয়াতেও সেই ধরণের ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছে; জনসাধারণের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে। সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে ধন জন প্রাণের আশঙ্কা করিতেছে। কয়েকদিন হইল শুকছড়ি গ্রামের শ্রীবংশীমোহন দের বাড়ীতে একদল ডাকাত পড়ে, তাহাদের সংখ্যা অন্যূন ত্রিশ; কাহারও কাহারও হাতে বন্দুক ছিল, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে গিয়াছিল।

২। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে ধর্ম্মপুর গ্রামে এক পোদ্দারের বাড়ীতে একদল ডাকাত পড়ে। তাহাদের সংখ্যা ৩০ এর উপর, ঐরূপ বন্দুক হস্তে ও অশ্বপৃষ্ঠে। বাড়ীতে মেয়েলোকের উপর নৃশংস অত্যাচার হইয়াছে, এবং অনেক গহনাপত্র ও অনেক নগদ টাকা চুরি গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

৩। তিন চারিদিন হইল আমিরাবাদ গ্রামে শ্রীপীতাম্বর পোদ্দার নামক এক ধনশালী ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতের আক্রমণ হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে অশ্বপৃষ্ঠে ও বন্দুক হস্তে ৫০ জনের উপর লোক বাড়ী ঘেরাও করে, এবং দরজা খুলিয়া দিতে বলে। উক্ত পোদ্দারের এক বন্দুক ছিল, সে বন্দুক আওয়াজ করে; ডাকাতেরাও নিজ বন্দুক আওয়াজ করে এবং দেওয়াল কাটিতে আরম্ভ করে। উপরি উপরি বন্দুকের শব্দে প্রতিবেশী উমাচরণ পোদ্দার জাগে এবং নিজ বাড়ী হইতে নিজ বন্দুক আওয়াজ করিতে করিতে লোকজন সংগ্রহ করিয়া পীতাম্বর পোদ্দারের বাড়ীর দিকে যায়। তাহারা নিকটস্থ হইলে, ডাকাতের দল সম্মুখের শঙ্খাবতী খাল পার হইয়া চলিয়া যায়। সাতকানিয়ার চুরির ঘটনা দৈনন্দিন ব্যাপার। অবশ্য নানা কারণে সকল ঘটনা পুলিশে জানান হয় না। কিন্তু এইরূপ লোমহর্ষণ ঘটনা ইতঃপূর্ব্বে আর সেখানে শুনা যায় নাই। জনরবে প্রকাশ, ডাকাতেরা পূর্ব্বে ঘোষণা করে, অমুক বাড়ী আক্রমণ করিবে এবং সে ঘোষণা অনুসারে আক্রমণ করে।"

নাবালক চোর।

কয়েকদিন হইল স্থানীয় পুলিস এপর্য্যন্ত ৭ সাতজন নাবালক চোর গ্রেপ্তার করিয়াছে। কয়েকজন এখনও

যুক্ত হয় নাই। উহাদের বয়স ১০।১২ বৎসরের অধিক নহে। কেহ কেহ বিস্তৃতরূপে স্বীকারও করিয়াছে যে তাহারা বহুস্থানে চুরী করিয়াছে। কয়েকজন এখনও নাকি অপরাধ স্বীকার করে নাই। কি আশ্চর্য্য! উহারা এত অল্প বয়সে চৌর্য্যবৃত্তি কিরূপে শিক্ষা করিল? লোকেরা ছোট বালকদিগকে হাজতে দেখিয়া আলোচনা করিতেছে যে, আমাদের সুসভ্য গভর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার জন্য যতই চেষ্টা করেন, ততই যেন কুলোকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। সত্য নয় কি? সাধারণ জেলখানায় এতাধিক বদমায়েসের স্থান সংকুলন হইবে না। হিন্দুশাস্ত্রের কথা এই কলিযুগে বদমায়েসের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। এইক্ষণ তাহাই হইতেছে। আমরা প্রাচীন লোক, বাল্যকালে এরূপ বালক চোর কখনও দেখি নাই। ছেলেরা কুল, আম, জাম, গাব ফল ইত্যাদি খাইবার জন্য গৃহস্থদের বাড়ী যাইয়া বাড়ীর লোকের অজ্ঞাতে উহা খাইত। পরের ঘরে প্রবেশ করিয়া বাক্স পেটারা ভাঙ্গিয়া তাহারা মালপত্র অপহরণ করার কথা কখনও ভাবে নাই; একি ভীষণ কাল উপস্থিত। বালকেরা চোরের দল করিয়া চুরী করা আরম্ভ করিয়াছে। "অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি।" (কোনাপুর নিবাসী।)

টিপ্পনী।—দেশের দারিদ্র্য দূর এবং সাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার না হইলে 'অপরস্মা' কি হইবে, তাহা কি আর বলিয়া দিতে কাহাকেও হইবে?

যুবরাজের উপনয়ন

স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ-তনয় শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ বাহাদুরের শুভ উপনয়ন কার্য্য বিগত ২২শে ফাল্গুন তারিখে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরারাজপরিবারে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারগুলি অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে। কালের মাহাত্ম্যে সর্ব্বত্র ক্রিয়া লোপ ঘটিতেছে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজপরিবারে কলির প্রভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই ইহাই আনন্দের কথা।

এই উপনয়ন উপলক্ষে লক্ষ্য করিবার যোগ্য অনেক ঘটনাই ঘটিয়াছে। এখানে এমন কোন শ্রেণীর লোক নাই যাহারা এই ব্যাপারে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করে নাই। নানাবিধ দেবার্চ্চন হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার শুভ অনুষ্ঠানে কয়দিন রাজধানীতে একটা আনন্দ প্রবাহ বহিয়াছিল। দেবার্চ্চন, ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালী-ভোজন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়, আমোদ প্রমোদ সমস্তই অতি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দেবার্চ্চন।—

ত্রিপুরা রাজপরিবারের প্রত্যেক উৎসবেই শ্রীল শ্রীযুক্ত মাণিক্য বাহাদুরের রাজ্য মধ্যে স্থাপিত দেবতার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। উদয়পুরের ৺ত্রিপুরাসুন্দরী ভারতে বিখ্যাত। এই মহাপীঠ এবং নকুলেশ্বর ভৈরব মন্দিরে পূজার অনুষ্ঠান অতি সমারোহের সহিত হইয়াছিল। তারপর ৺চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা। ৺চতুর্দ্দশ দেবতা ত্রিপুর রাজবংশে কুলদেবতা। চতুর্দ্দশ দেবতার সংখ্যা এই,—

"হরোমা-হরি-মা বাণী কুমারো গণেশো বিধুঃ
অব্ধিগঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশঃ॥"

অর্থাৎ হর উমা, হরি মা (লক্ষ্মী), বাণী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, চন্দ্র, আকাশ, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কন্দর্প, এবং হিমালয় এই চতুর্দ্দশ দেবতা ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতা। এই উৎসব উপলক্ষে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজাতেও বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল। ৺বৃন্দাচন্দ্র লক্ষ্মীনারায়ণ জগন্নাথ দেবের পূজাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা রাজদেবালয়ে উৎসবের সময় যে ভাবে অর্চ্চনা হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে প্রাচীনকালে হিন্দুপঞ্চগণ কিরূপে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন, তাহার একটা মনোহর নিদর্শন পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালী ভোজন।—

রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। ৺দুর্গামণ্ডপের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া থাকে। সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ একত্র বসিয়া আহার করিতেছেন। নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইতেছে, ব্রাহ্মণদিগের সম্মান যাহাতে কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয় তৎপ্রতি রাজকর্ম্মচারী সকল সর্ব্বদা সতর্ক, দেখিলেও চক্ষু জুড়ায়। কোনরূপে কোন ব্রাহ্মণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিলে এবং মহারাজ তাহা জানিতে পারিলে বিশেষরূপ শাসনের ব্যবস্থা আছে। এ জন্যই সকলে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকে।

ত্রিপুরা রাজ্যে কাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম। এখানে প্রচুর শস্য জন্মে; কাঠ কাটিয়াও অনেকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বৃটিশ প্রজার মধ্য হইতে অনেকে কাঙ্গালী উৎসবের সময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া থাকে। এ ব্যাপারেও অনুমান হাজার কাঙ্গালী ভোজন ও বিদায় হইয়াছে।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়।—

এই উপনয়ন উপলক্ষ্যে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মহারাজের প্রজার মধ্যে বহুসংখ্যক পণ্ডিত আছেন, এ বিষয়ে ত্রিপুরেশ্বরের ন্যায় সৌভাগ্যশালী স্বাধীন রাজা আছেন কি না সন্দেহ।

নবদ্বীপ ভটপল্লী এবং কলিকাতার অনেক মহামহোপাধ্যায়কল্প পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

কয়েদী মুক্তি।—

যুবরাজের শুভ উপনয়ন উপলক্ষ্যে মহারাজ দয়া করিয়া কয়েকটি কয়েদীকে ও মুক্তি দিয়াছেন। (ত্রিপুরাহিতৈষী)

যাকে বলে 'হিতে বিপরীত,' কন্যা সহ গৃহ ত্যাগ করিয়া পরোক্ষে নিবারণের এবং সাক্ষাৎভাবে শীতল চক্রবর্ত্তীর আশ্রয় গ্রহণে কমলার ঠিক তাই ঘটিল। সকলেই দুঃখিনী কমলার ও তাঁহার কন্যা কুন্তীর হিত চাহিয়াছিল। শিবু করুণার বশবর্ত্তী হইয়াই বলিয়াছিল, ঘোষালদের বাড়ী যদি বিবাহ করি, তবে কুন্তীকে করিব। ছেলের দলও সেই কথা ধরিয়া ঘোট করিতেছিল, যে ভাবে হউক কুন্তীর সঙ্গে শিবুর বিবাহ দেওয়াইবে, অসহায়া দরিদ্রা বিধবার কন্যাটিকে সংপাত্রস্থা করিবে। রোষে ও ঈর্ষায় অম্বিকা ঘোষাল যখন কুন্তীকে সরাইয়া নিয়া যাইতে চান, পাছে সে কুপাত্রে অর্পিতা হয়, তাই কমলা তাহাকে লইয়া গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু হিত চাহিলেই হিত হয় না। দৈব প্রতিকূল হইলে, ঘটনা চক্র এমনই ভাবে আবর্ত্তিত হয় যে, সকল হিত চেষ্টা সেই চক্রে ঘুরিয়া দারুণ বিপরীত ফলই প্রসব করে। এ ক্ষেত্রেও তাই হইল। নিবারণের সহায়তা নিলে কুলোকে কুকথা চলিবে, কমলা তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু নিবারণ ব্যতীত আর কেহ এই বিপদে সাহস করিয়া তাঁহার সহায় হইবে, এরূপ ভরসা তিনি করিতে পারেন নাই। শীতল চক্রবর্ত্তীর গৃহে সেই রাত্রিতে যে তিনি গিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন, তাও ওই নিবারণের বলে। নহিলে যতই নিকট আত্মীয় হউক, সে কি তাঁহাকে আশ্রয় দিতে ভরসা পাইত? তবে এই সাহায্য যত দূর সম্ভব গোপনেই তিনি নিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গোপন রহিল না। শীতল চক্রবর্ত্তী একা সাহস করিয়া গিয়া কমলাকে আনিতে পারিলেন না,—নিবারণকে সঙ্গে যাইতে হইল। গভীর অন্ধকার রাত্রি আঁধার পথ, কোথা হইতে বোসেদের সরকার নিমাই ঘোষ তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। নিবারণ আবার লুকাইতে গিয়া ধরা পড়িল।

ক্রুদ্ধা বামার অসংযত রসনা হইতে যে কথা বাহির হইয়াছিল, চন্দ্রমণি তার ইঙ্গিত সর্ব্বত্রই দিয়া আসিয়াছেন। লোক ত কত রকম আছে। আর বয়সের কালে কে কি না করিতে পারে? কেহ কেহ এই কথা লইয়া কাণঘুষা করিতেছিল। সে দিন বৈকাল হইতে বামা অত্যুচ্চকণ্ঠে স্পষ্টই এই কথা তুলিয়া কুৎসিৎ গালিবর্ষণ করিতেছিলেন। পাড়ার লোক বধির নয়, সকলেই তা শুনিয়াছিল। তার পর বামার যখন ক্রোধোন্মাদ দেখা দিত, একস্থানে দাঁড়াইয়া কি বসিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। কখনও ধাইয়া ধাইয়া গিয়া ক্রোধের পাত্রের উপরে অগ্নিবর্ষণ করিতেন, কখনও পুকুর ঘাটে, কখনও এ বাড়ী, কখনও ও বাড়ী ধাইয়া যাইতেন, যাকে সম্মুখে দেখিতেন, তার সম্মুখেই মুক্তকণ্ঠে অগ্নি উদ্গীরণ করিতেন। সুতরাং পাড়ায় সে দিন এ কথা লইয়া অনেক আলোচনা, অনেক মন্তব্য হইয়াছিল। এমন একটা কাণ্ড হইবে, বিচিত্র কি—এরূপ কথাও অনেকে বলাবলি করিয়াছিল। বিশেষ ওপাড়ার লোক হরি ঘোষাল ও বামার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন না থাকিলেও, বোসেদের অনুগত সকলেই প্রায় ছিল, অম্বিকা ঘোষালকেও খাতির অনেকে করিত। সেই অম্বিকা ঘোষালের কন্যার সঙ্গে স্থিরপ্রায় বিবাহ সম্বন্ধ যে গাঙ্গুলীরা ভাঙ্গিয়াছিল, তাহাও তাহাদের প্রীতিকর হয় নাই। পাড়ার লোক—বিশেষ জ্ঞাতিরা বেশ একটু অপমানই ইহাতে বোধ করিয়াছিল। নিবারণের সঙ্গে ঘোষালদের বিবাদই যে এই সম্বন্ধভঙ্গের মূল কারণ, তাহাও সকলে জানিত। সুতরাং নিবারণের প্রতি তাঁহাদের অপ্রসন্নচিত্ত তখন সকলের আগে তাহার নামের দোষের কথাটাই যে ধরিয়া নিতে চাহিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

পর দিন সকালে যখন দেখা গেল, কমলা কন্যাপুত্র সহ শীতল চক্রবর্ত্তীর গৃহে আশ্রয় নিয়াছেন, আর ইহাও শুনা গেল যে নিবারণই শীতল চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ইহাদের তাহার গৃহে নিয়া রাখিয়াছে, গ্রামে তুমুল একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। বোসেদের সরকার নিমাই ঘোষ, কোথায় কি অবস্থায় ইহাদের দেখি

নিবারণ যে গাছের আড়ালে লুকাইয়াছিল, আবার নিমাই ঘোষের কৌশলে ধরা পড়িয়া স্বীকার করিয়াছিল, দরকারী কোনও গোপনীয় কাজে যাইতেছে, কেহ দেখে, তা সে চায় না, শীতল চক্রবর্ত্তী যে কেমন থতমত খাইয়া গিয়াছিল, কেমন একটা হাস্যকর বাজে ওজর দেখাইয়াছিল, ইত্যাদি সব কথা বিবৃত, পুনর্ব্বিবৃত, সালঙ্কারে পুনঃ পুনঃ বিবৃত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে! এত এক রকম হাতে হাতে ধরা পড়া! হরি ঘোষাল যেমনই হউক, অম্বিকা ঘোষাল বিবেচক ও বিচক্ষণ লোক। কলঙ্কের কথা টের পাইয়াই সে মেয়েটাকে সহরে তার বাসায় নিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, সেখানে গিয়া সে যে করিয়াই হউক বিবাহ দিত। কিন্তু রাত্রিতেই নিবারণ তাহা টের পাইয়া উহাদের সরাইয়া শীতল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে নিয়া রাখিয়াছে। টেরই বা পাইল কি প্রকারে? নিশ্চয়ই রাত্রিতে সেখানে গিয়াছিল। আর মা মাগীইবা কেমন? নিজের পেটের মেয়ে—আ ছি ছি ছি! পেট না চলে ভিক্ষা করিয়া কেন খায় না? না হয় মেয়ে লইয়া সহরেই যাইত। কত বড় লোক জামাই জুটিত! কিন্তু গ্রামে বামুনের ঘরে পাঁচজন সামাজিকের মধ্যে—ছি ছি ছি—এ কি সব কাণ্ড। আর নিবারণ—সেই কি ভাবিয়াছে! এত বড় বুকের পাটা তার কিসে হইল? হতভাগা ছেলেগুলো, তার কথায় নাচে, যা বলে তাই করে,—তাই কি সে মনে করিয়াছে, বামুনের ঘরে এত বড় একটা জাতমারা কাণ্ড করিবে, আর কেহ তাহাকে কিছু বলিবে না? না না, ভদ্রলোকের ছেলে কাহাকেও আর তার ছায়া মাড়াইতেও দেওয়া উচিত নয়!

শরৎ দুপুরের আগেই নিবারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, "আমি সবাইকে খবর দিয়েছি। বিকেলে নদীর পাড়ে আমাদের ক্ষেতের ধারে গিয়ে সব মিলব। একটা ঠিক ক'রে নিতে হবে, কি করা যায়। এখন তুমিও যেও নিবু।"

নিবারণ একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি যাব না শরৎদা, যাওয়াও আমার উচিত নয়। হয়ত মন খুলে সবাই কথা ব'লতে পারবে না। ব্যাপার এসে যে রকম দাঁড়াল, আমার কাউকে কিছু ব'লবার মুখ নেই। তোমরাই যা ভাল মনে হয়, ঠিক করগে। দৈব দোষেই হ'ক আর বুদ্ধির দোষেই হ'ক, যে বিপদ মাথার উপরে এনে ফেলেছি, আর কাউকে তার জন্যে কোনও ক্লেশ দিতে চাইনে। তবে নিজের জন্যে কিছু ভাবতাম না শরৎ দা। লোকে আজ যাই বলুক,- ধর্ম্মের কাছে খালাস আছি, আজ না হ'ক কাল অনেকেই সেটা বুঝবে। তবে অভাগী মেয়েটা একেবারে গেল। যদি বিশ্বাস কর, সে নির্দ্দোষ, তবে আমার কথা ভুলে যাও—তাকে যদি এই বিপদ থেকে উদ্ধার কত্তে পার, বড় একটা কাজ করবে। কুমারী মেয়ে, দুঃখিনী ওই মা বই কেউ তার এ পৃথিবীতে নাই। তার যে একেবারে সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে! বুঝতে পারবে না শরৎ দা? আর আজ যে এ দুর্গতি তার হ'ল, তার জন্যে—তার জন্যে—সবাই আমরা কিছু দায়ী।"

শরৎ উত্তর করিল, "কিছু কেন নিবু, পুরো দায়ীই একরকম আমরা! আচ্ছা দেখ্‌ব,—আর সবাই ত্যাগ করলেও আমরা তাকে ত্যাগ ক'রব না। তবে কি জানিস নিবু, কাঁটা যে ছড়ায়, সেও তা সব তুলে আন্‌তে পারে না। কালী ঢাল্‌লে, হাজার ধুয়েও সে দাগ একেবারে মুছে ফেলা বড় শক্ত। কুমারী মেয়ে—এ দাগ তার পক্ষে বড় সর্ব্বনেশে দাগ। তবে—দেখা যাক্ কি করা যেতে পারে।"

শরৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। নিবারণের চক্ষু মুখ রক্তবর্ণ, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল। হায়, সেই বজ্রাগ্নির জ্বালা আজ কেবল তার নিজের বক্ষকেই দগ্ধ করিতে পারে! বজ্রমুষ্টির সেই কঠোর আঘাত নিজের বক্ষই কেবল ভাঙ্গিতে পারে। এই পাপ যারা সৃষ্টি করিয়াছে, আজ বড় ফাঁক বুঝিয়াই সাংঘাতিক এই ঘা-টাই তারা দিয়াছে! যারা অপরাধী, তাদের যে সে আজ স্পর্শও করিতে পারে না। হায়, দুঃখীর উপরে এই লাঞ্ছনায় এই পীড়নে পাপের আজ এই প্রভুত্ব কিসে সম্ভব হইল? দেবতারা কি সত্যই নিদ্রিত আছেন। নিদ্রাও ভাঙ্গে। কিন্তু অমর লোক কি আজ সত্যই মৃত্যুর কবলিত হইয়াছে?

শরৎ কহিল, "একটু ঠাণ্ডা হয়ে থাকিস্ নিবু,- মনটা শক্ত ক'রে তোল্। রেগে অধীর হ'য়ে কোনও ফল নেই নিবু।"

"সব বুঝি শরৎ দা, কিন্তু তবু পাচ্ছিনে। সব চেয়ে

বড় দুঃখ শরৎ দা, নিজের মার কাছে, স্ত্রীর কাছে পর্য্যন্ত মুখ তুলে আজ চাইতে পাচ্ছিনে?"

"কেন, তাঁরাও কি তোকে বিশ্বাস করেন না?"

"জানিনা শরৎ দা। তবে বড় বেকুব হয়ে পড়েছি আমি। কথাটা এমনই একটা সত্যের আকার ধ'রে উঠেছে যে আমাকে দোষী ব'লে সন্দেহ ক'রে কাউকে দোষ দিতে পারিনে কিছু।"

"অনেক মিথ্যাই এ পৃথিবীতে এমন সত্যের অকার ধ'রে উঠে থাকে। কিন্তু যারা জানে, তারাও কি মিথ্যা সেই আকারটাকে মেনে নেবে? তাঁরা স্তব্ধ হয়ে গেছেন। যাবারই ত কথা। সঙ্কটটা যে বড়ই জটিল হ'য়ে উঠছে। নিষ্কৃতির পথ বড় সহজে কারও চোখে পড়ছে না।

শরৎ চলিয়া গেল। বৈকালে নদীতীরে ছেলের দল সমবেত হইল। নিবারণকে তারা অতি অন্তরঙ্গ ভাবেই জানিত,—এমন একটা দুষ্ক্রিয়া যে তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব হইতে পারে না, একথা কোনও যুক্তির দ্বারা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হইল না। ভিতরকার সব কথাই তারা জানিত,—ইহাও তারা বেশ বুঝিল, এই দুর্ঘটনার জন্ম তারাই প্রধানতঃ দায়ী। বাড়ীর প্রবীণ প্রবীণারা যাহাই বলুন, এই বিপদে নিবারণের সহায় হইয়াই তাহাদের দাঁড়াইতে হইবে, আর অনাথা কমলা ও কুন্তীকে এই কলঙ্ক ও অন্য সামাজিক নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা তাহাদের করিতে হইবে। করিতে তাহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। সকলেই একবাক্যে এই মন্তব্য প্রকাশ করিল।—শরৎ তখন কহিল, "এর একমাত্র পথ শিবুর সঙ্গে না হয়, আর কোনও সৎপাত্রে কুন্তীর বিবাহ দিতে হবে। গাঁয়ের বুড়োরা কেউ না আসুক, আমারা সামাজিক হব, আমরা চাঁদা তুলে ভোজ দেব, আমরা খাব! কেমন, রাজি?"

"হাঁ, রাজি! রাজি!" একবাক্যে এই সম্মতির ধ্বনি উঠিল।

সকলে তখন শিবুর দিকে চাহিল। বন্ধুবর্গের সমবেত জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখে শিবুর বিশুষ্ক বিবর্ণ মুখখানি নত হইয়া পড়িল। ক্ষীণকণ্ঠে সে কহিল "তোমরা যদি বল, আমিই কুন্তীকে বিবাহ ক'রব। তবে—"

শরৎ কহিল, "তবে—পারবে না শিবু। না শিবু, লজ্জা পেওনা, দুঃখিত হ'য়োনা,—তুমি পারবে না। বাপ মার তাড়না, গ্রামশুদ্ধ লোকের ধিক্কার—না শিবু এতটা চাপ ঠেলে উঠ্‌তে তুমি পারবে না। এতটা বল—বড় বেশী বল চাই শিবু—ভাঙ্গবে না বাঁক্‌বে না—শক্ত লোহার মত পাথর ভাঙ্গা পাকা সার কাঠের মুগুর হওয়া চাই যে—নিতান্ত কোমল স্বভাবের ছেলে মানুষটী তুমি তা পাব্‌বে না।"

অবিবাহিত ব্রাহ্মণ যুবক আর যে যে ছিল, সকলেই তখন বলিয়া উঠিল,—"আমি ক'র্‌ব, আমি ক'র্‌ব!"

শরতের একটু হাসিও পাইল। কহিল, "যদি সেকাল হ'ত,স্বয়ম্বর সভা ডেকে তোদের বসিয়ে দিতাম,' কুন্তী বেছে নিত। কিন্তু একটা বড় দাদার মত—আমি তোদের মধ্যে আছি। অনেক দেখেছি—অনেক ঠেকেছি—অনেক শিখেছি! আমার কথাটা একটু শুনিস্। ভাবের মুখে শক্ত একটা পণ কেউ ক'রে ফেলিস্‌নে এক্ষুণি। কাজটা যত সহজ ভাবছিস্, তা নয়। একদিনের মত একটা বাহাদুরী এ নয়। জীবনের মত একটা বড় ভার নিতে হবে। অনেক তাড়না অনেক কুকথা—বছরের পর বছর—বহুদিন ধরে—হয়ত বা জীবন ভরেই শুনতে হবে। আজকার এই ভাবের ঢেউ প'ড়ে গেলে—সেটা সইতে পারা বড় সহজ হবে না। ভাব যেখানে বড় উথ্‌লে উঠে, উল্টো দিকে নেমেও যায় আবার তেমনি বেশী। সেটা বড় কঠিন পরীক্ষা, সবাই সে অবসাদের ভার সইতে পারে না। তারপর সকলের বড় কথা—যার যার মনের দিকে চেয়ে দেখ্, যতদূর তল পর্য্যন্ত দেখতে পারিস তীক্ষ্ণ খোলা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্,, অনেক কথা আমরা মুখে প্রাণান্তেও স্বীকার করি না,—কিন্তু মনথেকে একেবারে মুছে ফেলতও পারিনে। চেয়ে দেখ্—মনের তলে কি কোনও কোণে কোথাও যদি একটু সন্দেহের দাগ কারও প'ড়ে থাকে, হাজার রগড়ানতেও যা উঠতে চাচ্ছে না,—তা হ'লে তাকে দুহাজারবার বলি এর মধ্যে মাথা দিস্ নি। বিয়ের পরটা বরাবরই এমন রোমান্সের মত মধুর থাকে না। ঝাল তেতো টক কটু সব রকম রসই কিছু কিছু তার মধ্যে দেখা দেয়। কোন্ রসটার স্পর্শ পেয়ে কখন যে ঐ দাগটা শেষে একটা বিসের ক্ষতে পেকে উঠ্‌বে, কেউ ব'ল্‌তে পারে না।

একটু ভেবে দেখ্ তোরা- যার যার মন বেশ ক'রে পরীক্ষে করে দেখ্। এত তাড়া কিছু নেই। দশদিন বাদে বল্লেও চ'ল্‌বে। হালকা ভাবে আর এসব কাজে হাত দিস্‌নি, এক শিবুর সঙ্গে বিয়ের কথা তুলে এতখানি কাণ্ড হ'ল। কে কতদূর কি পারবি জানিনে। আজ এর সঙ্গে কাল তার সঙ্গে মেয়েটার নাম যোগ ক'রে— আর কেলেঙ্কারী করিস্‌নে। আরে ছ্যা! অনাথা কুলের মেয়ে— এই ভাবে আজ বিপন্ন হ'য়ে প'ড়েছে—তাই ব'লে আজ এর হাতে, কাল ওর হাতে আমরা তাকে বিলিয়ে দিচ্ছি, এমন খেলনার মত তার নামটা ব্যবহার ক'রে তার অপমান ক'ত্তে পারি, এ অধিকার আমাদের নেই!"

সকলেই নীরব! কথাগুলির গুরুত্ব সকলেই অনুভব করিল। ভাবের দিক হইতে চিন্তার দিকে সকলের মন তখনকার মত ফিরিল। কিছুক্ষণ পরে যতীন কহিল, "শরৎদা!"

"কি ভাই যতীন?"

"একটা কথা হঠাৎ মনে উঠল।—কিছু মনে ক'র্‌বে না ত? তা হ'লে বলি।"

"কি, বল।"

"তোমায় পরীক্ষা করবার জন্য কথাটা তুল্‌ছি না। নিবু দার উপর দোষী ব'লে একটুখানি—কণার মতও একটু সন্দেহ তোমার মনে নেই ত?"

"না। এই ব্যাপারে আমি যেমন নিষ্পাপ, নিবুকেও আমি ঠিক তেমনই নিষ্পাপ মনে করি।"

যতীন কহিল, "তুমি ব'লছিলে না, ভাঙ্গবে না— বাঁকবে না লোহার মত শক্ত, পাথরভাঙ্গার সার কাঠের মুগুর হওয়া চাই। সে মুগুর নিবুদা ছাড়া, আমাদের ভিতর কেউ যদি আর থাকে, তবে সে তুমি। আমাদের সবার চাইতে অনেক বেশী হিসেবীও তুমি,— না বুঝে কেবল ভাবের খেয়ালে কোনও কাজ তুমি ক'রবে না। তা ব'ল্‌তে বড় লজ্জা করে, একথা এখন তোমায়—কিন্তু তুমি কি—"

"আমি!—আমি নিজে কুন্তীকে বিয়ে ক'ত্তে পারি কি না।"—বলিতে বলিতে শরতের মুখখানি একটু লাল, চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুদিন হইল তার স্ত্রী পিত্রালয়ে একটী সন্তান প্রসবকালে মারা গিয়াছে। আঘাতটা শরতের প্রাণে বড় বেশী লাগিয়াছিল। এখনও সে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই।

পুলিন কহিল, "যতীন বড় বেকুবের মত কথাটা বলে ফেলেছে শরৎদা।—এখনই দরকার ছিল না কিছু। যাক্ না কিছুদিন, শেষে যা হয় হবে।"

শরৎ আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "না এর একটা মীমাংসা এখনই হ'য়ে যাক্। আজ মনটা যতই ভেঙ্গে যাক্, বিয়ে হয়ত আবার করতেই হবে। সবাই করে আমি কি এমন বীর যে না ক'রে পারব। হাঁ, তোদের চাইতে আমার পক্ষেই এটা সব চেয়ে বেশী সহজ হবে আমি ঝানু হয়ে গেছি, যা গুঁতো তোদের চাইতে বেশী সইতে পারব বইকি? বেশ, তাই হবে, আমিই কুন্তীকে বিয়ে করব! তবে আর কটাদিন যেতে দিস্, মনটা এখনি---"

বলিতে বলিতে শরৎ চুপ করিল,—যতীন কহিল, "থাক্ শরৎদা, আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। এত তাড়া কি?— কবে কি হবে না হবে, এর পর যখন হয় ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে।"

শরৎ কহিল "না, আরও গোটাদুই কথা দরকার। হাঁ আমিই ক'র্‌ব। কথা ঠিক রইল—যদি এর মধ্যে আর কেউ সত্যি ভালবেসে তাকে বিয়ে ক'ত্তে না চায়— সেটা কিছু অসম্ভব নয়। তবে ওরা রাঢ়ী, আর আমরা বারেন্দ্র,—সমাজে এ নিয়েও গোল হবে। তা তোরা আছিস, পাছে দাঁড়াবি,—কিচ্ছু ভাবিনে আমি। আর একটা অনুরোধ আমার—কথাটা নিয়ে গাঁয়ে যেন আগে থেকেই একটা ঘাঁটাঘাটি না হয়।—আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত চল্, এখন ঘরে যাই। নিবুকে খবরটা দিতে হবে। আমিই তাকে বুঝিয়ে সব ব'লব। কিন্তু—আজ আর পারব না। একটা রাত যাক্—মনটা একটু হাল্‌কা হক্- কাল যা হয় দেখা যাবে।"

শরৎ উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিল,—যার যার ঘরে চলিয়া গেল। শিবু লজ্জায় একেবারে এইটুকু হইয়া গিয়াছিল। ঘরে গিয়া নিঃশব্দ শুইয়া রহিল।

(৩৫)

নিবু ভাবিয়াছিল, তার বন্ধুরা কেহ কেহ সন্ধ্যার পর

আসিয়া সংবাদ দিবে, তারা কি স্থির করিল। কিন্তু রাত্রি হইয়া গেল,—কেহই আসিল না। নিরাশার বড় গভীর একটি নিশ্বাস সে ত্যাগ করিল। তার দলও তবে আজ ভাঙ্গিয়া গেল—তার এমন বন্ধুরাও তাকে দোষী বলিয়াই সন্দেহ করিয়াছে। তারাও এই সঙ্কটে আসিয়া তার পাশেই দাঁড়াইবে না। কিন্তু শরৎদা,—সেও কি তাকে ত্যাগ করিবে? না—না, তা যে একেবারেই সম্ভব নয়। এই ওবেলা সে আসিয়াছিল, কই, সে ত তাহাকে অবিশ্বাস করে নাই। আরও অনেকে আসিয়াছিল, কই তাদের কথায়ও ত এমনটা সে বুঝিতে পারে নাই যে তারা তাকে সন্দেহ করে? তবে কি হইল?—কেহ আসিল না কেন? তবে কি সমবেত হইয়া সকল অবস্থা আলোচনা করিয়া তারা সকলে না হউক অনেকে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তার সঙ্গে আর সংস্রব তারা রাখিতে পারে না? মনটা নিবারণের একেবারে দমিয়া গেল। চিত্তের দৃঢ়তা তার অসীম ছিল,—কিছুতে সে কখনও টলে নাই। কিন্তু আজ সে একেবারেই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

যাহাই হইয়া থাক, সে জানিতে চায়। কণ্টকপূর্ণ এই সন্দেহ যে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। শিবুকে সে ডাকিয়া পাঠাইবে? না—না। ছি! শিবুকে মুখ দেখাইতেও যে তার আজ লজ্জা করিতেছে! আবার কে জানে, শিবুর মা বাপ হয়ত কত কি ভাবিবেন। তার চাইতে শরৎদার কাছে একবার গেলে মন্দ হয় না। নিবারণ উঠিয়া বাহির হইল। অন্ধকারে কে যেন এদিকে আসিতেছে। শরৎদা কি?—না—না। এযে—তাই ত—শীতল চক্রবর্ত্তী!

"কে। নিবু নাকি?"

"আজ্ঞে, হাঁ, আসুন।"

শীতল চক্রবর্ত্তী চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় গিয়া উঠিলেন। ঘরের মধ্য হইতে একখানি মাদুর আনিয়া নিবারণ তাঁহাকে বসিতে দিল। শীতল চক্রবর্ত্তী বাস্তবিকই বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।—লোকে না বলিতেছিল, এমন কথা নাই। বাড়ীতে আসিয়াও কতজনে কত গালি দিয়াছে। ঘোষালদের লোক আসিয়া কত শাসাইয়া গিয়াছে। চক্রবর্ত্তী তাদের জাতি মারিয়াছে। তারাও দেখিবে, তার জাতি লইয়া সে কেমন করিয়া এই কালীপুরে বাস্তব্য করে! তারপর গৃহিণী পণ করিয়াছেন, আজ রাত্রিতেই এ পাপ বিদায় না করিলে তিনি পুত্র কন্যাদের সহ গৃহত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে বা অন্য কাহারও গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। অথবা তাহাদের হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইবেন তবু এই জাতি মারা কলঙ্কের সংস্রবে থাকিবেন না। লোকে যা না বলিবার তা তাঁহাকে বলিতেছে। কেন তিনি এমন সহিতে যাইবেন?

সকল দুঃখের কথা বিবৃত করিয়া উপসংহারে তিনি কহিলেন, "কি বিপদেই আমাকে ফেলেছ বাবাজি, মনের অগোচরে পাপ নেই, ভেতরে কি আর আছে না আছে, তোমরাই জান। তা বাবা ছাপোষা গরীব লোক আমি, পরের ছেলে ঠেঙ্গিয়ে কোনও মতে পেটের ভাত ক'রে খাই। জাতমারা হ'য়ে যদি থাকি, ছেলেও ত কেউ আর আমার কাছে প'ড়তে পাঠাবে না। তা বাবা, তোমাদের বল আছে, দল আছে, আমাকে এখন এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।"

নিবারণ একেবারে বসিয়া পড়িল। মুখে কোন কথাও তার সরিল না। শীতল চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "তা হ'লে কি হবে বাবা? আমি ত আর ওদের বাড়ীতে রাখ্‌তে পারিনে।"

নিবারণ কহিল, "আজকার রাতটা অন্ততঃ থাক্ খুড়ো, কাল সকালে যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রব।"

"না বাবা, সে আর হয় না। গিন্নী যদি সত্যি ছেলেপিলে-গুলোর হাত ধরে বেরিয়ে পড়েন, কি উপায় ক'রব তখন? লোকে আমাকে কি ব'লবে? আবার ওই ঘোষালরা ক্ষেপে আছে, তাদের অসাধ্য কাজ নেই। কতকগুলো গুণ্ডা বদমায়েস পাঠিয়ে যদি উৎপাত একটা ঘটায়, গেরস্ত লোক আমি ঝি বউ ঘরে আছে—না বাবা, রাত্তিরটা আর আমি রাখ্‌তে তাদের পারব না। যা হয় উপায় একটা তুমি কর।"

"আচ্ছা যান তবে। রাত্রিতেই যা হয় ব্যবস্থা একটা ক'রব।"

"তা হ'লে কখন—"

নিবারণ একটু উত্তেজিত স্বরে কহিল, একেবারে সময় ক'রে দিতে পাচ্চিনে খুড়ো। একটা ব্যবস্থা ত আমার ঠিক ক'রে নিতে হবে। রাত্রির মধ্যেই আপনি নিষ্কৃতি পাবেন। তবে যতক্ষণ আমি কিছু ক'ত্তে না পারি, পথে তাদের

বের করে দেবেন না। তা হ'লে ভাল হ'বে না জানবেন।"

চক্রবর্ত্তী একটু ভয় পাইলেন। কারও ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা দেখ! রাম মারিলেও মরণ, রাবণ মারিলেও মরণ, হতভাগা মারীচের মত কি উভয় সঙ্কটেই তিনি পড়িয়াছেন! শেষে কহিলেন, "আচ্ছা, তবে যাই বাবা। পথে কেন বের ক'রে দেব? কমলা ত আমার পর নয়। তা বাবা, দুঃখী মানুষ—পাঁচজনের মুখ চেয়ে আমাকে চ'লতে হয়। তা তুমি বাবা অবিবেচক নও, যা হয় উপায় একটা আজ রাত্রিতেই ক'রো।"

শীতল চক্রবর্ত্তী উঠিয়া গেলেন। নিবারণ স্তব্ধভাবে সেইখানেই বসিয়া রহিল। কতকক্ষণ পরে ভবানী ঠাকুরাণী একটি প্রদীপ হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন।

"নিবু!"

"কি মা!"

"একা এইখানে আঁধারে ব'সে আছিস? আয় ঘরে আয়, খাবি দাবি না?"

"মা!" নিবারণের কণ্ঠস্বর কম্পিত, চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

"কি বাবা?" মাতার স্বরে বড় গভীর স্নেহময় একটা সমবেদনার করুণধ্বনি নিবারণ অনুভব করিল। তার সঙ্কোচ দূর হইল। প্রায় কাঁদিয়া সে কহিল, "বড় যে বিপদে প'ড়লাম মা। আর যে কূল দেখছি না কিছু।"

"ধর্ম্ম আছেন, তিনিই কূল দেবেন। কাঁদিস্‌নে বাবা, কাঁদিস্‌নি। আয় ঘরে আয়, ভাত খাবি আয়। সারাদিন বাইরে একা পড়ে আছিস্‌। আমি আবাগীও একটিবার এসে তোকে ডাকিনি।"

প্রদীপটি দাওয়ায় রাখিয়া ভবানী কাছে গিয়া পুত্রের হাত ধরিলেন। একটা বাতাসের ঝাপটা আসিয়া প্রদীপটি নিভিয়া গেল। অন্ধকার, কেহ কোথাও নাই। এ দুঃখ, এ লজ্জা আর কেহই দেখিবে না। দুটি হাত বাড়াইয়া নিবারণ মাকে জড়াইয়া ধরিল,—মার স্নেহময় বক্ষে মুখখানি রাখিয়া মুক্তপ্রাণে কাঁদিল। পুত্রের অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে ভবানী কহিলেন, "চুপ কর, চুপ কর বাবা। আর কাঁদিস্‌ নি। তোর এ চোকের জল যে আমি একেবারেই সইতে পারিনে বাবা। ভয় কি, ধর্ম্ম আছেন, তাঁর ভরসা রাখ, তিনিই সব দিক রক্ষে ক'রবেন।"

নিবারণ কহিল, "মা তুমি আমায় বিশ্বাস কর? ধর্ম্ম আমার সহায় আছেন, সত্য এ কথা নিজের মনে বুঝছ ত?"

ভবানী কহিলেন, "নিবু! তুই কি পাগল হ'য়েছিস্‌! তোকে পেটে ধ'রেছি, আমার কোলেই এত বড় হ'য়েছিস্‌। তুই কি আমার অচেনা কেউ? এতবড় একটা পাপ তুই ক'ত্তে পারিস্‌, তাকি আমি কখনও মনে ক'ত্তে পারি? তাই ভেবে কি সারাটি দিন তুই বাইরে একা পড়ে আছিস্‌ নিবু? ওরে পাগল, আমি যে মা! এ ত মিছে কথা। সত্যি একটা দোষ কল্লেও কি আমি তোকে বুকছাড়া ক'ত্তে পারি? আমি তোকে ডাকিনি। মনটা খারাপ, বড় একটা লজ্জা পেয়েছিস্‌, একলা হয়ত একটু সোয়াস্তিতে থাক্‌বি, তাই আমি আর এসে ত্যক্ত করিনি তোকে। তা তুই কি মনে ক'রেছিস্‌, ঘেন্নাকরে কি রাগ ক'রে তোর তত্ত্ব আমি করিনি? ওরে, দোষ ক'রে থাক্‌লেও কত বড় বিপদে তুই প'ড়েছিস্‌, আজ এই বিপদে কি মা পারে ছেলের উপর বিরূপ হ'য়ে থাকতে?"

নিবারণ কহিল, "লজ্জা আর গ্লানি যাই হক্‌—বিপদের কথা যদি বল মা, বিপদ আজ আমার আর কতটুকু? কিন্তু কন্তী আর কন্তীর মার কথা একবার ভেবে দেখ দিকি? তারা যে একেবারে অকূল পাথারে ভাস্‌ল। চকোত্তী খুড়ো এই মাত্র এসেছিলেন, ব'লে গেলেন, আর তাঁদের তাঁর বাড়ীতে তিনি রাখ্‌তে পারবেন না। আজ রাত্রিতেই একটা ব্যবস্থা ক'ত্তে হবে।"

"তাই নাকি! সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?"

"উপায় আর কিছুই নেই মা। তোমাকেই আজ তাদের আশ্রয় দিতে হচ্ছে। নইলে, ঘরছাড়া জাতমারা একেবারে নিরাশ্রয় হ'য়ে আজ রাত্রিতেই তাদের পথে গে দাঁড়াতে হবে।"

ভবানী নীরব। ইহা ছাড়া সত্যই আর গতি নাই। কিন্তু ইহাতেও যে কত বাধা, কত অসুবিধা, কত বিবেচনার কথা আছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়া একেবারে নির্ব্বাক্‌ হইয়া গেলেন।

নিবারণ কহিল, "কি বল মা? দুটি অনাথা নারী আর

একটি শিশু যার বাড়া হ'তে পারে না. এমন বিপদে আজ প'ড়েছে। তুমি ছাড়া তাদের আশ্রয় কোথাও আজ এই পৃথিবীতে আর নেই। সে আশ্রয় কি তাদের দেবে মা?"

"যদি না দিই বাবা, মানুষের ধর্ম্ম আমার থাকবে না। কিন্তু—"

"কিন্তু আর তবে কি মা?"

"বাবা, বৌমাকে সব বল। আমি যে একা নই। এ ঘর যেমন আমার, তেমন তারও। তার অধিকারে কোনও জবরদস্তী আমি ক'ত্তে পারি কি?"

"তার অধিকার! তাকি —তোমার উপরে মা?"

"কতক কতক উপরে বই কি বাবা? আমি মা, তোমায় আর বলব কি? আজ এই যে কলঙ্ক লোকে দিচ্চে, সত্যি হলেও আমি তোমায় যত সহজে বুকে তুলে নিতে পারি সে তা পারে না। কুন্তীকে যদি আজ বিয়ে ক'রে তুই ঘরে নিয়ে আসিস্, আমি তাকে বউ বলে বরণ করে ঘরে তুলে নেব। কিন্তু সে কি তাকে বোন্ ব'লে তেমনি হাত ধরে নিতে পারে? অন্য কোনও কথা হলে, তার মতের অপেক্ষা আমি ক'ত্তাম্ না। কিন্তু এ যে আলাদা রকম কথা। এতে এ ঘরে আমার চেয়ে তার অধিকার অনেক বেশী। কি আর ব'লব, বুঝতেই ত পার বাবা? তাকে বল, সে লক্ষ্মী মেয়ে—হয় ত বুঝবে, তোমাকে অবিশ্বাস কিছু করবে না, সে যদি আপত্তি কিছু না করে, আমি নিজে গিয়ে কুন্তীকে আর কুন্তীর মাকে নিয়ে আস্‌ব।"

"যদি আপত্তি করে?"

"তা হ'লে—তুমি এর মধ্যে একেবারেই যেতে পার না। আমি—হাঁ, তাই ক'ত্তে হবে—আলগা হ'য়ে তাদের আমার ঘরে এনে রাখব।—আমার সেই ঘরে তোমাদের আর কোনও ঠাঁই থাকবে না বাবা।"

নিবারণ একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "দাদা আমায় ত্যাগ ক'রেছেন, মাসোরা ধরে দিচ্ছেন। আমাকেও শেষে তাই ক'ত্তে হবে! খুব দুটি সুপুত্র পেটে ধরেছিলে মা।"

"অত বড় একটা গাল আমাকে দিস্‌নি নিবু। কুপুত্র আমি পেটে ধরিনি।—যাদব—ভুল একটু যাই করুক,—আমায় ত্যাগ করেনি। তুইও কি আমায় ত্যাগ ক'রবি? বাইরে অবস্থার গতিকে আলগা একটু রইলামই বা! মা বলে কি আমায় মনে রাখ্‌বিনে? না, যাদবই রাখবে না? না বাবা, তেমন ছেলে তোদের আমি পেটে ধরিনি। আয়, এখন উঠে আয়। রাত হ'য়ে গেল। খেয়েদেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বৌমাকে সব ব'লব।—ভালমানুষের মেয়ে সে, তোকে দুঃখ দেবে না। যাই হ'ক, আজ রাত্রিরেই একটা ব্যবস্থা ত ক'ত্তে হবে। আহা, অভাগীদের শেষে পথে বের করে না দেয়।"

নিবারণ উঠিয়া মার সঙ্গে ভিতরে গেল।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গভাষা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা। বিনা স্বদেশীভাষা পুরে কি আশা।" আমরা ইংরাজি ভাষায় যতই দিগ্‌গজ হই না কেন এমন কি আমাদের অতীতের গৌরব সংস্কৃত ভাষায় যতই সুপণ্ডিত হই না কেন, বাংলায় কথা কহিয়া বাংলায় লিখিয়া যেরূপ আনন্দ পাই সেই রূপটী আর কিছুতেই পাইতে পারি না। চোগা চাপকানে চেহারাটী বেশ ভাল দেখাইতে পারে বটে কিন্তু ধুতি চাদরের মতন স্বচ্ছন্দতা কখনই আনিতে পারে না। সেইরূপ আমাদের ইংরাজি বা সংস্কৃত চোগা চাপকান পোষাকের ন্যায় স্বচ্ছন্দতা প্রদান করিতে পারিবে না। তাই একদিন মাইকেল ইংরাজি বিদ্যার মহামহোপাধ্যায় হইয়াও গৌড়জন যাহাতে নিরবধি সুধা পান করিতে পারেন তাহার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে বাংলাভাষা যথেষ্ট গৌরবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু এমনটী পূর্ব্বে ছিল না।

একদিন এমন ছিল যখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই মাতৃভাষাকে 'ঘৃণার্হ ভাষা' এই আখ্যা দিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তখন আমরা অধঃপতনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলাম। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সমাজ মাত্র সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেন। পাঁচালী যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাংলা ভাষার আলোচনা করিতেন। প্রবাদছিল, "পাঁচ পাঁচালী পাশা। তিন নিয়ে বামুন চাষা॥" শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাঁচালীর আলোচনা করিলে 'চাষা' আখ্যা পাইতেন। যদিও প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাংলা ভাষায় পুস্তক রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তথাপি গত একশত বৎসরের মধ্যে বাংলার যেরূপ জাগরণ হইয়াছে এইরূপটী আর পূর্ব্বে হয় নাই। সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যবর্ত্তিভাষায় জয়দেবের সেই চিরনূতন গীত গোবিন্দ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সেই চিরমধুর বাংলা পদাবলী—কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলেও আমাদের স্বদেশীভাষা শিক্ষিতের ভাষা বলিয়া স্থান পাইত না।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পর বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল—কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত—কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ—কাশীরামদাসের মহাভারত—রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর গানে ক্রমশঃ বাংলা দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তথাপি তখন পর্য্যন্ত উহা উচ্চ শিক্ষার ভাষা বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই। মাইকেল—হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ—বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ গদ্যসাহিত্যের লেখকগণ বর্ত্তমান যুগে বাংলা ভাষার যুগান্তর করিয়া তুলিয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অধিকাংশ অশিক্ষিতই বাংলা ভাষার আলোচনা করিতেন। ঐ যুগান্তরের ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। একদিনের দীনাহীনা ।পচুটি নয়না মাতৃভাষা আজ অপরূপ রূপে রাজরাণীর বেশে দেশ আলো করিয়াছেন। আজ বাঙ্গালীর বড় শুভদিন। আমাদের সার রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। আমাদের সার জগদীশচন্দ্র, সার প্রফুল্লচন্দ্র জগতের এক একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক। এইরূপ আমরা নানাশাস্ত্রে এক একটী নেতা পাইয়াছি এবং আমরা প্রত্যেকেই মাতৃভাষাকে যতটুকু অলঙ্কৃত করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিতেছি বটে কিন্তু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার আলোচনা করা একটী সখের সামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ধনী কয়েক জন যশের খাতিরে এবং দরিদ্র কয়েকজন সামান্য কিছু অর্থের প্রয়োজনে বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এরূপ সখে ভাষার স্থায়ী পরিপুষ্টি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার অঙ্গ হইলেই ভাষার স্থায়ী পরিপুষ্টি হইতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা এবং বাঙ্গালী জাতির গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে প্রবেশিকা হইতে বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্য অবশ্যপাঠ্য স্থির করেন এবং এক্ষণে যাহাতে বাংলা ভাষায় এম্ এ পরীক্ষা হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালা জাতির প্রকৃত অভ্যুদয়ের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে তঁহার প্রাণোন্মাদনকারী অভিভাষণে সমগ্র বাংলা দেশ তাঁহার হৃদয়ের আবেগ কতক বুঝিতে পারিয়াছিল।

মাতৃভাষার সাধক লোকমান্য স্যার আশুতোষের সাধনায় আজ মাতৃভাষা শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনী ক্রমদলশোভিনী-সুহাসিনী-সুমধুরভাষিণী সুখদা বরদা হইয়াছেন। আমরা আজ সাত কোটী ভাই মাতৃভাষার ডাকে জাগিয়া উঠিয়া বাংলার মাটী বাংলার জল যাহাতে ধন্য হয় তাহার পথ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমরা পরাধীন জাতি—মহানুভব স্যার আশুতোষ আজ যে আমাদের নব জাতীয়জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই, নচেৎ আমরা মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতাম।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্

ঐতিহাসিক মহাকাব্য

শিবাজী

(সমালোচনা)

বঙ্গবাণীর বরপুত্র পৃথ্বীরাজ-প্রণেতা কবিভূষণ শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহোদয় বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে আর একখানি ঐতিহাসিক মহাকাব্য উপহার দিয়াছেন। নব্য মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রতিষ্ঠাতা ভারতমাতার অলঙ্কার হিন্দুর গৌরব-কিরীটের সমুজ্জ্বলরত্ন মহাপ্রাণ মহাবীর শিবাজীর চরিত অবলম্বনে এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে।

শিবাজীর আরাধ্যা দেবী ভবানী।

কবি নিজেই কাব্যের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন, "পৃথ্বীরাজে আমি হিন্দু জাতির পতন বর্ণনা করিয়াছিলাম। পতনের পর উত্থান প্রকৃতির নিয়ম, শিবাজীতে আমি এই উত্থান বর্ণনা করিয়াছি। উত্থান ও পতন, উভয়ই কতকগুলি নৈসর্গিক কারণের সমবায়ে ঘটিয়া থাকে। প্রাণপণে উভয় কাব্যে যথাশক্তি সেই কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছি।"

প্রস্তাবনার উপসংহারে তিনি আবার বলিয়াছেন, "সাদৃশ্যের উল্লেখে যদি কেহ অনুচিত স্পর্দ্ধার আরোপ না করেন, তবে উপসংহারে বলি, Paradise Lostএর পর Paradise Regained পাঠ যেরূপ প্রয়োজনীয়, পৃথ্বীরাজে হিন্দুজাতির পতন পাঠের পর শিবাজীতে হিন্দুজাতির উত্থান পাঠ করাও সেরূপ আবশ্যক।"

ঠিক কথা। যে জাতির মধ্যে পতন ও উত্থানের পর্য্যায় কেবল একবার নয়, অনেকবার আসিয়াছে গিয়াছে—সেই জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যদি জাতীয়জীবনের পুষ্টি ও উন্নতি কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষার বিষয়—তাঁহাদের অতীত ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসে কখন কোন পাপে, কি দুর্ব্বলতায় জাতি পড়িয়াছিল, আবার কখন কোন ধর্ম্মের কোন শক্তির প্রভাবে জাতি আবার উঠিয়াছিল। অনেক উত্থান পতন ভারতে এই হিন্দুজাতির হইয়াছে। তার মধ্যে বহুযুগব্যাপী একটা উন্নত অবস্থার পর পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যে পতনের আরম্ভ হয়, আবার কয়েক শতাব্দীব্যাপী প্রবল এক বিদেশাগত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতির পরাধীনতার পর শিবাজীর সঙ্গে যে অভ্যুত্থান হয়, এই দুইটিকেই আমাদের সেই উত্থান পতনের দুইটি আদর্শ দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরিয়া যে কবি তাঁহার দুইখানি জাতীয় মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, বিষয়নির্ব্বাচনে ইহা তাঁহার গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিরই পরিচায়ক। পৃথ্বীরাজে পতনের যে গ্লানির চিত্র দেখিয়া পাঠকের মন ক্ষোভে ও নিরাশায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, শিবাজীতে অভ্যুত্থানে সেই চিত্ত আবার আশায় ও আনন্দে অপূর্ব্ব এক শক্তির প্রেরণায় জাগ্রত ও প্রমত্ত হইয়া উঠে। আঁধার ও আলো, মৃত্যু ও জীবন—কিসে আঁধার কিসে আলো, কোথায় মৃত্যু কোথায় জীবন—পর পর দুইখানি কাব্যে হিন্দুর জাতীয় জীবনের দুই দিক—কবি চিত্রিত করিয়াছেন, এবং দুইটী এই আদর্শচিত্রে জাতীয় ইতিহাসের বড় একটি প্রধান তত্ত্ব—তার পূর্ণতায় বিশ্লেষিত হইয়াছে।

তাঁহার প্রস্তাবনার প্রারম্ভেই কবি বলিয়াছেন, "কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ অতীত হইয়াছে। আমার সেই বিশ্বাস নাই বলিয়া, পৃথ্বীরাজ রচনার পর, আমি শিবাজী রচনায় প্রণোদিত হইয়াছি। নূতন শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে অতি প্রাকৃতের যুগ চলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রাকৃত চিরদিনই আছে ও থাকিবে। প্রাকৃত অবলম্বনে মহাকাব্য রচনায় প্রয়াস ব্যর্থ হইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।"

আমরা কবির এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছি। যাঁহারা বলেন, মহাকাব্যের যুগ অতীত হইয়াছে, কেন যে তাহারা এ কথা বলেন, বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, এই উক্তি এই যুগের প্রতি বড় একটা অনর্থক গ্লানি আরোপ করিতেছে। মহাকাব্যের রস আস্বাদনে যে যুগের লোক অশক্ত, মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও সে যুগের লোক তেমনই অশক্ত। বর্ত্তমান যুগ কি এমনই দীন ও হীনবল হইয়াছে?

মহাকাব্যের উপাদান কি? কেন তাহা এ যুগে আমরা বুঝিতে পারিব না? কেন তাহার রসগ্রহণ করিতে পারিব না?

ছোট ছোট খণ্ড কবিতা, গীতি কবিতা, ছন্দোবদ্ধ চরিতগাথা বহুসংখ্যায় এখন বঙ্গীয় কবি-কল্পনা হইতে প্রসূত হইতেছে। এক একটী ভাব, এক একটী রস, এক একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য, মহৎ হউক কি ক্ষুদ্র হউক মানব জীবনের এক একটি বড় মর্ম্মস্পর্শী কথা, এই সব খণ্ড ও গীতি-কবিতায় এবং গাথায় ব্যক্ত হইতেছে। এক একটী এই ভাব-সৌন্দর্য্য, কথা ও ঘটনার কবিত্বরস যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, বহুভাবের বহুসৌন্দর্য্যের বহু বড় কথার ও ঘটনার সমবায়ে যে বিচিত্র এবং বিস্তারে ও গভীরতায় অসাধারণ কবিত্বরসের সৃষ্টি করে, প্রাণ কি আমাদের—সর্ব্বদিকে মনুষ্যত্বের এই উন্নতি ও প্রসারের যুগে এতই ছোট হইয়া গিয়াছে যে তাহা দেখিলেই ভয়ে শিহরিয়া চক্ষু মুখ ঢাকিয়া দূরে সরিয়া যাইব?

এ যুগের মানব সত্যই কি এমন লঘুচিত্ত ও ক্ষীণপ্রাণ? বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, কত আর নাম করিব, গভীরগবেষণা-মূলক কত বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ আজকাল জগতের সহিত বিশাল একটা প্রসারতা দান করিতেছে। মহাকাব্যের উপাদান যে মহৎ জীবনের চরিত্র-মহত্ত্ব ও কর্ম্মের মহত্ত্ব, কেবল তাহাই কি বিদ্বৎ সমাজ গ্রহণ করিতে পারিবেন না? বড় বড় উপন্যাসও আমরা প্রচুর দেখিতে পাই। সাধারণ মানুষের জীবনের সাধারণ ঘটনা সমূহে মানবমনের ও মানবচরিত্রের অসংখ্য ভাব অসংখ্য রহস্য যে ব্যক্ত হয়, তাহাই প্রধানতঃ এই সব উপন্যাসের উপাদান। অসাধারণ কোনও মানবমনের অসাধারণ শক্তি, চরিত্রের অসাধারণ মহত্ত্ব—অসাধারণ রহস্য যদি কোনও উপন্যাসে ব্যক্ত হয়, তাহাই কেন কেবল লোকের সুখপাঠ্য হইবে না। এই চরিত্র কেবল কল্পনা-প্রসূত না হইয়া যদি বাস্তব ঐতিহাসিক হয়, তবে পাঠকের চিত্তকে যে আকৃষ্ট করিবে—পাঠক তাহাতে দেখিবেন, কবিকল্পনার যে উচ্চ আদর্শ পার্থিব জীবনে সম্ভব বলিয়া মনে হইবে না—ইতিহাসে তাহাই সম্ভব হইয়াছে। মানুষ আমাদেরই এই পৃথিবীর মানুষ বাস্তবিক কত বড় হইতে পারে, দেখিয়াও বুঝিয়া পাঠকের চিত্ত একেবারে মুগ্ধ হইবে। সাধারণ মানবের জীবন অবলম্বনে উপন্যাস যদি উপাদেয় হয়, মহৎ ও অসাধারণ মানবের জীবন অবলম্বনে যে উপন্যাস, তাহা অনুপাদেয় হইবার কোনও কারণ নাই। এই মহৎ ও অসাধারণ জীবন যদি ঐতিহাসিক কোনও মহাপুরুষের

হয়, তবে তাহাই বা অনুপাদেয় হইবে কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, সীতারাম, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী প্রভৃতি উপাখ্যান—সব একেবারে না হইয়া অনেক পরিমাণে ঐতিহাসিক বটে। বাঙ্গলা সাহিত্যে কয়খানি পুস্তক এই সব উপন্যাস অপেক্ষা উপাদেয়? এগুলি উপন্যাস, গদ্যে রচিত। আর মহাকাব্য পদ্যছন্দে রচিত। বিষয়, অবস্থা ও ভাববিশেষে রচনার ছন্দ কোথাও গদ্য কোথাও পদ্যই ভাল লাগে। বঙ্গীয় পাঠকের পদ্যছন্দের প্রতি বিতৃষ্ণা কিছুই দেখা যায় না। ঐতিহাসিক কোনও বড় চরিত্র বা বড় ঘটনা অবলম্বনে কোনও উপন্যাস যদি পদ্যছন্দে হয়, তাহা নীরস কেন হইবে? পদ্য ছন্দে লিখিত এইরূপ উপন্যাসকেই ত একরূপ মহাকাব্য বলা যায়। তবে উপন্যাসে হাস্যচঞ্চল লঘু চিত্র, লঘু ভাবের বাহুল্য অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, মহাকাব্যের প্রধান লক্ষ্য, প্রাকৃতিক চিত্রের, কি ঘটনার বর্ণনায় কি চরিত্রের বিশ্লেষণে গম্ভীর ও মহত্বকে পরিস্ফুট করা। তবু নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র রৈবতক প্রভৃতি কাব্যে উপন্যাসের এই বিশেষত্বের অভাব কিছু নাই।—কাহারও অপ্রীতিকর তাহা হয় নাই। সুতরাং কাব্যেও তাহা চলিতে পারে।

প্রাচীন মহাকাব্যসমূহে অতি-প্রাকৃতের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

রায়গড়স্থিত শিবাজীর চিতাভূমি।

কিন্তু প্রাকৃতের মধ্যেও যাহা মহৎ, মহিমায় ও চিত্তাকর্ষক গুণে অতিপ্রাকৃত অপেক্ষা সর্ব্বদাই তাহা হীনতর নহে।

মহাকবি মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণের কথাই ধরুন; বহু ঘটনার সমাবেশ ইহাতে আছে। কিন্তু রাম সীতা লক্ষ্মণ ভরত দশরথ সুমিত্রা হনুমান্ প্রভৃতি চরিত্র সমূহের যে সব গুণ, যে সব মহত্ব পাঠকের চিত্তকে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তাহাদের চরণে নত করে, তাহা সবই প্রাকৃত ঘটনায় প্রাকৃত অবস্থাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতালপ্রবেশ এই দুটি অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণা না করিলেও, সেই অবস্থায় সীতার চরিত্র বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইত না।

যাহা হউক, প্রাকৃত কি অতিপ্রাকৃত, বাস্তব কি কল্পিত, কিছুই নীরস কি অনাদৃত হয় না, যদি কবি তেমন রঙ্গিন তুলিকায় তাঁহার চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারেন।

মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে! কবে গেল? মাইকেল এ যুগের, হেমচন্দ্র এ যুগের, নবীনচন্দ্র এ যুগের—তাঁহাদের কাব্য কি লোকে আদর করিয়া আনন্দে পড়ে না? রবীন্দ্রনাথ একেবারেই এ যুগের—এখনও বর্ত্তমান; তাঁহার 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জ্জন'—মহাকাব্যেরই পর্য্যায়ভুক্ত। তাহাও কি লোকে পড়ে না?

মহাকাব্যের যুগ অতীত হইয়াছে, দুই হিসাবে বলা যাইতে পারে। মহাকাব্য হয় না; আর মহাকাব্য কেহ পড়ে না। মহাকাব্য কোনও যুগেই ঝাঁকে ঝাঁকে হয় নাই,—মধ্যে মধ্যেই হয়—কখনও বেশী, কখনও কম। এ যুগেও এই দীন বাঙ্গালা দেশেও হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। মহাকাব্য যে লোকে পড়ে, তাহাও দেখাইবার প্রয়োজন কিছু আছে কি? যে দেশের আপামর সাধারণ এখনও ঘরে ঘরে রামায়ণ মহাভারত পড়ে সে দেশে মহাকাব্য লোকে পড়ে না, এ কথা বলা আর দিনকে রাত্রি বলা সমান।

মহাকাব্য পড়ে, যদি মহাকাব্যের মত মহাকাব্য হয়।— যোগীন্দ্রবাবুর পৃথ্বীরাজ দেশের লোকে অতি আদরে

গ্রহণ করিয়াছে। এইজন্য প্রভূত সম্বর্দ্ধনা সহকারে তাঁহাকে কবিভূষণ উপাধিও দেশের বরেণ্য পুরুষগণ দিয়াছেন। ভা.বর মহত্ব, রচনার প্রশান্ত মাধুর্য্য, স্থানে স্থানে তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাসের অনুরূপ চিত্তস্তম্ভনকর মহিমাময় গাম্ভীর্য্য, আর ঐতিহাসিক চরিত্র সমূহের উজ্জ্বল চিত্র, এবং ঘটনাবলীর উজ্জ্বল জীবন্ত চিত্রবিকাশ প্রভৃতি যে সব গুণে পৃথ্বীরাজ পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, শিবাজীতেও সেই সব গুণ সমানভাবে বর্ত্তমান সময়ের গতিতে কবির প্রতিভা ক্ষীণ হয় নাই, বরং আরও স্ফুরিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য। আবার ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট ইহার আছে, যে সব ঘটনার অবতারণা কবি করিয়াছেন, যে সব কথার প্রসঙ্গ তিনি তুলিয়াছেন, প্রামাণ্য ইতিহাস হইতে তাহার বিস্তৃত প্রমাণ তিনি পাদ

পণ্ঢরপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিঠোবা।

টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাব্যের রসধারা ইহাতে ব্যাহত হয় নাই। পাঠক পাদটীকাগুলি অনায়াসে বাদ দিয়াও যাইতে পারেন। এমনভাবে যেগুলি সন্নিবেশিত হয় নাই, যে জোরে রসভঙ্গ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি ও চিত্ত তাহারা টানিয়া নিবে। কাব্যরসপানে যাহাদের তেমন লিপ্সা নাই,—এই ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলি পড়িয়াও অনেক নূতন কথা তাঁহারা জানিতে পারিবেন। প্রধান কথাই এই, যে সাধারণ প্রচলিত ইতিহাসে শিবাজীর চরিত্র অনেক স্থলে বড় কালিমাময় করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার ও চরিত্র-মহত্ত্বের প্রকৃত চিত্র এই সব গ্রন্থে বড়

পাওয়া যায় না। মারাঠা জাতির সম্বন্ধে যে সব প্রামাণ্য ইতিহাস ইদানীং প্রকাশিত হইয়াছে, শিবাজীর জীবন ও চরিত্রের প্রকৃত চিত্র তাহাতেই পাওয়া যায়। কবি তাঁহার প্রমাণসমূহ এই সব গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে যে এক নূতন জাতীয়জীবন জাগ্রত হয়, তাহার মূলে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্ম—মানব ধর্ম্মের এই তিনটি শক্তিরই সমবেত ক্রিয়া ছিল। রামদাসস্বামী সেই জ্ঞানের, তুকারাম সেই প্রেমের এবং শিবাজী সেই কর্ম্মের মূর্ত্তিধর রূপেই আবির্ভূত হন। কবি এই তথ্যটি বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং ইঁহাদের চরিত্রে এই তিন শক্তির পরস্পর সহায়ক ক্রিয়া অতি সুন্দর পরিস্ফুট ভাবে তাঁহার কাব্যে চিত্রিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সর্গে পণ্ঢরপুরে বিঠোবার মন্দিরে কোনও উৎসব উপলক্ষে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের মূর্ত্তিধর এই তিন মহাপুরুষ যখন মিলিত হন, কবি সেই মিলন উপলক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

কে তোরে বুঝিত, হায়! লীলা বিধাতার
তাই প্রেরিলেন তিনি হেন মহাপ্রাণ
তিনজনে সমকালে, জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম,
মূর্ত্তিমান্, যেন নব ত্রিবেণীসঙ্গম
বিরচিল আসি পুণ্য মহারাষ্ট্রভূমে।"

তারপর রামদাসস্বামী আবার তুকারামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

দেখিলে ত রাজপুত্র শিবাজীরে তুমি,
ধর্ম্মিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ, বীর, সংসারী, সন্ন্যাসী,
আমাদের উভয়ের সঙ্গ লভিবারে
ব্যাকুল হৃদয় তার। বুঝি যোগ্যকাল
আমি দিব জ্ঞান, শিখাইব রাজনীতি;
প্রেম দিও তুমি সুদুর্লভ মর্ত্ত্যভূমে।
জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম, তিন হ'লে সম্মিলিত
সাধিবে সে মহাকার্য্য। শুধু বাহুবলে
হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা না হবে এখন,
চাহি প্রেম, চাহি ত্যাগ। উগ্র ক্ষাত্রতেজ
না হয় মিলিত যদি সত্ত্বগুণ সনে,
যুদ্ধ, রক্তপাত মাত্র হবে পরিণাম—
ধর্ম্মে, কর্ম্মে সমুন্নত মহারাষ্ট্র ভূমি
না হ'বে কদাপি। কিন্তু ভক্তি প্রেম যদি
পার শিখাইতে তারে; এ দুয়ের গুণে
হবে সে আদর্শরূপ ভারত মাঝারে।
অস্পৃশ্য মাবলী, বংশগর্ব্বিত ব্রাহ্মণে
বাঁধিবে সে প্রেম সূত্রে।"

কাব্যের ভাব ভাষা ও রচনা পদ্ধতির আদর্শের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। অধিক অংশ উদ্ধারে আলোচনা অতি দীর্ঘ ও ভারাক্রান্ত করিবার আবশ্যক নাই।

এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, আরে রামঃ! এও কি কবিতা, এও কি ছন্দ, যাহা আজকাল লোকের উপভোগ্য হইতে পারে? এ যে একেবারে সেকেলে পয়ার বাঁধা ছাঁচে ঢালা, এখন কি আর ইহা চলে?

ছন্দোবোধ্য জটিলতা কিছু নাই, ছন্দের ভাঙ্গা ভাঙ্গা বিশৃঙ্খল গতি নাই, কোথাও মাত্রা কোথাও অক্ষরের হিসাব —কোথায় যে কি ভাবে কি ভঙ্গীতে পড়িতে হইবে, তাহা বুঝিবার কোনও গোলমাল নাই,—সকলেই সহজে পড়িয়া যাইতে পারে, সব কথা সকলেই বেশ বুঝিতে পারে এমন প্রাঞ্জল সরল বিশদ রচনার ধারা, ছন্দের সহজ সাবলীল মধুর গতি—আমরা বলি সর্ব্বজনের বোধ্য সকলের উপভোগ্য—নব্য পাশ্চাত্য কাব্যের আদর্শে মিলুক না মিলুক—খাঁটি বাঙ্গালার ইহাই কবিতা, ইহাই ছন্দ, ইহাতেই তার রস—

"গৌড়জন যাহা আনন্দে করিবে পান।"

মাসিক সমালোচনা

পরিচারিকা—চৈত্র—১৩২৫

আমাদের হিন্দুর নারী পূজা—

ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ—লেখক শ্রীঅনাথ কৃষ্ণ দেব।

হিন্দুরা বলিয়া থাকেন, নারী তাহাদের পূজ্যদেবতা—স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে নারীকে শ্রদ্ধায় ও আদরে পূজা করিতে হইবে, সর্ব্বথা নারীর মর্য্যাদা রাখিতে হইবে, তাহার সন্তোষ বিধান করিতে হইবে, এইরূপ অনেক অনুশাসন আছে। বিবাহের মন্ত্রেও বরবধূকে যে সব কথা বলিয়া পত্নীত্বে গ্রহণ করেন, তাহাতেও বুঝা যায়, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ, স্বামীর গৃহে স্ত্রীর স্থান কত উচ্চ বলিয়া

ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারী মাতা,—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—এই প্রবচন সর্ব্বত্র সকলের মুখে শুনা যায়। আবার নারী পত্নী গৃহিণী ও সহধর্ম্মিণী, পত্নীভাবে পুরুষের সঙ্গে নারীর যৌন সম্বন্ধ একটা আছে। এই যৌন সম্বন্ধে আবার একটা ধর্ম্মের দিক আছে, আর একটা সম্ভোগের দিকও আছে। ধর্ম্মের দিক হইতেছে, অপত্যোৎপাদন এবং বংশ রক্ষা,—এই দিকের উচ্চতম কথা—'পিতৃঋণ পরিশোধ।'—পূর্ব্ব পুরুষ হইতে আমার অস্তিত্ব,—তাঁহাদের বংশধারা বর্ত্তমানে আমাতে বর্ত্তিত,—ইহাই তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ। পুত্র হইলে তাঁহাদের বংশধারা অক্ষুন্ন রহিল,—যাহা পাইয়াছিলাম তাহা ফিরিয়া দিলাম আমার সঙ্গে লুপ্ত হইল না। তাই পুত্র রাখিয়া যাইতে পারিলেই হিন্দু মনে করে,—পিতৃঋণ শোধ করিয়া গেলাম। যে পত্নী হইতে এই পিতৃঋণ পরিশোধ হয়, সেই পত্নীর সঙ্গে বড় নিবিড় একটা ধর্ম্মের সম্বন্ধই হিন্দু অনুভব করে। তা ছাড়া সকল ধর্ম্মাচরণ তাহাকে স্ত্রীর সঙ্গে করিতে হয় তাই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। সম্ভোগের দিক সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। এদিকটা পৃথিবীর সকল জাতিরই সমান। রূপমোহ প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া এই সম্ভোগের দিকে রাশ ছাড়িয়া দিলে মানবের কতদূর অধঃপতন হইতে পারে, সকল দেশের কাব্যে উপাখ্যানে তাহার চিত্র-বর্ণনা আছে,—বর্ণনার লক্ষ্যও মানবকে সতর্ক করা। হিন্দুর পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতিতেও এই সম্ভোগ-দিক হইতে নারীর সঙ্গে যৌন সম্বন্ধে পুরুষের কতদূর পতন হইতে পারে, নারীর রূপজ মোহ, কখনও কখনও নারীর মোহন বিলাস-বিভ্রম-সম্ভূত প্রলোভন ইত্যাদি কতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া মধ্যে মধ্যে বচনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই বচনগুলির উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক,—পড়িলে মনে হয় বচনের রচয়িতা বুঝি নারীকে কেবল পুরুষের সম্ভোগের পাত্রী বলিয়াই ধরিয়া নিয়াছেন। যাহাহউক প্রবন্ধলেখক নারীর সঙ্গে পুরুষের ধর্ম্মসম্বন্ধ, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে নারীর স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব শাস্ত্রীয় বচন আছে, তাহা চাপা দিয়া, সেগুলি একরকম কিছুই নয় এইরূপ বলিয়া, ঐসব গ্লানিকর বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, হিন্দুরা নারীকে শ্রদ্ধা করেন বলিয়া যে দাবী করেন, সেটা কিছুই নয়। বহু বিদ্রূপ তিনি করিয়াছেন, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের নামেও তাঁহার কাল কলমে অনেক কালী ছিটাইয়াছেন।

হিন্দু সমাজ বহু যুগের বহু বিস্তৃত সমাজ—অশেষ রকম ধর্ম্ম মত, নীতি ও রীতির জটিল সমবায় ইহার মধ্যে দেখা যায়। বর্ত্তমান স্মৃতি ও পুরাণ সমূহ ঠিক এক হাতের রচনা, অথবা যাঁহার নামে প্রচলিত সব তাঁহারই মাত্র কথার সঙ্কলন, ইহা কেহই বলেন না। একই গ্রন্থে অনেক সময় পরস্পর বিপরীত দুইরকম বচন ও অনুশীলন দেখা যায়। ইহাতে ইহাই মনে করা স্বাভাবিক ও সঙ্গত যে এক মতের বচনই সেই গ্রন্থকারের এবং আর কেহ নিজের ভিন্ন মতের অনুরূপ কতকগুলি বচন রচনা করিয়া গ্রন্থে প্রক্ষেপ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম, সমাজনীতি, রাজনীতি, গার্হস্থ্য নীতি যে কোনও বিষয়েই হউক, হিন্দুর প্রশংসাসূচক ও গ্লানিসূচক—দুই রকমেরই বহু বচন উদ্ধার করা যায়। অনেক স্থলে এক একখানি গ্রন্থের মধ্যেই বিপরীত অর্থসূচক বচন পাওয়া যায়। এ অবস্থায় বিদেশীরা যাহাই করুন, হিন্দুসন্তানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইবে, প্রশংসাসূচক বচনগুলির প্রমাণ অনুসন্ধান করা। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ সেগুলি চাপা দিয়া বিনা প্রমাণে কেবল গায়ের জোরে মন্দগুলিই সত্য বলিয়া বড় জোলস করিয়া উচ্চ নিনাদে ঘোষণা করিতেছেন, দিক। তাঁহাকে তখন কি বলিব?

স্মৃতি ও পুরাণের বিধিসম্বলিত বচনে যখন এরূপ বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই সব বচন মাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পুরাণে ইতিহাসে ও অন্যান্য বহু ধর্ম্মগ্রন্থে যে সব আখ্যায়িকা আছে, তাহা হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয়। যে প্রমাণ নিরপেক্ষ বিচারে যিনিই আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন ও বলিবেন, হিন্দু নারীকে হেয় বলিয়া দেখিত না, গৃহধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায়ই শ্রদ্ধা করিত। এই সব আখ্যায়িকার প্রমাণের সঙ্গে মিলাইলে প্রবন্ধ লেখক যে বচনগুলি বাজে বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান সেইগুলিই কাজের হইবে। যে সব বচনের গুরুত্বের ভারে হিন্দুর প্রাণটাকে তিনি একেবারে চাপিয়া পিষিয়া ফেলিয়াছেন, সেই গুলিই ফাঁকা বলিয়া উড়িয়া যাইবে।

হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনের বর্ত্তমান অবস্থাও পাশ্চাত্য রঙ্গিন চশমায় কেহ না দেখিলে এইরূপই সকলে দেখিবেন। যে দেশে প্রতি গৃহস্থের গৃহে মাতার স্থান সর্ব্বোচ্চ, যে দেশে পরস্ত্রী মাত্রই মাতৃসম্বোধনে সর্ব্বত্র অভিহিতা, যে দেশে মন্ত্রদীক্ষার সময় স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসিয়া গুরুর নিকটে একই মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন, যে দেশে প্রবীণা নারী মাত্রকেই স্বামী 'গিন্নী' বলিয়া সম্বোধন করেন, গৃহের প্রায় সকল কর্ম্মে এই গিন্নীরই হুকুম মানিয়া চলেন, তাঁহার মুখনাড়া, নথনাড়া নির্ব্বাক্‌ হইয়া সহিয়া যান,—সকলের উপরে যে দেশে ভগবৎ শক্তি নারীরূপে পূজার জন্য কল্পিত হইয়াছে—সে দেশে সেই সমাজে নারী হেয়, কুভাবে কুদৃষ্টিতে লক্ষিত, এ কথা সত্যদর্শী সুবিচারশীল কেহ বলিতে পারেন না। গৃহে নারীর এই উচ্চ মর্য্যাদার স্থানই সাধারণ রীতি। ইহার ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কিন্তু পুরুষের চক্ষে

নিগৃহীতা নারীর দৃষ্টান্ত আমাদের দেশ অপেক্ষা পাশ্চাত্য অঞ্চলে বেশী বই কম নহে।

সমাজভ্রষ্টা—গাথা বা কবিতার ছন্দে গল্প।

বাণী অতি সুন্দরী বালিকা, স্বামী উচ্ছৃঙ্খল যুবা, ধনীর সন্তান,—বাণীর দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। উদ্দাম ব্যভিচারে বৎসর তিনেকের মধ্যেই সম্পত্তি সব হারাইল, শেষে কোথায় গিয়া কুৎসিৎ রোগে মারা পড়িল। বাণী তখন সবে বারো বছরের বালিকাটি। স্বামীর এই দুর্গতি ও শোচনীয় পরিণামের জন্য ওই অতটুকু বালিকা বাণীকেই সকলে নিন্দা করিল, গালি দিল, শেষে তাকে বিদায় করিয়া দিল। (এমন কি সত্যই কোথাও হয়? আর ইহাই কি হিন্দুগৃহের সাধারণ চিত্র?)

বাণী মায়ের কাছে গেল,—মা ছাড়া কেউ তার ছিল না। মারও কোন সম্বল ছিল না,—চৌধুরীদের বাড়ী তারা চাকরী নিল,—রাঁধিত, বাসন মাজিত ইত্যাদি।

(পালন করিবার কেহ না থাকিলে, যার যেরূপ যোগ্যতা —পরের বাড়ীতে সেইভাবে খাটিয়া খাইলে কি কিছু দোষ হয়? না সেটা বড় লাঞ্ছনার বা অপমানের কথা? অন্যান্য সভ্য দেশের মেয়েরা কি দুরবস্থায় পড়িলে কি এমন খাটিয়া খায় না? না, তারা সকলেই রাজরাণী?)

ক্রমে বাণী বড় হইয়া উঠিল গাথায় বর্ণিত হইয়াছে,—

"বাণীর দেহে রূপ ধরে না আর
যৌবনেরই বসন্ত সম্ভার
এল জীবন কুঞ্জবনে
সর্ব্বদেহে ফুটল সঙ্গোপনে—"।

সেই সঙ্গোপনে ফোটা সর্ব্বদেহের যৌবনের বসন্ত সম্ভার দেখিয়া—

"চৌধুরীদের বড় ছেলে মণি
রূপের গুণের খনি
ওকালতি পাশ ক'রেছে দুমাস হ'ল সবে;—

*   *   *

"বাণী যেদিন পরিবেশন ক'রতে গেল পাতে
কেমন এক সাথে
দোঁহার পানে দোঁহার আঁখি নেমে
উঠ্‌ল না আর মুগ্ধ হয়ে রইল সেথা থেমে।"

(ইহাই সুরুচি, ইহাই সুনীতি, ইহাই সুসংস্কার, ইহাই নারী-ত্বের অতি উচ্চ মর্য্যাদার আর ইহাই বন্ধনমুক্ত আর্টের মহিমা!)

যাহা হউক, সেই রূপের গুণের খনি চৌধুরীদের ওকালতী পাশ করা মণি একদিন সকাল বেলায়—সেও আবার বকুলতলায় বাণী যখন কলসী কক্ষে জল আনিতে-ছিল,—

কাছে এসে বল্‌লে কিযে লজ্জাজড় সুরে,
এক নিমিষে বাণীর জগৎ উঠ্‌ল দুলে ঘুরে।"

বাণী আপনাকে কোনও মতে সুসংবৃত করিয়া কহিল,
"আমায় নিলে তুমি যে সমাজ ভ্রষ্ট হবে।"

এই নেওয়াটা যে কি রকম, তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা হয় নাই।

যাহা হউক, মণি শেষে প্রবাসে গেল। এক বছর পরে প্রথম উপার্জ্জনের টাকা 'বন্ধুভাবে' বাণীকে উপহার পাঠাইয়া দিল,—ইহাতে বাণীর উপকার হইতে পারে

চৌধুরীদের গিন্নী—মণির মা, বাণীকে আর বাণীর মাকে বিদায় করিয়া দিলেন। (মাতার কি রসবোধ বিহীন দুষ্টতা!) পাড়া পড়সীরাও ধিক্কারদিয়া বলিল তোমরা দূর হও

অগত্যা শেষে মণির টাকা কয়টী হাতে লইয়া—
"মায়ে ঝিয়ে বেরিয়ে গেল নিশীথ সনবাতে?"
কিন্তু কোথায় গেল॥

সংগ্রহ বৈচিত্র্য

(১)

বর্ণ বা অক্ষর (letter)

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সংখ্যক বর্ণ আছে। নিম্নে কয়েকটি প্রধান ভাষার বর্ণসংখ্যা দিলাম।

১। সংস্কৃত—৪৯*   ৭। ইংরেজী, জর্ম্মাণ ও ডাচ—
২। হিব্রু—২২   ৮। স্পেনীয়—২৭
৩। ইতালীয়—২১   ৯। আরবীয়
৪। ল্যাটিন—২৩   ১০। পারসিয়—৩২
৫। গ্রীক—২৪   ১১। আর্ম্মেনীয়—৩৮
৬। ফরাসী—২৫   ১২। পারশ্য (জেন্দ)—৪৫

চীন দেশীয় ভাষার বর্ণ নাই। উহাতে প্রায় ২০ হাজার শব্দাংশ (Syllable) আছে।

(২)

পৃথিবীর সর্ব্বপুরাতন পুস্তক

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩৬৬ সালে প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরে আশা (Assa) নামক রাজার রাজত্বকালে, রাজবংশীয় টা হোটেপ (Ptah Hotep) একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে রাজনীতি, ধর্ম্ম ও সাধারণ নীতি বিষয়ক বহু সূত্রের (aphorism) সংগ্রহ আছে। এই গ্রন্থ নারীজাতিকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে একেশ্বর বাদের (monotheism) আলোচনাও আছে এই গ্রন্থখানি প্যারী নগরে (Bibliotheque National) নামক মিউজিয়মে আছে। টা হোটেপ ১১০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া গিয়াছিল।

*অনেকে 'ক্ষ' লইয়া ৫০ এবং অতিরিক্ত একটি 'ল' লইয়া ৫১ বর্ণ ধরা হয়।

(৩)

মোটা মানুষ

ইংলণ্ড দেশের এসেক্সে (Essex) এডওয়ার্ড ব্রাইট নামক একজন অতিকায় মানুষ ছিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার শরীরের ওজন ছিল সাতমণ চব্বিশ সের। লোকটি দৈর্ঘ্যে ৫ ফিট ৯ ইঞ্চি ছিল। বুকের কাছে শরীরের বেড় ছিল ৫ফিট, আর পেটের উপর দিয়া মাপিলে শরীরের বেড় হইতে ৬ফিট ১১ ইঞ্চি।

ডেনিয়েল ল্যাম্বার্ট নামক আর একটি অতিকায় মানুষ ছিল, লিষ্টার সায়ারে। তাহার শরীরের ওজন ছিল ৯মণ ১০ সের। কোমরের কাছে তাহার শরীরের বেড় ছিল ছয় হাতের কিছু উপরে। আর তাহার পায়ের বেড় ছিল দুই হাতের কিছু উপরে। এই লোকটি প্রায় ৪০ বৎসর বাঁচিয়াছিল।

আমাদের দেশেও অতিকায় মানুষ বিরল নহে। কিন্তু তাহাদের কেহ উপরোক্ত দুই ব্যক্তির তুলনায় দাড়াইবে কিনা সন্দেহ. তবে তাহাদের ওজন ও মাপলইয়া দেখিলে ভাল হয়।

গৃহ-শিক্ষক

সরিষার তেল। হাতে ঝুলকালা বা হাড়ী কড়ার কি আলোর কালী লাগিলে সাবানেও অনেক সময় উঠে না। একটু সরিষার তেল মাখিয়া শুকনা ন্যাকড়ায় পুছিয়া ফেলিলে বেশ উঠিয়া যায়।

দাঁত যাহাদের খারাপ, একটু তেল মুখে নিয়া কুলকুচি করিয়া কতদিন ফেলিলে বেশ উপকার হয়। তেল-লবণে মিলাইয়া দাঁত মাজিলেও দাঁত ভাল থাকে।

সর্দ্দি লাগিলে গরম তেল পায়ে মালিশ করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। গরম সরিষার তেলে কর্পূর মিশাইয়া মালিশ করিলে শরীরের বেদনা অনেক সময় ভাল হয়। শিশুদের সর্দ্দি লাগিলে অনেক প্রবীণা গৃহিণী বুকে গরম সরিষার তেল মালিশ করেন। গরম একটু সরিষার তেল খাওইলেও শিশুর শরীর নাকি ভাল থাকে, কোষ্ঠ সরল থাকে। সরিষার তেল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিয়া অনেকে শিশুকে রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখেন, ইহাতে শিশুর শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং সহজে ঠাণ্ডা লাগিয়া কোনও অসুখ করে না। বর্ষাকালে প্রত্যহ সকালে কাজে বাহির হইবার আগে পায়ে সরিষার তেল বেশ মালিশ করিলে পা সহজে কাদায় খায় না।

রেড়ির তেল। কাটা ঘায়ে তখন তখন রেড়ীর তেল লাগাইলে, সম্ভব হইলে একটু রগড়াইয়া দিতে পারিলে, এবং পরিষ্কার ন্যাকড়া রেড়ীর তেলে ভিজাইয়া জড়াইয়া রাখিলে ঘা ভাল থাকে, কোনও দুষ্ট ক্ষত সেখানে হইতে পারে না। জল দিবার আগে রেড়ীর তেল দিতে হয়।

রেড়ীর তেল চুলের পক্ষেও উপকারী। খাটি নারিকেলের তেলও রাখিবার জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য তেল অপেক্ষা চুলের পক্ষে ভাল। নারিকেল তেলের সঙ্গে একটু রেড়ীর তেল মিশাইয়া ব্যবহার করিলে চুলের জোর বেশ বাড়ে, সহজে পাকেও না। বাজারের সাধারণ সুগন্ধ তেল অপেক্ষা এই রেড়ীর তেলে মিশ্রিত নারিকেলের তেল অনেক ভাল। সুগন্ধ তৈলাদির প্রধান উপাদান অনেক স্থলেই খনিজ তৈল। ইহাতে চুলের উপকার না হইয়া অনেক সময় অপকারই হয়।

কেরোসিন তেল। প্রদীপ জালাইতে এবং সহরে উনানের কয়লা ধরাইতে ঘরে ঘরেই ব্যবহৃত। আর একটি বড় সর্ব্বনেশে ব্যবহার ইহার আজ কাল হইতেছে, অভিমানী মেয়েরা গায়ে কাপড়ে আগুন ধরাইয়া পুড়িয়া মরিবার চেষ্টা করেন। কেহ মরেন; কেহ বা চাঁছড়াপোড়া হইয়া বাঁচিয়া থাকেন। সেটা বড়ই বিড়ম্বনা।

অনেক স্থলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাটাঘায়ে বেশ উপকার হয়,—বেদনার স্থানে মালিস করিলে উপকার হয়। আঙ্গুল পাকিলে বা পায়ে কাদায় খাইলে তাহাতেও লাগাইলে বেশ উপকার হয়।

হলুদ চূণ। হলুদ ও চূণ দুইটি দ্রব্যই কতক পরিমাণে শোধক বা বিষনাশক (dis infectant) আমাদের মাছমাংসে হলুদ মাখিবার রীতি এইজন্য হইয়াছে। ডাল তরকারীতে হলুদ না দিলেও চলে, কিন্তু মাছমাংসে না দিলে কেমন একটা গন্ধ পাওয়া যায়। খারাপ—কোনও দোষ থাকিলে তাহাও শোধন কতক পরিমাণে ইহাতে হয়।

পাণের সঙ্গে আমরা চূণ খাই,—নহিলে পাণ ভাল লাগে না। মুখের শোধন কার্য্যও ইহাতে অনেকটা করে। কোথাও ফুস্কুড়ী ভাঙ্গিয়া গেলে, কি ছোট বিষফোট উঠিলে, একটু চূণ গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে আর ভয় বড় থাকে না, সহজে তাহা বিষদুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। গলা-ব্যথা হইলে চূণ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে তাহাতেই অনেক সময় সারিয়া যায়। দেহের কোন স্থানে কঠিন আঘাত লাগিলে কি সামান্য ভাবে থেঁতলাইয়া গেলে হলুদ চূণ লাগাইয়া দিলে বেশ উপকার হয়।

নারিকেল তেলে চূণ ফেটাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রলেপ দিতে পারিলে পোড়া স্থানে সহজে ফোস্কা উঠিতে পারে না। চূণের জল দুগ্ধে মিশাইয়া শিশুদের খাওয়াইলে অজীর্ণতা ভাল হয়। চূণে জলে মিশাইয়া বেশ নাড়িয়া রাখিয়া দিতে হয়। চূণটা থিতাইয়া নীচে পড়িলে উপরের টলটলে জলটুকু তখন সাবধানে ছাকিয়া নিয়া শিশি বা বোতলে রাখিয়া দিতে হয়। তার একটু একটু দুধের সঙ্গে মিলাইয়া খাওয়াইতে হয়। শিশুর অজীর্ণতা দোষ দূর করিবার জন্য পল্লী অঞ্চলে অনেক গৃহিণীরা এইরূপ করিয়া থাকেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ — জ্যৈষ্ঠ—১৩২৬ — ২য় সংখ্যা

উদ্বোধন

জাগ প্রাণ, জাগ প্রাণ চারিদিক হতে
নিখিলের প্রাণ উঠ জাগি,
বিধাতার পাশে আজি অনশ্বর স্রোতে
মৃত্যুজিত বর লহ মাগি।

জাগ প্রাণ, উন্মুক্ত স্বাধীন
জাগ প্রাণ, বন্ধন বিহীন
প্রাণে প্রাণে মৃত্যু হোক লীন
জীবনের উন্মাদনা লাগি।

প্রতি অণু প্রাণময়, মৃত্যু নাহি চাহে,
চাহে হতে আনন্দের ভাগী।
জাগ প্রাণ, জাগ প্রাণ চারিদিক হতে
উঠ, নিখিলের প্রাণ জাগি।

বিশ্বে আজি একি হেরি পড়িয়াছে সাড়া
মৃত্যুঞ্জয় করে আবাহন,
প্রাণ চাহে, প্রাণ চাহে, নাহি তার বাড়া
প্রাণ চাহে নিখিল ভুবন।

প্রাণ চাহে, আত্মপ্রাণ নাশে
প্রাণ চাহে, মরণ বাতাসে
প্রাণ চাহে, জরা ব্যাধি গ্রাসে
প্রাণ চাহে করুণ স্পন্দন।

বিশ্বে আজি প্রাণ নাই প্রাণের অভাবে
শূন্য তার রত্নসিংহাসন,
তাই বুঝি আজি হেরি পড়িয়াছে সাড়া
মৃত্যুঞ্জয় করে আবাহন।

মরণের অত্যাচার চরম সীমায়
অন্ধকার অবসান আজ,
চিরবিরহের পর ঘন নীলিমায়
মিলনের মধুময় সাজ।

নিখিল মন্থন আজি শেষ
পুলকে জাগিয়া উঠে দেশ
আসে প্রাণ বিমোহন বেশ
বাজে তাই জীবনের সনাতন গান।
প্রতি সুরে টুটে ভয় লাজ
মরণের অত্যাচার চরম সীমায়
অন্ধকার অবসান আজ।

শ্রীসচ্চিদানন্দ সেনগুপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

কোথায় আছি

গত যুদ্ধের সময় আমরা শুনিতেছিলাম, এই যুদ্ধের অন্তে পৃথিবীতে এক নূতন যুগ আসিবে,—যে পাপে ইয়োরোপে এই আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়া সমগ্র পৃথিবী ছারখার হইতেছে, তাহা এই শোণিত প্লাবনে ধৌত হইবে, সভ্য ও শক্তিশালী জাতি সমূহের রাজ্যলিপ্সা-ধনলিপ্সা-মূলক ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর হইবে, ছোট বড় দুর্ব্বল প্রবল পৃথিবীর সকল জাতি পরস্পর প্রেমের সমযোগিতায় সুখসচ্ছন্দে এই পৃথিবীতে বাস করিবে,—কালচক্রের আবর্ত্তনে কলি শেষ হইয়া পুন সত্যযুগের পুনরাবির্ভাব হইবে। কিন্তু যেরূপ দেখিতে পাইতেছি, কলির অবসান হইতে এখনও বিলম্ব আছে। অথবা অশ্বরবী কল্কিদেবের অবতরণ সূচনার তূর্য্য-নির্ঘোষমাত্র বাজিয়া উঠিয়াছে, অবতরণ এখনও হয় নাই—হইতেছে মাত্র।

ছয় মাস হইল যুদ্ধ স্থগিত হইয়াছে, তার কিছুকাল হইতেই সন্ধির মজলিস্ চলিতেছে। বিজয়ী পক্ষের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যার যার স্বার্থের প্রেরণায় সেই ঘোরফের চালের খেলা কই, কিছু কম দেখা যায় কি? ওদিকে বিজিত পক্ষ সর্ব্বত্র বোল্‌শেভিক বিপ্লবে বিধ্বস্ত। বস্তুতঃ, মধ্য ও পূর্ব্ব ইয়োরোপ ঠিক কি অবস্থায় এখন আছে, কি ব্যাপার সেখানে চলিতেছে, কিছুই স্পষ্ট বুঝিবার যো নাই। অষ্ট্রীয়া বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক, রুষিয়া—এ সব অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব আছে কি নাই, তাহাও ভাল বুঝা যায় না। সন্ধির আলোচনায় বিজয়ী মিত্রপক্ষ আপনারাই অনেকে এখন পরস্পরের প্রতিপক্ষ। বিজিত পক্ষের মধ্যে মাত্র জর্ম্মাণীর সাড়া শব্দ যা কিছু পাওয়া যায়।

আবার শুনিতে পাই, বোল্‌শেভিক ঢেউ মধ্য-এসিয়াতেও আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান অশান্তির সঙ্গেও ইহার যোগ একটা অনেকে সন্দেহ করিতেছেন, এই যে কাবুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, ইহা কেবল আমীরের হঠকারিতা নয়, মধ্য এসিয়ার বোল্‌শেভিক বিপ্লব-শক্তিও ইহার পিছনে থাকিতে পারে, এরূপ সন্দেহও কেহ কেহ একটু করেন। অসম্ভবই বা কি?

কি যে এক ঘোর বিভীষিকাময় রহস্য তলে তলে চলিতেছে, যাহার কিছু কিছু আভাস এখানে ওখানে ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহা ভাবিয়া কূল পাই না। এক একবার মনে হয়, যেন ভিতরে এক কালাগ্নিলীলা ধূমায়িত হইতেছে, কবে একদিন বিপুলস্তূপীকৃত বারুদের আগুণের প্রচণ্ডবেগে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে, পৃথিবীর সমাজপদ্ধতি রাষ্ট্র পদ্ধতির বহির্বেষ্টনী ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড হইয়া উড়িয়া যাইবে! স্থিতির নীতি শৃঙ্খলা সব বিনষ্ট হইবে, সর্ব্বত্র মহাকালের সংহার-লীলা প্রকট হইবে! মহাকালের সেই মহাশক্তি—বিশ্বাস্ত-স্বরূপা বিশ্বাস্তকারিণী সেই মহাদেবী—সেই করালবদনা মহামেঘপ্রভাশ্যামা দিগ্বসনা, মুণ্ডমালিনা খড়্গমুণ্ডধারিণী কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলিত রুধিরচর্চ্চিতাঙ্গী শবকরসংঘাতে কৃতকাঞ্চী, সৃক্কযুগগলিত রক্তধারায় বিস্ফারিতাননা, অট্টহাসা, ঘোরা মহারৌদ্রী, শ্মশানালয়বাসিনী মহাকালরঙ্গিনী সেই মহাকালী সত্যই কি তবে এই বিশ্বশ্মশানে বিশ্বশবের বক্ষে নৃত্য করিবেন! সত্যই কি সেই সময় আসিয়াছে? কে জানে সময়োচিত কালের লীলা, সেই কালী বই কে আর জানিবে? যদি আসিয়াই থাকে আসুক, বুদ্‌বুদ আমরা কালের বক্ষে তাঁর ইচ্ছায় উঠিয়াছি, তাঁর ইচ্ছায় লীন হইব আবার তাঁর ইচ্ছাতেই হয়ত উঠিব! এই ঘোর বিগ্রহে তিনিই বিশ্বাস্ত স্বরূপা। আবার তিনিই কারণানন্দবিগ্রহা—সুদক্ষিণা সুখ-প্রসন্নবদনা স্মেরানন-সরোরুহা—বিশ্বপ্রসূ বিশ্বম্ভরা তাঁর ইচ্ছা তাঁর লীলা তিনিই জানেন। আমরা শুধু করযোড়ে নতশিরে বলিতে পারি—তাই বলি—

বিশ্বাস্তস্বরূপাং ততো বিশ্বপ্রসূং বিশ্বম্ভরাং।
নমামি কালিকাং ঘোরাং কারণানন্দবিগ্রহাং।"

কিন্তু তবু ভাবি, কোথায় আছি কোথায় যাইতেছি,—কি এ হইতেছে! যতদিন আছি ভাবনা আছে, ভাবিতে হয়, তাই ভাবি। আছি, তাই ভয় পাই, তাই অগ্রে করালীর অভয়বরদ দুটি হাতের দিকে চাহিয়া ইহাও বলি—

"শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমস্তুতে॥"

ইয়োরোপে সোয়িলিজম্ ও বোল্‌শেভিজম্

সোস্যালিজম্ এবং তাহারই এরূপ প্রচণ্ড চরম পরিণতি বর্তমান বোলশেভিজম্ ইয়োরোপের প্রাচীন রাষ্ট্রপদ্ধতি ও সমাজপদ্ধতির বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্রোহে উত্থিত হইয়াছে, যদি এই বিদ্রোহ সফল হইতে পারে ইয়োরোপের রাষ্ট্রপদ্ধতি ও সমাজপদ্ধতি চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে এবং তাহার প্রভাব যে কতদূর কিভাবে গিয়া পড়িবে,তাহা কল্পনাও কেহ করিতে পারে না। ইয়োরোপীয়েরা গর্ব করিয়া থাকেন, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা Equality, Fraternity এবং Liberty) তাহাদের সমাজ জীবনের মূলমন্ত্র। সেই ধুয়া ধরিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত এ দেশেরও অনেকে অবিরত দেশের—বিশেষতঃ হিন্দুর সমাজপদ্ধতিকে ধিক্ ধিক্ করিয়া কত গালি দিতেছেন তার মধ্যে সাম্য নাই, মৈত্রী নাই, স্বাধীনতা নাই। আর তাই নাই বলিয়াই দেশ এখন অধঃপাতিত। সুনীতির পরিপন্থী এই সমাজপদ্ধতি ভাঙ্গিয়া ফেল, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার সুখময় নন্দন কানন দেশে হাসিয়া উঠিবে, কোনও দুঃখ থাকিবে না।

ভাল মানিলাম। কিন্তু ইয়োরোপে সেই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রাজ্যে সমাজবিপ্লবী এই বোলশেভিজম্ এমন প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন? আসল কথা,ইয়োরোপে প্রকৃত পক্ষে সাম্য নাই, মৈত্রী নাই, নামে ছাড়া কাজে দরিদ্র জনসাধারণের স্বাধীনতাও এমন কিছু নাই। সুখ সচ্ছন্দতা দূরে থাক্, ধনবানের সর্ব্বগ্রাসী লিপ্সার প্রাবল্যে দরিদ্র জনসাধারণ দাসের ন্যায় হীন শ্রমে অবিরত খাটিয়াও পেটভরা অন্ন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সকলে পায় না। ইহাদের ক্ষুধার তাড়নাই প্রসব সোসিয়ালিজম্ আর এই বিকট বোলশেভিজমের উদ্ভব সেখানে হইয়াছে।

কথাটা আমাদের কাছে নূতন, আমাদের সাধারণ সংস্কারের বিরোধী, কিন্তু সত্য। তবে এই সত্যটা অল্প কথায় পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া বড় কঠিন। ভাল করিয়া বুঝিতে অনেক দূর পর্যন্তই ইয়োরোপের সামাজিক ইতিহাসটা একটু জানিতে হয়। যাহাহউক, অল্পকথায় যত দূর সম্ভব কথাটার আলোচনা একটু করিব। কারণ আজকাল কথাটা একটু দরকার হইয়া পড়িয়াছে। নহিলে নিজেদের কথাটাও আমরা ঠিক বুঝিয়া নিতে পারি না।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপে নূতন এক যুগ আরম্ভ হয়। Individualtiy ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকার লোকে প্রথম দাবী করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ দাবী তখন ধর্ম্মতত্ত্ব-চিন্তা এবং ধর্ম্ম সাধনার যে ক্ষেত্র তার মধ্যেই একরূপ সীমাবদ্ধ ছিল। এ পর্য্যন্ত যে সমাজপদ্ধতি ইয়োরোপে ছিল তাহাতে মোটের উপর চারিটি শ্রেণী বিভাগ দেখা যাইত, (১) চার্চ্চ (Church) বা যাজকমণ্ডলী (২) ফিউডাল শিভাল্‌রী Feudual Chivalry (যোদ্ধাও রাজ্যশাসক ভূস্বামী সম্প্রদায়) বুর্জ-ওয়াজে (Bourgeoisi) নাগরিক ব্যবসায়ী এবং সমাবস্থাপন্ন স্বাধীন ক্ষেত্রস্বামী বর্গ এবং সার্ফ (Serf) দরিদ্র ও প্রায় দাসবৎ কৃষি-শ্রমজীবি সমূহ। ভারতীয় সমাজবিন্যাসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চার বর্ণের সহিত এই চারিটি শ্রেণীর একরূপ তুলনা করা যাইতে পারে। শেষোক্ত এই শূদ্রবৎ সার্ফ (Serf) গণ ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা মোটের উপর মন্দ ছিল না। রোমীয় চার্চ্চ বা যাজকমণ্ডলীর সঙ্গে রাজন্য-বর্গের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ব্যাপারে অধিকার লইয়া বিবাদবিসম্বাদ কিছু হইত বটে, কিন্তু মোটের উপর প্রথম তিন সম্প্রদায় যার যার বৃত্তি ও সামাজিক অধিকারেরই মধ্যে একরূপ শান্তিতে বাস করিতেন। উচ্চ নীচ ক্রমে সামাজিক পদের যে পর্য্যায় যাহা ছিল, তাহার জন্য বিশেষ অসন্তোষ বা তাহা লঙ্ঘন করিয়া সম পদ বা সম অধিকার পাইবার জন্য একটা আগ্রহ কোথাও দেখা যাইত না। তবে সার্ফ বা শূদ্র সম্প্রদায় সময়ে সময়ে বড় পীড়িত হইত, তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহও মধ্যে মধ্যে ঘটিত। যে চাপ তাহাদের উপরে ছিল, তাহাতে যে ক্লেশ তাহারা পাইত, তাহা প্রধানতঃ আর্থিক বা Economic, সামাজিক বা Social নহে। যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যক্তিত্বের যে অধিকার লোকে বুঝিতে ও দাবী করিতে আরম্ভ করে, তাহাও ধর্ম্মক্ষেত্রের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিত্বের এই অভ্যুত্থান প্রধানভাবে রোমীয় চার্চ্চের বিরুদ্ধেই ঘটে, রোমীয় চার্চ্চের শাসন হইতে যে সব দেশ তখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমত গ্রহণ করে—সে সব দেশেও রাজারা কতকটা রোমীয় চার্চ্চের অনুকরণে পৃথক এক এক প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা

করেন। বহু প্রজা তাহার বিরুদ্ধেও ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা করে।

প্রায় দুই শতাব্দীকাল সর্ব্বত্রই বহু বিবাদ বহু অশান্তি ইহা লইয়া চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই বিবাদ অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়া আসে, ধর্ম্মসম্বন্ধে টলারেশন অর্থাৎ বিরুদ্ধমতের প্রতি উদার ব্যবহার আরম্ভ হয়। এ পর্য্যন্তও সমাজবিন্যাস মোটের উপর পূর্ব্বের মতই ছিল।

চার্চ্চের প্রভাব অনেকটা শিথিল হওয়ায় রাজন্য ও ভূস্বামীবর্গের শক্তি তখন বড় বাড়িয়া উঠে। ফরাসীদেশে এই শক্তির অত্যধিক পীড়নে নিম্নতর শ্রেণী সমূহের বিশেষতঃ দরিদ্র জনসাধারণের ক্লেশের একশেষ হয়। একটি কথা বুঝিতে হইবে এই যে এই অধিকার-চাপে এই যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তাহা প্রধান ভাবে আর্থিক। তখন স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকারের দাবী ধর্ম্মক্ষেত্রে যাহার আর প্রয়োজন বড় ছিল না, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অভিমুখে প্রসারিত হইতে থাকে। মানুষ সকল বিষয়ে সমান—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে কোনও ভেদ মানুষে মানুষে থাকা অন্যায়—সকলেই সকল বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করিবে, সকলেই স্বাধীনভাবে জীবনের বৃত্তি নির্ব্বাচন করিতে পারে, শ্রেণী বিশেষে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি কিছু থাকিবে না, ইত্যাদি সব নূতন নীতির আদর্শ প্রচারিত হইতে থাকে। ভল্টেয়ার, রুসে প্রভৃতি মনীষীরা প্রথমে নূতন এই সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করেন।

নিম্নতর শ্রেণীসমূহের উপরে অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্চ অধিকারের পীড়নও তখন অসহনীয় মাত্রায় গিয়া ফরাসী দেশে উঠিয়াছিল। রাজশাসন-পদ্ধতিতেও অনেক ত্রুটী ছিল—ক্লেশ তাহাতে আরও বাড়ে। নূতন এই সব নীতির আদর্শ যখন লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল, এই ক্লেশ এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করা বা উপেক্ষা করা তখন আর সম্ভব রহিল না। রাজ-শাসনের বিশৃঙ্খলা হেতু দেশে অর্থাভাব ও অন্নাভাবও অতি মাত্রায় দেখা দিল। এইসব কারণ পরম্পরা হইতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভীষণ ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইয়া—ইয়োরোপ ভরিয়া ভীষণ যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে, প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল এই অশান্তিতে ইয়োরোপ লণ্ডভণ্ড হয়।

ফরাসী বিপ্লবের পর ইয়োরোপে নূতন এক যুগ আরম্ভ হইল, এ যুগই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যুগ বলিয়া কথিত হয়। Individuality বা স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকার এই সময় হইতে নানা ভাবে নানা দিকে প্রসার লাভ করিতে থাকে, আজও পর্য্যন্ত জীবনের নূতন নূতন পথে ইহার প্রসরণ চেষ্টা চলিতেছে।

এই সব আদর্শের প্রতিষ্ঠা যাহা কিছু দেখা গিয়াছে, তাহা মাত্র রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এবং তাহা হইতেই Democracy বা গণতন্ত্র শাসনপদ্ধতি ইয়োরোপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং দণ্ডবিধিতেও সকলে সমান অধিকার মানিয়া নিয়াছে। কিন্তু এই গণতন্ত্র শাসনপদ্ধতির বাস্তব সম্ভব ব্যাপারের মধ্যে যদি আমরা প্রবেশ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, অজ্ঞ অল্পশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণ—Democracyর demos বলিতে যাহাদের বুঝায়—তাহারা যে প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু একটা শক্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে ধনে পদে ও জ্ঞানে উচ্চতর শ্রেণী সমূহের সঙ্গে কোনও দিকে সমতা তাঁহাদের ঘটিয়াছে, তাহা নয়। পার্লামেণ্ট বা প্রজাদের প্রতিনিধি সভার সদস্য নির্ব্বাচনে ছোট বড় উচ্চ নীচ সকলেই এক এক ভোট দেয়—এইরূপ তাহার বেশী কোনও সমতা কোথাও নাই। আর এই ভোটওযে তাহারা বড় বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত লোক বুঝিয়া ও বাছিয়া দেয়, তাহা নয়। প্রত্যেক দেশেই রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন দল আছে, দলের নেতারাই সর্ব্বেসর্ব্বা দলের জোর বাড়াইবার জন্য প্রত্যেক দলের সংবাদপত্র আছে, দলপতিদের মত তাহাতে খুব জোরে প্রচার করা হয়। সদস্য নির্ব্বাচনের সময় দলপতিদেরই লড়াই বাধিয়া যায়। ইঁহারা সকলেই পদস্থ ধনী লোক—নানা উপায়ে, নানা কৌশলে, নানা রকম লোভ দেখাইয়া, কখনও চাপ দিয়া সাধারণ লোকের ভোট ইহাঁরা সংগ্রহ করেন। এজন্য প্রচুর মদ্য পর্য্যন্ত বিতরণ করিতে হয়। পূর্ব্বে এমনও ছিল, বড় ঘরের সুন্দরী যুবতীরা দরিদ্র কৃষক প্রভৃতির বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চুম্বনের বিনিময়েও ভোট সংগ্রহ করিতেন!

যাহা হউক, তবু এই রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে সমান ভোটের অন্ততঃ একটা সমান অধিকার ইয়োরোপের অনেক দেশেই

আছে। কিন্তু সামাজিকক্ষেত্রে সাম্য কিছুই হয় নাই। বংশ কুল ধন পদ এই সবের পার্থক্যে বহুশ্রেণী ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিস্তর পার্থক্য ইয়োরোপীয় সমাজে বর্ত্তমান। এই সামাজিক পার্থক্য রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে ভোটের সমতার মধ্যেও প্রকৃত শক্তির অনেকটা পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। বংশে ও কুলে এখন যতটা না হউক, ধনে ও পদে যাঁহারা যত বড়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে তত বেশী গিয়া পড়িয়াছে। ইহাই এ অবস্থায় স্বাভাবিক, অন্যথা কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এই সামাজিক ভেদ এবং তাহার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনার যে তারতম্যতা তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বড় বেশী দুঃখের সৃষ্টি করিতে হয়ত পারিত না, যদি আর একটি বড় ভেদ এবং সেই ভেদের সঙ্গে সংসৃষ্ট কর্ম্মশক্তির ও সুখ-সম্ভোগের বড় বেশী একটা তারতম্য আধুনিক ইউরোপের ব্যবসায় ক্ষেত্রে না দেখা দিত। আরও মজা এই যে ফরাসী বিপ্লবে যে সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী ঘোষিত হইয়াছিল—যে বাণীর দুন্দুভিনাদে ইয়োরোপও মুগ্ধ ও বধির হইয়া গিয়াছিল, এই ভেদ এবং ভেদসম্ভূত দারিদ্র্যের এই দারুণ দুঃখের বড় একটি কারণ ইহাই!

পূর্ব্বে শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষে বৃত্তির একটা বিভাগ ছিল। ক্ষাত্র সম্প্রদায় অর্থাৎ অভিজাত ভূস্বামীবর্গ যুদ্ধ করিতেন, রাজকার্য্য করিতেন, ভূমির উপস্বত্ব তাঁহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যের অর্থাৎ বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করা তাঁহারা গ্লানিকর মনে করিতেন, কেহ করিলে স্ব-সমাজে তাহার মর্য্যাদা থাকিত না। Bourgeoisie বা বৈশ্য সম্প্রদায় ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন, বিভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ইঁহাদের মধ্যে গঠিত হয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় কঠোর কতকগুলি বিধির অনুবর্ত্তন করিয়া বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। যার যার সম্প্রদায়ের মধ্যেও বড় একটা সমযোগিতা ছিল,—সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র তাহাতে রক্ষা পাইত, ছোট বড়তে মনিবে ভৃত্যে পার্থক্য বড় দেখা যাইত না। প্রত্যেক ব্যবসায়ী গৃহস্থ নিজের গৃহে কাজ কর্ম্ম করিত, একা না পারিলে এপ্রেন্টিস রাখিত, এই এপ্রেন্টিসরাও কালে স্বাধীন ব্যবসায়ী গৃহস্থ হইয়া বসিত। কারখানার মালিকে আর কুলীতে যে প্রভেদ, সেরূপ কোন প্রভেদ কি সামাজিক কি ব্যবসায়িক ব্যবহারগত ভাবে এই সব মনিবে ও এপ্রেন্টিসে কোথাও দেখা যাইত না।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইউরোপের ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমূল এক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বের অবস্থা এমন ভাবেই ইহাতে বদলিয়া গেল যে এই পরিবর্ত্তনকে সাধারণতঃ Industrial Revolution বা ব্যবসায়িক যুগান্তর এই নাম দেওয়া হয়।

এক সময়ে দুইটি বড় কারণের সমবায়ে এই যুগান্তর ঘটে। একটি কারণ হইতেছে, বৃত্তি ও অধিকার ভেদ সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কারের পরিবর্ত্তন, তারপর নূতন সংস্কারের প্রভাবে লোকের প্রাচীন প্রথা সমূহের বর্জ্জন—এবং আগ্রহে নূতন নীতি নূতন আদর্শের অনুবর্ত্তন। সকলেই সমান সকলেরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার. জীবনের বৃত্তি প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে রুচি ও ইচ্ছা মত বাছিয়া নিতে পারে, সাম্প্রদায়িক কোনওরূপ গতানুগতিক পন্থার অনুবর্ত্তন অনাবশ্যক অনিষ্টকর, তথা স্বাধীনতার পরিপন্থী। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের উন্নতির জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারে, এবং ইহাতে অপরের স্বাধীন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করিলে, গবর্ণমেণ্টের আইন অথবা সামাজিক কোনও প্রথা তাহাতে ন্যায়তঃ বাধা দিতে পারে না। কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে ইচ্ছামত সকলেই সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উন্নতি লাভের চেষ্টা করিবে. ইহাতেই সকলের শক্তির সম্যক স্ফূরণ হইবে, দেশের ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হইবে। এই সব কথাই সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করিল,—এইসব নীতিরই অনুসরণ করিতে সকলের প্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠিল।

সময়মত বড় কতকগুলি সুযোগও উপস্থিত হইল। এই সব সুযোগের অবস্থাকে এই পরিবর্ত্তনের দ্বিতীয় কারণ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয় জাতি সমূহের বাণিজ্য উপনিবেশ ও অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল,—এই সময় আরও প্রসার ঘটে। ইহাতে প্রচুর ধনাগম ইউরোপে হয়। এই সব বাণিজ্যে যাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন, বৈদেশিক অধিকার সমূহের শাসন কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত হইতেন, এই ধন তাঁহাদের হাতে গিয়া জমে ব্যবসায়ে এই ধন নিয়োগ করিবার জন্য নূতন নূতন ব্যবসায়ের পথও তাঁহারা খুঁজিতে থাকেন। দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বিদেশে তাহা রপ্তানি করিতে পারিলে প্রচুর লাভ হয়। এদিকেও তাঁহারা মনোযোগী হইলেন। গৃহে গৃহে গৃহস্থ শিল্পীরা এত দিন যাহা উৎপাদন করিত, দেশের অভাব তাহাতে কুলাইয়া যাইত। রপ্তানীর জন্য উৎপাদন-বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহারা স্থানে স্থানে কারখানা স্থাপন করিয়া গৃহস্থ শিল্পীদের বেতন দিয়া এই সব কারখানায় নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। নানারকম কলের আবিষ্কারও এইসময়ে হইল, ক্রমে ষ্টীম এঞ্জিনের সাহায্যে সব কল চালাইবার উপায় হইল।

এইসব কলে অল্পশ্রমে অল্প সময়ে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার টাকারও অভাব নাই। নানাস্থানে কলের কারখানা বসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিতেও লাগিল। দরিদ্র স্বাধীন গৃহস্থশিল্পী যারা ছিল, ঘরে হাতে তাহারা যাহা করিতে পারিত, কলে প্রস্তুত দ্রব্যের মত সুলভ তাহা হইত না, তেমন প্রচুরও তাহা জন্মিত না। স্বাধীন ও অবাধ প্রতিযোগিতার নীতিই তখন সর্ব্বত্র

অনুসৃত হইতেছে, কলকারখানাওয়ালা ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা হইতে দরিদ্র গৃহস্থশিল্পীদের রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই. ইহাদেরও এমন শিক্ষা ও শক্তি নাই যে দল বাঁধিয়া প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করিয়া নিজেরাই কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং তাহাদের ব্যবসায় উঠিয়া গেল। তাহারা সব গিয়া কারখানার মজুর হইতে লাগিল। এখানেও অবাধ প্রতিযোগিতা—স্বাধীন চুক্তির নিয়ম। এক পক্ষে প্রবল ধনী সব ব্যবসায়ের মালিক, অপর পক্ষে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অন্নের কাঙ্গাল শ্রমজীবী—তাহারা দল বাঁধিয়া একযোগে কোনও দাবী করিতে তখনও শিখে নাই. সুতরাং মজুরীর হার মালিকরা যাহা দিতেন, মজুরেরা তাহাই নিতে বাধ্য হইত। তাহাদের দুঃখের আর অবধি রহিল না। সাম্য ও স্বাধীনতা অবাধ প্রতিযোগিতা স্বাধীন চুক্তি ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অধিকার। এই সব নীতির ফল ক্রমে ইহাই হইল যে দরিদ্র জনসাধারণ ব্যবসায় ক্ষেত্রে ধনী মহাজনদের অবাধ প্রভুত্বের পাশে একেবারে বাঁধা পড়িল। নিয়ত কঠোরশ্রমে দেহপাত করিয়াও পেটভরা অন্নের সংস্থান তাদের হয় না; কঠোর দারিদ্র্যের পেষণে প্রাণগুলি সব নীরস শুষ্ক পাষাণের মত হইতে লাগিল, অশেষ কদাচার—অশেষ পাপ তাহাদের মধ্যে দেখাদিল। সকল ব্যবসায়বাণিজ্য মহাজনদের হাতে গিয়া পড়িল, ঐশ্বর্য্য ও সম্ভোগের আড়ম্বর তাহাদের দ্রুত বাড়িতে লাগিল, আর তাহাদের এই বৈভবের পাশে দাসবৎ দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট শ্রমজীবিগণ দেশের অধিকাংশ লোকই. ইহারা—দীন কুটীরে অশেষ দুঃখে অশেষ কদাচারে জীবনভার বহিতে লাগিল। এই দুঃখ এই দারিদ্র্য এই আশাহীন অসহায়তা ধনীব্যবসায়ীদের ধনবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে আরও বাড়িল বই অবশ্য কমিল না। ব্যবসায়ক্ষেত্রে ধনী মহাজনদের এই প্রভুত্ব এই ক্রমবর্দ্ধনশীল ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের সঙ্গে দরিদ্রশ্রমজীবিসম্প্রদায়-সমূহের যারপরনাই একটা সামাজিক পার্থক্য সৃষ্ট করিল, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও ইহাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই অবস্থাই চলে। ক্রমে সহৃদয় সুধীবর্গের দৃষ্টি এই দিকে পড়িল। তাঁহারা ধনীতে ও দরিদ্রে মালিকে ও মজুরে, এই বৈষম্য যে কতদূর অন্যায় মাত্রায় গিয়া উঠিতেছে দরিদ্র জনসাধারণ কি কঠোরভাবে ইহাতে পীড়িত হইতেছে, তাহার দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন তখনকার অনেক পুস্তকে শ্রমজীবিগণের এই দুর্দ্দশার ভীষণ চিত্র এবং আলোচনা দেখা যায়। ক্রমে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অবাধ এই প্রতিযোগিতা নীতি স্বাধীন চুক্তির মুক্ত অধিকারে দেশেরপক্ষে জনসমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, দুর্ব্বলকে একেবারে সর্ব্বস্ব হারাইয়া প্রবলের প্রভুত্বের অধীন করিয়া ফেলে, দেশের নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন,—গবর্ণমেণ্টও নানারকম আইন করিয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণকে ধনী মালিকদের যথেচ্ছাকারের ব্যবহার হইতে যতদূর সম্ভব রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইলেন। ওদিকে শ্রমজীবিরাও দুর্গতির চরমপীড়নে শেষে দলবাঁধিতে আরম্ভ করিল, দল বাঁধা হইয়া ধর্ম্মঘট প্রভৃতি উপায়ে মালিকদের নিকট হইতে উচ্চতর হারে বেতন, মজুরীর সময় কমান প্রভৃতি নানারূপ সুবিধা আদায় করিয়া নিতে আরম্ভ করিল। একদিকে ধনী মালিক, অপরদিকে দরিদ্র মজুর, দুই পক্ষে নিয়ত একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সময় ও অবস্থা বুঝিয়া কোন্ পক্ষ কতটা সুবিধা আদায় করিয়া নিতে পারে. ইয়োরোপের ব্যবসায়ক্ষেত্রে অবিরত এই দ্বন্দ্ব—এই যোঝাযুঝি এখনও চলিতেছে। দেশে অধিকাংশ লোকই মালিক বা মজুর ভাবে কোনও না কোন ব্যবসায়ের সঙ্গে সংসৃষ্ট। সামাজিক জীবনটাও অনেক পরিমাণে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরস্পর এই প্রবল বিরোধে সমাজের কল্যাণ কিসে হইবে সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। যাহাহউক. এত প্রয়াস সত্ত্বেও ধনী মালিক সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব মোটের উপর অনেক বেশীই রহিয়াছে, মজুর পক্ষের দুঃখ অসুবিধাও যথেষ্ট রহিয়াছে,—সকলের উপরে তাহাদের মধ্যে ঘোর একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে, এই যে তাহারা মনে করে দেশের উৎপাদন যাহা কিছু তাহাদের শ্রমে হইতেছে, গ্রাসাচ্ছদনের উপরে তাহারা আর কিছুই পায় না. পরন্তু তাহাদেরই শ্রমজাত সম্পদে ধনী মালিকেরা অনেকে কাজ এমন কিছু না করিয়াও অশেষ সুখ ও ভোগবিলাস সম্ভোগ করিতেছেন। ওদিকে স্বার্থ রক্ষার প্রয়াসে ধনীমালিকেরাও ইহাদের চাপিয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। উভয়পক্ষের মধ্যে 'মৈত্রী' দূরের কথা, ঘোর একটা প্রতিপক্ষতার বিদ্বেষই সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা বাণীতে ইয়োরোপ মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার পরিণাম শেষে ইহাই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দেশের সুখের অবস্থা নয়, সমাজের পক্ষে কল্যাণও ইহাতে ঘটে না।

সম্পদে ব্যক্তিগত স্বত্ব the Right of private property), স্বাধীনভাবে যথেচ্ছবৃত্তি গ্রহণের অধিকার (freedom of labour) তাহাতে অবাধ প্রতিযোগিতা freedom of competetion) এবং ব্যক্তিগত স্বাধীন চুক্তির অধিকার (freedom of contract) ব্যবসায়ক্ষেত্রেগত বর্ত্তমান সমাজপদ্ধতি এই সব নীতির ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়াছে। এই সব নীতির পরিবর্ত্তে নূতন নীতির নূতন নীতির ভিত্তিতে এই সমাজ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে কল্যাণ হইবে না, এইরূপ এক মতের আবির্ভাব ও ইয়োরোপে হইয়াছে। ইঁহাদের মোট কথা এই যে, ব্যক্তিগত ভাবে কোনও সম্পদের স্বত্ব কাহারও থাকিবে না, কোনও সম্পদ ব্যক্তিগত ভাবে কেহ বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ে নিয়োগ করিতে পারিবেন না সন্তানসন্ততির উত্তরাধিকার সত্ত্ব কিছু থাকিবে না,

বড় বড় কারখানা সব দেশের জনসাধারণের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিবে, গবর্ণমেণ্টই শ্রমের তারতম্য অনুসারে তার উপস্বত্ব প্রজাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন, তাহাও ইহারা ভোগ করিবে মাত্র, সঞ্চয় করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে কোন ব্যবসায়ে নিয়োগ করিতে পারিবে না, ব্যক্তিগত সম্পদের সত্ব এবং সেই সম্পদবৃদ্ধির প্রয়াসে ব্যবসায়ে নিয়োগের অধিকার কিছুই যখন থাকিবে না। তখন প্রতিযোগিতাও থাকিতে পারে না। সকলে পরস্পরের সহযোগী হইয়া কাজ করিবে, শ্রমের পরিমাণ ও প্রয়োজনের হিসাবে যে যাহা পাইতে পারে, সে তাহাই মাত্র পাইবে।

বর্ত্তমানপদ্ধতির মূল নীতি যাহা তাহাকে এক কথায় বলা যায় Individualism ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য—স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির যথাসাধ্য বৈষয়িক উন্নতি লাভ করিবার পূর্ণ অধিকার। পরস্পর প্রতিযোগিতা ইহার একটি ঘনিষ্ঠ অঙ্গ। সুতরাং নূতন এই পদ্ধতির মূলকথা ব্যক্তিত্বের অধিকার যতদূর সম্ভব সঙ্কোচ করিয়া প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে পূর্ণ সহযোগিতার প্রবর্ত্তন। Individualistic Competition বা ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিযোগিতা ব্যবসায়ক্ষেত্রে লাভ করিয়া পূর্ণ সহযোগিতা বা associationকেই প্রধান করিতে হইবে। Individualitic Competitionএর বৈপরীত্যে association এই নূতন পদ্ধতির মূলভিত্তি বলিয়া এই মত বাদের নাম হইয়াছে, Socialism সোসিয়ালিজম (বা সহযোগিতার) মূল কথা এই বটে, কিন্তু ইহাদের নানা দল আছে, এবং নানা রকম পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দেশ করেন। এই 'সোসিয়ালিজম' এর কোনও পদ্ধতিই যে বাস্তব জীবনে সফল হইতে পারে, ইহা মনে করা কঠিন। ইহার পরীক্ষাও কোথাও হয় নাই। কিন্তু Individualism যে বিষম অনর্থের সৃষ্টি পাশ্চাত্য জগতে করিয়াছে, ইহা ব্যতীত তাহার আর কোনও প্রতিকারের সমীচীন পথ এ পর্য্যন্ত কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। বহুদিন অবধি সোসিয়ালিষ্টিক কোনও না কোনরকম পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সকল দেশে নানা রকম দলও গঠিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাস্তব চেষ্টা সফলতা লাভ করে নাই। তাহাদের সোসিয়ালিষ্টিক কোনওরূপ সমাজপদ্ধতিও কোনও দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

এই যুদ্ধের শেষভাগে বোলশেভিজম নামে অতি উৎকট এক সমাজবিপ্লববাদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সোসিয়ালিজম্-এরই চরম এক পন্থা ইহাকে বলা যাইতে পারে। এই মত বাদীগণের কর্ম্ম প্রচেষ্টা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে রুষিয়া সমাজপদ্ধতি ও রাষ্ট্রপদ্ধতি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশেও ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। অন্যান্য দেশের শ্রমজীবীদের মধ্যেও ইহার প্রভাব প্রসারিত হইতেছে। বর্ত্তমান সমাজ পদ্ধতি ও রাষ্ট্রপদ্ধতির নেতৃবর্গ সর্ব্বত্র ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়াউঠিয়াছেন।

পূর্ব্ব হইতেই সামাজিক যে দুর্গতি জনসাধারণের মধ্যে প্রবল যে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল, যুদ্ধের সময় তাহা আরও বৃদ্ধি পায়। শান্তির সময় তাহারাই দেহপাত করিয়া খাটিয়াছে,—এই খাটনির পুরস্কার যে সম্পদ তাহা ভোগ করিয়াছে, উচ্চতর ধনী সম্প্রদায় সমূহ। যে গবর্ণমেণ্টই একমাত্র প্রতিকারের কর্ত্তা সেই গবর্মেণ্টও প্রধানভাবে এই ধনীদের করায়ত্ত। তাহারা বুঝিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব ধনীদের হাত হইতে কাড়িয়া নিজেদের হাতে না নিতে পারিলে, এই পীড়নের এই দুঃখের অবসান তাহাদের হইবে না। এ চেষ্টাও সকল দেশে কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছিল। সকল দেশেই প্রজার মধ্যে শ্রমজীবীর দল, সোসিয়ালিষ্টের দল গঠিত হইয়াছিল,—তাহাদের প্রতিনিধিও কিছু কিছু দেশের পার্লামেণ্টে যাইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যুদ্ধের যা ক্লেশ বা ক্ষতি তাহা প্রধানতঃ ইহাদের উপরেই গিয়া পড়িল। সেনানায়ক বড় লোক, কিন্তু সৈনিক ইহারা—লক্ষ লক্ষ ইহারাই যুদ্ধক্ষেত্রে মরিয়াছে,—ইহাদের প্রতিপাল্য পরিবার সব অনাথ হইয়াছে। যুদ্ধের উপকরণ উৎপাদনে মজুর হইয়া রাত্রিদিন ইহারাই খাটিয়াছে, এই খাটনির মধ্যেও অনেককে ধরিয়া যুদ্ধে পাঠান হইয়াছে। সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ধনীদের কি? টাকা আছে, কিছু অভাব তাহাদের হয় নাই। অনশনে তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার অশেষ ক্লেশ পাইয়াছে। যুদ্ধের জয় হইলে রাজ্য বাড়িলে, ব্যবসায় বাড়িলে, ধনীদেরই সুখ বাড়িবে, তাহাদের কি?—যৎসামান্য দুটি উদরান্নের জন্য এখনও খাটিতেছে, তখনও খাটিবে,—দুঃখ তাহাদের দূর হইবে না, সুখ কিছু বাড়িবে না। শান্তির সময় তাহাদেরই কারখানার কলে পিষিয়া ধনীরা সকল সম্পদ ভোগ করিয়াছে। এখনও আবার এই যুদ্ধে লক্ষে লক্ষে নির্ম্মমভাবে তাহাদেরই বলি দিয়া, তাহাদেরই পরিবারবর্গকে অভাবের ক্লেশে ফেলিয়া ভবিষ্যতে নিজেদের আরও সুখের উপায়—পীড়নের আরও ক্ষমতা বাড়াইয়া নিতেছে। সর্ব্বথা ঠিক যুক্তিযুক্ত না হউক ধনী সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মনে এ অবস্থায় এই ভাবগুলিই সহজে উঠিবে। বাতাস দিয়া বাড়াইবার লোকও ছিল

যুদ্ধের ক্লেশও চারি বৎসরের শেষে একেবারে অসহনীয় মাত্রায় গিয়া উঠিয়াছিল। যখনই সুযোগ আসিল, জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দলে দলে কারখানার শ্রমী ইহারা, দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক ইহারা। কি কারখানায়, কি যুদ্ধক্ষেত্রে, নায়ক আর কয়টি? তাহাদের হাত হইতে সকল ক্ষমতা ইহারা কাড়িয়া নিল। সর্ব্বত্র শ্রমী ও সৈনিকের কাউন্সিল (Soldiers' and Working men's Council) গড়িয়া শাসনভার আপনারা গ্রহণ করিল। বহুদিনের সঞ্চিত অসন্তোষ ও বিদ্বেষ উচ্চতর ধনী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড একটা প্রতিহিংসা ভাবই যে ইহাদের শাসনে

প্রকট হইবে, এ অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক। সাধারণ সোসিয়লিজমএর মধ্যে এই প্রতিহিংসার ভাব নাই। সোসিয়ালিষ্টেরা চায়, সকলে সমান হইয়া সমান সুখভোগ করুক। যাহারা বেশী দখল করিয়া আছে, তাহার সেই বেশীটা ছাড়িয়া দিক,—যাহাদের কম আছে, তাহারাই সেটা পাউক, ভবিষ্যতে আবার এই বেশীকম না হয়, তার পাকা ব্যবস্থা হউক। কিন্তু বোলশেভিকরা চায়, যাহারা এতদিন বেশী ভোগ করিয়াছে, তাহারা দরিদ্রের উপরে দারুণ পীড়ন করিয়াই করিয়াছে, তার শাস্তি তাহারা পাউক, দরিদ্রেরা বড় হইয়া তাহাদের তেমনই চাপিয়া রাখুক পিষিয়া ফেলুক, অবশ্য বোল্‌শেভিক নীতি যে ঠিক কি, তাহা এখনও স্পষ্ট বুঝা যায় না। এখনও তারা আক্রোশে কেবলই ভাঙ্গিতেছে, গড়নের দিকে কোনও প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় নাই। এই ভাঙ্গার বেগ ধনী অভিজাত ও উচ্চতর সম্প্রদায়ের উপরেই গিয়া পড়িতেছে?

এখন ভারতের কথা—ভারতে বোলশেভিজমএর প্রাদুর্ভাব ঘটিতে পারে কি? যে পীড়ন ও অসন্তোষ বিদ্বেষ অবলম্বন করিয়া ইয়োরোপে বল্‌শেভিজম্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ভারতীয় সমাজে ঠিক সেইরূপ পীড়ন—সেই জাতীয় সামাজিক অসন্তোষ বিদ্বেষ নাই। উচ্চ নীচ ভেদ আছে, তাহা কতক গুলি সামাজিক ধর্ম্মগত অধিকার লইয়া, সামাজিক বৃত্তিগত অধিকারে বড়তে ছোটতে প্রবলে দুর্ব্বলে কোনও প্রতিযোগিতা কলহ দ্বন্দ্ব ভরিতে নাই। উচ্চতর শ্রেণী সমূহ নিম্নতর শ্রেণী সমূহের সকল জীবিকার বৃত্তি দখল করিয়া ইহাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া নেয় নাই,—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ বৃত্তিতে স্বাধীন ভাবেই জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, দেশে যে দারিদ্র্য আছে, সকল সম্প্রদায় সমানভাবে তাহার দুঃখভোগ করিতেছে। তাহার কারণ অন্যরূপ,—ইহা নয় যে উপরের জাতির লোকেরা নীচের জাতির কর্ম্মক্ষেত্র দখল করিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে একেবারে দাসত্বে পরিণত করিয়াছে। আর ভারতব্যাপী এই যে অসন্তোষ তাহা ভারত বাসী এক সম্প্রদায়ের অন্য সমপ্রদায়ের বিরুদ্ধে নহে। এ অসন্তোষের আকার আলাদা প্রকার, আলাদা নিদান, আলাদা প্রতিকারের পথও আলাদা। বোলশেভিক চরগণ এই অসন্তোষ ধরিয়া সাময়িক একটা উৎপাতের সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু বোলশেভিজম্ ভারতীয় সমাজে স্থান এখনও পাইবে না। কলকারখানা ও কুলীমজুরের দল ভারতের কোন কোনও নগরে কেবল দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় সমাজে এখনও তার ছাপ পড়ে নাই। ভারতীয় জনসাধারণ প্রধানভাবে এখনও স্বাধীন চাষী ও শিল্পী গৃহস্থ, ইহাদের মধ্যে যাহারা কৃষাণ, তাহারাও গৃহস্থ। স্বাধীনভাবে কাজ কর্ম্ম করিয়া খায়, কারখানার কুলীর মত নয়।

মূল্য বৃদ্ধি

'দেশের ও দশের কথায়' প্রসঙ্গে বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব, এইরূপ বলিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সহযোগী সুলেখক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার 'দাম বাড়িল কেন?' এই প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি যুক্তিসিদ্ধ ও অতি সমীচীন, প্রবন্ধটি পড়িলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

তবে একটিমাত্র কথা আমাদের বলিবার আছে। ব্যবসায়ীদের profiteering অর্থাৎ সুযোগ বুঝিয়া জোটবন্দী হইয়া বেশী লাভের আশায় দর চড়াইয়া রাখার একটা চেষ্টাও যে বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে না আছে, তা মনে হয় না। এরূপ profiteeringএর দরুণ সাধারণ প্রজার যে পরিমাণ ক্লেশ বাড়িয়াছে, তাহার আশু প্রতিকার গবর্ণমেণ্টের হাতে, এবং গবর্ণমেণ্টের এদিকে অবিলম্বে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, নহিলে দেশে এবার না খাইয়াই অনেক লোক মরিবে।

নিবেদন

শিমুলতলা রামকৃষ্ণ মাতৃমন্দিরের স্থাপক শ্রীযুক্ত স্বামী যোগবিলাস মহোদয়ের আবেদনখানি আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। এই মহৎ কার্য্যে সকলেরই যে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত তাহা বলাই বাহুল্য।

"The undersigned who is an unworthy and humble follower of the Great Master Ramkrishna is going to erect a new Ramkrishna Mandir at Simultala, the well known health-resort in Bihar, situated on the E. I. Railway. Besides a temple conseerated to the Master, there will be attached to the Institute a Charitable Dispensary, a Free Library, a Free School to impart religious and general rudimentary education to the children of the poor, and a home for the destitute and the distressed. A kindly lady has subscribed Rs. 1500, with which the building work has been commenced, but altogether a sum Rs. 7000 would be needed to complete the construction of the Institute. I appeal to the noble and the generous to assist this cause to serve the poor and the distressed. Kind contributions may be sent to the undersigned and they will be duly acknowledged in the Journal "Tatwa Manjari" the organ of the Kakurgachi Yogodyan."

SWAMI YOGABILASH.
Ramkrishna Matri Mandir. Simultala, Bihar.

নববর্ষের আহ্বান

(১)

পার হয়ে গেল পুরাতন যাহা
মোহ তবু নাহি যায়—
নবীনের তরে পরাণ আকুল,
হিয়া মাঝে পুরাতন
করে শুধু হায় হায়
সঞ্চয় আর — বরজন করা
এই ত প্রাণের রীতি
ওঠা আর নামা মরা আর বাঁচা
আঁধারে আলোকে রচে
চঞ্চল চল গীতি।
নাহি চির জ্যোতি – নাহি চির নিশা,
চলা শুধু চলা হেরি
মাঝে মাঝে পাই—আলো আর কালো
ধরারে — যেমন রহে
শীতে বসন্তে ঘেরি।

(২)

অতীতের সঞ্চিত যাহা
তাহারি ভিত্তি পরে
বর্ত্তমানের বিজয় কেতন
নির্ভয়ে তবে প্রাণ
উড়াও হরষ ভরে।
সব অবসাদ ভেঙে চুরে আজ
লহ ওরে লহ প্রাণ—
নব বরষের জীবন-আশীস
পাথেয় অভয় দান ;
থাকে যদি কিছু দোষ অপরাধ
মনের অন্তরালে
নিরমম হয়ে—ঝেড়ে ফেলে তাহা
নব বরষের হাতে—
চন্দন পর ভালে।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

বিনুদা

(উপন্যাস)

(৮)

আকাশ সেদিন পরিষ্কার থাকিবে বলিয়াই মনে হইতেছিল। সদ্য উদিত প্রভাত সূর্য্য দূরাগত কোন প্রবাসী পরমাত্মীয়ের মত নিদ্রিত কলিকাতার দ্বারে দ্বারে আনন্দের জাগরণ বহিয়া আনিয়াছিল। আজ সাতদিন করুণাময় প্রবল জ্বরে শয্যাগত ছিলেন, বিশ্বব্যাপী এই চেতনার সাড়া দিতে তিনিও যেন একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। এ কয়দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও রাত্রি জাগরণে বিনয় কিন্তু বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতি-যোগিতায় প্রথম যেমন কেহই ভীত হয় না, কিম্বা কায়িক শ্রান্তিটা পূর্ব্বে প্রতিযোগিতার কালে উপলব্ধি করে না, কিন্তু কার্য্য শেষে যেমন প্রথম ব্যক্তিও হয়রাণ হইয়া বসিয়া পড়ে,—ভাবে কেমন করিয়া দৌড়াইলাম, কিম্বা সাঁতার কাটিলাম,—কিম্বা আর যাহাই হো'ক করিলাম,—তেমনি বিনয় আজ বড়ই অবশ হইয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ঝিমাইতে-ছিল। প্রকৃত পক্ষে এই সাতদিন বিনয় একরূপ কিছুই পান আহার করে নাই, কিম্বা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও শয্যা ছাড়িয়া উঠে নাই।

রোগক্লিষ্ট করুণাবাবু কহিলেন,—"যাও বাবা, একটু বিশ্রাম করগে, মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে ; পুত্র যদি থাকত, সেও বুঝি এতটা কর ত না।"

"কি আর করেছি বাবা ! আপনি আমার যা করেছেন "

"হ্যাঁ হ্যাঁ খুব করেছি, বড় বেশী করেছি !—পাওনা ছিল হে, শোধ দিচ্ছি, বেশী দিয়ে থাকি, তাও সুদের আশায়, নীহার ভোগ করবে,—নীরু কোথায় ?"

"সেওত জেগে ছিল, ভোরের দিকটায় আপনি একটু ভাল আছেন দেখে আমিই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, বোধহয় ঘুমুচ্চে—"

"তুমিও একটু ঘুমোও গে, আমি এখন বেশ আছি।"

"জানালাগুলো খুলে দেব একবার ?"

"দাও—"

বিনয় নীরবে জানালা কটা খুলিয়া দিয়া পুনরায় শয্যা-প্রান্তে আসিয়া বসিল। স্থানান্তরে যাইতে সে অনিচ্ছুক,—তাঁহাকে একা ফেলিয়া কেমন করিয়া যাইবে, কেউ যে এখানে নেই,—আদিষ্ট কিম্বা প্রয়োজন বোধ না হইলেও বিনয় ধীরে ধীরে করুণাময়ের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বাহিরের আলো আর হাওয়ায় ঘরটা বোঝাই হইয়া উঠিতেছিল—করুণাময় একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া কৃতজ্ঞ নয়নে বিনয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে মুখে কত সংকোচ, কত ভয়,—কি বিনম্র জ্যোতি।—পদস্পর্শে অনুভব করিয়া বিনয় কহিল,—"জ্বরটা ছেড়ে গেছে, বুকের ব্যথাটা কেমন আছে বাবা ?"

"অনেকটা কম, নেই বল্‌লেই হয়। তোমার ভয়েই পালায় "

বিনয়েরও বুকের ভিতরের একটা ব্যথিত চিন্তার ভার যেন নামিয়া গেল, বলিল,—"ডাক্তারের ঔষধে বলুন বাবা। কিছু খাবেন এখন ?"

"হাঁ, খাব।"

বিনয় এইবার উঠিয়া গিয়া নিজের হস্তে এক পেয়ালা দুধ গরম করিয়া আর কিছু ফল ছাড়িয়ে আনিল,—চাকর বেয়ারাকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। ধুলিকণাও যদি পড়ে।

করুণাময় কহিলেন,—"তুমি কিছু খাবে না—?"

ছোট একখানা টেবিল বিছানার দিকে টানিয়া আনিতে আনিতে, "আমি খাব এখন, আপনি খান আগে—" বলিয়া পেয়ালাটা আর ফলের রেকাবখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বিনয় আবার আসিয়া পূর্ব্ব-স্থানে বসিল। বিনয়ের শুষ্ক ম্লান ওষ্ঠদ্বয় তাহার উপবাস-কান্তির সাক্ষ্য দিতেছিল। একরাশি রোদ্ বিনয়ের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল,—করুণাময় দেখিলেন, তাহাতে পরিস্ফুট শুধু অনাহারজনিত ক্লেশ, অনিদ্রার গভীর গ্লানি,—সজীবতার কোনই কিছু নাই। তাঁহার কৃতজ্ঞ অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল,—দুই হস্তে বিনয়কে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে করুণাময় কহিলেন,—

"বিনু ! বিনু ! তুই আমার ছেলে, না আমার বাপ—"

সে বুকের উপর মহাশান্তির আশ্রয়ে বিনয় নিতান্ত বালকের মত শুধু "বাবা" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিনয়ের মনে পরিয়াছিল ঠিক এমনি আর একদিনের কথা। বৃদ্ধা মুমূর্ষু জননী দৃঢ় আলিঙ্গনের বুকে মুখ লুকাইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, বক্ষে তখন এমনি রৌদ্র-ছায়ার সন্নিবেশ; মৃত্যুর করাল ছায়ায় জননীর মুখ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল;—শঙ্কাকুল দৃঢ় উত্তেজনায় বিনয়ের মুখে চোখে রক্ত ফাটিয়া পড়িয়া অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

নীরদের পশ্চাতে নীহার আসিয়া বলিল, "নীরদবাবু তোমায় দেখতে এসেছেন, বাবা।—"

নীরদ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন আজ ?"

"অনেকটা ভাল, বৎস।—বিনু !" বলিবার পূর্ব্বেই বিনয় একখানি চেয়ার টানিয়া দিল।

নীরদ বলিল, "না না, আপনি আবার কেন ? আমিই পারতুম।—আমি কাল সবে শুনেছি,—এখানে ছিলুম না বাইরে গিয়েছিলুম, কালই রাত্রিতে এসেছি।"

বিনয় উঠিয়া গেল,—এই অবসরে সে হাত মুখ ধুইয়া আসিবে।

নীরদ কহিল, "বিনুবাবুকেও বড্ড কাহিল দেখাচ্ছে যে ?"

"আজ সাতদিন কিছু মুখে দেয়নি নীরদ, চোখের পাতা এক করে নাই,—ও আমার ছেলের বেশী।"

কি ভাবিয়া নীহার বলিয়া ফেলিল,—"বাবায় অসুখ দেখেই একেবারে মুষড়ে গিয়েছে ; তবু যদি ছেলে হ'ত তোমার বাবা !" তারপর নীরদের দিকে ফিরিয়া বলিল,

"বিনুদা যখন বছর দশ বারোর, তখন একদিন বাবা ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনেন।"

কথাটায় করুণাময় বাবু বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন,—একটু বড় গলায় বলিলেন,—"অমন কুড়িয়ে পাওয়া সকলেই পায় না নীহার! আমি পেয়েছি, ধন্য হয়েছি। খুঁজে যে পায়, সেই-ই ভাগ্যবান্।"

নীহার লজ্জিতা হইয়া মুখ নত করিল, কহিল, "আমি সে ভেবে বলিনি বাবা।"

নীরদ বলিল, "অদৃষ্টের কথা বলা যায় না নীরু, বিনুবাবুকে দেখে বড়ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়।"

শয্যার উপরে জোর করিয়া বসিয়া করুণাময়বাবু কহিলেন, "নিশ্চয়ই—ঠিক।"

(৯)

অপরাহ্ণে খোলা ছাদের উপর বিস্তৃত গালিচায় অর্দ্ধশায়িত করুণাময় ধূমপান করিতেছিলেন। সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে অন্যমনস্ক বিনয় অদূরস্থিত একটা খর্জ্জুর বৃক্ষের দিকে তাকাইয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ সোণালী কিরণটুকু তাহারই শাখায় শাখায় লুটাইয়া পড়িয়া বিদায়ের পূর্ব্বে যেন সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। আলিশার উপরে ফুলের টবগুলিতে এইমাত্র মালী জল সেচন করিয়া গিয়াছে। পূর্ণ প্রস্ফুটিত সূর্য্যমুখী ফুলগুলি বিরহ বিধুর হৃদয়ে নতাননে বিন্দু বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল। ফুটন্ত গোলাপ গুচ্ছের উপর বড় বড় জলের ফোঁটাগুলি পশ্চিমের রক্তিম আভার প্রতিবিম্ব ধরিয়া ভেল্‌ভেটের উপর বহুমূল্য প্রস্তরের মত চক্ চক্ করিতেছিল। গৃহাভ্যন্তরে নীহার অর্গান বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"বাঁধনে ঘেরিয়া তাঁহারে আমি নিয়েছি আপন করিয়া।
আমার আপন হিয়ার মাঝারে নিয়াছি তাঁহারে বরিয়া॥
প্রীতি-প্রণতি-ভকতি হার, দিয়াছি তাঁহারে প্রেম উপহার,
আদরে সোহাগে নব অনুরাগে, হৃদয় উঠিছে নাচিয়া॥"

করুণাময় ডাকিলেন,—"বিনু!"

বিনয় তেমনি নিবিষ্টহৃদয়ে ভাবিতেছিল,—তাহার জীবনের কথা। সেই শৈশবে যখন সমস্ত দিন ছুটাছুটির পর মায়ের ছিন্ন মলিন আঁচলখানির উপর নিতান্ত নির্ভাবনায় ঘুমাইয়া পড়িত,—তখনই তাহার জীবনে যেন এর চেয়ে বেশী তৃপ্তি ছিল। তারপরও যখন সে "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে—তখনও তো কই সে শুধু দু'টি আহার্য্যের বেশী আর কিছুই প্রত্যাশা করে নাই। আর আজ এতখানি পাইয়াও তাহার হৃদয় আরও পাইবার আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। একি অন্যায় আবদার! নীরদের আগমনের পূর্ব্বে নীহারের সহিত তাহার বিবাহের সম্ভাবনায় যখন তাহার মনে কোন অনিশ্চয়তাই জাগে নাই, তখন সেই চিন্তাটাই তাহাকে অনুক্ষণ বিদ্ধ করিত,—না পাইতেই চাহিত। কিন্তু যেদিন সে নিজে নীরদকে ডাকিয়া আনিয়া নিজেই তাহার অতি দুর্লভ একটা পাওয়ার নিশ্চয়তায় অসম্ভাব্যতা আনিয়া ফেলিল, যখন সে বুঝিল নীহার নীরদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী, তখন আবার তাহাকেই পাওয়ার প্রবল একটা স্পৃহা বিনয়ের মাথায় চড়িয়া বসিল। এক একবার সে ভাবিতেছিল,—একি অসম্ভব দুরাশা! যাহা সে পাইয়াছে, পিতৃ-পিতামহের পুণ্যফলে নিশ্চয়ই। যাহা সে ভোগ করিতেছে তাহাই যে তাহার বড়ই বড় বেশী পাওয়া; তাহাতেও তৃপ্তি নাই! আজ কয়দিন করুণাময়ও কি একটা কথা বলি বলি করিতেছিলেন—তা যাহাই বলুন, সে প্রতিবাদ করিবে;—উড়িয়া আসিয়া নীহারের একার ভাগে সে কতখানি ভাগ বসাইয়াছে!—তাহার উপর আর অত্যাচার সে করিবে না,—তাহার মনে বড় কষ্ট দেওয়া হইবে। কিন্তু যিনি তাহাকে মৃত্যুর মুখে প্রাণদান করিয়াছেন,—তাঁর আজ্ঞা অবহেলা করিয়া তাঁহার সাধে বাদ সাধিয়া—অবাধ্যতায় তাঁর মনে কষ্ট দিবে সে? হায়—একি সমস্যা! সে যে চাহে না—সে যে এ বিবাহে প্রাণে শান্তি পাইবে না,—আবার এদিকে—বিনয় আর ভাবিতে পারিল না—

করুণাময় আবার ডাকিলেন,—"বিনু!"

বিনয় চমকিত হইয়া কহিল,—"আমায় ডাকছেন বাবা?"

"কাছে এস।"

বিনয় উঠিয়া আসিয়া কাছে বসিল।

করুণাময় কহিলেন,—"বিনয়! বাবা! আজ কয়দিনই ভাবছি কথাটা বলি বলি, কিন্তু বলা আর হয় না।—আজ তাই তোমায় বলব,—শোন।"

"বলুন।"

"আমি আর বেশীদিন বাঁচব না,—আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওপার থেকে আমার শমন এসেছে, শীগ্‌গিরই আমায় যেতে হবে।"

কথাটা শুনিতেও যেন বিনয়ের সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, "ওকথা কেন বাবা?"

"প্রয়োজন ছিল না বিনয়,—প্রয়োজন হয়েছে আজ। নীহারের কথাই আমি বলছি। তোমরা যা' জান, তা' সত্য নয়,—নীহার আমার কন্যা নয়।"

শেষ কথাটা তিনি একটু উচ্চৈঃস্বরেই কহিলেন,—অর্গান থামাইয়া নীহার দরজার অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল,—বিনয়ের যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিল,—"কন্যা নয়!!"

"না, কন্যা নয়।"

"তবে?"

"শোন তবে,"—করুণাময় একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"সে অনেক দিনের কথা, বাবার মৃত্যুর পর মাকে নিয়ে আমি আমাদের কাশীধামের বাড়ীতে যাই।"

কৌতূহল প্রশমিত করিতে না পারিয়া বিনয় বলিয়া ফেলিল, "তারপর?"

নীহার রুদ্ধশ্বাসে জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল,—তাহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া—যেন পরম রমণীয় দৃশ্য কাব্যের শেষের দুঃখময় দিকটা ঘনাইয়া আসিতেছিল।

করুণাময় বলিতে লাগিলেন,—"সেদিন সকালে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। শীতের রাত্রি সবে ভোর হয়েছিল, কোয়াসায় কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না,—বিশ্বনাথের দ্বারে প্রণাম কর্ত্তে গিয়ে কান্না শুনে মা একে তুলে নিয়ে আসেন।"

বিনয় আবার বলিল,—"নীহারকে?"

"হাঁ,—এই নীহারকে! ওকে নিয়ে আমরা বাড়ীতে ফিরছি; কোথা থেকে এক উন্মাদিনী নারী চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে এল,—কই আমার হারানিধি কই! শিশু, এক বোঝা ফুলের মত সুন্দর মনোহারী, ছোট দুখানি হাত বাড়ায়ে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ল। উন্মাদিনী এমন জোরে তাকে বুকের উপর চেপে ধরল, যে ও 'মা' 'মা' বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। শিশুর মুখচুম্বন ক'রে পাগলী তাকে আমার মায়ের পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে বলতে লাগল, আশ্রয় পেয়েছে, আর আমার কোন ভাবনা নেই! আঃ—বাঁচলুম! ওগো দেখো, তোমরা একে বাঁচিও। আমি পারলুম না। ওকেই বাঁচাতে, ওরই মুখ চেয়ে পেটের জ্বালায় যে পাপ করেছি, যে গরল খেয়েছি, তারই জ্বালায় আজ পাগল হয়ে গিয়েছি। আমিই পাপী, ওর দোষ নেই, ও ত জানত না। দুশ্চিন্তায় অনুতাপে পাগল হয়ে গিয়েছি, ভাল লাগেনি, তাই সে তাড়িয়ে দিয়েছে, বুকের রক্তদল বুকে করে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এনেছ দেখো, বাঁচিও, আমি যাই—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিগে যাই।"

আমরা তিনজনেই অবাক্ হয়ে শুনছিলুম,—সেই সন্তপ্তকাহিনী, সে কি প্রগাঢ় স্নেহ, সন্তানের জীবনরক্ষার্থে জননী তাঁহার রমণীর সার ধর্ম্ম নারীত্বের শ্রেষ্ঠরত্ন সতীত্ব বিকিয়ে দেছে! যখন চমক ভাঙ্গল দেখলুম সে আর নেই। আমি সেই কোয়াসায় ছুটে বেরোলাম, কিন্তু কোথায়ও তাকে খুঁজে পেলাম না। বহুদিবস বিবাহিত আমি, সে পর্য্যন্তও সন্তানের মুখ দেখি নাই, সন্তানের মমতা জানি নাই। মা মেয়েটিকে বুকে তুলে নিয়ে আমার স্ত্রীর কোলে দিয়ে বললেন,—"বৌমা, সন্তানের আপশোস ছিল তোমার, বিশ্বেশ্বরের দেওয়া নিধি, দেবতার দান, মাথা পেতে নাও।" তারই কয়েকদিন পরে কাশীতে একটা মস্ত হৈ চৈ শুনে, অন্নপূর্ণার ঘাটে গিয়ে দেখলাম একজন পুরুষ, বেশ ধনীর সন্তান বলেই মনে হয়, আর একজন স্ত্রীলোক, দুজনেই হতাবস্থায় পড়ে আছে, নারীর হাতে একখানি শাণিত ছোরা, আমূল নিজের বুকে বসিয়ে দিয়েছে। বিস্মিত নয়নে দেখলাম নারী আর কেউ নয়, সেই উন্মাদিনী। নারী নীহারের মাতা। একথা বলতাম না কিন্তু নীহারকে আমি তোমারই হাতে দিয়ে যাব, না করবে না জানি, কিন্তু আমার মৃত্যুর পর একথা জেনে —যদি তুমি—"

করুণাময় আর বলিতে পারিলেন না—একটা কি গুরু ভার পতনের শব্দে উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিলেন,—বিনয় তাড়াতাড়ি মূর্চ্ছিতা নীহারের মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

করুণাময় নেহাৎ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নিতান্তই বালকের মত চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"না না, সমস্ত ভুল, তুই আমারই কন্যা, আমারই বুকের নিধি, মনোরমার আদরের নীহার!"

(১০)

সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বাবধিও নীহারকে বিনয় করুণাময়ের কন্যা বলিয়াই জানিত। সে একটা বদ্ধমূল ধারণা। আশ্রয় দাতার পূর্ণযুবতী কন্যা, ঐশ্বর্য্য মদগর্ব্বিতা নীহারের সম্মুখে প্রতি মুহূর্ত্তেই কতখানি ভয়, কত সঙ্কোচ, মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলিতে কত তীক্ষ্ণ সংর্ক দৃষ্টি! অতি আপনার অতি আদরের হইলেও, সে তাহাদেরই আশ্রিত ত বটে। মন খুলিয়া সে হাসিতেও পারিত না। মনের কথা কত মুখ ফুটিয়া সব বলিতেও পারিত না। কখন কি বলিয়া ফেলিবে! একদিন অতি যন্ত্রণায় সে তাহার ভ্রাতৃবধুকে কি একটু বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই ফলে কত কষ্টই না সহ্য করিয়াছে। আবার এ'বার এখানেও যদি অতি আনন্দে কিছু বলিয়া বসে,—তবে আবার যদি, না, না—সে, তা একেবারেই সহিতে পারিবে না।

প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে—দুঃখের পাঠশালায় পড়িয়া যারা ডিগ্রী পাইয়া আসে, যতটুকুই তাহারা শিখিয়া আসে, জীবনে আর তাহা ভুলে না, ভুলিতে পারে না তীব্র বিষের মত সে শিক্ষা আপনা হইতেই শোনিতে অস্থি মজ্জায় মিশিয়া যায়।

কারখানার কাঁচা লোহ থেকে শ্রেষ্ঠ কুশলীর হস্তে পড়িয়া, গলিয়া, ঘাতপ্রতিঘাতে সুদৃঢ় পুতলাটার মত সুগঠিত সে হইয়াছে। কিছুতেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। অভাবের নিম্নতম সোপান হইতে উঠিয়া বিনয় আজ সর্ব্বসুলভ সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা,—অগাধ ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী যুবতী, সকলই তাহার পাওয়ার ভিতর বর্ত্তমান। কিন্তু সে ভুলেও একদিন কোনও দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই।

মূর্চ্ছিতা নীহারকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সমস্ত হৃদয় দিয়া বিনয় আজ একবার সেই মুখ খানির দিকে চাহিল। কতদিন সে দেখিতে চাহিয়াছে, কত কার্য্যে তাহার সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে;—বায়ুর স্তরে স্তরে সুরভি রেণু ছড়াইয়া দিয়া নিহার চলিয়া গিয়াছে,—নিঃস্ব দরিদ্র বিনয় তাহার রিক্ত হৃদয় লইয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে, পদশব্দেই তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়াছে; উন্নত মস্তক বুকের উপর নুইয়া পড়িয়াছে,—আর নীহারের পদশব্দেরই তালে তালে তাহার বুকের ভিতর কি একটা বড় বেশী ব্যাকুল নৃত্য মাতিয়া উঠিয়াছে। এমন কতদিন, কতবার!

মূর্চ্ছাভঙ্গে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের নবারুণোন্মেষের মত নীহার চক্ষু মেলিয়া চাহিল,—বড়ই কোমল করুণকণ্ঠে কাতর ক্রন্দন-কম্পিত স্বরে নীহার ডাকিল,—বিনুদা!"

"এই যে আমি হাওয়া কচ্ছি, ভয় কি নিরু!"

নীহার আবার ডাকিল,—"বিনুদা!"—আর বলিতে পারিলনা, বন্যার বেগে তাহার সঞ্চিত ক্রন্দন গুলি ফাঁপাইয়া উঠিল। নীহারের মনে পড়িল,—ঘৃণা ভরে তাচ্ছিল্যের স্বরে আশ্রিত বোধে অবজ্ঞা করিয়া কত দিন কত ব্যথা সে এই বিনুদার মনে দিয়াছে। বিনুদা কিছুই বলে নাই, কিছুই ভাবিয়াছে কিনা তাহাও সে ভাবে নাই। কিন্তু আজ বিনুদা সে সব কথাগুলির প্রত্যুত্তরে কি বলিবে? যদি না বলেও, মনে মনেই বা কি ভাবিবে? তাহার উপর কত বড় একটা উপহাস পূর্ণ ঘৃণা সেও মনে মনে পোষণ করিবে! সেত জানিত না যে সে আরও কত দীনা, আরও কত হীনা। সেত জানিত না অন্ধকারের সাথে কত নিবিড় ভীতির মত তাহারও জন্মাগত দারিদ্র্যের সঙ্গে কত বড় অপবাদ বিজড়িত রহিয়াছে। আজ শত অপরাধের স্মৃতি অঙ্কুশ তাড়নায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, সমস্ত হৃদয় লুটাইয়া পড়িয়া বিনয়ের পায়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিল,—আর তাহারই জীবন-স্মৃতি, জননীর কলঙ্ক একাধারে অবসাদ অবজ্ঞায়, লজ্জার ঘৃণায় তাহাকে অনুতপ্ত, ক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতেছিল।

কক্ষের তেলের প্রদীপ গুলি ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিলে আলোকের পরিবর্ত্তে সমস্ত ঘরটা যেমন একটা দূষিত বদ্ পোড়া তেলের সঙ্গে বোঝাই হইয়া যায়, তেমনি আজ করুণাময়ের একটী কথা—'আমার কন্যা নয়"—তাহার জননীর সেই অন্তিম বিলাপ "ওকেই বাঁচাতে ……… যে পাপ করেছি"—নীহারের জীবনের সমস্ত গুলি আলোক নিভাইয়া দিয়া একটা অতি তীব্র গ্লানি, অনুতাপের জ্বালায় সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীহার ছুটিয়া গিয়া তাহার কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। মূর্চ্ছাকালীন পতনের আঘাতে ছিন্ন কণ্ঠহার তাহার সমস্ত বুকের এতদিনের গর্ব্বটুকুর মত বিনয়ের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

আবার বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া করুণাময় বলিয়া উঠিলেন,—"বিনু! নীরু আমারই কন্যা!"

কুলটার কন্যা শুনিয়া বিনু যদি নীহারকে বিবাহ করিতে না চাহে? কিম্বা তাহারই আদেশ অনুরোধে বিবাহ করিয়া যদি আন্তরিক অশান্তি অনুভব করে!

উভয়কেই যে তিনি স্বীয় পুত্রকন্যার মত ভালবাসেন!

(১১)

নীহারের প্রতি একটা অনুকম্পায় হৃদয় ভরিয়া গেল। সে যেন আরও সতর্ক হইয়া চলিতে লাগিল। নীহারের বিষয়ে এতটুকু ঔদাসীন্য আজ যে তাহার অভিমানের বুকে তীরের তীব্রতায় বিদ্ধ হইবে! প্রকৃতির নবজাত শিশুটীর মতই যে সে এতদিন প্রতিপালিতা হইতেছে। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই যে সে এ সংসারে আসিয়াছে, বাক্‌স্ফুর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে করুণাময়কেই "বাবা" বলিয়া ডাকে, তাঁহাকেই পিতা বলিয়া জানে! আবাল্য, আজন্ম বিলাস বর্দ্ধিতা নীহার সুখের পাঠশালায় সৌখিন চর্চ্চা করিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুঃখের বর্ণপরিচয়, শ্রমসহিষ্ণুতার গণিতপ্রণালী সেত পড়িয়াও দেখে নাই। কেমন করিয়া তবে সে আজ এত অসময়ে এ আঘাত সহ্য করিবে।

দীনদরিদ্রার কন্যা হইলেও বড় ঘরে বড় ভাব লইয়াই সে বড় হইয়াছে। মান, সম্ভ্রম, আত্মমর্য্যাদার স্পৃহা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আপনিই উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।

থিয়াটারের অভিনেত্রীর মত তাহার এ রাজকন্যার ভূমিকাটুকু শেষ হইয়া যাওয়া অবধি যবনিকার আঁড়ালে, স্মৃতির দর্পণে আজ যখন তাহার নিজস্ব অবস্থা মূর্ত্ত দেখিতে পাইল, তখনকার মানসিক যে অশান্তি ও অস্থিরতা, ভুক্ত-ভোগী ছাড়া কেহই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এক নিমেষে, একটা কথায়, তাহার অগাধ ঐশ্বর্য্যে আধার ব্যাঙ্ক ফেল্ হইয়া গিয়াছে আজ! নীহারের সবই গিয়াছে, আছে কেবল আবলা মাখান বিকার। সবটাতেই যেন তাহার কিসে কি হইয়া পড়ে। যতই সে নিজেকে সামলাইয়া চলিতে চাহে, মজ্জাগত অভ্যাসগুলি যতই সে পরিবর্ত্তিত করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে, ততই তাহার অন্তরে বাহিরে একটা বিষম দ্বন্দ বাধিয়া যায়। "সে যাহা হইত" এবং "সে যাহা হইয়াছে," "যাহা উচিত ছিল" এবং "যাহা হইয়া গিয়াছে" "অজ্ঞাতে যাহা করিয়াছে যাহা শিখিয়াছে" এবং "এখন কি করিবে, এখন উপায়" "ভুলা উচিত" এবং "এ যে ভুলাও যায় না" সবটাতে মিলিয়া মিশ্র ঝঙ্কার দিয়া উঠে। বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়। উন্মাদগ্রস্ত রোগীর মত স্বীয় কার্য্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কথাবার্ত্তা, অন্যের আদর অভ্যর্থনা গুলি তাহার প্রাণহীন অভিনয়, ব্যঙ্গ উপহাস বলিয়া মনে হইতে থাকে। ধৃতাপরাধ দোষীর মত তাই সে লুকাইয়া পালাইয়া ফিরিত।

করুণাময় আসিয়া বলিলেন,—"চল্ মা বেড়িয়ে আসি।"

নীহারের ক্ষুব্ধ হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, "এ কালো মুখ না দেখালেই কি নয়?"

"চল্ মা, ভাবিস নি আর, ছাখ দেখি, পাগলী! আয় আয়—চল্ আমার সঙ্গে, তুই আমারই মেয়ে। আর কারও নোস্।"

নীহার উঠিয়া স্বীয় কক্ষে গিয়া কাঁদিতে বসিল। জীবন-কাহিনীটা এত হঠাৎ এমন ভাবে বলিয়া ফেলাটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে এবং নীহার বড় মর্ম্মাহতা হইয়াছে ভাবিয়া করুণাময়ও বড় অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। মনটা আরও খারাপ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন; বিনয়কে বলিলেন, "বিনু! বড়ই ভুল করে ফেলেছি, শুধরে দে বিনু, নইলে নিরু ও বাঁচবে না, আমিও মরব।"

"আমি কি করব, বলুন বাবা—বলে দিন—"

"বিনু, ওকে বিয়ে করবিনি—?"

আমি ত কখনও তা অস্বীকার করিনি—বাবা—"

করুণাময় যেন অনেকটা আশ্বাস পাইলেন।

অনেক সাধাসাধির পরও সেদিন যখন নীহার যাইতে সম্মত হইল না, বিনয়ের কথায় করুণাময় একাকীই বাহির হইয়া গেলেন। সান্ধ্য ভ্রমণ না করিলে তাঁহার শরীর ভাল থাকে না,—অভ্যাস প্রকৃতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

নীহার তাহার কক্ষের জানালার পার্শ্বে গরাদের উপর মস্তক রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল!

স্বাভাবিক নিম্নস্বরে, বিনয় সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ডাকিল, "নীহার !"

"কেও !"

"আমি, ব'স নীহার—" বলিয়া বিনয় খাটের উপর বসিয়া পড়িল। নীহার সেইখানেই বসিয়া বলিল,—"কেন বিনুদা ? তুমিত কখনও আমার এ ঘরে এস না।"

সে কথায় কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া বিনয় বলিল,—"নীহার তুমি বড় হয়েছ, তোমার আর কি বলব, অমন করে থেকোনা, বাবা বড়ই দুঃখ করলেন—। নীরু, কাঁদতে গেলে মানুষের কান্না ফুরোয় না,—কেন মিছে ভেবে কষ্ট পাচ্ছ ? কোন লাভ নাই।"

"সবারই কি তাই বিনুদা ?"

"সবারই তাই। অভাব অভিযোগ কার না আছে নীরু ? যার কোন অভাব নাই—যদিও বিরল, তার কাছে যাও, শুন্‌বে সেও একটা অভিযোগ করবেই করবে। পৃথিবীতে একমাত্র সুখ—যখনকার যা তাই ভগবানের দান বলে মাথা পেতে নেওয়ায়। মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য বর্ত্তমানের মুখে ভবিষ্যতের লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া। আর কিছু করতে যাওয়া কিম্বা ভাবাই দুঃখের নামান্তর। অতীতের কথা ভেবে বরং আরও ক্ষতি, কোনও লাভ নেই।"

"আপ্‌শোস হয় না বিনুদা ?"

"কি লাভ নীরু ! সে আপ্‌শোষ করতে যাওয়া মনে যে আরও আপ্‌শোস করবার রাস্তা করে দেওয়া।"

"কিন্তু বিনুদা, ক্ষতির কথাটা কেউ না ভেবে পারে না। দুঃখের আঘাত মানুষের বুকে বাজে বেশী; আর সে আক্ষেপগুলি মনে থাকে বলেই আমাদের দুঃখের গানগুলি সব চেয়ে বেশী মধুর।"

"কিন্তু আরও ভেবে দেখ, মিছে ভাবনায় যেটুকু করবার সময় ছিল তাও সে নষ্ট হয়ে যায়। আক্ষেপের নিষ্ফল অশ্রুপাতে সুখের যে আলোকটুকু জলধার মত হ'য়েছিল, একদিন যা সব আঁধারের বুকেও জ্যোৎস্না এনে দিতে পারতো—তাও যে নিবে যায়। আর এ দুঃখ শুধু তোমারই তো একলার নয়। লক্ষ্মীটি—ভেবোনা আর; ওকি কাঁদছো ? কেঁদোনা—ছিঃ ! তুমি কাঁদবে জানলে আমি বলতুম না, এত কথা তোমায় কখনও বলিনি; বলতে পারিও নি। তুমিও আমারই সমান নেমে দাঁড়িয়েছো, আজ তাই বললুম। নীরু ! আমিও বড় দুঃখী, জীবনটা আমারও বড় চোখের জলে ভেজা, দুঃখের জমাট অন্ধকারে ঘেরা। আমায় তো দেখছো নীরু, যেদিন প্রথম এ বাড়ীতে এসেছিলুম।"

উদ্বেলিত হৃদয়ে নীহার খুবই কাঁদিতেছিল, বলিল, "বিনুদা ! বিনুদা, কেন আমায় কেউ আগে বলে না। কেন আমার মা গলা টিপে মেরে ফেললে না, আজ এ স্মৃতির তাড়না, উঃ—"

সরল প্রাণে সান্ত্বনার্থেই বিনয় বলিল, "মা কি কখনও সন্তানের অহিত কামনা কর্ত্তে পারে নীহার ! মা যে তার সন্তানের জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিতে পারে।"

কোন কথায় কাহার মনে কোন ভাব বহিয়া আনে, কিসের সামঞ্জস্য ফুটাইয়া তোলে—ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠা উলটাইয়া দেয়—কে বলিবে।

দেহের সমস্ত তন্ত্রিগুলি সবলে নিষ্পেষিয়া দিয়া পূর্ব্বস্মৃতি নীহারের অন্তরের পাঁজরে আছড়াইয়া পড়িল,—এ বন্যার মুখে কি বাধ বাঁধিবে বালিকা !

"তাই মা, আমার মা নারীর সর্ব্বস্ব ধন বিকিয়েছিল, না বিনুদা ? মাতৃস্নেহের অমৃতধারায় তিক্ত গরল মিশিয়েছিল।"

"নীরু, নীরু আমি তা ভাবিনি, আমি তা বলিনি" দণ্ডিতের মত বক্ষ চাপিয়া বিনয় যেন রক্ষীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। সে যাহা ভুলাইতে আসিয়াছিল সে যে তাহাই মনে করাইয়া দিল। যে আগুন নিবাইতে সে আজ সব সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া কত কথাই বলিতে আসিয়াছে,—মরণ শত্রুর মত সে যে তাহাই উস্‌কাইয়া দিল।

(১১)

আজ নীহারের জন্মদিন উৎসব। প্রতি বৎসরই নীহারকে পাওয়ার দিনটায় করুণাময় ঘটা করিয়া আমোদ করিতেন, প্রতিবারই তিনি নীহারকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিতেন। নীহার এ যাবৎকাল জানিত উহা তাহার জন্মদিনই বটে।

নীহারের অযত্ন রক্ষিত শুষ্ক কেশ গুচ্ছগুলি আকুঞ্চন করিতে করিতে করুণাময় বাবু বলিলেন, "এবার কি নিবি মা ?"

"বাবা !"

"বল মা কি নিবি।"

"আর বোঝা চাপিও না বাবা, অনেক দিয়েছো, আর আমি চাইনি; এবার যদি পার আমায় বিস্মৃতি এনে দাও। বাবা ! অপরাধ তোমার যত বেশী তত বুঝি বিধাতারও নয়। তিনি নিঃস্ব করেছিলেন, তাই যদি থাকতেম, কোনই আসক্তির তাড়না থাকতো না। তেমনি গঠিতো হতেম, তেমনি হৃদয় হ'ত। ভিখারীর যে মায়ের বুকেই তার সমস্ত জগৎ। বাবা ! কেন তুমি আমার এত বড় সর্ব্বনাশের সহায়তা করলে, বাবা !"

"কিছুইতো হয়নি মা। তোরই বুকে যে আমারও সমস্ত জগৎ, তুইই যে আমার মা।"

পড়িবার ঘরে বসিয়া বিনয় কি একটা পড়িতেছিল। ঝড়ের মত সে ঘরে প্রবেশ করিয়া নীহার ডাকিল,— "বিনুদা !"

তাড়াতাড়ি সংযত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া বিনয় বলিল, "কেও নীহার ?" বল কি বলবে। ডাকলেই তো পারতে। শরীর ভাল নয়, নীচে না এলেই হ'ত।"

"শরীরটা আমি পাত কত্তেই চাই বিনুদা। জান তুমি ! আছে তোমার এই সব বইয়েতে এমন কিছু লেখা এমন বিষের সন্ধান দিতে পার ? মুহূর্ত্তে যা আমার এ সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে দেবে।"

অবাক হইয়া বিনয় নীহারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নীহার আবার বলিতে লাগিল, "নেই যদি ওসব বই ফেলে দাও। আমি আর পারিনি, এই যেচে দেওয়ার চেয়ে আমার দৈন্যই ছিল ভাল; এই সহানুভূতির চেয়ে তিক্ত উপহাস, এ চাপা কান্নার চেয়ে চেঁচিয়ে কান্নাই স্বস্তিদায়ক। তাতে অভিনয় নাই, কৃত্রিমতা নাই। অনাবৃত বুকে দুঃখের আঘাতগুলি সরল ভাবে বাজে। যাতনা যদিও কেউ তবু তারা সইতে পারার সময় দিয়ে আসে।"

বিনয় কহিল, "নীরু, তোমায় বোঝাতে পারি এমন বিদ্যা বুদ্ধি আমার নেই। আমি এই জানি কোনটাতেই অত উতলা হ'তে নাই। নিজের দুঃখটাই সবাই বেশী বলে ভাবে কার কতটুকু কেউ তা বোঝে না। ভেবে গ্যাখ; দেখবে তোমার চেয়েও বেশী দুঃখ পৃথিবীর বারো আনা লোকের। তারা কি কচ্ছে নীরু ! অত ভাবনা কিছুই নয়—ভেবে কি হ'চ্ছে। অতীতের কথা ভেবে যদি কোন লাভ হ'ত সবাই বসে বসে ভাবতো, কাজ করবার লোক, হাসবার লোক তবে কেউ থাকতো না। আমার কথাই ধরনা অতীতটা কি আমারই বড় সুখের নীরু। তখন কেঁদেছি, সে কান্নার ফলেই ভগবান আজ হাসবার সুযোগ দিয়েছেন হয়ত; আবার কাঁদবো কেন ? সুখের শৈশব, সোনার বাল্যকাল—মধ্যাহ্ন-জীবনের শোক সন্তাপে খানিক বিস্মৃতির শান্তি এনে দেয়,—আমার তা ছিল না, তোমার ছিল,—তুমি।

কথাটা কাড়িয়া লইয়া নীহার বলিল,—"আর একটা বিনুদা, আর একটাও যা ছিল আমার,— আর একটাও যা পেয়েছি আমি, জীবনের প্রতি বিন্দুবর্দ্ধনে মাতৃস্নেহের নির্ব্বাধ অমৃতের পারবর্তে বিশ্ব-রহিতার বিষাদ ধারা,— তোমার যা মেলে নি।"

কক্ষ কাঁপাইয়া নীহার তেমনি ঝড়ের বেগে উপরের সিঁড়িতে উঠিয়া গেল—হাতের কাছের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িয়া বিনয় সেই অসংযত পদশব্দ গুলিই যেন কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল

উৎসবের উপলক্ষে নীরদকান্তিও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। নীহারের জন্য তিনিও একটা সুরম্য উপহার আনিয়াছেন,—একটা দামী অর্গ্যান। উৎসবান্তে নীহার বাজাইয়া গাহিবে, আর সে অর্গ্যানের ঘাটে ঘাটে সা-রে গা-মা ঝঙ্কারের সাথে তাহারও হৃদয়ের কাণায় কাণায় সুরের লহরী বহিবে। শ্রবণ শিহরিবে,—প্রেমের বন্যা ছুটিবে। এ কয়দিনেই নীরদ কান্তি নীহারকে তাহার মানস কুঞ্জের অধিষ্ঠাত্রী কল্পনায় অনেকগুলি কবিতাও লিখিয়া ফেলিয়াছেন। তাহারও একখানি ছাপানো "নীহারিকা"- উৎসর্গ করিয়া আনিয়াছেন; ভাবের মূর্ত্ত উন্মাদনা নীহারিকার মতই নীরবে নীরোদমালায় শান্তির জ্যোতি বিকিরণ করিবে।

ঘরে ঢুকিতেই বিনয় নীরদকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া গেল,—করুণাময় বাবুও সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

কিন্তু নীরদের এতটা বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করিতেন না, তবে লজ্জায় কিছু বলিতে পারিতেন না। আশু ইহার একটা হেস্তনেস্ত অর্থাৎ বিনয়ের সহিত নীহারের বিবাহ সম্পন্ন করিয়া ফেলিবেন,—ইহাই সুস্থির করিয়াছিলেন। করুণাময় কি একটা কার্য্যে উঠিয়া গেলেন,—অসঙ্গত বোধেই বিনয়ও স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

নীহারের দিকে চেয়ারটা টানিয়া মৃদুকণ্ঠে নীরদ কহিল, "আমার এ ক্ষুদ্র উপহার তুমি গ্রহণ করেছ নীরু!"

নীহার অর্গ্যানটার ঘাটগুলি টিপিতে টিপিতে বলিল, "ফেলে দেওয়ার মত ত নয় এ।"

নীরদ। তবু তোমার মুখে নিয়েছ শুনলে আমার পরিতৃপ্তি—দিয়ে সুখ। আজ তোমার জন্মদিন—

নীহার। জন্মদিন আমার—"না" নীরদ বাবু!

নীর। যাক্, রহস্য রাগ—বল—তুমি—

নীহার। রহস্য নয় নীরদ বাবু, তোমায় না ব'লে পারব না। নীরদ বাবু! নীরদ বাবু! তোমায় যা দান—সবই যে আমার পাওয়ার সাধ। কিন্তু—আরও সুখী হ'তে পারতাম, আজ যদি তোমায় দেবার মত কিছু আমার থাক্‌ত,—কিন্তু আমি বড় দীনা, বড় হীনা, তবু তুমি আমায় ঘৃণা করবেনা বল।

নীরদ। নীরু! আমি তোমায় চেয়েছি, তোমাকেই পেয়েছি; আর আমি কিছু চাইনি ত,—কেঁদ না ছিঃ।—কাঁদবে কেন? সংসার যদি তোমায় পায়ে ঠেলেও দেয়,—আমি তোমায় বুকে ক'রে রাখব নীরু। কেঁদো না নীরু, কেঁদোনা, শোন! তুমি অনুমতি দাও; আমি তোমার বাবার কাছে আজই আমাদের বিবাহের প্রস্তাব করি।

কোলের উপর নীরদের হাতখানি দুই হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া নীরদ আবার বলিল, "বল নীরু।"

চোখের দু' ফোঁটা তপ্ত অশ্রু নীহারের লজ্জা-রক্তিম গণ্ডের উপর একটা উজ্জ্বল রেখা টানিয়া দিয়া নীরদের হাতের উপর পড়িয়া গেল। বিহ্বল দৃষ্টিতে নীরদের দিকে চাহিতেই সবিস্ময়ে নীহার দেখিল—করুণাময় বাবু কখন নিঃশব্দে দরজার পর্দা সরাইয়া তাহাদেরই পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—তাঁহার চক্ষে একটা বড় জলন্ত দৃষ্টি তাহাদেরই উভয়ের মস্তকে যেন অভিশম্পাত বর্ষণ করিতেছিল। "একি—বাবা!!!"

অর্দ্ধস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে এই বলিয়াই নীহার নীরদের হস্ত সরাইয়া দিয়া অর্গ্যানটার উপর মুখ লুকাইয়া ফেলিল,—উঠিবার শক্তিও তাহার ছিল না।—কি লজ্জা!—ছিঃ।

পশ্চাৎ হইতে করুণাময় বাবু ডাকিলেন,—"নীরদ কান্তি!"

নীরদ সলজ্জ কুণ্ঠায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "হাঁ, এই আপনার মতটা—"

নীহার আরও বেশী সঙ্কুচিত হইয়া রহিল; করুণাময় কহিলেন,—

"তোমার এ আচরণ আমি প্রত্যাশা করিনি নীহার। এত দূর আমি কল্পনাও করিনি। আপনিও বোধহয় জানেন নীরদ বাবু—নীহার বিনয়র হস্তেই সমর্পিতা হবে!"

বিনয় পরদা সরাইয়া কেবল ঘরে ঢুকিতেছিল,—আবার নীচে নামিয়া গিয়া হাতের কাছের একখানি দর্শনের পুস্তকের পাতো উল্টাইতে লাগিল—যেন কত মনোযোগ!

স্বপ্নাবিষ্টের নিদ্রিত চেতনার অদম্য উচ্ছ্বাসে—নীহার বলিল, "না—না—আমি তা মানব না,—না—কখনও নয়।"

করুণাময় আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাবিতেছিলেন,—"এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি,— কখনও কল্পনায়ও আনতে পারিনি,"—জানিতেও পারেন নাই—কখন নীরদ মাতালের মত টলিতে টলিতে কক্ষচ্যুত তারকার মত বাহির হইয়া যাইবার পথে বিনয়ের দিকে একবার চাহিয়া গেল। সে দৃষ্টিতে বিনয় এতটুকু হইয়া গিয়া—আরও দ্রুত পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে শেষের 'সমাপ্ত'টার উপর সমস্ত চোখে চাহিয়া রহিল।

শ্রীঅতুলানন্দ রায়।

(ক্রমশঃ)

রামায়ণের সমসাময়িক ভারতবর্ষ

(শেষাংশ)

খাদ্যাখাদ্য।

রামায়ণে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের নাম উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু অন্নদামঙ্গল বা মুকুন্দ রামের চণ্ডী প্রভৃতি পুস্তকের ন্যায় ব্যঞ্জন বা পিষ্টকাদির তেমন সুদীর্ঘ ফর্দ্দ দেখা যায় না। খাদ্যের বর্ণনায় নানা ফল, মাংস, দধি, মোদক, ঘৃতাদি অল্প কয়েকটী দ্রব্যের নামই অধিক পরিমাণে উল্লিখিত হইয়াছে। এমন কি সর্ব্ব প্রকার বিলাসতরঙ্গে ভাসমান রাক্ষসপতি রাবণের গৃহের খাদ্য দ্রব্যের বর্ণনা প্রসঙ্গেও নানা সুদৃশ্য স্ফটিক পাত্রে সুগন্ধ মৃগ, বরাহ, ছাগ, কুক্কুট, শশক, কৃকল, ময়ূরের মাংস; চিনি, মধু, অম্ল ও লবণ মিশ্রিত কুঙ্কুমগন্ধি খাদ্য ও বিবিধ প্রকার মদ্যের নাম ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষ খাদ্যের বা পেয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (সুন্দর ১১ শ সর্গ)।

হিন্দুদের মধ্যেও নানাপ্রকার মাংসের বহুল প্রচার ছিল। অতিথি সৎকার, যাগযজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি সকল ব্যাপারেই মাংস একটী অঙ্গীয় দ্রব্য ছিল। শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূটে অবস্থানকালে তথাকার অস্থায়ী গৃহপ্রবেশের সময়েও কৃষ্ণসারের ভর্জ্জিত মাংস দ্বারা "বাস্তু যাগ" সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (অযোধ্যা ৬৬শ সর্গ)। যুবরাজ ভরত বহুলোকজনসহ শ্রীরামের সহিত সাক্ষাৎ করার নিমিত্ত চিত্রকূটের নিকটে ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋষিপ্রবর এক রাজভোগের আয়োজন করেন। ঐ ভোজে গন্ধরস সমন্বিত ছাগ, মেষ, ময়ূর, বরাহ মাংস এবং—

"বাপ্যো মৈরেয় পূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্বৃতাঃ।
প্রতপ্তপৈঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ূর কৌক্কুটৈঃ॥" (৭০)

* * * *

"স্থুদাঃ পূর্ণা রসালস্য দধ্নঃ শ্বেতস্য চাপরে।
বভুবুঃ পয়সশ্চান্যে শর্করাণাঞ্চ সঞ্চয়াঃ॥ (৭৩)

"পুকুরপোরা মৌয়াফুলের মদ, পিঠর পাকে (ক্রমে পাক করা) প্রতপ্ত হরিণ, ময়ূর ও কুক্কুট মাংস, চৌবাচ্চা ভরা রসাল (গুড়, আদা ও জীরা মিশ্রিত ঘোল), শ্বেতবর্ণ দধি, শর্করামিশ্র জল (শরবত)" সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি সৈন্যদের জন্য শ্বেতবস্ত্র, দন্তকাষ্ঠ, কষায় কল্কচূর্ণ (খৈল), বহু সংখ্যক দর্পণ, অঞ্জন-করণ্ডিকা (কাজলের পাত্র) শ্মশ্রু প্রসাধন কঙ্কতিকা (চিরুণী), বহু ছত্র, বহু পাদুকা ও উপানহের (কাষ্ঠনির্ম্মিত পাদুকা এবং চর্ম্মনির্ম্মিত জুতার) জোগাড় করিয়াছিলেন। (অযোধ্যা ৯১ তমঃ সর্গ)।

এ সময় মৎস্যাহারের বেশী উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ রাক্ষসাদির মধ্যেই ইহার প্রচলন ছিল। রাক্ষস 'কবন্ধ' মৃত্যুর পূর্ব্বে রামের নিকটে পম্পাতীরের বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছিল—

"পম্পার বিহঙ্গগণকে কেহ বধ করে না, এজন্য তাহারা মানুষ দেখিয়া ভয় পায় না; সেখানে কুরব, ক্রৌঞ্চ, হংস ও প্লব নামক পক্ষীগুলি যেন ঘৃতপিণ্ডবৎ বোধ হয়। জলে প্রচুর রোহিত, নলমীন ও চক্রতুণ্ডাদি সুস্বাদু মৎস্য আছে। লক্ষ্মণ বাণাঘাতে সেগুলি নিহত এবং নিস্তক (আঁইস শূন্য) করিয়া ও লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করিয়া অগ্নির উত্তাপে পাক (শিককাবাব) করিয়া দিবেন।" (আরণ্য—৭৩ সর্গ)। রামায়ণের অন্যত্র বালি কর্তৃক কথিত আছে—

"শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্ম্মশ্চ পঞ্চম।
পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্ম ক্ষত্রশ্চ রাঘব॥"

"হে রাঘব, শজারু, গণ্ডার, গোসাপ, শশক এবং কচ্ছপ এই পাঁচ প্রকারের পঞ্চনখ প্রাণী ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের খাদ্য।"

আমাদের দেশে এইরূপ একটা প্রবাদ আছে যে, হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা হইতে সর্ব্বপ্রথমে এদেশে আম আনীত হয়। এদেশে নাকি তৎপূর্ব্বে অমৃত ফলের অস্তিত্ব ছিল না। রামায়ণ পাঠে এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়। শ্রীরামচন্দ্র বালী বধান্তে "মাল্যবান্" পর্ব্বতে অবস্থান কালে তথাকার প্রাবৃট শোভা বর্ণনা করিতে করিতে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—"ঐ দেখ পার্ব্বত্য লোকেরা—

"রসাকুলং ষট্পদসন্নিকাশং
প্রভুজ্যতে জম্বুফলং প্রকামম্।
অনেক বর্ণং পবনাবধূতং
ভূমৌ পতত্যাম্রফলং বিপক্কম্॥
(কিষ্কিন্ধ্যা ২৮শ সর্গ)

"রস পরিপূর্ণ ভ্রমর-কৃষ্ণ জম্বুফল (কাল জাম) ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতেছে। এবং নানা বর্ণের সুপক্ক আম্র ফল বায়ুতে বিচলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতেছে।" হনুমান লঙ্কায় অশোকবনেও বহু চাল্তা ও বানর মুখাকৃতি আম দেখিয়াছিলেন, (সুন্দর—১৪শ সর্গ)।

উৎসব—বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের নানা স্থানে বেশ আড়ম্বর সহকারে নবান্নোৎসব সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। এই উৎসবটী ভারতের একটি পুরাতন পর্ব্বোৎসব। রামায়ণের সময়েও ইহার অস্তিত্ব ছিল। বনবাসকালে শরদাগমে লক্ষ্মণ রামকে কহিয়াছিলেন—

"নবাগ্রয়ণ পূজা ভরভ্যর্চ্চ পিতৃদেবতাঃ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ॥ ৬
(আরণ্য – ১৬শ সর্গ)।

"এসময়ে লোকে নব শস্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃপুরুষের অর্চ্চনা এবং নবশস্য নিমিত্তক যাগ করিয়া বিগতপাপ হইয়া থাকে।"

এসময়ে এদেশে প্রতি আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় ধুমধাম করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা হইত এবং প্রতি গৃহদ্বারে একটী সুদীর্ঘ দণ্ডোপরি এক প্রকার পতাকা উচ্ছ্রিত হইত। ঐ পতাকর নাম ছিল ইন্দ্রধ্বজ। (কিষ্কিন্ধ্যা ১৬শ সর্গ ৩৭ শ্লোক)। বর্ত্তমান কালে এই উৎসব আর দেখা যায় না। মুদ্রারাক্ষস নাটকে এই ঋতুতেই "কৌমুদী" উৎসবের উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই উৎসবই সহস্র সহস্র বৎসরের পরিবর্ত্তনে "কোজাগরী" উৎসব রূপে পরিণত হইয়াছে।

ঐ সুদূরাতীত কালে বড় বড় রাজাদিগের মধ্যে যে সকল সাড়ম্বর যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ে এই নিত্যদুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে তাহা আরব্যোপন্যাসের গল্প অপেক্ষাও অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণে এই প্রকার যজ্ঞোৎসবের বিবরণ পাঠ করিলে তদানীন্তন রাজগণের সমৃদ্ধি এবং সম্পদনুরূপ দাতৃত্ব ও লোকরঞ্জকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুত্রকামী মহারাজ দশরথ পুত্রলাভের নিমিত্ত যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালীন যজ্ঞাড়ম্বরের চিত্র এইরূপ চিত্রিত হইয়াছে। "অপুত্রক দশরথ রাজাকে ঋষি ও ব্রাহ্মণবর্গ বিধি-বিহিত অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করিলে, সরযূনদীর উত্তর তীরে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিশাল যজ্ঞভূমি নির্ম্মিত হইল। অমাত্যগণ, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, রথকার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, কুম্ভকার, চিত্রকরাদি শিল্পিগণের সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞার্থে বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। আমন্ত্রিত রাজগণের জন্য সুরম্য অট্টালিকা, হস্তিশালা, মন্দুরা এবং সৈনিক নিবাসাদি নির্ম্মিত হইল। দূরদেশাগত ব্রাহ্মণবর্গ ও ভট্টগণের জন্য বহুগৃহ নির্ম্মাণ করা হইল। ভদ্র পৌরজন ও সর্ব্বসাধারণের জন্য বাসোপযোগী সুদৃশ্য ধর্ম্মশালা সকল স্থাপিত হইল। লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, স্বর্ণ রৌপ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সংরক্ষণার্থে সুরক্ষিত ও সুবৃহৎ ভাণ্ডার-গৃহ সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইতে লাগিল। বিদেহ, কাশী, কেকয়, অঙ্গ, মগধ, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র এবং দাক্ষিণাত্য হইতে মিত্ররাজগণ বহু সৈন্যসামন্ত সহ উপস্থিত হইলেন। প্রত্যহ নানা জাতীয় পুরুষ, রমণী, বালক, সন্ন্যাসী ও তাপসবর্গকে চতুর্ব্বিধ খাদ্যদ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইতে লাগিল। মণিকুণ্ডলধারী, সুবেশ সুন্দর পুরুষগণ খাদ্য পরিবেশন করিতে লাগিল। যথাকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণমণ্ডলী সদস্যপদে বৃত হইলে সামবেদোক্ত আহ্বান মন্ত্রে ইন্দ্রাদিদেবগণকে আহ্বান করিয়া সোমরস অর্পিত হইল। বিল্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত ৬টী, খদির কাষ্ঠের ৬টী, পলাশ নির্ম্মিত ৬টী, শ্লেষ্মাতকের ১টী এবং দেবদারু নির্ম্মিত অতি স্থূলাকার ২টী যূপ স্থাপিত হইল। ইহাদের প্রত্যেকটীর উচ্চতা ২১ অরত্নি (প্রায় ৩ হাত)। প্রত্যেকটী সপ্তপার্শ্ব অর্থাৎ ৮টী করিয়া শির তোলা এবং ২১ খণ্ড বস্ত্র দ্বারা ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। শিল্পকুশল ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অষ্টাদশ হস্ত পরিমিত ত্রিকোণাকার অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মিত হইল এবং শত শত পশু, পক্ষী ও জলচর প্রাণী বলিরূপে প্রদত্ত হইল। সম্বৎসর কাল পূর্ব্বে যে যজ্ঞীয় অশ্ব পাশমুক্ত ও বহুসৈন্যপরিবৃত হইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, সেই যজ্ঞাশ্ব আনিয়া দারুময় যূপে বন্ধন করা হইল। তারপর—

"কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্ব্বিশশাসৈনং ত্রিভিং পরময়া মুদা॥ ৩৩
পতত্রিণা তদা সার্দ্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।
অবসদ্রজনী মেকাং কৌশল্যা ধর্ম্মকাম্যয়া॥ ৩৪
হোতাধ্বর্য্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমাযোজয়ন।
মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যার্থ বাবাতা মাপরাং তথা॥
(আদি—১৪শ সর্গ)

"রাজমহিষী কৌশল্যাদেবী প্রমোদসহকারে সর্ব্বতোভাবে সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া, তাহাকে ৩ খানা খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। পরে তিনি ধর্ম্ম কামনায় সুস্থির চিত্তে একরাত্রি সেই অশ্বের সহিত যাপন করিলেন। তদনন্তর হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যুগণ মহিষী এবং রাজার অন্যজাতীয়া পত্নীগণকে সেই অশ্বের সহিত সংযোগ করাইলেন।" পরে সেই অশ্বের বসা (মেদ) উদ্ধার করিয়া তাহা অগ্নিতে হোম করিলেন। রাজা সেই বসার ধূমগন্ধ আঘ্রাণ

করিলেন। ১৬ জন ঋত্বিক বেত্র নির্ম্মিত প্লক্ষ (পাকুড়)-পত্র-নির্ম্মিত পাত্রে করিয়া অশ্বের বিভিন্নাঙ্গ বহন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা কল্পসূত্রের বিধানানুসারে প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে 'উকথ' এবং তৃতীয় দিবসে 'অতিরাত্র' সবন করিলেন। তৎসহ 'জ্যোতিষ্টোম' 'আয়ুষ্টোম' 'অভিজিৎ' 'বিশ্বজিৎ' 'অতিরাত্র' এবং 'আপ্তোর্য্যাম' নামক মহাক্রতু সকলও সম্পাদন করিলেন। তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকর্ত্তৃক অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্রে 'পুত্রেষ্টি' যাগও সম্পাদিত হইল। পুরোহিতগণ প্রচুর দক্ষিণা পাইলেন। মহাদান যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ভূমি, গাভী, স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র ইত্যাদি ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বিতরিত হইল। যাচকগণও বাঞ্ছারূপ ভিক্ষা প্রাপ্ত হইল। সংগৃহীত পর্ব্বতপ্রমাণ ধনরাশি নিঃশেষ হইল; শেষ—

"দরিদ্রায় দ্বিজায়াথ হস্তাভরণমুত্তমম্,
কস্মৈচিদ্ যাচমানায় দদৌ রাঘবনন্দনঃ। ৫৭।
(আদিঃ ১৪শ সর্গ)

"রঘুকুলনন্দন দশরথ জনৈক যাচমান ব্রাহ্মণকে স্বীয় হস্তাভরণ পর্য্যন্ত দান করিলেন।" এই মহা যজ্ঞের সহিত খৃষ্ট সপ্তম শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত রাজা শিলাদিত্যের সঙ্গোম-ক্ষেত্রের উৎসবেরই তুলনা হইতে পারে। এই প্রকার দান-মহোৎসব এদেশে ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় নাই।

এই যজ্ঞপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান কালের ব্যাপারের মত একটী ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। সেটি হইতেছে উৎসব ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তর্কযুদ্ধ। এখনও যেমন বড় বড় ব্যাপারে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গ শাস্ত্রীয় বিচারের অবতারণা করিয়া সেই স্থান কোলাহলময় করিয়া তোলেন, দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলেও তেমনই—

"কর্ম্মান্তরে তদা বিপ্রা হেতুবাদান্ বহূনপি।
প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পর জিগীষয়া॥"

"কর্ম্মসমাপনান্তে সুবক্তা ও ধীরপ্রকৃতি ব্রাহ্মণেরা পরস্পর জয়কামনায় নানা হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক বক্তৃতা করিলেন" (আদিঃ ১৪ সর্গ)।

রাজকীয় উৎসবোপলক্ষে সেকালেও একালের মত প্রজাবর্গের মধ্যে নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ হইত। প্রজাগণ স্ব স্ব গৃহ এবং রাজবর্ত্ম পত্রপুষ্পে সাজাইত। নিশাকালে জনপদ ও রথ্যা সমস্ত দীপালোক উদ্ভাসিত হইত। রামাভিষেক সংবাদ শুনিয়া অযোধ্যার প্রজাবর্গ যে সকল উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তন্মধ্যে এইরূপও বর্ণিত আছে—

"কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপগন্ধাধিবাসিতঃ।
রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈরামাভিষেচনে॥ ১৭
প্রকাশী করণার্থঞ্চ নিশাগমন শঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাং স্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্ব্বশঃ॥ ১৮
(অযোধ্যা ৬ষ্ঠ সর্গ)।

"পুরবাসীরা রামাভিষেক সংবাদে রাজমার্গ পুষ্পশোভিত এবং ধূমগন্ধে সুগন্ধীকৃত করিল এবং রাত্রিতে নগর আলোকিত করনাভিপ্রায়ে রাজপথে দীপবৃক্ষ সকল স্থাপিত করিল।"

পশুপক্ষি পালন—সেকালের রাজন্য-বর্গও তাঁহাদের প্রমোদোদ্যানে নানাপ্রকার পশুপক্ষী পোষণ করিতেন। হনুমান্ রাবণের হস্তিশালায় চতুর্দ্দন্ত হস্তী দেখিয়াছিলেন। পায়রা ময়ূরাদি পক্ষীর বিশেষ আদর ছিল। কেকয় রাজ্যে একপ্রকার বৃহদাকার শিকারী কুকুর ছিল। ভরত মাতুলালয় হইতে আসিবার সময়ে মাতুল যুধাজিৎ যেমন বহু গজাশ্বরথ ও ধনরত্ন-দাস দাসী প্রদান করিলেন, তেমনই—

"অন্তঃপুরেঽতি সংবৃদ্ধান ব্যাঘ্রবীর্য্যবলোপমান্।
দংষ্ট্রাযুধান্ মহাকায়ান্ শুনশ্চোপায়নং দদৌ॥" ২০
(অযোধ্যা—৭০ তমঃ সর্গ)

"অন্তঃপুরে অতি যত্নে বর্দ্ধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণদন্ত ও বলবীর্য্যবিশিষ্ট বৃহদাকার বহু কুকুর ভরতকে উপহার রূপে প্রদান করিলেন।" এই কুকুরগুলি নিশ্চয়ই অসাধারণ ছিল। নতুবা কখনও রাজোপহারে ব্যবহৃত হইত না। গ্রীকদিগের লিখিত প্রাচীন ভারতের বিবরণেও পশ্চিম-পঞ্জাবে এই প্রকার ভীষণাকার কুকুর ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। 'ষ্ট্রাবো' লিখিয়াছেন যে, তথাকার রাজা এসিয়া-বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডারকে ঐ প্রকার দেড়শত শিকারী কুকুর উপহার দিয়াছিলেন। ঐ কুকুরের মধ্যে দুইটি কুকুরকে একটি সিংহের প্রতি লেলাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা সিংহটাকে এমন ভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল যে, শেষে কুকুরের কামড় হইতে সিংহটাকে বাচাইতে নানা প্রকার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া, ঐ কুকুরের একটির এক-খানা পা কাটিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতেও ঐ কুকুরটা আক্রান্ত সিংহকে ছাড়ে নাই। ঐতিহাসিক ইলিয়াণ্টও তাঁহার ভারতীয় বিবরণে এই প্রকার সিংহ আক্রমণকারী ব্যাঘ্রদংষ্ট্রা কুকুরের উল্লেখ করিয়াছেন। শুনা যায় অদ্যাপিও উত্তর পশ্চিম প্রান্ত প্রদেশের জঙ্গলে ঐ প্রকার বন্য কুকুরের বংশ দেখা যায়। বলাবাহুল্য যে, রামায়ণোল্লিখিত কেকয় রাজ্য ঐ প্রদেশেরই অংশভুক্ত ছিল।

নানাবিধ

বর্ত্তমান সময়ের পুরি, গিরি, ভারতী, সংনামী ইত্যাদি নানাশ্রেণীর সন্ন্যাসীর মত তখনও বহু প্রকারের ঋষি-সম্প্রদায় এদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বিভিন্ন ঋষিদিগের আচার ব্যবহার এবং এবং সাধন প্রণালীও বিভিন্নপ্রকারের ছিল। 'বালখিল্য'গণ প্রজাপতির লোম হইতে, 'বৈখানস' ঋষিরা প্রজাপতির নেত্র হইতে ও 'সৎপ্রক্ষাল'গণ প্রজাপতির চরণবারি হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইতেন। এতদ্ভিন্ন

'মরীচিপ' সম্প্রদায় সূর্য্যকিরণ পান করিয়া, 'অশ্মকুট্ট' সম্প্রদায় কুটিতান্ন ভোজন করিয়া, 'পত্রাহারীগণ, বৃক্ষচ্যুত পত্র আহার করিয়া 'দন্তোলুখলীয়া' দন্তকুট্টিত অন্নাহারে বায়ু ভোজীরা শুধু বায়ু সেবন করিয়া এবং সলিলাহারিগণ জলমাত্র পান করিয়া প্রাণধারণ করিতেন। সাধন-প্রণালী অনুসারেও ইহাদের শ্রেণীভেদ হইত। "উন্মজ্জক"গণ জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া, "অনবকাশিক"গণ একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতেন। আবার "পত্রশয্য"গণ মাটিতে শয়ন করিতেন, 'অশয্য'গণ শয্যায় কখনও শুইতেন না, বসিয়া বা দাঁড়াইয়া কালকাটাইতেন তদ্ভিন্ন অনেক ঋষি (আকাশ নিলয়) অনাবৃতস্থলে কেহ কেহ পর্ব্বত পৃষ্ঠে কেহবা মরুভূমিতে অবস্থিতি করিতেন: কোন দল নিয়ত আর্দ্রবস্ত্রে থাকিতেন। (আরণ্য ৬ষ্ঠ সর্গ)। ঋষিগণ যে কেবল দেহনির্য্যাতন করিয়াই সাধন ভজন করিতেন, তাহা নহে, জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়া গেলে তাহারা স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গসুখের অধিকারী হইতে প্রয়াস পাইতেন। অগ্নিতে দেহবিসর্জ্জনই জীবন ত্যাগের প্রকৃত পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইত। তাপসী শবরী এবং মুনিবর শরভঙ্গ শ্রীরামের বনপ্রবাসকালে তাঁহার সমক্ষে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। জরাজীর্ণ দেহভার বহনাপেক্ষা এ ভাবে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তি তাঁহারা পরম শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলেন। উত্তরকালে গ্রীকরাজ আলেকজেণ্ডারের সহযাত্রিগণও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে অকুতোভয়ে অগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি এদেশ হইতে যে কয়েকটী ব্রাহ্মণ যোগী স্বদেশে পাঠাইয়াছিলেন, কালানস্ (কল্যাণ স্বামী?) তাঁহাদের একজন। রাজকীয় সম্মানাকাঙ্ক্ষায় যোগভ্রষ্ট হওয়ায় শেষে তিনি অনুতাপে অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। 'মৃচ্ছকটিকে' ঐ নাটকপ্রণেতা মহারাজ শূদ্রকের অগ্নি-প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগের উল্লেখ আছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও লাহোরাধিপতি মহারাজ জয়পাল স্থলতান মামুদের নিকটে পরাজিত হইয়া পরিতাপে ও লজ্জায় অগ্নিতে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করেন।

মহাভারতে যেমন ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব; দিগ্বিজয়াদির বহু প্রসঙ্গ দেখা যায়, রামায়ণে আত্মবিরোধের তেমন মলিন চিত্র তত বেশী দেখা যায় না, বরং তৎকালে রাক্ষসোপদ্রুত আর্য্যনৃপতিবৃন্দ যে একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া জাতীয় উন্নতির প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, রামায়ণে তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীকরাজ "মেনিলসের" পত্নী "হেলেনা"কে ট্রয়রাজকুমার পেরিস অপহরণ করাতে গ্রীক রাজগণ যেমন "এগামেমননের" পরিচালনাধীনে সমবেতভাবে ট্রয় আক্রমণ এবং ধ্বংস করিয়া জাতীয় কলঙ্ক মোচন করেন, তেমনিই আর্য্যাবর্ত্তের নরপতি মণ্ডলী রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ সংবাদে ভীষণ রোষান্বিত হইয়া ভরতের নেতৃত্বাধীনে লঙ্কাভিযানের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই রাবণ নিহত হওয়ায় এই সুবিশাল অভিযানের প্রয়োজন হয় নাই। সমাগত নৃপতিবৃন্দ শ্রীরামের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অযোধ্যায় থাকিয়া তদীয় অভিষেকোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা লঙ্কা সমরে শ্রীরামের কোনও সাহায্য করিতে না পারিলেও তিনি তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশানন্তর তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। বিদায়দান কালে কাশী নরেশ 'প্রতর্দ্দন'কে আলিঙ্গন করিয়া বিনয়াবতার রাম বলিলেন,—

"দর্শিতা ভবতা প্রীতির্দর্শিতং সৌহৃদং পরম্।
উদ্‌যোগশ্চ ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ॥ ১৬

এইরূপ করিয়া একে একে তিনশত নরপতিকে বিদায়াভিনন্দন করিলেন। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সকলকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,

"ভবদ্ভিশ্চ সমানীতা ভবতেন মহাত্মনা॥ ২৪
শ্রুত্বা জনকরাজস্য কাননাত্তনয়াং হৃতাম্।
* * *
যেতুমার্য্য মহৎ তত্র ভবতা তেজসাং চয়ঃ।"
(উত্তর—৩৮শ সর্গ)

"জানকীর অপহরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া মহাত্মা ভরত আপনাদিগকে আনিয়াছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আপনাদিগকে কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই। রাবণ যে সবংশে নিহত হইয়াছে তাহাও আপনাদেরই প্রভাবে আমি কেবল ... প্রত্যুত্তরে বিনয় ও শিষ্টাচার প্রকাশ করতঃ স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন প্রস্থানকালে কোন কোনও বলদর্পিত রাজা দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

"ন রাম রাবণং যুদ্ধে পশ্যামঃ পুরতঃ স্থিতম্।
ভরতেন বয়ং পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্॥" ও

"আমরা রাম ও শত্রু রাবণকে সম্মুখ সমরে দেখিতে পাইলাম না। রাবণবধের পরে ভরত অকারণে আমাদিগকে আনিয়াছেন।" রাজগণ স্ব স্ব রাজ্যে গিয়া অনুগামী ভরত শত্রুঘ্ন প্রভৃতিকে প্রচুর উপহার সহ বিদায় করিলেন। কি সুন্দর জাতীয় একতার চিত্র!

তখন জাতীয় আহ্বানে সকলের প্রাণে এমন সাড়া দিত যাহাতে মুষ্টিমেয় আর্য্যসন্তান আসমুদ্র হিমাচল তাঁহাদের ভুজতেজে প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। এই জাতীয়তার অনুপ্রাণনা তাঁহাদের বাহুতে চতুর্গুণশক্তি এবং হৃদয়ে অদম্য তেজের সঞ্চার করিত। তাঁহারা একে সহস্রের কার্য্য সাধন করিতেন। কবি প্রকৃতই গাহিয়াছেন—

"এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে
দিক অন্ধকার করেছিল ধূমে,
রণরঙ্গ মত্ত পূর্ব্বপিতৃগণ
যখন তাহারা করেছিল রণ
করেছিল জয় পঞ্চনদ গণ
তখন তাহারা কজন ছিল ?
আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিল তা'রা জয় ডঙ্কা তুলে,
যমুনা কাবেরী নর্ম্মদা পুলিনে
দ্রাবিড় তৈলঙ্গ দাক্ষিণাত্য ভূমে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে
তখন তাহারা কজন ছিল ?"
(হেমচন্দ্র)

রামায়ণের সময়ে এদেশে প্রচুর ধনৈশ্বর্য্য ছিল, দানের জন্য ; ভোগের জন্য নহে। বিদ্যা ছিল মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য : অর্থোপার্জ্জনের জন্য নহে বাহুতে অমিত বল ছিল, আর্ত্তত্রাণের নিমিত্ত ; পরপীড়নার্থে নহে। তখন ব্রহ্মচর্য্যপূত সংযম ছিল, শান্তিময় জীবনযাপনের নিমিত্ত। ফলতঃ যে সময়ে শ্রীরামের ন্যায় প্রজারঞ্জক রাজা ও পিতৃভক্ত পুত্র, ভরত ও লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতা, লক্ষ্মীস্বরূপা সীতাদেবীর ন্যায় সহধর্ম্মিণী, জটায়ুর ন্যায় বন্ধু এবং হনুমানের মত সেবক, কবিকল্পনার বিষয়ীভূতও হইতে পারে সেই যুগের পবিত্রতা ও সুখশান্তি কেবল অনুমানে উপলব্ধবা, এই স্বার্থসর্ব্বস্ব যুগে কুত্রাপি তাহা বাস্তব ব্যাপারে পরিণত হওয়া সম্ভবপর নহে।

শ্রীনীলকণ্ঠ দে

দেশের ও দশের কথা

দুর্ম্মূল্যতা

ধান, চাউল, ডাইল, মৎস্য, তৈল, কেরোসিন, চিনি, বাতাসা, কাঠ, কয়লা, কাপড়, তরিতরকারী, দুধ, ঘি, আটা ময়দা, সাগু বার্লি, পান সুপারী, খয়ের, জীরামরিচ, লঙ্কা, তামাক, হাঁড়ী, মালসা প্রভৃতি লোকের নিত্য প্রয়োজনে যে কোনও দ্রব্য লাগে, নিকটবর্ত্তী হাট বাজার অপেক্ষা এই খুলনা সহরে তাহার সমস্তই চড়া দরে বিক্রীত হইতেছে। বাজারদর এখানে বৃদ্ধি করা কেবল স্বেচ্ছাচারী দোকানদারের মর্জ্জির উপরই নির্ভর করে। দোকানদারগণ যখন ইচ্ছা, বে-কৈফিয়ত যে কোনও জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করে। বিধিলিপিও পুরুষকারের বলে কখন কখন খণ্ডন হইতে পারে, হাকিমের হুকুমও নড়িতে পারে কিন্তু এখানকার দোকানদাররূপী বিধাতাপুরুষগণের বেদবাক্যের কখনও নড়চড় হয় না! আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

চাউল

গত ১৯এ এপ্রিল শনিবার অপরাহ্নে বালাম চাউলের মণ ৬৷৷০ টাকা বিক্রয় হইতেছিল! ২০এ এপ্রিল রবিবার প্রাতে ৭টার সময়ে সেই চাউল ৭।০ টাকা দরে, খুচরা ৭৷৷০ টাকা দরে, বিক্রয় হইল! এখন স্থায়ী দর ৭৷৷০ টাকা মণ হইয়াছে। আমরা অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম, দক্ষিণে জলমা, সুরখালী প্রভৃতি হাটে অনেক ব্যাপারীর আমদানী হওয়ায় তথায় চাউলের মূল্য খুব বাড়িয়াছে, তাই সেই চাউল আসিয়া খুলনায় লাগায় এখানকার দোকানদারগণ নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া চাউলের দর বাড়াইয়াছে! দক্ষিণ অঞ্চলের গঞ্জসমূহে ব্যাপারীর আমদানী ও চাউলের দর বৃদ্ধি হইলে খুলনার দোকানদারগণের পূর্ব্বের খরিদা মজুত চাউলের দর এক রাত্রির মধ্যে মণকরা ৷৷০ আনা ১৲ টাকা বৃদ্ধি হয় কেন, কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? অনেক দোকানদারের ঘরে আগেকার সস্তাদরে কেনা চাউল ২০৲ মণ হইতে হাজার দেড় হাজার মণ পর্য্যন্ত মজুত আছে। তাহারা সে চাউলের মূল্য এরূপ চড়াইয়া দরিদ্র খরিদ্দারগণের সর্ব্বনাশ করে কেন?

এখানকার যথেচ্ছাচারী দোকানদারদিগের অত্যাচার হইতে নিরীহ খরিদ্দারদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্থানীয় কতকগুলি উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক "কো-অপারেটিভ ষ্টোর" স্থাপন করিয়া কাপড়, চাউল ও কয়লা আমদানী করিয়া কয়েক মাস যাবৎ বিক্রয় করিতেছেন। দুঃখের বিষয় বলিব কি, আগাম সময়ের খরিদা দুই আউড়ি চাউল ষ্টোরে মজুদ থাকিতেও তাঁহারাও অন্যান্য দোকানদারের ন্যায় বর্দ্ধিত দরে চাউল বিক্রয় করিতেছেন।

বর্ত্তমানে বর্দ্ধিত দরে যে চাউল খরিদ করিবে তাহা তাহারা বেশী বেচিলে কাহারও আপত্তি করিবার কারণ নাই, কিন্তু ঘরে পূর্ব্বের সস্তা মাল মজুত রাখিয়া বাজার দরের দোহাই দিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করা কি অত্যাচারের নামান্তর নহে?

স্থানীয় মাড়োয়ারী ও অন্যান্য বহুতর মহাজনের গুদামে হাজার হাজার মণ পূর্ব্বের খরিদা চাউল মজুদ আছে,

তাহারা এত দরেও এখানে মাল ছাড়িতেছে না, বোধ হয় বাজার আরও চড়িলে কলিকাতায় চালান দিবে।

আমরা আমাদের নবাগত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ থর্প বাহাদুরকে শীঘ্রই ইহার প্রতিকার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। শীঘ্রই ইহার প্রতিকার না হইলে অনেক দরিদ্র ভদ্রলোককে অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে কাল কটাইতে হইবে। মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ৩০৲।৩৫৲ টাকা বেতনের বহুতর ভদ্রবংশীয় দরিদ্র কর্ম্মচারী কার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে এই সহরে বাস করেন। তাঁহাদের আয় অল্প হইলেও তাঁহারা বালাম চাউল খাইতে আজন্ম অভ্যস্ত। মোটা চাউলের ভাত তাঁহাদের খাওয়া কোনদিন অভ্যাস নাই। কারণ চাউলের মূল্য তো কোন বৎসর এত বেশী হয় নাই? যে বৎসর খুলনার সাতক্ষীরা মহাকুমায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তদানীন্তন দয়ালু ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভিন্সেণ্ট মহোদয় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়া স্থানে স্থানে রিলিফেরকাষ্য ও সরকার হইতে চাউল বিতরণের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে বৎসরও মোটা চাউের মণ ৫৲ টাকা, বালাম ৬৲ টাকার বেশী মণ হয় নাই। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যদি এই জেলা হইতে শীঘ্রই ধান চাউলের রপ্তানী বন্ধ না হয়, তাহা হইলে আর দুর্দ্দশার পরিসীমাও থাকিবে না!

কেরোসিন তৈল

কয়েক মাস পূর্ব্বে এখানকার সমস্ত দোকানদারই সাদা কেরোসিনের বোতল দশ পয়সা দরে খুচরা বিক্রয় করিত। কিঞ্চিদূণ ১ মাস হইতে মারোয়ারীরা ৵০ আনা দরে খুচরা বেচিতে আরম্ভ করায় ৭।৮ দিন পর হইতে সমস্ত দোকানী-ই ঐ দরে কেরোসিন বেচিতে বাধ্য হয়। দশ বার দিন হইতে খুলনায় সাদা কেরোসিনের আমদানী নাই, যাহাদের ঘরে সাদা তেল মজুত ছিল, তাহারা দশপয়সা ক্রমে বার পয়সা, কোন কোন খরিদ্দারের কাছে।০ আনা বোতল বেচিতে আরম্ভ করিল! ইহা কি অত্যাচার নহে?

সর্ষপ-তৈল—সর্ষপ তৈলের সের জেলখানায় ৸৵০ আনা বাজারে ১ সের এক টাকায় উঠিয়াছে।

চিনি বাতাসা—গত রবিবার হইতে চিনি ।৵০ আনার স্থলে ৷৷৵০ আনা বিক্রীত হইতেছে! কেন? চিনির জাহাজ ডুবিয়াছে বলিয়া ত আমরা কোন সংবাদ পাই নাই। বরং সংপ্রতি কয়েক জাহাজ চিনি কলিকাতায় আসিয়াছে বলিয়াই শুনিয়াছি।

মৎস্য—মৎস্যের আমদানী নাই বলিলেই হয়, সুতরাং মূল্য বৃদ্ধি হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দুগ্ধ—বৈশাখ মাস—হিন্দুর নানাবিধ ব্রত নিয়ম, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড এই মাসে হয়। এজন্য দুধের বাজার ভয়ানক চড়িয়াছে। সের (১২০ তোলা) ।/০. ।৵০ আনা কোন কোন দিন ৷৷০ আনা বিক্রয় হইতেছে।

আলু ইত্যাদি—আলু ৭৲ মণ এবং খুচরা ৵০ আনা সের বিক্রয় হইতেছে। ডাইল, কলাই, আটা, ময়দা, ঘৃত, জীরামরিচ প্রভৃতি মসলা দৌলতপুর, সেনের বাজার, ফকিরহাট প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী হাটের তুলনায় চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। কেন এমন হয়? অনুসন্ধান প্রার্থনীয়।

তরিতরকারী ইত্যাদি।

এখন বৈশাখ মাস, কয়েক সপ্তাহ হইতে বৃষ্টি হওয়ায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এতদঞ্চলে তরিতরকারী ইত্যাদি যথেষ্ট জন্মিলেও এখানকার বাজারে তাহা অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হয়। তাহার কারণ বাজারের ফড়িয়াদের অত্যাচার। গ্রামের গৃহস্থবিক্রেতারা তাহাদের ক্ষেতের উৎপন্ন শাকের ডাটা, পটল, উচ্ছে, ঝিঙ্গা, কাঁচকলা, পাকাকলা, লেবু, নারিকেল ইত্যাদি যে কোনও দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ার্থ আনিবামাত্র ফড়িয়ারা বাজারের ইজারাদারের সহায়তায় তাহা তৎক্ষণাৎ সস্তায় কিনিয়া পরে যথেচ্ছাদরে বিক্রয় করে। মনে করুন, একজন তাহার গাছের এককুড়ি কাগজি লেবু বাজারে বেচিতে আসিল। সে বাজারে জিনিস নামাইতেই ফড়েরা আসিয়া ৷৷৵ আট আনায় ঐ কুড়িটা লেবু কিনিয়া লইল। আপনার বাটীতে রোগী আছে, লেবুর দরকার, না হইলেই নয়, একটী লেবু ফড়িয়ার প্রার্থনা মত আপনাকে তিন পয়সা দিয়াও কিনিতে হইল। ফড়িয়া এই হিসাবে এককুড়ি লেবুতে ৷৷৵০ আনা লাভ করিল!! এইরূপ সমস্ত দ্রব্য ফড়িয়ারা এক চেটিয়া করিয়া অসম্ভব লাভ করে। জমিদারের নায়েব মহাশয় ভিন্ন এই অত্যাচার আর কাহারও দ্বারা নিবারিত হইবার উপায় নাই। আমরা নায়েব বাবু বেণীমাধব বসু মহাশয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তিনি ফড়িয়াদের এই অসহনীয় অত্যাচার অচিরে নিবারণ করিয়া জমিদার বাবুদের যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখুন। (খুলনাবাসী)

টিপ্পনী—কেবল খুলনায় নয় দেশের সর্ব্বত্র সকলে এইরূপ মূল্য বৃদ্ধির জন্য যারপর নাই কেশ পাইতেছে। উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বাজার দরের অবস্থা সকলেই বুঝিতে পারেন। মূল্য বৃদ্ধি স্বাভাবিক কারণেও ঘটে, ম্যুনাফা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অস্বাভাবিক কারণেও ঘটে। খরিদ্দারগণ অসহায় ভাবে এই দর বৃদ্ধি মাথায় পাতিয়া নিলে অস্বাভাবিক চড়া দরও স্থায়ী হইয়া যায়। অবস্থা বিশেষে সাময়িক প্রতিকার গবর্ণমেণ্ট করিতে পারেন। কিন্তু স্থায়ী প্রতিকার প্রধানতঃ খরিদ্দারগণেরই হাতে। বিবিধ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিলাম।

বিক্রমপুরে অন্নকষ্টের সূচনা

বিক্রমপুরান্তর্গত চূড়াইন হইতে জনৈক ভদ্রলোক আমাদিগকে নিম্নলিখিতরূপ সংবাদ দিয়াছেন :—চূড়াইন ও খালপার প্রভৃতি আড়িয়লবিলের তীরবর্তী কয়েকখানি গ্রামে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গত ৭ বৎসর যাবত বর্ষার প্রবল স্রোতে এতদঞ্চলের কৃষকগণের আমন-ধান ভাসাইয়া নিতেছে, এবং ইহার ফলে অনেক কৃষককেই এতদিন হাল গরু পর্য্যন্ত বেচিয়া খাইতে হইয়াছে। গত বৎসরের আমনধান ভাসিয়া যাইবার পর তাহাদের মনে এইরূপ আশা ছিল যে, হয়তঃ আগামী বোরো ধানের ফসল পাইলেই তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশার কথঞ্চিৎ অপনোদন হইবে। কিন্তু অনাবৃষ্টিনিবন্ধন সমস্ত বোরা জমিই জ্বলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে আরও একটা বিপদ এই হইয়াছে যে, আড়িয়লবিলের চারিপাড়স্থ আমন জমিগুলিতে চাষ চলিতে পারে নাই, এবং ঐ বিলের উত্তরপারস্থিত প্রায় ১৮ মাইল দীর্ঘ ও ৭ মাইল প্রশস্ত বিশাল ভূমিখণ্ডে এইবার আর শস্য বপন করিতে পারা যায় নাই। লোকের পেটে ভাত নাই, গায়ে কাপড় নাই, এবং এখন ধারেও কেহ আর কাহাকে টাকা পয়সা দেয় না। চাউলের দর টাকায় ৫ সের এবং ধান টাকায় ॥ সের। বাজ ধানের মূল্য প্রতি টাকায় ৫॥ সের মাত্র। গরিব গৃহস্থের তো কথাই নাই, এমন কি চূড়াইন অঞ্চলের অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের ঘরেও এখন আর দুবেলা আহার চলিতেছে না। কৃষকদিগের মধ্যে অনেকেই যবের ছাতু এবং কেহ কেহ বা যবের মণ্ড ও কুমরা সিদ্ধ খাইয়া জীবনরক্ষা করিতেছে। কিন্তু এইরূপ যবের ছাতুতে বা মণ্ডেও বেশী দিন চলিবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ মাঘ মাসে বৃষ্টি না হওয়াতে অনেক জমিতেই যব ভাল জন্মিতে পারে নাই।

চূড়াইন অঞ্চলে অনেকগুলি আমবাগিচা আছে; কিন্তু দেশবাসীর কপালদোষে এবৎসর ঐ সকল গাছেও আম হয় নাই। অনেকেরই বিশ্বাস যে, হয়তঃ আর এক পক্ষকালের মধ্যেই চূড়াইন গ্রামের অধিকাংশ লোকের ঘরেই উপবাস আরম্ভ হইবে; তখন লোকের অবস্থা যে অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এ সময় সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে চূড়াইন অঞ্চলের কৃষকদিগকে হাল ও বীজ দ্বারা সাহায্য করিতে পারিলে, কতক জমি আবাদ হইতে পারিত। অবশ্য নীচের জমি এখন আর চাষ করিবার সময় নাই; কিন্তু টানের জমিতে এখনও পাট এবং ধানের চাষ চলিতে পারে। আমরা আশা করি, জিলার কালেক্টর সাহেব বাহাদুর এবং ঢাকা জিলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ সত্বর চূড়াইন বাসীর জীবন রক্ষার যথাযোগ্য উপায় বিধান করিবেন।" (ঢাকাপ্রকাশ)

টিপ্পনী—ইহা প্রধানতঃ দৈব আপদ। (সম্পূর্ণ ভাবে সম্ভব না হউক,) আংশিক দুঃখ নিরাকরণ প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্ট করিতে পারেন, এরূপ দৈব দুর্বিপাক হইতে প্রজার রক্ষাবিধান রাজধর্ম্মের বড় একটি কর্ত্তব্য। ক্রমাগত ৪ বৎসর যাবৎ বন্যায় আমনধান ভাসাইয়া দিতেছে, ইহা কি অপ্রতিকর দুর্ঘটনা! পূর্ত্ত বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের ইহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক

পল্লীর জলকষ্ট।

জীবন রক্ষার নিমিত্ত, বায়ুর পরেই, জলের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেই প্রাণরক্ষক জলের অভাব বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীবাসীই বহুকালাবধি অনুভব করিয়া আসিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, পল্লীতে পল্লীতে জলাভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রতি বৎসরই ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গ্রামবাসিগণ জলাভাবজনিত কষ্ট বিশেষরূপে উপলব্ধি করে।

এই সময়ে যদি একবার স্বচ্ছসলিলপায়ী নগরবাসীরা একসপ্তাহ গ্রামে পদার্পণ করেন তবে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, গ্রামবাসিগণ কিরূপ জল পান, স্নান ও অন্যান্য কর্ম্মের নিমিত্ত নিয়ত ব্যবহার করিয়া থাকে। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, পল্লীবাসিগণ জলাভাবে কিরূপ অহর্নিশ কষ্টে কালাতিপাত করে। তাঁহারা আরও বুঝিবেন,— পার্থিব সুখের লীলাক্ষেত্র নগরে বাস করিয়া শুধু সংবাদপত্রের দুই এক পঙ্‌ক্তি পাঠ করিয়াই পল্লীবাসীর দুরবস্থা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা একান্তই অসম্ভব। * * *

গ্রামবাসী যেসব অভাব অহরহ অনুভব করিয়া থাকে, জলকষ্টই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সেই জলাভাব যাহাতে প্রতি পল্লী হইতে বিদূরিত হয়, ধনে মানে, জ্ঞানে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সকলেরই তৎপ্রতিকারে যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। দেশের নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা,—তাঁহারা যেন বঙ্গপল্লীর জলকষ্ট নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। (ঢাকা-প্রকাশ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

টিপ্পনী—এই প্রার্থনা, হায়, একেবারেই অরণ্যে রোদন। কই, এ সব কার্য্যের চেষ্টা থাক, এ সব কথার আলোচনাও কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স কি সাময়িক সাহিত্যে বড় দেখিতে পাই না। কবে কর্ত্তারা হোমরুল পাইবেন জানি না—তত দিনে 'হোম'ই যে ছারখারে যাইবে।—স্বায়ত্ত শাসন এই হোমরুলের দিকে তাঁহারা একটু দৃষ্টি করেন না—যাহা একেবারে পরায়ত্ত কেবল তার জন্যই এত চেঁচাচেঁচি ঝগড়া ঝাটি কেন?

পথের দেখা

(গল্প)

অন্ততঃ পাঁচ সাতটি পাত্রী দেখিয়াও আমার জন্য বাবার পছন্দসই পাত্রী মিলিল না। আমার কামিনী-ভাগ্যটা বেশ সন্তোষজনক কিনা, সে বিষয়ে মাতাঠাকুরাণীর দৃঢ় সন্দেহ হওয়ায় অবিলম্বে গণক ডাকাইয়া আমার ঠিকোজী-কোষ্ঠি দেখাইয়া আমার কল্যাণে শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিবার মত প্রকাশ করিয়া তিনি অনেকটা শান্ত হইলেন।

দেশের বিচার দেখিয়া বহুপূর্ব্ব হইতেই আমার মন এই স্বার্থপর নিরীহ-নারী-পীড়নকারী পুরুষজাতটার বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিদ্রোহ করিয়া বসিয়াছিল। পাত্র দেখিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না। কারণ পুরুষমাত্রেই নাকি সুশ্রী। কুৎসিত হইলেও তিনি সুপুরুষ—যেহেতু তিনি পুরুষ। পাত্রী দেখা খুবই আবশ্যক, অত্যাবশ্যক। কেননা পাত্রী নারী। সুশ্রী হইলেও অতি বিশ্রী। বিশেষতঃ ঐ জাতটার গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে দেখিবার ও বিচার করিবার জন্য পুরুষকে অনেকটা সময় খরচ করিতে হয়। যেহেতু—তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধর বা কুলতিলকগণ কৃষ্ণ-দানোর গাত্রবর্ণ প্রাপ্ত না হয়—এই আশঙ্কা। ভবিষ্যৎ পুরুষ সুদূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া রূপ বিচারে বাহিরের শ্রী বাছিয়া লইতে একটুও ভুল করে না,—কিন্তু, নিজের পরের বিচারেও যে তাহার সেই সমানই পাওনা, একই দণ্ড—এ বিষয় পুরুষ বোধ হয় একবার ভুলিয়াও ভাবে না

শ্যাম-সুন্দর-পুরুষরতন দর্পণ সম্মুখে নিজের বর্ণ বিচারে নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লয়—'মন্দ কি!' কিন্তু নারী সে অবস্থায় উপাধি পায়—শ্মশানকালী বা রক্ষাকালী। এই ত পুরুষের বিচার!

বর্ণ-কালোর দেশ বাঙ্গালার পুরুষ একটু 'রং ফরসা' পাইলেই পরিতৃপ্ত। তাহা সে দুধে আলতা, কাঁচা সোণা বা হলুদ বরণ দেখিয়া লইবার জন্য তাহারা ব্যস্ত নহে। এবং অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখিতেও তাহারা রাজি নহে।

গৌরাঙ্গী সুপাত্রী বাছিতে বাছিতে বাঙ্গলা দেশ এক্ষণে 'বাছনি-নামঞ্জুর' শ্যামাঙ্গী পাত্রীতে পরিপূর্ণ। তাহাদের উপর প্রজাপতির করুণা দৃষ্টি পড়ুক চাই নাই পড়ুক, দেশ তাহার জন্য কোন ব্যবস্থা বা বিবেচনা করিতে বাধ্য নহে। সে সকল পাত্রীর জন্য দায়ী তাহাদের জন্মদাতাগণ।

যখন বাস্তবিকই বুঝিলাম—দেশের লোক আমার জন্য একটিও 'ফরসা' পাত্রী অবশিষ্ট রাখে নাই, তখন আমি মনে মনে যে আমার দেশের দাদাদের উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করি নাই—এটা সহজেই অনুমেয়। ফলে—মন আমার মায়া মমতায় ভরিয়া উঠিল—ঐ রং-ময়লা পাত্রীর জন্য। তাহাদের উপর এ অবিচারের জন্য তাহাদের যে কি মনঃকষ্ট দেশের কর্ত্তারা কি তাহা একেবারও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন? সমবেদনায় প্রাণ আমার কাঁদিয়া উঠিল। তুচ্ছ রং লইয়া দেশের লোক এত ব্যস্ত? রং-ই কি রূপ? না—রূপের একটা অংশ! 'রং' বাদ দিয়াই রূপ। 'রং' রূপকে রাঙ্গাইয়া তোলে মাত্র। অন্যদেশ রূপ বাদ দিয়া রংটাই বাছিয়া লয়। ইন্দ্রের সৌন্দর্য্য বোধ হয় একালে বজ্রশূন্য। নতুবা বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টিব-সং—এ দেশের মাথায় তাহার পতন হওয়া বহু পূর্ব্বেই উচিত ছিল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম—শ্যামাঙ্গী পাত্রীই বিবাহ করিব। কেন? তাহারা কি মানুষ নহে? তাহাদের দেহে কি প্রাণ নাই? সে প্রাণে কি প্রেম নাই? মানুষ হইয়া মানুষের উপর এ অত্যাচার, এ অবিচার ধর্ম্মে সহে না, তাই বুঝি বাঙ্গলার এ দুরবস্থা!

মনোভাব প্রকাশ করিয়া মাকে জানাইলাম—আমার জন্য একটী দরিদ্র শ্যামাঙ্গী পাত্রী স্থির করা হউক। আমি তাহাতেই রাজি আছি।

মা বিস্মিত নেত্রে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—"সে কি!—অবাক করলি যে!"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম—"না, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। সুশ্রী পাত্রী অর্থাৎ গৌরাঙ্গী পাত্রী আমি বিবাহ করিব না।" মনে মনে স্থির করিলাম—দেশে একটা দৃষ্টান্ত রাখিতে চাহি।

বাবা শুনিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"সত্যিই একটা পাগলামো নাকি? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—একি একটা

খেয়ালের কাজ ?"—তিনি সুপাত্রী অনুসন্ধান করিতে বিরত হইলেন না।

(২)

পিঠের উপর কালো ধোঁয়ার চুলের রাশি উড়াইয়া উন্মত্ত ট্রেনখানা রুদ্ধশ্বাসেই ছুটিতেছিল। উভয় পার্শ্বের লতা-বৃক্ষের ঘন-সবুজ উচ্চ প্রাচীর সমভাবেই বিপরীত দিকে ছুটিতেছিল। বিশ্বপিতার ফুলবাগিচার অজ্ঞাত কোন বন-ফুলের মৃদু সুবাস দুরন্ত হাওয়ার সহিত চলন্ত গাড়িতে প্রবেশ করিয়া ক্ষণেকের জন্যও ক্লান্ত যাত্রীর শ্রান্তি দূর করিতেছিল। আমি তৃতীয় শ্রেণীর বাতায়ন হইতে দেখিতেছিলাম—প্রায়—মেঘশূন্য আকাশ কি; গাঢ় নীল জগতের ঐ নিশ্ছিদ্র আবরণ কি অসীম, কি উদার উন্মুক্ত। তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—বিশ্বের যত অসহ্য উত্তাপ, যত প্রবল ঝঞ্ঝা, আকাশের ঐ প্রশস্ত বক্ষে গিয়াই প্রতিহত হয়, তবুও তাহা কত দৃঢ়, কি নিশ্চল! মানুষ শোকাশ্রুসিক্ত চক্ষুঃ মেলিয়া ঐ আকাশের প্রতিই উদাস করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে,—সেই নীল, গাঢ় নীল পরে কৃষ্ণ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ! প্রাণ বিমলানন্দে পূর্ণ হয়। শান্তির শীতল ধারায় শরীর সিক্ত হয়! মুগ্ধনেত্রে মানুষ তখনও দেখে সেই—জগৎজোড়া একটা সীমাহীন কৃষ্ণবর্ণ! বিশ্বকর্ম্মা কৃষ্ণবর্ণের পক্ষপাতী, তাহাই তিনি বিশ্বের স্বভাব ছবিখানিও ঐ বর্ণে 'চিত্রিত' করিয়াছেন। যে স্বভাবের মনোহর দৃশ্যে ভাবের আবেশে মানুষকে উন্মাদ করিয়া ফেলে, সেই মানুষই পুনঃ স্বভাবের বর্ণটাকে এত ঘৃণ্য, এত তুচ্ছ মনে করে কেন?

"আপনি কদ্দুর যাবেন?"

পার্শ্বস্থ এক ভদ্রলোকের প্রশ্ন আমার চিন্তায় বাধা দিয়া তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া দিল। নিজ অস্তিত্বের বর্তমান অবস্থাটা নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইয়া, গলাটা একবার ঝাড়িয়া লওয়া সত্বেও সদ্য সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জড়িতকণ্ঠে কহিলাম—"হাওড়া।" পার্শ্বেই বাতায়ন থাকা সত্বেও গাড়ির মেঝেতেই একমুখ পিক্ ফেলিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে বিড়িতে একটা সজোর দম কসিয়া ভদ্রলোক ততোধিক সজোরে কাশিতে কাশিতে সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলেন ও পানের পিকের উপর অনেকটা শ্লেষ্মা ফেলিয়া লালবর্ণ চক্ষু দুইটি আমার দিকে তুলিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কি পড়েন?"

আমি পাদুকাদ্বয়কে বেঞ্চের তলদেশে অনেকটা দূরে সরাইয়া দিয়া, পা গুছাইয়া একটু ভাল হইয়া বসিয়া জানালার দিকে মুখ করিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে না।"

"অ্যাঁ! এত অল্প বয়সে পড়া ছেড়ে দিলেন যে?"

"আর প'ড়ে শুনেই বা কি হবে?"

"তবুও মনে করুন—বিদ্যের একটা আলাদা মান খাতির আছে। আমার ছোট দুটি ভাইকে কোল্‌কাতায় রেখে পড়াচ্ছি।" গর্ব্বোৎফুল্ল দৃষ্টিতে ভদ্রলোক মুহূর্ত্তকাল আমার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"মুরগিহাটায় আমার মনোহারী দোকান আছে। নিবাস আমার বৈঁচির সন্নিকট। গেল বছর আমাদের গাঁয়ের ভোলাই ঠাকুর বি, এ, পাশ করেছে। এখন কোল্‌কাতায় চাকরি করে আর ওকালতি পড়ে। আহা ছোকরা বড়ই বিপদে পোড়েছে। গেল মাসে তার বাপটি মারা গ্যাছেন। ১৩।১৪ বছরের একটা বোন্ ঘাড়ে পোড়েছে। কত জায়গা থেকে দেখ্‌তে আসে কিন্তু পছন্দ করে না। মেয়েটি দেখতে ভারি সুশ্রী, অপরাধের মধ্যে মনে করুন কিনা—একটু শ্যামবর্ণ।" ভদ্রলোক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"ভো ঠাকুর তার বোন্‌কে নাকি কোল্‌-কাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবে শুনছি?"

ভদ্রলোকের বিড়ি নিভিয়া গিয়াছিল। অপর এক ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে চক্ষু প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"মশায়, আপনার দেশলাইটা একবার দিন না!"

অপরিচিতের অযাচিত প্রসঙ্গ শুনিতে প্রথমতঃ আমার বড়ই বিরক্তিবোধ হইতেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিসের একটা প্রবল আকর্ষণ, কি একটা দুর্জ্জয় আগ্রহে আমার মনটাকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষিত করিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিল। মন আমার মনেই—পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল—তারপর—ওগো—তারপর?

"বন্দেল জংসন"—ট্রেনখানা হুড় হুড় শব্দে ব্যাণ্ডেল ষ্টেসনে প্রবেশ করিয়া থামিয়া গেল, কুলি ও ফেরিওয়ালার বিভিন্ন বিকট চীৎকারে মুহূর্ত্তে সে স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল। প্লাটফর্ম্মে যাত্রীর জোয়ার আসিয়া প্রবল বন্যার স্রোতের মতই নিম্নগামী সোপান বাহিয়া উছলিয়া পড়িতে লাগিল। আর সেই স্রোতের বুকে আবর্জ্জনার মতই ভাসিয়া চলিল—কুলির মাথায় মালপত্র বাক্স বিছানা।

ভদ্রলোকটী কখন যে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতেও পারি নাই। আমি আগ্রহ-আকুল-দৃষ্টিতে সেই জনতার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু—কই, আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না।

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। একটা অযাচিত সন্ধান যে হেলায় হারাইলাম, তজ্জন্য অনুশোচনায় প্রাণ আমার গুমরিয়া মরিতে লাগিল। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইলে অন্য একটা কক্ষে উঠিয়া পড়িলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

(৩)

সে গাড়িতে ভিড় খব বেশী না থাকিলেও আর মাত্র দুই চারিজন যাত্রী কোন রকমে কায়ক্লেশে বসিতে পারে, এরূপ স্থান তখনও অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা অপর যাত্রীগণের হস্তপদের আয়াস না আরামের জন্য নিযুক্ত ছিল। আমি ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম। যাত্রীগণের মিলিত দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করিয়া যেন জানাইতে লাগিল—আমি সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া গুরুতর একটা অপরাধ করিয়াছি। কিন্তু বড় বিপদের মাঝে আপনাদের মতই কাহার ঐ বড় সুন্দর বড় করুণ-দৃষ্টি আমারই প্রতি নিবদ্ধ করিয়া,—যেন অভয় দান করিয়া—পলকে আমায় প্রকৃতিস্থ করিল।

এক ভদ্রলোকের পার্শ্বে একটি নবীনা যুবতী বসিয়াছিল। তাহার আয়ত চক্ষুর সরল চাহনির সম্মুখে আমিই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। সম্মুখস্থ বেঞ্চের উপর হইতে একটা শাক তরকারির পোঁটলা বাঙ্কের উপর তুলিয়া রাখিয়া, বালিকা পার্শ্বস্থ অপর এক ভদ্রলোককে অনুগ্রহ করিয়া একটু সোজা হইয়া বসিতে অনুরোধ করিয়া আমাকে বলিলেন—"আপনি ঐখানটায় বসুন।" ভদ্রলোকের এ ভদ্রতার কোন মূল্য তখন দেওয়া সম্ভব কি না, তাহা ভাবিতেও ভুলিয়া গিয়া আমি নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু একটু অনিচ্ছায়। কারণ—এ যে বড় নিকটে, সত্যই এ যে বড় নিকটে। কিন্তু—হা ঈশ্বর! মেয়েটির এখনও বিবাহ হয় নাই কেন? কেন? এ যে বড় সুন্দর। গাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব ভুলিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম—উপেক্ষিত বনফুলের মতই সে গ্রাম-সৌন্দর্য্য সত্যই বড় সুন্দর। দেখিবার আকাঙ্ক্ষা দারুণ তৃষ্ণার মতই আমাকে ক্লেশ দিতেছিল; কিন্তু নির্লজ্জ বেহায়ার মত সে সৌন্দর্য্য দুই চক্ষু ভরিয়া আর নিমিষের জন্যও পান করিতে বিবেক আমাকে কঠিন কষাঘাতে নিষেধ করিয়া মস্তক নোয়াইয়া দিল।

দূরের মাঠে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম—অন্ধদেশ এ সৌন্দর্য্যও অবহেলায় পায়ে দলিতেছে? বালিকাটি শ্যামাঙ্গী—এই অপরাধে সে আবর্জ্জনার মতই সংসারের এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিবে,—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? যদি থাকে,—আচ্ছা, এই কি সেই ভদ্রলোকের—উল্লিখিত—"ভোলাই ঠাকুর?" আর এই কি তাঁহার ভগ্নী? তাহা যদি হয়—তবে,—কিন্তু ওরা কি, তথাপি একটা আয়াসের নিশ্বাস যেন আমার সমস্ত বুকটাকে হাল্কা করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরিধানে সামিজের উপর একখানি আধময়লা মিলের মোটা সাড়ি। হাতে দুইগাছি মাত্র সোণার রুলি। নাকে নাকছবি। কানে ইয়ার-রিং—ইহাতেই মেয়েটিকে বেশ মানাইয়াছিল। গাড়ির দোলায় সেও মৃদু মৃদু দুলিতেছিল, আর সেই তালে তালে দুলিতেছিল তাহার কানের ইয়ার-রিং। অপলক দৃষ্টিতে আমি সেই রূপ দেখিতেছিলাম, আর মনে মনে একটা কল্পনার ছবি আঁকিতেছিলাম। সহসা আমার দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। ত্রস্ত মস্তক নোয়াইয়া গরদের চাদরখানাকে টানিয়া ভাল করিয়া গায়ে দিয়া সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। আর আমিও আমার অবাধ্য চাহনিকে জোর করিয়াই সে কক্ষ হইতে বাহির করিয়া, দূরে—বহুদূরে পাঠাইয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি ওই ব্যথা ভরা চক্ষুঃ দুইটি, তবু বড়ই মিষ্ট ঐ দৃষ্টি! মুখখানি বড়ই সুশ্রী—কিন্তু বড় মলিন। কেন? কেন? এ 'কেনর' কৈফিয়ৎ আমরা পুরুষজাত দিতে বাধ্য নই। এ স্বার্থপর মন বজ্র-কঠোর। তথাপি—আমার দ্বারা কোন উপকার হইবে কি? যদি সম্ভব হয়, তবে—তবে নিশ্চয়ই আমি-আমার অসংযত চক্ষুঃ পুনরায় দেখিল সে আমারই দিকে চাহিয়া আছে। সরলতার মাঝে কি যেন একটু জিজ্ঞাসা। আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল।

(৪)

ভদ্রেশ্বরে গাড়ি থামিতেই—একটি ভিখারী বালক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিল—"বল

হরি তোমায় কেমনে পাই—"। বালিকা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল, আর আমি অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলাম। গাড়ি চলিতেছিল। বালক তখনও গাহিতেছিল—"আমার হরিবোল বলা হোলো না—"। গান সমাপ্ত হইলে সে তাহার আঁচলের খুঁট হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া ভিখারীর উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইল। কিন্তু সেই ব্যবধানের মাঝে আমাকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিয়া ফেলিল—

"এই পয়সাটা ওকে দিন্ না!"

সে সুমিষ্টস্বরে আমার শরীরে মুহূর্তের জন্য একটা পুলকপ্রবাহ বহিয়া গেল। আমি সম্মুখে ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইলাম। সেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পয়সা দিতে চলন্ত গাড়ির ঝোঁক সামলাইতে পারিল না। দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া দুই হাতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া বসিয়া পড়িল। সে স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে অনেকক্ষণ হইতেই আমার মনে একটা প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছিল। কিন্তু কিসের একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। এক্ষণে বোধ হয় আমি পরোপকারীর আত্মপ্রসাদের উৎফুল্ল দৃষ্টিতেই—উঁহার প্রতি চাহিয়াছিলাম, সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় যাবেন?"

আমি বিনীতস্বরে কহিলাম—"হাওড়া"।

"আপনার নাম?"—আমি চমকিত হইয়া কম্পিতস্বরে বলিলাম—"বিমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।" এই কথোপকথনের মধ্যেও আমার দুষ্ট-দৃষ্টি কোন্ ফাঁকে দেখিয়া লইল—আমার নাম শুনিয়া মেয়েটির মুখখানা লাল হইয়া কোলের উপর অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

হাতের তালুতে নস্য ঢালিতে ঢালিতে—ভদ্রলোক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কোল্‌কাতায় কি করেন?"

"সেক্রেটারিয়েটে—চাকরি করি।"

"কতদূর পোড়েছেন?" আমি একটু বাহুল্যের হাসি হাসিয়া বলিলাম—"দু বছর হ'ল—বি, এ, পাশ কোরেছি।"

"তারপর "ল" পোড়লেন না যে?"

"নাঃ—তেমন সুবিধে মনে কোরলাম না।"

"সে কি মশায়! আজকাল বি, এ, পাশ কোরলেই যে "ল" পোড়তে হয়,—এটা দেশের একটা দৃঢ় সংস্কার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"

"তা ঠিক্"—বলিয়া আমি মৃদু হাসিলাম।

দুইটি বৃহৎ চক্ষুর ব্যাকুল-দৃষ্টি যে আমারই আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল, আমি তাহা বেশ উপলব্ধি করিতেছিলাম; কিন্তু আমি আমার বেয়াদব-চক্ষুর রাশটাকে প্রাণপণে টানিয়া অন্য পথে গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলাম।

আমিও ভদ্রলোকের নামটা জিজ্ঞাসা করিব কি না, এবং সেটা অভদ্রতা হইবে কি না, মনে মনে তাহার মীমাংসা করিতে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে,—যখনই মনের মধ্যে বদ্ধ ধারণা হইল, নাম ঠিকানা আমার খুবই আবশ্যক, তখনই আমি একটু কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কোথেকে আসছেন?" নামের পরিবর্তে কি একটা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়া, বুকের স্পন্দনে নিজেই ঘামিয়া উঠিলাম। চাদরে মুখ মুছিয়া জিজ্ঞাসু-নয়নে ভদ্রলোকের প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

ভদ্রলোকটি ততক্ষণে একখানা ইংরাজী নভেল খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুস্তক হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই বলিলেন—"বৈচি থেকে।"

ছন্ করিয়া যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ আমার শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। আর কোন প্রশ্ন করিবার সাধ্য আমার তখন ছিল না। কিন্তু এ কৌতূহলের বেগ—এ সন্দেহের ব্যাকুলতা আর সহ্য করা বড় কঠিন, বড়ই দারুণ। ভদ্রলোকের নামটা শুনিতে পাইলে আমার সব সংশয় মিটিয়া যায়।

মন যাহা চাহে বা যাহার জন্য ব্যস্ত—প্রকৃতির ঘটনা-বিবর্তনের সাহায্যে মনের সে আশা, সে আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় পূর্ণ হয় দেখিয়া সত্যই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়। প্রকৃতির সেই ঘটনাকে আমরা ঈশ্বরের বাঞ্ছনীয় বলিয়া মানিয়া লই—একি ঘটনা বিপর্য্যয় বলিয়া স্তম্ভিত হই।

পুস্তকের পাতা উল্টাইতেই ভদ্রলোকের অজ্ঞাতে একখানা পত্র গাড়ির মেঝেতে পড়িয়া গেল। স্পষ্ট দেখিলাম, শিরোনামায় লেখা আছে—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় • নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেয়েটী পত্রখানি তুলিয়া লইয়া বলিল—"দাদা চিঠি প'ড়ে গেছে।"

মুহূর্ত্তে আমার সব সন্দেহ মিটিয়া গেল। সত্যই একি অদ্ভুত ঘটনা বিপর্য্যয়!

লিলুয়া হইতে ট্রেণ ছাড়িলে ভদ্রলোক তাঁহার ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বিমলা, এইবার আমাদের নাম্‌তে হবে।" আমি চমকিত হইয়া মাথা নিচু করিলাম।

হাওড়ার পুলের জনতার মধ্যে ভদ্রলোকের গাড়িখানা অদৃশ্য হইয়া গেলে আমার সমস্ত দেহ কাঁপাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল। প্রিয়জনবিচ্ছেদের বুক জোড়া ব্যাথায় যেন আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু কিসের আশায় প্রাণ প্রবোধ মানিল।

(৫)

মার হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিয়া বলিলাম—"এই—ঠিকানায় বাবাকে আজই চিঠি লিখতে বল। পাত্রী দেখেছি, আমার পছন্দ।"

সত্যই পত্র চলিয়া গেল। আমি আমার নির্জ্জন কক্ষে, কল্পনা কুঞ্জে, আমার মানস-প্রতিমার স্বর্ণ-সিংহাসন সজ্জিত করিয়া একটি শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। তিন দিন পরে ছোট ভাই কমল পত্রের জবাব আনিয়া আমার টেবিলে রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। আনন্দ-আশঙ্কায় প্রাণ আমার শিহরিয়া উঠিল। অবিলম্বে পত্র লইয়া রুদ্ধ-শ্বাসেই পড়িয়া ফেলিলাম। প্রাণ যাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না, চক্ষু তাহার দৃষ্টির স্থূল বিচারে প্রমাণ করিয়া দেয়—যাহা সত্য, সত্যই তাহা সত্য! একবার, দুইবার, তিনবার পত্র পড়িলাম—সেই একই সংবাদ! প্রাণ যখন বুঝিল, চক্ষু যাহা দেখিতেছে, প্রকৃতই তাহা সত্য ও ধ্রুব,—চক্ষু তখন অন্ধ হইল! আমার অবসন্ন দেহটাকে যেন কোন নির্দ্দয় দেবতা দুই কঠিন হস্তে পেষণ করিয়া বহু উচ্চ হইতে সুদূর নিম্নে পুঞ্জীভূত অন্ধকার গর্ভে নিক্ষেপ করিল।

পত্রের প্রতি অক্ষর যেন সেই অন্ধকারে মিশিয়া গেল—ফুটিয়া উঠিল—অন্ধ-দৃষ্টির সম্মুখে, সেই বড় সুন্দর একখানি মলিন মুখ!

চক্ষু মুছিয়া পুনরায় পড়িবার চেষ্টা করিলাম—অক্ষরগুলা যেন সূর্য্যের তেজেই আমার দৃষ্টি ঝল্‌সাইয়া দিল। দুই হাতে কপাল টিপিয়া ভাবিতে লাগিলাম—ভগবানের একি মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ! ওগো একি অন্যায় অভিসম্পাত! ইহার কি কোন ব্যবস্থা, কোন উপায় নাই? আছে, বোধ হয় আছে। কিন্তু ———

কিন্তু একি? আমার সিক্ত চক্ষুর অস্পষ্ট দৃষ্টির সম্মুখে সেই মলিন মুখখানি অধিকতর মলিন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া পুনরায় যে তাহা অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছে। আর কি ফুটিবে না? জন্মের মতই কি?—

পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু পারিলাম না। দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিলাম। কি নির্দ্দয়—কাণের কাছে কে যেন কর্কশকণ্ঠেই পত্রখানা পড়িতে লাগিল—"মহাশয়, জানিনা জন্মান্তরের কোন্ কর্ম্ম-ফলে ভবিতব্যের অকাট্য বিধানে, নিয়তির অমোঘ শাসনে ভগিনীটি আমার সতর্ক প্রহরী তাহার বড় কঠিন দণ্ডে দণ্ডিতা। এ দণ্ড তাহার আজীবনের। ঠাকুর মহাশয় গৌরীদানের সমস্ত পুণ্য লইয়া চলিয়া গিয়াছেন,—আর পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছি আমি! আজ তিন বৎসর হইল"—

উঃ, আর সহ্য করিতে পারিলাম না। পত্রখানা পুনরায় চোখের সম্মুখে ধরিলাম—কৈ, কিছুই নাই! সব মুছিয়া একাকার হইয়া বুঝি আমার বুকের রক্তে মিশিয়া গিয়াছে। কেবল—শুধু কেবল তীক্ষ্ণ তীরের মতই আমার মর্ম্মে বিঁধিয়া আছে—সে বিধবা সে বাল বিধবা! দুর্দ্দান্ত দৈত্যের মতই আমায় ঘিরিয়া আছে—সে বিধবা—সে বিধবা! উঃ!

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রুচি-ভেদ

সূর্য্য উঠে, কমলিনী তারে দেখি হাসে,
কুমুদিনী চক্ষু মুদে দেখিয়া তরাসে।
চন্দ্র উঠে, কুমুদের মুখে হাসি ফুটে,
কমলের চক্ষু দুটী জলে' জলে' উঠে।
দিবা ও রজনী-ভেদে কিন্তু সরোবর
উভয়ের জ্যোতি মাখি' উজলে অন্তর!

শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী।

রাজনৈতিকক্ষেত্রে

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সার রিচার্ড টেম্পল যে একজন ক্ষমতাবান্ ইংরাজ ছিলেন, শিশির কুমার তাঁহার সহিত কথা কহিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শিশির কুমার পরদিন বেলভিডিয়ারে সার রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করেন। যে ভাবে তিনি যশোহরে মনরোসাহেব ও ডাকনিলীসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, লাটবাহাদুরের সহিতও সেই ভাবে দেখা করিবেন মনে করিয়াছিলেন। মনরো ও ডাকনিলীর নিকট কার্ড পাঠাইবারও প্রয়োজন হইত না; লাটসাহেবের নিকট কার্ড পাঠাইলেই যথেষ্ট হইবে এই মনে করিয়া শিশিরকুমার আপনার একখানি কার্ড আর্দ্দালির নিকট দিয়া লাট সাহেবকে দিতে বলিলেন। আর্দ্দালি নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিল না। লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে যে পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইতে হয়, শিশির কুমার তাহা ভাবেন নাই। আর্দ্দালি লাটসাহেবের নিকট কার্ড লইয়া গেলনা দেখিয়া শিশির কুমার বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সার রিচার্ড হঠাৎ কোনও কার্য্য উপলক্ষে কক্ষের বাহিরে আসিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র শিশির কুমার তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "আপনি আসিতে বলিয়াছিলেন বলিয়াই আমি আসিয়াছি। আমি প্রায় অৰ্দ্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতেছি। আপনার আর্দ্দালি বড় অশিষ্ট; পুনঃ পুনঃ বলাসত্বেও সে আমার কার্ডখানি আপনার নিকট লইয়া গেল না।" কথাগুলি শুনিয়া ছোটলাট বাহাদুর বুঝিলেন যে, শিশিরকুমার মনে মনে বড়ই চটিয়া গিয়াছেন। শিশিরকুমারকে তিনি মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—"আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে পত্রদ্বারা সময় স্থির করিয়া লইতে হয়। সকলেই যদি ইচ্ছামত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন এবং আমিও যদি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করি, তাহা হইলে এই প্রকাণ্ড বঙ্গদেশ শাসন করিবার সময় আমার কোথায় থাকে?" যাহাহউক, শিশিরকুমারকে সঙ্গে লইয়া সার রিচার্ড উদ্যানভ্রমণে বাহির হইলেন। লাটবাহাদুর বড়ই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রিয় ছিলেন। কিছুক্ষণ উদ্যানভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া উভয়ে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সার রিচার্ড বলিলেন,—"শিশির বাবু, আমার যাহা কিছু উন্নতি তাহা এই বঙ্গদেশ হইতেই হইয়াছে। আমার ইচ্ছা যে, এমন একটা কিছু করিয়া যাই, যাহাতে বঙ্গদেশে আমার নামটা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে।"

শিশির,—"আপনি কি করিতে চান?"

সার রিচার্ড,—"নির্ব্বাচন প্রথার জন্য আপনি যে মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার অধিবেশনের পর হইতে আমি সে সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান করিতেছি। আমার দুইটি ইচ্ছা আছে। প্রথম আপনাদিগকে নির্ব্বাচন প্রথা প্রদান; দ্বিতীয়—একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আমি যদি নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলন করি, তাহা হইলে ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ আমার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিবেন। আপনি যে অধিকার লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রদান করিতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কোন কোন সভ্যের সহিত কথা কহিয়া জানিয়াছি, তাঁহারা নির্ব্বাচন প্রথা চাহেন না।"

শিশির—"নির্ব্বাচন প্রথা চাহেন না! তাঁহাদের যুক্তি কি?"

সার রিচার্ড—"তাঁহারা বলেন যে কলিকাতায় বিভিন্নজাতীয় লোক বাস করে। নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইলে, কমিশনার নির্ব্বাচনের সময়ে বিভিন্নজাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিবে।"

স্বায়ত্তশাসনের অধিকারলাভে যে তাঁহার দেশবাসিগণের আপত্তি হইবে, শিশিরকুমার এ কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণ তাঁহার কোনও কার্য্যে সহায়তা করিবেন না, তিনি ইহাই জানিতেন।

কিন্তু তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেছেন, ইহা দেখিয়া শিশিরকুমার প্রাণে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। যাহাহউক শিশিরকুমার প্রাণস্পর্শী ভাষায় সার রিচার্ডকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি যখন নির্ব্বাচন প্রথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলনের আশঙ্কায় আপনার পশ্চাদপদ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আপনি আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের এই অধিকারটুকু প্রদান করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান; আমরা সমগ্র দেশবাসী আপনার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।" শিশির কুমারের কথাগুলি সার রিচার্ডের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ছোটলাট বাহাদুর বলিলেন,—"শিশির বাবু, আমি সমস্ত দায়িত্বই স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলাম, কিন্তু সাধারণ জনসম্প্রদায় যাহাতে আমাদের সহিত যোগদান করে আপনি তাহার চেষ্টা করিবেন।" প্রত্যুত্তরে শিশির বলিলেন,—"প্রাণপণ চেষ্টা করিব। আর আশা করি, বাবু হীরালাল শীলের সহায়তায় আমি কৃতকার্য্যও হইব।"

এই খানেই সেদিনের কথাবার্ত্তা শেষ হইল। ছোটলাট বাহাদুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময়েই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। লাট বাহাদুরের সহিত কিরূপ আদব কায়দায় কথা কহিতে হয়, শিশিরকুমার তাহাতে অভ্যস্ত ছিলেন না। জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমার ও মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারের সহিত তিনি যেভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেইভাবেই লাটসাহেবের সহিত কথা কহিয়াছিলেন। তাঁহার সরলতায় সার রিচার্ড সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে শিশিরকুমার প্রায়ই ছোট লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সার রিচার্ড ক্রমে শিশিরকুমারের এতদূর গুণপক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে, অনেক সময় তিনি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এজন্য সময় সময় তিনি শিশিরকুমারের বাটীতে পর্য্যন্ত যাইতেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, স্বর্গীয় বাবু সারদাচরণ মিত্র শিশির কুমারের পঞ্চম বার্ষিক স্মৃতি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"I saw sir Richard Temple at the humble cottage of Shishir Kumar discussing with him questions relating to the municipal constitution and it was in Shishir Kumar's cottage that the embryo of the Municipal constitution of Calcutta was hatched."

বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরের নিকট কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনের আশা প্রাপ্ত হইয়া শিশিরকুমার তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের নিকট এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। সংবাদটী ক্রমশঃ তাঁহার বিপক্ষ দলেরও শ্রুতিগোচর হইলে তাঁহারা শিশিরকুমারকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গাল সম্পাদককে সার রিচার্ড মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন। যাহা হইবার নহে, তাহা শিশির কুমারের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির চেষ্টায় কিরূপে হইবে? কিন্তু যখন প্রকাশ পাইল যে, সার রিচার্ড মিউনিসিপ্যালিটী সংস্কারের জন্য যে নূতন বিধি প্রণয়ন করিতেছেন, তাহাতে নির্ব্বাচন প্রথা (Elective System) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তখন ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণ বিস্মিত হইলেন। এসোসিয়েশনের অধিকাংশ সভ্যই মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ছিলেন; সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য পরিচালনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের যে ক্ষমতা ছিল, তাহা লোপ পাইবার আশঙ্কায় বাবু কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রমুখ প্রতিভাশালী সদস্যগণ প্রস্তাবিত নির্ব্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট করদাতাদিগকে দুইএর তিন (.) অংশ নির্ব্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বলিতে লাগিলেন যে, আংশিক অধিকার প্রদান করিলে [illegible] এরূপ ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট করদাতাদিগকে কমিশনার নির্ব্বাচনের হয় সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করুন, নচেৎ আদৌ ক্ষমতাপ্রদানের আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এইরূপ অসম্ভব দাবি করিলে গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন প্রথা আদৌ প্রবর্ত্তন করিবেন না এবং তাহাতে তাঁহাদের মনস্কামনাও পূর্ণ হইবে। নির্ব্বাচন প্রথা যে মনোনয়ন প্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা এক্ষণে সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে। সুতরাং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণের ব্যবহারে পাঠকের বিস্ময় হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কোনও একটী নূতন প্রথার বা অনুষ্ঠানের সঙ্গেই

তাহার প্রতিবাদিগণের আবির্ভাব হয়। ইংলণ্ডে রেলওয়ে প্রবর্ত্তনের এমন কি গোল আলু ব্যবহারের সময়েও তুমুল আন্দোলন ও প্রতিবাদ হইয়াছিল। তাহার উপর স্বার্থে আঘাত পড়িলে উত্তেজিত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। যাহা হউক, আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যাঁহারা স্বায়ত্তশাসনের প্রথম বীজ ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগ্ নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষে ও বিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বিপক্ষে। উভয় সভার মধ্যে মতভেদের কারণ কি, তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করাইবার জন্য আমরা ১৮৭৬ খৃঃ অঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারির অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিলাম—

"* * * লীগের প্রার্থনা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী সম্বন্ধে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে কলিকাতার জষ্টিশদিগের সংখ্যা ৭২ জন হইবে, ইহার এক ভাগ গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিবেন এবং দুইভাগ করদাতারা নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু এই আইনে কতক গুলি ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে জষ্টিশগণের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা অনেকটা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি ক্ষমতা স্বহস্তে রাখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন তবে এই ক্ষমতাবলে জষ্টিশদিগের স্বাধীনতা অনায়াসে হরণ কি অকর্ম্মণ্য করিতে পারেন। এই আইনটি লইয়া ইণ্ডিয়ান লীগ ও বিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সংগ্রাম। লীগের সভ্যেরা বলেন যে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত আইন দ্বারা নব কঠোর শাসনই প্রবর্ত্তন না করুন, ইহাতে করদাতাদিগের যে জষ্টিশ নিয়োগ ও বিয়োগ করার ভার অর্পণ করিতেছেন তাহার কোনও ভুল নাই। সুতরাং আমরা ইহার দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যের কতক ভার প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা এখন যাহা প্রাপ্ত হইতেছি তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হই। পরে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্ন করিব। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যেরা বলেন ইহা লইয়া আমরা কি করিব? যদি আমাদিগের হস্তে মিউনিসিপ্যালিটীর ভার অর্পণ করা হয়, তবে সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হউক, আমরা অর্দ্ধ ক্ষমতা চাহি না। লীগের সভ্যেরা বলেন যে, কোন দেশে একেবারে সম্পূর্ণ কোন স্বত্ব প্রজারা গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রাপ্ত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছে! এখন জষ্টিশেরা গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য, এখন গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যাহাকে তাহাকে কমিশনার নিযুক্ত কি উক্ত পদ হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন। এই আইন প্রচলিত হইলে জষ্টিশেরা করদাতৃদিগের ভৃত্য হইবেন। এখন গবর্ণমেণ্ট স্বকার্য্য সাধন উদ্দেশ্যে যত ইচ্ছা জষ্টিশ নিযুক্ত করিতে পারেন, এই জষ্টিশেরা গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য এবং গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত কার্য্য করা স্বভাবত তাঁহাদের ইচ্ছা। তাঁহারা করদাতৃগণের স্বার্থ অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি করেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে করদাতারা তাঁহাদের বিধাতা হইবেন, সুতরাং তাঁহারা করদাতৃগণের হিতাহিত চিন্তা করিবেন। করদাতারা আবার এরূপ ব্যক্তিকেই জষ্টিশ পদে নিযুক্ত করিবেন, যিনি তাঁহাদের হিত দেখিবেন। যদি কোন জষ্টিশ করদাতৃদিগের স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করেন, করদাতারা তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দূর করিয়া দিতে পারিবেন। সুতরাং এখন যেরূপ জষ্টিশেরা স্বকার্য্য সাধনে নিয়া দেখান এখন যেরূপ করদাতৃদিগের প্রতিনিধি হইয়াও তাহাদের স্বার্থ বিস্মৃত হন, তখন তাহা আর কেহ পারিবে না। তখন বাবু দিগম্বর মিত্রের কি তত্তুল্য কোন ব্যক্তি ভাইসচেয়ারম্যান পদের আকাঙ্ক্ষী হইলে তিনি অনায়াসে তাহা পাইবেন। তখন বাবু কৃষ্ণদাস পাল আর হগ-সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কলিকাতার বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবে মত দিতে কেহ সাহস করিবে না। অথবা গতবারে যখন ভাইসচেয়ারম্যান নিযুক্ত হন তখন যেরূপ নানা ছলনা করিয়া মিউনিসিপাল সভায় অনেক সভ্য অনুপস্থিত হন তাহা করা আর কাহারও সাধ্য হইবে না। তখন করদাতারা প্রতি জষ্টিশের কার্য্য মনোযোগপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবেন এবং প্রতি জষ্টিশ পদচ্যুত হইবার ভয়ে করদাতৃদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিবেন। যদি করদাতারা ও জষ্টিশেরা মিউনিসিপাল কার্য্যের উন্নতির প্রতি এইরূপ মনোযোগ দেন, তাহা হইলে অচিরাৎ যে বিস্তর মঙ্গল হইবে তাহার কোন ভুল নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যেরা বলেন, যখন গবর্ণমেণ্টের হস্তে এরূপ ক্ষমতা থাকিতেছে যে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন তখন জষ্টিশদিগের দ্বারা কি মঙ্গল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? তাঁহারা বলেন যে হয় জষ্টিশদিগকে

সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হউক, নচেৎ আমরা নাম দেখান ইলেক্‌টিব্‌ সিষ্টেম চাহি না। লীগের সভ্যেরা বলেন যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর উপর গবর্ণমেন্টের চিরকাল অসীম ক্ষমতা রহিয়াছে, সুতরাং এখন তাঁহারা যে আইন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আর অধিক অনিষ্ট কি হইবে যে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব। গবর্ণমেন্ট এখন ইচ্ছা করিলে কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলেই ব্যয় করিতে পারেন। গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেন, আরটনিয়ার সাহেব ৩৫০০০৲ হাজার টাকা পুরস্কার পাইলেন। গবর্ণমেন্ট রবার্টস্‌ সাহেবকে ভাইস-চেয়ারম্যান হইতে দিবেন না সংকল্প করিলেন, কেহ তাঁহাকে ভাইস্-চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না। সেদিন ডাক্তার পেইনকে মাসে ২০০০৲ হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইল। গবর্ণমেন্ট এরূপ শতশত স্থানে স্বেচ্ছাচারিতা দেখান এবং যখন এরূপ স্বেচ্ছাচার করেন, তখন কেহ উহা নিবারণ করিতে পারেন না। সেখানে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা গবর্ণমেন্ট যত ক্ষমতাই নিজহস্তে গ্রহণ করুন, তাঁহাদের এখন যে ক্ষমতা আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা কিছুই নাই যাহা ইহা দ্বারা তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইতে পারে। তবে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে একটা গুরুতর স্বত্ব পরিত্যাগ করিতেছেন। এখন গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে যত ইচ্ছা তত জষ্টিশ নিযুক্ত করিতে পারেন। গবর্ণমেন্ট যদি ইচ্ছা করেন, তবে করদাতৃদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্বাধীন জষ্টিশদিগকে দূর করিয়া তাঁহাদিগের স্থানে নিজের অনুগত লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হইলে গবর্ণমেন্ট ২৪ জন জষ্টিশের অধিক নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, অপর ৪৮ জন করদাতারা নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং যদি ৪৮ জন জষ্টিশ করদাতৃদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, তাঁহারা যদি নিস্বার্থভাবে কলিকাতাবাসীদিগের হিতকামনা করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট যতই স্বেচ্ছাচারী হউন, পরিণামে করদাতৃদিগের জয় হইবে। লীগ এই সমুদয় কারণে প্রস্তাবিত আইনের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মতে ৫টী অন্যায় হইতেছে। লীগ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যদিগকে দয়াধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিতেছেন না, যাহাতে দেশের লোকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে কলিকাতার করদাতৃদিগের পরিণামে মঙ্গল হয়, তাঁহারা যেন তাহার বিরোধী না হন। লীগের পক্ষে কলিকাতার করদাতারা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষে কলিকাতার জষ্টিশ ও সাহেবেরা। করদাতারা দেখিতেছেন যে, এই আইন জারি হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে, তাঁহারা দেখিতেছেন যে, ইহা হইলে অকর্ম্মণ্য স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক জষ্টিশেরা আর তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের যাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে এরূপ লোককে তাঁহারা কমিশনার পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। অপর পক্ষের লোকেরা ভয় করিতেছেন যে করদাতার হস্তে জষ্টিশ নিয়োগের ভার অর্পিত হইলে তাহাদের পদ স্থায়ী হইবে না। ইংরাজেরা ভয় করিতেছেন যে তাহা হইলে তাঁহারা এতকাল কলিকাতায় করদাতৃদিগের অর্থ লইয়া যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে ছিলেন, পাছে তাহার প্রতিবন্ধক ঘটে। লীগের ও এসোসিয়েশনের ইহাই লইয়া তুমুল সংগ্রাম। এক দিনে এক সময় দুই সভা তাঁহাদের নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত করদাতৃদিগকে আহ্বান করেন। লীগ একাকী উদ্যোগ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নিজে, সাহেবেরা, সংবাদপত্রের সম্পাদকরা সকলে একত্রিত হইয়া উদ্যোগ করেন। লীগ বিজ্ঞাপন দ্বারা, হাণ্ডবিলের দ্বারা এবং প্লাকার্ডের দ্বারা করদাতৃদিগকে আহ্বান করেন এবং ৪।৫ শত লোককে নিমন্ত্রণ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যেরা কলিকাতার বাটী বাটী গিয়া ধন্না দেন, এসোসিয়েশনের যে সভ্যেরা কখন কোন স্থানে গমন করেন নাই তাঁহারাও বাটী বাটী ভ্রমণ করেন। অন্যান দশ হাজার নিমন্ত্রণ পত্র ইঁহারা বিলি করেন। ইঁহাদের দলস্থ সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা আর একটী কাজ করেন। যাহাতে লীগের আহূত সভাতে লোক না যায় এরূপ যত্ন করেন। মিরর প্রথমে লীগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে চাহেন না। তিনি লীগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিয়া, এই বিজ্ঞাপন-সংবাদ, সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, অপর পক্ষকে বলিয়া দেন। তাঁহারা এই সংবাদ শুনিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। আবার তাহার পরে মিরর লিখেন যে লীগের সভ্যেরা ঈর্ষাপরবশ হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের দেখাদেখি আর একটী সভা আহূত করি-

তেছেন। মিরর তাহার পর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। কিন্তু লীগের সভ্যেরা তাঁহাকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বলেন যে টাউনহলে সভা হইবে, তিনি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করেন যে ন্যাশনাল থিয়েটারে সভা হইবে। ষ্টেটস্‌ম্যান কলিকাতাবাসী লোককে মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করেন যে কেহ লীগের সভায় না যায়; আবার বিজ্ঞাপনে লিখেন যে থিয়েটারে সভা হইবে। লীগের বিপক্ষে এইরূপে নানা ব্যক্তি দণ্ডায়মান হন। দুই স্থানে নির্দ্ধারিত সময়ে সভা আরম্ভ হয়। এসোসিয়েশন গৃহে দুইশত কি আড়াই শত লোক উপস্থিত হন। লীগের সভায় দুই হাজার লোকের অধিক আগমন করেন। লীগ গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করিতেছেন যে, তাঁহাদিগকে তাঁহারা যে কমিশনার নিয়োগের ভার দিয়েছেন, তাহার নিমিত্ত তাঁহারা কৃতজ্ঞ হইলেন, তবে আইনে যে সমুদয় অনিষ্টকর বাধা আছে তাহা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বলিতেছেন যে, এখন যে আকারে ইলেক্‌টিব্‌ প্রণালী গবর্ণমেণ্ট দিতেছেন ইহা অপেক্ষা কলিকাতায় যে প্রণালীতে মিউনিসিপ্যাল কার্য্য হইতেছে তাহা মঙ্গলদায়ক, অতএব হয় সম্পূর্ণ ভার করদাতাদিগকে দেওয়া হউক, নচেৎ তাঁহারা চান না। লীগের সভ্যেরা বলিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিতেছেন তাহা তাঁহারা কেন পরিত্যাগ করেন? এখন আট আনা প্রাপ্ত হইলে আবার আট আনা পাওয়া সহজ হইবে। একবারে ষোল আনা চাহিলে কখনই পাওয়া যাইবে না। অপর পক্ষেরা বলেন যে, ষোল আনা না দিলে আমরা কিছুই লইব না। আমরা অন্নাভাবে মরিব সেও ভাল তবু ষোল আনার কম গ্রহণ করিব না। অথবা ইহাদের বিবাদের মূল এই। উভয়ই স্বীকার পাইতেছেন যে ইলেক্‌টিব্‌ প্রণালী ভাল। লীগ বলিতেছেন যে ইলেক্‌টিব্‌ প্রণালী প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন, তবে এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে অনিষ্টকর অংশগুলি আছে তাহা পরিত্যাগ করিলে আমরা আরও কৃতার্থ হইব। এসোসিয়েশন বলিতেছেন যে; যদি অনিষ্টকর অংশগুলি পরিত্যাগ না হয়, তাহা হইলে আমরা এরূপ ইলেক্‌টিব্‌ প্রণালী চাহি না। লীগ যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর উপস্থিত আইনের উত্তম অংশ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অনিষ্টকর অংশ করদাতাদিগকে প্রদান করিতে পারেন না; কিন্তু এসোসিয়েশনের যেরূপ প্রার্থনা তাহাতে ইলেক্‌টিব্‌ প্রণালী না দিয়া গবর্ণমেণ্ট কেবল অনিষ্টকর অংশগুলি প্রদান করিতে পারেন।"

উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত লীগের ও এসোসিয়েশনের দুই সভা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। সার রিচার্ড টেম্পল যখন দেখিলেন যে নির্ব্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, তখন তিনি একদিন শিশিরকুমারকে ডাকিয়া বলেন,—"শিশিরবাবু, করদাতাদিগের মধ্যে অধিকাংশই যে নির্ব্বাচন-প্রথার পক্ষপাতী, একটী সভা আহ্বান করিয়া আপনি অবিলম্বে তাহা প্রমাণ করুন। নচেৎ নির্ব্বাচন-প্রথা প্রচলিত হওয়া অসম্ভব হইবে। ছোটলাট বাহাদুরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিশিরকুমার লীগের পক্ষ হইতে ১৮৭৬ খৃঃ অঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার, টাউনহলে সভার বন্দোবস্ত করেন। এই সভায় রেভারেণ্ড কে, এম্‌, বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ডাক্তার সার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি হাইকোর্টের উকিলগণ বক্তৃতা করেন। রাসবিহারী বাবুর বক্তৃতায় উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গৃহে উক্ত দিবসে বিরুদ্ধবাদীদিগের একটী সভা হইয়াছিল, তাহা উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর এই সভার সভাপতি ছিলেন। সার রিচার্ড স্থির করিয়াছিলেন যে, নির্ব্বাচন-প্রথার বিরুদ্ধবাদীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা সমর্থনকারীর সংখ্যা যদি অধিক হয়, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনে আর কোনও আপত্তি গ্রাহ্য করিবেন না। উভয় সভায় কিরূপ জন সমাগম হয়, তাহা দেখিবার জন্য তিনি অশ্বপৃষ্ঠে গুপ্তভাবে বহির্গত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বাটীর সম্মুখে একটু বেড়াইয়া তিনি শেষে টাউনহলের সম্মুখে উপস্থিত হন। উভয় স্থানের সভার জনতা লক্ষ্য করিয়া সার রিচার্ড নির্ব্বাচন-প্রথা সম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর লর্ড নর্থব্রুককে লিখিয়াছিলেন যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত। এই দুইটী প্রস্তাবের সমর্থনে ও তাহার

বিরুদ্ধে যে দুইটী সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে কিরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীদিগের সংখ্যা অতি অল্প ছোটলাট বাহাদুর আরও লিখিয়াছিলেন যে, যে অধিকার লাভের জন্য জনসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, তাহা প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সার্ রিচার্ড টেম্পল্ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচন-প্রথা প্রচলনে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন তাঁহারা এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে ছোটলাট বাহাদুরের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। ছোটলাট বাহাদুরের নিকট তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করিলে সার্ রিচার্ড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণের বক্তব্য শ্রবণে সম্মত হইলেন। এসোসিয়েশন হইতে নাটজন সভ্য নির্দ্দিষ্ট দিনে বেল্‌ভেডিয়ারে ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। প্রতিনিধির সংখ্যা দেখিয়া সার্ রিচার্ড অবাক্ হইয়াছিলেন। এইরূপ অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি আসিবেন, তিনি তাহা জানিতেন না, কিম্বা আশা করেন নাই; সুতরাং সকলের বসিবার আসনেরও কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। প্রতিনিধিগণের বসিবার আসন দিতে না পারায় ছোটলাট বাহাদুর দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করেন। সভ্যগণ তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া আপনারাই অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচনে করদাতাগণকে আংশিক অধিকারের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হউক, এবং তাহা যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসুবিধা হয় তবে নির্ব্বাচন-প্রথার আদৌ আবশ্যক নাই ইহাই প্রতিনিধিবর্গের বক্তব্য। বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সার্ রিচার্ড টেম্পল্ মহোদয় যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণের অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাদের অভিপ্রায় তিনি পূর্ব্বাপরই অবগত ছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারলাভে যাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অন্তরে যে কোন একটা দুরভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রতিনিধিসকল লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়া রহিলেন। পর দিবস তাঁহারা লাটসাহেবের ব্যবহার ও তীব্র মন্তব্য লইয়া মহা আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ইণ্ডিয়ান্ লীগের পক্ষ হইতেও ১৮৭৬ খৃঃ অঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩৮ জন প্রতিনিধি ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। লীগ হইতে কতজন প্রতিনিধি যাইবেন তাহা সার্ রিচার্ডকে পূর্ব্বে জানান হইয়াছিল; সুতরাং লাট সাহেব তাঁহাদের বসিবার আসনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। লীগের প্রতিনিধিগণ এই প্রার্থনা করেন যে, গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটীতে কমিশনার নির্ব্বাচনের এক চতুর্থাংশ ক্ষমতা আপনাদিগের হস্তে রাখিয়া অধিকাংশই করদাতাদিগের হস্তে অর্পণ করুন। তাঁহাদের এই প্রস্তাব যে সঙ্গত নহে, সার রিচার্ড তাহা তাঁহাদিগকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সার্ রিচার্ড টেম্পলের মিউনিসিপ্যাল বিল যখন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ কাউন্সেল দ্বারা উহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া ছোটলাট বাহাদুরের সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে মিষ্টার ইংরাম (Mr. Ingram) প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বিখ্যাত ওয়াবি কেসের সময় ইনি মিষ্টার এনেষ্টির সহযোগী ছিলেন। শেষে লাট সাহেবের সম্মতিক্রমে চেম্বার অব্ কমার্স্ হইতে মিষ্টার জেলিংস্, মিউনিসিপালিটী হইতে মিষ্টার ব্রান্‌সন্ এবং ইণ্ডিয়ান্ লীগের পক্ষ হইতে বাবু কালীমোহন দাস, ডাক্তার সার্ রাসবিহারী ঘোষ ও শিশিরকুমার প্রতিনিধিরূপে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ৪ঠা মার্চ্চ শনিবার ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন-প্রথা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছোটলাট বাহাদুরের অনুপস্থিতিতে তদানীন্তন এড্‌ভোকেট্ জেনারেল (Advocate General) মিষ্টার পল্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও প্রতিনিধিগণ ব্যতীত কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু যদুনাথ মল্লিকও ছিলেন। তিনি শিশিরকুমারকে সভাগৃহের এক কোণে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "শিশিরবাবু, জানি না সার্ রিচার্ড আপনাকে কোন্ মন্ত্রবলে বশীভূত করিয়াছেন?"

শিশিরকুমার হাসিয়া বলিলেন, "সার্ রিচার্ড আমাকে

মন্ত্রবলে বশীভূত করিয়াছেন, এ কথা না বলিয়া আমিই তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছি বলুন না কেন ?"

যদুবাবু।—"যা তা হউক, আপনি যে দেশের একটা কি গুরুতর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না।"

শিশির। "স্বায়ত্ত-শাসন লাভের অধিকারে যে আপনারা প্রতিবাদ করিবেন এ কথা আমি কখনও মনে স্থান দিতে পারি নাই। গবর্ণমেণ্ট ত আমাদের নিকট হইতে কোনও অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন না; বরং আমরা একটা নূতন অধিকার লাভ করিতেছি। এরূপক্ষেত্রে আপনারা প্রতিবাদ করিতেছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

যদুবাবু।—"আমাদিগকে এই নূতন অধিকার প্রদানের ইচ্ছা দেখিয়া মনে হয় যে, ভিতরে গবর্ণমেণ্টের কোন দুরভিসন্ধি আছে।"

শিশির: —"কি দুরভিসন্ধি ?"

যদুবাবু।—"এখানে, এ সময়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা সুবিধা হইবে না। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, গবর্ণমেণ্টের ভিতরে ভিতরে একটা মতলব আছে।"

শিশিরকুমার দেখিলেন যে যদুবাবুর সহিত তর্ক করা বৃথা; তিনি নিরস্ত হইলেন।

যথা সময়ে সভার অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। নির্ব্বাচন-প্রথার যে কত দোষ দেখান হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইণ্ডিয়ান্ লীগের প্রতিনিধিগণের মধ্যে বাবু কালীমোহন দাস সিনিয়র ছিলেন। তিনি নির্ব্বাচন-প্রথার সমর্থনে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তাহার বিরুদ্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার রাসবিহারী ও শিশিরকুমার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা কালীমোহন বাবুকে সতর্ক হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। ডাক্তার ঘোষ ক্রোধে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কালীমোহন বাবু যে দুরভিসন্ধিবশতঃ এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি তাঁহার বিপক্ষ সম্প্রদায়ের বক্তৃতা শুনিয়া স্বীয় বক্তব্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদের মতের পোষকতা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে শিশিরকুমার দণ্ডায়মান হইলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড কাগজের বাণ্ডিল ছিল, তিনি সেই বাণ্ডিলটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "আমি/বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে সভাপতি মহাশয়কে একবার এই বাণ্ডিলটা দেখিতে অনুরোধ করি। ইহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার করদাতার স্বাক্ষর আছে, এবং তাহারা সকলেই নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনের পক্ষপাতী। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যথা কর্ত্তব্য স্থির করুন।" সভাপতি মিষ্টার পল্ তখন বলিলেন যে, যে অধিকার লাভের জন্য পঞ্চাশ হাজার করদাতা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা মাত্র কয়েক জনের প্রতিবাদে, তাহাদিগকে প্রদান করিতে গবর্ণমেণ্ট অসম্মত হইতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট করদাতাদিগের প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। ইহার পর ২৫শে মার্চ্চ, শনিবার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিউনিসিপাল বিল পাশ হইয়া গেল।

শিশিরকুমারের বিপক্ষদল যখন দেখিলেন যে তাঁহাদের আশা কিছুতেই পূর্ণ হইল না, শিশিরকুমার জয়লাভ করিলেন, তখন তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। স্যার্ রিচার্ডের প্রস্তাবিত নূতন বিধি লিপিবদ্ধ হইল, তাহা যাহাতে কার্য্যকারী না হয় তাহারও বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। বিপক্ষদলের ব্যবহারে শিশিরকুমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান্ লীগের সভাগৃহে, কার্য্যপরিচালক সমিতির এক অধিবেশনে স্থির হইল যে ১নং ওয়ার্ড হইতে শিশিরকুমার কমিশনার পদ প্রার্থী হইবেন এবং অন্যান্য ওয়ার্ড হইতেও যাহাতে বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ কমিশনার পদপ্রার্থী হন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। শিশিরকুমার পদপ্রার্থী হইলে কলিকাতা শোভাবাজারের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও মহারাজা স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর উভয়েই সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজা কমলকৃষ্ণ শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন সকল সময় বিশেষভাবে দেশের কার্য্যে যোগদান করিতে না পারিলেও, স্বদেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী থাকিত। শিশিরকুমার কমলকৃষ্ণের এবং কৃষ্ণদাস যতীন্দ্রমোহনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হন। কলিকাতায় আগমনের পর রাজা দিগম্বরের চেষ্টায় শিশিরকুমার কিরূপে মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করা

হইয়াছে। কমলকৃষ্ণ একদিন শিশিরকুমারকে বলেন, "শিশির, মধ্যে মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" যে দিন এই কথা হইল শিশিরকুমার ঠিক তার পরদিন হইতে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে একদিন এক সভায় উভয়ের সাক্ষাৎ হয়; মহারাজা সভাপতি, শিশিরকুমার বক্তা। সভার কার্য্য শেষ হইলে মহারাজা বলিলেন, "শিশির, কই তোমাকে ত আর দেখিতে পাই না। আমি মধ্যে মধ্যে যে তোমাকে দেখা করিতে বলিয়াছিলাম।" শিশিরকুমার প্রত্যুত্তরে পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজা দেখা করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া দেখা করা বন্ধ করিয়াছি। তিনি আমাকে কৃপা করেন, আমি তাঁহার নিকট বড় কম যাই।" মহারাজা বাহাদুর উত্তর শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, শিশিরকুমারের সহিত বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যাহা হউক, পরদিবস শিশিরকুমার মহারাজা বাহাদুরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি দরিদ্র; রাজনীতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণে যদি মনে করে যে শিশিরকুমার ঘোষ অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশায় ধনী লোকদিগের নিকট গমনাগমন করে, তাহাতে আমার একটু দুর্নাম হইতে পারে। গত-কল্য সভাস্থলে আপনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলায় আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম।" এই সময় হইতেই উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। শিশিরকুমার ১ নং ওয়ার্ড হইতে যাহাতে কমিশনার নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, মহারাজা বাহাদুর তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে যাহাতে কোনও ভদ্র-লোক কমিশনার পদপ্রার্থী না হন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশনের সদস্যগণ তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কমিশনার হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ১নং ওয়ার্ড হইতে কমিশনার পদপ্রার্থী হইলে বাগবাজারের বাবু নন্দলাল বসু ও বাবু গোপাললাল মিত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হন। শিশিরকুমারের বিপক্ষদল তাঁহাকে একজন অশিক্ষিত ও নগণ্য ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে নানা নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি সার রিচার্ড টেম্পলের অনুগ্রহে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তাঁহার পরিচালিত অমৃতবাজার পত্রিকা সাধারণের আদরের জিনিস হইয়াছে, অনেকের নিকট ইহাই শিশির-কুমারের মহা অপরাধ ছিল। শিশিরকুমার বিলাসিতার অস্পৃশ্য ছিলেন। ছিন্ন পাদুকা ও সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তিনি সভাসমিতিতে যোগদান করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইতেন না। তিনি অতিশয় তাম্বূলভক্ত ছিলেন; পানের ডিবাটী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। শিশির-কুমারের অন্য দোষ না পাইয়া তাঁহার বিপক্ষদল তাঁহার বেশভূষার কথা লইয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিতেন। শিশির-কুমারের দেহের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর ছিল না; ইহাও তাঁহার এখন অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হইত। যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের নাম অনেকেরই নিকট পরিচিত। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না এবং বেশভূষার পারিপাট্যের দিকেও তাঁহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না। একবার তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার চেষ্টায় ভোট সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত একস্থানে গমন করিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই স্থানের একটা লোক বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, "সমগ্র যুক্তরাজ্যে কি ইহার অপেক্ষা আর যোগ্যতর ব্যক্তি নাই?" কিন্তু এই আব্রাহাম লিঙ্কনই নিঃস্বার্থ স্বদেশ সেবার জন্য তাঁহার দেশবাসীর নিকট বরেণ্য হইয়াছিলেন ও আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতে পারিয়াছিলেন। শিশিরকুমারের দেহের বর্ণ গৌর না হইলে কি হয়? তাঁহার সরলতা, চরিত্রের মধুরতা ও আন্তরিক স্বদেশ প্রেম যে তাঁহাকে গুণগ্রাহিগণের নিকট বরেণ্য করিয়াছিল। শিশিরকুমার যাহাতে কমিশনার নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন, তাহার জন্য তাঁহার বিপক্ষদল প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা শেষে সফলও হইয়া-ছিল। মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের চেষ্টায় শিশিরকুমার ১নং ওয়ার্ড হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। নির্ব্বাচনের দিন তাঁহার বিপক্ষদল যখন বুঝিতে পারিল যে শিশিরকুমারকে পরাজিত করা অসম্ভব, তখন তাঁহারা এক আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, শিশিরকুমার পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স দেন না, সুতরাং তিনি কমিশনার পদপ্রার্থী হইবার যোগ্য নহেন।

শিশিরকুমার তাঁহার ভাড়াটিয়া বাটীর জন্য পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স দিতেন, কিন্তু উক্ত টাকা তিনি তাঁহার বাটীর মালিকের মারফত দিতেন। শিশিরকুমার ব্যসদাদি বিচারক সার্ ষ্টুয়ার্ট হগের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তিনি সার্ ষ্টুয়ার্টের চক্ষুঃশূল ছিলেন, এরূপস্থলে বিচার ফল যাহা হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুভব করিতে পারেন। শিশিকুমার কমিশনার হইবার যোগ্য নহেন এই সংবাদ যখন প্রকাশ হইল, তখন তাঁহার বিপক্ষদল তাঁহার সহিত যে অভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেম, তাহা বর্ণনা করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শিশিরকুমারের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া, পতাকা-হস্তে বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে শিশিরকুমারের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হন। শিশিরকুমারের উচ্চাভিলাষকে উপহাস করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ বৃক্ষ আরোহণ করিয়া পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন। এই দলের অন্যতম নেতা বাবু গোপাললাল মিত্র উত্তরকালে নির্ব্বাচিত কমিশনারগণের সহায়তায় কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদলাভ করিয়াছিলেন। শেষে ইনি শিশিরকুমারের একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেম। নির্ব্বাচন-প্রথা প্রচলিত না হইলে গোপাল বাবুর ভাইস্ চেয়ারম্যান পদলাভ ঘটিত কিনা সন্দেহ। এই নির্ব্বাচন-প্রথা প্রচলনের জন্য কলিকাতাবাসীগণ আজীবন সার রিচার্ড টেম্পল্ ও শিশিরকুমারের নিকট ঋণী থাকিবেন।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

নবীন-প্রশস্তি

[কবির জন্ম-দিন উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিপুরা-শাখা-সম্মিলনে পঠিত।]

সাগর মেখলা গিরিকিরীটিনী চট্টলে,
তুমি ছিলে সেথা প্রকৃতির শিশু
প্রকৃতির স্নেহ-অঞ্চলে।

ফুল দিয়াছিল স্বপন ভরিয়া
পাখী দিয়েছিল সুর,
নির্ঝর দিল নির্ঝর ঝরায়ে
অন্তরে ভরপুর।

বাড়ব-অনল অনল দিয়েছে প্রজ্বলি'
কোমলে-কঠোরে কবিতা তোমার
উঠিয়াছে তাই উজ্জ্বলি'।

সুমহান্ ছবি কৃষ্ণ সে তব
ধর্ম্মের অবতার;
কর্ম্ম জ্ঞানে ও প্রেমে অনুপম
চিত্র এঁকেছ তাঁর।

সুতধার তব জীবন-সাধনা
পরের সেবায় প্রাণ,
হে নবীন, তব নিত্য নবীন
বুদ্ধ-নিমাইর গান।

গাহিয়াছে গান বাঁশরী তোমার
বিশ্বের মহা সুরে,
শিক্ষক তুমি, শিক্ষা তোমার
মহা মানবের তরে।

শক্তির আর সাম্যের পূত মন্ত্রেতে
সঙ্গীত তব সঞ্চারে প্রাণ
হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্রেতে।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

বন্ধন ও মুক্তি

(১)

"ও পিসিমা! পিসিমা!—দেখ গো, কে এয়েছে দেখ!"

"কে রে! বাবা যোগীন্ এলি! আহা! আয় বাবা আয়! কত কাল যে মুখখানি দেখি নি!"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা পিসিমা ভাগীরথী দেবী গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রণত ভ্রাতুষ্পুত্র যোগীন্দ্রনাথকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন।—

"ওরে, মা নেই বাপ নেই—পুণ্যি ছিল, তারা স্বর্গে গেছে,—বুড়ো একটা পিসি কর্ম্মের দোষে এই পাপ পিথিমীতে প'ড়ে আছি,—তা কি এম্‌নি ক'রে ভুলে থাকতে হয়রে বাবা!"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ভুলে কি আর আছি পিসী মা? চিঠি পত্তর ত লিখ্‌ছি।"

"তা ত লিখ্‌ছিস্,—খরচ পত্তরও যখন যা দরকার হয় দিচ্ছিস্! তা মুখখানি চোকে না দেখ্‌লে কি বুকটা জুড়োয় বাবা? এই ত কত বচ্ছরের মধ্যে বাড়ী মুখো একবার হ'লি নে। ঘর দরজা সব ত গোল্লায় গেল। আমি যে কদিন আছি,—এর পর তোর বাপপিতেমোর ভিটে যে একেবারে শেয়াল কুকুরের বাস হবে। বেহ্মজ্ঞানী হ'য়েছিস্, না হয় পাল পার্ব্বণ কিছু ক'র্‌বি নে,—তা বাপ-পিতোমোর বাস্তুভিটে—তা কি এমনি ক'রে আঁধার ক'রে রাখ্‌তে আছে বাবা?"

যোগীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কি ক'র্‌ব পিসিমা! জাতমারা ক'রে রেখেছ তোমরা। গাঁয়ে এসে কি থাক্‌বার যো আছে?"

"তা কেন থাক্‌বে না? এসে যদি মাঝে মাঝে থাকিস্, ধ'রে ত আর কেউ মার্‌বে না! তবে বেম্মজ্ঞানী হ'য়েছিস্, জাত ধর্ম্ম কিছু মানিস্ নে, খাওয়া দাওয়া তোর সঙ্গে কেউ ক'রে না। তাই ব'লে কি লাঠি মেরে কেউ তোদের তাড়িয়ে দিতে পারে? গাঁয়ে ত মোছলমানও কত আছে। আছে, তাদের ধর্ম্ম নিয়ে তারা আছে। কে তাদের কি ব'ল্‌তে যায়? তোরা কি তাদের চাইতেও আলাদা হ'য়ে গেছিস্? তোদের যে বেম্ম—তাঁর পূজো কি আমরাই করি নে? এই ত গিরোদা (গৃহদাহ) হ'লে সবাই বেম্মপূজো করে—আবার গে—"

যোগীন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন, "ও পিসিমা, আমরা তোমাদের সে বেম্মোর পূজো করি নে,—জান্‌লে?"

"ওমা, তবে আবার কোন্ বেম্মোর পূজো ক'রিস্। কয়জন বেম্মো আবার আছেন রে?"

"আমরা ত বলি একজন,—আর তিনি 'ব্রহ্ম'। আর-তোমরা সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে যাঁর পূজো কর, তিনি হ'লেন ব্রহ্মা।"

"ও তাই বল্! তা তফাৎ হবেই। শ্যাম হ'লেন কেষ্ট, আর শ্যামা হ'লেন কালী। ওই একটা 'আ' তেই কত তফাৎ হয়ে গেল। তা তোদের বেম্মো কেমন রে? কি ধেয়ান প'ড়িস্?—"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "পিসিমা! এ সব ধর্ম্মতত্ত্বের কথা এখন থাক্। তা এলাম এদ্দিন পরে, দুট খেতে টেতে দেবে ত? না, বল, শুধু তোমার পায়ের ধুলো নিয়েই—কালী নগরে চ'লে যাই,—সেইখেনে গিয়েই খাওয়া দাওয়া ক'রি গে।"

"ষাট! কালীনগরে কেন যাবি খেতে? বাড়ীতে এলি এত কাল প'রে—বুড়ো একটা পিসি আমি র'য়েছি—তা খেতে যাবি ছুটে কালীনগরে! ওমা, বলে কি? কেন, কালীনগরে কি?"

"সেই খেনেই দেবেনদের বাড়ীতে একটা কাজে এসে-ছিলাম।"

"ও তাই বল্! আমিও ত বলি, বলি যোগীন্ হঠাৎ কেন বাড়ীতে এল! বুড়ো পিসির এত বড় ভাগ্যি আজ কিসে হ'ল? তা কালীনগরে এসেছিলি,—তাই বুঝি দয়া ক'রে একটু দেখা দিতে এলি? হারে কপাল!"

"যেখান থেকেই যে ভাবে এসে থাকি, দেখা ত পেলে পিসিমা? তা, না এলে বুঝি ভাল হ'ত?"

"ষাট্! ষাট্! অমন কথা ব'ল্‌তে আছে রে যোগীন্? এসেছিস্, তবু মুখখানি একবার দেখ্‌লাম। তা, আর

ঘরে আয়! কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু বোস্, ঠাণ্ডা হ। ডাব আছে, পেপে আছে, কেটে কুটে দি, খা। তারপর মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দিচ্ছি,—ও বাড়ীর তারককে পয়সা দেব, সে মাছ তরকারী দুধ কিনে দেবে এখন,—আয়, ঘরে আয়!"

"ঘরে কি নেবে পিসিমা? আমার যে জাত গেছে—"

"বালাই! জাত কেন যাবে? একেবারে মোছলমান খিষ্টেন ত হ'সনি আর! তবে অনাচারটার ক'রিস্—তা একটু দাঁড়া বরং—আমার শিনের আর মালার চুব্ড়িটা আর জলের কলসীটা চালায় নিয়ে রেখে আসি!"

"আবার অত হাঙ্গামা ক'র্বে! তা, ঘরে নাই গেলাম। এই বারান্দাতেই বেশ দিনটা কাটিয়ে নিতে পারব। সন্ধ্যে বেলায় ত চ'লেই যাব।"

"ওমা বটে! তাও কি হয়? পরের ছেলে ঘরে একবার আস্বি, নে? তুই আজ বাড়ীতে এসেছিস্, বারান্দায় বসে থাক্বি, আমি তাই প্রাণে ধ'রে দেখ্তে পারি? হাঙ্গামা আর কি? কি জানিস্ বাবা, তোরা অনাচার ক'রিস্, মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে,—তা আমরা পাপী মানুষ কিনা, তাই,—নইলে দেবতার কি আর ছুঁৎ লাগে? দেবতা কোথায় না আছেন?"

ভাগীরথী ঘরে উঠিয়া মালার চুব্ড়ি, জলের কলসী, পূজার ও আহারের আরও দুই চারিটা জিনিশ চালায় নিয়া রাখিয়া আসিলেন। চারিদিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন, এমন আর কোনও দ্রব্য আছে কি না, বিধর্ম্মী ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহ প্রবেশে যাহার বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু চোকে কিছু পড়িল না। ভাবিলেন, নয় হ'ক ছাই, না হয় একটা জিনিশ ফেলাই যাইবে। তাই বলিয়া যোগীন্ কতক্ষণ পরের মত বাহিরে বসিয়া থাকিবে?

"আয় ঘরে আয়! হাস্ছিস্ যে! ভাব্ছিস্ বুড়ীকে ছুঁৎ রোগে ধ'রেছে?"

যোগীন্দ্রনাথ ঘরে উঠিতে উঠিতে কহিলেন, "বুড়ী গুঁড়ী—ছুঁৎ রোগ ত তোমাদের সবারই আছে।"

"তা জাতধর্ম্ম একটা থাক্লে তা মেনে চ'ল্তে হয় না কি? তবে মহাপুরুষ কি যোগী সন্ন্যেসী যারা—তারা আচার নিয়ম শুনেছি কিছু মানে না। তা আমাদের কি আর তেম্নি পুণ্যির জোর আছে বাবা?"

যোগীন্দ্রনাথ আর কোনও বাগ্‌বিতণ্ডা না তুলিয়া জামা উড়নী ছাড়িয়া রাখিয়া পিসিমার আস্তৃত মাদুরটির উপরে বসিলেন।—সকালে বন্ধুর গৃহ হইতে প্রচুর 'চা' যোগ করিয়াই আসিয়াছেন। পিসিমার প্রদত্ত গ্রাম্য ফলসহ জলযোগে বিশেষ স্পৃহা তাঁহার ছিলনা, কিন্তু পিসিমার মন ও মান রক্ষার্থ কিছু 'মুখস্থ' ও উদরস্থ করিতেই হইল। নতুবা সর্ব্বনাশ! পিসিমার সজল অনুযোগ সদয়ঙ্গম করিতে তাঁহাকে নিতান্তই ত্রস্ত হইয়া পড়িতে হইত! ভ্রাতুষ্পুত্রকে জলপানে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া ভাগীরথী বাজার হইতে ত্বরিত মাছ তরকারী দুধ ইত্যাদি আনাইলেন,—দ্বিপ্রহরের মধ্যেই পাঁচ ভাগ রাঁধিয়া আনিয়া কাছে বসিয়া খাওয়াইলেন,—বিশ্রামের জন্য যথাসাধ্য শয্যা পরিপাটি পূর্ব্বক বিছাইয়া দিলেন। যোগীন্দ্রনাথ ফুল ভাল বাসিতেন, কতকগুলি ফুল আনিয়াও বালিশের কাছে রাখিলেন। তারপর উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া আসিয়া, নিজে স্নান করিয়া আসিলেন। চালায় গিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া পূজা আহ্নিক সারিলেন,—তারপর নিজের হবিষ্যান্ন পাক করিয়া আহার করিলেন। এই প্রৌঢ়বয়সেও পিসিমার কর্ম্ম কুশলতা, ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া যোগীন্দ্রনাথ একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন।

একটু গড়াগড়ি দিয়া ভাগীরথী উঠিলেন। তখন বেলা পড়িয়াছে, একবাটি ক্ষীর, কিছু দুটা খোল ও মিষ্ট আনিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ চমকিয়া কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি ক্ষেপেছ পিসিমা? এ খাবে কে? আমি কি আর সেই ছেলে মানুষটি এখনও আছি।"

ভাগীরথী গালে হাত দিয়া কহিলেন, "বলে কি কত বুড়ো হ'য়েছিস্ রে যোগীন্, বয়েস ত এই বিয়াল্লিশ মোটে হ'ল। তোর বাবা বায়ান্ন বছর বয়সেও অমন দু তিনবাটি ক্ষীর খেতে পার্ত। সঙ্গে আরও কত আম খেত, কাটাল খেত——"

যোগীন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন, "তোমার সে বৃকোদরের দ্বাপর যুগ এখন আর নেই পিসিমা; তোমরাই ত ব'লে থাক ঘোর কলি উপস্থিত ত! কলি কিনা, মানুষ সব বেজায় ক্ষীণজীবি হ'য়ে প'ড়েছে। চল্লিশ পার হ'লেই এখন সব বুড়ো আর সবারই অম্বল অজীর্ণ হয়।"

পোড়া কপাল! তাই ব'লে এই ক্ষীরটুকু ক'রতে পারবিনি? সবে ত একসের দুধ মেরে এই ক্ষীর ক'রেছি

"সর্ব্বনাশ! এক—সের দুধের ক্ষীর! পাতলা এক পোয়া দুধ যে এখন পেটে সয় না।"

"অবাক্ ক'ল্লে! ক'দিন তা হ'লে আর বাঁচ্‌বি? পোড়া যম ত আমাদের চক্ষে দেখবে না। কত কাল যে আর এই পাপের বোঝা বইব,—আর কত দুঃখই যে অদেষ্টে আরও আছে! তা খা—খা! ওরে আমি ব'লছি কিছু হবে না।"

"তুমি বল্লেই যদি কিছু না হ'ত পিসিমা, তবে আর ভাবনা ছিল কি? তুমি ত একশ বছর পরমায়ু হ'ক, একথা হাজার বার আমাকে ব'লেছ। তা যে হবে না, এ কথা লিখে প'ড়ে দিতে পারি।"

"কেন হবে না? খেলেই প্রমাই বাড়ে। এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এক পোয়া দুধ খেতে পারবিনে, প্রমাই দাঁড়াবে কিসের জোরে? খুব খা দা, দেখিস্ প্রমাই হবে

"ওই ক্ষীর যদি খাই, প্রমাই আজ এই বিয়াল্লিশেই দাঁড়াবে। এক পাও আর এগোবে না।"

"বালাই! বালাই! অমন কথা ব'লতে আছে? আমি হাতে ক'রে এনেছি, ও অমের্ত্তো। তা সব না খাস্, একটু খানি মুখে দে। নইলে প্রাণটা আমার পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।"

ক্ষীরের বাটী পিসিমা ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মুখে সরাইয়া দিলেন।—

"তা হ'লে—একটু খানি হাতে তুলে বরং দেও—ছুঁয়ে আর নষ্ট কেন ক'রব? পাড়ার ছেলেরা খাবে।"

"তা খাবে। তাদের আবার জাত বিচের আছে কিনা? আরও আজকালকার ছেলে। খ' না তুই তুলে একটু—

অগত্যা যোগীন্দ্রনাথ একটুখানি ক্ষীর তুলিয়া লইলেন। ভাগীরথী একটা সন্দেশও হাতে গুজিয়া দিলেন। অগত্যা তাহাও মুখে দিয়া হাত মুখ ধুইয়া যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, তা হ'লে আজকে উঠি পিসিমা। থাকতে আর পারব না, আজ রাত্তিরেই ওখানে কাজ আছে।"

"তা কবে যাবি ক'ল্‌কেতা?"

"কালই যেতে হবে।"

"তা আমাকেও কেন অম্‌নি নিয়ে যা না?"

"তুমি! তুমি যাবে ক'ল্‌কেতায়? বল কি পিসিমা?"

ভাগীরথী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "তা যদি নিয়ে যেতিস্ বাবা—গঙ্গাস্নান ক'রে কালীদর্শন ক'রে আস্‌তাম। কপালে তা বড় ঘটে না। বৌমাকে—ছেলেমেয়েদের কতকাল দেখিনি। সেই উমিকে কোলে নিয়ে কত কাল হ'ল এসেছিল—আর বাছাদের চক্ষেও দেখিনি।"

যোগীন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া একটু হাসিলেন, শেষে কহিলেন,—"তা- আমাদের খিষ্টেনী বাড়ীতে তোমার পোষাবে পিসিমা?"

"তা তোরা ত একেবারে খিষ্টেন হ'স নি!—তারা খিষ্ট ভজে, গরু শুয়োর খায়। রাম বল! তা তোরা হ'লি বেহ্মজ্ঞানী, অত অনাচার ত করিস্ নে। না করিস্?"

"না—অতটা করিনে পিসিমা, তবে—"

"তবে আর কি? আর কিছু বলিস্ নে, আমি শুনতে চাই নি। তা আমায় নিয়ে চ, আলাদা একটা ঘরে থাক্‌ব,—একটু গঙ্গাজল আনিয়ে দিস্, পুজো আহ্নিক ক'রব, একমুঠো হবিষ্যি রেঁধে খাব। তোদের অনাচারে আমার কি আস্‌বে যাবে?"

"তা যেতে চাও যাবে,—কিন্তু অসুবিধে—তোমার কিছু হবে—সেটা বোঝ—"

"কিছু অসুবিধে হবে না আমার। তীর্থে যাব—অসুবিধে কিছু হ'লেই বা কি? দুদিন না খেলেই বা কি এসে যাবে?—তুই নিয়ে যা আমাকে। বুড়ী একটা পিসি—তোর বাড়ীতে প'ড়ে আছি—গেলেই ত এদিককার সব ফুরিয়ে গেল। এই একটা আবদার আমার রাখ্‌বিনি যোগীন্?"

"আচ্ছা, ইচ্ছে যদি এতই হ'য়েছে—যেও। তৈরী হ'য়ে থেকো। সন্ধ্যার পর আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব।"

(২)

পিসিমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কিছু চিন্তাকুল চিত্তে যোগীন্দ্রনাথ বন্ধুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। চিন্তার কারণ ছিল। যোগীন্দ্রনাথ নিজে যারপরনাই সদাশয় ও আনন্দময় স্বভাবের লোক ছিলেন। কলিকাতায় যখন তিনি কলেজে পড়িতেন, যখন ব্রাহ্ম সমাজে খুব যাতায়াত করিতেন, কতিপয় ব্রাহ্ম যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মে। ক্রমে ব্রাহ্ম পরিবার ভুক্তা আই এ পরীক্ষোত্তীর্ণা রূপবতী

কোন যুবতীর প্রতি চিত্তও বিশেষ আকৃষ্ট হইল। ইহার সঙ্গে দাম্পত্য মিলনের প্রয়োজন যখন অতি তীব্রভাবেই অনুভব করিলেন, তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিও মনের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তিনি জাগাইয়া তুলিলেন। পিতামাতা তখন পরলোকে। ইহলোকে এক বিধবা পিসিমা ছিলেন। দীক্ষা ও উদ্বাহ—পর পর দুইটি পরস্পর সহজেই সম্পন্ন হইয়া গেল,—তারপর পিসিমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। তখন আর পিসিমা কি করিবেন? পরলোকগত ভ্রাতৃ-ভ্রাতৃবধূ, পিতামাতা প্রভৃতি প্রিয়জনসমূহের জলপিণ্ড তর্পণাদির অভাবজনিত দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া, যথাবিধি বিলাপ পরিতাপ পূর্ব্বক ভ্রাতৃবংশতিলক সবধূ শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উত্তর পাঠাইলেন। প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে ও ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় বহু সুসন্তান তাহাদের হউক, জলপিণ্ডাদির অভাবে ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহারা যতই ক্লিষ্ট হউক, বংশের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিবে, পুন্নাম নরকে তাঁহাদিগকে পতিত হইতে হইবে না, ইহাই তাঁহাদের কতকটা সান্ত্বনার স্থল হইবে। তা অভাগী পিসিমাতাকে যোগীন্ যেন একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় না, মধ্যে মধ্যে তাহাদের চন্দ্রবদনদ্বয় দর্শনে যেন তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। ইত্যাদি।

প্রথমে কিছুকাল মধ্যে মধ্যে পিসিমাতাকে এই সুধা-বিতরণে যোগীন্দ্রনাথ কার্পণ্য বড় করিতেন না। ক্রমে যখন ছোট ছোট আরও দুই একটি চন্দ্রের উদয় হইতে আরম্ভ করিল, পৌত্তলিকতার কোনও কলঙ্কপাত কোমল সেই চাঁদগুলিতে পাছে হয়, এইভয়ে তাহাদের জননী অনসূয়া বড় ভীত হইয়া উঠিলেন। বর্ষার জলের মতই পৌত্তলিকতা পল্লীগ্রামগুলিকে ছাইয়া ঢাকিয়া আঁধার করিয়া রাখিয়াছে। কে জানে, কোন অলক্ষ্য সূত্র ধরিয়া জঙ্গলের কোন কণ্টকিত গুল্ম ইহাদের উর্ব্বরহৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবে,—কোন আঁধার ছায়া তাহাদের নির্ম্মল চিত্তফলকে দুরপনেয় কাল দাগ ফেলিবে, তাই ইহাদের লইয়া কিছুতেই আর তিনি পল্লীগ্রামে যাইতে চাহিলেন না।—সেই অবধি যোগীন্দ্রনাথ নিজেও আর বড় বাড়ী আসিতে পারেন নাই। যখন একটু আধটু ইচ্ছা হইয়াছে, অনসূয়া নানা রকম অসুবিধা দেখাইয়াছেন,—শেষে এই ইচ্ছা হওয়াটাও তাঁহার দূর হইয়া গেল।

এখন পৌত্তলিকতার প্রতি এতাদৃশী বিদ্বেষিণী অনসূয়া যে গৃহের কর্ত্রী, সেই গৃহে পরমপৌত্তলিকা পিসিমাতার অবস্থান যে নানা রকমে অতি অশান্তিজনক হইবে ইহা উপলব্ধি করিয়া যোগীন্দ্রনাথ সত্যই বড় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। পিসিমা এমন ধরিয়া পড়িলেন—এখন কি প্রকারে তিনি বলিবেন, না, তোমাকে আমার বাসায় লইয়া যাইতে পারিব না।—যাহা হউক, নিতান্ত যদি অসুবিধা দেখা যায়, বাসার পাশেই তাঁহার বন্ধু অনিলবাবুর বাসায় পিসিমাতা যে কয়দিন থাকেন রাখিয়া দিবেন। এই অনিল বাবু উদার মতাবলম্বী হিন্দু—অর্থাৎ হিন্দু সমাজভুক্ত, কিন্তু কোনওরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান গৃহে কখনও হয় না।—সুতরাং ইঁহার সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে অনসূয়ার কোনও রূপ আপত্তি ছিল না।—ছেলেমেয়েরাও সর্ব্বদা ইঁহার গৃহে যাইত। ইহার গৃহে অবস্থিতি হেতু তাহাদের মুখদর্শনসুখে পিসিমা বঞ্চিতা হইবেন না।—অনিলবাবু এবং তাঁহার স্ত্রীও আদর করিয়া পিসিমাতাকে রাখিবেন।—

তবে পিসিমাতাকে লইয়া গিয়া একেবারে বাসায় উঠিবেন, অপ্রত্যাশিত এই অতি অপ্রীতিকর ও ভয়াবহ ঘটনায় না জানি অনসূয়া কি বিশ্রী একটা কাণ্ড বাধাইয়া ফেলেন! তাই তাঁহাকে পূর্ব্বেই একটু সাবধান করিবার অভিপ্রায়ে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন,—পিসিমাতাকে লইয়া পরদিন প্রাতঃকালে তিনি কলিকাতায় পৌছিবেন।

যথাসময়ে যোগীন্দ্রনাথ পিসিমাতাকে লইয়া কলিকাতায় পৌছিলেন। পূর্ব্বে যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে অবশ্য এইটুকু সুবিধা হইল যে তাঁহাকে দর্শনমাত্র অনসূয়ার মূর্চ্ছা হইল না, অথবা এমন কিছু একটা গোলমাল তিনি করিলেন না, যাহাতে যোগীন্দ্রনাথ পিসিমাতার নিকটে অতি অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে পারেন।—অতি গম্ভীর বদনে একটি নমস্কার করিয়া তিনি বৃদ্ধা পিসী শাশুড়ীকে বসিবার জন্য একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।—ছেলেমেয়েরাও তদ্রূপ নমস্কার করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল,—মাতৃশাসনভয়ে কাছে ঘেঁসিয়া বেশী কথা কহিতে সাহস পাইল না। ভাগীরথীরও মনটা কেমন দমিয়া গেল।—নাতিনাতিনীদের আদর করিয়া কাছে ডাকিতে পারিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ-নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানির

দিকে একবার চাহিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তিনি একবার চাহিলেন। যোগীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া কহিলেন, "উর্ম্মি, তোর দিদিমাকে একখানা আসন টাসন কিছু এনে দে।"

কন্যা উর্ম্মিমালা একখানি আসন আনিয়া মাটিতে পাড়িয়া দিয়া কহিল "এইখেনে বসুন দিদিমা।"

ভাগীরথী নিঃশব্দে সেই আসনে বসিলেন।—যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কোন ঘরে উনি থাক্‌বেন ঠিক করেছ?"

"অনুসূয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, এ দিক্‌কার সব ঘরই ত অকুপায়েড (জোড়া), ফার্নিচার (আসবাবপত্র) সব রিমুভ করে (সরিয়ে) একটা যায়গা ক'রে দেওয়া সোজা নয়।—বারান্দার ওদিকে বাথরুমটার পাশে যে ছোট ঘরটা আছে, ময়লা কাপড়-চোপড়গুলা রাখা হত, সেইখেনে থাকতে পারেন।"

"বাম্নাব'ম্না!"

"আমাদের ত বামুনেই রাঁধে,—নিরিমিষ তরকারীও হয়।—তা ওঁর যদি তেমন প্রেজুডিস্ (কুসংস্কার) থাকে, ঐ ঘরেই আলগা উনুনে রেঁধে খেতে পারেন।"

"আচ্ছা, তাই হোক আজকে ত!" ও বেহারী, ওরে পিসিমার জিনিষপত্রগুলো ওই বাথরুমের পাশের ঘরটাতে নিয়ে যা ত।"

ভৃত্য বেহারী ঘরে ঢুকিতেই ভাগীরথী তাঁহার মালার ও শিবের ডুলিটি সরাইয়া নিজের কাছে রাখিলেন। বেহারী জিনিষপত্র লইয়া গেল। উর্ম্মি পিতার আদেশ পাইয়া ভাগীরথীকে লইয়া গিয়া সেই ঘরে পৌঁছিয়া দিল।

তখন অনুসূয়া কহিলেন, "তুমি একি কাণ্ড করলে বল দিকি!"

"কি কর্‌ব অনু, উনি ধরে প'ল্লেন—"

"তাই বলে একটিবার আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে না,—আমার সুবিধে অসুবিধে কি হবে কিছু জান্‌লে না,একেবারে বাড়ীতে এনে তুল্লে,—এটা কি তোমার উচিত হয়েছে?"

"কেন, টেলিগ্রাম—করেছিলাম কাল।"—

"সে ত খবর দিয়েছিলে, ওকে নিয়ে আস্‌ছি। আমার মতের অপেক্ষা ত করনি।"

"সময় পেলুম কই অনু। তা কি আর অসুবিধে এমন হবে। ওই একপাশে উনি থাক্‌বেন, দুটি রেঁধে খাবেন, ক্ষতি আর কি হবে।"

অনুসূয়া রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন, "শুধু রেঁধেই যদি দুটি খেতেন, ক্ষতি এমন কিছু ছিলনা। উনি নাইতে যাবেন যে গঙ্গায় পূজা অ হ্নিক করবেন—"

"তা ত কর্‌বেনই। কিন্তু তাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি?"

"না, আমাদের এ ঘরে ওসব চ'লতে পারে না।—পৌত্তলিকতার কোনও অনুষ্ঠান এখানে হ'তেই পারে না! গৃহের পবিত্রতা আমি নষ্ট হতে দিতে পারিনে! যা পাপ বলে মনে করি, নিজের ঘরে তার কোনও প্রশ্রয় আমি দিতে পারব না।—ছেলেমেয়ের সাম্‌নে অতি কুদৃষ্টান্ত এতে দেখান হবে। এর পর তারা যদি কোন অন্যায় করে কি বলে শাসন করব? আর এও ত জান, এই সব পাপের সংস্পর্শ হতে দূরে কত সাবধানে আমি ওদের রাখি।"

"বল কি অনু! চুরীও না, ডাকাতিও না, নিজের ঘরে ব'সে উনি পুজো সন্ধ্যে ক'র্‌বেন—তাতে কি এমন পাপ আমাদের হবে?"

অনসূয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "পৌত্তলিকতার উপরে আর বড় পাপ কিছু নেই—হ'তে পারে না! কারণ ঈশ্বরের অবমাননা হয় এতে। ব্রাহ্ম গৃহে কোনও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হ'তেই পারে না।"

"বড় যে সর্ব্বনেশে কথা ব'লছ অনু। গঙ্গাস্নান না ক'রে, পুজো আহ্নিক না ক'রে, যে উনি খাবেনই না কিছু। বুড়ো পিসি, শেষে উপোস করিয়ে মার্‌ব!"

"আগেই এটা ভাবা উচিত ছিল। আমাকে যদি জানাতে, আমি বুঝিয়ে দিতে পার্‌তুম, এ বাড়ীতে একদিনও ওঁর থাকা চ'ল্‌তে পারে না।"

"তা হ'লে এখন কি বল! ওঁকে কি বাড়ী থেকে পথে বের ক'রে দেব? সেটা কি দয়ার কাজ হবে, না ভদ্রতার ব্যবহারই হবে?"

অনসূয়া নীরবে একটু কাল ভ্রূকুটি করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কদিন ওঁকে রাখ্‌তে চাও এখানে?"

"কদিন আর চাইনে অনু। যদি বল, কালই অনিল-বাবুকে ব'লে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে ওঁকে রেখে দেব। কিন্তু উনি আমার পিসি—মাতে আর ওঁতে তফাৎ কিছু দেখিনি

কখনও।—বাড়ীতে নিয়ে এসেছি, এক সন্ধ্যে অন্ততঃ না খাইয়ে ওঁকে বের ক'রে দিতে পার্‌ব না। খাওয়াতে হ'লে, ওঁকে গঙ্গা স্নান করাতে হ'বে, ওঁর পূজো আহ্নিকের ব্যবস্থাও সব ক'রে দিতে হবে। পাকের জন্যে গঙ্গাজল আনিয়ে দিতে হবে। আর ওই বাথরুমের পাশের ঘরে ওঁকে যায়গা দিয়েছ, আজ মেথর ওঁর দোরের কাছ দিয়ে সেখানে যেতে পার্‌বে না।"

অনসূয়া চমকিয়া উঠিলেন।

"সর্ব্বনাশ! সে কি ক'রে হ'তে পারে? মেথর ত এই ন'টায় আস্‌বে, আবার বিকেলে আস্‌বে,—ঘর ধুয়ে ফেনাইল না দিয়ে গেলে দুর্গন্ধ হবে যে, ছেলেপিলেদের হেল্‌থ এফেক্ট ক'র্‌বে (স্বাস্থ্যহানি হবে।)"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "হয় অন্য একটা ঘর ওঁকে দেও, না হয় বাথরুম আজ ব্যবহার ক'রো না,—আর না হয় উর্ম্মি নিজে গিয়ে ধুয়ে ফেনাইল দিয়ে আসবে। না, ফেনাইল দরকার নেই। ওঁকেও ত যেতে হবে। গোবর দিয়ে বরং——"

"গোবর! ক্ষেপেছ তুমি! গোবর!" গোবরের নামে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিয়া অনসূয়া প্রায় মূর্চ্ছা যাইবার মত হইলেন।

"ওগো গোবরটা নেহাৎ অশুদ্ধ জিনিষ নয়,—ওটাও ভাল একটা disinfectant (শোধক দ্রব্য)। কেমন পার্‌বিনা উর্ম্মি?"

উর্ম্মি কহিল, "কেন পারব না? আজকে আমিই ঘর ধুয়ে টুয়ে দেব——"

ভ্রূকুটিকুটিল অগ্নিদৃষ্টিতে অনসূয়া উর্ম্মির দিকে একবার চাহিলেন। কিন্তু দৃষ্টি ব্যর্থ হইল। মাতার নিকট হইতে এইরূপ একটা রোষপ্রকাশের সম্ভাবনা বুঝিয়া উর্ম্মি সে দিকে আদৌ ফিরে নাই,—পিতার মুখের দিকেই চাহিয়াছিল।

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "বেশ ত, তুই ক'র্‌বি। এ সব মাঝে মাঝে নিজেদের হাতে করা ভাল,—নইলে কেউ পারে না। মেথর যদি দৈবি একদিন না এল, একেবারে অসহায় হয়ে প'ড়্‌তে হয়। বামুন না এলে তবু হোটেলে গিয়ে কি খাবার টাবার এনেও এক দিন চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মেথর নইলে একটি দিনও চলে না। যত সভ্য হচ্ছি আমরা, ততই অন্যের উপরে নির্ভরতা আমাদের বাড়্‌ছে। মেথররা যদি ধর্ম্মঘট একদিন করে, সহর শুদ্ধ লোকের ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌ ছাড়্‌তে হয়। তবে কি বল অনু? এই বন্দোবস্তই আজ হ'ক্‌। কাল সকালেই ওঁকে অনিলবাবুদের বাড়ীতে রেখে আস্‌ব।"

অনসূয়া নিতান্ত অপ্রসন্নভাবে কহিলেন, "তা—উপায় যদি আর নাই থাকে, একদিন কাজেই এটা সইতে হবে,—যদিও গৃহের পবিত্রতা নষ্ট ক'র্‌তে আমি একেবারেই রাজি নই।"

যোগীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া কহিলেন, "তা নাহয় অনুতাপ ক'রে কাল এ জন্য একটা বিশেষ প্রার্থনা করা যাবে।"

অনসূয়া কহিলেন, "কেন, উনি কি একদিন আমাদের ধর্ম্মমতের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারেন না?"

"কি, গঙ্গাস্নান পূজো আহ্নিক সব ছেড়ে? না, তা পারেন না। না খেয়ে বরং দুদিন কাটিয়ে দিতে পারেন,—কিন্তু এটা বাদ দিতে পারেন না।"

অনসূয়া কহিলেন, "তা হ'লে তুমি নিজে যা' হয় কর গে। আমি সে সব বন্দোবস্ত কিছু ক'রে দিতে পার্‌ব না, আমার ছেলেপিলেরাও পার্‌বে না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।" যোগীন্দ্রনাথ ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন,—সাড়ে আটটা বাজিয়াছে।

"ও বেহারী! যা—যা, শীগ্‌গির একটা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়। গঙ্গায় যাবে।"

উর্ম্মি কহিল, "চা টা খাবে না বাবা?"

"না, না,—আর সময় নেই। আফিসে যেতে হবে যে।"

যোগীন্দ্রনাথ অবিলম্বে পিসিমাকে লইয়া গঙ্গায় গেলেন। পূজা আহ্নিক ভাগীরথী ভাগীরথীতীরেই সারিয়া আসিলেন। বেহারী সঙ্গে গিয়াছিল, সে এক কলসী গঙ্গাজল লইয়া আসিল। এ দিকে ভ্রূকুটি কুটিলা অনসূয়া আদেশ দিলেন,—উর্ম্মিমালা চাউল, ডাইল, তরকারী, দুধ ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া আসিল। ঝি দোকান হইতে কিছু কাঠ আনিয়া এবং উনানের জন্য কয়েকখানি ইট নিয়া সাজাইয়া রাখিল।

ফিরিতে যোগীন্দ্রনাথের বেলা প্রায় ১০॥টা হইল। ১১টায় আফিস, উর্ম্মি তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা ও

খাবা বিস্কুট লইয়া আসিল, কোনও মতে তাই খাইয়াই তিনি আফিসে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর স্থানান্তরিত হইবার প্রস্তাব শুনিয়াই ভাগীরথী কহিলেন, "তা আমায় বরং আজ রাত্তিরেই বাড়ী পাঠিয়ে দে না যোগীন? পরের বাড়ীতে—কোথায় গিয়ে থাকব—"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "না, মা, সে হয় না পিসিমা। এসেছ যদি, কদিন থাক কালীঘাটে যাবে, আরও কত দেখবে শুনবে,—শেষে পাঠিয়ে দেব। অনিল আমার আপনার ভেয়ের মত। সেখানে কোনও অসুবিধে তোমার হবে না।"

"তোদের দেখতে পাব ত বাবা?"

"পাবে না! বল কি পিসিমা? রোজ যাব। আফিস থেকে ফিরবার সময়, তোমার পাতের ভাত দুটি খেয়ে আসব। রোজই দুটি ক'রে প্রসাদ রেখে দেবে আমার জন্যে—সেই আমার বিকেলের জল খাওয়া হবে। উর্ম্মি টুর্ম্মি ওরাও যখনই সময় হয়, তোমার কাছে যাবে,—গল্প সল্প ক'রবে।"

ভাগীরথী আর আপত্তি করিলেন না।

(৩)

সেদিন শিবরাত্রি। দুপরের পর ভাগীরথী অনেকগুলি শিব গড়িয়া একখানি পিঁড়ির উপরে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। উর্ম্মি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সকালে সন্ধ্যায় নয়,—মাত্র বেলা দুইটা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা যখন ইচ্ছা অনিলবাবুর বাড়ীতে গিয়া দিদিমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারে, এইটুকু অনুমোদন তারা মাতার নিকটে পাইয়াছিল। শান্তি প্রিয় যোগীন্দ্রনাথও এই আপোষে রাজি হইয়াছিলেন।

উর্ম্মি কহিল, "ওকি দিদিমা, অতগুলো মাটির ঢিপি বানিয়েছ কেন! কি হবে ওদিয়ে?"

"মাটির ঢিপি! ওমা, মেয়ে বলে কি? অবাক্ ক'ল্লে! মাটির ঢিপি কিলো?"

"তবে কি ও গুলো?"

"ও ত শিব। আজ শিব রাত্তির যে। কেন, তোরা শিবও দেখিস্ নি কখনও?"

"শিব! ওই তোমাদের মহাদেব ত? সে ত ছবি ছবিতে দেখেছি। তা ত ও রকম মাটির ঢিপির মত নয়?"

ভাগীরথী কহিলেন, "ওই ছবিতে যে মহাদেব দেখেছিস্, এই শিবও তিনিই। এও তাঁর এক মূর্ত্তি।"

উর্ম্মি হাসিয়া কহিল, "এও নাকি আবার মূর্ত্তি! এত মাটির পুতুল—যা তোমরা পুজো কর—তাও হয় নি। হাত নেই, পা নেই, নাকমুখ চোক্ কিচ্ছু নেই—কেবল এক একটা মাথার মত বের ক'রে দিয়েছ!"

ভাগীরথী আবার হাসিয়া কহিলেন, "পাগলীর কথা শোন! শিব ত এই রকমই!"

"ওই গুলো পুজো ক'রবে নাকি?"

"ছি দিদি! গুলো গুলো ব'লতে নেই। এঁরা হ'লেন দেবতা!"

"হুঁ। দেবতা ত ভারী! ওই সব ঢিপিগুলো আমিই ভেঙ্গে এক্‌খুনি একটা মাটির দলা ক'রে ফেলতে পারি। দেবতা ত তোমার এই!"

ভাগীরথী পিঁড়িখানি পিছনের দিকে একটু সরাইয়া রাখিলেন। কে জানে, চপলা বালিকা সত্যই যদি এইরূপ একটা বিগর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলে। দেবতার কোপে অমঙ্গল যাহা হইবার তাহা ত হইবেই। আবার এতগুলি শিব তাঁহাকে ফের গড়িতে হইবে। শেষে হাসিয়া কহিলেন, "তা পারবি নে কেন? আমিও পারি। হাতে গড়া জিনিষ ভাঙ্গতে কে না পারে?"

"হাতে গ'ড়ে হাতে ভাঙ্গা যায়, সে আবার কেমন দেবতা তোমাদের দিদিমা!"

"কি ক'রব দিদি? ভক্তি তেমন নেই, দেবতা নিজে ত মূর্ত্তি ধ'রে দেখা দেবেন না! কাজেই হাতে গ'ড়ে নিতে হয়।"

"হাতে গ'ড়ে নিলে ত সে পুতুল হ'ল।"

"পুতুল! ওমা, পুতুল কেন হবে? পুতুল নিয়ে ত খেলা করে? তাকি পুজো কেউ করে? এই যে শিব গড়িয়েছি,—পুজো যখন ক'রব, এর মধ্যেই আমার দেবতা আসবেন। মনে মনে এতেই আমার দেবতাকে তখন দেখতে পাব।"

উর্ম্মি একটু হাসিয়া কহিল, "দেবতা ত তোমাদের সেই মহাদেব, যার ছবি দেখেছি! তা সে মহাদেব কে তা জান?"

"ওমা, তাই যদি জানব, তা হ'লে আর এই পাপের

বোঝা ব'য়ে এখনও এই পিথিমীতে প'ড়ে আছি? কবে যে ত'রে যেতাম।"

"তা এই সব ভুল থেকে ত'রে যেতে চাও কি দিদিমা? বড় একজন পণ্ডিত অনেক গবেষণা ক'রে এর তত্ত্ব বের ক'রেছেন।"

"তা পণ্ডিত যোগী ঋষিরাই ত এর জানেন। আমরা মুখ্খু মেয়ে মানুষ—কি আর জানব।

"ও দিদিমা! ইনি তোমাদের সেকেলে যোগীঋষি দলের পণ্ডিত কেউ নন। তারা ত এ সব তত্ত্ব খুবই বুঝত। ইনি হ'লেন এ কালের একজন বড় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত।"

"পেত্নীতত্ত্বের পণ্ডিত তাই বল্ মহাদেব হ'লেন ভূতনাথ। ভূতের সাথে সাথে পেত্নী থাকবেই। তা পেত্নীতত্ত্ব যে জানে, ভূত তত্ত্বও সে অবিশ্যি জানবে, আর তা হ'লে ভূতনাথ মহাদেবের তত্ত্বই বা জানবে না কেন?"

ঊর্ম্মি হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিস্মিতা ভাগীরথী কহিলেন, "হাস্‌লি যে বড়? ওলো, এসব হাসির কথা নয় তোরা বেহ্মজ্ঞানী কিনা, কিছু মানিস্‌নে, তাই দেবতার কথায় এত হাসছিস্ তা হাস্‌তে নেই বাছা, ওতে অকল্যেণ হয়।"

ঊর্ম্মি কহিল, "আমি বল্‌ছিলাম কি দিদিমা—ভূতপেত্নীর কথা নয়।—পেত্নীতত্ত্ব, নয়—হি—হি—হি!—প্রত্নতত্ত্ব—প্রত্নতত্ত্ব

"আমিও ত তাই ব'লছি। তোরা না হয় ভূতকে পেত্ন বলিস—যেমন পেত্ন আর পেত্নী,—আমরা বলি ভূত আর পেত্নী। একই ত কথা হ'ল,—"

"নাঃ, তোমার সঙ্গে আর পারব না দিদিমা আচ্ছা, পেত্ন পেত্নীর কথা এখন থাক্। বড় একজন পণ্ডিত অনেক আলোচনা ক'রে যা ব'লেছেন—যদি শোন ত বলি।"

"তা বল্ না! নতুন তত্ত্ব যদি কিছু পাই,—সে ত ভাগ্যির কথা।"

"আচ্ছা, তা হ'লে শোন। ওই যে মহাদেবের পূজো তোমরা কর, ও দেবতা টেবতা কিচ্ছু নয়। দেবতা ত কিছু নেই-ই, সব তোমাদের মনগড়া পুতুল,—তা ও মহাদেব সেই মনগড়া পুতুলও নয়। সেকেলে একজন বিলেতের লোক—খুব তেজী আর জোয়ান ছিল,—ঘুরতে ঘুরতে এদেশে এসেছিল।"

"ওমা, বলে কি মেয়ে!"

"শোনই আগে। অনেক কালে—কত হাজার বচ্ছর আগে সে দেশের লোক সব একেবারে বুনো ছিল, বনের জন্তু সব মেরে কাঁচা তাই খেত, আর তার চামড়া প'রত, হাড় টাড়ও সব গেঁথে মালা টালা ক'রে তাই দিয়ে সাজ্‌ত। নাইত না, মাথায় চিরুণী দিত না,—তাই চুলটুলগুলো জটা বেঁধে থাকৃত।"

"তা থাক্‌ত। তাই বলে মহাদেব কেন বুনো সাহেব হ'তে যাবেন?"

"তা ছাড়া আর কে হবেন? গায়ের রংও যে একেবারে সাদা,—ঠিক সাহেবদের মত। এদেশের লোক ত কাল।"

"তা মহাদেব ত আর এদেশের লোক নন, দেবতা। তার গায়ের রঙ সাদা হ'তে বাধা কি?"

"দেবতা হ'লে ত? তা শোনই কথাটা। সেই লোকটা ত এদেশে এল। দেশবিদেশে যাবার ঝোঁক সাহেবদের তখনও বেশ ছিল। এদেশে তখন অনার্য্য জাতির বাস ছিল বেশীই, তাদের সব রঙ একেবারে কাল, আর বড় বিকট চেহারা। কেউ গাছের পাতা জুড়ে প'রত, কেউ বা একেবারে ন্যাংটাই থাকৃত।

সাদা সেই জঙ্গলী সাহেবটা এদেশে না এসে, একদল লোক জুটিয়ে নিয়ে হিমালয় অঞ্চলের একটা পাহাড়ী জঙ্গলী দেশ দখল ক'র্ত্তে চাইল। তখন সেখানকার নবাব একটা দুর্দ্দান্ত অনার্য্য জাতির সঙ্গে তার যুদ্ধ বেধে গেল। অনার্য্যদের এক রাণী কি রাজকন্যে বেই হ'ক্—খাঁড়া হাতে ক'রে যুদ্ধ ক'র্ত্তে এল, আরও কত কাল কাল ন্যাংটা মেয়ে খাঁড়া তুলে নাচ্‌তে নাচ্‌তে তার সঙ্গে এল। একযোগ হ'য়ে হাক্ ডাক ছেড়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ তারা বাধিয়ে দিল। তাই সেই মেয়েগুলোর নাম হ'ল শেষে হাকিনী ডাকিনী যোগিনী। আর খুব কাল ব'লে তাদের সেই সর্দ্দার মেয়েটার নাম হ'ল কালী। খুব যুদ্ধ হল, কাটাকাটি রক্তারক্তি—সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। লাফাতে লাফাতে শেষে কালী গিয়ে সেই সাদা সাহেবটাকে চিৎ ক'রে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর পা চেপে দাঁড়াল। হার মেনে সাহেব তখন হাত জোড় ক'রে বল্লে, "দোহাই কাল আদমীর মেয়ে! আমায় মেরো না।

আমিও রাজার ছেলে, যদি বল তোমাকে আমি বিয়ে করব।' কালী তখন লজ্জা পেয়ে জিবে কামড় দিয়ে একটু হাস্‌ল।—তারপর তাদের বিয়ে হ'ল, রাজা আর রাণী হ'য়ে দুইজনে সেই দেশটা তারা শাসন ক'রতে লাগল। এমন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হ'ল, অমন রাজা আর অমন যোদ্ধা রাণী,—ম'রে গেলে সেই জঙ্গলী লোকেরা তাদের দেবতা ব'লে মূর্ত্তি ক'রে পূজো ক'ত্তে আরম্ভ ক'র্‌লে। এই হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যেরা শেষে পাহাড়ী সেই অনার্য্যদের কাছ থেকে এই দুই মনগড়া দেবতার পূজো শিখে নিয়েছে। তাদের কাছে খুব বড় দেবতা ব'লে তারা মহাদেব নাম তাকে দেয়। বিলেতের সেই জঙ্গলী রাজপুত্রের আসল নাম সিওয়াল্ড বা সিবাল্ড—তাই থেকে এদেশে শিবনাম হ'য়েছে।—বুঝলে দিদিমা, তোমরা যে শিবের পূজো কর, সে শিব কেমন দেবতা, আর কালীই বা কেমন দেবী ?"

ভাগীরথী হাসিয়া কহিলেন "হাঁ বুঝলাম। তোদের এই পেত্নীতত্ত্বের পণ্ডিতের ঘাড়ে কোন বিলাতী পেত্নী এসে ভর ক'রেছিল বুঝি ? নইলে দেবতা নিয়ে এমন কথাও কেউ বলে ?"

উর্ম্মি কহিল, "না—না, বাজে কথা নয় দিদিমা ! সত্যি খুব পণ্ডিত তিনি। অনেক গবেষণা ক'রে অনেক প্রমাণ দেখিয়ে—এই তত্ত্ব খাড়া ক'রেছেন। শুধু এই নয়! তোমাদের ওই যে সরস্বতী দেবতা—"

"সেও বুঝি ওই জঙ্গলী সাহেব শিবের মেয়ে ?"

"হাঁ, তাই তিনি বলেন। এই দেখনা, তোমাদের সব দেবতা হ'লুদে, লাল, কাল, নীল এই সব রঙের,—কেবল মহাদেব সাদা আর সরস্বতী সাদা।—"

"কেন, গঙ্গাও ত সাদা।"

"বটে! তাই না কি! এই ঠিক হ'য়েছে তবে! তাঁকে লিখে পাঠাতে হবে, নতুন গবেষণার একটা সূত্র পাবেন। তিনি বলেন, সেই শিব আগে তাদের দেশে একটা বিয়ে ক'রেছিল,—একটি মেয়ে হয়,—রাজা হ'য়ে শেষে সেই মেয়েটিকে এদেশে নিয়ে আসে! খুব ভালবাস্‌ত, লেখাপড়াটড়াও খুব শেখায়, গান বাজনাও শেখায়। সেই মেয়ে হ'ল তোমাদের সরস্বতী। তবে সেই মেয়ের মা যে কে, সে শেষে কি ক'র্‌ল, কি হ'ল তার, এ সব তিনি ঠিক বুঝতে পারেন নি।—তাই অনুমান ক'রে ব'লেছেন—যে সে স্ত্রী তখন ম'রে গিয়েছিল।—গঙ্গা, দুর্গা চণ্ডী, এই সব স্ত্রীকে পরে তিনি এ দেশেই বিয়ে করেন। বদ নিয়ম এদেশে বরাবরই আছে।—তা গঙ্গা যখন সাদা ব'লছ—তা হ'লে সে নিশ্চয়ই শিবের সেই আগেকার বিলাতী বউ, সরস্বতীর মা। হাঁ, ঠিক হ'য়েছে। ওঁকে লিখে পাঠাতে হবে, এই সূত্র পেলে তিনি হয়ত আরও কত তত্ত্ব বে'র কর্‌বে পারবেন।"

"এ গল্প কোথায় প'ড়লে উর্ম্মি ? কে লিখেছে ?"—

একটি যুবক পাশেই একটা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া উর্ম্মির এই কথা শুনিতেছিল।—এখন অগ্রসর হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।—

"এই যে অরু! হাঁ, শুন্‌লে ত দাদা, উর্মি কি ব'লছে তা তোদের ইংরেজিশেখা পণ্ডিতরা কি এই সব পেত্নী তত্ত্ব বইতে লেখে নাকি ?"

অরুণ—(অনিলবাবুর পুত্র) উত্তর করিল, "হাঁ, তা হরেক রকম পেত্নীতত্ত্ব লেখে বই কি। তবে এত বড় একটা পেত্নীতত্ত্ব—সেই হাজার হাজার বছর আগে বিলিতী ভূত-পেত্নীর সঙ্গে এদেশী ভূতপেত্নীদের এমন একটা আশ্চর্য্য যোগাযোগের তত্ত্ব—কই, দেখিনি ত কাউকে লিখতে এখনও লোকটার পাগলা কল্পনার লাফটা খুব লম্বা বটে। একেবারে লঙ্কা টঙ্কা সব ডিঙ্গিয়ে গিয়ে কোথায় প'ড়েছে! কে এ উর্ম্মি ?—কোন্ কাগজওয়ালা এই মৌলিক প্রবন্ধ বের ক'রেছে ?"

উর্ম্মি কহিল, "কেন আপনি পড়েন নি ? 'নবযুগ' পত্রিকায় গেল মাসে তরঙ্গবাবুর এই প্রবন্ধ বেরিয়েছে। শুনেছি মৌলিক গবেষণায় তাঁর খুব নাম আছে।"

"কই, শুনিনি ত। কে ব'লেছে ?"

"মা ব'লেছেন। তিনিই প্রবন্ধটা আমাকে পড়তে দিলেন।"

"ও!—তা কথাগুলো যা ব'লেছেন, খুব মৌলিক বই কি ? হাঁ, আর একটা কথাও তাঁকে লিখে দিতে পার! পুরাণে বলে গঙ্গা স্বর্গের থেকে নেমে এসেছেন। তা হ'লে, একেবারেই তিনি ধ'রে নিতে পারবেন, তিনি এই জঙ্গলী সাহেবের সেই হারান বিবি বউ।"

"আপনি ঠাট্টা ক'চ্ছেন—যান্!"

"তা যাই বা করি, তুমি লিখে দিওনা, দেখো, আগামী

মাসে আর একটা প্রবন্ধ বেরোবে, এই তত্ত্ব নিয়ে। আর তোমার কাছে এই রহস্যের সূত্রটা পেয়েছেন, তাও স্বীকার ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাবেন। তোমারও বড় একটা নাম বেরিয়ে যাবে।"

উর্ম্মি একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "যান—আপনি ঠাট্টা ক'চ্ছেন, আমি লিখ্‌ব না কিছু। তা আপনি কি বলেন? শিব কালীগঙ্গা এরা কারা? একেবারে মন গড়া মিছে গল্প ব'লে উড়িয়ে দিতে চান?"

"আমরা চাইলেই বা এঁরা উড়ে যান্ কই? দেশের হাজার হাজার লোকের ভক্তি পূজোর ভারে যে এঁরা দেশের মনটা প্রাণটা ভ'রে বেশ শক্ত হ'য়ে চেপেই ব'সে আছেন?"

"আপনিও কি এদের দেবতা ব'লে মানেন?"

"আমি! আমি তা মান্‌তেও শিখিনি, না মান্‌তেও শিখিনি। আর আমার মানা না মানায় এঁদের এসে যায়ই বা কি? আমি ত নগণ্য একটা লোক বৈ তো।"

"কেন, আমরাও ত মানি না।"

"তোমরাই বা কটি লোক দেশের? তোমরা কটি হাজার লোক মোটে 'না' 'না' ক'চ্ছ,—আর কোটি কোটি দেশের লোক উচ্চকণ্ঠে 'হাঁ' 'হাঁ' ব'লে এঁদের জয়জয়কার তুল্‌ছে,—নেমাচ্ছে। তোমাদের এই 'না'র মূলে শক্ত কি ভিত্তি আছে বুঝিনে,—কিন্তু এঁদের এঁদের এই 'হাঁ'র মূলে বিরাট যে ভক্তির জীব আছে—তার তল পাওয়া যায় না,—হাজার হাজার বছরের অনেক ঝা গুতোতেও তা টলেনি। ছুটা ফাঁকা গল্প বচনা ক'রে, কি ছুটো টিট্‌কারী দিয়ে তুমি আমি আজ পারো তাই টলাতে? এই ত দিদিমা আছেন, একেবারে সেকেলে বুড়ী,—লেখাপড়া কিছু শেখেননি। এই ত এত বড় একটা পণ্ডিতী গল্প ব'লে,—উনি হাস্‌ছেন। কোনও যুক্তি দিয়ে তোমার গল্প উনি কাটাতে পারবেন না? কিন্তু ওঁর ভক্তি বিশ্বাস কি একটুও এতে টলেছে?"

উর্ম্মি কহিল, "হাঁ, দিদিমা,—এই যে কথাটা শুন্‌লে—স'ত্যি ব'লে মনে হয় না! না হয় ধর সত্যি হ'তেও ত পারে।"

ভাগীরথী হাসিয়া কহিলেন, "কি তোর ওই পেত্নীর কথা! আ পোড়া কপাল! তা তুই কি ব'ল্‌ছিস্, ওই কথা শুনেছি,—আর অম্‌নি এই শিবগুলি সব পূজো না ক'রে ফেলে দেব! হি—হি—হি!"

"পূজোই বা কেন ক'র্‌বে?"

"কেন ক'র্‌ব? দেবতা—তাঁর পূজো ক'র্‌ব না! ওমা বলে কি? তোরাও দেবতা একটা মানিস্—না হয় ব্রহ্মই তাকে বলিস্,—তাঁকে পূজো ক'রিস্‌নে?"

"তা করি বই কি? তিনি হ'লেন এক সত্য দেবতা—"

"আর আমাদের শিব কালীদুর্গা এঁরা বুঝি সব মিথ্যে দেবতা? কেন, কে ব'লেছে?"

অরুণ হাসিয়া কহিল, "এইবার ঠ'কেছ উর্ম্মি? এখন কি জবাব দেব দিদিমাকে? তোমরা যে মিথ্যে বল, তার প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ কেন, এর আবার প্রমাণ লাগে নাকি? পৃথিবীর সব সভ্য উন্নত দেশের লোকে জানে ঈশ্বর এক,—তিনি ছাড়া আর কোনও দেবতা নাই। আমাদের বিবেকও বলে তিনি এক অদ্বিতীয়।"

অরুণ কহিল, "এইখানে বড় জটিল ছুটি ভুল ব'ল্লে উর্ম্মি। এটাকে প্রমাণ ধ'রে থাক, তবে প্রমাণ হবে না।"

"কেন?—কিসে ভুল ব'ল্লুম।"

অরুণ উত্তর করিল, "প্রথম সভ্য আর উন্নত দেশ কোন-গুলো,—কিসে তারা সভ্য আর উন্নত? ব'ল্‌বে ইয়োরোপ। তা, তারা পার্থিব দশটা বিষয়ে যতই সভ্য আর উন্নত হ'ক, ধর্ম্মেও যে সব চেয়ে উন্নত, এ কথা সকলে স্বীকার করেন না। হ'লেও, তারা সবাই ঠিক এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই মানে না। তার খৃষ্ট মানে আরও কত জ্যোতির্ম্ময় দেব পুরুষ মানে, যারা স্বর্গে পরম জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরকে ঘিরে তাঁর স্তুতি গান ক'চ্ছেন।

তোমরা ঈশ্বরকে যে ভাবে মান, তার সঙ্গে এর কতটা মিল আছে, ভেবে দেখ দিকি? বৌদ্ধরাও অনেক দেবতা মানে। তারপর, আজকাল যতই তোমরা অবজ্ঞা কর,—প্রাচীন হিন্দুরা সভ্যতায় বেশ উন্নত ছিলেন ব'লে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও স্বীকার করেন। তোমাদের উপাস্য ব্রহ্ম নাম তাঁদের ব্রহ্মের ধারণাও তাঁদের। ব্রহ্ম উপরের কর্ত্তা, তার নীচে তাঁর থেকেই জাত অনেক তারা মান্‌তেন। তা হ'লে দেখ, পৃথিবীর কত বেশী লোক এক ঈশ্বর ছাড়া, আরও কত দেবতা মানে।

তারপর বিবেকের কথা ব'লছ? বিবেক তোমার আছে, আবার দিদিমারও আছে। তোমার বিবেক হয় ত বলে, এক ঈশ্বর ছাড়া আর দেবতা নাই। দিদিমার বিবেক সে কথা একেবারেই মানবেনা। সে নিকুষ্ঠ হ'য়ে ব'লবে, শিব, দুর্গা, কালী, গঙ্গা,—এঁরাও সব আছেন; মানুষের ভক্তির পূজা নেন,—ভক্তকে দয়া করেন।"

ঊর্ম্মি কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কি জানি,—এ সব কথা ত আজ নতুন শুনছি,—কক্ষনো আর শুনি নি। তা আপনিও কি দিদিমার মত এই সব মেলাই দেবতা মানেন?"

"আমি! আমি ত ব'লেছি, এ সব মানতেও শিখিনি, না মানতেও শিখিনি। মনটা কোনও দিকে বাঁধা পড়ে নি,—খোলাই আছে। তবে এ সব কথা আলোচনা ক'রেছি,—তাতে এই বুঝেছি, যারা পাঁচ দেবতা মানে, তারা এমন একটা ভুল কি পাপ কিছু করে না।"

"তা হবে। কিন্তু আপনি ব'ল্লেন, মনটা কোনও দিকে বাঁধা পড়েনি, খোলা আছে। কিন্তু তা কি থাকে? একদিকে না একদিকে টানবেই একটু। তা কোন্ দিকে আপনার মন টানে?"

অরুণ একটু ভাবিয়া কহিল, "এদ্দিন ত কোনও দিকেই ঠিক টানে নি। তবে এই কদ্দিন ধ'রে দিদিমার পূজো টুজো দেখ্‌ছি,—ওঁর ভক্তি আর নিষ্ঠা আর তার প্রেরণায় হাসিমুখে যে কঠোরতা উনি করেন, তা যখন দেখি, এক একবার ইচ্ছে হয়, ওঁর মত এই রকম পূজো আমিও করি। যে বিশ্বাস আর যে ভক্তির পূজো মানুষের মনকে এমন তন্ময় ক'রে, আরাম বিরাম সুখ সব ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারে, তার ভিত্তি মিথ্যা আমি ব'ল্‌তে পারি নে।"

ঊর্ম্মি ধীরে ধীরে কহিল, "আমার ইচ্ছে করে, দিদিমার পূজো একটু দেখি। কখনও ত দেখিনি।"

অরুণ কহিল, "তা বেশ ত,—আজ শিবরাত্রি সারাদিন উপোস ক'রে আছেন,—সারারাত ব'সে শিবপূজো ক'র্‌বেন। তা থাক না? যতক্ষণ পার, দেখ্‌বে,—তারপর যাবে।"

"সর্ব্বনাশ! তা হ'লে মা যে আস্ত রাখ্‌বেন না! তাঁর কড়া হুকুম, সন্ধ্যে হ'লে আর এখানে না থাকি।"

"কেন! পাছে, দিদিমার পূজো আহ্নিক কিছু চোকে পড়ে?"

ঊর্ম্মি একটু হাসিল,—কিছু বলিল না। অরুণ কহিল, "তা মাকে ব'ল্‌ব, তিনি ব'লে পাঠাবেন, খাওয়া দাওয়া ক'রে যাবে।"

"না, ছি! মাকে ফাঁকি দেব?"

অরুণ একটু অপ্রস্তত হইয়া কহিল, "সেটা অবিশ্যি ঠিক হয় না। তবে তোমাদের মাও যে বড় একটা ফাঁকি তোমাদের দিয়ে রাখ্‌ছেন। একটা গণ্ডীর মধ্যে তোমাদের বেঁধে রেখেছেন,—নিষেধের একটা শক্ত প্রাচীর তুলে, তার বাইরে যে ধর্ম্মের কত বড় একটা বিস্তৃত বিচিত্র ক্ষেত্র র'য়েছে,—তা একেবারেই তোমাদের দেখ্‌তে দিচ্ছেন না।"

ঊর্ম্মি কহিল, "সেটা বোধহয় ঠিক। কিন্তু তা হ'লেও—তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সেটা দেখ্‌বার চেষ্টা করা বোধ হয় উচিত হবে না। কি বল দিদিমা? তোমার ভক্তির পূজো দেখ্‌তে থাক্‌ব? মা কিন্তু বারণ ক'রেছেন।"

"বারণ ক'রেছে, তবে থাক্‌বি কি ক'রে লো? তুই মেয়ে সন্তান, এখনও বে হয়নি, বাপমার অবাধ্য হ'তে আছে? আর পূজোর দেখ্‌বি কি? কোনও ঘটা ত আর হবে না? ঘরে চুপচাপ ব'সে কেবল একলাটি আমিই পূজো ক'র্‌ব। তাতে আর দেখ্‌বার কি আছে?"

"কখনও দেখিনি যে। কেমন ভক্তি ক'রে পূজো কর,—তাই একবার দেখ্‌তাম।"

"পাগলের কথা শোন। ভক্তি কি দেখাবার জিনিশ? আর ভক্তিই বা কি ছাই আমার হয়! আবার তোরা সামনে যদি ব'সিস্ সেই ভক্তি দেখ্‌বি বলে—হি—হি—হি! তা হ'লে হবে কি জানিস্? ঠাকুরের দিকে ত মন যাবে না,—কেবল এই ভাব্‌ব, ভক্তি হ'ক্ না হ'ক্—তোদের কি ক'রে দেখাব, ঠাকুরকে কত ভক্তি ক'রে পূজো কচ্চি! হি-হি-ছি! আমার পূজোই যে হবে না!—না দিদি, তুই ঘরেই যা। আমি আর কি ভক্তি দেখাব? ঠাকুর যদি দয়া করেন, ভক্তি আপনিই হবে। তোর মা বাপ যতই বেঁধে ছেঁদে রাখুক,—বাঁধন ছিঁড়ে তিনিই বের ক'রে নেবেন।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঊর্ম্মি ঘরে ফিরিয়া গেল। বড় তীব্র এই অনুভূতির বেদনা সে তার চিত্তে আজ বহিয়া নিয়া

গেল, স্বাধীনতা বা মুক্তির বহু বাগাড়ম্বরের মধ্যে কত ছোট গণ্ডীর ভিতর কি শক্ত বাঁধনে সে বাঁধা আছে!

নূতন বার্ত্তার যে নূতন সাড়া সে আজ পাইল,—এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তার দিকে মুখ ফিরাইয়া বাহিরে কোনও সন্ধান তার নিবে, তার সম্ভাবনাও সে কিছু দেখিতে পাইতেছিল না। বন্ধনটা তাই বড়ই কঠোর, বড়ই তিক্ত, বড়ই ক্লেশকর বলিয়া তার মনে হইতেছিল।

(৯)

"বাবা!"

আজ রবিবার,—যোগীন্দ্রনাথ তাঁহার বসিবার ঘরে আরাম কেদারা খানির উপরে পা ছাড়িয়া দিয়া কি একটা বই দেখিতেছিলেন। অনসূয়া উপরে নিদ্রিতা। বড় ছেলেরা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে, ছোট ছেলেমেয়েগুলি আজ ছুটি পাইয়া দিদিমার কাছে গিয়া গল্প শুনিতেছে। উর্ম্মি ধীরে ধীরে পিতার কাছে গিয়া ডাকিল—"বাবা!"

যোগীন্দ্রনাথ অলসভাবে চক্ষু ফিরাইয়া কহিলেন, "কিরে উর্ম্মি, কি? আজ রবিবার, দিদিমার কাছে যাস্‌নি যে?"

"যাব—এই খানিকটে বাদে।—ওরা গেছে। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব বাবা।"

"কি কথা রে আবার? আর কোনও নতুন তত্ত্ব কোনও কাগজে প'ড়েছিস্ নাকি?"

"না—না,—তা কিছু নয়। তবে মনে একটা কথা কদিন ভাব্‌ছি—তাই।"

"কি কথা রে? বায়োস্কোপ দেখ্‌তে যাবি নাকি? না বন্ধুদের একটা পার্টি দিবি, না দল বেঁধে কোথাও বেড়াতে যাবার মত সব ঠাউরেছিস্? না কোনও সভা ক'রে রচনা পড়্‌বি, না আবৃত্তির লড়াই ক'র্‌বি?"

"এই দেখ! বাবা যেন কি! আমরা বুঝি কেবল তাই-ই ভাবি।"

"তা কই, আর ত বড় কিছু ভাব্‌তে দেখি নে।"

উর্ম্মি গম্ভীরভাবে একটি নিশ্বাস ছাড়িল। সত্যই ত! ইহার উপরে গুরু কোনও চিন্তা কি কর্ম্ম জীবনে তাদের কি আছে? সপ্তাহে একদিন সমাজ মন্দিরে—তাও প্রত্যেক রবিবারে যাওয়া ঘটে না। সেখানেই বা কি? ঐ একটানা সুরে এক কথাই ত বাল্যাবধি শুনিতেছে! কই, তেমন কোনও গভীর ভাবে স্পন্দন কি চিন্তার উন্মেষ প্রাণে কখনও বড় উঠে না! গৃহে পিতা হাসি গল্প করেন, সস্নেহ আদরে তাহাদের যত আবদার পালন করেন,—আর মাতার ধর্ম্মশিক্ষা—সে ত কেবলই নিষেধের কড়া শাসন, কোনও কর্ম্মের দিকে সাধনার দিকে চিত্তের আনন্দময় অভিনিবেশ হয়, কই, এমন ত কোনও প্রেরণা তারা কখনও পায় নাই! উর্ম্মি আবার বড় গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কি রে, কি কথা ভাবছিস্? আর একটা বড় কাজ ত আছে—ভালবাসা আর বিয়ে। তার কিছু সম্ভাবনা ঘটেছে নাকি রে? নতুন বিলেত থেকে এবার কে কে এসেছে না? তোদের মেয়েমহলে খুব একটা সাড়া প'ড়ে গেছে বুঝি?"

"যাও! তুমি যে কি বল বাবা! ছি! তাই বুঝি তোমায় আমি ব'ল্‌তে এসেছি।"

"কি তবে ব'ল্‌তে এসেছিস্,—ব'লেই ফেল্ না শুনি।"

একখানি চৌকি টানিয়া উর্ম্মি পিতার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। একটুকাল নতমুখে থাকিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া সলজ্জ বড় মধুর একটু হাসিল, কহিল, "কদিন থেকে একটা কথা কেবলই ভাব্‌ছি বাবা——"

"কি?"

"আচ্ছা, এদেশে হিন্দুদের যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম—তা কি একেবারেই খারাপ সব?"

যোগীন্দ্রনাথ একটু বিস্মিতভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন,—তারপর হাসিয়া কহিলেন,—"আমরা ত তাই বলি।"

"কেন?"

"কেন?" যোগীন্দ্রনাথ তেমনই একটু হাসিয়া কহিলেন, "তা যে ব'ল্‌তেই হবে। নইলে—আলাদা হ'য়ে আমাদের আলাদা একটা ধর্ম্ম গ'ড়ে নেবার সার্থকতা কি থাকতে পারে?"

"এ কি একটা কথা হ'ল বাবা? তোমরা আলাদা হ'য়েছ,—ধর যদি ভুল বুঝেই হয়ে থাক, তাই ব'লে সে ভুলটা স্বীকার না ক'রে, কেবল জোর ক'রেই ব'ল্‌বে—ওটা মন্দ—ওটা মন্দ—ওটা মন্দ?"

"তা ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালে ঘরটা মন্দই কেবল ভাবতে হয়, তার মন্দটাই কেবল দেখতে হয়,—নইলে সেই বাইরে কেউ দাঁড়াতে পারে না।"

"সত্যিই যদি মন্দ না হয়? উপর উপর একটু মন্দ যাই দেখাক্, ভিতরে যদি বাস্তবিকই অনেক ভাল থাকে,—যা হয় ত আগে দেখতে পাওনি—এখন খোলা চোকে তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে—এমন যদি হয়—তবে?"

"তবে—এখন আর না দেখাই আমাদের ভাল উর্ম্মি,—ঘরে যে ফিরে যাবার যো নেই।"

বলিতে বলিতে যোগীন্দ্রনাথ সত্যই একটু গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, একটি দীর্ঘনিশ্বাসও নির্গত হইল।

উর্ম্মি কহিল, "তা—তাই ব'লে সত্য যা তা দেখবে না? সত্যকে স্বীকার ক'র্‌বে না? না হয়, ও ঘরে—তারা না নেয় নেই গেলে। কিন্তু বাইরে কি ঐ সব ভাল নিয়ে অম্‌নি ঘর আবার বাঁধা যায় না?"

যোগীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সবাই যদি দেখে—ভাল যদি থাকে আর তা দেখে—সবাই যদি তাই স্বীকার ক'রে নেয়—তবে তা হ'তেও বা পারে।"

"ভাল কিছু আছে কিনা? তোমরা ত দেখ্‌তেই চাওনা বাবা?"

"না, তা আর চাই কই? তবে আজকাল জোর ক'রেই দুই একটা চোকে এসে যেন ধাক্কা দিয়ে প'ড়ছে। তা, আমরাও তেম্‌নি ধাক্কা দিয়ে আবার ঠেলে সেগুলোকে ফেলে দিতে চেষ্টা করি।"

উর্ম্মি কহিল, "আমার বড় জান্‌তে ইচ্ছে করে বাবা, ভাল ক'রে খুঁজে সব দেখ্‌তে ইচ্ছে করে! মন্দ যা তোমরা বল, কেম মন্দ, সব খুঁতখুতি মিটিয়ে তল পর্য্যন্ত সব দেখে বুঝে তবে তাকে মন্দ বল্‌তে চাই। আর সবই যে মন্দ, তা কখনও হ'তে পারে না। ভাল যা আছে, তাও আদর করে মাথায় তুলে নিতে ইচ্ছা হয়। তুমি কি ওর ভাল মন্দ সব পরীক্ষে করে দেখছ বাবা?"

"না মা, সেটা ব'ল্‌তে পারিনি।"

"তবে ছেড়ে এলে কেন?"

"ছেড়ে যেখানে এসেছি সেটা হয়ত বেশী ভাল।"

"তাও কি তুলনা ক'রে দেখেছ? ওর সব কথা ওজন ক'রে আর এরও সব কথা ওজন ক'রে তুলনা করে দেখেছ কোন্‌টা বেশী ভাল?"

"তাই ত! এসব কথা তোর মনে কোত্থেকে এলরে পাগ্‌লী?" একটু হাসিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে যোগীন্দ্রনাথ কন্যার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

"তা——আস্‌তে কি নেই বাবা?"

"থাক্‌বে না কেন? তা তোদের মা যে শক্ত পাঁচীর তুলে রেখেছেন। কোন্ ফাঁকে এ বুদ্ধিটা এল? হুঁ—! বুঝেছি! পিসিমা বুঝি তোকে ভজাচ্ছেন? সর্ব্বনাশ ক'রেছে! তোর মা যদি টের পান—অনর্থ ঘটবে দেখ্‌ছি! একেবারে হাত পা বেঁধে কুলুপ দিয়ে ঘরে পুরে তোকে রেখে দেবেন। ওমুখো আর হ'তে পাবি না।"

উর্ম্মি বড় ভয় পাইল। কহিল, "না বাবা, মাকে ব'লো না কিছু। দোহাই তোমার। না, সত্যি ব'ল্‌ছি, দিদিমা কিছু বলেন নি। তবে দিদিমা বড় ভাল,—তিনি যে ধর্ম্ম মানেন, খুব বড় একটা ভক্তি আর বিশ্বাস তাতে তাঁর আছে, আর মনটাও তাতে বেশ ভাল আছে। ভুল কি মন্দ একটা ধর্ম্মে কি তা কখনও কারও হয়? এই ত সে দিন গেলাম, শিবরাত্তির ছিল, মেলাই মাটির শিব গড়াচ্ছিলেন——"

"হুঁ!—তারপর কি হ'ল?"

উর্ম্মি সেদিনকার সকল কথা—সে যাহা বলিয়াছিল, অরুণ যাহা কিছু বলিয়াছিল, সব সরলভাবে পিতার নিকট খুলিয়া বলিল। কথাগুলি সব তার মনে একেবারে গাঁথা ছিল।

কিছুকাল নীরবে কি ভাবিয়া যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "হুঁ! তা হলে দেখ্‌ছি, আমাদের এই গণ্ডীর বাঁধন ছাড়িয়ে যেতেই তোর মনটা একেবারে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে উর্ম্মি!"

"তোমাদেরও গণ্ডী বাবা! তোমাদেরও বাঁধন! বাঁধন ত তোমরা মান না,—মুক্তির কথা—স্বাধীনতার কথাই ত বল।"

"ওইত মজা উর্ম্মি!—বাঁধনের নিন্দে করি হিন্দুদের বাঁধন ধরে,—মুক্তির কথা বড় গলায় বলি তাদের দোষ দেখিয়ে। কিন্তু আমরা যে তাদের চেয়েও শক্ত বাঁধনে—আমাদের বেঁধে ফেল্‌ছি,—তাদের চেয়েও সঙ্কীর্ণ একটা গণ্ডী টেনে তার ভিতরেই হাবু পাবু কচ্ছি।—হিন্দুরা মূর্ত্তি গড়েও পুজো করে, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, অগ্নি যজ্ঞ ক'রে এদেরও আরাধনা করে—কেউবা যোগে ধ্যানে এক পরব্রহ্মের চিন্তাও করে—

যার যেমন মন, যার যেমন শক্তি, যার যেমন ভক্তি, সেই ভাবেই সে তার দেবতাকে ধারণা করে নেয়, তার পূজা করে। ব্যবস্থাও সব রকম আছে। আর আমরা—কোন দেবমূর্ত্তি কি দেবতার পূজা দেখে হাজার ভক্তি কেন হ'ক না, সেখানে প্রণাম ক'রবার কি অঞ্জলিটি দেবার যো নাই!—কড়া নিষেধ তাতে। কারও ভাল লাগুক কি না লাগুক, ঐ এক বাঁধা নিয়মে বাঁধা সুরে বাছা বাছা বাঁধা কয়টি কথা বলেই উপাসনা ক'র্ত্তেই হবে।"

উর্ম্মি কহিল "এই গণ্ডী ছেড়ে বাইরে যেতে যদি মন আমার উন্মুখ হ'য়ে থাকে বাবা—তা কি যেতে পাব না? গণ্ডীর মধ্যেই বেঁধে আমায় রাখ্বে?"

"বাইরে কি যেতেই চাস্—উর্ম্মি?"

"ঠিক জানিনে বাবা, তবে বাইরেটা দেখ্তে ইচ্ছে করে।—সেথায় কি আছে, বুঝে দেখতে মন বড় আকুল হ'য়ে উঠেছে। তোমার মেয়ে বাবা, আচার নিয়ম তোমার মতেই পাল্ব। কিন্তু একেবারে আড়াল ক'রে কেন রাখ্তে চাও বাবা? ওদের মধ্যে কি আছে, ওরা কি বলে, সত্যটা কি কেবল গণ্ডীর মধ্যেই বাঁধা আছে না বাইরেও অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে,—এসব জান্তে কি দোষ বাবা?"

"দোষ—আমি কিছুই বলিনে।—তবে তোমার মা সেটা ইচ্ছে ক'র্বেন না।"

"সেটা—না করা কি ঠিক বাবা? আমি শিখ্তে চাই,—জান্তে চাই—দেখ্তে চাই!—তুমি যদি বল বাবা—ওদের বই টই আমি পড়ব। যারা জানে—এমন কাউকে পেলেও তার কাছে শিখ্ব। মা যদি তাড়না করেন—কিছু ব'লব না বাবা, ঝগড়া ঝাটি ক'র্বনা—চুপ করে সব স'য়ে থাক্ব, কিন্তু তবু—এসব একটু দেখ্তে শুন্তে আর শিখ্তে চাই বাবা। মানুষের জ্ঞান কি একটা বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে জোর ক'রে কারও ধ'রে রাখ্তে চাওয়া উচিত?"

"মোটেই না।—কিন্তু দেখে শুনে প'ড়ে—মন যদি এই গণ্ডীর বাইরেই একেবারে টানে, তখন কি হবে উর্ম্মি? কি ক'র্বি?"

"জানি না বাবা,—সে সমস্যার সিদ্ধান্ত তখনই হবে। তবে দিদিমা সেদিন ব'ল্ছিলেন ঠাকুর যদি দয়া করেন, ভক্তি পূজা চান, মন টেনে তিনি নেবেন, কেউ ধ'রে রাখ্তে পার্বে না।"

"ঠাকুর কি কেবল বাইরেই আছেন উর্ম্মি? গণ্ডীর মধ্যে কি তাঁকে পাওয়া যাবে না?"

উর্ম্মি হাসিয়া কহিল, "তা কি আর ছেড়ে যেতে তিনি পারেন বাবা?—তবে বাইরের কি ভিতরের—যদি টানেন—কোন্ ভাবের টানে আমাকে টান্বেন,—কে তা আজ বল্তে পারে বাবা?"

(৫)

অনসূয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কন্যার শাসন ও তাড়ন আরম্ভ করিলেন,—স্বামী যে সত্যই এ হেন পাপপ্রবৃত্তিতে কন্যাকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, একথা তিনি প্রত্যয়ই করিতে প্রথমে পারিলেন না। স্বামী যখন নিজেই অভিযোগ স্বীকার করিয়া নিলেন,—পরন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হইয়া বরং ইহা যে কোনও অপরাধই হয় নাই, এইরূপ দৃঢ় মত প্রকাশ করিলেন,—তখন একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া তিনি গেলেন!

কতকাল এইরূপ স্তব্ধ ও নির্ব্বাক্ থাকিয়া অতি গম্ভীর ভাবে অনসূয়া প্রশ্ন করিলেন,—"তা হ'লে কি বুঝ্তে হবে, তুমি পৌত্তলিকতার কুসংস্কারেই আবার আত্মদান ক'চ্ছ,—আলোক ছেড়ে বর্ব্বরতার পাপময় দুর্গন্ধ অন্ধকারে নিমগ্ন হ'চ্ছো।"

যোগীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "না, এখন ত সে রকম কিছুই মনে ক'র্ত্তে হবে না অনু।"

"তা হ'লে উর্ম্মিমালাকে এই পাপপ্রবৃত্তিতে অনুমোদন দেবার অর্থ কি?"

"জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসাকে পাপ প্রবৃত্তি বলা যায় না অনু। তার পর উর্ম্মি এখন বড় হয়েছে—এ সব বিষয়ে তার স্বাধীন অধিকারে আমাদের হস্তক্ষেপ করাটাও উচিত হবে না।"

"অবশ্য হবে!—স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিতে আমি প্রস্তুত নই!"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন,—স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচার—এ দুটো কথায় যাই বোঝাক, তাদের পার্থক্যটার মধ্যে ঠিক করে একটি রেখা টেনে দেওয়া বড় সহজ নয় অনু।—কোথায় যে রেখাটি পড়বে, তা নিয়ে বোধ হয় দুটী লোক এক মত হবে না।"

"বিবেক মান্‌লে অবাধ্য হতে হবে।"

"বিবেক তুমিও মান—আমিও মানি। কিন্তু এক মত ত হ'তে পাচ্চি না। তুমি যেটাকে স্বেচ্ছাচার ব'লে গাল দিচ্ছ—আমি সেটাকে উর্ম্মির স্বাধীন অধিকার ব'লে অনুমোদন কচ্চি।"

"মিথ্যা কথা! তা ক'র্ত্তে পার না। হয় ভুল বুঝছ, না হয় মিছে একটা জিদ কচ্ছ, মেয়ের আবদার রাখবার জন্যে।"

"না, সে রকম কোনও জিদ আমার নেই। তবে ভুল তুমি বুঝছ কি আমি বুঝ ছি—সেটা কে বিচার ক'রে বলে দেবে অনু?"

অনসূয়া টেবিলের উপরে তাহার কোমলহস্তে বড় কঠোর একটা আঘাত করিয়া কহিলেন,—"এর আচার বিচার কি? পৌত্তলিকতার পক্ষে আবার বিচার! ছিক! ব্রাহ্ম হ'য়ে এ কথা ব'ল্‌তে তোমার একটু লজ্জা হ'ল না?"

"ব্রাহ্ম হ'য়ে কারও স্বাধীনতার এতটা বিরোধ করাই বরং লজ্জার কথা।"

"স্বাধীনতা নয়!—স্বাধীনতা নয় এটা! (টেবিলে প্রচণ্ড করাঘাত)—স্বেচ্ছাচার—পাপের প্রবৃত্তিতে ঘোরতর স্বেচ্ছাচার!—আমি ব'ল্‌ছি মিষ্টার মুখার্জ্জি, এর প্রশ্রয় আমি কখনও দিতে পারব না!—ঐ বুড়ীকে যখনই নিয়ে এসেছ, তখনই জানি, এই রকম একটা সর্ব্বনাশ না হ'য়ে যাবে না।—সাধে আমি এত আপত্তি ক'রেছিলাম?—তা আমি ব'ল্‌ছি, তুমি নিজে বাইরে যা খুসী ক'র্ত্তে পার, ঘরে এ সব অনাচারের প্রশ্রয় আমি কক্ষনো দেব না। কড়া ভাবে আমি শাসন করব। আমার নিষেধ—উর্ম্মি কি ছেলেপিলেরা কেউ আর ও বাড়ীতে যেতে পার্‌বে না!"

এই বলিয়া অনসূয়া—উঠিয়া পদভরে গৃহতল কম্পিত করতঃ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

(৬)

গৃহে যারপর নাই অশান্তির সৃষ্টি হইল। যোগীন্দ্রনাথ একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। উর্ম্মি কিম্বা ছেলেপিলেরা কেহ ও বাড়ীতে ভাগীরথীর কাছে যাইত না। কিন্তু ঘরে উর্ম্মি তার এই নবজাগ্রত তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তির জন্য যে কোনও পুস্তক প্রয়োজন হইত, পড়িত। যোগীন্দ্রনাথ নিজে এ সব গ্রন্থের খোঁজ বড় রাখিতেন না। কন্যার ইচ্ছাক্রমে অরুণের কাছে গিয়া পুস্তক চাহিয়া আনিতেন,—তার কাছে না থাকিলে, নাম জানিয়া কিনিয়া আনিতেন। অনসূয়া স্বামী ও কন্যা উভয়কেই অবিরত সমান শাসন ও তাড়না করিতেন। উর্ম্মি পণ করিয়াছিল,—ধীরভাবে সবই সহিত। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

একদিন—সেদিনও রবিবার—দুপুরে পিতার বসিবার ঘরের এক পাশে বসিয়া উর্ম্মি একখানি ভাগবত পুরাণ পড়িতেছিল। যোগীন্দ্রনাথও তাঁহার আরাম কেদারা—খানির উপরে অর্দ্ধশয়িত হইয়া বেদান্ত সম্বন্ধীয় ইংরেজি একখানি গ্রন্থ দেখিতেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থে যেন তেমন মনঃসংযোগ হইতেছিল না,—ঘন ঘন মুখ ফিরাইয়া উর্ম্মির দিকে চাহিতেছিলেন। উপরে ছেলেপিলেরা ছুটাছুটি ও গোলমাল করিতেছিল,—কিন্তু অনসূয়ার কোন সাড়া কিছুক্ষণ আর পাওয়া যাইতেছে না। যোগীন্দ্রনাথ বুঝিলেন, তিনি মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সম্ভোগ করিতেছেন। তখন উঠিয়া গিয়া উর্ম্মির কাছে একখানি চৌকি টানিয়া নিয়া বসিলেন।

"কি বাবা?"

"একটা কথা তোকে আজ ব'ল্‌তে হবে উর্ম্মি!"

"কি বাবা? কি কথা?"

"ঘরে এই অশান্তি ত আর সহ্য ক'র্ত্তে পাচ্চিনে উর্ম্মি!"

"হাঁ, তুমি বড় দুঃখ পাচ্চ বাবা। যদি বল, দিদিমার কাছে ত যাই-ই না,—তা যদি বল, এ সব বইও না হয় আর প'ড়্‌ব না।"

ছল ছল চক্ষু দুটি তুলিয়া উর্ম্মি পিতার মুখপানে চাহিল।

"না মা, সে কখনও হ'তে পারে না। পিতা হ'য়ে তোর জ্ঞানের পথে ধর্ম্মের পথে এমন অস্বাভাবিক একটা অন্যায় বাধা আন্‌তে পারব না,—কাউকে আন্‌তে দিতেও পারব না। তবে অবিরত এই লাঞ্ছনা থেকে তোর নিষ্কৃতি যাতে হয়, তার একটা উপায় আমি ক'রেছি।"

"সে কি! কি-বাবা?"

"এ ঘরে এই অত্যাচার এই পীড়নের মধ্যে আর তোকে আমি রাখ্‌তে পারি না। প্রতিকারের কোনও হাত আমার নাই।—তাই মনে করেছি, এমন ঘরে এমন হৃদয়বান্ উদার পাত্রের হাতে তোকে দেব, যে স্বাধীনভাবে

ধর্ম্মের আর জ্ঞানের অনুসন্ধানে তোর সহায় হবে, বাধা কিছু দেবে না।”

উর্ম্মির মুখখানি লাল হইয়া উঠিল,—একটু ফিরিয়া পুস্তকখানির উপরে সে ঝুঁকিয়া পড়িল।—যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, “জানাশুনো কোনও ব্রাহ্ম পরিবারে এমন ছেলে দেখতে পাচ্ছি না। আমি অনিলকে ব’লেছিলাম—সে তোকে ঘরে নিতে প্রস্তুত। অরুণও প্রস্তুত।”

উর্ম্মি আরও নত হইয়া সেই পুস্তক খানির পাত খুঁলিতে লাগিল। কিছু বলিল না।

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, “তা কি বলিস্ মা?”

উর্ম্মি নতমুখে মৃদু অথচ ধীর দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, “না বাবা, সে হ’তে পারে না।

“কেন,—কেন হ’তে পারে না মা? অরুণ অমন ভাল ছেলে, আর আমার মনে হয়, তার উপরে তোর মনও কিছু আকৃষ্ট হ’য়েছে।”

“হাঁ, তাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি।—”

“খুবই শ্রদ্ধা করিস্। আর এও ব’লতে হবে,—নূতন এই আলো-মুক্তির এই মন্ত্র—হাঁ,—তাই আমি একে ব’লব—তার কাছেই তুই পেয়েছিস্।”

“তাও—ঠিক।”

“তবে?—কেন তবে তার সঙ্গে বিয়ে হ’তে পারে না?”

উর্ম্মি একটু নীরবে থাকিয়া কহিল, “বাবা, তুমি—তা কি ক’রে দেবে?—এক সমাজে তুমি আছ, তার নিয়ম লঙ্ঘন কি ক’রে তুমি ক’রবে?”

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, “সেটা আমার কথা উর্ম্মি। তোকে তা ভাবতে হবে না। মুক্তির ধারা সামলে, আমার জাত যাবে না। সে সমাজ যে কোনও ব্যক্তিকে তার মধ্যে গ্রহণ ক’র্ত্তে পারে,—সে সমাজ কাউকে একেবারে ত্যাগ ক’র্ত্তে পারে না,—আজ করলেও কাল আবার গ্রহণ ক’র্ত্তেই হবে।”

উর্ম্মি আরও একটু ভাবিল,—ভাবিয়া কহিল, “তুমি পারলেও আমি যে পারিনে বাবা।”

“কেন মা? বাধা কি?”

উর্ম্মি উত্তর করিল, “নিজের মন যে নিজে এখনও বুঝতে পারিনি বাবা! নূতন একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে,—নূতন তত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা কচ্ছি।—কিন্তু তোমার মেয়ে আমি, তোমার ঘরে এত বড় হয়েছি, কে জানে, এতদিনের এই সংস্কার-তা যদি না ব’দলে যায়? নূতনটা যদি গ্রহণ নাই ক’র্ত্তে পারি?—আমাকে নিয়ে তাঁদের হয়ত বড় অশান্তি হবে। আজ তাঁরা আমার ক্লেশ দেখে দয়া ক’রে আমায় আশ্রয় দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু হঠাৎ না বুঝে—ভবিষ্যতে তাঁদের ভালমন্দ সুখশান্তির কথা কিছুই না ভেবে, এ আশ্রয় নেওয়া কি উচিত হবে বাবা?”—

“তা হ’লে”—

“এখন থাক্ বাবা,—থাক্ আরও কিছুদিন। নিজের মনটা ভাল ক’রে বুঝে নিই,—মনের গতিটা কোন্ দিকে, যায় দেখি। যদি বুঝি, তাঁদের সুখী ক’র্ত্তে পারব, কোনও বিরোধ হবে না,—তখন যদি তাঁরা চান, আর তুমি বল, বেশ তাঁদের ঘরেই যাব। কিন্তু এখন পারচ না বাবা। তবে—তোমার বড় অশান্তি হ’চ্চে। কিন্তু কি করবে বাবা?—আমি যে তোমার মেয়ে, তাই বলে কি আমায় পরের ঘরে বিলিয়ে দেবে, তারা দয়া ক’রে নিতে চাচ্চে তাই?—না বাবা, তা দিও না, শরীরে কঠিন ব্যামো হলেও তা সইতে হয়,—তেমনি আরও কিছুদিন আমায় স’য়ে নেও বাবা।”

বলিতে বলিতে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি উর্ম্মি পিতার স্নেহের বক্ষে রাখিল। পিতা কহিলেন, ছি! অমন কথা ব’লতে আছে উর্ম্মি? ব্যামোর মত তোকে সইব!—তুই যে আমার বড় আনন্দ—বড় গৌরব। এই আঁধারে আলো—এইরূপ দুঃখে আমার মুক্তির আশা তুই?”

(সম্পূর্ণ)

সোনার সাপ

ফণা তুলে থাকে ফোঁস্ করে না ক
নাই বিষ, বিষদন্ত রে,
জড়ি বড়ি তোর কাজ কিরে ভাই
কাজ কি ঝাঁপান মন্তরে ?

ভেবেছ কি তুমি ধরবে ধরণী
এ নাগ কখনো মস্তকে,
জড়ায়ে যাইবে শিবের জটায়
বেষ্টন করি হস্তকে ?

ভেবেছ লাগিবে ওকি কোনো দিন
ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে,
পেতে দেবে ওকি সহস্র শির
হরির শয়ন গ্রন্থনে ?

জন্মেজয়ের সে নাগ-যজ্ঞে
এরে নিতে জোর করবে না
ভুলেও মালেরা কাছেতে পেলেও
ঘৃণায় ইহাতে ধরবে না।

সত্যই ওটা কুঁচের চক্ষু
ফণা গড়া ওর অভ্যন্তরে (অভ্রে)
আহ্লাদে যায় প্রহ্লাদ খেতে
বাধা দেয় যত বর্ব্বরে।

ক্ষণিকের সুখ পেতে দাও ওরে
দংশিয়া যাক্ হরদমে,
দুদিনের পর পচিবে পড়িয়া
আস্তাকুঁড়ের কর্দ্দমে।

কলমবীর

দাম চড়িল কেন ?

ধনী নির্ধন সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই একটা প্রধান প্রসঙ্গের বিষয় হইয়াছে, জিনিশপত্রের—বিশেষ খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতা। সকলেই বলিতেছেন," "একি হইল ? লড়াই থামিয়া গেলে দ্রব্যাদির মূল্য কোথায় সুলভ হইবে, তাহার পরিবর্ত্তে যে আরও চড়িল ও চড়িতেছে। এখন লোকের উপায় কি হইবে ?" বাস্তবিক ব্যাপারটাও বড় গুরুতর দাঁড়াইয়াছে। দেশের প্রধান খাদ্য চাউলের মূল্য ৮৲১০৲ টাকা মণে উঠিয়াছে, ডাইলের দাম দ্বিগুণের উপরে উঠিয়াছে, তৈলের মূল্য সের প্রতি প্রায় এক টাকায় দাঁড়াইয়াছে, চিনির দাম আট আনা সেরে উঠিয়াছে এবং চলন সই মিলের কাপড় গবর্ণমেণ্টের নানা ব্যবস্থাসত্ত্বেও ছয়টাকার কমে জোড়া মিলিতেছে না! প্রায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের বেলায়ই এইরূপ ঘটিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের যে বিশেষ কষ্টের কারণ ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

এখন উপায় কি ? সাধারণকে ত খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে হইবে! কিন্তু এই মহার্ঘ্যতা নিবারণের উপায় চিন্তনের পূর্ব্বে ইহার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। যখন যুদ্ধের সময় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়াছিল, তখন এক শ্রেণীর লোকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে যুদ্ধ থামিয়া গেলেই দ্রব্যাদির মূল্য প্রায় যুদ্ধের পূর্ব্বসময়ের ন্যায় হইবে। যখন যুদ্ধ থামিয়া গেল, তখন ইহারা সকলেই বলিলেন, এইবার সস্তার বাজার আসিবে। তখন এই মতের সমালোচনা উপলক্ষে আমি লড়াই থামিবার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছিলাম যে মূল্য থামা দূরের কথা, মূল্য আরও বাড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।* ঐ প্রবন্ধে আমি কেবল ভারতবর্ষের কথাই আলোচনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কোন কোন বিশেষ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য উৎপাদিত পরিমাণের অল্পতানিবন্ধন ঘটিতে পারে এবং ঐ ঐ দ্রব্যের এবং কিয়ৎ পরিমাণে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির উহা একটী

* "যুদ্ধ শেষে ভারতের আর্থিক অবস্থা" মানসী—পৌষ ১৩২৫।

প্রধান কারণ একথা স্বীকার করি; কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এই মহা দুর্মূল্যতার কারণ কেবল ভারতবর্ষের অনাবৃষ্টির ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে চলিবে না। এই মহার্ঘ্যতার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পূর্ব্বে কয়েকটি প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে ভারতে যুদ্ধের পূর্ব্বের সময়ের তুলনায় কাগজ ও রৌপ্য মুদ্রার কিরূপ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই বর্দ্ধিত মুদ্রা দেশে কিরূপভাবে আছে এবং উহাতে দেশে কিরূপ "ধনবৃদ্ধি" ঘটিয়াছে, তাহাও আলোচনা করিয়াছি। কাগজের এবং রৌপ্যের মুদ্রাই যদি দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিতে পারিত, তাহা হইলে বর্ত্তমানে আমাদের সম্পদের অভাব ছিল না। কিন্তু মুদ্রা অন্নবস্ত্র নহে, উহা অন্ন ও বস্ত্র পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইবার মধ্যবর্ত্তী মাত্র। এই মধ্যবর্ত্তীর বৃদ্ধির সহিত যদি অন্নবস্ত্রের পরিমাণ কমিয়া যায়, কিম্বা সমানও থাকে, তাহা হইলে বিনিময়ের বলে পূর্ব্ব তুলনায় অধিক মুদ্রায় অল্প অন্নবস্ত্র মিলিবে, অর্থাৎ মূল্য অধিক হইবে। সুতরাং দেশে যে মূল্য বৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি, মুদ্রাবৃদ্ধিই যে উহার একটী প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের খরচ যোগাইবার জন্য এবং আরও কোন কোন কারণে কাগজের নোট এবং ঐ নোটের পশ্চাতে আবশ্যকীয় মূল দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা গবর্ণমেণ্টকে নূতন সৃষ্টি করিতে হইয়াছে এবং উহার অধিকাংশ দেশের মধ্যে সঞ্চালিত হইতেছে একথা সাধারণের অবিদিত নাই। কোন আকারের কি পরিমাণ মুদ্রা কতদিনে নূতন সৃষ্ট হইয়াছে তাহার তালিকা দিয়া প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহ করিবার আবশ্যকতা এখানে নাই।

যে অতিরিক্ত অর্থের কথা বলিলাম, যুদ্ধের সময় যাহারা যুদ্ধ সম্পর্কীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, উহার অধিকাংশ তাহাদের হাতেই পড়িয়াছিল; এখন উহা ক্রমশঃই সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং সর্ব্বসাধারণের হাতে অধিক পরিমাণ অর্থ থাকায় মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। হাতে অধিক অর্থ থাকিলে অধিক দামে দ্রব্য খরিদে কষ্ট নাই, সুতরাং দেশের অর্থাধিক্য নিবন্ধন যাহাদের হস্তে অধিক অর্থ জমিয়াছে বা জমিতেছে, মূল্যবৃদ্ধির জন্য তাহাদের কোন প্রকার বিশেষ কষ্ট হইয়াছে একথা মনে করিবার হেতু নাই। কষ্ট হইয়াছে নির্দ্দিষ্ট আয়ভোগীদের অর্থাৎ দেশের মুদ্রাবৃদ্ধির সহিত যাহাদের আয় বাড়ে নাই, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট আয়ভোগী অর্থাৎ "চাকুরে" ভিন্নও যুদ্ধের জন্য এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর অতিশয় লোকসান হইয়াছে এবং হইতেছে, কিম্বা লাভ হয় নাই এবং হইতেছে না। এই শ্রেণীর লোকেরও বিশেষ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই গেল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের কথা। কিন্তু ভারতে কৃষিজীবীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ হইতে ৭৫ জন কৃষিকার্য্যের কিংবা স্ব স্ব জমিতে কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করে, সুতরাং এই মূল্যবৃদ্ধিতে ইহাদের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার।

আমি ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী প্রবন্ধে বলিয়াছি যে কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য যুদ্ধের সময় অতিশয় কমিয়া যাওয়ায় কৃষক শ্রেণীর লোকের কিরূপে কষ্ট ঘটিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের কিছুদিন পরে পাট প্রভৃতি কাঁচামালের মূল্য নানা কারণে একেবারে কমিয়া যায় এবং ধান্য প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও সস্তা হইয়া পড়ে। এরূপ হইবার কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ফলস্বরূপ কৃষিজীবিদিগের অতিশয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় এবং কাপড় লবণ প্রভৃতি বিদেশী দ্রব্যের মূল্য অতিশয় চড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের এই দুরবস্থা তীব্রতর হইয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট তখন ইহাদিগকে কোনরূপ আশ্রয় দিতে পারেন না। এখনও পাট প্রভৃতি কাঁচামালের দাম আশানুরূপ বৃদ্ধি হইতে পারিতেছে না। তাহার কারণ কতকগুলি কৃত্রিম এবং কয়েকটা অনিবার্য্য ঘটনা ইহাদের মূল্য চাপিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু খাদ্যশস্যের সম্বন্ধে উক্ত ঘটনাগুলি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। এজন্য স্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ মুদ্রাবৃদ্ধির inflation of currencyর সহিত ও অন্যান্য কারণে ইহাদের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, যাহারা খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিতেছে অর্থাৎ কৃষিজীবিগণ তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য যথেষ্ট মূল্য পাইতেছে। সুতরাং এই মূল্য বৃদ্ধিতে ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০।৭৫ জনের হাতে অধিকতর অর্থ আসিতেছে। ইহার ফলে কাপড় লবণ প্রভৃতি বিদেশী কিংবা স্বদেশী দ্রব্য অধিকতর মূল্যে খরিদ করিতে ইহাদের বিশেষ কষ্ট হইতেছে না, এবং জমির খাজনা পরিশোধ করিবার পক্ষেও ইহাদের বিশেষ

সুবিধা হইয়াছে। আর যে শ্রেণীর লোকের হাতে নূতন সৃষ্ট মুদ্রার অধিকাংশ জমিয়া গিয়াছে এবং জমিতেছে, তাহাদের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং যে খাদ্য দ্রব্য দেশে উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য বাড়িলেই যে অবিমিশ্র অনিষ্টের কারণ ঘটে, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই। এই মূল্য বৃদ্ধিকে অনেক সময় দেশের সুখসমৃদ্ধির নিদর্শন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে এই মূল্যবৃদ্ধির সহিত অপরাপর উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। কুলি এবং শ্রমজীবিগণের মজুরী বাড়িয়া যায় এবং নির্দ্দিষ্ট আয়ভোগী-দিগের বিশেষ দুর্দ্দশার কারণ ঘটিলেও অধিকতর অর্থ দেশে সঞ্চালিত হইতে থাকায় দেশের অধিকাংশ লোকের হাতে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা অধিকতর মূল্যে দ্রব্য খরিদ করিতে সক্ষম হয়। এদেশে বর্ত্তমানে এই মূল্যবৃদ্ধিতে এই জন্যই অধিকাংশ খাদ্য উৎপাদনকারীদিগের এবং বিশেষ এক শ্রেণীর কোনও অসুবিধা হয় নাই। মোটের উপর কৃষক শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় উকিল, ডাক্তার, মহাজন, জমিদার প্রভৃতির হাতে অধিকতর অর্থাগম হইতেছে, সুতরাং ইহাদিগেরও বিশেষ কোনও অভিযোগের কারণ হয় নাই। কেবল মারা পড়িতে বসিয়াছে নির্দ্দিষ্ট বেতন ভোগী কর্ম্মচারীগণ এবং এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী। দেশের অর্থবৃদ্ধির সহিত এই শ্রেণীর লোকের আয়বৃদ্ধি হইতে অনেক সময় লাগে, সুতরাং ইহাদের আয় হঠাৎ বাড়িবে না। কাজেই ইহাদের দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। কিন্তু মোটের উপর এই অবস্থা ঠিক হইলেও একটা বিশেষ কথা বলিবার আছে। গত বৎসর দেশে খাদ্য শস্য অনেক পরিমাণে কম জন্মিয়াছে, এজন্য অনেক কৃষকের ঘরে নিজের আবশ্যকীয় পরিমাণ শস্যের সংস্থান নাই। ইহা-দিগকে অনেক অধিক মূল্যে বাকি খাদ্য খরিদ করিতে হইতেছে। সেইজন্য কৃষকদিগের মধ্যেও সকলে মূল্যবৃদ্ধির সুবিধা পাইতেছে না. এই শ্রেণীর অনেক লোকেরও কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

আর একটী কথা এখানে বলিয়া রাখা দরকার। মুদ্রা-বৃদ্ধি হইলেই মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য্য একথা সত্য হইলেও, যদি এই মুদ্রাবৃদ্ধি শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য করা হয়, কিম্বা ঐ বর্দ্ধিত মূল্য ঐ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে অধিকতর মুদ্রার সাহায্যে অধিকতর দ্রব্য উৎপাদিত হইতে থাকে। সে স্থলে মূল্যবৃদ্ধি একেবারে বন্ধ না হইলেও এই বৃদ্ধি অতিশয় সংযত থাকে এবং ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইতে থাকায়, মূল্য অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া যায়। তখন নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগীদিগের অসুবিধাও অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। সুতরাং বর্ত্তমানে মূল্য কমাইতে হইলে দেশের এই নূতন সৃষ্ট সুমুদ্রার অধিকাংশ শিল্প ও কৃষিতে নিয়োজিত করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক পরিমাণে ইহা হইয়া থাকে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় ভারতে ব্যবসা করিয়া ইংলণ্ডে যে অতিরিক্ত অর্থাগম হইয়াছিল, তাহা ইংলণ্ডের শিল্পে নিয়োজিত হইয়া ইংলণ্ডের শিল্পপ্রাধান্যের ভিত্তিস্থাপন করে। কিন্তু ভারতের কথা স্বতন্ত্র; নানা কারণে এদেশে এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে খাটিবে না। তবে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে, এই অতিরিক্ত অর্থের উক্ত প্রকারের ব্যবহারে সাহায্য করিয়া লোকের দুর্দ্দশার অনেক পরিমাণে লাঘব করিতে পারেন। কি জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন ইহা হইবে না এবং কি ভাবে গবর্ণমেণ্ট এই সাহায্য করিতে পারেন, তাহার আলোচনা এ প্রবন্ধে চলিতে পারে না।

এখন যাহা বলিতেছিলাম। মূল্যবৃদ্ধির এক প্রধান কারণের কথা উপরে বলিয়াছি, কিন্তু একথা প্রারম্ভেই বলিয়াছি, দ্রব্য উৎপাদনের অভাবও এই মূল্যবৃদ্ধির আর একটী বিশেষ কারণ। গত ৪।৫ বৎসরের মহাযুদ্ধে ১০।১২ কোটী লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহারা পৃথিবীর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিগণের মধ্যেও বিশেষভাবে শক্তিসামর্থ সম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে একজনও অক্ষম কিম্বা অপরের পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল না। ইঁহারা গত ৪।৫ বৎসর ধরিয়া কেবল পরস্পরকে এবং সঞ্চিত ধনসম্পদ ধ্বংস করিয়াছে। সমাজের জন্য আবশ্যকীয় কোন দ্রব্য ইহারা উৎপাদন ত করেই নাই, পরন্তু যাহারা যুদ্ধে যায় নাই, তাহাদের মধ্যে অনেককে ইহাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করিতে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। ফলতঃ যুদ্ধে ব্যাপৃত সমস্ত দেশেই যাহারা শান্তির সময় খাদ্য এবং সমাজের আবশ্যকীয় অপরাপর দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিত, তাহারা সে সকল কার্য্য বন্ধ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে কেবল যুদ্ধের সরঞ্জাম। দেশের শিল্পিবর্গ তাহাদের কারখানায় সমাজের আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে গুলি, গোলা ও যুদ্ধের

অস্ত্রাদি। আবার দেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইতেই এই ধনসম্পত্তি ধ্বংসকারী এবং মনুষ্য-সংহারকারী সৈনিকদিগের আহার যোগাইতে হইয়াছে। স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য যাহারা শান্তির সময় অপরাপর কার্য্য করিত কিম্বা কিছুই করিত না, তাহাদিগকে কাজে লাগাইয়া এই ক্ষতির কিছু পরিপূরণ করা হইয়া থাকিলেও, এই যুদ্ধে পৃথিবীর যে মহা আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পরিপূরণ হইতে পারে না। একদিকে আবশ্যকীয় দ্রব্য যেরূপ অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছে, অপর দিকে উৎপাদিত এবং প্রস্তুত দ্রব্যও সেইরূপ ভীষণ ভাবে ধ্বংস হইয়াছে। জলে বহুসংখ্যক জাহাজ ডুবিয়াছে, তাহার সহিত ভূরি ভূরি বাণিজ্যদ্রব্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। স্থলে যে কত পরিমাণ নানা প্রকারের সম্পদ নষ্ট হইয়াছে, তাহার হিসাব করা অসম্ভব। সহস্র সহস্র গ্রাম একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, শত শত সহর ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে মনুষ্য-সমাজের আবশ্যকীয় দ্রব্য যে কত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বোপরি লক্ষ লক্ষ মনুষ্যজীবন নষ্ট হইয়াছে এবং অসংখ্য জীবন চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পৃথিবীর শ্রমশক্তির অতিশয় লাঘব হইয়াছে। ফলতঃ এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে নূতন দ্রব্যের উৎপাদন যেরূপ একদিকে বিশেষভাবে কমিয়াছে, অপর দিকে পূর্ব্বে উৎপাদিত দ্রব্যের ধ্বংসসাধনও সেইরূপ ভীষণ ভাবে ঘটিয়াছে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে বর্ত্তমানে অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্যের অতিশয় অল্পতা ঘটিয়াছে এবং সে জন্য উহাদের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। ধ্বংসপ্রায় শিল্প-প্রধান ইউরোপকে তাহার এই ক্ষতি পূরণ করিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে অনেক সময় লাগিবে। যদিও ধ্বংসের পর স্বাভাবিক নিয়মে পুনর্গঠন দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে, তথাপি ইউরোপ যে ৪।৫ বৎসরের কমে আবার পূর্ব্বাবস্থায় আসিতে পারিবে তাহা, পাশ্চাত্যদেশের কর্ম্মশীলতার কথা মনে রাখিয়াও, জোর করিয়া বলিতে পারি না। সুতরাং যাহারা যুদ্ধ শেষ হইলেই দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বাবস্থায় আসিবে মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুমান ঠিক হয় নাই। এই যুদ্ধ উপলক্ষে মজুরী এবং দৈনিক পরিশ্রমের হার বাড়িয়া গিয়াছে। শিল্পির বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে। একবার বাড়িলে ইহা আর কমেনা, সুতরাং যখন ইউরোপের এই যুদ্ধের ফলে প্রায় সমস্ত জগতে শান্তির পরে পুনর্গঠিত হইবে তখন দ্রব্যের মূল্য একেবারে পূর্ব্বের স্তরে নামিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য ইহারও অন্যতম কারণ মুদ্রাধিক্য। যুদ্ধে ব্যাপৃত সমস্ত দেশকেই যুদ্ধের খরচের জন্য প্রচুর পরিমাণে কাগজ এবং ধাতুর মুদ্রার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। সুতরাং মুদ্রার অনুপাতে দ্রব্যের অল্পতা বর্ত্তমান মূল্য বৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির একটী কারণ উৎপন্ন শস্যের অল্পতা। কৃষিজীবিদিগের মোটের উপর মূল্য বৃদ্ধিতে উপকার হইলেও এই কারণে ভারতের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। যাহাদের যথেষ্ট বিক্রয় করিবার আছে, তাহাদিগের সুবিধা হইলেও যাহাদের অভাবের জন্য কিছুই নাই কিম্বা সামান্য আছে, তাহাদিগের অধিক মূল্যে কিনিবার সামর্থ না থাকায় দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। অনাবৃষ্টি হইলেই ভারতে দুর্ভিক্ষ এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী। গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে দেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি ঘটে। তাহাতে কৃষিকার্য্যের অতিশয় ক্ষতি হয়। বাংলা দেশে ৭টী জেলায় অন্যান্য বৎসরের সহিত তুলনায় শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ বৃষ্টি হয়। ৮টী জেলায় শতকরা ৬১ হইতে ৭৭ ভাগ বৃষ্টিপাত হয় এবং ৯টী জেলায় শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ মাত্র বৃষ্টি পাওয়া যায়। মোটের উপর বঙ্গদেশে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় শতকরা ৭৭ ভাগ মাত্র বৃষ্টি হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বাঁকুড়া জেলার সদর উপবিভাগে এই কারণে অধিক হানি ঘটে। এই স্থানে সাধারণ অবস্থার সহিত তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ শস্য জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। আবার অতি বর্ষায় বগুড়া এবং রাজসাহী জেলার অনেকস্থলে ফসল নষ্ট হইয়া যায়। ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবেড়িয়ার উপবিভাগেও উক্ত কারণে ফসলের অতিশয় ক্ষতি হয়। দেশে এরূপ অবস্থায় মোটের উপর যে ফসল কম জন্মিবে, সে কথা বলা বাহুল্য। তারপর লোকের ঘরে পূর্ব্ব বৎসরের ফসল বিশেষ কিছু জমা থাকে না। কারণ গত বৎসরে তাহার পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় শতকরা ১৪॥ ভাগ কম ধান্য দেশে জন্মে। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্ব সঞ্চিত ধান্যের উপর নির্ভর করিবার উপায় নাই। দেশে দুর্ম্মূল্য ঘটিবার ইহাও একটী কারণ।

এই অনাবৃষ্টির সহিত গত শীতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে বাংলার—কেবল বাংলার কেন—সমস্ত ভারতের এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের লোকে জর্জ্জরিত হইয়াছে। কৃষকগণ চাষের সময় শয্যাগত থাকায় এবং তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সর্ব্বত্রই শ্রমশক্তির লাঘব ঘটিয়াছে এবং চাষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এজন্যও উৎপাদিত শস্যের পরিমাণের হ্রস্বতানিবন্ধন মূল্য বাড়িয়া যাইবার কারণ ঘটিয়াছে।

এই মূল্য বৃদ্ধির জন্য যে যে শ্রেণীর লোকের বিশেষ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে যে স্থান অতি বৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির জন্য শস্যের অতিশয় ক্ষতি জন্মিয়াছে, সেই সেই স্থানের অধিবাসিগণের—বিশেষতঃ কৃষকদিগের অতিশয় কষ্টের কারণ হইয়াছে। কারণ এই চড়া বাজারে তাহাদের বিক্রয় করিবার শস্য দূরের কথা, খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে যাহা দরকার তাহা হইতেও অনেক কম পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য যাঁহারা নানা প্রকার সুবিধা ভোগ করিতেছেন, এবং এই দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থার জন্য যাহারা ধনবান্ হইয়াছেন, কিম্বা যাঁহাদের আয় বাড়িয়াছে, এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট যে Excess profit tax বসাইয়াছেন, আবশ্যক হইলে সুব্যবস্থা মতে উপরোক্ত ব্যক্তিগণের উপর এইরূপ Famine tax বসাইয়া ঐ অর্থে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্য করিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। গবর্ণমেণ্টের সৃষ্ট অতিরিক্ত মুদ্রা যাহাদের হাতে বিশেষভাবে জমিয়াছে এবং যে সৃষ্ট মুদ্রা এই মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ, ঐ সকল ব্যক্তি সেই অতিরিক্ত অর্থের এক অংশ কেন দুর্দ্দশাগ্রস্তগণের জন্য ব্যয় করিবেন না, তাহার উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না।

এ ত গেল উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যবস্থার কথা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশের এই অতিরিক্ত মুদ্রায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যোৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইতে না পারিলে দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস হইতে পারে না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, যেরূপে হউক এই অতিরিক্ত মুদ্রা যাহাতে এই সকল কার্য্যে নিয়োজিত হয় সেই চেষ্টা করা। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে নানা উপায়ে তাহা করিতে পারেন। এ দেশে যে মূলধন আছে কিম্বা জমিয়াছে তাহার shyness এর বিষয় গবর্ণমেণ্ট অবগত আছেন। কিন্তু তাই বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে অনেক উপায়ে এই অতিরিক্ত অর্থে অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া অনতিবিলম্বেই প্রজার কষ্ট দূর করিতে পারেন। এই সমস্ত উপায়ের বিষয়ের আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। এ বিষয়ে একটী প্রকৃষ্ট উপায়ের বিষয় আমি ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। *

মূল্যবৃদ্ধির কয়েকটী কারণের বিষয় উল্লেখ করিলাম, কিন্তু এই পৃথিবীব্যাপী দুর্ম্মূল্যতার আর একটী কারণের বিষয় উল্লেখ করা দরকার। গত যুদ্ধের খরচ যোগাইবার জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত অধিকাংশ দেশকে বহুল পরিমাণে কাগজের মুদ্রার অর্থাৎ নানা প্রকারের নোটের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এই সকল নোটের আবশ্যকীয় শক্তির জন্য তাহার পশ্চাতে স্বর্ণমুদ্রার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ এই নোটগুলি ভাঙ্গাইয়া স্বর্ণ পাইবার উপায় নাই। কেবল কাগজের উপরেই অনেকস্থলে লেনাপাওনার কাজ চলিতেছে। এই জগদ্ব্যাপী মূল্যবৃদ্ধির ইহাও একটী প্রধান কারণ। এই উপায়ে কিরূপে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে সে আলোচনা কেবল বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অপরাপর সাধারণ পাঠকের পক্ষে নীরস ও বিরক্তিজনক হইবে। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিলাম।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি :—

(১) সমস্ত পৃথিবীতেই প্রায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বৃদ্ধি কেবল ভারতে সীমাবদ্ধ নহে।

(২) ভারতে এই মূল্য বৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ এই যে যুদ্ধের সময় এ দেশে নানা কারণে মুদ্রা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনেক কাগজের এবং ধাতুর মুদ্রা সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৩) এই অতিরিক্ত মুদ্রা দেশের শিল্পে ও কৃষিতে প্রযুক্ত না হওয়ায় উহা দেশের দ্রব্য উৎপাদন বিশেষরূপে বাড়াইতে পারে নাই।

---

* "A state bank for India" – Modern Review April, 1918.

(৪) বিশেষ বিশেষ স্থল ভিন্ন মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের ভাবী সুখ স্বচ্ছন্দতারই সূচনা করে।

(৫) অধিকাংশ লোকের হাতে অতিরিক্ত অর্থ আসায় মূল্য বৃদ্ধিতে তাহাদের অসুবিধা হয় নাই, কিন্তু নির্দিষ্ট আয়ভোগী ব্যক্তিগণ এবং আরও দুই এক শ্রেণীর লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

(৬) শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, দেশের অধিকাংশ কৃষিজীবিগণের সুবিধা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রচুর শস্য পায় নাই, তাহাদিগের অতিশয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

(৭) গত যুদ্ধে ৪।৫ বৎসরে আবশ্যকীয় দ্রব্যের উৎপাদন অনেক কম পরিমাণে হইয়াছে এবং উৎপাদিত অনেক দ্রব্য ও সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। উহাতে পৃথিবীর অনেক শ্রমশক্তিও নষ্ট হইয়াছে। মূল্য বৃদ্ধির ইহাও একটী কারণ।

(৮) সমস্ত পৃথিবীতেই মূদ্রাবৃদ্ধি ও শ্রমশক্তির অপচয়ের জন্য পারিশ্রমিকের হার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, দ্রব্যের উৎপাদনের ব্যয় অতিশয় বাড়িয়াছে এবং ইহাতেও মূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটিতেছে।

(৯) অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টিতেও ভারতে অনেক-স্থানে শস্যের ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে। এই শস্যের অল্পতা হেতুও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক চড়িয়া গিয়াছে।

(১০) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার জন্য পৃথিবীতে বিশেষ ভারতবর্ষে গত বৎসরে বহু লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায় অনেক লোক কাজ করিতে পারে নাই এবং অনেক লোক ঐ কারণে মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছে। এ কারণে শ্রমশক্তির অল্পতা হেতু কৃষিজাত এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনে বাধা ঘটায় দ্রব্যে অল্পতা মূল্য বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে।

(১১) লোকের যে অতিরিক্ত মুদ্রা জমিয়াছে, তাহার কিছু অংশ যাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য সংগৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য।

(১২) যাহাতে এই অতিরিক্ত অর্থ কৃষি ও শিল্পে নিয়োজিত হয়, অনতিবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের সে ব্যবস্থা করা উচিত।

(১৩) যুদ্ধে ব্যাপৃত অধিকাংশ দেশেই যথেষ্ট কাগজের নোটের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে আবশ্যকীয় স্বর্ণমুদ্রার বল নাই। ইহাও মূল্য বৃদ্ধির একটী কারণ।

(১৪) যুদ্ধের জন্য সমস্ত পৃথিবীর আর্থিক অবস্থার যে তোলপাড় ঘটিয়াছে; তাহা যুদ্ধ শেষেই স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে পারে না। এ বিষয়ে পৃথিবীর পূর্ব্বাবস্থার প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিতে কয়েক বৎসর সময় লাগিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র।

প্রেমের আগমন

কখন যে এলে তুমি অলক্ষিতে অগোচরে
না বুঝিনু না জানিনু হায়;
তোমার অঞ্চল কবে দুলিল সমীর স্রোতে,
নূপুর গুঞ্জিল রাঙ্গা পায়।

বলিল না কোন কবি তব আগমন গীতি,
কেহ না গাহিল প্রাণ খুলে,
তব অভিসার-পথ কেহ না বিছায়ে দিল
অভিনব পল্লব-মুকুলে।

হে রূপসি শব্দহীনা করতল ধৃত বীণা,
উষা-সম অনিন্দ্য-উদার।
এলে তুমি এলে ধেয়ে ভাষাহীন গান গেয়ে,
হৃদি-পদ্ম করি অধিকার।

কস্তুরী মৃগের সম গন্ধে ভোর প্রাণ মম,
মুগ্ধ আঁখি চারিদিকে চায়।
সে যেন পেয়েছে এবে অরুণ আভাস কার,
বিমণ্ডিত-লাবণ্য-লীলায়।

আহরিয়া নীল পদ্ম মথিত-নীলমা-তার,
মরম পল্লবে দিলে টানি।
বাজিল হৃদয় যন্ত্রে অশ্রুত সঙ্গীত শত,
অসীমের উদাত্ত রাগিনী।

অপূর্ব্ব তারুণ্য দিয়ে মণ্ডিত ক'রিলে বক্ষ,
বিশ্ব মম হইল আপন।
বুঝিতে নারিনু তবু ওগো প্রেম গরিয়সী,
স্বপ্ন সম তব আগমন।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

গরম জল।—বেশী গরম হইবে বলিয়া অনেকে জল অনেকক্ষণ ফুটান। এটা বড় ভুল,—অনর্থক কাঠ কয়লা পোড়ে। ফুটিতে আরম্ভ করিলে জলের তাপ আর বাড়ে না,—বেশী জ্বাল দিলে শীঘ্র শুষিয়া যায় মাত্র। সুতরাং জল শুধু খুব-গরম চাহিলে, ফুটিতে আরম্ভ করিলেই তাহা নামাইয়া নেওয়া উচিত। তবে কলেরা প্রভৃতি কতকগুলি রোগের বীজাণু, জলটা ১০।১৫ মিনিট না ফুটিলে নষ্ট হয় না। সে অবস্থায় জল ততক্ষণ ফুটানই উচিত।

কলেরার বিষ জলের আর দুধের সঙ্গেই বেশী সংক্রামিত হয়। কোথাও কলেরা লাগিলে প্রত্যেক গৃহস্থেরই উচিত পানীয় জল কতক্ষণ ফুটাইয়া তারপর ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়া।

ফিল্টার করিতে হইলে আগে জল ফিল্টার করিয়া তারপর ফুটান দরকার। কারণ অনেক সময় ফিল্টারের মধ্যেও কলেরার বীজাণু দেখা দেয় তাহা সহজে ধরা যায় না। সুতরাং ফিল্টার করা জলই, ফুটাইয়া নেওয়া নিরাপদ উপায়।

যাহাদের হজম ভাল হয় না,—আহারের দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে খুব গরম জল চায়ের মত খানিকটা একটু একটু করিয়া পান করিলে, হজমশক্তি বাড়ে। বহুদিনের অজীর্ণ রোগও ইহাতে অনেক সময় দূর হয়। আহারের পর ঠাণ্ডা জল না খাইয়া গরম জল খাইলে হজম ভাল হয়।

গুরু ভোজনের পর অনেকে প্রচুর ঠাণ্ডা জল, বরফ দেওয়া জল, লেমনেড্ প্রভৃতি পান করেন। সেটা মোটেই ভাল নয়,—তাহাতে হজমের বড় ব্যাঘাত হয়। এ সময় ঠাণ্ডা জল খাইতে যতই ইচ্ছা করুক, সে ইচ্ছা সংযত করিয়া কতটুকু গরম জল খাইতে পারিলে, সহজে তৃষ্ণা বারণ হয়,—আর হজমও সহজে হয়। রোদে ঘুরিয়া হয়রাণ হইয়া অনেক সময় বড় তৃষ্ণা পায়, গেলাসের পর গেলাস ঠাণ্ডা জল খাইয়াও তৃষ্ণা মিটে না,—তৃপ্ত হয় না। প্রচুর ঠাণ্ডা জল এই অবস্থায় খাইলে, বড় সর্দ্দি লাগে। ক্রেশ করিয়া একটু গরম জল অথবা এক কাপ্ চা খাইতে পারিলে তৃষ্ণা তখনই মিটিয়া যায়। সর্দ্দি লাগার আশঙ্কা থাকে না। শুনিয়াছি, চীন জাপানে কলেরা বড় কম, তারা কাঁচা জল এক রকম খায়ই না,—তাহাদের প্রধান পেয় ফুটন্ত জলে চার পাতা ফেলিয়া ছাকিয়া সেই রস—দুধ চিনি ছাড়া। অনেকে মনে করেন, কাঁচা জল না খাওয়ার দরুণ সে দেশে কলেরা এত কম।

গরম জল পানের পক্ষে যতই উপকারী হ'ক,—শরীর নিতান্ত অসুস্থ না থাকিলে স্নান সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা জলে করা উচিত, শরীর ইহাতে বেশ সুস্থ থাকে, বেশ একটা স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়, ঠাণ্ডা লাগিয়া সহজে অসুখ বিসুখ কিছু হয় না। প্রথম দুই এক মাস বয়স অতীত হইলেই শিশুদের ঠাণ্ডা জলে স্নান করান উচিত। একদিন হয়ত সর্দ্দি লাগিল, অমনই অনেকে ঠাণ্ডা জল একেবারেই পরিত্যাগ করেন। সেটা বড় ভুল। সর্দ্দি সারিয়া গেলেই আবার ঠাণ্ডা জল ধরাইতে হয়। ক্রমে ঠাণ্ডা জল বেশ অভ্যাস হইয়া যায়। সহজে ঠাণ্ডা লাগিয়া কোনও অসুখ বিসুখ হয় না।

স্নান, আহার ও নিদ্রা।—আমরা সাধারণতঃ স্নানের অব্যবহিত পরেই আহার করি, এবং সুযোগ পাইলে আহারের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাই। ইহার একটি অভ্যাসও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। স্নানের পরে কিছুকাল রক্তের গতি বাহিরের চর্ম্মের দিকে বেশী আসে, পাকস্থলীর দিকে কম হয়,—সুতরাং পাকস্থলী তার কাজ ভাল করিতে পারে না। নিদ্রার সময় আভ্যন্তরিক সকল দৈহিক-যন্ত্রেরই ক্রিয়া মন্থর হয়, পাকস্থলীও ধীরে ধীরে কাজ করে, সুতরাং হজমে অতি বিলম্ব হয়। আহারের পর নিদ্রায় যে ভাল হজম হয় না, এটা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। রাত্রিতে আহার করিয়াই সকলে নিদ্রিত হন না,—কেহ গল্প করেন, কেহ কিছু কাজ-কর্ম্মও করেন, কেহ শুইয়া শুইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনাও করেন। কিন্তু দিনে কাজ না থাকিলে প্রায় সকলেই আহারান্তে নিদ্রা যান। কাজের দিনে বৈকালে বেশ ক্ষুধা হয়, কিন্তু ছুটীর দিনে নিদ্রা ভাঙ্গিলে মনে হয় যেন পেটের ভাত যেমন তেমনই আছে। যদি কেহ কাজ না করিয়া ছুটীর দিন আহারান্তে বসিয়া গল্পসল্পও করেন, দেখিতে পাইবেন,—বৈকালে আর পেটে ভার নাই, আহার্য্য বেশ হজম হইয়া গিয়াছে। আহারের পরেই স্নানের রীতি এ দেশে নাই। সেটা বড়ই খারাপ। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, স্নানের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে আহার করা উচিত, আর আহারের পর অন্ততঃ তিন ঘণ্টা না গেলে স্নান করা উচিত নয়। এ সব নিয়ম অবশ্য গুরু-ভোজনের পক্ষেই; সামান্য জলযোগে অত হিসাব করিয়া চলিবার প্রয়োজন নাই,—চলিয়া পারেও না কেহ। শরীর যাদের খুব সুস্থ ও বলিষ্ঠ,—অনেক অনিয়ম তাহাদের সয়,—তা ছাড়া কাজের গতিকে অনেক সময় অনিয়ম করিতে হয়, এবং এক আধদিন অনিয়ম করিলেই যে অমনই একটা অসুখ হইয়া পড়ে, তা নয়। কিন্তু এইটুকু সকলের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে দীর্ঘকাল এই সব অনিয়ম করিলে শরীর ক্রমে রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

কলেরার বাহন

কলেরা বসন্তের মত ঠিক ছোঁয়াচে রোগ নহে। রোগীর ভেদ বমি দুই হাতে ঘাঁটিলে কি দিবারাত্রি রোগীর শয্যায় থাকিলেও সেই ছুঁতে এ রোগ হয় না। সুতরাং নির্ভয়ে সকলে কলেরা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে

পারেন। তবে এ রোগের মূল একরূপ বীজাণু আছে, খাদ্য ও পেয় তাহার বাহন। খাদ্যে ও পেয়ে আশ্রয় পাইলে বীজাণুর জোর বাড়ে এবং তার মধ্য দিয়াই শরীরে প্রবেশ করে। যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করেন আহার পানীয় তাঁহারা প্রস্তুত না করিলেই ভাল হয়। নিজের আহার পান করিতে যাইবার আগে বিষনাশক লোসনে (Lotion) হাত পা মুখ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলা দরকার এবং কাপড়টা ছাড়িয়া ফেলা ভাল। সাবান ও ফেনাইল ব্যবহার করিতে পারেন। তাহাতে পরিষ্কার হয় ও দুর্গন্ধ যায়। কিন্তু তাহাতে কলেরার বিষ নষ্ট হয় না। কলেরার বিষনাশক ভাল দুটি লোসনের কথা নিয়ে দেওয়া হইল।

(১) পারম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাশের জল। এই ঔষধটি সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়, দেখিতে অনেকটা ম্যাজেণ্টারের মত। দামও বেশী নয়। কয়েকটা কুঁচি এক বোতল জলে ফেলিলেই জলটা বেশ লাল হইয়া উঠে। কলসীতে কি হাঁড়িতে বা বালতীতেও জল করিয়া রাখা যায়—সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিতে হয়। পাতলা হইলে একদিন, ঘন হইলে দু'তিন-দিনও থাকে। তারপর ঔষধটা থিতিয়া নীচে পড়ে, জলটা প্রায় পূর্ব্ব মতই হইয়া যায়। তখন সে জলে আর কাজ হয় না। আবার তৈয়ারী করিয়া নিতে হয়। কোথাও খুব কলেরা হইতেছে, সেখানে হয়ত কাহারও যাইতে হইল। জল ফুটাইয়া খাইবার সুবিধা হয়ত হয় না। তখন জলে সামান্য একটু পারম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাশ্ মিশাইয়া খাওয়াও ভাল, তবু কাঁচা জল খাওয়া ভাল নয়। পার ম্যাঙ্গেনেট অব্ পটাশে কলেরার বিষ সহজেই নষ্ট করে। থালা বাসনও এইরূপে ধুইয়া নিলে ভাল হয়। কুয়ার জল ও পুকুর জল খারাপ হইলে, পারম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাশ্ দিয়া তাহা শোধন করিয়া নেওয়া কখনও কখন হইয়া থাকে। জলটা একদিন কি দুইদিন ব্যবহার করা যায় না, তারপর ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(২) পার্ক্লোরাইড্ লোসন—এই লোসন ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। লোসনে কখনও ঘন অর্থাৎ বেশী ঔষধ মিশান, কখনও পাতলা অর্থাৎ অল্প ঔষধ মিশান থাকে, দেখিয়া তাহা বুঝা যায় না। ডাক্তারখানায় জানিতে হয়। ঘন হইলে জলে মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। কি পরিমাণ জলে কতটুকু লোশন মিশাইতে হইবে, তাহাও ডাক্তারখানায় জানিয়া নেওয়া ভাল।

জল ও দুধ কলেরার বড় দুইটী বাহন। জল বেশ করিয়া ফুটাইয়া নিয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে হয়। পূর্ব্বেই গরম জল প্রসঙ্গে এ কথা বলা হইয়াছে। দুধে সহজেই কলেরার বিষ ধরে। এ বেলায় জ্বাল দেওয়া দুধ ওবেলায় আবার ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া ফুটাইয়া না নিয়া ব্যবহার করা উচিত নয়। বাসী দুধ কলেরার সময় একেবারেই ত্যাগ করা ভাল। অবশ্য কলেরার ভয় না থাকিলে শীতকালে বাসী দুধ আবার বেশ জ্বাল দিয়া ব্যবহার করা যায়। তাহাতে দোষ কিছু হয় না। টিনের বিলাতী ঘন দুধ কলেরার সময় টিন কাটার পরে দুই তিন দিনের বেশী রাখিয়া ব্যবহার করা উচিত নয়। দোকানের ক্ষীর বিয়ের মত বর্জ্জনীয়।

মাছ মাংস কাঁচা এ বেলাবটা ওবেলায় কি বাসী করিয়া খাওয়া উচিত নয়। তাহাতেও সহজে কলেরার বিষ ধরে। জল, দুধ, মাছ ও মাংস এই কয়টি পানীয় ও খাদ্যই কলেরার প্রধান বাহন। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য খাদ্য ও টাট্‌কা এই বাসী কি পচা খাওয়া উচিত নয়। কলেরার সময় উদরাময় যাহাতে না হয়, এ জন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক। সাধারণ উদরাময় এরূপ সময়ে সহজেই কলেরায় পরিণত হয়।

আর এক সর্ব্বনেশে আপদ্ আছে মাছি—মাছিরা কলেরার ভেদ বমিতেও বসে। এই ভাবে অনেক খাদ্য-দ্রব্যে বিষ সঞ্চারিত হয়। কলেরার ভেদ বমিতেই কলেরার বিষ থাকে। রোগীর ভেদ বমি হইবামাত্র তাহাতে বিষ-নাশক লোসন ঢালিয়া তৎক্ষণাৎ ঢাকিয়া রাখা উচিত। মাছি পড়িলে তাহা কিছুতেই খাওয়া উচিত নয়।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, আমাদের দেশের চিকিৎসকগণ রোগী দেখিতে গিয়া কেবল রোগই দেখিয়া আসেন। রোগ বিস্তার না হয়, এজন্য গৃহস্থদের সতর্ক বড় করেন না। এটি ইহাদের বড় একটি ত্রুটি।

ফ্রুট সল্ট। (Fruit-Salt.)

(গত জানুয়ারীর 'কাজের লোক' হইতে উদ্ধৃত)

ইহা একপ্রকার মৃদু জোলাপের কার্য্য করে। অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে মধ্যে মধ্যে এক গ্লাস জলে চা-চামচার এক চামচা পরিমাণ নিলে উপাদেয় পানীয় স্বরূপ হইবে, অথচ একবার দাস্ত পরিষ্কার হইবে মাত্র।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া :—

Castor sugar	1½ oz	1d
Epsom salt	2 oz	
Cream of Tartar	2 oz	
Bicarbonate of Soda	2 oz	
Tartaric acid	2 oz	
Citrate of Magnasia	2 oz	

এই গুলিকে পেষ্ট মটর বা প্রস্তরের খলে বারম্বার পিষিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। এই চূর্ণ পূর্ণ বয়স্কের চা খাইবার চামচের এক চামচা শীতল জলের সহিত সেব্য।

বোতল খুব ভাল করিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। বাজারে অনেক বিলাতী পেটেণ্ট ফ্রুট সল্ট বিক্রয় হয়। এদেশের প্রস্তুতও বিক্রয় হয়।

সংগ্রহ বৈচিত্র

খাঁটি ঘড়ী

স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরা সহরের প্রধান জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত অধ্যাপক স্যাম্পল্ এমন একটি ঘড়ীর আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা ষোল বৎসরে এক মিনিট মাত্র এদিক ওদিক হইতে পারে,—অপূর্ণ মানুষের শিল্প নৈপুণ্য এবিষয়ে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু বাস্তবিকই আর করিতে পারে না।

নূতন পশুখাদ্য

একরূপ ফল আছে, তার ইংরেজি নাম 'ক্যাক্টাস্'। ফলগুলির গায়ে একরূপ কাঁটা দেখা যায়। কাঁটাগুলি পোড়াইয়া ফেলিলে উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য রূপে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব উৎপাতে ঘাস নষ্ট হইয়া গেলে এই ফল এইরূপে প্রস্তুত করিয়া গৃহপালিত পশুদের খাইতে দেওয়া যায়। সম্প্রতি বোম্বে গবর্ণমেণ্ট ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। পরীক্ষা সফলও হইয়াছে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সম্বন্ধে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের স্যানিটারী কমিশনারের এক মন্তব্য বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় এক ভারতবর্ষেই গত বৎসর এই রোগে ৫০,০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষের অধিক লোকের মৃত্যু হইয়া, রোগী যাহারা সারিয়া উঠিয়াছে, তাহারাও নানারকম ছোটখাট দৈহিক উদ্বেগে একেবারে দুর্ব্বল ও কর্ম্মশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের সংখ্যা যে কত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও নগণ্য নহে।

স্বাস্থ্য ও স্বরোদয়

(কাজের লোক,—জানুয়ারী, ১৯১৯)

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বরাট

স্বাস্থ্যের সহিত নিশ্বাস প্রশ্বাসের খুব নিকট সম্বন্ধ, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বরোদয় শাস্ত্র এই নিশ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার জন্য মানবের দুইটি নাসাপুট আছে বটে, কিন্তু এই দুই নাসাপুট দ্বারাই এক সঙ্গে সমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, কখনও দক্ষিণ নাসিকায়, কখনও বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইরূপে এক এক নাসিকায় আড়াই দণ্ডকাল নিশ্বাস প্রবাহিত হয়। তার পর উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অপর নাসিকায় যায়।

সাধারণতঃ মনে হয় যে, আমাদের উভয় নাসিকা দ্বারাই আমরা সমভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। একটু প্রনিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময় এক নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, অপরটি তখন প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে।

এখন এইরূপ ঘটনা কেন হয়, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না জানি না। কি ইংরাজি, কি আধুনিক বাঙ্গলা, কোন ডাক্তারি পুস্তকেই ইহার সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ ইহা শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি অতীব কৌতূহলজনক ও বিশেষ দরকারী বিষয় তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কয়েকখানি প্রাচীন যোগশাস্ত্রে ও স্বরোদয় শাস্ত্রে।

দেহ মধ্যে নানা প্রকারের আকৃতিবিশিষ্ট সুবিস্তৃত নাড়ীসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ নাড়ী সকল নাভীর নিম্নে মূলাধার নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে শরীরাভ্যন্তরে ত্রিসপ্ততি সহস্র নাড়ী চক্রাকারে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি নাড়ী বিশেষ প্রকারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তাহারা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে খ্যাত।

বাম নাসিকাপুট দিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা ইড়া, দক্ষিণ নাসাপুটে পিঙ্গলা এবং উভয় নাসাপুট দ্বারা যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা সুষুম্না নাড়ী দ্বারা সাধিত হয়। ইড়া চন্দ্রস্বরূপা, পিঙ্গলা সূর্য্যস্বরূপা ও সুষুম্না অগ্নিস্বরূপা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইড়া অমৃতরূপে জগতের আপ্যায়নে অর্থাৎ তৃপ্তিসাধনে নিযুক্ত, পিঙ্গলা রৌদ্র অর্থাৎ তেজঃরূপে জগতের পরিশোধনে নিযুক্ত। যখন ঐ নাড়ীতে শ্বাস বহন আরম্ভ হয়, তখন মহা তাপ প্রকাশ পায় এবং যখন সুষুম্না নাড়ীতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সর্ব্বকার্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও মৃত্যু হয়।

এই ত গেল শাস্ত্রের কথা। স্বাস্থ্যের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? তাহাও শাস্ত্র আলোচনা করিতে বিরত হন্ নাই। আমরা তাহারই অবলম্বনে ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

স্বরোদয় শাস্ত্রে মানবের ব্যাধি ও মৃত্যুর সহিত, সমস্ত কার্য্যের সফলতা ও নিষ্ফলতার সহিত এই নাড়ীত্রয়ের কি সম্পর্ক, তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল অতি বিস্তৃত, সাধারণের বুঝিবার পক্ষে তাহারা কতদূর সুবিধাজনক, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। দৈর্ঘ্যচ্যুতিরও একটু আশঙ্কা যে না আছে তাহাও সাহস করিয়া বলা যায় না। কাজেই আমরা সাধারণের নিকট তাহার বিশদ আলোচনায় বিরত রহিলাম। কৌতূহলি পাঠক এ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে স্বরোদয় শাস্ত্র হইতে ইহা পাঠ করিয়া লইতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নাসিকায় আড়াই দণ্ডকাল শ্বাস প্রবাহিত হইয়া তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার

অন্য নাসিকায় গমন করে। কোন সময়ে যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার শরীরে হয় কোন ব্যারাম আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থা হইয়াছে। যাহারা এই পরিবর্ত্তনটি সৌভাগ্যক্রমে সময় মত বুঝিতে পারেন, তাহারা ব্যারামের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্যারামের সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, অথবা যে নাসিকায় শ্বাস-বহনের ব্যতিক্রম ঘটায় ব্যারাম আরম্ভ হইয়াছে, সেই নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় লইয়া যাইতে পারিলেই ব্যারাম আরোগ্য পথে অগ্রসর হইবে। স্বভাবতঃ ব্যারাম আরোগ্য হইবার পূর্ব্বেও এই অনিয়মিতভাবে প্রবাহিত বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং শ্বাস স্বাভাবিক হয়।

এই বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা কি কি রোগ আরোগ্য হইতে পারে তাহার একটা বিশদ তালিকা যোগশাস্ত্রে না থাকিলেও, আমরা যে কতিপয় ব্যারামে ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপাততঃ তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অনেক ব্যারামই এই প্রণালীতে আরোগ্য হইতে পারে।

প্রবল মাথা ব্যথা, কয়েক প্রকারের জর, অজীর্ণ, শ্বাসের ব্যারাম (Asthma) প্রভৃতি রোগে ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া লক্ষিত হয়। শ্বাসের ব্যারামে ইহা ইন্দ্রজালের মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রবল শ্বাসের টানের সময় রোগী যখন জলমগ্ন ব্যক্তির মত হাবু ডুবু খাইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া এই বুঝি প্রাণ গেল, সকলে যখন এই আশঙ্কা করিতেছে, সেই সময় এই বায়ু পরিবর্ত্তনের ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিলে ১০।১৫ মিনিট মধ্যেই আরোগ্য লাভ হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আমরা সচরাচর তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি।

প্রথমতঃ।—যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে সেই পার্শ্বে, শয়ন করিলে সাধারণতঃ শ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য নাসিকায় যায় যেমন, বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত অবস্থায়, বামপার্শ্ব চাপিয়া অর্থাৎ বাম কাৎ হইয়া শয়ন করিলে শ্বাস দক্ষিণ নাসিকায় যায়। কিন্তু কোন কোন ব্যারামের সময় এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায়ই সফল কাম হওয়া যায় না। তখন অন্য প্রকার প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ।—যে নাসিকায় বায়ু বহিতেছে, তাহা তুলার পুঁটুলি (Plug) দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সে সময় যেন মুখ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করা না হয়। তুলা দ্বারা সফল কাম না হইলে অঙ্গুলির সঞ্চালনে ঐ একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত। এইরূপ করিতে প্রথম দুই এক মিনিট খুবই কষ্ট হয়, যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু একটু ধৈর্য্যের সহিত কিছুকাল করিলেই আর কষ্ট থাকে না।

তৃতীয়তঃ।—প্রাণায়াম বিশেষ দ্বারা। ইহা বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি কথার অবতারণা করিতে হইবে। সেই জন্য কি প্রকারে শ্বাসের ব্যারামের (asthma) রোগীর এই প্রক্রিয়া দ্বারা উপকার হয় তাহাই সংক্ষেপে বলিলেই বোধ হয় ইহা অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। ব্যারামের সময় যে নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ধরিয়া লওয়া যাক্—সেটী দক্ষিণ নাসিকা, তাহা হইলে তদ্বিপরীত অর্থাৎ বাম নাসাপুট বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কাপিত করিয়া সেই অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহার একটুও দেরী না করিয়া অর্থাৎ বায়ু কুম্ভক না করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা সঙ্কাপিত করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। আবার এই প্রকারে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারাই (সাধারণ প্রাণায়ামের ন্যায় বাম নাসিকা দ্বারা নহে) শ্বাস গ্রহণ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ ৫।৭ মিনিট করিতে পারিলে সদ্য ও আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। শ্বাসের ব্যারামের প্রকোপের সময় এই ক্রিয়া করিতে সবই কষ্ট হয়। নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার ভয়ে প্রথম প্রথম রোগীরা ইহা করিতেই চাহে না। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত যদি কিছুকাল, অন্তত ২।৩ মিনিট এইরূপ করা যায়, তবে আর শেষে কষ্ট হয় না। প্রবল শ্বাসের টান ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। বোধ হয় যেন এক মুহূর্ত্তে প্রবল ঝড় প্রশমিত হইয়া প্রকৃতি দেবী শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আমরা দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু টানিতে বলিলাম, কারণ ব্যারামের সময় ঐ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যদি ব্যারামের সময় বাম নাসিকাপুট দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হয়, তবে উহার বিপরীত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ এবং দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ত্যাগ। এইরূপ বারে বারে করিতে হইবে। এই ক্রিয়া করিবার সময় বিছানায় শয়ন করিয়া করাই ভাল। বলা বাহুল্য, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সুবিধাটুকুও ইহাতে লওয়া যাইতে পারিবে।

শ্বাসের ব্যারামের ন্যায় অজীর্ণ রোগেও ইহা বিশেষ ফল-প্রদ। যখন পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ীতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখনই আহারের প্রকৃষ্ট সময়। এইকালে আহার করিলে তাহা সহজে জীর্ণ হয়। আহারের পরেও কিছুকাল দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হওয়া দরকার। সেই জন্য আহা-রের পর কিছুকাল বামপার্শ্বে শয়ন করা আবশ্যক। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এই সহজ নিয়মটী অবলম্বন করিয়া দেখিলে উপকার পাইবার সম্ভাবনা।

বঙ্গের পাঁচালি সাহিত্য ও বঙ্গের একেলে সাহিত্য

(১)

বঙ্গ সাহিত্যের আখড়ায় দেখিতেছি "একালে" আর "সেকালে" বেশ রীতি মত বাদ প্রতিবাদের মুগুর ভাঁজা ভাঁজি চলিতেছে। দুই পক্ষের আলোচনাতেই যুক্তি তর্ক প্রবল। কেহ পিছে হঠিবার পাত্র নন। আমরা এই আখড়ার পরিধির বাহিরে দর্শক মাত্র। দর্শকদের একটা মস্ত বদ অভ্যাস এই যে, উঁহারা উভয় পক্ষকে বাহবা দেয়। অবশ্য সেই বাহবাটা উভয় পক্ষে সমান না হইয়া এক পক্ষের দিকে একটু হেলিয়া যায়। বাহবার রীতিই এই। বর্ত্তমান প্রবন্ধ দর্শকের বাহবার হাততালি। বলা বাহুল্য এই লেখক নবীন অর্থাৎ খাঁটি একেলে। কাজেই তাহার বাহবাটা একালকে অর্থাৎ বিংশশতাব্দিকে ঘেঁসিয়াই যে হইবে সে কথাটা আগেই বলিয়া রাখা ভাল।

গত পৌষ মাসের "প্রবাসীতে" এবং তেরশ ছাবিবশ সালের বৈশাখের "মানসীতে ও মর্ম্মবাণীতে" পাচালী ও কবির গান, এবং ঐ শ্রেণীর সেকেলে ছড়া এবং গাথার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া, সমর্থনকারী উভয় লেখক বঙ্গীয় একেলে সহিত্যকে যে নজরে দেখিয়াছেন—সে নজরকে কু'নজর বই সুনজর বলা চলে না। তুলনায় একটা জিনিশকে বড় প্রমাণ করিতে গেলে আর একটা জিনিশকে মনে না হক মুখে যে ছোট করিতে হইবে – এ সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করাটাই বাহুল্য। তুলনায় আলোচনার রীতি এই। মাঘের প্রবাসীতে বসন্তবাবু, পূর্ব্বোক্ত লেখকদ্বয়ের বক্তব্যের একটা পাল্টা জবাব দিয়াছেন। বসন্তবাবুর জবাবটা অসঙ্গত হইয়াছে বৈশাখের "মানসী মর্ম্মবাণীতে" ও জিতেন্দ্রবাবু এই কথাটি প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন—প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন একথা অবশ্য নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি না। তবে পৌষের প্রবাসীতে নাগ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনের অদম্য উচ্ছ্বাস যতটা ব্যক্ত হইয়াছে যুক্তি ঠিক ততটাই চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

"নারায়ণ" বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম খাঁটি বাঙ্গালী আর খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য কি এ বিষয়ে আলোচনা তুলিয়াছেন। তারপর ক্রমশ এই আলোচনার তাপ অল্প বিস্তর সকল শ্রেণীর সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিকের মনে লাগিয়াছে। তাপ লাগা জিনিশটার স্পর্শ নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা নয়, পরন্তু গরম। কাজেই এসম্বন্ধে কেহ যতটা এবং যতটুকু মন্তব্য দিন না কেন, তাহাতে অল্প বেশী তাপ থাকিবেই যুদ্ধের কামান বারুদের তাপে যখন এতগুলো লোক মরিল, রাজ্য ধ্বংস হইল; সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মন্তব্যের কামান বারুদের চোটে একটা হাণ্ডেল এবং কতগুলি নিব এবং কাগজের ধ্বংস হইলে ক্ষতি নাই। না হওয়াই অন্যায়; কারণ তাহা হইলে এই চিরস্মরণীয় যুদ্ধের ব্যাপারকে বিদ্রূপ করা হইবে।

পৌষের "প্রবাসীতে" নাগ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের গোড়াতেই আধুনিক সাহিত্যের কৃত্রিমতার উল্লেখ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে তাঁর উক্তির কিয়দংশ এই—"বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর যে প্রাণের যোগ নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোনও প্রকার বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না—আধুনিক বাঙ্গালাসাহিত্যের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। আধুনিক বাঙ্গলাসাহিত্যে সুন্দর উচ্চভাব নিচয়ের সমাবেশ রহিয়াছে, পরিপাটি রচনা ও কলা-কৌশল আছে, সুবিন্যস্ত মনোহর বাক্যবিন্যাস আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু তথাপি একথাও সত্য যে আমাদের আধুনিক সাহিত্য কৃত্রিম। নাগ মহাশয় উপরে যে মন্তব্য দিয়াছেন তাহা হইতে ঠিক সত্য পাওয়া কঠিন। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের যে সব লক্ষণ থাকা প্রয়োজন—সে সব লক্ষণ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে আছে একথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন! অথচ তাহা যে কৃত্রিম সে কথাও বলিয়াছেন। কেন কৃত্রিম সে সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি এই –"জনকয়েক উকীল ব্যারিষ্টার মাষ্টার সম্পাদক —মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় লইয়া ত বাঙ্গালী-সমাজ নহে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাহিরে বৃহৎ বাঙ্গালী-সমাজ পড়িয়া রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক মজুর দরিদ্র জন সাধারণ রহিয়াছে—যাহারা এই বাঙ্গালা দেশকে মাথায় করিয়া

রাখিয়াছে।" নাগ মহাশয় তাঁর এই যুক্তিতে জোর দিবার জন্য ইংরাজী বয়েদ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"A nation dwells in cottages"।

নাগমহাশয় সম্ভবতঃ এই বলিতে চান যে বাঙ্গালার একেলে সাহিত্যে বঙ্গীয় পল্লী-জীবনের তরকারি কোটা এবং ঢেঁকিতে ধানভানার বর্ণনা নাই। বাস্তবিক আজ কালকার বাংলা সাহিত্যে—পল্লী-জীবনের সেই বর্ণনা নাই। * তাই বলিয়াই যে একালে বঙ্গ সাহিত্য "কৃত্রিম" একথা কেমন করিয়া বলা চলে? তুমি যদি প্রশ্ন কর, "ওহে রাম তুমি কি খাইয়াছ?" সে যদি আম খাইয়া বলে, "আমি মুড়ি খাইয়াছি" তাহা হইলে কি তাহার সেই উক্তি অকৃত্রিম হইবে? কখনই তাহা সত্য হইবে না। হয়ত রামের পাড়ার অধিকাংশ লোক মুড়ি খায়, সেইজন্য কি রাম তাহার আমের আস্বাদকে মুড়ির স্বাদ বলিয়া চালাইবে?। যদি চালায় তাহা হইলে—নাগ মহাশয়ের মতে ঐ কথা বলিয়া রাম তাহার পাড়ার অধিকাংশ ব্যক্তির সহিত "নাড়ীর যোগ" রক্ষা করিলেও সে যোগ কৃত্রিম সে যোগ অত্যন্ত ঝুটা। তাহাকে যোগ বলে না। পরন্তু তাহা একটা সঙ্কীর্ণ ডিপ্লোমেসি বই আর কিছু না। ধর্ম্মরাজ্যেও এই শ্রেণীর নীচতা প্রসার লাভ করিয়াছে। এবং সেই নীচতাকে বুদ্ধিমানেরাও সমর্থন করিয়া বলেন—"Hypocrisy is a tribrute which Vice pays to Virture" এবং এই ইংরাজী বাক্যকে বঙ্গীয় লেখকেরা মাসিক পত্রের বক্ষে তুলিয়া দিয়া তৃপ্তিও লাভ করেন। এ শ্রেণীর তৃপ্তিতে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ আসক্তি নাই—না থাকাই বাঞ্ছনীয়। অসত্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করা নিশ্চয়ই খুব কঠিন। এসংসারে সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ কজন আছেন জানিনা। সত্যকে ষোল আনা আশ্রয় করা কঠিন সেইজন্য যে ভেজাল সত্যকে তারিফ করিতে হইবে এ যুক্তি সমাজে অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ব্যাপারে সাহায্য করিলেও তাহা অন্যায় এবং নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। সুতরাং এস্থলে বসন্ত বাবুর "কাজেই তখনকার লোকের ধর্ম্মজ্ঞান অপেক্ষা ধর্ম্মভাণই বেশী ছিল" এই মন্তব্য বেশ একটু তিক্ত শুনাইলেও আসলে নিতান্ত খামখেয়ালী নহে। * মনের আদিরসাত্মক ভাব এবং অনুরাগের অত্যন্ত বিকৃত ভাবকে রাধাকৃষ্ণের মিলন তত্ত্বের মধ্যে খিচুড়ী পাকাইয়া দিবার বাতিক হইতে সেকেলে কবিরা নিষ্কৃতি পান নাই। এই দিক দিয়া সেকেলে কবিতার বেশ একটু ভণ্ডামী চলিয়াছিল বৈকি; একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। এ সম্বন্ধে বসন্ত বাবুর টিপ্পনি তীব্র হইলেও সত্য। †

নাগমহাশয় সমাজের অধিকাংশ লোকের দৈনন্দিন কার্য্যাবলির রংচঙে করা তালিকাকেই হয়ত সাহিত্য আখ্যা দিতে চান। সাহিত্য সম্বন্ধে এই-ই যদি তার ধারণা হয়, তাহা হলে আমরা নাচার। আশা করি, নাগমহাশয় সাহিত্য সম্বন্ধে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা নিশ্চয়ই পোষণ করেন না। জাতীয় রাষ্ট্রবন্ধনের ক্ষেত্রে অবশ্য—"A na- lives ttages" কথাটা সত্য। কিন্তু—"সাহিত্যিকের বাস দীনের কুটীরে, মজুরের ধূলিমাখা লোহার কোদালে", একথা ছন্দে মিলাইয়া একশতবার লিখিলেও সত্য নহে। ‡ সেকেলে পাচালী কিম্বা সত্যব্রতের ছড়া অথবা গাথার মূল্য সেকেলে সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়াই আছে। হয়ত তাহাতে অল্পবিস্তর সাহিত্যের গন্ধও আছে—কিন্তু তাহা এমন সৌরভ নহে যে তাহা লইয়া সাহিত্যের আসরে বুক ঠুকিয়া গৌরব অনুভব কিম্বা গর্ব্ব করিতে পারি। § অবশ্য একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে সেকেলে প্রাচীন কবিদের ছড়ায় এবং ব্রত কথায় তৎকালীন সমাজের সুখদুঃখের কাহিনী বেশ সরলভাবে বর্ণিত। কিন্তু সে বর্ণনা আজকালকার দিনে নিশ্চয়ই চলিতে পারে না। উকীল ব্যারিষ্টার এবং মাষ্টারদের

---

* একেবারেই থাকিবে না কেন? অনেক গল্পে উপন্যাসে ও কবিতায়ও পল্লী জীবনের এ সব চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মাঃ সঃ।

† পল্লীর সাধারণ লোক কেবল মুড়ীই খায় না, আমও যথেষ্ট খায়। সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামেই আম বেশী মিলে, লোকে বেশী খায়। মাঃ সঃ।

* এ দোষ কি বর্ত্তমান এই 'সত্য' যুগে একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে? মাঃ সঃ

† বর্ত্তমান 'যুগ সাহিত্যে'র—কোবিদগণও ত বলেন, আদিরস মুক্ত ও নগ্নভাবে ফুটিয়া উঠিলেই তাহা শ্রেষ্ঠ আর্ট হইল। মাঃ সঃ।

‡ জাতীয় সাহিত্য তবে কাহার 'সহিত' থাকিবে? জনকত সহরে খোসখেয়ালী বাবু মাত্র? মাঃ সঃ।

§ লেখক পাঁচালী কখনও দেখিয়াছেন? কি পড়িয়াছেন? তাহা হইলে কি এমন কথা বলিতে পারিতেন? না সত্যব্রতের কথা আর পাঁচালীকে এক শ্রেণীতে ফেলিয়া দিতেন? মাঃ সঃ।

হাতে যখন 'সাহিত্যসেবার ভার পড়িয়াছে তখন এটা নিঃসন্দেহ সত্য যে তাঁহাদের কলম হইতে ওপাড়ার হরি বাগ্দীর নাতবউ কেমন করিয়া ঘোমটার আড়ালে গুরুজনকে মুখ ভ্যাঙচায় সে বর্ণনা বাহির হইবে না। * যদি বাহির হয় সেটা অত্যন্ত কৃত্রিম হইবে—শুধু তাই নয় হাস্যকর হইবে। নাগ মহাশয় একথা বলিতে পারেন আজকালকার সাহিত্যে বাঙ্গালার পল্লীসমাজের নিখুঁত চিত্র নাই। একথা সত্য, কিন্তু একেলে সাহিত্যে তাহা নাই বলিয়া তর্কের খাতিরে তাহা অপূর্ণ হইতে পারে—কিন্তু কৃত্রিম নহে।

(২)

নাগ মহাশয় বলিতে চান—যে ছড়ায় ধর্ম্মের কথা, বেশী থাকে, তাহাই সাহিত্য। শুধু তাই নয়। তিনি আরো বলেন "একমাত্র ধর্ম্মই জনসাধারণকে একত্র করে; আমাদের দেশে সেই জন্য কেবল ধর্ম্মসাহিত্যই আছে" "আমাদের দেশে কেবল ধর্ম্ম সাহিত্যই টিকিবে—অন্য সাহিত্য স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই।" ধর্ম্মটা কি এবং তার সংজ্ঞা কি, নাগ মহাশয় সে বিষয় বুঝাইয়া বলিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। হরি হরি কিম্বা ব্রহ্ম ব্রহ্ম অথবা বিষ্ণু বিষ্ণু বলাই কি ধর্ম্ম? এ সম্বন্ধে পরিষ্কার কথা নাগ মহাশয়ের বলা উচিত ছিল। ধরিয়া লওয়া যাক—প্রচলিত মতে ঈশ্বরভাবে মত্ত থাকাই ধর্ম্ম। যে কাব্য হইতে ঈশ্বর প্রেম দূর করা হইয়াছে—তাহা নিশ্চয়ই সাহিত্য নয়। অন্ততঃ নাগ মহাশয়ের মত এই। আচ্ছা, মেঘনাদবধকাব্যটাও কি সাহিত্যক্ষেত্রে না টিকিবার সম্ভাবনার অন্তর্গত? এ সম্বন্ধে নাগ মহাশয় কি বলেন? ধর্ম্মই সাহিত্যের ভিত্তি এ কথা বলিতে গিয়া নাগমহাশয়—হিন্দুদের কতগুলি দেবদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। দেবদেবীর গুণ কীর্ত্তনে এদেশবাসীর মনে বিশেষ ভক্তির উদয় হয় এটা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহা সাহিত্য? + মা নামে আমার তোমার সকলের মনে ভক্তির উদয় হয়—তাই বলিয়া মাকে, ওমা—ওগো মা—ওগো আমার মা—বলিয়া বসন্ত বাবুর মতে "থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়" করিলে তাহা সাহিত্য হয় না। * নাগ মহাশয়ের মতে নীতি এবং ধর্ম্ম গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। তাহা হইলে আমার মনে হয় এ ভবসংসারে সর্ব্ব সমাজের দেব দেবীর জন্ম মৃত্যুর + ইতিহাস এবং মহাপুরুষেদের জীবন চরিতের তুলনায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য জগতে আর নাই। এ কালের সাহিত্যে আর সেকালের সাহিত্যে প্রভেদ আছে। সেটা সত্য। কিন্তু সেই প্রভেদকে কৃত্রিম আর অকৃত্রিম নামে অভিহিত করিলে নিতান্ত অন্যায় হয়।

সমাজকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্য অগ্রসর হয় এটা সত্য। কিন্তু সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সেই যোগকে, গাছের সঙ্গে মাটির যোগ বলা চলে না। মানুষের সঙ্গে একদিক দিয়া সব মানুষের যোগ আছে; কিন্তু সেই যোগকে, রামের ভাই হরির সম্বন্ধের সঙ্গে তুলনা করা ভুল। সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্যিকের ভাব এবং চিন্তার যোগটাই আসল এবং ঘনিষ্ঠ—সমাজের যোগটা গৌণ। বিগত সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণরিভিউ পত্রে স্যার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "Object and subject of a story" শীর্ষক চিঠিতে এক যায়গায় লিখিয়াছেন—The age is weaving in our minds its web of many coloured threads simply for the purpose of creation"—

সময়ের সমাজজীবন প্রত্যেক সাহিত্যিকের রচনায় অলক্ষ্যে কালের চিন্তার চরণ চিহ্ন অল্পবিস্তর থাকে। এই হিসাবে সেকেলে সমাজের পক্ষে সেকেলে সত্যব্রতের কথা, সেকেলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের রঙ্গ এবং পাচালী খাঁটি এবং অকৃত্রিম সাহিত্য ছিল—কিন্তু সে সাহিত্যের সঙ্গে এখন কি সম্বন্ধ? ‡ যদি কোন সম্বন্ধ সেকেলে সাহিত্যের সঙ্গে একেলে

* সেকালের সুখ দুঃখ কেবল ইহাই ছিল না। যা ছিল, তার সঙ্গে একালের খাঁটি বাঙ্গালীর প্রাণের তারই এক সুরে বাঁধা। মাঃ সঃ।

+ নয়ই বা কেন? কেবল তাহা সাহিত্য না হউক, তাহা সাহিত্য হইতে বাদ পড়িবে কোন হিসাবে? মাঃ সঃ।

* দেবদেবীর গুণকীর্ত্তনে কেবলই মা কথাটির ছড়াছড়ি কোথাও নাই, তবে মা ভাবটার অভিব্যঞ্জনা যথেষ্ট আছে। লেখক কি তাকেও সাহিত্য বলিতে চাননা? মাঃ সঃ।

+ দেবদেবী সকল দেশেই অমর। তাহাদের মৃত্যুর ইতিহাস কি? মাঃ সঃ।

‡ সম্বন্ধ বেশ আছে বই কি? সহরের বাবুদের না থাকিতে পারে, তাঁদের বাহিরে বিরাট সমাজের বেশ সম্বন্ধ আছে। সেখানে সেকেলে কৃষ্ণ এখনও 'মোহনকিশোর'—সত্যদেবের কথা পড়িয়া ঘরে ঘরে এখনও তাঁর পূজা হয়। মাঃ সঃ।

সাহিত্যে থাকে, তবে সে, দেবদেবীর গুণবর্ণনার জন্য নহে, পরন্তু নিছক আর্ট এবং আইডিয়ার সঙ্গে।* খাঁটি সাহিত্য কোন দিন জনসাধারণের অভাব অভিযোগে গড়ে না। কালিদাসের যে কোন কাব্য বা নাটক নিশ্চয়ই জন সাধারণের ফরমাইসে রচিত হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সেগুলি বাংলার পাঁচালি সাহিত্যের মতই জড় পদার্থ হইয়া যাইত,—এবং সেগুলিকে বিস্মৃত গহ্বর হইতে বাহির করিয়া তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য একালে নাগ মহাশয়ের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে অযথা বেগ পাইতে হইত।†

(৩)

নাগ মহাশয়ের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে,যে সব অধ্যাপক,উকীল ব্যারিষ্টার এবং সম্পাদক মুটে মজুরের সুরে সুর ধরিতে পারিতেছেন না তাঁহারা খাঁটি বাঙালী নহেন। তার প্রমাণ তিনি লিখিতেছেন, "বাঙালীর মন ও প্রাণ পাচালির ভিতর তাহার নিজস্ববাণী খুঁজিয়া পায়"—আর এখনকার সাহিত্যে নিজের প্রাণ খুঁজিয়া পায় না। নাগ মহাশয় আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে একদিকে এবং অশিক্ষিত অধিকাংশকে অন্যদিকে রাখিয়া বলিতেছেন, যে ভাব এবং যে চিন্তা বেশীর দিকে, খাঁটি বাঙলার প্রাণ সেইখানে। আজকালকার যুক্তি এবং তর্কের আসরেও এমন পঙ্গু যুক্তি ছাপার অক্ষরে বাহির হইল, এটা একটু আশ্চর্য্যের বিষয় বটে! সব দেশেই বেশীরভাগ লোকের চিন্তা মোটা, অল্প লোকই সূক্ষ্ম চিন্তা করে,—নাগ মহাশয়ের যুক্তি হিসাবে বলিতে পারি—যখন অল্প লোকের চিন্তা এবং ভাবের বেশীর ভাগ লোকের চিন্তা এবং ভাবের সঙ্গে যথেষ্ট প্রভেদ, তখন সেটা কৃত্রিম—যেহেতু বেশীর ভাগ লোক সেই মতে সায় দেয় না।

নাগ মহাশয় বাঙালার যে সময়ের পাচালী সাহিত্যের কথা বলিতেছেন, সে সময় জনসাধারণ এবং সামান্য রকমে অসাধারণ কবি এবং লেখকেরাও একহিসাবে কেন—সর্ব্বতোভাবে একই শ্রেণীর সামাজিক শিক্ষা ও বিধিনিষেধের আইন-কানুন মানিয়া চলিতেন। তখনকার সমাজে আধুনিককালের মত এত রকমের নূতন চিন্তা, নূতন শিক্ষা, সেই সঙ্গে নূতন খাদ্য দ্রব্যের আমদানি ছিল না। কাজেই তখনকার ধনী ঘরের ছেলের বাপের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে—চিড়া দধির ফলারই দেখা যাইত। কিন্তু এখনকার দিনে শ্রাদ্ধে চিঁড়ে দই— তেমন জুতসই হয় না তখন সমাজের জীবনে নব নব চিন্তার ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত না হওয়ায় সকল কবিই এক বোলে ধুয়া ধরিত—

দিয়ে চুণ খয়ের সুপারি
খায় পাণ রাজার ঝিয়ারী—

কিন্তু এখন পানের মসলা কেবল চুণ খয়ের সুপারী নয়। আরও অনেক রকম পাণের মসলার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন লেখক যদি এখন জোর করিয়াও বলেন—"বাঙালীর" পাণ খাওয়ার আসল আস্বাদ, পাচালীর যুগের সেই চুণ খয়ের সুপারীর মধ্যে আপন করে খুঁজিতেছে, তবু আশা করি, অতি অল্পসংখ্যক বাঙালী ছাড়া বেশীরভাগ বাঙালীই, দিব্য সুগন্ধী জরদা, সেন্ সেন্ ছাড়িয়া কিছুতেই কেবল খয়ের চুণ সুপারী দিয়া পান খাইবে না।

সেকালের বাপ-ঠাকুরদাদারা যে রকমে থাকিতেন, যে রকম খাদ্য খাইতেন, যে রকম বস্ত্র পরিধান করিতেন, সময়ের পরিবর্ত্তনে নূতন চিন্তার উৎকর্ষের পরেও যদি আমরা ঠিক সেই রকম খাই-পরি-করি—তাহা হইলে তো উন্নতি টুন্নতির† কোন অর্থ ই থাকে না।

(৪)

একালের চিন্তা, একালের সমাজ, সেকাল অর্থাৎ পাচালীর আমল‡ হইতে অনেক দূরে আসিয়াছে—এবং সত্য

* এই নিছক আর্ট বা আইডিয়া অপেক্ষা দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার সঙ্গে দেশের লোকের প্রাণের যোগ বেশী। মাঃ সঃ।

† লুপ্ত রত্ন, বিস্মৃত ইতিহাস—যত্নে উদ্ধার করিবার বস্তু বই কি? বড় বড় মনীষীরাও তাহা করিয়া থাকেন। মাঃ সঃ।

* লেখক মুসলমান আমলের বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের এবং বাঙ্গালীর চিন্তা ও কর্ম্মশক্তির ইতিহাসের তেমন খবর কিছু রাখেন বলিয়া মনে হয় না। মাঃ সঃ।

† 'উন্নতির' চেয়ে 'টুন্নতির' বহর এখন বেশী নয় কি? মাঃ সঃ।

‡ সেকালকে কেবল পাঁচালীর আমলই বলা যায় কি? মাঃ সঃ।

বলিতে কি যথার্থ উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সেকালের প্রতি আমাদের একটা দরদ আছে বলিয়া সেকালের পাঁচালী ছড়া ইত্যাদি আমাদের কাণে মধু ঢালে। বস্তুতপক্ষে একালে কবিতা বল, গল্প বল, কাব্য বল, সকলি সেকালের বাংলা পাঁচালীর চেয়ে ঢের সরস, ঢের সুন্দর এবং ঢের বেশী অকৃত্রিম।* মোহের চশমায় কালো পদার্থও বেশ দেখায়।† চণ্ডীদাসের ভিটি দেখিয়া অনেকের মনে অনেক রকমের ভাবের উদয় হয়—সেকি ঐ ভিটের সৌন্দর্য্যের জন্য, না ঐ ভিটের প্রতি সঞ্চিত পূর্ব্বস্মৃতির জন্য? নিশ্চয়ই পূর্ব্বস্মৃতির জন্য। তা না হইলে চণ্ডীদাসের জন্মভূমির ভিটের চেয়ে,—আজ কালকার জীবন্ত ক্যাবল দাসের বাড়ী ঢের বেশী সুশ্রী ও সবুজ, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আমাদের দেশের অতীতকালের যা কিছু সম্পদ, আজ না হউক, এক সময় সকলের মনে একটা আনন্দ, একটা মিলনের ভাব সঞ্চার করিয়াছিল—সেগুলিকে আমরা কেন না শ্রদ্ধা করিব? বর্ত্তমানের অঙ্কে বসিয়া যে সব বস্তুর এবং পুঁথির সাহায্যে অতীতকালের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিতেছে, তাহাকে ত অশ্রদ্ধা করা চলে না। কিন্তু এটাও সত্য—শ্রদ্ধেয় বস্তু সম্বন্ধে বেশী করিয়া কিছু বলাও ঠিক নয়। বাংলার সেকাল, সংস্কৃতের সেকালের মত সর্ব্বদিক দিয়া কোন দিনই উন্নত ছিল না। সাহিত্যের দিক দিয়া বরং সেকেলে সংস্কৃত সাহিত্য বেশী উন্নত ছিল। মেঘদূতে—কিংবা শকুন্তলায়—প্রকৃতির বাহ্য এবং অন্তর সৌন্দর্য্যের যে বর্ণনা পাই, আজ কালকার কবিরা কৈ তেমন সুনিপুণ ভাবে ত সাহিত্যসৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন না! অবিশ্যি না পারার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই বলিয়া এ কথা বলিব না যে, যেহেতু, আজ কালকার কবিরা শকুন্তলার যুগের সংস্কৃত কবিদের মত প্রকৃতির রূপের তারিফ করিতে পারেন না, তাই একালের সাহিত্য কৃত্রিম। যাক। যে কথা বলিতেছিলাম, বাংলার সে কালের কথা—যে কালে বাংলার কবিকঙ্কণের পাঁচালীর সৃষ্টি হইতেছিল সে সময়কার বাংলা একালের চেয়ে কোন অংশে ভাল ছিলনা। বরং বাংলা সাহিত্যের খাঁটি উন্নতি একালেই দেখিতে পাওয়া যায়।* সাদা সিধা ভাবে বাঁধি ছন্দের ভিতর দিয়া শ্যাম নাম শুনাইবার মধ্যে ভাবের লালিত্য আছে স্বীকার করি। যতদূর মনে হয় সমাজে ঐ কারণে চণ্ডীদাসের আদর এত বেশী। কিন্তু সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কেবল ভাবে নাই। ভাবের সঙ্গে যেখানে আর্ট, ছন্দ এবং ভাষার কৌশল একত্রে মিলিত হইয়াছে, সাহিত্যের যথার্থ সৌন্দর্য্য সেইখানে। বিদ্যাপতির কবিতায় চণ্ডীদাসের মত ভাবের প্রাধান্য না থাকিলেও সাহিত্যের সৌন্দর্য্য অধিক ফুটিয়াছে। শ্রীপাদ কল্পতরু কয়েক খণ্ড সামনে খুলিয়া বসিলেই, দেখা যাইবে তখন কার কবিদের রচনার মূল রস ছিল আদিরস।† হয় তো তখনকার সমাজে আদিরসের চর্চ্চাটা একটু খোলাখুলি ভাবেই হইত।‡ রাধাকৃষ্ণের অর্থ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা কিনা সে মীমাংসা এখানে নিষ্প্রয়োজন, কারণ এখানে সাহিত্যের কথাই হইতেছে আধ্যাত্মিকের কোন সংস্রব নাই। কাজেই সেকেলে কবিদের কবিতার প্রধান নায়ক এবং নায়িকা ছিলেন রাধা আর কৃষ্ণ।§ তাঁহাদেরই জীবন বৃত্তান্ত কবিরা নানা রসে লিখিতেন। বর্ণনার ধরণ সকল কবিরই প্রায় এক রকমেরই ছিল। অথচ সেই সব কবিদের মধ্যে আজ কেবল চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির নামই বেশী, অন্য কবিদের নাম লোপ পাইয়াছে তাহা বলি না। কিন্তু চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির নাম কেন এত বেশী? কারণ তাঁহাদের কাব্যে পাঁচালির অনুরূপ সমাজের বাটনা বাটা এবং দেবদেবীর নিতান্ত বস্তুগত ঘটনার তালিকা নাই। পরন্তু এমন সব ভাবের ছায়া এবং ইঙ্গিত আছে যাহা যুগে যুগে শুধু বাঙালী কেন, সর্ব্বদেশের লোকেই অন্তরে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিবে।

* তাই কি? বুঝাইয়া দিলে কি ভাল হইত না? মাঃ সঃ।

† আমরা যে কালো। কালো ভালো দেখিব না ত কি? ইহাই যে স্বভাব, চশমা কেন লাগিবে? মাঃ সঃ।

* এমন একটা dogmatic assertion সপ্রমাণ করিতে পারেন। মাঃ সঃ।

† কৃত্তিবাস, কাশীদাসও তখনকার কবি, কবিকঙ্কণ রামপ্রসাদও তখনকার কবি। তাঁদের কবিতার মূলরসও কি লেখক বলিতে চান,—আদিরস? মাঃ সঃ।

‡ এখনকার কাব্যে গল্প উপন্যাসেই কি কম হয়? নগ্ন আর্টের সমবাদীগণ ত তাহারই তারিফ করেন। মাঃ সঃ।

§ রামায়ণ মহাভারতে কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে রামপ্রসাদের গানে রাধাকৃষ্ণের নামগন্ধও নাই। মাঃ সঃ।

আজ কাল দেখিতে পাই, অনেকেই সেকালের পক্ষে উঠিয়া পড়িয়া সবদিক দিয়াই ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা ভুলিয়া যান, যে মানুষ সুবিধাকে চায়, মঙ্গলকে চায়—তৃপ্তির সন্ধানে ছুটে * যদি সত্যই সেকেলে ভাবের মধ্যে আনন্দের এবং আরামের কিছু থাকে, মানুষ আপনি তাহা গ্রহণ করিবে। সেকালের যাহা কিছু সেকালের পক্ষেই ভাল ছিল। একালে যাহা ভাল তাহা সেকালের তুলনায় মন্দ হইলেও একালের সমাজে বরণীয়,কারণ একেলে লোকের চিন্তা, ভাব, জীবন যাত্রার প্রণালী ও পারিপার্শিক অবস্থা ঠিক সেকালের মত নয়। যাহা একালের তাহা একালের লোকসমাজে সত্য- সেকালকে একালে জোর করিয়া জুড়িলে তাহাই কৃত্রিম হইবে†

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

* সুবিধা, মঙ্গল ও তৃপ্তি এক পথেই সর্বদা লাভ হয় না। শ্রেয় ও প্রেয়.—ইহাদের পার্থক্য বড় বড় মনীষীরা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। মাঃ সঃ।

† কালের ধারার পারম্পর্য্য ভাঙ্গিয়া একালকে কি সে ব হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা যায়? বাহিরে যতই তঃ দেখা যায়, একাল সেকালেরই সন্তান। মাঃ সঃ।

নন্দন পাহাড়

'এম্ এর' শেষদিনকার পরীক্ষার কাগজ দাখিল করিয়া যখন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং এর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন শরীরটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। বাড়ার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, চাকরটার হাতে কলম দুটা ফেলিয়া দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িলাম। মনে হইতেছিল, সমস্ত কলিকাতা সহরটা যেন আমাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। অপরিসর রাস্তাটা ছাড়াইয়া গাড়ী যখন গোলদীঘির ধারে আসিয়া পড়িল, তখন দু একজন পরিচিত সতীর্থের মুখ ও রাস্তার জনপ্রবাহ চোখে পড়িল; মনে হইল, যেন কতকগুলি ছায়া বাজীর পুতুল রাস্তার উপর দিয়া চলা ফেরা করিতেছে। একবার সোজা হইয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, তার পরেই চোখের সম্মুখে একটা অস্পষ্ট ধূসর যবনিকা নাচিয়া উঠিল। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, মনে হইল সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাইতেছি। তখন গাড়ী পূর্ণ বেগে ছুটিতেছিল

ভাদ্রের শেষ। বালিগঞ্জের একটা ছোট বাড়ীতে ঝুল-বারান্দার উপর একখানা ঈজি চেয়ারে শুইয়া শুইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলাম। বাড়ীর পশ্চিম দিকেই খানিকটা খোলা মাঠ। দূরে একটা ছোট লাল রংএর বাড়ীর আড়াল দিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। পশ্চিমাকাশে খণ্ড, লঘু মেঘগুলি জমিয়াছে; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রংএর বিচিত্র পরিবর্ত্তন চলিতেছিল, রাঙ্গা মেঘগুলির শীর্ষে শীর্ষে সোণালি রং জ্বলিতেছিল; নীল রং ক্রমে গাঢ় হইয়া মেঘগুলির উপর ধীরে ধীরে কালিমা লেপন করিয়া দিতেছিল! সূর্য্য ডুবিয়া গেল, কিন্তু তখনও বিচিত্র বর্ণ সমাবেশ চলিতেছিল। তার পর ধীরে ধীরে সন্ধ্যাসুন্দরী নীলাঞ্চল উড়াইয়া নামিয়া আসিলেন।

এতক্ষণ একদৃষ্টিতে রংএর খেলা দেখিয়া দেখিয়া একটু অবসাদ আসিতেছিল, ক্লান্তদৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেই দেখিলাম- একমুখ হাসি বধুঠাকুরাণী আসিতেছিল!

—"বলি খাতা পেন্‌সিল এনে দিব কি? সূর্য্যাস্ত সম্বন্ধে কবিতা লিখবে? খুব লোক কিন্তু, দুবার এসে ফিরে গেছি, ধ্যান যে ভাঙ্গেই না!—তবু ত"—

বাধা দিয়া কহিলাম "সত্যি বোঠান! দুবার এসে ফিরে গেছ—তা ডাকনি কেন?"

বোঠান হাসিয়া কহিলেন, "ডাকিনি ভাব্‌লাম বোধ হয় একটু ভাল লাগ্‌ছে, এ তিন চার মাসের মধ্যে এমন করে ভাল থাক্‌তে দেখিনি"—

—"সত্যি সূর্য্যাস্তটা ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছিল, বৌদি',—মনে হচ্ছিল, কত যুগ যুগান্তর থেকে এই বিচিত্র রংএর খেলা চলে আস্‌ছে"—

—"কবি মানুষ কিনা, তাই অনেক কথাই মনে হচ্ছিল। সে আমি কতকটা অনুমান করেই নেব এখন, আমাকে বল্‌তে যে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়্‌বে! তার চেয়ে আমি যা' জান্‌তে এসেছিলাম, সেই উত্তরটাই দাও; আজ চা খাবে কি?"—

"তা বুঝেছি, কাজের মানুষ কিনা, তাই বাজে কথায় কাণ দেবার সময় নেই!—তা' চা'তো আর খাবনা কালই বলেছি, বৌদি!"

"তবে ওষুধটা এনে দি'? ওষুধ খাবারও তো সময় প্রায় হ'য়ে এল!"—

"ছাই ওষুধ,—ও গুলো খেয়ে আর কি হবে?"—

বৌদি' গম্ভীর মুখে কহিলেন, "জানই ত' ওটা বৃথা আপত্তি, ওষুধ খেতেই হবে, না খেলে,—"

"তোমার জ্বালায় দেশে টেঁকা যাবে না। এইত?—তা নিয়ে এস তোমার ওষুধ, যত ইচ্ছা খাওয়াও, আমি একটুও আপত্তি করব্‌ না।"—

বৌদিদির মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"তা আমার কি আর ইচ্ছে যে তুমি কেবলি ওষুধ খাও? কি করব, রোগ ছাড়ে না, তাই আমিও ওষুধ ছাড়ি না—"

বুঝিলাম একটু ব্যথা দিয়াছি, হাসিয়া কহিলাম, "আচ্ছা বৌদি, সত্যি ওষুধ না খেয়ে পারা যায় এমন কোনও ব্যবস্থা কি তোমার মাথায় আসে না? এত বুদ্ধি রাখ তুমি, আর আমার একটা উপায় কর্ত্তে পার্‌বে না? আমি আর এমন করে রোগে ভুগে পারি না; ইচ্ছা হয় নিজের হাতে এ দুঃসহ জীবনটাকে—"

বৌদিদি শিহরিয়া উঠিলেন, কাছে সরিয়া আসিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন "ছিঃ, পাগল হলে? এত লেখা পড়া শিখেছ কি ছাই? যা' মনে করাও পাপ, তাই তুমি মুখে আন্‌তে চাও?" বৌদিদির শেষে কথাগুলি আমার কাণে শাসনবাণীর মতই বাজিতে লাগিল।

অপ্রতিভ স্বরে কহিলাম, "রোগের জ্বালায় আমার মাথার ঠিক নাই! তুমি আমাকে ক্ষমা কর বৌদি!"

সেই স্নেহশালিনী নারীর দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

স্বরটা একটু ধরিয়া আসিতেছিল, ধীরে ধীরে কহিলেন, "আজকার চিঠিতে একটা নূতন ব্যবস্থার কথা পেয়েছি।"

"চিঠি, কার চিঠি! দাদার?'—

বৌদিদির মুখে লজ্জা-কুণ্ঠিত হাসির একটু মৃদু আভাস ফুটিয়া উঠিল।—অঞ্চলের একটা খুঁট আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে কহিলেন,—"কোন ভাল একটা যায়গায় হাওয়া পরিবর্ত্তন কর্ত্তে গেলে বোধ হয় সুবিধা হতে পারে।"

আমি আগ্রহ ভরে কহিলাম, "সত্যি বৌদি, দাদা কি তাই লিখেছেন নাকি? না তুমি তাঁকে লিখেছ?"

"না আমি—তা, আমি লিখেছিলাম একবার, খুব—মত হয়েছে, এখন তুমি স্বীকার হলেই ও সব ঠিক করে নেওয়া যায়।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, "তা, পশ্চিমে গেলে আমি না খেয়ে মারা পড়ব যে।"

বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বৌদিদি কহিলেন "সে কি?"

"এই বামুন ঠাকুরের রান্না খেতে হবে ত? না—না আমি যাব না,—কিছুতেই না!" একটু নড়িয়া আবার স্থির হইয়া ঈজি চেয়ারটার উপর পড়িয়া রহিলাম।

"এখানে তোমার হাতের রান্না খেয়ে বেঁচে যাচ্ছি—আর সেখানে—না, আমি যাব না।"

বৌদিদি হাসিয়া উঠিলেন।

"ওরে না; পাগল, বৌদির হাতের রান্না ছেড়ে তোমার বামুন ঠাকুরের রান্না খেতে হবে না।"

উৎসাহের আবেগে উঠিয়া বসিলাম।

আঃ তা বল্‌তে হয় এতক্ষণ! তা হলে তুমিও যাবে বৌদি! ভিতরে ভিতরে এতটা পাকিয়ে তুলেছ; কিন্তু আমাকে কিচ্ছুটি জান্‌তে দাওনি—বটে? তা যাব, আমি নিশ্চয়ই যাব; পশ্চিম কেন, তোমার হাতের রান্না খেতে তোমার সঙ্গে আমি যমের বাড়ীও যেতে রাজি আছি!"

বৌদিদির হাসি সেই সন্ধ্যার বিরলান্ধকারের উপর দিয়া একটা আলোক তরঙ্গের মতই খেলিয়া গেল!

"বৌদি যখন যমের বাড়ী যাবে, তখন রাঁধুনির পদ

খালি রেখে যাবে না! শ্রীমানের জন্য পাকা রাঁধুনি—শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক রেখেই যাবে।"

"সেটি হচ্ছে না, বৌদি,—ও পদটা তোমার একচেটে করে রাখতে হবে,—আর কারু রান্না ও আমার রুচ্‌বে না।"

"তা বুঝেছি! রান্নাঘরের ধোঁয়ায় বুঝি—ভাবী গিন্নির রং ময়লা ধরে যাবে, তাই আমাকেই ও পদে পাকা করে রাখ্‌বে।"

হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলাম না; বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "ওষুধ নিয়ে আসি? না,—বাদ্‌লা হাওয়া দিচ্ছে ঘরেই চল।"

রোগশীর্ণ দেহটাকে কোনও মতে টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া আস্তৃত কোমল শয্যার উপর এলাইয়া দিলাম।

এম্‌.এ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াই যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলাম, যে শয্যার সঙ্গে প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলাম। আজ প্রায় চারি মাসের মধ্যে গৃহত্যাগ করিবার শক্তি নাই; রোগের প্রথম আক্রমণে জীবনের এক প্রকার আশাই ছিল না, কিন্তু যমদূতগুলা যখনই দুয়ারে সমাগত হইয়াছে, তখনই বোধ হয় বৌদিদির সেবাব্রতা মাতৃমূর্ত্তিখানি দেখিয়া দেখিয়া সরিয়া গিয়াছে। পক্ষপুটে আবৃত রাখিয়া বিহঙ্গিনী যেমন ব্যাধের কবল হইতে নিজ শাবককে রক্ষা করে, বৌদিদিও তেমনি করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

বৌদিদি ওষুধ লইয়া আসিলেন। ওষুধ খাইতেই একখানি ছোট প্লেট সম্মুখে ধরিলেন। কয়েকটা আঙ্গুর ও খানিকটা বেদানা ছিল। একটা আঙ্গুর তুলিয়া মুখে দিতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম,—"বৌদি, আমি যদি দেবর না হয়ে ছেলে হতাম, তাহ'লে কি এর চেয়ে বেশী যত্ন করতে পারতে?"

চাহিয়া দেখিলাম, বৌদিদির দুই চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মুখে একটু ম্লান হাসি, শরতের প্রভাতে শিশির সিক্ত তরুণ পল্লব শীর্ষে স্নিগ্ধ অরুণোদয়ের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই সন্তানহীনা নারীর অন্তরে কোন এক গোপনতম স্নেহতন্ত্রীতে বোধ হয় একটু মৃদু আঘাত লাগিয়াছিল, তাই তাঁহার চক্ষে অশ্রু, মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম।

কাজের অছিলা করিয়া বৌদিদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

[৩]

আশ্বিনমাসের প্রথমেই দেওঘর চলিয়া আসিলাম। নন্দন পাহাড়ের কাছেই একটা ভাল বাড়ী পাওয়া গেল, তাহাই ভাড়া লইলাম। বাড়ীটার দুইটা ভাগ;—দুইটী পরিবার এক বাড়ীতেই পৃথক পৃথক ভাবে বাস করিতে পারে। একটা অংশ পূর্ব্বেই ভাড়া হইয়া গিয়াছিল, কয়েকদিনের মধ্যে যাহারা ভাড়া নিয়াছেন তাঁহারা আসিয়া পৌছিলেন।

আমরা অন্য অংশটা নিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া ফেলিয়া বিদেশে আমাদের ছোট খাট গৃহস্থালীটি ঠিক করিয়া লইলাম।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করিয়া লইয়া বৌদিদি আসিয়া কহিলেন, "এই আপেল কখানা আর দুধটুক নেও ও বামুন পাক চাপিয়ে দিয়েছি, ঘণ্টাখানেকে সব ঠিক হয়ে যাবে, এতটা বেলা হয়ে গেছে, ভারি কষ্ট হচ্ছে নয়?"

একটু থামিয়া কহিলাম "না কষ্ট টষ্ট কিছু হবে না তবে আমি একটা কথা ভাবছি"—

"কি"?

"ও ভাগটায় যাঁরা থাকবেন, তাঁদের হাল চাল, নাম গোত্র কিছুই ত জানিনে বৌদি; ঠিক বনিয়ে থাকা শক্ত না হয়ে ওঠে! ঐ এক কারণেই এ বাড়ীটাতে আমার আসবার তেতটা ইচ্ছা ছিল না।

বৌদিদি একটু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সে কথা ত অনেকবার হয়ে গেছে! তা তুমি দেখ, আমি ঠিক বনিয়ে নেব; মানুষ ত, বাঘ ত আর নয়। বাঘও যে মানুষের বশ হয়।"

—"বাঘ বশ করা অনেক জায়গায় সহজ, কিন্তু মানুষ জীবটা মাঝে মাঝে এমনি দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠে, যে, তাকে বশমানাতে অনেক ফলপ্রদ মন্ত্রও নিরর্থক হয়ে যায়"—

"ইঃ, আমি তা মানিনে! আর তারা যদি এমনি খারাপ লোক হয়, তবু মাঝের দোরটায় একটা কুলুপ এঁটে

দিলেই সব গোল মিটে যাবে। আগে দেখাই যাক্ না, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়"--

এমন সময়ে পিসীমা ডাকিলেন, "বৌমা, একবার পাকঘরের দিকে যাও ত; কাছে আসিয়া কহিলেন, "ওরে বিনু, এমন যায়গায়ই বাড়ী নিয়েছিস যে মানুষের মুখ দেখ্‌ব এমন যো-টি নেই তারপর একটু বাবার মন্দিরে যাব, সেও ত কত দূরের পথ—একটু সহরের কাছে বাসা নিবি" --

বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন,—"তা পিসীমা, আমাদের মুখ দেখ্‌লে চল্‌বে না? বাবার মন্দিরে যখন ইচ্ছা গেলেই হবে, পাল্‌কী করেও যাওয়া যায়; আর এ দেশে তো সব যায়গাতেই মেয়েরা হেঁটে যায়,—আমরা তাও ত পারব"—উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বৌদিদি পাকঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পিসীমা হাতের মালা কপালে ঠেকাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আহা, প্রাতর্বাক্যে তোরা আমার চিরজীবী হয়ে থাক্, তোদের মুখ দেখলে দিন কাটবে না কেন? তবে কিনা বাবার মন্দিরে—"

পিসীমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলাম, "তা আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠে, তোমাকে আমি রোজ মন্দিরে নিয়ে যাব। হাঁটা চলা করলেইত এখানে শরীর ভাল হবে! এই পাহাড়ের কাছে খুব ভাল হাওয়া পাব বলেই এখানে বাড়ী নিয়েছি; এখানে বোধ হচ্ছে শীঘ্রই ভাল হয়ে যাব।"

—"তুই ভাল হয়ে ওঠ্, তুই যেদিন প্রথম মন্দিরে যেতে পারবি, সেই দিন আমি ভাল করে বাবার পূজো দেব—"

এমন সময়ে বৌদিদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "পাক হয়ে গেছে, দুটি খেয়ে নেও।"

"—এরি মধ্যে পাক হয়ে গেল বৌমা?" পিসীমা স্মিত মুখে বৌদিদির দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

"—তা আর হবে না, বৌদি যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, পাকঘরে ঢুক্‌লেই পাক হয়ে যায়।"

"কথার ভট্টাচার্য্যি! এখন ওঠ, বেলা ত কম হয়নি।" বৌদিদি পাকঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

আশ্বিনের মাঝখানে একদিন সন্ধ্যার পর, খোলা বারান্দার উপর বসিয়াছিলাম, অল্প দূরেই নির্জ্জন নন্দন-পাহাড়ের উপরকার ছোট মন্দিরটী ও অর্জ্জুন গাছটা নক্ষত্রালোকে দেখা যাইতেছিল। সহরের দিক্ হইতে দুই একটা কুকুরের ক্ষীণ ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। পাশের বাড়ীটা একজন শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীর। বাড়ীটা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের বাতাস ছুটাছুটি, মাতামাতি করিয়া বহিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সেই উদ্দম বায়ুপ্রবাহকে সেবন করিবার জন্য ভিলার (Villa) নির্জ্জন বারান্দার উপর শুধু যে একজন রোগশীর্ণদেহ বাঙ্গালী ও তাহার বৃদ্ধা পিসীমাতা বসিয়া রহিয়াছে ইহা অনুভব করিয়াই যেন সেই বায়ু প্রবাহ অন্ধ রুদ্ধ আবেগে জানালার খোলা কবাট গুলির উপর মাথা খুঁড়িতেছিল, এবং দুয়ারের ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিয়া কক্ষ মধ্যে আর্ত্ত পশুর মতই চীৎকার করিয়া ফিরিতেছিল।

পিসিমা হাতের মালাটা একবার কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, "হাওয়ার চোটে যে বারান্দায় বসাই দায়, হ'য়ে উঠ্‌লরে।"

আমি একটু হাসিয়া কহিলাম,—"তা' হাওয়া কেমন রেগে গেছে শুনছ? দরজা জানালাগুলি না ভেঙ্গে ছাড়বে না দেখ্‌ছি।"

"কে রেগেছে, ঠাকুরপো?"—হাস্য-প্রফুল্ল মুখে বৌদিদি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেআসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শুনছ না? বাতাসের আর্ত্তনাদ, যেন ভারি রেগে গেছে, এমনি চীৎকার করছে!"

"ষোল সালের সাইক্লোনের কথা বুঝি ভুলে গেলে? তাতাসের অমন শব্দ আমি কিন্তু জীবনে আর কখনও শুনিনি!"

"ঠিক্ বৌদি, জীবনে বিরাট যদি কিছু দেখে থাকি তবে সে ঐ একটা রাত্রিতেই দেখেছিলাম! প্রকৃতির অমন সংহার মূর্ত্তি যে কি করে আমাকে অতখানি আনন্দ দিল, তা আমি চিন্তা কল্লে স্তম্ভিত হয়ে যাই! মনে রাখবার মত একটা কিছু বুঝি সেই সর্ব্বপ্রথম দেখেছি, অনুভব করেছি! সৃষ্টিটা আমার কাছে সত্যি সেদিন বিরাট, বিপুল বলেই মনে হয়েছিল।"

"এই চালালে বুঝি তুমি তোমার পাঞ্জাব মেল,"—

আমি হঠাৎ বাধা পাইয়া আমার বিস্মিত দৃষ্টি বৌদিদির মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম,—"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আর কি,—এখন খেতে চল, তোমার কবিত্বের ফোয়ারা ছুটলে ত নন্দনের হাওয়াকেও হার মানতে হবে।"

একটু অপ্রতিভ স্বরে কহিলাম;—"ওঃ এই কথা! কিন্তু সারা দিন এমন করে খাওয়ার তাড়া দিলেও তো বাবু অস্থির হয়ে উঠ্‌তে হয়।"

"খেয়ে দেয়ে আগে শরীরটা শুধ্‌রে নাও, তারপর যত পার কবিতালক্ষ্মীর অর্চ্চনা করবে।"

এমন সময়ে ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। সমস্ত দিনে যেখানে মানুষের পায়ের শব্দ শুনা যায় না, সেখানে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া আমরা সকলেই একটু উৎসুক দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিলাম। দুই তিন মিনিটের মধ্যে গেটের কাছে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। একটা ছোক্‌রা গাড়ীর উপর হইতে নামিয়া কহিল, "বাবু, এই তালুকদার ভিলা আছে।"

বৌদিদি একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমাদের অন্য সরিক বুঝি এলেন,—" আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

"এই মালী, মালী, গেট্ খুলে দাও,"—একটা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। আমি আমার চাকরটাকে আলো নিয়া গেট খুলিয়া দিতে বলিলাম। একটু পরেই চারি পাঁচ জন লোক বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন। বৌদিদি ও পিসিমা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

"এই যে আপনারাই বুঝি অন্য ভাগটায় আছেন—নমস্কার।"

প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ—আপনারা?"

"ব্রাহ্মণ"—

"আঃ বাঁচালেন,—আমরাও ব্রাহ্মণ মনে করেছিলাম; অন্য কোনও জাত হ'লে একটু মুস্কিল হ'ত—তা কি আর কর্ত্তুম, একরকমে চলেই যেত। থাক, একটা বিষয়ে ত চিন্তা দূর হ'ল।"

আমি আমার চাকরকে ঘরগুলি খুলিয়া দিতে বলিলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সঙ্গে যাঁহারা একে একে গৃহ প্রবেশ করিলেন, এক একটি তাঁহাদের দেখিয়া লইলাম।

একটি দশ বার বৎসরের ছেলে এবং চৌদ্দ পনের বৎসরের একটি মেয়ের কোলে বোধ হয় একটি বছরখানেকের ছেলে বা মেয়ে, একটি অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক, মনে হইল ঝি। বাহিরে গাড়ীর কাছে প্রৌঢ় ভদ্র লোকটি জিনিশপত্র নামাইবার জন্য চলিয়া গেলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলাম, তাঁহার সঙ্গে একটা চাকর ও ঠাকুর।

কয়েক মিনিট পরে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বৌদিদি ভারি ব্যস্ত। মাঝের দুয়ারটা খুলিয়া ফেলিয়া নবাগতদিগের অংশে যাইতেছেন, আসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি বৌদিদি?"—

"ওদের ছোট ছেলে রয়েছে, সমস্ত দিন গাড়ীতে কিছু খায়নি, এক বাটী গরম দুধ দিয়ে আস্‌লাম। আর বড় ছেলেটিকে মেয়েটিকে খাওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে আসি। ওঁদের জন্যও ভাত চাপিয়ে দিয়েছি, এ রাত্তিরে কি আর পাক করে খাওয়া পোষাবে? বিদেশে হঠাৎ এসে উঠলে যদি পড়্‌শীরা সাহায্য না করে, তা'হলে প্রথম দিনটা ভারি কষ্টে যায়!"

"সেকি, এখনই এত টা করছ, একেবারে অপরিচিত যে!"—

"হলইবা অপরিচিত, কাল ত আর অপরিচিত থাকবে না! তখন হয়তো মনে করবে, প্রথম দিনটা ওঁরা কি ব্যবহারটাই করলে!"

আমি বৌদিদির প্রকৃতি জানিতাম। সেবা করিবার সুবিধা পাইলেই এই মহীয়সী নারীটার আর আপন পর ভেদ থাকে না?

একটু হাসিয়া বলিলাম, "তা'হলে আমি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করব?"

—"তা'ত করবেই! আমি ও মেয়েটির কাছে বলেছি। আহ্নিকের যায়গা করে রাখছি, তুমি বলগে!"—

বাহিরে আসিলাম; ভদ্রলোকটি একটা ষ্টীলট্রাঙ্কের উপর বসিয়া চাকরটাকে কি আদেশ করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে কাছে গিয়া বলিলাম, "আপনার আহ্নিকের যায়গা হয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে নিন, এর মধ্যে পাক হয়ে যাবে। ভারি কষ্ট পেয়ে এসেছেন সমস্তটা পথ!"—

একটু বিস্মিতভাবেই তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, "তা এর জন্য আর আপনারা কষ্ট পাবেন না; সব ঠিক করে নেব ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন,

—"সুজাতা! অ' সুজাতা!"—

মেয়েটির নাম বুঝি সুজাতা,—মিষ্টি নামটি! মৃদু হাসিয়া একটু

অপ্রতিভ ভাবে কহিলাম, "আমার বৌদি ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে গেছেন, তারা ছুটো খেয়েই এখনি আসবে!"

ভদ্রলোকটি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তোমরা বাপু অবস্থা যা করে তুলেছ, তা'তে unconditionally surrender করা ছাড়া তো আর উপায় নাই দেখছি। ঐ যাঃ! 'তুমি' বলে ফেল্‌লাম,—কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে, ছেলেদের সঙ্গে থাকতে থাকতে, 'তুমিটাই' আগেই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে।" তা কিছু মনে— বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিলাম,—সে কি, 'তুমি'ই বলবেন; —আপনার ছেলেরা বয়সী হ'ব।"

কিছুক্ষণ ভদ্রলোকটি কোনও কথা কহিলেন না। তার পর গভীরস্বরে কহিলেন,—হা ছেলের বয়সীই হবে, তোমার বয়স একুশ বাইশ হবে মনে হচ্ছে। যখন চলে গেল, তখন তার বয়সও উনিশ বছর হয়েছিল। তার বি, এ পাশের খবর যেদিন বেরুল, ঠিক সেদিনই সে চলে গেল—"

আমি প্রায় চীৎকার করিয়া কহিলাম, "প্রভাত? প্রভাত চাটুয্যে, আপনারা ছেলে? আপনি"—.

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তাকে তুমি কেমন করে চিনলে?"—

"বিপদে তার সঙ্গে পড়েছি যে," -তিনি আর কোনও কথা বলিলেন না। নন্দন পাহাড়ের অপর দিকে যেখানে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়াছিল, সেই দিকেই স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে বৌদিদির প্রেরিত চাকরটা আসিয়া খবর দিল, "আহ্নিকের জায়গা হয়েছে।" কোঁচার খুঁটটা তুলিয়া একবার চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া গাঢ়স্বরে তিনি কহিলেন, "চল বাবা। মীলক্ষ্মী—আজ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যে এ বুড়ো ছেলেটিকে একেবারে আপনার ক'রে নিলেন!"

প্রভাতের পিতা বিমলপ্রসন্ন বাবুকে ইহার পূর্ব্বে আর কোনও দিন দেখি নাই। তিনি মফঃস্বলের একটা বড় কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন জানিতাম। আজ নন্দন পাহাড়ের নীচের বাড়ীটায় বারান্দার উপর, যেখানে আশে পাশে রাশি রাশি অন্ধকার বুকের ভিতরের দুঃখরাশির মতই জমাট বাঁধিতেছিল, ঠিক সেইখানেই এমনই প্রিয় সতীর্থের শোকাতুর পিতাকে দেখিব, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও একবারটিও তাহা মনে করিতে পারি নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

সমালোচনা

সাময়িক সাহিত্য

নারায়ণ, চৈত্র ১৩২৫

'নারায়ণ' হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি, আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

বর্দ্ধিতমান ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।— পাশ্চাত্যজগতে Plant ও Animal breeder রা কি ভাবে ও কি কি গুণবিশিষ্ট গাছ বা গৃহপালিত জন্তু করিতে হইবে, তাহার একটা ideal (অর্থাৎ আদর্শ) পূর্ব্ব হইতে মনে মনে ঠিক করিয়া গড়িতে বসেন। মানবজাতির মধ্যেও ঐরূপ দরকার। পুত্র-কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে প্রত্যেক পিতামাতার উচিত একটি ideal চক্ষুর সম্মুখে গড়িয়া লওয়া, তদনুযায়ী তাহাদিগকে মানুষ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে ভবিষ্যতে "আদর্শ সমাজ" বলিয়া গণ্য হয়, এই আশায় রাজা রামমোহন রায় ইহার breeder স্বরূপ অবতীর্ণ হন। তিনি গড়িয়া যাইলেন। তাহার পর আরও কত "ফুল" ফুটিল ও ঝরিল, কত মহাত্মা আসিলেন এবং যাইলেন। এক্ষণে ইহা শাখাপল্লবে পূর্ণাবয়ব-বিশিষ্ট। ইহাদের কোটরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম-শিশু ও যুবকেরা বর্দ্ধিত হইতেছে, ব্রাহ্ম-সমাজের ভবিষ্যৎ ইহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু এই সমস্ত বর্দ্ধিতমান ব্রাহ্মদের কতকগুলি এমন গুণ দেখিতে পাইতেছি, যেগুলি সমূলে উৎপাটিত না করিলে ব্রাহ্মসমাজ আদর্শসমাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উহা কাহার দোষে—পিতামাতার দোষে না সঙ্গ দোষে? যখন ইহাই সত্য যে, ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ ঐ ক্ষুদ্র শিশু ও যুবকদের উপর নির্ভর করিতেছে, এখন হইতে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত; এই ব্রাহ্মসমাজরূপ বৃক্ষের আশপাশ পরিষ্কার রাখা উচিত। পুরাতন হইলে আর কালের স্রোত ফিরান

দূরে থাকুক বরং আরও নূতন রকমের evil প্রবেশ করিয়া এই ব্রাহ্ম-সমাজ বৃক্ষের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতে পারে। যে কয় প্রকারের evil সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া সমাজের অনিষ্ট করিতেছে, তাহা গত তিন বৎসর হইতে তত্ত্বকৌমুদী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে আলোচনা হইতেছে। বলাবাহুল্য যে প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই ঐগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত।

আরও কত রকমের evil সমাজের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিতেছে, তাহাই আমি বর্দ্ধিতমান ব্রাহ্মদের জীবন হইতে দেখাইব।

পূর্ব্বে বিবাহে পিতামাতাই ছেলে মেয়েদের পাত্র পাত্রী ঠিক করিতেন, তাহাতে ছেলে মেয়েরা বড় আপত্তি করিত না, কারণ পিতামাতা পুত্রকন্যা অপেক্ষা বড় বিচক্ষণ। এক্ষণে সমাজের মেয়েদের এমন স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা পাশ্চাত্য জাতিদিগের ন্যায় Court করিয়া নিজেরাই ভাবী "বর"কে মনোনীত করিতেছেন। আরও দেখি, মেয়ে যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন, হয় ত পিতা-মাতার আদৌ মত নাই—এরূপ দু' একটা বিবাহ সমাজে হইয়া পিতা ও কন্যাতে মুখ দেখা দেখি নাই। আমরা সমাজে কি কুদৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।—আবার এমন tasted মেয়েও সমাজে আছেন, যিনি দু'তিন পুরুষের সহিত Court করিয়াও অদ্যাপি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই।

আমরা ভগবানকে সাক্ষী করিয়া, আচার্য্যকে আনাইয়া engagement অনুষ্ঠান করি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবান্‌কে 'don't care' করিয়া আচার্য্যের উপদেশ এক কাণ দিয়া শুনিয়া অপর কাণ দিয়া বাহির করিয়া দিয়া engagement ভঙ্গ করে। এইরূপে কোন কোন কলেজ ক্লাসের মেয়ে ও পুরুষ "দাগী" হইয়া আছেন। যে মেয়ে একবার engaged হইয়া নিজের বিবাহ ভাঙ্গিয়াছেন, তাঁহার বিবাহ অন্য পুরুষের সহিত হওয়া শক্ত, কিন্তু পুরুষের তত আটকায় না, কারণ ব্রাহ্মসমাজে কুমার যুবক অপেক্ষা কুমারী-মেয়ের সংখ্যা বেশী। কি মেয়ে, কি পুরুষ, যিনিই engagement ভাঙ্গুন না কেন, তাঁহাদের আমাদের জিজ্ঞাস্য:—(১) engagement ভাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের কি একটা প্রথা ? (২) ভগবানকে সাক্ষী করিয়া engagement ring দেওয়া হইল, প্রেমপত্র লেখালেখি হইল, আর বিবাহের বাকীটুকু কি রাখিলেন ? আমার মতে, আচার্য্যগণ engagement অনুষ্ঠানে ব্রহ্মোপাসনা না করাই ভাল (?), যদি ব্রহ্মোপাসনা করা দরকার হয়, তবে সেই বিবাহ সময়কালীন। কেন মিছা মিছি এমন শুভ engagement অনুষ্ঠানে ভগবানের নামকে কলুষিত করা ? না হয় উভয়পক্ষ যদি কোন guarantee দেন যে তাঁহারা engagement ভাঙ্গিবেন না, তবে যেন আচার্য্যেরা engagement করান। একে ত আমরা খুবই কম সংখ্যক ব্রাহ্ম, তাহাতে যদি ঐরূপে engagement ভাঙ্গিয়া দুই চারি পরিবারে কথাবার্ত্তা, মুখ দেখা বন্ধ করি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে মিল থাকিবে কি করিয়া ? মিল না থাকিলে সমাজের উন্নতি হইতে পারে না। জানিবেন "union gives strength."

এখন কেবল ব্রাহ্মসমাজে divorceএর ঘটনা ঘটিতে বাকী। আমার বোধ হয়, যদি growing Brahmaরা আইনের ফাঁক পান, তাহাও করিতে পারেন।

কোন কোন ব্রাহ্ম জাতিভেদও মানেন, তাহাও বিবাহকালে বেশ বুঝা যায়। যাঁহারা জাতিভেদ মানেন, তাঁহারা অবশ্য narrow-minded, তাঁহাদের ব্রাহ্ম না হওয়াই উচিত ছিল। Eugenicistরা অসবর্ণ-বিবাহের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন যে, কোন একটি বংশ হঠাৎ অন্য কোন একটী বংশের সহিত মিলিত হইলে এই নূতন শোণিতের আগমনে বংশ অপকৃষ্ট না হইয়া বরং prolific হয়।

কোন কোন ব্রাহ্মযুবক বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাকে যদি বিলাত যাইবার ও তথাকার সমস্ত খরচ দেওয়া হয় বা প্রচুর যৌতুকের (dowry) প্রলোভন দেখান হয়, তাহা হইলে তিনি 'অমুক'কে বিবাহ করিতে পারেন। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, growing Brahmaরাও বিবাহেতে পণ চান। যে স্বর্ণপ্রতিমা 'স্নেহলতা—' কিছুদিন হইল বঙ্গদেশ হইতে hydra-headed পণপ্রথাকে দূর করিবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন, তাহা দেখিয়াও এখন কি আমাদের পণ গ্রহণ করা উচিত ?

আজ কাল ব্রাহ্মবিবাহেতে ৬০৲ টাকা হইতে তাহার উপর যতদূর হয় তত টাকা মূল্যের বেনারসী সিল্কের শাড়ী এবং আরও অন্যান্য জিনিষ কনেকে দেওয়া একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহা না দিলে 'বৌভাতের' দিনে কনে সাজান হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে গরীব ব্রাহ্মরা কি করিয়া ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে পারেন ? যে ব্রাহ্মযুবক পঞ্চাশ বা ১০০৲ টাকা মাহিনা পান, তাহার স্ত্রীর কি ৬০৲ টাকা দামের বেনারসী সিল্কের শাড়ী পরাটা সাজে ?

"উপাসনা আত্মার অন্ন"—কয়জন বর্দ্ধিতমান ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা তাহা ভাবিয়া প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করেন ?

ব্রাহ্মসমাজে আজকাল তিন রকম দলের সৃষ্টি হইয়াছে—(১) বড়লোক (২) মধ্যবিত্ত (৩) গরীব লোক। কোন কোন আচার্য্য বড়লোকের ছেলে বা মেয়ের বিবাহে বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কাজ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, মধ্যবিত্ত বা গরীব লোকদের বেলায় নানারূপ ওজর আপত্তি তুলেন। এ ভেদাভেদ কেন ? যিনি আচার্য্য তাঁহার মধ্যে equalityর ভাব সর্ব্বক্ষণ বিরাজ থাকা কর্ত্তব্য। তাহা যদি তাঁহার মধ্যে না থাকে, তবে তাঁহার নাম আচার্য্যের তালিকা হইতে কাটাইয়া দেওয়া উচিত। ঠিক তেমনি সমাজের সভ্যদের মধ্যেও দেখা যায়। এক সমাজের সভ্য হইয়া রবিবার উপাসনায় বা ব্রাহ্মোৎসব কালে কোন কোন বড়লোক, মধ্যবিত্ত ও গরীব ব্রাহ্মদের সহিত মেশন না। আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতাকি করিব, তবুও বাক্যালাপ করিব না। আমাদের ধর্ম্ম যখন উদার, তখন আমাদের মধ্যে "আমি বড়লোক," "উনি গরীব

লোক" এ ভাব না থাকাই উচিত। হায়! কবে আমরা 'এক মায়ের পেটের ভাই; ভেদ নাই' বলিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিশিতে শিখিব।

পাঠক পাঠিকাগণ! আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত লেখকের এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রাগ করিতেছেন। তা রাগই করুন বা যাই করুন, আমি উচিত বক্তা। আমি প্রবন্ধে বড় বাজে কথা বলি না—আমি কাজের কথা লিখিয়া কালি ও কাগজ নষ্ট করি। আমরা ঐ সমস্ত দোষ হইতে বর্দ্ধিতমান ব্রাহ্মিকাদিগকে ও সমাজকে রক্ষা করিতে চাই, কারণ ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ উঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ,
বি—এস্ সি (ইলিনর) এম্-এ-জি-এ
বহরমপুর কলেজের বটানির অধ্যাপক।

যে কয়েকটি বড় ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়া পত্রলেখক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ অবস্থায় একরূপ অবশ্যম্ভাবী।

বিবাহ সম্বন্ধে যেথানে অভিভাবকের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় না, যৌবন প্রাপ্ত পাত্রপাত্রীর স্বাধীন নির্ব্বাচনের উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করে, সেখানে এরূপ কোর্টশিপ এবং কোর্টশিপের পর এনগেজমেণ্ট হইয়া তাহার ভঙ্গ—ইহা ঘটিবেই। বৈবাহিক ব্যাপারে এই নীতি ব্রাহ্ম সমাজ ইয়োরোপের নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং সেথানে এরূপ ঘটনা যেরূপ অহরহ ঘটিতেছে, এখানে ব্রাহ্মসমাজেও ঘটিবে। তারপর, কোনও শাস্ত্রের অথবা প্রাচীন প্রথার শাসনের বশীভূত না থাকিয়া প্রত্যেক নরনারী যার যার স্বাধীন বুদ্ধিতে চলিতে পারে—ইহাই যেথানে উত্তম নীতি বলিয়া গৃহীত হইবে, এরূপ এবং আরও কতরূপ স্বেচ্ছাচার সেখানে আসিবেই।

ডাইভোর্সের কথা তিনি লিখিয়াছেন। কিন্তু ডাইভোর্সের নামে শিহরিয়া উঠিলে চলিবে কেন? সত্যই যদি আইনের বাধা থাকে, তবে সে বাধা তুলিয়া দিয়া ডাইভোর্সের বিধি ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তন করিতেই হইবে। ইহাতে ব্রাহ্মদের দোষ কেহ দিতে পারেন না। স্ত্রী পুরুষের বৈবাহিক বন্ধন সম্বন্ধে যে বিধি তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ডাইভোর্স না হইলে চলে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও তৎসঙ্গে সামাজিক অনুমোদনে সিদ্ধ হয় না। বাঁধা নিয়মে একটা পদ্ধতিও নাই। মোট একটা ধরণ আছে, প্রত্যেক দম্পতির বিবাহে তাঁহাদের বা তাঁহাদের অভিভাবকগণের ইচ্ছানুরূপ এই ধরণের অনুবর্ত্তনে বিশেষ বিশেষ বিস্তৃত পদ্ধতি স্থির ও লিপিবদ্ধ হয়। আবার আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করিতেও হয়। এই রেজেষ্ট্রী হইলে তবে আইনে বিবাহ বন্ধন বৈধ হয়। সেই আইনের বিধি এই যে কোন বিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রী, পত্নী বা পতির জীবৎকালে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে না। করিলে তাহা অবৈধ হইবে, আইন অনুসারে কঠোর দণ্ড সে পাইবে। এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রী একে অন্যকে পরিত্যাগ করিলেও পরিত্যক্ত স্ত্রী বা পুরুষ আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে না, করিতে হইলে আদালতে প্রতিপক্ষের অপরাধ প্রমাণ করিয়া বিবাহ বন্ধন ছেদন অর্থাৎ ডাইভোর্স করিতে হয়। ইয়োরোপীয় খৃষ্টীয় সমাজের বিধিও এইরূপ। যাহা হউক এরূপ ডাইভোর্সের ঘটনা যত সহজ ও অধিক হয়, সমাজের পক্ষে তত গ্লানির কথা, পারিবারিক জীবনের ভিত্তি তত শিথিল হয়, সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ কল্যাণ তত ক্ষুণ্ণ হয়। তাই ইংরেজ সমাজে ডাইভোর্সের পথ যতদূর সম্ভব সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে,—ব্যভিচার বা ব্যভিচার বশতঃ একে অপরকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া—এরূপ ঘটনার স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত ডাইভোর্স সেখানে বড় হয় না। ডাইভোর্সের মোকদ্দমাও অতি ব্যয়সাধ্য। স্বামী স্ত্রীকে নিয়ত পীড়ন করিলে অথবা গুরুতর মনান্তরে স্বামী স্ত্রীর এক গৃহে একত্র থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিলে আদালতের ব্যবস্থা নিয়া উভয়ে পৃথক্ থাকিতে পারেন,—কিন্তু ডাইভোর্সের পূর্ণ মুক্তি পাননা কোনও পক্ষই আবার বিবাহ করিতে তাহাতে পারেন না। ইহাকে 'judicial separation' বলে। স্বাধীনতার পূর্ণ লীলাভূমি আমেরিকা সমাজে শুনিয়াছি ডাইভোর্স অনেক সহজ। দুইজনের মত যেথানে মিলে না, বনিবনাও হয় না ইহাতেও নাকি ডাইভোর্স সেখানে হইতে পারে।

ইয়োরোপীয় খৃষ্টীয় সমাজে যে কারণে ডাইভোর্সের বিধির প্রয়োজন হইয়াছে, ব্রাহ্ম সমাজেও ঠিক সেই কারণ বর্ত্তমান, সুতরাং সেখানেই বা ডাইভোর্স ছাড়া চলিবে কেন? একটা অতি মোটা রকম দৃষ্টান্ত দেখাইব, যাহা সকলেই সহজে বুঝিবেন। ধরুন বিবাহের পর কোনও স্ত্রী স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া অপর কাহারও সঙ্গে পলাইয়া

গেল। এরূপ ঘটনা পৃথিবীর সকল দেশের সকল সমাজেই ঘটিতেছে, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজেও ঘটিতে পারে। যদি কখনও তা ঘটে, সেই স্ত্রীর স্বামী তখন কি করিবেন? আর যদি বিবাহ না করিয়া পারেন, সে ভাল কথা। যদি করিতে চান—ডাইভোর্স ছাড়া উপায় কি আছে?

তারপর বড়লোক, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র-সাম্যবাদী ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এই তিন শ্রেণী এবং তাহাদের মধ্যে ব্যবহারের পার্থক্যের কথা তুলিয়া লেখক পরিতাপ করিয়াছেন। যেখানে ধর্ম্মশাস্ত্রগত কোনও বিধি বা প্রাচীন প্রথা অন্য কোনও নীতির অবলম্বনে সামাজিক একটা শ্রেণী বিভাগ ও পরস্পরের সহিত ব্যবহারের একটা পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া না দেয়, সেখানে ধনবত্তার বিভেদ আপনা হইতেই এরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করে। ইহা স্বাভাবিক। কোনও সাম্যনীতির আদেশ বা উপদেশ ইহা বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। ইয়োরোপে প্রাচীন ফিউডাল তন্ত্রের অনুগত প্রথা সমূহ সামাজিক একটা শ্রেণী বিভাগ এবং পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের একটা পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু সমাজে বর্ণ বৃত্তি ইত্যাদির অবলম্বনে জাতিভেদ একটা আছে। নূতন ব্রাহ্মসমাজে ঐরূপ কিছুই নাই। সুতরাং ধনবল প্রধান এই যুগে ধনের ভেদই একটা শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি করিতেছে।

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সকল সমাজেই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দোষগুণ মানব চরিত্রে দেখাদেয়। ব্রাহ্মসমাজে দেখা দিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পাশ্চাত্য সমাজনীতির আদর্শে সমাজ গড়িতে গিয়া হিন্দুসন্তানের পুরুষপরম্পরাগত সংস্কার-বিরোধী কতকগুলি দোষ তাহার মধ্যে দেখা দিতেছে,—দেখিয়া চমকাইলে বা পরিতাপ করিলে চলিবে কেন? ইহা ত হইবেই। আমরা ইহাতে অযথা নিন্দা করি না। তবে তাঁহারা নাকি সর্ব্বথা নির্দ্দুষ্ট 'সতী'সাজিয়া অবিরত আঙ্গুল তুলিয়া তুলিয়া হিন্দুদের দোষই কেবল দেখাইতেছেন, কত টিটকারী দিতেছেন, মন্দ ছাড়া ভাল কিছুই তাহাদের মধ্যে দেখিতেছেন না, তাই তাঁহাদের দোষগুলাও দেখাইয়া দিতে হয়,—বলিতে হয়, পৃথিবীতে হিন্দুরাই কেবল বিশ্বের সকল পাপে পাপী নয়, পাপ তাঁহাদের মধ্যেও আছে। আর এই চিঠিখানায় তাঁহাদেরই একজন, তাঁহাদের কতকগুলি দোষ দেখাইয়াছেন। আমরা ইহাই বলি এসব দোষ তাঁহারা যে মন্দলোক বলিয়া ঘটিতেছে তা নয়। দেশের রীতি নীতি অবজ্ঞায় পায় ঠেলিয়া বিদেশের রীতি নীতি ধরিয়াছিলেন সুতরাং তাদের এসব দোষ ইঁহারা এড়াইতে পারেন না। দোষগুলি সংযত রাখিবার জন্য প্রাচীন নীতির ও প্রথার যে সব বন্ধন ইয়োরোপীয় সমাজে আছে, ব্রাহ্ম সমাজে তাহার কিছুই নাই। দেশের সংস্কার পুরুষানুক্রমে চিত্ত হইতে যত দূর হইবে, এই সব দোষের মাত্রা তাঁহাদের মধ্যে তত বাড়িবে।

ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩২৬।

বাঙ্গালীর ছেলে—লেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস্। প্রবন্ধটির মধ্যে লেখক মহাশয় আমাদের বর্ত্তমান জীবনপ্রণালীর কয়েকটি বড় অভাব সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কাজের কথার আলোচনা করিয়াছেন, যাহা সকলেরই ভাবিবার, বুঝিবার ও শিখিবার বস্তু। প্রবন্ধটি পড়িয়া বড় আনন্দ হইল। বাঙ্গলার মাসিক সাহিত্যে এরূপ কাজের কথার প্রবন্ধ বড়ই কম দেখিতে পাওয়া যায়। গল্প উপন্যাস অবশ্য আছে ও থাকিবেই। তাছাড়া সেকালের ও একালের সাহিত্যের তুলনা, কাব্যের আর্ট—এই আর্ট নীতির ধারা মানিবে না একেবারে নগ্ন মুক্ত হইয়া খোস খেয়ালে নাচিয়া চলিবে; জীবন যাপনে সমাজ ধর্ম্মের কোনও নীতির বন্ধন (অর্থাৎ বিধি নিষেধ) লোকে মানিবে না সেই আর্টেরই মুক্ত নগ্ন হইয়া যা খুসী তাই করিবে। ভাষাটা সাধু সংস্কৃত হইবে, না কলিকাতার কুকুরী চ'লতি ধাঁচের হইবে ইত্যাদি আর তাই লইয়া তর্কযুদ্ধ, ইহাতেই মাসিকগুলি প্রায় ভরপুর! যেন আমাদের আর কোনও অভাব কোনও দুঃখ নাই, এখন কেবল সাহিত্য বা কাব্যরসের ধারাটা ঠিক হইলেই আর নীতির বন্ধনগুলি সব ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলেই, মানবজীবনে আমাদের চরম কৃতার্থতা লাভ হইল। ইহার মধ্যে রমেশবাবুর এই প্রবন্ধটি পড়িয়া বাস্তবিকই বড় একটা তৃপ্তি হইল। মনে হইল দেশে কি এরূপ লেখক আর দুই চারিজন মিলে না, দেশের অশেষ দুঃখ যাঁহাদিগকে বাস্তব মোটা দেশের মাটিতে টানিয়া রাখিয়াছে, মোহন প্রজাপতিটির মত হালকা রঙ্গিল পাখার বাহার ছড়াইয়া হালকা বাতাসে মিঠা রোদে কেবল যাঁহারা ফরফর করিয়া ভাবের আকাশেই উড়িয়া বেড়াইতেছেন না।

"লেখক বলিতেছেন, আমাদের সকলেই যদি বুঝিতে পারে, আমাদের অভাব ৩ইটি—শিক্ষার বিস্তৃতি ও স্বাস্থ্যলাভ, তবে উঠিয়া পড়িয়া সকলেই সেই অভাব দূর করিবার জন্য প্রয়াসী হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অবস্থা ঠিক উল্টা অর্থাৎ আমাদের দেশের লোক আদৌই জানেনা যে তাহাদের অভাব কি।"

ঠিক কথা। যাহারা অভাব জানিবেন, তাঁহারা সহরের বাবু বা সাহেব, অভাবগুলি তাহাদের গায়ে আসিয়া আঘাত করিতেছে না। তাই একদল পলিটিক্সের চর্চ্চা আর একদল সাহিত্য রসের চর্চ্চামাত্র ইহা লইয়াই মত্ত আছেন। অভাব যাহাদের তাহারা অনুভব করে, দুঃখ পায়, কিন্তু কেন এ অভাব কিসে ইহার প্রতিকার, তা তারা জানে না, বোঝে না। যারা বুঝাইতে পারে তাহাদের ত সে দিকে মনই নাই। রমেশবাবু দুইটি অভাবের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদেরই সমান আরও একটি বড় অভাব রহিয়াছে, দেশের—বিশেষ ভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপযুক্ত বৃত্তির অভাব হেতু ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্য। সে দিকেও লোকের তেমনই দৃষ্টির অভাব, সময়োচিত সতর্কতার অভাব। কেবল যাহারা ভুগিতেছে, নিরুপায় হইয়া তাহারাই হাহাকার করিতেছে। তবে রমেশবাবু চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার প্রধান অধিকার যে স্বাস্থ্যনীতির ক্ষেত্র, তার সম্বন্ধেই প্রধান ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, শিক্ষার অভাবের দোষগুলিও এই দিক ধরিয়া দেখাইয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন, "আমরাও চিকিৎসক, অপর দেশের লোকও চিকিৎসক, আমরাও মানুষ, তারাও মানুষ; তবে কেন শুধু আমরাই রোগ ও জরা ভোগ করি? তার কারণ অনেকগুলি, সেগুলি প্রণিধান করিবার উপযুক্ত।"

কারণগুলি তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১। এদেশের প্রাচীন ব্যবস্থা ছিল, চিকিৎসকগণ দাতব্য ভাবেই রোগের চিকিৎসা করিতেন, ধনীরা এবং দেশের রাজাই তাঁহাদের প্রতিপালনে অর্থ ব্যয় করিতেন। কিন্তু এখন চিকিৎসা একটা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। চিকিৎসক সম্প্রদায় সাধারণ সমাজ হইতে পৃথক এক গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং লোকে তাহাদিগকে জীবনের নিত্য ঘটনার মধ্যে বড় আনিতে চায়না। (বস্তুতঃ পূর্ব্বে ছিল, এখনও গ্রামঅঞ্চলে কোথাও দেখা যায়—রোগীর মৃত্যুর হইলেও চিকিৎসকগণ আত্মীয়ের ন্যায় তাহার সংকারে সাহায্য করেন, শবদাহকের ন্যায় শ্রাদ্ধেও চিকিৎসকের নিমন্ত্রণ একটা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে। এখন নগরে চিকিৎসকগণ রোগীকে মুমূর্ষু দেখিলেই দ্রুত প্রস্থান করেন—অপেক্ষা করেন কেবল ফির টাকা কয়টির জন্য—গৃহস্থকে মরন্ত পুত্র ফেলিয়াও ফির টাকা লইয়া ডাক্তারের গাড়ীর কাছে ছুটিতে হয়। রমেশবাবু বলিয়াছেন,—

"এখন চিকিৎসকের পক্ষেও ব্যবসার হিসাবে ব্যারাম 'আরোগ্য' করাটাই লাভজনক বলিয়া তাঁহারা ব্যারাম 'নিবারণের' জন্য তাঁহারা আদৌ 'ব্যস্ত হন না'।

২। "গবর্ণমেণ্ট মোটাবেতনে সিভিলসার্জ্জন এবং তন্ন্যূন বেতনে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট রাখিয়া এবং তাহাদিগকে অবাধ প্রাকটিস্ করিবার সুযোগ দেওয়ায় বেসরকারী চিকিৎসকবৃন্দ প্রতিযোগিতায় অনেক স্থলে সফল হইতে পারেন না। কাজেই যাহারা সরকারী কাজ করে তাহাদের সময়ও সহানুভূতির অভাব এবং যাহারা বেসরকারী চিকিৎসক তাহাদের অর্থের অভাব বশতঃ সাধারণের উপকার হয়, এরূপ কার্য্যে উভয়ের কেহই মন দিতে পারেন না।" * * "দেশের মধ্যে যদি সচ্ছন্দভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় চাণান সম্ভব হইত, যদি হাসপাতালগুলিতে স্থানীয় চিকিৎসকবৃন্দ মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে পল্লীগ্রামে চিকিৎসকগণের বাহুল্য ও তাঁহাদের বিদ্যা ও বহুদর্শিতার বৃদ্ধি ঘটিত এবং সেই সঙ্গে সহৃদয়তার ফলে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিত, এবং বেতনভুক্ স্বাস্থ্যপরিদর্শকের নিয়োগের প্রয়োজন থাকিলেও, তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি তাবৎ দেশবাসীর খরদৃষ্টি থাকিতে পাইত।"

৩। চিকিৎসা ব্যবসায় পৃথক এক গণ্ডীর মধ্যে পড়ায় সাধারণ লোক স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে কোনও তত্ত্ব রাখিতে চান না। সকল বিদ্যালয়েই স্বাস্থ্যনীতি-শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বালিকা বিদ্যালয়ে এম্, এ বিএ প্রভৃতি উপাধির বিড়ম্বনা না রাখিয়া ধাত্রী বিদ্যা, শুশ্রূষাকারিণী বিদ্যা, রন্ধন বিদ্যা, গৃহস্থালী প্রভৃতি বিদ্যার সমাদর হওয়া বাঞ্ছনীয়।" "আমি চাহি না যে ঘরে ঘরে রমণীরা বীজগণিতের কূট অঙ্ক সমাধান করুন, আমি চাহি যে ঘরে ঘরে পুরুষেরা রমণীদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেন।" (হায়, নিজেরা জানিলে ত দিবেন? স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে সর্ব্বজনবোধ্য পুস্তকও বড় দেখা যায় না। গেলেও যে টাকায় দু'খানা সরস রঙ্গিল নভেল না কিনিয়া ওসব বাজে নীরস বই কে কিনিবে?)

৪। জাতীয় একতার অভাব। "জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষ সকলে মিলিয়া কাজ করিতে হইবে। হীন স্বার্থ বা তুচ্ছ আত্মাভিমান লইয়া দলাদলি করিবার আর সময় নহে—সে দিন চলিয়া গিয়াছে।" * * "দেশের লোক লইয়া লোকমত প্রবল করিতে হইবে। লোকমত প্রবল হইলে দেশ মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ও স্বাস্থ্যোন্নতির অভাব হইবে না।" * * *

দেশের লোক অজ্ঞ।—"অবস্থা ও ধারণা বিপরীত হওয়ার সঙ্গে ব্যবস্থাও বিপরীত রকম হইতেছে। অর্থাৎ কোথায় দেশের লোকের কথায়, দেশের লোকের সাহচর্য্যে, দেশের লোকের দ্বারা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা হইবে, তাহা না হইয়া—সুদূর সিমলা বা দার্জ্জিলিং মেলে বসিয়া স্বাস্থ্য-

বিধি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, আর দেশের লোকেরা অদৃষ্টের প্রহারের মত কতকটা "বোঝার উপর শাকের আটি"র মত তাহা গায়ে মাখিয়া নিতেছে!" * * * "রাষ্ট্র শক্তি যাহাতে প্রজার হস্তে সম্পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ কতকপরিমাণে ন্যস্ত হয়, দেশময় সেই আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশময় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যাবস্তারকল্পে সভাসমিতি কই?" * * * "আগে দেশের লোককে খাইতে ও বাঁচিতে দিতে হইবে, তবে ত রাষ্টশক্তি উপভোগ করিবার সুযোগ হইবে! যে চেষ্টায় কংগ্রেস হইতেছে, সেই চেষ্টাকে সমস্ত বর্ষব্যাপী এবং ক্রমানুযায়িক করিতে পারিলে এবং তাহাতে প্রাণের সংযোগ থাকিলে কত কাজ করা যাইতে পারে। দেশের লোককে জানাইতে হইবে ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি নিবার্য্য ব্যাধিগুলি কি কারণে হয়, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে নিবারণ করিবার উপায়গুলিও জানাইয়া দিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গে দেশের লোকের কর্ণে ও মর্ম্মে বেশ করিয়া এই কথাগুলি প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে যে, পৃথিবীতে আর কোথাও এই সকল ব্যাধির তাদৃশ উৎপাত নাই,—অতএব আমাদের দেশেও উহা থাকিতে পারে না।"

তারপর রমেশ বাবু শিশুস্বাস্থ্যের দুর্গতির কথা আলোচনা করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া ইহার প্রধান কারণ, কিন্তু সে কারণ কিসে দূর হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ম্যালেরিয়া ছাড়া অন্য কারণ গুলির উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। পিতামাতার অজ্ঞতাই ইহার মধ্যে প্রধান বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই অজ্ঞতা হেতু পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের দায়িত্ববোধ অপেক্ষা আপাত ভোগবিলাসের দিকেই ইঁহাদের মনের প্রধান আকর্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞানের অভাব হেতু দেশকাল পাত্র সম্বন্ধে কোনও বিবেচনা না করিয়া শিশুর পোষাক পরিচ্ছদ, স্নান আহার, সকল বিষয়েই সকলে যাঁর যাঁর খেয়াল বা সক ও সুবিধামত চলেন, স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবে চলিতে শিশুদের বাধ্য করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, শিশুরা মিষ্ট ও টক খাইতে ভালবাসে, আর তারা নগ্ন থাকিতে চায়। তিনটিই শিশুদের স্বভাবের প্রেরণা। ইহাতে স্বাস্থ্য তাহাদের ভাল থাকে, শরীরের পুষ্টি শক্তি তেজ ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ আমরা প্রাণপণে তাহাতে বাধা দিই। শিশুকে সর্ব্বদা বস্ত্রাবৃত রাখার সম্বন্ধে লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে অন্ততঃ আট মাস গ্রীষ্ম এবং চারিমাস মাত্র শীত। অথচ, অনেক স্থলে দেখা যায় সকল ঋতুতেই পিতামাতার খেয়াল বা অহঙ্কার পরিতৃপ্তি করিবার জন্য নানা রকম জামা কাপড় শিশুদিগকে পরাইয়া দেওয়া হয়। আজ কাল এমন কি দুই তিন মাসের শিশুকেও লজ্জানিবারক কৌপীন বা পাজামা ব্যতীত সহরে দেখা যায় না।" * * *

তারপর শিশুরা স্বতঃই জল ঘাঁটিতে ভালবাসে এবং নগ্নপদে জলে জলে বেড়াইতে পারিলে সুখী হয়। জল ঘাঁটিতে দেওয়া না হউক, প্রত্যহ স্নান করাইলে শিশুরা অতি স্বাস্থ্যবান্ হয়। শিশুরা চিৎকার করিতে ভালবাসে, ইহাতে তাহাদের বুকের জোর বাড়ে। ইহাতে বাধা দেওয়াও অতি অন্যায়। অথচ শিশুকে শিষ্ট ও ভদ্র করিবার অভিপ্রায়ে সকলেই তাহা করেন।

প্রসাধন চিত্র। একেলে বাঙ্গালী মেয়ের মত রূপ ও সাজ পোষাক,—প্রসাধন দ্রব্যাদিও রহিয়াছে, হালফ্যাসানের একখানি তেপায়ার উপরে। প্রসাধনকারিণী, পায়ে আলতা পরিতেছেন, কিন্তু পায়ের নীচে খড়ম রহিয়াছে। হাল ফ্যাসানের বাঙ্গালী মেয়েরা জুতা পরিয়া থাকেন খড়ম কোথাও কেহ পরেন না। তবে জুতা পায় দিলে আলতা পরা বৃথা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া খড়ম কেন? গ্রামের হাটে বাজারে এক শ্রেণীর নারীরা খড়ম পায় দিয়া জল চৌকির উপরে বসিয়া ডাবা হুঁকায় তামাক খায়। কিন্তু প্রবীণ কি নবীন বাঙ্গালী কোনও গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের পায়ে খড়ম কোথাও কি কেহ দেখিয়াছেন?

ব্যঙ্গচিত্র। চিত্রকর—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জমিদার' 'কবি,' 'পিতা ও পুত্র' এবং 'টাইপ বাবু' চারিখানি ব্যঙ্গ বা রঙ্গচিত্র আছে। 'জমিদার' ও 'কবির' চিত্র দুইখানি বুঝিলাম। 'পিতা ও পুত্রে' এক স্থূলকায় বিকটরূপ পিতা, রুগ্নশীর্ণ পুত্রকে বোধ হয় ঔষধ খাওয়াইতেছেন। ইহার মধ্যে ব্যঙ্গের বা রঙ্গের কি আছে বুঝিতে পারিলাম না। এদেশে কদাকার লোকও আছে, স্থূলকায় লোকও আছে—রুগ্নপুত্রও ঘরে ঘরে আছে। তাই বলিয়া কি সেই পিতা তাঁর রুগ্ন পুত্রকে ঔষধ খাওয়াইবেন না? পিতার কদাকার চেহারাটাই যেন চিত্রকরের বিদ্রূপের বস্তু! তা বেচারীর তাতে এমন দোষ কি? চিত্রকর নিজে যদি সুরূপ হন, তাই বলিয়া কুরূপকে বিদ্রূপ করিবেন?

তারপর 'টাইপ বাবু'। 'টাইপ বাবু'ই হউন আর 'কলম বাবুই' হ'উন, এদেশের অনেকেই কেরাণী। পেটের দায়ে রাতদিন খাটিয়া পেটভরা ভাত না পাইয়া অনেক কেরাণীই জীর্ণশীর্ণ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। এ দুঃখের চিত্র কি বিদ্রূপের বস্তু! এ চিত্র চিত্রকরের সহৃদয়তার পরিচয় দিতেছে না।

পল্লীর প্রাণ

[উপন্যাস]

(৩৬)

কাদম্বিনীর বড় লজ্জা করিতেছিল। ঘোমটা দিয়া ভাত দিয়া গিয়াছিল, শাশুড়ী কাছে বসিয়াছিলেন, কোনও বালাই ছিল না। কিন্তু এখন কেমন করিয়া সে স্বামীর ঘরে ঢুকিবে, কেমন করিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিবে, কি তাঁকে বলিবে, কিছুই সে ভাবিয়া কুল পাইতেছিল না। কোনও গুরুতর অপরাধ কারও কাছে করিলে যেমন লোকের মনে হয়,—ছি, ছি, কেমন করিয়া গিয়া উহাকে মুখ দেখাইবে,—ঠিক তেমনই একটা ভাব কাদম্বিনীর মনে হইতেছিল, স্বামীকে সত্যই যেন তার মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতেছিল। অন্ততঃ আজ রাত্রিটাও যদি সে কোনও ছুঁতায় শাশুড়ীর সঙ্গে গিয়া শুইয়া থাকিতে পারিত, তবে যেন হাতে স্বর্গ পাইত। কিন্তু নিবারণ আহার করিয়া উঠিয়া যাইবামাত্র ভবানী কহিলেন, "যাও ছোট বউমা, দুটি খেয়ে সকাল সকাল ঘরে যাও। আমার জপ টপ বাকী আছে, ঢের রাত হ'বে, তুমি ব'সে থেকো না।"

শাশুড়ীর কোন কথায় কোনওরূপ প্রতিবাদ কখনও কাদম্বিনী করে নাই, আজ এই 'অশুভে' কিছু 'কালহরণ' করিবারও কোনও উপায় রহিল না। এই আদেশ দিয়া ভবানী উঠিয়া গেলেন। কাদম্বিনী অগত্যা দুই গ্রাস ভাত মুখে দিয়া শয়নগৃহাভিমুখে গেল। কিন্তু পা যেন চলিতে চাহে না,—বুক দুরু দুরু কাঁপিতেছিল—ছি, ছি! কেমন করিয়া সে গিয়া ঘরে ঢুকিবে?—কেমন করিয়া ওঁর মুখের দিকে চাহিবে? কিন্তু তার এত লজ্জা এত সঙ্কোচ কেন? সে ত কোনও অপরাধ করে নাই। সে অবশ্য কোনও অপরাধ করে নাই,—কিন্তু স্বামী যে বড় একটা লজ্জা পাইয়াছেন, সারাটি দিন সেই লজ্জায় বাহিরে বসিয়াছিলেন। সে ঘরে গেলে হয়ত আরও লজ্জা পাইবেন,—তার কাছে বড় কুণ্ঠিত হইবেন। হয়ত মনে করিতেছেন, সেও এই কুকথা বিশ্বাস করিয়াছে,—তাই লজ্জায় তার দিকে চাহিতেও পারিবেন না। তাকে দেখিলে একেবারে মরিয়া যাইবেন। ওমা, এত বড় একটা লজ্জা সে তাঁকে কেমন করিয়া দিবে! সত্য যদি এইরূপ একটা অপরাধ করিয়া, নির্লজ্জ নিঃকুণ্ঠভাবে আসিয়া তাকে আরও তাড়না তিনি করিতেন, তাও যেন ইহা অপেক্ষা অধিক সহনীয় বলিয়া সে মনে করিত! কিন্তু তার কাছে তাঁর এই লজ্জা, এমন একটা অপরাধ ভাব—ছি, ছি, কেমন করিয়া সে ঘরে যাইবে, তাঁর সামনে গিয়া দাঁড়াইবে!

দরজার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল।—ঘরে আর উঠিতে পারে না। নিবারণ ঘরের মধ্যে বিছানার এক ধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। খোকা আর এক ধারে ঘুমাইতেছিল,—হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। ভবানী ঠাকুরঘরে আহ্নিকে বসিয়াছিলেন, চিৎকার করিয়া ডকিলেন,—"খোকা কাঁদে কেন রে? ও ছোট বউমা!"

কাদম্বিনী তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢুকিল,—খোকাকে কোলে তুলিয়া নিয়া একটু ঘুরিয়া বসিয়া তার মুখে মাই দিল। নিবারণ কল্‌কিটা নামাইয়া হুঁকাটা ঘরের বেড়ার গায়ে ঠেকাইয়া রাখিল। কাদম্বিনীর দিকে ফিরিয়া চাহিল—দুই একবার কাসিল—শেষে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "খোকার অসুখ ক'রেছে কিছু?"

কাদম্বিনী মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "না, অসুখ কি ক'রবে? এমনিই ঘুম ভেঙ্গে গেচে—কেঁদে উঠেছে।"

আরও কয়েক মিনিট গেল—খোকা আর ঘুমায় না,—'হাঁ—হুঁ—মা—আব্বা!'—ইত্যাদি শব্দ করিয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিল। কাদম্বিনী তাকে তুলিয়া নিবারণের দিকে সরাইয়া দিল। নিবারণ শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মুখে চুম্বন করিল,—মনের ভার কতকটা যেন লঘু হইল, লজ্জার সঙ্কোচও অনেকটা কাটিয়া গেল। কাদম্বিনী একবার ফিরিয়া চাহিল। নিবারণ কহিল, "একটা কথা তোমায় ব'লব কাদু—"

'কি?" লজ্জায় কাদম্বিনীর মুখখানি আবার নত হইয়া পড়িল। খোকার একখানি কাঁথা সে আঙ্গুলে খুঁটিতে লাগিল। নিবারণ আবার একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল,—কাদম্বিনী কহিল, "থাক্, তুমি ঘুমোও এখন, ও কথায় আর কাজ কি?"

কাদম্বিনীর হাতখানি হাতে টানিয়া নিয়া নিবারণ কহিল, "তুমি কি রাগ ক'রেছ কাদু?"

"রাগ! ওমা, রাগ কেন ক'র্ব?"

"তবে কি ভাবছ তুমি?"

কাদম্বিনী কহিল, "কি ভাব্ব? ছি, তুমি ও সব ভেবে মনে কোন দুঃখ ক'রো না,—এমন পুণ্যোৎ, সারাটি দিন ওই ভাবে গেছে——"

নিবারণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া তার হাতখানি হাতে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "তোমার মনে যদি কোনও সন্দেহ- কোনও দুঃখ হ'য়ে থাকে তা যে আজ আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ কাদু?"

সজল চক্ষু দুটি তুলিয়া কাদম্বিনী স্বামীর মুখপানে চাহিল,—দুই হাতে স্বামীর কটি জড়াইয়া ধরিয়া তার কোলে সজল সেই মুখখানি রাখিয়া কহিল, "না—না, ছি! তুমি কি পাগল? এই রকম একটা সন্দেহ তোমায় আমি ক'র্ত্তে পারি? ছি! তবে দুঃখু বড়ই হ'চ্ছে,—কত বড় দুঃখটা আজ তুমি পেয়েছ, লোকে কত কি ব'লছে,—কত মুখ ছোট তোমার হ'য়েছে,—তাই বড় দুঃখু আজ আমার হ'য়েছে,—তা কি হয় না?"

স্ত্রীর মাথায় স্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিবারণ কহিল, "তা কেন হবে না? সে দুঃখ ত আমারই দুখের ভাগ কাদু। দুঃখ আমি আজ খুবই পেয়েছি কাদু,—কিন্তু নিজের জন্য তত নয়,—যত নাকি সেই—সেই—অভাগী কুন্তীর জন্য। তার কথা আজ একবার ভেবে দেখ দিকি কাদু?"

কাদম্বিনী উঠিয়া বসিল,—কহিল, "সত্যি, আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম।—তোমার সত্যি—কে এমন কি ক'র্‌তে পারে? আমরা যদি তোমায় দুঃখু কিছু না দিই, তবে—অনিষ্টি এ রকম একটা নিন্দে বড় লজ্জার কথা—তা এমন পাথারে ত তোমার কিছু প'ড়্‌তে হয় না।"

"না, তবে তারা আজ একেবারেই পাথারে প'ড়েছে! ভবিষ্যতে যে দুর্গতি হবার তা ত হবেই, আজই যে তাদের একেবারে পথে দাঁড়াবার মত হ'য়েছে।—বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, আর সে মুখো হ'তে পার্‌বে না। শীতল চক্রবর্ত্তী এসে ব'লে গেলেন, আজ এই রাত্তিরটাও তাঁর বাড়ীতে তিনি আর তাদের রাখ্‌তে পার্‌বেন না।" নিবারণ বড় গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

কাদম্বিনীর সরল কোমল প্রাণটা একেবারে কাঁদিয়া উঠিল,- কহিল, "আহা, কি ক'র্‌বে তারা তবে? কে আর তাদের আশ্রয় দেবে? তা মাকে বল না? তিনি যদি বলেন, তবে ——"

"কি তবে কাদু?"

"অনিষ্টি ব'ল্‌তে আমার লজ্জা করে, লোকে আরও নিন্দে ক'র্‌বে,—মাও কি ভাব্‌বেন জানি না। তবে তিনি যদি——"

নিবারণের মুখে একটু হাসি ফুটিল। কহিল, "কি, আমাদের এই বাড়ীতে———"

"কাদম্বিনীও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "হাঁ, তাই ভাব্‌ছিলাম। তা লোকে যা বলে বলুক গে, বয়ে গেছে। তুমি মাকে বল না? তিনি যদি বলেন———"

নিবারণ আবার একটু হাসিল—কহিল, "মাকে ব'লেছি কাদু।"

"তিনি কি ব'ল্লেন? আপত্তি ক'র্লেন?" নিবারণ তখন সব দুঃখ—সব লজ্জা—ভুলিয়া গিয়াছিল। মন যেন নূতন এক চঞ্চল আনন্দের উচ্ছ্বাসে নৃত্য করিতেছিল। সমবেদনায় করুণায় আত্মবিস্মৃতা অমন স্ত্রী সম্মুখে বসিয়া, স্নেহের পুতলী চাঁদের মত অমন শিশু গায়ের উপর খেলা করিতেছে, এই পৃথিবীর কি এমন দুঃখ আছে—এই অমৃতপ্রবাহে ভাসমান-হৃদয়ে যাহার বিষ এতটুকুও স্পর্শ করিতে পারে!

হাসিয়া কাদম্বিনীর হাতখানি হাতে জড়াইয়া নিয়া নিবারণ কহিল, "তাঁর আপত্তি কিছুই নেই কাদু! - তোমার আপত্তির ভয় করেন। তোমার অনুমতি নিতে আমাকে ব'ল্লেন।"

"আমার আপত্তি! আমার অনুমতি! ওমা, সে কি!"

নিবারণ কহিল, "মা ব'ল্লেন—আর সে ঠিক কথাই—এ সব ব্যাপারে তোমার আপত্তির কারণ যত হ'তে পারে, তাঁর তত পারে না।"

"কেন, পরের মেয়ে ব'লে কি আমি এতই পর? ছি!"

"সেটা—যদি পার—তোমাতে আর তাঁতে মীমাংসা ক'রে নিও। আমি ব'ল্‌তে পারি না কাদু। তিনি মা, আমার দেবতা! আর তুমি—তুমি—তুমি আমার—" বলিতে বলিতে কাদম্বিনীকে বক্ষে টানিয়া নিয়া নিবারণ

তার মুখে মুখখানি চাপিয়া ধরিল। শিশু হাসিয়া কুঁদিয়া দুইজনের মধ্যে তার ছোট মুখখানি ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। শিশুর মুখে চুমা খাইয়া নিবারণ তাকে কাদম্বিনীর কোলে দিয়া কহিল, "এই নেও—তুমি আমার এই দুলালের মা। আমার যে কি তা আর—ব'লতে পারলাম না কাদু। তুমি হয়ত ব'লবে দাসী,—কিন্তু আমি যদি বলি রাণী—তাও কি ঠিক হয় কাদু?"

খোকা লহর তুলিয়া হাসিল। হাসিমাখা সরল মুখখানিতে খোকার মুখে চুম্বন করিয়া কাদম্বিনী কহিল, "নেও, আর এখন অত রঙ্গে কাজ নেই। ওই ত তোমাদের ধরণ। একটা মেয়েকে এত বড় বিপদে ফেলেছ, আবার নিজের বড় রঙ্গ দেখা দিয়েছে।"

"কি ক'রব কাদু? এ রঙ্গ যে আজ তুমিই দেখালে।"

"হাঁ, আমি দেখালাম বই কি? তা এই রঙ্গেই কি ঘরে ব'সে থাকবে? যা হয় একটা কর,—আজ রাত্তিরেই নাকি চক্কোত্তীরা তাদের তাড়িয়ে দেবে।"

নিবারণের মুখখানি আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। একটি নিশ্বাস সে ছাড়িল, কহিল, "হাঁ, মাকে নিয়ে এখনই সেখানে যেতে হবে কাদু।—তা হ'লে—না, আর দেরী করা উচিত নয়। উঠি তবে এখন।"

নিবারণ উঠিয়া দাঁড়াইল। কাদম্বিনীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। নিবারণ একবার তার দিকে চাহিল—বক্ষে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখে গাঢ় একটি চুম্বন দিয়া কহিল, "আসি তবে কাদু। আমার বড় দুঃখী বোন্ সে,—তোমার হাতে এনে ফেলে দেব। যত দিন কেউ তাকে না নেয়,—তার সুখ দুঃখ সব তোমারই হাতে।"

কাদম্বিনী কহিল, "আমি কি ক'র্ত্তে পারি বল? তার কপাল! মা দুর্গা করুন, রাজার রাণী সে হ'ক।"

"তাই হ'ক, মুখে তোমার ফুলচন্দন পড়ুক।" আস্তে কাদম্বিনীর কাঁধে হাতখানি রাখিয়া—একটু কাছে তাকে টানিয়া নিয়া, নিবারণ শেষে বাহির হইয়া গেল।

ঠাকুর ঘরে তখনও আলো ছিল।—নিবারণ ডাকিল, "মা!"

"কি বাবা!"

"তোমার আহ্নিক হয়নি এখনও?"

"হাঁ, এই ত হ'ল।"—জপের থলেটি গুটাইয়া মাথায় ও বক্ষে ছোঁয়াইয়া ঝুঙ্গীর মধ্যে ভবানী তাহা রাখিলেন। তারপর ভূ-নতা হইয়া ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন।

"কি বাবা?"

"চক্কোত্তী খুড়োর ওখানে এখন যেতে হয়!—তা তুমি জল টল্ কিছু খেয়ে নেও।"

"না,—থাক্ এখন। চল্—দেরী হ'য়ে যাবে।"

প্রদীপটি নিভাইয়া ভবানী ঘরে নিয়া রাখিলেন,—দরজায় একটি তালা বন্ধ করিয়া বাহির হইলেন। কহিলেন, "এক কাজ কর নিবু। ফয়েজকে একটা ডাক্ দে। খালি বাড়ী, বউমা একা—ভয় টয় পাবে শেষে। পাড়ার—না কাউকে আর জানিয়ে কাজ নেই।"

নিবারণ ছুটিয়া গিয়া ফয়েজকে ডাকিয়া আনিল,—তার বাড়ী নিকটেই ছিল। বরাবরই সে নিবারণের বড় অনুগত ছিল। এখন বাপ বেটায় তারা নিবারণের ক্ষেতে কাজ করিত, আরও অনুগত হইয়াছিল। নিবারণ ডাকিবামাত্র ফয়েজ উঠিয়া আসিল। তাকে পাহারায় রাখিয়া মাতা পুত্র নিঃশব্দে শীতল চক্রবর্ত্তীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(৩৭)

রাত্রি অনেক হইয়াছে। শীতল চক্রবর্ত্তীর গৃহিণী ত্রিতাপহারিণী একটি কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়া নিয়া তখনও দাওয়ায় বসিয়া বকাবকি করিতেছেন। কি বিষম পাপের ভোগেই তিনি পড়িয়াছেন। সারারাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহাকে বাহিরে বসিয়া থাকিতে হইবে নাকি? কাল সারারাত্রি গিয়াছে,—দিনেও একটু স্বস্তির নিশ্বাস কি ফেলিতে পারিয়াছেন? এতখানি রাত্রি হইল, সারাটি পৃথিবী নিঝুম হইয়া গিয়াছে। তা পাপ বিদায় না হইলে তিনি ত স্বস্তি হইয়া গিয়া একটু শুইতেও পারেন না ছাই! যাদের পাপ, তারা আসিয়া কেন নিয়া যাক্ না! কার বালাই পড়িয়াছে, সারারাত্রি ইহা লইয়া বসিয়া থাকিবে! তার কি আর আসিবে? পরের ঘাড়ে পাপের বোঝা ফেলিয়া ঘরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। কলিকাল, একটু ধর্ম্মজ্ঞান কি কারও এখন আছে? আর তা থাকিলে এমন পাপ ঘটিবেই বা কেন। ওরাই বা কেন বিদায় হয় না? একটু লজ্জাও কি নাই? গেরস্তর বাড়ীতে কোন্ মুখে আসিয়া সাঁধিয়াছে! আর ঠাঁই না থাকে

বাজারে কেন যাক্ না? ভাবনা কি? কত লোক আদর ক'রিয়া যায়গা দিবে।—আর মিন্সেও যেমন! পরের কথায় ভুলিয়া নিজের মাথা এমন করিয়া কেহ কাটিয়া দেয়! মুখে আগুন! মুখে আগুন!

একধারে উপবিষ্ট নীরব মিন্সের মুখে সত্যই তখন অগ্নি না হউক, ধূম-সংযোগ হইতেছিল। তা প্রবাদ বাক্যও একটা আছে 'পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ধূমাৎ।'

এমন সময় নিবারণের সঙ্গে ভবানী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন,—ত্রিতাপহারিণী কহিলেন, "এই যে! তবু এতক্ষণে দয়া তোমাদের হ'ল দিদি! তা তোমাদের পাপ—যা হয় একটা কর। গরীবকে এ ভাবে জ্বালান কেন বল দিকি? তোমরা নাকি বড় ধর্ম্মিষ্ঠ, বড় বিবেচকী, তা এটা কি রকম বিবেচনা হ'ল বল ত?"

শীতল চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "আ হা—হা! হ'ল কি তোমার পেত্নীর মা! ক্ষেপ্‌লে নাকি একেবারে? কাকে কি ব'লছ, একটু হিসেব নেই তোমার?"

ত্রিতাপহারিণী গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "ক্ষেপাও কেন? এই পাপ যখন বাড়ীতে এনে ঠাঁই দিয়েছিলে, তখন মনে ছিল না? ঢাকে ডাকে ঢোল, কোনও পাপে কখনও নেই। এ সব সইতে পার্‌ব না ব'লছি,—কেন সইব? খাই পরি কারোটা?—ক্ষুদ খাই, কুঁড়ো খাই, কোনও ধর্ম্মিষ্ঠীর দোরে ভিক্ষে মাগ্‌তে কখনও যাই? তোমার ইচ্ছে হয়, গলবস্ত্র হ'য়ে গিয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়,—আমার দায় প'ড়েছে! পোড়া কপাল! কত ধর্ম্মিষ্ঠীই অমন দেখ্‌লাম।" মুখ বাঁকাইয়া ত্রিতাপহারিণী দুইটি হাত ঘুরাইয়া আনিলেন।

ভবানী একেবারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিবারণ ক্রোধে ফুলিতে লাগিল। কিন্তু সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া চাপিয়াই রহিল। শীতল চক্রবর্ত্তী তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া কহিলেন, "এস বৌঠাকরুণ, এস! ওটা পাগল—আবার চ'টে গেছে—"

ত্রিতাপহারিণী উত্তর কহিলেন, "হাঁ, পাগল বই কি! তা পাগল হ'য়ে থাকি, হ'য়েছি। ওঁদের মত অমন ধর্ম্মিষ্ঠী আর অমন বিবেচকী ত আমরা নই,—কাজেই পাগল হ'তে হয়। নইলে উলু দিয়ে জামাই বরণ না ক'রে পাপ মুখে যা আসে তাই বলি! বলি, ও দিদি! বাড়ীতে আল্‌পনা দিয়ে বরণডালা সাজিয়ে রেখে এসেছ ত? আর পাল্কী বেহারা ঢাক্, ঢোল, মশাল নিয়ে আসনি—বিবেচনাই বা তোমার কি! আমরা না হয় পাগলই আছি।"

ভবানী উত্তর করিলেন, "আমার ছেলেকে আমি জানি বোন্, না জান্‌লে আজ আস্‌তে পার্‌তাম না। দরকার হ'লে বিয়ে দিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়েও আমি ওকে সচ্ছন্দে ঘরে নিয়ে যেতে পারি। তা সে দরকার হবে না,—নিজের নিষ্কলঙ্ক মেয়ের মতই ওকে আমি আমার ঘরে নিয়ে রাখ্‌ব। তার জন্যে তোমার কেন, তোমার মত আর যত মুখরা গাঁয়ে আছে, সবাই দল বেঁধে এসে গাল দিলেও আমি ভয় পাব না। তা কোথায় শীতল, কোন্ ঘরে ওরা আছে?"

"এই যে এই ঘরে।" তাড়াতাড়ি কুপিটি লইয়া আসিয়া উঠানের একপাশে ছোট একখানি জীর্ণ ঘরের দরজায় শীতল চক্রবর্ত্তী আলোটা রাখিয়া দিলেন। ভবানী গিয়া ঘরে উঠিলেন। নিবারণ দরজার বাহিরে পৈঠার উপরে বসিল।—

ভবানী ঘরে উঠিয়াই কহিলেন, "ওঠ্ কমলা, চল্, আমার বাড়ীতে চল্,—এক মুহূর্ত্তও আর এখানে থাক্‌বার দরকার নেই। তুই আমার বোন্, আর তোর কুন্তী আজ আমারও মেয়ে। চল্, ভয় কি তোর?"

কমলা কাঁদিয়া কহিলেন, "দিদি, এই পৃথিবীতে আজ কোথাও আর আমার দাঁড়াবার যায়গা নাই,—মুখের দিকে চাইব, এমন একটি লোক নাই। দয়া ক'রে তুমি ডাকছ,—চল তোমার ঘরেই যাই, ভাল মন্দ তুমিই জান দিদি!"

ভবানী কহিলেন, "কিছু ভাবিস্‌নি বোন্, ওই তের্‌তাপী আজ যাই বলুক্, আমি যদি তোদের আমার ঘরে নিয়ে যাই,—কেউ কিছু ব'ল্‌তে পার্‌বে না।—আজ ব'ল্লেও, কাল আর ব'ল্‌বে না,—বুঝবে। গাঁয়ে মানুষও আছে, সবাই তের্‌তাপী কি বামা নয়। চল্ ওঠ্—আর দেরী করিস্ নি।"

কথাগুলি ভবানী বেশ একটু চড়া গলায়ই বলিতে-ছিলেন,—ত্রিতাপহারিণীর কাণে তাহা গেল। কিন্তু তিনি আর কোন উত্তর করিলেন না। ভবানী বয়সে তাঁহার জননীরও জ্যেষ্ঠা, গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী।—মুখরা হইলেও ভবানীকে তিনি কোনও কটু কথা বলিতে কখনও ভরসা করেন নাই, সেরূপ

প্রয়োজনও কখনও অবশ্য হয় নাই। তবে আজ—রাগ হইলে নাকি কাহারও জ্ঞান থাকে না—মনে মনে এখন একটু একটু লজ্জাই পাইতেছিলেন।—কিন্তু সে লজ্জা স্বীকার করিয়া কিছু নত হইবেন, এমন পাত্রী তিনি ছিলেন না। বামার সঙ্গে তুলনাটা যে তিনি নীরবে সহিয়া গেলেন, ইহাই যথেষ্ট বলিতে হইবে।

কমলা ডাকিলেন, "কুন্তী! ওঠ—চল্ তবে।"

কুন্তী এক কোণে হাঁটুর উপরে মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল,—মাতার ডাকে আরক্ত মুখখানি তুলিল,—ধীরস্বরে কহিল, "না মা, আর কোথাও যাব না,—ঘরে চল।"

"ঘরে! হা আবাগী! ঘরে কি আর যাবার যো আছে?"

কুন্তী উত্তর করিল, "ঘর তোমার, কেন যেতে পারবে না? তারা গাল দেবে? দিক্! কত গাল দেবে? কি আর বেশী গাল দেবে? যত পারে দিক্, মুখ বুজে স'য়ে থেকো। না মা, আর কোথাও যাব না,—ঘরে চল।"

কমলা ভবানীর মুখপানে চাহিলেন। ভবানী স্নেহ-করুণকণ্ঠে ডাকিলেন, "কুন্তী।"

কুন্তী কহিল, "আপনি রাগ ক'রবেন না জ্যাঠাইমা, আপনার দয়ার পার নাই। আজ বেতর হ'য়ে আপনার মুখে মুখেও কথা ব'লতে হ'চ্ছে,—কিন্তু কি ক'রব, আপনার ওখানে—না, তা যেতে পারব না জ্যাঠাইমা! আপনি মাকে বলুন,—যাই কপালে থাক্, আমরা ঘরেই ফিরে যাই।"

ভবানী একটু ভাবিয়া কহিলেন, "কুন্তী বড় হ'য়েছে—যেতে চায় না—জোর ক'রে আমি নিতে চাইনে বোন্। তা যাও, বরং ঘরেই যাও, দেখ,—যদি বাড়াবাড়িই কিছু করে, টি'কতে না পার,—তখন এসো। কি ব'লিস্ নিবু তুই?"

নিবারণ উত্তর করিল, "আমি আর কি ব'লব মা! বেশ—তাই হ'ক্।"

ভবানী কহিলেন, "চল বোন্ তবে। আমরাই তোদের বাড়ীতে পৌছে দিয়ে যাব।—আর—কি জানি ওরা কি বলে কি করে,—আমি আজ তোদের কাছেই বরং থাক্‌ব। নিবু, চল্, আমাদের পৌছে দিয়ে তুই বাড়ী যা।"

শীতল চক্রবর্ত্তীর-গৃহ হইতে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কমলা থর থর কাঁপিতেছিলেন। ভবানী তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। কেতুর হাতখানি ধরিয়া কুন্তী স্থির দৃঢ়পাদক্ষেপে ইঁহাদের পশ্চাতে চলিল। বাড়ীর সম্মুখে পৌছিয়া নিবারণ রাস্তায় দাঁড়াইল। ইঁহারা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ও ঘরে সকলেই তখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। বামা সমস্ত দিন সমস্ত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া উচ্চকণ্ঠে গালিবর্ষণ করিয়াছেন। ঘোষাল-ভ্রাতৃযুগলও সর্ব্বত্র গিয়া গ্রাম্য সামাজিকবর্গের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন, নিবারণ তাঁহাদের জাতি নাশ করিয়াছে, তাঁহাদের অনূঢ়া ভ্রাতুষ্পুত্রীকে গৃহের বাহির করিয়া নিয়া শীতল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে রাখিয়াছে। দাক্ষায়ণী ঘরে বসিয়া কাঁদিয়াছেন, জলস্পর্শও করেন নাই। ক্লান্তিহেতু সকলেই এখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কমলা তাঁহার সকল সম্পদ্ ছোট একটা পুঁটলী বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন,—সেই সম্পদ্ লইয়াই নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া গৃহে উঠিলেন।—প্রদীপ জ্বালিবার উপায় ছিল না। অন্ধকারেই হাতড়াইয়া যাহা পাইলেন,—তাই কোনও মতে মাটিতে বিছাইয়া নিলেন। ক্লান্ত আজ তাঁহারাও বড় কম ছিলেন না—সুতরাং অচিরে নিদ্রার শান্তি তাঁহারাও লাভ করিলেন। নিবারণ ঘণ্টাখানেক রাস্তায় পায়চারী করিল,—কোনও গোলমাল শুনিতে পাইল না।—বুঝিল, রাত্রিতে আর কোনও উপদ্রব ঘটিবে না। তখন সে গৃহে ফিরিয়া গেল।

(৫৮)

প্রত্যূষে বামা সুন্দরীর ঘোর গর্জ্জনে বাড়ীর সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল,—উঠিয়া সকলে দেখিল, কমলা পুত্র কন্যাসহ আবার আসিয়া ঘর দখল করিয়া বসিয়াছেন,—নিবারণের মাতা ভবানীও তাঁহাদের গৃহে!

কমলার গৃহত্যাগে গ্রামে যে কুৎসিত আন্দোলন উঠি ছিল, শিবুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহের সকল সম্ভাবনা তাহাতেই তিরোহিত হইয়াছে। ঘোষাল-ভ্রাতৃযুগল এই ঘটনা তাঁহাদের বড় একটা সুগ্রহের ফল বলিয়াই কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সুগ্রহের সুদৃষ্টি তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, তাহাদের গৃহ এই কমলা-কণ্টক হইতে একেবারেই নিষ্কৃতি লাভ করিল। কুলভ্রষ্টা কন্যার সহযোগে মাতা কমলাও

অবশ্য জাতিভ্রষ্টা হইয়াছেন, তাহার জাতি ভ্রংশে পুত্র ক্ষেত্রমোহনও পতিত।

স্বধর্ম্মরত পবিত্রকর্ম্মা সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ তাঁহারা ইহাদের পাপসংসর্গে কি প্রকারে থাকিতে পারেন? সুতরাং এ বাড়ীতে আর ইহাদের স্থান হইতে পারে না,—পাঁচ টাকা করিয়া মাসহরাও আর দিতে তাঁহারা বাধ্য থাকিবেন না। গ্রাম্য সামাজিকবর্গের নিকটে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাঁহাদের বৈঠক আজই বসিবার কথা। সেই বৈঠকে নিবারণের এবং পুত্রকন্যাসহ কমলার জাতিপাত ধার্য্য হইলেই, এই শুভসংকল্প তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু কমলাকে যদি তাঁহারা নির্ব্বিবাদে আবার গৃহে আসিয়া বসিতে দেন,—তবে হয়ত—কে জানে অভিযোগটা চাপাই পড়িয়া যাইবে। কমলার পক্ষে কেহ অনায়াসে বলিতে পারিবে, সন্নিকদের পীড়নের ভয়ে একরাত্রি গিয়া তিনি গ্রামবাসী কুটুম্ব শীতল চক্রবর্ত্তীর গৃহে ছিলেন বলিয়াই তাহার জাতি যাইতে পারে না। সময়ে অসময়ে কুটুম্বের আশ্রয় কে না গ্রহণ করে? নিবারণকে রাত্রিতে পথে দেখা গিয়াছিল, তাহাতেই কি ধরিয়া নিতে হইবে যে সে তারকের কন্যাকে কুলের বাহির করিয়া নিয়া গিয়াছে।—ভিতরে কার কি দোষ গুণ আছে না আছে, কে তা জানে? কমলা কন্যাসহ তাহার কুটুম্ব বাড়ীতে গিয়া একদিন ছিলেন, আবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন,—ইহাকে কি গৃহত্যাগ কি কুলত্যাগ কেহ বলিতে পারে?—অভিযোগের বিরুদ্ধে এইরূপ সব আপত্তির কথা পূর্ব্বদিনেও ধীরবুদ্ধি কেহ কেহ তুলিয়াছিলেন।—আজ কমলা যদি নির্ব্বিবাদে আসিয়া গৃহে থাকিয়া যান, তবে এই সব আপত্তিরই জোর হইবে। সুতরাং তাঁহারা বিশেষ অপ্রসন্ন হইলেন। ছোট হউক্, বড় হউক্, আশা ভঙ্গে চিত্তের অপ্রসাদ কাহার না হয়? ওদিকে নিবারণের মা আসিয়া আবার ইহাদের আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে, মাগীর কি নির্লজ্জ ধৃষ্টতা। এমন মা না হইলে আর অমন ধনুর্দ্ধর পুত্র হয়? মাগী যদি আসিয়া না বসিত, তবে বলপূর্ব্বকই উহাদের বহিষ্কার করিয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু উহার সম্বন্ধে ত তা সম্ভব নয়। মাগী আবার অতি ব্যাপিকা,—কাহার সাধ্য উহার সহিত আঁটিয়া উঠে। যাহা হউক, একটা স্ত্রীলোকের ভয়ে নিজেদের স্বার্থ ত একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। বুঝা পড়া করিয়া একবার দেখিতেই হইবে। দুই ভায়ে কতক্ষণ যুক্তি পরামর্শ হইল,—তারপর অম্বিকা ঘোষাল উঠিয়া আসিলেন।

ভবানী তখনও গৃহে ফিরিয়া যান নাই, বামার গালি ভঙ্গী ও ভাবা শুনিয়া এবং ভাতৃযুগলের ছলা পরামর্শ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে আশঙ্কা হইতেছিল, ঘাড় ধরিয়াই বা ইহারা অভাগীকে বাহির করিয়া দেয়, ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া গুড়া করিয়াই বা ফেলে।—মনে হইল, অন্ততঃ আজকার দিনটা—কি অগত্যা এই বেলাটা এখানে তিনি থাকিয়া গেলেই ভাল হয়।—ওদের কি মতলব তাহা বুঝিয়া অবস্থামুযায়ী একটা ব্যবস্থা করিয়া তারপর তিনি গৃহে যাইবেন। পাড়ার একটি লোক ডাকিয়া নিবারণকে তিনি সংবাদ পাঠাইলেন,—নিবারণ চাউল, ডাইল, তরকারী প্রভৃতি যথাপ্রয়োজন আহার্য্য দ্রব্য পাঠাইয়া দিল।—কমলার ঘরে কিছুই ছিল না। ভবানী বসিয়া সেই তরকারী কুটিতেছিলেন,—অম্বিকা গৃহে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।—ভবানী যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাট্, বেঁচে থাক,—বস,—ভাল আছ ত?—ও ক্ষেতু, তোর কাকাকে ব'সতে দে ত একটা কিছু এনে?"

ক্ষেতু একটা মাদুর আনিয়া পাড়িয়া দিল। অম্বিকা বসিলেন।—একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "তা আপনি কেন এখানে বউঠাক্‌রুণ?"

ভবানী উত্তর কহিলেন, "তা তোমাদের বাড়ী—এক গাঁয়ের লোক আমরা—সুবাদেও তোমারা দেওর—তা আস্‌তে কি বাধা আছে কিছু?"

"বাধা আর কি থাক্‌তে পারে' আপনাদের পায়ের ধূলো বাড়ীতে যদি পড়ে, সে ত ভাগ্যির কথা—"

"আজ তবে এমন—অভাগ্যি কিসে হ'ল?"

অম্বিকা উত্তর করিলেন, "অভাগ্যির কথা কিছু হ'চ্ছে না বৌঠাক্‌রুণ। তবে আজ এই ঘটনার পর—আপনিই বলুন না—আপনার এখানে আসাটা কি ভাল হ'য়েছে?"

"মন্দই বা কি হ'য়েছে?"

অম্বিকা একটু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "সে ভাল মন্দ যদি আপনি না বোঝেন, আমি আর কি ব'লব?—কেউ আপনাকে ভাল ব'লবে না এতে।"

"সে যার যা খুসী বলুক।—যা ভাল মনে ক'রেছি, তাই ক'রেছি, তাই ক'রব।"

"তা আপনার বাড়ীতে আপনি যা খুসী ক'ত্তে পারেন। -আমাদের জাতমান আমাদের দেখ্‌তে হবে। আপনি তার মধ্যে কেন হাত দিতে এসেছেন?"

ভবানী উত্তর করিলেন, "তোমাদের জাতমানে আমার কি দায় প'ড়েছে যে হাত দিতে যাব অম্বিক? - কমলা একটা দুঃখে প'ড়েছে,—তার কিছু সাহায্য যদি ক'ত্তে পারি, তাই এসেছি। - তোমাদের জাতমানের কি হাত প'ল তাতে?"

"তাতেই ত প'ল বৌঠাকুরুণ?—ওঁকে আর আমরা বাড়ীতে যায়গা দিতে পারি না। তা হ'লে আমাদের জাতমান থাকে না।"

"কেন, কি অপকর্ম্মটা ও ক'রেছে? আর ওর ঘরে ও থাক্‌বে, তাতে তোমাদের জাত কেন যাবে?"

"কি ক'রেছে তা গাঁয়ের লোকের কাছে শোনেন গিয়ে। —যাক্, সে সব তর্ক আপনার সঙ্গে ক'ত্তে চাই না। অনেক অপ্রিয় কথা তাতে উঠবে, যাতে আপনি হয়ত শেষে ব'লবেন, আপনাকে আমরা অপমান ক'রেছি। সেটা আমরা চাইনে।"

"তবে কি চাও?"

"সে ত ব'ল্লাম। ওঁকে আর আমরা বাড়ীতে থাকতে দিতে পারি না।"

ভবানী উত্তর করিলেন, "এ বাড়ী ত কেবল তোমাদের নয় অম্বিক, ওঁরও ভাগ একটা আছে।"

অম্বিকা কহিলেন, "ভাগ কিছুই নেই। থাক্‌বার একটা দাবী মাত্র ছিল :—ওঁর জাত গেছে, সে দাবীও আর উনি ক'ত্তে পারেন না।"

"কে বলেছে?—তুমি ত গ্রামের ভট্টাযিয় নও, যে, ব'ল্লে আর অমনি ওর জাত গেল!"

"আমি না হই, গ্রামে ভট্টাযিয় ত আছে।—আজই বিকেলে সামাজিকদের সভা হ'বে, ভট্টাচাযিয়রাও আসবেন। তাঁরা বিচার ক'রে ব'ল্লে ত তখন মান্‌তে হবে বৌঠাকুরুণ? জাত তখন কেবল ওঁর যাবে না, আপনাদেরও যেতে পারে।"

ভবানী উত্তর করিলেন, "তা বেশ। সামাজিকরা আর ভট্টাযিয়রা বিচের ক'রে যা হয় একটা বলুন,—তখন যা হয়, বোঝা যাবে। আর তাতেই ওকে তোমরা বাড়ী ছাড়া ক'র্‌তে পার কিনা, সেটা মীমাংসা ক'রেও ত নিতে হবে। সমাজে কারও জাত গেলে, সরিকরা তাকে বাড়ীছাড়াও ক'ত্তে পারে, এমন আইন কিছু আছে? উকিলের মুহুরীগিরি কর, অবিশ্যি জান তোমরা।"

বর্দ্ধিত ক্রোধ অতি আয়াসে সংযত করিয়া অম্বিকা কহিলেন, "তা হ'লে কি উনি মামলা ক'রে এই বাড়ী দখলে রাক্‌তে চান?"

"ওর বাড়ী,—দুঃখী মানুষ, তোমরা যদি জোর ক'রে দূর ক'রে দিতে চাও,—তবে আর কি ক'ত্তে পারে ও? আইন আদালত ত এই জন্যেই র'য়েছে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে দেখ্‌তে পারেন, সেই চেষ্টা ক'রে। আমরাও দেখ্‌ব—কি ক'ত্তে পারি। আর দেখি, আপনিই বা কয়দিন ওঁকে আগ্‌লে রাখ্‌তে পারেন?" এই বলিয়া অম্বিকা উঠিলেন।

ভবানী কহিলেন, "শোন অম্বিক।—যতই চট, সামাজিকরা ওকে জাত মারা ক'রে রাখ্‌লেও বাড়ী ছাড়া ওকে তোমরা ক'ত্তে পার না। জোর জবরদস্তী—খবরদার— কিছু ক'রো না। জেনো—সত্যি ও একেবারে অসহায় নয়।"

"সহায় ত আপনি আর নিবারণ! হাঁ, মেয়ে বিকিয়ে সহায়টা পেয়েছে ভাল—"

"ছি—ছি—ছি—অম্বিক! তুমি কি মানুষ? ও তোমার ভাইঝি না? পরে যাই বলুক—নিজের রক্ত মাংস —তোমার মুখে এই কথা! বাড়ীর একটুখানি সরিকী ভাগের জন্য! এ থু থু যে নিজের মুখে পড়ছে,—ছি—ছি— ছি—! জান্‌তাম—তোমার একটুখানি বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, — তা দু ভাইই তোমরা সমান!"

এই ধিক্কারে অম্বিকা সত্যই একটু লজ্জা পাইলেন,— আর কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

বৈকালে ঘোষালদের হাঁটা হাঁটিতে প্রবীণ কয়েকজন সামাজিক এক বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসিলেন।—এই সব কথা লইয়া কাণাকাণিতে কি প্রকাশ্য ভাবে যতই নিন্দার আলোচনা গ্রামে হউক,—সামাজিক বৈঠকে তাহা বিচার ও দণ্ডের বিষয় সহজে কোথাও কেহ বড় করিতে চায় না। অন্য পাঁচটা ব্যাপারে অযথা ও অযৌক্তিক ঘোঁট অনেক হয়, —কিন্তু কোনও কুলকন্যা কুলত্যাগ যতক্ষণ না করে, এরূপ বহু ত্রুটি সামাজিকরা—দেখিয়াও চোক বুঝিয়া

থাকেন।—লোকে কু-কথা অনেক বলিতেছে।—তা মৃত তারকঘোষালের পরিবারে, কে জানে, যদি এমন একটা কিছু ঘটিয়াই থাকে—তাহা কি সামাজিক বৈঠকে তুলিতে আছে? এরূপ একটা কলঙ্কের কথা কার ঘরে না উঠিতে পারে? তবে হরিঘোষাল আর অম্বিকাঘোষাল নির্লজ্জ হইয়া একটা প্রকাশ্য অভিযোগই করিয়াছে। বিচারের জন্ত অনুরোধ উপরোধ বড় করিতেছে। তবু অনেকেই ছুঁতা করিয়া এড়াইলেন,—কয়েকজন আর এড়াইতে পারিলেন না,—নিতান্ত অনিচ্ছায় আসিলেন। তারিণী বাড়ুয্যেও আসিলেন।

ঘোষালরা যেরূপ আশঙ্কা ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। —তারকঘোষালের কন্তা বা স্ত্রী গৃহত্যাগ করে নাই,—কোনও বিপদের আশঙ্কায় একদিনের জন্ত মাত্র কুটুম্বগৃহে আশ্রয় নিয়াছিল।—নিবারণের মাতার সাহায্যপ্রার্থিনী হওয়ায়, তিনি নিবারণকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন মাত্র,—তা ছাড়া নিবারণের সঙ্গে এই ব্যাপারের আর কোনও সম্বন্ধ নাই।—গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অযথা একটা কথা তুলিয়াছে, এরূপ কুৎসা কত লোকের নামেই ইহারা করিয়া থাকে। সামাজিকদের কি উচিত, মাত্র তাহার উপরে নির্ভর করিয়া অনাথা একটি বিধবার আর তার কন্তার জাতি পাত করা?"

তারিনী বাড়ুয্যে তখন এই কথা বুঝাইয়া দিলেন—সকলেই তাহা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তারিণী বাড়ুয্যে শেষে ইহাও বলিলেন,—বিনা প্রমাণে সামাজিকগণ এই অপবাদ দিয়া এইরূপ একটা কঠিন দণ্ড উহাদের দিলে, আদালতে উহারা মানহানির দাবীতে নালিশ করিতে পারে এবং সেটা বড় সহজ ব্যাপার হইবে না,—জেল পর্য্যন্ত হইতে পারে।

ইহার পর আর কথাই কিছু রহিল না,—সামাজিকগণ সভয়ে একেবারে উঠিয়া পড়িলেন। প্রত্যেকেই ইহার মধ্যে তিনি নাই বলিয়া অবিলম্বে গৃহে প্রস্থান করিলেন। কেহ কেহ নিজের ঘরের কলঙ্কের কথা বাহিরে এমন ঢাক বাজাইয়া ঘোষণা করার অসঙ্গতি দেখাইয়া, ঘোষালদের কড়া দু'কথা শুনাইয়াও গেলেন। ঘোষালরা মুখ চুন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। বামা অবশ্য নিঃসঙ্কোচে গালি পাড়িতে লাগিলেন,—কিন্তু ঘোষালরা কমলার বিরুদ্ধে কোনওরূপ জবরদস্তী করিতে আর ভরসা পাইলেন না।

এখন করা যায় কি? ওই নিবে পাজি সকল বিষয়েই তাহাদের উপর টেক্কা দিয়া উঠিতেছে,—ইহা ত প্রাণ থাকিতে সহ্য করা যায় না! পুলিশে তিনি খবর দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তারাও ত এখনও নড়ে চড়ে না। সহরে গিয়া তদ্বির করিতে হইবে। ওই শয়তান তারিণীবাড়ুয্যেকে পর্য্যন্ত একটা স্বদেশী কি সিদিশানের প্যাঁচে ফেলিতে হইবে।

পরদিন প্রত্যূষেই অম্বিকাঘোষাল সহরে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শান্তি

ওরে তোরা আয় শান্তি পরীরা
বিরহী-হৃদয়ে ফিরিয়া আয়,
সুধার গাগরী বহি আয় পরী—
এ হিয়া তোদের করুণা চায়।

লক্ষ বেদনা নিবিড় আঁধারে
চিত্ত যে হায় রয়েছে ঢাকি,
তপ্ত তৃষিত দগ্ধ পরাণে
শান্তি প্রলেপ দে আজ মাখি।

হিয়ার গোপন মৌন বেদনা
নয়নের জলে পড়িছে ঝরি,—
সুধার আশার চকোরীর প্রায়
কত কাল আর রব গো পড়ি?

* * * *

লক্ষ্মীপুরীর পুণ্য প্রদীপ
জ্বলে দেন পুনঃ এ বসুধায়,—
ওরে তোরা আয় শান্তি পরীরা
বিরহীর বুকে ফিরিয়া আয়।

শ্রীমতী শোভারাণী ঘোষ।

"ভুল ভাঙ্গা"

[গল্প]

(১)

ডান হাতে এক গ্লাস্ দুধ বাঁ হাতে একটি কলাপাতায় কয়েকটি চুনো মাছ লইয়া বেলা ১১॥ টার সময় হেমন্ত ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্ত্রী সুনীতি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—বলি, তোমার কি আক্কেল গা ? এই কচি ছেলেটি এত বেলা পর্য্যন্ত দুধ না পেয়ে টাক্‌সি খাচ্ছে। সেই সকালে উঠে বেরিয়েছ, আর এই দুপ্রহর বেলা ক'রে এখন একটু দুধ নিয়ে এসেছ। কি হবে তোমার ও দুধ দিয়ে ?"

হেমন্ত একবার স্ত্রীর ক্রোধ-রক্তিম মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি ক'র্‌ব বুনি ? হাতে ত' চার গণ্ডার বেশী পয়সা ছিল না। সকাল থেকে কিছু খাওলাতের চেষ্টায়ই এত বেলা কেটে গেল। তা' ততক্ষণ খোকাকে একটু বার্লি রেঁধে খাওয়ালে না কেন ? কচি ছেলে এতখানি বেলা পর্য্যন্ত থাক্‌তেই বা পার্ব্বে কেন ?"

এবার স্ত্রীর মেজাজ একেবারে চড়িয়া উঠিল। সে চিৎকার করিয়া বলিল, "কেন, বার্লি খাওয়াতে যাব কেন ? একটি ছেলের দুধ যোগাতে যদি না পার্‌বে ত বিয়ে করেছিলে কেন ? আর যদি নাই পার্‌বে ত আমাকে বিদায় দাও। আমি ভা'য়ের বাড়ীতে চ'লে যাই। সেখানে আমার ছেলের একটু দুধ মিল্‌বে।"

হেমন্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তা রাগ ক'চ্ছ কেন ? খোকাকে সুখে রাখ্‌তে কি আমার অসাধ ? তবে না পার্‌লে কি ক'র্‌ব ?"

ইহাতে স্ত্রীর রাগ পড়িল না। সে কণ্ঠস্বরে আর একটু তীব্রতা মিশাইয়া উত্তর দিল,—"ইস্,—সুখে রাখ্‌তে! প্রাণ বাঁচাতে এক ছটাক দুধের সংস্থান ক'রতে পারেন না—আবার সুখে রাখ্‌বেন!"

স্ত্রীর নিকটে এরূপ শ্লেষোক্তি শ্রবণ করা হেমন্তের এক রকম অভ্যাসের মধ্যেই হইয়া গিয়াছিল। অন্যস্থলে সে ইহার কোনই প্রত্যুত্তর করিত না—শুধু নীরবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বকাজে চলিয়া যাইত। কিন্তু কি জানি অত্যন্ত ক্লান্তি বশতঃই হউক, আর মনের অস্বচ্ছন্দতার জন্যই হউক,—অথবা ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল বলিয়াই আজ সে একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—বলিল—"দেখ তুমি রোজ রোজ আমাকে এমনভাবে জ্বালিও না,—আর আমার ভাল লাগে না।"

এবার স্ত্রীর গণ্ড বাহিয়া দর্ দর্ ধারায় অশ্রু বাহিয়া পড়িল। সে বলিল—"আমি তোমাকে জ্বালাই ? বেশ ত আমিই যদি তোমার এত আপদ হ'য়ে থাকি ত আমাকে বিদায় দাও না কেন ? তোমারও প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ক্—আমারও হাড় জুড়ুক্। এমন কপাল নিয়েও এসে জন্মেছিলাম! তা' না হ'লে আর আজ আমার বাপ-ভায়ের পয়সা পরে খাচ্ছে,—আর আমার একরত্তি দুধের ছেলে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে। আমার ত আর মরণ নাই।"

এবার হেমন্তের চমক্ ভাঙ্গিল। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় যে সে তাহার এতদিনের ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল, এ জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা অশান্তির কাঁটা খোঁচা দিতে লাগিল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। স্ত্রী বলিতে লাগিল—"আমি ব'লে এ সংসার চালিয়ে গেলাম। আর কেহ হ'লে গলায় দড়ি দিত!"

হেমন্ত সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বারান্দার উপর একটি মাদুর পাতিয়া টান্ টান্ হইয়া শুইয়া পড়িল। তারপর সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে এক সময় নিদ্রার সুকুমার ক্রোড়ে আপনার অজ্ঞাতে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি ঢালিয়া দিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হঠাৎ খোকার চীৎকারে হেমন্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন শ্রান্ত ক্লান্ত সূর্য্য পশ্চিম-গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে। উঠানে পূর্ব্বের দিক্‌টাতে একটু রৌদ্র চিক্‌মিক্ করিয়া দ্বিপ্রহরে আপনার প্রচণ্ড তেজের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। আর পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ হইতে ক্রীড়ামত্ত বালকদিগের আনন্দ কোলাহল দূরাগত বংশীধ্বনির মত কাণে কাণে আসিয়া বাজিতেছিল।

হেমন্ত কোন রকমে আপনাকে খাড়া করিয়া, "কি হ'য়েছে খোকার ?" বলিয়া ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। গিয়া যা' দেখিল তাহাতে তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সম্মুখে একবাটি বার্লি লইয়া সুনীতি ছেলেকে খাওয়াইতে বসিয়াছে। খোকা বার্লি খাইবে না বলিয়া গুম্‌রাইয়া বসিয়াছিল। এই অপরাধে সুনীতি তাহার পিঠে প্রচণ্ড দুই চপেটাঘাত করিয়া বলিতেছিল,—"ইঃ! কি রাজা রাজ্‌ড়ার

ঘরে এসে জন্মেছেন–তাই উনি বার্লি খাবেন না। আপদ্ ম'লেও বাঁচতাম! আমার আর সহ্য হয় না।" এই বলিয়া ছেলের দুই বাহু ধরিয়া ধপাস্ করিয়া মাটিতে বসাইয়া দিয়া রাগে গড়্ গড়্ করিতে লাগিল।

হেমন্ত একটুকাল আত্মসংযম করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"তা' আমার উপর রাগ ক'রে ছেলেটাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? তখন দুধ ছিল না ব'লে আমি বার্লি খাওয়াতে বলেছিলাম। এখন দুধ যখন ঘরে রয়েছে –"

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। সুনীতি চিৎকার করিয়া বলিল—"কে তোমার উপর রাগ করেছে? দেখ, তুমি এ রকম মিছামিছি আমার পেছনে লাগলে আমি আর তিষ্ঠুতে পা'র্ব না। দুধ ব'লে ত' আর ছেলেটাকে খানিকটা পুকুরের জল খাওয়াতে পারি না।" এই বলিয়া একবাটি দুধ লইয়া আসিয়া খোকাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিল—"নাও, গেলো রাক্কস্! যমের অরুচি!—মলেও হাড় জুড়ো'ত।"

হেমন্ত আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"অমনভাবে খোকার অমঙ্গল টেনে এনো না—ও ত তোমারও ছেলে।" এই বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(২)

শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া হেমন্ত লেখাপড়া বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। পিতৃ-সম্পত্তির মধ্যে একখানি বাস্তুভিটা ও কিছু দেনা মাথায় করিয়া সে সংসার সাগরে ভাসিয়া পড়িয়াছিল। সে আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের কথা। নবপরিণীতা সুনীতি তখন সবে পিতার বৈভবের মধ্য হইতে এই দরিদ্র জীর্ণ মৃৎকুটীরে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিল। প্রথম গ্রাম্য-জীবনের অঙ্কপাতে তাহার মনে কি হইয়াছিল বলিতে পারি না—তবে গৃহের জীর্ণ অবস্থা ও উহার যৎসামান্য আস্বাব্ দেখিয়া পাড়া প্রতিবাসীদিগের নিকট কলিকাতায় পিতার রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ও উহার অগণিত 'ফার্ণিচার' ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া তাহার তুলনায় এই গৃহের দৈন্যতা সম্বন্ধে কিছু কিছু মত প্রকাশ করিয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর তখনই বুঝিয়াছিলেন যে এই পুত্রবধূকে লইয়া তিনি বিশেষ সুখী হইতে পারিবেন না; এবং পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াও তখন একদিন নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর হেমন্ত চারিদিক্ একেবারে অন্ধকার দেখিল। গৃহে যৎসামান্য যাহা কিছু ছিল, তাহাও বিক্রয় হইয়া গেল। তারপর অনেক কষ্টে গ্রামের মাইনর স্কুলে ১৫৲ টাকা বেতনে একটি মাষ্টারী পাইয়া উহাতেই বাহাল হইয়া গিয়াছিল। এই পাঁচ বৎসরে ১॥০ মাহিনা বাড়িয়া এখন ১৬॥০ টাকা হইয়াছে।

কিন্তু এ যৎসামান্য উপায়ে কায়ক্লেশেও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না। আজকাল জিনিশপত্র যেরূপ দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে প্রত্যেক মাসেই তাহাকে কিছু কিছু ধার করিতে হইত। ধার জুটিত বটে, কিন্তু উহা শোধের কোনই ব্যবস্থা হইল না।

সে দিন ঘরে ঘরে ৺পূজার শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত গ্রাম সোণার কাঠির স্পর্শে মায়াপুরীর রাজকুমারীর মত এক নবীন হিল্লোলে জাগিয়া উঠিয়াছে। আর সেই অবাধ আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে একখানি জীর্ণশয্যার উপর শয়ন করিয়া হেমন্ত আপনার অদৃষ্টের ধিক্কার দিতেছিল। একখানি জীর্ণ-বস্ত্র পরিধান করিয়া সুনীতি নিকটে বসিয়াছিল,—আর খোকা খালি গায়ে একটা হুলো বেড়ালের সাথে বসিয়া খেলা করিতেছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুনীতি বলিল—"দেখ, ঐ তোমার বড় দোষ। সাহায্য চেতে কোন অপমান নাই। তারপর তাঁরা ত আর তোমার পর নন। আমার দাদা ত কতবার লিখেছেন, তুমি ত লেখাপড়া বিশেষ কিছুই শেখ নাই,—তা ওটুকু বিদ্যে-বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব তা তিনি ক'রে দেবেন। কিন্তু তোমার যে কি এক গোঁ—ঐ না খেয়ে এইখানে প'ড়ে থাক্‌বে, তবু নড়্‌বে না।"

হেমন্ত বলিল—"কি জান সুনি। তাঁরা বড়লোক তাই বড় ভয়। তারপর কি মুখ নিয়েই বা গিয়ে তাঁদের কাছে দাঁড়াব? না সুনি এই আমরা বেশ আছি।"

সুনীতি বলিল—"পোড়া কপাল আমার! এই তোমার বেশ থাকা! না খেয়ে ভিটে কাম্‌ড়ে পড়ে থাক্‌লে যদি বেশ থাকা হয়—চখের উপর দুধের ছেলেটা না পেতে পেয়ে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাচ্ছে দেখেও যদি নির্ব্বিকার থাক্‌তে পারা যায়—তা তুমি থাক। আমি আর তোমায় সাথে

রোজ রোজ এ রকম খেঁচাখেঁচি করতে পারি না। আমার বাপ ভাই বড়লোক, সেই কথা নিয়ে তুমি আমাকে রোজ রোজ খোঁটা দাও। আর সে কথাই বা কি আর মিথ্যে! তুমি যা বেতন পাও সে বেতনের দশটা গোমস্তাও ত তাঁদের বাড়ী পড়ে রয়েছে। তা ত নিজের চোখেই সে বার দেখে এসেছ।"

হেমন্ত দেখিল বাতাস উল্টা দিকে বহিতেছে। তাই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এই নীরবতাই সুনীতির নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। চক্ষুর জল ফেলিয়া খোকাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল—"এমন পোড়া অদৃষ্ট না হ'লে আর ও আজ এ ঘরে এসে জন্মাবে কেন? নইলে আজ বৎসরের দিনে ওর অভাব কি?"

হেমন্ত কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"আচ্ছা, তোমার দাদা ত তোমাকে ৺পূজার সময় যেতে লিখে-ছিলেন না?"

সুনীতি বলিল—"তিনি কয় চিঠিতেই ত আমাকে যেতে লিখেছেন। আমিও ত অনেককাল সেখানে যাই না। কালও আবার তিনি লিখেছেন আমার পত্র পেলেই লোক পাঠিয়ে দিবেন।"

হেমন্ত বলিল—"তা বেশ তুমি লিখে দাও যে কেউ এসে তোমাকে ও খোকাকে নিয়ে যান।"

এবার সুনীতির মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সে একটু কটাক্ষ করিয়া বলিল—"সেখানে ত আর আমার দাদার কোন অভাব নাই। কল্‌কাতায় কলের জলে আর পাকা বাড়ীতে থাক্‌লে খোকারও একটু শরীর ভাল হ'বে। তা' ছাড়া তুমি যা রোজগার ক'র, তা ত তোমার নিজে পেতেই কুলোয় না। এ দিক্‌কার ধারকর্জ্জগুলি যাতে শোধ দিতে পার, তারই চেষ্টা ক'র। আমিও ওদিকে দাদাকে ব'লে ক'য়ে যা হ'ক্ তোমার একটা বন্দোবস্ত ঠিক করে দেব'খন। আর কিছু না হইলেও দাদার হাইকোর্টে আজকাল বেশ পশার হচ্ছে। উঠ্‌তি নাম ডাক্। তাঁর সাথে বেরিয়ে দুই একখান নকল টকল লিখ্‌তেও পার্‌বে।"

হেমন্ত সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একটু উদাসভাবে বলিল—"হাঁ, তুমি খোকাকে নিয়ে সেখানেই কিছুদিনের জন্য যাও। তোমার—খোকার খেতে প'র্‌তে এ কষ্ট আর আমি দেখ্‌তে পারি না।"

সেই সময় পার্শ্বের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে সপ্তমীর আরতি-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আর ঘন ঘন উলুধ্বনিমিশ্রিত একটা ঝট্‌কা বাতাস উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে প্রবেশ করিয়া ফুৎকারে মেজের বাতিটি নিবাইয়া দিয়া গেল। হেমন্ত আর একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

(৩)

শিশু পুত্র ক্রোড়ে লইয়া সুনীতি যখন সহরে ভ্রাতৃ-গৃহে আসিয়া পদার্পণ করিল তখন বাড়ীতে একটা আনন্দ-কোলাহলের সাড়া পড়িয়া গেল। ভ্রাতৃবধূ আসিয়া খোকাকে কোলে লইয়া বলিল—"হাঁ গা ঠাকুরঝি, ছেলেটা এমন রোগা হ'য়ে গেছে—একি চোখেও দেখনি? যেন দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসছ! তোমারও ত' দেখি মুখ একেবারে কালী মেরে গেছে। বলি সেখানে কি খেতে পেতে না?"

প্রত্যুত্তরে সুনীতি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমার অদৃষ্ট!"

সুরমা বলিল—"নাও বোন্, তোমার ভায়ের সংসার এবার তুমি বুঝে নাও। আমায় কিন্তু এবার কিছুদিনের জন্য রেহাই দিতে হ'বে।"

সুনীতি বলিল—"তা বৈকি? আমি দুদিনের জন্য এসেছি, এখন আমার উপর ভার চাপিয়ে দেবে বৈকি? তোমার সংসার তুমিই ক'র্‌বে।"

সুরমা বলিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ তা' দেখা যাবে'খন। নাও, এখন চল—স্নানটা ক'রে কিছু মুখে দিয়ে নেবে।—ওলো ও বিন্দী!—ও ক্ষিরী ও খেঁদিমা! আচ্ছা জ্বালালে দেখ্‌ছি। দশ পনরটা চাকর ঝি, কাজের সময় একটাকেও সারা জগৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। বলি কে ওখানে? শীগ্‌গীর ক'রে এক বাটি দুধ গরম ক'রে নিয়ে আয় দেখি,—খোকাকে খাইয়ে দি। নাও বোন্, তুমি চট্ ক'রে নেয়ে এস।—আ ম'লো! ও কাপড় আবার ছাড়্‌ছ' কি? ওরে খেঁদি, আমার ঘরে কাপড় আছে নিয়ে আয় ত।"

সুনীতি বলিল, "না—না—তোমার এত ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। আমিই সব গুছিয়ে নিচ্ছি।—তুমি ততক্ষণ খোকাকে একটু দুধ খাইয়ে দাও। দাদা ত এখনও এলেন না, কত বেলা হ'য়ে গেল।"

সুরমা বলিল,—"তাঁর কি আর এক তিলও অবসর আছে বোন্! কাজের হিড়িকে শরীরও একেবারে ভেঙ্গে

প'ড়েছে। আমি কত বলি—কিছুদিনের জন্য একটু বিশ্রাম নাও। একটু চেঞ্জে ঘুরে এসো। তা' কি তোমার দাদার সাথে পেরে উঠ্‌বার যো আছে? এই ত আজ আবার তুমি আস্‌বে ব'লে তোমাদের কাপড় চোপড় কিনতে সেই ভোরে উঠে বেরিয়েছেন আর ত এখনও উদ্দেশ নাই।"

সুনীতি বাধা দিয়া বলিল,—"সে কি? আমাদের কাপড় চোপড়ের জন্য এত কি তাড়া ছিল? না হয় দু'দিন পরেই হ'ত।"

সুরমা বলিল,—"না, তা' কি হয় বোন্‌? কত দিন পরে আস্‌ছ এখানে। আর তা' ছাড়া বরে দুঃখিত হবে'খন, ঠাকুরজামাই ও'ত সে রকম রোজগার কামাই কিছু ক'র্‌তে পারেন না,—তা তোমাদের সে রকম সচ্ছন্দ কাপড় জামাও বোধ হয় দিতে পারেন না।"

সুনীতি মনে মনে বলিল,—"হায় কপাল! সচ্ছন্দ ব'লে মোটেই জোটে না!" প্রকাশ্যে বলিল,—"না—না দুঃখিত হ'বে কেন? সে কথা ত আর কিছু মিথ্যে নয়।"

সুরমা বলিল,—"তা থাক্‌, কথায় কথায় বেলা বেড়ে যাচ্ছে। তোমার মুখের দিকে একেবারে তাকান যাচ্ছে না। যাও, স্নানটা সেরে নাও। আমি ততক্ষণ খোকাকে খাইয়ে জল খাবারটা গুছিয়ে ফেলি।"

সুনীতি আর একবার গৃহের চারিদিকে তাকাইয়া লইল। গৃহের এই আস্‌বাব—এই ঐশ্বর্য্য তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া একটা আনন্দের ঢেউ তুলিয়া দিল,—আর তাহারই পার্শ্বে শ্বশুরের সেই জীর্ণ হীন মৃত্‌-কুটীরখানি রাহুগ্রাসে চন্দ্রের মত মলিন হইয়া গেল।

স্নান সারিয়া সুনীতি গৃহে ঢুকিতেই সুরমা খাবারের থালা সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"এইবার এইটুকু মুখে দিয়ে নাও ত।"

"ওকি? তুমি চ'লে গেলে চল্‌বে না—" এই বলিয়া সুনীতি সুরমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ক'ত দিন পরে এস ভাই দুইজনে একত্রে বসি।"

সুরমা বলিল,—"নাও, ওটুকু খাবার আবার দু'জনে কি খাব।"

সুনীতি বলিল,—"তা হ'ক্‌, তুমি ব'স।"

অগত্যা সুরমাও সুনীতির সহিত আহারে বসিল।

এই সময়ে বেহারা একটা বস্তা লইয়া আসিয়া মেজের উপর রাখিল; ও তাহারই পশ্চাতে গৃহকর্ত্তা সুরেশচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতাকে দেখিয়া সুনীতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। সুরেশ ভগ্নীর মুখের দিকে কতক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল,—"কি রে, তুই অত রোগা হ'য়ে গেছিস্‌ কেন রে?"

সুনীতি এ কথার কোনই উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।—সে কি করিয়া বলিবে যে স্বামীগৃহে অনাহারেই আজ তার এ অবস্থা! স্বামীকে যে সে একেবারে ভাল না বাসিত তা নহে। স্বামীগৃহে সে যেরূপ অভাব অনুভব করিয়াছে —দিন রাত নাই নাই রব, শৈশব হইতে কোনদিনও সে এরূপ জীবনে অভ্যস্ত নহে। স্বামীর অক্ষমতাকেই সে সমস্ত প্রাণ দিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। সেখানে ভাল-বাসা কিছু হয়ত থাকিতে পারে—কিন্তু করুণা বিন্দুমাত্রও ছিল না। কিন্তু ভ্রাতার কাছে সে কথা সে কি করিয়া বলিবে? একটা দুর্ব্বলতা -একটা দারুণ ক্ষোভ ও লজ্জা তাহাকে একেবারে দলিয়া পিষিয়া দিয়া গেল। তাই সে কোনই উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু এ বিপদ্‌ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিল ভ্রাতৃবধূ। সুরমা একটু কটাক্ষ করিয়া বলিল—"তা কি জান, সকলেরই ত আর তোমাদের মত স্বচ্ছল অবস্থা হয় না। পুরুষ মানুষের রোজগারে একটু টান্‌ প'ড়্‌লে মেয়েমানুষকে অনেক সময় উপোস ক'র্‌তেও হয়। তারপর ঠাকুর জামাইরও ত আর অবস্থা তত স্বচ্ছল নয়।"

হেমন্তের নাম শুনিতেই সুরেশ বলিয়া উঠিলেন—"হতভাগা! গোয়াইন। সেটার কথা আর ব'ল না!"

সুরমা বাধা দিয়া বলিল—"ছি! তোমার বড় মুখ আলগা। এতে ঠাকুরঝি যে কষ্ট পেতে পা'রে, তা কি তোমার খেয়াল নাই?"

সুরেশ আর কিছু না বলিয়া কাপড়ের বস্তা খুলিয়া একটি সুন্দর জামা বাহির করিয়া খোকাকে পরাইয়া দিলেন। সুনীতি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার চোখ ছল্‌ ছল্‌ করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, এখনই যদি সে একবার খোকাকে কোলে করিয়া স্বামীকে দেখাইয়া বলিতে পারে—"দেখ, আমার খোকার অভাব কি? সে

কোনদিনও তোমার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না।" তাহা হইলে বোধ হয় তার একটু শান্তি বোধ হইত।

(৪)

প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে স্ত্রীর নিকট হেমন্ত তিন চার খানি পত্র লিখিয়াছে। প্রথম পত্রে লিখিয়াছিল—"আশা করি তোমার ও খোকার শরীর এখন একটু ভাল হইতেছে। ফেরত ডাকে তোমাদের কুশল জানাবে। দাদা ও বৌদিকে আমার প্রণাম জানিও। আমি এক রকম আছি।"

সুনীতি এ পত্রের উত্তরে লেখে—"আমার ও খোকার শরীর বেশ ভাল হইতেছে। খোকা ত বেশ মোটাই হইয়াছে। দাদা আমাদের কোনই অভাব বুঝতে দেন না। তোমার কথা আমি দাদাকে বলেছি। তিনি বল্লেন— মুহুরীর কাজে বেশ মাথা লাগে ও খুব চালাক-চতুর হওয়া চাই। ত' তুমি ত' কোন দিনই সে রকম চৌপিঠে নও। তাই তিনি কিছুদিন তোমাকে এখন তাঁর যে মুহুরী আছে তার কাছে এপ্রেন্টিস্ খাটতে বল্লেন। এতেও দু'চার পয়সা এখন পেতে পার। অতএব তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া চলিয়া আসিবে।"

ইহার পর হেমন্ত আরও দুই তিন খানি পত্র লেখে। কিন্তু সে পত্রের উত্তর দেওয়া সুনীতি কোনই প্রয়োজন মনে ক'রে নাই।

দ্বিতীয়পত্রে সে লিখিয়াছিল, "তোমার পত্রে খোকা বেশ মোটা হয়েছে জেনে বড় সুখী হলাম। তা'কে এখন বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে ক'রে। কিন্তু থাক্—এখনই তুমি চ'লে এসো না।"

শেষ পত্রে লেখে—"তোমার নিকট উপর্য্যুপরি দুই তিন-খানি পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না,—সে জন্য মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতেছে। পত্রপাঠ তোমাদের কুশল লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে। আমার এখানে বড় কষ্ট হইতেছে। রোজ একটু একটু জ্বরও হইতেছে। আর রাঁধতে গিয়ে হাতটাও সেদিন পুড়িয়ে ফেলেছি। তা' সে জন্য তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। খোকাকে বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়। তোমরা কবে আস্‌বে লিখো।"

উত্তরের আশায় একদিন দুইদিন করিয়া পনর দিন পর্য্যন্ত পোষ্টাফিসে হাঁটাহাঁটি করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া হেমন্ত অন্য কাজে মন দিল। কিন্তু খোকার অভাবে গৃহ তাহার একেবারে শূন্য লাগিত। বুকের ভিতর হইতে কে যেন অনেকটা সাহস তুলিয়া লইয়া একেবারে ফাঁক্ করিয়া দিয়াছিল। ঝড়ের রাত্রে বাতাসের মত এক একটা হু হু করা দীর্ঘশ্বাস তাহার খালি বুকের ভিতর একটা করুণ-স্পন্দন জাগাইয়া তুলিত। অন্ধকারে সে সমস্ত বিছানা হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া পাশবালিশটি সজোরে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিত। সকালে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিত সমস্ত বালিশ তাহার অশ্রুজলে ভিজিয়া গিয়াছে।

এম্‌নি ভাবেই হেমন্তের দিন কাটিতেছিল।

সে দিন সুরমা সুনীতিকে ডাকিয়া বলিল,—"এই দেখ তোমার ছেলের কাণ্ড। আমার এত দামী ফুলদানিটি ভেঙ্গে চুরমার করেছে। চোখে না দেখ্‌লে ত আবার প্রত্যয় যাবে না।"

সুনীতি বলিল,—"আমি কি তোমায় কেবল অবিশ্বাসই করে থাকি? খোকা ছেলেমানুষ ভেঙ্গেই যদি থাকে একটা—"

সুরমা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"আহা, ছেলে মানুষ ত' একেবারে হাড় জুড়িয়ে দিলেন আর কি? খেয়ে খেয়ে ত' উজোড় ক'রে দিলেন। এখন ত' ব্রহ্মাণ্ড খেলেও সাধ মেটে না। ছেলে মানুষ শুধু এই বেলা।"

প্রাতৃবধূর এ শ্লেষোক্তি সুনীতির অসহ্য হইল।—সেও কণ্ঠস্বর একটু চড়াইয়া বলিল,—"দেখ বৌ—তোমারটা ত এখনও খাই নাই। তুমি ও রকম সব সময় খোঁটা দিও না।"—

সুরমা এবার কণ্ঠস্বরে আরও একটু শ্লেষ মিশাইয়া বলিল —"না, আমারটা খাবে কেন? বলি কোন্ শ্বশুরের জমিদারী থেকে একেবারে ছালা বস্তা বেঁধে এনেছিলে? কাল খে'তে যার খু দ'রে না—তার আবার অত কেন?"

সুনীতির মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সমস্ত গায়ের জোর দিয়া সে সম্মুখের জানালার গরাদ চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিল—"দোহাই বৌ—তোমার পায়ে ধ'রে মিনতি কচ্ছি—অমনভাবে আমায় জালিও না।"

সুরমা এবার কণ্ঠস্বর একটু নম্র করিয়া বলিল—"আমি তোমাকে কি বলেছিলাম? দামী জিনিশটি অনিষ্টকল্পে তাই তোমাকে ব'লতে গেলাম—এই ত আমার অপরাধ।

তা বেশ তোমার ভাইয়ের ঘরবাড়ী—তুমিই দেখ। আমাকে রেহাই দাও। আমি আর সাতেও নেই পাঁচেও নই।"

এমন সময়ে সুরেশ ঘরে প্রবেশ করিতেই সুনীতি বলিয়া উঠিল—'দাদা, এইবার আমাকে পাঠিয়ে দাও।"

সুরেশ ভগ্নীর মুখের দিকে কতক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—"কেন, কি হয়েছে তোর; সত্যি কি তোর সেখানে যেতে ইচ্ছে হয়?"

উত্তরে সুনীতি বলিল,—"যেতে আমার সেখানে আদৌ ইচ্ছে হয় না,—কিন্তু তবুও মনে হয় পাছে তোমরা বিরক্ত হও।"

সুরেশ বাধা দিয়া বলিল,—"দেখ পাগল আর কি?—বলে কি? আমরা বিরক্ত হ'ব তোর উপর—তোর এই ধারণা হ'ল?"

সুরমা একটু কটাক্ষ করিয়া বলিল—"ঠাকুরঝির ঐ রকমই কথা।"

সুনীতি ভাবিল—তাইত সেখানে গিয়া সে কি করিবে? সেখানে গেলেই আবার সেই নাই—সেই অভাবের তাড়না ত' তাকে সহ্য করিতে হইবে। তাহাদের আহার বিহারে স্বামীর সেই উদাসীনতা; আর বর্ষাসিক্ত গ্রামের সেই বিকট মূর্ত্তি—ভাবিতেও তাহার গা শিহরিয়া উঠে। এখানে ত' তার কিছুরই অভাব নাই।—ভ্রাতার অসীম স্নেহের করুণার কোন অভাব ছিল না।—এ সব ছাড়িয়া—না, কিছুতেই যাইতে সে পারিবে না।

এমন সময় সুরেশ বলিল—"ভাল কথা—তোকে ব'লতে ভুলে গেছি—হেমন্ত চিঠি লিখেছে এই দ্যাখ্।" এই বলিয়া পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া সুনীতির হাতে দিল।

সুনীতি খাম খুলিয়া চিঠিখানি পড়িল।

শ্রীচরণেষু,

অনেকদিন আপনাদের কোন সংবাদ পাই না। আপনার ভগ্নীর নিকট ৩।৪ খানি পত্র লিখিয়াও উত্তর পাই নাই।—তজ্জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন আছি। আগতে আপনাদের কুশল সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন।

অপর আমার আজ মাসখানেক ধরিয়া রোজ জ্বর হইতেছে। শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে লিখিলাম। যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন। খোকার জন্মদিনে এই জামাটি কিনিয়া পাঠাইলাম। আমার প্রণাম জানিবেন। নিঃ ইতি—

প্রণতঃ
হেমন্ত।

চিঠি পড়া শেষ হইলে সুরেশ বলিল—"দেখ্‌বি নাকি সে জামা? সে একটা 'রাবিশ্'।"

সুরমা বলিল—"কোন্ জামা?—সেই যে ঠাকুরজামাই যেটা পাঠিয়েছেন? আঃ মরি জামার কি ঢং! তাই ব'ল, সেটা পাঠাতে কিন্তু তাঁর একটু লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। আমি কিন্তু ও বিশ্রী জামা খোকাকে প'রতে দেব না। সেটা খেঁদির মা'কে দিয়ে দাও—আর তুমি যেটা কিনে এনেছ, সেইটে খোকাকে পরিয়ে দাও।"

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল—"যা হয় তোমরা ক'র। আমার কাজ আছে, চল্লাম।"

সপ্তমীর শঙ্খঘণ্টা আর একবার ঘরে ঘরে বাজিয়া উঠিল। শরতের প্রভাতী সূর্য্য এক অভিনব মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া অন্তরে বাহিরে এক নবীন উদ্বেগ আনন্দ জাগাইয়া তুলিল। আর এই আনন্দ কোলাহলের মাঝখানে বসিয়া আজ সুনীতি মনের মতন করিয়া ছেলেকে সাজাইয়া দিল। নিজে একখানি ঢাকাই শাড়ী পড়িল, সুদীর্ঘ চুলের রাশি সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া খোঁপা বাঁধিল,—মাথায় সিন্দূরের রেখাটি স্পষ্ট উজ্জ্বল করিয়া দিল,—তারপর সুরমার ঘরে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিল—"চল্ যাই বোন্, ঠাকুর দেখে আসি গিয়ে।"

সুরমা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া—ননদের হাত ধরিয়া বাহির হইল।

* * * * *

খুব এক পশলা বৃষ্টির পর সন্ধ্যার সময় আকাশটা তখন বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রক্তিমচ্ছটা তখন পর্য্যন্ত দুই একখানি খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের উপর ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল,—আর তাহারই একটু আভা পৃথিবীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া অনেক দিনের পুঞ্জীভূত বুকের বেদনা অশ্রুসিক্ত ধরণীর কাণে কাণে জ্ঞাপন করিতেছিল। বর্ষাবারিসিক্ত তরুলতাগুলি নীরবে টুপ্‌টাপ্ টুপ্‌টাপ্ করিয়া সমবেদনায় অশ্রুবারি ফেলিয়া আপনার

ভদ্রতার লঘু করিয়া ফেলিতেছিল। আর মাঝে মাঝে বাতাসের এক একটা হু হু করা দীর্ঘনিশ্বাস পৃথিবীর বুকের ভিতর একটা স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়া দিগন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছিল।

প্রকৃতির এই বিচিত্র বিপর্য্যয়ের সহিত সুনীতিরও মনের কি রকম একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল। ঠিক যে স্থানের যে জিনিসটির প্রয়োজন তাহারই কোন এক নিভৃতস্থানে কি রকম বেসুরা বাজিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দিন ধরিয়া সমস্ত কাজের মধ্যে তাহার অন্তর্নিহিত একটা গুপ্ত বেদনা থাকিয়া থাকিয়া মাথা খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কোথায় কি যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক তাহার অজ্ঞাতসারে তাহারই অন্তরের মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল, সম্মুখে জনালার দিকে তাকাইয়া সে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

এমন সময় খেঁদির মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"বলি ও দিদিমণি, অমন ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছ যে?—তা আর ভেবে কি করবে বল?—পূজো শেষ না হ'লে ত আর যেতে পারছ না।"

সুনীতি খেঁদির মার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"কি ব'লছিস্ তুই? কোথায় যাব?"

খেঁদির মা একেবারে গালে হাত দিয়া বলিল—"ওমা, তাও কি শোন নি? জামাই বাবুর যে ভারি ব্যামো হয়েছে। কেন কালই ত টেলিগ্রাম এসেছিল। তোমায় বুঝি তা শোনান নি? আহা, বল্‌বেনই বা কোন প্রাণে!"

সুনীতির বুকের ভিতর হঠাৎ ছ্যাৎ করিয়া উঠিল—জোর করিয়া সে বলিল—"আচ্ছা, তুই যা, খোকাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আয় গিয়ে।"

খেঁদির মা খোকাকে লইয়া চলিয়া গেলে,—সুনীতি উঠিয়া সুরমার ঘরের দিকে চলিল। দরজার নিকটে আসিতেই ভিতর হইতে সুরেশ ও সুরমার কথোপকথন কাণে আসিয়া বাজিবামাত্র সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। দরজার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়া সে শুনিতে লাগিল।

সুরমা বলিল—"কিন্তু সে যাই ব'ল এ অনাছিষ্টি আমি সইতে পারি নে। কেন কি নবাব তিনি এসেছেন যে এতটুকু ত্রুটি তাঁর সইবে না। পান থেকে চুণ খস্‌লেই মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেল।"

সুরেশ বলিল,—"কিন্তু সে যাক্—তুমি তাকে কিছু বলো না।"

সুরমা গর্জ্জন করিয়া বলিল—"আমার কি দায় ঠেকেছে? তোমার বোন্‌কে আমি কেন ব'ল্‌তে যাব? তবে তিনি যে বড় তোমার উপর মায়া দেখান, সেটা আমার ভাল লাগে না। স্বামীকে যে ভালবাস্‌তে পারে না—স্বামী ম'রছে তাতে যার ভ্রূক্ষেপ নাই,—সে আবার ভালবাস্‌বে ভাইকে? ও সব সৃষ্টিছাড়া কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

কথাগুলি সুনীতির কাণের ভিতর যেন একরাশি গরল ঢালিয়া দিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। মাতালের মত টলিতে টলিতে সে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া মুখ গুঁজিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

তাহার সমস্ত বুকের ভিতর একটা প্রবল আলোড়ন জাগিয়া উঠিল। স্বামী তাহার মৃত্যুশয্যায়—আর সে নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কণ্টকে ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যবৈভবের মধ্যে সুখে দিনপাত করিতেছে। আজ সুরমার কথায় আর তার রাগ হইল না। সে মনে মনে বারবার করিয়া বলিল—"তাই ত এমনভাবে নিছক সত্য কথাটি ত তাহাকে আর কেহ ব'লে নাই। সুরমা আজ তাহার চোখ খুলিয়া দিয়াছে। আজ তাহার অন্তর্নিরুদ্ধ সমস্ত বেদনারাশি তাহার বুক ছাপাইয়া উছলিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে শয্যার উপর ছট্‌ফট্ করিয়া শেষে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিল। ইত্যবসরে কখন যে খেঁদির মা খোকাকে তাহারই পার্শ্বে শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা সে টের পায় নাই। হঠাৎ সে নিদ্রিত খোকাকে এমনভাবে সজোরে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল যে সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কি ভাবিয়া সুনীতি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল,—আপনার পরণের শাড়ী খুলিয়া ফেলিয়া একখানি আট পৌরে কাপড় পড়িল,—খোকার গা হইতে জামা খুলিয়া ফেলিল। তারপর এই বর্ষাসিক্ত কন্‌কনে শীতের মধ্যে একখানি র‍্যাপার দিয়া খোকার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত গুরুভার লইয়া ছুটিয়া ভ্রাতার ঘরে গিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল—"দাদা! আমাকে এখনই পাঠিয়ে দাও।"

সুরেশ বলিল—"সে কি, এখন রাত্রে কোথায়?"

সুনীতি ওষ্ঠ কামড়াইয়া দৃঢ়ভাবে বলিল—"না এখনই—এই মুহূর্ত্তে—আমি প্রস্তুত।"

* * *

অন্ধকার তখনও ভাল করিয়া কাটিয়া যায় নাই। আকাশ মেঘাবৃত। আর মাঝে মাঝে মেঘের গুরু গম্ভীর ডাক বুকের ভিতর আতঙ্ক জাগাইয়া তুলিতেছিল। এমন সময় সুনীতি খোকাকে কোলে করিয়া শ্বশুরের বাস্তুভিটার আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের কবাট উন্মুক্ত - সমস্ত ভিতরটা একেবারে খা-খা করিতেছে। এমন সময় বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। আর সেই আলোকে সুনীতির কপালের সিন্দূর ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে পার্শ্বের বাড়ী হইতে এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী আসিয়া তাহার হাত ধরিল। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় সুনীতির বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। বিহ্বল করুণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"সেই যদি এলে মা, ত'বে এত দেরী কল্লে কেন? আহা কালও—"আর বলিতে হইল না। মুহূর্ত্তে সুনীতির সম্মুখে বিশ্বপ্রকৃতি ঘুরিয়া উঠিল ও তাহার পায়ের নীচ হইতে পৃথিবীখানা যেন সরিয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

প্রতিবেশিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আহা, সপ্তমির ভোরে ———"

শ্রীসুশীল সেন।

রঙ্গ কৌতুক

কথার ফের।

[গ্রাম্য নদী তীর—নদীতীরে জনৈক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ স্নানের আয়োজন করিতেছেন—একজন পথিকের আগমন এবং নৌকা কিছু না দেখিয়া পার হইবার উপায় চিন্তা।]

পথিক।—হাঁ মশাই,—নদীতে জল কি বেশী?

ব্রাহ্মণ।—বড় কমও নয়,—এপারে ওপারে কয়খানি গ্রামের লোকের স্নান রন্ধন পান—সবই ত' এই নদীর জলে বেশ চ'লে যাচ্ছে!

পথিক।—না—না, তা ব'ল্‌ছি না। বলি, জল কেমন?

ব্রাহ্মণ।—তা বেশ ভাল মিঠে জল,—নোণা টোনা কখনও হয় না।

পথিক। কি মুস্কিল! 'আমি ব'লছি, জল কত হবে?

ব্রা।—তা ত মেপে দেখা কখনও হয় নি মশাই?

প।—(একটু রুক্ষস্বরে) কি জ্বালা হল! বলি নদী পার হওয়া যায় ত?

ব্রা।—তা কেন যাবে না?—ভবনদী কত লোক রোজ পার হ'য়ে যাচ্ছে,—আর এত সামান্য এই গাঁয়ের একটা নদী।

প।—সোজা কথাটা মশাই ব'ল্‌তে পারেন? নদী কি গাঁয়ের লোকে হেঁটে পার হয়?

ব্রা।—তেমন যোগসিদ্ধি ত এ গাঁয়ে কারও দেখিনি কখনও। মশায়ের যদি থাকে ত দেখ্‌তে পারেন।

প।—আঃ! কি ব'ল্‌ছেন মশাই! আমি উপর দিয়ে হেঁটে পার হবার কথা বলি নি; নদীর জল দিয়ে।

ব্রা।—তাতেও যোগসিদ্ধির আবশ্যক। নইলে দম আট্‌কে মারা যাবেন।'

প।—বলি জলে নামলে কি কাপড় ভেজে?

ব্রা।—তার জন্যে জলে নাম্‌তে হবে কেন?—ইচ্ছে ক'র্‌লে পারে ব'সেই বেশ ভিজিয়ে নিতে পারেন।

প।—বলি এই নদীর জল ঠাঁই না অঠাঁই।

ব্রা।—কোথাও ঠাঁই, কোথাও অঠাঁই,—তার কি ঠিকানা কিছু আছে।

প।—নাঃ! আপনার কাছে সোজা জবাব পাব না দেখ্‌ছি। তা দয়া ক'রে ব'ল্‌তে পারেন, নদী কি ক'রে পার হ'তে পারি?

ব্রা।—ওঃ! পার হবেন! তাই বলুন। তা আসুন, ওদিকে খেয়া আছে,—দেখিয়ে দিচ্ছি।——

পণ্ডিত।—"আছে অর্থে শব্দের উত্তর নিন্ প্রত্যয়ে—থাকে ইন্,—প্রথমার এক বচনে হয় 'ঈ' যথা—

ছাত্র।—দাসিন্—দাসী।

পণ্ডিত।—দূর হ গাধা, 'দাসী' হ'ল চাকরাণী 'দাস' শব্দের উত্তর স্ত্রী লিঙ্গে 'ঈপ্' ক'রে হয়।

ছাত্র।—কেন, আছে অর্থে নিন্ ক'রেও ত বেশ হ'তে পারে। 'দাস' যার আছে, সে হ'ল 'দাসী'।

পণ্ডিত।—(একটু ভাবিয়া) হাঁ,—পতিরূপে 'দাস' আছে—এই অর্থে হ'তে পারে বটে।

ছাত্র।—তা হলে ত শব্দটা 'দাসী' হ'তে পারে না, দাসিনী হবে,—দাসী হ'ল পুংলিঙ্গ—স্ত্রীলিঙ্গ হবে দাসিন্—দাসিনী। আর তা হ'লে 'দাসী' শব্দে ত বড় লোককেও ত বোঝান যেতে পারে—যার দাস আছে।

পণ্ডিত।—হাঁ, ব্যাকরণে সেটা ভুল হয় না।

শিক্ষক।—দুটি বিশেষ্য একত্র মিলিত হ'লেই দ্বন্দ্ব সমাস হয়,—যথা— বালক।—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

ভারতবর্ষ

৬ষ্ঠ বর্ষ | আষাঢ়—১৩২৬ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আফগান আমিরের সন্ধি-প্রার্থনা

আফগান আমীর আমানুল্লা সন্ধি প্রার্থনা করিয়া ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট ২৮শে মে তারিখে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম সরকারী কমিউনিকে প্রকাশিত হইয়াছে। আমির বলিতেছেন যে তাঁহার পক্ষের কোনও দোষ ছিল না,—যুদ্ধ আরম্ভ ভারতগবর্ণমেণ্টই করিয়াছিলেন। উত্তরভারতে যেরূপ অশান্তি ও উপদ্রব আরম্ভ হয়, বিশেষতঃ পেশোয়ার নগরে যেসকল ঘটনা হয় তাহাতে সেই অশান্তির বহ্নি তাঁহার রাজ্যেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় সীমান্ত রক্ষার্থ তিনি বাধ্য হইয়া সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই বাহিনীর সেনানায়ক সীমান্তের ম্যাপ অনুযায়ী আফগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া কয়েকটি স্থান সুরক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে খাত খনন করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে ব্রিটিশ সৈন্য আফগান সীমা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়, কাজেই বাধ্য হইয়া আমীর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আফগান দূত অবদুর রহমান ভারত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতগবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাঁহাকে বুঝাইলে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য তিনি স্থির করেন। এই কারণে যুদ্ধ চালাইবার জন্য আফগান ধর্ম্মপ্রচারক সেখগণ যে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা পত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আমীর তাহার প্রচার রহিত করিয়া এবিষয় মীমাংসার ভার জাতীয় সভার উপর অর্পণ করেন। জাতীয় সভা স্থির করেন, যে সকল ভ্রম বশতঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া যুদ্ধের অবসান করিবার জন্য বিশিষ্ট দূত ভারতে পাঠান হউক।

বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে আফগান সরকার যাহা কিছু করিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহার বিবরণ সমাধা করিয়া, আমীর ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তীব্র আলোচনা করিয়াছেন। এরোপ্লেন বা আকাশ-যান হইতে কাবুল ও জেলালাবাদ নগরে বোমা নিক্ষেপ ব্যাপার জর্ম্মাণ জেপেলিন কর্ত্তৃক লণ্ডননগরীর উপর বোমানিক্ষেপ ব্যাপারেরই অনুরূপ বলিয়া আমীর উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর আমীর জানাইয়াছেন যে দীর্ঘ শতাব্দীব্যাপী মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন হয়, অথবা অনর্থকরক্তপাতে উভয় দেশের মধ্যে শত্রুতা বদ্ধমূল হয়, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাঁহার সরল অভিপ্রায়ের নিদর্শন স্বরূপ আমীর সেনানায়কদিগকে সৈন্য চালনা ও সর্ব্ব প্রকার যুদ্ধকার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য যে আদেশ পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহার এক প্রস্থ নকলও ভারত সরকারের নিকট পাঠাইতেছেন।

উপসংহারে আমীর লিখিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের সহিত মিত্রতার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, এরূপ কল্পনাও আফগান সরকার কখনও করেন নাই। উভয় সরকারের মধ্যে যে

সকল প্রীতির ও কর্ত্তব্যের বন্ধন বহুকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা লঙ্ঘন করিতে কোনও কারণেই আফগান সরকার ইচ্ছা করেন না। যাহাতে উভয় পক্ষের সম্মান রক্ষা করিয়া, উভয়ের স্বার্থানুকূল সন্ধি স্থাপনা হয় ইহাও আফগান সরকারের অভিপ্রেত। আমীর বিবেচনা করেন উভয় পক্ষের ক্ষমতা প্রাপ্ত দূতগণ সম্মিলিত হইলেই অবিলম্বে এইরূপ সন্ধির ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

ভারতবাসীর মতামত

উপরে সরকারী সংবাদ হইতে আফগান আমীরের পত্রের সারাংশ ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল। এক্ষণে আফগান সমর সম্বন্ধে ভারতবাসীর মতামত কি তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যাবং যুদ্ধ চলিতেছিল, তাবৎকাল এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়ত আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত হইত না। কিন্তু আমীর যখন সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন ও বিনা সর্ত্তে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য নিজ সেনানায়কগণের প্রতি আদেশ দিয়াছেন, তখন ভারত সরকার যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিবার পক্ষে যে সকল সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আমীরের আপত্তি করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। অতএব ধরিয়া লওয়া যায় যে আফগান সমরে যুদ্ধ পর্ব্বের শেষ এবং শান্তি পর্ব্বের আরম্ভ। এ সময়ে সন্ধির সর্ত্তসম্বন্ধে প্রজাসাধারণের মতামত ব্যক্ত করিলে গভর্ণমেণ্টের সামরিক অসুবিধা অথবা অন্য কারণে আপত্তি করিবার কোনও হেতু দেখা যায় না।

অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতীয় লোকমতের কি মূল্য আছে। দেশের গভর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় লোকমতের প্রতি কোনও আস্থা বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তবেই লোকমতের একটা মূল্য থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে এরূপ দৃষ্টান্ত বা নীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই,—ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় সকল দেশেই স্বেচ্ছাতন্ত্র-মূলক গভর্ণমেণ্ট লোকমতের প্রতি প্রথমতঃ অনাস্থাই দেখাইয়াছেন, কিন্তু লোকমত বহু নিষ্ফল প্রয়াসের পর নিজ শক্তি বর্দ্ধিত করিতে করিতে অবশেষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কখনও কখনও দেশের এমন এক একটি সঙ্কটের সময় উপস্থিত হয়, যখন দেশবাসীর পক্ষে মতামত প্রকাশ না করিয়া নীরব থাকা নিতান্ত অন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়। প্রবল রাজশক্তি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া প্রজাসাধারণের পক্ষে স্বার্থ ও পরার্থ, ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুরোধে নিজমত ব্যক্ত করিতে বিরত থাকা সঙ্গত হয় না। পক্ষান্তরে সরকার পক্ষ হইতে অনেক সময় বলা হয়, এদেশে এখনও লোকমত বলিয়া কিছুই নাই। যে দেশ শতকরা ৯৫ জন লোক নিরক্ষর সেখানে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর উচ্চকণ্ঠ লোকমত বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। এ যুক্তির উত্তরও বহুবার বহু উপলক্ষে এদেশের দিক হইতে অনেকেই দিয়াছেন। অক্ষর পরিচয়ের সহিত রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য বোধের সম্বন্ধ ন্যায় যুক্তি অনুসারে কিছুই দেখা যায় না। ইউরোপের অনেক দেশে না হয় শতকরা ৯০ জন লোকেরই অক্ষর পরিচয় আছে, তাই বলিয়া তাহারা সকলেই শিক্ষায় ও চিন্তাশীলতায় এত উন্নত যে দুরূহ রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য আলোচনায় সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা মনে করিবার কোনও কারণ, অথবা এ বিষয়ের কোনও পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক দেশেই অল্পসংখ্যক শিক্ষিত শ্রেণীর লোক যাঁহারা, তাঁহারা এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দেশের লোকমত গঠন ও পরিচালনা করিয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে সাধারণ লোকশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া ক্রমে সাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচলন হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে অক্ষর পরিচয়ের সম্বন্ধে প্রজাতন্ত্র ইংলণ্ডের অবস্থাও বর্ত্তমান হইতে অনেক নিকৃষ্ট ছিল কিন্তু সেজন্য কি বলিতে হইবে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে লোকমত কখনও ছিল না?

অতএব গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় লোকমতের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা না দেখাইলেও আফগান সমর সম্বন্ধে স্বার্থ ও পরার্থ, ন্যায় ও ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিয়া ভারতের জনসাধারণের মতামত ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের পক্ষে—বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের যাহারা এ সকল বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করেন বা আলোচনা করেন, তাঁহাদের মতামতই বিশেষরূপে আলোচ্য।

যুদ্ধারম্ভের কারণ

যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রথমতঃ এই প্রশ্নই উঠে এ যুদ্ধ আরম্ভ হইল কেন, দোষ কোন পক্ষের। আমীর বলিতেছিলেন, দোষ

ভারতসরকারের, তাঁহার নহে,—তিনি ভারতীয় সৈন্যের কার্য্য হইতে ভারতসরকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধের আদেশ দিয়াছিলেন। আমীরের এ সকল কি সরল উক্তি, না পরাজিত, নিরুপায় শত্রুর সহজে অব্যাহতি পাইবার কৌশল মাত্র? এ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বাপর ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ পাইলে এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা সম্ভব হইতে পারে। যাবতীয় ঘটনার উভয় পক্ষ হইতে প্রকৃত বিবরণ পাওয়া সমাজের পক্ষে অসম্ভব। অতএব উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য কি থাকিতে পারে, উহা সফল করিবার সম্ভাবনা কিরূপ ছিল, এবং তদনুযায়ী উভয় পক্ষের আয়োজনেরই বা কিরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াই জনসাধারণ এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমাদের সরকারী বিবরণী হইতে দেখা যায়, ইতি পূর্ব্বে আফগান আমীরের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে সকল ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ— আমীর আমানুল্লার সিংহাসন গ্রহণ করিবার পরবর্ত্তী আচরণ সমূহে প্রজাবর্গের মধ্যে নানারূপ অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়ায় এই সকল অসন্তোষ বিনষ্ট করিয়া নিজ সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে নানা ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পাঞ্জাব দেশ বিজয়, অন্ততঃ লুণ্ঠন করিবার প্রলোভন দেখাইয়া দেশের লোকমত তাঁহার অনুকূল করিবার উদ্দেশ্যে আমানুল্লা ভারত বর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এ ধারণা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে। আমানুল্লা তরুণ যুবক, অল্পদিন মাত্র সিংহাসন লাভ করিয়াছেন, এরূপ গুরুতর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইলে প্রবীণ ও প্রতিপত্তিশালী প্রধান ও সর্দ্দারগণের সহকারিতার প্রয়োজন,—অতএব বুঝিতে হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য তাঁহার থাকিলে এই সকল প্রবীণ ব্যক্তিগণও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন, ইহা কি সম্ভবপর? যাঁহারা বিগত চারিবর্ষে ইউরোপীয় মহাসমরের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা ব্রিটিশ শক্তির সহায়তায় সম্মিলিত জর্ম্মাণ, অষ্ট্রীয়ান্ ও তুর্ক সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল দেখিয়াছেন, তাঁহারা যে অপরিণামদর্শী বালক আমীরের এইরূপ উন্মত্ত প্রলাপে প্রলুব্ধ হইয়া নিজ দেশের ও আপনাদিগের ব্যক্তিগত সর্ব্বনাশ সাধনের পথে অগ্রসর হইবেন, ইহা বিশ্বাস করা চলে না। বলা যাইতে পারে; পাঞ্জাব প্রদেশের ঘটনাসমূহ তাঁহার এরূপ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পক্ষে সুযোগ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কারণ অশান্তি সমগ্রভারতে নহে, প্রধানতঃ কেবল পাঞ্জাবের কয়েকটি স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল, সকল শ্রেণীর লোকেরাও আবার তাহাতে যোগদান করে নাই। প্রাশঃ সহরবাসীরাই দাঙ্গাকারী দলভুক্ত ছিল-এবং সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে এই অশান্তি প্রসারিত হয় নাই, ইহাই সরকারী বিবরণীতে দেখা যায়। কাজেই এরূপ সামান্য কারণে যে আফগান প্রধানগণ নিজেদের সর্ব্বনাশ হইতে পারে এতবড় গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা সঙ্গত মনে হয় না।

জনসংখ্যায় ও দেশের আয়তনে আফগানিস্থান ভারতের একটি প্রদেশের সহিত মাত্র তুলনীয় হইতে পারে; অর্থ ও সামরিক শক্তি বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতের সহিত তাহার তুলনাই চলে না। ঐ বিষয়ের পরীক্ষাও অনেকবার হইয়া গিয়াছে এবং আফগানগণ যে ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, তাহার ও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও তাহা সফল হওয়ার সম্ভাবনা কিরূপ, এদিক হইতে বিচার করিলে, আমীর যেভাবে নিজের দোষ অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা সরল বলিয়া বিশ্বাস করিবার পক্ষে বাধা দেখা যায় না।

তারপর আফগান সরকারের যুদ্ধের আয়োজন সম্বন্ধে যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও এই বিশ্বাসের পোষকতা হয়। আফগান সরকার অন্যূন দুইলক্ষ সৈন্য যুদ্ধের জন্য সমবেত করিতে পারেন, ইহা সরকারী বে-সরকারী নানা বিবরণী হইতেই দেখা যায়। যদি আফগান সরকার ইচ্ছা করিয়াই এই যুদ্ধ বাধাইতেন, তবে অভিযানের বিশিষ্ট প্রণালী (plan of campaign) অনুযায়ী অন্ততঃ ৫০।৬০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নির্দ্দিষ্ট কোনও পথে অগ্রসর হইত। যুদ্ধের বিবরণ যতদূর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে এরূপ কোনও যুদ্ধপ্রণালী অথবা বিশাল বাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায় না। সীমান্তের স্থানে স্থানে দুই চারিটি ব্যাটালিয়ান্ ব্যতীত বিরাট কোনও বাহিনী বৃটিশ আকাশ যানের

সাহায্যেও পরিদৃষ্ট হয় নাই। বাস্তবিক পাঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, এরূপ আয়োজন নিশ্চয়ই হইত। যাহার শক্তি ক্ষুদ্র, সেও কোনও বিরাট অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কিন্তু আফগান পক্ষে অবস্থানুযায়ী আয়োজনের পরিচয় তো কিছু দেখা যায় নাই ; বরং আফগান বাহিনী এরূপ যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না, এইরূপই দেখা গিয়াছে। কাজেই যুদ্ধের আয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলেও আফগান আমীরের উক্তি মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না।

সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, আমীরের নামে ভারতীয় নানা ভাষায় লিখিত ঘোষণাপত্র ভারতবাসীদিগকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে এদেশে প্রচার করা হইয়াছিল। এইরূপ ঘোষণাপত্র যে আমীরের জ্ঞাতসারে তাঁহারই আদেশক্রমে প্রচারিত হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ কি আছে? সরকারী বিবরণীতেই প্রকাশ যে রুসিয়ার বলসেভিকগণ আফগানিস্থানেও তাহাদিগের চর প্রেরণ করিয়া বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং অনেক তুর্কী সেনানীও সে দেশে আশ্রয় লইয়াছে। এই সকল ঘোষণাপত্র প্রচার করা ইহাদিগের দ্বারা অনায়াসেই হইয়া থাকিতে পারে। যুদ্ধের উপযুক্ত আয়োজন প্রভৃতি দেখিলে বরং বিশ্বাস করা যাইত যে আফগান সরকার ভারতীয় প্রজাকে উত্তেজিত করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা করিয়া লইতেছিলেন। যেখানে আয়োজনেরই অভাব, সেখানে অনর্থক শত্রুতা বৃদ্ধি করিয়া নিজ অনিষ্ট সাধন করিবার কারণ কি থাকিতে পারে বুঝা যায় না।

অতএব আমরা যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে আফগান আমীর ব্রিটিশ সৈন্যের গতিবিধি দেখিয়া আফগানিস্থান আক্রমণ করা ভারত সরকারের উদ্দেশ্য, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

আফগানের আশঙ্কা

আফগান দিগের মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা হওয়ার কারণও যথেষ্ট ছিল। ইউরোপীয় মহাসমরের ফলে ইসলাম গৌরবের অবশিষ্ট একটিমাত্র স্বাধীন ইস্‌লাম-শক্তি তুর্কী সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত প্রায়। সন্ধি সম্বন্ধে যে সকল জল্পনা কল্পনা ইউরোপের নানাদেশে হইতেছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে তুর্কী সাম্রাজ্যের কনস্তান্তিনোপল সহ ইউরোপীয়ান প্রদেশ, তীর্থস্থান সমূহ সহিত সিরিয়া প্রদেশ, আর্ম্মানীয়া ও মেসোপটেমিয়া প্রদেশগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন বা অপরাপর শক্তির অধীন করিয়া দেওয়া হইবে। এরূপ গুজবও শোনা গিয়াছিল যে, বহু শতাব্দীর পর সেণ্ট সোফিয়ার মসজীদ ভাঙ্গিয়া পুনরায় উহা খৃষ্টীয় মন্দিরে পরিণত করা হইবে। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন মুসলমান নরপতি ব্যতীত ইস্‌লামধর্ম্মের প্রধান পরিচালক বা মালিক অপর কেহ হইতে পারেন না এবং ইসলামের তীর্থস্থান সকলের কর্ত্তৃত্ব ইঁহার হস্তেই ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। তুর্কী সাম্রাজ্য এইরূপে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হইলে এবং তীর্থস্থান সকলের কর্ত্তৃত্ব ইউরোপীয় শক্তি বিশেষের ইঙ্গিতে পরিচালিত কোনও ক্ষুদ্র নরপতির উপর অর্পিত হইলে, ইসলামধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ যে খলিফার পদ তাহার ব্যবস্থা কি হইবে? এই সকল কারণে ভারতীয় মুশলমানগণের মধ্যে পর্য্যন্ত চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সঞ্চার দেখা গিয়াছে। অতএব স্বাধীন মুসলমান দেশ আফগানিস্থানে যে এই উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য বিশিষ্ট আকার ধারণ করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? তারপর রাজনৈতিক কারণেও আফগানের আশঙ্কা বর্দ্ধিত হওয়ার কথা। এক দিকে ব্রিটিশ ও অপরদিকে রুষ এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে অবস্থিত থাকায় আফগানিস্থান দুর্ব্বল হইলেও এ যাবৎ নিজ স্বাতন্ত্র্য এক প্রকার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইউরোপীয় সমরের পরিণামে রুষ সাম্রাজ্য এক্ষণে বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল এবং ব্রিটিশশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রবল। অতএব আফগান সরকারের সহিত পূর্ব্ব সৌহৃদ্য বজায় রাখিবার স্বার্থ ব্রিটিশ সরকারের পূর্ব্ববৎ বিশেষ কিছু নাই। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় সন্ধির ফলে এসিয়ার পরিণাম যেরূপ নির্ণীত হইতেছে, তাহাতে মেসোপটিমিয়ার শাসনভার এবং উত্তর পারস্যে রুষিয়ার যাবতীয় অধিকার ও ক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর ন্যস্ত হইবারই কথা। কাজেই পূর্ব্বে সিঙ্গাপুর হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত দক্ষিণ এসিয়ায় ব্রিটিশ শক্তিরই প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতএব দক্ষিণ এসিয়ার ভাগ্যবিধাতা প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ব্রিটিশশক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত স্বার্থের অনুরোধে ক্ষুদ্র আফগানিস্থানের

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পাওয়ার কোনও কারণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে হিন্দুকুশ পর্ব্বত-মালার অপর পার্শ্বে এবং আফগান উত্তর সীমান্ত অকশাস্ বা প্রাচীন বক্ষুনদীর অপর পারে রুষিয়ার অধিকৃত তুর্কীস্থান অবস্থিত। এই প্রদেশে মার্ভ, টাস্কেণ্ড প্রভৃতি স্থান আশ্রয় করিয়া রুষিয়ার বলসেভিকগণ তাহাদিগের বিপ্লববাদ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতেছে। হয়ত ব্রিটিশশক্তি রুষিয়ার বলসেভিকদিগকে দমন করিবার জন্য রুষিয়ান তুর্কীস্থানের বোখারা সমরকন্দ, টাস্কেণ্ড প্রভৃতি স্থানে সৈন্য চালনাও করিতে পারেন তাহার জন্যও আফগানিস্থানের মধ্যদিয়া পথের প্রয়োজন হইবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আফগান সরকার ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কার্য্যই হয়ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং সেই কারণেই সাধারণ ব্যাপারেই ভীত হইয়া ব্রিটিশ পক্ষ এইবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এইরূপ ধারণা তাঁহাদিগের মনে স্থান পাওয়া অস্বাভাবিক হয় নাই।

যুদ্ধের পরিণাম

এক্ষণে যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে ইহাই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। পরিণাম কি হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই যুদ্ধের কারণ ও বিবরণ কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। আমীর লিখিয়াছেন যে, ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই, পরন্তু ভারতসরকারের অভিপ্রায় বুঝিতে ভ্রম হওয়ায় আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদি এ কথা স্বীকার করা হয়, তবে তাঁহার অপরাধ গুরুতর নয়। অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে অপরাধী ব্যক্তির আইন অনুযায়ী নানাপ্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। ত্রুটি স্বীকার করান, সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, প্রাণদণ্ড ইত্যাদি নানারূপ দণ্ডের ব্যবস্থাই আইনে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও জাতিকে দণ্ডিত করিতে হইলে প্রথম তিনটি ব্যবস্থা সহজ ভাবেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ব্যক্তির পক্ষে কারাদণ্ডের সহিত জাতির পক্ষে সেই জাতিকে তাহার কোনও কোনও স্বাধীন অধিকার সম্বন্ধে সর্ত্তে আবদ্ধ করা তুলনীয়; সম্পত্তিবাজেয়াপ্তের সহিত সেই জাতির দেশের অংশ বিশেষ গ্রহণ করা অথবা সেই দেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অধিকার দাবী করা তুলনীয়. এবং প্রাণদণ্ডের সহিত সেই জাতির স্বাধীনতা বিলোপ করা তুলনীয়।

আফগান সমর ব্যাপার বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই। আফগানবাহিনী কর্ত্তৃক ব্রিটিশ ভারতে কোনও অংশের বিশেষ কোনও অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। এস্থলে যখন আফগান সরকার ভ্রমবশতঃ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, এবং এই উক্তি বিশ্বাস করিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণও বর্ত্তমান আছে; তখন ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে প্রথম দুইটি দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া আফগানদিগকে অব্যাহতি দেওয়া সঙ্গত, নিতান্ত পক্ষে আমাদিগের সরকার সৈন্য পরিচালনার খরচ বাবদ ক্ষতি-পূরণ দাবী করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত দুই সরকারের মধ্যে পূর্ব্বের যে সকল বাধ্যবাধকতা আছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখাই কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল ও প্রবলের মধ্যে যখন কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন দুর্ব্বলের অপরাধ ক্ষমা করাই প্রবলের পক্ষে ধর্ম্মানুমোদিত। ক্ষমা করিবার অধিকার ও সুযোগ প্রবলেরই আছে দুর্ব্বলের নাই। দুর্ব্বল যাহা সহিয়া যায় তাহা ভয়ে, আর প্রবল শাস্তিবিধানের ক্ষমতা সত্ত্বেও দুর্ব্বলের অপরাধ যদি সহিয়া যান তাহাতে ভয়ের আরোপ করা যায় না তাহাতে তাঁহার উদারতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

স্বার্থ ও পরার্থের দিক হইতে বিচার করিলেও এই ব্যবস্থা সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। দুই পক্ষের মধ্যে বৈদয়িক সম্বন্ধ বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষের যাহা স্বার্থ তাহাই প্রথম পক্ষের পরার্থ। অপর পক্ষের অধিকার প্রভৃতি স্বার্থ ন্যায়ধর্ম্মানুসারে অটুট রাখা কর্ত্তব্য। উদার ভাবে বিচার করিলেই নিজ স্বার্থের সহিত পরার্থের বিশেষ বিরোধ আছে এরূপ প্রতিপন্ন হয় না। আফগানদিগের স্বার্থ যাহাতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা ভারত-বাসীর পক্ষে পরার্থ বটে, কিন্তু উদার ভাবে বিচার করিলে তাহার সহিত ভারতবাসীর স্বার্থের কোনও বিরোধ নাই বরং ইহা ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল। যতদিন প্রবল রুষিয়ান শক্তির সহিত ব্রিটিশ সরকারের শত্রুভাব ছিল, ততদিন উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবধায়ক ক্ষুদ্র রাজ্য (Buffer State) হিসাবে আফগানিস্থানের স্বাতন্ত্র্যের

প্রয়োজনীয়তা বিশেষ পরিস্ফুট ছিল। ইউরোপীয় সমরের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে মিত্রভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে পুনরায় রুষিয়ার বলসেভিক সরকারের সহিত শত্রুতা চলিতেছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে দুইটি দেশের মধ্যে কখনও চিরস্থায়ী শত্রুতা মিত্রভাব থাকিতে পারে না। আজ যে মিত্র কাল সে শত্রু হইতে পারে। এজন্য অপর দেশ শত্রুতা অবলম্বন করিলে যেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সেই অনুসারেই কার্য্য করিতে হয়। কাজেই ব্যবধায়ক ক্ষুদ্র রাজ্য হিসাবে আফগানিস্থানের স্বাতন্ত্র্য ভারতবর্ষের পক্ষে চিরদিনই প্রয়োজনীয় থাকিবে।

তারপর দেখা যাউক, যদি ভারত সরকার আফগানিস্থানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লোপ না করিয়া ঐ দেশের মধ্যদিয়া রেলপথ খনির কার্য্য বা অন্য ব্যবসায় বাণিজ্যসংক্রান্ত অধিকার দাবী করেন, তাহার পরিণাম ফল কি হইতে পারে। প্রবল শক্তি যদি কোনও দুর্ব্বল শক্তির দেশে এরূপ অধিকার লাভ করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন, তাহার পরিণামে ক্ষুদ্র দেশের রাজশক্তি বিলুপ্ত হইয়া তাহার শাসন ভার প্রবলের হাতেই আসিয়া পড়ে। ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। বর্ত্তমানে মিশরদেশও এই নিয়মের একটি দৃষ্টান্তস্থল। অতএব আফগানদিগের সহিত সন্ধির ফলে তাহাদিগের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সহিত সংস্পৃষ্ট বিষয়ে কোনও অধিকার দাবী করিলে তাহার পরিণামে আফগানিস্থানের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইবে।

আফগানিস্থান ভারতসরকারের অধীনস্থ একটি প্রদেশে পরিণত হওয়া আমাদিগের স্বার্থের অনুকূল নয় প্রতিকূল। এরূপ হইলে ভারতের সীমান্ত উত্তরে বক্ষুনদীর অপর পারে রুষীয় তুর্কীস্থান এবং পশ্চিমে পারস্যের সহিত সংযুক্ত হইবে। এবং পশ্চিম ও উত্তর এসিয়া হইতে ভারতের যে ব্যবধান আছে তাহা অপসারিত হইবে। অতএব বড় বড় রাজ্যের সহিত ভবিষ্যতে সংঘর্ষ হইবে, আত্মরক্ষার্থে ভারতের সামরিক শক্তি আরও বাড়াইতে হইবে। তারপর রুষীয় তুর্কীস্থানে অথবা পারস্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তাহাতেও ভারত-গভর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, অথবা রাজ্য বিস্তারকারী কোনও ভবিষ্যৎ সমাট প্রতিনিধি বা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পার্শ্ববর্ত্তী দেশ বিভাগের জন্য অভিযান করিতেও প্রলুব্ধ হইতে পারেন। এই সকল কারণে আফগান রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইলে ভারতসরকারের সামরিক ব্যয় অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং বড় বড় দেশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনাও অনেক বেশী হইবে। এই সকল ব্যয় বাহুল্যের তুলনায় আফগানিস্থানকে যে বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় তাহা অতি সামান্য মাত্র। অন্য সকল কারণ ছাড়িয়া দিলেও অন্ততঃ এই কারণে কোনও চিন্তাশীল ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের এইরূপ কোনও অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিবেন না। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ; অন্নবস্ত্রের অভাবেই ভারতবাসী জীর্ণ। অর্থাভাবে ভারতসরকার জনসাধারণের হিতকর স্বাস্থ্য উন্নতি প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। তাহার উপর ভারতসরকার যদি এইরূপ ব্যয়বহুল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ হইবে, দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া-প্লেগ- প্রপীড়িত ধ্বংসোন্মুখ জাতি আরও দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইবে। ভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদিগের রাজসরকারের এরূপ কুমতি না হয়।

শাসন সংস্কার প্রস্তাবের কথা

ভারতের শাসনপ্রণালীসংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাব এতদিনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট মহাসভায় পৌছিয়াছে। এই প্রস্তাব আইনের পাণ্ডুলিপি আকারে কমন্স বা প্রতিনিধি সভায় পেশ হইয়া দ্বিতীয়বার সাধারণ আলোচনার পর একটি নব নির্ব্বাচিত কমিটির হস্তে বিশেষরূপে বিবেচনার জন্য সব অর্পিত হইয়াছে। এই কমিটি প্রয়োজন অনুসারে এ বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া যেরূপ সঙ্গত বিবেচনা করেন, তদনুরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করিয়া উহা পুনরায় কমন্স সভায় পেশ করিবেন। তখন আবার হয়ত সমগ্র কমন্স সভা কমিটিতে পরিণত হইয়া ইহার যাবতীয় অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিবেন। তারপর আবার সেই সংশোধিত প্রস্তাব তৃতীয়বার কমন্স সভায় পঠিত ও সমালোচিত হইবে এবং অধিকাংশের মতানুযায়ী আকারে

তাহা পাশ হইবে। কমন্সসভায় শেষ পর্য্যন্ত এই সকল ব্যাপার হইবে।

ইহার পর লর্ডসভার পালা। যেরূপ ব্যবস্থার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় ইতি পূর্ব্বেই লর্ডসভায় উক্ত বিল দ্বিতীয়বার পর্য্যন্ত পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে কমন্স সভার পাশ করা বিল লর্ডসভায় উপস্থিত করা হইলেই হয়ত বিশেষ বিবেচনার জন্য কমিটি গঠিত হইবে, নতুবা তৃতীয় বার আলোচনা হইবে। ইহার ফলে যদি বিল বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় তবে পুনরায় কমন্স সভায় উহার আলোচনা হইয়া পরিবর্ত্তিত অংশ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। যদি কমন্স সভা এ সকল পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিয়া লন ভালই, নচেৎ সমগ্র বিল বাতিল করিয়া প্রস্তাব উঠাইয়া লইতে হইবে।

দুই সভা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলে তবে সেই বিল সম্রাটের অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হইবে। অবশ্য এখানে কোনও গোলের সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় নীতি ও রীতি অনুসারে, দুই সভার পরিগৃহীত প্রস্তাব সাধারণতঃ সম্রাট্ বিনা আপত্তিতে অনুমোদন করিয়া থাকেন, এইরূপ কোনও প্রস্তাব কোনও অংশে পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার তাঁহার নাই। তবে যদি তিনি মনে করেন যে এইরূপ কোনও প্রস্তাব, দেশের পক্ষে অকল্যাণ-জনক অথবা পার্লামেন্টে পাশ হইয়া থাকিলেও যুক্ত রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাগণ উহার বিরোধী, তাহা হইলে, রাজা পার্লামেন্টের পাশ করা সমগ্র বিল না মঞ্জুর করিতে পারেন। ইহার ফলে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং কমন্স সভা পুনরায় নির্ব্বাচিত হয়। নব নির্ব্বাচিত কমন্স সভা পুনরায় সেই বিল পাশ করিলে এবং লর্ডসভা কর্ত্তৃক তাহা পরিগৃহীত হইলে সম্রাট পুনরায় আর তাহা রদ করিতে পারেন না।

লর্ডসভার আপত্তি সম্বন্ধেও ব্যবস্থা ইহারই অনুরূপ। লর্ড সভা অবশ্য প্রতিনিধি সভার পাশকরা বিলের অংশ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। এই পরিবর্ত্তিত বিল কমন্স সভা আলোচনা করিয়া যদি পরিবর্ত্তিত অংশ গুলি গ্রহণ করেন, ভালই নচেৎ বিল উঠাইয়া লইতে হয়। এইরূপ কোনও বিল উঠাইয়া লওয়া যদি কোনও মন্ত্রীসভা স্বীয় সম্মান ও কর্ত্তব্য বিরুদ্ধ মনে করেন, তাহা হইলে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিতে পারেন, অথবা কমন্স সভার নব নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। যদি নবনির্ব্বাচিত কমন্স সভায় পূর্ব্ব মন্ত্রীদিগের প্রাধান্য বজায় থাকে, তাহা হইলে পুনরায় পূর্ব্ব আকারে পূর্ব্ববিল পাশ করিয়া লর্ড সভায় পেশ করিতে পারেন। একই আকারে দ্বিতীয়বার কমন্স সভা হইতে পাশ করা কোনও বিল লর্ডসভা পরিবর্ত্তন বা না মঞ্জুর করিতে সক্ষম নহেন। অতএব দেখা যাইতেছে, কমন্স সভা যে আকারে কোনও বিল পাশ করেন, তাহা লর্ডসভা একবারমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। এই পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি থাকিলে, কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া নবনির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়, নচেৎ মন্ত্রীদলকে ঐ বিলের প্রস্তাব উঠাইয়া লইতে হয়।

মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে শাসন সংস্কার বিষয়ক মূল প্রস্তাব যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও দেশের কোনও রাজনৈতিক দল যথেষ্ট ও সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তারপর প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহের মতামত সব ভারতগভর্ণমেণ্ট যে নিজ মত বিলাতে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে মূল প্রস্তাব অনেক বিষয়ে সঙ্কীর্ণ করিবার কথাই বলা হইয়াছে। অধুনা কমন্স সভার ভারতসচিব এবিষয়ে যে আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে যে মূল প্রস্তাব কিরূপ আকারে পরিণত হইয়াছে তাহা এযাবৎ বুঝিতে পারা যায় নাই। কারণ তাহা অদ্যাবধি এদেশে প্রকাশ করা হয় নাই। তবে ঘটনা দেখিয়া যেরূপ অনুমান হয় তাহাতে ও প্রতিনিধি সভায় ভারতসচিবের প্রস্তাবনা উপলক্ষে বক্তৃতার যে অংশ এদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, মূল প্রস্তাব অনেক বিষয়ে সঙ্কীর্ণ করিয়া পার্লামেন্টে উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহার পর আবার নবনির্ব্বাচিত কমিটি বিলাতে সাক্ষী সাবুদ লইয়া দ্বিতীয়বার পরিবর্ত্তন করিবেন, তারপর তৃতীয় আলোচনা উপলক্ষে কমন্স সভায় আবার তৃতীয় দফা পরিবর্ত্তন হইবে। তারপর এই আকারে বিল পাশ হইলে লর্ডসভা আবার চতুর্থবার পরিবর্ত্তন করিবেন। লর্ড সভায় যে পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা যে স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে, ইহা নিশ্চিত মনে

করিবার কারণ এই যে সম্প্রতি যুদ্ধের পর কমন্স সভার নূতন নির্ব্বাচন হইয়াছে,—খাস যুক্তরাজ্য সম্পর্কিত অনেক গুরুতর বিষয়ের ব্যবস্থা এই সভাকে অচিরে করিতে হইবে, এরূপ অবস্থায় যে ভারতশাসনপদ্ধতির সংস্কার বিষয়ক বিলের পরিবর্ত্তন উপলক্ষে এই সভা অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার নবনির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে, এরূপ দুরাশা আমাদের মনে স্থান দেওয়া বাতুলের কার্য্য হইবে। তারপর লর্ডসভায় যে পরিবর্ত্তন হইবে ইহাও একরূপ ধরিয়া লওয়া যায়। কারণ বিলাতে সংস্কার বিরোধী দলের প্রাধান্য এই সভাতেই বেশী। লর্ড সিডেনহাম্ বোম্বাইয়ের গভর্ণর ছিলেন, তিনি বিলাতে ফিরিয়া গিয়া, ভারতবাসীদিগের উচ্চ আশার বিরোধী একদল গঠন করিয়া বক্তৃতা ও কাগজে লেখালেখি আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া, আমরা এদেশে মাত্র তাঁহাকেই আমাদের বিরুদ্ধ বলিয়া ভাবিতেছি। কিন্তু লর্ড সিডেনহাম্ বিলাতে একজন সাধারণ ব্যক্তি, তাঁহার অপেক্ষা ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে অনেক বড় লর্ড আছেন, যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষাও এসকল প্রস্তাবে অনেক বেশী প্রতিকূলতা করিবেন। ইংলণ্ডের ইতিহাস যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে প্রতিযুগেই প্রায় প্রত্যেক উদার প্রস্তাবেই পার্লামেণ্টে লর্ডসভা প্রতিবাদী হইয়াছেন। কি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট-সংস্কারের প্রস্তাব, কি উপনিবেশ সমূহের শাসনপদ্ধতির সংস্কার প্রস্তাব, কি আয়ার্লণ্ডে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব, সকল প্রস্তাবেই লর্ডসভা চিরদিন বাদী হইয়াছেন। দুর্ভাগ্য ভারতের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করাও চলে না যে এহেন লর্ডসভা বিনা আপত্তিতে, বিনা পরিবর্ত্তনে কমন্স সভার পাশ করা ভারতশাসন-সংস্কার বিষয়ক বিল মঞ্জুর করিয়া দিবেন।

অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, শাসনসংস্কার বিষয়ক মূল মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড প্রস্তাব অন্ততঃ চারিবার সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইবে। পার্লামেণ্টে যে আকারে ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা জানিতে পারিলেই প্রথম দফা পরিবর্ত্তন কি হইল আমরা বুঝিতে পারিব। তারপর প্রথম কমিটির দ্বিতীয় দফা পরিবর্ত্তন শেষ আলোচনার তৃতীয় দফা পরিবর্ত্তন ও লর্ডসভার চতুর্থ দফা পরিবর্ত্তন বাকী থাকিবে। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই যে মূল প্রস্তাব আরও সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করিবে, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধের মতই মানিয়া লওয়া যায়, যুক্তি প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব ইহার শেষ আকার যে কি দাঁড়াইবে তাহা কল্পনা করা বড়ই কঠিন। গয়লার বাড়ী হইতে গ্রাহকের নিকট পৌঁছাইতে যদি প্রত্যেক হাত বদ্‌লাইতে দুধে জল মিশিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পরিণামে তাঁহার ধবলতাটুকুও অবশিষ্ট থাকে কিনা সন্দেহ।

এই ত গেল শাসন সংস্কার প্রস্তাবের শেষ আকার কি হইবে সেই কথা। কিন্তু সেই শেষ আকারে কত দিনে ইহা পৌঁছাইবে, তাহা এ বিষয়ের দ্বিতীয় কথা। প্রথম কমিটি সাক্ষী সাবুদ লইয়া বিল পরিবর্ত্তন করিবেন, এ সকল ব্যাপার সময় সাপেক্ষ, কাজেই অন্ততঃ একবৎসর হয়ত ইহাতেই কাটিবে। তারপর প্রতিনিধি সভা অবসর মত ভারতের কথা তুলিবেন এবং শেষ আলোচনা করিবেন তাহাতে আরও ৫।৬ মাস চলিয়া যাইবে। বিশেষ জরুরি অনেক কাজ থাকিলে চাইকি বৎসরও ঘুরিয়া যাইতে পারে। তারপর লর্ডসভার বাগ-বিতণ্ডা, কমিটি ইত্যাদি ব্যাপারে আরও ছয়মাস লাগিবে। পরিবর্ত্তিত আকারে বিল কমন্স সভায় ফিরিয়া আসিলে পর আরও ২।৪ মাস হয়ত কাটিবে। অতএব শাসন সংস্কার রসায়নের পাক শেষ হইতে প্রায় তিনবৎসর এখনও লাগিবে

কবির গান

(*From Tennyson*)

থেমে গেছে বরষার ধারা,
ভাবে ভোর কবিবর নগরের কোলাহল ছাড়ি,
হইয়াছে আজি আত্মহারা।

বায়ু ভরা পূরব আকাশ,
কালো মেঘ গুলি ঢেউ খেলে যায় যবশীর্ষোপরি
মৃদু মন্দ বহিছে বাতাস।

নিরজনে বসি কবি গায়—
ললিত মধুর কণ্ঠে; বন্য হংস শুনি সেই গান
লুটাইয়া পড়ে তার পায়।

চাতক ভরত পাখী থামে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেছে দূরে; ধীরি ধীরি পল্লবের তলে
সর্পশিশু গুড়ি গুড়ি নামে।

শ্যেন পক্ষী আজি সে ভীষণ
পদতলে রাখিয়া শিকার, স্পর্শ নাহি করে তারে
মোহে করে সঙ্গীত শ্রবণ।

বলে থেদে পাখী বুল বুল
কত গান গাহিয়াছি, গাহি নাহি তেমন সুন্দর,
এ গানের আছে কোথা ভুল!

পলে পলে চ'লে যায় কাল
প্রলয়ের অবসানে কি ঘটিবে বলে দেয় কবি
গানে রচি' লয় মান তাল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যবিশারদ।

সুধীবচন

১। মূর্খা চিহ্নানি ষড়িতি গর্ব্বদুর্ব্বচনং মুখে।
বিরোধী বিষবাদী চ কৃত্যাকৃত্যং নমন্যতে॥

মুখে গর্ব্ব আর রূঢ় কথা, বিবাদ, বিষবাদিতা এবং শুভাশুভ বোধ-শূন্যতা—এই ছয়টি মূর্খের লক্ষণ।

২। মূর্খোহি জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ॥

শূকরের বিষ্ঠা গ্রহণের ন্যায় অন্যের ভালমন্দ কথার মধ্যে মূর্খ কেবল মন্দ কথাই গ্রহণ করে।

৩। উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।
পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্॥

মূর্খের নিকট উপদেশ ক্রোধেরই কারণ, শান্তির জন্য নহে—যেমন দুগ্ধ পান দ্বারা সর্পের বিষই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪। মূর্খোঽপি মূর্খং দৃষ্ট্বাচ চন্দনাদপি শীতলং।
যদি পশ্যতি বিদ্বাংসং মন্যতে পিতৃঘাতকং॥

মূর্খের নিকট মূর্খদর্শন চন্দনস্পর্শ হইতেও শীতল, কিন্তু মূর্খ বিদ্বান্ দেখিলে পিতৃহন্তা বলিয়া মনে করে।

৫। অন্তঃসারবিহীনস্য সহায়ঃ কিং করিষ্যতি।
মলয়েঽপি স্থিতো বেণুর্বেণুরেব ন চন্দনঃ॥

যাহার ভিতরে কোন পদার্থ নাই, তাহার (বড) মুরুব্বি কি করিবে, মলয় পর্ব্বতে থাকিলেও বেণু বেণুই থাকে, চন্দন হয় না।

৬। ক দোষোঽত্র ময়া লভ্য ইতি সংচিন্ত্য চেতসা।
খলঃ কাব্যেষু সাধূনাং শ্রবণায় প্রবর্ত্ততে॥

ইহা হইতে কি দোষ বাহির করিতে পারে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই খল ব্যক্তি সাধু ব্যক্তির কাব্য শুনিতে আরম্ভ করে।

বিনুদা

(উপন্যাস)

(১৩)

মাতুলপুত্র অনাদিমোহনের দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার্থে দিন পনর হইল বিনয় সপরিবারে তাঁহাকে লইয়া পুরীতে আসিয়াছে। পুরীতে করুণাময়েরই একখানি বাড়ীতে তাহারা রহিয়াছে। নিজের হাত-খরচ বাবদ করুণাময় বিনয়কে যাহা দিতেন, তাহার অধিকাংশই বিনয় সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল ন্যূনাংশ মাসিক-পত্র ও পুস্তকাদি ক্রয়ার্থে ব্যয়িত হইত। সেই অর্থেই বিনয় আশাতিরিক্ত চিকিৎসা করাইয়াও যেদিন হাল ছাড়িয়া দিল, সে দিন সন্ধ্যায় অনাদির মৃত্যুক্ষণ বড় দ্রুত আসিয়া পড়িতেছে বলিয়াই বহুদর্শী প্রবীণ চিকিৎসক জবাব দিয়া গিয়াছেন।

মঙ্গলা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"ঠাকুর পো! আমাদের কি হবে গো! তোমায় কত কষ্ট দিয়েছি—তাই বুঝি আজ এই আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল!"

বিনয় বহুকষ্টে নিজে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল,—"বৌঠান, চুপকর! তুমি অমন কল্লে দাদা যে আরও অস্থির হবেন।"

"চুপ কর্ত্তে কি পারি ঠাকুর পো! আজ যে একে একে এই আগেকার দিনগুলোর কথা আমার সব মনে পড়্ছে গো! ওগো অধর্ম্ম যে কারও সয়না গো!"

অনাদিমোহন ইঙ্গিতে বিনয়কে কাছে ডাকিলেন,—বিনয় অনাদির গায়ের চাদরখানি একটু সরাইয়া পার্শ্বে বসিল। অনাদির অন্তরের রুদ্ধ জ্বালা বিকৃত হইয়া মুহূর্ত্ত মৃত্যুর মত মুখের উপর জমিয়া বসিয়াছিল। বিনয় সেই দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ ফিরাইয়া নিল।

বহুদিবসাবধি অনাদিমোহন বহুমূত্র রোগে ভুগিতে-ছিলেন, কলিকাতায় বহুচিকিৎসার পরও তাহাই এবার বিশেষ বাড়িয়া উঠিলে, একদিন মঙ্গলা বিনয়ের দুটী হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুর পো! তুমি রাজা ভাই থাক্তে উনি কি আমাদের ফাঁকি দিয়ে যাবেন! অনেক কথাই তোমার মনে গাঁথা আছে জানি, আজ ভুলে গিয়ে আমার আর নিশির মুখ চেয়ে তুমি ওকে বাঁচাও ঠাকুরপো।"

করুণাময়ের আশ্রয় লাভ করিবার পর বিনয় প্রায়ই আসিয়া অনাদির খোঁজ খবর লইয়া যাইত। নিশিকে কোলে তুলিয়া লইত,—মঙ্গলার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া দু'চারটা গাল শুনিতে চাহিত; মঙ্গলা কিন্তু আর গালিও দিত না, কথাও কহিত না, অনেক দিন দেখাও দিত না। বিনয়ের মুখ দেখিলেই তাহার বড় লজ্জা করিয়া উঠিত, লুকাইয়া থাকিত, ডাকিলে সাড়াও দিত না।

করুণাময়ের অনুমতি লইয়া তাহার পরের দিবসই বিনয় ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ মতে ইহাঁদের লইয়া পুরীতে চলিয়া আসিয়াছিল।

আসিবার সময় করুণাময় বলিয়া দিয়াছিলেন,—"বিনু, আমারও শরীর ভাল নয়,—বেশী দিন থেকোনা যেন। সবটা বেশ গুছিয়ে দিয়েই তুমি চলে এসো, যখন যা প্রয়োজন হয় চেয়ে পাঠিও, মুখচোরা হয়ে থেকোনা যেন। রোজ একখানা করে পত্র লিখ্বে।"

এখানে আসিয়া প্রতিদিনই বিনয় মনে করিত এখন ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু ক্রমশঃই বর্দ্ধিতোন্মুখ ব্যাধিগ্রস্থ অনাদির কাতর দৃষ্টি এড়াইয়া, যাই যাই করিয়াও সে এতদিন রওয়ানা হইতে পারে নাই। সেবা শুশ্রূষায় পরিশ্রান্ত বুকে সেই উদ্বেগটাই বিনয়কে বেশী অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল।

তোয়ালে লইয়া অনাদির কোটরগত চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বিনয় কহিল,—"ভয় কি দাদা; তুমি সেরে উঠবে।

অনাদি কি বলিতে চেষ্টা করিয়া বড় করুণদৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল,—বিনয় সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন বলিল,—"আমায় চিন্তে পাচ্ছো না দাদা—আমি যে তোমার ভাই।"

কয়েকদিন হইতে অনাদির বাগ্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। একটা তপ্ত শলাকায় কে যেন অনাদির মর্ম্মস্থলটা বিদ্ধ করিয়া দিল। যন্ত্রণাতুর উচ্ছ্বসিত আবেগে অনাদির অসার রসনা ঘুমন্ত অবস্থায় বৃশ্চিকদংশনের জ্বালায় যেন

চিৎকার করিয়া উঠিল,—"বিন্নু! বিন্নু! আমিও কে ছিলাম তোর ভাই, সেদিন সেই বর্ষার জলে যখন—"

অনাদি আর বলিতে পারিলেন না। বন্যার মত বাঁধন ভাঙ্গিয়া অশ্রুপ্রপাত তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। অনাদির ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু কোন শব্দই আর বাহির হইল না।

সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত হইতেই যেন অনাদির ব্যাধি তিল তিল করিয়া আরোগ্যের দিকে যাইতে লাগিল। এতদিনের এই মজ্জাগত ব্যাধি মৃত্যুর দিকে যতটা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, বিনয়ের বিপুল অর্থব্যয়ে ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে অনাদি যেন ততটাই সজীবতার সাড়া দিয়া উঠিল।

বিনয় লিখিল,—উত্তরে করুণাময় এবার লিখিলেন,—"দিন দিন আমিও যেন কেমন হইয়া পড়িতেছি। অনাদি বাবু অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া যথার্থই বড় প্রীত হইলাম। তোমার নিঃশ্বাসে, তোমার ছায়ায়ও বুঝি একটা জীবনীশক্তি আছে; নিজের ভিতরই তাহা অনুভব করিয়াছি। নিজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিও। যত সত্বর পার চলিয়া আসিও।"

বলি বলি করিয়াও অল্পভাষী বিনয় সেইদিন আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। নিয়মিতরূপে প্রতিদিনের মত আজও অনাদির অবস্থা দেখিয়া, ঔষধ দিয়া পথ্য করাইয়া, বাতাস করিয়া, অনাদি ঘুমাইলে, নিজেও দুটি আহার করিয়া, নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে গিয়া শুইয়া পড়িল। একটা অজানা আশঙ্কায় থাকিয়া থাকিয়া তাহার প্রাণটা যেন বড়ই কাঁদিয়া উঠিতেছিল। করুণাময় লিখিয়াছেন,—"আমিও যেন কেমন হইয়া পড়িতেছি।" তবে কি তিনি এখনও অসুস্থ? নীহারকে বড় মর্ম্মাহত দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার উপর প্রত্যাখ্যাত নীরদের আশাও বাধ্য হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। রমণী হৃদয় তাহা পারিয়াছে কি? যদি না পারিয়া থাকে, অভিমানিনী নীহার মুখ ফুটিয়া ত কিছুই বলিবে না। ব্যর্থতা তাহার নিজেকেই তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। নীহারের জন্য বাবাকেও বড়ই ক্ষুণ্ণ দেখিয়া আসিয়াছি।—এই বৃদ্ধ বয়সে নীহারের জন্য তিনি বড়ই অস্বস্তিতে আছেন। আহা, নীহার যদি তাহা বুঝিত,—বুঝিয়া সামলাইয়া চলিত! আমাদের জন্যই তাঁর এ অশান্তি। নীহার যদি তাহা বুঝিত, তবে তাঁর কোন সাধই অপূর্ণ রাখিত না,—তাঁর অবাধ্য হইত না,—তাঁহার এ শেষ সাধটাও—ছিঃ—ছিঃ—কল্পনাও কত বড় স্বার্থপর! শেষ সাধ যে তাহারই সঙ্গে নীহারের শুভ মিলন—

বিনয় আর ভাবিতে পারিল না,—থিয়েটার ভাঙ্গিবার পর অগণ্য দর্শকবৃন্দের মত বিনয়ের জাগরণ ক্লিষ্ট মস্তকে হুড় হুড় করিয়া সহস্র চিন্তা একসঙ্গে তাহার শ্রান্ত কল্পনার উপর দিয়া চলিয়া গেল। চক্ষু দুইটি আপনা হইতেই কখন বাড়াইয়া গিয়া স্বপ্নের দুয়ার খুলিয়া দিল।

সদ্য প্রভাতে পুরীর জলো হাওয়ায় একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলাইয়া দিয়া বিনয়ের সুখের তন্দ্রায় যখন একটা প্রগাঢ় সুপ্তি আনিয়া দিতেছিল, একখানি সবল যষ্টির উপর দুর্ব্বল দেহভার রাখিয়া, ভেজান কপাটটা ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া অনাদি ডাকিলেন,—"বিনু, উঠিস্ নেরে! থাক্ থাক্, ঘুমা আর একটু, অনেক রাত্রিতে শুয়েছিস্ বুঝি।"

মুক্তদ্বার পথে সাগরপারের সদ্য বিকশিত প্রভাতারুণের রাশিকৃত স্বর্ণাভা আসিয়া বিনয়ের মুখে চোখে লুটাইয়া পড়িল,—ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বিনয় চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে সাশ্চর্য্যোল্লাসে বলিল,—"একি দাদা, আপনি উঠেছেন?"

তখনও নীরস মুখখানি বিস্তৃত বিস্ফারিত করিয়া হাসিয়া অনাদি বলিলেন,—"তুই-ই তো উঠিয়েছিস্ বিনু। আজ আমি বেশ ভাল আছি। তাই এসে অবধি প্রথম আজ সাগরপারের সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। বাড়ীর এত নিকটে! অতি সুন্দর, অতি মনোরম। বিনু আনন্দে আমার এতদিনের ব্যাধির সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে গেছে।"

পাশের একটা ঘরে একখানি ছোট চৌকীর উপর বসিয়া বিনয় চা খাইতেছিল, নিশিকান্ত সেইখানেই একটা বাটী লইয়া বসিয়াছিল। মঙ্গলা একটা স্পিরিটের ষ্টোভে অনাদির জন্য খানিকটা দুধ গরম করিতেছিল।

নিশিকান্তের বাটীতে চা ঢালিতে ঢালিতে বিনয় বলিল, "আমি আজই যাব বৌঠান।" মঙ্গলা ফিরিয়া চাহিতেই বিনয় আবার বলিল,—"মানা করোনা বৌঠান, বাবার বোধ হয় শরীর ভাল নয়, যেতে লিখেছেন।"

"তবে আর কেমন ক'রে মানা করি ঠাকুরপো? তবে আমরাও তোমার সঙ্গেই যাব।"

"তোমরা আরও কয়েকদিন এখানেই থাক, দাদারও শরীরটা আর একটু সারুক।"

"দরকার নেই আর, মেলাই কতকগুলো খরচ হচ্ছে। কত আর দেবে তুমি? তোমার দয়া ঠাকুরপো—"

কথাটা চাপা দিয়া বিনয় বলিল,—"মেলা আর কি খরচ হচ্ছে বৌঠান? বাড়ী ভাড়া এখানেও লাগছে না, সেখানেও লাগে না। খাই খরচ সেখানে যা', এখানেও ঠিক তাতে না হলেও সেখানেও লাগে ত বটে। বাবা টাকা পাঠিয়েছেন, এই নাও।"

বলিয়াই বিনয় কয়েকখানা নোট মঙ্গলার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল—নিঃশব্দে নোটগুলি তুলিতে তুলিতে মঙ্গলা বলিল,—"কিন্তু আজ ত তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না ঠাকুরপো, আজ দিন ভাল নয়। বেস্পতিবারের দিন তোমায় আমি কিছুতেই যেতে দেবো না। কাল বরং— হাঁ, একসঙ্গে সবাই যাব।"

লাঠীখানির উপর ভর দিয়া আসিয়া অনাদি থামিয়া কহিলেন, "তোর চা খাওয়া হয়েছে বিনু?"

কোন প্রত্যুত্তরের পূর্ব্বেই মঙ্গলা বলিয়া উঠিল, "ওগো! ঠাকুরপো আজই যাচ্ছিল, তা কাল এক সঙ্গেই সব যাব। তুমিও ত সেরে উঠেছ, আর এখানে থেকেই বা কি দরকার? বিশেষ এখানে একা—তার চেয়ে কোলকাতাতেই চল—যেখানে সব চেনা শুনো আছে। কি বল, কালই যাই চল। আজ চল একবার বাবা জগন্নাথের পায়ের ধুলো নিয়ে আসি গে।"

অনাদি বলিলেন,—"তা বেশ ত, এখানে থেকে আর দরকারও নেই—চল কালই। কোলকাতার কোন পত্র পেয়েছিস্ রে?"

ততক্ষণে বিনয় নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল,— "বাবার পত্র পেয়েছি; তাঁর শরীর হয় ত অসুস্থ—বৃদ্ধও হয়েছেন, যাওয়া দরকার।"

অনাদি কহিলেন,—"তা আজই চল্ না যাই আমি পারব যেতে।"

"আজ দিন ভাল নয় বল্‌ছেন বৌঠান, কালই যাব।" বলিয়াই বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রবলবেগে কাঁদিয়া ফেলিল,—মঙ্গলার মুখ দেখিয়া আজ তাহার মায়ের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে।

(১৪)

সেই দিন, সেই জন্মদিনের উৎসব সন্ধ্যায় নীরদকান্তিকে জবাব দেওয়ার পর নীহারের মুখে সেই অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়াই তিনি কেমন উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক দিন শুধু নীহারকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"আজ যদি মনোরমা বেঁচে থাকৃত!"

একটা দারুণ অবসাদে ক্রমশঃই তিনি অন্তরে অন্তরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিলেন। পরের বোঝা ঘাড় পাতিয়া স্বেচ্ছায় বহন আজ এতদিনের পর তাঁহার মনে যেন বড়ই একটা বিরক্তির ভাব উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ইচ্ছা করিয়াই তিনি নীহারের কথা ভুলিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধও হইয়াছিলেন, হঠাৎ তাঁহার শরীর বড়ই ভাঙ্গিয়া পড়িল। জীবনের প্রতি একটা বিরক্তিপূর্ণ তাচ্ছিল্যেই তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। বিনয় তখন পুরীতে, নীহার প্রতিবাদ করিতে গেলে অনেক কথাই তাঁহার গলায় ঠেলিয়া উঠিত, কিন্তু কিছু না বলিয়াই তিনি নিজের ঘরে চলিয়া যাইতেন। নীহার কাছে বসিতে গেলে সহজ স্বরে তিনি বলিতেন,—"যাও মা, আমায় একটু একলা থাকৃতে দাও, শেষ দিন কয়টায় একটু ভগবানের নাম করি।" নীহার ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে কত কি ভাবিতে বসিত; সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ঘাতপ্রতিঘাত খোঁচা খাইয়া যেন রক্তাক্ত হইয়া পড়িত। বুকের ভিতরে কি একটা যেন যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিত। তাহার জন্মের কথা, তার পর তাহার শৈশবের কথা, মায়ের কথা, সেই দিন সেই সন্ধ্যায় তাহার মূর্চ্ছার কথা, সেই বাদ্‌লার দিনে নীরদের কথা, বিনয়ের কথা, আর আজকাল তাহার পালক পিতার এই বিপরীত ভাবাপন্ন হইবার কথা তাহার মনে আসিয়া তাহাকেই সম্পূর্ণ অপরাধিনী করিয়া চলিয়া যাইত,—এক একবার তার মন ভরিয়া উঠিত, "বাবা! তোমার কথাই শুনব, নীরদকে আমি ভুলব, তুমি আমায় আবার তেমনি ভালবাস বাবা!" কিন্তু কোথা হইতে এক-রাশি স্মৃতির তাড়না একটা বিপ্লব বাধাইয়া দিত। কবে

কোন্ দিন নীরদ কি বাজাইয়াছিল, কবে সে তাহার কি উত্তর দিয়াছে; কবে কোন মুহূর্ত্ত হইতে নীরদকেই সে তাহার জীবনের আরাধ্য দেবতার পদে বরণ করিয়া লইয়াছে সমস্ত হৃদয়ের মধ্যে কতখানি স্থান নীরদকান্তি জুড়িয়া বসিয়াছে,—সব নীহারের চোখের সম্মুখে যেন একটা আলো ছায়ার সম্মিলিত ঢেউ বহিয়া যাইত, সেই উদ্বেল তরঙ্গে বাকী সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাইত,—স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, প্রবৃত্তি, স্পৃহা হৃদয়ের সমুদয় সুকুমার বৃত্তিচয় ঝঙ্কারিয়া শুধু প্রেমের সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিত! রমণী হৃদয়ের সার সম্পত্তি, নারী জীবনের যথাসর্ব্বস্ব স্বামীর চরণে সব ঢালিয়া দিয়া যেন নীহার নীরদের চিন্তায় ডুবিয়া যাইত! বিনয়কে যে নীহার ভাল না বসিত, তাহা নয়, বাসিত। কিন্তু প্রথম জীবনে যখন সে নিজকে করুণাময়ের কন্যা বলিয়া জানিত, তাহার গর্ব্বিত অভিমান বিনয়কে তাহাদেরই আশ্রিত ভাবিয়া কখনও পতিরূপে বরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহার পর যখন সে জানিল তাহার নিজের প্রকৃত জীবনী, তখন নীহার নীরদময়। নূতন যৌবনের প্রথম উন্মেষে সে তখন নীরদকান্তিকেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে!

আজ দুই দিবস যাবৎ ভিতরে ভিতরে রাত্রিতে করুণাময় বাবুর বেশ জর হইতে লাগিল। প্রাতে চায়ের টেবিলে নীহার জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা! তোমায় কত শুক্‌নো দেখাচ্ছে যে বাবা?" করুণাময় চা খাইতে খাইতে বলিলেন, "আমি এখন যেতে পার্‌লেই বাঁচি মা; আর কত দিন ভাল লাগে! কত দিন আজ মনো চলে গিয়েছে; তারই জন্য প্রাণ আজ কাল বড় কেঁদে উঠে মা।"

সেই দিনও অনেক রাত্রে বেড়াইয়া বেড়াইয়া করুণাময় প্রবল জর লইয়া গৃহে ফিরিলেন। নীহার চা লইয়া আসিয়া ডাকিল, করুণাময় কোন সাড়াই দিলেন না। চায়ের পেয়ালা রাখিয়া শয্যার পার্শ্বে গিয়া দেখিল, তিনি নিমীলিত নেত্রে পড়িয়া রহিয়াছেন। "ঘুমুচ্ছ বাবা?"—বলিয়া নীহার করুণাময়ের মাথায় হাত রাখিতেই চমকিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "একি! এ যে ভয়ানক জর! আমায় ডাক্‌লেও না বাবা?" ভারী সবুজ আবরণে গৃহের আলোক আচ্ছাদিত ছিল, তাই স্তিমিত আলোকে নীহার পূর্ব্বেই দেখিতে পায় নাই, জরের জ্বালায় করুণাময়ের মুখখানি বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

"বাবা, বড্ড জ্বালা হচ্ছে বাবা? তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব? কি করব?" "না মা দরকার নাই, তুই বোস্ আমার পাশে।" নীহার নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে করুণাময়ের মস্তক পার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। করুণাময় কহিলেন, "আমি তোদের মায়ের ডাক শুন্‌তে পেয়েছি নীরু, সে যে আমার জন্যই কতকাল বসে রয়েছে। বিনু এয়েছে রে? বিনু আমার সোনার ছেলে, বিনু এয়েছে রে? নীরু, মা!"

"বাবা! বাবা! আমায় ক্ষমা কর বাবা! এবারটীর মত আমায় ক্ষমা কর; আমি তোমার কথাই শুনব, তোমার কথাই রাখব বাবা।" করুণাময় শুনিতে পাইলেন কি না জানি না। জরের প্রাবল্যে তিনি ক্রমেই অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছিলেন। নীহারের চীৎকারে সরকার গোমস্তারা আসিয়া ডাক্তার আনিতে ছুটিয়া গেল। রুগ্ন অচৈতন্য পিতার পার্শ্বে নীহারও সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময়ে বিনয়ও পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পরের দিন ও পরের রাত্রি সমস্তক্ষণ বহু চেষ্টা করিয়াও বিনয় করুণাময়কে সম্পূর্ণ সচেতন করিতে পারিল না। বিনয়ের চিত্ত ব্যাপিয়া একটা দুরন্ত আক্ষেপ সমস্ত বুকে আঘাত করিতে লাগিল, কেন আমি আর এক দিন আগে এসে পৌছলুম না, কেন আমি বাবাকে ছেড়ে গিয়েছিলুম! নীহারের উপর অজ্ঞাতে একটা বিদ্বেষ আসিয়া পড়িল,—"সেওত আমায় লিখ্‌তে পারত!" মূর্চ্ছাভঙ্গে নীহার দেখিল, সম্মুখেই একজন অপরিচিতা রমণী তাহাকেই বাতাস করিতেছে। প্রথমে সে কিছুই বলিতে পারিল না, পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

"আমায় তুমি চিন্‌বে না বোন্।"

"বাবা কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন। ও কি, তুমি উঠো না! একটু ভাল হলে দেখতে যেও তখন। তোমার বিনুদা রয়েছে, কোন ভয় নেই।"

"বিনুদা এয়েছে?"

হাঁ, আমরা কালই এসেছি; এসে অবধি তোমায় আর সচেতন দেখ্‌তে পাইনি; কতই বকেছ সব, একটু ঘুমোও এখন, এই দুধটুকু খেয়ে নাও—এইবার শুয়ে পড়।"

"কি সব বকেছি আমি?"

"—পরে শুন্‌বে। এখন একটু ঘুমোও—আমি যাওয়া

ক'চ্ছ! লক্ষ্মীটি আমার! চুপ করে শুয়ে থাক।" বলিয়াই মঙ্গলা নীহারকে বাতাস করিতে লাগিল, আর এক হস্তে মুক্তকেশগুলি ছড়াইয়া দিতে দিতে অদ্ভুত দৃষ্টিতে নীহারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মঙ্গলার প্রশ্নোত্তরে নীহারকে বিনয় করুণাময়ের কন্যা বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিল।

অস্থির উদ্বেগে বিনয় করুণাময়ের শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া অনিমেষ নয়নে করুণাময়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল,—কখন তিনি একবার চক্ষু মেলিবেন,—"একবার—ওগো একটীবার," প্রাণের বিনিময়ে ভগবানের পায়ে বিনয় অনুক্ষণ যেন এই প্রার্থনাই করিতেছিল। সরকার অন্নদার সঙ্গে ডাক্তার সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। করুণাময়ের পারিবারে এই সাহেবই চিকিৎসা করিতেন। সাহেবও ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবেই সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিনয়ের নিকট তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেন,—আজকাল বেশ কথাবার্ত্তাও বলিতে পারিতেন।

সাহেব করুণাময়ের শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার পর উঠিয়া—"বিনু আমি আস্‌ছি" বলিয়াই বাহির হইয়া গেলেন।

অবিলম্বেই ডাক্তার সাহেব ফিরিয়া আসিলেন—অন্নদা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ডাক্তারের যন্ত্রের বাক্স লইয়া আসিল। সাহেব করুণাময়ের দক্ষিণ হস্তের মনিবন্ধের একটা শির কর্ত্তন করিয়া কি একটা ঔষধ প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বিনয় বলিয়া উঠিল,—"কি কর ডাক্তার?"

ডাক্তার পুনরায় অন্য হস্তে আর একটী ঔষধ প্রয়োগ করিলেন—তীব্র বিষের উত্তেজনায় করুণাময়ের দেহ নড়িয়া উঠিল। বিনয় বলিতে গেল—"আবার—" আর বলিতে পারিল না। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

বিষের প্রক্রিয়ায় করুণাময়ের অসাড় দেহ আবার একটু কাঁপিয়া উঠিল।

সমুদ্রের বুকে বহু দিবসাবধি ঝড় বৃষ্টি মেঘের পর প্রথম যে দিন সেই আকাশজলব্যাপী প্রলয়ের অবসান ঘোষণা করিতে পূবের হাওয়া আলোক রাজ্যের বার্ত্তা বহিয়া আনে,—জাহাজের ব্রীজের কাপ্তেন হইতে কেবিনের সাহেব, ডকের খালাসী পর্য্যন্ত সকলেই যেমন আনন্দোৎসুক নয়নে হাতের কাজ ফেলিয়া মুখের গ্রাস অভুক্ত রাখিয়া—জীবনে এই যেন প্রথম সূর্য্যোদয় দেখিতে চাহিয়া থাকে—তেমনি উদ্বেল আকুল আগ্রহে—অধীর পুলকে—কক্ষস্থ সকলেই করুণাময়ের দিকে চহিয়াছিল। সার্দ্ধচেতনাজড়িত আবল্যে করুণাময় কহিলেন,—"বিনু এয়েছে নীরু।"

"বাবা! বাবা! আমি এয়েছি বাবা। বাবা, একবার চেয়ে দেখ।"

"বিনুদা এয়েছে বাবা। বাবা কথা কও।"

"এয়েছে!"—করুণাময় চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—বিনয়ের চোখে চোখ পড়িল,—অধীর আনন্দে বিনয় কাঁদিয়া ফেলিল।

স্মরণাতীত দিন হইতে কয়েদ খাটিবার পর সদ্যমুক্তি-প্রাপ্ত কয়েদী সদরের লৌহ কবাট পার হইয়া সমস্ত আকাশ বাতাসটা যে ভাবে অনুভব করিয়া চাহে—স্বাধীন সত্ত্বা সে যেন তখনও ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই,—করুণাময় তেমনি ভাবে একবার কক্ষের চারিধার, কক্ষস্থ কলের মুখ, ঈষদোন্মুক্ত দ্বার পথে বাহিরের অন্ধকার আকাশটা নিরীক্ষণ করিয়াও যখন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, তিনি প্রকৃতই সচেতন কিম্বা অচেতন,—ধীরে ধীরে একখানি হস্ত বিনয়ের দিকে বাড়াইয়া দিলেন, অনুভব করিয়া বুঝিবেন।

ব্যাকুল আগ্রহে বিনয়—"বাবা! বাবা" বলিয়া করুণা-ময়ের হস্তখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল;—"আমায় চিন্তে পাচ্ছোনা বাবা? আমি যে তোমার বিনু।"

শিথিল তারের অস্ফুট ঝঙ্কারের মত করুণাময় শুধু বলিলেন,—"বিনু এয়েছিস্ বাবা! আঃ—"! যেন কত স্বস্তি, কত শান্তি, এতক্ষণ যেন তিনি তাহারই দর্শনাকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

উপাধান নিম্ন হইতে অতি কষ্টে চাবী বাহির করিয়া প্রসারিত হস্তে করুণাময় অদূরস্থিত অন্নদাকে কহিলেন,—"উইল!"

শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া ইতিমধ্যেই একদিন তিনি এটর্নি ডাকিয়া উইল তৈরী করিয়াছেন, বিনয় তখন পুরীতে।

কম্পিত হস্তে চাবী গ্রহণ করিয়া অন্নদা ড্রয়ার হইতে উইল বাহির করিল।

করুণাময় কহিলেন,—"পড়।"

বিনয় কহিল,—"রেখে দাও এখন বাবা,—আমার সঙ্গে তুমি কথা কও বাবা,—বল বাবা কোথায় তোমার জ্বালা।"

পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় বিনয় বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল, নীহার খাটের ফ্রেমে মাথা রাখিয়া করুণাময়ের দিকে চাহিয়াছিল,—কথা কহিবার শক্তিও নাই।

কম্পিত হস্তখানি বিনয়ের মাথায় রাখিয়া অন্নদার দিকে চাহিয়া আদেশের স্বরে করুণাময় কহিলেন,—"পড় উইল!"

অন্নদা সে আদেশ অমান্য করিতে পারিল না, পড়িল।

করুণাময় লিখিয়াছেন,—অতি সংক্ষেপে—"আমার স্থাবর অস্থাবর—জমীদারী এবং কলিকাতা কাশী ও পুরীর বাটী ত্রয় সমেত সর্ব্ব সুদ্ধ তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি সমস্তই আমার পালিত পুত্র শ্রীমান্ বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রাপ্ত হইবে,—এবং পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিবে। আমার পালিতা কন্যা নীহার বিবাহের পুর্ব্বাবধি জমীদারীর আয়ের বাৎসরিক ৬০০০০৲ টাকার এক চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইবে। বিবাহের যৌতুক বিনয়ের ইচ্ছানুসারেই প্রদত্ত হইবে। ব্যাঙ্কের দেড় লক্ষ টাকা বিনয় পাইবে। ইতি

করুণাময় কহিলেন, "ছেঁড়; আবার লেখ।" কাহারও কোন কথা কহিবারও সাহস ছিল না। মন্ত্র চালিতের মত অন্নদা ড্রয়ার হইতে কাগজ কলম লইয়া আসিল।

করুণাময় কহিলেন,—"লেখ।"

অন্নদা "বলুন।"

"আমার সমস্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ আমার কন্যা নীহার কণা—এবং বাকী বারো আনা আমার পুত্র শ্রীমান বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রাপ্ত হইবে। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ নীহার কণা নগদ টাকা এবং পুরীর বাড়ীখানি পাইবে। কলিকাতা এবং কাশীস্থ বাটীদ্বয় বিনয় পাইবে। ব্যাঙ্কের নগদ দেড় লক্ষ টাকার ৫০০০০৲ নীহারের এবং বাকী এক লক্ষ বিনয়ের। এতদ্‌বিষয়ের কাহারও কোনও আপত্তি থাটিবে না। ইতি।

"দাও দস্তখৎ করে দিই"

পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির মত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া—করুণাময় উইলের নিম্নে দাস্তখত করিয়া দিলেন,—পরে তাহা ডাক্তারের সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন,—"ডাক্তার—

অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহেব সে উইলের পাশে সহি করিয়া দিলেন।

"বস্—আমার কার্য্য শেষ—জানালা খুলে দাও,—বিনু! নিরু! আয় আমার কাছে আয়"—

উভয়ের মুখ চুম্বন করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি বিনু আগের গৌরবটুকু চিরকাল বয়ে নিও। আয় মা নিরু, ভাল হোস্, অভিমান ভুলে যাস্, ছোট হোস্ তবেই বড় হতে পারবি।"

করুণাময় উপাধানের উপর ঢলিয়া পড়িলেন,—দুই হস্ত তেমনি বিনয় ও নীহারের মাথায় রাখিয়া কহিলেন, "ঐরে—ঐ—তোদের মা আমায় ডাকতে এসেছেরে! দেখ্‌বি, ছাথ,—দেখতে পাচ্ছিস কি? আমি ত পাচ্ছি; ঐ ত, ঐ কালো জমাট মেঘগুলোর উপর ঐ বিজলীর আলোয় ঐ হাসিমাখা মুখখানা; দুখানি হাতে ছাউনিতে মেঘের কোলে জোছনার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস্‌নি। মনো! মনো! এসেছ! জানি তুমি আসবেই, না এসে তুমি পারবে না, চল যাই! বিনু! নীরু! আমার শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্। আমি যাই—"

করুণাময় চক্ষু বুজিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅতুলানন্দ রায়।

বংশ মাহাত্ম্য

হে বংশ, হে বঙ্গের চির সুহৃৎ, হে বাঙ্গালার অতীত গৌরবের সাক্ষী! আমি তোমাকে প্রণাম করি। বিধাতা জানেন, কোন স্মরণাতীত যুগে বাঙ্গালার মাটিতে তুমি প্রথম উপ্ত হইয়াছিলে। কিন্তু সেই অবধি সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে বাংলার মৃত্তিকার রসপান করিয়া, বাংলার জলবায়ুতে দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া চিরদিন তুমি বাংলার ও বাঙ্গালীর হইয়া আছ। হে বংশ তুমিই ধন্য, তুমিই যথার্থ স্বদের প্রেমিক! বাংলার সবই গিয়াছে, কেবল তুমি আছ। গৌড় অরণ্য, সপ্তগ্রাম ভাগীরথী গর্ভে নিমগ্ন, তাম-লিপ্তি শ্মশান, নবদ্বীপ অন্ধকার, কিন্তু—তুমি আছ, যেমন ছিলে তেমনই আছ। চৈতন্য হরিনামে, রঘুনাথ দিধীতিতে, জয়দেব গীতগোবিন্দে, চণ্ডিদাস বৈষ্ণব পদাবলীতে। প্রতাপাদিত্য ইতিহাসে,—কিন্তু তুমি সশরীরে বর্ত্তমান। অতএব, হে অজর অমর, অক্ষয়, অব্যয় আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে বংশ, তোমার মত বাংলার লবণের মর্য্যাদা রক্ষক ত আর একটা খুঁজিয়া পাই না। লক্ষণ সেন রাজা হইয়া যাহা পারেন নাই, কৃষ্ণচন্দ্র জমিদার হইয়া যাহা পারেন নাই, উদ্ভিদ হইয়াও তুমি তাহা করিয়াছ; হে উদ্ভিদ বংশাবতংশ! তুমিই যথার্থ বাংলার সুহৃৎ। বাঙ্গালীর প্রথম জন্মোৎসব দিনে নাড়চ্ছেদে তুমি, বাংলার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মোৎসবে দেবী প্রতিমার কাঠামোতে তুমি, আর সর্ব্ববিধ উৎসবের আসর সাজাইতে, মেরাফ বাঁধিতে তুমি। উৎসবে তুমি, আবার শ্মশানেও তুমি। কোটিপতিও শ্মশান যাত্রার দিনে আপনার সুবর্ণপালঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া তোমারি মঞ্চ আশ্রয় করে। হে বংশ, বিধাতা তোমাকে বাংলার সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সৃজন করিয়াছেন; তাই বাংলার আর সকলেই বাংলার মায়া কাটাইলেও তুমি সেই মহা শ্মশানে পড়িয়া আছ। বাংলার সে আনন্দ নাই, হাসি নাই, আশা নাই, উৎসাহ নাই, সে ধর্ম্মভিরুতা নাই, সে সহানুভূতি নাই, সে বারমাসে তের পার্ব্বন,—কিছুই নাই—কেবল তুমি আছ। হে বাংলার নিত্যকালের সঙ্গী আলোককে ছায়া সংস্পর্শ শূন্য বলিয়া ভাবিতে পারি অগ্নিকে উত্তাপ হইতে পৃথক করিয়া ভাবিতে পারি, জল হইতে সমস্ত সম্পর্কবিযুক্ত করিয়া তৃষ্ণাকে চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বাংলাকে ভাবিতে পারি না। তোমার অস্তিত্বের সঙ্গে বাংলার অস্তিত্ব ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। কিন্তু বংশ, তোমার এই একনিষ্ঠ দেশভক্তির ফল, এই পরহিতে সর্ব্বস্ব সমর্পণের ফল কি হইয়াছে জান কি! হে মহাযোগী, উচ্চশীর্ষ তুমি, চিরদিন বাংলার ইষ্টচিন্তায় সমাহিত হইয়া আছ, স্বার্থান্বেষী, অজ্ঞানান্ধ কাপুরুষের কলঙ্ক কাহিনী তোমার কর্ণে প্রবেশ করে কি? কিন্তু আমার যে সহ্য হয় না প্রভু! বিজ্ঞানান্ধ হস্তিমূর্খের দল বলে তুমিই নাকি বাঙ্গলার সর্ব্বনাশের কারণ; তুমিই নাকি মশককুলকে আশ্রয় দিয়া ম্যালিরিয়ায় দেশের ধ্বংস সাধন করিতেছ! পাষণ্ডেরা বলে বাঙ্গলাকে মনুষ্যবাসোপযোগী করিতে হইলে তোমার বংশ নির্ব্বংশ করিতে হইবে! হা ভগবান্! এ দোষ কারও নয়, বাঙ্গালার মাটিরই দোষ। অকৃতজ্ঞতার চাষ, নেমকহারামীর আবাদ বাঙ্গলার মাটিতে যেমন সাফল্য লাভ করিবে, এমন আর জগতের কোথাও নহে। এই বংশাতঙ্ক বাঙ্গলার বাবুদের এক নূতন ব্যাধি। জলাতঙ্কের ভয়ে কাসৌলি শৈলারোহণ, পীতাতঙ্কের ভয়ে চীনাদের য়ুরোপ বাস নিবারণ; আর এই বংশাতঙ্কের জন্য বাঙ্গলার পল্লী ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর সহরে পলায়ন। বংশ কিন্তু সর্ব্বত্র। কোথায় নাই! বোটানিক্যাল গার্ডেনে বাঁশ, জুগার্ডেন বাঁশ; চৌরঙ্গীতে বাঁশ, আবার বারাকপুরে লাট বাগানেও বাঁশ। সহরে গেলেই কি বাঁশের হাত হইতে নিস্তার আছে! চাকরীতে বাঁশ, ব্যাবসায়ে বাঁশ, বেকার ঘুরিয়া বেড়াইলে একেবারে অসংস্কৃত অখণ্ড বাঁশদণ্ড। গোটা সহরটা বাঁশের ভরে হাঁসফাঁস করিতেছে। কিন্তু সে বাঁশের কথা কেহ ভাবে না। হে সর্ব্বগুণাধার বংশবৃক্ষ! সব দোষ তোমারই। ভালকথা, উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, তুমি নাকি তৃণজাতীয়। আমরি! মরি! এমন পণ্ডিতের বালাই লইয়া মরি! হে মহাবৃক্ষ, এ সমস্তই তোমার গৌরব লাঘব করিবার মানসে বিদ্বেষবিজৃম্ভিত প্রলাপ মাত্র। কিন্তু এই সকল কীর্ত্তিনাশাদের সাধ্য কি, তোমার কীর্ত্তিনাশ করে।

হে বংশ,হয় ত নিয়তির নির্ম্মম বিধানে একদিন তোমার বংশ নির্ব্বংশ হইবে; কিন্তু "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি" তোমার দেবদুর্লভ কীর্ত্তিই তোমায় কালজয়ী করিয়া রাখিবে। হে কীর্ত্তিমান্, হে বাঙ্গলার অনন্য শরণ, তোমার কীর্ত্তিকাহিনী, তোমার গুণগরিমা, একমুখে বর্ণনা করা অসাধ্য। হে বংশ! ভক্ত আমি তোমার ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত প্লীহাযকৃৎ পুরিতোদর দুর্ব্বলদেহে শক্তি দাও, আমি তোমার গুণকীর্ত্তন করি। বাঙ্গলার শতসহস্র পর্ণকুটীর, যেখানে কত কল্পনা কুশল কবি, জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত; প্রাতঃস্মরণীয় গৃহী, সংসার বিরক্ত সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তোমারই দৈহিক উপাদানে নির্ম্মিত। তোমার কৃপায় বাঙ্গলার অতি বড় দরিদ্রও পর্ণকুটীরবাসী। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর পাকগৃহে কোক কয়লা তোমার স্থান অধিকার করিয়াছে বটে; কিন্তু এমন দিন ছিল, যে দিন একমাত্র তুমিই বাঙ্গলার পাকশালার চুল্লীতে ইন্ধন যোগাইয়াছ। রেলীব্রাদার চিরজীবী হইয়া থাকুক, কিন্তু তুমি যে একদিন ছাতা দিয়া বাঙ্গলার মাথা রক্ষা করিয়াছিলে সে কথা কেমন করিয়া ভুলিব?

ষ্টিলপেনের তীক্ষ্ণাগ্রভাগের ভয়ে শূন্যমস্যাধারে মুখ লুকাইয়া বাগ্দেবীর চরণতলে আশ্রয় লইয়াছে, সে কথা সত্য, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক না হইলেও আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি রামায়ণ; মহাভারত অষ্টাদশ পুরাণ ছ-খানা দর্শন, তোমার বা তোমার কোন পূর্ব্বপুরুষের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত। তারপর বাংলার শিল্প কৌশল, কলা বিদ্যা তোমাকে আশ্রয় করিয়া কি সরল ও বিস্ময় কর ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল! দুষ্টা গাভীকে তুমিই ফাঁদে ফেলিয়া দুগ্ধ প্রদান করিতে বাধ্য করিতে। দুষ্টের দমন ও মূর্খের চিকিৎসায় তুমি কেমন সিদ্ধ হস্ত ছিলে সে কথা বংলার মহাকবি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সমুদ্র মন্থনে সুধাও উঠিয়াছিল আবার হলাহলও উঠিয়াছিল, কিন্তু তুমি দুগ্ধ সমুদ্র মন্থন করিয়া নবনীতামৃত বংলার ঘরে ঘরে এতকাল যোগাইয়া আসিয়াছ, বাঙ্গালীর তুষ্টি, পুষ্টি আয়ু ধৃতি বর্দ্ধিত করিয়াছ মহাকবির প্রাণে ছন্দ যোগাইয়াছ, "আমন্দমন্থধ্বনিদত্ততালম্"। তাহারই ফলে বাঙ্গালী আজ তোমাকে ম্যালেরিয়া বীজভূত বলিয়া নির্ব্বংশ করিতে চায়। তাই কি তোমার বিনা সাহায্যে বংলার এক দণ্ড চলিবার যো আছে। এখনও কুলা, ডালা, ধুচনি, চুপড়ী না হইলে দিন চলেনা। চোঙ্গা না হইলে উনান জ্বলে না। আলনা না হইলে কাপড় দোলে না। মৎস্য প্রিয় বাঙ্গালীর মৎস্য শিকারে এখনও তুমি দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। মুনি, আড়ং, ঘোচনা, পোলো, চেটো, আটল, সবই তোমার দান। নিষ্কর্ম্মার নিত্য সহচর, ও অবসরের চিত্ত বিনোদন ছিপের কথা আর নাই বলিলাম। তোমার মত স্বত্ব রক্ষক আর নাই। তোমার "বেড়াই" রামের জমি হইতে শ্যামের জমিটুকু প্রভেদ করিয়া রাখিয়াছে; রাম তাহার পুকুর পাড়ে যে "নটিয়ার" ক্ষেত টুকু করিয়াছে, শ্যামের ছাগলের যে তাহা খাইবার অধিকার নাই তুমিই তাহা প্রমাণ করিতেছ। মহাপ্রাণ তুমি নিজেও যেমন উচ্চশীর্ষ অপরকেও তেমনি উচ্চশীর্ষ দেখিতে ভালবাস। তোমার মঞ্চ আশ্রয় করিয়া অনেক অকাল কুষ্মাণ্ড উচ্চে উঠিয়াছে আবার অনেক দুরারোহ উচ্চস্থানে উঠিবার একমাত্র অবলম্বন "মই"। তোমার নিন্দকদের মধ্যে এমন অনেক পরশ্রীকাতর নরাধম আছে যাহারা অপর কাহাকেও "গাছে তুলে, মইকেড়ে নিয়ে" আনন্দ উপভোগ করে; আবার এমন অনেক পণ্ডিতমূর্খ আছে যাহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে উপায়কে দূর করিয়া দেওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া ঈপ্সিত উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া পদাঘাতে "মই" দূর করিয়া দেয়। তাহাদের জীবন পথ বিলাতী মাটি দিয়া পালিস করা। কৃতজ্ঞতার কুশাঙ্কুরও তাহাদের পদে বিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু তবুও তোমার দান প্রাবৃটের মেঘের দানের মত অজস্র। তুমি আছাড় খাইয়া "ছেঁচা" হইয়া গরীব গৃহস্থের আবরু রক্ষা কর; দায়ের কোপ খাইয়া "কেঁচা" হইয়া লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা কর। তোমার "মাচায়" শুইয়া দীন দরিদ্র লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে, তোমার "খাঁচায় বসিয়া ময়না রাধাকৃষ্ণ বলে। তোমার সিন্দুর চুপড়ীটী সম্বল করিয়া নববধূ যে দিন স্বামী গৃহে যাইত সেদিন আর নাই, কিন্তু বিবাহ রাত্রে টোপরের অগ্রভাগে বিজয় বৈজয়ন্তি হস্তে তুমি এখনও দাঁড়াইয়া আছ। হে বাঁশ বাংলার বনমানুষ তুমি, ওস্তাদের হাতে পড়িলে তোমার হাড়ে ভেল্কি খেলে। বাংলার প্রধানও সনাতন যান গোশকটের বজ্র কঠিন পঞ্জর কয়খানা তোমার অস্থিনির্ম্মিত। আজকালকার নব্য ইন্দুর সম্প্রদায় Rat-Extricator বেশ ভাল

রূপই চেনে কিন্তু গত বৎসরের Influenza সহিয়া যে দু একটী বৃদ্ধ ইন্দুর বাঁচিয়া আছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা কর শুনিতে পাইবে "চোঙা" কলের কথা তাহারা আজও ভুলে নাই। ক্ল্যারিওনেট ও ফ্লুলোটে বাংলার আকাশ আজ ঝঙ্কৃত হইতেছে বটে, কিন্তু কোন্ দূর অতীতে যমুনাতীরে যে পাগল করা বাঁশের বাঁশী বাজিয়াছিল, তাহার সুরে মোহিত হইয়া বাঙ্গালার জগৎ পূজ্য কবি গাহিয়াছিলেন "এখনো সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে, এখনও প্রেমের খেলা সারা নিশি সারা বেলা, এখনও কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।" আর কত বলিব এখনও বাঙ্গালার বধূ গোমাতার পূজা করিয়া তাহার মুখে বংশ পত্র ধরিয়া আপনার স্বর্গবাস কামনা করে, এখনও বাংলার জননী বংশ পত্রে "ষাট" বানাইয়া পিতৃকুল ও স্বামী কুলের বংশ বৃদ্ধি কামনা করেন। "পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ" প্রভৃতি বচন বংশের নিত্য প্রয়োজনীয়ত্বই সূচিত করিতেছে।

অতএব হে বংশ, হে বাঙ্গালার উদ্ভিদ্ দেবতা তুমি বরদ হও। এই বর দাও, দিন দিন তোমার বংশের সহিত বাঙ্গালীর বংশ বর্দ্ধিত হউক, এই বর দাও বর্ষার আসার সিক্ত তোমার পত্র রাজির স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্য্যের মত ধৌত পাপ-তাপ বঙ্গ সন্তান অপূর্ব্ব গৌরব শ্রীমণ্ডিত হইয়া ধন্য হউক।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা

যদি দয়া ক'রে ভবে পাঠায়েছ হরি।
তবে দাও হে আমারে ক্ষমতা।
এ মহা বিশ্বে করিতে আপন
শিক্ষা দাও হে সমতা।
তোমার করুণা কিরণ পরশে
সুপ্ত হিয়া মম জাগুক হরষে
ঘুচুক্ মনের মোহের আঁধার
দূর হ'য়ে যাক জড়তা।

কাঁদে অসহায় নিরাশ্রয় যারা
মুছাতে তাদের তপ্ত অশ্রুধারা
ব্যথিত বেদনা জাগাতে পরাণে
দাও হে হৃদয়ে মমতা।
রিক্ত করিয়া ভাণ্ডার তব
দাও যত চাও দীনতা
দয়া করি দেব দিওনা কেবল
ঘৃণ্য অধম নীচতা॥

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালার কৃষি সম্পদ ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিকার

বাঙ্গালার উর্ব্বরক্ষেত্রই উহার সমস্ত সম্পদের একমাত্র অন্তহীন ভাণ্ডার। দেশের দিগন্ত-বিস্তৃত ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে অশেষ শস্য সম্ভারে প্রকৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান্য এবং বর্ত্তমানকালে পাটই প্রধান উল্লেখযোগ্য। উহাই বঙ্গের প্রধান উপজীবিকা ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ। উহা ভিন্ন ডাল, শর্ষপ, তিল, নারিকেল সুপারী কলা, আম, কাঁঠাল প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গের স্বাভাবিক উর্ব্বরতা সমগ্র ভারতের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার কারণও যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। বঙ্গের দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র বহুল, সুপরিসর নদনদ্যাদির বারিরাশি যোগে সরস হইয়া অপূর্ব্ব

উর্ব্বরতা-শক্তি লাভ করিয়াছে। ষড়্‌ঋতুর বিচিত্র লীলার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নানা মনোহর রূপ-বৈচিত্র সংঘটিত হইয়া দেশের শস্য সম্পদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে ও ক্ষেত্রাদির চির-যৌবনের হেতু অক্ষুণ্ণ থাকে। কৃষি-কার্য্যের সৌকর্য্যের জন্য কৃষককে অন্যান্য অনেক দেশের কৃষকের মত কষ্টসাধ্য উপায়ে ক্ষেত্রে জল প্রদান করিবার সম্পূর্ণ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না; কিম্বা দারুণ আতপ-তাপে সামান্যমাত্রও জলের নিমিত্ত আকাশের পানে চাহিয়া মেঘ হইতে বারি-বর্ষণের আকুল প্রতীক্ষা করিতে হয় না। বঙ্গদেশে 'হাজাশুকা'র উৎপাত খুবই কম। নদী-মাতৃকা বাঙ্গালার ভূমি চিরকাল রস হইতে বঞ্চিত হইবে না; অপিচ মেঘবারি প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়া কৃষকের আয়াস অনেক পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছে। কৃষকগণকে এই অযাচিত ও প্রচুর দানের সময় ও সুবিধা নিরূপণ পূর্ব্বক কাজ করিতে হয়; তাহাতে অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গকৃষকের আয়াস বা পরিশ্রম অতি সামান্য বা নগণ্য বলিয়া প্রতীতি হইবে। এই ভারতেরই বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ প্রদেশে কৃষিকার্য্য এমন ক্লেশসাধ্য ও প্রকৃতির স্নেহলাভ হইতে বঞ্চিত যে কৃষককুলকে প্রাণপাত করিয়া ক্ষেত্রের কার্য্যসাধন করিতে হয়।

কিন্তু এই সব প্রাকৃতিক সুযোগ সত্ত্বেও বাঙ্গলার কৃষি কার্য্যের প্রণালীতে এমন কতকগুলি ত্রুটী আছে যাহাতে এই সুযোগ অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইতেছে। জনমণ্ডলীর অধিকাংশই কৃষিজীবি নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রাংশ কর্ষণ করিয়া কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছে। প্রাচীন কাল হইতে কৃষকগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ জমি চাষ করিতেছে। বর্ত্তমানে যে অবস্থার দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রদান করা উচিত তাহা হইতেছে এই যে এদেশে কৃষক কুল স্ব স্ব বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া কায করিতেছে। কিন্তু কোন বিশেষজ্ঞ বা বিচক্ষণ ব্যক্তির নেতৃত্বে বা উপদেশানুযায়ী কায করিবার সুবিধা পাইতেছে না। আমাদের এত বড় কৃষিকার্য্যের সুযোগ, কিন্তু আমাদের দেশের লোক সেদিকে ফিরিয়া চাহিয়াও দেখেন না। অন্যান্য দেশের ধাতু শিল্পাদির ন্যায়, আমাদের কৃষিকার্য্য আমাদের দেশের প্রধান ও সর্ব্বোত্তম কার্য্য ও সমস্ত ব্যবসায়ের মধ্যে অগ্রগণ্য। অন্যান্য দেশের শিক্ষিতগণ নিজেদের দেশের গুরুতর ও মূল্যবান্ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া ব্যবসায়কে সর্ব্বপ্রকারে সম্পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিতেছেন; কিন্তু আমরা আমাদের দেশের প্রধান ব্যবসা কৃষিকে চিরকাল তুচ্ছ ও অবহেলা করিয়া আসিতেছি;—কৃষিকার্য্যও অসম্পূর্ণ ও বহু পশ্চাতে রহিয়া যাইতেছে! কিন্তু আমাদের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্য্যে মন দিতেন, দেশের জমি যদি উত্তম ও আধুনিক প্রণালী অনুসারে আবাদ করিতেন, তাহা হইলে যে অচিরে "সোণা ফলিত" তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দৈন্য ঘুচিয়া যাইত—দেশের জীবিকার্জ্জনের চিন্তার চিরকালের জন্য সুমীমাংসা হইত, দেশের প্রকৃত অভাব মোচন হইত। কারণ কৃষিকার্য্যের আয় চিরস্থায়ী আয়—ইহা ধ্বংস হইবার নহে। পরন্তু পুরুষানুক্রমে উহার ফলভোগ করিয়া দেশের সকল ক্লেশের ও "গুণরাশি-নাশকারী" দারিদ্র্য দুঃখের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা সম্ভবপর হইত।

আমাদের কৃষকদিগকে প্রকৃত সাহায্য দান করাই কৃষির উন্নতির পক্ষে প্রধান ও প্রকৃষ্ট পন্থা। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইয়া উন্নত ও সুফলদায়ী প্রণালী অনুসারে কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য কৃষকদিগকে শিক্ষা ও সাহায্য দান করিবেন। তাহা হইলেই দেশের এমন মূল্যবান্ ও বৃহৎ কৃষিব্যবসায় আশানুযায়ী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িতেছে না। আমরা মোহ-মুগ্ধ; আসল জিনিষ নিকটে থাকিতে আমরা তাহাতে হতাদর হইয়া সুদূরপরাহত লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ঘুরিয়া মরি! এমন বিরাট প্রশস্ত কৃষি ব্যবসায় রহিয়াছে,—তাহার মর্য্যাদা আমাদের অশিক্ষিত কৃষককুলই কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। শিক্ষিতগণ এখানে সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমরা নিয়ত দেখিতে পাই, কোথায়ও এই কৃষিসম্বন্ধে আড়ম্বরপূর্ণ ও কচিৎ করুণরস সম্বলিত বাক্যাবলীযুক্ত দীর্ঘ বক্তৃতা হইতেছে; কোথাও বা কৃষিসম্বন্ধে সুদীর্ঘ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ভাবময় প্রবন্ধ লিখিত বা পঠিত হইতেছে। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, উভয়ত্র কোনস্থলেই প্রকৃত উপদেশ বা পথ নির্দ্দেশের কোন উদ্যোগ বা অনুসন্ধিৎসা বর্ত্তমান নাই; আছে কেবল ভাবরসযুক্ত বাক্যযোজনাকৌশল

যাহা শ্রবণরঞ্জক বটে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে প্রকৃত তত্ত্বের নির্দ্দেশ করে না।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে কেবল বক্তৃতাদি উপদেশ দানে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ব্যক্তি বিশেষের কৃষিকার্য্যের প্রতি মন বা প্রকৃত ঐকান্তিকতা থাকা চাই। তাহা না হইলে উপদেশাদি কার্য্যকারী হইবে না! পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের গুরুত্বাদি বিবেচনা করিয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইতে চাহে, এমন ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা সুশিষ্যে প্রদত্ত বিদ্যার ন্যায় প্রকৃত কার্য্যকারী হইয়া থাকে। মোটকথা কৃষির উন্নতি করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে প্রকৃত আগ্রহ থাকা চাই, মন থাকা চাই, প্রকৃতরূপে যথাযথ চিন্তা করা চাই। কৃষি ভগবানের চিরন্তন বিধান, ইহা হইতে মানবাদি যাবতীয় প্রাণীর জীবিকা সংস্থান হইয়া থাকে। ইহার মূল্য চিরস্থায়ী; এবং যে ব্যক্তি কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন, তিনি নিজের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের প্রকৃষ্ট জীবিকার পথ চির প্রশস্ত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা উপদেশ মাত্রই পাইয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত উপদেশের সন্ধান পাই না। ইহাতে যে আমাদের কতকটা অসুবিধা না হয় তাহা নহে। আমরা কর্ত্তব্য বুঝিয়া থাকিলেও পন্থা পাই না। এক্ষেত্রে দেশের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এই যে অচিরে শিক্ষিতগণ দেশবাসীর সম্মুখে প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিবার ভার গ্রহণ করেন ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন।

এক্ষণে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমি কৃষিসম্বন্ধীয় সময়োপযোগী দুইটি পন্থার উল্লেখ করিব। উহাদের কার্য্যকারীত্ব অভিজ্ঞতা ও ধৈর্য্য সাপেক্ষ। যাহারা প্রথম হইতেই ভূমির অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কৃষির উন্নতি কিছুই কষ্টসাধ্য নহে, যদি তাহারা আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা পরিত্যাগ করিয়া নিজের হাতে কর্ম্মে লাগিয়া যান ও অন্যের প্রতি নির্ভরশীল না হইয়া প্রকৃত শিক্ষা ও বিচক্ষণতার সাহায্য লইয়া কৃষির যাবতীয় উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন।

পক্ষান্তরে যাহারা ভূমির অধিকারী হইতে পারেন নাই, তাহাদের প্রথমতঃ কিছু অর্থ, কিছু মূলধন দ্বারা ভূমির স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়া প্রকৃত উৎসাহ সহকারে আধুনিকতম প্রণালীসহযোগে কৃষির উন্নতির জন্য লাগিয়া যাইতে হইবে; কৃষক কুলকে ঐ ঐ প্রণালী অনুসরণ করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে হইবে। এরূপ করিলে পূর্ব্বে যেখানে একগুণ আয় হইতে, সেখানে দুই বা ততোধিক গুণ আয় হইয়া যেমন একদিকে কৃষিকার্য্যের তেমনই অন্যদিকে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থার আমুল পরিবর্ত্তনও উন্নতি সাধিত হইবে। দেশের যে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। এইরূপ একজন, দুইজন, তিনজন ক্রমে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগে কৃষিকর্ম্মের বিরাট আয়োজন সম্ভবপর হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে অল্প আয়াস ও ব্যয়ে ও অধিকতর সুশৃঙ্খলাসহকারে কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে ও দেশে নব আশার কিরণ ছটা দেশবাসীর মনে আনন্দ ও আশ্বাসের বারতা আনয়ন করিবে। দেশে এইরূপ ক্রমে পাঁচ সাত দশজন ও পরে আরও অনেক অনেক শিক্ষিত লোকে কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিলে দেশের যাবতীয় দৈন্য ঘুচিয়া যাইবে; এবং দেশের সমুদয় বিস্তৃত ক্ষেত্রের পানে দৃষ্টিপাত করিলে যেখানে বর্ত্তমানে জঙ্গলময় কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেখানে অচিরে শোভন উদ্যান পরিবেষ্টিত স্বাস্থ্যকর সুদৃঢ় আবাস গৃহাদি বিরাজ করিবে এবং সমস্ত বঙ্গভূমির দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনব সম্পদ যুক্ততার শোভা ধারণ করিবে। বর্ত্তমানে যে যে স্থলে সহর বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদয় স্থল ব্যতীত সমস্ত বঙ্গভূমিতে কেবল মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু যদি এই আশার স্বপন প্রকৃতই সফল হয়, তবে দেখিতে পাইবে যে বঙ্গের সর্ব্ব অঙ্গে শস্য শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে রম্য উদ্যানাদির সহিত আবাস গৃহাদির প্রাচুর্য্য নয়ন মনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। তাহা হইলে বঙ্গের অদৃষ্টে আর্থিক উন্নতি সুখসৌভাগ্যের যুগ আবির্ভূত হইবে!

কৃষিসম্বন্ধীয় আর এক প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করা যাইতে পারে; ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত এবং ইহা প্রকৃত পক্ষে কৃষি বাণিজ্যের অন্তর্ভূক্ত! ইহাতে আমদানি রপ্তানির নিমিত্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যত্র বহন করিয়া ক্রয়কালীন মূল্য হইতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান

হইতে পারা যায়! কিন্তু এই কার্য্য একাকী পরিচালনা করা দুরূহ। একেত হাতে যথেষ্ট মূলধনের প্রয়োজন! ইহাতে দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার খরচপত্রাদি ও শ্রমজীবিদিগের পারিশ্রমিকাদির বিধান সমস্তই যাহাতে সুশৃঙ্খলানুসারে নির্ব্বাহ হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই কার্য্যে যদি পাঁচজন সম-লক্ষ্য যুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তি একত্র হইয়া কার্য্যপরিচালনা করিতে পারেন, তবেই লাভবান হইতে পারেন। এইরূপেই কৃষিসম্বন্ধীয় যদি কিছু উন্নতি বিধান করিতে পারা যায়, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। বস্তুতঃ শস্য-উৎপাদন (Production) ও আমদানি রপ্তানির কার্য্য (Distribution)—এই দুইটি অতি বৃহৎ কার্য্য; এবং ইহা সুপরিচালিত হইলে দেশ যে প্রকৃতই সম্পদ্‌শালী হইবে ইহাতে, সন্দেহ নাই। আমরা যে এই সমস্ত কার্য্য কিছু কিছু না করিতে পারি বা না করিয়া থাকি, এমন নহে। সাহেবের কুঠীতে কিম্বা জমিদারের কর্ম্মালয়ে থাকিয়া আমরা এই প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি; কিন্তু স্বাধীন ভাবে করিতে পারিনা, কারণ আমাদের প্রবৃত্তি বা উৎসাহ নাই। বস্তুতঃ কোন কার্য্য করিতে গেলে, তাহাতে ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক ও স্বাবলম্বন অভ্যাস আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য তবে সিদ্ধি হইয়া থাকে।

দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি সমস্ত অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া দেশের প্রধান ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে চান ও দেশের অতুল সম্পদের দিন আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবেই ভবিষ্যতের উচ্চ আশা পোষণ করা সার্থক হইতে পারে। বঙ্গের প্রধান ব্যবসায়ে যে বাঙ্গালীর প্রকৃত অধিকার রহিয়া গিয়াছে, ইহা কি অধিক বুঝাইবার আবশ্যক হইবে? এবং এই ব্যবসায়ে যে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই আপনার শক্তি সামর্থ্য ও বিবেচনা নিয়োজিত করিয়া নিজেকে ও দেশকে যথেষ্ট উন্নত করিতে পারেন তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? বস্তুতঃ এই কৃষিকার্য্যেই যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রধান ও প্রকৃত অধিকার সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা বলিতে হইবে না। অতএব আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অধিক কাল বৃথায় যাপন না করিয়া আশু প্রকৃত কর্ম্মের অনুসরণ করুন। বঙ্গজননীর দান—কৃষিজাত প্রকৃত সম্পদরাশি যে উদ্যোগী পুরুষ সিংহকে অচিরে আশ্রয় করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ, বি এ।

কল্পনার প্রতি *

এস মোর কল্পনা সুন্দরি!
উষার ললিত তান লয়ে,
শোভাময় অমল শীতল
কনক আঁচল উড়াইয়ে।
ভুলে যাও অতীত সঙ্গীত,
রেখে দাও ভবিষ্য ভরসা,
সম্মুখের সুধার ভাণ্ডার
কর পান মিটায়ে পিপাসা।
বাঁধ বীণা নব তার দিয়ে,
গাও আজি নবীন সঙ্গীত,
পায় যদি একটু সান্ত্বনা
আঁধারের কোন বা ব্যথিত।

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত

---

* লেখিকার অন্তিম রোগশয্যায় রচিত।

আকবর শাহের বন্ধুপ্রীতি

উদার হৃদয় ও জনপ্রিয় মোগলসম্রাট আকবর শাহের অনেকগুলি বন্ধু ছিলেন। তন্মধ্যে বীরবল, ফৈজি ও আবুল ফাজলই প্রধান। বীরবল বাদশাহের কার্য্যে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন। ফৈজির স্বাভাবিক মৃত্যুই ঘটিয়াছিল; কিন্তু আবুল ফাজল সম্রাট পুত্র সেলিমের ষড়যন্ত্রে তাঁহারই নিয়োজিত উচগুার রাজা বীরসিংহের হস্তে বিদেশে নিহত হয়েন। একে একে বন্ধু ত্রয়ের বিয়োগ শোকে আকবর কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন ইতিহাস প্রিয় পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা সে বিবরণ এ স্থলে প্রদান করিলাম।

পেশোয়ারের নিকটস্থ পর্ব্বতবাসী আফগানেরা অতিশয় কঠোর ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠায় তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট্ আকবর ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা বীরবল ও জৈনখাঁর অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই পর্ব্বত বাসীদিগের সহিত যুদ্ধে জৈনখাঁর হঠকারিতায় বীরবর বীরবল অকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সংবাদে সম্রাট অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন এবং জৈন খাঁর হঠকারিতায় এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে অবগত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মুখ দর্শনে বিরত ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবলের মৃত দেহ না পাওয়ায় লোকে গুজব রটাইয়াছিল যে, আফগানেরা তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। বন্ধুবৎসল আকবর এ গুজবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বীরবলের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন। একজন দুষ্ট কৌশলী লোক এই সুযোগে বীরবল সাজিয়া সম্রাটের নিকট আসিতেছিল; কিন্তু এ ব্যক্তিও সম্রাটের নিকট পৌছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সম্রাট্ বীরবলকে এতই ভালবাসিতেন যে এই জাল বীরবলের মৃত্যু সংবাদেও তিনি নূতন শোক পাইয়াছিলেন। *

* In the course of action for subduing Yusafies, Akbar's greatest personal friend Raja Birbal died owing to the rashness of Zein Khan, the General. Akbar refused to see Zein Khan, and was long inconsolable for the death of Birbal. As the Raja's body was never found, a report gained currency that he was alive among the prisoners and it was so much encouraged by Akbar, that a long time afterwards an imposter appeared in his name. As this Second Birbal died before he reached the court, Akbar was again mourning.

Elphinstone's History of India.

ফৈজি আকবরের সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। কথিত আছে তিনি ব্রাহ্মণবেশে কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। আকবর ইহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে ৫ই অক্টোবর ফৈজী পরলোক গমন করেন। বদৌনি বলেন যে কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ রব করিতে করিতে ফৈজি প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অতিরিক্ত দৌর্ব্বল্য বশতঃ বাক্ রোধ হইয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়। পীড়িত হওয়ায় ফৈজি কয়েকদিন রাজ সভায় আসিতে পারেন নাই। সম্রাট প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে দ্বিপ্রহর রাত্রে ফৈজীর অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠায় তাঁহার স্বজনবর্গ সম্রাটকে সংবাদ প্রেরণ করেন। সম্রাট্ তখন দিবসের কর্ম্মক্লান্ত দেহ লইয়া দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় সুষুপ্তি সুখে মগ্ন ছিলেন; কিন্তু স্নেহের বন্ধুর পীড়া বৃদ্ধির অবস্থা জ্ঞাত হইয়া সে সুখ শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজবৈদ্য সমভিব্যাহারে সামান্য লোকের ন্যায় পদব্রজে ফৈজির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফৈজির তখন মুমূর্ষু অবস্থা। বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া সম্রাট বালকের ন্যায় বিলাপ করিয়া একেবারে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া করুণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সেখজি আমি তোমার জন্য হেকিম লইয়া আসিয়াছি। তুমি কি আমার সহিত একটী কথাও বলিবে না? কিন্তু ফৈজির কথা বলিবার শক্তি ছিল না। উত্তরে তিনি শুধু সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সম্রাট বন্ধু শোকে উন্মত্তপ্রায়, হইয়া রাজমুকুট দূরে নিক্ষেপ করিয়া মাতার ন্যায় ভূমিলুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।*

* Faizi died, 5th. October, 1595, barking like a dog according to the austere Badauni but really weak and speechless. Akbar saw him at mid-night supporting

দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেলিমের নিয়োজিত উচণ্ডার রাজা বীর সিংহের হস্তে আবুলফাজল নিহত হয়েন। সম্রাট এক দুই করিয়া দিন গণিতেছিলেন—আবুল ফাজল আসিবেন; কিন্তু আবুলফজল আসিলেন না। আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। আর সকলেই শুনিল আকবর জানিলেন না তাঁহাকে এ সংবাদ শুনায় কে? তৈমুর বংশের এই রীতিছিল, রাজপুত্র প্রভৃতি কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার উকিল হাতে কালো রুমাল বাধিয়া সম্রাটের কাছে উপস্থিত হইতেন। আবুল ফাজলের মৃত্যু সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার উকিল হাতে কালো রুমাল বাঁধিয়া আকবরের সম্মুখে গেলেন; উকিলকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং তখনই দরবার ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শোকে আকবর এতদূর মুহ্যমান হইয়াছিলেন যে, সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সে রাত্রি তিনি কেবল কাঁদিয়াই কাটাইয়াছিলেন।*

শেষে যখন শুনিলেন সেলিমই আবুল ফাজলের মৃত্যুর কারণ তখন গভীর মনোদুঃখে বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন—"সেলিমের যদি রাজা লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে আমার প্রাণ বিনষ্ট করিল না কেন? আবুল ফাজল বাঁচিয়া থাকিলে আমি সুখী হইতাম।"

ক্রমে আসল কথা প্রকাশ হইল—সেলিমের প্ররোচনায় উচণ্ডার রাজা বীরসিংহ আবুল ফাজলকে হত্যা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সম্রাট পাত্রসিংহ ও রাজসিংহকে নিযুক্ত করিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বীরসিংহ প্রাণভয়ে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই কিছুদিন পরে আকবরের মৃত্যু হইল—আকবর বাঁচিয়া থাকিলে আবুল ফাজলের হত্যাকারীর আর কিছুতেই নিস্তার ছিল না।

'খোসরোজের' প্রবর্ত্তক আকবরকে 'মহামতি' আখ্যায় অভিনন্দিত করিতে পারি না বটে; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা তাঁহার গুণকীর্ত্তনে কুণ্ঠিত হইব কেন? ইন্দ্রিয়-পরায়ণ আকবর ইতিহাস পৃষ্ঠায় চিরদিনই মসীবর্ণে চিত্রিত থাকিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বন্ধুবৎসলতা যে আদর্শস্থানীয়, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনীও তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না, একথা আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারি।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

সংগ্রহ . বৈচিত্র

১। গত মহাসমরে মিত্রপক্ষের হতাহতের সংখ্যা

		হত	আহত
১।	বৃটিশ-সাম্রাজ্য	৬৫৮,৭০৪	৩,০৪৯,৯৯১
২।	ফ্রান্স	১,০৭১,৩০০	৫,২০০,০০০
৩।	ইটালী	৪৬০,০০০	১,৫০০,০০০
৪।	রুষিয়া	১,৭০০,০০০	৯,১৮৫,০০০
৫।	সার্ভিয়া	৩৫০,০০০	১২০,০০০
৬।	আমেরিকা	৩৬,১৫৪	১১৭,৯৪১

ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি দেশ মিত্রপক্ষে যোগ দিয়াছিল। তাহাদের হতাহতের সংখ্যাও কম হইবে না।

২। দীর্ঘকাল রাজত্ব

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে মিশর দেশে পেপী নামধারী একজন রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছয় বৎসরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া একশত বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার রাজত্বকাল মোট ৯৪ বৎসর! এত দীর্ঘকাল পৃথিবীতে আর কোনও রাজা রাজত্ব করিয়া যান নাই। এ নামধারী আরও একজন রাজা

his friend he said gently—'Sekhji! here is a doctor, will you not speak to me?' One fancies the faint look of the closing eyes, but no words escaped the lips. The Emperor threw his head-dress on the ground and wept aloud.

Keen's—The Turks in India.

* When the news of that dire calamity and dreadful event—the murder of Abul Fazel—reached that shadow of god, the Emperor Akbar, he was extremely grieved, disconsolate, distressed and full of lamentation. That day and night he neither shaved as usual nor took opium, but spent his time weeping and lamenting.

Wakayai-Asad-Beg',

ইহার পূর্ব্বে মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৩। আশ্চর্য্য মৃত্যু

এই পৃথিবীতে অনেক বড় বড় লোক আশ্চর্য্য ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গ্রীক পণ্ডিত এস্কাইলাসের (Aschylos) নাম সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি একদিন বাহিরে বসিয়াছিলেন এমন সময় একটি কচ্ছপ ঈগল পাখীর নখরচ্যুত হইয়া তাঁহার মাথার উপরে পতিত হয়। সেই আঘাতেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

রোমে কুইন্টাস্ লুকানাস্ বেশ্‌সাস্ নামক একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে একটি সুচের খোঁচা লাগে। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রোমের গ্রিটর ফেবিয়াস্ দুধ পান করিবার সময় একটি ছাগলের লোম গলায় বাঁধে। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্যাল্‌কাস্ নামক এক জ্যোতিষী নিজের মৃত্যুর সময় গণনায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঠিক যখন সেই সময় অতীত হইয়া গেল, তখন তিনি খুব জোরে হাসিয়া উঠেন। হাস্য করিতে করিতেই তাহার মৃত্যু হইল।

কবি অট্‌ওয়ে (Otway) বহুদিন উপবাসের পর এক গিনি সংগ্রহ করিয়া রুটি ক্রয় করিলেন। সেই রুটির একটুকরা মুখে দিতেই তাহা গলায় বিঁধিয়া গেল এবং সেই সময়েই তাহার মৃত্যু হইল।

জিউক্সিস্ নামক একজন বিখ্যাত চিত্রকর এক অতি কদাকার বৃদ্ধার চিত্র অঙ্কিত করেন। সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া তিনি হাসিতে আরম্ভ করেন। হাসিতে হাসিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

৪। লাইট হাউস বা আলোক স্তম্ভ

অতি প্রাচীন কালে ও লাইট্ হাউস্ ছিল। প্রাচীন কালের বিখ্যাত লাইট্ হাউস্ ছিল এলেকজেন্ড্রিয়া। সহরের নিকট ফ্যারস্ দ্বীপে অবস্থিত। জোসেফাস্ (Josephus) বলেন যে ৪২ মাইল ব্যবধান হইতে উক্ত আলোকস্তম্ভটি দেখা যাইত। প্রাচীন কালের সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে ইহা অন্যতম। টলেমি সোটের (Tolemy Soter) ইহা স্থাপন করেন।

আধুনিক কালের বিখ্যাত লাইট্ হাউসের মধ্যে, ইংলণ্ডের প্লিমাউথ বন্দরের নিকট এডিষ্টোন্ (Eddystone) লাইট্ হাউস্ ও ফ্রান্সের টুর ডি কর্ডান্ (Tour de Corduan এর নাম করা যাইতে পারে। এডিষ্টোন লাইট হাউস্ ৫৫ ফিট উচ্চ ও ১৭ মাইল দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করে। নিম্নে আমরা কয়েকটি বড় বড় লাইট হাউসের নাম ও তাহাদের উচ্চতা দিলাম।

১। নিউ ইয়র্ক হেলগেটের লাইট হাউস ২৫০ ফিট

২। নিউ ইয়র্ক স্বাধীনতা স্তম্ভের (statue of liberty) উপরের লাইট হাউস্‌টি ২২০ ফিট উচ্চ।

৩। জেনোয়া নগরের লাইট হাউস্‌টি ২১০ ফিট উচ্চ। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি উচ্চ আলোকস্তম্ভ আছে।

দুঃখের দান

শত দুঃখ বেদনায়,
এবে বুঝিয়াছি আমি,
সকলি তোমার দান,
হে মোর জীবন-স্বামী।

দাও প্রভো! শান্তি সুখ,
হৃদয় পাতিয়া ল'ব;
দাও মোরে অশ্রু জল,
সেও তো নীরবে স'ব

আমার প্রাণের গর্ব্ব বিশ্বাস,
ভেঙ্গে যাক্ শত বেদনায়;
দুখের যে দান দিয়াছ হে প্রভো!
যেন না পাসরি তায়।

দিও আশা প্রভো! যতই নিরাশা,
সকল জীবন কর্ম্মে;
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
গাঁথা যেন থাকে মর্ম্মে।

শ্রীশৈলজাসুন্দরী দত্ত

রাজনীতি-ক্ষেত্রে

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শিশিরকুমারের আন্তরিক অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক যত্নে ইণ্ডিয়ান্ লীগের দ্বারা কিরূপে এলবার্ট টেম্পল অব্ সায়েন্স (Albert Temple of Science) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আমরা এক্ষণে তাহা বিবৃত করিব। ১৮৭৫ খৃঃ অঃ স্বর্গগত সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সভ্যগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও তেওতার রাজা শ্যামশঙ্কর রায় বাহাদুর শিশিরকুমারকে বলেন যে, ইণ্ডিয়ান্ লীগেরও পক্ষ হইতে যুবরাজের প্রতি উপযুক্ত-সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ইণ্ডিয়ান লীগের সভাপতি শম্ভুচন্দ্র প্রস্তাব করেন যে, লর্ড ক্যানিং-এর পত্নীর নামানুসারে যেরূপ লেডি ক্যানিং মিষ্টান্ন হইয়াছে, সেইরূপ কলিকাতার ময়রাদিগের দ্বারা একপ্রকার উৎকৃষ্ট সন্দেশ প্রস্তুত করাইয়া তাহার নাম এলবার্ট সন্দেশ দেওয়া হউক! আমাদিগের দেশের নেতৃপদলোলুপ ব্যক্তিগণ অনেক সময় কিরূপ শিশুজনোচিত প্রস্তাব করেন, ইহা তাহার একটী দৃষ্টান্ত। শিশিরকুমার শম্ভুচন্দ্রের প্রস্তাব শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সার্ রিচার্ড টেম্পল্, কলিকাতায় একটী শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, শিশিরকুমারের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। যুবরাজের সম্মানার্থ আতসবাজি পোড়াইয়া অনর্থক অর্থব্যয় করা অপেক্ষা তাঁহার ভারত-ভ্রমণ চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে শিশিরকুমার দেশে একটী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন মনে করিলেন। তিনি তাঁহার এই অভিপ্রায় মহারাজা বাহাদুর কমলকৃষ্ণ ও রাজা শ্যামশঙ্করের নিকট জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। শিশির-কুমারের উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না, কিন্তু এরূপ বৃহৎ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা ইণ্ডিয়ান্ লীগের পক্ষে সম্ভব কিনা, মহারাজা বাহাদুর ও রাজা বাহাদুর তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। একটী শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন, কিন্তু লীগের পক্ষে এত অর্থসংগ্রহ করা তাঁহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শিশিরকুমারের নিকট কিছুই অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত না। তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজেন্দ্রকুমার রায়ের নিকট শুনিয়া-ছিলেন যে, বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর যদি একটু ইঙ্গিত করেন, তাহা হইলে ময়মনসিংহের জমিদার বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিতে পারেন। রাজেন্দ্রকুমারের নিবাস ঢাকার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে। তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা ভাল ছিল। যৌবনে কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমে ঘোর বিলাসী হইয়া-ছিলেন, কিন্তু শেষে শিশিরকুমারের সংস্পর্শে আসিয়া একজন প্রকৃত স্বদেশসেবক হইয়া উঠিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি একজন ধার্ম্মিক পুরুষ হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র-কুমার সাধারণতঃ দিগু বাবু নামেই পরিচিত। প্রস্তাবিত শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বপ্রথমে দিগু বাবুই ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হন। শিশির-কুমারের মধ্যমাগ্রজ এই সময় বাবু ধনপত্ সিংহের দেওয়ান বাবু কেদারনাথ সিংহের নিকট জানিতে পারেন যে, ধনপত্ ও তাঁহার সহোদর লক্ষ্মীপত্ প্রত্যেকে বহরমপুর কলেজের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিবেন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ম্যাকেঞ্জির নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া-ছেন। শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শিশিরকুমার বাবু হরিশ্চন্দ্র, বাবু ধনপত্ ও বাবু লক্ষ্মীপতের নিকট হইতে দেড়লক্ষ টাকা হস্তগত করিবেন স্থির করিলেন। ছোটলাট বাহাদুর সার্ রিচার্ড টেম্পলের শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে জানিয়া শিশিরকুমার তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিবেন স্থির করিলেন। যুবরাজের কলিকাতায় আসিবার ঠিক পূর্ব্বদিন রাত্রে নয় ঘটিকার সময়, শিশিরকুমার বেল্-ভিডিয়ারে সার্ রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। তিনি আপনার কার্ড উপরে পাঠাইয়া দিলেন;

সাধারণের ন্যায় শিশিরকুমারকে ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে পত্র লিখিয়া সময় নিরূপণ করিতে হইত না। তিনি যখনই ইচ্ছা তখনই লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় দারুণ শীতে, শিশিরকুমার দেখা করিতে আসিয়াছেন জানিয়া সার্ রিচার্ড ভাবিলেন, নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কার্য্য আছে। সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল :—

শিশির।—"যুবরাজ আগামী কল্য আসিবেন; আপনি সম্ভবতঃ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অতি প্রত্যূষেই ডায়মণ্ড-হারবার যাইবেন।"

সার্ রিচার্ড।—"হাঁ, আমি অতি প্রত্যূষেই রওনা হইব।"

শিশির।—"যুবরাজ কলিকাতায় পদার্পণ করিলে আপনার সহিত আর সাক্ষাতের সুযোগ হইবে না, সেই জন্য এত রাত্রিতে আপনার নিকট আসিতে বাধ্য হইয়াছি।"

সার্ রিচার্ড।—"কি প্রয়োজন বলুন।"

শিশির।—"যুবরাজের এই ভারত ভ্রমণ ব্যাপারটী আমরা চিরস্মরণীয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

সার্ রিচার্ড।—"কি উপায়ে?"

শিশির।—"আমাদের দেশে কোন শিল্প-বিদ্যালয় নাই, তাহা আপনি জানেন। আপনার মনেও এদেশে একটী শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে। আমরা দেশের এই অভাবটি দূর করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

সার্ রিচার্ড।—"প্রস্তাবটী খুবই ভাল, কিন্তু তাহাতে যে অনেক টাকার প্রয়োজন হইবে।"

শিশির।—"আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একটু সাহায্য করেন, তাহা হইলে অতি সহজেই অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে।"

সার্ রিচার্ড।—"আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

শিশির।—প্রসিদ্ধ ধনী লছমীপত্ ও তাঁহার সহোদর ধনপত্ এবং ময়মনসিংএর জমিদার বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়, ইঁহারা প্রত্যেকে দেশের জনহিতকর কার্য্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছেন। আপনি যদি তাঁহাদের একটু ধন্যবাদ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত টাকা পাওয়া খুবই সহজ হইবে।"

সার্ রিচার্ড।—"এ আর বেশী কথা কি? এই দানের জন্য নিশ্চয়ই আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিব।"

শিশির।—"আপনাকে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে।"

সার্ রিচার্ড।—"কি বলুন।"

শিশির। "আপনাকে বলিতে হইবে যে, উক্ত অর্থ শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিলে দেশের একটী বহুদিনের অভাব মোচন হইবে এবং দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

সার্ রিচার্ড একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। দাতাগণ যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আপনার কথামত অনুরোধ করিতে পারি।"

শিশির।—"আপনিত কাল অতি প্রত্যূষেই ডায়মণ্ড-হারবারে গমন করিবেন। আপনার সহিত তাহা হইলে তাঁহারা সাক্ষাৎ করিবেন কখন? এখন রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকা। আপনি যদি হরিশ্চন্দ্র ধনপত্ ও লছমীপত্‌কে আগামীকল্য প্রাতে ছয় ঘটিকার পূর্ব্বে আপনার সহিত এখানে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লেখেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে পারি। তাঁহারা সকলেই কলিকাতায় আছেন।" শিশিরকুমারের অনুরোধ শুনিয়া সার্ রিচার্ড হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, শিশির বাবু আপনার সকল কার্য্যই অদ্ভুত দেখিতেছি। যে সকল ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় নাই, তাঁহাদিগকে পত্র লেখা কি আমার পক্ষে সঙ্গত?" কিন্তু শিশিরকুমারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা কঠিন। তাঁহার নিকট সার্ রিচার্ডের কোনও যুক্তিতর্ক টিকিল না। রাত্রি দশটা বাজিল, শিশিরকুমার কিছুতেই ছোট লাট বাহাদুরকে ছাড়িলেন না। সার্ রিচার্ড বাধ্য হইয়া হরিশ্চন্দ্র ধনপত্ ও লছমীপত্‌কে পর দিবস প্রাতে ছয় ঘটিকার সময় তাঁহার সহিত বেল্‌ভিডিয়ারে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। শিশিরকুমার আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া পত্র তিনখানি লইয়া হরিশ্চন্দ্র, লছমীপত্ ও ধনপতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন, এই আনন্দে

সেই রাত্রিতে তাঁহাদের নিদ্রা হইল না, সাজ সজ্জার আয়োজনেই রজনী অতিবাহিত হইল। রাত্রি চার ঘটিকার পর শিশিরকুমার সকলকে লইয়া বেল্‌ভিডিয়ার অভিমুখে রওনা হইলেন। তখনও প্রভাত হয় নাই, এমন সময় শিশিরকুমার হরিশ্চন্দ্র, ধনপত্‌ ও লছ্‌মীপত্‌কে সঙ্গে লইয়া বেল্‌ভিডিয়ারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পৌঁছিবামাত্র একজন আর্দালি তাঁহাদিগকে লইয়া লাটবাহাদুরের শয়ন-কক্ষের সম্মুখের বারান্দায় বসিবার আসন প্রদান করিল। দ্বার উন্মোচন করিয়া সার্ রিচার্ড চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে শয়ন-কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। যথারীতি অভিবাদনান্তর সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক তিনটীর মধ্যে কেহই ইংরাজী জানিতেন না এবং ছোটলাট বাহাদুরও বাঙ্গালা কিম্বা হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, শিশিরকুমার অনুবাদ করিয়া তাহা পরস্পরকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। সার্ রিচার্ড বলিলেন,—"আপনাদের দেশে শিল্প-বিদ্যালয় নাই। যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যদি আপনারা একটী শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহা হইলে যুবরাজের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে দেশের একটী মহৎ উপকার করা হইবে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, আপনারা দেশের জনহিতকর কার্য্যে অর্থ-সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আপনারা শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যদি সেই অর্থ প্রদান করেন, আমি বিশেষ আনন্দিত হইব।"

অনুবাদকরূপে শিশিরকুমার লাটসাহেবের কথাগুলি হরিশ্চন্দ্র, ধনপত্‌ ও লছ্‌মীপত্‌কে বুঝাইয়া দিলেন। হরিশ্চন্দ্র পঁয়তাল্লিশ হাজার ও লছ্‌মীপত্‌ চল্লিশ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ধনপত্‌ প্রথমে একটু আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বহরমপুর কলেজের জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে জানাইয়াছেন, এখন যদি তিনি তাঁহার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। শিশিরকুমার হাসিয়া ধনপত্‌কে বুঝাইয়া বলিলেন, "জেলার মাজিষ্ট্রেট্ ছোটলাট বাহাদুরের একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী মাত্র। জেলার মাজিষ্ট্রেটের মনস্তুষ্টির জন্য আপনি বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।" ধনপত্‌ শেষে চল্লিশ হাজার টাকা দান করিতে সম্মত হইলেন। শিশিরকুমারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। এইরূপে অর্থ সম্বন্ধে সফলকাম হইয়া শিশিরকুমার শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য একটী সভা আহ্বান করিলেন এবং সার্ রিচার্ডকে সেই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। যুবরাজের কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে, ইহা জানিয়াও ছোটলাট বাহাদুর শিশিরকুমারের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। ছোটলাট বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১৮৭৫ খৃঃ অঃ ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশানাল রঙ্গমঞ্চে এক মহতী সভার অধিবেশন হইবে, এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। সার্ রিচার্ডের অভিপ্রায় অনুসারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণকে সভায় যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সভার দিন ছোটলাট বাহাদুর স্বীয় শরীর-রক্ষকগণের সহিত বেল্‌ভিডিয়ার হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে আগমন করেন। সেখানে শিশিরকুমার দিগুবাবুর গাড়ী লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সার্ রিচার্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। শিশিরকুমার নিকটে থাকিলে ছোটলাট বাহাদুর তাঁহারই সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন, তাহাতে লীগের অন্যান্য সদস্যগণের তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হইবে না, এই ভাবিয়া শিশিরকুমার অদৃশ্য হইলেন। সার্ রিচার্ড কিন্তু তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন; শেষে তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া আপনার পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছোটলাট বাহাদুর ইণ্ডিয়ান্ লীগের সদস্যগণকে তাঁহাদের সাধু চেষ্টার ও হরিশ্চন্দ্র, ধনপত্‌, লছমীপত্‌, দিগুবাবু প্রভৃতি দাতৃবর্গকে তাঁহাদের দানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিদ্যালয়ের নাম হইল এল্‌বার্ট টেম্পল্ অব্‌ সায়েন্স (Albert Temple of Science) সার্ রিচার্ড বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গভর্ণমেণ্ট হইতে বাৎসরিক ৮০০০ আট হাজার টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা এইখানেই বলিয়া রাখি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্

এসোসিয়েশনের সদস্যগণ আপনাদিগকে উপেক্ষিত ভাবিয়া এই সভায় যোগদান করেন নাই।

ইণ্ডিয়ান লীগের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সভাপতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। শিশিরকুমার লীগের অন্যান্য সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়া রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লীগের সভাপতি মনোনীত করিবেন স্থির করিলেন। কৃষ্ণমোহনের তখন শিক্ষিত সমাজে বিপুল প্রতিপত্তি ছিল। স্বীয় অধ্যবসায় বলে তিনি সংস্কৃত, আরবী, পার্সি, হিব্রু, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটিন্, গ্রীক্, উড়িয়া, তামিল, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও সদস্যরূপে তিনি তিনি নব্যসম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় ছিলেন। শিশিরকুমার একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লীগের সভাপতির পদগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে কৃষ্ণমোহন বলিয়াছেন, আগামীবারে লীগের যে সাধারণ অধিবেশন হইবে, আমি তাহাতে উপস্থিত থাকিব। লীগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমি আমার অভিমত প্রকাশ করিব।" কৃষ্ণমোহনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, কবিবর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীল দিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন'—"আগামী অধিবেশনে কৃষ্ণমোহন আমাদের লীগের কার্য্য দেখিতে আসিবেন বলিয়াছেন, সকলেরই উক্ত অধিবেশনে অবশ্য অবশ্য উপস্থিত থাকিতে হইবে।" সভার অধিবেশনের দিনে কৃষ্ণমোহন লীগের সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া লীগের সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার যে আশায় তাঁহাকে লীগের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। শিশিকুমার জন্মাবধি আশা, উৎসাহ ও তেজস্বিতায় পূর্ণ ছিলেন। দেশের কার্য্য করিবার জন্য নির্য্যাতন বা উৎপীড়ন তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইত। রাজ কর্ম্মচারীদিগের অসন্তোষভাজন হইব, এই ভয়ে তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। বয়োগুণে তাঁহার তেজস্বিতা হ্রাস পাইয়াছিল এবং সকল বিষয়েই তিনি রাজপুরুষদিগের মুখাপেক্ষা করিতেন। ইণ্ডিয়ান্ লীগের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের কোনও কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা হইলে কৃষ্ণমোহন সভ্যগণকে প্রতিবাদে নিরস্ত করিতেন। লচ্ছ্মীপত্ সিং একবার্ট টেম্পল্ অব্ সায়েন্সের জন্য স্বীয় প্রতিশ্রুত চাঁদা চল্লিশ হাজার টাকা দান করিলে, কৃষ্ণমোহন, এত অর্থ লীগের হস্তে রাখা কর্ত্তব্য নয় স্থির করিয়া শিশিরকুমারের অজ্ঞাতে তাহা শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট প্রেরণ করেন। কৃষ্ণমোহনের এই ব্যবহারে শিশিরকুমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর মিষ্টার উড্রো একবার্ট টেম্পল্ অব্ সায়েন্সের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিছিল। আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি বাধ্য হইয়া উক্ত টাকা লইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান্ লীগের সভাপতি কৃষ্ণমোহনের কাণ্ড দেখিয়া ধনপত্ তাঁহাকে প্রতিশ্রুত চল্লিশ হাজার টাকা দান করিতে সম্মত হইলেন না. তিনি কিন্তু উক্ত টাকার বার্ষিক সুদ ১৫০০ দেড় হাজার টাকা প্রতি বৎসরে দান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে তিনি হরিশ্চন্দ্রের প্রতিশ্রুত পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আদায় করিয়া আপনার নিকট রাখিলেন। কৃষ্ণমোহন জানিতে পারিয়া এই টাকাও গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিবার জন্য শিশিরকুমারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শিশিরকুমার তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। ধনপত্ সুদের ১৫০০৲ পনর শত টাকা মাত্র এক বৎসর দিয়াছিলেন। এই সময় সার্ রিচার্ড টেম্পলের কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বোম্বাইএর গভর্ণরের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থলে সার এস্লি ইডেন্ বাঙ্গালার ছোটলাটের পদে নিযুক্ত হন।

সার্ রিচার্ড টেম্পল শিশিরকুমারকে অন্তরের সহিত ভালবসিতেন বলিয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার সি, ই, ব্যাকল্যাণ্ড প্রথমে বড়ই বিরক্ত হইতেন। কিন্তু শিশিরকুমার ব্যাকল্যাণ্ডের সহিত কোনওরূপ অসদ্ব্যবহার না করিয়া কিরূপে তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তাহা উল্লেখ করিব। শিশিরকুমার ইচ্ছা মত লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেল্‌ভিডিয়ারে গমন করিতেন। লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে পূর্ব্বে সময় ঠিক করিয়া লইতে হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু শিশিরকুমারের প্রতি এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তিনি বেলভিডিয়ারে উপস্থিত হইলে সার্

রিচার্ড তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেন। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে লাট সাহেব শিশিরকুমারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, ইহা মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ডের নিকট অসহ্য বোধ হইত। অন্তরে বিদ্বেষভাব থাকিলেও কিন্তু ব্যাক্‌ল্যাণ্ড বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতেন না। একদিন শিশিরকুমার সার্ রিচার্ডের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় চীফ্ সেক্রেটরী কতকগুলি কার্য্য লইয়া ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেলভিডিয়ারে উপস্থিত হন। ছোট লাট বাহাদুরের নিকট সংবাদ পাঠান হইলে তিনি চীফ্ সেক্রেটরীকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইলে শিশিরকুমারের প্রস্থানের পর চীফ সেক্রেটরী লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড এই সকল কারণে মারের উপর বড়ই বিরক্ত ছিলেন। একদিন তিনি আর তাঁহার ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। শিশির-কুমার বেলভিডিয়ারে উপস্থিত হইলে তিনি বলেন "আপনি কি পূর্ব্বাহ্ণে লাট বাহাদুরকে পত্র লিখিয়া আপনার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সময় নিরূপণ করিয়াছেন ?"

শিশির—"না।"

ব্যাক্—"আপনি কি এ নিয়ম অবগত নহেন ? আপনি যখনই ইচ্ছা সাক্ষাৎ করিতে আসেন দেখিতে পাই। আপনি কি আপনাকে ছোটলাট বাহাদুরের পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করেন ?"

শিশির—"আজ আমি বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছি। আমার সহিত সাক্ষাৎ করা না করা লাট বাহাদুরের ইচ্ছা-ধীন। যাহা হউক আমি ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইব; আপনি আজি অনুগ্রহ করিয়া আমার কার্ডখানি উপরে পাঠাইয়া দিন।"

সে দিন মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড বিশেষ কিছু না বলিয়া কার্ড-খানি লাট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কার্ড পাইবা মাত্র সার্ রিচার্ড শিশিরকুমারকে ডাকিয়া পাঠাই-লেন। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে শিশিরকুমার যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তিনি ছোটলাট বাহাদুরকে বলিলেন, "আপনার প্রাইভেট সেক্রেটরীর কথায় বুঝিলাম যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার পূর্ব্বে পত্র দ্বারা সময় নিরূপণ না করায় আপনাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।" শিশিরকুমারের কথা শুনিয়া সার্ রিচার্ড বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আমার সুবিধা অসুবিধার কথা বিচার করিবার মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ডের কোনও প্রয়োজন নাই। আপনি স্বীয় স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে না আসিয়া আমাকে যে শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা করিতে আগমন করেন, আমার প্রাইভেট সেক্রেটরী বোধ হয় অবগত নহেন। আপনি সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমার কোনও অসুবিধা হয় না, তবে অসময়ে আসিলে আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে হয় এবং তাহাতে একটু কষ্টভোগও করিতে হয়। যাহা হউক আপনি আমার সহিত যেমন সাক্ষাৎ করিতে আসেন, সেইরূপই আসিবেন। আশা করি আপনি মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ডের কথায় দুঃখিত হইবেন না।" শিশিরকুমার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে শিশিরকুমার আর এক দিন সার্ রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেলভিডিয়ারে উপস্থিত হইলে মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি আপনি পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া আসিয়াছেন ?"

শিশির—"না।"

শিশির কুমারের উত্তর শুনিয়া প্রাইভেট সেক্রেটরী সাহেব ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার বিনীতভাবে বলিলেন, "বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত আমি লাট বাহাদুরের সহিত দেখা করিতে আসি না। আর লাট সাহেবও আমাকে বলিয়াছেন যে, আসিবার পূর্ব্বে সময় স্থির করিবার প্রয়োজন নাই।" কথাগুলি শুনিয়া মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ড আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রূঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনি কি তাঁহার কোনও সেক্রেটরী যে ইচ্ছামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ? লাট বাহাদুর নিতান্ত ভাল মানুষ, তাই তিনি লজ্জায় কোনও কথা বলিতে পারেন না। আপনি যে দিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, সে দিন তাঁহার আর কোন কাজই হইবে না। নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যাহাতে তাঁহার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আমার কর্ত্তব্য। আপনাকে আমি কিছুতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিব না।" কথাগুলি শুনিয়া শিশির-কুমার মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। তিনি সেক্রেটরী সাহেবকে উত্তেজিত না করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,

"কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী-সংক্রান্ত কয়েকটী বিষয়ের আলোচনার জন্য, সার্ রিচার্ডের অনুরোধমত আমি আজ আসিয়াছি। তিনি স্বয়ং আমাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেও যে আমাকে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিয়া সময় স্থির করিতে হইবে, তাহা আমি জানিতাম না। ভবিষ্যতে আমি আর কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিব না। আজ যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কার্ডখানি উপরে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।" মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ড কোনও কথা না বলিয়া একটু চিন্তা করিয়া কার্ডখানি লাট সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। সার্ রিচার্ড কার্ডখানি পাইবা মাত্রই শিশির-কুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুইদিন বাধা প্রাপ্ত হইয়া শিশিরকুমার উপরে যাইবার সময় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তিনি প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া ছোটলাট বাহাদুর কি তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন? মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ড কি তাঁহারই আদেশমত তাঁহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন? শিশিরকুমার সকল কথা সার্ রিচার্ডকে বলিবেন স্থির করিলেন। লাট বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়াই তিনি বলিলেন, "আপনি আমাকে সুবিধা মত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই আমি আপনার নিকট আসি। আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া সময় স্থির করি না বলিয়া আপনার বোধ হয় বড়ই অসুবিধা হয়। আমার আগমনে যদি বিরক্ত হন কিম্বা অপমান বোধ করেন, তাঁহা হইলে আমাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমি সাবধান হইতে পারি।" মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার দুই দিন যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তিনি তাহা যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আপনার প্রাইভেট সেক্রেটরীর কথার ভাবে অনুমান হয়, যে, তিনি যেন আপনারই অভিপ্রায়ে, আমাকে অপমানিত করিবার জন্য, আমার প্রতি রূঢ়ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।" শিশিরকুমারের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া সার্ রিচার্ড একটু হাসিয়া বলিলেন, "শিশির বাবু, মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ড আপনার সহিত যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া আমি যে বিরক্ত হইব, ইহা কখনও হইতে পারে না। আমার কার্য্যে সহায়তা ও আমাকে সৎপরামর্শ দান করিবার জন্যই আপনি আগমন করেন, এজন্য আমি আপনার নিকট চির বাধিত। যাঁহারা স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাঁহাদিগকেই পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া সময় ঠিক করিয়া লইতে হয়। আপনি এতদিন আমার নিকট আসিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একদিনও আপনার নিজের কোনও কথা বলেন নাই। আপনি পুনর্ব্বার যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ড কোনরূপ আপত্তি করিলে আপনি তাঁহাকে বলিবেন যে, সার্ রিচার্ড টেম্পল্ বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করিবেন এবং তিনি মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ডের বিনা সাহায্যে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম।" শিশিরকুমার যথারীতি অভিবাদনান্তর প্রস্থান করিলেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তার উপর তাঁহার যেরূপ প্রভাব ছিল, তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ডকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ভালবাসা দ্বারাই তিনি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। পশুশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ড তাহার সম্পাদক মনোনীত হইয়া-ছিলেন। শিশিরকুমার ধনপতের নিকট হইতে পশুশালার (Zoological Gardens) উন্নতিকল্পে ছয় হাজার টাকা আদায় করিয়া ব্যাকল্যাণ্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শিশিরকুমারও মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।

কার্য্যদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট সার্ রিচার্ড টেম্পলকে বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুরের পদ হইতে বোম্বাইএর শাসনকর্ত্তার পদে উন্নীত করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। নূতন কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য সার রিচার্ডকে শীঘ্রই কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; সেইজন্য সময়ের সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন বঙ্গবাসিগণ তাঁহার সুশাসনের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার অবসর পান নাই। শিশিরকুমারের সহিত সার্ রিচার্ডের কিরূপ ঘনিষ্টতা ছিল, তাহা পাঠকবর্গ সম্যক্ অবগত আছেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট বাহাদুরকে অভিবাদন পত্রপ্রদান করিবার জন্য শিশিরকুমার, বাগ্মীবর বাবু কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ব্রজেকুমার রায় (দিগু বাবু) বোম্বাই যাইবেন স্থির হইল। বোম্বাইএ

সান্ধ্য-সম্মিলন ও অভিনন্দনপত্র প্রদান উপলক্ষে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই টাকার অধিকাংশই দিগু বাবু এবং কতক মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রদান করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমার কালীচরণ ও দিগুবাবুর সহিত বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, সার্ রিচার্ড পুনায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা লাট বাহাদুরের জন্য বোম্বায়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তত্রত্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে বেহ্‌রামজী মালাবারী অন্যতম ছিলেন। উত্তরকালে ইনি একজন সমাজ-সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্টলেক্‌চার্স ইনি ভারতীয় বহু ভাষায় অনূদিত করাইয়াছিলেন। শিশিরকুমার প্রভৃতি যে দিনই বোম্বায়ে পদার্পণ করেন, মালাবারী সেই দিনই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ করেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদের সহিত অবস্থান করিতেন। মালাবারী তখন বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখন বোম্বাইএ সার মঙ্গলদাস নাথুভাই একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। শিশিরকুমার একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লাট-বাহাদুরের অভ্যর্থনার নিমিত্ত একদিনের জন্য তাঁর বাংলোখানি ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ করিলে সার মঙ্গলদাস সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে, লাটবাহাদুর এ দেশীয় কোন সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হয় না। বোম্বাই বাসীগণ সে সময় লাট-বাহাদুরকে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা কোন উচ্চতর জীব বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাকে ভারতীয় কোন সান্ধ্য-সম্মিলনে উপস্থিত করা তাঁহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু শিশিরকুমার নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই সময় কালীচরণ একা সামাজিক বিষয় লইয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন; তাঁহার বাগ্মিতা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

শিশিরকুমারের সহিত সার মঙ্গলদাসের ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল। এই সময় দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবাসীগণের সিবিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় প্রবেশাধিকারের বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করিতে-ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট যাহাতে বয়স বৃদ্ধি করিয়া দেন, সুরেন্দ্র বাবু তাহারই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকায় শিশিরকুমার, সিবিল সার্ভিস্ পরীক্ষা যাহাতে ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে ও প্রবর্ত্তিত হয় তাহার জন্য আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন। সার মঙ্গলদাস একদিন কথা প্রসঙ্গে শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট যে পদগুলি ইউরোপীয়দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, আন্দোলন করিলেই যে ভারতবাসীগণ তাহা সহজে প্রাপ্ত হইবে, তাহা মনে হয় না। ভারতবাসীগণকে নিম্ন বিভাগের ২০০ হইতে ৩০০ টাকার পদগুলি প্রদান করিবেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই অঙ্গীকার যে পদে পদে ভঙ্গ হইতেছে, তাহার ত কোনও প্রতীকারের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। গভর্ণমেণ্ট যাহা ইংরাজ-দিগের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে আমরা তাহা পাইব, তাহা মনে হয় না; গভর্ণ-মেণ্ট আমাদিগকে যাহা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাতেও যে আমরা বঞ্চিত হইতেছি, সেই বিষয়ের আন্দোলন করাই যে সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। সার মঙ্গলদাসের পরামর্শ মত শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন, এবং দেশের নেতৃবৃন্দকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কয়েকদিন বোম্বায়ে অবস্থান করিয়া শিশিরকুমার পুনায় লাটবাহাদুর সার্ রিচার্ড টেম্পেলের নিকট গমন করিলেন। দুই একদিন পরে কালীচরণ ও এক্তেন্দ্রকুমারও পুনায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই মহামতি র‍্যাণাডের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার একদিন প্রাতে লাটবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আলিপুরে বেল-ভিডিয়ারে সার্ রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হইত না; কিন্তু পুনায় তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, সুতরাং প্রথমদিন লাটবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। শিশিরকুমার একজন আর্দ্দালিকে ডাকিয়া লাটসাহেবের নিকট তাঁহার কার্ডখান পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু আর্দ্দালি কার্ড লইয়া যাইতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিল, "সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে

পূর্ব্বাহ্নে পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইতে হয়, তাহা কি আপনি জানেন না?" শিশিরকুমারের কার্ড প্রাপ্ত হইলেই লাটসাহেব যে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, আর্দ্দালি তাহা জানিত না। যাহাহউক, শিশিরকুমার আর্দ্দালিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাট সাহেব কোথায়?" প্রত্যুত্তরে আর্দ্দালি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল, "ঐ বাগানে বেড়াইতেছেন। সার্ রিচার্ডকে দেখিতে পাইয়া, ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, শিশিরকুমার, উদ্যানের যে স্থানে লাটবাহাদুর বেড়াইতেছিলেন, সেই দিকে দ্রুত পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একজন অপরিচিত ব্যক্তি লাটভবনের নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া তাহাকে বাধা প্রদান করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে রক্ষিগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশিরকুমারের সে দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি ক্রমশঃই সার্ রিচার্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিশিরকুমারকে নিষেধ করিলেও রক্ষিগণ তাঁহার পথ রুদ্ধ করিতে সাহস করে নাই। একজন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত লাটভবনের কয়েকজন রক্ষী গোলমাল করিতেছে দেখিয়া, কারণ অনুসন্ধান জন্য, সার্ রিচার্ড ধীরে ধীরে শিশিরকুমারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। শিশিরকুমার বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?" সার্ রিচার্ড শিশিরকুমারকে দেখিয়া মহা আনন্দে তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন। আর্দ্দালি ও রক্ষিগণ শিশিরকুমারকে একজন মহারাজা কিম্বা তদপেক্ষা কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি মনে করিয়া আপন আপন কার্য্যে প্রস্থান করিল

উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে শিশিরকুমারের সহিত লাট বাহাদুর সার্ রিচার্ড টেম্পলের বহু দেশ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। অনেক দিনের পর শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ, লাট বাহাদুরের কথার আর শেষ নাই। খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল যে আহার প্রস্তুত; কিন্তু সে কথায় সার্ রিচার্ড কর্ণপাত করিলেন না, তিনি শিশিরকুমারের সহিত বঙ্গদেশের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে খানসামা পুনরায় সংবাদ দিল যে, আহার্য্য ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে এবং মহিলাগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শিশিরকুমারকে পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া সার্ রিচার্ড আহার করিতে চলিয়া গেলেন। প্রথম দিবসের এই সাক্ষাতের সময় শিশিরকুমার তাঁহার বোম্বাই আগমনের কারণ প্রকাশ করেন নাই। লাট বাহাদুরের কথা মত তিনি তাঁহার সহিত আর একদিন সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। এ বারে তিনি পূর্ব্বাহ্নে পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম:—

শিশি।—"আপনি বঙ্গদেশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য বঙ্গবাসীগণ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনার বঙ্গদেশ ত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ের অল্পতা নিবন্ধন, তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। আমি, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় বঙ্গবাসীগণের পক্ষ আপনাকে অভিনন্দন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে এখানে আগমন করিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অভিনন্দন পত্র গ্রহণ করিলে, আমরা বাধিত হইব।"

সার্ রিচার্ড।—"বেশ, আমার কোনও আপত্তি নাই। আগামী কল্যই ব্যবস্থা করুন

শিশির:—"আগামী কল্য অসম্ভব।"

সার রিচার্ড—"কেন?"

শিশির।—"আমরা আপনার সম্মানার্থ একটি সান্ধ্যসম্মিলনের ব্যবস্থা করিব এবং তাহাতে এদেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিব ইচ্ছা করিয়াছি। সেই সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য আপনাকে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বোম্বায়ে যাইতে হইবে

সার্ রিচার্ড।—"শিশির বাবু, আপনাকে তাহা হইলে মাসাধিককাল অপেক্ষা করিতে হইবে।"

শিশির।—"কেন?"

সার্ রিচার্ড।—আমি বোম্বায়ের দক্ষিণ অংশটী পরিদর্শনে বহির্গত হইব, স্থির হইয়া গিয়াছে। কোন তারিখে, কোন স্থানে যাইব, তাহাও স্থির করিয়া দিয়াছি। পরিদর্শন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের অভিনন্দন পত্র গ্রহণ ও সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিব।"

শিশির।—"পরিদর্শনে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে আমাদের

এই সামান্য কার্য্যটী শেষ করিয়া যাইলে বড়ই অনুগৃহীত হইব।"

সার্ রিচার্ড একটু হাসিয়া বলিলেন, "শিশিরবাবু, সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি যে সকল স্থানে গমন করিব স্থির হইয়াছে, তত্রত্য অধিবাসিগণ আমার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছেন। এখন যদি আমি দিন পরিবর্ত্তন করি, তাঁহারা বড়ই দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এরূপ অবস্থায় আমার পরিদর্শনের দিন পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইতে পারে না।" শিশিরকুমার লাট বাহাদুরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলের আশা দেখিতে পাইলেন না। শেষে তিনি বলিলেন, "যদি এক মাসকাল আমাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে আমার কষ্টের ও ক্ষতির সীমা থাকিবে না।"

সার্ রিচার্ড—"আপনার ক্ষতি হইবে?"

শিশির—"বিশেষ ক্ষতি হইবে।"

সার্ রিচার্ড—"আপনার যদি বিশেষ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে ত বড়ই চিন্তার কথা হইল।" কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "শিশিরবাবু, আপনার ক্ষতি করিব না। আমি আমার পরিদর্শনের দিন পরিবর্ত্তন করিলাম।" সার্ রিচার্ড তৎক্ষণাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার মফঃস্বল পরিদর্শন উপস্থিত বন্ধ রহিল, অবিলম্বে এই সংবাদ প্রচার করিয়া দিন।" লাট বাহাদুরের আদেশ শীঘ্রই প্রতিপালিত হইল।

তিন চারি দিনের মধ্যেই সকল কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। শিশিরকুমার অবিলম্বে কালীচরণ ও ব্রজেন্দ্রকুমারকে লইয়া পুনা হইতে বোম্বায়ে আগমন করিলেন এবং সার্ মঙ্গলদাস নাথু ভাইএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সম্মিলনের দিন প্রাতে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হইয়া শিশিরকুমারের হস্তগত হইল। যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগের নাম লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইল। সন্ধ্যার সময় সম্মিলন; এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে নিমন্ত্রণ-পত্রগুলি কিরূপে বিলি করা হইবে, শিশিরকুমার তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি পুলিশ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। শিশিরকুমার লাটবাহাদুরের একজন বিশিষ্ট বন্ধু জানিয়া পুলিশ কমিশনার আগ্রহসহকারে নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণের ভার গ্রহণ করিলেন। অশ্বারোহী কনেষ্টবলদিগের দ্বারা তিনি অতি অল্প সময় মধ্যেই পত্রগুলি যথাযথ ঠিকানায় বিলি করিয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সার্ মঙ্গলদাস নাথু ভাইএর উদ্যানে, লাটবাহাদুর সার্-রিচার্ড টেম্পল পুনা হইতে আগমন করিয়া সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিলেন। সম্মিলনের ও অভিনন্দন-পত্র প্রদানের অধিকাংশ ব্যয় ব্রজেন্দ্রকুমার বহন করিয়াছিলেন, এজন্য অভিনন্দন-পত্রখানি তাঁহারই পাঠ করিবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি শিশিরকুমারকে পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। শিশিরকুমার অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া তাহা একটী মূল্যবান্ আধারে রাখিয়া লাট বাহাদুরের হস্তে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমারের সহিত লাট বাহাদুর যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া বোম্বাইবাসীগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। বোম্বাই-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা যে একজন বাঙ্গালীর অনুরোধে তাঁহার মফঃস্বল পরিদর্শনের সকল ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য পুনা হইতে বোম্বায়ে আগমন করিবেন, বোম্বাইবাসীগণ ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। পুনায় অবস্থানকালে, তত্রত্য অধিবাসিগণের অনুরোধে কালীচরণ বঙ্গদেশে নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে একদিন একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

জন্মভূমি

পবিত্র ভারতবর্ষ জননী জন্মভূমি!
আমার নয়নে মাগো নহ কভু মাটী তুমি।

মূর্ত্তিমতী 'মা'-টি মোর 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'
দেবী-রূপে পূজি তোমা, তুমি যে মা মহিয়সী

অন্নপূর্ণা তুমি মাগো বিদ্যাদাত্রী বীণাপাণি,
দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা তুমি মাগো লক্ষ্মীরাণী।
তোমার যা' কিছু মাগো ফল-ফুল-লতা-তরু,
সাগর-সরিৎ-হ্রদ, কানন-ভূধর-মরু—

মা তোমার পুত্র কন্যা মা তোমার বেশ-ভূষা,
তোমারি তামসী নিশা, তোমারি কনক-উষা ;
তোমার অরুণ ইন্দু তোমার আঁধার-আলো,
সকলি নয়নে মোর লাগে মাগো কত ভালো !

কোকিল-কূজন তব মধুপ-গুঞ্জন গান,
ময়ূরের কেকারব নদী-জল কল তান ;
তোমারি শালিক-শ্যামা দয়েল পাপিয়া-বধূ—
শ্রবণ-যুগলে মোর বরষে হরষে মধু।

দেহে মাগো প্রাণ তুমি কণ্ঠে মোর তুমি ভাষা,
সাধন-রাধন তুমি, জীবনে তুমি মা আশা।
প্রণমি জনম-ভূমি! তুমি মা আমার দেবী,
সুখে দুঃখে চিরদিন যেন মা তোমারে সেবি।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়।

পরাজয়।

(১)

টাকা পয়সা যথেষ্ট আছে। পৈত্রিক-সম্পত্তি যাহা পাইয়াছিলাম তাহাও নিতান্ত অল্প ছিল না। আমার নিজেরও কিছু সংস্থান ছিল। কিন্তু সকল সময় টাকা পয়সাতেই সুখ হয় না। আমার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। বিপুল সম্পত্তি—ভোগ করিবার মাত্র আমি একা। বার-বার চারিটী রমণী-রত্নের পাণিগ্রহণ করিয়া আমি গৃহ আলোকিত করিয়াছিলাম। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় একে একে তাহারা আমাকে অসময়ে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। আমি যে একা সেই একাই রহিয়া গেলাম।

আর বিবাহ করিব না স্থির করিয়া প্রায় দশ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছি। স্ত্রী-হত্যায় বড় ভয়। জমীদারীর কাজ-কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকি। ভাবিয়াছি পোষ্য না গ্রহণ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি কোন এক সদ্ উদ্দেশ্যে দান করিয়া যাইব। কিন্তু প্রাণের অন্তরতম-প্রদেশে পুত্রস্নেহ যেন সময় সময় কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিত। সে অনুভূতির একটু অস্পষ্ট আভাস মাঝে মাঝে পাইতাম।

সে দিন মাঘ মাসের বৈকাল। আমি একটা মহালের বন্দোবস্ত শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। বেহারাগণ হুঁম্ হুঁম্ করিয়া আমাকে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমরা যখন "পাগলার মাঠ" অতিক্রম করিতেছিলাম, তখন বাহকগণ সহসা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। একটী শিশুর ক্রন্দনধ্বনি যেন আমার কাণে গেল। ব্যাপার কি দেখিবার নিমিত্ত নামিয়া পড়িলাম। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে অদূরে একটী সদ্যপ্রসূত সন্তানসহ একজন অসংবৃতবসনা রমণী পড়িয়া আছে, দেখিলাম। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। রমণীর শরীরে সধবার চিহ্নমাত্রও ছিল না। তখনই বুঝিলাম পাপের শাস্তি।

শিশুটী আবার কাঁদিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের গোপনপ্রদেশ হইতে অপত্য স্নেহের করুণ-গীতি ধ্বনিত হইল। মায়ামমতায় জড়িত মানুষ—শিশুর কষ্ট সহ্য করা তাহার পক্ষে নিতান্ত কঠিন। তাই ধীরে ধীরে শিশুসহ রমণীকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিলাম। হীনপ্রভ-চক্ষুর ভঙ্গীতে সে যেন তাহার সরল প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল তা'র কথা বলিবার শক্তি বুঝি পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছিল।

নিকটে লোকালয় না থাকায় বাহকগণ সেই ভাবেই পাল্কী লইয়া ছুটিয়া চলিল। আমি অতিকষ্টে পদব্রজে তাহাদের অনুসরণ করিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া আগুন জ্বালিতে আদেশ করিলাম। কিন্তু রমণী আর সে শুশ্রূষা চাহিল না। ধীরে ধীরে কোমল চক্ষু দুইটী শিশুর উপর বিন্যস্ত করিয়া সে এ কুটিল জগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। দেখিলাম, একটা কোমল অপত্যস্নেহ তাহার নয়নে লাগিয়া আছে।

অতি সন্তর্পণে রমণীর শীতল বক্ষ হইতে শিশুটীকে তুলিয়া দেখিলাম—তখনও কেটী মাতার অনুসরণ করে নাই। একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে অবিলম্বে "বিশুর মা" নাম্নী একটী বর্ষীয়সী রমণীকে ডাকিতে পাঠাইলাম। বিশুর মা আমার প্রজা, আমাকে ভক্তি করে, সময় অসময়ে তাহাকে ডাকিলে আর 'না' শুনিতে হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। হাতের কাজ ফেলিয়া বিশুর মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। বিশুর মার প্রাণ আছে, বুদ্ধিও আছে। আমার নিকট হইতে শিশুকে লইয়া তাহার কোমল অঙ্কে স্থাপন করিল। বুকের কোনও গুপ্ত কোমল স্মৃতি বোধ হয় জাগিয়া উঠিল—নতুবা তাহার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টস্ টস্ করিবে কেন!

তিনদিন পূর্ব্বে যদুনাথ সরকারের একটী পুত্র হইয়া মরিয়া গিয়াছে। যদুনাথ আমার কর্ম্মচারী, প্রজাও বটে। সুতরাং একান্ত অনুগত। বিশুর মা সে খবরটী জানিত। তাই কালবিলম্ব না করিয়া সে শিশুটীকে লইয়া চলিয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে যদুনাথের স্ত্রী শিশুটীকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছে। দুই হাত তুলিয়া সে আমার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে। শুনিয়া বড়ই নিশ্চিন্ত হইলাম। শিশুটীর প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবানকে আমিও ধন্যবাদ দিলাম।

যদুনাথ তখন মফঃস্বলে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলাম। দুই দিন পরে সে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলাম। সে অবনত-মস্তকে সকল কথা শুনিয়া একটু আনন্দই প্রকাশ করিল। তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার দশ টাকা মাহিয়ানা বৃদ্ধি করিলাম কৃতজ্ঞতায় যদুনাথ নুইয়া পড়িল।

(২)

দীর্ঘ পাঁচটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে; শিশুটী এখনও যদুনাথের স্ত্রীর নিকট। তবে তাহাকে মাঝে মাঝে না দেখিলে থাকিতে পারি না, তাই বিশুর মা তাকে আনিয়া আমাকে দেখাইয়া নিয়া যায়। অনেক সময় আবার নিজেও যাই। প্রাণের আবেগে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনেক দিনের তপ্ত বক্ষ শীতল করি। একদিন আমার আদর যদুনাথের স্ত্রীর চোখে ধরা পড়িল। কি ভাবিয়া যেন সে আমার দিকে কুটিল ভ্রূভঙ্গিসহ চাহিল।

যদুনাথকে বলিয়া বালকটীর নাম রাখিয়াছিলাম দেবকুমার। তাহার দেবু নামই প্রচলিত হইতেছিল। কিন্তু এই ঘটনার দু'দিন পরেই শুনিলাম যদুনাথের স্ত্রী তাহার নাম বদলাইয়া দুঃখীরাম রাখিয়াছে। বিশুর মা পূর্ব্বতন নাম ব্যবহার করায় রমণী জিহ্বার কিঞ্চিৎ তীব্র তাড়নাও সহ্য করিয়াছে। মেয়েমানুষের স্বভাব সঠিক বোঝা শক্ত। তাই দেখিয়াও দেখিলাম না, শুনিয়াও শুনিলাম না। রমণী (যদুনাথের স্ত্রী) যাহা ইচ্ছা করুক্। আমার তা'তে কি?

আর দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই বেশ বুঝিলাম, রমণীর ইচ্ছা নয় যে আমি তাহার দুঃখুকে বুকে টানিয়া লই। দুঃখু তাহার নিজস্ব। পরের হাত তাহাতে পড়িবে কেন? কিন্তু আমারও বুকে আগুন আছে। দুঃখু ছাড়া সে আগুন নিভান দায়। তাই আমার বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া দুঃখুর পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। দুঃখু আসিয়া সকাল বিকাল আমার বাড়ীতে পড়িয়া যায়। আমিও তাহাকে যথাসাধ্য আদর করিয়া তপ্ত প্রাণ শীতল করি। কিন্তু ভয় হইত পাছে এ সুখেও অন্তরায় ঘটে।

দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই যা' ভাবিলাম তাহাই ঘটিল। দুঃখু আর আমার বাড়ী আসে না। বিশুর মা আসিয়া খবর দিল রমণীর মত নয় যে দুঃখু লেখাপড়া করে। সে গরীব, তার আবার লেখাপড়া কি! বুঝিলাম এ কুটিল রমণীর ষড়যন্ত্র। পাছে দুঃখু হাতছাড়া হয় এই ভয়ে দুঃখুর লেখা পড়া নিষেধ। আমি রমণীর প্রতিদ্বন্দ্বী; আমাদের বাদ বিসম্বাদে পাছে দুঃখুর অপকার ঘটে, এই ভয়ে মাষ্টারকে যদুনাথের বাড়ী গিয়া দুঃখুকে পড়াইয়া আসিতে বলিলাম। এবার আর রমণী বাধা দিল না। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই রমণী বুঝিয়া ফেলিল যে তাহার দুঃখু কৃতজ্ঞতার পাশে ক্রমেই আমার নিকট আবদ্ধ হইতেছে।

রমণীর প্রাণের উন্মুক্ত বিহঙ্গম দুঃখীরাম—তাহার বন্ধন রমণীর নিতান্ত অসহ্য। আমার দাবী যদুনাথের উপর। রমণী সে টুকু স্বীকার করে। কিন্তু তারপর সব মুক্ত, সব স্বাধীন। ইহাই ভাবিয়া রমণী মাষ্টারকে নিষেধ

করিয়া দিল—তিনি যেন দুঃখুকে আর না পড়ান—তার পড়াশুনার আর প্রয়োজন নাই।

রমণীর ব্যবহারে আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। হায়, কি নিষ্ঠুর! সে তার আপন হৃদয়ের সুখটুকুর জন্য লালায়িত, আর আমার বুকের অসহ্য বেদনার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না! এই কি স্ত্রী-জাতির বিশেষত্ব!

ঘটনাগুলি একে একে ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ ডুবিয়া গেল। পুরুষের অভিমান জাগিয়া উঠিল। রমণীর উপর একটু রাগ করিলাম। মনে মনে ঠিক করিলাম তাহাকে কিছু শিক্ষা দিতে হইবে।

কিন্তু যদুনাথ গৃহে নাই; তাহার অসাক্ষাতে কিছু করা অন্যায়, তাই তাহাকে সুদূর মফঃস্বল হইতে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাহার আসিতে দীর্ঘ চারিটী দিবস কাটিয়া গেল। আমার সে কয় দিবসের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় থাকাতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করিলাম।

যদুনাথ আসিলে তাহার নিকট সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম। সে রমণীর অন্যায় ব্যবহারের জন্য বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিল। তাহার হইয়া আমার নিকট ক্ষমাও চাহিল। যদুনাথের ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। পূর্ব্বের পরুষভাব কিছু নরম হইল। যদুনাথ দুঃখীরামকে আমার বাড়ী পাঠাইয়া দিবে বলিয়া সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিল। আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

তারপর দিবস যদুনাথ যখন আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেখিলাম গতিক বড় ভাল নয়। নতুবা যদুনাথ অত কাঁপিয়া উঠিবে কেন? কথা তার বন্ধ হইবেই বা কেন? মনে মনে বুঝিলাম, রমণী দুঃখীরামকে ত্যাগ করিবে না। বুঝিলাম, রমণীর অপত্যস্নেহ পতি-প্রেমকেও ছাপিয়া উঠিয়াছে। আজ রমণী জননী—সাধ্য কি স্বামী তাহাকে রমণীর আসনে বসাইয়া জননীর সম্মান-টুকু কাড়িয়া লয়।

যদুনাথকে বলিলাম, "আর বলিতে হইবে না,—বুঝিয়াছি! এখন যাইতে পার।" বিষণ্ণ মুখখানা হইয়া যদুনাথ অবনত-মস্তকে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা—কি আর ভাবিব? দুঃখীরাম ছাড়া ত আমার কিছুই নাই। তারই কথা, তারই মুখখানা, হৃদয় মনের আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। দুঃখীরামকে আরও ভাল করিয়া মানসিক অঙ্কে জড়াইয়া ধরিতেছিলাম। এমন সময় যদুনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। তার মুখখানায় যেন একটু আনন্দের আভাসই ছিল। আমি তাহাকে ডাকি নাই। সে কেন আসিল জিজ্ঞাসা করায় সে গলা কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দুঃখুকে আপনি নি'ন্।" আর সে বলিতে পারিল না। তবুও আমি তার প্রস্তাবের মর্ম্মকথা বুঝিয়া ফেলিলাম। যদুনাথের প্রভুভক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আমি তাহাকে দশটী টাকা দিয়া দুঃখুর জন্য মিঠাই কিনিয়া লইতে বলিলাম। বাজারের মিঠাই ভাল নয়। তাই যদুনাথকে ফটকের ধার হইতেই ডাকিয়া ফিরাইলাম। ঘরের মিঠাই একটা পাত্রে নিজ হাতে উত্তমরূপে সাজাইয়া যদুনাথকে দিয়া বলিলাম, "দুঃখুকে দিও।" যদুনাথ চলিয়া গেল।

পরদিবস প্রাতঃকালে বিশুর মার নিকট শুনিলাম, সে মিঠাই রমণী ফেলিয়া দিয়াছে। দুঃখুরামের মিঠাই খাওয়া অন্যায়! যদুনাথের উপার্জ্জিত ধন সে সানন্দে গ্রহণ করে, অথচ আমার দেওয়া কয়েকটা মিঠাই নিতে সে পারিবে না! রমণীর এত অহঙ্কার!

যখন যদুনাথ আসিল, তখন দেখিলাম তাহার মুখের উপর দুঃখের একখানা গভীর কালো ছাপ পড়িয়া গেছে। বেচারীর চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ করিতেছে। তাহার জন্য বড়ই দুঃখিত হইলাম। ভয় হইল পাছে রমণীকে শাস্তি দিতে গিয়া প্রভুভক্ত যদুনাথকে ব্যথা দিয়ে বসি। তাই তাহাকে অভয় দিয়া বসিতে লাগিলাম। দুঃখীরামকে লইয়া দূরে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। তাহার বিরহই রমণীর পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি হইবে আশা করিলাম। যদুনাথকে খুলিয়া বলায় সে কোনও আপত্তি দেখাইল না। তারপর যে দিন যাত্রার উদ্যোগ করিলাম; সে দিন যদুনাথ দুঃখীরামকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল। অনেকদিন পরে দুঃখুকে পাইয়া এত আনন্দিত হইয়াছিলাম যে যদুনাথের জলে ভরা চোখ দুটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর আর জুটিয়া উঠে নাই।

(৩)

দুঃখুরামকে লইয়া তিনটি বৎসর কলিকাতায় কাটাইয়া দিয়াছি। মাষ্টার রাখিয়া তাহার পড়ার বন্দোবস্ত করিয়াছি। সে যখন পড়ে তখন একাগ্রমনে প্রত্যেক কথাটী শুনিয়া

যাই। দেশে আর যাই না। রমণীকে বড় ভয় করে। জমীদারীর চেয়ে দুঃখু অনেক বড়। তাই দুঃখুই আমার সব। তার সাথে খেলা করি। তার সঙ্গে যে কার্য্যটী সমাপ্ত হয় না, সেখানে যেন কি একটা অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা রহিয়া যায়।

দুঃখু কিন্তু রমণীকে ভোলে নাই। তার মা'র কথা সন্ধ্যায় সকালে আমার নিকট বসিয়া, আমার হাতে হাত রাখিয়া কতবার বলিত—আর আমার নিকট হইতে তাহার মায়ের প্রশংসা আদায় করিয়া লইত। রমণীর অভাব কি আমাতে যায়! তাহার বক্ষ যে মায়ের স্নেহে ভরা।

আমি আর দুঃখু একদিন খেলা করিতেছি, এমন সময় ভৃত্য মণিচাঁদ একখানা চিঠি রাখিয়া গেল। আমরা দুইজনে চিঠিখানা ভাগাভাগি করিয়া পড়িতে লাগিলাম। দুঃখুরাম তখনও পড়িতে তত শিখে নাই। তবুও তার পড়া চাই—তাই তা'কে অর্দ্ধেক দিতে হয়। এরূপ না হইলে আমাদের কিছুই পাঠ হয় না।

পত্রে বেশী কিছু ছিল না। কিন্তু যেটুকু ছিল তাহাতেই ভাবনার যথেষ্ট কারণ ছিল। যদুনাথেরই পত্র—সে লিখিয়াছিল—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

পাদপদ্মে শত সহস্র প্রণতিপূর্ব্বক দাসের সানুনয় নিবেদন এই যে দুঃখুর মা প্রায় দুই বৎসর হইল অত্যন্ত পীড়িত। সে আর বেশী দিন বাঁচিবে না, ইহাই তার বিশ্বাস। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একবার দুঃখীরামকে দেখিতে চায়। সে আরও বলে যে সে দেখিয়াই পরিতৃপ্ত হইবে, তাহাকে রাখিতে চাহিবে না। তাহার এই শেষ প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিলে আমরা দুইজনেই চিরঋণী থাকিব।

আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী দাসানুদাস
শ্রীযদুনাথ সরকার।

চিঠি পড়িয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। করিলাম কি! আবার স্ত্রী-হত্যা! আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই দিবসই দুঃখীরামকে লইয়া স্বদেশযাত্রা করিলাম। বড় আশা রমণীকে তাহার ধন ফিরাইয়া দিয়া আবার তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিব। কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ। বিধাতা সে আশা সফল হইতে দিলেন না। রমণীর স্নেহের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ নয়ন প্রাণ ভরিয়া দুঃখুকে দেখিতে না দেখিতেই নিমীলিত হইয়া গেল। মায়ের শীর্ণ হস্তের শেষ আশীর্ব্বাদ দুঃখীরামের মস্তকে বর্ষিত হইতে না হইতেই সে হস্ত অবশ হিম হইয়া আসিল। আর আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করিতে কি করিলাম! যদুনাথ! তোমার প্রভুভক্তির যথেষ্ট উপযুক্ত পুরস্কার পাইলে! ভীষণ মর্ম্ম-ব্যথায় বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। একমাত্র ভরসা দুঃখীরাম—সে যদি এই দুঃখ-সন্তপ্ত-হৃদয়ে একটু সুশীতলধারা ঢালিয়া দিতে পারে! কিন্তু কি বিড়ম্বনা। দুঃখুর চক্ষু দুটী অত ভীষণ ভাবে জ্বলে কেন? তার সমস্ত অঙ্গে আগুণের ফুল্কি জ্বলিয়া উঠে কেন? দুঃখু যে পুড়িয়া গেল। কি করি! হায় ভগবান্! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

দুঃখুকে ধরিতে ছুটিয়া গেলাম। কিন্তু পারিলাম না, পড়িয়া গেলাম। কি এক মূর্চ্ছার অন্ধকারে আমায় ছাইয়া ফেলিল।

যখন আবার সংজ্ঞালাভ করিলাম তখন শুনিলাম, দুঃখও ফাঁকি দিয়া চলিয়ে গিয়াছে। বুঝিলাম, এবার দুঃখু মা চিনিয়াছে। নইলে মৃত্যুও তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইবে কেন? রমণীর মৃত্যুতেও সুখ। আজ তাহারই জয় বলিতে হইবে, নইলে তাহার শাস্তি আমার উপর চাপিয়া পড়িবে কেন?

ভগবান্ তোমার একি লীলা? এ ভাঙ্গা বুকে আবার আগুণ জ্বালিয়া দিলে কেন? যদি পুড়িয়া মারিতে চাও, তবে পোড়াও, একবারে ছাই করিয়া ফেল—সব জ্বালা চুকিয়া যা'ক্। দুঃখুরাম! আর পারি না। আমায় নিয়ে চল। এ বুকভাঙ্গা ব্যথা বড় অসহ্য।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

হৃত-সম্পদে

বসন্ত গিয়েছে চলে রাখি তার শুষ্ক ফুলদলে,
উৎসব হয়েছে অন্ত ধূলিচিহ্ন রাখি গৃহতলে।
সহসা নিবেছে দীপ আছে শুধু গাঢ় অন্ধকার,
শুকায়ে গিয়েছে নদী মরুচিহ্ন আছে বালুকায়।

বিচূর্ণ সুরম্য হর্ম্য সাক্ষী রাখি ভগ্ন স্তূপে তার,
ছিন্ন সূত্র আছে পড়ি ঝরে গেছে মুকুতার সার।
ভেঙ্গেছে মেলার হাট স্মৃতি তার রাখি ভাঙ্গা ঘরে,
পুড়েছে শ্যামল পল্লী চিহ্ন তার আছে ভস্ম পরে।

যৌবন গিয়াছে চলে রাখি হায় জীর্ণ জরা ভার,
ছিন্ন তন্ত্রী আছে পড়ে নাহি আর বীণার ঝঙ্কার।

মরেছে ফুলের বাগ আছে শুধু কণ্টকের ঝাড়,
কর্ত্তিত সুপক্ক শস্য ক্ষত চিহ্ন ক্ষেত্রে কাঁদে তার।

পথ নাহি সরোবরে আছে শুধু পঙ্ক চারিধারে,
হয়েছে যজ্ঞের শেষ চিহ্ন রাখি বিদগ্ধ অঙ্গারে।
প্রিয়তম গেছে ছাড়ি চূর্ণ করি হৃদয় আগার,
অশ্রু আর হাহাকারে মর্ম্মন্তুদ চিহ্ন রাখি তার।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সংস্কৃত-শিক্ষা

শিক্ষার অবনতিই মানব-সমাজের সকল অবনতির মূল। সুতরাং যাহাতে শিক্ষার কোনরূপ অবনতি না হয় সে বিষয় সকলেরই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষের গৌরবের যাহা কিছু আছে সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় প্রতিষ্ঠিত। অতএব সংস্কৃত শিক্ষার অবনতি হইলে আমাদের অবনতি অনিবার্য্য এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত শিক্ষার এই অবনতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশেই অধিক দেখা যাইতেছে। শিক্ষার বহুল প্রচারই একমাত্র শিক্ষার উন্নতি নহে, কিন্তু শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের গভীরতাই প্রধানতঃ শিক্ষার উৎকর্ষের পরিচায়ক। বঙ্গদেশে সংস্কৃত পরীক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলেও তাহাদের জ্ঞান-গরিমা যে ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে তাহাতে কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। প্রাচীন অধ্যাপক-শ্রেণীর মধ্যে যিনি যে স্থান শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার ন্যায় সেই স্থানের দায়িত্বভার বহনে সমর্থ অপর ব্যক্তি এখন আর পাওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে অতি সত্বর শিক্ষার প্রণালীর সংস্কার না হইলে অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গদেশের পাণ্ডিত্য-গৌরব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে এবং পরবর্ত্তী শিক্ষার্থীগণের দ্বারা লুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধার অসম্ভব হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণের যোগ্যতা পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব এই শোচনীয় পরিণামের জন্য সংস্কৃত পরীক্ষাই যে প্রধান দায়ী, এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালে ছাত্রগণের অধ্যয়ন শেষ হইলে সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকটে বিচার দ্বারা তাহাদিগকে নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে হইত। ঐ সমস্ত বিচারক্ষেত্রে ছাত্রগণ পরাজিত হইলেও প্রাসঙ্গিক কথাবার্ত্তায় তাহাদের বিদ্যার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইত। তদনুসারে বিচারক পণ্ডিতমণ্ডলীও তাঁহাদের পদমর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। সুতরাং প্রথমতঃ প্রাধান্যলাভের জন্য এবং পরে লব্ধ প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য যাবজ্জীবন তাহাদের বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত করিতে হইত। তাহারই ফলে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারসমূহ অতুলনীয় রত্নভাণ্ডার হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে রাজকীয় পরীক্ষার প্রচলন হইল। কিন্তু তখন এই পরীক্ষা বিদ্যার পরিচায়করূপে গণ্য না হইয়া কেবল রাজকীয় সম্মানলাভের উপযোগী হইল। তবে সেই সময়ে যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহাদিগকেও পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথানুসারে বিচারের দ্বারা বহুবার পরীক্ষা দিতে হইত। সেইজন্য উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে তখনও জ্ঞান-গরিমার বিশেষ অভাব হইত না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণও সর্ব্বসমক্ষে স্বধীত-শাস্ত্রে নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে সমস্ত উত্তীর্ণ ছাত্রই পণ্ডিত বলিয়া প্রতীত হইতেন। ক্রমশঃ রুচির পরিবর্ত্তনে প্রচলিত বিচারপ্রথার উচ্ছেদ হইতে লাগিল। অগত্যা তখন হইতে সংস্কৃত বিদ্যার্থীগণের যোগ্যতা নির্দ্দেশের ভার আস্তে আস্তে পরীক্ষার উপরে আসিয়া পড়িল। এখন ঐ ভার সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষাকেই

বহন করিতে হইতেছে। যাহার দ্বারা যে বিষয়ের যোগ্যতার নির্দ্দেশ হয়, তাহার দোষেই যে সে বিষয়ের অবনতি হয়, ইহা অতিযুক্তি সঙ্গত কথা। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

পরীক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করিতে হইলে পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক এবং প্রশ্নপত্রের আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ের পাঠ্য নির্ব্বাচনের প্রসংসা করা যায় না। তাহার কারণ, প্রথমতঃ বহু বৎসর পর্য্যন্ত পাঠ্য-পুস্তক প্রায় একরূপই রহিয়াছে, অধিকন্তু ঐ সকল গ্রন্থের প্রশ্নও প্রায়শঃ অপরিবর্ত্তিতভাবেই হইয়া থাকে। তাহাতে ছাত্রগণ কেবলমাত্র কয়েক বৎসরের পুরাতন প্রশ্ন দেখিয়াই পরীক্ষার ফললাভে সমর্থ হয়, এজন্য তাহারা পাঠ্য-পুস্তকগুলির যথারীতি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন বোধ করে না। তাহাতে গ্রন্থে ব্যুৎপত্তিলাভের বিশেষ ব্যাঘাত হয়।

দ্বিতীয়তঃ—উপযোগী কঠিন পুস্তকের পাঠ্য-তালিকা হইতে নির্ব্বাসন। এই নির্ব্বাসন দুই প্রকারে সাধিত হয়। প্রথম প্রকার—পাঠ্য-তালিকা হইতে ঐরূপ পুস্তকের নাম বাদ দেওয়া, যেমন ন্যায়ে 'ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব,' 'প্রকাশ সহিত কুসুমাঞ্জলি,' বেদান্তে 'সিদ্ধান্ত লেশ সংগ্রহ,' মুগ্ধবোধ এবং সুপদ্ম প্রভৃতি ব্যাকরণে 'কারকচক্র,' বাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্য প্রকার—'অথবা' বসাইয়া সেই সব পুস্তকের পরিবর্ত্তে সরল পুস্তকান্তরের নির্দ্দেশ। যেমন 'অদ্বৈতসিদ্ধি খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' প্রভৃতির স্থলে 'রামানুজ চতুঃসূত্রীভাষ্য' প্রভৃতি পাঠ্য হইয়াছে। কঠিন পুস্তকের স্থানে আপেক্ষাকৃত সরল পুস্তক পাঠ্য হইলে পরীক্ষার্থীগণ কঠিন পুস্তকের পরীক্ষা দিতে চাহে না। কারণ কঠিন গ্রন্থের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া সেই বিষয়ে উত্তীর্ণ অন্য ছাত্র হইতে তাহাদের বিশেষত্ব বুঝিবার কোন পথ থাকে না, কিংবা কোন কার্য্যে নিয়োগের সময় ঐ বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা না হওয়ায় উহা কোন কার্য্যের সাধকও হয় না। প্রত্যুত বিষয়ের কাঠিন্যবশতঃ অন্য ছাত্র হইতে পরীক্ষায় তাহাদের উচ্চস্থান অধিকার করা কিম্বা পারিতোষিক লাভ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া থাকে। এ জন্য বাধ্য হইয়া সকল পরীক্ষার্থীরই এক পথে চলিতে হয়। সুতরাং ঐ জাতীয় গ্রন্থের নাম পাঠ্য-তালিকায় থাকিলেও ফলতঃ উহা নির্ব্বাসিতই হইয়াছে। এইরূপে ঐ সব কঠিন গ্রন্থের প্রচলন বন্ধ হওয়ার পরবর্ত্তী ছাত্রগণ যে আবশ্যকমত উহার অধ্যাপনাদি করিবেন তাহার সম্ভব নাই। সুতরাং এই নির্ব্বাসনের ফলে তাহাদের নাম চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে।

তৃতীয়তঃ, এক পুস্তকের একই ব্যক্তির পাঠ্যরূপে একাধিকবার নির্দ্দেশ। যেমন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণ সাঙ্খ্যের মধ্য এবং উপাধি পরীক্ষায় এবং কাব্য ও ব্যাকরণের সমস্ত পরীক্ষায় 'উদ্ভটসাগর' পাঠ্য হইয়াছে। প্রায় সকল পরীক্ষার্থীই প্রথমে ব্যাকরণের এবং তৎপরে কাব্যের পরীক্ষা দিয়া থাকেন। "উদ্ভটসাগর" এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক নহে যে উহা পরীক্ষায় পাঠ্য হইবার যোগ্য। এ কথা সকল অধ্যাপক মহাশয়েরাই স্বীকার করেন।

কথঞ্চিৎ উপযোগী হইলেও দুইবার ঐ পুস্তকের পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ যে অতি নিষ্প্রয়োজন, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। দুইবার করিয়া এক পুস্তকের পরীক্ষা লইবার যে কি উপযোগিতা তাহা বলা কঠিন।

চতুর্থতঃ, ইহাও দেখা যায় যে অনেকস্থলে মধ্য-পরীক্ষার পাঠ্যের তুলনায় আদ্য-পরীক্ষার্থীর পাঠ্যের ভার অনেক গুরুতর হইয়াছে। প্রবন্ধের বিস্তার ভয়ে এই সব বিষয়ের উদাহরণ-সহকারে আলোচনায় নিবৃত্ত থাকিলাম।

পাঠ্যনির্ব্বাচনের এই দুরবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে নির্ব্বাচক-মহোদয়গণ পাঠ্য পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এই প্রথার বশীভূত হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকেন। ঐরূপ পরিবর্ত্তনে শিক্ষার উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে তাঁহাদের চিন্তার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎপরিবর্ত্তে ঔদাসীন্য এবং স্নেহপরবশতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে এই মাত্র বলা যায় যে—যাহাদের ছাত্রবর্গকে লইয়া পরীক্ষা, সেই অধ্যাপক মহাশয়গণের সম্মতি লইয়া কার্য্য করিলে বোধ হয় এই গলদ কমিতে পারে। শুনিয়াছি পরীক্ষার প্রথম অবস্থায় তাহাই করা হইত।

তারপর প্রশ্নের কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এখনকার ভাল প্রশ্নগুলি অধিকাংশই পূর্ব্ব প্রশ্নের নকল মাত্র। সুতরাং সে সকলের উত্তর অনেকেই জানেন। যে প্রশ্নগুলি নূতন হইতেছে, ইতিহাসাদি জ্ঞানের জন্য তাহার উপযোগীতা থাকিলেও পরীক্ষিতব্য বিষয়ে তাহার উপযোগিতা খুবই অল্প। অনেকস্থলে প্রশ্ন দেখিয়া মনে হয়, বুঝি ঐ রকম

প্রশ্ন না হইলে পরীক্ষকের বিশেষ অসুবিধা। যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহারাও প্রশ্নের জন্য পূর্ব্বে কোন চিন্তা করেন বলিয়া মনে হয় না। সময় মত যে কোন স্থান হইতে প্রশ্ন করিয়া ফেলেন। প্রশ্নপত্রের রচনার ভারও অনেক সময় অন্যায় ভাবেই অর্পিত হয়।

তজ্জন্য পরীক্ষকগণের অনন্যশীলিত বিষয়েরও প্রশ্ন করিতে হয়। ইহাতে পরীক্ষক এবং পরীক্ষার্থী উভয়েরই বিশেষ অসুবিধা হয়। কর্ত্তৃপক্ষও পাঠ্যের তালিকায় 'গ্রন্থ-ব্যাখ্যা মাত্র জিজ্ঞাস্য' লিখিয়া দিয়া পরীক্ষকগণকে সরল প্রশ্ন করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। প্রশ্নের সারল্যের ধারা ক্রমশঃ *এতই প্রবল হইয়াছে যে, কেহ ছাত্রের বিদ্যা বুঝিবার* উপযোগী প্রশ্ন করিলেই পরিক্ষার্থীগণ তাহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং যাহাতে পুনরায় এরূপ কঠিন প্রশ্ন না হয় সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতেও ছাড়েন না। ইহাতে মনে হয় যেন তাঁহারা কখনও কঠিন প্রশ্নের কথা কল্পনাও করেন নাই। এই সব কারণেই এখনকার প্রশ্নগুলি ছাত্রের বিদ্যা বুঝিবার উপযোগী হয় না। উত্তরপত্রের পরীক্ষায়ও অনেক রকম গোলমাল হইয়া থাকে। অনেকে আবার ঐ কার্য্য ছাত্র কিংবা বন্ধুর দ্বারা সম্পন্ন করেন। কেহ বা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। কেহ মুগ্ধবোধের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেও তাহার দ্বারা যেমন পাণিনি বা সংক্ষিপ্তসারের পরীক্ষাকার্য্য যথার্থ-ভাবে নিষ্পন্ন হয় না, সেইরূপ এই সব ক্ষেত্রেও পরীক্ষায় অনেক গলদ থাকিয়া যায়। কেহ কেহ ইহার পরিহারের চেষ্টাও করেন। কেহ বা পাছে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য "এবানি তস্য নশ্যন্তি" হয় এই ভয়ে চুপ করিয়া থাকেন। তারপর পরীক্ষক মহাশয়গণের মধ্যেও সকলেই যে পক্ষপাতশূন্য হইয়া কাজ করেন তাহাও বলা যায় না। এই সব কারণে অনেক যোগ্য ছাত্রই বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া থাকেন, তাহাতে পরীক্ষার প্রতি তাহাদের আস্থা নষ্ট হইতেছে। উত্তরোত্তর এইরূপ সরল প্রশ্ন হইতেছে দেখিয়া ছাত্রগণ অনায়াসে বহু উপাধি লাভের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। অনেক অধ্যাপক মহাশয়েরও ঐ সঙ্গে ছাত্র পাশ করাইয়া 'সব জানৃতা' পণ্ডিত হইবার আশা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায়, পরীক্ষার্থীদের কাহার নিকট কোন্ শাস্ত্র পড়া উচিত, এবং অধ্যাপকগণেরও কাহাকে কোন্ বিষয়ের ছাত্র করা সঙ্গত এই বিবেচনাও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

ইহাতে প্রতি বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, সেই হিসাবে ফেলের সংখ্যাও অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতেছে। ফেলের মাত্রা এত অধিক দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষকেও বাধ্য হইয়া প্রায় প্রতি বৎসরেই শতকরা দশ নম্বর পর্য্যন্ত গ্রেস্ দিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে উত্তীর্ণ করিতে হইতেছে।

এইরূপে উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে ভয়াবহ অযোগ্যতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; এবং এইরূপ অযোগ্যতা *প্রকাশ পাওয়ায় কোন স্থানেই তাহাদের আদর হইতেছে* না। শিক্ষিত সমাজের নিকট হইতে তাহাদের সাহায্য বা সহানুভূতি লাভ ত দূরের কথা! তাহাদের নিকট এখন 'টোলের ছাত্র বা টোলের পণ্ডিত' এই কথাগুলি যেন 'টুলোভূত' শব্দের আর একটী পর্য্যায়, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জন্তুবিশেষের বোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টোলের পণ্ডিত সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পর্য্যন্ত কিরূপ ধারণা তাহা তাঁহার কথা হইতেই বেশ বুঝা যায়।

"There is one point of usefulness of the pandits. They come in contact with all classes of people and mix freely with all of them, a thing which graduates of the universities cannot do. They can therefore do an invaluable work in collection of folk lore, informations about the worship of inferior deities, and soon, and if they can be made enumerators, much of the trouble experienced by Mr. Gait in the present census work will be avoided in future censuses."

The conference of orientalists including museums and archecology conference held at Simla July 1912, P 59.

অর্থাৎ পণ্ডিতদের এই একটী কার্য্যকারিতা দেখা যায় যে তাঁহারা যেমন সাধারণ লোকজনের সহিত মিলামিশা করিতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরা সে রকম পারেন না। অত-এব তাঁহাদিগকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রূপকথা বা

প্রবাদবাক্য প্রভৃতির অথবা নিকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র দেবতাসমূহের পূজা-পদ্ধতির বিবরণ সংগ্রহে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে তাঁহাদের একটা কার্য্যকারিতা পাওয়া যাইতে পারে। আর যদি তাঁহাদিগকে আদম-সুমারীর লোক-গণনার কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে গেট সাহেবকে ঐ কার্য্যে যে অসুবিধা কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছিল পরবর্ত্তী আদমসুমারীসমূহে আর সেরূপ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৫।)

তাঁহার পক্ষে এইরূপ কথা বলা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহা বিবেচ্য। ভারতবর্ষের নিজস্ব বলিয়া গৌরব করিবার যাহা কিছু ছিল বা এখনও আছে, তাহা এই পণ্ডিতদেরই সম্পত্তি এবং তাঁহারাই এ পর্য্যন্ত উহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। পরিণামে যদি তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই থাকিবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথার অন্য সমালোচনা অনাবশ্যক।

ধনীবর্গের উপযুক্ত সাহায্য না পাইয়া অধ্যাপকগণ এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্রগণকে অন্ন দিতে পারেন না এবং সতত নিজের উদরান্নের চিন্তায় ব্যগ্র থাকায় আশানুরূপ শাস্ত্রচর্চ্চাও করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং বিদ্যার যে হ্রাস হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? বিদ্যার এইরূপ অভাবনীয় হ্রাসের জন্য তাঁহাদের তেজস্বিতাও নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ইংরাজী শিক্ষার তুলনায় সংস্কৃত-শিক্ষা যে অল্প পরিশ্রম বা অল্পবুদ্ধিসাধ্য তাহা নহে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিতগণের উচ্চ আশা সফল করিবার অনেক ক্ষেত্র এবং সুযোগ আছে, সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের কিন্তু সেরূপ কোন পথই নাই। এজন্য সকলেই যে কোন প্রকারেই হউক্ না কেন নিজের সন্তানসন্ততির ইংরাজী শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। অগত্যা যাহাদের ইংরাজী শিক্ষার কোন আশা নাই এইরূপ ছাত্র লইয়াই বর্ত্তমান সময় সংস্কৃতশিক্ষা চলিতেছে। ইহাতেও সংস্কৃত-শিক্ষার অবনতি হইতেছে।

তারপর জীবিকার কথা। সংস্কৃত পরীক্ষায় উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে পূর্ব্বে কাব্যতীর্থদের স্কুলের হেড্‌পণ্ডিতের পদ সুলভ ছিল। আজকাল সংস্কৃতে বি, এ এবং কাব্যতীর্থদের সংস্কৃতশাস্ত্রে বিদ্যার বিশেষ পার্থক্য প্রায়ই হয় না। পরন্তু গ্রাজুয়েটগণ ইংরাজী জানেন, এজন্য হেড্‌পণ্ডিতের পদে তাঁহাদের আবেদনই অগ্রগণ্য হয়। ঐরূপ অযোগ্য ব্যক্তিগণের উপর শিক্ষকতার ভার ন্যস্ত হওয়ায় ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়েও সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতেছে। তেজস্বিতা যোগ্যতার নিত্য সহচরী। সুতরাং যাঁহার বাস্তবিকই যোগ্যতা আছে, তিনি কর্ত্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে পারেন না। এ জন্য অনেকস্থানেই যোগ্যতর ব্যক্তির আদর হয় না। সেই স্থানে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য চাটুকার বা সুপারিস্‌পত্রসংগ্রহীতৃগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অন্যান্য উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের দাবী করিবার মত স্থান পূর্ব্বেও ছিল না, এখন ত নাই-ই। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের সকল বিভাগের পুস্তকই পড়ান হয়। তাহার মধ্যেও পূর্ব্বের যুক্তি অনুসারে ইংরাজী শিক্ষিতগণের দাবীই বেশী। প্রধানপণ্ডিত কয়েকজন ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও শিক্ষার্থীগণের আশানুরূপ যোগ্যতা না থাকায় তাঁহারাও আশানুরূপ শিক্ষার উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত পণ্ডিতগণ ব্যতীত এখনও দেশে অনেক ভাল পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই নির্দ্দিষ্ট কোন আয় নাই। এই অবস্থায় সংস্কৃতপরীক্ষার উত্তরপত্রের পরীক্ষক হইতে পারিলে তাহাদের কিছু সাহায্য হইতে পারে তাহাও হইতেছে না। কারণ উত্তরপত্রগুলি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া বহুল পরিমাণে ইংরাজী স্কুল ও কলেজের অধ্যাপকগণের দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে। সুতরাং এদিক্ দিয়া দেখিলেও টোলের পণ্ডিত কিম্বা ছাত্রগণ সংস্কৃত পরীক্ষার দ্বারা কোনরূপ সাহায্য পাইতেছেন না।

পরীক্ষকতার ভার ক্রমশঃ এতই অযোগ্য ব্যক্তির উপর গিয়া পড়িতেছে যে অনেক অধ্যাপক মহাশয়েরা ঐ কার্য্যে গৌরবলেশও অনুভব করেন না। এমন কি কোন কোন ছাত্রও কোন পরীক্ষক বিশেষের নিকট পরীক্ষা দিতে অতিশয় লজ্জা বোধ করেন। অথচ রাজকীয় উপাধি না থাকিলে তাঁহার মূর্খতা দূর হইয়াছে ইহা বুঝিবার কোন উপায় থাকে না বলিয়া ছাত্রগণকে পরীক্ষার ফি উত্তরোত্তর বেশী দিতে হইতেছে এবং অপ্রয়োজনীয় পুস্তক কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হইতেছে।

সংস্কৃত-শাস্ত্রের উপাধিও যেন এখন একটা অদ্ভুত বস্তু

হইয়া পড়িয়াছে। যেন ইহার অন্ততঃ একটী না পাইলে জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। এই উপাধি-ব্যাধির আগ্রহ কবিরাজ, উকীল প্রভৃতি সকল শ্রেণীতেই দেখা যায়। আমাদের পণ্ডিতমহাশয়গণ ত এ বিষয়ে কল্পতরু। যখন ইহার সারবত্তা এত দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন তাঁহারাই বা বৃথা কলঙ্কের ভাগী হইবেন কেন? এই সব কারণে প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ক্রমশঃই বাড়িতেছে এবং তজ্জন্য তাঁহাদের অধ্যাপনার উৎসাহও কমিয়া যাইতেছে। অনেকে উপযুক্ত ছাত্রের অভাবে অধ্যাপনা কার্য্য একরূপ পরিত্যাগই করিয়াছেন। সুতরাং ভাল ছাত্রের সংখ্যাও খুব কমিয়া যাইতেছে। যে ন্যায়শাস্ত্র অন্ততঃ তিন চারি বৎসর না পড়িলে কোন শাস্ত্রেরই যথারীতি অধ্যাপনা করা অসম্ভব এখন সেই ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রই এ দেশে অত্যন্ত দুর্লভ।

বঙ্গদেশ ন্যায়শাস্ত্রের উৎপত্তিক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটী অজাতশ্মশ্রু বালকের নিকট সেই দেশের ন্যায়শাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিতগণের সেই ন্যায়শাস্ত্রের বিচারেই পরাভব হইল! ইহা অপেক্ষা আর কি অবনতি হইতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই কর্ত্তৃপক্ষের ইহাতেও চৈতন্য হইতেছে না। এখনও সময় আছে, সুতরাং এই মুহূর্ত্ত হইতে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখনই তাঁহাদের সঞ্চিত ভাণ্ডার বুঝিয়া না লইলে ৫০ বৎসরের পরে তাহার সন্ধানের পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইবে। মনে হয় যেন আর পাঁচ বৎসর পরে শাস্ত্রার্থে সন্দেহ হইলে তাহার নিরাকরণ করিবার মত লোক আর এ দেশে পাওয়া যাইবে না। এইরূপেই ভারতবর্ষের ধর্ম্মকার্য্যে ও দর্শনাদি-শাস্ত্রে যে বিশেষত্ব আছে তাহা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে। ভারতের আর কোনই স্বতন্ত্রতা থাকিবে না।

শ্রীসুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

মালা গাঁথা

সে দিন প্রভাত বড়ই কোমল
তরল আলোক ঢালা!
কানন মাঝারে গিয়াছিনু সাধে
গাঁথিতে ফুলের মালা।

প্রিয়ের গলায় দোলাইয়া সুখে
ফুলের কোমল হার
নিয়ড়ে বসিয়া সোহাগ করিয়া
হেরিব শ্রীমুখ তাঁর।

বাছনি করিয়া বনে বনে কত
খুঁজিলাম পাতি পাতি
কোন্ ফুলে তাঁরে মানাইবে ভালো
কোন্ ছাঁদে মালা গাঁথি?

হেরিনু করবী গোলাপ রাণীরে
হেরিনু চম্পা-বঁধু
রজনীগন্ধা টগর করবী
বুক ভরা সুধা মধু।

গন্ধের রাজা গন্ধরাজেরে
মনে না ধরিল মম
অবশেষে গেনু শেফালির কাছে
—পেলব মধুর কম—

ছুঁইতে শেফালি পড়িল ঝরিয়া
ঝুর্ ঝুর্ করি তলে
ভিজাইল দেহ হায়রে আমার
শিশির-অশ্রু-জলে।

শেফালির পানে চাহিয়া আমার
ঝরিল নয়ন বারি
আর তো হল না মালা গাঁথা মোর
কুসুম ছিঁড়িতে নারি!

হেরিনু আকাশ হেরিনু কুসুম
চাহিনু প্রভাত পানে
সকলি তো ভালো নিঠুরতা শুধু
প্রকৃতিরে বাজ হানে।

ক্ষম মোরে বঁধু মালা গাঁথা আজি
হ'ল না হ'ল না আর
কুসুম দলিয়া কুসুমের গলে
কেমনে দি' উপহার?

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

নন্দন-পাহাড়

(৪)

অগ্রহায়ণের শেষ। আমার স্বাস্থ্য দ্বিগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়া বিধাতা পুরুষটী তাঁহার বুদ্ধি ও বিবেচনার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলেন, যে, আমার ক্ষতিপূরণ সকল দিক্ দিয়াই করিবেন।

সে দিন ভোর বেলাটাতে দারুণ শীতে হাত পা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। তবু সকালের হাওয়া খাওয়ার লোভটা ছাড়া অসম্ভব মনে হইল। গরম কাপড় চোপড় পরিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে বৌদিদি দুয়ার খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

—"ঠাকুরপো বুঝি এই ভোরেই বেরুচ্ছ? আজ কোন্ দিক্ জয় কর্ত্তে যাবে তা' হ'লে?"—

—"কেন আমায় কি 'দিগ্বিজয়' পেলে নাকি?"—

—"দিগ্বিজয়!—দিগ্বিজয়ের যে টুকু বুদ্ধি ছিল, তার অর্দ্ধেকটুকুও যদি তোমার থাকৃত, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্ত্তে পার্তাম্!"—

হঠাৎ আজ আমার বুদ্ধি বিবেচনার অস্তিত্ব বিষয়ে বৌদিদির এতখানি সন্দেহ দেখিয়া মনের ভিতরটায় একটু অস্বস্তি অনুভব করিলাম। বুঝিলাম একটা কিছু মতলব আছে, তাই এই অপবাদ দেওয়া! একটু গম্ভীরভাবে পরিহিত বেশভূষার দিকে তাকাইলাম! দিগ্বিজয়ের চেয়েও বুদ্ধি কম!—বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না!

গলার স্বর খাটো করিয়া কহিলাম,—"নাঃ, ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না! বিশ্ববিদ্যালয় যে জয়-পত্রিকাগুলি ললাটে বেঁধে দিয়েছে, তা'তে বুদ্ধি কম এমন কথা তো লিখে নাই, বৌদিদি!—ও। তোমার কিছু মতলব আছে, ঠাকুরুণ!"—

—"মতলব কিছু নেই আমার,—তবে আজ থেকে তোমার চা খেতেই হবে, এই বলে যাচ্ছি,—আমি জল চাড়িয়ে এসেছি; চা না খেয়ে বেরু হ'য়োনা কিন্তু"—

—"সে হচ্ছে না বৌদি, যা ছেড়েছি তা আর কেন?"—

"না না, সে হবে না, চা তোমাকে খেতেই হবে।"—

বৌদিদি মৃদু হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন; সরিয়া আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলাম;—

—"সে হচ্ছে না, বৌদি', চা যদি আমাকে খেতেই হয়, কেন খাব, সেটাও আমাকে জানতেই হবে"—

—"তা' আমি বল্‌ব না; তবে তোমাকে যে চা খেতেই হবে এটা কিন্তু অত্যন্ত ঠিক্!"—

একেবারেই নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য বলিলাম—"বাঃ, আমাকে যে একেবারে কোলের ছেলেটি পেয়ে বস্‌লে,—খা, তোর ওষুধ খেতেই হবে; সময়ে অসময়ে খাবার খেতেই হবে;—মধ্যে মধ্যে কাঁচা মাথাটাও খেতে হবে; তার উপর আবার চা!"—হাতের আস্তিনটা গুটাইয়া, সবলপুষ্ট ডান হাতটা একটু মেলিয়া ধরিয়া কহিলাম,—"এঃ, আমি কি আর সেই রোগা, প্যান্‌পেনে বিনু মুখুয্যে আছি নাকি? আমি সেল্‌ফ্-গবর্ণমেণ্ট (Self Government) চাই, স্বরাজ চাই,—নইলে বিদ্রোহ কর্‌ব,—একেবারে আইরিশ্ সিন্‌ফিন্‌দের মত!"

বৌদিদির মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল। "ভারি ত বীরপুরুষ, দাকার গায়ে মক্কা যান্! আচ্ছা, তুমি বিদ্রোহ কর, আমিও 'মেশিন্ গন্' (Machine Gun) তৈয়ারী করে তুল্‌ছি,"—

ভারি দমিয়া গেলাম। এই "মেশিন্ গন্‌টা" যে কি

পদার্থ তাহা জানিতাম না ;—তবে বৌদিদি প্রায়ই ভয় দেখাইতেন, আর সে ভীতিটা একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতই আমার মনের মধ্যে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল।

—"তোমার এ বিদ্রোহের ব্যাধিটা যে সংক্রামক হ'য়ে উঠ্‌তে চল্‌ল ;—না, চা তোমাকে খেতেই হবে ;—বসে থাক ওই চেয়ারটার উপর,—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা' নিয়ে ফিরে আস্‌ব !"—

দ্রুতহস্তে জানেলার কবাটগুলি সব খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, টেবিলটা ঝাড়িয়া, গুছাইয়া, বৌদিদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি সুশীল ও সুবোধ বালকটীর মতই টেবিলটার একটা পাশ চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। বিদ্রোহটা কেমন করিয়া যে 'সংক্রামক' হইয়া উঠিল, ভাবিয়া কুল-কিনারা পাইতেছিলাম না, অথচ ঐ কথাটার মধ্যে যে অনেকখানি লুক্কায়িত অর্থ রহিয়াছে তাহাও বেশ্ বুঝিতেছিলাম। কিন্তু "মনের অগোচর ত পাপ নাই!" কিছুই বুঝিলাম না ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা গোপনতন্ত্রীতে অতি মৃদু একটা পুলক ঝঙ্কার রহিয়া রহিয়া সাড়া দিতেছিল, তাহা অস্বীকার করাও চলিতেছিল না ; নিজের বুকের উপর কাণ পাতিয়া সেই সাড়াটা কোনও দিনই শুনিতে সাহস করি নাই ; কিন্তু সে যে ক্রমেই সুরের পর্দ্দা চড়াইয়া দিতেছিল, এবং অন্যের কাছেও ধরা পড়িবার মত অবস্থা করিয়া তুলিতেছিল, সে তথ্যটাও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

এমন সময়ে বৌদিদি ঘরের মধ্যে আসিয়া টেবিলের পাশেই চায়ের পেয়ালাটা ও একখানা প্লেটে কিছু খাবার রাখিয়া দিলেন এবং কহিলেন,—"কাল রাত্রে কিছু খেতে পার নাই, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে এখন"

—"হাঁ বৌদিদি, তুমি যখন বল্‌ছ, তখন নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে—কিন্তু এতক্ষণ সেটা টের পাইনি তো,—"

"বেশ, চা'টা আর ঐ খাবার কিছু খেয়ে হাওয়া খেতে যাও!"—

নিরুপায় হইয়া কহিলাম, "চা আর ঐ খাবারগুলি খেয়ে আবার হাওয়া খেতে যাব—পেটে সইবে ত ?"

"দেওঘরের জল ভাল, খুব হজম করায়, জল একটু বেশী হ'য়ে খেলেই আর কোনও আপদ্ থাকবে না।—"

"এ গুলি হজম কর্‌বার জন্য আবার বেশী করে জল খেতে হবে,"—একটু এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলাম, "বৌদি', আমি বল্‌ছি যে,"—

"হাঁ, কি তুমি বল্‌ছ ?"—

"তুমি যদি এখন 'মার্শ্যাল ল' জারি করে বস, তা' হলে"—

—"আর তোমার কিছুটী বল্‌বার থাকে না,—এইতো, কেমন ?"—

স্বর যথাসম্ভব মোটা করিয়া বলিলাম,—

"হাঁ!—"

"ঠিক্ তাই, 'মার্শ্যাল ল' জারি কর্‌লে খুব দ্রুত ফল দেখা যায় ; – চা' জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও—"

"এই ত খাচ্ছি"—স্বরটা নিতান্তই মিহি রকমের বাহির হইয়া গেল,—নিজের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ওটা 'মার্শ্যাল্ ল'র গুণ বোধ হয়!—

চা শেষ করিয়া খাবারগুলি উদরস্থ করিলাম!

বৌদিদি একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—

"লক্ষ্মী ছেলে,—এই তো চাই!"

—"ভারি লয়াল্! – নয় ?"—

স্বরটা স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছিল। সেটা চা' ও খাবারের গুণে, কি বৌদিদির প্রশংসা-বাণী শুনিয়া, ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম না!

চায়ের পেয়ালা ও প্লেট সরাইয়া নিতে নিতে বৌ-দিদি কহিলেন,—"আচ্ছা, এখন বেড়াতে যাও। বেশী রোদ্ উঠ্‌বার আগেই ফিরে এস কিন্তু!—

বৌদিদি চলিয়া গেলেন। সদর্পে মোটা বাঁশের লাঠিটা হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। লাঠি গাছটী দেও-ঘরেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারান্দার উপর আসিতেই পিছনে চাবির শব্দ পাইয়া ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, বৌদিদি ডাকিতেছেন। ফিরিয়া আসিলাম ; বৌদিদি তাঁহার নিজের ঘরটার মধ্যে চলিয়া গেলেন। দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিলাম, "বৌদিদি, ডাক্‌লে ?"—

ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বৌদিদির ছোট টেবিলের কাছে সুজাতা মাথাটী অসম্ভব রকম নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

চূর্ণ কুন্তল কপোলের পাশে পাশে উড়িতেছিল, খোলা জানালার ফাঁক্ দিয়া প্রভাতারুণের কোমল রশ্মি তাহার মুখের একটা পাশে পড়িয়াছে এবং সেই দিক্‌কার কর্ণভূষা মৃদু আলোক সম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

টেবিলের উপর একটা চায়ের পেয়ালা, সুজাতা তাহা স্পর্শ করে নাই, এবং অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, চা'টা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। বৌদিদির মুখের দিকে চাহিলাম, ঐ লাঞ্ছিতা বালিকার কাছে পরাজিত হইয়া তাঁহার একটু দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে হাসির অর্থ অনেকখানি গভীর! ঠিক্ বৌদিদির ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া তাহা বিশ্লেষণ করিবার সাহস আমার ছিল না। তবে বিদ্রোহ যে কোথায় সংক্রামক হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আমার তিলমাত্রও বিলম্ব হইল না। এবং বৌদিদির কঠোর 'মার্শ্যাল ল' যে এখানে ফেল পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া ভারি খুসি হইয়া উঠিলাম।

ইতিমধ্যে আমার অন্তরের সেই গোপন তন্ত্রীটার সুরটা আর একটু উঁচু পর্দ্দায় সাড়া দিয়া উঠিল, এবং সেই দারুণ শীতের মধ্যেও আমার কাণের কাছটা অসম্ভব রকম গরম হইয়া উঠিল; বোধ হয় লালও হইয়াছিল।

কোন্ সময়ে যে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম, স্মরণ নাই। একটু গোলমালে চমক্ ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিলাম, ঠিক্ ডাকঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। চিঠি পত্রগুলি আনিবার জন্য ডাকঘরের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম।

(৫)

পরদিন ভোর বেলাটায় পিসিমা আসিয়া ডাকিয়া তুলিলেন। কহিলেন, "আজ পূর্ণিমা, বাবার মন্দিরে নিয়ে যাবি রে?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিলাম, "তা' তুমি যেতে চাও, ল, কিন্তু আজ এই পরবের দিনে ভারি ভিড় হবে যে। মন্দিরে ঢুকতে প্রাণান্ত হয়ে যাবে, সে দিন তো জানই, পরব ছিল না, তবু কি কষ্টটাই পেলে"—

পিসিমা একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আঃ আমার পোড়া কপাল! ঠাকুরের দেখা কি অম্‌নিই পাওয়া যায় রে? ওটুকু কষ্ট কি কষ্ট রে? সে কালে পায়ে হেঁটে দু' পাঁচ শ' কোশ পথ চলে, তবে না লোকে তীর্থ ধর্ম্ম করত! তা'দের ফলও হত;—আর এখন রেল ষ্টীমার হ'য়ে ঘরের দোরে সব তীর্থ এগিয়ে এসেছে, তবুও আমরা অভাগীরা তীর্থধর্ম্ম করা ছেড়ে দিয়েছি! ঠাকুর যদি অদৃষ্টে না লেখেন, তবে তাঁর দেখা পাওয়া যায় কি? মহাপাপী আমরা জন্মে জন্মে কত পাপই করেছি, তাই—"

পিসিমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "তা' ঠিক্‌ই তো পিসিমা, একটু কষ্ট কর্ত্তে হয় বই কি? তা আমি গাড়ী করে আসি' তুমি ঠিক্ হয়ে নও।"

"না, তোর আর গাড়ী কর্ত্তে হবে না, কতটা দূরই বা আর হবে, আমি পায়ে হেঁটেই যাব,"—

"সে কি হয় পিসিমা, আজ ভারি ভিড় হবে যে?"—

"হ'ক্ না ভিড়; তুইই তো সে দিন বল্‌ছিলি যে কোথাকার রাজা নাকি গঙ্গাজলের ঘড়া মাথায় করে, কত পথ হেঁটে বাবার মন্দিরে এসে থাকেন,—আর এম্‌নি পাপিষ্ঠি আমি, এখান থেকে ওখানে গাড়ী করে যাব? না, তা' হবে না,—তুই হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে, তার পর চল্,"—

এমন সময়ে বৌদিদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন,—

"হাঁ, খেয়ে দেয়ে বাবার মন্দিরে যাওয়া,—পিসিমার যে আর কথা!—না, সে সব হবে না; তুমি ফিরে এসেই খাবে, ঠাকুরপো!"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিলাম, "সেকি, আমি অসুখের মানুষ, অতবেলা না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌ব কেন?"

"হ্যাঁ অসুখের মানুষ! আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি বুঝব! —বাবার মন্দিরে একটু সংযত হয়েই যেতে হয়, ওখানে আর তোমার ইংরিজি মত চালিয়ে কাজ নেই, ভাই,"— শেষ কয়টী কথা বৌদিদি ভারি গম্ভীরভাবে কহিলেন। তাঁহার চোখে মুখে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার কোমলশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

"তা' অন্নদাত্রী যখন তুমিই বৌদি', তখন ওর আর কোনও তর্কই চল্‌তে পারে না"।

"বেশ, তা' হ'লে ঠিক্ হয়ে নেও, আমি সঙ্গে যাব;— আর একটী প্রাণীও যাবে কিন্তু, বুঝ্‌লে?"

এই "আর একটী প্রাণী" যে কে, তাহা আমার বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। বৌদিদির মনে কি কল্পনা

ছিল তাহা তিনি কোনও দিনই ভাঙ্গিয়া বলেন নাই। তবে ইদানীং 'সুজাতার' নাম আমার সম্মুখে বড় একটা উচ্চারণ করিতেন না। কিন্তু এমনি স্নেহ প্রীতি-বিজড়িত ইঙ্গিতে আভাসে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, যাহাতে আমার বুকের ভিতরকার শোণিতোচ্ছ্বাসটা সময়ে সময়ে বড়ই দ্রুত তালে নাচিয়া উঠিত!

বৌদিদি চলিয়া গেলেন। একটু পরেই পিসিমা বাহিরে আসিয়া রীতিমত ডাকাডাকি সুরু করিয়া বেলা যে খুব অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে সকলকেই তাহা জানাইয়া দিলেন। বৌদিদি বাহির হইয়া আসিলেন; তাঁহার পশ্চাতে সুজাতা। আমি ফটকের কাছে ঐ দুই সদ্যস্নাতা ক্ষৌমবাস-পরিহিতা নারীকে দেখিলাম। বৌদিদির মুখে জগজ্জননীর মুখচ্ছবির ছায়া অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর তাঁহার পিছনের লজ্জাবিনম্রমুখী কিশোরীটীর মুখশ্রীর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাহা বিশ্লেষণ করিতে আমি কোনও দিনই সাহস করিতাম না।

গেটের বাহিরে আসিতেই দেখিলাম, বিমলপ্রসন্নবাবু ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছেন। প্রসন্নদৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"কি বাবা, কোথায়ও বেরুবে?"

"মন্দিরে যাওয়ার জন্য পিসিমা তাড়া ধরেছেন,—তাই বেরিয়েছি!"

"মা লক্ষ্মীও যাচ্ছেন বুঝি? ওকি সুজাতাও যাচ্ছিস্? তা' বেশ্ বেশ্।—ভারি ভিড় হবে আজ, তুমি একলাটী যাচ্ছ বিনু, অজিতকে সঙ্গে নিয়ে যাও না কেন? সে চল্‌তে ফির্‌তে তারি শক্ত হয়ে উঠেছে; বিশেষ মা লক্ষ্মীর সঙ্গে এই ক'টা মাস দেওঘরে থেকে তার অনেক রকম শিক্ষাই হয়েছে। ও অজিত, অজিত!"

অজিতনন্দন পাহাড়ের দিকে যাইতেছিল, পিতার আহ্বান শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"ও অজিত, তোর দাদাবাবুর সঙ্গে যা'না রে মন্দিরে।"

অজিত ভারি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইয়াই দেখিল, রীতিমত একটী পল্‌টন্ মন্দিরোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে।

বোতাম খোলা জামাটার ভিতর দিয়া অজিতের পুষ্ট গৌর দেহটার খানিকটা দেখা যাইতেছিল। সে দুই হাতে বোতাম টানিয়া দিতে দিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল।

—"মন্দিরে যেতে পার্‌বি তোর দাদাবাবুর সঙ্গে—" বিমলপ্রসন্ন বাবুর মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অজিত বলিয়া উঠিল, "খুব পারব, বাবা!"—এবং দ্বিতীয়বার বলিবার অপেক্ষা না রাখিয়া অজিত আমাদের এই ক্ষুদ্র পল্‌টন্‌টার সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইল।

মন্দির-প্রাঙ্গণে যখন প্রবেশ করিলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা। বিস্তৃত মন্দির প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ; কোনও মতে এক পার্শ্বে একটু স্থান করিয়া লইলাম। খাতা বগলে পাণ্ডার দল আমাদিগকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমরা যে ধরনীধর পাণ্ডা ঠাকুরের আশ্রিত জীব এই সংবাদটী প্রদান করিয়া সকলকেই পরম আপ্যায়িত করিয়া দিলাম। পাণ্ডাঠাকুরের দলও একে একে শিকারান্তর অন্বেষণে সরিয়া পড়িল।

মন্দির-প্রাঙ্গণের বিপুল জনসংঘ সমুদ্রতরঙ্গবৎ সংক্ষুব্ধ হইতেছিল; মিশ্রিত জন-কোলাহল একটা বিরাট গর্জ্জনের মতই শুনা যাইতেছিল! কোথায়ও এতটুকুও স্থান নাই। সকলেই কর্ম্মব্যস্ত; আসিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে!

পুষ্পবিল্বদলের মিশ্রগন্ধে বায়ুপ্রবাহ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। ভিক্ষার্থীর যাচ্ঞাবাণীর সঙ্গে ঢোলমাদলের বাজনা ও সানাই বাঁশীর সুর মিশিয়া এক অপূর্ব্ব কলতান সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে! বিস্ময়মুগ্ধ বালকবালিকার অস্ফুট কলরোলের সহিত লজ্জাকুণ্ঠিতা নারীর শঙ্কাচকিত দৃষ্টি মিশিয়াছে। পরুষকণ্ঠের কোলাহলের মধ্যে বর্ষীয়সী রমণীর ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে!

কেহ ষোড়শোপচারে সাজাইয়া অনাদিদেবের পূজোপকরণ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; কেহ উপহারসম্ভার স্তূপীকৃত করিয়াছে; কেহ মন্দির চত্বরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছে, দেবাদিদেবের পাদমূলে নিবেদন করিয়া দিবার মত কত বেদনাই হয়তো সে বহন করিয়া আনিয়াছে।

কেহ রঙ্গিন্ শালু, বা রেশমসূত্র টানাইয়া বাবার মন্দির চূড়ায় সহিত মায়ের মন্দির চূড়া সংলগ্ন করিয়া দিতেছে। দেবতা তাহার কোন্ কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, তাই সে তাহার ভক্তি-উপহার লইয়া আসিয়াছে!

আবার কেহ দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়িতেছিল; দেবতা তাহার কামনা পূর্ণ করেন নাই;—তবু সে দেবাদিদেব শঙ্করের পাদমূলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। দেবতা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়াছেন; স্বর্ণপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, নির্ম্মম ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছেন; জীবনের আশা, আনন্দ, আলো নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে, নিভিয়া গিয়াছে! আঁধার ঘরের মাণিক, সাতরাজার ধন এক মাণিক কোথায় পড়িয়া গেল, কে হরণ করিয়া লইল? কোথায় শান্তি? কেমন করিয়া তীব্র চিত্তদহনের অবসান হয়?—শান্তি হয়?

ভাগ্যহীন আসিয়াছে তোমার দুয়ারে;—হে শঙ্কর! হে দেবাদিদেব! শান্তি দাও—ঐ ভাগ্যহীনকে!

অল্পকালমধ্যেই আমাদের পাণ্ডাঠাকুর দেখা দিলেন। ধরণীধর ঠাকুরের ক্ষীণ দেহখানা যে অতটা ভরসা বহন করিয়া আনিতে পারিবে, তাহা পূর্ব্বে মনে করি না। আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেও বোধ হয় মানুষ অতটা খুসি হয় না, যতটা খুসি হইয়াছিলাম আমরা ঐ দীর্ঘদেহ সরল-প্রকৃতি ব্রাহ্মণটীকে পাইয়া।

মন্দিরে প্রবেশের সমস্ত আয়োজন পাণ্ডাঠাকুর অতি ক্ষিপ্রতার সহিত শেষ করিয়া ফেলিলেন।

পাষাণ প্রাচীরের গাত্রে ক্ষুদ্র প্রবেশদ্বার; সেই দ্বার সম্মুখে শত শত বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বর্ষীয়ান্-বর্ষীয়সী, উন্মুখ আগ্রহে মন্দির প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ক্ষুদ্র দ্বার মুহূর্ত্তের জন্য উন্মুক্ত হইতেই সকলেই প্রাণপণ আগ্রহে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করিতেছে। যে সবল, সে দুর্ব্বলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে; যে অর্থশালী সে দ্বাররক্ষীকে অর্থপ্রদান করিয়া নিজের প্রবেশের সুবিধা করিয়া লইতেছে। সব দিকেই ভারি বিশ্রী রকমের উলট্ পালট্, বিশৃঙ্খলা, সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিতেছে। কাহারও কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই! মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য জ্বলিতেছে, পায়ের নীচে পাষাণখণ্ড উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাত্রীদলের অবস্থা এমনই হইয়া উঠিয়াছে, যে তাহা কল্পনা করাও দুরূহ!

ধরণীধর ঠাকুর দ্বাররক্ষী পাণ্ডার সহিত কি বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। সহজে প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইব মনে করিয়া অতি কষ্টে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রথমেই আমি কোনও মতে পথ তৈয়ারী করিয়া লইতেছিলাম; আমার পশ্চাতেই সুজাতা তারপর বৌদিদি ও পিসিমা, সর্ব্বশেষে অজিত।

দ্বারের কাছে আসিতেই দ্বার খুলিয়া গেল; দুই পাশ দিয়া উন্মত্ত জনসংঘ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যাহারা সম্মুখে ছিল তাহাদের পিষিয়া, দলিয়া, পশ্চাতের যাত্রীর দল অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পাশের একটা লোক পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা পাইয়া একেবারে সুজাতার উপর আসিয়া পড়িল। বামহস্তে সুজাতাকে ধরিয়া ফেলিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার প্রচণ্ড মুষ্টি লোকটার মাথার পাশে নামিয়া আসিল। তাহার আর্ত্তচীৎকার যাত্রীদলের কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া গেল। আমার উপর চাপিয়া পড়িয়া কতকগুলি লোক মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া একবার বৌদিদি ও পিসিমার দিকে চাহিলাম। অজিত একপা' পিছনে হটিয়া গেল। তিন চারিজন তাহার স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৌদিদি ও পিসিমাকে রক্ষা করিবার জন্য সম্মুখের দিকে ফিরিতে গেলাম। সুজাতার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, তাহার মুখখানা একেবারেই বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে যে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে তাহা দেখিয়াই বুঝিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে আর একটা তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিল এবং মন্দিরের মধ্যে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সুজাতার বাহুমূল দৃঢ় হস্তে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। যখন ফিরিয়া চাহিলাম, তখন মনে হইল একটা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি।

হাত বাড়াইয়া পাষাণ প্রাচীর পাইলাম, এবং সুজাতাকে টানিয়া প্রাচীরের দিকে সরিয়া গিয়া আশ্রয় লইলাম। মন্দিরের দুয়ার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুজাতার অবসন্ন দেহ আমার গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

"এই প্রাচীরে পিঠ্ রেখে একবার ঠিক্ হয়ে দাঁড়াও তো সুজাতা!—বৌদি, পিসিমা বাইরে পড়ে রইলেন যে! —আমি দোরটা খুলে তাদের রক্ষে কর্ত্তে পারি কিনা দেখি!"—

কোনও উত্তর পাইলাম না। সুজাতার বাহুমূল ধরিয়া সবলে নাড়া দিলাম। সুজাতা বিন্দুমাত্রও সাড়া দিল না।

এতক্ষণ আমার বাহুর উপর আশ্রয় পাইয়াছিল, এখন

ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাইবার মত হইল। অবস্থা বুঝিয়া দুই হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিলাম। তাহার মূর্চ্ছাতুর দেহলতা আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল।

"সুজাতা, ও সুজাতা, এ বিপদের সময় তুমি এমন হয়ে পড়্‌লে?"—আমি প্রায় উন্মাদের মতই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম।

আমার তখনকার মানসিক উদ্বেগ বর্ণনাতীত। বাহিরে বৌদিদির ও পিসিমার কতই লাঞ্ছনা হইতেছে, মনে করিয়া আমার ইচ্ছা হইতেছিল পাষাণ প্রাচীরের উপরেই মাথা খুঁড়িয়া মরি।

মন্দিরের ভিতরকার সেই রুদ্ধ দরদালানের দারুণ অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য যাত্রীর দল যেন প্রেতের মতই বিচরণ করিতেছিল।

দলিত পুষ্পবিল্বদলের, দধি দুগ্ধ ঘৃতের, নানা পূজোপকরণের মিশ্রগন্ধে মন্দির বায়ু সত্যই গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। মন্দির তল পিচ্ছল, কর্দ্দমাক্ত; অসংখ্য যাত্রী দেবতার দর্শন পাইবার জন্য মন্দির মধ্যে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিতেছে; সেখানে ঘৃতের প্রদীপটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া অন্ধকার দূর করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ভ্রান্ত মন্ত্রোচ্চারণ, নিষ্পিষ্ট যাত্রীর অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি,—পাণ্ডাদিগের কলরব,—সবটা মিলিয়া মিশিয়া একটা বীভৎস ব্যাপার গড়িয়া তুলিয়াছে।

একবার মনে হইতেছিল এই বিপুল কোলাহল কলরবের মধ্যে, অর্থগ্রহণের এই লুব্ধ আয়োজনের মধ্যে, পাষাণ প্রাচীর বেষ্টিত অন্ধকারের মধ্যে কোথায় দেবতার স্থান?

কিন্তু তখনই আবার দর্শনপ্রার্থী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভক্তি ও নিষ্ঠার, আগ্রহ ও ব্যাকুলতার ছবি চোখের কাছে ফুটিয়া উঠিল।

মনে হইল, এই পাষাণ প্রাচীরের অন্ধকারের মধ্যে দেবতা তিষ্ঠিতে না পারিয়া বোধ হয় ঐ যাত্রীদলের শ্রদ্ধাপূত-হৃদয়ের মধ্যেই স্থান করিয়া লইয়াছেন!

অন্ধকারে চক্ষুঃ অভ্যস্ত হইয়া আসিল, সুজাতার মুখের দিকে চাহিলাম; চক্ষুঃ দুইটী অর্দ্ধ মুদ্রিত, বিশৃঙ্খল চুলের রাশি, চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে!

আমার পাশেই কাহারা দণ্ডায়মান ছিল। মৃদু অস্ফুট-স্বরে কেহ কহিল, "জিজ্ঞাসা কর না ওঁকে, মেয়েটীর কি হয়েছে!"

চাহিয়া দেখিলাম, একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা যুবতী তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী যুবককে কথা কয়টী বলিলেন! যুবক আমার দিকে ফিরিতেই বলিয়া উঠিলাম, "আমার সঙ্গের এই মেয়েটী অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে, আপনি দয়া করে একটু সাহায্য কর্‌বেন?"—

—"দয়া' এর মাঝে কিছু নেই, বলুন, কি সাহায্য আপনাকে কর্ত্তে পারি"—

"একটু জল কি এখানে মিল্‌বে?"—

—"জল?—না, দোর না খোলা পর্য্যন্ত জল পাওয়া যাবে মনে হয় না; আমার সঙ্গে একটা ভাঁড়ে কিছু চরণামৃত রয়েছে, তারি দু' একটা ঝাপ্‌টা দিয়ে দেখ্‌তে পারেন।"—

দুই তিনটা ঝাপ্‌টা দেওয়ার পর সুজাতা একবার চম্‌কিয়া উঠিল, তারপর ধীরে ধীরে চক্ষুঃ খুলিল। মুখের কাছে নীচু হইয়া ডাকিলাম,—"সুজাতা!"—

সুজাতা মাথা নাড়িল; তার পর চারিদিকে চাহিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

যুবকটী কহিলেন, "ওঁর জ্ঞান ফিরেছে; স্থির হতে কিছু সময় নেবেন। আপনি এক কাজ করুন, ওঁকে আমার স্ত্রীর কোলে শুইয়ে দিন্; তার পর আসুন, আমারা দোরটা খোলাবার চেষ্টা করি।—এ ভাবে এর মধ্যে আর কিছুক্ষণ থাক্‌লে মারা পড়্‌বেন যে!"—

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা যুবতীটী প্রাচীরে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার কোলের উপর সুজাতাকে শোয়াইয়া দিয়া মন্দিরের দুয়ারের কাছে সরিয়া আসিলাম। একটা পাণ্ডাঠাকুরকে কিছু দক্ষিণা কবুল করিয়া, যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহারই বিপরীত দিক্‌কার একটা দ্বার খোলাইয়া লইতে বড় বেশী সময়ের দরকার হইল না!

সুজাতাকে ধরিয়া লইয়া যখন কোনও মতে বাহিরের উজ্জ্বল নির্ম্মল আলোকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন মনে হইল, দীর্ঘ কার-প্রবাসের পর মুক্ত-বায়ুতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

যে দিকে জনতা কম ছিল, সেই দিকে আমরা সরিয়া আসিলাম। যুবকটীকে কহিলাম, "আপনি এঁদের নিয়ে এখানে একটু বিশ্রাম করুন, আমি একবার আমার

পিসিমা ও বৌদিদি ঠাকুরুনকে খুঁজে দেখি।—এমন বিপদে আর পড়িনি কোনো দিন,—তবু আপনাকে পেয়ে বেঁচে গেছি!"

প্রায় একঘণ্টা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কোথায়ও তাঁহাদিগকে পাইলাম না। উদ্বেগে, আশঙ্কায় আমি একেবারে উন্মাদের মত হইয়া উঠিলাম। যুবকটী কহিলেন, "আমার মনে হয় তাঁরা আপনাকে খুঁজে না পেয়ে বাসায় চলে গেছেন;—সঙ্গে একটী ছেলে ছিল বল্‌ছিলেন না?"

—"সে যে একেবারেই ছেলেমানুষ; সে কি এই ভিড়ের মাঝ্ থেকে ওঁদের নিয়ে বেরুতে পেরেছে?"

এমন সময়ে ধরণীধর পাণ্ডাঠাকুরকে দেখিলাম, তিনি ব্যস্তভাবে আমার দিকেই আসিতেছিলেন। দূর হইতেই কহিলেন, "ওঁদের আমি বাসায় রেখে এই ফিরে এলাম; প্রায় ঘণ্টাখানেক আপনাকে খুঁজে দেখ্‌লাম, মন্দিরের মধ্যে খুঁজ্‌লাম, তারপর মনে কর্‌লাম আপনি ওঁদের না দেখে বাসায় চলে গেছেন—তাই গাড়ী করে ওঁদের একদম্ বাসায় নিয়ে গেলাম,—চলুন্ আপনাকে গাড়ী করে দিচ্ছি।"

আমরা সকলেই একত্রে বাহির হইয়া আসিলাম। যুবকটীর গাড়ী ঠিক্ ছিল। আমি তাঁহার নাম ও বাসার ঠিকানা জানিয়া লইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন,—"বিলক্ষণ! আপনি এত করে বল্‌ছেন কেন? আমি বিপদে পড়্‌লে কি আপনি আমার জন্য এ টুকু কর্ত্তেন্ না?"—

পাণ্ডাঠাকুর গাড়ী লইয়া আসিলেন। দুইখানা গাড়ীই খানিকটা পথ পাশাপাশি চলিল। তারপর মোড়ের মাথায় আমাদের গাড়ী ভিন্ন পথ ধরিল। জানেলা দিয়া মুখ বাহির করিয়া কহিলাম,—"নমস্কার—কাল দেখা হবে!"—"নমস্কার"—গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

সুজাতা একবার মুখ বাহির করিয়া অন্য গাড়ীর দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল। সে দিকেও একখানি পরম সুন্দর মুখের উজ্জ্বল হাসি দেখা যাইতেছিল!

গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সুজাতা গাড়ীর মধ্যে মুখ আনিল।

মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখন কেমন আছ, সু—?"

সুজাতা চকিতভাবে একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিল, পরক্ষণেই মাথাটী নিচু করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল,—"ভাল আছি এখন!"—

—"ভয় আর কর্‌বে না?" সুজাতার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম।

সুজাতা কোনও উত্তর দিল না। শুধু একটি ম্লান হাসির রেখা মুহূর্ত্তের জন্য তাহার পাণ্ডুর মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

আমি তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভয় কর্‌চে, সু—?—উত্তর চাই!"—

এই উত্তর দাবী করিবার মত জোর হঠাৎ যে আমি কেমন করিয়া পাইলাম, তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

সুজাতা ধীরে ধীরে তাহার প্রশান্ত দুইটী চক্ষুর ম্লান দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য আমার মুখের উপর স্থাপন করিল; পর মুহূর্ত্তেই চক্ষু নত করিয়া লইয়া নিজের পায়ের দিকে চাহিল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

ইচ্ছা হইতেছিল, ঐ নারীকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন দ্বারা পীড়ন করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষিত উত্তরটী জানিয়া লই।

কিন্তু আজ যেন অনেকখানিই পাইয়াছি, সেই প্রাপ্তির আনন্দ আমাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল।

ঠিক্ আমার সম্মুখের আসনে সুজাতা বসিয়া রহিয়াছে। তাহার সুগৌর মুখখানির উপর বিন্দু বিন্দু স্বেদ সঞ্চিত হইয়াছে। হাওয়ার বেগে চূর্ণকুন্তল উড়িয়া উড়িয়া ললাটের উপর লুন্ঠিত হইতেছে! তাহার কুণ্ঠা, তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহাকে একটি মৌনশ্রীর মধ্যে অধিষ্ঠিতা করিয়া দিয়াছে। যেন জন্ম জন্মান্তরের পরিচয় কাহিনীটি তাহার সর্ব্বাঙ্গে নিবিড় হইয়া রহিয়াছে।

তাহার কালো চোখের দৃষ্টিটুকু যেন আমার চির পরিচিত;—মনে হয়, জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধ যবনিকা ভেদ করিয়া ধ্রুব তারার মতই ঐ দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করিতেছে। আমি স্তব্ধভাবে গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়া সুনীল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, ঐ সুনীল আকাশ ভেদ করিয়া সেই চির পরিচিত দৃষ্টিটুকু আমার দিকেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, এবং কখন সেই দৃষ্টিটুকু সরিয়া আসিয়া সুজাতার কালো চক্ষে আশ্রয় লইয়াছে। ক্রমশঃ

সুজাতার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া আনিলাম; দেখিলাম, আকাশের গায়ের সেই দৃষ্টিটুকু সুজাতার শান্তদৃষ্টির মধ্য দিয়া আমার মুখের উপরেই মুহূর্ত্তের জন্য নিবদ্ধ হইয়াছে।

সুজাতা চক্ষু নত করিল।

গাড়ী আসিয়া ফটকের কাছে দাঁড়াইল। বাসার সকলেই সেখানে উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

বিমূঢ়া

গরবে বিমূঢ়া অই মধুরা সুন্দরী
কিসের এ গর্ব্ব তব? রূপ রাশি তব,
সে আমার অন্তরের প্রেম নব নব,
তোমার ও অঙ্গ ঘিরি ফিরিছে সঞ্চরি।
আমার অন্তর-তলে উষারাগ-মায়া,
তোমার অধরখানি দিয়াছে রাঙিয়া।
অঞ্চলে পড়েছে দিব্য সুশীতল ছায়া,
অঙ্গে অঙ্গে দিয়াছে গো লাবণ্য মাখিয়া।
আমার হৃদয়-পদ্ম-দল দল শোভা,
করেছে নয়ন তব স্নিগ্ধ মনোলোভা।
আমারি মনের রঙ চরণে তোমার,
এঁকেছে অলক্ত-রাগ-বিস্ময়-সম্ভার।
তুমি ভাব ধাই আমি তোমারি সন্ধানে,—
আমি ধাই আমারি এ অন্তরের পানে।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

খোস্‌খেয়ালি সাহিত্য

কেহ কেহ মনে করিতেছেন—সাহিত্য খোস্ খেয়ালি বাবুদের হাতে আসিয়া পড়ায়, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সহিত দীন, মজুর এবং যাহারা খোস্ খেয়ালি নহে তাহাদের যোগ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা সাহিত্যের মধ্যে কেবল দেশের অবস্থা এবং আচার ব্যবহারের চিত্র দেখিতে চান, তাঁহারা যে সাহিত্য কেবল মাত্র সৌন্দর্য্য এবং ভাব লইয়া চলে যে সাহিত্যকে "ঝুটা" সাহিত্য বলেন। সাহিত্য কি, এ সম্বন্ধে অধুনা বাঙ্গালার মাসিক পত্রে অনেক রকমের আলোচনা করা হইয়াছে, কাজেই এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি আমার জ্যৈষ্ঠের প্রবন্ধের নীচে সম্পাদকীয় টিপ্পনিতে মালঞ্চ সম্পাদক মহাশয় এক জায়গায় বলিয়াছেন, "জাতীয় সাহিত্য তবে কাহার সাহিত্য থাকিবে? জন কত সহরে খোস্ খেয়ালী বাবুর মাত্র?" আশা করি সম্পাদক মহাশয় কিছু মনে করিবেন না—তর্কের খাতিরে নহে, সত্যের খাতিরে বলিতে হইল—সাহিত্য কেবল খোস্‌খেয়ালি বাবুদের জন্য না হইলেও, উহা খোস্ খেয়ালিদের জন্যই বটে। চাষা মজুর যাহাদের খাটিয়া খাইতে হইবে—তাহাদের পক্ষে সাহিত্য চর্চ্চা করা দুঃসাধ্য। সাহিত্যের দায়িত্বের জন্য যদিও আজকাল অনেকের মাথায় চিন্তা রীতিমত তোলপাড় করিতেছে, তবু ইহা মিথ্যা নহে—যে সাহিত্য খোস্ খেয়ালিদের সময় কাটানো এবং ভাববিলাসে ডুব দিবার একটা মজার জিনিষ। এইজন্য আসল সাহিত্য, কোন দিন দীনের আশ্রয়ে পুষ্ট হয় নাই। পল্লীজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের চিত্র সাহিত্যে স্থান পায় এ কথা সত্য, কিন্তু সেই চিত্রের সাহিত্যগত সৌন্দর্য্য উপভোগ করে কাহারা? যাহারা উপভোগ করে তাঁহারা লেখাপড়া জানা কয়েকজন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত,—বাদবাকী বিরাট জনসঙ্ঘ, দেশের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া বসিয়া থাকিলেও তাহাদের সহিত সাহিত্যের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই—এ কথা সত্য। দাশুরায়ের

পাঁচালির সহিত এবং অন্যান্য পাঁচালির সহিত আমার কোন পরিচয় নাই, এ কথা সম্পাদক মহাশয় কেমন করিয়া অনুমান করিয়াছেন জানি না। সত্যব্রতের কথা যে পাঁচালি নহে এ কথা কে না জানে? আমার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল—সেকেলে পাঁচালি এবং ছড়া, সেই সঙ্গে সত্যব্রতের কথার মধ্যে দেশবাসী জনসাধারণের সামাজিক ইতিহাস এবং তাহাদের সুখ দুঃখের কথা বর্ণিত থাকিলেও তাহা সাহিত্য হিসাবে এমন কিছু নয়, যাহা লইয়া বুক ফুলাইয়া সাহিত্যের মজলিসে আসর গরম করিতে পারি। মুসলমান আমলে পানের মসলা আবিষ্কৃত হয় নাই, কেবলমাত্র এখনি হইয়াছে এমন কথাও আমার প্রবন্ধে কোন জায়গায় বলা হয় নাই। পাঁচালি সাহিত্য আখ্যা পাইতে পারে, কিন্তু উহা যে বড় সাহিত্য একথা কখনও বলিতে পারি না। পাঁচালির যুগে শিক্ষিত যাঁহারা ছিলেন—তাঁহাদের চিন্তা শক্তি এবং দূর দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ ছিল—একথা সর্বৈব সত্য নহে। কারণ তাঁহাদের চিন্তার মধ্যে যে টুকু নূতনত্ব প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার খাল কিম্বা কেন্নাল ছিল মুশলমানী সভ্যতা। কাজেই তখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তার সহিত জনসাধারণের চিন্তার তেমন কোন প্রভেদ ছিল না। ছিল না বলিয়াই তখন শিক্ষিতদের কলম হইতে অত্যন্ত সাধারণ সাহিত্য বাহির হইত—সে সাহিত্যে তারিফের যোগ্য কোন রকমের সম্পদ ছিল না। কবি হিসাবে ভারতচন্দ্র একজন হইলেও তাঁহার বিদ্যা ও সুন্দরের কথায় (রচনায় লিখনের ভঙ্গীও অনুপ্রাসের ঘটা থাকা সত্বেও) যে সব তত্বের অবতারনা করা হইয়াছে, সেগুলি নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামগ্রী নহে। আজ কাল কার দিনে সে বর্ণনা অত্যন্ত জঘন্য। তখনকার দিনে যাত্রার মধ্য দিয়া পাঁচালির মধ্য দিয়া নীতি প্রচারের চেষ্টা চলিয়াছে, কিন্তু সে নীতির মূল্য নীতিহিসাবে যদি কিছু থাকে ত আছে—সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য এতটুকুও নাই। কারণ সাহিত্য যদি নীতি গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে "সাহিত্য" আর "নীতি" এই দু'টী শব্দের সৃষ্টি হইত না। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন জায়গায় আদিরস নাই একথা সম্পাদক মহাশয় কেমন করিয়া বলিলেন জানি না। তিনি কি বলিতে চান—বাংলার মূল রামায়ণ এবং মহাভারত এমনি আদিরস বিবর্জ্জিত কাব্য, যাহা ছেলেমেয়েরা বাপ ও মায়ের সম্মুখে সর্ব অংশ অবাধে পড়িতে পারে। বলা বাহুল্য রামায়ণ মহাভারতের সাহিত্যগত মূল্য এতটা বেশী হইত কিনা—যদি তার মূলে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের রসোৎস না থাকিত। এখনকার যুগে—লেখকেরা আদিরস বর্জ্জিত একথা আমি কোন জায়গায় বলি নাই। কাজেই সম্পাদক মহাশয়ের "এ দোষ কি বর্ত্তমান এই 'সত্য' যুগে একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে?" এই টিপ্পনী সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়াছে। সত্য যুগ কখনও ছিল একথা মানি না—কখনও হইবে এমন কথাও জানি না। আজকালকার দিনে অনেকেই আদি রসে ভিত্তি গাড়িয়া কবিতা এবং গল্প উপন্যাস লিখিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সে লেখার নায়ক শ্রীমান্ এবং নায়িকা শ্রীমতী—রাধা এবং কৃষ্ণ নহেন। বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণ যে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ছিলেন না—পরন্তু যুবক এবং যুবতী ছিলেন এই কথা কাণে বিশ্রী শুনাইলেও—প্রাণে ঠিক শুনায়। বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ—বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের চেয়ে অনেক উঁচুদরের প্রেমিক এবং প্রেমিকা। সে যাই হউক, আসল কথা বাংলার সেকেলে পাঁচালির চেয়ে সেকেলে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে তবু কিছু সাহিত্য ছিল। সাহিত্যের গতির দুইটী ফুটপাথ এবং একটি সদর-রাস্তা আছে। যে সাহিত্য কেবল মাত্র সামাজিক চিত্র এবং বিদ্রূপের চাবুক লইয়া চলে—এবং যে সাহিত্য কেবল মাত্র সাময়িক ভাব এবং নীতি উপদেশ লইয়া চলে—তাহাদের গতি সঙ্কীর্ণ ফুটপাথে। কারণ সেখানে ভাল মন্দ চিন্তার তেমন সংগ্রাম নাই। যে সাহিত্য বর্ত্তমানের উপর খোঁটা গাড়িয়া, শুধু সমাজ নহে; পরন্তু মানব-জীবনের ভাল মন্দভাবকে, হাসি-কান্নাকে সুনিপুণভাবে ফুটাইয়া তোলে এবং দূর ভবিষ্যতের দিকে পাঠকের চিন্তাকে টানিয়া লয় তাহার গতি সদর পথে। যাহারা সদর পথে চলে তাহাদের জোর বেশী; সংগ্রামে তাহারাই জয়ী হয়। সর্ব্বদেশেই এইরূপ সাহিত্যের তিনটি ধারা আছে। বাংলার সেকেলে সদর সাহিত্য রামায়ণ মহাভারত এবং বৈষ্ণব পদাবলি। এই সাহিত্য সেকালে সৃষ্টি হইলেও তাহা সদর সড়কের যাত্রী বলিয়া কোনদিনই বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবিবে না। সেকেলে অন্যান্য সাহিত্য ফুটপাথের, তাহার মূল্য যৎসামান্য সাহিত্যের দিক্ দিয়া,—ইতিহাসের দিক্ দিয়া অবশ্য বেশী আছে।

আজকালকার দিনে যে সাহিত্য হইবে তাহা সদর রাস্তার—ফুটপাথের নহে। এই সাহিত্যের সঙ্গে, বাংলার অধিকাংশের যোগ না থাকিলেও এই সাহিত্যই যুগসাহিত্য এবং এই সাহিত্যই ভবিষ্যতের সাহিত্য। যে ভাব এবং যে চিন্তা এবং যে সেণ্টিমেণ্ট লইয়া অধিকাংশ লোক কারবার করে—তদনুযায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হইলে—সে সাহিত্য কিছুদিনের মত প্রসার লাভ করিলেও তাহা বেশী দিন টিকিতে পারে না। তারপর সম্পাদক মহাশয় বোধ করি এ কথা খুব ভাল করিয়াই জানেন যে বাংলা উপকথায় এবং ঠাকুরদাদার ঝুলির গল্পের ব্যক্তিরা সবই রাজা এবং উজির—এমন কি রামায়ণের মহাভারতের মূল পাত্রপাত্রীর দল রাজবংশের—কেহই মুটে মজুরের বংশের নহে। রামায়ণের মধ্যে বাঁদরের কের্ত্তন আছে বটে, তাও রাজবংশের বাঁদর; বনজঙ্গলের গাছে চড়া সাধারণ বাঁদর নহে। কাজেই এ কালের লোকেরা সেকালের যে সব সাহিত্য আদর যত্ন করিয়া পড়ে সে সব সাহিত্য এরিষ্টোক্র্যাট সাহিত্য—জনসাধারণের গুড় মুড়ির সাহিত্য নহে। আর সেই সাহিত্য পড়ে কারা? যারা ভদ্রঘরের ছেলে, যারা মুটে মজুরদের খাটায়। কাজেই সারাদিনের মধ্যে যাহারা অল্প খাটে এবং বিষয় বুদ্ধি যাহাদের অল্প তাহারাই সাহিত্য পড়ে। এ হিসাবে সাহিত্য খোস্-খেয়ালিদের জন্যই বৈকি। সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন—বাংলার লেখাপড়া না শেখা দলের লোকেও রামায়ণ মহাভারত এবং পাঁচালি পড়িয়া সুখ পায়—কাজেই এ হিসাবে সেকেলে সাহিত্যের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ ছিল। এ কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু এ কথাও তো মিথ্যা নহে, আজকাল যাহাদের উপর সাহিত্য-রচনার ভার পড়িয়াছে, তাহাদের চিন্তা কেবল গ্রামের আচার আর প্রথায় আবদ্ধ নাই,—তাহাদের চিন্তার সহিত, জগতের চারিদিকের চিন্তার সহিত রীতিমত তোলপাড় চলিতেছে,—কাজেই আজকালকার বাঙালি সাহিত্যিকদের কলম হইতে—মদন-কিশোরের স্তোত্র পরিপাটি রকমে বাহির হইতে পারে না। পল্লী-জীবনের চিত্র সাহিত্যে স্থান পাইলে, সাহিত্য অপবিত্র হয় না। কিন্তু এ কথা ঠিক্ যে নিধিরাম হাঁড়ির জীবন বৃত্তান্ত যদি কেহ সুন্দরভাবে কোন উপন্যাসে বর্ণনা করে, তাহা হইলে তাহাতে নিধিরামের কি আসে যায়? নিধিরাম ত সে পুঁথি পড়িতে পারিবে না। তারপর আগে সব নাটকেই আদর্শ চরিত্র সব এক রকমেরই ছিল। কাজেই মিলনান্তক নাটক কিম্বা উপন্যাস খুব চলিত। এখন চরিত্রের ভাল মন্দ লইয়া বিস্তর মতভেদ দেখা দিয়াছে। এই সব দিক্ দিয়াও সেকেলে পাঠ্য-সাহিত্য একালে আমাদের সব দিক্ দিয়া আনন্দ দিতে পারে না। সেকালের পয়ার আর তিন পায়ের বুনিয়াদি কবিতার ছন্দও আজকাল ফিকে হইয়া গেছে। এখন ছন্দে বৈচিত্র আসিয়াছে। কোন দিক্ দিয়াই সেকালকে একালে লাগান কঠিন। "এ কাল সেকালের সন্তান" এ কথা সত্য কিন্তু সব সময়ই কি বাপের মতই ছেলে হয়? অনেক সময় ছেলে বাপের চেয়ে মন্দ, অনেক সময় ভালও হয়। প্রহ্লাদের বাপ যে কি রকমের রত্ন ছিলেন সেত সকলের জানা আছে। কাজেই সম্বন্ধের দোহাই সব জায়গায় চলে না। তা'ছাড়া একাল যদি সেকালকে আশ্রয় না করিয়া বাঁচিবে না, তাহা হইলে] আরও গভীরভাবে তর্কের জলে ডুব দিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—একেবারে আদিম বর্ব্বর আমলের সহিত যখন এ কালের যোগ আছে, তখন সে আদিম বর্ব্বরতাকেও একালে চালান উচিত। আমার শিশু-জীবনের সহিত আমার বৃদ্ধ-জীবনের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধের অর্থ ইহা নহে, যে এ বয়সে হামাগুঁড়ি না দিলে সেই শিশু-জীবনের কোন মূল্য থাকে না।

সাহিত্য কোন দিনও সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। সাহিত্য, সাহিত্য-রসিকের জন্য, অবশ্য সাহিত্য-রসিক ধনীর গৃহেও জন্মায়, দীনের গৃহেও জন্মায়। কিন্তু তাই বলিয়া এটা মিথ্যা যে বিরাট জনসংঘের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আমাদের দেশে যে কয়েকটি সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের দ্বারা আদৃত—সেগুলির পাত্রপাত্রীকে গল্পের কিম্বা নাটকের পাত্র পাত্রীরূপে নহে, পরন্তু দেব দেবীরূপে জনসাধারণ পূজা করে। কাজেই যেখানে একটা পূজার ও ধর্ম্মভাবে লোক অগ্রসর হয়, সেখানে সাহিত্যের বিচার নিষ্প্রয়োজন। রামায়ণ মহাভারতের সহিত বিরাট জনসংঘের যোগ সাহিত্য-রসের ভিতর দিয়া নহে, পরন্তু ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়া। ঐ জনসংঘের কাছে রামায়ণ মহাভারত কিস্সা নহে—পরন্ত একেবারে সব সত্য ব্যাপার, সুতরাং বিরাট জনসংঘের কাছে সাহিত্যের কদর চিরদিনই কাণাকড়ি। মুষ্টিমেয়

উচ্চশিক্ষিত জন কয়েক খোস খেয়ালীদের জন্যই সাহিত্য। এ কথা সত্য। সেকেলে পাঁচালির সাহিত্যমূল্য যাঁহারা অনুসন্ধান করিতেছেন কিম্বা এষ্টিমেট করিতেছেন, তাঁহারাও মুষ্টিমেয় জন কয়েক অধ্যাপক এবং সম্পাদক মাত্র। পল্লীবাসীরা এজন্য মাথা ঘামায় না। কাজেই একথাও বলিতে পারি, পাঁচালি সাহিত্যের তারিফকারীগণও খোস্ খেয়ালী শিক্ষিত বাবুরাই। রামাই ডোম-পাঁচালির সাহিত্য সম্পদের খোঁজ রাখে না, যদিও সে বিরাট জন-সংঘের একজন। *

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

* লেখক মহাশয়ের কথাগুলি অধিকাংশই dogmatic ধরণের। তবে অনেকগুলি এমন কথার অবতারণা তিনি করিয়াছেন, যাহার আলোচনা আবশ্যক। এ সংখ্যায় বোধ হয় হইয়া উঠিবে না।—আগামী সংখ্যায় চেষ্টা করিব। 　সম্পাদক।

বিশ্বাস

সাধনায় সিদ্ধি হবে নাকি মম,
আসিবে নিশ্চয় তুমি প্রিয়তম।
কিন্তু যদি আশা না হয় পূরণ,
সুখ স্বপ্ন যেন ভাঙ্গে না কখন।
আসিবে, এ বিশ্বাসে মন,
সুখে যেন নাথ থাকে অনুক্ষণ।

শ্রীমতী অবলাবালা মিত্র।

চিন্তা ও স্বপ্ন

মাঘ মাস, আসাম প্রদেশ, বড় ভীষণ শীত, আমার শিশু-পুত্রকে বুকে জড়াইয়া লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া আছি; রাত্রি ৮টা। সমস্ত দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে—এমন সময় বাবা ও মা ভাগবত সভা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং সেখানকার আলোচ্য বিষয় পুনরালোচনা করিতে লাগিলেন। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, 'বাসাংসি জীর্ণানি,' প্রেতলোক, পুনর্জ্জন্ম, দেবচনীক প্রভৃতি কত বিষয় সম্বন্ধে বাবা আহার করিতে করিতে মার সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। আমি ইহার অনেক কথাই বুঝিতে পারিলাম না, তবু মনোযোগ দিয়া সব শুনিতেছিলাম। একটা কথা আমাকে বড় চঞ্চল করিল। বাবা বলিলেন, আত্মা জোঁকের মত একটা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। খোকা একটু নড়িয়া উঠিল। উহাকে শান্ত করিতে করিতে আমার মনে হইল—আমার এই খোকা কোথায় কোন দেশে 'বাসাংসি জীর্ণানি বিহায়' স্ত্রী-পুত্র পরিজনদিগকে কাঁদাইয়া আজ এই নবদেহরূপ বাস গ্রহণ করিয়া আমার কোলে ভাল মানুষটীর মত ঘুমাইয়া আছে। আহা! উহার স্ত্রী পুত্র কন্যারা উহাকে দেখিবার জন্য কত ব্যাকুল! আমি যদি কোন উপায়ে জানিতে পারি, তাহারা কে এবং কোথায় আছে তাহা হইলে আমি তাহাদের সংবাদ দেই—যাহার জন্য তোমরা কাঁদিয়া আকুল, তোমাদের সেই হারানিধি, এই দেখ আমার কোলে আজ হাসিতেছে! তারপর একদিন তাহারা আসিয়া খোকাকে দেখিয়া যাইবে, খোকার সেই বউ হয় ত মার চেয়েও বয়সে বড়, তাহার কন্যারা পুত্রবধূরা হয় ত আমাপেক্ষাও বয়সে বড়।

এইরূপ কল্পনায় আমি তন্ময় হইয়া আছি, এমন সময় মা আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "খোকা কাঁদে কেন?" আমি তাড়াতাড়ি খোকার দিকে মন দিলাম।

আবার শুনিলাম বাবা বলিতেছেন, "পাপ পুণ্য যাহা কিছু, তাহা পরলোকে ভোগ করিতে হইবে। পরলোকে সাতটা প্লেন অথবা স্তর এবং এক একটা প্লেনে সাতটা করিয়া 'সব্ প্লেন' আছে—"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "প্লেন, সব প্লেন কি বাবা ?"

"ছেলে মানুষ, তুই কি বুঝ্‌বি ?"

"আচ্ছা, বুঝাইয়া বল না ?"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "এই মনে কর্‌, একটা প্রকাণ্ড বাড়ী, তাতে সাত সাতে উনপঞ্চাশটা তালা আছে; নীচের তালাগুলি নরক এবং উপরের তালাগুলি যেন স্বর্গ। মানুষ মরিয়া গেলে এই উনপঞ্চাশ তালায় পাপপুণ্যগুলি কর্ম্মফল অনুযায়ী তাকে ভোগ করিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মানুষ মরিয়া গেলে আবার কতদিন পরে জন্মায় ?"

"সাধারণতঃ ৫০০ হইতে ৮০০ বৎসরের মধ্যে।" শুনিয়া আমি অবাক্‌! আমার সমস্ত কল্পনা নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল। ২৫ বৎসর করিয়া যদি এক এক পুরুষ ধরা যায় তবুও ২৫।৩০ পুরুষ হইয়াছে। তখন আবার প্রশ্ন করিলাম—মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা হয় কি না ?

"দেখা হয় বটে, দেখিবার ক্ষমতা থাকিলে দেখা যায়। মৃত্যুর পর আত্মার উপরে পিঁয়াজের খোসার মত আরও চারটা আবরণ থাকে। উপরের শেষ আবরণের মধ্য দিয়া দেখা যায়, এই আবরণ যাহার যত স্বচ্ছ হইবে সে তত পরিষ্কার ও দূরে দেখিতে পাইবে। কাজেই কাছে থাকিলেও আবরণ যদি স্বচ্ছ না হয় তবে দেখা যায় না।"

"তবে যে ইংরাজীতে কথা আছে "We shall meet is heaven again—এটা কি মিথ্যা ?"

"না, প্রাণের আকর্ষণ যেখানে বড় বেশী, বড় গভীর, সেখানে মৃত্যুর পর মিলন অবশ্যই হয়।"

আঃ খোকাটা কি যন্ত্রণা করিতেছে, কি ভয়ানক শীত, পা ছুড়িয়া ছুড়িয় লেপ ফেলিয়া দেবার চেষ্টা।

একটা কথা হঠাৎ মনে হইয়া আমার বড় হাসি পাইল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিতেও বড় লজ্জা করে; ভাবিয়া চিন্তিয়া কথাটাকে ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বাবা! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কথাটার অর্থ কি ?"

"এই মনে কর্‌, ছেলেমেয়েদের কত জায়গা হইতে সম্বন্ধ আসে, হইতে হইতে ঠিক্‌ এক জায়গায় হয়।"

"বাঃ রে! যেখানে বিবাহ হইবে সেইটাই ত ঠিক্‌ জায়গা, তবে আর নির্ব্বন্ধ কি হইল ?"

"তা নয়, হিন্দুরা বিশ্বাস করে বিবাহ জিনিসটা ছেলে-খেলা নয়। জন্মান্তরের আকর্ষণের ফল। ভাগবতে লেখা আছে—ব্রহ্মার শরীর দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ পুরুষ ও এক ভাগ স্ত্রী হয়। বাইবেলেও লেখা আছে, আদমের বাম পাঁজরা হইতে ঈভের উৎপত্তি। এই সব কারণে স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গী বলে, ও স্বামী স্ত্রী উভয় মিলিয়া একটী পূর্ণ অঙ্গ হয়।"

"তবে নির্ব্বন্ধ কি হইল ?"

"ব্যস্ত হইও না, হিন্দুশাস্ত্রে ৩৩ কোটি দেবতার উল্লেখ আছে। তাঁহার মধ্যে কর্ম্ম-দেবতা বলিয়া এক শ্রেণীর দেবতা আছেন। তাঁহারা মানুষের পাপ পুণ্যানুসারে কে কোথায় জন্মিবে তাহা ঠিক্‌ করিয়া দেন। এই কর্ম্ম দেবতা-রাই যে যাহার স্বামী স্ত্রী হইবে তাহা ঠিক করিয়া দেন, এক জন্মের স্বামীস্ত্রীই যে পরজন্মেও স্বামী স্ত্রী হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তবে প্রাণের আকর্ষণ খুব বেশী থাকিলে প্রায়ই হয়। শাস্ত্রে একটী কথা আছে "পূর্ব্ব জন্মস্ত যা ভার্য্যা পশ্চাৎ ধাবতি ধাবতি," এই "ধাবতি" শুধু একবার নহে। 'ধাবতি—ধাবতি'—অর্থাৎ বহুবার। একেই বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।"

বাবা উঠিয়া গেলেন। আর আমি এই সমস্ত কথাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম, সেই উনপঞ্চাশ তালা বাড়ী, পাপ, পুণ্য, আত্মা, কর্ম্মদাতা, পশ্চাৎ ধাবতি—এই ভাবিতে লাগিলাম।

ওকি! কে ও মেয়েটি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে অনিমিষ-নয়নে কাহার অন্বেষণ করিতেছে ? প্রত্যেক তালায় প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে পাগলিনীর মত কাহার অন্বেষণে ফিরিতেছে! উহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার খোকাকেই খুঁজিতেছে। স্নেহে করুণায় আমার বুক ভরিয়া উঠিল, আমি তাহার কাছে গিয়া বলিলাম—"ওগো, তুমি যাহাকে খুঁজিতেছ, সে আমার কাছে আছে। সে একবার চোক তুলিয়া আমার দিকে চাহিল, কি সে করুণ দৃষ্টি! তারপর সে হাসিল, সে স্বর্গীয় হাসি কি মধুর!

পরক্ষণেই সে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামিতে লাগিল এবং তাহার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির উপরে ক্রমেই আবরণ পড়িতে লাগিল, আমি তাহার সঙ্গ ছাড়িলাম না। দেখিলাম, তাহার জ্যোতিঃ যত কমিয়া আসিতেছে, দেহ তত ফুটিয়া উঠিতেছে,—শ্রীতে, মাধুর্য্যে, লাবণ্যে দেহ ক্রমেই মণ্ডিত

হইতে লাগিল। সে এক একবার আমার দিকে চাহিতে লাগিল। আমিও সে কোথায় যায় তাহা দেখিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

'খোকা কেঁদে খুন হ'ল। কেমন তর ঘুম তোর!' মার এই তিরস্কারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া খোকার দিকে মনোনিবেশ করিলাম। কিন্তু সেই তাহার সেই করুণ-দৃষ্টি আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। আমার বুকের ভিতরটায় কি যে বেদনার অনুভব হইল, তাহা সুখের কি দুঃখের বলিতে পারি না। চোখের জল বাধা মানিল না। আর কি আমি কখনও এই স্বপ্নের শেষ টুকুও দেখিতে পাইব? হায় মা! তুমি জান না। কোন্ স্বর্গরাজ্য হইতে আমাকে টানিয়া আনিলে? আর কি আমি তাহাকে দেখিতে পাইব? এই জন্মে কি আমার সেই স্বপ্ন সফল হইবে?

শ্রীকনকলতা সেনগুপ্তা।

স্মৃতি

থেকে থেকে কেন কাঁদে প্রাণ হেন
কি যেন অভাব জাগিয়ে তায়;
দিকে দিকে আজ এ কি শোক সাজ
করুণ এ গান গাহে কে হায়?

নিবে যায় আলো—আসিছে আঁধার,
অতীতের ভুল হানে তরবার,
গড়েছিনু যাহা স্বপনে সোনার
পবনে আজি সে উড়িয়া যায়।

উছলিত আঁখি কি দিয়ে বা বাঁধি,
গুমরিয়া বুকে উঠে হিয়া কাঁদি,
যেন স্মৃতি হরি আশার সমাধি
পাশে বসি কাঁদে সে উভরায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

শিক্ষাদানে বাঙ্গালা-ভাষা

ভাষাই শিক্ষার দর্পণস্বরূপ। সে ভাষা আপন ভাষা না হইলে, শিক্ষার আদর্শপূর্ণ হয় না। মাতৃস্তন্যে যে ভাষা শিখায়, মাকে শিশু যে ভাষায় ডাকে, তাহাই আপন ভাষা, মাতৃভাষা। ঐ ভাষায় প্রাণ বাঁচে, উহাতেই প্রাণের কথা খুলে। পরের ভাষায় অন্তরের প্রকৃতি ফুটে না, চিন্তার উৎস ছুটে না। চিন্তা করিতে শিক্ষা করাই যদি শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়, তবে স্বতঃই যে ভাষায় চিন্তা ফুটে, তাহাই শিক্ষার প্রকৃত পথ। তবে কি আমাদের দেশে শিক্ষা-দীক্ষা পঠন-পাঠন আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালাতেই হওয়া সঙ্গত নহে? ইহাই এখন প্রশ্ন। বহু সমস্যার মধ্যে যে শিক্ষা-সমস্যা লইয়া বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে, এই প্রশ্নের সদুত্তর তাহারই প্রধান বিষয়।

বৈদেশিক-শাসন অপেক্ষা বৈদেশিক ভাষার শাসন বেশী। ভাষা যেমন করিয়া এক জাতিকে পরাজিত করে, আভ্যন্তরীণ অশেষ পরিবর্ত্তন দ্বারা নূতন জাতি, নূতন প্রকৃতি গড়িয়া তুলে, রাজদণ্ড তেমন করিয়া পরকে আপন করিতে পারে না। জাতীয় প্রকৃতি ভাষার সহিত মিশিয়া থাকে; সুতরাং নিজের ভাষা নির্ব্বাসিত বা অনাদৃত হইলে, পরের ভাষা আসিয়া আপনাকেও পর করিয়া দেয় এবং এই পর করিবার প্রয়াসে শেষে আপন হারাইয়া বসে। অপরপক্ষে বিজয়ী জাতি যদি নিজের ভাষা না চালাইয়া বিজিতের ভাষায় শাসন-বিধান করিতে পারেন, তবে প্রজার প্রাণের কথা ও প্রাণের মমতা একাগ্রত্ব করিয়া শাসন-পদ্ধতি সহজ ও মঙ্গলময় করিতে পারেন।

ভারতীয় মুসলমান শাসনে তাহাদের জাতীয় রীতি-নীতির সহিত তাঁহাদের ভাষাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঠিক্ তাহা চলে নাই। সরকারী কাগজপত্রে যে ভাষা চলিত, ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তায় বা হিসাব রক্ষায় প্রথমতঃ তাহা চলিত না। অবশেষে বিদেশী পারসীকের সহিত আমাদের দেশীয় হিন্দীর সংমিশ্রণ হইয়া, শিবিরে শিবিরে বিভিন্ন ভাষাভাষী সৈনিকের আলাপনে এক নূতন শিবির-ভাষা বা উর্দ্দু গঠিত হয়। উহা দেশীয় প্রকৃতির সহিত কতকটা সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজে বদ্ধমূল হইয়াছিল; এখনও সে শঙ্কর-ভাষা আছে। নিছক্ পরভাষা চালাইলে শাসন পর্য্যন্ত তাহার সীমা হইত; আফিসের পোষাকের মত লোকে সময় পাইলেই তাহা পরিত্যাগ করিত

প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড মেকলে-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বিচার-ফলে এ দেশে ইংরাজী ভাষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উহার ফল ফলিতে আরম্ভ হয়। নূতন জিনিশের আকর্ষণ চিরকালই বেশী। প্রথম প্রথম লোকে ইংরাজীতে লিখিতে পড়িতে ইংরাজীভাষাময় হইয়া গেল! খাইতে, শুইতে, চলিতে, বলিতে সর্ব্বত্র ইংরাজী, ইংরাজীতে পত্র লিখিতে, কবিতা রচিতে, স্বপ্ন দেখিতে লোকে পাগল হইল। বাঙ্গালীর ছেলে সেই স্বপ্নের ঘোরে মাইকেল হইয়া গেলেন, আর ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বাপকে অভিবাদন করিতে বিদেশ হইতে ইংরাজীওয়ালা বন্ধুর আশ্রয় লইলেন। সে একদিন গিয়াছে; সে দিন আর নাই। এখন লোকে বুঝিয়াছে, পরের ভাষা যতই চলুক্, উহা মনুষ্য-জীবনের প্রাকৃতিক পন্থা নহে। বাঙ্গালী গুরুমহাশয় হইতে গণিতাধ্যাপক পর্য্যন্ত, ৪ দ্বিগুণে ৮ হয়—এই হিসাবই মনে মনে করেন; শোকে ক্ষোভে বাঙ্গালা ভাষাতেই ক্রন্দনের রোল উঠে, ক্রোধের সময় বাঙ্গালা-বুলিই ধরা পড়ে। বাঙ্গালাতে একটা জিনিশ না চিনিলে, উহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রকৃতভাবে বুঝিয়া দেখিলে আমরা পরভাষায় লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়নের বেলায় অনবরত মনে মনে অনুবাদ করিয়াই প্রকৃত অর্থবোধ করিয়া থাকি। ইহাতে যে শক্তি বা সময়ের অপব্যয় হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চব্বিশ ঘণ্টা এমন অবিরত অনুবাদের উপর থাকিতে কাহারও ভাল লাগে না

ইংরাজীভাষায় শিক্ষাদান-পদ্ধতির জন্য আমাদের এই একটা নিত্য অসুবিধা অলক্ষিত রহিয়াছে। স্কুল কলেজের শিক্ষায় বাঙ্গালী যুবককে বৈদেশিক ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, নিত্য নূতন চিন্তা লইয়া আলোচনা করিতে হয়; তাহাতে যদি উহা অধিগত করিবার প্রণালীটিও কঠিন ও জটিল হয়, তাহা হইলে সাধারণ ছাত্রের পক্ষে কোন প্রকারে আপন বাঁচাইয়া দুই চারিটি পাশ দেওয়া ব্যতীত জ্ঞানের পরিধি বিশেষ বৃদ্ধি করিবার উপায় থাকে না। শেষে যখন অর্থকরী বিদ্যা লইয়া শ্রান্ত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোল্লঙ্ঘন করিয়া সংসারে প্রবেশ করে, তখন আবার অন্ন-সংস্থানের জন্য তাহার সমস্যার পার থাকে না। যদি ভাগ্যক্রমে কোন প্রকারে অর্থাগমের সংস্থান হয়, তবে প্রথমতঃ সে হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচে; পরে পরিবার প্রতিপালনের গুরুভারে ও চাকরী বা ব্যবসায়ের সন্তাড়নে তাহাকে সর্ব্বদা এমন ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় এবং সময় সময় নানা ব্যসন বা সাময়িক প্রলোভনে এত অবশ বা পরবশ হইয়া পড়িতে হয়, যে তাহার আর জ্ঞান-বৃদ্ধি করিবার সময়, সুবিধা বা প্রবৃত্তি থাকে না। যদি তবুও কাহারও থাকে, সেও উপযুক্ত মানসিক খাদ্য পায় না। বৈদেশিক ভাষায় ভাষা সমস্যা ও মাতৃভাষায় উপযুক্ত পুস্তকের অভাব তাহাকে নিরুৎসাহ করে।

এইভাবে আমাদের দেশীয় শিক্ষার্থীরা ভাষা সমস্যায় পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ করে; তাহারা বিঘ্ন পার হইয়া অগ্রবর্ত্তী হয় বটে, অন্নসংস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করে বটে, কিন্তু কু-ফলের হাতে নিস্তার পায় না। ফল বাহিরে দেখা না গেলেও উহা ক্রমে মজ্জাগত, বংশগত ও ব্যক্তিগত হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষার্থীর বাল্যজীবন হইতেই সমস্যা চলিতেছে। বৈদেশিক ভাষায় শিক্ষার দোষে সে না বুঝিয়া মুখস্থ করে, সে বোঝার ভারে মস্তিষ্ক পীড়িত হয় এবং তাহাকে প্রকৃত শিক্ষায় বঞ্চিত করে।* লাভের মধ্যে এই হইতেছে, আমাদের

* A member of the Viceroy's Educational conference held at Simla in August 1917 remarked ;—"Boys, necessitated by the change in the medium of instruction at some stage in the school course, were expected to crowd too much into the school course and tended to acquire the deplorable habit of learning by heart dictated notes. In consequence they never gained a real grasp of the subjects and therefore the Universities were forced to do what should be the work of schools, and much to the detriment of sound learning and national development.

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে যুবকগণ দুর্ব্বল, হীনমতি, পল্লবগ্রাহী এবং অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িতেছে। এ সম্বন্ধে গুজরাট শিক্ষাসম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে মনস্বী মহাত্মা গান্ধি গুজরাটী ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

"The strain of receiving instruction through a foreign medium is intolerable. Our children alone can bear it, but they have to pay for it. They become unfit for bearing any other strain. For this reason, our graduates are mostly without stamina, weak, devoid of energy, diseased and mere imitators. Originality, research, adventure, ceaseless efforts, courage, dautlessness and such other qualities have become atrophied. We are thus incapacitated for undertaking new enterprises, and we are unable to carry them though if we undertake any. Some who can give proof of such qualities die an untimely death. An English writer has said that the non-Europeans are the blotting-sheets of European civilisation. Whatever truth there may be in this cryptic statement, it is not due to the natural unfitness of the Asiatics. It is the unfitness of the medium of instruction which is responsible for the result." †

এই জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত শিক্ষা প্রায়ই আর সমাপ্ত হয় না। বাঙ্গালী পনর আনা উকীল, মোক্তার, কেরাণী বা চাকুরিয়া হইয়া কাল কাটাইতেছে। বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তা, আবিষ্কার বা সাধনা সংস্পর্শে দেশের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইতেছে না। কাজেই দোষ আসিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর পড়িতেছে; কারণ তাহাতে মানুষ গড়িতেছে না। অবশ্য গবর্ণমেণ্টের যাহা দরকার, তাহার অভাব হইতেছে না। শাসন-সৌকর্য্যের জন্য দেশীয় নিম্ন-কর্ম্মচারীর যে সাহায্য বা সেবা দরকার, তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্তই পাওয়া যাইতেছে; বাঙ্গালীর মত লিপি-কুশল কেরাণীর জাতি জগতে দুর্ল্লভ। কিন্তু দেশ প্রতিভার উন্মেষের জন্য প্রতীক্ষা করে; উহার মূলে ভাষা-সমস্যা যে একটি প্রধান অন্তরায়, আজ তাহা রাজা প্রজা সকলেরই মনে জাগিতেছে।

শুভ সূচনা দেখা গিয়াছে। মহামান্য বড়লাট ও বঙ্গেশ্বর উভয়ই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধিকার সম্বন্ধে অনুকূল মত পোষণ করিতেছেন বলিয়া বোধ হয় * গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অধিবেশনে বঙ্গাধিপ লর্ড রোণাল্ডশে অসঙ্কোচে কয়েকটী মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার একটী কথা এখানে আলোচ্য। তিনি বলেন, † "আমরা যেমন (আমাদের দেশে) অতৎ সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রাচীন মৃত ভাষা সকল শিক্ষা দেই, তোমরা তেমন ভাবে ইংরাজী শিখাও কেন? এ প্রণালীতে কি কাজ হইতে পারে? প্রাচীন ইংরাজী ভাষায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে কি আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল ফল হইবে? যাঁহাদের একটা বিশেষ মনের টান আছে, তাহারা ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান প্রধান অপূর্ব্ব গ্রন্থ অধিগত করুন; কিন্তু তাই বলিয়া সকলকে সমানভাবে বাধ্য করিয়া একটা পরের ভাষা, যে ভাষার সহিত তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন সম্পর্ক নাই, এমন একটা ভাষা শিক্ষা দেওয়া একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।" এমন কথা আমরা বহুদিন শুনি নাই। বঙ্গেশ্বর বঙ্গবাসীর হৃদয়ের কথা টানিয়া বলিয়া হৃদয়ের স্থান অধিকার করিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কঠিন প্রশ্নের সমাধানের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন।

কথাটা এই, বাস্তবিকই সকলের কি সেক্সপীয়র, মিল্‌টন না পড়িলে নয়? সকলেই কি উহা পড়িবার জন্য পড়ে, না

† Indian Review April, 1918 P. 268.

* His Excellency the Viceroy, in his opening speech at the educational conference held at Simla in August, 1917 said :—"I believe a very real advance can be made in the encouragement of the Vernaculars both outside and independently of their place in our educational system and within it."

† I ask, why teach English as we teach dead languages, namely through their literature? Is the system likely to work, is instruction in archaic English really likely to effect the object which we have in view? By all means, let those whose bent lies in that direction study the master-pieces of English Literature. But that is a very different thing from compelling all and sundry to study a literature which is not their own and which has no relation whatever to the daily experience of their own lives."

অর্থকরী বিদ্যার লোভে মোহের বশে পাতা উল্টায়? যাঁহার সেক্সপীয়র মিল্‌টন পড়িবার আবশ্যক আছে, তিনি পড়ুন; শুধু ইংলণ্ডের মহাকবি কেন, তিনি হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে, গেটে, শীলার—মোলিয়ার, হাইন—হুইটম্যান্ প্রভৃতি বহু-মনীষীর মস্তিষ্কের সার সম্পত্তি লাভ করুন। প্রতিভার ক্রীড়াক্ষেত্র প্রাচীর বেষ্টিত নহে; প্রতিভাশালী ব্যক্তির জ্ঞান-পরিধির সীমা নাই। কিন্তু পনর আনা লোকের বৈদেশিক ভাষা-সমস্যায় পড়িয়া সে কঠিন সাধনা, সাধের বিড়ম্বনায় প্রয়োজন কি?

তবে একটা কথা আছে। যাহারা কেরাণীগিরি করে, তাহাদের ইংরাজীর উন্নত প্রাচীন সাহিত্য সাধনার প্রয়োজন নাই বটে, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রে সে জ্ঞানবিশেষ ব্যবহারে আসে না বটে, কিন্তু এই কেরাণী বা নিম্ন কর্ম্মচারীরও ব্যবহারিক কর্ম্মজীবন ছাড়া একটা পৃথক্ জীবন আছে। সেও সংসার বা সমাজের কর্ত্তা, বিশ্বরাজ্যের প্রজা, বিশ্ব-জ্ঞানের অংশীদার। জ্ঞান-বলে যে মনের বল জাগে, হৃদয় বিকসিত হয়, তাহার জীবনেও সে হৃদয়ের ও মনের ক্রিয়া আছে। অর্থের জন্য সে কেরাণী হইয়াছে বলিয়া, তাহার চিত্ত অনুর্ব্বর রাখা কর্ত্তব্য নহে। এজন্য তাহারও ইংরাজী সাহিত্য পড়িবার প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু যে তাহার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

যে দিক হইতেই ধরা যায়, ইংরাজী আমরা ছাড়িতে পারি না। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ ইংরাজী আমাদের রাজ-ভাষা, গবর্ণমেন্টের উচ্চ রাজকার্য্য, আফিস আদালত বা বিচারপ্রচারের ভাষা; ইহাতে আমাদের অভাব অভিযোগ নিবেদিত হয়, দাবি দাওয়া গ্রাহ্য ও স্বত্ব-স্বামিত্ব সাব্যস্ত হয়; আমাদের গৃহ-ধর্ম্মের শত প্রয়োজনের জন্য এ ভাষা আমরা ছাড়িতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ—ইংরাজী-সাহিত্য অতুল সম্পত্তির অধিকারী, উহা সম্মুখে এক নূতন ভাবরাজ্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আমাদিগকে সমুন্নত করিয়াছে, আমাদের মাতৃ-ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং জ্ঞান-গৌরবে আমাদের পদ ও অর্থ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। দেশে বিদেশে রাজদরবার বা জ্ঞানধর্ম্মের মহামণ্ডলে আমাদের যে আসন বা প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে, তাহার মূলীভূত কারণ এই ইংরাজী-সাহিত্যের বিদ্যা-গৌরব। ইহা ছাড়িতে গেলে আমরা বড় হীনপ্রভ হইয়া পড়িব। তৃতীয়তঃ—ইংরাজী আজ আর শুধু ইংলণ্ডের জিনিস নহে, ইহা আজ জগতের ভাষা—সভ্যজাতির একটি সুপরিচিত সাধারণ ভাষা। বিশ্বমণ্ডলের জ্ঞান-রাশির সার-সংগ্রহ করিয়া ইংরাজী-সাহিত্য অত্যধিক পুষ্ট হইয়াছে। একটা ভাষা শিখিলে যখন জগতের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়, তখন তেমন ভাষা শিখিবার সুযোগ কোন্ জ্ঞান-পিপাসু জাতি সাধ করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়?

চতুর্থতঃ—ইংরাজী আমাদের সমগ্র ভারতের সার্ব্বজনীন সাধারণ ভাষা হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রায় ১৫০টি প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত; তন্মধ্যে ২৫টি প্রধান ভাষা আছে। এমন কোন ভাষা নাই, যদ্দ্বারা সর্ব্বত্র কথাবার্ত্তা চলে; উত্তর ভারতের বহুস্থলে হিন্দীর পসার থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে নাই, তামিল-তেলেগু কোন ভাষার সহিত ইহা সম্পর্কিত বা সমধর্ম্মী নহে; অথচ ভারতের সর্ব্বত্র ইংরাজীতে লিখন-পঠন কথাবার্ত্তা চলে। এই ভাষায় সকল জাতির অভাব অভিযোগের ব্যাখ্যা হয় এবং ভাব-বিনিময়ের জন্য ইহা ভারতীয় বিভিন্নধর্ম্মী ও বিভিন্নভাষাভাষী জাতিগুলির সমন্বয় ও একতা সম্পাদনে সহায়তা করিতেছে। রাজ-নৈতিক কোন প্রকার অধিকার বা অনুগ্রহলাভের কোন আশা বা আদর্শ আমাদের সম্মুখে থাকিলে, তাহার মূলে] এই ভাষা। এ বন্ধন-রজ্জু আমরা ছাড়িতে পারি না। পঞ্চমতঃ, নব্য দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের জন্য আমাদিগকে বহুকাল ইংরাজী ভাষায় লিখিত, মৌলিক বা অনূদিত গ্রন্থের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে। এইরূপ আরও নানা কারণে আমাদের ইচ্ছা বা সাধ্য হইলেও ইংরাজীভাষা আমরা ছাড়িতে পারিব না।

ইংরাজী সকলকেই শিখিতে হইবে। কেহ অপরিসীম জ্ঞানের নিমিত্ত, কেহ বৈদেশিক কাব্যেতিহাসের চর্চ্চার জন্য, কেহ রাজ-সরকারে প্রতিপত্তি বা পদ-গৌরব বৃদ্ধির আশায়, কেহ বা রাজনৈতিক ব্যাপারে দেশের ও দশের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যে ইংরাজী শিখিবে; আবার সাধারণ লোকে চাকরী, ব্যবসায় বা অর্থলাভের জন্যও ইংরাজীর শরণাপন্ন হইবে। সুতরাং ইংরাজী আমাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষনীয় ভাষা থাকিবেই। সমস্যা এখানে নহে।

প্রকৃত প্রশ্ন এই যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা চলুক, কিন্তু সকল বিষয় শিক্ষার একমাত্র সোপান ইংরাজী ভাষা হইবে

কেন? এখনকার মত সংস্কৃত, পারসীক এমন কি, বাঙ্গলা-ভাষা শিখিতে গেলেও ইংরাজীর মধ্য দিয়া শিখিতে হইবার ব্যবস্থা থাকিবে কেন? এতদ্দেশীয় কোন ভাষার পরীক্ষায় ইংরাজী হইতে সেই ভাষায় অনুবাদ করিবার যে প্রশ্ন থাকে, তাহাতে অনেকস্থলে প্রশ্ন ও উদ্ধৃত অংশের ইংরাজী বুঝিবার ভুলের জন্য অনুবাদে ভুল হয়; সুতরাং পরীক্ষা প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষারই হয়, প্রাদেশিক ভাষার হয় না। প্রশ্ন বুঝে না বলিয়া গণিতবিজ্ঞানে ভুল হয়, ইতিহাস, ভূগোলের জ্ঞান আছে কিনা বুঝা যায় না। এই সব কারণে বলিতে হইতেছে, গণিত-বিজ্ঞান ইতিহাস-ভূগোল ইংরাজী ভাষায় শিখাইবার প্রয়োজন কি? কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে কমিশন বসিয়াছে, উহা হইতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এতদ্বিষয়ে শিক্ষা-সম্পর্কিত সকল সম্প্রদায়ের মত লওয়া হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে বহু অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞগণ লিখিত প্রস্তাবনায়, এবং সভা সমিতি ও সংবাদপত্রাদিতে এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন। প্রসঙ্গ বিশেষে সামান্য মতভেদ থাকিলেও মোটামুটি অনেকেরই এক মত দেখা যাইতেছে। সকলেই বলেন, গণিত ইতিহাসাদির অধ্যাপনায় বাঙ্গালা ভাষাই শিক্ষা-দানের পন্থা হউক্; মাতৃভাষার সেবা ও উৎকর্ষ-সাধনে সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা উচিত। কি ভাবে তাহা করা যায়, তাহাই আমাদের বিবেচ্য। আমরা দেখিব, শিক্ষা দানে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার কতদূর ও কি ভাবে হইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হইতে বাঙ্গালাভাষাকে শিক্ষাদানের ভাষা করিতে দৃঢ়মত ব্যক্ত হইয়াছে।

(১) বঙ্গদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা প্রবেশলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তেমন পসার তার হয় নাই; কেমন যেন অবজ্ঞাত, কোণঠেসা অবস্থায় আছে। কেহই সে অবস্থা ভাল দেখেন না বটে,—কিন্তু কেন জানি না, তাহার কোন প্রতিকারও কল্পিত হইতেছে না। যদিও বাঙ্গালার পরীক্ষা বাধ্যতামূলক এবং পাশের নম্বরও ইংরাজীর সমান, তবুও যে প্রশ্নে যে ভাবে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে বাঙ্গালায় পাশ করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের প্রথম দ্বিতীয়ভাগও পড়িতে হয় বলিয়া মনে হয় না। যাহারা জলের "জ" শব্দের "স" ও পানভোজনের "ন" কারে বিষম গোল করে, যাহাদের একখানি কাগজে এমন কি এই জাতীয় শতাধিক ভুলও দৃষ্ট হয়, তাহারাও প্রশ্নের গুণে পরীক্ষকের অনিচ্ছায় অবাধে অর্দ্ধেক নম্বর পাইয়া হাসিতে হাসিতে পাশ করিয়া যায়। এবার ও গতবার I. A. পরীক্ষায় যে প্রশ্ন হইয়াছে, তাহার কতক স্বচ্ছন্দে স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ মানে জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালায় পাশ করিতে একটু বাধিয়া গেলে দেশে হৈ চৈ হইবে আশঙ্কা করিয়াই যেন কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কোচের সহিত গৌণভাবে কোন মতে বাঙ্গালা পরীক্ষা সম্পন্ন করিতেছেন। পরীক্ষার গতিক বুঝিয়া স্কুল কলেজে বাঙ্গালা পড়া হয় না, কালজে Percentage রাখা হয় না, ছাত্রেরা ভাবে দুই কুড়ি সাত হাতেই আছে। বাঙ্গলা পরীক্ষাটা একটা যেন প্রহসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালাভাষার পাণিগ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু উহা যে কুলীনব্রাহ্মণকন্যার মত চিরকাল পিত্রালয়ে অন-জ্ঞাত রহিয়া গেল, ইহাই দুঃখের বিষয়।

বাঙ্গালার পাঠ্য ও প্রশ্নপ্রণালী সম্পূর্ণ বদলাইতে হইবে; বি, এ পরীক্ষার মত অন্যান্য পরীক্ষায়ও নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য হইতে প্রশ্ন করিতে হইবে। বি, এ পরীক্ষায় ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক নাতি বৃহৎ পুস্তক থাকা দরকার। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব এবং প্রচীন ও আধুনিক নানা গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া বাঙ্গালায় এম, এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। উহাতে আদর্শ যথাসম্ভব উচ্চ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা পরীক্ষায় একটা চরম লক্ষ্য নির্ণীত হইলে, ভাষার গৌরব ও প্রতিপত্তি অচিরে বাড়িয়া যাইবে।

(২) উচ্চ বিষয়ে বক্তৃতা ও মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশ বাঙ্গালা ভাষাতেই করিতে হইবে। বৈদিক তত্ত্ব ও যাগাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূজ্যপাদ স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের যে বাঙ্গালা বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহাতে বিষয়ের গাম্ভীর্য্য কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করেন না। দেশমান্য স্যর জগদীশচন্দ্র তাঁহার অদ্ভুত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের যে বিবরণ বাঙ্গালা বক্তৃতায় ব্যাখ্যাত করিতেছেন, তাহা সকল লোকের হৃদয়গ্রাহী হইতেছে এবং উহাতে বাঙ্গালাভাষার কোন দীনতা পরিলক্ষিত হইতেছে না।

(৩) দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে এতদ্দেশীয় কেহ কোন প্রামাণিক গ্রন্থ লিখিবার সময় যদি উহা বাঙ্গালাতেই লিখেন

অথবা অগত্যা ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতে লিখেন, তাহা হইলেও বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট সমাদর করা হইবে। প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের বিজ্ঞান ও অর্থনীতির গ্রন্থাবলী বাঙ্গালায় অনূদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

(৪) ইংরাজী বা অন্য ভাষায় এতদ্দেশীয় বা বিদেশীয় মনীষীর লিখিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থমালা বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। যদিও পাশ্চাত্য জাতির মত ভারতবর্ষীয়েরা উপযুক্ত গ্রন্থের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা করিতে শিখেন নাই, অনেক ভাল বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয়ের অভাবে অচিরে অমুদ্রিত ও অলক্ষিত হইয়া পড়ে, তবুও পরিষদ ও বিদ্যোৎসাহী ধনীদিগের সাহায্যে শীঘ্র কতকগুলি বিখ্যাত পুস্তকের অনুবাদ হইলে দেশের বিশেষ উপকার হয়।

(৫) সর্ব্বশেষে এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রস্তাব এই যে হাইস্কুলের নিম্নশ্রেণী হইতে আপাততঃ অন্ততঃ I. A. ক্লাস পর্য্যন্ত স্কুল কলেজে গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ও তর্কশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া উচিত এবং অন্ততঃ ইতিহাস ভূগোলের পরীক্ষা গ্রহণও ঐ ভাষায় হওয়া একান্ত অভিপ্রেত।

প্রাদেশিক ভাষায় অধ্যাপনা বিষয়ে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। (ক) প্রাদেশিক ভাষায় উক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে পারিবার মত উপযুক্ত পুস্তক নাই। এ আপত্তি বেশী দিন থাকে না, বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলে, অতি শীঘ্রই অসংখ্য গ্রন্থকারের চেষ্টায় পুস্তকের অভাব বিদূরিত হইবে। বিশেষতঃ বাঙ্গালাভাষার ভাষা-সম্পদ্ অতুলনীয়, তাহাতে ভাবপ্রকাশ বিষয়ে আয়াস পাইবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পুস্তকের অভাব হইবে না, তবে উহা কিছু সময়সাপেক্ষ। (খ) বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিষয়ক পরিভাষার অভাব। ইংরাজীভাষায় বহু বৈদেশিক শব্দ আপন করিয়া আত্মসাৎ করা হইয়াছে, উহাতে তাহার নিজের গৌরব কমে নাই। আমাদের ভাষায় যাহার সহজবোধ্য পরিভাষা আছে, তাহা ব্যতীত প্রথমতঃ সমস্ত শব্দই অবিকল ইংরাজী হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ক্রমে গ্যাস, প্লাগ, চেয়ার টেবিলের মত সে সকল শব্দও আমাদের হইয়া যাইবে। নানা প্রদেশে পরিভাষার যে সকল তালিকা ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এমন দুর্ব্বোধ্য ও কিম্ভূত কিমাকার যে উহা গ্রহণ না করাই ভাল।

(গ) মাতৃ-ভাষায় অধ্যাপনা করিতে অনেক শিক্ষক বা অধ্যাপক অভ্যস্ত হন নাই। সরকারী বা মিশনারী স্কুল কলেজের বৈদেশিক শিক্ষকগণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তাঁহাদের মধ্যে বি, এ, ক্লাসের নিম্নে অধ্যাপন করেন, এমন অধ্যাপক ও সংখ্যায় অধিক নহেন। এ দেশের পনর আনা শিক্ষক বাঙ্গালী, বাঙ্গালা তাহাদের মাতৃ-ভাষা, উহাতে অভ্যস্ত হইতে তাহাদের অধিক সময় লাগিবে না। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অধ্যাপনা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই; আবশ্যক মত ইংরাজী বাঙ্গালা মিশাইয়া এক প্রকার খিচুড়ী ভাষায় বিজ্ঞানাদি বিষয় স্বচ্ছন্দে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; এই প্রণালীই অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বিশেষজ্ঞের মত জানা গিয়াছে।

(ঘ) অনেক বিষয় বাঙ্গালাতে পড়াইতে গেলে ছাত্রেরা ইংরাজী ভাল শিখিবে না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষা ভাল করিয়া শিখে না। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। সকল দেশেই মাতৃ-ভাষায় সাধারণ শিক্ষা চলে এবং বিদ্বন্মণ্ডলী বৈদেশিক ভাষাও শিখিয়া থাকেন। আর যদি বাস্তবিকই বাঙ্গালাভাষায় অধ্যাপনা করিলে ইংরাজী শিখিবার বাধাই হয়, তাহাতেই বা নিতান্ত ক্ষতি কি? সকলের পক্ষে ইংরাজী ভাষা তত ভাল করিয়া শিখিবার প্রয়োজন বিষয়ে স্বয়ং বঙ্গেশ্বরও সন্দিহান হইয়াছেন। যাহারা ভাল ছাত্র, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা একটু চেষ্টা করিলেই ইংরাজী ভাষা প্রায় ইংরাজের মতই শিখিয়া থাকে। তীক্ষ্ণ মেধা ও অধ্যবসায়ে বাঙ্গালী যুবক কাহারও নিকট পরাভূত নহে। যদি পৃথক্‌ভাবে ইংরাজী পড়িতে গেলে, তাহাতে একটু সময়ই বেশী লাগে, তবে তৎসহ ইহাও বিবেচ্য যে বাঙ্গালা ভাষায় গণিত ইতিহাসাদি পড়িলে, সে সব বিষয়ে সময় অনেক কম লাগিবে। একদিকে যে সময় পাওয়া যায়, প্রয়োজন বোধে অন্যত্র তাহার সদ্ব্যবহার করা চলে।

(ঙ) কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভাগে—একাধিক প্রাদেশিক ভাষা থাকিবার সম্ভব, উহার কোন্

ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে, ঠিক্ করা কঠিন! এক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া চলে না সত্য। সে সব স্থানে যে ভাষার লোক সংখ্যা বেশী, তাহাতেই আপততঃ পক্ষপাতিত্ব দেখান যাইতে পারে। তবুও কিছু অসুবিধা হয়, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে সে অসুবিধা নাই। এখানে হিন্দু মুসলমান্ সকলেরই একই মাতৃ-ভাষা—বাঙ্গলা। বঙ্গ-বিভাগের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা পৃথক্ হওয়ায় ও তাহাদের পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বঙ্গভাষার প্রসার-পথ সুগম হইয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

„বরাত”

শশীর সৌভাগ্য হের হরের মস্তকে স্থিতি,
অভাগ্য শশীর দেখ কলাক্ষয় তবু নিতি।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

পল্লীর প্রাণ

(৩৯)

"হাঁ হে ঘোষাল! এ কি নোংরামো ক'রেছ বল ত?"

"কেন, কি হ'য়েছে বাবু? কি নোংরামো ক'রেছি!" বলিতে বলিতে অম্বিকা ঘোষালের মুখ যেন একটু শুকাইয়া আসিল।

বেণীবাবু কহিলেন, "আগাগোড়া তোমরা কাঁচা কাজ ক'রে আস্‌ছ। নিজেরা ঠ'ক্‌ছ,—আমাকেও বেকুব বানাচ্ছ। শেষকালে এত বড় একটা নোংরামো গিয়ে ক'ল্লে! আরে ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা! এও ভদ্রলোকে করে? হাঁ, শত্রুতা একটা আছে,—বুঝে বুদ্ধি ক'রে ভদ্রলোকের মত শত্রুতা কর। কিন্তু এ সব কি? ছ্যাঃ!"

"কি ব'ল্‌ছেন, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। কেন, কি ক'রেছি আমি?"

"নিবারণের নামে পুলিশে খবর দিয়েছে, তারা স্বদেশী দল বেঁধে গাঁয়ের লোকের উপর জুলুম ক'চ্ছে, রাজদ্রোহী দলের সঙ্গে ওদের তলে তলে যোগ আছে, ডাকাতী করে! আবার তারিণী বাড়ুয্যেকেও জড়িয়েছ এর মধ্যে! বুদ্ধিকে বলিহারি যাই!"

ঘোষালের মুখ একেবারে চুণ হইয়া গেল, একটু থতমত খাইয়া তিনি কহিলেন, "আমি! আমি পুলিশকে এই খবর দিয়েছি! কে ব'ল্লে?"

"তারিণী বাড়ুয্যে এসেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমাকেও ডেকে তার মোকাবলা সব ব'ল্লেন। পুলিশ সাহেবও ছিলেন।"

"কি ব'ল্লেন? আমি পুলিশকে খবর দিয়েছি?"

বেণীবাবু উত্তর করিলেন, "অতটা খুলে ম্যাজিষ্ট্রেট্রা কি পুলিশরা এ সব কথা বাইরের লোক কাউকে বলে না। তবে তাঁরা যা ব'ল্লেন, সব শুন্‌লাম, অবস্থাও সব জানি, তারিণী বাড়ুয্যের সঙ্গেও অনেক কথা হ'ল। বুঝ্‌তে কি আর বাকী থাকে ঘোষাল যে তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করে নি?"

"গাঁয়ে ঢের লোক আছে, যারা নিবারণের জবরদস্তীতে হাড়ে হাড়ে চ'টে গেছে। যে কেউ পুলিশের কাছে গিয়ে এই নালিশ ক'ত্তে পারে। আর সত্যি যদি এই সব দোষ তা'দের থাকে, পুলিশকে তা কি জানান উচিত নয়?"

বেণীবাবু উত্তর করিলেন, "এ সব দোষ তাদের নেই,—

আর নিবারণ এমন কোনও জবরদস্তী কারও উপরে করে না, যাতে এত বড় শক্রতা গাঁয়ের আর কেউ তার বিরুদ্ধে ক'র্‌বে।—তবে শক্রতা তোমাদের সঙ্গে খুবই একটা চ'ল্‌ছে। তাতে ক'রে এত দূর হিতাহিতজ্ঞানশূন্য তোমরা হ'য়েছ যে নিজেদের ঘরেরও এত বড় একটা আত্মমারা কথা নিঃসঙ্কোচে প্রচার ক'রেছ!"

"আপনি গাঁয়ের কোনও খবর রাখেন না,—তাই জানেন না কিছু,——"

"খবর খুবই রাখি ঘোষাল। পূজোয় একবার ক'রে দেশে যাই,—তা ছাড়া গাঁয়ের লোকও ঢের সহরে আসে, তাদের সঙ্গেও দেখা শুনো হয়। একটা পাড়াগাঁয়ে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে—সেটা বুঝে নিতে এমন বেশী কিছু লাগে না। বুদ্ধি একটু রাখি ঘোষাল, একেবারে ফাঁকা হাল্‌কা মাথা নিয়ে এতদিন ওকালতী করি নি।"

ঘোষাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন,—শেষে কহিলেন, "তা—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি ব'ল্লেন?"

বেণীবাবু উত্তর করিলেন, "রাজার জাত—এত বড় একটা জেলা শাসন ক'চ্ছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট কি আর গেঁয়ো একটা খবরে অমনি টপ ক'রে ধরে নেবেন, গাঁ শুদ্ধ ভদ্রলোকের ছেলেরা একটা রাজদ্রোহী দল ক'রে যা খুসী তাই ক'চ্ছে? আরও তাঁর অত বড় বিশ্বাসী লোক তারিণী বাড়ুয্যের নামও ওদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে! তিনি তারিণী বাড়ুয্যেকে ডেকে পাঠিয়েছেন,—আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের কাছে খুঁটিনাটি সব সন্ধান নিলেন।"

"তারিণী বাড়ুয্যে কি ব'ল্লে? আপনিই যা ব'ল্লেন? আপনি জানেনই বা কি?"

"আমি যদ্দুর জানি না জানি, তারিণী বাড়ুয্যে ত জানে সব। যে সব কথা সে ব'ল্লে, তা সত্যি।—আমাকে ও অবশ্য ব'ল্‌তে হ'ল—আমিও তা সত্যি ব'লে বিশ্বাস করি।"

অম্বিকার চক্ষু মুখ লাল হইয়া উঠিল,—কহিলেন, "ধরুন, সত্যিই যদি আমি এই রকম একটা নালিশ ক'রে থাকি, আপনার আশ্রিত লোক আমি—চাকর ব'ল্লেও হয়—তা আপনার কি উচিত হ'য়েছে আমার নালিশের বিরুদ্ধে এই রকম একটা মত দিয়ে আসা?"

"এ কেমন কথা তোমার ঘোষাল! গাঁয়ের সব ভদ্রলোকের ছেলে—তাদের বিরুদ্ধে এত বড় সর্ব্বনেশে একটা মিছে নালিশ তুমি আন্‌বে,—আর জেনে শুনে আমি তার সমর্থন ক'র্‌ব? নালিশ যখন ক'ত্তে গিয়েছিলে, মরুব্বি ব'লে আমার পরামর্শ নিয়েছিলে তখন? গোপনে যত কিছু নোংরামো ক'র্‌বে, অনুগত লোক বলে তার সব কালই আমাকে গায়ে মাখ্‌তে হবে! এ যে বড় বাড়াবাড়ি দাবী তোমার ঘোষাল

ঘোষাল কহিলেন, "আজ এই বিশ বছর অনেক এমন নোংরামোর কালী চাকর ব'লে আমি গায় মেখেছি—"

বেণীবাবু একটু ভ্রূকুটি করিয়া কিছু রুক্ষস্বরে কহিলেন, "ও সব কথা তুলোনা ঘোষাল। আমি উকিল, তুমি মুহুরী,—ওকালতীতে নোংরামো অনেক ক'ত্তে হয়,—তার কালী তোমাকেও গায় মাখ্‌তে হ'য়েছে, আমাকেও হ'য়েছে।"

ঘোষাল তখন বড় চটিয়া গিয়াছিলেন, মাথার ঠিক ছিল না,—বলিয়া ফেলিলেন, "কেবল কি ওকালতীর নোংরামো! কি না ক'রেছি আমি——"

বেণীবাবু রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, "সাবধান ঘোষাল! যা ক'রেছ, নিজের স্বার্থে, কেবল আমাকে ভালবেসে নয়। আর যাই আমি ক'রে থাকি, তোমার এ নোংরামোর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। ভদ্রলোকের কাজ এ নয়!"

ঘোষাল মুখ নীচু করিলেন। মুখে কোনও রা সরিল না। বেণীবাবু একটু পরে আবার কহিলেন, "তারিণী বাড়ুয্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গ্রামে গিয়ে নিজের চোকে সব দেখ্‌তে, নিজের কাণে গ্রামের লোকের সব কথা শুন্‌তে অনুরোধ ক'রেছে। তরসু তিনি যাবেন। আমাকেও অবশ্য যেতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম, না গিয়েও পার্‌ব না।"

অম্বিকা কহিলেন, "গিয়ে আপনিও ত ব'ল্‌বেন, নিবারণ যা ক'রেছে, বেশ ক'রেছে!"

বেণীবাবু উত্তর করিলেন, "বেশই যদি সে ক'রে থাকে, তাই যদি দেখা যায়, গাঁয়ের লোকও যদি তাই বলে,—তবে কি আমি ব'ল্‌ব, না, ওসব কিছু নয়,—নিবারণ অতি মন্দ কাজ ক'রেছে,—তাকে আর গাঁয়ের যত ছেলেকে হাতকড়ি দিয়ে চালান দেওয়া হ'ক? চমৎকার হবে তা হ'লে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ মনে মনে হাস্‌বে, আর ভাব্‌বে, যেমন গুণধর মুহুরী, তেম্‌নি তার মনিব উকিল! তবু যদি লাভ তাতে কিছু হ'ত! না ঘোষাল, মিছেমিছি নিজেকে অত ছোট আমি ক'র্ত্তে পারব না। কাঁচাবুদ্ধিতে এতদিন যত চাল চেলেছ, নিজেরাই ঠ'কেছ,—নিবারণের একগাছি চুলও ছিঁড়্তে পার্ নি। আর এবার ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিজে গিয়ে যখন তার কাজের তারিফ ক'রে আস্‌বে, ভোঁতা মুখ তোমাদের একেবারে ভোতা হবে!"

বেণীবাবু গড়গড়ার নলটি মুখে তুলিয়া দিয়া তাকিয়ার উপরে গা ছাড়িয়া শুইয়া পড়িলেন। ঘোষাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিলেন। বেণীবাবু কহিলেন, "দেখ, আবার ভিতরে গিন্নীর কাছে গিয়ে কাঁদ্‌তে ব'সো না। তাতে সুবিধে কিছুই হবে না,—কেবল আমার অশান্তিই বাড়্‌বে। এম্‌নি যাদবকে নিয়ে ঝঞ্ঝাটের এক শেষ আমার হ'চ্চে। সে দিন আবার যাদবের বৌয়ের সঙ্গে গিয়ে ঝগড়া ক'রে এসেছেন। সেও দু কথা শুনিয়ে দিয়েছে। ছাড়্‌বে কেন? আর এমন জ্বালায়ও প'ড়েছি! বাইরের এই সব কাজকর্ম্ম নিয়ে ঘরের মেয়ে মানুষ—ওদের এত খোঁচা-খুচি গোলমাল কেন বাপু? জ্বালাতন হ'য়ে গেলাম।"

ঘোষাল একটু থমকিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তা—আমি যদি এতই অশান্তির কারণ হ'য়ে থাকি,—বলুন, আমি বিদেয় হচ্চি। বেশ ত, এত যোগ্যতা আছে, নিবারণকে এনেই আপনার মুহুরী করুন।"

বেণীবাবু একটু হাসিলেন,—কহিলেন, "ঘোষাল! পাগলামো ক'রো না।—যাও এখন,—মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর গে। এমন অনেক ব্যাকুবি আছে, যা মনে মনে স্বীকার ক'রে নিয়ে শোধবার চেষ্টা করাটাই ভাল। আমি কৈফিয়ৎ কিছু চাই নে। নিজে বুঝে দেখো—নিজে বুঝে চলো। এ সব কথা আর তুলো না।"

ঘোষাল আর কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

(৪০)

ম্যাজিষ্ট্রেট্ গ্রাম পরিদর্শনে যাইবেন,—গ্রামের একজন মাতব্বর ব্যক্তি তিনি, বেণীবাবু একদিন পূর্ব্বেই গ্রামে গিয়া পৌছিলেন। তারিণী বাড়ুয্যের উপদেশে গ্রামের যুবকগণ সকলে গিয়া বেণীবাবুকে ধরিল,—তাদের কাজ দেখিবার জন্ত তাঁহাকে আহ্বান করিল। বেণীবাবু যারপর-নাই চতুর লোক,—নাম যশঃ প্রতিপত্তিও চাহিতেন,—স্বভাবে বেশ একটু দিলদরিয়া ভাবও ছিল। গ্রামবাসী শিক্ষিত যুবকবৃন্দ সকলে আসিয়া যখন হাসিমুখে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল,—প্রাণে বাস্তবিকই বড় একটা আনন্দ ও গৌরব তিনি অনুভব করিলেন। তা ছাড়া, ইহাও বুঝিলেন, গ্রামে তাঁহার প্রতিপত্তি রক্ষার পক্ষে এই সব যুবকগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিতান্ত প্রয়োজন। গ্রামের সংবাদ তিনি রাখিতেন। ইহারা যে ভাল বই মন্দ কিছু করিতেছে না, এ কথা তিনি সহজেই বুঝিয়া নিয়াছিলেন। নিজের একটা পুরুষোচিত সাহস হিম্মৎ ও দৃঢ়তাও তাঁহার স্বভাবে ছিল,—তাই, বোধ হয় সমপ্রাণতার একটা সাড়া অনুভব করিয়া নিবারণের প্রতিও অন্তরে একটা শ্রদ্ধার ভাব তাঁহার জাগ্রত হইয়া উঠিয়া ছিল।

সমাগত যুবকদের তিনি সহৃদয় আগ্রহে ও স্মিত মুখে অভ্যর্থনা করিলেন। বাজার হইতে প্রচুর আম ও রসগোল্লা আনাইয়া তাহাদের জলযোগ করাইলেন,—তারপর তাহাদের সঙ্গে গ্রামপর্য্যটনে বাহির হইলেন। তারিণী বাড়ুয্যেও আসিয়া পথে ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।—

বেণীবাবু দেখিলেন, ইহাদের উদ্যমে গ্রামখানির যেন শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। নিজের স্বার্থে বিশেষ কোনও ব্যাঘাত না ঘটিলে লোকহিতকর সফল কোনও কার্য্যে প্রাণ ভরিয়া একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠে না, এরূপ দীনচিত্ত লোক এ পৃথিবীতে অতি দুর্লভ—যদি না সেই হিতকর্ত্তার প্রতি দারুণ একটা অসূয়া বা বিদ্বেষ কাহারও মনে থাকে। গ্রামের এই উন্নতিতে বেণীবাবুর কোনওরূপ স্বার্থহানির কারণ নাই, দীনচেতা লোকও তিনি ছিলেন না, নিবারণের প্রতি ব্যক্তিগত কোনওরূপ অসূয়াবিদ্বেষ ত তাঁহার ছিলই না, বরং তার সাহস হিম্মৎ আর তেজস্বিতার কথা সব শুনিয়া ক্রমে তার প্রতি একটা শ্রদ্ধাই তাঁহার জন্মিয়াছিল।

গ্রামের সর্ব্বত্র বেণীবাবু ঘুরিয়া দেখিলেন। ঘোষালদের মুরুব্বি বেণীবাবু নিবারণের দলের ছেলেদের লইয়া উৎসাহে তাদের কাজ দেখিয়া বেড়াইতেছেন, ইহাতে স্বভাবতঃই সকলের মনে বড় একটা কৌতুহল জাগিয়া উঠিল,—গ্রামের বহু লোক আসিয়া জুটিল। সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে বেণীবাবু যুবকের কার্য্যের প্রশংসা করিলেন, নিবারণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "চিরজীবী হ'য়ে থাক বাবা!—

আমার হাতে যদি থাকৃত, এই গাঁয়ের রাজা তোমাকে ক'রে দিলাম। তা এই রকম কাজ কর, রাজার মতই গ্রামে তুমি সকলের বড় হ'য়ে থাকৃবে। তোমার মত এই রকম সব ছেলে যদি গ্রামে গ্রামে থাকৃত, দেশের এই হাহাকার ছু'দিনেই দূর হ'য়ে যেত।—গাঁ ছেড়ে লোকে সহরে যাচ্ছে,—সহর ছেড়ে আরামের জন্ত গাঁয়ে সবাই সাধ ক'রে আস্ত।"

কথাগুলির মধ্যে কোনরূপ কৃত্রিমতা ছিল না,—সহজ প্রাণভরা আগ্রহেই উচ্চারিত হইল। সকলে যারপরনাই বিস্মিত হইল। এই বেণীবাবুর কথায় যাদব আসিয়া নিবারণকে পৃথক্ করিয়া দিয়া গিয়াছিল! না, না! তা হইতেই পারে না। যাদব আপনা হইতেই—পাছে বেণীবাবু চটেন এই ভয়ে ধাইয়া আসিয়া এই কুকাণ্ড করিয়া গিয়াছে। লোকে সে দিন যেমন বেণীবাবুর সুখ্যাতি করিতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে তেমনই দুর্ভাগ্য যাদবকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

বৈকালে বেণীবাবু উপযাচক হইয়া নিবারণ ও শরতের ক্ষেত-বাগান দেখিয়া আসিলেন। তাহা দেখিয়াও যারপর-নাই আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং যথাসাধ্য ইহাদের সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। গ্রামের অন্ত কোনও যুবক যদি চাকরী বা ওকালতীর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া এইরূপ ক্ষেত-বাগান করিতে চায়, তাঁহা দ্বারা যত দূর সহায়তা হইতে পারে, সর্ব্বদাই তার জন্ত তিনি প্রস্তুত থাকিবেন, এরূপ ভরসাও বার বার সকলকে দিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় বেণীবাবুর জয়ধ্বনি করতঃ যুবকগণ গৃহ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিল।

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আসিলেন। বেণীবাবু ও তারিণী বাড়ুয্যে যুবকদের লইয়া গিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। গ্রামের অবস্থা তাঁহাকে দেখাইলেন। সাহেবও দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। গ্রামের বহু লোককে ডাকিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করাও হইল। নিবারণ জবরদস্তী করে, এরূপ অভিযোগে কেহ কেহ যে না করিত, তা নয়। কিন্তু বেণীবাবু আগের দিন যেরূপভাবে ইহাদের কার্য্যের সমর্থন করেন, তাহাতে তাঁহার সম্মুখে এরূপ কোনও ইঙ্গিতও কেহ করিতে সাহসী হইল না। সকলেই এক বাক্যে বলিল, তাহারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। হরিঘোষাল পর্য্যন্ত কোনও অভিযোগ করিতে পারিলেন না। গ্রামে গ্রামে যুবকগণ যদি ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে, তবে পঞ্চায়েৎ ও ইউনিয়ন কমিটির কার্য্য অতি সহজ হইয়া আশু সার্থকতা লাভ করিবে এবং বাঙ্গালার পল্লীগুলি সত্বর বাসের যোগ্য হইয়া উঠিবে, এই অভিমত তিনি প্রকাশ করিলেন। শেষে গোপনে বেণীবাবু ও তারিণী বাড়ুয্যের নিকট বলিলেন, ইহাদের বিরুদ্ধে এই সব গুরুতর অভিযোগ যে করিয়াছে, সে যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশতঃ শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যেই করিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ মাত্র নাই।

নিবারণকে গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই স্নেহের চক্ষে দেখিত। কিন্তু গ্রামের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে সে যে ছেলের দল নিয়া পুকুর সাফ জঙ্গল সাফ করিত, পগাড়-গুলি সংস্কারের চেষ্টা করিত, ইহা যে সকলে বড় ভাল চক্ষে দেখিত, তা বলা যায় না।—যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিত, তাহারা মনে একটু চটিতও বটে। এ সব কার্য্যের তারিফ কেহই করিত না। কাজকর্ম্ম নাই, ঘরে বসিয়া আছে, এই একটা বাই চড়িয়াছে,—কলেজের ছেলেরা ছুটিতে যখন বাড়ী আসে, তাদের লইয়া একটা হুজুগ করে, সাধারণতঃ এইরূপ কথাই গ্রামের লোকে বলিত। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে সকলের দৃষ্টি যেন ফিরিয়া গেল। বেণীবাবু আর স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব—ইঁহারাই নিবারণের আর তার দলের ছেলেদের কার্য্যের এতটা তারিফ করিয়া গেলেন। তাই ত! তবে ত নিবারণ নেহাৎ হেলাফেলার যোগ্য একটা লোক নয়! এই সব কাজও তবে নিতান্ত একটা বাই নয়,—বাজে একটা হুজুগ নয়,—ভাল কাজই বটে! অমন যে বেণী বসু—নিবারণের শত্রু ঘোষালদের মুরুব্বি—আর এ অঞ্চলে একটা নাম ডাকের মানুষও বটে,—তিনি শতমুখে বলিলেন, নিবারণরা বেশ কাজ করিতেছে, গ্রামের অনেক ভাল ইহাতে হইবে। তারপর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্—সাহেব লোক—জেলার রাজা বলিলেই হয়—তিনি পর্য্যন্ত এই কথা বলিয়া গেলেন। কাজটা তবে—হাঁ, ভালই বটে! কেনই বা না ভাল হইবে? গ্রামে এই জল কষ্ট, এই ব্যারামপীড়া—আর বর্ষায় জলে জঙ্গলে চারিদিক যে কি হইয়াই থাকে! তা যদি ভাল জল একটু পাওয়া যায়,—ব্যারাম পীড়া কম হয়, আর

একটু সাফ সাফাই ঋটুথটে সব থাকে, সেটা ভালই বলিতে হইবে বই কি? তাই ত! নিবারণ তবে ভালই করিয়েছে। নূতন একটা শ্রদ্ধার চক্ষে গ্রামের লোক নিবারণকে দেখিতে লাগিল।

আরও একটি বড় ফল ইহার দেখা গেল। কয়দিন পূর্ব্বেও যে কলঙ্কের কথা লইয়া সকলে নিবারণকে ধিক্কার দিতেছিল, তাহাও অনেক পরিমাণে চাপা পড়িল। যে বড় একটা শ্রদ্ধা নিবারণের প্রতি সকলের চিত্তে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তার মধ্যে এরূপ কলঙ্ক বড় আমল পায় না। তাই সেটা অনেক পরিমাণে চাপা পড়িল,—চাপা পড়িল—নিবারণের পক্ষে,—কিন্তু হায়, অভাগী কমলা ও কুন্তীর পক্ষে নয়। একদিনে সকলেই যে নিবারণকে এ সম্বন্ধে একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে মনে স্বীকার করিয়া নিল, তা নয়। তবে তার পক্ষে এই দোষটার দিকে লোকের দৃষ্টি তেমন পড়িত না। কিন্তু কুন্তীকে যখনই কেহ দেখিত, কি তার কথা ভাবিত, নিষ্কলঙ্ক বলিয়া কেহই বড় তাকে মনে করিতে পারিত না। সেই সামাজিক বৈঠকের পর লোকে এটা বুঝিতেছিল যে কন্যা সহ শীতল চক্রবর্ত্তীর গৃহে আশ্রয় নেওয়ায় কমলার পক্ষে এমন দোষের কিছু হয় নাই। আর সত্যই ত, নিবারণ যদি কুন্তীকে বাহির করিয়াই নিবে, তবে শীতল চক্রবর্ত্তীর গৃহে নিয়া রাখিবে কেন? আর তাহার জননী ভবানী ঠাকুরাণীই বা তাহাতে সহায়তা কেন করিবেন? সেটা দোষের কিছুই হয় নাই। কিন্তু মেয়েটা ভাল নয়,—আর মা মাগীও বড় নচ্ছার! নিবারণ হাজার হউক বয়সের ছেলে ত—মা মেয়েতে তাকে ভুলাইয়া নিয়াছিল, কিছু পাইবার থুইবার আশায়। ছি, ছি, ছি! গলায় দিতেও মাগীদের দড়ী জোটে না! নিবারণকে সাক্ষাৎভাবে নিন্দা না করিলেও, কুন্তীর এবং কমলার সম্বন্ধে লোকে কু-কথা অনেক কানাকানি করিত।

কমলা রন্ধনাদি বহু কর্ম্মে বিশেষ কুশলা ছিলেন। কতক এই কারণে, কতক তাঁহার দারিদ্র্যের প্রতি করুণা করিয়া গ্রামে কাহারও বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম কিছু উপস্থিত হইলে লোকে তাঁহাকে ডাকিত, রন্ধনাদি বহু কর্ম্মের ভার কমলা ও কুন্তীর হাতে দিত। ইতিমধ্যে একটি বিবাহ, একটি শ্রাদ্ধ এবং একটি অন্নপ্রাশন গ্রামে হইয়াছিল। কিন্তু কেহই কমলাকে ডাকিল না,—সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে কমলা একরূপ জাতিভ্রষ্টার মতই হইয়া পড়িলেন। কেহ স্পষ্ট কোনও কথাই বলে নাই,—কাহাকে তিনি কি বলিলেন? লোকে ডাকে দয়া করিয়া, দাবী কিছুই নাই,—না ডাকিলে তিনি কি করিতে পারেন? ঘরে বসিয়া কমলা অশ্রুপাত করিলেন। আর মনে মনে বড় বিপদ গণিলেন। কন্যার বিবাহের আশা ত গেলই,—এই সব কাজকর্ম্মে বৎসরে বহুদিন তাঁহার চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন ঐ পাঁচটি টাকা মাসোহরা মাত্র তাঁহার ভরসা,—তাও যদি ওরা বন্ধ না করে। হায়, পুত্রকন্যাকে একসন্ধ্যা দুটি ভাতই বা তিনি কোথা হইতে দিবেন?

(৪১)

ঘরে খাবার জল একবিন্দু নাই, কমলারও শরীরটা আজ তেমন ভাল নাই। কুন্তী স্নান করিয়া আসিয়া ঘড়াটি কাঁখে লইয়া বোসেদের নূতন পুকুরে জল আনিতে গেল। পাড়ার একজন ব্রাহ্মণ গৃহিণী ডুব দিয়া কাপড় কাচিয়া ভরা কলসীটি কক্ষে লইয়া ঘাটের তক্তার উপরে কেবল উঠিয়া দাঁড়াইছিলেন। কুন্তী স্নান করিয়া আসিয়াছে, নিঃসঙ্কোচে গিয়া সেই তক্তার উপরে পা দিল। গৃহিণী ভ্রূকুটি-কুটিল বক্রদৃষ্টিতে কুন্তীর দিকে একবার চাহিয়া কলসীর জল সব গব্ গব্ শব্দে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেন,—দিয়া আবার গিয়া জলে নামিলেন। কুন্তীর চক্ষু-মুখ লাল হইয়া উঠিল,—দীপ্ত নয়ন দুটি তুলিয়া সেও গৃহিণীর দিকে একবার চাহিল। সে দৃষ্টিতে ভয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, সঙ্কোচ কিছু ছিল না। তীব্র একটা বিদ্যুৎজ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।—আহতা সর্পী যেমন করিয়া ফণা তুলিয়া চায়, ঠিক তেমনই গ্রীবা তুলিয়া বালিকা কুন্তী এই প্রবীণা গৃহিণীর দিকে চাহিল। গৃহিণী মুখ ফিরাইয়া নিলেন,—তাঁহার ক্ষুদ্র অবমাননার উদ্যম এই বালিকার তেজের সম্মুখে সত্যই যেন পরাভব স্বীকার করাইয়া নত হইয়া পড়িল।

কলসীটি ভরিয়া নিয়া গম্ভীর পদক্ষেপে কুন্তী গৃহে ফিরিয়া আসিল। ঘাটে পথে কুন্তী বড় একটা বাহির এখন হইত না। অপ্রত্যাশিতভাবে এত বড় অবমাননার আঘাত আর সে কখনও পায় নাই। আহত নারীত্ব আজ যেন তার প্রাণ ভরিয়া বিশ্বদাহী তেজে জ্বলিয়া উঠিল। তার মনে হইতেছিল, সমস্ত জগৎ—জগতের সমস্ত মানব—

সকলের সকল সংস্পর্শ সকল সাহচর্য্য হইতে—তার লাঞ্ছিত নারীত্বের মর্য্যাদা লইয়া সেই নারীত্বের আশ্রয়েই সে একা কোথাও পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়! কিন্তু হায়, সে স্থান তার কোথায়। তখন একবার চক্ষে তার জল আসিল,—কিন্তু অবিলম্বেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া নিল! ছি! এই নীচ অবমাননার বেদনা, আর তাহাতে তার এই দারুণ অসহায়তা কেহ দেখিবে? দেখিয়া তাকে বিদ্রূপ করিবে! ধিক্!

ঘরে আসিয়া কলসীটি যথাস্থানে রাখিয়া কুন্তী রাঁধিতে গেল। কমলা কহিলেন, "তুই থাক্ না? পূজোটা সেরে আমিই গিয়ে রাঁধ্‌ব এখন।"

"না, আমিই রাঁধ্‌ব।" এই বলিয়া মাতার আর দ্বিতীয় কোনও কথার অপেক্ষা না করিয়া কুন্তী গিয়া উনান ধরাইয়া দিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তখন তার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। একটা কিছু কাজে তার অশান্ত চিত্তের ব্যাপৃতি ব্যতীত ধীরভাবে তিষ্ঠান তাহার পক্ষে তখন অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

আগের দিন হইতেই বাদল চলিতেছিল, দুপুরে এক পশলা খুব জোরে বৃষ্টি হইয়া সারাটা বৈকাল টিপ টিপ করিয়া জল পড়িতেছিল। কমলা নিদ্রিতা, ক্ষেতু কোথায় গিয়াছে। কুন্তী পিছনের দরজাটির কাছে বসিয়াছিল আকাশ ভরা মেঘের আঁধার, সেই আঁধারে আর নিয়ত বৃষ্টির ধারায় নীচের গাছপালা সব আঁধার, সিক্ত কর্দ্দমাক্ত মাটি আঁধার, ঘর আঁধার, আর সকলের উপরে মনটা বড়ই আঁধার। আঁধার মন লইয়া চারিদিকে বর্ষাসিক্ত এই আঁধারের মধ্যে একা বসিয়া থাকা—সে যে কি দুঃসহ অবসাদকর একটা নিরানন্দ, তাহা, যে না কখনও অনুভব করিয়াছে, তাকে ভাষায় এমন কথা নাই, কল্পনার এমন চিত্র নাই, যাহা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে লোকে নাকি আত্মহত্যা বেশী করে। আশাহীন নিরানন্দ এমন নিবিড় হইয়া বোধ হয় আর কোথাও কোনও সময়ে মানবের চিত্তকে ঢাকিয়া চাপিয়া একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারে না।

অনেকক্ষণ কুন্তী বাহিরের মেঘাবৃত সেই বর্ষাসিক্ত গাছপালার নিরানন্দ আঁধারের দিকে চাহিয়া রহিল। কি ভাবিতে ভাবিতে এক একবার তার চক্ষু দুটি অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। একটা দম্‌কা বাতাসে কতখানি বৃষ্টির ঝাপটা সহসা মুক্ত দ্বারের মধ্যদিয়া তার গায়ে আসিয়া পড়িল। চমকিয়া কুন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল,—অশ্রু মুছিয়া মাতার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল। কমলার ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ইস্! সন্ধ্যে যে হ'য়ে এল। জলটল ঘরে আছে ত?"

"আছে।"

"রাঁধ্‌বি কি এ বেলা? কিছুই ত বুঝি ঘরে নেই।"

কুন্তী কহিল, "এ বেলা আর রাঁধ্‌তে হবে না মা। দুটি ভাত আর তরকারী আছে। ক্ষেতুর তাতেই হবে।"

"আর তুই?"

"আমার ক্ষিদে নেই।"

কমলা একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "চাল আছে, দুটি ভাত বরং রেঁধে দিই—"

"না মা, কিছু দরকার নেই,—সত্যি আমার ক্ষিদে নেই।"

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বৃষ্টি আবার তখন জোরে আরম্ভ হইয়াছিল, বাহিরের অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিতেছিল। কমলা উঁকি দিয়া দেখিলেন, ওঘরে পাকশালে উনানে আগুন জ্বলিতেছে,—দাক্ষায়ণী পাক করিতেছিলেন। বামা দুর্ব্বৃত্ত ছেলেমেয়েদের গালি দিতেছেন। কমলার একবার মনে হইল,—আজ যদি দিদির কাছ হইতে গরম দুটি ভাত আর মাছের ঝোল চাহিয়া আনিতে পারিতেন!

কুন্তী কহিল, "মা, চল না কাশী যাই।"

চমকিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া কমলা কহিলেন, "কাশী! ওমা, বলিস্ কি কুন্তী! কাশী আমরা কি ক'রে যাব? টাকা কোথায়?"

কুন্তী কহিল, "এখন যে আর থাক্‌তে পারিনে মা। চল, কাশী যাই। এই ঘরখানা বিক্রী ক'র্লে ১৫।২০টি টাকাও কি হবে না? তাতেই যাবার খরচ কুলিয়ে যাবে।"

"তা যেন গেল,—কিন্তু তারপর?"

"বামুনের মেয়ে—ভাবনা কি মা? দু'ঘরে ভাত রেঁধে যা পাব, তিনটি প্রাণীর তাতেই চ'লে যাবে। এক ক্ষেতু, তাকে যদি দু'বেলা পেট ভ'রে দুটি ভাত দিতে পারি মা—আমাদের জন্যে তার আর ভাবনা কি?"

ভিজিতে ভিজিতে ক্ষেতু তখন আসিয়া ঘরে উঠিল। কমলা ধমক্ দিয়া কহিলেন, "কোথায় গিইছিলিরে হতভাগা? জলে ভিজে এলি, জ্বর হ'য়ে যদি পড়িস্—তখন কি হবে? একটু মিছরী সাগু কিনে দেব, সে পয়সাটিও ত'আমার নেই।"

কুন্তী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তার আঁচলে ক্ষেতুর গা মাথা পুছিয়া দিল, একটু শুক্‌না বস্ত্রখণ্ড বাহির করিয়া দিল,—ক্ষেতু তাই পরিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িল।

কমলা আবার কহিলেন, "কোথায় গিইছিলি এই বৃষ্টিবাদলে?—রাত হ'য়ে এল, চোকে দেখিস্‌নি কিছু?"

ক্ষেতু কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, "কেষ্টদের বাড়ীতে খেলা কচ্ছিলাম মা,—তা কেষ্ট বল্লে তাদের নারায়ণসেবা হবে—"

বলিতে বলিতে ক্ষেতু কাঁদিয়া ফেলিল। কুন্তী কহিল, "তাই বুঝি এতক্ষণ হা ক'রে সেখানে ব'সেছিলি? এত বলি, তবু তোর একটু শিক্ষা হ'ল না ক্ষেতু?"

ক্ষেতু কহিল, "আমি ত থাক্‌তে চাইনি,—তা কেষ্ট কিছুতেই আস্‌তে দেবে না। মিছেমিছি আমাকে ধ'রে রাখ্‌ল দিদি।—কত আম, কাঁটাল, চিনি, বাতাসা, দুধ, দই,—পুরুতঠাকুর এসেছে—তা আমাকে ঘরেও ঢুক্‌তে দিলে না। কেষ্টর জ্যাটাইমা ব'ল্লে, তুই এখন ঘরে আসিস্‌নে ক্ষেতো—সন্ধ্যে হ'য়ে এল—যা ঘরে যা।"

কুন্তী চক্ষু মুখ যেন জ্বলিয়া উঠিল,—তীব্রস্বরে সে কহিল, "আর কেন মা? চল, কাশীতেই চল। সেখানে সবারই স্থান আছে।"

কমলা চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "আমাদের মত অভাগীর স্থান কাশীতেও কি আছে কুন্তী?"

"থাক্‌লে সেথায়ই আছে মা,—এখানে আর নেই। ভাত রেঁধেও দুটি খেতে সেখানে পাব,—কিন্তু এখানে যে ঘরে ব'সেই উপোস ক'রে ম'র্তে হবে। কাজ ক'রে খাবারও যে ঠাঁই আর নাই।"

কমলা ধীরে ধীরে কহিলেন, "বিদেশ—বিঠাঁই,—কে জানে, যদি চোক্ বুজি—একা তুই—এই কাঁচা বয়সে—কোথায় যাবি? কার আশ্রয়ে গে দাঁড়াবি?"

কুন্তী উত্তর করিল, "ধর্ম্ম আছেন, দেবতা আছেন,—তাঁদের ছাড়া—এখানেই বা কোথায় কি আশ্রয় আমাদের আছে মা? তবু খেটে দুটি সেখানে খেতে পাব। এখানে যে কোনও উপায়ই নেই।"

কমলা কহিলেন, "বড় ভয় পাই মা! কাশী—বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন—শুনেছি যায়গা মোটেই ভাল নয়—"

কুন্তী উত্তর করিল, "ধর্ম্ম যদি রক্ষে করেন মা,—কোথাও কারও কোনও ভয় নেই। কিছু ভেবো না,—আমি ভয় করি না।—চল, কাশীতেই যাই। কালই খোঁজ নেও, ঘর কারও কাছে বেচ্‌তে পার কিনা।"

কমলা তখন আর কিছু বলিলেন না। নীরবে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে ক্রমেই জোরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ঘন ঘন মেঘগর্জ্জনও হইতেছিল। দুটি ভাত আর একটু তরকারী ছিল,—ক্ষেতু খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। প্রদীপটি নিভাইয়া দিয়া কুন্তীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কমলা শুইয়া পড়িলেন। বড় দুর্য্যোগের রাত্রি ছিল সে দিন। কিন্তু এই মাতা ও কন্যার অন্তরে যে আঁধার দুর্য্যোগ বহিতেছিল,—বাহিরের এই দুর্য্যোগ—সে আর তার কাছে কতটুকু!

(৪২)

ঘরদুয়ার বেচিয়া কন্যাকে লইয়া গিয়া কাশীবাসিনী হইবেন, এ কথাটা কমলার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। দেশেও অবশ্য তিষ্ঠান বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু তবু শক্ত হইয়া থাকিতে পারিলে, এ কলঙ্কের কথা লোকে একদিন হয়ত আর মনে করিবে না। কারণ, ইহাদের আচরণে ক্রমে লোকে বুঝিবে, কথাটা একেবারেই ভিত্তিহীন! কিন্তু এই কলঙ্ক মাথায় করিয়া কাশী গেলে, জীবনে আর মাথা হইতে তাহা নামিবে না! এই সব কলঙ্কে যারা কলঙ্কিত, কাশীই তাদের আশ্রয়। সেখানে গেলে লোকে কিনা বলিবে? ছি! আত্মীয়স্বজন-সমাজে আর যে কখনও মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। ওই ক্ষেতু—আজ বালক—একদিন ত বড় হইবে।—দেশে ফিরিয়া আসিলে জ্ঞাতি-বান্ধব সকলেই তাকে এই কথা তুলিয়া খোঁটা দিবে। তারপর কাশী—হউক্ বিশ্বনাথের ক্ষেত্র—এই পাপ কলিতে বহু পাপ সেখানে দেখা দিয়াছে! এরূপ অনূঢ়া যুবতী কন্যা লইয়া তাঁহার মত নিঃসহায়া বিধবার পক্ষে কাশীতে গিয়া বাস করা নিরাপদও নহে। এ দিকে কুন্তীও বড় শক্ত হইয়া বলিতেছে, দেশে আর থাকিতে পারে না, কাশী যাইবে। কি বলিয়া তাহাকে তিনি বুঝাইবেন? সে যা বলিতেছে,

তাহাও ত অযৌক্তিক কিছু নয়। সামাজিক বৈঠকে প্রকাশ্য কোনও শাস্তিবিধান না হউক, গ্রাম্য-নারীরা একরূপ জাতিচ্যুতই তাঁহাদিগকে করিয়া রাখিয়াছে,—অনেক খোঁটাও শুনিতে হইতেছে। এ সবও যদি সহ্য করিয়া থাকা যায়, পেটের দুটি ভাত—তার পথও যে প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। কি উপায় তিনি এখন করিবেন? অসহনীয় দুশ্চিন্তায় দীর্ঘ দুর্য্যোগের রাত্রি একেবারে বিনিদ্র হইয়া তিনি কাটাইলেন। দেশ ছাড়িয়া কাশী যাইবে, সকল লাঞ্ছনা হইতে মুক্তিলাভ করিবে,—এই আশার শান্তিতে কতকটা স্থিরচিত্ত হইয়া কুন্তী শেষে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সারাটি রাত্রি কমলা নিজে দুটি চোকের পাতা এক করিতে পারিলেন না।

পরদিন বৈকালে ভবানী আসিয়া যখন কহিলেন, শরৎ কুন্তীকে বিবাহ করিবে,—কমলা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। ভবানী কহিলেন, "রাঢ়ীবারেন্দ্রে বিয়ে চল নেই,—সামাজিকরা গোলমাল একটু ক'র্‌বে। তা ছেলেরা দল বেঁধেছে, সবাই বিয়েতে আস্‌বে, খাবে। সব ঘরই প্রায় আট্‌কা প'ড়্‌বে তাতে। কে কাকে কি ব'ল্‌বে বোন্? আর রাঢ়ী হ'ক্, বারেন্দ্র হ'ক্,—বামুন ত সবাই। শুনেছি, শাস্তরের বাধা কিছু নেই।—তবে রীত নেই, এই যা কথা। তা সবাই যদি এসে জোটে—এই শেষে রীত হ'য়ে যাবে। তা তোমার ত কোনও খুঁৎখুঁতি নেই বোন্?"

কমলা সাশ্রুনয়নে উত্তর করিলেন, "আমার আর কি খুঁৎখুঁতি হবে দিদি? যে দুর্গতিতে পড়েছি, আমার কি আর খুঁৎখুঁতি কিছু এতে হ'তে পারে? বামুনের ছেলে—যে দয়া ক'রে নেবে, তার হাতেই যে ওকে এখন দিতে পারলে বাঁচি দিদি। বড় দুঃখী আমি দিদি! পেটের অন্ন, জাত-মান সব হারিয়েছিলাম,—একেবারে অকূলে ভেসেছিলাম। সেই অকূলে আজ কূল পেলাম দিদি,—নিবু তোমার রাজা হ'ক্, ছেলেরা সব লক্ষ্মীশ্বর হ'য়ে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করুক্।"

ভবানী কহিলেন, "তা হ'লে, বোন্, উদ্যোগ ক'রে বিয়েটা এখন দিয়ে ফেল্‌তে হয়। এই ত কলেজ খুলে এল—ওরা বাড়ীতে সব থাক্‌তে থাক্‌তেই যে সব সেরে ফে'ল্‌তে হবে।"

কমলা একটি নিশ্বাস ছাড়িলেন,—ধীরে ধীরে একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, "কিছুই যে সম্বল নেই দিদি——"

ভবানী উত্তর করিলেন, "সম্বল ত নেই-ই। আজও নেই,—কালও নেই। তা সে জন্যে তোর কিছু ভাব্‌তে হবে না। ওরা এক সন্ধ্যে খাবে—সে ওরাই তার ব্যবস্থা ক'রে নেবে। আর গায় হলুদ, নান্দীমুখ, আর ধরগে কনের চেলী বরের জোড়—দানসামগ্রী কিছুই দরকার নেই তবে ফুলশয্যের কাপড় চোপড় আছে—তা সে সব হ'য়ে যাবে,—তুই ভাবিস্‌নি কিছু। যার কেউ নাই, সবার উপরেই তার দাবী দাওয়া আছে। নইলে সমাজ সামাজিক্‌ত্তে কেন? কেবল ঘোঁট ক'রে দুর্ব্বলকে জব্দ কর্‌বার জন্যে? তা হ'লে সমাজ ছেড়ে লোকে বনে গিয়ে থাক্‌লেই পারে?"

কমলা সাশ্রুনয়ন অঞ্চলে মার্জ্জনা করিতে করিতে কহিলেন, "না দিদি, আমার আর লজ্জা কি? আমি ভিখিরী—ভিখিরীর কি আর লজ্জা কিছু আছে? তোমাদের পাঁচজনের দয়ার আশ্রয়েই ত আছি।—আজ যে শরৎ কুন্তীকে বিয়ে ক'র্‌বে, সেও তোমাদের দয়া। আর বিয়েটা যে নির্ব্বাহ হবে, সেও তোমাদের দয়াতেই হবে। নইলে আমার আর সাধ্য কি দিদি?"

কমলার হাত দুটি ধরিয়া ভবানী কহিলেন, "ছি, অমন কথা ব'ল্‌ছিস্ বোন্? কে কাকে দয়া ক'ত্তে পারে? পাঁচজন আত্মীয়-বান্ধব আমরা এক যায়গায় আছি, কার দিন কখন কেমন হবে কে জানে? দুঃখে বিপদে সবারই যে সবার পাশে এসে এম্‌নি দাঁড়াতে হয়। আজ তুই দুঃখে প'ড়েছিস্, কাল, কে জানে, আমি হয়ত এর চাইতেও বড় দুঃখে প'ড়ব,। তখন——"

"বালাই! বালাই! অমন কথা মুখেও এনো না দিদি! ষাট্, যাদব নিবু তোমার বেঁচে থাক্—রাজা হ'ক্,—কেন তুমি দুঃখু পাবে? কেন পরের দয়া চাইবে?"

ভবানী উত্তর করিলেন, "ঠাকুর সবাইকে ভাল-ভালাইতে রাখুন, বাকী কটা দিন যেন এই ভাবেই কাটিয়ে যেত পারি। তবে কি জানিস্ বোন্, কিছুরই দর্প ক'ত্তে নেই—দর্পহারী নারায়ণ মাথার উপরে আছেন। দিতেও তিনি, আবার নিতেও তিনি। মানুষ কিসের জোর, কিসের দর্প ক'ত্তে পারে? সে যাক্ গে,—তা হলে শীগ্‌গিরই একটা দিনটিন্ দেখে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করা যাক্।"

"সে তুমি জান দিদি! কুন্তী আর আমার নয়,

তোমাদেরই।—যা ভাল হয় ক'র্‌বে। আমি আর কি ব'ল্‌ব দিদি ?"

ভবানী গৃহে ফিরিলেন। কমলা উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। কুন্তী দ্বারের আড়ালেই বসিয়াছিল,—কমলা চাহিয়া দেখিলেন, মুখখানি তার লাল হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত—আরক্ত! মাতার দিকে একবার চাহিয়াই সে উঠিয়া বাহিরে গেল। খিড়কীর পুকুরঘাটে মায়ের পাকের বগুনাটি ভিজান ছিল,—তাড়াতাড়ি গিয়া তাই মাজিতে বসিল। কমলা কিছু বিস্মিত হইলেন,—তাই ত, ও কি ভাবিতেছে!

রাত্রিতে প্রদীপটি নিভাইয়া কমলা যখন শয়ন করিলেন, কুন্তী শয্যার পাশে বসিয়া রহিল।

কমলা কহিলেন, "ব'সে রইলি যে! শো না ?"

কুন্তী কহিল, "মা, একটা—কথা তোমায় ব'ল্‌ব।"

"কি লো ?"

"কাল—নিবুদাকে একবার আস্‌তে ব'ল্‌বে ?"

"নিবুকে! ও মা, কেন লো ?"

"আমার একটা কথা আছে, তার সঙ্গে।"

কমলা অতি বিস্ময়ে কহিলেন, "বলিস্ কি কুন্তী! তার সঙ্গে আবার কি কথা তোর ? ছি! লোকে দেখ্‌লে কি ব'ল্‌বে ? এম্‌নিই ত কথার অন্ত নেই!"

কুন্তী উত্তর করিল, "কথা—যা ব'ল্‌বার তা ত ব'ল্‌ছেই। বেশী আর কি ব'ল্‌বে ? যাই বলুক্, কালই একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা ক'র্‌তেই হবে। বস মা, তাঁকে একবার আস্‌তে ব'ল্‌বে।" দুই হাতে মাতার হাতখানি কুন্তী চাপিয়া ধরিল।

কমলা কহিলেন, "কি জানি বাছা, তোদের রকম আমি কিছু বুঝি না। তার সঙ্গে আবার এখন কি কথা তোর ? কেন, কি বল্‌বি ?"

বড় গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস কুন্তী ত্যাগ করিল,—কহিল, "কি ব'ল্‌ব, তা এখনই তোমায় ব'ল্‌তে পার্‌ছি না মা। দোহাই তোমার মা, এই কথাটি আমার রাখ। তুমি যদি না বল মা, আমাকেই ব'লে পাঠাতে হবে। একটিবার—কালই একটিবার—তাঁর সঙ্গে আমার দেখা ক'র্‌তেই হবে।"

কন্যার দৃঢ়তার কাছে বরাবরই কমলা কিছু হার মানিয়া চলিতেন। কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অগত্যা শেষে তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, তবে ব'লে পাঠাব আস্‌তে। কি যে তাকে ব'ল্‌বি তুই, তা ত ভেবেই কূল পাচ্ছি নে। নে, এখন শো বাছা। আর ভাল লাগে না। ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার মাথা ঘুরে গেল। এমন কপালও ক'রে এসেছিলাম, পোড়া যমেও যদি চোকে দেখে!"

মার পাশে শুইয়া মাকে কুন্তী জড়াইয়া ধরিল,—অশ্রু-ধারায় মার বুকখানি সিক্ত হইতেছিল। স্নেহে তার অশ্রু-মার্জ্জনা করিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া মা কহিলেন, "চুপ কর্ চুপ কর্ আবাগী! আর কাঁদিস্ নে। দেবতার দয়ায় দুঃখের দিন ত শেষ হ'য়ে এল!"

(৪৩)

পরদিন দুপুরের পর নিবারণ আসিল। কন্যার ইচ্ছায় কমলা নিজের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আগেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। মুক্তদ্বার গৃহের মেঝের কুন্তী নিবারণকে বসিতে দিল,—নিজে একটু সরিয়া সম্মুখে মাটিতে বসিল। তাহাদের এ সাক্ষাৎ লোক-চক্ষুর অন্তরালে না ঘটে, ইহা ত প্রয়োজনই বটে,—কেহ ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া শুনিলেও বোধ হয় কুন্তীর আপত্তি ছিল না। আপত্তি যা ছিল, মাতার উপস্থিতিতে,—কারণ তিনি প্রতিবাদ করিয়া তাহার এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য পণ্ড করিতে পারেন।

কুন্তী কহিল, "নিবুদা, নির্লজ্জ হ'য়ে আজ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি, একটি কথা ব'ল্‌ব ব'লে। কথা যা, তা তোমাকেই ব'ল্‌বার। আর কারও মুখে ব'লে পাঠালে, হয়ত ঠিক সে আমার কথাগুলি বুঝিয়ে তোমায় ব'ল্‌তে পারত না,—তাই নিজেই তোমাকে ব'ল্‌ব ব'লে ডেকে পাঠিয়েছি।"

"কি কথা কুন্তী ?"

নিবারণ যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছিল,—বড় একটা সঙ্কোচও বোধ করিতেছিল। আজ এই বালিকার সম্মুখে নির্ভীক্ তেজস্বী সেও যেন কেমন দমিয়া এতটুকু হইয়া যাইতে-ছিল,—বুকের মধ্যে তার থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কুন্তী কহিল, "নিবুদা, আমরা বড় দুঃখী তা জানি। অদৃষ্ট মন্দ, অনেক দুঃখ পাচ্ছি,—কিন্তু দুঃখে কাতর নই। বিধাতা যদি দুঃখ দিয়েছেন, সইবার মত শক্তিও দিয়েছেন। দুঃখ সবই সইতে পারতাম, কিন্তু এ অপমান আর সইতে পারি নে।—কেন তোমরা এত অপমান আমাদের ক'চ্ছ ?"

"অপমান! সে কি কুন্তী!"

কুন্তী তেমনই উত্তেজিত-স্বরে উত্তর করিল, "দুঃখ যতই পাই, তোমাদের দয়া কখনও চেয়েছি ? কেন, যেচে এত দয়া তোমরা ক'র্‌তে এসেছ ? মা দুঃখী, পাত্তেন বিয়ে দিতেন,—না পাত্তেন, কুলীনের মেয়ে ত, বিয়ে নাই হ'ত। গাঁয়ে ত গরীবের মেয়ে আরও আছে।—কই, আর কারও জন্যে ত এত দয়া তোমাদের দেখি নে! আমি কি এতই হীন, এমনই পথে পড়া অনাথ একটা ভিকিরী মেয়ে—যার মান-ইজ্জৎ কিছুই নেই—যাকে নিয়ে যা খুসী তোমাদের ক'র্‌তে পার ? আজ এর হাতে, কাল ওর হাতে—যে যখন দয়া ক'রে নেবে, তার হাতেই বিলিয়ে দিতে পার ? তার তাতে যত কালীই আমার গায়ে এসে পড়ুক্,—সেটা যেন কিছুই নয়, সেই কালী নিয়েই আবার আমি তোমাদের ধন্যি ধন্যি ক'রে, যার ঘরে তুলে দেবে, তার ঘর কাল ক'র্‌তে যাব!"

"কুন্তী!" বড় ব্যথিতস্বরে এই একটি মাত্র কথা নিবারণের মুখে ব্যক্ত হইল।

কুন্তী কহিল, "নিবুদা! রাগ ক'রো না, মনে কোনও ব্যথা পেও না আমার কথায়! বড় দুঃখে কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরোল। হয়ত গুছিয়ে ব'লতে পারিনি,—মনটা ভ'রে কদিন ধ'রে আমার আগুণ জ্বলছে। কিন্তু ভুল বুঝো না, তোমাকে ব্যথা দিতে আমি চাইনি। তুমি—তুমি—নিবুদা! হাঁ, সত্যি তুমি বড় ভাল। স্নেহ কর,—আমিও—হাঁ, আপনার জনের মতই তোমাকে দেখি তাই মন খুলেই সব কথা তোমাকে ব'লতে পারলাম। আর কাউকে—বোধ হয়—পারতাম না। কিন্তু ভুল বুঝো না, মনে যদি তোমার ব্যথা দিয়ে থাকি, ক্ষমা ক'রো।"

নিবারণ কহিল, "কুন্তী! অনেক ভুল আমরা ক'রেছি। বড় দুর্ভাগ্য—তার যা কিছু শাস্তি তা তোরই উপর এসে প'ড়েছে। কিন্তু যা হবার তা হ'য়েছে। উপায় আর কিছু নাই। এখন এই যা এক প্রতিকার এর হ'তে পারে—তাই আমরা ক'রব স্থির ক'রেছি। সব অপরাধ ক্ষমা ক'র্—রাগ ক'রে তাতে বাদী হ'স্ নে।"

কুন্তী উত্তর করিল, "রাগ করিনি নিবুদা, সত্যি ভুল বুঝো না। যা হ'য়েছে, সব ভুলে যেতে পারি। কিন্তু যা ব'লছ, তা পারব না, প্রাণ থাকতে পারব না। জিদ ক'রো না,—জোর ক'রে আর এ দয়া ক'ত্তে চেও না। তা বরদাস্ত হবে না।"

"ভুল বুঝিস্ নি কুন্তী। শরৎদা—"

"তাকে আমার প্রণাম দিও নিবুদা। তাঁর দয়ার পার নাই। কিন্তু এত বড় দয়া কারও আজ আমি নিতে পারি না। ছি! দুঃখী ব'লে আমার কি ঘৃণ লজ্জা কিছুই থাকতে নেই!"

"তবে কি—আমাকেই এমন চির অপরাধী ক'রে রাখ্‌বি কুন্তী?"

"তোমাকে! তোমাকে অপরাধী ক'রে রাখ্‌ব! ছি! এমন কথা ব'লছ নিবুদা! তোমার দোষ কি? অদৃষ্ট আমার মন্দ, যা হবার তা হ'য়েছে। তুমি কেন আপনাকে অপরাধী তাতে মনে ক'রবে? তবে অপমানটা মনে বড় বেজেছিল, দু কথা ব'লে ফেলেছি। ক্ষমা ক'রো, মনে কিছু রেখো না। বল, আমাকে ক্ষমা করলে! বল, মনে কিছু রাখ্‌বে না। সব সইতে পারব নিবুদা, কিন্তু তুমি যদি মনে কোনও ব্যথা রাখ, তা—তা—সইতে কখনও পারব না———"

বলিতে বলিতে কুন্তী কাঁদিয়া ফেলিল। ধিক্! এ কি সে করিতেছে! কেহ দেখিলে কি বলিবে? সহসা উঠিয়া কুন্তী ঘরের এক কোণের দিকে সরিয়া গেল। অতি আয়াসে আত্ম-সম্বরণ করিয়া, চক্ষু মুছিয়া আবার আসিয়া ধীরভাবে বসিল।

নিবারণ কতক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। তারপর কহিল, "আমার কথা ভেবে কোনও দুঃখ পাস্‌নি কুন্তী। তুই আমার ছোট বোন্,—রাগ ক'রে হ'ক্, আবদার ক'রে হ'ক্, দু কথা আমাকে ব'লতে পারিস্ বই কি? তাতে কি আমি রাগ ক'ত্তে পারি?" ঈষৎ আরক্ত ছল ছল চক্ষু দুটি তুলিয়া নিবারণ কুন্তীর মুখের দিকে একবার চাহিল।—কুন্তী মুখ ফিরাইয়া নিল,—বিদ্রোহী অশ্রু আবার চক্ষু ভরিয়া উঠিতেছিল। অতি ক্লেশে সে আপনাকে একটু সামলাইয়া নিল।

নিবারণ কহিল, "তা হ'লে এখন—কি ক'রব কুন্তী?"

কুন্তী মুখ ফিরাইয়া বসিয়াই রুদ্ধপ্রায়-কণ্ঠে উত্তর করিল, "কি ক'রবে? যাকে ব'লেছিলাম, কাশী যাব। তাই যাতে যেতে পারি, ব'লে ক'য়ে ক'রে দেও।"

"কাশী! কি সর্ব্বনাশ! কাশী যাবি কেন?"

কুন্তী কহিল, "এখানে যে আর দিন চলে না। সেখানে মায়ে ঝিয়ে ভাত রেঁধেও দুটি খেতে পাব।"

নিবারণ গাঢ়স্বরে উত্তর করিল, "দুটি ভাতের জন্যে দেশ ছেড়ে কাশী যাবি কুন্তী? এদ্দিন ত যাবার দরকার হয় নি। আজ দেশে কি তোদের দুটি পেটের ভাতেও বাদ সাধলাম!"

কুন্তী কহিল, "না না নিবুদা। তোমরা কি বাদ সেধেছ? দেশে—দেশে—আর যে থাকতে পারি নে—"

কুন্তীর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। নিবারণ কহিল, "এমন তেজী মেয়ে তুই কুন্তী, একটা মিছে কথার ভয়ে পালিয়ে শেষে কাশী গিয়ে লুকুবি? লোকুকে বুঝতে দিবি, এত বড় মিছে কথাটাই সত্যি! আর আমার মাথায়ও এত বড় একটা অপরাধ রেখে যাবি! জীবন ভ'রে যে এই স্মৃতি আগুণের মত আমায় দগ্ধ ক'রবে কুন্তী।"

কুন্তী একটু কাল নীরবে থাকিয়া শেষে কহিল, "ভয়ে—পালাতুম না। দেশে থেকে খেটে দুটি খেতে পারি, কোনও পথ তার বলে দিতে পার নিবুদা?"

নিবারণ একটু ভাবিয়া উত্তর করিল, "পারি! একটা পাঠশালা ক'রে ছোট ছোট মেয়েদের পড়াতে পারবি? একটু ত লেখাপড়া শিখে'ছিস্। বড় হয়েছিস্, বুদ্ধি আছে—ক্রমে আরও শিখে নিবি।"

কুন্তীর মুখখানি একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই আবার শুকাইয়া গেল, কহিল, "আমার কাছে কেউ কি মেয়ে প'ড়তে দেবে?"

"দেবে!—দেয়, তা আমরা দেখ্‌ব। তোর ভাবতে হবে কিছু। কেমন ক'রবি তাই? পারবি ত?"

"পারব। এই দয়া আজ তোমাদের কাছে ধন্য হ'য়ে নেব নিবুদা। তোমরা ঠিক ক'রে দেও, মেয়েদের আমি পড়াব। তা যদি পারি নিবুদা, সুখেই দেশে থাকব।"

"আচ্ছা, তাই হবে। উঠি তবে আজ কুন্তী। আমি তোর ভাই, বোনের মত সব দাবী তোর আমার উপরে আছে। এটা কখনও ভুলিস্ নি যেন। পাঠশালা তোকে ক'রে দেব,

কিন্তু দুদিন দেরী হয়ত হ'তে পারে। কিছু ক্লেশ তোদের হয়ত হবে। কিন্তু সে ক্লেশ আমি তোদের পেতে দেব না। আমার এ দাবী যদি না মানিস্, কিছু ক'র্‌ব না তবে। খুসী তোর কাশী যা, কি যমের যা—কিছু আর ব'ল্‌ব না। কেমন শুন্‌বি ত আমার কথা?" এই বলিয়া নিবারণ উঠিয়া দাঁড়াইল।

"শুনচ। ছোট বোন্‌ ব'লে স্নেহ ক'রো, তোমার পায়ের তলে প'ড়ে থাক্‌ব।"

গলবস্ত্র হইয়া কুন্তী নিবারণকে প্রণাম করিয়া তার পদ-ধূলি লইল।

নিবারণ কহিল, "আশীর্ব্বাদ করি, দিদি, তোর গৌরবে আমাদের এই গ্রাম ধন্য হ'ক্।"

সম্পূর্ণ।

বরষা

"এ ভরা বাদরে"　　ঝর্ ঝর্ ঝরে,
অবিশ্রাম বারি ঝরে যায়।
অতিশয় শ্রান্ত তায়
অবসন্ন হৃদি কায়,
বসুন্ধরা রহিয়াছে পড়ে।

সে যে　　বিরহিনী সম হায়,
রয়েছে নিস্তব্ধ তায়!
শব্দ শুধু বর্ষা-ধারা করে।

বল কার মমতায়,
ছুটিছে পাগল প্রায়,
ওরে চঞ্চল বারি-ধারা রে!
প্রকৃতি যে আজি হায়,
তোর পথ পানে চায়,
বিষাদিত, তৃষিত-অন্তরে।
এসেছ কি এ ধরায়,
জুড়াতে সে ব্যথিতায়!
দিবে তব প্রেম-বারি তারে?

কিম্বা সাগরের গায়　　মিশাইবে আপনায়
সেথা তুমি হয়ে যাবে লীন।
তবু, পাইবে'গো পূর্ণতায়,　　বাঞ্ছিত যা এ ধরায়,
হইয়াও ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ।

"এ ভরা বাদরে"　　ঝর্ ঝর্ ঝরে,
অবিশ্রাম ধারা বহে যায়!

এ ঘোর বাদল ঝড়ে,
শূন্যতা মনেরে ঘেরে,
নিবারিব কেমনে গো তায়!
মন মোর দূরে দূরে
কাহার সন্ধান তরে
ধারা-স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়!
আজি প্রাণ চাহে যারে,
খুঁজে নাহি পায় তারে;
কাঁদিয়া বেড়ায় নিরাশায়।
এবে কে জুড়াবে মোরে!
কি বেদনা বুক ভ'রে!
ব্যাকুলতা প্রাণে বহে যায়।

হৃদি মন চাহে যায়　　কভু কি গো পাব তায়?
ঘুচিবে এ বিষাদ মলিন!
নয়, কাটাইয়ে এ মায়ায়,　　নিবারিয়া সে আশায়,
হয়ে যাব দীন হতে দীন।

"এ ভরা বাদরে"　　ঝর্ ঝর্ ঝরে,
অবিশ্রাম বারি ঝরে যায়!
এ ঘন বাদলে ঘেরে
কত কথা মনে পড়ে
মনেতে বিলীন হয়ে যায়।

শ্রীভারতী বসু।

রঙ্গকৌতুক

(১)

"কাশীতে ম'লে শিব হয়।"

"তাই নাকি দিদি! আহা, মিন্সের কি পুন্যিই ছিল। ভুগে ভুগে শেষে কাশীতেই ত ম'ল। কোনও ওষুধে কিছু হ'ল না। হবে কেন? পুন্যির টান।

"ওমা, সে যে ম'ল যক্ষে কাশীতে?"

"তা যক্ষেকাশীতে কি হয় দিদি? যক্ষি? তাই বা মন্দ কি? যক্ষি হ'য়ে কত টাকাকড়ি আগ্‌লে রাখ্‌বে,— আমি যখন যাব, গা ভরা গয়না গড়িয়ে দেব। আহা, আমিও যেন যক্ষে কাশীতেই মরি দিদি!"

(২)

মোক্ষদা।—এখন কি আর সতী কেউ আছে। সে ছিল আগে, সোয়ামী মলে অম্‌নি সমরণে যেত।

সারদা।—সত্যি, এখন কেন কেউ সমরণে যায় না ভাই?—

মোক্ষদা।—কি ক'রে যাবে? কোম্পানীতে আইন ক'রেছে কেউ সমরণে যেতে পার্‌বে না।

সারদা।—ওমা, একি অধর্ম্মের কথা। একটা আইন ক'রে দেশ শুদ্ধ মেয়েদের সব অসতী ক'রে দিলে? আচ্ছা, ধর, কেউ যদি যায়, তবে কি হয়?

মোক্ষদা।—শুনেছি ত ফাঁসী হয়।

সারদা।—ওমা, সোয়ামীর কাছে স্বর্গে যাবে,— সেখানে গিয়ে কি ক'রে ফাঁসী দেবে?

মোক্ষদা।—কোম্পানীর যে প্রতাপ বোন্, স্বর্গে কেউ গেলেও ধ'রে এনে ওরা ফাঁসী দিতে পারে।—

(৩)

"এমন কপালও ক'রেছিলাম, কোনও দেবতার নাম যদি পাপমুখে আন্‌তে পারি?"

"কেন লো, মুখে তোর এমন কি পাপ হ'ল?

মুখে কি আর পাপ ছিল দিদি? যত পাপ নাম এসে এক সংসারে জুটেছে। ভাসুরের নাম কালী, মিন্সের নাম কৃষ্ণ, শশুরের নাম কাদাফেষ্ট, শাশুড়ীর নাম ফুগ্‌গো, খুড়-শশুরের নাম হরি। পরের ঘরের যে দুই মামাশশুর তাদেরও নাম দেখ রাম আর শিব। কোন নামটা মুখে আন্‌ব বল?"

(৪)

"শব্দসম্পদ কাকে বলে?"

"টাকার ঝন্ ঝনিকে।"

"এই যে লিখেছে 'বাঙ্গালার শব্দসম্পদ কম?' তার মানে কি?"

"টাকার নোট হ'য়েছে কি না, শব্দ সম্পদ আর বড় শোনা যায় না। তাই ওকথা লিখেছে।"

(৫)

ব্রাহ্মণী।—ঘরে যে জল পড়ে গো!

পণ্ডিত।—জল পড়ে! অঁা! কোথা থেকে?

ব্রাহ্মণী।—আকাশ থেকে, আবার কোথা থেকে প'ড়্‌বে! চালে যে খড় নেই।

পণ্ডিত।—আকাশ থেকে পড়ে। আহা, সে যে দৈবানুগ্রহ! পুরুষকার দ্বারা খাত ক'রে পাতাল থেকে আর জল আন্‌তে হবে না,—শাস্ত্র বাক্য আছে—

"পততি কদাচিন্নভসঃ
খাতে পাতালতোঽপি জলমেতি।
দৈবমচিন্ত্যং বলবৎ
বলবানপি পুরুষকারোঽপি॥"

(৬)

"অব্যয় কাকে বলে?"

"যার ব্যয় হয় না—অর্থাৎ কৃপণের ধন।"

(৭)

"ঠাকুরঝি নেই; সংসারেই আর চলে না ভাই।"

"কি ক'রে চ'ল্‌বে? তোমার হ'ল ব্যামোর শরীর, ঠাকুর নেই, রাঁধ্‌বে কে? ঝি নেই, বাসনমাজা, জল-তোলা এই সবই বা কে করে?"

(৮)

"স্বামী বলে' অধিকারীকে?"

"ওমা সে কি! যাত্রার দলও নেই, পাঁচালীর দলও নেই,—কিসের অধিকারী তবে?"

দেশের ও দশের কথা

রাণীর সৎকার্য্য।—উড়িষ্যা আটগরের রাণী সম্প্রতি অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বৃষ্টি পড়িলেই তিনি আটগড়ের দরিদ্র কৃষকদিগকে বিনামূল্যে বীজধান বিতরণ করিবেন। রিলিফ কার্য্যে প্রজাদিগকে নিযুক্ত রাখিবার জন্য রাজ্যের ভিতর কয়েকটি পুষ্করিণী খননও আরম্ভ করিয়া ছিয়াছেন। দেবমন্দির সমূহের জীর্ণ সংস্কার চলিতেছে।

(এডুকেশন গেজেট)

দান।—মাসিক ২০৲ বেতনের দরিদ্র পণ্ডিত বাবু রাজচন্দ্র আইচ অতিকষ্টে যে পাঁচশত টাকা জমাইয়াছিলেন তাহা সমস্তই চট্টগ্রাম সাতকানিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ তহবিলে দান করিয়াছেন। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ দাতার নাম চিরস্মরণীয় করণোদ্দেশে স্কুল লাইব্রেরীতে তাঁহার একখানা প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রবাবুর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ লাইব্রেরী ও আফিস প্রকোষ্ঠ পণ্ডিত রাজচন্দ্রমহল নামে অভিহিত হইবে।

(এডুকেশন গেজেট)

জলকষ্ট ও জমীদার।

জলকষ্টে দেশে যে হাহাকার উঠিয়াছে আমরা গত সপ্তাহে তাহার সামান্য পরিচয় দিয়াছি। সরকার বাহাদুর দেশের জলকষ্টের কথা সবিশেষ অবগত আছেন। এবিষয়ে সরকার বাহাদুরের প্রতিকার চেষ্টা প্রচুর না হইলেও উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু জলকষ্ট নিবারণে জমীদারদের যে কিছু কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, সে কথা তাঁহারা একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছেন। নিজেরাও রায়তের হিতার্থ ইন্দারা পুকুর কাটান না। রায়ত ইন্দারা পুকুর কাটিতে উদ্যত হইলেও নজরের দাবী দাওয়া করিয়া বাধা জন্মান।

মজা পুকুর।—দেশের বড় বড় দীঘিপুষ্করিণীগুলি সংস্কার অভাবে মজিয়া যাইতেছে। তাহাতে একদিকে দেশের জলকষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। অপরদিকে মজা পুকুরের জল পচিয়া দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। যে মশা ম্যালেরিয়া বিস্তার করে, এই সকল মজা পুকুর সেই মশার জন্মস্থান। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—মজা পুকুরগুলির মালিক জমিদার ও তালুকদার। সরিকী বিবাদে তাঁহারা অবসন্ন। মজা পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়া দেওয়ার সৎপ্রবৃত্তিও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা অনেকেই নগরবাসী হইয়াছেন। তাঁহাদের পুকুর পচিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল করুক মন্দ করুক সে বিষয়ে তাঁহারা ঘোরতর উদাসীন।

একটী প্রস্তাব।—মজা পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার জন্য জমীদারের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া কোন ফল নাই। আমাদের একটি প্রস্তাব এই—ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড লোকালবোর্ড ও গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ঐ সকল মজা পুকুর সংস্কার করিয়া নেওয়ার জন্য প্রথমতঃ জমীদারের উপর নোটিশ করা হউক। তাহাতে যদি ফল না হয় তবে বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি ঐ সকল পুকুর 'একোয়ার' করিয়া তাহা ডাক নীলামে রায়তদের নিকট বিক্রী করিয়া দিন। একোয়ার করিতে বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির যে টাকা ব্যয় হইবে ডাক নীলামে পুকুর বেচিয়া দিয়া সেই টাকাটা অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। কাজটুকু করিতে বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির কোন নূতন ব্যয়বৃদ্ধির ভয় নাই। অধিকন্তু দেশের জলকষ্ট সমস্যা এই উপায়ে কতক উপশম হইতে পারে। মজা পুকুর এইরূপে লোপ করিতে পারিলে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিরও কতকটা আশা করা যায়।

(রায়ত)

খাজনা লওয়ার অত্যাচার।

ভূম্যধিকারী রায়তদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার সময় ছলে বলে কৌশলে, অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া, নির্দ্দিষ্ট দেয় খাজানার অতিরিক্ত নানারূপ আবুয়াব ও বাজে খরচ আদায় করিয়া থাকেন। যে যে তারিখে প্যায়দা খাজানার জন্য প্রজাকে তাগিদ দেয় তাহার প্রত্যেক তারিখের জন্য রোজখরচ প্রজার নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ আদায় করে। যদি কেহ রোজ দিতে অপারগ হয়, তখনই রায়তকে ভূম্যধিকারীর বাড়ীতে বা কাছারীতে লইয়া আবদ্ধ করিয়া, গলা ধাক্কা, লাঠি দিয়া ঠেলা দেওয়া

ইত্যাদি অন্যায় ও অমানুষিক আচরণ এবং কুৎসিত গালিগালাজ করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। রায়ত বেচারা তখন যেরূপেই হয় প্যায়দার রোজ আদায় করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে।

রায়ত মুহুরী আমলা তহশীলদারের নিকট খাজানা দিবার জন্য উপস্থিত হইলে, মুহুরীবাবুরা তলব বাকীর খাতাটা লইয়া ১০৲ টাকার স্থলে ১৫৲ কিম্বা ১২৲ টাকার কথাই বলিবে। তখন রায়ত বেচারার এমন সাহস হয় না যে, কর্ত্তার কথার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার কিছু বলে, তথাপি বড় সাহস করিয়া খাজানার পরিষ্কার হিসাবের কথাটা বলিলে, তখনই তাহাকে ধমকাইতে ধমকাইতে বলিবে যে, অমুক অমুক তারিখে তোর বাড়ীতে যে প্যায়দা গিয়াছিল—

তাহার রোজ	১৲
নায়েব নজর	১৲
স্কুল খরচ	১৲
মুহুরীর তহরী	১৲
মৃধা বরকন্দাজ	১৲

আর আজকাল স্কুল খরচের ভারটা রায়তদিগের উপর খুবই চাপান পড়িয়াছে। ক্রমশঃ ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব ইচ্ছা রহিল।

হাসমত আলী খাঁ। (রায়ত)

রায়তের দুঃখ।

মোটামুটি ধরিতে গেলে আমাদের দেশে দুই শ্রেণীর আত্যাচারী লোকের কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। এই দুই শ্রেণীর দ্বারা সময় সময় পল্লী গ্রামের নিরীহ এবং দরিদ্র প্রজাশ্রেণীর উপর যেরূপ ভীষণ অত্যাচারের অনুষ্ঠান হয়, তাহা শ্রবণ করিলে অতি বড় পাষাণহৃদয়ও বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথমশ্রেণীতে জমিদার বা তাঁহাদের দুর্ম্মুখ কর্ম্মচারিবৃন্দ। নিরীহ এবং দরিদ্র প্রজার উপর অত্যাচারী জমিদারের সংখ্যা কম হইলেও জমিদারের দুর্ব্বৃত্ত কর্ম্মচারিবৃন্দের অত্যাচারে অনেক সময় জমিদারের নাম পর্য্যন্তও কলঙ্কিত হয়। অনেক জমিদার এরূপ আছেন, যাঁহারা প্রজাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের নিয়োজিত নায়েব গোমস্তা, পেয়াদা, বরকন্দাজ প্রভৃতির নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রজাদিগকে চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া পথের কাঙ্গাল সাজিতে হয়। দেব-প্রকৃতিবিশিষ্ট জমিদারের এলেকাও এজন্য দানব-রাজ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদের দেশের জমিদারী সেরেস্তায় আজিও শিক্ষিত লোক প্রবেশ করিতে পারে নাই, করিবে বলিয়া আমরা আশা করিতেও পারিতেছি না। সুতরাং অশিক্ষিত মুর্খ শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারস্রোত নিবারণ হওয়াও সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর জমিদার ও জমিদারকর্ম্মচারীর কথা ছাড়িয়া দিলে যদি আমরা অন্য দলের কথা উপস্থিত করি, তবে বলিব সে দল দেশের সুদখোর মহাজন। ধরিতে গেলে ইহাদের অত্যাচার সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। দেশের দরিদ্র অধিবাসী ও কৃষক প্রজাগণ ইহাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা ইংরেজ রাজপুরুষদিগের সামান্য খুঁটিনাটি দোষের কথা উল্লেখ করিয়া, সংবাদপত্রে গগনভেদী চীৎকারে চতুর্দ্দিক নিনাদিত ও তোলপাড় করিয়া তুলেন, তাঁহারা কি সুদখোর মহাজন বা উত্তমর্ণদিগের দারুণ অত্যাচারের কথা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? পল্লীগ্রামের সাধারণ অবস্থা যাঁহারা অবগত নহেন, কৃষক প্রজার সুখদুঃখের কথা যাঁহারা একবারও চিন্তা করিবার অবসর পান নাই, নিরীহ রায়ত শ্রেণীর উপর সুদখোরদের সুদের ছাঁদন বাঁধনের জ্বালা যে কত প্রখর যাঁহারা স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই, আমরা কোন্ বলে, কোন্ বুদ্ধিতে এবং কোন্ ভাষায় তাঁহাদিগকে বিজ্ঞ, বহুদর্শী, ন্যায়পরায়ণ দেশহিতৈষী বলিয়া সম্মান সমাদর ও প্রশংসা করিব? রাউলাট বিলের এক লাইনে যাঁহারা ভবিষ্যৎ অত্যাচারের স্বপ্ন দেখিয়া দেশের চারিদিকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছেন। এদিকে মহাজনী অত্যাচার আমাদের সোণার দেশকে যে উৎসন্ন দিতে বসিয়াছে তৎপ্রতি আমাদের দেশধুরন্ধর, দেশের নেতা ও দেশহিতৈষী বাক্যবীরগণের ভ্রূক্ষেপ আছে কি? বাঙ্গলার প্রজা তথা বাঙ্গলা দেশ সুদখোরের অমানুষিক অত্যাচারে যে গোল্লায় যাইতে বসিয়াছে, তৎপ্রতি কাহারও লক্ষ্য আছে কি? হায় আমরা, আর হায় আমাদের দেশ।

আমরা "প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়, কার্য্যকালে খুঁজি সবে নিজ নিজ পথ।' (রায়ত)

জনসভার কর্ত্তব্য।

কুমিল্লা "পিপলস্ এসোসিয়েসন্" নামে একটী সমিতি আছে। কুম্ভকর্ণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু কার্য্যকলাপে উহাকে কুম্ভকর্ণের ঠাকুরদাদা বলিয়া আমাদের মনে হয়। কারণ শুনিয়াছি কুম্ভকর্ণ নাকি ঘুমাইত ছয়মাস, এ যে ঘুমায় এক বৎসর। তার পর হঠাৎ একদিন জাগিয়া কংগ্রেস বা কন্‌ফারেন্স প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া আবার নাসিকা গর্জ্জনে নিদ্রা যায়। তাই চারিদিকে অন্নাভাবের হাহাকারেও উহার নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে না। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিয়া কি এরূপ ভাবেই তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য সমাপন করিবেন? দেশের অন্নাভাবের কারণ কি এবং কি প্রকারে উহা নিবারিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রতীকারে ব্রতী হওয়া এবং দরকার হইলে গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে? ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভা নামে আর একটী সভা কলিকাতায় আছে। তাহাদের কোন সময় একটু নড়িতে চড়িতে দেখা যায় বটে কিন্তু এবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এই দুর্ভিক্ষে তাঁহারা কি করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তাঁহারা কি দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কিছু অবগত নহেন? যদি হিতসাধিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয় তবে ইহাই প্রকৃত সময় তাঁহা তাহাদের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(ত্রিপুরা হিতৈষী)

টিপ্পনী।—কেবল ত্রিপুরার দোষ নয়। দেশের সর্ব্বত্রই এই সব সভার অবস্থা এই রকমই বটে।

কুষ্ঠ রোগী—সমস্ত পৃথিবীতে ১০ লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে; তন্মধ্যে কেবল এক ভারতেই ১ লক্ষ। পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশেই কুষ্ঠরোগীর বসবাসের জন্য কুষ্ঠাশ্রম ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ভারতে বহু কুষ্ঠরোগী কিন্তু কুষ্ঠাশ্রমের সংখ্যা অতীব অল্প, ইহাতে সমস্ত রোগীর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব। কুষ্ঠরোগীদের জন্য ভারতে চিকিৎসা ও বাসের সুবন্দোবস্ত বিশেষরূপে হওয়া বাঞ্ছনীয়। (এডুকেশন গেজেট)

টিপ্পনী।—রোগের সংক্রামতা নিবারণের জন্যও এইরূপ আশ্রম নিতান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, বহু কুষ্ঠরোগী অবাধে রাজপথে লোকের গা ঘিঁসিয়া বিচরণ করিতেছে, ভিক্ষা করিতেছে। ইহার ফলে এই ভীষণ ব্যাধি যে আরও কত বিস্তৃত হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে। কুষ্ঠরোগীরা অতি দুর্ভাগা, সকলেই করুণার পাত্র। কিন্তু এই ব্যাধি হইতে যথাসম্ভব সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টাও সামাজিক বড় একটি ধর্ম্ম। এই অবাধ বিচরণে ও ভিক্ষায় ইহারাও সুখে থাকে না, যেদিক হইতেই বিবেচনা করা যাউক, আশ্রমই এই রোগীদের যোগ্যস্থান। কিন্তু এত আশ্রম করে কে? এদেশে কি তাহা সম্ভব হইবে!

ধর্ম্ম সভার বার্ষিক উৎসব।

২৮শে বৈশাখ বসিরহাট মহকুমার অধীন পুঁড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় (বি, এল) মহাশয়ের সভাপতিত্বে "সদালাপ সভা"র ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও দরিদ্র নারায়ণের অন্নদানরূপ সেবাব্রত এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। * * * * * *

এই সমিতির নামেই ইহার উদ্দেশ্য সূচিত হইতেছে,। প্রতি রবিবারে সাধারণ অধিবেশনে, স্তোত্র, গীতা, ভাগবত, সাধু মহাত্মাগণের জীবনী, ধর্ম্ম ও নীতিপূর্ণ বিবিধ প্রবন্ধ ও চরিত্রগঠনোপযোগী নানা আলোচনা হওয়ার পর "মধুরেণ সমাপয়েৎ" বিধি নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থাও আছে। প্রতি একাদশীতে "হরিবাসর" প্রণালীতে স্তোত্রাদির পর শ্রীশ্রীনারায়ণের অর্চ্চনা, ভোগ প্রদান ও প্রসাদ বিতরণ হইয়া থাকে। ইহার একাঙ্গীভূত একটী ধর্ম্ম ও নীতিমূলক পুস্তকালয় ও অনেক সাধু মহাপুরুষের প্রতিকৃতি সমিতি-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং "সেবা ভাণ্ডার" নামক ভাণ্ডার যথাসাধ্য দুঃস্থ সেবা ব্রত করিয়া আসিতেছেন। গত বার্ষিক অধিবেশনে পরিগৃহীত দাতব্য 'হোমিও' ঔষধালয় একবৎসর যাবৎ ঔষধ বিতারণে বহু আর্ত্তের উপকার সাধন করিয়াছেন। সম্প্রতি ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড এই সমিতি হইতে বিতরণের জন্য বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা মূল্যেরও অধিক কুইনাইন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। দেশস্থ বহু কৃতবিদ্য মহাত্মা সভায় সমবেত ছিলেন। এই আদর্শের সমিতি প্রতিষ্ঠায় দেশের মঙ্গল সাধন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(এডুকেশন গেজেট)

টিপ্পনী।—শেষ কথাটি খুব সত্য। এরূপ ধর্ম্মসভা দেশে অনেক আছে। কিন্তু দরিদ্রসেবার ব্যবস্থা অনেক স্থানেই দেখা যায়। ধর্ম্মালোচনা, দেবপূজা প্রভৃতি যতই প্রয়োজন হউক, দরিদ্রকে অন্নদান রোগীকে ঔষধ দান তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন। প্রকৃত দেব সেবাও তাহাই।

নৈশ বিদ্যালয়।

এখানে বঙ্গীয় ধর্ম্মমণ্ডলের একটা শাখা কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম কুমিল্লার সেই ধর্ম্মমণ্ডল ইতিমধ্যেই একটী কল্যাণকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তাঁহারা এখানে একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। ইহা এই মণ্ডলীর প্রাণের পরিচয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যক্তিই হউক বা সমষ্টিই হউক যতদিন তাহার দেহে প্রাণ থাকিবে ততদিন সে কোন না কোন কার্য্য করিবে। সমাজের বা সমষ্টির প্রাণের স্পন্দন শুধু অনুভব করা যায় তার কার্য্যে।

আমাদের দেশে সভাসমিতি সঙ্ঘ প্রভৃতির অভাব নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে কয়টীর প্রাণ আছে? হয়তো কোনদিন সভা করিয়া কয়েকটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল, তারপর সব নীরব—সব নির্ব্বিকার। কিন্তু এই মণ্ডলটীর প্রথম অবস্থায় যে প্রাণের স্ফুরণ দেখিতেছি তাহা যদি স্থায়ী হয় তবে উহা হইতে সমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

(ত্রিপুরা হিতৈষী)

ঢাকা অনাথ-আশ্রম।

গত ১০ই মে শনিবার প্রাতে, 'ঢাকা অনাথ আশ্রমস্থ' 'বৈকুণ্ঠনাথ গৃহে' ইহার বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক সভ্য ও সাহায্যকারী উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় রায় শ্রীনাথ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্যারম্ভে আশ্রমের কয়েকটী বালিকা একটী ধর্ম্মসঙ্গীত গান করে এবং আশ্রমের বালকবালিকাদের কেহ কেহ কর্ম্মসঙ্গীত ও আবৃত্তি করিয়া উপস্থিত সভ্য মণ্ডলীর সন্তোষসাধন করিয়াছিল। সভার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে, সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন, এবং সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্মানে ইহার অনুমোদন করেন;—"ঢাকা অনাথ আশ্রমের এই সভা সর্ব্বপ্রথমে পৃষ্ঠপোষিকা ও সর্ব্বপ্রধান হিতকারিণী সন্তোষের রাণী দিনমণি চৌধুরাণীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয় স্বর্গীয়া রাণীমহোদয়া নিয়ত আশ্রমের হিতে মনোযোগী ছিলেন। এই প্রখ্যাতনামা দানশীলা মহিলার প্রদত্ত ২৫,০০০৲ হাজার টাকা দ্বারাই তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য আশ্রমের 'বৈকুণ্ঠনাথ গৃহ' নির্ম্মিত এবং তাঁহার অনুগ্রহেই এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব সম্ভবপর হইয়াছে। সভা আশা করেন যে পুণ্যশ্লোকা রাণীমহোদয়ার উত্তরাধিকারী কুমার হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীও এই আশ্রমের সাহায্যতৎপর হইবেন

কার্য্য বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য:—গত আগষ্ট মাসে বঙ্গেশ্বর লর্ড রোনাল্ডশে মহোদয় আশ্রম পরিদর্শন করিয়া আশ্রম ও অনাথ বালক বালিকাগণ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ সহকারে বিস্তারিত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হ'ন, এবং বর্ত্তমান দালানের উপর দ্বিতল নির্ম্মাণ জন্য ২১০০৲ টাকা দান মঞ্জুর করেন। আশ্রমের সভাপতি মিঃ এফ, সি ফ্রেঞ্চ, সি এস, আই, মহোদয় ঢাকা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বিল্ডিং ফণ্ডে ১,৫০০ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ সময়ে জয়দেবপুরের ভূতপূর্ব্ব কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের অঙ্গীকৃত ৫,৬০০ টাকা, ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হইতে আলোচ্য বর্ষের দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই আশ্রম ১৯০৯ সালে মাত্র দুইটী অনাথ বালক লইয়া একটী ক্ষুদ্র বাটিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎপর গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত দশবিঘা জমিতে প্রায় ৩০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে আশ্রমের জন্য প্রশস্ত দালান নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষশেষে এক মাস হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ২৬টী বালক বালিকা আশ্রমে ছিল। বয়স্ক চারিটী বালক ঢাকা ইঞ্জিনীয়ারি স্কুলের শিল্পশিক্ষা বিভাগে অধ্যয়ন করে; ইহাদের তিনজনে ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইতেছে। একজন রেসিডেণ্ট পণ্ডিত অন্যান্য বালকগণকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। বালিকারা সকলেই একজন উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রীর অধীনে শিক্ষা পাইতেছে। স্থানীয় একজন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মহিলা আশ্রমের একটী সুন্দর এক বৎসর বয়স্কা বালিকাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে গবর্ণমেণ্ট বিল্ডিং ফণ্ডে ৪,০০০৲ টাকা এবং শিক্ষা প্রভৃতির সাহায্য ৮৭০৲ টাকা আশ্রমে দান

করিয়াছেন। ঢাকা মিউনিসিপালিটী ১২০ টাকা দিয়াছেন, নিয়মিত মাসিক চাঁদা ও এক কালীন দান হইতে ৪৭৭৩৩৶৫ পাওয়া গিয়াছে। ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে প্রাপ্ত এবং পূর্ব্ব বৎসরের তহবিলে ২৬৭১০৶০ মজুত ছিল। সর্ব্বসমেত এ বৎসর ১৬,৪০৪৶৩ আয় এবং পূরাতন ঋণের শোধ ৭০০৲ টাকা লইয়া মোট ৪,৬৪৭॥৬ খরচ হইয়াছে। বর্ষশেষে ২২,৭৫৬॥৶০ হস্তে অবশিষ্ট ছিল।

নিম্নলিখিত মাসিক সাহায্যকারিগণের প্রতি সভা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন:—মহামান্য ত্রিপুরার মহারাজ ৩০৲ মাননীয় কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া) ২৫৲ টাকা মাননীয় বাবু ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর) ২৫৲ টাকা এবং পাবনার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ ও রাধিকাভূষণ রায় ১০৲টাকা। দালান নির্ম্মাণের জন্যও নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে:—বাবু রেবতীমোহন দাস ৫০০৲, বাবু গৌরনিতাই সাহা শঙ্খনিধি ৫০০৲, বাবু বৈজনাথ চোটুলাল ২০১৲ এবং জনৈক পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়ী ১০০৲ টাকা।

(ঢাকাপ্রকাশ)

রেলষ্টেশনের স্ত্রীলোকদিগের বিশ্রাম গৃহ।

"সে দিন আমার একজন আত্মীয়া স্ত্রীলোক বরিশাল হইতে ষ্টীমারে আসিয়া খুলনায় অবতরণ করেন। আমরা তাঁহাকে রেলষ্টেশনে "জেনানা রুমে" বসাইয়া ঘোড়ার গাড়ীর অনুসন্ধান করিত যাইব বলায় তিনি ষ্টীমার ষ্টেসন হইতে "জেনানা রুমে" প্রবেশ করিয়াই তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন যে দুর্গন্ধে ঘরের মধ্যে বসা যায় না। দেখিলাম অপর একটী ভদ্রমহিলাও জেনানা রুমের দ্বার-দেশে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি রেলগাড়ীতে যাইবেন বলিয়া তাঁহাকে অনেক সময় ঐ জেনানা রুমেই অপেক্ষা করিতে হইবে। ঐ ঘরের মধ্যে ভয়ানক দুর্গন্ধ বলিয়াই তিনি দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমার আত্মীয়া স্ত্রীলোকটী অত্র সহরের কোনও একটী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের কন্যা এবং ষ্টীমারের সেকেণ্ড ক্লাসের আরোহিণী। যাহা হউক, পরে আমরা অতি কষ্টে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাকে লইয়া আসিলাম। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটী বরাবরই জেনানা রুমের বাহিরে দরজার ধারে বসিয়া ছিলেন। এখন আমরা রেল কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করি যে ঐ জেনানা রুমটী তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছেন? এ দেশীয়া স্ত্রীলোকগণকে তাঁহারা কি পশুর অধম মনে করেন?"

(খুলনা)

টিপ্পনী।—কেবল ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষের দোষ নয় আমাদের দেশের নারীদেরও যথেষ্ট ত্রুটি আছে। সামান্য একটু অসুবিধার জন্য অনেকে এই সব সাময়িক বিশ্রামস্থান নোংরা করিতে এতটুকুও দ্বিধা করেন না। তাঁহারা মনে করেন, একবার আসিয়াছেন, এখনই চলিয়া যাইবেন। কিন্তু এই গৃহ যে তাঁহাদের পরে আরও অনেকে আসিয়া ব্যবহার করিবেন, একথা একবারও ভাবেন না। প্রত্যেক পুরুষের উচিত, এই সব বিষয়ে গৃহের নারীদের কর্ত্তব্য শিক্ষা দেন।

কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা।

কুমিল্লা নগরীতে ঈশ্বর পাঠশালা নামে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় ১৩১৮ সালে স্থাপিত হইয়া একটী কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে স্মৃতি, কাব্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছাত্রকেই ইংরেজী ভাষাও অধ্যয়ন করিতে হয়। এই বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটী পুস্তকাগার আছে। তাহাতে বেদ দর্শন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ে দুই প্রকারের ছাত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যাহারা এই বিদ্যালয়ের সংস্থষ্ট ছাত্রাবাসে অবস্থিতি করে। দ্বিতীয়তঃ যাহারা অন্যত্র বাস করে। যাহারা ছাত্রাবাসে অবস্থান করে তাহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

নিয়মাবলী কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে। অন্যান্য চতুষ্পাঠীতে যথাসম্ভব অনুকরণীয়। * * * *

১। প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া মঙ্গল প্রার্থনা পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিতে হইবে এবং হস্তমুখাদি প্রক্ষালনান্তর প্রাতঃস্নান করিতে হইবে।

২। নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যাত্রয় করিতে হইবে।

৩। একাদশী ব্রত পালন করিতে হইবে।

৪। রবিবারে নিরামিষ খাইতে হইবে।

৫। নিজ হাতে শাক শবজি উৎপাদন করিতে হইবে।

৬। পাক ও হাট বাজার নিজেরা করিতে হইবে। ভৃত্য রাখা নিষেধ।

৭। তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন নিষেধ।

৮। দিবা নিদ্রা নিষেধ।

৯। অশ্লীল আলাপ ও অসদ্ব্যবহার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

১০। অতিরিক্ত বাক্যব্যয় ও কুতর্ক করিবে না। সত্য অনুসন্ধানের জন্য সংযত বাক্যে আলোচনা দ্বারা সময়ক্ষেপ করিবে ও অন্যের কার্য্য হানি করিবে না।

১১। অধ্যাপক মহাশয় অধ্যাপনা স্থানে উপস্থিত হইলে ছাত্রগণ দাঁড়াইয়া যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং শ্রেণী পরিত্যাগের সময় অধ্যাপক মহাশয়কে যথাবিধি অভিবাদন করিবে।

১২। ছাত্রদিগকে পাঠশালার ছাত্রাবাসে অধ্যাপক মহাশয়ের অধীনে থাকিতে হইবে

১৩। আবশ্যক হইলে অধ্যাপক মহাশয়ের অনুমতি নিয়া দুইজন এক সঙ্গে যাইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় স্থানান্তরে থাকিতে পারিবে না।

১৪। শয়নের পূর্ব্বে শয্যারোহণ করিয়া দৈনিক কার্য্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিবে এবং একাগ্রতার সহিত অনন্তশক্তি অনন্তমাহাত্ম্য ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিদ্রা যাইবে।

১৫। ছাত্রগণ যে বৎসর গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে না, সেই বৎসর অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা দিতে হইবে। উত্তীর্ণ না হইলে বৃত্তি রহিত হইবে।

অধ্যাপক মহাশয়ও নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবেন।ঃ—

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান, প্রাতঃস্নান, নিয়মিত সময়ে আহ্নিক, দিবানিদ্রাত্যাগ, তামাক নস্য প্রভৃতি ব্যবহার না করা, কুতর্ক না করা।

ছাত্র ও অধ্যাপক মহাশয়ের কোন অসুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা অধ্যাপক মহাশয় কমিটির গোচরার্থ পাঠাইবেন

অধ্যাপক মহাশয় বর্ষারম্ভ হইতে ৮ শারদীয়া পূজার বন্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিপদ ও অষ্টমী প্রভৃতি বন্ধ উপলক্ষে ছাত্রদিগকে সংস্কৃত রচনা লিখা ও বক্তৃতা অভ্যাস করাইতে চেষ্টা করিবেন এবং শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

সময় সময় ছুটীর দিন অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রগণকে নিয়া নিকটস্থ কোন স্থান দেখিতে যাইবেন।

অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিয়ম পালন করাইবেন। (এডুকেশন গেজেট)

মধুকৈটভের উৎপত্তি।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহার

পাদরী এনড্রুজের পত্র।

[নায়ক হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের কথা।

শ্রীযুক্ত সি এফ, এণ্ডরুজ মহাশয় সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানির প্রচার করিয়াছেন,—

লাহোর হইতে বিস্তৃত সংবাদ পাইয়াছি যে, কঠোর শ্রমের সহিত কারাবাস দণ্ডাজ্ঞার ফলে মিঃ কালীনাথ রায় মহাশয়ের ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহার এই দুর্ব্বল অবস্থাতেই, জেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে গম ভাঙ্গিয়া ময়দা পিষিতে দিয়াছিলেন। তাহার ফলে শীঘ্রই তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। তিনি এখন জেলের হাসপাতালে আছেন। তাঁহাকে আমি যতদূর জানি, তাহাতে যখনই আমি কঠোর শ্রমের সহিত কারাবাস দণ্ডাজ্ঞার কথা শুনিলাম তখনই আমি সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম যে, এইরূপ ঘটিবেই। এবং ইহা ভাবিলেও কষ্ট হয় যে, তাঁহার দণ্ডের পরিমাণ কমাইয়া না দিলে আরও দুই বৎসর ধরিয়া এইরূপ অবস্থা চলিবে।

তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। দুইটী প্রশ্ন অন্যান্য কয়েদীদিগের সহিতও সংশ্লিষ্ট। তৃতীয় প্রশ্নটী

শুধু কালীনাথ বাবুর সম্বন্ধে। প্রথম প্রশ্ন এই—পঞ্জাব প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইয়াছিল কিনা। যদি পঞ্জাব সত্যসত্যই প্রকাশ্যে বিদ্রোহী না হইয়া থাকে, তাঁহা হইলে মার্শাল 'ল' জারি করিবার কোন আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত কারণ ঘটে না। এখন আমরা সার মাইকেল ওডায়ারের বিদায়কালীন বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়াছি। সেগুলি পাঠ করিয়া মনে হয়, পঞ্জাব প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয় নাই। আমরা মাতাল ফিলিপের আদেশের বিরুদ্ধে অ-মাতাল ফিলিপের নিকট আপিল করিতে পারি। সম্প্রতি আমার একজন বাঙ্গালী বন্ধু আমাকে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমি সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ করিব না। কিন্তু যে কোন ভদ্রলোক সার মাইকেল ওডায়ারের বিদায়কালীন শেষ বক্তৃতাগুলি ক্রমান্বয়ে পাঠ করিয়া দেখুন; দেখিবেন তাহাতে তিনি সমগ্র পঞ্জাবের অসাধারণ রাজভক্তির প্রশংসাগানে আকাশমণ্ডল মুখর করিয়া তুলিয়াছেন এবং অসন্তুষ্ট জনগণের সংখ্যাল্পতার কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। সার মাইকেল ওডায়ারের নিজের বর্ণনা অনুসারেই, আমার মনে হয়, এরূপ অবস্থাকে কোন ক্রমেই প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার নিজের পত্রে ইহাকে স্থানীয় অশান্তি বলিয়াছেন, এ কথাটা প্রকৃত অবস্থার অনেকটাই কাছাকাছি। সার মাইকেল ওডায়ার এক নিশ্বাসে নরম গরম হইতে পারেন না। আবার সম্প্রতি যে ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সৈন্যবলের উপর বিজয়লাভ করিয়াছেন, সেই ভারত গবর্ণমেণ্টও দণ্ডফৌজ প্রভৃতিকে যুদ্ধ ঘোষণা কিম্বা প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলিতে পারেন না।

সার শিবস্বামী আয়ার ৫ই জুন তারিখে "সার্ভাণ্ট অব ইণ্ডিয়া" পত্রে এবং মিঃ এলফ্রেড নণ্ডী ৯ই জুন তারিখে লীডার পত্রে অতি দক্ষতার সহিত দ্বিতীয় প্রশ্নটীর আলোচনা করিয়াছেন। প্রশ্নটী এই যে, আসল দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড এবং দাঙ্গায় ও হত্যায় উত্তেজনা ঘটিত মামলা ছাড়া অপর কোন মামলার মার্শল ল অনুসারে বিচার হওয়া সঙ্গত কি না। মার্শাল ল'য়ের সমস্ত ইতিহাসে দেখা যায় যে, দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত থাকিবার সময় যে সকল লোককে হাতেনোতে ধরা হয় এবং বিদ্রোহের দরুণ যখন সাধারণ আদালত খোলা যাইতে পারে না, কেবল সেই সময়েই তখনি তখনি সরাসরি বিচার করিবার জন্যই মার্শাল ল জারি করা দরকার হয়। কিন্তু যে সকল মামলা জটিল এবং কূটতর্কে পূর্ণ, যে সকল মামলায় কোন বিশেষ বিশেষ কথার অর্থ ও ব্যবহার নির্ণয় করিবার জন্য খণ্ড মনোযোগ দেওয়া দরকার হয় এবং আইনের নিখুঁত সংজ্ঞার উপর নির্ভর করিতে হয়, সেরূপ স্থলে মার্শাল ল প্রয়োগ করা চলে না। এই সকল মামলার সাধারণ আইন অনুসারেই বিচার হওয়া উচিত। এবং পাঞ্জাবের অবস্থায় সরকারী বিবরণেও এমন কোন কথা নাই, যাহার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, লাহোরের অবস্থা এমন ভয়ানক বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল যে, জনসাধারণকে বিপন্ন না করিয়া সাধারণ আইন আদালত খোলা যাইতে পারিত না'।

তৃতীয় প্রশ্নটি মিঃ কালীনাথ রায়ের নিজের বিশেষ দণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট। আমি বিচারকের রায় পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি। যে সকল মূল প্রবন্ধের সংস্রবে এই মামলা সেগুলিও আমি পড়িয়াছি। আমি কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রত্যেকবার পাঠের পর আমি ক্রমান্বয়ে অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে, সমগ্র প্রবন্ধাবলী এক সঙ্গে লইয়া বিচার করিলে কোন জজ আসামীকে দণ্ডিত করিতে পারেন।

সুতরাং এখন তিনটি প্রকাশ্য প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। এবং প্রশ্নগুলি এমন জরুরি বলিয়া বোধ হইতেছে যে, এই তিনটি প্রশ্ন সম্বন্ধেই উচ্চতর আদালতে আপীল রুজু করা উচিত। কলিকাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যারিষ্টারের মত লওয়া হইয়াছে তিনি এইরূপ আপীলেরই পক্ষপাতী। মিঃ মণ্টেগু এখন যে তদন্ত কমিশন বসাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই কমিশনের যদি সামরিক আদালতের ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিবার ক্ষমতা থাকে—আমার বিশ্বাস তাহা থাকিতে পারে,—তাহা হইলেও প্রিভি কাউন্সিলে আপীল, করার ফল ভালই হইবে। কারণ ইহাতে প্রকাশ পাইবে যে জনসাধারণ এই ব্যাপারে অতি মাত্রায় বিচলিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

জগন্মান্ত মহাকবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, পাঞ্জাবের দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং তাহা দমনের জন্ত গবর্ণমেণ্ট যে কঠোর সামরিক আইনে সেখানে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত পত্রখানি সম্প্রতি বড়লাট বাহাদুরের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন :—

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themself for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongrucus context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours faithfully

RABINDRA NATH TAGORE.

মর্ম্মানুবাদ :—"স্থানীয় দাঙ্গাহাঙ্গামা-জনিত অশান্তি দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ভীষণতা এতই অধিক যে বড় কঠিন আঘাত পাইয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি, বৃটিশ প্রজারূপে ভারতে আমরা কি অসহায় অবস্থায় আছি। দুর্ভাগ্য লোক-দের প্রতি যে অত্যধিক কঠোর দণ্ড বিধান করা হইয়াছে, এবং যে ভাবে তাহারা দণ্ডিত হইয়াছে, প্রাচীন এবং আধুনিক যুগে কতিপয় বিশেষ দৃষ্টান্ত ব্যতীত কোনও সভ্য গবর্ণমেণ্টের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই, ইহাও আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই দণ্ড যাহাদের উপরে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাঁহারা নিরস্ত্র ও নিঃসহায়। যে শক্তি সেই দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে মানুষের জীবন নাশ করিবার উপযোগী ব্যবস্থাপ্রণালী অতি ভয়ঙ্কর-রূপে কার্য্যকরী। যখন এই কথা আমরা মনে করি, বেশ জোরে আমরা বলিতে পারি, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ইহার আবশ্যকতা ছিল না,—এবং ধর্ম্মনীতির দিক হইতে

ইহার সমর্থন করা যায় না। আমাদের পঞ্জাববাসী ভ্রাতৃগণ যে সব অপমান ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ, বাহিরে না যায় তার চেষ্টা সত্ত্বেও, ভারতের সর্ব্বত্র গিয়া কিছু কিছু পৌছিয়াছে, এবং তাহাতে রোষ ও অসন্তোষের যে গভীর বেদনা সর্ব্বত্র সকলের হৃদয়ের উত্থিত হইয়াছে, আমাদের শাসনকর্ত্তৃবর্গ তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ, দেশের লোককে খুব একটা শিক্ষা দিলেন, এই ভাবিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদও অনুভব করিয়াছেন। এই নির্ম্মম উদাসীনতা প্রায় সব এঙ্গলোপত্রিকা প্রশংসা করিয়াছেন,—কেহ কেহ আমাদের এই ক্লেশের কথা তুলিয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষ ইহাতে কিছুমাত্র বাধা দিবার চেষ্টা করেন নাই,—বরং উৎপীড়িত প্রজাদের পক্ষীয় কোনও পত্রিকা তাহাদের কোনও বেদনা এবং তৎসম্বন্ধে কোনও মন্তব্য যদি প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, তাহাই কঠোরভাবে চাপিয়া রাখিবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন। প্রবল অস্ত্রশক্তির যে অধিকার এবং সুনীতির অনুবর্ত্তক বলিয়া যে প্রতিষ্ঠা গবর্ণমেণ্টের আছে, তাহাতে তাঁহারা অনায়াসে সদয় ব্যবহার করিতে পারিতেন। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি, প্রতিহিংসা তাঁহাদের উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিকে একেবারে অন্ধ করিয়াছে এবং আমাদের সকল আবেদনও ব্যর্থ হইয়াছে। আমার কোটি কোটি স্বদেশবাসী আতঙ্কে নীরব হইয়া যে গভীর বেদনা তাহাদের চিত্তে বহন করিতেছে, নীরব যে প্রতিবাদ তাহাদের সেই চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছে, সকল দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়া সেই বেদনাময় প্রতিবাদকে আজ আমি ধ্বনিত করিতে চাই। দেশের জন্য এ অবস্থায় ইহাই মাত্র আমি এখন করিতে পারি। এমন সময় এখন আসিয়াছে, যখন রাজকীয় সম্মানচিহ্নসমূহ এই অপমানের সম্মুখে আমাদের লজ্জা ও গ্লানিকে আরও বড় করিয়াই তোলে। আমার যে দেশবাসীদিগকে তাহাদের তথাকথিত হীনতাবশতঃ মানবের অযোগ্য অপমান সহিতে হইতেছে, রাজকীয় সকল বিশেষ সম্মানের চিহ্ন হইতে মুক্ত হইয়া আমি আজ তাহাদেরই পাশে দাঁড়াইতে চাই। তাই অতি ক্ষুব্ধচিত্তে এবং যথোচিত সম্মানসহকারে আমি আজ বড়লাট বাহাদুরকে এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে নাইট্ উপাধি হইতে তিনি আমাকে মুক্তিদান করুন। এই উপাধি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তার হাতে মহামান্য ভারতেশ্বরের নিকট হইতে আমি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বের প্রতি আমার চিত্তের শ্রদ্ধা এখনও অক্ষুণ্ন রহিয়াছে।"

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(দৈনিক বসুমতী হইতে উদ্ধৃত।)

যে সকল দীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে বঙ্গবাণীর মন্দির আলোকিত, তাহার একটি দীপ নিবিল। বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালাপাঠকের সুহৃদ, আদর্শচরিত্র, নিরহঙ্কার, জ্ঞান-ধ্যানমগ্ন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরলোকগত হইয়াছেন। গত পাঁচ বৎসর হইতে রামেন্দ্রবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মের বিরাম ছিল না। এই অবস্থায় কয়মাস পূর্ব্বে দুঃসহ কন্যাশোকে রামেন্দ্রসুন্দরের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর তাঁহার মাতৃদেবী পুত্রের পূর্ব্বে পরলোকগত হয়েন। রামেন্দ্রসুন্দর মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে সগ্রাম জেমো-কান্দীতে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া কয় দিন মাত্র কলিকাতা বাসের পর জাহ্নবীর কূলে দেহ-রক্ষা করিলেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর যাহা গেল তাহা আর পাইব না,—যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইবে না, হইবার নহে।

বিজ্ঞানে, দর্শনে, বেদে রামেন্দ্রসুন্দরের অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি দর্শন বিজ্ঞানের জটিলতত্ত্ব ভাষান্তরের কথা, যেমন সরলভাবে বাঙ্গালায় বুঝাইয়াছেন তেমন বুঝি আর কেহ পারে নাই। প্রকৃতির রহস্য তিনি সরল বাঙ্গালায় বাঙ্গালীকে বুঝাইয়াছেন। আজ রামেন্দ্রহীন সাহিত্য সমাজ রামহীন অযোধ্যার দশা প্রাপ্ত হইল।

জীবন কথা।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুনগোত্রীয় জিঝোতীয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়রাও মুর্শিদাবাদ জিলার টেঁয়াগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র জেমোর রাজবাটীতে বিবাহ করিয়া জেমোয় বাস করিতে থাকেন। বলভদ্রের দুই পুত্র—কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর। ব্রজসুন্দর পৌরাণিক-শাস্ত্রে বুৎপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গালায় মাধব-সুলোচনা

নাটক ও স্বর্ণসিন্দুরসিংহ প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর প্রতিভায়, তেজস্বিতায় ও চরিত্রগুণে সমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং সেক্সপীয়রের একখানি নাটক সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। গোবিন্দসুন্দরের পুত্র রামেন্দ্রসুন্দর ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন।

'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য রামেন্দ্র বাবু স্বীয় জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন,—ক্লাসের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই; কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর। সেই সঙ্গে স্বধর্ম্মের প্রতি—স্বদেশের প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। পিতৃদেবের জ্যোতিষশাস্ত্রে ও গণিতে অসামান্য অধিকার ছিল। বাল্যকালেই তাহার ফলভোগী হইয়াছিলাম।

"পাঠশালার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বৎসর প্রথম পুরস্কার পাইতাম; ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান ও বৃত্তি লাভ করি। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা বহি পড়ার নেশা জন্মিয়াছিল।

"পরে কান্দি ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হই। প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় পিতৃদেবের দুঃখ হইয়াছিল। পরে আর এরূপ ঘটনা হয় নাই। ইংরেজি স্কুলে পড়িবার সময় বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার বৎসরে পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনায় অবশ হইয়া পড়ি ও পরীক্ষার ফলে হতাশ হই। ১৮৮১ অব্দে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান পাইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি।

"পিতৃব্যদেবের সহিত কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হই। এই সময়টা পড়াশুনায় বড় অমনোযোগ ঘটে। পাঠ্য পুস্তক না পড়িয়া বাহিরের বহি (ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পুস্তক) অধিক পড়িতাম। ফলে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় দ্বিতীয়স্থানে নামিতে হয়। ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক সুবর্ণ পদক লাভ করি।

"১৮৮৩ সালে পিতৃব্যের মৃত্যু পুনরায় অবসন্ন করিয়াছিল। বি, এ, পরীক্ষাতেও তেমন যত্নপূর্ব্বক পড়িতে পারি নাই। এই সময়ে বিজ্ঞানগ্রন্থের অধ্যয়নে নেশা জন্মে। ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরূপ বন্ধ করি। ১৮৮৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম স্থান ও ৪০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করি। এই সময়ে নবজীবনে আমার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুই একটা প্রবন্ধ বেনামিতে লিখিয়াছিলাম।

"পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এম, এ, দিবার জন্য প্রস্তুত হই। রসায়নের অধ্যাপক পেডলার সাহেব একটি 'ক্লাস এক্সারসাইজ' দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও তখন হইতেই প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি, এ, পরীক্ষায় তিনি রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন; ঐ পরীক্ষায় আমার কাগজ সম্বন্ধে তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন;—আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি; তন্মধ্যে ঐ 'Out of the way the best'—কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনর্ব্বার—"Out of the way the best।" তাঁহার ঐ বাক্যে উৎসাহের সহিত প্রেমচাঁদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এম, এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রথম স্থান, আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক ও ১০০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার লাভ করি।

"পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পর বৎসর প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলাম (১৮৮৮)। পরীক্ষকগণের এইরূপ মন্তব্য—"The candidate who took up physics and Chemistry is perhaps the best stu'ent that has as yet taken up these sub jects at this examination.' অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল সকল ছাত্র ফিজিক্‌স্‌ এবং কেমিষ্ট্রী লইয়াছেন, এই ছাত্রই তাহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরে দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটারিতে বিনা বেতনে বিজ্ঞানচর্চা করিতে পেডলার সাহেবের অনুমতি লইয়াছিলাম। ১৮৯০ সালে এন্‌ট্রান্সে পরীক্ষক নিযুক্ত হই। চারি বৎসর পরে ফার্ষ্ট আর্টসে পরীক্ষক হই। আর পাঁচ বৎসর পর হইতে এন্‌ট্রান্সে অন্যতম হেড এক্‌জামিনার বা প্রথম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছি।

"১৮৯২ সালে রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া থাকি। * * কৃষ্ণকমল বাবুর পদত্যাগের পর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়াছি।"

"কলেজ হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে প্রধানতঃ বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকি। 'সাধনা' পত্রিকা বাহির হইলে মাসিক পত্রিকায় বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

"১৩০৩ সালে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া 'প্রকৃতি' প্রকাশ করিয়াছি।"

"১৩১০ সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশ করিয়াছি। সামাজিক প্রবন্ধগুলি এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই।"

"১৩০১ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্থাপন অবধি উহার সহিত সংস্পৃষ্ট আছি।"

"১৩০৫ হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত পরিষৎ পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছি।"

শেষে রামেন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন,——

"বাঙ্গালা সাহিত্যের ও তদ্দারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি, এই প্রার্থনা।"

(সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত।)

রামেন্দ্রসুন্দর যখন পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ করেন, তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সেই অভ্যর্থনা সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র-মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্ত্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য পরিষদের সারথী তুমি, এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাংত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।
নিধীনাংত্বা নিধিপতিং হবামহে॥

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।
৫ই ভাদ্র, ১৩২১।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত অঙ্গ সজীব রাখিতে যে সমস্ত মহিমাময় জীবন উদ্ভাসিত হইয়া জাতীয় ইজ্জৎ বাড়াইতে জীবনোৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, তাঁহাদেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ, প্রতিভার সহজসিদ্ধ দীপ্ত আলো, আমাদের বানরীপাড়া গ্রামনিবাসী বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার জীবনশিখা গত ৩১শে মে, শনিবার, অপরাহ্নে গিরিধিতে চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। দেশের এই অতি ঘোর দুর্দ্দিনেও আজ সকল বেদনা ছাপিয়া অজ্ঞাতে একটী করুণ সুর মুহুর্মুহু বেদনা দিতেছে। সে পূত-জীবনের পুঞ্জীভূত স্মৃতি কত দেবভাব পরিপূরিত, অতুলনীয় ও অব্যক্ত। উজ্জ্বলালোক বিকীরণে দেবত্বলাভ করিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মজীবন, কর্ম্মজীবন, নির্ভীক স্বদেশপ্রেম, অসামান্য তেজস্বিতা, কঠোর সত্যানুরাগ, সৎসাহিত্যসেবা, সুমধুর বক্তৃতা, আত্মসমর্পন যোগ ও স্বার্থত্যাগের যে কোন একটী লইয়া আলোচনা করিলেই একটী জীবনের দিব্য মানবতা দেবগরিমায় ভরপুর হইয়া যায়। সে পূতজীবনের যৌবনোন্মেষে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে আত্মীয়স্বজন ও স্বসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অঙ্কে পৌছাইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচারকরূপে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া উচ্চ নীচ সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া তিনি যে অসামান্য প্রভাব স্থাপন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের নিরপেক্ষ ইতিহাস-লেখক তাহার সাক্ষ্য দিবেন। তারপর, স্বাধীন প্রচারকরূপে বঙ্গের বিভিন্ন স্থলে ভ্রমণ ব্যপদেশে সময় সময় কপর্দ্দক-শূন্য হস্তে নির্ভরতার যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার পরম ভাগবত জীবনেরই পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সময়ে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের সহিত তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের যে চিত্র দেখিয়াছি, তাহা স্থলবিশেষে চাঞ্চল্য বলিয়া নিন্দিত হইলেও উহার ভিতর একটা নির্ভীকতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের এক অঙ্কে অভ্রখনির প্রচুর অর্থাগম, আবার সেই সংগৃহীত অর্থরাশি অকাতরে নবশক্তি প্রচারে নিঃশেষিত করা কি অনাসক্ত কর্ম্মের আদর্শ স্মরণ করাইয়া দেয় না? এতদ্ভিন্ন বঙ্গসাহিত্যেও তাহার স্থান খুব নিম্নে নহে। স্বভাব কবি স্বর্গীয় গোবিন্দ দাসের অপরিমেয় কবিত্বপ্রতিভা বাদ দিলে বালকবালিকার পাঠোপযোগী সহজ সরস কবিতা প্রণয়নে তাঁহার প্রচুর ক্ষমতা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। স্কুলপাঠ্য ব্যতিরেকেও "মনোরমার জীবনী" "নির্ব্বাসনকাহিনী" প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সৎসাহিত্য সেবার আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুন্দর সুন্দর গল্প সংযুক্ত তাঁহার বক্তৃতা, শ্রোতার হৃদয়ে বক্তব্য বিষয়ের দৃঢ় ছাপ অঙ্কিত করিতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা না শুনিয়াছেন, তাঁহারা ইহার ধারণাই করিতে পারিবেন না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রবল বন্যা বাঙ্গলাদেশকে উন্মত্তবৎ করিয়াছিল, সে প্রবলপ্রবাহে ইন্ধন যোগাইতে মনোরঞ্জন বাবু অক্লান্ত কর্ম্মের জলন্ত চিত্র আজও স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনকালে, পুলিশের লগুড়াঘাতে ক্ষত-বিক্ষত পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জনকে মঞ্চোপরি দাঁড় করাইয়া যে প্রাণস্পর্শী উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র বাংলার অন্তরতম প্রদেশ বাজিয়া উঠিয়াছিল। আজও ভাষা সহিত পিতাপুত্রের সে উজ্জ্বল চিত্র হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। তারপর ১৯০৯ খৃঃ অব্দে অশ্বিনী কুমার প্রভৃতি বাংলার যে নয়জন বিশেষ কর্ম্মী নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, মনোরঞ্জন বাবু তাঁহাদের অন্যতম। ঘটনার ফেরে পড়িয়া অনেকেরই অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি, কিন্তু মনোরঞ্জন বাবুর স্বদেশী ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে দেখি নাই। জাতীয় ইজ্জৎ তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, প্রচলিত-মতে গোজামিল দিয়া তাহা সাহিয়া যাইবার পাত্রও তিনি ছিলেন না। তাঁহার স্বাদেশিকতা ধার করা বা হরের জিনিষ ছিল না, তাই মাতৃভূমির প্রতি "দরদ" জাগাইতে জাতির 'ইজ্জৎ" বাড়াইবার মহামন্ত্র অটুটভাবে আমরণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আজ ক্ষুদ্র বৃহৎ কত কথা, কত ব্যবহার মনে পড়িতেছে। তাহার সামান্যাংশও এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। বাংলা দেশ আজ মনোরঞ্জন বাবুর অন্তর্ধানে ব্যথিত, বরিশাল মর্ম্মাহত,—আবার এমন বিগ্রহকে নিজস্ব বলিয়া ঘোষণা করিবার সৌভাগ্যে গর্ব্বিত। আজ বেদনার উদ্ঘাটিত অর্গল নিমেষে রুদ্ধ করিয়া সে অমৃতলোক-গামীপূত আত্মার অভিনন্দনোদ্দেশে প্রাণ খুলিয়া ডাকিয়া বলি—যাও দেব! সেই দেশে যাও,—যেথায় শুনিতে হয় না অনাহারক্লিষ্ট অগণিত নরনারীর দুর্দ্দমনীয় পেটের জ্বালার কথা—যেথায় দেখিতে হইবে না বস্ত্রাভাবে নগ্ন নরনারীর বিকটচিত্র!—যে দেশে অত্যাচার নাই, উৎপীড়ন নাই,—যেথায় ভাইয়ের দরদের উপর কুলিশ বর্ষিত হয় না—যাও দেব, সেই দেশে যাও! আজ আর পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতে বলিবার সাহস নাই, কেননা আমরা যে বড়ই অকৃতজ্ঞ। দুইদিনে সকল ভুলিয়া যাই—সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারি—আমাদের দরদহীনতার যে তুলনা নাই!—আমরা মর্ম্মন্তুদ লাঞ্ছনার কাহিনী শুনিয়াও নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারি। আমাদের জন্য ভাবিও না—মৃতপায় এ জাতির "ইজ্জৎ" নষ্টের ভয় কি?—দরদের উপাসক। এই মরজগতের দরদ জাগাইতে জীবনব্যাপী যে সাধনা করিয়া গিয়াছ—দরদীর মহা দরবারে তেমনি করিয়া একটীবার তোমার দরদের কণ্ঠে আমাদের কথা বলিও—যদি তাঁহার প্রাণে একটু বেদনা জাগাইতে পার!

(বরিশাল-হিতৈষী)

কাব্য-পাঠিকার পত্র

(১)

সবিনয় নিবেদন,——

চৈত্রের 'পরিচারিকায়' গাথার আকারে বিতরিত 'সমাজ-দ্রষ্টার' মাথা লক্ষ্য করে' বৈশাখের 'মালঞ্চ' থেকে যে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার উপযোগিতা-সম্বন্ধে আমার পক্ষ থেকে কিছু বল্‌বার আছে—কারণ, সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌বার যোগ্যতা রচনাদির পক্ষে গৌরবজনক হলেও, আমার বিশ্বাস 'মালঞ্চ' এখানে অধিকার-বহির্ভূত কাজ করেছেন। উক্ত পত্রের মন্তব্য ও প্রশ্নগুলির যথাযোগ্য উত্তর লিপিবদ্ধ কর্‌বার আগে, গাথাটিকে আমার চোখের সাহায্যে একবার দেখে নিই।

গাথার আরম্ভ এইরূপ,——

"বাণী যখন নয় বছরের শিশু,
পূর্ণ যুবা স্বামী তাহার বিত্ত
পিতৃধনের অধিকারী,
যৌবনেরই মত্ত মদে বিষম অত্যাচারী
দিনে দিনে পলে পলে কর্‌ছে আয়ুক্ষয়" ইত্যাদি।

বালিকা পত্নী ও পূর্ণযৌবনে পৈত্রিক-সম্পত্তির অধিকার-লব্ধ স্বামীর মধ্যে এ রকম একটা ঘটনা অসম্ভব নয়, আর "অসম্ভব যে নয়" এইটুকু জানাই গল্পপাঠকের পক্ষে তবে যদি কেউ বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী হন, তা'

হ'লেও ঐ চিত্রটুকুকেই বাল্য-বিবাহের প্রতি দোষারোপ নিয়ে মালকোঁচা মেরে বল্‌তে পারেন—"সুন্দং দেহি"। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গল্পমাত্রেরই কর্ত্তব্য বিশেষ বিশেষ সমাজ নীতির প্রতি সম্মান বা অসম্মান প্রদর্শন করা নয়,—স্বভাব-নীতির অনুসরণ করাতেই গল্পের ধর্ম্ম বজায় থাকে; আর সমালোচ্য গল্পটীকে ঐ স্বভাব-নীতির মেরুদণ্ড-সাহায্যে দাঁড় করানোই যে গল্প লেখিকার অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য তা' বক্রকটাক্ষে চাইবার জন্যে বদ্ধপরিকর না হলেই দেখা যায়।

সে যাই হোক্, গল্প-পথে একটু অগ্রসর হয়ে দেখ্‌তে পাওয়া গেল যে, পরে তথাকথিত বিশুর মন না ওঠায় ক্রমেই সে পঙ্কমলিন পাপের গভীর জলতলে ডুবে যেতে লাগ্‌লো—শেষে অত ধনসম্পত্তির একটি কড়িও যখন আর ঘরে রইল না, তখন দেনার দায়ে মুখ দেখাতে না পেরে সে গ্রাম ছেড়ে পালালো। এই অবস্থায় বিশুর আত্মীয়েরা পলায়িতের উদ্দেশ্যে বল্লে,——

"আহা বাছা,
বয়স নেহাৎ কাঁচা
জানি না কোন মনের দুঃখে
একটী কথা বল্‌লে নাকো মুখে
যোগী হয়ে বেরিয়ে গেল দেখি,
ঘরে যে বৌ নেকী
হারামজাদী নেহাৎ পাজী
আর কিছু না এ সব শুধু বৌয়েরই কারসাজি!—"

'মালঞ্চ' জান্‌তে চেয়েছেন, "এমন কি সত্যই কোথাও হয়? আর ইহাই কি হিন্দু-গৃহের সাধারণ চিত্র?" *

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, ওরূপ ঘটনা একটু সেকেলে ধরণের মেজাজ মাসি, পিসি বা প্রতিবেশিনীদের দৌলতে আদুরে ছেলের ভাগ্যে ঘটা বিচিত্র নয়, কেননা বেটা-ছেলেদের যে কাঁচা বয়সে ওরকম একটু আধটু দোষ ঘটতেই পারে এটা তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ—অপরপক্ষে ঘরে বৌ থাক্‌তে ওরকম একটা দুর্ঘটনা ঘট্‌লে সে বৌ "নেকী" থেকে আরম্ভ করে' মুরুব্বি ধরণের প্রাচীনা গিন্নীবান্নিদের মুখে মুখে ক্রমে "হারামজাদী" "পাজী" প্রভৃতিতে উন্নতি হবে, এটাও আশ্চর্য্য নয়।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর বয়স যে এ ক্ষেত্রে "আরও কাঁচা!" উত্তরে বলি—"কোন্ ক্ষেত্রেই বা তা নয়? তবু স্বামীর দুর্ভাগ্যের দায় যে স্ত্রীতেই অর্শায়, তার কারণ প্রবীণাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, স্ত্রীলোকেরা অল্প বয়সেই অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমতী হয়ে থাকে আর তা' হওয়াটাও দরকার। এ কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে উক্ত চিত্র গৃহস্থ-পরিবারে সাধারণ নয়,—কিন্তু যা' সাধারণ' চিত্র শুধু তাই যে গল্পের উপাদান হবে, আর 'বিশেষ' চিত্র হবে না এমন কোন কথা আছে কি? হিন্দুগৃহই হোক্, আর অহিন্দুগৃহই হোক্ ওরূপ চিত্র 'সাধারণ' হওয়াটা কোনো গৃহেই বাঞ্ছনীয় নয়। তবে গল্প লেখ্‌বার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, কোনো গৃহে ওরূপ ঘটনা 'বিশেষ' হলেও তার মূলে কুঠার পড়া দরকার। 'মালঞ্চ' কেন ধরে নিচ্ছেন যে 'হিন্দু'গৃহেই বিশেষভাবে হুল ফুটিয়ে দেখার জন্যে দুনিয়ার লেখকলেখিকারা ষড়যন্ত্র করেছেন।

(২)

গল্পের দ্বিতীয় অংশে, বীভৎস কোনো রোগের ক্ষতে অপরিণামদর্শী বিশুর অপমৃত্যু ঘটার পর——

বাড়ীর লোকে বাণীর কাছে বল্লে নানা মতে
"তা' বাছা আর তোমায় নিয়ে কর্‌ব বল কিবা
রাত্রি দিবা
কে আর রবে তোমার সেবা নিয়ে
থাক আপন মায়ের বাড়ী গিয়ে!"

এ ঘটনা যতই আপ্‌শোষের হোক্ না কেন, অসম্ভব একটুও নয়। স্বামীর সম্পর্কেই শ্বশুরালয়ের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ—সেই স্বামী মৃত, উপরন্তু ঘরে টাকা থাকা দূরে থাক্, দেনার দায়ে গাঁয়ে মুখ দেখানোও ভার; এ অবস্থায়ও একটা 'বালবিধবা' জাতীয় পরগ্রহকে বিদায় করে' দিতে যারা না চায়, তারা ত দেবতারও পূজ্য।* অতএব ঐ বাড়ীর লোককে ধন্যবাদ দিতে না পার্‌লেও এখানে দোষ দেওয়া যায় না।

যাই হোক্, বাণী মায়ের কাছে গেল,—মা ছাড়া কেউ তার ছিল না। মারও কোনো সম্বল ছিল না,—চৌধুরীদের বাড়ী তারা চাকরী নিলে। 'মালঞ্চ' এখানে প্রশ্ন তুলেছেন—"পালন করিবার কেহ না থাকিলে যথাযোগ্য পরের বাড়ীতে খাটিয়া খাওয়া কি দোষের, না সেটা বড় অপমানের কাজ? অন্য সভ্যদেশের মেয়েরা দুরবস্থায় পড়িলে কি এমন খাটিয়া খায় না? না, তারা সকলেই রাজরাণী?"

শেষ মন্তব্যটি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ, কারণ উক্ত গাথার রচয়িতা রাজ-পরিবারভুক্তা; তা' ছাড়া, যে প্রশ্ন 'মালঞ্চ' তুলেছেন তা' তোল্‌বার অবকাশ যদি গাথা থেকে পাওয়া যেত, তা হলেও বা কথা ছিল, কিন্তু রচয়িত্রী সে অবকাশও দেননি দেখ্‌ছি। 'চাক্‌রী নেওয়া' কার্য্যটিকে লাঞ্ছিত বা অপমানিত করে' তাচ্ছিল্যের তুলিকায় আঁকা ত দূরের কথা—লেখিকা যে কতখানি সহানুভূতি ও করুণা ঢেলে দেখিয়েছেন তা' তাঁর বর্ণনা তুলেই দেখাচ্ছি:—

* পাঠকগণ মনে রাখিবেন, বৌটি তখন নবমবর্ষীয়া বালিকা মাত্র।

* পিতামাতা এরূপ বালবিধবা কন্যা আপনাদের কাছে নিয়া রাখিতে চান বটে, কিন্তু সাধারণ হিন্দু গৃহস্থজীবনের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন শ্বশুরবাড়ীর লোকে সচরাচর এরূপ ভাবে বিধবা বৌকে বিদায় করিয়া দেয় না।

"বিধবার ঐ একটি মাত্র মেয়ে
তাহারি মুখ চেয়ে
ভুলেছিলেন স্বামীর মৃত্যু দৈন্য দুঃখ জ্বালা ;
অনেক গেঁথে, অনেক জপে মালা
দূরাত্মীয়ের সাহায্যেতে শেষে কড়িটি ফেলে
পেয়েছিলেন আশাতীত, পেয়েছিলেন বড় ঘরের ছেলে !
বাণীরে তাই দেখে যে আজ
মাথায় যেন পড়্‌ল ভেঙ্গে বাজ !
বড় সুখে অকাতরে মায়ের বুকে নিদ্রা গেল বাণী ;
কপালে কর হানি'
মাতা বসে রইল রাত্রি জাগি'
বল্‌লে শুধু—"দুরদৃষ্টে এই কি ছিল হায় রে হতভাগী !
চৌধুরীদের বাড়ী গিয়ে চাকরী নিল মাতা
পরের বাড়ী খব্‌তে গিয়ে ভিজে ওঠে ভারি চোকের পাতা,
নইলে কিবা খাবে ?
পেটের দু'টি অন্ন কোথায় পাবে ?
বাণী হেথা ভাগ করে নেয় মায়ের বেদনাকে
হাতে হাতে এটা ওটা গুছিয়ে দিতে থাকে !
এম্‌নি করে কাজে বিরাম হীন
দুঃখে সুখে লাগ্‌লো যেতে দিনের পরে দিন !"

বলুন তো, এই স্নেহার্দ্র সহানুভূতি মণ্ডিত statement of factটীর মধ্যে এমন ছিদ্র কোথায় আছে যা' থেকে অনুমান করা চলে যে পরের বাড়ীতে খেটে খাওয়াকে লেখিকা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেছেন আর সেটা তিনি নিজে "রাজরাণী" বলেই ? রাজরাণীত্বই যদি এ ক্ষেত্রে একমাত্র অপরাধের কারণ হয় তা হ'লে 'মালঞ্চের' সমালোচক বাবাজীকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, যে তিনি আসচে-জন্মে নারীত্বলাভ করে' রাজরাণীই হন।

(৩)

বাণী যে সময় মায়ের কোলে ফিরে এসেছিল, সে সময় তার বয়স ছিল বারো বছর মাত্র। ক্রমে সে বড় হতে লাগ্‌ল, এবং মানব-জীবনের বসন্ত ঋতু অর্থাৎ যৌবন বৈধব্য-নীতির প্রতি কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন না করে' সে বেচারীরও সর্ব্বদেহে বিকশিত হয়ে পড়্‌ল। যৌবন নামক প্রাকৃতিক অবস্থাটির পক্ষে হয়ত যা' এটা সুরুচির পরিচায়ক না হ'তে পারে—তবে যা' ঘটেছে তার বর্ণনায় আশা করি ব্যাকরণ-দোষও কিছু দাঁড়ায় না। কিন্তু——

"চৌধুরীদের বড় ছেলে মণি
রূপের গুণের খনি
ওকালতি পাশ করেছে দু'মাস হল সবে—"

বাণী যে দিন পরিবেশন কর্‌তে গেল (স্নুতহিবুক যোগে নিশ্চয়ই যায়নি, কারণ তা' হলে শেষাশেষি বিয়েটা হয়েই যেতে পার্‌তো)—কেবল গ্রহনক্ষত্রের দোষে·

"দোঁহার পানে দোঁহার আঁখি নেমে
উঠ্‌ল না আর, মুগ্ধ হয়ে রইল্‌ হেথায় থেমে !"—

সর্ব্বনাশ আর কি,—সম্মুখে ভাতের থালা হাতে করে' উদ্ভিন্ন-যৌবনা উষার ফুলবালার মতন বালবিধবা বাণী আর নিয়ে ভাতের থালায় হাত রেখে রূপবান্ ও গুণবান্ নবীন ও অবিবাহিত উকীল যুবক মণিলাল !

'মালঞ্চ' বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে বল্‌ছেন—ইহাই সুরুচি, ইহাই সুনীতি, ইহাই নারীত্বের অতি উচ্চমর্য্যাদার, আর ইহাই বন্ধনমুক্ত আর্টের মহিমা ! উত্তরে আমি বলি,—ওর মধ্যে কুরুচি বা কুনীতি কোন্‌টা ?

বিধবার দেহে যৌবন-বিকাশটা না তার মনে মদনের বাণ-নিক্ষেপ-রূপ অকার্য্যটা ? দ্বিতীয়তঃ নারীত্বের প্রতি অমর্য্যাদাই বা এ চিত্রে কোন্‌খানটা ঘট্‌লো তাও তো দেখ্‌তে পাচ্ছি নে,—মণিলালের তরফ থেকে কি ?

সমালোচক হয়তো বল্‌তে চান যে বাণী পরিবেশন কর্‌তে আস্‌বামাত্র মণিলালের উচিত ছিল—একেবারেই গললগ্নীকৃত বাসে "আয়া ত্বি বরদে দেবি" বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা, এবং তা হলেই স্বভাবের মর্য্যাদা না থাক্, বিধানদাতাদের মর্য্যাদা থাক্‌তো। হতে পারে সমালোচক মহাশয়ের অন্তরাত্মা ভোগবতী পার হয়ে ইদানীং মন্দাকিনীর জলে নেমে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু বেচারী মণিলাল একে অবিবাহিত, তাতে আনকোরা কলেজ ফেরত ছোকরা—সমালোচক মহাশয়ের Fire proof বুকের কষ্টিপাথরে তাকে যাচাই কর্‌লে একটু বাড়াবাড়ি হবে না কি ? তারপর, গল্পের মণিলাল যদি গল্পের বাণীর মর্য্যাদা-হানিকর কিছু করেই থাকে সেটা বরং তার অবস্থাবিবেচনায় মার্জ্জনা করা যায়, কিন্তু ও গল্পের সমালোচক তাঁর মন্তব্য প্রকাশের ভঙ্গীতে নারীমর্য্যাদা সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী জ্ঞানের পরিচয় দিতে পেরেছেন কি ?

তারপর একদিন সকালবেলা বাণী যখন বকুলতলা দিয়ে কলসী কক্ষে জল আন্‌ছিল সেই সময় মণির সঙ্গে পথে দেখা হয় এবং মণি সসঙ্কোচে এমন একটা প্রস্তাব করে যাতে—"এক নিমেষে বাণীর জগত উঠ্‌ল দুলে পুরে"—কিন্তু মণির ঐ প্রস্তাবে দরিদ্রা-তনয়ার চিত্তজগৎ দুলে ও দুলে ওঠা সত্বেও—

"কোন মতে আপনাকে সে সুসম্বৃত করি
বল্‌লে "হরি, হরি !
এমন কথা আন্‌লে কেন মুখে ;
বড়ই দুখে
পড়ে আছি চরণ ছায়ে, অভাগিনীর দুঃখ কেন লবে !
আমায় নিলে তুমি যে আজ সমাজ ভ্রষ্ট হবে।"

অন্যে যাই বলুক আমি তো ঐ বালিকার সংযম আত্ম সম্মান-বোধ ও অনাবিল প্রীতিটুকুর প্রশংসাই করি,—কারণ

নিজের কথা না ভেবে তার মতন অবস্থাতেও সে এই কথাটাই ভেবেছে যে তাকে নিয়ে তার প্রীতি-পাত্রটী সমাজ-ভ্রষ্ট হবে। 'মালঞ্চ' বলেন—"ঐ নেওয়াটা যে কি রকম তা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই"— কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ঐ 'নেওয়াটা' যে 'বিবাহ করা' তা' স্পষ্টতর করবার দরকারই ছিল না, কেন না প্রস্তাবটা অন্যরূপ হলে 'সমাজভ্রষ্ট হওয়া না হওয়ার' কথা উঠ্‌তোই না; আর তা' এই জন্যে যে ডুব দিয়ে জল খাওয়ার বন্দোবস্তই যদি স্থির হোত, তা'হলে 'সমাজ' নামক "শিবের বাবা" নিশ্চয়ই টের পেতেন না। গাথাটীর শেষাংশে মণি প্রবাসে গিয়ে এক বছর পরে প্রথম উপার্জ্জনের কিছু টাকা একখানি চিঠির সঙ্গে বাণীর নামে পাঠিয়ে দেয়, তাতে লেখাছিল—

"ছেড়েছি সব আশা
তোমার ভাল চাওয়ার লাগি খুঁজে না পাই ভাষা;
বন্ধু বলে দিলাম হাতে
প্রথম উপার্জ্জনের টাকা এই চিঠিটীর সাথে—
অনুগ্রহ নয়,
হয়ত কাজে লাগ্‌তে পারে দুঃখে অসময়!—"

মালঞ্চ 'বন্ধুভাবে' কথাটীকে চিহ্নিত করায় মনে হচ্ছে যে ও কথাটীর সম্ভাব্যতায় তিনি সন্দিগ্ধ। কিন্তু তিনি যা অসম্ভব মনে করেন তা অন্যের পক্ষে, এমন কি যারা পরস্পরকে পতি-পত্নীভাবে পেলেই একদিন সুখী হত তাদের পক্ষেও অসম্ভব হতে পারে। কিন্তু হলে কি হবে—"Guilty minds are always suspicious" এ কথাও তো মিথ্যে নয়। সে যাই হোক্ মালঞ্চেরই মতন সন্দেহে ও শঙ্কায় পাড়া-পড়সীদের ধিক্কারের মাঝখানে চৌধুরী-গৃহিণীও উক্ত ঘটনার পর বাণী ও বাণীর মাকে বিদায় করে দিলেন।

অগত্যা মণির টাকা কয়টি হাতে লইয়া—

"মায়ে ঝিয়ে বেরিয়ে গেল নিশীথ ঘন রাতে।" মালঞ্চে প্রশ্ন দেখ্‌ছি—'কিন্তু কোথায় গেল?'

উত্তরে কিছুমাত্র না ভেবেই বলা যায় যে প্রথমতঃ গেল 'মালঞ্চে'র এজলাসে সুবিচার পাবার আশায়। এ আশা করাটা অন্যায়ও ছিল না, যেহেতু তারা কেউই এমন কোনো কাজ করেনি যা সমাজ-বিধি-বিরুদ্ধ; অপরাধের মধ্যে ঐ সকল বিধি বিধানের চাপ রক্তাক্ত-হৃদয়েও মাথা পেতে সহ্য করেছে। দ্বিতীয়তঃ গেল ওখানকার কাজীর বিচারে ফাঁসির হুকুম শুনে উচ্চতর আদালতে আপীল করতে। সর্ব্বশেষে গেলে, High-Court of Justice থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে নিজেদেরই সেই পরিত্যক্ত আবাসে, যেখান থেকে পরের বাড়ী চাকরী করতে এসেছিল। এইবার সত্য সত্যই

—"শ্রাবণ ধারা ঝরল অবিরল
বিধাতার এ দুটী-চোখের দুঃখ-করুণ জল।"

বলা বাহুল্য, সমাজ-বিধাতা মনু বা রঘুনন্দন প্রভৃতির চেয়েও এ বিধাতা অনেক বড়, কেননা তিনি শুধু সমাজ-দ্বারের পাহারওয়ালাই নয়, উপরন্তু মানব-হৃদয়পদ্মের সেই অন্তর্য্যামী যিনি জীবনে জীবনে আবির্ভূত হয়ে সত্যের পরশ বিলিয়ে যান, এবং তা' প্রকাশ ও প্রচার করবার বলও কাউকে কাউকে কাউকে দিয়ে থাকেন। ইতি—

শ্রীমতী সত্যপ্রিয়া দেবী।

মন্তব্য।—আমরা যে সমালোচনা করিয়াছিলাম,—তাহা লইয়া এই লেখিকা মহোদয়ার সঙ্গে কোনও রূপ বাদ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। মূল কবিতা, আমাদের সমালোচনা এবং এই প্রতিবাদ পত্র যাঁহারা পড়িয়াছেন ও পড়িবেন, তাঁহারাই বিচার করিবেন, আমরা যথোচিত কোনও মন্তব্য করিয়াছি কি না। অবশ্য নিজে আমরা সেরূপ মনে করি না। তবে নিরপেক্ষ সাহিত্যবিৎ দশজনের বিচার শির পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

শেষ আর একটি কথা বলিতে চাই। আমরা যে প্রসঙ্গক্রমে 'রাজরাণী' কথা বলিয়াছিলাম, তাহা এরূপ স্থলে সাধারণতঃ যেমন লোকে বলে, সেই ভাবেই বলিয়াছিলাম। মূল কবিতার রচয়িত্রী মহাশয়ার পদমর্য্যাদার প্রতি কোনও রূপ বিদ্রূপের অভিপ্রায় ছিল না,—সে কথা আদৌ তখন মনেই হয় নাই। তবে ইহাতে যদি তাঁহার মনে ব্যথা দিয়া থাকি, অতি বিনীতভাবে করজোড়ে তাঁহার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি নারী, আমাদের মাতৃস্বরূপা, লেখিকার ভাবে, তাঁহার লেখার আলোচনা যতই করি, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার কোনও অমর্য্যাদা করিতে পারি না। অসতর্ক হইয়া যদি কিছু করিয়া থাকি, তবে প্রার্থনা করি, অধমকে তিনি মার্জ্জনা করিবেন।

সম্পাদক।

চিত্র ব্যখ্যা

পদ্মপত্রশোভিত সরোবরে রামসীতা।

রাম নববধূ সীতাকে লইয়া অযোধ্যা প্রত্যাগমন করিলে সমগ্র অযোধ্যাপুরী আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিল। বরবধূ মধুযামিনীতে অযোধ্যার পদ্মপত্রশোভিত সরোবরসমূহে চন্দ্রালোকে খেলা করিয়া বেড়াইতেন। পদ্মপত্রের বর্ণের সহিত রামের বর্ণের সমতা দেখিয়া সীতা পদ্মপত্রে খেলিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইতেন।

প্রেমিক প্রেমিকারযুগল প্রেমবিহ্বল হইয়া সরোবরে অবতরণ করতঃ লুকোচুরি খেলিতেন। সীতা সরোবরে লুকাইলে রাম তাঁহাকে পদ্মের সহিত ভুল করিয়া খুঁজিয়া পাইতেন না। আবার রাম লুকাইলে সীতা পদ্মপত্রের মধ্যে রামকে খুঁজিয়া পাইতেন না। এইরূপে রামসীতার আত্মলীলায় কত মধুযামিনী অবসান হইয়াছিল।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নারায়ণ
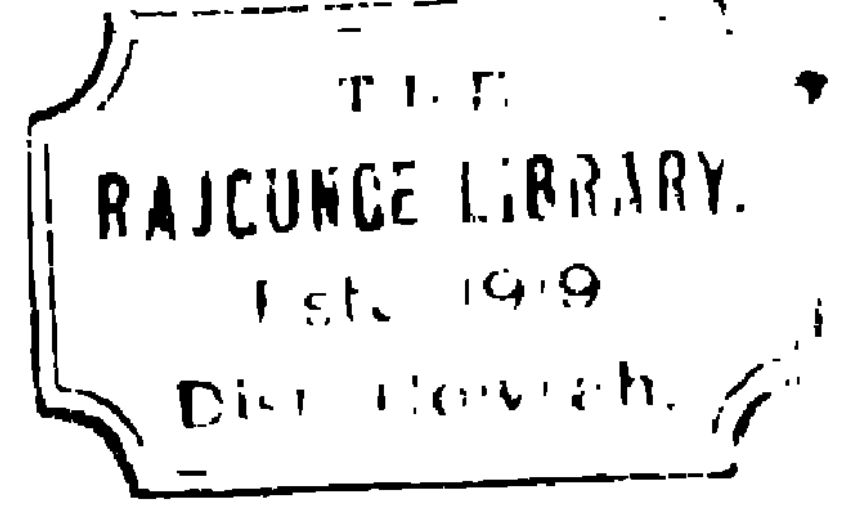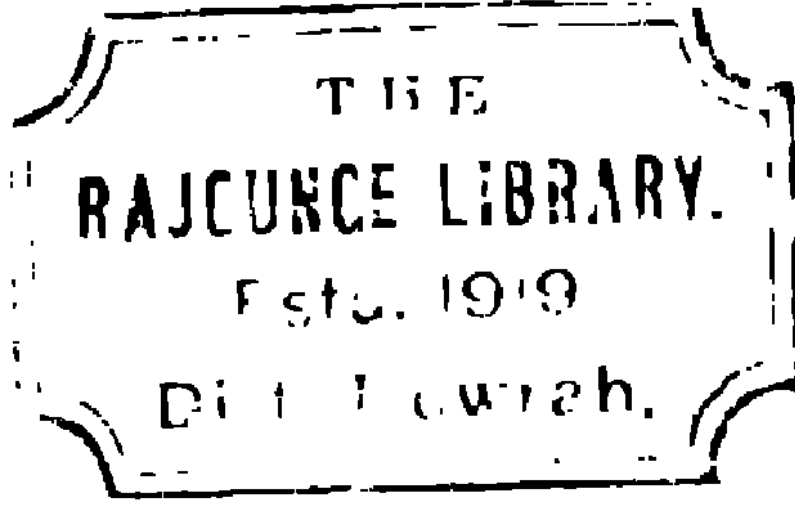
৫ষ্ঠ বর্ষ ৬ | শ্রাবণ—১৩২৬ | ৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

পথ কোথায় ?

দুঃখ দুর্গতি আমাদের অশেষ,—প্রতিকারের পথও ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, দূরে—আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে, শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, নিরাশার বিভীষিকা সেই ক্ষীণ শক্তি টুকুকেও একেবারে অসাড় করিয়া ফেলিতেছে।

দেশে প্রধান যাঁহারা, এই অন্ধকারের মধ্যেও আলো ধরিয়া দেশকে যাঁহারা মুক্তির পথে এখনও বোধ হয় চালাইতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যে মনীষার অভাব বড় নাই। কিন্তু মনে হয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তাঁহারাও ঠিক পথটি খুঁজিয়া লইতেছেন না। যে আলো তাঁহাদের চক্ষে পড়িতেছে, তাহা এমন বে-আড় ভাবেই পড়িতেছে যে তাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টিবিভ্রমই ঘটিতেছে, পথটা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। বরং অপথকেই পথের মত দেখিতেছেন। অথবা মনীষা আছে, কিন্তু প্রাণ তেমন নাই, প্রাণে এমন অনুভূতি নাই, যাহাতে সময়োচিত কঠোর কর্ম্মসাধনায় তাঁহাদিগকে প্রেরিত করিতে পারে। বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হউক, বুদ্ধিতে মানুষ বোঝে, বিচার করে, কিন্তু কর্ম্মের প্রেরণা তার আসে প্রাণের অনুভূতি হইতে। দেশের প্রধান যাঁহারা, মাথা যাঁহারা, তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন কথাটা বলা ধৃষ্টতা হইতে পারে, কিন্তু তবু বলিতে হইতেছে। ভুল বড়রাও করে, ছোটরাও করে। বড়র তরফ হইতে তাদের ভুলের কথা বলাটা ধৃষ্টতা পদবাচ্য হইতে পারে, কিন্তু বড়র ভুলে ক্ষতি যত বড় হয় ছোটর ভুলে তা হয় না।

এই বড়রা তাঁহাদের মনীষা লইয়া কি করিতেছেন? এক দল—ইঁহারাই সব চেয়ে বড় দল—তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ও অবসর রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনেই পর্য্যবসিত করিতেছেন,—আন্দোলনের সীমার বাহিরে কল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান একেবারেই গিয়া পৌছিতেছে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনও কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারও আমাদের নাই। সুতরাং আন্দোলনই করিতে হয়। কাজটাও অপেক্ষাকৃত সহজ। নাগরিক জীবনের সকল বৈভববিলাসের মধ্যে থাকিয়া ফুরফুরে মত বেশ করা যায়,—পল্লীর জঙ্গলে পচা জলকাদায় পা দিতে হয় না। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন—(Political agitation) একেবারে নিষ্প্রয়োজন তাহা বলিতেছি না। কিন্তু দেশের বাস্তব যে অতি গভীর দুঃখ—যাহা সর্ব্বত্র সকলে আজ হাড়ে নাড়ে অনুভব করিতেছে, যাহা দিন দিন অসহনীয় সীমায় গিয়া উঠিতেছে, যাহা দেশের অস্থি মজ্জা মেরুদণ্ড সব শুকাইয়া পেষিয়া একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে,—তাহা কেবল নাগরিক রাষ্ট্রীয়সভার বিভূতিতে বা সংবাদ পত্রে লেখনী চালনায় দূর হইবার নহে। তার জন্য বহু কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাণপাত করিয়া খাটিতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, উন্নত রাষ্ট্রীয় অধিকার রাষ্ট্রীয় শক্তি আয়ত্ত করিতে না পারিলে আর কোনও কাজই হইবে না। কিন্তু এই আন্দোলনে তাহা আয়ত্ত হইবার সম্ভাবনা ত বড় কিছু দেখা যাইতেছে না। যে দিবে সে অতি প্রবল, আর যে পাইতে চায় সে অতি দুর্ব্বল। দুর্ব্বলকে চাপিয়া রাখিয়া প্রবল যেখানে মনে করে তার স্বার্থ সিদ্ধি হইবে, আর চাপিয়া রাখিবার মত প্রচুর শক্তি ও তার আছে, তখন সে দুর্ব্বলকে চাপিয়াই রাখে,—রাখার পক্ষে ওজরের অভাব তার হয় না, যদি এরূপ কোনও ওজর দেওয়া সে দরকারই মনে করে। দুর্ব্বলকে এ অধিকার লাভ করিতে হইলে কর্ম্মশক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে, মানুষ হইয়া তাকে উঠিতে হইবে, কথার ছটায়, কলমের ওস্তাদীতে ফল বেশী কিছু হইবে না।

আর একদল মনীষী আছেন, দলে অতি বড় না হইলেও, মাথার কচ্‌কচি কি কলমের খোঁচাখুঁচিতে ইহারা বড় ছোট নহেন,—সাহিত্যের রস সাগরে এক তুমুল তরঙ্গ তাঁহারা তুলিতেছেন। সেকালের কি একালের সাহিত্য বড়, বৈষ্ণব কবি কি রবিবাবু বড়, সাহিত্য কেবল রসে রসিক হইয়া প্রমোদ উত্থানে গোলাপী নেশায় প্রেম বিলাসে বিভোর থাকিবে,—আর পৃথিবীতে নন্দনের সুখ ভোগ করিবে, না মানুষকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়াসে ব্যর্থ হইবে,—মানুষ নীতির বন্ধন মানিয়া চলিয়া তার জীবনকে নীরস অসাড় করিয়া ফেলিবে, না সকল বন্ধন সবুট পদাঘাতে ছিন্ন করিয়া উদ্দাম বাসনার তাড়নায় সমাজ ও পরিবার ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে,—সাহিত্যরসিক মনীষিরা এই বিতর্কেই মাতিয়া আছেন, যেন দেশের পরমার্থ ইহাতেই সাধিত হইবে। এসব বিতণ্ডা কিছু ভাল লাগে, যদি আর পাঁচটা গুরু কাজের কথার মধ্যে একটু একটু চাটুনির মত হয়। কিন্তু ইহাদের আধিক্যই এত বেশী হইয়া উঠিতেছে যে কাজের কথাই একটু আধটু চাটনীর মত দেখা দেয়—অনেকের পক্ষে আবার তাহা তিক্ত চাটনা। গুরুপাক এত মধুর রসের মধ্যে হজমী হইলেও এই তিক্ত চাটনী, সত্য কয় জনের ভাল লাগে?

আরও কেহ কেহ আছেন যাঁহারা দেশের সকল দুর্গতির কারণ হিন্দুসমাজের উপরে আরোপ করিয়া গালি দিতেছেন। জাতিভেদহেতু দেশে একতা নাই। অধিকাংশ লোককে হিন্দুসমাজ একেবারে নীচে চাপিয়া রাখিয়াছে, মানোবচিত সকল সুখে সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়া তার একেবারে হীন ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। সহস্র বিধি নিষেধের বন্ধনহেতু স্বাধীন ভাবে একটু চলা ফেরার অবকাশ কাহারও নাই। 'মনুর' পাষাণ 'মানব'কে চাপিয়া একেবারে অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে,— এ অবস্থায় জাতির মনুষ্যত্বের শক্তি ও মহিমা বিকাশ লাভ করিতে পারে না। এমন কি দেশের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেও অনেক সময় এইরূপ সব কথা শোনা যায়, তাঁহার শিষ্য অনুশিষ্যগণও সর্ব্বদা ইহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন। আমাদের প্রবাসীতে তাঁহার একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, 'বাতায়নিকের পত্র'। প্রবন্ধটী মোটের উপর এতই উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বলিতে ইচ্ছা হয় এ প্রবন্ধ রবীন্দ্র নাথেরও গৌরব। তবে শেষের দিকে আমাদের দুর্ব্বলতা ও অবসাদের কথা তুলিয়া হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার সেই পুরাতন উক্তিরই পুনরুক্তি তেমনই কঠোর ভাবে করিয়াছেন।

ভারতের অধিবাসী সব হিন্দু নহে। হিন্দুনামে সাধারণ ভাবে সেন্সাস্ রিপোর্টে উল্লিখিত হইলেও বহু সম্প্রদায় এমন আছে লোকসংখ্যাও তাদের কম নয়—হিন্দুসমাজ-শাসন বা ধর্ম্মশাসন তাহাদিগকে খুব কমই স্পর্শ করে। খৃষ্টান শিখ পার্শী এসব সম্প্রদায় বাদদিলেও এক মুশলমানের সংখ্যাই ছয় কোটির উপরে। মুশলমান জাতিভেদ মানে না, বরং সাম্যনীতি মুসলমান যতটা স্বীকার করিয়াছে জগতের আর কোনও জাতিই তত করে নাই। সেই মুসলমানও ভারতে তবে এমন হীন ও দুর্ব্বল কেন? হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের অবস্থা উন্নত নয় কেন? ভারতের বাহিরেরইবা মুসলমান কোথাও তেমন মাথা তুলিতে পারিতেছে না কেন?

জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ উচ্চনীচ পর্য্যায়ভেদ, আচার নিয়মের অনুবর্ত্তিতা, শাস্ত্রের শাসন, বহু প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান,—এসব সত্ত্বেও বহু সহস্রবৎসর হিন্দু অতি উন্নত ও শক্তিমান্ ছিল। মুসলমান জয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই যবন শক হূন প্রভৃতি বহু বিদেশী জাতির চাপ হিন্দুর উপরে আসিয়া পড়িয়াছে,—তাহাও হিন্দু সামলাইয়া আবার ঠিক হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান আমলেও রাজপুত

রাঠা শক্তির পরিচয় নিতান্ত কম দেয় নাই। ধর্মের ও ...জের ক্ষেত্রেও নূতন নূতন কত ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছে, ...া প্রভাব তার রাখিয়া গিয়াছে। সেই হিন্দু আজ এত ...ল হইয়া পড়িয়াছে কেন?—ইহার কারণ তার ধর্ম-...তি বা সমাজ পদ্ধতিতে নয়, অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে ...বে।

ধর্মপদ্ধতি বা সমাজপদ্ধতি কোনও দেশেই কোনও ...এ সময়ে দুই চারিজন মাথাওয়ালা লোকের হাতে গড়া ...নিশ নয়। এমন কোনও ধর্ম্ম পদ্ধতি বা সমাজ ...তিও নাই, যার মধ্যে দোষ গুণ দুই-ই না পাওয়া ...ইবে। কোনও ব্যক্তির দেহ ও চরিত্র যেমন কতক স্বভাবের প্রভাবে, কতক পারিপার্শ্বিক বহু অবস্থার প্রভাবে ...ার দোষগুণ লইয়া গড়িয়া উঠে, সমাজপদ্ধতিও কতক জনমণ্ডলীর প্রকৃতির বশে, কতক বহু অবস্থার প্রভাবে বহু ...গ ধরিয়া তেমনই ক্রমে তার সকল দোষগুণ লইয়া গড়িয়া উঠে। কোনও বিশেষ একটি আদর্শ ধরিয়া নির্জ্জীব মূর্ত্তি গড়ার মত কোনও দেশেই কোনও মানব সেই দেশের সমাজপদ্ধতি গড়ে নাই, গড়িতে পারে নাই। স্বাভাবিক ...তি গতি যেদিকে দেখা গিয়াছে, সেই দিকেই তখনকার সাময়িক অবস্থায় আত্মরক্ষা করিয়া যত দূর সম্ভব মঙ্গল লাভ করিতে পারে মঙ্গলে স্থিত হইতে পারে, সেই লক্ষ্য ধরিয়াই যুগে যুগে শাস্ত্রবিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

হিন্দু সমাজ বাস্তবিক বিধিনিষেধে অষ্টেপৃষ্ঠে বাধা একটা 'অচলায়তন' নহে। প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র, পরবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, সংহিতা,—তার পর রঘুনন্দন প্রভৃতি নব্যস্মৃতি—সব যদি কেহ তুলনা করিয়া দেখেন, কত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ রঘুনন্দনের স্মৃতি-শাসিত, কিন্তু সেই স্মৃতির ব্যবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান বাস্তব আচার নিয়ম যদি কেহ তুলনা করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন, সমাজ কত বদলিয়া গিয়াছে।—পুরাতন ইতি-হাসইবা ঘাঁটিতে হইবে কেন? আমাদের চক্ষের উপর দিয়া এই যুগে যে কি পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সমাজিক ও পারিবারিকজীবন যেরূপ ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। কঠোর আচার নিয়মের কত ...কের কত বাধা ভাঙ্গিয়া হিন্দুসমাজ নূতন পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থার সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই ইহা লক্ষ্য করিতেছেন, অনুভব করিতেছেন। কালের গতির সঙ্গে হিন্দুসমাজ চলিতে অক্ষম নয়। প্রাচীন কোনও পদ্ধতি ইহার বেণী দ্রুত চলিতে পারে না। নূতন কোনও আদর্শেও প্রাচীন পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া কেহ গড়তে পারে না। ভাঙ্গিবার শক্তি সম্ভব হইলেও, ভাঙ্গিতে পারিলেই গড়িতে সহজে কেহ পারে না। এরূপ বিপ্লব অমঙ্গল বই মঙ্গল কোথাও প্রসব করে নাই। ইতিহাসের সাক্ষ্যই ইহার প্রমাণ।

জাতিভেদ তুলিয়া দেও, ছোট বড় পর্য্যায় সব এই মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া ফেল, সব সমান হইয়া দাঁড়াক, শাস্ত্রবিধি ও লোকা-চারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সকলে যার যার স্বাধীন বুদ্ধিতে চল,—এরূপ সব কথা মুখে বলা যায়, কাজে হয় না, হইলেও তাহাতে মঙ্গল ঘটে না।

দোষ আমাদের পদ্ধতিতে অনেক আছে। কোথায় কোন্ পদ্ধতিতে তা নাই? ব্যষ্টিমানব যেমন পূর্ণ ও নির্দ্দোষ হয় না—সমষ্টি মানবও হয় না। তবে কালোপযোগী সংস্কার ও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাহা হইতেছে ও হইবে।

ক্রমাগত হিন্দুসমাজের উপরে এই আক্রমণ কেবল তাহার পদ্ধতিকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবার বৃথা প্রয়াস—ইহাতে কেবল বিদ্বেষেরই সৃষ্টি হয়, আরও শক্ত করিয়া লোকে দোষ ধরিয়া থাকিতেই চায়।

এই বিদ্বেষ যে কেবল এই আন্দোলনেই সৃষ্ট হইতেছে তা নয়, আরও যে দুইটি আন্দোলনের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতেও যথেষ্ট হইতেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সাহিত্য ক্ষেত্রে, আর সংস্কার ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই সমান দলাদলি, সমান রেষারেষি, সমান বিদ্বেষের বিষ উঠিতেছে। কেহ কাহাকেও চুকিয়া কথা কয় না। লেখনীতে বা রসনায় এক পক্ষ অপর পক্ষকে কত বড় শক্ত ঘা দিতে পারে · লক্ষ্য বেশীই এই দিকে, বাহাদুরীও তাহাতে। অথচ দেশের সব চেয়ে বড় দুঃখ বড় অভাব—আসল যে সব দুঃখ যে সব অভাব—যাহাতে দেশের প্রাণ, দেশের সকল শক্তি একেবারে পিষিয়া বাহির হইতেছে, এ সব আন্দোলন তার প্রতিকারের পক্ষে কোনও সহায়তাই করিতেছে না।

অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, দেহে স্বাস্থ্য নাই, মনে

সুখ নাই, প্রতিকারে কোনও আশা নাই, কেবল দুঃখ কেবল অন্ধকার—মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ই ঐহিক জীবনে ক্লেশের একেবারে চরমে গি া পৌঁছিয়াছে। দেশের আশা ভরসা ছেলেগুলির একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। শিক্ষার ব্যয়ের দাবিতে ছেলের বাপেরা চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছে, শিক্ষার চাপে ছেলেগুলির মাথা মজ্জা অস্থি চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আর শিখিতেছেই বা তারা কি ছাই! কাজের কথা বাদ দিয়া বাজে কথারই বহর বাড়িতেছে! আর সে শিক্ষা পাইয়া কি যে এরা করিয়া খাইবে, তায় কোনও কিনারা কেহ পাইতেছে না। ছাত্র ও অভিভাবক সকলেই আশার কোনও পথ দেখিতে না পাইয়া ভবিষ্যতের ভাবনায় আকুল হইয়া হায় হায় করিতেছে!

এইত দেশের অবস্থা, তার কোনও প্রতিকারের কথা নাই, কোনও প্রয়াস নাই,—এই সব আন্দোলন লোককে কেন আকৃষ্ট করিবে? নেতারা চেঁচাইয়া মরিতেছেন, কিন্তু তাঁদের কথায় কোমর বাঁধিয়া কাজে নামিতেছে কয়জন? আর কাজ কিছু থাকিলে ত তাহাতে নামিবে? তাঁরাও বাক্য ঝাড়েন, এরাও যারা আসে—বাহবা দিয়া চলিয়া যায়। নিত্যকার জীবনে যাদের এত দুঃখ—নিকট ভবিষ্যৎ যাদের এমন অন্ধকার—রাষ্ট্রীয় অধিকারের দর ভাল মন্দের কথা তারা ভাবিতে পারে না, তারজন্য দিতেও কিছু পারে না। সাহিত্যরসের আদর্শ লইয়া এত কচকচি তাদের মনে কোনও আনন্দের আগ্রহ জন্মাইতে পারে না। হিন্দুসমাজের জাতিভেদের দোষ, বিধিনিষেধের বন্ধন, সামাজিক অধিকার কি হওয়া না হওয়া উচিত, তা লইয়াও লোকে বড় মাথা ঘামাইতে পারে না। আগে চায় লোকে অন্নবস্ত্র পাইয়া সুস্থদেহে এই পৃথিবীতে থাকিতে, তারপর অন্যকথা। সে অভাব যেখানে নাই, খাইয়া পরিয়া সচ্ছন্দে লোকে আছে, সেখানেও এসবের জন্য লোক বড় মরে না। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিব। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে সাহা ও সুবর্ণবণিক—এই দুই সম্প্রদায়ই জল অনাচরণীয় জাতি। কিন্তু বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ধনধান্যে ইহারা সৌভাগ্যবান, লেখাপড়াও শিখিতেছে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চতর জাতিসমূহ ইহাদের জল খায় না খায়, বেদ ইহারা পড়ে না পড়ে (আর কেইবা পড়ে) তার জন্য থোরাই কেয়ার ইহারা করে। বরং ব্রাহ্মণাদি জাতির লোকেরা অনেকে ইহাদের কাজ করিয়া ইহাদের অন্নেই প্রতিপালিত হইতেছে! তারপর সামাজিক অধিকারের বৈষম্য যাই থাক্, হিন্দুশাস্ত্রের জাতিভেদবিধি কোনও জাতিরই মুখের অন্ন কাড়িয়া লয় নাই। যার যার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে সে খাইয়া পরিয়া বেশ থাকিতে পারে, সর্ব্বত্র এরূপ ব্যবস্থা আছে। তথাকথিত সাম্যনীতির গর্ব্ব সত্ত্বেও ইয়োরোপেই বরং দেখা যায়, নিম্নতর দরিদ্রশ্রেণী সমূহ উচ্চতর ধনী সম্প্রদায় সমূহের অতিলিপ্সায় একেবারে নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সোসিয়ালিজম্ বল্‌শেভিজম্ দরিদ্রের এই দারুণ অন্নকষ্টের ফল। এদেশের সমাজবিন্যাসে জাতিভেদে ধনভেদ এমন ঘটে নাই। জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই বরং শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিলে সব চেয়ে দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়।

তাই বলিতেছিলাম, এই সব আন্দোলন, দলাদলি দ্বেষাদ্বেষি কিছু কমাইয়া, ইহাতেই প্রমত্ত বল বা লেখনী কিছু সংযত করিয়া, দেশের যে সব বড় দুঃখ—যাহাতে দেশ সত্যই একেবারে মরু হইয়া যাইতেছে, তার প্রতিকার হইতে পারে এরূপ সব কর্ম্মানুষ্ঠানে এখন দেশের প্রধান যাঁহারা তাঁহাদের ব্রতী হওয়া আবশ্যক।

এই সব কর্ম্ম কি?

১। আশু দারুণ এই অন্ন ও বস্ত্রকষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কতক গবর্ণমেণ্টকে ধরিয়া, কতক নিজেদের প্রয়াসে সর্ব্বত্র সদাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষুধার্ত্ত যাতে ৩টি অন্ন পায়, বস্ত্রহীন যাহাতে লজ্জা নিবারণ করিতে পারে, তাহা করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় নেতারা যদি তা পারেন, দেশের জনসাধারণ তাঁদের হাতের মুঠায় আসিবে। মণ্টেগুর শাসন সংস্কার অপেক্ষা অনেক বড় রাষ্ট্রীয় মঙ্গল তাহাতে হইবে।

২। আশু এই দুঃখ দূর হইলে স্থায়ী ব্যবস্থাও কতকগুলি করিতে হইবে। যথা—

(ক) গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি।

(খ)—ছেলেদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা। অল্প ব্যয়ে অল্প সময়ে কাজের কথা যাতে বেশী শিখিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাপ্রণালী নিরূপণ ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। কেরাণীগিরি বা ওকালতীতে কেবল আর কুলাইতেছে না। একটু উপরে উঠিয়াই ছেলেরা যাহাতে নানাবিধ ব্যবসায় বাণিজ্যের

'বস্থা অভ্যাস করিতে পারে, উচ্চতর শিক্ষায় সেইরূপ ব্যবস্থা করা। এজন্য সরকারী শিক্ষাবিভাগ এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের দিকে হা করিয়া চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। আপনাদের পরিচালনাধীনে নূতন শিক্ষার—এক কথায় জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রচার করিতে হইবে।

(গ) ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং তাহার উন্নতি ও প্রচারকল্পে সর্ব্ববিধ সাহায্যদান।

৩ এই সব জনহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য কংগ্রেস হইতে স্থায়ী কর্ম্মকর কমিটি নিয়োগ।

কংগ্রেসের কর্ম্মশক্তি এখন প্রধানতঃ এই দিকে পরিচালিত হওয়া দরকার।

এই সব কর্ম্ম আরম্ভ হউক, তার ফল ফলুক—মানুষ সুস্থদেহে ও সুস্থমনে একটু বাঁচিয়া থাকিবার আশা দেখুক,—ক্রমে কর্ম্মী স্বাবলম্বী ও শক্তিমান্ মানুষ তাহারা হইয়া উঠুক—উন্নত জীবনের অধিকার তারা আপনারা দেখিয়া লইবে। হিন্দুসমাজের শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার বাস্তবিক কখনও মানুষকে চাপিয়া রাখিতে চায় নাই,—চাহিলেও পারে নাই। 'মনু'তে ও মানবে স্থায়ী অমঙ্গলকর বিরোধ এদেশে কখনও ঘটে নাই।

সাময়িক সাহিত্য

প্রবাসী আষাঢ়—১৩২৬।

অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে

শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্র ঠাকুর মহোদয়ের কয়েকখানি পত্র—

প্রথম পত্রখানিতে তিনি লিখিয়াছেন, "অসবর্ণ বিবাহ ত বিবাহ; তাহা তো আর অবিবাহ নহে। বর্ত্তমান সময়ে দেশশুদ্ধ কৃতবিদ্য লোক যখন উহাকে বিবাহ ছাড়া অবিবাহ বলেন না, বলিতে পারেনও না, তখন তাঁহাদের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করা আমার মতে আইন কর্ত্তাদের পক্ষে কোনক্রমেই শোভা পায় না।"

দেশশুদ্ধ কৃতবিদ্য লোক অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করিতেছেন, একথা বলাটা কি ঠিক? রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃগণ প্রায় সকলেই ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন—প্রতিবাদের পক্ষে শাস্ত্রের বিধিও অনেক দেখাইয়াছেন। ইহারা যে দেশের কৃতবিদ্য লোক নহেন একথা বলা যায় কি? যুক্তি দ্বারা ইহাদের যুক্তি খণ্ডন করিতে হইবে। কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের বাহির বলিয়া ইহাদের একেবারে ঠেলিয়া রাখা যায় না।

দ্বিতীয় পত্রে একস্থানে আছে,—"বিবাহের পাত্র নির্ব্বাচনের কষ্টিপাথর প্রেম, জহুরী-জ্ঞান। দুয়ের যোগ মণিকাঞ্চন যোগ। যে বিবাহ প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞান দ্বারা অনুমোদিত তাহা সর্ব্বথা অনুষ্ঠাতব্য।"

যাঁহারা কোনও সমাজভুক্ত নহেন, যাঁহারা বলেন 'মনু' মানিনা, 'মানব' মানি, তাঁহাদের পক্ষে একথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মবিধির উপরে প্রতিষ্ঠিত কোনও সমাজের লোকের পক্ষে সর্ব্বদা ইহা চলে না। ইঁহাদের সকলকেই জীবনের অনেক কাজে 'মনু' মানিতে হয়। (অবশ্য 'মনু' বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে যে, প্রাচীন ধর্ম্মবিধি ও লোকাচার সমাজকে সমাজরূপে ধরিয়া রাখিয়াছে)। তর্কটা হইতেছে হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ চলিতে পারে কিনা তাহা লইয়া। সুতরাং পক্ষে ও প্রতিপক্ষে সকল যুক্তিতে শাস্ত্র ও লোকাচারের প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বিধি নিষেধের সকল বন্ধনের বহির্ভূত, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ আইন আছে কি না আছে, তাহা দেখিবারও কোন প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় পত্রে আছে, "আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে কোন পাত্রাপাত্র যদি বিবাহসূত্রে নিবদ্ধ হয়, তবে তাহা হিন্দুমতের বিবাহ বলিয়া হিন্দুসমাজে কেন গণ্য হইবে না, তাহারও কোনও কারণ নাই।"

বিরাট হিন্দুসমাজ অসংখ্য জাতিতে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত, বিবাহ পদ্ধতিও অনেকরকম আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে তান্ত্রিক শৈব বিবাহ হইত, তাহাও বিবাহ ছিল। বৈষ্ণবের কণ্ঠিবদলও বিবাহ আসাম কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' যদি হিন্দুসমাজেরই একটা সম্প্রদায় বিশেষ বলিয়া আপনাকে মনে করেন ও সেইভাবে চলেন এবং তাহার ফলে অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় সমূহ যদি তাঁহাদিগকে আপনাদেরই এক বিশিষ্ট সম্প্রদায় বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকে হিন্দুরা অবশ্যই হিন্দু বিবাহ বলিয়া মনে করিবেন।

চতুর্থ পত্রে একস্থানে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"পুরাতন ভদ্রসমাজের (যেমন ধৃতরাষ্ট্রের আমলের)

কু-রীতি এবং কু-নীতি কালের সর্ব্বশোধনী মার্জ্জনীর আশীর্ব্বাদে ক্রমশঃই আবর্জ্জনার ঝুড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতে থাকে এবং সু-রীতি এবং সু-নীতি ক্রমশঃই নবতর এবং কল্যাণতর মূর্ত্তিতে লোকসমাজে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে থাকে।"

প্রথম কথাটার মধ্যে '(ধৃতরাষ্ট্রের আমলের)' এই খোঁচাটুকু না থাকিলেই শোভন হইত। ইহার আবশ্যকতাও এস্থলে কিছু দেখা যায় না। মানব অপূর্ণ—প্রাচীন কি আধুনিক সকল সমাজেই মানবের মধ্যে দোষ ত্রুটি অনেক থাকে। এক যুগে বা এক সমাজে যাহা কু-রীতি ও কু-নীতি বলিয়া গণ্য, অন্য যুগে বা অন্য সমাজে তাহা কু-রীতি ও কু-নীতি বলিয়া লোকে গণ্য করে না। ধৃতরাষ্ট্রের আমলের যে কু-রীতি ও কু-নীতির কথা অনর্থক এখানে তোলা হইয়াছে, তাহা তখন লোকে কু-রীতি বা কু-নীতি বলিয়া মনে করিতেন না। আর এই কু-রীতি ও কু-নীতি সত্বেও সেই আমল ভারতের যে বড় একটা উন্নতির ও গৌরবের আমল ছিল, একথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অস্ততঃ যে অসবর্ণ বিবাহ পত্রের প্রসঙ্গ—সেই অসবর্ণ বিবাহ তখন সমাজে বেশ চলিত। প্রেম-প্রেরিত গান্ধর্ব্ব বিবাহও তখন নিন্দনীয় ছিল না। মহাভারতকার স্বয়ং ব্যাসদেবই এইরূপ অসবর্ণ গান্ধর্ব্ব মিলনের ফল।

কালের মার্জ্জনী 'সু' ও 'কু' দুই দূর করে। প্রাচীন সমাজের সঙ্গে আধুনিক সমাজের তুলনা করিলে, মানব-সমাজে সুরীতি ও সুনীতির যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, এমনও মনে হইবে না। কালের গতি জগতের মানব-সমাজকে যে রীতিনীতি সম্বন্ধে কেবলই উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছে, এ কথা ইতিহাসের বাস্তব প্রমাণ সাপেক্ষ, এক কথায় ধরিয়া নিবার বিষয় নহে।

ঘরে বাইরে।— লেখক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,—

প্রথমেই 'বীরবলের হালখাতা' হইতে এই কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে'য় আমাদের জাতীয় সমাজের সমস্যার ছবি একেছেন, কেন না ও উপন্যাসখানি একটি রূপক কাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নিখিলেশ হচ্চেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইয়োরোপ, আর বিমলা বর্ত্তমান ভারত।"

লেখক প্রবন্ধে এই রূপক তত্ত্বেরই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রবন্ধের শেষের দিকে তিনি বলিতেছেন, "ইয়োরোপের মধ্যে একটা সত্য আছেই। কি এ সত্য? * * * দেখ্‌তে পাচ্চি আমরা মানুষের জীবন—মানুষের দুর্ব্বার কর্ম্মপ্রেরণা তার জীবনে অসীম ভোগ সামর্থ্যের আভাস—তার অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত উদ্যম—ধরিত্রীর কাছ থেকে তার আনন্দ আদায় সামর্থ্য। দেখ্‌তে পাচ্চি আমরা ইহলোকে মানুষের লীলাবিলাস। তবে কর্ম্ম-ভোগকে মন্থন ক'রে যে অমৃত না উঠে বিষ উঠ্‌ল, তার কারণ 'অহং' এর কর্ম্ম—'অহং' এর ভোগ, এ কর্ম্মভোগ সারা বিশ্বের আশীর্ব্বাদ নিয়ে কল্যাণময় হয়ে ওঠেনি, বিশ্ব মানবের প্রেম নিয়ে শুদ্ধ হয়ে ওঠেনি, এ কর্ম্ম এ ভোগ নিখিলেশের জ্ঞান ও হৃদয় নিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় নি।"

ইহাকেই প্রবন্ধের মোট চুম্বক বলা যাইতে পারে,—কথাটা মোটের উপরে সত্য,—তবে নিখিলেশের চরিত্রকে ঠিক প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও হৃদয়ের রূপক বলা যায় কি না, ইহা বিবেচনার বিষয়। থাক্ সে কথার আলোচনা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

তার পর লেখক আবার বলিতেছেন, "এদেশের এক দল বল্‌বেন, কর্ম্মটাই থাক, ভোগটা আবার কেন? ওটা আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিকতার বিরোধী। কিন্তু এই সৃষ্টি মানেই ভোগ—এই লীলা মানেই শব্দ গন্ধ রূপ রস—তার অনুভূতি—তার অনুভূতির আনন্দ। সুতরাং তা অস্বীকার করা মানেই সৃষ্টিকে অস্বীকার করা। আসল কর্ম্মে ও ভোগে এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে, যিনি ভোগবাদ দিয়ে কর্ম্মকে বা কর্ম্ম বাদ দিয়ে ভোগকে আশ্রয় করবেন, তাঁহারই কর্ম্মভোগ হবে।"

শেষে এই কথাগুলিতে সুরেশ বাবু প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন,—"কর্ম্ম ও ভোগকে নিজের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য তার প্রতিষ্ঠা হবে নিখিলেশের সত্য-জ্ঞানের উপরে। বিমলার যে সন্দীপের প্রতি টান সে টানের পিছনেও একটা সত্য আছে। এই সন্দীপে আর নিখিলেশে যখন মিলন হবে—নিখিলেশের অন্তর দেবতার উপরে যখন সন্দীপের অন্তর দেবতার প্রতিষ্ঠা হবে, তখনই বিমলার পূর্ণ-

শক্তি মুক্ত হবে। আমরা প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপরে নবীন ইয়োরোপের কর্ম্ম ও ভোগকে প্রতিষ্ঠিত করে, বর্ত্তমান ভারত গ'ড়ে তুলব। তখনই তা সত্য হবে—বিমলানন্দে; নিত্য হবে, চিরমঙ্গলে; মুক্ত হবে—চির সুন্দরে।"

ভোগমুখী হইলেও নবীন ইয়োপের কর্ম্মসাধনা অতি প্রবল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার ভারতের প্রাণে ইয়োরোপকে টানিয়া আনিতে কেন হইবে? ভারতের নিজের ধর্ম্মও এই আদর্শে হীন নহে। আধ্যাত্মিকতা, নিষ্কাম কর্ম্ম, ত্যাগ, বৈরাগ্য গুণ, মোক্ষসাধন, ইহাই কেবল ভারত-ধর্ম্মের আদর্শ নহে। যাঁহারা এই সবই মাত্র ভারতীয় ধর্ম্মের আদর্শ বলিয়া গৌরব করেন তাঁহারাও ভুল করেন আবার যাঁহারা বলেন, ত্যাগ বৈরাগ্য আধ্যাত্মিকতায় গা ছাড়িয়া দিয়া ভারত কর্ম্মশক্তিহীন ও নিৰ্ব্বীৰ্য্য হইয়াছে, তাঁহারাও ভুল করেন। ভারত এখন হীন হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা সত্য; কিন্তু তার কারণ ভারতীয় ধর্ম্মের আদর্শের নহে। ভারতের ধর্ম্মগুরুগণ শক্তিভেদে অধিকারী ভেদে অবস্থা ভেদে সংস্কার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোনওরূপ সাধনাই তাহাতে বাদ যায় নাই। মোক্ষ এবং মোক্ষের অনুকূল ত্যাগ বৈরাগ্য নিষ্কামতাদিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও ভোগাভিমুখী কর্ম্মসাধনাকে ভারতের ধর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করিতে কখনও বলেন নাই। ব্রহ্মণ্যকে সমাজে শীর্ষস্থানে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু ক্ষাত্র বৈশ্য শূদ্র সকল ধর্ম্মেরই যথাযোগ্য স্থান তাহাতে আছে, এবং এই চতুরঙ্গেরও সমন্বয়েই সমাজের ও সমাজ-ধর্ম্মের যে পূর্ণতা তাই ভারতধর্ম্মের আদর্শ। ব্রহ্ম প্রধানতঃ ভোগ বিমুখতার ধর্ম্ম হইলেও ব্রহ্মণ্য তেজ বলিয়া এ কটা কথা প্রাচীন গ্রন্থে সর্ব্বদাই আমরা দেখিতে পাই, কোনওরূপ অবজ্ঞা ও অপমানের সম্মুখে সে তেজ কি ভীষণ দাহিকাশক্তিতে জ্বলিয়া উঠিত তাহারও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাণপ্রস্থ আশ্রম শেষ জীবনে অবলম্বনীয় হইলেও মধ্য জীবনে গার্হস্থ্যই সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আশ্রম—মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। গীতা যে নিষ্কামধর্ম্মের মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

> ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥
> হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
> তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

(এই স্বর্গও একরূপ ভোগেরই ক্ষেত্র—ইহা মোক্ষ নয়—মোক্ষকামী সাধক কখনও স্বর্গ কামনা করেন না।)

অতি প্রাচীনকালে সেই বৈদিক যুগে ঋষিরা যে প্রার্থনা করিতেন, তার মধ্যে দেখিতে পাই, তাঁহারা দেবতার নিকট বৃষ্টি, শস্য, ধন, পুত্র, স্বাস্থ্য, বল, শত্রুজয় অর্থাৎ এই পার্থিব জীবনে সুখে ও গৌরবে থাকিতে যাহা কিছু প্রয়োজন সব চাহিতেছেন।—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভই সাধনার লক্ষ্য বলিয়া সাধনশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শক্তিরূপে ভগবদুপাসনা যেরূপ বিচিত্র মূর্ত্তি ধরিয়া ভারতে দেখা দিয়াছে,জগতে আর কোথাও এমন দেখা যায় না। এই শক্তিদেবীর মূর্ত্তি সমূহ কখনও সিংহবাহিনী, কখনও শবাসনা, কখনও পদ্মাসনা, বহু অস্ত্রধারিণী, সর্ব্বদাই বরাভয়দায়িনী। সাধকের অভীষ্ট অনুসারে ইনি ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী, স্বর্গাপবর্গদা, ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষদা সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিদা। আবার যুগে যুগে ইনি ভীমা রণরঙ্গিণীরূপে পাপদানবনাশিনী, জগতের মঙ্গলবিধায়িনী।

এখনও এই হীন যুগে, দুর্ব্বল হিন্দু বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে দেবীর নিকট এই প্রার্থনা উচ্চারিত হয়—

> রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।
> দেহি সৌভাগ্য মারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্
> বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্,
> বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
> ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।
> রূপং দেহি জয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে।
> পুত্রান্ রক্ষতু কৌমারী পশূন্ মহেশ্বরী মম।
> ধনং যক্ষেশ্বরী পাতু বারাহী পৃষ্ঠতো মম।
> কান্তারে পাতু মাং দুর্গা সমুদ্রে জলচারিণী।
> সংগ্রামে চণ্ডিকা পাতু রাত্রৌ রাত্রিবরা সদা।
> আঢ্যাং কুরুষ্ব দারিদ্র্যং রোগশোকঞ্চ দারুণম্,
> সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে।
> বিবাদে চ জয়ং দেহি যুদ্ধে বিজয় মেবচ।
> বন্ধু স্বজন বৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতি।

ইহা অবশ্য বৈরাগীর প্রার্থনা নহে। কর্ম্মভোগ প্রার্থী

ইহার অধিক আর কি চাহিতে পারে? ইয়োরোপই বা ইহার অধিক আর কি চাহিতেছে? তবে আমরা চাহিবার মত চাহিতে পারিতেছি না। তাই যাহা পারি তাহাই করিতে হইবে, চাহিবার আদর্শ ইয়োরোপের কাছে ধার করিতে হইবে না।

আবার দেখিতে পাই, পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানীরা এই প্রার্থনার কথা নিন্দা করিয়া থাকেন,— বলেন, এদেশের ধর্ম্মের আদর্শ অতিহীন, দেবতার কাছে কেবল 'দেহি' 'দেহি' এই প্রার্থনা। নিবৃত্তির মোক্ষের আদর্শের কথা যেখানে, সেখানেও গালি। আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্মশক্তি হারাইয়া দীনহীন হইয়া সব গোল্লায় গেল। আবার কামার্গ সাধনার এই যে সব কথা তাহাতেও ইহারা বলিবেন, এরা অতি হীন, কেবল সুখ চায় ভোগ চায়! তাই এক একবার হাসিও পায়, আর ভাবি, "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা"।

নারায়ণ—আষাঢ়

ভাগ্যহীনা।—(গল্প) শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী। কোনও ভাগ্যহীনা নারীর কাহিনী, নারী রাজপুতের মেয়ে, সুন্দরী, পিতার আদরিণী। বাঙ্গালী কোনও সুরূপ সম্পন্ন বিপত্নীক কায়স্থ যুবকের সঙ্গে প্রেম হয়, বিবাহ হয়,—শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক স্বামীর গৃহে আদরে গৃহীতা হন। পরে ক্রমে পিতা স্বামী শাশুড়ী সকলেই মরিয়া গেলেন। কারণ না মরিলে তিনি ভাগ্যহীনা কেমন করিয়া হইবেন, স্বামীর প্রথম পক্ষের পুত্র বধূও সম্পদলিপ্সু মামা'শ্বশুর চক্রান্তে বিষপ্রয়োগে মারা গেল। ভাগ্যহীনা তখন সকল ত্যাগ করিয়া কাশীতে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। গল্পেরা অবতরণিকারূপিনী কাশীপ্রবাসিনী ভাগ্যবতী অন্য এক রমণীর নিকটে ভাগ্যহীনা তাঁহার জীবনের কথ বলিতেছেন।

অবতরণিকারূপিনী ভাগ্যবতী এই নারীর কথাতেই গল্প আরম্ভ হইয়াছে। আরম্ভেই দেখিতে পাই এই মন্তব্য—"এখন ত বাপের গোত্র ছাড়িয়া আসিয়াছি। তাই এতদিন যাহারা নিজের লোক ছিল, এখন তাহারা পর হইয়া গিয়াছে, আর যাহারা পর ছিল, তাহারাই নিজের লোক হইয়াছে। এই নিয়মই নাকি মনু পরাশর প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন! শৈলি আমার ছোট বোন হইলেও এখন তাহাকে নিজস্ব বলিতে পারি না।"

পড়িয়া একটু হাসি পাইল। হায়,—পুণ্যভূমি ভারতের প্রাচীন ঋষি মনু পরাশর! দিনকাল এমনই পড়িয়াছে যে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তোমাদের নামে একটা খোঁচা সকলেই দিবে! লেখিকা মহোদয়া কি জানেন না যে এ নিয়ম কেবল মনু পরাশর শাসনপীড়িত এই অধঃপতিত দেশেরই কুনিয়ম নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা বর্ত্তমান। সুসভ্য পাশ্চাত্যমণ্ডলেও নারী বিবাহের পর পিতার নাম গোত্র ত্যাগ করিয়া স্বামীর নামগোত্র পরিচিত হইয়া স্বামীর ঘরে আসে? এখানেও পিতৃকুল যেভাবে পর হয়, সেখানেও তাই হয়। তবে এ পর ঘটে মাত্র সামাজিক সম্বন্ধে। স্নেহের সম্বন্ধে নয়,—এখানেও নয়, সেখানেও নয়। লেখিকা মহোদয়া কি মনু পরাশর প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সংহিতা পড়িয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছেন? বিবাহিতা ভগ্নীর পিতৃমাতৃহীনা কনিষ্ঠা ভগ্নীকে তাঁহার স্বামীর গৃহে স্নেহে প্রতিপালন করিতে অধিকার নাই, অথবা করিলে পাপের ভাগিনী হইবে, এরূপ কোনও বিধি কি কোনও শাস্ত্রে তিনি পাইয়াছেন? ইহার পর ক্রমে হয়ত ইহাও শুনিতে পাইব, দরিদ্রা জননীকে সন্তানদের রাঁধিয়া খাওয়াইতে হয়, দরিদ্র গৃহিণীকে গৃহকর্ম্ম করিতে হয়, কেহ যার নাই, দাসী হইয়া তাকে পরের বাড়ী চাকরী করিয়া খাইতে হয়, স্বামী সারাদিন বাহিরে খাটিয়া ঘরে আসিলে তাকে খাবার দিতে হয়—সব মনু পরাশরের কু-নীতি শাসনের ফল। ম্যালেরিয়া কলেরা দুর্ভিক্ষ—এসবের জন্যও লোকে শেষে মনু পরাশরকে দায়ী করিতে আরম্ভ না করেন।

বাঙ্গালের কাণ্ড

(১)

বেঙ্গল নাগপুর-রেলওয়ে-একাউণ্ট বিভাগে যে কয়জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী কাজ করিতেন, শ্রীধর বাবু বেতনে তাহাদের সকলের সিনিয়র না হইলেও বয়সে অনেকের সিনিয়ার ছিলেন। সেইজন্য সেই আফিসের "ইস্তিক-লাগাত" সকল বাবুই তাঁহাকে 'বাঙ্গাল দাদা' এবং আরও সংক্ষেপে 'বাঙ্গাল দা' বলিয়া ডাকিত। 'বাঙ্গাল' বিশেষণটি বসাইবার সবিশেষ কারণ ছিল। শ্রীধর বাবু না জানি কোন্ অখণ্ডনীয় দোষে পূর্ব্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং শস্যশ্যামলা বঙ্গ-পল্লীর স্নিগ্ধ ক্রোড়ে বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া যৌবনের বাসন্তী ঊষায় কলিকাতার সহরে কোম্পানীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

স্বর্ণলতার নীলকমলের 'বাচ্চা হনুমানে'র মত বাঙ্গাল ডাকটা আফিস্ময় ছড়াইয়া পড়িল; এবং খোট্টা চাপরাশি হইতে আগন্তুক ভদ্রলোক পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাঙ্গাল বাবু বলিয়াই চিনিয়া লইল।

পাথরের স্বভাব এই যে তাহা একবার ঠাণ্ডা হইলে সহজে উত্তপ্ত হয় না এবং একবার তাঁতিলে পুনরায় সহজে ঠাণ্ডা হইতে চায় না। সংসারেও পাষাণপ্রকৃতির লোক আছে। শ্রীধরবাবু লোকটি সেই ধাতের। গুরুতর কথাকে হাসিয়া হালকা করিতে এবং দুই পক্ষে সায় দিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে বাঙ্গালদার যথেষ্ট প্রশংসা আছে। কিন্তু তিনি নিজে একবার রাগিলে ব্যাপারটি মাত্রা বহির্ভূত হইয়া বড় সাহেবের কর্ণে গিয়া পৌছিত। এই জন্য অডিট্ ক্লার্ক মহেন্দ্রবাবু সে ক্রোধের নাম দিয়াছিলেন "বাঙ্গালের গোঁ"। গোঁ পড়িয়া গেলে সকলেই নির্ভীকচিত্তে বাঙ্গালদাকে ঘিরিয়া বসিয়া হাসাহাসি করিত। তখন শ্রীধর বাবু তাঁহার গাঢ় শ্মশ্রুর ভিতর হইতে একটু হাসিয়া লইয়া উত্তর করিতেন, "আঃ! ও কথা ছাড়ান্ দেও। মানুষের কি এত বরদাস্ত হয়? আমি অন্যায়ের মাথায় পায়জার মারি। হউক্ না সে লাট্ সাইব্।"

ভবতারণের বাড়ী যশোরে। তাঁর কিন্তু 'বাঙ্গাল' কথাটা একেবারেই অসহ্য। মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সে দিন টিফিনের ঘণ্টায় ভবতারণের দস্তুরমত তর্ক চলিতেছিল—একটি উচ্চারণ নিয়া; তাহা ডাবউইন্ কি ডারুইন্। মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—'বাঙ্গালের ইংরাজীতে 'ডরিউ" আর বাঙ্গলায় "ড়" উচ্চারণ হয় না।"

ভবতারণ রাগিয়া উত্তর করিলেন, "উচ্চারণ কেন হবে না মশায়? আপনাদের কাণের দোষ।"

"কাণের দোষ! বল দিকি তুমি "ডারুইন্"?

"আমি আপনার কাছে পরীক্ষে দিতে আসি নাই।"

"আমার ঠেঙে পরীক্ষা দিতে আসবে কেন। ও সব হবে না আমি বল্‌ছি। একি বাঙ্গালের কর্ম্ম?"

"মশায়, আপনি বারে বারে বাঙ্গাল কচ্ছেন কেন?"

"যেহেতু আপনি বাঙ্গাল আছেন তাই কচ্ছি।"

এই অনুকরণে সকলে হাসিয়া উঠিল। ভবতারণ চোখ মুখ লাল করিয়া উত্তর করিলেন—"বাঙ্গাল মানে কে মশায়? আপনার ইয়া কি দেখাচ্ছে?"

তখন পরেশ বাবু চটিয়া উঠিলেন কহিলেন, "বাঙ্গাল মানে ইডিয়ট্।"

ভবতারণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "এ মানে পরেশ বাবুর অভিধানে আছে। আমারে বাঙ্গাল ক'লি আমি 'ঘটিচোর' কব।"

শ্রীধর বাবু তাঁহার স্বাভাবিক হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"বাঙ্গাল'ই কও আর 'ঘটি'ই কও, তোমাদের স্লাশ্ যে একটা তা কিন্তু স্বীকার কর্‌তে হইব।"

ভবতারণ মনের ঝাল মিটাইয়া কহিলেন, "আমায় যে 'বাঙ্গাল' ডাক্‌পে, আমি তাকে ডাক্‌প 'ভোজপুরী—ঘটিচোর?"

ভবতারণের বিশেষণটি কোন অভিধানকারের হস্তগত হয় নাই। সুতরাং তাহার অর্থ আমরা পাই নাই। তবে ভবতারণের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী বিজ্ঞের মত উত্তর দিবেন যে পূর্ব্ববঙ্গপ্রবাসী কয়েকটি কলিকাতার তথাকথিত 'বাবু' কোন ও বাঙ্গাল ভদ্রলোকের আতিথ্য ভোগ করিয়া বিদায়ের বেলা পকেটে গ্লাস কিম্বা র‍্যাপারের নীচে ঘটি প্রভৃতি যে সকল জিনিশ পার্শ্বাপার্শ্বে থাকা সম্ভব, তাহা নিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সেই হইতে এই অপূর্ব্ব

বিশেষণটির সৃষ্টি হইয়াছে। ভবতারণ সময় সময় ইহার 'সাটে' ইংরাজী করিয়া জি-সি (G. C.)'ও ডাকিতেন। অবশ্য কোন ভাষাবিৎ অথবা প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এই বৈজ্ঞানিক-যুগে শব্দটির "রুট্" অনাবিষ্কৃত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

যাহা হউক্, পরেশ বাবু আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিতে লাগিলেন, "বাঙ্গাল মনুষ্য নহে, উড়ে এক জন্তু"—ইত্যাদি।

শ্রীধর বাবুর গুণ ছিল এই যে তিনি খোঁচা খাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন, আর ভবতারণ ফোঁস্ করিয়া দংশন করিতে উদ্যত হইতেন।

এই বাক্যুদ্ধের পর সপ্তাহেই ভবতারণ বিদায় নিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

আফিসের বাবুরা এই সুযোগে বাঙ্গালদাকে নির্ভয়ে উপভোগ করিতে লাগিলেন।

(২)

বড় সাহেব দীর্ঘ ছুটির পর আসিয়া দেখিলেন যে, বিস্তর কায মুলতবি পড়িয়া রহিয়াছে। এই গলদ নিরাকরণের জন্য তিনি বাবুদিগের উপর এক পরওয়ানা জাহির করিলেন যে 'এরিয়ার' কাজগুলি সমস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আফিস্ ছয়টায় ছুটি হইবে।

এই ইস্তাহার পাঠ করিয়া কর্ম্মচারিমহলে দস্তুরমত একটু কড়া হাওয়া বহিতে লাগিল। অবশ্য ইহা যে ক্ষণস্থায়ী তাহা আর বলিতে হইবে না। কিশোরবাবু ভ্রূর সন্ধিস্থল কুঞ্চিত করিয়া, কলমটি কাণে রাখিয়া কহিলেন, "ইঃ, ভারী ত নক্রি! এই তিন বছরে ত্রিশ টাকার উপরে মাইনে বাড়্ল না, তার আবার ওভার টাইম্!"

সারদাবাবু হাতের কাগজ ছুড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "এইবার তা হ'লে তল্পি গোছাতে হ'ল। মারি জুতো গোলামীর মাথায়!"

বড়বাবু শ্রীশচন্দ্র একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক তিনি কাঠ পেন্সিলের মাথা চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন, "তাই ত দেখ্ছি এ সব ত বড় খাম্‌খেয়ালি। কি বল হে বাঙ্গাল বাবু?"

শ্রীধর বাবু কতকগুলি ডিমারেজের হিসাব চেক্ করিতেছিলেন। তিনি হিসাবের দিকেই চক্ষু রাখিয়া উত্তর করিলেন—"ও সব নিয়ে আপনারা মাথা ঘামান। আমি ও সব কিছু মানি না"।

বড়বাবু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "একি খেলা বাঙ্গাল দা? না মান্‌লে কি সাহেব শুন্‌বে?"

শ্রীধর বাবু মাথা তুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈস্বরে কহিলেন, "রাখ্যা ছ্যান আপনার সাহেব! আমি বরাবর দশটার সময় আমু, পাঁচটার সময় চল্যা যাব, ব্যস্। ও সব্ অর্ডারের তোয়াক্কা কিছু কম রাখি, বোঝ্‌লেন্? কোন বেটার মাথা তামাক' খাই না খাবও না। খাটি, পয়সা দেয়, ব্যস্।"

বড়বাবু চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিদধিক ঊর্দ্ধে তুলিয়া কহিলেন, "চুপ কর। ষাঁড়ের মত চেচিও না। একটু আস্তে বল। আমাদের রুটি মেরো না।"

শ্রীধর বাবুর কণ্ঠস্বর আরও এক ঘাট উপরে উঠিল। হাতের কলমটি টেবিলের উপর ঠক্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি চাক্রি চাকরি করিয়া ত আপনারা মশায়, খাশটাকে উচ্ছন্ন দেলেন। কে যেন কইছিল যে, প্রতিধ্বনি বড় ধামাধরা, আপনারা ঠিক তাই! আপনারা কুকুরের মত গোলাম, সাপের মত নীচ। সাপও রাগ হইলে আত্মসম্মানে মাথা তুলিয়া জাগে, কিন্তু আপনারা অপমানি হ'লে আরো নেতায়ে পড়েন। বড় সাহেব যদি বাপ্‌কে মামা ডাক্‌তে কয়, সেয়াও বোধ করি আপনারা পারেন। ধিক্ আপনাগো। চাকরি কর্‌তে আ'ছি কাম করিয়া যামু। Duty is Duty! ব্যস্।"

"নাও নাও থাক্, ব'কোনা। চাকরি গেলে খাবে কি বাঙ্গাল?"

শ্রীধর বাবুর স্বর এইবার তৃতীয় ঘাটে আসিয়া পৌছিল। "চাকরির গুষ্টির মাথায় পাঁচজার মারি। ঘাস কাট্যা খামু, মুটিয়াগিরি করমু, মাটি কাটুম। বাঙ্গাল কহনো ইজ্জৎ বেচ্যা, চাকরির পেত্যাশা করে না।"

"আরে রেখে দাও না। ঢের দেখেছি! তোমাদের ত মুখেন মারিতং জগৎ।"

"কি কোন্‌ছেন আপনি মশায়? তবে ছাখ্‌বেন—"

এই বলিয়া শ্রীধর বাবু সাহেবের লিখিত হুকুমপত্র বড়বাবুর সম্মুখ হইতে টানিয়া নিয়া তাহাতে বড় বড় অক্ষরে দ্রুতহস্তে লিখিয়া গেলেন—"আমরা ছয়টা পর্য্যন্ত কাজ

করিতে বাধ্য নাই। যদি কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করে, তবে তাহাকে ওভারটাইমের দরুণ Extra দিতে হইবে।"

লেখা সমাপ্ত করিয়া বড়বাবুকে কহিলেন—"করেন, দস্তখৎ করেন!" বড়বাবু কাগজখানি হাতে লইয়া মিনিট দুই খোব করি ক্ষুধার্ত্ত-পরিবারের শুষ্ক মুখগুলি চিন্তা করিয়া টেবিলের উপর কাগজখানি রাখিয়া কহিলেন—"আমি সই করব না। থাক্, আর কটাই বা দিন। ও চ'লে যাবে 'খন। এমন কাজ করো না বাঙ্গাল।"

কিন্তু শ্রীধর নাছারবান্দা প্রকৃতির লোক। সারদা, কিশোর, মহেন্দ্র ও অন্যান্য সকলকে স্বাক্ষর করিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ বলিল 'দেখি,' কেহ কহিল, "দূর্, তা কি সম্ভব!" আর কেহ বা উত্তর করিল, "আমাদের সই এ কি হবে বাঙ্গালদা? বড়বাবুই যখন দিলেন না।"

তখন শ্রীধর বাবু নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে করিতে কহিলেন, "এই ত মশায় আমাদের সাহস! এই ত আমাদের একতা! ভেরার দল কোথাকার!" তারপর চাপরাসিকে ডাকিয়া, কাগজখানি তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, "বড় সাহেবকে সেলাম দাও।"

না জানি কি কারণে বড় সাহেব পরের দিন হুকুম রদ্ করিয়া দিলেন। শ্রীধর বাবুর জিদ্ বজায় রহিল। বাবুদের নিস্তেজ, ম্লানমুখশ্রী আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কিশোর বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "না হবে কেন? বাঙ্গালদা একাউন্ট্ আফিসে আমাদের সাক্ষাৎ 'শকুনি মামা' যে!"

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি ত আগেই ব'লেছি, একটা সই থাকাই ভাল। সকলের সই থাক্‌লে একটা clique বোঝায়!"

বড়বাবু সন্দিগ্ধভাবে বেচারি পেন্সিলটির মস্তক চর্ব্বণ করিয়া দূরদর্শী বিজ্ঞের ভাবে উত্তর করিলেন, "তাই ত সাহেব যে চ'টে রইল, পরিণাম ভাল হবে নাক।"

চাপরাশি মহলে আতঙ্কের হ্রাস হইল। মহাদেও সিংহ সকলকে বুঝাইল যে বাঙ্গালবাবুর বাস্তি এলেম আছে, আর তিন কুড়ি পাঁচ রুপেয়া মাহিনা সে তলপ্ পায়।

(৩)

এ যাত্রা ভালোয় ভালোয় কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু আর এক অঘটন ঘটিয়া বসিল।

স্ত্রীলোকের বিশ্রাম ঘরে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাঙ্গালী যুবতী পাঞ্জাব মেইলের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। নির্জ্জনে বসিয়া থাকায় যুবতী বেঞ্চের ব্যালিসে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত-মনে ঘুমাইতেছিল। ঠিক্ সেই প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে পাইচারি-পরায়ণ জনৈক ফিরিঙ্গী ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লোলুপ-দৃষ্টিতে সেই যুবতীর নিদ্রিত সৌন্দর্য্য পান করিতেছিল। সুরার হজমীশক্তির প্রাবাল্যহেতু তাহার ইন্দ্রিয়ের বুভুক্ষা এতই প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল যে ফিরিঙ্গী-পুঙ্গব পদমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

নিদ্রিতা যুবতীর মস্তকে হস্তার্পণ করিবার সময় সাহেবের মানসিক গতি যাহাই থাকুক, যুবতীর অচেতনাবস্থা তাহার হাতথানিকে অন্যায় স্বাধীনতা ও সাহস প্রদান করিতেছিল। ভদ্রমহিলা এই আকস্মিক স্পর্শে চমকিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

বাঙ্গাল বাবু না জানি কি কারণে তখন সেখানে আসিয়াছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার বাঙ্গালের গোঁ চড়িয়া গেল। তিনি দ্রুতপদে "নেকাল জানোয়ার,—নেকাল শুয়ার" প্রভৃতি মধুবচন উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পূজার ছুটিতে দীপাবলির তেজে উদ্ভাসিত, অহর্নিশি মুখরিত নাট্যশালাসম হাওড়া ষ্টেশন জনবিরল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তামাসা দেখিতে বা সাক্ষ্য দিতে কিংবা সাহায্য করিতে সেখানে একটি প্রাণীও আসিয়া জুটিল না। সাহেব উত্তেজনার শেষধাপে উঠিয়া তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত বাঙ্গাল বাবুর মুখের সম্মুখে নাচাইতে নাচাইতে কহিলেন, "তোম্ কোউন্ হায়?"

শ্রীধর বাবুও সুর সমানে চড়াইয়া উত্তর করিলেন, "হাম্—এসা করনেওয়ালা আদমি হায়" এই কথা বলিয়া উপদেশ ও উদাহরণের মধ্যে যেটি শ্রেয়স্কর তাহাই পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলেন। সাহেব ঘুরিয়া বেঞ্চের উপর পড়িয়া গেল। শ্রীধর বাবু পুনর্ব্বার আর এক ঘুঁষিতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেলেন। তখন সাহেবের চৈতন্য হইল এবং পেণ্টলুনের ধূলি ঝাড়িতে

ঝাড়িতে এই ব্যবহারটি যে তিনি শীঘ্র ভুলিবেন না, এই কথা তাহার বিদ্রোহীকে বুঝাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ঐ ঘটনার পরের দিন বড় সাহেবের কাণে কথাটি নির্দ্দোষভাবে পৌছিয়া তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাঁহার অধীনস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারিটির এবংবিধ অশিষ্টতা, তিনি ইতিপূর্ব্বে আর একবার ক্ষমা করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু এবার আর নয়।

অচিরে সুপারিন্টেডেন্ট্ ঘটিত সকল ব্যাপার শ্রীধর বাবুর সহযোগী কর্ম্মচারিরা শুনিতে পাইলেন। কেহ বলিলেন—"বেশ হ'য়েছে।" কেহ বা কহিলেন, "অন্যায় হ'য়েছে"। বড়বাবু চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "বাঙ্গাল কাজটা ভাল করনি।"

শ্রীধর উত্তর করিলেন "রাখ্যা যান্ মশায়। মোল্লার দৌর মজিদ্ পর্য্যন্ত।"

তিন দিবস পরে পুলিস আসিয়া বাঙ্গাল বাবুকে আফিস হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

শ্রীধর বাবু দুইদিন হাজতে কাটাইয়া দিলেন। তৃতীয় দিন তিনি বিচারার্থ ম্যাজেষ্ট্রেট্ সাহেবের সম্মুখে নীত হইলেন। তাঁহার হাতে হাতকড়ি, কটিদেশে রজ্জু বাঁধা, চারিজন পুলিস পাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার বলিষ্ঠ সর্ব্বংসহ দেহে কোনও প্রকার কাতরতা নাই, মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তা তার এতটুকু কালছায়া ফেলিতে পারে নাই। সেই অচল, অটল, দৃপ্ত বাঙ্গালবাবু আজ অন্যায়ের প্রতীকার করিতে গিয়া আইনের ষড়জালে বিজড়িত হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস আছে, তাঁহার ধর্ম্মই তাঁহাকে রক্ষা করিবে।

শ্রীধরবাবু চাহিয়া দেখিলেন, বড় সাহেব আর ষ্টেশন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট সাহেব উপস্থিত হইয়াছেন। আর একাউন্ট্ বিভাগের সকল কর্ম্মচারী,—যাহাদের সঙ্গে এক বেঞ্চে বসিয়া এতদিন কাজ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে বাঙ্গালদাদা বলিয়া কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, যাঁহাদের জন্য তিনি নিজে বড় সাহেবের হুকুম অমান্য করিয়া সকলের দোষ নিজে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আজ বিপদের দিনে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীধরের প্রাণটা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তারপর যখন সাক্ষী আরম্ভ হইল, তখন সেই সকল বন্ধুগণ একে একে শপথ করিয়া স্ব স্ব পৈত্রিক প্রাণের ও ততোধিক চাকরির হিত-কামনায় স্পষ্টাক্ষরে কহিল যে, শ্রীধর বাবু বিনা কারণে গিল্‌ক্রাইষ্ট্ সাহেবকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা শ্রীধর বাবুকে না থামাইলে হয়তঃ সেইখানে খুনাখুনী হইয়া যাইত। শ্রীধর বাবু চিরদিনই উদ্ধত প্রকৃতির লোক। ইত্যাদি।

শ্রীধর অধোমুখে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিলেন। তাঁহার উকীল নাই বা বলিবার কিছুই নাই। পরিশেষে তিনি বিচার শুনিতে পাইলেন যে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাঁহাকে ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

পুলিস শ্রীধর বাবুকে জেলে নিয়া চলিল। সাক্ষীরা সকলে বিদায় লইল। বড়বাবু রাস্তায় আসিয়া সিগারেট্ টানিতে টানিতে পরেশ ও সারদার নিকট প্রশংসা করিয়া কহিলেন—

"যা বল, বাঙ্গাল জাতটার একটা মেরুদণ্ড আছে হে।"

শ্রীজনার্দ্দন মুখোপাধ্যায়।

সত্তা

দিবসের যত চিন্তা কুড়ায়ে,
সন্ধ্যায় গাঁথি' মালা
নিশিথে চকিতে নেহারি পুলকে
তা'তেও তোমার খেলা;

তুমি নাই,—তা'তে নাহি হেন ফুল,
তোমারেই তা'রা চাহিতে ব্যাকুল
তুমি রূপ রস সুরভি, সেথায়
তোমারি পূর্ণলীলা।

দিবসে, শ্রমের লভ্য যে টুকু
নিয়ে আসি' খালি ঘরে,
জ্বালায়ে দেখি সান্ধ্য-প্রদীপ
তুমি তা'তে থরে থরে ;

কাঁদায় জঠরে, তবু হাসি ফোঁটে
একা ঘরে মোর, সাথি এসে জোটে
ব্যর্থ ব্যাকুল, বেঁচে থাকি বেশ
নিত্য আলোক-আঁধারে।

দীনের, স্বপন কেমন নিঠুর
কেমনে বুঝাই তা'য়,
ভ'রে দিয়ে যায় মুক্তা মাণিক
হৃদয়ের আঙ্গিনায় ;

ঘুম ভেঙ্গে গেলে, দেখি আঁখি মেলে
তব পদ লেখা আঙ্গিনার কোলে
অধর মাঝে হাসি' খল্ খল্
উন্মাদ মদিরায়।

শ্রীমাখনলাল মৈত্র।

পুরাণ কাহিনী

পুরাকালে যাহা ছিল তাহা লইয়াই পুরাণের সৃষ্টি। পুরাণ দুই প্রকার মহা পুরাণ এবং উপপুরাণ
মহাপুরাণ যথা :—

১। ব্রহ্ম ২। পদ্ম ৩। বিষ্ণু ৪। শিব ৫। ভাগবত ৬। ভবিষ্য ৭। নারদীয় ৮। মার্কণ্ডেয় ৯। অগ্নি ১০। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ১১। লিঙ্গ ১২। বামন ১৩। স্কন্দ ১৪। মৎস্য ১৫। কূর্ম্ম ১৬। বরাহ ১৭। গরুড় ১৮। ব্রহ্মাণ্ড।
উপপুরাণ অষ্টাদশ, যথা :—

১। আদি ২। সনৎকুমার ৩। নরসিংহ ৪। ব্রহ্মাণ্ড ৫। দুর্ব্বাস ৬। নারদীয় ৭। উশন ৮। কপিল ৯। মানব ১০। বারুণ ১১। কালিকা ১২। মাহেশ ১৩। সাম্ব ১৪। সৌর ১৫। পরাশর ১৬। মারীচ ১৭। ভার্গব ১৮। কৌমার।

পদ্ম-পুরাণ বলেন যে পুরাণ গুলির মধ্যে পদ্মই শ্রেষ্ঠ। পদ্মপুরাণ ভগবানের হৃদয়। ব্রহ্মপুরাণ ভগবানের মস্তক। বিষ্ণুপুরাণ ভগবানের দক্ষিণ বাহু। শৈবপুরাণ বামবাহু। ভাগবতপুরাণ উরুদ্বয়। নারদীয়পুরাণ নাভি। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ দক্ষিণ পদ। আগ্নেয়পুরাণ বাম পদ। ভবিষ্যপুরাণ দক্ষিণ জানু। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বাম জানু। লিঙ্গপুরাণ দক্ষিণ গুল্ফ। বরাহপুরাণ বাম গুল্ফ। স্কন্দপুরাণ লোমরাজি। বামনপুরাণ ত্বক্। কূর্ম্মপুরাণ পৃষ্ঠ। মৎস্য-পুরাণ মেদ। গরুড়পুরাণ মজ্জা। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অস্থি। এই-রূপে পুরাণগুলি ভগবানের অবয়বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণ ভগবানের হৃদয় বলিয়া প্রথমে প্রচলিত হইল। পদ্ম-পুরাণ চারিটী খণ্ড,—স্বর্গ খণ্ড, পাতাল খণ্ড, ক্রিয়াযোগসার এবং ভূমি খণ্ড। স্বর্গ খণ্ডে ৪৯টী অধ্যায় আছে। স্বর্গ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। পরে ব্রহ্ম নামক একপ্রকার জ্যোতি হইল। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি এবং মহতত্ত্ব হইলেন। মহতত্ত্ব তিন প্রকার, সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার সৃষ্টি হইল। ক্রমে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র ও রস-তন্মাত্র উৎপন্ন হইল। রস-তন্মাত্রের সৃষ্টিকে জলপ্লাবন বলা যায়। রস তন্মাত্র হইতে গন্ধতন্মাত্র এবং ক্রমশঃ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সুদর্শন দ্বীপের বিষয় বর্ণিত আছে। ঐ দ্বীপ চক্রবৎ চতুর্দ্দিকে লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহার দুই অংশে শশ বর্ত্তমান আছে এবং অপর অপর অংশে জল আছে। এই বর্ণনায় সুদর্শন দ্বীপকে চন্দ্রলোক বলিয়া বোধ হয়।

পরে ছয়টী বর্ষ পর্ব্বতের উল্লেখ দেখা যায়, যথা :—

১। হিমবান্ ২। হেমকূট ৩। নগোত্তম নিষধ ৪। বৈদূর্য্যময় নীল ৫। শশিসন্নিভ শ্বেত ৬। সর্ব্বধাতু-মণ্ডিত শৃঙ্গবান্।

এই সকল পর্ব্বতের অস্তিত্ব অবশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পদ্মপুরাণ বলেন এই কয়েকটী পর্ব্বতের মধ্যে পুণ্য জনপদও কতকগুলি বর্ষ আছে। তাহার মধ্যে একটী ভারতবর্ষ। তাহার পর হৈমবতবর্ষ এবং তাহার পর হরিবর্ষ। হৈমবতবর্ষ হিমালয় এবং হরিবর্ষ তিব্বত। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে এবং নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত মাল্যবান্ পর্ব্বত। মাল্যবান্ পর্ব্বতের পর গন্ধমাদন পর্ব্বত। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে মেরু নামক পর্ব্বত। ইহা পদ্মপুরাণের মতে চতুরশীতি সহস্র যোজন উন্নত এবং উহার অধোভাগের পরিমাণ চতুরশীতি যোজন। এই পর্ব্বতের পার্শ্বে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বুদ্বীপ এবং উত্তরকুরু (হরিবর্ষ) এই চারিটী দ্বীপ বর্ত্তমান আছে। শৈলশিখর হইতে ভাগীরথী চন্দ্রহ্রদে পতিত হইয়াছেন।

মেরুপর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল বর্ষ। তাহার পর আরও দুইটী অর্থাৎ ঐরাবতবর্ষ এবং ইলাবৃতবর্ষের উল্লেখ আছে। তাহার পর কৈলাস পর্ব্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গোত্রী যাইতে এবং শিমলার পাহাড় হইতে কৈলাস পর্ব্বত দেখা যায়। কৈলাসের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বত।

হিমালয় প্রদেশের ভূগোল অদ্যাবধি সুচারুরূপে প্রণীত হয় নাই। হওয়াও বড় সুকঠিন। কারণ চিরতুষার পর্ব্বতরাজির মধ্যে জরিপ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। মৈনাক পর্ব্বতের নিকট হিরণ্যশৃঙ্গগিরি অবস্থিত। তাহার নিকটে বিন্দুসরোবর আছে। দিব্য নদী সপ্তধা হইয়া বটোদকা, নলিনী, পবিত্রকারিণী সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা ও সিন্ধু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে মেরুর উত্তর পার্শ্বে উত্তর কুরু অবস্থিত। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ। সেখানে হেরণ্বতী নদী আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত নদী গুলির নাম পাওয়া যায়।

১। গঙ্গা ২। সিন্ধু ৩। সরস্বতী ৪। গোদাবরী ৫। মহানদী ৬। নর্ম্মদা ৭। বাহুদা ৮। শতদ্রু ৯। চন্দ্রভাগা ১০। যমুনা ১১। দৃষদ্বতী ১২। বিপাশা ১৩। বিপাপা ১৪। বেত্রবতী ১৫। কৃষ্ণবেণ্বা ১৬। ইরাবতী ১৭। বিতস্তা ১৮। পয়োষ্ণী ১৯। দেবিকা ২০। বেদস্মৃতি ২১। বেদশিরা ২২। ত্রিদিবা ২৩। সিন্ধুলা ২৪। কৃমি ২৫। করীষিণী ২৬। চিত্রবহা ২৭। ত্রিসেনা ২৮। গোমতী ২৯। ধূতপাপা ৩০। চন্দনা ৩১। কৌশিকী ৩২। বহা ৩৩। হৃদ্যা ৩৪। নাচিতা ৩৫। লোহিতারণী ৩৬। রহস্যা ৩৭। শতকুম্ভা ৩৮। সরযু ৩৯। চর্ম্মণ্বতী ৪০। হস্তিসোমা ৪১। দিশা ৪২। শরাবতী ৪৩। ভীমা ৪৪। ভীমরথী ৪৫। কাবেরী ৪৬। বালুকা ৪৭। বাপী ৪৮। শতমলা ৪৯। নীবারা ৫০। মহিতা ৫১। সুপ্রয়োগা ৫২। পবিত্রা ৫৩। কৃষ্ণলা ৫৪। বাজিনী ৫৫। পুরুমালিনী ৫৬। পূর্ব্বাভিরামা ৫৭। বীরা ৫৮। মালাবতী ৫৯। পলাশিনী ৬০। পাপহরা ৬১। মহেন্দ্রা ৬২। পাটলাবতী ৬৩। অসিক্নী ৬৪। কুশবীরা ৬৫। মরুত্বা ৬৬। প্রবরা ৬৭। মেনা ৬৮। হেমা ৬৯। ঘৃতবতী ৭০। অনাতকী ৭১। অনুষ্ণী ৭২। সেব্যা ৭৩। কাপী ৭৪। সদাবীরা ৭৫। অধৃষ্যা ৭৬। রথচিত্রা ৭৭। জ্যোতিরথা ৭৮। বিশ্বামিত্রা ৭৯। কপিঞ্জলা ৮০। উপেন্দ্রা ৮১। বহুলা ৮২। কুবীরা ৮৩। অম্বুবাহিনী ৮৪। বৈনন্দী ৮৫। পিঞ্জলা ৮৬। বেণা ৮৭। তুঙ্গবেগা ৮৮। বিদিশা ৮৯। কৃষ্ণবেগা ৯০। তাম্রা ৯১। কপিলা ৯২। ধেনু ৯৩। সকামা ৯৪। বেদস্বা ৯৫। হবিঃস্রাবা ৯৬। মহাপদ্মা ৯৭। শিপ্রা ৯৮। পিচ্ছলা ৯৯। ভারদ্বাজী ১০০। কৌশিকী ১০১। শোণা ১০২। চন্দ্রমা ১০৩। দুর্গমা ১০৪। অন্তঃশিলা ১০৫। ব্রহ্মমেধ্যা ১০৬। পরোক্ষা ১০৭। রোহী ১০৮। জম্বুনদী ১০৯। সুনাসা ১১০। তাপসা ১১১। দাসী ১১২। সামান্যা ১১৩। বরুণা ১১৪। অসী ১১৫। নীলা ১১৬। ধৃতিকরী ১১৭। পর্ণাশা ১১৮। মানবী ১১৯। বৃষভা ১২০। ভাষা ১২১। ব্রহ্মমেধ্যা ১২২। সদনিরাময়া ১২৩। কৃষ্ণা ১২৪। মন্দগা ১২৫। মন্দবাহিনী ১২৬। ব্রাহ্মণী ১২৭। মহাগৌরী ১২৮। দুর্গা ১২৯। চিত্রোৎপলা ১৩০। চিত্ররথা ১৩১। মঞ্জুলা ১৩২। রোহিণী ১৩৩। মন্দাকিনী ১৩৪। বৈতরণী ১৩৫। কোকা ১৩৬। শুক্তিমতী ১৩৭। অনঙ্গা ১৩৮। বৃষা ১৩৯। লৌহিত্য ১৪০। করতোয়া ১৪১। বৃষকা ১৪২। কুমার ১৪৩। ঋষিকুল্যা ১৪৪। মারিষা ১৪৫। সুপুণ্যা ১৪৬। সর্ব্বধা।

পদ্মপুরাণ বলেন যে এই সকল ব্যতীত আরও নদী

আছে। পদ্মপুরাণে নিম্নলিখিত জনপদ গুলির উল্লেখ আছে :—

১। কুরুজাঙ্গাল ২। শাল্ব ৩। মাদ্রেয় ৪। জাঙ্গল ৫ শূরসেন ৬। পুলিন্দ ৭। বোধ ৮। মাল ৯। মৎস্য ১০। কুশট্ট ১১। সৌগন্ধ ১২। কুন্তি ১৩। কোশল ১৫। বেদ ১৬। ভোজ ১৭। সিন্ধু ১৮। পুলিন্দক ১৯। উত্তম ২০। করূষ ২১। দশার্ণ ২২। মেকল ২৩। উৎকল ২৪। পঞ্চাল ২৩। নৈকপৃষ্ঠ ২৬। যুগন্ধর ২৭। বোধ ২৮। মদ্র ২৯। কলিঙ্গ ৩০। কাশী ৩১। অপর কাশী ৩২। জঠর ৩৩। কুকুর ৩৪। সুসত্তম ৩৫। অবন্তী ৩৬। অপবকুন্তি ৩৭। গোমন্ত ৩৮। মল্লক ৩৯। পুণ্ড্র ৪০। বিদর্ভ ৪১। নৃপবহিক ৪২। অশ্মক ৪৩। উত্তরাশ্মক ৪৪। ক্ষুদ্র ৪৫। গোপরাষ্ট্র ৪৬। অধিরাজ্য ৪৭। কুশট ৪৮। মল্লরাষ্ট্র ৪৯। কেরল ৫০। বালব ৫১। উপবাস্য ৫২। বক্র ৫৩। বক্রাতপ ৫৪। শক ৫৫। বিদেহ ৫৬। মাগধ ৫৭। সহ্ম ৫৮। মলজ ৫৯। বিজয় ৬০। অহি ৬১। বঙ্গ ৬২। বক্লোম ৬৩। সুদেষ্ণ ৬৪। প্রহ্লাদ ৬৫। মহিষ ৬৬। শশক ৬৭। বাহ্লিক ৬৮। বাটধান ৬৯। আভীর ৭০। কালতোয়ক ৭১। অপরান্ত ৭২। তারান্ত ৭৩। পুষ্কল ৭৪। চর্ম্মচন্ডক ৭৫। অটবী শেখর ৭৬। মেরুভূত ৭৭। উপাবৃত ৭৮ অনুপাবৃত ৭৯। স্বরাষ্ট্র ৮০। কেকয় ৮১। কুট্ট ৮২। অপর কুট্ট ৮৩। মাহের ৮৪। কক্ষ ৮৫। সামুদ্র ৮৬। নিষ্কুট ৮৭। অন্ধ ৮৮। বহু ৮৯। অন্তর্গিরি ৯০। বহির্গিরি ৯১। অঙ্গ মলদ ৯২। মগধ ৯৩। মালব ৯৪। অর্যটী ৯৫। সত্বতর ৯৬। প্রাবৃষের ৯৭। ভার্গব ৯৮। পুণ্ড্র ৯৯। ভার্গ ১০০। কিরাত ১০১। ভাস্বর ১০২। শক ১০৩ নিষাদ ১০৪। নিষধ ১০৫। নর্ত্ত ১০৬। নৈর্ঋত ১০৭। পূর্ণল ১০৮। পূতিমৎস্য ১০৯। কুন্তল ১১০। কুশক ১১১। তীরগ্রহ ১১২। শূরসেন ১১৩। ঈজিক ১১৪। কল্পকারণ ১১৫। তিলভাগ ১১৬। মসার ১১৭। মধুমত্ত ১১৮। ককুন্দক ১১৯। কাশ্মীর ১২০। সিন্ধুসৌবীর ১২১। গান্ধার ১২২। দর্শক ১২৩। অভীসার ১২৪। কুদ্রুত ১২৫। শৌবিল ১২৬। বাহ্লীক ১২৭। দর্বি ১২৮। মালবাদ ১২৯। অর্ব্বাবাত ১৩০। আমরথ ১৩১। উরগ ১৩২। বহুবাদ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ক্ষোভ

হে অন্তরতম ! অন্তরে যদি
রাজ-হৃদয় আসনে,
চির বঞ্চিত কেন লাঞ্ছিত
সদা অবিদ্যার শাসনে ?

শত জনমের কলুষানল
পুঞ্জিত সদা মানসে,
ইন্দ্রিয় কুল ইন্ধনতায়
জোগায় অশেষ বিশেষে।

শ্রান্তি বিহীন নিয়ত নবীন
বাসনা ঝঞ্ঝা বহিয়া
উজ্জ্বল স্নিগ্ধ দেউটি-টি তব
যায় শতবার নিভিয়া।

ত্রস্তে যখনি আলোটি তোমার
মৌন বিরলে জ্বালিয়া
দেখি চারি ভিতে অজ্ঞেয় অন্তর
হাসে আশে পাশে সরিয়া।

বহে অশ্রু যাতনা দারুণ
জাগিয়া উঠে মরমে,
একি উপহাস, হে নিষ্করুণ !
বাজে কি গো তব মরমে ?

তুমি দুর্ব্বল-হৃদিবাঞ্ছা, তবে
কেন হই হেন দলিত !
দয়া ও প্রেয়সী, হে শাশ্বত ! চির
বাঞ্ছিত মম ইঙ্গিত।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

শিল্প—সুবাসিত নারিকেল তৈল।

(আমেরিকান পদ্ধতি)

পরিষ্কৃত কোচিন নারিকেল তৈল	অর্দ্ধ পাঁইট
,, রেড়ীর তৈল	অর্দ্ধ পাঁইট
আল কোহল	
স্লিপারী এলম বার্ক	এক আং
জল	চারি আং
অয়েল বারগামট	এক আং
অয়েল লিমন	হাফ আং
অয়েল পিমেন্টো	হাফ আং
অয়েল অ্যালমণ্ড	এক ড্রাম

প্রথমে নারকেল তৈলটাকে ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ীর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আলকোহল বা সুরাসারটাকে উহার সহিত মৃদু অগ্নির উত্তাপ দিয়া আস্তে আস্তে মিশ্রিত করিতে হইবে। এলম বার্কটাকে একটু গুড়া করিয়া ঐ ৪ আউন্স জলে ভিজাইয়া সেই জলটা উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করতঃ ব্লটীং দ্বারা ফিল্টার করিয়া লও। তাহার পর সুবাসিত করিবার জন্য বাকী তৈলগুলি মিশাইয়া খুব নাড়িয়া দাও এবং একটা শীতল স্থানে রাখিয়া দাও। ইহাকে ঘোর লালবর্ণ করিতে হইলে—যখন নারকেল তৈল ও ক্যাষ্টর অয়েল একত্রে মিশান হয়, তখন তাহাতে আলক্রানেট কট কিছু দিলেই তৈল লাল হইয়া যাইবে। অথবা এসেন্স প্রভৃতি মিশানর পর সামান্য পরিমাণ টীং গামবোজ মিশাইয়া দিলেও বেশ রং হইবে।

মিশ্রিত তৈলটা ২।৩ দিন একটা ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিবসে ২।৩ বার ঝাঁকরাইয়া দিতে হয়। ২।৩ দিন এইরূপ করিলে সমস্ত দ্রব্যগুলি মিশ্রিত হইয়া অতি সুন্দর সুবাসিত হইয়া উঠে।

ইহার পর ৩ আউন্স বা ৪ আং শিশিতে পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করিতে হয়। কেশতৈলের মধ্যে নারিকেল তৈলকে আমরা মস্তিষ্ক এবং কেশের জন্য হিতকর মনে করি। কারণ এদেশের মহিলাগণ অনেকেই নারিকেল তৈলই অধিক ব্যবহার করেন এবং অশিতি বর্ষ পর্য্যন্তও তাঁহাদের কেশ পাকে না।

নারিকেল তৈলের একটা গন্ধ আছে, ইহাকে একেবারে নষ্ট করা কঠিন, তবে বারম্বার কাষ্টের কয়লা চূর্ণের উপর ঢালিয়া ফিল্টারিং ব্লটীং দ্বারা ফিল্টার করিয়া লইলে উহার গন্ধ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং তৈল বেশ রিফাইনও হইয়া যায়।

(কাজের লোক।)

সাবানে ক্ষারাধিক্য আছে কি না জানিবার সহজ উপায়। আজকাল সাবান মাখার চলন বেশী হইয়াছে, কিন্তু সাবানে ক্ষারাধিক্য (free fat) থাকিলে তাহা চর্ম্মের অপকার করে। অল্প পরিমাণে সাব্লিমেটকে জলে দ্রবীভূত কর। এই দ্রাবণকে উত্তপ্ত কর। শুষ্ক সাবানের উপর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া এই উত্তপ্ত দ্রাবণ ফেলিতে থাক। সাবানে সামান্য হরিদ্রা বর্ণের দাগ হইলেও বুঝিতে হইবে যে, অমিশ্রিত ক্ষার অর্থাৎ ক্ষারাধিক্য রহিয়াছে। এই সাবান ব্যবহার করা উচিত নহে।

(কাজের লোক।)

পেটাই লোহা, ঢালাই লোহা বা ইস্পাত চিনিবার সহজ উপায়।—লোহার গাত্র উখা দ্বারা বেশ চকচকে করিয়া লও, এই চকচকে যায়গায় এক বিন্দু নাইট্রিক এসিড ফেলিয়া দাও। নাইট্রিক এসিড খানিকক্ষণ ক্রিয়া করিলে তবে জল দিয়া এই আক্রান্ত স্থান ধৌত কর। পেটাই লৌহে (Bar iron) ছাইএর মত দাগ, ইস্পাতে বাদামী কাল দাগ, ঢালাই লৌহে ঘন কৃষ্ণবর্ণ দাগ পড়িবে। যদি পেটাই লৌহের সহিত ইস্পাত থাওয়ান হইয়া থাকে, তাহা হইলে কতটা পেটাই লৌহ আর কতটা ইস্পাত তাহা অনায়াসে এই পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে।

(কাজের লোক)।

টিনের গাত্রে কাগজ আঁটিবার আঠা।—টিনের গায়ে সাধারণ গঁদ দিয়া কাগজ আঁটা যায় না।

নৈসর্গিক তাপের হ্রাসবৃদ্ধিতে টিনের আয়তন কমে বাড়ে বলিয়া টিনের গায়ে কাগজ থাকে না। কিন্তু নিম্নলিখিত উপায়ে গঁদ প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে উঠিয়া যায় না :—৬০ ভাগ বাবলা আঠা (উৎকৃষ্ট) এরূপ পরিমাণ জলের সহিত মিলাইতে হইবে, যেন তাহা ৪৫ ভাগ শ্বেতসারের (গম) সহিত ফুটাইতে পারা যায়। এই পরিমাণ জলে বাবলা আঠা গুলিয়া তাহাতে ৪৫ ভাগ গমের উৎকৃষ্ট শ্বেতসার মিশাইয়া দাও, অতঃপর তাহাতে ১৫ ভাগ চিনি গুলিয়া ফুটাইতে থাক। ইচ্ছামত ঘন হইয়া যাইলে আর অগ্নিতে রাখিবার আবশ্যক নাই। ফুটাইবার সময় একটু কর্পূর মিশাইয়া দিলে এই আঠা বহুদিন অবিকৃত থাকে।

(কাজের লোক।)

আলুমিনিয়াম পালিশ করিবার প্রণালী।—আলুমিনিয়ামের তৈজসাদি জিনিসপত্র কিছুকাল ব্যবহার করিলে কিছু মলিন হইয়া যায়, তাহাদিগকে পুনরায় রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল করিতে হইলে এমারি এবং চর্ব্বি একত্র মিশ্রিত করিয়া পালিশ করিবার তুলি দ্বারা তৈজসের গাত্রে ঘসিতে হয়। কিন্তু ইহা লাগাইবার পূর্ব্বে তৈজসের গাত্র রীতিমত তৈলশূন্য করিয়া লওয়া আবশ্যক। পিউমিস্-ষ্টোন্ দ্বারা এই কার্য্য বেশ চলিতে পারে। শেষে রুজ এবং তার্পিন তৈল ব্যবহার করিলে ইহা ঠিক নূতনের ন্যায় চকচকে হইয়া উঠে।

(কাজের লোক।)

দন্ত-সংস্কার চূর্ণ। হরিতকী, শুঠ, খদির, মুথা, কর্পূর, সুপারীপোড়া, গুড়ত্বক ও লবঙ্গ প্রত্যেকটি সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমান ওজন শোধক খড়িচূর্ণ লইয়া একত্র করিতে হইবে। এই চূর্ণে দন্তধাবন করিলে দাঁতের গোড়া পরিষ্কার করিয়া, দাঁতের গোড়ায় ফুলা, বেদনা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ উপশম করে এবং জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতির ক্ষত আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহা নিত্য ব্যবহার করিলে দন্ত সকল দৃঢ় হয়, মুখ সুগন্ধ ও সরস হয়, জিহ্বার জড়তা যায়, আহারে রুচি জন্মে।

(কাজের লোক।)

নববল ও নিদ্রা।—ক্লান্তি অনুভব করিলে চিৎ হইয়া শয়ন করিবে এবং ৫ মিনিট কাল দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিবে। ৫ মিনিটের মধ্যে দেহে নববলের সঞ্চার হইবে। যদি নিদ্রা না হয়, তবে চিৎ হইয়া শুইবে এবং ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিবে। দেখিতে দেখিতে নিদ্রাভিভূত হইবে।

(কাজের লোক।)

স্বাস্থ্য বস্ত্রাদি

(১)

আমাদের দেশের লোকদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, লজ্জা ও শীত নিবারণ জন্য বস্ত্রাদির আবশ্যক, এ জন্য শীতকালে বস্ত্রাদির দ্বারা শীত নিবারণ ও বাহিরে যাইতে হইলে লজ্জার উপরোধে সমুদয় গাত্র আবৃত করা আবশ্যক হয়। এই বিবেচনা নিতান্ত ভুল। এই সম্বন্ধে দুই চারিটি আবশ্যক কথা বলা যাইতেছে। আমাদের সমুদয় শরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা সাধারণতঃ উষ্ণ। এই উত্তাপ ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না। শরীরে সার পদার্থ রক্ত হইয়া শরীর পালন করিতেছে। আবার শ্রমাদি দ্বারা শরীর কিছু কিছু নষ্ট হইতেছে। এই বিনাশ ক্রিয়ায় উত্তাপ উৎপন্ন হয়। কয়লা কিংবা কাষ্ঠ চুলাতে জ্বালাইলে অথবা তৈল প্রদীপে জ্বালাইলে যে প্রকার উত্তাপ উৎপন্ন হয়, শরীর মধ্যে চিনি, ঘৃত ও চাউল প্রভৃতি খাদ্য নিঃশ্বাসের বায়ুর সহিত দগ্ধ হইয়া সেই প্রকার উত্তাপ উৎপন্ন করে। ইহাতেই শরীর উষ্ণ হইয়া থাকে। এই উত্তাপ যেমন সর্ব্বদা উৎপন্ন হইতেছে, তেমনই আবার শীতল বায়ু প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা নষ্ট হইতেছে। উত্তাপ যত নষ্ট হয়, খাদ্যদ্রব্যের তত অধিক প্রয়োজন হয়। এই জন্য শীতকালে ক্ষুধা অধিক হয়। স্বভাবতঃ মেদ ও চর্ম্মের আবরণ দ্বারা কতকটা উত্তাপ রক্ষিত হয়, কিন্তু মনুষ্যের গাত্রে পাখীর মত পালক বা পশুর মত লোম নাই। এইজন্য বস্ত্রাদির আবরণ আবশ্যক। কাপড় লজ্জা নিবারণ ব্যতীত শীতকালে শীত নিবারণ করে,—বায়ু অধিক উষ্ণ হইলে তাহার তাপ ও রৌদ্রের সময় বাহিরের উত্তাপ শরীরে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহাতে শরীর অধিক উষ্ণ হইতে পারে না। শীতকালে গা ঢাকা থাকিলে শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ শীতল বায়ু দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না। কাপড় নিজে উত্তাপের অপরিচালক নহে। উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্যে যে শুষ্কবায়ু থাকে তাহা অত্যন্ত অপরিচালক, এজন্য যে কাপড়ে যত অধিক

বায়ু থাকে, তাহা তত অধিক অপরিচালক। তুলার লেপ, কম্বল, ফ্লানেল প্রভৃতি এই কারণে শীতনিবারণ করিতে অধিক উপযোগী। কাপড় গাত্রে অল্প ঢিলাভাবে ব্যবহার করিলে, গাত্রবস্ত্রের মধ্যে যে স্থান থাকে তাহাতে কতকটা শুষ্কবায়ু আবদ্ধ থাকে, এজন্য অধিক টান অপেক্ষা কিছু ঢিলাবস্ত্রে অধিক শীত নিবারণ হয়। তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে শীতকালে চর্ম্মের গাত্রবস্ত্র অধিক ব্যবহৃত হয়, কারণ রবার ও চর্ম্মের কাপড়ের মধ্য দিয়া বায়ু একেবারেই চলাচল করিতে পারে না। এজন্য ঐ কাপড় গাত্রে থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শীত নিবারণ হয়।

শরীর গরম আছে এমন সময়ে হঠাৎ শীতল বায়ু লাগিলে বিবিধ প্রকার পীড়া হয়, কিন্তু গায়ে কাপড় থাকিলে তাহা হইতে পারে না। কার্পাস, রেশম, তসর, রবার ও চর্ম্মকাপড় এজন্য ব্যবহৃত হয়। অসভ্য দেশের লোকেরা গাছের ছাল, পাতা ও জন্তুর চর্ম্ম ব্যবহার করিয়া থাকে। যোগীরা ভস্মলেপন করেন।

কার্পাসবস্ত্র—ইহা সুলভ দৃঢ় ও সহজে জলশোষণ করে না, জল লাগিলে সঙ্কুচিত হয় না ও অধিক দিন ব্যবহার করা যায়। এই সকল গুণ আছে বলিয়া ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়। কার্পাস পশম অপেক্ষা অধিক উত্তাপ পরিচালক। কিন্তু শণের কাপড় (লিনেন) অপেক্ষা কম পরিচালক।

পশম—ইহা উত্তাপের মন্দপরিচালক, অধিক জল-শোষক, ইহার প্রত্যেক সূতের মধ্যে ও দুই সূতের মধ্যবর্ত্তি, এই দুই স্থানেই অধিক জল-শোষণ করে। উত্তাপের মন্দ পরিচালক ও জল-শোষক এই দুইটি অতি প্রয়োজনীয় গুণের জন্য ইহা পাট ও কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পশমের মধ্যে অনেকটা শুষ্কবায়ু থাকে। এজন্য বাহিরের শীতল বায়ু উহার মধ্য দিয়া পরিচালন দ্বারা শরীরের উত্তাপ নষ্ট করিতে পারে না। এই কাপড়ের দোষ এই যে, ধৌত করিলে সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হয় এবং কিছুদিন ব্যবহার করিলে সূত্র সকল কঠিন ও সঙ্কুচিত হয়, তখন উহা উত্তমরূপ জলশোষণ করিতে পারে না এবং অপরিচালকতা গুণ কম হওয়াতে শীত নিবারণ ভাল রূপ হয় না। এজন্য পুরাণ পশম বা ফ্লানেল নূতন অপেক্ষা অনেক কম জল-শোষক ও শীত নিবারক। আমাদের পাঠকগণ যেন পুরাণ ফ্লানেল ও পশম ব্যবহারকালে এই কথা স্মরণ রাখেন। অনেকের বিশ্বাস যে ফ্লানেল ও পশম অত্যন্ত গরম। কিন্তু ইহাদের নিজেদের গরম করা গুণ কিছুই নাই। ইহারা অপরিচালক, এজন্য গায়ে থাকিলে শরীরের উত্তাপ অধিক নষ্ট হইতে দেয় না। এইজন্যই প্রকারান্তরে গরম।

মেরুনো—কার্পাসের সহিত শতকরা ২০-৫০ অংশ পশম মিলাইলে মেরুনো কাপড় প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ কার্পাসের ও পশমের মধ্যবর্ত্তী। এই কাপড়ে গেঞ্জি ফ্রক হয়। ইহা অত্যন্ত ঘর্ম্মশোষক, কিন্তু গাত্রে টানভাবে থাকা উচিত নহে।

লিনেন—ইহা শণ বা flax বৃক্ষের ত্বক্ (ছাল) হইতে প্রস্তুত হয়। এই কাপড় কার্পাসবস্ত্র অপেক্ষা কিছু অধিক উত্তাপ পরিচালক, জলশোষক ও কোমল (মোলাম)। সাহেবেরা কাপড়ের ভিতরে ইহা অধিক ব্যবহার করে।

জুট—ইহা পাটগুল্মের ছাল হইতে প্রস্তুত। ইহার বস্ত্র লিনেনের ন্যায়, কিন্তু কিছু মোটা।

তসর ও গরদ—এই প্রকার বস্ত্র অত্যন্ত দৃঢ়। এই জন্য অনেকদিন ব্যবহার করা যায়। ইহার কাপড় উত্তম, কিন্তু মূল্য এত অধিক যে অনেকে ব্যবহার করিতে পারে না।

চামড়া ও রবার—বৃষ্টির সময় এই প্রকার বস্ত্র অত্যন্ত উপকারী। অত্যধিক শীত নিবারক বলিয়া ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহাদের মধ্য দিয়া ঘর্ম্ম বহির্গত হইতে পারে না, বায়ুও চলাচল করিতে পারে না। এ জন্য অন্যান্য সময় অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এই কয়েক প্রকার ভিন্ন অন্যান্য অনেক রকম কাপড় আছে। কিন্তু তাহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, এজন্য বর্ণনার আবশ্যক নাই।

পরিশ্রমের পর মোটা কাপড় গায়ে দিলে ঘর্ম্ম বাষ্পাকারে নির্গত ও বস্ত্রে ঘনীভূত হইয়া জল হয়। বাষ্প জল হইবার কালে তাহা হইতে প্রচ্ছন্ন তাপ বাহির হয়। ঐ তাপ দ্বারা শরীর বেশ গরম হয়। পরিশ্রমের পর কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা পশম ও সূতার দ্বারা প্রস্তুত কাপড় (মেরুনো) অধিক উপকারী। যে সকল ব্যক্তির সর্ব্বদা সর্দ্দি হয় অথবা যাহাদের দৈহিক যন্ত্র সকল দুর্ব্বল, শীতকালে তাহাদের গাত্রে প্রথমে ফ্লানেল দিয়া তাহার উপর একখে

(আময়) ছাগচর্ম্ম বন্ধন করিলে অধিক উপকার হয়। ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় এক টুক্‌রা ফ্লানেল কাপড় পেটের উপর বাঁধিয়া রাখিলে অনেকের মতে তাহা ওলাউঠা রোগের আক্রমণ নিবারণ করে। ইংরাজীতে ইহার নাম 'কলেরাবেল্ট'। রাত্রিকালেই শৈত্য লাগিবার অধিক ভয়, এবং রাত্রিকালেই অধিকাংশ কলেরা রোগ উপস্থিত হয়। এ কারণ উক্ত ফ্লানেল কেবল রাত্রিকালে বন্ধন করিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়। বিবিধ প্রকার কাশী ও সর্দ্দি রোগে ফ্লানেল পিরাণ ও উলের মোজা অত্যন্ত উপকারী। শিরঃপীড়া রোগে উলের মোজা বিলক্ষণ উপকার করে।

শীত নিবারক—এই কার্য্যে পাট ও কার্পাস অপেক্ষা পশম অধিক উপকারী। অত্যধিক শৈত্যে চামড়া ও জল-প্রতিরোধক রবার প্রভৃতি অধিক প্রয়োজনীয়।

উত্তাপনিবারক—সাক্ষাৎভাবে সূর্য্যের কিরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বস্ত্রের নির্ম্মাণ অপেক্ষা বর্ণের দিকে লক্ষ্য করা অধিক আবশ্যক। শ্বেতবর্ণের বস্ত্র উত্তাপ প্রতীপণ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তৎপরে পাংশুটে, পীত এবং গোলাপী, নীল ও পরিশেষে কৃষ্ণ। কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাদি অত্যন্ত উত্তাপ পরিচালক, এ জন্য উষ্ণপ্রধান দেশে ব্যবহার করা ভাল নয়। সাদা কাপড় গরম দেশের জন্য অতি উত্তম। ধূসরবর্ণও মন্দ নহে। ছাতা ও টুপী সাদা কাপড়ের হইলে অধিক উপকারী। গরম দেশে ছায়ার মধ্যে বস্ত্রের উত্তাপ পরিচালকতা গুণ বিবেচনা করিতে হইলে বর্ণের প্রতি মনোযোগ না করিয়া তাহা যে দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত তাহার উত্তাপ পরিচালকতা গুণ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এজন্য ছায়াতে থাকিলে বস্ত্রের পরিচালকতা গুণ ও স্থূলতা গুণ দেখাই উচিত।

ঘর্ম্ম শোষক—পশম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। গন্ধশোষক—এই ধর্ম্ম বস্ত্রের বর্ণের উপর অনেকটা নির্ভর করে। কাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে নীল, লাল, হরিত ও পীত। শ্বেতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা কম গন্ধ শোষণ করে। যে সকল বস্ত্রে অধিক আর্দ্রতা শোষণ করে, গন্ধও তাহাতে অধিক শোষণ করে। এ জন্য পশম অন্যান্য বস্ত্রাপেক্ষা অধিক গন্ধ-শোষক।

মেলেরিয়া নিবারক—খালি গায়ের উপর ফ্লানেল ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অনেক কম হয়। আফ্রিকা দেশে বহুবিধ পরীক্ষায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

শিরস্ত্রাণ—শৈত্য, উত্তাপ, আর্দ্রতা ও আলো হইতে মস্তককে রক্ষা করিবার জন্য কোনও প্রকার আবরণ আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের লোক এ বিষয়ে প্রায় পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মাথায় একটি সাদা কাপড়ের পাগ অথবা টুপি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মাথার আবরণ এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে মাথায় চাপ না পড়ে ও ঘর্ম্ম সহজে বহির্গত হইতে পারে। মাথার চুল ও আবরণের মধ্যে একটু ফাঁক্ থাকিলে ও হাল্‌কা হইলে এবং উহা আবশ্যক মত বড় হইলে সকল উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

আবাহন

এস তুমি এস, প্রভু তুমি এস
এস সঙ্গীতে মোর সঞ্চরি ;

এস ধীর চল চঞ্চল চরণে
এস প্রভু মোর জীবনে মরণে
এস শয়নে মধুর স্বপনে
নিমেষে সকল আঁধার হরি

শোক অশ্রুধারে এস গো সান্ত্বনা
দুঃখ পারাবারে এস নিজ জনা
নিবিড় আঁধারে এস জ্যোতি কণা
এস, মঙ্গল রাশি অঞ্চলে ধরি

এস প্রভু ললিত-গীত-ঝঙ্কারে
এস প্রভু ধীর গম্ভীর ওঁকারে
এস ভকতের পূত আঁখিধারে
শুধু হাসি রাশি সাথে করি।

আশা চেয়ে কাটায়েছি কত রাত
এস, এস, এস, ধর প্রভু হাত
এস সখা, এস প্রিয়, এস নাথ
অমৃতে জীবন উঠিবে ভবি।

এস এস প্রণয়েবি মাঝ দিয়া
এস হাসি গান রূপরাশি নিয়া
এস ভুলায়ে সকল সরল হিয়া
দাঁড়ায়ে তোমার অভয় বাণবী।

আপনা ভুলিয়া পাগলের পারা
হৃদি মরুভূমে এস বারিধারা
নব জাগরণে ভেঙ্গে এস কারা
ভয় ভ্রান্তি রাশি সব পাসরি।

দলিয়া সকল বিপদ্ বিভ্রম
(এস) দীনের কুটীরে অন্তরতম
যত গ্লানি, দোষ ক্ষম প্রভু ক্ষম
তোমারি আলোকে ফেল আবরি।

শ্রীসচ্চিদানন্দ সেন গুপ্ত।

বাঘ ও শিকারী।

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পরীক্ষায় এইরূপ একটী প্রশ্ন থাকে, এমন কোন্ অপরাধ আছে, যাহা করিলে শাস্তি হয় না, কিন্তু তাহার নিষ্ফল চেষ্টা মানবকে দণ্ডনীয় করে, — তবে উত্তর সহজ হইলেও অনেক পরীক্ষার্থীকে বোধ হয় কলম তুলিয়া ভাবিতে হইবে।

আত্মহত্যা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঘটিয়া থাকে, জীবনে অকৃতকার্য্য কত পুরুষ, পরীক্ষায় ফেল হইয়া কত ছাত্র, এবং স্বামী বা শাশুড়ীর সহিত কলহ করিয়া কত কুলবধূ এই কুকার্য্য করিয়া দণ্ডবিধি আইনকে ফাঁকি দেয়। আমাদের দেশে আফিং, গলায় দড়ী এবং জলে ডোবা, এই তিন উপায়ই প্রশস্ত ছিল। কিন্তু আজকাল লোকে, বিশেষতঃ মেয়েরা শিক্ষার আলোক পাইয়া কেরাসিন্ তেলের আগুনে মরিতে শিখিয়াছে।

ফরাসী দেশ শিক্ষিত দেশ, সেখানে যখন সকলই অদ্ভুত রকমের, তখন আত্মহত্যাই বা বাদ যাইবে কেন?

সেখানকার সত্যভাবের আত্মহত্যা নরহত্যায় পরিণত হয়। তাহারই একটী বিচিত্র চিত্র আজ পাঠকপাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

প্যারি সহরে সীন্ নদীর পোলের উপর একটী যুবক ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দারুণ অশান্তি লইয়া সে আজ পোলের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাত্রি তখন প্রায় আটটা, কর্ম্মক্লান্ত জনস্রোত এই পোলের উপর দিয়া আপন আপন আবাসে চলিয়া গিয়াছে, এখনও দুই একজন ত্বরিতপদে এই ভদ্রলোকটীর পানে একবার মাত্র চাহিয়া আপন আপন গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইতেছে। কেহ দাঁড়ায় না, কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না,—কারণ আধুনিক জগতে অপরিচিতের সহিত গায়ে পড়িয়া আলাপ করা অসভ্যতা। যুবকটী একবার এদিক্ ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ কোথায়ও নাই, তখন সে যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করিল, পরে চোখের জল মুছিয়া নীচে খরস্রোতা সীন্ নদীর দিকে একবার চাহিল, ধীরে ধীরে বলিল, "মেরী, মেরী, তুমি সুখে থাক!" আবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া চোখের জল মুছিল, পোলের রেলিং-এর উপরে তাহার টুপিটি রাখিল, গায়ের কোট ও ওয়েষ্ট্ কোট খুলিয়া রাখিল, আবার দুইপাশে চাহিয়া রেলিং বাহিয়া উপরে উঠিল, এবং 'হে ভগবান' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিবে এমন সময়ে থামের আড়াল হইতে একটী লোক হঠাৎ বাহির হইয়া পশ্চাৎ-দিক হইতে তাহার কামিজ ধরিয়া ফেলিল, যুবকটী চমকিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? কি চাও?"

আগন্তুক ধীরভাবে উত্তর করিল, "আমি আপনাকে চাই।" যুবক বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আপনি কি আমায় চিনেন? আমি আপনাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না।"

আগন্তুক অতি সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আমিও আপনাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; কিন্তু এই দুই ঘণ্টা ধরিয়া আপনার অনুসন্ধান করিতেছি।"

অতি দুঃখের মধ্যেও যুবকের হাসি পাইল, কিন্তু একটু কঠোরস্বরে সে বলিল,—"আপনি চলিয়া যান, আমাকে বিরক্ত করিবেন না।"

আগন্তুক একটুও বিচলিত না হইয়া কহিল,—"আমি আপনারই মত একজন ভদ্রলোকের অনুসন্ধান করিতেছিলাম, ভগবান্ যখন আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন তখন অনুগ্রহ করিয়া আমাদের ক্লাবে একটীবার আসুন,—আশা-করি এই উপকারটা—" যুবক একটু বিরক্তভাবে উত্তর দিল, "মহাশয়, আপনি আপনার কাজে যান। ক্লাবে যাইবার মত সময় আমার নাই।"

এই বলিয়া পুনরায় সে রেলিং ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল। আগন্তুক অতি বিনীত ভাবে বলিল—"নয়টার সময় আপনাকে ক্লাবে উপস্থিত না করিতে পারিলে আমি বড় বিপদে পড়িব। আপনার সীন্ নদীত পলাইয়া যাইতেছে না, আপনি না হয় দুই ঘণ্টা পরে আসিয়া আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে চলুন।"

"কিসের ক্লাব?"

"আপনি কোট টুপি পরুন, পথে যাইতে যাইতে আপনাকে সমস্ত বলিব, নচেৎ আমরা সময়ে পৌঁছিতে পারিব না। একজন ভদ্রমহিলা আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন।"

"ভদ্রমহিলা! আমার জন্য? সে কি মহাশয়?"

"চলুন, সব শুনিবেন।"

পথে যাইতে যাইতে আগন্তুক বলিলেন, "আমাদের একটি ক্লাব আছে, তাহার নাম—'বাঘ শিকারী ক্লাব।' অনেক ভদ্রমহিলাও এই ক্লাবের মেম্বর। আমাদের এই ক্লাবের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং আধুনিক পৃথিবীতে যত নর-নারী আত্মহত্যা করে তাহার হিসাব লইয়া আমরা দেখিয়াছি যে প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যর্থ প্রেম তাহার মূল কারণ। এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসা লইতে না পারিয়া মানুষ উন্মত্ত হইয়া উঠে, এবং তখনই স্বহস্তে আপন প্রাণ নষ্ট করে। আমাদের ক্লাবে এইরূপ ব্যর্থ প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রতিহিংসা লইবার জন্য একত্রে আনয়ন করি এবং তাহারা পরস্পরকে পিস্তলের গুলির দ্বারা হত বা আহত করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। আজ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময়ে একটী ভদ্রমহিলা এই উদ্দেশ্যে ক্লাবে আসিয়াছেন, যে ভদ্রলোকটীর আসিবার কথা ছিল তিনি অনুপস্থিত, বোধ হয় কাপুরুষটা ভয়ে পলাইয়াছে। আমি ক্লাবের সেক্রেটারী,—মহিলাটী আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, যদি রাত্রি নয়টার মধ্যে সেই কাপুরুষটা অথবা অন্য কোন সমদণ্ডীকে উপস্থিত করিতে না পার তবে সেই পিস্তলের গুলিতে তোমাকে মারিয়া সমস্ত পুরুষজাতির বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিব। মহাশয়, আপনাকে পাইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত—আসুন, এই যে আমাদের ক্লাব, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নয়টা বাজিতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি আছে।"

যুবকটীকে বসাইয়া পাশের হলঘরে প্রবেশ করিতেই মহিলাকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কি সংবাদ মহাশয়?"

সেক্রেটারী কহিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! সীন্ নদীর পোলের উপরে এক যুবককে পাইয়াছি, তিনি"

"ঈশ্বরকে নয়, বল সয়তানকে ধন্যবাদ। নয়টা বাজে, যাহা হয় শীঘ্র কর।"

সেক্রেটারী যুবকটীকে মহিলার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, এবং দুইজনেই একটী টেবিলের নিকট উপবেশন করিলে সেক্রেটারী বলিলেন—"আমাদের ক্লাবের নিয়মানুসারে কোনরূপ বাক্যালাপ না করিয়া কেবল পরস্পরের প্রতি চাহিয়া নিজ নিজ মনের ক্রোধ ও হিংসা জাগাইয়া তুলুন। আমি আধ ঘণ্টা পরে আসিয়া আপনাদিগকে রঙ্গস্থলে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন এবং একটী কবর খুঁড়িবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তিনি আধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে বৈদ্যুতিক আলোক উদ্ভাসিত কক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুইটী নরনারী বসিয়া আছেন। পুরুষটী গম্ভীর প্রকৃতির, তিনি দুই একবার যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া নত মস্তকে মনে মনে তাহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যুবতীটী মুখরা, সে কিছুক্ষণ চুপ

করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পোলের উপর কি করিতেছিলেন ?"

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যুবক উত্তর করিল, "পোলের জল কত গভীর তাহাই পরীক্ষা করিবার চেষ্টায় ছিলাম।"

হাসিয়া প্রশ্ন হইল—"কোন দুঃখে ?"

যুবক একটু হাসিয়া উত্তর করিল—"যে দুঃখে আপনিও আজ এই ক্লাবে উপস্থিত হইয়াছেন।"

যুবকের এই ব্যঙ্গহাসিতে যুবতী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমার বিষয় আপনি কি জানেন ?"

যুবক কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিলে যুবতী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনার নামটী জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

"নাম ও পরিচয় লওয়া কি ক্লাবের নিয়ম বিরুদ্ধ নয় ?"

"হইতে পারে নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু আজ আমার হাতে আপনার নিস্তার নাই; সেই জন্যই জানিতে চাই, কাহার পাপরক্তে আমার এই হস্ত কলঙ্কিত হইল।" এই বলিয়া তাহার সুন্দর শুভ্র দক্ষিণ হস্ত খানা টেবিলের উপরে রাখিল, হাসিয়া যুবক বলিল, "অধীনের নাম—জেমস্ মারকিন্।" নাম শুনিয়া যুবতী চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মারকিন্!—মারকিন্! আপনি কি সেই কবি মারকিন্ ?"

মারকিন্ হাসিয়া বলিল, "লোকে আমাকে তাই বলে বটে। আমার মত কবি প্যারী সহরে গলিতে গলিতে পাওয়া যায়।" এবার যুবতীর মুখ গম্ভীর হইল, সে গাঢ়স্বরে বলিল, "আপনার প্রায় সমস্ত কবিতাই আমি পড়িয়াছি, এবং জেনারেল্ লোভাট্ যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার কবিতা আমার কাছে ভাল লাগিত, এখন উহা আমার কাছে বিষ বলিয়া মনে হয়।" বলিতে বলিতে সে জেমসের মুখের দিকে চোখ তুলিতেই দেখিল, বিস্ফারিত চক্ষে জেমস্ তাহার দিকে চাহিয়া আছে, রমণী-সুলভ লজ্জায় যুবতী চক্ষু নত করিল। ধীর ও স্পষ্টস্বরে জেমস্ কহিল, "আপনার জেনারেল্ লোভাট্ আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট দিয়া সৈন্য লইয়া যাইবার সময়ে হতভাগিনী মেরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া গেলেন।" এ কথায় কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল, যুবতী লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কেন তোমার মেরী আমার জেনারেলের নয়নপথে পড়িল ? কেন তুমি তাহাকে সামলাইয়া রাখ নাই ?"

কবি ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আপনি আপনার জেনারেল্‌কে কেন আঁচলে বাঁধিয়া রাখেন নাই ?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া যুবতী বলিল, "হতভাগ্য কবি! ইহার প্রতিফল তোমাকে পাইতে হইবে। আজ গুলি করিয়া তোমার মাথা উড়াইয়া দিব।" ঢং করিয়া ঘড়িতে সাড়ে নয়টা বাজিল। পাশের দরজা খুলিয়া পিস্তল হস্তে সেক্রেটারী প্রবেশ করিলেন, এবং উভয়কে কথা বলিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "একি, আপনারা ক্লাবের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কথা বলিতেছেন যে!" জেমস্ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যুবতী বলিয়া উঠিল, "কথা না বলিলে কি করিয়া জানিতাম যে এই হতভাগা কবির জন্য আমার জেনারেল্—যাক্ সে কথা! এখন রাত অনেক হইয়াছে, যাহা হয় শীঘ্র কর। ইহার মাথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য আমার হাতটা সুড়সুড় করিতেছে।" সেক্রেটারী টেবিলের উপর পিস্তলটী রাখিয়া বলিলেন, "আমাদের ক্লাবের নিয়মানুসারে এই পিস্তলে ছয়টী টোটার মধ্যে পাঁচটী গুলিভরা, আর একটী ফাঁকা। এই প্লেটের উপর যে দুইটী কাগজ আছে, তাহা আপনারা এক একখানা তুলিয়া নিন্।" সেক্রেটারীর কথানুসারে তাহারা এক একখানা কাগজ তুলিয়া নিল, পরে কাগজ খুলিলে দেখা গেল, যুবতীর হাতের কাগজে 'বাঘ' লেখা ও জেমসের হাতের কাগজে 'শিকারী' লেখা রহিয়াছে। উভয়েই জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার মানে কি ?"

"আসুন, বুঝাইয়া দিতেছি," বলিয়া সেক্রেটারী তাহাদিগকে একটী প্রকাণ্ড ঘরে লইয়া গেলেন, পরে একটী রূপার ছোট ঘণ্টা যুবতীর গলায় বাঁধিয়া বলিলেন, "আপনি ঐ দেয়ালের নিকট দাঁড়াইয়া ঘণ্টা নাড়ুন, আর উনি এখান হইতে অন্ধকারে আপনাকে গুলি করিবেন," বলিয়া অস্ত্র প্রান্ত দেখাইয়া দিল। শেষে সেক্রেটারী আবার বলিলেন, "যদি গুলি নিষ্ফল হয়, তবে আপনাকে শিকারী হইতে হইবে এবং আপনাকে বাঘ হইতে হইবে।" পরে যুবতী ও জেমস্ তাহাদের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলে সেক্রেটারী বাহিরে আসিয়া কবাট বন্ধ করিয়া বৈদ্যুতিক আলো নিভাইয়া দিলেন। অন্ধকারে যুবতী ঘণ্টা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "যদি তুমি এক গুলিতে আমাকে না মারিতে পার; তবে আমার

হাতে তোমার নিস্তার নাই, আমার বাল্যকাল হইতেই ইহা অভ্যাস আছে এবং নিশানা কখনও ভুল হয় না।"

গুড়ুম করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল, পরক্ষণেই সেক্রেটারী বাতি জ্বালিয়া দেখিলেন, যুবতীর মস্তকের প্রায় দুই হাত উপরে গুলি বিদ্ধ হইয়াছে। এবার জেম্‌সের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হইল, যুবতী পিস্তল হাতে লইয়া জেমস্‌কে বলিল, "তুমি এখন ভগবানের নাম স্মরণ কর।"

আবার দরজা বন্ধ হইল, বাতি নিভিল এবং একটু পরে পিস্তলের আওয়াজ হইল। সেক্রেটারী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জেম্‌সের মাথার একহাত উপরে দেওয়ালে গুলি বিদ্ধ হইয়াছে। যুবতী বলিল, "এ পিস্তল বড় ভারী, ইহা মেয়েলোকে ব্যবহার করিতে পারে না।" আবার যুবতীর গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আবার বাতি নিভিল, টুং টুং করিয়া ঘণ্টার ধ্বনি শোনা গেল, এবং একটু পরেই পিস্তলের আওয়াজ হইল। সুইচ্ টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সেক্রেটারী দেখিলেন, ছাতের কাছে দেওয়ালের গায়ে গুলি বিদ্ধ হইয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি! আপনি কি কখনও পিস্তল ব্যবহার করেন নাই?" জেমস্ কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সেই মুখরা যুবতী হাসিয়া বলিল, "উনি যে কবি।" আবার জেমস্ এর গলায় ঘণ্টা বাঁধা হইল এবং যুবতী পিস্তল লইয়া নিজেই আপন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "পিস্তলটা বড় ভারী। তাই সেবার পারি নাই। কিন্তু এবার আর রক্ষা নাই।" জেমস্ কোন উত্তর দিল না। স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাতি নিভিল এবং একটু পরে পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া সেক্রেটারী বাতি জ্বালিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জেমসের মাথার দুই তিন হাত দূরে দেওয়ালে গুলির চিহ্ন রহিয়াছে। সেক্রেটারী একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "আপনারা ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিতেছেন।" জেমস্ নির্ব্বাক, কিন্তু যুবতী একবার তীব্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। আবার যুবতীর গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া জেমস্‌কে আবার যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া সেক্রেটারী বাহিরে গিয়া বাতি নিভাইয়া দিলেন। টুং টুং করিয়া ঘণ্টার আওয়াজ হইতেছে এবং একটু পরেই পিস্তলের আওয়াজ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা গুরুপতন শব্দ শোনা গেল, সুইচ্ টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সেক্রেটারী দেখিলেন, জেমস্ ধরাশায়ী। যুবতীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে জেমস্ তাহার নিজের উপর পিস্তল ব্যবহার করিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই কবির সরল এবং সুন্দর ব্যবহারে যুবতীর মন আকৃষ্ট হইতেছিল। এখন এই আত্মত্যাগে তাহার রমণীহৃদয় শ্রদ্ধায় এবং ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া জেমস্‌এর মাথা কোলে তুলিয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ওঠ—ওঠ! আমি তোমাকে এইরূপভাবে মরিতে দিব না। হে কবি, তোমার প্রতিভা এইরূপ ভাবে নষ্ট হইতে দিব না! ওঠ ওঠ, তোমার নিজের জন্য না হইলেও আমার জন্য এবং দেশের জন্য তুমি বাঁচিয়া থাক। ছিঃ, ছিঃ, আমি কেন ইহা আগে বুঝিতে পারি নাই!" পরে সে সেক্রেটারীকে তীব্রকণ্ঠে বলিল, "দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ? শীঘ্র একজন ডাক্তার ডাক।"

ধীরভাবে সেক্রেটারী বলিলেন, "এই টোটা গুলিভরা ছিল না, উনি পিস্তলের ধাক্কায় এবং মনের আবেগে পড়িয়া গিয়াছেন, ঐ দেখুন চোখ মেলিতেছেন।" যুবতী চাহিয়া দেখিল—জেমস্ তাহার দিকে চাহিয়া আছে, লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি জেমস্‌এর মাথা মাটিতে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জেমস্‌এর দিকে একবার আড়-চোখে চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। জেমস্ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, তাহার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত, তখন তাহার কর্ণে এই কথাই ঝঙ্কৃত হইতেছিল—"হে কবি, তুমি আমার জন্য এবং দেশের জন্য বাঁচিয়া থাক!" কে এই সুন্দরী? জেমস্ সেক্রেটারীর সাহায্যে টলিতে টলিতে সেই পূর্ব্বোক্ত টেবিলে আসিয়া বসিল, এবং এক গ্লাস পানীয় প্রার্থনা করিল। সেক্রেটারী চলিয়া গেলে যুবতী ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা কার্ড দিয়া বলিল —"আপনি অনুগ্রহ করিয়া কাল বৈকালে একবার আমার সহিত দেখা করিবেন।" সেক্রেটারী আসিবার পূর্ব্বেই ক্লাব হইতে সে চলিয়া গেল। জেমস্ কার্ডে যুবতীর নাম ও ঠিকানা পড়িয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। একি! এ যে ডিউক অব্ টুর্ণের বড় আদরের মেয়ে সুজেন্! পরের দিন জেমস্ সুজেনের কথানুসারে দেখা করিতে গেলে ডিউক্ অব্ টুর্ণে এবং তাঁহার পত্নী অতি সমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর—তারপর এক শুভদিনে দুটী ভাঙ্গা প্রাণ আবার জোড়া লাগিল।

শ্রীকনকলতা সেনগুপ্তা।

রাজনীতিক্ষেত্রে

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অধ্যায়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে রাজনীতি চর্চ্চার বিশেষ অভাব ছিল। এ দেশের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট ও এংলো ইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্রগুলি যাহা বুঝাইতেন, সাধারণ লোক তাহাই বুঝিত। কেবল সাধারণ লোক নহে, যে দুই চারি জন ব্যক্তি রাজনীতির আলোচনা করিতেন, তাঁহারাও সেইরূপ বুঝিতেন। গভর্ণমেণ্ট পক্ষের কথার সঙ্গে প্রজাপক্ষের ও যে দুই চারিটী কথা বলিবার আছে, তাহা প্রায় কাহারও মনে উদিত হইত না। শিশিরকুমার তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকার ভিতর দিয়া, কিরূপে এইভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে নূতন ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রচলন করিয়া প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে যে স্থায়ী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন ; সুতরাং এখানে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এংলোইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্রগুলি যখন বঙ্গদেশের জমিদার সম্প্রদায়ের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, আমাদের দেশের কোনও কোনও নেতা সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। জমিদারদিগের অত্যাচারে প্রজাবর্গ দিন দিন অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িতেছে, এংলো ইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্রগুলি যখন এই সুর ধরিল, আমাদের পূর্ব্বোক্ত নেতৃগণও সেই সুরে সুর মিশাইয়া দিলেন। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রেরও যে জমিদার সম্প্রদায়ের উপর সদ্ভাব ছিল না, আমরা পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এংলো ইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্রগুলি আন্দোলন আরম্ভ করিলে শিশিরকুমার তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেশবাসিগণের নিকট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকারিতা সপ্রমাণ করিতে আরম্ভ করেন। আমাদের দেশের নেতাদিগের মধ্যে প্রথমে যাঁহারা এংলো ইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্রগুলির সহিত যোগদান করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধবাদী হন, তাঁহারা শেষে অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া আপন আপন মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় জর্জ্জ টম্‌সন নামক জনৈক সদাশয় ইংরাজ তাঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। এই টম্‌সনের প্ররোচনায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে বাবু কৃষ্ণদাস পাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থন করিয়াছিলেন। একবার কলিকাতার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে মিষ্টার হিউম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে দুই একটী কথা উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের নায়কগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধবাদী থাকিলেও শেষে অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া তাঁহারা আপন আপন ভ্রম উপলব্ধি করিয়া তাহা সংশোধন করিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধান অনুসারে যে ভূমির কর একবার নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট তাহার উপর আর কোন নূতন কর ধার্য্য করিতে পারেন না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। পথকর (রোড সেস্) ধার্য্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত্তভঙ্গ করিয়াছেন। পথকর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব হইলে শিশিরকুমার তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন হইতে প্রথমে প্রতিবাদ হইয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যখন বলিলেন যে, জমিদারবর্গ প্রজাদিগের নিকট হইতে উক্ত কর আদায় করিতে পারিবেন, তখন আর কোন আপত্তি থাকিল না। গভর্ণমেণ্ট যে কেবল প্রজাগণের নিকট হইতে নহে, জমিদারগণ হইতেও কর আদায় করিবেন ইহা না বুঝিয়া

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সভ্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। দূরদর্শী শিশিরকুমার পথকরের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল।

ভারতে সিপাহীবিদ্রোহের সময় দেশীয় রাজন্যবর্গ গভর্ণমেণ্টকে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টও সে জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে এই রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ কালে গভর্ণমেণ্টের কোনও কোনও ইংরাজ কর্ম্মচারীর কু-দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। কোন কোন এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র তাঁহাদিগকে চরিত্রহীন ও প্রজাপীড়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগের হস্ত হইতে রাজ্যপরিচালন ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতেন। কোন কোন দেশীয় সংবাদপত্র ভালমন্দ বিচার না করিয়াই এংলো ইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্রগুলির সহিত যোগদান করিতেন। দেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক রাজ্য শাসিত হইলে দেশের যে কি পরিমাণ মঙ্গল হইতে পারে, তাহা গভর্ণ... বুঝিলেও এ দেশের কোন কোন রাজনীতিক ব্যক্তি ... বুঝিতে পারিতেন না। শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় রাজন্যবর্গের অনুকূলে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। রাজ্যের কোনও

রাজার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিয়া

আন্দোলন করিবার জন্য শিশিরকুমারকে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাকে বলিতেন, "তুমি তোমার রাজার নিকট ফিরিয়া যাও। তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজের দুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইলে রাজা নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ মোচন করিবেন।" শিশিরকুমার বলিতেন যে, এ দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ যদি প্রজার উপর কোন অন্যায় অত্যাচার করেন, তাহা হইলে যাহাতে সেই অত্যাচার নিবারিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু রাজার নিকট হইতে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য আন্দোলন করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এক সময় ময়ূরভঞ্জ ও ত্রিপুরা এই দুই রাজপরিবার মধ্যে পারিবারিক বিবাদের সূচনা হওয়ায়, একখানি এ দেশীয় সংবাদপত্র রাজ্যটাকে গভর্ণমেণ্ট যাহাতে নিজ অধিকারে গ্রহণ করেন, তার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট কিন্তু দেশীয় রাজন্যবৃন্দের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

ভারতের স্বাধীন রাজন্যবর্গই ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষ্যস্বরূপ; তাঁহারাই ভারতের জাতীয় জীবন-গঠনের প্রধান অবলম্বন; এই জন্য শিশিরকুমার তাঁহাদের বড়ই অনুরক্ত ছিলেন সকল রাজার বিরুদ্ধে, গভর্ণমেণ্টের নিকট কেহ কোনও অভিযোগ উত্থাপন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে শিশিরকুমার বলিতেন যে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন রাজাদিগের কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। রাজ্যের কোনও প্রজার যদি কোন দুঃখ কষ্টের কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রজার নিজের রাজার নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। শিশিরকুমার বলিতেন যে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কোনও অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টায় ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট গমন করা যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ স্বীয় রাজ্যের কোনও অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট গমন করা অসঙ্গত। মলহররাও যখন বরোদার গাইকোয়ারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কর্ণেল ফেয়ার তখন বরোদার রেসিডেণ্ট ছিলেন। রেসিডেণ্ট সাহেব বরোদাধিপতির উপর বড় সদয় ছিলেন না। মলহররাও পানীয় দ্রব্যের সহিত হীরকচূর্ণ মিশিত করিয়া কর্ণেল ফেয়ারের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। অভিযোগের বিচার জন্য তিনজন দেশীয় রাজা ও তিনজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী লইয়া একটী কমিশন গঠিত হইয়াছিল। বিচারে মলহররাও যদিও দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইলেন না, তথাপি তাঁহাকে রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া বরোদার সিংহাসন হইতে অপসৃত করা হইল। মলহররাওএর বংশের অন্য একজনকে গাইকোয়ার নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন দ্বিভাষী ছিল। পত্রিকার ইংরাজী অংশটী বাড়াইয়া দিয়া শিশিরকুমার একটী Overland Edition বাহির করিয়া, দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র, তাহা প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বিবাঙ্কুর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্যে একটা বিশেষত্ব ও নূতন ভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পত্রিকা পাঠ করিবার জন্য তাঁহারা উৎসুক হইয়া থাকিতেন। বরোদার ব্যাপার লইয়া

দেশমধ্যে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল; সর্ব্বত্রই মলহর-রাওয়ের প্রতি অবিচারের কথা আলোচিত হইত। বরোদার ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবাসী বিভিন্ন জাতির স্বার্থ যে একই সূত্রে জড়িত, ইহাই প্রমাণ করা শিশিরকুমারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইলে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা ইংরাজী প্রবন্ধ উদ্ধৃত না করিয়া, পাঠকগণের সুবিধার জন্য ১২৮২ খৃঃ অঃ ১৭ই বৈশাখের অমৃতবাজার পত্রিকার বাঙ্গালা অংশ হইতে একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম।

"মলহর রাওয়ের রাজ্যচ্যুতি।"

"প্রবল ঝটিকা হইয়া গেলে সংসার যেমন স্তম্ভিত হয়, মলহররাওয়ের রাজ্যচ্যুতিতে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়াছে। তৃষিত চাতক বারিভরে অবনত মেঘের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে বারি প্রত্যাশা করিতেছিল, জলধর বারিবর্ষণ না করিয়া তাহাকে বজ্রাঘাত করিয়াছেন! ভারতবর্ষবাসীরা স্বপ্নেও এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল না যে, লর্ড নর্থব্রুকের মুখ হইতে এরূপ নিদারুণ বাক্য নিঃসৃত হইবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত প্রবল ব্যক্তির বলদ্বারা শাসন করা রাজনীতির নূতন নিয়ম নহে। যতদিন রাজার সৃষ্টি হইয়াছে, যতদিন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ততদিন এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে দিন এই নিয়ম অনুসারে ফ্রান্স নররক্তে প্লাবিত হয়, ফ্রান্সসম্রাট্ রাজ্যচ্যুত হন এবং ফ্রান্সের পতন হয়; এই নিয়মানুসারে প্রতাপান্বিত ইংলণ্ড অকারণে সে দিন আমেরিকা ও রুষিয়ার নিকট অবনত হইলেন। লর্ড মেও যদি মলহররাওকে রাজ্যচ্যুত করিতেন, মলহর রাওকে কেন, এ দেশের সমুদয় স্বাধীন রাজাগুলি ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহাতে যত অন্যায়ই দেখিতাম, মনকে ইহাই বলিয়া সান্ত্বনা দিতাম যে জগতের রীতিই এই। লর্ড ডালহাউসী অযোধ্যার নবাবকে যে অন্যায়পূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করেন, তাহাতে লোকে ইহাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে তাহার ন্যায় গবর্ণর জেনারেল দ্বারা এরূপ অন্যায় কার্য্য সম্পাদিত হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই আশ্চর্য্য। কিন্তু নর্থব্রুক, যিনি আমাদের নিরপেক্ষতার উদাহরণস্থল, যিনি আমাদের সন্তপ্ত-হৃদয়ে শীতল বারি সিঞ্চন করিতে ভারতবর্ষে অবতরণ করেন, তিনি মলহররাওকে রাজ্যচ্যুত করিলেন! যে লর্ড নর্থব্রুক্ আমাদের সকল আশার প্রস্রবণ, যাঁহার মুখ দেখিয়া অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমরা অনেক কষ্ট বিস্মৃত হইয়াছি, তিনি মলহররাওকে রাজ্যচ্যুত করিলেন! যখন আমাদের এই কথা স্মরণ হইতেছে আমরা চারিদিক্ শূন্য দেখিতেছি। আমরা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম না যে লর্ড নর্থব্রুক দ্বারা এরূপ কার্য্য হইবে যাহাতে ভারতবর্ষবাসীরা সন্তাপ-সাগরে ভাসিবে। কিসে লর্ড নর্থব্রুককে এরূপ নিদারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। কিসে তাঁহার মন এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল যে তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না? যিনি আমাদিগকে শান্তি, সন্তোষ প্রদান করিতে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন এবং গাইকোয়াড়কে রাজ্যচ্যুত করিলে যে ভারতবাসীদিগের মর্ম্মান্তিক হইবে তাহা তিনি জানেন, কিন্তু তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি জানেন গাইকোয়াড়কে রাজ্যচ্যুত করিলে ন্যায় বিচার হইবে না, তিনি যে প্রতিজ্ঞা দ্বারা আপনাকে আবদ্ধ করেন, তাহার বিপরীত কার্য্য করা হইবে। তিনি জানেন যে, তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের মধ্যে আতঙ্কের উদয় হইবে, স্বাধীন রাজারা আপনাদিগের মান মর্য্যাদা, পদগৌরব, নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হইবেন। তিনি যে অপরাধে গাইকোয়াড়কে রাজবিচারে উপস্থিত করেন, তাহা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছেন; শুধু কমিশনারগণ তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেন নাই, ইংলণ্ডবাসীরা তাঁহাকে এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, ষ্টেট্ সেক্রেটারী তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। দেশে যাঁহার তাঁহার শত্রুপক্ষীয় তাঁহারাও আর স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেন না যে তিনি অপরাধী, এবং গবর্ণমেণ্টও এরূপ বলিতে পারিতেছেন না যে তিনি অপরাধী, তথাপি লর্ড নর্থব্রুক্ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। মলহর রাওয়ের আর এক অপরাধ যে, তাঁহার রাজ্যে অবিচার হয়। কিন্তু যে রাজার বিপদে প্রজারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, যে রাজাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপনের নিমিত্ত প্রজাবর্গ গভর্ণমেণ্টের নিকট

প্রার্থনা করিতেছে, যারা সুসভ্য ইংরাজ শাসনাধীন হওয়া অপেক্ষা তাঁহার অধীনে অবস্থিতি করা সর্ব্বোতভাবে শ্রেয়স্কর মনে করে,—যে রাজার প্রতি প্রজার এরূপ অনুরাগ তাহার রাজ্যে অবিচার ও অরাজক হইতেছে বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক ইহাও গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। তবে কি প্রথম অবধি লর্ড নর্থব্রুকের উদ্দেশ্য ছিল যে মলহররাও দোষী হউন্ নির্দ্দোষী হউন্ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন? তিনি মলহররাওকে বন্দী করার সময় প্রতিজ্ঞা করেন যে, বিচারে নিষ্কৃতি হইলে মলহররাও পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেন যে ২০ মাসের মধ্যে যদি গাইকোয়াড় রাজ্যে সুবিচার স্থাপন না করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি গুরুতর আজ্ঞা হইবে; কিন্তু এই ২০ মাসের মধ্যে তাঁহার কোন ভয় নাই। এ সমুদয় কি অলীক? আমরা লর্ড নর্থব্রুককে এরূপ অপবাদ দিতে পারি না।* যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা এখনও বিশ্বাস করেন যে এরূপ অপবাদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু তিনি আপনার বুদ্ধির নিমিত্তই হউক্ আর কু-লোকের পরামর্শ শুনয়াই হউক্, বরোদা সম্বন্ধে আগাগোড়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে যদি কেহ এখন এই অপবাদ দেয়, তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের তাঁহার পক্ষ হইয়া কোন কথাই বলিবার আর সাধ্য নাই। মলহররাওকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তিনি শুদ্ধ অবিচার করেন নাই, তাঁহার বন্ধুবান্ধব, অনুগত আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের অধীশ্বর, তিনি অতি উচ্চ আসনে আরূঢ়, তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে বায়ু ব্যজিত হয় তাহা অমৃতময়, তাঁহার কর্ণে যে শব্দ প্রবেশ করে তাহা মধুপূর্ণ, তিনি অহর্নিশি প্রফুল্লিত মুখদর্শন করেন, তাঁহার নিকট সম্ভবতঃ ভারতবর্ষবাসীদিগের মলিন মুখ প্রতিবিম্বিত হইবে না। ভারতবর্ষবাসীদিগের দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁহার চতুঃপার্শ্বের বায়ুরাশি কম্পিত করিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে অনেকেই তাহার অনুগত ও বন্ধু। তাঁহারা প্রতপদবিক্ষেপে ভারতবাসীদিগের মলিনমুখ দর্শন করিতেছেন আর লজ্জায় অধোমুখ হইতেছেন; তাঁহাদের কর্ণে যে শব্দ প্রবেশ করিতেছে, তাহাই ভারতবর্ষবাসীদিগের অসন্তোষভাবপূর্ণ; তাঁহারা যাহার নিকট যাইতেছেন, সেই বলিতেছে যে লর্ড নর্থব্রুক্ দ্বারা এই কার্য্যটী হইল! লর্ড নর্থব্রুক যদি মলহররাওকে বন্দী করিয়াই রাজ্যচ্যুত করিতেন, তাহা হইলে লোকে কষ্ট পাইত, কিন্তু সে কষ্ট তাহাদের মর্ম্মচ্ছেদ করিতে পারিত না। তিনি গাইকোয়াড়ের প্রতি সুবিচার করিবেন আমাদিগকে এই বাক্য দ্বারা কেবল সান্ত্বনা করেন নাই, যাহাতে গাইকোয়াড় এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হন, পদে পদে তাহার সাহায্য করিয়াছেন। যখন লোকে জানিল যে, গাইকোয়াড় নিষ্কৃতি পাইলেন, যখন সকলে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনারূঢ় দেখিবে প্রত্যাশা করিতেছে,—যখন যাহারা গাইকোয়াড়ের উদ্ধারের নিমিত্ত ঈশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহারা ভাবিতেছে যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন,—যখন গাইকোয়াড় নিষ্কৃতি হইলেন বলিয়া লর্ড নর্থব্রুকের অনুগত আত্মীয়-স্বজন আনন্দিত হইতেছেন এবং দেশীয় লোক সকলে লর্ড নর্থব্রুকের জয়জয়কার করিতেছে, এই সময় সহসা গাইকোয়াড় রাজ্যচ্যুত হইলেন। সুতরাং এই নিদারুণ আজ্ঞা পূর্ব্বে লোকের মনে যত কষ্ট প্রদান করিত, এখন তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণ অধিক কষ্ট প্রদান করিয়াছে। মলহররাও গেলেন তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি কি? খণ্ডেরাওয়ের মৃত্যুর সময় ত আমরা বিন্দুমাত্র চক্ষের জল নিক্ষেপ করি নাই। মলহররাওয়ের যদি মৃত্যু হইত তাহা হইলেও বোধ হয় আমরা মুহূর্ত্তের নিমিত্ত দুঃখিত হইতাম না। তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন, তাঁহার স্থলে আর একজন গাইকোয়াড় নিযুক্ত হইতেছেন, সুতরাং তাঁহার রাজ্যচ্যুত হওয়াতেই বা আমাদের বিশেষ ক্ষতি কি হইল? কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের এই কার্য্যে নিরাশা আসিয়া আমাদিগকে অবসন্ন করিয়াছে, আমাদের আর বল ভরসা কিছুমাত্রই নাই। যখন নির্দ্দোষতা মলহররাওকে রক্ষা করিতে পারিল না, যখন দেশীয় লোক একত্রিত হইয়া গবর্ণর জেনারেলের নিকট রোদন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, যখন টাইম্‌স্ ও ইংলণ্ডের যাবতীয় সংবাদপত্র তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, ষ্টেট্ সেক্রেটরী তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন আমাদের রক্ষা কোথায়? যখন লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় প্রজারঞ্জক গবর্ণর জেনারেল দ্বারা এরূপ নিদারুণ আজ্ঞা নিঃসৃত হইল, তখন আমাদের আর ভরসা কি?"

মলহররাওয়ের রাজচ্যুতির ব্যাপার লইয়া অমৃতবাজার

পত্রিকা ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। বরোদার ব্যাপারে লর্ড নর্থব্রুক যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় তীব্রভাবে তাহার সমালোচনা করিলে হিন্দু প্যাট্রিয়ট বড়লাট বাহাদুরকে সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"The country could afford to lose many a Mulhar Rao, but could ill afford to lose the genius of such an enlightened, highminded and just statesman as Lord Northbrook."

স্বীয় ব্যবহারে হিন্দু-প্যাট্রিয়ট ক্রমশঃই দেশবাসীর বিশ্বাস হারাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিশিরকুমার সকল উৎপাতের মূলীভূত কারণ, অতএব তাঁহাকে দমন করার জন্য হিন্দু-প্যাট্রিয়ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। শিশিরকুমার বরোদার ব্যাপার লইয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় যেরূপভাবে আন্দোলন করিয়াছেন, তাহাতে রাজদ্রোহিতার আভাস স্পষ্টই লক্ষিত হয়; রাজদ্রোহিগণ সংবাদপত্রে আন্দোলন করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের বহু বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই মর্ম্মে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় এক অতি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় "প্যাট্রিয়টের স্বদেশানুরাগ" (Patriot's Patriotism) শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকাকে অভিযুক্ত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোনটার এক পংক্তির কোন অংশ, অন্য এক পংক্তির কতক অংশ যোগ করিয়া দিয়া এক নূতন পংক্তি সৃষ্টি করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকাকে রাজদ্রোহ-প্রচারক সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকাকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইলে তাৎকালিক এড্‌ভোকেট্ জেনারেল মিষ্টার পল্ বলিয়াছিলেন যে, পত্রিকার প্রবন্ধগুলি বাস্তবিক রাজদ্রোহিতাদোষে দুষ্ট নহে; জুরিগণ বিচারে পত্রিকা সম্পাদককে শাস্তিদান করিবেন বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের এই মোকদ্দমা না করাই কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্ট এড্‌ভোকেট জেনারেলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য হিন্দু-প্যাট্রিয়ট ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের বিবাদের কথা লইয়া "ভারত-সংস্কারক" যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দুপ্যাট্রিয়টের মধ্যে প্রকাশ্য রূপে বিবাদ চলিতেছে দেখিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। অমৃতবাজার বলেন, 'আমরা যখন হিন্দুপ্যাট্রিয়টের দোষ দর্শন করিয়াছি, তখনি গোপনে তৎ-সম্পাদককে তজ্জন্য অনুযোগ করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা তাঁহার মত সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্যাট্রিয়ট আমাদের লেখার এক এক অংশ হইতে অন্যায় সমালোচনা পূর্ব্বক সাধারণের নিকট আমাদিগকে অপদস্থ করিয়াছেন। তিনি এখন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু লেখা হইলে তিনি যদি তাহা সহ্য করিতে না পারেন, লোকে বলিবে তিনি এখন গভর্ণমেণ্টের সন্তোষসাধনার্থী হইয়াছেন। হিন্দুপ্যাট্রিয়টের মতে অমৃতবাজার কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াইবার কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অমৃতবাজার এরূপ দোষে আদৌ দোষী কিনা তাহার আলোচনা আমরা এখানে করিতে চাই না। কিন্তু হিন্দুপেট্রিয়ট এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বিবেচিত কার্য্য করিয়াছেন আমরা কখন এরূপ বলিতে পারিব না। এরূপ উক্তির দ্বারা একজন সহযোগীর ঘোর বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা, পেট্রিয়ট কি তাহা বুঝিতে পারেন না? বিশেষতঃ অমৃতবাজারের সঙ্গে যখন তাঁহার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, তখন যথার্থ কোন ভ্রমপ্রমাদ দেখিলে গোপনে উপদেশ দিলেই বন্ধুর কার্য্য করা হইত। প্যাট্রিয়ট দেশীয় পত্র সকলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছেন, তিনি যখন কোন সহযোগীর উপর সম্পাদকীয় [illegible] প্রকাশ করেন, বিশেষ বিবেচনা সহকারে করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।"

মলহররাও এর স্থলে গভর্ণমেণ্ট যাঁহাকে গাইকোয়াড়ের পদে অভিষিক্ত করেন, লর্ড রিপণের শাসনকালে একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পছন্দ মত একটী লোককে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, পলিটিক্যাল্ এজেণ্ট তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। এজেণ্ট সাহেব নিজের নির্ব্বাচিত একটি লোককে দেওয়ানের

পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন। প্রতিকারের আশায় গাইকোয়াড় কলিকাতায় আসিয়া লর্ড রিপনের শরণাপন্ন হন এবং লর্ড রিপণও তাঁহাকে এজেন্টের যথেচ্ছাচারিতার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় গাইকোয়াড় শিশিরকুমারকে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিষ্টার সমর্থকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে শিশিকুমার গাইকোয়াড়কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পদচ্যুত মলহররাওয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার শত্রু।" শিশিরকুমারের এই কথায় গাইকোয়াড় প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন, "আপনি যদি মলহররাওয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া আন্দোলন না করিতেন, তাহা হইলে বরোদার সিংহাসন সম্বন্ধে বোধ হয় স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইত। গভর্ণমেণ্ট হয়ত বরোদারাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইতেন। আর আমার বরোদার সিংহাসনে স্থান হইত না। সুতরাং আপনি আমার শত্রু নন্, পরম বন্ধু।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

বিনুদা

(উপন্যাস)

(১৫)

অপমানিত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সেই দিন সেই অশুভক্ষণে করুণাময়ের বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিবার পর, নিরদকান্তি আর সে মুখো হয় নাই। কতদিন ভাবিয়াছে, একবার দেখা করিয়া আসে। গাড়ীতে যাইতে যাইতে একবার গাড়ী থামাইয়া খবরটা লইয়া আসে, তাঁহারা কে কেমন আছেন, নীহারের বিবাহ হইয়াছে কিনা। কিন্তু কোন দিনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই ভাবিতে ভাবিতে সে নিজের বাড়ীর সদর দরজায় উপস্থিত হইয়াছে। এক একবার ভাবিয়াছে, বিলাত যাইয়া পরীক্ষাটা দিয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কি এবং কাহাকে মনে পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাও এ যাবৎ কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে নীরদকান্তি সাহিত্য চর্চ্চায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিত। এইবার অবসরমত সে তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। বড় বড় সভা সমিতিতে যোগদান করিয়া, নূতন উদীয়মান কবি নাট্যকারদিগকে উৎসাহিত করিয়া, দরিদ্রের সাহায্য করিয়া, প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল। নীরদ নিজেও লিখিতে পারিত লিখিতও মন্দ নয়।—অল্পদিনের ভিতরই কাগজপত্রে বড় বড় অক্ষরে তাহার উদ্দেশ্যে মেলা কথাই বাহির হইয়া গেল,—"এমনটি হয় নাই, হবে না" ইত্যাদি। সপ্তাহে একাধিক দিবস তাহারই বাড়ীতে সভা বসিতে লাগিল। নিরদ ভাবিল—"এ এক রকম মন্দ নয়, ভুলিয়া থাকা যায়।"

নিহারকে সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল, এ ভালবাসা করুণা কিম্বা কৃপা নয়—মুখদেখানো নয়। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত এ প্রেমস্রোত কবি-হৃদয়ের কোন নিভৃত কোণ হইতে—কখন হইতে যে প্রবাহিত, কোথায় শেষ, নীরদ কিছুই জানিত না। কিন্তু নীহারকে পাওয়ার একটা স্পৃহা তাহার মনে প্রবলভাবেই জাগিয়াছিল। নীরদের স্বভাবই এই ছিল যে, কোন্ বস্তুই সে খুঁজিয়া লইতে জানে না, মাগিতে চাহে না। কেন সে ভিক্ষা করিবে? অন্যের নিকট কোন কিছুর জন্যই প্রার্থনা করা সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিত। এ ভাব তাহার আজিকার নহে, জন্মাবধির। শৈশবেও সে কোন দিন কোন আহার্য্য বস্তু চাহিয়া খায় নাই। পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন মলিন হইয়া গেলেও নিজে তাহা জনকজননীর নিকটও প্রকাশ করে নাই। নীরদের স্বভাব বা মজ্জাগত প্রকৃতি অথবা খেয়াল, সংসার তাহারই করুণাপ্রার্থী হইবে,—সে যদি দেয়, তাহাই বেশী। সে যদি গ্রহণ করে, তাহাই যথেষ্ট। উপযাচক হইয়া সে কোন কার্য্য করিত না, কিম্বা কোন কথা কহিতেও ভালবাসিত না। কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তখন তাহার যথার্থ উত্তর দিত।

নীরদ নীহারকে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিল,—তার জন্য সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চ্চায় মন দিল। এমনই করিয়াই প্রায় দুই মাস কাটিয়া গেল।

ছোট হাজিরার পর আরাম কেদারায় বসিয়া ধূম পান করিতে করিতে নীরদকান্তি বলিয়া যাইতেছিল,—অদূরে বসিয়া সন্তোষ তাহাই লিখিতেছিল।

সন্তোষ নীরদকান্তির নব-নিযুক্ত কেরাণী। মাসিক পত্রাদির প্রবন্ধাদি নীরদ মুখে বলিয়া যাইত, সন্তোষ তাহা লিপিবদ্ধ করিত।

মুখের সিগারেটটা টানিতে টানিতে নীরদ বলিল,—"কতদূর হয়েছে, পড় ত।"

সন্তোষ লিখিত খাতা খানির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বলিল,—"ভগবানের দান ভেবে যুবক মরণোন্মুখ বৃদ্ধ এডামসের কাতর প্রার্থনায় সম্মত হয়ে দুটো চোখ ভরা জল নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। কাহারও চোখে জল দেখ্‌লে, নীরদ তাহাকে ফেরাতে পার্‌তো না।"

"নীরদ কি হে?

"আজ্ঞে আপনি না বল্লেন?—যুবকের নাম এই প্রথম লেখা হ'ল।"

"না—না—কাটো কাটো, ওখানে লেখো,—কি লিখ্‌বে, সুন্দর একটী নাম—"

সন্তোষের এক বাল্য বন্ধুর নাম ছিল—উমাশঙ্কর। তাহার কথাই বোধ হয় সে ভাবিতেছিল,—বলিল, "আজ্ঞে, উমাশঙ্কর দিতে পারেন।"

"নাহে না, ও সব নাম হয় না। বড় লোকের ছেলে, বিলেত গেল, এক কথায় গরীব প্রতিবেশীর মেয়েটার ভার নিতে রাজী হয়ে বুড়োকে শান্তিতে মরতে দিল; জন যদিও ভালবাস্‌তো, তার যে কিছুই ছিল না; খেতে দেবে কি? তাই বুড়ো মর্‌বার সময় বাঙ্গালীর হাতেই মেয়েকে সঁপে দিয়ে গেল; চেহারা সুন্দর, মেজাজ বড়, খরচে খুব, আশা সুখেই থাক্‌বে। যুবক যদিও বিয়ে কর্‌বে বলে কখনও ভাবেনি আর তেমন ভালবাস্‌তোও না মেয়েটাকে,—তবে কৃপালী তারা, কৃপা করেই তার সুখ, কাকেও ফেরাতে পার্‌তো না। তারপর দেখ সে দেশে ফিরে এল, ইচ্ছা কল্লেই মেয়েটীকে বিয়ে করে নিয়ে থাক্‌তে পার্‌ত। তা অতটা তাড়াতাড়ি করা ভাল নয় ভেবে একাই চলে এল,—এসেও কিন্তু সে তার কর্ত্তব্য ভুল্‌লে না,—বিয়ে করা স্ত্রীর মতই খরচ পাঠাতে লাগল, খবর নিতে লাগল—"

মাঝখানে সন্তোষ বলিল,—"আজ্ঞে চরিত্র খুবই সুন্দর, আসক্তি নাই—বিরক্তিও নাই।"

নীরদ কহিলেন,—"তবে—তবে——"

সন্তোষ।—আর একটা কথা—ওটাই বেশী সুন্দর! সে বিয়ে না করেও তাদের প্রতিপালন কর্ত্তে লাগল। জানে জন্ তাকে ভালবাসে, তবু বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; আচ্ছা—বিয়েটা হয়েই গেল না কেন?

নীরদ।—না না, সবে তখন বাপটা মারা গেল, আর বিয়ে জীবনের একটা বড় কথা, দু'জনেই একটু ভাব্‌বে তো। বুড়ো মর্‌বার সময় যুবকের হাতে তুলে দিলে, সে সময় অত ভাব্‌বার সময় ছিল না;—তবে একেবারে বিয়েই ত আর তাতে হয়ে গেল না, এতো আর হিন্দুর মত নয়। দু'জনেরই মত হয়, বিয়ে হবে; না নয় না হবে; মেয়েটীর বিয়ে হয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত যুবক তার ভার গ্রহণ কর্‌লো।—তা নাম—বল না হে—

সন্তোষ।—আজ্ঞে আপনিই বলুন আমার কেমন ঠাকুর দেবতার নাম ছাড়া অন্য নাম মাথায় আসে না। আচ্ছা "দয়াময়,"—"করুণাময়" দিতে পারেন।—দয়ার চরিত্র—গল্পের নামও দিয়েছেন—"বিপন্নে দয়া।"

নীরদ।—হাঁ—হাঁ—কি বল্লে—?

সন্তোষ।—"দয়াময়" "করুণাময়", দিতে পারেন।

নীরদ।—না—না লেখো—"নীহার"—লেখো—"নীহাররঞ্জন"—কেমন হ'ল? সুন্দর নাম নয়?

সন্তোষ।—আজ্ঞে, সুন্দর নামই হয়েছে। গল্পটীও সুন্দর হয়েছে।

নীরদ।—হাঁ—হাঁ—তোমার ভাল লেগেছে বুঝি?

সন্তোষ।—আজ্ঞে আমার কেন, সবারই ভাল লাগবে। "নীহাররঞ্জন"—এই যা নাম দিলেন, এর চরিত্রটা—হাঁ, আপনার মতই কথাবার্ত্তা চালচলন—আপনারই মত দয়াশীল—

নীরদ।—তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ।

সন্তোষ।—আজ্ঞে, তারপর বলুন—এটা এমাসেই শেষ কর্ত্তে হ'বে।

নীরদ।—শেষ কর্ত্তে হবে, তা শেষ ত হ'ল না,—দেখি

কি করি ?—তা আজ আর থাক্, কাল যা হয় একটা ভেবে ঠিক করবো। বেয়ারাকে বল চিঠিগুলো দিয়ে যেতে—

সন্তোষ। "আজ্ঞে আচ্ছা" বলিয়া প্রস্থান করল। বেয়ারা আসিয়া এক তাড়া ডাকের পত্র দিয়া গেল।

প্রথমখানাই দেখিলেন,—বিলাতের পত্র :—

(বঙ্গানুবাদ)

"প্রিয় মিষ্টার রায়—"

অনেকদিন তোমায় দেখি নাই; তোমার অন্নেই এতকাল প্রতিপালিতা হইলাম,—তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি ভোল নাই। বিদেশিনীর প্রতি তুমি যে দয়া দেখাইয়াছ, যিশুর মত তোমায় পূজা কর্ত্তে ইচ্ছা করে। তোমার কথা যে দিন ভুলিব—সে দিন সব ভুলিয়া আমি মরিব—তার পূর্ব্বে নয়।

জন্ কারখানায় কাজ শিখিয়াছে, বেশ ভাল কাজ পাইয়াছে।

জন্ আমায় ভালবাসে, আমায় বিবাহ করিতে চাহে, আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় তোমার নিকট তাহা কোনদিন প্রকাশ করি নাই। জনের ভয় তুমি যদি এই হতভাগিনীকে বিবাহ কর।

এতখানি স্পর্দ্ধা আমি করিতে পারি না। তুমি রাজা, তুমি আমার মত একজন কৃষককন্যার দুর্ভাগ্যে কতকাল আর তোমাকে জড়াইয়া রাখিবে। যাহা করিয়াছ, তাহাতেই আমাকে, আমার মৃত পিতাকে, আমাদের সকলকে তুমি কিনিয়া রাখিয়াছ,—আমরা তোমার দাসানুদাস।

তুমি যদি মত দাও, আনন্দচিত্তে তুমি যদি সমর্থন কর, জনের প্রস্তাবে আমি সম্মত হইব। নতুবা নয়।

চিরজীবন তোমার বাঁদী আমি,—হয় তোমার আদেশ পাইয়া জনকে বিবাহ করিব, নতুবা তোমার নিকট ভারতে যাইব। তুমি লিখিয়াছ, নানা কারণে তোমার এখানে আসিবার আরও কিছুদিন বিলম্ব আছে। কাজের ক্ষতি করিয়া তুমি কেন আসিবে ? আমিই সেখানে যাইব।

আমি কি করিব,—তুমি বলিয়া দাও, আমায় আদেশ কর।

মত পাইলে, আগামী মে মাসেই আমাদের বিবাহ হইবে।

আমরা ভাল আছি।—তুমি আমার শত শত ধন্যবাদ ও প্রণাম গ্রহণ করিবে। তোমারই উত্তরের আশায় রহিলাম। ইতি—

তোমারই চিরকৃপার্থিনী
মারগারেট।

একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া নীরদ অন্য পত্রগুলি দেখিতে লাগিলেন।—একখানি তার বিনয় লিখিয়াছে, করুণাময়ের মৃত্যুর কথা, আরও লিখিয়াছে—

"কাল থেকে নীহার শয্যাগত, অজ্ঞান, এ সময়ে একবার আপনি আমায় একটু সাহায্য করিলে, বড়ই উপকৃত হইব।"—

নিঃশেষিত প্রায় সিগারেটটি তাচ্ছিল্যের সহিত ফেলিয়া দিয়া আর একটি সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে নীরদ ডাকিল,—"সন্তোষ!"

সন্তোষ কক্ষান্তরে কি করিতেছিল,—আসিয়া বলিল,—"আজ্ঞে!"

"ওহে তোমার "বিপন্নে দয়া" শেষ হয়েছে, এই নাও, তারপর এই পত্রখানি যোগ করে দাও, মিঃ রায় কেটে ওখানে "নীহার রঞ্জন" লিখো। আর শেষটা একটু বাকী রইল, তা কাজটা করেই আসি আগে—"

বলিয়াই নীরদ কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল, যাইবার সময় বেয়ারাকে ডাকিয়া বলিল,—"গাড়ী যোতাও।"

সন্তোষ মারগারেটের পত্রখানি হাতে লইয়া মনে মনে কহিল,—"নীহাররঞ্জন তা হলে বাবু স্বয়ং!"

একটু পরেই বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া নীরদকান্তি সন্তোষকে বলিল,—

"ওহে, এই নাও এই হাজার টাকা। আর এই ড্রাফ, ভাল করে দেখে নাও, এই নমুনা—হ্যামিলটনের বাড়ী থেকে এই আংটী দুটো কিনে নিয়ে আসবে—২০০৲ করে এক একটা—দেখে নাও ক্যাটেলগটা। এনে আংটী দুটী এই মারগারেটের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে, লিখে দিও—উভয়কে দুটি—মারগারেট আর জনকে—বিবাহের যৌতুক। আর আমার নামে আর একখানা পত্রও লিখে দিও, 'আমি আনন্দচিত্তে এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করলুম।' আমি যাই, আমার একজন পরমাত্মীয় কাল মারা গেছেন, এই

মাত্র জান্‌লুম্‌। যাই, তাদের দেখে আসি। তুমি এখনি যাও, ভুলোনা যেন।"

গাড়ী তৈরী ছিল—নীরদ উঠিয়া বলিলেন, "চালাও, ঘোষ সাহেবের বাড়ী।"

তাহার পরের দিবস সন্তোষ রেজেষ্টারী করিয়া পত্রসহ যৌতুক প্রেরণ করিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত হৃদয়ের একটা গুরুচিন্তার ভার শূন্য করিবার মত নীরদের যৌতুক উপহার বিদেশিনীর প্রতি একটা দায়িত্বপূর্ণ চিন্তার ভার শূন্য করিয়া দূর সাগর পারে চলিয়া গেল।

মার্‌গারেটের স্মৃতি নীরদ মুছিয়া ফেলিল,—নীহারের নাম আবার ভাস্বর হইয়া উঠিল।

(১৬)

দুঃখের জাঁতায় পিষ্ট চূর্ণে প্রকৃতি বিনয়ের মূর্ত্তি গঠিত করিয়াছিলেন। যত দুঃখই তাহার সহিয়া যায়। সম্পূর্ণ সামলাইয়া উঠিতে না পারিলেও বিনয় নীহারকে লইয়াই মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

করুণাময়ের মৃত্যুর রাত্রি হইতেই মানসিক অশান্তি, উত্তেজনা ও অস্থিরতার সহিত শারীরিক দুর্ব্বলতা মিশিয়া নীহারকে একেবারেই শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। দিনে দুই একবার মাত্র জ্ঞান হইত। অবশিষ্ট সময় দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই হত-চৈতন্যের মত পড়িয়া থাকিত। আর সেই অজ্ঞানাবস্থায় অবিরাম প্রলাপ বকিত। উদার-চরিত্র সাহেব ডাক্তার নীহারকে কন্যার মত ভালবাসিতেন। তাঁহারই সুচিকিৎসায়, বিনয়ের আন্তরিক অবিশ্রান্ত শুশ্রূষায় ও মঙ্গলার অকৃত্রিম সেবায় ক্রমশঃ নীহার পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থতা বোধ করিতে লাগিল। দিনে এখনও দু' একবার মূর্চ্ছা হয়, তবে তাহা আর তত মারাত্মক নহে।

আজ সকাল হইতে নীহারের আবার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছিল। সাহেব শয্যা পার্শ্বেই একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন; বিনয় নীহারের মাথার ধারে বসিয়া কপালে গোলাপ জলে ভিজা ন্যাকড়াখানি বার বার বদ্‌লাইয়া দিতেছিল। সম্মুখেই একটী বৈদ্যুতিক "অফিস্‌ ফ্যান" অবিরাম হাওয়া করিতেছিল।

আজও আবার নীহার পূর্ব্বের মত প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছে।—

"ঐ, ঐ! শুন্‌, শুন্‌, শুন্‌! মাও মরে গেল। আঃ বাঁচ্‌লুম!—কেমন মজা, কেমন শান্তি, ধর্ম্মের শাঁখ আপনি বাজে; ভেবে কি আর ছিলে!"

সাহেব কতকটা বুঝিয়া, কতকটা না বুঝিয়া বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিনয় ডাকিল,—"নীরু! নীরু!"

একটুমাত্র চেতনা পাইয়া নীহার একবার বলিল,—"কেও, বিনুদা—" তাহার পর আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল; নীহার বলিতে লাগিল,—

"বিনুদাকে—আমার সাথে বিয়ে দেবে বলে এনেছো বাবা? ইস্‌! আমি যে তোমার মেয়ে! অাঁ—মেয়ে নই, মেয়ে নই! কই জাননি ত। ওঃ—ওগো—আমার আগে জান্‌তে দাওনি কেন তোমরা!—বিনুদা! আমায় ক্ষমা কর, আমি জানতুম্‌ না; তোমায় কত কি বলেছি, কত অবজ্ঞা করেছি—না—না—নীরদ—নীরদ—আমার জীবন সর্ব্বস্ব! আমার—দেবে না বাবা, দেবে না? ওঃ—"

জিজ্ঞাসু-নয়নে বিনয় সাহেবের দিকে চাহিল, সাহেব বলিলেন, "Let her speak Binu, let me read her heart and the real root of her dieseasc."

কিছুক্ষণ পরে নীহার আবার বলিতে লাগিল,—"বাবা! বাবা! অভিমান করেছো বাবা! আমার উপর রাগ করেছো! আমায় ক্ষমা কর—এবারটীর মত আমায় মাপ কর বাবা—তোমার কথাই শুনবো। বিনুদাকে—না—না! ছিঃ! কি লজ্জা! বিনুদা যে দাদা! ওমা কি লজ্জা! ও ঝি, শুনছিস্‌, বাবা কি বলেন, শুন্‌ছিস্‌? আমার বুঝি দুবার বিয়ে হ'বে? দুজন বুঝি স্বামী—কেন—কেন—জানিস্‌নি তোরা—নীরদ—নীরদ। দূর হ, বুঝি দুবার বিয়ে হয়েছিল! কি বল্‌ছিস্‌? বাবা রাগ করবেন? তা কি কর্‌ব' পারব না তা,—আমি বিনুদাকে বল্‌ব সব,—বিনুদা ভাল মানুষ—তিনি শুনবেন। ওঝি, আমায় ঘরে নিয়ে চল্‌, বিনুদাকে ডেকে দে,—দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নি—তোদের জামাই এসেছে যে——"

ডাক্তার বলিলেন, "নীরদ কে বিনু?"

বিনয়ের কোন উত্তরের পূর্ব্বেই নীহার বলিল, "ওঃ—বিনুদা, একটু জল——"

"এই যে এই নাও" বলিয়া বিনয় নীহারের মুখে একটু বেদানাজল ঢালিয়া দিল।

'আঃ! বিনুদা, আমার বুক শুকিয়ে গেছলো—বিনুদা! আমিও আর বাঁচবো না।"

"কেন, বাঁচবে না কেন? ভয় কি? তুমি সেরেই তো উঠ্‌ছো।"

"উঠ্‌তে আর আমার সাধ নেই বিনুদা" বলিয়া নীহার একখানি হাত বিনয়ের কোলের উপর রাখিয়া দিল।

"এই নাও, এই ওষুধটুকু খাও তো।"

'দাও।"

নীহার পাশ ফিরিয়া শুইল। বিনয় মঙ্গলাকে ডাকিয়া দিল,—সাহেবকে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

আদ্যন্ত সমস্ত শুনিয়া সাহেব বলিলেন,—"নীরদের সঙ্গেই বিয়ে দাও বিনু—নইলে নীরুকে বাঁচাতে পারবে না।"

বিনয় বলিল,—"আমিও তাই ভাবছি, কিন্তু এখন এক বৎসরও না যেতে—"

ডাক্তার বলিলেন,—"না না এখন নয়,—আরও কিছু দিন যাক্—; নীরুও আরও একটু সুস্থ হোক্, তাকে একটু ভাব্‌তেও দাও।"

গতরাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া গিয়া নীরদ আজ একটু বিলম্বেই উঠিয়াছিল। উঠিয়াই তাড়াতাড়ি নীহারের সংবাদ লইতে আসিল। দূর হইতেই সাহেবকে দেখাইয়া বিনয় বলিল,—"ঐ, নীরদ বাবু আস্‌ছেন!" তাহার পর উঠিয়া নীরদকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল,—"আসুন! বেলায় উঠেছেন বুঝি আজ?"

"হাঁ, একটু দেরীই হয়ে গেছে। কেমন আছে নীহার?" বলিয়াই নীরদ সম্মুখস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিনয় কহিল,—"আজ সকাল থেকে আবার ডিলিরিয়াম হয়েছিল, তবে এখন একটু ভাল—বড়ই ভাবিত হয়ে পড়েছি।"

"আপনিও একটু সাবধান থাক্‌বেন। আপনার উপর দিয়েও কম অত্যাচার হচ্ছে না,—দেখ্‌বেন। আপনার একার মত আমরা দশজনেও পারবো না।"

"আমার কিছুই হবে না নীরদ বাবু। প্রকৃতির হাতে সবটাতেই আমার সৃষ্টি। সবটাই আমি সয়েছি,—সবই শিখেছি।"

"কেবল একটা নয় বিনুবাবু।"

"কি?"

"মানুষের চোখ দুটো যে দিকটায় বেশী চেয়ে থাকে—আত্ম-সুখ সম্ভোগচেষ্টা, স্বার্থপরতা। এদিকটা আপনি একেবারেই ভুলে গিয়েছেন। পরকে নিয়েই সব; পরের সুখেই আত্মতৃপ্তি, পরের দুঃখে এতটা আত্মবিস্মৃতি,—আমি দেখিনি বিনুবাবু,—পড়িওনি।"

"পরের দুঃখটা যাঁরা বুঝতে পারে, তারাই তা নিবারণ কর্ত্তে যথাসাধ্য প্রয়াসী হয়, এতো নূতন কিছুই নয়, নীরদ বাবু। বাবার কথাই ভাবুন না, আমি আর কতটুকু কি কচ্ছি কার? যেটুকু বুঝে কচ্ছি, একদিন আমিই তা আমার জীবনে পূর্ণভাবে অনুভব করেছি। নীরদবাবু! আমিও যে বড় দুঃখী।"

বিনয়ের স্বরটা যেন ভারী হইয়া উঠিল। সকলেই নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন।

পানান্তে ডাক্তার নীহার সম্বন্ধীয় বিহিত ব্যবস্থা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিনয় নীরদকে লইয়া নীহারের কক্ষে প্রবেশ করিল।

কয়েকদিন পরে আজ সকালে চায়ের টেবিলে সকলেই পরম সন্তোষের সহিত হাস্যালাপ করিতেছিলেন। নীহারও আজ তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছে। নীহারের সুস্থতা প্রাপ্তিতে সকলেই ভগবানকে এবং সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছিল।

সাহেব সবিনয়ে বলিলেন,—"বাঁচালে তোমায় বিনুই বাঁচিয়েছে মা।"

নীহার কৃতজ্ঞ-নয়নে বিনয়ের দিকে চাহিতেই বিনয় মুখ নত করিয়া কহিল,—"আমি আর কি করেছি সাহেব? এ তো আমার কর্ত্তব্য। তুমি আর নীরদ বাবু যা করেছো, তাই খুব বেশী।"

উচ্চ হাস্যের সহিত নীরদ বলিল,—"হ্যাঁ, আমি মত খুবই করেছি, দু'বেলা দু'কাপ করে চা খেয়েছি কেবল; আপনারা দু'জনে মিলেই এবার Miss Ghoseকে যমের মুখ থেকে কেড়ে রেখেছেন,—আপনি আর ডাক্তার সাহেব।"

৫

"এর চাইতেও নীহারের শুভাশুভ আর একজনের হাতে নির্ভর কর্চ্ছে যে নীরদবাবু।"

"কে সে?"

বিনয়কে কোন প্রত্যুত্তর করিবার সময় না দিয়াই সাহেব বলিলেন,—"পরে শুনবেন মিঃ রায়। তোমরা তবে কালই যাচ্ছ বিনু!"

"মনে ত কর্চ্ছি।"

"না না, আর দেরী কোরো না, তোমারও শরীর বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। নীহারও সম্পূর্ণ সেরে উঠেনি। পশ্চিমের হাওয়াটা এখনই বেশ ভাল। যাও একবার ঘুরে এসো।"

"ডাক্তার ভালই বলেছেন বিনুবাবু, যান্ দিনকতক বেড়িয়ে আসুন। মনেও শান্তি পাবেন, শরীরটাও শোধরাবে।"

বিনয় কহিল,—"আমার তেমন দরকার নেই। তবে নীরুর জন্য—নীরু! কি বল?"

"আমার বেশ লাগবে বিনুদা—চল কালই; তবে"—বলিয়া একটু থামিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীহার বলিল,—"না, চল আমরাই যাবো, চল কালই। বিনুদা! ঐটে ——?

"যাও নিয়ে এসো।"

নীহার উঠিয়া গেল—বিনয় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—নীহারের—"তবে"র মীমাংসা কেমন করিয়া করিবে! বিনয় বুঝিয়াছিল নীহার কি বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। সে যে সেই এতটুকু থেকে নীহারকে তন্ন তন্ন করিয়া শিখিয়াছে; বিনয় ভাবিতে লাগিল, নীরদবাবু রাজী হইবেন কি?

সুন্দর একটী লেদার কেসে একটী বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়, হাতীর দাঁতের ফ্রেমে বাঁধানো করুণাময়ের একখানি হাফটোন্ ফটো, ও সোনায় বাঁধানো একখানি ছড়ি লইয়া নীহার কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিয়া বলিল, "তুমি বল বিনুদা।"

"কেন তুমি কি বোবা?" বলিয়া ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বিনয় বলিল,—"সাহেব! নীরু তোমায় এই উপহার দিচ্ছে; তুমি গ্রহণ কল্লে আমরা কৃতার্থ হব।"

"My Goodness! কেন, আমি ফী নিইনি বলে নাকি?" বলিয়া ডাক্তার একটু হাসলেন।

বিনয় কহিল,—"না ডাক্তার, ফী আর তুমি কত নিতে? আর এই বা নীরু কি দিচ্ছে তোমায়? তুমি যে তার অমূল্য জীবন রক্ষা করেছো সাহেব।"

"আমি না তুমি? তোমাকেই কিছু দেওয়া উচিত নীরুর।"

বিনয় একটু হাসিয়া কহিল,—"দিবি রে নীরু?"

নীহারও তেমনি হাসিয়া বলিল,—"কি নেবে বল?"

"দিবি তো।"

"দেবো।"

"যাই চাইব।"

নীরু মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, পরে কহিল,—"দেবো বিনুদা,—চাও তুমি, তোমায় দেবো আমি, দেবতার পায়ে যে মানুষ তার বুক চিরে রক্ত দেয়,—আমিও দেবো।"

সস্নেহে বিনয় কহিল, "আমি যে তোর বিনুদা। দেবতা যদি বল্‌বি,—তবে দেবতারই মতন অনেক দূরে চোখের আড়াল হয়ে থাক্‌বো তা কিন্তু বলে রাখ্‌ছি।"

"তবে কি চাও বল, আমি তোমায় তাই দেবো।"

"দিস্ বোন্, একদিন চেয়ে নেবো। আজ যদি দিবি, তবে তোর চিন্তাগুলি সব আমায় দে, তুই একটু হেসে খেলে বেড়া'।"

ডাক্তার কহিলেন,—'সব চেয়ে বেশী আনন্দিত হলেম, নীরু, তোমার উপহারের ভিতর এই ফটোখানা পেয়ে। বিনু, তুমি এরই মূর্ত্ত উপদেশ। তোমারও একখানা ফটো আমায় দেবে বিনু?"

"কেন সাহেব?"

'আমি এদের ডুপ্লিকেট কাপি বিলেতে আমার ছেলেদের কাছে পাঠিয়ে দেবো,—শোবার ঘরে টানিয়ে রাখবে। ঘুম ভেঙ্গে উঠ্‌তে প্রতিদিন তারা এ মুখ দুখানি দেখে উঠবে। দিনের শেষে এ মুখ দুখানিই দেখে ঘুমুবে। বিনু, ডাক্তারি আমি শিখেছি বলে মনে কর্ত্তুম, যদি এঁকে আজও আমি জীবিত রাখ্‌তে পার্‌তুম।" বলিয়াই ডাক্তার করুণাময়ের ফটোখানি চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। সাহেবের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সাহেব আবার বলিলেন,—"সত্য মিঃ রায়, এদের দু'জনার গুণে আমি মুগ্ধ হয়েছি। বিশ্বাস কর্ব্বে কিনা জানি না, আমি আমার স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম সব

পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি, যদি হতে পারি এই বিনয়ের মত। অন্তর যখন তোমার পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, তখন তুমি এমন হাস্‌তে পার; সমস্ত হৃদয় ব্যাকুল-আগ্রহে যাকে পাবার জন্য দু'হাত বাড়ায়ে আছে, তাকে তুমি এমন হাসতে হাসতে পরের হাতে তুলে দিতে পার বিনু। I wonder, you are simply singular.

কথাটা উপহাসচ্ছলে উড়াইয়া দিবার জন্যই বিনয় সহাস্যে নীহারের দিকে চাহিয়া কহিল,—"এর চেয়ে বেশী কি দেবে তুমি নীরু?"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

পরের দিন ষ্টেশনে দেখা করিতে গিয়া, নীরদকে দেখিয়া ডাক্তার বিনয়কে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন,—"মিঃ রায়ও যাচ্ছেন তা হ'লে।"

"অনেক সেধে তবে রাজী করিয়েছি সাহেব,—পশ্চিমের হাওয়ার চেয়েও বেশী কাজ কর্‌বে নীরুর। নয় সাহেব—তুমি ত ডাক্তার, বল না?"

ডাক্তার একবার বিস্মিতনেত্রে বিনয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি তোমায় ভক্তি না করে পাচ্ছিনি বিনু।"

"তুমি ত সবই জান সাহেব।"

"জানি বিনু, আর এও জানি—Any one else would have shot him down।

বিনয় বলিল, "আমি যে নীরুকে ভালবাসি, তুমি ত জান—তোমায় ত বলেছি। তুমিই ত বলেছো, সাহেব, নীরদকে ছাড়া নীহারকে বাঁচাতে পারবো না। যাকে ভালবাসি, তার সুখেই যে বড় সুখ; ত্যাগের মাঝেই প্রেমের পরিতৃপ্তি, ভালবাসার চরম শান্তি।"

(১১)

মাসাধিককাল পশ্চিমের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া সকলেই—বিনয় নীরদ ও নীহার—শেষে একদিন ৺কাশী-ধামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সংবাদ পাইয়া, কাশীর বাড়ীর দরওয়ান ষ্টেশন হইতে তাহাদের লইয়া আসিল। গঙ্গার উপর প্রশস্ত একখানি বাগানের বুকে সুন্দর একখানি দ্বিতল বাড়ী। দোতালার বারান্দা থেকেই ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দিরচূড়া দেখা যাইত। সম্মুখেই সদর-রাস্তা। পশ্চিমের পুষ্টিকর হাওয়ার গুণেই হোক, কিম্বা মানসিক স্ফূর্ত্তিতেই হোক্, নীহারের চেহারা সম্পূর্ণ ফিরিয়া গিয়াছে। শুষ্ক পাণ্ডুর গণ্ড দুটী আবার সরসরক্তে রঙ্গিন্ হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দর টানা চোখ দুটী আবার পূর্ব্ব উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অল্পতেই নাচিয়া উঠে। ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ আবার পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণ সর্পের মত নিতম্বের উপর দিয়া দুলিয়া পড়িয়াছে। সুপ্ত সৌন্দর্য্য আবার যেন জাগরণের সাড়া দিয়া উঠিয়াছে। সুন্দরী নীহার পশ্চিমের হাওয়ায় আরও বেশী সুন্দর হইয়াছে।

বারন্দার নীচে ফুলের বাগানটীতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফুটন্ত ফুলগুলি দুলাইয়া দিয়া নীহার যখন ছুটিয়া যাইত,—অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া থাকিয়া বিনয় ভাবিত,—"এই বুঝি পশ্চিমের মূর্ত্তদক্ষিণ হাওয়া, এত সুন্দর, এত স্নিগ্ধকর!" নীহার ফুল তুলিত,—মালা গাঁথিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িত, চতুর্দ্দিকে ফুলভরা গাছগুলি হাওয়ায় দুলিয়া নীহারকে বেষ্টন করিয়া নাচিত,—বিনয় দেখিত, ভাবিত—দীর্ঘনিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া, চোখের জল মুছিয়া ঘরের কবাট বন্ধ করিত।

একদিন ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নীরদ বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি দেব দেবী মান বিনু বাবু?"

"মানি না নীরদ বাবু? আমি যে হিন্দুর ছেলে।"

"কিন্তু হিন্দুর আচার ত মান না বিনু বাবু।"

"কেন, আমি সাহেবদের সঙ্গে চা খাই বলে? আপনারা ব্রাহ্ম, আপনাদের সঙ্গে একাসনে বসে খাই বলে? নীরদ বাবু আমার জন্মদাতা পিতা, আমার জননী ছিলেন সত্য সামাজিক আচারবদ্ধ হিন্দু। কিন্তু আমার পালক পিতা, তিনি যে ছিলেন আপনাদের মত। আর তা যাক্, আচার আমি মানি না নীরদ বাবু। আচার এক ধর্ম্ম এক ভগবান্ আর। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে প্রবৃত্তিই আমাদের ধর্ম্ম। যদি বলেন কেন,—আমি বলব, প্রবৃত্তিই কর্ম্মের পরিচালক, কর্ম্মই যোগের সোপান-সাধনার বীজমন্ত্র—সাধনাই ধর্ম্ম—সিদ্ধিতেই মুক্তি। সকলেরই অন্তরাত্মা উজ্জ্বল শান্তিময় অন্তিম কামনায় অপার্থিব কোন শক্তির উপাসনা করে। সে শক্তি এমন, যা আমাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে সর্ব্বাংশে বড়। সেই শক্তিই হিন্দুর শিব—কৃষ্ণকালী, তোমাদের এক ব্রহ্ম—ইংরেজের যীশু, মুসলমানের মহাম্মদ। সরলভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে যে ভাবে যে নামেই তাঁকে ডাকার মত ডাকা যায় তাতেই তিনি সাড়া দেন। প্রাণ দিয়ে দেখ্‌তে চাইলেই তিনি দেখা দেন। বহু রূপ

তাঁর—সাধনার উপায়ও তাই হয়। এই বহু পন্থা লক্ষ্য করেই দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

এই বহু পন্থা স্মরণ করেই ইংরেজ কবি টেনিসন্ বলেছেন—

"God fulfils himself in many ways."

যে ভাবেই যে ডাকুক্—সে ডাক্ শোন্‌বার মত হয়ে যদি হৃদয়ের হৃদয়ে বেজে উঠে,—হৃদয়স্থিত ভগবান্ তাতেই পূর্ণ প্রকটিত হয়ে স্বরূপমূর্ত্তিতে দেখা দেন ; বাহ্যিক আচার-পালনে কি এসে যায়? পালন না কল্লেই বা কি ক্ষতি হয়? পরম পিতা পরমেশ্বর যখন বলি, সার্ব্বজনীন বলে যখন তাঁকে অভিহিত করি, তুমি আমি রাম শ্যাম রহিম সবাই যে তখন ভাই। সবাই যে তখন একই পিতার সৃষ্ট। সর্ব্বভূতে ভগবান্ বিরাজমান্ যখন স্বীকার করি, সকল প্রাণময় জগৎরূপে তাঁর অস্তিত্ব যখন মানি, তোমার আমার পার্থক্য তখন কোথায় থাকে নীরদবাবু? কিন্তু তা যাক্, তুমি মান আর না মান নীরদবাবু, ৺বিশ্বেশ্বরের এ মন্দির-দ্বারে, তুমি যে ভগবানকেই ডাক, তাঁকেই স্মরণ করে, শপথ কর নীরদবাবু, আমার একটা কথা রাখ্‌বে।

নীরদ সাগ্রহে বলিলেন,—"আমি রাখ্‌ব বিনুবাবু, বল কি কথা—শপথ কর্‌লুম, আমি রাখ্‌ব।"

"রাখবে?"

"শপথ কর্‌লুম।"

বিনয় একটু ভাবিল। বায়স্কোপের ফিল্‌ম্‌এর মাঝখানটা হঠাৎ ছিন্ন হইয়া গেলে, পূর্ণানুরক্ত দর্শক যেরূপ অসহ্য আগ্রহে সাদা পর্দ্দার দিকে চাহিয়া থাকে, তেমনি দৃষ্টিতে নীরদ বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিনয় ধীরে ধীরে, থামিয়া থামিয়া, মন্দিরের দিকে চাহিয়া বলিল,—"যত দিন নীহারের বিবাহ না হয় ততদিন আর তার মুখদর্শনও কর্‌বে না—দেখা দেবে না,—কথা কইবে না। বল।"

নীরদকান্তির দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল, ঠেকিয়া ঠেকিয়া বলিলেন, —"বিনুবাবু—না শপথ করেছি, আবার কর্‌লুম,—তাই হবে,—তাই হবে।"

নীহার সমস্ত শুনিল—বিনয়েরই মুখে। যে অবসন্ন হৃদয় লইয়া নীহার পশ্চিম যাত্রা করিয়াছিল ততোধিক বিষণ্ণ হৃদয় লইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

"কথা রইল,"—বলিয়া নীহার একটু হাসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল,—হাসিটুকু দেখিয়া বিনয়ের চোখ দুটী ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল—সে হাসি এত মর্ম্মান্তিক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅতুলানন্দ রায়।

সাধু ত্রিগুণাচরণ

(কৃষ্ণচন্দ্র ইনিষ্টিটিউটের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

উপক্রমণিকা।

অনেক ফুল্ল—বিকশিত কুসুম প্রথমে সৌরভে জগৎ আমোদিত করে, কিন্তু সংসার-মরুর নিদাঘ বায়ুতে তাহার কোমল দেহ বিশুষ্ক করিয়া দেয়। জগৎ যে আশা তাহাদের জন্য পোষণ করিয়াছিল, তাহা আর পূর্ণ ও পরিপক্ক হইতে পারে না,—অকালে সে পবিত্র পুষ্প ঝরিয়া পড়ে।

নিত্যপরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সমুদ্রে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অসংখ্য লোক প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণ করিতেছে,—কই, কে তাহার ইয়ত্তা করে? কিন্তু সময়ে সময়ে এমন দু'একটী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় যে, তাহাদিগকে মানুষ না বলিয়া দেবতার পদে বরণ করিতে ইচ্ছা হয়।

সাধারণ মানবের জীবন প্রধানতঃ তাহার জাতি, বর্ণ, সমাজ, পরিবার এবং পিতামাতার রীতিনীতি, আচার ব্যবহারানুযায়ী এক প্রকার নিয়মিত হইয়া যায়। তদনুসারে স্বীয় জীবন পরিচালিত করিয়া সে কালক্রমে নীরবে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিহস্তে আত্মসমর্পণ করে। এই শ্রেণীর

মানবের অভ্যুত্থান ও বিলয়ে জগতের কিঞ্চিন্মাত্র হর্ষ বা শোকের উদ্রেক হয় না ; ইহা চিরাভ্যস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অধিকাংশ মানবই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরন্তু মহাপুরুষগণের প্রতি স্বতঃই ভক্তি ও প্রীতি বন্যার লহরীর ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া তাঁহাদের চরণপ্রান্তে ধাবিত হয়। মঙ্গলময় মহেশ্বর ইঁহাদের দুঃখী ও পতিত মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিবার জন্য, আতুরের সেবার নিমিত্ত এবং জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞানের উজ্জ্বল ও পবিত্র আলোক দর্শন করাইবার নিমিত্ত মর্ত্তধামে প্রেরণ করিয়াছেন। সাহিত্য এবং ইতিহাসে এই কৃতীপুরুষগণের কীর্ত্তিগাথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিয়া প্রতিনিয়ত কর্ম্ম পথভ্রান্ত যুবকগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত করিয়া কর্ত্তব্যের পথে প্রধাবিত করিয়া দিবে।

মহামতি তুলসী বলিয়াছেন,—"তুলসী যব জগ্‌মে আয়ো জগ্ হসে তোম্ রোয়। এয়সা করণীকর চলকি তোম্ হসে জগ রোয়"—আজ যে কর্ম্মবীরের কর্ম্মকথা আমরা আলোচনা করিব তাঁহার জীবনে এই কথাটী অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছিল।

বাঙ্গালা ১২৬০ সালের মাঘমাসে বর্ত্তমান খুল্‌না জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে ইঁহার অভ্যুদয় হয়। পিতা

পিতৃ-পরিচয়

৺গুরুচরণ সেন মহাশয় অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। যে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হউক না কেন, দীনদরিদ্রকে পরিতোষপূর্ব্বক অন্ন বস্ত্র দান না করিয়া ইনি নিজে বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ করিতেন না। ৺সেন মহাশয়ের যথেষ্ট অর্থসম্পত্তি ছিল—এবং তিনি দয়া, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার আর একটী বিশেষ গুণ ছিল, নির্দ্দোষ-কৌতুকপ্রিয়তা। কৌতুকের সহিত ব্যঙ্গ ও শ্লেষের কোনও সম্বন্ধ ছিল না বা লোকের মনে তিনি কোনও প্রকার আঘাত দিতেন না, গ্রামস্থ লোকে তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি-মিশ্রিত ভয় করিত, —আবার সরলপ্রাণে মিশিতেও সঙ্কুচিত হইত না। তাঁহার বাড়ীতে দোল, দোল ও দুর্গোৎসব পূজাদি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত,—এতদ্ভিন্ন তিনি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে অনেক অর্থব্যয় করিতেন। গুরুচরণ বাবু স্বীয় পিতৃশ্রাদ্ধে কয়েক সহস্র টাকা খরচ করিয়া 'দানসাগর' করেন। প্রতি বৎসর দরিদ্র শ্রেণীর—(প্রায় সহস্রাধিক লোককে) চিড়া, মুড়কী, দই ও গুড় ইত্যাদি দিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইতেন, ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান আনন্দ। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের ধারণা ছিল যে তিনি অতুল ধনসম্পত্তির মালিক,—কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। ইনি পুত্রকন্যাগণের জন্য বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ Morrell সাহেব বাখরগঞ্জ জিলার একজন শিকারী ছিলেন। ইঁনি সুন্দরবনের অনেক স্থলে প্রজাপত্তন করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে উক্ত স্থান আজ মরেলগঞ্জ নামে বিখ্যাত। এই মরেল সাহেবকে গুরুচরণ বাবু ১৫০০৲ টাকা ধার দেন, —কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ মিঃ মরেল দেউলিয়া হইয়া পড়ায় তিনি টাকা ফেরৎ পান নাই।

কাটিপাশার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ৺রোহিণীকুমার সেন মহাশয়দের জমীদারীতে ইনি কার্য্য করিতেন। রোহিণীবাবুর পিতামহের কাল হইতে তিনি তৎপদে অপ্রতিহত প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহাদের জমীদারীর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন।

তখনকার সামাজিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। মদ্যপান করা অনেকেরই অভ্যাস ছিল। বিশেষতঃ বাটভোগের সম্পর্কিত বংশে জন্মিয়া বলিয়া তিনি মাঝে মাঝে গুরুঠাকুরের প্রসাদ পাইতেন। সুখের বিষয়—মদ্যপায়ী হইলেও ইঁহাকে কখনও অপ্রকৃতিস্থ হইতে দেখা যায় নাই।

ত্রিগুণাচরণের মাতার নাম ব্রহ্মময়ী দেবী। ইনি ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী খালিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধনামা জমীদার

মাতৃ-পরিচয়

৺জয়মঙ্গল মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তখন পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল না,—অধিকন্তু বেশী লেখাপড়া শিখিলে স্ত্রীলোক বিধবা হয় এইরূপ কুসংস্কার ছিল। কাজেই ব্রহ্মময়ী বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। জমীদার-কন্যা হইয়াও তিনি শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া নিজ হস্তে সমস্ত কাজ করিতেন। ত্রিগুণাচরণের মাতা অতিশয় সরলস্বভাবা ছিলেন। সাংসারিক আবিলতা তাঁহার উদার হৃদয়-কন্দরে বিন্দুমাত্র স্থান পাইত না। এই স্নেহশীলা রমণী পুত্রকন্যাগণকে কদাচিৎ প্রহার করিতেন এবং যদি কখনও নিতান্ত বাধ্য হইয়া প্রহার করিতে হইত,—তবে তাহাদিগকে এরূপভাবে আঘাত করিতেন যে তাহারা বেশী বেদনা না পায়। ইঁহার মানসিক শক্তি একেবারেই ছিল না

বরং ভীরু প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। কোনও বিপদ্ বা অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকিলে অতিশয় ভীতা হইয়া পড়িতেন এবং সামান্য কারণে অনেক সময় দুশ্চিন্তা করিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাহার মন অতিশয় সরল ছিল—এজন্য লোকের কথায় সহসা বিশ্বাস করিতেন এবং অনেক সময় তজ্জন্য প্রতারিতা হইয়াছিলেন। একবার তিনি নিজের সারল্যের জন্য পিতৃপ্রদত্ত অনেকগুলি মোহর হারাইয়া ফেলেন। এমন নির্ম্মল প্রকৃতিবিশিষ্ট পিতামাতার সন্তান সাধারণতঃ বিশুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। সৌভাগ্যক্রমে ত্রিগুণাচরণ পিতামাতার গুণগুলির সমষ্টি একাধারে বহন করিয়া এক দেহে উভয়ের চিহ্নস্বরূপ জগতের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যে সেনহাটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'ঢাকাই কবি' * বঙ্গের হাফিজ ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জন্মভূমি, যেখানে বালকবন্ধু অক্লান্তকর্ম্মা শিশুসাহিত্যের প্রবর্ত্তক এবং সখাসম্পাদক প্রমদাচরণের জন্ম, সেই দেশ যে আরও দু' একটী মহাপুরুষকে গর্ভে ধারণ করিবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

প্রথমে একটি পুত্র সন্তান নষ্ট হওয়ায় 'রাখাল রাজে'র মাদুলী ধারণ করেন। ৺রাখালরাজের আশীর্ব্বাদে পুত্র হইল বলিয়া বালকের নাম রাখা হয় রাখালদাস। আজও গ্রামে তিনি "রাখাল বক্‌সি" নামেই সমধিক পরিচিত।

কথিত আছে যে—"যে তরুটী বর্দ্ধনশীল হইবে তাহার দুইপাতা দেখিয়াই বুঝা যায়।" বালক ত্রিগুণাচরণের আচরণে এমন দুই একটী কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করা যাইত যে, তিনি যে ভবিষ্যতে একজন মহৎ ব্যক্তি হইবেন লোকের সে বিষয়ে বদ্ধমূল ধারণা হইত। শিশুকাল হইতেই "আলালের ঘরের দুলালের" ন্যায় অতীব আদরে ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন, কিন্তু এরূপক্ষেত্রে সাধারণতঃ বালকগণ যেমন দোষের আকরস্বরূপ হয়, ত্রিগুণাচরণের মহৎচরিত্রে সে দোষগুলি কোনদিনও পরিলক্ষিত হয় নাই। ইনি কখনও বালক-সুলভ অপবাদে অপরাধী হন নাই ও একটী দিনের জন্যও

বাল্যজীবন ও ত্রিগুণাচরণের শিক্ষা

কদাপি কাহারও নিকট শাস্তিভোগ বা কঠোর ব্যবহার প্রাপ্ত হয়েন নাই। সেই জন্যই বুঝি তাঁহার প্রকৃতি এমন নম্রতাময় এবং ব্যবহার এত মধুর হইয়াছিল। তিনি একটী দিনের তরেও যাহার সহিত মিশিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ ও পুলকিতচিত্তে তাহার প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়াছেন।

যথাসময়ে তাঁহার বিদ্যারম্ভ করা হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ায় তাহার বিশেষ অনুরাগ, অত্যাশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। তৎকালে সংস্কৃত ও পারসী ভাষার সমধিক প্রচলন ছিল। ইংরাজী শিক্ষা তখনও পল্লীগ্রামে প্রবেশ করে নাই। ১১ বৎসর বয়সে অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের পাঠ শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় স্বীয় মামাত ভাই হাইকোর্টের উকীল ৺গিরিজাশঙ্কর মজুমদার মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়েন। ইহার বাসা ছিল ভবানীপুরে - সুতরাং সপ্তমশ্রেণীর ছাত্র একাদশবর্ষ বয়স্ক বালক ত্রিগুণাচরণকে তথা হইতে (Share) সেয়ারের গাড়ীতে কলিকাতায় পটলডাঙ্গায় হেয়ার স্কুলে পড়িতে আসিতে হইত।

পরে যখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন তখন খুল্লতাত ভ্রাতা মোক্ষদাচরণের নিকট প্রেরিত হয়েন। সে সময়ে এতৎপ্রদেশে বাষ্পীয়যান প্রচলিত হয় নাই, অনেকদিন নৌকাপথে চলিয়া কলিকাতা যাইতে হইত।

মোক্ষদাচরণ ইহাকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ভ্রাতার প্রগাঢ় স্নেহ, সতত মঙ্গল চেষ্টা ও নিয়ত সূক্ষ্ম অনুসন্ধান সর্ব্বদা তাঁহাকে ন্যায় পথে অব্যাহত রাখিত। যেদিন তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঠ সুন্দররূপে শিক্ষা করা না হইত (যদিও এরূপ ঘটনা অতীব বিরল ছিল) সে দিন শিক্ষকগণের তিরস্কার অপেক্ষা দাদার অসন্তোষই তাহার প্রবল অনুতাপ, গভীর বিষাদ ও অনভ্যস্ত আতঙ্কের কারণ হইত। কিন্তু হায়! বিধির কি অভাবনীয় বিচার!—ত্রিগুণাচরণের অদৃষ্টক্রমে অল্পদিনের মধ্যে,—তিনি আপন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবার বহুপূর্ব্বে—ইনি লোকান্তরে পলায়ন করেন। এই সময় হইতে ত্রিগুণাচরণকে সর্ব্বদা মলিন মুখে ও গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইত। এই নিদারুণ আঘাতই,—এই বিষাদকালিমাই তাহার পরবর্ত্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে আশানুরূপযুক্ত ফল প্রদান না করিবার জন্য দায়ী। শেষে ব্রাহ্মসমাজের

* স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ইঁহাকে "ঢাকাই কবি" এই আখ্যা দিয়াছেন। বোধ হয় "ঢাকা প্রকাশের" সম্পাদকতা করার জন্য এই নাম প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

সংস্পর্শে আসিয়া তিনি কতকটা সুস্থ হয়েন ও শান্তিলাভ করেন।

ক্লাসের প্রত্যেক পরীক্ষায়ই তিনি প্রথম হইয়াছেন। শিক্ষকমহাশয়গণ তাঁহার অসামান্য প্রতিভায় ও সহযোগী ছাত্রবৃন্দ তাঁহার অমায়িক ভ্রাতৃভাবে মুগ্ধ হইতেন। শিক্ষকগণ তাঁহার কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন তাহা একটা উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক চণ্ডীবাবুকে ছেলেরা বিশেষ ভয় করিত। তিনি অত্যন্ত প্রহার করিতেন বলিয়া ছাত্রমহলে তাঁহার নাম ছিল "বাবাচণ্ডী।" একদিন পড়াইবার সময় চণ্ডীবাবু একটী প্রশ্ন ত্রিগুণাচরণ ভিন্ন প্রথমে অন্যান্য ছাত্রবর্গকে জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কেহই উক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে পারেন না। বাবাচণ্ডীর ভয়ে সকলেই কাঁপিতে লাগিল—বেত হাতে গুরুমহাশয়দের ছবি বোধ হয় তখনও তাহাদের মনে জাগিতেছিল। "কার কপালে কি আছে বলা নাহি যায়—" সকলের মনেই এক অবস্থা। বালকবর্গ বলিদানের জন্য উৎসর্গীকৃত ছাগ শিশুর ন্যায় সন্ত্রস্ত! সকলের দৃষ্টি ত্রিগুণাচরণের উপর ন্যস্ত। একে একে সকলকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। অবশেষে ত্রিগুণাচরণকে প্রশ্ন করায় তিনিও ইহার সম্যক্ উত্তর দিতে পারেন না। অতঃপর তাঁহাকে কোনও প্রকার শাস্তি না দিয়া,—শিক্ষকমহাশয় ঈষৎ হাসিলেন এবং সমস্ত বালকগণকে বসিতে বলিলেন। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণবাবু, হরলাল বাবু ও নীলমণি বাবু প্রভৃতি তাঁহাকে অনেক সময় আদর করিয়া গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং খুব করিয়া খাওয়াইয়া দিতেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত সিবিলিয়ান্—বঙ্গের কৌস্তভমণি,—স্বর্গীয় স্যার্ রমেশচন্দ্র দত্ত এক সময়ে তাঁহারই ছাত্র ছিলেন। প্রাপ্ত বয়সে তিনি এই শিক্ষক মহাশয়ের জ্ঞানবত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। উক্ত কৃষ্ণবাবু একবার বলিয়াছিলেন যে তিনি যত ছাত্রকে পড়াইয়াছেন তন্মধ্যে ইংরেজীভাষায় ব্যুৎপত্তির নিমিত্ত দুইটী ছাত্র বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত,—সিবিলিয়ান্ রমেশচন্দ্র ও সাধু ত্রিগুণাচরণ।

যখন ত্রিগুণাচরণ চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন, তখনই তাঁহার ইংরাজীতে এতদূর ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট ছাত্রকে পাঠ বুঝাইয়া দিতেন। ইনি বিদ্যাভ্যাসকে এমন সুখকর বিবেচনা করিতেন যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যানস্থ যোগীর ন্যায় দিবানিশি পাঠে মনঃসংযোগ করিয়া থাকিতেন। কোনও কোনও দিন রাত্রে পড়িতে পড়িতে একেবারেই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত এবং রজনী প্রভাতে পাখীর কূজন কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিত। ইহাকে জ্ঞানের আরাধনা ও জ্ঞানদার ধ্যান ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই ধ্যানের কঠোরতা ও মোক্ষদাবাবুর অকাল মৃত্যুজনিত শোক তাঁহার শরীরকে একেবারেই ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি ষষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন।

তখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি প্রবিষ্ট হইয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন। এবার প্রথমে তাঁহার পাঠে তত মনঃসংযোগ ছিল না—সুতরাং তিনি নির্ব্বাচনী পরীক্ষায় সংস্কৃতে অনেক নম্বরের জন্য অকৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে দেখা গেল। সে কি কঠোর অধ্যবসায়,—কি অমানুষিক চেষ্টা ও যত্ন! একদিন রাত্রে তিনি এত গভীর মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাসে রত ছিলেন যে রাত্রি শেষ হইয়া গেলেও তাঁহার জ্ঞান ছিল না। শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন মহাশয় প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। একবার তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে ত্রিগুণাচরণ যোগীর ন্যায় তন্ময়চিত্তে পাঠাভ্যাসে রত। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করা হইল। বাণীর একনিষ্ঠ সাধক জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত রাত্রে কি জন্য আসিয়াছ?" হরিচরণ বলিলেন—রাত্রি বহুক্ষণ অতীত হইয়াছে। তখন তাঁহার জ্ঞান হইল।

চেষ্টা ও যত্ন আশানুরূপ ফল প্রদব করিল। F. A. পরীক্ষায় তিনি প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষায় প্রথম হইয়া—গোয়ালিয়র মহারাজের প্রদত্ত স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হন। এই সময় বিখ্যাত প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তাঁহাদের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। কোনও কোন দুরূহ স্থানের অর্থ তাঁহার নিকট সন্দেহজনক বোধ হইলে

তিনি ত্রিগুণাচরণকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"What is your opinion, my son ?" ত্রিগুণাচরণ প্রত্যুত্তরে বিনীতভাবে তাহার সঙ্গত অর্থ নিবেদন করিতেন। একদিন একটি ছাত্র ঔদ্ধত্যের সহিত প্যারীবাবুর অধ্যাপনার একটি প্রতিকূল সমালোচনা করেন। যুবকের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রটিকে ভৎর্সনা করিয়া বলেন যে শিক্ষকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে ও কিরূপভাবে কথা বলিতে হয়, তাহা প্রত্যেকেরই ত্রিগুণাচরণের নিকট শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তিনি এরূপ নম্রভাবে শিক্ষকের নিকট নিজ মত ব্যক্ত করিতেন যে তাহাতে কোন শিক্ষকই মনে করিতে পারিতেন না যে তাহার অসম্মান করা হইল।

শৈশব হইতেই তাহার স্বাস্থ্য সুপটু ও বলিষ্ঠ ছিল। শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল; কিন্তু নানাবিধ অনিয়ম ও অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলে তাহার পাঠের তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী হইতেই শরীর দিন দিন অসুস্থ হইতে আরম্ভ করে এবং নানাবিধ উৎকট শিরঃপীড়া তাহাকে আশ্রয় করে। অনেকে মনে করেন, তাঁহার ভ্রাতা এসিষ্টেন্ট সারজন মোক্ষদাচরণের মৃত্যুই তাঁহার রোগের কারণ।

F. A. পরীক্ষার পর, B. A. ও M. A. পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিবার চেষ্টা তাহার আদৌ ছিল না,—অধিকন্তু নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য হইতে তাহাকে পাঠ সমাপন করিতে হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মসমাজ এই নির্জ্জীব বঙ্গদেশে নবজীবন আনিয়াছিল। কেশবচন্দ্র মধ্যাহ্নগগনে প্রতিভা-বিস্তার করিতেছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম তখন ছাত্রগণের প্রধান আকর্ষণ ছিল। সেই উচ্চ আদর্শ ত্রিগুণাচরণের স্বচ্ছহৃদয়ে পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য প্রচারক-বর্গের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। ত্রিগুণাচরণের পিপাসিত চিত্ত শোকাকুল হিয়া,—পবিত্র পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে শান্তির আশ্বাসপ্রাপ্তিতে মুগ্ধ হইল। তিনি রীতি-মত উপাসনা ও উৎসবাদিতে যোগ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার উদার হৃদয় আরও উদার হইয়া পড়ে। তিনি ছাত্রবর্গকে লইয়া নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্য ও সভাসমিতির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্ব্বে এবং তাঁহার পরী-ক্ষার পূর্ব্বে মনের গতি ও চিন্তা অন্যান্য বিষয়ে প্রধাবিত হও-য়ায়,—পাঠের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। অধিকন্তু তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নাই। অনেক সময়ে বন্ধুগণের ঈর্ষা প্রদীপ্ত বিপক্ষতায়ও তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইত। হায়, জগতে ভালবাসাই যাহাদের চরিত্র, "জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ আর ভকতি ভগবানে" যাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র—তাঁহাদের স্বতঃই এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহারে কষ্ট পাইতে হয়। নতুবা মহাত্মা ঈশা ক্রুশাঘাতে মৃতবৎ হইতেন না।

ত্রিগুণাচরণের পবিত্রতার দিকে এতদূর দৃষ্টি ছিল যে, তিনি B. L. দিয়া ব্যবহারজীবী হইতে ইচ্ছা করিলেন না,-কিন্তু আত্মীয়স্বজনগণের আগ্রহাতিশয্যে আইন অধ্যয়ন করেন। ইংরেজ দার্শনিকগণ অধিকাংশ সংশয়বাদী; এজন্য তিনি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া Optional Mathematics লইয়াছিলেন. এই প্রকারে ধর্ম্মপথে থাকিবার চেষ্টা শৈশব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ছিল।

কর্ম্ম-জীবন

যে সমস্ত গুণ থাকিলে লোকে নেতৃস্থানীয় হয়, ত্রিগুণা-চরণের সে সকল গুণ বেশ ছিল। সেনহাটী মেসের সমস্তই ও কালীয়া কোম্পানীর * অধিকাংশ তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেন।

নিজের দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষাও অপরের দুঃখ তাহার উদার হৃদয়কে সর্ব্বদা ব্যথিত করিয়া তুলিত। গৃহে বাহিরে সকলের প্রতি তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল। জনৈক আত্মীয় পরিবারের অশনবসনের অত্যন্ত কষ্ট দেখিয়া তাহার মনে একটী মহান্ ভাবের আবির্ভাব হয়। নিজে অনেক অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া গ্রামে "দাতব্য ভাণ্ডার" সংস্থাপিত করেন। আজও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডার অনেক গরীব-দুঃখীকে উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিতেছে। ইহা যে কত ভদ্র ও ইতর শ্রেণীর লোককে দুঃখের নিদারুণ হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছে ও করিতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। লোকের দারিদ্রতা দেখিলেই তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না,—এ বিষয়ে তুকারামের

---

* এক্ষণে লোকে বলে 'মেস' তখন বলা হইত "কালীয়া কোম্পানী।"

সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়: তুকার মত তিনিও অভাবগ্রস্তকে নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ফেলিতেন এবং সেই দানব্যাপার গোপন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। বিনয় ও দানের প্রতিমূর্ত্তি ত্রিগুণাচরণ নিজের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিলে ক্ষুব্ধ হইতেন।

কোনও দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে কাহারও অসুস্থতা সংবাদ শ্রবণ করিলে নীরবকর্ম্মী অনতিবিলম্বে তথায় উপনীত হইতেন এবং রাত্রি জাগরণ ও অর্থসংগ্রহ করিয়া রোগীর সেবা করিতেন।

তবে রাণীগঞ্জে ও টীকারিতে তিনি দুইটী অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন,—রাণীগঞ্জের আশ্রমটী অনেকদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার অসামান্য দয়াশীলতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল।

গ্রামের মধ্যে তিনি প্রভৃত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন স্ত্রী-শিক্ষা এবং যুবকগণের মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধিত করাইবার নিমিত্ত তিনি তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। "যশোহর সম্মিলনী" নামক স্ত্রী-শিক্ষা ও বালকগণের ব্যায়াম ও নীতি-শিক্ষা বিধান-সমিতি তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুগণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে তাহার উন্নতিকল্পে তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার বাগ্মীতা ও যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া নড়াইলের প্রবল প্রতাপ জমীদার ৺চন্দ্রকুমার রায় বলিয়াছিলেন—"এই বাবুটী কালে একজন বড় উকীল হইবেন।" এ হতভাগ্য দেশে Parliament নাই, তখন Councilএ প্রতিনিধি নিয়োগ পর্য্যন্ত ছিল না, সুতরাং আদালতই লোকের প্রতিভা বিকাশের কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। তখনকার বৃদ্ধগণ স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী ছিলেন সুতরাং ত্রিগুণাচরণও তাঁহার সহযোগীগণকে যে কিরূপ প্রতিকূলতা ও কষ্ট সহ্য করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়াছেন তাহার প্রণিধান করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে।

স্ত্রী-শিক্ষা

তাঁহার যত্নে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় কলিকাতাস্থ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে Cricket খেলার প্রথম সূত্রপাত এবং Presidency Cricket Club সংস্থাপিত হয়। কর্ম্মস্থান হইতে গ্রামে আসিয়াই তিনি যুবকদলকে এবং বালকদিগকে নীতিপরায়ণ সুস্থ ও সবল করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিতেন। ইহাদিগকে তিনি একটী সঞ্জীবনী শক্তিতে জাগাইয়া তুলেন। অধিকন্তু গ্রামের ভদ্রপরিবারের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে সম্মান ও অর্থনষ্ট না করিয়া যাহাতে গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়া গ্রাম্যপঞ্চায়েৎ সমিতি স্থাপন করতঃ সমাজের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাহার জীবদ্দশায় কয়েকটী বিবাদ অতি উত্তমরূপে মীমাংসিত হইয়াছিল।

শারীরিক উৎকর্ষ

ত্রিগুণাচরণের ধর্ম্মবিশ্বাস কোনও সম্প্রদায়ের ভিতরে আবদ্ধ ছিল না। নিজ গৃহে যখন দোল দুর্গোৎসবাদি পূজা হইত তখন তিনি ভক্তি ও প্রেমে বিগলিত হইতেন, আবার ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা-স্থলেও তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির প্রস্রবণ বহিয়া যাইত,—তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা পতিত হইত। কোনও বিষয়ে গোঁড়ামি বা কোনও সম্প্রদায়ের উপর তিনি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না।

ধর্ম্মবিশ্বাস

ত্রিগুণাচরণ কাপুরুষ ছিলেন না—তিনি বন্ধুগণকে সর্ব্বদাই বলিতেন,—"কখনও অত্যাচার দেখিলে নীরবে তাহা সহ্য করিবে না। অবশ্য তাহার প্রতিবিধানের জন্য যত্ন করিবে।" একদিন সুরাপানে উন্মত্ত এক গোরা জনৈক নিরীহ বাঙ্গালীকে অপমান করিতেছিল। ত্রিগুণাচরণের বীরোচিত উদার হৃদয়ে তাহা সহ্য হইল না, তিনি তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিলেন। গোরাপুঙ্গব তাঁহার ঘুসী সেবনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ১০৲ টাকার একখানা নোট্ উপহার দিলেন, কিন্তু তিনি তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমি টাকা চাহি না, আর নিরীহ লোকের প্রতি অত্যাচার করিও না।"* অন্য একবার Cricket খেলিতে গিয়া সাহেবের ছেলেদের সহিত তাহাদের বিবাদ ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, ত্রিগুণাচরণ তাহাতে বিশেষ সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

সাহসিকতা

M. A. পাশ করিবার পর সাটক্লিফ্ সাহেব তাঁহাকে হেয়ার স্কুলের অধ্যক্ষপদে বরণ করিতে চাহিলেন কিন্তু

* কালিয়া নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত L. M. S. মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

স্বাধীনচেতা ত্রিগুণাচরণ বাল্যকাল হইতেই দাসত্বকে ঘৃণা করিতেন,—তাই তিনি সেই অযাচিত উচ্চপদ, যাহা বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর জীবনমরণের লক্ষ্যস্থল, তাহা উপেক্ষার সহিত অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যান করিলেন। হায়, পরে Grant-in-aid স্কুলের শিক্ষকতাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল!

পাঠ্য অবস্থা শেষ করিয়া শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কয়েক বৎসর মধ্যে তিনি কিছুই করেন নাই। পরে পিতার অর্থহানির নিমিত্ত তাহাকে বাধ্য হইয়া অধ্যাপনার কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল। প্রথমে তিনি নানাপ্রদেশে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া, পরিশেষে কলিকাতায় Ripon কলেজের Principal পদে উন্নীত হয়েন। তদ্বিষয়ে অধিক বলিতে চাহি না; ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তথায় তিনি নিরপেক্ষ ব্যবহার পান নাই। অন্যের দোষে তাহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। ভারতের গৌরবরবি নেতৃ স্থানীয় ও দেশের লোকের নিকট এরূপ ব্যবহার তাঁহার নিকট সাংঘাতিক হইয়াছিল।

ছাত্রগণ তাহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন ও তাঁহার অপার্থিব স্নেহ মমতা তাহাদিগকে মন্দাকিনীর পবিত্র ধারার ন্যায় স্নিগ্ধ ও পুলকিত করিয়া তুলিত।

বহুদিন হইতেই ত্রিগুণাচরণের শরীর দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হইতেছিল। অবশেষে বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ১৩ই ফাল্গুন—

মৃত্যু

বৃহস্পতিবার ৪৪ বৎসর বয়সে সমগ্র বঙ্গদেশকে কাঁদাইয়া শ্রীভগবানের পরম পবিত্র ও শান্তিময় চরণে আশ্রয়লাভ করেন।

তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন আপন পর ইতর বন্ধু সকলেই ব্যাকুলিত ও উদ্বিগ্নচিত্তে তাহাকে দেখিতে আসিতেন। তিনিও সকলকে পরম সমাদরে ও স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিতেন। লোকের কোলাহল হইতে চিকিৎসকগণ তাহাকে নির্জ্জনে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে সময়ে সময়ে অনেকেই তাহার নিকট আসিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিন্তু তিনি নিজে সকলকে আহ্বান করিয়া নানাবিধ সমাজ-সংস্কারক এবং দেশহিতকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। রুগ্না-বস্থায় স্বভাবতঃ মানবের প্রকৃতি একটু বিপরীত ভাবাপন্ন হয়, পলে পলে ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতার প্রকাশ পায়; কিন্তু ত্রিগুণাচরণ রোগের গভীর মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় কাতর থাকিলেও কখন কোন প্রকার বিপরীত ভাব ধারণ করেন নাই।

তাঁহার নশ্বরদেহ মর্ত্যধামে চিতাবহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে—কিন্তু দেশবাসীর সমক্ষে যে উজ্জ্বল ও মনোহর

উপসংহার

দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই অনুকরণীয়। দেশের এবং দশের জন্য তিনি আজীবন যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার সমগ্র ইতিহাস শ্রবণ করিলে হৃদয় পুলকে নৃত্য করিয়া উঠে। ইচ্ছা হয় যে তাঁহার ভস্মরাশি ভক্তিসহকারে মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা ধন্য হই!

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

শেষ ভিক্ষা

বেজে উঠে ওই জীবন-বীণায়
শেষ বিদায়ের গান
সকল গানের প্রভু আজি মোর
লও গো শেষের দান
ক্ষ্যাপার মতন সারা নিশি দিন
বেসুরেই শুধু বাজাইনু বীণ,—

লাগি৻

তোমার আলোক-সভায় কেমনে
বাজাব এ বীণাখান!
বীণায় আমার দাও নবসুর—
সঙ্গীতে হৃদি কর ভরপুর,
শতদল হয়ে তব পাশে যেন
ভেসে উঠে মোর গান।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন

পরাজয়

(গল্প)

(১)

বিনোদ সজোরে টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, "এ হ'তেই পারে না। শাস্ত্রে কোথাও অসবর্ণ বিবাহের অনুমতি দেয় না। বরং—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।"

শ্রীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ তোর একটা বড় দোষ। কথায় কথায় সংস্কৃত আওড়াবি। আরে গাধা! এটা যে একেবারে কমনসেন্সের কথা। ক'বে কে কি অবস্থায় বিধি নির্দ্দেশ ক'রে গিয়েছেন—আর তোরা তাই একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ধ'রে বসে আছিস্।"

অজিত একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিল, "Old order changeth yielding place to new."

উপেন তাহার দাড়িতে হাত বুলাইয়া একটু কটাক্ষ করিয়া বলিল—"আচ্ছা তুই যে শাস্ত্রের কথা বল্লি—ধর্‌লাম না হয় শাস্ত্রে প্রকাশ্যে এরূপ কোন বিধান দেয় না। কিন্তু তা ব'লে আমাদের দেশে যে অসবর্ণ বিবাহ ছিল না,—এ কথা ত' আর ব'ল্‌তে পার্ব্বি নে—আর যাঁরা করেছিলেন তাঁদের শাস্ত্র আর কিছু গিলে ফেলে দেয় নি।"—

বিনোদ বলিল, "তা না হ'তে পারে। কিন্তু সমাজে এতে একটা স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়;—আর সেই স্বেচ্ছাচারিতাই সমাজধ্বংসের মূলীভূত কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।"

উপেন।—"রেখে দে তোর বড় বড় কথা! বলি পূর্ব্বকালে কুরুপাণ্ডবদের মত সমাজহিতৈষী সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠবংশ আমাদের দেশে 'ত' আর ছিল না। কিন্তু তাঁদের বংশেও মিশ্রণ দোষ ছিল।—বৃহস্পতির স্ত্রীর গর্ভে চন্দ্রের ঔরসে বুধের জন্ম হয়েছিল। আবার বুধের পৌত্রের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে নহুষের জন্ম হয়। আর এই নহুষের পুত্র যযাতি অসুর-পুরোহিত শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে প্রতিলোম হিসাবে বিয়ে করেন; আবার অসুররাজ বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সাথে অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হন। আর ইহারই ফলে পুরুরাজের জন্ম হয়।—আবার দেখ মেনকার কন্যা শকুন্তলাকে ক্ষত্রিয়রাজ দুষ্মন্ত বিয়ে করেন। আবার মৎস্যগন্ধার গর্ভে পরাশরের ঔরসে ব্যাসের জন্ম হয়;—আর এই ব্যাসের ঔরসেই বিচিত্রবীর্য্যের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবের জন্ম হয়; আর এক দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। তোদের বড় বড় বীর শ্রেষ্ঠ নৃপতি পাণ্ডবরা পাণ্ডুর নামে পরিচিত হ'লেও তাঁর ঔরসজাত নয় তা ত' জানিস্?"

শ্রীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "রাখ্ উপেন, তুই যে একেবারে ঠিকুজি আওড়াতে আরম্ভ কর্‌লি দেখ্‌ছি।"

উপেন।—"রোস্—আমরা ত' শাস্ত্র জানি নে। তবে এ গুলির একটা সৎ মীমাংসা আজ বিনোদের কাছ থেকে নিতে হবে।"

বিনোদ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "বলি আমি ত' আর শাস্ত্রকার নই—যে তোমাদের সব প্রশ্নের মীমাংসা দেব।"

অজিত।—"তারপর উপেন তোমার ঠিকুজি কি শেষ হ'ল?"

উপেন।—"না তোরা যে গোলমাল আরম্ভ কর্‌লি তা ব'ল্‌বই বা কি! বস্ বিনোদ, অস্থির হ'লে চ'ল্‌বে না।"

অজিত একটু হাসিয়া বলিল, "নাও, আজ উপেনকে ক্ষেপিয়েছ, এখন তাল সাম্‌লাও।"

উপেন।—"তারপর দেখ আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক চন্দ্রবংশীয় ধন্বন্তরী—তিনি নাকি আজকাল বাঙ্গলার বৈদ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, তিনি ছিলেন ভর্গভূমির পিতামহ,—আবার এই ভর্গভূমির বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমন কি শূদ্র পর্য্যন্ত ছিল। ঐ বংশেরই আর একজন ক্ষত্রিয় শৌনকের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন,—আবার এই শৌনকের বংশধরগণও চারিবর্ণে বিভক্ত হ'ন। ঋগ্‌বেদের টীকাকার মেধাতিথি হ'তে কাণ্বায়ণ বংশীয় ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি হয়। এ দিকে আবার বৃহস্পতির পুত্র বিতথ ভরদ্বাজ জন্ম হয়!—আর এখনকার ভরদ্বাজ গোত্র তাঁরই নামানুযায়ী হয়। তাঁর বংশে কেহ বা ক্ষত্রিয়, কেহ বা ব্রাহ্মণ হ'ন।

শ্রীশ অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল—"না, উপেন, তুই দেখ্‌ছি পাগল ক'রবি। মশা মারতে কামান দাগা কেন? যা Palpable truth তার জন্য আবার এত প্রমাণ দর্শনের কি দরকার?

অজিত।—উপেনের হচ্ছে Law in precedence as against law in spirit."

উপেন।—"হতভাগারা তোরা একটু চুপ কর্‌ না। তারপর শোন্ বিনোদ—বলিরাজার কোন দাসীর গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমের ঔরসে কক্ষিবনের জন্ম হয়। তিনি ব্রহ্মণ-আখ্যা পান—আর শুধু তাই নয় তিনি আবার বৈদিক ঋষি ব'লে পরিচিতও হন্। আবার হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠাতা হস্তীরাজার পুত্র অজামীরের নলিনী, কেশিনী ও ধুমিনী নাম্নী তিন স্ত্রী ছিলেন; প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ মৌদ-গল বংশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন;—দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ কৌত্যায়ণ ব্রাহ্মণ; আর তৃতীয় পত্নীর গর্ভ হইতে কুরুপাণ্ডবদের জন্ম হয়। তোদের অত বড় মুনি বশিষ্ঠ—তিনি অক্ষমালা নাম্নী এক চণ্ডালকন্যাকে বিয়ে করেন,—আর এই অক্ষমালাই শেষে অরুন্ধতী নামে খ্যাতা হ'ন।"

শ্রীশ অধীরভাবে বলিয়া উঠিল—"বলি—তুই থাম্‌বি না—কি?"

উপেন।—"তোরা কি বাপু একটুকাল সুস্থির হ'য়ে বস্‌তে পারিস না?—তারপর পরশুরাম যখন সসাগরা ধরা নিঃক্ষত্রিয় করেন তখন ক্ষত্রিয়াণীগণ ব্রাহ্মণদিগের নিকট গিয়ে পুত্রের কামনা করেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের কামনা পূর্ণ করেন। শেষের ক্ষত্রিয়দের জন্ম ত' হয় এই ভাবে। আবার ভারতবর্ষের চতুঃপার্শ্বে যে সমস্ত ম্লেচ্ছ ও অসভ্যজাতি বাস করত, তারা সমস্তই প্রায় ক্ষত্রিয় হ'তে উদ্ভূত হয়েছিল। শক্, যবন, কাম্বোজ, পারদ প্রভৃতি জাতি সগররাজ কর্তৃক সমাজ বিতাড়িত ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। গুরুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা যে দুই জাতির মিলিত ফল তা' বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের শত্রুতা হ'তেই বেশ বুঝা যায়; আর এই কারণেই তাঁদের দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ বলা হ'য়ে থাকে। ঋষি ঋচিকের স্ত্রীর গর্ভে জমদগ্নির ও তাঁরই শাশুড়ীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। তোদের দুই একজন বড় বড় মুনিঋষির জন্মের কথা শুনলে অবাক্ হ'য়ে যাবি। ব্যাসের জন্ম হয়েছিল জেলেনীর গর্ভে, পরাশরের চণ্ডালিনীর গর্ভে, শুকদেব ও কণাদ শুকী ও উলূপী হইতে—বশিষ্ঠ উর্বশী হইতে, আর নারদ দাসী হইতে জন্মগ্রহণ করেন।"

বিনোদ।—"কিন্তু তা না হয় শুন্‌লাম। বলি তুমি ব'ল্‌তে চাও কি?"

উপেন।—"ব'ল্‌তে আমি আর কিছুই চাই নে। আমরা শাস্ত্র টাস্ত্র অত বুঝি না। এ থেকে আমাদের কমনসেন্সে এই মনে হয় যে তখন এ সব এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। যা'তে জাতির উন্নতি হ'ত তাই তাঁরা ক'রতেন। তা না হ'লে, গাধা, এটা বুঝতে পারিস্ না যে যাঁরাই বলে, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে আমাদের সমাজের—দেশের শ্রেষ্ঠ ছিলেন বা হয়েছিলেন—যাঁদের জীবন-চরিত এখনও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আকাশে নক্ষত্রের মত ফুটে রয়েছে, যাঁদের গৌরব নিয়ে আমরা এখনও সগর্ব্বে মাথা তুলে পৃথিবীর বুকের উপর চ'লে বেড়াচ্ছি—তাঁদের প্রায় সকলেরই জন্ম হয়েছিল এইরূপ অসবর্ণ সম্মিলনে। দেশ তাঁদের তুচ্ছ করে নাই,—সমাজ তাঁদের বিতাড়িত করে নাই—ধর্ম্ম তাঁদের ত্যাগ করে নাই।"

অজিত।—'আর যখন এইরূপ অসবর্ণ মিলনে কোন বাধা ছিল না—তখনি ছিল আমাদের দেশ গৌরবের লীলাভূমি।'

শ্রীশ। আর আজকাল যে য়ুরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে 'ইউজেনিক্ থিওরি' নিয়ে এত নাড়াচাড়া হচ্ছে সেটাও ত হচ্ছে ঠিক ঐ।

উপেন।—তোমাদের 'ইউজেনিক্ থিওরিই' ব'ল আর যাই ব'ল, এ সত্যটা যে আমাদের দেশে পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, আর তা বুঝ্‌তে পেরেই যে তাঁরা এরূপ সমস্ত ব্যবস্থা ক'রেছিলেন—সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ হয় না।

বিনোদ।—"বাঃ তা কেন? তাই যদি হ'বে তা হ'লে সমাজে এরূপ বিধি ব্যবস্থা এল কেন?

উপেন।—তার কারণ ভারতবর্ষে নানা জাতির সংমিশ্রণ হয়েছে। তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে যখন নদীর কূল ভাঙ্‌তে থাকে—তখন সে পাড় রক্ষা করতে হ'লে তাকে শক্ত ক'রে বাঁধ দিয়ে রাখ্‌তে হয়। কিন্তু নদীর গতি যখন অন্যদিকে ফিরে যায়—তরঙ্গের আর যখন ভয় থাকে

না—তখন সে কূলকে উর্ব্বর ক'র্‌তে হ'লে সে ইট্ সরিয়ে বাঁধ ভেঙ্গে ফেল্‌তে হয়। ভারতেরও সেই অবস্থা হ'য়েছিল। যখন বিভিন্ন অত্যাচারী জাতি ও ধর্ম্মের সংঘর্ষে ভারতের ধর্ম্ম কলঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল,তখনই অনেকগুলি কঠোর নিয়মকানুন ক'রে সমাজের পাড় বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন ত' আর তার প্রয়োজন নাই। আমাদের সমাজকে উর্ব্বর ক'র্‌তে হ'লে এখন এই বাঁধগুলি ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে।

বিনোদ।—"কিন্তু যে কারণে তুই এই সকল rigid rule এর সৃষ্টি হ'য়েছিল ব'ল্‌ছিস্, সে কারণ ত এখনও বর্ত্তমান রয়েছে। এখনও ত' অন্য জাতি—অন্য ধর্ম্ম আমাদের উপর আধিপত্য ক'র্‌ছে।"

উপেন।—"অন্য জাতি আমাদের উপর আধিপত্য ক'র্‌ছে, সে কথা ঠিক,—কিন্তু অন্য ধর্ম্ম আধিপত্য ক'র্‌ছে এ কথা ঠিক্ নয়। কারণ আজকাল চারিদিকে ধর্ম্মের একটা সাম্য এসেছে। ইংরাজজাতি আর যাই করুক, আমাদের ধর্ম্মের—সমাজের উপর তারা কোনদিনও হাত দেয় না।

বিনোদ।—বেশ তাই যদি হ'বে তা হ'লে এ ত' বেশ সহজ কথা। তা হ'লে সকলেই এতে মত দিতে পারে 'ত'—কিন্তু তা কেউ দিতে চায় না কেন?

উপেন।—আমরাও ত তাই ব'ল্‌ছি। তার কারণ আর কিছুই নয়—এই হাজার বৎসর ধ'রে আমরা ঘা খেয়ে খেয়ে এখন মনের এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি—যে কোন কিছু পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে গেলেই আমাদের ভয় হয়—পাছে আবার ঘা খাই। এম্‌নি একটা আতঙ্ক আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের বুকের মধ্যে মুখগুঁজে পড়ে রয়েছে। আমরা বুঝ্‌তে পারি না—কিন্তু এইটাই খুব স্বাভাবিক—আর এইটাই আমাদের এই সব পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে তুলে।

বিনোদ।—আচ্ছা, তুই যে বল্লি আগেকালে মুনিঋষিরা এ সত্যটা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন,—তাই যদি হ'বে তা হ'লে তাঁরা ত' শাস্ত্রে এর একটা বিধান দিয়ে যেতে পার্‌তেন—তা' দেন নি কেন?

উপেন।—তাঁরা কি ক'র্‌তে পার্‌তেন কি না পার্‌তেন বা কি করেছেলেন কি না করেছিলেন, সে সব নিয়ে ত তোর সাথে তর্ক করা চ'ল্‌বে না। অসবর্ণ বিবাহে যে যে মত পাওয়া যায় সেইগুলিই যে প্রক্ষিপ্ত নয়, তাই বা জান্‌ব কি ক'রে? আর প্রক্ষেপকারীরাই যে যত্ন ক'রে পূর্ব্বের বিধানগুলি শাস্ত্র থেকে তুলে ফেলেন, তাই বা তুমি আমি কি ক'রে জান্‌ব?"

বিনোদ এবার একটু চটিয়া উঠিয়া বলিল, হুঁ! তোমাদের সবই প্রক্ষিপ্ত। এরপর একদিন ব'ল্‌বে যে এই ভারতবর্ষটাই প্রক্ষিপ্ত। তোদের সাথে তর্ক ক'র্‌তে যাওয়া না ঝক্‌মারি।"

অজিত বলিল, "চুপ্ উপেন—বিনোদ এবার চটেছে, আর না।"

তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে! কলিকাতার রাস্তার গ্যাসের বাতিগুলি দুই একটি করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। আর সমস্ত দিনের কর্ম্মক্লান্ত লোকগুলি সান্ধ্য-ভ্রমণে রাস্তার উপরে ভিড় জমাইয়া তুলিতেছিল। ভৃত্য যখন টেবিলের উপর বাতিটি জ্বালাইয়া দিয়া গেল, তখন শ্রীশ সেই ম্লান বাতিটিকে একটু উস্কাইয়া দিয়া বলিল,—"নে উপেন, অজিত, চ' বেরিয়ে পড়া যাক্। সমস্ত দিনটাই বাজে তর্কে কেটে গেল। বিনোদটা কোনদিনও মানুষ হ'বে না।"

উপেন একটু কটাক্ষ করিয়া বলিল, "হবে হবে—তবে তর্কের দ্বারা নয়।"

অজিত বলিল, "When an arrow will pierce him through and through the heart."

(২)

ঠিক্ বৈকাল বেলাটায়—যখন সূর্য্য শেষ বিদায়ক্ষণে অদূরে ত্রিতল অট্টালিকার পিছনে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল,—সমস্ত দিন বৈশাখের তীব্র তাড়নার পর যখন একটুকু খোলা হাওয়ায় শরীরটা ঠাণ্ডা করিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে—ঠিক সেই সময়টাতে হঠাৎ মুষলধারে বর্ষা নামিয়া কলিকাতার রাজপথ ভাসাইয়া দিয়া গেল। এমন সময়ে যখন চারিটি দেওয়াল বেষ্টিত ছোট ঘরটির মধ্যে প্রাণটা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে—অথচ বাহির হইবারও কোন উপায় থাকে না—সেই সময়ে উপেন তাহার জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত ছিন্ন ঘটনাগুলি সম্বন্ধে গ্রন্থি দিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া হঠাৎ এক সময়ে উঠিয়া জানালার নিকট

দাঁড়াইয়া বৃষ্টির এই আড়ম্বর দেখিবার জন্য বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। এমন সময় দেখিল, বিনোদ মাথায় একটা ছাতি দিয়া, কাপড় তুলিয়া এক হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া তাহারই মেসের দিকে আসিতেছে। উপেন তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে বিনোদ, এই জল ঠেঙ্গিয়ে – কি মনে ক'রে ?"

বিনোদ একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আরে শুনেছিস্ শ্রীশের বিয়ে। এমন খবরটা পেয়ে আর কিছুতেই ঠিক্ থাক্‌তে পার্‌লাম না,—তাই স্থান-কাল বিবেচনা না ক'রেই একেবারে ছুটে এসেছি।"

উপেন আনন্দাতিশয্যে বলিয়া উঠিল, "সত্যি ?"

বিনোদ বলিল, "আরে, সত্যি নয় ত' কি আর তোর সাথে চালাকি ক'র্‌তে এলাম ? তুই এখানে আছিস্ কি না তা সে জানে না। সেই জন্য তোর কথাও আমার কাছে লিখেছে।"

এই বলিয়া সে পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া উপেনের হাতে দিল। উপেন চিঠিখানি খুলিয়া দুই তিন বার পড়িয়া একটু হাসিয়া বলিল, "বাস্ আর কি ? শ্রীশেরও আইবুড়ো নাম ঘুচ্‌ল—এবার বাকি রইলি শুধু তুই।"

বিনোদ বলিল, "শ্রীশ না বড় বড়াই ক'র্‌ত' সে কোনদিনও বিয়ে ক'র্‌বে না ! একেই ব'লে 'সাধ্‌লে জামাই কাঁঠাল খান্ না, শেষে ভুষ্‌লোও পান না'। বাপ্‌রে বাপ্ কম নাকালটাই আমাদের করিয়েছে !"

"কিন্তু আমি ত' দেখ্‌ছি ভুষ্‌লো ছেড়ে তার বেশ্ পাকা কাঁঠালই মিলেছে—ভুষলো বোধ হয় রইল তোর জন্যই।"

"আরে, আমি ভুষ্‌লো কা'কে ব'ল্‌ছি তাই তুই বুঝ্‌লি না। দেখ্‌না চিঠি লিখেছে মেয়েটি তত সুন্দর নয়। সেবার অত সুন্দর মেয়ে নিয়ে, বাবা, কর্ম্ম সাধাই না সেধেছি—তা তখন বাবুর মেজাজই অন্য রকম। কেন বাপু, এখন। একেই ব'লে cupid's arrow !"

উপেন একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "সেটাও' reserve রয়েছে তোর জন্য। যাক্ অজিত ত' সংসারী আগেই হয়েছে—শ্রীশও শেষকালে হ'ল ;—এখন তোকে একটু সংসারী দেখ্‌তে পেলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে কিছুদিন থাক্‌তে পারি। বলিস্ কি ভাই, তোদের জন্য আমার রাত্রে সেই কষ্টকে পর্য্যন্ত ঘুম হয় না।"

বিনোদ তাহার পিঠে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, "নে নে তোর বুড়োমি রাখ্। তুই ছেলের বাপ হ'য়েই এই—এর পর ত' দিন পরেই রয়েছে।"

উপেন একটু মাথা নাড়িয়া দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিল, "বাবা, এ ত' ছেলে নয়,—এ যে কম্ ক'রে তিন্ তিন্ হাজারের 'ক্যাস্ সার্টিফিকেট্'।"

পরদিন অপরাহ্নে উপেন, বিনোদ ও অজিত শ্রীশের গ্রামের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই তাহাদিগকে খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে নিয়া বসাইল। প্রথম দর্শনের এই শিষ্টাচার শেষ হইলে বিনোদ সম্মুখের ত্রিপায়া হইতে চায়ের কাপ্‌টি মুখে তুলিয়া বলিল, "তারপর শ্রীশ, at last caught in the trap ?"

অজিত বলিল, "Or succumbed to the mightier dictates of the heart."

উপেন বাধা দিয়া বলিল, "আরে না না, এবার শ্রীশের কর্ত্তব্যবুদ্ধিটা বাপের এক ডাকেই একেবারে মন ছাপিয়ে উঠেছে।"

শ্রীশ একটু হতাশ ভাবেই বলিল, "নাও, সময় পেয়েছ ব'লে নাও ! ব'ল্‌বার ত' এখন আমার কিছুই নাই।"

উপেন বলিল, "কিরে, তুই যে একেবারে হতাশভাবে গা ছেড়ে দিলি ! শুভকর্ম্মের সূচনাতেই এই ! Never mind, cheer up !"

অজিত বড় রকমের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "জগতের ধরণই এই ! ভাল কাজ কেউ ক'র্‌তে গেল ত' অম্‌নি সমালোচনা।"

বিনোদ বলিল, "না শ্রীশ, ক্ষমা কর ভাই। এই দেখ তোর would be তিনির health drink ক'র্‌ছি। Ladies and gentlemen—"

উপেন মুরুব্বিয়ানা ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আরে থাম্ থাম্—তোরা ভারি ছ্যাব্‌লা হয়েছিস্।"

বিনোদ ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কি আমি ছ্যাব্‌লা ? আচ্ছা দেখ্ এবার কে বেশী গম্ভীর হ'তে পারে।"

এর পর বিনোদ বেশ একটু গম্ভীরভাবেই বসিয়া রহিল।

(৩)

বৌভাতের পরদিন বৈকাল বেলায় অজিত হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা শ্রীশ, চ'না যাই আজ একটু বাইচ্ খেলে আসি গিয়ে।"

এ কথায় বিনোদ উৎসাহে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এই ঠিক বলেছিস্—অজিত একটা genius, নে নে, শীঘ্র ক'র শ্রীশ—দেরি করিস্ নে ভাই।"

উপেন বলিল, "নে তোদের মত বাই! রক্ত গরম থাকলেই ওই হয়। তারপর ঝড় নেমে পড়ুক—তা হ'লেই বেশ হ'বে, এই বিদেশে বিঘোরে।"

বিনোদ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "উপেনের প্রাণের উপর বড় দরদ। শ্রীশও আবার ওর কথায় সায় দিবি নাকি?"

উপেন একটু মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা কি আর মিথ্যে! —এখন familyman, অনেক দিক্ দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়। তোদের যেমন 'Idle brain is the seat of the devils'."

বিনোদ ঠাট্টা করিয়া বেশ একটু সুর করিয়াই বলিল, "নন্দলাল একদা এক করিল বিষম পণ।"

অজিত বলিল, "উপেন ত' আর তোদের মত ফচ্‌কে নয়। ওর হচ্ছে a sane mind in a sane body."

বিনোদ বলিল, "ঠিক্ বলেছিস্—'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্ আপৎকালে হ্যুপস্থিতে'।"

শ্রীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "নে তোরা বাজে ফচ্‌কেমিই ক'র্‌বি না যাবি? যেতে চাস্ ত' বল্, নৌকো ঠিক করি।"

উপেন বলিল, "তোরও তা হ'লে মত আছে দেখ্‌ছি। আমি কি তা হ'লে একেবারেই Alone alone—all all alone?"

অজিত জোড়া দিয়া বলিল, "Alone on a wide wide sea."

উপেন বলিল, "নে চল্ তা হ'লে। আজকালকার দিনে Majority'র opinion মেনে চলাই সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।"

বিনোদ একটু হাসিয়া বলিল, "এইবার পথে এস। নাও শ্রীশ, এবার তোমার চেষ্টা দেখ। এখন আমাদের অদৃষ্ট আর তোমার হাত যশ।"

তখন সবে সূর্য্য অদূরে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষান্তরালে ঝুপ্ করিয়া নামিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বগগণ লজ্জাবনত বালিকা-বধূর মুখের মত ঘোমটার আড়ালে একেবারে রাঙ্গাইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যায় আর ঝর্‌ঝরে হাওয়ায় সমস্ত জগতে যখন একটা নূতন চেতনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—সেই সময় চারি বন্ধুতে একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি মাঝ দরিয়ায় ভাসাইয়া দিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হঠাৎ চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া একখানি ঘন কৃষ্ণ মেঘ সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। নদীর জল নীল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। শ্রীশ গুণ গুণ স্বরে গাহিতে লাগিল—

"* * * *
কদম্ব গাছের ঝাড়
চিকণ পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরাল।"

বিনোদ একটু মুচ্‌কি হাসিয়া গাহিল, "আমি ভাবিতেছি কার আঁখি দুটি কাল।"

শ্রীশ গাহিতে লাগিল—

"আকাশ মেঘেতে ঢাকা
দোয়েল দুলায়ে পাখা—
—বকগুলি আঁকা বাঁকা
ফিরে আকাশে।"

বিনোদ কটাক্ষ করিয়া গাহিল, "চাতকি ফিরিছে মরি দারুণ পিয়াসে"।

উপেন উত্তেজিত-স্বরে একটু দাঁত খিঁচাইয়া বলিল "নে নে, ফচ্‌কে এয়ারের দল, চুপ কর! এদিকে প্রাণ নিয়ে টানা টানি—আর ওদের কবিত্ব উথ্‌লে উঠ্‌লো। দোহাই তোর অজিত, একটু বেয়ে চল। আগে পাড়ে লাগিয়ে নে, তারপর যত ইচ্ছে তোদের কবিত্ব ঝাড়িস্—আমি কিচ্ছু বল্‌'তে যাব না।"

বিনোদ কৃত্রিম বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "আঃ চুপ ক'র্‌না উপেন "বেরসিকের মত রসভঙ্গ করছিস্ কেন?" ঠিক্ এই সময়ে বাতাসের একটা ঝাপ্‌টা তাহাদের কাণের পাশ দিয়া সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া তাহাদের প্রাণে একটা আতঙ্ক জাগাইয়া তুলিয়া চলিয়া গেল। চারি বন্ধুতে তখন

বেশ একটু ভীত ত্রস্তভাবেই নৌকা বাহিয়া তীরে আসিয়া লাগিল। চারিজনে নামিয়া নৌকা আড় করিয়া কাছি দিয়া শক্ত করিয়া একটা গাছের গুঁড়ির সাথে ক্ষিপ্রহস্তে বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর মুষলধার বৃষ্টি, মেঘের গুরু-গর্জ্জন—আর থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতের ক্ষণিক আস্ফালন মস্তকে করিয়া চারি বন্ধুতে অজানা গ্রামের পিচ্ছিল, অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

আছাড় খাইয়া কাদা মাখিয়া, ভিজিয়া অনেকক্ষণ পরে যখন তাহারা একটা দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন এক বৃদ্ধ আসিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহার কুটির মধ্যে লইয়া গেল। পর্ণ কুটিরের বারান্দায় আসিয়া তাহারা দাঁড়াইলে বৃদ্ধ ডাকিয়া বলিলেন, "সুধা—মা—চট্ ক'রে আমার গামছা খানা নিয়ে এসত'।"

অবিলম্বে সুধা গামছা আনিয়া দিলে বৃদ্ধ বলিলেন, "যাও 'ত' মা আমার ট্রাঙ্ক্‌টা খুলে চারিখানা কাপড় নিয়ে এস—বাবুরা একেবারে ভিজে গিয়েছেন।"

সুধা চারি বন্ধুর দিকে একবার ক্ষণিকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাপড় আনিতে চলিয়া গেল।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল কিন্তু বৃষ্টির আর বিরাম নাই দেখিয়া অগত্যা বৃদ্ধের অনুরোধ আতিশয্যে তাহারা সেইখানেই আহার করিয়া রাত্রিটা বৃদ্ধের কুটিরেই অতিবাহিত করিল।

কিন্তু প্রকৃতির এই বিপর্য্যয়ের কোন চিহ্নই আর প্রভাতে দেখা গল না। ভোর হইতেই সমস্ত উঠানটা নির্ম্মল রোদে ভরিয়া গিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পুকুরের ঘোলাটে জলের পাশে দুই একটি ভেকের ডাক শুনা যাইতেছিল। তুমুল বিপর্য্যয়ের পর সমস্ত প্রকৃতির উপর একটা বিমল শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

চারি বন্ধুতে বৃদ্ধের নিকট বহু বিনয় দেখাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। দুই পা যাইয়াই বিনোদ হঠাৎ একবার পিছনে তাকাইতেই দেখিতে পাইল—দরজার পার্শ্বে দুইটি করুণ কোমল "কাক চক্ষু জল।" তাহার বুকের ভিতর ধপাস্ করিয়া উঠিল।

চারি বন্ধুতে যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, তখন উপেন বিনোদের একটু অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বলিল, "কিরে বিনোদ, হঠাৎ অমন শুমট্ মেরে গেলি কেন? দেখিস্ যেন তড়্‌কে যাস্ নে।"

বিনোদ একটু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "যা—সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।"

শ্রীশ বলিল "চুপ উপেন—ওকে এখন একটু চিন্তা ক'রতে দে। দেখ্ 'ত' কেমন কাতর ওর দৃষ্টি!"

অজিত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "Absence makes the heart grow fonder."

বিনোদ বলিল,"দ্যাখ তোরা যদি এরকম বাজে ফাজলামি ক'রবি 'ত' আমি এখুনি এইখানে নেমে যাব। তোদের সাথে আর যাব না।"

অজিত বলিল, "হাঁ, তাই ঠিক্।"

শ্রীশ বলিল, "ওহে ভায়া, আমরা এত কাঁচা ছেলে নই যে তোমাকে এইখানে একা ছেড়ে দিয়ে যাব। ওদিক মাড়িও না বাপু—ব্রাহ্মণের ছেলে—শেষে কায়েতের হাতে জাত দেবে?"

বিনোদ নিরুপায় দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

(৪)

আরও কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া উপেন, বিনোদ ও অজিত একদিন শ্রীশ ও তাহার আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। গাড়ী ছাড়িবার সময় শ্রীশ, ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল,—"দেখিস্ উপেন বিনোদকে সামাল। ও সুবিধা পেলেই কিন্তু এ দিকে ছুটে দেবে।" উত্তরে অজিত মৃদু হাসিয়া বিনোদের দিকে একটা কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিল, "Magnetic attraction, বাবা, আমরা কি ক'রব ব'ল?"

ঠিক্ ভোর বেলায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিলে, তিন জনে নামিয়া পড়িল। বিনোদ গাড়ী ভাড়া করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিল এক কোণে একটি বালিকা ছোট একটি বালকের হাত ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একবার দুইবার দেখিল,—বিনোদের বুকের ভিতর কেমন একটা রক্তের চঞ্চল স্রোত বহিয়া গেল। তাহার মুখ হইতে হঠাৎ অস্পষ্টস্বরে বাহির হইয়া পড়িল, "এ কি—এ যে সেই সুধা!"

বিনোদের মন বারবারই বলিতে লাগিল, তাহার তাহাদিগকে এখন সাহায্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বৃদ্ধকে ত' সে সেখানে দেখিতে পাইল না। সে কি করিয়া

সুধাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল—বোধ হয় বৃদ্ধ গাড়ী আনিতে গিয়াছেন। এঁদের এরূপ অসহায় অবস্থায় এখানে ফেলিয়া যাওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইবে। তাহার মনে হইল, তাহাকে দেখিয়া সুধা এখন অনেকটা ভরসা পাইয়াছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত একাকী অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে নিশ্চয়ই তার খুব আশঙ্কা হইতেছিল। যাহা হউক, আজ যে সে সুধার এতটুকুও উপকারে লাগিয়াছে ইহাতেই সে ধন্য! তাহার মনে হইল, এই শত শত যাত্রীর দৃষ্টির সম্মুখে সে আজ এক অমূল্যরত্নের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভাবিতেও তাহার বুক গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। সে একটু গম্ভীর পাদক্ষেপেই সেখানে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হঠাৎ সুধার কণ্ঠস্বরে তাহার চেতনা হইল। সুধা বলিতেছিল, "বাবা, ঐ যে ঐখানে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"কই—কোথায়?" বলিয়া বৃদ্ধ সুধার অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট দিকে আসিতেছিলেন। বিনোদ দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধের নিকট আসিয়া হাত জোড় করিয়া একটা নমস্কার করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধও একটি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—"এই যে বিনোদবাবু—বেশ হয়েছে—আপনার দেখা পেলাম। ভাগ্যিস্ সুধা আমায় দেখিয়ে দিলে।"

বিনোদ হঠাৎ একটু লজ্জিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "না-না, আপনি আমাকে "আপনি" ব'ল্‌বেন না,—বড়ই লজ্জিত হই এতে আমি। আপনি আমাকে "তুমি" বলেই সম্বোধন ক'র্‌বেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "হাঁ—তা—কি ব'ল্‌ছিলাম। সুধার নিতান্ত অনুরোধেই চিকিৎসার জন্য এলাম। তা আপনি—হাঁ—তা তুমি—একটু দেখ্‌বেন—হাঁ—দেখ শুনো।"

বিনোদ লাফাইয়া উঠিল, বলিল, "সে কথা কি আর ব'ল্‌তে হবে! আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমার যথাসাধ্য ক'র্‌ব। এ অধিকারটুকু আপনি আমাকে দিলে আমি সুখী হ'ব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "হাঁ, বাবা তা তোমরাই ত ভরসা। সুধাও আমাকে সেই ভরসা দিয়ে নিয়ে এসেছে। নইলে কি আর এই বুড়ো বয়সে বিদেশে আসি! তা বাবা বেশ—এখন আমরা আপাততঃ বৈঠকখানায়ই থাক্‌ব। সে বাড়ীখানা বড় ছোট—তা কয়েকদিন বেশ চ'ল্‌বে 'খন। আর আমরাও ত আর লোক বেশী নই। এই সুধা, আমি আর ছোট খোকা। কেমন বাবা চ'ল্‌বে না?"

বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে, হাঁ চ'ল্‌বে বই কি!"

বৃদ্ধ তখন বিনোদের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তা বাবা আমরা আসি এখন? তোমরাও সময় নষ্ট হচ্ছে।"

বিনোদ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে কিচ্ছু না—সে জন্য আপনি ভাব্‌বেন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তা এখন যাই। তুমি বিকেলে একটু সময় ক'রে আমাদের ওখানে যেও বাবা। তখন চিকিৎসার যা হ'ক্ পরামর্শ ক'র্‌ব। তোমরা সব জান শোন। কা'কে দেখান কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'র্‌ব।"

বিনোদ মেডিক্যাল কলেজে পড়িত। সে বলিল, "সে জন্য আপনি কিচ্ছু ভাব্‌বেন না। সে সব আমি ঠিক্ ক'র্‌ব। আমি বিকেলে নিশ্চয়ই যাব।"

ইহার পর বৃদ্ধ আর একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সুধার হাত ধরিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন। বিনোদ হঠাৎ নীচু হইয়া টুক্ করিয়া বৃদ্ধের পায়ে একটা প্রণাম করিয়া ফেলিল।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, "আঃ আঃ ও কি? আঃ!"

চাবুকের ছপ্ ছপ্ ও সহিসের হিস্ হিস্ শব্দে গাড়ীখানি যখন অদৃশ্য হইয়া গেল,—তখনও বিনোদ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল। এমন সময় পিছন হইতে হঠাৎ উপেন আসিয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিতেই সে চম্‌কাইয়া উঠিল।

উপেন বলিল—"কি রে! তোকে না গাড়ী ঠিক্ ক'র্‌তে পাঠিয়েছিলাম? আর এই বুঝি তুই গাড়ী ঠিক্ ক'র্‌ছিস্?"

বিনোদ একটা ঢোক্ গিলিয়া বলিল,—"হাঁ—না—তা—গাড়ী পাই কোথা?"

অজিত বলিল—"হাঁ-না—তা—কি রে? তোকে কি ভূতে পেলে না কি? মুখ যে একেবারে ফ্যাকাসে মেরে গেছে দেখ্‌ছি। ব্যাপার কি?"

উপেন বলিল—"ভূতে নয়—পেত্নীতে পেয়েছে। হতভাগা তোর সাম্‌নে কম্ ক'রে একশ' গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে,

আর তুই ব'ল্‌ছিস্ গাড়ী পাই কোথা। ও দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছিলি কি? ওটা 'ত' পুব নয়।"

বিনোদ বলিল—"নাও গাড়ী তোমরা ঠিক্ ক'র। আমি পা'র্‌ব না। ও গাড়োয়ান বেটাদের সঙ্গে আমি খেঁচাখেঁচি ক'র্‌তে পারি না।"

এই বলিয়া উপেন ও অজিত একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলিল। তার পর তিন বন্ধুতে নিস্তব্ধভাবে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল।

(৫)

বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়াই কোন রকমে হাতে মুখে একটু জল দিয়া বিনোদ এক নিশ্বাসে সুধাদের বৈঠক-খানার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুধা তখন পশ্চিমের দিকের বারান্দায় একটা রেলিং এর উপর ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রক্তিমচ্ছটা তাহার চোখে মুখে লুটাইয়া পড়িয়া এক অভিনব মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছিল। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত দীর্ঘ কুঞ্চিত দুই এক গাছি চুল তাহার গোলাপী অধরে লুটাইয়া পড়িতেছিল;—আর বাতাসের দুই একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস কাণে কাণে তাহার কি এক অভিনব বার্ত্তা আনিয়া দিতেছিল। তাহার ক্ষুদ্র গোলাপী অধরোষ্ঠে একটু ক্ষীণ মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বিনোদের মাথা ঘুরিয়া গেল। কি জানি কি এক অদৃশ্যশক্তি তাহাকে সেইখানে একেবারে মাটির সহিত গাড়িয়া দিয়া গেল। কোন্ এক ভারবাহী জীবের মত সে যেন তাহার দেহখানি কাঁধে করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

"ও কি, আপনি—তুমি ওখানে দাড়িয়ে রইলে কেন? এস ভিতরে এস।" বৃদ্ধের ডাক শুনিয়া বিনোদের হঠাৎ চেতনা হইল। তাহার শ্যামলগণ্ডও লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি দিয়া সে বলিল—"না—এই আপনি আছেন কি না—তাই ভাবছিলাম।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"কেন আমি না থাক্‌লে কি তুমি আস্‌বে না? এ'ত তোমাদেরই বাড়ী ঘর এক রকম। আমি না থাক্‌লেও এসো।"

বিনোদ বলিল—"হাঁ, তা নিশ্চয়ই।"

সুধা চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া তাহাদের আলাপ শুনিতেছিল।

সে দিন বিনোদ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিয়া যখন গৃহে ফিরিল, তখন তাহার বুকের ভিতরটা একেবারে যেন খালি হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ সে একটা নেশা—একটা মাদকতার তীব্র আকর্ষণে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিল। নেশার ঘোরান্ধকার কাটিয়া গেলে যেমন একটা অবসন্নতা আসিয়া পড়ে আজ বিনোদের তাহাই হইল। সে বাড়ী আসিয়া চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। আহারের কথা আর তাহার মনেই রহিল না। বিছানায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছটফট্ করিয়া ভোর বেলায় ঘুমাইয়া পড়িল।

উপেন ও অজিতের ডাক শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিতেই উপেন বলিল—"কি রে, তোর ও রকম চেহারা হয়েছে কেন? ব'লি কিছু টেনেছিস্ নাকি?"

বিনোদ বলিল—"কাল রাত্রে মোটেই ঘুম হয় নাই, সেই জন্যই শরীরটা বড়ই খারাপ হয়েছে।"

উপেন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"তা হ'লেই 'ও' ঠিক হয়েছে। তোর ভিতরে germ ঢুকেছে। দে'ত অজিত ওর একটা prescription ক'রে।"

অজিত একটু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ case টা একটু serious ব'লেই বোধ হয়। এখনই ওকে Liquor matrimonii দেওয়ার বন্দোবস্ত ক'র্। ওটার বেশ একটু antiparasitic action আছে।"

বিনোদ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তারপর ডাক্তার বাবুর 'ফি' কত?"

উপেন একটু কটাক্ষ করিয়া বলিল, "অজিত 'ত' 'ফি' চায় না। আর তুই যে রকম কঞ্জুস্—তোর কাছ থেকে ও 'ফি' নেবেও না। আগে ওর ওষুধের action হ'ক—তারপর যার কাছ থেকে 'ফি' নেবার তার কাছ থেকেই নেবেখ'ন। সে জন্য তোর অত ভাব্‌তে হবে না। কি বলিস্ অজিত?"

অজিত বলিল, "আল্‌বাত্।"

বিনোদ বলিল, "আচ্ছা সে 'ও' গেল বাজে কথা। ব'লি এখন কি মনে ক'রে হঠাৎ এই সকাল বেলা?"

উপেন বলিল, "এই সকালে এসেছি—তোমাকে একেবারে গ্রেপ্তার ক'র্‌তে। পাজি! কাল তোর কি হয়েছিল?"

বিনোদ একটু এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিল, "ওঃ, কাল যে ভারি মাথা ধরেছিল।"

উপেন বিনোদের পিঠে এক ঘুসি বসাইয়া বলিল, "পাজি! আবার মিথ্যে কথাও ব'ল্‌তে শিখেছিস্? ভাবিস্ কি তুই বড় চালাক। অজিত আর আমি যে কাল দুই তিনবার তোর বাড়ীতে এসে খোঁজ ক'রে গেছি তা জানিস্?"

বিনোদ বলিল, "ওঃ, তোরা বুঝি কাল এসেছিলি? ও! হ'লে ঠিক হয়েছে। কাল কমলার একটা সম্বন্ধ দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।"

উপেন বলিল, "আবার মিথ্যে কথা? পাজি! তোর মাথা ভেঙ্গে দেব। উনি বোনের সম্বন্ধ দেখ্‌তে গেছেন তা' বাড়ীর কেউ জানে না। বলি, কাণাকে হাইকোর্ট দেখাস্ নাকি?"

অজিত বলিল, "বলি, কাল কলেজ থেকে ফিরেই না খেয়ে দেয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্তের মত কোথায় বের হওয়া হয়েছিল?"

বিনোদ এবার একটু রাগিয়া বলিল, "এ কথা তোদের কে বলেছে? সব মিথ্যে। থাই নাই আমার ইচ্ছা। কাজ ছিল তাই গিয়েছিলাম। আমার কি কোন কাজ থাকতে নাই নাকি?"

উপেন বলিল, "আহা চট কেন? কাজ থাকতে নাই তা কি আমরা ব'ল্‌ছি? তবে কাজটা একেবারে Volcanic irruption এর মত এই পঁচিশ বৎসর বয়সে আজ হঠাৎ উথলে উঠ্‌ল তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলাম।"

বিনোদ বলিল, "আরে যাঃ! ফাজলামি ক'র্‌বারও একটা সময় অসময় আছে। সব সময় কি ও ভাল লাগে?"

উপেন একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "বিশেষতঃ এখন ত লাগবেই না। বাঙ্গালীর ছেলে ভাত শুদ্ধ যখন তেতো লাগ্‌ছে? আচ্ছা সে যাক্, ব'লি কর্ত্তা আজ অনুগ্রহ ক'রে এই দীন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে—অর্থাৎ—কলুটোলায় ৫৯নং মেস্ বাটীতে পদার্পণ করিয়া অনুগৃহীত ও বাধিত করিবেন।"

তারপর অজিতের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ঠিক্ হচ্ছে না অজিত?"

বিনোদ এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা—আচ্ছা হয়েছে। তুই যে দেখ্‌ছি একেবারে মস্ত সাহিত্যিক হ'য়ে প'ড়্‌লি। এবার অজিতের ভাত মারা যাবে দেখ্‌ছি।"

অজিত কটাক্ষ করিয়া বলিল, "তোদের সব ভাবসাবে আমার 'ভাষা যে ভাসিয়া যায় নয়ন জলে'।"

বেলা বাড়িয়া পড়িতেছে দেখিয়া উপেন ও অজিত বিনোদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

(৬)

সে দিন দুপুর বেলায় আকাশে সারি সারি অনেকগুলা মেঘ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত দিনের মধ্যে সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। চারিদিকে যেন একটা বিষাদের ঘন ছায়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

উপেন ও অজিত তাহাদের মেসের গৃহে একখানি চৌকির উপরে বসিয়া সবে দুইটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়াছে, এমন সময়ে শ্রীশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোরা কি বেঁচে আছিস্ না কি?"

উপেন ও অজিত তাহার মুখের দিকে বিস্ময়দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। শ্রীশ একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অমনভাবে তাকিয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে তার খোঁজ রাখিস্ কিছু? না ঘরে বসে বসে বাপের পয়সায় শুধু সিগারেটই ধ্বংস ক'র্‌ছিস্?"

উপেন বাধা দিয়া বলিল, "বস্ শ্রীশ, আগে ঠাণ্ডা হ'— বাড়ীর খবর টবর বল, তারপর কি ব'ল্‌ছিস্ শোনা যাবে খ'ন।"

অজিত বলিল, "হাঁ, কিছুর মধ্যে কিছু নয়—হঠাৎ একেবারে এসে পিলে চম্‌কিয়ে দিচ্ছিস্ কেন? দু দণ্ড ব'স্— দু'চারটে খোস্ গল্প কর। Her Majest,র শারীরিক কুশলটুশল জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে দে। তারপর অন্য কথা।"

শ্রীশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"যাঃ, এখন ও সব বাজে কথা শুনবার আমার সময় নাই। কি ক'রে যে তোরা এখানে থেকেও এমন নির্ব্বিকার থাকতে পারিস্ আমি তাই ভাবছি। আমি ত সেই দেশেও এমন চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পার্‌লাম না। ছুটে চ'লে এলাম।"

উপেন বলিল, "কি বিনোদের কথা ব'লছিস্ ত? তার কথা আর বলিস্ নে।"

শ্রীশ বলিল, "তোরা জানিস্ তা হ'লে। কিন্তু এর ত একটা ব্যবস্থা করতে হয়। আমরা পাঁচজন থাকতে ও যে সে এম্‌নি ভাবে নষ্ট হ'য়ে যাবে সেটা ত ঠিক নয়। আমাদের ত একটা কর্ত্তব্য আছে!"

অজিত বলিল, "তিনি যে কোন্ জলে ডুব দিচ্ছেন তা

জান্‌লে 'ত' ব্যবস্থা ক'র্‌ন। নইলে শুধু হাঃ হুতাশই সার।"

উপেন বলিল, "এমন সব মিথ্যে কথা আজকাল সে ব'ল্‌তে শিখেছে। কথায় কথায় আমাদের চোখে ধূলো দেয়।"

শ্রীশ বলিল, "ওঃ—তোরা তা হ'লে এখনও সব জানিস্ না। তা হ'লে শোন্ ব'লি। আমি সেই অবধি কম ক'রে পাঁচ ছয়খান চিঠি বিনোদের কাছে লিখেছি। মনে নাই, তোদের কাছে লিখেছিলাম যে বিনোদ বাড়ী বদ্‌লেছে কি না। কিন্তু তোরা লিখ্‌লি, 'না', সে পূর্ব্বের বাড়ীতেই আছে।' তার আগেও আমি দু' তিন খানা চিঠি লিখেছি। তার পরেও আবার দু'তিন খানা লিখ্‌লাম; কিন্তু "কা কস্য পরিবেদনা।" কোনই উত্তর নাই। শেষে একটু ভয় হ'ল। ভাবলাম বেশী অসুখ টসুখ কিছু ক'রে নাই ত? আরও দু'দিন গেল, কিন্তু আর ঠিক থাক্‌তে পার্‌লাম না। তখন একখানা টেলিগ্রাম্ ক'রে দিলাম। তার দু'দিন পরে বাবুর একখানা কার্ড পেলাম। লিখেছে—"তোর চিঠি সবই পেয়েছি—টেলিগ্রামও কাল পেলাম। আমার কোনই অসুখ ক'রে নাই। বরং আর কোনদিনও বোধ হয় আমি শারীরিক এত সুস্থ ছিলাম না। কেন তুই টেলিগ্রাম ক'রে মিছে মিছি পয়সা নষ্ট ক'র্‌লি? আমি আর তোদের বন্ধুত্বের যোগ্য নেই। আমাকে ক্ষমা করিস্।" চিঠি প'ড়ে আমার মাথা ঘুরে গেল,—ভাব্‌লাম ব্যাপার কি? কিন্তু কিছুই স্থির ক'র্‌তে পার্‌লাম না। ভাবলাম তোদের কাছে লিখি; কিন্তু আবার কি সাত পাঁচ ভেবে লিখ্‌লাম না। আরও দু'দিন এই ভাবে কেটে গেল। তারপর একদিন কি ভেবে বাড়ী থেকে বের হ'লাম। তোদের বোধ হয় মনে আছে সেই যে একদিন বাইচ্ খেল্‌তে গিয়ে আমাদের গ্রামের পাশে এক বৃদ্ধের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম,—একেবারে সেই বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। কিন্তু গিয়ে দেখি বাড়ীতে তালাবন্ধ। অনেক অনুসন্ধান ক'রে জান্‌লাম যে তাঁরা কল্‌কাতায় এসেছেন। ঠিকানাটাও অনেক কষ্টে যোগাড় করা গেল। তখন ব্যাপারটা একেবারে দিনের মত স্পষ্ট হ'য়ে গেল। বিনোদ যে এই দিকেই চলেছে সে বিষয়ে আমার আর কোনই সন্দেহ রইল না। তারপর পরদিনই কল্‌কাতায় রওয়ানা হ'য়ে এলাম। ব'ল্‌ব কি তোদের—কম চোখের জলটাই কি আমাকে মোছাতে হয়েছে! তিনি ত একেবারেই বেঁকে বসেছিলেন যে আমাদের কলেজ ত এখনও খোলে নাই—তবে আমি কল্‌কাতায় এসে কি ক'র্‌ব? অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে মাত্র তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর ক'র্‌তে পেরেছি।"

অজিত একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাই ও' বড়ই কষ্টের কথা। এ দুঃখ রাখ্‌বার কি আর যায়গা আছে? এইবার বিনোদের কাছ থেকে এর interest সমেত compensation আদায় ক'র্‌বি।"

উপেন বলিল, "তাই বল। বিনোদ ডুব দিয়ে ডুব দিয়ে জল খাচ্ছে একাদশীর বাবাও জান্‌ছে না। ভারি চাল চেলেছে কিন্তু আমাদের উপর। চল পাজিটাকে আজ উচিত মত সাজা দিতে হ'বে।"

শ্রীশ বলিল, "চুপ্—এখন কোন গোলমাল করিস্ নে। আমি ঠিক্ ক'রেছি ওকে একেবারে বামাল সমেত ধ'র্‌তে হ'বে। বুঝ্‌লি?"

* * * * *

সন্ধার সময় বিনোদ নিয়ম মত সুধাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে সুধা একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি ভেবেছিলাম আজ বুঝি আর আপনি আস্‌বেন না।"

বিনোদ একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে সুধার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কেন? হঠাৎ তোমার এমন কথা মনে হ'ল কেন?"

সুধা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"না—আপনার যে আজ কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন। তাঁরা আপনার খোঁজ কর্‌ছিলেন যে।"

বিনোদ চোখে মুখে একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটাইয়া বলিল, "কখন এসেছিল? ক'জন?"

সুধা বলিল, "এই তিনটে চার্‌টের সময়। আপনি আর—তিন জনে আমাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন তাঁরাই।"

বিনোদ একটু উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—"শ্রীশটা এসেছে তা হ'লে। এ তারই কাণ্ড।"

এমন সময় বাহিরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া সুধা বলিল, "এই বাবা এসেছেন বোধ হয়। যান না

বিনোদবাবু দরজাটা খুলে দিন। বাবা আজ কিন্তু আপনাকে কি দরকারি কথা ব'লবেন ব'লছিলেন।"

বিনোদ একটু ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তারা কখন আবার আস্‌বে ব'লে গেছে?"

সুধা একটু হাসিয়া বলিল, "না, তা কিছু বলে যাননি"—

বিনোদ আর কিছু না বলিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল।

দরজা খুলিতেই শ্রীশ, উপেন ও অজিত একেবারেই তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"বলি, এইবার যাবে কোথায়?"

বিনোদ একেবারে হতভম্বের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহাদিগের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। উপেন বলিল "তোর লজ্জা করে না? আমাদের পর্য্যন্ত ফাঁকি দিতে শিখেছিস্?"

শ্রীশ একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—"নাও এখন চল— তোর বাবা বাইরে দাড়িয়ে রয়েছেন!"

বিনোদ উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল—"সত্যি! তোদের পায়ে পরি মিথ্যে ব'লে আমাকে কষ্ট দিস্‌নে।"

শ্রীশ বলিল—"না হয় বাবা নাই ডাক্‌লেন।—আমরা ডাক্‌ছি। তুই আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাক্‌তে পার্‌বিনে।"

উপেন বলিল—"হতভাগা তোর কি একটু কাণ্ডজ্ঞান নাই। আর একটা নিরীহ, বেচারী মেয়েরও সমস্ত জীবন মরুভূমি ক'রে দিতে প্রবৃত্ত হ'য়েছিস্। তুই কি তাকে বিয়ে ক'র্‌তে পার্‌বি? যেখানে তা পার্‌বিনে— সেখানে এতটা মাখামাখি ক'র্‌তে যাওয়ার মত পাপ ও ধৃষ্টতা আর নাই।—তাই ব'লছি—চ' আর এক মুহূর্ত্তও দেরি কর্‌তে পার্‌বিনে এখানে।"

বিনোদের বুকের ভিতরটা তখন বড় তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে। একটা কাতর ম্লান দৃষ্টিতে সে একবার উপরের বারান্দার দিকে তাকাইল। সুধা বারান্দার এক কোণে চুপ করিয়া দাড়াইয়া ছিল। কে যেন হঠাৎ তাহার পিঠে চাবুক মারিয়াছে—মুখ তাহার একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। তার সেই মলিন কাতর দৃষ্টি,—সেই করুণ ম্লান নয়ন পল্লব,—বিনোদের সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে উপেনের দু'খানি হাত ধরিয়া বলিল—"মাপ কর ভাই আমাকে। আমার আত্মানুশোচনা একটুকুও হয় না। সুধার পিতা যদি আজ সুধাকে আমার হাতে দেন- আমি ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত তা মাথা পেতে নেব। কারণ আমার আজ এটা বেশ সত্য স্পষ্ট মনে লাগছে যে অসবর্ণ বিবাহে কোনই দোষ নাই! ভগবান যে এমন ভাবে আমাকে শিক্ষা দেবেন তাত' আমি আগে বুঝি নাই।"

উপেন হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, এর সিদ্ধান্ত সুধার বাবা আর তোর বাবা ক'র্‌বেন তুই এখন সরে আয়," বিনোদকে টানিয়া লইয়া তারা চলিয়া আসিল।

শ্রীসুশীল সেন

প্রবাসে

পিয়াসী হৃদয় হেথা　　কাঁদিয়া মরিছে শুধু
　　আপনা আপনি.
হেথা ত মিলে না স্নেহ,　　ভালবাসা প্রীতি, এ যে
　　স্বার্থের বিপণি॥

কেহ কারো পানে ফিরে,　　নাহি চায়, শুধু বোঝে
　　আপনার কাজ।
অর্থহীন শূন্য দিঠি,　　চাহে এ উহার পানে
　　নাহি শঙ্কা লাজ॥

এখানে চাঁদের আলো,　　তরল আনন্দ প্রায়
　　মূর্চ্ছাতুর আসি।
পড়িতে পারে না গায়,　　বাধা পেয়ে ফিরে যায়
　　হতাশে নিঃশ্বাসি'॥

তরুণ অরুণ কর　　পরিচিত বন্ধু প্রায়
　　না চুমে বদন।
মলয় মারুত এসে　　বাধা পেয়ে ফিরে যায়
　　করিয়া রোদন॥

সংক্ষেপে সকল কথা কহিতে হইবে হেথা
কেহ যেন কার
কোনো কথা নাহি বোঝে ; কেহ আর নাহি খোঁজে
কি হারায় কার।

এখানে বসন্ত আসে, না গায় কোকিল কভু
বহে না মলয়।
এখানে সকলি আছে, আছে সুগঠিত দেহ
নাহিরে হৃদয়॥

হেথা নাহি উচ্চকণ্ঠে সরল উদার হাসি
সরস বচন।
আনন্দের চঞ্চলতা, নাহি হেথা ; তীব্র শোকে
আকুল ক্রন্দন॥

হেথা যদি কাঁদে হাসে অমনি নিজেরে স্মরি'
লুকায় গোপনে।
কি জানি কি হয় পাছে, সভ্যতার হানি বুঝি
ভয় হয় মনে॥

আছে বটে বিচিত্রতা, নাহি তাহে মধুরতা
নাহি তাহে প্রাণ।
নাহি তাহে কোমলতা শ্যাম-স্নিগ্ধ সরসতা
সবি যেন ভাণ

ঐশ্বর্য্য সুষমা এর মদগর্ব্বে দরিদ্রের
করিতে নিরাশ।
উচ্চতা যা কিছু এর যেন সে দীনেরে শুধু
করে উপহাস॥

নগণ্য যে তুচ্ছ দীন, তার হেথা স্থান কোথা ?
লাঞ্ছনা লভিতে।
পড়ে থাকে এক কোণে, দেখে বোঝে ভাবে শোনে
কাঁদিয়া মরিতে॥

ফিরে চল্ ওরে কবি, হেথা তোর স্থান কোথা
রে দীনাতিদীন।
জান নাকি তুচ্ছ তুমি একান্ত নগণ্য ক্ষুদ্র
হায় ভাগ্যহীন॥

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন

অনুতপ্তা

কুক্ষণে আহা এসেছিনু ছেড়ে সুখের পল্লী-গেহ,
রূপের বিপণি খুলিয়া হেথায় বেচিতে আপন দেহ।
সতীর মহিমা দলিয়া চরণে লভিতে কুলটা নাম,
প্রেম প্রীতি স্নেহ ফেলিয়া পিছনে সেবিতে কেবল কাম।
ক্ষণিকের মোহে আসিলাম চলে ছুটিয়া নরক দ্বারে,
কণ্টক ঝাড় নিলাম বক্ষে ফেলিয়া কুসুম হারে।
অতীত দিনের কতনা কাহিনী পড়িতেছে আজি মনে,
সেই গৃহখানি, সুখ সম্পদ, সেই সঙ্গিনীগণে।
সেই বাঁশবন কেতকীর ঝাড় নদীটির কল-বাণী,
তুলসীর বেদী মঙ্গলাগাভী কঞ্চির বেড়াখানি।
মনে পড়ে সেই শঙ্খ বাজায়ে সাঝের প্রদীপ জ্বালা,
নিত্য প্রভাতে দূর্ব্বা-কুসুমে ভরে লওয়া ফুলডালা।
নব শাঁখা চুড়ী পরিয়া হস্তে সকলে প্রণাম করা,
বিয়ের বাড়ীতে পাঁচ এঁয়ো মিলে বরণের ডালা ধরা।
চন্দন চাঁপা চণ্ডীর ব্রত পুন্নি-পুকুর করা,—
লক্ষ্মীপূজায় আলিপনা দিয়ে কড়ি ধানে ঝাঁপি ভরা।
আশ্বিনমাসে দুর্গোৎসবে নূতন কাপড় পরা,
বিজয়ার দিনে সাশ্রুনয়নে প্রতিমা বরণ করা।
ফাল্গুনমাসে হোলির দিবসে আবিরে ভবন-ভরা,
শিবরাত্রিতে সারা নিশি জেগে রামায়ণ-গাথা পড়া।
পাব না ত আর সে সুখ শান্তি ছেদেছি তাহার মূলে
লভিতে হেথায় মরম দহন পাপের কুহকে ভুলে।

আজিকে তপ্ত ঘূর্ণিত জীবন করে শুধু হাহাকার,
অনুতাপানলে পুড়িয়া কেবল হৃদয় হতেছে ক্ষার।
আগ্নেয়গিরি উদ্গার সম ঝরিছে অশ্রুধার ;—
নারীর মহিমা বুঝেছি আজিকে হইয়ে ঘরের বার।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য ও জাতীয় জীবন

আবহমান কাল হইতেই মানবের মনের ভিতর জ্ঞান-লাভের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা আপনাকে নানা বিষয়ের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য প্রাণীর মত সে শুধু আহার বিহার—শুধু বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না—কোন দিন পারেও নাই। জ্ঞানলাভের একটা প্রবল বাসনা চিরদিনই তাহার বুকের ভিতর আপন অধিকার বিস্তার করিয়া কায়েমি বন্দোবস্ত করিয়া ছিল। কিন্তু প্রাচীন যুগে যখন নানাকারণে আপনার প্রাণধারণের চেষ্টাতেই তাহাকে সদা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইত তখন এই জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার বিধিমত সুবিধা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই জ্ঞানলিপ্সা একদিকে যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে,অন্যদিকে তেমনি সে তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবারও যথেষ্ট সুযোগ ও সময়ও পাইয়াছে ; এবং তাহার ফলে সে ক্রমাগতই আপনাকে স্পষ্টতর ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে,—জাগতিক রহস্যকে জানিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। মানবের এই সর্ব্ববিধ জ্ঞান-প্রবৃত্তি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতেছে,—ও এতদুভয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সহিত তাহার পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। সাহিত্য বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই লিপিকলার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে বিস্তৃতভাবে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। সে সময়ে ইহা ধারাবাহিকরূপে মানবের মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল ; এবং সেই হেতু উহার বিস্তৃত প্রচার লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। লিপিকলার আবিষ্কারের সাথে সাথে সাহিত্যের অভ্যুদয় হইলেও, বিজ্ঞান. তাহার বহুপরে জগতের আধুনিক উন্নত সভ্যতার ফলে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছে। বিজ্ঞান সাহিত্যের অঙ্গীভূত। তাহার প্রণালী বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য একই। সাহিত্য পৃথিবীর জ্ঞানবীরগণের চিন্তা ও উপলব্ধির ফল সম্ভূত ; বিজ্ঞান জড়জগতের ঔপদানিক বিশ্লেষণ ও তাহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টার ফল।

মানবের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার এই দুইটি মার্গের ভিতর সাহিত্য আমাদের আলোচনার বিষয় সুতরাং সাহিত্যকে একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব একজন বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন—

"It is what great men and women of the world think and feel and write down in good prose and beautiful poetry in some particular language." অর্থাৎ জগতের মনীষীগণ গভীর চিন্তার দ্বারা যাহা উপলব্ধি করেন তাহা কোন বিশিষ্ট ভাষায় গদ্য বা পদ্যাকারে নিবদ্ধ হইলে তাহাই সাহিত্য। সুতরাং ইতিহাস দর্শন, কাব্য, নাট্য, উপন্যাস, কবিতা—এক কথায় যে কোন সুলিখিত চিন্তাপ্রণালীই সাহিত্যপদবাচ্য।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে সাহিত্যের মূলে ভাষা ও লিপিকলা বিদ্যমান। মানব যখন তাহার জ্ঞান-গবেষণা ও আলোচনার ফল শুধু ভাষায় প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া তাহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে—তখন হইতেই জগতে সাহিত্যের বিশেষ অভ্যুদয় হইয়াছে। ভাষা মানবের ঈশ্বরদত্ত দান—মানুষ স্বতঃই আপনার ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে সক্ষম ; লিপিকলাও অতি প্রাচীন যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুতরাং জগতের অতি প্রাচীন যুগ হইতেই সাহিত্য মানবসমাজে প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু এ পৃথিবীতে সাহিত্য কখনও সর্ব্বসাধারণ সাহিত্য হইবার সুযোগ পায় নাই। কারণ বংশবৃদ্ধির সঙ্গে জগতের আদি মানবসমাজ তাহাদের আদি-বাসস্থান ছাড়িয়া

পৃথিবীর বক্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; বিভিন্ন দল বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছে, এবং কালক্রমে প্রাকৃতিক বৈচিত্রের অবশ্যম্ভাবী ফলে বিভিন্ন প্রদেশবাসী তাহাদের সার্ব্বজনীন আদি ভাষাকে বিকৃত করিয়া স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়াছে। "The popnlation of different countries gradually give to their language a new form of their own, until a time comes when those who once used the same speech cease to understand one another, because their language have taken different ways." সুতরাং এই বিভিন্ন স্থানে বাসের ফলেই মানবসমাজে একটা জাতীয় বৈষম্য ও ভাষার বৈষম্যের প্রথম সূত্রপাত হয়, ও ক্রমে ক্রমে উহা পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। তাহার পর মানবের জ্ঞান কালক্রমে উত্তরোত্তর উন্মেষিত হইলে উহা লিপিবদ্ধ করিবার উপায় উদ্ভাবিত হওয়া মাত্র বিভিন্ন দেশীয় মনীষীগণ বিভিন্ন ভাষায় আপনাদের চিন্তা প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন; এবং এই ভাষা বৈষম্যের ফলে সাহিত্য প্রকারভেদ হইয়া সাহিত্যের অঙ্গে জাতীয়ত্বের ছাপ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। বস্তুতঃও জাতীয় সাহিত্য ব্যতীত সাহিত্য সাধারণের উপলব্ধি একটা নির্ব্বিশেষভাবে (abstraction) মাত্র পর্য্যবসিত হয়; ও উহার একটা পরিস্ফুট স্বরূপ অনুভব করা কঠিন হইয়া পড়ে।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রথম হইতেই সাহিত্য স্থানভেদে ও ভাষাভেদে বিভিন্ন জাতি-সাহিত্যরূপে দেখা দিয়াছে। এক্ষণে জাতীয়-জীবন (Nationality) এই সাহিত্যের দ্বারা কিরূপভাবে পরিপুষ্টি ও বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহাই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

এই স্থলে "জাতি" বলিতে আমরা কি বুঝি সেই বিষয় একটু আলোচনা না করিলে আমরা "জাতীয়-জীবন" কে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি না। বাঙ্গালা ভাষায় Nation ও people এই দুইটি ইংরাজী কথার বিভিন্ন প্রতিশব্দ নাই; কিন্তু উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। "People" বলিতে 'বংশগত, ভাষাগত ও প্রথাগত সাম্যের দ্বারা নিবদ্ধ এক দেশবাসী কোন নির্দ্দিষ্ট মানব সমষ্টি" বুঝা যায়। কিন্তু "Nation" বলিতে উহা অপেক্ষা আরও একটু বেশী বুঝায়। "Nation" বলিতে "ঐ মানবসমষ্টির একটা সম্মিলিত, একীভূত জীবন ও কোন রাষ্ট্রবিশেষে তাহার অস্তিত্বের বিকাশ"—এই দুইটি ভাব বুঝিতে পারা যায়। "By a nation we generally understand a society of all the members of a state as united and organised in the state. It is the consciousness, more or less developed, of political connection and unity which lifts the nation above the people The idea of a nation always bears the necessary relation to the state and we may say "no state, no nation." Nation বলিতে তাহা হইলে আমরা একটা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের অস্তিত্ব অনুভব করি। কিন্তু উক্ত লেখকই "people" এর ব্যাখ্যা লিখিতে লিখিয়াছেন—"It is a union of masses of men of different occupations and social strata in a hereditary society of common spirit, feeling and race, bound together, especially by language and customs, in a common civilisation which gives them a sense of unity and distinction from all foreigners, quite apart from the bond of the state." সুতরাং এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে "Nation ও People" এর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। "Nation" অথবা জাতি বলিতে একটা সম্মিলিত রাষ্ট্রীয়-জীবনের উপলব্ধি বিশিষ্টরূপে প্রয়োজন। এই রাষ্ট্রীয়-জীবনের উপলব্ধি যখন এক মানব সমষ্টির ভিতর বিকশিত হইয়া উঠে ও তাহার রাষ্ট্রীয় অধিকার যখন সে সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তখনি তাহার জাতীয়-জীবন উন্মেষিত হয়।

কেহ কেহ আবার এই Nation ও People এবং Society বা সমাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেও উহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। "The nation (Volk) is a necessarily connected whole, while society is a casual association of a number of individuals. The nation as embodied in the state is an organism, with head and members; society is an unorganised

Mass of individuals. The nation has a legal personality (ist eine Rechts person), Society has no collective personality, but only consists of a mass of private persons. The nation is endowed with unity of will, and the power to make its will actual in the state. Society has no collective will, and no political power of its own. Society can neither legislate nor govern, nor administer justice. It has only a public opinion, and exercises an indirect influence on the organs of the state, according to the views, interests. and demands of many or all of its members. The nation is a political idea. Society is only the shifting association of private persons within the domain of the state." "A people may branch off into different states; we limit our conception of a Society to the inhabitants of one state: Within the state, too, the idea of Society is independent of differences of nationality, including all who are living in the state. A people seems to have a natural organisation of its own, at least on the physical side; a society is only a sum of individual men." কিন্তু আবাল্য হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া "Society has no collective personality" কিম্বা "collective will" একথা আমরা বলিতে পারি না।

রাষ্ট্রনীতিতে এই জাতীয় জীবনের একতা মানবের নিকট সম্যক প্রতিভাত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই এমন কি জগতের আদিযুগ হইতেই একস্থলে বাসের ও ভাষা সাম্যের একতা মানব উপলব্ধি করিয়াছিল। মধ্যযুগে কোন নিদৃষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানীয় মানব সমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র সংগঠিত হইত; এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সাধারণতঃ এই সকল ক্ষুদ্র সমষ্টির প্রত্যেকটীতে এক একটি নির্দ্দিষ্ট ভাষাই ব্যবহৃত হইত। ফ্রান্সের চিন্তাশীল রাজনৈতিক (Reusseau) রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তি সমজাতীয়ত্বের উপর না দেখিয়া এক স্থানীয়ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ছিলেন। বস্তুতঃও তখন পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের স্বত্বা মানবের ভিতরে প্রকটিতে হইবার সুযোগ পায় নাই। এই জন্যই আদিযুগে এখন যে স্থান এক রাষ্ট্রাধীন তখন উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যখণ্ডে বিভক্তছিল। উদাহরণ স্বরূপ ভাতবর্ষ ও গ্রীস্‌দেশের ইদানিং ও তৎকালীন অবস্থার আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এই স্থানীয়ত্বের প্রভাব বেশীদিন টিকিতে পারে নাই। সাহিত্যের প্রসারের সহিত জাতীয়ত্বের উন্মেষ ও এই জাতীয়ত্বের ভিত্তির উপরেই রাষ্ট্রগঠনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানবকে স্বতই উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তাই বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ন যখন ক্ষুদ্র ফরাসী রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে আপনার দুর্নিবার জিগীষাকে বদ্ধ রাখিতে না পারিয়া সমস্ত য়ুরোপব্যাপী এক মহা সাম্রাজ্য সংগঠনে প্রবৃত্ত হইলেন সেই সময় মানবের অন্তর্নিহিত জাতীয় জীবন ফরাসীর আধীনতভীত য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। এই জাতীয় জীবনের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। জাতীয় সাম্যের একতা ও জাতীয় বৈষম্যের প্রতিদ্বন্দিতা পৃথিবীর সার্ব্বজনীন শান্তিমূলে কঠোর কুঠারাঘাত করিলেও পরস্পর প্রতিযোগিতার দ্বারা রাষ্ট্রীয় জীবনের ও পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে উহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে মানবের স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তিই প্রথম মানবের ভিতর জাতীয় জীবন প্রচারের মূল কারণ। সাহিত্যের বিভিন্নতাই মানবের হৃদয়ে এই স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তি উন্মেষিত করে। একস্থানে বাস করিয়া একই ভাষা ব্যবহার করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট মানব সমষ্টির ভিতর একদিকে যেমন পারস্পরিক সহানুভূতি জন্মে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন মানব সমষ্টির ভিতর স্থানগত, ভাষাগত ও অন্যান্য নানা প্রকার পার্থক্য থাকায় তাহাদের ভিতর একটা পারস্পরিক বিদ্বেষ জাগিয়া উঠে; ও বিভিন্ন প্রদেশবাসী বিভিন্ন মানব সমষ্টির সেই পারস্পরিক বিদ্বেষভাবের উপরই মানবের জাতীয় জীবন অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, যখনি এক নির্দ্দিষ্ট মানব সমষ্টি অন্য মানব সমষ্টির স্বাতন্ত্র্যে আঘাত করিতে গিয়াছে তখনই তাহার জাতীয় স্বত্বা সবলে আপনাকে প্রকাশ করিয়া অন্যের সেই আধিপত্যের চেষ্টায় বাধা প্রদানে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে আন্তর্জাতিক বৈষম্যের সংঘর্ষে জাতীয় জীবন আপনাকে প্রকাশ করে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের সহিত সাহিত্যও এই অন্তর্জাতিক বৈষম্যর সৃষ্টি করে। ভাষা ও সাহিত্যের খাল বাহিয়া কি ভাবে জাতীয় জীবনের বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তাহা চীন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপীয় কোন জাতির তুলনা করিলে স্পষ্ট প্রতিয়মান হইবে। য়ুরোপীয় জাতিবৃন্দের ভাষা ও সাহিত্যে অল্প বিস্তর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। তাহাদের জাতীয় জীবনও প্রায় তদ্রূপ। চীন কিম্বা ভারতবর্ষ এত নিকটে অবস্থিত হইলেও তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে কোনও প্রকার সামঞ্জস্য নাই, তাহাদের জাতীয়জীবনের মধ্যেও সেই জন্য সমুদ্রতুল্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় জীবনের সংগঠনে, উদ্বোধনে ও বিকাশে জাতীয় সাহিত্য বর্ত্তমান যুগে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে। এক্ষণে জাতীয় জীবনের উপর সাহিত্যের সেই প্রভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

মানব তাহার জাতীয় স্বত্ত্বা (National existence) উপলব্ধি করিবার পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের জনসমষ্টি লইয়া সামাজিক জীবন গঠন করিত। একস্থানে বাসই এইরূপ সম্মিলিত জীবনের প্রধান ও মূলীভূত কারণ। কিন্তু তাহার পরই ধর্ম্মের সাম্য ও ভাষার সাম্য মানবের এই সম্মিলিত জীবন গঠনে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু অগ্রে ভাষা সাম্য না থাকিলে প্রথাগত বা স্বভাবগত কোন সাম্যই সম্ভব হইত না; ও এই বিবিধ সাম্যের ফলে তাহাদের মিলিত জীবন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া এই সামাজিক জীবনের ভিতর দিয়া কালক্রমে তাহারা জাতীয় জীবনে উপস্থিত হইতে পারিত না। এস্থলে বলা উচিত যে স্থানগত ও রাষ্ট্রগত অধিকার মানবের উপর যতই আধিপত্য বিস্তার করুক না কেন ভাষা বা সাহিত্য ও স্বভাবগত (স্বভাব সাহিত্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়) প্রভাব মানবের মনের উপর তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। বোস্‌নিয়ার অন্তর্গত শ্লাভগণ এত যুগ ধরিয়া অষ্ট্রীয়ার রাষ্ট্রাধীন থাকিলেও তাহাদের স্বভাবগত ও ভাষা বা সাহিত্যগত পার্থক্য তাহারা চিরদিনই বজায় রাখিয়াছে। রাষ্ট্রগত ও স্থানগত একতা তাহাদের এ পার্থক্য দুরীভূত করিতে পারে নাই। তাহাদের এই ভাষাগত জাতীয় বৈষম্যের ক্ষণিক উদ্বেলনই যে আজ সমস্ত য়ুরোপব্যাপী এই মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। ফ্রাঙ্কো প্রাসিয়ান্ যুদ্ধের পর আলসাস্-লোরেন জার্ম্মাণির করতলগত হইলেও আজ পর্য্যন্তও উহার অধিবাসীবৃন্দ পুনরায় ফরাসীর অন্তর্ভূক্ত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। পোলাণ্ড চিরকাল রাসিয়ার পদানত থাকিলেও উহার অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের ভাষাগত বা সাহিত্যগত ও স্বভাবগত পার্থক্য বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু যখনই তাহাদের জাতীয় স্বত্বা উদ্বুদ্ধ হইয়া মাথা খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছে তখনি আবার রাসিয়ার প্রচণ্ড আঘাতে উহা ধূলিসাৎ হইয়াছে। সাহিত্য ও ধর্ম্মের বৈষম্য না থাকিলে ভারতবর্ষ এতদিন অন্যজাতির সংঘর্ষে উহাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত।

কিন্তু এই যে ভাষা সাম্য—যাহার ফলে এতবড় একটা ক্রম বিকাশ মানবজীবনে প্রকটিত হইয়াছে—তাহা সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। অতএব এই ভাষা কি ও তাহার প্রভাব কিসে সে বিষয়ে আমাদের কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। "It is the expression of the common spirit and the instrument of intellectual intercourse. It is carried forward and handed down as a heritage in the family. The national language therefore keeps the sense of nationality awake and living by daily exercise. Even strange races, entering on the heritage of a new language, are gradually transformed in spirit by it until their nationality is changed." জাপানের বর্ত্তমান ও অতীত জাতীয় জীবনের বিষয় আলোচনা করিলে এই সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি হয়। অধুনা জাপান আপন সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া য়ুরোপীয় ভাষা ও সাহিত্য অবলম্বন করিতেছে। ফলে তাহাদিগের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় ভাবে গঠিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে।

ভাষা সাম্য তাহার এই প্রভাব মানব জীবনে সাহিত্যের ভিতর দিয়াই বিস্তার করিয়া আসিতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুম গন্ধবাহী সমীরণ যেমন বুকের মধ্যে ফুলের গন্ধ

চাপিয়া ধরিয়া চতুর্দ্দিক উল্লসিত করে—একটা নূতন জীবনের আন্দোলন জাগাইয়া তুলে, সাহিত্যও তেমনি বিশিষ্ট মনীষিগণের প্রজ্ঞা তাঁহাদের সমভাবীয় সমাজে প্রচার করিয়া জাতীয় জীবনের স্পন্দন জাগাইয়া তুলে। সাহিত্যই ভাষার সহায়তায় মানবের চিন্তা প্রণালীকে স্থায়ী করিয়া রাখে—সাহিত্যেই ভাষার পরিসমাপ্তি ও সার্থকতা! সাহিত্যের সহায়তায়ই মানব বংশপরম্পরায় আপনাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এক কথায় "The 'national movement' has received its chief impulse from national literature which is the means to community of thought and feeling, and to the common extension of intellectual possessions." ফরাসীদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে উপরোক্ত উক্তির সত্যতা সম্যক উপলব্ধি হয়; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে ফরাসী জাতি যখন বুর্বোঁ (Bourbons) রাজগণের দীর্ঘ ও কঠোর শাসন ও অত্যাচারে দাসত্বের নিম্নতম পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছিল সেই সময় রুসো (Rousseau) ভোলটেয়ার (Voltaire) প্রভৃতির অগ্নিমুখী লেখনীর দীপ্ত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। তাহাদের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া সাহিত্যই তখন ফরাসীগণকে তাহাদের বিস্মৃত জাতিস্বত্ব (national right) স্মরণ করাইয়া দিয়া ফরাসী বিপ্লবের সূচনা করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই ফরাসী জাতি তাহাদের তৎকালীন সামাজিক কুপ্রথা, ধর্ম্মের ব্যভিচার ও শাসকের স্বেচ্ছাচারকে উপেক্ষা করিয়া সবলে আপনাদের জাতীয় জীবনকে খাড়া করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল "By means of their work and that of their followers it was brought about that long before the Revolution of 1789, there had occured a revolution in the realm of ideas, by which the hold of the existing church, state and soceity on the minds of men has been signally loosened" ইহার ফলাফল যাহাই হউক এই বিপ্লব যে সাহিত্যের কষাঘাতে নিদ্রিত জাতীয়জীবনেরও জাতীয়সত্ত্বার স্পন্দন অনুভূতির ফল সম্ভূত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এবং এই যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহাদের জাতীয় জীবনে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল তাহারই ফলে আজ তাহারা এই দীর্ঘ চারিবৎসর ধরিয়া প্রবল পরাক্রান্ত জার্ম্মাণির সহিত বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া পৃথিবীর বুকের উপর আপনার স্থান ও স্বত্ত্বা স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কিন্তু যদি সাহিত্য না থাকিত তাহা হইলে রুসো ভোল্‌টেয়ার প্রভৃতি এমনভাবে তাহাদের শিক্ষা সমগ্র জাতির ভিতর প্রচার করিতে পারিতেন কি? সাহিত্যের সহায়তায়ই কি এ জাতীয় উদ্বোধন সংঘটিত হয় নাই? সেইরূপ ইংলণ্ডের উৎপীড়ক ষ্টুয়ার্ট বংশের রাজত্বের প্রারম্ভে ইংলণ্ড যে দাস্যভাবে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা হইতে তাহার মুক্তির মূলেও আমরা সাহিত্যের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারি। সেইসময় ক্রম্‌ওয়েল প্রমুখ রাষ্ট্রবিপ্লবকারীগণ ষ্টুয়ার্ট রাজগণের স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন, মিল্টন প্রমুখ ব্যক্তিগণের সাহিত্যিক আন্দোলনের ফলেই কি তাহা আরব্ধ ও ক্রমবর্দ্ধিত হয় নাই? পার্লিয়ামেণ্ট ও রাজশক্তির মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ বাধিবার পূর্ব্ব হইতেই পিউরিটান (Puritan) সাহিত্যিকগণ "Waged war against custom, tradition, tyranny in church and in state for the sake of what seemed to them a nobler order and a stricter allegiance." এবং এই সাহিত্যিক সংঘর্ষই ইংলণ্ডের প্রজাতন্ত্রের সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে স্বীয় শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অধুনা প্রবল পরাক্রান্ত জার্ম্মানীর জাতীয় জীবন ট্রিট্‌স্‌কে (Trietschke) বার্ণহার্ডি (Barnhardi) প্রভৃতি কয়েকজন মনীষির অগ্নিময়ী লেখনীর ফল সম্ভূত সে বিষয়ে কোনই মতভেদ নাই।

এযাবৎ আমরা জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় উন্নতিতেই সাহিত্যের প্রভাব আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু জাতীয় জীবন বলিতে রাষ্ট্রীয় ভিন্ন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনও বুঝি। আদি যুগ হইতে মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপর জাতীয় সাহিত্য যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে তাহার বিশেষ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ভারতবর্ষের সাহিত্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিকল্পনা লইয়াই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়াও ইংলণ্ডের এ্যাডিসন (Addission) মিল্টন (Milton), বাট্‌লার (Butler) প্রভৃতি, ফ্রান্সের ভোল্‌টেয়ার (Voltaire), স্পেনের লোপ্‌-ডে-ভিগা (Lop De Vega) সার্ভ্যান্টিস্‌ (Cervantes) ও রাসিয়ার টলষ্টয় (Tolstoy) এর অমর লেখনি চিরদিন সাহিত্যজগতে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির সহায়তা করিবে।

সামাজিক জীবনেও সাহিত্য আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে সঙ্কোচ করে নাই। অন্য পক্ষে আমাদের সামাজিক জীবন সম্পূর্ণভাবে জাতীয় সাহিত্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় সাহিত্যের সেই সমাজের একখানা সুনির্ম্মল দর্পণের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই জাতী গার্হস্থ জীবন প্রতিফলিত করে। বঙ্গদেশে কবিকঙ্কণ প্রভৃতির সময়ে যুদ্ধ বিগ্রাহাদি সর্ব্বদাই সংঘটিত হইত, ও এই কৃশাঙ্গ, ভীরু বঙ্গবাসীগণের মধ্যেও সীতারাম, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি দুই একজন প্রকৃত বীরের অভাব ছিল না। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যে এই বীরত্বের বর্ণনা বা আলোচনা বড় স্থান পায় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের হস্তে পড়িয়া বীরত্বের বর্ণনায় বীরগণের অস্ত্রের "শন্‌ শন্‌ একরূপ ভ্রমর গুঞ্জনের মত বোধ হয়।" প্রকৃত যুদ্ধের বর্ণনা অপেক্ষা অস্ত্ররক্ষার বর্ণনাই অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে।

"যতেক ব্রাহ্মণ পাইক্‌ পৈতা ধরি করে।
দন্তে তৃণ করি তারা সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে।"

এইরূপ বর্ণনা মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যে বিরল নহে। "কাল কেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ভীমের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়াও বীরত্বের জগতে একটি মোমের পুতুলের ন্যায় নম্র করিয়া ফেলিয়াছেন।" ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি নামের স্থলে প্রাণকুমার মিহিরকুমার প্রভৃতি নাম স্থান লাভ করিয়াছে। এই সকল সাহিত্যের প্রভাবে বাঙ্গালীর যে আর্য্যতেজে সিংহল বিজয় সম্ভব হইয়াছিল সে বিক্রম ক্রমে সুকুমার ভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। —মালকোঁচা ফুলকোঁচা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু প্রেমের কথা বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয় নাই। প্রেমের বর্ণনায় যেমন বঙ্গসাহিত্যের তুলনা নাই, স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি কোমল গুণনিচয়ও বঙ্গচরিত্রের দ্বিতীয় নাই। তাই ইংরাজি সাহিত্যে যখন—

Into the volly of death
Marched the three hundred"

প্রভৃতি বর্ণনার পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল তখন বাঙ্গলা সাহিত্য

"মো যদি সিনান লাগিয়া ঘাটে, আর ঘাটে পিয়া নায়।
মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়া, বাহু পশারিয়া রয়॥
বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়।
আমার নামের একটি আখর পাইলে হরিষে লেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া ফিরয় কতই পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে সে দিন সে মুখে থাকে॥
"মনের কাকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর কিছু জানে অনুমানে।"

প্রভৃতি প্রেম ও এরূপ উন্মাদনার চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছিল। কোমলে কঠোর এরূপ তুলনা আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। "কিনিয়া চাঁপার ফুল কেহ দেহি কাণে।"

ইহার সহিত কোন বড় ইংরাজ লেখকের "Rude nations delight in flowers" এর তুলনা ইংরাজ ও বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের সমতুল্য।

জাতীয় সাহিত্য কিরূপে জাতীয় জীবনকে চিরকাল প্রলুব্ধ করিয়া আসিতেছে তাহা আমরা অলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে এই বিষয়ে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের স্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইংরাজি সাহিত্য কিম্বা ফরাসি সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গসাহিত্য এখনও তাহার শৈশব সীমা অতিক্রম করে নাই। এ সকল সাহিত্যের তুলনায় বঙ্গসাহিত্য যে অনেক বিষয়ে নিকৃষ্ট তাহার কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গভাষায় দৈন্য বা বঙ্গে মনীষির অভাব বঙ্গ সাহিত্যের সে নিকৃষ্টতার কারণ নয়। অন্যান্য সাহিত্যের সহিত বঙ্গ সাহিত্যের বয়সের পার্থক্যই ইহার মূলীভূত কারণ একহাজার বৎসরের উপর ইংরাজি সাহিত্য জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছে—কত বাধা বিঘ্ন—কত ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা ও পরিণতির জ্ঞানে উহা আজ মানব সমাজে আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের বয়স একশত বৎসরের বেশী উপরে হয় নাই।

কিন্তু ইতিমধ্যেই বঙ্গসাহিত্য কয়েক বিষয়ে অন্যান্য সাহিত্যের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আধ্যাত্মিক পরিকল্পনায় বঙ্গসাহিত্য জাগতিক সাহিত্যে ইহারই মধ্যে

আপন স্থান লাভ করিয়াছে ও পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্য বীরগণও ইহা কিছুদিন পূর্ব্বে মানিয়া লইয়াছেন। কবির ভাষায় বলিতে গেলে "দেবভাষা পৃষ্ঠে যার কিসের অভাব তার ?" সত্যই জগতের প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্য তাহার গৌরবময়ী জ্ঞানের আকর লইয়া যখন বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেছে তখন বঙ্গ সাহিত্যের এ বিকাশ কিছুই আশ্চর্য্য নয়। এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গসাহিত্য যে একদিন জাগতিক সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পরিগ্রহণ করিতে পারিবে এ আশা করাও বোধ হয় অসমীচিন নয়।

বস্তুতঃ বঙ্গবাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভাববিস্তার করিতে বঙ্গসাহিত্যের শক্তির আভাস আমরা কিছু কিছু পাইয়াছি। সাহিত্যের প্রভাবে মধ্যযুগেই আমাদের নৈতিক শক্তির যে বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নোক্ত এই উদাহরণটি হইতেই বুঝা যাইবে যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ইতরবর্ণের মধ্যে বিশাল গণ্ডির রেখা নির্দ্দেশিত হইয়াছে, সেই সমাজের ক্ষুদ্র একজন পূজক ব্রাহ্মণ—

"শুন রজকিনী রামি
ও দুটি চরণ, শীতল দেখিয়া শরণ লইলাম আমি॥
তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও পিতৃমাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥

এইরূপ বর্ণনার দ্বারা আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন। আপনার পরিপূর্ণ কিন্তু সমাজনিন্দিত প্রেম উচ্চকণ্ঠে সমাজেরই মুখের উপর প্রকাশ করিতে তিলমাত্র সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করেন নাই।

কিন্তু রাষ্ট্রীয়জীবনে উহার প্রভাব এখনও সম্যক্‌বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। অবশ্য ভারতীয় জাতীয়স্বত্বাকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে বঙ্গসাহিত্য কতখানি সহায়তা করিতে পারে তাহা বলা কঠিন। কারণ, ভারতবর্ষে ধর্ম্মভেদে ও প্রদেশভেদে নানা জাতীর সৃষ্টি হইয়াছে ও প্রত্যেক জাতিরই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আছে। কিন্তু এই যে বিভিন্ন জাতি ইহাদের সমষ্টি লইয়াই ভারত। ইহাদের প্রত্যেকের জাতীয় জীবন যদি প্রবুদ্ধ হয় ও সেই উদ্বোধনের দিনে যদি সকলের সম্মিলিত ও সাধারণ স্বার্থ প্রত্যেকের মনে অধিপত্য লাভ করিতে পারে তবে সম্মিলিত ভারতীয় জাতি স্বত্বার উপলব্ধি কঠিন হইবে না। তাই সমগ্র ভারতবর্ষের দিক হইতে দেখিতে গেলেও যে বঙ্গসাহিত্যের কোন উপকারিতা না আছে তাহা নয়। বঙ্গসাহিত্য ভারত সাহিত্যের একটী অঙ্গ ত।

সমগ্র ও সম্মিলিত ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু প্রাদেশিক জাতিস্বত্বা ও একতার দিক্ হইতেও বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন "ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যে যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সংর্ব্বাংশে এক, যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, একদেশ তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা জ্ঞান নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালী জাতির একতা বোধ নাই, শিখের মধ্যে শিখজাতির একতা বোধ নাই। ....জাতি প্রতিষ্ঠা নানাকারণে ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে লোপ পাইয়াছে।" তাহার পর শিবাজীর মহামন্ত্রে মহারাষ্ট্রগণের জাতীয় জীবনের সাময়িক উপলব্ধি ও রণজিৎ সিংহের প্রণোদনে শিখগণের জাতীয়স্বত্বার আংশিক অনুভূতির ফল আলোচনা করিয়া বঙ্কিমবাবু আবার বলিয়াছেন—"যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল তবে সমুদয় ভারত এক জাতীর বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত ?"

সুতরাং দেখা যাইতেছে বঙ্গসাহিত্য সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যদি শুধু বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে তবে আমাদের পক্ষে তাহাও তুচ্ছ নয়।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গসাহিত্য এই জাতীয় উদ্বোধনে প্রভূত সহায়তা করিতে পারে। ইংলণ্ড ফ্রান্স ইটালী, জার্ম্মানী, যেদিকেই আমরা তাকাই সেইদিকেই জাতীয় জীবনীশক্তির কেন্দ্র জাতীয় সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। সাহিত্যপ্রসূত জ্ঞানালোক মানবের চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে,—সাহিত্যের উত্তেজনায় নিদ্রিত জাতি জাগিয়াছে,—সাহিত্যের তীব্র কষাঘাতে জাতির মধ্য হইতে স্বেচ্ছাচার, ব্যভিচার দূরে পলায়ন করিয়াছে,—সাহিত্যের প্ররোচনায় জাতির মনুষ্যত্ব নিদ্রোত্থিত সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছে।

তবে বঙ্গসাহিত্যও কেন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে না ? যে সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঔপন্যাসিক, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের মত নাট্যকার,

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনসেন ও রবীন্দ্রনাথের মত কবি আবির্ভূত হইয়াছেন সে সাহিত্যে মনীষা, প্রজ্ঞা, জ্ঞানের অভাব কি ? যে সাহিত্যের কবি গাহিয়াছেন —

"এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য হিন্দুমুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ এস এস খ্রীষ্টান্।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধর হাত সবাকার,
এসহে পতিত, কর অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে,
আজি ভারতের, মহা মানবের সাগর তীরে।"

সে সাহিত্যের সার্ব্বজনীন প্রেম, সে সাহিত্যের উদারতা সব পার্থক্য সব ব্যবধানকে ডুবাইয়া দিয়া জাতীয় উদ্বোধনে কি সক্ষম নয় ? যে সাহিত্যের নাট্যকার—

"গিয়াছে দেশ দুঃখ কি, আবার তোরা মানুষ হ'।" এই মহামন্ত্রের সাধনা প্রচার করিতে পারেন, সে সাহিত্যে শিক্ষার শিক্ষকের অভাব কি ?

তাই বলি বঙ্গসাহিত্য অক্ষয় হউক। অন্যান্য সাহিত্যের মত তাহার শিক্ষায় আমাদের এ নিদ্রিত জাতি-জীবন সোণার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিতা রাজকুমারীর মত জাগিয়া উঠুক,— সুনিপুণ অঙ্গুলি সঞ্চালনে বীণার তারের ঝঙ্কারের মত আমাদের সুপ্ত মনুষ্যত্ব, লুপ্ত গৌরব বাজিয়া উঠুক। বঙ্গ-সাহিত্য ধন্য হউক, আমরাও ধন্য হই।

শ্রীসুনীল সেন।

মায়ের পূজা

প্রণমি শ্রীপাদ পদ্মে গরীয়সী মা আমার,
তোমার চরণ পূজা জীবনে করেছি সার।
মন্দির-দুয়ারে তব বিঘ্ন যদি আসে রুখি',
তোমার পূজার লাগি হই যদি চির-দুঃখী ;
সাধনার পথে মাগো বিপদ বিষাদ-ব্যথা,
চির-সাথী হ'য়ে মোর দাঁড়ায় যদি বা হেথা—
জীবনের লক্ষ্য ভুলি' দুর্ব্বল ভীরুর মত,
তবু কি ত্যজিব কভু মা তোমার পূজা-ব্রত ?
তোমার উর্ব্বর ক্ষেত্র হয় যদি তপ্ত মরু,
না দেয় রসাল ফল কাননে তোমার তরু ;
বিহগের মধু-গীতি কভু যদি হয় বন্ধ,
গন্ধবহ নাহি আনে সুরভি কুসুম-গন্ধ ;
বসন্তে না ডাকে পিক কাননে না ফুটে ফুল,
মধু-লোভে কভু যদি না আসে মধুপ-কুল ;
তোমার চরণ চুমি' জাহ্নবী-যমুনা নদী,
তুলি জল-কল-তান নাহি বহে কভু যদি—
আমার নয়নে তবু নহ কিগো জন্মভূমি,
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' আরাধ্যা জননী তুমি ?
ভাগ্য দোষে যদি মাগো নিখিল-জগৎ মাঝে,
তোমারি সন্তান-দল দাঁড়ায় ভিখারী সাজে ;
যদিবা কখন তারা হারা'য়ে মা বীর্য্য-বল,
পরের দুয়ারে ঘুরি' ফেলে শুধু অশ্রু-জল ;
হ'য়ে যদি গৃহ-শূন্য তরু-তলে কর বাস,
কাঙ্গালিনী বলি' তোমা পরে করে উপহাস—
তবু মা তোমার পূজা যাব না কখন ভুলি,
আরাধ্যা জননী বলি নিব তব পদ-ধূলি।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়।

সুধীবচন

১। কুগ্রামবাসঃ কুজনস্ত সেবা
কুভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্তা
বিনাগ্নিনা সন্দহতি শরীরম্॥

কুগ্রামে বাস, কুজনের সেবা, কুভোজন, ক্রোধমুখী ভার্য্যা, মূর্খপুত্র, বিধবা কন্তা—এই সব অগ্নিবিনাও দেহকে দগ্ধ করে।

২। অনেক শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
অল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥

শাস্ত্র অনেক, জানিবার বস্তু বহু, সময় অল্প, বিঘ্নও বিস্তর সুতরাং যাহাতে যাহা সার আছে, তাহাই লইতে হইবে, হংস যেমন জলের মধ্য হইতে দুগ্ধ মাত্র গ্রহণ করে।

৩। নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানং।
বয়োগতে কিং বনিতা বিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

নির্ব্বাণ দীপে তৈল দান, চোর গেলে সাবধানতা, বয়স গেলে বনিতা-বিলাস, এবং জল সরিয়া গেলে সেতুবন্ধ সব বৃথা।

৪। রূপং জরা সর্ব্বসুখানি তৃষ্ণা
খলেষু সেবা পুরুষাভিমানং।
যাচ্ঞা গুরুত্বং গুণমাত্মপূজা
চিন্তা বলং হন্ত্যদয়া চ লক্ষ্মীম্॥

জরা রূপকে, বাসনা সর্ব্বসুখকে, খলের সেবা পুরুষাভিমানকে, যাচ্ঞা গুরুত্বকে, আত্মপূজা গুণকে, চিন্তা বলকে এবং অদয়া লক্ষ্মীকে বিনাশ করে।

৬। অর্থো নরাণাং পতিরঙ্গনানাং
বর্ষা নদীনামৃতুরাট্ তরুণাং।
স্বধর্ম্মচারী নৃপতিঃ প্রজানাং
গতং গতং যৌবনমানয়ন্তি॥

অর্থ নরগণের, পতি নারীদের, বর্ষা নদীসমূহের, বসন্ত ঋতু তরুগণের এবং স্বধর্ম্মচারী নৃপতি প্রজাদের, যৌবন অর্থাৎ বল ও শ্রী বারবার গত হইলেও আবার ফিরিয়া আসে।

৭। জিতেন্দ্রিয়ত্বং বিনয়স্ত কারণং
গুণপ্রকর্ষ বিনয়াদবাপ্যতে।
গুণাধিকে পুংসি জনোঽনুরজ্যতে
অনুরাগঃ প্রভাবো হি সম্পদঃ॥

জিতেন্দ্রিয়ত্ব বিনয়ের কারণ, বিনয় হইতে গুণপ্রকর্ষ লাভ হয়, শ্রেষ্ঠ গুণবান্ পুরুষের প্রতি লোকে অনুরক্ত হয় এই লোকানুরাগই প্রভাব ও সম্পদ।

৮। ত্রিবিক্রমোঽভূদপি বামনোঽসৌ
স শূকরশ্চেতি সবৈ নৃসিংহঃ।
নীচৈরনীচৈরতি নীচনীচৈঃ
সর্ব্বরূপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যং॥

ত্রিবিক্রম (বিষ্ণু) বামন হইয়াছিলেন, তিনিই শূকর হইয়াছিলেন, তিনিই আবার নৃসিংহ হইয়াছিলেন। নীচ, অনীচ, অতি নীচ, সকল উপায়েই ফল লাভ হয়।

৯। বাল সখিত্বমকারণহাস্যং
স্ত্রীষু বিবাদমসজ্জনসেবা।
গর্দভযানম সংস্কৃত বাণী
ষট্সু নরো লঘুতামুপযাতি॥

বালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব, অকারণ হাস্য, স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ, অসতের সেবা, গর্দ্দভ যান, অসংস্কৃত কথা,—এই ছয় দোষে মানুষ লঘু হয়।

১০। ধনেন কিং যো ন দদাতি যাচকে
বলেন কিং যশ্চ রিপুং ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো নঽধর্ম্মমাচরেৎ
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥

যাচককে যে না দেয়, ধন তার বৃথা ; শত্রুকে যে দমন না করিতে পারে, বল তার বৃথা ; ধর্ম্ম যে আচরণ করে না, শাস্ত্রজ্ঞান তার বৃথা ; জিতেন্দ্রিয় যে না হয়, আত্মাই তার বৃথা।

১১। মনীষিণঃ সন্তি ন তে হিতৈষিণঃ
হিতৈষিণঃ সন্তি ন তে মনীষিণঃ।
সুহৃচ্চ বিদ্বানপি দুর্ল্লভো নৃণাং
যথৌষধং স্বাদু হিতং চ দুর্ল্লভম্॥

মনীষী অনেক আছে, কিন্তু তারা হিতৈষী নয়, হিতৈষী অনেক আছে, কিন্তু তারা মনীষী নয়, স্বাদু—অথচ হিতকর ঔষধ যেমন দুর্লভ, বিদ্বান্ সুহৃৎও তেমনই বহুলোকের পক্ষে দুর্লভ।

প্রিয়া

(১)

উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত তরঙ্গিত হৃদি
করি স্থির প্রশান্ত শীতল,
হে প্রেমসম্ভবা দেবি! প্রকাশিলে তুমি
বিকাশিয়া চিত্ত-শতদল!

(২)

অপূর্ব্ব কল্যাণরূপে ভরিল ভুবন
তৃপ্ত হ'ল বুভুক্ষু পরাণ,
কত জন্মান্তের তৃষা—ক্ষিপ্ত আকিঞ্চন—
মুহূর্ত্তেকে হ'ল অবসান!

(৩)

অজ্ঞাত-রাজ্যের কোন্ বিচিত্র রাগিনী
ঝঙ্কারিল অন্তর-বীণায়,
উৎসারিল সুধা-উৎস দগ্ধ মরু 'পরে
মুক্ত করি 'নন্দন-শোভায়!

(৪)

হেরিলাম তুমি নহ নর্ম্ম-সহচরী
হে তাপসী প্রেয়সী আমার!
সকল শক্তির মূল জগদ্ধাত্রী তুমি
মহাপীঠ যোগ-সাধনার!

(৫)

কি সান্ত্বনা ঝরে পড়ে হাসিতে তোমার
প্রতি বাক্যে দেয় কিবা বল,
নিষ্ঠুর সংসার মাঝে সহস্র আঘাতে
রহিয়াছি অটল অচল!

(৬)

কি নিষ্কাম-সেবাব্রত শিখাইছ তুমি
আপনারে করি সদা দান,
বিশ্বজিৎ যজ্ঞে রতা যেন কল্পরাণী
সর্ব্বস্ব উৎসর্গি তৃপ্ত প্রাণ!

(৭)

নিঃসঙ্গ পান্থের তুমি অনন্ত পথের
শান্তিদাত্রী জীবন সঙ্গিনী!
কত সুখ দুঃখে নিত্য মিলায়ে হৃদয়
বহিতেছ পুণ্য-প্রবাহিনী!

(৮)

কে তোমারে বিঘ্ন ভাবে আধ্যাত্মলোকের
কেবা কহে মায়ার বন্ধন,—
মুক্তি তব ক্রীড়া সখী অয়ি শুচিস্মিতে!
কর স্বার্থ-শৃঙ্খল মোচন!

(৯)

বিশ্বাসে নির্ভরে তব পূর্ণ সারা হৃদি
তোমা মাঝে ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান,—
তুলসী মঞ্চের দীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যায়'
কর কোন্ আলোকের ধ্যান।

(১০)

তুমি মোর গৃহলক্ষ্মী, দরিদ্র কুটীরে
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী বিশ্বরাণী;
মুখরিলে শিশু-হাস্যে নীরব অসন
শুনালে কি আনন্দের বাণী!

(১১)

স্বর্গ-মর্ত্ত্য মাঝে তুমি রচিয়াছ প্রিয়ে!
কি অমৃত-মিলন-শরণী,
মুমুক্ষু আত্মার পাশে এনেছ বহিয়া
মন্ত্রপূত বিশল্যকরণী!

(১২)

বিশ্বের প্রতিমা তুমি দেবী, সখী, প্রিয়া,
প্রাণেশ্বরী, হৃদয়তোষিণী,
কত ছন্দে কত গীতে তোমারি বন্দনা
করে বিশ্ব দিবস-যামিনী!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

নন্দন কানন

(

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিতেই সুজাতা যখন ক্ষুদ্র শয্যা খানির উপর উঠিয়া বসিল, তখন তাহার মনে হইল, যেন একটা অকারণ আনন্দ, একটা নূতন বিস্ময়, তাহার অন্তর মধ্যে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

বাহিরে কেবল, নির্ম্মল আলোক সদ্যোজাত শিশুর হাসিটুকুর মতই ফুটিয়া রহিয়াছে! আকাশে ছিন্ন, লঘু, মেঘ ছিল; নিদ্রা ভঙ্গের পর স্বপ্নের স্মৃতিগুলি যেমন বিচ্ছিন্ন ভাবে মনের মধ্যে আনাগোনা করে, মেঘখণ্ডগুলিও নীলাকাশের গায়ে তেমনি ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

সুজাতা তাহার ঘরের জানালা খুলিয়া ফেলিল; খানিকটা প্রভাতের কোমল আলোক মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যে ঠিকরিয়া পড়িয়া হাসিয়া উঠিল।

অন্তর যখন পরিপূর্ণ থাকে, তখন বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির অহ্বানটা বুকের কাছে আসিয়া একটু বেশী করিয়াই সাড়া দিয়া উঠে! ভিতরে ভিতরে যে আনন্দ, পুলক, অনুভূতি, সমস্ত তুচ্ছতার গণ্ডী ভেদ করিয়া উঠে, সে তাহাকে দুই হাতে বরণ করিয়া লয়, কোনও নিষেধ সে মানে না, কোনও বাধা সে গণ্য করিতে চাহে না।

বুকের মধ্যে এ যে কিসের আনন্দকে সে ধরিয়া বাঁধিয়া আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, তাহা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। একটা পুলক, একটা আনন্দহিল্লোল তাহাকে ছাড়াইয়া, ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল, এবং বাহিরের ঐ নীলাকাশের মধ্যে, নির্ম্মল আলোকহিল্লোলের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া লুটাইয়া দিতে চাহিতেছিল।

এমন সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে অজিত আসিয়া ডাকিল,—"দিদি—ও দিদি,—"

সুজাতা একমুখ হাসি লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল,—

অজিত কহিল, "আমার পড়বার ঘরে যাবি, দিদি?—" এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া দিদিকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

"ছাড়, ছাড়, ওরে পাগল, আমি এম্‌নিই যাচ্ছি।—"

কিন্তু অজিত কথা শুনিল না; সুজাতাকে টানিয়াই লইয়া চলিল।

পড়িবার ঘরে ছোট টেবিলটার কাছে টানিয়া আনিয়া অজিত দিদিকে চেয়ারের উপরেই বসাইয়া দিল; এবং দিদিকে দেখাইবার জন্য দেরাজের ভিতর হইতে যে মহার্ঘ্য দ্রব্যটী টানিয়া বাহির করিল, সেটা একটা ছোট দূরবীন!

"ওরে পাগল! দূরবীন্ নিয়ে এসেছিস্, ভেঙ্গে ফেল্‌বি যে।"—

যুদ্ধজয়ী বীরের মতই বুক টান করিয়া অজিত কহিল "তা ভাঙ্গ্‌লেই বা কি? ওটা যে আজ থেকে আমার!—আর সত্যি কি আমি ওটাকে ভেঙ্গে ফেল্‌ব?—দিদির যেমন কথা!—কেমন করে ওটা ব্যবহার কর্ত্তে হয়, কোথায় ওর কল কব্জা, আমি সবটাই যে শিখে নিয়েছি!"—

বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া সুজাতা এতক্ষণ অজিতের গর্ব্বোৎফুল্ল মুখের দিক চাহিয়া ছিল। সবটা শুনিয়া কহিল। "ওটা তোর কিরে?"—

"দাদাবাবু আমাকে দিলেন যে? ভারি জানিস্ তো তুই!"—কোঁচার খুঁট দিয়া একবার পরম যত্নে মুছিয়া লইয়া দূরবীন্‌টাকে অজিত চোখের কাছে তুলিয়া লইল!—জানালার ফাঁক দিয়া নন্দন পাহাড় দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে বাগাইয়া ধরিল।

পুলকের আবেগে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "এই দেখ্, মন্দিরটার গায়ে যে ছোট টীকটীকিটা রয়েছে, আমি তা'ও এখান থেকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

দুই হাতে অজিতকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া সুজাতা, কহিল, "তোকে দিলেন কিরে, অজু?"

"হাঁ, আমাকেই তো দিলেন,"—একটু গলা খাটো করিয়া কহিল, "ওই একদিন চেয়েছিলুম কিনা, যাবার দিন দিয়ে যাবেন বলেছিলেন। কিন্তু আজ ভোরেই উঠেই বল্‌লেন, 'এই নাও তোমার দূরবীন্'। দেখ্ দিদি, আমি তো প্রথমটা বিশ্বাসই কর্ত্তে পারিনি,—কিন্তু যখন কলকব্জা

খুলে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, তখন বুঝ্‌লাম, সত্যিই দিলেন —কিন্তু দিলেন কেন দিলেন, তা' জানিস্?"—

সুজাতার বুকের মধ্যে রক্তের প্রবাহটা একটু দ্রুত চলিতেছিল। সে অজিতের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

অজিত হাত ছাড়াইয়া লইতে লইতে কহিল—

"দেখ্ দিদি, আমি একটা মস্ত লোক হবই, তিনি বলেছেন!—দেখিস্ তা' আমি হবই!"—

"তা' তো হবি,—কিন্তু দূরবীন্ দিলেন কেন, বললিনেত?"—

অজিত তাহার ক্ষুদ্র রক্তাধর উল্‌টাইয়া কহিল, "ওঃ—সে—কাল যে মন্দির থেকে নিয়ে এসেছিলুম্—তাই!"—

ও কারণটা যে দূরবীণ্ পাওয়ার পক্ষে খুব একটা মস্ত কারণ, তাহা তেমন করিয়া অজিতের মনে হইতেছিল না। সে দূরবীন্ তুলিয়া লইয়া জানেলার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল এবং দুই একবার চোখে লাগাইয়াই দিদির দিকে ফিরিয়া কহিল—

"চল্ দিদি, ছাতে যাই, সেখান থেকে সব দেখ্‌ব।"

তখন দুইজনে ছাতে উঠিয়া আসিল।

ছাতে আসিয়া চঞ্চল অজিত দূরবীণ্ ঘুরাইয়া নানা দ্রব্য দেখিতে লাগিল। সুজাতা একটা বেঞ্চের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। দিদির উৎসাহহীন ভাবটা অজিতের এতক্ষণ লক্ষ্যই ছিলনা। এখন হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি তুই একবারটা দেখ্‌বিনি?" এখান থেকে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের গাছগুলি সাদা চোখে কলাই শাকের ক্ষেতের মতই দেখা যাচ্ছে, দূরবীণের ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখ্ ওগুলি কত বড় বড় গাছ!"

দূরবীণ্‌টা হাতে লইয়া সুজাতা ডিগ্‌রিয়া পাহাড় দেখিল, তার পর দূরবীণ ঘুরাইয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল।

নন্দন পাহাড় হইতে কেহ নামিয়া আসিতেছিল; ছাতের উপর হইতে সাদা চোখে তাহাকে অনেকটা ছোট দেখা যাইতেছিল। সুজাতা দূরবীণ ফিরাইয়া নন্দনপাহাড়ের দিকে ধরিল। মন্দিরটা দেখিল, অর্জ্জুন গাছটা দেখিল, তার পর যে নামিয়া আসিতেছিল, তাহাকে দেখিল।

মুহূর্ত্তমাত্র,—সুজাতার দুই কর্ণমূল রাঙ্গা হইয়া উঠিল। দূরবীণটা হাতে রাখাও কষ্ট হইয়া উঠিল; তবুও আর একবার সেইদিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া দেখিয়া লইল। পর-মুহূর্ত্তে হাত বাড়াইয়া দূরবীণটা অজিতকে দিতে যাইয়া সুজাতা দেখিল, পিছনে, স্মিতমুখে কেহ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

দূরবীণ্ অজিতের হাতে পৌছিবার পূর্ব্বেই নবাগতের হাতে আসিল। দূরবীণ্ ছাড়িয়া দিয়া সুজাতা ছুটিয়া পালাইতেছিল; যে আসিয়াছিল সে বাঁ হাত বাড়াইয়া তাহার অঞ্চল টানিয়া ধরিল এবং ডানহাতে দূরবীণ্ ধরিয়া নন্দন পাহাড় হইতে কে নামিতেছে তাহাকে দেখিল। ততক্ষণ সুজাতা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল।

অজিত আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—"বৌদি!"—

'বৌদিদি' একটু হাসিয়া অজিতকে দূরবীণ্‌টা ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন,—"চল্ সুজাতা, জলখাবারগুলি ঠিক ক'রে সাজিয়ে দিবি!—ঠাকুরপো ঐ নন্দন পাহাড় থেকে হাওয়া খেয়ে ফিরে আস্‌ছে! খাবার না পেলে আমার কাঁচা মাথাটাই যদি দাবী ক'রে বসে!"

সুজাতা একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। জেলের কয়েদীর মত কম্পিতপদে তাহার দিদিকে অনুসরণ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

(৭)

পরদিন বিকালের দিকে খানিকটা ঘুরিয়া বাসায় ফিরিতেই পিসিমা কহিলেন, "ওরে বিনু, বৌমার যে ভারি অসুখ করেছে;—তুই একবার তাকে দেখে আয়তো।"

"কই, আমি বেরিয়ে যাবার আগে ত কিছুই ব'ল্লেন না!"

"ও তেমনি মেয়ে কিনা, একেবারে অচল না হলে কি আর ব'ল্‌তে চায়?"

আর কোনও কথা না বলিয়া বৌদিদির ঘরের কাছে গিয়া ডাকিলাম, "বৌদিদি!"—

বৌদিদি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "এই যে আমি এখানেই রয়েছি; আমাকে নাকি শুয়ে না থাক্‌লেই চল্‌বে না" এই কথা কয়টী বলিবার সময় অনুভব করিলাম, কথা বলিতে তাঁহার খুব বেশী কষ্ট হইতেছে।

ব্যস্তভাবে কহিলাম, "তুমি হাস্‌ছ, বৌদি', তোমার চোখ মুখ যে একেবারে জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে; খুব বেশী অসুখ করেছে বুঝি? এখন কেমন বোধ করছ?"

আর একবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "না, এমন বেশী কিছু নয় ভাই, ও এখনি ঠিক্ হয়ে যাবে,—"

কিন্তু বৌদিদির উপেক্ষার হাসি দেখিয়া অসুখটা সারিয়া দাঁড়াইবার কোনও লক্ষণই দেখাইল না। বরং দেওঘরের জল হাওয়াতে রোগ সারে, তেমন কেহ রোগে পড়ে না বলিয়াই যেন, যাহাকে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে একেবারে প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়াই ধরিল। দুদিনের মধ্যেই বৌদিদির মুখের হাসিটুকু একেবারেই নিভিয়া গেল, এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থার মধ্যে যে দুই একটা ভুল কথা মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল, তাহা কেবলি গৃহস্থালীর কথায় ও সুজাতাকে গড়িয়া তুলিবার পরামর্শে পরিপূর্ণ!

ভারি ভয় পাইয়া গেলাম। পিশিমা আসিয়া কহিলেন, "ওরে বৌমার তো এমন অসুখ কোনো দিনই দেখি নাই; তুই অজয়ের কাছে তার করে দে,—কি জানি' কি আছে কপালে!"

দাদার কাছে তার করিয়া দিয়া দেওঘরের যত কবিরাজ ডাক্তার আনিয়া জড় করিলাম। ঔষধ আসিল; ডাক্তারদের সৃষ্টিছাড়া আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। ঔষধের চেয়ে শুশ্রূষার উপরেই যে রোগিণীর জীবনমৃত্যু বেশী নির্ভর করিতেছে তাহা বুঝাইয়া দিতে তাঁহারা ত্রুটী করিলেন না।

সুজাতা সব কথা শুনিল, এবং নিঃশব্দে শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল। পিসিমা তাঁহার পূজার ঘরে মালা জপ করিতে বসিয়া গেলন এবং মধ্যে মধ্যে বৌদিদির ঘরের কাছে আসিয়া সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পিসিমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন রাত্রি প্রায় এক প্রহর কাটিয়া গিয়াছে। সুজাতা বৌদিদির শিয়রে বসিয়া পাখা করিতেছিল। একটা ঈজি চেয়ারের উপর পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলাম। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইল, উঠিয়া গেলাম। বৌদিদির পাণ্ডুর ঠোঁট দুইখানা একটু নড়িল; সুজাতা একটু বেদানার রস মুখে ঢালিয়া দিল, রসটা গড়াইয়া পড়িয়া গেল। সুজাতা তাহার চকিতদৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য আমার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—"কি হবে?"—

কথাটা বলিতেই তাহার চক্ষুর পাতা ভিজিয়া উঠিল। প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করার চেয়ে, প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা যে কত কঠিন, তাহা সুজাতা এ কয়দিনে বেশ বুঝিয়াছিল তাই সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্বের মতই আবার পাখা করিতে লাগিল এবং মধ্যে একবার মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া লইল।

ঐ একটী ক্ষুদ্র বালিকার কাছে এ কয়দিনে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণটা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। দুই হাত পাতিয়া তাহার নিকট হইতে ক্রমাগতই ঋণ গ্রহণ করিয়া করিয়া নিজকে একেবারে ডুবাইয়া দিতেছিলাম; ঋণ গ্রহিতার যদি মনে মনে সঙ্কল্প থাকে যে, সে কোনও দিনই গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিবে না, তাহা হইলে যেমন অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্রমাগতই ঋণ গ্রহণ করিতে থাকে, আমিও ঠিক তেমনি সুজাতার কাছে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ গ্রহণ করিতেছিলাম। কোনও দিন শোধ করিতে পারিব এমন আশাও ছিল না, শোধ করিবার তেমন মতলবও বুঝি ছিল না।

এ কয়দিন পর্য্যন্ত ঐ ক্ষুদ্র বালিকাকে বৌদিদির শিয়রে দেখিতেছি। কি ক্লান্তিবিহীন, বিশ্রামহীন সেবা! আমি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতাম যে, অতটুকু বালিকা কেমন করিয়া রাতদিন ঐ আনন্দহীন রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত এবং রোগীর ঠোঁটের প্রত্যেক কম্পনটি পর্য্যন্ত নির্নিমেষনয়নে লক্ষ্য করিত। এত উদ্বেগ বুকের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াও সে যে কেমন করিয়া অমন শৃঙ্খলার সহিত নিপুণ হস্তে প্রত্যেকটী কাজ করিয়া যাইত, তাহা আমি বুঝিতেই পারিতাম না।

ঔষধটা খাওয়াইয়া দিলাম, বোধ হয় বুকে একটু বাধিল। হঠাৎ কেমন অস্থিরতা চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল; পরক্ষণেই মুখখানা একেবারে বিবর্ণ, রক্তহীন হইয়া গেল।

সুজাতা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"দিদি যে একেবারে কেমন হয়ে প'ড়লেন, দেখুন ত!"

"অতটা অস্থির হলে ত চলবে না, আমি চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছি, তুমি বাবাকে ডেকে আনত সুজাতা! যাও—যাও!"—

সুজাতা যাইবার কোনও লক্ষণই দেখাইল না; শুধু একবার ঘাড় বাঁকাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "না, আমি এমন অবস্থায় দিদিকে ফেলে যেতে পারব না।"—এই বলিয়া সে বেশ শক্ত হইয়া বসিয়া জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল।

এত যে বিপদ, তবু আমার মনে হইতে লাগিল ঐ মেয়েটী যেন তাহার ঠিক যায়গাখানিই দখল করিয়া বসিয়াছে, এবং সে যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া উঠিয়া না যায়, তাহা হইলে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়ার উপায় নাই।

বোধ হয় আমি আমার নিজের অন্তর থেকেই তাহাকে ঐ আসনখানি ক্রমেই ছাড়িয়া দিতেছিলাম, এবং তাকে সেখানে অধিষ্ঠিতা দেখিবার আনন্দ, কল্পনাতেই খানিকটা অনুভব করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাই, যখন অধিকার পাওয়ার পূর্ব্বেই তাহাকে ঐ যায়গাটীতে দেখিলাম, তখন ওটা যে তার প্রাপ্য নয়, অথবা সে যে ওস্থানটা দখল করিবার অধিকার এমনভাবে এখন পর্য্যন্ত পায় নাই, একথাটা একবারটীও আমার মনে হইল না।

দুই তিনবার জলের ঝাপ্‌টা দিতেই অস্থিরতার ভাবটা কাটিয়া গেল। সুজাতা তখন পাখাটা আমার দিকে সরাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত পরেই বাবাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

)

বোধ হয় সুজাতার প্রাণপণ সেবাতে পরিতুষ্ট হইয়াই মরণের দেবতাটী বৌদিদিকে পায়ে ঠেলিয়া রাখিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার পাদস্পর্শটাও তো তেমন কোমল নহে। তাই নিরাময় হইবার অবস্থায় পৌছিয়াও কিছুদিন পর্য্যন্ত এমনি দুর্ব্বল, কাতর রহিয়া গেলেন যে, পাশ ফিরিয়া শুইবার শক্তিও রহিল না।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, এযাত্রায় যে ইনি বাঁচিয়া গেলেন, সে কেবল এই অক্লান্ত পরিশ্রমী মেয়েটিরই শুশ্রূষার গুণে এবং এমন নিপুণ শুশ্রূষা তিনি তাঁহার দীর্ঘ ডাক্তারীর অভিজ্ঞতার মধ্যে আর কোনও দিনই দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

ডাক্তার চলিয়া গেল বৌদিদি আমার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "আলাউদ্দিন রাজপুতদের আক্রমণ করেছিল বলেই না, প্রমাণ হয়ে গেল, যে, রাজপুতের মেয়েরা কেমন হাস্‌তে হাস্‌তে এবং কতটা নির্ভয়ে আগুণের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরতে পারে! আমার অসুখ হয়েছিল বলেই না প্রমাণ হয়ে গেল যে, এই দুধের মেয়েটাও কতখানি শক্তি রাখে, সেবা কর্ব্বার ও শুশ্রূষা কর্ব্বার!"—কথাটা বলবার সঙ্গে বৌদিদির মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসিটুকু তাঁহার রোগশীর্ণ মুখের উপর তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের পাণ্ডুর লেখার মতন প্রতীয়মান হইতেছিল।

"তা' বাহাদুরীটা কার?—আলাউদ্দীনের আক্রমণের? না—রাজপুত মেয়েদের পুড়ে মরার?"—

"তুমি তো বল্‌বে রাজপুত মেয়েদের পুড়ে মরার বাহাদুরীটাই বেশী—কেমন নয় কি?"—

"ঠিক্ বিচার কর্‌তে হলে তো তাই বল্‌তে হয়, কেমন সু—?"—সুজাতার নামটা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, কথা ফিরাইয়া লইয়া কি যে বলিব স্থির করিবার পূর্ব্বেই বৌদিদি কহিলেন,—

"চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা;—ওগো কর্ত্তা, আলাউদ্দীনের আক্রমণ না হ'লে যে রাজপুত মেয়েদের ওসব পুড়ে মরাটরা কিছুই হত না, ইতিহাসেরও এ বাহাদুরীটা পেতে হ'ত না"—

যখন তর্কের আসরে নামিয়া সুজাতার পক্ষই গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছি, তখন লজ্জায় পড়িয়া হঠাৎ ফিরিবার ইচ্ছা হইল না।

কহিলাম, "রাজপুত মেয়েদের ভিতর পুড়ে মরার শক্তি ছিল বলেই না তারা পুড়ে মর্ত্তে পেরেছিল, নইলে কত যায়গায় তো দেখা গেছে,—"

বাধা দিয়া বৌদিদি কহিলেন, "ওগো উকিল মশাই, থাক্ আর বেহায়াপনা কর্‌তে হবে না. বিচ্ছে বোঝা গেছে; সুজাতারই জয় জয়কার হোক্;—কি বলিস্‌রে, সুজাতা!"

তর্কের মাঝখান থেকে বৌদিদি তো পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেনই; কিন্তু পরাজয়ের সমস্ত লজ্জাই যে আমার উপরেই চাপাইয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার গা জলিয়া গেল!

সুজাতার দিকে চাহিলাম, তাহার চোখমুখ অসম্ভব রকম লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুই হাতে আঁচলের একটা

খুঁট্‌ তুলিয়া লইয়া সে ক্রমাগতই আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল!

কিন্তু বৌদিদির নিষ্ঠুরতার সীমা ছিলনা। হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সে কথা যাক্‌, সুজাতা যে বায়না ধরেছে তার একটা ব্যবস্থা ত আমাকে কর্ত্তে হয়!"

মুখশ্রী যথা সম্ভব গম্ভীর করিয়া কথাগুলি বলিয়া গেলেন; আমার নিজের অবস্থাটা কিন্তু নিতান্তই শোচনীয় হইয়া উঠিল। বুকটা একটু কাঁপিতেছিল, একটু গলাটা ঝাড়িয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলাম,—

"কি রকম?"—

"এ কয়দিন তো তুমি ঠাকুরের রান্না খেয়েছ, ও আর সেটা মোটেই পছন্দ করছেনা। বুঝ্‌লে, গোঁসাই?"—

"গোঁসাই কি করবে তার?—তুমি উঠে পাক করবে নাকি?"—কথাটা ঠিক মানাইল না বুঝিলাম। একটু জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলাম।

"তা' নয় কর্ত্তা, ঐ প্যান্‌পেনে মেয়েটা মাথা খাচ্ছে আমার, ও তোমার জন্যে পাক করবে;—তোমার খাওয়া ভাল হয় না, এজন্য যে ওর দরদের অন্ত নেই!"—

সুজাতা পাখা ফেলিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বৌদিদি কহিলেন, "ওরে কলিতে তো কারু ভাল করতে নেই,—তোর আর্‌জি পেশ্‌ কর্ত্তে আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে আর তুই কিনা একটু হাওয়া দিচ্ছিলি, পাখাটা ফেলে চলে যাচ্ছিস্‌!"—

সুজাতা রাগিয়া গিয়াছিল; বক্রদৃষ্টিতে একবার বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়াই গেল।

বৌদিদি হাসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দূরবীন্‌ হাতে অজিত আসিয়া হাজির হইয়া কহিল, "দাদাবাবু, আজ রাস্তায় ভারি একটা মজা হয়ে গেছে;—ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সাহেব কোথা থেকে সাইকেল, ছুটিয়ে আস্‌ছিল, পথের ওপর একটা ষাঁড় ছিল, বেল্‌ দিতেই সেটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠ্‌ল. সাহেব সাম্‌লাতে না পেরে সাইকেল থেকে পড়ে গেল। রাস্তায় অনেক লোক ছিল, কেউ বা হেসে উঠ্‌ল, কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল; আমি ছুটে গিয়ে সাহেবকে ধর্ত্তেই, সাহেব হাস্‌তে হাস্‌তে দাঁড়াল। লেগেছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই সাহেব আমাকে পরিষ্কার বাঙ্গলায় তাঁর যে লাগেনি তা' বল্‌লেন! সাহেবরা এমন বাঙ্গালা কি বলতে পারে দাদাবাবু? আমি শুনে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।"

"বটে তুই যে সাহেবকে ধর্‌তে গেলি, তোর ভয় করল না?"—

"ভয় করবে কেন দাদাবাবু? ওতো মাটীতে প'ড়ে গড়াচ্ছিল; হেঁটে চ'লে যাচ্ছে.—সে সাহেবকেও আমি ভয় করিনে!"—

অজিত একটু বুক ফুলাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল! কথা শুনিয়া বৌদিদি হাসিয়া উঠিলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব তোকে আর কি বল্লেরে?"—

"সাহেব আমাকে তার কুঠিতে ধরে নিয়ে গেয়ে তার মেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল;—ঠিক্‌ আমার সমান বয়সী একটী ছেলে আছে, সে মেমসাহেবের ছোট ভাই। কিন্তু সে বোধ হয় আমার সঙ্গে জোরে পারে না; তার হাতের কব্জি আমি টিপে দেখেছি; খুবশক্ত—কিন্তু তা হলেও পাঞ্জা কষে, আর দেওয়ালের গায়ে ঘুষি ঠুকে আমি যা' হাত শক্ত করে তুলেচি; আমার সঙ্গে আর পার্‌তে হয় না!"—

"অবাক্‌ কর্‌লি যে অজিত, তুই এত কাণ্ড করে এলি সাহেবের কুঠিতে যেয়ে!—"

"মেম আমাকে রোজই যেতে বলেছে। মেমের একটি মেয়ে আছে; বৌদিদি, তোমার গায়ের রং সোণার মত, কিন্তু তার গায়ের রং ঠিক দুধের মত সাদা। চুলগুলি সোণালি রং এর, তোমার চুলের মতন এমন কালো,—এমন সুন্দর নয়!"—

"তুই তাকে বিয়ে করবিরে, অজিত?"

"দুঃ—বৌদির যে কথা! দেখুন্‌ তো দাদাবাবু, দূরবীণটার এই স্ক্রুটা আমি কিছুতেই খুল্‌তে পারলুম না!—দিদি সেদিন ছাতের উপর বসে এম্‌নি জোরে জোরে মোড় দিচ্ছিল, যে এখন আর খোলাই যাচ্ছে না।"

"ছাতের উপর তোর দিদি দূরবীন্‌ দিয়ে কি কচ্ছিলরে?" হঠাৎ বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তাই বলি আর কি?"—অজিতের মুখে একটু দুষ্টু হাসি ফুটিয়া উঠিল

"বল্‌ না লক্ষ্মী ভাইটী!"

"কি দেবে আমাকে?" --

আচ্ছা, তোকে এই—আমার সেই ষ্টাইলো পেন্‌ট দেব।"

"কই দাও,"—এই ষ্টাইলো পেন্‌টার দিকে অনেক দিন হইতে অজিতের যে একটা লুব্ধ দৃষ্টি ছিল, তাহা বৌদিদি জানিতেন।

"না দিলে তুই বল্‌বিনে?—যা, তবে তোকে আর দিলুম না।"—বৌদিদিকে অন্য কথা তুলিবার চেষ্টা করিতেই লুব্ধ অজিত বলিয়া উঠিল, "দিদিকে বলোনা কিন্তু দিদিমণি; দাদাবাবু নন্দন পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন, দিদি তাই দেখ্‌ছিল ওই দূরবীন্‌টা দিয়ে!"—

"আরে পণ্ডিত, তুমি দিদির নামে বানিয়ে বল্‌চ,—আসুক সুজাতা, আমি তাকে বলে দিচ্ছি!"

অজিত একটু অপ্রতিভ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তারপর যখন দেখিল, ষ্টাইলো পেন্‌ও হাত ছাড়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দিদির গালি খাবার পথও তৈয়ারী হইয়া যাইতেছে, তখন সে রুখিয়া উঠিয়া নিতান্ত নিরুপায়ের মতই বলিয়া ফেলিল,—

"চাইনে তোমার ষ্টাইলো পেন;—ভারিত জিনিষ; ওর একটা আমি বড় হ'লে কিনে নেব।"

বড় হইলে কিনিয়া লইবে মনকে এ প্রবোধটা দিয়াও কিন্তু তাহার চোখের কোণে জল আসিতেছিল। কারণ যে জিনিষটা সদ্যই পাওয়া যাইতেছিল, তাহা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যই পিছাইয়া গেল!

পর মুহূর্ত্তেই যখন বৌদিদি তাঁহার বালিশের নিম্ন হইতে সেই অপূর্ব্ব দ্রব্যটি বাহির করিয়া অজিতের সম্মুখে ধরিলেন তখন লুব্ধ অজিত এত বড় অপমানটাকেও মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলিয়া গেল এবং একেবারে ছোঁ মারিয়া তাঁহার হাত হইতে কলমটা লইয়া বাহির হইয়া গেল!

বৌদিদি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ!"

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত টেবিলের উপরকার এটা ওটা নাড়িতে লাগিলাম। বৌদিদিকে কিছু বলা দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিলে সব দিক্ রক্ষা হইবে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। একবার বৌদিদির মুখের দিকে চাহিলাম। শীর্ণ, পাণ্ডুর ললাটের উপর স্বেদবিন্দু ফুটিয়া রহিয়াছে। একটু হাসিয়া একটু কথা বলিয়াই যেন বড় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন মনে হইল। পাখাখানা তুলিয়া লইয়া একটু হাওয়া দিতেই বৌদিদি কহিলেন, "ওমা, ওকি! ছিঃ, হাওয়া দেওয়ার দরকার নেই তো!"

তাঁহাকে শশব্যস্ত দেখিয়া একটু হাসিয়া কহিলাম, "কই, এতদিন বলনি ত, বৌদি?"—

মুখে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন "বল্‌বার শক্তি থাক্‌লে বল্‌তাম বই কি! কিন্তু তবু মনে হয় ভগবান্ যে এতখানি অসুখ দিয়েছেন, কষ্ট দিয়েছেন, এরও যথেষ্ট আবশ্যকতা ছিল। যেখানে পাওয়ার দাবী আছে, সেখান থেকে যথেষ্ট পেলেও সেটা প্রাপ্যর সীমানার মধ্যেই থেকে যায়,—ছাড়িয়ে যায় না; কিন্তু যেখানে কিছুই পাওয়ার দাবী ছিল না, সেখান থেকে এতটাই পেয়েছি যে, সেই পাওয়াটা আমার একটা খুব বড় সমস্যার মীমাংসা করে দিয়েছে।"

বৌদিদির কথাগুলি যে আমার কাছে নিতান্ত হেঁয়ালীর মত বোধ হইল, এমনটা বলিতে পারি না, যেহেতু আমার মনের মধ্যে ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই এমন কতকগুলি কথা বৌদিদিকে বলিবার জন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল, যাহা এই কথাগুলির সঙ্গেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত।

বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম, "বেশ, তারপর?"—

তিনি কহিলেন, "আগে পাখাটা রাখ, পরে বল্‌চি!"

"আচ্ছা হাওয়াটা না হয় আমি নিজেই খেলাম।"—

বৌদিদি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "সোণা খাঁটি কিনা জান্‌বার জন্য মানুষকে সত্যিই অনেকখানি বেগ পেতে হয়। শুধু বাহিরটা দেখে যদি মানুষ সোণা চিন্‌তে পার্‌ত, কোনও কথাই ছিল না; কিন্তু তা'তো হয় না ঠাকুরপো; দুঃখের কষ্টিপাথরের উপর তাকে কত করেই যে কষে দেখতে হয়। নইলে প্রায়ই সোণা বলে মানুষ আদর ক'রে পেতল ঘরে নিয়ে যায়—"

"তারপর সিন্দুকে উঠিয়ে রাখে, এই ত?"

"না, গলায় পর্‌তে চায়; কিন্তু দু'দিন না যেতেই সবাই ধরে ফেলে, যা' এত করে নিয়ে আসা হয়েছে তা' সোণা তো নয়ই; পেতল বা গিল্‌টি!"

হাওয়া যে কোন্‌দিকে বহিতেছে, তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না, কিন্তু তবুও হঠাৎ মুখরের মতই বলিয়া ফেলিলাম, "খাঁটি সোণা তুমি কিছু পেয়েছ নাকি ?"

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বুঝি আর তর সইছে না, কেমন ? হাঁ, খাঁটি সোণা আমি কিন্তু পেয়েছি, এবং এই অসুখের মধ্যেই সোণা খাঁটি কিনা তা' আমি পরখ করে যাচাই করে নিয়েছি।"

"তবে আর কি, এখন নেক্‌লেস্ তৈরী করে ফেল ;— আর বাপু, এত বাজে বক্‌তেও পার তুমি !"

"তা আমার পাওয়া সোণা দিয়ে যা'ই আমি তৈরী' করি না কেন, এটা ঠিক বলে রাখলাম, যে, যার গলায় আমার তৈরী জিনিষ আমি ঝুলিয়ে দেব তা তাকে মাথা পেতে নিতেই হবে,"—

তর্ক করিতে করিতে দুই পক্ষই সময়ে সময়ে এমন একটা যায়গায় আসিয়া পৌছে, যেখানে উভয় পক্ষই হঠাৎ থামিয়া যায়, এবং তর্ক বন্ধ করিয়া দেয়। আমাদের কথাগুলি এতদূর অগ্রসর হইলে বৌদিদি হঠাৎ থামিয়া গেলেন, আমিও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও কথা বলিতে পারিলাম না।

তারপর হঠাৎ কখন যে এক সময়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিলাম, তাহা নিজেও ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম না।

(৯)

আমার এমন কতকগুলি কাজ ছিল যাহা বৌদিদি নিজে দেখিয়া গুছাইয়া করিয়া না রাখিলে আমার কিছুতেই মন উঠিত না ; বৌদিদি ছাড়া আর কেহ যে সে কাজগুলি তেমন করিয়া করিতে পারে এ বিশ্বাস আমার ছিল না। মা-মরা ছেলেগুলি যেমন সময়ে সময়ে আত্মীয় বিশেষের কাছে অতিরিক্ত আদর পাইয়া একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, আমার অবস্থাটাও ঠিক তেমনি হইয়াছিল। ছেলেবেলায় মা স্বর্গগত হইলেন, তার পর হইতেই বৌদিদির কাছে অতিরিক্ত আদর পাইয়া পাইয়া নিজের ছোটখাট কাজগুলিও আর করিয়া লইতে পারিতাম না।

সুতরাং বৌদিদি ব্যারামে পড়া অবধি আমার থাকিবার ঘরটার চেহারা এমনই বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছিল, যে, তাহা আমার নিজের কাছেই অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়াছিল। কিন্তু গুছাইতে যাইয়া জিনিষপত্রগুলিকে আরও বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিতাম। ক্রমে বই খাতাপত্রগুলি বিছানার উপরেই স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল ; শুইবার দরকার হইলে সেগুলি একপাশে সরাইয়া কোনওমতে একটু যায়গা করিয়া লইতাম। টেবিলের উপর রাজ্যের জিনিস জড় হইতেছিল ; বিশৃঙ্খল খাতাপত্রগুলির মধ্যে কয় তারিখের আধখোলা খবরের কাগজ ; কতকগুলি ঔষধের শিশির পাশে কালীশূন্য দোয়াত দুইটী ; কলমদানীর উপর মণিব্যাগ্‌টা ; একপাশে ছাতিটা ও বেড়াইবার লাঠিগাছটা ; ছাতিলাঠির উপরেই খাবারের রেকাবীখানা ; পাশেই একটা কোট্ ও একটা গেঞ্জি ; যে কোনও একটা জিনিষ ধরিয়া টান দিলেই আর পাঁচটা পড়িয়া যায়। আল্‌নার কাপড়গুলি চেয়ারের উপর স্তূপীকৃত ; জুতাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; মনে হয় ঠিক যেন জার্ম্মাণ আক্রমণের পরের অবস্থা।

বহুদিন পরে সেদিন একটু নন্দনপাহাড়ের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার ঘরটা কে সাজাইয়া, গুছাইয়া, ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। বিছানার কালীমাখা চাদরের স্থানে ধোলাই চাদর আস্তৃত রহিয়াছে। বইগুলি সেল্‌ফের উপর উঠিয়াছে। খাতাগুলি টেবিলের উপরে, চিঠিপত্রগুলি লেটার কেসের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কাপড়জামাগুলি আল্‌নায় শোভা পাইতেছে। চেয়ারটা টেবিলের কাছে রহিয়াছে, অন্য ঘর হইতে একটা ছোট চেয়ার আনিয়া জানালার কাছে রক্ষিত হইয়াছে ; টেবিল ল্যাম্পের কালীটা কে সযত্নে মুছিয়া ঠিক করিয়াছে। এবং শয্যার কাছেই টীপয়টা রাখিয়া, তাহার উপর জলের গেলাস, পানের ডিবাটা গুছাইয়া রাখিয়াছে। আর একখানা ছোট টীপয়ের উপর বিকালের জলখাবারটা ভোক্তার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

কোথায়ও এতটুকু ত্রুটী নাই ;—বৌদিদির নিপুণ হস্তের পরিচয়টী যেন আমি প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই দেখিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু তবু এটা তো নিশ্চিত,

যে বৌদিদি তাঁহার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া কিছু আর এতগুলি কাজ করিতে পারেন নাই।

সুতরাং এ যে সুজাতারই কর্ম্মকুশলতার পরিচয়টা প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না।

এই সাজান গুছান প্রত্যেকটা কার্য্যই যেন আমাকে অভ্রান্ত ভাষায় জানাইতেছিল,—সে কত নিপুণ, কত সুন্দর যে এমনি করিয়া বুকের দরদ দিয়া কাজ করিতে পারে।"

রূপ কথায় রাজকন্যা যেমন কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে তাহার গোপন স্থান হইতে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া আসিয়া, তাহার কোমল, নিপুণ পদ্মহস্তের স্পর্শ দিয়া প্রত্যেক জিনিষের উপরেই লক্ষ্মীর আলিপনা শ্রী ফুটাইয়া দিয়া আবার তাহার নীরব গোপনতার মধ্যে ফিরিয়া যায়;—এও তেমনি আজ আমার এই মলিন বিশৃঙ্খল কক্ষটার সমস্ত কুশ্রীতাকে দূর করিয়া দিয়া কোথায় আপনাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তখনি, এত যে করিয়াছে, সে ঐ পাশের ঘরটার মধ্যেই আছে, এবং আমি ইচ্ছা করিলেই এই মুহূর্ত্তেই যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতে পারি, এই অতি সত্য কথাটী বার বার মনে পড়িয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা নিবিড় পুলকস্পন্দন সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল!

রূপকথার রাজকন্যা কোন এক সার্থক, শুভ মুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত গোপনতার খোলস দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিয়াছিল;, এমনটা কি হইতেই পারে না, যে, ঐ নারী, যে রাজকন্যাও নহে, রাজবধূও নহে, শুধু সাধারণ গৃহস্থ ঘরেরই কন্যা, সেও একদিন তেমনি করিয়া ধরা দিবে?

সমস্ত ঘরটা একবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। ছোট খাট সমস্ত দ্রব্যগুলির সঙ্গেই যেন একটা নিবিড় পরিচয় স্থাপন করিয়া লইতেছিলাম!

তাহারা যে, দুইখানি কর্ম্মনিপুণ পরমশুভ্র, কোমল হস্তের সমস্ত স্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে!

বৌদিদির ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৌদি, তুমি কি ইন্দ্রজাল জান?"

"কেন, কি হয়েছে ঠাকুরপো?"

"বিছানার উপর উঠে বসবে, সে শক্তিও তো তোমার নেই দেখ্‌ছি; কিন্তু আমার ঘরের চেহারা অমন বদ্‌লে গেল কি ক'রে?"

কি আশ্চর্য্য দুটি চক্ষু! চোখের দৃষ্টির ভিতর দিয়া যে অমন করিয়া স্নেহ ক্ষরিত হইতে পারে তাহা আমি আর দেখি নাই! বৌদিদির চোখ দু'টি হাসিতেছিল, কিন্তু চোখের পাতা যে জলভার হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি কোনও মতেই গোপন করিতে পারিলেন না।

মনে হইল বর্ষার জলসিক্ত তরুণ পল্লব শীর্ষে প্রভাত-সূর্য্যের কোমল, নির্ম্মল আলোকলেখা পড়িয়া হাসিতেছে। "তা, হবে, বোধ হয় যাদু কিছু জানি; কিন্তু এমনি অদৃষ্ট যে উঠে গিয়ে একটু দেখ্‌বো সে শক্তিও ভগবান্ রাখেন নি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তোমার খাবার খেয়ে এসেছ?—ও ঘরেই তো রাখ্‌তে বলেছিলাম। আচ্ছা এখানে আমার কাছে বসেই খাবে; হাত মুখ ধুয়ে এস! —সুজাতা,—ও সুজাতা!—

আমি যে ঘরে আছি, সুজাতা তাহা জানিতে পারে নাই। পাক ঘরের দিক হইতে উত্তর দিল, "দিদি, ডাকছ কি?"—

তার পরই পায়ের শব্দ পাইলাম। কিন্তু এর মধ্যেই সুজাতা আসিয়া পড়িল।

—"আলুগুলি কুটে ঠিক করছিলাম দিদি;—তোমার কিছু চাই?"— হঠাৎ পাশের দিকে চাহিয়াই দেখিল, ঘরের মধ্যে আরও একজন রহিয়াছে, যাহার আগমন সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।

অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়া, গায়ের কাপড়টা যদিও সুসংবৃত্ত ছিল, তবুও আর একটু টানিয়া ঠিক করিয়া দিল; এবং বৌদিদির বিছানার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া নীরবে আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল!

ঠিক একখানি আনন্দ প্রতিমা! অন্তঃপুরের স্বচ্ছন্দতার মধ্যে তাহাকে এমন করিয়া আর কোনও দিনই দেখি নাই। অযত্নবিন্যস্ত কালো চুলের রাশি ঢেউ খেলিয়া, পিঠ্ ছাড়াইয়া নামিয়াছে; কর্ম্মের বাস্তবতার মধ্যে সে যে নীল সাড়ীখানি আঁটিয়া, জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার নিটোল সৌন্দর্য্য সবখানি ফুটাইয়া তুলিয়াছে! সুগৌর ললাটের উপর স্বেদবিন্দু দেখা যাইতেছে এবং লজ্জারক্তিম কপোলের পাশে কর্ণভূষা দুলিয়া দুলিয়া তাহাকে এমন একটা অপূর্ব্ব শ্রী

দান করিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়াটাই সব চেয়ে বড় মুস্কিল!

—"ও কিরে, জুজু দেখ্‌লি নাকি? ঠাকুরপোর খাবার বুঝি ওঘরে রেখেছিস্? এ ঘরে নিয়ে আয় তো! সুজাতা ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

"বৌদি, এ বেচারাকে তুমি ওমন করে খাটাচ্ছ যে? পরের মেয়ে—নিজের ঘরে ওর কিচ্ছুটি কর্‌বার নেই, কিন্তু এখানে তো তুমি ওকে একদণ্ডও বিশ্রাম দাও না!"—

বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "আমি কি ওকে খাটুতে বলি? ও কিছুতেই ছাড়বে না; ঠাকুরের রান্না তুমি পছন্দ কর না বলে ও যে নিজেই পাক কর্‌তে সুরু করেচে! এ যে কি আশ্চর্য্য মেয়ে, মুখে বেশী কথা বলে না, কিন্তু এম্‌নি করেই দুদিনের মধ্যে পরকে আপন করে নিতে পারে, যে আমি ভেবে অবাক্ হয়ে যাই! কাজ কর্ম্ম শেখ্‌বার জন্য ওর যে কি আগ্রহ, এবং কত দ্রুত যে ও সব আয়ত্ত করে নিতে পারে! আমি তো ঐ টুকু মেয়ের কাছে হার মেনে গেছি। বাপের বাড়ী যা কিছু শিখেছিলাম, ও তা সবই তো খলে ঝেড়ে নিয়েচে, এখন কি শিখিয়ে যে ওর আগ্রহ মেটাব তা' আমি বুঝ্‌তে পারিনে।"—

হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া ফেলিলাম,—"তোমার কথাগুলি কেমন শোনাচ্চে জান?"—বৌদিদি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি!"—

"ঠিক্ যেন বোনের ঘট্‌কালি কর্‌চ, এম্‌নিতর শোনাচ্চে"—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জা করিতে লাগিল।

—"তা' যদি শোনাই তা'তেই বা কি? অমন লক্ষ্মীর মত বোনের ঘট্‌কালি কর্‌তে লজ্জা হবার কোনও কারণই নেই তো! আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি ওর বিয়ের ঘট্‌কালিটা কর্‌ব এ ইচ্ছাটা অনেক দিন থেকেই আমার মনে মনে রয়েচে!—তোমার কাছে আর বল্‌তে বাধা কি? —তা তুমিও একটু চেষ্টা করে দেখ না কেন?"

শেষ কথা কয়টা বৌদিদি ধীরে ধীরে হাসিয়া হাসিয়া বলিয়া গেলেন।

"নাঃ—তা'তে আর কাজ নেই, ঘট্‌কালির বিদায় নিয়ে মহা গোল বেধে যাবে!" ঠিক্ এখনি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িলে হয়তো পরাজয়ের কলঙ্কটা গায়ে মাখিতে হইবে না মনে করিয়া, দুয়ারের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া গেলাম।

কিন্তু ঠিক তখনি সুজাতা খাবারের রেকাবী ও জলের গেলাসটা হাতে করিয়া দুয়ারের কাছে দেখা দিল!

কিন্তু বৌদিদি তাহাকে দেখিতে না পাইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, সুজাতার বিয়ের ঘট্‌কালিটার বিদায় আমি একাই নেব, কিন্তু মনে রেখ, ইন্দিরা বামনীর হুকুম এখন পর্য্যন্ত কেউ ওল্‌টাতে সাহস করেনি।"

"শুধু দাদা ছাড়া,—নয়!"—বৌদিদি এমন একটা তীক্ষ্ণ বাণের আশা করেন নাই; কিন্তু সাহসী সৈনিকের মতই দুই হাতে তাহা ঠেকাইয়া দিয়া কহিলেন,

—"না তিনিও না।"—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিলেন।

—"বটে, প্রমাণ আছে কিছু!"

"প্রমাণ চাই!—আছে বই কি?"—বলিয়া বালিশের নীচ হইতে একখানি খাম বাহির করিয়া, হাত বাড়াইয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন।

খামের উপরে দাদার হস্তাক্ষর—বৌদিদির নাম লেখা।

"এ ইন্দিরা দেবীর চিঠি,—আমি এ নিয়ে কি করব?"

বৌদিদি একটু হাসিয়া কহিলেন, "পড়"। সুজাতা খাবারের রেকাবী টেবিলের উপর রাখিয়া মাথা নীচু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দিকে একবার চাহিয়া চিঠি পড়িলাম।

চিঠিতে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখা ছিল:—"সুজাতাকে তুমি যদি চাওই, আমার তাতে আর আপত্তি কর্‌বার কি থাক্‌তে পারে? তুমি যাকে পছন্দ করেচ, সে যে তোমার সংসারকে আনন্দ নীড়ে পরিণত কর্‌তে পার্‌বে, এ বিশ্বাস আমার খুবই আছে। বিনু নিশ্চয়ই ওকে পছন্দ কর্‌বে। তুমি যাকে দেবে, তাকে যে সে মাথায় করে নেবে তা' আমি জানি! তবু তাকে একটিবার জিজ্ঞেস্ কর্‌বে কি? তোমার চিঠি পেলেই আমি সুজাতার বাবাকে লিখ্‌ব!"—

সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া একটা বিদ্যুতের প্রবাহ যেন প্রবলবেগে বহিয়া গেল। চিঠিটা বৌদিদিকে ফিরিয়া দিবার সময় হাতটা অনিচ্ছা সত্বেও কাঁপিতেছিল। বৌদিদি সেটুকু লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"কেমন প্রমাণ পেলে ত?—এখন বল ত মাথায় করে' নেবে কি না?"—

একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিলাম,—"দাদা বুঝি তোমায় মাথায় করে নিয়েছেন, বৌদি?"—

"ছিঃ ভাইটি, দিদিকে কি অমন কথা বল্‌তে আছে?"—

লাথি খাইয়া হাসিলাম, এবং একটু অগ্রসর হইয়া দুই হাতে বৌদিদির পায়ের ধূলা লইলাম।

স্নেহ তরলকণ্ঠে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন,— অত্যন্ত মৃদুস্বরে,—"সুজাতাকে পাওয়ার সৌভাগ্য হোক্!"—

আমি দুই কাণ ভরিয়া বৌদিদির আশীর্ব্বাণী অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিলাম।—

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

দেশের ও দশের কথা

মফঃস্বলের কাগজগুলি দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। সর্ব্বত্র সমানভাবে একই হাহাকার—অস্বাভাবিক দুর্ম্মূল্যতায় দরিদ্র অন্ন খাইতেছে না,—কূপের জল নাই, পল্লীবাসীরা সর্ব্বত্র রুগ্ন, তার উপরে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, ইহার বিস্তৃত বিবরণ বার বার উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন —তবে আমাদের মফঃস্বলের সহযোগিবর্গ এ অবস্থায় কি বলিয়াছিল—তাহা সকলেরই জানা উচিত। তাহাদের কয়েকটি মন্তব্য মাত্র নিম্নে তুলিয়া দিলাম। মারোয়ারী মহাজনদের নির্ম্মম ধনলিপ্সাও যে এই মহার্ঘতার বড় একটি কারণ। এ কথা অনেকবার আমরা উল্লেখ করিয়াছি। রঙ্গপুর দর্পণ হইতে উদ্ধৃত এই বিবরণ তাহা প্রমাণ করিবে। সহযোগী সত্য বলিয়াছেন, আশু প্রতিকার গভর্ণমেণ্টের হাতে।

"রঙ্গপুরে পশ্চিম দেশীয় ও কয়েকজন মারোয়ারী মহাজন প্রত্যেক বুধবার ও শনিবার ষ্টেসন রোড ও লালবাগের হাটের রাস্তার ধারে প্রভূত পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়া কতক গোলাজাত ও কতক বিদেশে রপ্তানী করিতেছে। সুতরাং সহরে চাউলের আমদানী কম হওয়ায় চাউলের মূল্য আরও দুর্ম্মূল্য হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত মহাজনগণ কয়েক সপ্তাহ চাউল ক্রয় করা বন্ধ করিয়াছিল; তজ্জন্য চাউলের মূল্য প্রতি মণ ৮৲ হইতে ৭৲ টাকায় নামিয়াছিল। গত বুধবার ও শনিবার হইতে গণেশলাল প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় চাউল ব্যবসায়িগণ পুনরায় এইভাবে পথিমধ্যে চাউল ক্রয় করায় পুনরায় সাধারণ মোটা চাউলের বাজার মণ প্রতি ৮৲ টাকায় চড়িয়াছে; এমন কি গত শনিবার নবাবগঞ্জ চাউলের আড়তে ৮৲ টাকা দিয়াও কেহ কেহ আদৌ চাউল ক্রয় করিতে পারেন নাই। সহরে এইভাবে চাউলের আমদানী হ্রাস হইলে সহরবাসীর কষ্টের সীমা থাকিবে না। আমরা ভরসা করি আমাদের জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শীঘ্র ইহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইবেন। যাহাতে এই চাউল ব্যবসায়িগণ পথের মধ্যে চাউল ক্রয় করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিতে না পারে তৎপ্রতি কঠোর ব্যবস্থা করিয়া গরীব ও মধ্যবিত্তের জীবন রক্ষা করুন।"

(রঙ্গপুরদর্পণ)

দেশের দশা—দেশের ও দশের দুর্দ্দশার কথা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে আতঙ্কের গম্ভীর হুঙ্কারে প্রাণমন প্রকম্পিত হইয়া উঠে। বাক্যবাগীশ বঙ্গবীর বক্তৃতার বাহার ফলাইয়া দেশহিতৈষণা সংসাধন এবং রাজনৈতিক বাহবা পাইবার উদ্দেশ্যে কত চিন্তা কত শ্রম ও কত অর্থ বিনিয়োগ করিতেছেন; কিন্তু হায়, অন্নহীন বস্ত্রহীন দীনদরিদ্র দেশবাসীর প্রাণরক্ষা ও মানরক্ষার নিমিত্ত কেহও তিলার্দ্ধকাল সংযতচিত্তে ভাবিয়া দেখিতেছেন না। বাঙ্গালী কেবল কথায় কথায় গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া—আপনাদিগের ইতিকর্ত্তব্যতা বিস্মৃত হইয়াই—কথা গাঁথিয়া করতালি লইবার উদ্দেশ্যে আত্ম-বিহ্বল হইয়া—উচ্চ চীৎকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে অভ্যস্ত! নিজের পায়ে ভর করিয়া, আত্মাবলম্বী হইয়া, সপ্তকোটী প্রাণের সম্মিলিত বল সম্বল করিয়া, আপনাদের প্রকৃত মঙ্গল বিধানের কোনও একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিতে কখনও ইচ্ছা করেন না—অথবা অতি সূক্ষ্ম হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় ইচ্ছার উদ্রেক হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী বা যত্নবান হন না।

মফঃস্বলের লোকগুলির দুঃখ দুর্দ্দশার বিষয় কাহারও হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্থান লাভ করিতে পারিতেছেনা দেখিয়া,

সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই মর্ম্মে মর্ম্মে প্রপীড়িত হইতেছেন। আমরা তাই বিদ্যাভিমানী ধনমদমত্ত ও আভিজাত্যবিলাসী বাঙ্গালী বাহাদুরদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ভাই, একবার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ—তোমার স্বদেশবাসী—তোমার আশাধারী—তোমার সহোদরসদৃশ নরনারীগণ ক্ষুধার অন্ন, পিপাসায় সুপেয় জল, রোগে ঔষধ ও মানরক্ষার প্রধান সাধন সামান্য বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করিতে না পারিয়া কত কষ্ট পাইতেছে—কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে কত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস সহকারে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমাদের প্রতি পরোক্ষে অভিশাপ উদ্‌গীরণ করিতেছে! এস, আর নিশ্চিন্ত থাকিও না। ধনী ধনের সাহায্যে ও কর্ম্মী স্বকীয় উৎসাহউদ্যম সাহায্যে উহাদিগের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার প্রশমনে বদ্ধপরিকর হও; নহিলে দেশের লোকক্ষয় মান-ক্ষয় ও সর্ব্বক্ষয় হইয়া গেলে, শেষে তোমার ঐ বিদ্যা, ঐ বৈভব, এবং ঐ আভিজাত্যের স্পর্দ্ধা করিবে কাহাকে লইয়া? যদি মনুষ্যত্বের অণুকণাও তোমার কোমলকান্তি দেহখণ্ডে বিরাজমান থাকে, তবে আজ এ দুর্দ্দিনে গ্রামে গ্রামে—ঘরে ঘরে খুঁজিয়া খুঁজিয়া নিরন্ন নির্ব্বাসন অভাগাদিগের সংখ্যা-নির্দ্দেশ কর; আর নিজ সাধ্যানুসারে তাহাদের ক্লেশ নিবারণের প্রকৃত উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কায়মনঃপ্রাণে তৎসাধনে অগ্রসর হও। পরেরদিকে তাকাইয়া থাকিও না। ঘরের লোক লইয়া ঘরের অভাব দূর করিতে আরম্ভ কর। (ঢাকা প্রকাশ)

দেশের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। খাদ্যের অভাব, পানীয় জলের অভাব, বস্ত্রের অভাব, চতুর্দ্দিকে অভাবের তীব্র তাড়নায় মানুষ জর্জ্জরিত। তার উপর যে ভবিষ্যতের আশায় মানুষ সকল সহ্য করিতে পারে, তাহাও যদি শূন্যে বিলীন হইয়া যায় তবে কি লইয়া সে জীবনধারণ করিবে? অথচ সকলেই নীরব—যেন ব্যাপার বড় বেশী কিছু নয়। মাঝে মাঝে দুই এক স্থান হইতে দুই একটু ক্ষীণ ধ্বনি উত্থিত হয় বটে, কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় উহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া আমাদের মনে হয়। একজন অনিবেশান্তকে আটক করিলে কলিকাতার টাউনহল উচ্চকণ্ঠের চীৎকারে মুখরিত হইয়া উঠে, একটী রাউলাট আইন পাশ হইলে গগন প্রান্তর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হয়, কিন্তু কোটী কোটী লোক যে আজ অভাবের তাড়নায় অতি দুঃখময় জীবন-যাপন করিতেছে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবনের দিন গণিতেছে, তাহার প্রতিকার নিমিত্ত কয়টা সভাসমিতি হইয়াছে? কয়টা ডিপুটেশন গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। এই অন্ন সমস্যা কি এতই সহজ যে এদিকে দৃষ্টি প্রদান না করিলেও ইহার আপনা আপনি সমাধান হইবে? আগে দেশের লোকের মুখে দুই মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিবার যোগাড় কর, তৃষ্ণায় পানীয়ের ব্যবস্থা কর, তারপর রাজনীতি, সমাজনীতি যাহা ইচ্ছা তাহা লইয়াই আন্দোলন করিও। দেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি ইহাই আমাদের অনুরোধ।

এখন সকল স্থান হইতেই এ প্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানি বন্ধ করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে। বাঙ্গালা হইতে খাদ্য শস্য রপ্তানিই যে এবারকার দুর্ম্মূল্যতার কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গ-দেশে প্রতিবৎসর ৭৫০০০০০, টন চাউলের প্রয়োজন। কিন্তু বিগত বৎসরে এই পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয় নাই, অথচ রপ্তানি যথেষ্ট হইয়াছে। ১৯১৭-১৮ সনে ২০১৯২৭১ মণ চাউল কলিকাতা হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৮-১৯ সনে ৫৩২৩১৬০ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। একে তো দেশের খাদ্যোপযোগী শস্য উৎপন্নই হয় নাই, তার উপর এই অতিরিক্ত পরিমাণ চাউল রপ্তানি। অন্ন কষ্টের ইহাই কি কারণ নয়? এদিকে আবার প্রতি-বৎসর উড়িষ্যা ও ব্রহ্মদেশ হইতে বহু পরিমাণ চাউল বাঙ্গালায় আমদানী হইত; কিন্তু এবার উড়িষ্যায় শস্য না হওয়ায় সেখান হইতে চাউল আমদানীতো এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার তৈলের সের যখন ১৲ ১।০ ছিল, তখন এদেশ হইতে ২৫৫৮৯৬৫ মণ সরিষা অন্যত্র চালান হইয়া গিয়াছে। তাই এখন সকলেই বুঝিতেছে এখান হইতে রপ্তানি বন্ধ ও অন্যস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে 'খাদ্য' শস্য আমদানী করিতে না পারিলে এই অন্ন কষ্ট নিবারিত হইবার কোন উপায় নাই। ভারত সভার প্রেসিডেণ্ট রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর এসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানাইয়া-ছেন যে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশ হইতে চাউল রপ্তানি ও রেঙ্গুন চাউল আমদানি সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত

পরামর্শ করিতেছেন এবং কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহা ভারতগবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন ইত্যাদি। এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়াছি। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য কমিশন কমিটির ন্যায় কাল বিলম্ব না করিয়া যাহাতে অচিরে উহার যথাবিহিত প্রতিকার অবলম্বন করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করা উচিত। দেশের লোক সকলেই এখন গবর্ণমেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করেন তাহার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। (ত্রিপুরাহিতৈষী)

নন্দলালী দেশসেবা

"প্রতিভাবান কবি ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় নন্দলালের চরিত্রে আমাদের দেশভক্তির একটা জীবন্ত বহু চিত্র আঁকিয়াছেন।

নন্দের ভাই কলেরায় মরে তাহাকে দেখিবে কেবা।
সকলে বলিল নন্দ করগে ভাইয়ের সেবা।
নন্দ বলিল ভাইয়ের জন্য প্রাণটা যদি দি,
না হয় দিলাম কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?

এবার শুধু কলেরায় মরা নয়, বসন্তে মরা, জ্বরে মরা অন্নাভাবে দুর্ব্বল দেহে নানাবিধ রোগের বীজবপন করিয়া তাহার ফলে মরা। এরূপ কত ভাবে যে দেশের লোক মরিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক ইনফ্লুয়েঞ্জায় দুইমাসে ৬০ লক্ষ লোক ভারতবর্ষ হইতে জীবন লীলা সম্বরণ করিয়াছে। ইহার নিমিত্ত কয়টা দেশবাসীর মর্ম্ম ভাঙ্গিয়া অন্ততঃ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস উত্থিত হইয়াছে ? কয়টী নেতার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছে ? তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টার কথা না হয় নাই বলিলাম। অথচ সকলেই উচ্চকণ্ঠে নেতৃত্বের দাবী করিবে, দেশভক্তের উচ্চাসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত সকলেই লালায়িত। দেশময় অন্নকষ্টের একটা ঘোর হাহাকার উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু কয়টী হৃদয়ে উহার প্রতিধ্বনি উত্থিত হইয়াছে ? কয়টী হস্ত উত্তোলিত হইয়া বলিয়াছে, ভাই সব! তোমরা ভয় করিও না, আমাদের অন্নের থালা তোমাদের ক্ষুন্নিবারণ না করিয়া আমাদের ভোজনে নিয়োজিত হইবে না। তোমরা দেশকে ভালবাস, অন্ততঃ বক্তৃতায় তাহারই সুস্পষ্টধ্বনি উত্থিত হয়; কিন্তু দেশকে ভালবাসায় তোমরা কি বুঝাইতে চাও তাহা দেশের লোক বুঝিতে পারে না। তোমাদের দেশকে ভালবাসার অর্থ কি দেশের লোককে ভালবাসা বুঝায় না ? যদি তাহাই হয়, তবে এই দুর্দ্দিনে তোমাদের কি কিছুই করিবার নাই ? দরিদ্র ভ্রাতার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা না করিয়া তোমরা কোন হিসাবে রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে সাহস কর ? বঞ্চিতের লুব্ধ দৃষ্টি যে তোমাদের অন্নের গ্রাসকে তিক্ত করিয়া তুলে না ইহা বড়ই আশ্চার্য্যের বিষয়! নগ্নদেহ কোটী কোটী দেশবাসীর মধ্যে তোমাদের বিলাস বসন যে তোমাদিগকে কোনরূপ লজ্জা প্রদান করে না, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়! এই কি তোমাদের দেশভক্তি এই কি তোমাদের ভ্রাতৃপ্রেম। তোমাদের দেশ সেবায় নন্দলালের চরিত্রের অভিনয় হইতেছে ইহা কি তোমরা বুঝিতে পার না ? তোমাদের কাল্পনিক দেশভক্তির বাহার পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতির কূটতর্কাদি পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হও, অভুক্তের অন্নের ব্যবস্থা কর। অমৃতবাজার পত্রিকা আপিলের নিমিত্ত অর্থ সাহার্য্য প্রার্থনা করিয়াছে। দেশের লোকের অন্নের ব্যবস্থা করিয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কয়টা প্রার্থনা উহা পূর্ব্বে করিয়াছে ? তোমরা চাও মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা, দেশবাসীর অন্নের ব্যবস্থা নয় ? তোমরা চাও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, দেশবাসীর রোগের প্রতীকার নয় ? অর্থাৎ তোমরা দেশবাসীকে চাও না, চাও দেশের স্বাধীনতা! এরূপ অদ্ভুত কর্ম্মপ্রণালীর অর্থ আমরা বুঝি না। তাই আমাদের শুধু নন্দলালের কথাই মনে হয়। (ত্রিপুরাহিতৈষী)

জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় বিষয়

('রায়ত পত্রিকা হইতে এই পত্রখানি উদ্ধৃত করা হইল')

গাজীরহাট—যশোহর

সম্পাদক মহাশয়! যুগযুগান্তের বাঙ্গলার নিঃস্ব ও লাঞ্ছিত রায়তের উপর যে আপনাদের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে, ইহাতেই তাহারা দুই হাত তুলিয়া ভগবানের কাছে আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতেছে। যদি ইহার কোনরূপ প্রতিকার হয়, তবে গরীব প্রজাদের দুঃখে যে আপনারা প্রকৃতই দুঃখী একথা ধ্রুব সত্য প্রমাণ হইবে। আমাদের এখানে—

১। কূপ, ইন্দারা খনন করিতে জমিদারের অনুমতি লইতে হয়।

২। খনন করিতে যত ব্যয় হয় নজর তাহার সিকি, স্থান বিশেষে অর্দ্ধেকও লওয়া হয়।

৩। আমলাগণ যাহার নিকট যত লইয়া পারেন।

৪। রায়তের রোপিত গাছ রায়ত ইচ্ছামত কাটিতে পারে না, কাটিলে জমিদার বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

৫। কিস্তি খেলাপী সুদ কচিৎ লন। কিন্তু ড্যামেজ সুদ টাকায় ।০ আনা লইয়া থাকেন। প্রায়ই তাহা দাখিলায় লিখিত হয় না।

৬। জমিদার ও তদীয় কর্ম্মচারীরা প্রজা ধরিয়া বেগার খাটান।

৭। গ্রামের মাতব্বর প্রজাকে আসন দেওয়া হয় বটে, তাহা ছেঁড়া চট বা ছেঁড়া মাত্তর।

৮। প্রতি চেকের দাম ৫ পয়সা, আঁটাল বা টীকেটের দাম যাহা পড়ে তাহাই লয়েন। তহুরী পার্ব্বণী টাকায় /০ আনা হইতে কোন কোন স্থানে ৵০ আনাও লওয়া হয়।

৯। কোন কোন জায়গায় স্কুলের চাঁদা লয়। বারোয়ারী পূজার চাঁদা প্রায়ই সব জায়গায় লয়।

১০। কোন কোন জায়গায় মাড়োচা আদায় করে।

১১। জমিদারের পিতা মাতার শ্রাদ্ধ, পুত্র কন্যার বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে কোন কোন স্থানে কিছু কিছু আদায় করা হয়।

কোন কোন স্থানে দুর্গোৎসবের পাঁটা খরিদ, চৌকিদারী ট্যাক্স ও সদর কর্ম্মচারীর আগমনে চাঁদা আদায় করা হইয়া থাকে। নায়েব তহশীলদারের পিতা মাতার শ্রাদ্ধ বা পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অনেক স্থানে আদায় করা হয়।

যশোহর জেলার অন্তর্গত রামনগরের জমিদার বাবু বল হরি ঘোষ চৌধুরী শ্রাদ্ধ উপলক্ষে টাকায় ॥০ আনা হিসাবে প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়াছেন।

১২। জরিপে রায়তের জমি কম হইলে খাজনা কম হয় না, অধিক হইলে কর বৃদ্ধি, এবং উপযুক্ত সেলামী দিতে হয়।

১৩। নাম পত্তন করিতে হইলে, মূল সম্পত্তির মূল্যের সিকি জমিদারকে দিতে হয়।

১৪। জমিদারের কোন কোন নূতন আগত কর্ম্মচারী বা স্বয়ং জমিদার আসিলে ব্যক্তিবিশেষে ১৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। নিরন্ন ব্যক্তি দিতে অক্ষম হইলে খাজনার টাকা হইতে অগ্রেই নজরের টাকা কাটিয়া লওয়া হয়।

১৫। ভাগাড় প্রভৃতি স্থান খাস করিয়া লইয়া উপযুক্ত মূল্যে প্রজার সাথে বন্দোবস্ত করা হয়।

১৬। হালট প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

১৭। পেয়াদা বরকন্দাজ আসিলে রোজ খোরাকী ৷১০ লয়েন।

১৮। চৌদ্দপোয়া দিয়া খাজনা আদায় করা হয়।

১৯। আমলার উপর নির্ভর করিয়া জমিদারগণ বড় বড় সহরে থাকেন।

২০। খাজনা বৃদ্ধি, ভোগোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, প্রভৃতি জব্দ করিতে জমিদারের যথেষ্ট আগ্রহ আছে।

২১। ঐ অর্থের দ্বারা কোনও সৎকার্য্য করা হয় না।

২২। জমিদারের কাছারীর নিকটবর্ত্তী কোন কোন সুন্দরী কন্যা বা গৃহস্থের স্ত্রী থাকিলে নানাবিধ কূট কৌশলে, প্রলোভনে ও উৎপীড়নে তাহার সতীত্ব নষ্ট করা হয়। গ্রামের কোন কোন ন্যায়বান্ ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহাকে বরকন্দাজ মোতায়েন ও অযথা নালিশের দ্বারা জব্দ করা হয়।

২৩। জমিদার কর্ত্তৃক খাল, নালা, জল কষ্টের জন্য পুকুর, স্কুল, পোষ্টাফিস, ডাক্তার খানা কিছুই হয় না, বরং জলকষ্ট নিবারণের জন্য মরা পুকুর কাটিতে গেলে, অতি উচ্চ হারে সেলামী ও খাজনা চায় এবং পুকুরে দেয় মাছও পাড়স্থিত বৃক্ষাদির অর্দ্ধেক অংশ দাবী করেন।"

(রায়ত)

টিপ্পনী—সব অভিযোগ সত্য কি না জানি না। তবে এইরূপ অনেক ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। জমিদারগণ অন্ততঃ নিজের ভবিষ্যত স্বার্থেরদিকে চাহিয়াও সতর্ক হইবেন। সাধারণের চোক ফুটিতেছে, চোক ফুটিলে কেহ নীরবে অসহায়ভাবে পীড়ন গ্রহণ করে না। সময় বুঝিয়া জমিদারগণ সাবধান না হইলে রায়তবর্গ বোলসেভিক হইয়া উঠিবে। তখন তাঁহারা তাল সামলাইতে পারিবেন না।

সুদখোর মহাজন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পল্লী কৃষকের উপর, নীরিহ দরিদ্র শ্রেণীর উপর আমরা সুদখোর দলের যেরূপ অত্যাচারের অসিপাত দেখি, তাহাতে এই শ্রেণীর নামে তাহাদের প্রবৃত্তির উপর আমাদের ঘৃণা হয়। আমাদের দেশে সুদের হার অত্যন্ত চড়া, এরূপ উচ্চ হারের সুদ আদান প্রদান পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বলিয়া মনে হয় না। দেশের দরিদ্র শ্রেণী ও কৃষক প্রজাগণ নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া এই অসম্ভম উচ্চহারের সুদ দিতে বাধ্য হয়। অভাবগ্রস্ত কৃষকগণ টাকা কর্জ্জ করিবার সময় একবারও চিন্তা করিয়া দেখে না যে, পরিণামে এই টাকার জন্য তাঁহাদিগকে কি শোচনীয় দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষেই মানুষ বিপদে পড়িলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়। বিশেষতঃ পেটের দায়ে হিতাহিত জ্ঞান আদৌ থাকে না। অনেকে শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, শতকরা মাসিক ১২৷৷০ টাকা সুদ আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের ভাগ্যে প্রায় সময়ই লাগিয়া থাকে। শতকরা ২৷৷০ টাকা ৩৵০ —উহা ত বাজার চলিত দর। শতকরা ২৲ টাকা সুদ প্রায় সর্ব্বত্র এবং সব সময়ের জন্যই প্রচলিত। অবশ্য অনেক বড় বড় মহাজন ১৲ বা ১৷০ টাকা হার সুদেও টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা দরিদ্রের জন্য নয়, সে সহায়সম্বলহীন নিরীহ কৃষকের জন্য নয়। শতকরা মাসিক ঐ হারের সুদ জমিদারের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, যেহেতু তাঁহারা একদমে একত্র ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা কর্জ্জ লন। আমরা বিশেষ তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি, দেশের সাধারণ সুদের হার কোন মতেই ২৷৷০ টাকার কম নহে।

অন্যদিকে আমাদের দেশের কৃষক শ্রেণীর অবস্থা অতি শোচনীয়। প্রায় চৌদ্দ আনা কৃষকের অবস্থাই অচল। আজ এক জোড়া বা একটি বলদ কিনিতে হইবে, সুতরাং টাকার দরকার; কর্জ্জ করা ভিন্ন উপায় নাই। কাল ক্ষেত্র বুনিবার জন্য বীজ ক্রয় করিতে হইবে, টাকা চাই; মহাজনের নিকট খত না দিলে টাকা মিলিবে কোথায়? মহাজন মাসিক শতকরা ৬৷০ টাকা সুদ লইলেই বা টাকা কর্জ্জ না করিয়া উপায় কি? ইহার উপর ষ্ট্যাম্পের মূল্য, লেখাই বাটা, তহুরী দস্তুরী প্রভৃতি আগড়ম বাগড়ম ধরিয়াও টাকার কিয়দংশ তখনই মহাজন কাটিয়া লয়। বাকী যে কয়টি টাকা তাহাই লইয়া হতভাগ্য কৃষক বেচারা গৃহে প্রত্যাগমন করে। আরও কথা টাকার পরিমাণ কিছু বেশী হইলে তাহার দলিলখানা আবার রেজেষ্টারী করিতে হয়, এই রেজেষ্টরী খরচ ও বাজে সেলামী সহ নেহায়েৎ কম নহে। সেখানেও সনাক্তদারের রোজা, কৈফিয়ত লেখার পারিশ্রমিক, কেরাণী বাবুর তবিয়ত ঠাণ্ডাই, স্কুলের লাই-ব্রেরীর, ডাক্তারখানার চাঁদা শোধ করিয়া যাহা কিছু বাঁচে তাহাই লইয়া কৃষক বাড়ী যায়। উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। কিন্তু হায়, তাহার গর্দ্দানে যে কি ভয়ানক বোঝা চাপিল তাহা সে তখন টের পাইল না। এদিকে কপালের জোরে বৎসরের কৃষিকার্য্য যদি সুফল হইল তবেই রক্ষা। আর যদি তাহা না হইয়া যদি অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি জলপ্লাবন প্রভৃতির কোনও একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, তবেইত সর্ব্বনাশ!! এক-দিকে জমিদারের খাজনার জন্য গোমস্তা বাবুর বিষম তাগাদা, প্রভুদের চোকরাঙানী। অন্য দিকে যম-রূপী মহাজনের যম-তাড়না, দরিদ্র কৃষক ইহার কোনটি রক্ষা করিবে! সম্বৎ-সরে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে যে শস্য উৎপাদিত হইল, ইহার কোন্ অংশ সে জমিদারের গোমস্তার তাহার পেয়াদার রোজ, পূজা পার্ব্বণীর খরচা, ইত্যাদি বলিয়া দিবে, কোন অংশই বা মহাজনের সুদ স্বরূপ প্রদান করিবে, আর কোন্ অংশ রাখিয়াই বা নিজের ও নিজ সন্তানসন্ততি পরিবারবর্গের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিবে? হতভাগা কৃষক তখন নাকের জল চোখের জল এক করিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকে। অর্থলোভী, স্বার্থপর, মহাজন নানা উপায়ে, নানা ছল চাতুরী সঙ্গে আদালতের সাহায্যে দরিদ্র কৃষকের ভিটা মাটী উৎসন্ন করিয়া দেয়। তাহার সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হয়। শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি আসিয়া তাহার হৃদয়ে দাবানল জ্বালাইতে থাকে। শেষে তাহার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে না লইয়া আর উপায় থাকে না।

(ক্রমশ)

টিপ্পনী—অবস্থা যতই সত্য হউক, ইহার জন্ম নিজেও কতক দায়ী। পাটের চাষে কৃষকদের হাতে অনেক সময় বেশ টাকার আমদানী হয়। কিন্তু অনেকেই নানারূপ ব্যসনে তাহা তৎক্ষণাৎ খরচ করিয়া ফেলে, শেষে দায়ের সময়ে হায় হায় করে। এরূপ অবস্থা নিজেরাও চক্ষে দেখিয়াছি। জমিদারের পীড়ন তারা এড়াইতে সহজে পারে না, কিন্তু সাবধান হইলে সুদখোরের পীড়ন এড়াইতে পারে। সুদখোরকে হাজার গালি দিলেও সে ছাড়িবে না, খাতকের দুঃখেও তার চিত্ত গলিবে না। আবার দায়ের সময় উপকার তাদের টাকায় কিছু হয়। ইহার একমাত্র উপায় কৃষককে হিসাবী হইতে হইবে।

উকীল মোক্তার।—ইহাদের কোন্ দলকে রাখিয়া কোন্ দলের নিন্দানামা বা সুখ্যাতি কুখ্যাতি প্রকাশ করিব। ইহাদের উভয় দলই সমান। নির্ব্বোধ কৃষকের—নিরীহ বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির রক্ত কণিকা শোষণ করিতে ইহারা উভয়েই পাকা ওস্তাদ। বঙ্গ বা ভারতজননী যেরূপ ভাবে প্রতিবৎসর এই উভয়দলকে প্রসব করিতেছেন, তাহাতে অনুমান হয় দশ বৎসর পরে ইহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন হইবে। উকীল মোক্তারের অসম্ভব দলবৃদ্ধিতে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে, রাজনীতির খট্‌কা লইয়া যাহারা সব সময় মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন, বিন্দু সময়ের জন্য ইহার খাতা খানিও তাঁহাদিগকে আমরা খুলিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আমরা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি যে, এই দলের অসম্ভব সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যাও ক্রমশঃ হু হু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র কৃষক—নির্ব্বোধ রায়ত শ্রেণী—নিরীহ সরল প্রকৃতির পল্লীবাসী যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ফকির সাজিতেছে। কে এ স্রোত থামাইবে? কে ইহার প্রতিকার করিবে? দেশের ধুরন্ধর মহারথগণ অন্ধ ও বধির। অথবা স্বার্থ ও খাতিরের মোহে তাঁহারা বিবেকশূন্য। উকীল মোক্তারের মধ্যে যাঁহারা মক্কেলের সাদা কাগজ নাড়াচাড়া করিয়া করিয়া অথবা ভিত্তিহীন কথা শ্রবণ করিয়া "তাইত, কুচপরোয়ানাই বেটাকে আমি ঠিক করিয়া দিতেছি, এত অন্যায়!" ইত্যাদি কথা দ্বারা লোক ভুলাইয়া নিজের স্বার্থ সাধন করেন, সেই শ্রেণীর ঘৃণিত লোকগুলিকে শিক্ষা দিতে না পারিলে আর উপায় নাই, রক্ষা নাই। আমরা আশা করি যদি ইহার প্রতিকারের কোনও পন্থা থাকে দেশের মহোদয় মহাত্মাগণ অবিলম্বে তাহা অবলম্বন করিবেন। দেশের যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। (রায়ত)

টিপ্পনী—ইহার প্রতিকারও গৃহস্থের নিজের হাতে। উকিল মোক্তার মামলা পাইলে ছাড়িবে কেন? ইহাই তাহাদের বৃত্তি। একেবারে সহজে না ছুটিয়া গ্রাম্য মাতব্বরদের কাছে গিয়া বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা ইহারা করে না, কেন? উকিল মোক্তারেরা গ্রামে গ্রামে গিয়া ত ইহাদের টানিয়া আনে না। রায়ত পত্রিকাখানির একটি ত্রুটি দেখিতেছি, কথাগুলি বড় বেশী এক তরফা হইয়া যাইতেছে। ইহাতে আন্দোলন অনেকটা ব্যর্থ হয়। রায়তদের মনে অন্যান্য শ্রেণীর প্রতি কেবল একটা অসন্তোষই ইহাতে জন্মিবে,—নিজেদের ত্রুটি দেখিবে না, সংশোধনের চেষ্টাও করিবে না। তাহাও অনেক আছে।

আলো বন্ধ—তৈলাভাবে মিউনিসিপালিটী রাস্তায় আলো বন্ধ করিবেন বলিয়া ঢোল দিয়াছেন। রাস্তায় সরকারী আলো বন্ধ—গৃহে আলো বন্ধ—এ অন্ধকার কে কবে ঘুচাইবে? এ যে ঘোর অন্ধকার।

(বরিশাল হিতৈষী)

কাগজে লাভ—বিগত আগষ্ট হইতে মার্চ্চ অবধি ৮ মাসে টিটাগড় মিল ২১, ৫৪, ৪৪৭ টাকা লাভ করিয়াছেন। একথা শুনিয়া আমরা, যাহারা কাগজের মূল্যাধিক্যে সর্ব্বনাশ পাইতেছি তাহাদের প্রাণে কেমন জ্বালা উপস্থিত হয় তাহা বলিবার স্থান কি আমাদের আছে? থাকিলে এত চড়াদামে কাগজ বিক্রয় করিয়া এত লাভ করিবার অধিকার নিশ্চয় খর্ব্ব করা হইত।

(বরিশাল হিতৈষী)

টিপ্পনী—মোট লাভ এই হইয়াছে, কিন্তু মূলধন কত ছিল? লাভ বেশী কি কম হইল, তাহা তাহারই অনুপাতে ধরিতে হয়।

বাঁশের আদর—টিটাগড় কাগজ কলের মালিকগণ অচিরে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁশ হইতে কাগজ তৈয়ারীর মণ্ড প্রস্তুত করিবার কল স্থাপন করিবেন। আমাদের দেশীয় জমিদার ও ধনী মহাজনগণ কেবল ঘুমাইবেন। গরীবেরা হয়ত বাঁশ বেচিয়া দুপয়সা পাইবে। বাঁশের চাষ বৃদ্ধি করা উচিত।

(বরিশাল হিতৈষী)

বাগেরহাট সংবাদ।

১। স্থানীয় কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে বাগেরহাটে একটী চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। চিনির মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে স্থানে স্থানে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ আবশ্যক। ইহাতে লাভেরও বিশেষ

সম্ভাবনা আছে। আশা করি, চাকুরী প্রত্যাশী দেশের যুবক বৃন্দ এইরূপ ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া দেশের প্রকৃত হিতসাধনে বদ্ধপরিকর হইবেন।

(খুলনাবাসী)

বাঙ্গালার শিক্ষা

গত বর্ষের হিসাব

বাঙ্গালার শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ গত বর্ষের সরকারী রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় আছে :—

স্কুল কলেজের সংখ্যা

বাঙ্গালা দেশে গত বর্ষে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫০, ৮৮৭ এবং ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৯, ৬৫, ২৭৩। তন্মধ্যে পুরুষ-ছাত্র ছিল—১৬, ৪৮, ০৭৮ এবং স্ত্রী-ছাত্রী ছিল—৩, ১৭, ১৯২।

কলেজের সংখ্যা

গতবর্ষে একটী নূতন কলেজ স্থাপিত হওয়াতে বাঙ্গালা দেশে কলেজের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল—৩৪, ছাত্রের সংখ্যা —২০, ৪৭৯। ইহার মধ্যে ১৭, ৯৯৯ জন হিন্দু, ২,০৫২ মুসলমান এবং অবশিষ্ট ৪২৮ জন অন্যান্য জাতিভুক্ত।

উচ্চ ইংরেজী স্কুল

উচ্চ ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা ২,৬৭৩। ছাত্রের সংখ্যা ৩,৯৬, ৪৬৫।

প্রাইমারী স্কুল

প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা—৩৪,০৭০। ইহার মধ্যে উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৩,১৭৪ এবং নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৩০,৯০৩০। ছাত্রের সংখ্যা—১১,৮২,৬৬০।

মুসলমান ছাত্র-সংখ্যা

বাঙ্গালা দেশের সকল শ্রেণীর স্কুলকলেজে মোট ৮,৯৯,৬৭৯ জন মুসলমান ছাত্র আছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৮,৬৪,১৯৫। সুতরাং মুসলমান ছাত্রসংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাড়িয়াছে।

(হিন্দুস্থান)

সংগ্রহ বৈচিত্র্য

পুরাতন কাগজ—আজকাল কাগজের মূল্য অধিক। পুরাতন কাগজ অবহেলার জিনিষ নয়। জাপান দেশে কাগজের কাপড় কোট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ইহা শীত নিবারক। ডাক্তারগণ বলেন বুকের ভিতর একখণ্ড কাগজ রাখিয়া দিলে বুকে ঠিম লাগিতে পারে না। কাগজে মৎস্য জড়াইয়া রাখিলে শীঘ্র পচিয়া যায় না। পুরাতন কাগজ নষ্ট না করিয়া দীনদরিদ্র ভারতবাসী ইহার শীত নিবারক গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

(এডুকেশন গেজেট)

চুটকী

মৌমাছির ওজন—পাঁচ হাজার মৌমাছি এক সঙ্গে ওজন করিলে কত হয় জানেন? বড়-জোর আধ সের!

* * *

গঙ্গা ফড়িংএর কাণ—গঙ্গাফড়িংয়ের কাণ তার মুখে থাকে না—থাকে তার সাম্‌নের দুই ঠ্যাংয়ের উপরে!

* * *

লবণের ছড়ি—রুশ পোল্যাণ্ডে এমন অনেক গ্রাম আছে—যেখানে ইট-চুণ সুরকির বদলে কেবল লবণের চাপ্‌ড়া দিয়া বাড়ী লুণ-ঘর তৈয়ারি হয়!

* * *

এবারের মহাসমরে জর্ম্মাণরা যে বিষাক্ত বাষ্প ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাতে ফ্রান্সের জমির উর্ব্বরতা নাকি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ সব জমিতে অন্ততঃ পনর বছর আর চাষ-বাস করা চলিবে না।

(হিন্দুস্থান)

প্রথম বায়স্কোপ—সর্ব্বপ্রথম বায়স্কোপ দেখানো হয় শিকাগো সহরে, 'ওয়ার্লডস ফেয়ার' নামে মেলায় সে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা তখন তাহার নাম ছিল— 'কিনেটোস্কোপ'।

মেয়ে এটর্ণী—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ফ্রান্সে, হল্যাণ্ডে ডেনমার্কে, রুষিয়ায় ও ফিনল্যাণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ কুড়িহাজার মেয়ে-এটর্ণী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা নাম কিনিয়াছেন, তাঁহারা গড়পড়তায় বৎসরে পনেরো হাজার টাকা রোজগার করে।

স্নানাগার—নিউইয়র্ক সহরের একটি বিখ্যাত নূতন হোটেলে দুই হাজার স্নানের ঘর আছে! পৃথিবীর আর সব সহরের চেয়ে লণ্ডনেই পারিবারিক স্নানাগারের সংখ্যা বেশী। কিন্তু সাধারণ স্নানাগারের সংখ্যায় জাপান আর সব দেশকে টেক্কা দিয়াছে। এক টোকিও সহরে স্নানাগার আছে আট শতেরও অধিক এবং প্রতিদিন প্রায় তিনলক্ষ লোক সেখানে স্নান করিতে যায়!

ঝিনুকের ডিম—বৎসরে ৪০০,০০০ করিয়া ঝিনুকের ডিম হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে ৪০০ কি তাহারও কম টিকিয়া থাকে।

পদোচিত আকৃতি—আমাদের সম্রাটের যে আর্দ্দালী সকলের চেয়ে লম্বা, সে প্রায় সওয়া চার হাত উঁচু। চৌদ্দবৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহার শরীরের দৈর্ঘ্য ছিল ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি।—আঠার বৎসর বয়সে তাহার উচ্চতা ৬ ফিটে উঠিয়াছিল।

পায়রার আহার—সাধারণের ধারণা পায়রা বড় কম খায়। কিন্তু তাহা সত্য নহে। একশত পায়রা এক সপ্তাহের মধ্যে ১৫ বিঘা জমির মটর কলাই সাবাড় করিতে পারে। বিলাতী বুনো পায়রারা তিন চারমাসে যে গম খায়, তাহার রুটি করিলে তিন ডিভিসন সৈন্যের একবৎসরের খোরাকী স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।

চুয়ান্নতলা বাড়ী—আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে "উল্‌ওয়ার্থ বিল্ডিং" নামে একটি অট্টালিকা আছে, তাহা চুয়ান্ন তলে বিভক্ত! পৃথিবীতে এর চেয়ে উঁচু আফিস বাড়ী আর দুটি নাই। স্বর্গীয় ফ্রাঙ্ক ডবলিউ উল্‌ওয়ার্থ সাহেব এই বাড়ীর নির্ম্মাতা। তিনি যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য আঠার কোটি টাকা।

মাটীর নীচে খাল—ইংলণ্ডের উত্তরে ওয়ার্সালি ও সেণ্ট হেলেন্‌সের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মাটীরনীচে একটী খাল আছে। খালটী প্রায় ৮ ক্রোশ লম্বা! ল্যাঙ্কাসায়ার অঞ্চলে অনেক কয়লার খনি আছে। মাটীর ভিতর হইতে উপরে কয়লা তুলিতে বেশী খরচ হইয়া থাকে। এই খরচ বাঁচাইবার জন্য এই খাল কাটানো হইয়াছে। এখন এই খাল দিয়াই কয়লা চালান হইতেছে।

বিড়ালের জন্য অনাথাশ্রম—বিলাতের চেষ্টারে ওয়ালটার স্কট নামে এক বিড়ালপ্রিয় ভদ্রলোক, বিড়ালের জন্য দাতব্য হোটেলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অনাথ বিড়ালগুলিকে রাস্তা হইতে ধরিয়া আনিয়া এখানে রাখা হয়। দিনে তিনবার করিয়া তাহারা খাইতে পায়। হোটেলে বাঘের মাসীদের দল দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে।

সব-চেয়ে বড় বই—চীন দেশের এক ঔষধের দোকানে একখানি বই আছে, সেখানি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গ্রন্থ। দোকানের ঔষধের যে সমস্ত প্রশংসা-পত্র পাওয়া গিয়াছে, এই পুস্তকে তাহাই ছাপা হইয়াছে। যখন বন্ধ করা থাকে, বইখানি তখন মোটা হয় এক ফুট। যখন খোলা থাকে, তখন তার মাপ চওড়ায় সাত ফিট ও লম্বায় সাড়ে তিন ফিট। বইখানি ওজনে প্রায় তের মণ পাঁচ সের এবং সেখানিকে রাখিবার জন্য একটি বিশেষ টেবিল তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। (হিন্দুস্থান)

বিজ্ঞানের কেরামতি—তারহীন টেলিগ্রাফের দ্বারা এতদিন ছয় হাজার মাইলের বেশী দূর খবর পাঠানো চলিত না কিন্তু একজন আমেরিকান অবিষ্কারক ডাঃ লিডস ফরেষ্টের অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহর হইতে নিউজীল্যাণ্ডে খবর পাঠানো সম্ভব হইয়াছে। এই দুই দেশের মধ্যে বার হাজার মাইলের সুদীর্ঘ ব্যবধান। (হিন্দুস্থান)

তার বার্ত্তার বদলে শামুক-বার্ত্তা—বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এমিল অ্যালেক্স বিজ্ঞান জগতে একটি বিচিত্র প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। প্রস্তাবটি কি তাহা বলিবার আগে, গোড়ায় দুইটা কথা বলা দরকার।

শামুক সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু নর শামুক ও নারীশামুকের ভিতরে যে মনের কথা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, একথা বোধ হয় সকলে জানেন না।

প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিখ্যাত অ্যাবি ফ্যাব্রে দেখাইয়াছেন, নরশামুক ও নারী-শামুককে আলাদা আলাদা টিনের বাক্সে বন্দী করিয়া রাখিলেও, নর-শামুক অনায়াসেই সে চালাকি চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলে; প্রিয়তমা যে কাছেই আছে, এটা বুঝিতে তার একটুও দেরি হয় না।

অধ্যাপক আলেক্স পরীক্ষায় আরও বেশী অগ্রসর

হইয়াছেন। শামুকের মানসিক বার্ত্তা আদান-প্রদানের শক্তি কতটা বেশী, সেটা বুঝিবার জন্য তিনি দাবা খেলার ছকের মত দুখানি ছক লইয়া পরীক্ষা সুরু করেন। প্রথম ছকের সাদা ঘরগুলিতে তিনি কয়েকটা নারী শামুক আনিয়া রাখিলেন। তারপর দ্বিতীয় ছকের সাদা ঘরগুলিতেও ঠিক সমান-সংখ্যার কয়েকটা নর-শামুক বসাইয়া, সে ছকখানিকে তিনি অন্য একটী গৃহে রাখিয়া আসিলেন। তার পর তিনি এ-ঘরে আসিয়া প্রথম ছকের নারী শামুকগুলিকে সাদা হইতে কালো ঘরে বসাইয়া দিলেন। অন্য গৃহে, দ্বিতীয় ছকের নর-শামুকগুলি আপন আপন স্ত্রীদের গতিবিধি ও স্থান পরিবর্ত্তনের দৃশ্য দেখিতে পাইতেছিল না বটে, কিন্তু তাহার পত্নীদের অনুসরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সাদা ঘর ছাড়িয়া কালো ঘরে সরিয়া গেল! নর-শামুক ও নারী শামুকের মাঝখানে ক্রমে ক্রমে ব্যবধানের দূরত্ব বাড়াইয়াও অধ্যাপক অ্যালেক্স দেখিয়াছেন, নরেরা নারীর গতিবিধি অনায়াসে অনুসরণ করিতেছে।

এইরূপ অনেক পরীক্ষার পর অধ্যাপক অ্যালেক্স এখন বলিতেছেন, তাঁহার এই নূতন আবিষ্কারের ফলে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ শীঘ্রই সেকেলে হইয়া পড়িবে। তাহার বদলে ভবিষ্যতে শামুকবার্ত্তার চলন হইবে। ইহার জন্য বিশেষ তোরজোড়ের দরকার নাই; প্রতি টেলিগ্রাফ আফিসে এক এক জোড়া করিয়া নর ও নারী শামুক এবং দুখানি বর্ণমালা-লেখা ছক থাকিলেই দিব্য কাজ চলিয়া যাইবে। মনে কর, প্যারী সহর হইতে মার্সেলসে কোন কোন খবর পাঠাইতে হইবে। সে ক্ষেত্রে প্যারী আফিসে বসিয়া সংবাদপ্রেরক, এ বি-সি-ডি প্রভৃতি লেখা ছকের উপরে নারী শামুক বসাইয়া যে যে অক্ষরের দরকার, সেই সেই অক্ষরের উপরে তাহাকে বুলাইয়া যাইবে। ওদিকে মার্সেলসের আফিসে বর্ণমালার ছকের উপরে নর-শামুক, পূর্ব্বোক্ত নারী-শামুকের অনুসরণে ঠিক নির্দ্দিষ্ট অক্ষরগুলির মাড়াইয়া চলিতে সুরু করিবে। নর-শামুকের সেই গতিবিধি দেখিয়া সংবাদ-সংগ্রাহকের পক্ষে খবর বুঝিতে বিলম্ব হইবে না!

এই শামুক-বার্ত্তার খবর দিয়া "পিয়রসন্স্ উইকলি"র লেখক বলিতেছেন, এ ব্যাপারটায় অবাক হইবার কিছুই নাই। (হিন্দুস্থান)

হোপ ডায়মণ্ড

এই বিখ্যাত মণিতে নীলকান্ত মণি এবং হীরকের সৌন্দর্য্য এবং দ্যুতি সমভাবে বিদ্যমান। ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের কোন মন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করিত। কোন ইউরোপবাসী ইহাকে সেখান হইতে চুরি করিয়া লয়। ক্রমে মণিটি ১৬৬৮ খ্রীঃ অব্দে বিখ্যাত পরিব্রাজক ও রত্নবণিক তাবার্ণিয়ের হস্তে পতিত হয়। ঋণের দায়ে তিনি মণিটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। তাহার পর দেশে গিয়া জ্বরে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

কালক্রমে এই মহারত্ন ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুই কর্ত্তৃক ক্রীত হয়। শ্রীমতী মন্টেস্পান নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার অনুগৃহিতা ছিলেন। শ্রীমতীর হাব-ভাবে মোহিত হইয়া রাজা তাহাকে এই মণি উপহার প্রদান করেন। কিন্তু যে দিন হইতে উক্ত মহিলা এই রত্ন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, সেই দিন হইতে তিনি রাজানুগ্রহে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতা হন। রাজস্ব-সচিব ফোকেট রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন; তিনি কোন প্রসিদ্ধ নিমন্ত্রণ সভায় পরিয়া যাইবার জন্য মণিটি মহিলার নিকট চাহিয়া লইয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার পর দিন হইতে তিনি রাজার বিষনয়নে পতিত হন।

পুনরায় এই অমূল্যরত্ন ফ্রান্সের রাজভাণ্ডারে উপস্থিত হয়। ফ্রান্সের অধিপতি ষোড়শ লুইএর মহিষী মহারাণী মেরী আঁতইনেত রাজভাণ্ডারস্থিত মণিমুক্তারাজির মধ্যে এই মণিটি অত্যন্ত মনোনীত করিয়া ধারণ করিতে আরম্ভ করেন। পরিণামে তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘোর দুর্গতি ঘটিত হইয়াছিল, ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বধ্যভূমিতে জল্লাদের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। রাজকুমারী লাম্বেল কিছুদিন এই মণি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে জনতার হস্তে তাঁহার জীবননাশ ঘটিয়াছিল।

বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় কিছুদিন পর্য্যন্ত এই মণির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অবশেষে ৪০ বৎসর পরে হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম নগরে একজনের নিকট ইহা আছে বলিয়া জানা গেল যাহার অধিকারে তখন ইহা ছিল, তাহার উচ্ছৃঙ্খল পুত্র এই মণি অপহরণ করে এবং নানা প্রকার অপব্যয়ে পিতার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া শেষে নিজে আত্মহত্যা করে।

তাহার পর ইহা যাহার হস্তগত হয়, সে ব্যক্তি খাইতে না পাইয়া মণি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাইবার পূর্ব্বেই অনাহারে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে।

অবশেষে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের হোপ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়া এই জগদ্বিখ্যাত মণি "হোপ হীরক" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। কালক্রমে ঐ বংশের লর্ড হেন্‌রি ফ্রান্সিস হোপ ইহা বিক্রয় করিয়া ফেলেন। অনেক হাত ঘুরিয়া অবশেষে ইহা রুসিয়া দেশের রাজ-পরিবারস্থ প্রিন্স কানিটোভস্‌ক নামক এক রাজ-কুমারের অধিকৃত হয়। তিনি ইহাকে তাঁহার প্রণয়িনী বিখ্যাত রূপবতী ফ্রান্সদেশীয়া অভিনেত্রীকে দান করেন। রমণী যেদিন এই রত্ন প্রথম ধারণ করিয়া নাট্যমন্দিরে অভিনয় করিবার জন্য উপস্থিত হন, সেই দিন রাজকুমার কোন কারণে সেই রঙ্গমঞ্চেই গুলী করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। আবার ইহার ৬ দিন পরে রাজকুমার নিজেও রাষ্ট্র-বিপ্লব-কারীদিগের হস্তে নিহত হন।

তাহার পর গ্রীসদেশীয় কোন মণিকার এই রত্ন ক্রয় করিয়া দেশে যাইবার সময় পথে কোন গিরিচূড়া হইতে শকটসহ পতিত হইয়া স্বীয় পত্নী ও দুইটী সন্তানের সহিত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন।

তৎপরে এই দুর্ভাগ্যপ্রদ মণি তুরস্ক রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি সুলতান আবদুল হামিদের রাজকোষে উপনীত হয়। পরিণামে তাঁহার কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা সকলেরই স্মরণপথে সম্পূর্ণ বিদ্যমান। "নবীন তুরস্ক" নামক বিদ্রোহী প্রজাদিগের কর্ত্তৃক তিনি রাজ্যচ্যুত হন। তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্রী সালেমা এই মণি ধারণ করিতেন। পাছে তিনি বিদ্রোহীদিগের হস্তে পতিতা হইয়া অপমানিত হন, এই ভয়ে সুলতান গুলী করিয়া তাহার প্রাণবধ করেন।

অবশেষে এই মণি স্পেনদেশীয় সেনর হবিব নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অধিকারভুক্ত হয়। জাহাজ ডুবি হইয়া সিঙ্গাপুরের নিকট সমুদ্রে তাহার দেহত্যাগ ঘটে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে মণিটি ডোবা জাহাজ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের "ওয়াসিংটন পোষ্ট" নামক সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারী মিঃ এডওয়ার্ড বি ম্যাকলিন নামক এক ব্যক্তি এই রত্নের বর্ত্তমান অধিকারী। মিঃ ম্যাকলিনের পিতা এবং শ্বশুর উভয়েই ক্রোরপতি, ম্যাকলিনের একটি মাত্র পুত্র তাহার নাম ভিনসওয়ালস্ ম্যাকলীন। বয়স এগার বৎসর মাত্র এই বালক তাহার ক্রোরপতি পিতামহ ও মাতামহের একমাত্র বংশধর বলিয়া তাহাকে ক্রোরপতি বালক বলিয়া ডাকা হইত। আমেরিকায় বালক-চোর অর্থাৎ ছেলেধরার উৎপাত বড়ই বেশী। ছেলেধরারা ধনী ব্যক্তিদিগের সন্তান চুরী করিয়া কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখে যে কোনমতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। শেষ অবস্থায় উপযুক্ত নিষ্ক্রয় মুদ্রা দিলে অপহৃত বালক বা বালিকাকে ছাড়িয়া দেয়। পাছে সেই ছেলেধরারা বালক ম্যাকলীনকে চুরি করে, সেই জন্য তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখা হইত।

এইরূপ রাজপুরোচিত ভোগে এবং সতর্কতার সহিত ম্যাকলিন-তনয় প্রতিপালিত হইতেছিল কিন্তু নিয়তির গতি কে রোধ করিবে? কাল চোরে চুরি করিলে কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? সম্প্রতি এই বালক পিতার প্রাসাদোপভবনের পার্শ্বস্থ রাজপথে খেলা করিতে গিয়া মোটর চাপা পড়িয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। কবি-প্রসিদ্ধি আছে যে, উদ্যান বৃক্ষের নীচে যে বসে, সেই মরে। এইরূপ এই মণি যাহারই অধিকারে আসিয়াছে তাহারই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ভবিষ্যতে আর কত লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, কে বলিবে?

এই বিখ্যাত মণির ওজন ৪৪॥০ ক্যারাট বা প্রায় ২ তোলা। ইহার প্রকৃত মূল্য প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা।

(দৈনিক বসুমতী)

অশ্রু

বুকের ভাষা নীরব হলে আঁখির আড়ে অশ্রু বয়,
শতেক কথা, শতেক ব্যথা নয়ন কোণে ব্যক্ত হয়।
বক্ষ সে ত শীতল কোমল তপ্ত জলে একি ঢালা,
দুটী বিন্দু অশ্রু কণায়—এত দহন, এত জ্বালা।

শ্রীনরেন গাঙ্গুলী

পুস্তক সমালোচনা

শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ দাস ঘোষ প্রণীত "হেমচন্দ্র" প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় "কবি হেমচন্দ্র" নামক ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবুর পুস্তিকা দৃষ্টে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকবি হেমচন্দ্রের কাব্যগুরু। কিন্তু সেই ভ্রম বিশ্বাস অদ্য মন্মথবাবু তাঁহার সুমধুর লেখনী নিঃসৃত সমালোচনায় দূর করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু হেমবাবুর কবিত্ব সম্বন্ধে আরও কতকগুলি ভ্রমাত্মক ধারণা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন। মন্মথবাবু সেই সমস্ত ভ্রমাত্মক ধারণা এক একটী করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। মাইকেলের গ্রন্থাবলীতে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য আছে এবং আর একদিকে দেখিতে গেলে তাহাতে যথেষ্ট দোষও আছে। হেমচন্দ্রে মাইকেলের গুণগুলি ষোল আনায় বর্ত্তিলেও তাঁহার দোষ একটীও আসে নাই। হেমচন্দ্র জীবিত থাকিতে আমরা তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম বটে কিন্তু তাঁহার আসন যে কত উচ্চে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় নাই। অদ্য মন্মথবাবু সেই উচ্চতা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। মন্মথবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে যে সমস্ত ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া হেমচন্দ্রের জীবনী ও কবিত্বের সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিয়াছেন সেইরূপ ভাবে অদ্যাবধি আমাদের দেশের কবিগণের সম্বন্ধে কোন সমালোচনা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হেমচন্দ্রের যেমন সরলতা মাখান কবিতাকুঞ্জ, তাঁহার সমালোচকও সেইরূপ সরল প্রাঞ্জল করিয়া বাংলায় একটী সুন্দর উপহারের সামগ্রী তৈয়ারী করিয়াছেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, যে মন্মথবাবু "হেমচন্দ্র" লিখিয়া সফলতা লাভ করিবেন।

অবসর চিন্তা তৃতীয় খণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বি, এল্, মহাশয় হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল এবং বঙ্গীয় প্রজাসত্ববিধি আইন সম্বন্ধে পণ্ডিত বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে ভাবতরঙ্গের জলপ্রপাত থাকিতে পারে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। সহসা একদিন তাঁহার অবসর চিন্তার তৃতীয় খণ্ডের একখানা পুস্তক পাইয়া—আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তৃতীয় খণ্ড পড়িয়া আমাদের মনে হইল যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধমালার পর সেই প্রকারের প্রবন্ধ এই মাত্র প্রথম পাইলাম। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের মধ্যে স্বাধীনচিন্তার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার রচনায় যথেষ্ট স্বাধীনচিন্তার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধখানিতে ১। কথা বলিতে পারি না ২। অভ্যুদয় ৩। আতিথেয়তা ৪। অনুকরণ ৫। প্রকৃত ক্ষতি ৬। সম্পত্তি হরণ ৭। ভয় ৮। সুখ ৯। অসহ্য ও সহ্য ১০। বিস্মৃতি ও ভ্রান্তি ১১। নানা কথা, এই এগারটী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

কথা বলিতে পারি না—নিরীহ ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। প্রিয়জন হইলে কি হয় নিরীহ ব্যক্তি পাইলেই ভালবাসার অত্যাচার করিতে নিরস্ত হন না। চিরপুরাতন জিনিষ—কিন্তু চিরনূতন ভাবে প্রচার করিয়া নিরীহ ব্যক্তিগণের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন।

অভ্যুদয়ে সুরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন- "অভ্যুদয়কালে সর্ব্বদাই এই বিষয়ে যত্নবান ও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য" যে,'আমার পদস্খলন না হয়। ইহা প্রত্যেক মনুষ্যেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। আতিথেয়তায়, সুরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,"যিনি তোমার বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন তোমাকে কয়েকটী গুণে গুণান্বিত মনে করিয়া তোমার বাটীতে আইসেন; তোমাকে যদি অতিথি মনে করেন, যে তুমি কৃপণ, তুমি লোকের সঙ্গ-সুখ ভালবাস না, তুমি সামান্য ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত তাহা হইলে কেহ তোমার বাটীতে অতিথি হন না।"

এইরূপ সুরেন্দ্রবাবুর পুস্তিকায় অনেক শিখিবার কথা আছে। স্কুল কলেজের ছাত্র মাত্রেরই এই পুস্তিকাখানি যে একান্ত পাঠোপযোগী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রবাসী(?)
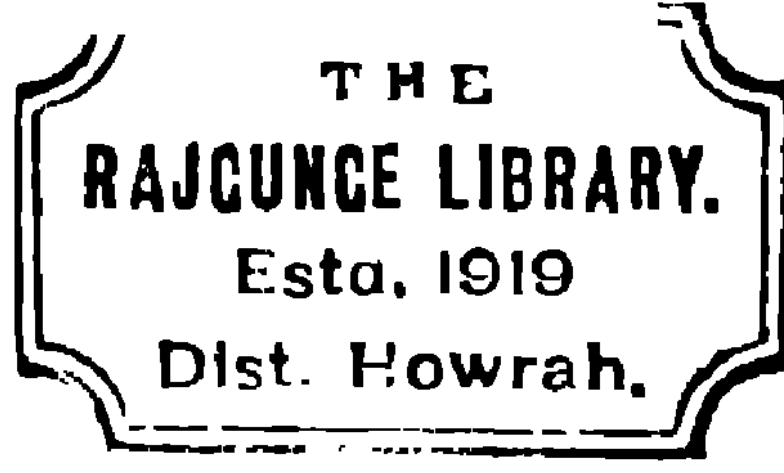
৬ষ্ঠ বর্ষ | ভাদ্র—১৩২৬ | ৫ম সংখ্যা

রাজনীতিক্ষেত্রে

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সার্ রিচার্ড টেম্পালের পর সার্ এস্‌লি ইডেন্ বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুরের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় লর্ড নর্থব্রুক্ ভারতের বড়লাট ছিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারে যখন কৃষকগণ জর্জ্জরিত হইতেছিল, তখন সার্ এস্‌লি তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি যখন বর্ম্মার চিফ্ কমিশনারের পদ হইতে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন বঙ্গবাসিগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। জগতে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলেই প্রলোভনের দাস, ইহাই সার্ এস্‌লির বিশ্বাস ছিল। তিনি গভর্ণমেণ্টকেও প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি পব্‌লিক ওয়ার্কস্ সেস্ জমিদারদিগের স্কন্ধে চাপাইবেন, এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ছোটলাট বাহাদুরের মস্‌নদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সার্ এস্‌লি অতি সহজেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন। মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর ও বাবু কৃষ্ণদাস পাল তৎকালে এসোসিয়েশনের জীবনস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের কার্য্য পরিচালিত হইত। সার্ এস্‌লি এই ক্ষমতাশালী সভ্যদ্বয়কে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীয় আয়ত্তে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অমৃতবাজার পত্রিকার নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও লিপিচাতুর্য্য লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহার সম্পাদক শিশিরকুমারকেও বশীভূত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহনের ন্যায় শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশ্রেণীর লোক যখন বশীভূত হইয়াছেন, তখন শিশির কুমারের ন্যায় সামান্য ব্যক্তি যে অনায়াসেই তাঁহার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শিশিরকুমার মাত্র দুইবার সার এস্‌লির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে কেবল অল্‌বর্ট টেম্পল্ অব্ সায়েন্স সম্বন্ধে দুই একটী কথা হইয়াছিল। দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় উভয়ের মধ্যে যে

কথোপোকথন হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

সার্ এস্‌লি।—"শিশির বাবু, আপনাকে আমি আমার একজন বিশেষ বন্ধু বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালীরা যে, আমার প্রতি প্রিয় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আপনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আপনার পত্রিকায় কেন যে মধ্যে মধ্যে কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। লর্ড নর্থব্রুক্ আপনার কতগুলি প্রবন্ধ আমাকে দেখাইয়াছিলেন; সে গুলি পাঠ করিয়া আমি লজ্জায় অবনত-মস্তক হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

শিশির।—"আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; আপনি আমার প্রবন্ধের মধ্যে একটীও কুৎসাপূর্ণ বাক্য দেখাইতে পারেন কি? আমার পত্রিকায় যদি কুৎসাপূর্ণ বা রাজদ্রোহ সূচক কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট যে আমাকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিতেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি যে কখনও কোনও অসঙ্গত বা আইন বিরুদ্ধ কথা আমার পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করি নাই, গভর্ণমেণ্টের নীরবতাই তাহার প্রমাণ।

সার্ এস্‌লি।—"গভর্ণমেণ্টের সদাশয়তাই আপনাকে প্রশ্রয় দান করিয়াছে।"

শিশির। "আমার পত্রিকার প্রবন্ধগুলি অশ্লীলভাষী ও আপনাদের কুৎসায় পরিপূর্ণ, আপনি কি তাহা দেখাইতে পারেন?"

সার্ এস্‌লি।—"আপনি কি বলিতে চান যে, আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য নহে? আপনি অতিশয় 'চালাক', তাই স্পষ্টভাবে আমাদিগকে দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চক ইত্যাদি বলেন না। কিন্তু আপনার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা আপনার প্রবন্ধ পাঠে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।"

শিশিরকুমারের সহিত কথার সময় সার্ এস্‌লি বিন্দুমাত্র ক্রোধের ভাব প্রকাশ করেন নাই, তিনি যেন রঙ্গচ্ছলেই কথা বলিতেছিলেন। শিশিরকুমারও বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

সার্ এস্‌লি ইডেন্ পুনরায় বলিলেন,—"আমি বাঙ্গালী জাতির সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি, তাহা আপনি অবগত আছেন। তাহাদের সকল অভাব অভিযোগের কথাই আমি অবগত আছি। বড়লাট বাহাদুরকে আমি বলিয়াছি যে, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবন্ধগুলি অন্তঃ-সারহীন, সুতরাং তাহাতে আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে।"

শিশির।—"অন্তঃসারহীন প্রবন্ধগুলি লইয়া গবর্ণমেণ্টের কি এরূপ আলোচনা করা কর্ত্তব্য?"

সার্ এস্‌লি।—"শিশিরবাবু, এই বিশাল ভারতভূমি যে একখানি সামান্য পল্লী নহে, পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিবার সময় এ কথাটী স্মরণ রাখিবেন। ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শুভাশুভের কথা সংবাদপত্রে আলোচনা করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, এ কথা বিস্মৃত হইবেন না। কিরূপভাবে সংবাদপত্রে আন্দোলন করিলে, দেশের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা আপনি সম্যক্ অবগত নহেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহা আমাকে একবার দেখাইবেন, আমি সংশোধন করিয়া দিব। আবশ্যক হইলে আমি স্বয়ংও আপনার পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া দিব।"

ছোট লাট বাহাদুর কি উদ্দেশ্যে কথা বলিতেছিলেন, শিশির কুমার তাহা বুঝিতে পারিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি বোধ হয় আমার সহিত উপহাস করিতেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার জন্য আপনি কষ্ট করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া দিবেন, এ কথা আমি মনে স্থান দিতে পারিতেছি না।"

সার্ এস্‌লি—"শিশরবাবু, আমি আপনার সহিত উপহাস করিতেছি না; আমি সত্য কথাই বলিতেছি। আমি প্রায়ই হিন্দু প্যাট্রিয়ট্ পত্রিকায় লিখিয়া থাকি, কিন্তু এ কথা কেহই অবগত নহেন। আপনার কোনও আপত্তি না থাকিলে আমি আনন্দের সহিত পত্রিকা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। তাহাতে আপনার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, কারণ তাহা হইলে আমি এবং আপনি প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশ শাসন করিব।"

শিশিরকুমার একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে কৃষ্ণদাসের কি গতি হইবে?"

সার্ এস্‌লি।—"তিনিও অবশ্য আমাদের সহিত থাকিবেন।"

বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা কি উদ্দেশ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ জন্য উদ্বিগ্ন, শিশিরকুমারের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহা বুঝিতে বড় বিলম্ব হয় নাই। যে হিন্দু প্যাট্রিয়ট্ পত্রিকা পাঠ করিবার জন্য এক সময়

জনসাধারণ উৎসুক হইয়া থাকিত, তাহা যে কি জন্য ক্রমশঃই দেশবাসীর বিশ্বাস হারাইয়াছে, শিশিরকুমার একণে তাহা বুঝিতে পারিলেন। প্যাট্রিয়টের ন্যায় অমৃতবাজার পত্রিকাখানিও হস্তগত করাই সার্ এস্‌লির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই জন্যই তিনি শিশিরকুমারকে বঙ্গদেশ শাসনের অধিকার প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচতার পরিচয় প্রদান করা শিশিরকুমারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি প্রলোভনের অতীত ছিলেন। লাট বাহাদুরের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া শিশিরকুমার স্বীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান বিসর্জ্জন দেওয়া নীচতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই হিন্দু প্যাট্রিয়ট্ স্বাধীনতা হারাইয়াছে; অমৃতবাজার পত্রিকাও যদি সেই পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে দেশের অভাব অভিযোগের কথা আর গভর্ণমেন্টের গোচর হইবে না, শিশিরকুমার এই কথা স্মরণ করিয়াই সার্ এস্‌লির প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতে পারেন নাই। তিনি বিনীতভাবে ছোটলাট বাহাদুরকে বলিয়াছিলেন, "অমৃতবাজার পত্রিকা বাগবাজার হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে; বেল্‌ভেডিয়র হইতে পত্রিকার কার্য্য পরিচালন করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব হইবে?"

অমৃতবাজার পত্রিকার আদর্শে তাৎকালিক অন্যান্য বাঙ্গালা সংবাদপত্রও গভর্ণমেন্টের কার্য্যের সমালোচনা করিত। আদর্শকে খর্ব্ব করাই সার্ এস্‌লির উদ্দেশ্য ছিল, সেইজন্যই তিনি শিশিরকুমারকে মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট ও প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকাখানি হস্তগত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারকে তিনি বলিলেন, "বেল্‌ভেডিয়ারের দ্বার আপনার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিবে। আপনি প্রত্যহই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। বিষয় নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ভার আপনার থাকিবে, আর নির্ব্বাচিত বিষয়টী কিরূপভাবে লিখিত হইবে, তাহা স্থির করিয়া দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমার থাকিবে। সংবাদপত্রে কিরূপভাবে আন্দোলন করিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে, তাহা জানিবার সুযোগ আপনার কখনও হয় নাই। আমি বহুকাল হইতেই শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আছি এবং বঙ্গদেশের ন্যায় বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার আমার উপর ন্যস্ত; এরূপ ক্ষেত্রে আমি আপনাকে সৎপরামর্শ দিতে পারিব বলিয়া আশা করি।"

সার্ এস্‌লি ইডেন্ হাসিতে হাসিতে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, কিন্তু শিশিরকুমার তাঁহার এই হাসির গূঢ় অর্থ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে অমৃতবাজার পত্রিকা দেশবাসীর আদরের জিনিস, যে পত্রিকা পাঠ করিবার জন্য জনসাধারণ সর্ব্বদাই উৎসুক, সেই পত্রিকা পরিচালনের ভার প্রলোভনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গের শাসনকর্ত্তার হস্তে প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সার্ এস্‌লির কর্ত্তৃত্বাধীনে সংবাদ পত্রখানি পরিচালিত হইলে শিশিরকুমারের আর্থিক সুবিধা হইত বটে, কিন্তু অর্থের জন্য স্বদেশসেবার প্রবৃত্তি হৃদয় হইতে বলপূর্ব্বক অন্তর্হিত করা তিনি নীচতা ও স্বদেশদ্রোহিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন। শিশিরকুমার বড়ই বিভ্রাটে পড়িলেন। ছোটলাট বাহাদুরের সম্মুখে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা কতদূর বিপজ্জনক তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনার সদাশয়তা ও মহানুভবতা ভারত-বিদিত। আমিও আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আপনার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা কতদূর সম্ভব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে প্রত্যেকবার পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইতে হইবে। কখনও কখনও দুইবারও সাক্ষাতের প্রয়োজন হইতে পারে। তাহাতে আপনার কার্য্যের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! আপনি গোপনে পত্রিকার কার্য্য পরিচালন করেন, ইহা যদি কোনও রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আপনার সুনামে কলঙ্ক অর্পিত হইতে পারে। আপনি বাঙ্গালী জাতির সুহৃদ্; আপনার যশোরবি যাহাতে নিষ্প্রভ হয়, সেরূপ কার্য্য করা আমি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। সেরূপভাবে পত্রিকার কার্য্য চলিতেছে, সেইরূপ ভাবেই চলুক, তবে আমি মধ্যে মধ্যে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, ইহা স্বীকার করিতেছি।"

সার্ এস্‌লি উত্তর করিলেন,—"শিশিরবাবু, আপনার যুক্তিগুলি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বেল্‌ভেডিয়ারে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আপনাকে পূর্ব্বে কোনও পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক হইবে না। আমি আমার প্রাইভেট্

সেক্রেটারীকে বলিয়া রাখিব যে, আপনি আসিবামাত্রই যেন তিনি আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। আর আমার সুনাম ও দুর্নামের জন্য আমিই দায়ী রহিলাম।"

জন্মভূমির অকৃত্রিম সেবক নির্ভীক হৃদয় শিশিরকুমার কিন্তু অটল। সার্ এস্‌লির হস্তে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্য পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া তিনি দেশদ্রোহী হইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শিশিরকুমারের সহিত প্রথমে সার্ এস্‌লি হাসিতে হাসিতে কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, তখন ক্রোধে তাঁহার গণ্ডদ্বয় আরক্ত হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বিরক্তির সহিত শিশিরকুমারকে বলিলেন, "আপনি কোন্ সাহসে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

সার এস্‌লির রুদ্রমূর্ত্তি শিশিরকুমারের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। তিনি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, "সমগ্র ভারতবর্ষে অন্ততঃ একজনও ন্যায়নিষ্ঠ সম্পাদক থাকিবে, ইহা কি লাট বাহাদুরের অভিপ্রেত নহে?"

যে শিশিরকুমারকে সার এস্‌লি ইডেন সামান্য পল্লীবাসী মাত্র মনে করিয়া প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার তেজস্বীতা নির্ভীকতা ও স্বদেশসেবার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের প্রত্যুত্তরে ছোট লাট বাহাদুর আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিলেন। তিনি অতিশয় কর্কশস্বরে বলিলেন, "শিশিরবাবু, আপনি স্মরণ রাখিবেন, আমি ছয় মাসের মধ্যে আপনাকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিব।" সার এস্‌লি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই ভীতিপ্রদর্শন শিশিরকুমারের দৃঢ়তা ভঙ্গ করিবে, শিশিরকুমার তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন! কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। শিশিরকুমার উত্তর করিলেন, "আপনি বঙ্গদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা; আপনি সবই করিতে পারেন। আমাকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দিলে যে আমি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইব, তাহা আপনি মনেও করিবেন না। আমি আমার গ্রামে ফিরিয়া গিয়া, জমিচাষ করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।"

সার এস্‌লি ক্রোধে আসনত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশিরকুমারও উত্তেজিতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। শেষে তিনি লাটবাহাদুরকে বলিলেন, "এখন আমি আপনারই গৃহমধ্যে, আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তার নিকট আমি এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই। যাহাইহউক, এই আপনার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।" কথাগুলি বলিয়া, শিশিরকুমার আর বিলম্ব না করিয়া, কক্ষ ত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতেই শিশিরকুমার সার এস্‌লি ইডেনের চক্ষুশূল হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের যত্নে ও চেষ্টায় এল্‌বার্ট টেম্পেল অব্ সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করা সার এস্‌লির প্রধান কর্ত্তব্য হইল। সার রিচার্ড টেম্পেল্ শিল্প বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্ট হইতে বাৎসরিক আট হাজার টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সার এস্‌লি তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। শিশরকুমারের চেষ্টায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালীটিতে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা রহিত করা সার্ এস্‌লির অন্যতম কর্ত্তব্য হইল। শিশিরকুমারকে ব্যক্তিগতভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর একদিন শিশিরকুমারকে বলেন, "শিশিরবাবু, আপনি একটু সাবধান হইবেন, নচেৎ আপনার পত্রিকার পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইবে!" শিশিরবাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "পত্রিকা পরিচালনে যে আমি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা মনে হয় না। যাহাতে আমার কোন বিপদ না হয়, তৎপ্রতি আমি সাধ্যমত লক্ষ্য করিয়া থাকি।" এই কথোপকথনে শিশিরকুমার বুঝিতে পরিয়াছিলেন, যে তাঁহার পত্রিকার ধ্বংসসাধনের আয়োজন হইতেছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার কয়েকখানি সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রগুলির সংযম সাধন উদ্দেশ্যে অদ্য কাউন্‌সিলে একটি বিল পাশ করা হইবে। সংবাদটি পাঠ করিয়া শিশিরকুমার প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেশ্য সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার বিনাশ সাধনার্থ সার এস্‌লি যে নূতন বিধি প্রণয়ন করিবেন, ইহা শিশিরকুমার মনে করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় তখন শিশিরকুমারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। প্রস্তাবিত বিধি সম্বন্ধে কি স্থির হয়, তাহা

জানিবার জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। লর্ড লিটন তখন আমাদের বড়লাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন, কোন কোন কার্য্যে তিনি সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু শাসনককর্ত্তার উপযুক্ত গুণ তাঁহার অতি অল্পই ছিল। তিনি অনেক সময় তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীগণের কথায় চালিত হইতেন! সার্ এস্‌লি তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, কাবুল যুদ্ধের ব্যাপার লইয়া এদেশীয় সংবাদ পত্রগুলি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পারে, অতএব প্রতিকার জন্য দেশীয় সংবাদ পত্রগুলির মুখবন্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বড়লাট বাহাদুর সম্মতি প্রদান করিলে পাছে কোনওরূপ প্রতিবাদ হয়, এই এই আশঙ্কায় বিলটি এক অধিবেশনেই বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত সংবাদগুলি এই আইনের গণ্ডীর বহির্ভূত ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার কতক অংশ ইংরাজীতে এবং কতক অংশ বাঙ্গালায় লিখিত হইত। পত্রিকার বিনাশ সাধন জন্যই যে সার্ এস্‌লি এই নূতন বিধি প্রণয়নে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তাহা আইনের বিধান হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আইনটি কেবল বাঙ্গালা সংবাদ পত্রগুলির উপর প্রযোজ্য নহে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রগুলির উপরও হইবে।

ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বিল সম্বন্ধে কি স্থির হয়, তাহা জানিবার জন্য শিশিরকুমার উদ্বিগ্নচিত্তে সহোদরগণের সহিত অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস গৃহে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় মতিবাবু শশব্যস্তে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, এ দেশের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইতে চলিল।" শিশিরকুমার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "সার্ এস্‌লি পত্রিকার ধ্বংস সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিন্তু পত্রিকাকে যেরূপেই হউক বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। এবার হইতে আমরা পত্রিকা ইংরাজীতেই প্রকাশ করিব।" তাঁহার কথা তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট বেদবাক্য ছিল। সার্ এস্‌লি ইডেনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য শিশির ও তাঁহার সহোদরগণ অতিমাত্র বদ্ধ পরিকর হইলেন। বর্ত্তমানের তুলনায় তখন ইংরাজীতে সংবাদ পত্র পরিচালন করা যে কিরূপ কষ্টকর ছিল, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। চারি পাঁচ দিন টাইপ্, প্রেসের সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে অতিবাহিত হইল। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন সাপ্তাহিক ছিল এবং প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইত। প্রকৃতপক্ষে একদিনের মধ্যেই দ্বিভাষী অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরাজীতে পরিণত হইয়াছিল। আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরবর্ত্তী বৃহস্পতিবারে ২১শে মার্চ্চ তারিখে, যথা সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সার্ এস্‌লি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন যে তাহা আর দ্বিভাষী নহে, আদ্যোপান্ত ইংরাজীতে লিখিত। পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের কার্য্য কলাপ লক্ষ্য করিয়া ছোটলাট বাহাদুর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং শিশিরকুমারকে তিনি ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন। সার্ এস্‌লি ইডেনকে তাঁহার কোন কোন এ দেশীয় বন্ধু এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন যে, শিশিরকুমারের ইংরাজীতে জ্ঞান অতীব সংকীর্ণ, সুতরাং ইংরাজীতে সংবাদপত্র পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় তাঁহার পত্রিকার অস্তিত্ব যে শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে পত্রিকার সম্পাদক এরূপ সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারেন, সে পত্রিকার উন্নতি অনিবার্য্য। ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অমৃতবাজার পত্রিকার বিনাশ সাধন জন্য যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহার কোনওরূপ ক্ষতি না করিয়া বরং উপকার করিয়াছিল। সার্ এস্‌লি নূতন আইন বিধিবদ্ধ না করিলে অমৃতবাজার পত্রিকা হয়ত দ্বিভাষীই থাকিত। আইন বিধিবদ্ধ হইলে শ্রীযুক্ত মতিবাবু ঢাকায় গমন করেন। সেখানে তাঁহারই উদ্যোগে উক্ত আইনের প্রতিবাদ জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বাবু আনন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার সভার পর কলিকাতায়ও সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট মহাসভায়ও ইহা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল এবং মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কতকগুলি ক্ষীণবিত্ত ও দুর্ব্বল সংবাদপত্র ধ্বংসের পর ভারতের অকৃত্রিম সুহৃদ্ লর্ড রিপন এই মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা হরণকারী আইন উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

যশোহরে অমৃতবাজার পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই স্থানীয় রাজ পুরুষদিগের চক্ষুশূল হইয়াছিল। মিষ্টার ওয়েষ্টল্যাণ্ড যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি যশোহরের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁহার সেই গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠায় তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"It appears once a week and is conspicuous only for its scurrilous tone and its disregard of truth."—অর্থাৎ পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক; ইহা অশ্লীলভাষী ও সত্যাপলাপী বলিয়া পরিচিত। "বেঙ্গলী" তখন সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল এবং ইহার সম্পাদক ছিলেন বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশবাবু বেঙ্গলীতে মিষ্টার ওয়েষ্টল্যাণ্ডের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে ঐতিহাসিকদিগের নিরপেক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু মিষ্টার ওয়েষ্টল্যাণ্ডের নিকট তাহা উচিত বলিয়া মনে হয় নাই। যশোহরের ইতিহাসে তিনি অতি নগণ্য ঘটনারও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঘোষ বাবুদের ঐকান্তিক যত্নে যে মাগুরায় দাতব্য চিকিৎসালয়, ইংরাজী বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা তিনি তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করা যুক্তি সঙ্গত মনে করেন নাই কেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

প্রতীক্ষা

সন্ধ্যা আসে ঘনাইয়া বুকে
প্রকৃতিরে হানে কালো-ছায়া;
ঘুম ছেয়ে আসে চোখে মুখে
নদীনীরে নামে মৌন মায়া।
দীর্ঘশ্বাসে উদাসীন বায়ু
চলে কোন্ অজানিত পথে;
নিবে আসে ধরণীর আয়ু
মেঘ চলে ভেসে মায়া-রথে।
সাঁঝের পেছনে নিশারাণী
স্বপ্ন আসে পিছে পিছে তার;
মূক হয়ে' আসে সব বাণী
কোলে লয়ে আছে আঁধিয়ার।
এমন সময়ে সে তো কভু
রহিতনা আর কোনো খানে;
সকলি আগের মত, তবু
পদধ্বনি শুনি না তো কাণে!
সাঁঝের সমীর লেগে, ধীরে
ঝরি পড়ে বকুলের ফুল
শেষ পাখী ফিরে এল নীড়ে
আজি এ তার কেমন ভুল!
কি নাম তাহার নাহি জানি
আমি শুধু তারেই যে চিনি
চিনি তার চরণ দু'খানি
নূপুরের সেই ঝিনি-রিনি
ঘোমটা খুলিয়া মোর পানে
কোনো দিন চাহে নাই সে তো
আমি বসে রহিতাম ধ্যানে
আপনার মনে চলে যে'ত।
হোথা ওই বকুল শাখায়
ব্যথা-ভরে গাইত কোকিল
বাধিতনা আঁচল কাঁটায়
কেশ তার হ'তনা শিথিল।
ভিজিত না নীল শাড়ীখানি
ভরা ঘট সহসা ছলকি
বাঁকা-বাঁকা ভুরু দু'টী হানি,
দাঁড়াত না সহসা থমকি
এই বাঁকা পল্লী-পথ-মাঝে
সিক্ত-পদ-চিহ্ন আঁকি-আঁকি
চলে যেত প্রতিদিন সাঁঝে
ধীর ভাবে নত করি আঁখি।
কত দিন ভাবিয়াছি, কত
সুধাইব পরিচয় তার
নয়নে ভরিত কথা শত
মুখে তাহা ফুটিতনা আর!
বায়ু এসে কয়ে' যেত কথা
ধীরে ধীরে লতিকার কাণে
আঁকিয়া রাখিত যত ব্যথা
চাহি ধরা আকাশের পানে।
শেষ! দিবা শেষ হ'য়ে আসে
সন্ধ্যা শেষ, আসে আঁধিয়ার
হাসে মৃত্যু জীবনের পাশে
অন্তহীন সাগরের পার!

কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিবন্ধু।

বিন্দুদা

(১৮)

দুইজনেই তাহারা দুজনকে পাইবার আশা একরকম ছাড়িইয়াই দিয়াছিল। এই বার এই একত্র ভ্রমণে তাহা আবার নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল,— উভয়কেই মোহাবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। অজ্ঞাতে যেমন সেই প্রথমে তাহারা অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তেমনি অজ্ঞাতে উভয়েই উভয়ের সহিত দৃঢ়তররূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময়ে বিনয়ের এই অপ্রত্যাশিত এবং উভয়েরই অবোধগম্য ব্যবহারে উভয়েই চমৎকৃত, হতবুদ্ধি এবং শেষে বিরক্ত হইয়া গেল। নীরদ একেবারে দমিয়া পড়িল, নীহার বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মত আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল :

নীরদ ভাবিতে লাগিল,— "করুণাময়বাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক, বিনয় নীহারকে বিবাহ করিবে। কিন্তু আমাকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিম লইয়া যাইবার কি কারণ ছিল তবে? পরিচিত বলিয়াই আমি তাহার উপহাসের পাত্র নই। আর নীহার—সেই বা কেমন? সে কি কিছুই জানে না? তবুও কেন সে—যাক্ ভাবিবনা,—ভাবিয়া কি করিব? উপযাজক হইয়া দেখা করিয়া বিনয়ের নিকট নীহারের পাণিপ্রার্থনা করিব? না, আমি তা পারিব না। প্রয়োজনও নাই। মারগারেট গিয়াছে, নীহারকেও বিদায় করিব। ভারতে আসিয়া মারগারেটের স্মৃতি ভুলিয়াছি; স্থানান্তরে যাইয়া নীহারকে ভুলিব,—কিছুই শক্ত নয়,—পারিব আমি! ক্রমে নীহারের উপর একটা দারুণ অভিমান আসিল, অভিমান ক্রোধে পরিনত হইল। "নাঃ! আর তাহার মুখদর্শনও করিব না!" বিনয়ের উপরও সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল।—সব তাহারই চাতুরী। মুখেই অমন সরল মধুর, অন্তরে বিষ।

সেদিন সেই বিপ্লবময়ী সন্ধ্যায় বাধ্য হইয়াই নীরদ করুণাময়ের বাটিতে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল। আজও তাহার মনের মধ্যে একটা বিরাট বিপ্লব বাঁধিয়া যায়। জোর করিয়াই নিজেকে এই এত দিনের স্নেহপ্রীতিপ্রেমের বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া স্বীয় স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রকৃতিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। আর সে তাহাদের সংস্পর্শেই আসিবে না। কিন্তু একবার লিখিত কোন শব্দ উঠাইয়া ফেলিতে হইলে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কাগজও যেমন উঠিয়া যায়, তেমনি নীহারের স্মৃতি ভুলিতে গিয়াও নীরদের প্রাণের ভিতরে তীব্র বেদনাময় একটা গভীর ক্ষত হইয়া গেল। কিন্তু নিজের উপর নীরদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সঙ্কল্পচ্যুত সে কখনও হইত না। কিন্তু এবার যেন সমস্ত জীবনের অভ্যস্ত আসন তার টলিয়া গেল। বিরাট একটা ট্রেন বীরবিক্রমে আকাশ পৃথিবী কাঁপাইয়া দিয়া কত পাহাড় নদী অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানের সন্নিকটেই যদি আসিয়া পড়ে,—অগ্রগামী ইঞ্জীনটা রুদ্ধ বাষ্প নির্গমনে তখন নিস্ফল গর্জ্জন করিতে থাকে সমস্ত রাগটা যেন লাইন্ ম্যান গুলিরই উপর পড়ে—তেমনি গর্জ্জন করিতে করিতে নীরদ একদিন সন্তোষকে ডাকিয়া বলিল, সন্তোষ! মানুষ সব শয়তান! সব বেইমান! কোন্ কথায় কোন্ কার্য্যে কাহার হৃদয় কতখানি ভাঙ্গিয়া যায়,—কেউ তা বোঝে না।"

সন্তোষ সম্মুখস্থ অঙ্কের খাতা খানির দিকে চাহিয়াই কহিল,—"আজ্ঞে।"

নীরদ বলিল,—"সব স্বার্থপর! সব শয়তান! নিজের পাওয়ার ভিতর ব্যাঘাত ঘটলেই একেবারে তোমাদের সেই পুরোনো দুর্ব্বাসা—এই শাপ দেয় ত এই ভস্ম করে! পরের জন্য,—পর কেন, যাকে খুব বন্ধু বলে বেড়াই তারও মুখ চেয়েও নিজে একটু সরে দাঁড়ান, কিম্বা কিছুই ছেড়ে দেওয়া—নাঃ ঐ দুর্ব্বাসা, ভিক্ষা নেবে—তাও যেন দাবী, না পেলেই মহা রাগ!"

সন্তোষ বড়ই নিবিষ্ট ভাবে খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল হস্তস্থিত পেন্সিলটায় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, applying ,this formula to both the sides we get, taking out the factor common to both—"

নীরোদ অবাক হইয়া কহিল—"তোমার মাথা!"

সন্তোষ কহিল,—"আজ্ঞে—না—এই n টাই শুধু যত গোল বাধাচ্ছে, অথচ common নেওয়াও চলে না—"

"কেন হে, common নিচ্ছিলে যে!" বলিয়াই নীরদ কাছে আসিয়া অঙ্কটী করিয়া দিয়া কহিল,—"মিলেছেত?"

"আজ্ঞে—আপনার কেমন হয়ে গেল;"

"মাষ্টারী কর বুঝি?"

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—"

"কোথায়?"

"আজ্ঞে আপনার এখানে আসেন—বিনুবাবু—"

নীরদ সবিস্ময়ে বলিল, "কোথা!"

"আজ্ঞে, তাঁদেরই বাড়ীতে,—তাঁর একটী ছোট বোন আছেন, তাঁকেই—"

"সেখানে আবার জুটলে কি করে?"

"আজ্ঞে সেদিন আপনাকে খুঁজতেই সেখানে গিয়েছিলুম—তা আপনাকেও পেলুম না, তখন আমার কি মনে হ'ল—বল্লাম বাড়ীতে ছেলে পিলে কেউ থাক্‌লে পড়াতে পারি।—অমনি তিনি বল্লেন, আমার বোন্‌কে পড়াও।—"

কতক্ষণ নীরবে কি ভাবিয়া নীরদ কহিল,—"তা ছাখ—ওহে।"

"মাষ্টারী ছেড়ে দাও।"

"আজ্ঞে, তা আপনি বল্লেই দেবো। আপনি আমার বড় ভাইয়ের মতন—তবে ২৫ টাকা ক'রে পাচ্ছিলেম—অমনি—"

"আমিই তা দেব 'খন—"

"আজ্ঞে, আপনার কাজত আরও অনেক কমেই গেছে, ৩০৲ টাকা করে দিচ্ছেন—"

"আরও কম্‌বে, এবার থেকে দিন কতক বসে বসেই পাবে—আমি আবার বিলেত চল্‌লুম্।"

"আজ্ঞে—আবার!"

"হ্যাঁ—আবার।"

"আজ্ঞে তবে আমি না হয়—সে কয়দিন অন্য কোথায়ও—"

"নাহে না, আর অন্য কোথাও দরকার নেই,—এখানেই থাক; লাইব্রেরীর চাবী দিয়ে যাব,—পড়বে। গাড়ী থাকবে,—বেড়াবে; দেখ্‌বে শুনবে,—তবে বকে যেও না যেন,—মায়ের কথা মনে রেখো,—মাইনে সবটা তুমি পাবে না,—যা খরচ দরকার হয় সরকার মশায়ের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। তাকেই বলে যাবো বাকীটা তোমার মায়ের নামে তোমায় দেশে পাঠিয়ে দেবে।

(১৯)

কিছুদিবস পরে জমিদারী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই বিনয় আবার কাশীতে চলিয়া গেল।

যাইবার দিন নীহার বলিল,—"আজই যাবে বিনুদা?"

বিনয় উত্তর করিল,—"হুঁ।"

"দু'দিন না হয় জিরিয়েই যাও"

"জিরোবার সময় যদি পাই সেদিন জিরোবা,—আজ আর নয়। বলিয়াই চলিয়া গেল।

নীহার আপন মনে বলিল,—"আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি যে,—তা নয় বিনুদা; আমিই তোমার একমাত্র অশান্তির কারণ। বুঝি সব; কিন্তু কি করবো, মন আমি বাঁধতে পারছিনি।"

বিনয় গাড়ীতে উঠিয়া ভাবিল,—"এখন আমার কিম্বা নীরদের কারও সম্মুখে থাকা উচিত নয়,—নীহার নির্জ্জনে একটু ভাবুক। নীরদ বিলেতে,—আমিও কতদিন কাশীতেই কাটিয়ে আস্‌ব।"

কাশীতে আসিয়াই বিনয় বহু অর্থ ব্যয়ে, কাশীর বাটীর চতুপার্শ্বস্থ আরও কিছু জমি ক্রয় করিয়া, এবং পূর্ব্ব বাড়ীর সঙ্গে আরও একখানি বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া একটী অনাথ আশ্রম খুলিয়া দিল, এবং সদরের সম্মুখে বড় বড় অক্ষরে লিখিল — "করুণার দান।" তার পর উপযুক্ত লোকের হস্তে সমাগত অনাথ বালক বালিকাদিগের শিক্ষা ও প্রতিপালনের ভারার্পণ করিয়া অভাবানুযায়ী সকলের বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

সাহেব শুনিয়া বিনয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"বিনু তুমিই উপযুক্ত পুত্রের কর্ত্তব্য করেছ।"

বিনয় কহিল,—"সাহেব, আমি বাবার আদেশ পালন করেছি মাত্র। এ তো সব পুত্রই করে থাকে। আমার হাতে এত অর্থ বাবা দুঃখীকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। সাহেব, সব চেয়ে বেশী আনন্দ আমার আজ,

আমি বাবার ব্রত উদ্‌যাপন কর্ত্তে পেরেছি। অনাথকে আশ্রয় দান কর্ত্তেই বাবা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যার কেউ নেই তিনিই তার ছিলেন। তাঁরই পায়ে বসে আমি এই পরহিত ব্রতের আশীর্ব্বাদ পেয়েছি; তারই দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছি, তারই পুণ্য উপদেশে পুণ্য প্রবৃত্তি আমার হৃদয়ে বিরাজমান।" বলিতে বলিতে বিনয়ের দুই চক্ষু এক অস্বাভাবিক জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। সাহেব বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নীহারের দুই চক্ষে অজস্র ধারা বহিতেছিল। বিনয় সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া কহিল,—"পাগলি আজ কি কাঁদতে আছেরে?"

শুধু একবার "বিনুদা", বলিয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীহার কাঁদিয়া উঠিল। তার মনে হইল বিনয়কে যে কত ব্যথা দিয়াছে, কত বিদ্রূপ করিয়াছে আরও কত ব্যথা দিতে বসিয়াছে। কত বড় নিষ্ঠুরের মত বিনুদার সমস্ত জীবনটা একেবারে নৈরাশ্যময় করিয়া ফেলিয়াছে।

বিনয় নিজেও অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল।

নীহার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "এই দেবতার পায়ে আমিও আমাকে বিলাইয়া দিব।"

নীহারের সদা বিষণ্ণ অশান্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে আজ যেন আবার তাহার বহুপূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইল। অনুতাপের অশ্রুতে তাহার মিথ্যা অভিমান গলিয়া গিয়া সেখানে আজ পূর্ণ প্রকৃত শান্তি বিকশিত হইল।

নানা কার্য্যের অছিলায় দিবসের অধিকাংশ সময় বাহিরে অতিবাহিত করিয়া, অবশিষ্ট যাহা বাকী থাকিত, তাহাও বিনয় আজকাল তাহার পড়িবার ঘরখানিতেই কাটাইয়া দিত। নীহারের সহিত ক্বচিৎ কখনও দেখা হইত বা না হইত।

আহারের সময় নীহার কাছে থাকিয়াই আহার করাইত বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলিতে পারিত না। বিনয়ও মুখ গুঁজিয়াই আহার করিয়া চলিয়া যাইত। নীহার ভাবিত,—"বলি, আমার কথা আছে।" কিন্তু নীহার কিছু বলিতে না বলিতেই বিনয় 'এটা ওটা' করিয়া বাহির হইয়া যাইত। তাহারও যেন কি বহু কথা মুখেই থাকিয়া যাইত, বলা আর হইত না।

আজ দুপুরের পর নীচে পড়িবার ঘরখানিতে একখানি নাতিবিস্তৃত শয্যার উপর শুইয়া বিনয় একখানি মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিল। ঝি আসিয়া বলিল,—"দাদাবাবু, দিদিমণি একবার ডাক্‌চেন ওপরে।" কাগজ খানির উপর দৃষ্টি রাখিয়াই বিনয় বলিল,—"কেনরে, যা জিজ্ঞেস্ করে আয়।"

ঝি বাহির হইতেই বলিল,—"আপনাকেই ডাক্‌চেন দাদাবাবু।"

"যাচ্ছি, যা,"—বলিয়া বিনয় কাগজ খানিই উল্‌টাইয়া যাইতে লাগিল। পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

মেঝেয় একখানি আসনের সম্মুখে একথালা শুধু ফল-ফুলুরী রাখিয়া নীহার বসিয়াছিল। বিনয় ঘরে ঢুকিতেই বলিল,—'বস, বিনুদা।"

"ও কিরে, আজ যে আমার একাদশী, উপোস।"

"তা আমি জানি, এসব খেতে পার।"

"না না। একটা উপোসে কি আর হবে? কর্চ্ছি যখন!—"

"না না। তা হবে না। এমন করে তোমায় আমি দিন দিন মরতে দেবনা। না বিনুদা, এস।" বলিয়াই নীহার বিনয়ের হাত ধরিয়া বলিল,—"বিনুদা, আর যাই কর, আমায় যে শাস্তি দেবে দাও, নিজের উপর তুমি অমন করে প্রতিশোধ নিওনা। বিনুদা, আমি জানি, আমার উপর অভিমান করেই তুমি আমায় এত পর করে দিয়েছ। আমার দিব্যি রহিল বিনুদা, তুমি যদি না খাবে আমিও আজ আর কিছু খাবনা।"

"তুই খাস্‌নি এখনও?" বলিয়া বিনয় নীহারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পায়ের একটা নখ খুঁটিতে খুঁটিতে নীহার বলিল,—"তুমি খাও আগে।"

"বল্‌তে হয় তা,—" বলিয়াই বিনয় বসিয়া পড়িল।

নীহার কহিল,—"না না, সবই তোমায় খেতে হবে। এমন কিছু বেশী নয়,—না—না, আমার মাথা খাও।"

"একি—আমার শাস্তি নিক্‌?"

"আবার উপোস করে দেখো। শোন, শোবার ঘরে আমি বিছানা করে রেখেছি। শোওগে একটু, অত খাটা

কিছু নয়। ঘুমিওনা যেন, আমার কথা আছে।" বলিয়াই নীহার বিনয়ের ভুক্তোচ্ছিষ্ট থালাখানি লইয়া চলিয়া গেল। বিনয়ের বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিল, নীহারের কথাটা কয়দিন হইতেই সে বড় বেশী চিন্তা করিতেছিল। কিন্তু এমন চোখে আঙ্গুল দিয়া আজিকার মতন আর তাহাকে নীহার দেখাইয়া দেয় নাই—"আমি বড় হইয়াছি, আমার ভাবেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তোমার দুঃখ বুঝিয়াছি।"

ভাবিতে ভাবিতে বিনয় শুইবার ঘরে আসিয়া চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

নীরদের প্রত্যাগমনের অপেক্ষাতেই বিনয় চুপ করিয়া ছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিনয় বুঝিয়াছিল, নীরদ ও নীহার উভয়েই উভয়কে প্রাণাধিক ভালবাসে। সেদিন যে সেই বিশ্বেশ্বরের মন্দির দ্বারে নীরদকে অঙ্গীকার বদ্ধ করাইয়াছিল,—তাহাও তাহাদিগকেই একটু নির্জ্জনে ভাবিয়া দেখিবার জন্য, নিজেদের মনের সহিত ভাল করিয়া মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য—উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালবাসা কতদূর গভীর, কতখানি সত্য। নীরদকান্তির চরিত্রও বিনয় বিশদভাবে বুঝিয়া দেখিয়াছিল; আরও একটু দেখিবার জন্যই সে এই বিচ্ছেদ সংঘটন করিয়া নীরবেই রহিয়াছিল। চোখের দেখা পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া বিনয় মফঃস্বলে চলিয়া গেল। সন্তোষকেও মাষ্টার রাখিয়াছিল, পরীক্ষার জন্য। শেষে বিনয় যখন বুঝিল—না, ইহারা সত্যই পরস্পরকে বড় বেশী ভালবাসে, অথচ তার মধ্যে অসঙ্গত অধীরতার কিছু নাই, তখন সে বিবাহের আয়োজন করিতেই কলিকাতায় আসিয়া শুনিল,—নীরদ পুনরায় বিলাত চলিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিল, নীরদ ব্যারিষ্টারী পড়িতেছে,—অধিকতর আনন্দেই সে নীরদ ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে স্থির করিয়া, নীহারের বিবাহের প্রসঙ্গটা স্থগিতই রাখিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু নীহার যেদিন বুঝিল, বিনয় কত মহৎ, কত উদার, কতখানি স্বার্থত্যাগী, তাহার সমস্ত জীবনের একটানা স্রোতে একটা বিষম ধাক্কা লাগিয়া গেল। নীহার জানিত, বিনয় তাহাকে ভালবাসে,—জানিত না, অভিমান ভরে বিনয় এত ত্যাগ স্বীকার করিবে কিম্বা করিতে পারিবে। জানিত বিনয় তাহার প্রেম প্রত্যাশা করে; জানিত না, তাহার প্রত্যাখ্যানটাও বিনয় এমন সহাস্যে সহিবে, কিম্বা সহিতে পারিবে।

ভাবিয়াছিল বিনয় পুরুষ, মন ফিরাইয়া লইবে, তাহাকে ভুলিবে—ভুলিয়া সুখীই হইবে; ভাবিতেও পারে নাই বিনয় তাহাকে এতখানি প্রাণের সহিত মিশাইয়া ফেলিয়াছে ত্যাগেই তাহার এত পরিতৃপ্তি, হৃদয় দিয়াই তাহার এত আনন্দ, বিনিময়ে কিছু গ্রহণে এত নিস্পৃহা।

বিনয়ের প্রতি ভক্তি, নীরদের প্রতি প্রেম, নীহারের হৃদয়ক্ষেত্রে অবিরাম সংগ্রাম করিতেছিল। এযাবৎ প্রেমই বিজয়ী হইয়াছে। এবার ভক্তি প্রধান হইল। নীহার ত্যাগের সাধনা বরণ করিয়া লইল। আত্মত্যাগীর আত্মপ্রসাদস্ফুরিত জ্যোতির সম্মুখে তাহার প্রেমের মূর্ত্তি মলিন হইয়া গেল। নীহার বিনয়ের পায়ে আপনাকে উৎসর্গ করিল, বিনয়ের সুখ শান্তির জন্য, বিনয়ের জ্বালা প্রশমিত করিতে নিজের সুখচিন্তা বলি দিল। নীরদকে ভুলিয়া নয়, আপনার কথা ভুলিয়া; নীরদের স্থানে বিনয়কে বসাইতে নয়, দেবতার মত বিনয়ের পূজা করিতে,—দেবতারই সন্তোষার্থে দেবতার শ্রীচরণে স্বীয় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার প্রবৃত্তিতে।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া নীহার বিনয়ের পদপ্রান্তে বসিল।

কিছুক্ষণ কোন কথাই আর কেহ খুঁজিয়া পাইল না, পরে একটা নিঃশ্বাস টানিয়া বিনয় বলিল,—"বল, কি বলবে নাকি তুমি, আমি আবার বেরোব।"

"কোথায়?"

"আছে, কাজ।"

"আজ আর বেরিও না।"

"কেনরে?"

"কেন আবার কি?—কিছুই ত খেলেনা—"

"ভাত যে ওর চেয়েও কম খাই।"

"তা হোক, চেহারা যে দিন দিন খারাপ হচ্ছে।"

"আমার চেহারা—"বিনয়ের স্বরটা একটু কাঁপিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বিছানায় উপর উঠিয়া বসিয়া গলাটা ঝাড়িয়া বলিল,—"না, কই, ও কিছু নয়; ভালই বা কবে ছিল, তুই তার জন্য ভাবিস্ না।" নীহারের দিকে চাহিতেই দেখিল, অতি কষ্টে নীহারও অশ্রু সম্বরণ করিতেছে, কিন্তু পরিতেছে না। একটা উচ্চ হাস্যের সহিত বিনয় কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিল,—"ওরে পাগলী! আমি কি আর তোর সেই ছোট্ট বিনুদাই আছিরে নীরু? আমি এখন বড়

হয়েছি, নিজের সুখ দুঃখ বুঝতে শিখেছি, ভাবতে শিখেছি—" বলিতে বলিতে বিনয় উঠিল। নীহার কহিল, "যেওনা, বসো।"

"আচ্ছা, তা বস্‌ছি, তুই যা দেখিন্ একটু চা তৈরী করে নিয়ে আয় ত।"

"ভুলোচ্ছ আমায়! চা খাবে ত বল্‌ছি বেয়ারাকে। আমি এখন যাব না।"

"থাক্ থাক্—এই দুপুর বেলায়—"

"তবে,—আমায় তাড়াইতেই বুঝি চাও?"

"তাড়াতে চাই নীরু" আবার বিনয়ের স্বরটা ভারী হইয়া আসিল; বিনয় চুপ করিল।

নীহার কহিল,—"দাও না আমায় বিদেয় করে, আমিই অভাগী দূর হয়ে যাই, তবু তুমি"—নীহারও আ· ·লিতে পারিল না।

বিনয় বলিল,—"ওসব কথা কেন নীরু?"

"তুমি এমন বাইরে বাইরে যদি কাটাও— তোমার বাড়ী, তোমার সব—"

"আর তোর কিছুই বুঝি নয়? আমিও তোর কেউ নই, নারে?"

"তবে অমন পরের মত—"

"পরের মত নয় রে, কাজে কর্ম্মে বেড়াতে হয়।"

"শুধু তাই বিনুদা?"

"হাঁ—তা—না—তা ছাড়া আবার কি?"

"বিনুদা! আমি যে তোমায় চিনেছি। আমায় লুকাতে যেও না, পারবে না।"

বিনয় জোর করিয়া হাসিয়া বলিল,—"তুই যে কি বলিস্ নীরু, লুকাবো আবার কি?"

"না বিনুদা পারবে না, আমি যে নারী—আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। বল আমার কথা রাখবে."

"কি?"

"বল রাখ্‌বে."

"বল না শুনি—।"

"তুমি বিয়ে কর, তুমি সংসারী হও, সুখী হও। বিনুদা, এমন করে আমার সব অপরাধে ক্ষমা করো না, আমার দেওয়া এতগুলো আঘাতের মুখে তুমি এমন করে হেসো না। আমি আর সইতে পার্‌ছিনি। বিনুদা, আমায় শাস্তি দাও, আমার উপর সদয় হয়ে একটু নির্দ্দয় হও—একটু কঠোর হও। আমি সইতে পারব। আমি ভুলব, আমি পারব। আমি তোমার কাছেই তা শিখেছি। তোমার কাছেই যা পেয়েছি তাই তুমি নাও, ওগো তুমি নাও বিনুদা! অমন রিক্ত হয়ে তুমি সব বিলিয়োনা; নিজের সুখের দিকে কে না তাকায় বিনুদা?—"

বিনয়ের হৃদয় ব্যাপিয়া একটা তুমুল তুফান ছুটিল। উচ্ছলিতকণ্ঠে "নীরু নীরু কেন"—বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া বিনয় আবার তেমনি অভিভূতের মত বলিতে লাগিল, "—আমি তাকিয়েছিলুম নীরু; কিন্তু আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন! আজ আমি অনেক দূরে নীরু—অনেক দূরে! সেখানে দাঁড়িয়ে তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার আনন্দেই আমারও আনন্দ। সেখানে দাঁড়িয়ে তোমার প্রাপ্তিতেই আমার পরিতৃপ্তি—তোমার ত্যাগে নয়।"

বিনয় চলিয়া গেল। নীহার দুই হস্তে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ওগো, আমার পাপের কি শাস্তি নাই? বাবা, বাবা! একবার ফিরে এসে বিনুদাকে ফিরিয়ে আন, আমায় ক্ষমা কর্ত্তে বল।"

পরিতপ্ত নীহার সেই স্থানেই লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বিজয়ী বিনয় তাহার গৌরবময় অভিমানে তাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া যে মর্ম্মান্তিক দণ্ডবিধান করিয়া গেল, পরিত্যক্তার চিরনির্ব্বাসনকালে কৃতকর্ম্মের স্মৃতির মত তাহাকে যে তাহা তুষানলের জ্বালায় বিদগ্ধ করিবে!

(২১)

বিনয় কহিল,—"আমি বলছি, আপনি লিখুন না?"

এটর্নি কহিলেন,—"আর একটু না হয় ভেবে দেখুন বিনু বাবু।"

"আমি ভেবেছি, ভেবেই স্থির করেছি! লেখো অন্নদাবাবু।"

"বলুন।"

বিনয় কহিল,—"লেখো—

১। স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থ স্থাপিত "করুণার দানের" ব্যয় ভার নির্ব্বাহার্থে সমস্ত সম্পত্তির।০ চারি আনা অংশ উক্ত মন্দিরভুক্ত হইবে। উহার বাৎসরিক আয়

১৫৪০০৲ টাকা উহার নিমিত্তই ব্যয় হইবে। ৺কাশীধামস্থ বাটী উক্ত কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিবে। ব্যাঙ্কের ১৫০০০০৲ টাকারও এক চতুর্থাংশ ৩৭৫০০৲ টাকা উক্ত "করুণার দানের" নামে সঞ্চিত থাকিবে।

২। স্বীয়াংশ এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সর্ব্বসমেত ॥০ আট আনা অংশ আমার ভগ্নী শ্রীমতী নীহার কণা রায় প্রাপ্ত হইবেন। পুরীর বাড়ী এবং ভূসম্পত্তি তিনিই পাইবেন। ব্যাঙ্কের টাকারও অর্দ্ধাংশ ৭৫০০০৲ টাকা নীহার কণা পাইবেন।

৩। কলিকাতাস্থ বাটী এবং বাকী সম্পত্তি ।০ চারি আনা আমার প্রাপ্য হইবে।

আমার প্রাপ্যাংশের আয় বাৎসরিক ১৫০০০৲ টাকা হইতে—১০০০০৲ টাকা প্রতি বৎসর ভারতীয় নানা পুণ্যানুষ্ঠানে স্বর্গগতা জননী মনোরমা ঘোষের নামে প্রদত্ত হইবে। ইহাতে আমার কিম্বা আমার কোন সত্বাধিকারীর কোনই আপত্তি থাটিবে না।

নিজ খরচের বাবদ বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আমার আদেশানুযায়ী যথাস্থানে প্রেরিত হইবে। আমার মৃত্যুর পর আমার স্বীয় অংশ ভগ্নী নীহার কণা দেবীর গর্ভজাত প্রথম পুত্রের প্রাপ্য হইবে। অন্যথায় তাহাও কোন পুণ্য কার্য্যে উৎসৃষ্ট হইবে।

৪। সমস্ত সম্পত্তির উন্নতিকল্পে প্রতি বৎসর একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হইবে। উক্ত ব্যক্তির নির্ব্বাচন এবং সমস্ত বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার আমার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত নীরদকান্তি রায় বিএ বার এ্যাট ল মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

"লিখেছ? ব্যস্! দাও সই করে দিই।"

বিনয় সহি করিল।

"সাহেব, সেই উইলেও তুমি সাক্ষী ছিলে, এ উইলেও তুমিই প্রধান সাক্ষী—দাও সই দাও। তোমার সহির দাম আছে। ব্যস্ এইবার এটর্নি বাবু আপনি, ব্যস্! দাও দাও অন্নদা বাবু, তুমিও একটা নাম লিখে দাও, তুমিই লেখক! হুঁ—হ'ল!

অলৌকিক কোন যাদুবিদ্যা দর্শনে দর্শকমণ্ডলী যে দৃষ্টিতে যাদুকরের দিকে চাহিয়া থাকে, তেমন ভাবে উপস্থিত সকলেই—ডাক্তার এটর্নি অন্নদা—বিনয়ের দিকে চাহিয়া ছিল। বিনয় সর্ব্বসমক্ষে করুণাময়ের উইলখানা একবার মস্তকে স্পর্শ করিয়া, পরে স্থির দৃষ্টিতে উহার দিকে চাহিয়া রহিল; বিনয়ের নয়ন কোণে দুই বিন্দু অশ্রু চক্ চক্ করিয়া উঠিয়া উইলখানার উপর পড়িল।

ডাক্তার কহিলেন, "সব ত কল্লে! বিনয় কিন্তু নীরদের মত নিয়েছ?"

বিনয় ডাক্তারের দিকে চাহিয়া কহিল,—"নিয়েছি ডাক্তার, তবে বড় বেগ পেতে হয়েছে। আমারই একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছ্লো, তবে সে ভুলটাই কিন্তু নিরোদকে আরও উন্নত করেছে। বিচ্ছেদবিরহ-জ্বালা ভুলতেই নীরদ ব্যারিষ্টারী পড়্তে গিয়ে সসম্মানে ফিরে এয়েছে। সেদিন বিলেত থেকে এসেই আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এল, বল্লে, "বিনুদা আমি তোমার কথা সব শুনেছি, তুমি আমায় মাপ কর, তোমার উপর আমি রেগে গিয়েছিলুম।" সেইদিনই আমি তাকে আমারও মনের কথা বললুম। নিরোদ দৃঢ় স্বরে বল্লে,—"না, তা হবে না বিনুদা, আমি সব জেনেছি।" অনেক করে শেষে তার হাতে পায়ে ধরে তাকে রাজি করিয়েছি ডাক্তার! নিরোদ সম্মত হয়েছে। নীহার যাকে ভালবাসে, সে কি আমার কথা না রেখে পারে ডাক্তার? তার যে আমাকেও ভালবাসতেই হবে। তবে এই উইলের কথা সে জানেনা, প্রয়োজন নেই।"

(২২)

জানালার গরাদে ধরিয়া নীহার শূন্য আকাশটার দিকে চাহিয়া ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারের মুখে সমস্ত প্রকৃতি যেন গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। ফুটপাথের উপর দিয়া আফিস প্রত্যাগত কেরাণীর দল শ্রান্তপদে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। এক একটা করিয়া সহস্র চিন্তা নীহারের মনটাকে রাস্তার উপরের ঐ বোঝাই ট্রামগুলির মত কোথায় লইয়া যাইতেছিল! নীহার ভাবিতেছিল, উপরের গম্ভীর মহাশূন্যটার মত সেই নিজে বিনুদার সমস্ত জীবনটা এমন নিঃস্ব অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া তাহার স্বীয় গণ্ডীর ভিতরটা বোঝাই করিয়া তুলিয়াছে। তাহার নিজের পাওনা সব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়াছে, বিনুদা হৃদয় রিক্ত করিয়া তাহাকেই সন্তুষ্ট করিয়াছে। যেখানে সে ইচ্ছা করিলেই একজনকে স্বর্গসুখ

প্রদান করিতে পারিত, নিজেও হয়ত শান্তিই পাইত.সেখানে সে তাহার অদূরদর্শিতায় কত বড় একটা বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়াছে। একজন—এমন একজন যে তাহারই সুখেচ্ছায় নিজের বুকের রক্ত পর্য্যন্ত নিংড়াইয়া দিতে পারে, তাঁহাকে তো চিরজীবনের তরে কাঁদাইল,—আর সে নিজেই কি আর এ জীবনে শান্তি পাইবে ! নীরদকে সে আন্তরিক ভালবাসে, নীরদকে সে চাহে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শান্তির আনন্দ, প্রেমের পূর্ণতা, আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি এমন ভাবে সম্পাদিত হইয়া বিমুদার কথা যে প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করাইয়া দিবে ! ভোরের হাওয়া যেমন প্রত্যেকটী দিবসে ভগবানের দান ঘোষণা করিয়া দেয়, তেমনি তাহাদের প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস, তাহাদের সকল সুখৈশ্বর্য্য যে বিমুদার দান স্মরণ করাইয়া দিবে। এই মিলন—এ বিবাহ—যদিও তাহার জীবনের বাঞ্ছিত—বাসনা—তথাপি এ প্রেমালিঙ্গনের বুকে উভয়েরই যে অনুতাপের ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিবে ! এর চেয়ে—

নীহার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল, পশ্চাত হইতে বিনয় কহিল,—"বাপ্ ! নিঃশ্বাসের ঝড়ে যে লোহার গরাদেগুলোও কেঁপে উঠ্‌ছে !—দেখিস, আমার পৈতৃক বাড়ীখানিও না যায়। আমার মুরদে হবে না আর।"

নীহার সলজ্জিত ভাবে বলিল,—"বিমুদা ! বোসো।"

বিনয় একটু হাসিয়া কহিল,—"উহুঁ, আমি একনিশ্বাসে এতবড় একটা ঠাট্টা করে ফেল্‌লুম্, আর তুমি যে ছোট্ট একটু "বোসো" বলেই তা উড়িয়ে দেবে—তা হচ্চে না। সবটাতেই আমি হেরে যেতে রাজী নই।"

"হারলে কই বিমুদা, তুমিই বিজয়ী বীর।"

"কেমন করে দাঁড়াব বল্‌ত ?"

"বোসো ঐখানে।"

"বন্দীও তাহ'লে আর একটু এগিয়ে এসো।" বলিয়া বিনয় অদূরস্থিত একখানি চেয়ারে বসিল।

"তারপর কি ভাবছিলি এত—একদম বেহুঁস—এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি—"

"অনেকক্ষণ এসেছো ?" নীহার একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

বিনয় একটু হাসিয়া কহিল,—"ওকি ?"

নীহার এবার হাসিয়া ফেলিল,—"নাঃ তুমিও যেমন পার বিমুদা !"

"পেরেছি তাহ'লে স্বীকার করছিস্ !"

"আমি পারতে দেবোনা, বিমুদা।"

"কিরে ?"

"এত বড় একটা 'বাহোবা' তুমি যে কেঁদে নেবে—আমি তা সহ্য করবো না।"

'বাহোবা' কিরে ? তুই যে 'বাহোবা' নিচ্ছিস্।"

"না বিমুদা, উড়িয়ে দিও না।"

"উড়িয়ে দেবার মত নয়ত বটেই। তুই যেন বেশ অনুভব করেই বলছিস্ মনে হচ্চে।"

"বিমুদা, আর আমার লজ্জা ক'রবার সময় নেই। তুমি তোমার যে সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছো, আমি জানি বিমুদা, আমার উপর অভিমান করেই তা বেছে নিয়েছো। আমার উপর রাগ করেই, সে রাগের প্রতিশোধ নিজের উপর দিয়ে তুমি নিচ্চ।" একটু থামিয়া আবার নীহার তেমনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"বিমুদা, যখন তোমায় চিন্‌তে পারিনি, তখন তোমায় ভুল বুঝেছিলুম। যখন নিজেকে জানিনি, তখন তোমায় অবজ্ঞা করেছি। সে দোষ আমার নয়, ভেবে দেখ বিমুদা,—বুঝবে, কেন একথা বল্‌লুম। জ্ঞান প্রাপ্তির পূর্ব্ব থেকে শিশু তার জীবনের চতুর্দ্দিকে যে সম্বন্ধে যে হাওয়ায় বেড়ে উঠে, তেমনি সে গঠিত হয়। আমারও অপরাধ ঐ খানে বিমুদা। কিন্তু যখন সে ভুল ভেঙ্গে গেল, তখন আমি বহুদূরে, বহু নিম্নে ! তোমরা তখন আমার পাওয়ার ভিতরে নও। তখন সে যে কি পরিতাপ বিমুদা, তুমিও ত তা বুঝবে না। নিখিল অভাব দৈন্যের দুঃখ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তুমি যেদিন এবাড়ীতে এলে, সেদিন তুমি জীবনে যে আনন্দ, যে স্বস্তির আভাস পেয়েছিলে, আমার তখন ততোধিক নিরানন্দ ততোধিক অস্বস্তি। সঙ্গে একটা তীব্র তাড়না, জননীর অপবাদ। সমস্ত হৃদয় খুঁজে সেদিন একমাত্র শান্তি পেয়েছিলুম নীরদের চিন্তাটুকুতে। নীরদকে আগেই ভালবেসেছিলেম, নীরদের চিন্তাতেই আপনাকে ডুবিয়ে দিলুম। তোমায় যতটা অবজ্ঞা করতুম, ততোধিক ভক্তি তোমার প্রতি এল। কিন্তু আমার সে উৎকৃষ্ট প্রাণে তোমায় নিতে পারিনি। জানত বিমুদা রমণী একবার

যাকে ভালবাসে, তাকে ভুল্‌তে পারে না আর। ঘৃণা কর্ত্তে পারে—ঘৃণা হতে পারে, কিন্তু ভুলতে পারেনা তারা। নীরদকে ভালবাস্‌তুম তোমায় ভক্তি কর্‌তুম,—দাদার মত তোমায় দেখতুম্‌, কিন্তু যেদিন জান্‌লুম, তুমি আমায় আমার মত ভাল বাসনি, তোমার মত ভাল বেসেছ, যেদিন বুঝ্‌লুম, তুমি তোমার সমস্ত উন্মুখ বাসনা নয়ে আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছ; যেদিন দেখ্‌লুম্‌ তোমার সুখে স্পৃহা নাই, দুঃখে বিরাগ নাই, ভোগে আসক্তি নাই, বন্ধনে ভীতি নাই, সেদিন প্রথম আমার জ্ঞান হ'ল। তাকিয়ে দেখ্‌লুম্‌, আমারই হৃদয় স্পর্শ করে তুমি বহুদূরে•স্থির স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভোরের তারাটীর মতন অটল অচঞ্চল—সেদিন তোমার পায়ে শির আপনার থেকেই নুয়ে পড়লো। তোমার পুজো কর্ব্বো ভাবলুম্‌—তোমার দেখে ত্যাগ করতে শিখ্‌লুম্‌। দেখ্‌লুম্‌ তাতেই বেশী আনন্দ। বিনুদা, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর; বল তুমি—''

ভগ্নকাংসপাত্রে আঘাত করিলে যে ধ্বনি উত্থিত হয়—তেমনি ভগ্ন আওয়াজে বিনয় ডাকিল,—"নীহার! নীহার!—"

বিনয়ের হৃদয় মথিত করিয়া—অশ্রুর রাশি উচ্ছসিয়া উঠিল। উভয়েই কাঁদিতেছিল।

নীচে নীরদ ডাকিলেন,—"বিনুদা!"

জানালায় মুখ বাড়াইয়া বিনয় ডাকিল,—"এস হে!"

নীহার বলিয়া উঠিল,—"না না, এখানে—এখন নয়। আগে বল, বল বিনুদা, আমায় ক্ষমা করলে, গ্রহণ ক'র্‌লে! বল, নিজের বুকটা তুমি অমন করে খালি করে দেবে না। বিনুদা, আমার অভিমান ভেঙ্গে গেছে। দম্ভ গুঁড়ো হ'য়ে গেছে, নিজের ভুল আমি আজ বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। বল, বল বিনুদা, তুমিও ভুলেছ। বিনুদা, বিনুদা, আমার জন্মের সঙ্গে আমি বড় মস্ত একটা অপবাদ নিয়ে এসেছি,—আমার মৃত্যুর সময়ে এত বড় একটা আক্ষেপ নিয়ে মরতে দিয়োনা। বল, আমায় তোমার পায়ে স্থান দেবে—''

নীহার বিনয়ের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। দুই চক্ষের অজস্র অশ্রু ধারে নীহারের মস্তক সিক্ত করিয়া বিনয় নীহারকে তুলিয়া ধরিল,—কহিল,—"তুই যে অনুক্ষণ আমার হৃদয়ের সঙ্গেই গাঁথা আছিস্‌ দিদি। তোর উপর কি রাগ আমার আছেরে আর? তুই-ই যে আমার গতি মুক্তি সব? নীরদ দ্বারের কাছে আসিয়াই আবার সরিয়া গেল। নীরু, তুই যে তোর বিনুদার প্রাণ।—এস—এস আমি বল্‌ছি, এস নাহে বাবু; এই নাও, আমার বুকের রক্তদল তোমার হাতে তুলে দিলুম—দেখো নীরোদ! নীরু আমার বড় অভিমানী—"

নীহার মূর্চ্ছিত হইয়া নীরদের বুকে এলাইয়া পড়িল।

"বিনুদা, বিনুদা", বলিয়াই রুদ্ধকণ্ঠ নীরদ নত হইয়া নীহারের মস্তকে মুখ চাপিয়া রাখিয়া অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে কাঁপিতে লাগিলেন।

বিনয় তেমনি অভিভূত উচ্ছ্বাসে বলিল,—"বাবা! বাবা! আজ একবার তোমারও হৃদয় শূন্য করে নীরদের মাথায় স্নেহাশীষ দাও বাবা। বিনু আজ নীরুর বিনুদাদা, সত্যই তার বিনুদা!"

(২০)

মহা সমারোহে নীহার নীরদের বিবাহ হইয়া গেল। সেই দিনই শুধু বিনয় বড়ই উন্মনা হইয়াছিল। বিবাহের পর বিনয় সুন্দর একটী সোণার কৌটায় উইলখানি পুরিয়া নীরদের হস্তে দিয়া কহিল,—''আমি চলে গেলে এটা খুলে দেখো নীরদ।"

সভয়ে নীরদ বলিল,—''তুমি কোথায় যাবে?"

"যাবনা, যাচ্ছিনা, দেখো তুমি, এখন রেখে দাও।"

সন্ধ্যা সরিয়া গিয়াছে। সেদিন অমাবস্যার ঘোর রাত্রি। পৃথিবীর বুকে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছিল। দূরে অসংখ্য তারকা বিরহীর ম্লানগণ্ডে অফুরন্ত অশ্রুর মত চক্‌ চক্‌ করিতেছিল। অন্ধকার তাহাতে যেন আরও ভীষণ দেখাইতেছিল।

ব্রহ্মচারীর বেশে বিনয় আসিয়া নীহারের হস্ত ধরিয়া কহিল,—''আমি চল্‌লুম্‌ নীরু। সুখে থাকিস্‌, আশীর্ব্বাদ করি। দিনের কাজে শুধু ভগবানের নাম মনে রাখিস্‌ বোন্‌, সন্ধ্যায় সব শ্রান্তি দূরে যাবে,—শান্তির পরশ পাবি।"

শঙ্কাকুল কণ্ঠে নীহার বলিল,—''একি তোমার বেশ !!! কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

আত্মপ্রসাদের পূর্ণানন্দে বিনয় সগর্ব্বে বলিল,—

"আবার যাচ্ছি আমার মায়ের কুটিরে, সেই কুড়ের দ্বারে, আমার মহা পুণ্যতীর্থে। ক'দিন সেখানে থেকে আর সব তীর্থ ঘুরে দেখ্‌ব, শান্তি কোথায় বেশী।"

নীহার চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—'বিনুদা বিনুদা, আর আমায় শাস্তি দিয়োনা। আমার উপর অভিমান করে বাবা চলে গিয়েছেন, আমার উপর রাগ করে তুমিও আমায় ছেড়ে যেওনা বিনুদা।"

"ছেড়ে কোথায় যাচ্ছি নীরু! যাচ্ছি তোদেরই জন্য দেবতার আশীষ মেগে আনতে। সকল তীর্থ রেণুতে শুধু তোদেরই অফুরন্ত স্নেহ ঢেলে দিতে। কাঁদিস্‌নি;—হাসি-মুখে আমায় বিদায় দে বোন্‌। প্রতি বৎসর আমি একবার করে তোদের দেখে যাব। বৎসরের সকল জ্বালা আমায় দিস্‌—আমি তা' নিয়ে যাব। আমার সারা বৎসরের আহরিত শান্তিটুকু তোরা নিস্‌—আমি কৃতার্থ হ'ব। সাধনা সফল হবে আমার।"

বিনয় সেই অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল।

নীহার চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বিনুদা, বিনুদা, ফিরে এস। ওগো, কেউ পার, আমার সর্ব্বস্ব নাও, আমার সমস্ত নাও, বিনুদাকে ফিরিয়ে আন।" কোথা হইতে সেই অন্ধকার আকাশ রোমাঞ্চিত করিয়া বিনয় বলিয়া গেল, "বৎসরান্তে আবার দেখা দেব বোন!"

কৌতূহল প্রশমিত করিতে না পারিয়াই নীরদ উপরে বসিয়া কৌটা খুলিয়া উইলখানি পড়িতেছিলেন, উইলের সঙ্গে বিনয় একখানি পত্রও দিয়াছে—দেখিলেন বিনয় লিখিয়াছে—

"বৃথা আমার জন্য উতলা হয়ো না। যেখানেই যখন থাকি তোমায় জানাব। প্রয়োজন মত অর্থাদি নির্দ্দেশ মতে প্রেরণ করিও। প্রতি বৎসর এমন দিনে একবার করিয়া দেখিয়া যাইব। ইতি—।"

সভীতিবিস্ময়ে "বিনুদা বিনুদা," বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে নীচে ছুটিয়া আসিল,—নীহার নীরদ কাঁদিয়া কহিল,—একদিন নিজেই বলেছিল;—বিনুদা আজ দেবতার মত সত্যই বহু দূরে চলে গেল,—দেখতে পাচ্ছোনা? আকাশের গায় সব গুলো তারকায় বিনুদার প্রতিমূর্ত্তি, বিনুদার পুণ্যের জ্যোতিঃ, বিনুদার চরণ রেণু!"

নীরদ, নীহার সেই খানে লুটাইয়া পড়িয়া বিনয়ের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিল।

শ্রীঅতুলানন্দ রায়

সম্পূর্ণ।

অশান্ত

আমি চাহি বাঁধতে তরী
　　পল্লী ঘাটে বটের ছায়ে
সুদূরেরি ঢেউ এসে যে
　　করছে আঘাত তরীর গায়ে।
　হঠাৎ বুকে জোয়ার লাগি,
　উঠছে নবীন আশায় জাগি,
　কঠিন বাঁধন ছিঁড়তে নারে
　　খুড়ছে মাথা তটের পায়ে।

(২)

ভাবছেনা তার শক্তি যে ক্ষীণ
　　ভাবছেনা তার স্বল্প আয়ু
ধার ভুলে সেই প্রবল তুফান
　　চূর্ণিত বুক ঘূর্ণি বায়ু।
কোন অসীম জলের খেলা,
পাণ্ডু শ্যামল সুদূর বেলা,
কোন অধীর মুক্ত পবন
　　তাহার কাণে কি গান গাহে।

(৩)

দিগন্তের ওই অন্তরালে
　　ইন্দ্র নীলের বন্দরেতে
ভিঁড়বে কখন পণ্য নিতে
　　যপছে যে তাই অন্তরেতে।
　প্রবল স্রোতের উজান ঠেলে
　সচল দাঁড় আর পালের বলে
　চন্দনে ঢেউ খাওয়ার চেয়ে
　　মুক্তা ভারে ডুবতে চাহে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

টাকার মহিমা

হায় রে টাকা! হায় রূপচাঁদ
তোর কেরামত ব'ল্‌বো কত?
হে "অখণ্ডমণ্ডলাকার্‌"!
তোমায় পদে জগত নত!
"চরাচরে ব্যাপ্ত" তুমি,
খুঁজে পায়না মূর্খ গরু।
তোমায় যিনি দেন চিনায়ে
তিনিই কলির আসল গুরু।
"চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ"
হয় হে প্রভো তোমার গুণে,
টাকায় "গবচন্দ্র"কেও
রাজা বলে সবাই মানে।
টাকা হ'লে বাঁদীর ছেলে
হ'য়ে বসে সমাজপতি।
"জলকাতের দল" কর্ত্তা ব'লে
তারেই তখন করে স্তুতি।

ধনীর মেয়ে—খাঁদা, টেরা
কিম্বা হ'লে জ্যান্ত কালী
চুল যদি হয় মুড়ো খ্যাংরা,
তবু তিনি রূপের ডালি।
টাকার জোরে কার্ত্তিকের ন্যায়
বরটী তাহার জু'টে যাবে;
গরীবের পদ্মিনী মেয়ের
বিয়ে দিতে প্রাণ বেরুবে।
গাবের খাড়ি ধনীর গিন্নী
'রাজা ঠেরেন' উপাধি পান।
ক'টকের পিশি ভোটকার মাসী
সেই রূপসীর মান বাড়ান।
ধনবানের কোষ্ঠী হ'লেই
তিনটী গ্রহ "তুঙ্গী" হবে।
বুদ্ধির অভাব থাক্‌লেও তার
"বুধাদিত্য যোগ"টী র'বে।

সিন্দুক পোরা থাক্‌লে টাকা
চোর ডাকাত হয় ভাগ্যবান্‌।
স্বার্থপর হয় স্বদেশ সেবক
গো-মূর্খ হয় বুদ্ধিমান।
ধনী অত্যাচারী হ'লে
তাকে বল্‌বে "প্রতাপশালী"।
'স্পষ্টবাদী বক্তা' তিনি
সবকে যদি পাড়েন গালি।

হায় গোরাচাঁদ! তোর মোহেতে
ডুব্‌রী ডোবে সাগর জলে;
পঞ্চমুদ্রার লোভে ঘাতক
ফাঁসী পরায় লোকের গলে।
টাকার লোভে সুদ খোরেরা,
মনটী বাঁধে পাষাণ দিয়ে।
টাকার তরে কুলীন ছেলে
গণ্ডা গণ্ডা ক'র্‌ছে বিয়ে।
মিথ্যা কথার ব্যবসা খোলেন
শিক্ষিত লোক টাকার তরে,
মা'র পেটের ভাই টাকা নিয়ে
খুনো খুনী ক'রে মরে।
বন্ধ্যা নারী হচ্ছে মাতা
টাকার এমন কার্‌সাজী।
টাকা পেলে আগুনেতে
ঢুক্‌তে লোকে হয় রাজি।
মদ্‌ মুর্‌গী বিলাতী জল
হজম করে দেয় টাকায়।
টাকা পে'লে ভট্টাচার্য্যির
স্মৃতির শোলক উল্টে যায়।
সত্য, নীতি, ধর্ম্ম ঈশ্বর
এসব কেবল ধোকার টাটি,
"একমেব অদ্বিতীয়"
হায় রূপ চাঁদ তুমিই খাটী।

শ্রীনীলকণ্ঠ দে

শিক্ষার একটা কথা

[জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ—জ্ঞান প্রচার সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।]

শিক্ষা নামে যে জিনিসটা আমাদের দেশে চলিতেছে, সেটাকে যাঁহারা একটা বিরাট প্রহসন মাত্র বলিয়া মনে করেন তাঁহারা কতকটা বাড়াবাড়ি করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে এ শিক্ষার গোড়ায় গলদ রহিয়াছে এবং ইহা নিজের মূল শিকড়গুলি সত্যের গভীর স্তর পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়া নিজেকে সর্ব্বতোভাবে বাস্তব ও যথার্থরূপে সফল করিয়া তুলিতে পারে নাই। এ দেশের উপর দিয়া পশ্চিমের সভ্যতার যে বেনো জল কিছুকাল ধরিয়া বহিয়া যাইতেছে তাহারই নরম পলিমাটিতে প্রধানতঃ এ শিক্ষার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায়; এবং তাহারই রসে ইহার বিকাশ ও পরিপুষ্টি হইয়াছে দেখা যায়; কিন্তু এই পলিমাটির নীচে দেশের বহুশতাব্দীব্যাপী সাধনার ও সভ্যতার যে জমাট ও সার মাটির স্তরগুলি প্রচ্ছন্নভাবে সাজান রহিয়াছে, সেগুলির সঙ্গে বর্ত্তমান শিক্ষার বিশেষ কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিতেছে না যে সেই স্তরগুলিকে নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিলে আমাদের দেশের মাটিতে বেশীর ভাগ আগাছা পরগাছারই ফসল ফলিবে, কিন্তু কোনও ফলবান তরু নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া, ঝড় বাতাসের সঙ্গে যুঝিয়া শীতগ্রীষ্ম, শুখো ডুবো প্রভৃতি প্রকৃতির অবস্থাবিপর্য্যয়গুলিকে নিজের সেবায় ও সার্থকতার পরিপূর্ণতা সাধনে নিয়োগ করিতে পারিবে না। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্র বলিয়া নহে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি অপরাপর ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

মোটামুটি ভাবে এ কথা সকলেই মানিয়া লন। আমাদের শিক্ষার ত্রুটী যথেষ্ট এবং ইহার অনেকটাই মিথ্যা, এ কথা অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের যে প্রথিতযশা মনীষী বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত সর্ব্বোচ্চ সনন্দখানিকে 'চোতা কাগজ' বলিয়া একদিন উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের কৃত্রিম ময়ূরপুচ্ছের ভরমুটা সভার মাঝে ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে কতকটা লজ্জা দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ভাবের ঘরে চুরি চলে না, সেই ভাবের ঘরে বসিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সত্যের বাজারে যাচাই করিতে যাইলে আমাদের সর্ব্বোচ্চ সনন্দগুলিরও জাল দলিল বলিয়া ধরা পড়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। পৃথিবীর ধূলামাটির সংস্পর্শ ছাড়িয়া আমাদের রামেন্দ্রসুন্দর যেন সন্ধ্যার একটি শুভ্র নির্ম্মল আলোক রেখার মত স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও আজ সশরীরে যদি আমাদের মাঝখানে বিদ্যমান থাকিতেন, তবে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি হীরেন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করিবেন না। কিছুদিন তাঁহার অন্তেবাসী হইয়া আমরা জানিয়াছিলাম যে শেষ জীবনে তাঁহার সেই সমুজ্জ্বল বুদ্ধি ও মনীষা মার্জ্জিত, শাণিত পাশ্চাত্য ও বস্তুবিজ্ঞানের অজ্ঞেয়বাদের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিল, এবং শিক্ষায় দীক্ষায়, চিন্তায় অনুষ্ঠানে, আচারে ব্যবহারে আমাদের দেশের শিক্ষিতদের যে পাশ্চাত্যানুবর্ত্তিতার মোহ, যে অন্ধ অনুচিকীর্ষার ব্যাধি এবং পরকীয় গৌরবের আওতায় থাকিবার মিথ্যা অভিমান, তাহাই তাঁহার ঋষি দেবতা-নবেদ্য জীবন যজ্ঞে শেষ আহুতি হইয়াছিল। অমন জ্ঞান গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে যে, সরস, কোমলভাবপূর্ণ হৃদয়খানি তিনি ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও নানাবিধ জাতীয় অনুষ্ঠানের কৃত্রিমতা, অসারতা ও অশোভনতা গভীর বেদনার চাঞ্চল্য উৎপাদিত করিত, ইহা আমরা জানি।

শিক্ষার গলদ স্বীকার করিতে আমরা গররাজী নই। তবে সে সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি তেমন স্পষ্ট তীব্র ও চিরন্তন নহে। এই জন্য এ ক্ষেত্রেও আমাদের কথা, অনুভূতি ও কাজের মধ্যে পরস্পর মিল নাই। যেটাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মুখে সায় দিই, সেটাকে অন্তরাত্মায় তেমন নিবিড়ভাবে হয়ত অনুভব করি না; এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ অস্পষ্ট ও সাহসশূন্য, প্রতিপালন শিথিল, বাধাপ্রাপ্ত, অশোভন ও অসফল হইয়া থাকে।

গাহিতে বসিলে যে ব্যক্তির সুরগুলি পরস্পরের সঙ্গে

সুসঙ্গত হইল না, এবং তাল, মান, লয়ের সংবাদ রাখিল না, তাহার কণ্ঠ-স্বরের মাধুর্য্য আমাদের প্রশংসা অর্জ্জন করিলেও, আমরা তাহার শিক্ষাকে অস্বীকার না করিয়া পরি না। স্বভাব যাহা পাইয়াছে ও রাখিয়াছে, শিক্ষা তাহাকে উন্মুক্ত করিয়া অবসর দিবে; স্বভাবে যাহা কেবল সুন্দর, শিক্ষায় তাহা শিব ও সত্য হইয়া উঠিবে; স্বভাবে যেটি আকাঙ্ক্ষা শিক্ষায় সেটি সঙ্গতি, স্বভাবে যাহা প্রেরণা, শিক্ষায় তাহা চরিতার্থতা; স্বভাবে যাহা অল্প, শিক্ষায় তাহা ভূমা। এই জন্য যেখানে দেখি সুন্দর জিনিষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাশ্বত এবং কল্যাণে সফল হইয়া ধন্য না হইল, তাহাকে পাইয়া আমরা আদর করিলেও তাহাকে লইয়া নিশ্চিন্ত ও কৃতার্থ হইয়া বাস করিতে পারি না। ঝরণার জলে পিপাসা মিটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা নীচে গড়াইয়া না আসিল, ততক্ষণ তাহার জলে অবগাহন করিয়া এবং আমাদের মাটি সরস ও উর্ব্বরা করিয়া লইয়া তৃপ্ত ও ফলবান্ হইতে পারি না। অতএব শুধু প্রেরণা যথেষ্ট নয়, চরিতার্থতা চাই; আরম্ভ হইলেই হইল না, উপসংহার চাই। পাখীর ডাকে, পাতার মর্ম্মরে, বাতাসের আকুল অভিসারে যে সুরলহরী গুলি এ বিশ্বে জাগিতেছে, মাধুর্য্য-সম্পদে ও ছন্দোবৈচিত্রে কি সে গুলির ন্যূনতা আছে? সে মহাসঙ্গীতে মানুষ নিজের ষোল আনা সব সময়ে ধরা দিয়া থাকিতে পারে না কেন? কেন মানুষের সভ্যতার আদিম উষা সামগানে আবার মুখর হইতে যাইল? কেন তবে মানুষের মন্দিরে ও কুঞ্জে মিলনে বিচ্ছেদে, সুখে দুঃখে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, জীবনে মরণে সঙ্গীতের আয়োজন চিরদিন এত সাগ্রহ হইয়া রহিয়াছে? বিশ্বসঙ্গীতের মাঝে কি খুঁজিয়া পায় না যাহা যোগাইতে মানুষের কণ্ঠ ও যন্ত্র এত রাগরাগিণীর সৃষ্টিতে অক্লান্ত, এত তালমানলয়ের বন্ধনে স্বেচ্ছায় বদ্ধ ও তাহাদের পরিচর্য্যায় সতর্ক? সেটি স্বরের বৈচিত্র ও মাধুর্য্য নহে; কারণ বিশ্বে তাহার স্বাভাবিক আয়োজন অপ্রচুর নয়। তবে স্বভাবে সে স্বরগুলি পরস্পরের সঙ্গে অপেক্ষা ও মিল রাখিয়া এবং পরস্পরের পরিচর্য্যা করিয়া এমন একটা কিছু পূর্ণাবয়ব স্বর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে না, যাহাকে আমরা আমাদের ভাবসমূহের বাণীমূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারি। প্রকৃতিতে সুরগুলি যেন পরস্পরের খোঁজ রাখিতেছে না; পরস্পরের অন্বেষণ করিতেছে না। কিন্তু আমাদের রাগরাগিণীতে, তালমানলয়ে সুরগুলির পরস্পরের অন্বেষণ, অপেক্ষা, সঙ্গতি ও সহায়তা রহিয়াছে। আবার, আমাদের সঙ্গীতে সুরগুলির উদয়, স্থিতি, পরিপুষ্টি ও লয় আমাদের স্বায়ত্ত; আমরা যেটিকে যখন যেরূপভাবে চাই, সেটিকে তখন সেই-রূপভাবে পাইয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতির মহোৎসবে আমরা চাই বলিয়া কিছু পাইতেছি না, যাহা আপনা হইতে আসি-তেছে তাহারই আস্বাদ করিয়া সুখী হইতেছি, যাহা আপনা হইতে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা আমাদের নিষ্ফল। বর্ষার পূর্ণিমা-রাত্রিতে বর্ষণ-পরিতৃপ্ত পথভ্রষ্ট একখানা মেঘ-স্নিগ্ধ কৌমুদী অঙ্গে মাখিয়া কোন অজানা স্বপ্নলোকের একটা ইঙ্গিতের মত আমাদিগকে মুগ্ধ; আত্মহারা করিয়া দেয়; কিন্তু বাতাস যখন তাহা-দিগকে সরাইয়া দিবে তখন আমাদের অপরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ত তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। প্রকৃতিতে শুধু চিত্র সম্বন্ধে নয়, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সম্বন্ধেও দেখি যে সে গুলি আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়া আসে না এবং যাইবার সময় আমাদের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া যায়। প্রকৃতিতে আমাদের বাঞ্ছিত ও উপভোগ্য জিনিষ প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি আমাদের স্বায়ত্ত নয় বলিয়া, আমরা উপভোগ্য সামগ্রীর একটা আলাহিদা আয়োজনও করিয়া লইয়াছি। শব্দের দিক্ হইতে সেইটি আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত এবং তাহার রাগ-রাগিণী, তাল-মান-লয়। অতএব দেখিতেছি যে প্রধানতঃ দুইটি কারণে আমাদের এই আলাহিদা বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক স্বরগুলির মধ্যে পরস্পরের অপেক্ষা, মিলন ও সহায়তা পাইতেছিনা বলিয়া। দ্বিতীয়তঃ সে গুলির আসা যাওয়া, বিকাশ ও পরিণতি আমাদের আয়ত্ত নয় বলিয়া। ইহাই হইল প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতা, এবং এই অসম্পূর্ণতার যথাসম্ভব পূরণের জন্যই আমরা যে উপায় আবিষ্কার করিয়া লইয়াছি, সেইটার নাম শিক্ষা। শুধু সঙ্গীতকলার দিক্ হইতে নয়, মানুষের সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষার এই লক্ষণ গ্রহণ করা চলিতে পারে।

মানুষের নানান্ দিক্—শরীর, ইন্দ্রিয়, হৃদয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা। এ সকলের নানান্ বৃত্তি রহিয়াছে; কতদিকে আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা রহিয়াছে; কতরকম আরম্ভের চেষ্টা রহিয়াছে। কিন্তু সকল সময়ে ও সর্ব্বতোভাবে তাহাদের

বৃত্তিগুলির মধ্যে পরস্পর মিল ও সহকারিতা থাকে না; সকল সময়ে তাহাদের আকাঙ্ক্ষার আবেগ চরিতার্থতার মধ্যে বিশ্রান্তি লাভ করিতেছে না; এবং সকল সময়ে তাহাদের আরম্ভ উপসংহার পর্য্যন্ত পৌঁছিবার শক্তি যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমাদের ভিতরে প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতার এই একটা দিক্। আবার আমাদের সংস্কার-গুলি ও বৃত্তিগুলি সর্ব্বতোভাবে ত আমাদের বশে নয়। যাহা চাই, যেটি চাওয়াতেই আমার কল্যাণ বলিয়া আমি মনে করি, যেটি আমার প্রেয়ঃ বা শ্রেয়ঃ অথবা উভয়ই, সেইটিরই পরিচর্য্যায় ও উপকারিতায় আমার সকল দেওয়াকে ত ঢালিয়া দিতে পারি না। আমার চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে মিল নাই; আমার উদ্দেশ্য ও আয়োজন, লক্ষ্য এবং যাত্রা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার মধ্যে এমন কোনও একটা অসন্দিগ্ধ ও চিরন্তন যুক্তবেণী আমি খুঁজিয়া পাই না যেখানকার পুণ্য-তীর্থোদকে অবগাহন করিতে পাইয়া আমার এই বহুজন্ম ব্যাপী মহাতীর্থযাত্রা চতুর্ব্বর্গের সফলতালাভে ধন্য হইয়া উঠিবে। আমার প্রকৃতি যে আমার আদর্শের অনুবর্ত্তন করে না, আমার শক্তির সাহস যে আমার লক্ষ্যের বিপুলতার সাম্‌নে অভিভূত হইয়া পড়ে; এবং আমার লক্ষ্যও যে অব্যভিচরিত রূপে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল নহে;—ইহাই হইল আমার স্বাতন্ত্র্যের অভাব এবং এইটি আমার ভিতরে প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতার অপরদিক্। অতএব সামঞ্জস্য ও স্বাতন্ত্র্য, প্রধানতঃ এই দুই দিকে আমাদের প্রকৃতির সুরগুলিকে নিযুক্ত করিয়া লইয়া জীবনরাগিণীর সৃষ্টি করিতে হইবে; নহিলে সে সুরগুলিতে কতকটা খণ্ডিত মাধুর্য্যের সম্ভাবনা থাকিলেও, সে গুলি আমাদের 'জীবন কুঞ্জে' একটা অখণ্ডৈকরস, পূর্ণ-মধুর রাগিণী রচিয়া দিবে না; এবং সে রাগিণী আমাদেরই আয়ত্ত থাকিয়া, আমাদেরই আকাঙ্ক্ষা, আশা ও ভরসার বাণী-মূর্ত্তি হইয়া, হে আমাদের চিরবাঞ্ছিত, তোমারই আবাহনে ও আপ্যায়নে সর্ব্বদা ও সর্ব্বতোভাবে বরিত ও কৃতার্থ হইবে না। এই জন্য শিক্ষা চাই, এবং সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিচয় ঐ দুইটীতে—আমাদের সকল দিকের মধ্যে এবং ভিতরে ও বাহিরের মধ্যে সামঞ্জস্য; এবং আমাদের ভিতরের সবটা ও বাহিরের অন্ততঃ যতটার সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত, ততটার উপরে আমা-দের অবিসংবাদিত স্বাধিকার। এই দুইটি নহিলে শিক্ষা হয় না। এবং এই দুইটির সদ্ভাব ও অভাব এবং তার-তম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের শিক্ষার হিসাব নিকাশ লইতে হইবে। অতএব বর্ত্তমানে যে আমরা আমাদের কথা, চিন্তা ও কাজের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাইতেছি না, এবং যেটাকে বুঝিতেছি সেটাকে কর্ম্মের মধ্যে আকার দিয়া মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে যে সাহস ও শক্তি পাইতেছি না, ইহাতে সামঞ্জস্য ও স্বাধিকার এই দুইটিকেই আমরা হারাইতেছি, এবং এই দুইটি যদি না থাকিল, তবে আমাদের শিক্ষা যে বাস্তব হইতেছে না সে পক্ষে আর সন্দেহ রাখিব কি?

এক কথায় যদি শিক্ষার লক্ষণ দিতে হয় তবে বলিব, স্বারাজ্য। সামঞ্জস্য ইহার ভিতরকারই কথা। বহুকে লইয়া যেখানে এক স্বরাট্ হইবে, সেখানে বহুর পরিচালন-সূত্রগুলি একই স্থানে ন্যস্ত হওয়া চাই। মাকড়সা যে উদ্দেশ্যেই জাল পাতুক্, জাল পাতাটা সেশই হয়, এবং তার ফলে সে জালে তার নিশ্চিন্ত স্বাধিকার। তাই স্বারাজ্য বলিলেই সামঞ্জস্য আপনা হইতেই আসিল। প্রাচীন ঋষিরা এই স্বারাজ্য-সিদ্ধির মধ্যেই অমৃতের সন্ধান পাইয়া ইহার জয়গানে তাঁহাদের বেদবাণী উদাত্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, "তমসঃ পরস্তাৎ" যে 'আদিত্যবর্ণ' পুরুষ রহিয়াছেন, স্বারাজ্য-সিদ্ধির ফলে 'অমৃতের পুত্র' মানুষ তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুর পারে গমন করিয়া থাকে। এই অমৃতের পর আর কিছু পাওয়া মানুষের পক্ষে হইতে পারে না; সুতরাং স্বারাজ্য-সিদ্ধির চেয়ে বড় আর কোন সিদ্ধি মানুষের নাই। ইহা পাইলে আর কিছুরই অভাব বা অপেক্ষা থাকে না; এবং ইহা যতক্ষণ না পাইল ততক্ষণ মানুষ আর কিছুরই মধ্যে নিজেকে নিশ্চিন্তভাবে ধরা দিয়া শান্ত থাকিতে পারে না। সমুদ্রে সকল 'আপঃ' প্রবেশ করিতেছে, অথচ সমুদ্র যেমন নিজের পরিপূর্ণতায় "অচলপ্রতিষ্ঠ," মহাকাশে এই সমগ্র বিশ্বটা নাচিয়া ছুটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ আকাশ যেমন নিজের সমাহিত গৌরবে নিত্যতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছে; সেইরূপ স্বারাজ্য সিদ্ধিতে মানবের সকল প্রেরণা ও সকল কামনা, সম্মিলিত ও পরিসমাপ্ত হইতেছে, অথচ ইহার নিজের গভীরতায় কোনও ক্ষোভের চাঞ্চল্য নাই, এবং ইহার নিজের প্রতিষ্ঠা শাশ্বত ভূমিতেই সুস্থির রহিয়াছে।

মানুষের ব্যষ্টিরূপ ও সমষ্টিরূপ—সে নিজে এবং তাহার সমাজ ; এ দুটির কোনটাকে উপেক্ষা করিয়াই স্বারাজ্য হয় না। গাছ বাড়িয়া ফলপুষ্পে সার্থক হইবার পক্ষে শুধু বীজের নিজস্ব শক্তিটাই যথেষ্ট নহে ; শূন্যের মাঝখানে, অসম্ভব, প্রতিকূল বা অসম্পূর্ণ অবস্থার মাঝখানে ফেলিয়া রাখিলে সে বীজের নিজস্ব প্রকৃতি রিক্ত এবং ব্যর্থই রহিয়া যায়। মাটির রসে বাহিরের তাপ, আলোক, বাতাস ও শিশিরে সে নিজেকে বাস্তবের মধ্যে হাজির করিবার অবসর পাইবে ; যতক্ষণ না মধুমক্ষিকা বা বসন্তবাতাস প্রতিবেশী পাদপের পুষ্পপরাগরেণু বহিয়া আনিয়া তাহার পুষ্পসজ্জার মাঝে ছড়াইয়া দিবে, ততক্ষণ তাহার পুষ্পসম্ভার একটা নিষ্ফল রূপের হাট পাতিয়া রাখিবে মাত্র, সে হাটে কোন কিছুরও বিনিময় হইয়া কাহাকেও সফলতা আনিয়া দিবে না। মানুষও যদি সত্যকার জীবন পাইতে চায়, তবে তাহার সমষ্টিরূপ বা সমাজকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সমাজ যেখানে পরতন্ত্র, অবসন্ন, অসংস্কৃত ও অসুন্দর, সেখানে ব্যক্তির সেই সমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্য দিয়া, এবং তাহাকে তদবস্থ ফেলিয়া রাখিয়া স্বারাজ্য-সিদ্ধিতে পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি ? স্বারাজ্য পাইতে হইলে হয় তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত পাইতে হয়, নয় তৈয়ার করিয়া লইতে হয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটিমাত্রও জীব বদ্ধ রহিল, মুক্তি পাইল না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই মুক্তি পাইবে না ; মুক্তি এমন একটা মন্দির যাহার দ্বারে প্রবেশ করিতে হইলে সকল জীবকে হাতধরাধরি করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে, অগ্র পশ্চাদ্ ভাবে প্রবেশ করা চলিবে-না ; এ কথা যাঁহারা বলিয়াছেন তাঁহারা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা বলেন নাই। এ প্রকার মুক্তি-কল্পনার উদারতা একদিকে আমাদের হৃদয়-টাকে নিখিল-জীবের সঙ্গে মমতা-বন্ধনে বাঁধিয়া দেয় এবং আমাদের সকল প্রকার লোক সেবার প্রচেষ্টাকে মহাগৌরবে মণ্ডিত করিয়া দেয় ; কারণ এবংবিধ মুক্তি পাইতে হইলে আমাদের যে আর সকলকে সঙ্গে লইয়া চলিতে হইবে ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার একটি সহযাত্রীও পথে পিছাইয়া থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বরের রুদ্ধ দ্বারের কাছে আমায় তাহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে যে। অপর দিকে কিন্তু এ প্রকার মুক্তি-কল্পনা আমাদের তীর্থ যাত্রার অসীমতা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া অন্তরে ভয় আনিয়া দেয়। বিশ্বজীবের মুক্তিতে তবে আমার মুক্তি ! সে মুক্তিতে কোন দিনও তবে আমি পৌঁছিতে পারিব না। সমষ্টি মুক্তি ? তাহার জন্য কালের ত কোনও সীমা রেখা টানিয়া দেওয়া যায় না যাহার মধ্যে সে পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে ! ব্যাস, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য—কেহই ত তবে এখনও পার যাইতে পারেন নাই ; সকলেই খেয়ার ঘাটে বসিয়া আছেন ও পথের পানে চাহিয়া আমাদের জন্য ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটও 'পথের ধুলায় অন্ধ' ও মলিন হইয়া আছে ততক্ষণ, পর্য্যন্ত পারের মাঝি তাহার নৌকা ভাসাইবে না বলিয়া করুণ জবাব করিয়াছে যে ! তবে উপায়—আমার মত অসহিষ্ণু ব্যস্তবাগীশ, আপ্তসারা জীবের উপায় ? উপায় খুঁজিয়া লইবার জন্য আমাকে একটা রফা করিয়া লইতে হইয়াছে ; ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এমন ধারা রফা শেষ পর্য্যন্ত চলুক আর নাই চলুক, আমি এক রকম করিয়া লইয়াছি। নিজকে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে কতকদূর পর্য্যন্ত আমাকে সমাজের সঙ্গে ও সমাজকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইবার আবশ্যকতা থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত [illegible]। খানিকদূর পর্য্যন্ত সমাজের আশ্রয়ে এবং সমাজের সর্ব্ববিধ শুভ ব্যবস্থার সহায়তা লইয়া আমাকে থাকিতেই হইবে ; অন্যদিকে আমি যখন শ্রেয়োলাভের পথে চলিতে আরম্ভ করিব, তখন অনেকদূর পর্য্যন্ত সমাজকেও সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আমাকে সর্ব্ববিধ সেবা ও পরিচর্য্যার দ্বারা সমাজকেও আমার কল্যাণের অংশভাগী করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই হইল অপরের আমার উপর দাবী। এ দাবী অগ্রাহ্য করিয়া যে চলিতে গেল, সে কল্যাণের দিকে পিছন ফিরিয়াই চলিল। কিন্তু এ দাবীরও একটা সীমা আছে ; খানিকদূর পর্য্যন্ত আত্মোন্নতি ও লোকসেবা এ দুয়ের মধ্যে পরস্পরের অপেক্ষা থাকিলেও, মানবাত্মা পরিণামে এমন একটা ভূমিতে গিয়া পৌঁছায় যেখানে সে আত্মারামও আত্মতৃপ্ত হইয়াই নিঃশ্রেয়সের চরম পদবীতে আরোহণ করে, সেখানে আর তাহার সঙ্গ নাই এবং কাহারও জন্য বা কিছুরও জন্য অপেক্ষা নাই। এ ভূমিতে পৌঁছিয়া লোকসেবা না করিলেও ক্ষতি নাই ; এবং যে এ ভূমিতে পৌঁছিয়াছে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকসেবা করুক আর নাই করুক, তাহার মহনীয়

বরণীয় পুণ্যজ্যোঃতি এ ভ্যাটবীর অভ্যন্তর ভাগে তাহার স্নিগ্ধ সংস্পর্শে তমোমালিন্য কতকটা দূর করিয়া দিবেই। আমরা ধরিতে ছুঁইতে পারি এমন ভাবেই যে কেবল জন-সেবা করা হয় এমন নয়; আমাদের ধীবৃত্তিগুলিকে সকল প্রকার শুভাসনায় নিয়োগ করিতেছেন যে সবিতা, তিনি কি আমাদের ধরিবার, ছুঁইবার, মাপিবার, তলিবার জিনিষ? অতএব কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ:—মানবাত্মার স্বারাজ্য লাভের যে শেষভূমি সেখানে 'স্ব' মানে আত্মেতর আর কিছুই নহে; তখন স্বারাজ্যের জন্য কিছুরও অপেক্ষা নাই; সমাজ বা বিশ্বমানব সে ভূমির কাছাকাছি পৌঁছাক, আর নাই পৌঁছাক, আত্মা তখন 'স্থিরঃ স্বে মহিম্নি।' আসল কথা, সে ভূমিতে আপন ও পরের মাঝে যে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে তাহার বিলয় হইয়া যায়। এখন 'আমি'ও একটা যেমন, 'তুমি'ও একটা তেমন, এবং 'সে'ও একটা তেমন, কিন্তু স্বারাজ্যের শেষ ভূমিতে 'তুমি'ও 'সে', 'আমি'র পাশে স্বতন্ত্র আর একটা কিছু নহে—'আমি'র ভিতরেই তাহাদের স্থান; একটা বিরাট 'আমি' বিশ্বকে কুক্ষিগত করিয়া, বিশ্বের সুখ-দুঃখ, জীবন মরণ, উত্থান পতন নিজেরই ভাবনার মধ্যে সমাপ্ত করিয়া টানিয়া লয়, বাহিরে পড়িয়া থাকিতে দেয় না; তখন যে স্বরাট্ সেই বিশ্বরাট্; তখন কে আমার বাহিরে পর হইয়া, উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকিল যে তাহাকে আদরে যজ্ঞশালায় আহ্বান করিয়া না লইলে আমার অসমাপ্তি রহিয়া যাইবে? যখন আত্মাই হোতা, আত্মাই হবিঃ, আত্মাই হবন, আত্মাই ঋত্বিক্ অগ্নি, এবং আত্মাই যজ্ঞ শেষ অমৃত; তখন কে কাহারে বরণ করিয়া লইবে, কে কাহারে যজ্ঞান্তে মোচন করিবে? এক ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ মহাপাদপের শাখায় শাখায় স্বাদু পিপ্পলের ফল যতক্ষণ আমি খাইয়া বেড়াইতেছি, ততক্ষণই আর একটি সুপর্ণ পক্ষী কিছু না খাইয়া কেবল দেখিতেছে; কিন্তু আত্মাই যখন মহাপাদপের মূলে, শাখায়, ছন্দোরূপে পত্ররাজিতে, ফলে, ভোক্তায় ও ভোগ্যে, দ্রষ্টায়ও দৃশ্যে নিজেকে ওতপ্রোত দেখিল, তখন কে তাহার বাহিরে পড়িয়া রহিল যে তাহার পরীক্ষায় নিজের সত্তাকে সে যাচাই করিয়া লইবে?

শিক্ষার প্রসঙ্গে এতবড় কথা না পাড়িলেও বোধ হয় চলিত; কিন্তু এটাও আবার ভুলিলে চলিতেছে না, যে শুধু ছোট কথায় এবং মাঝারি কথায় মানবাত্মার সাজ পোষাকেরই পরিচয় দেওয়া হয়, তাহার স্বরূপের সার সত্যের পরিচয় দেওয়া চলে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদিগকে স্বাস্থ্য, সম্পদ, জ্ঞান ও শক্তি আনিয়া দেওয়া—শুধু এ কথা বলিয়া শেষ করিলে জিনিষের খোসাতেই শেষ করা হইল, সার পর্য্যন্ত পৌঁছান হইল না। শিক্ষা আমাদের শরীরটাকে সুস্থ করিবে, অন্নমুষ্টি যোগাইবে, চরিত্রবান্ করিবে—এগুলি বেশ কথা এবং মোটামুটি ভাবে দেখিতে যাইলে সোজা কথা। কিন্তু এ কথাগুলি বলিলেই আসল কথা বলা হইল না; এমন একটা কথা বাকি রহিয়া গেল যেটা না বলিলে একথাগুলির মধ্যে কোনও নিয়ত বন্ধন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কোনরূপ সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করা যায় না, কোনও-রূপ পরিণতি ও সম্পূর্ণতার একটা দিগ্‌দর্শন আবিষ্কার করা চলে না। শরীরটাকেই সব চেয়ে বড় না করিব কেন? অন্নমুষ্টি যোগানটাকেই শিক্ষা বলিতে আপত্তি কি? মস্তিষ্ক ও হৃদয় এ দুটার মধ্যে একটাকে খাটো করিয়া অপরটার অনুশীলন করিলে হানি কি? সবই আসিল কিন্তু জীবনে পবিত্রতার সৌন্দর্য্য থাকিল না, তাহাতেই বা আসিয়া যাইল কি? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব মিলিবে না যতক্ষণ না একটা কথা আমরা বলিতে পারিতেছি, সেই কথাটি স্বারাজ্য। অতএব বড় কথা গোলমেলে কথা বলিয়া ভয় পাইলে আমাদের চলিতেছে কৈ? অনাবৃষ্টিতে মৃত্তিকা যখন নীরস, তখন বাগানের মালীকে ডাকিয়া ফুল ফলের গাছ পালার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়, প্রত্যেকটিতে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা হইয়াছে কি না; কিন্তু আষাঢ়ের মধ্যাহ্নে বিশ্বাত্মার সঞ্চরণশীল স্নেহের মত একখানা মেঘ উঠিয়া যে দিন নিজেকে রিক্ত করিয়া 'তৃষিতধরা মাঝে' ঢালিয়া দিয়া গেল, সে দিন আর গাছ পালার তথ্য লইবার প্রয়োজন থাকে না। 'স্বারাজ্য' বলিলে এমন একটা কিছু পাইলাম যাহা আমাদের প্রকৃতি-উদ্যানের সর্ব্বাংশে অকাতরে অপক্ষপাতে বর্ষিয়া গেল; তাহাকে আর ঝাঁঝরি হাতে করিয়া প্রত্যেক তরুগুল্মটির মূলে কুণ্ঠিত বারিধারা আলাহিদা যোগাইয়া বেড়াইতে হয় না।

লক্ষ্য দূরে থাকিলে অস্পষ্ট আবছায়ার মত দেখাইবেই! কিন্তু সেখানে না পৌঁছিলে যদি আমাদের চরিতার্থতা না থাকে, তবে পথের ধারে চোখের সামনে উপস্থিত যাহা

পাইলাম-তাহাতেই আমাদের সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম বিলাইয়া দিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিলে চলে কি? দীর্ঘ তীর্থযাত্রায় যখন আমার অভীপ্সিত দেবমন্দিরের চূড়া অস্পষ্ট দেখা গিয়াছে, তখন পথিমধ্যে এক পান্থশালায় নিজেকে নিশ্চিন্তভাবে ফেলিয়া রাখিব কি? দিনের বেলায় হাটে বেচাকেনা করিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মাঝি পদ্মার জলে ডিঙি ভাসাইয়া, যখন দূরে গগন সীমান্তে অস্পষ্ট মসীরেখার মত আপন 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' পল্লীবাসটি দেখিতে পায়, তখন সে পরপারের নিকটে একটা বালির চরে ডিঙি বাঁধিয়া, আকাশ পানে চাহিয়া, জল-কল্লোলে ক্ষুৎপিপাসা মিটাইয়া পড়িয়া থাকিবে কি? গন্তব্য স্থানে না পৌঁছিলে যদি আমাদের চলিত, তবে না হয় এখানে সেখানে এটা সেটা লইয়া থাকিয়া যাইতাম; যেটি ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, কাজেই অল্প লইয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের চলে না। শুধু শরীরের স্বাস্থ্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়; শুধু খাইতে পরিতে পাইলেই হইল না; শুধু লেখাপড়া শিখিলেই রেহাই নাই; যশ, সম্পদ, এমন কি চরিত্র, এ গুলিতেও বিরাম স্থান নাই। পথ চলিতে চলিতে যথাসম্ভব এ সমস্ত আমাকে পাইতে হইবে, কিন্তু সে পাওয়াকে আরও একটা বড় পাওয়ার আরম্ভ বা ভূমিকা করিয়া না লইতে পারিলে, আমায় যে অল্পেই পড়িয়া থাকিতে হইল, এবং অল্প কিছুতেই ত সুখ নাই, স্বস্তি নাই! আবার আদর্শ অস্পষ্ট বলিয়া—তাহার প্রভাব যে আমাদের উপর কম হইবে, এ কথাও সব সময়ে ঠিক কথা নহে। 'পাখীগণ' যখন 'করে রব' তখন শিশুগণ নিজ নিজ পাঠ মন দেয় বটে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে প্রেরণা রহিয়াছে সেটা গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড এবং সেটা শিশুদের ইন্দ্রিয়ের কাছে বেজায় স্পষ্ট; 'রাখাল'ও যখন 'গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,' তখনও প্রেরণাটি ঠিক ইহাই। কিন্তু কবি বা শিল্পী যখন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে বসিল, তখন সে ধ্যানে যে আদর্শটিরে অস্পষ্ট-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে তাহাকেই বাস্তবের মাঝখানে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইল; কবির প্রত্যেক ভাব, ভাষা ও ছন্দের এবং শিল্পীর প্রত্যেক তুলিকাসম্পাত ও বর্ণবিন্যাসের পশ্চাতে সেই ধ্যানলব্ধ অস্পষ্ট আদর্শটিরই প্রেরণা ও প্রভাব রহিয়াছে; কিন্তু সে প্রভাবের মূল অস্পষ্ট বলিয়া কি তাহার নির্দ্দেশ অব্যবস্থিত, তাহার দাবী কি একটুও শিথিল? যেমন আদর্শটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া একটা লক্ষণ বা বিবৃতি দিয়া হাজির করা যায় না, সেইরূপ কবির বা শিল্পীর সাধনা যে পুরস্কারের আশায় রহিয়াছে, অথবা যে ব্যর্থতার আশঙ্কা করিতেছে, তাহাকেও স্পষ্ট একটা কোনও বিবরণ দিয়া প্রকাশ করা চলে না; তাহা সৃষ্টির আনন্দ বা ব্যর্থতার নৈরাশ্য এই রকম একটা অস্পষ্ট কথায় আমাদের বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু সাধনার মূল উৎস এবং শেষ পরিণতি এতটাই অস্পষ্ট হইলে কি হইবে—কবি তার প্রতি পদক্ষেপে এমন একটা কিছুর প্রেরণা ও নির্দ্দেশ অনুভব করে যেটার প্রভাব ও শাসন, উদ্যত বেত্রদণ্ডের চেয়ে ঢের বেশী সতর্ক ও মর্ম্মান্তিক। অতএব স্বারাজ্য বুঝি না বলিলে রেহাই নাই।

অনেক বড় কথা আমরা বুঝিতে চাহি না বলিয়াই বুঝি না। চোটর কাছে যে আপনাকে একেবারে ক্রীতদাস করিয়া ধরা দিয়াছে; তাহার বড়র ত আশাও নাই এবং বড়তে তাহার প্রয়োজনও নাই। যে জীব গর্ত্তের অন্ধকারেই নিজের স্বাভাবিক বাসস্থান করিয়া লইয়াছে, তাহার গর্ত্তের দ্বারে যদি উদার বিশ্বের ভূমালোক গিয়া কোন দিন উপনীত হয়—তবে সে যে ভয়ে গর্ত্তের ভিতর তাহার অসহিষ্ণু দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখিবে। আমরা শরীরের ভোগ সুখ, খাওয়া পরার সুখ প্রভৃতি তুচ্ছতার মধ্যে নিজেদিগকে এমনভাবে সমাপ্ত ও অভ্যস্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছি, যে অনেক বড় সত্য কথা আমাদের কাছে বাজে কথারই সামিলই হইয়া আছে; সে সব কথা শুনিলে আমরা বুঝি না এবং বুঝিবার সম্ভাবনা হইলেও অস্বস্তি বোধ করি। বড় কথা গোলমেলে কথা বলিয়া আমরা নিজ নিজ গর্ত্তের মধ্যে বেশ বিজ্ঞের মতই জীবনটা কাটাইয়া দিই; কিন্তু যে সকল মহাজন বড়র জন্য, সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্যই তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, বড় লইয়াই যাঁহাদের দরকার এবং বড় নহিলে যাঁহাদের কোন মতেই চলিবে না; তাঁহাদের মুখে 'বড় কথা' এ আপত্তি ত কেহ কোনও দিন শুনিল না। পক্ষান্তরে সংসারের ঐহিকসর্ব্বস্বেরা যে কথা গুলিকে সাদাসিধা কথা বলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছে, সে কথাগুলির অনেকটাই আপাততঃ সাদাসিধা, বস্তুতঃ নহে। যে দেখে যে পৃথিবী সমতল এবং পৃথিবীরই চারিধারে চন্দ্র

সূর্য্য ও নক্ষত্র জগৎ ঘুরিয়া পাহারা দিয়া বেড়াইতেছে, তার দেখা আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষের সহজ ধারণার খুবই অনুকূল সন্দেহ নাই; কিন্তু একটু খানি তলাইয়া দেখিতে যাইলেই সে দেখার ভুল ধরা পড়ে, আমাদের সহস্র ধারণা গুলির মধ্যে গোল বাহির হইয়া পড়ে। এ সহজ ধারণাকে উল্‌টাইয়া দিয়া বিজ্ঞান কিছু কাল ধরিয়া যে কথাটা আমাদিগকে শুনাইতেছে, সেটা শুনিতে ও বুঝিতে খুব শক্ত কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে জগতের চলা ফেরা ব্যাপারের যে কৈফিয়ৎ পাই তাহা সত্যের সরলতায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বজনীন সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য্য সম্পাতে চিত্তাকর্ষক। আমাদের অনেক সহজ জ্ঞানের মধ্যে যে গোল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা বিজ্ঞানে গিয়া ধরা পড়ে; আর দূর হইতে আনাড়ীর দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের যে সত্যগুলি দুর্দ্ধর্ষ ও জটিলতায় সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়, পরীক্ষায় এবং উপলব্ধিতে সে সত্যগুলির সরল সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মল ঔদার্য্য মানবাত্মাকে বিস্মিত, মুগ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত না করিয়া যায় না। স্বারাজ্যসিদ্ধির চরম ভূমিতে 'আমি'র মধ্যেই 'তুমি' না 'আমি'র পাশে 'তুমি' এ বিচার আগে করিয়া লইয়া তবে স্বারাজ্যের কথায় ঘাড় পাতিয়া দিব, এ কথা যাঁহারা ভাবিতেছেন, তাঁহারা কথাবার্ত্তার অধিক আর কিছুই করিবেন না; তাঁহারা তাঁহাদের নিরালাপুরীর অর্গলগুলি খুলিয়া পথে বাহির হইয়া তীর্থযাত্রা করিবার প্রয়োজন সত্যসত্যই প্রাণে এখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহারা আগে বুঝিতে চান যে মানবাত্মার এই মহাব্রত প্রতিষ্ঠার অবসানে দেবতার প্রসাদ লইয়া সোজা গুঁজি মুখে দিতে হয়, না মস্তক বেষ্টন করিয়া মুখে দিতে হয়। যেন এই মহাসত্যটা বুঝিবার অপেক্ষাতেই তাঁহাদের সকল উদ্যম, সকল অধ্যবসায় পড়িয়া আছে।

মানুষ হাটবাজারে বেচা কেনা করে, বাস করে না। কারবার করিতে গিয়া তাহাকে একটা না একটা মুখোস পরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পরের মাল কত সস্তায় কিনিবে এবং নিজের মাল কত বেশী দরে বিকাইবে ইহাই তাহার চিন্তা। এখানে সত্যের আসল ছবিটি তার কাছে অন্তর্হিত। কিন্তু বাস করিবার জন্য একটা মন্দিরও আছে। সেইটার নাম অন্তরাত্মা। এখানে 'শান্তশীতল রাগে' যে ঠাকুরটি বিরাজ করিতেছেন তাঁহার স্নেহজাগ্রত নয়নের নিম্নে প্রাণকে নিরাভরণ হইয়া হাজির হইতে হয়। হাটে মিথ্যা কারবার করিয়া, এক রাশি অভিমানের পশরা বহিয়া মানুষ যখন অবসন্ন পদে তার মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সে মন্দিরাভ্যন্তরের 'মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ নিনাদ' তাহার কম্পিত মস্তক হইতে সকল অভিমানের ও প্রবঞ্চনার ঝুড়ি ধুচুনির উপর লটাইয়া দেয়। সে পশরা মাথায় বহিয়া অন্তরাত্মার মন্দিরে যে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সে 'চিন্তামণির নাচদুয়ারে' আমায় যে মুখোস খুলিয়া ফেলিতেই হইবে। এখানে আসিয়া ঝুটাকে সাচ্চা হইতেই হইবে যে। এখানে মানুষের ছোট বড় দুইটা দিকই বেশ করিয়া মিলাইয়া, হিসাব নিকাশ করিয়া পাকা খাতায় তুলিতে হইবেই যে। বাজারে কাণাকড়ি লইয়া খেলিয়াছি, কাণাকড়িই কুড়াইয়াছি, কিন্তু আমার নিভৃত গৃহকোণে 'নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' যে অন্তরাত্মা বিরাজ করিতেছেন সেখানে আমার পুঁজিপাটার কড়াক্রান্তির একটা হিসাব আমায় করিয়া লইতেই হইবে যে। নিজের ধনরত্নের সিন্ধুকটি কেহ ঘাড়ে করিয়া হাটে যায় না; সেখানে কারবারের ফল কুড়াইয়া আনিবার জন্য একটা ছোট থ'লেই যথেষ্ট; কিন্তু ঘরে ফিরিয়া সে থ'লেটিকে লইয়া সিন্ধুকের কাছেই ত হাজির করিতে হয়; ছোটকে আর ছোট করিয়া ফেলিয়া রাখা চলে না, বড়র সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হয়। সকল কাজের মধ্যে ছুটি করিয়া লইয়া আমার অন্তরাত্মার মাঝে, যে বড়টির কাছে আমার এক আধবার হাজির হইতেই হয়, সেই বড়ই ত স্বারাজ্য। হাটের পথে কেহ আমাকে ইহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কবুল করি না; বলি স্বারাজ্য আমি জানি না, বুঝি না। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আর আত্মবঞ্চনা চলে কি? মানুষ যতক্ষণ বলিতেছে আমি শরীরের সুখ চাই, প্রতিপত্তি চাই, বাহ্য সম্পদ চাই, ততক্ষণ সে ফুলের বাহিরে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতেছে মাত্র; ফুলে যেই সে বসিতে পাইল সেই সে সুস্থির হইল; কারণ তখন যে তার নিশ্চিন্ত ও সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া হইয়াছে, এটা চাই, ওটা চাই করিয়া আর ব্যর্থ প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। সেই ফুলটাই তার অন্তরাত্মা এবং তাহাতেই যে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠার আনন্দ তাহাই ত স্বারাজ্য-সিদ্ধি।

ভাঁটার সময় সাগর যখন আপনাকে একটুখানি সরাইয়া লইয়াছিল তখন তাহারই রসে সিক্ত বেলা ভূমিতে

বসিয়া তাহার পানে পিছন ফিরিয়া নিজের ভিতরে যে দীনতার মণ্ডুকটি বাস করে তাহার জন্য একটা গর্ত্ত কাটিতেছিলাম। পশ্চাতে বিপুল উচ্ছ্বাসে সাগরের তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু আমি তার শাশ্বত ভৈরব বাণীকে একটা অজানা রহস্য ভাবিয়া গ্রাহ্য করি নাই; মনকে বুঝাইয়াছিলাম যে ও বিরাট রহস্যের সঙ্গে আমার নিজস্ব ছোট গর্ত্তটির কোনও সম্পর্ক নাই। আমার মণ্ডুক-জীবনের ক্ষুদ্রতা নিজেতেই পর্য্যাপ্ত এবং সেইটুক খানিই আমার স্বারাজ্য। খাওয়া পরার কথা ভাবিব, সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথা ভাবিব এবং সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে নিজেকে খুব চালাক ও লায়েক করিব৷ সেইটাই আমার শিক্ষা। ভেক গর্ত্তের জল টুকুতে লাফাইতে শিখিবে, বেশ চালাকি করিয়া পোকা মাকড় ধরিয়া খাইতে শিখিবে, বংশ বৃদ্ধি করিয়া যাইতে আলস্য থাকিবে না, এবং অমন মত গর্ত্তের পারে বসিয়া সাগরের বিপুলতা ও নদনদীর স্বাধীনতাকে শ বিজ্ঞের মত উপহাস করিবে—ইহাই হইল তাহার শিক্ষা এবং ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু হে মানবাত্মা! সাগরের জলের বিপুলতা ও গভীরতার মাঝখানেই যে তোমার স্বাভাবিক মন্দির একথা কতক্ষণ নিজেকে তুমি ভুলাইয়া রাখিয়া কূপ-মাণ্ডুক্যের তুচ্ছতাকে বরণ করিয়া রহিবে? বিরাট তুমি, তোমার এ তুচ্ছের সাজ কতক্ষণের জন্য? ভূমা তুমি, তোমার এ অল্পের ভাণ কতক্ষণ টিকিবে? কতক্ষণ তুমি বলিবে যে, সাগরসৈকতে যে একরত্তি জল চোঁয়াইয়া গর্ত্তের ভিতর আসিতেছে তাহাই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত; কেবলমাত্র খাওয়া পরা, সম্ভ্রম্পের যে কৃপণ কুণ্ঠিত সুখ তাহাই আমার বাঞ্ছনীয়? যে শাশ্বত আনন্দে এ নিখিল বিশ্বসৃষ্টির সম্প্রসারণ অনুভব করিয়াছে, যে বাধহীন, সঙ্কোচহীন আনন্দে এ জগৎটা প্রতিষ্ঠিত, এবং সাগরের জলে বরফের মত যে অপরিমেয় আনন্দে, সৃষ্টি নিজের বিশিষ্ট রূপ আবার হারাইয়া ফেলিবে, সে আনন্দ যে তোমারই আনন্দ, সে যে তোমার নিজেকে নিজের ভালবাসার চরিতার্থতা; কতক্ষণ সে আনন্দের পূর্ণাভিষেক হইতে নিজেকে ভয়ে তুমি সরাইয়া রাখিতে পারিবে? ঐ দেখ সাগরের জলে আবার জোয়ার আসিতেছে; যে সঙ্কীর্ণ বেলাভূমিতে সাগর এ সংসারের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, সেটাকে মাঝে মাঝে সাগর নিজের বিপুল আলিঙ্গনের মধ্যে টানিয়া না লইলে, বুঝি বা গর্ত্তের জলে মানবাত্মার মণ্ডুকলীলাভিনয় চিরন্তন হইত। কিন্তু জোয়ারের সময় সিন্ধু যখন তোমার বালির খেলা ধুইয়া মুছিয়া দিয়া যাইবে, তখন, হে মণ্ডুক! তুমি তোমার দীনতার ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিয়া সেই প্রাচীন সুবর্ণ পক্ষীটির মত হিরণ্ময় পক্ষপুট বিস্তার করিয়া সাগরের বিশালতার পানেই অভিযান করিবে না কি? যেখানে সাগরের অশান্ত গাঢ় নীলিমা আকাশের সুস্থির নীলিমার কাছে ধরা দিয়াছে, যেখানে সমগ্র সৃষ্টিটা চিদাকাশের সমাধিবেদীপ্রান্তে সম্ভ্রমে প্রণত, সেই দিকে, হে মানবাত্মা! খেলা ভাঙ্গিবার পর তোমার পুণ্য-অভিযান। ঊর্দ্ধ, অধঃ, চতুর্দ্দিক যথায় অন্তরের পূর্ণ পুণ্য মহিমায় দীপ্ত সুনির্ম্মল যে ভূমিতে পূর্ণ হইতে পূর্ণ বিয়োগ করিলে পূর্ণই অবশেষ থাকে, যে পদটী "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"—তথায় হে সুরি! তোমার হিরন্ময় পক্ষবিস্তার করিয়, তোমার অপার ভূমার 'আয়ত চক্ষু' মেলিয়া দেশকালের সীমারেখার বাহিরে যে আত্মার সর্ব্বাত্মতা তুমি অনুভব করিবে, তাহাই তোমার স্বারাজ্য। এখানে 'স্ব' এর মধ্যেই সব, 'আমি'র ভিতরেই 'তুমি'।

আর একদিন দেখি পট পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কাহার কাছে, কি যেন কি একটা চাই; কি যেন কি একটা না পাইলে আমার প্রাণের ক্ষুধা ভরে না, পিপাসা মিটে না; সেই চাওয়াটার নাম দিয়াছি আমার ভিক্ষার ঝুলি। সেই ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া এই মহাব্রজের কুঞ্জ দ্বারে দ্বারে আমি 'জয় রাধে' বলিয়া মাধুকরী করিয়া বেড়াইতেছি। ভিক্ষা মুষ্টি হাতে করিয়া সে যখন কুঞ্জ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া আমি বলিতেছি—হে আমার চিরবাঞ্ছিত! তোমারই পায়ে আমায় বিকাইতে না পারিলে আমার চরিতার্থতা নাই! তোমারই গৃহাঙ্গন আমার প্রাণের অঞ্চল দিয়া নিত্য মুছাইতে না পারিলে যে আমার স্বস্তি নাই; তোমারই ডাকে আমার চরণ চঞ্চল, তোমারি সেবায় আমার কর দুটি অনলস করিতে না পারিলে আমার 'জন্ম'টাই যে বৃথায় যাইবে। অতএব হে আমার তুমি! তোমারি আবাহনে, আপ্যায়নে ও পরিচর্য্যায় আমার 'আমি' কে স্বীকার করিয়া লও। তোমার দ্বারে আমার এ ভিক্ষা। আমার এ ভিক্ষার মর্ম্ম সে বুঝিল না, ফিরিয়া গেল। বাউলও অন্ত

দ্বারে গিয়া তাহার ঝুলি পাতিয়াছে। এ জগতের প্রত্যেক হৃদয়টার কাছে সে আপনাকে বিনা কড়িতে লুটাইয়া বিলাইয়া দিতে চায়; কিন্তু জগতের প্রাণী যে কড়ি দিয়া কিনিতে ও বেচিতেই অভ্যস্ত; যেখানে কড়ির নাম গন্ধ ও নাই, আদান প্রদানের একটা কষাকষি মাজামাজি নাই, সেখানে যে পা বাড়াইয়া দিয়াছিল সে ত সত্যসত্যই বাউল—সে বুদ্ধিমান্ হুঁসিয়ার জীবের কারবারের বাহিরে। শকুন্তলা যে দিন নব-মল্লিকার মূলে বারি সেচন করিতে গিয়া কাহার পানে সলজ্জ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াছিল, শ্রীরাধা যেদিন 'কনককলসে' যমুনার জল ভরিতে আসিয়া কাহার বেণুরবে স্রোতের মুখে বেতসীর মত কাঁপিয়া উঠিতেছিল, জুলিয়েট যেদিন রোমিওর বক্ষোলগ্ন হইয়া বিহগকণ্ঠে উষার জাগরণ শব্দটাকে নিশীথের সুখ স্বপ্নেরই সামিল করিয়া লইতেছিল, দেস্‌দেমোনা যেদিন স্বামীর আততায়ী হস্তের নিষ্পেষণে শেষ নিশ্বাসে বলিতেছিল—"প্রভু—" সেদিন কিন্তু সে সকলের মধ্যে সেই প্রাচীন বাউলটাই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বুদ্ধ যেদিন নির্ব্বাণের জন্য, জীবের জন্ম-জরা-মরণ দুঃখ দূর করিবার জন্য বোধিবৃক্ষতলে সমাধি করিলেন, খৃষ্ট যেদিন জগতের কলুষকলঙ্ক নিজের শোণিতে প্রক্ষালিত করিয়া দিবার জন্য যূপকাষ্ঠে উঠিলেন, চৈতন্য যেদিন জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলাইবার জন্য জাহ্নবী তীরে সন্ন্যাস লইলেন, কবির যেদিন কুষ্ট-কুৎসিত জীবের মুখের "কাছে মেরা রাম" বলিয়া প্রেমের আরতি করিলেন, সেদিন সেই পরিচিত বাউলটারই আমরা সাড়া পাইয়াছি। সে যে আমার বড়ই দরদী, সাঁচ্চা ফেলিয়া ঝুটা লইয়া থাকিতে আমায় কোন মতেই দিবে না। আমাদের "ক্ষুধিত পাষাণের চারি ধারে সেই বাউলটাই আবার আপন মনে হাঁকিয়া বেড়াইতেছে—"তফাৎ যাও সব ঝুটা হায়।" বাউল আমাদিগকে যে স্বারাজ্য দিবে, সে যে সেবার স্বারাজ্য; প্রেমের স্বারাজ্য; সেথান 'তুমির' পাশে 'আমি'—'তুমির' দুয়ারে নিত্য বিকাইয়া 'আমি', বলির দুয়ারে যেমন ভগবান্।

প্রেমের স্বারাজ্য বড় কি নির্ব্বাণের স্বারাজ্য বড়—ইহা লইয়া গোলমাল করিয়া কোনও ফল নাই। প্রেমের স্বারাজ্যে জগৎ-সংসারটা 'আমার', জ্ঞানের স্বারাজ্যে জগৎ-সংসারটা "আমি"। প্রথমটিতে তোমার সঙ্গে আমার সেবার সম্বন্ধ, সুতরাং তুমি আমার অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে; দ্বিতীয়টিতে তোমার সঙ্গে আমার ভাবনার সম্বন্ধ, আমি ভাবিতেছি বলিয়াই তুমি রহিয়াছ; সুতরাং তুমি আমার বাহিরে থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তরে। প্রথমটিতে, আমি সকল গণ্ডী কাটিয়া দিয়া আমার প্রেমকে অকাতরে সকলের কাছে বিলাইয়া দিয়াছি, সুতরাং কেহ আমার পর নাই, কোথাও আমার কুণ্ঠা নাই, কোন খানে আমার ব্যাঘাত নাই, নিজেকে ঢালিয়া দিতে কোন কিছুরও অপেক্ষা নাই, ইহাই হইল আমার স্বারাজ্য। জগতে এমন কেহ দীন অকিঞ্চন নাই, যাহাকে আমার ভাণ্ডারের বাহিরে এক পাশে শূন্য রহিয়া যাইতে হইবে। জগতে এত বড় কাহারও ঐশ্বর্য্যের স্পর্দ্ধা নাই যেখানে আমার সাধের বাউলটি হাজির হইতে সঙ্কোচ বোধ করিবে। এ স্বারাজ্য কি কম স্বারাজ্য? ব্রহ্মাণ্ডে এমন কাহারও সাধ্য আছে কি, যে একটা সীমারেখা টানিয়া দিয়া বলিতে পারে—ওহে বাউল! তোমার সেবার অধিকার এই পর্য্যন্তই। কোন পাপী তাহাকে বলিতে পারে—ওগো, আমার কাছে তুমি এসো না, আমাকে তুমি ছুঁয়ো না। কোন পুণ্যশ্লোক তাহাকে বলিবে—ওগো, আমার পুণ্য-মহিমাই আমার কাছে পর্য্যাপ্ত, তোমার সেবার আমার প্রয়োজন নাই? কে আছে এমন রাজা যে, মিথ্যা স্তুতি-গানের কোলাহল উপেক্ষা করিয়া একটিবার প্রাসাদ-বাতায়ন-পথে পথের ঐ বাউলটির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিবে না? পথিক আজ তার সিংহদ্বারে যে দান লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দান বরিয়া লইতে রাজ-বেশের মণি-মুক্তার বন্ধনের ভিতর হইতেও মানবাত্মা যে সাগ্রহ হইয়া উঠে; সে দানের স্থির, স্নিগ্ধ আভার সম্মুখে রাজ-চক্রবর্ত্তীর গৌরব সমুজ্জ্বল বিজয়শ্রী এবং, অসামান্য সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীও যে লজ্জায় ম্লান হইয়া পড়ে! আবার কে আছে অন্ধতমসাচ্ছন্ন কারাগারে এমন উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত চিরবন্দী, যাহার কারাকক্ষের লৌহ অর্গল ঐ বাউলের ডাকে নিঃশব্দে খুলিয়া যাইবে না? যাহার ক্লিষ্ট পীড়িত অঙ্গ হইতে বন্ধনশৃঙ্খল সে ডাকের সম্ভ্রমে খুলিয়া পড়িবে না? আরেবা যে দিন ক্ষত্রিয় রাজকুমারের কারাকক্ষে সঞ্চারিণী শুশ্রূষার মত আসিয়া 'হাতীশালে হাতী ও ঘোঁড়াশালে ঘোঁড়ার', কথা বলিয়াছিল, সেদিনও আমরা আমাদের ঐ বাউলটিকে চিনিতে পারিয়াছিলাম।

দ্বিতীয়টিতেও আমি সকল গণ্ডী কাটিয়া দিয়া সৃষ্টির নিখিল সামগ্রী নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছি। কোথাও আমার কুণ্ঠা নাই, বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই; কারণ সবই যে আমি। আমার ভাবনার ভিতরেই বিশ্বটা বুদ্বুদের মত উঠিয়া মিলাইতেছে। সকল সুখদুঃখকে বুকে করিয়া আমি আনন্দ, সকল আলো আঁধার অন্তরে বহিয়া আমি "ধ্রুবজ্যোতিঃ"; সকল শুভ অশুভকে জড়াইয়া লইয়া আমি শিব; সকল সুধা ও গরল সম্মিলন করিয়া আমি অমৃত; এবং সকল সুন্দর অসুন্দরের সমন্বয় করিয়া লইয়া আমি মধুর। ইহাই আমার স্বারাজ্য। তবেই প্রশ্ন উঠিতেছে, জ্ঞান বড় না প্রেম বড়? শিক্ষায় সেবক করিয়া তুলিবে না বৈরাগী করিয়া তুলিবে? শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বারাজ্য একথা বলিলেই ত পরিষ্কার হইল না—স্বারাজ্য যে দুইরকম হইয়াছে। সেবায় ও প্রেমে কি মানবাত্মার চরিতার্থতা, অথবা নিজের ব্রহ্মত্বের উপলব্ধিতে? প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক, তাহার অপেক্ষায় আমাদের শিক্ষার ও সাধনার সকল আয়োজন অনুষ্ঠান স্থগিত করিয়া রাখার কোনও কারণ নাই। শিক্ষার বা সাধনার একটা মূল অবিচ্ছিন্ন কাণ্ড রহিয়াছে, যাহা হইতে এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া, সেবার ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যের ধর্ম্ম শাখার ন্যায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে গিয়াছে। গোড়ায় অনেক দূর পর্যন্ত জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে, সেবা ও বৈরাগ্যের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ এমন কি আত্মীয়তা রহিয়াছে। পরে হয় ত আলাহিদা ব্যবস্থা, এবং চরমে হয়ত আবার একাত্মতা। যার তুচ্ছ ভোগসুখে অনাসক্তি নাই, সে কি প্রাণ ঢালিয়া পরের সেবা করিতে জানে? আবার পরের জন্য যার প্রাণ টানিতেছে না, ভাই বন্ধুর জন্য, স্ত্রী পুত্রের জন্য, দীন দুঃখীর জন্য, দেশের জন্য যাহার প্রাণে দরদ হইতেছে না, সে কি নিজের ভোগ-সুখে অনাসক্ত, বৈরাগী সহজে হইতে পারে? যে নিজের দিকে তাকাইল না, তার এমন একটা কিছু জুটিয়াছে যার দিকে তার পিছন ফিরিতে তার সাধ্য বা অবকাশ নাই। লোক-সেবা না করিলে, সর্ব্বভূত-হিতে রত না হইলে, বাসনা ত্যাগ হয় না, সুতরাং বৈরাগীরও নিঃসঙ্গ হওয়া সম্ভবে না। এই জন্য জ্ঞানীর পক্ষে, ব্রহ্মমন্দিরে যাত্রীর পক্ষে, ফলাভিসন্ধানশূন্য হইয়া লোক-সেবা করা সাধনার প্রথম ও অপরিত্যাজ্য অঙ্গ। যে ইহা দ্বারা চিত্তের সম্প্রসারণ ও বাসনার সংশোধন করিয়া না লইল ব্রহ্মাত্মতা রূপ স্বারাজ্য-সিদ্ধিতে তাহার অধিকার ও যোগ্যতা সাব্যস্ত হইল না। অতএব যে বলিতেছে যে স্বারাজ্যের জন্য গোড়া হইতেই লোকসঙ্গত্যাগ করিতে হইবে, দেশ ও সমাজকে উপেক্ষা করিতে হইবে, সে অন্ধতমিস্রার সঙ্কীর্ণ গুহারই অন্বেষণ করিতেছে, জ্ঞানের বিপুল ভাস্বর মন্দির তাহার আশার সীমারেখার বাহিরে। পক্ষান্তরে যে বলিতেছে—আমি ভাল বাসিব, সেবা করিব,—জানিয়া শুনিয়া আমার লাভ কি,—সেও বড় কাঁচা কথা বলিতেছে। ইচ্ছা, শক্তি ও জ্ঞান—এই তিনের ত্রিবেণী-সঙ্গমে ডুব দিতে না পারিলে সেবা কখনও নিশ্চিন্ত ও চিরস্থায়ী কল্যাণে ধন্য হয় না। মায়ের মত সন্তানের ভাল করিবার ইচ্ছা কার? কিন্তু ভাল করিবার শক্তি এবং ঠিক ভালর জ্ঞান না থাকিলে মা যে অনর্থ ঘটাইয়া বসেন, তাহার জন্য ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের কাছেও বোধ হয় ক্ষমা নাই। সেবাকে বাস্তব ও সুন্দর করিবার জন্য যেমন পশ্চাতে প্রেম চাই, তেমন তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিবার জন্য জ্ঞান চাই। চলিবার পথ থাকিলেই শুধু চলা হয় না, দেখিয়া শুনিয়া চলিতে পারা চাই, নহিলে চলিতে ইচ্ছা থাকিল মন্দিরে, গিয়া পড়িব কোন পাথারে! যে জগৎ ভালবাসিবে, তার খাঁটী করিয়া আপনাকে ভালবাসা চাই, যে যজ্ঞে তোমাকে 'আমি' চিনিয়া বরণ করিয়া লইব, সে যজ্ঞে যজমান 'আমি' নিজেকে আগে চিনিয়া লইব, অথবা একই চেনার দুইটা দিক্—তুমি ও আমি, যজমান ও আমি, যজমান ও পুরোহিত, হোতা ও দেবতা, পরস্পর পরস্পরকে চেনাইয়া লইতেছে। ইহাই অরণি সংঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি,—ইহাই সাকার পূজায় দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা; একটা প্রদীপ-শিখা প্রবর্ত্তিত হইল এবং উভয়ের রশ্মি সংহত হইয়া আলোকের সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দিল, প্রকাশকে সাহস ও অভয় দিল! ইহাই উপসংহারে সেই মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। যে পুরাণ বৃক্ষের শাখায় আত্মা বিচরণ করিতেছে, তাহারই মূলে ও শিরায় শিরায় যেমন রস চাই, তাহার পাতায় পাতায় তেমনই আলোকের অঞ্জন চাই; নহিলে শুকাইয়া মরিয়া স্থাণু হইয়া রহিবে। রস—প্রেম বা আনন্দ, আলোক—অনুভূতি বা জ্ঞান। যে হিরন্ময় পাত্রে সত্যের মুখ অপিহিত রহিয়াছে তাহার উন্মোচন করিলে দেখিব পক্ষিশাবকের মত মানবাত্মা

একটা অমৃতের মাঝে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহার দুইটি পক্ষপুট—একটি জানা, অপরটি চাওয়া; একটি পাওয়া, অপরটি দেওয়া; একটি 'আমি,' অপরটি 'তুমি'। শিক্ষা, সাধনা আত্মাকে স্বারাজ্য ভূমিতে তুলিতে গিয়া এ দুয়ের কাহাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া কাহাকে বজায় রাখিবে? অতএব জ্ঞানের স্বারাজ্য ও প্রেমের স্বারাজ্য এ দুয়ের মধ্যে গোড়া পত্তনের সময় হইতেই একটা খাত কাটিয়া রাখা চলে না। জড় লইয়া যদি গড়িয়া চলিতে হইত, তবে পত্তনের সময়েই আমাকে শেষ ভাবিয়া লইতে হইত; কিন্তু একটা সজীব পদার্থ যেখানে বাড়িয়া উঠিতেছে, সেখানে মূল কাণ্ডটা অবিভক্ত থাকিল বলিয়া, শাখাপ্রশাখা ফল পুষ্পের ভবিষ্যতের জন্য আমার আশ্বস্ত হওয়া ছাড়া চিন্তিত হওয়ার কোনই কারণ নাই। পরিণামে যেখানে বিভক্ত হওয়া স্বাভাবিক, গোড়ায় সেখানে অবিভক্ত সম্মিলিত ও সাপেক্ষ থাকাটাও স্বাভাবিক হইতে পারে। যে সেবা চায় সে জ্ঞানের, এবং যে জ্ঞান চায় সে সেবার মুখ দর্শন করিবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞা গোড়াতে অসঙ্গত ও মারাত্মক। "এই বাহ্য আগে কহ আর" শুধু এই কথাই প্রভু কহেন নাই; "এই হয় আগে কেহ আর" একথাও প্রভু কহিয়াছেন।

বৈরাগীর ধর্ম্ম শিখাইতে গিয়া ভারতবর্ষ ঠকিয়া গেল—এ কথা আংশিক ভাবেই সত্য। প্রথমতঃ কালের মাপ-কাটিটা একটু বড় করিয়া লইলে, কার হার কার জিত, তাহা অনেক সময় বলা শক্ত; দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ যদি শেষ পর্য্যন্ত ঠকিয়াই গিয়া থাকে, বৈরাগীর ধর্ম যে তার জন্য কতটা দায়ী, তাহা দেখাইয়া দেওয়াও সহজ নহে। যদি কতকপরিমাণেও দায়ী হয়, তবে তাহা প্রাচীন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য ভাঙ্গিয়া দিয়া সমাজাত্মার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে বলিয়াই। আগে চতুরাশ্রমের ভিতর কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের, সমষ্টির ও ব্যষ্টির যে সমন্বয়, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বারাজ্যের পত্তনভূমি; সে ব্যবস্থায়, সেবা ও বৈরাগ্যের যে অবিভক্ত মূলকাণ্ডের কথা বলিতেছিলাম, তাহা বেশই দৃঢ়, দীর্ঘ ও পরিপুষ্ট। এ সমন্বয়ের পরবর্ত্তী বেদ হইতেছে গীতা। নানা ভাব-বিপ্লব ও কর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্য হইতে যজ্ঞবরাহরূপে এই বেদের সমুদ্ধার ভগবান করিয়া আসিতেছেন বার বার। প্রেম এই বেদের মন্ত্র, জ্ঞান এই বেদের ব্রাহ্মণ; 'তুমি' এই বেদের দেবতা, 'আমি' এই বেদের ঋষি, সেবা এই বেদের ছন্দঃ; ত্যাগ এই বেদের ঋক্, প্রেম এই বেদের সাম এবং জীবন এই বেদের যজুঃ। হে ঋষি সনাতনি! তোমার বরেণ্য ভর্গঃ আমাদের পৃথিবীর অশান্ত ধী বৃত্তিগুলিকে আবার শুভবাসনায় বিনিয়োগ করুন, সে তোমার প্রসাদ পাইবার আশাতেই সম্প্রতি যে রক্তগঙ্গায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে। তাহার আশা কি সফল হইবে? ভারতের মহাকাল মন্দিরের পূজারি ভারতের অন্তরাত্মা; তাহার নিদ্রালস নেত্রে আবার তোমার জ্ঞানাঞ্জন বিলেপিত হউক; সে উঠিয়া মন্দির দ্বার খুলিয়া দেখুক, আজ নিখিল বিশ্বের অন্তস্তলে তাহারই মন্দিরাভিমুখে তীর্থযাত্রার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; বিশ্বমানব যে দিন শ্রদ্ধার নৈবেদ্য মাথায় বহিয়া আনিয়া তাহার মন্দিরের চারিধারে ঘেরিয়া দাঁড়াইবে, সে দিন, হে প্রাচীন পূজারি! তুমি যেন সজাগ থাকিও, তোমার সেই সিন্ধু-স্বরস্বতী-স্তন্য-পানবাহিত সামগানে অভ্যস্ত কণ্ঠস্বর সম্পদে ও ছন্দোবৈভবে যেন অকুণ্ঠিত থাকে; তোমার দেবতার প্রসাদ-নির্ম্মাল্যে বিশ্বমানবের নৈবেদ্য যেন সার্থক হয়; তোমার ধীরোদাত্ত আশীর্ব্বাণী যেন বিশ্বমানবের প্রাণে অভয় ও আশ্বাস আনিয়া দেয়। তোমার মন্দিরাভ্যন্তরের এক কোণে যে বর্ত্তিকাটি তুমি এতকাল ধরিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছ, তাহাই তোমার আশার বর্ত্তিকা, তাহাই তোমার প্রাচীন স্বারাজ্যের অবশেষ এবং ভাবী স্বারাজ্যের ভরসা। সাগ্নিকের অগ্নির মত তাহা তোমার নিরলস ও অকুণ্ঠিত ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। তোমার ঐ মন্দিরের আলো যদি নিবিয়াই যায়, তবে হে মন্দভাগ্য পুরোহিত! রাষ্ট্রীয় স্বারাজ্যের মিথ্যা গৌরব ও বাহ্য সম্পদের তুচ্ছ চাকচিক্য তোমার অন্ধকারকে স্বচ্ছ করিয়া দিবে না। তোমার প্রকৃত স্বারাজ্যের বিনিময়ে যদি তুমি শুধু রাষ্ট্রীয় স্বারাজ্য ও বাহ্যসম্পদ পাও, তবে তাহাতে স্বারাজ্য ও সম্পদকে উপহাস করা হইবে মাত্র। কারণ সে স্বারাজ্যে সাত্মতা নাই এবং সে সম্পদ শ্রেয়ঃ পদবীকে আশ্রয় করে না।

শিক্ষার লক্ষণ এক কথায় যেমন স্বারাজ্য, স্বারাজ্যের লক্ষণ এক কথায় তেমনই শক্তি। অশক্তের স্বারাজ্য হয় না। বলহীনের দ্বারা আত্মা লভ্য হয়েন না। প্রেমের

স্বারাজ্য ও জ্ঞানের স্বারাজ্য, এ দুইটারই গোড়ার কথা শক্তি। বালকের রোদনই বল, কিন্তু বল ত বটে। সে কাঁদিয়া জিতিয়া যাইতেছে, সে জিতিয়াই যাইতেছে, হারিয়া যাইতেছে না। প্রেমের জয়ও জয়। শুধু ইহাই নহে, প্রেমের জয়ই জয়। যে ভালবাসিল কিন্তু জিতিতে পারিল না, তার এখনও ভালবাসা হয় নাই। সে নিজের তুচ্ছ অভিমান ও স্বার্থের কাছে এখনও বিজিত হইয়াই আছে। অহেতুক প্রেমের, রাগাত্মিকা ভক্তির কোথাও কোন অবস্থাতেই পরাভব নাই। কোনও একজন ধনুর্দ্ধরের ভুবনবিজয়ী বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু চালাকি করিতে গিয়া হর-কোপানলে তাহাকে ভস্মত্ব পাইতে হইয়াছিল; এইখানে তাহার পরাভব। কিন্তু যে প্রেমের কথা আমরা ভাবিতেছি, তাহার পূজায় মহাদেবের মহাসমাধি ত ভাঙ্গিয়াছিলই, অধিকন্তু যে দিন সেই প্রেমের শব-প্রতিমা খানিকে স্কন্ধে করিয়া 'পাগল শিবপ্রমথেশ' এই মহা বিশ্বের পরতে পরতে কাঁদিয়া ফুকরাইয়া বেড়াইতেছিলেন, সেদিন স্বয়ং চক্রীর সুদর্শনচক্র সতীকলেবর জগতের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া সতীনাথের শোকভার কথঞ্চিত লঘু করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু জগৎটাকে এমন একটা মহাপীঠ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে যে আমাদের মত অপ্রেমিক অভাজনকে এই পুণ্যক্ষেত্রে অতি সঙ্কোচে পা বাড়াইয়া চলিতে হয়—পাছে কোনও ভক্তের জবাপুষ্পাঞ্জলি আমাদের অসতর্ক পদস্পর্শে অপমানিত হইয়া পড়ে। অতএব মৃত্যুতে প্রেমের পরাভব নাই। আলেকজেন্দারের, সিজারের অথবা নেপোলিয়নের বিজয়-অক্ষৌহিনী যাহা গড়িতে পারিয়াছিল তাহা ত ভাঙ্গিয়াই ছিল; কিন্তু বুদ্ধের, খৃষ্টের, অথবা গৌরাঙ্গের প্রেম যাহা পড়িয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার ভিত্তি মানবত্মার ভিতর সুস্থির রহিয়াছে, তাহার সাম্রাজ্য, আস্তীর্ণ করিয়া রাখিতে পৃথিবী বিপুলতরা হইলেও চলিত এবং তাহার বিজয়নিশান বহন করিয়া লইতে কালবত্ম আরও নিরবধি হইলেও মন্দ হইত না। দন্তে তৃণ করিয়া তৃণাদপি সুনীচ হইয়া প্রেমিক রাজরাজেশ্বরের দুয়ারে ভিক্ষার জন্য আসিয়া দাঁড়াইল, রাজরাজেশ্বর তাহাকে তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারটা ঢালিয়া দিয়া পার পাইবেন না; তাঁর নিজেকে তার কাছে বাঁধা দিতে হইবে যে। যে ঐশ্বর্য্য চায় তাকে ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিলেই সে ফিরিয়া যায়; কিন্তু যে মাধুর্য্য চায়, আমাকে চায়, তার কাছে ফাঁকি দেওয়া চলিবে না, আমাকেই তার কাছে ধরা দিতে হইবে এবং সে আমার কাছ হইতে ফিরিবার নামটি করিবে না। যে ঐশ্বর্য্যের ভিখারী, সে ঐশ্বর্য্য পাইয়া আমার গোলাম হইল, আর যে মাধুর্য্যের ভিখারী তার কাছে ভিক্ষা দিতে গিয়া, আমিই তার গোলাম হইয়া বসিলাম। যে আসিয়া ধন-দৌলত চাহিয়াছে, তাহাকে আমার খাজাঞ্চি খানায় পাঠাইয়া দিয়া আমি খালাস, কিন্তু যে আমাকেই দেখিতে আসিয়াছিল, তার জন্য যে এই বর্ষার নিরালা বাসরে প্রাণের ফাঁকাটার ভিতর হইতে থাকিয়া থাকিয়া একটা করুণ-সুর উঠে—"মাহ ভাদর, ঘোর বাদর, শূন্য মন্দির মোর।" অতএব প্রেমের স্বারাজ্যের দাপট্ বড় কম নয়। জ্ঞানের স্বারাজ্যের কথা আর না হয় নাই বলিলাম। কথাটা দাঁড়াইল, শক্তি। যে সুপর্ণ-পক্ষীটীর খবর আমরা ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি, তার জ্ঞান ও প্রেম, এই দুইটা পক্ষপুট; এবং সেই পক্ষপুটের বিস্তার ও সঞ্চালন যেটাকে পাইয়া হয়, তাহাই হইল শক্তি। শক্তি নহিলে পক্ষপুটের ব্যবহারও নাই, প্রয়োজনও নাই।

শক্তির প্রয়োগ কোথায় বা কাহার উপরে? মানুষের একটা ভিতর একটা বাহির। বাহিরের যেমন নানান্ থাক্, নানান্ বৈচিত্র্য, ভিতরেও তেমন। ভিতরে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, হৃদয়, আত্মা; ইহাদের নানা সংস্কার, নানা বৃত্তি, নানা চেষ্টা। বাহিরে শরীর, সমাজ, প্রাণীজগৎ ও জড় প্রকৃতি। এই সমস্তগুলি জড়াইয়া লইয়া, এবং এইগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া, যেটা রহিয়াছে সেইটাই পুরা মানুষ। প্রেমেই হউক, আর জ্ঞানেই হউক, মানুষকে নিজের এই ষোল আনা বুঝিয়া লইয়া দখল করিতে হইবে। এই দখল সাব্যস্ত করিতে শক্তি চাই; এবং দখল সাব্যস্ত হইবার নামই স্বারাজ্য। কেহ জগতের দ্বারে দ্বারে নিজেকে ধরা দিয়া জগৎকে স্বীকার করিয়া যাইয়াছে; কেহ বা জগৎটা নিজের ধ্যানের মধ্যেই টানিয়া লইয়া তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার ভিতরে বা বাহিরে কিছু বা কেহ, অস্বীকৃত হইয়া, পর হইয়া থাকিল, ততক্ষণ আমি একটা চৌহদ্দীর ভিতর বাঁধা পড়িয়া থাকিলাম—অল্প, কৃপণ ও কুণ্ঠিতই রহিয়া গেলাম। এ অবস্থায় আমার ছুটি নাই।

নিজের ভিতর শক্তি জাগাইব কি উপায়ে? ক্ষুদ্র

আমিত্বের বোঝাটুকু বহিতেই আমার শক্তিটুকু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আমি, জ্ঞানের সম্পর্কেই হউক, আর প্রেমের সম্পর্কেই হউক, এতবড় জগৎটাকে আবাহন করিয়া আনিয়া আমার অন্তরাত্মার সিংহাসনে বসাইব কোন্ সাহসে? এত অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে বরণ করিয়া লইয়া যে দিন পাদ্যার্ঘ্য যোগাইতে হইবে সেদিন কি আমার ভৃঙ্গার নিত্য পূর্ণ করিয়া রাখিবার জন্ম একটি একটি করিয়া বাহিরের শিশির কুড়াইয়া আনিব? অথবা আমারই ভিতরে এমন কোন রুদ্ধ উৎস উপেক্ষিত অনাবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়া আছে, যেটিকে কোন উপায়ে একবার বহাইয়া লইতে পারিলে, আমার ভৃঙ্গার ত ভরিবেই, অধিকন্তু তার স্নিগ্ধ অনাবিল প্রবাহ আমার বিশ্বনারায়ণের পাদমূলে স্বচ্ছন্দে গড়াইয়া আসিয়া ধন্য হইবে? আমি ছুটিব তবে কোন দিকে? কোথায় আমার পাদ্যার্ঘ্য, কোথায় আমার নৈবেদ্য, কোথায় আচমনীয় কোথায় দক্ষিণা? বাহির হইতে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে অথবা নিজেরই অন্দরের ঠাকুরঘরে আমার কোন আপন জন পূজার সব আয়োজন প্রস্তুত রাখিয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, কখন আমি স্নান করিয়া শুচি হইয়া আসিয়া তার দুয়ারে করাঘাত করিব? ছুটিয়া বেড়ান পশ্চিমের হাল ব্যবস্থা, আর 'হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব'দেওয়া আমাদের সাবেক ঘরওয়া ব্যবস্থা। ভাল কোন্‌টা, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কি? মহাদেব যে দিন কৈলাস পর্ব্বতে মহাধ্যানে বসিয়াছেন, আর নন্দীর শাসনে মুখরা চঞ্চলা প্রকৃতি যেন চিত্রার্পিতবৎ হইয়া রহিয়াছে, সে দিন আমরা দেখিতেছি জ্ঞানের স্বারাজ্য। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।" এ ক্ষেত্রের বাহিরে ত ছুটাছুটি নাই-ই, বরং সমস্ত বাহিরটা ভিতরের শাসনে আত্মসমর্পন করিয়া সুস্থির রহিয়াছে। আর যে গৌরাঙ্গ 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু' রাখিয়া—'নদে ভাসাইয়া' অযাচকে প্রেম বিলাইয়া ফিরিতেছিলেন, সে দিন তাঁর বাহিরে ছুটাছুটি ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শিশির কুড়াইয়া ভাণ্ড ভরিবার ছুটাছুটি নহে, সে যে জলভারাবনত আষাঢ়ের নব মেঘের পৃথিবীর সন্তপ্ত ধূলিরাশির মাঝে নিজেকে ঢালিয়া দিবার পুণ্যাভিসার। সে যে আসলে আহরণ নয় বিতরণ, বিতরণের জন্যই আহরণের ভঙ্গী।

স্বারাজ্যের কথা শক্তির কথা বলিয়া সকল প্রকার ক্লৈব্যকে আমাদের পরিহার করিতে হইবে—ভাবনায় ক্লৈব্য বিশেষতঃ! যাঁহারা শিক্ষায়, দীক্ষায় অনুষ্ঠানে স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার কথা বলেন, দেশের ও জগতের হাওয়া বুঝিয়া তাহারই অনুবর্ত্তন করার পরামর্শ দেন, আমি যেটি চাহিতেছি বিনাওজরে আমার মুখের কাছে তাহাই যোগাইয়া দিতে চাহেন, তাঁদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভাসিতে চাহিলে ভাসিয়া যাওয়াই হইবে, রহিয়া বসিয়া যাওয়া হইবে না; যাহারা ভাসিয়া চলিল, প্রকৃতির বিচার তাদের জন্য এমন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যেখানকার নীরব, বিপুল অন্ধকারে গণনাতীত দুর্ব্বল, ভরসাহীন, বিশ্বাসহীন, আদর্শহীন জাতি নিজেদের সকল চিহ্ন ও সকল কাহিনী হারাইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে মানুষকে সত্য, শিব ও সুন্দর জিনিষটাই চাহিতে শেখান; সকল সাধনার লক্ষ্য হইবে সেই বাঞ্ছিত পদার্থটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপে মানুষকে মিলাইয়া দেওয়া। যেটী চাহিতেছি সেটাকে পাইবার শক্তি দেওয়াই দেওয়া নহে; চাহিবার মত জিনিষকে চাহিবার শক্তি দেওয়াও দেওয়া।

কাজ করিবার জন্য একপ্রকার বড় কথা আছে, আবার কাজে ওজর করিবার জন্য আর এক রকমও আছে। যে বড় কথা পাড়িয়া কাজে ঢিল দিল বা কাজ হইতে সরিয়া পড়িল, তার দুর্ব্বলতার বরং ক্ষমা আছে; কিন্তু ভণ্ডামির ত ক্ষমা নাই। স্বারাজ্যের শেষ ভূমিতে আমরা সকলে হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ করি, আর আগু পিছু হইয়াই প্রবেশ করি, দীর্ঘযাত্রার পথে যে আমরা সকলে সমান তালে হাঁটিতেছি! বিশ্বমানবের পাঠশালায় কাহারও হাতে ব্যাপ্তিপঞ্চক দেখিলে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কেহই স্বারাজ্য পায় নাই, সুতরাং সকলেই সমবয়; কেহই নিজের বর্ত্তমান ব্যাপারে তুষ্ট নয়, অতএব সকলেরই বর্ত্তমান অবস্থা তুল্য; এইরূপ বড় কথায় যে ছোটবড় সকলকে টানিয়া সমান গোত্র করিয়া দিবে, তার ঠিকে ভুল হয়ত হইতে পারে, কিন্তু একথা পাড়িয়া যদি সে কেবল ছোটকেই একথা মিথ্যাভিমানেই মগ্ন করিয়া রাখিতে চায়, সত্যসত্যই বড়র কাছে আসিবার চেষ্টা হইতে ফিরাইয়া দিতে চায়, তবে তার সে কপটাচারের ত ক্ষমা নাই।

তপস্যা দ্বারা অমৃতের ভজনা করা হয়, মৃত্যুর নহে। স্বারাজ্যসিদ্ধিই ধ্যানের ফল, নৈষ্কর্ম্য ও দীনতা নহে।

সকল অসমঞ্জকে সামঞ্জস্য দিবার জন্য, সকল খণ্ডিতকে সমগ্র ও পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য, সকল পরবশকে আত্মবশ হওয়াইবার জন্যই তপস্যা ও ধ্যান। বাহিরের সকল উদ্যম ও অনুষ্ঠান আমাদিগকে সচল করিয়া রাখিতেছে, কিন্তু এ সচলতা কল্যাণের অভিমুখে হইবে না, অমৃতের অন্বেষণে হইবে না, প্রতিষ্ঠার জন্যই হইবে না, যদি ইহার প্রেরণা ও উপদেশ আমাদের ভিতরকার অচলায়তনের বাস্তু দেবতাটির কাছ হইতে না আসে। আমি চলিতেছি, কিন্তু আমার দৃষ্টি যদি লক্ষ্যে স্থির না রহিল, আমার পদবিক্ষেপের নিম্নে পথ যদি ব্যবস্থিত ও সুস্থির হইয়া না থাকিল, তবে আমার চলার পরিণাম কোথায়, সার্থকতা কিসে? সমরক্ষেত্রে একটা বিপুল বাহিনী অভিযান করিয়াছে, কিন্তু তাহার বিপুলতা, সাহস ও শৌর্য্য তাহাকে ধ্বংস হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারিবে না, যদি তার সকল কোলাহল ও চাঞ্চল্য হইতে দূরে, সেনাপতি তার পরিচালনার সব সূত্রগুলি, নিজের ধ্যানের মধ্যে একত্র ও সম্বদ্ধ করিয়া না লন। আমাদের পৃথিবীর ও গ্রহউপগ্রহগুলির মহাশূন্যে যে অভিযান তাহাতে শৃঙ্খলা ও অভয় থাকিত না, যদি সবিতার কেন্দ্রাকর্ষণ তাহাদের জন্য একটা পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দিত। সকল সফলতার সিদ্ধি ও অভয় দিবার জন্য এমন কিছুর উপদেশ ও পরিচালনা আবশ্যক, যেটি নিজে ধীর ও নির্ভয়। সেই অচল ও অভয়ের ভূমিতে দাঁড়াইবার জন্য যেটি চাই—তাহাই তপস্যা—তাহাই ধ্যান। অমৃতের পুত্রই অমৃত লাভ করিবে। সচল ও অচলের মধ্যে, কর্ম্ম ও ভাবনার মধ্যে, যোগ ও ক্ষেমের ভিতরে, মৃত্যু ও অমৃতত্বের মাঝখানে যেখানে মিল হইয়া সন্ধিপত্রে সাক্ষর হইয়া গেল, সেইটাই স্বারাজ্য ভূমি, তাহাই শিক্ষার সাফল্য। তপস্যায় বাড়াবাড়ি করিয়া কেহ কখনও ঠকে নাই—আমাদের ভারতবর্ষও নহে। আমরা ইতিহাস ভুল শিখিয়াছি।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

সাঁঝের দীপ

তোর ঘরে মা দীপ হ'ল কি জ্বালা?
সন্ধ্যা নামে ঐ যে বনের পাশে
অস্ত রবির রক্ত আবির মাখি'
ধেনুরা সব ঐ যে ফিরে আসে।
তোর ছেলে মা পথের খেলা ছাড়ি'
ধূলি-দেহ সজল আঁখি দুটি
খোলা পথের সকল মায়া কাড়ি'
তোর কোলে মা ঐ যে আসে ছুটি'।

দীপ হ'ল কি হ'ল মা তোর জ্বালা?
আকাশ ঘিরি ঘন তারার মালা
আঁধার সাথে ঐ যে ধীরে ফোটে
ছেলে মা তোর ঐ যে ঘরে ছোটে।

তোর ঘরে মা দীপ হ'ল কি জ্বালা?
আঁধার ঘেরা তরুর মূলে মূলে
ঝিঁঝির দলে তুমুল মুখরতা
বিজন হ'ল নদীর কূলে কূলে;
পাখীরা সব উড়ে গেল কুলায়
কণ্ঠে নিয়ে তাদের কলস্বর
খেলার পথে হঠাৎ—মনে-পড়া
তোর ছেলে মা ঐ যে ফেরে ঘর।

দীপ হ'ল কি হ'ল মা তোর জ্বালা?
সাজান' কি হ'ল বরণ-ডালা?
মন-ভোলা মা ঐ যে ছেলে তোর
ছুটে আসে দেখে আঁধার ঘোর।

তোর ঘরে মা দীপ হ'ল কি জ্বালা?
বনের পথে মৌন সকল পাখী
সারা দিনের আবোল-তাবোল বকা'
নদীর জলে আঁধার এলো ঢাকি'।

আঁধার এলো দেখে পথের 'পরে
ধূলো খেলা রইল পড়ে' কোথা—
তোর ছেলে মা ঐ যে ছুটে আসে
আকুল চোখে ব্যাকুল স্নেহ-ব্যথা।

দীপ হ'ল কি হ'ল মা তোর আলা?
দিগন্তে মা নিভ্‌ল দিনের আলা?
এখন মা তোর ছোট্ট আঁচলখানি
ছেলের তরে জানাক্ স্নেহ-বাণী।

কালো আঁধার যখন করে' কালো
তপ্ত ধরার খিন্ন-করা বুক
কেমন উজল হ'য়ে ওঠে ওমা
তোর ঘরে ঐ ছোট্ট পিদীম টুক্
সকল জগত অন্ধ হ'য়ে আসে
তোর ঘরে মা একটী হিয়া জাগে
প্রতিদিনের ক্লান্ত অবসরে
বিধির চির স্নেহ-আশীষ মাগে।

দীপ হ'ল কি হ'ল মা তোর আলা?
আকাশ ঘেরা ফোটা তারার মালা
তার চেয়ে মা ঐ যে পিদীম টুক্
কেমন আমার ভরিয়ে দে'খায় বুক!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সত্য-পালন

(১)

রসিকবাবু কাছারী হইতে ফিরিয়াই দেখিলেন, বাহিরে আফিস ঘরে টেবিলের উপরে একখানা চিঠি রহিয়াছে—খামের উপরে লালকালিতে মোটা অক্ষরে নিম্নরেখ urgent বা 'জরুরী' লেখা। লেখাটা তাঁহারই এক বহুদিনের প্রিয়বন্ধু দিনেশের লেখার মত। ধরাচুড়া পরা অবস্থাতেই টেবিলের কাছে বসিয়া রসিকবাবু খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, পত্র বাহির করিয়া পড়িলেন,—

প্রিয় রসিক,

অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় না,—আশাকরি কুশলেই আছ। আমি বড় রুগ্ন—মৃত্যু আসন্ন। যাইবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা হইলে বড় সুখী হইতাম। সময় করিয়া একবার এখানে আসিবে কি? ইতি—

তোমারই—'দিনেশ'।

বড় গভীর একটি নিশ্বাস রসিক বাবুর বুক ভরিয়া উঠিল। পত্রখানি একহাতে ধরিয়া অপর হাতের উপরে মুখখানি রাখিয়া কেমন গভীর আনমনা ভাবে কতক্ষণ তিনি উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দিনেশের সঙ্গে কলিকাতায় এক মেসে থাকিয়া এক কলেজে তিনি পড়িয়াছেন। দুইজনে বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তখন জন্মে। দিনেশ ছেলে খুব ভালছিল, প্রথম বিভাগে সব পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে,—তিনি নিজে তৃতীয় বিভাগের উপরে কখনও উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু দরিদ্রের সন্তান দিনেশ সহসা পিতৃহীন হইয়া কোনও মতে বি এ পাশ করিয়া মাষ্টারী করিতে গেল,—আর ধনীর সন্তান তিনি কয়েকবার ফেলটেল হইয়াও শেষে এম এ বি এল পাশ করিয়া পিতার সহযোগিত্বে বড় এক সহরে উকিল হইয়া বসিলেন। পিতার পসারে তাঁহার বেশ পসার হইয়াও উঠিল। তারপর দিনেশের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হইয়াছে,—চিঠি পত্রের বিনিময়ও কখনও কখনও হইত,—খবর রাখিতেন দিনেশ বড় অসচ্ছল অবস্থায় আছে, দেনা করিয়া দুটি ছেলেকে কলেজে পড়াইত, ছেলে দুটিই মারা যাওয়ায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অতি সাধুচরিত্র এবং প্রতিভাবান্ দিনেশ কঠোর দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আজ এমন দুঃস্থ অবস্থায় দেহপাত করিতে বসিয়াছে। আর তিনি—তার তুলনায় কত হীন, কিন্তু তবু সম্পদে ও পদ-গৌরবে দশ জনের একজন হইয়া কত সুখে ও সম্মানে

আছেন। কেন এ অবিচার? তাঁহার চক্ষে জল আসিল। বছর খানেক হইল তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে,—সংসারে অসুবিধাও তার জন্ত কিছু ভোগ করিতে হইতেছে,—কিন্তু মুখের বাহির করিলেই আজ এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেও সদ্বংশজাতা সুন্দরী যুবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া অনায়াসে তিনি সকল অসুবিধা দূর করিয়া নূতন দাম্পত্য সুখভোগে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। সুস্থ সবল ও কান্তিমান্ দেহে তিনি এখনও প্রায় যুবাপুরুষের ন্যায়। আর দিনেশ—স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, রূপে—কিছুতেই ত তাঁহার অপেক্ষা হীনতর সে ছিল না। দুর্ভাগ্যের পেষণে অকালে জীর্ণ হইয়া সে আজ চলিয়া যাইতেছে। হায়, কেন এ পার্থক্য! ন্যায়-দণ্ডধারী বিধাতার রাজ্যে কেন এ অবিচারই বা কেন? তিনি এত সুখী, এমন ভাগ্যধর,—আর সেই দিনেশ তার কেন আজ এই দুর্গতি, পরিবারকে দুটি অন্ন দিবার জন্য জীর্ণদেহে তার ক্ষীণ প্রাণটুকু পর্য্যন্ত কেন সে ধরিয়া রাখিতে আজ পারিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে মনটা বড় ভার হইয়া উঠিল,—প্রাণটা প্রিয় বন্ধুর দুঃখে দারুণ ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিল।

সহসা অন্তঃপুরে জননীর কণ্ঠস্বর কাণে আসিল,—চাকরকে ডাকিয়া তিনি বলিতেছিলেন, "ওরে দেখ্ ত বিন্দে, রসিক এল সাড়া পেলাম—তা ভিতরে কেন আস্‌ছে না? হাত মুখ ধোবে, জলটল খাবে, কি ক'চ্ছে ব'সে?"

জননীর কণ্ঠস্বরে রসিকবাবুর চমক ভাঙ্গিল, আর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

মাতা জিজ্ঞাসিলেন, "কতক্ষণ এসেছিস্, কাপড়চোপড় না ছেড়ে বাইরে বসেছিলি যে?"

চোগা চাপকান্ খুলিতে খুলিতে রসিকবাবু কহিলেন, "একখানা চিঠি এসেছে—তাই পড়্‌ছিলাম মা।"

"কার চিঠি?"

"দীনেশ লিখেছে—তার খুব ব্যারাম—"

"ওমা, কি ব্যারাম! খারাপ নয় ত কিছু?"

"খুলে কিছু লেখেনি—তবে খুব বেশী কাহিল—বোধ হয় বাঁচবে না।"

"ওমা! কি সর্ব্বনাশ! তার পর?"

"আমাকে একবার যেতে লিখেছে।"

"তা হ'লে ত যেতেই হয়,—তা কবে যাবি?"

"দেরী করা আর উচিত নয়,—কালই বিকেলে যাব।"

"তার মেয়েটারও বিয়ে হয় নি বুঝি?"

"নাঃ!"

রসিকবাবু হাত মুখ ধুইয়া আসিলেন। মাতা খাবারের রেকাবখানি সম্মুখে দিয়া কাছে বসিলেন। কতক্ষণ এ কথা ও কথার পর কহিলেন, "আমি ত আর পারিনে রসিক। তোর ঘরসংসার বজায় থাকে, এর একটা ব্যবস্থা যা হয় কর। বিনু সরু এদ্দিন ছিল, তারাও পরের ঘরে গেল—"

রসিকবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "তা আর ভেবে কি ক'র্‌বে মা? মেয়ে ত বড় হ'লে পরের হ'য়ে পরের ঘরেই যায়।"

"তা যায়। তাই ত পরের মেয়ে এনে নিজের ঘর-সংসার ঠিক রাখ্‌তে হয়। নইলে কি কারও চলে?"

"বড় ছেলে কেউ ঘরে নেই; পরের মেয়ে কি দিয়ে আন্‌ব।"

"তোর না আছে, আমার বড় ছেলে তুই ত আছিস্! তুই একটি মেয়ে এনে এখন আমায় দে না?"

রসিকবাবু উত্তর করিলেন, "সে ত সময় যখন ছিল, এনে দিয়েছিলামই। তা কপালে তোমার টিঁক্‌ল না, কি ক'র্‌বে?"

"সময় কি এখনই নেই রে রসিক? তোর আর বয়স কি? তোর চাইতেও কত বেশী বয়সে যে লোকে বিয়ে করে।"

"বয়স কত কম হয় নি মা।—এ বয়সের মেয়ে যেখানে যত আছে, সবই মেয়ের মত। তাদের কাউকে আনা যেত যদি ছেলে থাক্‌ত—তা যে নেই মা।"

মাতা কহিলেন, "দেখ বাবা, ওসব পাগলামো কথা এখন ছেড়ে দে। বুড়ী ধাড়ী ত আর এদেশে কেউ বিয়ে ক'ত্তে পারে না। কাজেই সংসার যার না চলে, ছেলে না থাক্‌লে নিজেরই ওরই একটা মেয়ে দেখে ঘরে আন্‌তে হয়। সবই তোর বাড়াবাড়ির বাছা বিয়ে ক'রে আন্‌লে কেউ নাকি আবার তাকে মেয়ের মত দেখে থাকে?"

"কি ক'রে যে না দেখে পারে তা ত ভেবে পাইনে।"—

মাতা কহিলেন, "যে ক'রেই হ'ক দেখে না ত কেউ। —ষাট বছুরে বুড়োও ত তাদের বিয়ে ক'রে এনে ঘর করে?"

রসিক বাবুর একটু হাসি পাইল,—কহিলেন, "ষাট্ বছর বয়স যদি হ'ত, তা হ'লেও বরং দেখ্তাম,—নাত্নীর সঙ্গে তবু বৌ বৌ খেলান যায়।"

মাতাও ছি ছি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—শেষে কহিলেন, "দেখ্, কথা কাটাকাটি যত ইচ্ছা কর্।—কিন্তু এটাও বুঝ্তে হয়, সংসার যে চলে না।—যেটের ছেলেপিলে কটি রয়েছে—লোকজন পাঁচজন র'য়েছে—যেমন তেমন একটা সংসার ত তোর নয়। আমি বুড়ো মানুষ, এত কি পারি? আর দিনই বা কটা আছে? চোক বুজ্লে শেষে উপায় কি হবে? আর কিছু না ভাবিস্, বাছাদের ভালও ত একবার ভাব্তে হয়—"

"সেটা খুবই ভাব্ছি মা। সৎমার হাতে ভালর চাইতে মন্দই বেশী হ'তে পারে; দুষ্টু গরুর চাইতে শূন্য গোয়ালও ভাল।"

"সৎমা কি সবই মন্দ হয় বাবা? আর কিছু না হ'ক, সংসারটা ত গুছিয়ে রাখতে পারবে? বাপের যদি দৃষ্টি থাকে, সৎমা কি মন্দ ক'র্তে পারে? পুরুষ যদি পুরুষের মত হয়, মেয়ে মানুষ কখনও বিগ্ড়োতে পারে না।"

রসিকবাবু কহিলেন, "এ তর্কে কোনও লাভ নেই মা। হার জিৎ কারও হবে না। দুদিকেই ব'লবার ঢের কথা আছে।"

মাতা উত্তর করিলেন, "ওরে, তর্ক ক'রে কি তোকে হারাতে চাই বাছা? নিজের ঘরসংসার চ'ল্ছে কি না, তাকি আর তর্ক ক'রে কাউকে বোঝাতে হয়!"

"চ'লে ত যাচ্ছে এক রকম। এই ঢের।"

"যাচ্ছে ত আমি বুড়ো মানুষ মুখে রক্ত উঠে মচ্চি তাই। তা পষ্ট ব'ল্ছি, বাবা, আমি আর পারি নে। দিন ঘনিয়ে এল, পুজো আহ্নিক পরকালের ভাবনা সব গোল্লায় গেল। শরীরেও আর কুলোয় না। তা আমি ব'ল্ছি, ও মাসে যতীনের মা বাবা ওরা সব কাশী যাবে। আমিও তাদের সঙ্গে চ'লে যাব। তারপর তোর ছেলেপিলে—তোর ঘর সংসার—যা জানিস্ ক'র্বি।"

রসিকবাবু আবার হাসিয়া কহিলেন, "অত চটলে কেন মা? আজই ত আর বিয়ে হ'চ্ছে না। দিনেশকে দেখ্তে যাচ্ছি, ফিরে আসি, কদিন একটু ভাবি, দেখা যাক্ সংসারটা চালান যায় কি না, শেষে যা হয় করা যাবে।"

(২)

"এসেছ ভাই! এস!"

মুখে একটু হাসি ফুটল, চক্ষুদুটিও অশ্রুভারাক্রান্ত হইল,—দিনেশ শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া বন্ধু রসিকের সুপুষ্ট হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন। বিমলা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে স্বামীর এই বন্ধুটিকে দুই তিনবার বিশেষ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিলেন।

"ইস্! একেবারে কিছুই নেই যে শরীরে!" সজল-নয়নে মুখে যথাসাধ্য একটি হাসি ফুটাইয়া রসিকবাবু বন্ধুর শীর্ণ হস্তখানির উপরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

দিনেশ একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর করিলেন, "আছে বই কি—এখনও কিছু, তবে এ টুকু যেতে আর দেরী নেই বেশী।"

বিমলা মুখখানি ফিরাইয়া নিয়া হাঁটুর উপরে রাখিলেন। রসিক কহিলেন, "না—না, পাগল! যাবে কেন? আগুন একটু খানি থাক্লেও আবার জ্বালিয়ে তোলা যায় যে!"

"কাঠখড় যদি থাকে,—তা যে একেবারেই ফুরিয়ে গেছে।"

"যায়নি—যায়নি! এখনও ঢের দেরী আছে তার। এত ভয় কেন পাচ্চিস্ দিনু? আগে কেন লিখিস্নি আমাকে? তা হ'লে চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করা যেত।"

দিনেশ বড় গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আর দরকার কি তার ভাই? এ জীবনটার কর্ম্মফল যা ছিল, চূড়ান্ত ভোগ তার হ'য়ে গেছে! কেন আর টেনে রাখা? কেবল বোঝা বওয়াই সার। আর যে তা ভাল লাগে না।"

রসিকবাবু ঈষৎকম্পিত গাঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "কেবল নিজের জন্যে হ'লে বোঝাটা যত শীগ্গির হয় ফেলে যেতে পাল্লেই বোধ হয় ভাল হয়।—তবে সেটাকে আশ্রয় ক'রে আরও দুটি প্রাণী র'য়েছে,—ফেলে গেলে তারাও যে ভেঙ্গে পড়ে দিনু। দুঃখের হ'ক্, সুখের হ'ক্, বোঝাটা নিদেন তাদের খাতিরেও ব'ইতে হয় বই কি?"

"হয়, যদি কর্ত্তার হুকুম থাকে। নইলে কে কি পারে রসিক? আমি ত ব'য়েই যাচ্ছিলাম,—কিন্তু ডাক

এসেছে, ফেলেই যেতে হবে!—এদের কথা—তিনি ভাবান তাই না ভাবি,—নইলে ভাব্‌বার আমি কে? কিছু ক'র্‌বারই বা আমি কে? অনাথ—আশ্রয়হীন—বড় দুঃখী—এ পৃথিবীতে কত আছে? দুজন বাড়্‌ল কি কম্‌ল—পৃথিবীর কি এসে যায় তাতে? তবে মন বোঝে না, তাই ভাবি—দুঃখ পাই। কিন্তু কি ক'র্‌ব?"

বলিতে বলিতে দিনেশ চুপ করিলেন। চক্ষু দুটি বুজিয়া আসিল,—দুটি প্রান্ত হইতে দুইটি অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

বিমলা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, কন্যা সুকুমারীকে পাঠাইয়া দিলেন। সুকুমারী আসিয়া সলজ্জভাবে পিতৃবন্ধুকে প্রণাম করিল। রসিকবাবু হাতখানি তার মাথায় রাখিয়া মাত্র আশীর্ব্বাদ করিলেন। কোনও কথা বলিবার সাধ্য তখন তাঁহার ছিল না।

এই চিন্তার বা কল্পনার অনুভূতির সঙ্গে অতিতীব্রতা অথবা বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের উত্তেজনা—যাহারই প্রতিক্রিয়া বশতঃ হউক, সমস্ত রাত্রিটা দিনেশ বড় অবসন্নভাবে পড়িয়া রহিলেন।

পরদিন সকালে তাঁহাকে কতকটা সুস্থ দেখা গেল।—রসিকবাবু কাছে আসিয়া বসিলেন,—হাসিয়া নানা রকম কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। দিনেশের মুখেও মধ্যে মধ্যে হাসি দেখা গেল।

কতক্ষণ পরে দিনেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বে থা আর ক'র্‌বে না রসিক?"

"এই গেল যা! এখানে তুমিও ব'ল্‌ছ বিয়ের কথা! হায়, খেসারীর ডাল! সঙ্গে সঙ্গে তুমিও এখানে উপস্থিত হ'লে!"

দিনেশ উত্তর করিলেন, "বিয়ের সঙ্গে খেসারীর ডালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছু নেই।—ওটা বৈধব্যের সাথী।"

"তা আমার সঙ্গে যে অভাগীর বিয়ে হবে, তার সাথে ওটা অম্‌নিই এসে জুট্‌বে বটে।"

দিনেশ রসিকের হাত ধরিয়া কহিলেন, "ঢের দেরী আছে তার রসিক,—তুমি এখনও এক রকম যুবাপুরুষ।"

"এই পঁয়তাল্লিশ বছরে! হাঁ, একেবারে টাট্‌কা যুবা বটে।"

"টাট্‌কা না হও, বেশ পাকা বটে। ছোট ছেলেপিলে কষ্ট আছে, মা বুড়ো হ'য়েছেন,—বিয়ে না ক'র্‌লে ঘরসংসার তোমার চ'ল্‌বে না যে———"

"মা তাই ব'লেন বটে! কিন্তু চ'লে ত যাচ্ছে। তবে এখন শাসাচ্ছেন কাশী চ'লে যাবেন। দেখা যাক্‌ ত!"

"দেখবে আর কত দিন?—আমি বলি, শীগ্‌গির বিয়েটা ক'রে ফেল। খুব লক্ষ্মী একটি মেয়ে দেখ—যে তোমার ছেলেপিলের মা হ'তে পার্‌বে। আর খুব দুঃখীর মেয়ে—তোমার আশ্রয়ই যে বড় ভাগ্য ব'লে মনে ক'র্‌বে। এমন মেয়ে ঢের পাবে।"

"তা পেতে পারি। মেয়ে এমন ঢের আছে, লক্ষ্মী হ'লেও বড় দুঃখী বটে। কিন্তু—"

"তবে আর কিন্তু কি রসিক?"

রসিক বাবু উত্তর করিলেন, "কথাটা কি জান ভাই, মেয়ে যা দেখি, সবাইকে আমার মেয়ের মতই চোকে লাগে। এই আমার বিনু সরু যেমন—তাদেরও ঠিক তেম্‌নি মনে হয়। কি ক'রে বিয়ে করি বল। এক একবার মনে হয় দিনু, বিধবা বিয়ের চল থাকলে মন্দ হ'ত না। আমার মত লোকের গিন্নী যদি একটা দরকারই হয়, তবে গিন্নীবান্নী-গোছের একটি অনাথা বিধবাকে বিয়ে করে আন্‌লেই ভাল হয়। চাই গিন্নী, চাই ছেলেপিলেদের মা, পনর ষোল বছরের মেয়ে কি তা হ'তে পারে? সে যারা বিয়ে ক'রে আনে, গিন্নী আনে না, ছেলেপিলের মা আনে না, আনে আর কিছু,—তা সে প্রবৃত্তি এখন আর এ বয়সে যেন না হয়।"

দিনেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রসিক বাবু হাসিয়া কহিলেন, "কি হে, সে প্রবৃত্তিটা আমার নেই—সেই দুঃখেই এত বড় একটা নিশ্বাস ছাড়্‌লে নাকি?"

দিনেশ রসিকের হাতখানি ধরিয়া কহিলেন, "না—না, তা নয়। আমার মত রোগজীর্ণ কেউ ইহপরকালের সন্ধিস্থলে—মহাযাত্রার পথে দাঁড়িয়ে—ওসব কথা কি ভাবতেও পারে? তবে মনে হচ্ছিল কি জান? এমন কেউ থাক্‌তে পারে যাকে ঘরে নিলে, তারই বড় উপকার তুমি ক'র্‌তে পার।—তোমার সেবা, তোমার ছেলেমেয়েদের সেবা, প্রাণপণে সব ক'রেও এ উপকারের হয়ত সামান্য প্রতিদানও হয় না।"

চমকিয়া রসিকবাবু দিনেশের মুখের দিকে চাহিলেন। দিনেশের নয়ন দুটি মুদ্রিত, ফোটা ফোটা জল সেই মুদ্রিত দুটি নয়নের প্রান্ত হইতে নির্গত হইতেছিল।

"আপনার খাবার আর চা এনেছি কাকাবাবু!"

রসিক চাহিয়া দেখিলেন,—এক হাতে চা আর এক হাতে খাবারের রেকাবখানি ধরিয়া সুকুমারী আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে। গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুক ভরিয়া উঠিল,—মুখখানিও অমনি নত হইয়া পড়িল।

দিনেশ চক্ষু মেলিয়া কহিলেন "কে, সুকু! খাবার এনেছিস্? বেশ!"

"একি! তুমি কাঁদছ বাবা? কি হ'য়েছে? বুকে কি ব্যথা উঠেছে আবার?"

টেবিলের উপরে চা ও খাবার রাখিয়া সুকুমারী তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া আঁচলে তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।

দিনেশ কহিলেন, "না মা, ব্যথা ওঠেনি। আজ বেশ ভালই আছি। এমনিই রসিকের সঙ্গে কথায় কথায়—হাঁ, খাও রসিক, খাও? চা টা জুড়িয়ে যাবে যে। যা সুকু, পাণ এনেদে রসিককে।"—

সুকুমারী ধীর পাদক্ষেপে বাহিরে চলিয়া গেল। দিনেশ কহিলেন, "বড় লক্ষ্মীমেয়ে আমার সুকু। কি ধীরভাবে কি যত্নেই যে আমার সেবা ক'চ্ছে—যেন আমার মা এসে ওর মধ্যে অধিষ্ঠান ক'রেছেন—আমার এই রোগযন্ত্রণা দেখে।"

রসিকবাবু উত্তর করিলেন, "হাঁ, কাল থেকে দেখ্‌ছি, চমৎকার মেয়ে! ওর মত মেয়েও যে এত পারে, দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি।"

"দুঃখের পাঠশালায় শিক্ষা পেয়েছে যে। জমি যেখানে ভাল, এই শিক্ষার চাষে সেখানে সোনা ফলে।"

সুকুমারী পাণ লইয়া আসিল, টেবিলের উপরে রাখিয়া পিতার কাছে গিয়া বসিল। দিনেশ কহিলেন, "তুই যা এখন সুকু, ভাল কিছু রেঁধে তোর কাকাবাবুকে খাওয়াবি আজ। তোর মার শরীর ভাল না, একা হয় ত পারবেন না। যা, যদি দরকার কিছু হয়, ডাক্‌ব। আমি বেশ আছি আজকে।"

সুকুমারী উঠিয়া গেল। একটু পরে দিনেশ কহিলেন, "গোটা দুই কথা তোমাকে ব'ল্‌ব রসিক, তাই তোমাকে এত তাড়া দিয়ে আস্‌তে লিখেছিলাম।"

"কি কথা, বল।"

দিনেশ কহিলেন, "বেশীদিন আর আমার বাকী নেই রসিক! এত দুঃখেও থাক্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু আর পাচ্ছি না। ডাক্তার ডাক প'ড়েছে। তবে কি না—ওদের একেবারেই পথে বসিয়ে যাচ্ছি, কিছুই আমার সম্বল নেই।"

স্নেহে দিনেশের হাতখানি ধরিয়া রসিকবাবু কহিলেন, "সে জন্য কিছু ভেবোনা দিনেশ। তোমার স্ত্রী কন্যা কোনও দুঃখ পাবে না। আমি তাঁদের ভার নিলাম।"

"ভার নিলে! হাঁ, আমি যে তাই চাই, তাই ব'ল্‌তে তোমাকে আস্‌তে লিখেছিলাম! হাঁ, তাই নেও, একেবারে আপনার ক'রে ওদের ভার তুমি নেও, আমাকে নিশ্চিন্ত ক'রে দেও, শান্তিতে চ'লে যাই। রসিক! আমার সুকুকে তুমি বিয়ে কর।"

"দিনেশ!"

"না, না! আপত্তি ক'রো না ভাই! একেবারে আপনার ক'রে ওদের ভার তুমি না নিলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছি নে। এর চাইতে ভাল আর সুকুর ভাগ্যে কিছু হ'তে পারে না। কে জানে, কি হবে, কোথায় কবে কার ঘরে সে যাবে? এই অনিশ্চিত অবস্থায় ওকে ফেলে শান্তিতে আমি যেতে পাচ্ছি নে। অন্যায় ভার তোমাকে কিছু দিচ্ছিনে রসিক। তুমি অসুখী হবে না। তোমার গৃহিণী—তোমার ছেলেপিলেদের মা ও হ'তে পারবে। যদি তা না পাও, এত বড় একটা দায় তোমাকে নিতে ব'ল্‌তাম না। বল, আমার কথা রাখ্‌বে রসিক? আর এ উদ্বেগ আমি সইতে পাচ্চ নে। বড় ঘুম পাচ্ছে! বল, একটু সোস্তি হ'য়ে আমি ঘুমুই! বল, আমার সুকুর সুখদুঃখের সকল দায়িত্ব ধর্ম্মতঃ তুমি নিলে,—বল—বল!"

"আচ্ছা—নিলাম—নিলাম! তুমি একটু ঠাণ্ডা হও, অত উত্তেজিত হ'য়ো না। এই দুর্ব্বল অবস্থা—বড্ড খারাপ হবে যে ওতে।"

"আর খারাপ কি? জীবনের শেষ কর্ত্তব্য পূর্ণ হ'য়ে গেল। আজ আর কাল—ক্ষতি কি? যখন হয়, এখন গেলেই হ'ল। হাঁ, ওদের একবার ডাক না রসিক?"

"থাক্—থাক্! এখন থাক্! কথা ত হ'য়েই গেল।

আর বাড়াবাড়ি কেন এখন ? একটু ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও! ইস্! একেবারে জলের মত ঘাম ছুটেছে যে!"

কোঁচার খুটে রসিকবাবু দিনেশের ঘাম পুছিতে আরম্ভ করিলেন। দিনেশ একটু হাঁপাইতে হাঁপাইতে অবরুদ্ধপ্রায় স্বরে কহিলেন, "না—না! ডাক—ডাক! আমি ব'লে যাই! একটু বাকী আছে, সেরে যাই। আর বুঝি পারব না। ডাক—ডাক!"

রসিকবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ডাক দিলেন। সুকুমারী ও বিমলা ছুটিয়া গৃহে আসিলেন। দিনেশ তখন বড় হাঁপাইতে ছিলেন, চক্ষু দুটি বিস্ফারিত—অস্বাভাবিক একটা উজ্জলতায় কেমন জল জল করিতেছিল।

"বিমলা! এস! সুকু, আয় কাছে আয়! বিমলা, আর ভয় নাই! রসিক ব'লেছে সুকুকে নেবে! এই যে! সুকু! ঐ দেখ, ওঁর হাতে তোমাকে দিয়ে গেলাম, উনি তোমার মহাদেব! ভক্তি ক'রে সেবা ক'রো! সাবধান! এতটুকু দুঃখ ওকে দিও না। যা বলেন, তাই ক'রবে। রসিক! এই নেও—আমার সুকুকে আজ তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।—"

এক হাতে রসিকবাবুর আর এক হাতে শান্তির হাত খানি ধরিয়া দিনেশ তুলিতে চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু হাত দুখানি শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল। চক্ষুদুটি শিবচক্ষু হইল। জীবনের শেষ প্রয়াস—সেই মহাশ্বাসের স্পন্দন বক্ষ ছাড়িয়া মুখে গিয়া উঠিল!

বিমলা চিৎকার করিয়া স্বামীর বক্ষে আছড়িয়া পড়িলেন।

"বাবা! বাবা গো!" বলিয়া শান্তি পিতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল!—তার মনে হইল, মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া পিতা তার ডাকে সাড়া দিতেছেন!

(৩)

শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হওয়া পর্য্যন্ত পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিনেশের স্থানীয় বন্ধুদের উপরে অর্পণ করিয়া রসিকবাবু তাঁহার গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন।

অবগুণ্ঠনাবৃতা বিমলার নিকটে এই সব বন্দোবস্তের কথা বুঝাইয়া বলিয়া যখন তিনি বিদায় চাহিলেন,—বিমলা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আবার কবে আসবেন ?"

রসিকবাবু উত্তর করিলেন, "তা যখন দরকার হয়, আসতে পারি। কাজটা হ'য়ে যাক,—তারপর দেশে গিয়ে থাকতে চান কি আর কোথাও থাকলে সুবিধে হয় নিজে ভেবে একটা স্থির করুন, তখন এসে ত তার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিতেই হবে।"

বিমলা উত্তর করিলেন,—"আমার জন্যে আর কিছু ভাববার দরকার দেখি না। যেখানে হয় থাকলেই হবে। তবে তাঁর সেই শেষ কথাটা—তার একটা ব্যবস্থা শীগ্‌গির যদি ক'রে ফেলেন, তা হ'লেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।"

"হুঁ—তা—কদ্দিনের মধ্যে সেটা হ'লে ভাল হয় মনে করেন ?"

বিমলা উত্তর করিলেন—"সে আর আমি কি ব'লব ? —আপনি যা ভাল মনে করেন ক'রবেন। তবে বেশী দেরী ক'রে আর দরকার কি ? বাধা ত কিছু নেই।"

"বাধা—আচ্ছা, আমি গিয়ে আপনাকে দিন ঠিক ক'রে জানাব। বেশী দেরী হবে না,—ধরুন এই দুই তিন মাস—"

"আপনার যদি অসুবিধে কিছু থাকে, তাই হবে।"

রসিকবাবু একটু কি ভাবিয়া কহিলেন,—"তদ্দিন আপনারা এইখেনেই বরং থাকুন, আমি সেই রকম বন্দোবস্তই ক'রে দেব। কি বলেন ?"

"আচ্ছা।"

"তা হ'লে—এখন আসি।"

"আসুন,—আপনার মঙ্গল হ'ক্।"

সুকুমারী মাতার আড়ালে বসিয়াছিল, মৃদুস্বরে তিনি আদেশ করিলেন,—আনত মুখে উঠিয়া আসিয়া সে রসিকবাবুকে প্রণাম করিল। দু ফোঁটা চক্ষের জল তাঁহার পায়ে পড়িল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন,—মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সুখে থাক, মঙ্গল হ'ক্।"

মাসাধিক কাল পরে রসিকবাবু বিবাহের দিন স্থির করিয়া পত্র লিখিলেন। খরচ পত্রের জন্য কিছু টাকাও পাঠাইয়া দিলেন।

দুইদিন পূর্ব্বে কয়েকখানি অতি মনোহর মূল্যবান্ অলঙ্কার এবং বহুমূল্য পট্টবস্ত্রাদিসহ গায়হলুদের তত্ত্ব আসিল

বিবাহের দিন সংবাদ আসিল, নিকটবর্ত্তী এক বন্দরে বরযাত্রীদের সহ রসিকবাবু অপেক্ষা করিতেছেন, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি সেইখানেই হইবে, রাত্রি নয়টার সময় লগ্ন, তার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহারা উপস্থিত হইবেন।—

রাত্রি পৌনে নয়টা, বহুলোকজন আলো ও বাদ্য সহ বরের শোভাযাত্রা দিনেশের দীন গৃহের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। উঠানে বিবাহের সব আয়োজন প্রস্তুত,—লোকজনসহ রসিকবাবু সেখানে প্রবেশ করিলেন।

পুরোহিত কহিলেন, "লগ্ন উপস্থিত। বরকর্ত্তা কে?"

"আমি।"

"আপনি!"

"হাঁ, আমিই বরকর্ত্তা। লগ্ন উপস্থিত, বিবাহ তবে আরম্ভ হউক, এস মুকুন্দ।"

অতি সুরূপ সুগঠন একটি যুবকের হাত ধরিয়া রসিক বাবু তাহাকে বরের পীঁড়িতে বসাইয়া দিলেন।

"এ কি! আপনি—"

পুরোহিত, কন্যাকর্ত্তা এবং উপস্থিত আরও অনেকে অতি বিস্ময়ে রসিকবাবুর দিকে চাহিলেন।

রসিকবাবু হাসিয়া কহিলেন,—"হাঁ, আমি বরকর্ত্তা, বর নই,—বর এই মুকুন্দ। দিনেশ আমার বাল্যবন্ধু, মৃত্যুশয্যায় ধর্ম্মতঃ তার কন্যার সুখদুঃখের সকল দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছিলাম। দিনেশ তখন যাই ভাবুক, পিতার মতই সে দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম, আর কোনও ভাবে নিতে পারি না। বিবাহের পর স্বামীর দায়িত্ব যত বড়ই হ'ক, তার আগে কন্যার সুখদুঃখ মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী তার পিতা। দিনেশের অভাবে সুকুমারীর পিতা এখন আমি অতি সৎপাত্রেই আমি আজ তাকে দান কচ্ছি। মুকুন্দ সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত আর অতি সচ্চরিত্র, আমার এক নিকট জ্ঞাতি-ভগ্নীর পুত্র। ওর পিতা নাই, কিন্তু সম্পত্তি তিনি যথেষ্ট রেখে গেছেন। কন্যা সুখে থাকবে, এই কামনা ক'রেই দিনেশ তাকে আমায় সঁপে দিয়েছিল। আমি তাকে যার হাতে আজ দিচ্চি, পরমসুখে সে সুকুমারীকে রাখবে। দিনেশের ইচ্ছা এতেই ঠিক পূর্ণ হ'ল। আর সুকুমারীর মাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, তিনিও বলবেন, এই জামাই আর আমাকে বেয়াই পেয়েই তিনি অনেক বেশী সুখী হবেন। সত্যভঙ্গের অপরাধে আমাকে দোষী ক'রবেন না।"

গৃহমধ্যে সমবেত নারী কণ্ঠে কুলু কুলু হুলুধ্বনি উঠিল,—মঙ্গলশঙ্খ ঘনঘন মধুর গম্ভীর ধ্বনিতে ঘোষণা করিল, হাঁ কেবল সুকুমারীর মা নয়, সকলেই এই জামাই আর তাঁকে বেয়াই পাইয়াই কৃতকৃতার্থ হইলেন। তাঁর সত্যের কেবল বাহ্যিক বাক্য নয়, মর্ম্মের মর্ম্ম তিনি পালন করিয়াছেন। তাহাই সার্থক সত্যপালন!

[illegible]

বর্ষাতত্ত্ব

জান' কি মা উপরে কিসের শব্দ?
নীচে মানুষ ভয়েই থাকে স্তব্ধ!
তুমি ভাব' মেঘের আওয়াজ, আপনি বুঝি হয়?
ওটা তোমার মস্ত ভুল মা! শোন' মিথ্যে নয়!
আমি যেমন তোমার ছেলে ছাদের উপর খেলি
(ইচ্ছা মত গিয়ে)
আকাশ দেশেও তেম্‌নি আছে তাদের অনেক ছেলে
কেবল খেলা নিয়ে!

যখন করে ছুটোছুটি টিনের ছাদের' পর,
শব্দ আসে, যাতে তোমার লাগে এমন ডর!
তাইতে তুমি মোরে, কেবল
রাখ ঘরে ভরে'
পাছে আমি দুষ্টু হয়ে কেবল খেলা করি
কিম্বা ছাদে ছুটতে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে পড়ি!

বল' ত' মা কেন পড়ে জল?
ভাবছ বুঝি ছেঁদা মেঘের তল!

হা' নয় মা ছুটে ছুটে ঘেমে ওঠে তারা
তাদের গায়ের ঘাম গুলি সব পড়ে এমন ধারা।
তাদের মা-ও তোমার মত ঠাণ্ডা হ'তে বলে
বাতাস করে কত!
তারা কিন্তু শোনে নাক মোটেই মায়ের কথা
বাড়ায় আরও তত!
তোমার মত ওদের মারও মুখে মাণিক জ্বলে
ঝিলিক্‌মারে আকাশ জুড়ে যখন কথা বলে!
বুঝতে তুমি নার', আমায়
ক্ষ্যাপা বলে সার'!
ঘুমোয় ওরা শান্ত হয়ে যখন এসে নেমে
তোমার কওয়া বৃষ্টি বাদল তখনি যায় থেমে!
তুমি তাদের কভু দেখ'নিত'
তাদের কথা বোঝাও শেখ'নিক'!

জল পড়লেই তাদের আমি পষ্ট দেখা পাই
ভালবাসি তাদের কথাও, সবাই শুন্‌তে চাই!
পাঠায় আমায় জলের ফানুস্ উঠান্‌খানি ভরে'
ছুঁলেই মিশায় জলে
তাতেই তাদের ছবি আছে মুখটি নিচু ক'রে'
দেখ্‌লে দেখা মেলে!
জলের ধারা পড়ে যখন তারি ফাঁকে ফাঁকে
আঙুল নেড়ে আদর করে আমায় তারা ডাকে!
ঢেকে দুটি কাণ, আমি
শুনি তাদের গান!
আমায় বড় ভালবাসে আকাশ শিশুর দল
তাইতে এত ভালবাসি দেখ্‌তে বাড়া' জল!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কাউণ্ট টল্‌ষ্টয়

লিও নিকোলেভিচ টল্‌ষ্টয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গাওর্ভাচ অফ্ মস্‌কভির অন্তর্গত টুলা নামক স্থানে এক বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রাদেশিক সহর হইতে টুলা অনেক মাইল দূরে অবস্থিত। ইয়াসনয়া পলিয়ানা তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী, এইখানেই তাঁহার জন্ম হয়। তাহার যখন কিঞ্চিদধিক এক বৎসর বয়স, তখন তাঁহার মাতা পরলোকে গমন করেন। ইহার ছয় বৎসর পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

তাঁহার চারি ভ্রাতা ছিলেন, তন্মধ্যে তিনিই কনিষ্ঠ। বড় তিন ভ্রাতা অতি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

প্রথমে কিছুকাল গৃহে গৃহ-শিক্ষকদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে লিওটলষ্টয় পিটর্সবর্গ ইউনিভার্সিটিতে প্রবিষ্ট হন। স্থানটী তাঁহার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। তিনি সেখানে বরাবর থাকিবার অভিলাষ করেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই তাঁহার ভাব বদল হইয়া গেল; তিনি জুয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অধ্যয়নের একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা ছিল না,—তবে তিনি সকল বিষয়েরই পুস্তক আগ্রহসহকারে পাঠ করিতেন। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইউনিভার্সিটী হইতে নাম কাটাইয়া দেন। পরবর্ত্তী তিন বৎসরে তাঁহার সাতিশয় উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাওয়া যায়। জুয়া খেলায় তিনি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি ব্যসনে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকাল হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকিতেন; তৎকালে তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন একটা শবদেহ পড়িয়া আছে!

সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ নিকোলাসের সহিত ককেসসে গমন করেন। নিকোলাস ককেসিয়ান সৈন্যদলে একজন গোলন্দাজ সেনানী ছিলেন। ককেসস্ প্রদেশের পর্ব্বতমালা, সূর্য্যকিরণ ও প্রকৃতির একটু অতিমোহন ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই সময়ে প্রায়ই তাঁহার গভীর ভাবাবেশ হইত। কখনও বা তিনি বিষাদভরে হতচেতন

হইয়া পড়িতেন, আবার কখনও শান্তিরসে আপ্লুত হইতেন। প্রেম ও আত্মোৎসর্গ যে সুখের মূলমন্ত্র তাহা তাঁহার হৃদয়ে এই সময়ে প্রতিভাত হইল।

তিনি সেনাদলে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সৈনিকবৃত্তি তাঁহার ভাল লাগিল না। আঠার মাস চাকুরী করিয়াও তাঁহার পদোন্নতি হইল না। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ক্রিমিয় যুদ্ধ হয়। তিনি ঐ যুদ্ধে যোগদান করেন। প্রথম প্রথম যুদ্ধে তাঁহার খুব উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি অল্পদিনই যুদ্ধের উপর একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। মানুষ মানুষকে হত্যা করিতেছে এই নিদারুণ দৃশ্য তাঁহাকে বড় ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি সৈন্যদল ছাড়িলেন। কিন্তু আবার জুয়াখেলায় মত্ত হইয়া ঋণজালে জড়িত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বিশ্বাস হয়, তিনি কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য জগতে প্রেরিত হইয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্মকে তিনি নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে চাহিলেন। তিনি স্থির করিলেন এই সংস্কৃত ধর্ম্ম ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের মত নিরপেক্ষ হইবে এবং ইহাতে দুর্ভেদ্য রহস্যের আবরণ কিছু থাকিবে না। উহা যে কেমন মানুষের পরকালের সুখের আশা প্রদান করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে তাহা নয়, আমাদিগকে সুপথে চালিত করিয়া ইহজগতেই আমাদের সুখবিধায়ক হইবে। ২৫ বৎসর পরে তিনি এই আদর্শমত কার্য্য করিয়াছিলেন।

পিটার্সবর্গে প্রত্যাগমন করিবার পর টলষ্টয়ের পুনরায় নৈতিক অধঃপতন হইয়াছিল। স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে তাঁহার কখনই ভাল ধারণা ছিল না। পুরুষগণ যে সাহস, ন্যায়পরতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহা কেবল স্ত্রীলোকেরই দোষে। ইহা তাঁহার যৌবনকালের মত সন্দেহ নাই, কিন্তু আশী বৎসর বয়সেও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত দেখা যায়, তাহা ইহারই অনুরূপ। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ঈদৃশ হইলেও তিনি স্বীয় নৈতিক অধোগতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন, বিবাহ না করিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপ ভ্রমণে বহির্গত হন। ভ্রমণকালে গিলোটিন যন্ত্রের দ্বারা কোন হতভাগ্যের মস্তকচ্ছেদ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। এমন কি কয়দিন রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। এই সঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "কোন প্রকার যুক্তিতর্কের দ্বারাই এই কার্য্যের সমর্থন করা যাইতে পারে না; সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে লোকে যেকোন যুক্তির দ্বারাই ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া আসুক না কেন, আমি জানি ইহা অনাবশ্যক। কি ভাল এবং মন্দ তাহা লোকের কার্য্য বা বাক্যের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না, আমার হৃদয় এবং আমাকর্ত্তৃকই তাহা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকশিক্ষা বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। ভ্রমণকালে তিনি জার্ম্মাণী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়গুলি দর্শন করিয়া এবং ফ্রিবেল, প্রধন আর্‌বার্ট প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন তিনি শিক্ষাসংক্রান্ত নানারূপ পরীক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। রুসোর ন্যায় তাঁহার মতে শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা ও স্বভাবানুবর্ত্তন। এই নীতি অনুসারেই তিনি ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানার স্কুলের ছাত্রবৃন্দের অধ্যাপনা করিতেন। বালকদিগকে পুস্তক আনিতে হইত না; তাহারা খেলা করিতে করিতে শিক্ষালাভ করিত, এবং ইচ্ছামত বিদ্যালয়ে আসিত বা তথা অনুপস্থিত থাকিত আর যেখানে সেখানে বসিয়া শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিত। কোনরূপ নিয়মের বাঁধাবাঁধি ছিল না, সকলই 'অনিয়ম' বা 'খোলা নিয়ম' (Disoder বা free order)। ইতিহাস শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন, বর্ত্তমান কাল হইতে ইতিহাস শিক্ষার সূচনা হওয়া উচিত, অতীতকাল হইতে নহে। তিনি ভূগোল শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। সাহিত্যসম্বন্ধে তিনি বলেন, "সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্তরে রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় সাহিত্য সেই সার্ব্বজনীন প্রয়োজন সাধন করিতেছে না। জনসাধারণের সেবা হইতে সাহিত্যকে টানিয়া লইয়া গিয়া কয়েক সহস্র মাত্র ব্যক্তির সেবার জন্য উহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সৌন্দর্য্য কি তাহা বুঝিতে হইলে তাহার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতে হইবে, অনেকে এই কথা বলিয়া থাকেন; একথাটী কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়; সূর্য্যের সৌন্দর্য্য, মানুষের মুখের সৌন্দর্য্য, গাথা-সাহিত্যের শব্দসৌন্দর্য্য, আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্য্য এবং প্রেম ও ভক্তি প্রণোদিত হইয়া মানুষ যে সকল কার্য্য করে,

সেই সকল কার্য্যের সৌন্দর্য্য সকলেই ত উপভোগ করিয়া থাকে। কই, তাহার জন্য ত পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন হয় না ?"

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মিস্ সোনিয়া এব্যার নাম্নী এক কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি রুষিয়াবাসী এক জার্ম্মান চিকিৎসকের কন্যা। বিবাহের সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল অষ্টাদশ বৎসর। তাঁহারা ষোলজন সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীস্ত্রীতে যে সমস্ত জীবনটা বেশ সদ্ভাবে কাটাইতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। তবে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পারিবারিক জীবন অতিশয় সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। টলষ্টয় এই কয়েক বৎসর যেরূপ পরিশ্রমে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা অলৌকিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তদীয় পত্নী তাঁহার জীবন সঙ্গিনীস্বরূপ অনেক সাহায্য তাঁহাকে করিয়াছিলেন।

টলষ্টয় অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য সে বিষয় সন্দেহ মাত্র নাই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি Childhood ও Autobiography নামক পুস্তকদ্বয় লিখিয়াছিলেন। প্রচার হইবামাত্র পুস্তক দুইখানির যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। War and peace নামক পুস্তকখানির প্রণয়নকালে তাঁহাকে অতিশয় পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি এই উপলক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ, অপরিচিত প্রদেশে ভ্রমণ, কৌতুকাগার ও পুস্তকাগার পরিদর্শন এবং জীবন স্মৃতি ও পারিবারিক ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন।

এরিষ্টটল্ বলিয়াছেন, ইতিহাস অপেক্ষা কাব্য অধিকতর সত্য। টলষ্টয় বেশ বুঝিতেন যে কাব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ইতিহাস কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারে না। ঐতিহাসিক চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া স্যার ওয়ালটার স্কট ইতিহাসের সহিত উহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলেন নাই এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। সমালোচকদিগের মতে আর্ট হিসাবে এরূপ সামঞ্জস্যের অভাব একটী দোষ। আবার এরূপ চরিত্র যদি গ্রন্থের কোন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দোষটী গুরুতর হয়। "War and peace" নামক গ্রন্থে টলষ্টয় আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়নকে পশ্চাৎভাগে রাখিয়াছেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল তিনি দর্শন পাঠে অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন সোপেনহোরের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি আর নাই। জর্ম্মান দার্শনিকের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দর্শন তাঁহার হৃদয়ে আশু সাড়া পাইয়াছিল।

টলষ্টয় এইবার লোক সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সাধারণের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। সাময়িক সাহিত্য কেবল কয়েকজন ব্যক্তি মাত্রেরই উপভোগ্য হইত। সাহিত্যিকগণ যখন লোকসাধারণের জন্য পুস্তক লিখিতেন তখন তাঁহারা তাহাদের প্রকৃত অভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পুস্তক রচনা করিতেন না, তাহাদের কামনার উত্তেজনা করিতেন মাত্র। অতএব প্রকৃতপক্ষে লোকপ্রিয় এবং মহত্ত্বোদ্দীপক সাহিত্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। টলষ্টয় বুঝিলেন লোকসাধারণ যাহা লিখিয়াছে তাহাই অনায়াসে লোকসাধারণের বোধগম্য হইয়া থাকে। অতএব গাথাসাহিত্য এবং কথাসাহিত্য অতি মূল্যবান জিনিষ। প্রতিভাবান কবিদিগের যে গ্রন্থগুলি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে তাহা সযত্নরক্ষিত উদ্যান-কুসুম, আর গাথাসাহিত্য সুগন্ধ বনফুল। তিনি কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত গল্পগুলি সংগ্রহ করিতে এবং পুরাকালের কবিতা অবলম্বন করিয়া উপাখ্যান রচনা করিতে লাগিলেন। প্রাচীন সাহিত্য পাঠ উপলক্ষে তিনি গ্রীক ভাষা শিক্ষা করেন। হোমর, প্লেটো, জেনোফন ইসপের গল্প প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি প্রভূত আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ভল্গা অঞ্চলে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। উহার উপশমকল্পে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং দুই লক্ষ সত্তর হাজার পাউণ্ডেরও অধিক চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই দুর্ভিক্ষ দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল যে শস্যের আকস্মিক অভাব দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ নহে, উহার প্রকৃত কারণ ভূমি ও ধনের দোষাবহ বিভাগ। অতঃপর তিনি হেনরী জর্জ্জের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

টলষ্টয় প্রণীত আনা কারেনিনা পৃথিবীর মধ্যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই পুস্তকখানি শেষ করিতে তাঁহার দুই বৎসর লাগিয়াছিল। উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের

যে কিরূপ অধোগতি হয় তাহা এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রগুলি অবস্থার সমবায়ে গঠিত হইয়া উঠে, চিরকাল একই ভাবাপন্ন হইয়া থাকে না। তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে তিনি এক একটী পরিবারকেই এক অখণ্ড বস্তু বলিয়া ধরিয়াছেন, পরিবারের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে নহে। মানুষ সেখানে অংশমাত্র, তাহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একটা খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয়। এতদিন তিনি আর্ট হিসাবে সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে উহাকে নীতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিবার বাসনা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি যে উপন্যাসগুলি রচনা করেন, সে সমুদায়ই নীতিগর্ভ, তবে অপরাপর সাহিত্যগুরুদের গ্রন্থে উদ্দেশ্যটা যেমন প্রচ্ছন্ন আছে, তাঁহার গ্রন্থনিচয়েও সেইরূপ। ধর্ম্মসম্বন্ধেও তাঁহার মত এইবার বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইল। খৃষ্টধর্ম্মে এতদিন তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু এখন হইতে তিনি উপবাস, উপাসনা প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। সাধারণ লোকের ন্যায় জীবনযাপন করাই উচিত, ইহাই তাঁহার ধারণা হইল। ত্যাগেই প্রকৃত মহত্ত্ব ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন; জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম প্রথম তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিয়া উঠিত। এক সময়ে তাঁহার বোধ হইল জীবন দুঃখময়, ইহার নাশ হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি; এই বিশ্বাস এত প্রবল হইয়াছিল যে মধ্যে মধ্যে তিনি আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা করিতেন। অবশেষে তাঁহার প্রতীতি হইল যে ঈশ্বরবিহীন জীবন জীবনই নহে, এবং ঈশ্বরকে জানাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—

"What more do you ask ?" Exclaimed a voice within me. "This is He. He is that without which one cannot live. To know God and to live is one and the same thing. God is life. Live seeking God, and then you will not live without God."

তিনি তাঁহার স্বশ্রেণীর লোকদিগের জীবন-যাত্রার প্রণালী পছন্দ করিলেন না। তাহাদের জীবন জীবনই নহে, উহা জীবনের একটি ভাণমাত্র। তাহারা এরূপ অনাবশ্যক আড়ম্বর লইয়া থাকে যে তাহাদের পক্ষে জীবনের অর্থ বা উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। রুষিয়াবাসী শ্রমজীবিগণ জীবনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করে তাহাই উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা। সে ব্যাখ্যা এই,—

"Everyone has come to this world by the will of God. And God has so made man that everyone can destroy his soul or save it. The aim of man in life is to save his soul; and to save his soul, he must live 'godly,' and to live "godly" he must renounce all the pleasures of life, must labour humble himself, suffer and be merciful."

ভালবাসার বন্ধনের দ্বারা লোক সাধারণের সহিত আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায়ে তিনি উপবাসাদি করিতেন, কিন্তু এরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া তাঁহার সন্তোষ লাভ হইল না। তিনি এ সকল অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলেন। প্রেমই যে সকল ধর্ম্মের সার বস্তু এবং সকল দেশের ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ যে প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি অকপটে স্বীকার করিলেন। তিনি বলিয়াছেন :—For me the doctrine of Jesus is simply one of those beautiful doctrines which we have received from Egyptian, Jewish, Hindoo, Chinese and Greek antiquity. The two great principles of Jesus, love of god (in a word, absolute perfection) and love of one's neighbour (that is to say, love of all men without distinction) have been preached by all the sages of the world—Krishna, Buddha, Laotse, Confucius, Socrates, Plato, Marcus Aurelius, and among the moderns, Rousseau, Pascal, Kant, Emerson, Epictetus and many others. Religion and moral truth is everywhere and always the same I have no predilection whatever for Christianity. * * *

তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন :—I shall not seek for explanation of everything. I know that the explanation of everything, like the commencement of everything, must be concealed in infinity. But I wish to understand in a way which will bring me to what is inevitably inexplicable. * * *

এই গভীর পরিবর্ত্তনের ফলে তাঁহার চতুর্দ্দিকের অবস্থার

সহিত, বিশেষতঃ তাঁহার পরিবারের সহিত তাঁহার নূতন করিয়া বিরোধ বাধিয়া গেল। একদিকে তিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের তুর্কযুদ্ধের যৎপরোনাস্তি নিন্দাবাদ করিলেন, অপরদিকে তাঁহার স্ত্রীর সহিত এই সময় যে পত্রব্যবহার চলিয়াছিল তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় তাঁহাদের পারিবারিক জীবন কিরূপ অশান্তিময় হইয়াছিল। দাম্পত্যকলহটা কিছু বাড়াবাড়ি রকমের হইলে তিনি ইয়াস নিয়া পলিয়ানাতে গমন করিতেন। পল্লী আবাসে বাস করিয়া তাঁহার মানসিক শান্তি ফিরিয়া আসিত, এবং প্রায়ই তিনি পত্নীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

তিনি এই সময়ে আবার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেন, যথা—The Death of Ivan Ilyatch, What shall we do then? The Powers of Darkness, The Kreutzer Sonata এবং অনেকগুলি Folk-story। প্রথমোক্ত পুস্তকখানি সাহিত্য-জগতে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি; ধীরে ধীরে শারীরিক পীড়া বর্দ্ধিত হইয়া মানুষের চরিত্রকে কেমন করিয়া শিথিল করিয়া ফেলে তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শেষ পুত্র ইভানের জন্ম হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ১৩টী সন্তান হইয়াছিল। পরবৎসর তিনি Kreutzer Sonata লিখিয়াছিলেন। বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে ইহা এক ভয়ঙ্কর অভিযোগ। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি বলেন:—The Christian ideal is not marriage. There is no such thing as Christian marriage.. Marriage from the point of view of a Christian is not an element of progress, but a fall. Love and whatever precedes it and follows it is an obstacle to the true human ideal. * * *

The Christian ideal is that of love of God and one's fellow man..., whereas sexual love, marriage in the service of self, is in any case an obstacle to the service of god and man, and therefore from a Christian point of view a fall, a sin.

To get married would not help the service of God and man, though it were soon to perpetuate the human race. For that purpose instead of getting married and producing fresh children it would be much simpler to save and rear those millions of children who are now perishing around us for lack of food for their bodies, not to mention lack of food for their souls. * * *

ইহার ভাবার্থ এই:—খৃষ্টীয় বিবাহ আদর্শ বিবাহ নহে; খৃষ্টীয় বিবাহ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। খৃষ্টানের চোখে বিবাহ উন্নতির উপাদান নহে, ইহা মানুষকে অধোগতির দিকে লইয়া যায়। ভালবাসা (অর্থাৎ কামজ ভালবাসা) এবং ইহার আনুষঙ্গিক যাহা কিছু তাহা মানবের প্রকৃত আদর্শের বিরোধ্পাদন করে। * * * খৃষ্টীয় আদর্শ হইতেছে পরমেশ্বরের এবং মানুষের প্রতি প্রেম * * * কামজ ভালবাসা, বিবাহ, আত্মসুখসাধন, ঈশ্বরের এবং মানুষের সেবায় বিরোধ্পাদন করে; কাজেই খৃষ্টানের দৃষ্টিতে তাহা পদস্খলন ও পাপ। যদিও মানবজাতির স্থায়িত্ববিধানকল্পে বিবাহ করা যায় তথাপি তদ্দ্বারা ঈশ্বরের ও মানুষের সেবার সহায়তা হইতে পারে না। বিবাহের দ্বারা নূতন সন্তানোৎপাদন করিবার পরিবর্ত্তে যে লক্ষ লক্ষ শিশু খাদ্যাভাবে ও শিক্ষার অভাবে আমাদের চতুর্দ্দিকে বিনষ্ট হইতেছে তাহাদিগকে যদি রক্ষা ও মানুষ করা যায় তাহা হইলে সহজেই লোকস্থিতির ব্যবস্থা হইবে।

বাষাত্তর বৎসর বয়সে টলষ্টয় Resurrection নামক পুস্তক লেখেন। জীবনের শেষ বিংশ বৎসর তিনি জগতের সম্মুখে আচার্য্যস্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে বহুলোক তাঁহার দর্শনলাভ মানসে ইয়াসনা পলিয়ানাতে আগমন করিতেন। তিনি এই সময়ে রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জাপান যুদ্ধের প্রতিবাদ এবং রুষিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের নিন্দা করেন। অপরদিকে রাজ্যশাসনকল্পে যে সকল প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক, তিনি সেই সকলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না।

টলষ্টয়ের চরিত্রসম্বন্ধে এই একটী বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে যে তিনি যেভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহা তাহার শিক্ষার অনুরূপ নহে। তিনি মধ্যযুগের সাধুপুরুষের ন্যায় জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি নিচয় বড় প্রবল ছিল। অনেক সময় তাই তাঁহার কথায় ও কার্য্যে অসামঞ্জস্য দেখা যাইত। টাকার ব্যবহার

তিনি অনুমোদন করিতেন না, অথচ টাকা না হইলেও তাঁহার চলিত না; যেখানে যাইতেন, ভৃত্য টাকা বহন করিয়া তাঁহার অনুগমন করিত। ব্যক্তিবিশেষ সম্পত্তির অধিকারী হইবে এ রীতিরও তিনি অনুমোদন করিতেন না, সুতরাং তিনি তাঁহার পুস্তকের কপিরাইট প্রভৃতি সমস্ত স্বত্বস্বামিত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অথচ ঐগুলি সবই তাঁহার পত্নীকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কিন্তু তিনি স্বীয় শিক্ষার সহিত সাধনার সামঞ্জস্য দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে প্রত্যূষে চারিঘটিকার সময় তাঁহার স্ত্রীকে তিনি একখানি পত্র লিখিলেন এবং পাঁচ ঘটিকার সময় ইয়াসনা পলিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পত্র খানিতে এই কথাগুলি লেখাছিল, * * "আমার অন্বেষণে যাইও না, এমন কি আমার ঠিকানা জানিতে পারিলেও যাইও না। সেরূপ করিলে তোমার এবং আমার, আমাদের উভয়েরই অমঙ্গল হইবে, অথচ আমার মতের পরিবর্ত্তন হইবে না। * * * আমার যাহা কিছু দোষ হইয়াছে তাহার জন্য মার্জ্জনা করিও। এই ৪৮ বৎসর আমার সহিত জীবনযাপন করিয়াছ তজ্জন্য ধন্যবাদ। * * * * যদি আমায় পত্র লিখিতে চাও, সাশার হাতে উহা দিও সে আমাকে পাঠাইয়া দিবে। সে আমার ঠিকানা জানে, কিন্তু সে অঙ্গীকার করিয়াছে উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। * * *

টলষ্টয়ের সেক্রেটারী ডাক্তার মাকোভেজি তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। কন্যা আলেকজান্ড্রা এ বিষয় জানিতেন। ১১ই নভেম্বর সন্ধ্যাকালে টলষ্টয় সামার্দিন মঠে উপস্থিত হন। তাঁহার ভগিনী এই মঠে ব্রহ্মচারিণীর ব্রতধারণ করিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন। পরদিন অপরাহ্ণে আলেকজান্ড্রা হঠাৎ তথায় আসিয়া পিতাকে বলিলেন, তাঁহার পলায়নের সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য সকলে আসিতেছেন। সেই রাত্রেই টলষ্টয় কন্যাসহ মঠ হইতে প্রস্থান করিলেন। সম্ভবতঃ দক্ষিণ প্রদেশে তাঁহার যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, তাঁহাকে আপোষ্টোভোতে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে প্রাতে ছয় ঘটিকার সময় মানবলীলা সম্বরণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ছিল।

ঝুলন

(১)

শ্যাম কোলে ওই দোলে রাইকিশোরী
দুহুঁ দোঁহা আঁকড়িয়া রয়েছে ধরি।
রাই হাসে মধুহাস বদনে নাহিক ভাষ
উদ্দাম উড়িছে বাস বিহ্বল হরি।
শ্যাম কোলে ওই দোলে রাই কিশোরী।

(২)

আবেশ জেগেছে প্রাণে দুহুঁ চাহে দোহাপানে
রাই মুখে প্রেম গানে বাজে বাঁশরী,
পুলকে যমুনাজল বহি চলে কলকল
খসি পড়ে ফুলদল তনু আবরি।
শ্যাম কোলে ওই দোলে রাইকিশোরী।

(৩)

বহিছে মলয়বায় ঝর ঝর দেহ তায়
রয় বল ঘিরে হায় কেমন করি,
আনন্দে রয়েছে মাতি শ্যাম রাই দুহু সাথী
জোছনায় মধুরাতি গিয়াছে ভরি।
শ্যাম কোলে ওই দোলে রাইকিশোরী।

(৪)

প্রেমভরে দুইজনা ঝুলে সুখে আনমনা
সরমে মরম কথা পড়িছে ঝরি,
বসন উড়িয়া পড়ে লাজে রাই দুই করে
মাধবে জড়ায়ে ধরে সুখে শিহরি।
শ্যাম কোলে ওই দোলে রাইকিশোরী।

(৫)

প্রেমে ভরা সারা বুক উপজে অতুল সুখ
চুহুঁ চুমে দোঁহা মুখ লাজ পাসরি,
দুইজনে সারানিশি দোঁহা অঙ্গে আছে মিশি
হাসিতেছে দশদিশি কি শোভা মরি।
শ্যাম কোলে ওই দোলে রাইকিশোরী।

(৬)

ঘন কাল কেশরাশি বদনে পড়িছে আসি
ক্ষণতরে শোভারাশি যাইছে সরি,
নদীতীরে কুঞ্জবনে দুইজনে দোঁহাসনে
যাপে নিশি ফুল্লমনে সব পাসরি।
শ্যাম কোলে ওই দোলে রাইকিশোরী।

শ্রীসচ্চিদানন্দ সেন গুপ্ত

নন্দন-পাহাড়

[১০]

সুজাতাকে পাওয়া যে সত্যই একটা সৌভাগ্য, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আমি বুঝিতেই পারিতাম না, যে, এত দর্শন বিজ্ঞান যে ঘাটিয়াছে, সেক্সপীয়র কালিদাস কণ্ঠস্থ করিয়াছে, তাহার কাছেও ঐ অতটুকু একটি অর্দ্ধ-শিক্ষিতা বালিকাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাওয়া সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইবে কেন?

উহার নীলসাড়ীর বেষ্টনীর মধ্যে, উহার দোদুল্যমান কর্ণভূষার অন্তরালে, উহার লজ্জারক্তিম সুগৌর কপোলের কাছে কাছে, উহার নিবিড় সংসর্পিত কালো চুলের রাশির মধ্যে, উহার কালো চোখের গভীর দৃষ্টির মধ্যে, উহার হাস্যোজ্জ্বল অধরপুটের পাশে পাশে, এমন কি আকর্ষণ থাকিতে পারে, মোহিনী শক্তি থাকিতে পারে, যাহাতে হেগেল, কোমৎ ভুলায়, সেক্সপীয়র কালিদাস ডুবায়, আর্য্যভট্ট মোক্ষমুলর কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়?

কিন্তু এটা কোনও মতেই অস্বীকার করিতে পারিতাম না, যে ক্ষুদ্র একটা কপোলতিলকের মধ্যে সাদি হাফিজের সমস্ত মদিরা উজাড় করিয়া ঢালা থাকা একেবারেই অসম্ভব নহে; এবং কালোচোখের নিবিড় দৃষ্টিটুকুর ভিতরে সেক্সপীয়র কালিদাসও হারাইয়া যাইতে পারে!

জীবনের এতগুলি বৎসর শুধু কাব্যলক্ষ্মীর উপাসনা করিয়াই কাটাইয়াছি, এবং কাব্যলক্ষ্মী যে স্পর্শ দিয়া বারবার তাঁহার পদ্মহস্তে ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, আজ মনে হইতেছিল, সে সবই যেন একটা দীর্ঘ নীরস তপস্যার পর অদৃশ্য দেবতার কাছে শুষ্ক পার্থিব বর লাভ!

কিন্তু চরম আনন্দ ও মুক্তি যে শুধু দেবতার দর্শন লাভের মধ্যেই লুক্কায়িত, তাহা একবারও মনে হয় নাই!

আজ সমস্ত কাব্যের ও কবিতার আনন্দ ও রস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যখন সুজাতার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিল, তখন মনে হইল, এতকাল যে কাব্যলক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিয়াছি, সাধনা করিয়াছি, তাহার চরম সার্থকতার মুহূর্ত্ত আসিয়াছে, এবং কাব্যলক্ষ্মী বুঝি তাঁহার দুর্লভ অমৃত ভাণ্ড হস্তে লইয়া ঐ সুজাতার মূর্ত্তিতেই ধরা দিতে আসিয়াছেন!

আজ সবই যেন নবীন সবুজে নন্দিত হইয়া উঠিয়াছে! অদূরের ঐ নন্দন পাহাড়, দূরের ঐ ধূসর ডিগরিয়া, ত্রিকূট মাথা তুলিয়া আকাশের নির্ম্মল আলোক লেখাকে সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হাসিতেছে!

নীল আকাশে খণ্ড রঙ্গিন্ মেঘের এমন খেলা, এমন লাস্যলীলা, বুঝি, সৃষ্টির শুভ প্রভাতের পর, এই সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হইয়াছে! হরিৎক্ষেত্রের মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা পথগুলি, কোন্ দূর পল্লীর দিকে চলিয়া গিয়াছে! সে পথে যাহারা আসে, যাহারা যায়, তাহাদের বুকের ভিতরে যে আশা, বিস্ময়, পুলক, আনন্দ, স্ফুরিত হইতে থাকে, তাহা যেন আজ আর আমার কাছে অজানিত ইতিহাস নহে! তাহারা যেন আমারই পুলক, আনন্দ, বিস্ময়ের এক কণা কুড়াইয়া পাইয়াছে!

দূরে কে যেন সানাই বাঁশীটি বাজাইয়া বাজাইয়া আকাশ, বাতাস সঙ্গীতে সঙ্গীতে ভরিয়া দিতেছিল; কোথা হইতে মাদলের মাতালধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া বুকের ভিতরটা নৃত্যমুখর করিয়া তুলিতেছিল। পশ্চিমের পাগল

হাওয়া খোলা জানেলার পথে পুষ্পগন্ধে বহন করিয়া আনিতেছিল!

দূরে দূরে স্বপ্নপুরীর মতই, লাল, নীল, সাদা বাড়ীগুলি দেখা যাইতেছে; কে যেন নিপুণ হস্তে অঙ্কিত একখানি চিত্রপট মেলিয়া ধরিয়াছে। ঐ পুষ্পবিতানে ঘেরা বাড়ীগুলি আর যেন আমার কাছে শুধু ইট্ চূণ কাঠের সমষ্টিই নহে; উহাদেরও প্রাণ আছে, হৃদয় আছে! উহারাও যেন মানুষের মতই সুখ, দুঃখ, আনন্দ অনুভব করিতে পারে! প্রভাতারুণের নির্ম্মল আলোকে উহারাও যেন পুলকিত হইয়া জাগিয়া উঠে; কোমল, শুভ্র, শশাঙ্ক লেখায় ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্ন দেখে;—আবার মেঘমেদুর আনন্দবিহীন সন্ধ্যায় কাহার বিরহে ম্লান হইয়া উঠে!

কিন্তু ইহারা স্বপ্নরাজ্যের সমস্তখানি বিস্ময় ও পুলক নিঃশেষ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? ইহারা কাহাকে চাহে,—কি চাহে? আমার কাছেই বা কি প্রয়োজন ইহাদের?

আজ্ কার প্রভাতের আকাশ, বাতাস, চরাচর, এমন করিয়া রঙ্গিণ্ নেশায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছে কেন?—

ক্ষুদ্র কক্ষটীর মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। বাহির হইয়া আসিলাম। অজিত বারান্দার উপরেই দাঁড়াইয়াছিল। দুই হাত ধরিয়া তাহাকে একবার কোলের কাছে টানিয়া আনিলাম। সে তাহার বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল!

"বেড়া'তে যাচ্ছেন্ বুঝি দাদাবাবু?—আপনি রোজই বলেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন; কিন্তু রোজই ফাঁকি দেন; আজ্ আর ছাড়্ছিনে; দিদি আমাকে আজ সকাল সকাল তুলে দিয়েচে, এবং এই বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে থাক্তে বলেচে!—আজ্ আর আপনি আমায় না নিয়ে যেতে পার্চ্চেন্ না!"—বলিয়াই অজিত হাসিয়া উঠিল।

সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলাম, "তোমাকে ফাঁকি দেবার মতলব তো আমার একটুও নেই অজিত! বেলা আট্টার আগে তুমি বিছানা ছাড়্বেনা, তা' কেমন করে আমার সঙ্গে যাবে?"

"সে বুঝি আমার দোষ?—দিদি যদি আমাকে এম্নি রোজ সকালে তুলে দেয়, আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যেতে পারি। তা' সে তুলে দেয় না যে!"—অজিত তাহার ক্ষুদ্র অধর একটু প্রসারিত করিয়া, ঘাড় ফিরাইয়া একবার ঘরের দিকে চাহিল। খুব জোর দিয়া বলিলেও কথাগুলি যাহাতে তাহার দিদির কাণে না যায়, সে চেষ্টা অজিতের যথেষ্ট ছিল!

"যত দোষ হ'ল বুঝি তোমার দিদির?—তুমি যে ঘুমিয়ে থাক, ওঠ না, সেটা কিছু নয়,—কেমন?"—

"বাবে, দাদাবাবুর সে কথা! আমি তো ঘুমিয়েই থাকি, উঠ্ব কেমন করে? ঘুমিয়ে থাকি বলেই তো উঠিনে! জেগে থেকেও উঠিনে, এমনটা হলে, না হয় আমার দোষ দিতে পার্তেন! দিদি তো খুব ভোরেই ওঠে;—সে যদি আমাকে না জাগিয়ে দেয়, তবে দোষটা কার?—তার না আমার? তা' দিদি জাগাবে কি, তার তো কাজের অন্ত নেই; ভোরে সবার আগে উঠেই সে ফুল তুল্বে, ঘর সাজাবে, বাবার আহ্নিকের যারগা কর্বে—" হঠাৎ ফিরিয়া বাড়ীর দিকে চাহিয়া অজিত চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "দিদি ভাল হচ্ছে না কিন্তু, তুমি রোজই যে আমার দূরবীণ চুরি করে এনে ছাতে উঠে মজা করে সব দেখবে, তা' হচ্ছে না কিন্তু!"—অজিত বাড়ীর দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল, হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া রাখিয়া ছাতের দিকে চাহিলাম; ছাতের উপর সুজাতা ছিল; অজিত যে তাহাকে হঠাৎ দেখিয়া ফেলিয়া এমন বিশ্বাসঘাতকতাটা করিবে সে তাহা মনে করে নাই। এখন অজিতের অতর্কিত চীৎকার, শুনিয়া অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়া সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল!

অজিত হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল, "কেমন জব্দ! সে দিনও ঠিক এম্নি জব্দ হয়েছিল বৌদির কাছে। আপনাকে বলিনি সব, দাদাবাবু! ঐ মন্দির থেকে আস্বার পরদিন। নন্দনপাহাড় থেকে আপনি নেমে আসছিলেন, দিদি দূরবীণ হাতে সব দেখ্ছিল,—আর ঠিক তেম্নি সময়ে বৌদি' এসে পড়্লেন। ও তো দূরবীণ্ ফেলে দিয়ে ঠিক এম্নি করে ছুটে পালাল,—সে এম্নি ছুট্, একেবারে পড়ে কি মরে!—কি জব্দ!"—অজিত আবার হাসিয়া উঠিল!

অজিত আমাকে সেদিনকার প্রত্যেকটি কথাই বলিয়াছিল বটে, এবং এমন অনেক খবরই আমি অজিতের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতাম, যাহা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

কাছে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ও তুচ্ছ হইলেও আমার কাছে বড় অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান্।

"কিন্তু দিদি তার অভ্যাস ত কিছুতেই ছাড়বে না; সকাল বেলা দুব্বীণ নিয়ে যে ছাতে উঠবে তা' উঠবেই।"

অজিতের প্রত্যেকটা কথা যেন আমার বুকের মধ্যে এক একটা ফুলের মতই ফুটিয়া ফুটিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে ছিল; নিজের কল্পনার অনুরূপ কত অর্থই মনে আসিতেছিল!

সুজাতা কবে কি করিয়াছিল, কবে কি বলিয়াছিল, অজিত অনর্গল তাহাই বকিতে বকিতে পথ চলিতেছিল। অজিত কিন্তু বিন্দুবিসর্গও জানিত না, যে, তাহার মত বালকের প্রত্যেকটি কথাও একটা বিচিত্র স্বপ্নলোক গঠন করিয়া তুলিতে পারে!—

[১১]

বাসায় ফিরিয়া আসিতে বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল।

বৌদিদি কহিলেন, "বাপ রে, এমন দস্যি ছাড়া বেড়ানও আমি আর দেখিনি'; এত রোদ লাগিয়ে অসুখ করবে না?"—

বৌদিদি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং হাঁটিয়া বারান্দা পর্য্যন্ত আসিতে পারিতেন।

"ওরে সুজাতা, অজিতকে আর ঠাকুরপোকে কি তৈরী করেছিস্, এনে দে ত! আহা, ছেলেটার মুখ চোখ রাঙ্গা হয়ে গেছে। ছেলেমানুষ, ও কি পারে এই রোদ্দুরই রোদ লাগাতে!—" অজিতকে সস্নেহে কাছে টানিয়া নিয়া বৌদিদি বাতাস দিতে লাগিলেন

"আমার কিছু কষ্ট হয় নি তো বৌদি;—আজ চোল পাহাড়ে গিয়েছিলাম,—সে কি পাহাড়,—আমি ভেবে ছিলাম, যেন কতই উঁচু হবে;—তা' বৌদি, সে কি পাহাড়, তুমি যে গোবর্দ্ধন পাহাড়ের কথা বলে থাক, তেম্নি হবে। একটু বেশী গায়ে জোর থাক্‌লে শেষ হয় তুলে হাতের উপর রাখা যায়।—অমন পাহাড় জান্‌লে আমি কখখনই দেখতে যেতাম না! তা' ওর চেয়ে আমাদের নন্দন পাহাড়ই ভাল; দাদাবাবু তো ছাড়বে না"—অজিত আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ওরে পাগল, বাঙ্গ্‌লার মাটীতে একটা ঢিবিও দেখিস্‌নি,—তবু ও ওটা তোর গায়ে লাগ্‌ল না; আচ্ছা; তোকে একদিন ত্রিকূট পাহাড়ে নিয়ে যাব; গাড়ী করে যাওয়া যাবে;—বৌদি', তুমি একটু শক্ত হয়ে উঠ্‌লেই যাব,"—

"সুজাতাকে বুঝি নিয়ে যাবে না, ঠাকুরপো?"—বৌদিদির মুখে একটু হাসি পলকের জন্য উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অজিত বলিয়া উঠিল, "না, দিদিকে আর নিয়ে কাজ নেই; ও মন্দিরে ঢুকতেই মূর্চ্ছা যায়, ত্রিকূট পাহাড়ের নীচে হয়তো ওকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।"—

সুজাতা খাবার নিয়া আসিতেছিল, অজিতের কথাগুলি শুনিয়া তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তার পর একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে অজিতের মুখের দিকে চাহিল।

"ও সব আমি ভয় করিনে,—তুমি বাপু যে মেয়ে, তার পরিচয় সেদিনই পাওয়া গেছে! ভালকথা, বৌদি, চোল্ পাহাড় থেকে একটা নতুন জিনিস এনেছি,"—কথা শেষ না করিয়াই অজিত ছুটিয়া বাহিরের বারান্দায় গেল; এবং প্রকাণ্ড একটা পুঁটুলি দুই হাতে টানিয়া আনিয়া বৌদিদির পায়ের কাছে ধুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল!

—"কিরে, ও?"—

"এগুলি দিয়ে মোরব্বা তৈরী করে দেবে কিন্তু, বৌদি." পুঁটুলি খুলিয়া অজিত তাহার উড়ানী খানা টানিয়া লইল; একরাশি বেল সমস্ত ঘরে গড়াইতে লাগিল।

"ওরে পাগল, তুই গোবর্দ্ধন ধারন না করতে পার্‌লেও গন্ধমাদন যে ভেঙ্গে আন্‌তে পারিস্ তা'তে আর কোনও সন্দেহই নেই!"—

বৌদিদির কথাটার অর্থ গ্রহণ করিবার কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া অজিত কহিল, "সে এত বেল গাছ পাহাড়ের উপর হয়ে রয়েচে, বৌদি', তোমাকে আর কি বল্‌ব! কিন্তু বেলগুলি সবই ভারি ছোট ছোট; গাছগুলি খুব নীচু, হাত বাড়িয়ে বেল পাওয়া যায়!"—

চাকরটাকে ডাকিয়া বৌদিদি কহিলেন, "ওরে বেলগুলি কুড়িয়ে ঐ চুবড়িটাতে রাখ্‌তো!—সুজাতা খাবার রেখে পালিয়েচে! তোমরা খেয়ে নাও, এর পর আর কত বেলায় ভাত খাবে?"—

খাবার খাইতে খাইতে অজিত কহিল,—"বৌদি, আজ আমরা আরও একটা নতুন বাড়ীগায় গিয়েছিলাম"—

—"কোথায় রে ?"

"ওই কম্পাস্ টাউনে, সেই ভদ্রলোকদের বাসায়; যিনি মন্দিরে সেদিন দাদাবাবুকে কত সাহায্য করে ছিলেন"—

—"সত্যি নাকি ?"—

"হুঁ,—তাঁরা আজ বিকেলে এখানে আস্‌বেন যে!"

—"তাঁরা!—কে কে আস্‌বেন রে ?"

আমি হাসিয়া কহিলাম,—"সে বাসার সবাইই আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বেন;—মেয়েরাও নাকি আস্‌বেন, অতুলবাবু বল্‌লেন,"—

"ওমা, তাই নাকি ? তবে তো কিছু খাবার তৈরী করিয়ে রাখ্‌তে হয়;—ও সুজাতা, সুজাতা!"—.

মুখের ভিতরে খানিকটা খাবার গুঁজিয়া দিতে দিতে অস্পষ্টস্বরে পেটুক অজিত কহিল, "কি কি তৈরী কর্‌বে বৌদি'? তোমার সেই রসপুলিটা কিন্তু ভুলোনা!"—

"ওরে পেটুক ছেলে, তুমি কতটা রসপুলি খেতে পার, তা' আমি একদিন দেখ্‌ব!—"

অজিতের মুখের খাবার ফুরাইয়াছিল, সে উৎসাহপূর্ণ মিনতির কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "একদিন আর কেন ? আজই দেখ না, বৌদি'! আজকাল দিনটাও খুব ভাল দিন।—আমি পাঁজিতে দেখেছি "অলাবু ভক্ষণ" নিষেধ, কিন্তু রসপুলি ভক্ষণ নিষেধ লেখেনি তো!—আচ্ছা, দাদাবাবু, "অলাবু"টা কি ?—"

অজিত তাহার এম্, এ, পাশ-দিগগজ দাদাবাবুকে যে কথাটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, তাহার অর্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট কোনও কেতাবের মধ্যে পাওয়া যায় কিনা, একবার মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিলাম; কিন্তু বিস্তর লাটীন্, জার্ম্মাণ্ শব্দের অর্থ খুঁজিয়া পাইলেও, "অলাবু"র অর্থ তো কোথায়ও পাইলাম না।

বৌদিদি কিন্তু ততক্ষণ আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ সুজাতা সেখানে ছিল না।.

কাহারও পরিবর্ত্তে একদিনের জন্ত কোনও স্কুলে নূতন শিক্ষকতা করিতে গেলে প্রথমদিন দুষ্ট ছেলের হাতে পড়িয়া যেমন শিক্ষক বেচারীকে একেবারে নাকাল হইয়া উঠিতে হয়, আমারও অবস্থাটা কতকটা তেমনি হইয়া উঠিল!

বৌদিদির নিষ্ঠুরতার সীমা ছিল না; একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওরে অজিত, ওসব এম্, এ, পাশের বিদ্যেয় কুলাবেনা। তুই তোর দিদির কাছে জিজ্ঞাসা করিস, সে বল্‌বে।"—

আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া বোধহয় অজিতের দয়া হইল, সে চট্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "সে কথার অর্থ এম্, এ, পাশের বিদ্যেয় কুলোবেনা, তা আমি জান্‌তে যাব বুঝি দিদির কাছে? তুমি তো খুব বল্লে, বৌদিদি!"—অজিত হাসিতে লাগিল।

রেকাবীতে একটা ক্ষীরের সন্দেশ ছিল, ভারি খুসি হইয়া তাহা অজিতের রেকাবীতে তুলিয়া দিয়া কহিলাম, 'ঠিক কথা অজিত। তোর এম্, এ, পাশ কর্‌তে কোনোদিনই "অলাবু"র অর্থ দরকার হবে না, এবং তুই স্বচ্ছন্দে পাশ করে যেতে পারবি।—এই আমি তোকে বর দিলম্।"—

সন্দেশটা মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিল "আচ্ছা, বৌদি' তোমার 'অলাবুর' চেয়ে, এই ক্ষীরের সন্দেশ রসপুলি অনেক ভাল নয় কি ?"—

"অলাবু জিনিষটা কি তাই জানলিনে, তার ভাল কি মন্দ কেমন করে বুঝ্‌বি ?"—

"আরে "ভক্ষণ নিষেধ" লিখেচে, তবু পাঁজির পাতা কেউ ছিঁড়ে ফেলেনি, তা'তেই বুঝ, ওর চেয়ে এ গুলি ভাল। আর দেখেচ তুমি, দুধ দিয়ে তৈরী কোনও খাবার, পাঁজিতে 'ভক্ষণ নিষেধ' লিখেচে! আরে পাঁজি যে তৈরী করে তারও তো কোন্ খাবারটা ভাল, কোনটা মন্দ তা' জ্ঞান আছে? মনে কর কেউ যদি "ক্ষীরের সন্দেশ ভক্ষণ নিষেধের" দিনে একথাল ক্ষীরের সন্দেশ হাতে দিয়ে বসে তা' হ'লে সে বেচারা কি কর্‌বে বল দেখি ?"—

কথা বলিতে বলিতে অজিত তাহার খাবারের শূন্য রেকাবীর উপর আর একবার হাত বুলাইয়া লইল, কিছু হাতে ঠেকে কি না! .

বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "সবাইতো আর তোর মত পেটুক নয়রে, অজিত! তা' তোকে আর দুটো মিষ্টি দেব ?"—

লুব্ধ অজিত কহিল, "ভোজনের আর ওজর কি

বৌদি'?—নিয়ে যদি তুমি খুসি হও, আমি কেন আপত্তি করে তোমার মনে কষ্ট দেব, তাই বল।"—

অজিতের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

এই লোভী ছেলেটী অল্পদিনের মধ্যেই বৌদিদির প্রচুর স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। চিরদিনই বৌদিদির কাছে পেটুকের আদর যথেষ্ট! অজিত সময়ে অসময়ে নানা আবদার করিয়া বৌদিদির সমস্ত স্নেহটুকু, আদরটুকু অধিকার করিয়া লইতেছিল!

এই সন্তানহীনা নারীর ক্ষুধিত অন্তর একটা ছোট ছেলেকে বুকের কাছে রাখিয়া লালন করিবার জন্যই যে একান্ত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম।

বিকালের দিকে অতুলবাবুদের গাড়ী ফটকের কাছে আসিয়া থামিতেই অজিত ছুটিয়া যাইয়া গেট্ খুলিয়া দিল। অজিতের সঙ্গে অতুলের স্ত্রী ও সুজাতার সমবয়সী একটী কিশোরী ভিতরে আসিলেন। এতক্ষণ প্রাঙ্গনের এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম; এখন অগ্রসর হইয়া অতুল বাবুদের কাছে গেলাম। অতুলবাবুর সঙ্গে আর একটী যুবক ছিলেন।

নমস্কার প্রত্যর্পণ করিয়া হাসিমুখে অতুলবাবু কহিলেন, "এটী আমার ছোট ভাই অনিল; আস্‌ছেবার এম্, এ, দেবে"—

আমি অনিলকে নমস্কার করিয়া কহিলাম, "উনি যে আপনার ছোট ভাই, তা' বল্‌বার আগেই বুঝ্‌তে পেরে ছিলাম; আপনাদের চেহারার মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশী রয়েচে যে,"—

কথা বলিতে বলিতে বারান্দার সিঁড়ির উপরে উঠিতে-ছিলাম; হঠাৎ চাহিয়া দেখিলাম, দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া বৌদিদি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভিতরেও মেয়েদের চাপা হাসির শব্দ শুনা যাইতেছিল!

বিস্মিত দৃষ্টিতে বৌদিদির মুখের দিকে চাহিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আ আমার কপাল, এই তোমার অতুল-বাবু!—আমার তখনি মনে মনে সন্দেহ হয়েছিল; তা' কেমন করে বুঝ্‌ব যে ওরা এখানে এসেচে।"—

অতুল ও অনিল বৌদিদির কথা শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, এবং দুই লাফে সিঁড়ি পার হইয়া বারান্দার উপর উঠিল! বিস্মিতকণ্ঠে অতুল কহিল, "সে কি, ইন্দিরা, দিদি, তুমি এখানে?"—

অতুল ও অনিল উভয়েই বৌদিদিকে প্রণাম করিল। তিনি অনিলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ও কি অতুল, তুই যে আমাকে প্রণাম করলি? ছেলেবেলায় মার সঙ্গে যখন মামাবাড়ী যেতাম, তখন বিজয়ার দিনও তো তোর কাছ থেকে একটা প্রণাম আদায় কর্ত্তে পারি নি'! বয়সে সাতদিনের বড় বলে আমি তোর কাছ থেকে গুরুজনের সম্মান যতই আদায় করে নিতে চাইতাম, তুই ততই বেঁকে বস্‌তি,—মনে আছে সে কথা? দিদি বলেও তো কোনো দিন ডাক্‌তে চাইতি না।"—

—"ছেলে বেলায় কি গোঁয়ার ছিলাম, তা' বুঝি তুমি ভুলে যাওনি ইন্দিরা দি'?"—

বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "ছাখ্, আমার এই ছেলের মত দেবরের সাম্‌নে আমার নামটা আর নিস্‌নে। তুই তো এখন বড় সড় হয়েছিস্, আমিই না হয় সাতদিনের দাবী ছেড়ে দিয়ে তোকেই অতুলদা' বলে ডাক্‌ব!"—

তারপর তেমনি হাসি মুখে আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি তো অবাক্ হয়ে গেছ, ঠাকুর পো! এরা যে আমার মামাত ভাইরা!—ওমা, ওরা এতদিন এখানে রয়েচে, তা' ঘুণাক্ষরেও জানিনি!—কিন্তু তোমাদের ইংরিজি আদব কায়দা এমনি করে হাত পা বেঁধে দেয়, যে, একটু ভাল করে পরিচয়টা নেবে তারও ক্ষমতা থাকে না। ছাই ও নিয়মে না চলে, আমাদের দেশী নিয়ম মেনে চল্‌লেই হয়;—পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাত পুরুষের খবর টের পাওয়া যায়!"

"তা' বল্‌তে পার বৌদি', ও কেমনই আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, বেশী পরিচয় নেওয়াটা আর ঘটেই ওঠে না।"

অনিল ধীরে ধীরে কহিল, "অনেক দিনের একটা কথা মনে হচ্ছে, ইন্দিরা দিদি!—কলেজে আমাদের সঙ্গে হীরা-লাল বলে একটী ছেলে পড়্‌ত; ক্লাসে রাজেন্ বলে আর একটী ছেলের সঙ্গে তার খুব খাতির হয়। প্রায় ছ'মাস পরে একদিন মেসের ঘরে হীরালাল মুখ ভার করে বসে রয়েচে দেখ্‌লাম! বোধ হয় কাঁদ্‌ছিল;—অনেক জিজ্ঞাসা-বাদ করে জান্‌লাম, ঐ রাজেন্ হীরালালের বৈমাত্রেয় ছোট

ভাই, এবং এতদিন পরে বাড়ীঘরের খোঁজ নিতে যেয়ে সব বেরিয়ে পড়েচে ;—তাই হীরালাল কাঁদ্‌ছিল !"—

"কুলীন বামুনের ছেলে বুঝি ?"—

"হাঁ, তাইই—গোড়াতেই যদি বাপের নাম জিজ্ঞাসা কর্‌ত তা'হলে এমনটা হতে পার্‌ত না,"—

সবলেই খুব খানিকটা হাসিয়া লইল।

"আমি ত আগে কিন্তু বুঝিনি ;—বৌ ঘরে এল, তাকে দেখেই আমার মনে হ'ল, এর মুখ আমার জানা ; কিন্তু সেই তোর বিয়ের পর তিন চার দিন ছাড়া তো ওকে আর দেখিনি, চার পাঁচ বছরে চেহারাও অনেকটা বদ্‌লে যায়,—বিশেষ মেয়েদের চেহারা ;—কিন্তু ওর ড'ান্ গালের ছোট্ট তিলটা দেখে, আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল, তা'ও দূর হ'ল। তখন আরও নিঃসন্দেহ হব বলে দোরের পাশে এসে দাঁড়ালাম।—ওমা দেখি, আমারি শ্রীমান্ ভাইরা !"—

অজিত একটু এদিক্ ওদিক চাহিল, তারপর বৌদিদির একেবারে কোলের কাছে সরিয়া গিয়া কহিল, "তোমার যে শ্রীমান্ ভাইদের বাজার বসে গেল, বৌদি' !"——

—"এবং তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী শ্রীমান্, আমার এই ছোট্ট অজিত ভাইটি !"—অজিতকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বৌদিদি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

কিন্তু অজিত একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রবল আপত্তি জানাইয়া কহিল, "বারে, আমি বুঝি হ'লাম ছোট্ট অজিত ! — সেদিন সায়েবের বাসায় গেছ্‌লাম, সায়েব আমার হাত ধরে খুব নেড়ে দিয়ে বল্‌লে, 'বাঃ, অজিত, তুমি এ দুমাসে খুব বড় হয়ে উঠেছ যে !'—সত্যি বৌদি, যখন প্রথম দেওঘরে আসি, তার চেয়ে আমি ডবল বড় হয়ে উঠেচি কি না, আচ্ছা বলনা কেন ?"—অজিত তাহার পাঞ্জাবীর আস্তিন্ টানিয়া সুপুষ্ট হাতটা বৌদিদির দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বৌদিদি আর একবার অজিতের মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন, "ষাট্ আমার বাছা, শরীর ভাল হয়েচে কইরে তোর অজিত ? ক'দিন অসুখ হয়নি, এই যা।"—

—"পার্‌লেনা বুঝি প্রাণ ধরিয়ে বল্‌তে ? সেদিন মেমসায়েবের ছোট মেয়েটাকে টেনে কোলে নিতে গেছ্‌লাম, মেমসায়েব হেসে বল্‌লে, ওকে তুমি কোলে তুল্‌তে পারবে না, অজিত, ও বড্ড ভারি আছে !"—

অজিতকে থামাইয়া দিবার জন্য বৌদি'দি কহিলেন, "তোর মেমসায়েবের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পারিস্, অজিত ? তা'হলে তার বড় মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধটা স্থির করে ফেল্‌তাম।"—

সেখানে যে আরও কয়েকজন নবাগত ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন, সে কথাটা মনে করাইয়া দিবার জন্য অজিত একবার বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া দ্রুত ইঙ্গিত করিল ; তার পর ব্যস্তকণ্ঠে কহিল,—"মেম সায়েব তো তোমার কথা খুব জিজ্ঞেস্ করেন, বৌদি' !—হয়তো এখানে একদিন এসে তোমাদের দেখেও যেতে পারেন ;—বল্‌ছিলেনও একদিন তাই।"

—"না বলে কয়ে বুঝি হঠাৎ তাঁদের নিয়ে আসিস্‌রে অজিত !"—

"তুমিও যেমন বৌদি', মেম এল আর কি তোমার বাসায়,—"

"সত্যি দাদাবাবু, হয়তো মেম্ একদিন আস্‌বেন, নন্দন পাহাড় দেখ্‌তে তো একদিন আস্‌বেনই ; সে দিন যদি আমরা অনুরোধ করি অবিশ্যি এখানে একবারটী আস্‌বেন।"

অনিল কহিল, "তা' অসম্ভব কিছু নয় ; এরা আইরিস্‌ম্যান্ ; নূতন এখানে এসেচেন, বাঙ্গালীদের সঙ্গে একটু মেলামেশার ইচ্ছেও আছে। বেশ ভাল লোক, সবাই ত বলে। তা' অজিতের সঙ্গে এত খাতির হ'ল কি ক'রে ?"

তখন বৌদিদি অজিতের সঙ্গে সাহেবের কেমন করিয়া পরিচয় হইল, সবটা খুলিয়া বলিলেন।

"সাহেবের বাড়ীতেও রোজই একবার যে যাবে তার বাধা নাই। মেম সায়েবের একটি ভাই আছে, ওরি এক বয়সী ; তার সঙ্গে পাঞ্জাকষা, ঘুসাঘুসি করা, ওর নিত্যিকার কাজ ; ভারি সুন্দর ছেলেটী, কতদিন এ বাসায় এসেছে ; আমি খাবার কিছু দিলে খেতেও আপত্তি করে না।"

"বৌদিদি এল্‌বার্ট কাল আমার কাছে কি বলেছে জান ?"

"কিরে, অজি ?"—বৌদিদি স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"সে যে নিষেধ করে দিয়েচে, বৌদি' ! একদিন সে নিজেই বল্‌বে বলেচে।"—

"তবু তোর কাছে শুনিই না, কি এমন কথাটা।"

অজিত তখন বৌদিদির কাণের কাছে মুখ নিয়া গোপনে যে কথাটী বলিল, তাহা আমরা প্রত্যেকেই শুনিতে পাইলাম।

"এই রে, গেল বৌদিদির আর একটী ভাই বেড়ে! এতগুলি ভাইয়ের আবদার অত্যাচার একা সহ্য করে উঠ্‌তে পারলে হয়!"

চাহিয়া দেখিলাম, বৌদিদির চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু একটা প্রসন্ন-তৃপ্তি সমস্ত মুখখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "যিনি দেওয়ার মালিক, তিনি দুই হাতেই ঢেলে দেন,— এতটুকুও কৃপণতা করেন না ত! কিন্তু বুদ্ধির দোষে আমরাই সব নষ্ট করে ফেলি যে! ভাই পাওয়ার চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে, ঠাকুরপো? যে বোনের এতগুলি ভাই পাওয়ার সৌভাগ্য হয়, সে ত সীতাদেবীর মতই ভাগ্যবতী, তবু তিনি তো—শুধু এক লক্ষ্মণকেই পেয়ে ছিলেন।"

আমরা কেহই যে লক্ষ্মণ ঠাকুরের পায়ের ধূলার উপযুক্তও নই, সে কথাটা বৌদিদিকে বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িল।

দুই একজন মানুষের মুখের চেহারার ভিতরে মাঝে মাঝে, এমন একটা কিছু ফুটিয়া উঠে, যাহাতে, তর্ক প্রতিবাদ যাহারা করিতে চাহে, তাহাদের একেবারে নির্ব্বাক্ করিয়া দেয়।

আমিও বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া কোনও কথা বলিতে পারিলাম না।

মনে হইল, এই অত্যন্ত স্নেহশালিনী নারীর ভাণ্ডার উজাড় করিয়া শুধু স্নেহের দাবী করাই চলে; কোনও তর্ক প্রতিবাদ করা যেন একেবারেই চলে না!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদিদি কহিলেন, "ভাল কথা অতুল, বিদ্যুতের বিয়ের কি করছিস্ রে? ও তো বেশ বড় হয়ে উঠেচে যে।"

"কই কিছু তো করে উঠ্‌তে পারি নি; আজ কালকার দিনে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি ব্যাপার, তা'ত জান ইন্দিরা দি!"—

"সত্যি অতুল, আমি অনেক সময়েই ভাবি যে পোড়া দেশে এ কি প্রথাই ঢুকেছে। এমন সব মেয়ে যাদের বিয়ের জন্যে সেকালে কর্ত্তাদের এতটুকুও ভাব্‌তে হত না, আজ নাকি দেশটা শিক্ষা পেয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, তবুও এই সব লক্ষ্মীর মত মেয়েদের বর জোটানো কত বড়ই দায় হয়ে উঠেছে। শুধু টাকার জোরে কত মেকি চলে যাচ্ছে। কিন্তু খাঁটি সোণা যাচাই করে ক'জন নিতে চায়?"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৌদিদি অনিলও আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, "এই ইংরিজি শেখার সব চেয়ে বড় দোষই হয়েচে, এই, যে, প্রত্যেক মানুষ নিজেকেই বড় করে দেখ্‌তে চায়, কিন্তু নিজেকে বড় করে দেখ্‌তে গেলেই যে সব চেয়ে আগে নিজের স্বার্থটাই বড় হ'য়ে ওঠে, সেটা হিসাব করে দেখ্‌তে কেউই চায় না!

"ঠিক্ কথা বৌদিদি,—কৌলীন্যের জন্য কিছু মর্য্যাদা কর্ত্তারা সেকালে নিতেন বটে; কিন্তু সে দাবীটা একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যেত; কার কাছে কি প্রাপ্য হবে, সেটা ঠিক্ হিসাব করে ধরে দেওয়া ছিল; কেউ তা ছাড়িয়ে যেতেও চাইত না,—চাইলেও সমাজ তা' সহ্য করত না। এখন তো আর তা' কিছু নেই, এখন শুধু স্বার্থের দিক্ দিয়েই হিসাবটা তৈরী হয়ে উঠ্‌চে কাজেই এ সব স্বার্থের দাবী বেড়েই চল্‌বে!"—

অনিল কহিল, "হাঁ, বাড়বেই বটে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। নুন জলের ভিতর ফেললে গলেই থাকে; কিন্তু এমন একটা সময় আছে, যখন ক্রমাগতই ফেল্‌তে ফেল্‌তে নুনও আর গলে না! সমাজের যখন সেই অবস্থা দাঁড়াবে তখন এসব বন্ধ হয়ে আস্‌বে।

অতুল কহিল, "সে অবস্থা আস্‌বার এখনও অনেক বিলম্ব আছে বলে মনে হয়;"—

বৌদিদি একটু হাসিয়া কহিলেন, "খুব বেশী বিলম্ব আছে বলে মনে হয় না। আট বছরে গৌরীদান এখন আর হয় না। এখন এই সব গৌরীদের ষোল সতের বছরের আগে আর দান করা ঘটে উঠ্‌ছে কই?"

অনিল কহিল, "এর পর মেয়েরা যখন এই অপমানটাকে বেশ্ অনুভব কর্ত্তে শিখ্‌বে, তখন তা'রা যা'তে অপমান থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে তা'রি উপায় খুঁজবে!"—

—"এই তোমার স্নেহলতার মত ?"—অতুলের কথা শুনিয়া অনিল একটু সোজা হইয়া বসিল। তারপর বৌদিদির মুখের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "না, স্নেহলতার ব্যাপারটা আমি কোনদিনই ভাল বলে মনে করি নি,' - তবে কোন্ উপায়ে মেয়েরা নিজেদের সম্মান বজায় রাখ্‌বে, তা' তারা নিজেরাই ঠিক্ করে নিতে পারবে।"—

এতক্ষণ বৌদিদি শূন্যদৃষ্টিতে নন্দনপাহাড়ের দিকে চাহিয়াছিলেন, এখন অজিতের মাথাটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "ঠাকুরমাদের কাছ থেকে বাঙ্গলার মেয়েরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পুড়ে মরবার শক্তি বোধ হয় কিছু কিছু পেয়েছিল, কিন্তু তাঁর অপব্যবহার ঐ স্নেহলতা যেমন করেছে, এমন আর একালে কেউ করেছে বলে শুনিনি!—ওতো মরেছেই, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার মেয়েগুলিকে অমন কলঙ্ককর মরবার পথটা দেখিয়ে দিয়ে সভ্য-জগতের কাছে অত্যন্ত ছোট করে দিয়ে গেছে। 'ওটা যে মোটেই ভাল হয়নি, তা' প্রমাণ হয়ে গেছে! বাঙ্গালীর ঘরের হতভাগীদের মরবার এই অন্যায় নেশা দেখে।"—

অতুল কহিল, "আমার মনে হয়, এ ব্যাপারটা যে, এতটা ছড়িয়ে পড়েচে, তার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী ঐ সংস্কারক ভায়ারা; হিন্দু-সমাজকে একটা গ্লানি দেবার জন্যেই এটাকে তাঁরা সে সময়ে ভারি উঁচু করে ধরেছিলেন। মরবার পরও অতটা বাহবা পাওয়ার মধ্যে একটা মস্ত প্রলোভন লুকিয়ে আছে! আমি জানি একটি ভদ্রঘরের বধূ স্নেহলতার ব্যাপারের পর কেরোসিনে পুড়ে মরেছিল; কিন্তু সে যে চিঠিখানা রেখে গিয়েছিল, তার মধ্যে পুনশ্চ দিয়ে অনুরোধ করা ছিল যে, ঐ চিঠিখানাকে যেন খবরের কাগজে ছেপে দেওয়া হয়! তার দুঃখ-কষ্টের যথেষ্ট কারণ ছিল, জানতাম, সে জন্য তার পুড়ে মরার খবর পেয়ে, সমস্ত অন্তরটা তার' জন্য ব্যথায়, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণও হয়ে উঠেছিল; কিন্তু ঐ চিঠিটা পড়েই আমার হরিভক্তি চটে গেল।—খোঁজ করে দেখ, এরা যে মরে, তার পোনে ষোল আনাই একটা কল্পিত দুঃখ গড়ে নিয়ে পোষণ করতে থাকে, তারপর একদিন নভেলীয়ানার চূড়ান্ত করে দেয়!"—

'দাদার সমালোচনার মধ্যে মায়া দয়া একটুও নেই;—সবাই কি নভেলীয়ানা করে? মরবার যথেষ্ট কারণও থাকতে পারে ত—"

অনিলের কথা শুনিয়া অতুল কহিল, "আত্মহত্যা করবার আবার কারণ?—তুই যে অবাক্ করলি, অনিল! ও যারা করে, কাপুরুষ বলেই করে!—" "পৃথিবীতে অনেক বড় লোক আত্মহত্যা করেছে দেখা যায়,—"

"তাদের আমি বড়লোক বলিনে; যারা ইহকাল সর্ব্বস্ব পরকাল মানে না, ভগবান্‌কে উড়িয়ে দেয়, তারাই ও করতে পারে!

নেপোলিয়া পৃথিবীর খুব একটা বড়লোক ছিলেন, মানবে ত?—আত্মহত্যা করবার তাঁর যেমন যথেষ্ট কারণ হয়েছিল, অমন কটা লোকের হয়? তবু তিনি আত্মহত্যা করেননি! ম্যারেঙ্গো, অষ্টার্লিজে তাঁর যে বীরত্ব ফুটে না উঠেছিল, তা' ফুটেছিল তাঁর ঐ আত্মহত্যা না করায়; তিনি যদি আত্মহত্যা কর্ত্তেন্ তা' হলে তাঁর জীবনব্যাপী সমস্ত বীরত্বের উপরেই কলঙ্ক কালিমা লেপন করে দিয়ে যেতেন।"

বৌদিদি একটু হাসিয়া বাধা দিয়া—কহিলেন, "ওরে তোরা দু'ভাই এখনো তেম্‌নি তার্কিক আছিস্ যে! তর্ক করতে আরম্ভ করলে ত জ্ঞান থাকত না; সেই কত বছর আগেও ঠিক এম্‌নিটী ছিলি!"

পিসিমা এতক্ষণ ভিতরে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে-ছিলেন, এখন বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "ও বৌমা, তোমাদের কথা যে আর ফুরায়ই না। ওদের কিছু খেতে দেবে না?"

বৌদিদি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কতদিন পরে ভাইদের পেয়েচি পিসিমা, তাই আর সব ভুলে গেছ।"—

অতুল ও অনিল পিসিমাকে প্রণাম করিল। পিসিমা তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন, "চিরজীবী হও,—সুখী হও।"—

বৌদিদি কহিলেন, "এর নাম অতুল, ও আমার সাত দিনের ছোট,—ও হাইকোর্টে ওকালতী করে; আর এটী ছোট অনিল, এম্, এ, দেবে!"

"আহা, বাপ্ নেই, কেইবা বাছাদের সুখ দেখে, তাল হয়েছে শুনে আহ্লাদ করে! তা' আশীর্ব্বাদ করি মার কোল জুড়িয়ে থাক, কোনো দিন দুঃখ কষ্ট পেও না,"—

অতুল ও অনিল পিসিমাকে আর একবার প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে অতুলরা চলিয়া গেল। চলন্ত গাড়ী হইতেও মুখ বাহির করিয়া অতুল ও অনিল তাহাদের বাসায় কবে যাইব সে তারিখটা বার বার মনে করাইয়া দিতে লাগিল।

গাড়ীতে উঠিবার সময়ে এবং গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া যখন কথা বলিতেছিলাম তখন বিদ্যুৎকে দেখিলাম।

এই বিদ্যুৎ!—হাঁ, সুন্দরী বটে! এমন সুন্দরী যে কোনও স্ত্রীলোক হইতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না। এমন তীব্র সৌন্দর্য্য আমি আর দেখি নাই।

তীক্ষ্ণধার তরবারির মতই শাণিত এই উজ্জ্বল রূপের উপর চক্ষু পড়িলেই দৃষ্টি ঝলসিয়া ফিরিয়া আইসে!

গাড়ী চলিয়া যাইতেই বাসার দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সিঁড়ির উপর সুজাতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের পাশ দিয়া ঘুরিয়া গাড়ী চলিয়া যাইতেছিল। গাড়ীর জানেলা দিয়া একখানি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত হাস্যোজ্জ্বল মুখের পাশে আর একখানি অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ দেখা যাইতেছিল।

সে মুখ বিদ্যুতের; দীপ্ত-শিখার মতই উজ্জ্বল!—ফিরিয়া সুজাতার দিকে চাহিলাম।

মনে হইল, শরতের নির্ম্মল, কোমল জ্যোৎস্না মূর্ত্ত হইয়া সিঁড়ির উপর নামিয়া আসিয়াছে! দেখিলে চক্ষু তৃপ্ত হয়; ঝলসিয়া যায় না!

আমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুজাতা তাহার নিবিড় মেঘতুল্য চুলের রাশি দুলাইয়া মৃদু হাস্যোজ্জ্বল মুখে, দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল!—

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

বিলাসিনী

বিশ্রামটাও কাজের অঙ্গ সেটাই বড় কাজ।
তোমার,—বাজে কাজের জন্য আছে মা ভগিনী ভাজ
কুলীর দ্বারা যে কাজ চলে
সে কাজ আমায় করতে বলে,
পত্নী তোমার ক্রীতদাসী? হয় না মনে লাজ।

কাপড় কাচো বাসন মাজো
এঁটো মুচোও, বাপ্,
দু'দিন পরে বল্‌বে করো
পায়খানাটাও ছাপ্।
ঘটর ঘটর বাট্‌না বাটো,
আলুর সঙ্গে আঙ্গুল কাটো,
রান্নাঘরে প্রবেশ করে' মাথায় হানো বাজ॥

চিঠি লেখা গল্প করা
নাটক নভেল বোঝা,
মূর্খরা সব মনে কর
যেন বড়ই সোজা।
দেশের দশের খবর রাখা
বাজে ভাবো, সাবান মাখা,
উলের লেসের কাজগুলো আর নারী দেহের সাজ॥

চাকর বাকর রাখ্‌তে নারো
মিছে আমায় দুষো
দু'জন না হয় মাসী পিসী
নীচের ঘরে পুষো।
বুঝেছি ত তোমার ওজন,
না হয় বলো, দাসী দু'জন
খরচ দিয়ে পাঠিয়ে দিতে লিখ্‌ছি বাবায় আজ॥

বেতাল ভট্ট

দেশের ও দশের কথা

দেবী আমার সাধনা আমার
স্বর্গ আমার—'আমার দেশ'

কবি প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে আজিও দেশাত্মবোধ বাস্তবিক জাগ্রত হয় নাই। বাঙ্গালী আজও পর্য্যন্ত জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জ্ঞানে আপন মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রদ্ধার স্রক্-চন্দনে অভিনন্দন করিতে শিখে নাই। বাঙ্গালীর স্বার্থ-বধির কর্ণ-কুহরে এখনও স্বজাতির মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ প্রবেশ করে নাই। এই যে দেশের সর্ব্বত্র অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, দুর্ম্মূল্যতা, আধি-ব্যাধির দারুণ হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে—আমরা দেশের লোক হইয়া—স্বদেশের জন্য—স্বজাতির জন্য কি করিতেছি? অবশ্য, এমন কথা বলিতেছি না যে, দেশের সকলেই নীরব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। স্থানে স্থানে যে দুই একজন সহৃদয় স্বদেশ-হিতৈষী সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম'। দেশের নানাস্থান হইতে কেবল দুর্ম্মূল্যতার কথা, অন্নকষ্টের সংবাদ, বস্ত্রাভাবের অভিযোগ শুনা যাইতেছে। তাহার কতিপয় বৃত্তান্ত নিম্নে দিতেছি:—

খুলনা

গত বৎসর যেরূপ ধান্য জন্মিয়াছিল, তাহা যদি রপ্তানী না হইত, তাহা হইলে আজ এ জেলায় অন্নের জন্য হাহাকার উপস্থিত হইত না। কিন্তু সে সমস্ত ধান আজ কোথায়, ঠিকানাও নাই। কোন যাদুমন্ত্রে যেন তাহা উড়িয়া গিয়াছে। আজ জেলাবাসীকে ৭৷৹ ও ৭৷৶৹ টাকা দরে চাউল কিনিয়া খাইতে হইতেছে। শুধু যদি চাউল বেশী মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইত, তাহা হইলেও লোকে কায়ক্লেশে কোনও রকমে চালাইতে পারিত, কিন্তু তাহাত নয়। চাউল, লবণ, তৈল, ক্যারোসিন, ডাইল, কলাই, লঙ্কা, কাঠ, কয়লা, কাপড়, আটা, ময়দা, সাগু, সুজি প্রভৃতি যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যই অগ্নিমূল্য, সুতরাং দরিদ্র পল্লীবাসিগণ চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছে।

(খুলনাবাসী—২৭এ আষাঢ়)

ত্রিপুরা

দেশের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় আকার ধারণ করিতেছে। চাউলের দর ৯৲ ৯৷৹ টাকা। ৪৷৹ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইলে যাহারা দুই বেলা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, বর্ত্তমানে তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে তাহা ভাবিতেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। ইতিমধ্যেই অনেকে জমাজমি রেহান দিয়া কিংবা পরিবারের গাত্রালঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক নিষ্ঠুর প্রকৃতির মহাজনদিগের নিকট উহা বন্ধক রাখিয়া যে দু'চার টাকা আনিতে পারিয়াছিল তাহা অভাবের তপ্ত সৈকতে বারিবিন্দুসম দু'দিনেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

(ত্রিপুরা-হিতৈষী—৭ই শ্রাবণ)

চট্টগ্রাম

ভবিষ্যতে সংস্কারের বিষয় যেরূপ আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না, তেমন এই দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিও অমনোযোগী হইতে পারে না। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করার উপায় চিন্তা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ৩ টাকা ৩৷৹ টাকায় যে চাউল বিক্রয় হইত এখন তাহা ৭৲ টাকা করিয়া বিক্রয় হইতেছে। স্থলবিশেষে চাউলের মণ ৮ টাকা ১০৲ টাকা করিয়া বিক্রয় হইতেছে। মুগ, কলাই, খেসারী, অড়হর, বুটের মূল্যও প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে চিনির মূল্য প্রায় আড়াই গুণ বাড়িয়াছে। হলুদ, লঙ্কা ও মসলার মূল্যও প্রায় ২৷৹ গুণ বাড়িয়াছে। সরষপ ও সর্ষপ তৈলের মূল্যও তদ্রূপ। কেরোসিন তৈল পূর্ব্বে প্রতি টিন ১৷৴৹, ১৷০৹, ১৷৶৹ করিয়া বিক্রয় হইত। সংপ্রতি তাহাও প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রতি টিন ৪ হইতে ৬৲ টাকা করিয়া বিক্রয় হইয়াছে।

(জ্যোতিঃ—১৫ই শ্রাবণ)

ফরিদপুর

ফরিদপুর সহরে চাউল, ডাল, তৈল, লবণ, চিনি, আটা এবং অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। মোটা চাউলের দর ৯৷৹ টাকা, সরু বালাম ১০৲ টাকা। প্রতিদিনই দর বাড়িতেছে। অন্যান্য দ্রব্যের ত কথাই নাই। আমরা পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। সকল দ্রব্যের এরূপ দুর্ম্মূল্য দর থাকিলে লোকে অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে থাকিবে।

(সম্মিলন—৯ই শ্রাবণ)

নোয়াখালী

'অমৃতবাজার পত্রিকার' নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, নোয়াখালীতে বালামের চাউল ও দেশীয় সরু চাউলের দর দশ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তবে সেখানকার সুসংবাদের মধ্যে এই যে, স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত আইচ নিজ ব্যয়ে ১৫০৲ মণ বালাম চাউল আমদানি করিয়া খরিদ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়াছেন।

ঢাকা

ঢাকাতেও চাউলের দাম খুব বাড়িয়াছে। কিন্তু নোয়াখালীর মত ঢাকাতেও খরিদ-দরে চাউল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'বরিশাল-হিতৈষী' লিখিয়াছেন: "ঢাকার দরিদ্রদিগের নিকটে বিনা লাভে চাউল বিক্রয়ের যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বাবু অতুলচন্দ্র দাস ১০০৲ ও বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় ৫০০৲ মণ চাউল খরিদ মূল্যে কমিটির হস্তে প্রদান করিয়াছেন। আরও অনেকে এরূপ

চাউল দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রাজা শ্রীনাথ রায় জানকীনাথ রায়, অনারেবল্ শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রমানাথ দাস, খান্ সাহেব মহম্মদ হাফিজ, বাবু বসন্তকুমার দাস কমিটিকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। ঢাকা বন্ধু।"

দুর্ভিক্ষের বিবরণ

"মহাশয় বরিশালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা ইতিপূর্ব্বে আপনাকে জানাইয়াছি। দুর্ভিক্ষের ভীষণতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, সকল শ্রেণীর নর নারীর মধ্য হইতেই তুমুল হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। প্রতিদিনই মর্ম্মান্তিক ঘটনাবলী আমরা শুনিতে পাইতেছি। আর স্বচক্ষে দেখিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতেছি।

লোক-লোচনের অগোচরে, দারুণ অন্নাভাবে সর্ব্বশ্রেণীর নরনারী তিল তিল করিয়া জীবনীশক্তি নষ্ট করিতে করিতে কিরূপে পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার কয়েকটী বিবরণ পাঠ করুন:

১। বৈরকাঠী গ্রাম আমাদের আশ্রম হইতে জলপথে ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী। আজ তিন দিবস গত হইল বৈরকাঠী হইতে সংবাদ পাইলাম, শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাসের ৬ বৎসরের পুত্র অন্নাভাবে মারা গিয়াছে। সেখানে গ্রামে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত। সংবাদ পাওয়া মাত্র আমরা ৩ জন নৌকাযোগে বৈরকাঠী যাই এবং কালীচরণ দাসের পরিবারবর্গের অবর্ণনীয় দুরবস্থা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। কালীচরণ দাস দেশে থাকে। বরিশালে পানের দোকান করিয়া অতি সামান্য যাহা কিছু পায়, তাহাতে তাহার নিজের ও সঙ্গের নাবালক বড় ছেলেটীরও সংকুলান হয় না। আমাদের সঙ্গে গ্রামবাসী অনেক লোক ছিলেন, কালীচরণ দাসের স্ত্রী নিজ মুখে অতি কষ্টে বলিল, সে আজ তিন দিবস কিছুই খাইতে পায় নাই। হতভাগিনী তখন শয্যাশায়িনী, উত্থানশক্তি তাহার ছিল না, অতি কষ্টেই তাহাকে বসান হইল। আমাদের আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া অভাগিনী কত কাঁদিল, কত বলিল। স্ত্রীলোকটী বলিল, প্রায়ই তাহারা উপবাসের দিন কাটাইত। তারপর তিন সন্ধ্যা উপবাসের পর ৬ বৎসরের ছেলেটী অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ধক্ ধুক্ করিয়া জ্বর প্রকাশ পাইল। তারপর ৩ দিনের জ্বরে (জ্বরে কি করিয়াছে? জীবনী শক্তি দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী হরণ করিয়াছে।) বালকটী মারা গেল, বালকটা মরিয়াছে কিন্তু বালকের ৮ বৎসরের ভগ্নীর অবস্থা শোচনীয়, অন্নাভাবে শরীর কঙ্কালসার হইয়াছে, মুখ-চোখ সাদা হইয়া গিয়াছে, শরীরে রক্ত নাই, মা ও মেয়ের একটু একটু জ্বর। স্থানীয় চিকিৎসকগণ বলিলেন, ইহাকে "দুর্ভিক্ষ-জ্বর" বলে। আমরা বৈরকাঠীর অনেকগুলি পরিবারে দারুণ অন্নকষ্টের পরিচয় পাইয়াছি। শুনিলাম, নিঃস্ব গ্রামবাসীগণ আমাদের সহৃদয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট সাহায্য দান বা ঋণদান সম্বন্ধে প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

২। এই অস্বাভাবিক দুর্দ্দিনে ভদ্রঘরের নরনারী মরিতে মরিতেও কিরূপে সংগোপনে মানরক্ষা করিতেছেন, তাহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম:—

শ্রীযুক্তা বৈদ্য-বংশীয়া বিধবা-পরিবারে পাঁচজন। পুত্রটী কবিরাজী করিয়া অতি সামান্য কিছু আয় করেন। বিধবাটী ৴৷ পোয়া চাউল জলে কচলাইয়া তাহার জলটুকু মাত্র খাইয়া পাঁচ দিন বাঁচিয়া আছেন। তাহার পর যখন তাহার উত্থানশক্তি একেবারে রহিত হইল তখন এই সংবাদ আমরা পাই। বিধবার বাড়ী ভাড়কাঠী।

৩। এই সংকোচ কৃষকশ্রেণীর মধ্যেও দেখা যাইতেছে। সোনা মোল্লার বাড়ী আশ্রমের এক রকম নিকটেই। ৫০ বৎসর বয়স হইলেও বেশ সবল ও সুস্থ লোক ছিল। আজ ৫ দিন গত হইল স্থানীয় চৌকীদার আসিয়া সংবাদ দিল "শীঘ্র চলুন" সোনা মোল্লা মরিতে বসিয়াছে, ৩/৪ দিন কিছুই খায় নাই। অমনি ছুটিলাম, দেখিলাম বলিষ্ঠ সোনা মোল্লা দাঁড়াইতে পারিতেছে না। আশ্রমের নিকট বাস করিলেও সোনা মোল্লা এ পর্য্যন্ত সাহায্য লয় নাই বা তাহার প্রাণান্তক কষ্টের কথা জানাইতে দেয় নাই।

(বরিশাল-হিতৈষী)

পেটের দায়ে প্রাণ বিসর্জ্জন

মান্দ্রাজের সংবাদে প্রকাশ যে সেখানকার কুরাস নদীতে ৩০ জুলাই সকালবেলা একটী স্ত্রীলোক এবং তিনটী শিশুর মৃতদেহ জলে ভাসিতে দেখা যায়। পুলিশ ঘটনার সংবাদ পাইয়া তদন্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। তদন্তের ফলে প্রকাশ যে, স্ত্রীলোকটী দেনার দায়ে এবং পেটের জ্বালায় শিশু তিনটীকে জলে ভাসাইয়া দিয়া নিজে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করতঃ সকল কষ্টের অবসান করিয়াছে।

(ঢাকা-প্রকাশ)

২৫৲ টাকায় কুলবধূর আত্মবিক্রয়

খুলনার উল্লাপাড়া থানার বড়পাঙ্গাসী গ্রামের যাদু নামক জনৈক ব্যক্তি উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে যায়। যাদুর মা নিজেই আহারের সংস্থান করিতে পারে না কাজেই পুত্রবধূকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয়। সেখানেও হতভাগিনীর আহারের সংস্থান না হওয়ায় তাহার পিতৃকুলের কোন আত্মীয়া রমণীর সাহায্যে ভালগাছি মোকামে কোন বারবনিতার নিকট সে ২৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের জন্যই কুলবধূ এইভাবে আত্মবিক্রয় করিয়াছে।

(ঢাকা-প্রকাশ)

৩রা শ্রাবণের 'বরিশাল-হিতৈষী' দেশের দুর্দ্দিনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

"আমি সংসারে বাঁচিতে চাই বাঁচিবার অধিকার আমার আছে এই কথাগুলি জোর করিয়া বলিতে হইবে। কৈ, এমন নেতা কৈ, যিনি এই একটীমাত্র কথা বলিবেন—এবং হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা অবধি সর্ব্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিবেন—রাজার দ্বারে—ধনীর দ্বারে সর্ব্বোপরি বিশ্বের দ্বারে ও বিশ্বপতির দ্বারে এই কথাটী জলদ গম্ভীরস্বরে বলিবেন,—আমরা অন্নাভাবে মরিতে জন্মগ্রহণ করি নাই—তেমনিভাবে মরিব না।"

আমরাও বলি—'আমরা অন্নাভাবে মরিতে জন্মগ্রহণ করি নাই—তেমন ভাবে মরিব না'। মানুষ আমরা—আমাদেরও প্রাণ আছে, শক্তি আছে, ভক্তি আছে, মতি আছে, গতি আছে—চাই শুধু তার জাগরণ। সুপ্ত-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে—কর্ম্ম-বিমুখকে কর্ম্ম-প্রাণতায় উদ্যমশীল করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই ত আমার মা-জন্মভূমির

দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীভূত হইবে, নিরন্ন দেশবাসীর অন্নের সংস্থান হইবে—মা আমার অন্নদা-জ্ঞানদারূপে আবার প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন। ইতি—

"সেবক"

সদনুষ্ঠান

মা-জন্মভূমির অভাগা সন্তানকুলের কল্যাণ-সাধনের জন্য নানাদিকে নানাভাবে যাহারা চেষ্টা করিতেছেন, সেই সমুদয় স্বদেশ-প্রাণ ও স্বজাতি-বৎসল ব্যক্তি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। ২৯শে আষাঢ় 'বীরভূম-বার্ত্তা' লিখিয়াছেন :—

মহান্তের সৎকার্য্য।—বীরভূম জেলার মল্লারপুরের মহান্ত ভগবান দাস মহোদয় দেশে অনেক লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দিন দিন সাধারণের ধন্যবাদের ভাজন হইতেছেন। তিনি মল্লারপুরে একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য পাঁচ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন : এবং রামপুরহাটে একটী টাউনহলের অভাব দেখিয়া উক্ত টাউনহল নির্ম্মাণার্থ ছয় সহস্র টাকা দিয়াছেন। মহান্ত মহারাজ বহু টাকা ব্যয় করিয়া চন্দ্রনাথের উনকোটী তীর্থে যাইবার পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া এবং ছত্রশীলার পার্শ্বস্থ সংকীর্ণ পথের ধারে রেলিং বসাইয়া 'দর্শনার্থি' গণের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক সৎকার্য্যের কথা শুনা যায়। মহান্ত মহারাজ তাঁহার দেবোত্তর ষ্টেটের অর্থ এরূপ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেছেন শুনিয়া দেশের দশে বাস্তবিকই আনন্দিত হইতেছেন।

বীরভূম হইতে আরও সৎকার্য্যের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ১২ই শ্রাবণের 'বীরভূম-বার্ত্তা' লিখিয়াছেন :—

অবৈতনিক বিদ্যালয়।—বিগত ১০ই জুলাই বীরভূম জেলার নলহাটী ইউনিয়ন কমিটীর অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে একটী অবৈতনিক নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোনও স্থানের ইউনিয়ন কমিটী অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ইহা আর শুনা যায় নাই। নলহাটী ইউনিয়ন কমিটীই বোধ হয় এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হইলেন। আমরা উক্ত ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কালিদাস সরকার মহোদয়কে এজন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কৃষি-নৈশ-বিদ্যালয়।—বীরভূমের জেলা-কৃষি-সমিতি জেলার ১৬টী মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয়ে ১৬টী নৈশ-কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। চিলিয়ান্ নাইট্রেট প্রচার সমিতি এই নৈশ-বিদ্যালয় গুলিতে মাসিক দশ টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন। এরূপ নৈশ-বিদ্যালয়ে কৃষকদিগের অনেক উপকার সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৩ই শ্রাবণের কাঁথির 'নীহার'ও দুইটী শুভসংকল্পের কথা জানাইয়াছেন :—

শুভ-সংকল্প।—মেদিনীপুর মহিষাদল রাজটেক্‌নিক্যাল্ স্কুলটী কিছু-কাল হইল উঠিয়া গিয়াছে, ইহা মেদিনীপুরের দুর্ভাগ্য। সম্প্রতি আমরা অবগত হইলাম যে, মেদিনীপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পরলোকগত কার্ত্তিক-চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় মেদিনীপুরে একটি টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল সংস্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ছুতার, কামার, তন্তুবায় প্রভৃতির নিত্য-প্রয়োজনীয় গৃহ-শিল্পের শিক্ষা দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় রমেশ বাবুর এই শুভ-সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের একটী বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

কাঁথি কলেজ।—প্রস্তাবিত কাঁথি কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলিয়াছে। কাঁথির যে সকল বদান্য ভদ্রলোক এই মহদনুষ্ঠানে যত অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের নাম ও প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ প্রকাশ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত চক হজরতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন অগস্তী মহাশয় এই অনুষ্ঠানে ১০০০১ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন অবগত হইয়া আমরা প্রীতি-লাভ করিলাম। এ ছাড়া কতিপয় ভদ্রলোক ১০০, ৫০, এবং ২৫, টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। কাঁথিতে ধনশালী ব্যক্তির অভাব নাই। আমরা আশা করিতেছি যে, তাঁহাদের সাহায্যে কাঁথির এই একটী মহা অভাব দূর হইতে পারিবে।

আমাদিগকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, মানুষের মত মাথা উঠাইয়া দাঁড়াইতে হয়—যদি এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করিতে হয়—তবে নিশ্চেষ্ট হইয়া কাল কাটাইলে চলিবে না। নানাদিকে নানাভাবে দেশহিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইবে। এই কঠোর জীবন সংগ্রামে জয়-লাভ করিয়া বিশ্বের বরেণ্য জাতি সমূহের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে হইলে, এই নিদ্রিত জাতির উদ্বোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। জগতের অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির ন্যায় আমাদিগকেও কর্ম্মপ্রাণ হইবে।

ষ্টীমার ষ্টেশনে দুর্গতি

খুলনা ষ্টীমার ঘাটে যাত্রিগণের জন্য কোন প্রকার বন্দোবস্ত না থাকাতে এই বর্ষার দিনে যে তাহাদের কি অসুবিধা হয় তাহা অবর্ণনীয়। আমরা পুনঃপুনঃ এ বিষয় ষ্টীমার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু কোনই ফললাভ হয় নাই। ষ্টীমার ঘাটে স্থান না আছে এমন নয় : রেলওয়ে টালিক্লার্কদের জন্য একটু কুড়েঘর খালি পড়িয়া আছে : ঐ ঘরখানা একটু বিস্তৃত করিয়া একপার্শ্বে পুরুষদের এবং অপর পার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের দাঁড়াইবার জায়গা করা কি এতই কঠিন? পূর্ব্ববঙ্গের বহু লোকের বাধ্য হইয়া খুলনার পথে যাইতে হয়। তাঁহারা অতি কষ্টভোগ করিয়া যান এবং খুলনার নির্ম্মম ব্যবহারে খুলনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকেন। এই জন্যও আমরা খুলনার অধিবাসিগণ আর এরূপ ক্লেশ দেখিতে পারি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ষ্টীমার কর্ত্তৃপক্ষ বিদেশী তাঁহারা কেবল লাভ, তাঁহারা যাত্রিগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য আদৌ লালায়িত নন। তবে রেলওয়ে বোর্ড ও গভর্ণমেণ্ট কি আমাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পারিবেন? আমরা ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গর্ণকে এই বিষয়টা একটু অনুসন্ধান করিয়া যাত্রিগণের ক্লেশ নিবারণ করিতে অনুরোধ করি। রেল হইতে অবতরণ করিয়া যাত্রিগণ ষ্টীমারে যাইবার জন্য ব্যগ্র হয়, এবং লাইন তাড়াতাড়ি পার না হইলে কাটা পড়িবার আশঙ্কা থাকে। ঘাটে গিয়া টিকিট না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা ষ্টীমার ঘাটে না থাকিলে তাহাদিগকে উন্মুক্ত স্থানে শিশুসন্তান ও স্ত্রীলোকগণ সহ বাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। বর্ষা আসিলে মাথা গুঁজিবার স্থান পাওয়া যায় না। ইহা কি অসহনীয় দৃশ্য নয়?

(খুলনা)।

কম্পা-মুক্তা

রহস্যের গুপ্ত গেহে, রয়েছ কোথায় ?
বার বার খুঁজে মরি পাই না সন্ধান ;
জ্যোতি তব বিশ্বমাঝে নিত্য শোভা পায়,
ক্ষণে ক্ষণে করি দেয় বিমুগ্ধ নয়ান।
থেকে থেকে ফেলি জাল, দেই ডুব কত
ব্যর্থ হয় সব চেষ্টা, অশ্রু আসে চোখে
তবু মন ধায় তোরি পানে অবিরত,
রে মুক্তা, বারেক শুধু হেরিবারে তোকে।

বসন্ত প্রভাতে হেরি কুসুমিত বনে
উজ্জ্বল বরণ রাগে তব রূপ-রাগ —
দিনান্তে দিগন্ত-তীরে পশ্চিম গগনে
স্বর্ণ হস্তে তোর ঝরি পড়ে চূর্ণ ফাগ।
প্রতি ছবি হেরি তব গন্ধে বর্ণে গীতে
রে মুক্তা, তোমারে শুধু পাই না দেখিতে।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

বিনিময় বিভ্রাট

পৃথিবীর সমস্ত কার্য্যই আদান প্রদানের উপর চলিতেছে। আদিম অবস্থায় যখন মুদ্রার প্রচলন হয় নাই, তখন কেবল দ্রব্যের আদান প্রদানের উপরই আমাদের দৈনন্দিন দেনা পাওনার কার্য্য চলিত। ক্রমশঃ আদান প্রদানের এক সাধারণ মধ্যবর্ত্তীরূপে মুদ্রার আবির্ভাব হইল। এখনও পৃথিবীতে আদান প্রদানের উপর অনেক কার্য্য চলিলেও মুদ্রাই সমস্ত দেনা পাওনা মিটাইবার জন্য বিনিময়ের প্রধান উপায় হইয়াছে। সুতরাং মোটামুটী এখন বিনিময় (exchange) কথাটাতে আমরা মুদ্রা বিনিময়ই বুঝিয়া থাকি।

নানা প্রকারের মুদ্রা হইতে পারে। রাজশক্তি সাধারণতঃ এই মুদ্রার প্রকার এবং শক্তি নির্ণয় করিয়া দিয়া থাকেন। পৃথিবীর আদিমকালে নানাপ্রকার উপাদানে মুদ্রা প্রস্তুত হইবার প্রমাণ পাওয়া গেলেও বর্ত্তমানে মূল্যবান্ ধাতুই মুদ্রার প্রধান উপকরণ। পৃথিবীর নানাদেশে নানা প্রকারের ধাতুর মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত। সভারেন, ডলার, ইয়েন, টাকা প্রভৃতি নাম ভেদে নানা প্রকারের স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা নানাদেশে সঞ্চালিত হইয়াছে। এই সমস্ত দেশের পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য চলিতেছে, সুতরাং মুদ্রা বিনিময় অনিবার্য্য। এক দেশ অপর দেশকে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে উক্ত প্রথমোক্ত দেশ উহার মূল্য তথায় প্রচলিত মুদ্রায় হিসাব করিবে, কিন্তু শেষোক্ত দেশে উক্ত মুদ্রা প্রচলিত না থাকায় তাহাকে তাহার নিজ মুদ্রার হিসাবে উহা দিতে হইবে। সুতরাং এই প্রকার আদান প্রদানের জন্য মুদ্রার একটী বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট থাকা দরকার। স্বর্ণ ও রৌপ্যেই প্রধানতঃ অধিকাংশ মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছে। এই স্বর্ণ ও রৌপ্যের দাম যদি পৃথিবীতে একেবারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিত তাহা হইলে এই মুদ্রা বিনিময়ের হারও চিরকালের জন্য বান্ধা থাকিত। কিন্তু "চাহিদা ও যোগানের" (Demand and supply) নিয়ম অনুসারে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান্ ধাতুর মূল্যও পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং এই বিনিময়ের হারও একেবারে নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে না। এই হারের হঠাৎ পরিবর্ত্তনে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে নানারূপ বিপ্লব ঘটায়। তখন আমরা উহাকে 'বিনিময় বিভ্রাট' বলিয়া থাকি।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যে এইরূপ একটা বিভ্রাট' ঘটিয়াছে সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। কি কারণে উহা ঘটিয়াছে তাহা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এখানে বরাবরই রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। তৎপূর্ব্বে এদেশে স্বর্ণ ও

রৌপ্য মুদ্রা উভয়ই পাশাপাশি চলিত। কিন্তু কোম্পানী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে একমাত্র রৌপ্য মুদ্রাই এদেশের আইন সঙ্গত মুদ্রারূপে প্রচলিত করেন। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে রৌপ্যের দাম পৃথিবীতে অতিশয় কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে "হোম্ চার্জ্জের" খরচ দিতে গভর্ণমেণ্টের ভয়ানক লোকসান দিতে হয়। অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রায় গভর্ণমেণ্টের বিলাতী দেনা শোধ করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক টাকার আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে সকল ব্যবসায়ীর সর্ব্বদা বিলাতে টাকা পাঠাইতে হইত, তাহাদেরও ভয়ানক ক্ষতি হইতে থাকে। গভর্ণমেণ্টের বজেটে প্রতিবৎসর অর্থন্যূনতা ঘটিয়া অতিরিক্ত কর আদায়ের অবশ্যকতা দাড়ায়, কিন্তু তাহাতে ভয়ানক প্রতিবাদ হইতে থাকায় গভর্ণমেণ্ট টাকার মূল্য বাড়াইয়া দিয়া এই ক্ষতি নিবারণের উপায় করিতে সঙ্কল্প করেন। এবং "হরচেল" কমিটীর পরামর্শ অনুসারে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে টাকশাল বন্ধ করিয়া দেন, অর্থাৎ রৌপ্য দিয়া সাধারণকে টাকা খোদাই করিয়া লইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। এই নীতির ফলে দেশে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় টাকার ক্রয়কারী শক্তি বাড়িয়া যায় এবং অন্য প্রকারে এজন্য দেশের অসুবিধা হইলেও রৌপ্যের দামের হিসাবে টাকার দাম বাড়িয়া যাওয়ায় গভর্ণমেণ্টের 'হোম্ চার্জ্জের' খরচ কমিয়া যায়। তারপর 'ফাউলার' কমিশনের পরামর্শ অনুসারে গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এক টাকার দাম ১৬ পেন্স হিসাবে বিনিময়ের মূল্য বান্ধিয়া দেন এবং বিলাতী স্বর্ণমুদ্রাকে এদেশের আইনসঙ্গত মুদ্রারূপে চালাইয়া ১৫৲ টাকায় উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করেন। এইরূপে তখন বিনিময়বিভ্রাট' কিছু মিটাইয়া গভর্ণমেণ্ট এই নীতির ফলাফলের অপেক্ষা করিতে থাকেন। উক্ত কমিটী এদেশে ক্রমশঃ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করিবারও পরামর্শ দেন এবং এ বিষয়ে একটী নীতি নির্দ্দিষ্ট করেন। কিন্তু বিলাতী সভারেণ এদেশে আমদানী করিয়া টাকার দাম বান্ধিয়া দিলেও অন্যান্য অনেক বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট উক্ত কমিটীর নির্দ্দিষ্ট নীতির পথ হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইতে থাকেন। তাহার ফলে বিলাতে এবং এদেশে গভর্ণমেণ্টের নীতির তীব্র সমালোচনা হইতে থাকে। তখন এ বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে 'সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্' মহাশয় মিষ্টার অষ্টিন্ চেম্বারলেনের সভাপতিত্বে এক কমিশন নিযুক্ত করেন। উক্ত কমিশন্ অনেক অনুসন্ধান ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর যে সকল অনুরোধ লিপিবদ্ধ করেন, তাহার মধ্যে উহারা এদেশে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের বিরুদ্ধে মত দেন এবং বিলাতী স্বর্ণ-মুদ্রার সহিত দেশের রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ের সুব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। চেম্বারলেন্ কমিশনের এই পরামর্শের ফলে এদেশে স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন আবার কমিতে থাকে এবং এদেশে যে সকল বিলাতী সভারেণের আমদানী হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই গহনা প্রভৃতিতে নষ্ট হওয়ায় এদেশে স্বর্ণ-মুদ্রার দেনা পাওনা এক প্রকার উঠিয়া যায় এবং বিলাতী সভারেণ স্বর্ণের বাজার হিসাবে রৌপ্য-মুদ্রায় ক্রীত এবং বিক্রিত হইতে থাকে।

যুদ্ধারম্ভে সমস্ত পৃথিবীতে নানা প্রকারের 'মুদ্রাবিভ্রাট' উপস্থিত হয়। সে সব কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। যে সব দেশে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত, তথায় যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সৈন্য পাঠাইতে হওয়ায় অনেক রৌপ্যমুদ্রার আবশ্যক হয় এবং পৃথিবীতে রৌপ্যের মূল্য অতিশয় বাড়িয়া যায়। তখন ষ্টেট্ সেক্রেটারী মহাশয় বিষম বিভ্রাটে পড়েন। তিনি বিলাত হইতে এক সভারেণের উপর ১৫৲ টাকা হিসাবে এদেশে কাউন্সিল ড্রাফ্ট (council draft) দিতেছিলেন, কিন্তু ১৫৲ টাকা প্রস্তুত করিতে তাহার যে রৌপ্যের দরকার তাহাও তিনি এক সভারেণ দিয়া কিনিতে পারেন না। সুতরাং এক সভারেণের ১৫৲ মূল্য বান্ধিয়া রাখা আর সম্ভবপর থাকে না। রৌপ্যের মূল্য তারপর আরও চড়িতে থাকে। তখন ষ্টেট্ সেক্রেটারি মহাশয় উক্ত হিসাবে 'কাউন্সিল ড্রাফ্ট (council draft) বাহির করিতে একবারে অসমর্থ হওয়ায় বিনিময়ের হার রূপার হিসাবে ভয়ানক চড়িয়া যায় এবং ১৲ টাকার দাম ১ শিলিং ৮ পেন্সে উঠে অর্থাৎ সভারেণের বিলাতী দাম ১২৲ টাকায় দাড়ায়। হঠাৎ এইরূপ ব্যপার ঘটায় ব্যবসায়ের বাজারে ভয়ানক বিভ্রাট উপস্থিত হয়। যে সমস্ত ভারতীয় সওদাগরী আফিস বিলাতের সহিত ব্যবসায়ে অগ্রিম কণ্ট্রাক্ট করিয়াছিল, কিংবা মাল জাহাজ বোঝাই করিয়াছিল বিল করিবার সময় পরিবর্ত্তিত বিনিময়ের হারে যখন তাহারা এদেশীয় টাকার হিসাবে উহার বিল করিলেন, তখন তাহাদের ঐ টাকা পরিশোধ করিবার জন্য বিলাতী ক্রেতাকে যেখানে পূর্ব্বে ১৫৲ টাকার

জন্য এক সভারেণ দিতে হইত, সেখানে ঐ এক সভারেণ দিয়া' ১২৲ টাকা মাত্র পরিশোধিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ তাহার ভারতীয় দেনা পরিশোধ করিতে তাহার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে শতকরা প্রায় ২০ হইতে ২৫ ভাগ অধিক মুদ্রা দিতে হইল। কিন্তু বিলাতে উহার অনেক দ্রব্য বিক্রয়ের আবার অগ্রিম কণ্ট্রাক্ট থাকায় সেখানে বিলাতী ক্রেতা অধিক মূল্য পাইলেন না, সুতরাং তাঁহার ভয়ানক লোকসান হইল। সেখানে বিলাতের অগ্রিম কণ্ট্রাক্ট ছিল না, সেখানেও হঠাৎ বিনিময়ের বিভ্রাটের ক্ষতি পূরণোপযোগী মূল্য বাড়িল না। এইরূপ বিলাত হইতে এখানে যাঁহারা মাল কিনিয়াছিলেন কিংবা অগ্রিম কণ্ট্রাক্ট করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেনা শোধ করিবার জন্য পূর্ব্বে যে টাকার আবশ্যক হইত তাহা হইতে কম টাকার আবশ্যক হইল, অর্থাৎ তাহারা প্রায় শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ কম মূল্যে দ্রব্য খরিদ করিলেন। ইহার ফলে বিলাতী দ্রব্য অনেক সস্তায় পাইলাম এবং ভারতীয় দ্রব্যের জন্য বিলাতকে অধিক মূল্য দিতে হইল।—ভারত যাহা পাইত তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ পাইল, বিলাত যাহা পাইত তাহা অপেক্ষা কম অর্থ পাইল। গোলমালে কেহ বা হঠাৎ লোকসান দিল, কেহ বা হঠাৎ লাভবান্ হইল তখন ব্যবসা রাজ্যে এক বিকট চিৎকারধ্বনি উঠিল।

এরূপ অবস্থায় ব্যবসায়বাণিজ্য চলিতে পারে না। বিলাতী মুদ্রার হিসাবে দাম বাড়িয়া যাওয়ায় এদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ভয়ানক বিপ্লব ঘটিল। বিনিময়ের বাজার সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল থাকিলে বাণিজ্যের বিষয়ে যে অনিশ্চয়তা ঘটে, তাহা অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়েরই ক্ষতি করে। তখন ষ্টেট্‌সেক্রেটারি মহাশয় নানারূপ হিসাব করিয়া এক সভারেণের মূল্য ১০।১২৲ টাকায় বান্ধিয়া দিলেন এবং সেই হিসাবে বিনিময়ের বাজারে কাজ চলিতে লাগিল। কিন্তু রূপার বাজার আরও চড়িতে লাগিল, তখন ষ্টেট্ সেক্রেটারি মহাশয় ঐ হারও বাহাল রাখিতে না পারিয়া বর্ত্তমানে ১২৲ টাকা হিসাবে সভারেণের মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যের এই পরিবর্ত্তনশীল বাজারে কতদিন এই হার বান্ধিয়া রাখা যাইবে তাহা বলা যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে নানারূপ বিভ্রাট ঘটিতে পারে।

এই বিনিময় বিভ্রাটের সহিত আরও নানা প্রকারের মুদ্রাবিভ্রাট ঘটিয়া বিষয়টীকে অতিশয় জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বিলাতী গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ রূপ অনুসন্ধানের পর উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া পরামর্শ দিবার জন্য সম্প্রতি আর এক 'রয়াল কমিশন' নিযুক্ত করিয়াছেন। দেখা যাউক, এই কমিশনের ফল কিরূপ দাঁড়ায়। এই বিনিময় বিভ্রাটের কারণ স্বর্ণের সহিত বিনিময়ে রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধি। সুতরাং রৌপ্যের দাম হিসাবে স্বর্ণের দাম অনেক কমিয়াছে। কিন্তু এদেশে বিলাতী দেনা পরিশোধের বেলায় বিনিময়ে স্বর্ণের দাম কম হইলেও বাজারে স্বর্ণের দাম অতিশয় চড়া। এরূপ ঘটিবার কারণ আমদানী সমস্ত স্বর্ণের উপর গভর্ণমেণ্টের অধিকার। কি জন্য কিরূপে ইহা ঘটিয়াছে তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

গভর্ণমেণ্ট যাহাই করুন, এবং যত কমিশনই বসান, উহাতে সাময়িক অসুবিধা কিয়ৎ পরিমাণ দূর করিলেও বিনিময় বিভ্রাট একেবারে মিটাইতে পারিবে না।

স্বর্ণ ও রৌপ্যেই সাধারণতঃ মুদ্রা প্রস্তুত হইবে। পৃথিবীর বাজারে চাহিদা ও যোগানের নিয়মে এই দুই ধাতুর মূল্যের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং যতদিন পৃথিবীর মুদ্রা সমষ্টিকে এই দুই মূল্যবান্ ধাতুর দাসত্ব হইতে উদ্ধার না করা যায়, ততদিন এই বিনিময় বিভ্রাটের একেবারে সমাধান হইতে পারে না। কি প্রকারে তাহা করা যায় তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

জ্যাঠামশাই

(পুরস্কার রচনা)

উপর্য্যুপরি চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা নষ্ট হওয়ার পর গৃহিণী যে দিন একটী পুত্র প্রসব করিলেন সে দিন অতি বড় দুঃখের মধ্যেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ জগদীশপ্রসাদের মুখে একটু আনন্দ দেখা দিয়াছিল।

দেবগড় গ্রামে জগদীশ মুখুয্যের মত সৌম্য, শান্ত, সহিষ্ণু এবং কোমলপ্রকৃতির লোক আর কেহই ছিল না। তীব্র দারিদ্র্য, সর্ব্বগ্রাসী অভাবের মধ্যেও কখনও কেহ তাঁহাকে নিরানন্দ দেখে নাই। জগদীশপ্রসাদের আর্থিক অবস্থা অতি হীন। পৈত্রিক ভিটা, দু'টী গাভী, কতকগুলি কীটদষ্ট পুঁথি, খানকতক দেনো বাসন ও বহু পুরাতন ভগ্নাবশেষ একটী রূপার গড়গড়া ব্যতীত তাঁহার আর বিশেষ কিছুই ছিল না। দু'এক ঘর যজমান ছিল, তাহাদেরই ক্রিয়া-কলাপে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কৃচিৎ দু'একটী রৌপ্যমুদ্রা পাইতেন।

গৃহিণী কমলাদেবী বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ মাস বাপের বাড়ীতেই থাকিতেন। বৃদ্ধ পিতা,—দেখিবার কেহই ছিল না। সময়ে স্নানাহার করাইতে,—একটু যত্ন বা সেবা-শুশ্রূষা করিতে বৃদ্ধের তেমন কেহই ছিল না। তাহার উপর সম্প্রতি আর একটী বিপদ হইয়া গিয়াছে। কমলা-দেবীর কনিষ্ঠা ভগ্নী বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আসিয়া আছেন। শ্বশুরবাড়ীর কেহই তাঁহার ভার লইতে পারেন নাই। বিধবা বোন্, বয়স অল্প, কি জানি গ্রামের লোক কে কি রকম! এই ভাবিয়া কমলাদেবী তাঁহাকে নিজের চোখে চোখে রাখিয়াছিলেন।—এই সকল কারণে তিনি স্বামীর কাছে প্রায়ই থাকিতে পাইতেন না।

জগদীশের বয়স চল্লিশের উপর হইয়াছিল। কিন্তু চির-জীবন দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে তিনি বৃদ্ধের মত স্থবির হইয়া পড়িয়াছিলেন!

শ্বশুর বার বার পত্র লিখিতেন,—'বাবা, আমি যে ক'দিন আছি বিনোদগাঁয়ে এসে আমার কাছে থাক, তারপর —আমি গেলে দু'চার ঘর যজমান রইল, দেখো শুনো।'

জগদীশপ্রসাদ লিখিলেন,—'সংসার ফেলে, বুড়ো পিসিকে একলা রেখে কি কোরে যাব?'

নিজে রাঁধিয়া খাওয়া, আবার সংসারের কাজ করিতে হয়,—এই সকল কারণে, মুখুয্যে মহাশয় তাঁহার এক দূর সম্পর্কের পিসিকে বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। পিসিঠাকুরাণীর মাসের মধ্যে প্রায় দশদিন ব্রত উপবাস ইত্যাদি ছিল;—তাহার উপর বয়সও হইয়াছিল। সুতরাং পিসিমাকে আনিয়া জগদীশপ্রসাদের শুধু যে কিছু খরচ বাড়িয়াছিল, তাহা নয়, পরিশ্রমও অনেক বাড়িয়াছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া থাকাটা তিনি একেবারেই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই।

(২)

এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা ও জীবনব্যাপী দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যদিয়া অতিকষ্টে,—একান্ত শান্ত সহিষ্ণু চিত্তে ব্রাহ্মণ যখন জীবনের শেষপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ে ভগবান্ এ স্নেহের বন্ধন দিলেন কেন? জগদীশ ইহাই ভাবিতেন। আবার বলিতেন,—'আহা, মুখুয্যেবংশে বাতি দিতে যদি একজনও থাকে।' ইহার ঠিক পাঁচ বৎসর পরেই কমলাদেবী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া,—পাঁচ বৎসরের শিশুকে স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়া চিরজনমের মত বিদায় লইলেন। পিসিমা ইতিপূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত শোক, সমস্ত দুঃখ, আর দারিদ্র্য মাথায় করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একান্ত একা জীবনের শেষপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর রহিল একমাত্র পাঁচ বৎসরের শিশু।

'সে যে অতি দুঃখীর সন্তান,—আবার মা-হীন। তা'র যতটা যত্ন, যতটা আদর, যত আনন্দ পাওয়া উচিত, সে তো তা' মোটেই পাচ্ছে না। এই ত' পদে পদে তার কত ত্রুটী হইতেছে।'—কেবল এই চিন্তাই বৃদ্ধের সমস্ত মনকে আলো-ড়িত করিয়া তুলিত। যখন প্রাণ একেবারে হাহাকার করিয়া উঠিত—বৃদ্ধ তখন আঁধার গৃহে, নির্জ্জনে দ্বিগুণ বেগে—শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতেন,—চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন;—'এ কি করলে ভগবান্!—এ বন্ধন কেন দিলে প্রভু? পাপের কি এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?"

(৩)

একদিন দুপুর বেলা বামুনপাড়ার হরিঘোষাল—মুখুয্যে মহাশয়ের উঠানে আসিয়া ডাকিলেন, 'দাদা, ঘরে আছ নাকি?'

জগদীশপ্রসাদ ছেলেকে বুকে করিয়া ঘরের ভিতর

শুইয়াছিলেন, ঘোষালের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই দাওয়ায় বাহির হইয়া আসিলেন। একটু আপ্যায়নের পর হরিঘোষাল গোটা দশেক আম ও ঘরের গাইয়ের খানিকটা দুধ মুখুয্যে মশায়ের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন,—'দাদা, তোমাদের বৌমা দীনুকে খেতে দিলে,—মনে কিছু ক'রো না ; কিছুই ত আর দিতে পারি না।'—জগদীশপ্রসাদ ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন দীননাথ।

একটু ম্লানহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন,—"তা' বেশ করেছেন! এতে আবার মনে কি ক'র্‌বো ভাই? বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও।" •

ইহার ঠিক দিন চারেক পরেই একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোষাল মুখুয্যে মশায়ের বাড়ীতে আসিলেন। একেবারে দাওয়ার উপর উঠিয়া বলিলেন—"দীনু দাদা কোথা? এই সন্দেশ কটা ধর তো। আজ বাড়ীতে তৈরী করেছিল,—দীনুর জন্যে ক'টা পাঠিয়ে দিলে। ছেলেপুলে ত আর হ'ল না, ঐ দীনুতেই ছেলের সাধ মেটাতে চায়।" বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

তার পর অনেক কথা হইল ; ঘোষাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—'তাই মনে করছিলাম দাদা,—তোমাদের বৌমাও বল্‌ছিল,—আহা, দীনুর কি কষ্ট, মা মরা ছেলে। কাল বিকেলে বুঝি কোথায় পড়ে গিয়ে কতকগুলো কাদা মেখে সানের ঘাটে বসে' কাঁদছিল। তাই ও বুঝি আবার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কি খেতে দিয়েছিল,—তবে থামে। আর তোমারও দাদা এ বয়সে একটা বন্ধন। তাই বল্‌ছিলাম কি,—দীনুকে যদি পোষ্যপুত্রের মত দাও ত' আমাদের তা'কে মানুষ কর্‌তে বড় ইচ্ছে। তোমার আশীর্ব্বাদে যা' হোক কিছু করেছি—ভোগ কর্‌বার তো আর কেউই নেই।'

এই সময়ে দীনু কোথা হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া একেবারে বাপের হাঁটু জড়াইয়া ধরিল। মুখে কথা নাই ;—চোখের জলে বুক ভাসিয়া গিয়াছে।

'কিরে—কি হোলো বাবা?' বলিয়া বৃদ্ধ জগদীশপ্রসাদ পুত্রের চিবুক ধরিয়া মুখখানি একবার জোর করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া দেখিলেন। ছেলে আরও কাঁদিয়া জানাইল যে গয়লাদের পঞ্চা আর জমিদারবাবুদের নীলুর সঙ্গে সে খেলিতে গিয়াছিল। কিন্তু তা'র চোখে কাজল না থাকায় এবং কাপড় ময়লা বলিয়া কেহ তাহার সঙ্গে খেলিবে না বলিয়াছে।

পিতা বলিলেন—'আচ্ছা বাবা, কাজল দিচ্ছি।' পরক্ষণেই ঘোষাল মহাশয়ের দিকে চোখ পড়ায় ছেলেকে কোলের আরও কাছে টানিয়া লইয়া ভারি গলায় বলিলেন,—'কি রে, তোর কাকার সঙ্গে যাবি? খুড়ীমা কত খাবার দেবেন, কাজল প'রিয়ে দেবেন, যাবি বাবা?'

'না'—বলিয়া বালক পিতার দুইটী হাঁটুর ভিতর মাথা গলাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ঘোষাল মহাশয় দু'হাত বাড়াইয়া দীননাথকে কোলে লইবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন—'দীনু, যাবি বাবা? চ' তোকে শিবপুকুরের ধারে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।' সে শুধু দিগুণ বলে পিতার হাঁটু জড়াইয়া রহিল।

'তা হ'লে, একটু ভেবে দেখো দাদা, এখন তবে আসি।'—বলিয়া ঘোষাল মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জগদীশপ্রসাদ সস্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—'বেঁচে থাক্‌তে তা পার্‌ব না দাদা। মরে গেলে ত' আমার দীননাথ তোমাদের পাঁচজনের কাছেই দাঁড়াবে।'—ঘোষাল নীরবে চলিয়া গেলেন।

• অনেক অনুসন্ধানের পর একখানা ছাতাধরা কাজলনাতা পাওয়া গেল, বৃদ্ধ তাহাতেই একটু তেল দিয়া কাজল পড়াইয়া ছেলের চোখে কাজল পরাইয়া দিলেন।

(৪)

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জগদীশপ্রসাদ পুত্রকে গ্রামের উচ্চ ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভিক্ষা ও দু একটী যজমানের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি পুত্রকে বিদ্যালয়ে দিয়াছিলেন।

তিনি প্রতিদিন একটী যষ্ঠি হস্তে দীননাথকে বিদ্যালয়ে রাখিয়া আসিতেন, আবার ছুটীর পর তাহাকে বিদ্যালয় হইতে লইয়া আসিতেন।

আষাঢ় মাস। সেদিন অপরাহ্নে খুব ঝড় উঠিল। অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। বৃদ্ধ জগদীশ প্রসাদ আকাশের দিকে চাহিয়া উন্মনা হইয়া বসিয়া আছেন। আর এক একবার পথের দিকে চাহিতেছেন। দীনু বিদ্যালয়ে গিয়াছে। আহা, সে হয়ত নিরাশ্রয় হইয়া পথে ভিজিতেছে। ঐ মোড়লদের কেষ্টার গলা শোনা যাচ্ছে না?—জমিদার

বাবুদের নীলুও ত' পাল্কী কোরে বাড়ী এল। দীনু ত' তবে নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পথে একা ভিজিতেছে। আহা, ছেলে মানুষ,—কেউ কি তা'র হাত ধরিয়াও আনিতে পারিল না? এইরূপ কত চিন্তাই আসিল। কিন্তু বৃষ্টি থামে না।

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া একটী পুরাতন ছাতা ও লাঠিটী লইয়া বৃদ্ধ পুত্রের উদ্দেশ্যে চলিলেন। কিছু দূরেই দীননাথ ভিজিতে ভিজিতে আসিতেছিল।—'একি রে, সন্দেশ, কলা সব কোথা পেলি বাবা। কে দিলে?'

'খুড়ীমা দিলেন বাবা। খুড়ীমা বোলেছেন—তাঁর কাছেই এবার থেকে থাক্‌বে'—তুমি খাবার দিতে পার না।'

'চ' বাবা চ'——বলিয়া তিনি পুত্রের মাথায় ছাতা ধরিয়া নিজে ভিজিতে ভিজিতে আসিতে লাগিলেন—।

'হাঁ রে দীনু, তুই তবে বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চলে এলি কেন? খুড়ীমার বাড়ীতে একটু বস্‌লেই ত' হোত।'

'কেষ্ট দাদা মাছ ধর্‌তে যাবে কিনা, তাই আমি পালিয়ে এসেছি বাবা।'

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ জগদীশ পুত্রকে কোলে করিয়া পড়াইতেছেন,—দীনু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—'হাঁ বাবা, আমরা খুব গরীব নয়? আচ্ছা, নীলু বল্‌ছিল তুমি আমার ছাতা কিনে দিতে পার না। আচ্ছা, আমাদের পাল্কী নেই কেন বাবা?' কি একটা ভয়ে জগদীশপ্রসাদ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কথা কহিলেন না।

'খুড়িমা আমায় কত খেলনা দেবেন বোলেছেন। খুড়িমা ব'লেছেন, তুমি মিছে বাবা হ'য়েছ, খেতে দিতে পার না। হাঁ বাবা, খুড়ীমা আমাদের খেতে দেন?'

অষ্টমবর্ষের বালক। তাহার মনে বিষের অঙ্কুর একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। একান্ত দরিদ্র স্নেহময় পিতা,—তিনি কি উত্তর দিবেন? বৃদ্ধ নীরব।

অনেকক্ষণ পরে জগদীশ বলিলেন,—'আচ্ছা দীনু, আজ স্কুলে কি পড়্‌লি বল্ বাবা।'

'বাবা, কেষ্ট দাদা আজ পড়া বল্‌তে পারে নি, মাষ্টার মশাই খুব বকেছেন।'

'আর তুই বুঝি সব পেরেছিস্?' বলিয়া তিনি—সস্নেহে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

'হাঁ বাবা,—মাষ্টার মশাই আজ কি বল্‌লেন জান বাবা? বল্লেন—'তোরা খেতে পাস্‌না। একটা ভাল কাপড় জামা নেই—আবার স্কুলে আসিস্ কি কর্‌তে?' কাল থেকে ভাল জামা কাপড় পাস্ তো ভদ্রলোকের মত প'রে স্কুলে আস্‌বি। নয়ত ও রকম ময়লা ছেঁড়া কাপড় প'রে আর আসিস্ নি, বুঝলি? বলে ধম্‌কে উঠ্‌লেন।'

বৃদ্ধ কি ভাবিতেছিলেন,—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'আজ বড় ভিজেছিস্; না দীনু? আয় একটু শুই,' বলিয়া ছেলেকে লইয়া ঘরের ভিতর শুইয়া পড়িলেন।

(৫)

দিন আসে, দিন যায়। কিন্তু কই অবস্থার ত' কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। ভিক্ষা আর করিবার সামর্থ্য নাই। যজমানের কাছ হইতেই বা আর কি বলিয়া সাহায্য চাহিবেন? এই ত'—সেদিন ভারি অসুখটা থেকে যজমানেরাই অর্থ দিয়া সাহায্য দিয়া বাচাইল। আবার একমাস হইল, দীনু রক্তামাশয়ে ভূগিতেছে। লোক নাই, কে শুশ্রূষা করিবে? অর্থ নাই,—কি করিয়া চিকিৎসা হইবে। বৃদ্ধ বসিয়া বসিয়া এইরূপ কত ভাবেন। ছেলেকে কোলে করিয়া কত কাঁদেন। 'সেদিন যদি ঘোষালদের কথা শুনিতাম!—দীনুকে যদি পোষ্যপুত্ররূপে দিতাম। দীনু আমার কত সুখে—কত আদরে মানুষ হ'ত। ছেলে? দরিদ্রের আবার ছেলে কি? নিরন্নের আবার পুত্রস্নেহ কি? এই ত' সে কাতর-কণ্ঠে এত অভাব জানায়। পূরণ করিতে পারিলাম কই? জামা দিতে পারি নাই,—কাপড় দিতে পারি নাই। ভাল আহার! তাই বা কবে দিলাম? সে যে শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহাও ত' অপরের সাহায্যে। এই যে করাল ব্যাধিতে বালককে তিল তিল করিয়া মরণের মুখে লইয়া যাইতেছে,—আমি'ত পিতা, কই তার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য কিছুই ত' করিতে পারিতেছি না। তবে তাকে অপরের হা'তে দিতে কুণ্ঠিত হই কেন? ভগবান্! এবার দীনুকে বাঁচাইয়া দাও। আর তাকে এমন কোরে অযত্ন কোরবো না। ঘোষালকেই দেব। আমার আবার পুত্রের দাবী কি?' পুত্রকে বুকে করিয়া এইরূপে নির্জ্জনে,—কত নিস্তব্ধ নিশীথে বৃদ্ধ আকুল হইয়া কাঁদিতেন।

একটী দৈব ঔষধ ধারণ করিয়া, অনেক সেবা শুশ্রূষার পর দীননাথ সারিয়া উঠিল। তাহার গলায় পূর্ব্ব হইতেই চারিটী মাদুলী ছিল, এখন হাতে আর একটী কবচ উঠিল।

(৬)

আরও দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে ;—একদিন সকালে জগদীশপ্রসাদের খুব জ্বর আসিল।—দুপুরবেলা হরি ঘোষাল একটু দুধ ও মিছরী এবং চাকরের হাতে কিছু ফলমূল লইয়া উপস্থিত হইলেন। জগদীশের ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিলেন—'দাদা', কেমন আছ ?'

খুব জোর করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ চোখে জগদীশপ্রসাদ একবার চাহিলেন। কি যেন একটা শঙ্কায় চমকিয়া উঠিয়া বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া একবার বিছানার পাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দীনু ত' কাছেই বসিয়া আছে।— আবার ধড়াস্ করিয়া বালিশের উপর মাথাটা ফেলিয়াই ঘোষালের দিকে চাহিলেন।

ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—'কেও, হরি! এস ভাই।' বলিয়াই চোখ বুঁজিলেন।

'শরীরটে কেমন বোধ কর্‌ছ ?'—বৃদ্ধ কি ভাবিতে ছিলেন, কটমট করিয়া চাহিয়াই বলিলেন,—"দীনু ? দীনু ত আমার কাছেই আছে ? নিতে এসেছ দাদা ?'

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর আশে পাশে চাহিয়া জগদীশ ঘোষালকে কহিতে লাগিলেন, -'ভাই, তোর্ হাতে ধর্‌ছি, আমার একটা অনুরোধ রাখিস্।"

'কি অনুরোধ ? বলনা দাদা,—ওকি অমন ক'রে কাঁদ্‌ছ কেন ?'

'সেদিন ভাই তোকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ; আজ তোরই হাতে আমার দীনুকে সঁপে দিচ্ছি।—দেখিস্ ভাই, যেন অযত্ন না হয়।—আজ হ'তে সে তোরই ছেলে; আমার আর কোন অধিকার নেই। বাছা কত জিনিষ চেয়েছিল, কিছুই দিতে পারি নি।'

বৃদ্ধ দীননাথের হাত ধরিয়া ঘোষালের হাতে দিলেন। দর দর করিয়া অশ্রু বহিল।

ঘোষাল প্রস্থান করিলে জগদীশ বড় কাঁদিলেন। ভয় হইল যেন কমলাদেবীর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেন।—কে যেন প্রেতাত্মার স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে,—'ওগো, আমার কেউ নেই,—তুমি আমার স্বামী। তোমার হাতে আমার দীনুকে রেখে গিয়াছিলাম, আজ কাকে দিলে!' বৃদ্ধ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

যাহা হউক, হরিঘোষালের সাহায্যেই জগদীশপ্রসাদ এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন। দীননাথ হরিঘোষালের কাছেই পোষ্য-পুত্ররূপে মানুষ হইতে লাগিল। ঘোষালগৃহিনী হেমাঙ্গিনী ঠাকুরাণীর বহু চেষ্টায়, বহু তাড়নার ফলে বালক দীননাথ তাঁহাকে 'মা' এবং হরিঘোষালকে 'বাবা' বলিতে শিখিল। ঘোষাল গৃহিণী চাকরের প্রতি এবং দীনুর প্রতি কড়া নিষেধ দিয়া রাখিলেন,—'খবরদার মুখুয্যে পাড়ায় যাবি নি। যদি কখনও শুনি মুখুয্যে পাড়ায় গেছ কি মুখুয্যে বাড়ীতে ঢুকেছ ত' কেটে দু'খানা ক'র্‌ব।

(৭)

ঘোষাল গৃহিণীর যত্ন—সে খুব বেশী, খুব নিরেট। তা'তে এতটুকু ফাঁক ছিল না।—দীনু তখন হইতে জগদীশকে জ্যাঠামশাই বলিয়া জানিয়া রাখিল।

ক'দিন ধরিয়া বৃদ্ধ জগদীশপ্রসাদের আহার নাই, নিদ্রা নাই। বৃদ্ধের কিছুই ভাল লাগিত না। সমস্ত দিন নিজের কুঁড়ে ঘরটীতে একা পড়িয়া থাকিতেন। বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—সব শক্ত হইয়াছে। কাঁদিবার ক্ষমতাটুকুও কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে। বৃদ্ধ প্রতিদিন রাত্রে দীনুর পরিত্যক্ত খেলনাগুলি তুলিয়া রাখিতেন। আবার সকাল বেলা সে গুলি পাড়িতেন।

ঘরের সুমুখ দিয়া গ্রামের পাকারাস্তাটি গিয়াছে। ঘরের জানালাটি খুলিয়া, পথের ধারে মুখ করিয়া প্রত্যহ সকালে বৃদ্ধ বসিয়া থাকেন। গ্রামের সব ছেলে এই রাস্তা দিয়া স্কুলে যায়। দীনুও রোজ যায়। বৃদ্ধ রোজ দেখেন। কতদিন মনে করিয়াছেন ডাকি, কিন্তু পারেন নাই। ঘোষালের চাকরটা যে থাকে,—সে যদি কিছু বলে।— আজও বৃদ্ধ সেইখানটিতে প্রবল আকাঙ্ক্ষার সহিত পুত্রের প্রতীক্ষায় ঘোষাল বাড়ীর দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন। একে একে সব ছেলে চলিয়া গেল। ঐ যে দীনু আসিতেছে। আজ আর ঘোষালের চাকরটা নেই।—বৃদ্ধের বড় আনন্দ হইল! আজ দীনুকে ডাকিবেন, কথা কহিবেন।

দীনু যখন একেবারে জান্‌লার কাছে আসিল, বৃদ্ধ ডাকিলেন—'দীননাথ, একবার আয় না বাবা!' দীনু চাহিয়া দেখিল,—পিতা।

'চুপ কর জ্যাঠামশাই, যাচ্ছি।'

হাঁ রে, কে তোকে 'জ্যাঠামশাই বল্‌তে শিখিয়ে দিলে বাবা ?'

'মা'—বলিয়াই এদিক ওদিক চাহিয়া দীননাথ বাড়ীর দরজায় যেমন পা দিয়াছে শুনিতে পাইল—একি গরু-দাদা যে পিছনে ডাকিতেছে। হারু ঘোষালের চাকর। আর বাড়ীতে প্রবেশ করা হইল না। সে তৎক্ষণাৎ দীনুর হাতে একটা জোরে টান দিয়া বলিল,—'চ' স্কুলের বেলা হয়েছে,—আর 'জ্যাঠামশাই' এর কাছে যায় না।' দু'জনে চলিল। হেমাঙ্গিনী ঠাকুরাণীর কথা দীনুর মনে হইল,—মুখুয্যে বাড়ীতে ঢুকিলে তিনি যে কাটিয়া ফেলিবেন! খানিক দূর গিয়া দীনু মুখ ফিরাইয়া ছল ছল চোখে পিতার দিকে একবার চাহিল। জগদীশ দেখিতে পাইলেন হারু দিনুর পিঠে খুব জোরে একটা ধাক্কা দিল। দীনু মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্কুলে চলিল বৃদ্ধ জানলা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সেদিন দুপুরবেলা জগদীশপ্রসাদ এক বাটী দুধ গরম করিয়া ছেলের জন্য স্কুলে লইয়া গেলেন। তারও দীনুর জন্য স্কুলে কিছু মিষ্টি ও একটু দুধ লইয়া গিয়াছিল।

দীনু সব খাইয়া পিতার হাতের দুধ টুকু খাইবে, অমনি হারুর চোখে চোখ পড়িল;—বাটি হইতে মুখ তুলিয়া দীননাথ বলিল,—'না বাবা'—তার পর চমকিয়া বলিল—'জ্যাঠামশাই আমি খাব না।'

সন্ধ্যাবেলায় দীননাথ পড়িতেছে, এমন সময় হেমাঙ্গিনী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া আসিয়া উপস্থিত—'হাঁরে, রাক্ষস! এত গিলেও পেট ভরে না? আবার স্কুলে গিয়ে জ্যাঠার কাছ থেকে দুধ খাওয়া হয়েছে! আ মরণ আর কি!—অদেশ্লের দশা হলেই ঐ হয়। এঁটো কুড়ের পাত কি আর স্বর্গে যায়?' এই বলিয়া সামনের রুলগাছটী তুলিয়া সক্রোধে দীনুর পিঠে এক ঘা দিয়া দুম্ দুম্ করিয়া চলিয়া গেলেন। একেবারে রান্নাঘরে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'দেখ বামুন মেয়ে! মুখপোড়া ছেলেকে আজ খবরদার কিছু খেতে দিও না।'

বামুন মেয়ে মা ঠাকুরাণীকে বেশ চিনিতেন; তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

(৮)

এই ঘটনার পর হইতে দীনুর সেই চির পরিচিত পাকা রাস্তা দিয়া বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। এখন সে রোজ মাঠের ধার দিয়া স্কুল যায়।

মুখুয্যে মহাশয় পঞ্চার মুখে প্রত্যহই পুত্রের সংবাদ পান। আজ তিন চারিদিন হইল পঞ্চাকেও দেখিতে পান নাই। একদিন সন্ধ্যাবেলা পঞ্চা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'হাঁ বাবা, তোকে তিন চার দিন দেখিনি - দীনু কেমন আছে রে?'

"দীনুর যে খুব অসুখ;—তুমি কি কিছু শোননি মামা?'

'না বাবা, কই, কেউ ত' কিছু বলেনি বাবা। ভয়ানক দুর্য্যোগ, তাই আজ ক'দিন বেরোতেও ত' পারি নি বাবা। কি অসুখ হয়েছে রে পঞ্চু?—এখন কেমন আছে।'

'খুব অসুখ মামা। মাথা কেটে গিয়ে সে'দিন কত রক্ত বেরোল। তোমায় সব বলছি মামা। কাউকে বোলোনা, হেরো জানতে পারলে মেরে ফেলবে।'

'না—না। দাঁড়িয়ে রইলি কেন বাবা? বোস্, বোসে বোসে সব বলত বাবা শুনি?' বলিয়া জগদীশ দাওয়ার উপর পঞ্চার সম্মুখে একখানা তালপাতার বোনা চৌকা আসন রাখিলেন।

পঞ্চা বলিতে লাগিল—"রবিবারদিন বিকেলবেলা আমরা সানের ঘাটের রোয়াকের পেছনে বোসে দু'জনে গল্প করছিলাম। আমি আর তোমার দীনু। আমি বললাম, —হ্যাঁরে দীনু, তুই হরিমামাকে 'বাবা' বলে ডাকিস্ কেন। মুখুয্যে মামাই ত তোর 'বাবা'।—সে বললে—'চুপ কর ভাই, মা শুনতে পাবে।' আমি বললাম—'অত ভয় কিসের রে? আচ্ছা, তোর বাবার জন্যে তোর মন কেমন করে না? তুই তোর বাবাকে ভালবাসিস্ না ঘোষাল মামাকে ভালবাসিস্? সে বললে—'আমি ভাই - বাবাকেই—ভালবাসি। একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার কাছে নিয়ে যাবি?'—

'ওকি! তুমি কাঁদছ যে মামা! তবে আমি আর বোলবো না।'—বলিয়া পঞ্চা একটু গম্ভীর হইল।

'না, না—বলে যা বাবা,—তারপর?'—বলিয়া বৃদ্ধ চোখ মুছিলেন।

"তারপর—কখন যে সেখানে হিমু মামী এসেছিল জানিনা; বোধ হয় লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সব কথা শুনেছিল, জান মামা? আমরা পালিয়ে আসতে যাব, আর অমনি দীনুকে ধরে তার ঘাড়ে এমন এক চড়

মার্‌লে যে সে পড়ে গেল। সানের রোয়াকে তা'র কপাল ছেঁচে গিয়ে খুব রক্ত বেরোল। বুকেও খুব লেগেছিল। সেই দিন রাত্তির থেকে খুব জ্বর; খালি বলে 'বাবা, আমি বাড়ী যাব।' আবার ডাকে—'জ্যাঠামশাই'—আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।"

'উঃ—বাবা একটু জল দেতো খাই'—বলিয়া জগদীশ-প্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পঞ্চা তাঁহার হাতে এক গ্লাস জল দিল,—তিনি একনিশ্বাসে খাইয়া ফেলিলেন। পঞ্চাকে বলিলেন—'যা।'

তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ জগদীশ-প্রসাদ ছুটিতে ছুটিতে ঘোষাল বাড়ীতে গেলেন। সম্মুখের উঠানে হেরো গরুর খড় কাটিতেছিল। সে বাড়ীর ভিতর খবর দিতে গেল। জগদীশ প্রসাদ চণ্ডীমণ্ডপ হইতে শুনিতে পাইলেন, বৌমা হেমাঙ্গিনী বলিতেছেন,—'ছেলের টান্ দেখে আর বাঁচিনা।—তবু যদি ছেলেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ কর্‌তেন। অত যদি টান্ ত' ছেলেকে পুষ্যি হুকুর দেওয়া হয়েছিল কেন? হেরো, তুই চুপ্ কোরে বাড়ীর ভেতর বোস্ দিকিন্—বুড়ো যা' হয় করুক্ গে। আ মরণ!'

দীনু রোগক্লিষ্ট মুখে একবার ডাকিল;—'হাঁ মা', আমার বাবা এসেছেন?'

'হাঁ,—জ্যাঠামশাই এসেছে; একটু ঘুমো দিকিন।'

তারপর অনেক সাধ্যসাধনার পর সে'দিন জগদীশ রোগীর গৃহে প্রবেশাধিকার পাইলেন। একেবারে দীনুর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—'বাবা দীনু, তোর অসুখ করেছে? তোর বাপ মায়ের কাছে কেমন আছিস্ বাবা?'

দীনু একবার চোখ মেলিয়া চাহিল,—চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ;—'কে, বাবা এসেছ?—বাবা—'

সভয়ে দেখিল দোরের পাশে হেমাঙ্গিনী দাঁড়াইয়া,—চমকিয়া উঠিল,—'উঃ জ্যাঠামশাই, বুকে বড় ব্যথা।'—বলিয়াই—জগদীশপ্রসাদের হাতটী বুকের উপর রাখিয়া চোখ বুঁজিল। মাথা বালিশের পাশে টলিয়া পড়িল। চোখের কোণে জল গড়াইল।

জগদীশ ছেলেকে বুকে টানিয়া লইয়া, মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আরও চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—'দীনু! বাবা দীননাথ!'

দীননাথ তখন বৃদ্ধের সমস্ত ডাক, সব অশ্রুকে—উপেক্ষা করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কে বলিতে পারে!

কবাটের আড়াল হইতে হেমাঙ্গিনী ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন,—'হারু, রুগী একটু ঘুমিয়েছে ঘুমুগ্। তোর জ্যাঠামশাইকে বাইরে গিয়ে বস্‌তে বল। অত ক'রে কেঁদে আর আমার ছেলের অমঙ্গল কর্‌তে হবে না।'

* * * *
* * *

সেদিন বুকের ধনকে শ্মশানে রাখিয়া বৃদ্ধ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। সব শেষ হইয়া গেল। রাত্রি অন্ধকার। সমস্ত পল্লী নিস্তব্ধ;—গৃহ একান্ত নীরব—একেবারে আঁধার! প্রাণ তার চেয়েও আঁধার;—সেই অন্ধকার হৃদয়ে শোক, দুঃখ নিবিড় হইয়া রহিয়াছে। তীব্র যন্ত্রণা দিতেছে। সেই গভীর তমিস্রা রজনীতে, হৃদয়ের বিপুল ভার লইয়া শত শত জ্বালাময়ী চিন্তার মাঝখানে বৃদ্ধ কখন তাঁহার ছোট দাওয়াটীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন জানিতে পারেন নাই। নিদ্রাতেও শান্তি নাই,—বৃদ্ধ স্বপ্ন দেখিলেন, কমলা দেবী আসিয়াছেন,—তাঁহার কোলে দীনু ঘুমাইতেছে। দীনুর বড় অসুখ। কমলাদেবীকে দেখিয়া জগদীশপ্রসাদের বড় ভয় হইল। কমলাদেবী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—'চুপ কোরে বোস, দীনুর আমার বড় অসুখ।' দীনু চোখ মেলিয়া ডাকিল,—'বাবা'। হেমাঙ্গিনী কোথা হইতে আসিয়া পাশবিক বলে দীনুকে কাড়িয়া লইল। খুব মারিল। দাওয়া হইতে পড়িয়া গিয়া দীনুর কপাল কাটিয়া গেল, খুব রক্তপাত হইল। দীনু কাঁদিতে লাগিল,—'জ্যাঠামশাই, বুকে বড় ব্যথা;—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, যাব না!' জগদীশপ্রসাদ ছুটীয়া দীনুকে কোলে করিতে গেলেন। দীনু একেবারে ঘুমাইয়া পড়িল।—জগদীশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—খুব ঝড় বৃষ্টি তখন হইতেছে।

তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে গেলেন, পারিলেন না;—কে যেন বড় করুণ স্বরে ডাকিল, 'উঃ, জ্যাঠামশাই! বুকে বড় ব্যথা।'

হেমাঙ্গিনীর কান্নায় নাকি সেদিন পাড়ার লোক ঘুমাইতে পারে নাই।

শ্রীনীরদবিহারী সেন গুপ্ত

বার্লিনে খৃষ্টপর্ব্ব ও নববর্ষের উৎসব

খৃষ্টপর্ব্ব (X' mas)

পাশ্চাত্য জাতি সমূহের প্রধান পর্ব্ব খৃষ্টপর্ব্ব। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট যেদিন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দিনে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যিনি জগতের পাপভার মোচনের জন্য মানবত্রাতারূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার জন্মদিনে ভক্তগণ আনন্দ উৎসব করিয়া থাকেন। সমস্ত ইউরোপখণ্ড এই দিন উৎসবানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে; জার্ম্মাণ দেশে এ উৎসব কি ভাবে সম্পন্ন হয় আজ তাহাই বলিব।

উৎসবের আয়োজনে পর্ব্ব আগমনের দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই বার্লিন নগরী বহু উপকরণে সজ্জিত হইতে থাকে। চিরসজ্জিত দোকান ঘর প্রভৃতি উৎসবের সাজ সজ্জায় এবং বিবিধ উপকরণে ভূষিত হইয়া নূতনতর হইয়া উঠে। সেই উৎসব দিনের কথা ভাবিয়া পূর্ব্ব হইতেই সকলে আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়—চারিদিকে হাসির রোল আনন্দের ফোয়ারা ছুটে। রাস্তাঘাট প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয় বুঝি বা স্বয়ং কমলার আগমন হইয়াছে। ২৫শে ডিসেম্বর—পর্ব্বদিন উপস্থিত হইল। আমাদের দেশে 'ধান্য পৌর্ণমাসী'র দিনে (মাঘমাসের পূর্ণিমায়) যেমন কলাগাছ পুঁতিয়া ব্রত করা হয়, বার্লিনে তেমনি দেবদারু বৃক্ষের চারাগাছ ঘরের মেজে বা টেবিলের উপর বসাইয়া খৃষ্ট পর্ব্বের উৎসব আরম্ভ হয়। প্রত্যেকের বাড়ীতে এক একখানা দেবদারু বৃক্ষ (চারাগাছ) কিনিয়া আনে। ইহাকে জার্ম্মান ভাষায় "ভাইন্ আক্‌ট্-বাউম্" (Weinacht Baum) অর্থাৎ পর্ব্বী বৃক্ষ বলে। এই 'বাউম্' কোনরূপ আধার (Standing)এর সাহায্যে ঘরের মেজে বা টেবিলের উপর বসাইয়া রঙীন্ কাগজের ফুল, পরী (angel), স্ফটিকের গোলা প্রভৃতি ইহার শাখা প্রশাখায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। গোড়া হইতে অল্প কতক অংশ বাদ দিয়া আগা পর্য্যন্ত আলো (candle) দিবার জন্য গাছের কাণ্ডে স্থানে স্থানে লৌহশলাকা পুঁতিয়া তাহাতে candle বসাইয়া দেওয়া হয়। বৃক্ষের নীচে পরিবারস্থ লোকদিগের প্রাপ্ত উপহার সামগ্রী অভ্যাগত বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখাইবার জন্য সাজাইয়া রাখা হয়। এইরূপে 'ভাইন্-আক্‌ট্-বাউম্' ড্রইংরুমেই সাজান থাকে। এই সাজসজ্জা দুপুর হইতে আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সমাপ্ত হয়। কেহ কেহবা দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই সাজসজ্জা করিয়া রাখে।

ড্রইংরুমে এই 'ভাইন্-আক্‌ট্-বাউম্' হইতে একটু দূরে লম্বা এক টেবিলে সাদা ধব্‌ধবে একখানা চাদর পাতিয়া তাহার চারিদিকে চেয়ার সাজাইয়া রাখা হয়। এইখানে বসিয়া সকলে চা, রুটি, কেক্ (cake) প্রভৃতি খায়।

২৫শে ডিসেম্বর 'Geschonktag' অর্থাৎ The day for presenting something to friends and relatives. দূর হইতে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা পরস্পরকে উপহার পাঠাইয়া থাকে। বাড়ীতে স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, পিতা পুত্র কন্যাকে, ভাই বোনকে, বোন্ ভাইকে, যাহার যাহা ইচ্ছা উপহার দিয়া থাকে। সেদিন রাত্রে কেহ নিজ বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যায় না, সকলেরই নিজ নিজ বাড়ীতে উৎসব, ছুটীতে সকলেই আপন আপন বাড়ীতে আসিয়াছে, পুত্রকন্যারা ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছে, পিতা মাতা পুত্র কন্যা ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া আপন বাড়ীতে উৎসবের আনন্দে মাতিয়া যায়।

সন্ধ্যা আসিলে পরিবারস্থ সকলে সান্ধ্যপোষাক-পরিচ্ছদে পরিপাটিরূপে সজ্জিত হইয়া ড্রইংরুমে আসিয়া একত্র হয়, 'ভাইন্-আক্‌ট্ বাউমের' আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইল, সকলের মুখে হাসি, সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল—সকলের চোখেমুখেই আনন্দের জ্যোতিঃ প্রকটিত, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হাসি করতালিতে আপনাদের হৃদয়ের অজস্র আনন্দধারা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে লাগিল, বয়স্ক বালকবালিকারা 'বাউমের' বর্ণনা ও উপহার সামগ্রীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল, পিতা মাতা হাসিমুখে পরস্পরের দিকে চাহিলেন। সরল সুকুমার

পুত্রকন্যাদিগের এই আনন্দে তাঁহারা যেন হৃদয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করিলেন। আহা, আজ কি সুখের দিন!

মরি! মরি! এ আনন্দ দর্শনে কাহার হৃদয় না আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হয়! আজ যীশুর জন্মদিন তাই এত আনন্দ, এত আমোদ, প্রতি বাড়ীতেই আনন্দলহরী খেলিতেছে, আমোদের বাজার বসিয়াছে।

তারপর সকলে মিলিয়া স্তোত্র গীত আরম্ভ করিল, পিয়ানো হারমোনিয়ম বাজিয়া উঠিল, সকলে মিলিয়া 'বাউমের' চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে গাইতে লাগিল। সকলেই যেন একেবারে যীশুনামসুধাতে মজিয়া গেল।

এইরূপে কিছুক্ষণ নৃত্যগীতের পর পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া পিতামাতা খাইবার টেবিলের চারিদিকে চেয়ারে বসিয়া যান, মাতা খাবার সব বণ্টন করিয়া দেন, শেষে নিজের ভাগ লইয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া পড়েন, তারপর গ্লাসে পানীয় ঢালা হয়, পান করিবার পূর্ব্বে সকলেই 'Prost Weinacten' অর্থাৎ good health and merry Christmas জ্ঞাপন করিয়া পরস্পরের গ্লাসে গ্লাস ঠেকাইয়া শুভ কামনা পূর্ব্বক health পান করেন।

আহারাদি শেষ করিয়া রাত্রি প্রায় ১২টা, ১টার পর সে আনন্দ-বাজার নীরব হয়। সে দিনের জন্য উৎসব শেষ হইল।

২৬শে ডিসেম্বর ঃ—কালকার দিনে যীশু ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহার মঙ্গলকামনায় উপাসনার পোষাক পরিয়া প্রাতে ১১ টার সময় সকলে গীর্জ্জাঘরের দিকে চলিল। ১১টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত গীর্জ্জাঘরের উপাসনাদি শেষ করিয়া সকলেই আপন আপন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিল; তারপর বাড়ীতে Dinner শেষ করিয়া পর্ব্বীয় নূতন পোষাক পরিচ্ছদাদিতে সজ্জিত হইয়া সকলে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদিগের বাড়ী 'ভাইন্-আকট-বাউম্' দেখিতে দেখিতে ও তাহার বর্ণনাতে সেদিন অতিবাহিত করিল।

এইখানে আমাদের দেশের দুর্গা পূজার কথা মনে পড়ে। আমরা যেমন এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিতে যাই এবং কোন বাড়ীর প্রতিমা কিরূপ হইতেছে, কিরূপ সাজাইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করি, ইহারাও সেইরূপ নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের ও বন্ধুবান্ধবদিগের বাড়ী 'Weinacht Baum' দেখে এবং কাহাদের 'বাউম' সুন্দর হইয়াছে, কাহাদের প্রাপ্ত উপহার কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করে।

নববর্ষ

এইরূপে বার্লিনে X'mas পর্ব্বের উদ্‌যাপন হয়। ইহার পর সকলে নববর্ষের উৎসবের অপেক্ষায় থাকে। নববর্ষের প্রথমদিন অতিবাহিত হইলেই 'বাউমের' সাজ সজ্জা খুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসে। (কাহারও কাহারও ঘরে ইহার পরও কিছুদিন 'বাউম' থাকে)। ইহা আমাদের দেশের প্রতিমা বিসর্জ্জনের ন্যায় Baum বিসর্জ্জন। কিন্তু এব্যাপারে কোন উৎসবাদি হয় না।

নববর্ষের প্রথম দিন প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতিরই আনন্দের দিন। সকলেই নববর্ষকে সানন্দে আহ্বান করিয়া আনেন কবি তাঁহার অপূর্ব্ব গীতি ছন্দে সেদিনের পবনহিল্লোলকে মাতাইয়া তোলেন। সেদিন নব উৎসাহে ও নব আনন্দে সবাই পূর্ণ হইয়া উঠেন। সেদিন আকাশে বাতাসে জলে স্থলে নব জাগরণ ধ্বনিত হইয়া উঠে।

কিন্তু আমাদের দেশে এই নববর্ষের আগমন সুধু কবির গীতিতেই সম্বর্দ্ধিত হয়। তাহার জন্যে বিশেষ কোন উৎসব করা হয় না। পাশ্চাত্য দেশে এই নববর্ষের আগমনী উপলক্ষে অনেক আনন্দ উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা তাহাদের মধ্যে একটী জাতীয় উৎসবরূপে পরিগণিত হয়।

জার্ম্মানদিগের মধ্যে এই আনন্দ উৎসব কিরূপ ভাবে সম্পন্ন হয় তাহার একটি নমুনা দিব।

বৎসরের প্রথম দিনে বার্লিনে প্রায় লোক মাতাল হয়। জনসাধারণের সে মাতলামি বড় ভয়ঙ্কর। তাই সকলকে বিশেষতঃ বিদেশীদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি ১২টার পর বার্লিনের রাস্তায় হুলুস্থুল ব্যাপার হইবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়।

রাত্রি ১২টা হইতে পরদিনের রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এক দিন। রাত্রি ১২টার পর তাহাকে morning বলে। ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে যদি কেহ রাস্তায় মাতলামি বা হাঙ্গামাদি করে, তবে পুলিশ তাহার জন্য যথাবিহিত প্রতিবিধান করে, কারণ তখনও বৎসরের প্রথম দিন আসে নাই। কিন্তু ১২টা বাজিলে পর পুলিসে আর

কিছুই করে না। ১২টার পর বন্দুক, revolver প্রভৃতির ফাঁকা আওয়াজ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। পুলিশে এই হুলস্থুল ব্যাপারে বাধা দেয় না বটে, কিন্তু পাছে মাতলামির ভাণ করিয়া কেহ দোকান পাট লুট করে বা কোথাও কেহ কাহাকেও গুলি করে, এই ভয়ে রাস্তার ধারে এবং মোড়ে সজ্জিত সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত থাকে। কারণ এসময়ে মাঝে মাঝে মাতাল দুষ্টলোকেরা গুলি ভরিয়া জনস্রোতের উপর আওয়াজ করে। সময় সময় লোকও মারা যায়।

৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি ১২টার পর বার্লিনে গাড়ী ঘোড়া ট্রাম, মটরকার প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়। সন্ধ্যা ৫।৬টার সময় হইতে কোন restaurant বা 'restauration'এ যাইয়া জায়গা দখল করিয়া না বসিলে পরে জায়গা পাওয়ার সাধ্য কি? ৮।৯টার সময় সমস্ত restaurant restauration প্রভৃতি লোকে একদম পরিপূর্ণ; ১২টার মিনিট ১০।১৫ পূর্ব্বে সমস্ত দোকানঘর বাড়ী প্রভৃতির জানালা বন্ধ করিয়া জানালায় Barricade ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, কারণ মাতালেরা ঢিল, বোতল প্রভৃতি দোকান বাড়ীঘর ইত্যাদির জানালা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে থাকে। রাত্রি ১২টার পর 'Berliner Castle' হইতে ১০১ বার তোপধ্বনি করা হয়।

সে রাত্রে নিজ নিজ বাড়ীতে বা restaurant, 'restauration' প্রভৃতিতে বসিয়া সকলেই রাত্রি ১২টার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। সাধারণ লোকগুলী সন্ধ্যা হইতেই Public bar, 'restaurrtion' ইত্যাদিতে বসিয়া সুরাদেবীর উপাসনা আরম্ভ করিয়া দেয়, এক একজন মাতাল হইয়া পাগলের মত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত পান করিতে থাকে। কিন্তু ১২টার পূর্ব্বে এ অবস্থায় কেহই রাস্তায় বাহির হইতে পারে না, হইলেই পুলিসে গ্রেপ্তার করিবে। অতিকষ্টে কোনপ্রকারে রাত্রি ১২টার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে।

তারপর ১২টার ঘণ্টা। পড়িল, আমাদের দেশে আগুন লাগিলে যেমন বীভৎস চীৎকারে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, শুধু হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ, সেইরূপ এইখানেও যেই ১২টা বাজিল, অমনি যেন—

"অকস্মাৎ একেবারে শতেক কামান
করিল অনল বৃষ্টি

গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির চলাচল আধঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ হইয়া যায়।

বার্লিন কোর্ট হইতে তোপধ্বনি আরম্ভ হইলে মাতালেরা হৈ হৈ, রৈ রৈ রবে চীৎকার করিয়া সহরকে যেন নাচাইয়া তুলিতে থাকে, সকলেই রাস্তার উপরে "প্রোষ্ট্ নৈয়ে ইয়ার" (Prost Neujahr) অর্থাৎ Happy New Year বলিয়া চেঁচাইতে থাকে। ঘরপোড়ার সময় যেমন দ্রুম্ দ্রাম্ শব্দ হয়, তেমনি চারিদিকে দ্রুম্ দ্রাম্ শব্দ আরম্ভ হইল, গৃহস্থ পরিবারের লোকেরা দোতলা তেতলার উপর হইতে রং-দেশলাই জালাইতে থাকে, আর মাঝে মাঝে revolverএর ফাঁকা আওয়াজ করে। চারিদিকে কেবলই হৈ হৈ রৈ রৈ দ্রুম্ দ্রুম্।

মাতালদের বোতল পাথর ইত্যাদি ছোঁড়াছুঁড়িতে হুড়াহুড়িতে, বন্দুকের আওয়াজ প্রভৃতিতে মনে হয় যেন নববর্ষ সদর্পে পুরাতনকে 'দলি-পদভরে' আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, এইরূপ দুই তিন ঘণ্টা ব্যাপী হুড়াহুড়ি ব্যাপারের পর সমস্ত থামিয়া যায়, সহর নীরব ও শান্ত হয়।

শ্রীরেবতীরমণ ঘোষ।

আসল ও সুদ (অথবা প্রকৃতির প্রতিশোধ)

(পুরস্কার-রচনা)

(১)

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "চল, শেষ একবার তারকেশ্বরে বাবার কাছে হত্যা দিয়ে দেখি। বাবা যদি কৃপা ক'রে কোন আদেশ করেন। বাবা! কি পাপে বৃদ্ধ বয়সে আমাদের এই শাস্তি? সাত নয়, পাঁচ নয়, আমাদের একটি মাত্র ছেলে। কি দোষে সেই অন্ধের নড়ি সুরেশ এত দিন যাবৎ আমাদের উপর বিরূপ?"

"চল," বলিয়া কর্ত্তা মুখ ফিরাইয়া একটি সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

গৃহিণী কর্ত্তাকে নিয়া তারকেশ্বরে বাবার কাছে হত্যা দিতে গেলেন।

গৃহিণী অনসনে, অনিদ্রায় তিনিদিন বাবার দুয়ারে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। কর্ত্তা বিষণ্ণবদান, অর্দ্ধাশনে বাবার দুয়ারে বসিয়া রহিলেন।

তৃতীয় রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। বহু দিন পূর্ব্বেই গৃহিণীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। তিন দিনের অনশনে, অনিদ্রায় মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রি শেষে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তন্দ্রার ঘোরে দেখিলেন যেন উজ্জল গৌরবর্ণ জটাজুটমণ্ডিত এক যোগী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বলিলেন, "বাবা! কি পাপে আমাদের এই মর্ম্মান্তিক শাস্তি? কেন একমাত্র পুত্র সুরেশ আমাদের প্রতি, বিমুখ? কেন আজ দশ বৎসর যাবৎ আমরা বাছাকে চোখের দেখায় পর্য্যন্ত বঞ্চিত?"

যোগী উত্তর করিলেন না। শুধু একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। গৃহিণী সেই দিকে চাহিবামাত্র বায়োস্কোপের ছবির মত কতকগুলি ছবি দেখিতে পাইলেন। অধিকন্তু মনে হইল, যেন তিনি ছবিগুলির কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছেন।

প্রথম দৃশ্য

বিবাহ বাসর। লোকে লোকারণ্য। কন্যাকর্ত্তার গৃহ আত্মীয় প্রতিবেশী, কুটুম্ব কুটুম্বিনীতে পূর্ণ। কিছুকাল পরে বরযাত্রী সহ বর আসিয়া উপস্থিত হইল। বাদ্যভাণ্ডের বিপুল নিনাদ। বিবাহ আসরে বরের পিতা গম্ভীর ভাবে আসনে উপবেশন করিলেন। কন্যাকর্ত্তা গলবস্ত্র হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। বরের পিতা ক'নের গহনা, দান সামগ্রী প্রভৃতি দেখিতে চাহিলেন। হাতে নিক্তি; একটী একটী করিয়া গহনা ওজন করিলেন। ওজনে ত্রিশ ভরি হইল। বরকর্ত্তা কর্কশভাবে বলিলেন, "আর বিশ ভরি সোণা কোথায়? রূপার ও শ্বেতপাথরের দানসামগ্রী কোথায়? সোনার ঘড়ি, চেন, কাশ্মিরী শাল কোথায়?" কন্যাকর্ত্তা আদ্রনয়নে বিনীতভাবে বলিলেন, "বাড়ী ঘর বন্ধক দিয়া দশ হাজার টাকা কর্জ্জ করিবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে মহাজন সাড়ে সাত হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হইল না। তার থেকে পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়াছি। আর বাকী আড়াই হাজার, টাকায় যাহা কুলাইয়াছে তাহা দিয়াছি। কথামত সমস্ত দিতে পারি নাই।" তখন মহারোল গণ্ডগোল। শেষে কন্যাকর্ত্তা এক হাজারের জন্য একখানা হাণ্ডনোট লিখিয়া দিলেন। তবে বিবাহ হইল।

গৃহিণী বলিলেন, "এযে আমাদের সুরেশ, এই যে আমাদের কর্ত্তা, এই যে সুরেশের শ্বশুর। শুনিয়াছি বটে সুরেশের বিবাহে একটা মস্ত গোলমাল—"

যোগী তর্জ্জনী দ্বারা ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া গৃহিণীকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিয়া দ্বিতীয় দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কচি বউ। অপরূপ রূপ, কিন্তু ম্লান মুখ, ক্ষীণকায়। ছিন্ন মলিন বসন। মাঘ মাস। শীতে থর থর কাঁপিতেছে।

বউটি বাপ মায়ের আদরের মেয়ে। শাশুড়ীকে নিজ মারই মত মনে করিত। শীত সহ্য করিতে না পারিয়া শাশুড়ীকে বলিল, "মা! আমার বড় শীত করে। আমায় একটি সেমিজ কি জামা কিনে দিন্।" শাশুড়ী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "হাড়হাবাতের মেয়ে। আমি তোকে সেমিজ জামা কিনিয়া দিতে পারিব না। কেন, তোর বাপ কি তোকে জামা কাপড় কিনিয়া দিতে পারে না? এমন সৃষ্টিছাড়া বাপতো কখনও দেখি নাই। শীত সইতে না পারিস্, লেখ্ তোর বাপকে।"

বউ নীরব হইল। শুধু অন্তর ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। বউ জানিত, বাপ তারই জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। বাড়ী ঘর বন্ধক দিয়াছেন।

বউর সর্দ্দিকাশি ও অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল। চিকিৎসাপত্রের নামও নাই। অবশেষে বউ একদিন বলিল, "মা, আমার বাবা মাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমাকে কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিন।" শাশুড়ী আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "লেখ্ তোর বাপকে। আগে হাজার টাকা দিয়া হ্যাণ্ড্-নোট খালাস করুক্, তারপর মেয়ে নিয়ে যাক্।" এবার বউ সত্যসত্যই তার বাবাকে পত্র লিখিল। বউর বাপ স্ত্রীর গহনাপত্র এবং নিজের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বন্ধক দিয়া হাজার টাকা পাঠাইলেন। বউ কলিকাতায় বাপের বাড়ীতে গেল। বউএর স্বামী তখন কলিকাতা মেসে থাকিয়া এম্ এ ও ল' পড়ে। সে ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করিল।

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "বাবা! এ যে আমার বউ। সেই যে গেল, আর আসিল না। হতভাগী আমার বাছাকেও আর আসিতে দিল না। কেন, আমি বউএর উপর এমন কি বেশী অত্যাচার করিয়াছি? কত শাশুড়ী বউকে মারে ধরে, খাইতে দেয় না, লোহার শিক পোড়াইয়া——"

যোগী আবার তর্জ্জনীদ্বারা ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া তৃতীয়দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা ভবানীপুরে একটী সুন্দর ত্রিতল বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীবারান্দা এবং একটী ক্ষুদ্র বাগান। একটী সুসজ্জিত কক্ষে একটী সুন্দরী যুবতী চেয়ারে উপবেশন করিয়া কলে সেলাই করিতেছে। সেলাইয়ের কলের এক পার্শ্বে স্তূপীকৃত সিল্কের কাপড় ও লেশ্। যুবতীর পরিপুষ্ট অঙ্গ হইতে যেন লাবণ্য ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে। সেলাইর শ্রমে যুবতীর গণ্ডদ্বয় ঈষৎ আরক্তিম। ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদজল। বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া তাহা সম্পূর্ণ অপনোদিত করিতে পারিতেছে না। পার্শ্বে কার্পেটমণ্ডিত মেঝের উপর দেবশিশুর ন্যায় দুইটী উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ শিশু খেলা করিতেছে। বড়টী খুকী, বয়স বৎসর সাতেক হইবে। সুবৃহৎ Dolly পুতুলকে কোলে নিয়া আদর করিতেছে। ছোটটী খোকা বয়স চারি বৎসর। কখনও ছুটাছুটি করিতেছে, কখন বা যুবতীর কলের নিকট আসিয়া লেশ্ ও সিল্কের কাপড় টানিয়া যুবতীর সেলাইর বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। যুবতী ক্রোধে ও বিরক্তিতে সেলাই বন্ধ করিয়া খোকার মুখচুম্বন করিতেছে।

এমন সময় গাড়ী বারান্দার নীচে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। যুবতী খুকীকে ইঙ্গিত করিল। খুকী দ্বার সংলগ্ন ক্ষুদ্র রেলিংএর দরজা বন্ধ করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সুগঠিত, সুদৃশ্য আফিস গাড়ী হইতে মাথায় শামলা, নাকে সোণার চশমা, কাল আলপাকার চোগাচাপকান্ পরিহিত একটী সুন্দর যুবক সিঁড়ি দিয়া টক্ টক্ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। দরজার নিকটে আসিতেই খুকি বলিল, "আজ কোর্ট থেকে ফির্তে বড্ড দেরী হ'য়ে গিয়েছে। মা বল্লে আজ তোমার জরিমানা।" যুবক অমনি সাতখানি গিনি পকেট হইতে বাহির করিয়া খুকীর হাতে দিল। খুকী দৌড়াইয়া গিয়া উহা সেলাইর কলের উপর রাখিয়া পুনরায় দরজার নিকট আসিয়া বলিল, "মা বল্লে, এ জরিমানায় হবে না, আরও বেশী জরিমানা দিতে হবে।" যুবক হাসিয়া বলিল, "আর তো জরিমানা দিবার টাকা নাই। তবে দেখ্ছি জরিমানার টাকার জন্য আমার জেলেই যেতে হ'ল।" খুকী "এস তবে" বলিয়া রেলিংএর দরজা খুলিয়া দিয়া যুবকের হাত ধরিয়া টানিতে

টানিতে যুবতীর নিকটে নিয়া গেল। যুবতী তখন অধিকতর নিবিষ্টভাবে সেলাই করিতে লাগিল। খুকী বলিল, "এই নেও তোমার কয়েদী" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

যুবতী একমনে সেলাই-ই করিতেছে। যুবক কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া কলের উপর হইতে সিল্কের কাপড় ও লেস্ মেঝেতে ফেলিয়া দিল। যুবতী একবার কৃত্রিম ক্রোধ ভরে চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কয়েদীর এরূপ ব্যবহার বড় অন্যায়। এর জন্য আলাদা শাস্তি পেতেই হবে।" যুবক হাসিয়া বলিল, "যখন আলাদা শাস্তি পেতেই হবে, তখন জেলর (Jailor) কেও ছাড়িব না।" বলিয়া যুবতীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার গণ্ডে ললাটে, ওষ্ঠে, চিবুকে, কেশে, গ্রীবায় অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল।

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "এই যে আমার সুরেশ। এই যে সে ডাইনী। এইরূপেই আমার বাছাকে যাদু করেছে—"

যোগী পুনরায় ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্পর্শ করিলেন। গৃহিণীকে নিতান্ত অনিচ্ছায় নিরস্ত হইতে হইল। গৃহিণীর সম্মুখে চতুর্থ দৃশ্য প্রকটিত হইল।

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতার একপ্রান্তে একটী পুরাতন দ্বিতল গৃহ। গৃহের এক কক্ষে এক প্রৌঢ় এবং এক প্রৌঢ়া। মুখে শান্তি ও সন্তোষের চিহ্ন। প্রৌঢ় বলিল, "বাবা সুরেশের আর তুলনা নাই। এমন জামাই কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? বাড়ী ঘর চারুর বিবাহে বন্ধক পড়েছিল। তা ছাড়িয়ে দিলে। নিজ ব্যয়ে নিরুর সুপাত্রে বিয়ে দিয়ে দিলে।" প্রৌঢ় তদুত্তরে বলিল, "জামাই ভাল, সন্দেহ নাই, তবে কেন যে নিজের বাপ মার প্রতি এমন অভক্তি, অশ্রদ্ধা, তা বলা যায় না। সুরেশকে কত বুঝাইয়াছি—বলিয়াছি হাজার হইলেও পিতামাতা পরমগুরু। কিন্তু কিছুতেই সুরেশের মতি ফিরল না। তাকে কিছুতেই বাড়ী যেতে বা বাপমার সঙ্গে দেখা করিতে রাজি করতে পারলুম না। আর আমাদের উপকারের কথা বলছ? আমরা প্রকাশ করে না বল্লেও এটা সর্ব্বদা তার মনে নিশ্চয়ই জাগে যে, তোমারই সুপারিশে তার ওকালতীতে পশার। তোমার ছেলেবেলাকার সহপাঠী বন্ধু হৃষিকেশবাবু তার পিছনে না দাঁড়ালে এত অল্প সময়ে তার এমন পশার কিছুতেই হ'ত না। তা যাক্ এখন কাশীবাস ঠিক্ তো? এক চারু আর নিরু। এরা দুজনেই সৎপাত্রস্থ হয়েছে। আর তো আমাদের সন্তান নাই। এখন আর কার মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে সংসারে থাকি! তুমি যে পঞ্চাশ টাকা পেন্সন পাও, তাহাতেই আমাদের দুটো প্রাণীর সচ্ছন্দে চলে যাবে।—"

গৃহিণী আবার একেবারে তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন এই যে আমার বেয়াই, বেয়াইন্, সুরেশের শ্বশুর শাশুড়া। তোদের সুখের জন্যই বুঝি বাছা সুরেশকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম আর বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছিলাম? আলো বেয়াইন্, আর মুখের ভালমানুষি করিস্‌নে লো—"

যোগী পুনরায় ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্পর্শ করিলেন। কিন্তু গৃহিণী নিরস্ত হইলেন না, বলিলেন, "সুরেশের বিয়ের সময় পণ নিয়েছিলাম। বেয়াইর বাড়ী ঘর বন্ধক দিতে হইয়াছিল। আচ্ছা, সুরেশ রোজগার করে সেই টাকা সুদ শুদ্ধ আদায় করে বাড়ী ঘর খালাস করেছে। তা সে করুক। মা কালীর কৃপায় আমাদের টাকা পয়সার অভাব নেই। কিন্তু বাছার আমাদের উপর এমন অভক্তি হল কেন? আজ দশবৎসর বাছার দর্শনে বঞ্চিত হ'য়ে রয়েছি কেন?"

যোগী এইবার প্রথম কথা কহিলেন। জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সুরেশ যে টাকা শাশুড়ীকে দিয়াছে, সে হচ্ছে

আসল

আর এই যে তোমাদের মনঃকষ্ট, অনুতাপ, অশান্তি, এ হচ্ছে

সুদ

এ সংসারে কেহ কাহারও কিছু নিয়ে হজম করতে পারে না। যারটা তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। **নিজেরাও মনে রাখিও এবং বাঙ্গলার বাপ-মাদিগকে বলিও যে তারা ছেলের বিয়ের সময় কশাইর মত পণ নেয় বলেই, ছেলেরা স্বাধীন হ'লেই শ্বশুর শাশুড়ীর অনুগত হ'য়ে পড়ে এবং বাপ-মাকে দু'চখে দেখিতে পারে না। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ।"**

বলিয়া যোগী অদৃশ্য হইলেন। গৃহিণী জাগিয়া কাঁদিয়া

উঠিলেন। কর্ত্তা নিকটে আসিলে তন্দ্রাঘোরে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, কর্ত্তাকে বলিলেন। কর্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "দেব দেব যা আদেশ করেছেন, তা সত্য। তবে, এখন আর প্রতিকারের উপায় নাই। চল, বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যাক্।"

৩

সরু খাল দিয়া ক্ষুদ্র ডিঙ্গি-নৌকাতে গৃহিণী ও কর্ত্তা বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখা গেল সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বজরা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে। খাল এত সরু যে বজরা অতিক্রম করিয়া যাওয়ার যো নাই। সে অঞ্চলে বজরার আবির্ভাব এতই বিস্ময়জনক যে খালের দুইপার দিয়া গ্রামের ছেলের দল বজরার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। একটা দুষ্ট ছোড়া গান ধরিয়াছে—

"মা গো মা! বউকে কিছু ব'লো না।
বউকে যদি বল্‌বে মা, আমার লাগাল পাবে না।"

গ্রামের বৃদ্ধেরাও গৃহের বাহির হইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছে এবং বজরার আরোহীকে তৎসম্বন্ধে নিষ্ফল অনুমান করিতেছে।

খানিক পরে ডিঙ্গি একেবারে বজরার নিকটে আসিয়া পড়িল। ডিঙ্গির মাল্লা বজরার পার্শ্বে সংলগ্ন একটা বাঁশ ধরিল। গৃহিণী বজরার আরোহীদিগকে দেখিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না। বজরার খোলা জানালা দিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এ যে তাঁরই পুত্র সুরেশ, তারই পুত্রবধূ, সেই দেবশিশুর মত দুটী শিশু, গত রাত্রে স্বপ্নে যাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া গৃহিণী, "কে রে বাবা সুরেশ এলি, এতদিনে অভাগিনী মার কথা মনে পড়েছে?" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডিঙ্গির উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন।

যখন চেতনা হইল গৃহিণী চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন বজরার ভিতরে সুরেশ তাঁহার মস্তক নিজ কোলে রাখিয়া গোলাপ জল সিঞ্চন করিতেছে এবং পাখা দিয়া মৃদু মৃদু বাতাস দিতেছে। পুত্রবধূ তার পদদ্বয়ে তৈল মালিস করিতেছে এবং গরম ফ্লানেলের সেক দিতেছে।

অদূরে কর্ত্তা চেয়ারে উপবিষ্ট। নাতি নাতিনীদ্বয় কর্ত্তার হাটুর উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু ও গুম্ফ দ্বয় দখল করিবার সমূহ চেষ্টা করিতেছে।

গৃহিণী আনন্দাতিশয্যে চক্ষু মুদিত করিলেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস, বি, এল্।

পুরাণ কাহিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে সমুদ্রের প্রমাণ এবং শাকদ্বীপ,কুশদ্বীপ,শাল্মলী দ্বীপ ও ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিবরণ আছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে নারদ-যুধিষ্ঠির এবং বশিষ্ঠ দিলীপ সংবাদে দিলীপ কর্তৃক যজ্ঞ করিতে অসমর্থ দরিদ্রগণের সর্ব্বযজ্ঞ-ফললাভোপায়ের প্রশ্ন এবং তদুত্তরে বশিষ্ঠ কর্তৃক তীর্থ বিবরণ ও তীর্থ-যাত্রাপ্রণালী এবং পুষ্কর-তীর্থ বিবরণ বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে নানা তীর্থ ও নর্ম্মদা মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

সপ্তম অধ্যায়ে ত্রিপুরদাহ ও রুদ্রকোটি বিবরণ লিখিত আছে।

অষ্টম অধ্যায়ে কাবেরী ও নর্ম্মদার সঙ্গমমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

নবম অধ্যায়ে নর্ম্মদা-তীর্থ-মাহাত্ম্যে, ভৃগুতীর্থ, রুদ্রবেদী করুণাভ্যুদয়স্তোত্র ও অন্য নানাবিধ তীর্থের বিবরণ বর্ণিত আছে।

দশম অধ্যায়ে প্রথমে রেবামাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। পরে মহর্ষি নারদ বলেন যে, শুকসঙ্গীতি নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা প্রমোহিনী, সুশীলের কন্যা সুশীলা, স্বরবেদীর কন্যা সুস্বরা চন্দ্রকান্তের কন্যা সুতারা ও সুপ্রভের কন্যা চন্দ্রিকা নামক কয়েকটী অপ্সরা ছিলেন। এই পঞ্চ গন্ধর্ব্বকুমারী সমুজ্জ্বল রূপবতী ছিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ইহারা সকলেই হেমবৎ গৌরবর্ণা ছিলেন এবং হেমকান্তিময় শোভন বসন ব্যবহার করিতেন। সকলেই স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, তাল, লয়, মৃদঙ্গাদি বাদ্যসহ দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত এই ত্রিবিধ লয়ের সহিত নৃত্য, হাব, ভাব, বেণু বীণা বা অন্যযন্ত্র বাদন, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি লোকবিনোদন কলা বিষয়ে বিশারদা ছিলেন। তাঁহারা সকলে সকলকে মোহিত করিয়া বিচরণ করিতেন। ইহাঁদিগের বিবরণ পাঠ করিলে পাশ্চাত্যরমণীগণের কথা মনে হয়। একদা বৈশাখমাসে পঞ্চসখী গৌরীদেবীর পূজা করিয়া বিবিধ কৌশলে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং গান্ধর্ব্ব স্বর-সংযোগে গান করিতে লাগিলেন। এই সময় মুনিবর বেদনিধির পুত্র তীর্থ-প্রবর স্নান করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অপর কামদেবের ন্যায় অতুল রূপবান্ ছিলেন। অপ্সরাগণ তখন নৃত্যগীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার নিকটে

আসিবার পূর্ব্বেই তীর্থপ্রবর মহাশয় অদর্শন হইলেন। অপ্সরাগণ বিরহে আকুল হইয়া উঠিলেন। পুনরায় তাঁহারা গৌরীপূজার জন্য পরদিন আসিলেন এবং তীর্থপ্রবর মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়া পরস্পর বাম দক্ষিণ ভাবে হাত ধরাধরি করিয়া ভুজপাশ রচনাপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধন করিলেন এবং বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তীর্থপ্রবর মহাশয় এ বিবাহ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না বলিলেন। ব্রাহ্মণকে বিবাহে অনিচ্ছুক দেখিয়া প্রমোহিনী ব্রাহ্মণের হাত ছাড়িয়া পদদ্বয় ধরিলেন। সুশীলা ও সুস্বরা তাঁহার বাহুদ্বয় গ্রহণ করিলেন। সুতার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। চন্দ্রিকা মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ নির্ব্বিকার ছিলেন, এবং ক্রমে সেই ব্রহ্মচারী প্রলয়ানল-সন্নিভ হইয়া তাঁহাদিগকে শাপ দিলেন, "তোরা পিশাচীর ন্যায় আমাতে লগ্ন হইয়াছিস—অতএব পিশাচী হইবি।" কন্যাগণ বলিলেন, "তুই প্রিয়কারিণী-গণের অপ্রিয় করিলি—তুইও আমাদের শাপে পিশাচ হইবি।" তৎপরে সেই কন্যাগণ ও ব্রহ্মচারী সকলেই পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়ে যে সকল তীর্থের বিষয় শুনিলে পাপ সকল বিলয়প্রাপ্ত হইবে, বশিষ্ঠ কথিত সেই সকল তীর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নানাতীর্থ বর্ণিত আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মঙ্কণক তীর্থের ইতিহাস ও পৃথুদকা-দির ইতিহাস বর্ণিত আছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে যমুনা মাহাত্ম্য কথিত আছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে যমুনা মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বিকুণ্ডল-চরিতও দেবদূত বিকুণ্ডল সংবাদে যমলোক গতি নিবারণোপায় এবং গঙ্গা, শালগ্রামশীলা, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

ষোড়শ অধ্যায়ে সুগন্ধাদি বিবিধ তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

সপ্তদশ অধ্যায়ে বারানসী মাহাত্ম্য কথিত আছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বারানসী মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে পঞ্চায়ত্ম্য বিবরণ কৃত্তিবাসেশ্বর ও কপর্দ্দীশ্বরের ইতিহাস, ব্রহ্মপার স্তোত্র, মধ্যমেশোপাখ্যান ও তত্রত্য অন্যান্য তীর্থ বিবরিত আছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়ে গয়াদি নানাবিধ তীর্থ প্রথমে বর্ণিত আছে। পরে পদ্মপুরাণ বলেন যে তীর্থে না যাইতে পারিবে, সর্ব্বতীর্থ গমনের ফল কামনায়, সে সকল তীর্থে মনে মনে যাইলেও ফললাভ হইতে পারে।

বিংশ অধ্যায়ে প্রভাস মাহাত্ম্য কথিত আছে।

একবিংশ অধ্যায়ে প্রয়াগ মাহাত্ম্য কথন প্রস্তাবে তীর্থকৃত্য নির্দ্দেশ ও তত্রত্য নানাতীর্থ বিবরিত হইয়াছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়ে প্রয়াগে অনশনাদি বিবিধ ব্রতের ফল বর্ণিত আছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে সর্ব্ব তীর্থাপেক্ষা প্রয়াগের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন সর্ব্বদেবগণ সহ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের তথায় অবস্থিতি হেতু ও তীর্থ ফল লাভের অধিকারী নির্দ্দেশ বর্ণিত আছে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে সর্ব্বতীর্থ ফলপ্রদ বিষ্ণু ভজনের মহিমা বর্ণিত আছে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ কথিত আছে।

ষড়বিংশ অধ্যায়ে বিবিধ সদাচার ধর্ম্ম কথিত আছে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে হিন্দুগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বর্ণিত আছে।

দ্বিজাতিগণ শূদ্রের নিকট হইতে জলব্যতীত দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত পায়স, স্নেহ দ্বারা পক্ক দ্রব্য, গোদুগ্ধ, শক্তু, পিণ্যাক এবং তৈল গ্রহণ করিতে পারিবেন। হিন্দুগণ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বর্জ্জন করিবেন :—

বৃন্তাক। নালিকা শাক। কুসুম্ভ। ভস্মক। পলাণ্ডু লশুন। শুক্ত। নির্য্যাস। ছত্রক। গ্রাম্য বরাহ। স্বেদজ দ্রব্য। পীযূষ। করকা। বিকৃতাকার বা বিমুখ দ্রব্য। গৃঞ্জন। কিংশুক। বর্ত্তুলাকার কুষ্মাণ্ড। যজ্ঞডুম্বুর। বর্ত্তুলাকার অলাবু। দুগ্ধসহ তক্র বা সক্তার অন্ন। কৃমিদুষ্ট বা ভাবদুষ্ট দ্রব্য। অসৎসংসর্গ যুক্ত অন্ন। মনুষ্য-ঘ্রাত কুক্কুরাঘ্রাত বা গবাঘ্রাত আহার্য্য। পুনঃ সিদ্ধ অন্ন। চণ্ডাল, ঋতুমতী নারী বা পতিত জন কর্ত্তৃক দৃষ্ট অন্ন। কদর্য্যস্থানে রক্ষিত অন্ন। কাক, কুক্কুট, কৃমি বা কুষ্ঠরোগী দ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন। রজস্বলা রোগিণী মলিন বা পরকীয় বস্ত্র পরিধানা নারীদ্বারা প্রদত্ত অন্ন। বিবৎসা, বৃষের জন্য ইচ্ছাযুক্ত বা প্রসবের পর দশদিন অতীত না হইয়াছে এমন গাভীর দুগ্ধ। বক। হংস। দাত্যূহ। চটক। শুক। কুরর। চকোর। জালপাদ। কোকিল। বায়স। খঞ্জন। শ্যেন। গৃধ্র। পেচক। চক্রবাক। ভাস। পারাবত। কপোত। টিট্টিভ। গ্রাম্যকুক্কুট। সিংহ। ব্যাঘ্র। মার্জ্জার। কুক্কুর। শূকর। শৃগাল। মর্কট। গর্দ্দভ। এবং মদ্য।

পঞ্চনখদিগের মধ্যে গোধা, কূর্ম্ম, শশ, খড়্গ মৎস্য, ও শল্লক নিত্য ভক্ষ্য।

রাত্রে পিণ্যাক, উদ্ধৃত স্নেহ, দেবধান্য, দধি ও তিল সম্পর্ক যুক্ত দ্রব্য ত্যাগ করিবেন।

বৃথা রন্ধিত নিম্নলিখিত দ্রব্য বর্জ্জন করিবেন :—

কৃষর। সংযাব। পায়স। পিষ্টক। অনুপাকৃতপশুর মাংস। দেবতা ব্যতিত অপরের উদ্দেশ্যে কৃত হবিঃ। যবাগু। মাতুলিঙ্গ। অনুপাকৃত মৎস্য। নীপ। কপিত্থ। এবং প্লক্ষ।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে দানধর্ম্ম মাহাত্ম্য কথিত আছে।

ত্রিংশ অধ্যায়ে বানপ্রস্থধর্ম্ম এবং একত্রিংশ অধ্যায়ে সন্ন্যাসিধর্ম্ম কথিত আছে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জাতীয় শিক্ষার অধিকার

[জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ—জ্ঞানপ্রচারসমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত]

আমাদের ছেলেরা মানুষ হইবে, তাই তাদের সুশিক্ষার প্রয়োজন। তারা আমাদেরই সব ছেলে, উপযুক্ত আহারে তাহাদের দেহের পুষ্টি যাহাতে হয়, স্বাস্থ্য ও শক্তি যাহাতে বাড়ে, তাহা আমাদেরই করিতে হয়,—আবার বিদ্যায় ও জ্ঞানে যাহাতে তাদের মানসিক শক্তি সমূহের যথোচিত উন্মেষ হয়, যোগ্য সাধনায় তাদের চরিত্র উন্নত হয়, তাহাও অবশ্য আমাদেরই দেখিতে হইবে। ইহাই স্বাভাবিক নয় কি? আমাদের ছেলে পিলেদের সুশিক্ষার বিধান আমাদেরই স্বাভাবিক অধিকার নয় কি?

বিধাতার ইচ্ছায় বর্ত্তমান যুগে প্রবলপ্রতাপ, অসাধারণ কর্ম্মকুশল ইংরেজ আমাদের রাষ্ট্রপ্রভু। দেশের শাসন ও রক্ষণের ভার একেবারেই তাঁহাদের হাতে। যেটুকু সাহায্য আমাদের চান, তাই দিয়াই আমরা বেশ নিশ্চিন্ত আছি। আছি, বেশ আছি। তাহা লইয়া কোনও কথা বলিবার স্থান এ নহে, আজকার আলোচ্য বিষয়ও তাহা নহে।

তবে দেশের বুড়াদের শাসনপ্রভুত্বের সঙ্গে তাদের ছেলেপিলেগুলির শিক্ষার প্রভুত্বও একেবারে তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। শিক্ষার কর্ত্তৃত্ব একেবারে শাসন কর্ত্তৃত্বেরই সামিল হইয়াছে। বিদেশী রাজপুরুষ তাঁহারা শাসন করিতেছেন, দেশের শান্তিরক্ষা করিতেছেন, মাথায় বুদ্ধি আর হাতে শক্তি থাকিলে এটা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এদেশের ছেলেদের মনের ধাত বুঝিয়া সেই ধাতটির মত মনের খোরাক যোগান—সেটা ত এমন সহজ ব্যাপার নয়। স্বর্গের দেবতারা হয়ত পারিতে পারেন; কিন্তু যতই বড় হউন, ইঁহারাও মানুষ, দেবতা নহেন। অথচ অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল এই খোরাক ইঁহারাই যোগাইতেছেন। তবু, এই সঙ্গে যদি তাহাদের দেহের খোরাকটাও ইঁহারা যোগাইয়া দিতেন, এই দুর্দ্দিনে আমরা বাঁচিয়া যাইতাম, দুহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতাম, বড় শ্রান্ত ক্লান্ত একান্ত অবসন্ন আমরা—নিশ্চিন্ত হইয়া একেবারে ঘুমাইয়া থাকিতাম।

দেশের ছেলেদের শিক্ষার ভার একেবারে বিদেশীর হাতে, তাঁহারা যেটুকু শিখাইবেন, তাই মাত্র তারা শিখিবে, আর কিছু শিখিবার উপায় নাই,—তাঁহারা ঠিক যেভাবে, যেমন ঘরে, যেমন আসনে, যেমন গুরুর কাছে, যে ভাষায়, যত খরচ করিয়া, তাই শিখিতে বলিবেন, ঠিক তেমনই করিয়া তাহাদের শিখিতে হইবে, অন্যথা হইবার যো নাই,—ইহার মত অস্বাভাবিক ব্যাপার যে আর কি হইতে পারে, তা জানিনা।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা সকলেই প্রায় মনে করি, ইহাই স্বাভাবিক, ইহার বিপরীত কোনও ব্যবস্থার কথা শুনিলেই আমরা চমকিয়া উঠি,—মনে করি, ও বাবা! এ আবার কি আজগবী কথা বলে ওরা! জাতীয় শিক্ষা? সেটা আবার কি? এই ত কত স্কুল কলেজ আছে, ছেলেরা বেশ ইংরেজি শিখিতেছে, পাশ করিতেছে, বি এ, এম এ, হইতেছে, চাকরী করিবে, উকিল হাকিম হইবে—এই ত সব বেশ আছে। আবার জাতীয় শিক্ষা কি? যত বাজে হুজুগ। কান দিও না—কান দিও না, ছেলেগুলো মাঠে মারা যাইবে শেষে! হাঁ, দেশী টোল গুলা আছে, বামুন-পণ্ডিতেরা ব্যকরণ পড়ায় আর শাস্ত্র পড়ায়,—তা ভোঁতা-ছেলে যারা, লেখা পড়া কিছু হইবে না, তারা গিয়া সেখানে অং বং ঠং আওড়াক, মন্ত্র পড়িয়া কি বড়ী টিপিয়া পারে দুটি পেটের ভাত করিয়া খাক্। সে টোলগুলা ত আছেই। এরা আবার কোন্ জাতীয় শিক্ষার কথা বলেগো! না না, ওসব বাজে বাঙ্গাল হুজুগে কাজ নেই। এই যা আছে, খাসা আছে।

যাহা অস্বাভাবিক, তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া এই যে ধারণা—স্বাভাবিক কিছু করিবার চেষ্টাকেই অস্বাভাবিক

ও অশুভ বলিয়া শিহরিয়া উঠা, মোহের বিকার আর কি হইতে পারে জানিনা।

কেবল কি তাই? আমরা মনে করি, ইহা ছাড়া আর গতি নাই—এই শিক্ষা যে না পাইল, সে অন্ধকারেই রহিয়া গেল। এই শিক্ষার ছাপ যার গায় না পড়িল, পেটের দুটি অন্ন আর তার জুটিবে না। তাই বড় কোনও অসুবিধা যদি ইহার মধ্যে নূতন উপস্থিত হয়, যাহাতে সাধারণের পক্ষে শিক্ষা দুর্লভ হইতে পারে, তবে দেশময় হাহাকার পড়িয়া যায়। কৃতাঞ্জলি হইয়া কাতর প্রার্থনায় কাঁদিয়া আমরা বলিতে থাকি, "ওগো, রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমাদের যে আর গতি নাই। ছেলেগুলির সর্ব্বনাশ হইবে যে! তারা মানুষ হইবে না—কি করিয়া খাইবে? রক্ষা কর! তাদের শিক্ষার পথ কঠিন করিও না। আমরা যে নেহাত গরীব—নেহাত ছোট! কলম পিশিয়া দুটী ভাত খাইব, তারও যে আর পথ নাই। তোমরা তা না শিখাইলে কে আর শিখাইবে?"

অবশ্য আমরা এখন ঠিক এরূপ প্রার্থনা করি না, করি emphatic protest. আমরা পারি না তা বলি না,—গালি দিয়া বলি, তোমরা কেন করিবে না?—কিন্তু কাজের হিসাবে দেখিলে ইহা অসহায়ের দীন প্রার্থনা বই আর কিছুই নয়। কারণ protest যতই করি, সভামঞ্চের বক্তৃতায় আর সংবাদপত্রের 'কলম'রচনায় গালি যতই দিই, সকল অসুবিধা সকল কঠোর বিধান মাথা পাতিয়াই নিতেছি। কেননা, আমরা নিজেরা কিছুই করিব না,—এক্ষেত্রে আমরা কিছু করিতে পারি, এ বিশ্বাস আমাদের নাই, আমাদের করিবার কিছু আছে, সে ধারণাও নাই।

ইহা অপেক্ষা হীন দীনতা মানুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে তাও জানি না!

অতি আদিম বর্ব্বর অবস্থার কোনও জাতি—যেমন আফ্রিকার নিগ্রো প্রভৃতি যাহাদের অতীত কোনও গৌরবের ইতিহাস নাই—নিজস্ব জ্ঞানের বা সাধনার কোনও অধিকার নাই, উন্নত অপর কোনও জাতির শাসনাধীনে তাহারা আসিলে, সেই উন্নত শাসক জাতি শিক্ষার দ্বারা তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিবার ভার অবশ্য নিতে পারেন,—নেওয়াই দরকার। কিন্তু আমরা কি তেমন কোনও জাতি? অতীত জ্ঞানও সাধনার এমন কোনও অধিকার কি আমাদের নাই, যাহাতে বিদেশী রাজপুরুষগণের বিহিত, তাঁহাদেরই কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত বিদেশী ধাঁচের শিক্ষা ব্যতীত আমাদের মানুষ হইবার আর উপায় নাই? যদি কেহ তাই বলিতে চান বলুন। মুখ কে কাহার চাপিয়া ধরিতে পারে? তবে আমরা এমন কথা বলিনা। এমন কথা মনে করিতেও বড় লজ্জা পাই।

অবশ্য একথা কেহ বলিতে পারেন তোমাদের ত সেই সেকেলে বামনাই বিদ্যা আর টুলো পণ্ডিতী? তাকি আর একালে চলে?

ইহার উত্তরে আপাততঃ সংক্ষেপে আমরা এই বলিতে পারি, সেকেলে সেই বামনাই বিদ্যাই আমাদের বিদ্যা, টুলো পণ্ডিতীটাই আমাদের পণ্ডিতী। আমরা যদি আমরা থাকিতে চাই, হাটের গোলে না আপন হারাই, তবে সেই বামনাই বিদ্যা আর টুলো পণ্ডিতী একেবারে ছাড়িতে পারি না। একালেও তা চলে, চালাইতে হইবে। তবে একাল যখন একাল, তখন কেবল সেকেলে বিদ্যায় আর সেকেলে পণ্ডিতীতে চলিবে না। একালে যা নহিলে চলে না, সেটাকে সেকালের সঙ্গে জুড়িয়া নিতে হইবে। নহিলে একালেই যাদের প্রথম হাতে খড়ি হইল, এইরূপ কাহারও চলিতে পারে, ভারত সন্তানের চলে না।

এই যে সেকাল আর একাল, দুইটাকে জুড়িয়া আমাদের আধুনিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করা সে কে করিবে? আমরা বলি, তাহা বিদেশী রাজপুরুষগণ পারেন না, আমাদেরই করিতে হইবে। এ অধিকার আমাদেরই অধিকার।—ইহাই জাতীয় শিক্ষা, ইহাতেই জাতীয় শিক্ষার অধিকার।

তারপর এই যে অবজ্ঞাত বামনাই বিদ্যা আর টুলো পণ্ডিতী, ইহাকে না জানিয়া না বুঝিয়াই আমরা এত অবজ্ঞা করিয়া থাকি।—আজ কাল যতই হীন হইয়া থাক, অথবা হীন বলিয়া মনে হউক, প্রকৃত পক্ষে ইহা তত হীন নহে। এই বামনাই বিদ্যাই অনেক বিদ্যার বিশ্বগুরু ভারতের বিদ্যা,—এই বিদ্যার অধ্যাপনাই টুলো পণ্ডিতী! অধ্যাত্মবিদ্যায় ভারত যে এই জগতের শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল, এবং এখনও সেই স্থানে অধিকার করিয়া আছে—ইহা একরূপ সর্ব্বজনস্বীকৃত। দুদিনের তরে এই পার্থিব জীবনের মালিক হইয়া, এই বিদ্যাটাকে

যতই অপ্রয়োজনীয় আমরা এখন মনে করি, বাস্তবিক এটা তাহা নয়। সকল বিদ্যার শিরোমণি এই অধ্যাত্ম বিদ্যা, সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ এই অধ্যাত্ম বিদ্যার সাধনা।' আধুনিক সভ্যতা যদি এই পৃথিবীটাকে একটু নীচে রাখিয়া উপরে এই বিদ্যার সাধনাটাকে একটু স্থান দিত, তবে জগৎব্যাপী এই কাড়াকাড়ি, কামড়াকামড়ি, এই মহামার লীলা এই হাহাকার বুঝি, আজ দেখিতে হইত না।

বড় হউক কি ছোট হউক, সবচেয়ে বেশী দরকারী কি একেবারেই অদরকারী যাহাই হউক, ভারতীয় বামনাই বিদ্যা পৃথিবীটাকে একেবারে বাদ দিয়া কেবল আত্মাকে লইয়াই সকলভোলা পাগল হইয়া রহে নাই। কাব্য, নাটক, সঙ্গীতনৃত্যচিত্রাদি চারুকলা, গণিত জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদ শারীরস্থান রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান, স্থাপত্য ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বহুবিধ শিল্প, বাণিজ্যাদি বার্ত্তানীতি, দণ্ডনীতি, যুদ্ধনীতি—কত আর নাম করিব,—এই পৃথিবীতে শক্তিমান্ ও গৌরবান্বিত জাতি হইয়া থাকিতে যত কিছু বিদ্যা ও সাধনার আবশ্যক হয়, তাহাতেও প্রাচীন অন্যান্য জাতি সমূহ অপেক্ষা মোটের উপর ভারত যে হীনতর ছিল, তাহা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা কেহ বলিতে পারিবেন না। এসবও বিদ্যা, এসব বিদ্যাও শিখিতে হইত, শিক্ষার অনুরূপ সাধনাও করিতে হইত। সব বিদ্যা একেবারে বামুনের একচেটিয়া সম্পত্তি না হইলেও, বামুনের প্রাধান্য সর্ব্বত্র ছিল এবং পুঁথি হইতে যাহা শিখিতে হইত, তাহাও টুলো ধরণেই লোকে শিখিত,—সাধনাও সকল বিদ্যায় গুরুর কাছে তাঁহাদের শিষ্যেরা করিত। এটাও বামনাই রীতি। তার পর বামনাই বিদ্যা কেবল ভারতের সীমার মধ্যেই আপনাকে বাঁধিয়া রাখে নাই।—দেশ বিদেশের যে সব বড় বড় জাতির সংস্পর্শে ভারত আসিয়াছে, তাহাদের শিক্ষণীয় যাহা কিছু—তাহাও বামনাই পাণ্ডতী আদরে গ্রহণ করিয়াছে, নিজস্ব করিয়া নিয়াছে।

আর একটা কথাও এইখানে বলা দরকার পরা কি অপরা অধ্যাত্ম, কি পার্থিব,—যে বিদ্যাই হউক, তার আলোচনা অধ্যাপনা সাধনা সব সেই সেই বিদ্যার অধিকারী-দের হাতে ছিল। নিষ্কণ্টকে নিরুদ্বেগে এই সব বিদ্যা অধীত বা সাধিত হইতে পারে, রাজা তার উপায় করিয়া দিতেন মাত্র, কর্ত্তৃত্ব তাহার উপরে করিতেন না। বাধা দূর করিয়া দিতেন, বৃত্তিদান ভূমিদান করিতেন, ভিতরে হাত চালাইয়া খোঁচাখুঁচি কিছু করিতেন না। কেবল রাজা কেন, ধনিগণ—এমন কি সাধারণ সামাজিকগণ পর্য্যন্ত—স্থায়ী কি সাময়িক দানে বা পুরস্কারে এবং অন্যান্য উপায়ে বিদ্যাধিকারী ও বিদ্যাদাতা যাঁহারা, তাঁহাদের প্রতিপালন করিতেন,—করাটাই ধর্ম্ম ও পুণ্য বলিয়া মনে করিতেন, করিয়া কৃতার্থ হইতেন,—তার জন্য কর্ত্তৃত্বের দাবী কিছু করিতেন না।

এইরীতি প্রাচীন হিন্দু আমল হইতে—মুসলমান আমল, তারপরেও ইংরেজশাসন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কালহইতে ইহা বদলাইয়া গিয়াছে।—কেবল এই রীতিটাই বদলায় নাই, নানা দিকে বর্ত্তমান এই কালে দেশে যেন একটা যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। কেবল ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে গত শতাব্দী বা সার্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে বড় একটা যুগান্তর হইয়া গিয়াছে,—এই যুগান্তরের কারণ মানবজীবনের কতকগুলি নূতন আদর্শ লইয়া, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রবল অভ্যুত্থান, বিজ্ঞানে তাঁহাদের অপূর্ব্ব অভাবনীয় অতি বিস্ময়কর সাধনা, আর সেই সাধনার ফলে দুর্জ্জয় উদ্যমে পৃথিবীময় তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক শক্তির প্রসার। সার্দ্ধশতাব্দী কাল পূর্ব্বে পাশ্চাত্যমণ্ডলেও একটা সেকাল ছিল,—শিক্ষা দীক্ষা সাধনাও সেকালে রকমের ছিল।—সেটা, একেবারে না হউক, কতকটা আমাদেরই দেশের রীতির মতই ছিল বটে। ব্যবসায়াদি শিক্ষাও বংশানুক্রমে বা গুরু শিষ্য (অর্থাৎ মাষ্টার এপ্রেণ্টিস্) পরম্পরায় চলিত।

পৃথিবীময় এই যুগান্তরের আবর্ত্তের মধ্যে আমরাও গিয়া পড়িয়াছি। ইংরেজশাসনের অধীনে আসিয়াছি বলিয়া প্রায় একটানে গিয়া পড়িয়াছি,—নহিলেও ক্রমে ধীরে ধীরে গিয়া পড়িতাম, এড়াইতে একেবারে পারিতাম না।—পৃথিবীর কোনও জাতিই পারিতেছেনা,—আমরা কি এখন সব পীর যে পারিতাম।

শাসন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত যখন হইল,—তখন কতকটা দেশীয় লোকের সহায়তায় শাসনকার্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে এবং আরও অনেক কারণে এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন রাজপুরুষগণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহাতেও শিক্ষিত দেশীয় লোকের সহায়তা তাঁহারা নিলেন বটে, কিন্তু মূলনিয়ন্তৃত্ব তাঁহাদের হাতেই রহিল।—তখন ইহার প্রয়োজনও ছিল। নানা কারণে—নানা অবস্থার সংযোগে এই শিক্ষাপদ্ধতির আকর্ষণ ক্রমে এত বেশী হইল, ইহার প্রসারও ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল, যে দেশীয় প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি একেবারে কোণঠেসা হইয়া কোনও মতে অতি দীন ক্ষীণ ভাবে আজ তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে।

যে যুগান্তরের কথা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম, সরকারী এই ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব কতক তার কারণও বটে, আবার কতক তার ফলও বটে।—কিন্তু এই যুগান্তরের পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া চলিতে, আপনাকে একেবারে না হারাইয়া—যে সব নূতন ভাব চিন্তা নীতির আদর্শ এবং তাহাদের সঙ্গে সংসৃষ্ট নূতন যে সব কঠিন সমস্যা আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, সে সবের সমাধান, নূতনকে পুরাতনের সঙ্গে বাহিরকে ঘরের সঙ্গে মিলাইয়া নিতে, যাহা আমাদের শিখিতে হইবে, করিতে হইবে, বর্ত্তমান এই শিক্ষাপদ্ধতি তার পক্ষে সহায়তা বড় কিছু করিতেছে না,—অথচ দুঃসহ একটা ভারের মত ক্রমেই তাহা আমাদের চাপিয়া পিষিয়া ফেলিতেছে।—শিক্ষাও তাই একটি বড় সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যুগপরিবর্ত্তনে শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার বৃত্তির কথাটাও এমনই ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে, যে একটিকে ছাড়িয়া অন্যটির কথা আমরা ভাবিতেও বড় পারি না। এই শিক্ষার শিষ্য প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় সমূহ। যুগপরিবর্ত্তনের প্রভাবটা তাঁহাদেরই মধ্যে বেশী আসিয়া পড়িয়াছে; শিক্ষা এবং তৎসংসৃষ্ট জীবিকার সমস্যাটাও তাঁহাদের পক্ষেই বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। বুঝিতে হইলে এই যুগান্তরের প্রকৃতি এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার ফলে জীবনযাত্রার রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তিত অবস্থায় জীবিকার প্রয়াস তদুপযোগী যোগ্যতালাভের উপায় ইত্যাদি কয়েকটি কথার একটু আলোচনা আবশ্যক

আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গলার কথাই আমাদের আঁতের কথা। সেই কথাটাই বুঝিব, সেই কথাটাই বলিব

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই জীবিকার কথা একটা সমস্যার কথাই ছিল না। সরল পল্লীজীবনে, অতি সরল সহজ ভাবে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণ তখন সুস্থ সবল দেহে, বেশ একটা নিশ্চিন্ত শান্তির আরামে বাঙ্গালার শ্যাম-শোভাময় সুজল সুফল গ্রামগুলি ভরিয়া বাস করিতেন। অতি সুলভে প্রচুর পুষ্টিকর আহার্য্য তখন মিলিত,—বহু পরিমাণে তাহা আবার গৃহস্থের গৃহে গৃহেই উৎপন্ন হইত। ধুতি ও উড়নীতে পুরুষের এবং এক একখানি মোটা শাড়ীতেই নারীদের ভদ্রোচিত বেশ হইত। সেই কাপড়ের মোটা সূতাও আবার ঘরে ঘরে মেয়েদের চরকায় জন্মিত। মোটা হইলেও এই স্বাস্থ্যকর তাঁত কাপড়ের উপরে অন্যান্য প্রয়োজন বড় কমই ছিল। প্রত্যেকের জন্য এত জামা, জুতা, সেমিজ, জ্যাকেট, রেশমী শাড়ী উড়নী লাগিত না। জনেজনের এত চেন্ ঘড়ী; মিহি ছড়ী, সোণার জড়োয়ার বালা-চুড়ী, নেক্লেস্-মাকড়ী, তখন চক্ষেও কেহ দেখিত না। এত সাবান ছিল না, এসেন্স্ ছিল না, সুরভি এত কেশ তৈল ছিল না, আরসী চিরুণীও এত দামী দামী ছিল না। ছেলেদের জন্য এত স্কুল কলেজের বেতন দিতে হইত না, মেসের খরচ বহিতে হইত না, রাশি রাশি বই খাতা কিনিতে হইত না। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য এত জামা কাপড় পোষাক তখন লাগিত না,—মেলিনের খাবার বেঞ্জারের খাবার, হর্লিকের দুধের গুড়া ছাড়া তারা সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহে বাড়িয়া উঠিত।—এত ঠুন্কা পুতুলখেলনা ছাড়াও তারা আনন্দে খেলিত। ঘরে ঘরে এত ছবি, আল্না, টেবিল, চেয়ার, খাট, পালঙ্ক, চিনাবাসন, কাচের বাসন লাগিত না, এত রকম বেরকম আলো জ্বলিত না। এত ডাকঘর ছিল না, নিত্য এত চিঠিপত্রের বিনিময় হইত না, কথায় কথায় তারে খবর চলিত না, রেল ষ্টীমারে নিয়ত এমন কাজে অকাজে দেশবিদেশে কেহ যাতায়াত করিত না। এত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সাহিত্যে অর্থব্যয় কাহারও করিতে হইত না। নাম করিতে গেলে ফুরায় না,—তখন ধনিজনের যাহা বিলাসভোগ্য ছিল,—ধনিজনও যাহা চক্ষে দেখিতেন না, এখন দরিদ্রেরও তাহা নিত্য প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

ইহা ছাড়া কোনও মতে শরীরধারণের জন্য নিত্য নিতান্ত যে আহার্য্য প্রয়োজন, তাহার মূল্যও দ্বিগুণ চতুর্গুণ

বাড়িয়াছে। একদিকে যেমন আহার্য্যাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের মূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে নবাগত পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্রুতবিস্তারে অন্যান্য বহু ও বিবিধ ব্যয়বহুল প্রয়োজন আমাদের দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে আমাদের জীবনযাত্রার ধরণে এত বড় একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বৎসরে বৎসরে এমন ভাবে এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একটু একটু করিয়া এমন ভাবে আমরা এই নূতন পরিবর্ত্তিত জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা —যারা এই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছি—তারাও তেমন ভাবে বুঝি না—কখনও বুঝিতেও পারি নাই—যে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি বা হইতেছি। কেবল এখনকার কথা আর তখনকার কথা, ধীরভাবে কখনও তুলনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, কি ছিলাম কি হইয়াছি,—বুঝিয়া বিস্ময়ে আত্মহারা হই। এই পরিবর্ত্তন ভাল কি মন্দ, উন্নতি কি অবনতির লক্ষণ, তাহার আলোচনার অবসর এস্থলে নাই, আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। যেদিন গিয়াছে, ঠিক সেদিন আর ফিরিবে না। যে স্রোতের মুখে আমরা চলিয়াছি, সে স্রোত কিছু সংযত করিতে পারিলেও বিপরীত মুখে আর প্রত্যাবৃত্ত হইব না। যেসব নূতন নূতন সম্ভোগে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ত্যাগ করিয়া একেবারে আবার সেই সরল—কেবল মোটা ভাত কাপড়ের—গ্রাম্য জীবনে আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না। ইহার মধ্যে অনেক নিতান্ত তুচ্ছ ও অবশ্যপরিত্যজ্য অহিতকর বিলাসব্যসন হইলেও, অনেক আবার এমনও আছে—যাহা বর্ত্তমান যুগসভ্যতার সঙ্গে চলিবার জন্য, নবজাগ্রত বহু জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তির জন্য, মোটা ভাত কাপড়েরই মত প্রয়োজনীয়।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই পরিবর্ত্তন যখন আরম্ভ কেবল হয়, তখন মোটা ভাত কাপড় অতি সুলভে মিলিত, গৃহেও অনেক পরিমাণে প্রস্তুত হইত, তাহার উপর সাধারণ ভদ্রলোকের ব্যয়বহুল প্রয়োজনও অতি অল্প ছিল। এইরূপ অবস্থায় এই সব গ্রাম্য পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ কোথাও লাগিত না। সামান্য যাহা লাগিত, তাহাও প্রত্যেককেই রোজগার করিয়া আনিতে হইত না। কোনও এক পরিবারের ২।১ জন মাত্র বাহিরে কাজকর্ম্ম করিলেই স্বচ্ছন্দে সকলের চলিয়া যাইত। যৌথ পরিবারনীতির বেশ জোর তখন ছিল। পরিবারের একজনের উপার্জ্জিত অর্থে পরিবারভুক্ত সকলেই সমানভাবে প্রতিপালিত হইবার অধিকারী ছিলেন। যিনি উপার্জ্জন করিতেন, উপার্জ্জিত অর্থ কেবল তাঁহারই নিজস্ব সম্পদ, তাহার ভোগে কেবল তাঁহার নিজের স্ত্রীপুত্রদেরই অধিকার আছে, তিনিও তখন এরূপ মনে করিতেন না। তারপর বহু সম্বলবিহীন পরিবার সম্পন্ন কুটুম্বকর্ত্তৃক তখন প্রতিপালিত হইতেন। দরিদ্র কুটুম্বস্বজনাদির প্রতিপালন ধনীমাত্রেই তখন বড় একটা কর্ত্তব্য, বড় ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতেন। জমিদার ও স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণের প্রদত্ত দান, দক্ষিণা, বৃত্তি, বার্ষিক, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতির সাহায্যে যাজক, পণ্ডিত ও অধ্যাপক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের বিলাসবিহীন সরল গ্রাম্য জীবন সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইত।

শ্রেণীভেদে সমাজে মোটের উপর একটা বৃত্তিবিভাগ প্রাচীনকাল হইতে তখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান ছিল। যাজক ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণ এবং জমিদার তালুকদার প্রভৃতি পুরুষানুক্রমিক সম্পন্ন গৃহস্থগণ ব্যতীত, ভদ্রসমাজভুক্ত বলিয়া তখন যাঁহারা বিবেচিত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের কিছু অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়োজন হইত, চিকিৎসা ও রাজকার্য্যাদি দ্বারাই তাঁহারা সেই অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু খুব বেশীসংখ্যক লোকের এরূপ অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়োজন হইত না; কঠোর প্রতিযোগিতা ছিল না, এরূপ কোনও বৃত্তি-গ্রহণে বিশেষ ক্লেশ কাহারও হইত না। এই ভাবে সমাজ চলিতেছিল, এমন সময় এই মহা পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। ইংরেজরাজের শাসনপ্রণালী দেশমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে ইয়োরোপীয় সভ্যতার নূতন নূতন আদর্শ ও রীতিনীতি প্রচারিত হইতে লাগিল। আমাদের চিত্তের ভাব, চিন্তার গতি, নূতন নূতন দিকে ধাবিত হইল। বহু নূতন নূতন প্রয়োজন ও বিলাস দ্রুত আমাদের জীবন পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুকারণে আহার্য্যাদিরও মূল্য বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল।

এই নবযুগের প্রবর্ত্তনে যে সব নূতন প্রভাব আমাদের মধ্যে আসিল, তাহার ফলে সকলের আগে অর্থের প্রয়োজন

বড় বাড়িয়া উঠিল। কতক প্রয়োজনবৃদ্ধির ফলে এবং কতক নূতন শিক্ষার প্রভাবে মনের ভাব ও জীবননীতির আদর্শের পরিবর্ত্তনে, পূর্ব্বে যে সব পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকার ছিল, তাহাও লুপ্ত হইতে চলিল। যৌথ-পরিবারনীতি শিথিল হইল,—এক জনের উপার্জ্জনে অন্য সকলের আর চলে না। সামার্থ্য ও প্রবৃত্তি দুই চলিয়া যাইতেছে। ধনী এখন দরিদ্র কুটুম্বকে প্রতিপালন করিতে তেমন পারেন না, পারিলেও করিতে চান না। দরিদ্র কেহ এখন কুটুম্বদ্বারা প্রতিপালিত হওয়াও গ্লানিজনক মনে করেন। যাজক ও অধ্যাপক তেমন দান দক্ষিণা বৃত্তি পান না, যা পান তাহাতে আর তাঁহাদের চলে না। বৃত্তি বার্ষিক যাহা আছে, ভিখারীর দানের মত এখন তাহা হইয়াছে।

ফলে এই সময়ের মধ্যে ভদ্রসমাজভুক্ত কর্ম্মক্ষম প্রায় সকল পুরুষেরই কোন না কোনও বৃত্তিদ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়োজন হইয়া উঠিল।

এদিকে ইংরেজরাজের নূতন শাসনযন্ত্রের বিবিধ বিভাগ, ইংরেজ বণিকগণের বিবিধ প্রকারের বিপুল বাণিজ্যাদি, ইংরেজের বিবিধ-অঙ্গীয় নূতন ধরণের শিক্ষাপ্রণালী, দ্রুত দেশমধ্যে বিস্তৃত হওয়ায়, নূতন নূতন বহু বৃত্তির দ্বারও শিক্ষিত দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। ইংরেজরাজ যে ভাবের শিক্ষাপ্রণালী দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহার ফলে জীবিকার হিসাবে এই সব নূতন নূতন বৃত্তির যোগ্যতা (এবং তাহাই মাত্র) শিক্ষিতসম্প্রদায় লাভ করিতে লাগিলেন।

জীবিকা অর্জ্জনের প্রয়োজন যেমন সকলের হইল, একভাবের কতকগুলি উপার্জ্জনের কর্ম্মক্ষেত্রও তাঁহাদের সম্মুখে আসিল,—সেই সব কর্ম্মক্ষেত্রে যে কর্ম্মে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে তাহার অনুরূপ শিক্ষাও তাঁহারা লাভ করিতে লাগিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই সব কর্ম্মক্ষেত্রের দিকেই অগ্রসর হইলেন।

এই যে সব বৃত্তি, এই যে সব কর্ম্মক্ষেত্র—এইগুলি বাহিরের প্রকৃতিতে এবং সংখ্যায় ও ব্যাপকতায়—কিছু নূতন হইলেও, পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান জীবিকার জন্য যে সব বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইতে মূলে যে একেবারে পৃথক তা নয়। অধ্যাপনা, রাজকার্য্য, চিকিৎসা, বিচারালয়ে ব্যবস্থাদির অভিজ্ঞতায় অর্থী প্রত্যর্থীর বিবাদ নিষ্পত্তির সহায়তা, এবং তদনুরূপ যে সব বৃত্তিতে, দৈহিক শ্রম অপেক্ষা অধীত বিদ্যার বেশী প্রয়োজন হয়, পূর্ব্বেও ভদ্রসন্তানগণ সেই সব বৃত্তি অবলম্বনেই জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেন, এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে নূতন পরিবর্ত্তিত এই যুগে তাঁহারা তাই করিতেছেন। কেবল সেই সব বৃত্তি এখন নূতন রকমের হইয়াছে,—তাহাদের সংখ্যা ও ব্যাপকতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে, প্রয়োজনের অনুরূপ তাহা বাড়িয়াছে কি না, সকলেই এই সব পথে জীবিকা-অর্জ্জনে সমর্থ হইতেছেন কি না, এই সব বৃত্তিতে তা হইতে পারে কি না, এবং যাহা তাঁহারা উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের পরিবর্ত্তিত জীবনের সকল প্রয়োজন কুলাইতেছে কি না। যদি তা হইয়া থাকে, তবে জীবিকার সমস্যা বলিয়া কোনও সমস্যা আমাদের নাই। আর যদি না হইয়া থাকে, ইহার বড় সমস্যাও আর কিছু এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। আগে খাইয়া পরিয়া, আর যাহা না হইলে নয়, তাহা পাইয়া সুস্থ দেহে সুস্থ চিত্তে থাকিতে হইবে, তারপর অন্য কথা, অন্য চিন্তা।

সরকারী ও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বেসরকারী চাকরী, এবং আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়,—সাধারণতঃ এই সব বৃত্তিতেই শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করেন। পুরুষ-পরম্পরাগত সংস্কার এবং তাঁহারা যে শিক্ষালাভ করিতেছেন সেই শিক্ষা, দুইই এই সব বৃত্তির দিকে তাঁহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে, এই সব বৃত্তিরই যোগ্যতা তাঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুরিত করিতেছে। আমাদেরও সাধারণ একটা ধারণা এই হইয়াছে, শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোককে এই সব বৃত্তিদ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। এসব যে তাঁহাদের যোগ্য বৃত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এসব বৃত্তি চিরদিন আছে, চিরদিনই থাকিবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রসন্তান ব্যতীত যে আর কেহ এসব বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন না, এ কথাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া এমন হইতে পারে না যে, শিক্ষপ্রাপ্ত ভদ্রলোকমাত্রকেই এসব বৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেই হইবে,—শিক্ষা পাইলেই, এইরূপ কোনও বৃত্তির যোগ্যতালাভ করিলেই, ভদ্রসন্তানমাত্রই তাহাদ্বারা

জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইবেন। দেশের ও সমাজের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে এসব বৃত্তি কত হইতে পারে, এবং তার অনুপাতে কতলোকে ইহা চায়,- তাহারই উপরে এ সমস্যার সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে। পাওয়ার চাওয়া বেশী হইলে, সকলেই যা চায় তা পায় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাকর কেহ কখনও রাখে না। চাকর যতজন চাই, চাকরী যদি তার অনেক বেশী লোকে চায়, তবে হাজার যোগ্যতা থাকিলেও চাকরী সকলে পাইবে না। দেশের রোগ পীড়া এবং রোগপীড়ার জন্য দেশের লোক কত অর্থব্যয় করিতে পারে, তাহার উপরেই কত চিকিৎসাবিৎ দেশে প্রতিপালিত হইতে পারেন, তাহা নির্ভর করিতেছে। যদি সেই অনুপাতের হিসাবে চিকিৎসকের সংখ্যা বেশী হয়,—তবে অনেককেই নিরন্ন থাকিতে হইবে, অথবা ভাগে সকলেই এত কম কম পড়িবে যে, কাহারাও পূরাপেট ভাত তাহাতে হইবে না। আইন-ব্যবসার সম্বন্ধেও এই কথা। দেশের লোক কত কলহ করে, কলহ লইয়া কত তা'রা আদালতে যায় বা অর্থ সঙ্গতিতে যাইতে পারে, তাহাতেই নির্দ্ধারিত হইবে কত উকিল মোক্তার মক্কেলের টাকায় উদরান্নের সংস্থান করিতে পারেন।

যুগ-পরিবর্ত্তনে নূতন অবস্থার আগমনে, যখন বহু এই সব নূতন বৃত্তির পথ দেশের লোকের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল, বৃত্তির উপযোগী শিক্ষারও ব্যবস্থা হইল, তখন অবস্থা একরূপ ছিল। যে কেহ শিক্ষালাভ করিলেই এই সব বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিতেন। উপার্জ্জনও বেশ হইত। তারপর বৎসরের পর বৎসর নূতন নূতন প্রয়োজনে, নূতন চাকরী অনেক বাড়িতেছে, দেশের লোকের বিবাদ-বিসম্বাদ বাড়িতেছে, মামলা করিবার স্পৃহা বাড়িতেছে, কোন কোনও শ্রেণীর মধ্যে মামলা করিবার সামর্থ্যও বাড়িতেছে। এদিকে অতিক্রত দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছে, বিবিধ রোগপীড়া দেশমধ্যে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এসব বেশই বাড়িতেছে, কিন্তু এই সব ধরিয়া যাঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে চান, তাঁহাদের ক্রততর সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়িতেছে কি? ইহাদের পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত হইলেও তা বাড়িতে পারে কি? বাড়িলে যে দেশ মরু হইয়া যাইবে। তখন উপায়?

এই খানেই হইল, এই সমস্যার মূল কথা। তা বাড়ে নাই—বাড়িতে পারে না। তাই দেশ ভরিয়া এই হাহাকার উঠিয়াছে, ছেলেরা কি করিয়া খাইবে!

শত শত এম এ, বি এ একরূপ বেকার। সামান্য ৩০।৪০ টাকা মাসিক বেতনের মাষ্টারী কি কেরাণীগিরি—যাতে সচ্ছল ভাবে একটি লোকেরও কোনক্রমে চলে না—তার জন্য ইহাঁরা কত উমেদারী করিয়া ফেরেন, একটু সুপারিসির জন্য দ্বারে দ্বারে কি কাতর প্রার্থনাই না করিয়া বেড়ান! এম এ বি এল কত উকিল বটতলায় ঘুরিয়া বেড়ান, দিনান্তে একটী নিশ্বাস ছাড়িয়া খালিহাতে—কি দারুণ নিরাশার ব্যথায় ভগ্নপ্রায় বুকে গৃহে ফেরেন! গৃহে আসিয়া হয়ত দেখেন, ভাঁড়ারে চাউল নাই, —মুদী, গোয়ালা, কাপড়ওয়ালা, ধোবা—এমন কি সকালকার জুতা সারিবার মুচি পর্য্যন্ত পাওনার জন্য বসিয়া আছে।

অথচ দেখিতেছি,—হাজার হাজার ছাত্র বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে,—আরও কত হাজার হাজার ছাত্র প্রতিবৎসর প্রবেশদ্বারে মাথা খুঁড়িতেছে, ইহাদের পশ্চাতে আবার সে লক্ষ লক্ষ এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে!— শত শত রাশি রাশি লেখাকুলীর বোঝায় ভগ্নপ্রায় মনে জীর্ণ দেহের শীর্ণ হাতে উপাধি কাগজখানি লইয়া—আরও কত শত শত আবার বহু আঘাতে পড়িয়া পড়িয়া প্রাণপণে দেহ মন কোনও মতে খাড়া করিয়া, কত আশায় কত প্রয়াসে হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া এই উপাধির চাঁদ ধর ধর করিয়াও ধরিতে না পারিয়া, যৌবনের দেহ জরায় একেবারে জীর্ণ করিয়া সেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছেন!

এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যুবক ও বালক— দেশের শ্রেষ্ঠ ধন, বঙ্গীয় ভদ্রসমাজের বংশধরগণ—দেশের ভবিষ্যত আশা—বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ পড়িতেছে, কেহ প্রবেশ করিতেছে, কেহ প্রবেশ দ্বারের মুখে অগ্রসর হইতেছে, কেহবা একেবারে জীর্ণ ও পিষ্ট লইয়া বাহির হইতেছে,—ইহাদের প্রায় সকলেরই লক্ষ্য এই বাঁধা কয়েকটী পথে জীবিকা অর্জ্জন করিবে! এ পথ যে রুদ্ধপ্রায়, যারা ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাদেরই ঘাঁযাঘেঁসি ঠ্যাসাঠেসিতে প্রাণান্ত হইতেছে,—ইহা দেখিয়াও লোকে দেখিতেছে না,—

অথবা দেখিয়াও উপায়ান্তর কিছু খুঁজিয়া পাইতেছে না।—দেশের শিক্ষা বলিতে—এক এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা,—আর তাহা এই কয়েকটি বৃত্তির যোগ্যতা মাত্র তাহার শিষ্যদের দিতেছে! এসব পথের বাহিরে আর কোথায় কোন্ দিকে, জীবিকার উপযুক্ত বৃত্তি লাভ হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার উপযোগী শক্তি সামর্থ্য বিকাশ করিবে, এরূপ আর কোনও শিক্ষাপদ্ধতি দেশে নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষায় যে যোগ্যতা লাভ হয়, তাহাতে সাধারণতঃ কেরাণীগিরি, আর তার অন্তর্ভুক্ত ইস্কুলকলেজের মাষ্টারী, ওকালতী আর ডাক্তারী—এ কয়টি বৃত্তিতে মাত্র ছাত্রেরা প্রবেশ করিতে পারে।—১৫।২০ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই শিক্ষা যাহারা লাভ করিত, ইহার কোনও না কোনও বৃত্তিতে ছাত্রগণ প্রবেশ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তুএই সব বৃত্তিকামী এবং বৃত্তিকামনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা এখন এত বাড়িয়া পড়িয়াছে যে আর ইহাতে কুলাইতেছে না কুলাইবেও না।— ব্যবসায়বাণিজ্যে প্রসারে দেশে প্রচুর ধনাগম ও নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের আবির্ভাব ব্যতীত লোকের জীবিকালাভের ও অন্নবস্ত্র সংস্থানের উপায় আর নাই। এদেশে তার কত সম্ভাবনা যে রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত বিদেশী আসিয়া এই দেশেরই মাটিতে হাত দিয়া রাশি রাশি সোণা তুলিয়া এখনও নিয়া যাইতেছেন। আর আমরা, হায়,—কোথায়—কার দ্বারে গিয়া কার কাছে দাসখত দিয়া এক বেলা একমুঠা দুটি ভাত পাইব, তাহা ভাবিয়া কুল পাইতেছি না!

কেন?—কারণ, যে শিক্ষা আমরা এই বিপুল ব্যবসায়-বাণিজ্যের যুগে পাইতেছি,—তাহাতে এদিকটা আমাদের দেখিতেও দেয় না,—কেবল শিখায় ইংরেজি বলিতে আর ইংরেজি লিখিতে, ইংরেজি গণিতের বড় বড় আঁক কসিতে, আর ইংরেজি আইনের যত কূট প্রশ্নের মিমাংসা করিতে,—আর তার প্যাচের উপরে প্যাচ টানিতে। ইহাতে পেট যে কয়টি ভরিবার তা ভরিয়াছে, বছর বছর আরও দুই চারিটির করিয়া হয়ত ভরিতে পারে;—তার বেশী আর ভরিবে না। সকলের পেটে যদি অন্ন চাই, ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ খুঁজিতে হইবে,—সেই খোঁজাটাই এখন শিখাতে হইবে।

আজকালকার ভদ্রলোকের ছেলের মত কিছু লেখাপড়া শেখে, আর তার জোরে কিছু করিয়া খাইতে পারে, সাধারণতঃ এই দুটি উদ্দেশ্যেই সকলে ছেলেদের ইস্কুল কলেজে পড়িতে পাঠান। একটি উদ্দেশ্য অধিকাংশের পক্ষেই ব্যর্থ হইতেছে। যাদের পক্ষে কিছু সার্থক হইতেছে বা হইতে পারে, তাদেরও এজন্য এত বৎসর এত মাথা ক্ষয় করিয়া, বিদেশী ভাষায়, বিদেশী সাহিত্যের, আরও কত অনাবশ্যক দুরূহ জটিল বিষয়ের এত খুঁটিনাটি এমন করিয়া শিখিতে হয় না। উচ্চতর শাস্ত্রাধ্যয়ন, তার আলোচনা, নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধান, আর এসবের অধ্যাপনা যাঁহাদের জীবনের বৃত্তি হইবে বা হইতে পারে, তাঁহাদের কথা আলাদা। কিন্তু সাধারণ রাজকর্ম্মচারী, কেরাণী, উকিল, ইস্কুলের মাষ্টার যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই, ধরুন এম এর মত পাঠ্য পড়িয়া সময় অর্থ ও মস্তিষ্ক বৃথা ক্ষয় করিবার কি এমন প্রয়োজন আছে? তবু এই সব জীবিকার যাঁহাদের সভ্য হইতে পারে, তাঁহারা যাহা খুসী করিতে পারেন।—কিন্তু সে আশা যাদের নাই,—তারা কেন এমন করিয়া মরিতেছে?

হাঁ, আজ কালকার ভদ্রলোকের মত লেখাপড়া ভদ্রলোক সকলকেই শিখিতে হয়। কিন্তু তার জন্য এত আড়ম্বর, অর্থব্যয় এত রাশি রাশি দুরূহ পুস্তক পড়া আর তার নোট মুখস্থ করা—পরীক্ষার জন্য একেবারে দেহপাত করা—এত কি দরকার হয় কিছু?

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানানুগতিক আধুনিক উচ্চতর শিল্প বিদ্যা—তদুপযোগী শিক্ষালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপকগণের পরিচালনে শিখিতে হয়। বিবিধশাস্ত্রের উচ্চতর তত্ত্বানুসন্ধী যাঁহারা তাহাদিগকেও তাহার উপযুক্ত অধ্যাপকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইহাঁদের ব্যতীত সাধারণভাবে সাহিত্য ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বার্ত্তাশাস্ত্র--প্রভৃতির মোটামুটি একটা জ্ঞান যাঁহারা লাভ করিতে চান, বর্ত্তমান এই শিক্ষাপদ্ধতির ঘানি কলে ঘাড় না পাতিয়া দিয়াও অনেক সহজে ও অল্প ব্যয়ে তাঁহারা তাহা করিতে পারেন। ইহার জন্য ব্যবস্থাও অবশ্য একটা দরকার। এই সব শাস্ত্রের সাধারণ জ্ঞাতব্যবিষয় সমূহ সরলবাঙ্গালায় সংকলিত হইয়া পুস্তকাকারে যদি প্রকাশিত হয়,—আর শিক্ষার্থীগণের অধিগম্য স্থান সমূহে এই সব পুস্তকের সংগ্রহ বা লাইব্রেরী যদি থাকে, তবে কলেজে যারা পড়িতে আসে, এরূপ ছাত্রগণ সকলেই তাহা

প্রায় আপনারাই পড়িয়া শিখিতে ফেলিতে পারে। অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হয়। তার জন্য দরকার এই যে ইস্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থাটা এমন করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রদের এই দক্ষতা জন্মে। তারপর এই সব উচ্চতর বিদ্যার পথ যদি নির্দ্দেশ করিতে হয় আর অধিকারের কোনও নিদর্শন যদি ছাত্রদের পক্ষে প্রয়োজন হয়, তবে কোনও শিক্ষাপরিষৎ বিভিন্ন বিষয়ের একটা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যতালিকা স্থির করিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে তার পরীক্ষা নিয়া ছাত্রদের সার্টিফিকেট বা উপাধি দিতে পারেন। ছাত্রদের অধ্যয়ন ও পরীক্ষার উপযোগী পুস্তক সংকলন করিবার ভারও এইসব শিক্ষাপরিষৎ গ্রহণ করিতে পারেন। দুই এক জন বড় পণ্ডিত যদি এই সব লাইব্রেরীতে নিযুক্ত থাকেন, তবে শিক্ষার্থীরা তাঁহাদের কাছে অনেক সাহায্য পাইতে পারে। তাঁহাদের অবশ্য ক্লাস করিয়া নোট লেখান কাজে নিযুক্ত করিলে চলিবে না।

এখন এই কলেজগুলিতে ছাত্রেরা যাহা শিখিতেছে, তারচেয়ে এ অবস্থায় এ সব বিষয়ে বড় কম তারা শিখিবে না। মহাত্মা কার্লাইল্ কোনও বক্তৃতার প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন, অধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় বড় বড় এক একটি লাইব্রারী হইলেই যথেষ্ট হয়। প্রাচীনকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, পুস্তক সকলে পড়িতে পাইত না। বড় পণ্ডিতেরা কোনও একস্থানে সমবেত হইতেন,—শিক্ষার্থীরা তাঁহাদের নিকট যাইত, তাঁহাদের অধিকৃত বিদ্যা তাঁহাদের মুখের বক্তৃতায় শুনিত। কিন্তু এখন বড় বড় পণ্ডিত—যাঁহারই কোনও জ্ঞান লোককে দিবার আছে, তাহা তিনি লিখিয়া ছাপান পুস্তককারে প্রকাশ করেন। সে সব পুস্তক কিনিতে না পারিলেও বড় কোনও লাইব্রারীতে গিয়া সকলেই পড়িতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের কাছে আসিয়া তাঁহাদের মুখের বক্তৃতা শুনিবার প্রয়োজন কাহারও হয় না। সাহিত্য ইতিহাসাদি সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে এ কথা খুবই সত্য।

বস্তুতঃ—মুখে আর নূতন কে কি বলিবেন? যাঁহারা নিজেরা পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহারা সেই পুস্তকের কথাই আবার মুখে বলিতে পারেন। যাঁহারা নিজেরা কিছু লেখেন নাই, তাঁহারাও পরের পুস্তকের কথাই সংগ্রহ করিয়া মুখে বলিবেন। সে সব পুস্তক ছাত্রেরা নিজেরাই যদি পড়িতে আর বুঝিতে পারে, তবে ক্লাস করিয়া এই সব বক্তৃতার কি এমন প্রয়োজন আছে? থাকিলেও অন্ততঃ সেইটুকুর জন্যই তাহা দরকার, যাহা ছাত্রেরা নিতান্তই বুঝিতে পারিবে না।

দেশে এখন অনেক কলেজ আছে, অনেক ছাত্রই সেখানে পড়ে,—পড়িবার জন্য পাগল হইয়া আসে। কলেজের খরচ হু হু করিয়া বাড়িতেছে,—অভিভাবকরাও প্রাণপণ করিয়া, কেহ বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া কেহ বা দেনায় ডুবিয়া ছেলেদের পড়িতে পাঠান, কিন্তু শেখান তাদের কি হয়? সে সব বই নিজেরাই পড়িয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারে, আয়ত্ত করিতে পারে; সেই সব বই ই অধ্যাপকগণ কেহ কিছু ব্যাখ্যা করেন,—কেহ তার নোট লিখাইয়া দেন। সে নোট আবার বাজারেও অনেক কিনিতে পাওয়া যায়। ছাত্রেরা যার খুসী শোনে, যার খুসী কিছু লেখে; যার খুসী হয় না, কিছু শোনেও না, কিছু লেখেও না। শেষে বাজারের নোট কিনিয়া মুখস্থ করে। বই পড়ার চেয়ে নাকি নোট মুখস্থ করিতে পারিলে ভাল পাশ করিবার সম্ভাবনা বেশী। কেবল আই এ, বি এর সম্বন্ধে একথা নয়। শুনিতে পাই, উচ্চতম পাঠ্য এমে যারা পড়ে, তারাও নাকি বই পড়ার চেয়ে অধ্যাপকদের নোট মুখস্থ করিলে পাশ ভাল হইতে পারে।

কলেজে পড়িতে আসিয়াছে, পরীক্ষা দিতে হইবে, পাশ হইতে হইতে হইবে।—নহিলে কলেজে পড়া ব্যর্থ। নির্দ্দিষ্ট Percentage of attendance না থাকিলে ছাত্রেরা পরীক্ষাই দিতে পারে না,—তাই এত বেতন দিয়া তারা কলেজে পড়ে, সিট্‌ভাড়া দিয়া মেসে থাকে। সকল অবস্থা ও ব্যবস্থার হিসাব করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, কলেজগুলি হইয়াছে, এই Percentage of attendance কেনা বেচার দোকান। মাসে মাসে টাকা দিয়া ছাত্রেরা তাই কিনিয়া রাখে, পুরা হাজিরার সংখ্যাটা না দেখাইতে পারিলে যে তাহাদের পরীক্ষা দেওয়াই হয় না!

প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীতে কত যে ত্রুটি রহিয়াছে, দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনের হিসাবে তা যে কত রকমে বিফল,—কেবল বিফল নয়—দারুণ অনিষ্টকরও বটে,—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না সব কথা বলিতে গেলে বড় একখানা পুঁথি হইয়া পড়ে। তবে মোট কয়েকটা

কথা বলিলাম। আর এত বলিতেই বা হইবে কেন? একটু চিন্তাশীল কে এমন আছেন, যিনি ইহা বুঝিতে পারেন না? ব্যয়বহুল বৃথা এই যে আড়ম্বর, এই যে সোণা ঢালিয়া কাচ কেনা, এই যে চকচকে রঙ্গিল বিলাতী খেলনার দোকানদারী, একএক টুকরা চোতা-কাগজের জন্য—সোণার চাঁদ ছেলেগুলি এই যে এমন করিয়া শেষ হইতেছে, ইহা সত্যই আর চক্ষে দেখা যায় না!

ছেলেগুলিকে যদি মানুষ করিতে হয়, তবে নূতন ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে করিতে হইবে। নূতন এই শিক্ষাপদ্ধতি বর্ত্তমান যুগে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ হইতে পারে, হইলে মঙ্গল হয়, তাহাই এখন আমাদের ভাবিবার কথা।

দুইটি দিক হইতে আগে আমরা এই কথাটি আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। প্রথম, সাধারণভাবে আবশ্যকীয় বিবিধ জ্ঞানের অধিকার—শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়—আধুনিক যুগের জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত বৃত্তি সংস্থানের যোগ্যতা অর্জ্জন।

প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাহা প্রয়োজন, পূর্ব্বের আলোচনাতেই তাহা একরূপ বলা হইয়াছে। আর একটী মাত্র কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হয়।—এইখানে আমাদের টোলের অনাড়ম্বর সহজ ধরণটা ধরিতে পারিলেই সবচেয়ে ভাল হয়। তবে আধুনিক এই টোলগুলি হইবে বড় বড় পুস্তকাল অল্পে সন্তুষ্ট সরল অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত পণ্ডিতদের লইয়া, যাঁহাদের নিকট সমাগত শিক্ষার্থিগণ গাছতলায় বসিয়া হউক কি গৃহতলে মাদুরে বসিয়াই হউক, দুরূহ কথাগুলি বুঝিয়া নিবে, নূতন কথা ইঁহাদের কিছু থাকিলে শ্রদ্ধায় শুনিবে, ইহাদের নির্দ্দেশ মত পুস্তক পড়িবে। যে পরিষদের অধীনে এইরূপ যে টোল থাকিবে সেই পরিষদকে ছাত্রগণ কিছু কিছু বেতন দিতে পারে। তাহাদের দ্বারা এবং ধনীর দানে পরিষদ এই সব টোল আর টোলের অধ্যাপকদের পালন করিতে পারেন।

বড় বড় স্থানে বড় বড় এই সব টোলই উচ্চতর জ্ঞান তত্ত্বের অনুসন্ধান ও অনুশীলনের মন্দির হইতে পারে।

দ্বিতীয়, ব্যবসায়িক শিক্ষার কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজকর্ম্ম, আইন ও চিকিসা ব্যবসায়ে মাত্র বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত সকলের জীবিকার সংস্থান হইতে পারে না। কোন দেশেই তা এখন হয় না। বড় বড় স্বাধীন ও উন্নত দেশের অবস্থার সন্ধান যদি আমরা নিই, দেখিতে পাইব, রাজকার্য্যাদি বৃত্তিতে যত লোক জীবিকা অর্জ্জন করে তার অপেক্ষা অনেক অধিক লোক নানাবিধ ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জ্জন করেতেছে। আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে,—নহিলে বাঁচিবার উপায় নাই। ব্যবসায় বাণিজ্য এমন অনেক আছে, যাহার জন্য বিশেষ কোনও technical ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন কাহারও হয় না। এই সব ব্যবসায়ের মধ্যে শিক্ষানবিশ ভাবে প্রবেশ করিয়া কাজ শিখিতে হয়, তারপর হয় নিজে না হয় মালিকের সহকারী রূপে শিক্ষানবিশরা কাজ আরম্ভ করিতে পারে। পাশ্চাত্য অঞ্চলের অনেক অভিভাবকই স্কুলের পড়া হইলেই ছেলেদের কোনও না কোনও ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশীতে লাগাইয়া দেন,—সব ছেলেই সেখানে ঝাঁক বাঁধিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না। যে সব বৃত্তির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন, সেই সব বৃত্তিকামীরা মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। আমাদেরও তাই এখন করিতে হইবে। এই শিক্ষানবিশগণ উচ্চতর জ্ঞানের অধিকার যদি চান, এই সব লাইব্রেরীতে গিয়া পড়া শুনা করিতে পারেন।

আধুনিক অনেক এমন ব্যবসায় বাণিজ্য আছে, যাহার জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন। এই সব শিক্ষার সাধারণ নাম বলা যাইতে পারে, 'Technical শিক্ষা। এই টেক্‌নিকাল শিক্ষা সাধারণতঃ বড় ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু এখনকার সব কলেজে যে রাশি রাশি অর্থ একরূপ বৃথা ব্যয় হইতেছে, তাহার বেশীর ভাগ ঘুরাইয়া এইদিকে আনা প্রয়োজন। আনিতে পারিলে অর্থের প্রয়োজন অনেকটা কুলাইয়া যাইবে। তাহা ব্যতীত ধনীর দানও চাই,—সে দানও টানিয়া আনিতে হইবে। এই সব টেক্‌নিকাল শিক্ষালয়ের সঙ্গে লাইব্রারী ও দুই একজন যোগ্য পরিচালকের ব্যবস্থা করিলে, মোটামুটি ভাবে প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞানও শিক্ষার্থীরা অর্জ্জন করিতে পারে।

অতি সংক্ষেপে—মোট একটা পন্থার ইঙ্গিতের মতই কথা কয়টি বলা হইল। কারণ বিস্তৃত ভাবে এসব কথার আলোচনার স্থান ও সময় এ নহে।—তা ছাড়া আরও অনেক

কথা বলিবার আছে। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে ব্যবসায়বাণিজ্যের একটা রীতি আছে। অনেক ব্যবসায়ীসম্প্রদায়ভুক্ত স্বাধীন গৃহস্থগণ স্বস্ব গৃহে সেই সব ব্যবসা পরিচালনা করিয়া সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছে। বৈজ্ঞানিক শিল্পের আমদানীতে এসব একেবারে বিনষ্ট হইয়া পাশ্চাত্য Industrialismএর নাগপাশে দেশের লোক বাঁধা না পড়ে, ফলে সোসিয়লিজিম্ বোল্‌শেভিজমের বিপ্লবে সমাজ বিধ্বস্ত না হয়, এদিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে সব বজায় রাখিয়া নূতন নূতন এমন অনেক দিক আছে, যে সব দিকে শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় ব্যবসায়বাণিজ্যের নূতন নূতন ক্ষেত্র রচনা করিয়া নিজেরা সুখে থাকিতে পারেন,—দেশকেও সুখী ও সমৃদ্ধ করিতেও পারেন। প্রবল বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা সে সব ক্ষেত্রে আছে। কিন্তু এ প্রতিযোগিতার সঙ্গে সংগ্রাম আমাদের করিতেই হইবে, তার জন্য প্রথম হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে।

এদিকে যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, আর একদিকে সেই সব শিক্ষার উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাও দেখিতে হইবে। দুটী কাজ প্রায় এক সময়েই আরম্ভ করিতে হইবে। তবে এসব কথারও বিস্তৃত আলোচনা আজ এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধনেই মানবজীবনের পূর্ণসিদ্ধি হয় বলিয়া এদেশের প্রাচীন গুরুগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিশ্বজগতের অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তির সর্ব্বজনপূজ্যা কোনও মূর্ত্তি বিশেষের ধ্যানে গুরুর উপদেশ এই—

"চিন্তয়েৎ জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাম্।"

দেহ মন সুস্থ থাকে আর সমাজের মঙ্গল হয় এই জন্য যে সব সদাচার ও সুনীতি পালন করিতে হইবে, তাহাই ধর্ম্ম,—ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জনে পার্থিব কাম্য সুখ সম্ভোগ লোকে করিবে, ইহাই হইল অর্থ ও কাম। শেষ—অধ্যাত্ম বিদ্যার অধিকারে ও তার সাধনায় মোক্ষ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদিগকে এই চতুর্ব্বর্গলাভের যোগ্য করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ইহার একটিকেও বাদ দিবে তাহা অসম্পূর্ণ।

শিক্ষার কথাটা; আমরা এতক্ষণ কেবল অর্থকামের দিক হইতেই আলোচনা করিয়াছি। ধর্ম্ম মোক্ষ সম্বন্ধে কোনও কথাই বলা হয় নাই। কারণ প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য মাত্র অর্থ ও কামের অভিমুখে, ধর্ম্মমোক্ষের নামগন্ধও তার মধ্যে নাই। আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, অর্থ ও কাম—মাত্র এই দুইটি বর্গ লাভের পক্ষেও এশিক্ষা এখন কিরূপ ব্যর্থ হইতেছে এবং এই ব্যর্থতা দূর হইয়া সার্থক কিসে হইতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে অর্থ কাম বর্গদ্বয়ের সিদ্ধির পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রয়োজন একথা স্বীকার করি। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অর্থকাম সিদ্ধির পক্ষে কতক সহায়তা করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আর করিতেছে না, করিতে পারেও না। তবে কিভাবে কোন্ পথে এই শিক্ষা পরিচালিত করিলে আমরা আকাঙ্ক্ষিত অর্থকামের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, তাহা হয়ত কিছু বুঝিয়াছি। যদি বুঝিয়া থাকি, আর সেই বুদ্ধিতে কাজ কিছু করিতে পারি, তবেই বলিব, এই শিক্ষা আমাদের পক্ষে কিছু সার্থক হইয়াছে। নহিলে বলিব কথার বহর ছাড়া আর কিছুই আমরা শিখি নাই। আর ভোগের কামনাই অনেক জুটাইয়াছি, তাহা তৃপ্তির জন্য কোনও আয়োজন করিতে শিখি নাই।

যাহা হউক তবু এ ভরসা আমাদের করিতেই হইবে, এটা আমরা কিছু শিখিয়াছি, এবং সেই ভরসায় কাজও আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু একথাটি আমাদের প্রথম হইতেই মনে রাখিতে হইবে যে কেবল অর্থ কামের সিদ্ধিতেই মানবজীবনের পূর্ণসিদ্ধি হয় না, কেবল অর্থ কাম সাধনার যোগ্য শিক্ষাতেও পূর্ণ শিক্ষা হয় না। ধর্ম্ম মোক্ষের বড় দুটি বর্গ এ যুগের শিক্ষার খাতা হইতে একেবারে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। শিক্ষার আলয় তাই কেনাবেচার কারখানা হইয়াছে, মনুষ্যত্বের সাধনার মন্দির আর কোথাও নাই।

নূতন যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের কথা আমরা বলিলাম, তাহার চতুরঙ্গ সম্পূর্ণ করিতে আমাদের হইবে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনে পূর্ণ মানুষ যাহাতে ছেলেরা হইয়া উঠিতে পারে, তেমনই মন্দিররূপে শিক্ষালয় গুলিকে গড়িতে হইবে। যদি পারি তবেই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা মহাদেবীর সফল পূজা হইবে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমরা লাভ করিব।

কথাটা বলিয়া ফেলা যত সহজ হইল, কাজে করাটা কিছু তেমন সহজ হইবে না। যা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তা আবার গড়িয়া লওয়া বড় কঠিন। তবে হাল ছাড়িলে ত চলিবে না, — কাজটা যত কঠিন হউক, করিতেই হইবে। কিভাবে তা আরম্ভ করা যায় তার সম্বন্ধেও দুই একটি ইঙ্গিতমাত্র এখানে করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি বড় প্রভাব ইহা আমরা দেখিতেছি, যে ইহা আমাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ও বিদ্যার প্রতি বড় একটা অবজ্ঞা আমাদের মনে জন্মাইয়া দেয়। আমরা পড়ি না, আলোচনা করি না, পরীক্ষা করি না, তুলনা করি না, এক কথায় একতরফা এই রায় দিয়া বসিয়া থাকি, ওসব বাজে বুজরুকী, একেবারেই অসার,— কেবল অসার নয়, আধুনিকযুগোপযোগী উন্নতির পরিপন্থী॥ তাই সাধনা দূরে থাক, শিখিবার একটা আগ্রহও কোথাও বড় দেখা যায় না। এই ভাবটি দূর করিতে হইবে। আমরা এমন কথা বলি না, অন্ধ ভাবে বামুনরা যা বলে তাই কর, আর মনে কর তাহাতেই তোমার পরমার্থ লাভ হইল। তবে একথা অবশ্য বলিব, আমাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ও বিদ্যা কি ছিল, কি তাহা লোককে বলিয়াছে, কেন বলিয়াছে, তাহা আমাদের শিখিতে ও বুঝিতে হইবে। আর যদি তা শিখি ও বুঝি, তবে ভরসা করিয়া ইহাও বলিতে পারি, এ যুগেও আমরা আমাদের ধর্ম্ম ও বিদ্যার সাধনা ত্যাগ করিব না। চরিত্রগঠনের পক্ষে বহুযুগের পুরুষপরম্পরাগত যে সব উচ্চ সংস্কার লইয়া আমরা জন্মিয়াছি, শিক্ষা ও সাধনা আমাদের তদনুরূপ হওয়া আবশ্যক। এই শিক্ষা প্রাচীন সেইধর্ম্মের ও বিদ্যার শিক্ষা। সেই শিক্ষা পাইলেই, সেই সব সংস্কার তাজা হইয়া জাগিয়া উঠিলেই, আমরা বুঝিব কোন পথে আমরা যাইব, কি ভাবে, কোন্ কর্ম্মসাধনায় মনুষ্যত্ব লাভে আমরা ধন্য হইব। আমাদের উচ্চশিক্ষায় এখন পাশ্চাত্য বিদ্যারই সর্ব্বময় প্রভুত্ব। এই প্রভাব আমাদের স্বাভাবিক সংস্কারের অনেকটা প্রতিকূল।—তাই সেগুলি অঙ্কুরেই প্রায় শুকাইয়া যাইতেছে। অথচ সংস্কারের বীজ এমন আর কিছুই নাই, যাহা এই বিদ্যার আবহাওয়ায় শক্তিরূপে জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে। আমরা যে একেবারে গাছাড়া নির্জ্জীব পুতুলের মত হইয়া পড়িতেছি, তার একটি বড় কারণ ইহাই। অবশ্য এমন প্রতিভা, এমন শক্তিশালী বীজও আছে, যাহা অবস্থার সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া সতেজে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এরূপ ভাগ্যধর পৃথিবীতে কয়টি মিলে? তাই উচ্চশিক্ষার প্রকৃত সাফল্যের জন্য তাহাতে প্রাধান্য দিতে হইবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের, পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্থান হইবে তার নিম্নে। আপাততঃ ইহাই মাত্র আমরা করিতে পারি। বেশী কিছু করিবার অধিকার আমাদের নাই। ইহার বেশী করিবে তারাই—যারা এই শিক্ষায় মানুষ হইয়া উঠিবে।

এই যে চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির কথা মোটামুটি বলা হইল, তার প্রবর্ত্তন করিবে কে?

গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় ইহা পারিবেন কি? এ অধিকার সে পক্ষের আছে কি? আমরা বলি না, নাই, থাকিতে পারে না। আমাদের ধর্ম্ম ও মোক্ষ সাধনার অনুকূল শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে হইতে পারে না।

ধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত অর্থ কামের সাধনা যদি সম্ভব ও শুভ কখনও হয়, তবে তারই উপযোগী শিক্ষামাত্র সেখানে হইতে পারে। কিন্তু তারই বা আশা কোথায়? কেবল খরচের বহরই বাড়িতেছে,—শিক্ষা যাহা হইতেছে, কোন্ কাজে তাহা আসিতেছে? সাধারণ যে বিদ্যা শিক্ষা —যাহা অতি অল্পব্যয়ে সহজেই হইতে পারে, তার জন্যই ব্যয়ের অবধি নাই, আট ঘাট বাঁধিয়া যত শক্ত তা হইতে পারে, তাহা হইতেছে। ব্যবসায়বাণিজ্যাদির যে শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন তার জন্য কি অসাধ্য ব্যয়ের ব্যবস্থাই যে হইবে, তাহা ভাবিয়া কূল পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। যে আভাস পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ত চক্ষু স্থির! সে ব্যবস্থা যে ভবিষ্যতে কোন্ যুগে এদেশে সম্ভব হইবে, তাহা বিধাতাই জানেন।

তাই আজ বলিতে চাই, দেশের মঙ্গলের জন্য দেশের ছেলেদের মানুষ করিবার জন্য, চতুর্ব্বর্গ সাধনে তাহাদের জীবন পূর্ণ সিদ্ধি আনিবার জন্য যে শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে,—সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা। এই শিক্ষাদানে যে ছেলেদেরমানুষ করা, তাহা জাতীয় শিক্ষারই অধিকার।

চৌদ্দবৎসর পূর্ব্বে এই অধিকার বুঝিয়া এই শিক্ষা দেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্ত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আশানুরূপ সফলতা পরিষৎ লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আশা হয়, সুদিন আসিতেছে—দেশের লোকের মোহভ্রান্তি কাটিতেছে, দেশ আত্মরক্ষার জন্ত বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধিলাভের জন্ত জাতীয় শিক্ষার এই অধিকার এখন স্বীকার করিবে—এই শিক্ষারই আশ্রয় এখন গ্রহণ করিবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

অনন্তরূপ

তুমি মম প্রাণারাম, তুমি প্রেমসিন্ধু,
করমের সুরস্থত, মরমের ইন্দু।
পিরীতির ভাগীরথী, করুণার গঙ্গা,
তুমির ভূমা যে তুমি, হৃদয়ের সংজ্ঞা।
কোকিল কূজন তুমি, কুসুমের গন্ধ,
বিহগের মধু-গীতি, তটিনীর ছন্দ'।
গোপন হিয়ার মোর তুমি শরদিন্দু,
তুমি মম প্রাণারাম, তুমি প্রেমসিন্ধু।

পাতক কলুষহারী তুমি মহা খড়্গ,
ভক্তির ভোক্তা তুমি, মুক্তির স্বর্গ।
ধৈরযের 'হিমালয়' ধরণীর কান্তি,
উদার গগন তুমি বিরহীর শান্তি।
সন্তান কোটি প্রাণ কল কল ছন্দে—
নিশিদিন অবিরাম তব নাম বন্দে।
করমের সুর তুমি, মরমের ইন্দু,
তুমি মম প্রাণারাম, তুমি প্রেমসিন্ধু।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

অশ্রুমিলন

আজি অনিবার ঘন বরষার ধারা বরষণ দিনে
ভাবি দিবা যামী কি করিছ তুমি মম দরশন বিনে
বাতায়ন পাশে আছ তুমি বসে শূন্তের পানে চাহি
আলুলিত কেশ শ্লথ ভূষা বেশ, সংশয় এতে নাহি।

তুমি চেয়ে আছ মোর পানে আর আমি চেয়ে তোমা পানে
বর্ষারূপে দোঁহার অশ্রু পারাবার মাঝখানে।
আজি বর্ষার বিরহেরে তাই পরম মিলন কই—
অশ্রুতে আঁখি ঢাকে তাই তোমা দেখিতে পাই না সই।

শ্রীকালিদাস রায়।

বাঙ্গালার যক্ষ্মা

('আয়ুর্ব্বেদ')

"বঙ্গদেশে যক্ষ্মারোগ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। যক্ষ্মার অপর নাম ক্ষয়রোগ। রোগমাত্রেই ক্ষয়; কিন্তু যক্ষ্মায় অতি শীঘ্র দেহের ক্ষয় করিয়া থাকে বলিয়া ইহার সাধারণ নাম ক্ষয়।—যে শ্রেণীর যক্ষ্মা অতি মারাত্মক, উহার নাম রাজযক্ষ্মা। রাজযক্ষ্মা হইলে মানুষ হাজার দিন অর্থাৎ মোটের উপর তিন বৎসরের অধিক বাঁচে না। রাজযক্ষ্মা ও সাধারণ যক্ষ্মায় তফাৎ অনেক, রাজযক্ষ্মায় ক্ষয়কারী শক্তি যত অধিক, তেমন অপর যক্ষ্মার নহে। উহা অত্যধিক পরিমাণে সংক্রামক, তাই মানুষমাত্রেই উহাকে ভয় করিয়া থাকে। রক্তবমন ও জ্বর ইহার প্রধান ও সাধারণ লক্ষণ, তবে রক্ত বমন হইলেই যে ক্ষয় হইবে, এমন কোন কথাই বলা যায়

না। বাঙ্গালী অন্নচিন্তায় জর্জ্জরিত, প্রফুল্লচিত্ততা বাঙ্গালীর নাই, তাই যক্ষ্মা বাঙ্গালায় এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদা কদর্য্য স্থানে বাস, কদার্য্যাহার প্রভৃতি দ্বারাই যক্ষ্মা-রোগের উৎপত্তি হয়। কখন কখন ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে যক্ষ্মার উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। কাস-সংযুক্ত অল্প অল্প জ্বরই যক্ষ্মার মূল চিনিবার উপায়। যাহারা অত্যাধিক মৈথুনাসক্ত, তাহাদেরই যক্ষ্মারোগ হইবার সম্ভাবনা সমধিক। যক্ষ্মারোগীর দিবানিদ্রা বর্জ্জনীয়। নিত্য মুক্তবায়ু সেবন ও সহ্য হয় এমন প্রাতভ্রমণ ও সান্ধ্যবায়ুসেবন কর্ত্তব্য। রাত্রে আবদ্ধ গৃহে না থাকিয়া জানালা খুলিয়া সুবাতাস সেবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া মুক্তবায়ু সর্ব্বদা সেবন করে, তাহাদের দিকে যক্ষ্মা আর ঘেঁসিতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন উপদ্রব না থাকিলেও যক্ষ্মারোগাক্রমে শীর্ণ হইতে থাকে। যক্ষ্মারোগ কতিপয় বৎসরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঋষি-প্রণীত নিয়মাদি রক্ষা না করিয়া আমরা হীনবল হইতেছি, তাহার উপর উদরান্নের সংস্থানের জন্য আমাদের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও যথোপযুক্ত আহারের অভাব বাঙ্গালায় যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। যক্ষ্মা সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া লোকে ইহাকে বড় ভয় করে।

যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে মৈথুন সম্বন্ধে সতর্কতাবলম্বন বা তাহাকে বর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। যাহারা এ বিষয়ে অসতর্ক, তাহারাই মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনে।

যক্ষ্মারোগীর অন্যান্য নিয়ম-প্রতিপালনের মত দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ বর্জ্জনীয়। কুপথ্যত্যাগ করিবে, অতি-জনতায় বা এক স্থলে বহু লোক একত্রে শয়ন করিবে না। বহুজননিঃশ্বাসে গৃহের শুদ্ধ বায়ুও দূষিত হইয়া পড়ে। প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বদা মনকে প্রফুল্ল রাখিতে হইবে। স্ত্রী বা মৈথুন বিষয়ে সর্ব্ব-প্রকার চিন্তা হইতে দূরে থাকিবে। কলহ ও ক্রোধ বর্জ্জন করিবে; শোক দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মাইবে না; অতি আহার বা অনাহার করিবে না। সর্ব্বদা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দ্বিতল ও ত্রিতলে যাতায়াত পরিত্যাগ করিবে। শীত বা রৌদ্র লাগাইবে না, দূষিত মৎস্যমাংস ভোজন ও অতি মসলা সংযুক্ত দুষ্পাচ্য ব্যঞ্জনাহার এবং অধিক লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন ভক্ষণ বর্জ্জন করিতে হইবে, গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান করা কর্ত্তব্য, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এই রোগের একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা। ভাজা পোড়া দ্রব্যাহার নিষিদ্ধ। ২৫ হইতে ৫০ বৎসর-বয়স্ক ব্যক্তিগণেরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী। ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রোগীই অনেক দেখা যায়।

বর্ষাকালে এই রোগ বেশী হইয়া থাকে। যাহাদের পুরাতন রোগ, তাহারাও বর্ষাকালে বেশী ভুগিয়া থাকে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ইহার যাপ্যাবস্থা। শীতকালেও ইহার আক্রমণ কিছু কম। প্রাতরুত্থান দেহকে রোগমুক্ত করে, যক্ষ্মারোগে প্রাতরুত্থান অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রাতভ্রমণও উত্তম ব্যবস্থা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুক্ত বায়ু সেবন বড় সুপথ্য। হিমালয় প্রদেশে ধরণহর নামক স্থানে গভর্ণমেণ্ট যক্ষ্মা-রোগীর বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেখানে একটী যক্ষ্মা-আশ্রম করিয়াছেন, আর সংপ্রতি কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও গভরমেণ্ট একটী যক্ষ্মা চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহা অতি উচ্চ। অতি উচ্চস্থানে বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া রোগী প্রফুল্ল চিত্ত হয়। কলিকাতায় কলের ধুম চিমনী দিয়া উপরে উঠিয়া যায় সত্য কিন্তু সে ধুম উপরের দিকে বেশী উঠিতে পারিয়া কিছু বিশুদ্ধ হইয়া নীচেই নামিয়া আসে। মন্দের ভাল বলিতে হইবে। অগ্ন্যুত্তাপ, ধুমসেবা—যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ। পল্লীতে পল্লীতে যাঁহারা যক্ষ্মারোগী দেখিবেন, তাঁহারা যেন যক্ষ্মারোগীকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া তাহার আয়ুবৃদ্ধির সহায়তা করেন। এবং যাহাতে সেই স্থানে আর যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধি হইতে না পারে, তাহারও উপায় করেন।

বংশানুক্রমে যক্ষ্মারোগ সংক্রামক হইতে দেখা যায়, তাই অনেকে যক্ষ্মারোগীর পুত্র-কন্যার সহিত নিজ পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন। যাহারা যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষা করে, তাহারা এই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। যক্ষ্মারোগীর পুত্রকন্যাগণকেও সাধারণতঃ দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়। যক্ষ্মারোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে যক্ষ্মার বীজাণু বিচরণ করে, অধিকন্তু যক্ষ্মারোগীর শুক্র-শোণিতেও যক্ষ্মার বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে পুরুষেরই যক্ষ্মা হয় এমন নয়, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও বহুতর যক্ষ্মারোগী দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহাদের

জরায়ু দূষিত ও যাহারা প্রদরাদি রোগে পীড়িত, তাহারা অতি সহজেই যক্ষ্মারোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। তাহাদের স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া তাহাদের শিশুগণও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইতে পারে। তবে বাল্যকালে উহাদের রোগ প্রকাশ পায় না, বয়স হইলে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কিছুকাল তাহা যাপ্য হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার অনেক প্রকার প্রণালী আছে। পূরাকালে আমাদের দেশে এখনকার মত যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও দূরদর্শী ঋষিগণ এই রোগের সর্ব্বপ্রকারে আলোচনা করিয়াছিলেন। অধুনা ইউরোপীয় ডাক্তারগণ যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন, তাহার আলোচনা ভালই হইতেছে। শীতপ্রধান দেশেও যক্ষ্মারোগ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে বাঙ্গালার আর রক্ষা নাই, সেইজন্য দেশের চিন্তাশীল বাঙ্গালীগণ এই রোগের হস্ত হইতে যাহাতে বাঙ্গালা দেশ রক্ষা পাইতে পারে—তাহার জন্য চেষ্টাশীল হউন, ইহাই বক্তব্য।" (দৈনিক বসুমতী)

ভারতী

"ভারতী"র গত আষাঢ় সংখ্যায় যক্ষ্মা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা সুষমা সিংহ লিখিত একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। নিম্নে সেই প্রবন্ধ হইতে যক্ষ্মার প্রতিষেধক কয়েকটি উপায় উদ্ধৃত হইল।

"যক্ষ্মারোগাক্রান্ত না হইবার কয়েকটী প্রধান উপায়ঃ—বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, বাস গৃহে, অফিসে ও কর্ম্মস্থলে আলোক ও বাতাসের বহুলতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ, সুপাচ্য ও পরিমিত আহার, সংযত জীবন-যাপন। অত্যাধিক ধূম ও মদ্য-পানে মানবের জীবনী শক্তি হ্রাস হয় ও অতি-শীঘ্র মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

"কোথায় থুথু ফেলিবে না, সে রাস্তাতেই হোক, কিম্বা বাড়ীর দেওয়ালে মেজেয় কি কোন গাড়ীতেই হোক। যদি থুথু ফেলিবার দরকার হয়, তবে পিক্‌দানী বা কোন পাত্রে অল্প জল দিয়া তাহাতে, অথবা এক টুক্‌রা কাপড়ে ফেলা উচিত। কারণ সকলের জানা উচিত যে 'no spit, no consumption।" বিলাতে ও আমেরিকার রাস্তায়, ফুটপাথে, আলোকস্তম্ভে, বাড়ীর দেওয়ালে "থুথু ফেলা নিষেধ," "এখানে থুথু ফেলিলে .... টাকা দণ্ড হইবে" ইত্যাদি লেখা থাকে।"

"এমনভাবে কাপড় পরা উচিত যাহাতে মাটীতে কাপড় না স্পর্শ করে ; রাস্তায় চলিতে কাপড় মাটীতে লুটাইলে কাপড়ে ধূলা-ময়লা, থুথু প্রভৃতি লাগিয়া যায় ও বাড়ীতে নানা প্রকার রোগের আমদানী হয়।"

"সোণা রূপা বা কোন প্রকার ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা মুখের মধ্যে দিবে না। পয়সা, আনী, দুয়ানী, সিকি, অধুলী, টাকা প্রভৃতি কত প্রকারের কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত লোকের হাত দিয়া চলা-ফিরা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মুখে দেওয়া দূরে থাকুক, মুদ্রাস্পর্শে হাত ধোয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

"আহারের পূর্ব্বে হাত মুখ ধুইতে অবহেলা করা উচিত নহে ; হাত না ধুইয়া হাতের অঙ্গুলি মুখের মধ্যে বা নাকের গর্ত্তে প্রবেশ করাইবে না।"

"প্রত্যহ স্নান করিবে ও দেহ পরিষ্কার রাখিবে। কি শীত কি গ্রীষ্ম, সর্ব্বকালেই মুক্ত বাতাসে প্রত্যহ ব্যায়াম করিবে। ভ্রমণকরা, দাঁড়বহা, সাঁতারকাটা, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শরীরের পক্ষে অনুকূল। নাক দিয়া সর্ব্বদা নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইবে। অত্যধিক ব্যায়ামও আবার ভাল নয় ; সবল সুস্থ ব্যক্তিও তাহাতে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মারোগীর সহিত কখনও এক সঙ্গে শয়ন করিবে না। উক্ত ব্যাধিগ্রস্থ রোগীকে কখনও চুম্বন করিবে না বা করিতে দিবে না।"

"ঘর-দ্বার সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। মধ্যে মধ্যে ঘরের দেওয়াল ধৌত করা কিংবা চুনকাম করা উচিত। যে গৃহে একবার কোন যক্ষ্মারোগী বাস করিয়াছে, সে গৃহে বাস করিবার পূর্ব্বে খুব ভালরূপে disinfect করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মার বীজ না পুড়াইলে অনেকদিন যাবৎ উহা বাঁচিয়া থাকে, বিশেষতঃ অন্ধকারপূর্ণ অপরিষ্কার স্যাঁতসেঁতে জায়গার যক্ষ্মাবীজ বহুদিন জীবিত থাকে।"

"বিদ্যালয়ের কক্ষ গুলিতে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলো ও বাতাস প্রবেশ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।"

"ছাত্রগণ কখনও কাহারও ব্যবহৃত পেন্সিল বা অন্যকিছু দ্রব্য লইয়া ব্যবহার করিবে না ; কারণ বালকদিগের প্রায়ই পেন্সিল কলমের প্রান্তভাগ মুখে দেওয়া অভ্যাস আছে।"

"দোকান হইতে বাঁশী বা অন্য কোন বাজনা (মুখে দিয়া বাজাইবার) ও খেলেনা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পর সর্ব্বদা ধৌত করিয়া ব্যবহার করিবে।"

"ক্লাসে বসিবার সময় বালকগণ কখনও কুঁজো হইয়া বসিবে না। কুঁজো হইয়া বসিলে বুক প্রশস্ত হয় না ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস অবাধে লওয়া ফেলা যায় না।"

মালঞ্চ-পুরস্কার

'মালঞ্চ' পুরস্কারের জন্য আমরা যে সব গল্প ও প্রবন্ধ পাইয়াছি,—তাহা কতিপয় প্রবীণ ও বিজ্ঞ সাহিত্যবিৎ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়। তাহাদের মত এই যে, একেবারে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারের উপযুক্ত গল্প ও প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। যে গুলি তাঁহারা ভাল বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও গুণের তারতম্য অনুসারে পর্য্যায় নির্ণয় করা কঠিন। গল্পগুলি তাঁহারা ১ম ও ২য় মোট এই দুইটী শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর গল্পগুলির প্রত্যেকটির জন্য ১০৲ টাকা করিয়া এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পগুলির প্রত্যেকটির জন্য ৫৲ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হয়,—এইরূপ তাঁহাদের মত। এবং তদনুযায়ী আমরা পুরস্কার ঘোষণা করিলাম।

সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। তার মধ্যে মাত্র দুইটি—১০৲ টাকা করিয়া পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ একটিও পাওয়া যায় নাই।

এই গল্প ও প্রবন্ধ আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে ক্রমে মালঞ্চে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

সম্পাদক—

গল্প—প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার।

প্রত্যেকটির জন্য ১০৲ টাকা।

১। **পরিচয়**—শ্রীযুত সুধানলিনী কান্ত দে।
২। **দর্পচূর্ণ**—শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। **জ্ঞান ও ইমান্**—শ্রীযুত শান্তিকুমার রায়চৌধুরী।
৪। **আসল ও সুদ**—শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দাস বি, এল,
৫। **জ্যাঠামহাশয়**—শ্রীযুত নীরদবিহারী সেনগুপ্ত।
৬। **রক্ত ছলি**—শ্রীযুত অতুলানন্দ রায়।

গল্প—দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরস্কার।

প্রত্যেকটির জন্য—৫৲ টাকা।

১। **মাছধরা**—শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
২। **দুঃস্বপ্ন** সরোজবাসিনী গুপ্তা।
৩। **শ্লিপিতের কথা** – শ্রীযুত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত।
৪। **ভুল ভাঙ্গা**—শ্রীযুতা প্রতিভা দেবী।
৫। **সত্যরক্ষা**—শ্রীযুত সরোজবাসিনী গুপ্তা।
৬। **হাজার টাকা**—শ্রী……………(মাহেশ)

প্রবন্ধ—পুরস্কার—প্রত্যেকটির জন্য ১০৲ টাকা।

১। **স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র**—শ্রীযুত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।
২। **দ্বিজেন্দ্র প্রতিভা**—শ্রীযুত বলাই দেবশর্ম্মা।

মানসী
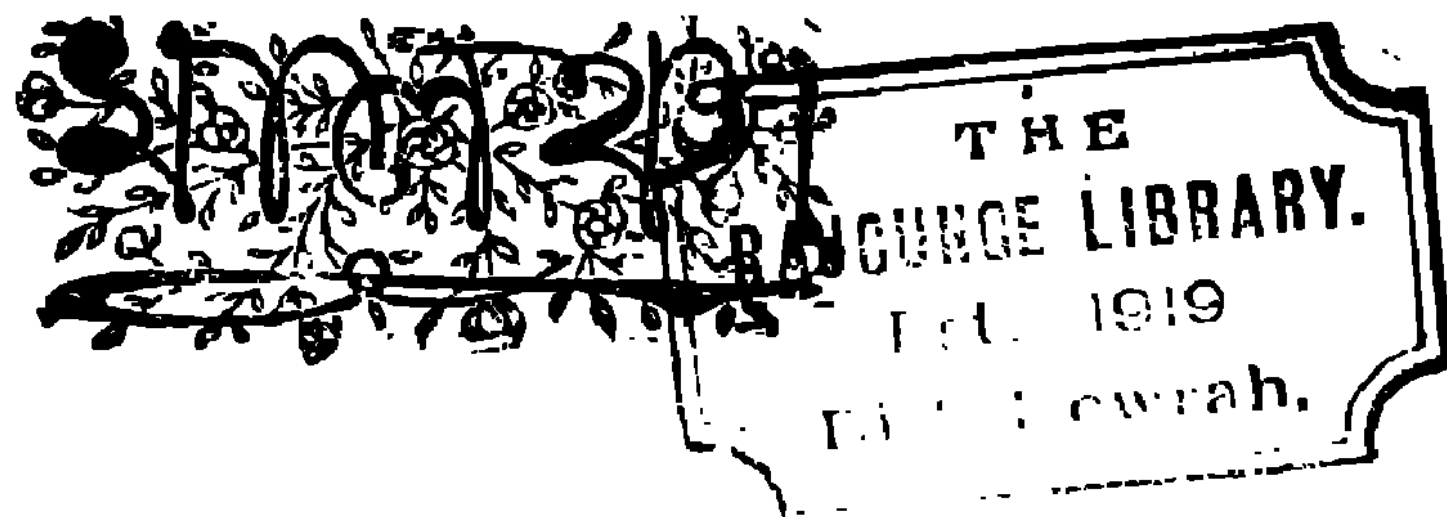
৬ষ্ঠ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩২৬ | ৭ম সংখ্যা

বিএ বউ

(১)

বৈকাল বেলা,—শ্যামাচরণ চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া বিষণ্ণ বদনে হুঁকা টানিতেছিলেন। যত বড় বিষাদের ভারই প্রাণটার উপরে চাপিয়া পড়ুক, যত বড় তীব্র দুশ্চিন্তার দংশনেই মনটা পাগল হইয়া উঠুক, কাল-বদনা-হুঁকা-মুখচুম্বনে, আর সেই মুখনিঃসৃত কালান্ত-ধূম্রসুধাপানে যতটা শান্তি তখন পাওয়া যায়, এমন আর কিছুই কি এই ত্রিলোকে আছে, সেই শান্তি দিতে পারে? মহিমা কি ইহার কম? পুরাণবাক্যই এ সম্বন্ধে রহিয়াছে—যথা—

"বিড়ৌজা পুরা পৃষ্টবান্ পদ্মযোনিং
ধরিত্রী তলে সারভূতং কিমস্তি।
চতুর্ভির্মুখৈরিত্যবচদ্বিরিঞ্চি
তমাখু তমাখু তমাখু তমাখুঃ॥!"

ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে চারিটি বেদ নাকি নির্গত হইয়াছিলেন,—সেই চারিমুখ হইতে এক তামাকুবাণী বিনির্গতা হইলেন। ত্রিতাপ হইতে মোক্ষপ্রদানে, বেদের চারিগুণ শক্তি অবশ্য এটি তামাকুতে থাকিবে!—সেই তামাকুসুধার শ্রেষ্ঠ আধারিকা ও বাহিকা হুঁকা, তাই ইহার কালরূপ নয়ন পথে পড়িলেই জাতি কুলমান সব ভুলিয়া সেবক উন্মত্ত হইয়া ছুটে—শ্যামের কালরূপ দেখিয়া বৃন্দা-বনের গোপিকারা যেমন ছুটিত! আর ইহার সেই প্রাণ-মাতান মোহন গুড়্‌গুড়্‌ ধ্বনি—শ্যামের মুরলী কি ইহার চেয়েও মধুর বাজিত?

যাক্! মনে বড়ই একটা ব্যাথা পাইয়া, দুশ্চিন্তায় সত্যই বড় পীড়িত হইয়া, শ্যামাচরণ চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া তামাক্ টানিতেছিলেন। একে একে—দুইয়ে দুইয়ে—তিনে তিনে—ক্রমে পাড়ার ও অপর পাড়ারও অনেকে আসিয়া দেখা দিলেন। শ্যামাচরণের দুঃখের সংবাদ বাজার বেলাতেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়াছিল।—বাজারের কেনা মাছ তরকারী ঘরে ঘরে পাক হইল, সকলের মধ্যাহ্নভোজন তাহাতে সুসম্পন্ন হইল, তদন্তে মধ্যাহ্নভোজন-ক্লান্ত দেহের নিদ্রা-সম্ভোগে একটু বিশ্রামও হইল, নৈসর্গিক অন্যান্য ক্রিয়াদিও যথাপ্রয়োজন নির্ব্বাহ হইল, হস্তপদমুখাদি প্রক্ষালিত ও মার্জ্জিত হইল, তামাকুতাম্বুলাদিও যথারীতি

সোবত হইল,—যাহা হইবার তাহা কি না হইল? তখন একে একে দুয়ে দুয়ে তিনে তিনে সকলে শ্যামাচরণের দুঃখে সমবেদনা জানাইতে ও সান্ত্বনা দিতে আসিলেন।—সকলেই যে বড় বেদনা একটা অনুভব করিয়াছিলেন তা নয়,—তবে আসিতে হয় তাই আসিলেন। কেহ আসিলেন দুঃখে, কেহ আসিলেন কৌতূহলে। কৌতূহলের কারণও বড় একটা এই দুঃখকর ঘটনায় ছিল বই কি? আর এই দুঃখটাও ঠিক এ জাতীয় দুঃখও নয় যে তৎক্ষণাৎ হাটবাজার ও খাওয়াদাওয়া সব ফেলিয়া সকলের ছুটিয়া আসিতেই হইবে। তবে কিসের এমন দুঃখ? আর এত লোকই বা তার জন্য বেশ ধীরেসুস্থে অবসর সময়ে আসিল কেন?

ইহাদের কথায় বার্ত্তায় রহস্যটা পরিষ্কার বুঝা যাইতে পারে।

যদুনাথ। তাই ত শ্যাম, একি হ'ল? সত্যি নাকি?

তারক। সত্যি নয় কি মিথ্যে খুড়ো! ঐ ত হারাণীর মা আমাদের বাড়ীতে গেছ্‌ল—সব ব'লে এল।

সদাশিব। বাজারেও ত বিন্দে মুদীর দোকানে এই কথাই হ'চ্ছিল।

সর্ব্বানন্দ। তাই ত—তাই ত! কি সর্ব্বনাশটাই ক'রে ফেল্লে বল ত—"

মহিম। ছেলেবেলায় বাপ ম'রে গেল—মা ম'রে গেল—বুকে ধ'রে মানুষ করেছিল—"

সারদা। আহা, অমন চমৎকার ছেলে—যেন হিরের টুক্‌রো হে!

নবকুমার। হাঃ— কত আশা করেছিল শ্যমদা, ওর দুঃখ সব দূর হবে —

পরেশ। রাজার হালে শেষ কালটা কাটাবে—

যোগেশ। বিলেত গেছল গেছল! সরকারী বৃত্তি পেলে—ভাল ছেলে—কেন যাবে না?—

মহানন্দ। সে ত বেশই ক'রেছিল। গাঁয়ে একটা মানুষের মত মানুষ হ'ত। কত মুখ উঁচু হ'ত আমাদের, একটা দায়ে ঘায়ে ঠেক্‌লে উপকার কত হ'ত—"

দীননাথ। আর তোমার উপকার! সে কি আর গাঁয়ে কখনও পা দেবে ভেবেছ, না কল্‌কেতায় কখনও দেখা হ'লে চিন্‌বে? বাড়ীতে গেলে চাপরাশি ঘাড় ধ'রে দূর ক'রে দেবে!

কেদার। ঘাড় ধরা পর্য্যন্ত কারু ঘেঁসতেও হবে না, তারও আস্‌তে হবে না। সে মূর্ত্তি দেখ্‌লেই যে ভয়ে সরে আস্‌তে হবে! কথা আছে —"শত হস্তেন বাজিনা"—আর একি জান—'সহস্রহস্তেন তথা সাহেব চাপরাশিনা'!"

যদুনাথ। আরে না না কেদার, বন্ধু আমাদের তেমন ছেলেই নয়—

এতক্ষণে শ্যামাচরণের মুখে একটু বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল, ফুরসুতও বোধহয় এই প্রথম পাইলেন। কহিলেন, "তাই ত খুড়ো, আমি একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেছি! সেই বন্ধু—আহা, সোণার ছেলে আমাদের! ক'লকেতায় যে প'ড়ত—সব পরীক্ষেতে জলপানি পেত—ধন্যি ধন্যি সবাই ক'ত্ত। তা একটু দেমাক্ কি বাবুগিরি কখনও দেখিনি। দেশে আস্‌ত—যেন পাড়াগাঁয়ের কোলের ছেলেটি—খালি পায়ে খালি গাঁয়ে সারাটি গাঁ চ'কে বেড়াত! হাট বাজার ক'ত্ত—মাছ তরকারী দুধ কিনে নিজের হাতে ব'য়ে আন্‌ত—আর কিনা ক'ত্ত! বাড়ীতে যদ্দিন থাক্‌ত খুড়ো, আমাকে ন'ড়ে ব'স্‌তে হ'ত না। আর সেই বন্ধু আজ-

দীননাথ। ওহে, বিলেতের সাদা জল পেটে গেলে, আর ম'দো হাওয়া গায় লাগ্‌লে, সেই বন্ধুরাই এই হয়ে ওঠে। বিলেত ফেরা কটা ছেলের মাথা ঠিক থাকে হে?

কাশী ভট্টাচার্য্য। বন্ধু ত তেমন ছেলে ছিল না, তারও মাথা বিগ্‌ড়ে গেল! সাধে বামুনসভা এদের কিছুতেই নিতে চায় না। এই যদি আজ হ'ল—এরপর কি না হ'তে পারে? ঐ যে বলে —

"ভোজনং যত্র তত্র চ শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতীতীরে অপরং কিংভবিষ্যতি॥"

পাড়ার জগদম্বাপিসী ও অপর দুইএকজন প্রবীণা আসিয়াও দাওয়ার সম্মুখে প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "বালাই! বালাই! ভট্চাজ্জির মুখে আগুন! ওমা গোমুতে ম'ত্তে কেন গেল বাছা? আহা বেঁচে থাক্, মা-বাপ মরা মরুক্কে ছেলে—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে—সওয়াশ বছর পেরমাই পেয়ে বেঁচে থাক্! তা হ'লই বা বউ বিবি, হাতের নোয়া সিঁথের সিন্দুর তার অক্ষয় হ'ক্।"

ভবভবানী হাসিয়া কহিলেন "আর জগীদির যেমন কথা!

হাতে নোয়া আর সিঁথেয় সিঁদুর সে বউ পর্‌বে কিনা যে তার ক্ষয় অক্ষয় কিছু হবে!"

দিগম্বরী কহিলেন—"ওলো, পরুক না পরুক, ক্ষয় অক্ষয় কিছু তাদের আছে? ভাতার ম'লে কি তারা রাঁড় হয় লো? একটা ম'রে আর একটা ধরে! এয়োস্ত্রী ওদের কক্ষণো ঘোচে না। জানিস্?"

ভবভাবিনী গালে হাত দিয়া বিস্ময়প্রকাশে কহিলেন, "ওমা কি ঘেন্না! এই বঙ্কুর বউ—"

জগদম্বা বাধা দিয়া কহিলেন, "বালাই! বালাই! বঙ্কু বেঁচে থাক্, তার বউ নিকে ক'ত্তে কেন যাবে? গোমুতে মরণ হ'ক্ ওই মুখপোড়া ভট্টাজ্জির! ওপার কুম্ভি বিষ্যুতি ওর যেথানে আছে তার গে হ'ক্!"

দিগম্বরী জিজ্ঞাসিলেন, "ওপার কুম্ভি বিষ্যুতি কাকে বলে জানিস্ ভবি?"

ভবভবানী। (একটু ভাবিয়া) এই বিষ্যুত বারে নদী পার হয়ে কোথাও যদি কেউ যাত্রা করে, ওপারের কাছাকাছি যেই গেল, অমনি কুম্ভি রাশি হ'য়ে জলে ডুবে মরে। একেবারে কুম্ভি বিষ্যুতি গো—ওপারের কাছাকাছি যেতেই একেবারে কুম্ভি বিষ্যুতি! হাঁ গা ভট্টাজ্জি ঠাকুর, কেমন তাই না?

কাশী ভট্টাচার্য্য একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন "হাঁ, তাই বই কি? একেবারে মল্লিনাথের টিকে হয়েছে—"

জগদম্বা বলিয়া উঠিলেন, "মল্লিনাথ! ওমা, সে যে আমার ভাসুরপো গো! তার টিকে হয়েছে! ওমা, তবে কি তাদের ঘরে মা এসেছেন? ওগো কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো! ওগো আমি কোথায় যাব গো! ওগো সে কুলে যে বাতি দিতে কেউ আর রইল না গো! ওগো মাগো!"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন! কাশীভট্টাচার্য্য কহিলেন "ওগো সে মল্লিনাথ নয় গো! সে মল্লিনাথ নয়—"

"অঁ! সে মল্লিনাথ নয়? তা ব'ল্‌তে হয়! তা মার কেরপাত হ'য়েছে,—সেই মল্লিনাথের ঘর থেকে—হাঁ গা, তাদের ঘর কদ্দূর গা?"

"সে ঢের দূর! সেথায় তোমার মল্লিনাথের যাবার ঢের দেরী আছে।"

"আহা মাগো! তোমায় চিনির ভোগ দেব মা! দয়া ক'রে আমার মল্লিনাথের ঘরে এস না! তোমার দয়ায় যে বড় পাই মা! সেবার গঙ্গা নাইতে কালীঘাটে গেলাম—যত লোকের গা ভরে মা ফুটে ফুটে উঠেছেন! তেরাত্তির বাস ক'ত্তে ওরা দিলে না—টেনে নিয়ে চ'লে এল!"

"সে বেশ ক'রেছিল। নইলে মার কেরপা তোমার গায়েও ফুটে উঠ্‌ত।"

সদানন্দ। আরে, রেখে দেও তোমাদের মার কেরপা! শ্যাম ভাইপোর আজ এই বিপদ-

তারক। আর বিপদ যা হবার তা ত হ'লই। এখন-

সারদা। বিলেতে গিয়েছিল গিইছিল, সেটা সামলান যেত। দেশে এসে একটা প্রাচিত্তি কল্লেই তুলে আমরা নিতাম—

যদুনাথ। তা ত নিতামই। বঙ্কুর মত ছেলে, তাকে কি আমরা ফেল্‌তে পাত্তাম?

কাশী ভট্টাচার্য্য। আমি পাতি লিখে দিতাম! বঙ্কুর মত ছেলে—বামুনসভার খাতির ক'ত্তাম না, পাতি লিখে দিয়ে, নিজে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করাতাম। তা এসেই অমনি বিয়ে ক'রে ফেল্লে—

নবকুমার। বি এ পাশ করা একটা ধাড়ী খৃষ্টানী মেয়ে! —আরে ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা! এমন কাজটাও বঙ্কু ক'ল্লে!

যদুনাথ। বিয়েও ত খৃষ্টানী মতেই তবে হ'য়েছে শ্যাম?

শ্যামাচরণ। না খুড়ো, লিখেছিল ত হিন্দুমতে হবে—

কাশী ভট্টাচার্য্য। হিন্দুমতে! বল কি শ্যামাচরণ? কলেজে পড়ে মেয়ে—বি এ পাশ করেছে—বিশপঁচিশ বছর বয়স ত হয়েছেই! হিন্দুমতে!"

শ্যামাচরণ। উনিশ কুড়ি হ'তে পারে। তা কলকেতায় বড় লোকের ঘর—হিন্দু খৃষ্টান বেহ্মজ্ঞানী ও সব সমান! সেখানে কি বিচের কিছু আছে?

যদুনাথ। দুর্গা বল! দুর্গা বল! ঘোর কলি তবে উপস্থিত!

কাশী ভট্টাচার্য্য। তা হিন্দু মতে কি ক'রে বিয়ে হ'ল? তুমি গেলে না, বরকর্ত্তা—

দীননাথ। আর বর কর্ত্তা! "বর কর্ত্তা হ'ল বর, কন্যাকর্ত্তা কনে!"—আর কাউকে লাগে না হে—এ সব বিয়েতে ভটচাজ্, অমনিই হ'য়ে যায়!

কালী ভট্টাচার্য্য। তা হ'লে ত আর হিন্দুমতের বিয়ে হ'ল না! নান্দীমুখ হবে, পুরুত চাই, নাপিত চাই—

কেদার। পুরুত নাপিত পয়সা দিলে ক'লকেতায়ই ঢের মেলে হে। তবে নান্দীমুখটা—হাঁ, শ্যাম দা নান্দীমুখ কে ক'ল্লে?

শ্যামাচরণ। আমাকে লিখেছিল, তা আমি ত গেলাম না, নিজেই বোধ হয় ক'রেছে। বাপ নাই, অধিকারী ত সেই।

কালী। তা বটে—তা বটে—নান্দীমুখের অধিকারী ত সেই বটে! তুমি হ'তে তার প্রতিনিধি।

যদুনাথ। বলি, বিয়ে কি সত্যি হ'য়ে গেছে শ্যাম!

ভবভাবিনী প্রাঙ্গন হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"ওমা, বিয়ে হ'য়েছে বইকি? নইলে বাড়ীতে অমন মড়াকান্না উঠল? মাগী যে সেই সকাল থেকে কেঁদে গড়াগড়ি যাচ্ছে! আমাদের সেজবউ গিয়ে দুটি রেঁধে দিলে, তবে সবার পেটে অন্নজল প'ল।"

যদুনাথ। হরি বোল! হরি বোল! হুঁ—! তা ভেবে আর কি করবে শ্যাম? তোমার অদেষ্টে নেই ওকে দিয়ে হিত কিছু হবে, কি ক'রবে?

কালী ভট্টাচার্য্য। তা শ্যামাচরণেরই বা দুঃখ এমন কিসের?—জমাজমি কিছু আছে—নিজের হাতেও দু পয়সা আছে—দর্শক্রিয়ান্বিত গৃহস্থ—দিন ত যাচ্ছেই চলে।

মহানন্দ। তা ত যাচ্ছেই। তবু বঙ্কু যদি দুপয়সা আরও আনত—

শ্যামাচরণ। যাক্—যাক্! সে কথা আর এখন ভাবা মিছে। সে বেঁচে থাক্, সুখে থাক্, সেই এখন ভাল।

ভবভাবিনী!—তাও হ'লে ত! বি এ পাশ করা বিবি মাগ ঘরে, সাজপোষাকেই যে ফতুর ক'রে দেবে! ওরা নাকি বেলায় বেলায় পোষাক বদ্‌লায়। বাজারে গিয়ে দামী দামী সব কাপড় নিজেরাই কিনে আনে,—মিন্সেদের গলা ধ'রে নাচে! ব'তনে সেদিন সেজবউএর কাছে গল্প কচ্ছিল শুন্‌লাম—"

দিগম্বরী। নাচে! ওমা, বলিস্ কিলো ভবী! তারা কি খ্যামটাউলী নাকি?

ভবভাবিনী। খ্যামটাউলী ত ভাল। নিজেরাই নাচে—মিন্সেরা বসে দেখে! এরা, কি জানিস্, মিন্সে-মাগীতে মিলে গলাগলি ধ'রে ধেই ধেই ক'রে লাফাতে থাকে—একেবারে কালী নাচ লো! আর ওই চ'ত পুজোয় বাউলেরা যেম্‌নি ক'রে ধিঙ্গি নাচ নাচে, বিলিতী মেমগুলো ত শুনেছি—এমনি নাচে। তা তুই না ব'ল্লি—তাদের মত নিকেও ওরা করে,—তা নিকে যদি করে, তবে কি আর নাচে না?

দিগম্বরী। ওমা, তা ত নাচ্‌বেই! নিকে ক'র্‌বে, আর নাচ্‌বে না?—তা চ' যাই ভবী, বেলা গেছে, কাপড় কেচে গে আসি। এস না জগীদি? হাঁ করে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছ কি?—কাপড় কাচ্‌তে যাবে না?—

"চ' যাই। হুঁ—বঙ্কু অমন ছেলে—শেষে এই ক'ল্লে! গুরুঃ! তুমি যা কর!"

তিনজনে সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন!

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—আর সকলেও একে একে দুইয়ে দুইয়ে তিনে তিনে—যেমন আসিয়াছিলেন, চলিয়া গেলেন। শ্যামাচরণ তখন আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ধীরে ধীরে হুঁকাটি টানিতে টানিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

২

"শুনেছ গিন্নী! আর এক বিপদ উপস্থিত।"

গিন্নী অর্থাৎ শ্যামাচরণের সহধর্ম্মিণী ত্রিপুরাসুন্দরী কহিলেন, "ওমা, কি বিপদ আবার! ষাট, বঙ্কু আমার ভাল আছে ত?"

"ভাল ত আছে—বউ নিয়ে দেশে আস্‌ছে যে!"

"বউ নিয়ে—দেশে—আস্‌ছে—। ওমা, কি সর্ব্বনাশ! কি হবে এখন!"

"তাই ত ভাব্‌ছি! এখন কি উপায় করি বলত গিন্নী?"

"তাই ত—কি করা যায় এখন! কোথায় থাক্‌তে দেব? কি খাবে? ওরা নাকি খানা খায়—সে সব নাম ক'ত্তেও নেই! চৌকিতে ব'সে—টেব্‌লি না কি বলে—কাঠের মাচার মত—ঐ যে গো ইস্কুলে ঘরে ঘরে থাকে—দেখনি? তারির ওপর সান্‌কী রেখে খানা খায়—ছুরী কাঁটা চাম্‌চে দিয়ে! ওমা—কি করে তা খায় গো! আমি ত ভেবেই কূল পাইনে। মুখ কেটে ফুটেও যায় না!—আঁচায়

না, হাত ধোয় না—ওমা, সব যে সকড়ী দিয়ে একাকার ক'রবে গো! তাইত—তাইত—! কি হবে এখন আর সেই টেব্‌লি সাব্‌কী ছুরী কাঁটা চাম্‌চে—তাই বা কোথায় পাব? তাইত—তাইত—! কি বিপদই যে হল! তা খানা খাবে—ওমা, কি ঘেন্না! হিন্দুর ঘর—কি ক'র্‌বে এখন গো! ভাবছ কিছু?

"তাইত—তাইত! কি ভাবব, কি ভাবতে বল গিন্নী! আবার জাত যাবে যে! হিন্দু ব'ল্লে কি হয়? আগা গোড়া সব খৃষ্টানী! দেশের লোকে কি আর তাই ক্ষ্যামা দেবে?"

"তা তাদের সঙ্গে কি আর আমরা খাব, না এক ঘরে থাক্‌ব? বাড়ীতে মোছলমান চাকরবাকরও ত থাকে। তবে তারা বাইরের ঘরে ছুটি রেঁধে খায়;—কোনও বালাই নেই। এরা হ'ল সাহেব—সেই মেমসাহেবের মত ঘাঘরা-পরা বউ—ওমা, কি হবে এখন! কোথায় থাক্‌তে দেব! কি খেতে দেব? হাঁ গা, সেই ত বন্ধু, বিলেত থেকে ফিরেও ত দেশে এসেছিল, তেম্‌নিই ত দেখ্‌লাম। মনেই ত হয়নি কখনও সে বিলেত গেছ্‌ল!"

"বিএ পাশ করা বিবি বউ যে বিয়ে ক'রেছে!"

"হুঁ—তাইত—তাইত! কি ক'রে সেটা কল্লে! কেমনই বা সে বউ? আচ্ছা—বন্ধু—না! সে ত তেমন ছেলেই নয়। একটু বেয়াড়া চাল তার দেখিনি! কদিন ছিল, গায় একটি জামা কখনও দেয়নি। ঠাকুর ঘরের দোরে এসে গড় হ'য়ে পেন্নাম ক'ল্লে!—তাইত—তাইত! আচ্ছা—এও ত হতে পারে—বউটি আমাদেরই বউটির মত হয় ত—"

"পাগল! তাও কি হয়? বি, এ, পাশ ক'রেছে?"

"তা আমার বন্ধুও ত বিলেতে গেছে। সে ত সাহেব হ'য়ে যায়নি, ঠিক আমাদের ঘরের ছেলেটির মতই আছে। তা বউটি বি, এ, পাশ ক'রেছে ব'লেই কি—"

"ও রকম না হয়ে যায় না। তুমি জাননা তাই ব'লছ।"

"তাহ'লে বন্ধু কেন বিয়ে ক'ল্লে?"

"তাই ত আশ্চয্যি হ'চ্ছি! তা লেখাপড়াজানা চালাক চতুর মেয়ে—বয়েসও হ'য়েছে—গান বাজনা করে—নাচেও বইকি? তা ব্যাটাছেলের মন—বয়েসের কাল—"

উহুঁ—বন্ধু আমার তেমন ছেলেই নয়! তা কবে আস্‌বে লিখেছে?"

"কাল সকালেই যে। আটটার গাড়ীতে এসে পৌঁছবে।"

"তাহ'লে ইষ্টিশানে লোক পাঠাতে ত হয়। কে যাবে? তুমিই যাও না?"

"ও বাবা! আমি তা পার্‌ব না গিন্নী। আদবকায়দা কিছু জানিনে—ওই বিবি বউ!"

"আচ্ছা, তবে ও বাড়ীর য'ত্‌নেকে পাঠিয়ে দেব 'খন। হাজার হ'ক্‌, বউ নিয়ে আস্‌ছে—ইষ্টিশানে কারও যেতে হয় বইকি? হাঁগা, নতুন বউ আস্‌ছে—আলপনা দেব নাকি? বাজনা টাজনা নিয়ে পাল্কী করে—"

"বল কি গিন্নী! পাগল হ'লে নাকি? জুতো পায় দিয়ে হয়ত বন্ধুর হাত ধ'রেই খটমট ক'রে এসে উপস্থিত হবে! ঘোমটা দিয়ে তোমার আলপনার ওপরে দুধে আল্‌তায় দাঁড়াবে কিনা? পাগল—পাগল! পাগল আর কাকে বলে?"

(৩)

পরদিন—বেলা তখন প্রায় ৯টা। ত্রিপুরাসুন্দরী কম্পিতদেহে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন—কখন কি ভাবের এক বউ বা বিবি লইয়া বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হয়! কি তিনি বলিবেন, কোথায় বসিতে দিবেন, কি খাইতে দিবেন, ভাবিয়া কিছুই কুল পাইতেছিলেন না। শ্যামাচরণ রাত্রিপ্রভাতেই কোথায় গিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। খোঁজখবর আর তাঁহার নাই। কিন্তু তিনি ত ঘরের দরজায় কুলুপ দিয়া কোথাও গিয়া লুকাইতে পারেন না? ষাট, বন্ধু আসিতেছে যে! ঘরের ছেলে—তাও কি তিনি কখনও পারেন। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা উঁকি দিয়া দিয়া এক একবার দেখিয়া যাইতেছে, ভয়ে কাছে কেহ ঘেঁসিতেছে না। দুটি কথা কাহারও সঙ্গে বলিয়াও যে মনের এই বিষম ভার তিনি একটু হাল্‌কা করিবেন, তারও কোনও সুযোগ ছিল না। যাহা হউক, একাই তিনি দুঃসাহসী বীরের ন্যায় অরাতির আগমন প্রতীক্ষায় দুর্গদ্বারে বসিয়া রহিলেন!

একটি ঝি—আর তার পশ্চাতে লালপেড়ে সাড়ী পরা ঘোমটায় মুখখানি ঢাকা বয়স্থা একটি বধূ—গৃহ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এই যে আমরা এলুমগো মাঠাকরুণ! তা কই, কোনও উদ্‌যোগ আয়োজন কিছু দেখছি না যে—"

বিস্মিতা ত্রিপুরাসুন্দরী উত্তর করিলেন, "কিসের উদ্‌যোগ আয়োজন গা! তোমরা কে? কোত্থেকে আস্‌ছ?"

ঝি।—ওমা কিচ্ছু জান না কি? তাইত বলি—কেন বাবু চিঠি লিখেছিলেন পাওনি?

ত্রিপুরা।—বাবু! কে বাবু? কোত্থেকে তোমরা আস্‌ছ গা?

ঝি।—এই ত ক'লকেতা থেকে আস্‌ছিগো! তোমাদেরই ছেলে বঙ্কু বাবু—

ত্রিপুরা।—বঙ্কু! ওমা তাইত!—তোমরা—তা বউ কোথা গো?

ঝি।—ওমা, এই ত বউ! তোমরা বাদ্যিবাজনা পাঠালে না, পাল্কী পাঠালে না, তাইত হাঁটিয়েই অম্‌নি নিয়ে এসেছি গো! এই দেখ না

ঝি একহাতে বধূবেশা যুবতীর ঘোমটাটি তুলিয়া আর একহাতে দাঁড়ি ধরিয়া তার মুখখানি উঁচু করিয়া ধরিল—বড় সুন্দর মুখখানি! হাসিয়া বধূ মুখ নত করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

"এই—বউ! ওমা— !" হা করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঝি কহিল, "ওমা, এই ত বউ! বউ ত রকমই হয়? তোমরা কি ভেবেছিলে গা?"

তাই ত! তিনি ত সত্যই বলিয়াছিলেন, সেই তাঁদের বঙ্কু—সে কি একটা আস্ত বিবি বিবাহ করিতে পারে? এ ত বউই বটে! আহা, কি চাঁদের মত মুখখানি গা! আর তিনি আভাগী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, বউটিকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া নিলেন না!

সহসা উন্মত্তার ন্যায় ত্রিপুরাসুন্দরী ছুই লাফে আসিয়া উঠানে নামিলেন। বধূকে বুকে টানিয়া নিয়া কহিলেন, "এস—এস! মা আমার—ঘরের লক্ষ্মী আমার—ঘরে এস! তাই ত বলি, বঙ্কু কি আমার তেমন বউ আন্‌বে!—উলু! উলু! উলু!—ওগো, তোমরা সবাই এস গো!—ভয় নেই ভয় নেই! বিবি নয় গো—বউ। এস—এস! আমি আবাগী বুঝিনি—একটু আল্‌পনা দিইনি, বরণডালা সাজাইনি,—তা যাক্‌গে, তোমরা সবাই এসগো! ওগো, এস এস! উলু দেও—শাঁখ বাজাও—আমি বউ ঘরে তুলে নিই!—উলু!—উলু! উলু!"

প্রতিবেশিনীরাও হুলুধ্বনি করিতে করিতে সকলে ছুটিয়া আসিলেন—কেহ কেহ ঘরে গিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া শাঁখ বাজাইলেন! বঙ্কুও আসিয়া তখন খুড়ীমাকে আর অন্যান্য গুরুবী প্রতিবেশিনীদিগকে প্রণাম করিল। খালি উঠানে এই হুলু শঙ্খধ্বনির মধ্যে শুধু হাতেই ছেলেবউ বরণ করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী ঘরে নিয়া গেলেন!

(৪)

বউটির নাম কমলিনী, পুকুরঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল। প্রতিবেশিনী এক ননন্দা চারুবালা কমলিনীর সঙ্গে কিছু বেশী আলাপ করিয়া নিয়াছিল। চারুবালার ভালঘরে বিবাহ হইয়াছিল, শ্বশুর বড় এক সহরে থাকেন। কিছু বাঙ্গালা লেখাপড়া সে শিখিয়াছিল, মাসিকপত্রাদি আর নাটক নভেল খুব পড়িয়াছে। ইংরাজিতেও এক দেবরের সাহায্যে ফাষ্টবুক সারিয়া সেকেণ্ডবুক ধরিয়াছে! বিদুষী বলিয়া কিছু গর্ব্ব তাহার ছিল,—তাই সাহস করিয়া সেই কমলিনীর সঙ্গে একটু মিশিত, বেশী আলাপ সালাপ করিত। আর সকলে আসিত যাইত, চাহিয়া চাহিয়া অবাক্ হইয়া দেখিত, কাছে বসিয়া কথা বলিতে ভরসা বড় পাইত না। বি এ পাশ করা, বিবি সাজের বিবি ঢঙ্গের কোনও মেয়ের কাছে আসিয়া হয়ত তারা বসিত, সসম্ভ্রমে হইলেও দুটি কথা হয়ত বলিত, এটা ওটা হয়ত জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু বিএ পাশ করা, আবার ঘোমটাপরা বউ—এ যেন জাব যে কেমন হইতে পারে, সেটা তারা হৃদয়ঙ্গম করিতেই বোধ হয় পারিত না। তবে চারুবালা নাকি লেখাপড়া জানা মেয়ে, সহরে থাকে, শ্বশুর বড়লোক, ভাতার একেলে বাবু, তার সাহস কিছু বেশী!

যাহা হউক, এই চারুবালা দৈবাৎ পুকুরঘাটে আসিয়া দেখিল, কমলিনী বাসন মাজিতেছে! দেখিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল! বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে গালে হাত দিয়া কহিল, "ওমা এ কি গো! তুমি বাসন মাজ্‌ছ! এই পুকুর ঘাটে ব'সে! অবাক্ কল্লে যে ভাই?"

কমলিনী হাসিয়া কহিল, "তা, কোথায় যাব বাসন মাজতে? পুকুরঘাটে ছাড়া জল এখানে কোথায় আর পাব?"

"জলের কথা ত হচ্ছে না! তা তুমি বাসন মাজছ"

"কে মাজবে তবে?"

"তাই ত—তাই ত!"—চারুবালা কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না,—শেষে কি মনে করিয়া বলিল, "কেন, তোমাদের ঝি—"

"ঝির অসুখ ক'রেছে।"

"অ—সুখ—করেছে!" তা—

"আর ত খুড়ীমা আছেন। তা তিনি এসে বাসন মাজ্‌বেন আর আমি বউ ঘরে বসে থাক্‌ব, তাও কি হয় ভাই?"

"তাই ত ভাই, তুমি যে অবাক্ কল্লে একেবারে! আমরা ত এমনটা ভাব্‌তেই পারিনি।"

"কি ভাব্‌তে পারনি? বউ এসে বাসন মাজ্‌বে—এটা কি এমনই অভাবনার একটা কথা?"

"বউ!—তা ভাই তুমি—"

"কেন, আমি কি বউ নই?"

"তা ভাই যাই বল, এতটা আমরা কেউ সত্যি ভাব্‌তে পারিনি।—তুমি কলেজে প'ড়েছ—বিএ পাশ ক'রেছ—"

"তা না হয় ক'রেইছি। তাতে বাসন মাজ্‌তে এমন মানা কি আছে?"

"কি জানি ভাই—এ ত—শুনিওনি কখনও। বিএ পাশ—"

"হাঁ ভাই, তোমাদের ছেলে কি বিএ পাশ কেউ করেনি?"

"তা ক'র্‌বে না কেন? তা ক'র্‌বে না কেন? কত বিএ পাশ করা ছেলে আছে—"

"তারা কি ক'রে?"

"ক—রে—তা যে যা পারে করে, কেউ এমে পড়ে, কেউ মাষ্টারী করে—কেউ—"

"বাড়ী ঘরে থাকে ত?"

"যারা থাকে—থাকে। কেউ কেউ ক'ল্‌কেতায় পড়ে—"

"ছুটিতে ত বাড়ী ঘরে আসে?"

"ও মা, তা আসে বই কি!—ও গাঁয়ে ইস্কুল আছে, যোগীন দা, ও পাড়ার নেতা মামা, সেখানে মাষ্টারী করে। তারা ত বাড়ীতেই থাকে।"

কমলিনী কহিল, "তা এঁরা কি হাটবাজার করেন না? কি আর কোনও কাজকর্ম যদি দরকার কিছু হয়—তা করেন না?"

"ওমা, তা করে বই কি? বড়মানুষ ত এমন কেউ নয়। যা দরকার সবই কত্তে হয়।"

"তবে আমার বাসন মাজা দরকার হ'লে কেন তা ক'রব না?"

"তা ভাই, তারা হ'ল ব্যাটাছেলে—"

"তা আমরা মেয়ে ব'লেই এত বাবু কেন হ'তে যাব? তাদের কাজ যদি তারা ক'ত্তে পারে, আমাদের কাজ আমরা কেন ক'ত্তে পারব না?"

"তা ত বটেই—তা ত বটেই। তবে কিনা—মেয়ে যারা কলেজে পড়েছে—আবার বিএ পাশ করেছে—তারা কি আর—"

"কি? পাড়াগেঁয়ে বউ হ'য়ে থাক্‌তে পারে না? গেরস্তর কাজ কম্ম ক'ত্তে পারে না?"

"তা—ভাই—যাইবল—তুমি একেবারে নতুন ধাঁচের মেয়ে—"

"নতুন কিছুই নয় ভাই। যারা পারে না, তারাই বরং নতুন। ছেলেরা ত কত বিএ এমে পাশ করে, তারা কি সব সাহেব হয়? আমরাই বা বিবি হব কেন? তারা যদি এদেশের গেরস্ত হ'য়ে বেশ থাক্‌তে পারে—আর পারবেনা কেন? আমরাই বা তা পারব না কেন? না পার্‌লে চ'ল্‌বেই বা কেন? যে না পারে, মিথ্যেই সে লেখা পড়া শিখেছে।"

চারুবালা অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে কেমন একটা লজ্জাও তার হইল। ছি! কতটুকুই আর লেখাপড়া সে শিখিয়াছে? আর এ বিএ পাশ করা—তবু ত দিব্য বউটি! আর সত্যই ত? কেন হইবে না? এদেশের মেয়েরা—বিয়ের পরে বউই ত সকলকে হইতে হয়। বিএ পাশ করিয়াছে বলিয়া কি দেশছাড়া হইবে? ছেলেদের ত হয় না। মেয়েদের কেন হইবে? হউক না বিএ, বউকে বউই হইতে হইবে!—হাঁ, বিএ বউ ঠিক কথাই বলিয়াছে!

সম্পূর্ণ।

(মালঞ্চে প্রকাশার্থ)

(১)

পুত্র বলিল, "বাবা, যদি আমি তোমার একটা টাকা বাঁচিয়ে দি' তা'হলে কি তোমার আহ্লাদ হয় না ?"

পিতা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" পুত্র বলিল, "ও, সে আমি ঠিক বাঁচিয়েছি, সেই তুমি বলেছিলে যে যদি আমি ইস্কুল থেকে ভাল Report আনতে পারি তা'হলে তুমি আমাকে একটা টাকা দেবে। কিন্তু আমি তা' আনি নি ; আনবার চেষ্টাও কর্‌বো না।"

(২)

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রুদ্ধভাবে কয়েদীকে কহিলেন, "আমি কি তোমাকে গতবারে বলি নাই যে, আমি তোমাকে পুনরায় আমার সম্মুখে দেখিতে চাই না।"

কয়েদী করযোড়ে বলিল, "হাঁ প্রভু, আপনি ত'া বলেছেলেন বই কি। আমিও পুলিশকে বল্লুম যে আমায় ছেড়ে দে ; সাহেব আর আমাকে দেখতে চান না। কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়লে না। কি করি বলুন !

(৩)

"হাঁ্যা হে রাম, তোমার ছেলে আজকাল কি কচ্ছে ?"

রামবাবু বলিলেন, "সে আজকাল শিরীষের কারখানায় কাজ কচ্ছে।"

ভদ্রলোকটি কহিলেন, "ওহে খবর নাও ; এতদিনে বোধ হয় জুড়ে গেছে।"

(৪)

একটা অতিস্থূলকায় ব্যক্তি অতি কষ্টে একটা বাড়ীর দরজায় প্রবেশ করিতেছিলেন। পার্শ্বস্থ একটা ক্ষীণকায় ব্যক্তি তাহা দেখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "বাবা! লোকটা কি মোটা !"

ক্ষীণকায় ব্যক্তিটার পায়ে একটা 'গোদ' ছিল। মোটা লোকটা তাহার অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইয়া পিছন ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিল, "মশাই, যে ভিৎ গেড়েছেন, ওর গাঁথুনি তুল্লে আমাকেও ছাপিয়ে যাবেন।"

সংগ্রহ বৈচিত্র্য

পার্লামেণ্টের 'হাউস অফ কমন্‌সে' হাততালি নিষিদ্ধ।

* * * * *

মাদী কুকুর প্রায়ই পাগল হয় না। পাগল হয় মদ্দা কুকুর।

* * * * *

সারাগোটা সমুদ্রের আগাছা এত বেশী ঘন যে, তাহাতে বৃহত্তম জাহাজ চালনাতেও বাধা উপস্থিত হয়।

খালি আকগাছ হইতে নয়—এমন ১২০টি বিভিন্ন উদ্ভিদ আছে। যাহাদের ভিতর হইতে চিনি পাওয়া যায়।

* * * * *

বজ্রের বর্ণবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে। যেমন সাদার চেয়ে কালো রঙের কোন কিছুর উপরেই বাজ পড়িবার সম্ভাবনা বেশী।

হিন্দুস্থান।

স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র

[জাষ্টিস শ্রীযুত উড্রুফ্ সাহেবের বক্তৃতা অবলম্বনে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ জ্ঞানপ্রচার সমিতির অধিবেশনে পঠিত।]

(শেষাংশ)

গতবারে আমরা শব্দের গোড়ার কথা কতকপরিমাণে আলোচনা করিয়াছি। শব্দের দিক্ হইতে দেখিতে যাইয়া আমরা আমাদের জগৎ প্রত্যয়ের (experence of the world এর) পাঁচটা থাক্ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি—অশব্দ, পরশব্দ, শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্ম শব্দ এবং স্থূল শব্দ। শেষ তিনটাকে আমরা জড়াইয়া অপরশব্দ সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। সম্মুখে বিশাল জলরাশি। জলে যদি চাঞ্চল্যের লেশ না থাকে, জলরাশি যদি একখানা স্ফটিক দর্পণের মত সম্মুখে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার অবস্থা অশব্দের অবস্থা। জলে চাঞ্চল্য জাগিয়াছে, তরঙ্গগুলি ছুটাছুটি করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে উঠিতেছে; ইহাই হইল পরশব্দের অবস্থা। আমি বা অপর কেহ সে ঊর্ম্মিচাঞ্চল্য শুনিবার জন্য উপস্থিত না থাকিলেও তাহা পরশব্দ। কারণ, আমরা স্পন্দ বা চাঞ্চল্য মাত্রকেই পরশব্দ বলিব, এইরূপ পরামর্শ করিয়া লইয়াছি, সে চাঞ্চল্য শ্রবণযোগ্য ও শ্রুত হউক আর নাই হউক। তারপর, স্বয়ং প্রজাপতি মহাশয় তাঁহার কর্ণে, অর্থাৎ নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য দ্বারা, জলরাশির সেই চাঞ্চল্য শুনিলেন; অবশ্য এমনভাবে শুনিলেন যার চেয়ে বেশী ও খাঁটিভাবে শোনা আর হইতে পারে না। ইহাই হইল শব্দতন্মাত্র—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, তরঙ্গচাঞ্চল্যের বিশুদ্ধ, অবিকৃত বাণীমূর্ত্তি। ইহাই শব্দের প্রকৃতি ও আদর্শ (stand ard)। ঢেউগুলি যতই ছোট হউক না কেন, চাঞ্চল্য যতই মৃদু হউক না কেন, এমন কি বাহিরে স্পষ্টতঃ কোনও-রূপ চাঞ্চল্য না থাকিয়া যদি শুধু অণু পরমাণু ইলেক্‌ট্রন্-গুলারই চাঞ্চল্য থাকে, তবুও তাহা প্রজাপতির কর্ণের নিকট পাশাইয়া যাইবে না; কারণ, আমাদের সংজ্ঞা-মত সে কর্ণ যে শ্রবণশক্তির পরাকাষ্ঠা, নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য। যিনি কল্পিত পরাকাষ্ঠা বলিতে চাহেন তিনি তাহাই বলিয়া তৃপ্ত হউন। পক্ষান্তরে, চাঞ্চল্য যতই বিরাট্, বিপুল হউক না কেন, তাহাও প্রজাপতি শব্দরূপে শুনিতেছেন। কোনও স্পন্দ তোমার আমার শ্রবণযোগ্য হইতে হইলে একটা অধঃ-রেখা এবং একটা ঊর্দ্ধরেখার মাঝের কোনও অবস্থায় তাহাকে থাকিতে হইবে। সূক্ষ্মতার একটা সীমা অতিক্রম করিয়া যাইলে সেটা আর আমাদের শ্রবণযোগ্য হইবে না; আবার বিপুলতার একটা সীমা লঙ্ঘন করিলেও সে আমা-দের কাণে শব্দরূপে ধরা পড়িবে না। প্রজাপতির বেলায় এইরূপ কোন সীমারেখা নাই। এ প্রকার শ্রবণসামর্থ্যের কথা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। যেখানে ধাপের উপর ধাপ, থাকের উপর থাক্ দেখিতে পাই, সেখানেই একটা পরাকাষ্ঠার কথা চরমের কথা আমরা ভাবিয়া লইতে পারি; সেই পরাকাষ্ঠার ভূমিই প্রাজাপত্য পদবী—ঐশ্বর্য্য; যোগশাস্ত্র যাহার লক্ষণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্।"

সে যাহাই হউক, এখন অগস্ত্য যদি এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিবার সঙ্কল্প করিয়া আমাদের সিন্ধুতটে গিয়া উপস্থিত হন, তবে তিনি তাঁহার দিব্যকর্ণে প্রশান্ত সাগরের এত মৃদু স্পন্দগুলির ভাষা শুনিবেন, যেগুলি তোমা আমার ভৌতিক কর্ণে আদৌ কোন সাড়া দেয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও বৈজ্ঞানিক যোগীরা তাঁহাদের যন্ত্ররূপ দিব্যকর্ণের সাহায্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট জিনিষের স্পন্দগুলিকে ধ্বনিরূপে ধরিয়া ফেলিতেছেন, সেগুলির ভাষা যে এমনভাবে কোন কালে আমরা শুনিতে পাইব, তাহা পূর্ব্বে কল্পনায় আনিতেও সাহস করিতাম না। এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা ফেলিয়া দিলেই টেলিফোঁ নামক যন্ত্রের নলটি কাণের সন্নিকটে আনিয়া তাহাকে দিব্যকর্ণ বানাইয়া লইতে পারিব, এবং সেই দিব্য-কর্ণের সাহায্যে, তুমি কাশীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে, আমি এই তত্ত্ববিদ্যাসমিতির গৃহে বসিয়া ধ্যানস্থ (clairvoy-ant) না হইয়াই তাহা অবিকল শুনিতে পাইব। তত্ত্ব-বিদ্যার অনুশীলকেরা ধ্যানধারণাপ্রসাদাৎ সে কাজ বে-খরচায় হাঁসিল করিয়া ফেলিতে পারেন; সুতরাং তাঁহাদের আর এখানে খরচা করিয়া টেলিফোঁর বন্দোবস্ত করিতে

হয় নাই। তবে আবার, বিজ্ঞানও বোধ হয় তত্ত্ববিদ্যার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই চলিতেছে। টেলিফোঁ'এ তোমার ও আমার মধ্যে তার টাঙ্গাইয়া লইতে হয়। তাহাতে হাঙ্গামা অনেক, খরচ বিস্তর। আমাকে যে পরিমাণে জড়ের সহায়তা লইয়া অভিলাষ পূরণ করিতে হইবে, সেই পরিমাণে জড়ের কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া তার গোলামী করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলাম আর কাজ হইল—এমনটা হইবে না; কাজ করিতে গেলে বাহিরের যে পাঁচটা জিনিষের উপর আমাকে নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের রীতি-মত ভাবে যোগাযোগ করিয়া লইতে হইবে। এই জন্য বৈজ্ঞানিকের টেলিফোঁ আমার অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও আমায় স্বাধীন করিয়া দিতে পারে না। শুধু টেলিফোঁ কেন, বৈজ্ঞানিকের অনেক আয়োজনই আমাকে গোলাম করিয়া রাখিতেছে—বাহিরটার কাছে, পরের কাছে। দেওয়ালে ঐ বোতামটা টিপিলাম আর মাথার উপর সুরক্ষিত কাচপুরীর ভিতর কেমন নিমেষে বিজলী বাতি জলিয়া উঠিল। বেশ মজা। কিন্তু যে বিরাট তারের ব্যূহ আমাদের সহরটার মাথার উপর আকাশকে ছাইয়া রাখিয়াছে, অথবা আমাদের পদনিম্নে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর কলেবরে শিরা প্রশিরার মত নিজেকে চালাইয়া দিয়াছে। সেই তারের শৃঙ্খলবিশেষে যদি একটু গোলযোগ বাধিয়া যায়, তবে আমি দেওয়ালে বোতাম টেপা কেন, মাথামুড় খুঁড়িয়া আমার মিয়ত্রমা প্রাপ্তির সম্ভাবনা করিয়া তুলিলেও, আমার ঘরের ভিতরে অন্ধকারের জমাট একটুখানিও ভাঙ্গিবে না। আচার্য্য যামেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞানের মায়াপুরী আমাদের চিনাইয়া দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেটা যে আবার গোলাম-খানাও, এ-কথাটাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। বিজ্ঞানও মর্ম্মে-মর্ম্মে সেটা অনুভব করেন। টেলিফোঁ টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া, বিজ্ঞান, সূক্ষ্ম ও দূরবর্ত্তী স্পন্দগুলিকে ধরিবার আর এক রকম ফন্দি সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আচার্য্য মাক্সওয়েল ও হার্জ। মর্কোনি-নামা পুরোহিতের কর্ম-কুশলতায় সে মন্ত্রের যথাযথ বিনিয়োগ হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমরা পাইয়াছি তারহীন বার্ত্তাবহ। সমুদ্রের গভীর জলে তার (cable) ফেলিয়া রাখিবার আর তেমন দর-কার নাই; লম্বা লম্বা খুঁটি পুঁতিয়া শত শত যোজন তার টাঙ্গাইয়া আর না রাখিলেও খপরের বিনিময় চলিতে পারে। এ দৃষ্টান্তে তারের গোলামী আমাদের কমিল বটে, কিন্তু বাহিরে যে যন্ত্র আমাদের তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইতেছে, সময়ে সময়ে সেটা এমন বিশাল মূর্ত্তিতে দেখা দেয় যে তাহার সম্মুখে আমাদের মত আনাড় ব্যাপারীর প্রাণ বিস্ময়ে ও ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। তারহীন বার্ত্তা যে আমাদের শক্তির বিস্তার বাড়িয়াছে এবং বাহিরের গোলামী অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে বটে, কিন্তু শক্তির পরাকাষ্ঠায় আমরা অবশ্য পৌঁছাই নাই, এবং আমাদের গোলামীও একেবারে অপগত হয় নাই। শক্তির পরাকাষ্ঠা যেখানে তাহাই প্রজাপত্যপদবী; যে ভূমিতে উঠিলে সমস্তই আত্মবশ তাহাই স্বারাজ্যসিদ্ধি। ইহাই লক্ষ্য। বিজ্ঞানও নানা ভুল-ভ্রান্তি, সংশয়-সংস্কারের মধ্য দিয়া এই লক্ষ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। তত্ত্ববিদ্যা ও ভারতবর্ষের অধ্যাত্মশাস্ত্র যদি ঠিক হয়, তবে তাহার অনুশীলনের ফলে মানুষ ঐ লক্ষ্যের দিকে আরও কাছাইয়া আসিতে পারে। যে ঈথারতরঙ্গগুলি তারহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্র (co-herer) পাতিয়া ধরিতেছে, সেগুলি এবং তার চেয়েও সূক্ষ্ম কম্পনগুলি যদি আমরা শুধু ধ্যানেই ধরিয়া ফেলিতে পারি, তবে শক্তির পরাকাষ্ঠার দিকে বেশী অগ্রসর ত হইলামই, অধিকন্তু সে শক্তি, বাহিরের সম্বন্ধে অনেক বেশী নিরপেক্ষ স্বাধীন হইল; দূরের সূক্ষ্ম স্পন্দনগুলি গ্রহণ করিতে, বাহিরে একটা যন্ত্র বানাইয়া পাতিয়া রাখিতে আর হইল না। এই দৃষ্টান্তে সেই পূর্ব্বের কথাটাই পরিষ্কার হইতেছে—দিব্যকর্ণের বা যোগজ শব্দ-প্রত্যক্ষের নানা থাক্ রহিয়াছে: যেমন যন্ত্র তেমন শোনা; আমার যা ধারণা যত গাঢ়, অনুভবও তত গভীর। এই দিব্যকর্ণের চরম পরিণতি পারমার্থিক কর্ণে; সকল যোগজ বিভূতির পূর্ণবিকাশ স্বয়ং যোগেশ্বরে। বলা বাহুল্য তোমার আমার স্থূল কর্ণেরও শব্দ গ্রহণ সামর্থ্যের তারতম্য রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতির জীবের ত কথাই নাই।

জলরাশির দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব প্রবন্ধে ব্যাপারের প্রধান কথা কয়টাই আবার ঝালাইয়া লইলাম। শব্দের পাঁচটা থাক্ এবং শব্দ গ্রহণ সামর্থ্যের তিনটা থাক্, ইহাই একটা প্রধান কথা। আর একটা প্রধান কথা, স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রের লক্ষণ। দ্রব্য একটা শক্তিব্যূহ। সেই শক্তিব্যূহ যে চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা যদি কোনও

নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য দ্বারা শব্দরূপে গৃহীত হয়, তবে সেই শব্দই সে দ্রব্যের স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্র। এরূপ বিশুদ্ধ বীজমন্ত্রের নিজের দ্রব্য বা অর্থ গড়িয়া তুলিবার শক্তিও আছে। আমরা গুরুমুখে বা সাধনায় যে বীজমন্ত্রগুলি পাই, সেগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ। এইরূপ হইবার যে কারণ আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপত পূর্ব্বপ্রবন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমাদের চলিত বীজমন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ নহে বলিয়া তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি (অর্থ গড়িয়া লইবার শক্তি) একপ্রকার সুপ্ত বলিলেই হয়। মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্র-চৈতন্য এবং জপ পুরশ্চারণ প্রভৃতির দ্বারা সে শক্তি ধীরে জাগাইয়া লইতে হয়। দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দেখাইয়া এই কয়টা কথা প্রতিপন্ন করিতে আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রয়াস পাইয়াছি।

জড়জগতের সবিতা গ্রহ-উপগ্রহগুলির আদিম অবস্থা রূপে একটা বিপুল নীহারসমুদ্র কল্পনা করিতে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও ভালবাসেন। ঋষিরাও জগতের (শুধু জড়জগতের নয়) আদি কারণ বা উপাদানকে কারণ সলিল রূপে ভাবিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা আর যাহা হউন আর না-ই হউন, কবি। তাঁহাদের বেদপুরাণগুলি কাব্য সম্পদে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন, এই অপূর্ব্ব চিত্রখানি আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি? কারণ-সলিলে অনন্ত শেষশয্যায় শুইয়া ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন। তাঁহার নাভিকমলে পদ্মাসনে ব্রহ্মা সমাসীন রহিয়াছেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত মধু-কৈটভনামক দৈত্যদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইয়া 'ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ'—ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা বিপন্ন হইয়া যোগনিদ্রার স্তব করিয়া বিষ্ণুকে জাগাইলেন। বিষ্ণু জাগিয়া দৈত্য দু'টার সঙ্গে লড়াই করিলেন। দৈত্যযুগল প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, "আমরা খুসী হইয়াছি; তুমি আমাদের কাছে বর লও।" বিষ্ণু বলিলেন, "তোমরা আমার বধ্য হও।" এ গল্পটার রহস্য কি? আমরা যে শব্দবিজ্ঞানের আলোচনা এই দুইদিন ধরিয়া করিতেছি, তাহারই গোড়ার কথা কয়টি এই গল্পের মধ্যে লুকান রহিয়াছে। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা চৈতন্য। তিনি এক বই, দুই নহেন। কিন্তু এক এক হইয়া থাকিলেও সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির জন্য নিজেকে যেন বিভক্ত করিয়া দুই করিয়া লইতে হয়। তাঁহার এক ভাগ বা দিক (aspect) হইল আধার বস্তু; অপর ভাগ বা দিক্ হইল আধেয় বস্তু। অনন্ত-শেষ-শয্যা এই জাগতিক আধার বস্তুর সঙ্কেত; এবং সে বিরাট্ আধার বস্তু একটা অপরিসীম শক্তিব্যূহ (an infinite system of stresses)। আমরা মনে করি, বুঝিবা এই জলবিন্দুটিকে গোটা দু'চার শক্তি গড়িয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। আমাদের হিসাবের সম্ভাবনা ও সুবিধার জন্য আমাদিগকে ব্যাপারটাকে নিতান্ত ছোট করিয়া দেখিতে হয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে আধার শক্তি জলবিন্দুর অণু-পরমাণু প্রভৃতিকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেটা ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল শক্তিব্যূহ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। জলবিন্দু কি জলবিন্দুরূপে থাকিত, যদি তাহাকে পৃথিবী বাতাসের রেণু প্রভৃতি টানিয়া ও চাপিয়া ও ধরিয়া না রহিত? পৃথিবী ও তার এত সাজ-সরঞ্জাম কি সম্ভাপর হইত, যদি সৌরজগতের ও ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর দ্রব্য তাহাকে টানিয়া ও চাপিয়া ও সামলাইয়া না রহিত? এই প্রকার টানিয়া, চাপিয়া রাখার নাম আমরা এক কথায় দিয়াছি শক্তিব্যূহ (stress)। অতএব জগতে এমন কোনও কিছু ছোট বা অল্প নাই যাহার আধার-শক্তিকে আমরা অনন্ত শেষ শয্যারূপে ভাবিতে না পারি। কারণ, আমরা দেখিতেছি যে, তাহার আধার-শক্তি (constituting forces) নিখিল-শক্তি-ব্যূহের এক তিলও কম নহে। তুমি আমি অল্পই দেখিতে শিখিয়াছি, তাই অল্পর মূলে ও অল্পকে ঘিরিয়া যে ভূমা ও বিরাট রহিয়াছে, তাহাকে সহজে ধরিতে ছুঁইতে পারি না। বিজ্ঞান অনেক মাথা ঘামাইয়া পৃথিবী ও আতাফলের টানাটানির একটা বিবরণ দিল; বিবরণ খাসা হইয়াছে। দেখিয়া আমরা আহ্লাদে আটখানা হইতেছি কিন্তু ভুলিয়া যাই যে শুধু-একটা গণিতের জন্মদাসী আতাফল ও পৃথিবী লইয়াই এ বিশ্বের কাণ্ড-কারখানাটা চলিতেছে না। দুইটা ছাড়িয়া তিনটা জিনিষের টানাটানি বুঝিয়া-পড়িয়া লইতে লাপ্লাসের মত মাথাও ঘুরিয়া যায়; নিখিল শক্তি-ব্যূহের বিবরণ দিবে কে? বিবরণ দিতে পারি আর নাই পারি, তাহাই কিন্তু ছোট, বড়, মাঝারি সকলেরই মূলে; আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে বিষ্ণু আধার-শক্তিরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন; সেই আধার-শক্তির সঙ্কেত অনন্তশয্যা।

তারপর নাভি-কমল। তাহার উপর ব্রহ্মা বসিয়া আছেন। কে ব্রহ্মা? তিনি শব্দপ্রবাহরূপে অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি যাহাকে আধার ও আশ্রয় করিয়া হইতেছে, তিনি সর্বব্যাপী আত্মার অথবা বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যাস্তীর্ণ মূর্ত্তি —সেই নিখিল শক্তিব্যূহ (সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ) যাহার কথা আমরা এতক্ষণ ধরিয়া বলিতেছি। ঘড়ি বাজিয়া উঠিল; এই বাজা ব্যাপারের মূলে ঘড়ির ভিতরকার চাকাগুলির, দোলক প্রভৃতির শক্তিগুলি (forces) রহিয়াছে; শুধু ভিতরকার হিসাব দিয়াই আমাদের রেহাই নাই; বাহিরের তাপ, আলোক, তাড়িত-চৌম্বক-শক্তি ও অপরাপর দ্রব্যের আকর্ষণ, এই বাজা ব্যাপারের পিছনে অবশ্যই রহিয়াছে। তবেই ঘড়ি যখন বাজিতেছে তখনও তাহার মূলে সেই অনন্তদেবই রহিয়াছেন, যাহার সহস্রশীর্ষ সহস্র অক্ষি প্রভৃতি বেদবাণী আমাদের বারবার শুনাইতেছেন। এই দৃষ্টান্ত বুঝিলে আমরা বুঝিব কেন শব্দব্রহ্মরূপ ব্রহ্মাকে অনন্ত-শয্যাস্তীর্ণ বিষ্ণুর নাভিকমলে বসাইয়া রাখা হইল। গল্পটা শুনিতে আজগবি, কিন্তু ইহা সৃষ্টির বা অভিব্যক্তি-প্রবাহের মূল কথাটির দিব্য প্রতীক, এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। নাভি-বিবর হইতে পদ্মমৃণাল উদ্‌গত হইয়া আমাদিগকে ইহাই সঙ্কেতে জানাইতেছে যে, ব্রহ্মা শব্দব্রহ্ম; কারণ সকল-প্রকার শব্দাভিব্যক্তির মূলে যে নাদ বা প্রণবোচ্চার, তাহা ত নাভিস্থানকে বিশেষতঃ আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে। নাদধ্বনি যে নিখিলধ্বনি-বৈচিত্র্যের মূল উৎস। প্রণবের আলোচনাস্থলে এ কথাটা আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ নাভিকমলে শব্দব্রহ্মরূপ ব্রহ্মা কেন বসিলেন তাহার একটা কৈফিয়ৎ আমরা পাইলাম। সর্বব্যাপী আত্মা বা চিবস্তু নিজেকে যেন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগে নিখিল-শক্তিব্যূহ-স্বরূপ আধার বা আশ্রয় হইলেন; অপরভাগে নিখিল-বেদশব্দাত্মক কলেবর ধরিয়া আধেয় বা আশ্রিত হইলেন। শব্দের স্রষ্টৃত্ব আমরা পূর্বেই কয়েকটা দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। শব্দের এই প্রকার সৃষ্টি সামর্থ্য স্মরণ রাখিলে, আমাদের আর গোল হইবে না, কেননা বিষ্ণুর নাভি-পদ্মোপরিস্থিত শব্দব্রহ্মকে সৃষ্টির মালিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার ধ্যানে নিখিল বেদশব্দ আবির্ভূত হয়; সেই বেদশব্দপূর্ব্বক সৃষ্টি হইয়া থাকে—জগৎ সেই শব্দ-প্রভব। বেদশব্দ মানে স্বাভাবিক শব্দ, এটা যেন মনে থাকে; অর্থাৎ কোনও পদার্থের মূলীভূত চাঞ্চল্য পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত হইলে যে বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দ হয়, তাহাই; আমরা যে গুলিকে বেদশব্দ বলিয়া কহিতেছি ও শুনিতেছি, ঠিক সেগুলি নহে। আমাদের প্রাপ্ত (inspired, revealed) শব্দগুলিতেও অল্পবিস্তর বিকৃতি ও সাঙ্কর্য্য হইয়াছে।

ব্রহ্মা শুধু আধার-কমলে বসিয়া আছেন এমন নহে; তাঁহার একটা বাহনও আমরা যুটাইয়া দিয়াছি; সেটা হংস। হংসটা কি? কোনওপ্রকার শব্দ উচ্চারণ ও শ্রবণ করিতে যাইলে প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ (vital functioning) যে আদৌ হয়, সে পক্ষে হালের বিজ্ঞানও আর সন্দেহ রাখে না। সেই প্রাণন ব্যাপারের স্বাভাবিক শব্দ ও বীজমন্ত্র 'হংস'; প্রাণিমাত্রেই, শুধু মানুষে নয়। গম্ভীর রাত্রিতে জাগিয়া স্থির হইয়া বসিয়া শুনিলে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দটাকে মোটামুটি (roughly) 'হংস' বলিয়াই মনে হয়। সাধকের দিব্যকর্ণে প্রাণনক্রিয়ার, যে প্রায় বিশুদ্ধ ধ্বনি (approximate acoustic equivalent) ধরা পড়ে, তাহা যে সত্য সত্যই 'হংস,' সে বিষয়ে শাস্ত্র, গুরু ও মহাজনেরা একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন। হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখার জিনিষ; শুনিয়াই মাথা নাড়িয়া বিশ্বাস অবিশ্বাস প্রকাশ করায় কোনই লাভ নাই। বাহনের পরিচয় ত পাইলাম। বাগ্‌দেবী সরস্বতীর বাহনও হংস এ কথাও আপনারা স্মরণ রাখিবেন। বিরিঞ্চির হস্তে আবার অক্ষসূত্র। ইহা বর্ণমালা অর্থাৎ শব্দসমূহের মৌলিক অংশগুলি (units or elements of sounds)। যথা 'গৌঃ' এই শব্দ গকারৌকার-বিসর্জ্জনীয়াঃ, গ, ঔ, ঃ। মহামেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা, অপর কোন দেবতার গলদেশে ইহাই মুণ্ডমালারূপে দুলিয়াছে। আসলে কিন্তু ইহা মাতৃকা—বর্ণময়ী। কমণ্ডলু চতুরানন প্রভৃতির বিবরণ দিতে যাইলে আমাদের পুঁথি আর শেষ হইবে না। আপাততঃ শব্দের দিক্ হইতে মোটা মোটা আরও দু'টো-একটা কথা আমরা ভাবিয়া দেখিব। নাদধ্বনি প্রধানতঃ নাভিস্থানে উত্তেজনা বিশেষ হইতে সঞ্জাত হয়, এবং বাহন হংস প্রাণন ক্রিয়ার শাব্দিক মূর্ত্তি—এই দুইটি কথা মনে রাখিলে আমাদের আর বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে শব্দব্রহ্ম

অথবা ব্রহ্মা শব্দতন্মাত্রবপুঃ, অর্থাৎ নিরতিশয় ও বিশুদ্ধ শব্দসমষ্টিই ব্রহ্মার কলেবর ; আর, তিনি যাহার উপর আশ্রয় করিয়া এবং যাহাকে বাহন করিয়া রহিয়াছেন, সেই নাভি-কমল ও হংস স্পন্দাত্মক পরশব্দের প্রতিমূর্ত্তি। অতএব স্পন্দাত্মক পরশব্দকে মূল করিয়া শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ ও স্থূল শব্দ এই ত্রিবিধ অপরশব্দের যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছিলাম, তাহার একটা সাঙ্কেতিক বিবরণ symbolic represcnton গল্পটার মধ্যে আমরা পাইলাম। আপাততঃ গল্প বলিয়াই চালাইতেছি, কিন্তু ঠিক গল্প ইহা নহে। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধার আত্মা। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছুর অভিব্যক্তি হইতেছে তাহার মূল বিষ্ণুতে। বিষ্ণুই অভিব্যক্ত হইতেছেন। আমরা যাঁহাকে বিষ্ণু আখ্যা দিতেছি তাঁহাকে বৈজ্ঞানিকের তরফের হার্বার্ট স্পেন্সার হয়ত 'অজ্ঞেয় শক্তি' Inscrutable power) বলিয়া ছাড়িয়া দিবেন। নাম যাহাই দেওয়া হউক, বিষ্ণুই বল আর আত্মশক্তিই বল, এই বিশ্বাভিব্যক্তির মূলে ও অন্তরালে একটা কিছু রহিয়াছে। নিখিল সৃষ্টির সম্ভাবনা, সূচনা ও প্রেরণা তাহারই ভিতরে। সেই বস্তুটি শব্দতন্মাত্ররূপে, শব্দপরাকাষ্ঠারূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন—অর্থাৎ, প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই মূলবস্তু হইতে আবির্ভূত হইতেছেন। সেরূপ আবির্ভাবের জন্য পরশব্দের আবশ্যকতা যে আছে তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু পরশব্দ থাকিলেই হইবে না, ছ'টো একটা বাধা বা অন্তরায় অতিক্রম না করিতে পারিলে সেরূপ অভিব্যক্তি হইবে না। আমি শব্দ শুনিতেছি ; আমার শ্রুত শব্দ নিরতিশয় শব্দ বা শব্দপরাকাষ্ঠা নহে। কেন নয়? পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা শব্দ শোনার যে সমস্ত উপাদান ও নিমিত্তের আলোচনা করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে এই কথাটা পরিষ্কার হইয়াছে যে আমার শোনা শব্দেতে বিকার (deformation ও সঙ্কর (confusion), এই দুইটি দোষ অল্পবিস্তর থাকিবেই।

আমার স্থূল, ভৌতিক কর্ণ অবিকৃত ও অসঙ্কীর্ণ শব্দ গ্রহণ করিতে যোগ্য নয়। আমার ভিতরে যে বিষ্ণু রহিয়াছেন তাঁহার ইহাই কর্ণমল। এই কর্ণমল রহিয়াছে বলিয়া, আমার শ্রবণ-সামর্থ্যের এই ক্রটি ও দোষ রহিয়াছে বলিয়া, আমি নিরতিশয় শব্দ বা স্বাভাবিক শব্দ শুনিনা ; এইজন্য আমার শোনা শব্দ, শব্দতন্মাত্র নহে ; আমার কর্ণ ভৌতিক কর্ণ, পরমার্থিক কর্ণ (absolute ear) নহে। শব্দ শোনার সামর্থ্য আমার মধ্যে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতে পারে নাই ; পারে নাই তার প্রমাণ, আমার কাণে যন্ত্র লাগাইয়া অথবা ধ্যানস্থ হইয়া অনেক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে হয়। অভিব্যক্তির ধারা কোনও একটা বাধাতে ধাক্কা পাইয়া যেন থামিয়া রহিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। সর্ব্বভূতের মধ্যেই অভিব্যক্তির এই দশা দেখি। যতটা অভিব্যক্তি হইলে সম্পূর্ত্তি হয়, পরাকাষ্ঠা হয়, তাহা এখনও কোথাও হইয়াছে দেখি না। কি যেন একটা কি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, ষোল আনা ফুটিয়া উঠিতে দিতেছে না। আমার শ্রবণ সামর্থ্যের এই যে দোষ বা প্রতিবন্ধক তাহাকে কর্ণমল বলিলে, বেশ বলা হয় না কি? বিষ্ণু মানে সর্ব্বব্যাপী ; কাজেই যেখানে কর্ণ বা শ্রবণ-সামর্থ্যের আয়োজন বা ব্যবস্থা, সেইখানেই এই বিষ্ণুকর্ণমল। অর্থাৎ কর্ণমল শুধু তোমার আমার ঘরওয়া কথা নহে, ইহা একটা জাগতিক ব্যবস্থা। তবে তোমার আমার দৃষ্টান্তে মূল তথ্যটি বুঝিবার সুবিধা আমাদের হইতে পারে। এখন, আমি যদি শ্রবণ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইতে চাই, তবে অবশ্য আমাকে কর্ণমল পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, আমার ভৌতিক কর্ণটাকে পারমার্থিক কর্ণ করিয়া লইতে হইবে। কর্ণ নির্ম্মল না হইলে শ্রবণ নিরতিশয় ও বিশুদ্ধ হইবে না। আমরা যে সকল লক্ষণ ও পরিভাষা করিয়া লইয়াছি, তাহাতে, এ সকল কথা বলিয়া আমরা একটা কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছি মাত্র। কর্ণমল বা শ্রবণশক্তিনিষ্ঠ দোষ দুই কারণে হইতে পারে, অথবা তাহার বিবৃতি দুই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। আবরণ ও বিক্ষেপ তমঃ ও রজঃ। শব্দ হইল, অপরে শুনিতে পাইল, আমি পাইলাম না ; এ ক্ষেত্রে কি যেন শব্দটাকে আমার কাছ হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে ; এই আবরণের জন্য বহু সূক্ষ্ম শব্দ আমি শুনি না, অনেক বিপুল শব্দও আমি শুনি না ; দুইটি সীমা রেখার মধ্যে, একটা গণ্ডীর ভিতরে শব্দ আসিয়া হাজির হইলে, তবে আমি তাহাকে শুনিতে পাই। ইহার পরিভাষা করা হউক—তামসিক কর্ণমল। আবার শব্দ শুনিলেও ঠিকভাবে শোনার সম্ভাবনা আমার নাই। একই সময়ে নানা জিনিষের উত্তেজনা নানা শব্দ জন্মাইতেছে। বাগানে বসিয়া রহিয়াছি—কাকের

ডাক, ঝিঁঝিঁর ডাক, চিলের ডাক প্রভৃতি কত শত শব্দ যে মাখামাখি জড়াজড়ি করিয়া আমার কাণে আসিতেছে, তার হিসাব কে দিবে? মোটামুটিভাবে সেগুলিকে আলাদা করিয়া চিনিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে তাহারা মাখামাখি করিয়া, সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, সে পক্ষে আর সন্দেহ থাকে কি? জলে একটা ঢেলা ফেলিলাম; একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হইতে চারিধারে সুশৃঙ্খলার সহিত ঢেউগুলি কেমন ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর একটা ঢেলা ফেলিলাম; নূতন একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হইল, এবং তাহাকে বেড়িয়া আরও এক সার ঢেউ ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পূর্ব্বের ঢেউগুলি তখনও মিলাইয়া যায় নাই। নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সংঘর্ষ হইল, ফলে, নূতন ও পুরাতন উভয়েই নিজস্ব প্রকৃতি ও শৃঙ্খলা হইতে অল্প বিস্তর বিচ্যুত হইল। ইহা তাহাদের সাঙ্কর্য্য interference of waves। আমাদের শ্রুত শব্দগুলির এইরূপই দশা। কোন একটা জিনিষের নিজস্ব প্রকৃতি আমরা শব্দে তাই ধরিতে পারিতেছি না; যেটাকে কোন জিনিষের শব্দ বলিতেছি সেটা নিশ্চয়ই তারই নিজস্ব স্বাভাবিক শব্দ নহে। বিশ্বের হাটে সকলেই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতেছে, এ হট্টগোলের মধ্যে আমার হারানো মামার গলা বাছিয়া লওয়া আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভবই হইয়া পড়িয়াছে। তবে অবশ্য 'অধোর্দ্ধবর্গ-মধ্যস্থ-পুনঃনারায়ন শব্দঃ' মামার ডাক একেবারে যে না শুনিতেছি এমনও নহে; সে ডাক আর পাঁচটা ডাকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে। জগতের নিখিল সামগ্রীর যে ক্ষেত্রে গোলে হরিবোল দিবার ব্যবস্থা, সে ক্ষেত্রে আমি বিশুদ্ধ, ভেজাল শব্দ শুনিতেই বাধ্য। ভেজাল ধরিয়া সংশোধন করিয়া লইবার সামর্থ্য আমার কর্ণের নাই। ইহা কর্ণের আর এক দোষ—ইহার নাম দিই রাজসিক কর্ণমল। এই কর্ণমলের দারুণ শোনা শব্দ-গুলিও গোল পাকাইয়া যাইতেছে—প্রকৃতি বা স্বভাব হইতে বিচ্যুত, বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই দুই প্রকার কর্ণ-মলের একটা মধু, অপরটা কৈটভ; একটা তমঃ, অপরটা রজঃ। এই কর্ণমলের সংস্কার না হইলে, কি আমাতে কি তোমাতে, কি প্রজাপতিতে, পারমার্থিক কর্ণ অথবা শব্দ-গ্রহণ-শক্তি-পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। বিষ্ণু প্রজাপতি বা ব্রহ্মারূপে নিখিল স্বাভাবিক বা দৈবিক শব্দ-রাশি অভিব্যক্ত করিতে যাইতেছেন; সেরূপ অভিব্যক্তি হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই, যতক্ষণ কর্ণমল রহিয়াছে। রূপকচ্ছলে বলা হউক, কথাটা কিন্তু সোজা, এবং কথাটায় আপত্তি করার কিছু নাই। অভিব্যক্তিধারা (stream of evolution) কে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতে হইলে, সকল গণ্ডী, বাধাবাধি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, এ কথা বলিলে উক্তেরই শুধু পুনরুক্তি করা হয় মাত্র। যে নির্ম্মল হইবে তাহাকে ময়লা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এ কথা বলিলে নূতন কোন কথা বলা হয় কি? তুমি জলে ঢেলা ফেলিয়া দিলে, আমাকে তার শব্দ শুনিতে হইলে কাণ হইতে আঙ্গুল সরাইয়া লইতে হইবে। সেইরূপ কারণ-সলিলে যে চাঞ্চল্য, তাহাকে নিরতিশয়ভাবে শুনিবার প্রয়োজন হইলে, শ্রবণসামর্থ্যের কুণ্ঠা ও কৃপণতা অর্থাৎ কর্ণমল থাকিলে ত চলিবে না। এই জন্য প্রাজাপত্য অধিকার নিরুদ্বেগ করিতে হইলে কর্ণমল দূর করাই চাই। এই জন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন মধু কৈটভ 'বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণং উদ্যতৌ'। দৈত্যদ্বয় বিনষ্ট না হইলে অর্থাৎ কর্ণমল বিদূরিত না হইলে, ব্রহ্মার পদবী, অর্থাৎ নিরতিশয়-শ্রবণ-সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ ও চরিতার্থ হইতে পারে না। বিষ্ণুর যোগনিদ্রা না হইলে আবার দৈত্য দুইটার প্রাদুর্ভাব হয় না।

বীজের মধ্যে যাহা প্রসুপ্ত ও প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে তাহা যদি জাগ্রত ও পরিস্ফুট হইয়াই থাকিত, তবে ত বীজ গাছ হইয়াই রহিত। বীজ হইতে ধীরে ধীরে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে ধীরে ধীরে গাছ হইতেছে—এই ক্রমিক ও ধারাবাহিক ব্যাপারটারই তাহা হইলে কোনই অর্থ থাকিত না। অভ্যুদয় বা ক্রমবিকাশ নামক প্রবাহটা তাহা হইলে নিরর্থক হইয়া রহিত। বীজের মধ্যে যে বিষ্ণু রহিয়াছেন, যে বৈষ্ণবী শক্তি রহিয়াছেন, তিনি নিদ্রিত রহিয়াছেন বলিয়াই বীজ আপাততঃ বীজই হইয়া রহিয়াছে; সে শক্তির নিদ্রা, অর্থাৎ মূর্চ্ছিতাবস্থা (potential condition) যেমন যেমন অপগত হইবে, বীজের পাদপরূপে পরিণতিও তেমনি তেমনি প্রকৃত হইতে থাকিবে। এই জন্য সর্ব্বভূতাত্ম-রাত্মা বিষ্ণু না ঘুমাইলেও জাগিলে কোনও জিনিষের বাড়া কমা, উদয় বিলয়ের প্রসঙ্গই অর্থহীন হইয়া পড়ে। জিনিষের হ্রাস বৃদ্ধি মানেই তার ভিতরকার শক্তিব্যূহের বিভিন্ন অবস্থা।

বিশ্বের উদয় বিলয় হইতেছে দেখিয়াই আমরা ভাবিতেছি যে, যে বস্তুটি বিশ্বের বীজ বা মূলরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার একরকম সঙ্কোচ ও বিকাশ যেন আছে। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তি, অথবা নিখিল শক্তির আশ্রয় যে জগন্নিবাস, তাঁহার অনন্ত শক্তিব্যূহ সকল সময়ে ঠিক একভাবে থাকিলে, কোনরূপ চলা-ফেরা, হ্রাস-বৃদ্ধি, উদয়-বিলয় সম্ভবে না. সুতরাং সৃষ্টি অথবা জগৎ বলিলে যাহা বুঝি সেটা আদৌ সম্ভবপর হয় না। এটা বিজ্ঞানের পরিক্ষিত ও স্বীকৃত কথা; দর্শন শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি নহে। বিজ্ঞান যাহাকে কার্য্যকারী শক্তি (Energy) বলেন, তাহার দুইটা অবস্থা আমরা দেখিতে পাই। একটা প্রচ্ছন্নাবস্থা (potential বা static condition); অপরটা উদার বা ব্যক্ত অবস্থা (kinetic condition)। জলের কণিকাগুলি নূতনভাবে বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইলে বরফ হইল; এই অভিনব বিন্যাসের (new configuration এর ফলে বরফের উৎপত্তিতে প্রচুর তাপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে আবার বরফ যখন গলিয়া জল হইতে থাকিবে তখন সব প্রচ্ছন্ন তাপশক্তি হিসাবে ধরা পড়িয়া যাইবে। পুনশ্চ, জল যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখনও ঐ প্রকার প্রচ্ছন্নাবস্থা হয়। জলের ভিতর যে বিষ্ণু রহিয়াছেন তিনি সব সময়ে ঠিক এক অবস্থায় থাকিলে জল জলই রহিয়া যায়, বরফ বা বাষ্প হইতে পারে না। এরূপভাবে দেখিলে, আমার মধ্যেও বিষ্ণু রহিয়াছেন, তোমার মধ্যেও রহিয়াছেন; আমার ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তিনি সব সময়ে ঠিক সমবস্থ হইয়া থাকিলে আমিও সব সময়ে সমানই রহিয়া যাইতাম। আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম সব সময়ে ঠিক একভাবেই হইত। হয় না যে, ইহাতেই বুঝিতেছি, আমার মূলে একটা পরিবর্ত্তনের ও ক্রমিকতার বন্দোবস্ত রহিয়াছে; আমার জ্ঞান ও শক্তি যে অল্প ও সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি, অথবা এই ব্যাপারটাকে বলিতেছি, যে, বিষ্ণু আমার মধ্যে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। আমার অভিভূতাবস্থাটি আমার বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। আমার যে ক্রমিক বিকাশ বা অভ্যুদয় তাহাই আমার বিষ্ণুর জাগরণ। শুধু আমার বেলায় নয়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়া রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই জগৎ, জগৎ। রহিয়াছে বলিয়াই সৃষ্টি হইতেছে, বিকাশ হইতেছে।

এই জাগতিক রহস্য ও সৃষ্টির গোড়ার কথাটি স্মরণ রাখিলে, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ও প্রবোধ, এই পৌরাণিক গল্প শুনিয়া আর হাসিব না। কার্য্যকরী শক্তির (Energyর) ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা শুনিয়া বৈজ্ঞানিক হাসিয়া থাকেন কি?

ঘুমাইয়া থাকিলেই জাগা হয়, জাগিয়া থাকিলেই উঠা হয়। বিষ্ণু কারণসলিলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। ইহা যেন বিশ্বশক্তির একটা মগ্ন ও মুচ্ছিত অবস্থা (static condition) এ ভাবটা সব সময়ে থাকিলে কোনও পরিণতি ও পরিবর্ত্তন সম্ভব থাকে না। যে ধারাটিকে সৃষ্টি বলিতেছি সেটি আর আদৌ চলে না। বিষ্ণু আর ব্রহ্মারূপে, সৃষ্টিকর্ত্তাভাবে দেখা দিতে পারেন না। ব্রহ্মাতে শব্দগ্রহণ সামর্থ্যের যে পরাকাষ্ঠা, নিগূঢ় স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্র শুনিবার ও বলিবার শক্তির যে চরমোৎকর্ষ তাহা সম্ভব না যদি [illegible] নিদ্রা হইতে উঠিত না [illegible] বীজের ব্যক্তাবস্থা [illegible] অনুমান হয়। যোগনিদ্রা হইতেই বর্ণমন্ত্র [illegible], সেই প্রভাতেই মধুকৈটভের আবির্ভাব। [illegible] বলিয়া যোগনিদ্রা ভাঙ্গিলেন— প্রচ্ছন্নকে (p[illegible]) ব্যক্ত (Kinetic) করিয়া লইলেন। যেমনি নাভিপদ্মে কর্ণমল, অমনি [illegible] অজ্ঞতা ও ক্রূরতা, প্রকাশ হইল। মধুকৈটভের সংহার হইল। মধুকৈটভ শব্দের বিকার ও মল। শব্দের বিকার ও মল ঘুচিয়া গেলেই শব্দ বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক হইল। বীজমন্ত্রগুলির উদ্ধার ও চৈতন্য হইল। এইরূপ সমর্থ (dynamic ও creative) বীজমন্ত্রগুলি না পাইলে ত সৃষ্টি হইবে না, ব্রহ্মার অধিকারই সাব্যস্ত হইবে না। মধুকৈটভ [illegible] নিরুদ্ধ ও [illegible] হইলেন।

মধুকৈটভের আখ্যায়িকার ভিতরে [illegible] সব কয়টা আসল কথা পাইলাম ত? আখ্যায়িকাটির এরূপ ব্যাখ্যাই আমরা দিতেছি কেন? কোন আখ্যায়িকার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে বসিয়া প্রথমেই ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, তাহার মধ্যে কোনও নির্দেশক, [illegible] সঙ্কেত, অথবা চিহ্নদর্শন (sign[illegible]) প্রচ্ছন্নভাবে দেওয়া আছে কি না। বর্ত্তমান আখ্যায়িকার সেরূপ সঙ্কেত [illegible]। প্রথম সঙ্কেত ব্রহ্মার [illegible] নিখিল বেদ-শব্দ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। কাজেই ব্রহ্মা শব্দসম্পর্কীয়

শক্তির পরাকাষ্ঠা ; বেদশব্দ মানে বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় শব্দ। এইরূপ শব্দকে, অর্থাৎ বীজমন্ত্রকে, পুরোহিত করিয়াই ব্রহ্মার সৃষ্টিযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না। মধুকৈটভ যে কাহারা তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য অতি স্পষ্ট সঙ্কেত রহিয়াছে—'বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ'। বস্তুতঃ 'কর্ণমল' এই শব্দটিই এ মহারহস্য পেটিকার চাবিকাটি। তার পর ব্রহ্মা যোগনিদ্রার প্রবোধনের জন্য যে স্তব করিলেন, তাহা যে মুখ্যতঃ বাগ্দেবতার শব্দব্রহ্মের স্তব ; ব্রহ্মা শব্দব্রহ্ম হইবার জন্য পরমা বাকের স্তুতি করিতেছেন—সাধক তাঁহার সিদ্ধিকে বরণ করিয়া লইতেছেন। "ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারস্বরাত্মিকা। সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা। অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।" ইত্যাদি স্তব শুনিয়া আর সংশয় থাকে কি, কিসের এ স্তব, কেন এ স্তব ?

সেদিন আমরা গঙ্গার গোলোকধামে উৎপত্তি, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থিতি, হরজটাজালে অবগুণ্ঠন এবং শেষকালে গোমুখীদ্বারে ভূতলে অবতরণ—এই আখ্যায়িকাটিরও শব্দ পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছি। গোলোক ও গোমুখীর 'গো' শব্দ সেখানে আমাদের নির্দ্দেশক (guiding clue) ; আর ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া অগ্রসর হইতে হইতে এই মহারহস্যটিরই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে গঙ্গা বেদশব্দময়ী ; ভগীরথের ঐ শঙ্খধ্বনি ত শব্দসঙ্কেত ; এবং তাহাই গঙ্গা-মাহাত্ম্যের মর্ম্মকথা আমাদিগকে ডাকিয়া শুনাইয়া যাইতেছে। গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে বেদশব্দধারা, বীজমন্ত্র-সমষ্টি কতক কতক তোমার আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে ; কর্ণমলের দরুণ তাহাও বিকৃত ও সঙ্কর অবশ্যই কিছু হইয়াছে ; কিন্তু গুরুশিষ্যের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় না থাকিলে বীজশব্দগুলির যতটা বিকৃতি ও সঙ্কর হইত, সম্প্রদায় থাকায়, ততটা হইতে পারে নাই। আমাদের প্রচলিত শব্দগুলির নানাকারণে বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হওয়ার একটা রোগ আছে। সেদিন চিত্র আঁকিয়া এ রোগের একটা নিদান দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কর্ণমল ও রসনা-মলের মাহাত্ম্যে আমাদের শ্রুত ও উচ্চারিত শব্দগুলি গোল পাকাইয়া ক্রমশঃই ভেজাল ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে। শব্দ যত অস্বাভাবিক হইবে ততই তাহা অশক্ত ও অসমর্থ হইতে থাকিবে। শব্দ লইবে অথচ বিভ্রমের কোনও ঠিকানা থাকিবে না, বকিয়া মরিব কিন্তু অর্থ অদৃষ্টে যুটিবে না। এইরূপ অসমর্থ (uncreative) শব্দ লইয়া জীবন-যাপন যকমারি, সাধন ও সিদ্ধি ত দূরের কথা। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে ভগবান্ যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, একথা তাঁর নিজমুখে শুনিয়াছি। ধর্ম্মের ও সদাচারের একটা আদর্শ (standard) আবার বাহাল করিয়া দিতে, তাঁহার আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ। বিষ্ণু আসিলেন, কিন্তু তাঁহার পাদোদ্ভবা গঙ্গা আসিলেন না, এমনটা হয় না। ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসিলেন বিষ্ণু ; আর শব্দ-বিভ্রাট্ দূর করিয়া স্বাভাবিক ও সমর্থ শব্দসমষ্টির ধারা পুনঃ বহাইয়া দিয়া জীবের স্বর্গদা মোক্ষদা হইবার জন্য আসিলেন গঙ্গা। স্বাভাবিক শব্দ ও বীজমন্ত্রগুলি হারাইয়া ফেলিলে জীব তার অন্তরাত্মায় ইষ্টদেবতার জন্য মণিমণ্ডপ রত্নসিংহাসন গড়িবে কি দিয়া ? কপিল আদিবিদ্বান্ ঋষি বলিতেছেন ; তাঁহা হইতে গুরুশিষ্য পরম্পরায় স্বাভাবিক শব্দরাশি, নিখিল বেদ প্রবাহিত হইতেছে ; সে ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই কল্যাণ ও চরিতার্থতা। সগরপুত্রগণ মদোদ্ধত হইয়া সেই আদি বিদ্বানের অবমাননা করিল, ধর্ষণা করিল ; মানুষ, সেই আদি বিদ্বান্ হইতে আরম্ভ করিয়া যে স্বাভাবিক শব্দ ধারা গুরুশিষ্যপরম্পরায় বহিয়া আসিতেছে, তাহাকে উপেক্ষা করিল, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইল ; বলিল—"আমরা শ্রুতি-স্মৃতি মানিতে যাইব কেন ? বেদ যাহাকে স্বাভাবিক শব্দ বলিতেছে সেটাই যে স্বাভাবিক শব্দ তার প্রমাণ নাই ; আমাদের চলিত শব্দেরই বা দোষ কি ? আমরা এইগুলির দ্বারাই কাজ চালাইব।" এই অবিচারপূর্ব্বক, অপরীক্ষা-পূর্ব্বক বিদ্রোহের ফলে শব্দসঙ্কর ও শব্দবিভ্রাট সীমা উপ-চাইয়া ভয়ানক হইল। সম্প্রদায়ে (traditionএ) ও শব্দসঙ্কর ছিল, তবে তাব বাড়াবাড়ি হইতে পারে নাই, এবং সেটাকে সারিয়া লওয়ারও একটা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সম্প্রদায় মানিব না বলাতে, শব্দসঙ্কর আর ছাড়াইয়া গেল ; সেরূপ শব্দসঙ্করের ফল নিষ্ফলতা, বৈয়র্থ্য। ইহাই সগর-পুত্রগণের ভস্মত্বপ্রাপ্তি, জীবসাধারণের পাতিত্য। ভগীরথ তপস্যা করিয়া, আবার সেই বীজশব্দময়ী সনাতনী বেদ-বাণীকে মঙ্গল-ভৈরব শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে এই পতিত ধরায় বরণ করিয়া লইয়া আসিলেন। পথিমধ্যে জহ্নু মুনি

একবার সেই পুণ্যতোয়াকে পান করিয়া আবার বাহির করিয়া দিলেন, পদ্মাসুর পথ ভুলাইয়া অন্য পথে লইয়া যাইতে গেল। স্বাভাবিক শব্দরাশির মর্ত্ত্যে বাহাল থাকিয়া আমাদের চতুর্ব্বর্গ সাধন করার পথে দুইটি প্রধান বিঘ্ন বা অন্তরায়। বিস্মৃতি ও বিকৃতি। ভুলিয়া গেলে চলিবে না, আবার রূপান্তরিত, বিকৃত করিয়া ফেলিলেও চলিবে না। জহ্নুমুনি প্রথমটার সঙ্কেত, পদ্মাসুর দ্বিতীয়টার সঙ্কেত। তবে জহ্নু কেওকেটা নহেন, তাঁহার বিস্মৃতি যোগবিস্মৃতি, নির্বীজ সমাধিতে, তুরীয়ভাবে যে প্রকার বিস্মৃতি হয়, সেই প্রকার বিস্মৃতি। সে ত অশব্দের অবস্থা, সে অবস্থায় শব্দের, এমন কি স্বাভাবিক শব্দেরও কি স্মরণ থাকে? ইহা হইল শেষ থাকের অনুভূতি।

জহ্নুমুনি বেদশব্দরাশি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া যদি তাহা শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে চালাইয়া না দেন, তবে ত ধারা ঐখানেই থামিয়া গেল; আমাদের মত ভস্মপ্রাপ্ত সগরসন্ততিগণের উদ্ধারের ত কোনও ব্যবস্থা হইল না। তাই জহ্নুমুনিকে জঙ্ঘা চিরিয়া আবার গঙ্গাজীকে বাহির করিয়া দিতে হইল। 'গঙ্গা' বলিতে ঊর্দ্ধমার্গ হইতে আমাদের অবতরণ—উচ্চ থাক হইতে শিষ্যসম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনায় নিম্ন থাকে নামিয়া আসা বুঝান হইল। পদ্মাসুরের পিছন পিছন গিয়া আমাদের আর পথভ্রষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। সাধক সম্প্রদায় প্রবাহটাকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য, বেদশব্দের গ্লানি ও শব্দান্তরের অভ্যুত্থান নিবারণ করিবার জন্য, ভগীরথের তপস্যাকে সূত্র ও উপলক্ষ্য করিয়া, সনাতন শব্দমালার আমাদের লোকে যে অবতরণ, তাহাই গঙ্গার আবির্ভাব—এই মূল কথাটী উপাখ্যানের ভিতর হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিল না কি? পরশব্দ শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ, এই কয়টি ধাপে ধাপে শব্দ যে আমাদের লোকে (plane এ) নামিয়া আসে, তাহার সন্ধান এই আখ্যায়িকার মধ্যে আমরা পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। 'সনাতন শব্দমালা' শুনিয়া নাস্তিক মহাশয় যেন চমকাইয়া না উঠেন। ইহা একটা সংজ্ঞা, যেমন গণিত শাস্ত্রের অনেক সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি এই:—যে কোনও দ্রব্যের মূলে অবশ্যই একটা শক্তিব্যূহ (System of Constituting Forces) রহিয়াছে। যদি সেই শক্তিব্যূহ জনিত চাঞ্চল্য কোনও পারমার্থিক শ্রবণসামর্থ্যের কাছে শব্দরূপে ধরা পড়ে, তবে সেই শব্দই সে দ্রব্যের স্বাভাবিক শব্দ, বীজমন্ত্র বা বৈদিক শব্দ। বলা বাহুল্য, লক্ষণ মানিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, এ প্রকার শব্দের সহিত তাহার বিষয়ের বা অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বা সনাতন। কোনও দ্রব্যের তিনটি বিন্দু সংযুক্ত করিয়া, ধর, একটা সরলরেখা পাইলাম; এখন দ্রব্যটি স্থিরই থাকুক আর চলিয়াই বেড়াক, তাহার সেই তিনটি বিন্দু যদি এক সরলরেখাতেই বরাবর থাকিয়া যায়, তবে সেই দ্রব্যকে গণিতের পরিভাষায় কঠিন দ্রব্য (Rigid Body) বলে। সত্য সত্যই সেরূপ কোন জড়দ্রব্য আছে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। তার কোনও মনগড়া (a priori) উত্তর দেওয়া যায় না; পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও, স্ব স্ব অর্থের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধের বন্ধনে বদ্ধ ('বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' উপমা দিবার জিনিস হইয়া আছে) কোনও স্বাভাবিক শব্দমালা সত্যসত্যই আছে কি না, তাহারও কোনও মনগড়া উত্তর দেওয়া যায় না। ইহারও সত্যতা পরীক্ষাসাপেক্ষ। আমাদের কিন্তু লক্ষণ ও পরিভাষা করিতে কোনই বাধা নাই। কেন এইরূপ পরিভাষা করিতেছি তাহার কৈফিয়ৎ পূর্ব্বপ্রসঙ্গে বোধ হয় কতকটা পরিষ্কার হইয়াছিল। নাস্তিক মহাশয়ের সঙ্গে আপাততঃ আমরা আর আলাপ করিব না। মধুকৈটভবধ ও গঙ্গার ভূতলে অবতরণ, এই দুইটা বৃত্তান্তের মধ্যে আমাদের শব্দতত্ত্বের অনেক মর্ম্মকথা আমরা টানিয়া বাহির করিতে পারিলাম। উপাখ্যানের যে যে অংশে শাস্ত্রকারেরা রহস্যোদ্ঘাটনের চাবিকাটিটি ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সেই সেই অংশ হাতড়াইয়া আমরা একেবারে বিফলমনোরথ হই নাই। পূর্ব্বোপাখ্যানে 'কর্ণমল' শব্দটি এবং পরের উপাখ্যানে 'গোমুখী' প্রভৃতি শব্দ না পাইলে, আমাদের অন্বেষণ সহজ ও সফল হইত না। "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি"—গঙ্গা সলিলে অবগাহন করিয়া এই মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে গঙ্গার মন্ত্রাত্মিকা মূর্ত্তিটিই উজ্জ্বল হইয়া হৃদয়ে জাগিয়া উঠে; মন্ত্র বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলেই তাহা অর্থসফলতায় ধন্য হইয়া উঠিবে, এই মহাসত্যটিই আমাদের বুদ্ধিতে ভাসিয়া উঠে। তবে আশঙ্কা হয়, কলির প্রভাবে শব্দসঙ্কর, শব্দবিকার, ও শব্দ সঙ্কোচ যে মাত্রায় বাড়িয়াছে, তাহাতে গুরুপরম্পরাগত স্বাভাবিক শব্দমালা

গঙ্গারূপে এই মেদিনীমণ্ডলের কলুষ-কলঙ্ক ক্ষালন করিতে সাধকের যোগক্ষেম বহন করিয়া আনিতে আর বেশী দিন বুঝি থাকিবেন না। ভগবানের মীনকলেবরে, বরাহমূর্ত্তিতে যে পুনঃ পুনঃ বেদ-সমুদ্ধার, প্রলয়পয়োধিজলে বটপত্রে শয়ান হইয়া তাঁহার যে বেদরক্ষা—সে সকল কথার তলাইয়া আলোচনা করিতে যাইলেও আমরা শব্দতত্ত্বেই গিয়া উপনীত হইব। তবে সে আলোচনার অবসর আজ আর আমাদের নাই। মোটামুটি উপাখ্যান দুইটির যতটুকু আলোচনা আমরা করিতে পারিলাম, তাহাতে, আশা করি, আমাদের বেদ-পুরাণের আখ্যায়িকাগুলি যে একেবারে গুলির আড্ডায় রচিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিতে নাস্তিক মহোদয়েরও কতকটা দ্বিধা অতঃপর হইবে।

আমাদের দেওয়া শব্দের বিবরণটি শাস্ত্রসিদ্ধান্তের কতটা কাছে বা দূরে রহিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার নিজের বিশ্বাস, বড় বেশী দূর দিয়া যায় নাই। দুই-একটা পরিভাষা পণ্ডিত মহাশয়দের দেওয়া পরিভাষার সঙ্গে হয় ত ঠিক খাপ না খাইতে পারে। পরশব্দকে 'পরশব্দ' বলিলাম কিসের জন্য? আমরা যাহাকে শব্দতন্মাত্র বলিলাম তাহাই কি আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুমোদিত শব্দতন্মাত্র?—এইরূপ দুই-একটা পরিভাষা-সংক্রান্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর কি দিব, সে বিষয়ে হয় ত কতকটা ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক্ হইতে অগ্রসর হইয়া সার জন উড্রফ আমাদিগকে বেদ-শব্দের ও মন্ত্রের যে লক্ষণ ও ব্যাখ্যান দিলেন, তাহা আদৌ শাস্ত্রের দিক্ মাড়াইল না, একথা বলিলে, আমার বোধ হয়, কতকটা আনাড়ীর মত কথা বলা হইবে। দর্শনগুলিসম্বন্ধে যাহাই হউক, উপনিষৎ বা অধ্যাত্মশাস্ত্র নৈয়ায়িক মহাশয়ের ফরমাইশ-মত ঠিক্ চলেন নাই। শিশু জিজ্ঞাসা করিল—পৃথিবী কেমনধারা পথে সূর্য্যের চারিধারে পাক্ দিতেছে? আমি তাহাকে বলিলাম—বৃত্তের মত গোলাকার পথে। কিন্তু পথ ত ঠিক্ বৃত্তের মত নয়; শিশু বড় হইলে, তার বুদ্ধি আরও একটু পরিপক্ক হইলে, আমি ভুল সংশোধন করিয়া দিলাম; বলিয়া দিলাম যে পথটি বৃত্ত নহে, বৃত্তাভাস (ellipse)। বিশেষজ্ঞেরা জানেন যে এখানেও অব্যাহতি নাই, প্রয়োজনমত আরও সংশোধন করিয়া লইতে হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রেও এইরূপ। শিষ্যের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইল, গুরু বলিলেন, 'তুমি যে অন্ন খাইতেছ তাহাই ব্রহ্ম'। পরে সংশোধন করিয়া বলিলেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম'; এইরূপে শিষ্যের অধ্যাত্ম দৃষ্টি যতই প্রস্ফুটিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহাকে গুরু ব্রহ্মের নূতন নূতন মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিলেন। 'ব্রহ্ম' শব্দটা বাহাল রাখিলেন, কিন্তু তাহার লক্ষণ ক্রমশঃ বদলাইয়া দিতে লাগিলেন। শেষকালে শিষ্য আপনিই উপলব্ধি করিলেন যে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। একই শব্দের এই পাঁচটা লক্ষণ একসঙ্গে পাশাপাশি ফেলিয়া রাখিলে নৈয়ায়িক মহাশয়ের শিরঃপীড়ার গুরুতর কারণ অবশ্যই ঘটিবেই, কিন্তু যেখানে সাধকের বুদ্ধি ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া একটার পর আর একটা, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর, লক্ষণ আবিষ্কার করিয়া লইতেছে, সেখানে আগাগোড়া একটা শব্দই বাহাল রাখিলে ক্ষতি নাই; বরং তাহাই স্বাভাবিক। শব্দ কি—আত্মা কি—তাহাই আমি জানিতে চাহিয়াছি; আমার জানা ক্রমশঃই হয় ত গভীরতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকিবে; কিন্তু আমার অনুসন্ধান অন্বেষণের জিনিস ত একই রহিয়াছে—ক্রমশঃ তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে ও ধরিতে পারিতেছি মাত্র। এ ক্ষেত্রে আমার অন্বেষণের সামগ্রীর নামটা বদলাইয়া না ফেলাই ভাল। তাই, অন্নই ভাবি, আর প্রাণই ভাবি, আর মনই ভাবি, আমি খুঁজিতেছি আত্মাকে, ব্রহ্মকে। যেমনটা বুঝিতেছি তেমনটা লক্ষণ দিতেছি। অধ্যাত্মশাস্ত্রের ইহাই রীতি। অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ে নবোঢ়া বধূকে পাতিব্রত্যের নিদর্শনস্বরূপ অরুন্ধতী-নক্ষত্র দেখানর প্রথা পূর্ব্বে ছিল। অরুন্ধতী কিন্তু ছোট তারা, সহজে দেখা যায় না। তাই নিকটের একটা স্থূল, উজ্জ্বল তারার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্বামী বধূকে বলিলেন—'ঐ দেখ অরুন্ধতী'। যখন বধূর দৃষ্টি তাহাতে সুস্থির হইল, তখন আবার স্বামী বলিলেন—না ওটা নয়, উহার নিকটে যে ছোট তারাটি রহিয়াছে, 'উহাই অরুন্ধতী'। অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই রীতিতে আমাদের আত্মসাক্ষাৎ-কারের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকেন। শব্দ একটা, তার পরিভাষা পাঁচ রকমের। যাঁহারা উপনিষদ্‌গুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে 'আকাশ' 'প্রাণ,' 'বায়ু' প্রভৃতি শব্দের পরিভাষা ও প্রয়োগ পূর্ব্বোক্ত অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ে হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মবস্তুই লক্ষ্য, কিন্তু তাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বলিয়া এই শব্দগুলির মোটা মোটা লক্ষণগুলি আদৌ আমাদের

সম্মুখে উপনীত করা হইয়াছে। এই নজিরে সার জন উড্রফ চৈতন্যের সম্পন্দ চঞ্চল অবস্থাটাকে পরশব্দ বলিয়া অন্যায় করেন নাই। বিশেষতঃ শ্রুতি জগত-প্রবাহকে যে শব্দপূর্ব্বক বলিতেছেন, তাহা মূলতঃ স্পন্দ বা চাঞ্চল্য বই আর কিছুই নহে। সাম্যাবস্থায় (cosmic equilibrium এর) অবসানে যে বৈষম্যের প্রথমোন্মেষ (initial cosmic dis-equilibrium), তাহাকে চাঞ্চল্য ছাড়া আর কি বলিব? সাংখ্যকার প্রকৃতি এবং শব্দতন্মাত্রের মাঝে যে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার নামক দুইটা তত্ত্ব বসাইয়াছেন, সে দু'টাকে জড়াইয়া, পরশব্দ বলিলে দোষ হয় না; কারণ, সে তত্ত্ব দুইটা বৈষম্যাত্মক এবং বিক্ষোভাত্মক; এবং আমাদের পরিভাষা মতে, বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্যই পরশব্দ। শ্রুতি ঈক্ষণা-পূর্ব্বক শব্দতন্মাত্র ও আকাশের সৃষ্টি করিতেছেন; আমরা সেই ঈক্ষণাকে পরশব্দ বা 'পশ্যন্তীবাক্' বলিতে পারি না কি? বলা বাহুল্য, আমরা শব্দের দিক্ হইতেই হিসাব লইতেছি। ইহাই সৃষ্টির গোড়ার কথা। আমরা ইহাকে পরশব্দ বলিয়া নৈয়ায়িকের কাছে হয়ত দোষ করিলাম, কিন্তু শ্রুতির রীতি-পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া যাইলাম কি? শব্দতন্মাত্র-সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা আর করিব না। তবে স্মরণ রাখিবেন, আমাদের লক্ষণমত, ইহা বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ—নিরতিশয় শ্রবণ সামর্থ্য দ্বারা গৃহীত শব্দ।

স্বাভাবিক শব্দের কিভাবে পরীক্ষা লইতে হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিশেষ ভাবে বলিয়াছি। দ্রব্য ও অর্থ থাকিলেই যে শব্দ থাকে (অবশ্য পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত) এবং যে শব্দ থাকিলেই তাহার অর্থ নির্ম্মিত হইয়া যায় (অবশ্য বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলে), সেই শব্দই স্বাভাবিক শব্দ। ইহাই স্বাভাবিক শব্দের পরীক্ষা (test)। স্বাভাবিক শব্দ-সম্বন্ধে আর দুইটি আসল কথা বলিয়া আমরা আপাততঃ বিদায় লইব। প্রথম কথাটি এই লাটিম ঘুরিতেছে, তার ঘোরাটা অবশ্য একটা অক্ষের (axis of rotation এর) অবলম্বনে হয়; আমাদের পৃথিবীও একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া পাক খাইতেছে। চুরুটের ধোঁওয়া পাক দিতে দিতে উপরে উঠিতেছে, এইরূপ পাক দেওয়াও অবশ্য—একটা অক্ষ আশ্রয় করিয়াই হইতেছে। হেল্মহোল্জ ও লর্ড কেল্ভিন্ মনে করিতেন যে অণুগুলি ঈথারসাগরে ঐ রকম এক-একটা আবর্ত্ত। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের আবর্ত্তনও এক-একটা অক্ষ আশ্রয় করিয়াই হইতেছে। ইলেক্ট্রন্গুলা অণুর (atom এর) ভিতরে নাকি পাক খায়—সেখানেও তবে অক্ষ ভাবিয়া লইতে আমাদের অধিকার আছে। সেখানে গতি কেবল একদিকে সোজাসুজি চলিয়া যাওয়া, সেখানে সেই গতির রেখাটিই অক্ষ। সেখানে আবর্ত্তন (rotation) হইতেছে, সেখানে অক্ষ সেই রেখাটি, যার চারিধারে এবং যার আশ্রয়ে আবর্ত্তন হইতেছে। গাড়ীর চাকার অক্ষ যেমন। যে দুই প্রকারের গতি বলিলাম, সেই দুইটার বিবিধ সংমিশ্রণে সকল প্রকার গতি হইতেছে। এইজন্য অক্ষের সাহায্যেই সকল প্রকার গতির হিসাব আমাদের লইতে হয়। গণিত-শাস্ত্র অক্ষের সাহায্যে (co ordinate axes এর সাহায্যে) গতির (curve of motion এর) বিশ্লেষণ ও বিবরণ দিতে গিয়া নিতান্ত আজগুবি একটা কিছু করিয়া বসেন নাই। তাই আমাদের বলিতে সাহস হয়, অক্ষের কথা গত্যাত্মক এই জগতের গোড়ার একটা কথা। এখন পরীক্ষা করিয়া ইহা আমরা পাইলাম। সদা দেখিতেছেন, প্রত্যেক সজীব পদার্থসমূহের উৎপত্তি কিরূপে হইতেছে, তাহা যদি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে আমরা অক্ষ (axis of generation) জিনিসটাকেই বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। গাছ হইতেছে—একটা দণ্ডকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া শাখা প্রশাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; একটা পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, একটা মুখ্য শিরাকে অবলম্বন করিয়া শত শত শিরা প্রশিরা পত্রাবয়বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতএব এখানে অক্ষের ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটা লতা এই বর্ষার রসে বাড়িয়া গাছ ছাইয়া ধরিয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখিব একটা মূল অক্ষের আশ্রয়ে লতার নানাদিকে নানা ফেঁকড়া বাহির হইয়াছে। একটা মূল (Primary) অক্ষ; তাহা হইতে আবার কত গৌণ (secondary) অক্ষ বাহির হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর জীবদেহ পরীক্ষা করিলে দেখি মেরুদণ্ড (Spinal axis) কে আশ্রয় করিয়া স্নায়ুজাল সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রাণনব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে। ভাইজ্মান প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদেরা আমাদের বলিয়াছেন যে বংশপরম্পরায় একটাই বীজপদার্থ (Germplasm) বরাবর বহিয়া যায়; তোমাতে আমাতে তাহার অনবিচ্ছিন্ন বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে বটে, কিন্তু

আমাদের ভিতর বংশগত বীজটি, তাহার নিজস্ব প্রকৃতিটিকে প্রায় অবিকৃত ও অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াই, বহিয়া যায়। আমার পিতামহ, পিতা ও আমি একই অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া লতার নানা ফেকড়ার মত এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আমাদের সকলকে একসূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিতে বংশধারা, লতার মুখ্য অঙ্গ-দণ্ডটির মত, অবিচ্ছিন্নভাবেই বহিয়া যাইতেছে। আমার উৎপত্তি, আমার পিতার উৎপত্তি এই অঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই হইয়াছে। আর দৃষ্টান্ত লইব না। তবে কথাটা দাঁড়াইল যে, অঙ্গ জিনিষটা সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি ব্যাপারে গোড়ার কথা। অঙ্গ, মুখ্য বা গৌণ হইতে পারে—লতার দৃষ্টান্তে, মূল অঙ্গ ছাড়া, ফেকড়াগুলিরও ছোট ছোট অঙ্গ আছে। এখন সমস্যা এই—জগতে বিচিত্র শব্দ রহিয়াছে; নানা জীবের নানা শব্দ; নানা জাতির নানা ভাষা; তোমার আমার শব্দও ঠিক এক নহে; বিশ্বে এই শব্দ-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি—নানাপ্রকার ভাষার উৎপত্তি কি কোনও অঙ্গ আশ্রয় করিয়া হয় নাই? ধ্বনিবৈচিত্র্য গুলি ভাল করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলে তাদের মধ্যে আমরা কি কোন কোনও মূলশব্দের (primaries) আবিষ্কার করিতে পারি না? ফুরিয়ারের রীতিতে গণিতবিৎ যে কোনও জটিল ছন্দোবদ্ধ গতিকে (complex harmonic motion কে) সরল ছন্দোবদ্ধ গতিতে (simple harmonic motionএ) ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন, একথাটা আপনারা ভুলিবেন না। বিরাট্ শব্দ-বৈচিত্রের ভিতরে আমরা কি একটা অবিচ্ছিন্ন মৌলিক শব্দ-ধারা আবিষ্কার করিবার আশা করিতে পারি। লতা টানিয়া তার মুখ্য মেরুদণ্ডটি আমরা যেরূপ বাহির করিয়া লইতে পারি, সেইরূপ? এ প্রশ্নের উত্তর,—আমাদের সেরূপ আবিষ্কার করিতে পারাই উচিত; এবং তাহাই যদি হয়, তবে এটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শব্দের এই বিরাট্ বিশ্বরূপ মূর্ত্তির যাহা মেরুদণ্ড (axis of generation), নিখিল শব্দরাশির যাহা মূল প্রকৃতি, তাহাই সেই স্বাভাবিক শব্দপ্রবাহ, বেদশব্দধারা, গঙ্গার আবির্ভাব, যাহার কথা এই দুই দিন ধরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্"—এই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে আমরা এতক্ষণে চিনিতে পারিলাম কি। প্রাজাপত্য ভূমি হইতে আমাদের থাকে শব্দপ্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, তাই ঊর্দ্ধ্বমূল, অধঃশাখ এই বৃক্ষ। বৃক্ষের একটি মূলকাণ্ড অবলম্বন করিয়া চারিদিকে নানা শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পড়ে, পত্র পুষ্পাদি উদ্‌গত হয়, সেইরূপ প্রজাপতির স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রগুলি নিম্ন ভূমিতে (lower planeএ) নামিয়া আসিতে গিয়া একটা মেরুদণ্ডের আশ্রয় লইয়াছে—সেই মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়াই নিখিল শব্দ-বৈচিত্র্য একটা মহাপাদপের মত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সেই মেরুদণ্ডই হইল স্বাভাবিক শব্দ-ধারা, যাহা গুরুপরম্পরাক্রমে কতক পরিমাণে আমাদের কাছেও পৌঁছিয়াছে। এ স্বাভাবিক শব্দ-ধারাই সকল শব্দের প্রকৃতি ও আশ্রয়। যে ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে চিনিয়াছে, সে বেদ চিনিয়াছে—"যস্তং বেদ স বেদবিৎ।" যাবতীয় শব্দের সঙ্গে স্বাভাবিক শব্দের সম্বন্ধ এই প্রকার।

আর একটা কথা। একটা চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিলাম। সেই চুম্বকটি যে শক্তিব্যূহ (field, lines of force) রচনা করিয়া রাখিয়াছে, আমরা পরীক্ষা দ্বারা সেই শক্তিব্যূহের (lines of forceএর) একটা প্রতিকৃতি আঁকিয়া দিতে পারি। বিজ্ঞানাগারে প্রত্যেক বালককে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া চৌম্বক শক্তি ও তাড়িত শক্তির সমাবেশ বা সংস্থানের নক্সা আঁকিয়া ফেলিতে হয়। যে নক্সা খানা আমরা পাই তাহা সেই শক্তিব্যূহের চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (visual representation)। এখন দেখুন, রং বা হং একটা বীজমন্ত্র। ইহারা এক-একটা শক্তি-ব্যূহের শাব্দিক প্রতিকৃতি। কথাটা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। কিন্তু সেই সেই শক্তিব্যূহের এক-একটা চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (vistual or optic equivalent) ও থাকিবে, চুম্বকের যেমনধারা থাকে। আমরা ধরিতে পারি আর নাই পারি, আছে। চুম্বকের বেলায় যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি, পরীক্ষা দ্বারা সেই চাক্ষুষ প্রতিকৃতি আমাদের আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ফল কথা, শব্দের দিক্ হইতে দেখিলে শক্তি-ব্যূহ যেরূপ স্বাভাবিক শব্দরূপে ব্যক্ত হয়, রূপের দিক্ হইতে দেখিলে, তাহা সেইরূপ স্বাভাবিক রূপভাবে ব্যক্ত হয়। শব্দের বেলায় পারমার্থিক কর্ণ, দিব্যকর্ণ ও ভৌতিক কর্ণ রহিয়াছে,—রূপের বেলায়ও তেমনি পারমার্থিক চক্ষু, দিব্যচক্ষু ও ভৌতিকচক্ষু থাকিবে। স্বাভাবিক শব্দকে আমরা বলিয়াছি মন্ত্র, আর স্বাভাবিক রূপকে আমরা বলিতেছি

মন্ত্র—য ন্ত্র-যন্ত্র। বৈদিক যজ্ঞ এবং তান্ত্রিক হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠানে মন্ত্র যেমন চাই, যন্ত্রও তেমনি চাই; মন্ত্র ও যন্ত্রের "কুসংস্কার" এতক্ষণে আমরা একটু বুঝিতে পারিলাম কি ?

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া খাঁটি স্বাভাবিক শব্দের আলোচনাই করিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক শব্দের অর্থটাকে স্থিতিস্থাপক (elastic) মনে করিয়া সার জন্ উড্রফ্ ইহার বেশ একটা শ্রেণীবিভাগও আমাদের দিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, আজও আমাদের আর অবকাশ নাই। সে শ্রেণী বিভাগের সামান্য একটু নমুনা দেখাইয়াই আজিকার মত ক্ষান্ত হইব। অপরশব্দ লইয়া শ্রেণী বিভাগ করিতেছি।

অপর শব্দ দ্বিবিধ - স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক (artificial)। কোন একটি পদার্থকে বুঝাইবার জন্য আমরা অনেক সময় যদৃচ্ছাক্রমে (arbitrarly) কোনও একটি বাচনিক সঙ্কেত (vocal sign) ব্যবহার করিয়া থাকি; যে সঙ্কেতটি ব্যবহার করিয়া থাকি, সেই সঙ্কেতটি ব্যবহার না করিয়া অন্য সঙ্কেত ব্যবহার করিলেও চলিত; যে নামে ডাকিতেছি সেই নামেই ডাকার কোনও নিয়ত হেতু নাই। যেমন, আমরা কোন ব্যক্তিকে যদু বা হরি এই নামে ডাকিয়া থাকি। এই নাম অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা মনগড়া নাম। বলা বাহুল্য, আমাদের স্বাভাবিক শব্দ বা নামের যে লক্ষণ তাহা এ-সব ক্ষেত্রে নাই। নাম স্বাভাবিক হইতে হইলে তাহাকে পদার্থের সত্তা ও স্বরূপের সঙ্গে কোনও রূপ একটা সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। যে নাম দিতেছি তাহার একটা হেতু বা কৈফিয়ৎ থাকিবেই। সুতরাং এ রকম নাম আমরা আমাদের খোস্ খেয়াল মত দিতে পারি না।

তারপর, স্বাভাবিক নাম আবার দুই প্রকার—নিরতিশয় ও সাতিশয়; প্রকৃত ও বিকৃত (pure এবং approximate)। পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত শব্দতন্মাত্রই নিরতিশয় শব্দ; তাহাই শব্দের প্রকৃতি। শ্রবণ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা নাই, এমন কর্ণে শ্রুত শব্দ সাতিশয় শব্দ; তাহা অল্পবিস্তরবিকৃতিপ্রাপ্ত; একবারে খাঁটি শব্দ নহে। দিব্যকর্ণ ও লৌকিক কর্ণ এই শব্দ শুনিতে সমর্থ। নিরতিশয় শব্দের পরিভাষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। সাতিশয় শব্দের শ্রেণীবিভাগ আমরা করিতেছি। কোনও পদার্থ রহিয়াছে, তাহার মূলীভূত শক্তিব্যূহ সমষ্টিভাবে (as a whole) দিব্যকর্ণে যে শব্দ উৎপাদন করে, সেই শব্দ সেই পদার্থের মুখ্য (primary) সংজ্ঞা। এইটি পদার্থের বীজমন্ত্র। যেমন. অগ্নির মুখ্য নাম রং; আকাশের হং; প্রাণক্রিয়ার হংস; ইত্যাদি। এইগুলি মৌলিক অথবা যৌগিক (simple অথবা compound) হইতে পারে। রং হং পূর্ব্বোক্ত প্রকারের, হ্রীং বা ক্রীং শেষোক্ত প্রকারের। মৌলিক বীজগুলির সংযোগে বা সংমিশ্রণে যৌগিক বীজগুলি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, পদার্থের শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে (specifically), আংশিকভাবে, ক্রিয়া করিয়া যে শব্দানুভূতি জন্মায়, সে শব্দকে সেই পদার্থের গৌণ (secondary) নাম বলা চলিবে। এ নাম বীজমন্ত্র নহে। ধর কাক ডাকিল; তাহার ডাক শুনিয়া তার নাম দিলাম কাক; এখানে যে শক্তিব্যূহ কাককে কাক করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটা আংশিক অভিব্যক্তি তাহার ডাকে; কাকের চলা-ফেরা, খাওয়া-বসা প্রভৃতি অপরাপর অভিব্যক্তিও রহিয়াছে; কাক শব্দও নানা রকমের করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, 'কাক' এই শব্দটা কাকের গৌণ স্বাভাবিক নাম। আবার, কাক নিজেই ডাকে; কেহ তাহাকে ডাকাইয়া দেয় না। অতএব, তাহার শব্দ স্বতঃসম্ভূত। ঢাকে কাটি দিয়া তাহার ধ্বনি শুনিলাম; ধ্বনি শুনিয়া তার নাম দিলাম ঢাক। এই নাম তাহার গৌণ স্বাভাবিক নাম। তবে এ ক্ষেত্রে শব্দ স্বতঃ-সম্ভূত নহে, পরতঃসম্ভূত। এই স্থলেই শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রবণেন্দ্রিয়টাকে উত্তেজিত করিতেছে; কাকের শব্দ বা ঢাকের শব্দ আমি শুনিতেছি ও শুনিয়া নাম দিতেছি।

কিন্তু আমাদের অধিকাংশ শব্দ অন্য রকমের। অগ্নির মুখ্য স্বাভাবিক নাম বা বীজ রং। কিন্তু তাহাকে অগ্নি বলিতেছি কেন? অগ্নি জ্বলিলে তাহার লেলিহান্ শিখা এবং কুণ্ডলাকারে ঊর্দ্ধগামী ধূম আমরা দেখি; এই বক্রগতি বা আবর্ত্তের মত গতি বুঝাইতে চাই; তাহা করিতে গিয়া 'অগ্' ধাতু আমরা আবিষ্কার করি; তাহার উপর যথাযোগ্য প্রত্যয় করিয়া 'অগ্নি' শব্দ পাই। এই 'অগ্নি' শব্দ আমাদের চোখে দেখা অগ্নির একটা গুণ বা সম্বন্ধ

বুঝাইতেছে। শুধু 'রং' বলিলে এই ধর্ম্ম বা সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে সূচিত হয় না। 'অগ্' ধাতু 'অ'ও 'গ' এই দু'টা বর্ণের সমাবেশে হইয়াছে; 'অ' ও 'গ' পুন-সম্ভাতঃ দিব্য-কর্ণে শ্রুত বক্রগতির মুখ্য স্বাভাবিক নামের উপাদান। প্রত্যেক বর্ণ এক-একটা অর্থের .(যোগভাষ্যকারের মতে নিখিল অর্থের) মুখ্য নাম বা বীজ; এবং তাহাদের বিবিধ সংযোগ ও সংস্থান দ্বারা কোনও-একটা পদার্থের বা ক্রিয়ার মুখ্য স্বাভাবিক নাম হওয়া বিচিত্র নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করিব। একটা ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য 'অগ্নি'। অপরাপর ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য সেইরূপ 'বহ্নি' (হুতদ্রব্য দেবতার উদ্দেশ্যে বহন করে), 'হুতাশন', 'বৈশ্বানর' (বিশ্বনর বা সর্ব্বজীবে পাচকাগ্নিরূপে বর্ত্তমান) প্রভৃতি নাম রহিয়াছে। কাকের ডাকের মত এগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাণে শোনা শব্দের অনুরূপ নহে। শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে চক্ষু, ত্বক্ প্রভৃতি অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিকে চেতাইয়া কতকগুলি ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের জ্ঞান আমাদের দিতে পারে- যেমন অগ্নির দৃষ্টান্তে বক্রগতি প্রভৃতি। সেই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ধাতু ও উপসর্গ-প্রত্যয়াদি লইয়া আমাদের এক-একটা নাম গড়িয়া লইতে হয়—আমরা নিজেরাই গড়িয়া লই, অথবা পরম্পরাক্রমেই প্রাপ্ত হই। এগুলিও খুবই প্রয়োজনীয় শব্দ। এগুলির যথাযথ সংযোগ সংস্থান করিয়া সমর্থ বেদমন্ত্র বা তান্ত্রিক মন্ত্র হইতে পারে। তবে এ বিরাট্ ব্যাপারের আলোচনায় আজ আর প্রবৃত্ত হইব না।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

কামনা

(Heine হইতে)

এ পাপ ধরাবে রক্ষা করোনা,
করুণা করোনা মানবদলে;
মিথ্যা গর্ব্ব আশ্রয় যাঁর
পড়ে আছে যারা আঁধার তলে।
জ্বালা দিতে যারা জনম লভেছে
মুক্তি তাদেরে দিওনা প্রভু,
বিদ্বান্ বলি অভিমানী যে গো
তাহারে রক্ষা করোনা কভু।

প্রেমিক জনারে বঞ্চনা করে
যে রমণী সারা দিবস নিশি—
আলোক তাহারে দিওনা হে প্রভু,
থাক্ সে গো চির আঁধারে মিশি।
মিথ্যা কপট বন্ধু যাহারা
চিত্তে হানিছে যাতনা শর,
বহ্নির মত উগ্র উগারি
তাহাদেরে প্রভু দগ্ধ কর।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

পরিচয়

উৎসর্গ

আমার বড় সাধের নাতি
শ্রীমান্ প্যারীশঙ্করের করকমলে।

বৎস! আমার যে উইলে তোমাকে সমস্ত দিয়া গিয়াছি, তাহার মধ্যে এই ডায়রীখানাও রহিয়াছে। তুচ্ছ জিনিষ বলিয়া হাসিও না ভাই! এত বুড়া হইয়া গেলাম, কত দেখিলাম, কত ঠেকিলাম, কত শিখিলাম, কিন্তু আজ এই পরপারের তীরে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছে তুচ্ছ কিছুই নহে। মনে হইতেছে, এ জীবনের মেয়াদটা যদি আবার ফিরিয়া পাইতাম তবে বড় মধুর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতাম। ভুল হইত বটে, ভুলের হাত আমি এড়াইতে চাহি না। কিন্তু—পড়িলেই বুঝিবে।

আশীর্ব্বাদ করি মানুষ হও। ইতি।
তোমার দাদা মহাশয়।

বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, আর বেশীদিন বাঁচিব না। যাহা বলিবার আছে এই বেলা বলিয়া রাখা ভাল। সারাটা জীবন দেশের কাজে খাটিলাম, অকলঙ্ক চরিত্রমহিমাও আমার আছে। মান বল, যশ বল, অর্থ বল কিছুরই আর অভাব নাই। এত পাইয়াছি যে মনে হইতেছে মরিবার আগে কাহাকেও কিছু দান করিয়া গেলে ভাল হইত। বাহিরের লোক এ অবস্থায় যদি ভাবে আমার মত সুখী কেহ নাই; তবে তাহাদের বেশী দোষ দিতে পারি না। কিন্তু আমি জানি, আমার অন্তরের শান্তি এবং সুখ অনেক দিন পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট নাই।

কেন, সেই কথাটাই আজ বলিতে বসিয়াছি। গল্পটা বলিব শোন। আমার জীবনের এই কাহিনীটি শেষ পর্য্যন্ত আজ যে পড়িবে, আমি নিশ্চয় জানি তাহার আর আমার প্রতি আগেকার মত শ্রদ্ধা থাকিবে না। এই কথাটাই তাহার বার বার করিয়া মনে হইবে এই লোকটা এতদিন ফাঁকী দিয়াই আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ইহার চেয়ে চরিত্র হিসাবে আমরা কোন অংশেই খাটো নহি।

সত্য বলিতেছি ফাঁকী দিবার কোন মতলব ছিল না। তবে যে আমি জীবনের একটা অংশ সকলের নিকট হইতেই লুকাইয়া গিয়াছি তাহা মিথ্যা নহে। সে দোষ স্বীকার করিতেছি এবং তাহার জন্য পরলোকে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বিধাতাকে অপমান করিব না। যদি শাস্তি কিছু পাইতে হয়, তবে মাথা পাতিয়া লইবার শক্তি ও সাহস যেন থাকে, এই প্রার্থনা।

জীবনের যে নিভৃত কথাগুলি আজ বলিতে যাইতেছি, কেন এতদিন সে সব কাহারো কাছে বলি নাই তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। বোধ করি লজ্জা আসিয়া বাধা দিয়াছে। কিন্তু মনে হয়, তাহাই সব নয়। এ সংসারের হাটে অনেক পথ চলিলাম, ঠেকিয়া ঠেকিয়া পথের মাঝে কত দুঃখ পাইয়াছি, কত কান্না কাঁদিয়াছি। কেহ অশ্রুজল মুছায় নাই। বোধ করি এই কথাটা যদি জানিতে ও বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে ভুলত্রুটিই মানুষের জীবনের সব খানি নয়, কিন্তু পাপ ও অপরাধকে লইয়া এবং ছাড়াইয়াই মানুষের জীবন মহত্তম এবং বৃহত্তম কিছু, এবং এই মানুষকে কেহ ভুল করিবে না, অপমান করিবে না, বরঞ্চ উদার আলিঙ্গনে ঘরে তুলিয়া লইবে তাহা হইলে আমার শ্রান্ত মন নিশ্চয় বিশ্বের মাঝখানে তাহার সমস্ত ভিতরটা মুহূর্ত্তে খোলসা করিয়া দিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। কিন্তু বুঝিয়াছি, সংসার বড় বিষম জায়গা, পদে পদে বিচার হয়, তেমন করিয়া আমি যদি না ক্ষমা পাইতে পারি, কিন্তু আমারি জন্য অনেক গ্লানি বহন করিয়া যে রমনী নিঃশব্দে কবে কোন্ অজানা লোকে সরিয়া পড়িয়াছে তাহার স্মৃতিকে ইহারা অপমান করিবে। সে আমি সহ্য করিতে পারিব না, পারিব না!

দুই বৎসর হইল কলিকাতা সহরে আসিয়া পড়িতেছিলাম। ইহার আগে কলিকাতার অনেক বদনাম শুনিতে পাইতাম। সেখানে নাকি সহজেই ছেলেরা বিগড়াইয়া যায়। কিন্তু এই দুই বৎসরেও তাহার কোন পরিচয় পাইলাম না। আর পাইবই বা কিরূপে? স্কুল কলেজ, বই কিতাব, কলেজের খেলা এবং মা—ইহার বাহিরে আমার কোন দরকার বা আকর্ষণ ছিল না।

কিন্তু সেইবার বহুদিনের পুরাণো ঝি মারা যাওয়ার ভারী কষ্টে পড়িতে হইল। অনেক খোঁজাখুঁজি অনেক হাঁটাহাঁটি করিবার পরও কোন ঝি কিংবা চাকর মিলিল না, ভারী মুস্কিলে পড়িলাম।

সেই দিন কলেজ বন্ধের দিনে আমি এবং আমার এক বন্ধু লোকের খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলাম। কলিকাতা সহরে এমন ধারা লোক খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন তাহা এই কথা বলিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে একবার একটি ছোকরাকে সে বাসার কাজ করিতে জানে কিনা জিজ্ঞাসা করায় যথেষ্ট গালাগালি খাইয়াছিলাম। ভদ্রলোকের ছেলেকে আমি এমন করিয়া অপমান করি, তাহার সাতপুরুষে কেহ চাকরী করিয়া খায় নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাস্তাটার নাম স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু যাহোক কলিকাতা সহরেরই একটা রাস্তা। ঠিক মোড় ফিরিবার পথে ফুটপাথের উপর দেখিলাম একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া। বয়স তাহার কত হইবে আন্দাজ করিতে পারি না, কিন্তু এমন একটা কোমলতা ও মাধুর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছাপিয়া দেখা দিয়াছিল যে ঐ শুষ্কমুখ ও ছিন্ন বসন তাহা ঢাকিতে পারিতেছিল না। সুন্দর কিছু দেখিলেই মনকে আকর্ষণ

করিবে এ অস্বাভাবিক নহে। আমি ও আমার বন্ধু তাহার মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। সে আমাদের দিকে করুণভাবে চাহিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারিল না।

আমি বলিলাম, বোধ হয় ভিক্ষা চাহিতেছে। বন্ধু কহিল, ভদ্রঘরের মেয়ের মত বোধ হইতেছে। হয়ত দুঃখে পড়িয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু লজ্জাবশতঃ কাহারো কাছে কিছু চাহে না। চল, কিছু দিয়া দিয়া আসি।

চারি আনা পয়সা তাহার হাতে দিতে গেলাম। সে হাসিয়া উঠিল, আমার দিকে তাহার আশ্চর্য্য দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, বাবু, পয়সার আমার কিছুমাত্র দরকার নাই।

ভাবিয়াছিলাম, গরীবের মেয়ে, পয়সা দিলেই আগ্রহ করিয়া লইতে চাহিবে। এবং তাহা হইলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিব ঝির কাজ সে করিতে পারিবে কি না। কিন্তু তাহা হইল না। তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সে দান গ্রহণ করিল না বটে, কিন্তু সেই না-গ্রহণ করাটাও মিষ্টতায় ভরিয়া দিয়া গেল। যখন বাটী ফিরিয়া আসিলাম, মনে আর কোন ক্ষোভ রহিল না।

সেই দিন রাতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেকক্ষণ ঘুম হইল না। সেই রাস্তার ধারের আশ্চর্য্য মেয়েটীর ছবি বার বার আমার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে লাগিল। তাহার মুখ, তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার চোখের আশ্চর্য্য দৃষ্টি, তাহার হাসি এবং দান প্রত্যাখান কিছুই আর অনাবৃত রহিল না। প্রত্যেকটি অন্তরের স্তরে স্তরে জমা হইয়া সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। হৃদয়ের মধ্যে কি এক পুলক-বেদনা জাগিয়া উঠিল যাহাকে না পারিলাম বুঝিতে, না পারিলাম দূর করিতে!

পরদিন ভোর হইতেই গত রাত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল, সমস্ত মনটা ব্যথায় টন্‌টন্ করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল পথ চলিতে চলিতে কোন্ আমার প্রিয়তমকে পাইয়াছিলাম। কিন্তু হারাইয়া ফেলিয়াছি।

কিন্তু বাঁকের রাস্তার মোড়ে আসিয়া যেই দেখিলাম মেয়েটি আজও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অমনি মনের সমস্ত অভিমান ও অন্ধকার এক নিমেষে কাটিয়া গেল। আশ্চর্য্য, আমাকে দেখিয়া মেয়েটিরও মুখ নিবিড় হাসিতে ভরিয়া গেল। সে ভারী স্নিগ্ধ হাসি, যেন বলিয়া গেল, আসিয়াছ, শেষ করিয়াছ। আমি কিন্তু একবার তাহাকে দেখিয়াই দ্রুতপদে পথ ধরিয়া চলিয়া গেলাম! একটি কথাও কহিলাম না।

আমাকে কি নেশায় পাইল, কে জানে! প্রতিদিন সকাল বেলা তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসি, দেখি তেমনি সে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে। একটি কথাও কোনোদিন হইল না। অথ আমি ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছিলাম, তাহার অতি কাছাকাছি যেন আসিয়া পড়িয়াছি। ঐ একটু খানি তাহার হাসির ভিতর দিয়া সমস্তটা মানুষ যেন ক্ষণেকের জন্য বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠে! সে যে আমারি জন্য প্রতিদিন ওখানে আসিয়া দাঁড়ায় তাহাই আমার হৃদয় যেন বুঝিতে চাহিল।

কয়েকদিন পরের কথা। আমি সেই রাস্তার মোড় ঘুরিয়াছি। তাহাকে ছাড়াইয়া যাইব, শুনিতে পাইলাম মেয়েটি পিছন হইতে ডাকিতেছে, বাবু শোন, কথা আছে। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। সেই মেয়েটি আমার কাছে আসিয়া আবার কহিল, কথা আছে বাবু শোন!

তখন আমার মনে কি ভাবের যে উদয় হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু অবাক্ হইয়া তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া একটু হাসিয়া সে বলিয়াছিল, অমন করে কি দেখছ বাবু?

আমি কহিলাম, তোমাকে।

ক্ষণেতে সমস্ত মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। বলিল, রাস্তার লোকের দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকে কেউ, না?

আমি কহিলাম, জানি না, কিন্তু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

সে আরও লজ্জিত হইয়া বলিল,—সে যাক্। আমি আজ কদিন থেকে চাকরী খুঁজছি, পেলে কারো বাড়ী ঝির কাজ করি। বল্‌তে পার কারো বাড়ী চাকরী পাওয়া যায়?

আমি আনন্দে বলিয়া উঠিলাম, ভাবনা নাই তোমার। এস, আমার সঙ্গে এস। আমি তোমার কাজ দিব।

সে হাসিয়া উঠিল; বলিল—আমার জন্য কি নতুন একটা চাকরী তৈরী করবে যে চাকরী জুটিয়ে দেবে বলচ?

আমি কহিলাম, না গো না, এ কদিন আমি একটা ঝিই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। রোজ রোজ তারই জন্য এদিক দিয়ে হেঁটে যেতাম দেখ নি?

বটে! তারই জন্য?—তা হতে পারে। বলিয়া অকারণে হাসিয়া বলিল, আমার নাম লীলা।

সেইদিন হইতে আমাদের বাড়ীতে লীলার কাজ জুটিল। আমারও আর সেই পুরাণো রাস্তাটার মোড় ঘুরিবার কিছুমাত্র উৎসাহ রহিল না।

নিজের ঘরের মধ্যে এমন করিয়া প্রত্যাশিত ভাবে লীলাকে পাইয়া আমি এমন একটা বিজয়-আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম যাহা আজও আমি ভুলিতে পারি নাই। লীলা আমাকে কখনো সঙ্কোচ করে নাই, তাহার হাসিও থামিয়া যায় নাই।

জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনোদিন লীলার কোন পরিচয় জানিতে পারি নাই। হইলে কি হয়? ভালবাসার ত জাতবিচার নাই। আমার সমস্ত প্রাণ কি ভাল বাসিতেই তাহাকে চাহিত, তাহা আমি কি করিয়া বুঝাইয়া বলিব?

মনে করিওনা ছোটলোকের মেয়ে বলিয়া ভালবাসা বুঝিবার কিংবা ভালবাসিবার তাহার ক্ষমতা ছিল না। আজ যতই তাহাকে মনে করিতেছি ততই চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে এবং এই কথাটাই মনে হইতেছে, এত বড় মন ও প্রেমের পরিচয় দিয়া যে গেল কিছুতেই তাহাকে কেবল মাত্র দাসী বলিয়া আর ভাবিতে পারি না। নিশ্চয় তাহার বড় পরিচয় কিছু ছিল, যাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তাঁহার অন্তর্যামী জানিতেন।

এ কথাও আমার অনুভব করিতে দেরী হয় নাই যে সে নিভৃতে তাহার হৃদয়ের একান্ত ভালবাসা ও পূজা আমাকেই নিবেদন করিয়া দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সংক্ষেপে বলিব। তরুণ মন, তখন সংসারের বাঁধাবাঁধি ও শাসনকে আজকের মত ভয় ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিতে শিখি নাই। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম, এই মেয়েটিকেই বিবাহ করিব। কারণ এমন করিয়া এত সহজে আর কাহার হৃদয়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে পারিব এবং কেই বা আমাকে এত প্রাণঢালা ভালবাসা দিতে পারিবে? তখন অন্তরের মধ্যে স্বাধীনতা ও সরলতার যে প্রাচুর্য্য ছিল তাহারই জন্য ইহা কিছুই কঠিন বলিয়া বোধ হইল না।

সুতরাং মাকে বলিলাম, মা, লীলাকে আমি বিবাহ করিব।

মা অত্যন্ত রাগ করিলেন, অনুনয় বিনয় করিলেন, এবং অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাকে চিঠী লিখিতে বসিলেন।

বাবা লিখিলেন, সত্য! কেন্ন যদি আমাকে এমন কথা শুনিতে হয়, তবে আর তোমার মুখ দেখিব না। সেই হতভাগীকে আজই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে

সে বড় গভীর বিষাদে রাত্রি কাটিয়াছে। বেশ মনে আছে সেদিন নিরুপায় কান্নায় কান্নায় বালিশ বিছানা ভিজিয়া গিয়াছিল। এই বাধা পাইয়া আমার সমস্ত যৌবনজগতের বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। এবং লীলাকে পাইবার জন্য মন আরো বেশী করিয়া উদ্বেলিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিধাতার দ্বারে নালিশ পাঠাইতে লাগিল।

আমি মনে মনে কহিলাম, লীলা, তোমাকে আমি বিবাহ করিবই। সংসারের বড় [illegible] হইয়াছে যে আমাদের দুজনের প্রেমের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতে চায়। কিন্তু তাহাকে আমি ভয় করি না। আমি জানি ইহার পর উভয়ের প্রেমে উভয়ে পূর্ণ থাকিয়া সারা জীবন কাটাইয়া দিতে পারিব।

আমি কহিলাম, লীলা, তোমায় আমি বিবাহ করিব। লীলা আমার দিকে আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া রহিল আবার কহিলাম, লীলা, তোমায় আমি বিবাহ করিতে চাই।

লীলা হাতজোড় করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, অমন কথা তুমি বলিও না। ওগো, অমন করিয়া নিজেকে তুমি অপমান করিও না। আমি সহ্য করিতে পারিব না।

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, লীলা, সত্য বলিতেছি, তোমাকে নহিলে আমার চলিবে না, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।

লীলা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, তোমার অতখানি

প্রেমের আমি কি যোগ্য? আমি সে যোগ্য নহি। আমাকে এত ভালবাসিও না।

আমি কহিলাম, এস, আমরা পলাইয়া যাই।

কিন্তু না, লীলা কিছুতেই সেই কথা শুনিল না। আমাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিত বলিয়াই সে অমন প্রাণপণ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আমাকে রক্ষা করিতে চাহিল। তাহার অন্তরকে সে আমাকে দান করিয়াছিল, কিন্তু ঐ দেহটা কিছুতেই দিতে চাহিল না। সে বলিল, উহা পবিত্র নয়। উহা তোমাকে দিতে পারিব না।

লীলাকে কোন মতে বিবাহ করিতে পারিলাম না। শুধু তাই নয়। ইহার পর আমি একদিন একা ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় লীলা আসিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, আমার একটা কথা রাখিবে?

আমি বলিলাম, বল।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।

সে যে কত কষ্টে এই কটা কথা বলিল, এবং হাসি দিয়া নিজেকে ও আমাকে কতদূর ছলনা করিতে চাহিল, তাহা আমার অন্তর্যামী মন সহজেই ধরিতে পারিল। এবং সেই জন্য বক্ষের পুঞ্জীভূত বেদনা অশ্রু হইয়া চোখ দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রুদ্ধকণ্ঠে তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিলাম, লীলা, তুমি! তুমি এই কথা বলিতেছ! এতটা নিষ্ঠুর কখনো হইও না।

মুহূর্ত্তের জন্য বোধ করি সে ধৈর্য্য হারাইল। অশ্রু সজল চোখে আমার বক্ষে তার মুখখানি রাখিল।

আমি বলিলাম, লীলা এমনি করিয়া যদি অনন্তকাল কাটিয়া যায় তাহা হইলে বিধাতার কাছে আমার কিছুমাত্র নালিশের কথা থাকে না।

সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমার দুই হাতের উপর দুই হাত রাখিয়া বলিল, আমার আজিকার এ স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিও। আমা অপেক্ষা কে বেশী জানে যে আমাকে বিবাহ করিলে তোমার ভালবাসার অপমান হইবে? সে হইতে পারে না। আমার ভালবাসাকে তুমি যদি একটুও শ্রদ্ধা কর, তবে তুমি নিশ্চয় বিবাহ করিয়া আমাকে রক্ষা করিবে।

আমি অধীর হইয়া কহিলাম, আমি বিবাহ করিলে তোমাকে কি করিয়া রক্ষা করা হইল?

সে হাসিয়া বলিল, বুঝিতে পারিতেছ না? আমার জন্মের ইতিহাস ত শুভ্র নয়, অকলঙ্ক নয়। পাপে যে জন্মিয়াছি। সুতরাং এই দেহ তোমাকে দান করিয়া তোমার মান কলুষিত করিব না। আর তুমি যদি বিবাহ কর, তবেই আমি এখানে থাকিতে পারি। কারণ আমি ত রক্তমাংসে গড়া মানুষ, দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে। নিজেকে আমি কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং একমাত্র তুমি বিবাহ করিলে আমার এখানে থাকা সম্ভব হয়।

সেদিন আমি এ সকল কথা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু আজ বুঝিয়াছি, সে ছলনা দ্বারা সে আমাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। সে যে আমাকে অশান্ত ভালবাসে, আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহারই জন্য কাছে কাছে থাকিতে চাহিয়াছিল, একথা বুঝিতে পারি নাই। সে জানিত, তাহার আমার গৃহে থাকিবার একমাত্র উপায় আমারই বিবাহ দেওয়া। কারণ পিতা তাহাকে দূর করিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

আর বেশী কিছু বলিবার নাই। আমি বিবাহ করিলাম। চারি বছর পরে আমারই বুকে আমারই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দাসী লীলা প্রাণত্যাগ করিল। ইহারই পরে আমি দেশের কাজে মাতিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম সুখ যদি কোথাও থাকে ত এইখানে। এবং বিরাট কর্ম্মস্রোতের মধ্যে সেই সন্ধ্যার বিদায় কাতর মুখখানিকে ভুলিয়া গেলাম।

আজ আমি বুড়া হইয়াছি, অনেক যশ উপার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু জীবনের এই সন্ধ্যাবেলায় দেখিতেছি, জীবনের সেই প্রথম প্রভাতে একটি মেয়ের যে অতুলনীয় ভালবাসা পাইয়াছিলাম তাহার মত কিছুই নহে। বিশ্বাস কর, আজ আমার মনে হইতেছে, আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। পরপারের তীরে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছে তাহার স্মৃতিকে গোপন করিয়া এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছি বটে, কিন্তু হায়, আমার লীলাকে আজও আমি তেমনই ভালবাসি, তাহারই জন্য পথ চাহিয়া আজও মনে মনে বসিয়া আছি।

জানি, তোমরা আমার এই আচরণকে অতি নিন্দনীয় বলিবে। বলিবে, এমন করিয়া একজন জন্মের ইতিহাসহীন

রমণীকে আজীবন ভালবাসিয়া আমি অপরাধ করিতেছি এবং যাঁহাকে আমি বিবাহ করিয়াছি, তাঁহারও প্রতি অন্যায় করিতেছি। কিন্তু ভাই, মন কি এ সব-ন্যায় অন্যায়ের সীমা রেখা মানিতে চায়? তাই বলিয়াছি, পরলোকে যদি ইহার জন্য শাস্তি পাইতে হয়, সহ্য করিব। কিন্তু তাহার আগে লীলাকে যেন একবার দেখিতে পাই।

দাদামহাশয়।

শ্রীসুধানলিনীকান্ত দে।

(পুরস্কার রচনা।)

অনুমান

নদী জলে ভেসে যায় খসে'-পড়া পাতা
নেচে' নেচে' মৃদু বায়
এক্-আকাশ জোছনায়
স্নান করি'। বুকে লয়ে' বনানীর গাথা।
তরল সঙ্গীত তুলি'
ছোট ছোট ঢেউ গুলি
ফুটিছে টুটিছে কত নিমেষে নিমেষে
রূপালি নদীর নীরে
তরী গুলি ধীরে ধীরে
কেবা জানে চলিয়াছে কোন্ বিদেশে!
স্বর্ণ শত তারা লয়ে'
আকাশ-স্তবধ হয়ে'
চেয়ে আছে অধো দিকে থির অপলক
পড়েছে তারার ছায়া
চিত্রিত চাঁদের মায়া
নদী নীরে—কাঁপিতেছে আনন্দ পুলক!
আনন্দে কি বেদনায়
মূরছি তটের গায়
পড়ে এসে উর্ম্মিরাশি, জেগে উঠে গান।

ওপারে বনানী-রেখা
যেন মধ্য স্বর্গ-রেখা
দ্বিখণ্ডিত বিশ্ব-রূপ দ্বিভাগ সমান
যেন এক দিব্য ছবি
আঁকি কোন্ মহা কবি
কোথায় চ'লয়া গেছে' বহুদূর পারে
হেরিয়া রচনা তাঁর
স্বপনের মত প্রায়
মাঝে মাঝে মনে হয় চিনি বুঝি তারে।
অর্থহীন একি সবি?
সে কি রে উন্মাদ কবি
আঁকিয়াছে ভাবহীন কেবলি অক্ষর?
এই ছবি এই গান
এই হাসি এই প্রাণ
নাহি কি ইহার মাঝে কিছু অনশ্বর?

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র

(পুরস্কার রচনা।)

আজ আমি দুরাশায় মুগ্ধ হইয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। জানি না ইহা সুধী-সমাজে সমাদৃত হইবে কিনা? তবে আশার মধ্যে—

"চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রে পতিতাকৃষিঃ
ন শালেস্তম্ব বপ্ত গুণমপেক্ষ্যতে॥"

অথবা বিবুদ্‌বৃন্দের স্বভাবই এই যে

"যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমবাম্বুমধ্যাৎ।"

তাই আমি আজ এই প্রবন্ধ লিখিতে সাহসী। আশাকরি আমার এই সামান্য প্রবন্ধ তাঁহাদের কৃপালাভে বঞ্চিত হইবে না।

ভারতবর্ষ চিরকালই কল্পনাকুঞ্জরিত কবিকুলের কাব্য-কানন। বহু পুরাকাল হইতে সোনার ভারতবর্ষ কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির বীণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত ছিল। তাহার পরও অনেক কবির কাকলী বঙ্গের কাব্য জগৎকে বসন্ত আমোদে আমোদিত রাখিয়াছিল। কিন্তু ইহার বেশীর ভাগই গীতি কবিতা। জয়দেব বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ এই গীতিকবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। যাহা আজও বঙ্গভাষার আসর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে নাই।

খাঁটি বাংলা ভাষার নাটককারগণের নাম একটুকু পুরাণ দিনের ইতিহাস হইতে অন্বেষণ করিলে আমাদের প্রথমেই কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের নাম মনে পড়ে। আধুনিক নব-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন কাব্যে মাইকেল, উপন্যাসে বঙ্কিম, তেমনই নাট্য সাহিত্যে দীনবন্ধু বাবু।

তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা নাট্যপথে রস-সাহিত্যে নবীন ভাবের ধারায় মানবের মনকে আপ্লুত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তন্মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ভদ্রার্জ্জুন প্রভৃতি আরও দুই চারিখানি দীনবন্ধু বাবুর পূর্ব্বতন সময়ে লিখিত নাট্য গ্রন্থরাশির ভিতরে নাটক নাম পাওয়ার যোগ্য। তাহা ভিন্ন অপর যে কয়েকখানি দেখা দিয়াছিল সে সকল 'গোদোমাল'।

কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব ও ভদ্রার্জ্জুন সে সময়ের শ্রেষ্ঠ নাটক হইলেও তাহাদের দ্বারা নাট্য সাহিত্য সবিশেষ পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। "নাট্যং নটেন বিনিয়োগার্হং" —যাহা নটগণ কর্ত্তৃক অভীনিত হয়—তাহাই নাট্য। তাহার চরম সার্থকতা অভিনয়ে। এই জন্যেই নাটকের অপর একটী নাম দৃশ্যকাব্য, যাহা দর্শন করিলে অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে যাহার অভিনয় দেখিলে হৃদয়ে বিমল কাব্যরস উপভোগ-জনিত আনন্দ অনুভব করা যায়—তাহারই নাম দৃশ্যকাব্য। সুতরাং দৃশ্যকাব্যের প্রথম সার্থকতা অভিনয়ে, আর বাংলার আদি রঙ্গমঞ্চে আমরা দৃশ্যকাব্যের প্রথম সার্থকতা দেখিতে পাই—দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থাবলীতে। যাহা বহু লোকের সম্মুখে অনেক সখের রঙ্গমঞ্চে ও ব্যবসায়ীর থিয়েটারে অভিনীত হইয়া বঙ্গদেশে যুগান্তর আনিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সাহিত্য দর্পণের মতে নাটকের লক্ষণ—

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতং।
বিলাসর্দ্ধ্যাদি গুণবদ্ যুক্তং নানা বিভূতিভিঃ।
সুখ দুঃখ সমুদ্ভূতি নানারস নিরন্তরং।
পঞ্চাদিকা দশপরা স্তত্রাঙ্কা পরিকীর্ত্তিতাঃ
প্রখ্যাত বংশো রাজর্ষি ধীরোদাত্ত প্রতাপবান্

* * * *

এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এববা,
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্ব্বে কার্য্যং নির্ব্বহণেঽদ্ভুতং।

*

এ লক্ষণ দীনবন্ধু বাবুর—শুধু দীনবন্ধু বাবুর কেন বাংলার কোনও নাটকে খাটে না। বিশেষতঃ তাঁহার নীলদর্পণ ব্যতীত অন্য নাটকগুলির একখানিও খ্যাতবৃত্ত নহে। তাহার কারণ এইটুকু ধরা যাইতে পারে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকারগণের মত সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণকারী (blind follower) ছিলেন না।

প্রাচীন নাটক কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব ও ভদ্রার্জ্জুন—এই দুইখানি বহি যথাক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিজয়চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রাচীনত্ব-পুরস্কারে উক্ত নাটকদ্বয় অমূল্য হইলেও নাট্যসাহিত্যের রসসৃষ্টির চরম সার্থকতা উহাদের দ্বারা হয় নাই। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ছন্দে রচিত পাশ্চাত্য আইন অনুসরণে লিখিত ভদ্রার্জ্জুন দৃশ্যকাব্য না হইয়া শ্রব্যকাব্য হইলে সাহিত্য জগতে আরও অনেক ঊর্দ্ধ আসনলাভ করিতে সমর্থ হইত। সাহিত্যদর্পণোক্ত প্রকরণের সহিত মিল রাখিয়া মৃচ্ছকটিকের মত কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব প্রণীত হইয়াছিল। আমরা সংস্কৃত হইতে এত বেশী পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম যে—সেই সময়েও কুলীন-কুলসর্ব্বস্বকে ঠিক আপনার করিয়া লইতে পারি নাই।

ইহাতেই অনুমিত হয়—কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের আমলে বঙ্গীয় দৃশ্যকাব্য নেহাইৎ স্তনন্ধয় শিশু না হইলেও একেবারে নাবালক শ্রেণীভুক্ত ছিল। এবং তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য নাবালক শ্রেণী হইতে সাবালক শ্রেণীতে উন্নীত হয়।

দীনবন্ধু বাবুর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে খানকতক নাটক সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা হইতে অনূদিত হইয়া বঙ্গবাসীর দুয়ারে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। তাহার প্রায় অধিকাংশই নায়ক-নায়িকার উৎকট প্রেমাভিনয়ে পরিপূর্ণ।

তাহার অব্যবহিত পরে দীনবন্ধু বাবুর পুস্তকের প্রচার হওয়ায় উক্ত দোষ অল্লাধিক পরিমাণে তাঁহার লিখিত চরিত্রেও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমি নিজের মত নিবদ্ধ না করিয়া বঙ্কিম বাবুর অভিমত কিছু তুলিয়া দিলাম—

"দীনবন্ধুর এই দুইটী গুণ (১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি—তাঁহার কাব্যের গুণ দোষের কারণ। * * *। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই, যে—যেখানে এই দুইটীর মধ্যে একটীর অভাব হইয়াছে—সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক-নায়িকা (Hero এবং Heroine), তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল, কামিনী বা বিজয়ের বেলা—লীলাবতী বা ললিতের বেলা, চরিত্র ও ভাষা উভয় বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্ব্বব্যাপী, তবে এখানে নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকার কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না কেন না কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালাসমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, 'কোর্টশিপে'র পাত্রী হইয়া বিবি 'কোর্ট' করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে—এমন মেয়ে বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না। কেবল আজ কাল না কি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরাজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে—ইংরাজকন্যার জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে।"

কিন্তু এ কথা বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়া গিয়াছেন—"আমাদের দেশে বড় জোর প্রণয়পাত্রের চাদরখানা লইয়া গায়ে দিতে পারে। তার বেশী এ দেশের ধাতুতে সহ্য হইবে না।" যাউক্.

বঙ্কিমবাবু দীনবন্ধু বাবুর নায়কের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজকর্ম্ম নাই—কাজকর্ম্মের মধ্যে কাহারও Philanthrophy, কাহারও কোর্টশিপ. এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালাসমাজেই নাই। কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই এখানে দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।"

কিন্তু এ লেখার উপরেও দুই একটা কথা বলা যাইতে পারে। সকল সময়েই লেখকের সব লেখা সমাজের প্রতি চাহিয়া জন্ম গ্রহণ করে না—অথবা পরিস্ফুট হয় না। লেখকের অনেক সময় এদিকেও দৃষ্টি পড়ে—দেশের লোক কি চায়? সমাজে না থাকিলেও সমাজের Majorityর (সমষ্টির) ঝোঁকটা কোন দিকে? দীনবন্ধু বাবুর সময় লীলাবতী বা কামিনী সমাজে না থাকিলেও—সমাজের লোক লীলাবতী বা কামিনীকে চায়। প্রতীচ্যবাণীর বরপুত্র হইলেও দীনবন্ধু বাবুর অন্তর সংস্কৃতের প্রভাব-বর্জ্জিত ছিল না। নায়ক-নায়িকার কথোপকথন তাই অলঙ্কারে বুঝি করিয়াছেন। তবে এইখানে একটু ব্যক্তিগত বিশেষত্ব আছে যে, তিনি নায়িকাকেও স্থানে স্থানে পয়ারে 'প্রমাণ' দিয়াছেন।

চরিত্রই নাটকের শ্রেষ্ঠ বর্ণনীয়। সুতরাং নায়ক-নায়িকার চিত্র যদি পছন্দসই না হয়; তাহা হইলে সে নাটক কেমন করিয়া দেশের ও দশের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে? তদানীন্তন সময়ে একটা প্রণয়ের দমকা হাওয়া সমাজবক্ষঃ আলোড়িত করিয়া দিয়াছিল। যদিও সে পদার্থটা আকাশ কুসুমের মত কল্পনাতেই রহিয়া গিয়াছে, তবুও তাহার প্রবাহের আঘাতে সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে বিচলিত হইয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর লেখার মধ্যে দেখিতে পাই "কেবল আজ কাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি।" তাই—

"আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"

এই নজিরের বলে বিদ্বদ্বৃন্দের পরিতোষের জন্য উৎকট প্রেমের অবতারণা। এমনও একটা কথা শোনা যায়—যে, প্রণয়বর্ণনা অর্থাৎ আদিরস ব্যতীত নাটক হয় না। সে বেশীদিনের কথা নয়—প্রায় বছর সাতেক পূর্ব্বে—আমি

তখন কাব্য-শাস্ত্রের উপাধির পাঠ্য পড়ি, আমার একটী প্রবীণ মেদিনীপুরঅধিবাসী সহপাঠী কিছুতেই মুদ্রারাক্ষসকে নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, বই খানিতে আদপেও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ নাই—এবং আদি রসের পক্ষাঘাত হইয়াছে।

কিন্তু কেবল এক রসের বর্ণনায় নাটক প্রণয়ন হয় না। একঘেয়ে মিষ্টও কাহার ভাল লাগে না। তাই শকুন্তলার বিদূষক বলিয়াছেন—"তিন্তিড়িএ উবরে জিঅস্ত পিণ্ডিখজ্জুরেহিং সদ্ধা ভোদি।" তাই অন্যান্য রসের অবতারণার জন্য অন্যান্য চরিত্রের সমাবেশ। সে বিষয়ে দীনবন্ধু বাবু ফাল্গুনীর মত সব্যসাচী। কারণ তাঁহার ভূয়োদর্শন এত বেশী ছিল যে, অবান্তর বর্ণনায় ফোয়ারার মত কলমের ডগা হইতে রসের সলিল বিকীর্ণ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। বিশেষতঃ হাস্যরস বিষয়ে।

"ঘোড়াটাকে আমি বড় ভালবাসি, ওর একটা বিশেষ গুণ আছে—ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।" কমলে কামিনী।

এই প্রকারের হাসির কথায় তাঁহার প্রতিনাটকই পরিপূর্ণ। বেশী আর কি বলিব—নিমেদত্ত জলধর মদেরচাঁদ প্রভৃতি তাহার পরিপূর্ণ উদাহরণ কেহ কেহ বলেন—"নিমে দত্তের মত একজন শিক্ষিতকে এরূপভাবে হীন করায় শিক্ষার অবমাননা করা হইয়াছে। এবং সেটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।" এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য—অস্বাভাবিক ত' মোটেই নয়—বরঞ্চ তাঁহার "বাবা, গুরুতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটী হয়েছ বিদ্যার জোরেত' হওনি"র (সধবার একাদশী) মত ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিদ্রূপ। নিমে দত্তের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া বহুদিন পূর্ব্বে পিতৃদেবের মুখ হইতে শ্রুত একটী মাতালের গল্প মনে পড়িয়া গেল। বোধ হয় এ হাসির আলোচনায় সেটুকু তুলিলে বড় বেশী অসঙ্গত হইবে না।

ভদ্রলোক দেখিয়া পিতৃদেব সেই কামরায় উঠিলেন। ভদ্রলোক তখন মদ খাইয়া চুর হইয়া ছিলেন। তিনি পিতৃদেবকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিয়া 'জলপথে চলা অভ্যাস আছে' ইত্যাদি পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এক গ্লাস মদও তাঁহার সম্মুখে ধরা হইল। "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে"—বলিতে বলিতে তিনি অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। যাহাতক পিতৃদেবের এই কথা বলা, সেই সঙ্গে মাতাল গোঁ ধরিল—"অথবা কৃত বাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ। মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" এই সংস্কৃতের ঝঙ্কারে পিতৃদেব তাহার মর্য্যাদা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া অন্যান্য সহযাত্রীগণের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। অবসরক্রমে যেই তাহার পানে একবার ফিরিলেন, অমনি মাতাল মৃদুস্বরে হাত নাড়িয়া বলিল—

"Twinkle Twinkle little star,
How I wonder what you are!"

কবিতা শুনিয়া পিতৃদেবের কিঞ্চিৎ হাসির উদ্রেক হইল। যেমনই হাসা—তেমনই সে বেটা সুর করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী।"

এই চাক্ষুষ নিমেদত্ত দীনবন্ধুর নিমে দত্ত হইতে বড় বেশী কম যায় না। ইনিও এম, এ।

দীনবন্ধু বাবুর যে সময় আবির্ভাব—সে সময় বঙ্গসাহিত্যে যুগপৎ বোধন ও বিসর্জ্জনের কাল। প্রবীণকে বিদায় দিয়া বঙ্গবাসী তখন নবীনের সমাদরে ব্যাপৃত। তবে প্রবীন ও নবীনে বিসদৃশভাব ছিল না। প্রবীন ঈশ্বরগুপ্তের নবীন সাহিত্যরথী দীনবন্ধু রঙ্গলাল মাইকেল বঙ্কিম প্রভৃতি শিষ্য স্থানীয় এবং সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতার খাতিরে ঋণী।

দীনবন্ধু বাবুর কৈশোরজীবনের নব আদর্শ তাঁহার সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছিল—ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদিত প্রভাকর। তখন ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গ সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার আধিপত্য বাৎসল্যভাব বিজড়িত ছিল। আধুনিক এডিটারদিগের মত তিনি প্রথমেই প্রবন্ধের নিম্নে সহি নামের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না। তিনি তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার এই গুণের জন্যই Hindu Patriot এর অভিমত—যে তিনি আধুনিক লেখকদিগের গুরুস্থানীয়।

কিন্তু দীনবন্ধু বাবুর লেখাতে গুরুর বিদ্যার মর্য্যাদা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের লেখায় সেটা অনুভব-বেদ্য।

"এলোচুলে বেণে বউ আল্‌তা দিয়ে পায়
নলক নাকে কলসী কাঁকে জল আন্‌তে যায়।"

এই সকল কবিতা দেখিলে স্বতঃই প্রভাকরের গুপ্ত কবিকে মনে পড়ে। বঙ্কিম বাবুর হিসাবে এখানে গুরুশিষ্য এই মাত্র প্রভেদ—যে ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (wit) প্রধান, দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান।

তাই তাঁহার প্রত্যেক নাটকে হাস্যরসের বহুলতা দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই হাস্যটাই অন্যান্য রসের চেয়ে তাঁহার হাতে খেলিয়াছে ভাল। সেই ভালর নেশাতেই অনেক নাটকই তাঁহার নাটকের আকারে প্রহসন।

সংস্কৃত নাটক বলিলে যে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীটুকু পাওয়া যায়, বাংলার নাটকের লক্ষণ তাহা অপেক্ষা বিস্তৃতবিসর। নাটক প্রকরণ ভাণ প্রভৃতি সংস্কৃতের আলঙ্কারিকের সমস্ত ভেদগুলিই বঙ্গভাষায় ওই একই নাটকের অন্তর্গত। এক কথায় সাহিত্যদর্পণের মতে "দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং" "তদ্রূপারোপাত্তু রূপকং" এই লক্ষণদ্বয়ে যে পদার্থ বোঝা যায়, তাহাই বাংলায় নাটক অর্থাৎ দৃশ্যকাব্য। তাহা হইলে আর দীনবন্ধু বাবুর লেখায় নাটকত্ব হানি হইতে পারে না। বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে অভিনেয় দুইটী পদার্থ দেখা যায়। প্রথম নাটক, দ্বিতীয় প্রহসন।

সাহিত্য দর্পণকার বলিয়া গিয়াছেন—

"ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতং"

কবিকল্পিত সামাজিকদিগের নিন্দনীয় চরিত্রের বর্ণনা যে পুস্তকে আছে তাহাই প্রহসন। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রভৃতি দীনবন্ধুবাবুর দু'একখানি বহি প্রহসনেরই অন্তর্গত।

নাটকে রসসৃষ্টি বিষয়ে সহানুভূতিই মুখ্য কারণ। সহানুভূতির অভাবে অনেক সময় আদর্শ যেন প্রাণহীনের দস্তুরিকাদের মত। দীনবন্ধু বাবু যখন পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টে কাজ করিতেন—সেই সময় তাঁহার চোখে পড়ে নীলকর সাহেবদিগের নিদারুণ অত্যাচার। সেই সহানুভূতির ফল্গু—"নীলদর্পণ।" ইহার পরই তাঁহার নবীনতপস্বিনী। নবীনতপস্বিনীর হোঁদলকুতকুতের মূল প্রধান কিম্বদন্তী। Merry wives of windsor এর ভাবাবলম্বনে বোধ হয় জলধর ও জগদম্বার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি অনেকের মতে রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। দীনবন্ধু বাবুর নাটকগুলি আলোচনা করিলে বাস্তবিক বেশ বোঝা যায়, প্রকৃত ঘটনা, জীবিত চরিত্র, ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী, জনশ্রুতি চলিত মেয়ে পাঁচালী, খোস গল্প, এই সকল দীনবন্ধুবাবুর নাটকের উপাদান। তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। কিন্তু কি 'নীলদর্পণ' কি বিয়ে পাগলা বুড়ো' কি 'সধবার একাদশী' সর্ব্বত্রই চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে ওই এক কথা। এখানেও আমি বঙ্কিমবাবুর অনেক পংক্তি অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"দীনবন্ধুর অনেকগুলি গল্প প্রকৃত ঘটনা মূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। নীলদর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত। নবীন তপস্বিনীর বড়রাণীর ছোটরাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত, সধবার একাদশীর প্রায় সকল নায়কনায়িকাগুলিই জীবন্ত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; বর্ণিত ঘটনাও প্রকৃত। বিয়ে পাগলা বুড়োও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।"

এই জন্যই বোধ হয় কেহ কেহ বলেন—নিমেদত্ত একজন তথাকথিত প্রধান সাহিত্যিকের 'কেরাকেটার টা'। কিন্তু ইহাতে দীনবন্ধুর কৃতিত্বের অর্থাৎ সৃজন-নিপুণতার অসামর্থ্য ধ্বনিত হইতেছে না। কারণ মনে রাখিতে হইবে—ইহারও বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্যের জন্য বেশী মাত্রায় সৃষ্টি সামর্থ্যের প্রয়োজন। এখানে কলাকৌশলের (Art এর) অভাব হইলে সুফল হওয়ার সম্ভাবনা আদপেই নাই। যে হেতু সমস্ত কাজই ক্ষমতার মুখাপেক্ষী।

দীনবন্ধু বাবু ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমসাময়িক ছিলেন। তাহা হইলেও মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব্বে দীনবন্ধু বাবুর নীলদর্পণ রচিত। মাইকেল মধুসূদনের প্রথম সৃষ্টি পদ্য সাহিত্য এবং প্রায় শেষ সময়ে তিনি দুই একখানি নাটক ও প্রহসন বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়া যান। ১৮৫৯ সালে বাংলা সন্দর্ভে মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়; তাহার পর বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। সুতরাং সাহিত্যজগতে প্রবেশ কাল হিসাবে দীনবন্ধুবাবু মাইকেল অপেক্ষা জুনিয়ার হইলেও নাট্য সাহিত্যে অনেক সিনিয়ার ছিলেন।

সাহিত্যে আজ কালের দিনে একটা কথা বড় করিয়া

উঠিয়াছে—সেটা চলতি ভাষায় ওকালতী। মুখের কথায় বর্ণনা করিলে সেটা সহজে বোধগম্য হয়—এই তাহার সার। আমার মনে হয় আধুনিক চলতি ভাষায় লেখা—

"অশ নদীর সুদূর পারে—
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।
নিজের হাতে নিজে বাঁধা
ঘরে আধা বাইরে আধা
এবার ভাসায় সন্ধ্যা হাওয়ায় আপনারে।
কাটল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে
কথার সে ভার নামাবে মন
নীরব হয়ে শোন দেখি শোন
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন বীণার তারে।"

এই কবিতার চেয়ে দীনবন্ধু বাবুর লেখা—

"যে মাটীতে পড়ে নর উঠে তাই ধরে"

অথবা

"গড়গড় তাড়াতাড়ি
চলিছে রেলের গাড়ী
ধারেতে নড়িছে বাড়ী
জানলায় পড়ে সাড়ী
রমণীরা দেখিছে।"

প্রভৃতি কবিতা অধিক চলতি অর্থাৎ বেশী জনসাধারণী। আজ কালকারের চলতির মত 'কলোক্যালের' চাপরাশ বক্ষে বহন করিয়া অবোধগম্য নহে। যেন আপনারই তালে স্বচ্ছন্দগমনে মরালগতি।

কেহ কেহ অভিযোগ করেন—"দীনবন্ধু বাবুর লেখা সর্ব্বস্থানে সুরুচি-সঙ্গত নয়"—অর্থাৎ আধুনিক মার্জ্জিত সাদা কথায় বস্ত্রাবৃত উলঙ্গ নয়। একেবারে খোলা। সুতরাং অশ্লীল হিসাবে অপাঠ্য। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় নবজীবনে একটী বেশ ভাল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার ভাবাংশ এই।—আমরা একেবারে উলঙ্গের প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারি না। কেন না একটা সঙ্কোচ যেন আমাদিগকে প্রতি পদে বাধা দেয়। কিন্তু পরিচ্ছদের মধ্যে আবরণবিহীন অর্থাৎ অর্দ্ধনগ্ন আমাদিগকে তাহার নগ্ন সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। সেইরূপ সাহিত্যের খোলাভাব তত দোষাবহ নহে—যত দোষ ঢাকা-ঢাকা খোলা খোলার মধ্যে। তবে সংস্কৃতের প্রভুতা এই অশ্লীলতার একটা কারণ বিশেষ। কেন না—এই অশ্লীলতা—অর্থাৎ এই খোলাভাব সংস্কৃত সাহিত্যের মজ্জাগত। কাব্যের অস্ফুট সৌন্দর্য্যের দোহাই দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া বলিতে সংস্কৃত সাহিত্যকারগণ অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহারা যখন যে ভাবের বর্ণনা করিতেন—তখন তাহার অন্ত পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িতেন না।

ইংরাজির হস্তরেখাও যে তাঁহার ছিল না—তাহা নয়। তাহার প্রভুতা চিহ্ন কয়েকটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। আর একটীর উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। Shakespeare তাঁহার All's well that Ends well নামক নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে 'বারট্রামে'র সম্মুখে বন্দী 'প্যারোলেসে'র যে অবস্থা দেখাইয়াছেন—তাহারই আবছায়া বোধ হয় দীনবন্ধু বাবুর কমলে কামিনীর তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে শিখণ্ডী-বাহন মকরকেতন প্রভৃতির হাতে বকেশ্বরের অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্দী প্যারোলেসের চোখ বাঁধা—বকেশ্বরেরও তাই। প্যারোলেস স্বকর্ম্ম সন্ধানে চক্রান্ত বদ্ধ—বকেশ্বরও সেই রকম। হু-বহু অনুবাদ অপেক্ষা এই লেখা আমাদের অন্তরের সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে। একজন বড় পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন—"যিনি যত বেশী শিক্ষিত তিনি তত বেশী মৌলিকতাহীন।" এ কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

উপসংহারে আর বেশী কথা বলিতে চাহি না। তবে এ কথা ধ্রুব সত্য যে—তাঁহারা ঘৃতদীপ দানে বঙ্গবাণীর সে কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই তাঁহার আধুনিক ভক্তগণ ইলেকট্রিক লাইট জ্বালিয়া দিয়াছেন। আর সেই ঘৃতদীপ-প্রজ্বলিত আলোই আধুনিক ভক্তগণের পথপরিদর্শক। পরিশেষে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কবিবর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্রের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—

যশোর আমার যশোর আমার ভূমিল যাহার যমুনাতীর,
বাণীর বরেতে আছিল যাহার অধরে হাস্য নয়নে নীর।
দর্পণে হেরি করুণ চিত্র আর্ত্ত বাঙ্গালী মণ্ডলীর
দীনবন্ধু করে দিল দূর তাদের দুঃখ সুগম্ভীর॥

ভারতী—শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণতীর্থ।

তুমি

তুমি যে আমার জীবন-কাননে
মধুর বসন্ত হেন,
তুমি যে আমার হৃদয়-গগনে
শারদ-চন্দ্রমা যেন।

তুমি যে আমার মরম-বীণায়
ঊষার পুরবী তান,
তুমি যে আমার অন্তররাজ!
প্রাণের চেয়েগো প্রাণ।

তুমি যে আমার নয়নে নয়ন,
লক্ষ্য-পথে ধ্রুবতারা,
তুমি যে আমার চরম আরাম
কিবা স্নিগ্ধ সুধাধারা।

তুমি যে আমার সাধনার ধন
স্বর্গ, মোক্ষ, ধ্যান, জ্ঞান,
তোমারি মূরতি ধরিয়া হৃদয়ে
লভিব যে নিরবাণ।

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত

মাছধরা

"এ যে রকম মোটা বই হাতে করে চেয়ারে বসে রয়েছে, এ অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ ফেরতা গোছের কিছু একটা হবে।"

"ঐ তোর কেমন এক কথা। মেয়ে পছন্দ হল কি না, তাই বলনা।"

"শুধু মেয়ের রূপ দেখলেই ত হয় না মা।" গোকুল ফটোখানি বন্ধু অতুলের হাতে ফিরাইয়া দিল।

গোকুলের মা কিছু রাগতস্বরে বলিলেন, "সেদিন শিবপুর থেকে যে সম্বন্ধটা এল, তারা ২০০০৲ টাকার গহনা আর ১৫০০৲ টাকা নগদ দিত, বললি কিনা ও বড়লোকের মেয়ে। আজ এইটে, এরা নগদ কিছু দিক আর নাই দিক, গহনা পত্তর বেশ দেবে, এর হল কিনা মেয়ের বই হাতে! তার চেয়ে খোলসা করে বলনা কেন, যে করব না, সব দিক চুকে যায়।"

"তুমিই বল না মা, বড়লোকের মেয়েদের অহঙ্কার থাকে কি না, লেখাপড়া জানা মেয়েরা শ্বশুরে হয় কি না! এরকম মেয়ে ঘরে এলে দু'দিনে তোমার পর করে দেবে।"

"ঐ তোর কেমন এক কথ। যে করলে; বৌ আমার পর করে দেবে। দের দেবে, আমার বরাতে যা থাকে তাই হবে। এমন আমি গরীবের মেয়ে পাই কোথায় বল্!"

গোকুলের মা অতুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমিই বাবা, ওকে একটু বুঝিয়ে বল না; ও যা গোঁ ধরবে তাই!"

অতুল এতক্ষণ ফটোখানি হাতে করিয়া নীরবে মাতা-পুত্রের কলহ শুনিতেছিল, এইবার কথা কহিল, বলিল, "দেখ্ গোকলো, তোর কেমন একটা বাজে 'হুইম' আছে দেখছি। ফটোতে মেয়ের হাতে বই দেখেই আঁৎকে উঠলি; মেয়েটা নিজে গিয়ে একবার দেখ্ না হয়।"

"আর নিজে গিয়ে দেখতে হবে না; চিত্রেই স্বরূপ চিত্রিত হয়ে আছে।" বলিয়া গোকুল একটু ব্যঙ্গভাবে হাসিল।

গোকুলের মা বলিলেন, "আর জ্বালাস নি গোকলো। আমি আর কদিন আছি বল্? আমার কি বৌ নিয়ে দু'দিন সাধ আহ্লাদ করতে ইচ্ছে যায় না? তুই যদি"—গোকুলের মা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, অতুল বাধা দিয়া বলিল, "তুমি এখন অনেক দিন আছ জ্যেঠাইমা। তোমায় কিছু বলতে হবে না, আমি এই বাঁদরটাকে ঠিক করে দিচ্ছি।"

অতুল গোকুলের হাত ধরিয়া টানিল, বলিল, "চল্; বেড়িয়ে আসি।"

"এরি মধ্যে কিরে? ছ'টা বাজুক।"

"ড্যাম ইয়োর (Dam your) ছ'টা, তুই চল ত।"

দুই বন্ধুতে রাস্তায় বাহির হইয়া ট্রামে উঠিল।

অতুল গোকুলের সহপাঠী; শুধু সহপাঠী নয়, আন্তরিক বন্ধু। গোকুল যখন প্রবেশিকা পড়ে, তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। সেই সময় হইতেই অতুলের সহিত তাহার হৃদ্যতা। একমাত্র অতুলের উৎসাহে ও সৎপরামর্শে, গোকুল সামান্য পৈতৃক সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া ও মধ্যে মধ্যে দুই একটি ছেলে পড়াইয়া, কোনও প্রকারে আপনার ও মাতার গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে এবং নিজে এম, এ পর্য্যন্ত পড়িতে সক্ষম হইয়াছে। অতুল ধনীর সন্তান; কিন্তু দরিদ্র গোকুলের সঙ্গ তাহার এত প্রীতিপ্রদ যে, কতদিন সে গোকুলের বাটীতে শাকান্ন ভোজন করিয়া, তাহার সহিত একত্রে পাঠাভ্যাস ও রাত্রি যাপন করিয়াছে। ইহাদের এই ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া, কলেজের অন্যান্য সহপাঠীরা ইহা-দিগকে 'মানিক জোড়' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

শ্যামবাজারের মোড়ে আসিয়া দুই বন্ধুতে ট্রাম হইতে নামিল। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "বলি মতলবটা কি, যাবি কোথায়?"

"এই চল্ না, একটা মেয়ে দেখে আসা যাক।"

"তোর সখ হয়ে থাকে, তুই যা। আমি মোহনবাগানের ম্যাচ দেখে আসি।"

"এখনি ত এখানে আর 'ম্যাচ' হয়ে যাচ্চে না। এখানে 'ম্যাচের' জোগাড় করে, তারপর 'ম্যাচ' দেখতে যাওয়া যাবে এখন।"

গোকুল মেয়ে দেখিতে যাইতে কিছুতেই রাজি নয়। অতুল তাহাকে জোর করিয়া, শ্যামবাজারের এক দ্বিতল বাটীতে লইয়া উপস্থিত হইল। কন্যার পিতা অনুপস্থিত; কন্যার ভাই উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া মেয়ে দেখাইয়া দিলেন। বলাবাহুল্য অতুল গোকুলকে বরের বন্ধু বলিয়া তথায় পরিচয় দিয়াছিল।

কন্যা দেখিয়া বাহির হইয়া, রাস্তায় চলিতে চলিতে অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলি?"

গোকুল গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "এ ত সেই কচোঁছ বই হাতে করা মেয়ে।"

"বলি, বাড়ীর চালচলন আর মেয়ের চেহারা দেখে, বই হাতে করার কিছু দোষ দেখ্লি কি?"

গোকুল নীরব। অতুল কিয়ৎকাল পরে বলিল, "দেখ্ গোকলো, তুই বড় বাড় বাড়িয়েছিস্, তুই আমার কাছে লুকুচ্ছিস্। ঠিক করে বল্, তোর মনের ভাবটা কি?"

গোকুল হাসিয়া বলিল, "তোর যে দেখছি জোর জুলুম। চল, ঐ পার্কে গিয়ে বসিগে।"

উভয়ে পার্কের এক নির্জন স্থানে গিয়া বসিল। গোকুলকে নীরব দেখিয়া অতুল বলিল, "তুই শিক্ষিত, তুই যে লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করবি না, একথা তুই গঙ্গা জলে নেমে বললেও আমি বিশ্বাস করব না। বল্ খুলে তোর মনের কথাটা কি।"

গোকুল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আচ্ছা তুই ঠিক করে বল দিকিনি সেই "রাজধানী" পত্রিকায় 'বিবাহে পণ গ্রহণ' প্রবন্ধে তুই যে সব কথা বলেছিলি, সেগুলো কি তোর মনের কথা?"

"তুই কি বলতে চাস, আমার মুখে এক কথা আর কাজে আর এক কথা।"

"তবে আমায়ই বা—" গোকুল আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কি ভাবিয়া আবার চুপ করিয়া রহিল।

অতুল কিয়ৎকাল কি ভাবিল, পরে গম্ভীর ভাবে কহিল, "সামান্য দেনাপাওনার কথা যেখানে হবে, সেখানে যখন তুই বে করবি না বলে কৃতসঙ্কল্প, তখন তোর মনের কথাটা জ্যেঠাইমাকে খুলে বললেই ত সব গোল মিটে যায়।"

"তা হয় না অতলো, মার প্রকৃতি তুই জানিস না। যেতে টাকা চাওয়াটা যে কি দোষের সে কথা তাঁকে বোঝাতে পারবে না; উল্টে ছেলে অবাধ্য বলে রাগারাগি করবেন, আর আমার সারা জীবনটা অতিষ্ঠ করে তুলবেন।"

অতুল কি ভাবিতেছিল; হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "হুঁ, তাও বটে। তবে তুই কার্ত্তিকটি হয়েই থাক্।"

(২)

"হাঁ, সেই কথাই ঠিক। জানেনই ত অতুলবাবু, আজ কালের বাজারে টাকা খরচ করলেও জানাশুনা এমন এম, এ পাশ করা ছেলে সহজে মেলে না।"

"সেই জন্যেই ত আমি এত কথা বলছি। আমি কাল গোকুলের সঙ্গে মালঞ্চায় মাছ ধরতে যাবার বন্দোবস্ত করেছি।"

"আপনার ভরসাতেই কাজে নেমে পড়ছি; পরে বরাতে যা থাকে তাই হবে।"

"তবে ঐ কথাই রইল। আমি এখন উঠি। বেশ সাবধানে কাজ করবেন; আর দেখবেন, ছেলের মাকে সন্তুষ্ট করতে সাধ্যমত ক্রটী করবেন না।" অতুল গাত্রোত্থান করিল। কন্যাকর্ত্তা উমাচরণবাবু অতুলের সহিত সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে বলিলেন, "সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন; তার কিছুমাত্র ক্রটী হবে না।"

উমাচরণ বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, অতুল বরাবর গোকুলের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"কিরে অতলো, এত দেরী যে? তুই গিয়েছিলি কোথায়?" গোকুল অতুলের হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

অতুল সহাস্যমুখে বলিল, "আরে, মাছধরার পনির জোগাড় করতে গিয়েই যা দেরী হ'য়ে গেল। পনির পাই নি, পচা আলু আর খোল ভাজা জোগাড় করে এনেছি।"

গোকুল সোৎসাহে বলিল, "আর পনিরে কাজ নেই। খোল আর পচা আলুতেই কাল মাছ ধরে আঁটি বেঁধে ফেলা যাবে।"

গোকুলের মা গৃহকর্ম্ম করিতেছিলেন; বলিলেন, "এই বোশেখ মাসের রোদ্দুরটা সমস্ত দিন মাথায় লাগাবি তোরা!"

অতুল বলিল, "মা জ্যেঠাইমা, মালঞ্চার সে গঙ্গায় আমি আর একবার মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। সানের উপরেই এক মস্ত আম গাছ, আর পেছনে গঙ্গাদেবীর ঘর; সমস্ত দিনই ঘাটে ছায়া থাকে

"গঙ্গা কিরে?" গোকুলের মা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অতুলের মুখের দিকে চাহিলেন। অতুল সহাস্যমুখে উত্তর করিল, "তা জান না বুঝি; ঐ দক্ষিণ দেশে পুকুরই হচ্চে গঙ্গা। ওদের দেশের লোকেরা বলে, যেখান দিয়ে আগে গঙ্গা গিয়েছিল, এখন গঙ্গা মজে গিয়ে, সেখানে সব পুকুর হয়ে গেছে।"

গোকুল ও তাহার মা একটু হাসিলেন। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী ক'টায়?"

অতুল উত্তর করিল, "গাড়ী ন'টার সময়; এখান থেকে ঠিক আটটার সময় খেয়ে দেয়ে বেরুতে হবে।"

পরদিন সকালে দুই বন্ধুতে দুই গাছা ছুইল ও মসলার পুঁটলি হাতে করিয়া বেলেঘাটা ষ্টেসনে উপস্থিত হইল গাড়ী ছাড়িতে পনের মিনিট দেরী। অতুল আর কাল বিলম্ব না করিয়া দুইখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইল এবং গোকুলকে গাড়ীতে বসাইয়া, অপর একটি ভদ্রলোকের সহিত কি কথা কহিতে কহিতে টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে চলিয়া গেল। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় অতুল আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "এরি মধ্যে তুই গিয়েছিলি কোথায়?"

"ট্রেন ছাড়তে দেরী আছে দেখে, একটু ঘুরে এলুম। তোর ভয় করছিল না কি?" অতুল গোকুলের পার্শ্বে উপবেশন করিল; সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও ছাড়িয়া দিল।

মল্লিকপুর ষ্টেসনে দুই বন্ধুতে গাড়ী হইতে নামিল। একটি চাষা লোক আসিয়া করযোড়ে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি মজুমদারের গঙ্গায় মাছ ধরতে যাবে?"

আতুল উত্তর করিল, "হাঁ, তোমায় কি উমাচরণ বাবু পাঠিয়েছেন?"

"এজ্ঞে।"

"তোমার আর আসবার দরকার ছিল না; আমরা পথ ঘাট সব জানতুম। তা বেশ করেছ, চল; এই ছিপ দু'গাছা আর এই পুঁটুলিটা ধর।"

"যে'জ্ঞে।" চাষা লোকটি অতুলের হাত হইতে ছিপ ও পুঁটুলি গ্রহণ করিয়া চলিল অতুল ও গোকুল তাহার অনুসরণ করিল।

গোকুল ইতিপূর্ব্বে কখনও কলিকাতার বাহিরে পদার্পণ করে নাই। সে এই পল্লিগ্রামের খোড়োঘর, ক্ষেত, বাগান, জঙ্গল প্রভৃতি দেখিয়া মনে মনে বেশ আনন্দোপভোগ করিতে লাগিল। সে চাষা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা বাপু, তোমাদের দেশের রাস্তাগুলো সবই কি এই রকম সরু সরু আর তার দু'পাশে বড় বড় খানা।"

"এজ্ঞে, আপনাদের ত বড় রাস্তা দিয়েই নিয়ে আসচি।"

অতুল হাসিয়া বলিল, "এর বাড়ীর কানাচ দিয়ে ওর বাড়ীর উঠান দিয়ে চলাফেরা করতে করতে যে রাস্তা হয়ে পড়ে, সেই গুলোই হ'ল এদের 'লেন,' বুঝেছিস?"

গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে চাষা লোকটি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "এজ্ঞে, এই রাস্তা দিয়ে ঠাকুর ম'শায়ের—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই অতুল তাহাকে ধমকাইয়া উঠিল, "চ, চ, তোর আর জ্যাঠামী করতে হবে না। আমি সব জানি।"

গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি বলছিল ?"

অতুল নিম্নস্বরে বলিল, "এইখানে এক বাবাঠাকুর আছেন, যাকে পঞ্চানন্দ ঠাকুর বলে, তাই বলছিল।"

কথায় কথায় ইহারা মজুমদারের গড়ায় আসিয়া পৌঁছিল। গোকুল বলিল, "গড়া মজে গিয়ে পুকুর, আর পুকুর মজতে সুরু হলে, জলের ভিতর এই রকম গাছ পালা হয় নাকি ?"

চাষা লোকটি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এজ্ঞে, এগুলো ঝাঁজি ; জাল ফেলবার সময় এগুলো সাফ করা হবে।"

অতুল মসলার পুঁটলিটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "আর সমালোচনায় কাজ নেই, যা করতে এসেছিস তাই কর্।" পরে চাষালোকটির দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি এখন যেতে পার বাপু, আমরা সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

"যে'জ্ঞে" বলিয়া চাষা লোকটি চলিয়া গেল।

(৩)

"মাছ ধরে ত ঝাঁটি বেঁধে ফেলা গেল। এখন রাস্তা ভুলে ঘুরতে ঘুরতে এসে যে ট্রেন ফেল হলে, তার কি করা যায় বল। সেই রাত তিনটির আগে ত আর কোনও ট্রেন নেই।"

"করবে আর কি, বসে বসে খাপি খাও। আমার ত কিদের নাড়ীভুঁড় হজম হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।" অতুল ছিপ দু'গাছা প্লাটফরমের উপর রাখিল।

গোকুল কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "এখন গ্রামের মধ্যে ফিরে গিয়ে দোকান থেকে কিছু কিনে খাওয়া যাক।"

"তারপর বনের ভিতর দিয়ে অন্ধকারে ষ্টেশনে ফিরে আসতে আসতে, হয় বাঘের না হয় বরার উদরে বিশ্রাম লাভ করা যাবে।"

গোকুল ভয় পাইয়া বলিল, "এ দেশে বাঘ আছে নাকি ?"

অতুল উত্তর করিল, "বাঘ না থাক বাঘরোল বলে এক জাতীয় জানোয়ার আছে ; সেটা বাঘের খুড়তুতো ভাই।"

ইহারা কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছে, এমন সময় কলিকাতা হইতে একখানা 'ডাউন ট্রেন' (down train) আসিয়া পৌঁছিল। ট্রেন হইতে বর সমভিব্যাহারে একদল বরযাত্রী নামিতে দেখিয়া অতুল উৎসাহের সহিত বলিল. "দেখ্ গোকলো, এই বরযাত্রীদের দলে মিশে গেলে হয় না ?"

গোকুল কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা হয়, কিন্তু যদি ধরা পড়ি।"

"আরে, ধরা পড়বি কিরে ? কন্যের দল মনে করবে বরযাত্রী, আর বরের দল মনে করবে কন্যাযাত্রী। আর যদিই ধরা পড়ি, আমাদের অবস্থার কথা খুলে বললেই হবে। খুব মজা হবে এখন।" অতুল গোকুলকে আর দ্বিরুক্তি করিতে না দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

গোকুল বলিল, "টেনে নিয়ে যাচ্চিস কোথায় ?"

"ছিপ দু'গাছা ষ্টেসনে চাপরাশিদের কাছে কিছু পয়সা দিয়ে গচ্ছিত করে রেখে আসা যাক।"

"তা চল্। তোর সঙ্গে যখন আজ বেরিয়েছি তখন বরাতে অনেক দুঃখ আছে।" গোকুল অতুলের সঙ্গে চলিল।

অতুল হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুঃখ কিরে, তোর বরাতে যে আজ ফলার জুটে গেল।"

দুই বন্ধু বরযাত্রীদের অনুসরণ করিল। বিবাহ-বাটীতে আসিয়া যখন দেখিল, কেহই তাহাদিগকে কোনও প্রকার প্রশ্ন করিল না, তখন তাহারা ধীরে ধীরে বিবাহ সভার এক কোণে গিয়া বসিল।

"ওরে অৎলো, ও পাড়ার নেপা যে এখানে রে! এই সব মাটী করলে।" গোকুল অতুলের গা টিপিয়া চুপি চুপি নৃপেনের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। অতুল কি জবাব দিতে যাইবে, এমন সময় নৃপেন তথায় আসিয়া, এক গাল দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "আরে, মানিক জোড় যে রে! ওরে জগা, অতুল বাবু আর গোকুল বাবুকে পাণ টান দিয়ে যা রে।" নৃপেন তথায় আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ব্যস্তভাবে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

সভার ঠিক মধ্য স্থলে বর উপবিষ্ট। বরের দক্ষিণে বরকর্ত্তা, একটি হুঁকা হাতে করিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে, কয়েকজন বৃদ্ধের সহিত, সেকালে কি ছিল আর

একালে কি হল, বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। বরের অপর পার্শ্বে কয়েকজন বালক বরকে জ্বালাতন করিতে ব্যস্ত। গৃহের এক কোণে ছাত্রের দল, তাহাদের শিক্ষকদিগের বিদ্যাবুদ্ধির সমালোচনায় তৎপর। গৃহের অপর কোণে যুবকের দল সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছে।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমাদের গোকুল ও অতুলের স্বভাব নয়। সুতরাং তাহারা এই যুবকদলের সহিত সামাজিক আলোচনায় ক্রমে ক্রমে যোগদান করিয়া দিয়াছে। গোকুলের বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। সে বহু বিবাহ ও বিবাহে পণ গ্রহণ প্রথা সম্বন্ধে এরূপ অচ্ছেদ্য তর্কযুক্তির অবতারণা করিয়া আমাদের সমাজের দোষগুণগুলি দেখাইতেছে যে, যুবকদল একবাক্যে তাহার মত সমর্থন করিতেছে।

ইহারা সকলে যখন সমাজ চিন্তায় বিভোর, এমন সময় সভার অপর পার্শ্বে এক গোলযোগ উঠিল। কন্যাকর্ত্তা, কতক সময়াভাবে এবং কতক অক্ষমতা নিবন্ধন কথামত বিবাহের সমুদয় অলঙ্কার ও পণের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া, বরকর্ত্তার হাতে ধরিয়া নানারূপ অনুনয় বিনয় করিতেছেন; আর বরকর্ত্তা, নানারূপ অভদ্রভাষা ব্যবহার করিতে করিতে সভা হইতে বরকে উঠাইয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। এ দৃশ্যে যুবকদলের মধ্যে একটা ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। গোকুল উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "কি বর তুলে নে যাবার ভয় দেখাচ্ছে! নে যাক্ না তুলে! না হয় মেয়ের বে নাই হবে। তা বলে, সভার মাঝে এক ভদ্রলোককে চোর জোচ্চোর বলে যাবে, আর আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌বেন!"

পার্শ্বস্থ একজন যুবক কহিল, "ওহে, ছেলের বাপ খুব ভাল রকমই জানে যে, আজ বর তুলে নিয়ে গেলে কাল মেয়ের বাপের জাত যাবে। কেলেঙ্কারীট কি কম!"

নৃপেন এতক্ষণ দলের এক পার্শ্বে বসিয়া নীরবে ইহাদের সকল কথা শুনিতেছিল, এইবার বলিল, "হাঁ হে হাঁ, বর তুলে নেযাবে বললিই হল আর কি! আর যদিই নিয়ে যায়, আমাদের গোকুল আছে, জাত রক্ষে করবে এখন। চল চল, একটা প্রতিবিধান করা যাক। বেতে টাকা দিতে পারলে না বলে যে এই রকম গালাগালি দেবে, তা কিছুতেই সহ্য করা যায় না।"

যেমনি বলা তেমনি কাজ। গোকুল কি বলিতে যাইতেছিল, আর বলা হইল না। যুবকের দল হৈ হৈ করিতে করিতে বরকর্ত্তাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া, তাঁহার সহিত বচসা আরম্ভ করিয়া দিল। ক্রমে ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধের দল যুবকগণকে শান্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কন্যাকর্ত্তা একবার বরকর্ত্তার হাতে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করেন, একবার যুবকদলকে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। বরকর্ত্তা ক্রোধে বরকে আসন হইতে উঠাইয়া লইয়া সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বরযাত্রিগণও তাঁহার অনুসরণ করিল।

"আপনারা এ কি করলেন?" বলিয়া কন্যাকর্ত্তা যুবকগণের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টি গোকুলের মর্ম্ম স্পর্শ করিল।

"আপনি ভাববেন না। আমরা এখনই আপনার মেয়ের বের বন্দোবস্ত করছি।" নৃপেন গোকুলের হাত ধরিল; বলিল, "চল, ব্রাহ্মণের জাত রক্ষা কর।"

গোকুল হতভম্ব হইয়া পড়িল বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নৃপেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি!"

"হাঁ, তুমি। ভয় নেই, জাত রাখতে গিয়ে জাত যাবে না। ঘর তোমাদের পালটী ঘর, মেয়েও ভাল; আমার সব জানা আছে।"

উপস্থিত যুবকের দল সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আর ইতস্ততঃ করবেন না গোকুলবাবু, লগ্নকাল উত্তীর্ণ হয়। আমাদের মধ্যে কেউ অবিবাহিত ব্রাহ্মণ সন্তান থাকলে আর আপনাকে একাজ করতে বলতুম না।"

গোকুল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অতুলের মুখের দিকে চাহিল। অতুল বলিল, "আর দেরী করিস্‌ নি, ভাববার সময় নেই। ঘর আর মেয়ের খবর আমি নিয়েছি, তুই অসঙ্কোচে বিবাহ করতে পারিস্‌। তুই পণ না নিয়ে বিবাহ করতে চেয়েছিলি; কিন্তু তার চেয়েও কি এটা বেশী কাজ করা হবে না।"

গোকুল তখনও নীরব; এক্ষেত্রে সে যে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অর্থশূন্য দৃষ্টিতে উপস্থিত যুবকগণের দিকে চাহিয়া রহিল।

"সব দিক বিবেচনা করবার আর সময় নেই। চল,

ভদ্রলোকের এই বিপদের সময়, এতগুলো লোকের অনুরোধ উপেক্ষা করিসনি।” বলিয়া অতুল গোকুলের হাত ধরিয়া বরাসনে বসাইয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ও উলুধ্বনি বাজিয়া উঠিল।

শুভ দৃষ্টির সময় গোকুল যখন দেখিল যে, সেই ফটোর বই হাতে করা মেয়ের সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে, তখন সে কিছু বিস্মিত হইল। কৌতুহল দমন করিতে না পারিয়া সে বিবাহ ও স্ত্রী আচার শেষ হইয়া যাইবা মাত্রই অতুলের সহিত দেখা করিবার জন্য বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া সে আরও অধিকতর বিস্মিত হইল; দেখিল, বর বরকর্ত্তা, বরযাত্রিগণ, অতুল, নৃপেন প্রভৃতি সকলে একত্রে আহারে বসিয়াছে। গোকুলকে দেখিয়া সকলে সমস্বরে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বরবেশধারী যুবক বলিল, “কি গোকুল বাবু, কেমন মাছ ধরলেন?”

আবার হাসির রোল উঠিল। নৃপেন হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমাদের অভিনয়টা যে রকম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে, তাতে অতুলকে বাহাদুরী না দিয়ে থাকা যায় না। কি বল হে গোকুল?”

গোকুল সকলই বুঝিল। ক্রোধ ও অভিমান পূর্ণ দৃষ্টিতে সে একবার অতুলের দিকে চাহিল। অতুল বলিল, “আর দেখছিস্ কি? তুই যা গোঁ ধরেছিলি, তোর সে গোঁ তো রক্ষে হয়েছে! এ রকমটা না করলে তোর আর বে হত না,—তুই চিরকাল কার্ত্তিক হয়েই থাকৃতিস।”

গোকুল “কিন্তু—”বলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, অতুল বাধা দিয়া বলিল, “আর কিন্তু করতে হবে না। তোর মার কথা বলছিস ত? তা আমি শেষ পর্য্যন্ত না ভেবে আর একাজ করিনি। তুই যা, এখন বাসর ঘরে গিয়ে—”

* * * *

গোকুলদের বাটীর সম্মুখে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। অতুল তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া বাটীর মধ্যে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, “জ্যেঠাইমা, শিগ্‌গির এস, গোকলো একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরে এনেছে;—সে একলা সেটা আনতে পারছে না।”

গোকুলের মা গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া সদর-দরজায় ছুটিয়া আসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না; তিনি কোনও প্রকারে কৌতুহল দমন করিয়া, তাড়াতাড়ি পুত্রবধূকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমাপন করিবার পর গোকুলের মা সবিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য বিশেষ সমুৎসুক হইলেন। অতুল একে একে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল; কহিল, “মাছ চারে এনেছিলুম জ্যেঠাইমা, তবু কি রাস্কেলটা মাছ গিলতে চায়?”

আনন্দে গোকুলের মার চক্ষে জল দেখা দিল। তিনি বধূর চিবুক ধরিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন, “ফটো দেখে তখনি ত আমি বলেছিলুম অৎলো, এ যে মা দুর্গা! আমাকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে বুঝি এরা এমনি করে মাকে সোণা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে! কেবলি কি আমি সোণা দিয়েই মার কদর বুঝ রে গোকলো?”

মার কথা তীব্র শেলের মত গোকুলের অন্তরে গিয়া বিঁধিল। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; দুই হাতে মার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “আমি বুঝতে পারিনি মা, আমায় ক্ষমা কর।”

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভ্রান্তি

মঙ্গলময় দীর্ঘতীর্থযাত্রী যথা পথভ্রান্ত হয়ে
পথে ভোগ্য বস্তু লভি মগ্ন রহে তায়
ভুলে যায় লক্ষ্য নিজ আত্মহারা রয়ে
ভাবে সে চরমকাম্য মৃগতৃষ্ণিকায়।

তেমতি এ বিশ্বজনে নিত্য করে ভুল,
সাধন পন্থায় ভাবে সাধনার শেষ
সুক্ষ্মেরে হারায়ে শুধু ধরি লয় স্থূল,
করণে হারায়ে ফেলে কর্ম্মের উদ্দেশ
রাজা ভাবে রাজ্য বুঝে ভোগের সহায়,
ভক্তিময় লোকাচারে ধর্ম্ম শেষ হায়!

শ্রীকালিদাস রায়

রাজনীতিক্ষেত্রে

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভারতবর্ষে জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার হিউম পাঠকবর্গের পরিচিত, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। জাতীয় মহাসমিতি গঠনের কল্পনা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিলে তিনি শিশিরকুমারের সহিত একদিন তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সকল কথা অবগত হইয়া শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন যে, যাহারা দেশের প্রকৃত শক্তি, সেই সাধারণ জনসম্প্রদায়কে বাদ দিয়া কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া জাতীয় মহাসমিতি গঠনের চেষ্টা ভিত্তিহীন প্রাসাদ নির্ম্মাণের চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। কথাগুলি শুনিয়া মিষ্টার হিউম বলিয়াছিলেন, এদেশের সাধারণ শ্রেণীর লোকের নিকট আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত, এরূপ অবস্থায় তাহাদের সহানুভূতি লাভ করা কতদূর সম্ভব হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন যে, কিরূপে সাধারণ লোকদিগের হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হয়, তাই তিনি দেখাইয়া দিবেন। যে কঠোর রাজনীতি শিক্ষিতসম্প্রদায়ও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, নিরক্ষরদিগের নিকট তাহা কতদূর প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে, পাঠকবর্গ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার প্রসার ও তাহাতে এদেশীয় সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া না দিলে দেশের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে, ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রচলন হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, নিরক্ষর লোকদিগকে এই সকল কথা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা যে অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইবে তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে সকল অভাব অভিযোগের সহিত নিরক্ষরদিগের স্বার্থ জড়িত, বুঝাইয়া দিলে তাহারা তাহা না বুঝিবে কেন? সেই সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা আলোচিত হইলে, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ দেশের প্রকৃত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ও অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ক্ষেত্রটী উর্ব্বর করাই প্রয়োজন। শিশিরকুমার এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পথকর, চৌকিদারী ট্যাক্স প্রভৃতির কথা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ও অবগত আছে; শিশিরকুমার প্রথমে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করাই স্থির করিলেন। কিরূপে পথকরের টাকা অপব্যয় হয়; গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে পুলিশের কর্ম্মচারিগণ প্রজাদিগের উপর মধ্যে মধ্যে কিরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে, শিশিরকুমার তাহা নিরক্ষর লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। স্বীয় সহোদরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, সাধারণ জনসম্প্রদায় লইয়া সভাসমিতি করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আয়ারল্যাণ্ডে ওকনলের ন্যায় শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নিম্নশ্রেণীর ও অশিক্ষিত লোকদিগকে লইয়া সভা আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে ১৮৮৬ খৃঃ অঃ ১৩ই মার্চ্চ তারিখে যশোহরের আট মাইল পশ্চিমে ঝিকরগাছা নামক স্থানে এক মহতীসভার অধিবেশন হয়। তৎকালে ভারতবর্ষের আর কোনও স্থানে সেরূপ বৃহৎ রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। সভাস্থলে কতলোকের সমাগম হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় নাই। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বাবু আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ আপন আপন প্রতিভা ও কার্য্য দ্বারা যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ঝিকরগাছার সভার অধিবেশনের পর তাহা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুদূর-আমেরিকার কোনও কোনও সংবাদপত্রে এই সভার অধিবেশনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

সভার অধিবেশনের সময় যশোহর জেলার তাৎকালিক

ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার টুট সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ব্যবহারে সভাপতি ও বক্তৃবর্গের [illegible] বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভারতবাসী স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়; সমাগত জনমণ্ডলী ম্যাজিষ্ট্রেটের দুর্ব্ব্যবহার প্রথমে নীরবে সহ্য করিলেও শেষে তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রত্যেকেরেই মুখে একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। মণ্ডপের ভিতর স্থানাভাব বশতঃ বহির্ভাগেও একটী অতিরিক্ত সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহিরের জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক লোকদিগকে আহ্বান করিয়া তাহারা কি উদ্দেশ্যে এবং কাহার কথায় সমবেত হইয়াছে জানিতে চাহিলেন। একটী বালক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়াছিল,—"বাবা আসিতে বলিয়াছেন বলিয়াই আসিয়াছি; কেন আসিয়াছি জানি না।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আপনার নোট বইএ বালকের কথা কয়টী লিখিয়া লইলেন। কথা কয়টী লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, গভর্ণমেণ্ট যদি এই সভার কথা কখনও আলোচনা করেন, তখন তিনি বালকটীর কথাগুলি উল্লেখ করিয়া করিয়া বলিতে পারিবেন যে, এই সভায় জনমণ্ডলী কি উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছিল তাহা তাহারা অবগত নহে,—এরূপ ক্ষেত্রে এসভার কোনও মূল্য নাই। মণ্ডপের ভিতরের ন্যায় বাহিরেও তিনি জনসঙ্ঘের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমারের হৃদয়ে আদৌ যশলাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল না; স্বদেশ সেবার আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিত। ঝিকরগাছার সভার প্রধান উদ্যোগী হইয়াও তিনি স্বয়ং সভায় উপস্থিত ছিলেন না, অন্তরালে থাকিয়া তিনি সভার যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই সভায় প্রধানতঃ চৌকিদারী বিলের প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। এই বিলে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি ধনী কি দরিদ্র, সকল সম্প্রদায়েরই স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট সভার অধিবেশনের পর বুঝিতে পারিলেন যে, দেশের লোকেরা যে কার্য্যে আপত্তি করিতেছে, গভর্ণমেণ্টের সে কার্য্য পরিহার করা কর্ত্তব্য। চৌকিদারী বিল পাশ হইল না। সৎকার্য্যে বাধা বিঘ্ন অনেক। যে উদ্দেশ্যে [ঝিকরগাছার সভার অধিবেশন হয়, তাহা সফল হইলেও এবং ভারতগভর্ণমেণ্ট সভার কার্য্যবিবরণী আলোচনা করিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেও, কতকগুলি ব্যক্তির ব্যবহারে গভর্ণমেণ্ট সে চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ ঝিকরগাছার সভা আহ্বান করিয়া যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের তথাকথিত কয়েকজন নেতার হৃদয়ে সেই প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। তাঁহারা ঝিকরগাছার সভার সমান কিম্বা তাহার অপেক্ষা বড় এক সভার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ দুই বৎসর ধরিয়া নিরক্ষর লোকদিগকে দেশের প্রকৃত অভাব অভিযোগের কথা বুঝাইতে যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এই নেতৃবৃন্দের সেরূপ পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য কোথায়? তাঁহারা চড়কসংক্রান্তির সময় তারকেশ্বরের মেলায় উপস্থিত হইয়া এক সভার আয়োজন করিলেন। বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিল। ব্যবস্থাপক সভার প্রসার, ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে সিবিলসার্ভিস পরীক্ষা প্রবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয় লইয়া বক্তৃবর্গ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রোতৃবর্গ তাঁহাদের বক্তৃতা আদৌ উপভোগ করিতে পারে নাই। সভার অধিবেশনের পর সংবাদপত্রে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হইল। ক্রমান্বয়ে এই শ্রেণীর কয়েকটী সভার অধিবেশন হইলে গভর্ণমেণ্টের সেগুলির উপর বড় আর আস্থা রহিল না। ঝিকরগাছার সভার অধিবেশনের পর ভারতগভর্ণমেণ্টের যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী সভাগুলি সে চাঞ্চল্য দূর করিয়াছিল। নিরক্ষর লোকেরা যে ব্যবস্থাপক সভার প্রসার প্রার্থনা করিবে, একথা গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। মিষ্টার র‍্যানাডে একবার সিমলা হইতে ফিরিবার সময়, কলিকাতায় আসিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস পরিদর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন যে, বড়লাটবাহাদুর লর্ড ডাফারিণের সহিত ঝিকরগাছার সভা সম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। লাটবাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, ঝিকরগাছার সভা গভর্ণমেণ্টের মনে একটা চিন্তা ও চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াছিল, এই সভায় দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে রাজনীতি শিক্ষা প্রদানের অতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। দেশের সাধারণ লোকে যদি

গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে রাজ্যশাসনের জন্ত গভর্ণমেণ্ট যখনই কোন নূতন বিধির ব্যবস্থা করিবেন, তখনই দেশের প্রকৃত শক্তিস্বরূপ এই সাধারণ জনসম্প্রদায় প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিবে, এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সাধারণের সেই প্রতিবাদ উপেক্ষা করা নিরাপদ হইবে না। ঝিকরগাছার সভার পরবর্ত্তী সভার কার্য্যাবলী গভর্ণমেণ্টের উদ্বেগ সম্পূর্ণ প্রশমিত করিয়াছিল।

শিশিরকুমার যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অত্যাচার যখন ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, শিশিরকুমার তখন তাঁহাদের সেই অবিচার ও অত্যাচারের কথা কইয়া ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পোষ্ট অফিসের কার্য্য কিরূপভাবে পরিচালিত হইত, উদাহরণ স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। মিষ্টার কিস্ (Kisch) তখন পোষ্টমাষ্টার জেনারেল। একদিন কলিকাতা অফিস হইতে এত অধিক বিলম্বে ডাক পাঠান হইয়াছিল যে, তাহা হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্বেই ডাকগাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং শেষে রেলকর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পরামর্শ করিয়া এক খানি স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করা হইল এবং এই স্পেশাল ট্রেণ মোকামা ষ্টেশনে ডাকগাড়ীতে ডাক উঠাইয়া দিয়া আসিল। এই উপলক্ষে গভর্ণমেণ্টের ষোলশত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীগণের দোষে যে টাকা অপব্যয় হইল, তাহার জন্ত কাহাকে দায়ী করা হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং ডাকবিভাগের কার্য্যের বিশৃঙ্খলভাব কথা উল্লেখ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় আন্দোলন চলিতে লাগিল। তখন ডাকবিভাগের কতকগুলি পদ ভারতবাসিগণের জন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। ক্রমে ক্রমে দুই একটী করিয়া অশিক্ষিত ইউরোপীয়ান ও ইউরেশীয়ান উক্তবিভাগে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং তাহারা আবার আপন আপন অধীনে দশবারোজন করিয়া আত্মীয়স্বজনকে চাকুরী দিয়া প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিল। যাহাদের জন্ত ডাকবিভাগের চাকুরীগুলি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাদের প্রার্থনা ক্রমশঃই অগ্রাহ্য হইতে লাগিল। অমৃতবাজার পত্রিকার বর্ত্তমান সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় স্বীয় প্রতিভাবলে এই সময় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ গ্রজ বসন্তকুমারকে সম্মুখে আদর্শস্বরূপ রাখিয়া শিশিরকুমার যেমন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মতিলালও সেইরূপ শিশিরকুমারকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনে সাক্ষ্যপ্রদানের সময় তিনি যে অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা ডাকবিভাগের কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন, যিনিই তাহা পাঠ করিবেন, তিনিই তাঁহার প্রশংসা করিবেন। কিন্তু এংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি তাঁহার উপর অযথা নিন্দাবর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মতিলালের সাক্ষ্যপ্রদানের ব্যাপার লইয়া অনেকে অনেকরূপ মন্তব্য প্রকাশ করায়, ১৮৮৭ খৃঃ অঃ ৫ই এপ্রিল তারিখে মতিলাল ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন।

ডাকবিভাগের চাকুরীর ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় যে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ভারতবাসিগণের প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া অশিক্ষিত ইউরোপীয়ান ও ইউরেশীয়ানদিগকে ডাকবিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত করা কিছু দিনের জন্ত বন্ধ হইয়াছিল। আমাদের দেশে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, এক সময় কোন লোক বিপদে পড়িয়া উদ্ধারের জন্ত মা কালীর নিকট মহিষ বলি দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে। বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া লোকটি পূজা দেওয়ার কথা ভুলিয়া যায়। দেবী তখন স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে পূজার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। লোকটী কাতরভাবে দেবীকে জানাইল যে, সে নিতান্ত গরীব, এরূপ অবস্থায় মহিষের পরিবর্ত্তে দেবী যদি অনুগ্রহ করিয়া একটী ছাগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সে শীঘ্রই পূজা দিতে পারে। দেবী তাহাতে সম্মতা হইলেন। কিন্তু লোকটী আবার পূজা দেওয়ার কথা ভুলিয়া যায়। দেবী পুনরায় স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া পূজার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে লোকটী স্বীয় দুরবস্থার কথা জানাইয়া ছাগের পরিবর্ত্তে একটী ফড়িং দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। দেবী তাহাতেই সম্মতা হইলেন। লোকটী বার বার দেবীর অনুগ্রহ পাইয়া একটু নির্ভয় হইয়াছিল; সে দেবীকে বলিল,—মা, ফড়িং ধরিতে আমার যথেষ্ট সময় লাগিবে ও

কষ্ট হইবে, কিন্তু আপনি হাত বাড়াইলেই ফড়িং পাইতে পারেন। ডাক বিভাগে এ দেশবাসীর চাকুরীর ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া, উক্ত গল্পটী অবলম্বনে শিশিরকুমার একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে কবিতাটী উদ্ধৃত করিলাম –

"THE GODDESS KALEE & THE GRASSHOPPER."

Low at the Goddess Kalee's shrine
His knee a zealot bent,
And in a fit of holy zeal,
From Heaven but rarely sent,

He vowed that chosen from his herds,
With all convenient speed,
The lordliest of the buffalo bulls,
Should in her honour bleed.

The Goddess hailed with glad assent
This tribute to her fame,
And waited longingly and long
The gift that never came.

Before her feet with streaming tears
The devout fell again,
Told her of drought & failing crops,
Of toil, and want, & pain.

And Kalee, pity tendered decreed
That he his vow should keep,
But in lieu of lordly buffalo,
Might sacrifice a sheep.

Drying tears, the man went forth,
And vainly strove to find,
Among his fat and thriving flock,
One bold, or lean, or blind.

The hours glide by, day follows day,
And when the Goddess chid,
He strove to still her lawful ire
By promising a kid.

For her and her alone should he
The first that came to hand.
He had not counted, first would come
The fattest of his band.

So time went on, and once again
Before her he appears,
lies prostrate at great Kalee's feet,
And bathes them with tears

"Goddess ! look down & pity me,
My chilorm cry for bread ;
A kid is much, deign to accept
A grass-hopper instead."

"Well, be it so !" The Goddess said,
In deep disgust and pain ;
And rendered bolder by her words
The zealot spoke again.

"Lady", he said, "to catch one
Would cost me time & trouble,
Stretch out your hand in yonder field,
And take him from the stubble."

Thus India ! To thy prayer at last
A gracious ear is lent,
Not buffalo, sheep nor kid is here,
But grass-hoppers are sent.

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ বসু।

তুমি

যখন তুমি দাঁড়ালে এসে
আঁখির আগে,
পূরব কোণ কনক হেম-
কিরণ রাগে

সাগরে ঘুম ভাঙালে তুমি
মলিন ভূমা রাঙালে তুমি
গন্ধ-বহ তোমারে চুমি
অলকে লাগে
যখন তুমি দাঁড়ালে এসে
আঁখির আগে

যখন তুমি রহিলে থির
জ্যোতির্ম্ময়ী,—
রজত-আভা ঝলসি উঠে
নয়নে অয়ি!

দগধি গেলে অশুচিতম
অধীর যত বাসনা মম
হরিলে মোহ কুহেলি সম
আলোকময়ি!
যখন তুমি রহিলে থির
কুটীরে অয়ি!

গুছালে তুমি শিথিল হেম-
ওড়না খানি
বিদায় বেগে দাঁড়ালে তুমি
শিয়রে রাণি!

রহিল মম বিষাদ মেখে
রঙিন তব হাঁসিটী লেগে
মুগ্ধ শুধু রহিনু জেগে
যুক্ত-পাণি

গুছায়ে নিয়ে চলিলে হেম-
ওড়না খানি।

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার।

নন্দন-পাহাড়

[১৫]

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সেদিনকার ডাকে যে প্যাকেটটা পাইয়াছিলাম, তাহাই খুলিয়া ফেলিলাম।

একখানি সুদৃশ্য বাঁধানো 'রামায়ণ'; কলিকাতায় একজন বন্ধুর কাছে লিখিয়াছিলাম, সে পাঠাইয়া দিয়াছে। মলাটের উপরকার সোনার জলে লেখা "সুজাতা" নামটা আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন মৃদু হাসিয়া উঠিল।

সুজাতা রামায়ণ মহাভারত পড়িতে ভালবাসে এ খবরটা অজিতের কথার মধ্য হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু 'রামায়ণ' আনাইয়া আজ মনে হইল, সত্যই যেন একটা মহাবিপদে পড়িয়াছি। চিঠি লিখিলেই 'রামায়ণ' প্যাকেট্‌ বন্দী হইয়া চলিয়া আসিতে পারে, কিন্তু যাহার জন্য আনীত হইয়াছে তাহার হাতে ঐ রামায়ণখানি পৌঁছাইয়া দেওয়াটাই যেন একটা মহাশক্ত ব্যাপার। তখনই সুজাতাকে ডাকিয়া সহজ, সরলকণ্ঠে যদি বলি, "সুজাতা, এই রামায়ণখানা তোমার জন্য আনিয়েছি,"—সব গোল মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বলা দূরে থাকুক, কথাটা ভাবিতেই কাণের কাছটা কেন যে এমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং বুকের ভিতর হইতে একটা দ্রুত শোণিতোচ্ছ্বাস প্রবলবেগে হৃদ্‌পিণ্ডটাকে নাড়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া শিরায় শিরায় বিদ্যুতের স্রোতে বহিয়া যাইবে, তাহা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

অন্যমনস্ক ভাবে টাইটেলটা তুলিয়া লইয়া ভিতরের পাতায় "সুজাতা" লিখিয়াই মনে হইল, কাজটা ভাল করি নাই। ঐ উজ্জ্বল কালো কালীর অক্ষর তিনটী ঠিক্ যেন সাধারণ অক্ষরের মত হয় নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে গাছের গায়ে গায়ে লাগানো সামান্য 'চাপাটীর' মধ্যেও ইংরাজ যেমন নানা সঙ্কেত আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, মনে হইল, আমার লেখা ঐ অক্ষর তিনটীর মধ্যেও যেন আমার গোপন ইতিহাসের অনেকখানি পরিচয়, অনেকগুলি সঙ্কেত, যে কেহ খুঁজিয়া পাইতে পারে!

মলাটের উপরকার সোনার জলে লেখা ঠিক ঐ তিনটী অক্ষরই যেন কালীর লেখা এই একই তিনটী অক্ষরের কাছে উজ্জ্বলতায় অনেকখানি ম্লান দেখা যাইতেছিল।

সে অক্ষর কয়টী দপ্তরীর বাড়ীর প্রাণশূন্য যন্ত্রের পেষণের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে;—আর এরা যে টাইলোর মুখ দিয়া আমার অন্তরের সমস্তখানি উন্মুখ আগ্রহ, স্নিগ্ধ

অনুভূতি শোষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে! যে করুণ, কোমল সুর নিশিদিন মর্ম্মবীণায় গুঞ্জরিতেছে, এ যে তাহারই স্নিগ্ধ রেশ টুকু!

ছুঁরি দিয়া কাটিয়া তুলিয়া ফেলিলে হয় না? আবার কালীর আঁচড় কাটিয়া কাটিয়া অক্ষর কয়টাকে লুপ্ত করিয়া দেওয়া যায় না? এমন করিয়া কাটিয়া কেহ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিয়াছে কি?

কে বটগাছের ছাল কাটিয়া তুলিয়াছিল, বিশ্বের ঠাকুরের বুকের উপর সে ক্ষত আপনার নিষ্ঠুর চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল। ঐ ছুরিকার আঘাত বা কয়টা কালীর আঁচড়ে অক্ষর কয়টা তো মুছিবেইনা, শুধু একটা ক্ষত, একটা চিহ্ন বুকের মধ্যে রাখিয়া যাইবে!

অক্ষর নিশ্চিহ্ন করিবার সমস্ত আয়োজন তো ব্যর্থ হইয়া গেলই; অজ্ঞাতে কখন যে হাতের বহি মুখের কাছে উঠিয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই, চমকিয়া উঠিয়া "সুজাতার" নামাক্ষর সংস্পর্শ হইতে উদ্যত ওষ্ঠকে ফিরাইয়া লইলাম। হাতের বহি নামাইয়া ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিতেই দেখিলাম, অজিত আসিতেছে।

অজিত কহিল, "দাদা বাবু, খেতে আসুন"—তারপর টেবিলের উপরকার উজ্জল কারুকার্য্যশোভিত বহিখানার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিল। বহি তুলিয়া লইয়া যখন দেখিল, তাহার দিদিরই নাম লেখা রহিয়াছে, তখন অজিত আর অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, দুই হাতে বহি আঁকড়িয়া ধরিয়া, "ও দিদি, তোর রামায়ণ; ভারি সুন্দর,—দাদা বাবু আনিয়েছেন," বলিতে বলিতে ছুটিয়া পাকঘরের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ দুরন্ত ছেলেটা তো ঘুণাক্ষরেও বুঝিল না, যে মুহূর্ত্তপূর্ব্বেই তাহার দাদাবাবু ঐ বহিখানা কেমন করিয়া ঠিক জায়গা মত পৌছাইয়া দিবে, তাহাই ভাবিয়া কতখানি দ্বিধা, কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল।

টেবিলটার কাছে মুহূর্ত্তকাল অপরাধীর মতই দাঁড়াইয়া রহিলাম; পা দুটা একটু কাঁপিতেছিল; কিন্তু বুকের মধ্যে যে গুরু স্পন্দনটা ক্রমাগতই সাড়া দিতেছিল, তাহাকে ঠিক্ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, সঙ্কোচ অপেক্ষা পুলকের ভাগটাই বেশী পাওয়া যাইত।

অজিতের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে আহারের চেষ্টায় যাইতে হইল, এবং বৌদিদির আক্রমণটা কোন্ পথে আসিবে, তাহার জন্য একটু সতর্ক হইয়া উঠিলাম।

থালাটা কাছে রাখিয়া হাস্যরঞ্জিত মুখে এবং অত্যন্ত মৃদুস্বরে বৌদিদি কহিলেন, "বইটা বাঁধতে যে এক অর্দ্ধ-বাসের ভাতের খরচ লেগেচে!"—

প্রথম নিশ্চিন্ত মনে—কারণ এই পরম বুদ্ধিমতী নারীর মৃদুস্বর শুনিয়াই বুঝিলাম, ঝড়টা শুধু আমার উপর দিয়াই যাইবে, সুজাতা পর্য্যন্ত পৌছিবে না—ছোট বাটীটা হইতে রসটুকু নিঃশেষ করিয়া পাতের উপর ঢালিয়া লইয়া কহিলাম, "অজি' গেল কোথায়?—ও অজিত, খাবিনে?"—

"সে রামায়ণের ছবি উল্টোচ্ছে।"—

—"ওকে ভাজাটা খুব বেশী ক'রে দিয়ো আজ, বুঝ্‌লে বৌদি'?"

—"কেন, ভারি উপকার করেছে বুঝি? বইটা হাতে পৌছে দেবার দায় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েচে,—নয়? দু'বার ঘরের দোরে গিয়ে ফিরে এসেছি, জান গোঁসাই?"

অজিত আসিয়াছিল, তাহার পাতে সব ভাজাগুলি তুলিয়া দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আহারে লাগিয়া গেলাম।

লজ্জা ও সঙ্কোচ মানুষকে যে এমন করিয়া আনন্দ দিতে পারে, তাহা এর পূর্ব্বে জানিতাম না!

[১৬]

পরদিন সকালবেলা অনিল আসিয়া কহিল, "ইন্দিরা দি', ত্রিকূট পাহাড় দেখতে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত তো স্থির হয়ে গেল!"

স্মিতমুখে বৌদিদি কহিলেন, "কে কে যাবে অনিল, আর কি বন্দোবস্তই বা তোরা কর্‌লি তার কিছুই তো জানাস্‌নি,"—

মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অনিল কহিল, "বাঃ, সে তো তুমিই যা' হয় ঠিক্ করবে,"—

"আমিই যদি সব করব, তবে তোরা কি বন্দোবস্ত কর্‌লিরে অনিল?"

"যাওয়াটা যে হবে সেইটেই আমাদের সভায় স্থির হয়ে গেল; এবং বন্দোবস্তের ভার সবটা তোমার উপর,—এই তো কথা হয়েচে! আমি তো তাই-ই তোমাকে বল্‌তে এলাম, ইন্দিরা দি'!"—

"তবেই হয়েচে, তোদের ত্রিকূট দেখতে যাওয়া!—আমি ঘরে বসে সব বন্দোবস্ত করে দেব, খুব জোরের সভা কিন্তু তোদের যা' হোক্!"

"তা' কেন ইন্দিরা দি', তুমি যা' যা' দরকার মনে করবে আমাদের বলবে"—

"আর তোরা সেইটুকু করে খালাস হবি, কেমন, এই তো?"—

অনিল হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না; একবার বৌদিদির মুখের দিকে চাহিল, তার পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিল, "হুঁ"—এমন সময়ে অতুল সশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, "তুমি শুধু হুকুমই করে যাবে, তোমার হুকুম তামিল করবার লোকের অভাব না হ'লেই হ'ল!"

বৌদিদি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তোরা কটী জুটেচিস্ কিন্তু বেশ! ওরে, তোরা কি এমনিই মা বোনের আঁচল ধরা হয়ে থাকবি, যে বাইরের পাঁচটা বন্দোবস্ত করবার সময়ও আমাদের কাছে হুকুম চাইবি, নিজেরা কিছুই করবিনে?"

অতুল কহিল, "হুকুম করার চেয়ে হুকুম তামিল করাটাই যে বেশী আরামের, এ বিষয়ে আমরা বাঙ্গালীরা সবাই একেবারে একমত। আর জান কি, এ সব পথেঘাটে চলবার খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত এতই বেশী করতে হয়, যে যারা বাড়ীতে মা বোনের হাতে খরচাটা কোনমতে পৌঁছে দিয়ে সকল রকমের আরাম পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের এসব পোষায় না! ও যা তুমি বললে, সেটা ভারি ঠিক!—আমরা কটিই বেশ জুটেচি! এ সব মুস্কিলের চাইতে আদালতে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করাও ঢের সহজ বলে মনে হয়, ইন্দিরা দি!"

সুজাতা আসিয়া একখানা শ্বেতপাথরের রেকাবীতে কতকগুলি পান রাখিয়া গেল। অনিল একবার চকিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তারপরই দৃষ্টি নত করিয়া লইল, কিন্তু তাহার কাণের কাছটা যে অসম্ভব রকমের লাল হইয়া উঠিল, সেটা আর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেও আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

অনেকগুলি চিঠি উত্তরের অপেক্ষায় টেবিলের উপরকার রঙ্গিণ প্রস্তরখণ্ডের নীচে জমিয়া উঠিয়াছিল, আমি আমার ঘরে বসিয়া তাহারই উত্তরগুলি লিখিয়া শেষ করিতেছিলাম। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তের পর হইতে আর আধঘণ্টা পর্য্যন্ত আমার লেখা দুইটি ছত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়া গেল; আর এতটুকুও অগ্রসর হইতে চাহিল না।

আমি আমার ঘরের মধ্যে টেবিলের কাছে বসিয়া কাগজের উপর কতকগুলি অনর্থক কালীর আঁচড় কাটিতে লাগিলাম; এবং মধ্যে মধ্যে অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম।

কৃপণের রত্নপেটিকার দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িলে, সে সংবাদটা যেমন সর্ব্বাগ্রে কৃপণই পাইয়া থাকে, এবং সে যেমন নিশিদিনই শুধু ঐ একই চিন্তাতেই মহাবিব্রত হইয়া উঠে এবং নিজের মানসিক শান্তিকে ক্ষুণ্ণ ও বিরল করিয়া তুলে, আমার মানসিক অবস্থাটাকেও ঠিক তেমনি দীন ও ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিতে দেখিয়া আমি সত্যই বড় বিস্মিত হইয়া উঠিলাম! অন্তরের মধ্যে এই যে একটা বেদনার মৃদু স্পন্দন, একটা নূতনতর অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম, ইহার পূর্ব্বে আর কোনও দিনই তো এমনটা অনুভব করি নাই। বৌদিদির গলা শুনিয়া চমক ভাঙ্গিল। তিনি আমার ঘরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই যে এরা এসেচে, ঠাকুরপো, এসনা একবার, তোমার চিঠি লেখা যে আর শেষই হয় না!"

চিঠির কাগজের উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া লিখিতে লিখিতে কহিলাম, "এই চিঠিটা সেরেই যাচ্ছি বৌদি;—অনেকদিনের চিঠি সব পড়ে রয়েচে,—আজ এদের উত্তরগুলি লিখে শেষ করবই প্রতিজ্ঞা করে বসেচি"—কিন্তু প্রতিজ্ঞা যে কখন করিলাম তাহাও ভাল মনে পড়িল না। চিঠির কাগজের উপর দৃষ্টি পড়িতেই যে কথাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, তাহা যে আমারই লেখা, তাহাও যেমন নিঃসন্দে[illegible] সেগুলি যে ঠিক কখন লিখিলাম সেই সমস্যা[illegible] কাছে তেমনই বিস্ময়কর হইয়া উঠিল।

মানুষের চিত্তটা একটা অদ্ভুত সৃষ্টি! কত ক্ষুদ্রতম কারণও যে এই মানব চিত্তের উপর রেখাপাত করিতে পারে, দোলা দিয়া যাইতে পারে, তাহার মীমাংসা কোনও বৈজ্ঞানিকের গবেষণার মধ্যে আইসে না। যে কোনও মানবচিত্তের সুখ দুঃখের, বিস্ময়ক্ষোভের, আশানিরাশার দ্বন্দ্বের ইতিহাসের সম্পূর্ণ পরিচয়টি গ্রহণ করা একান্তই অসম্ভব এবং এই পরিচয়গ্রহণের সমস্ত চেষ্টা ঠিক তখনি

ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, যখন মানুষ মনে করে, যে, হয়তো কিছু পরিচয়, কিছু সন্ধান সে পাইয়াছে!

চিঠির কাগজখানা শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, "আচ্ছা, থাক্, আজ আর চিঠি নাই বা লিখ্‌লাম। কিন্তু ত্রিকূট দেখতে যাওয়ার দিনটাকে ওই যে সপ্তাহ পরে ফেলা হয়েছে, ওতে আমার মোটেই মত নেই, এবং আজকার সভায় আমার এই আবৃত্তি পেশ করে দিচ্ছি, যে, ওদিনটাকে এগিয়ে ঠিক্ এসপ্তাহের মাঝখানে কোথায়ও ফেলা হ'ক্!"

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াই একবার ভিতরের দরদালানের দিকে চাহিলাম, ভাবিয়াছিলাম, সুজাতাকে দেখিব। কিন্তু সেখানে চাকরটা কি করিতেছিল,—সুজাতাকে দেখা গেল না!

শান্তকণ্ঠে অনিল কহিল, "আমারও ঠিক ওই মত, যদি যেতেই হয়, তা'হলে যত শীগগির যাওয়া হয় সেইই ভাল।"

অতুল কহিল, "আমাদের মতে কিছু হবে না দেখ্‌চি— কারণ আমরা যতই ঠিক করি ততই সেটা গুলিয়ে যায়, আচ্ছা, ইন্দিরাদি' যা' বলে তাই করা যাবে।"—

অজিত ও আলবার্টকে ফটকের কাছে দেখা গেল। বৌদিদি একটু হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, কারু মত নিয়ে কাজ নেই; আল্‌বার্ট যা বল্‌বে আমরা তাই করব"-

অজিত আসিয়া মলিন মুখে জানাইল, "আল্‌বার্ট চলে যাচ্ছে বৌদি,"—অজিতের কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল।

"চলে যাচ্ছে, সে কিরে?"—

"হ্যাঁ বৌদি, সায়েব ছুটি নিয়েছেন; দেশে তাঁর মার অসুখ, তাই দেখতে যাবেন, আর মাত্র দিন পনের এখানে আছেন।"

আল্‌বার্ট চলিয়া যাইবে শুনিয়া সকলেই একটু বিশেষ করিয়া কষ্ট অনুভব করিতেছিল। এই প্রিয়দর্শন বিদেশী বালকটি সকলের নিকট হইতেই প্রচুর স্নেহ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

পিসিমা ঘরের ভিতরে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। মালাটা একবার কপালে ছোঁয়াইয়া উঠিয়া আসিলেন এবং দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া উদ্বেগপূর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যিই বাছা চলে যাচ্ছে, বৌমা? আহা, এমন সোণার চাঁদ ছেলে, আর আমার চোখে পড়েনি, চিরজীবী হোক্ বাছা, মার কোল জুড়িয়া থাক্।"—

"আমি যখন খুব ছোট্টটী ছিলাম, তখনি আমার মা স্বর্গে গেছেন, পিসিমা"—এই মাতৃহীন বালকের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের ছিন্ন অর্দ্ধোচ্চরিত করুণ কাহিনীটী, সেখানকার বাতাসে একটা ব্যথার ইতিহাস রচনা করিয়া তুলিল।

বৌদিদি দুইহাতে আলবার্টকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া নীরবে তাহার স্বর্ণাভ কোমল চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিলেন। চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিয়াছিল, পিসিমা একবার আঁচলে চক্ষু মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ও গুরু—গুরু!" তার পর আল্‌বার্টের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "সকল দুঃখ কষ্টের অতীত হয়ে তিনি চলে গেছেন সত্যি, কিন্তু সেখান থেকেও তিনি তোমাকে দেখ্‌চেন এবং তোমার মঙ্গলবিধান করচেন, একথাটা মনে করে কোনো দুঃখ ক'রো না বাছা!"—

আল্‌বার্টের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, "আমিও বেশী কিছু ভাবিনে পিসিমা, একদিন ত তাঁর কাছে যাবই; তবে কেউ তার মাকে ডাক্‌চে, অথবা দুঃখে কষ্টে পড়ে মার কাছে ছুটে যাচ্ছে, দেখ্‌লেই মনটা কেমন করে ওঠে, এই যা!"

আল্‌বার্ট হাসিতে লাগিল; সে হাসিটুকু ঠিক্ বর্ষণোন্মুখ মেঘের আড়াল হইতে বিচ্ছুরিত অত্যন্ত বিবর্ণ শশাঙ্কলেখার মতই অনুজ্জ্বল, ম্লান!

অজিত কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা তো আমারও নেই, আলবার্ট"—সুজাতা দুয়ারের কাছে আসিয়া সব শুনিতেছিল, অজিতের কথা শুনিয়া সে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া আসন্ন ক্রন্দনের বেগটাকে রোধ চাহিতেছিল।

এই দুইটী অপরিণতবয়স্ক বালক এ করিতেছে কি?

সেই ম্লান সন্ধ্যার কোমল আলোক এমন করিয়া তাহারা ব্যথায়, বেদনায় ভরিয়া দিল যে, সকলেরই চিত্ত একটা অনির্দ্দিষ্ট ক্ষোভে ও ব্যথায় ভরিয়া গেল এবং প্রত্যেকেরই চোখের কোণে কোণে অশ্রুর আভাস জাগিয়া উঠিল।

হঠাৎ অজিত কহিল, "তা আমি ত ওজন্যে কিছু

ভাবিনে। আমি প্রায় রোজ রাত্রেই মাকে স্বপ্ন দেখি, কাল রাত্রেও তিনি আমার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছেন, আচ্ছা তুই যদি আমার কাছে থাক্‌তেই এত ভালবাসিস্ তা' হলে আমি তোকে নিয়ে যাব!"—অজিত তাহার ক্ষুদ্র অধরপুট একটু প্রসারিত করিয়া দিল এবং কথাটা যে সুজাতাকে খুব বেশী আঘাত করিবে, যেন ইহা বুঝিয়াই তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

সুজাতা কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে অজি', চুপ কর্, চুপ কর! তুই এমনি করে বলিস্, বাবা শুন্‌লে কি বাঁচবেন? তোর কি মায়া দয়া একটুও নেই?"—

"বা, মার কাছে যদি যেতে পাস্, তা হলে কি তুই যাস্‌নে দিদি?"—কিন্তু এই অবোধ বালকটীর চোখেও অশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া নন্দন-পাহাড়ের দিকে চাহিল। নন্দনপাহাড়ের দিক হইতে একটা প্রবল বায়ুপ্রবাহ 'হা হা' শব্দে বহিয়া আসিয়া দরজা জানেলার উপর আছাড়িয়া পড়িতেছিল। মনে হইল, যেন শোকার্ত্ত কেহ বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতেছে এবং একটা গভীর বিষাদের নিবিড় কালো ছায়া সেখানে মূর্ত্ত হইয়া নামিয়া আসিতেছে!

[১৭]

সেদিন ত্রিকূট পাহাড়ের নীচে একটা খোলা জায়গায় বিশ্রামের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র দলটি আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমরা দেওঘর ছাড়িবার ছয় সাত ঘণ্টা পূর্ব্বেই আমাদের দুই বাসার চাকরদের ও অতুলদের পাকের ঠাকুরকে বৌদিদি কতকগুলি জিনিষপত্র সঙ্গে দিয়া একটা গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। একটু দূরে কতকগুলি গাছের আড়ালে সতরঞ্চ টানাইয়া তাহারা পাকের আয়োজন করিতেছিল।

অজিত ও আলবার্ট মহা আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছিল; বৌদিদি তাহাদের ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে অজি, তোরা রোদে অত ছুটিস্‌নেরে! একটা অসুখ করে বস্‌বে!"—

কিন্তু বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগের "রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিও না" এই সনাতন উপদেশটী বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে ও পরে এ পর্য্যন্ত কোনও বালকই প্রতিপালন করিবার তেমন আগ্রহ দেখায় নাই। সুতরাং ওটাকে স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়া বর্ণ-পরিচয় ছাপিলে কোনও ক্ষতিই নাই, এই কথা জানাইয়া দিয়া অতুল উঠিয়া পড়িল।

অতুলের স্ত্রী তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "ঠাকুরঝি, ও উপদেশট প্রথম ভাগেই শুধু রয়েছে, আইনের বইতে যে মোটেই নেই; কিন্তু যারা আইন্ নিয়ে থাকে তারাই আবার রোদ্‌কে অতটা ভয় করে কেন?"—

"নিষেধটাকে অগ্রাহ্য করাই মানুষের স্বভাব, কিন্তু যেটা সম্বন্ধে নিষেধের কোনও বাধা বন্ধন নেই, সেইটেকেই শুধু মানুষ মান্‌তে চায়।"—

বৌদিদি কহিলেন, "ও তর্ক তবে তোরাই কর্! আমি দেখে আসি ওরা পাকের বন্দোবস্ত কতদূর করে তুল্‌ল!"—সুজাতা ও বিদ্যুৎ একটু দূরে একটা গাছের তলায় বসিয়া কথা বলিতেছিল। বৌদিদিকে উঠিতে দেখিয়া তাহারাও উঠিল। অতুলের স্ত্রী ঈষৎ হাসিয়া বৌদিদির অনুসরণ করিল।—

অনিল একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়া ছিল; সে তাহার দৃষ্টি দূর দিগ্বলয়ের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল, "মানুষের কাছে আনন্দ কখন্ কোন্ মূর্ত্তিতে ধরা দেয়, তার কিছুই ঠিক্ নেই। আস্‌বার পূর্ব্বে মনে করেছিলাম, যে এখান থেকে কত আনন্দের স্মৃতিই বহন করে নিয়ে যাব! কই, তা' তো সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না! আমার মনে হয় ও জিনিষটাকে খুঁজ্‌তে গেলেই দুর্লভ হয় ওঠে!"

একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি পুরীতে সমুদ্র দেখেচেন!"

"দেখেছি, কেন বলুন তো?"—

"শান্ত-সমুদ্রের অন্তঃস্থল থেকে সব সময়েই একটা গভীর আন্দোলন উঠ্‌চে, যার প্রকাশ শুধু তার নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে,—তরঙ্গের আকারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। আমার মনে হয়, সে যে পরিপূর্ণ, তারি আনন্দ তাকে অমন নৃত্যমুখর করে তোলে। মানুষের আনন্দ তখনি সম্পূর্ণ হয়, যখন তার প্রকাশ বাইরে আর দেখা যায় না,—শুধু গভীর ছন্দে অন্তরের মধ্যেই জেগে ওঠে!"

"হবে!—কিন্তু এমন ঢের মানুষও আছে, যারা আনন্দের খবর পেলে, বিশ্বসংসারকে না জানিয়ে থাক্‌তে পারে না! এবং আমার মনে হয় ঠিক্ ঐখানটাতেই তার চরম

সার্থকতা।—আচ্ছা, সমুদ্র সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?"—

অনিল একটু হাসিয়া কহিল, "পূর্ব্বের ও কথাটার পক্ষে ও বিপক্ষে ঢের বল্‌বার আছে! সে যাক্।—সৃষ্টির মধ্যে দুটো জিনিষ আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের চোখে দেখে থাকি; সমুদ্র জিনিষটা অত্যন্ত বিস্ময়কর, কিন্তু তার চেয়েও সহস্র-গুণে বিস্ময়কর ঐ অনন্ত নীল আকাশ!"—

হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "তার চেয়েও বিস্ময়কর আর একটা জিনিষের নাম আমি করতে পারি"—

অনিল তাহার শান্তদৃষ্টি উৎসারিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপর বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "কি সে ?"

"যেখানে সকল কবিত্বের শেষ এবং সকল আনন্দের আরম্ভ, সে জিনিষটা হচ্ছে,—হাস্‌বেন না অনিল বাবু, নারীর কালো চোখ!" কথাটা বলিয়াই এবং অনিলকে উত্তর দিবার বিন্দুমাত্রও অবসর না দিয়া যেখানে পাকের বন্দোবস্ত হইতেছিল, সেই দিকে চলিয়া গেলাম।

আমাকে দেখিয়া বৌদিদি বলিয়া উঠিলেন, "দেখচ ঠাকুরপো, এরি মধ্যে সুজাতার সঙ্গে বিদ্যুতের ঝগড়া বেধে গেছে।"

বিদ্যুৎ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল; সুজাতা অত্যন্ত শান্তমুখে দাঁড়াইয়া আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়াইতেছিল।

"ওরা দুজনেই জিদ্ ধরেচে, পাক করবে! কিন্তু আমি বলচি যে থাক্ না, আজ আর কারু পাক করে দরকার নেই।"

বিদ্যুৎ ও সুজাতা উভয়েই চকিত দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে বিবাদ মীমাংসার মতই এটাও একটা যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, তাহা আমাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইলেও, যাহারা বিচার প্রার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার লাভ সত্যই খুব সহজ হইল না।

তাহারা কথাও কহিল না, অথচ ঠিক্ মনোমত উত্তরটি না পাওয়া পর্য্যন্ত নতমুখে দাঁড়াইয়াই রহিল, এবং আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়াইয়া জড়াইয়া ও পায়ের নখে মাটী খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া এই কথাটাই বারংবার জানাইয়া দিতে লাগিল যে মীমাংসা তাহাদের মনঃপূত না হইলে তাহারা ঠিক খুসি হইতেছে না। কিন্তু আজ এই পাহাড়ের পাদদেশে উদাস প্রান্তরের মাঝখানে ইহারা দুইটীতে যে হাঁড়ি কাঠি লইয়া বসিবে এটা যে কোনও মতেই হইতে পারে না তাহা দৃঢ়স্বরে জানাইয়া দিয়া কহিলাম, "বৌদিদি, তুমি ওদের নিয়ে একটু ঘুরে এসনা কেন,"—কিন্তু বৌদিদিও নড়িবার কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া কহিলেন, "তা' যাচ্ছি, কিন্তু তার পূর্ব্বে কর্ত্তারা বাহিরে মাতামাতি করে ফিরে এসে যখন মুখ শুকিয়ে ঠিক ঐ মলিন হাঁড়ি কাঠির সম্মুখেই দাঁড়াবেন, তখনকার ব্যবস্থাটা একটু না করে রেখে স্বস্তি পাচ্ছি কই ?"

"সে তো ঐ ঠাকুর চাকর রয়েচে, ওরাই সব ঠিক করে নেবে এখন"—

একথার উত্তরে বৌদিদি শুধু একটু হাসিলেন; সে হাসিতে স্নেহামৃত ক্ষরিত হইতেছিল। বিদ্যুৎও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; সুজাতার মুখের দিকে চাহিলাম। স্বেদবিন্দু তাহার ললাটের উপর ফুটিয়া উঠিতেছে, মৃদু বায়ু তাহার চূর্ণ কুন্তল উড়াইতেছে! লজ্জারক্ত কপোলের বর্ণসুষমার উপর দোদুল্যমান কর্ণভূষার হীরক আভা লাগিয়া লাগিয়া তাহার সুগৌর মুখখানিকে সপ্তমীর দেবীপ্রতিমার চারুমুখশ্রী প্রদান করিয়াছিল।

কখন অনিল আসিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। ফিরিয়া চাহিয়াই দেখিলাম অনিলের চকিত দৃষ্টি সুজাতার মুখের উপরেই নিবদ্ধ রহিয়াছে!

অনিলের সে দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর ও তন্ময় এবং এক-বারেই জ্বালা-শূন্য।

যে একবার ভাল বাসিয়াছে, তাহার ঐ দৃষ্টিকে চিনিতে একটুকুও বিলম্ব হয় না! মুহূর্ত্তের জন্য আমার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু এত বিরক্তি লইয়া যাহার মুখের দিকে চাহিলাম, সে পরম নিশ্চিন্ত মনে বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "ইন্দিরা দি,' ঐ বড় পাথরের টিবিটার পাশেই ভারি সুন্দর একটা ঝাওগা দেখে এসেচি,—তোমরা দেখ্‌বে ? এস না ?"—

যে এমন সহজ সরল কণ্ঠে কথা বলিতে পারে, তাহার উপর রাগ হয় না। কিন্তু তবু বুকের ভিতর একটা নূতন-তর জ্বালা অনুভব করিতেছিলাম! এ কিসের জ্বালা ? এ কিসের দহন ?—

হাতের কাজগুলি শেষ করিয়া ফেলিয়া স্মিতমুখে বৌদিদি কহিলেন, "চল্ অনু, তুমিও চলনা ঠাকুরপো!—ওকি, তোমার মুখ চোখ্ অমন দেখাচ্ছে যে? অসুখ করেনি তো?"

একটা পাত্রে কিছু সরবৎ তৈয়ারী করা ছিল; এক গেলাস আমার হাতের কাছে ধরিয়া কহিলেন, "এইটে খেয়ে নাও তো! অনেকটা ভাল বোধ করবে।" সরবৎটা নিঃশেষে পান করিয়া গেলাসটা ফিরাইয়া দিতে দিতে কহিলাম, "না, ও কিছু নয়, বৌদি'; এখনি সব ভাল হয়ে যাবে। আচ্ছা, চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।" কিন্তু যাইবার উৎসাহ যে আমার একেবারেই ছিল না, তাহা বোধহয় বৌদিদির তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইল না।

—"থাক্ না, আমরা এখন নাই বা গেলাম, অনু!" একখানা হাতপাখা জিনিশপত্রের মধ্য হইতে তুলিয়া লইয়া বৌদিদি কহিলেন, "এই পাথরটার উপর বেশ ভাল হয়ে বস দেখি, আমি একটু হাওয়া দিচ্ছি।—যে পাহাড় ফাটা রোদ্, এতে কি আর মাথা স্থির থাকে?"

নিতান্ত বাধ্য ছাত্রের মতই পাথরখানার উপর বসিয়া পড়িলাম, এবং বৌদিদির হাতের পাখার বাতাসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইলে ভাবিতে লাগিলাম, এ আমি হইয়াছি কি? এ কোন্ মরুভূর মধ্যে, তৃষ্ণার্ত্ত আমি আসিয়া পৌঁছিয়াছি? শ্যামবনানীর কোমল ছায়া এখানে নাই; বিহঙ্গের কাকলী এখানে শুনা যায়না; মেঘের ছায়ায় এ দারুণ কঙ্করপথ ছায়াবৃত হইয়া উঠে না;—শুধু দূরে—অতি দূরে, দেখা যায় সেই স্বপ্নপুরী; যেখানে রঙ্গের উপর রঙ্গের খেলা চলিয়াছে;—সবুজের নেশায় আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে; পুষ্পে ফলে, লতিকায় পল্লবে নন্দনশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে! সুন্দরের রথচক্রের ছায়ায় ছায়ায় লাস্য-লীলার কোমল নর্ত্তন চলিয়াছে; এবং সেই চিরকিশোর বিশ্বের ঠাকুরটির বাঁশরীর উন্মুখ আবাহনগীতি আকাশ বাতাস পাগল করিয়া দিতেছে!

কিন্তু কোথায় কাহার কাছে ঐ স্বপ্নপুরীর সোণার চাবি কাটিটি!—কাহার মায়াস্পর্শ, কাহার নিবিড় সঙ্কেত, কাহার ধ্রুবদৃষ্টিটুকু, আমাকে ঐ স্বপ্নরাজ্যের পথ দেখাইয়া দিবে?—

লতাগুল্মের সাহায্যে, খণ্ডপ্রস্তরের সিঁড়ি বাহিয়া; অজিত ও আলবার্ট ত্রিকূটের উপর খানিকটা উঠিয়া গিয়াছে। সেখানে এক প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া পড়িয়া অজিত তাহার দূরবীণটা পরম যত্নে বাহির করিয়া লইল; এবং বারংবার চীৎকার করিয়া জানাইয়া দিল যে তাহারা ঐ দূরবীণটীর সাহায্যে বহুদূরের দৃশ্য চমৎকার দেখিতে পাইতেছে, এমন কি অতুলদের কম্পাস্ টাউনের বাসাটীও একেবারে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

বৌদিদি মহাব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "ও অনিল, ওদের ডেকে বল্, ওরা নেমে আসুক।—ওমা, এমন বিপদে পড়েচি এদের নিয়ে এসে! কখন ওরা পাহাড়ে চড়ে বসল, তা'তো কিছুই দেখিনি!—ও অজিত, অজিত!"—

অতুলের স্ত্রী হাসিতে হাসিতে কহিল,—"ঠাকুরঝি কি ক্ষেপলে? পুরুষছেলে পাহাড়ে উঠেচে তা'তে হয়েচে কি? আর তোমার ঐ আলবার্ট টা তো পাহাড়ের দেশের লোক! ওরা ঠিক নেমে আসবে, ভয় কি?"—

বিনুও হাসিতেছিল, কিন্তু সুজাতার মুখ একেবারে কাগজের মতই সাদা হইয়া গেল। সে বৌদিদির কাছে সরিয়া আসিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "ও দিদি, তুমি ওদের নেমে আসতে বল, সত্যি আমার ভয়ে বুক কাঁপছে!"—

একটু হাসিয়া অনিল উঠিয়া পাহাড়ের দিকে গেল; অজিত ও আলবার্ট অনিলের দিকে দূরবীণ্ বাগাইয়া ধরিয়া হাসিতে লাগিল, এবং একটু পরেই কাঠবিড়ালীর মতই স্বচ্ছন্দে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতে লাগিল। সুজাতা রুদ্ধনিশ্বাসে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল;—এবং যতক্ষণে তাহারা ঠিক্ মাটীতে আসিয়া না দাড়াইল, ততক্ষণ বৌদিদির আঁচল চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

অজিত কাছে আসিতেই সুজাতা কহিল,—"আচ্ছা অজিত, তুই এমন সর্ব্বনেশে হয়ে উঠ্লি কেন বল্তো? তোর কি ভয় নেই রে!"

আলবার্ট কহিল, "ভয় কি দিদিমণি? ও যে বাঙ্গলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে প্রতিজ্ঞা করেচে; ওর ভয় করলে চলবে কেন?"—

"তোমার ভয় করেনা, আলবার্ট?"

"আমি আইরিশ্, আমার ভয় করতে নেই দিদিমণি! আমাকে হয়তো যুদ্ধে গোলাগুলি খেয়েই মরতে হবে।"

আলবার্ট তাহার দুই পকেটের মধ্যে হাত দুইখানি প্রবেশ

করাইয়া দিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সুজাতা শিহরিয়া উঠিয়া অজিতের হাত চাপিয়া ধরিল এবং নিতান্ত অসহায় ভাবে একবার চারিদিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

বৌদিদি কহিলেন, "ষাট, ষাট্! অমন কথা বল্‌তে নেই, লক্ষ্মী ভাইটী আমার।"

আল্‌বার্ট একটু বিস্মিতভাবে বৌদিদির মুখের দিকে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "আমাকে যে একজন বড় জেনেরাল্ হতেই হবে দিদিমণি!"

বৌদিদি আল্‌বার্টের গর্ব্বিত মুখখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পরম বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, "ওমা, এতটুকু ছেলে বলে কি? এর এখনি এত সাহস! সাধে কি আর ওরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে আমাদের এত বড় দেশটার উপর রাজত্ব করচে!"

অজিত তাহার ক্ষুদ্র বন্ধুটীর প্রশংসাবাণী শুনিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সুজাতার দিকে চাহিয়া কহিল, "শুন্‌লি দিদি,—আর তুই তো তোর অজিতের বাসায় ফির্‌তে পনের মিনিট দেরী হলেই একেবারে কেঁদে অস্থির হ'স্! আমরা যে এমন ভীরু, সে শুধু তোদের ঐ চোখের জলের জন্যে!"

"আচ্ছা, তুই থাম্, খুব পাকা পাকা কথা শিখেচিস্ কিন্তু! আর তুই অমন করে পাহাড়ে পর্ব্বতে উঠ্‌তে পাবিনে।—যদি পড়ে যেতি!"—সুজাতার কণ্ঠস্বর আবার অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল।

"হাঁ, আমি এখনও ছোট্টটী আছি আর কি? বার বছরের সময় বাদল কি করেছিল জানিস্? আমি তো আর কদিন পরেই চৌদ্দ বছরে পড়্‌ব।"

অজিত বিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তির মত মুখশ্রী অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া প্রথমে সুজাতার তারপর বৌদিদির মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখের এই অত্যন্ত গম্ভীর ভাবটী দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

এই আনন্দের হাটের মধ্যে আমার কোনও যোগ ছিল না। দূরে বসিয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিলাম। ঐ সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞ শিশু—কি বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়াই বিশ্বসংসার উহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে! ঈর্ষার জ্বালা নাই, নিরাশার দহন নাই, শুধু পরিপূর্ণ আনন্দের কল্পনা ও আয়োজন!

এই তরুণ হৃদয়গুলিই এই মাটীর পৃথিবীটাকে বিচিত্র ও রঞ্জিত করিয়া তুলে;—আশা ও বিশ্বাসের নির্ম্মল আলোকে প্লাবিত করিয়া দেয়!

এমন সময় মাথায় চাদর জড়াইয়া অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল!

"খালি পেটে এমন যে মধুর হরিনাম, তাও বেশীক্ষণ করা যায় না। আর এতো পর্ব্বতারোহণ ও শরতের তীক্ষ্ণ রৌদ্রসেবন। আহারের ব্যবস্থা কি, ইন্দিরা দি?—এদিকে নাড়ী পর্য্যন্ত—যে হজম হয়ে যাবার যোগাড়?"

অতুলের স্ত্রী টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল; অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, "এলেন দিগ্বিজয় করে। এখানে এই পাহাড়ের তলায় খিদে বল্‌লেই বুঝি খাবার পাওয়া যাবে?"

বৌদিদি মৃদুহাসিয়া, অতুলের স্ত্রীকে একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "তুই থাম্‌রে ফাজিল্ বৌ!" তারপর অতুলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "খাবার কিছু সঙ্গে নিয়ে এসেছি, অতুল। তোমরা সবাই ই চপলা, কিছু খেয়ে নাও; তারপর পাক তো হ'ল বলে!"—

অজিত আনন্দে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়, বৌদি! কিন্তু কোথায় রেখেচ তুমি সেগুলি? আমি তো একবার চালডালের পুটুলিগুলি সব খুঁজে দেখে এসেচি কই কোথাও তো কিছুটী পেলাম না!"

পরম হৃষ্টস্বরে অতুল কহিল, "সব কাজের ভার যখন ইন্দিরা দি'র উপর দেওয়া হয়েছে, তখন কিছুরই যে অভাব হবে না, ও আমি ঠিক্ জান্‌তাম্!"—

শালপাতার উপর খাবার গুলি সাজাইয়া দিতে দিতে বৌদিদি সুজাতা ও বিদ্যুৎকে কহিলেন, "ওরে তোরা দুটীতে সবাইকে খাবার দিয়ে আয়না?" অজিত দিবার অপেক্ষা না রাখিয়া একটা ঠোঙ্গা তুলিয়া লইল। আল্‌বার্ট একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়া সম্মুখের আর একখণ্ড প্রস্তরকে টেবিল করিয়া লইয়াছিল।

সুজাতা তাহার সেই অপূর্ব্ব টেবিলটীর উপর খাবারের ঠোঙ্গা রাখিতেই অজিত বলিয়া উঠিল, "তুমি বাপু, বাঙ্গালী হয়ে গেছ, আর টেবিলের মায়া কেন?"—

আল্‌বার্ট হাসিয়া কহিল, "না, আমি আইরিশ্‌, টেবিল ছাড়্‌ব না; তবে আমি বাঙ্গলাকে ও বাঙ্গালীকে খুব ভালবাসি।"

"ঠিক্ কথা, যে আইরিশ্‌, সে আইরিশ্‌ই থাক্‌, এবং যে বাঙ্গালী সে বাঙ্গালীই থাক্।"—অতুল কথা বলিতে বলিতে পরিস্কার ঘাসের উপরেই বসিয়া গেল এবং খাবারের ঠোঙ্গা টানিয়া লইয়া সেই দিকেই মনঃসংযোগ করিল।

বৌদিদি কহিলেন, "তুমি আস্‌বেনা, ঠাকুরপো? যা না, তোরা কেউ ঠাকুরপোকে খাবারের পাতাটা দিয়ে আয়না?"

কিন্তু সুজাতা কি বিদ্যুৎ কেহই নড়িলনা। বিদ্যুৎ তাহার আরক্ত ওষ্ঠপুট দাঁতে ঈষৎ চাপিয়া একবার অপাঙ্গে আমার দিকে চাহিল; সুজাতা কোনও দিকে না চাহিয়া বৌদিদির পাশে বসিয়া পড়িয়া শালের পাতার উপর খাবার সাজাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অতুলের স্ত্রী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, "ওসব কিছু ওদের দিয়ে হবে না, ঠাকুরাণী; তুমি নিজেই দিয়ে এস না?"

তখন বৌদিদি খাবারের পাতাটা তুলিয়া লইতেই আমি কহিলাম, "ওর চেয়ে আর এক গেলাস সরবৎ আমাকে দাও না, বৌদি; খাবার খেতে ইচ্ছাটা বড় নেই।"—

"আচ্ছা, খাবারও খাও, সরবৎও দিচ্ছি!"

অজিত তাহার খাবারগুলি নিঃশেষ করিয়া গম্ভীর মুখে বলিয়া উঠিল, "আমারও খাবার খেতে ইচ্ছে নেই, সরবৎই খাব।"—

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

সেইদিন সন্ধ্যার অনেক পরে আমাদের গাড়ী মন্থর গতিতে, উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া, সবুজ ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া দেওঘরে প্রবেশ করিল।

ঠিক্ আমার সম্মুখের আসনেই সুজাতা ও বৌদিদি বসিয়াছিলেন। গাড়ীর কোণের অন্ধকারের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া সুজাতাকে দেখিতেছিলাম।

খোলা জানেলার পথে চাঁদের আলো তাহার অনাবৃত মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। বাতাস তাহার অযত্ন-বিন্যস্ত চুলের রাশি উড়াইয়া কর্ণভূষণ দুলাইয়া, কেশতৈলের স্নিগ্ধ বকুলগন্ধ বহন করিয়া আনিয়া আমার মুখে চোখে মৃদুল স্পর্শ দিয়া যাইতেছিল।

এই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুর মধ্যে কতবার তাহার অঞ্চলের মৃদুস্পর্শ আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে, কতবার তাহার ত্রস্ত চকিত দৃষ্টি আমার মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য উৎসারিত হইয়াছে।

সেই অদ্ভুত চক্ষু দুইটীর নিবিড় দৃষ্টি কি শান্ত, কি অচঞ্চল! বিশ্বের সমস্ত রহস্যের বিপুল ইতিহাসটী যেন ঐ দৃষ্টির মধ্যেই লুকায়িত রহিয়াছে।

অতুলদের 'গাড়ী' কম্পাস্ টাউনের দিকে চলিয়া গেল। পথে একবার গাড়ী রাখিয়া আল্‌বার্টকে তাহার কুঠিতে পৌঁছাইয়া দিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম রমাপ্রসন্নবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

মেঘ ও বিদ্যুৎ

বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন দেখিয়াছিলেন যে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত তড়িৎ-শক্তির যেমন বিদীর্ণ করিবার, উত্তাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে, আকাশে যে বিদ্যুৎ দেখা যায় তাহাতেও সেই সকল ক্ষমতা সমানভাবে বিদ্যমান। তবে পার্থক্য কেবল মাত্র তাহাদের কার্য্যকর সামর্থ্যের পরিমাণে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তাড়িৎপূর্ণ মেঘ হইতে তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায় কি না দেখিবার জন্য তিনি আকাশে ঘুড়ি উড়াইয়া তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঘুড়ির উপরের ধাতব শলাকায় সহিত সূতার একপ্রান্ত সংলগ্ন করিয়া অপর প্রান্ত একটী চাবির সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং চাবি ও হাতের ব্যবধানের মধ্যে যাহাতে তড়িৎ-শক্তি সঞ্চলিত হইতে না পারে সেজন্য উহা

একটী রেশম সুতার সহিত বাঁধিয়া হাত দিয়া ধরিয়াছিলেন। রেশম সুতাটী শুষ্ক রাখিবার জন্ত তিনি ঘরের মধ্য হইতে ঘুড়ি উড়াইয়া দেখিলেন যে উক্ত চাবি হইতে সহজেই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে পারে।

তড়িৎ শক্তি দুই প্রকারের,—সংযোগ-তাড়িৎ-শক্তি ও বিয়োগ-তড়িৎ-শক্তি। বিদ্যুৎ চমক দুইটী বিভিন্ন জাতীয় তড়িৎ-শক্তি-সম্পন্ন মেঘের মধ্যে কিংবা মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে তড়িৎ ক্ষরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পৃথিবী ও মেঘ তড়িৎ-শক্তির আধারস্বরূপ, মধ্যস্থিত বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ পরিচালন ক্ষমতা নাই বলিয়া একটী হইতে অপরটী পৃথকভাবে থাকিতে পারে। যখন একটীতে তড়িৎ-শক্তির আধিক্য হয়, তখনই বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া অপরটীতে পরিচালিত হয়। এইরূপ তড়িৎ-ক্ষরণের নাম বিজলী চমক।

সাধারণতঃ তিন প্রকার বিদ্যুতের চমক দেখিতে পাওয়া যায়,—বাঁকা রেখার ন্যায়, পিণ্ডের ন্যায় গোলাকৃতি ও কতকটা স্থান লইয়া বিস্তৃত আকারের। বিস্তৃত বিদ্যুৎ-ছটা বহুদূরস্থিত মেঘের রেখাকার বিদ্যুতের প্রতিফলিতাংশ। মেঘ পৃথিবীর উপর স্তরে স্তরে সজ্জিত; পৃথিবী হইতে বহু দূরস্থিত মেঘের রেখাকার বিদ্যুৎ তন্নিম্নবর্ত্তী কোন মেঘ হইতে প্রতিফলিত হইয়া ওরূপ বিস্তৃতভাবে আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। গোলাকৃতি বিদ্যুৎ কদাচিৎ দেখা যায়; এবং ইহার উৎপত্তির কারণও আজি পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায় নাই। ইহার আকার একটী উজ্জ্বল আলোক পিণ্ডের ন্যায়। এরূপ বিদ্যুৎ পিণ্ডাকারে ধীরে ধীরে গমন করে ও অবশেষে প্রচণ্ড বেগে ফাটিয়া যায়। এইরূপ বিদ্যুৎ সাধারণতঃ বজ্র নামে অভিহিত হয়। রেখাকার বিদ্যুতের গতিপথ অতিশয় আঁকা বাঁকা। বায়ুমণ্ডল তড়িৎ-শক্তির অপরিচালক হইলেও তন্মধ্যে ভাসমান ধূলিকণা সমূহ তড়িৎ-শক্তি পরিচালনে সমর্থ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার একটী হইতে অপরটীতে সঞ্চালিত হইয়া গন্তব্যস্থানে গমন করে বলিয়া ওরূপ আঁকা বাঁকা দেখায়।

মেঘ, বৈদ্যুতিক শক্তি কেমন করিয়া প্রাপ্ত হয়? এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে সমস্ত পদার্থ বাষ্পাকারে উত্থিত হয় এবং সেই বাষ্পের উত্তাপশক্তি শেষে তড়িৎ শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে সন্তজাত বাষ্পের মধ্যে কোনরূপ তড়িৎ-শক্তির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি তড়িৎ-শক্তিপূর্ণ তরল পদার্থ হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয় তাহাতেও তড়িৎ-শক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে সম্ভব কারণ এই হইতে পারে যে যখন বাষ্প উপরের দিকে উঠিতে থাকে তখন কঠিন ও তরল পদার্থের সূক্ষ্ম কণাবু সহিত সংঘর্ষে উহা বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন হইয়া মেঘাকারে পরিবর্ত্তিত হয়; কিংবা উপরে উঠিবার সময় বিভিন্ন প্রকার তাপ বিশিষ্ট বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া মেঘ তড়িৎ পূর্ণ হইয়া থাকে।

দিবস ও রজনীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে বায়ুমণ্ডলে তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে কিংবা মধ্যরাত্রে সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। সেজন্য দিবসের শেষভাগে ও রাত্রিতে প্রধানতঃ ঝড়বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মেঘ বিভিন্ন জাতীয় তড়িৎ-শক্তি সম্পন্ন হয় ও তাহাদের পরিমাণের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কতকগুলি অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল মেঘ হইতে বিদ্যুৎক্ষরণ হয় ও ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। মেঘ যত বেশী হয় তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম কণাও তত বেশী থাকে। সেজন্য গ্রীষ্মকালের প্রখর সৌরকর তাপে যখন লবণাম্বুধির ও অন্যান্য জলাশয়ের জল অধিক পরিমাণে বাষ্পাকারে পরিণত হয় তাহার অব্যবহিত পরেই ঝড় ও বৃষ্টির প্রবলতা দেখিতে পাওয়া যায়।

আকাশে নানা বর্ণের বিদ্যুৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সাদা, নীল, বেগুনে ও লাল এই কয়টী বর্ণ দেখা যায়। বিদ্যুতের বর্ণ মেঘের দূরত্ব ও বিদ্যুতের আতিশয্যের উপর নির্ভর করে। বিদ্যুতের পরিমাণ যত অধিক হইবে আলোকের বর্ণ তত সাদা হইবে। একটী বায়ুশূন্য কাচপাত্রের ভিতর দিয়া তড়িৎশক্তি চালনা করিলে বায়ুর চাপের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের বর্ণপার্থক্য লক্ষিত হয়। যদি পাত্রমধ্যস্থ বায়ুর চাপ খুব কমিয়া যায় বা একেবারে বায়ুশূন্য হয় তাহা হইলে নীল কিংবা বেগুনে রংএর আলোক দেখা যাইবে। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে নীল ও বেগুনে রংএর বিদ্যুৎ-ছটা বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে উৎপন্ন হইতেছে।

বিদ্যুৎ চমকিবার অব্যবহিত পরেই এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় তাহাকে আমরা মেঘ গর্জ্জন বলিয়া থাকি।

মেঘ হইতে অন্য মেঘে যখন তাড়িৎ সঞ্চালিত হয় তখনই এই শব্দের উৎপত্তি হয়। শব্দ অপেক্ষা আলোকের গতি বেশী বলিয়া আগে আলোক দেখিতে পাওয়া যায় ও পরে শব্দ শ্রুতি গোচর হইয়া থাকে। মেঘগর্জ্জনের সময় কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় লওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। বৃক্ষ তড়িৎ-শক্তির পরিচালক সুতরাং মেঘ হইতে বিদ্যুৎ পৃথিবীতে আসিবার সময় সর্ব্বাগ্রে বৃক্ষের শীর্ষস্থানে আকৃষ্ট হয় ও তৎপরে মাটীর ভিতর পরিচালিত হয়। বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত আমাদের দেহ সংলগ্ন থাকিলে আমাদের ভিতর দিয়া তাড়িৎ-শক্তি পরিচালিত হইয়া যায় ও শিরাসমূহের সহসা আকুঞ্চন হেতু মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইলে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে মাটীর উপর বসিয়া কিংবা শুইয়া থাকিলে আশু বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। মেঘ গর্জ্জনের সময় নৌকা যাত্রীদের নৌকার উপর দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নয়। কারণ জলের তাড়িৎ-শক্তি আকর্ষণের ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বজ্রাঘাত হইলে জলের উপরের মনুষ্য শরীরে উহা আকৃষ্ট হয় ও সেখান হইতে জলের ভিতর চালিত হইয়া থাকে। বজ্রাঘাতের সম্ভাবনা থাকিলে কাঠের চৌকির উপর কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। তবে নিয়তির হাতে কে এড়াইবে? সর্ব্বনিয়ন্তা ব্যক্তিগত জীবনের উপর যে বিধান দিয়াছেন তাহা কখনই মুছিবার নহে।

শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য।

পুনরুদ্ধার

যতটুকু শক্তি আছে হাতে
সেদিন প্রভাতে
শূন্যপানে করিয়া সন্ধান
হানিলাম বাণ,
জানিনা সে পড়েছে কোথায়
কোন অজানায়।

বক্ষভেদি ওঠে কোন সুর,
আলোক বাতাস আজ সকলি মধুর
একশ্বাসে গেয়েছি সে গান,
থেমে গেছে—
আর তার পাইনি সন্ধান।

বর্ষ চলিয়া গেছে পাছে,
কোনদিন দেখি এক গাছে
অভাঙ্গা বিঁধিয়া সেই তীর!
মন মোর হয়েছে সুস্থির।

একদিন চেয়ে চেয়ে দেখি
বঁধুর অন্তর মাঝে এক
অতীতের ভুলে যাওয়া গান
সব টুকু আঁকা বিমলিন!
তৃপ্তহিয়া,—পেয়েছি সন্ধান।

(Arrow-ward the song—Longfellow)

শ্রীনরেন গাঙ্গুলী

লক্ষ্মী

(সত্য ঘটনা-অবলম্বনে লিখিত।)

শুভময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, শিক্ষাদীক্ষায় সভ্যতায় ভদ্রতায়, চরিত্রের পবিত্রতায় আদর্শ যুবক। কিন্তু আজ তাঁহার আচরণে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই মর্ম্মাহত। দুই বৎসর হইল বিজয়বাবুর একমাত্র কন্যা

মনোরমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। মনোরমা এখন চতুর্দ্দশবর্ষীয়া, সে ইহার মধ্যে বয়েকবার শ্বশুরঘর করিয়াছে। গুণময়ও শনিবারে শনিবারে শ্বশুরালয়ে আসিতেন। উভয় গৃহই কলিকাতায়, সুতরাং কোন পক্ষেই অসুবিধা নাই। বেশ আনন্দে দু'জনের দিন কাটিতেছিল। কিন্তু দৈবক্রমে আজ রাত্রে গুণময় শ্বশুরমন্দিরে আসিয়া একজন ঝির মুখে কথায় কথায় শুনিয়াছেন যে বিজয়বাবুর একটি রক্ষিতা আছে, তাহাকে তিনি বিস্তর টাকা খরচ করিয়া প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়া দিয়াছেন, ও তাহার উপর মোটা টাকা মাসহারা দেন। যত কাযই থাকুক না কেন, নিজ বাটীতে যত বিপদই ঘটুক না কেন, বৃষ্টিবাদলা ঝড় ঝাপটা যতই হউক না কেন, রোজ একটিবার করিয়া সেখানে না গেলে তাঁহার চলে না। তবে যে কারণেই হউক, সেখানে রাত্রি কাটান না। প্রবীণ শ্বশুর মহাশয়ের এই কীর্ত্তির কথা শুনিয়া চরিত্রবান্ জামাতার মন ঘৃণায় লজ্জায় রাগে ক্ষোভে পূর্ণ হইল। তিনি কোট ধরিলেন, এখনই মনোরমাকে নিজগৃহে লইয়া যাইবেন, আর কখনও তাহাকে বাপের বাড়ী মুখো হইতে দিবেন না। এমন বাপের বাতাস লাগিলেও মনোরমার চরিত্র কলুষিত হইয়া যাইবে, গুণময়ের এইরূপ বিশ্বাস। তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি এই কথা স্ত্রী ও শাশুড়ীকে বলিলেন এবং শাশুড়ী ঠাকুরাণী যে ঘরণী হইয়াও স্বামীর এমন অনাসৃষ্টি অনাচার সহ্য করেন, সে জন্যও তাঁহাকে দু'কথা বলিতে ছাড়িলেন না। ভাগ্যে বিজয়বাবু তখন গৃহে ছিলেন না, নতুবা উচ্চশিক্ষিত জামাতা তাঁহাকেও খাতির করিতেন না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী দু'একবার মৃদুস্বরে জামাতাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে ফল হইল না দেখিয়া তিনি বেশী তর্ক করিতে গেলে আরও কেলেঙ্কারী হইবে বুঝিয়া নিরস্ত হইলেন। গুণময় ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া অশ্রুমুখী মনোরমাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। মনোরমার জননী নীরবে চক্ষু মুছিলেন।

বিজয়বাবু যথাসময়ে গৃহে ফিরিয়া সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া রাগ বা দুঃখ, অভিমান বা অপমান-জ্ঞান, কোনওরূপ মনোভাব প্রকাশ করিলেন না, গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ গুম হইয়া থাকিলেন। পরে অফিস ঘরে গিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া বেয়ারাকে তখনই ডাকে দিতে বলিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

(২)

গুণময় পরদিন প্রাতে শ্বশুরমহাশয়ের চিঠিখানি পাইলেন। পোষ্টকার্ডে সামান্য কয়টি কথা। সব চিঠিখানা নকল করিয়া দিতেই বা ক্ষতি কি?

"মঙ্গলাস্পদেষু —

বাবাজী, তোমার কার্য্যে দুঃখিত হই নাই, বরং সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ। তবে তোমাকে একটা কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। একবার সন্ধ্যার সময়—নং বেলিয়াঘাটা রোডে আমার একটি বন্ধুর বাটীতে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে কি? হয়ত আমার গৃহে আর পদার্পণ করিবে না, তাই অন্যত্র দেখা করিতে বলিতেছি। আশা করি, আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। একবার একদণ্ডের জন্য আমার সংস্পর্শে আসিলে তোমার চরিত্র হানির সম্ভাবনা নাই। Robust চরিত্রের লক্ষণই এই। আশীর্ব্বাদক শ্রী বিজয়গোপাল বসু।"

খানি পড়িয়া গুণময়ের প্রথম ঝোঁক হইল, কখনই এমন শ্বশুরের সহিত বাক্যালাপ করিবেন না। কিন্তু চিঠির শেষ কথাকয়টিতে তাঁহার আত্মাভিমান বেশ একটু স্ফীত হইল; তিনি নিজ চরিত্রবলের উপর নির্ভর করিয়া অনুরোধ রক্ষা করাই স্থির করিলেন, অধিকন্তু এই সুযোগে শ্বশুর-মহাশয়কে সুনীতির মহিমা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, ইহাও মনে মনে স্থির করিলেন।

সন্ধ্যাকালে গুণময় পত্রে নির্দ্দিষ্ট বাটীতে পৌঁছিলে দরওয়ান তাঁহাকে দ্বিতলের একটি প্রশস্ত কক্ষে লইয়া গেল। গুণময় দেখিলেন, বিজয়বাবু শুভ্র ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আলবোলায় টান দিতেছেন, আর কেহ সেখানে উপস্থিত নাই। বিজয় বাবু জামাতাকে কাছে বসিতে বলিলেন ও বাটীর সকলের কুশল প্রশ্ন করিলেন। পরে একটু দম লইয়া ও জামাতাকে একটু বিশ্রামের অবকাশ দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"তোমাকে আমার জীবনের ইতিহাস শুনাইব বলিয়া আহ্বান করিয়াছি। একটু স্থির হইয়া সবটি শুনিতে হইবে, শুনিয়া তোমার যথাকর্ত্তব্য করিবে, আমি কোন আপত্তি করিব না।" গুণময় ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন। বিজয় বাবু গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"আজ আমার যে উন্নতির অবস্থা দেখিতেছ, আমার প্রথমজীবনে ইহার কিছুই ছিল না। কেন না আমি দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার শৈশবেই মাতাপিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। স্বগ্রামস্থ এক জ্ঞাতির গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, সেখানে আদরও ছিল না, অনাদরও ছিল না। তিনি নিজের ধান্ধায় ঘুরিতেন, আমার তত্ত্বাবধান করিতেন না। নির্ভবনায় সমবয়স্ক-দিগের সহিত মিলিয়া বাগানে বাগানে কুল পেয়ারা খাওয়া ও খেলাধূলা করাই আমার কাজ ছিল। নামমাত্র স্কুলে যাইতাম। কিছুদিন পরে, গ্রামের স্কুলে ভাল পড়া হয় না এই অছিলায় (কেননা প্রায় বৎসরই ক্লাসে উঠিতে পারিতাম না) কলিকাতা সহরে এক ধনী আত্মীয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন, কিন্তু তিনিও আমার উপর দৃষ্টি রাখিলেন না। তাঁহার অর্থসাহায্যে সহরের স্কুলে পড়িতে লাগিলাম। সহরে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া শীঘ্রই বেশ বকিয়া গেলাম, রীতিমত বদখেয়াল শিখিলাম। হাতে অর্থ ছিল না, ধনী সহপাঠীদের লেজ ধরিয়া আমোদ সাগরে সাঁতার দিতে লাগিলাম।

"এ সব কুৎসিত কথা তোমার বলা উচিত নহে, কিন্তু না বলিলে তুমি আমাকে ঠিক বুঝিতে পারিবে না, তাই বাধ্য হইয়া বলিতেছি। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া তোমাকে শুনিতে হইবে, আবার এই অনুরোধ করিতেছি।

"এই বেলিয়াঘাটায় এক রাত্রে কুস্থানে ইয়ারবর্গের পাল্লায় পড়িয়া বেজায় বাড়াবাড়ি করিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছি, বন্ধুবর্গ যখন আমোদপ্রমোদের পর চলিয়া গেল, তখন আমি অর্দ্ধ-অচেতন, শরীরটা রীতিমত বেএক্তার হইয়া পড়িয়াছিল। সেই অবস্থায় ঐ কুস্থানের একটি নারী (তাহার নাম মথাকমণি) সেবাশুশ্রূষা করিয়া আমাকে সুস্থ করিয়াছিল। সেই অবধি আমার উপর তাহার কেমন মায়া পড়িয়া গেল। কেন জানি না, সে আমাকে সোণার চক্ষে দেখিল। ক্রমে বন্ধুবর্গের সে বাড়ীতে আনাগোনা কমিয়া আসিল, কিন্তু আমি প্রায়ই সেখানে যাইতাম আর দরিদ্র হইলেও আদর যত্ন পাইতাম। বাবাজী বিরক্ত হইও না, মিছামিছি তোমাকে এই লজ্জাকর কথা বলিতেছি না। মন্দর ভিতর ভালর বীজ নিহিত ছিল, সেই কথাই এখন বলিব।

"একদিন থাক আমাকে বলিল, 'দেখ, একটা কথা বলি, রাগ করিও না। তুমি যে ইয়ারদের দলে মিশিয়া একেবারে বয়াটে হইয়া যাইতেছ ইহার শেষ কোথায় একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? উহাদের সকলের রেস্ত আছে, ফুর্ত্তি করিতেছে, তোমার দশা কি হইবে?' ভূতের মুখে রাম নামের ন্যায় তাহার মুখে এই হিতবাণী শুনিয়া আমি বোকা বনিয়া গেলাম। হাসিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার মুখ পানে চাহিয়া সে সাহস হইল না। অগত্যা লজ্জায় অধোবদন হইলাম। সে আরম্ভ করিল, 'দেখ, ও সব চলিবে না। উহার ঢের সময় আছে; এখন তোমার লেখাপড়ার সময়। মন দিয়া লেখা পড়া কর, মানুষ হও দু'পয়সা আনিতে শেখ, তার পর ফুর্ত্তির সুবিধার অভাব হইবে না।' এবার আমি কথা কহিলাম। বলিলাম, 'লেখা পড়া এমন অবহেলা করিয়াছি যে এখন আর চেষ্টা করিয়া শোধরাইয়া লওয়া অসম্ভব।' সে বলিল, 'বেশ, তা হ'লে হোমিওপ্যাথি স্কুলে পড়িয়া ডাক্তার হও। তা'তে বেশী বিদ্যেসাধ্যির ত দরকার নাই।' আমি বলিলাম, 'বই কিনিতে, মাহিনা দিতে টাকা লাগিবে। আমি কোন্ মুখে আশ্রয়দাতার কাছে বলিব, এদিককার লেখা পড়া হইল না, হোমিওপ্যাথি পড়িব, খরচ দিন।' থাক বলিল, 'টাকার ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। যা' লাগে আমি দেব। এতে আর ন'শ পঞ্চাশ লাগিবে না। তুমি মন স্থির করিয়া পড়া আরম্ভ কর।'

"আমি ত এই প্রস্তাব শুনিয়া অবাক্। যা'হক্, তাহার কথা ঠেলিতে পারিলাম না। কেমন সুবুদ্ধি হইল, তাহার প্রস্তাবে রাজী হইলাম। ক্রমে দুই বৎসর পড়িয়া পাশ করিয়া বাহির হইলাম। যে দিন পাশের সংবাদ শুনিল, সে দিন থাক আনন্দে হরির লুঠ দিল ও আমাকে ষোড়শোপচারে আহার করাইল।

"তাহার আনন্দাবেগে একটু ভাঁটা পড়িলে আমি সঙ্কোচের সহিত বলিলাম, 'পাশ করিয়া ত বাহির হইলাম। এখন করিব কি? "এ পাশে চাকরি মেলে না'। ডাক্তারখানা খুলিয়া বসিতে হইলেও অনেক টাকার খেলা। আর কলিকাতায় গলিতে গলিতে ডাক্তার, পসার জমাইতে কখনও পারিব কিনা সন্দেহ। তোমার পরামর্শ শুনিয়া দেখিতেছি ষাঁড়ের গোবর হইলাম।'

সে একটু হাসিয়া বলিল, 'আগে যা হচ্ছিলে সে যে একেবারেই—ষাঁড়ের গোবর তবু ত পদে আছে। যা'হক্, তোমাকে যখন পাশ করিতে বলিয়াছি, তখন এ কথা না ভাবিয়া রাখিয়া বলি নাই।' এই বলিয়া সে ক্যাশ বাক্স হইতে পাঁচশত টাকার নোট বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। বলিল, 'এই টাকায় আপাততঃ দোকান সাজাও, পরে আরও লাগে আরও দেব।' আমি তাহার পুঁজির টাকা লইতে আপত্তি করিয়া বলিলাম, 'সে কি হয়? তোমার আপদ্ বিপদ্ আছে, সঞ্চিত টাকা কি এমন করিয়া নষ্ট করিতে আছে?' সে এবার খুব এক চোট হাসিয়া বলিল—(সে হাসি শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম), 'আমাদের টাকার ভাবনা কি হয়? তুমি আর দ্বিধা করিও না, কাজে বসিয়া যাও।' আমি একটু দম লইয়া বলিলাম, 'তাইত, এ টাকা তোমায় কি করিয়া শোধ করিব তাই ভাবিতেছি।' সে বলিল, 'ওগো', সে ভাবনায় কাজ নাই। যখন বড় ডাক্তার হইবে, তখন ডাকিলেই আসিবে, এই সর্ত্তে টাকাটা তোমায় দিলাম। দেখো, তখন যেন বলোনা, আমরা কাজের লোক, বাজে কাজে সময় নষ্ট করিতে পারি না।' আমি আবেগের সহিত গাঢ়স্বরে, বলিলাম, 'সে কথা ভাবিওনা, থাক। আমি যত বড়ই হই, তোমার দয়া তোমার স্নেহ কখনও ভুলিব না, তুমি না ডাকিলেও রোজ একবার করিয়া আসিব।' সে বলিল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা, সেই কথাই থাকল। দেখা যা'বে, তুমি কেমন সত্যবাদী।'

"তা'রপর দোকান সাজাইলাম, ধড়াচূড়া বাঁধিলাম, রোগীর সন্ধানে ফিরিতে লাগিলাম। জানি না, আমার কোন্‌গুণে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিতে দেখিতে পসার জমিয়া গেল, হাতযশে সকলে মুগ্ধ হইল, বড় বড় ঘরে ডাক আসিতে লাগিল, মাসে হাজার টাকা উপায় করিতে লাগিলাম।

কিন্তু ধনগর্ব্বে আমি সেই দয়াময়ী স্নেহময়ী পতিতাকে ভুলি নাই। নিজের উচ্চপ্রাসাদ নির্ম্মাণের আগে বেলিয়াঘাটার সেই খোলার বাড়ীর জমি কিনিয়া এই দেখ আমার দারিদ্র্যহারিণী থাকমনির অট্টালিকা করিয়া দিয়াছি। না, না, আর তাহাকে 'থাক' বলিব না, তাহা হইতেই আমার এই লক্ষ্মীশ্রী,—এখানে 'লক্ষ্মী'মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছি। অসময়ে যে আমাকে অধঃপতনের অতল হইতে উদ্ধার করিয়াছে, অকূলে কূল দিয়াছে, তাহার কাছে কি আমি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি? তাহারই অনুরোধে বিবাহ করিয়াছি, সংসারী হইয়াছি; স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সুখে জীবন কাটাইতেছি। কিন্তু আমার সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মনে করিয়া দিনান্তে একবার তাহাকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারি না। অন্যায় করিয়াছি কি?"

(৪)

জামাতা বাবাজী পতিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে প্রথম প্রথম একটু উসখুস করিতেছিলেন, কিন্তু শেষটা বেশ নিবিষ্টচিত্তেই বৃত্তান্তটা শুনিলেন। তাহার পর শ্বশুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আপনি পিতৃতুল্য, আমি যে হঠকারিতার কাজ করিয়াছি, বালকের ছেলেমানুষি মনে করিয়া তাহার জন্য মাফ করুন। আর সেই দয়াবতী মহিলার কাছে আমাকে একবার লইয়া চলুন, আমি তাঁহার চরণধূলি লইয়া ধন্য হই।'

বিজয়বাবু আনন্দের আবেগে জামাতাকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং আবেগ একটু প্রশমিত হইলে অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, 'লক্ষ্মী, একবার এদিকে এস।" লক্ষ্মী বোধহয় পাশের ঘরেই ছিল, ধীরপদক্ষেপে শ্বশুর-জামাতার সম্মুখীন হইল। গুণময় অবাক্ হইয়া দেখিলেন, বিধবার বেশে অর্দ্ধবয়স্কা এক নারী, চোখে মুখে হাবভাব কিছুমাত্র নাই, মুখে ম্লান হাসি ও দৃষ্টি নত। দেখিয়া গুণময় অগ্রসর হইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে হেঁট হইতেছিলেন, 'লক্ষ্মী' ব্যস্ত হইয়া তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "ছিঃ বাবা, আমাদের মত পাপিষ্ঠাকে কি তোমার মত সচ্চরিত্র ভদ্রবংশীয় ছেলের প্রণাম করিতে আছে? এমনিই আমাদের পাপের অন্ত নাই, আবার তোমার প্রণাম গ্রহণ করিয়া কি আরও পাপে ডুবিব? যা'হক্, আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠা, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—বেঁচে থাক, সুখে থাক, চরিত্রধনে ধনী হও।"

তাহার পর 'লক্ষ্মী' ঘটা করিয়া উভয়কে জলযোগ করাইল, সে সব বিবরণ দিয়া আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
(অধ্যাপক।)

দেশের ও দশের কথা

"Without Country you have neither name, token, voice, nor rights, no admission as brother into the followship of the Peoples. You are the bastards of Humanity. Soldiers without a banner, Israelites among the nations, you wil find neither faith nor protection ; none will be sureties for you.

Mazzini.

জানিনা কোন্ পাষাণ-দেবতার অভিশাপে হতভাগ্য দেশ আমার এত জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। আধি-ব্যাধি, দুঃখ-বিপদ, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর নিষ্পেষণে ও নিপীড়নে দেশ যে যায় যায় হইয়াছে। কখনো অন্ন-বস্ত্রের অভাব কখনো বা দৈব দুর্ঘটনা, কখনো বা ব্যাধির আক্রমণ—এইত প্রতিদিন শুনিতে পাইতেছি।

যুদ্ধনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভাব করালমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ঘটিয়াছে। দেহ ধারণোপযোগী জিনিষাদি সংগ্রহ করিতে যে মূল্য প্রদান করিতে হইতেছে তাহা এদেশবাসী অনেকেরই সাধ্যাতীত। অথচ এই সময়ে অনেকেরই আয় বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

"পুষ্টিকর খাদ্য ও শরীর রক্ষণোপযোগী বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইলে সাধারণতঃ যে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে এস্থলে তাহার কিছুরই ব্যত্যয় ঘটে নাই। নানাপ্রকার রোগে এদেশবাসী মশামাছির ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতেছে। জ্বর, ওলাওঠা, উদরাময়, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু এ দেশে উহার প্রকোপে যে পরিমাণ লোক যমালয়ে প্রেরিত হইতেছে তাহা অন্য দেশের লোক ধারণা করিতে পারে না।

"এ বৎসর হঠাৎ চাউলের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি হওয়ায় দেশে এক মহা হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এদেশের চাউল বিদেশে রপ্তানি করিয়া শেষে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আনাইয়া এদেশ রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও এত উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে না পারিয়া বহু লোক অনাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। যে দেশ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সে দেশের চাউল বিদেশে চলিয়া যাইতেছে ; এখন সেই দেশের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য অন্য দেশের অপকৃষ্ট চাউল অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতেছে ; তাহাতেও এদেশবাসীর দগ্ধ উদর পূর্ণ হইতেছে না।

"এখন এদেশে চাউল প্রতিমণ ১০৲। ১২৲ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। কোনও কোনও স্থানে ঐ মূল্য ১৫৲ ১৬৲ টাকায় উঠিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একমণ চাউল দুই টাকায় বিক্রয় হইত। এমন কি গত বৎসরেও চারি টাকায় একমণ চাউল বিক্রয় হইয়াছে। একমণ তৈল ক্রয় করিতে এবার অন্ততঃ পক্ষে ৫২৲ টাকার প্রয়োজন হয় ; গত বৎসরেও উহা ২৫৲ পঁচিশ টাকায় পাওয়া যাইত। একমণ চিনি এখন মফঃস্বলে ৩০৲ ত্রিশ টাকা দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে। গত বৎসরে উহা ক্রয় করিতে ১৫৲ টাকার অধিক লাগে নাই। লোকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে, শান্তি অপেক্ষা যুদ্ধের অবস্থাই আমাদের পক্ষে ভাল ছিল।

"এ দিকে দুর্ভিক্ষ মহামারীর আক্রমণে দেশবাসী মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। কি করিয়া উদরপূরণের সংস্থান করিবে, কি করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির পন্থা আবিষ্কার করিয়া রক্ষা পাইবে, কি উপায়ে দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া ধনার্জ্জনের পথ সুগম করিবে—এই চিন্তায় বাঙ্গালী আপন শক্তি নিয়োজিত করিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ বাঙ্গালী আর এক ভীষণ বিপদে পতিত হইল। ২৪শে সেপ্টেম্বরের ভীষণ ঝটিকায় বাঙ্গালার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার কতক বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

বঙ্গে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত।

"গত ২৪এ সেপ্টেম্বর পূর্ব্ববঙ্গের বহু জিলার উপর দিয়া অতি ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত প্রবাহিত হওয়ায় যে মহাপ্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে উহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা ভীত ও চিন্তিত হইয়াছি। উক্ত প্রলয় ঝড়ে কত লোকের প্রাণ নাশ হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু চাঁদপুর,

খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জিলায় সহস্র সহস্র নরনারী গৃহহীন হইয়াছে, অসংখ্য বৃক্ষ ভূপতিত ও শস্য বিনষ্ট হইয়াছে। বঙ্গের সর্ব্বত্রই এখন আহার্য্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় লোকে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছিল, সেই দুর্দ্দিনে এই ভীষণ অনর্থপাতে লোকের ক্লেশ সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইবে। পূর্ব্ববাঙ্গলার লোক অন্নহীন ও বস্ত্রহীন হইয়াছিল, ঝড়ে তাহাদিগকে গৃহহীন করিয়াছে।

চাঁদপুর।

"গত ২৪এ সেপ্টেম্বর সমস্তদিন চাঁদপুরে ভীষণ বারিবর্ষণ হইয়াছিল। রাত্রি ১০ ঘটিকার পরে তৎসহ ভীষণ ঝটিকা আরম্ভ হয়। মহকুমার সকল স্থলেই এই ঝড় বহিয়াছিল। সংখ্যাতীত গৃহ ও বৃক্ষ ভূমিসাৎ হইয়াছে। অসংখ্য মালভরা নৌকা ডুবিয়াছে। সহরের অদূরে এক মুসলমান বৃদ্ধ ঘরচাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। আরও মৃত্যুর খবর আসিতেছে। একে এই ভীষণ ঝড়, তদুপরি জল বৃদ্ধি হওয়ায় শত শত লোকের ঘরের মধ্যে হাঁটু-সমান জল দাঁড়াইয়া যাওয়ায় তাহাদের অবর্ণনীয় ক্লেশ হইয়াছে।

ঢাকা।

"গত ২৪এ সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০ টার পর হইতে ঢাকা সহরে তুমুল ঝটিকা উত্থিত হয়। রাত্রি ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত এই ঝড় প্রচণ্ডতম হইয়াছিল। লোকে বলে, বহুকালে ঢাকায় এমন ঝড় কেহ দেখে নাই। ঢাকা সহরের এবং সমীপবর্ত্তী সকল স্থলের খড়ের বাড়ীগুলি চুরমার হইয়াছে। অসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে। বুড়ী গঙ্গায় অসংখ্য নৌকা ও অনেক গুলি বাষ্পীয় তরী ডুবিয়া গিয়াছে।

নোয়াখালী।

"নোয়াখালি সহরে ঝড় হইয়াছিল। তবে উহার উগ্রতা তেমন ভীষণ হয় নাই। কলিকাতা হইতে পূর্ব্বেই ঝড়ের তার তথায় গিয়াছিল। রাত্রি ৯॥ ঘটিকার সময়ে ঝড় উত্থিত হয়। একটার সময়ে নদী ও খালের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া সহর জলমগ্ন হইয়াছিল। অনেকের সেই ১২৮৩ সালের ভীষণ বন্যায় কথা স্মরণ হইতেছিল। রাত্রি ৩টার সময় হইতে জল কমিতে থাকে। অনেক খড়ের ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। ঘর পড়ায় ১ জন লোক মারা গিয়াছে। চরের অনেক মহিষ ভাসিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

"গত ২৪এ সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রবল ঝড় হইয়াছিল। ভোর ৬টার সময়ে ঐ ঝড় অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। অসংখ্য ঘর ও গাছ পড়িয়া গিয়াছে। এমন লোক নাই যাহার কিছু না কিছু অনিষ্ট হয় নাই। এই ঝড়ে আমন ধানের অনিষ্ট হইয়াছে। নদীগর্ভে বহু নৌকা নিমগ্ন হইয়াছে। একে লোকের অন্নকষ্ট, তাহার উপর এই দৈব উৎপাত!

নারায়ণ গঞ্জ।

"গত ২৪এ সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টার পর হইতে পরদিন ভোর ৭টা পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জে অতি ভীষণ ঝড় বহিয়াছিল। সমস্ত সহর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষ যে গুলি এখনও দাঁড়াইয়া আছে সে গুলিও ডালপালা শূন্য। টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইয়াছে। ষ্টীমার ঘাট ধ্বংসস্তূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উচ্চবিদ্যালয়ের ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লোকের অনিষ্ট ও ক্লেশ অবর্ণনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

ফরিদপুর।

"ফরিদপুরে ভীষণ-ঝড়ে লোকের বিশেষ ক্লেশ হওয়ায় তাহাদের সাহায্যার্থ তথাকার সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এন, রায় সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। নগর ও উপকণ্ঠের দরিদ্রদের দানার্থ ৪ শত টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। আরও অর্থ সংগ্রহ করা হইবে।

ময়মনসিংহ।

"ময়মন সিংহ সহরের বেশী ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু সহরের দক্ষিণপূর্ব্ব দিক হইতে ভৈরব বাজার ও ঢাকা পর্য্যন্ত ভীষণ কাণ্ড হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের ওপারে শম্ভুগঞ্জের নিকট ময়মনসিংহ হইতে ভৈরববাজার হইতে ময়মনসিংহযাত্রী দুইখানি ট্রেন যাত্রিসহ উলটাইয়া পড়িয়াছে। ময়মনসিংহ হইতে ভৈরব বাজার পর্য্যন্ত রেল বন্ধ হইয়াছে, গাড়ী আর যাতায়াত করিতে পারে না। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রেল দুই দিন বন্ধ ছিল। এখন দিনে এক খানা ট্রেন যাতায়াত করিতেছে। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ আসিতে ১৫ ঘণ্টা লাগিতেছে। ভৈরববাজারের নিকট রেলের খেয়া ষ্টীমার ডুবিয়া গিয়াছে।

তারপাশা।

"লৌহজঙ্গে আর এক খানি ঘরও নাই। প্রকাণ্ড স্কুল-বাটী ও বাজার উড়িয়া গিয়াছে। তথাকার ষ্টীমার ঘাটের প্রকাণ্ড ফ্লাট খানা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে! শুনাযায়, ফ্লাটে বহু লোক ছিল, তাহাদের অনেকেই মারা গিয়াছে।

মুন্সিগঞ্জ।

"গত পূর্ব্ব বুধবার বিক্রমপুরে সর্ব্বত্র অতি ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের স্থিতি-কাল প্রায় ১ দিন ১ রাত্রি। জল বাড়িয়া প্রায় ৩০ ইঞ্চি দাঁড়াইয়াছিল। লোকে অতি উৎকণ্ঠিতভাবে সেই রাত্রি যাপন করিয়াছিল। টেলিগ্রাফের তার ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল। মালখানগর ও ইছাপুরায় টেলিগ্রাফ আফিসের যন্ত্রপাতি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে তাহার কিনারা হইতেছে না। সমস্ত হাট ও বাজার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ধান ও টাকা চুরির সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। মালখানগর, আউটসাহি ও পাইকপাড়ায় বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস ঘর উড়িয়া গিয়াছে। ভূ-পতিত বৃক্ষে পথ আটক হইয়া আছে। কমলাঘাট বন্দর কোথায় ছিল তাহার চিহ্নও দেখা যাইতেছে না। প্রাচীনেরা বলিতেছেন —"এমন ঝড় আমরা কদাচ দেখি নাই।" এই ঝড়ে পণ্ডিত কালীকান্ত ন্যায়লঙ্কার মারা গিয়াছেন।

বিঝারি (ফরিদপুর)

"বিঝারি, কাণ্ডপাড়া, কাপাসপাড়া, আচুয়া, দমুখন্দা, ভোজেশ্বর, উপসি, ফতানপুক, ধাগারণ এবং সমীপবর্ত্তী বহু গ্রামের উপর দিয়া অতি ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছে। উৎপাটিত বৃক্ষরাজি পথরোধ করিয়াছে। অসংখ্য গৃহ পতিত হইয়াছে। গত ২৪এ সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে ঝড় আরম্ভ হয়, উহা ৮ ঘন্টা ছিল। উপসি গ্রামস্থ বিঝারি উচ্চ স্কুলের ৩ খানা ঘরের ছাদ উড়াইয়া নিয়াছে।

২৪এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্রি এই অঞ্চলে ঝড় হইয়াছিল। রাউথভোগ বিদ্যালয়ের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। হেড্‌মাষ্টার ও অপর এক শিক্ষক কোনরূপে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। ৭ বৎসর বয়সের একটি বালিকা গৃহপতনে মারা গিয়াছে। আরও অনেক মৃত্যুর খবর শুনা যাইতেছে। উৎক্ষিপ্ত টিন পড়িয়া একটা লোকের দেহ দুইখণ্ড হইয়াছে। এক মাঝি নিকটবর্ত্তী বিলে ঝড়ের মধ্যে পতিত হয়। নৌকায় তাহার দুই পুত্র ছিল। নৌকা নিমজ্জিত হইলে বৃদ্ধ মাঝি বহুক্লেশে সাঁতার দিয়া স্থলে উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার পুত্রদ্বয়ের খোঁজ হইতেছে না।

সাভার—(ঢাকা)।

"সাভার হইতে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ দত্ত কবিভূষণ দত্ত কবিভূষণ লিখিয়াছেন।

বিগত ৭ই আশ্বিন বুধবার প্রাতে ৬টা হইতে সমস্ত দিনমান অল্প বেগে বৃষ্টি হইয়া রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এই বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, তৎপর রাত্রি ১১টা হইতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত অতি প্রবল বেগে ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়া কিয়ৎকাল বিরাম হয়। তাহার প্রায় অর্দ্ধঘন্টা পর আবার প্রথম উত্তর দিক হইতে ঘণ্টাখানেক তৎপর পশ্চিম দিক হইতে এইরূপ ভয়ঙ্কর ঝড় দিবা ১০টা পর্য্যন্ত হইয়াছে। এতদ্দেশের এমন একটী স্থান নাই যাহাতে এই ঝড়ের বেগ না পৌছিয়াছে। এদেশের কাঁচা পাকা সর্ব্বপ্রকার ঘর দালান কোঠা বৃক্ষাদি ভাঙ্গিয়াছে ও স্থানান্তরে উড়াইয়া নিয়াছে। ঐ ঝড়ের সময় নদীর জল প্রায় ৫।৬ হাত পরিমাণ স্ফীত (বান ডাকার মত) হওয়ায় ঐরূপ স্ফীত জলের ভীষণ তরঙ্গে এতদ্দেশীয় চতুর্দ্দিক জলমগ্ন হয়। পল্লীবাসীর বাড়ীঘর গো মেষ ছাগ ইত্যাদি পশুকুল এক প্রকার নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছে। আমাদের সাভার গ্রামের পাদদেশে বংশাই ও বিখ্যাত ধলেশ্বরী নদীর সংযোগ স্থান বিধায় পশ্চিম দিকের ঝড়ে ও বর্ষাপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাশির ভীষণ তরঙ্গে ও প্রখর স্রোতে কত গাছপালা ও কত ধান্যগাছ ও মৃত গো ছাগ ইত্যাদি পশু নদীর তীরে জমাট বাধিয়া রহিয়াছে। ধান্য ক্ষেতে আর ধানের গাছ নাই, সমস্ত ধানগাছ ঝড়ে একত্র হইয়া বোধ হয় ৪।৫ ফুট পুরু হইয়া নদীর ধারে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখাইতেছে। ঐ ধানগাছের জমাট হইতে থাম খুটী কপাট চৌকাঠ সিন্দুক চৌকী টুল তক্তা ঘরের চালা, ঘৃত তৈলপূর্ণ টীনের জের, ময়দা, চাউল, ইত্যাদির বস্তা, লেপ, তোষক, কাঁথা, কাপড়, কত জিনিষ ঐ ধানের থাম হইতে বাহির হইতেছে। কত পাটের জলে (ভিজান পাটরাশি) জলে ভাসিয়া গিয়াছে। নিজ সাভার গ্রামের নদীতীরবর্ত্তী গৃহস্থের বাড়ীর ও দোকানদারদের দোকানের চিহ্নও নাই। হাইস্কুলের প্রকাণ্ড বোর্ডিংয়ের দালান ঘর একবারে ভূমিসাৎ। দাতব্য ডিস্পেন্সারীর

উপরের চালা, থানার আলংবর,পোষ্ট আফিস,ষ্টীমার আফিস, ও অনেক গোলা গুদাম এবং অসংখ্য গৃহাদি যেন উড়িয়া গিয়া অচিহ্ন হইয়াছে।

নদীতে ৩টা মানবের মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। একে দেশে ৪.৫ সের দর চাউল, কাপড়ের দর অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ভয়ঙ্কর দুর্মূল্য, তাহাতে আবার ঝড়ে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লণ্ড ভণ্ড হওয়ায় কত যে কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে ও হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ধনী ও অল্পাধিক দরিদ্র সকলেরই ঝড়ে ক্ষতি হওয়ায় সকলেই আপন আপন নিজ বাড়ীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় কুলী মজুর ছুতার মিস্ত্রী পাওয়া যায় না, গাছপালা সব দরজা রাস্তা ঘাটে পড়িয়া থাকায় লোকে স্বচ্ছন্দে চলাচল করিতে পারিতেছে না। পোষ্টাফিসের আফিস ঘর উড়িয়া যাওয়ায় ও রানার লোক না পাওয়ায় ডাক চলাচল বন্ধ হইয়াছে।"

(সঞ্জীবনী—১৫ই আশ্বিন।

মৃত্যু।

"ঢাকার কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কলিকাতা আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ আসিতে তিনি ৬৮টা মৃত দেহ দেখিয়াছেন।

চাঁদপুর হইতে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কলিকাতা আসিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, নদীতে ও নদীর চড়ায় বহু মৃতদেহ দেখা গিয়াছে। তাহার অধিকাংশ স্ত্রী লোকের দেহ।

খুলনা।

"খুলনার বাজারে এক খানিও কাঁচা ঘর নাই।

বরিশাল।

"বিগত ৭ই আশ্বিন বুধবার প্রভাতকাল হইতে এই অঞ্চলে শেষবেলা পর্য্যন্ত প্রবল বৃষ্টি হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে সহসা ঝটিকা আরম্ভ হইয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি ভীষণ ঝটিকা চলিয়াছিল। ইহাতে সহরের অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মূলোৎপাটিত হইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় টিনের চালা উড়িয়া গিয়াছে। গৃহস্থের ঘড়বাড়ী শাকসবজী বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। কাশীপুর ও অন্যান্য গ্রামের দুই একটী লোকের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই জেলায় বহুলোক গৃহহীন হইয়াছে। অনেক লোক নানাভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১২৮৩ সনের বন্যা হইতে এ বন্যা কম বলিয়া মনে হইতেছে না। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না।

ঢাকা।

"ঢাকা হইতে যে বিস্তারিত সংবাদ আসিয়াছে উহা অতীব ভয়াবহ। উৎপাটিত বৃক্ষরাজি ও ধ্বংস স্তূপ রাজপথে পুঞ্জীভূত হইয়া অতিশয় ভীষণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। গৃহহীন নরনারীকে এই রাজপথে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। সহরে অনেক প্রকাণ্ড বাড়ী আংশিক ভগ্ন হইয়াছে। বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক আফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, ইডেন হাই স্কুল, জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের বিশ্রাম ভবন, নদীতীরস্থ নবাবের আফিস ইত্যাদি বাটী আংশিক নষ্ট হইয়াছে। এই ভীষণ ঝড় নূতন সহরেরও ক্ষতি করিয়াছে। বহুবৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে। এখানে গবর্ণর বাহাদুর যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটিও অংশতঃ নষ্ট হইয়াছে।

ঝড়ের পরদিন প্রাতে নদীগর্ভে একখানিও নৌকা দেখা যায় নাই। পুলিশদের "ডায়ানা" নামক বাষ্পীয়তরী ডুবিয়াছে, নবাবের বাষ্পীয়তরী ও অনেকগুলি নৌকা, পাটের বণিকদের অনেকগুলি বাষ্পীয়তরী নিমগ্ন হইয়াছে। এই জাহাজ ও নৌকা ডুবিতে বহুলোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। হিন্দুস্থান জীবনবীমা কোম্পানীর ধুরন্ধর বাবু অম্বিকাচরণ উকীলের পত্নী জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছেন। তাহার মৃতদেহ নদীগর্ভে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

পত্নীর অসুস্থতা নিবন্ধন অম্বিকা বাবু চিকিৎসকের উপদেশ মতে নদীগর্ভে একখানি গ্রীন বোটে বাস করিতেছিলেন। ২৪ এ সেপ্টেম্বর তিনি যখন বেড়াইয়া নৌকায় আইসেন তখন রাত্রি ১০টা। ঐ সময়েই প্রবল ঝড় বহিতেছিল। নৌকায় অম্বিকা বাবুর পত্নী, শাশুড়ী, দুই পৌত্র ও এক বৃদ্ধ আত্মীয় বাস করিতেন। অম্বিকা বাবু ও তাহার স্ত্রী উক্ত বৃদ্ধকে বলিলেন, চলুন আমরা নৌকা ছাড়িয়া কোন সুরক্ষিত স্থলে আশ্রয় লই। এই অনুরোধ বৃদ্ধের মনের মত নহে বলিয়া তিনি নৌকা ছাড়িয়া উঠিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। যখন বৃদ্ধ সম্মত হইয়াছিলেন তখন আর তীরে উঠিবার সাধ্য ছিলনা। কয় মিনিটের মধ্যেই প্রবল তরঙ্গে নৌকা ডুবিল। পত্নীকে এক বাহুতে ধারণ করিয়া সেই তরঙ্গায়িত নদীর মধ্যে তিনি হাবুডুবু খাইতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার হস্ত মুষ্টি শিথিল হইল; পত্নী ভাসিয়া গেলেন। নদীগর্ভে ৬ ঘণ্টা ভাসমান থাকিয়া অর্দ্ধ অচেতন অম্বিকাবাবু ভোরে মিট্‌ফোর্ড হাস্পাতালের নিকটে এক

বালকের দৃষ্টি পথবর্ত্তী হইলেন। ঐ বালক তাহার উদ্ধার সাধন করিল। অম্বিকা বাবুর অন্য সকল সঙ্গীর সংবাদ এখনও জানিতে পারা যায় নাই। নদীর পরপারে তাহার স্ত্রীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরা।

কুমিল্লা সহরের ৩০ মাইল পশ্চিমে গত ২৪এ সেপ্টেম্বর অতি ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। রাত্রি ১০টা হইতে সকাল ৯টা পর্য্যন্ত ঝটিকার তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছিল। লোকের ঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া উড়াইয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। ১০০ বৎসরের বৃদ্ধ বটগাছগুলি সমূলে উৎপাটিত এবং পাটের কোম্পানীর বৃহৎ টিনের গুদামগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে। জলও আকস্মিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় ১৫ বর্গ মাইল স্থানের অবস্থা শোচনীয়।

বাগের হাট।

"বাগের হাট ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অতি ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছে। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ঝটিকার উন্মত্ততা চলিয়াছে। সর্ব্বত্রই ধ্বংসলীলা পরিলক্ষিত হইবে। কাঁচা ও টিনের ঘরগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে। পুলিশ সাহেবের বাড়ী, থানা, হেড মাষ্টারের বাসা, মুন্সেফ-দেব বাড়ির বাটীর ঘর পড়িয়া গিয়াছে। বাজারের দোকান ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার হইয়াছে। উৎপাটিত বৃহৎ বৃক্ষগুলিকে আস্ত উড়াইয়া বহুদূরে লইয়া গিয়াছে। গাছ পালা ও পশুপাখীর মৃতদেহ পুঞ্জীভূত হওয়ায় রাস্তায় চলা ক্লেশকর—অনেকস্থলে লোক মারা গিয়াছে। খুলনা বাগের হাট লাইনের খুব ক্ষতি হইয়াছে। স্থানীয় খেয়াঘাটে বিস্তর ভাড়াটে নৌকা ছিল। উহাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ সাহেব ও পুলিশ ইন্সপেক্টর দিয়া-খাড়ায় ডাকাইতির তদন্তে গিয়াছিলেন, তাহাদের নৌকা ডুবিয়াছে। ৬টি গৃহহীন পরিবার স্থানীয় উচ্চ স্কুল বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বাড়ী ঘর নষ্ট হওয়ায় লোকের প্রায় ২ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

নেত্রকোণা।

"২৫এ সেপ্টেম্বর সকাল ৫টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত নেত্রকোণায় ভীষণ ঝড় হইয়াছে। কতকগুলি বাড়ী এমন-ভাবে উড়িয়া গিয়াছে যে উহাদের চিহ্নমাত্র নাই। থানা, দারোগাদের বাড়ী, মুন্সেফদের কাছারী বাড়ী, স্কুলবাড়ী ভাঙ্গিয়া আংশিক নষ্ট হইয়াছে। টেলিগ্রাফের তার নষ্ট হইয়াছে। (সঞ্জীবনী।)

দান।

"চট্টগ্রাম জেলাবাসী মহম্মদ আবদুল বারী চৌধুরী নামক রেঙ্গুন নিবাসী জনৈক মহাজন একলক্ষ টাকা দিতেছেন। ঐ টাকায় রেঙ্গুনের চাউল অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। ঐ টাকা ছাড়া চট্টগ্রামের অন্যান্য লোক চারি লক্ষ টাকা তুলিতেছে। ঐ টাকাতেও রেঙ্গুন চাউল সস্তা দরে দেওয়া হইবে। রেঙ্গুন হইতে চাউল আমদানি করা সম্বন্ধেও গবমেণ্ট সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবেন।"

(বাঙ্গালী)

এই পতিত জাতির উদ্ধার সাধন করিতে হইলে আমা-দিগের শুধু দারিদ্র্য-সমস্যা লইয়া ব্যস্ত থাকিলেই চলিবে না। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে যে দেশে দুর্ব্বৃত্তেরা নারীর অবমাননা ও লাঞ্ছনা করিতে সাহস পায় এবং যে দেশের লোক চোখের সাম্‌নে নারীকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কুচিত হয়, কিংবা নারীর লাঞ্ছনা-কারীকে নির্ব্বিঘ্নে অব্যাহতি পাইবার সুযোগ দেয়, সে হতভাগ্য দেশের জন্য বিধাতা না জানি আরো কত দুঃখ-দুর্দ্দশা পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন!

"এ দেশে রেলপথে মহিলাদিগের কামরায় গোরাঙ্গের প্রবেশের অভিযোগ মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়—অত্যাচার অনাচারের কথা কখন কখন আদালত পর্য্যন্ত পৌঁছায়। এইরূপ এক মোকর্দ্দমায় রাণাঘাটের হাকিম মিষ্টার কে, সি, দে আসামীকে গুরুপাপে লঘু দণ্ড দিয়া বিশেষ নিন্দিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে—খুলনা লাইনে এইরূপ একটি ব্যাপার ঘটিয়াছে। বারাসত—হৃদয়পুরের শ্রীযুত আবদুল হাই ও শ্রীযুত মনিমোহন মুখো-পাধ্যায় ইহার বিবরণ অমৃতবাজার পত্রিকায় বিবৃত করিয়া-ছেন। ঘটনাটি এইরূপ—গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ৯৭ নং আপ বনগ্রাম লোক্যাল ট্রেণ শিয়ালদহ ছাড়িবার পর কাঁকুড়-গাছির কাছে একজন বৃটিশ গোরা সৈনিক সেই ট্রেণে একখানি মেয়েগাড়ীতে প্রবেশ করে। কামরায় একজন মাত্র মহিলা ছিলেন। তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলে, পাশের কামরায় একজন যাত্রী, ব্যাপার দেখিয়া শঙ্কাব্যঞ্জক

শিকল টানেন। ট্রেণ থামিলে যাত্রীরা নামিয়া আসিয়া গার্ডকে গোরাটার নাম ও সেনাদুলের নাম লিখিয়া লইতে বলেন। গার্ড সে কথায় কর্ণপাত করে না। ট্রেন দমদমা জংসনে বা খুবুডাঙ্গায় পৌছিলে এ কথা ষ্টেশন মাষ্টারকে জানান হয়। তিনি আসিয়া গোরাটাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে, সে কথায় কর্ণপাত করে না; তাহার সঙ্গীদের মধ্যে একজন আসিয়া একজন যাত্রীর ছাতা লইয়া সমবেত জনতাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ষ্টেশনমাষ্টার গোল দেখিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দেন এবং গোরাবাজারের ষ্টেশনমাষ্টারকে সে বিষয়ে টেলিগ্রাফ করাও প্রয়োজন মনে করেন না। ট্রেণ গোরাবাজারে পৌছিলে যাত্রীদের হাত ছাড়াইয়া গোরাটা পলায়ন করে—তবে তাহার টুপী নাকি সে ফেলিয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারে আমরা যাত্রীদের সহিষ্ণুতারও নিন্দা করিতে বাধ্য। রেল-ওয়ের কর্ত্তারা এই বিষম অভিযোগের তদন্ত করিবেন কি ?

(দৈনিক বসুমতী)

'রায়ত' এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

"আমরা ঘটনাটা পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। একজন ভদ্রমহিলার যাহাতে অনায়াসে সম্ভ্রম নষ্ট হইতে পারে একটা গোরা তাহাই করিয়া অনায়াসে সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রস্থান করিল! বাঙ্গালীরা চীৎকার করিয়া গার্ড সাহেব বাহাদুর হইতে যত জনের কাছে অভিযোগ জানাইল, কেহ একবার তাহা আমলে আনাও দরকার বোধ করিলেন না। রেল পথে কেন, সর্ব্বত্রই সাদায় কালায় পার্থক্য আছে জানি এবং তাহা এতদিন, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সহিয়াও আসিতেছি। আজ যদি এই ঘটনাটা রূপান্তরিত হইয়া উপস্থিত হইত, অর্থাৎ বাঙ্গালী মহিলার গাড়ীতে গোরা না হইয়া, যদি মেমের গাড়ীতে বাঙ্গালী ভ্রম ক্রমেও—প্রবেশ ত দূরের কথা, দরজার নিকটবর্ত্তীও—হইত, তাহা হইলে তাহাকে আর পলাইবার সুযোগ দেওয়া হইত না; পরন্তু শিকল টানার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হাতে শিকল পড়িত।

সে যাহাই হউক, এখন আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারের সবিশেষ তদন্ত করিয়া সুবিচার করিতে অনুরোধ করি।"

বাঙ্গালীর ধ্বংস।

(সঞ্জীবনী)।

যে সকল ব্যাধি নিবার্য্য, সুসভ্য দেশের অধিবাসীরা উন্নত স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্ত্তন দ্বারা যে সকল ব্যাধি তাহাদের দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী কিন্তু সেই ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নিবার্য্য ব্যাধিতে ধ্বংসের পথে যাত্রা করিয়াছে। বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৬৫ লক্ষের কাছাকাছি। গত ৪ বৎসরের সর্ব্বপ্রকারে কত লোক মারা গিয়াছে তাহা দেখুন ;—

১৯১৫—১৪ ৮৮ ৫৩৭ ; ১৯১৬—১২ ৪১ ০২১ ;
১৯১৭—১১ ৯৭ ৫০৯ ; ১৯১৮—১৭ ২৭ ৩৩১ ।

১৯১৮ সালের মৃত্যু সংখ্যা কি ভয়াবহ। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর হইতে প্রায় ৬ লক্ষ অধিক লোক মারা গিয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় লোকক্ষয় হওয়ায় সেই সকল দেশের লোকসাধারণের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রতীকার উদ্ভাবনের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও লোকসাধারণ বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এখনও চৈতন্য হইল না।

কলেরা।

বিসূচিকা নিবার্য্য ব্যাধি। পানীয় জলের সঙ্গে সাধারণতঃ এই রোগের বীজাণু দেহে প্রবেশ করে। এই রোগে—

১৯১৫ সালে—১ ৩০ ৬৭৯ ; ১৯১৬ সালে—৭০ ৮৩৬ ;
১৯১৭ সালে—৪৫ ০২১ ; ১৯১৮ সালে—৮১ ৩৭৯ ;

জন ব্যক্তি মারা গিয়াছে।

বসন্ত।

বসন্ত রোগে—

১৯১৫ সালে—৩২ ৭৮৫ ; ১৯১৬ সালে—১৩ ৮৯০ ;
১৯১৭ সালে—৭ ০১০ ; ১৯১৮ সালে—৮ ৫৭৬ ;

ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

প্লেগ।

বঙ্গদেশে প্লেগে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক মারা যায়। এই ব্যাধিতে—

১৯১৫ সালে— ১৯৯, ১৯১৬ সালে— ১১০,
১৯১৭ সালে— ১৬৩, ১৯১৮ সালে— ২৮৯,

ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্র। এত বড় শত্রুর সহিত লড়াই করিতে হইলে যেমন দেশব্যাপী সার্ব্বজনিক প্রচেষ্টা চাই তাহা কবে হইবে বলা যায় না। তবে ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশে এমন তাণ্ডব কাণ্ড ঘটাইতেছে যে রাজা প্রজা সকলেই ইহার ভয়ে ভীত হইয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে ঝিনুকে সমুদ্রসেচনের মত চেষ্টাও দেখা যাইতেছে। জ্বরে—

১৯১৫ সালে—১০ ৬৪ ১৫৯, ১৯১৬ সালে—৯ ০৯ ৮৮০,
১৯১৭ সালে—৮ ৮২ ৭৬৮, ১৯১৮ সালে—১৩ ৫৭ ৯০৬,
ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে! যে রোগে ১৯১৮ সালে এক বৎসরে ১৩॥ লক্ষ লোক মরিল সেই রোগের প্রতীকার কল্পে কি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে তীব্রভাবে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল না?

উদরাময় ও আমাশয়।

পানীয় জলের দোষে এবং দারিদ্র্যহেতু অভক্ষ্যভক্ষণে উদরাময় ও আমাশয় রোগ হয়। বঙ্গদেশের অল্প কয়টি স্থান ব্যতীত সহরে ও গ্রামে কোথাও পানীয় জলের সুব্যবস্থা দেখা যায় না। উদরাময় ও আমাশয়ে—

১৯১৫ সালে—২৮ ৯১৯, ১৯১৬ সালে—২৬ ২১১,
১৯১৭ সালে—২৫ ০০০, ১৯১৮ সালে—২৯ ১৫০,
ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

শ্বাস যন্ত্রের ব্যাধি।

শ্বাস যন্ত্রের ব্যাধিতে—

১৯১৫ সালে—১১ ৭৩১, ১৯১৬ সালে—১১ ৬৭৫,
১৯১৭ সালে—১১ ৫১০, ১৯১৮ সালে—২০ ৯০১,
জন প্রাণ হারাইয়াছে।

অপঘাত মৃত্যু।

১৯১৫ সালে—১৯ ৫৬৭, ১৯১৬ সালে—১৯ ১২২,
১৯১৭ সালে—১৮ ৮৩৯, ১৯১৮ সালে—১৮ ৮৫২,
জনের অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

অপর বিবিধ ব্যাধি।

এতদ্ভিন্ন অপর বিবিধ রোগে—

১৯১৫ সালে—২ ০০ ৫২৬, ১৯১৬ সালে—১ ৮৯ ২৯৭,
১৯১৭ সালে—১ ৯৭ ১৯৮, ১৯১৮ সালে—২ ০৯ ২৯৬,
জন বঙ্গদেশবাসী প্রাণ হারাইয়াছে।

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিল্প কলেজ স্থাপনের জন্য কোন ব্যক্তি ১০ লক্ষ টাকা দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।" সার নীলরতন সরকারের বিশেষ চেষ্টাতেই বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহার আমলে যদি শিল্পকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে অতিশয় আনন্দের বিষয় হইবে।

এদিকে অন্নাভাবের দরুণ দেশের কোন কোন স্থান হইতে আত্মহত্যার হৃদয়বিদারক সংবাদও পাওয়া যাইতেছে:—

অন্নাভাবে আত্মহত্যা।

মুন্সীগঞ্জ হইতে সহযোগী "বেঙ্গলীর" জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে সদর সবডিভিসন হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী বাদির পুকুর গ্রামে ব্রজনাথ দে নামে একব্যক্তি ২১০ দিন ধরিয়া অনশনে কষ্ট পাইতেছিল। জঠরানলের দাহ সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রজনাথ গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। সদর হইতে ১১ মাইল দূরে ইছাপুর বাজারেও একজন মুসলমানকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়! তাহার আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া কয়েক জন দোকানদার মিলিয়া তাহার মুখে জল দেয়। অবশেষে তাহার চৈতন্য হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।"

(মোসলেম হিতৈষী,—৯ই আশ্বিন।)

অভাবের পীড়নে মানুষ না করিতে পারে এমন দুষ্কার্য্য জগতে খুব কমই আছে। অনশন-ক্লিষ্ট দেশবাসীগণের মধ্যে অনেকে লুট-পাট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নানা স্থান হইতে চুরি ডাকাইতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এ সব পাপ কর্ম্ম হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে হইলে শুধু রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত করিলেই চলিবে না, দণ্ড বিধানের সঙ্গে এই সমুদয় অনশন পীড়িত হতভাগাদের অন্ন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে 'ত্রিপুরা-হিতৈষী'র সুচিন্তিত মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"শাসন ও পালন—চতুর্দ্দিক হইতে লুটপাটের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহা আশঙ্কার কথা বটে। কিন্তু ইহা যে অন্নাভাবের স্বাভাবিক পরিণতি তাহাও অস্বীকার

করিবার যো নাই। মানুষ যখন ক্ষুধার তাড়নায়, শিশু-সন্তানের ক্রন্দনে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, তখন তাহার ধর্ম্ম বুদ্ধি, ন্যায় অন্যায়ের বিচার লোপ পায়। ইহাদের এই অবস্থার কথা ভাবিলে কাহার না হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হয়? অন্যায়ের সমর্থন কেহ করিতে পারে না। লুটপাট যে অন্যায় তাহাও কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু তাহারা যে অবস্থায় পড়িয়া এ অন্যায় কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, হাসি মুখে জেলে যাইতেও প্রস্তুত, তাহাও একবার ইহার সঙ্গে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্ট অন্যায়ের নিমিত্ত শাসন করুন তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, এমন কি যাহারা এই লুটপাটে লিপ্ত তাহাদেরও নয়। কিন্তু এই শাসনের সঙ্গে পোষণেরও ব্যবস্থা করা দরকার। যে হতভাগ্যগণ পুত্র পরিবারের অনশনক্লিষ্ট মুখদর্শনে ও আপন ক্ষুধার তাড়নায় এই সমাজনীতি-বিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল, জেলে গেলে তারা দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে। কিন্তু তাহাদের পুত্র পরিবারের কি দশা হইবে? তাহাদের তখন গভর্ণমেণ্টের করুণা ও সাহায্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আমরা আশা করি গভর্ণমেণ্ট এই দুর্ভাগ্যদের নিরুপায় নিরাশ্রয় অনন্য-নির্ভর পরিবারবর্গের সাহায্য করিয়া সকলদিক রক্ষা করিবেন।"

বুভুক্ষিত নর-নারীর ক্লেশ নিবারণের জন্য "রামকৃষ্ণ মিশন," "বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ কাজ করিতেছে। "বরিশাল-হিতৈষী" সংবাদ দিয়াছেন যে, সেখানে দেশবিশ্রুত স্বদেশ-সেবক ও জন-নায়ক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও অপরাপর দেশভক্তগণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর সাহায্য-কল্পে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে মুক্তহস্তে দান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছেন।

কো অপারেটিভ ষ্টোর।

"স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণের পক্ষ হইতে একটী কো-অপারেটিভ ষ্টোর স্থাপিত হইল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সভাপতি, তাঁহার আফিসের মিঃ লিদেন ডেপুটী চেয়ারম্যান, বাবু ব্রজবন্ধু ভৌমিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সেক্রেটারী, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সেরেস্তাদার বাবু শশীভূষণ সেন এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী।

এই কোম্পানী সাধুভাবে পরিচালিত হইবে একদিকে যেমন বাঙ্গালীর অকর্ম্মণ্যতার কলঙ্ক ঘুচিয়া যাইবে, অপরদিকে তেমনি সস্তায় জিনিষ প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র স্বল্পবেতনভুক্ত কর্ম্মচারীবর্গের জীবনযাত্রা সহজ হইবে। আমরা এই সমিতির দীর্ঘজীবন কামনা করি।"

(বরিশাল-হিতৈষী)

কলেজ কো-অপারেটিভ ষ্টোর।

"গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবাসী কলেজ কো-অপারেটিভ ষ্টোর্সের সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সাত মাস হইল এই ষ্টোর খোলা হইয়াছে, এই সাত মাসে ৭০৯ টাকা ৪ আনা ৪॥ পাই লাভ হইয়াছে। কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গ এই ষ্টোরের অংশী। প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় সভায় বলেন যে, সকল ছাত্রেরই অংশী হওয়া উচিত এবং দেশের উন্নতি বিধানের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। ইহার ফলে তাহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে ও ভবিষ্যতে উন্নতির পথ সুপ্রসন্ন হইবে

(হিন্দুস্থান)

ঝঞ্ঝা-পীড়িতের সাহায্য চেষ্টা।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর পূর্ব্ববঙ্গে যে ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে, সংবাদপত্রে সকলেই তাহার বিস্তৃত বিবরণ অবগত আছেন। তথাপি এই বন্যায় বন্যাপীড়িত দেশবাসীর সাহায্যের জন্য সরকার বাহাদুর ও দেশনায়কগণ যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বঙ্গোপসাগর হইতে উঠিয়া ঝড়টি খুলনা জেলার দক্ষিণ দিয়া প্রেসিডেন্সি বিভাগে প্রবেশ করে। খুলনা সদর ও বাগের হাট মহকুমা ও যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমার এক অংশের মধ্য দিয়া ইহা গোপালগঞ্জ ও মাদারিপুরে যায় এবং সেখান হইতে পদ্মা ও নিকটবর্ত্তী চরের উপর দিয়া মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় প্রবেশ করে। সেখান হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার উপর দিয়া কিশোরগঞ্জের ও নেত্রকোণা মহকুমার কিয়দংশের মধ্য দিয়া ময়মনসিংহ জিলার

প্রবেশ করে এবং এই খানেই ঝড়ের গতি শেষ হইয়া যায়।

যে পথ দিয়া ঝড়টি বহিয়া গিয়াছে তাহার পঁচিশ মাইলের মধ্যে যে যে গ্রাম বা সহর পড়িয়াছে তাহারাই ঝড়ের অতি ভীষণ ভাবে অনুভব করিয়াছে। দুই পার্শ্বে চল্লিশ মাইলের মধ্যে যে যে গ্রাম বা সহর পড়িয়াছে, তাহারাও ইহার ভীষণতা অল্প বিস্তর অনুভব করিয়াছে। এই ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারা আশ্রয়হীন ও খাদ্যহীন হইয়া অতি কষ্টে দীন কাটাইতেছে। জলপথসমূহ শবদেহে আচ্ছাদিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এই বন্যা পূর্ব্ববঙ্গ একরূপ শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। পদ্মার চরের কথা সকলেই অবগত আছেন। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ও নমঃশূদ্রগণ এই স্থানে সামান্য কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া, চাষ বাস করিয়া পুত্রকন্যা নিয়া জীবন যাপন করে। ঝড়ের সময় নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে এই চরগুলি সব ডুবিয়া যায় এবং চরবাসিগণ নদীতে ভাসিয়া যায়। অনেক নৌকা আরোহী সমেত ডুবিয়া গিয়াছে। কয়েকখানা ষ্টীমার ও ফ্লাট পদ্মাগর্ভে স্থান নিয়াছে।

গরু পাঁঠা ছাগল প্রভৃতি পশু যে কত মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কাঁচা ও টিনের ঘরের শতকরা ৮৫ ভাগ পড়িয়া গিয়াছে। অতীতের সাক্ষী বহু যুগের বড় বড় গাছ-পালা সব ভূমিসাৎ হইয়াছে।

সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে এই ঝড়ে যশোহরে ১০ জন, খুলনায় ২৭৯ জন, ফরিদপুরে ৫৭০ জন, ময়মনসিংহে ৪২ জন, ঢাকায় ২১৫ জন এবং চরে ও নদীতে প্রায় ১০০০ জন লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অবশ্য এ সমস্ত ক্ষেত্রে ঠিক করিয়া বলা যায় না যে কত লোক বাস্তবিক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনুমান মাত্র। অতএব মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে যে গবর্ণমেণ্ট যে মৃত্যু সংখ্যা দিয়াছেন তাহা অপেক্ষা বহু-সংখ্যক লোক এই ভীষণ বন্যায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। এই বন্যায় পূর্ব্ববঙ্গের যে কি ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকগুলি ব্যতীত অপর কেহ তাহা ধারণাও করিতে পারিবে না। দৌলতখাঁর বন্যা, ১৩১৬ সালের বন্যা প্রভৃতি দৈব-বিড়ম্বনায় বহুলোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু সেগুলি বর্ত্তমান এই বন্যার মত এমন এতদূর ব্যাপী হয় নাই। ২।১ জেলার লোকেই মাত্র সেই বন্যায় কষ্ট পাইয়াছে।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে দেশের মধ্যে সম্প্রতি একটা একতার ভাব দেখা দিয়াছে। এদেশের এক জেলার লোকের দুঃখ আজকাল বাঙ্গলা দেশের সমস্ত লোক নিজের দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন। একের দুঃখ দূর করিতে সমস্ত দেশের লোক চেষ্টা করেন। এই ভীষণ দৈবদুর্ব্বিপাকের মধ্যে সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ের সহানুভূতির এই স্পন্দন মন্দসময়ে বিধাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ।

পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান এই দুর্দ্দশার কথা যে দিন হইতে খবরের কাগজের স্তম্ভে কলিকাতায় প্রকাশ হইতে লাগিল, সেইদিন হইতেই কলিকাতাবাসী দেশনায়কগণ পূর্ব্ববঙ্গবাসীর সাহায্যের জন্য কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী, মিঃ সি, আর, দাশ, মিঃ সত্যানন্দ বসু প্রমুখ নায়কগণ একটি সমিতি গঠন করিয়া চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় দুই লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিল। কলিকাতায় বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠিত হইল। কমিটির একটি সভায় মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী ও মিঃ সি, আর, দাশকে নিম্নলিখিত হারে টাকা খরচ করিবার অধিকার দেওয়া হয়—

ঢাকা—১৪,০০০৲, খুলনা, ৫০০০৲ ফরিদপুর ৫০০০৲, এবং কুমিল্লা ৫০০৲।

ইহার পরে দেশনায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কমিটির একটি সভায় স্থির হয় যে এই কমিটি দেশের অন্যান্য রিলিফ কমিটির সহিত একযোগে কার্য্য করিবে। এই কমিটি কার্য্যকারী সভাগণ প্রত্যেক জেলা, মহকুমা ও বড় বড় গ্রামে যাইয়া সেই স্থানের স্থানীয় লোকদিগকে লইয়া সাব কমিটি গঠন করিয়া এবং চাল, কাপড় ও বাড়ী ঘর তুলিবার জিনিস পত্র দিয়া দুঃস্থ লোকদিগকে সাহায্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ ডি, এন মৈত্র ও প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি চিকিৎসা-কমিটিও গঠিত হইয়াছে। তাহারা রুগ্ন লোকদিগের চিকিৎসার জন্য ভাল চিকিৎসক ও ঔষধ পথ্যাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহা ব্যতীত রামকৃষ্ণ মিশন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সোস্যাল সার্ভিস লীগ প্রভৃতি

আরও বহু সমিতি এই ভাবে দেশের যথাসাধ্য সাহায্য চেষ্টা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের সাহায্যের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতেছেন। বন্যার অব্যবহিত পরেই আমাদের সহৃদয় লাট সাহেব বাহাদুর পূর্ব্ববঙ্গের রিলিফ কার্য্যে দেশবাসীর সাহায্য চাহিয়া সাধারণ একখানি পত্র প্রকাশ করেন এবং তাহার কিছু দিন পরে শ্রীযুক্ত কামিং সাহেবের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সেই সভায় দেশের বহুগণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সভায় রিলিফ কার্য্যের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। স্বয়ং লাটসাহেব বাহাদুরকে সেই কমিটির সভাপতি স্থির করা হয়। মিঃ কামিং চেয়ার ম্যান এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ক্রাম সাহেব, মৌলভী ফজলল হক্ প্রভৃতি অনেক লোক কমিটির কার্য্যকারী সদস্য নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই গবর্ণমেণ্ট চাল, কাপড়, বীজ, ঘর তুলিবার সরঞ্জাম পত্র, চাষ বাসের সুবিধার জন্য টাকা ধার দিয়া দুঃস্থ লোকদিগের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করি ভগবানের আশীর্ব্বাদে দেশবাসীর ও গবর্ণমেণ্টের এই মহৎ কার্য্য সফল হইবে এবং তাঁহাদের সাহায্যে আমাদের পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ শীঘ্রই এই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।

রমা

রমার চিররুগ্ন স্বামী তার বুকের পাঁজরগুলা নাড়াইয়া নাড়াইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে দিন তাকে চির-বৈধব্য দিয়া গেল ঠিক, সেই দিন থেকেই তার বাল্যসখা কেশব রাশীকৃত ভালবাসা, সহানুভূতি নিয়া রমার সমস্ত দারুণ দুঃখটা ঢাকা দিয়া ফেলিতে চাহিল। যেখানটায় খুব ব্যথা সেখানে খানিকটা বরফ দিলে স্বস্তি হয়, আবার বেশীক্ষণ রাখিলে তার চেয়ে বেশী কষ্ট হয়। রমার ঠিক তেমনি হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর কেশব তার দুঃখটাকে একটু লাঘব করিবার জন্যে উবুড় হইয়া পড়িয়াছিল। রমা তখন তাহাকে খুব আপনার মনে করিয়া একটু সান্ত্বনা পাইয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল—মঙ্গলঘটের পাশে চারা কলাগাছের মত তার জীবনের দ্বারে আসিয়া সে একেবারে ঝাড় বাঁধিয়া বসিয়াছে, তখন রমার যেন কেমন একটু ভয় হইল। তাহার স্বামী যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর চাকরদের নিয়া বালবিধবা বেশ একরকম সংসার পাতিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু যখনি সেই বিপুল সম্পত্তির মাঝখানে ছোট সংসারের ভিতর অশিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল কেশবের চলা ফেরা দেখিত তখনি সে শিহরিয়া উঠিত।

একদিন কেশবকে নিরালায় পাইয়া রমা কহিল, "কেশবদা, তুমি কাল বাড়ী যাও। তোমার বাড়ী থেকে চিঠি আসছে তুমি বাড়ী যাচ্ছনা কেন?"

কেশব কেমন যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। মুখ খানা ভার করিয়া বলিল, "তোমার জন্যইত যেতে পাইনি, আপাল ঝঁজেব মোকদ্দমাটা না চুকলে কেমন করে আমি চলে তিনশ টাকা জলে যাবে।"

"তা যাক, কেশবদা তুমি বাড়ী যাও, তোমার জন্যে তোমার সংসারটা মাটি হবে?"

"কি আর করব? এতো আর শুধু আজকের কথা নয়। ছেলেবেলা থেকে তোমাকে খুব আপনার ভেবে আসছি, আর চিরকাল তাহাই ভাবব। কতদিন না খেতে পেয়ে—সংসারের কষ্ট দেখে তোমার কাছে ছুটে এসেছি, তুমি অকাতরে দু তিনশ করে আমায় টাকা ঢেলে দিয়েছ—সে সব কথা আমি কি ভুলেছি না ভুলতে পারব?"

"ভুলতে ত বলছি না, কেশবদা,—তুমি বাড়ী যাও, মাঝে মাঝে এসে সব দেখা শুনা করো।"

বুড়ীঝি আসিয়া বলিল "তুমি কেমন মেয়ে গা, সারাদিনের পর কাচকলা সেদ্দ দিয়ে দুটো আলোচালের ভাত খাবে—তাতেও সাধাসাধি।"

রমা তার খুব দরকারী সুখস্বচ্ছন্দগুলা অবহেলায় ফেলিয়া দিত আর এই বুড়ীঝি সেইগুলা কুড়াইয়া কুড়াইয়া

তার কাছে লইয়া আসিত; ইহাতে রমা সুখী কি অসুখী হইত তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না।

রমা গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল "এই যে যাই, সব যোগাড় করেছিস্?"

"যোগাড় আবার কি করব? একরত্তি মেয়ের আবার ভিট্‌কেলাম কত? কারো ছোঁয়া জলটী পর্য্যন্ত ব্যভার করবেন না।"

কেশব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। রমা তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু অনিচ্ছার হাসি হাসিল। বলিল, "আমি না খেলে—তোদের আর বুঝি খেতে নেই?"

বড় এক ফোঁটা চোখের জল বুড়ীঝির কুঁচ্‌কে-যাওয়া কপোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। রমা ইঙ্গিতে কেশবকে বুঝাইয়া দিল—যে বুড়ীঝি আর একটু হলেই ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিবে।

বুড়ীঝি ও রমা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রমার কথায় কেশবের প্রাণটা কেমন—যেন একতর হইয়া গেল। শরীরের কোনও স্থানে একটা কাঁটা ফুটিলে যেমন খিচ্ খিচ্ করে, রমার কথাগুলা ঠিক তেমনি করিয়া তার প্রাণের ভিতর খানিকটা অস্বস্তি দিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা আপালকে অন্দর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া কেশব ভয়ানক চটিয়া গেল। বলিল—"এত সকালে একেবারে বাড়ীর ভিতরে কোথা গেছ্‌লি রে?"

বুড়া চাষা সেইমাত্র রমার অভয় নির্ম্মাল্য নিয়া আসিতেছে। কোন উত্তর করিল না; হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

কেশব পাঁড়েজীকে ডাকিয়া খুব খানিকটা ধমকিয়া দিল। বলিল, "তোম্ কাঁহে উস্‌কো ভিতরমে যানে দিয়া?"

পাঁড়েজী সেইমাত্র ভাঙটী ঘুঁটিতেছিল। কেশবের কথায় রাগিয়া গিয়া বলিল, "কেয়া করেগা—মাজীকা হুকুম!"

তখন খানিকটা লজ্জা আসিয়া কেশবের সমস্ত রোষটাকে একেবারে গলা চাপিয়া ধরিল। সত্যই ত! সে এ বাড়ীর কে? রমাই যখন তাহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তখন ঝি চাকর তাহাকে মানিবে কেন? আপাল পাঁড়েজীকে একটা "রাম রাম" দিয়া চলিয়া গেল।

রাগে দুঃখে অভিমানে কেশব অন্দর মহলে চলিয়া গেল। রমাকে বলিল, "আমি এখনিই বাড়ী যাব। তুমি তোমার সব বুঝে সুঝে নাও।"

"কেন কেশবদা?"

"না, আমি আর থাকতে পারব না, তোমার জন্যে আমার বাড়ী ঘর সব গেল!"

"আমি ত অনেকদিন থেকেই তোমায় যেতে বলছি কেশবদা, তা যেতে হয় যা'বে,—এখন কি যায়, খেয়েদেয়ে যাবে 'খন।"

"না আমি এখনি যা'ব, পরশু আপালের মোকদ্দমা, যা হয় করো, আমি চল্লাম।"

"সে যা হয় আমি করব 'খন। এখন কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না, আমার মাথা খাও—দুটি খেয়ে বরং বিকেলে যেও। উঠন্ত রদ্দুর মাথায় করে কেউ কখনো যায়?"

রমার কথায় কেশব ভারী খুসী হইল। বেলা দশটার সময় ভাত খাইয়া নিজের ঘরে একটু ঘুমাইয়া লইবার ভাণ করিয়া সমস্ত দিন ভোর চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় রমা আসিয়া বলিল, "কেশবদা, সন্ধ্যা হ'য়েছে, ওঠনা? আমি মনে করেছিলাম—তুমি বুঝি আমায় না বলেই চলে গেছ।"

কেশব একটু অপ্রতিভ হইল। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল "অাঁ! সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে?"

"তা আর কি হ'য়েছে—না হয় কাল যাবে?"

কেশব আর কোন কথা কহিল না। রমা পা পা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তারপর একমাস কাটিয়া গেল। আজকাল করিয়া আর এ পর্যান্ত কেশবের যাইবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। আপাল একদিন তাহার লাঙ্গল গরু বিক্রয় করিয়া রমার সমস্ত টাকা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া মিটাইয়া দিয়া গেল। আপাল বিনা আপত্তিতে নিতান্ত ভালমানুষটির মত তাহার সমস্ত ঋণশোধ করায় কেশব একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল। তাহার কুবুদ্ধির চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল,—আরত কোন ছল নাই? তবে কি করিবে! কেমন করিয়া সে রমার মিথ্যা আত্মীয় সাজিয়া তাহার বাড়ীতে বাস করিবে?

বিজয়া দশমীর দিন রমা তাহার স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া কত কাঁদিল। স্বামীর ফটো জিনিষ পত্র সবগুলা

যেন তাহার প্রাণের ভিতর ধাক্কা দিয়া দিয়া বুকের খানিকটা ধসাইয়া দিয়া গেল। রমা বিছানায় শুইয়া ছট্ফট্ করিতেছে। সহসা দরজা খোলার শব্দ হইল। রমা ... শিথিল বস্ত্র আঁটিয়া পরিয়া বলিল, "কে ও, কেশব ঠাকুর আজ এ ধারে যে?"

তখন রমার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তৃষ্ণায় জিহ্বা আড়াইয়া পড়িতেছে। কেশব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"কেন রমা? আস্তে নেই? এলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?"

রমা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "না কেশব দা, তুমি বেরিয়ে যাও, আমার প্রাণ তোমায় বিশ্বাস করতে চাইছে না।"

কেশব মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "সে কি রমা! তুমিই না বল্তে যে তুমি আমায় খুব ভালবাস! আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাক্তে হ'লে তোমার কষ্ট হ'য়?"

"ভালবাস্লেই কি নিরালায় পরনারী বিধবার কাছে অমন বিশ্রী চোখ নিয়ে আস্তে হয়?"

"রমা, তুমি কি বলুছ? ভগবান জানেন আমি তোমায় কত ভালবাসি।"

"ভালবাস্তে পার—কিন্তু সে ভালবাসার ভিতর যে রাশীকৃত ময়লা জড় করে নিয়ে এসেছ। আমার রূপযৌবন ঐশ্বর্য্য দেখে তুমি ভালবেসেছ। আমার এগুলা বাদ দিলে আর তুমি ভালবাসবে না—বাস্তে পার না।"

কেশব ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ভুল বুঝেছ।"

"হ'তে পারে ভুল বুঝেছি—তুমি কিন্তু বেরিয়ে যাও।"

কেশব কহিল, "রমা—আমি—"

"না, আর আমি কোন কথা শুন্তে চাই না, তুমি বেরিয়ে যাও, যাও—যাও বলুছি!"

কেশব একটু নরম হইয়া বলিল, "আমায় এমন অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া ভিন্ন তোমার কি কোন কর্ত্তব্য নেই?"

"কিছু না! বিধবার আবার কর্ত্তব্য? থান কাপড় পরে জীবনটাকে মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত পৌছে দিতে পারলেই শেষ!"

রমা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দ্বারে শিকল লাগাইয়া দিল। কেশব চীৎকার করিতে করিতে উঠিতে গিয়া নেশার ঝোঁকে ঘরের মেঝেতে বিগতচেতন হইয়া পড়িল।

পরদিন বেলা দশটার সময় কেশবের চেতনা হইলে—দেখিল দরজা খোলা। হা-হা করিতেছে। বাড়ী যেন জনশূন্য নীরব। কেশব উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে ঘরের বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। কৈ, কেউত নাই! উঠানে একটা গরু বাঁধা থাকিত সেটা পর্য্যন্ত নাই। তবে কি রমা বাড়ী একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে? শত বৃশ্চিকের দংশন বুকে করিয়া কেশব নীচে আসিল। পাঁড়েজীকে জিজ্ঞাসিল "ব্যাপার কি—এরা সব কেথায় গেল?"

"ফজিরমে সবকৈ কাশি গিয়া—আপ্ জান্তা নেই?"

"কুছ্ ঠিকানা দেগিয়া?"

পাঁড়েজী অবহেলার স্বরে "নেহি" বলিয়া তার সেই ময়লা বিছানাপাতা আধ ভাঙ্গা খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া গান ধরিল "সীতারাম ভজরে মনুয়া—"

কেশব সেদিকে আর লক্ষ্য না করিয়া উদাস হৃদয়ে ষ্টেশনের দিকে ছুটল। সাড়ে পাঁচটার সময় কাশীর একখানা টিকিট করিয়া সে গাড়ীতে উঠিল।

কাশীতে গাড়ী হইতে নামিয়া কেশব প্রমাদ গণিল। সেই অচেনা দেশে লোকারণ্যের মাঝে কেমন করিয়া রমার বাসা বাহির করিবে। বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবিল। অকৃতজ্ঞ বুদ্ধি তাহাকে কোন উপায় স্থির করিয়া দিতে পারিল না।

চার পাঁচদিনের পর কেশব বিশ্বনাথের নাটমন্দিরে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। সহসা বুড়ী ঝিকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "বুড়ী ঝি তোমরা কোথায় আছ?"

বুড়ীঝি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুমি কেমন বামুনের ছেলে গা—হেথা পর্য্যন্ত তাড়া করেছ! যেওনা দেখি এবার বৌমার কাছে—মেরে হাড় গুড়ো করে দেবোনি।"

মুখ বাঁকাইয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া বুড়ী ঝি চলিয়া গেল। কেশব তার সমস্ত অপমানটাকে বেমালুম হজম করিয়া দূরে দূরে তাহার পিছু লইল।

পরদিন সকালবেলা রমা ঠাণ্ডা মেজেতে পড়িয়া খোলা-গায়ে গড়াইতেছিল। কেশব আসিয়া ডাকিল, "রমা!"

তাড়াতাড়ি রমা উঠিয়া বসিল। কাপড়খানা বুকে মাথায় জড়াইয়া বলিল "একি? কেশব দা? তুমি ক'বে এলে?"

কেশব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া—কেমন একতর হইয়া গিয়া বলিল "একি করেছ রমা?"

"কেন? কি করেছি কেশব দা, মাথা নেড়া ক'রেছি! বেশত হ'য়েছে, পাঁশগাদায় আর ঘি ঢেলে কি হবে? চুলগুলো ভারি বোঝা হ'য়েছিল। একদিন তেল না দিলে গুমো গন্ধ ছাড়ত। জ্বালাতন হ'য়ে তাই বিশ্বনাথের পায়ে দিয়ে দিয়েছি।"

কেশবের চক্ষে জল আসিল। সে কোন কথা কহিল না। মুখখানা চুণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, রমা বাধা দিয়া বলিল "কোথায় যাচ্ছ কেশব দা?"

"চ'লে যাচ্ছি।"

"না, তা হ'বে না, যদি এসেছ একটু বিশ্বনাথের প্রসাদ খেয়ে যাও।"

কেশব মাথা নাড়িয়া জানাইল "না"।

"কেন কেশব দা?—আমায় এবার ঘৃণা করেছ বলে—বিশ্বনাথের প্রসাদকে পর্য্যন্ত অবহেলা করবে?"

কেশব দরজার দিকে চাহিয়া বলিল,"বুড়ী ঝি কোথায়?"

"এই কি কিনতে গেল। ভুলে দরজাটা খুলে রেখে গেছে—তাইত তুমি আসতে পেরেছ—তা না হ'লে বাহিরে চাবি দিয়ে তবে সে যায়।"

কেশব কোন কথা কহিল না। ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর ভিতর দেখিলে বুড়ী ঝি তাহার হাড় গুড়া করিয়া দিবে সে কথা তখনো সে ভুলে নাই।

রমা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মেজেতে আবার শুইয়া পড়িল। মনে মনে বলিল, "সংসারে পুরুষগুলা কি ঝুটা রূপ নিয়েই উন্মত্ত হয়! প্রাণ কি তাদের এত হেলাফেলার জিনিষ?"

একমাস পরে কেশব একটা নূতন মতলব আঁটিয়া রমার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দলিল পত্র কোথায় কি থাকে সবত সে জানে। এই অবসরে সেগুলা হস্তগত করিয়া জাল করিয়া ফেলিবে। পাঁড়েজী কেশবকে দেখিয়া ব্যস্ততার সহিত একটা অভিবাদন করিল। কেশব তাহার হাতে দশটাকার একখানা নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "অন্দরকা চাবী কাঁহা হায়?"

পাঁড়েজী হাসিতে হাসিতে বলিল, "খুলা হায়—আপকো জানানা লোক বিলকুল আ গিয়া।"

কেশব সব কথায় কান না দিয়া ভিতর বাড়ীর দিকে ছুটিতেছিল; দেখিল—তাহার সেই দরিদ্রাশীর্ণ পুত্র কন্যাগুলি বেশ সাদা ধবধবে পোষাক পরিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। পুত্রকন্যারা আহ্লাদে পিতার ঘর্ম্মাক্ত উরুদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। তাহাদের দেখিয়া কেশবের মুখ শুখাইয়া গেল। অন্দরে প্রবেশ করিয়াই সে তাহার বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিল, "একি—ব্যাপার কি? তোমরা এখানে?"

কেশব ঠাট্টা করিতেছে মনে করিয়া তাহার স্ত্রী মুচকিয়া হাসিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। মাতাও পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। কেশব উদাসভাবে উঠানে বসিয়া পড়িল। বলিল "মা, তোমরা হাসছ—কিন্তু আমার কান্না পাচ্ছে,—তোমার পায়ে পড়ি, বল কি হয়েছে—তোমরা এখানে কেন?"

বৃদ্ধা আরো একটু জোরে হাসিয়া বলিলেন "আমায় আবার লুকচ্ছিস্ কি? রমা তোকে উইল করে দিয়েই—আমাদের আসতে চিঠি লিখেছিল। আহা, অমন মেয়ের এমন ভাগ্যও হয়!"

কেশবের আর বুঝিতে বাকি রহিল না! তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। যাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য সে তাহার সমস্ত কুটীল বুদ্ধিটা খরচ করিয়া কাশি থেকে ব্যস্ত হইয়া আসিতেছে—আজ সেই রমা তাহার মতলবটাকে এত সহজ সাধ্য করিয়া দিয়া তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে তীর বিঁধিয়া দিয়াছে! সে যে শরীর রূপযৌবন ধনসম্পত্তিতে তাহার প্রেম লুটাইয়া দিয়াছিল! এগুলার পিছনে এমন চিরমধুর পবিত্র প্রেম লুকাইয়া রহিয়াছে—তাহা সে সে একদিনও দেখে নাই! তাহার চক্ষু টন্ টন্ করিতেছিল। প্রাণের ভিতর চোখের জলের ভিতর দিয়া রমার মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল।

কেশব ধূলা পায়েই আবার কাশি রওনা হইবার জন্য দাড়াইল। বৃদ্ধা মাতা পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কিরে কোথায় আবার যাচ্ছিস্?"

কেশবের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে! বলিল "ভয় নেই তোমাদের—আমি শিগ্‌গির ফিরে আসব—আবার আমি কাশি যাচ্ছি।"

মাতা কি বলিতে যাইতেছিলেন—কেশব তাঁহার কথায় কান না দিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

কেশব কাশীতে পৌঁছিয়া যে বাড়ীতে রমা ছিল সে বাড়ীতে অনুসন্ধান লইয়া জানিল রমা সেইদিন সকাল বেলা সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীওয়ালা বলিল "মেয়েটীর শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে বলে এখান থেকে চলে গেছে—এ বাড়ীতে তাদের নাকি একটু কষ্ট হ'ত।" এ ছাড়া কেহই তাহার আর কোন সংবাদ দিতে পারিল না। তিন চারিদিন কেশব সমস্ত কাশিসহর পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল। অবশেষে নিরাশ হইয়া কাশিতেই কোন রকমে তাহার জীবনের গণাদিন কয়টা কাটাইয়া দিবার সংকল্প করিল। রমার ঘরে—তাহার রাশীকৃত স্মৃতির মাঝখানে স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতে তাহার আর আদৌ ইচ্ছা হইল না।

তিন চারি বৎসর পরে জটাজুটধারী কেশব রমার বাড়ীতে একবার আসিয়া দেখিল—উপরের ঘরে মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া রমা। মরিবার জন্য আজ দুইতিন মাস সে কাশি ছাড়িয়া স্বামীর ভিটায় আসিয়াছে। কেশব হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। খাটের নীচে হাঁটু গাড়িয়া বিছানার উপর রমার শীর্ণ কঙ্কালসার হস্তে তাহার অশ্রু-প্লাবিত রুক্ষগণ্ড চাপিয়া ধরিয়া বলিল "রমা, রমা সত্যই কি আজ তুমি বিধবার কর্ত্তব্য শেষ করতে এসেছ—আমায় এত শিক্ষা দিয়েও কি হয় নি—তোমার মৃত্যুতেই কি আজ তার সমাধান করে যা'বে ?"

রমার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। অসহ্য যাতনায় ছটুপটু করিতে করিতে স্বামীর ফটোখানি ক্ষীণবক্ষে চাপিয়া ধরিল। মিনিট খানেক পরে বাড়ীতে কান্নাগোল উঠিল। কেশবের আর্ত্তনাদ সেই তুমুল রোদনধ্বনি ভেদ করিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ঘোমটা"

(১) সূত্রতত্ত্ব ও ব্যাকরণতত্ত্ব।

Rowe's Hints, প্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "সাহিত্য প্রবেশ" বিদ্যাসাগরের "ব্যাকরণ কৌমুদী" হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা দেখিতে পাই—এই বিশাল জগৎটা পর্য্যন্ত একটা মূলসূত্র বা defination এর উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটারও একটা মূলসূত্র বা definnation ধরিয়া লইতে হইবে। যথা,—

"যে বস্ত্রখণ্ডাবরণে শ্রীশ্রীমতী রমণীকুলের শরদিন্দু-নিভানন, তাসুর নামাখশুর প্রভৃতির দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইয়া আবৃত থাকে, তাহাকে বাংলার প্রচলিত ভাষায় এক কথায় "ঘোমটা" বলে।

Now, ঘোমটা is certainly a word। তাই ব্যাকরণ-বিৎ প্রশ্ন করিতে পারেন,—"ঘোমটা বিশেষ্য বিশেষণাদির মধ্যে কোন্ পদ ?"—(অবশ্য নিমন্ত্রণের ডাল খিচুরী প্রভৃতি পদের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।)

ঘোমটা যখন একবার উঠান, আর একবার দেওয়া হয়, অর্থাৎ কোন সময় ঘোমটার হাত খানেক 'আয়' বা 'বৃদ্ধি' আবার কোন সময় পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত 'ব্যয়' বা 'কমান' হয়,—তখন, "আয়-ব্যয়" থাকা সত্বে ইহা "অব্যয়" নহে।

ঘোমটা যে, "সর্ব্বনাম" নয়, তা ব্যাকরণবিদ্‌গণকে আর বোধ হয় বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

তারপর এটা যে বিশেষণ নয় তা'র প্রমাণ আমাকে দিতে হইবে কি ?—দিতে হইলে দেখুন "ঘোমটার" মধ্যে "অভ্রভেদি-রজত-তুষার ধবল গিরি শৃঙ্গ" নাই,—"অমল-কমল-দল-সম্ভার-সন্নিভ মনোহর চারু চিকোরানন-ধারিণী জগদম্বে" * নাই,—"সুগন্ধি-কুসুমদাম-সুবাস-বাসিত-সুমিষ্ট-রসাল-ফল-গন্ধ-ভরপুর বৃক্ষাবলী ঘন-সন্নিবিষ্ট পত্রচ্ছায়া-সুশীতল, বনবালকগণ-সাম-রাগোচ্ছ্বাস পরিপ্লুত-হংস-কোকিল-শুক-পারাবত-ময়ুর-কূজন কূজিত-সরঃশোভন-ভূষণ-চারু-ফুল্লানন দেবপদ-বাঞ্ছিত-পদ্মবন-পরিশোভিত নির্ভয়-হৃদয়-জীব-জন্তুচয় ক্রীড়াময়-মহাসুখ স্থান-তপোবন"ও

* "পাগলের কথা" By D. N. Das.

নাই !—আর না বলিলেও বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন,—"ঘোমটা" "বিশেষণ" নয়।

যাক্‌গে ও কথা। তারপর হওয়া যাওয়া খাওয়া দেওয়া প্রভৃতি যখন ক্রিয়া,—আর সেহেতু "ঘোমটা" খাওয়া দাওয়া করেন না, তখন তিনি ওপথে যান না।

বাকী বিশেষ্যকে লইয়া টানাটানি। অব্যয় সর্ব্বনাম বিশেষণ ক্রিয়া ও বিশেষ্যের মধ্যে অব্যয়াদি চারিটী বাদ গেল রহিল এক "বিশেষ্য"। যেমন ছোট্ট ছেলে মেয়েরা অঙ্ক করে।

"৫ হইতে ২ লইলে ৪ থুরি ৩ থাকে।

৫ " ৪ " ১ থাকে।" ইত্যাদি।

দেখুন দেখি অঙ্কে আমার বিদ্যার দৌড়। অঙ্ক খুব ভাল জানি। কিন্তু করি না; তাই সব সময় ঠাওর হয় না। ভুলচুক হয়।

যাক্‌গে। ঘোমটা যে "বিশেষ্য"—তা এইত প্রমাণ করলাম।

এখন দেখতে হবে ঘোমটাটা কি বাচক বিশেষ্য। বলুন ত? দেখুন আপনি পারলেন না! এই দেখুন পট্ ক'রে "পদার্থ বাচক" বলে ফেল্লেম। ব্যাকরণে বিদ্যা আমার কম নয়।

(২) বিজ্ঞান তত্ত্ব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তক লিখিতে বসিয়াছেন। পদার্থ সম্বন্ধে লিখিতে হইবে। লিখিলেন,—পদার্থ দুই প্রকার লিখিতেই কি যেন ভাবিলেন। ভাবিয়া "পদার্থ দুই প্রকার" কাটিয়া "তিন প্রকার" লিখিলেন। যথা;—

"চেতন, অচেতন আর উদ্ভিদ্।"

বাপ্‌রে বাপ্! বই লিখ্‌ব হাতে যা উঠবে লিখে যাব। এত চিন্তা আবার কিসের! বলদের মত চিন্তা করে মাথা খারাপ করে মা, বাপ্‌কে কাঁদিয়ে ফল কি?—ইচ্ছার ঠাকুরদাদা তাঁকে—"এঁড়ে বাছুর" বলিত!

এই দেখুন উপস্থিতে যা মনে আসে তাই ব'লে ফেলি—তাই বলেছি ঘোমটা—

"পদার্থ-বাচক" বিশেষ্য।

বলবেন,—"বল্লেইত হ'বে না। যখন বিজ্ঞানের কোপ কাটালে,—তখন প্রমাণ কর "ঘোমটা" কি রকম "পদার্থ।" তা না হ'লে আমরা বিজ্ঞান-শিশু বামন তোমার টিকি ধ'রে ঘুরাব।"

বলুলেম,—ঘোমটা চেতনপদার্থ।

ম'শায়, ওদিক দিয়ে টিকিটা ধর্‌বেন না। বিজ্ঞানের প্রমাণ চান,—ক'রে দি, শুনুন—,

রমণীর অলঙ্কার ঘোমটা কোন সময় হাত খানেক বৃদ্ধি পায়,—আবার কোন সময় পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে। এইরূপ করিয়া ইহা নড়ে চড়ে। তাই প্রমাণ করা যায় ইহার "চেতনা" আছে।

অতএব ইহা "চেতন পদার্থ।"

বিজ্ঞান বোধ হয় হাসিলেও আপত্তি করিতে পারিবেন না।

(৩) কারণ-তত্ত্ব

এই গেল বিজ্ঞাপনের গোল। তারপর তর্ক উঠিতে পারে,—"ঘোমটা কখনও বৃদ্ধি পায়—আবার কখনও কমিয়া যায়, ইহার কারণ কি?"

হুঁ, তা'রও কারণ আছে: এই দেখুন মহাবীরগণ-প্রবেশ-বিমুখ রমণী-অন্তঃপুরে যখন সুকেশী লাবণ্যময়ী-ললনাগণ ভ্রমরকৃষ্ণ-কেশ-পাশ আলুলায়িত করিয়া রন্ধনে, ভোজনে কিম্বা কেশ-বিন্যাসে নিবিষ্ট থাকে, তখন যদি দৃষ্টিপথে ভাসুর, মামাশ্বশুর প্রভৃতি পতিত হন, তবেই গোল বাধে। অমনি—

সুদীর্ঘ বস্ত্র খণ্ডেন শবদিন্দু নিভাননাঃ।
আবরিতা ভবন্তিতা জলদেনেব চন্দ্রমাঃ॥

এই দেখুন সংস্কৃতও কিছু জানি।

তারপর, তাঁহারা অর্থাৎ ভাসুরাদি দৃষ্টিপথান্তরালে যখন গমন করেন, তখন আবার রমণীর আবরণ উন্মুক্ত হইয়া পাক ক্রিয়া কিংবা ভোজন ক্রিয়া আরম্ভ করে। অথবা

"ললিত-লবঙ্গ লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে॥"র

মত আলুলায়িত দোদুল্যমান কেশ-পাশ রজত-কাঞ্চন-পরিশোভিত হইতে আরম্ভ করে।

এখন বুঝিলেন কেন ঘোমটা কখনও বৃদ্ধি পায় আবার কখনও কমিয়া যায়?—

(৪) অর্থ-তত্ত্ব

এখন আমরা দেখিব—ইংরেজী চালে আমরা চলি—আমাদের দেশের ঘোমটার চলনটাও কি সে দেশ হইতে আসিয়াছে ?—না, কেননা মেম সাহেব ত কতই দেখা যায়, তাহাদের ঘোমটা নাই। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে পারি ঘোমটা বিলিতি চাল নয়।

কাজেই তারপর আমাদের দেখিতে হইবে, রমণীগণের যে হস্তেকদীর্ঘ ঘোমটা, সেই ঘোমটার অর্থ কি ? অর্থ হ'লেইত সব বুঝতে পারব। আপনারা এক কথায় বল্‌বেন, ঘোমটা অর্থ "আবরণ বা ঢাকনি।" দেখুন আপনারা মস্ত একটা ভুল কর্‌লেন। আপনারা ঘোমটার "প্রতিশব্দ" বলেছেন। "প্রতিশব্দ" আর "অর্থ" কি এক কথা ? কখনো না।

এই দেখুন আমি এর কেমন অর্থ করছি।—শুনুন,—

ঘোরস্য মত্ততায়াঃ টানস্থতি তথৈব চ।
আত্মার্থং সমাদায় ঘোমটা পরিকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ—ঘোর মত্ততার টান হইতে রমণীগণের আত্মরক্ষা করিবার উপায়কে সরল ভাষায় ঘোমটা বলে।

বুঝিলেন কি ?—বোধ হয় এই মাত্র বুঝিয়াছেন হিন্দুর সুন্দরী ললনার সুন্দর মুখ ছবি সন্দর্শনে দুর্ব্বৃত্তগণ মুগ্ধ হইয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করে। তাই, সেই পামরগণ যাহাতে রমণীর মুখ ছবি দেখিতে না পায়; তাহারই জন্য ললনাগণের সুদীর্ঘ আবরণ বা ঘোমটার ব্যবস্থা।

(৫) প্রত্ন তত্ত্ব।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে কখন হইতে এইরূপ অত্যাচার আরম্ভ হয় ?—কখন হইতে হিন্দুরমণীর সর্ব্বস্ব সতীত্বের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয় ?—কে ইহার প্রবর্ত্তক ?—এই সতীত্ব বিধ্বংসী কে ?—

হে অতীত সাক্ষী অভ্রংলিহ হিমাচল! তুমি কি দেখিয়াছ কে এই সতীত্বের উপর অত্যাচার করিয়াছিল ? একি!—তুমি স্থির, গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া! তুমি তাহা জান না ? হে কলকল-নাদিনী বক্ষ-বিধৌতিনী পূতবারি-ধারিণী জীবকলুষনাশিনী মাতর্গঙ্গে তুমি কি দেখিয়াছ কে এই অত্যাচারের প্রবর্ত্তক ? তুমিও জান না! কে এই বিশ্ব সংসারে পৃথিবী ভিতরে জান, কে এই সতীত্ব বিধ্বংসী ? কেহই জান না!—শুধু কেউ কুলুকুলু করিয়া, কেউ শন্‌ শন্‌ করিয়া চলিয়া যাও; আর কেউ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক। বুঝেছি—তোমাদের ভয় হয়। তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তোমরা ভীত! হুঁ, সে খুব প্রতাপশালীই বটে!

হে স্মৃতিধারি জীবগণ-স্মৃতি রক্ষক ইতিহাস! তুমি কি জান ?—না তুমিও বলিতে ভয় পাও ?—

শন্‌ শন্‌ অনিল-স্বননে কর্‌ কর্‌ করিয়া ইতিহাসের পাতা উল্টিয়াছে। দেখুন—সকলে চাহিয়া দেখুন "এ কা'র কীর্ত্তি!"

হিন্দুরাজত্ব পাতায় পাতায় উল্টান হ'ল।—কিন্তু কোথাও ঘোমটা পাইলাম না। হিন্দুদের আদি-গ্রন্থ-বেদ—বিশ্বাস না হয় ইতিহাস দেখিয়া লইবেন—তাহাতে ঘোমটা দেখি না। তারপর রামায়ণে ঘোমটা পাই না,—মহাভারতে ঘোমটা পাই না। পাতায় পাতায় হিন্দু রাজত্ব খুঁজিলাম,—ঘোমটা পাইলাম না।

তারপর মুসলমান রাজত্ব। পাতায় পাতায় খুঁজিয়া দেখিলাম,—

ঐ বিলাসি-সিরাজ—নদী বাহিয়া চলিয়াছেন,—আর ঐ রাণীভবানীর বিধবা কন্যা সুগঠনা তারাসুন্দরী—প্রাসাদ-ছাদে দাঁড়াইয়া আলুলায়িত কেশপাশ তপন-তাপে শুকাইতেছেন।

সিরাজ দেখিলেন। অমনি পাপবুদ্ধি কুমতি আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় লইল।

রাণী ভবানী বিপদে পড়িলেন।

* * * *

বুঝিলেন কি ? মোগল রাজত্ব যখন ফুরাইয়া যায়, বিলাসিতায় তখন চারিদিক পরিপূর্ণ! সেই বিলাসিতার মাঝে কত অনাচার অত্যাচার হইত কে বলিতে পারে ? তারপর সেই বিলাসিতার চরম ফল ফলিল একদিন—পলাশীর আম্রকাননে সেইদিন ইহার চরম ফল ফলিল—

"মুসলমান রাজত্ব পতন
অথবা
হিন্দুর রমণীর ঘোমটা বা আবরণ।"

হায়! সিরাজ!

(৬) তারপর।

সেই অবধি এদেশে ঘোমটার প্রচলন। তার আগে যে ছিল, তার প্রমাণ পাই না। তারপর ইতিহাসে যেমন—এক এক জাতি মহা পরাক্রমে তালিবনের মত সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠ কাঁপাইয়া শত শত বৎসর পৃথিবীপৃষ্ঠে নানাক্রীড়া করিয়া পতন প্রাপ্ত হয়—সেইরূপ এই ঘোমটাও কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে হাত দেড়েক পর্য্যন্ত উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে যে come to an end তাহাতে আর বিচিত্র কি!

এখনও বিবাহের সময় হইতে হিন্দুললনার সুদীর্ঘ ঘোমটার প্রচলন আছে, তাহা বোধ হয়, সমস্ত হিন্দুই জানেন। আজকালও ঘোমটা দেখিয়া বলা যায় কার লজ্জা বা সরম কি পরিমাণ আছে ? যে যত বেশী ঘোমটা দেয়, সেই লজ্জাশীলা বা সুন্দরী।

এই হ'ল ঘোমটার তত্ত্বকথা।

শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য।

ঈষ্টলীন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাঙ্গা ক্রুস

মিসেস্ লেভিসনের কথায় ও ব্যবহারে স্বভাবতঃই বড় একটা রুক্ষতা ছিল, তাহাতে আবার বয়স এখন তাঁহার আশীর উপর উঠিয়াছে। ইজাবেল পৌছিয়া দেখিলেন, মিসেস্ লেভিসন একেবারে আগুণ হইয়া বসিয়া আছেন! মিসেস্ ডেনের বিলম্বে সময় মত ডিনার খাওয়া তাঁহার হয় নাই, এখন আবার লেডী ইজাবেলের বিলম্ব হওয়ায় চায়ের জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইতেছে। এ সব অনিয়ম এ বয়সে শরীরেও সয়না, মনেও সয়না। ইজাবেল একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমার বোধ হয় দেরী হইয়া গিয়াছে। একটি ভদ্রলোককে বাবা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতে পারিলাম না।"

মিসেস্ লেভিসন ভ্রূকুটি করিয়া কঠোর ভাবে উত্তর করিলেন, "কুড়িমিনিট তোমার দেরী হইয়াছে, আর আমি চা'র জন্য বসিয়া আছি! যাক্! এ সব, এখন চা আনিতে বল।"

মিসেস্ ডেন অবিলম্বে ঘণ্টা টিপিলেন, পরিচারিকা হাজির হইল, তাকে যথাযথ আদেশ দিলেন। মিসেস্ ডেন মিসেস্ লেভিসনের দৌহিত্রী—তাঁহার নিজের নাম এমা—বয়স এখন ২৬ বৎসর হইবে। মুখখানি সুন্দর না হইলেও অঙ্গসৌষ্ঠবে বেশ একটি শ্রীছাঁদ তাঁহার ছিল; বিবিধ কলা বিদ্যাতেও তিনি বিশেষ গুণবতীও ছিলেন, আর তার গরবে সর্ব্বদাই ভরপুর হইয়া থাকিতেন।

ইজাবেলের দিকে চাহিয়া মিসেস লেভিসন্ কহিলেন, "গায়ে কি একটা ঝুলি পরিয়া আসিয়াছ, খুলিয়া রাখিবে না বাছা?"

ইজাবেল উপরের ঢিলা পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। ইতিমধ্যে পরিচারিকা চায়ের সরঞ্জামাদি লইয়া আসিল। মিসেস্ ডেন্ বলিয়া উঠিলেন—ওমা চা যে তৈরী হয় নাই, দিদিমা! তুমি কি এই ঘরের মধ্যেই চা তৈরী করাবে নাকি?"

"তবে কোথায় করাব?"

"কেন একেবারে তৈরী চা নিয়া এলেই ত সুবিধা হয়। এ সব ঝঞ্ঝাট আমার ভাল লাগে না।"

"তা বই কি? চা টুকু সব রেকাবে ঢালিয়া পড়ুক, আর একেবারে ঠাণ্ডা দুধের মত হইয়া যাক্। তুমি বরাবরই এম্নি কুড়ে এমা!"

"কে তবে রোজ তোমাকে এই ঘরে চা করিয়া দেয়?" এই বলিয়া মিসেস ডেন ইজাবেলের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক একটি মুখভঙ্গী করিলেন। একটু পিছনের দিকে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, কাজেই দিদিমা সেটা লক্ষ্য করিলেন না। ইজাবেল একটু সলজ্জভাবে মুখ নত করিল,—বৃদ্ধা মাতামহীর প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ তাহার সরল স্নেহময় প্রাণে ভাল লাগিল না। আবার মিসেস্ ডেন অসন্তুষ্ট হন, এটাও সে ইচ্ছা করিল না। মিসেস লেভিসন উত্তর করিলেন, "হ্যারিয়েট আসিয়া চা তৈরী করে, আর যেদিন একা থাকি আমার সঙ্গে বসিয়া সে চা খায়, একাই আমি বেশী থাকি! হুঁ—হুঁ। তোমার বুঝি এটা বড় ভাল লাগিতেছেনা এমা ঠাকরুণ! নজরটা বড় উঁচু—ধরাকে একেবারে সরাজ্ঞান কর কি না?"

"তা তোমার যা খুসী বলিতে পার দিদিমা।"

"হাঁ, ঐ যে চায়ের কৌটা রহিয়াছে, জল ঠাণ্ডা হইয়া যায় যে। আজ রাত্রে যদি চা খাইতে হয়, তবে তৈরী করিয়া ফেল এখনই।"

"তাইত! কতটুকু চা জলে দেব?" হাত বা হাতের দস্তানা পাছে একটু ময়লা হয় এ ভয়েও এমা ডেনের মনটা বড় দমিয়া যাইতেছিল।

ইজাবেল উঠিয়া কহিল, "আমি তৈরী করিয়া দেই, বাড়ীতে আমিই বরাবর চা তৈরী করি।"

"কর বাছা, অমন দশটা এমাও তোমার একার সমান হয় না।"

ইজাবেল হাসিয়া হাতের দস্তানা দুটি খুলিয়া ফেলিয়া চায়ের টেবিলে গিয়া বসিল। তখন একটি অতি সুরূপ ও সুবেশ যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।—যুবক অতি সুরূপ বটে, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিলে এই রূপের মধ্যেও এমন একটা মধুরতা কেহ দেখিবে না, যাহাতে স্নেহ প্রীতিতে কাহারও চিত্ত ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু আকৃতিতে বাহ্যিক এমন একটা বাহার ছিল, বাহ্যিক ব্যবহারেও এমন একটা মোহন ভঙ্গি ছিল যে সকলেরই প্রথম প্রথম ইহাকে বড় ভাল লাগিত, এবং লোকসমাজে আদর আপ্যায়নও সর্ব্বদাই সকলে ইহাকে করিত। অন্তরে ইহার কাহারও প্রতি স্নেহ প্রীতিকরুণার লেশ মাত্র ছিল না।—অতি স্বার্থপর ও ভোগলিপ্সু এই যুবক উচ্ছৃঙ্খল অমিতাচারে নিয়ত অপব্যয়ে সর্ব্বদাই ঋণগ্রস্ত থাকিত।—তবে লোকে এটা জানিত যে বৃদ্ধ ও অতিসমৃদ্ধ সার পিটার লেভিসনের উত্তরাধিকারী সে—সুতরাং ঋণ প্রাপ্তিতে নিতান্ত অসুবিধা তার বড় হইত না। এই যুবক মিসেস্ লেভিসনের পৌত্র, নাম ফ্রান্সিস্ লেভিসন,—সৈনিক বিভাগের জনৈক কাপ্তেন।

বৃদ্ধা দিদিমা ইজাবেলের সঙ্গে নাতির পরিচয় করিয়া দিলেন। সেনানায়ক সুরূপ বেশভূষায় অতি মোহনদর্শন এই যুবক এমনই মুগ্ধদৃষ্টিতে ইজাবেলের দিকে চাহিল যে ইজাবেলের সমস্ত মুখখানি ঘন রক্তরাগে একেবারে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বিধাতার বিচিত্র রহস্য এই যে, যে দুইটি লোকের প্রভাবে ইজাবেলের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখদুঃখ নিয়ন্ত্রিত হইবে, সেই দুইটি লোকের সঙ্গেই প্রথম পরিচয় আজ একদিনেই তার হইল!

চা খাওয়া হইল, মিসেস্ ভেন ও লেডী ইজাবেল বিদায় গ্রহণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোনও বড়ঘরে নাচের মজলিসে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ ছিল,—এখন সেইখানে তাঁহারা যাইবেন।

সূক্ষ্ম একটি স্বর্ণহারে গ্রথিত মকরতমণি-খচিত একটি স্বর্ণক্রুস্ ইজাবেলের বক্ষে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। মিসেস্ লেভিসনের দৃষ্টি সহসা এই ক্রুস্‌টির দিকে পড়িল।—তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বড় সুন্দর ক্রুস্‌টি ত বাছা তোমার গলায়—"

'হাঁ, ভারি সুন্দর ক্রুস্,—নয়? মা মরণ কালে এটি আমাকে দিয়া যান। কোনও ভোজে কি উৎসবে যখন যাই,—তখন এইটি আমি পড়ি। আপনি দেখিবেন? আচ্ছা, খুলিয়া দিতেছি।"

মিসেস্ ভেন্ বলিয়া উঠিলেন, "তাইত আগে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি নাই,—ঐ ক্রুসটি * ছাড়া আর কোনও অলঙ্কারই যে তুমি পর নাই—আর মোটে ঐ ছুটো সেকেলে বিশ্রী মুক্তার ব্রেস্‌লেট?"

"ব্রেসলেট দুটীও মা আমাকে দেন। তিনি সর্ব্বদাই এই ব্রেসলেট পরিতেন।"

"এমন সেকেলে ভঙ্গীর মেয়েও আর দেখি নাই গো! কেন তোমার মা সেই কোন যুগে এই ব্রেস্‌লেট পরতেন বলিয়া তোমাকে আজও তাই পরিতে হইবে? কেন, তোমার হীরার গহনাগুলি কেন পর নাই?"

সলজ্জ ভাবে ইজাবেল উত্তর করিল, "হাঁ, আগে তাই পরিয়াছিলাম। শেষে—সব খুলিয়া রাখিলাম।"

"ওমা! কেন?"

"ভারী ঝক্ ঝক্ করিতেছিল সেগুলো।— কেমন লজ্জা হইল,—মনে হইল, লোকে হয় ত ভাবিবে, আমি খুব জাঁকাল সাজ করিবার জন্যই সেগুলা পরিয়াছি। ছি! সেটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। ভারী লজ্জা করে।"

মিসেস্ ভেন একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে উত্তর করিলেন, "একদল মেয়ে আছে যারা দেখাইতে চায়, সাজ সজ্জা তারা কতই যেন তুচ্ছ করে। তুমি বুঝি সেই দলে যেতে চাও লেডী ইজাবেল—তা এও এক রকম ঠাটই বটে!"

ইজাবেল এই বিদ্রূপে কোনও অসন্তোষ প্রকাশ করিল না,—তার মনে হইল কিছুতে হয়ত মিসেস্ ভেনের মেজাজ গরম হইয়া গিয়াছে। তা হইয়াছিলও বটে,—কিন্তু

---

* যিশুখৃষ্ট ক্রুস নামক এক প্রকার কাষ্ঠদণ্ডে দেহত্যাগ করেন। একখানি কাঠের উপরে আড়ভাবে আর একখানি কাঠ, তাহার সঙ্গে পেরেকে দণ্ডিত ব্যক্তির হাত পা বিদ্ধ করিয়া রাখা হইত। ক্রমে বহু যাতনায় বদ্ধব্যক্তির প্রাণবিয়োগ ঘটিত। যিশুখৃষ্টের শত্রুপক্ষ রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া এই দণ্ডে তাহাকে দণ্ডিত করান। মানবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ঈশ্বরাবতার যিশুখৃষ্ট ক্রুসে এই দণ্ড গ্রহণ করেন, তাই ক্রুস খৃষ্টানদের অতি পবিত্র চিহ্ন। অনেক ধর্ম্মপরায়ণ খৃষ্টান ছোট ছোট ক্রুস চিহ্ন বক্ষে ধারণ করেন।

কেন যে হইয়াছিল তাহা ইজাবেল বুঝিতে পারে নাই। ফ্রান্সিস্ লেভিসন মুগ্ধ ভাবে অবিরত শিষ্ট আদর আপ্যায়নে ইজাবেলকেই প্রীত করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, ইহা মিসেস্ ভেনের একেবারেই সহিতেছিল না। এরূপ আদর আপ্যায়ন পুরুষ কেহ, তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া অপর কাহাকেও করে ইহা তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না।

মিসেস্ লেভিসন ক্রুসটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিলেন "নেও বাছা, তোমার ক্রুস্ নেও। ভারী সুন্দর ক্রুস। তোমার গলায় হীরা" চাইতে এই ক্রুস্ অনেক ভাল মানাইয়াছে। এমা যাই বলুক, হীরা জহরতের অলঙ্কারে তোমার ওই রূপের শোভা কিছু বাড়িবে না।"

ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ ক্রুস্টি নিয়া ইজাবেলের হাতে দিতে গেল, কিন্তু হঠাৎ কেমন করিয়া সেটা মাটিতে পড়িয়া গেল। ফ্রান্সিস্ ব্যস্তভাবে সেটি তুলিতে গিয়া সেটি মাড়াইয়া ফেলিল,—ক্রুস্টি ভাঙ্গিয়া দুই খানা হইল।

মিসেস্ লেভিসন্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এই যা! কি হইল—কার দোষে গেল?" ইজাবেল কোন উত্তর করিতে পারিল না। ক্রুসের খণ্ড দুখানি হাতে নিতে নিতে অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার চক্ষু দুটি ভরিয়া উঠিল।

কাপ্তেন লেভিসন বড় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। মিসেস্ ভেন বলিয়া উঠিলেন, এই দেখ, পাগল যেন! ঐ একটু ঠুনকো ক্রুসের জন্য একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিলে? ভারী ত জিনিষ!"

মিসেস্ লেভিসন কহিলেন, "তা মেরামত করিয়া নিতে পারিবে। দুঃখ কি বাছা?"

ইজাবেল চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাপ্তেন লেভিসনের দিকে চাহিয়া কহিল "আপনি অত লজ্জিত হইবেন না। [illegible] একার কিছু এমন ত্রুটি হয় নাই—আমিও সামলাইয়া ধরিয়া নিতে পারিলাম না। হাঁ, এটা মেরামতও করিয়া নেওয়া যাইব বই কি?"

ক্রুসের উপরের টুকরাটা খুলিয়া ফেলিয়া হারটুকু ইজাবেল গলায় পরিল।

মিসেস্ ভেন বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি কেবল ঐ একটু সরু হার গলায় দিয়াই যাইবে নাকি?"

"কেন, তাতে দোষ কি? কেউ যদি কিছু বলে, তখন বলিব ক্রুসটা দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

মিসেস্ ভেন্ হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"লোকে বলিবে! যেন ন্যাকা, কে বলিবে আবার কি? তবে একথাটা অনেকেই ভাবিবে, লর্ডমণ্ট সেভার্ণের কন্যার অলঙ্কার তেমন কিছু নাই।"

ইজাবেল একটু হাসিয়া উত্তর করিল "কেন, সেদিন রাজদরবারে গিয়াছিলাম—আমার হীরার অলঙ্কারগুলি সবাই ত দেখিয়াছে

মিসেস্ লেভিসন বলিয়া উঠিলেন "তুমি যদি আমাকে আজ এই অবস্থায় ফেলিতে ফ্রান্সিস্ লেভিসন,—এক মাসের মধ্যে তোমাকে আমার বাড়ীতে ঢুকিতে দিতাম না! যাক্! এমা, যদি যাইতে হয় ত এখনই যাও। আর এখন দিন কাল এমনই পড়িয়াছে, নাচ আরম্ভ হইবে রাত দশটায়! আমাদের সময় সাতটার বেশী দেরী হইত না। এখনকার মেয়েরা সব রাতগুলাকে যেন দিন করিয়া তুলিয়াছে!"

"হাঁ, তাত বটেই। সেই কালের সে উত্তম দিন—যখন রাজা তৃতীয় জর্জ্জ বেলা একটায় সিদ্ধ করা মটনের ডিনার খাইতেন!" এই বলিয়া নাতি লেভিসন দিদিমাকে ব্যঙ্গ করিল।

যাহা হউক, বিদায় নিয়া তাঁহারা নীচে আসিলেন। কাপ্তেন লেভিসন বাহুতে ইজাবেলের বাহু ধরিয়া তাকে নামাইয়া আনিল। এমা ভেন একাই নামিলেন, মনটা ইহাতে তাঁহার আরও গরম হইয়া উঠিল।

গাড়ীতে উঠিয়া ইজাবেল কহিল—"তাহ'লে আজকার মত বিদায় হই।"

কাপ্তেন লেভিসন হাসিয়া উত্তর কহিল, "না এখনই বিদায় হইব না আপনারা যাইতে না যাইতেই আমিও সেখানে [illegible] ব।"

"কেন আপ[illegible] বলিয়া[illegible]

মজলিসে আপ[illegible]"

"হাঁ, আগে তা[illegible] ভা[illegible]ছলাম। কিন্তু এখন মতটা বদলিয়া গিয়াছে। তাহ'লে আপাততঃ বিদায়, লেডী ইজাবেল!"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কতদূর গিয়া মিসেস্ ভেন কহিলেন, "শুধু ওই একটু চেন গলায়—কেমন যে তোমাকে দেখাইবে—যেন ইস্কুলের মেয়েটি!"

ইজাবেল উত্তর করিল, "তাতে আর কি এমন আসিয়া যাইবে মিসেস্ ভেন্? আমি ত সে কথা ভাবিতেছি না, ভাবিতেছি, আমার ওই ভাঙ্গা ক্রুসের কথা। আমার মনে হইতেছে, এটা বড় একটা অশুভ লক্ষণ—"

"অশুভ—কি!"

"অশুভ লক্ষণ। মা মরিবার সময় ক্রুসটি আমাকে দিয়াছিলেন। রক্ষা কবচের মত এটি তিনি আমাকে সাবধানে রাখিতে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'বড় কোনও দুঃখ যদি পাও, বিপদে যদি পড়, এই ক্রুসটির দিকে চাহিও ভাবিও, আমি তোমাকে কি উপদেশ দিতাম আর সেই ভাবে চলিও। কিন্তু আজ সেই ক্রুসটি আমার ভাঙ্গিয়া গেল।"

মিসেস্ ভেন একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন' "তুমি আবার কাঁদিতেছ ইজাবেল? তা আমি তোমাকে বলিতেছি, কাঁদিয়া তোমার চক্ষু দুটি লাল হইবে—এমন অবস্থা সেই ডার্টফোর্ডের ডাচেসের * বাড়ীতে সাথে করিয়া তোমাকে আমি নিয়া যাইতে পারিব না। যদি শান্ত হইতে না পার, তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিব, আমি একা শেষে যাইব।"

ইজাবেল চক্ষু মুছিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "মেরামত করিয়া নিতে পারিব,—কিন্তু ঠিক অমন ক্রুসটি আর হইবে না।"

ডাচেসের নাচের মজলিসে তাঁহারা গিয়া পৌঁছিলেন। গৃহের আলোকসজ্জা, সুসজ্জিত বহু নরনারীর সমাগম, তাহাদের উদ্দাম আনন্দময় নৃত্য উৎসব—সবই ইজাবেলের কাছে নূতন,—অল্পকালের মধ্যেই এই প্রমোদের উল্লাসে তার সেই ভাঙ্গা ক্রুসের দুঃখ ইজাবেল ভুলিয়া গেল। কাপ্তেন লেভিসনও নাচের মজলিসে গিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার সঙ্গেই ইজাবেলকে বেশী নাচিতে হইল। †

নৃত্যে লেভিসনের আগ্রহ এমনই প্রকাশ পাইতেছিল যে দূরে দাঁড়াইয়া দর্শক একটি যুবক আপন মনে বলিয়া উঠিল, "সাবধান লেডী ইজাবেল! চেহারার বাহারে আর হাবভাবে লেভিসন্ যেমনই হউক, প্রাণ ওর পাষাণ! ছলনায় ওর তুলনা নাই! বিশ্বাস ওকে করিও না, সাবধান! যদি কর, মরিবে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বার্বারা হেয়ার

বড় কোন ব্যবসার বাণিজ্যের কেন্দ্র নয়, কোনও কাউন্টি* প্রধাননগর নয়, কোন বিশপের আস্থানও এখানে ছিল না, তবুও ওয়েষ্টলীন সহরটি নিতান্ত একটা নগণ্য সহরও ছিল না,—অন্ততঃ ওয়েষ্টলীনের অধিবাসীরা ইহাকে নিতান্ত নগণ্য বলিয়া মনে করিত না। তবে ইহার চালচলন কিছু সেকেলে ধরণের ছিল বটে। পার্লামেন্টে এই সহর হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরিত হইতেন। আগাগোড়া ছাদে ঢাকা বড় একটি বাজারও এখানে ছিল, সেই ছাদের উপরে বড় একটি ঘর ছিল,—সেইটি ছিল সহরের টাউন হল, জাষ্টিস্ † অর্থাৎ স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটদের আফিস আদালত এইখানেই বসিত।

* 'ডিউক' অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ উপাধি। ডিউকের পত্নীকে ডাচেস্ বলে।

† নাচের মজলিসে সাহেব মেমরা জোড়ায় জোড়ায় মিলিয়া কখনও হাত ধরাধরি করিয়া কখনও পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজনার তালে লাফাইয়া লাফাইয়া নাচে। স্বামী স্ত্রীতে কখনও জোড় মিলান হয় না। স্বামী স্ত্রী নয় এইরূপ একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীতে এক একটি জোড় হয়।

* ইংলণ্ড ২৬টি কাউন্টি অর্থাৎ প্রদেশ বা জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক কাউন্টিতে ম্যাজিষ্ট্রেট বা সেরিফ ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের শাসন কেন্দ্রের স্থল স্বরূপ যে সহর, সেইটিই সেই কাউন্টির প্রধান নগর—সাধারণতঃ কাউন্টি টাউন নামে পরিচিত।

† বিশপ—প্রধান বা অধ্যক্ষ যাজক। ইংলণ্ডে (ইয়োরোপের অন্যান্য অনেক দেশেও) সুনিয়ন্ত্রিত একটি ধর্ম্মশাসন তন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত আছে। ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের প্রধান কর্ত্তা রাজা। রাজার অধীনে নির্দ্দিষ্ট এক একটি অঞ্চলে এক একজন অধ্যক্ষ যাজক থাকেন, ইঁহাদের নাম বিশপ, এবং বিশপের শাসনাধীন এই এক একটি অঞ্চলের নাম 'বিশপ্রিক' বা 'ডাইওসিস্।' প্রত্যেক ডাইওসিস্ আবার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, ইহাদের নাম পেরিশ। বড় এক একটি অথবা ছোট দুই তিনটি গ্রাম লইয়াই প্রায় এক একটি পেরিশ হয়। প্রত্যেক পেরিশে এক একটি গির্জ্জা এবং এক একজন যাজক আছেন, ইঁহারা সকলেই সেই বিশপের অধীন। বিশপ এবং সাধারণ পেরিশযাজক

ওয়েষ্টলীন সহর হইতে কতকটা পূর্ব্বের দিকেই গিয়াই কতকগুলি ভদ্রলোকের বাড়ী,—তার নিকটে সেণ্ট জুডের গির্জ্জা। এইটিই এখানকার বড় গির্জ্জা এবং সহরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা এই গির্জ্জাতেই ভজনা করিতে যান। ইহার প্রায় এক মাইল দূরে বিখ্যাত ঈষ্টলীন—লর্ড মণ্টসেভার্ণের সুবৃহৎ গ্রাম্য বাসগৃহ। বাটীখানি অতি সুন্দর, চারিদিকে বিস্তৃত ময়দান এবং বহু সুদৃশ্য সুবিন্যস্ত বৃক্ষরাজিতে বেষ্টিত। ওয়েষ্টলীনের কেবল বাহিরেই সেণ্টজুডের গির্জ্জার নিকটে যে কতিপয় ভদ্রলোকের বাড়ীর কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাহইতে কিছু দূরে ঈষ্টলীনের দিকে আর একটি নাতি বৃহৎ বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। এইটি জাষ্টিস্ বা ম্যাজিষ্ট্রেট্ হেয়ার সাহেবের বাড়ী,—বাড়ীর সম্মুখে একটি ময়দান—ময়দানের পর রাস্তার পাশে কয়েকটি বৃক্ষ-কুঞ্জ আছে, তাই এই বাড়ীখানির নাম কুঞ্জবন।"

হেয়ার সাহেবের তিনটি সন্তান—দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র। বড় কন্যা এন, তাহার বিবাহ হইয়াছে; কনিষ্ঠ কন্যা বার্বারা, বয়স এই উনিশ বৎসর, এখনও কুমারী। আর পুত্র রিচার্ড জ্যেষ্ঠ সন্তান—কিন্তু তাহার কথা এখন থাক! পরে পাঠকবর্গ তার পরিচয় পাইবেন।

যে মাস পড়িয়াছে, কিন্তু দিনটা বড় ঠাণ্ডা ছিল,—মিসেস্ হেয়ার তাঁহার বসিবার ঘরে বসিয়া আছেন। বহুদিন যাবৎ ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু মিসেস্ হেয়ার এখন যারপরনাই দুর্ব্বল, কোনও রূপ দৈহিক ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না। পাণ্ডুর ও বিষণ্ণ মুখখানি সর্ব্বদাই তাঁহার ক্ষীণ স্বাস্থ্যের পরিচয় যেন দিতেছে। দিনটি বড় ঠাণ্ডা ছিল, ঠাণ্ডা শরীরে সহিত না, তাই সর্ব্বাঙ্গ শালে জড়াইয়া একখানি আরাম কেদারার কোমল গদীর মধ্যে তিনি যেন ডুবিয়া বসিয়া আছেন।—চেয়ারখানি হার্থ বা অগ্নিকুণ্ডের * কাছেই সরান ছিল—যদিও কুণ্ডে তখন আগুন মোটেই জ্বলিতেছিল না। যে মাসের দিনগুলি সাধারণতঃ গরমই হইয়া উঠে, এবং তখন ঘরে ঘরে কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়া কেহ রাখে না। নিকটেই একটি জানালায় উজ্জ্বলবর্ণা অতি সুন্দরী একটি তরুণী বসিয়াছিল, তার হাতে একখানি পুস্তক, অন্যমনস্ক-ভাবে পুস্তক খানির পাতা সে উল্টাইতে ছিল।

মিসেস্ হেয়ার এই তরুণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বার্বারা নিশ্চয়ই এতক্ষণ চা খাবার সময় হইয়াছে।"

বার্বারা উত্তর করিল "বল কি মা? এইত পনর মিনিটও হয় নাই তোমাকে বলিলাম, ছটা বাজিয়া দশ মিনিট মোটে হইয়াছে।"

"আমার এমন তৃষ্ণা পাইয়াছে। বার্বারা, যাও লক্ষ্মী মা আমার, ঘড়ীটা আর একবার দেখিয়া এস।"

বার্বারা একটু যেন বিরক্তভাবে উঠিয়া গিয়া বারান্দায় ঘড়ী দেখিয়া আসিল। কহিল, "সাতটা বাজিতে এখনও উনত্রিশ মিনিট বাকী আছে মা। তোমার পকেট ঘড়ীটা কাছে রাখিয়া দিও,—ডিনারের পর এই চারবার তুমি আমাকে ঘড়ী দেখিতে পাঠাইলে!"

মিসেস্ হেয়ার প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিলেন, "আমার এমন তৃষ্ণা পাইয়াছে! সাতটা যে বাজেও না ছাই! চার জন্য আমার প্রাণ গেল যে!"

গৃহিণী নিজের গৃহে—চায়ের জন্য প্রাণ যাইতেছে—

ইঁহাদের মধ্যে যাজকদের আরও কয়েকটি পদ আছে। বিশপ যেখানে থাকেন খুব বড় একটি গির্জ্জা সেখানে থাকে, নাম ক্যাথিড্রাল গির্জ্জা। বিশপের সহকারী আরও অনেক যাজক সেই গির্জ্জার কার্য্যের সঙ্গে সংসৃষ্ট থাকেন। বিশপের আস্থান সাধারণতঃ বড় একটি সহরে পরিণত হয়। এই সহরগুলি 'ক্যাথিড্রাল' সহর নামে পরিচিত হয়। বিশপের উপরে ইংলণ্ডে আবার দুইজন প্রধান বিশপ আছেন, 'আর্চ্চ-বিশপ' নামে তাঁহারা পরিচিত। ('আর্চ্চ' শব্দাংশটি প্রধানার্থ সূচক।) ইঁহাদের একজনের আস্থান ক্যাণ্টারবেরী নগরে, আর একজনের আস্থান ইয়র্ক নগরে। ক্যাণ্টারবারীর আর্চ্চ-বিশপের পদই আবার সর্ব্বোচ্চ। ইনি খাস রাজপুরোহিত। রাজার অভিষেক, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, রাজসন্ততিগণের জাতকর্ম্মাদি সকল অনুষ্ঠান ইনিই সম্পন্ন করেন। স্থানে স্থানে স্থানীয় শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য রাজকীয় আদেশে কয়েকজন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হন। ছোটখাট অপরাধের বিচার নিষ্পত্তি ইঁহারাই করেন, গুরু অপরাধে অভিযুক্ত আসামীদের সম্বন্ধে সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করিয়া সেসনে তাহাদের সোপর্দ্দ করেন। সরকারী বড় বড় জজেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া সেসন করেন। এই সব ম্যাজিষ্ট্রেটরা কোথাও কোথাও শান্তিরক্ষক জাষ্টিস্ নামে পরিচিত।

* ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ;—শুইবার বা বসিবার প্রত্যেক ঘরে দেয়ালের সঙ্গে একটি করিয়া অগ্নিকুণ্ড থাকে। প্রত্যেক কুণ্ডের উপরে একটি চিম্নি ছাদ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া ধূম বাহির হইয়া যায়। এই হার্থ বা অগ্নিকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানটা অতি আরামের যায়গা।

আনাইয়া খাইলেই ত হয়, নির্দ্দিষ্ট সময় তার হউক বা না হউক! মিসেস্ হেয়ার ফিরাইতে পারিল না। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে গৃহে আনিয়াছেন, সেই অবধি এপর্য্যন্ত নিজের ইচ্ছা বলিয়া কিছু একটা যে মিসেস্ হেয়ারের আছে এমন লক্ষণও কখনও প্রকাশ পায় নাই। নিজের গৃহিণীর কর্ত্তৃত্বে ভৃত্যদের একটি আদেশও তিনি জীবনে কখনও দিয়াছেন কিনা সন্দেহ। হেয়ার সাহেব অতি কড়া প্রকৃতির লোক—অতি জেদী, অতি একগুঁয়ে। নিজে যা বুঝিতেন তার উপরে আর কারও কোনও বুদ্ধি বা অভিমতের কোনও খাতির কখনও তিনি করিতেন না। মিসেস্ হেয়ার ছিলেন আবার অতি শান্ত নরম প্রকৃতির মেয়ে। সুতরাং সহজেই এই তেজস্বী শক্ত স্বামীর একান্ত অনুগত হইয়া তিনি পড়েন। স্বামীকে বড় ভালও বাসিতেন এবং জীবন ভরিয়া নিজের ইচ্ছাকে একেবারে স্বামীর ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করিয়াই তিনি চলিয়াছেন বস্তুতঃ ইচ্ছা বলিয়া একটা বৃত্তিই তাহার একরূপ ছিল না। গৃহে স্বামীই ছিলেন সর্ব্বে সর্ব্বা। স্বামীর এই সর্ব্বথা অনুবর্ত্তিতা মিসেস্ হেয়ার কখনও ক্লেশকর বা গ্লানিকর বলিয়াও বিবেচনা করেন নাই। কোনও কোনও নারীর স্বভাব আছে যে তারা তা একেবারেই করে না। তবে একথাও অবশ্য বলিতে হইবে যে যতই তেজী, জেদী আর কড়া হউন, হেয়ার সাহেব নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম লোক ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী কিছুতে কোনও ক্লেশ পান এরূপ কোনও অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। সব কাজ তাঁহার নিজের ইচ্ছায় হয়, সকলে তাঁহার ইচ্ছামতই চলে, এইটি তিনি চাহিতেন। ইহাতে তাঁহার স্ত্রীর বা অপর কাহারও যে কোনও ক্লেশ বা অসুবিধা হইতে পারে, এই কথাটা তাঁহার মনেই কখনও উঠিত না। আর মিসেস্ হেয়ারও এমনই নির্ব্বাক্ হইয়া ধীর শান্ত সহিষ্ণুভাবে সর্ব্বদা স্বামীর ইচ্ছা পালন করিয়া আসিয়াছিলেন যে এটা বুঝিবার কোনও অবসরও হেয়ার সাহেব কখনও পান নাই। তিনটি সন্তানের মধ্যে এক মাত্র বার্ব্বারাই পিতার এই দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা পাইয়া ছিল, কিন্তু অমন কড়াভাবে ইহা বার্ব্বারার চরিত্রে এখনও তা প্রকাশ পায় নাই।

মিসেস্ হেয়ার আবার ডাকিলেন, "বার্ব্বারা!" তাঁহার মনে হইতেছিল, আরও এক পোয়া ঘণ্টা অন্ততঃ অতীত হইয়াছে।

"কি মা?"

"ঘণ্টাটা বাজাও ত মা,—আর ওদের বল, সব ঠিকঠাক করিয়া রাখুক, সাতটা বাজিলে যেন আর একটুও দেরী না হয়।"

"কি জ্বালা গো! ওরা ত রাখেই সব ঠিকঠাক করিয়া। আর এত তাড়াতাড়িই বা কি? হয় ত বাবারই একটু দেরী হইবে।"

যাহা হইক, বার্ব্বারা উঠিয়া গিয়া ঘণ্টাটা টিপিল। ভৃত্য আসিলে তাহাকে বলিয়া দিল, চায়ের যোগাড় সব ঠিকঠাক করিয়া রাখে, দেরী না হয়।

কন্যার এই একটু অধীর ভাব লক্ষ্য করিয়া মিসেস্ হেয়ার কহিলেন, "তুমি যদি জানিতে মা, আমার গলা কেমন শুকাইয়া গিয়াছে, মুখ যেন কাঠ হইয়া উঠিয়াছে,—তা হ'লে অত বিরক্ত হইতে না!"

বার্ব্বারা বড় দুঃখ হইল। হাতের বইখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া জননীকে একটি চুম্বন করিল। তারপর জানালার দিকে একবার চাহিল।

"ঐ যে বাবা।"

"তিনি আসিয়াছেন! আঃ—বাঁচিলাম! হাঁ মা, যদি তাঁকে বলি কেমন তৃষ্ণা আমার পাইয়াছে, তবে বোধ হয় একটু আগে চা খাইতে তিনি আপত্তি করিবেন না।"

বলিতে বলিতে জাষ্টিস্ হেয়ার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক—চেহারাটি মন্দ নয়, মুখের আকৃতি কতকটা বার্ব্বারার মত, কিন্তু বার্ব্বারার মুখের সে সৌন্দর্য্য অবশ্য তাহাতে ছিল না। সাজপোষাকে ও ভাবভঙ্গিতে পদোচিত গৌরবের একটা ভাব সর্ব্বদাই তাঁহাতে প্রকাশ পাইত।

"রিচার্ড!" (ইহার নিজের নামও রিচার্ড।)

"কি গো?"

"আমাকে এখনই চা খাইতে দিবে?—আজ একটু আগে চা খাইতে তুমি অসুবিধা বোধ করিবে না ত? আমার একটু জ্বর বুঝি হইয়াছে,—জিবটা একেবারে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে,—কথা বলিতেই কষ্ট হইতেছে।"

"সাতটা ত বাজে,—কত আর দেরী তোমার হইবে?"

এই বলিয়াই হেয়ার সাহেব বাহিরে চলিয়া গেলেন—

ঠাস্ করিয়া দরজাটি পিছনে বন্ধ হইল। তিনি যে কোনও রূপ কঠোর বা কর্কশ ভাবে এই কথাটি বলিলেন, তা নয়। তবে স্ত্রীর এই সাগ্রহ কাতর অনুরোধের দিকে তাঁহার মনটাই যেন আকৃষ্ট হইল না,—কেমন একটা উদাসীন ভাবেই সেটা তিনি উপেক্ষা করিয়া গেলেন। মিসেস্ হেয়ার বড় দুঃখে অতি গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সেই নিশ্বাসটি শেষ হইতে না হইতেই হেয়ার সাহেব আবার ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, "তা এখনই চা খাইতে আমার আপত্তি কিছু নাই। রাতটায় বেশ জোছ্না হইবে। পিনায়ের সঙ্গে আমি বেরোব, বোচাম্পের বাড়ী যাব,—সেখানে তামাক টামাক খাব। চা আনিতে বল বার্বারা।"

চা আসিল,—খাইয়া হেয়ার সাহেব বাহির হইলেন। পিনার সাহেব আসিয়া তখন ডাকিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে বোচাম্প সাহেবের বাড়ীর দিকে গেলেন। বোচাম্প লর্ডমণ্টসেভার্ণের কর্ম্মচারী, ওয়েষ্টলীনের নায়েবও—নিজের, ক্ষেত খামার যথেষ্ট আছে।

মিসেস্ হেয়ার কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন "বড় শীত আজ বার্বারা। তা যদি একটু আগুন জ্বালিতে বলি, তোমার বাবা কি কিছু ব'লবেন?"

"যদি ইচ্ছা হয় আগুন জ্বালাওনা? বাবা জানিতেও পরিবেন না। ফিরিতে তার অনেক রাত হইবে,—আসিয়াই গিয়া শুইবেন।"

বার্বারা ঘণ্টাটি টিপিল। ভৃত্য জ্যাস্পার আসিয়া দাঁড়াইল। বার্বারা কহিল, "জ্যাস্পার মার বড় শীত করিতেছে, একটু আগুন তিনি চান।"

"একটু বেশী করিয়া শুকনা কাঠ দিও জ্যাস্পার—যেন শীঘ্র বেশ জলিয়া ওঠে।" এমনই মিনতির স্বরে মিসেস্ হেয়ার কথাটি বলিলেন, যেন কাঠগুলি তাঁহার নয়, জ্যাস্পারের।

আগুন জ্বালা হইল, মিসেস্ হেয়ার কুণ্ডের একেবারে সম্মুখে তাঁহার চেয়ারখানি সরাইয়া নিয়া বসিয়া, আরামে আগুন পোহাইতে লাগিলেন। বার্বারা আন্মনা ভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল,—তারপর উঠিয়া সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। আলনায় তার শালখানি ছিল, গায়ে জড়াইয়া বাহির হইল। সদর দরজায় আসিয়া রাস্তার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে একবার চাহিল। তখন রাত্রি হইয়াছে—ঠাণ্ডাও বড় পড়িয়াছিল—লোকজনের সাড়াশব্দ কিছু পাওয়া যাইতে ছিল না—বড় সুন্দর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক যেন নীরব মাধুরীতে হাসিতেছিল।

ফটকের দরজার উপরে একটু ঝুঁকিয়া আপন মনে বার্বারা কহিল, আজও আসিল না। কবে আসিবে সে, না থাকিলে দিনগুলি যে একেবারেই কাটে না। কেমন যে বিশ্রী লাগে! কেন গিয়াছে? এত দেরীই বা হইতেছে কেন? কর্ণেলিয়া ত বলিয়াছিল, মাত্র একদিন সেখানে তার হইবে।"

দূরে কার পদ শব্দ হইল। বার্বারা একটু সরিয়া একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল রাত্রি বেলায় একা সে সদর দরজায় দাঁড়াইয়া আছে কেহ দেখে এটা তার ভাল লাগিল না। পদশব্দ নিকটে আসিল।—বার্বারার বুকটা যেন নাচিয়া উঠিল, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইল, দুটি কপোল রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙ্গা হইয়া গেল, চঞ্চল একটা পুলকপ্রবাহ শিরায় শিরায় ছুটিল! ওই পদধ্বনি যে সে চেনে! আর তাহা কতই-তার মিঠা লাগে। সাবধানে ফটকের দরজার উপরদিয়া একটু মুখ বাড়াইয়া সে দেখিল। ঐ যে সুগঠন দীর্ঘকায়—দেহসৌভাগ্যে যার অতুলনীয় শ্রী নিজেই যে কখনও অনুভব করে নাই—ঐ যে ওয়েষ্টলীনের দিক হইতে দ্রুত পদক্ষেপে সেই ত আসিতেছে। একটু সরিয়া সে দাঁড়াইল। প্রকৃত প্রেম চিরদিন এমনই ভীরু—এমনই লজ্জায় সঙ্কুচিত। আর যা কিছু ত্রুটিই বার্বারার থাক্, হৃদয়ের এই প্রেম তার যেমনই সত্য, তেমনই গভীর ছিল! কিন্তু কই, সেই দৃঢ়-হস্তের চালনায় ফটকের দরজা ত খুলিল না! পদধ্বনি যে তেমনই ক্ষিপ্র গতিতে সম্মুখের পথেই চলিল! বার্বারার বুকটা একেবারে দমিয়া পড়িল, মৃদু চরণক্ষেপে সে দরজার কাছে আসিল, আকুলদৃষ্টিতে সেই পথের দিকে চাহিল—হাঁ, ঐ যে! সেত চলিয়াই যায়! তার কথা ত কিছু ভাবিল না, তার কাছে ত একবার আসিল না। নিরাশার একটা তীব্র চাঞ্চল্যে বার্বারা অধীর হইয়া উঠিল, ডাকিল—"আর্কিবাল্ড।"

হাঁ, এই পথগামী আর কেহ নন,—আমাদের পূর্ব্ব

পরিচিত কার্লাইল সাহেবই—আর্কিবাল্ড তাঁহার খাস খৃষ্টানী নাম। *

"কে, বার্বারা! এখানে দাঁড়াইয়া আছ যে? চোর ধরিবে নাকি?" হাসিয়া কার্লাইল বার্বারার করমর্দ্দন করিলেন।

দরজাটি খুলিয়া ধরিয়া বার্বারা কহিল, "তুমি কেমন আছ? কখন আসিলে?"

"এই ত আসিতেছি। আটটার গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এক এক ষ্টেশনে গাড়ী থামে আর যেন নড়ে না, আমি হেন ব্যক্তি আজ গাড়ীতে তাও যদি একটু হুঁস্ কারও থাকে। তাই ত এত দেরী হইয়া গিয়াছে। এখনও বাড়ী যাই নাই।"

"নাঃ! ওমা, কর্ণেলিয়া কি বলিবে!"

"আফিসে মিনিট পাঁচেক দেরী হইল। এখনই আবার বোচাম্পের ওখানে যাইতে হইবে—জরুরী একটা কথা আছে। আসি এখন বার্বারা, তোমাদের এখানে এখন আর যাইতে পারিতেছি না।"

"বাবা যে বোচাম্প সাহেবের বাড়ীতে গেলেন।"

"হাঁ, তিনি আর জিনার সাহেব সেখানে গিয়াছেন, অনেক রাত বসিয়া তাঁরা তামাক খাইবেন আর গল্প সল্প করিবেন।"

"হুঁ—তাহ'লে বোচাম্পের কাছে এখন আর যাইব না। আমার কথাটা একটু গোপনীয়।"

এই বলিয়াই তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং বার্বারা হাত ধরিয়া তাহাদের গৃহের দিকে চলিলেন। কার্লাইলের ব্যবহারে যে কোনও রম্য ভাবাবেশ প্রকাশ পাইল, তা নয়। কিন্তু বার্বারার চিত্ত যেন তখন নন্দনের আনন্দ লহরীতে নৃত্য করিয়া উঠিল।

"এ ক'দিন তোমরা সব ভাল ছিলে ত বার্বারা?"

"হাঁ তা তুমি হঠাৎ লণ্ডনে চলিয়া গেলে কেন?—যাইবার সময় একবার দেখা করিয়াও ত গেলে না।"

"কারণ, হঠাৎ যে যাইতে হইল। হঠাৎ একটা জরুরী কাজ আসিল, আর 'হঠাৎ' অমনি চলিয়া গেলাম। দেখা করিব আর কখন?"

"কর্ণেলিয়া বলিয়াছিল, একদিনের জন্ত তুমি গিয়াছ।"

"তাই নাকি? তবে কি জান বার্বারা, লণ্ডনে একবার গেলেই অনেক কাজ জুটিয়া যায়। হাঁ মিসেস্ হেয়ার কেমন আছেন?"

"ঐ এক রকমই।—আমার কি মনে হয় জান? মার অসুখ বেশীই তাঁর মনের বাতিক। একটু যদি গা ঝাড়া দিয়া ওঠেন, আর নড়া চড়া করেন, অনেক ভাল থাকেন তিনি। তোমার ও বাণ্ডিলে কি?"

কার্লাইল একটু গম্ভীর রবে উত্তর করিলেন "তোমার সে খোঁজে কি দরকার মিস্ বার্বারা। তোমার কিছুই এতে নাই, যা আছে মিসেস্ হেয়ারের।"

"মার জন্ত কিছু কিনিয়া আনিয়াছ নাকি আর্কিবাল্ড?"

"কাজেই। পাড়াগেঁয়ের লোক আমাদের লণ্ডনে গেলেই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের জন্ত কিছু কিনিয়া আনিতে হয়। অন্ততঃ সেকালে ত এই নিয়ম ছিল।"

বার্বারা হাসিয়া কহিল, "হাঁ, যখন লণ্ডনে যাইবার আগে লোকে উইল করিয়া যাইত আর বোম্বাই ঘোড়ার গাড়ীতে পনর দিন বসিয়া যাইতে, হইত। ঠাকুরদাদা ছেলেবেলায় আমাদের কাছে সেই সব গল্প করিতেন। হাঁ সত্যই কি মার জন্ত ওতে কিছু আনিয়াছ?"

"এই দেখ। বলিলাম না তাই। তা তোমার জন্তও কিছু আনিয়াছি।"

"কি—কি?"

"আঃ, একটু কি তর সয় না! একটু থাম না দেখিবে কি আনিয়াছি।"

বাণ্ডিলটি বাগানের একখানা টুলের উপরে রাখিয়া

---

* শিশু জন্মিবার কয়েক দিন পরেই তাহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। এই সময়ে তাহার নিজস্ব একটা নামও রাখা হয়, সেই নামে শিশু খৃষ্ট শিষ্য হয় বলিয়া নামকে Christian name বা 'খৃষ্টানী' নাম বলে। শিশুর ধর্ম্ম শিক্ষার দায়িত্ব তখন এক বা একাধিক ব্যক্তি গ্রহণ করেন। পুরুষ বা নারী বিশেষে ইঁহারা শিশুর God father or God mother (ধর্ম্ম পিতা বা ধর্ম্ম মাতা) হন। পিতামাতার অভিপ্রায় জানিয়া ইঁহারাই শিশুর নামকরণ করেন। অনেক সময় ইঁহাদের কাহারও বা কাহারও কাহারও নামও শিশুকে দেওয়া হয়। সুতরাং দুই বা ততোধিক নামও অনেকের হয়। এস্থলে আর্কিবাল্ড ইঁহার খাস খৃষ্টানী নাম, আর কার্লাইল তাঁহার পিতৃবংশের পদবী। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু—বয়সে ছোট হউক বড় হউক—সকলেই এই খাস খৃষ্টানী নাম ধরিয়া সকলকে ডাকে। বাহিরের লোকেরা পদবীর আগে 'মিষ্টার' যোগ করিয়া ডাকে; যেমন মিষ্টার কার্লাইল বা কার্লাইল সাহেব।

কার্লাইল তাঁহার পকেটগুলি খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

'আহা—তা বুঝি হারাইয়া গিয়াছে। কোথায় যেন ফেলিয়া আসিয়াছি।'

বার্বারার বুকটার মধ্যে দুব্‌ দুব্‌ করিয়া উঠিল। আহা কি আনিয়াছিল? কি হারাইয়া গেল?

"না এই যে আছে।" কার্লাইল ছোট্ট একটি বাক্স বাহির করিলেন। খুব সুন্দর একটি সোনার হার তাহাতে ছিল। হারটি তিনি বার্বারার গলায় পরাইয়া দিলেন। সুদৃশ্য একটি লকেটও তাহাতে ঝুলিতেছিল। বার্বারার কপোল দুটি ভরিয়া ঘন ঘন রক্তোচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল,—আনন্দের উত্তেজনায় বুকও বড় দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। একটি কথা উচ্চারণ করিয়াও কার্লাইলকে সে তার ধন্যবাদ জানাইতে পারিল না। কার্লাইলও আর কিছু না বলিয়া গৃহ মধ্যে মিসেস্ হেয়ারের সম্মুখে গিয়া উঠিলেন।

বাণ্ডিলটি খুলিতে খুলিতে একটু হাসিয়া হাসিয়া কার্লাইল কহিলেন, "দেখুন মিসেস্ হেয়ার, হাসিবেন না। এটা জন্মকাল পোষাকের জন্য মক্‌মল নয়, অথবা দানপত্রও এমন একটা নয় যাতে বছর দুলাখ টাকার একটা সম্পত্তি আপনাকে দেওয়া আছে। সামান্য একটা হাওয়ার গদী মাত্র—চেয়ারে রাখিলে যাতে আপনি কেবল একটু আরামে বসিতে পারেন।"

অবিরত বসিয়া বসিয়া শুইয়া শুইয়া মিসেস হেয়ারের গা ব্যাথা হইয়া উঠিত। মধ্যে মধ্যে তিনি একটি হাওয়ার গদীর কথা বলিতেন। চক্ষে এমন জিনিশ কখনও দেখেন নাই, তবে শুনিয়াছিলেন লণ্ডনে নাকি পাওয়া যায়। তাই কখনও কখনও বলিতেন, তার একটি হইলে বেশ একটু আরাম তিনি পান।

কার্লাইল এই গদীটি তাঁহার জন্ম আনিয়াছেন। মিসেস্ হেয়ার বলিয়া উঠিলেন, 'আহা, কি বলিয়া যে তোমাকে ধন্যবাদ দিব আর্কিবাল্ড।'

কার্লাইল হাসিয়া কহিলেন, "ধন্যবাদ যদি কিছু দেন ত আর কখনও কিছু আনিব না। হঠাৎ একদিন একটা দোকানে এটা চোকে পড়িল। তখন মনে হইল, মিসেস্ হেয়ার এই রকম একটা গদীর কথা বলিতেন, অমনি কিনিয়া ফেলিলাম।"

গদীটি হাতে একটু নাড়িয়া চাড়িয়া মিসেস্ হেয়ার কহিলেন, "বড় পাতলা যে আর্কিবাল্ড।"

"পাতলা! হাওয়া পোরা নাই যে। এই দেখুন—(গদীতে হাওয়া দিয়া) কেমন এখন কি পাতলা দেখেন?"

"বাঃ! তুমি বড় ভাল ছেলে আর্কিবাল্ড!"

"তা লণ্ডনে গেলে আত্মীয়বন্ধুর জন্য কিছু কিনিয়া আনিতেই হয়। ঐ দেখুন না, বার্বারাকে কেমন খাসা সাজাইয়া দিয়াছি।"

"বাঃ! বাঃ! তাই ত! কি চমৎকার হার! আর্কিবাল্ড তোমার উদারতার যে পার নাই। অনেক টাকা যে খরচ করিয়াছ? অল্পে ত হয় নাই।"

কার্লাইল কহিলেন, "আপনিও যেমন, কতই আর লাগিয়াছে? মনে আছে ত সেই যে একদিন বার্বারা আর কর্ণেলিয়াকে নিয়া লীনবরো সহরে বেড়াইতে যাই—বার্বারার হার হারাইয়া গেল। বার্বারা কেবলই আমাকে অনুযোগ দিয়া বলিতেছিল, আমার দোষেই তার হার হারাইয়া গেল—সহর দেখিতে সারাদিন তাকে রাস্তায় রাস্তায় টানিয়া নিয়া বেড়াইয়াছি।"

বার্বারা একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "হাঁ, আমি বুঝি অনুযোগ দিয়াছিলাম, তামাসা করিয়া করিয়া বলিতেছিলাম যে। হাঁ, তা কর্ণেলিয়ার জন্য কি আনিয়াছ?"

"খাসা একটা জিনিশ আনিয়াছি—তবে যদি ঠকিয়া না থাকি। একটা শাল কিনিয়াছি—প্যারি সহরের খাঁটি কাশ্মীরী শাল—দোকানদার ত তাই বলিল। শেষে একেবারে দেশী মাঞ্চেষ্টারী শাল না হইয়া পড়ে!"

বার্বারা একটু হাসিয়া কহিল, "তা যদি প'ড়েই, কর্ণেলিয়া তা ধরিতে পারিবে না।"

"সে ঠিক কথা—তবে, আমার মত কি জান বার্বারা? বিদেশী জিনিশ কেন যে আমাদের দেশী জিনিশের উপর টেক্কা দিয়া বেড়াইবে, আমি তা বুঝি না। আমি যদি শাল কখনও পরি, একেবারে বাছা ফরাসী শাল ফেলিয়াও আমাদের দেশী মোটা মকইচ্ কি পেস্‌লীর শাল আমি মাথায় তুলিয়া নিব।"

বার্বারা কহিল, "হাঁ, ফরাসী শাল একখানা আগে পরিয়াই দেখ না? তখন আর এ কথা বলিবে না।"

মিসেস্ হেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, "শালখানার দাম কত পড়িয়াছে ?"

"যদি বলি—সর্ব্বনাশ! কর্ণেলিয়াকে তা বলিয়া দিবেন না কিন্তু। গালি দিয়া আমাকে ভূতছাড়া করিবে, আর কাগজে মুড়িয়া শালখানি বাক্সে তুলিয়া রাখিবে, একদিনও বাহির করিয়া গায় দিবে না। আঠার গিনি দাম নিয়াছে।"

"আঠার গিনি! ওমা, তবে খুব ভাল শালই হইবে। আমি ত ছয় গিনির উপরে শাল কখনও গায় দিই নাই।"

"আর কর্ণেলিয়া, বোধ হয়, তার অর্দ্ধেক দামেও শাল কখনও কেনে নাই। আচ্ছা, তা'হলে উঠি এখন। কর্ণেলিয়া যদি জানিতে পারে কতক্ষণ আসিয়াছি,—বড় গালি দিবে।"

কার্লাইল উঠিয়া বাহির হইলেন। বার্বারাও সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিল। কার্লাইল কহিলেন, "ঠাণ্ডা লাগিবে যে বার্বারা, শামলাটাও ফেলিয়া আসিয়াছ!"

"না, ঠাণ্ডা কেন লাগিবে ? তুমি আসিলে, আর অমনই চলিয়া গেলে, দশ মিনিটও এখানে রহিলে না।"

"বাড়ী যাই নাই যে এখনও বার্বারা!"

"যদি বোচাম্প সাহেবের ওখানে যাইতে, ঘণ্টা দুই দেরী যে সেখানে হইত।"

"সেখানে যে কাজের কথা ছিল। কাজের কথা কিছু হইলে, কার্ণেলিয়ার কাছে সাতখুন মাপ। তার আর জিভের আগায় পাঁচশ প্রশ্ন এখন জমা হইয়া আছে, লণ্ডনে গিয়া কি দেখিলাম, কি করিলাম, কি হইল ইত্যাদি। এটা ঠিক জানিও বার্বারা এখন বাজে কথায় দেরী করিলে কি আর রক্ষা আছে ? আচ্ছা, আসি তবে এখন।"

বার্বারা ডাকিল, "আর্কিবাল্ড !"

"কি আবার ?"

গলার সেই হারটিতে একটু হাত দিয়া নাড়িতে বার্বারা কহিল, "আমি ত তোমাকে ধন্যবাদও একটু দিলাম না—তা আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবে না ত ?"

"পাগল আর কি! ধন্যবাদের কি হইয়াছে ? আচ্ছা আমার দাম আমি আদায় করিয়া নিতেছি—বিদায় বার্বারা !"

একটু নীচু হইয়া বার্বারার কপালে একটি চুমা দিয়া হাসিতে হাসিতে কার্লাইল দৌড় দিলেন,—কতটুকু গিয়াই মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া আবার কহিলেন, "কেমন, এখন আর বলিতে পারিবে না, তোমাকে কখনও কিছু দিই নাই!"

সমস্ত শিরা ঘনস্পন্দিত করিয়া অতি চঞ্চল একটা পুলক-প্রবাহ বার্বারার দেহ ভরিয়া নাচিয়া উঠিল, সমস্ত হৃদয় তার এই আনন্দ নৃত্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাল্যাবধি তাহারা খেলার সাথী কিন্তু বড় হইয়া উঠিলে পর কই আর্কিবাল্ড তাহাকে আর কখনও চুমা দিয়াছে কি ? কই, মনে ত তাহার পড়ে না ! এমনই একটা প্রমোদচঞ্চল আনন্দের নেশায় বিভোর হইয়া সে ঘরে আসিল, যে মিসেস্ হেয়ারও সেটা লক্ষ্য করিলেন, করিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

চতুর রোজা

(১)

বলে রোজা এ ভূত আমি
পারব না ক ছাড়াতে,
সাধ্য ত নাই ইচ্ছা ও নাই তাড়াতে।
ঘুর ঘুরে এক মাকে রেখে
মরলো তনয় মর্ত্ত থেকে,
জৈষ্ঠ্য তাহার একই দিনে
মরলো জ্বরে 'আরাতে'

সে যে দিবস রাত্রি জাগি
ভাবতো কেবল মায়ের লাগি
পারলে না হায় মরণ কালে
সেই ভাবনা এড়াতে
পারব না ভূত ছাড়াতে।

(২)

অতৃপ্তি তার থাকতে দূরে
বেড়াচ্ছে এই ঘরেই ঘুরে
দেখছি আমি মলিন মুখে
মায়ের কাছে দাঁড়াতে

মা যে তাহার একলা ঘরে
কে বা তাহায় যত্ন করে
মুক্ত দেহ পড়লো আবার
মায়ার মোহ কারাতে
এ ভূত আমি পারব না ক ছাড়াতে।

(৩)

তোমরা যদি সবাই মিলে
হও গো তাহার মায়ের ছেলে;
চাও যদি হায় অভাগিনী।
সকল সেবা ছাড়াতে

তোমার যদি আপন কাণে,
চাও দুঃখিনী মায়ের পানে,
সেই দিনে সে শান্তি পাবে
আসবেনা আর ধরাতে
পারব না ভূত ছাড়াতে।

(৪)

নইলে যদিন বাঁচবে বুড়ী
হতভাগা আসবে ঘুরি
মায়ের লাগি হয় ত তারে
মোক্ষ হবে হারাতে।

মানবে না সে মন্ত্র কোন
গঙ্গা, গয়া, বলছি শোন,
ঘটাবে নূতন নূতন বিপদ
এই তোমাদের পাড়াতে।
পারব না গো পারব না ভূত ছাড়াতে॥

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রবিজয় বসু

বিগত ৺শ্যামাপূজার পরদিন শ্যামামায়ের বিসর্জ্জনের সঙ্গে ভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ধীর, প্রশান্ত সদানন্দ দেবেন্দ্র বিজয় বহুদিনের রোগক্লিষ্ট দেহত্যাগ করিয়া ইহ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন। দারুণ রোগ যাতনায় মহাদেবতুল্য সৌম্যদর্শন সেই পীনোন্নত দেহ জীর্ণ হইয়াছিল, অশেষ যাতনায় তিনি তাহাতে অবস্থান করিতেছিলেন,—যে যাতনা আর দেখিতে না পারিয়াই বুঝি দয়াময়ী মা যাইবার সময় স্নেহের কোলে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া গেলেন।

আগের দিন রাত্রিতে মার পূজা যখন হইতেছিল, মার ডাক বুঝি তিনি শুনিয়াছিলেন। কেবলই পূজার কথাই বলিতেছিলেন, পূজার কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। পাড়াতেই পরিচিত কোনও ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পূজা হইতেছিল—দেবেন্দ্রবিজয় তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, "যাও, মার পূজা হইতেছে, প্রসাদ লইয়া আইস মার প্রসাদ গ্রহণ করিব। যাও, প্রসাদ লইয়া আইস, তোমরা নেও, আমি নিই,—আমি শান্তি পাইব, সংসারে শান্তি থাকিবে।"

তিনি তখনই সেই বাড়ীতে গেলেন। মার ভোগ তখন শেষ হইল, মাকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া আসিলেন। গভীর রাত্রি অন্যদিন সন্ধ্যার পরেই তিনি সামান্য কিছু পথ্য করিতেন, সেদিন সেই মহানিশায় পরম পরিতোষে মার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, মার কৃপায় তারজন্য কোনওরূপ অসুস্থতা পরদিন রাত্রিপ্রভাতে তাঁহার দেখা গেলনা। দ্বিপ্রহরের পর আবার বলিলেন, "বড় ইচ্ছা হয় মহা প্রসাদ আবার কিছু পাই।" আবার লোক গেল, মার প্রসাদ লইয়া আসিল, আবার তাহা গ্রহণ করিলেন।

রাত্রিতে মার প্রসাদ ভোগে পূতদেহ পূতসলিল ভাগীরথীতীরে শ্মশানের [illegible] মায়ের কোলে বিলীন হইল, মৃণ্ময়ী মায়েরই [illegible] ধৌত [illegible] পূত বারিতে [illegible] সন্তানের দেহাবশেষ [illegible] হইল, চিন্ময়ী মায়ে চিন্ময় সত্ত্ব বিরাম লাভ করিল।

কঠিন রোগ—অন্তিম শয্যা—সে শয্যায় অন্তিমের বিশ্রাম টুকুও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। বহুদিন যাবৎ সমস্ত দিনরাত্রি বসিয়া থাকিতে হইত, শুইতে পারিতেন না। কিন্তু কোনও-রূপ ক্লেশের জন্য কোনও অধীরতা কেহ কখনও তাঁহার চির-সৌম্যমুখে দেখে নাই! সেই যে আনন্দময় সৌম্য মধুর হাসিটুকু—যে যাইত সেই দেখিত,—সেই যে আনন্দময় স্নিগ্ধ কথাগুলি—যে যাইত, সেই শুনিয়া পরিতুষ্ট হইত! অক্ষুণ্ণ চিরপ্রসন্ন একটা মধুরতা দেবেন্দ্রবিজয়ের স্বভাবের প্রধান বিশেষত্বই ছিল। স্বভাবের এইগুণে তাঁহার তুলনা মিলিত না বলিলেই হয়। অন্তিম সেই দারুণ যাতনাময় রোগশয্যায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। সেদিনও যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সেই প্রশান্ত হাসিই তাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই স্নিগ্ধ মধুর কথাই শুনিয়াছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই এক কথা সেদিনও বলিয়াছিলেন, "হাঁ, বেশ আছি!"

কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন লাগে আপনার? বড় যে ক্লেশ পাইতেছেন।"

দেবেন্দ্র বিজয় একটু হাসিয়া মাত্র এই উত্তর করিলেন, "কি জান, নিরানন্দের চরম যেখানে, সেইখানেই আনন্দ!"

জীবন ভরিয়া দর্শনতত্ত্বের অনুশীলন দেবেন্দ্র বিজয় করিয়াছেন। কিন্তু সুবিজ্ঞ-পণ্ডিতোচিত বিচারবিশ্লেষণই কেবল তিনি করেন নাই, তত্ত্বের দর্শনও পাইয়াছিলেন। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী ব্যতীত এমন সময় এমন কথা কাহারও মুখে বাহির হয় না। রোগাবসন্ন দেহেও মনের এই বলও আর কাহারও দেখা যায় না।

সকল তীর্থের একটা সমন্বয় করিয়া গীতার একখানি অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ তিনি সম্পাদন করিতেছিলেন। সুধী মাত্রেই জানেন, গীতার এরূপ বিশাল ও উচ্চাঙ্গ সংস্করণ আর নাই। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি চক্ষুর দৃষ্টি হারাইয়া, আরও অনেক ক্লেশকর ও

অবসাদকর রোগে ভুগিতেছিলেন এই অবস্থায় এই গীতা সম্পাদিত হইতেছিল। প্রায় সারা হইয়াছিল, অল্পই বাকী ছিল। দেহত্যাগের অল্প কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি মনে মনে চিন্তা ও বিচার করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন, লেখক লিখিয়া নিয়াছেন! ইহা কি সাধারণ শক্তির কথা!

বড় আকাঙ্ক্ষা তাঁহার, ছিল এই সম্পাদনকার্য্য যদি শেষ করিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু মার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিতেই তিনি তাঁহাকে লইয়া গেলেন। এই মহাব্রতের সম্পূর্ণতায় তাঁহার যে তৃপ্তি হইত, দেশের যে মঙ্গল পরিপূর্ণ হইত, তার অভাবের অপেক্ষাও, তাঁহার দারুণ রোগযাতনা বুঝি মার প্রাণে বেশী ব্যাথাই জাগাইয়াছিল, তাই আগেই তিনি তাঁহাকে তাঁহার শান্তির কোলে টানিয়া নিলেন। ময়ী, লীলাময়ী, মঙ্গলময়ী মা,—তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা তিনিই জানেন। তিনিই জানেন—তাঁর কোন্ ইচ্ছা, কোন লীলা কবে কোথায় কি মঙ্গল প্রসব করিবে।

প্রায় বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলায় সম্ভ্রান্ত এক কায়স্থ পরিবারে দেবেন্দ্রবিজয় জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ বিএল উপাধি লাভ করিয়া প্রথমে কিছুকাল ওকালতী করিয়া শেষে মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে সাবজজিয়তি লাভ করিয়া যথা সময়ে অবসর গ্রহণ করেন। অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনই এই ভাবে অতিবাহিত হয় এবং ইহার মধ্যে বিশেষত্ব তাঁহার এমন কিছুই ছিলনা,—কাহারও বড় থাকে না।

স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর মহাশয়ের একমাত্র আদরের কন্যা তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। দাম্পত্য জীবনে দেবেন্দ্রবিজয় যেরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া ছিলেন, এরূপ সৌভাগ্য এ দেশেও অল্প লোকের দেখা যায়।

প্রথম জীবন হইলেই দেবেন্দ্রবিজয় সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বঙ্গবাসী পত্রের সংস্রবে স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্যরূপে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, সাহিত্যানুশীলনে তাঁহার চিন্তার লক্ষ্য ও ধারায় বড় একটি বিশেষত্ব ছিল, সেটি ভারতের বিদ্যা, ভারতের তত্ত্বজ্ঞান, ভারতের সাধনা. ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মপদ্ধতি ও সমাজ পদ্ধতির প্রতি গভীর আন্তরিক একটা শ্রদ্ধা যাহার ভিত্তি ছিল যুক্তি, অন্ধবিশ্বাসমাত্র নয়। তাই এই শ্রদ্ধা তাঁহার চিত্তকে কখনও সঙ্কীর্ণ, মতকে কখনও অনুদার করে নাই। হিন্দুর ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও গবেষণা তিনি করিয়াছিলেন,—যুক্তি বা rationalismএর দিক্ হইতেই এসবের শ্রেষ্ঠত্ব জীবন ভরিয়া লোককে তিনি বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধ গত ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এ সব বিষয়ের আলোচনায় অনুরাগী যাঁহারা, সকলেই জানেন, একদিকে যুক্তি ও প্রমাণের হিসাবে সেগুলি যেমন সারবান্, আর একদিকে ভাষার মধুর গাম্ভীর্য্যে তেমনই চিত্তগ্রাহী। দুঃখের বিষয় এসব প্রবন্ধ পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই,—এবং হইবার সম্ভাবনাও কম। কারণ, নভেল ছাড়া সারগর্ভ তত্ত্বালোচনাসম্বলিত পুস্তক এখনও কিনিয়া পড়িবার লোক বাঙ্গালায় তেমন হয় নাই।

হিন্দুসমাজপদ্ধতির মূল নীতি কি, প্রকৃতি কি, লক্ষ্য কি, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, এই সব কথা সাধারণকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে 'সমাজ ও তাহার আদর্শ' নামক বৃহৎ একখানি পুস্তক তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। একখণ্ড মাত্র বাহির হইয়া ছিল, আর হয় নাই। শেষ জীবনে গীতার এই সংস্করণ আরম্ভ করেন, সমগ্র জীবনের সঞ্চিত জ্ঞান—এই একটি অতি মহদানুষ্ঠানে তিনি নিয়োগ করেন,—রুগ্ন শরীরেও অবিশ্রান্ত উদ্যমে তিনি ইহা সুসম্পন্ন করিতে প্রয়াসী হন। বহু অর্থ ব্যয়ে ক্রমে বৃহৎ ছয় খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও শেষ হইল না। শেষ যে হইল না, এই ক্ষোভ লইয়াই ইহসংসার হইতে দেবেন্দ্রবিজয় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় অনেক সময় হাসিয়া বলিতেন, আরব্ধ কোন কর্ম্মই সম্পূর্ণ হইবে না, ইহাই যেন আমার জীবনে নিয়ত হইয়া আছে। শেষ উদ্যম সুবৃহৎ এই যে গীতার সংস্করণ—মনে করিয়াছিলাম, এইটি বুঝি শেষ হইবে,—এইখানেই বিধাতা তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মে সম্পূর্ণতার সাফল্য দান করিবেন, এবং তাহা যদি হয়, ইহজীবনের এই সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিয়াই তিনি যাইবেন। কিন্তু অন্তের জন্য সে আকাঙ্ক্ষাও পূরিল না। আর যদি কেহ তাঁহারই পন্থার অনুসরণে বাকী এই কর্ম্মটুকু শেষ করিতে পারেন,

সম্পূর্ণতায় দেশের আধুনিক ধর্ম্মসাহিত্যে সমুজ্জ্বল এক অমূল্য রত্ন—অন্ধকারে অভ্রান্তপ্রায় পথপ্রদর্শক এই গ্রন্থখানি হইবে। কিন্তু এমন কে আছেন জানি না। ইহার মধ্যে কেবল গভীর জ্ঞান নয়, অধ্যাপক-পাণ্ডিত্য নয়, সাধকের তত্ত্বদর্শনেরও আভাস যে পাওয়া যায়। এই জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অধিগম্য হইলেও এই তত্ত্বদর্শনের অধিকার—তা কি সহজে কাহারও হয়?

চিরপ্রফুল্ল নিত্যপ্রশান্ত, নিয়ত আনন্দময়, সর্ব্বত্র নিরহঙ্কার, সরল, উদার, সহৃদয় বন্ধুবৎসল অতি মধুরস্বভাব ও সুরসিক, দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র বোধ হয় তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রয়োজনে যখনই যেখানে গিয়াছেন, সর্ব্বত্র, কেবল সহৃদয় ও সামাজিক হাকিম বলিয়া সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় সকলেরই আন্তরিক প্রীতি তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন। পদগৌরবে কোথাও তিনি উচ্চতর একটা স্তরে উঠিয়া থাকিতেন না, তাঁহার মত প্রাণ যার, তাহা থাকিতে পারেও না।

সকল শ্রেণীর সকল রকম লোকের সঙ্গেই সমান ভাবে তিনি মিশিতেন,—প্রাণ খুলিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন, অতি ঘনিষ্ঠ প্রিয় বন্ধুর ন্যায় সকলে তাঁহাকে দেখিত। যেখানেই যখন তিনি রহিয়াছেন, অতি রম্য আনন্দপূর্ণ সামাজিক সহৃদয়তার একটি ভাব তিনি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। মরুভূমিতেও তাঁহার সরল নিরহঙ্কার আনন্দময় প্রাণের স্পর্শে যেন ফুলের বাগান ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বাঙ্গালার বহুস্থানে তিনি গিয়াছেন বহুস্থানে রহিয়াছেন। বহু লোক তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাঁহার মধুর সহৃদয়তার, তাঁহার উন্নত চরিত্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন প্রিয়জনের ন্যায় ভাল বাসিয়াছে, গুরুজনের মত শ্রদ্ধা করিয়াছে। কেহই এমন নাই, তাঁহার এই মৃত্যু সংবাদে যে অন্তরে অন্তরে দারুণ একটা আঘাত না পাইবে, তাঁহার স্মৃতির সম্মুখে যাহার শির না আনত হইবে।

পাপ ও পুণ্য

মধুগন্ধে মুগ্ধ করা মঞ্জুল কাননে
অলস আরামে কাটে 'পাপ' সারা দিন ;
কঠিন বন্ধুর শৈলে সশঙ্কে বিজনে
খাটে 'পুণ্য' স্বেদ সিক্ত বিরাম বিহীন।

নিশীথে বিনিদ্র পাপ স্বপ্ন-তাড়নায়,
সত্রাসে আতঙ্কে কাঁপে ফেলি অশ্রুজল ;
পুণ্য সুখ সুপ্তি লভি রাঙ্কব শয্যায়
নবীন উষায় জাগে লভি নব বল।

শ্রীদীননাথ মজুমদার

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী

গত পূজার পূর্ব্বে সুপণ্ডিত ভগবদ্ভক্ত দেবচরিত্র সাধক, সমগ্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের অশেষশ্রদ্ধাভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রোগজরাজীর্ণ নশ্বর এই পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে ব্রাহ্মসমাজের প্রধানস্তম্ভই আজ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ব্রাহ্মসমাজ অধিক দিনের নয়, কিন্তু ইহার ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই পর পর তিনটি যুগ ইহার চলিয়া গিয়াছে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ও কেশবচন্দ্র—তিন যুগের ইতিহাস এই তিনজন মহাপুরুষের জীবনের সঙ্গে গ্রথিত। এই তিন যুগের প্রবর্ত্তক ইহাঁরা, নেতা ইহাঁরা গুরু ইহাঁরা; ইহাঁদের হইতেই এই তিন যুগের ভাবের প্রেরণা কর্ম্মের প্রেরণা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছে! চতুর্থ যুগের গুরুর স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁহার সঙ্গে আজ বুঝি এই চতুর্থ যুগেরও অবসান হইল। এমন ভাগবত নিষ্ঠায় শক্তিমান্ চরিত্র বলে সমুন্নত, বিশিষ্ট আদর্শের শ্রদ্ধাশীল অটল সেবক, কাহার নেতৃত্বে নূতন কোন্ যুগ ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভ হইবে, বিধাতাই জানেন। সরল ভগবৎভক্তি, সেই ভক্তির প্রেরণায় সহজভাবে ভগবদুপাসনা, সুনীতির উন্নত আদর্শ, সকল শ্রেণীর সকল মানবের মধ্যে সমান ভারত্বের সম্বন্ধস্বীকার, জীবনের সকল ক্ষেত্রের সকল কর্ম্মে নরনারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, শাস্ত্রনিরপেক্ষ আত্মবিবেকানুমোদিত মানের অনুসরণ, তাহারই উপরে সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন, ইহাই প্রধানতঃ শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজে আদর্শ ছিল। এই আদর্শের অনুবর্ত্তন, এই আদর্শের প্রচার, ব্যক্তিগত ও সমাজিকভাবে ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শিবনাথ নিষ্ঠাবান্ প্রাচীন পল্লী ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রথম যৌবনেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। সরল বিশ্বাসে অটল দৃঢ়ভাবে শিবনাথ সমগ্রজীবন এই আদর্শের অনুবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আদর্শের প্রতি এই ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, সরল সাধু চরিত্র, আর নির্ম্মল ভগবদ্ভক্তি, ইহাই শিবনাথের জীবনের বিশেষত্ব ছিল। ব্রাহ্মসমাজের উপরে তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ও সর্ব্বজনস্বীকৃত নেতৃত্ব যে ছিল, ইহাই তাহার নিদান। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে, এমন কি ব্রাহ্মমতের বিরোধী হিন্দুগণও যে তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন, তাহারও মূল কারণ। মতের বিরোধ যতই থাকুক, সাধু চরিত্র, আপন ধর্ম্মে অটল নিষ্ঠা আর সরল ভগবদ্ভক্তি, চিরদিন সর্ব্বত্র সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই গুণ সকলেই বুঝিত, অনুভব করিত, দেখিত,—তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নিন্দুকবর্গও তাঁহাকে সহস্রমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, শ্রদ্ধায় সর্ব্বদা তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কোনও কোনও কার্য্যের ন্যায়ানুগত্য স্বীকার না করিলেও তাঁহার প্রতি একটি অশ্রদ্ধার কথা কখনও কাহারও মুখে শুনি নাই। এ কথা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, তিনি যাহাই করিয়াছেন সরল ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া করিয়াছেন।

সার্ব্বজনীন এরূপ শ্রদ্ধা কেবল ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কেন কোনও সমাজভুক্তই আর কাহারও প্রতি বোধ হয়, এ যুগে আর দেখা যায় নাই। তাঁহার দেবচরিত্রের ইহার উপরে আর প্রমাণ কি হইতে পারে। ভক্তির মধু যেখানে, মক্ষিকার মত লোক সেখানে আকৃষ্ট হয়। শাস্ত্রীমহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে উপাসনা করিবেন শুনিলে বহুলোক আগ্রহে ধাইয়া যাইত, মন্দির লোকে লোকারণ্য হইত,—তাহার সরল প্রেম ভক্তিউচ্ছ্বাস সকলের প্রাণ গিয়া স্পর্শ করিত, প্রেমভক্তির অশ্রু সকলের চক্ষে বহিত! নূতন কোনও কথা কি তিনি বলিতেন? না, তা নয়। কথা আর নূতন কয়টি আছে? কিন্তু প্রেমভক্তি চির পুরাতন হইলেও চির নূতন। সেই প্রেমভক্তির প্রস্রবণ ভক্তসাধকের চিত্ত হইতে উৎসরিত হইত, প্রাণে প্রাণে গিয়া তাহার অমৃতময় স্পর্শ দিত, অমৃতের সে স্পর্শে পাষাণ গলিয়া জল হইত। প্রাণই প্রাণ স্পর্শ

করে। মুখের কথা শুধুই মুখের কথা তার কোথায় কি এমন শক্তি আছে?

শিবনাথ ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন, সাহিত্যরসিক ছিলেন, সাহিত্য কলার উচ্চ অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বহু কবিতা পাঠক ও শ্রোতার চিত্তকে ভাবের আবেশে তন্ময় করিয়া ফেলে, উচ্চতর এক দিব্য লোকে তুলিয়া নিয়া যায়। তাঁহার উপন্যাসগুলি চরিত্রাঙ্কণের নিপুণতায় বঙ্গীয় গ্রাম্য জীবনের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্রের বাস্তবতায় চিরদিন বঙ্গসাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। এদেশে যাহা সুন্দর, যাহা মধুর, দোষ দুর্ব্বলতা সত্বেও, এই সব চিত্রে সর্ব্বত্রই তাহার প্রতি হৃদয়বানের সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়,—নির্ম্মম বিদ্বেষের তীব্র আঘাত কোথাও নাই। প্রাণটা যে তাঁহার কতখানি উদার ও দেশের প্রতি মমতায় পূর্ণ ছিল, সর্ব্বত্র তাহার পরিচয় এই সব চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

নির্ম্মলচরিত্র, সরল ভগবদ্ভক্ত, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রাণ সাধক, ভক্তিপ্রাণে তোমাকে আজ প্রণাম করিতেছি! অমরলোকে অক্ষুণ্ণশান্তির অক্ষয় আনন্দের অধিকারী তুমি হও।

কৈফিয়ৎ

মালঞ্চের পরিচালকবর্গের প্রায় সকলেই পূজার ছুটিতে নানা প্রয়োজনে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। তাই কার্ত্তিকের সংখ্যা বাহির হইতে এত বিলম্ব হইয়া গেল। গ্রাহকবর্গেরও অনেকে স্থানান্তরে ছিলেন, তাঁহাদের নিকট সবিনয়ে আমরা মার্জ্জনা চাহিতেছি।

বিনীত—
প্রকাশক।

বাউল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসুর সৌজন্যে

৬ষ্ঠ বর্ষ — অগ্রহায়ণ—১৩২৬ — ৮ম সংখ্যা

লক্ষ্মী-পূর্ণিমা

ঘুমুসনে রে ঘুমুস নে আজ—আয়রে সবাই বাইরে আয়!
ঘুমের রাণীর স্বপন-খেলা?—এই মাধুরী নাই রে তায়।
নীল আকাশের তোরণ খুলে লক্ষ্মী সোণার পৈঠাতে,
সভায় ছেড়ে আসলো রে আজ অপ্সরীরা ওই সাথে;
লক্ষ্মী দেবীর চরণ-ধোয়া জোছনা ধারা উছ্‌লে যায়,
অপ্সরীদের মোহন হাসির অন্ধ তুফান উথ্‌লে তায়,
নিখিল ভুবন হাসিয়ে দে'যায়—ভাসিয়ে দে'যায় আজ রাতে,
ঢেউ খাবি আয় উছল ধারায় মনের সোনার বজ্‌রাতে;
লক্ষ্মী দেবীর রক্ত-রাঙা শিরীষ-কোমল হাত হোতে
সুধার ধারা ঝর্‌ঝরিয়া ঝরচে রে আজ সাত স্রোতে,
হাত পেতে নে—হাত পেতে নে—হাত পেতেনে ঐ ধারা,
নেয়নি শিশু এ স্বাদ কভু—তাদের নেওয়াও—কৈ তারা?
লক্ষ্মী দেবীর অধর কোণের মধুর হাসি ভুবন ছায়,
অপ্সরীকুল চামর ঢুলায়—মেদুর মৃদুল পবন তায়,
মন্ মাতানো এই হাসিটুক্ আজ্‌কে সবাই ভুঞ্জে নে—
মন্ মাঝারের মৌচাকে আজ এই মধুটুক্ পুঞ্জে নে;
চারদিকে চার-পাচীর-ঘেরা আঁধার-ভরা কূপ তেজে,
লক্ষ্মী রাণীর রূপ দেখে নে—স্বর্গভোলা রূপ সে যে!
জান্‌লা কপাট বন্ধ কোরে অন্ধসম রোস্ কেন?
আর পাবিনে বছর মাঝে পাগল-করা রস হেন।
সকল ভুলে কাজ তেয়াগি বাইরে সবাই আয়রে আয়—
লক্ষ্মী রাণীর হাসির খেলা আজ্‌কে ভুবন ছায়রে ছায়।

ঠেকবে আজি সবাই মধুর চোখ ফেরাবি যার পানে,
কি এক নেশা বইচে যেন মন ছুটে যায় তার টানে,
কার পরশে দশটি দিকে রূপ-শতদল ফুট্‌চে রে!
মঞ্জুলতার তুফান আজি চার দিকেতেই ছুট্‌চে রে!
উত্‌রে মেঘে ঝিলিক মারে বিজুল্‌লতা কোন্ খেলায়!
এই নিশিতে চমক-দেওয়া লাজের হাসি মন ভোলায়,
কোন্ খেয়ালে আজ রাজারা দেউলে হয়ে দ্যায় মানিক।
সিন্ধু হাঁকে—'আমার রতন ভুবন যদি নেয় তা নিক্'!
বাব্‌লা গাছে—অশথ্ গাছে জোনাক্ জ্বলে সাত হাজার!
রত্ন যেন পুঞ্জীভূত সাত সাগর আর সাত রাজার!
লক্ষ্মী দেবীর হাসির সাথে আনন্দ হাস চার দিকে,
কোন্ পানে আজ মুখ ফেরাবো—চাইবো রে আজ কার দিকে!
মন্ কাননের বন্ বালিকা আরম্ভিল ফুল বোনা,
হিন্দোলাতে কল্পনারি উলনোনা আর ভুলবো না!
নীল গগণের তোরণ হোতে লক্ষ্মী রাণীর ঢঙ মেলা!
তাইতো রে আজ প্রাণ খেলে মোর রঙ দেখিয়েছে রঙ খেলা,
আজ রূপসীর হাট্ বসেচে বিশ্বপরাণ গুলজারি,
দোদুল দোলে মৃদুল ও বায় জোছ্‌না ফুলের ফুল্‌ঝারি,
গগন মাঝে রঙ্গ দেখায় ইন্দ্র পুরীর রঙ্গিনী,
লক্ষ্মী রাণী আজ এসেছেন সঙ্গে নিয়ে সঙ্গিনী!
জান্‌লা কপাট বন্ধ কোরে আজকে রে আর থাকিসনে,
অন্ধকারের বন্দী শালায় মনকে রে আজ রাখিস নে;
কাজ তেয়াগি সকল ভুলে বাইরে সবাই আয়রে আয়!
লক্ষ্মী রাণীর হাসির খেলা আজকে ভুবন ছায় রে ছায়!

শ্রীশ্যামাপদ কবিরাজ।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতবাসীদিগের প্রতি বাহ্যিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকেন এরূপ প্রকৃতির বহু ইংরাজ দুর্ভাগ্য ক্রমে এদেশে পরিলক্ষিত হয়। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের সময় এই সকল মহাপুরুষের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠকবর্গের মধ্যে জন্ বিম্সের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তিনি একজন সুপণ্ডিত, ভাষাবিৎ এবং কর্ম্মঠ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং আপনাকে ভারতবর্ষের অন্যতম অকৃত্রিম সুহৃদ বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি যখন কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় সুযোগ্য পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বাবু জগদীশনাথ রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি জগদীশ নাথের সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির নিমিত্ত একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের সময় বিম্সের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই সময় তিনি রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই মর্ম্মে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই সংবাদ পত্রে রাজদ্রোহ সূচক প্রবন্ধাদি লিখিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। এ দেশের অধিবাসিগণকে যত অধিক পরিমাণে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অপসারিত করা যাইবে ততই মঙ্গল। শাসন ও বিচার কার্য্যে এ দেশের লোক অপেক্ষা ইউরোপিয়ানরা যে যোগ্যতর সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসীকে সিবিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার প্রদান করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।*

মিষ্টার বিম্সের ন্যায় তথাকথিত ভারত বন্ধুর সাক্ষ্য পাঠ করিয়া দেশবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিল। শিশিরকুমারও অল্প বিস্মিত হন নাই। কিন্তু তিনি জানিতেন যাহারা এই-রূপ একটা সমগ্র জাতির উন্নতির অন্তরায় হয় তাহাদিগের শিক্ষা প্রয়োজন! নিজেরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিব, আর ভারতবাসীর কল্পিত দোষ লইয়া তাহাদিগকে হেয় ও লাঞ্ছিত করিব, এ চেষ্টা সঙ্গত নয়। এই জন্য তিনি অমৃত বাজার পত্রিকায় মিষ্টার বিম্সের গুপ্তভাবে ঋণ গ্রহণের কাহিনী প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন! ১৮৮৭ খৃঃ অঃ ২১শে এপ্রিল তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্যটী প্রকাশিত হয়—

"We are curious to know if there are any records in the Bangal Secretariat showing that Mr. Beams now an officiating member of the Board of Revenue in Calcutta by the graces of Sir Rivers Thompson, has been in impecunious circumstances in his official life. There have been some instances in which Mr. Beams has had to borrow money of native gentlemen connected in someway with the districts in which he held office and now that he is placed in a very high and responsible post in this province, we take it that the holder thereof has now placed himself in such a position that he is no longer under the necessity of begging for loans, and that the Government has satisfied itself that his surroundings are such as not to impair his efficiency. Mr. Beams has had

* "The educated natives were a disaffected lot who vented their spleen against Government by contributing seditious articles to newspapers and therefore should never be trusted with posts of responsibility. He would introduce no innovations, except such as would exclude natives more thoroughly from the service than at present. He then said that covenanted civil service should be entirely and exclusively reserved for Englishmen. Mr Beams held that European judges were far more competent than natives to perform judicial functions. He would keep the civil service a sacred preserve solely for Europeans and not thrown open to natives. In administrative qualities, he thought the natives were far inferior to the Europeans." (A. B. Patrika).

to borrow monies from Ray Dhunpat Singh and late Roy Luchmiput Singh, zemindars and bankers of Purnea and Moorshidabad. And at one time when ceased to have any official connexions with Bengal and Behar, that is, when he was the District magistrate of Cuttack and officiating Commissioner of the Orissa Division, he did not feel himself restrained by any considerations of delicacy and honour from applying for a loan of Rs 30,000 to the late Raja Digambar Mittra of Calcutta, who owned the very valuable zemindary of Patamanda in the District of Cuttack. Raja Digambar very wisely did not choose to lend the money himself, but got a relative of his, a Hindu lady to advance the sum of Rs 30,000 to Mr. Beams. Mr Beams it must be said is not now under any pecuniary obligation to this lady. We are not familiar with the rules which govern the Covenented Civil Service but we know of instances in which members of that service, who have been found to be in pecuniary embarassments of this kind have been degraded or relieved of offices of trust. We should like to know if Mr. Beams ever communicated the nature of his pecuniary transactions with natives of the country to the Government he has been serving. We only trust that the Government is in full possession of the facts. If not, the present L. G. of Bengal owes a duty to himself, to the rest of the members of the covenented Civil Service, and to the public to make a strict enquiry as to the truth or otherwise of the statements which we publish to-day. For, according to our common sense views of the things, we do not see any difference between the act of the Hon'ble Mr. Sullivan for which he was expelled from the service and that of Mr. Beams."

উক্ত মন্তব্যটী প্রকাশিত হইলে মিষ্টার বিম্‌স্ প্রথমে আদৌ বিচলিত হন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী পরিচালিত সংবাদ পত্রের কথায় গভর্ণমেণ্ট সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না; সুতরাং তাঁহার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু শিশির কুমার যে তাঁহার ঋণ গ্রহণের ব্যাপার প্রমাণ সহ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তিনি আদৌ মনে করিতে পারেন নাই। বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে কোন অভিযোগের কথা আন্দোলন করিতে হইলে যে পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে, শিশির কুমার তাহা ভালরূপই জানিতেন। তিনি ক্রমান্বয় তিন মাস অমৃতবাজার পত্রিকায় মিষ্টার বিম্‌সের ঋণ গ্রহণের ব্যাপার লইয়া আন্দোলন পূর্ব্বক তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মিষ্টার বিম্‌স্ রায় ধনপত, রায় লছ্‌মীপৎ ও রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের আত্মীয়ার নিকট ব্যতীত রায় শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ও বাবু উমেশচন্দ্র মণ্ডলের নিকট হইতেও ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ষ্টেটস্‌ম্যান ডেলি নিউস্ পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতার ইংলিশম্যান ও প্রয়াগের পাইওনিয়র বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া মিষ্টার বিম্‌সকে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার আন্দোলনের ফলে বড়লাট বাহাদুর লর্ড ডাফরিণ ও ছোটলাট বাহাদুর সার ষ্টুয়ার্ট বেলি উভয়েই মিষ্টার বিমসের ঋণগ্রহণের ব্যাপারটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শিশিরকুমার যে, আন্দোলন করিতেছিলেন, তাহার মূলে সত্য রহিয়াছে, তখন তাঁহারা মিষ্টার বিমসকে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বরের পদ হইতে অপসৃত করিয়া অন্যপদে নিযুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। নিম্নে গভর্ণমেণ্টের আদেশ লিপিবদ্ধ হইল—

"His Excellency in council has further come with great regret to the conclusion that the period of Mr. Beams' present officiating appointment in the Board of Revenue must be at once terminated and that he should be transferred to a suitable appointment within the jurisdiction of which no native creditor of his resides or has an estate or commercial establishment."

শিশিরকুমারের সহিত মিষ্টার বিমসের ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা ছিল না। কিন্তু বিম্‌স্ সমস্ত ভারতবাসীর যে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারই প্রতিকারের জন্য তিনি তাঁহার আচরণ লোকের গোচর করিয়াছিলেন। তাঁহার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। সিবিলিয়নদিগের মধ্যে অনেকেরই এ দেশীয়দিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা অভ্যাস ছিল। তাঁহাদিগকে এই আইন বিগর্হিত কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই শিশিরকুমার তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকায় বিমসের ব্যাপারটি অতি তীব্রভাবে আলোচনা করিয়া প্রতীকারের আশায় তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মিঃ বিমসের দণ্ড দেশবাসীর কি উপকার করিয়াছিল, বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মিষ্টার বিমসের বিচার ফলে ইংলিশ-ম্যান ও পাইওনিয়র মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এই দুইখানি পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত ভারতবাসীর উপরও ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ দেশীয়গণকে কোনও বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, পাইওনিয়র এইরূপ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক ইংলিশ-ম্যান ও পাইওনিয়রের সমবেত চেষ্টা বিমসকে রক্ষা করিতে পারে নাই। অপরাধীর সমর্থন করিয়া পত্রিকা দুইখানি স্ব স্ব প্রকৃতির সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইংলিশম্যান অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিবার জন্য বিম্‌সকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। শিশির-কুমারকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলে ইংলিশম্যানের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না, বরং দেশে একটা ভয়ানক উত্তেজনার বন্যা প্রবাহিত হইবে এই কথা বলিয়া ঢাকাগেজেট লিখিয়াছিলেন,—

"The great oracle of Hare Street (the Englishman) seems to think that if the Editor of the Amrita Bazar Patrika is mulcted a sum of two or three thousand rupees and be made to rot for some weeks in some of the Indian jails, all the troubles would cease. We can only pity the man for his utter ignorance of the resources of the Amrita Bazar Patrika and the spring from which it draws its life blood. We would ask the Englishman and its followers to try the experiment once for all. We would be no false prophet if we were to say here that as soon as the news spreads throughout the country that the Editor of the Amrita Bazar is in troubles the whole country from Peshwar to Assam, from Himalaya to Comorin, will rise to one man to hep him and send forth a growl that will shake the throne of the Queen mother and make her look attentively into the affairs of India Why, such a course of action, if followed up at all, will only tend to strengthen the cause which they propose to smother by all means."

১৮২৩ খৃঃ অঃ ৭ আইনের বিধান অনুসারে বিম্‌সকে কর্ম্মচ্যুত করাই উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কেবল মাত্র রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বরের পদ হইতে অপসারিত করিয়া অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করায় শিশিরকুমার সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি মিষ্টার বিমসের বিচার ফল লইয়া আন্দোলন করিতে বিরত ছিলেন না। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্ পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, সে জন্য এদেশীয়গণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। অপমানিত মিষ্টার বিম্‌স্ অধিক দিন ভারতবর্ষে কার্য্য করিতে পারেন নাই; তিনি বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

মিষ্টার-বিমসের পর আর একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে শিশিরকুমার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম সার্ লেপেল গ্রিফিন (Sir Lepel Griffin) ইনি মধ্যভারতে বড়লাট বাহাদুরের (Agent) প্রতিনিধি ছিলেন। কার্য্য পটুতার এবং বিদ্যা বুদ্ধির জন্য ইঁহার প্রশংসা ছিল। কিন্তু ইঁহার ন্যায় দাম্ভিক, যথেচ্ছাচারী ইংরাজ এদেশে অধিক আসে নাই। সকল বিষয়েই ইনি আপনাকে "সর্ব্বেসর্ব্বা" জ্ঞান করিতেন। সার্ লেপেলের অত্যাচারে মধ্যভারতের রাজন্যবর্গ উত্যক্ত হইয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুরের নিকট কোনও অভিযোগ করিতে হইলে তাহা সার লেপেলের যোগে পাঠাইতে হইত। আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দেখিলে সার লেপেল তাহা বড় লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিতেন না। তাঁহার অত্যাচার কাহিনী অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া

শিশিরকুমার কিরূপে তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি—

রেওয়ার বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত গোলাপ সিংএর পিতামহী চান্দেলিন মহারাণী রাজপুত রমণী। স্বাধীন মহারাজার মহিষী হইয়া পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা তাঁহার পক্ষে কত দূর সম্ভব, সহৃদয় পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। মহারাজার মৃত্যুর পর সার্ লেপেল গ্রিফিন নাবালক মহারাজ কুমারের শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মহারাণী তাহাতে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল নাই। এই ব্যাপারে মহারাণী একটু স্বাধীনভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; সার্ লেপেলের নিকট তাহা অসহ্য বোধ হইয়াছিল। মহারাজ কুমারকে জোর করিয়া তাঁহার জননীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হইয়াছিল। সার লেপেল স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া মহারাণীর প্রতি নানারূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন; এমন কি প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সৈনিক পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন *। এজেন্টের এই দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহতা হইয়া মহারাণী স্বীয় প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসিনী হইয়াছিলেন †। সেখানে তিনি মাত্র কান্দা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন। রাজপ্রাসাদে বাস করা যাঁহার অভ্যাস, দাসদাসীগণ সর্ব্বদাই যাঁহার আদেশ প্রতিপালনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সেই মহারাণী সার লেপেলের অত্যাচারের আশঙ্কায় অরণ্যবাসিনী হইয়া শিবিকায় শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মর্ম্মাহতা মহারাণী চান্দেলিন স্বীয় দুঃখ-কষ্টের কথা বড়লাট বাহাদুরকে একখানি পত্রে জানাইয়া প্রতীকারের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা সেই পত্রের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"In the meantime Sir Lepel visited Rewah and accordingto Dr. Goldsmith and Major Martelli's report against us he issued a Rubkar, by virtue of which all the Maharanis, kinsmen and sirdars have been ordered to keep seperate from the young Maharaja.

"Now Dr. Goldsmith is the master, tutor and director of the young Maharaja. The amount of Rs 3400/- allotted for the maintenance of the prince, which was formally disbursed by me, being his own mother has also been given into the hands of Dr. Goldsmith. It was formerly proposed that Dr. Goldsmith will dine in one compartment and master Puranmal in another and the Maharaja in the next. But it was not carried in to effect. Still the Doctor made the teaching staff eat with the Maharaja which should not have been done till his marriage. I hear they are taking steps to convert.

"Since the Doctor has been made in charge of the Maharaja's food, he has commenced to do many things which are quite against the Hindu religion. He comes with his shoes on near the rosoyee when the food is ready to inspect it. A Hindu cooking place is not an English hotel, and I fear, if this news will be abroad there will be great difficulty in celebrating the marriage of the Prince. The Hindus are very rigid in these matters and excommunicate such persons.

"Though the Rubaka issued by Sir Lepel Griffin permitted me to remain with the Prince, yet it forbade me to prepare the Maharaja's food according to my will, and as no relative or Sirdar was permitted to stay with me, I thought it proper to withdraw myself. Their motive in permitting me is that they will establish their freedom in case any evil befalling the prince.

"Formerly when the Maharaja had to march from Rewah to Sutna, Colonel Kalya Sing, who was the most confident Sirdar of the state, had to prepare accomodation in Rampur situate between Rewah and Sutna where the Maharaja had to lodge during the night. The next day he had to stay in Kirpalpur his own birth-place and thus on the

* এজেন্টের একখানি পত্রে মহারাণী লিখিয়াছেন—"We are declared rebels; troops and artillery were arrayed in front of our abode,"

† মহারাণী স্বয়ং এজেন্টকে একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—At last I left the state and went to a foreign place, when I lived in a jungle for more than six months.

third day the journey had most conveniently to come to an end.

"The present manager Dr. Goldsmith caus d the Maharaja to march the distance of 31 miles in one day from Rewah to Sutna, and as no accomodation was ready he made the Maharaja starve all night and sleep on the ground."

ইহা ব্যতীত মহারাণী চান্দেলিন সার লেপেল গ্রিফিনের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খল রাজ্য শাসন ও ষ্টেটের অর্থ অপব্যয়ের অভিযোগও করিয়া ছিলেন। বড়লাট বাহাদুর সার্ লেপেলের নিকট মহারাণীর অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে সার লেপেল মহারাণীকে উন্মাদিনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। এজেণ্টের এই অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শিশিরকুমার তাঁহার অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাট বাহাদুর লর্ড ডাফারিণ পত্রিকা পাঠে বিচলিত হইয়া স্বয়ং রেওয়ায় গমন করিবেন স্থির করিলেন। বড়লাট বাহাদুর রেওয়ায় গমন করিবেন, এই সংবাদ যখন প্রচারিত হইল, রেওয়ার অধিবাসিগণের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু মহারাণীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহই ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, সে জন্য একটু চিন্তার কারণ হইয়াছিল। মহারাণী চান্দেলিনের প্রতি সার্ লেপেল গ্রিফিনের ভীষণ দুর্ব্যবহারের কথা বড়লাট বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিবার জন্য মহারাণীর পক্ষ হইতে শিশিরকুমারকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল, কিন্তু পাছে হিতে বিপরীত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় শিশিরকুমার রেওয়া গমনে অসম্মত হইয়াছিলেন। লর্ড ডাফারিণের রেওয়া গমনের পূর্ব্বে মহারাণীকে অরণ্য হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মহারাণী এই উত্তর করিয়াছিলেন যে, যতদিন না সার লেপেলের অত্যাচারের প্রতীকার হয়, ততদিন তিনি অরণ্যবাসিনী থাকিবেন, রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিবেন না। বড়লাট বাহাদুর রেওয়ায় উপস্থিত হইলে মহারাণীর কর্ম্মচারিগণ এজেণ্টের অত্যাচারের কথা যথাসম্ভব তাঁহার গোচরে আনায়ন করিলেন। লর্ড ডাফারিণ ভারতীয় কোন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না; এজন্য জনৈক অনুবাদকের সাহায্যে তিনি মহারাণীর কর্ম্মচারিগণের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। মহারাণীর সকল অভিযোগের কথা নিরপেক্ষ ভাবে লাট বাহাদুরের গোচর করা হয় নাই। সার লেপেলের ব্যবস্থাগুণে অনেক কথাই অপ্রকাশিত ছিল। শিশিরকুমার কিন্তু পত্রিকায় তীব্রভাবে মহারাণীর প্রতি অত্যাচারের কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলনের ফলে লর্ড ডাফারিণ শেষে মহারাণীর প্রতি যাহাতে আর কোনওরূপ অত্যাচার বা উৎপীড়ন না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন জানাইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের চেষ্টায় ও লর্ড ডাফারিণের অনুগ্রহে মহারাণী এইরূপে সার লেপেলের অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

যাহারা অত্যাচারপ্রিয় তাঁহাদের পাত্রাপাত্র বিচার থাকে না। সার লেপেল গ্রিফিন রেওয়ার মহারাণীকে গৃহচ্যুত করিয়া দিলেন; ইহার পর ভূপালের বেগম সাহেবার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ভারতবাসী হউন বা ভারতবাসিনী হউন প্রত্যেকেই ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকিবেন, ইহাই তাঁহার বিবেচনায় সঙ্গত ছিল। পরাজিত জাতির আবার আত্মমর্য্যাদা কি, ইহাই তিনি ভাবিতেন। ভূপালের বেগম সাহেবা কোনও কারণ বশতঃ তাঁহার কয়েক জন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়াছিলন। বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী বেগম সাহেবার প্রতি সার লেপেল গ্রিফিনের পূর্ব্ব হইতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, তাহার উপর এই বিদায়প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের প্রবোচনায় বেগম সাহেবা গ্রিফিনের বিরক্তির পাত্রী হইলেন। এই কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বদাই সার লেপেলের নিকট, বেগম সাহেবার বিরুদ্ধে, মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিত। কোন কারণে বেগম সাহেব বড়লাট বাহাদুরকে একখানি পত্র (kharita) লিখিয়াছিলেন। পদচ্যুত কর্ম্মচারিগণ সার লেপেলকে জানাইল যে বেগম তাঁহার বিরুদ্ধে লাট বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। গ্রিফিন তৎক্ষণাৎ বেগম সাহেবার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। ইংলণ্ড হইতে জেনারেল ডালি Genearal Daly বেগম সাহেবাকে ভূপালের রেলওয়ে সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। বেগম সাহেবা তাহার উত্তর প্রদান করিলে চক্রান্তকারী কর্ম্মচারিগণ সার লেপেল গ্রিফিনকে জানাইল যে, বেগম সাহেবা তাঁহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে পত্র লিখিয়াছেন। সার লেপেল এই

সকল মিথ্যা অভিযোগ সত্য জ্ঞান করিয়া বেগম সাহেবার প্রতি নানা অন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বেগম সাহেবাকে তাঁহার আইন পরামর্শ-দাতা মিষ্টার বেলের সহিত পত্র বিনিময় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সার লেপেল গ্রিফিন এইরূপ ব্যবস্থা করেন যে, রাজ্য সংক্রান্ত কোনও পত্র গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইতে হইলে তাহা তাঁহার যোগে পাঠাইতে হইবে।

নবাব সাহেব সিদ্দিক হোসেন নামক একজন সম্ভ্রান্ত আফগানকে বেগম সাহেবা প্রথমে তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হোসেন সাহেবের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা লক্ষ্য করিয়া সার লেপেল গ্রিফিন চিন্তাযুক্ত হইলেন। পরে বেগম সাহেবা যখন সিদ্দিক হোসেনের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন, সার লেপেলের ভীষণ গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। এজেণ্ট সাহেব একবার ভূপালে উপস্থিত হইয়া একটী দরবার আহ্বান করেন। এই দরবারে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ওমরাওগণের সমক্ষে তিনি সিদ্দিক হোসেনকে নানারূপে অপমানিত করিয়া চিরদিনের জন্য ভূপাল পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব সাহেব তাঁহার এই অন্যায় আদেশ প্রতিপালন করা উচিত বলিয়া মনে করেন নাই। ক্রমে ক্রমে তিনি সার লেপেলের চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন। ক্রোধোন্মত্ত গ্রিফিন নবাব সাহেবের অবস্থানের জন্য প্রাসাদ হইতে বহুদূরে একটী বাড়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। স্বামী ও স্ত্রীতে যাহাতে আদৌ সাক্ষাৎ না হয়, তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য তিনি গুপ্তচরও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অমানুষিক অত্যাচার ভূপালবাসিগণের হৃদয়ে বিলক্ষণ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। সার লেপেল, বেগম সাহেবা ও তাঁহার কন্যা লুতম্ জেহানের মধ্যে মনোমালিন্য উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া এই অসন্তোষ শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই ভীষণ অত্যাচার কাহিনী শিশিরকুমারের শ্রবণ গোচর হইলে, তিনি প্রতীকারের চেষ্টায় অমৃত বাজার পত্রিকায় আন্দোলন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাদি হস্তগত না হইলে তিনি কোন বিষয়ের আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বিপন্না বেগম সাহেবাকে সার লেপেল গ্রিফিনের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল বলিয়াই যেন ভগবান অলক্ষ্যে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন। এক অতি অদ্ভুত উপায়ে ভূপালের রাজ্যসংক্রান্ত সরকারী কাগজপত্রাদির নকল শিশির কুমারের হস্তগত হয়। ভূপালের জনৈক পুস্তক বিক্রেতার সহিত শিশির কুমারের প্রায়ই পত্রবিনিময় হইত। এই পুস্তক বিক্রেতাই সরকারী কাগজ পত্রাদির নকল তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলেন। এই সকল কাগজ পত্রের অকৃত্রিমতাও অতি অদ্ভুত উপায়ে জানিতে পারা গিয়াছিল। ডাক্তার কারি (Dr. Currie) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন কারণে সার লেপেল গ্রিফিনের চক্ষুশূল এবং শেষে ভূপাল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। অপমানিত ডাক্তার প্রতীকারের আশায় কলিকাতায় আসিয়া শিশির কুমারের নিকট ভূপালের সার লেপেল গ্রিফিনের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করেন। শিশির কুমার পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে যে সকল কাগজপত্র পাইয়াছিলেন, তাহা ডাক্তার কারিকে দেখাইলে ডাক্তার কারি শপথ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সে গুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে শিশির কুমারের সংশয় দূর করিয়াছিলেন। প্রমাণাদি সংগৃহীত হইলে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় সার লেপেলের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতদ্বেষী কয়েকখানি সংবাদপত্র সার লেপেলের পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল। কিন্তু গ্রিফিনের পক্ষে এই পরামর্শানুসারে কার্য্য করা সম্ভব হয় নাই। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককে শাস্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

আহাম্মদ আলিখাঁ নামক জালালাবাদের জনৈক যুবকের সহিত বেগম সাহেবার কন্যা লুতম্ জেহানের বিবাহ হইয়াছিল। ভূপাল ষ্টেট হইতেই এই যুবকের শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই। আহাম্মদ আলিখাঁ শ্বশ্রূকে অপসারিত করিয়া ভূপালে আধিপত্য লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কন্যা লুতম্ জেহানও স্বামীকে

রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মাতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেগম সাহেবা নানা কারণে কন্যার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই লইয়া মাতা, কন্যা ও জামাতার মধ্যে মনোবাদ চলিতেছিল। সার লেপেল গ্রিফিনই ইহার মূল ছিলেন। তিনি বেগম সাহেবাকে স্বামীর নিকট হইতে দূরে রাখিয়া বেগম সাহেবা ও তাঁহার কন্যা এবং জামাতার মধ্যে মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া এবং পদচ্যুত কর্ম্মচারিগণকে পুনরায় ষ্টেটের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কৌতুক উপভোগ করিতেছিলেন। ইহার প্রতীকারের জন্য শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় তীব্র আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলন দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।

শিশিরকুমারের চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। লর্ড ডাফারিণ পত্রিকা পাঠ করিয়া সার লেপেল গ্রিফিনকে ভূপাল হইতে সরাইয়া নিজাম রাজ্যে গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সার লেপেল কিন্তু নূতন পদে কার্য্য করিতে পারেন নাই। অমৃতবাজার পত্রিকার তীব্র সমালোচনা তখন দেশীয় রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে গ্রিফিন যে একজন অত্যাচারী পুরুষ ইহা সকল রাজারই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এই কলঙ্কের ভার স্কন্ধে লইয়া গ্রিফিন কোথাও কার্য্য করা সুবিধাজনক মনে করেন নাই; তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছিল। অত্যাচারীর হস্ত হইতে মধ্যভারতের রাজন্যবর্গকে রক্ষা করিয়া তিনি সমগ্র ভারতবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শিশির কুমারকে শাস্তি প্রদানের জন্য সার লেপেল গ্রিফিন গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সার লেপেল তাঁহার কয়েকটী বন্ধুর উত্তেজনায় স্বয়ং শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলে, স্বর্গগত সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন যে তিনি এক মাস ধরিয়া তাহাকে জেরা করিবেন এবং তাহাতে তাঁহার আরও কীর্ত্তি কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা অবগত হইয়া সার লেপেল শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনয়ন করিতে সাহস করেন নাই।

ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া সার লেপেল গ্রিফিন পার্লামেণ্ট মহাসভায় আপনার ব্যাপারটী লইয়া আন্দোলন করিবার অভিপ্রায়ে, একদিন পরামর্শ করিবার জন্য মিষ্টার ব্রাড্‌লর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাড্‌ল পূর্ব্ব হইতেই সার লেপেলের অত্যাচার কাহিনী অবগত ছিলেন, সে জন্য তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। সার লেপেল গ্রিফিন যথাভাবতে রাজন্যবর্গকে তাঁহার দ্বারদেশ হইতে অনেক সময়ই উপেক্ষা করিয়া ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে যে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রদান করিতেন সেই আঘাতই তিনি মিষ্টার ব্রাড্‌লর দ্বারদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই ঘটনাটী সম্বন্ধে ১৮৮৯ খৃঃ অঃ জানুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—

"Proud as he is 'it must have been great humiliation to him to knock at the door of a M. P. and to be refused admittance. It was a case of

'Take physic, pomp!
Expose thyself and feel what wretches feel,
And show the heavens more just?'

Sir Lepel was spurned from the door just as he has spurned the chiefs of Central India and especially as he treated with the greatest contumely the lady who has ever been friendly ally of the English Government."

নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের জন্যই গভর্ণমেণ্টের নিকট অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিপত্তি। পার্লামেণ্টের সভ্য মিষ্টার ব্রাড্‌ল ও মিষ্টার বেকোইনের অনুগ্রহে এই প্রতিপত্তিটুকু দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মতিবাবু এই দুই মহানুভবের হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহাদিগকে ভারতবন্ধু করিয়াছিলেন। মিষ্টার কেইন প্রথমে মাদক দ্রব্য প্রচলনের প্রথা বিলোপ সাধনের জন্য যত্নবান হন। মতিবাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষের দুঃখ কষ্টের কথা জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রতীকারের জন্য

পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মিষ্টার কেইন ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে কোন মতেই সম্মত হন নাই। কিন্তু মতিবাবু ছাড়িবার লোক নহেন; তিনি পুনঃ পুনঃ ভারতের অভাব অভিযোগের কথা মিষ্টার কেইনের নিকট বর্ণনা করিয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্বদেশ সেবায় মতিবাবুর আন্তরিকতা লক্ষ্য করিয়া মিষ্টার কেইন অমৃতবাজার পত্রিকায় লণ্ডনের সংবাদ দাতারূপে পত্রলিখিতে আরম্ভ করিলেন। মতিবাবু অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে শিশিরকুমারের কতকগুলি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া Indian Sketches নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মিষ্টার কেইন এই গ্রন্থের ভূমিকায় শিশিরকুমারের একটী অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন; গ্রন্থের পরিশিষ্টে আমরা তাহা উপস্থিত করিলাম।

১৮৮৯ খৃঃ অঃ স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় মিষ্টার ব্রাডল একবার বোম্বায়ে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় বোম্বায়ে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইতেছিল। শ্রীযুক্ত মতিবাবু কলিকাতা হইতে মহাসমিতিতে যোগদান করিতে গমন করিয়া ছিলেন। শিশির কুমার একবার পত্র দ্বারা ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের কথা মিষ্টার ব্রাড্‌লকে জানাইয়া পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। পত্র বিনিময়ে অনেক সময় কার্য্য সিদ্ধি হয় না, মিষ্টার ব্রাডল যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা তাঁহার গোচরে আনয়ন করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহার সহানুভূতি লাভ করিতে পারা যাইবে, এই ভাবিয়া মতি বাবু একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম—

মতিবাবু—"পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষের দুঃখ-কষ্টের কথা আলোচনা করিয়া আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমগ্র-ভারতবাসী আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে।"

মিঃ ব্রাডল—"শিশির বাবুর পত্রোত্তরে আমি এ সম্বন্ধে আমার মতামত পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছি। সর্ব্ব প্রথমে আমার নিজের দেশের শ্রমজীবিগণের (working people) ইষ্টানিষ্টের প্রতি দৃষ্টি রাখাই আমার কর্ত্তব্য।"

মতিবাবু—"তাঁহারা স্বাধীন জাতি; তাঁহারা তাঁহাদিগের দুঃখ কষ্ট মোচনে ও স্বার্থ সংরক্ষণে সমর্থ।"

মিঃ ব্রাড্‌ল—ভারতবর্ষের রাজনীতি শাস্ত্রে আমি অনভিজ্ঞ। আমি কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিবার চেষ্টা করিলে ভারতসচিব (সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্‌স্) হয়ত এরূপ উত্তর প্রদান করিবেন যে, আমাকে নীরব হইয়া থাকিতে হইবে। এই সকল কারণে আমি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।"

মতিবাবু—"আপনি একজন ইংরাজ। ভারতবাসী যাহাতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে সুবিচার প্রাপ্ত হয় তৎ-প্রতি দৃষ্টি রাখা কি আপনার কর্ত্তব্য নহে?" মতিবাবুর যুক্তিতর্ক মিষ্টার ব্রাড্‌লকে বিচলিত করিতে পারিল না। শেষে মতিবাবু ভারতবাসীর প্রতি কয়েকটী অবিচারের কথা এরূপ করুণভাবে বর্ণনা করিলেন যে, তাহাতে সহৃদয় ব্রাড্‌লের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়া গেল। মিঃ ব্রাড্‌ল পুনরায় বলিলেন—"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু অবগত নহি, এরূপ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টে কোনও কথা উত্থাপন করিলে আমাকে হয়ত অপদস্থ হইতে হইবে।"

মতিবাবু—"আপনি সেজন্য চিন্তিত হইবেন না। মিষ্টার ডিগ্‌বি আবশ্যক মত আপনাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল কথা অবগত করাইবেন ভারতবর্ষের ব্যাপার লইয়া পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিলে আপনি যাহাতে প্রত্যেক বারেই সফল হইতে পারেন, অমৃত বাজার পত্রিকা অফিস হইতে আমরা তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করিব।"

মিঃ ব্রাড্‌ল—"বেশ। আমি পার্লামেণ্টে আপানাদের দুঃখ কষ্টের কথা আন্দোলনে সম্মত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথ নাথবসু।

চুটকী

(১)

বাবু ভৃত্যকে একটি গর্ত খুঁড়িতে বলিলেন। ভৃত্য বলিল, "মাটীগুলি কোথায় রাখবো ?"

বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কেন রে বোকা ? গর্ত্তটা না হয় একটু বড় ক'রে কেটে সেই গর্ত্তেই রাখিস।

চাকর বলিল, "যে আজ্ঞে প্রভু।"

(২)

বাবু রাগ করিয়া বলিলেন, "হয় তুই বাড়ী হ'তে বেরো, না হয় আমি বেরই, ভৃত্য বলিল, "আমি গরীব মানুষ, আমি আর কোথায় যাব, আপনিই বেরুন"।

(৩)

প্রভু রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "শূয়ারকা বাচ্ছা।" ভৃত্য করযোড়ে বলিল, "হুজুর মা বাপ, সব বল্‌তে পারেন"।

"স্মৃতি"

(গল্প)

সূচনা

সেই নির্জ্জন গ্রামের মাইনর স্কুলে যখন মাষ্টারী করিতাম —তখন বৃদ্ধ মতি মাষ্টারের সহিত আমার বড়ই প্রণয় জন্মিয়াছিল। তিনি যেন কি রকম অদ্ভুদ প্রকৃতির লোক ছিলেন। কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না; নির্জ্জনে নিজের মনে থাকিতেই ভালবাসিতেন। সব সময়ই একটা কেমন দুঃখের করাল ছায়া তাহার সমস্ত চোখে মুখে ছড়াইয়া থাকিত। কেহ কেহ বলিত মতি মাষ্টারের জীবনে একটা গুহ্য কাহিনী আছে। সে যা হ'ক, গ্রামের মধ্যে আমিই যেন কেমন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম।

মতি মাষ্টারের অনেক গুণ ছিল। বাঙ্গালা তিনি খুব ভাল জানিতেন। ছেলেদের উপর অত্যাচার তিনি কোন কালেপ করিতেন না, অথচ ছেলেরা সকলেই তাহাকে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তবে তার একটা দোষ ছিল এই যে তিনি শুদ্ধ ভাষা ভিন্ন কথা বলিতে পারিতেন না। পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের বাঙ্গালার ফল খুবই ভাল হইত—এ জন্য তাঁহার প্রমোশনও খুব দ্রুত হইতেছিল।

সে দিন নদীর পারে একটী পুলের পার্শ্বে বসিয়া মতি মাষ্টার ও আমি গল্প করিতেছিলাম। সে অনেক গল্প—দেশ বিদেশের যুদ্ধ—চালের দর—বাজার করা ইত্যাদি ইত্যাদি এমন সময় দূর হইতে একটা সুমধুর সঙ্গীত লহরী আসিয়া মাষ্টারকে কেমন একটুউ দিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম মতি মাষ্টারের মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল—কি যেন একটা অপ্রকাশ্য যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্ করিতে করিতে এক সময়ে হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি হইয়াছে ?' তিনি কিন্তু এ কথার কোনই উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

* * * *

আজ কতকাল পরে মতি মাষ্টারের কথা মনে পড়িতেছে। সেই ঘটনার কয়েকদিন পরেই তিনি মারা যান। তাঁহার

মৃত্যুর পর তাঁহার ঘরে অন্যান্য জিনিষের মধ্যে এই কাগজ তাড়া পাইয়াছিলাম। এখন পর্য্যন্ত এই কাগজগুলি আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি, মাঝে মাঝে বাহির করিয়া ঝাড়িয়া পুছিয়া পড়িয়া আবার তুলিয়া রাখি।

(১)

কাসুন্দিয়া, রবিবার—রাত্রি ১২টা।

"আঁখি কেমন কহন না যায়।"

সে দিন সন্ধ্যার সময় নবীন মৃদু মলয় আন্দোলিত বিক্ষুব্ধ নদী তরঙ্গের পার্শ্বে বসিয়া উদাস সুরের সেই গান বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল—আহা এমনটি বুঝি আর কখনও শুনি নাই। এমন নিছক সত্য কথা—এমন মর্ম্মস্পর্শী আকুল সংগীত আর কেহ কোন দিনও আমাকে শোনায় নাই। আমার হৃদয়ের তারে তারে—আমার প্রাণের অতলস্পর্শী মর্ম্মবেদনার করুণ রুদ্ধশ্বাস এমন করিয়া আর কেহ'ত গাহে নাই! আমার অন্তস্পর্শী করুণ বেদনার সুর এমন ভাবে আর কেহ'ত মূর্চ্ছনার তানে জাগাইয়া তুলে নাই। তবে আজ এমনটি কে গাহিল? কোথা গাহিল? কেন গাহিল? জানিতে কি আমার ইচ্ছা হয় না?

জীবনের যে অধ্যায়টি অশ্রুজলের মাঝখানে ডুবাইয়া দিয়া আসিয়াছি, তাহা যে এমন ভাবে রক্তের দাগে আমার অন্তরের অন্তস্থে প্রতিফলিত হইয়া আছে তাহাত' বুঝি নাই! যে স্মৃতি বিস্মৃতির অতল গর্ভে লীন হইয়াছে ভাবিয়া হাফ ছাড়িয়াছিলাম—তাহাই যে আমার কণ্ঠনালী বেষ্টন করিয়া সূক্ষ্ম ফাঁসিজাল নির্ম্মাণ করিয়া চুপ করিয়া মুখ গুজিয়া পড়িয়াছিল তাহা'ত' জানিতাম না। যাহা শুধু যৌবনের একটা নেশা, একটা মাদকতা মাত্র বলিয়া চাপিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহাই যে আজ আবার আমাকে এমন ভাবে কাঁদাইয়া তুলিবে তাও কখনও ভাবি নাই।

"আঁখি কেমন কহন না যায়।" এই একটি কথা আরত' কিছুই নয়। যখন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবি তখন মনে হয় সত্যই এমন কথাটি আর শুনি নাই। এ কথাটি কি এতই সত্য? সত্য! সত্য! সত্য! নইলে এমন ভাবে আমার অন্তরের পরতে পরতে ইহা গাঁথিয়া যাইবে কেন?

এ'ত শুধু মুখের কথা নয়। এ'ত দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা নয়। এযে আমার প্রাণের কথা! একেবারে স্পষ্ট, জ্বলন্ত আমারই জীবনের একটি ঘটনা। আজ অকূল সাগর মন্থন ক'রে সে সংগীত শোনালে আমায় কে?

আজ নয়, কাল নয়—সে অনেক দিনের কথা! আমার তখন প্রথম যৌবনের নেশা। সমস্ত প্রকৃতির উপর কি যেন একটা সৌন্দর্য্যের ছাপ মেরে দিয়েছিল। আমার সেই নবীন যৌবনের সম্মুখে—যখন সমস্ত জগৎ একটা অজানা আবেগে নেচে উঠেছিল,—কত জল্পনা কল্পনা আকাশ কুসুমের মত নূতন নূতন রঙে বিচিত্র মধুর হ'য়ে ফুটে উঠেছিল। যখন আমার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষারাশি আকুল আগ্রহে মিলনের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন একদিন—জীবনের কোন এক সার্থক মুহূর্ত্তে তাকে ভালবেসে ছিলাম। বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের কি বিচিত্র মধুর অঙ্গুলিস্পর্শে আমাদের দুটি ক্ষুদ্র হৃদয় যে কখন কি ভাবে একই মূর্চ্ছনায় বেজে উঠেছিল তাহা কখনও বুঝ্‌তে পারি নাই।

লোকে বলিত সে কালো। কিন্তু কই আমিত' কখনও তাকে সে ভাবে দেখি নাই। আমার মনে হ'ত তার সেই প্রশান্ত, নীল, কোমল চক্ষু দুটি, সেই মধুর হাসিটুকু সেই সুগোল সুন্দর মুখখানি আমার বুকের ভেতর আসন পেতে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে বসেছিল।

"আঁখি কেমন কহন না যায়।" আমি যে কি চোখে তাকে দেখেছিলাম তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় এমন ভাবে আর কেহ কখনও দেখে না। রোজই ত দেখি! কত দেখি! পূর্ণিমারাত্রে জ্যোৎস্না পরিপ্লাবিত উচ্ছাসময়ী নদীর তরঙ্গভঙ্গ দেখিয়াছি,—অমানিশার ঘোরান্ধকার বক্ষে বিদ্যুতের উজ্জ্বল আস্ফালন দেখিয়াছি—শারদ প্রভাতে রৌদ্রোজ্জ্বল গগনের নবীন কমনীয়তা দেখিয়াছি;—কিন্তু জীবনের সেই কোন শুভক্ষণে,—তরল ভাবোন্মাদের উচ্ছ্বাসমুখে—প্রকৃতির কোন্ সে কমনীয় মুহূর্ত্তে তাকে যে চোখে দেখেছিলাম সে চোখে ত' আর কিছুই দেখি নাই।

তাই ভাবি লোকে তাকে কেন কালো বলে! তাদের কি চোখ নাই? না সে চোখে আমার মত দৃষ্টি শক্তি নাই?

প্রতিভা আমাদেরই পাড়ার মেয়ে। ছোট বেলায় তাকে আরো অনেক দেখেছি। তার সাথে অনেক দিন খেলেছি অনেক মিছা মিছি ঝগড়া ক'রে রাগ করে তাকে মেরেছি। কিন্তু কই এমন ভাবে 'ত' তাকে আর কোন দিনও দেখি নাই। সেদিন তাকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে দেখলাম।

"আখি কেমন কহন না যায়।" আমার এই চর্ম্মচোখেই তাকে পূর্ব্বে দেখেছি;—তখনও ত এত ভাল লাগে নাই। আজ তাকে দেখে এত সুখ—এত আনন্দ হয় কেন? আজ তাকে বুকে চেপে ধ'র্‌তে আমার অশান্ত হৃদয় এমন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠে কেন?

তারপর থেকে রোজই তার সাথে দেখা হ'ত।

এমনি ভাবে অনেকদিন কেটে গেল। আমার যৌবন আর প্রতিভার সুকুমার কৈশোরের একটা উদ্দাম বাঁধা-হীন আনন্দ আমাদের দুজনকেই ঘিরে একেবারে বিভোর ক'রে রেখেছিল। কতদিন হাস্য কোলাহলের মধ্যে প্রতিভা তার সেই স্বহস্তরচিত মালাগাছি আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছে;—আর আমি কত সোহাগে তার একরাশি এলোচুলের মধ্যে গোলাপের কুড়ি গুঁজে দিয়েছি। এক-দিনের জন্যও সে আমাদের বুঝ্‌তে দেয়নি যে এই হাস্য কৌতুকের অন্তরালে একটা তীব্র বেদনা আছে, যে এক-দিন বিরাটমূর্ত্তি ধ'রে আমাদেরই মাঝখানে এসে দাঁড়াবে—যে, একদিন বিধাতার অমোঘ দণ্ড আমাদের দুটি কিশোর হৃদয়ের উপর কষাঘাত ক'রবে।

যা হ'ক, এই ভাবে আমাদের দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। সমস্ত দিন কোন রকমে ছট্‌ফট্‌ ক'রে সন্ধ্যার অনেক আগেই আমি এক নিশ্বাসে ছুটে গিয়ে প্রতিভাদের বাড়ীতে উঠ্‌তাম।—আর এই সুখ মিলনের মধুর কল্পনায় আমাদের সমস্ত দিনটা কেটে যেত। আমাদের দুটি নবীন যৌবনের সুখস্পর্শে যেন সমস্ত জগৎ পুলক বিহ্বলে নেচে উঠ্‌তো।

এই ভাবে আমাদের দুটি নবীন জীবন আনন্দস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কোথায় উধাও হ'য়ে ছুটে চলেছিল।—তার যেন কোথাও এতটুকু বাঁধা কিম্বা পঙ্কিলতা নাই।

এমনি ভাবে আমাদের জীবন চিরকাল কাট্‌তে পারলে না। আমাদের প্রেম জগতের বাহিরে যে আর একটা বাস্তব জগৎ আছে,—সে যে তার কর্ত্তব্য একেবারে ঘড়ীর কাটার ন্যায় রুটিন মত ক'রে চলেছিল—তা আমাদের আদৌ খেয়াল ছিল না। তাই থাকিয়া থাকিয়া ভাবি, "আঁখি কেমন কহন না যায়।"—ভাবিতে কি কোন দোষ আছে?

(২)

"আখি কেমন কহন না যায়।"

কে তুমি এমন ভাবে আমাকে আবার কাঁদালে? আমার ভাঙ্গা বুকের ভিতরে যে স্থানটিতে রক্তের দাগ, সেই খানেই ঘা দিলে কে তুমি? যা আর কোন দিনও ভাবিব না বলিয়া নিজের মনে সহস্র বার প্রতিজ্ঞা করে-ছিলাম, তাহাই আবার আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলে কে তুমি? সেই সুখ রজনীর অতীত স্মৃতি, এই ছ্যা ছ্যা করা জীবনের মধুর অধ্যায়টি আজ আবার এই মর্ম্মন্তুদ বুকের বেদনার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে! সেই ছিন্ন সূত্র জোড়া দিয়া আজ আবার পারিজাতের মালা গাথিতে হইবে! আমার হতচ্ছাড়া জীবনের সে যে এক মঙ্গল স্মৃতি! এ ব্যর্থ জীবনের গৌরব কাহিনী! এ পরিত্যক্ত জীবনের বরণ সঙ্গীত!

সে কথা আর ভাবিতে পারি না। ভাবিতে ভাবিতে আমার মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে। সবই ত' ত্যাগ করিয়াছি! যে গৌরবের মধুময় আকাঙ্ক্ষা একদিন আমার সমস্ত জীবন ভরিয়া কল্পনার মধুর চিত্র আঁকিয়াছিল তাহা ত্যাগ করিয়াছি; যে স্বদেশ-প্রেমিকতা একদিন আমার বুকের মধ্যে আপনার বিশ্ববিজয়ী আসন বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল তাহা বিস্মৃত হইয়াছি;—যে শিক্ষার বিচিত্র সঙ্গীত একদিন আমারই এই ক্ষুদ্র বুকের মধ্যে মধুর মূর্চ্ছ-নায় বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহাও ভুলিয়াছি। কিন্তু কই, এ মধুময় বেদনার স্মৃতি ভুলিতে পারি না কেন? এ স্মৃতি আমার অস্থিতে অস্থিতে,—আমার মজ্জায় মজ্জায় গাথিয়া গিয়াছে,—সে স্মৃতি আমার এ ছন্নছাড়া জীবনের অক্ষয় কবচ হইয়া রহিয়াছে। একি কখনও ভুলা যায়?

তারপর এমনি ভাবে অবাধ আনন্দ স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে আমরা দুজনে যে কোথায় চলে ছিলাম তাহার

কোনই স্থিরতা ছিল না। সে যখন হাসিতে হাসিতে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন আমার সম্মুখে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি নাচিয়া উঠিত। আত্মহারা আমি তাহারই সে ঢল ঢল কোমল মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। কত দিন সে হাস্য কৌতুকের মাঝখানে কোন কিছু দেখিয়া বলিয়া উঠিত "এযে আমারই মত কালো।" আমার বুকের মধ্যে তখন ছ্যাৎ করিয়া উঠিত। আমি অস্থির চিত্তে তাকে আমার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতাম। কতদিন আমাকে একটু বিরস কিম্বা গম্ভীর দেখিলেই সে তার সেই কালো, করুণ, কোমল চক্ষুদুটি আমার মুখের উপর ফেলিয়া কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিত—"তুমি কি আমার উপর রাগ ক'রেছ? আমি কি কিছু অন্যায় ক'রেছি?"—তখন আমার বুকের মধ্যে বাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রোচ্ছাস জাগিয়া উঠিত। তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিতাম না যে তাহার উপর রাগ করিবার মত শক্তি, ক্ষমতা আমার ছিল না।

এমন এক একটি ঘটনা মানুষের জীবনে এমন এক এক সময়ে ঘটিয়া যায় যে সে তাহারই জীর্ণ, শীর্ণ স্মৃতিটুকু আপনার হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিবন্ধব প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের ন্যায় তাহারই পূজা ক'রে। আমারও তাহাই হইয়াছিল। আমার নবীন জীবনের সেই সুক্ষ্ম মধুর স্মৃতিটুকু যাহা এতদিন "আমার ভাঙ্গা দেউলের দেবতা"রূপে অতি সঙ্কোচে আমারই হৃদয় মন্দিরে লোক চক্ষুর অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ না জানি কাহার অজ্ঞাত কণ্ঠস্বরে তাহাই আবার আমার মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাই বলিতেছিলাম আজ আবার এমন সঙ্গীত আমায় শোনালে কে তুমি? আমার মর্ম্মব-প্রতিষ্ঠিত হৃদয়-মন্দির ভাঙ্গিয়া সে স্মৃতিজালটুকু টানিয়া বাহির করিলে কে তুমি?

এমনি বাধাহীন, সঙ্কোচহীন জীবন আমাদের কতদিন কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। আমাদেরই প্রেম জগতের বাহিরে যে একটা কুৎসিৎ কুটিল দৃষ্টির সূক্ষ্ম ফাঁসিজাল গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা আমরা একদিনের জন্যও টের পাই নাই। তাই যেদিন আমাদের সেই আশৈশব পবিত্র প্রেম পাঁচজনের কুটিল দৃষ্টির সম্মুখে বিচিত্রভাবে রঞ্জিত হইয়া কুৎসিৎ আকার ধারণ করিল, সেইদিন আমাদের পুনর্জন্ম হইল।

"আঁখি কেমন কহন না যায়।" এ সংগীত কে তোমায় শেখালে? এমন সুমধুর আকুল সংগীত কে তোমাকে গাহিতে বলিল? আমার এ বুকের বেদনা তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে?

"আঁখি কেমন কহন না যায়।" আমার সেই জীবন প্রভাতে যেদিন প্রথম তাহাকে দেখিয়াছিলাম সেইদিন প্রথম ভাবিয়াছিলাম—"আঁখি কেমন কহন না যায়।" তারপর আমাদের সে প্রেমোচ্ছাস যখন অবাধ আনন্দে স্রোতের মত তর্‌ তর্‌ বেগে বহিয়া চলিয়াছিল—তখনও কে গাহিয়াছিল "আঁখি কেমন কহন না যায়।" তারপর যখন বাহিরের বিষদৃষ্টির সম্মুখে আমাদের অবাধ আনন্দ সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌লে—তখনও আবার আমার মর্ম্মবীণায় ঝঙ্কার দিয়া কে গাহিয়াছিল "আঁখি কেমন কহন না যায়।" আজ আবার জীবনের এই শেষস্তরে, নিরাশ জীবনের এই সার্থক মুহূর্ত্তে কে গাহিল "আঁখি কেমন কহন না যায়।" আমার সেই বহু বিস্মৃত সুখ কাহিনীর গোপন মন্দিরে আঘাত করিয়া কে গাহিল "আঁখি কেমন কহন না যায়!" আমার শেষ জীবনের নিরাশা সঙ্গীতে বেসুরা বাজাইয়া কে গাহিয়া উঠিল "আঁখি কেমন কহন না যায়।"

বহুদিন সে কথা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, কত স্থান ঘুরিয়াছি। কোনদিনও সংসারী হই নাই। পিতামাতার বহু চেষ্টায়ও আমাকে বাঁধিতে পারে নাই। আজ শেষ জীবনে এই নির্জ্জন গ্রামের মাইনর স্কুলে মাষ্টারী করিয়া দিন কাটাইতেছি। এখানেও কি আমার নিস্তার নাই? এখানেও কি আমাকে সেই স্মৃতি সঙ্গীত শুনিতে হইবে? তবে আমি কোথায় যাই?

মতি মাষ্টার যে কেন এত গম্ভীর ছিলেন তা এতদিনে বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু একথা আমি কাকেও বলি নাই, কোনদিন বলিবও না।

শ্রীসুশীল সেন।

কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

১। নেতা কে?—যে লোক কেবল চলিতে বলে, নিজে এক পা চলে না।

২। দেশ-হিতৈষী কে—যে ব্যক্তি গানে ও বক্তৃতায় স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য রোদন করে, কিন্তু ঘরে গিয়া ভাই-ভগ্নীকে চিনিতে পারে না,—পিতা-মাতাকে অন্ন দেয় না।

৩। সমাজ-সংস্কারক কে?—যে ব্যক্তি নিজের ঘরটিকে বাদ দিয়া অপরের ঘরের বিধবার বিবাহ দিতে চায়—জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে বলে।

৪। ত্যাগী কে?—যে ব্যক্তি ত্যাগস্বীকারের জন্য পরকে উপদেশ দেয়, অথচ নিজের বেলায় এক পয়সা না মাপ।

৫। তেজস্বী কে?—যে ব্যক্তি বড় লোকের পায়ের কুত্তা, কিন্তু গরীবের কাছে নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী।

৬। বড় লোক কে?—যে ব্যক্তি গরীবের রক্ত শোষণ করিয়া আপন অভ্যুদয়ের সোপান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

৭। সুলেখক কে?—যাহারা স্কুল বুক লেখে।

৮। কবি কে?—যাহার কবিতায় বুঝিবার কিছু থাকে না,—থাকে শুধু বিলাতী গন্ধ।

৯। ঔপন্যাসিক কে?—বিলাতী গল্পের পট চুরি করিয়া স্বদেশী পরিচ্ছদে যে তাহা প্রকাশ করে।

১০। নাট্যকার কে?—কথোপকথনচ্ছলে ছাই ভস্ম লিখিয়া যিনি থিয়েটারে ম্যানেজারের পায়ে তৈল মর্দ্দন করেন।

১১। বিদ্বান কে?—বিলাতী লেখকের মুখস্থ করা বুলি যিনি সময়ে অসময়ে কপচাইয়া থাকেন।

১২। বড় কবিরাজ কে?—যাহার ভুঁড়ি ও টিকি খুব বড়।

১৩। বড় ডাক্তার কে?—যাঁহার মোটর আছে ও যাঁহার দর্শনী বেশী।

১৪। সত্যবাদী কে?—উকীল, এটর্ণী ও ব্যারিষ্টার।

১৫। কর্ত্তব্য-পরায়ণ কে?—পুলিসের লোক।

১৬। প্রবীণ কে?—যে ছোকরা দাড়ীগোঁফ কামাইয়া থান কাপড় পড়ে এবং নস্য লয়।

১৭। স্বদেশের কাজ করিতেছেন কাহারা?—যাঁহারা যখন তখন স্বদেশী ফণ্ড খুলিয়া থাকেন।

(হিন্দুস্থান হইতে)

শান্তি

(গল্প)

শ্রাবণের প্রথম শনিবার। মুহুর্মুহু ধারাপাতের পর সবেমাত্র কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত হইয়া, নবোদ্যমে পুনঃ-বর্ষণের জন্য মেঘপূর্ণ আকাশে একটা বিরাট আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছিল, রাজপথের পার্শ্বে জীর্ণ অট্টালিকার আবরণশূন্য ভগ্ন বাতায়নে বসিয়া এক অতিরুগ্ন বালিকা, পার্শ্বে এক প্রবীণ,—মুখচ্ছবিতে তাঁহার দুঃখ দৈন্যের সবটুকু চিহ্নই বিদ্যমান ছিল। দূরে গীত বাদ্যের ঐক্যতান একটা আনন্দোৎসব ঘোষণা করিতেছিল।

"ও কিসের বাজনা বাবা? বিয়ের?" রুগ্ন বালিকা ধীরে ধীরে বলিল।

চিন্তিত প্রবীণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"উ! না,—ও আমাদের রাজা যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছেন,

তাঁহার রাজ্যময় শান্তি স্থাপন হ'য়ে গেল,—আজ তাই সব আনন্দ উৎসব কোর্চ্ছে।"

বালিকার মুখমণ্ডলে যেন একটা আনন্দ-জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। স্মিত বদনে বলিল—"উঃ!—তা'হলে আমাদের খুব বড় রাজা!"

"হ্যাঁ মা আমাদের খুব বড় রাজা।"

"ও—তাইতে কাল মা জগার মাকে বোল্‌ছিল যুদ্ধ থেমে গেল, এইবার কাপড় আর চাল সস্তা হবে। এইবার আমরা দুবেলা ভাত খেতে পাবো। নইলে আমরা যে গরিব—দুবেলা ভাত কোথায় পাব? না বাবা?"

দরিদ্র পিতা কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ মা—আমরা বড় গরিব।"

বালিকার মুখখানা যেন মলিন হইয়া গেল। স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল "আচ্ছা বাবা! তুমি আমাদের রাজাকে দেখেছ? আমি দেখিছি।" কন্যার গর্ব্বোৎফুল্ল দৃষ্টি পিতার মুখে নিবদ্ধ হইল।

"না মা আমিত দেখিনি। তুমি কোথায় দেখলে?"

"কেন পোষ্টকার্ডে!"

দরিদ্রের শেষ সম্বল মুখের হাসিটুকু আজ পিতা কন্যার নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।

শান্তি উৎসবের শোভাযাত্রা সেস্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। কন্যা তাচ্ছিল্যস্বরে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"একি হো'য়েছে বাবা? মোটে কয়েকটি লোক!"

সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পিতা বলিলেন—"কি কোরবে মা! সবাই উঠতে পারেনি। উপোস কোরে আছে কিনা! ক্রমে ক্রমে সব আসবে।" জিজ্ঞাসু নয়নে কন্যা বলিল—'কেন বাবা—সবাই উপোস কোরে আছে কেন? বেরতো কোরেছে?"

অতি দুঃখের হাসি হাসিয়া পিতা বলিলেন—"হ্যাঁ মা কঠোর ব্রত করেছে। তবে একটা গল্প শোন।" পিতা নিম্ন লিখিতরূপ একটি গল্প উল্লেখ করিলেন।—

অতি প্রাচীনকালে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা একটা ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঘোষণা করিলেন—আজ তাঁহার রাজ্যে বিজয়োৎসব করিতে হইবে। তদুপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত দোকান পাট, কাজ কর্ম্ম বন্ধ থাকিবে। শুধু আনন্দ করিতে হইবে।

অচিরে রাজাদেশ—রাজ্য মধ্যে প্রচার করা হইল। কতিপয় অসভ্যলোক রাজদরবারে আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল—"মহারাজ! আজ আমাদের দশা কি হইবে।"

গুরুগম্ভীর স্বরে মহারাজ প্রশ্ন করিলেন—"কেন? তোমাদের কি?"

কাতরস্বরে অসভ্যগণ ব্যক্ত করিল—"হুজুর! আমরা দিন-মজুর। আজ রাজ্যের কাজ-কর্ম্ম সমস্ত বন্ধ রাখিবার হুকুম দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের উপায় কি হইবে! আনন্দের দিনে কি আমরা অনাহারে থাকিব!"

ভবিষ্যতে দিন-মজুরের বিষয় সুবিবেচনা করা যাইবে এই মীমাংসা করিয়া মহারাজ বেয়াদবগণকে দরবার হইতে বিদায় করিয়া দিলেন।

নক্ষত্র প্রস্ফুটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দীপ-মালায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মহারাজ বিজয়োৎসব পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। রাজধানীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া রাজমহলের তোরন-দ্বারে উপনীত হইয়া বিষণ্ণ বদনে মহারাজ কহিলেন—"দেখ দামোদর, অদ্যকার এই উৎসবে আমি বেশ আনন্দ পাইলাম না। এ উৎসবে আমি কোন প্রকৃত প্রাণের সাড়া পাইলাম না। ইহার কারণ?"

"কি জানেন মহারাজ! দেশে আর তদ্রূপ প্রাণ নাই। যাহা আছে—তাহারও আর সাড়া দিবার মত অবস্থা নাই। অকর্ম্মণ্য অসাড় হইয়া গিয়াছে।"

কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে মহারাজ বলিলেন—"কেন?"

"এ রাজ্যের প্রজাগণ নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে বলিয়া।"

বিস্ফারিত নেত্রে মহারাজ বলিলেন—"তবে অবিলম্বে এ নিমখারামগণকে উদ্বিগ্ন অস্থির করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হউক। এবং বিজয়োৎসবের জন্য অন্যদিন নির্দ্দিষ্ট কর।"

যুক্তকরে দামোদর বলিল—"মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য এবং অধীনের একটা নিবেদন। আগামী বিজয়োৎসবের উদ্যোগ আয়োজনের সম্পূর্ণ ভার এই দাসের উপর ন্যস্ত করা হউক।"

মহারাজ দামোদরের উপর উৎসবের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তাহকাল পরে একদিন অপরাহ্নে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কিসের চিৎকার দামোদর?"

"মহারাজ! ঐ শুনুন—প্রাণের সাড়া। আজ বিজয়োৎসব, তাহাই প্রজাগণ উল্লাসধ্বনি করিতেছে।"

"সে কি দামোদর! আজ বিজয়োৎসব—তাহা আমাকে পূর্ব্বে জানাও নাই কেন?"

"মহারাজ। আনন্দের হেতু বা কারণ উপস্থিত হইলে, প্রাণের প্রকৃত আনন্দ-উৎসব স্বাভাবিক-মার্গে আপনি আসিয়া মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে। আনন্দ—পূর্ব্বাহ্নে তাহার আগমনের জন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় না। আনন্দকে অভ্যর্থনা করিতে সাজ শয্যা করিয়া প্রাণে আসন বিস্তার করিয়া প্রস্তুত হইতে হয় না। আনন্দ—দাম্ভিক নহে। আনন্দ, অতি নম্র—উপযাচক। চলুন মহারাজ আনন্দোৎসব দর্শন করিবেন চলুন।"

রাজপথ লোকারণ্য। আবালবৃদ্ধ বণিতা আজ কিসের আনন্দে পূর্ণ উৎসাহে: চলিয়াছে। রাজ্যের কুত্রাপি পত্র-পুষ্পের আড়ম্বর নাই। চতুর্দ্দিকে অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে—"জয় মহারাজের জয়।" রাজধানীর উপর দিয়া একটা ফ‍ূর্ত্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে শত সহস্রাধিক দৈন্য-মলিন মনুষ্য সমবেত হইয়াছে, হস্তিপৃষ্ঠে মহারাজকে দর্শন করিয়া সকলে গগনভেদী চিৎকার করিল "মহারাজের জয় হউক।"

দামোদর হস্তোত্তলন করিয়া বলিল—"মহারাজ! এতদিন আপনি রণোন্মাদে উন্মত্ত ছিলেন,—রাজ্যে দুর্ভিক্ষ মহামারিতে একটা হাহাকার উঠিয়াছে, এ সংবাদ আপনি অবগত আছেন কি? এই দেখুন আপনার রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক প্রজা আপনার সম্মুখে উপস্থিত। বিজয়োৎসব করিবার আপনার এই শুভলগ্ন। উহাদের অনশনক্লিষ্ট মুখে আহার দিবার ব্যবস্থা করুন, দেখিবেন আপনি আনন্দ সহস্রধারায় প্রবাহিত হইতে থাকিবে। নতুবা যাহার উদরে অন্ন নাই, তাহার প্রাণে আনন্দ স্থান পাইবে কোথায়? মহারাজ! আদেশ দিন।"

"কিসের আদেশ দামোদর!"

"কিসের আদেশ? এখনও বুঝিতে পারেন নাই মহারাজ! ইহাদের আমি আহার দিব বলিয়া এখানে আহ্বান করিয়াছি। আপনার এই অনাহারী প্রজার ক্ষুধার্ত্ত লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে আপনার রাজ্যের ভোজ্য ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিউন, দেখিবেন—সে কি আনন্দ, সে কি মহোৎসব।"

সপ্তাহকাল ব্যাপী রাজ্যে দানছত্র চলিল। দরিদ্র প্রজাগণ দানসামগ্রী লইয়া পরিতৃপ্ত আনন্দে মহারাজের বিজয়-মঙ্গল-গীতে দশদিক্ মুখরিত করিয়া চলিয়া যায়। উচ্চমঞ্চে উপবেশন করিয়া মহারাজ সেই দৃশ্য দর্শন করেন আর বিমলানন্দ তাঁহার প্রাণে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, স্বর্গীয় সুখস্পর্শে শরীর শীতল হইয়া যায়।

সপ্তাহের শেষ দিবসে মহারাজ বলিলেন—"দামোদর, তোমার বিজয়োৎসবের আয়োজন সফল হইয়াছে। আমি আনন্দ পাইয়াছি।"

রজনীর শেষ ভাগে মহারাজ স্বপ্ন দেখিলেন—দুইটি বালিকা,—মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ মাখিয়া মহারাজের শয্যা পার্শ্বে আসিয়া কহিল—"বাবা! আমরা আসিয়াছি।"

"কে মা তোমরা?" বালিকাদ্বয় সহাস্যে উত্তর করিল,-"আমার নাম তৃপ্তি।" "আর আমার নাম—শান্তি।"

দুই হস্তে তাহাদের আলিঙ্গন করিতেই মহারাজের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল।"

গল্প শেষ করিয়া প্রবীণ বলিলেন—"তাই বোল্‌ছিলাম মা,—দেশের লোক উপোস ক'রে আছে,—আনন্দ কোরবে কে?

পিতার মুখে করুণ দৃষ্টি ফেলিয়া কন্যা বলিল—"অচ্ছা বাবা,—আমাদের রাজাও কেন—যারা খেতে পায় না—তাদের খেতে দেন না?"

"দিচ্ছেন বই কি মা! যেখানে দুর্ভিক্ষ হোচ্ছে, সেখানে আহার যোগাচ্ছেন উলঙ্গকে কাপড় দিচ্ছেন। অনেক দিচ্ছেন বই কি মা

"তবে কেন আমরা দু-বেলা ভাত খেতে পাই না?"

"আমাদের চেয়েও অনেক কাঙ্গাল আছে মা, যারা এক বেলাও ভাত খেতে পায় না।"

"উঃ তাদের কি কষ্ট বাবা! আমার যদি অনেক টাকা থাকতো?"

"তাহোলে কি কোরতে?" "তাহলে সব্বাইকে দিতাম।" কন্যা পিতার বুকে মুখ লুকাইল। দূরে বিজয়োৎসবের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাষাণ উদ্ধার

এখনো গৌতমবধূ পাষাণ শয়নে !
চিরকুদ্ধ আঁখি মেলি' দেখ একবার
গোলোক ছাড়িয়া শুধু তোমারি কারণে
কে আজ অতিথি ওই দুয়ারে তোমার ?
কি পাপ তোমার দেবি, কি ভয় জীবনে ?
আপনি যে পুণ্যময় অভয় বিলা'তে
অভিরাম রূপ ধরি' নেমেছে ভুবনে
ছড়াইতে মুক্তি বীজ চরণ ধূলাতে।

কি তপ গৌতম তুমি তপিছ কোথায় ?
জীবনে শিখেছ, শুধু পাপীরে ঘৃণিতে,
সে এসেছে, তুমি যারে সাধিছ বৃথায়,
পাপের পাষাণ ভার বুকে তুলে নিতে।
জাগ গো গৌতমবধূ, ঘুমায়ো না আর
বিধাতা অতিথি আজ দুয়ারে তোমার।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অধিকার

সমাজ-সংস্কার

সম্প্রতি আমাদের দেশের নব নেতৃবর্গ অধিকারের দাবীর দোহাই দিয়ে সমাজের মধ্যে সংস্কার আনবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছেন। তাঁদের এই চেষ্টা নিশ্চয়ই সাধু; যে হেতু তাঁদের যুক্তি এবং তর্কের মধ্যে বিবেচনার অভাব বেশী নেই। এ সম্বন্ধে আলোচনাও সমাজের পক্ষে কল্যাণ-কর; সুতরাং এ বিষয়ে দু'চারটে কথা বল্‌লে হয় ত সেটা অন্যায় হবে না। আজ কালকার সমাজসংস্কারের আলো-চনার প্রধান সুর হল অধিকার, অর্থাৎ যার যা অধিকার তাকে তার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়, বাস্তবিক পক্ষে এই অন্যায়টা ঘৃণ্য—এবং এ রকম অন্যায় যত না হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে—অধিকার মানে কি ? একটা হচ্ছে স্বভাবজাত অধিকার আর একটা হল ঘাড়ে চাপা অধিকার। আমরা দেখ্‌তে পাই, ঘাড়ে চাপা অর্থাৎ Imposed Right কোন দিন টেকসই হয় না। যার স্বভাবের মধ্যে বড় একটা অধিকারকে ধারণ করবার ক্ষমতা নেই তাকে যদি কোন বড় অধিকার দেওয়া যায়—সে অমনি স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সেই অধিকারের অবমাননা করে। কাজেই আমাদের উচিত হচ্ছে—অধিকার দেবার আগে দেখে নেওয়া কাকে কোন্ অধিকার দেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে কে কাকে অধিকার দেবে, অর্থাৎ অধিকার অন্যকে দেবার মালিক কে ? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হল—যে অধিকার কাড়ে সেই অধিকার দেবার মালিক। এক কথায় Might is rightটা কাণে ঠিক না শোনালেও—এটা নিশ্চয়ই ঠিক যে Rightএর সঙ্গে Mightএর সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ। অবিশ্যি এখানে একটা কথা উঠতে পারে—Mightটা কি ? সোজা কথায় Mightটা হ'ল ক্ষমতা। ক্ষমতাটা ধর্ম্মভাবাপন্নও হতে পারে, আবার পশুভাবাপন্নও হতে পারে। তা মানুষ যখন ষোল আনা দেবতা নয়—কিছু পরিমাণ যখন মানুষের মধ্যে উগ্র প্রবৃত্তি আছে, তখন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি মাঝে মাঝে ক্ষমতার অপব্যবহার করবে এটা স্বাভাবিক। আমি বলছি না যে, যেটা স্বাভাবিক সেইটেই সব সময় ভাল।

কাজেই ক্ষমতার অপব্যবহার স্বাভাবিক হলেও তা নিশ্চয়ই মন্দ। কিন্তু তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, যেটা স্বাভাবিক সেইটের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সংস্কার বল উন্নতি বল সবটাই চালান কর্ত্তব্য। অন্তত এইটে হ'ল আজকালকার থিওরি। আমাদের সমাজে আমরা ক্ষমতা সম্পন্নেরা মানুষকে তার স্বভাব-জাত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি —এবং তারি ফলে আমাদের সমাজে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা সঞ্চিত হচ্ছে। এ কথা আজ কালকার উদীয়মান এবং প্রবীণ লেখকগণ নানা ছন্দে, নানা বর্ণে অনেকবার বলেছেন এখনও বলছেন, কাজেই ও কথার বড়ির দাল ফেঁটিয়ে বিশেষ কোন লাভ দেখি না। এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—আমরা মানুষকে অধিকার দিতে গিয়ে দানের অতি নেশায় স্বাভাবিকতার ব্যাড়া ডিঙিয়ে যাচ্ছি কি না? আমাদের মনে হয়—সেই গলদ হচ্ছে। জাতি বিচারের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নেই। কেন না, সেখানে আমরা বাস্তবিক বিশেষ অন্যায় করেছি, অর্থাৎ সমাজে ব্রাহ্মণ্য কৌলিণ্যকে সপ্তম স্বর্গে তুলে রাখ্‌তে গিয়ে আমরা অব্রাহ্মণদের পায়ের তলায় রেখেছি। এই রকম পাপটা যে চিরকাল চল্‌তে পারে না, সেটা এখন আমরা মুখে না বুঝ্‌লেও কাজে বুঝি—কারণ, এখন ভদ্র এবং শিক্ষিত ছাত্রসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রে মেলা মেশায় তেমন কোন অসামঞ্জস্য নেই। কিন্তু যখন আমরা একজন চাষীকে বলি একজন প্রফেসারের সঙ্গে সভায় এক আসনে বসে যাও—তখনি আমাদের মনে হয় আমরা অধিকারদানের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাই। এ সম্বন্ধে তার্কিকেরা খুঁটিনাটি বিস্তর তর্ক তুল্লেও—মোটের উপর এই অসামঞ্জস্যের কোন প্রতিকার হয় না। একজন নীচ বংশের ছেলেকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে তাকে উচ্চমনা করে উচ্চাসন দেওয়া ভাল। মানুষের কতগুলি জন্ম অধিকার সকলের সঙ্গেই সমান, কিন্তু কর্ম্ম অধিকার সমান নয়—যেহেতু সকলের ক্ষমতা এক রকমের নয়। একই মায়ের পেটের এক ছেলেকে বিধাতা কেন হাইকোর্টের জজ হবার অধিকার দেন, আর অন্য ছেলেকে কেন ভিক্ মেগে বেড়াবার সুযোগ দেন এ সম্বন্ধে সান্ত্বনা লাভের জন্য আমরা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল নিয়ে হট্টগোল করলেও—এখনও এর কোন মীমাংসা হয় নি। যা হউক বিধাতা যাকে যে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন —তাকে যখন আমরা সেই অধিকার জোরজবরদস্তি করে দিতে যাই বিভ্রাট উপস্থিত হয় তখনি; আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয় ত মনে করি, একটা উলঙ্গ সাঁওতালকে কোলের কাছে বসিয়ে ঘি ভাত খাওয়ালেই তাকে তাঁর জন্ম অধিকার দেওয়া হল। এটা অধিকার দেওয়া নয়, পরন্তু অধিকারের ইজ্জত নষ্ট করা। আর এই শ্রেণীর অধিকার দান কিম্বা অধিকার প্রাপ্তি মানুষকে—তার আসল উদ্দেশ্য হ'তে অনেক দূরে টেনে নিয়ে যায়। সাঁওতাল হিতৈষীর পক্ষে সেইটেই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য যে, সাঁওতালকে এমন শিক্ষা দেওয়া যে—ঐ রকমে ঘি ভাত খাবার অবস্থা হবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন সে তার দৈন্য-আশ্রমের ভিজে পানতা ভাতকে ঝাঁটা মারতে না শেখে। অধিকার পাওয়ার মানুষ মানুষকে সাহায্য করতে পারে—কিন্তু কোন মানুষকে অধিকার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের নিজের আত্মশক্তির মধ্যেই অধিকারের বীজ অঙ্কুরিত হয়। অবিশ্যি বাইরের প্রতিকূলতায়—অনেক সময় সে বীজ অঙ্কুরিত হ'তে পারে না। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সেই প্রতিকূলতায় সায় দেব না।

মেয়েদের অধিকারকে আমরা পুরুষেরা হিন্দুসমাজে বড় বেশী রকম খর্ব্ব করেছি, অর্থাৎ তাদের লেখা পড়া শেখান কর্ত্তব্য মনে করিনি। লেখা পড়া শেখায় মানুষ জ্ঞানে উন্নত হয়। আমাদের দেশে পুরুষেরা কতকটা স্বার্থের জন্য কতকটা সামাজিক মঙ্গলের জন্য মেয়েদের একটু কোণ ঠাসা করে রেখেছে। কিন্তু সেই কোণঠাসার মধ্যে কেবল যে পুরুষেরই হাত আছে, এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পূর্ব্বেই বলেছি সব অধিকারের মূলে ক্ষমতা আছে। তর্ক বাদ দিয়ে সত্যি বল্‌তে কি এই ক্ষমতার আসরে বহুক্ষেত্রে নারী দুর্ব্বল। চিন্তায় দুর্ব্বল, কাজে দুর্ব্বল, এমন কি উদারতায় দুর্ব্বল। এগুলো হল রমণী সমাজের স্বভাব দত্ত জন্মলব্ধ অক্ষমতা। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে অক্ষমতা কথা প্রয়োগ করা চলে না। কারণ যার যেটা নয় সে যদি সেটা থেকে বঞ্চিত হয় তা হলে সেটাকে কেউ অন্যায় বলে না। অর্থাৎ অশ্ব শৃঙ্গ হতে বঞ্চিত এ কথাটা ভুল, এবং বিষম ভুল। শৃঙ্গবিহীন গরুকে শৃঙ্গ বঞ্চিত গরু বলা যেতে পারে, কারণ গো-জাতির শৃঙ্গে অধিকার আছে। যে ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের কাছাকাছি অধিকারের রাস্তায় তাল ঠুকে এসে

দাঁড়ায় সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বলতে হবে—ঐ মেয়ারা মেয়েদের অধিকার থেকে বঞ্চিত।

পুরুষ যদি হঠাৎ গৃহিণী হয় তা হলে পৌরুষের দিক দিয়ে সে ছোট হয়ে পড়বে। এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষে মাঝে মাঝে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। এই ব্যতিক্রম গুলোকে ব্যাকরণের exception ruleএর কোঠায় ফেলে রাখা উচিত। কারণ সাধারণ নিয়মে জগত চলে—অসাধারণ নিয়মে চলে পাগল এবং প্রতিভা। মেয়েদের শরীর সম্বন্ধে বিধাতা কতগুলো এমন আইন কানুন করে রেখেছেন—যার জন্যে মেয়েদের পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে তালে তালে চলা। সন্তান, বাবা এবং মার দুজনেরই। কিন্তু ছেলের দিক দিয়ে মার কর্ত্তব্য যতটা, পুরুষের কি ঠিক তাই? কখনই নয়। এ অবস্থায় যদি বলি "কেন মেয়ে পুরুষ দুই সমান, অতএব পিতার কর্ত্তব্য মাতার সঙ্গে সমান হবে"—তাহলে অন্যায় বলা হবে।

মেয়েদের যেটা স্বাভাবিক অধিকার সেখানে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। কিন্তু যখন মেয়েরা বলেন পুরুষের সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে আমরা সমান তখনও সেটা ন্যায় নয়। সত্যি কথা—সমাজে আইন কানুন তৈরির বেলা পুরুষের কলমটাই একমাত্র চলে—মেয়েদের কলম চলে না! এ সম্বন্ধে অধিকারের নেশায় মত্ত হয়ে—একশবার সভা এবং সমিতি করেও এটা ঠিক যে সমাজ শাসন কিম্বা দেশ শাসন সম্বন্ধে মেয়েদের চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ কোন দিন কোন কাজ দেবে না। একটা বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে যেখানে—হাজারো সমস্যা বর্ত্তমান সেখানে মেয়েদের বুদ্ধি চলে না। এ সম্বন্ধে মেয়েরা বিদ্রোহ করলে—পুরুষদের অশান্তির সঙ্গে মেয়েদের অশান্তিও কম হবে না। পুরুষ একটু ক্ষমতাসম্পন্ন কাজেই সে ক্ষমতার কাছে অক্ষমের অবনতি আছে; অবিশ্যি পুরুষ সে ক্ষমতার অপব্যবহার করুক এটা কোন দিন বাঞ্ছনীয় নয়। বাঞ্ছনীয় নয় বলেই মেয়েদের প্রতি পুরুষের অযথা অত্যাচারের জন্য পুরুষেরাই মেয়েদের চেয়ে বেশী রকম চেঁচামিচি করচে। যার যতটা ক্ষমতা—তার অধিকার ততটা। ক্ষমতার একটা দাবী আছে—সে দাবীকে সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আগুন যতক্ষণ আগুন থাকে ততক্ষণ সে কণা মাত্র থাকলেও ভয়ের কারণ হয়। তেমনি ক্ষমতা যেখানে বর্ত্তমান সেখানে তার দুর্ব্বলতায় বেশী কিছু আসে যায় না। কিন্তু যেখানে গোড়ায় গলদ অর্থাৎ যেখানে ক্ষমতার লেশ নেই সেখানে অধিকারের জয়-মুকুট এনে হাজির করলেও কিন্তু হবে না। কয়লায় আগুন না দিয়ে ফুঁ দিলে যেমন ঠোট ব্যথা হয়—তেমনি যার ক্ষমতা নেই তাকে অধিকার দিলে—সে অধিকারকে ব্যর্থ করে।

আজকাল দেখতে পাই অনেকে মেয়েদের এবং অধঃপতিত জাতিদের অধিকার দেবার জন্যে ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার ফলে একটা বিভ্রাট উপস্থিত হয়। অবশ্য সংস্কারের প্রারম্ভ-পর্ব্বে এই বিভ্রাট স্বাভাবিক, তবু এ সম্বন্ধে আমাদের একটু ভেবে দেখা কর্ত্তব্য। যারা দীর্ঘদিন প্রাপ্য অধিকারটুকু থেকে বঞ্চিত, তাদের যদি হঠাৎ প্রাপ্যের উপর আদর্শজাত অধিকার দাও তাতে তাদের অমঙ্গল বই মঙ্গল হবে না। খেয়ে পরে পেট মোটা হয়ে থাকা মন্দ না। কিন্তু যে পেট রোগা তাকে একদিনে উদারতা বশতঃ অনেক বেশী গিলিয়ে দিলে সে বাড়ীতে কলেরা ডেকে আনে; ফলে নিজেও মরেই অন্যকেও জ্বালায়।

আমাদের দেশের মেয়েদের অধিকার কতটা এবং কি এ বিষয় তুমুল আন্দোলন হওয়া চাই। কারণ, এ সব বিষয় বাদ প্রতিবাদের জাতাকলে পড়লেই ঠিক সত্যের দেখা পাওয়া যায়। ইংরেজি মেয়েদের অধিকারের সঙ্গে আমাদের দেশের মেয়েদের অধিকারের তুলনা চলে না। কারণ এক এক দেশের মানুষ এক একটা স্বতন্ত্র ধাতে তৈরি। অধিকারটাও ধাত বুঝে দেওয়া হয়। সৈন্য চালনার অধিকার সেই নেয়—এবং সেই পায় যার অন্তরে নর যে নারায়ণ এই ভাব কোন দিন সচেতন নয়। তেমনি যে দেশে মানুষ কেবল বস্তুকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকতে চায়—সে দেশের মানুষের অধিকার—আর বস্তুর অতীত ধর্ম্মরাজ্যে যাদের সাধনা তাদের অধিকার সমান হতে পারে না। যে কারণেই হোক আমাদের দেশের মেয়েদের দেহ পবিত্রতার প্রতি আমাদের একটা উচ্চ শ্রদ্ধা আছে। অতিরিক্ত বস্তুতন্ত্র পরায়ণ হয়ে উঠলে মানুষ দেহকে বিশুদ্ধ রাখতে পারে না বলেই এ দেশে পুরুষে আর মেয়ে মানুষে একসঙ্গে মাখামাখিটাকে প্রশ্রয় দেয় নি। কারণ ঐ মাখামাখির ফলে যে স্খলন সম্ভব হয়—সে স্খলনটা এদেশে বেজায় ঘৃণ্য। শুনেছি বিলেতে এ বিষয়ে জনসাধারণের

ঘৃণা তেমন প্রবল নয়, কারণ সেখানে ডাইভোর্স ব্যাপারটা নাকি সমাজের একটা নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে আমরা ওটাকে অমন হাল্কা ভাবে দেখতে শিখিনি! এই সব কারণে এদেশে মেয়ে মানুষের অধিকারের মধ্যে মস্ত একটা প্রভেদ রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে দেহ বিশুদ্ধির দাবীটা স্ত্রী জাতির উপর এত প্রবল কেন? কথাটা না পেঁচিয়ে সহজেই বলি—এর কারণ, স্বভাব-জাত শক্তির প্রেরণায় পুরুষ বেশ একটু চটপটে এবং দৈহিক দিক্ দিয়ে রমণীর চেয়ে অধিক কার্য্যক্ষম এবং অধিক চিন্তাশীল। সাধারণতঃ দেখা যায়—যাদের মধ্যে ইন্‌টেলেক্ট যত বেশী তাহাদের মধ্যে দৈহিক এবং মানসিক অন্যান্য বৃত্তি প্রবলতর। এই জন্যে প্রতিভাশালীর চরিত্র সম্বন্ধে অনেক রকম কাণা ঘুসা শোনা যায়। মোটের উপর স্বাভাবিক কারণেই পুরুষ সবদিক্ দিয়েই একটু উড়ন্ত। এই জন্যে পুরুষের বেলায় সমাজ একটু শাসন-লাগাম ঢিলা রাখে। বলা বাহুল্য এ সত্ত্বেও পুরুষ নিজের প্রবৃত্তিকে দমিয়ে আনবার চেষ্টা প্রাণপণ করছে। যখন সমাজ বেঁধে বাস করা ছাড়া মানুষের অন্য উপায় সেই—তখন যেটাতে সমাজে বেশী অশান্তি না ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখা ভাল। আর মঙ্গল প্রতিষ্ঠার কাজে মেয়েরা স্বাভাবিক নিয়মে পুরুষের বশ্যতা মেনে চলেন। যে ক্ষেত্রে তাঁরা ঐ স্বাভাবিক বশ্যতা স্বীকারে বিদ্রোহ করেন সেখানে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। সেই বিপ্লবের ধোঁয়ায় দুই পক্ষেরই চোখে জ্বালা ধরে। এই যে জ্বালা—এটা কোন পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে। বশ্যতা স্বীকার দুর্ব্বলতার কিম্বা নীচতার লক্ষণ নহে—যদি সেই বশ্যতায় নিজের এবং দশের উপকার হয়।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

পথের লাগি

(১)

পথের লাগিয়া কাটিয়া ফেলেছ আহা
সব বুনো বেলী হয়নি একটু মায়া।
যাইবার পথ বটে ছোট ছিল অতি
কিবা দোষ ছিল? ছিল না কোনই ক্ষতি
তার পাশে পাশে ছিল টগরের ঝাড়
সব কাটা গেছে একটীও নাহি আর
এত পরিমল এত রূপ ডুবে যাক্
পথ চাও তুমি পথটী তোমার থাক্।

(২)

পরে পথ দিতে মরে বড় বড় তরু
রাজ্য শ্মশান নগরী যে হয় মরু।
ভৃত্য প্রভুরে ভ্রাতা যে ভ্রাতারে কাটে
পিতৃশোণিতে অভিষেক করে বাটে।
পথ করে দিতে রূপ পুড়ে হয় ছাই
পোতের পথটী আঁখি জলে রচা চাই।
বড়ই দারুণ বড়ই দারুণ পথ
চলে তাই দিয়ে কত দুরাশার রথ।

(৩)

পথ করে দিতে নির্দ্দোষী দেয় প্রাণ
রাজা দেয় তার স্বাধীন রাজ্য খান।
রমণীর দেহ কোমল শিশুর মাথা
তাই দিয়ে হয় পথের পাথর গাঁথা
পথের লাগিয়া নানা কথার ছল
সমর শান্তি দর্পের কোলাহল।
লোভ ক্ষোভ কোপ বসে বসে রচে পথ
চলে তাই দিয়ে কত দুরাশার রথ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গৃহশিক্ষক

গ্রামে কলেরারোগ নিবারণের নিয়মাবলী। ১

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি যথাযথ পালন করিলে গ্রামে কলেরা রোগের বিস্তার নিবারণ হয়।—

১। এক প্রকার সূক্ষ্ম পোকা খাদ্য বা জল, দুধ ইত্যাদি পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগের পোকা বেশী গরম সহ্য করিতে পারে না। অতএব খাদ্য দ্রব্য দুই বেলাই টাট্‌কা রান্না করিয়া খাইবে। খাবার জিনিষ সমস্তই গরম থাকিতে থাকিতে খাইবে। ঠাণ্ডা অবস্থায় খাইবে না।

২। খাবার জল ও দুধ উত্তমরূপে না ফুটাইয়া খাইবে না। জল কলসীতে ৫ দিন রাখিয়া বাসি করিয়া খাইবে না।

৩। খাবার জিনিষের উপর যাহাতে মাছি বসিতে না পারে এমত ব্যবস্থা করিবে, অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্য সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। কলেরা রোগীর মল মূত্রে ও বমিতে মাছি বসিয়া সেই মাছি কোন খাদ্যদ্রব্যে বসিলে যে ব্যক্তি সেই খাদ্য খাইবে তাহারই কলেরা হইতে পারে।

৪। কলেরা রোগীর বিছানা ও কাপড় ইত্যাদি কোন পুষ্করিণী বা নদীতে কিম্বা কোন কূপের ধারে কাচিবে না। কাপড়চোপড় ফেনাইল জলে ভিজাইয়া, জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইবে কিম্বা হাইডার্জ পারক্লোরাইড বা সাইলিন জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে সংক্রামক দোষ নষ্ট হয়। এক ভাগ ফেনাইল বিশ ভাগ জলের সহিত মিলাইয়া ব্যবহার করিবে। কলেরা রোগীর ময়লা কোন পুষ্করিণী, নদী বা কূপের জলের সহিত মিশিলে যে ব্যক্তি ঐ জল ব্যবহার করিবে তাহারই কলেরা হইতে পারে।

৫। কলেরা রোগীর বিছানা এবং মল ও বমনাদি খড়ের উপর ঢালিয়া কেরোসিন তেলের সাহায্যে পোড়াইয়া দিবে, তাহা না হইলে মাঠে গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুতিয়া ফেলিবে।

৬। কলেরা রোগীর মল ও বমনাদি উপরোক্ত নিয়মানুসারে যত শীঘ্র সম্ভব নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যতক্ষণ এই মল ও বমনাদি বাটীতে থাকিবে তাহাতে মাছি বসিতে না পারে এরূপ বিধায় খোলা না রাখিয়া কোন পাত্রে (মাটির গাম্‌লা, মাল্‌সা বা হাড়িতে) ঢাকিয়া রাখিবে। ঐ পাত্রে ঘুঁটের ছাই ও ফেনাইল জল বা সাইলিন ঢালিয়া রাখিবে।

৭। যাহারা কলেরা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিবেন তাঁহারা কার্ব্বলিক সাবান ও ফেনাইল জলে (উপরোক্ত মাত্রায়) বা হাইড্রার্জ পার ক্লোরাইড বা সাইলিন জলে হাত উত্তমরূপে না ধুইয়া কোনরূপ খাবার জিনিষ বা পানীয় জল স্পর্শ করিবেন না।

এই নিয়ম পালন না করিলে তাহাদেরও কলেরা হইতে পারে।

৮। কলেরার সময় কেহ খালি পেটে থাকিবে না এবং রাত্রি জাগিবে না।

৯। ঐ সময় গুরুপাক কোন জিনিষ খাইবে না। এবং সামান্য পেটের অসুখ হইলেই তাহা অগ্রাহ্য না করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ খাইবে।

১০। বাসগৃহ ও তাহার চতুঃপার্শ্ব সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে, তাহা না হইলে মাছির উপদ্রব হইয়া বাটীতে এবং গ্রামের মধ্যে কলেরা ছড়াইয়া পড়িবে।

১১। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে কলেরা হইলে সেই গ্রামে কোনমতেই যাইবে না। এবং সেই গ্রামের কোন জিনিষ ব্যবহারও করিবে না। যদি একান্ত না গেলে নয়, তাহা হইলে সে গ্রামে অধিকক্ষণ থাকিবে না, সে গ্রামে কোন জিনিষ খাইবে না, এবং তথা হইতে যত শীঘ্র সম্ভব নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পরিধেয় কাপড় চোপড় তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া গরম জলে উত্তমরূপে ফুটাইবে, অথবা হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড সাইলিন জলে ১১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে এবং হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইবে।

এই নিয়ম পালন না করায় অনেক স্থলেই কলেরা আরম্ভ হয় ও রোগ বিস্তার হইয়া পড়ে। ('রায়ত')

গোময়

যাহা মহৎকার্য্যে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত তাহাকে যদি সামান্য কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহার যে অপব্যবহার করা হয় একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা আজকাল সচরাচর গোময়ের যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, উহা অপব্যবহার—গোময়ের অনাদর। গোময় কৃষিক্ষেত্রে সারস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ঘুঁটের আকারে জ্বালানি কাঠের কার্য্যও করিয়া থাকে। যে রাশি রাশি গোময় জ্বালানি কাঠের কাজ করে, উহার তুলনায় যেটুকু সারস্বরূপ ব্যবহৃত হয় উহা অতি সামান্য। ঘরদ্বার লেপিবার জন্য ও অন্যান্য কার্য্যে অতি সামান্য গোময়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা দেখাইতে চাই যে, গোময় সারস্বরূপ ব্যবহৃত না হইয়া ইন্ধনে পরিণত হইলে, উহার বড়ই অসদ্ব্যবহার করা হয়। একমাত্র কৃষিক্ষেত্রে সারস্বরূপ ব্যবহারেই গোময়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার, প্রকৃতির অভিপ্রেত কার্য্য, করা হয়।

গোময়ে যে সকল দ্রব্য একত্রে মিলিয়া আছে, সেই পদার্থসমূহ মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেলে উদ্ভিদ শরীরের উপাদান যোগাইয়া দেয়। সেইগুলি উদ্ভিদ আকারে পরিণত হইলে, গোজাতির আহারস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া পুনরায় যখন গোময়ের আকার প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই দ্রব্যগুলির একটা চক্রপূর্ণ হয়। গোময়স্থিত পদার্থ সকল এইরূপ চক্রাবর্ত্তে ঘুরিয়া পুনরায় গোময়রূপ প্রাপ্ত হইবে, ইহাই স্বভাবের নিয়ম। গোজাতি উদ্ভিদ হইতে যে ধার করে, স্বভাবের বশে তাহারা সেই ধার শোধ দিতে বিলম্ব করে না। গোজাতি ক্ষেত্রোৎপন্ন পদার্থই আহার করে। ঘাস, বিচালি, ভূসি, খোল, সকলগুলিই ক্ষেত্রোৎপন্ন পদার্থ। গোরুরা স্বভাবের বশে যদি থাকিতে পায় তবে ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য আহার করিয়া মল মূত্র ক্ষেত্রেই ত্যাগ করে, এবং ঐ মল মূত্র উদ্ভিদ জীবনের উপযোগী সারের কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদগণের ধার শোধ দিবার জন্য গোময় ও গোমূত্র ক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াই স্বভাবের নিয়ম।

প্রাণিগণ যে উদ্ভিজ্জ দ্রব্য সকল ভক্ষণ করে, উদ্ভিদগণ সেই দ্রব্য সকল, কতক ভূমি হইতে, কতক বায়ু হইতে সংগ্রহ করে, উদ্ভিদভোজী প্রাণিগণের মলমূত্র ভূমিতে ফিরাইয়া দিলে, এই ধার শোধ হয় এবং উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করে প্রাণিগণ প্রশ্বাস সহকারে সেই সকল দ্রব্য বায়ুতে মিশায়—তাহার দ্বারাই বায়ুর ধার শোধ যায়। এখন দেখ, স্বভাবের বশে প্রাণী-উদ্ভিদ এবং মাটি, বায়ু, জল, প্রভৃতি সকলে যে রকমে আপনাদের ভিতর দেনা পাওনা পরিষ্কার রাখিতে চায় মানুষে যদি তাহার বিপরীতাচরণ করে, তবে কি অপব্যবহার করা হইল না? স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইতে গেলে যে কুফল ফলিবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ঘুঁটে পুড়াইলে গোময়স্থিত অধিকাংশ দ্রব্যই ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া গিয়া বাতাসে মিশে, কেবল ভস্মগুলিই পড়িয়া থাকে। যাহা উড়িয়া যায় তাহার মধ্যে এমন দ্রব্য থাকে, যারা ভূমিতে না থাকিলে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যায়। এই পদার্থটি সোরা-জান বিশিষ্ট পদার্থ। ক্ষেত্রে উহা না থাকিলে তথায় শস্য জন্মিতে পাবে না এবং এই পদার্থের ইতর বিশেষে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের পরিমাণের অনেক ইতর বিশেষ হয়। সার পদার্থের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ। ঘুঁটে পুড়াইলে এই সার পদার্থটি বাতাসে মিশিয়া গেল, যে ভস্ম বাকি রহিল তাহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় না হইলেও (কোনও কোনও উদ্ভিদ ভস্মসারে সমধিক বর্দ্ধিত হয়, ইহা সত্য) এই ফল হয়, যে পদার্থগুলি মাটির প্রাপ্য তাহা মাটিতে না পড়িয়া বাতাসে মিশে। মাটি উদ্ভিদগণকে যে যে দ্রব্য ধার দিয়াছিল তাহা আর শীঘ্র ফিরাইয়া পায় না; সুতরাং তাহার উর্ব্বরতা কমিয়া যায়। ভূমি আর সুন্দর শস্য উৎপন্ন করে না, শস্য আর প্রাণিগণের উপযুক্ত সম্যক আহার যোগায় না, এবং মানুষে আপনার দুর্ব্বুদ্ধির ফল অপনারা ভোগ করে।

ঘুটে পুড়াইতে সারোপযোগী যে পদার্থ বায়ুতে মিলিয়া যায় তাহা যে চিরকাল বায়ুতে মিশিয়া থাকে একথা ঠিক

নহে বটে। কেন না স্বভাবের নিয়ম বশে ভূমিতে যে দ্রব্য দেওয়া আছে তাহা কালে ভূমিতেই মিশিবে নিশ্চয়; তাহা না হইলে চক্র পুরে না। কিন্তু ঘুটে পুড়াইলে এই চক্র পূর্ণ হইতে অকারণ এত বেশী বিলম্ব হইয়া পড়ে যে, সেই বিলম্ব শস্যজীবনের পক্ষে বড়ই হানিজনক হইয়া উঠে। শস্যোৎপাদনের জন্য ভূমির যে দ্রব্যগুলি যখন প্রয়োজন তখন তাহা পায় না। যে বৎসর যে ক্ষেত্রে ধান্য জন্মিল, সে বৎসর সেই ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি দ্রব্য খড় ও ধান্যের সঙ্গে মিলিল, পর বৎসর ধান্যোৎপন্ন হইবার সময় ক্ষেত্রের সেই অভাবগুলি পুরণ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ঘুটে পুড়াইলে বায়ুর সহিত যে সার পদার্থ মিশিয়া যায়, তাহা শস্যক্ষেত্রে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়ত যুগযুগান্তর বিলম্ব হইবে। সুতরাং ক্ষেত্রের অভাব ক্রমশই বাড়িতে থাকে। ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রসমূহে সোরাজান বিশিষ্ট পদার্থের যে অভাব জন্মিয়াছে। গোময় সারস্বরূপ ব্যবহৃত না হইয়া জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়াই যে ইহার একটা প্রধান কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

জলের স্রোতে পাহাড়ের মাটি ধুইয়া যায়; প্রতি বৎসর পাহাড়ের যে মাটি ধুইয়া যায় তাহা সমগ্র পাহাড়ের সহিত তুলনায় এত কম যে, পাহাড়ের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহা টের পাওয়া যায় না। কিন্তু এইরূপে একটু একটু করিয়া ক্ষয় হইয়া, কালে সমগ্র পাহাড় ধূলিসাৎ হইয়া যায়। গোময় ঘুঁটের আকারে পরিণত হইয়া জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ায় দেশের ভূমির উৎপাদিকাশক্তির যে হ্রাস হয় তাহা দুই একবৎসরে টের পাওয়া যায় না না বটে, কিন্তু এই একটু একটু হ্রাস হইয়া কালে যে কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। ঘুটের ব্যবহার আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত এবং এই বহুকাল ধরিয়া ভূমির প্রাপ্য পদার্থ বাতাসে মিশিতেছে। বায়ু হইতে মাটিতে ফিরিয়া আসিতে গিয়া আমাদের দেশের ভূমির প্রাপ্য কোন্ অরণ্যে পতিত হইতেছে তাহা কে জানে? আমরা অপনাদের দোষে আমাদের ভূমির উর্ব্বরাশক্তি কমাইতেছি তাই লোকে বলে, যেন রাগ করিয়াই মাতৃভূমি ভারতবাসীগণকে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত করিতেছে।

ভূমির প্রাপ্য দ্রব্য ভূমিকে দিয়া ভূমিকে সন্তুষ্ট কর, তবেই ভূমি তোমাদের উপযুক্ত আহার যোগাইবে।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায় এম, এ, এম, আর, এ, সি;
এম, আর, এ, এস, ই।
(রায়ত)

সংগ্রহবৈচিত্র

আশ্চর্য্য আত্মিক ব্যাপার

প্রতিশোধ-বাসনায় জন্মান্তর

পূজনীয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীমতী সরযুবালা দেবী কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট এক আশ্চর্য্য আত্মিক ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদান করিলাম।

মথুরার কোন বিখ্যাত শেঠ বংশের একটি যুবকের জ্বর হইয়াছিল। যুবকটির বয়স বাইশ বৎসর। জ্বর বাড়িয়া ক্রমে বিকার উপস্থিত হয়। যুবক বিকার ঘোরে নানা প্রলাপ বকিতে থাকেন। কিন্তু প্রলাপের মধ্যেও কতকগুলি কথা বেশ সুসংবদ্ধ ছিল।

যুবক তাঁহার পিতাকে ডাকিয়া বলেন,—বৎসর ২৩ কি ২৪ পূর্ব্বে আপনি আমায় (যুবকের পূর্ব্বজন্মের) বাড়ীতে ডাকাতি করেন। আমার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত আপনি লুণ্ঠিত করিয়া আনেন এবং আমাকে নিহত করেন। সে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য, আমার সে নষ্ট সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত আমি আপনার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

বলিতে বলিতে যুবক নিকটে দণ্ডায়মান তাঁহার পিতার প্রতি

ক্রোধোদ্দীপ্ত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে থাকেন। আবার বলিতে, থাকেন,—গত ২২ বৎসরে আপনি আমার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, আমি হিসাব করিয়া দেখিতেছি, তাহা প্রায় আপনার সেই লুণ্ঠিত অর্থের—যাহা আমার বাটী হইতে আনিয়াছিলেন, তাহার সমান। এখন কেবল পাঁচ হাজার টাকা বাকী আছে। যদি আপনি আমাকে আমার সেই বাকী পাওনাটা দিয়া দেন, তাহা হইলে আপনাকে আর কষ্ট না দিয়া এখনই চলিয়া যাই।

যুবকের পিতা পুত্রের প্রলাপোক্তি বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিশেষ আশ্চর্য্য হন। তাঁহাকে সে সময় একটু চঞ্চল—অন্যমনস্ক দেখা যাইতে লাগিল—তিনি যেন তখন বিবেকের কশাঘাতে একটুকু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্মরণ করিয়া দেখিলেন, —যুবক বিকারের ঘোরে বকিতে থাকিলেও তাঁহার কথাগুলি সব সত্য। তিনি তখন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার শুইবার ঘরে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধটি তখন যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। একটি টাকার তোড়া লইয়া তিনি যন্ত্রচালিতের মত আবার তাঁহার পুত্রের রোগ-শয্যা-পার্শ্বে আসিলেন। পুত্র যাহা চাহিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাই লইয়া উপস্থিত হইলেন।

যুবক টাকার তোড়া দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—আমি কিরূপে আপনার টাকার তোড়া পরলোকে লইয়া যাইব? আপনি এই টাকাগুলি আমার নামে উৎসর্গ করুন এবং উহা গরীবদের দান করুন। কতক টাকা দেবসেবার জন্য রাখিয়া দেউন।

পিতা কোন কথা না কহিয়া পুত্রের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। টাকাগুলি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা আরম্ভ হইয়া গেল। টাকাগুলি ফুরাইয়া আসিবার সময় যুবকের আত্মা তাঁহার জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল।

পিতা পুত্রের মৃত্যুতে শোক করিলেন বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে শোকাভিভূত হওয়া অপেক্ষা তাঁহাকে বোধ হয় অধিক অনুতপ্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছিল।

(দৈনিক বসুমতী)

বিবাহবন্ধনচ্ছেদের মামলা

গত ১৩ই অক্টোবর সোমবারে বিবাহবন্ধনচ্ছেদনের আদালতে মূলতবী মামলা বাদে নূতন করিয়া ২০।২৫টি নূতন মামলা রুজু করা হইয়াছে। বন্ধনচ্ছেদনের আবেদন স্বামী কুলের তরফ হইতেই খুব বেশী রকম আসিয়াছে। ঐ পক্ষ হইতে ১২২৮ খান আবেদন পাওয়া গিয়াছে; পক্ষান্তরে স্ত্রীপক্ষ হইতে ৩৭৮ খানি মাত্র আবেদন আসিয়াছে। পত্নীপক্ষ হইতে বিবাহস্বত্ব সাব্যস্তের আবেদনের সংখ্যা ১৫৫। বিবাহ নাচক করিবার আবেদন পতিপক্ষ হইতে ১৪, পত্নী পক্ষ হইতে ১০। পত্নীপক্ষ হইতে আইনসঙ্গতভাবে পৃথকবাসের প্রার্থনার জন্য দরখাস্ত পড়িয়াছে ৫ খানা। (দৈনিক বসুমতী।

বিবেক বাণী

একের পিঠে শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু এক মুছে ফেল্লে শূন্যের কোন মূল্য নাই। সেইরূপ ঈশ্বরকে প্রথমে লাভ করে অপরাপর কাজ কর, সে সমস্ত সার্থক হবে। যদি তাঁকে ছেড়ে দাও, তাহ'লে সকলই অনর্থক।

চকমিকির পাথর হাজার বছর জলের মধ্যে পড়ে থাকলে তার আগুণ নষ্ট হয় না। তুলে লোহার ঘা মারবা মাত্রই আগুণ বেরোয়। ঠিক ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত সংসারে থাকলেও তার বিশ্বাস ভক্তি নষ্ট হয় না, ভগবৎ কথা হলেই সে উন্মত্ত হয়।

ভিজে দেশালাই হাজার ঘস্‌লে জলে না, কেবল ধোঁয়া উঠে, কিন্তু শুকনো দেশালাই ঘস্‌বামাত্রই দপ করে জলে উঠে। ভক্ত শুকনো দেশালাই, হরিকথা শোনা মাত্রই তার প্রেমাগ্নি জলে উঠে। কিন্তু কামিনী কাঞ্চনাসক্ত মানুষের প্রাণ, ভিজে দেশালাই, হাজার ঈশ্বর প্রসঙ্গেও উদ্ধ হয় না।

বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাইরে মালা জপ্‌লে গঙ্গাস্নান তীর্থে গেলে কি হবে? সংসারাসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটি বেরিয়ে পড়বে। কত আবোল তাবোল বকে, হয় ত বিকারের খেয়ালে হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাত বলে চেঁচিয়ে উঠলো!

টিয়া পাখী সহজ বেলায় রাধা কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণ বলে, কিন্তু বেড়ালে ধল্লে কৃষ্ণ নাম ভুলে নিজের বুলি বেরোয়— ক্যা ক্যা করে। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।

('কাজের লোক')

"কবির মানসী"

(গল্প)

প্রবেশিকা পাড়ি দিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ একদিন সুনীলের কবি হইবার ইচ্ছাটা আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। সুনীল অত্যন্ত করিৎ-কর্ম্মা ছেলে—'শুভস্য শীঘ্রং'—শাস্ত্রের এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতে সে মোটেই বিলম্ব করিল না।

কিন্তু কবি হইতে হইলে কবিজনোচিত চেহারা এবং সাজসজ্জা চাই; তাহার জন্য সুনীল উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। গরমে ভারি জামা গায়ে দেওয়া যায় না বলিয়া দাদার নিকট হইতে টাকা লইয়া নিজের পছন্দ মত ফিন্‌ফিনে একটি জামা কিনিল; গোঁফের রেখা ভাল করিয়া না উঠিতেই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল; ছোট করিয়া ছাটা মাথার চুলগুলি মোটেই কাব্যের সঙ্গে খাপ খাইত না, কাজেই মাথাঘোরা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে বিলম্ব হইল না এবং সঙ্গে সঙ্গে 'কেশরঞ্জন' 'কুন্তলশোভা' ইত্যাদি অনেক প্রকার তৈল কবিবরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। কিন্তু মুস্কিলে পড়িল সে একটা জিনিষ লইয়া, অথচ তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে কবি আখ্যা লাভ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু তাহার জন্য দাদার কাছে দৃষ্টিহীনতার অনেক প্রমাণ দেওয়া সত্বেও দাদা মোটেই কথাটা আমলে আনিলেন না। অগত্যা সেটাকে বাদ দিতেই সে বাধ্য হইল।

এইরূপে উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিয়া সুনীল পূর্ণ উদ্যমে কাব্যচর্চ্চায় আত্মসমর্পণ করিল। বলাবাহুল্য শৃগাল কুকুরের গল্পসমন্বিত ও ত্রিকোণচতুষ্কোণ-চিত্রিত কবিত্বহীন বইগুলি, যাহা প্রবেশিকা সাগরের তরণী বলিয়া খ্যাত, তাহারা সুনীলের কাব্য-জলধির উত্তালতরঙ্গমালা দর্শন করিয়া কোথায় যে গিয়া আশ্রয় লইল, তাহার সঠিক খবর কেহ বলিতে পারে না। এ সব অসার বিষয়ে সময় ক্ষেপ না করিয়া সুনীল আরব্ধ কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে কবি অরুণ বাবুর নিকট হইতে কবিতার ছন্দ, যতি, মাত্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিল। এখন আপন কুঠরীর দ্বার বন্ধ করিয়া সমস্ত সময়টা কবিতা দেবীর আরাধনায় কাটাইয়া দিতে লাগিল। অবশ্য কবিত্বরসহীন দাদার ভয়ে দুপুর বেলাটা স্কুলেই কাটাইয়া দিতে হইত। সে যাই হোক, এরূপ একনিষ্ঠ সাধনায় কবিতা-দেবীর আসন টলিল। তাঁহার কৃপায় দশদিনের মধ্যে ছোট, বড়, মাঝারি অন্ততঃ দেড়শো খানেক কবিতা সুনীলের লেখনী মুখে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল।

কবিদের নাকি একটা মস্ত রকম ব্যাধি আছে যে তাঁহারা যাহা লেখেন তাহা শুনিবার মত একজন লোক চাই। ইহা লইয়াই সুনীল একটু মুস্কিলে পড়িল। এমন সমজদার লোক কে আছে? বেরসিক সমপাঠীরা তো এসব বুঝিবেই না, অনর্থক ঠাট্টা করিবে মাত্র। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুনীল অবশেষে তাহার ছোট বোন্ নীলিমাকেই উপযুক্তজ্ঞানে শ্রোতার আসনে বসাইয়া দিল।

প্রথমটায় নীলিমা ইহাতে একটু বেশ আমোদ বোধ করিল বটে, কিন্তু অল্প দিনের ভিতরই সে ছোড়্‌দার কবিতা-দেবীর উপর ভয়ানক চটিয়া গেল। সুনীলের লেখনী এত রাশি রাশি কবিতা উদ্‌গীরণ করিতে লাগিল, যে, নীলিমার আর হাঁফ ছাড়িবার সময় রহিল না। তাহার উপর নীলিমা কেবল কবিতা শুনিয়াই নিস্কৃতি পাইত না, তাহাকে রীতিমত মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইত—"বেশ হয়েছে," "অতি চমৎকার" "এমনটি আর হয়নি" ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২)

এতদিন সুনীল তাহার কাব্যরসের ভাগ একমাত্র নীলিমাকেই দিয়া আসিতেছিল। এবার বুঝিল, যে, তাহার কাব্যসুন্দরীকে কনে' বউটির মত ঘরের কোণে বসাইয়া রাখিলে তাহার উপর ভয়ানক অবিচার করা হয়, সাহিত্যের দরবারে তাহার গুণপনা দেখানো একান্ত দরকার। যেই কথা, সেই কাজ। সুনীল তার পরদিনই 'স্কোয়ার সাইজের' কতকগুলি লেপাফা কিনিয়া আনিয়া মাসিক, দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক, বিখ্যাত অখ্যাত কুখ্যাত—অনেক পত্রিকায়—(যতগুলি পত্রিকার নাম তার জানা ছিল)—প্রত্যুত্তরের টিকেট সহ এক একটি কবিতা পাঠাইয়া দিল।

সুনীল উত্তর আসিবার দিন গণিতে লাগিল। ক্রমে প্রায় সমস্তগুলির উত্তরই আসিয়া পৌছিল। কিন্তু হায়, "সবে

কর নিরাশার বাণী!" কেহ লিখিয়াছেন, "ধন্যবাদের সহিত প্রত্যার্পিত হইল,"। কেহ লিখিয়াছেন, "স্থানাভাব—ক্ষমা করিবেন"। আবার কেহ লিখিয়াছেন, "এরূপ কবিতা আমাদের আদর্শের অনুরূপ নহে"—ইত্যাদি ইত্যাদি। একমাত্র "নব্যপ্রতিভা"র সম্পাদক মহাশয়ই এই নবপ্রতিভাশালী কবির প্রতিভার কদর বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার কবিতাটী পাইয়া বাধিত হইলাম, উহা শ্রাবণ সংখ্যায় ছাপা হইবে। ভবিষ্যতে আপনার আরো লেখা আমরা আশা করি।" অন্য পত্রগুলি দূরে সরাইয়া রাখিয়া সুনীল অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই পত্রখানা বার কয়েক পড়িল। তারপর কলম লইয়া নূতন কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করিল।

শ্রাবণের ঠিক ২রা তারিখ "নব্যপ্রতিভা" সুনীলের নব্যপ্রতিভাজাত কবিতাটি সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহাদের গৃহদ্বারে আসিয়া হাজির হইল। সে দিন তাহার আনন্দ আর ধরে না! নবপ্রসূতি যেমন একাকী বসিয়া নবজাত সন্তানটিকে বারবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, তেমনি করিয়া সুনীল এই কবিতাটিকে অন্ততঃ পঞ্চাশবারও পাঠ করিল! কিন্তু দাদার ভয়ে তাহার এই প্রতিভার কথাটির সহিত বাড়ীর কাহাকেও পরিচিত করিয়া দিতে পারিল না—নীলিমাও তখন মামাবাড়ী।

(৩)

সুনীল যে কেবল নিজের কবিতা নিয়াই ব্যস্ত থাকিত, অন্যের কবিতার কদর জানিত না, একথা বলিলে তাহার উপর অবিচার করা হয়। সে রীতিমত লাইব্রেরী হইতে মাসিকপত্রাদি আনিয়া সমস্ত কবিতা একবার পড়িত এবং যেটা তার খুব মনে ধরিত, সেটা নকল করিয়া রাখিয়া মুখস্ত করিয়া ফেলিত। এইরূপে সে একখানা বড় খাতা প্রায় ভরিয়া ফেলিয়াছিল কবিছাড়া কাব্যের সমজদার কে আছে!

"আর্য্যগরিমা" তখনকার একখানা শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র আশ্বিনের সংখ্যায় 'চারু রায়' লিখিত "প্রেম" শীর্ষক একটি কবিতা বাহির হইল। সুনীল অনেক কবিতা লিখিয়াছে এবং পড়িয়াছে; কিন্তু এমনটি সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে তৎক্ষণাৎ কবিতাটিকে তাহার খাতায় বন্দী করিয়া লইল এবং সেদিনই উহা 'দাঁড়ি কমা সহ' মুখস্থ করিয়া ফেলিল। সবচেয়ে দুইটি লাইনই তার মনে গুঞ্জরিতে লাগিল—

"কুৎসিতে সুন্দর কর তোমার আলোকধারে,
পরিচিত করে' দাও চির অজানারে।"

সুনীল ভাবিতে লাগিল, আহা, এমন লেখা যার লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে তাহার হৃদয়খানি না জানি কতই সুন্দর—কতই প্রেমপূর্ণ! আচ্ছা চারু রায় পুরুষ না স্ত্রীলোক? পুরুষের শুষ্ক প্রাণের মধ্য হইতে কি এমন লেখা বাহির হয়? সুনীলের হৃদয় বলিয়া উঠিল—না না, কখনও নয়, এ লেখা নিশ্চয় রমণীর কমনীয় হৃদয়ের প্রতিবিম্ব! এতদিন সুনীলের ভাবরাশি মূর্ত্তিমতী মানসীদেবীর আশ্রয় না পাইয়া ব্যর্থতার করুণস্বর তুলিতেছিল। এবার মানসী দেবীর সন্ধান পাইয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। এখন কিরূপে ইহার সহিত পরিচিত হওয়া যায়?

অনেক চেষ্টা করিয়া সুনীল চারু রায়ের ঠিকানা সংগ্রহ করিল। সেদিন আর সে মাথা ধরিয়াছে বলিয়া স্কুলে গেল না, চৌকির উপর পড়িয়া রহিল। বৌদি আসিয়া মাথায় গোলাপ জল ঢালিয়া বাতাস করিতে চাহিলেন। সুনীল বলিল তাহাতে কিছু উপকার হইবে না, নির্জ্জনে একটু পড়িয়া থাকিলে আপনিই সারিয়া যাইবে, আরো দু' একদিন সে এরূপ করিয়া ফল পাইয়াছে। বৌদি চলিয়া গেলেন।

সারাটা দিন গবেষণা করিয়া সুনীল যে দীর্ঘ পত্রখানা লিখিয়া ফেলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম এইরূপ:—ত্রেতাযুগে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া কেবলমাত্র বাঁশরীর সুমধুর স্বরেই মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ প্রেমে-পাগলিনী হইয়াছিলেন, সুনীলও ঠিক সেইরূপ (কলিকাল কিনা, তাই উল্টাদিক হইতে) চারুকে না দেখিয়াই, (এমন কি বাঁশী না শুনিয়াও) শুধু তাহার কাব্য পড়িয়াই তাহার প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছে! তাহাকে সে তাহার কাব্য জগতের মানসী দেবীপদে বসাইয়া 'কাব্য-কুসুম-হারে' তাহার অর্চ্চনা করিতে চায়, ভক্তের এই প্রাণভরা অনুরাগ কি ব্যর্থ হইবে?—এইরূপ অনেক কথা সুনীল তাহার কবিত্বের ভাষায় সাজাইয়া একখানা পুরু রঙিন লেপাফায় বন্ধ করিয়া নিজহাতে ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

(৪)

পাঁচ ছয় দিন পরে সুনীল তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া কবিতার খাতাখানার পৃষ্ঠা উল্টাইতেছিল, এমনসময় তাহার দাদার খাস চাকর ভজু আসিয়া জানাইল, বড়বাবু এখনি ছোটবাবুকে বৈঠক খানায় তলব করিয়াছেন। ছোট-বাবুর কবিতার খাতাখানাও সঙ্গে লইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। শুনিয়া সুনীল চম্‌কাইয়া গেল। এমন সময়ে তাহার তলব কেন? তার উপর আবার কবিতার খাতা! সে যে কবিতা লেখে তাই বা কে তাঁহাকে বলিল? এ নিশ্চয়ই বৌদির কাণ্ড—আচ্ছা, এর শোধ নেওয়া যাবে'খন। যাই হোক্, দাদার আদেশ অমান্য করিবার সাহস সুনীলের হইল না, আস্তে আস্তে নবাগত বধূটির মত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

বৈঠকখানায় গিয়া দেখিল, দাদার পার্শে দীর্ঘশ্মশ্রু এক অপরিচিত ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একখানা পত্র পড়িয়া। সুনীল ঢুকিতেই পত্রখানা হাতে লইয়া দাদা ডাকিলেন, "এদিকে আয়ত, সুনীল।" সুনীলের বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এ ভদ্রলোক নিশ্চয়ই চারুর অভিভাবক। পত্রখানা কোন রকমে ইঁহার হাতে গিয়া পড়িয়াছে, তাই তিনি দাদার কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছেন! সুনীলের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। পত্রখানা সুনীলের দিকে একটু সরাইয়া দিয়া দাদা বলিলেন, "পড়্‌ত দেখি পত্রখানা।" সুনীল কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—একটা কথা উচ্চারণ করিবার শক্তিও তাহার রহিল না। দাদা আবার বলিলেন, "কি দাঁড়িয়ে রইলি যে, পড়্‌না হতভাগা! আজ বাদে কাল পরীক্ষা। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এই সব হচ্ছে! পুড়িয়ে ফেল্, খাতা-গুলো সব্ পুড়িয়ে ফেল্। ফের এ সব করবি ত মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব!"

ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"আঃ, থাক্‌না খাতাগুলো, ছেলে মানুষী একটা করে ফেলেছে, তার জন্যে বেচারার এত পরিশ্রমের জিনিষটে নষ্ট করে দেবে কেন?"

দাদা বলিলেন,—"তুমি বোঝনা, চারু, এরকম ব্যাপারে কঠিন শাস্তিই চাই। খাতাগুলো পোড়ালে চিরদিন একথা মনে থাকবে, আর ও পথে পা বাড়াবে না। ভাগ্যিস্ তোমায় এ পত্রখানা লিখেছিল, একজন ভদ্রমহিলাকে যদি লিখ্‌তো তো কি হতো বল দিকি?" ভদ্রলোকটি আর কিছু বলিলেন না।

দাদার কথা শুনিয়া সুনীলের তো চক্ষু স্থির! অঁা! এরই নাম চারু! এই জোয়ান মদ্দা লোকটীকেই সে মানসীদেবী কল্পনা করিয়া মনে মনে স্বর্গ সুষমা রচনা করিয়াছিল! হায়, হায়, কি ভুলই সে করিয়াছে! চারুবাবুর উপর সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল—এরই জন্য এত লাঞ্ছনা! দাদা আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কি, তবু দাঁড়িয়ে! পুড়িয়া ফেল্—শীগ্‌গির পুড়িয়ে ফেল্।"

যন্ত্রচালিতের ন্যায় সুনীল আগুন জ্বালিয়া এক একখানা পৃষ্ঠা তাহাতে আহুতি দিতে লাগিল। তখন তাহার অন্তরের অবস্থা কবিছাড়া কেহ বুঝিবেন না—বুঝাইতে পরিবেন না। ভাবুক পাঠকপাঠিকা কল্পনার চক্ষে দেখুন। সুনীলের এত পরিশ্রমের এত আদরের খাতাগুলি কয়েকটী মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভস্মসাৎ হইয়া গেল! আর কবির মানসী দেবী (?) তখন চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে গল্প করিতেছিলেন।

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা

প্রকৃতির প্রাণে যেমন একবারেই বসন্তের শুভ আবির্ভাব, সাহিত্যেও তেমনি কচিৎ প্রতিভার স্পর্শ। নিত্য যে সাহিত্য লইয়া কারবার তাহা নিতান্ত কৃত্রিম। সে সাহিত্য জাতি বিলাসের মতই ভোগ করে, তাহাতে জাতীয় জীবনে একটা সাড়া পড়িয়া যায় না, কোন মহৎ ভাবের প্রেরণায় উচ্চ আদর্শের অনুসরণে লোককে প্রবুদ্ধ করে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যসাধনা সমস্তটাই প্রতিভা-প্রভায় প্রদীপ্ত। তাহার মধ্যে গতানুগতিকতা, বা পুরাতনের উপর প্রলেপ এ সব ছিল না। তিনি চলিয়াছিলেন সম্পূর্ণ নূতন পথে, একেবারে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে।

সাহিত্য সৃষ্টির মূলে আছে দুইটী প্রেরণা, দুইটী কামনা। এক আত্মসুখবাসনা, আর এক জাতীয় মঙ্গলসাধন।

সাংসারিক অনেক বিলাসের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিলাসও এক প্রকার উপভোগ। এই তৃপ্তির প্রেরণায়ও সাহিত্য গঠিত হয়। কিন্তু ইহার সৃষ্ট যে সাহিত্য তাহা স্বার্থ-কলুষিত। কারণ মানুষ লুতাজালের মত আপনাকে মাঝে রাখিয়াই উহা রচনা করে। যে প্রবৃত্তি তাহার বাঞ্ছিত, যে আশা তাহাকে চালিত করে, যে সংস্কারে সে গঠিত, তার রচিত সাহিত্য ঠিক তাহারই প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠে। জাতীয় সাহিত্যে মনীষা থাকিলেও তাহা সার্ব্বভৌমিক স্বাধীনগতি হইতে পারে না। স্বার্থকে মাঝে রাখাতে মুক্ত ভাবে কোন সমুচ্চ ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। এ সাহিত্যের দ্বারা ব্যক্তির বা জাতির কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই সাধিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্য সাধকের সাধনা, ভক্তের আরাধনা। ইহা আত্মবিসর্জ্জিত বিশ্বপূজিত। এ সাহিত্য শিবসাধক। ইহা চলিয়াছে সমস্ত হীনতাকে দলিত করিয়া সকল কলুষকে ধ্বস্ত করিয়া আত্মাকে প্রজ্ঞা দান করিয়া যাহা অনিন্দ্য আনন্দপ্রসূ, যাহা কল্যাণকর তাহারই সৃজনে।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিক।

দ্বিজেন্দ্র প্রতিভা ঊর্দ্ধগামী হইয়া স্বর্গকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ভগীরথের মত সেই দিব্য অমৃত ওজস্বী জীবন ধারাকে নামাইয়া এই দুর্ব্বলহৃদয় বাঙ্গালীকে বাঁচাইতে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য ‧ ‧ঠিক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ নাটকে যোশী বলিতেছেন, "এমন কবিতা লেখো যা পড়ে ভাই ভায়ের জন্য কাঁদে, মানুষ মনুষ্যত্বের জন্য কাঁদে!"

এই ভাবই তাঁর সমস্ত রচনার জীবনীশক্তি, তাঁর প্রতিভার.বিশেষত্ব। বাংলা সাহিত্যে ভাইও নাই, মানুষও নাই; আছে কেবল কবি ও মানসী। কাজেই তাহাতে ভায়ের জন্য কিম্বা মানুষের জন্য কাঁদিবার কাঁদাইবার চেষ্টা মাত্র নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু সমগ্র রচনার ভিতর দিয়া মানুষকে মহৎ কি তাহা দেখাইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তদ্ভাব-ভাবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমগ্র দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে "আমির" একটা ক্ষীণ রশ্মিরেখা পর্য্যন্ত নাই। সমস্তই ত্যাগে,সংযমে প্রীতিতে পরার্থে মানবিকতায় উদ্ভাসিত।

তাঁর সাহিত্য সম্পদের দুইটা বিভাগ হইতে পারে। লঘু হাস্যরস রচনা, ও গুরু নাটক।

নাটকের তুলনায় হাস্যরস অল্প হইলেও তার শক্তি কম নয়। বরং সাধারণ ক্ষেত্রে তাহার কার্য্যকারিতা অধিক বলিয়াই মনে হয়। মানুষের স্বভাব এমনি হাল্কা যে, সে তরল জিনিষকেই সাগ্রহে গ্রহণ করে। সেই জন্য তাঁর "হাসির গানে" প্রথমেই জাতীয় মনে একটা উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে হাসিতে গিয়া অনেকেই কাঁদিয়া ফেলিয়াছে, বিদ্রূপের রসভোগ করিতে গিয়া নিজ স্বরূপের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সামলাইয়া গিয়াছে, ভণ্ড অনাচারীকে ব্যঙ্গের কশাঘাত লাগাইতে গিয়া দেখিয়াছে তাহা আগে নিজেরই পিঠে পড়ে।

যে সাহিত্য মনের উপর একটা স্থায়ী ভাবকে মুদ্রিত করিয়া না দেয়, তাহা নিতান্তই বিফল। অবসরযাপনের রসভোগ সাহিত্যানন্দ নয়। সাহিত্য যে ভাবকেই ফুটাক, তাহার স্থায়িত্ব চাই!

দ্বিজেন্দ্ররচনায় এ গুণ আছে। "নন্দলাল" পড়িয়া যে হাস্যের তরঙ্গ বহে তাহা নিমেষেই স্তব্ধ হইয়া যায় না। চিত্তকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া রাখিয়া দেয়, যেন স্বদেশ-ভক্তিতে ঐ হীনতা না আসে।

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্য উন্নতির পথে চলিলেও একমুখী ভাবই তার সর্ব্বাঙ্গীনতার বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালীও যেমন সুখ স্বপ্নে বিভোর হইয়া গরিষ্ঠ আদর্শকে অবলম্বন করিতে পারিতেছে না, বাংলা সাহিত্যও তেমনি সত্য দৃপ্ত মহীয়ান চিন্তাকে বরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে না।

সাহিত্যের প্রয়োজন কি?—আনন্দ?

কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়া আনন্দ পাইবার আবশ্যকতা কি? নাচিয়া গাহিয়া তাস দাবা খেলিয়া বারোয়ারী করিয়া শতেক রকমে ফুর্ত্তি পাওয়া যায়, তবে আবার একটা নূতন কেন? সাহিত্যের বিশেষত্ব কোথায়?

সহস্র ধারায় সুখের প্রবাহ বহিলেও তাহা মরু বিস্তারে শরৎ সম্পাতের মত। বর্ষণের পরেই যে দাহ, সেই দাহ আবার জ্বালা—আবার উৎকট তৃষ্ণা।

সংসারে দুঃখের নিবৃত্তি নাই, মোহের ভ্রান্তির শেষ নাই। মানুষ সাহিত্যিক আনন্দ চায় অমৃত রূপে। তাহা হৃদয়কে

বলিষ্ঠ করিবে, আশাকে আশ্বাসে সঞ্জীবীত করিবে,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—সেই আত্মার উদ্বোধন করিবে। আর যাহারা মহাভাবের ভাবুক, মহাকার্য্যের সাধক, যাঁরা দুঃখকে জয় করিয়াছেন, ক্লৈব্যকে দলিত করিয়াছেন, মোহকে পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রজ্যোতিতে মলিন অন্তর নির্ম্মল করিয়া দেয়।

সাহিত্য রসের ইহাই বৈশিষ্ট।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই বলপ্রদ সুধাময় সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁর নাট্য সম্ভারে যতগুলি চরিত্র আছে, প্রতাপ দুর্গাদাস দারা মহম্মদ চন্দ্রগুপ্ত ভীষ্ম—সকলেই মহাপুরুষ। ইঁহাদের ত্যাগ সত্যনিষ্ঠা সূর্য্যের অপেক্ষা ভাস্বর, চরিত্রপ্রভায় সকল মোহ মালিন্য বিনষ্ট হইয়া যায়!

এ রকম প্রশ্ন এখানে অসঙ্গত নয়, যে শিক্ষাই না হয় হইল, কিন্তু আনন্দ কৈ? সৌন্দর্য্য কোথায়? প্রশ্নটা এখনকার একটা প্রধান বিতর্কের বিষয়।

সৌন্দর্য্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অবয়ব নাই। শ্রী কোথাও দেহী কোথাও অশরীরী। বিমল বাসন্তী গগনে বাসন্তী চন্দ্রমাও শোভনীয়, আবার ঘনতমিস্রা রজনীতে দেহহীন হেনার গন্ধও মনোরম। একটা শরীরী লাবণ্য আর একটা আধ্যাত্মিক শোভা, একটা কায়া আর একটা প্রাণ।

সাহিত্যশিল্প একান্তই আধ্যাত্মিক। চিত্তবৃত্তির বিচিত্র লীলাভঙ্গির অভিব্যঞ্জনায় যে মাধুর্য্য বোধের বিকাশ তাহাই সাহিত্যশ্রী বা আর্ট!

আর্টের এই সূত্রের ভিতর বহু জটিলতা আছে। এক দল ভাল লাগা মাত্রকেই আর্ট বলিয়াছেন। ভাললাগাকে নিকষ করিলে কিন্তু শুদ্ধ আর্টের পরিচয় পাওয়া যায় না! ভাললাগা স্বৈরিণী প্রবৃত্তি। তাহার গতি ভাল দিকেও, আবার মন্দের দিকেও। গীতায় যাহাকে "মনসাম্বরম্" বলিয়াছে, ভাললাগার বিচারে শিল্পের অনুসরণ করিলে সেই পাপাচারের পদে পদে সম্ভাবনা।

দুর্নীতিও ভাল লাগে। সংসারে ইহারই আধিক্য! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এই সবের প্রতিই অধিকাংশের প্রবলতা। কতকাল পূর্ব্বে একজন বুদ্ধ জন্মিয়াছেন, কিন্তু দস্যু তস্কর পররাজ্য-লোভীর অন্ত নাই। কু-নীতি অনেকেরই প্রিয়, তাই বলিয়া তাহা সাহিত্যসৌন্দর্য্য নয়।

সাহিত্যে সাধু এবং অসাধু দুই চিত্রই থাকিবেই। কিন্তু এমন ভাবে থাকিবে যাহাতে মন্দগুলি কুৎসিততম হইয়া এবং সাধু ভাবগুলি উজ্জ্বলতম হইয়া উঠে। যে রচনা-ভঙ্গিমায় যে প্রকাশপদ্ধতিতে মন্দচিত্রগুলি মলিন হইয়া পড়ে এবং উচ্চ আদর্শগুলি শোভনীয় এবং লোভনীয় হইয়া উঠে তাহাই শিল্পকলা!

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে কতকগুলা কুভাবদুষ্ট-রুচি সাহিত্য-প্রাঙ্গনকে আবর্জ্জনা ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর কবি প্রতিভা সেই পাপাচারের বিরুদ্ধে একটা দৃপ্ত অভিযান। তাঁর নাটকগুলি প্রমাণ করিয়াছে মহত্বে কি উদারতম শিল্পসুষমা, আত্মার পবিত্রতার কি উজ্জ্বল অমৃত-ধারা বিলায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যসাধনা ভগীরথের পিতৃপুরুষ-উদ্ধারের মত একটা মহাব্রত—শ্রেষ্ঠ তপশ্চর্য্যা। তাঁর প্রত্যেক লেখাটীর মধ্যে এই সুপ্ত বিমূঢ় জাতিকে জাগাইবার ঐকান্তিক বাসনা গুমরাইতেছে।

জাতীয় চিত্ত যখন বিলাসে স্বার্থপরতায় ক্লৈব্যতার সহস্র দুর্ব্বলতায় ম্রিয়মান, তখন প্রতাপসিংহে, দুর্গাদাসে, মেবার-পতনে, পরপারে, ভীষ্মে যে পাঞ্চজন্য মন্দ্রিত হইয়াছে, তাহাতে জাগিবার বাঁচিবার পুলকোচ্ছ্বসিত সাড়া পড়িয়া যায়।

দিল্লীর ঐশ্বর্য্যসম্পদ, ভারতব্যাপী যশঃ সম্মান সুখ-স্বচ্ছন্দের মোহে মুগ্ধ মানসিংহ, আর তার পার্শ্বেই রাণা প্রতাপ, প্রাণের মাঝে একটা দীপক ভাবকে ফুটাইয়া তোলে, ধারণা হয় তুচ্ছ ঐ কনককোহিনুর, ঘৃণ্য ঐ মানমর্য্যাদা আরামআয়েস, আর কি সাধের ঐ দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের নিদারুণ বিড়ম্বনা। যখন দেখি দেবপ্রাণ দুর্গাদাসের বিশাল চরিত্রজ্যোতি, তখন সমস্ত স্বার্থ পুরীষের মত হেয় হইয়া উঠে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে এমন একটা চরিত্র নাই যাহাতে না একটা মহাভাবকে উদ্রিক্ত করে। আর সে সকল সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে তন্দ্রাজড়িমা নাই—তাহা সন্ধ্যার কৃষ্ণচ্ছায়া নহে, প্রভাত প্রফুল্লিত প্রস্ফুট মাধুর্য্যে পরিশোভিত।

যে আর্টের ধুয়ায় পাপের চিত্রগুলি অবাধে সাহিত্যে প্রসার পাইতেছে, দ্বিজেন্দ্রলাল নীতিপরায়ণ হইলেও সেই কালিমালিপ্ত ছবিগুলিও তাঁর সাহিত্যে প্রচুর।

কারণ অন্ধকারের পাশেই আলোকের উজ্জ্বলতা, কৃষ্ণের পার্শ্বেই শুভ্রের শোভনীয়তা। দ্বৈতের দ্বন্দ্বেই শ্রীর প্রতিষ্ঠা।

তথাকথিত আর্টবাদীরা মন্দকে আঁকিতে গিয়া এমন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তার কাছে পুণ্য নিষ্প্রভ। কিন্তু এ একটা মহা দুষ্কৃত ব্যবহারিক জগতের অন্যায়ের ন্যায়, অথবা তার অপেক্ষাও ইহা অন্যায়। ইহাতে পাপের প্রতি আরও আকর্ষণ বাড়ে। জাতির মর্ম্ম কলুষিত হইয়া পড়ে।

দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে মন্দ আছে, কিন্তু মোহন হইয়া নাই, ভালকে উত্তম করিতে আছে। সত্য ও শালীন আর্ট তাহাই। ঔরঙ্গজেবের ময়ূরসিংহাসন লাভ অপেক্ষা দারার দুর্ভাগ্যকেই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়, গুলনেয়ারের রূপ যৌবন পিশাচীর ভীষণ কদর্য্যতায় ক্লিন্ন।

অনেকের মত শিক্ষার বিষয় হইলেই কবিত্বে হানি ঘটে। কথাটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

পতিতই কেবল মন্দের মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখে। বারাঙ্গনার দেহে যে চারুতা দেখে, লাম্পট্য কাপট্যে যে শোভা দেখিতে পায়, আত্মার অধোগতিতে যে রস পায়, সে আর যাই হোক, মানুষের অনাত্মীয়। মানব গোষ্ঠীর যাহা মাধুর্য্য, তাহা সমস্তই শুদ্ধ সত্ত্ব গুণান্বিত।

মানুষের কাছে কমনীয় বেশ্যা নহে, শ্যামাঙ্গী নিরাভরণা কুললক্ষ্মী। শাক্য রাজকুমার আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র নহেন, ভিক্ষুক সিদ্ধার্থই আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা।

ভাল লাগাই যখন সৌন্দর্য্যের নিকষ, তখন ত কুভাবের মধ্যে শিল্প-সুষমা নাই। যাহা কিছু শুদ্ধতম তাহাই ত মানুষের কাছে রমণীয়। ভীষ্মের ত্যাগ, রামের পিতৃসত্যপালন, এই সব মহাপ্রাণ—তাঁইত আমাদের কাছে মহাসুন্দর।

মনোবৃত্তির প্রকৃতি—তাহা সত্য হইলে অপর ক্ষেত্রেও সংক্রামিত করিবে। এই জন্যই সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নহে।

সৌন্দর্য্য বোধের দুইটী দিক। একটি মাধুর্য্য—তাহাতে শুধু তৃপ্তি—একটু মিষ্ট অনুভূতি—ইহা তন্দ্রার মত অলস আবেশ। আর একটা মহিমা; ইহাতে জাগরণের আনন্দ, সাত্ত্বিক সুখ। যূথিকার গন্ধে হৃদয়কে মোহিত করিয়া ফেলে, আকাশের বিশালতার অন্তরে একটা উদার আশা জাগাইয়া দেয়।

দ্বিজেন্দ্র নাট্যে এই পুষ্প মাধুরী অপেক্ষা অভ্রচূড় মহিমারই আধিক্য। ইহার কারণ তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় প্রাণশক্তিকে প্রবুদ্ধ করা।

মহম্মদের সাম্রাজ্য উপেক্ষা, দারার নিস্পৃহভাব, দুর্গাদাসের কর্ম্মোল্লাস, সরযুর স্বামীগৃহের দারিদ্র গ্রহণ, এ সকল মহিমাপ্রভাত পুলক।

এক কথায় বলিতে গেলে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য সাধনা বাংলা ভাষায় নবজীবন দান করিয়াছে। ক্ষুদ্রতা দৈন্য মালিন্য অমঙ্গল যাহা ছদ্মবেশে জাতীয় ধর্ম্মকে ক্ষয় করিতেছে, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহা হইতে রক্ষা করিতে একটা মঙ্গলময় মধুময় ওজস্বী আদর্শ ধরিলেন।

বাংলা সাহিত্যে জননী ভগিনী পত্নী কল্যাণময়ী নারীকে কেবল নায়িকা মূর্ত্তিতেই দেখা গিয়াছে। কিন্তু এর অপেক্ষা অকল্যাণ আর কি হইতে পারে? ঈশ্বরের করুণা যা নারীমূর্ত্তিতেই প্রত্যক্ষ, তাহাকে কেবল ভোগের উপকরণ করা হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু সেই মহীয়সী নারীকে স্বর্গীয় ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁর নারী চরিত্রগুলি "নির্দ্দোষ উষার চেয়েও, নির্ম্মল বীণার ঝঙ্কারের চেয়েও সঙ্গীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়েও পবিত্র।" মহামায়া, মানসী সত্যবতী, সরযু ইহাদের চরিত্র হইতে একটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি বিস্ফুরিত হইতেছে।

ভালবাসা ভোগে নহে সেবায়, স্বার্থ সম্পূরণে নহে আত্মত্যাগে। নারী সম্পূর্ণভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই পূজ্যা। দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে কোনখানে নায়িকা-বিকট প্রধান চরিত্র নাই।

পত্নীত্বও নারীত্বের একটা সুকুমার অংশ! তাহাও পবিত্র, সুন্দর, লালসাবেশহীন। মহামায়া সরযু সরস্বতী প্রভৃতিতে ইহা সুস্পষ্ট। আর লালসাশূন্য হইয়াও যে ভালবাসার চিত্র আঁকা যায়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মানসী ও ছায়া।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর নারী চরিত্রগুলির একটা বিরুদ্ধ মত আছে এই যে উহা অস্বাভাবিক।

উহা অসাধারণ বটে। কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সাহিত্য শুধু স্বাভাবিক হইলে উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। যে সকল বিষয় ব্যবহারিক জগতে নাই, যে সব আদর্শ কল্পনায় অপরিচিত, সাহিত্য তাহারই সৃষ্টি করিবে। সে সব অসম্ভব হইবে না, তারমধ্যে সম্পূর্ণ সম্ভাবনীয়তা থাকিবে শত।

তুচ্ছতার দাস কামনাক্লিষ্ট আমাদের কাছে ভীষ্মের ত্যাগ এবং সংযম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাই কি? ভীষ্ম চরিত্রের ভিতর সত্য না থাকিলে মানুষ যে পশু হইয়া পড়ে, সংসার নরক সদৃশ হয়।

সাহিত্যে নরনারী বেশীর ভাগ নায়ক ও নায়িকা। ব্যবহারিক জগতে ইহা মহা-ব্যভিচার এবং অসত্য এবং জীবনের পক্ষেও উহা মারাত্মক।

দ্বিজেন্দ্র বাবু এ অনাচারকে বর্জ্জন করিয়া মানুষকে সত্য মানুষ করিয়াই আঁকিয়াছেন। তিনি মানুষী ভাবের সঙ্গে দৈবী ভাবের সংমিশ্রণে নরনারায়ণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাই তাঁর স্নেহপাগল সাজাহান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দুর্গাদাস, দেশবৎসল প্রতাপসিংহ, স্বর্গেরস্বপ্ন মানসী, মূর্ত্তিমতী মমতা সরযু, সকলেরই মধ্যে মানুষ!

যুগে যুগে মানুষই মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রতিভূ হইয়া আছে। সাক্ষাৎ দেবী ভগবান্ এই মর্ত্তেরই মানব। মানবের করুণা স্নেহ প্রীতি সখ্য মায়া মমতা এই অশান্তি-জর্জ্জর জগতে ঐশ্বরিক দান। সাহিত্যে সেই নরদেব উপেক্ষিত ও বিকৃত মূর্ত্তি। দ্বিজেন্দ্র প্রতিভা প্রচুর ভাবে উজ্জ্বলরূপে সেই নরনারায়ণকেই চিত্রিত করিয়াছে!

জীবনের মধ্যে প্রেমই গরিষ্ঠ। সাহিত্যেও তাহা প্রধান। কিন্তু সাহিত্যে সাধারণতঃ যে প্রণয় আছে তাহা কামনাকলুষ, নিতান্ত আত্মসর্ব্বস্ব, পাশবিকপ্রকৃতি। দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যে সত্য ভালবাসার প্রতিষ্ঠা।

প্রীতির ধর্ম্ম ত্যাগ, ভোগ নহে। প্রেমে "আমির" সম্পূর্ণ বিলোপ। পরকে তুষ্ট করিয়াই আপনাকে বিলাইয়াই ভালবাসার সার্থকতা।

সিংহল বিজয় নাটকে বালকের উক্তিতেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের আদর্শ বোঝা যাইবে।

বালক বলিতেছে, "জানি তুমি প্রতিদানের জন্যই ব্যাকুল। কিন্তু আর এক ভালবাসা আছে, জেনো মহারাণী, যা নিত্য বিশ্বের আপনাকে জাগিয়ে তোলে, যা আপনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়, সুখী করে সুখী হয়।"

দ্বিজেন্দ্র বাবু এই সূত্রেই তাঁর প্রণয়ের চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন। মানসী ছায়া সকলেই ইহার অনুগত।

দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার সমস্তই উদ্দেশ্যমূলক। মানুষের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগাইবার জন্য তাঁর কবিত্ব শক্তি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছে।

বাঙ্গালীর অন্তরে আর যে গুণই থাক, তাহাদের স্বদেশভক্তির একান্ত অভাব। দ্বিজেন্দ্র বাবু স্বজাতীর এই সুপ্তশ্রদ্ধাকে উদ্বুদ্ধ করিতে মহাশঙ্খ বাজাইয়াছেন। তাঁর নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির অধিকাংশই দেশপ্রাণ এবং সকল গুলিই বৈদ্যুতিক শক্তির মত একটা তীব্র অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। প্রতাপের সহিত দেশের জন্য জাতির জন্য দুঃখ সহিতে প্রবল আগ্রহ জন্মে—গোবিন্দ সিংহের মত মায়ের সেবায় সমস্ত সুখ শান্তি বলি দিতে সাধ হয়—সত্যবতীর সন্ন্যাস বিলাসের মতই বরণীয় হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতা বিশ্ব জগতের অনুকরণীয়। দেশপ্রেমের ছদ্মবাস পরিয়া মানুষের পশু-প্রকৃতি—জগতের বুকে কেবল অশান্তির অনলই জ্বালিয়াছে। দেশ বড় বটে, কিন্তু মানুষের চেয়ে নহে। দেশ ভক্তি যদি মনুষ্যত্বের পরিপন্থী হয়, তবে তাহাও পরিত্যাজ্য। জগৎ যদি মনুষ্যত্বের অনুকূল দেশপ্রীতির অনুসরণ করে, তবে পৃথিবীর সমস্ত অশান্তির আগুন নিভিয়া যায়। দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে "মানসীর" চরিত্রে এবং "আবার তোরা মানুষ হ" গানে বর্ত্তমান বিশ্বসমস্যার একটা সুমীমাংসা আছে।

মানসীর উক্তি—"স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তবে জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্।"

কোনও বিশেষ রচনায় দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার সমগ্র পরিচয় দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব। তবে দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে এক কথায় ইহা বলিলেই বোধ হয় মোটামুটি তার পরিচয় দেওয়া হয় যে, সমগ্র দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের অন্তর হইতে মেঘমন্দ্রস্বরে মন্দ্রিত হইতেছে "আবার তোরা মানুষ হ।"

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

শিশু

হে শিশু, চঞ্চল তুমি, সকলের অন্তর মাঝেতে
অধিকার নিতে চাও ঝাঁপাইয়া সবার কোলেতে।
তুমি নাহি মান কভু রাজার গর্ব্বিত অর্থরাশি,
মান নাক' সংসারের কার্য্য-সাধা তীব্র-ম্লান-হাসি।
তুমি মুক্ত;—দরিদ্রের মলিন অঞ্চলে ছুটে' যাও
যদি সেথা হৃদি-খোলা একবিন্দু প্রেম খুঁজে পাও।
ধন ও দারিদ্র্য আর বয়সের অসমতা নিয়ে
যে দ্বন্দ্ব যে গর্ব্ব-হাসি যে তাচ্ছিল্য-অন্ধ ঘরে গিয়ে
বাহিরের পথটুকু মানব খুঁজিছে দিবারাতি—
তুমি সেথা দ্বার খুলি' জ্বালাইয়া দেও দীপ্তবাতি!
তোমার বাহিরে বিশ্ব খুঁজিতেছে শুধু সাম্য-স্থান,—
তুমি আপনার সুরে গাহিতেছ মিলনের গান,
সে ধ্বনি ভাসিয়া আসে এ জগতে,—তাই বিশ্বজনে
এখনো বাঁচিয়া আছে শুনি' তাহা শুধু ক্ষণে ক্ষণে।

শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী।

ঈষ্ট্‌লীন্‌

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রালোকে সাক্ষাৎ

হেয়ার পরিবারের সঙ্গে বাল্যাবধিই কার্লাইল সাহেবের বড় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার পিতার প্রথমা পত্নী জাষ্টিস্ হেয়ার সাহেবের অতি নিকট সম্পর্কিতা ভগ্নী * ছিলেন। সেই সূত্রেই এই দুই পরিবারের মধ্যে অতি অন্তরঙ্গ একটা আত্মীয়তার ভাব জন্মে, এবং অতি প্রিয় স্বজনের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহারা মেলামেশা করিতেন। স্বর্গীয় কার্লাইল সাহেবের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র আর্কিবাল্ড শৈশবাবধি হেয়ার সাহেবের কন্যাদ্বয় এন্ ও বার্বারার খেলার সাথী ছিল। আর্কিবাল্ড তাহাদের বড় ভাল বাসিত, কখনও আদর করিত, কখনও ক্ষেপাইত—নানারূপ উপদ্রবও করিত,—বড় ভাই যেমন ছোট দুটি বোনের সঙ্গে করিয়া থাকে। শান্তস্বভাবা এন্ তাহার সকল উপদ্রব ধীরভাবে সহ্য করিত, কিন্তু বার্বারার কিছু তেজ ছিল, তার সঙ্গে আর্কিবাল্ডের বালসুলভ ঝগড়াঝাঁটিও অনেক হইত। এই ভাবেই প্রায় এই বয়স পর্য্যন্ত কাটিয়াছে। আর্কিবাল্ড তখনও বার্বারাকে ঠিক তেমনই ছোট বোন্‌টির মত দেখিতেন, তেমনই আদর করিতেন, ক্ষেপাইতেন। কিন্তু বার্বারা বড় হইয়া তাহার এই বাল্য-সখাকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

রাত্রি দশটা বাজিল। মিসেস্ হেয়ার জলের সঙ্গে একটু ব্রাণ্ডী মিশাইয়া পান করিলেন। প্রত্যহই শয়নকালে তিনি ইহা পান করিতেন, নহিলে নাকি তাহার সুনিদ্রা হইত না। তিনি বলিতেন, দুশ্চিন্তার ভার দূর করিয়া মনটা ইহাতে বেশ একটু চাঙ্গা করিয়া তোলে। বার্বারা মাতাকে এই ব্রাণ্ডী জল মিশাইয়া দিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পশ্চাতে গৃহ মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছিল, বাহিরের ময়দান হইতে কেহ দেখিলে স্পষ্ট তাকে দেখিতে পায় এমনই ভাবে জানালার সম্মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া বার্বারা দাঁড়াইয়াছিল। এক স্বপ্নরাজ্যে সে তখন বিচরণ করিতেছিল, আর কতই যে রম্য কল্পনাচিত্র তার নন্দিত মন ভরিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল! আহা, আর্কিবাল্ডের স্ত্রী মিসেস্ কার্লাইল সে হইবে—ওয়েষ্টলীনবাসী কে এমন আছে, তাহার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে না চাহিবে? আর্কিবাল্ড কেবল যে তার প্রাণের প্রিয়তম দেবতা তা নয়, সর্ব্বাংশে

* Cousin (কাজিন)—Cousin বলিতে খুড়তাত, জেঠতাত, মামাত, পিসাত, মেসোত—সব ভাই ভগ্নীকেই বুঝায়। আমাদের মত এই সম্বন্ধের আলাদা আলাদা নাম—ইংরেজসমাজে নাই।

ইঁহার মত যোগ্য পাত্রও এ অঞ্চলে আর কেহ নাই। সদ্বংশজাত সুরূপ সমধুর-স্বভাব সচ্চরিত্র যুবক, বিপুল সম্পদের অধিকারী, কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতিশীল—প্রত্যেক কুমারীর পক্ষেই অদ্বিতীয় লোভনীয় বর এই আর্কিবাল্ড কার্লাইল। কুমারী কন্যার মাতাও ওয়েষ্টলীনে এমন কেহ ছিলেন না যিনি জামাতৃরূপ মনে মনে তাঁহাকে কামনা না করিতেন, এবং আর্কিবাল্ড তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিলে অতি আগ্রহে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই প্রস্তাব না গ্রহণ করিতেন।

হারের সেই লকেটটি হাতে আদরে নাড়িতে নাড়িতে এক একবার নিজের কপোলে তাহা চাপিয়া ধরিয়া বার্বারা আপন মনে কহিল, "না-না, এর আগে এমন নিঃসন্দেহ হইয়া তার মনের কথা কখনও বুঝি নাই! এক একবার মনে হইয়াছে, হয় ত তার মনে কিছু আছে,—আবার মনে হইয়াছে, না, কিছু না, একথা তার মনেও কখনও হয় না। কিন্তু আজ এমন সুন্দর এই হারটি আমাকে উপহার দিল, আর—আর—সেই চুম্বন—আহা, আর্কিবাল্ড!"

বাহিরে শুভ্রকৌমুদী ফুটফুট হাসিতেছিল, উদ্‌ভ্রান্তভাবে তার দিকে বার্বারা চাহিয়া রহিল, চাহিয়া চাহিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া আবার কহিল, "আহা, যদি স্পষ্ট খুলিয়া বলিত আমাকে ভালবাসে! শুধু একবার এই কথাটি বলিয়াই যদি সে আমার প্রাণ শান্ত করিয়া দিত!—কিন্তু—না, বলিবে—বলিবে! আমি জানি বলিবে! তবে ওই কুক্রুট কর্ণীবুড়ী—"

ওকি! ময়দানের ও ধারে ওই গাছের ঝোপের ছায়ায়—ও কে দাঁড়াইয়া! যেন হাত ইসারা করিয়া তাকে ডাকিতেছে! কে ও! একটা মানুষের মত নয়! তাই ত! বার্বারার বুকটার মধ্যে যেন লাফ দিয়া উঠিল, ভয়ে মুখ একেবারে পাংশু হইয়া গেল! প্রথমেই তার মনে হইল, চিৎকার করিয়া উঠিয়া ভয়ের সাড়া সে তুলিবে, চাকর দাসীরা ছুটিয়া আসুক। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, না, চুপ করিয়া থাকাই ভাল। কে জানে কি রহস্য এ! এ গৃহের সঙ্গে যে বড় ভয়াবহ একটা গূঢ় রহস্য সংস্পৃষ্ট আছে।

বার্বারা বাহিরে আসিয়া গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়াইল,—লোকটিও সরিয়া আসিয়া তার দৃষ্টির সম্মুখীন হইল, মাথার টুপীটি খুলিয়া নিয়া তার দিকে খুব জোরে নাড়িতে লাগিল। ভয়ে বার্বারা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাও সে বুঝিল, এ রহস্য তাহাকেই ভেদ করিতে হইবে! বাড়ীর লোকজনদের ডাকিতে সে পারে না। ওদিকে অজ্ঞাত ওই লোকটি এমনই ভাবে তার বাহু আন্দোলন করিয়া সঙ্কেত করিতেছিল, যে তাহা অবহেলা ক রাও আর যায় না। তবে বার্বারার স্বভাবতঃই এমন একটা সাহস ছিল, যেরূপ নাকি তরুণবয়স্কা নারীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। দ্রুত গৃহমধ্যে ফিরিয়া শালখানি নিয়া সে গায় দিল, ধীর স্বরে—যেন অস্বাভাবিক কিছুই একটা হয় নাই এমন ভাবে কহিল, "মা, আমি একটু বাইরে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াই, দেখি বাবা আসেন কি না।"

মাতা হাঁ না কিছুই বলিলেন না,—বার্বারা আস্তে দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইল। গাড়ীবারান্দার নীচে গিয়া আবার দাঁড়াইল। ভয়ে পা উঠিতেছিল না,—বুকে সাহস ধরিয়া মনটা শক্ত করিয়া নিতে প্রয়াস পাইল। দূরে ঐ লোকটির হাতে টুপী তখন আবার বড় জোরে বড় ঘন ঘন নড়িতেছিল। দৃঢ় চরণক্ষেপে বার্বারা অগ্রসর হইল। কি একটা অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় মন তার পরিপূর্ণ হইল, দেহ কম্পিত কণ্টকিত হইয়া উঠিল! কে ও! মানুষ, না অপার্থিব প্রেতলোকের কোনও জীব? সেই যে এক অমঙ্গলের গভীর ছায়া তাহাদের গৃহকে আঁধার করিয়া রাখিয়াছে, কে এ আসিয়াছে—সেই ছায়াকে কি আরও গভীর আরও কালো করিয়া রাখিয়া যাইবে! তার দৃগ্‌ভ্রম হয় নাই ত? না,—তা ত নয়ই! ঐ যে সেই মানবমূর্ত্তি গাছের ছায়া হইতে বাহির হইয়া তাকে কাছে যাইতে সঙ্কেত করিতেছে! বিশুষ্কমুখে কম্পিত-চরণে গায়ের শালখানি দুই হাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বার্বারা আরও কতদূর অগ্রসর হইল, একেবারে কাছে গিয়া দাঁড়াইল,—মূর্ত্তি আবার গাছের ছায়ার মধ্যে সরিয়া গেল!

আড়ষ্ট প্রায় কণ্ঠে বার্বারা কহিল, "কে! কে—তুমি! কি চাও!"

মৃদু চাপাস্বরে মূর্ত্তি উত্তর করিল, "বার্বারা! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

আঁ! ও যে চেনা—বড় চেনা স্বর! অর্দ্ধস্ফুট একটি ধ্বনি বার্বারার মুখ হইতে ব্যক্ত হইল, তাহাতে আনন্দের

উচ্ছ্বাস ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল ভয়ের ব্যাকুলতা! বার্বারা ছুটিয়া বৃক্ষগুচ্ছ মধ্যে প্রবেশ করিল,—ফুঁকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই চাষী মুজুরের মত বেশধারী সেই লোকটি দুটি বাহু বাড়াইয়া বার্বারাকে ধরিল।—বার্বারা চিনিয়াছিল, এই ছদ্মবেশ তাহারই ভাই রিচার্ড! কহিল, "কোথা হইতে আসিলে রিচার্ড? কেন আসিলে?"

"তুমি কি আমাকে চিনিয়াছিলে বার্বারা?"

"না, কি করিয়া আগে চিনিব? আরও এই বেশ তোমার! তবে একবার আমার মনে হইয়াছিল—হয় ত তুমিই হইবে। ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলাম! রিচার্ড! রিচার্ড! এ কি দুঃসাহস তোমার? যদি ধরা পড়, তবে—তবে—তবে যে—"

"ফাঁসিকাঠে আমাকে ঝুলিতে হইবে! হাঁ, তা জানি বার্বারা।"

"তবু সাহস করিয়া আসিয়াছ? মা যদি দেখেন, ভয়ে যে তিনি অমনই মরিয়া যাইবেন!"

"বড় দুঃখে আছি, আর যে পারি না বার্বারা! সেই অবধি লণ্ডনেই আমি আছি———"

"লণ্ডনে!"

"হাঁ, লণ্ডনে! বাহিরে আর কোথাও যাইতে ভরসা পাই নাই। যে কাজ করি বার্বারা—বড় শক্ত কাজ—আর তা পারি না। ভাল কিছু কাজ কর্ম্মের সুবিধা হয়, যদি টাকা কিছু পাই। মা কি তা আমায় দিতে পারেন?"

"কি কাজ কর রিচার্ড? কোথায়?"

"আস্তাবলে!"

"আস্তাবলে! রিচার্ড!" বার্বারা শিহরিয়া উঠিল।

"আস্তাবল বলে ছাড়া কোথায়—কি আর কাজ আমার পক্ষে সম্ভব এখন বার্বারা? তোমরা কি ভাবিতেছিলে আমি সেখানে সওদাগরী কি মহাজনী করি, না মহারাণীর কোনও মন্ত্রী খাসনবীশ হইয়াছি? না বড় একটা সম্পত্তি পাইয়া খাসা খোসখেয়ালে বেড়াইতেছি? হাঁ, আস্তাবলেই আমি কাজ করি, হপ্তায় বার শিলিং মুজুরী পাই, আর তাতেই সব চালাইয়া নিতে হয়।"

কথাগুলিতে বড় তীব্র মর্ম্মভেদী একটা বেদনা—আর মর্ম্মাহতের গভীর একটা অভিমানও ব্যক্ত হইল। বার্বারার মনে বড় ব্যথা বাজিল,—ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "রিচার্ড! আহা অভাগা রিচার্ড! সেই অশুভ রাত্রিতে, হায়, কি সর্ব্বনাশই তুমি করিয়া ফেলিয়াছ! তখন হয়ত তোমার মাথায় ঠিক ছিল না, একেবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলে।—এইটুকু ভাবিয়াই যা কিছু সান্ত্বনা আমরা পাই।"

রিচার্ড কহিল, "সে খুন আমি করি নাই বার্বারা!"

"আঁা! কি—কি বলিলে রিচার্ড!"

রিচার্ড আবার কহিল, "বার্বারা, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি নির্দ্দোষ! শপথ করিয়া বলিতেছি, খুন যখন হয়, আমি সেখানে উপস্থিতও ছিলাম না। তুমি যেমন দেখ নাই, ঠিক তেমনই আমিও চক্ষে দেখি নাই, কে খুন করিয়াছে! প্রত্যক্ষ কোনও জ্ঞান এ সম্বন্ধে আমার নাই।—তবে আমি অনুমান করিতে পারি। আর আজ আকাশে ওই চাঁদ যেমন সত্য, আমার সে অনুমানও তেমনই সত্য!"

বার্বারা থর থর কাঁপিতেছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে রিচার্ডের আরও কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল,—কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি বলিতে চাও বেথেল খুন করিয়াছে?"

"বেথেল! না, বেথেল নয়। সে চুরী করিয়া পাখী মারিতে গিয়াছিল।"

"বেথেল ত চুরী করিয়া পাখী মারে না।"

"মারে না? ভাল, মারে কিনা, একদিন হয়ত লোকে তা জানিবে। তবে অন্তকাল পর্য্যন্ত সে এমনই পাখী মারুক, আমার তাহাতে আসিয়া যাইবে না কিছু! সে আর রুক্‌স্লি——"

বার্বারা চাপাস্বরে বলিয়া উঠিল, "রিচার্ড, মার মনে কেমনও শক্ত একটা ধারণা হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই তা যায় না,—তিনি বলেন, বেথেলের হাত ইহাতে কিছু না আছেই।"

"তাঁর ভুল! কিসে তিনি এরূপ মনে করেন?"

"কিসে, কেমন করিয়া প্রথমে এই ধারণাটা তাঁহার মনে জন্মিল, তা জানি না। তিনি নিজেও বোধ হয় বলিতে পারেন না। তবে জান ত তাঁর মন বড় দুর্ব্বল, আর যা তা ভাবেন। সেই সর্ব্বনেশে রাত্রি হইতে তিনি নাকি কেবলই বিভীষিকা দেখিতেছেন—ওই খুনের কথাই কেবল স্বপ্নে দেখেন। আর এই সব স্বপ্নে বেথেল নাকি খুবই দেখা দেয়। তাই তিনি বলেন, যে ভাবেই হউক, বেথেল

যে ইহাতে সংস্থষ্ট আছে, তার আর সন্দেহ মাত্র নাই।"

রিচার্ড উত্তর করিল, "বেথেলের কোনও সংস্রবই ইহাতে নাই।—তোমারই মত এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিষ্কলঙ্ক।"

"আবার তুমি ইহাও বলিতেছ—তোমারও কোনও সংস্রব নাই।"

"আমি তখন সে ঘরেও ছিলাম না। আমি শপথ করিয়া তোমাকে এ কথা বলিতেছি। আর কেহ নয়, থর্ণ খুন করিয়াছে।"

"থর্ণ! থর্ণ কে?"

"জানি না। আহা, যদি জানিতাম। যদি তাকে ধরিয়া দিতে পারিতাম, সে এক্টার একজন—বন্ধু।"

"রিচার্ড!" তীব্র একটা বিরাগের ভাবে বার্বারা গ্রীবা হেলাইয়া চাহিল।

"কেন, কি বার্বারা?"

"ঐ নাম আমার সম্মুখে উচ্চারণ করিলে! একটু বিবেচনা করিলে না?"

রিচার্ড উত্তর করিল, "বার্বারা, এ সব কথার আলো-চনার জন্য আমি এই বিপদে আসিয়া পা দিই নাই। আমি নির্দোষ—এ কথা এখন হাজার জোর করিয়া বলিলেও কোনও ফল তাহাতে হইবে না। 'বড় রিচার্ড হেয়ারের পুত্র ছোট রিচার্ড হেয়ার ইচ্ছাপূর্ব্বক খুন করিয়াছে'—করোণার যে এই রায় দিয়াছেন, তাহা আমি আর উল্টাইয়া দিতে পারি না। হাঁ, বাবা কি এখনও আমার উপরে তেমনই বিরূপ আছেন?"

বার্বারা কহিল, "হাঁ, একেবারেই তিনি বিরূপ হইয়া আছেন। চাকর চাকরাণীদের উপরে কড়া এই হুকুম হইয়াছে—তোমার নামও কেহ এ বাড়ীতে মুখে না আনে। ইলাইজা কেয়ার করিত না, তোমার ঘরটিকে সে 'রিচার্ড সাহেবের ঘ'রই বলিত। হয়ত অত সে ভাবিত না, অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই,—বাবাকে চটাইবে এ মতলব তার ছিল না। জান ত, বড় ভাল চাকরাণী ছিল সে, তিন বছর আমাদের বাড়ীতে ছিল। প্রথম যে দিন তোমার নাম সে মুখে আনে, বাবা তাকে সাবধান করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় দিন রাগিয়া আগুণ হইয়া গালি পাড়িলেন,—তৃতীয় দিন তক্ষুণি তাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। তার টুপী শাল নিয়া যাইবে সে টুকু অবসরও তাকে দিলেন না। আর একজন বাহিরে গিয়া তার হাতে তা দিয়া আসে। তার বাক্স পেটরা শেষে তার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাবা শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন—হাঁ, তুমি কি জান না তা?"

"কি শপথ? কত শপথই ত তিনি করেন।"

"এটা যা তা নয়, বড় গুরু—বড় কঠোর একটা শপথ রিচার্ড! করোণার যখন রায় দিলেন, সেই আদালতে বসিয়াই তাঁর সহযোগী আর সব জাষ্টিস্‌দের সম্মুখে, অতি গুরুভাবে তিনি এই শপথ করেন, তোমাকে দেখিতে যদি কখনও পান, তখনই পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিবেন। কেবল এখনই নয়, দশ বৎসর পরেও যদি কোথাও তোমাকে দেখেন, অমনই তোমাকে পুলিশের হাতে দিবেন। তাঁর মেজাজ ত জান রিচার্ড। ঠিক জানিও, তাঁর এ শপথ তিনি রাখিবেন। বাস্তবিক এখানে আসাটা তোমার পক্ষে বড় দুঃসাহসই হইয়াছে।"

রিচার্ড বড় তিক্তভাবে উত্তর করিল, "পিতার মত স্নেহময় ব্যবহার কোনও দিনই তাঁর কাছে পাই নাই! আমার স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয় বলিয়া, মা একটু বেশী আদর আমাকে করিতেন, একটু লাই দিতেন। তার জন্য ঘরে, বাহিরে, সর্ব্বদা, সকলের সম্মুখে, অবজ্ঞার উপহাস করিয়া তিনি আমাকে অপদার্থ প্রতিপন্ন করিতেই কেবল চাহিয়াছেন! ঘরে যদি সুখে থাকিতাম, একটু আনন্দের জন্য হয় ত হীন সংসর্গে গিয়া পড়িতাম না। যাক্! মার সঙ্গে আমি একবার দেখা করিতে চাই বার্বারা।"

বার্বারা একটু ভাবিয়া কহিল, "তাই ত! কি করিয়া তার বন্দোবস্ত করা যায়, তা ত ভাবিয়া পাই না।"

"তুমি আসিয়াছ, তিনি কি একবার আসিতে পারেন না? তিনি গিয়া শুইয়াছেন, না বাহিরেই আছেন?"

বার্বারা শঙ্কিতভাবে কহিল, "আজ রাত্রিতে ত হইতেই পারে না। বাবা যে কোনও সময় আসিয়া পড়িতে পারেন, বোচাম্প সাহেবের ওখানে বেড়াইতে গিয়াছেন।"

"দেড় বছর তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়া আছি। আজ এত কাছে আসিয়া একবার তাঁকে না দেখিয়া চলিয়া যাইব! হাঁ, টাকার কথা যে বলিতেছিলাম, একশ পাউণ্ড আমার চাই।"

বার্বারা কহিল, "কাল রাত্রিতে আর একবার আসিও, টাকা পাইবে। তবে মার সঙ্গে দেখা হওয়ার সুবিধা হইবে কিনা, সেটা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। কি জানি কি বিপদে পড়িবে, ভয়ে আমি সারা হইতেছি।" বলিয়া একটু থামিয়া বার্বারা আবার কহিল, "হাঁ, আর একটা কথা। তুমি বলিতেছ, তুমি নির্দ্দোষ। ভাল, তা কি প্রমাণ করা যায় না?"

"কে তা করিবে? আমার বিরুদ্ধে যে বড় জোর প্রমাণ রহিয়াছে। থর্ণের নাম যদি করি, কে তাহা এখন বিশ্বাস করিবে? মিথ্যা একটা গল্প বলিয়াই সকলে মনে করিবে,—তার কথা কেহই ত কিছু জানে না।"

বার্বারা ধীর মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসিল—"এই থর্ণের কথা—সত্যই একটা গল্প নয় ত?"

রিচার্ড প্রত্যুত্তরে একটু রুক্ষভাবে কহিল, "তা হ'লে তুমিও একটা গল্প—আমিও একটা গল্প! বার্বারা! তুমিও আমাকে বিশ্বাস করিলে না?"

বার্বারা মনে বড় আঘাত পাইয়া বলিল, "রিচার্ড! আর্কিবাল্ডকে কেন সব কথা খুলিয়া বল না? যদি কেহ তোমাকে এই সঙ্কটে সাহায্য করিতে পারে, তুমি যে নির্দ্দোষ তার প্রমাণের একটা উপায় করিতে পারে, তবে সেই পারিবে। তাকে অনায়াসে তুমি বিশ্বাস করিতে পার।"

"হাঁ, তা পারি। আমি যে আজ এখানে আসিয়াছি, একথা এক আর্কিবাল্ডকেই বিশ্বাস করিয়া বলা যাইতে পারে!—হাঁ, আমি কোথায় আছি সবাই ভাবে বার্বারা?"

"কেউ বলে তুমি আর নাই। কেউ বলে, তুমি অষ্ট্রেলিয়ায় পলাইয়া গিয়াছ। এই অনিশ্চয়তার অশান্তি উদ্বেগ মাকে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল। একবার একটা গুজব উঠিয়াছিল, লিভারপুলে অষ্ট্রেলিয়া যাইবার একটা জাহাজে কে তোমাকে দেখিয়াছে। কিন্তু অনেক খোঁজ নিয়াও ঠিক কিনা তা জানিতে পারি নাই।" !

"ঠিক ত নয়ই। কোনও মতে আমি লণ্ডনে গিয়া পৌঁছি,—এ যাবৎ সেখানেই আছি।"

"আর সেই আস্তাবলে কাজ করিতেছ!"

"ভাল আরকি করি? ভদ্রলোকের মত কোন ব্যবসায়ের উপযুক্ত করিয়া কোন শিক্ষা আমাকে দেওয়া হয় নাই। তবে ঘোড়া নিয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি, ঘোড়া কেমন করিয়া রাখিতে হয় সেটা বেশ বুঝি। আর পিছনে যার পুলিশ, তাকে একেবারে গা ঢাকা হইয়াই থাকিতেই হয়। ধর, আমি ভদ্রলোকের ছেলে—"

সহসা চমকিয়া রিচার্ডের মুখে হাতচাপা দিয়া বার্বারা অতি ত্রস্তভাবে চাপা গলায় কহিল, "চুপ চুপ! সর্ব্বনাশ! ঐ যে বাবা!"

পিনার সাহেব আর হেয়ার সাহেব বড় গলায় কি কথা বলিতে বলিতে আসিতেছিলেন। পিনার সাহেব বরাবর চলিয়া গেলেন, হেয়ার সাহেব ফটকের পথে বাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে প্রবেশ করিলেন, ভাই বোন্ দুটিতে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইল। নিশ্বাসটি ফেলিতেও তারা ভরসা পাইল না, পাছে তার শব্দও পিতার কাণে যায়! হেয়ার সাহেব বরাবর গৃহের দিকে গেলেন। বার্বারা কহিল, "রিচার্ড! আর না, আমি যাই, এক মিনিটও আর দেরী করা উচিত নয়। কাল আবার আসিও,—আমি দেখি কি করা যায়।"

বার্বারা ছুটিয়া চলিল,—রিচার্ড তার হাত ধরিয়া টানিয়া ধরিল, কহিল, "আমি যে নির্দ্দোষ, এ কথা তুমি বিশ্বাস করিয়াছ বলিয়া মনে হয় না। বার্বারা! গভীর এই নিঃস্তব্ধ রাত্রি—শুধুই আমরা দুজন এখানে—আর কেহ নাই; এক ঈশ্বর মাথার উপরে আছেন। একদিন তুমি ও আমি দুজনেই তাঁর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব,—সেই সত্য জানিয়া আবার চলিতেছি, তোমাকে যা বলিয়াছি, তাও তেমনই সত্য। থর্ণ হ্যালিজনকে হত্যা করিয়াছে, আমার কোনও সংস্রব তাহাতে ছিল না।"

ইহার উত্তর কিছু না দিয়াই বার্বারা ত্রস্ত গাছের ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আসিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গৃহের সম্মুখে গিয়া উঠিল।

বাহিরের দিকের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া হেয়ার সাহেব তখন ভিতরে গিয়া ঢুকিয়াছেন।

বার্বারা ডাকিল, "বাবা! বাবা! আমি বাইরে। দরজা খুলিয়া দেও।"

হেয়ার সাহেব দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন, যারপর নাই বিস্ময়ে বার্বারার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই রাত্রে বাইরে কি হইতেছিল? আচ্ছা মেয়ে ত!"

বার্বারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "আমি—আমি—ওই ওধারের পথের দিকে গিয়াছিলাম—তুমি আসিতেছ কি না তাই দেখিতে। কেন, তুমি কি আমাকে দেখিতে পাও নাই?" বলিতে বলিতে বার্বারা গৃহ মধ্যে গিয়া উঠিল।

হেয়ার সাহেব ধমকাইয়া কহিলেন, "এক ঘণ্টা আগে গিয়া তোমার ঘুমান উচিত ছিল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কার্লাইলের আফিসে।

ওয়েষ্টলীনের ঠিক মধ্যভাগে লাগালাগি দুইখানি বাড়ী ছিল। একখানি বড়, আর একখানি খুব ছোট। বড়টি কার্লাইল সাহেবের বাসগৃহ, ছোটটিতে তাঁহার আফিস্ বসিত।

আইন ব্যবসায়ে কার্লাইল সাহেবের নাম ছিল, মান-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। পিতার আমলে 'কার্লাইল ও ডেভিসনের আফিস্' বলিয়া ইহার পরিচয় ছিল,—এখন শুধু আর্কিবাল্ড কার্লাইলের নামেই ব্যবসায় চলিতেছে। সহযোগী এই ডেভিডসন সাহেবের ভগ্নী ছিলেন, ভূতপূর্ব্ব কার্লাইল সাহেবের (অর্থাৎ আর্কিবাল্ডের পিতার) প্রথমা পত্নী। একটি মাত্র কন্যা কর্ণেলিয়াকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। পিতা দ্বিতীয়বার যখন বিবাহ করেন, কর্ণেলিয়া তখন বেশ বড় হইয়াই উঠিয়াছেন। একটি মাত্র পুত্র আর্কিবাল্ডকে প্রসব করিয়া এই দ্বিতীয়া পত্নীও ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন। কর্ণেলিয়াই মাতৃহীন শিশু ভাইটিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন। মাতার মতই কর্ণেলিয়া তাহাকে স্নেহ করিতেন, শাসন করিতেন। আর কোনও মা বালক জানিত না, শৈশবে ভগ্নীকেই 'কর্ণীমা' বলিয়া ডাকিত। কর্ণীমা যে মায়ের কর্ত্তব্যে এতটুকুও অবহেলা করেন নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁহার বড়া শাসনও কখনও শিথিল হয় নাই। এখনও ছোট বড় সকল কাজে এই প্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতাকে তিনি বালকের ন্যায়ই আপন শাসনাধীনে রাখিতে চাহিতেন। আর্কিবাল্ডও সে শাসন মানিতেন, তাহাই তাঁহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল,—অভ্যাসের প্রভাব এমনই প্রবল বটে! সাধারণ বিষয় বুদ্ধি কর্ণেলিয়ার বড় তীক্ষ্ণ ছিল, তবে গুরু কোনও বিষয়ে সমীচীন বিচার-শক্তিতে অনেক ত্রুটি তাঁহার দেখা যাইত। ভ্রাতৃস্নেহ আর অর্থসঞ্চয়ের লিপ্সা—তাহার স্বভাবের প্রধান দুইটি ধর্ম্মই ছিল ইহা।—মৃত্যুকালে অকৃতদার ও নিঃসন্তান মাতুল ডেভিডসন সাহেব তাঁহার সম্পত্তি সমান দুই ভাগ করিয়া কর্ণেলিয়াকে ও আর্কিবাল্ডকে দিয়া যান। আর্কিবাল্ডের সঙ্গে কোনও শোণিতসম্বন্ধ তাঁহার ছিল না। কিন্তু আপন ভাগিনেয়ী কর্ণেলিয়া অপেক্ষাও সরলহৃদয় মুক্তপ্রাণ এই বালককে তিনি অধিক স্নেহ করিতেন। পিতা বৃদ্ধ কার্লাইল সাহেব তাঁহার সম্পত্তির সামান্য কিছু কর্ণেলিয়াকে দেন, বাকী সব আর্কিবাল্ড পান। ইহাতে অন্যায়ও কিছু হয় না। কারণ আর্কিবাল্ডের জননী বিশ হাজার পাউণ্ড সম্পত্তিসহ স্বামীগৃহে আসেন, এবং ইহা অবলম্বন করিয়াই পরে বিপুল সম্পত্তি তিনি অর্জ্জন করেন।

মিস্ কার্লাইল *—মিস্ কর্ণী বলিয়াই সকলে তাঁহাকে ডাকিত—এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। এখন এক-রূপ স্থিরই সকলে বুঝিয়াছিল বিবাহ তিনি আর করিবেনই না। সম্পত্তিশালী কার্লাইল সাহেবের কন্যার পাণিপ্রার্থী কেহ উপস্থিত হয় নাই,† ইহা একেবারেই সম্ভব নয়। সুতরাং লোকে মনে করিত, কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অত্যধিক মমতাবশতঃই কর্ণেলিয়া কুমারী অবস্থায় রহিয়াছেন। কারণ বিবাহ করিলেই ভাইটিকে ছাড়িয়া তাঁহাকে পতিগৃহে যাইতে হইবে। সকল কুমারীর চিত্তেই যথাসময়ে প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, সকলেই কোমল এই বৃত্তির অনুদ্গতা হয়,—সকলেই আশাকরে, যত

* পিতার পদবীর আগে 'কুমারী' অর্থ সূচক 'মিস্' শব্দযোগে অবিবাহিতা কন্যারা আখ্যাত হয়। স্বামীর পদবীর আগে 'গৃহিনী' অর্থসূচক 'মিসেস্' (বা মিষ্ট্রেস্) যুক্ত হইয়া বিবাহিতা নারীদের আখ্যা হয়। ঠিক বাঙ্গলা করিলে আমাদের দেশের 'বাড়ুয্যের ঝি' 'বাড়ুয্যে বউ বা বাড়ুয্যে গিন্নী' খেতাবের অনুরূপ খেতাব এই দুইটি হইবে।

† ইংরেজসমাজে কন্যার পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করার প্রথা নাই। পুরুষ আপনি আসিয়া কন্যার পাণিপ্রার্থী হইবে, তারপর কন্যার মনোমত হইলে সে তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিবে। কন্যার পক্ষ হইতে কাহারও নিকটে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করা কন্যার মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া লোকে মনে করে। যে সকল কন্যার সম্পত্তি যৎসামান্য, তাহার পাণিপ্রার্থীরূপে কেহ বড় উপস্থিত হয় না। এরূপ কন্যার বিবাহ ইংরেজসমাজে বড় দুর্ঘট।

দিনেই হউক, কেহ আসিয়া তাহাকে বলিবে, 'পিতার নাম ত্যাগ করিয়া আমার বরার্দ্ধাঙ্গী হইয়া আমার গৃহে আসিয়া বিরাজ কর। কিন্তু মিস্ কার্লাইল একেবারেই এ জাতীয়া নারী ছিলেন না,—প্রণয়ের ও পরিণয়ের কথা লইয়া যদি কেহ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইত, তখনই তিনি তাহাকে সোজা বিদায় করিয়া দিতেন। শেষ দুঃসাহস করিয়াছিল, স্থানীয় এক গির্জ্জার নূতন যাজক। মিস্ কার্লাইলের বয়স তখন চল্লিশ,—আর যাজকের বয়স আটাশ বৎসর মাত্র। একদিন সকাল বেলায় পরিপাটি পোষাকের উপরে যাজকোচিত সুধৌত সাদা নেক্‌টাই গলায়, আর একজোড়া ফিকা বেগুণে রঙের দস্তানা কিনিয়া হাতে পরিয়া, কর্ণী-বিবির গৃহে সে উপস্থিত হইল। কর্ণীবিবি বড় পাকা গৃহিণী ছিলেন। সকল দিক এত সতর্ক ও কুশল ভাবে নিজে দেখিয়া শুনিয়া গৃহকর্ম্ম চালাইতেন, যে পাচিকাদাসীরা কেহই তাঁহাকে সুনজরে দেখিত না। প্রেমিক যাজক যখন উপস্থিত হইল, কর্ণীবিবি কি রান্না হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছিলেন। পাতলা গুড়ের কি একটা পিঠাও প্রস্তুত করিবার কথা হইতেছিল। কতখানি গুড় লাগিবে, নিজেই তাহা মাপিয়া দিবেন বলিয়া তিনি ভাঁড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। হাতায় করিয়া একটা গামলায় কতখানি গুড় উঠাইয়াছেন, এমন সময় শুনিলেন, যাজক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। যাজককে যে ঘরে বসান হইয়াছিল, সেটা ঐ ভাঁড়ারের পাশেই এবং মাঝের দরজাটাও তখন খোলা ছিল। কর্ণীবিবি বাড়া-বাড়ি আদবকায়দার ধার বড় ধারিতেন না,—সেই গুড়ের গামলা হাতে করিয়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গামলাটি টেবিলের উপরে রাখিয়া এই ব্যক্তি কি বলিতে চায়, শুনিবার জন্য দাঁড়াইলেন। প্রেমিক যাজকের হৃদ্-কম্প উপস্থিত হইল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেমন আমতা আমতা করিতে লাগিল,—কি ভাবে কি বলিবে ভাবিয়া কূল সে পাইতেছিল না। কর্ণীবিবি কিছু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ঐ গুড় নিয়া দিলেন তবে পিঠা হইবে, লোকটা যা বলিতে আসিয়াছে সোজা বলিয়া ফেলিলেই ত পারে? তাঁহার মনে হইয়াছিল, কোনও চাঁদার জন্য এই লোকটি আসিয়াছে,—ভয়ে বা সঙ্কোচে তাহা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। মুখ একটু নত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া তিনি তাহার কথাও দুই একটা ধরাইয়া দিতে লাগিলেন—মুখ নত করিয়া, কারণ এই আগন্তুক অপেক্ষা মাথায় কর্ণীবিবি অন্ততঃ এক ফুট লম্বা হইবেন। অবশেষে দুঃসাহসী যাজক তাঁহার কথাটা বলিয়াই ফেলিল। হতভাগ্য কিছু চাঁদা মাত্র নয়, তাঁহাকেই চায়, এই অদ্ভুত কথাটা যখন বুঝিতে পারিলেন, ক্রোধে কর্ণীবিবি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন!

"এই এতটুকু কাঁচা ছোকরা—একটু লজ্জা নাই তোমার! দূর হ বাঁদর!"

বলিয়াই একটা ঝাঁকি দিয়া গামলা শুদ্ধ গুড় তিনি দুর্ভাগ্য প্রেমিকের সুবেশ অঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন।

কেমন করিয়া যে পূতযশা এই ধর্ম্মযাজক এ হেন কলঙ্করাশি গায় মাখিয়া সেই গৃহ হইতে বাহির হইল, আর ওয়েষ্টলীদের রাস্তা দিয়া নিজগৃহে গিয়া আশ্রয় নিল, তাহা সেই জানে। কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল,—আর কেহ তারপর প্রেমার্থীরূপে উপস্থিত হইয়া কর্ণীবিবির বিরক্তি উৎপাদন করে নাই।

কার্লাইল সাহেব তাঁহার আফিসে বসিয়া কাজকর্ম্ম দেখিতেছিলেন। ঈষ্টলীন তিনি খরিদ করিবেন স্থির হইয়াছে। বন্ধকী তমঃসুকগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া নেওয়া দরকার। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ডিল সাহেবকে ডাকিয়া দলীলগুলি তাঁহাকে দিয়া কহিলেন, "খুব সতর্ক-ভাবে একেবারে য়িহুদীর দৃষ্টিতে এইগুলি ভাল করিয়া দেখুন।"

ডিল্ দলীলগুলি লইয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া বসিলেন। হেয়ার সাহেব এবং অন্যান্য জাষ্টিসরা কি একটা আইনের ফ্যাসাদে পড়িয়া কর্লাইলের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা গিয়া কার্লাইলের খাস্ কামরায় বসিলেন। আস্তে আস্তে—যেন বড় ভয়ে ভয়ে কে দরজাটি খুলিল। ডিল চাহিয়া দেখিলেন, বার্বারা হেয়ার।

বার্বারা কহিল, "কার্লাইল সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করিতে পারি?"

ডিল কহিলেন, "একটু পরে মিস্ বার্বারা। তিনি ব্যস্ত আছেন, জাষ্টিসরা আসিয়াছেন।"

"জাষ্টিসরা! ওমা, তবে বাবাও ত আসিয়াছেন! কি হইবে ডিল্ সাহেব! বাবা যদি আমাকে দেখেন——"

উঁচু গলায় কি বলিতে বলিতে জাষ্টিস্‌রা তখন বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। ডিল্ ত্রস্ত উঠিয়া বার্বারার হাত ধরিয়া কেরাণীদের ঘরের মধ্য দিয়া গিয়া ওধারে একটি ছোট ঘরে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়া আসিলেন। লজ্জায় বার্বারা যেন মরিয়া গেল। ছিঃ! লোকগুলি কি মনে করিতেছে! আর তাই ত—বাবাই বা আসিয়াছেন কেন?

কয়েক মিনিট পরেই ডিল্ সাহেব আসিয়া কহিলেন, "জাষ্টিস্‌রা এই চলিয়া গেলেন, আর ভয় নাই মিস্ বার্বারা।"

লজ্জায় অবনতমুখে অতি মৃদুস্বরে বার্বারা কহিল, "আপনি কি ভাবিতেছেন জানি না। তবে কি জানেন, মার একটা জরুরী কাজে আমি আসিয়াছি। শরীর ভাল নয়, তিনি নিজে আসিতে পারিলেন না। তাঁর নিজের একটা গোপনীয় কাজের কথা, বাবা জানিতে পারেন এটাও তাঁহার ইচ্ছা নয়।"

ডিল সাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন, "মা, অনেক লোক উকিলের কাছে অনেক রকম কাজে আসে। উকিলের আফিসে যারা কাজ করে, কে, কেন, কি কাজে আসিয়াছে, এ সব কথা তাদের কিছু ভাবিতে নাই।"

এই বলিয়া ডিল কার্লাইল সাহেবের খাস কামরায় বার্বারাকে পাঠাইয়া দিলেন। থতমত খাইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বার্বারা কহিল, "আমি তোমার মক্কেল হইয়া আসিয়াছি,—মা একটা কাজে আমাকে পাঠাইয়াছেন। বাবাকে দেখিয়া ভয়ে একেবারে মূর্চ্ছা যাইবার মত হইয়াছিলাম,—ভাগ্যে ডিল সাহেব তাঁর ঘরে নিয়া আমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন—"

কার্লাইল বার্বারাকে বসিতে বলিলেন। বার্বারা দেখিল, আফিসে ধীর, গম্ভীর, পাকা কাজের লোক এই কার্লাইল যেন আর এক ব্যক্তি, কালকার সেই হাসিখুসী চঞ্চল তাদের সেই ঘরোয়া আর্কিবাল্ড নয়!

বার্বারা মৃদুস্বরে কহিল, "একটা ভয়ানক কথা তোমাকে বলিব। কেহ শুনিবে না ত? তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে!" সংত্রস্ত দৃষ্টিতে বার্বারা এদিক ওদিক একবার চাহিল।

কার্লাইল ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "অসম্ভব! ঘরে সব ডবল দরজা দেখ নাই? কোনও কথা বাহিরে কেহ শুনিতে পায় না।"

তবু বার্বারা টেবিলের উপরে ঝুঁকিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল, "রিচার্ড এখানে আসিয়াছে!"

"রিচার্ড! এই ওয়েষ্টলীনে!"

রিচার্ডের সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বার্বারা কহিল, "রিচার্ড বলে সে নির্দ্দোষ। খুন যখন হয়, সে ঘরেও সে ছিল না। কে থর্ণ নাকি খুন করিয়াছে।"

"থর্ণ! কে থর্ণ?"

বার্বারা উত্তর করিল, "আমি জানিনা। একটার—কে বন্ধু, রিচার্ড বলিল। এমন গুরু শপথ করিয়া সে বলিল, যে আমি আর বিশ্বাস না করিয়া পারিলাম না যে সত্য কথাই সে বলিতেছে। যদি সম্ভব হয়, একবার তার সঙ্গে তুমি দেখা করিবে? আজ রাত্রিতেও সে আবার আসিবে। তার নিজের মুখে তার সব কথা শুনিলে, তুমি হয়ত বুঝিতে পারিবে, কোনও উপায় কিছু হইতে পারে কিনা, যাতে সে যে নির্দ্দোষ তার প্রমাণ হয়। এত বুদ্ধি তোমার, তুমি সব করিতে পার।"

কার্লাইল একটু হাসিয়া কহিলেন, "সব পারি না বার্বারা,—তা রিচার্ড কি কেবল এই কথা বলিতেই আসিয়াছে?"

"না না! সে বরং বলে একথা বলিয়া এখন আর কোনও লাভ নাই,—কেহই বিশ্বাস করিবে না। একশ পাউণ্ড সে চায়! আস্তাবলে কাজ করিতেছে, বড় দুঃখে আছে,—ভাল কি কাজের একটা সুযোগ পাইয়াছে, একশ পাউণ্ড পাইলে তাই এখন করিতে পারে। মা তাই তোমার কাছে আমাকে পাঠাইয়াছেন। তাঁর হাতে টাকা নাই,—বাবার কাছেও চাহিতে পারেন না। আজ কি তুমি এই টাকাটা চালাইয়া দিতে পারিবে? শীঘ্রই মা শোধ দিবেন।"

"টাকা কি এখনই চাও? তা হ'লে ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হয়। আমি এখানে না থাকিলে, আফিসে ডিল্ বেশী টাকা রাখে না।"

"ঠিক এখনই চাই না। সন্ধ্যার সময় পাইলেই চলিবে। আর রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে ত?"

কার্লাইল কহিলেন, "বড় আশঙ্কা হয়—অবশ্য তারই জন্য। তা সে যদি ওখানে আজ আসেই, আমি না হয় যাইব। কি বেশে সে আসিয়াছে?"

"চাষী মজুরের বেশে—চুই গালে কালো গালপাট্টা দাঁড়ী! তা চাষী মজুর ছাড়া আর কি ভাবেই বা সে এখানে নির্ভয়ে আসিতে পারে? তিন মাইল দূরে দিনে কোথায় গা-ঢাকা দিয়া থাকে—লোকজন বড় সে দিকে যায় না। হাঁ, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। মাকে কি বলিব রিচার্ড আসিয়াছে?"

"সে কি? তিনি কি জানেন না? তবে——"

"ওহো, আমার মাথার ঠিক নাই, সব কথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারি নাই। রিচার্ড নিজে যে আসিয়াছে, তা আমি মাকে বলি নাই। বলিয়াছি, টাকার জন্ম একজন চেনা লোক সে পাঠাইয়াছে। তা মাকে কি আসল কথাটাই বলা ঠিক হইবে?"

"কেন হইবে না? বলাই ত উচিত তাঁকে।"

"কিন্তু বড় ভয় করে যে। বলিলেই ত তিনি দেখা করিতে চাহিবেন। রিচার্ডও মার সঙ্গে একবার দেখা করিতে চায়।"

"তা ত চাহিবেই। রিচার্ড ভাল আছে,—তবু যা হ'ক, নিরাপদে আছে, ইহা জানিলে মিসেস্ হেয়ার একটু স্বস্তিই বরং পাইবেন।"

"তা—ঠিক! এই খবর পাইয়াই মার আশ্চর্য্য একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যেন নূতন জীবন তিনি পাইয়াছেন,—নিজেও তাই বলিলেন। কিন্তু কেমন করিয়া দেখা হইবে? বাবাকে বাড়ী হইতে সরান যায় কি করিয়া? তাঁর রকম ত জান? কারও বাড়ীতে কি ক্লাবে বেড়াইতে যাইবার কথা যদি মা একটু ইঙ্গিতেও বলেন, অমনই তিনি বাড়ীতে শক্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন, এক পাও নড়িবেন না! তুমি কি কোনও একটা কৌশল করিতে পার, যাতে তিনি বাহিরে কোথাও গিয়া অনেকক্ষণ থাকেন?"

"আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি।"

বার্বারা কহিল, "আমি কিন্তু আর আসিব না। কি জানি কি সন্দেহ কে করিবে! তুমিও বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া খবর কিছু দিলে—সেটাও বোধ ভাল হইবে না।"

"আচ্ছা, তবে এক কাজ করিও। ঠিক তিনটার সময়—তোমাদের বাড়ীর সামনে রাস্তায় একবার বাহির হইও।"

বার্বারা বিদায় হইয়া আসিল,—আফিসের বাহিরে পা দিতেই দেখিল, কর্ণেলিয়া আসিতেছেন। নারী কেহ মাথায় এত উচু সচরাচর বড় দেখা যায় না,—মস্ত টুপী, তার তার উপরে আবার ছাতি—যেন পালতোলা একখানি জাহাজ ঘুরিয়া বার্বারার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! আকারে এত দীর্ঘ হইলেও যৌবনে কর্ণেলিয়া সুন্দরী ছিলেন। দেহাবয়রে সে নিটোল ভাবটি এখন নাই, বরং হাড়গুলিই সর্ব্বত্র পরিস্ফুট দেখা যায়,—কিন্তু মোটের উপর এমন একটা মহিমাময় শ্রী তাঁহার এই দীর্ঘ দেহে ছিল যাহাতে লোকে তাঁহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে না দেখিয়া পারিত না।

"বটে! তুমি আর্কিবাল্ডের ঘরে এতক্ষণ ছিলে!"

বার্বারা আমতা আমতা করিয়া বলিল, তার মা একটা জরুরী কাজে তাকে পাঠাইয়াছেন!

"তোমার মা তোমাকে কাজে পাঠাইয়াছেন! বটে! দুইবার আমি আর্কিবাল্ডের খোঁজ করিয়াছি, দুই বারই ডিল আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে—বড় জরুরী কাজে সে আছে, ডাকিলে কাজের ব্যাঘাত হইবে! তুমি ছিলে, তা ত ডিল আমাকে বলিল না?—আচ্ছা, দেখিব কেমন সে ডিল,—আমার সঙ্গেও এত লুকাচুরী খেলে। আর এত লুকাচুরীই বা কিসের?"

বার্বারা বড় ভয় পাইল। কি জানি, কর্ণেলিয়া যদি আফিসে কেরাণীদের সামনেই গিয়া চেঁচামেচি করেন, অথবা তার বাবার কাছেই গিয়া বলেন! থতমত খাইয়া সে বলিল, "না, না, লুকোচুরীর কিছুই নাই, তাঁর নিজের একটা কাজে আর্কিবাল্ডের পরামর্শ তিনি চান। তা শরীর ভাল নয়, নিজে আসিতে পারিলেন না, তাই আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

"কি এমন কাজ পড়িল তোমার মার?"

"সে—এমন কিছুই নয়—সামান্য একটা কথা—এই তাঁর টাকা কড়ি নিয়া——এমন কিছুই একটা নয়—"

"এমন কিছুই যদি নয়, তবে এতক্ষণ দরজা বন্ধ করিয়া আর্কিবাল্ডের ঘরে কেন ছিলে?"

"সব খুঁটি নাটি কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।"

কথাটা অবশ্য কর্ণেলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। বড় কিছু একটা রহস্য ইহার মধ্যে আছেই। বার্বারার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতদূর গেলেন, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,

কিন্তু বার্বারাও বড় শক্ত মেয়ে—কিছুই তিনি বাহির করিতে পারিলেন না।

ওদিকে কার্লাইল কি কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে মনে মনে একটু আলোচনা করিয়াই, হেয়ার সাহেব ও অন্যান্য জাষ্টিসদের খবর পাঠাইলেন, তাঁহারা এখনই একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে ভাল হয়। জাষ্টিসরাও সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিলেন। বিচারবিভ্রাট করিয়া বড় একটা সঙ্কটে তখন তাঁহারা পড়িয়াছিলেন,—ইহার জন্যই কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা কার্লাইলের আফিসে আসিয়াছেন। কার্লাইলের সহায়তা তাঁহারা চান, তাই ডাকিবামাত্র আবার সকলে চলিয়া আসিলেন। কার্লাইল উঠিয়া দাঁড়াইলেন কহিলেন, "সামান্য একটা কথার জন্য আপনাদের ডাকিয়াছি,—এক মিনিটেই হইয়া যাইবে, বসিতে আর বলিব না। কি জানেন, যতই ভাবিতেছি, দেখিতেছি এই লোকটাকে জেলে দেওয়া মোটেই আপনাদের ঠিক হয় নাই। আজ সন্ধ্যাবেলায় আপনারা পাঁচজনেরই আমাদের বাড়ীতে তামাক খাইবার নিমন্ত্রণ রহিল, তখন এ সম্বন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা করিব। ঠিক সাতটায় আসিবেন কিন্তু, দেরী না হয়। আমার বাবার সেই তামাকের কৌটাটা মনে আছে ত? খুব ভাল ব্রডকাট্ তামাক আর চার্চ্চ-ওয়ার্ডেন চুরুট তাতে ভরিয়া রাখিব। কেমন, আসিবেন ত আপনারা?"

অতি আগ্রহে ও আনন্দে জাষ্টিসরা কার্লাইলের এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা বিদায় হইয়া যাইতেছেন, তখন কার্লাইল হেয়ার সাহেবকে একটু টানিয়া একধারে নিয়া চুপিচুপি কহিলেন, "আপনি অবশ্য আসিবেন কিন্তু হেয়ার সাহেব। আপনি না থাকিলে কিছুই হইবে না। কি জানেন ওঁদের বুদ্ধি তেমন পাকা নয়।"

এই প্রশংসাবাদে অতি হৃষ্ট হইয়া হেয়ার সাহেব কহিলেন, "হাঁ আসিব বই কি? ঝড় জল হ'ক, কি আগুন লাগুক, কিছুতেই আমার বাধা হইবে না।"

হেয়ার সাহেবকে দূরে সরাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত একরকম হইল,—কার্লাইল গিয়া খাসকামরায় বসিলেন। একজন কেরাণী আসিয়া সংবাদ দিল, মিস্ কার্লাইল আসিয়াছেন, আর কর্ণেল বেথেল সাহেব।

কার্লাইল আদেশ দিলেন, "মিস্ কার্লাইলকে আগে পাঠাইয়া দেও।"

কর্ণেলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কার্লাইল কহিলেন, "কি কর্ণেলিয়া, কি?"

"হাঁ, এখন ত বলিবেই, কি!—সকালে বলিয়া আসিলে ছটায় তোমার সময় হইবে না, ডিনার খাইবে না। কিন্তু কখন যে পারিবে, তাও বলিয়া আসিলে না। আমি এখন কি হিসাবে ডিনারের যোগাড় করিতে ওদের বলি?"

"হুঁ—বাহিরে একটু যাইবার কথা ছিল,—তা যাওয়া হইল না। ছটার একটু আগেই—এ ধর পৌনে ছটায় ডিনারের বন্দোবস্ত কর। আমি——"

"কি, ব্যাপার কি অ কিবাল্ড?"

"ব্যাপার! কই কি, ব্যাপার? কিছুই ত জানি না? হাঁ, বড় ব্যস্ত আছি কর্ণেলিয়া, কর্ণেল বেথেল সাহেব বসিয়া আছেন। তুমি এখন এস, ডিনারের সময় আর যা কথা হইবে।"

কর্ণেলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এই কথায় এক চেয়ারে গিয়া শক্ত হইয়া বসিলেন,—কহিলেন, "আমি বলিতেছিলাম, হেয়ারদের বাড়ীতে কি ব্যাপার হইয়াছে যে বার্বারা এখানে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া একা তোমার সঙ্গে বসিয়া এত কথা বলিতেছিল? তার মার কি কাজ সে বলিল——"

ঈষৎ একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া কার্লাইল কহিলেন, "ঐ যে জাষ্টিসরা এক ফ্যাসাদ করিয়া ফেলিয়াছেন জান না? রবিবারে তার বাগানে আগাছা তুলিয়া ফেলিতেছিল বলিয়া ঐ যে মালীটাকে জেলে দেন,—মিসেস্ হেয়ার তাই——"

"এক পাল আস্ত গাধা এই জাষ্টিসগুলা! এক তোলা বুদ্ধি যদি ওদের ঘটে থাকে!" জাষ্টিসদের এই ফ্যাসাদের প্রসঙ্গে কর্ণেলিয়া এই সুমিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

কার্লাইল কহিলেন, "হাঁ তাই ত মিসেস্ হেয়ার বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। লোকটা একেবারে রাজদরবারের কাছে আপিল করিয়াছে।—তা তিনি ত নিজে আসিতে পারিলেন না—শরীর ভাল নয়—তাই বার্বারাকে পাঠাইয়াছেন, বেশী কোনও হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে কিনা, এইটা তিনি জানিতে চাহেন। হাঁ কার্ণেলিয়া, বাড়ীতে আজ "পার্টি?"

"হাঁ, ঐ জাষ্টিস্‌দের পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তাঁরা তামাক টামাক খাইবেন। বাবার সেই তামাকের বাক্সটা ঠিক করিয়া ঠিক দিও,—আর——"

কর্ণেলিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"না না, ও সব কিছু হইবে না। তাদের আসিয়া কাজ নাই। পাঁচ ছয় জনে দুঘণ্টা বসিয়া তামাক খাইবে,—গন্ধে আমি মরিয়া যাইব যে!"

"তুমি সে ঘরে নাই গিয়া বসিলে।"

"তাদেরও গিয়া বসিবার দরকার নাই কিছু। নূতন সব পর্দা আমি টাঙ্গাইয়াছি, তামাকের ধোঁয়ায় সব কালো হইয়া যাইবে। না, না আমি কিছুতেই দিব না!"

একটু গম্ভীর ও দৃঢ়ভাবে কার্লাইল কহিলেন, "কর্ণেলিয়া, তাঁদের ডাকিয়াছি, জরুরী কাজের কথা আছে! কাজের কথা—বুঝিলে? তাদের আসিতেই হইবে। তা বসিবার ঘরে যদি তোমার আপত্তি থাকে, আমার শোবার ঘরেই তাঁদের যায়গা করিয়া দিতে হইবে।"

"কাজ" বলিলেই কার্ণেলিয়া বুঝিতেন, তাহাতে ঘরে পয়সা আসিবে। আর ঘরে পয়সা আসে, পয়সা থাকে, ইহার বড় কামনাও কর্ণেলিয়ার আর বড় কিছু ছিল না। ধনলিপ্সা এক মাদক নেশার মতই যেন তাঁহাকে বিভোর করিয়া তুলিত, কার্লাইল ভগ্নীর এই দুর্ব্বলতাটা বেশ জানিতেন, এবং অন্য কোনও সহজ উপায়ে সম্ভব না হইলে, এই নেশাটাকেই খেলাদিয়া ভগ্নীর কড়া জিদ তিনি নরম করিয়া ফেলিতেন।

কর্ণেলিয়া চুপ করিয়া আছেন, কার্লাইল আবার কহিলেন, "তা তোমার পর্দা যদি খারাপ হইয়া যায়, নূতন পর্দা আমি কিনিয়া দিব। কেমন? তা হ'লে তুমি এখন এস কর্ণেলিয়া, মোটেই সময় এখন নাই।"

জাষ্টিস্‌দের পার্টি আর তামাকের ধোঁয়া সম্বন্ধে আপত্তির কথা আর না তুলিয়া কর্ণেলিয়া কহিলেন, "তা যাই, কিন্তু বার্বারা হেয়ারের এই রহস্যটা কি আগে তাই বল, শুনিয়া তবে যাইব। ভারী চালাক তোমরা আর কি, নয়? তা আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। বার্বারা বলিল, তার বাপ কি টাকার কথা। আবার তুমি বলিতেছ, জাষ্টিস্‌দের এই ফ্যাসাদের কথা। আসল কথা, এটাও নয়—ওটাও নয়। সেইটা কি আমি শুনিতে চাই। আমি জানিতে চাই, তোমার আর বার্বারার মধ্যে কি এমন একটা রহস্য থাকিতে পারে।"

চেয়ারে খুব শক্ত আর সোজা হইয়া বসিয়া কর্ণেলিয়া ভ্রাতার দিকে চাহিলেন।

কার্লাইল বুঝিলেন, ভগ্নীর কাছে এ কথা গোপন রাখিবার চেষ্টা বৃথা। তবে তাঁহাকে বলিলেও ভয়ের কিছু কারণ নাই। বিশ্বাস করিয়া গুপ্ত কথা কিছু বলিলে, কর্ণেলিয়ার মুখে তার একটু আভাসও কেহ কখনও পাইবে না। এ সব বিষয়ে নিজের উপর তিনি যেরূপ ভরসা রাখিতে পারেন, ভগ্নীর উপরেও ঠিক সেইরূপ ভরসাই রাখিতে পারেন। টেবিলের উপরে একটু ঝুঁকিয়া চুপি চুপি কার্লাইল রিচার্ডের ওয়েষ্টলীনে আগমন সম্বন্ধীয় সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন, "কেমন শুনিলে ত সব? তা হ'লে এখন এস আমার কাজের অন্ত নেই।"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কর্ণেলিয়া উঠিয়া বাহির হইলেন। কার্লাইল এক টুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া নিয়া একখানা খামে পুরিয়া তাহা আঁটিয়া নিজের নাম ও ঠিকানা তাহাতে লিখিলেন। ডিল সাহেবকে ডাকিয়া সেই খামখানি তাঁর হাতে দিয়া কহিলেন, "ডিল, ঠিক আটটায় এই চিঠিখানি নিয়া আমাদের বাড়ীতে যাইবেন। ভিতরে পাঠাইয়া দিবেন না, বাহিরে ডাকিয়া আমার হাতে দিবেন।"

ঠিক তিনটার সময় কার্লাইল হেয়ার সাহেবের বাড়ীর ধার দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। কথা ছিল,—বার্বারার সঙ্গে পথে দেখা হইল। কহিলেন, "সব বন্দোবস্ত হইয়াছে বার্বারা। সন্ধ্যার পর জাষ্টিস্‌দের সব নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আমাদের ওখানে তাঁরা যাইবেন, মদ আর তামাক খাইবেন। হেয়ার সাহেবও দলে থাকিবেন।"

বার্বারা একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তবে কি করিয়া আসিবে, রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করিবে?"

"সে হইবে, কিছু ভাবিও না।"

এই বলিয়াই বরাবর কার্লাইল চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রিচার্ডের কথা

ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় জাষ্টিস্রা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যতই তামাক তাঁহারা খাউন, তার তামাকের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করিয়া ফেলুন, কর্ণীবিবিও মজ্‌লিসে গিয়া বসিলেন, অতি আগ্রহে তাঁহাদের আলোচনায় যোগ দিলেন। লোকে বলিত, আইনে বাপের মতই পাকা বুদ্ধি কর্ণীবিবির ছিল। কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। আইনের ঘোরপেঁচের মধ্যে তাঁহার সূক্ষ্মবুদ্ধি সহজেই প্রবেশ করিত, অনেক জটিল সমস্যায় সহজ একটা মীমাংসার পথও অনেক সময় তিনি বাহির করিয়া ফেলিতে পারিতেন

ঠিক আটটার সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, ডিন সাহেব কি জন্য ডাকিতেছেন।

কার্লাইল উঠিয়া বাহিরে গেলেন, একখানা চিঠি হাতে করিয়া একটু পরেই আবার ঘরে আসিলেন, কহিলেন, "বড় একটা জরুরী কাজে আমাকে এখনই একটু বাহিরে যাইতে হইবে। তা আপনারা বসুন—আমি আর আধ ঘণ্টা—এই যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিতেছি।"

কর্ণীবিবি বলিয়া উঠিলেন, "কি কাজ আবার? কে তোমাকে এখন ডাকিয়া পাঠাইল?"

কার্লাইল অন্যের অলক্ষ্যে ভগ্নীকে একটু ইসারা করিলেন। কর্ণেলিয়া বুঝিয়া চুপ করিলেন। কার্লাইল কহিলেন, "ডিন সাহেব আসিয়াছেন,—আইনের কথা আমার চেয়ে তিনি বরং ভালই জানেন। আর আমিও শীঘ্রই ফিরিতেছি।"

জাষ্টিস্দের আলোচনা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা আপত্তি কিছু করিলেন না।

কার্লাইল বাহির হইয়া দ্রুতপদে হেয়ার সাহেবের বাড়ীর দিকে চলিলেন। সেদিনও বড় সুন্দর জ্যোৎস্না, সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী যেন হাসিতেছিল,—পথে বাগানে ঘেরা একটা ছাড়াবাড়ীর দিকে কার্লাইলের দৃষ্টি পড়িল। 'আবী বাগান' নামে এই বাড়ীটি পরিচিত, বহুকাল পূর্ব্বে এইখানে একটি 'আবী' বা সন্ন্যাসীদের মঠ * ছিল, তার চিহ্নও এখন কিছুই নাই,—কিন্তু স্থানটি এখনও 'আবী বাগান' নামে পরিচিত। ছোট একটি বাড়ী (আবী কুটীর নামে পরিচিত) সেই বাগানের মধ্যে আছে। এই কুটীরেই জর্জ্জ হ্যালীজন্ বাস করিত, এই খানেই সে খুন হয়, এবং এই খুনের দায়েই রিচার্ড হেয়ার আজ এমন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পথে যাইতে যাইতে এই 'আবী বাগানের' দিকে চাহিয়া আজ সেই সব কথা কার্লাইলের মনে পড়িল। বাগানটা এখন খালি, সেই খুনের পর আর কেহ আসিয়া এখানে বাস করে নাই। জর্জ্জ হ্যালীজনের দুইটিমাত্র কন্যা সন্তান ছিল, জয়িস্ আর এফী, এফী নিরুদ্দিষ্টা,—জয়িস্ কার্লাইলদের বাড়ীতে এখন প্রধানা পরিচারিকা।

সত্বরই কার্লাইল হেয়ার সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। কয়েকখানি নোট মিসেস্ হেয়ারের হাতে দিয়া কহিলেন, "মোহর না আনিয়া নোটই আমি আনিয়াছি,—পথে নিয়া যাইতে সুবিধা হইবে।"

মিসেস্ হেয়ার দুই হাতে কার্লাইলের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আর্কিবাল্ড, আমার বাছাকে আমি একবার দেখিব। তার একটা বন্দোবস্ত করিতে পারিবে ত? আমিই বাগানে যাইব, না সে ঘরে আসিতে পারিবে?"

"বোধ হয় তাকেই—ঘরে আনা যাইবে,—আপনাকে আর বাহিরে যাইতে হইবে না। তবে রাতটায় বড় জোছনা। হাঁ, চাকর বাকরার সব কোথায়?"

বার্ব্বারা কহিল, "ভাগো আজ দিদি এনের জন্ম দিন। মা কতকগুলি কেক্ আর এক বোতল মদ তাদের দিয়াছেন, রান্না ঘরে তারা বসিয়া আমোদ করিতেছেন। আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া আসিয়াছি, তারা আমোদ আহ্লাদ করুক,—দরকার কিছু হইলে ডাকিব।

"বেশ হইয়াছে। তাদের দিক থেকে কোনও ভয় আর নাই।"

* রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসী-দের মঠ অনেক আছে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রণালী ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল, তখন অনেক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীর মঠ ইংলণ্ডে বর্ত্তমান ছিল। তাহার স্মৃতি স্থানে স্থানে এখনও দেখা যায়।

বার্বারা কহিল, "আমি তবে দেখিয়া আসি, রিচার্ড আসিল কিনা।"

"তোমার যাইতে হইবে না। আমিই যাইতেছি।"

বার্বারা কহিল, "ঐ—ঐ যে! সে আসিয়াছে দেখিতেছি! ঐ যে ঝোপের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে!"

কার্লাইল কহিলেন, "তবে আমি যাই। একটু দেরী হইবে তাকে লইয়া আসিতে। আগে তার সব কথা আমি শুনিব। শেষে তাকে পৌঁছাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইব। কি জানি, জাষ্টিস্‌রা যদি চলিয়াই আসেন!"

কার্লাইল অবিলম্বে বাহির হইয়া গেলেন। রিচার্ড কহিল, "মা কি আসিতেছেন?"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "না—তোমাকেই ঘরে যাইতে হইবে। তোমার বাবা বাহিরে গিয়াছেন,—চাকর বাকররাও পাকের ঘরে বসিয়া আমোদ করিতেছে। নির্ভয়ে তুমি যাইতে পার। আর এ বেশে দেখিলেও কেহ তোমাকে চিনিবে না: খাসা ত এক জোড়া গালপাট্টা পরিয়াছ রিচার্ড?"

রিচার্ড উত্তর করিল, "তা হ'লে এখনই আমাকে লইয়া যাও! বড় ভয় করিতেছে, ভালয় ভালয় সরিয়া যাইতে পারিলেই এখন বাঁচি। হাঁ, টাকা পাইব ত?"

"তা পাইবে। কিন্তু আগে সব কথা আমি শুনিতে চাই,—এইখানেই তা বল।"

"বার্বারা তোমাকে সব বলিতে বলিয়াছে, কিন্তু বলিয়া লাভ কিছুই নাই। কে আমাকে বিশ্বাস করিবে? তুমি নিজেই করিবে না।"

"বলিয়াই দেখ না রিচার্ড? সংক্ষেপে সময় বেশী নাই।"

রিচার্ড বলিতে আরম্ভ করিল,—"হ্যালীজনের বাড়ীতে সর্ব্বদা আমি যাইতাম, তা নিয়া বাড়ীতে অনেক কথা হইত। বাবা আর মা মনে করিতেন, এফীর টানে আমি সেখানে যাই। হয়ত তাই যাইতাম। যাক্ সে কথা! হ্যালীজন আমার বন্দুকটি চাহিয়াছিল, সে দিন সন্ধ্যার পর যখন এফীর—যা হ'ক্, কারও সঙ্গে দেখা করিতে-

কার্লাইল কহিলেন, "রিচার্ড! পুরাণ একটা কথা কি আছে জান? কথাটা খুব পাকা কথা। সেটা এই যে—'তোমার উকিলকে আর ডাক্তারকে নিঃসঙ্কোচে সকল কথা খুলিয়া বলিবে।'—আমাকে বুঝিতে হইবে, তোমার জন্য কিছু করা যায় কিনা। সব কথা খুলিয়া আমাকে বল, নহিলে কিছুই বলিবার দরকার নাই। ভয় করিও না, তোমার গুপ্তকথা সাবধানে আমি রক্ষা করিব।"

রিচার্ড উত্তর করিল, "ভাল, তাই তবে বলিব। এফীকে আমি ভাল বাসিতাম; ভাবিয়াছিলাম, যতদিনই অপেক্ষা করিতে হউক,—তাকেই আমি বিবাহ করিব।"

"বিবাহ করিবে!" বিবাহ কথাটার উপর একটু জোর দিয়া কার্লাইল এই প্রশ্ন করিলেন। *

রিচার্ড যেন একটু ক্ষুব্ধ হইল, কহিল, "কেন, তুমি কি মনে কর অন্য কোনও অভিপ্রায় আমার ছিল? অত বড় পামর আমি নই।"

"থাক্! বলিয়া যাও! হাঁ, এফীও কি তোমাকে ভালবাসিয়াছিল?"

"ঠিক বলিতে পারি না। কখনও মনে হইয়াছে ভালবাসে,—কখনও মনে হইয়াছে সে কেবল আমাকে লইয়া খেলাই করিতেছে। সে 'তার' সঙ্গেই থাকিতে বেশী চাহিত। এক একদিন সে বলিত, আজ সন্ধ্যার পর আসিও না, আমি দেখিয়াছি, ঠিক ঠিক সেই সেই দিন 'তার' আসিবার কথা।"

"এই 'তার'—সে কে?"

"এই সেই হতভাগা থর্ণ!"

"থর্ণ! কে সে? তার নামও ত কখনও শুনি নাই।"

"ওয়েষ্টলীনে কেউ শোনে নাই। খুব সতর্ক হইয়া সে চলিত, পাছে কেউ তাকে দেখে—কেউ চেনে। কয় মাইল দূরে সে থাকিত,—লুকাইয়া সন্ধ্যার পর আসিত।"

"কেন, এফীর জন্য?"

"হাঁ, ঘোড়ায় চড়িয়া আসিত। হ্যালীজন যখন বাড়ীতে না থাকিত, দুই একঘণ্টা এফীর সঙ্গে কাটাইত,—কখনও দুজনে বাগানের মধ্যেও ঘুরিয়া বেড়াইত।"

* রিচার্ড সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তান, এফী সাধারণ লোকের কন্যা। এরূপ অবস্থায় বিবাহটা 'জাত দেওয়ার মতই বিবেচিত হয়।' তাই ভদ্রবংশীয় যুবক কেহ নিম্ন শ্রেণীর কোনও যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হইলে, লোকে সেটা সন্দেহের চক্ষে দেখে। সাধারণতঃ সেই যুবকেরও কু-অভিপ্রায়ই থাকে। ভদ্রবংশীয় যুবকেরা নিম্ন শ্রেণীর সুন্দরী মেয়েদের ভালবাসার ছলে ভুলাইয়া বিপথে লইয়া যায়, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

"যাক্, সে দিন ঠিক কি হইয়াছিল, তাই বল।"

রিচার্ড কহিল, "হ্যালীজনের বন্দুকটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল,—কয়দিনের জন্ত আমার বন্দুকটা সে চায়। সন্ধ্যার সময় বন্দুক লইয়া আমি বাহির হইলাম। বাবা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মিথ্যা একটা ছুতা তাহাকে দেখাইলাম।—তাও শেষে আমার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। হ্যালীজনের বাড়ীর পিছনের বাগানের পথ দিয়া আমি যাইতাম। সেখানে গিয়া পৌছিয়াছি অমনই এফী আসিয়া বলিল,—সে দিন আর সে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না। আমরা কথা বলিতেছিলাম, লক্‌স্লি তখন ওদিকে যাইতেছিল, বন্দুকহাতে আমাকে দেখিতে পায়। এফী আমাকে যখন ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিল, আমি এড়াইতে পারিলাম না। তার কোনও কথাই তখন আমি ফেলিতে পারিতাম না। বন্দুকটি তার হাতে দিয়া কহিলাম, সাবধানে নিয়া যেন রাখে—গুলিভরা আছে। এফী ঘরে চলিয়া গেল,—কিন্তু আমি চলিয়া আসিলাম না, বাগানেই লুকাইয়া রহিলাম। আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল, থর্ণ আসিয়াছে বলিয়াই এফী আমাকে ঘরে ঢুকিতে দিল না,—যদিও এফী তা সাফ অস্বীকার করে। লক্‌স্লি আবার এইদিকে আসিল,—আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাগানে কেন লুকাইয়া আছি? আমি কোনও জবাব না দিয়া সরিয়া গেলাম। ভাবিলাম, আমি কি করি না করি, লক্‌স্লির তাহাতে কি? এ সব ঘটনাই শেষে আমার বিরুদ্ধে বড় প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়। মিনিট কুড়ি পরে, একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিলাম। মনে হইল, কে বুঝি পাখী মারিতে বন্দুক ছুঁড়িল। তখনই দেখিলাম, বেথেল একটা গাছের ঝোপ হইতে বাহির হইয়া কুটীরের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ঐ গুলিতেই হ্যালীজন খুন হইয়াছিল!"

রিচার্ড একটু থামিল,—কার্লাইল দীপ্ত চন্দ্রালোকে তীব্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রিচার্ড আবার আরম্ভ করিল, "মুহূর্ত্ত পরেই দেখিলাম থর্ণ উর্দ্ধশ্বাসে কুটিরের দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম! তার মুখ বিবর্ণ বিকৃত, চক্ষু দুটি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে,—মুখ একটু ফাঁক, দাঁতগুলি পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—যেন কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কে সে ছুটিয়া পলাইতেছে!"

কার্লাইল জিজ্ঞাসিলেন, "এই মাত্র তুমি না বলিলে সন্ধ্যার পরে ছাড়া থর্ণ কখনও আসিত না?"

"আর কখনও সন্ধ্যার আগে তাকে দেখি নাই। যাই হ'ক্, সে দিন তখন সন্ধ্যার কেবল আগেই তাকে দেখিলাম। উর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটিয়া গেল। একটু পরেই তার ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাইলাম, ঘোড়া ছুটাইয়া সে চলিয়া গেল। কিছুই তখন আমি বুঝিতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, এফীর সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হইয়াছে,—কিন্তু তাতে এমন আতঙ্কে ছুটিয়া পলাইবে কেন? কেমন একটা আশঙ্কা হইল, দৌড়িয়া কুটিরের দিকে গেলাম। ঘরে ঢুকিতেই পায়ে ঠেকিয়া হ্যালীজনের গায়ের উপরে পড়িয়া গেলাম—রক্তারক্তি হইয়া সে দরজার কাছেই পড়িয়াছিল! দেখিলাম, আমার বন্দুকটি পাশেই পড়িয়া, আর তার পাঁজরে সেই বন্দুকেরই গুলি বিঁধিয়াছে!"

একটু দম নিয়া রিচার্ড আবার বলিতে লাগিল, "এফীকে ডাক দিলাম,—কিন্তু সাড়া পাইলাম না। বাড়ীতে লোক যে কেহ আছে, এমনই মনে হইল না। কেমন একটা দারুণ আতঙ্কে আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম,—বন্দুক তুলিয়া নিয়াই দৌড় দিলাম—অমনই —"

"বন্দুকটা কেন তুলিয়া নিলে?"

"আমার মাথার ঠিক ছিল না! হঠাৎ কেমন মনে হইল, আমার বন্দুকটা ওখানে হ্যালীজনের পাশেই পড়িয়া থাকা ভাল নয়। যাই হ'ক্, বন্দুক নিয়া কেবল বাহিরে পা দিয়াছি, দেখি লক্‌স্লি আবার ঠিক আমার সম্মুখেই বাগানের একটা ঝোপের মধ্য হইতে বাহির হইল! আমার মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল, সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিলাম—বন্দুকটা ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াই ছুটিয়া পলাইলাম! লক্‌স্লি ডাক দিল,—ফিরিয়াও চাহিলাম না!"

কার্লাইল কহিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় প্রমাণ হয় এইটা। লক্‌স্লি সাক্ষ্য দিয়াছিল তুমি উত্তেজিত অবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইলে, তাকে দেখিয়াই ভয়ে বন্দুকটা আবার ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া গেলে।"

রিচার্ড ভূমিতে একটা পদাঘাত করিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিল, "ওঃ! সব আমার কাপুরুষতারই ফল! যেয়ে

হইয়া জন্মিলেই আমার ঠিক হইত! যাক্, কতদূর গিয়াই আবার বেথেলকে দেখিলাম। মনে হইল সে বোধ হয় থর্ণকে দেখিয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে বলিল, কাহাকেও সে দেখে নাই,—কে থর্ণ তাও সে চেনে না। এফীর কাছে আমি ছাড়া যে আর কেহ আসে তাও সে জানে না। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, একটা বন্দুকে আওয়াজ সে পাইয়াছে কিনা। সে বলিল, "হাঁ, পাইয়াছি, লক্স্লি বোধ হয় পাখী মারিতেছিল, তাকে এই বাগানেই দেখিয়াছি।' আমি কহিলাম, 'ঠিক তখনই তোমাকে কুটীরের দিকে ছুটিয়া যাইতে দেখিলাম যে।' বেথেল উত্তর করিল, না, ঠিক কুটীরের দিকে নয়, তাড়াতাড়ি বাগানেরই ওধারে যাইতেছিলাম। কেন, এ সব কথা কেন? কি হইয়াছে?' আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'থর্ণকে তোমার চক্ষে পড়ে নাই।' সে আবার বলিল, 'না কাউকে দেখি নাই।' তুমি, আমি আর লক্স্লি ছাড়া আর কেউ বাগানে আসিয়াছে, তা ত টের পাই নাই। আমি চলিয়া আসিলাম, বুঝিলাম, থর্ণকে সে দেখেই নাই।"

কার্লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই রাত্রেতেই কেন তুমি পলাইয়া গেলে? সেটা যে একেবারেই একটা সর্বনেশে কাণ্ড হইয়াছে!"

"হুঁ, অতি আহাম্মক আমি, তাই কিছুই না ভাবিয়া ভয়ে একেবারে পলাইয়া গেলাম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, কোথাও গিয়া একটু লুকাইয়া থাকিয়া জানিব, ব্যাপার কিরূপ গিয়া দাঁড়ায়। ঘণ্টা কয়েক পরে 'আবী কুটীরে' আবার গেলাম। বাহিরেই এফীর সঙ্গে দেখা হইল! আগুণ হইয়া সে আমাকে বলিল, তার পিতাকে আমিই খুন করিয়াছি,—বলিতে বলিতে কাঁদিয়া চেঁচাইয়া সে মূর্চ্ছা গেল। কুটীরে তখন আর কে কে ছিল,—গোলমালে তারা ছুটিয়া আসিল। আমি সরিয়া আসিলাম। মনে বড় একটা ক্ষোভ হইল,—এফীই যদি আমাকে সন্দেহ করিতে পারে, কে আর বিশ্বাস করিবে! তখনই আমি চলিয়া গেলাম। ভাবিলাম, দিন দুই কাছে কোথাও লুকাইয়া থাকিব,—কি হয় না হয় জানিব। যদি সুবিধা বুঝি, তবে ফিরিব। কিন্তু সে সুবিধা আর হইল না। করোণারের তদন্ত হইল, রায় বাহির হইল, আমিই খুন করিয়াছি! তখন আর কোনই উপায় রহিল না। আর এফী—তদন্তের সময় ঘুণাক্ষরেও বলিল না, থর্ণ তার কাছে আসিয়াছিল!"

কার্লাইল ধীরে ধীরে কহিলেন, "চার জন তোমরা সেই বাগানে তখন ছিলে,—এর মধ্যে একজন অবশ্য হ্যালিজনকে গুলি করিয়াছে। বেথেল হইতে পারে না—"

"না,—বন্দুকের আওয়াজ যখন হয়, ঠিক তখনই আমি বেথেলকে দেখিয়াছি!"

"লক্স্লি কোথায় ছিল তখন?"

"লক্স্লিও নয়। তখন কিছু দূরে বাগানের মধ্যে সে ছিল, আমি যেখানে ছিলাম, তারই সোজাসুজি আড়দিকে। খুন যে থর্ণ করিয়াছে, তাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কার্লাইল, তুমি যেন আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না?"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "আমাকে একটা বড় চমক তুমি লাগাইয়া দিয়াছ। সব আমাকে ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ভাল, থর্ণকে যখন তুমি ঐ ভাবে দৌড়িয়া পলাইতে দেখিলে, তখনই কেন গিয়া তাকে চাপিয়া ধরিলে না?"

"আমি ব্যাকুব—আমি কাপুরুষ! বাল্যাবধিই আমি আস্ত ব্যাকুব—একেবারে কাপুরুষ! এ দুর্ব্বলতা কখনও শোধরাইবে না, আমরণ আমার স্বভাবে লাগিয়া থাকিবে! আর তাকে ধরিলেই বা কি হইত? আমার বন্দুক পড়িয়াছিল লাসের কাছে। আমি যদি বলিতাম, আমি নই, থর্ণ খুন করিয়াছে, কে আমার কথার সমর্থন করিত?"

কার্লাইল কহিলেন, "আরও একটা কথা আছে। এই থর্ণ যদি এফীর কাছে এত যাওয়া আসা করিত, কারও চক্ষে সে কখনও পড়ে নাই, এটা কেমন করিয়া হইতে পারে? এফীর প্রসঙ্গে এ রকম নূতন কোনও লোকের নাম, আগে কখনও শুনি নাই। আজই কেবল তোমার মুখে শুনিলাম।"

রিচার্ড উত্তর করিল, "থর্ণ সোজা বড় রাস্তায় কখনও আসিত না,—আশপাশের গলিঘুজি ঘুরিয়া যাওয়া আসা করিত। আর সেই একদিন ছাড়া সন্ধ্যার আগেও তাকে কখনও আসিতে দেখি নাই। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না,—বিশ্বাস করিবে বলিয়া ভরসাও আমি কিছু করি নাই। তবে গুরু দিব্য করিয়া আমি বলিতেছি, যা বলিলাম, সব সত্য। আমি, থর্ণ, এফী, আর

হ্যালিজন—সকলেই আমরা একদিন বিধাতাপুরুষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব,—সেই সত্য জানিয়া বলিতেছি, আমি নির্দ্দোষ, থর্ণ সে দিন এফীর কাছে আসিয়াছিল, আর সেই হ্যালীজনকে খুন করিয়াছে।"

কার্লাইল নীরব। রিচার্ড আবার বলিল, "আর কেন আজ আমি এই মিথ্যা বলিব? এ মিথ্যায় কোনও উপকার ত আমার আজ হইবে না? হাজার বার করিয়া বলিলেও মুক্তি আমি আর পাইব না।"

কার্লাইল কহিল, "না, তা আর পাইবে না। ভাল প্রমাণ চাই। আচ্ছা, আমি দেখি! হাঁ, এই থর্ণ রকমের লোক?"

"তেইশ চব্বিশ বছর বয়স হইবে,—বেশ লম্বা একহারা চেহারা, আর একেবারে আমিরী চালের বাবু—খুব বড় ঘরের ছেলের মত।"

"তার আত্মীয় স্বজন কারা? কোথায় সে থাকিত?"

"কিছুই তা জানি না। তবে এফী একদিন বড়াই করিয়া বলিতেছিল, সে সোয়েনসন হইতে দশ মাইল পথ ঘোড়ায় চড়িয়া আসে যায়।"

"সোয়েনসন! সোয়েনসনের থর্ণদের কেউ নয় ত?"

"না তাদের মধ্যে ত এক রকম কাহাকেও জানি না। একেবারে আলাদা এক ধরণের মানুষ এ। খাসা সুগন্ধিতে ভুর ভুর—হাত ভরা আংটি—আর সেই খাসা মিহি মোলায়েম দস্তানা,—কই, সোয়েনসনের থর্ণদের মধ্যে ত এ রকম কাহাকেও দেখি নাই। খুব বড়ঘরেরই ছেলে সন্দেহ নাই, তবে বাবুগিরিটায় তেমন সুরুচির পরিচয় কিছু দেখি নাই, এত ঝক্‌ঝকে জাঁকাল জহরতের আংটি বোতাম চেন, এ সব তারা কখনও পরিয়া বেড়ায় না।"

"সব জহরত ঝুঁটা না সাচ্চা? একটু হাসিও কার্লাইলের মুখে ফুটিল।

"ঝুঁটা নয়, সব সাচ্চা! হীরার বোতাম, হীরার আংটি, হিরার পিন্,—সব খুব দামী জিনিশ একেবারে—ঝক্‌ঝক্ করিত! বোধ হয় এফীর চক্ষু ধাঁধিয়া দিবার জন্যই সব সে পরিয়া আসিত। এফীও একদিন বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, আমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘরের জাঁকাল গৃহিণী সে হইতে পারে।"

কার্লাইল কহিলেন, "তুমি যে রকম বলিতেছ, তাহাতে সে সোয়েনসনের থর্ণদের কেহ হইতেই পারে না। তারা সব ব্যবসায়ী লোক, গৃহস্থ, খাটো, মোটা, ভারীভুরী—একেবারে দিনেমার (Dutch) দের মত। আর তারা সব শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক, এ সব বাবুয়ানী বদখেয়াল কারও নাই। হাঁ, রিচার্ড, এফী কোথায়?"

রিচার্ড অতি বিস্মিতভাবে কার্লাইলের মুখের দিকে চাহিল।

"এফী কোথায়? আমি তা কি করিয়া জানিব? তোমাকেই ভাবিতেছিলাম জিজ্ঞাসা করিব।"

কার্লাইলও একটু বিস্মিতভাবে রিচার্ডের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, রিচার্ড আসল কথাটা এড়াইতে চায়। কহিলেন, "তার পিতার সমাধির পরেই সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। লোকে বলে, সে গিয়া তোমার সঙ্গেই জুটিয়াছে।"

"তাই নাকি, কি আহাম্মক এরা! সেই রাত্রির পর এফীকে আমি আর দেখি নাই, তার খবরও কিছু রাখি না। যদি কারও সঙ্গেই সে গিয়া জুটিয়া থাকে, থর্ণের সঙ্গে গিয়া জুটিয়াছে, আমার সঙ্গে নয়।"

"এই থর্ণ কি দেখিতে খুব সুপুরুষ?"

রিচার্ড উত্তর করিল, "লোকে হয় ত তাকে সুপুরুষই বলিবে। এফীও মনে করিত, এমন কামদেব বুঝি মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবীতে কখনও জন্মে নাই। হাঁ, সুন্দর কোঁকড়ান কালো চুল তার মাথা ভরা, খাসা কালো জুলপী, সুন্দর কালো চোক, আর নাকমুখও বেশ ভালই বটে। তবে বড় বিশ্রী রকম বাবু—তাতে খারাপই তাকে দেখাইত।"

বেশী আর কিছু শুনিবার বা জানিবার ছিল না, সময়ও অনেক গিয়াছে। কার্লাইল আর অধিক বিলম্ব না করিয়া রিচার্ডকে ঘরে তার মাতার কাছে সাবধানে পৌছাইয়া দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত জাষ্টিসরা কার্লাইলের ঘরে বসিয়া মজলিস্ করিলেন। কর্ণীবিবি এত তামাকের ধোঁয়া আর গন্ধ আর নিতান্তই শেষে সহিতে না পারিয়া উঠিয়া শুইতে গেলেন।

সোয়েনসনের থর্ণদের সঙ্গে ডিল সাহেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কার্লাইল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু রিচার্ড যেরূপ বলিয়াছিল, সেরূপ বাবু যুবক থর্ণ তাহাদের

মধ্যে কেহই নাই। অন্য কোথাও তাঁহাদের এরূপ কোনও স্বজন আছে বলিয়া ডিল সাহেব জানেন না।—তবে এই থর্ণ কে? আবার সোয়েন্‌সন হইতে আসিত! কার্লাইল ভাবিয়া কিছুই কূল পাইলেন না। শেষে এই থর্ণের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, সব বর্ণনা করিয়া ডিল সাহেবকে কহিলেন, "আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, থর্ণ নামে এই রকম কোনও লোক আছে কি না, আপনি একটু ভাল করিয়া খোঁজ নিবেন। হয় ত বাজে কোনও কোম্পানীর ছোক্‌রাও হইতে পারে। যা হ'ক, আপনি একটু খোঁজ নিবার চেষ্টা করিবেন,—এই লোকটি কে বাহির করিতে পারেন কিনা দেখিবেন।"

ডিল চলিয়া গেলেন। শেষে জয়িস্‌কে ডাকিয়া কার্লাইল অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়িস্ বলিল, এইরূপ একটি লোক এফীর কাছে আসিত বটে। একদিন মাত্র সে তাকে দেখিয়াছে। লোকটি দেখিতে ভাল, বেশ লম্বা একহারা চেহারা,—বড় বাবু আর খুব কায়দাদুরস্ত—সৈনিক পুরুষরা যেমন হয়।

"সৈনিক পুরুষ! সে যে সৈনিক পুরুষ তা কি করিয়া জানিলে?"

"এফী বলিয়াছিল, সে কোন্ সেনাদলের কাপ্তেন, ঠিক কাপ্তেন নয়, লেফ্‌টেনাণ্ট।"

"লেফ্‌টেনাণ্ট?"

"হাঁ সাহেব, লেফ্‌টেনাণ্ট থর্ণ। আর ফিট বাবু! সেই একদিনই তাকে দেখি। আমাকে দেখিয়াই সে চলিয়া গেল। একখানা রুমাল ফেলিয়া গিয়াছিল, এমন চমৎকার রুমাল! এফী ডাকিয়া বলিল, কাপ্তেন থর্ণ! তোমার রুমাল ফেলিয়া গিয়াছ। ফিরিয়া সে রুমাল নিয়া গেল। এফীর সঙ্গে সেদিন আমার খুব ঝগড়া হয়। এই সব বড় ঘরের-ছেলে—এরা এত আসে যায় এটা মোটেই ভাল নয়। এফীকে অনেক বলিতাম, তবে আমার কথা সে গ্রাহ্যই করিত না। রিচার্ড হেয়ার সাহেবকেও সেদিন দেখি—বাগানের মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। বোধ হয় থর্ণ গেলে তিনি আসিবেন, এই মতলব ছিল। তখনই জানি একদিকে থর্ণ, আর একদিকে রিচার্ড হেয়ার সাহেব—এফীর মঙ্গল কখনও হইবে না। তার এক হপ্তা পরেই এই সর্ব্বনাশ হইল।"

কার্লাইল কহিলেন, "আচ্ছা, এ কথা কি তোমার মনে কখনও হয় না, এফী হয় ত থর্ণের কাছেই গিয়াছে?"

"না সাহেব, না হইতেই পারে না! রিচার্ড হেয়ারের কাছেই সে যায়। ওয়েষ্টলীনের সকলেই তাই বলে। আমিও অন্য রকম কিছু মনেই করিতে পারি না। ভাবিয়া লজ্জায় দুঃখে ঘৃণায় মরিয়া যাই, বাবাকে যে খুন করিল, এফী আবার তার কাছেই গিয়া এই ভাবে রহিল!"

কার্লাইল তখন আর ইহার প্রতিবাদ কিছুই করিলেন না।

(ক্রমশঃ)

কবির প্রতি

কোন্ অমরার বীণা-নিন্দিত
অমিয় মধুর গান,
কোন্ তটিনীর কল-কল্লোল
চির-উচ্ছল তান;

কোন্ নিঝরের মধু-সঙ্গীত
আকুল মর্ম্ম-বাণী,
কোন্ সাগরের গুরু-গম্ভীর
কোন্ সঙ্গীত খানি;

কোন্ বিহগের মধুর-কূজন
কোন্ সে মধুর স্বর,
কোন্ পাদপের পবন-দোদুল
পত্রের "মর্ম্মর;"

কোন্ স্বরগের মাধুরী হে কবি!
তোমার গীতিতে রাজে,
কোন্ সে বীণার মধু ঝঙ্কার
তোমার বীণায় বাজে?

কোন্ বাঁশরীর আকুল রাগিনী
চিত্ত-পাগল-করা,
কোন্ কিন্নর-কণ্ঠের গীতি
অমিয়-মাধুরী-ভরা ;

কোন্ জলদের বজ্র-গভীর
হৃদয়োন্মাদী সুর,
কোন্ নূপুরের মধু-নিক্বণ
সুন্দর, সুমধুর ;

কোন্ সুদূরের স্বপ্নের গীতি
চিরমাধুরিমা-মাখা,
কোন্ অজানিত, অস্ফুট ছন্দ,
স্মৃতির-কোণেতে আঁকা,

কোন্ মায়াময়ী মাধুরী হে কবি!
তোমার গীতিতে রাজে,
কোন্ ত্রিদিবের আকুল ছন্দ,
তোমার বীণায় বাজে ?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন।

নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়

মগধের প্রসিদ্ধ নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, মহাভারতোক্ত জরাসন্ধের রাজধানী "রাজগৃহের" নিকট ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন,—আজ কাল পাটনা জেলার বিহার সবডিভিজনে "বড়গাঁ" নামক গ্রামের নিকট এই বিদ্যালয় ছিল। (১)

চীন-তীর্থ-যাত্রী ফাহিয়ান তাঁহার ভ্রমন-বৃত্তান্তে নালন্দ সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করেন নাই। কিন্তু হুয়েন সাঙ তাঁহার গ্রন্থে নালন্দের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—নালন্দ রাজগৃহ হইতে ১৫লী (Li) (২) উত্তরে অবস্থিত। ই-সাঙ, মহাবোধি বৃক্ষ হইতে সাত যোজন দূরে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হুয়েন সাঙের সহিত ইহার উক্তির ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। হুয়েন সাঙ লিখিয়াছেন,—কোন একটি সর্পের নামানুসারে ইহা নালন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আম্রকুঞ্জের বৃহৎ পুষ্করিণীতে ঐ সর্পটি বাস করিত। (৩) ইহার নালন্দ নামকরণ সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এইস্থানে কোন সময় এক রাজা ছিলেন, ইনি অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন, এই কারণে তথাকার অধিবাসীগণ, তাঁহাকে "নালন্দ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। উক্ত রাজার উপাধি অনুসারে, এই বৌদ্ধবিহার "নালন্দ" নামে অভিহিত হইয়াছে। (৪) বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতে নালন্দ নামক গ্রামের উল্লেখ আছে, এবং ইহাও স্পষ্ট লিখিত আছে যে নালন্দ রাজগৃহের নিকট অবস্থিত। (৫)

গুপ্ত-রাজত্বকালে নালন্দ বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই মহা-বিশ্ববিদ্যালয় কোন সময়ে, কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কেহই স্থিরতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, নালন্দ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা বলেন,—ফাহিয়ান চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। হুয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আগমন করেন, ইনি তাঁহার গ্রন্থে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাঁদের উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ঐতিহাসিকগণ, ইহার প্রতিষ্ঠার সময় পঞ্চমশতাব্দীর মধ্যভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উক্তির কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না, ইহা ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত মাত্র। হুয়েন্ সাঙ তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন,—বুদ্ধের নির্ব্বাণের কিছুদিন পরে মহারাজ শক্রাদিত্য ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এখন হইতে সাতশত বৎসর

(১) Cunningham's Anc. Geog. P. 468.
(২) Li (লী) চীন দেশের মাইল, ইংরাজি মাইলের তিন গুণ।
(৩) Walter's Ywn. Chowang-vol. II. P. 164.
(৪) Walter's Ywn. Chng-vol. II. P. 164.
(৫) Majjhima Nikaya vol. I. P. 371.

পূর্ব্বেও ইহা এইরূপই ছিল। (১) স্পুনার সাহেব বলেন, এই বিদ্যালয় খৃষ্টের পূর্ব্বেই ভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রামখানি তদপেক্ষাও প্রাচীন। (২) সময়ানুযায়ী নালন্দ বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (৩) মহারাজ অশোকের সময় হইতে এই বিদ্যালয়ের "সাত্ত্বিক" অবস্থা বা শান্তিযুগ আরম্ভ হয়। ঐ সময় জন কয়েক সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী, নালন্দে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমশঃ ইহা বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। তারপর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ইহার রাজসিক অবস্থা বা কর্ম্মযুগ আরম্ভ হয়। এই সময় নালন্দ মহা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ভারতের বিভিন্নপ্রান্ত হইতে ছাত্রগণ এই স্থানে আসিয়া, বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তামসিক বা পতনই ইহার অন্তিম অবস্থা। অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাব হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, সঙ্গে সঙ্গ নালন্দেরও পতন হইতে আরম্ভ হয়, কারণ ইহা প্রধানতঃ বৌদ্ধগণেরই সম্পত্তি ছিল। ক্রমে মুসলমানগণের অত্যাচারে, বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীগণ হয় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিলেন, না হয় অন্যদেশে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন

সপ্তম শতাব্দীতে দশ সহস্র বৌদ্ধসন্ন্যাসী নালন্দ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছিলেন। (৪) হুয়েন সাঙ কয়েক বৎসর এখানে ছিলেন, তিনি এই বিদ্যামন্দিরের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, —বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত এবং নানাপ্রকার সুন্দর শিল্পকার্য্য সুশোভিত, বৃহৎ বৃহৎ কক্ষ এই বিদ্যালয়ের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত শিখরের ন্যায় উচ্চ প্রাচীর, গগনচুম্বী গম্বুজ দর্শককে স্তম্ভীত করিয়া দেয়। চতুর্দ্দিকে নানাজাতীয় বৃক্ষ সুশোভিত উদ্যান ও সচ্ছ-সলিলা পুষ্করিণীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করিয়াছিল। (৫) অন্য চীনযাত্রী লিখিয়াছেন,—"ইহার উচ্চতা এত অধিক ছিল যে, ছাদে উঠিলে, মেঘের গতি স্পষ্ট দেখা যাইত। (৬) এই বিশাল ভবনের চতুর্দ্দিক নানাপ্রকার কারুকার্য্য সুশোভিত ছিল, লালপ্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ ও সুশোভিত পাঠ-গৃহ এই ভবনের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। (৭) সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ই-সাঙ নালন্দে উপস্থিত হন, তিনি লিখিয়াছেন,—ইহাতে আটটি বড় বড় হল্, এবং তিন সহস্র কক্ষ ছিল, ঐ সকল কক্ষে তিন সহস্র সন্ন্যাসী বাস করিতেন (৮) হুয়েন সাঙ লিখিয়াছেন,—ঐ সময় ভারতে অসংখ্য সঙ্ঘারাম ছিল, কিন্তু নালন্দের বিশালতা, ঐশ্বর্য্য এবং শিল্প চাতুর্য্যের নিকট সকলকেই হার মানিতে হইত। ভারতের রাজন্যবর্গ ইহার সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষ সাধনে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন, ফলে, ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। (৯) এখানে সর্ব্বসমেত ছয়টি বিদ্যালয় ছিল। তন্মধ্যে প্রথম বিদ্যালয় 'শক্রাদিত্য' দ্বিতীয় "বুদ্ধগুপ্ত" তৃতীয় "তথাগত" চতুর্থ "বালাদিত্য" পঞ্চম 'বজ্র' এবং ষষ্ঠ বিদ্যালয় মধ্যম ভারতান্তর্গত কোন রাজা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বিভিন্ন রাজগণের নিকট হইতে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা পাইত, বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, রাজগণ দুইশতেরও অধিক গ্রাম, বিদ্যালয়ের পরি-চালকগণকে দান করিয়াছিলেন। (১০) এখানকার ছাত্রা-লয়ে ধনহীন ছাত্রবর্গের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা হইত না। উচ্চশ্রেণীর বিদ্যার্থিগণ বাসের জন্য উত্তম কক্ষ পাই-তেন, নিম্নশ্রেণীর বিদ্যার্থিগণ সাধারণ কক্ষ পাইতেন। এই স্থান খনন করিয়া, জানিতে পারা গিয়াছে যে, একটি কক্ষে একজন ছাত্রই বাস করিত, কারণ এখানে যতগুলি কক্ষ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোনটিই দৈর্ঘ্যে ১২ ফুট এবং প্রস্থে ৮ ফুটের অধিক নহে। বিদ্যালয়ের ব্যয়, দান গৃহীত দ্রব্যের দ্বারা চলিত। হুয়েন সাঙ লিখিয়াছেন,—আমি প্রত্যহ ১২০টি জম্বীর ২০টি জায়ফল ২০টি খেজুর, আড়াই তোলা কর্পূর, একপোয়া মহাশালী ধান্যের তণ্ডুল, প্রতিমাসে তিনরাশি তৈল এবং প্রতিদিন

(১) The life of Hiuen Tsiang. Beal. P. 110-112. Records of the estern World. Beal. vol II. P. 167-168.

(২) Archœlogical Reports of the Eastern circle-1915-16. P. 33.

(৩) The idea of stages,—from Havel's Indo-Aryan Civilization.

(৪) Bel's life of Hiuen Tsing. P. 112.

(৫) Life of Hiuen Tsiang. P. 110-114.

(৬) I-Tsiang Takakusu. p. 86, Also Records of the Western World. p. 170.

(৭) Archoelogical Reports of E. C. 1915-16. p. 35.

(৮) I-Tsiang Takakusu p. 65.

(৯) Life of Hiuen Tsiang. p. 112.

(১০) I-Tsiang Takakusu. p. 65.

কিছু মাখম পাইতাম। (১) নালন্দ বিহার যথার্থই এক বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল স্থানের ছাত্রকেই এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন শাখায় একশত আচার্য্য ছিলেন। গণিত, জ্যোতিষ, ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইত। হুয়েন সাঙ লিখিয়াছেন,—বিদ্যালয়ে বৌদ্ধ-গ্রন্থ ব্যতীত বেদ, উপনিষদ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থও পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈদ্যবিদ্যা হেতুবিদ্যা এবং শব্দবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। (২) নালন্দে মান-মন্দির বা যন্ত্র-মন্দিরও ছিল এবং উহার "জল-ঘড়ী" হইতে মগধবাসিগণ সহজেই সময় নির্ণয় করিয়া লইত। (৩) বিদ্যালয়ে যে ঘণ্টা বাজান হইত, তাহাও ঐ "জল ঘড়ী"র সময়ানুসারে। ই-সাঙ লিখিয়াছেন, এইরূপ জলঘড়ী চীনদেশে প্রচলিত করিলে, তত্রস্থ অধিবাসিগণের একটা আবশ্যকীয় অভাব দূর হইবে! (৪) এই বিদ্যালয়ে শিল্প বিভাগও ছিল, কারণ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শিল্পকলা, চিত্রকলা এবং মন্দিরাদি নির্ম্মাণে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রেণীভুক্ত হইবার পূর্ব্বে, বিদ্যার্থিগণের নিকট হইতে কঠিন পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত, এই পরীক্ষায় যে সকল বিদ্যার্থী উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহাদিগকেই বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে গ্রহণ করা হইত। (৫) দুই বা তিন বৎসরের মধ্যে ছাত্রগণের পাঠ শেষ হইত। উপাধি প্রাপ্ত যুবকগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিয়া, আপনাপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। (৬)

আচার্য্যগণ প্রতিদিন আপনাপন আসনে বসিয়া শিক্ষাদান করিতেন, ছাত্রগণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিত। (৭) সমস্ত দিন তর্ক-বিতর্কে কাটিয়া যাইত, এই আলোচনায় বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই যোগ দিতেন। হুয়েন সাঙ লিখিয়াছেন,—গূঢ় প্রশ্নোত্তরের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে কখন কখন সমস্ত দিন রাত অতীত হইয়া যাইত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের পণ্ডিত-গণ এই বিদ্যালয়ে জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে আসিতেন। (৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র, পদক প্রভৃতি পাইবার জন্য ছাত্রগণ লালায়িত হইতেন। নালন্দ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র মুদ্রা ছিল। ভূমি খনন করিয়া নালন্দের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রার এক দিকে দুইটি হরিণের (মৃগ) মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, অপরদিকে লিখিত আছে,———"শ্রীনালন্দমহাবিহারীয়-আর্য্য-ভিক্ষুক-সংঘস্য।" (৯)

বিদ্যালয়ের পরিচালন কার্য্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ছিল। বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীও উত্তম ছিল এবং তৎকালীন ভারতের অন্যান্য বিদ্যাপীঠগুলি নালন্দের নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হইত। (১০) সকল কার্য্যই যথাসময়ে সম্পাদিত হইত! প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজিলেই, ছাত্রগণ শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানার্থে গমন করিতেন। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থিগণ একত্রিত হইয়া, উত্তরীয় হস্তে পুষ্করিণীতে যাইতেন এবং স্নানান্তে যথাবিহিত দেবার্চ্চনাদি করিতেন। (১১) ছাত্র-বর্গের স্নানের জন্য বৃহৎ বৃহৎ দশটি পুষ্করিণী ছিল। (১২) প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্ম্মাচার্য্যগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন এবং ভগবানের স্তুতি করিতে করিতে প্রত্যেক কক্ষে গমন করিতেন। হুয়েন সাঙ যখন এই বিদ্যালয়ে ছিলেন, সেই সময়, সম্ভ্রান্ত রাজবংশোদ্ভব "শীলভদ্র" বিদ্যালয়ের মহন্তের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সদস্যগণের মধ্যে ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞানচন্দ্র, শীঘ্রবুদ্ধি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। "লামা" সম্প্রদায়ের সংস্থাপক "পদ্ম সম্ভব" এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন।

নালন্দ বিদ্যালয়ের শিল্পচাতুর্য্যও অত্যন্ত চমৎকার। ডাক্তার স্পুনর এবং ব্রডলে সাহেব Broadley এই লুপ্ত শিল্প নৈপুণ্যের অনেক ভগ্নাবশেষ বাহির করিয়াছেন। জেনারেল কানিংহম বলেন, ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের শিল্প-চাতুর্য্যের মধ্যে, ইহার শিল্প-নৈপুণ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার ভগ্নপ্রস্তর খণ্ডগুলি, তৎকালীন শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন

(১) Life of Hiuen Tsiang p. 109.
(২) Life ot Hiuen Tsiang p. 11
(৩) Indo-Aryan Civilization.
(৪) I Tsiang Takakusu, P. 145-46
(৫) Pecords of the Western World. P. 171.
(৬) I Tsiang Takakusu. P. 177.
(৭) The Life of Hiuen Tsiang. P. 112,
(৮) Records of the western world. P. 170.
(৯) Archeological Reports of E.C. 1916-17. P 43,
(১০) Records of the, W, World. P. 170.
(১১) I Tsiang. Takakusu. P. 108.
(১২) I Tsiang-Takakusu. 154-55.

স্বরূপ, কলিকাতা মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে। সম্প্রতি, "রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটী" নালন্দের নিকটস্থ ভূভাগ খনন করিয়া, কতকগুলি অমূল্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই খননে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে, চীনযাত্রী হুয়েন সাং বর্ণিত দ্রব্যও অনেক পাওয়া গিয়াছে। ভূগর্ভস্থ সৌধ যে সকল ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা আধুনিক ইষ্টক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রস্তুত। এই সকল ইষ্টক দেখিতে চকচকে প্রস্তরের ন্যায় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। সহস্র সহস্র বর্ষপরে কোন সময়ে এই পবিত্র স্থান ধ্বংশে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সঠিক নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজা দেবপাল নগরহার (জালালাবাদ) নিবাসী বীরদেব নামক কোন ব্যক্তিকে এই বিহারের মহন্ত পদে বরণ করেন। পরে বঙ্গেশ্বর মহিপালের রাজত্বের নবমবর্ষে, অগ্নীমুখে ইহা ধ্বংশ হইয়া যায়, পরে তৈলক গ্রাম নিবাসী বালাদিত্য ইহা পুনরুদ্ধার করেন। কালচক্রের কুটীলগতিতে, আমাদের এই প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য স্বরূপ কতকগুলি ভগ্নপ্রস্তর-স্তূপ ব্যতীত এখন আর কিছুই নাই।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

বিশ্বরূপ

ওগো বিশ্ব সুবিশাল! বিচিত্র প্রকাশ নিরন্তর!
গিরি-নদী-সিন্ধু-মরু-জড়-জীবে ভৌম কলেবর!
কেমনে বাসিব ভাল কোন্‌রূপে হবে উপাসনা,
হে মহান্! হে বিচিত্র! হে সুন্দর! বলনা, বলনা!

নিদাঘে তাপস রুদ্র! চৌদিকে জ্বলিছে কোটি চিতা,
তপোদীপ্ত ভালনেত্র! শবাসনে মেদিনী মূর্চ্ছিতা!
শঙ্কিত বাসব ব্রহ্মা—ত্রিপুরে লেগেছে হাহাকার,
ভস্ম প্রায় চরাচর! তপো বহ্নি জ্বেলেছ দুর্ব্বার।
তপ্তনীহারিকাপথে শঙ্খচিল বেড়ায় ফুকারি,
আর্ত্ত-বিশ্ব-দূত সম দেবকুলে বেদনা প্রচারি!

বরিষায় গঙ্গাধর! গঙ্গাবেগ ধর শির' পর!—
বিদ্যুৎ-দশন দিয়া চিরি' চিরি' সুমেরু শিখর,
কোটি কোটি ঐরাবত মুক্ত করে জাহ্নবীর পথ,
বজ্রনাদে ধ্বনি' শঙ্খ আগে আগে যায় ভগীরথ!
দাঁড়ায়েছ চন্দ্রচূড়! এলাইয়া কপর্দ্দ মণ্ডল,
সপ্তলোক বিপ্লাবিনী শির বাহি' ঝরে অবিরল!

শরতে সুন্দর বপু! শ্রীঅঙ্গে ঝলিছে রবিকর,
মুকুটে মাণিক জ্বলে! পরিধানে চারু পীতাম্বর।
গলায় কমলা! শেফালি ঝরিছে পদ'পর,
শুভ্রমেঘ-রৌপ্যছত্র! কাশ গুচ্ছে দুলিছে চামর।
ঝিঁ ঝিঁর নৌবৎ বাজে ফুলে ঘেরা বনবীথি পাশে,
অপূর্ব্ব রাজেন্দ্র বেশে শরতের বন-সভা হাসে!

হেমন্তে কুবের সম প্রান্তরে বসেছ বার দিয়া',
ধরায় কাঞ্চনকোষ থরে থরে দেহ এলাইয়া!
ধান্য শীর্ষে বাঁধি' চূড়া কর্ণিকার সর্ষপের ফুলে,
গলায় ধান্যের মালা! মঞ্জীরে মটরপুষ্প দুলে!
অলিরে পাগল করি' বসিয়াছ জগৎ-পালন,
বিতরিছ ভারে ভারে নবান্নের মহা আয়োজন!

শিশিরে ব্রাহ্মণবটু কুহেলির উত্তরীয় গায়!
নীহারের রূপমালা করে বিজড়িত শোভা পায়!
পিঙ্গল কুন্তল উড়ে শীতখিন্ন-তরুলতাশিরে,
কৃচ্ছ্র-প্রাণায়ামরত নিশিথের শীতার্ত্ত সমীরে!
জপশেষে ব্রাহ্ম যামে নীরাজলে ঢালি' হিম জল,
আরক্তিম পূর্ব্বাশায় জ্বালাও প্রভাত হোমানল!

বসন্তে বিনোদচূড়া বাঁধিছে নবকিসলয়ে!
ফুলের অঙ্গদ, হার! ফুলদল কেয়ুরে-বলয়ে!
চিক্কণ শ্যামল অঙ্গে কুঙ্কুম মেখেছ ফুলরেণু,
মঞ্জীরে গুঞ্জরে অলি মলয়ে বাজিছে মৃদু বেণু!
নব-নটবর বেশ! শিঙারের ঘটা অতুলন,
বৃন্দাবনে বন পথে বনমালী মদন মোহন!

নিত্য নব নব রূপ! স্থিত নেত্র নির্ব্বাক রসনা,
বল বল হে বিচিত্র! কোন্‌রূপে হবে উপাসনা!

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ

[১৮]

পরদিন ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; একটা অত্যন্ত বিশ্রী অবসাদ ও তিক্ততায় সমস্ত মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল। রাত্রিতে সুনিদ্রা তো হয়ই নাই, শুধু এই কথাই বার বার মনে হইয়াছে, যে, এ কোন্ গ্রহ আমার ভাগ্যাকাশে দেখা দিল! ইহার প্রবল আকর্ষণে, আমার সুখ দুঃখের যে ধারাটী আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার মধ্যে কতখানি বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে? এবং কোন্ মন্ত্রেই বা ইহার তুষ্টিসাধন করিয়া আমার দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের, জয় পরাজয়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিব?

—হায়রে মানুষের মন! কত অল্প আঘাতেই এ মন বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে! দারুণ সংঘাতে এই মনই আবার কোথা হইতে বিপুল শক্তি সংগ্রহ করে! এর বহু বিচিত্রতার মধ্যে নিশিদিন কত ভাঙ্গাগড়াই চলিতেছে!—এর হাসি কান্নার চুণিপান্না দিয়া মানুষের জীবনেতিহাসের প্রত্যেক পাতাটী সাজানো রহিয়াছে! এ যে কখন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, আবার কখন বজ্রতুল্য কঠিন হইয়া উঠে, সে রহস্যের মীমাংসা চিরদিনই ত দুর্জ্ঞেয় রহিয়া গেল! ওরে, এমনি মানুষের অন্তহীন সাহস সে এই মন নিয়াও আবার খেলা করিতে চায়! এ যে আগুণ নিয়া খেলার চেয়েও কত ভীষণ ও সর্ব্বনাশকর, তাহা সে একবার ও তো হিসাব করিয়া দেখে না!

একটা তুচ্ছ চোখের চাহনির বিশ্লেষণ লইয়াও যে প্রকাণ্ড একটা রাত্রি এত উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়া যাইতে পারে, এ কথাটা বহিতে পড়িলেও এই দিনের পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। মনে করিতাম, ওটা শুধু কবিরই কল্পনা ও অতিরঞ্জন! কিন্তু এ তুচ্ছতম কথাটাও যে এমন করিয়া আমার কাছে সত্য হইয়া উঠিবে, তাহা জানিতাম না!

তবু যদি ঐ খানটাতেই ও ব্যাপারের সব শেষ হইয়া যাইত! কিন্তু সংসারের সব ব্যাপারেই দেখা যায়, ঠিক তেমনটী হয় না! ওর শুধু কি এইই কারণ, যে, অলক্ষ্যে যে দেবতাটী বাস করেন, তিনি মানুষের হৃদয় লইয়া খেলা করিতে ভাল বাসেন; এবং সেই খেলার মধ্য দিয়াই মানুষকে জানাইয়া দেন, যে, সে কতখানি কাঙ্গাল, কতখানি তুচ্ছ!

অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া গড়িয়া তোলার মালিকও তিনি; আবার মানুষ যাহা অন্ধগর্ব্বে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে ব্যর্থ, নগণ্য করিয়া দেওয়ার কর্ত্তাও তিনি!

তবু কি মানুষ তাহা বুঝিতে চায়! সে নিজেকে বড় করিয়া তুলিয়া তুলিয়া, কবে যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পথের ধূলায় মিশাইয়া যায়, তাহাও জানিতে পারে না!

দুয়ারে মৃদু করাঘাত শুনিয়া হঠাৎ মনে হইল, এ যেন সেই অলক্ষ্যের দেবতারই আহ্বানসঙ্কেত! মানুষ তাহার নিত্যকার হাসি কান্নার মধ্যে, খেলা ধূলার মধ্যে যাহার আগমনসংবাদ স্বপ্নেও মনে করে নাই, নির্মেঘ আকাশ হইতে বজ্রপাতের মতই, মধ্যে মধ্যে এই নির্ম্মম নিষ্ঠুর অপ্রত্যাশিতকে তিনি হঠাৎ আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া যান! মাঝে মাঝে এক একটা সর্ব্ব বিধ্বংসী ভূকম্প আসিয়া যেমন নদনদীর চিরন্তন গতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া যায়, অথবা সেই শস্য শ্যামল কূলপ্লাবিনী নদীর ধারাটীকে মুছিয়া দিয়া যায়; খাতটীকেও চিহ্নহীন করিয়া দিয়া পলকের মধ্যে সেই অন্তহীন রহস্যের ক্রোড়ে ফিরিয়া যায়, এও তেমনিই আসিয়া পড়িয়া নিমিষের মধ্যে দারুণ হাহাকার জাগাইয়া দিয়া চলিয়া যায়!

"ঠাকুরপো কি উঠেচ?—একবার এদিকে আসতে হবে,"—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলাম। "কি বৌদি?"—

"আমি আরো দুবার এসে ফিরে গেছি, ঠাকুরপো! অজিতের যে খুব বেশী জ্বর হয়ে পড়্‌ল!—বাবা তোমাকে ডাক্‌তে বল্লেন!"

হাঁ, ঠিক্ এম্‌নি একটা কিছু আমি আশঙ্কা করিতেছিলাম। কথাটা শুনিয়া বুকের ভিতরটা একবার কাঁপিয়া উঠিল!

জীবনে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে, যে গুলি সূচনাতেই জানাইয়া দেয়, যে. সহজে ঘটিয়া যাইবার জন্য তাহারা আত্মপ্রকাশ করে নাই! তাহারা অনেক দুঃখ দিবার জন্য, এবং অনেকখানি কাড়িয়া লইবার জন্যই আসিয়াছে।

—"কাল অত পাহাড়ে রোদ্ লেগেচে; আজ ছেলে এমন হয়ে পড়্‌ল; মোটেই আমার ভাল লাগ্‌চেনা, ঠাকুরপো! এ জ্বর যে সহজে যাবে এ তো একবারটীও মনে হচ্ছেনা! মা মঙ্গলচণ্ডী, বাছাকে ভাল করে দাও;—বাবা বৈদ্যনাথের পায়ের কাছে এসে—দূর ছাই,—কি যে মাথামুণ্ডু বকে যাচ্ছি! আর এত ছাইভস্মও মনে আসে!—"

হায়রে, এ যে আমার মনেরই সেই কথা;—সকলের বুকের মধ্যেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে!

বৌদিদি একবার একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার দুই চোখের জল যে ছাপাইয়া নামিয়া আসিতে চাহিতেছে, তাহা রোধ করা তাঁহার সাধ্য ছিল না।

একটা কিছু যেন বুকের কাছে ঠেলিয়া উঠিতেছিল; কোনও মতে শুষ্ককণ্ঠে কহিলাম,—

"তুমি কি ক্ষেপ্‌লে বৌদি? জ্বর হয়েচে, সেরে যাবে; এত ভয় পেলে চল্‌বে কেন?"—কিন্তু বুকের ভিতরে ভিতরে কে যেন মৃদু শিহরিয়া উঠিতেছিল, এবং জানাইয়া দিতেছিল, এর মধ্যে উপেক্ষা করিবার কিছু তো নাইই; নিজের মনকে যুক্তি তর্ক দ্বারা ভুলাইবারও কিছু নাই!

—"তুমি চল, একবার তাকে দেখে এস; তারপর যা' হয় ব্যবস্থা কর। সুজাতা তো একেবারে কেঁদেই আকুল হয়ে উঠেচে,"—

সুজাতার ঘরে অজিত শুইয়া রহিয়াছে। শিয়রের কাছে রমাপ্রসন্ন বাবু; পার্শ্বে সুজাতা। আমি ঘরের মধ্যে যাইতেই সুজাতা উঠিয়া বৌদিদির কাছে আসিয়া তাঁহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল! কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দুই চক্ষু ফুলিয়াছে; অশ্রু সজল দুই চোখের দৃষ্টি সে একবার আমার মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া যেন জানাইয়া দিল, "এবার তোমারই হাতে আমার অজিতকে তুলে দিচ্ছি, ওগো, ওকে আরাম করে দাও,—সুস্থ করে দাও!"—

রমাপ্রসন্ন বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, "এ পাগ্‌লিকে নিয়ে তো বড়ই মুস্কিলে পড়ে গেলাম, বাবা! আমার মা লক্ষ্মী তো ওকে প্রবোধ দিতে যেয়ে হা'র মেনেচেন্; ও সেই শেষ রাত্রি থেকে কেবলি তোমাকে ডেকে আন্‌বার জন্য বল্‌চে, কাল্‌কার সমস্ত দিনের কষ্টের পর একটু বিশ্রাম করুচ বলে, আমি আর ডাক্‌তে দিই নি, তবু কি শোনে, দু'তিন বার মা লক্ষ্মীকে পাঠিয়েচে; এখন তুমি একবারটী ওকে বেশ করে দেখ;—তারপর যা হয় কর; আমি তো এর জ্বরের সূচনাটাই ভাল দেখ্‌চিনে, বাবা!"

আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সুজাতা এতখানি নির্ভর কোথা হইতে পাইল, যে, বিপদের সূচনাতেই শুধু আমাকেই বার বার তাহার মনে পড়িয়াছে!

আমার বুকের ভিতরটা নিংড়াইয়া সমস্তখানি স্নেহপ্রীতি ঐ বালিকার দিকেই অগ্রসর হইয়া যাইতে চাহিতেছিল; এবং তাহাকে এই কথাটাই বারংবার জানাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল, যে, মানুষের শক্তির তুচ্ছতার তো একেবারেই সীমা নাই, কিন্তু শেষ রক্তবিন্দু দিলেও যদি ঐ বালককে এতটুকুও আরাম দেওয়া যায়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না!

কিন্তু মানুষের গর্ব্বেরও যে সীমা নাই তাহা তো তখন তেমন করিয়া মনে করি নাই!

দুনিয়ার সমস্ত বন্ধন,সকল স্নেহের আকর্ষণ দুই হাতে ছিন্ন করিয়া দিয়া যে চলিয়া যায়, সে হউক না এতটুকু শিশু, তবু তাহার বিদায়-মুহূর্ত্তের কাকুতি, তাহার বেদনার পরিমাণ, তাহার রোগ যন্ত্রণার অসীম বিস্তার তাহারই শিয়রে বসিয়া তাহারই মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া, তাহাকে বাহু বেষ্টনীর মধ্যে টানিয়া রাখিয়া, এতটুকুও কি উপশম করিয়া দেওয়া যায়? ওরে, অশ্রু ঢালিয়া যদি ক্ষুদ্র শিশুর ওষ্ঠপুটের এতটুকুও কাকুতি কমানো যাইত।—প্রাণ দিয়াও যদি কোলের শিশুকে ফিরাইয়া আনা যাইত!

কিন্তু তা' কি হয়?—বলিতে পার, বিশ্বের মালিক কোথায় বসিয়া এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন?

কিন্তু এ হইল কি? এমন করিয়া সকলের হৃদয়েই এক-যোগে অমঙ্গল আশঙ্কা কেমন করিয়া জাগিয়া উঠে!—

একটু জোর করিয়াই সমস্ত অবসাদ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলাম, "বাঃ আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কাল একটু অত্যাচার বেশী পড়েচে, তাই হঠাৎ এ

জরটা এসেচে, ও ভয় করবার কিছু নেই—" কিন্তু অজিতের দিকে চাহিতেই আমার বুকটা একেবারেই দমিয়া গেল; এবং অজিত যখন তাহার দুই রক্ত চক্ষু মেলিয়া আমার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল, তখন আর আমার এতটুকুও সাহস রহিল না।

ডান হাতটা বাড়াইয়া দিয়া অজিত অস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, "দাদাবাবু, আমার দূরবীণ্‌টা?—" সুজাতা তাড়াতাড়ি ড্রয়ারের ভিতর হইতে দূরবীণ্‌টা বাহির করিয়া লইয়া আসিয়া কহিল, "ও অজি, এই যে তোমার দূরবীণ্,—কিন্তু অজিত যখন দূরবীণ্ লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল না এবং ঘরের দেওয়ালের দিকে দুই চক্ষুর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল; তখন বিছানার পাশে দূরবীণ্ ফেলিয়া দিয়া সুজাতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অজিত আর একবার চক্ষু চাহিল; বোধ হইল যেন কাহাকে খুঁজিতেছে,—তারপর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "বৌদি, খাবার চাইনে, আমি সরবৎই খাব!"—

কিন্তু তাহার হাসিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল; এবং তন্মুহূর্ত্তেই, এই কথা বলিবার জন্য একটু বেশী শ্রম হইল বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, অজিতের দুই হাতের মুঠি শক্ত হইয়া আসিল;—চক্ষুর তারকা ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল! বৌদিদি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে অজি যে কেমন হয়ে পড়্‌ল!" সুজাতা ছুটিয়া আসিয়া অজিতের মুখের উপর পড়িয়া ডাকিল, "ও অজি, অজি!"—

বৌদিদি বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে অজিতকে টানিয়া কোলের মধ্যে আনিলেন।

"নাঃ তোমরা দেখ্‌চি সব মাটী কর্‌বে! দেখ্‌চনা ওর ফিট্ হচ্ছে, জল আন, বৌদি;—জল আন!"—

বৌদিদি উঠিয়া জল আনিলেন এবং অজিতের চোখে মুখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলেন।

আমি সুজাতার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিলাম, "অমন অস্থির হলে চল্‌বে না, সুজাতা, যদি কেঁদে ওকে ভয় দাও, ও ঘরে তোমাকে রেখে আস্‌ব!"—

সুজাতা চকিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি গোল কর্‌ব না, কাঁদব না; শুধু অজির শিয়রে চুপ করে বসে থাক্‌ব;—তা' আমাকে থাক্‌তে দেবেন ত?"—

"হাঁ, তা' দেব,—" এই এক মুহূর্ত্তে,—এবং অত্যন্ত বিপদের মুহূর্ত্তে,—যখন মানুষ সব চেয়ে নির্ভরের স্থানটীকে আঁকড়িয়া ধরিতে চাহে,—ঠিক্ তখনি আমি এই একমাত্র ভাইয়ের রোগশয্যাপার্শ্বে বোন্‌কে বসিতে দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তৃত্ব কেমন করিয়া যে এত অনায়াসে গ্রহণ করিলাম, তাহা মনে করিয়া এত উদ্বেগের মধ্যেও আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সুজাতাও ঠিক এমনি একদিন বৌদিদির পীড়ার সময়ে সেবার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু মানুষ যে কতই স্বার্থপর তাহা ভাবিয়া আমি অবাক্ হইয়া যাই! সুজাতার উপর যে এতখানি জোর খাটাইতে পারিয়েছি, এমন সহজভাবে তাহাকে সম্বোধন করিতে পারিয়েছি,—সেটা যদিও এতখানি বিপদের মুহূর্ত্ত মধ্যে,—তবুও একটা মৃদু পুলকানুভূতি যে ভিতরে ভিতরে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল, তাহা মনে করিয়া নিজের কাছেও লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিলাম।

চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া যখন বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বাহিরে চৈত্রের প্রখর রৌদ্র তীক্ষ্ণ ছুরিকার মতই শাণিত হইয়া উঠিয়াছে!

দূরে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের শ্যামল শ্রীর মধ্য দিয়া তাহার প্রস্তর রাশির ধূসর বর্ণ, প্রখর দিবালোকে অভিনেতার রাজবেশের অন্তরাল দিয়া তাহার বিপুল দৈন্যের মতই, ফুটিয়া বাহির হইতেছিল!

সহরের দিক্ হইতে মিশ্র কর্ম্ম-কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে; পথের উপর দিয়া ছিন্ন মলিন বসন ভিক্ষুক সুর তুলিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে! তাহার ক্লান্তিও নাই, সুরের পরিসমাপ্তিও নাই!—এ যেন বিশ্বের গোপন বেদনার চিরন্তন কাহিনীটী, বাঁশীর সুরে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে! অনাদিকাল হইতে ঐ ভিক্ষুক মাটীর পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া তাহার বাঁশী বাজাইয়া ফিরি-তেছে! কেহ উহাকে আদর করে নাই; কখনও কাছে ডাকে নাই। তবুও সেই বেদনার সুরটীকে চিরকাল জাগাইয়া রাখিয়াছে; এবং যখন যাহাকে ইচ্ছা সেই সুর শুনাইতেছে!—

আজ নন্দন পাহাড়ের পাদদেশের এই রৌদ্রতপ্ত বাড়ী-টাকে বেষ্টন করিয়া উহার করুণ বেদনার সুর বাজিয়া

উঠিয়াছে ; সমস্ত অন্তরটা পীড়িত করিয়া তাহারই নিষ্ঠুর রেশ শিংরিয়া উঠিতেছিল !—

এ কোন্ দারুণ নির্ম্মম ছন্দ ? -এ কোন্ করুণ গীতি-নাট্যের বেদনাপূর্ণ অভিনয় ?—

—ওগো, মর্ম্মতন্ত্রীর সহিত এই সুরের যোগকে কেমন করিয়া অস্বীকার করিব ?—মুছিয়া চিহ্ন হীন করিয়া দিব ?

[১৯]

জীবনটাই একটা স্মৃতির বিরাট স্তূপ ! ইহার মধ্যে অমর, অক্ষয় অশোকের স্তম্ভ আছে ; মর্ম্মর স্বপ্ন তাজ-মহালও আছে ! আবার অতীত গৌরবের বিধ্বস্ত নিদর্শন হস্তিনানগরীর ধ্বংসাবশেষও আছে। একটু খুঁড়িয়া, একটু খুঁজিয়া দেখিলেই হাহাকারে পরিপূর্ণ শোকের নির্ম্মম আঘাতে স্তম্ভিত, ধ্বংসের উদ্দাম লীলায় বিধ্বস্ত, সহস্র পম্পেই ও চিতা ভস্মের নিম্নে প্রোথিত দেখা যাইবে !

এ একটা প্রকাণ্ড বিয়োগান্ত নাটকের মতই, বহু বিচিত্রতার মধ্য দিয়া দিনের পর দিন অভিনীত হইয়া যাইতেছে ; নিপুণ তুলিকায় হাসি কান্নার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে ! মেঘের পাশে রৌদ্রের মতই এর সুখের ও দুঃখের দিনগুলি পাশাপাশি সাজানো রহিয়াছে ! কখন যে সকল রস ভঙ্গ করিয়া দিয়া, বিপুল রূপৈশ্বর্য্যের অন্তরাল হইতে ক্ষুধিত কঙ্কালের মতই, সুখের হাসির মধ্য দিয়া দুঃখের অশ্রু অতর্কিতে বাহির হইয়া আইসে, এবং ধ্বংস লীলায় বিশ্বকে চকিত, সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে, তাহা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝা যায় না।

এমনটা যে কেন হয়, মানুষ বহু বিতর্কের মধ্য দিয়াও তো তাহার মীমাংসা খুঁজিয়া পায় না ! এই যে হাসি কান্না, এর কি কোনও মূল্যই নাই ? এই যে অতর্কিত, নিষ্ঠুর আঘাত, এই যে মর্ম্মান্তিক হাহাকার, এগুলি কি কিছুই নহে ! ইহার আরম্ভ ও শেষ কি শুধু এখানেই ?

মাথার উপরকার উন্মুক্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্ররাজি দেখা যাইতেছিল ; তাহারা উন্মুখ দৃষ্টিতে যেন আমারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে !

সৃষ্টির আদি বেলা হইতেই উহারা যে অমনি করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে,—কেন ? মাটীর পৃথিবীটার বাহিরে এই যে বিপুল, বিচিত্র, অনন্ত রহস্যাধার বিশ্ব রহিয়াছে, উহার সহিত কি মানুষের যোগ নাই ? শুধুই কি মানুষকে একটু তৃপ্তি দিবার জন্য, তাহার বিস্ময় পুলকিত দৃষ্টিকে নন্দিত করিবার জন্য, উহারা অনাদিকাল ঐ উন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে !

কিন্তু ঐ নক্ষত্র লোকের ওপারেও যে মানুষের অপরি-তৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা অন্ধ আবেগে ছুটিয়াছে ;—ওর সঙ্গে একটা নিবিড় পরিচয় স্থাপন করিবার জন্যও যে মানুষ অন্তরে অন্তরে কতখানি লুব্ধ, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে !

এর কোনোটাকেই তো অস্বীকার করা চলে না, মিথ্যা বলা যায় না !

কিন্তু এই লুব্ধতারও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির পথ কোথায় ?—সে মীমাংসা কি মরণের মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় ? তবে কি মরণ জীবনেরই আরম্ভ মাত্র ? তাই কি এই অতিথিটী জীবন নাট্যের অভিনয়ের যে কোনও অংশে অরসিকের মতই এমন করিয়া হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া জানাইয়া দেয়, "ওরে মুগ্ধ, ওরে ভ্রান্ত, তোর জীবনের পূর্ণতা এই মাটীর পৃথিবীরই বাহিরে ! একে তুচ্ছ করিয়া, এর সমস্ত বাধা বন্ধন কাটিয়াই তুই ঐ বিরাটকে লাভ করিতে পারিস,– এবং তোর সকল আকাঙ্ক্ষার সমাধান করিতে পারিস্ !"—

আজ অজিতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেবলি মনে হইতেছিল, একটী পরিপূর্ণ আনন্দস্রোত বহিয়া চলিয়াছিল, কে তাহার উৎস মুখ এমন করিয়া রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছে ?

ওরে, সে কতখানি অকরুণ, কতখানি নিষ্ঠুর !

আবার তখনি মনে হইতেছিল, তা' কি হয় ?—যে এমন করিয়া জীবন হরণ করিতে পারে, সে কি নিষ্ঠুর ? করুণা পারাবার না হইলে তো এমন নিষ্ঠুরতা সাজে না !

নদীর কুল ভাঙ্গে, আর এক কুল গড়িয়া উঠিবার জন্যই ! আজ যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কাল সে কোথায়, কতখানি সৌন্দর্য্য লইয়া গড়িয়া উঠিবে,—অন্ধ মানুষ তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে ?—

কিন্তু, ওরে, তবু কি মন বুঝিতে চায় ? যিনি ভাঙ্গা গড়ার মালিক, তিনি এমন করিয়া কান্নার সুরে সুরে বুকের ভিতরটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন কেন ?

—দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিতেছিল, কিন্তু তখনই তাহাদের মনে পড়িল, যাহারা অন্তহীন দুঃখের সমুদ্র বুকের

মধ্যে লইয়া নীরবে অজিতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে! রাত্রির অন্ধকার আসিয়া কখন দিনের আলো নিভাইয়া দিতেছে সে খবরও তাহারা আজ সাতদিন রাখে না, আবার কখন প্রভাতের স্নিগ্ধ অরুণ জাগিয়া উঠিয়া চরাচরকে আলোকস্নাত করিয়া দিতেছে, সে সংবাদও তাহাদের নিকট পৌঁছে না!

এমন শোকের চিত্র আর কখনও দেখিয়াছি মনে হয় না! শোক তখনি অত্যন্ত ভীষণ, যখন সে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে না, শুধু দুই চক্ষের অত্যুগ্র জ্বালা বহিয়া রহিয়া জানাইয়া দেয়, কোথায় অন্তরে অন্তরে অগ্নিসমুদ্র গুমরিতেছে!

বৌদিদি নিঃশব্দে কখন আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন, জানিতে পারি নাই! স্নেহাশীষের মতই মাথার উপর তাঁহার কোমল হস্তের মৃদুস্পর্শ আমাকে জানাইয়া দিল, যে, এই বাড়ীটার মধ্যে আজও যে কয়টী প্রাণী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের উপরই তাঁহার অক্লান্ত সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে!

বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কি, বৌদি?"—

"কিছু নয়, ঠাকুরপো! এই খোলা বারান্দার উপর এমন করে বসে থাকলে আর কি হবে বল? অজিতের কাছে বসবে চল! দেখ যদি কিছু করতে পার! এ সাত দিন সাত রাত্রি ওর ঘর ছাড়নি', আজ বাইরে এসে বসে রইলে, ওর বাপ্ বোন্ আরও অস্থির হয়ে উঠবে যে!"

শুষ্ককণ্ঠে কহিলাম, "ডাক্তার কি বলে গেছেন, জান?"

—"জানি;—কি করবে বল? মানুষের চেষ্টার যদি কোনো মূল্য থাকত, তা'হলে অবিশ্যি ফল পেতে;—কিন্তু তা' যে কতই তুচ্ছ, এ কয়দিনের প্রাণপণ চেষ্টার পর তা' বুঝতে তো আর বাকী নেই, বিনু!—এখন ওঠ!"

কিন্তু উঠিবার শক্তি সত্যই আর একবিন্দুও ছিল না! ভিতরে যাইয়া ত আবারও ঐ দারুণ শোকের ছবি দেখিতে হইবে!

দূরে ধূসর ছায়ায় আবৃত নন্দন-পাহাড়টা দেখা যাইতেছিল; যেন একটা বিপুলকায় দৈত্য সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার নিঃশ্বাসের শব্দ বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া আমারই কাণের কাছে তাহার অস্তিত্ব জানাইয়া যাইতেছে!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদিদি স্নেহপূর্ণ মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন, "ঠাকুরপো!"—

বৌদিদির এই সুরের আহ্বানটীকে আমি বিশেষ করিয়া চিনিতাম; সুতরাং একটু চকিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম!

—চক্ষু দুইটী সত্যই জলে ভরিয়া গিয়াছে; এবং ক্ষুদ্র অধরপুট দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া তিনি যে কান্নার বেগটাকে রোধ করিবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা, একবার মুখের দিকে চাহিয়াই, বেশ্ বুঝিতে পারিলাম!

"সর্ব্বনাশ যে কতদিক্ থেকেই ঘিরে এসেচে তা' তুমিও ঠিক্ জান না ঠাকুরপো! কিন্তু আজ্ ঠিক এমন একটা মুহূর্ত্তে এসে দাঁড়িয়েছি, যখন তোমাকে আর সকল কথা না জানিয়ে পারচিনে!"

আমি বুঝিতেই পারিলাম না, মাথার উপর বিধাতার যে নিষ্ঠুর খড়্গ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সর্ব্বনাশকর এমন আর কোন্ ব্যাপার যুক্ত হইতে পারে যাহার কথা মনে করিয়া বৌদিদির মত অত্যন্ত বুদ্ধিশালিনী নারীও স্বস্তি পাইতেছেন না! তবু ব্যাপারটা যে নিশ্চয়ই উপেক্ষার কিছু নহে এবং অত্যন্ত গুরুতর তাহা আমার বুঝিতে বাকী রহিল না।

"যিনি সকল ব্যাপারকে এমন করে জড়িয়ে জটিল করে তুলেচেন, তিনি বেশী কথা বল্‌বার অবসর তো রাখেননি, ঠাকুরপো! তাই আজ এত বড় সর্ব্বনাশের সামনে দাঁড়িয়েও, যে কথাটাকে তোমার কাছে না বলে পারচিনে, সে কথাটা কত বড়ই যে সাংঘাতিক, তা' তুমি এতেই বুঝে, মনটা একটু ঠিক্ করতে পারবে কিনা, বল!"—

বৌদিদি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই একেবারেই চুপ করিয়া গেলেন। এত দুঃখেও হাসি আসিতেছিল; বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম, "যে কথাটা তুমি নিজেই মনের ভিতর রেখে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রস্তুত কর্ত্তে চাচ্ছ, তা' যতটাই শক্ত হোক্ না কেন, আমি ঠিক্ সহ্য কর্ত্তে পারব। তুমি বল, বৌদি,"—কিন্তু মানুষ যত বড়ই প্রতিজ্ঞা করুক্ না কেন, সে প্রতিজ্ঞা করিবার সময়ে কখনই মনে করে না, যে, তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই, তাহার মাথার অকারণে এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতরূপে একটা দারুণ বজ্রাঘাত বা অমনি একটা কিছু হইবে,

তাই বৌদিদি যখন তাঁহার দুই হাতের মধ্যে লুণ্ঠিত অঞ্চলের প্রান্তভাগটা তুলিয়া লইয়া, মুঠা করিয়া ধরিয়া,—ধীরে ধীরে কহিলেন, "ঠাকুরপো,—উনি সুজাতার সঙ্গে অনিলের বিয়ে ঠিক্ করে পাকা কথা দিয়ে এসেচেন ;—কল্‌কাতায় অতুল-দের বাসায় গিয়ে মামীমার সঙ্গে এ সব কথাবার্ত্তা হয়েচে !"—তখন আমার মনে হইল ঠিক্ আমার মাথার উপরকার আকাশটা অনেকখানি ফাঁক্ হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার ভিতর হইতে একখানা বিপুল বলশালী, নিষ্ঠুর, অদৃশ্য হস্ত বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া সবলে একটা নাড়া দিয়া আমার সকল আশা, আনন্দ চিহ্নহীন করিয়া মুছিয়া দিয়া গেল, এবং ভিতরে ভিতরে শক্তিমান্ বলিয়া যে দর্পটুকু ছিল তাহাও একেবারেই চূর্ণ করিয়া দিল !

নন্দন পাহাড়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিলাম ; মনে হইল, সেই নিদ্রিত দানবরাজ ঘুমের মধ্যেই একটু গা নাড়া দিয়া উঠিতেছে, এবং এখনি উঠিয়া আসিয়া বিকট মূর্ত্তিতে এই সিঁড়ির পাশের প্রাঙ্গনের উপরই দাঁড়াইবে !

তবুও দুই হাতে সিঁড়ির প্রান্তভাগটা চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিলাম, "এ সব কথা আর কেন বল্‌চ, বৌদি ! আজ যেটা সব চেয়ে বড় বিপদ্ তার সঙ্গেই যুঝ্‌তে দাও : —তার পর ও সব কথা, কোনও দিন সময় হয়তো, শোনা যাবে !—আর এ সব কথার মীমাংসা কর্‌বার ভারও তো আমাদের উপর কেউ দেয় নি ;—ও নিয়ে আর মিছে উদ্বেগ বাড়ালে চল্‌বে কেন,—বৌদি ?"—

"আজ এত বড় বিপদের মধ্যে এ সব কথা যে কারু মনে আস্‌তে পারে না, তা' আমিই কি জানিনে, বিনু ?— কিন্তু তবু সত্যি আজ আমি বড় ভয় পেয়ে গেছি ; অজিতের শিয়রে যদি ওঁকে পাষাণ মূর্ত্তির মতই অমন স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে না দেখ্‌তাম, তা' হলেও বুঝি আজ আমার উদ্বেগ এতটা সীমা ছাড়িয়ে যেত না ! কিন্তু উনি যা করবেন না কর্‌বেন তা' শুধু একবার স্থির করে ফেলেই যে কতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে বসেন, এবং কেউই যে আর তা' ওল্‌টাতে পারে না, সে খবরটা আর কেউ না পাক্, আমি তো এই কয় মাসের মধ্যে বিশেষ করেই জেনেচি, ঠাকুর পো ; তাই নিজের মনটাকে আর কোন মতেই তো বোঝাতে পার্‌চিনে। এর মীমাংসা আর আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই স্থির করে উঠ্‌তে পার্‌লাম না বলেই তো, তোমাকে, যতই বিশ্রী দেখাক্, এই বিপদের ভাঙ্গন কূলে দাঁড়িয়েও, সব বল্‌তে এসেচি ! তবু সব কথা খুলে বল্‌বার সময় কি আমাকে ঠাকুর দেবেন !"—

"ওর মীমাংসা যদি তোমার বুদ্ধিতে না আসে, তবে আর কারু বুদ্ধিতে আস্‌বে মনে করিনে ! তবে একটা কথা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, বৌদি, এর একটা যে কোনও আলোচনা কর্ত্তে গেলেই, সেটা এতই বিশ্রী হবে এবং নিজেদের স্বার্থটাকে এমনি বড় করে তোলা হবে, যে, আমি তোমাকে ওসব বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত থাক্‌তেই বলি !"

বৌদিদি কহিলেন, "আ আমার কপাল, এই বুদ্ধি নিয়েই বুঝি দুনিয়ার সকল যুদ্ধ জিতে আস্‌বে ! ওরে, নিজের স্বার্থটাই ত্যাগ করিতে শিখেচ, কিন্তু অন্যের স্বার্থ রক্ষা করবার বুদ্ধিটাও একটু আধটু না থাক্‌লে চলে কই ? এত যে বিপদ, তবু এরি মধ্যে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, সে শুধু ওরি মুখ চেয়ে ; ওযে নীরবে মুস্‌ড়ে যাচ্ছে ; চারিদিক থেকেই আগুনে ঐ একবিন্দু মেয়েটাকে ঘিরেচে ; ওকে রক্ষে কর্ত্তে হবে,—বাঁচাতেই হবে ! আজ সব চেয়ে সহজ কাজটা করেই তুমি পালাস পাচ্ছ কই ? ওই সুজাতাকেও যে আজ তোমার না দেখ্‌লেই নয়, ঠাকুর পো !" —

বৌদিদির কণ্ঠস্বর করুণ ও অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল ; কোনও কথা বলিলাম না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "এ যে কি গ্লানি রাতদিন বুকের ভিতর পুষে রেখেচি তা' বলে বোঝানো যাবে না ত ! তার মুখের দিকে সাহস করে যে চাইব, সে শক্তিও আমার নেই ; আর তার বেদনার পরিমাণ করে ওঠ্‌বার ক্ষমতাও আমাদের কারু নেই ! অজিতের বিছানার কাছে বসে বসে যখন দেখি, সুজাতা মাঝে মাঝে দুই হাতে খাটের বাজু চেপে ধরে, আর তার অশ্রুহীন চোখ দুটো বাইরের আকাশের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হয়ে থাকে, তখন ইচ্ছা হয় আমি চেঁচিয়ে উঠে তাকে দুই হাতে টেনে বুকের মধ্যে আনি ! তার এ জ্বালার উপর প্রলেপ দেবার ক্ষমতাই যদি আমার না ছিল, তা' হলে তাকে এমন করে পুড়ে মরবার সহজ পথটা কেন আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম ! ওরে, এতটুকু মেয়ে, তার জন্য পর পর যে সব কঠিন আঘাত তৈরী হয়ে রয়েচে তা' মনে করতেও যে আমার বুকের রক্ত জমে যায় !"—

—"এতকাল তোমার কোলের ছায়ায় গড়ে উঠ্‌লাম, তুমি যে কি চাচ্ছ তা' কি আর আমি বুঝিনি, বৌদি'! কিন্তু তবু তুমি যে তোমার সুজাতাকে কেমন করে বাঁচাবে তা' আমি ভেবে পাচ্ছি নে!"—

"এর বুদ্ধি তোমাকে একটা কর্ত্তেই হবে, ঠাকুর পো! -সব চেয়ে বড় বিপদের কথা হয়েচে কোথায় জান?- সেদিন ত্রিকূট দেখে ফিরে আস্‌বার পরই সুজাতার সাম্‌নেই আমাকে ডেকে বাবা বল্‌লেন,—

"মা লক্ষ্মী, ওকে তো অনিলের হাতেই দেব বলে কল্‌কাতায় তার মার সঙ্গে পাকা কথা ঠিক করে এলাম;—একালের বাপদের মত মেয়ের কাছে মতামত জিজ্ঞাসা করা যদি আমি ভাল মনে কর্‌তাম, তা' হলে হয়তো সুজাতাকে একবার জিজ্ঞাসা করতাম;—এই পর্য্যন্ত বলেই একটু হেসে মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লেন, 'তা' আমার মা—তার বুড়ো ছেলের কথা চিরদিনই মেনে চলেছে, এবং এবারেও বুড়ার এই শেষ আশীষ্‌ মাথায় রেখে সুখী হোক্‌।"—তার পর কি ভেবে একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন, "প্রথম মনে করেছিলাম, ওকে বিনুর হাতেই দেব, কিন্তু অতুল একদিন বল্‌ছিল, বিলাতের সঙ্গে বিনুর বিয়ের চেষ্টা সে করচে, এবং চিঠি পত্রও লিখেছে তাই ভেবে দেখ্‌লাম, এ বেশ হবে, এরা দুটীতেই উপযুক্ত পাত্রে পড়্‌বে; আমি তাই কল্‌কাতা যখন গেলাম অতুলের কথামতই তার মার সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করে এসেচি!—তোমার কাছাকাছি মাকে রাখ্‌বে এ ইচ্ছাটা আমার বড়ই হয়েছিল; তা' এ বেশ হ'ল, সব দিকেই কারু কিছু আর ক্ষোভ রইল না!"—ওর কথা শুনে আমার অবস্থা যা' হল তা' তোমাকে আর বলে বোঝাতে হবে না! একবার সুজাতার মুখের দিকে চাইলাম, সে কাঠের পুতুলের মতই বসে রয়েচে; এত বড় যে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল, সে তা' যেন প্রথমটা বুঝ্‌তেই পারেনি!

বৌদিদির কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, তার পর ধীরে ধীরে কহিলাম,—"তা, সুজাতা তার বাপের কথা বেদবাক্য বলে মনে করে দেখেছি, সে যদি তাঁর কথা শোনে, সব গোলই ত মিটে যায়!—আর সে যে শুনবে না, এমন কোনও লক্ষণও তো তার তুমি পাওনি,—বৌদি!"

কথাটা বলিবার সময়ে আমার কণ্ঠ নালীটা কেহ যেন কঠিন হস্তে টিপিয়া ধরিতেছিল!

—"বিপদ যে ঠিক ঐ খানটাতেই সঙ্গীন্‌ হয়ে উঠেচে! সুজাতা তার বাপের কথার বিরুদ্ধে একটী নিঃশ্বাসও ফেল্‌বে না ত; সে তেমন মেয়েই নয়, ঠাকুর পো!"—

"তবে আর কি, বৌদিদি!"—কথাটা বলিয়াই ইচ্ছা হইতেছিল, ঐ অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া ঐ নন্দন পাহাড়ের কঠিন, শীতল বক্ষের উপর মুখ রক্ষা করিয়া, একবার চীৎকার করিয়া বুকের ভিতরকার দারুণ জ্বালাটাকে বাহির করিয়া দিই!

কিন্তু কি অদ্ভুত শক্তি দিয়াই ভগবান্‌ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন! এই মানুষই, যাহার গায়ে তুচ্ছ কাঁটার আঁচড়টাও সহ্য করিতে পারে না, তাহাকেই নিজের হাতে চিতা ভস্মে পরিণত করিয়া আইসে! তবে, যে আঘাতে পর্ব্বতও চূর্ণ হয়, তাহাই এই মানুষ বুক পাতিয়া সহ্য করে!

বৌদিদি এবার আঁচল তুলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "তবে আর কিছুই না ঠাকুর পো,—সোজা কথায়, সুজাতা বাঁচবে না, এবং আমার সব চেয়ে বড় দুঃখই এই যে, আমিই ওকে মার্‌লাম! আজ যখন আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বাবা বল্‌লেন,—"অতুল ও অনিলকে ডেকে পাঠাও, মা লক্ষ্মী! অজি' যখন আর আমার কোন বন্ধনই রাখ্‌বে না, তখন সত্যিই সব দিক্‌কার হিসেব একটু সময় থাক্‌তে মিটিয়ে নেওয়াই ভাল;—এরপর আমার মাথাটাই স্থির রাখ্‌তে পার্‌ব কিনা তাহাই এক একবার সন্দেহ হচ্ছে! তবু কেবলি মনে হয়, মা লক্ষ্মী, এত বড় পরীক্ষার উপযুক্তও আমি নই!—প্রভাত যেদিন চলে গেল, সে দিন এই বলেই মনটাকে বুঝিয়েছিলাম, যে ওর মা ত ছেলেদের বড় ভাল বাস্‌ত, তাই একটীকে কাছে নিয়ে রাখ্‌ল! অজি'কে বুকে করে রাখ্‌লাম; মা হারা ছেলেকে মায়ের স্নেহ দিয়েই জড়িয়ে রাখ্‌তে হ'ল। ওবে বড় হয়ে উঠ্‌চে, সব দিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে, তা' মনে করেও ত স্বস্তি পাইনি, মা লক্ষ্মী! কত রাত ওর মুখের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি! আর দুই হাত জোড় করে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই বার বার জানিয়েছি যে, এই বুড়ো বয়সে যখন ওর মুখ দেখ্‌বার মত চোখের দৃষ্টিও কমে যাচ্ছে, তখন এ আঁধারের আলোক রেখাটুকুকে নিভিয়ে দিয়োনা! কিন্তু

মা লক্ষ্মী, তিনি কি প্রার্থনা শুনলেন?—না আমাকে রিক্ত কাঙ্গাল করেই তিনি তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করবেন! তাই এই আলোটুকু থাকতে থাকতেই এদিককার সব হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে চাই, মা লক্ষ্মী!—কথা কয়টি বলেই তিনি একটু হাসলেন; সে হাসি, ঠাকুর পো, যেন আমার চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত লোপ করে দিল। তার পর এই এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই সুজাতা যে আমার কোলের মধ্যে মাথা রেখে চুপ করে পড়ে ছিল, একটু কাঁদেনি; একটা বড় করে নিশ্বাসও ফেলেনি; শুধু নিঃশব্দে পড়ে রইল; আমি কি বুঝিনি, কিন্তু ও কতখানি ব্যথা বুকের ভিতর রেখে আমার কোলের মাঝে মুখ লুকিয়েছিল?—তুমি আমার ছেলের মত, ঠাকুর পো, তবু না বলে পারিনে, তোমরা পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষের এ কষ্ট বুঝবার মত ক্ষমতা তোমাদের নেইও, থাকবে এ আশাও আমরা করি নে —কিন্তু মেয়ে মানুষের বুকের ব্যথা আমি ত বুঝি আমি কেমন করে চুপ করে থাকব?—তাই আমার এমন অজির সোণার শরীর কালী হয়ে গেছে তা' যখন চোখে পড়ে তখন হাজার অস্থির হয়ে উঠলেও নিজেকে সামলে নিই; কারণ তখনি ত ঐ সুজাতার শুক্নো, রুক্ষ মুখ খানার দিকে চোখ ফিরে আসে!—আহা, ওর দুঃখের যে আর পার নেই, ঠাকুর পো;—ওযে অমন সোণার চাঁদ ভাইকেও হারাতে বসেছে, নিজেকেও বিসর্জ্জন দিতে অগাধ জলে নেমে পড়েছে!"—শেষ দিককার কথাগুলি বলিয়াই তিনি অঞ্চলের প্রান্ত তুলিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিলেন!

এই আশ্চর্য্য প্রকৃতির নারীকে আমি বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি! অন্যের দুঃখ কষ্ট এমন করিয়া বুকে তুলিয়া লইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। দেবতার মেঘের মত, স্নেহ বর্ষণই যেন এই অদ্ভুত নারীর সমস্ত জীবনের কার্য্য!

মনে মনে ইহাঁকে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "যিনি তোমাকে এমন করে বিশ্বসংসারের ব্যথা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বুকে জড় করবার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই তোমাকে সেই ব্যথা শান্ত করবার পথ দেখিয়ে দেবেন, বৌদি'!—ঠিক এই মুহূর্ত থেকে আমি ওসব কথা চিন্তা করা একেবারেই ছেড়ে দিলাম? আমি জানি যিনি সব ব্যাপারকে জটীল করে তোলেন, তিনিই আবার কেমন করে যে নিমিষের মধ্যে সব সরল করে দেন, তা' চিরদিনই আমাদের বোঝবার বাইরে থেকে যাবে!—তোমার পায়ের একটু ধুলো আমার মাথায় দিয়ে যাও, বৌদি';—যদি এতটুকু দুর্ব্বলতাও আমি বুকের ভিতর অনুভব করে থাকি, তা'হলে তোমার ঐ পায়ের ধুলাই আমার সে দুর্ব্বলতাকে নষ্ট করে দেবে!—এর পর সুজাতা সম্বন্ধে সব চিন্তাই তোমার উপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম—কণ্ঠের স্বর এমন করিয়া আর কোনও দিন রুদ্ধ হইয়া আইসে নাই! চোখের জলে কিছু দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবু দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বৌদিদির পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইলাম!

চিরদিনই ঐ বিপুল স্নেহশালিনী নারীর পায়ের ধুলা লইয়া কৃতার্থ হই; কিন্তু আজ মনে হইল, সেই ক্ষুদ্র রাঙ্গা পা'দুইখানির এতটুকু ধুলার মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত আশীষ আমার জন্য সঞ্চিত ছিল!"

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত।

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার দুর্দ্দশা

সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্য অবলম্বিত উপায় সমূহের মধ্যে পরীক্ষার দ্বারা কিরূপ ফল হইতেছে পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার সম্যক্ আলোচনা করা হইয়াছে। এখন ইহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা কিরূপ চলিতেছে এবং তাহাতে কতদূর ফললাভ হইতেছে তাহাও দেখিতে হইবে। অতি প্রাচীন কাল হইতে এপর্য্যন্ত সংস্কৃত শাস্ত্র সকলের অধ্যয়ন অধ্যাপনা টোলেই হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বের ন্যায় এখনও ছাত্রগণ টোলে আহার ও বাসস্থান

পাইয়া থাকে। জ্ঞানের গভীরতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পূর্ব্ব কালের পড়াইবার রীতিও যে খুব ভাল ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ তাহাতে যে সুফল পাওয়া গিয়াছে আজ পর্য্যন্ত কেবল তাহার মাহাত্ম্যেই সেই আদর্শ সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলিত আছে। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষায় টোলের গৌরব চিরদিনই সমধিক এবং সেই গৌরব রক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজে স্বতন্ত্র একটী টোল বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের টোলে পড়িতে কখনও কোনরূপ বেতন লাগিত না, এ প্রথাও সংস্কৃত কলেজে রীতিমতই রক্ষিত হইয়াছে। ছাত্রদিগের আহারের যথোচিত বন্দোবস্ত না থাকিলেও কিছু বৃত্তি এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। অধিকন্তু পূর্ব্বে কোন স্থানেই ব্যাকরণ সাহিত্য বেদ দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়ের যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত না, এবং অধ্যাপকগণের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অনেকস্থানে যাতায়াত ও নানাবিধ কায়ক্লেশ করিতে হইত, তাহাতে উভয় পক্ষেরই শাস্ত্রালোচনার বিশেষ ব্যাঘাত হইত, এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য পূর্ব্বে কর্তৃপক্ষ সমস্ত শাস্ত্রের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে প্রচুর পরিমাণে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃতকলেজে শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করিতেন। এখন পর্য্যন্তও সেই প্রথাই চলিতেছে। অতএব সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগকে টোলসমূহের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

এরূপ সুব্যবস্থা সত্ত্বেও ছাত্রগণ কেন যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না প্রত্যুত উত্তরোত্তর অবনতির পথেই অগ্রসর হইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সময়ের অল্পতা এবং কার্য্যের বিশৃঙ্খলতার প্রতিই প্রথম দৃষ্টি পড়ে। বর্ত্তমান কালে সমস্ত শাস্ত্র পড়িবার জন্যই সাধারণরূপে একটী কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে বৃত্তি পাইয়া থাকে, তাহাতে ঐ সময়ের একটা আভাস পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ—

নব্যন্যায়ের মধ্য দুইবৎসর, উপাধি তিন বৎসর, নব্য-স্মৃতির উপাধি দুই বা তিন বৎসর। অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের উপাধি দুই বৎসর এবং মধ্য এক বৎসর। সকল প্রথম পরীক্ষার পাঠ্যই এক বৎসরে পড়া হয়।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটী উপাধী পরীক্ষার পরিচয় দিতেছি—

সাহিত্যে

প্রথম পত্র

পাঠ্য		শ্লোক সংখ্যা (মোটামুটি)
শিশুপাল বধ	১০ সর্গ	৮০০
নৈষধ	৯ "	১৪০০
মেঘদূত	" "	১১৮

দ্বিতীয় পত্র

	অঙ্ক
অভিজ্ঞান শকুন্তলা	৭
মালতী মাধব	১০
মুদ্রারাক্ষস	৭
মৃচ্ছকটিক	১০

তৃতীয় পত্র

কাদম্বরী (পূর্ব্বার্দ্ধ)	৬০০ পৃষ্ঠা
*সাহিত্য দর্পণ (সম্পূর্ণ)	৫০০ "
ছন্দোমঞ্জরী	১৫০ "

চতুর্থ পত্র

উদ্ভট সাগর	৪৫০ শ্লোক

নব্য ন্যায়

প্রথম পত্র

	পৃষ্ঠা (টীকাশূন্য)
ব্যধিকরণ	
তর্কব্যাপ্তি গ্রহোপায় পরামর্শ	২০০ "

দ্বিতীয় পত্র

*সামান্য নিরুক্তি	১০০ "
সব্যভিচার	১০০ "
সৎপ্রতি পক্ষ	৭৫ "

তৃতীয় পত্র

*অনুমিতি	১৭০ "
*অবয়ব	১০০ "
কেবলান্বয়ী	১০০ "

বেদান্তে

সভাষ্য ছান্দোগ্যোপনিষৎ

" বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

*ভামতী ও ভাষ্যসহ বেদান্তসূত্র

*অদ্বৈতসিদ্ধি ১ম পরিচ্ছেদ বা খণ্ডন খণ্ড-খাদ্য ১ পরিচ্ছেদ

যদিও এম্, এ, বি, এ, এমন কি আই, এ, পরীক্ষার্থীর পাঠ্য সংখ্যার তুলনায় ও উপাধি পরীক্ষার্থীর ঐরূপ পাঠ্যের তালিকা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, তাহা হইলেও পঠিত বিষয়ে তাহাদের প্রশ্নের কাঠিন্যের তুলনায় উপাধি পরীক্ষার্থীর প্রশ্নের কাঠিন্য ও নীরস বিষয়গুলি কেবল মাত্র যুক্তি গম্য, এবং ধর্ম্ম সংসৃষ্ট হওয়ায় ও ব্যবহার ক্ষেত্রে তাহার উপযোগীতা না থাকায় যে কঠিনতর হইয়াছে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তারপর ইংরাজী পরীক্ষার্থীগণের অনেকেই সমস্ত পাঠ্যপুস্তক ক্রয় পর্য্যন্ত করেন না, নোটের দ্বারাই কাজ চালাইয়া থাকেন, সংস্কৃত পরীক্ষার্থীদের সেরূপ ভাবে কাজ চলে না। কারণ সংস্কৃত পুস্তকগুলি আদ্যোপান্ত পরস্পর এমন দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট যে আদ্যন্ত না পড়িলে অনেক গ্রন্থে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত অতি দুরূহ হইয়া উঠে। বিষয় যতই গুরুতর হউক না কেন তাব ত্ম্য করিয়া দেখিলে ইংরাজী শিক্ষার তুলনায় অধ্যাপকগণ সংস্কৃত শাস্ত্র যে কঠিনতর ভাবে পড়াইয়া থাকেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তদ্ভিন্ন ইংরাজী পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্যই অনেকে পড়েন, তাহাদের পঠিত বিষয়ে নিপুণ হইবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণের প্রায় সকলেরই পড়াইবার উদ্দেশ্যে পড়িতে হয়, সুতরাং বিষয়ে নৈপুণ্যলাভের জন্য তাহাদের কঠিনভাবে পড়াই বিশেষ প্রয়োজন। ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ্য ক্ষুদ্রায়তন হইলেও পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে তাহাদের ঐ পাঠ্যের অন্ততঃ দ্বিগুণ ও কঠিনতর টীকার নিয়মিতরূপে আলোচনা করিতে হয়। সুতরাং তাহাও উপেক্ষণীয় নহে।

এখন দেখা যাউক সংস্কৃত কলেজে বৎসরে কতদিন পড়া হয়। প্রথমতঃ ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সংস্কৃত আদ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার জন্য এবং ম্যাট্রিকুলেশন্ আই, এ, বি, এ, ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজে পড়া হয় না।

তারপর বৈশাখের প্রথম হইতে ১৫।১৬ ই আষাঢ় পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের বন্ধ। ৺পূজার সময়েও মোটামুটি হিসাবে সংস্কৃত কলেজে দেড় মাস ছুটী থাকে, বড়দিন উপলক্ষেও ১০ দিন বন্ধ হয়। এতদ্ভিন্ন সমস্ত রবিবারগুলি গণনা করিলে তাহাও ২০।২২ টী হইবে। ইহার পর রথযাত্রা জন্মাষ্টমী আদিতে বৎসরে অনূ্যন ১৫ দিন হইয়া থাকে। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে দেখা যাইতেছে যে বৎসরে ৭ মাস ১৫ দিন সংস্কৃত কলেজ বন্ধই থাকে। তারপর শাস্ত্রশাসন-ভীরু ছাত্র ও অধ্যাপকগণ পূর্ণিমা অমাবস্যা, প্রতিপদ ও অষ্টমীতে পঠন পাঠন করেন না। সুতরাং সেগুলির হিসাব করিলে আরও অনূ্যন ২৫ দিন ধরিলে খুব বেশী পড়া হইলেও সংস্কৃত কলেজের টোলে তিন মাস ২০ দিনের বেশী পড়া হয় না। পড়িবার সময় সাধারণতঃ ১২—৪টা এই চারি ঘণ্টা! শনিবারে ১২—২টা এই দুইঘণ্টা মাত্র। সুতরাং কোন অধ্যাপকেরই সম্পূর্ণ সপ্তাহে ২২ ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। ইহার মধ্যে অনেক প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয়েরই ইউনিভারসিটি কলেজে সপ্তাহে ৮.৯ ঘণ্টা করিয়া পড়াইতে হয়। সুতরাং ছাত্রগণ সপ্তাহে ১৪ ঘণ্টার অধিক ঐরূপ অধ্যাপকের অভ্যাসসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এস্থানে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে সপ্তাহে ১৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অধ্যাপকগণকে প্রথম দ্বিতীয় ও উপাধি এই তিন শ্রেণীর ছাত্র পড়াইতে হয়।

এক্ষণে সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যদি বৎসরে ৩মাস ২০দিন ২ঘণ্টা করিয়া দৈনিক পড়া যায় তবে এক একটী উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য কতদিনে শেষ হওয়া উচিত। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে পাঠ্য তালিকায় নির্দ্দিষ্ট পুস্তকরাশির মধ্যে প্রধান এক একখানি মাত্র পুস্তক মোটামুটি উল্টানের পক্ষে ঐরূপ এক বৎসর পর্য্যাপ্ত নহে। দুই বা তিন বৎসরে ভাল করিয়া পাঠ্য শেষ করা ত দূরের কথা। চতুষ্পাঠীর সূক্ষ্ম ধী সম্পন্ন প্রবীণ অধ্যাপকবর্গও • চিহ্নিত অথবা ঐ জাতীয় এক একখানি গ্রন্থ দুই বৎসরের কমে শেষ করিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারা যায়। (অবশ্য তাঁহাদের পড়া সংস্কৃত কলেজের হিসাবে হইত না টোলের হিসাবে হইত। টোলে প্রতিপদ্ অষ্টমী ও পক্ষান্ত দিন ভিন্ন প্রায়ই অনধ্যায় হয় না, কিম্বা দৈনিক ৪ ঘণ্টা মাত্র পড়া হয় না।) সুতরাং বর্ত্তমান কালের ছাত্রগণের সেরূপভাবে পড়িতে হইলে কতখানি সময়ের দরকার তাহা ভাবিবার বিষয়।

এই ত গেল সময়ের কথা। এখন বিশৃঙ্খলতাটা কি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। কলেজের নিয়মানুসারে একটী ক্লাসের জন্য একঘণ্টা কাল মাত্র সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে, দর্শন বা স্মৃতি এমন কি ব্যাকরণেরও একটী পাঠ ভাল

করিয়া পড়াইতে হইলে দুই ঘণ্টার কম সময়ে হয় না, এজন্য ছাত্রদের অনবসরেই পড়া বন্ধ করিতে হয়।

"সংস্কৃত কলেজ" শব্দটী সংস্কৃতের শিক্ষার প্রাধান্য সূচনা করে, সম্প্রতি এই শিক্ষার প্রাধান্য এতদূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে ক্ষুদ্রায়তন একটী গৃহে এক সময়ে আট জন অধ্যাপকের অধ্যাপনা করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে যাঁহাদের স্বর অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ ও যাহাদের কঠিন বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়, সে সমস্ত ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গের অসুবিধার কথা লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। গ্রীষ্মকালে কলেজের কেরাণীরা পর্য্যন্ত টানা পাখার বাতাস পাইয়া থাকেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গের প্রতিও ততদূর সুপ্রসন্ন নহে।

এই ত গেল পড়ার কথা। এখন বেতনের কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ইউনিভারসিটি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ সপ্তাহে ২।৩ ঘণ্টা মাত্র পড়ান। সপ্তাহে ৬ ঘণ্টার অধিক প্রায় কাহাকেও পড়াইতে হয় না। তাহাদের বেতন মাসিক অন্যূন ২০০৲ টাকা। আর যাহারা সংস্কৃত কলেজে সপ্তাহে ১৪ ঘণ্টা পড়াইয়া ইউনিভারসিটিতে ৭৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন, তাহাদের জন্য ৫০৲ টাকার উপরে ইউনিভারসিটির ব্যবস্থা প্রায়ই হয় না। ইহার উপরে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। ইউনিভারসিটি কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার্থী এখনও ৩০ জনের বেশী হয় নাই অথচ সংস্কৃত অধ্যাপকের সংখ্যা পঁচিশের উপরে উঠিয়াছে। এতদবস্থায় সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণের কার্য্য কি অন্য কোন অধ্যাপকের দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। যদি নিযুক্ত অধ্যাপকের দ্বারা কার্য্য করান অসম্ভবই হয়, তবে সেইরূপ কার্য্যকুশল দেখিয়া রাখাই উচিত।

যাহা হউক, বৎসরে ঐরূপ দীর্ঘকাল ছুটী পাইয়া এবং ছাত্রের অন্ন না যোগাইয়া সপ্তাহে অনধিক ২২ ঘণ্টাকাল অধ্যাপনা করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের কোনরূপে দিন কাটিতে পারে, কিন্তু যাহাদের প্রতিদিন ছাত্রের অন্ন যোগাইয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম সহকারে পড়াইতে হয়, সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষ কিরূপ মনোযোগী তাহাও দেখিবার বিষয়।

সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে সংস্কৃত ইউনিভারসিটি গঠিত হইয়াছে, ইহার বোর্ডের অধিবেশনে বিদেশস্থ মেম্বরগণের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথেয় প্রভৃতির জন্য প্রায় চারি পাঁচ শত টাকা ব্যয়িত হয়। যদি কোন কারণে অধিবেশনের সময়ে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের মীমাংসা অসাধ্য হইয়া উঠে (প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে) তবে সেই মীমাংসার জন্য কোন পথ অবলম্বিত হয় তাহা আমরা জানি না। আবার ঐরূপ ব্যয় বাহুল্য করিয়া সভার আহ্বান করিতে হইলে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আর যদি পরীক্ষার বৃত্তির ন্যায় পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়াই বোর্ডের বৃত্তি প্রদত্ত হয়, তবে সেই বার্ষিক ৫০৲ টাকা বা ১০০৲ টাকা সাহায্যের যোগ্যতা বিবেচনা করার জন্য নিরর্থক এত ব্যয় না করিয়া ঐ টাকাগুলিও বৃত্তিস্বরূপে দান করিলে কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রশংসিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপসংহারে এখানকার ছাত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। টোল বিভাগে পড়িবার জন্য কয়েকটী ছাত্র কলেজ হইতে মাসিক ৬৲ টাকা বৃত্তি পায়। তাহাও ছুটীর সময়ে পাইবার নিয়ম নাই। কয়েক বৎসর যাবৎ খাদ্যদ্রব্য এত দুর্মূল্য হইয়াছে যে কলিকাতার ৬৲ টাকা বৃত্তি অতিশয় অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। সুতরাং ছাত্রদের আহারের চিন্তাও করিতে হয়, সম্ভবতঃ অচির ভবিষ্যতে বাসস্থানের চিন্তাও করিতে হইবে। কিন্তু কোন অধ্যাপকের বাটীতে ছাত্রগণের আহার কিম্বা বাসস্থানের জন্য অল্পমাত্রও চিন্তা করিতে হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আহার, বাসস্থান ও পড়া সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজ হইতে অন্য টোলেই সুবিধা বেশী। এই জন্যই সংস্কৃত কলেজে ভাল ছাত্র আসিতে চাহে না। কেবল যাহাদের কলিকাতায় থাকাই প্রয়োজন এইরূপ ছাত্রের দ্বারাই এ স্থানের টোলের কার্য্য চলিতেছে! এইরূপ ছাত্রের অধ্যাপনায় কতদূর অনুরাগ থাকা সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে অধিক বেতনে সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইয়া অধ্যাপকগণের বিদ্যার হ্রাস ভিন্ন অন্য কোন লাভ হইতেছে না। যদি তাঁহাদিগকে যথোচিত বৃত্তি প্রদান করিয়া বাড়ীতে টোল করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে দেশে সংস্কৃত শিক্ষার এতদপেক্ষায় অনেক উন্নতির সম্ভাবনা থাকিত।

শ্রীসুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী

সুধী বচন

শরীরনিরপেক্ষস্য দক্ষস্য ব্যবসায়িণঃ।
বুদ্ধি প্রারব্ধ কার্য্যস্য নাস্তি কিঞ্চন দুষ্করম্॥

শরীরনিরপেক্ষ দক্ষ ব্যবসায়ী বুদ্ধিপূর্ব্বক যদি কার্য্য আরম্ভ করে তবে তার পক্ষে দুষ্কর কোনও কর্ম্মই থাকে না।

অতি দাক্ষিণ্যযুক্তানাং শঙ্কিতানাং পদে পদে।
পরাপবাদ ভীরুণাং দূরতো যান্তি সম্পদঃ॥

অতিশয় দাক্ষিণ্যযুক্ত, পদে পদে শঙ্কিত, পাছে কেহ কিছু বলে এই ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ব্যক্তিদের সম্পদ দূরে পলায়ন করে।

আদেয়স্য প্রদেয়স্য কর্ত্তব্যস্য চ কর্ম্মণঃ।
ক্ষিপ্রমক্রিয় মানস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্॥

দান গ্রহণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইত্যাদি ক্ষিপ্রতা সহকারে না করিলে কাল তার রস খাইয়া ফেলে,—অর্থাৎ সে কাজে আর সুবিধা কিছু হয় না।

ন স্বল্পস্য কৃতে ভূরি নাশয়েন্মতিমান্নরঃ।
এতদেব হি পাণ্ডিত্যং ন স্বল্পাদ্ ভূরিনাশনম্॥

মতিমান্ পুরুষ অল্পের জন্য অধিক নষ্ট করে না। অল্পের জন্য অধিক নষ্ট না করিয়া ফেলা, ইহাই পাণ্ডিত্য।

অফলানি দুরন্তানি সমব্যয় ফলানি চ।
অশক্যানি চ বস্তূনি নারভেত বিচক্ষণঃ॥

নিষ্ফল পরিণামে ক্লেশকর ব্যয়ের সমান মাত্র ফলদায়ক অসাধ্য যে সব কাজ বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত হন না।

কিংনু স্যাদিদং কৃত্বা কিংনু স্যাদকুর্ব্বতঃ।
ইতি সংচিন্ত্য মনসা প্রাজ্ঞঃ কুর্ব্বীত বা নবা॥

করিলে কি হইবে, না করিলেই বা কি হইবে, এই কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা হয় কাজ করেন, না হয় না করেন।

দেহে পাতিনি কা রক্ষা যশো রক্ষ্য মপাতবৎ।
নরঃ পতিতকায়োঽপি যশঃ কায়েন জীবতি॥

দেহ পাত হইলে রক্ষা আর কি! এক মাত্র যশই অপাতবৎ রক্ষণীয়। দেহ পাত হইলেও মানব যশোদেহে জীবিত থাকে।

নিমেষ মাত্রমপিতে বয়ঃ গচ্ছন্ন তিষ্ঠতি।
তস্মাদ্দেহেষ্বনিত্যেষু কীর্ত্তিমেকা মুপার্জ্জয়॥

নিমেষে নিমিষে তোমার বয়স গত হইতেছে, রহিতেছে না। দেহ যখন অনিত্য তখন কীর্ত্তি উপার্জ্জন কর।

বুধাগ্রে ন গুণান্ ব্রূয়াৎ সাধু বেত্তি যতঃ স্বয়ং।
মূর্খাগ্রেঽপি ন চ ব্রূয়াদ্ বুধপ্রোক্তং ন বেত্তি সঃ॥

পণ্ডিতদের কাছে নিজের গুণের কথা বলিও না—তাঁহারা নিজেরাই তাহা বুঝিতে পারেন।—মূর্খের কাছেও বলিও না,—জ্ঞানীর কথা তারা কিছু বুঝিতে পারে না।

যাবৎ স্বস্থমিদং দেহং যাবদ্ মৃত্যুশ্চ দূরতঃ।
তাবদাত্মহিতং কুর্য্যাৎ প্রাণান্তে কিং করিষ্যসি॥

যতদিন দেহ সুস্থ আছে এবং মৃত্যু দূরে আছে, ততদিন আত্মহিত সাধন কর। প্রাণ গেলে আর কি করিবে?

ব্যর্থাভিমান

কুটীর-দুয়ার করিয়া বন্ধ, নিভায়ে সাঁজের বাতি
আঁধারে লুকায়ে করিয়াছি ভোর কত মিলনের রাতি!
শত দুর্য্যোগ করিয়া মাথায়
কতবার সে যে এসে গেছে হায়,
সেধে গেছে তার বাঁশরীর তানে, খুঁজে গেছে আতি পাতি,
বৃথা অভিমানে আমি এক কোণে ছিন্ন আঁচল পাতি
বিরহ শয়নে করিয়াছি ভোর কত মিলনের রাতি!

কত এসে সে যে করেছে আদর, ভাঙ্গেনি ঘুমোর মোর,
নিঠুর হেলায় সুদিনের নিশা কত হয়ে গেছে ভোর!
প্রভাতে মলিন কুটীর সজ্জা
নীরবে কেবল দিয়াছে লজ্জা,
কলরবে পাখী উঠেছে গাহিয়া,—"রবেনা গরব তোর",
তবু ভাঙ্গাবুকে পোড়া অভিমান রেখেছি চাপিয়া ঘোর;
দেই নেই তবু বুঝিতে নিজেরে সে যে মোর মনচোর!

সেদিন হইতে আমার দুয়ারে নীরব তাহার বাঁশী,
"উঠ প্রিয়ে"—ব'লে কাহার কণ্ঠ সুধালে না আর আসি;
সেদিন সহসা কাঁপিল বক্ষ,
প্রভাতে ফেলিনু হারায়ে লক্ষ্য
না হেরি তাহার চরণ-চিহ্ন অঙ্গনে পাশাপাশি,
হাহাকার করি উঠিল চিত্তে দৃপ্ত বেদনারাশি;
বুঝিলাম সেই জীবন আমার, আমি শুধু তার দাসী!

আজি কত নিশি দুয়ার খুলিয়া, জ্বালিয়া সাধের বাতি
ব'সে আছি একা আশায় জাগিয়া কুসুম-শয্যা-পাতি!—
আঁখিতে আকুল শ্রাবণের ধারা,
কই, তবু তার নাহি আর সাড়া;
বাজে না ত আর বাঁশরী তাহার পাগল করিয়া রাতি!
কেন করিলাম পোড়া অভিমান?—তাইত গিয়াছে জাতি,
একেবারে তাই ফেলেছি হারায়ে চির জীবনের সাথী!

শ্রীকুঞ্জবিহারি চৌধুরী।

কুব্জ

(শার্লক হোম)

আমার বিবাহের কিছুদিন পরে মে মাসের একরাত্রে সারাদিন কাজের পর পাইপ খাইতে খাইতে একখানা নভেল পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলাম। আমার স্ত্রী বহুক্ষণ উপরে শুইতে গিয়াছিলেন। হল ঘর বন্ধ হইবার শব্দেও বুঝিয়াছিলাম,চাকরবাকররাও যার যার ঘরে শুইতে গিয়াছে। নভেল পড়া আর হইল না। ঘুমে চক্ষু আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। আমিও শুইতে যাইবার ইচ্ছায় উঠিয়া পাইপের ছাইটা ঝাড়িতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমার ঘরের ঘণ্টা টানিল। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, পৌণে বারটা। ভাবিলাম এতরাত্রে বোধ হয় কেহ আর বেড়াইতে আসে নাই, নিশ্চয়ই কোন রোগী আসিয়াছে,—ভয় হইল পাছে সারা রাত্র জাগিতে হয়। নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে হল ঘরে যাইয়া দরজা খুলিলাম—দেখিলাম শার্লক হোম সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া। আমাকে দেখিয়াই হোম্ বলিল, "আমি ভাবিয়াছিলাম, বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে না।"

আমি তাঁহাকে ঘরে আসিতে বলিলাম। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে হোম বলিল, "তোমার বাড়ীতে আজ একটু থাকতে পারি কি? তোমার ত অবিবাহিত বন্ধুদের জন্য একটা ঘর আছে। আর টুপির আলনা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আর কেহ এখন তোমার অতিথি নাই।

হোম আমার অতিথি হইলে যে আমি খুব সুখী হইব এই কথা বলিয়া আমি তাহাকে কিছু খাইতে অনুরোধ করিলাম। আমাকে ধন্যবাদ দিয়া হোম বলিল ওটারলু হইতে সে অল্প সময় আগে খাইয়া আসিয়াছে। তবে আমার সঙ্গে বসিয়া একটা পাইপ খাইতে পারে।

আমার পাইপটা তাঁকে দিলাম। হোম পাইপে তামাক ভরিয়া আমার সাম্‌নে বসিল এবং গম্ভীর ভাবে পাইপ টানিতে আরম্ভ করিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে বিশেষ কোন দরকারী কাজ ছাড়া এতরাত্রে হোম কখনও আসে নাই। তাই আমিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ এইভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হোম আমার কাজ কর্ম্মের সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা তুলিয়া বলিল, "দেখ, ওয়াটসন, আমার হাতে এখন খুব আশ্চর্য্য রকমের একটা কেস্ আছে—সবই আমি গুছাইয়া আনিয়াছি। আর দুই একটা সূত্র পাইলেই আমার ধারণা ঠিক হইবেই—তবে সে সূত্র আমি নিশ্চয়ই পাইব—নিশ্চয়ই পাইব!" বলিতে বলিতে তার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—মুখে সাফল্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—হোম আবার গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে। সে মুখ দেখিয়া তাঁহাকে কলের পুতুল বলিয়া ভ্রম হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হোম বলিল, "বিষয়টার কতকগুলি খুব আশ্চর্য্য রকমের ভাব আছে। আমি সমস্ত বিষয়টা খুব তলাইয়া দেখিয়াছি—এবং বোধ হয় মীমাংসারও কাছাকাছি আসিয়াছি। এখন তোমার সাহায্য পাইলে আমার বড় উপকার হয়।"

আমি বলিলাম, "তোমাকে সাহায্য করা ত আমার পক্ষে খুব আনন্দের কথা।"

"বেশ, আমার সঙ্গে কাল এল্‌ডারসট পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে?"

"নিশ্চয়ই"

"ভাল, আমি ওটারলু হইতে ১১—১০ মিনিটের গাড়ীতে রওয়ানা হইতে চাই।"

"ইতিমধ্যে আমি এদিকের সব বন্দোবস্ত করিয়া নিতে পারিব।"

"ভাল, তোমার যদি খুব ঘুম পাইয়া না থাকে, তবে আমি আপাততঃ ঘটনাটা কি এবং কি কাজ এখনও বাকী আছে—তা' তোমাকে বলিতেছি।"

"ইহার পূর্ব্বে অবশ্য আমার খুব ঘুম পাইয়াছিল, কিন্তু

এখন বেশ জাগিতে পারব।"

"তবে আমি সংক্ষেপে তোমাকে সব কথা বলি। এল্‌ডারসটের রয়াল ম্যালো সৈন্যদলের কর্ণেল বার্কের খুনের খবর বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ। আমি সেই বিষয়টারই তদন্ত করিতেছি।"

"কই, আমি ত সে সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই

"কেবলমাত্র দু'দিন আগে ইহা ঘটিয়াছে, আর এখনও এ সম্বন্ধে খুব হৈ চৈ হয় নাই। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই :—

"রয়াল ম্যালো একদল বিখ্যাত আইরিশ সৈন্য। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইহারা অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিয়াছিল এবং তারপর হইতেই সব সময় ইহারা বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে সব কাজ করিয়াছে। গত সোমবার রাত্রি পর্যান্ত ইহারা জেমস্ বার্ক্‌লের নেতৃত্বাধীনে ছিল। এই জেমস্ বার্ক্‌লে একজন অসাধারণ বীর। পূর্ব্বে ইনি সামান্য পদাতিক সৈন্যের কাজ করিতেন। তারপর বীরত্বের জন্য উচ্চতর পদ পাইতে পাইতে শেষে এই সৈন্যদলের কর্ণেলের পদে উঠিয়াছেন। যখন সামান্য সার্জেন্টের কাজ করিতেন, তখন এই দলের অন্যতম সার্জেন্টের কন্যা মিস্ ন্যান্সি ডিভয়কে বিবাহ করেন। কাজে কাজেই কর্ণেলের পদে উঠিবার পরে সামাজিক ভাবে প্রথম প্রথম তাহাদের একটু গোলমালে পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু সহজেই তাঁহারা ইহা সামলাইয়া লইয়াছিলেন। মিসেস্ বার্ক্‌লেকে অন্যান্য নায়কদিগের স্ত্রীরা খুব শ্রদ্ধা করিতেন এবং নায়কগণও বার্ক্‌লেকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং উভয়কেই রেজিমেন্টের সমস্ত লোক খুব ভাল বাসিত। এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে মিসেস্ বার্ক্‌লে দেখিতে খুব সুন্দরী ছিলেন। আজ ৩০ বৎসর যাবৎ তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, তবুও সেই সৌন্দর্য্যের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। মোটের উপর দেখিয়া মনে হইত বার্ক্‌লেরা খুব সুখী পরিবার। মেজর মার্ফী বলেন, কখনও তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া হইয়াছে বলিয়া তিনি শুনেন নাই। কিন্তু তিনি ইহাও বলেন যে মনে হইত যেন মিসেস্ বার্ক্‌লের তাঁর স্বামীর ওপর যতটা না টান ছিল, কর্ণেলের তাঁর স্ত্রীর উপর তার অপেক্ষা অনেক বেশী টান ছিল। একদিনের জন্যও স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইলে তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতেন। মিসেস্ বার্কলেও তাঁর স্বামীকে খুব ভাল বাসিতেন, কিন্তু সে ভালবাসা তিনি খুব দেখাইতে পারিতেন না।

রেজিমেন্টের সমস্ত লোকই তাদের খুব শান্তিপ্রিয় সুখী পরিবার বলিয়াই জানিত এবং এরূপ শোচনীয় ঘটনা হইতে পারে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

কর্ণেল বার্কলের চরিত্র কতকগুলি অদ্ভুত রকমের ভাব ছিল। সাধারণ ত বেশ একটা আনন্দময় স্ফূর্ত্তির ভাব তাঁর দেখা যাইত কিন্তু মাঝে মাঝে আবার অত্যন্ত কঠোর ও ক্রুদ্ধ ভাব তিনি ধারণ করিতেন। কিন্তু স্ত্রীর সহিত, ব্যবহারে এ ভাবের কোন লক্ষণই তাঁর দেখা যাইত না। মেজর মার্ফী ও অন্যান্য নায়কগণ বলেন যে কর্ণেলের সেই বিপরীত ভাব দেখিয়া তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। মাঝে মাঝে যেন তিনি কি একটা উদ্বেগ ও নৈরাশ্যে একেবারে কাতর হইয়া পড়িতেন। মেজর বলেন, এমনও হইয়াছে যে খাবার ঘরে বসিয়া সবার সঙ্গে তিনি আনন্দে অতি উৎসাহের সঙ্গে হাসিয়া কথা কহিতেছেন, হঠাৎ যেন কোন্ অজানিত হাতের স্পর্শে সেই হাসি চক্ষুর পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল! এবং তখন হইতে অতি বিমর্ষ ভাবে তিনি কয়েক দিন কাটাইতেন। আর একটি বিষয় তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। কর্ণেল কখনও সন্ধ্যার পর একাকী থাকিতে পারিতেন না! তাঁর মত একজন বীর সৈনিকের পক্ষে এই কাপুরুষোচিত ব্যবহারে লোকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা বলাবলি করিত।

রয়াল ম্যালোর প্রথম ব্যাটালিয়ন আজ কয়েক বৎসর যাবৎ এল্‌ডারসটে আছে। বিবাহিত নায়কগণ ব্যারাকের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট এক এক বাংলায় বাস করিতেন। কর্ণেল যে বাংলায় বাস করিতেন তাহার নাম ল্যাচিন। এই বাংলাটি ব্যারাক হইতে প্রায় আধ মাইল উত্তরে। বাড়ীর উত্তর দিক হইতে বড় রাস্তার ব্যবধান প্রায় ৩০ হাত চাকর বাকরের মধ্যে একজন কোচম্যান্ ও দুই জন দাসী। এই তিনজন কর্ণেল ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত ল্যাচিনে অপর কেহ বাস করিত না। অতিথি অভ্যাগতও কেহ কোন দিন আসিয়া সেখানে বাস করে নাই।

এখন এই ল্যাচিনে গত সোমবার রাত ৯।১০টার সময় যাহা ঘটিয়াছে সেই কথা বলি।—মিসেস্ বার্ক্‌লে রোম্যান ক্যাথলিক এবং ওয়েষ্টষ্ট্রীট চার্চ্চের অধীনে দরিদ্র-

দিগকে কাপড় বিতরণ করিবার জন্য একটি সমিতিগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা। ঘটনার দিন সন্ধ্যা ৮টায় এই সমিতির একটি সভায় যোগদান করিবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি আহার করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। যাইবার সময় কর্ণেলকে বলিয়া যান যে তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। কোচম্যান সে কথা শুনিয়াছে। তারপর তাঁহার প্রতিবেশিনী মিস্ মরিসনকে লইয়া সভায় যান। মিনিট চল্লিশেক থাকিয়া সভা শেষ হইবার পর—৯-১৫ মিনিটের সময় বাড়ী ফিরেন। পথে মিস্ মরিসনকে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন।

কর্ণেলের বাংলাতে সাধারণত সকাল বেলায় বসিবার জন্য পৃথক একখানি ঘর ছিল। তাহার সম্মুখে রাস্তার দিকে বড় এক জোড়া কাঁচের দরজা খুলিলেই বাড়ার সামনের বাগানে আসা যায়। রাস্তা ও বাগানের ব্যবধান মাত্র ৩০ গজ এবং ইহার মাঝে মাত্র একটি ছোট লোহার রেলিং বসান দেওয়াল। বৈকালে সে ঘরে কেহ যায় না বলিয়া জানালাগুলি সব সময় বন্ধ থাকিত। মিসেস্ বার্ক্‌লে সভা হইতে ফিরিয়া বরাবর এই ঘরে যান। তারপর নিজে আলো জ্বালিয়া দাসী জেন ষ্টুয়ার্টকে ডাকিয়া চা আনিতে বলেন। কর্ণেল খাবারঘরে বসিয়াছিলেন। স্ত্রীর ফিরিবার সংবাদ পাইয়া তিনি তখন সেই ঘরে যান। কোচমান্ তাঁকে যাইতে দেখিয়াছে, কিন্তু আর তাঁহাকে জীবন্ত দেখা গেল না। প্রায় মিনিট দশেক পরে জেন চা আনিয়া আসিয়া শুনিতে পায়, তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী ঘরের মধ্যে ঝগড়া করিতেছেন। সে দরজায় শব্দ করিল, কিন্তু কোন জবাব পাইল না। তখন দরজা খুলিতে যাইয়া দেখে যে তাহা ভিতর দিক হইতে রুদ্ধ। কাজে কাজেই সে অপর দাসীকে খবর দিতে যায়। উভয়ে কোচম্যান্‌কে সঙ্গে লইয়া হল ঘরে আসে এবং শুনিতে পায় যে তখনও তাঁহারা খুব ঝগড়া করিতেছেন। তিনজনেই বলে যে তাহারা কর্ণেল ও মিসেস্ বার্ক্‌লের গলার শব্দ শুনিতে পাইয়াছে,—অপর কাহারও শব্দ তাহাদের কাণে আসে নাই। কর্ণেল খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু চাপা গলায় কথা বলিতেছিলেন সুতরাং তাঁহার কথা কেহ কিছু বুঝিতে পারে নাই। মিসেস্ বার্ক্‌লে খুব চিৎকার করিয়া কথা বলিতেছিলেন, এবং বার বার বলিতেছিলেন,"কাপুরুষ,আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! তোমার সঙ্গে থাকিয়া আমার বাঁচা মরা দুই সমান!" হঠাৎ পুরুষের গলায় একটা আর্ত্তস্বর ও কি একটা জিনিষের পড়িবার শব্দ শোনা গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের গলারও একটা চিৎকার শোনা গেল। ভয়ানক একটা কিছু ঘটিয়াছে সন্দেহ করিয়া কোচমান্ দৌড়িয়া যাইয়া দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ওদিকে ঘরের মধ্যে হইতে কাঁদিবার শব্দ আসিতে লাগিল। কোচমান্ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও দরজা খুলিতে পারিল না। দাসী দুইজন ভয়ে এত অধীর হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারাও তাহার কোন সাহায্য করিতে পারিল না। তারপর কি ভাবিয়া সে বাগানের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া ঘরের অপর দিকে গেল। সৌভাগ্যক্রমে সে দিকের একটা সেই পথে জানালা খোলা ছিল,—সে ঘরে ঢুকিল। দেখিল, মিসেস্ বার্ক্‌লে অজ্ঞান অবস্থায় একটাকোচের উপর পড়িয়া আছেন। আর কর্ণেল—একটা চেয়ারের হাতের উপরে পা, মাথাটা মাটিতে—এই অবস্থায় একরাশি রক্তের মধ্যে পড়িয়া আছেন,—জীবনের লক্ষণ কিছু নাই! উপায়ান্তর না দেখিয়া কোচমান্ দরজা খুলিতে যাইয়া দেখে দরজার গায় চাবি নাই; ঘরে কোথাও চাবির সন্ধান না পাইয়া সে আবার সেই জানালা দিয়া বাহিরে আসিল এবং পুলিশ ও একজন ডাক্তারকে খবর দিল। মিসেস্ বার্ক্‌লের উপরেই সবার খুব সন্দেহ হয়। অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁহাকে তাঁহার ঘরে লইয়া যাওয়া হয় এবং কর্ণেলকে একটা সোফার উপর রাখিয়া ঘর ও তার আশ পাশ অনুসন্ধান করা হয়।

কর্ণেলের মাথার পিছন দিকে দুই ইঞ্চি লম্বা একটা কাটার দাগ ছিল। যা দেখিয়া মনে হয় যেন কোন ভোঁতা যন্ত্রের আঘাতেই উহা হইয়াছে। কি যন্ত্র দ্বারা আঘাত দেওয়া হইয়াছে তাহাও অনুমান করা সহজ। কারণ কর্ণেলের কাছেই মাটিতে হাঁড়ের বাট লাগান কাঠের একটা অদ্ভুত মুগুর পড়িয়াছিল। কর্ণেল যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই সেই স্থান হইতে নানা প্রকারের অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং পুলিশের বিশ্বাস যে এই মুগুরটিও তার সব অস্ত্রের একটি। কিন্তু চাকররা বলে যে এই অদ্ভুত মুগুড়টি তাহারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। যাহা হউক,

নানা রকমের জিনিশের মধ্যে ইহা চোখে না পড়া খুব আশ্চর্য্য নয়। ঘরের মধ্যে পুলিশ আর কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিশের সন্ধান পায় নাই। তবে বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে মৃত কর্ণেল মিসেস্ বার্ক্‌লের কাছে কি ঘরের অন্য কোন স্থানে দরজায় সেই চাবি পাওয়া গেল না। এল্‌ডারসট হইতে একজন 'চাবিওয়ালা আনিয়া তবে সেই দরজা খোলা হয়। এই অবস্থায় গত মঙ্গলবার মেজর মাফি পুলিশের অনুসন্ধানে সাহায্য করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়া খবর পাঠান। ঘটনাটি খুব রহস্যজনক সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম সে সাদা চোখে যে রহস্য দেখা যায়, ব্যাপারটি তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী রহস্যপূর্ণ।

আমি চাকরদের নানা প্রকারের প্রশ্ন করিয়াই জানিতে পারিলাম যে কর্ণেলের মুখের চেহারা দেখিয়া তাহারা সকলেই অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। মুখে একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকার চিহ্ন ছিল। অনেক লোক সেই মুখ দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। অতএব বেশ বোঝা যাইতেছে যে তাঁহার পরিণাম ভাবিয়া কর্ণেল অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। পুলিশরা যে অনুমান করে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে খুন করিয়াছেন, ইহার সঙ্গে এই অনুমানের বেশ সামঞ্জস্য আছে। আর তাঁহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া মুখ ফিরাইয়াছেন এবং তাহাতেই মাথার পিছন দিকে ঘা লাগিয়াছে, ইহাও সেই অনুসারে বেশ অনুমান করা যায়। মিসেস্ বার্ক্‌লের নিকট কোন খবরই পাওয়া গেল না, কারণ মানসিক উত্তেজনায় তিনি পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন।

পুলিশের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে হঠাৎ মিসেস্ বার্ক্‌লের মন খারাপ হইয়া যাইতে পারে, বাড়ী ফিরিবারপথে এরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া তাহারা কিছু সন্ধান পান নাই। এই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, আমার অনুসন্ধানের জন্য কোন্ খবর দরকার ও কোনগুলির দরকার নাই চিন্তা করিতে করিতে এক এক করিয়া কতকগুলি চুরুট শেষ করিলাম। চাবির খোঁজ না পাওয়া একটা বড় কথা। শত অনুসন্ধান করিয়াও চাবিটি যখন ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল না তখন কেহ নিশ্চয়ই ইহা সরাইয়াছে। কর্ণেল বা তার স্ত্রী যে তাহা করেন নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়, অতএব কোন তৃতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঘরে ছিল এবং সে জানালা দিয়াই আসিয়াছিল। তাই মনে হইল, ঘর ও বাগানটি বেশ ভাল ভাবে খুঁজিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যাইবে। আমি কি কি ভাবে অনুসন্ধান করি তা তুমি সবই জান। বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম যে লোকটি রাস্তা হইতে বাগানের ভিতর দিয়া দৌড়িয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। রাস্তা হইতে ঘরের জানালা পর্য্যন্ত পাঁচ যায়গায় তাহার পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি। পায়ের গোড়ালি অপেক্ষা আঙুলের চিহ্নই বেশী ভালভাবে পড়িয়াছে। যাই হউক, এই লোকটির সম্বন্ধে আমি খুব আশ্চর্য্য হই নাই,—তাহার সঙ্গী আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া তুলিয়াছে।"

"তাহার সঙ্গী!"

হোম তার পকেট হইতে একখানা পাতলা কাগজ বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া হাঁটুর উপর রাখিলেন। দেখিলাম কাগজখানার উপরে কোন ছোট জন্তুর পায়ের চিহ্ন।

দেখিয়া আমি বলিলাম, "কি, কুকুর নাকি?"

"না, কুকুর কি পর্দ্দার উপরে উঠিতে পারে! আমি পর্দ্দার উপর ইহার উঠিবার চিহ্ন দেখিয়াছি।"

"তবে কি বাঁদর?"

"তাও নয়। বাঁদরের পায়ের চিহ্ন এরূপ নয়।"

"তবে কি?"

"কুকুর; বিড়াল বাঁদর প্রভৃতি আমরা যে সব জন্তু সচরাচর দেখি তার একটিও নয়। আমি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি, সে জানোয়ারটি লম্বায় প্রায় ২ ফুট কিন্তু পা দুখানি অপেক্ষাকৃত খুব ছোট। ইহা পর্দ্দার উপর উঠিতে পারে ও মাংস খায়।"

"সে কথা বুঝিলে কি করিয়া?"

"কারণ জানালার কাছে একটি খাচায় একটা কেনারি পাখী ছিল। ইহা পর্দ্দা বাহিয়া উঠিয়া কেনারিটি ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল সে চিহ্ন আমি দেখিয়াছি।"

"তবে এটা কি?"

"নামই যদি বলিতে পারিতাম, তবে ত এই রহস্যের অর্দ্ধেক মীমাংসা হইয়া যাইত। তবে মনে হয় ওয়াসেল গোছের কোন জন্তু। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যেমন দেখিতে পাই তাহা অপেক্ষা বড়।"

"কিন্তু এই খুনের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক ?"

"তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। তবে এ কথা তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে আমরা অনেক সন্ধান পাইয়াছি। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে একটা লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া কর্ণেল ও মিসেস্ বার্কলেকে ঝগড়া করিতে দেখিয়াছে,—তারপর একটা অদ্ভুত জন্তু সঙ্গে করিয়া বাগানের মধ্যদিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া জনালা দিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। তারপর হয় সে কর্ণেলকে মারিয়াছে, না হয় কর্ণেল তাহাকে দেখিয়া ভীষণ ভয় পাইয়া পড়িয়া যান এবং পড়িবার সময় কোন শক্ত জিনিষে আঘাত পাইয়া মারা গিয়াছেন। আমরা আরও বুঝিয়াছি যে এই লোকটা যাইবার সময় চাবিটাও সঙ্গে করিয়া নিয়া গিয়াছে।"

"তোমার অনুসন্ধানের ফলে দেখিতেছি ঘটনাটা আরও রহস্যময় হইয়া উঠিল।"

"ঠিক কথা। আগেই ত বলিয়াছি, সাদা চোখে মনে হয় যা প্রকৃত পক্ষে ঘটনাটা অনেকবেশী গোলমেলে। যাক্, তোমাকে ত অনেকক্ষণ জাগাইয়া রাখিলাম ওয়াটসন্, এল্ডার সটে যাইবার পথে বাকি কথা সব বলিব।"

"না, না, আমরা এতদূর আসিয়াছি যে এখন এখানে বন্ধ করা অসম্ভব।"

"আচ্ছা, তবে শোন, ইহা ঠিক যে ৭।৷৹টার সময় মিসেস্ বার্কলে যখন বাহির হন, তখন তাঁহার স্বামীর সঙ্গে তাহার কোনও মনান্তর ছিল না। আবার ইহাও ঠিক যে বাড়ীতে ফিরিয়াই স্বামীর সঙ্গে যাহাতে দেখা না হয় তার জন্য তিনি এই ঘরে গিয়াছিলেন। এবং কর্ণেল যখন সেই ঘরে আসিলেন তখন তিনি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গালাগালি করিতে থাকেন। অতএব ৭।৷৹টা হইতে ৯টার মধ্যে এমন কিছু নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, যাহাতে তাঁহার ভাব এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যে দেড় ঘণ্টায় তাঁহার ভাবের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল সেই দেড় ঘণ্টা মিস্ মরিসন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। অতএব এটা ঠিক যে যতই না বলুন, তিনি নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে কিছু জানেন।

আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, যে এই যুবতীর সঙ্গে কর্ণেলের কোন সম্বন্ধ হয় ত ছিল এবং সে কথা এই যুবতী তাঁহার স্ত্রীর কাছে স্বীকার পাইয়াছেন। মিসেস্ বার্কলের রাগিয়া হঠাৎ বাড়ী ফেরা ও মিস্ মরিসনের এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলা দেখিয়া সহজে মনে ইহাই হইবে। কিন্তু এ ধারণা আমার মনে বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। তবে আমার মনে ঠিক এ বিশ্বাস হইয়াছিল যে মিস্ মরিসন জানেন, কেন মিসেস্ বার্কলে কর্ণেলের উপর চটিয়া গিয়াছিলেন। আমি মিসেস্ মরিসনের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি নিশ্চয়ই কিছু সংবাদ রাখেন এবং এই রহস্যের যথাযথ মীমাংসা না হইলে মিসেস্ বার্কলেকে খুনের দায়ে আদালতে হাজির হইতে হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া মিস্ মরিসন কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিলেন এবং হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি আমার বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আমি কোন কথা বলিব না। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে। অসুখে সে কোন কথা বলিতে পারিতেছে না, এ অবস্থায় যদি আমি বলিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারি তবে বোধ হয় বেশী দোষের হইবে না। গত সোমবার যাহা ঘটিয়াছিল, আমি বলিতেছি শুনুন।— ওয়েষ্ট ষ্ট্রীট মিসন হইতে রাত্র প্রায় পৌনে ন'টার সময় আমরা বাড়ীতে ফিরিতেছিলাম। পথে আমাদের হাডসন্ ষ্ট্রীট দিয়া আসিতে হয়। সাধারণত এই রাস্তাটি বড় নির্জ্জন, রাস্তার বাঁ-দিকে কেবল মাত্র একটী আলো ছিল। আমরা যখন আলোটার কাছে আসিয়াছি, তখন দেখি একটি লোক—পিঠে বাক্সের মত কি একটা ঝুলাইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে— সে একটু কুঁজো। আমরা কাছে আসিতেই সে আমাদের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইল এবং আমাদের দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভগবান, এযে ন্যান্সি।" তাহাকে দেখিয়া মিসেস্ বার্কলের মুখ মৃতের ন্যায় রক্ত শূন্য হইয়া গেল। তিনি ভয়ে এমন কাঁপিতে লাগিলেন যে আমি না ধরিলে তিনি নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইতেন। আমি পুলিশ ডাকিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু মিসেস্ বার্কলেকে তার সঙ্গে অত ভদ্রভাবে কথা বলিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

তিনি বলিলেন, "আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ তুমি মরিয়া গিয়াছ বলিয়া যে আমার বিশ্বাস ছিল, হেনরী।" সে অতি বিকৃত স্বরে উত্তর করিল, "বাস্তবিকই আমি মরিয়া গিয়াছি।" তার মুখের রং অত্যন্ত কাল এবং চেহারা

বড় ভয়ানক। মিসেস্ বার্কলে আমাকে একটু অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, তিনি তাহার সঙ্গে গোপনে কয়েকটা কথা বলিতে চান, এবং ভয়ের কোন কারণ নাই বলিয়াও আশ্বাস দিলেন। ভয়ের কারণ নাই বলিলেন ঘটে, কিন্তু তাঁহার গলার স্বরে বুঝিলাম যে তিনি বিশেষ ভয় পাইয়াছিলেন এবং মুখের চেহারা দেখিয়াও তাহা মনে হইতেছিল।

যাহা হউক, তাঁহার অনুরোধ মত আমি একটু অগ্রসর হইলাম এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া তাঁহারা কি কথা বলিলেন। কতক্ষণপরে মিসেস্ বার্কলে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষু দুটি তখন ভীষণ ভাবে জ্বলিতেছিল। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম সেই লোকটা আলোর নীচে হাত গুটাইয়া দাঁড়াইয়া আছে —যেন রাগে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। পথে আমাদের আর কোন কথা হয় নাই। আমার বাড়ীর কাছে আসিয়া মিসেস্ বার্কলে আমার হাত ধরিয়া বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন, যেন একথা আমি কাহাকেও কিছু না বলি। আর কেবলমাত্র বলিলেন, এই লোকটা তাঁহার পূর্বের পরিচিত।" আমি কাহাকেও কিছু বলিব না—প্রতিজ্ঞা করিলে তিনি আমাকে চুম্বন করিয়া চলিয়া গেলেন এবং সেই অবধি আমি তাঁহাকে আর দেখি নাই। মহাশয়, আমি আপনাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তাঁহার কি বিপদ হইতে পারে না বুঝিয়া আমি পুলিশের কাছে সব গোপন করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, সব কথা খুলিয়া বলাই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলকর।"

মিস্ মরিসনের কথা শুনিয়া, ওয়াটসন, আমি যেন অন্ধকারে আলো দেখিলাম! পূর্ব্বে যাহা খাপছাড়া বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহার মধ্যে যেন একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম এবং সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমার কাছে পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই লোকটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই আমি কৃতকার্য্য হইব। আমার মনে হইল, এলডার সটে থাকিলে তাহাকে বাহির করিতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। বোধ করিয়া আমি এ কয়দিন সেখানে থাকিয়াই তাহাকে খুঁজিয়াছি, এবং আজই বৈকালে তাহার খোঁজ পাইয়াছি। তাহার নাম হেন্‌রী উড এবং হাড্‌সন্ ষ্ট্রীটেই একটা বাড়ীতে সে এখন থাকে। আজ পাঁচ দিন যাবৎ সে ওখানে আছে। তার বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথা বলিয়া জানিলাম, সে সন্ধ্যার পর সৈন্যদের মধ্যে বাজী দেখাইয়া বেড়ায়। কি একটা জন্তু নাকি সে পিঠে করিয়া বেড়ায়। সেটা দিয়া খেলা দেখায়। গত দুই রাত্রি নাকি বাড়ীওয়ালী তাকে ঘরের মধ্যে কাঁদিতে শুনিয়াছে। টাকা পয়সা সম্বন্ধে সে বেশ ভাল। তবে গচ্ছিত টাকার সঙ্গে সে তাহাকে একটা অদ্ভুত রকমের টাকা দিয়াছে। সেই টাকাটা আমার হাতে দিল। দেখিলাম, সেটা ভারতবর্ষের টাকা।

তুমি বোধ হয় পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছ ওয়াটসন্, আমরা এখন কতদূর আসিয়াছি, এবং কেন তোমার সাহায্য আমি চাই। ইহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে মিস্ মরিসন চলিয়া গেলে, এই লোকটা মিসেস্ বার্কলের পাছে পাছে যায় এবং রাস্তায় দাড়াইয়া স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া দেখিতে পায়। তারপর ঘরের মধ্যে যায় এবং যাইবার সময় বাক্সের সেই জন্তুটি বাহির হইয়া পড়ে। ঘরের মধ্যে কি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে এই লোকটিই আমাদিগকে সব সংবাদ দিতে পারিবে।"

"তুমি তাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিবে?"

"হা এবং অন্য একজন লোকের সম্মুখে।"

"আমিই বুঝি সেই লোক।"

"হাঁ, যদি সে সব কথা খুলিয়া বলে, তবে ত ভালই,— নতুবা আমাদের তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্টের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে।"

"আমরা যে এখন যাইয়া তাহাকে সেখানে পাইব, সে কথা তোমাকে কে বলিল?"

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি বেকার ষ্ট্রীটের একজন লোককে সেখানে পাহারায় রাখিয়া আসিয়াছি। সেখানেই যাক না কেন, এই লোক তাহার পিছে লাগিয়া থাকিবে। কাল তার সঙ্গে হাডসন্ ষ্ট্রীটে নিশ্চয়ই দেখা হইবে। ভাল কথা, এখন তোমার শুইতে যাওয়া উচিত। আর বেশীক্ষণ তোমায় বসাইয়া রাখা বাস্তবিকই অন্যায় হইবে।"

তার পরদিন ঠিক দুপুরের সময় আমরা এলডার সটের ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম এবং তখনই হাড্‌সন্ ষ্ট্রীটে চলিয়া গেলাম। হোম তাঁহার মনের ভাব গোপন করিবার

যতই চেষ্টা করুন, আমি তো বুঝিতে পারিতেছিলাম যে তিনি খুব উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। "এই সেই রাস্তা" বলিয়া হোম আমাকে নিয়া ছোট্ট একটি নির্জ্জন রাস্তায় ঢুকিলেন। ইতিমধ্যে একটি আরব বালককে আসিতে দেখিয়া হোম বলিলেন, "এই যে সিম্পসন্, খবর কি ?"

"খবর সব ঠিক।"

"বেশ" বলিয়া হোম স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইলেন এবং তার পর আমাকে নিয়া একটি বাড়ীতে ঢুকিলেন।

কার্ড পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে বিশেষ প্রয়োজনে তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন এবং পর-মুহূর্ত্তেই যাহার খোঁজে আমরা এতদূর আসিয়াছিলাম, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সেদিন অপেক্ষাকৃত গরম থাকা সত্ত্বেও সে চিমনির কাছে একখানা চেয়ারে জড়ভরতের মত বসিয়াছিল। আমরা তাহার সম্মুখে যাইতেই সে দুইখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া আমাদের ব'সতে বলিল।

হোম কোন রকমের কোন মুখবন্ধ না করিয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম বোধ হয় হেন্‌রী উড্? আমি আপনার সঙ্গে কর্ণেল বার্কলের খুনের সম্বন্ধে একটু আলাপ করিতে আসিয়াছি।"

"আমি তাহার কি জানি ?"

"সেই খবরই ত আমি জানিতে আসিয়াছি। বোধ হয় আপনি জানেন যে এ রহস্য ভেদ না হইলে আপনার বন্ধু মিসেস্ বার্কলে খুনের দায়ে অভিযুক্ত হইবেন।" এই কথা শুনিয়াই যেন লোকটা চমকিয়া উঠিল।

সে বলিল, "মহাশয়, আপনারা কে তাহা আমি জানি না। আর কি করিয়াই বা আপনারা সব খবর পাইলেন তাহাও জানি না। তবে আপনি কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন, এখন যে কথা বলিলেন তাহা সত্য ?"

"মিসেস্ বার্কলের জ্ঞান হইলেই পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে বলিয়া অপেক্ষা করিতেছে।"

"তবে আপনিই কি পুলিশের লোক ?"

"না।"

"তবে এ বিষয়ে আপনার প্রয়োজন কি ?"

"যাহাতে সত্য কথা প্রকাশ পায় সে বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

"তবে আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন, আমি বলিতে পারি, তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—"

"তবে কি আপনিই দোষী ?"

"না।"

"তবে কর্ণেল বার্কেলকে কে খুন করিল ?"

"নিয়তিই তাহাকে খুন করিয়াছে। তবে এই কথা বলিতে পারি, আমি যদি তাহাকে হত্যা করিতাম, তবে তার উপযুক্ত শাস্তিই হইত। কি হইয়াছিল শুনিবেন ? সব কথা খুলিয়া বলাই আমার উচিত। আর বলিবই না কেন ? ইহাতে আমার লজ্জার কিছুই নাই।—শুনুন তবে—

এখন আমাকে যেরূপ কদাকার ও পঙ্গু দেখিতেছেন, পূর্ব্বে আমি এরূপ ছিলাম না। একদিন ছিল যখন ১১৭ নম্বর সেনাদলের মধ্যে করপোরাল হেনরী সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ও দক্ষ বালক ছিল। আমরা তখন ভারতবর্ষের বুরটী ক্যাণ্টনমেণ্টে ছিলাম। বার্কলে সেই দলে সার্জ্জেণ্ট ছিল। সুন্দরী ন্যান্সী ডি ভয় আমাদের দলের কলার সার্জ্জেণ্টের কন্যা। ন্যান্সীর ন্যায় অমন সুন্দরী আমাদের ক্যাণ্টনমেণ্টে কোন স্ত্রীলোকই ছিল না। দুইটি লোক ন্যান্সীকে ভালবাসিত। কিন্তু সে ভালবাসিত, এই দুইজনের মধ্যে একজনকে। মহাশয়, আমার পঙ্গু ও কুব্জ চেহারা দেখিয়া আপনারা হাসিতেছেন, কিন্তু ন্যান্সী আমাকেই ভালবাসিত।

ন্যান্সী আমাকে ভালবাসিত বটে, কিন্তু তাহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে বার্কলের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়, কারণ বার্কলে একটু লেখা পড়া জানিত এবং গুজব ছিল সে শীঘ্রই কমিশন পাইবে। কিন্তু ন্যান্সী আমারই প্রতি অনুকূল। এবং আমাদের বিবাহেরও সব আয়োজন হইল। এমন সময় সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইল।

আমরা বুরটীতে আট্‌কা রহিলাম, আমাদের ক্যাণ্টনমেণ্টে অনেক সাধারণ ভদ্রলোক ও স্ত্রীলোক ছিলেন। চারিদিকে প্রায় দশহাজার বিদ্রোহী সিপাহী আমাদের ঘিরিয়াছিল। এই রূপ আটক অবস্থায় দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের জল ফুরাইয়া আসিল! জেনারাল নীল তাঁহার সৈন্যদল লইয়া কিছু উত্তরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের বিপদের সংবাদ তাঁহাকে কি করিয়া দেওয়া যায়, তখন এই প্রশ্ন উপস্থিত

হইল। আমি স্বেচ্ছায় জেনারেল নীলকে খবর দিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিলাম। অনুমতি পাইলাম এবং কি করিয়া বাহির হওয়া যায় এ সম্বন্ধে বার্কলের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। কারণ, বার্কলেই নাকি ওই দেশের খবর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানিত। বার্কলে আমাকে বাহিরে যাইবার জন্য পথের একটা নক্‌সা করিয়া দিল। রাত দশটার সময় আমি যাত্রা করিলাম। হাজার হাজার লোকের জীবন রক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু দেওয়ালের বাহিরে যখন যাই, তখন একজনের কথাই মাত্র আমার মনে পড়িল। একজনের মুখের ছবিই আমার চ'খের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

শুষ্ক একটা জলপথের মধ্য দিয়াই আমার রাস্তা ছিল। মনে করিয়াছিলাম এই নীচু জমি দিয়া গেলে শত্রু পক্ষের পাহারার চক্ষে পড়িব না। ভয়ানক অন্ধকার রাত। সেই পথে খানিকটা অগ্রসর হইয়া আমি শত্রুপক্ষের ছয়জন সৈন্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহারা যেন আমারই অপেক্ষায় অন্ধকারে সেখানে বসিয়াছিল। তাহাদের সম্মুখে যাইতেই তাহারা আমার মাথায় ঘা মারিয়া আমার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাদের কথা আমি সব বুঝিলাম না। কিন্তু যতটুকু বুঝিলাম তাহাতে যেন সেই আঘাত আমার মাথায় না লাগিয়া বুকে লাগিল। জানিলাম, আমার যে বন্ধু আমার পথের নক্‌সা করিয়া দিয়াছেন, তিনিই একজন দেশী চাকরের সাহায্যে আমার বাহিরে যাইবার সংবাদ শত্রু পক্ষকে জানাইয়া আমাকে ধরাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলিবার আমার দরকার নাই। বার্কলে যে কি প্রকারের লোক ছিল, ইহা হইতে তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। জেনারাল নীল তার:পরদিন অবশ্য বুরুটা উদ্ধার করিলেন; কিন্তু পলাইবার সময় সিপাহীরা আমাকে তাদের সঙ্গে লইয়া গেল। বহুদিন পর্য্যন্ত আমি একজনও স্বদেশবাসীর মুখ দেখিতে পাই নাই। আমার প্রতি সিপাহীরা নানা রকমের অত্যাচার করিত। একবার পালাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ধরা পড়িয়া আরও শাস্তি পাইলাম। সেই ভয়ানক শাস্তির ফলই আমার এই বর্ত্তমান চেহারা। একদল সিপাহী পলাইয়া নেপালের দিকে গেল। পথে দার্জিলিংএর কাছে পাহাড়ীরা তাদের হত্যা করে এবং ফলে আমি তাদের হাতে পড়ি। শেষে অনেক কষ্টে তাদের হাত হইতে পলাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আফগানিস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। আবার ঘুরিতে ঘুরিতে পাহাড়ে ফিরিয়া আসি। সেখানে আসিয়া আমি সেই দেশী লোকদের সঙ্গেই থাকিতাম এবং ক্রমে নানা রকমের বাজী দেখাইয়া সামান্য ভাবে দিন কাটাইতে লাগিলাম। আমার মত হতভাগ্যের ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার কি দরকার? আর যাইয়াই বা কি করিব? তাই পাহাড়েই বাস করিতে লাগিলাম। প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিও আমাকে ইংলণ্ডের দিকে টানিতে পারিল না। ভাবিতাম এই অথর্ব্ব অবস্থায় সেখানে ফিরিয়া যাওয়া অপেক্ষা ন্যান্সী ও আমার বন্ধুরা মনে করিবে যে হ্যারী উড্ মরিয়া গিয়াছে, সেও অনেক ভাল। শুনিয়াছিলাম, বার্কলে ন্যান্সীকে বিবাহ করিয়াছে ও জীবনে অনেক উন্নতি করিয়াছে, তবুও একদিনের জন্যও কাহাকেও একটি কথা বলি নাই।

বয়স যত বেশী হইতে লাগিল, দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাও তত প্রবল হইতে লাগিল ইংলণ্ডের কথা সর্ব্বদা খুব মনে হইত। ভাবিলাম, মরিবার সময় একবার সেই সুন্দর দেশ দেখিব। সামান্য বাজীওয়ালার কাজ করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, সেই ক্ষুদ্র পুঁজি নিয়া ভাসিয়া পড়িলাম। ইংলণ্ডে ফিরিয়া এখানে আসিলাম। আমি সৈন্যদের রীতি-নীতি জানি। কি করিয়া তাদের আনন্দ দেওয়া যায়, তাও জানি। বাজী দেখাইয়া সামান্য যাহা উপায় করিতাম, তাহা দিয়াই কোন রকমে দিন কাটাইতেছিলাম।"

এইখানে সার্লক হোম তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "তার পর তোমার সঙ্গে মিসেস্ বার্কলের দেখা ও পরিচয়ের কথা আমি ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছি। তুমি বোধ হয় মিসেস্ বার্কলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত গেলে এবং রাস্তা হইতে তাদের স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া দেখিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলে?"

"হাঁ তাই বটে। আমাকে দেখিয়া বার্কলের এমন ভাব হইল যে ইতি পূর্ব্বে আমি সে ভাব আর কাহারও কোন দিন দেখি নাই। আমাকে দেখিয়াই সে পড়িয়া গেল। কিন্তু পড়িবার পূর্ব্বেই তার মৃত্যু হইয়াছিল।"

"তারপর?"

"তাপর ন্যান্সী অজ্ঞান হইয়া যায়। আমি ন্যান্সীর

হাত হইতে চাবি নিয়া দরজা খুলিয়া লোক ডাকিব ভাবিলাম, কিন্তু পাছে তাহা হইলে সকলে আমাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করে, তাই চাবিটা পকেটে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। যাইবার সময় টেডীকে তাড়া করিতে গিয়া আমার লাটিটা ফেলিয়া আসিলাম।"

"টেডী আবার কে ?"

হোমের কথা শুনিয়া লোকটা একটা খাঁচা হইতে বেজীর মত একটা জন্তু বাহির করিয়া বলিল, "এই টেডী,— একে দিয়াই আমি খেলা দেখাই। টেডী বেশ সাপ নিয়া খেলা করিতে পারে।—আর কিছু জানিবার দরকার আছে কি ?"

"হয় ত মিসেস্ বার্কলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে আবার আমাদের তোমার সাহায্য নিতে হইবে।"

"বেশ, দরকার হইলে আমি আবার সব কথা বলিব।"

"আর যদি দরকার না হয়, তবে মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে আর এ সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। গত ৩০ বৎসর যাবৎ তাঁহার দুষ্কার্য্যের জন্ম কর্ণেল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন।

বলিয়াই হোম বাহিরের দিকে চাহিলেন। মেজর মার্ফী তখন সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হোম উডের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে গেলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে বাহির হইলাম।

হেমাকে দেখিয়াই মেজর বলিলেন, "শুনিয়াছেন বোধ হয় যে সব গোল মিটিয়া গিয়াছে ?"

"কি হইয়াছে ?"

"ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছে যে সন্ন্যাস রোগে কর্ণেলের মৃত্যু হইয়াছে।"

মেজরের কথার উত্তরে কেবল মাত্র ছোট্ট একটি 'বেশ' বলিয়া হোম আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "চল ওয়াট্‌সন এল্‌ডার সটে থাকিবার আর আমাদের কোন দরকার নাই।"

সোজা পথে ষ্টেশনে গিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী আমাদের নিয়া লণ্ডনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

শ্রীঅমলেন্দু দাসগুপ্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ডাকাতী

"গত দু সপ্তাহের মধ্যে মাত্র বাঙ্গালা দেশেই ২৯টী ডাকাইতি সংঘটিত হইয়াছে,—বাকুড়া জেলায় ১, বীরভূমে ২, বর্দ্ধমানে ৩, খুলনা ১, হুগলীতে ২, হাওড়া ১, মেদিনীপুরে ৪, মুর্শিদাবাদে ১, ২৪ পরগণায় ৩, বগুড়া ৩, দিনাজপুরে ৩, জলপাইগুড়িতে ১, পাবনায় ১, রাজসাহীতে ১, রংপুরে ১, ময়মনসিংহে ১।" (খুলনা, ৬ই কার্ত্তিক)

১৫ দিনে ২৯টি ডাকাতী শুনিতে প্রথমেই হয়ত সকলের গা শিহরিয়া উঠিবে ! কিন্তু বাঙ্গালা দেশটি ছোট নয়, বর্ত্তমান বাঙ্গালাও ইংলণ্ড অপেক্ষা বোধ হয় ৪।৫ গুণ অন্ততঃ বড় হইবে। বাঙ্গালার এক একটি জেলা ছোট এক একটি দেশের মত প্রায়। দেশের এখন যেরূপ অবস্থা—দরিদ্রের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, বহুরোগে দেহে স্বস্তি নাই, মনে সুখ নাই। এ অবস্থায় মানুষের হিতাহিত বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্ধি লোপ পায়। এই অবস্থার সঙ্গে এক এক জেলার ডাকাতীর সংখ্যা মিলাইয়া দেখিলে, বাঙ্গালীকে বড় দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া চিন্তাশীল কাহারও মনে হইবে না। ভারতবাসী আর বাঙ্গালী—বাঙ্গালার শান্ত ধর্ম্মভীরু হিন্দু মুশলমান তাই এই অবস্থায়ও এত কম ডাকাতী। অন্য কোথাও হইলে দেশ লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত।

আবার সাধু হরিদাস

পিরোজপুরের সন্নিহিত কুমারখালী নিবাসী কাজল খাঁ নামক জনৈক মুসলমান পূর্ব্বে পোলিশ কনেষ্টবল ছিল। কতকদিন পিরোজপুর টাউনে পরে রিভার পোলিশে কনেষ্টবলী কার্য্য করিয়াছে। হঠাৎ তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সে চাকরী ছাড়িয়াছে। সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার পরিধানে গৈরিক বসন, গায়ে নামাবলী, গলায় তুলসীর মালা, মস্তকে শিখা ও হস্তে লোহার চিমটা। তাহাকে দেখিলে মুসলমান বলিয়া বুঝা যায় না। বর্ত্তমানে তাহার নাম হরিদাস। সর্ব্বদা হরিনাম নিয়া বেড়াইতেছে। রায়েরকাঠির জমিদার বাবুগণ ও পিরোজপুরের কয়েকটি প্রসিদ্ধ উকিল মোক্তার বাবুগণ উক্ত হরিদাসের বর্ত্তমান জীবনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলাম। একস্থানে লিখিত আছে, কাজল খাঁ বৈষ্ণব

ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলে তাহার স্বজাতীয় মুসলমানগণ ও আত্মীয় স্বজনগণ তাহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে, নানারূপ প্রহার করে, এমন কি একজন মুসলমান যুবক তাহার বাম চক্ষুর উপর ঘুসি মারিয়া চক্ষুটির দৃষ্টি শক্তির হানি করিয়াছে। তখন কোন কোন ব্যক্তি হরিদাসকে বলিল, "তুমি কেন এত অত্যাচার সহ্য কর? যদি তুমি ইহার কোনও রূপ প্রতিকার করিতে ইচ্ছা কর, তোমার পিছনে লোক আছে, এখনই ইহার প্রতিশোধ লওয়া যাইতে পারে।" তখন হরিদাস কাঁদিয়া বলিল, "বাবু উহাদের সাধ্য কি যে আমাকে অত্যাচার করিবে? এ, আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমি পোলিশে চাকরী করিবার সময় যে কত নির্দ্দোষী লোককে কিলাইয়াছি, বিপদে ফেলিয়াছি, এ তাহারই প্রতিশোধ। এ যে কিলে কিলে কাটাকাটি যাইতেছে, এ ঠাকুরের আদেশ, ক্রমে আমার দেহ পবিত্র হইতেছে।"

এক্ষণ হরিদাসের বয়স ৩৫ বৎসর। কোনরূপ ভোগ বিলাসের ইচ্ছা নাই, কোথাও হরিনাম শুনিলে তখন নৃত্য করিতে থাকে ও দুই চক্ষে ধারা বহিতে থাকে; ক্রমান্বয় ৮।১০ দিন উপবাসী থাকে, অন্ন গ্রহণ করে না সামান্য ফল জল খাইয়া কাটায়।

ইতি মধ্যে একদিন স্থানীয় উকিল লাইব্রেরীতে গিয়াছিল, তখন উকিল বাবুগণ তাহার জীবনী শুনিয়া কিছু আর্থিক সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন। হরিদাস টাকা গ্রহণ করে নাই, বলিয়াছে "আমি টাকা দিয়া কি করিব? আমার অর্থের আবশ্যক নাই।"

অনেকে হরিদাসের নিকট গিয়া ব্যারামের ঔষধ চাহিতেছে। নানারূপ স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন করিতেছে। হরিদাস বলিতেছে, আমাকে ঠাকুর সেই ক্ষমতা দেন নাই।

রহমতপুরে আচমত আলী নামক একটী মুসলমান যুবকের কথা শুনিলাম। সে প্রায় ১ বৎসর যাবত হরিনামে মাতোয়ারা হইয়াছে। সে প্রায়ই হরিনাম নিয়া নৃত্য করিতে থাকে। "হরে রাম হরে রাম গৌর নিতাই বাধে শ্যাম" এই বলিয়া নাচিতে থাকে এবং সময় সময় প্রেমে বিভোর হইয়া পড়ে। আচমত আলী মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়াছে, এক সন্ধ্যা আতপ অন্ন নিজে নূতন হাঁড়িতে পাক করিয়া খাইতেছে।

জানি না জগতের কি পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। যাহা সত্য তাহা নিত্য থাকিবে। ভগবৎময় আবার হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। কেহ বলিতে পারেন কাজল খাঁ ও আচমত আলীর পানে, কে এই ভাব উদ্বুদ্ধ করিল? একবার মুসলমান মহাত্মা দরাপ খাঁ হিন্দুধর্ম্ম বলে জগতে অলৌকিক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।" (কালীপুর নিবাসী ২৫শে ভাদ্র)।

বিশ্বের ঠাকুর বিশ্বেরই ঠাকুর,—হিন্দুর মুশলমানের খৃষ্টানের আলাদা আলাদা কেহ তিনি নন। সমাজ বৈষম্য সৃষ্টির নিয়ম, সামাজিক ধর্ম্মের আচারনীতিকে সমাজ বা সম্প্রদায় বিশেষে অনেক বৈষম্য তাই দেখা যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে প্রকৃত বৈষম্য কিছু নাই। আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে যাঁহারা উঠিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সমান সেই এক বিশ্বঠাকুরের সেবক, তবে ঠাকুরের নাকি অনন্তরূপ, অনন্ত লীলা, যে ভাবে যাকে দেখা দিবেন, সেই ভাবেই সে তাঁকে দেখিবে। যে লীলায় যাকে মাতাইবেন, সেই লীলায় সে প্রমত্ত হইবে। তবে ঠাকুরের এই দেখা যে পাইয়াছে সে জানে সকল ভাবে সকল রূপে ঠাকুর এক! ইহাতে বিদ্বেষ যে করে সেও ঠাকুরকে অপমান করে, আর যে সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে গর্ব্ব করে, সেও তেমনই ঠাকুরকে অপমান করে।

অন্নছত্র

"বরিশাল ঝালকাঠী ষ্টেসনের অধীন কলাখিকান্দর গ্রামের শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ কুণ্ড গত ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা হইতে গত লক্ষ্মীপূর্ণিমা পর্য্যন্ত অন্নছত্র দিয়া, গরীব লোকদিগকে এক মাস আহার দিয়াছেন। দৈনিক ২০০ শত কি ২৫০ শত লোক ভোজন করিয়াছে। তৎপর ঐ গ্রামের বিপিনচন্দ্র নট্ট গত ১লা কার্ত্তিক হইতে ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অন্নদান করিবেন। তাহাতে দৈনিক ৩৫০ হইতে ৪০০ শত লোকে আহার পাইতেছে। ঝালকাঠি থানার এলাকায় বহুতর সৎক্রিয়ান্বিত লোকের বাস। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দুও আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এঁহেন কুণ্ড ও নট্ট সম্মান সৎক্রিয়া করিয়া সমাজে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিলেন। এই অন্নকষ্টের দিনে এইরূপ লোকের আবির্ভাব একান্তই বাঞ্ছনীয়।"

(কাশীপুর নিবাসী—১৯শে কার্ত্তিক)

সাধু! ইহাই খাঁটি ভারতসন্তানের দান। ফাণ্ডে চাঁদ দেওয়ার নিন্দা আমরা করি না। তাহাতেও দুঃখীর প্রশমন হয়। কিন্তু নিজের ঘরে বা প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে নিজের হাতে দরিদ্র নারায়ণকে অন্নজল বস্ত্রদানে তৃপ্ত যে করা খাঁটি ভারতবাসী তাতেই সব চেয়ে বেশী তৃপ্তি পায়।

সকাম কি নিষ্কাম যেমনই হউক, কিছুই আসিয়া যায় না। হাতে করিয়া দুঃখীকে যে অন্ন দিতে পারে, দরিদ্রের প্রতি মমতা তারই আছে। দুঃখীর মুখে নারায়ণ তার হাতের অন্নগ্রহণ করেন আবার তার হৃদ্গত নারায়ণ এই সেবাতেই তৃপ্ত হন। ভিতরে বাহিরে এই তৃপ্তি এই আনন্দ কি ফাণ্ডে চাঁদা দানে হয়?

কলিকাতার মদ্যপায়ী

"এই দুদিনেও মদ্যপায়ার সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। গত ১৯১৮ সালে একমাত্র কলিকাতা সহরে যে পরিমাণ মদ্য বিক্রীত হইয়াছে, তাহার মাসিক হিসাব সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত হইল।—জানুয়ারী—১ লক্ষ ৯ হাজার ৪০ সের; ফেব্রুয়ারী—১ লক্ষ ১২ হাজার ১৩০ সের; মার্চ—১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৩৫ সের এপ্রিল—৮৮ হাজার ৪২৫ সের; মে—১ লক্ষ ৮ হাজার ৮৩৫ সের; জুন ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৮০ সের; জুলাই—১ লক্ষ ১২ হাজার ২৫ সের; আগষ্ট—১ লক্ষ ১৩ হাজার ৪২০ সের; সেপ্টেম্বর—১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৩৫ সের; অক্টোবর—১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮২৫ সের; নবেম্বর—১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৫৫ সের; ডিসেম্বর—১ লক্ষ ৪২ হাজার ২৩৫ সের। এই হিসাব পাঠ করিয়া অন্যান্য স্থানের বিক্রীত মদ্যের পরিমাণ এবং দেশের কত লোক কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া কত অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনেও যদি লোকের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে আর কখন হইবে?"

(ঢাকা প্রকাশ ২৮শে ভাদ্র)

দুর্ভিক্ষ আছে, অভাব আছে, দুঃখীর ঘরে। বড়লোকের কি? কলিকাতায় ধনীর অভাব নাই। আর সকলেও বাঙ্গালী নয়; কলিকাতার ব্যবসায়ি অঞ্চলে কত যে বড় বড় বাড়ী নিত্য হইতেছে, অসংখ্য মোটরের জ্বালায় যেখানে রাস্তা পার হওয়াই যে কিরূপ দায়, সহযোগী তাহা জানিলে বোধ হয় একথা বলিতেন না। এত ধনী যেখানে, মদ বিক্রী সেখানে

কেন না হইবে? আর একটা কথাও ভাবিতে হইবে। মদ বেশী খায় সাহেব বা সাহেবী কাদায় বাঙ্গালী বাবুরা তাদের সংখ্যা কলিকাতায় বড় কম নয়। আর তারা খায় দামী বিলাতী মদ, তার দামও অনেক বাড়িয়াছে। নিম্নতর শ্রেণীর কোনও কোনও সম্প্রদায়ের কতক কতক লোক কিছু মদ খায়। তবে দেশী 'ধেনোর' উপরে তারা বড় উঠিতে পারে না,—খুব বেশী দামও তার নয়। সুতরাং কলিকাতায় মদ বিক্রীর পরিমাণ দেখিয়াই এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় নাই যে বাঙ্গালী গৃহস্থগণ একেবারেই মতিচ্ছন্ন হইয়াছে, এত দুর্গতির মধ্যেও কেবল মদ খায়। না, এদেশের সাধারণ লোকের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অত বিকৃত নয়। আয়ের বেশী পয়সাই মদে উড়ায় এরূপ লোক ইয়োরোপে যত অধিক, এমন আর কোথাও নাই।

দুর্দ্দিনে গঙ্গা স্নান

"গঙ্গাস্নানের এই রাস-পূর্ণিমার গ্রহণের যোগ উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের বহুযাত্রী খুলনার পথে কলিকাতায় যাতায়াত করিয়াছে। এক একদিন ষ্টেশনে লোক ধরে নাই এবং যাত্রিগণ ষ্টেশনে পড়িয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে যখন এত লোক ঐ দেশ হইতে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছে তখন এ দেশে ঝটিকা ও দুর্ভিক্ষের ক্লেশ কোথায়? ঝড়ে যাহাদের ঘর দুয়ার পড়িয়া গিয়াছে, তাহারা এক প্রকার উন্মুক্ত স্থানেই বাস করিতেছিল, সুতরাং পথের ক্লেশ তাহাদের নিকট কিছুই নয়। বরং ষ্টেসনঘর ও রেলগাড়ী ও ষ্টীমারে তাহারা স্বীয় স্বীয় আলয় অপেক্ষা অধিক আবৃত স্থানে কাটাইতে পারিবে মনে করিয়াছে। পেটে অন্ন না থাকিলেও একবার এই সুযোগে এ দেশের রমণীকুল ভাগীরথীতে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইতে ইতস্ততঃ করে না। সংসার যাহাদের টনিক বিষময়, তাহারা তীর্থযাত্রায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হয়। তাই এবার ঘর দুয়ার অন্ন বস্ত্রের এত অভাব সত্ত্বেও পূর্ব্ববঙ্গবাসী দরিদ্র হিন্দুগণ দলে দলে গঙ্গাজলে পূত হইবার জন্য ছুটিয়াছে। হায়— আমাদের এই অবস্থা কি বুঝিবার জন্য কেহ নাই?"

(খুলনা ২৭শে কার্ত্তিক)

কে বুঝিবে? অনুভব করিবার মত প্রাণ কোথায় আছে? বুঝিবার মত বুদ্ধি কোথায় আছে? বিদেশী শিক্ষায় বিদেশী আচারনীতির দাসত্বে আমাদের বুদ্ধি বিকৃত, প্রাণ পাষাণ চাপে অসাড়। যে প্রেরণায় সহস্র ক্লেশ সহস্র বাধা সহস্র অসুবিধা তুচ্ছ করিয়াও এদেশের নর নারী পুণ্যযোগে তীর্থাভিমুখে ধাবিত হয়, সে প্রেরণার উৎস যেখানে শুকাইয়া গিয়াছে সেখানে লোকে ত বলিবেই, ইহারা হয় ভণ্ড, নয় পাগল। তবে ভণ্ড ইহারা নয়। ভণ্ড লোক ঠকাইয়া ঐহিক সুখ চায়, সুখ ফেলিয়া দুঃখে গিয়া ঝাঁপিয়া পড়ে না। তবে কি ইহারা পাগল?—হউক,—এই পাগলামোর এই অবশেষটুকু যতদিন আছে, ততদিনই আমরা আছি। তারপর কি থাকিবে, কে থাকিবে, সেই পাগল ঠাকুরই জানেন!

বিনামূল্যে দুধ বিতরণ

"বোম্বাই সহরের কতিপয় ধনবতী মহিলা সেখানকার দরিদ্র হিন্দুদিগকে, পীড়িতা হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে এবং শিশু সন্তানের মাতাদিগকে বিনামূল্যে খাঁটি দুধ বিতরণের উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠন করিয়াছেন "বঙ্গে আর্য্য মহিলা সমাজে'র তত্ত্বাবধানে এই কমিটি গঠিত হইয়াছে। লেডী চন্দ্রপ্রভাবকর প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ইহার উদ্যোগী। তাঁহারা বলেন, "খাঁটি দুধের অভাবেই এত শিশু অকালে মরিতেছে।" খুব ভাল কাজ।

(কাশীপুর নিবাসী)

ভাল কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল বিনা পয়সায় দুধ যোগাইয়া—কেবল এইরূপ ভিক্ষা ও দয়ায় দানে—কি একটা জাতিকে বাঁচাইয়া রাখা যায়? গেলেও সে কি বাঁচার মত বাঁচা? খাঁটি দুধের অভাবেই কি কেবল শিশু মরিতেছে? কেবল দুধ দান করিলেই কি তারা বাঁচিবে? না মা বাপ তাদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে? দুধ বিতরণে নয়, মা বাপ সুস্থশিশুর জন্ম দিতে পারে, আর জন্মিলে নিজেরা তাদের খাওয়াইয়া পরাইয়া আর একটু ভাল ঘরে রাখিয়া স্বাস্থ্যবান্ মানুষ করিয়া তুলিতে পারে, তার ব্যবস্থা যতটুকুই যিনি করিতে পারেন ততটুকু স্থায়ী মঙ্গল তিনি দেশের করিলেন। সাময়িক দুঃখের নিবৃত্তি ইহাতে কিছু হইতে পারে স্থায়ী মঙ্গল কিছুই হইবে না,—বরং এই সব দরিদ্রকে আরও পরনির্ভর ও অসহায় করিয়া ফেলিবে। শুনিয়াছি বিলাতে কোথায় কোন্ এক মহিলা-সমিতি এইরূপ একটা অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন। বিলাতী নকলেই কেবল দেশের হিত হয় না।

গো-মাতার পূজা

(মুসলমানগণের মিলন)

"গত শনিবার ১লা নবেম্বর তারিখে গোপাষ্টমীর দিনে সোদপুরে পিঞ্জারাপোল মেলা হইয়া গিয়াছে। এই মেলার প্রধান কর্ত্তব্য এই যে; ফলফুল ও অন্যান্য উপাদেয় উপকরণ দ্বারা গোপালের পূজা করা হয়। গোপালকে পূজা করিয়া সেই সকল উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য খাওয়ান হয়। মাড়োয়ারীগণই এই মেলার উদ্যোক্তা। এই বৎসরের পিঁজরা-পোলের মেলায় একটা বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালার এবং পশ্চিম উত্তর ভারতবর্ষের প্রায় এক হাজার মুসলমান ও কতকগুলি মুসলমান ভলাণ্টিয়ার মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভলাণ্টিয়ারগণের 'ব্যাজ' (বিশেষ চিহ্ন) ছিল। তাঁহারা অনুষ্ঠানের সাহায্য করিবার জন্যই মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং 'গো-মাতা কি জয়' শব্দে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মেলার প্রবেশদ্বারে এবং তোরণদ্বারে লালবর্ণের কাপড়ে বড় বড় অক্ষরে নিম্নলিখিত কথাগুলি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। লালকাপড়ে এই কথাগুলি লিখিত হইয়াছিল—"Accept best regards and good wishes of your Muslim brethren on the occasion of the Sodepur Pinjrapole Mela. 1st November, 1919." অর্থাৎ ১৯১৯ সালের পিঁজরাপোলে মেলা উপলক্ষে আপনাদের মুসলমান ভ্রাতাদের শুভাকাঙ্ক্ষা ও সম্মান আপনারা গ্রহণ করুন। মুসলমান ভ্রাতাগণ এই ব্যাপারে হিন্দুগণের বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষণ করিয়া প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করিয়াছেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাড়োয়ারী উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

(বাঙ্গালী)

হিন্দু মুশলমানে এরূপ সমপ্রাণতা ও সহযোগিতা আগে বেশ ছিল। এখনও অনেক গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। গো-হত্যা লইয়া যে বিদ্বেষ, মারামারি ও খুনাখুনি এখন হয়, তার মূলে রহিয়াছে রাজনৈতিক কুবুদ্ধি। সেটা যেখানে দেখা দেয় নাই, সেখানে হিন্দু মুশলমান ধর্ম্ম বৈষম্য যতই থাক, বিদ্বেষ

কিছুই নাই। গ্রামে মুশলমান বাস্তুকর-পূজায় হিন্দুর বাড়ীতে বাজায় নূতন কাপড় পরিয়া দুর্গোৎসব দেখিয়া আসে দেবালয়ে ফলফুলাদী পাঠায়। আবার হিন্দু গৃহস্থেরাও দরগায় সিন্নি দেয়. সিন্নীটাই মুশলমানী অনুষ্ঠান। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ সত্যনারায়ণকে সিন্নী দিয়া থাকে। শুনিয়াছি কোন্ পীরের সিন্নীর অনুকরণে সত্যনারায়ণের এই সিন্নী ভোগের প্রচলন হইয়াছে।

ভ্যাড্রালোক (ভদ্রলোক)

আজ কাল অনেক ইংরেজি কাগজে 'ভ্যাড্রালোগ' (Bhadralogue) কথাটী দেখিতে পাওয়া যায়।—কথাটা সকলেই জানেন,—আমাদের 'ভদ্রলোক' কথাটির বিকৃত ইংরাজি। এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান্ পত্রিকাওয়ালারা প্রথমে কথাটা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। 'ভদ্রলোক' কথাটার ইংরেজি আছে—Gentleman ভদ্রলোক বলিতে যে সব সম্প্রদায়কে বুঝায় ইংরেজিতে সাধারণতঃ তাহাদের gentle বিশেষণে বিশিষ্ট করা হয়। কিন্তু এই gentleman বা genteel কথায় যে পরিমান সামাজিক মর্যাদা বুঝায়, এদেশের ভদ্রসম্প্রদায় সেরূপ মর্য্যাদার যোগ্য নন, বোধ হয় এই মনে করিয়াই তাঁহারা এই দুইটি কথার বদলে 'ভদ্রলোক'কে বিকৃত করিয়া 'ভ্যাড্রালোগ' কথাটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন পাছে এদেশের ভদ্রলোককে gentlemen বা genteel বলিলে কথা দুইটির জাতি যায়। বোধ হয় ৪।৫ বৎসর এই কথাটির প্রচলন হইয়াছে। তার আগে. যথোপযুক্ত ইংরেজি কথা দ্বারাই এই সম্প্রদায়কে তাঁহারা বিশিষ্ট করিতেন এরূপ অনেক বিষয়েই তাঁহারা আমাদের অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তা করুন তাহাতে এমন আসে যায় না কিছু। কিন্তু আমরা এমই হতভাগা--আমাদের ইজ্জৎ বোধ এমনই ভোঁতা হইয়া গিয়াছে,—যে আমরাও কিছু না ভাবিয়া অনায়াসে এই কথাটি মাথা পাতিয়া নিয়াছি, আমাদের ইংরেজি কাগজওয়ালারাও সর্ব্বদা এখন ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন! ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনেও এই কথাটি অনেক সময় দেখা যায়। নিম্নে নমুনাস্বরূপ একটি বিজ্ঞাপন তুলিয়া দিলাম।

WANTED—Bhadralogue Apprentices for dairy must be perpared to do manual work, allowance for matriculates Rs. 15, non matriculates Rs 10 per mensem. After one year's training selected matriculate apprentreies will be paid Rs 30-3-60, non matriculate Rs. 20-2-10 per. mensem. Apply Box No 2941 with certificates previous history etc C-o "Bengalee".

2911—16—11—19.

এই বিজ্ঞাপনটি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা মনে হইল, কিছু অবান্তর হইলেও এখানে তাহা না বলিয়া পারিতেছি না। বিজ্ঞাপনদাতা যে এদেশেরই কোনও ব্যবসায়িক এটা না বলিলেও বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি শিক্ষানবীশ ভাবে গরুর রাখালী কাজে কয়েকজন ভ্যাড্রালোগ চাহিয়াছেন,—যাহাদের রাখালের মত তাঁহার চাকর হইয়া গরু পালিতে আপত্তি নাই। শিক্ষানবীশী কাজের জন্য ম্যাট্রিকুলেটকে এবং অম্যাট্রিকুলেটকে ১০ টাকা করিয়া মাসিক মজুরী দিবেন। শিক্ষানবীশী শেষ হইলে মুজুরী হার হইবে ৩০ হইতে ৬০,......এবং ২০ হইতে ৪০ টাকা।

সার বিট্সন বেলের সহৃদয়তা

"তিনি এইক্ষণে আসাম প্রাদেশের চিফ কমিশনর। একদা তিনি এক সবডিপুটী কলেক্টরকে সঙ্গে লইয়া বহু দূর ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এক স্থলে দেখিতে পাইলেন যে রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অল্পবয়স্ক এক বালক অশ্রুপাত করিতেছে। সার বিট্সন বেলের আদেশক্রমে সবডিপুটী কালেক্টর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঐ বালক দুটি পেঁপে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল, দারোগা উহার একটি লইয়া গিয়াছেন, তিনি উহার দাম দেন নাই। বলিয়া গিয়াছেন যে "অপর পেঁপেটী যত দামে বিক্রয় করিবে ঐ পেঁপের দামও তত পাইবে।" সার বিটসন বেল তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে দশ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া ঐ পেঁপে দশ টাকার কিনিয়া লইলেন। বালক আনন্দে আত্মহারা হইয়া থানার অভিমুখে ছুটিল। সার বিট্সন্ বেলও পশ্চাৎ পশ্চাৎ থানায় গমন করিলেন। বালক পুলিশের নিকট হইতেও তাহার পেঁপের জন্য আর একখান ১০ টাকার নোট পাইল।

(কাশীপুর, ২৬শে কার্ত্তিক)

বিট্সনবেল সাহেবের সহৃদয়তার, দরিদ্রের প্রতি করুণার এরূপ অনেক কাহিনী শোনা যায়। এ সব শুনিলে সে কালের রাজাদের কথাই মনে পড়ে। কেহ যদি এই সব কাহিনী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তবে বাস্তবিক বড় একটি কাজ হয়।

সিভিলিয়ান সাহেবেরা যদি এই সহৃদয়তার অনুসরণ করিতে পারেন, দেশের দারিদ্র প্রজার সত্যই 'মা বাপ' তাঁহারা হইতে পারেন।

একটু মমতা সহৃদয়তা অমায়িক ব্যবহার কাহারও কাছে পাইলে এদেশের সাধারণ লোক একেবারে দাসের মত তার অনুগত হইয়া পড়ে। এতদিন দেশ শাসন করিয়াও কেন যে রাজপুরুষগণ এটা বুঝিতে পারেন নাই তাহা ভাবিয়া পাই না।

প্রবাসী
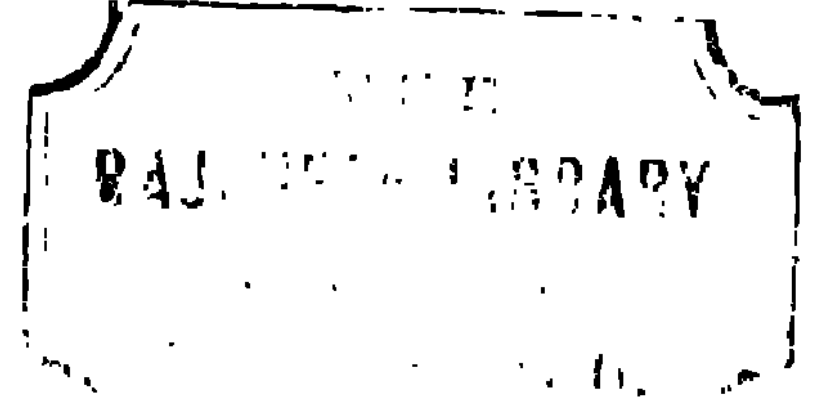
৬ষ্ঠ বর্ষ | পৌষ—১৩২৬ | ৯ম সংখ্যা

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

এই সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপসিংহ এক ভীষণ চক্রান্তে পতিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। মহারাজার এই রাজ্যচ্যুতির বিস্তৃত বিবরণ শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় বিবৃত করিয়া কিরূপে মহারাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। মতিবাবুর নিকট মিষ্টার ব্রাড্‌ল ভারতের দুঃখকষ্টের কথা পার্লামেণ্ট মহাসভায় আন্দোলন করিতে প্রতিশ্রুত হইলে মতিবাবু তাঁহার নিকট কাশ্মীরের মহারাজার প্রতি অবিচারের কথা ব্যক্ত করিলেন। মহারাজার নাম শুনিয়া মিষ্টার ব্রাড্‌ল বলিলেন,—"ভারতীয় রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে কোনও কথার সংস্রবে থাকা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না।"

মতিবাবু—কেন, তাঁহাদের অপরাধ কি?

মিঃ ব্রাড্‌—মতিবাবু, আমি গরিব লোক। আমি যদি তাঁহাদের সংস্রবে থাকি, তাহা হইলে সাধারণে মনে করিবে যে, আমি তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছি।

মতিবাবু—আপনাকে যদি কেহ উৎকোচ প্রদান করিতে চায়, আপনি কি তা গ্রহণ করিবেন?

মিষ্টার ব্রাড্‌ল হাসিয়া কহিলেন—"কিছুতেই নহে। মিষ্টার হিউম আমাকে বলিয়াছেন যে, বড়লোকের সংস্রবে না থাকাই ভাল।" মতিবাবু—কহিলেন, "সাধারণের বিশ্বাস যে মিষ্টার ব্রাড্‌ল কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং সত্যের সমর্থনে তিনি প্রাণপণ করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। আপনি পবিত্রজীবন যাপন করিতেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। লোকের মিথ্যা দোষারোপের আশঙ্কায় আপনার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ মহানুভবের কি কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হওয়া উচিত?"

মিঃ ব্রাড্‌ল—"মতিবাবু, এই কাশ্মীরের মহারাজার কথা লইয়া লাহোরের উকিলবাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু ও কাশ্মীর ষ্টেটের ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার আই, সি, সরকার আমার নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়াছি।"

মতিবাবু—"আমাকে কিন্তু আপনি বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন না।"

মিষ্টার ব্রাড্‌ল—"কাশ্মীরের মহারাজা যদি আমার নিকট আগমন করিয়া তাঁহার অবিচারের কথা আমাকে

বলিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিতে পারি।"

মতিবাবু—"বর্ত্তমানে তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার আপনার নিকট আগমন করা অসম্ভব।"

মিঃ ব্রাড্‌ল—"তাঁহার প্রজাগণ যে তাঁহার রাজ্যচ্যুতিতে দুঃখিত তাহা আমি কিরূপে বুঝিব?"

মতিবাবু—"মহারাজার প্রজাদিগের প্রতিনিধিরা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিতে পারেন।"

মিঃ ব্রাড্‌ল—"বেশ, আমি তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া মহারাজার সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

জাতীয় মহাসমিতিতে কাশ্মীর হইতে তিনজন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। মতিবাবু তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাজার সম্বন্ধে তাঁহার ও মিষ্টার ব্রাড্‌লর মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিলেন। প্রতিনিধিত্রয় মতিবাবুর পরামর্শমত একখানি আবেদনপত্র সহ মিষ্টার ব্রাড্‌লর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিত্রয়ের মধ্যে লাহোরের পণ্ডিত গোপীনাথ ছিলেন। মহারাজার রাজ্যচ্যুতিতে তাঁহার প্রজাগণ যে মর্ম্মাহত হইয়াছে, আবেদনে তাহা উল্লেখ করা ছিল। মিষ্টার ব্রাড্‌ল তখন মহারাজার পক্ষে পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পলিটিক্যাল এজেণ্টদিগের বুদ্ধিবিকারের কথা পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন না; কিন্তু মতিবাবু ছাড়্‌বার লোক নহেন, তিনি শেষে মিষ্টার ব্রাড্‌লকে সে সম্বন্ধেও সম্মত করিয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাড্‌ল ও মিষ্টার কেইনকে ভারতবন্ধু করিয়া মতিবাবু শিশিরকুমারের সহোদরের যোগ্য কার্য্যই করিয়াছেন, ইহাদিগের উভয়ের ন্যায় আরও একজন সহৃদয় ইংরাজ শিশিরকুমারের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি সুপরিচিতনামা শ্রীযুক্ত উইলিয়ম ডিগ্‌বি।

Prosperous British India. India, for the Indians—and for England প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, ভারতের অকৃত্রিম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত উইলিয়ম ডিগ্‌বি, C. I. E মহোদয়ের বিশেষ পরিচয় প্রদানের আবশ্যক হইবে না। এ দেশের বহু রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অধিকতর যত্ন ও আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। এই ডিগ্‌বি শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে উপস্থিত হইয়া অনেক সময় শিশিরকুমারের সহিত ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেন। ইংলণ্ডে ভারতের কথা আন্দোলন করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল এজেন্সী (Indian political Agency) নামে একটী সমিতি প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। উইলিয়ম ডিগ্‌বি ইহার জীবন স্বরূপ ছিলেন। উক্ত এজেন্সী অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। ভারতবর্ষের কোন কথা পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিতে হইলে শিশিরকুমার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া মিষ্টার কেইন ও মিষ্টার ব্রাড্‌লকে বুঝাইয়া দিতেন। পার্লামেণ্টে কিরূপভাবে ভাবে প্রশ্ন করিতে হইবে, শিশিরকুমার অনেক সময় তাহা ডিগ্‌বির নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। এই পলিটিক্যাল এজেন্সী কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আমরা পাঠকবর্গকে তাহা পরে অবগত করাইব। আমরা এক্ষণে কাশ্মীরের ব্যাপারটী আলোচনা করিব।

১৮৮৫ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীরের মহারাজা রণবীর সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিংহ কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই সময় গভর্ণমেণ্ট কাশ্মীরে একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৪৬ খৃঃ অঃ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত গোলাব সিংহের যে সন্ধি হয়, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা উল্লেখ ছিল না। কাশ্মীরে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলে মহারাজা প্রতাপ সিংহের ক্ষমতা ও মর্য্যাদার লাঘব হইবে, এই ভাবিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে গভর্ণমেণ্ট মহারাজাকে জানাইয়াছিলেন যে, রেসিডেণ্ট তাঁহাকে কেবলমাত্র সদুপদেশ দান করিবেন, রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে তিনি কখনই হস্তক্ষেপ করিবেন না। যাহা হউক, মহারাজার প্রতিবাদ সত্বেও ১৮৮৬ খৃঃ অঃ মার্চ্চ মাসে মিষ্টার প্লাউডেন কাশ্মীরের রেসিডেণ্টপদে নিযুক্ত হইলেন। স্বীয় ব্যবহারে মিষ্টার প্লাউডেন এ দেশে সুনাম রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কার্য্যে যোগদান করিয়াই তিনি মহারাজা প্রতাপ সিংহের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার

সম্বন্ধে মিষ্টার যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, তাঁহার Kashmir of its Prince নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"Mr. Plowden, however, from the moment he took over charge of his office assumed an attitude unfavourable to his Highness. He seems to have joined his post with a foregone conclusion against the Maharaja. He affected a lofty supercilious air, and treated the Durbar with almost undisguised contempt. On occasions he went so far as to inisist upon the ministers retiring before he would condescend to speak to Maharaja."

প্লাউডেন মহারাজার সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিবার লোকেরও অভাব হয় নাই। মহারাজার সহোদর অমরসিংহ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্লাউডেনকে সমর্থন করিয়াছিলেন।

গিলগিট (Gilgit) কাশ্মীরের অন্তর্গত একটী বিভাগ। ইহার মধ্য দিয়া বহিঃশত্রুর ভারতবর্ষে প্রবেশ সম্ভবপর। তাহা ব্যর্থ করিতে হইলে তথায় ইংরাজ সৈনিকাবাস স্থাপন আবশ্যক। এই জন্য রেসিডেণ্ট মিষ্টার প্লাউডেন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই বিভাগটি গ্রাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মহারাজা প্রতাপ সিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তিনি মহারাজাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। প্লাউডেনের অসদ্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া মহারাজা, বড়লাট বাহাদুর লর্ড ডাফারিণের শরণাপন্ন হইলে লাট বাহাদুর প্লাউডেনকে কাশ্মীর হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। প্লাউডেনের পর কর্ণেল প্যারি নিস্‌বেট্ (Colonel Parry Nisbet) রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ইনি বাহিরে মহারাজার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেও অন্তরে গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যসাধনে যত্নবান ছিলেন। মহারাজার সহোদর রাজা অমরসিংহ সর্ব্বদাই কাশ্মীরের সিংহাসন লোলুপ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন; রেসিডেণ্ট ও রাজা অমর সিংহ আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতে লাগিলেন। অমর সিংহের কয়েকজন অনুগত ভৃত্যও মহারাজা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিল। মহারাজা প্রতাপসিংহ চরিত্রহীন, তিনি রাজ্যশাসনে অনুপযুক্ত, তিনি রুস গভর্ণমেণ্টের নিকট ইংরাজ রাজদ্রোহাত্মক কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছেন, এইরূপ কয়েকটী অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। মহারাজা রেসিডেণ্টের মিথ্যা অভিযোগের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। দুঃখে কষ্টে মহারাজা একরূপ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহারাজার রাজ্যচ্যুতিতে তাঁহার প্রজাগণ মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। পাছে প্রজাগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় মহারাজাকে একখানি পরোয়ানাতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। রাজা অমরসিংহ মহারাজাকে নানারূপে ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; মহারাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাজা অমরসিংহ জ্যেষ্ঠাগ্রজকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পরোয়ানাখানিতে স্বাক্ষর করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার আর কোনও বিপদ থাকিবে না। মহারাজা পরোয়ানাখানি পাঠ করিয়া প্রথমে তাহাতে কিছুতেই স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন নাই; কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন যে স্বাক্ষর না করিলে তাঁহার ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারময় হইবে, তখন তিনি স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরোয়ানাখানিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। মহারাজা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পাঁচজন সভ্যের হস্তে অর্পণ করিতেছেন, এই মর্ম্মে পরোয়ানাখানিতে লিখিত হইয়াছিল।

এই পরোয়ানায় লিখা ছিল, নিজের পারিবারিক বিষয় ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যেই মহারাজার অধিকার থাকিবে না। রাজ্যের আয়ব্যয় শাসন সংরক্ষণ সমস্তই প্রকারান্তরে কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারীদিগের অত্যাচারের আশঙ্কায় মহারাজা স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণেল নিস্‌বেট গভর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করেন যে, মহারাজা প্রতাপসিংহ প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় পাঁচ বৎসরের জন্য রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজা প্রতাপ সিংহ যে বাধ্য হইয়া পরোয়ানা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গকে তাহা অবগত করাইবার জন্য আমরা মহারাজা

কর্ত্তৃক বড়লাট বাহাদুরকে যে পত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা হইতে নিম্ন লিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"With the information of these lettres and with the full confidence and strength of being supported by my own brother and his now strong party, Colonel R. P. Nisbet dashed into my room at a fixed time and brought such great and many-sided pressure in all solemnity and seriousness that I was obliged to write what was desired by him inorder to relieve myself for the moment—having full faith that your Excellency's Government would never accept such onesided view of the case and that opportunity will be given to me of defending myself."

উক্ত পত্রে মহারাজা প্রতাপ সিংহ বড়লাট বাহাদুরকে ইহাও জানাইয়া ছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাকে তাঁহার স্বাধীনতা প্রদানে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে লাট বাহাদুর যেন স্বহস্তে তাঁহার জীবন গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান করেন। মহারাজা লিখিয়াছিলেন,—

"In case the liberty is not allowd to me by the Supreme Grovernment, and I have to remain in my present most miserable condition, I would most humbly ask your Excellency to summon me before you and I will be most happy to beg such summons—and shoot me through the heart with your Excellency's hands and thus at once relieve an unfortunate prince from unbearable misery, contempt, and disgrace for ever."

মহারাজার পত্রখানি পাঠ করিলে নয়নে স্বতঃই অশ্রু প্রবাহিত হয়। পরের দুঃখ শিশিরকুমার আপনার দুঃখ জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন, একথা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিংহের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের কথা অবগত হইয়া শিশিরকুমার তাঁহার পত্রিকায় ও মিষ্টার ব্রাডলর সাহায্যে পার্লামেণ্ট মহাসভায় আন্দোলন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এ সময় শিশিরকুমারের শরীর ভাল ছিল না; তাঁহার উপযুক্ত সহোদর শ্রীযুক্ত মতিবাবু তাঁহার পরামর্শ মত পত্রিকা পরিচালনা করিতেন। ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হন না। উৎপীড়িত, অপমানিত ও রাজ্যচ্যুত মহারাজা প্রতাপসিংহকে অত্যাচারী ও ষড়যন্ত্রকারিগণের চক্রান্ত হইতে উদ্ধার করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা শিশিরকুমার ও তাঁহার অনুজ মতিবাবুর হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল বলিয়াই যেন ভগবান্ তাঁহাদিগকে সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য মহারাজা প্রতাপ সিংহ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত রাজ্যের রশ্মি পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা যে সত্য নহে; গভর্ণমেণ্ট কাশ্মীরের অন্তর্গত গিলগিট (Gilgit) বিভাগটী অধিকার করিবার জন্যই যে মহারাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, তাহা সাধারণকে অবগত করিবার জন্য শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় গভর্ণমেণ্টের একখানি গুপ্ত দলিল প্রকাশ করেন। ১৮৮৯ খৃঃ অঃ অক্টোবর মাসে ৩রা তারিখে শিশির কুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় উক্ত গুপ্ত দলিল প্রকাশ করিয়া যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক তাহা হইতে সকল কথা অবগত হইবেন—

"Today we shall publish a document which will startle India—probably Lord Lansdowne himself. Lord Lansdowne, we are credibly informed, has been very much disgusted with the Kashmir business. We have a very high authority for stating that his Excellency was actuated by the best of motives in accepting what he calls the "Edict of Resignation" by the Maharaja. But when he accepted this responsibility of Governing Kashmeer through a Resident, he had no notion that there was so much intrigue, to put the matter mildly, surrounding the business. His Excellency's heart now recoils at what he is obliged to do to defend a measure which is wholly untenable. A noble Englishman of high principles, his Excellenay is not willing to stick to a measure which his conscience does not justify. And therefore, he is only seeking an opportunity to

restore Kasmere to its legitimate owner. Our formation, incredible as it may appear, is received from such a high source that we cannot help putting faith in it."

"In the following document the original of which his Excellency will find in the foreign offiice, the viceroy will find the real reason why the Maharaja of Kashmir has been deposed. It will be seen that his highness was deposed, not because he resigned or oppressed his people, but because 'Gilgit' was wanted for strategical purposes by the British Government. Mr. Plowden proposed that the principalities of 'Gilgit' should be occupied by the British Government at once and this proposal of Mr. Plowden was the main cause of his downfall. Sir H. M. Durand, the foreign Secretary, however, condemned Mr. Plowden's proposal and him as Resident in the following memorandum, which was, submitted to the then. Viceroy Lord Dufferin :—Opinion of Foreign Secretary about the occupation of 'Gilgit'.

To His Excellency.

I do not agree with Mr. Plowden, the Resident in Kashmeer, in this matter. He is too much inclined to set Kashmeer aside in all ways, and to assume that if we want a thing done we must do it ourselves.

'The more I think of this scheme, the more clear it seems to me that we should limit our overt interference as far as possible to the organisation of a responsible military force in Gilgit. So far we can hope to carry the Durbar thoroughly with us. If we annex Gilgit or put an end to the Suzerainty of Kashmeer over the petty principalities of the neighbourhood, and, above all, if we put British troops into Kashmeer just now, we shall run a risk of turning the Durbar against us and thereby increase the difficulty of our position. I do not think this is necessary. No doubt, we must have practically the control of Kashmeer relations with those principalities, but this we already have. Indeed, the Durbar has now, since the dismissal of Lachman Das, asked Mr. Plowden to advise the Gilgit authorities direct without reference to them. If we have a quiet and judicious officer at Gilgit, who will get the Kashmeer force into thorough order and abstain from unnecessary excrecise of his influence, we shall, I hope. in a short time have the whole thing in our hand, without hurting any one's feelings.

Altogether, I think, our first step should be to send up temporarily and quietly a selected military officer (Capt A-Durand, of the Intelligence Department) and a junior medical officer. Both of them will have the support of the Durbar when and where it will be necessary, and they will not display any indiscretion, so that the Durbar may not have any hint of the work they are about to undertake and they will have to obtain the consent of the Durbar in matters concerning military difficulties. Once we can establish a belief that onr undertaking is nothing but the welfare of the Durbar, we are surely to attain our object. Time will show that my view is not a wrong one. In it lies, I venture to hope, the safe realisation of that object, which was once contemplated in Lord Canning's time, and afterwards was abandoned after deliberation.

Eventually Major Mellis should go to Kashmeer on the part of the Durbar and submit a mature scheme for the better administration of the state, which is at present very badly managed indeed. This scheme should include the ontline of our arrangements for strengthening the Government policy.

'After the expiry of 6 months we will be in a

position to decide whether the permanent location of a political agency at Gilgit, also a contingent of troops for the defence of the frontier, for which the Durbar have already agreed to put the resources and troops at the disposal of the British Government.

(Sd) H. M. Durand
6th May.

"Nevy well"

(sd) Duffern
10th May

"All the suggestions contained in the above have been carried out. Capt. A-Durand is just now in the neighbourhood of Gilgit, with "a junior medical officer' ; the political agency has been established ; and "eventually" Major Mellis has gone to Kashmeer on the "part of the Durbar.........to submit a scheme......for strengthening the Government policy." Sir H. Durand's suggestions have been disregarded only on one point and that we believe, by himself. He says, "we already have the control over the Gilgit principalities" and we "have the whole thing without hurting any one's felings," Being one of the wisest men in India, why did not Sir H. Durand stick to the wise suggestion of his own of controlling the affairs of Kashmeer without hurting any one's feelings ! So it will be seen that when Sir John Goist said that he would not he surprised if a feeble-minded man like Pertab Sing would withdraw his resignation or when Lord Cross declared that the Maharaja cruelly oppressed his subjects ; or when Lord Lansdowne wrote to the Maharaja that his highness was an extravagant and bad ruler, they were not aware of the real reason of the Maharaja's deposition. It was Gilgit that the Government wanted.

"One of the rumours very current in India is that, when the Viceroy comes to Lahore, the foreign office will invite the Maharaja to meet his Excellency there. The Maharaja would, of course, come and then he would be persuaded to pen a real "Edict of Rsigntion." We notice this rumour at all to show how people are prone to attribute all sorts of motives to the Government. We have, however, very little doubt that then will be a meeting at Lahore and we hope everything will be satisfactorily settled, If there be any talk of Gilgit, of course the Maharaja should cordially co-operate with the Govt. for the defence of the Empire."

অমৃতবাজার পত্রিকায় উক্ত মন্তব্যটী প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের কোনও সংবাদপত্র তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। লর্ড ল্যান্সডাউন তখন বড়লাট বাহাদুরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটীর অংশবিশেষ কল্পিত বলিয়া প্রকাশ করিলেও তাহার মূলে যে সত্য নিহিত ছিল, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেণ্টের গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ বড়লাট বাহাদুরের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা উৎপীড়িত, অপমানিত, রাজ্যচ্যুত মহারাজা প্রতাপ সিংহ বাহাদুরকে ধ্বংসের মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎকালে কোনও বিধান প্রচলিত না থাকায় গভর্ণমেণ্ট অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালক শিশিরকুমার প্রভৃতিকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে গভর্ণমেণ্টের কোনও গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ না হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য লাট বাহাদুর 'Official secrets Act নামে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। মহারাজা বাহাদুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া শিশিরকুমার ও মতিবাবু মিষ্টার ব্রাড্‌লর সহায়তায় পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভারত-গভর্ণমেণ্টের অবিচারের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। সদনুষ্ঠানে মানব চিরদিনই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে। অত্যাচারপ্রপীড়িত মহা-

রাজাকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিশির কুমার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবানের অনুগ্রহে তিনি সফলতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত দলিল প্রকাশ করিয়া আন্দোলন না করিলে কাশ্মীরের মহারাজার ভবিষ্যৎ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর হইত, পাঠকবর্গ তাহা সহজে অনুমান করিতে পারেন। মহারাজের প্রতি অবিচারের কথা কিরূপ ভাবে পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিতে হইবে, শিশিরকুমার বিস্তৃত ভাবে তাহা মিষ্টার ব্রাড্‌লর নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন এবং তাহারই ফলে মহারাজা প্রতাপ সিংহ বাহাদুর স্বীয় সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া এখনও সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু

বন্দীর জয়

(ক)

"আসবন্দৌলা !"

উজ্জ্বল চন্দ্রাতপতলে স্বর্ণ সিংহাসনের উপর হইতে মোগল বাদসাহ বাবরসাহ ডাকিলেন, "আসবন্দৌলা !"

প্রহরী তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া কুর্ণিশ করিয়া কহিল, "জাহাপানা !"

বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্দ্দার শিলাদিত্য কোথায় ?"

"হুজুর ! বোধ হয় বাড়ীতে আছেন।"

"কতক্ষণ বাড়ীতে গেছেন ? কিছু ব'লে গেছেন ?"

"বলেছেন জাঁহাপনা আজ বড়ই ক্লান্ত, জনাবের কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সাক্ষাৎ করিবেন।"

বাবর শাহর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "বাবর সাহকে যদি এই সামান্য একটা যুদ্ধ ক'রে সমস্তদিন বিশ্রাম করিতে হইত, তাহা হইলে সে কখনই এতবড় একটা সাম্রাজ্য চালাতে সক্ষম হত না। আসব। তুমি এখনই তাঁহাকে আমার সংবাদ দাও। বল, সম্রাট এখন সম্পূর্ণ বিশ্রান্ত, তিনি নির্ভাবনায় আসতে পারেন।"

"যো হুকুম খোদাবন্দ !" প্রহরী কুর্ণিশ করিতে করিতে করিতে গমনোন্মুখ হইল।

"আসব !"

"হাঁ, ভাল কথা, যদি দেখ তিনি বিশেষ ক্লান্ত, তবে আর কিছু বলিবার আবশ্যক নেই।"

"যো হুকুম মালেক ! প্রহরী চলিয়া গেল।

এই শিলাদিত্য অনেক রাজপুত সর্দ্দার, বাদসাহের আশ্রিত। তিনি তাহার একমাত্র কন্যা কমলকুমারীর সহিত বাদসাহের পুত্র হুমায়ুনের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত। ফতেপুরের যুদ্ধ অবসানে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে একথা অনেক দিন হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছে। বাদসাহেরও তাহাতে প্রবল ইচ্ছা।

"সম্রাট আমাকে আহ্বান করিয়াছেন ?"

বাদসাহ ফিরিয়া দেখিলেন, সম্মুখে শিলাদিত্য। উপযুক্ত আসনে তাঁহাকে স্থান দিয়া তিনি কহিলেন, "এ আনন্দের দিনে নিকটে এমন কেহ নাই যাহার সঙ্গে একটু আলাপ করি।"

"জাঁহাপনা শ্রান্ত, সেই জন্য অধীন উপস্থিত হয় নাই।"

ঈষৎ হাস্যের সহিত বাদসাহ উত্তর করিলেন, "যার মাথার উপর এত বড় একটা সাম্রাজ্যের ভার, তার কি বিশ্রামের সময় আছে? সর্দ্দার, আমার বোধ হয় আমি এ অসময়ে তোমাকে ডাকিয়া তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইলাম।"

শিলাদিত্য একটু হাস্যের সহিত বলিলেন, "দিল্লীশ্বর ভারতেশ্বর বাদসাহের যদি সামান্য বিশ্রামের সময় না থাকে, তবে তাঁর একজন অমাত্যের সময় কোথায়? সংসারিক কাজে একটু ব্যস্ত ছিলাম বটে।"

"এমন সময় কি কাজ সর্দ্দার ?"

"সম্রাট ! এইমাত্র দূত মুখে সংবাদ পেলাম কমলের মাতুল মৃত্যুশয্যায়। তিনি আমার কন্যাকে একবার

দেখতে ইচ্ছা করেন। সেই জন্য তাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলাম।"

সম্রাটের মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উটিল। তিনি বিস্মিতভাবে কহিলেন, "শিলাদিত্য! তুমি কি বাতুল? যুদ্ধ এইমাত্র শেষ হইয়াছে। এখনও বিচ্ছিন্ন রাজপুতগণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এখনও দু'একটা কামানের শব্দ দূরে শোনা যাইতেছে। পথঘাট কোলাহলে পরিপূর্ণ। এ অবস্থায় বালিকাকে সেখানে পাঠান কি যুক্তিসঙ্গত? আর সেই পর্ব্বতের পথ কি নিরাপদ?"

"তাকে না পাঠাইলেই নয়, বৃদ্ধের অন্তিম প্রার্থনা। আমি উপযুক্ত শিবিকারও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি। সঙ্গে চারজন সশস্ত্র পদাতিক ও দুইজন অশ্বারোহী প্রেরণেরও ব্যবস্থা হয়েছে!"

"সৈনিকেরা এখনও লুণ্ঠনে ব্যস্ত, এ সময় কি তাদের শত্রু মিত্র জ্ঞান আছে?"

শিলাদিত্য উত্তর কহিলেন, "বাদসাহের ভাবী পুত্রবধূ, ভাবী দিল্লীশ্বরীর শিবিকা লুণ্ঠন করা ত দূরের কথা, শিবিকার দিকে দৃষ্টিপাত করে এমন লোকও দুনিয়ায় বিরল।"

"আমার সেনা না করিতে পারে, কিন্তু রাজপুত?"

মোগলের আশ্রিত হইলেও শিলাদিত্যের মনুষ্যত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। স্বজাতির প্রতি এই শ্লেষ বাক্যে ক্ষণিকের জন্য তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা, রাজপুত কখনও নিরাশ্রয় জনের উপর অত্যাচার করে না। রাজপুত কখনও অতিথির অবমাননা করে না, স্ত্রীলোকের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে না। সে রক্তে রাজপুতের জন্ম নয়।" কিছু আবেগের সহিত কথা কয়টা বলিয়াই শিলাদিত্য শিহরিয়া উঠিলেন।

অন্য কোন সম্রাটের সম্মুখে শিলাদিত্যের এ ঔদ্ধত্যের যে বিষময় ফল ফলিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বাবরসাহ সে প্রকৃতির লোকে ছিলেন না। তিনি আনন্দের সহিত বলিলেন, "এ কথা রাজপুতেরই উপযুক্ত বটে! আমি কথাটা পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলাম মাত্র। আমার মনে অন্য কোন ভাব ছিল না। যাও সর্দ্দার, তুমি তোমার কন্যাকে সচ্ছন্দে সেখানে পাঠাইতে পার।"

এই কথায় শিলাদিত্যের আশঙ্কা দূর হইল। তিনি নিজেই অপ্রতিভ হইলেন। মনে মনে বাদসাহের বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তবে এখন বিদায় হই।" এই বলিয়া যথোচিত অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

(খ)

এই সেই ফতেপুরের যুদ্ধপ্রাঙ্গন। যেখানে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মোগল বাদসাহ বাবরের অগণিত মুসলমান সেনার সহিত রাজপুতগৌরব-রবি মিবারের অধীশ্বর মহারাণা সঙ্গের অধীনস্থ রাজপুতগণের সংঘর্ষ হয়। মুসলমান এখন চারিদিক বিজেতা। যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহারা দিন্ দিন্ রবে গগন মাতাইয়া লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছে। চারিদিকেই একটা অশান্তির বাতাস, চারিদিকেই একটা গগনভেদী হাহাকার।

এই ভীতিপ্রদ যুদ্ধক্ষেত্রের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মারবার অধিপতি রাও গাঙ্গের পৌত্র রাঠোর সেনার পরিচালক বীরযুবক রায়মল। আজ তাঁহার মন গভীর চিন্তায় পরিপূর্ণ। স্বজাতির এই ভীষণ পরিণামের কথা স্মরণ করিতে তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইতেছিল, চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল কাটিল। ক্রমে চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধতা ধারণ করিল। সূর্য্যদেব রাজপুতের এই দুঃখ দেখিতে না পারিয়াই যেন পশ্চিম গগনে মুখ লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের উপর সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

আরও কিছুকাল এইভাবে কাটিল। হঠাৎ অদূরে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। উপর্য্যুপরি পুনরায় তিনবার ঐরূপ শব্দ। তারপর স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর ও পুরুষের আর্ত্তনাদ। তাহার পর সমস্ত নিস্তব্ধ।

রায়মল চমকিয়া উঠিলেন। কিয়ৎকাল তিনি স্থির ভাবে দাঁড়াইলেন। তার পর সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একটা ক্ষীণ আলোক তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই সঙ্গে একখানি শিবিকা ও কয়জন লোককে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিলেন। শিবিকা নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন, শিবিকা বাহকেরা তাঁহারই লোক। তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ রত্নমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "রত্ন! ব্যাপার কি?"

রায়মল অভিবাদন করিয়া বলিলেন "সেনাপতি, কে এক রমণী কয়েকজন মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃতা। আমরা এইমাত্র তাঁকে উদ্ধার করে নয়ে এসেছি। ইঁহার বাহকেরা প্রায় সকলেই হত, কেবল একজন পলায়িত।"

"ইঁহার পরিচয় কিছু পেয়েছ?"

"কিছুই না।"

"আচ্ছা, তোমরা এখন বিশ্রাম করগে, আমি এখনই ইহার পরিচয় নিয়ে যাচ্ছি।"

বাহকেরা সকলে চলিয়া গেল।

রায়মল ধীরে ধীরে শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতর হইতে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী বাহির হইয়া আসিল। রায়মল স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ সৌন্দর্য্য তিনি পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। বিস্ময়ের বেগ একটু সামলাইয়া লইয়া তিনি যুবতীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কে আপনি একাকিনী এই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে? আপনি কাহার কন্যা?"

যুবতী নির্ভয় চিত্তে উত্তর করিল, "আমি আপনারই স্বজাতি। আমার পিতার নাম শিলাদিত্য, আমার নাম কমলকুমারী।"

তাহার কথা শুনিয়া রায়মল ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার মুখে সন্দেহের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন "শিলাদিত্য! কোন্ শিলাদিত্য? যিনি সম্রাটের ভাবী বৈবাহিক! আপনি তাঁহার কন্যা?"

কমলকুমারী পূর্ব্ববৎ উত্তর করিল, "আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, আমি তাঁহারই কন্যা।"

রায়মল বরাবরই শিলাদিত্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। যে বিজাতির করে স্বীয় প্রাণপ্রতিমা কন্যাকে অকাতরে সমর্পণ করিতে পারে, যে রাজপুতকলঙ্ক স্বজাতিদ্রোহী হইয়া মোগলের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করিতে পারে, সে কি ঘৃণার পাত্র নয়?

রায়মল একটু বিদ্রূপের সহিত বলিলেন, "ভাবী দিল্লীশ্বরীর সম্মুখে দাসের এ বাচালতা মাপ হয়।"

কমলকুমারী তাহার এই শ্লেষবাক্য বুঝিতে পারিলেন। তাহার মুখমণ্ডল চকিতের মধ্যে লোহিতাভা ধারণ করিল। পিতার প্রতি এ বিদ্রূপবাণ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সগর্ব্বে সে উত্তর করিল, "দেখুন, পিতাকে সকলেই জানে তিনি রাজপুত কুলকলঙ্ক। কিন্তু কেহ কি ইহার কোন কারণ অন্বেষণে সমর্থ হয়েছে? বাবরশাহ আমার পিতামহ, মাতা ও আত্মীয়কুটুম্ব সকলকেই দুইবার দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করে তাঁদের প্রাণ রক্ষা করেছেন। সেইজন্য পিতা তাঁহার এত অনুগত। কারণ না জেনে অনর্থক আমার পিতার উপর এই ঘৃণার উক্তি আপনার মুখে শোভা পায় না। জেনে রাখুন সেনাপতি, এ আমার পিতার বিশ্বাসঘাতকতা নয়, এ রাজপুত হইয়া রাজপুতের মস্তকে পদাঘাত নয়, এ উপকারীর প্রত্যুপকার মাত্র।"

কেবল স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন শিলাদিত্যের এ বশ্যতা স্বীকারের আর অখণ্ডনীয় কারণ কিম্বা প্রমাণ কিছুই ছিল না। রায়মল বালিকার মুখে এই প্রত্যুপকারের কথা শুনিয়া মনে মনে সন্দিহান হইলেন। কিন্তু ইহা পিতৃদোষ-স্খালনের জন্য কন্যার স্বকপোলকল্পিত বাক্য বিবেচনায় তিনি মনের আবেগ মনোমধ্যে চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, "যাক্ সে কথা। সংসারে ভুল সকলেরই হ'তে পারে। ধরে নিন, এটাও আমার একটা ভুল ধারণা। কিন্তু আপনি এ যুদ্ধের সময় একা পথে বাহির হয়েছিলেন কেন?"

"দৈব বিড়ম্বনায় আমাকে বাহির হইতে হইয়াছে। আর তাহা না হইলেও রাজপুতরমণী কি যুদ্ধকে কিংবা মৃত্যুকে ভয় করে?" এই বলিয়া কমলকুমারী একে একে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

তাহার বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বর সেই নির্জ্জন উপত্যকাভূমির উপর যেন মধু বর্ষণ করিল। কি আশ্চর্য্য! এই জনশূন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অপরিচিত এক সৈনিকের সম্মুখে এই বালিকা একাকিনী, অথচ সে বিন্দুমাত্র ভীতা নহে। রায়মল তন্ময়চিত্তে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, "তা' হ'লে আজ রাত্রির মত আমাদের দুর্গে থাকতে পারেন।"

"আমার থাকিতে কোন বাধা নাই, কিন্তু আমাকে স্থান দিলে আপনাদেরই বিপদের সম্ভাবনা।"

এই কথায় রায়মল উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "রাজপুত বিপদে লালিত, বিপদের মাঝেই পালিত। বালক যেমন খেলার সামগ্রী হারাইয়া দুঃখে অভিভূত হয়, রাজপুতও সেই রকম বিপদশূন্য হইলে চিন্তান্বিত হয়। বিপদকে সে

ভয় করে না। আর অতিথির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হ'লে রাজপুত দুঃখিত হয়, অতিথি সৎকারে নয়। আপনি সচ্ছন্দে আমার সঙ্গে আস্‌তে পারেন।" এই বলিয়া তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। কমলকুমারী আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। পথে যাইতে যাইতে রায়মলের মনে নানা চিন্তা উঠিতে লাগিল। এই অপরূপ রূপবতী বালিকার কোমল মূর্ত্তিখানি তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। এই সরলা, কোমলা, স্নেহময়ী বালিকাকে কি কেহ প্রাণ থাকিতে শত্রুর করে সমর্পণ করিতে পারে ?

(গ)

গভীরা রজনী। যত দূর দেখা যায় কেবল জমাট অন্ধকার রাশি। রাজপুত দুর্গের যে কয়েকজন মাত্র প্রহরী ছিল, তাহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় নিদ্রিত। কেবল ভিতর দিকে তোরণ দ্বারে একখানি বিচিত্র খট্টার উপর অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় রায়মল। তাঁহার কিছুদূরে ভূমিশয্যায় রায়মলের বিশ্বস্ত দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ দুইজন যোদ্ধা খবটো ও রত্নমল। সকলেই চিন্তিত, সকলেরই মুখে একটা বিষাদের ছায়া !

অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধ রজনী মথিত করিয়া একটা কামানের শব্দ হইল। রায়মল চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পুনরায় ঐরূপ শব্দ, একবার দুইবার, তিনবার! বাহিরে অস্ত্রের ঝন্ ঝনা শ্রুত হইল। রায়মল গবাক্ষপথে চাহিয়া দেখিলেন। নিমিষের মধ্যে প্রায় দুই শত মশালের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে রায়মল দেখিলেন, বাহিরে দাড়াইয়া প্রায় চারি শত সশস্ত্র মোগল সেনা। তিনি দ্রুতবেগে তথা হইতে একেবারে প্রাচীরে যাইয়া উঠিলেন। তাহার চিন্তাস্রোত গভীরতর হইয়া উঠিল। হায়! এ মুষ্টিমেয় রাজপুতসেনা এই বিপুল মোগলসেনার সম্মুখে কতক্ষণ টিঁকিবে!

এমন সময় বাহির হইতে গম্ভীরভাবে কে বলিয়া উঠিল, "দুর্গরক্ষক! শীঘ্র বন্দিনীকে মুক্ত করুন, নচেৎ রক্ষা নাই!"

এ বন্দিনী যে কমলকুমারী রায়মল তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন, "আশ্রিতকে শত্রুহস্তে তুলিয়া দেওয়া রাজপুতের ধর্ম্ম নয়! রাজপুত রক্ষা পাইবার আশা করে না, মৃত্যুই রাজপুতের অধিক প্রিয়!" সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। সেই জীর্ণ দুর্গ সে আঘাতে কাঁপিয়া উঠিল। পুনরায় আর একবার। এইবার দুর্গের কিয়দংশ ভূমিসাৎ হইল। রায়মল প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দুর্গ ভূমিসাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অগণিত মুসলমান সেনা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। এ কি! কোথায় তাহারা ভগ্ন দুর্গের ভিতর সবেগে প্রবেশ করিবে, তাহা না করিয়া পলায়ন! রায়মল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সেই সৈন্যমণ্ডলী একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "সেনাপতি, বিদায়! রাজপুতরমণী কখনও আশ্রয়দাতার অমঙ্গল কামনা করে না। আশ্রয়দাতার মঙ্গলের জন্য এই সৈন্য সরাইয়া লইলাম। মনে রাখিবেন, এ নিজের স্বাধীনতার জন্য নয়, আপনাদের মঙ্গলের জন্য।"

প্রাচীরের উপর হইতে রায়মল শিহরিয়া উঠিলেন। কি আশ্চর্য্য, এ যে কমলকুমারীর স্বর! তিনি উর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে একেবারে কমলকুমারীর গৃহসম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য। আর কালবিলম্ব না করিয়া রায়মল দুর্গের বাহির হইলেন। তাহার পর নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে সেই সৈন্যমণ্ডলী লক্ষ্য করিয়া প্রবলবেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু কোথায় তাহারা? তাহারা যে তখন অনেক দূরে! আরও কয়েক মুহূর্ত্ত নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া রায়মল ফিরিলেন। সেই সময় পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন লোক সবলে তাঁহার তরবারি ছিনাইয়া লইল। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। রায়মল ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তিনি তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। চকিতের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে লইয়া চলিয়া গেল। রায়মল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

(ঘ)

বিস্তৃত সভামণ্ডল। ওমরাহ ও পারিষদ বেষ্টিত সিংহাসনে বাবর বাদশাহ উপবিষ্ট। তাঁহার একপার্শ্বে শিলাদিত্য ও কমলকুমারী। কিয়দ্দূরে বন্দী রায়মল। সকলেই নিস্তব্ধ, সকলেই উৎকণ্ঠিত।

কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রায়মলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রায়মল, তুমি এখন মোগলের বন্দী।"

তেজস্বী রায়মল তাঁহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি যে বন্দী, আমার বন্ধনদশাতেই তাহা সপ্রমাণিত। সুতরাং ওকথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি।"

"তোমার অপরাধ গুরুতর, সে অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

রায়মল শ্লেষের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বাদসাহের দরবারে এ একটা নূতন বিচার বটে। বন্দীর প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা, অথচ সে তাহার অপরাধের বিষয় কিছুই জানে না।"

এই কথায় সভাস্থ সকলে বিচলিত হইয়া উঠিল। খোজাগণের অস্ত্র ঝন্ ঝন্ কাঁপিয়া উঠিল বাবরসাহ কিন্তু স্থির নিশ্চল।

বাদসাহ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে দুই গুরুতর অপরাধ। প্রথম স্ত্রীলোকের শিবিকা লুণ্ঠন, দ্বিতীয় সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীর কন্যাকে বলপূর্ব্বক আটক করিয়া রাখা।"

"সম্রাট! এর প্রমাণ?"

"প্রমাণ শিবিকারক্ষকদের মধ্যে সেই পলায়িত ব্যক্তি।"

রায়মল নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সম্রাট, রায়মল এতদূর হীন নয় যে, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিবে। আশ্রয়হীনাকে আশ্রয়দান এই তার অপরাধ। শিলাদিত্যের কন্যার প্রতি কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শিত হয় নাই বরং তাঁহার রক্ষার জন্য নিজের ও আমার সেই সামান্য কয়েকজন সৈন্যের জীবন আপনার প্রেরিত সেই অগণিত সেনার বিরুদ্ধে আহুতি প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার ফল বেশ চমৎকার হইল। বাদশাহের বিচারে উপকারীর প্রত্যুপকার—প্রাণদণ্ড।"

বাবরসাহ ঈষৎ কোপের সহিত কহিলেন "মিথ্যা কথা! তুমি বালিকার আশ্রয়দাতা এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা!"

চকিতের মধ্যে রায়মলের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দুঃখে, ক্রোধে ও ক্ষোভে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার হস্ত তরবারি অন্বেষণ করিল। উদ্ধত যুবক সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া কহিলেন "সম্রাট!" সেই নিস্তব্ধ সভাগৃহ প্রতিধ্বনি করিল—"সম্রাট!" ঘরের প্রত্যেক দেওয়াল হইতে প্রতিশব্দ উঠিল—"সম্রাট!"

সভাস্থ সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সকলের মুখেই ক্রোধের চিহ্ন। কিন্তু সম্রাট অবিচলিত। তাঁহার মুখে উদ্বেগের কোন চিহ্নমাত্র নাই। ধীরে ধীরে বাবর সাহের মুখে মৃদু হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি রায়মলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "রায়মল! তুমি প্রকৃত বীর। সিংহের ঔরসে সিংহেরই জন্ম হয়, শৃগালের নয়। তোমার সঙ্গে পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি সে সকল কেবল ক্রোধের অভিনয় মাত্র। তোমার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে আমি সমস্তই অবগত।" তাহার পর তিনি শিলাদিত্যের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "শিলাদিত্য! তোমার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

শিলাদিত্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কি বক্তব্য সম্রাট?"

"শোন শিলাদিত্য! বাদশাহ বীরের সম্মান জানেন। রায়মল প্রকৃত বীর, রাজপুতের মুখোজ্জ্বল। তোমার কন্যা রাজপুতেরই উপযুক্ত। এ কমল রাজপুত সরোবরেরই শোভাবর্দ্ধক, মোগলের অন্তঃপুরের জন্য নয়। আমার ইচ্ছা এই কমল সেখানেই শোভা পায়।"

শিলাদিত্য উত্তর করিলেন, "বাদসাহের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।"

"তবে তাই হ'ক্।" বাবরসাহ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন। তাহার পর এক হস্তে কমল কুমারীর একখানি হাত ধরিয়া অপর হস্তে রায়মলের হাত ধরিয়া দুই হস্ত একত্র করিয়া বলিলেন, "রায়মল! তোমার বীরজনোচিত কথায় আজ আমি পরম পরিতুষ্ট। তোমার বীরত্বের জন্য আজ তুমি মুক্ত—এই তোমার প্রথম পুরস্কার। আর নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দানের জন্য এই তোমার দ্বিতীয় পুরস্কার।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে সেই সমবেত সভাসদগুলী একবাক্যে চিৎকার করিয়া উঠিল, "জয় সম্রাট বাবর সাহের জয়! জয় দিল্লীশ্বরের জয়!"

বাদসাহ তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "সভাসদ্‌গণ! রায়মলের এ বীরত্ব কি প্রশংসার যোগ্য নয়?"

পুনরায় সভাগৃহ কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল, "জয় বন্দীকি জয়!"

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিধারা

বিশ্ব-প্রকৃতিতে যে অনন্ত কর্ম্মপ্রেরণা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার অনুসরণ করিয়া মানবকে নিয়ত কর্ম্মযোগ-রত হইতে হয়, এবং এই বিশ্ব-প্রকৃতির মূলে যে বিশ্ব-নিয়ম রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া কর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। সুতরাং জ্ঞানযোগ-যুক্ত হইতে হইবে। জ্ঞান সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে মানব উচ্চাবস্থায় উপনীত হইয়া বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়ের সত্ত্বাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইহাই হইল মানবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা এবং এই অবস্থায় মানব প্রকৃত ভক্তি-যোগের অধিকারী হয়। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতরে এই যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ক্রমোন্নীত ধারা বিদ্যমান্ রহিয়াছে, এই সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে

প্রকৃতি-মাতার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া কি স্থাবর কি জঙ্গম, কি উদ্ভিদ্ সকলকেই প্রকৃতির বশে নিয়ত কর্ম্মের অধীন হইতে হয়। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই অনন্ত কর্ম্মের প্রবাহ বহিতেছে। জন্ম, বৃদ্ধি ও বিনাশের নিয়মে সকলকেই নিয়মিত হইতে হইতেছে। এক সুনিয়ন্ত্রিত ঘটনাব অধীন হইয়া সমগ্র সৃষ্টপদার্থ প্রকৃতির সত্ত্বাকে বজায় রাখিতেছে। এরূপে সমস্ত জগৎ এক মহান্ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে। যাবতীয় ইতর সৃষ্টপদার্থ প্রাকৃতিক শক্তিবশে স্বতঃই নিয়মিত হইয়া অক্ষুণ্ণ পর্য্যায়ে পরিচালিত হইতেছে। সেখানে বিশেষ কোন বাধাদ্বন্দ্বের হেতু বর্ত্তমান নাই। কিন্তু মানবের বেলায় একটু বৈশিষ্ট লক্ষিত হয়। তাহার কারণ ভগবান মানুষকে উৎকৃষ্ট দেহমনের অধিকারী করিয়াছেন, এবং সেই হেতু মানুষ অনেকটা নিজের রুচি ও বিবেচনা অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে। ইহাই মানবের বিশেষত্ব; ইহাই তাহার বিধাতৃ-বিহিত অমূল্য স্বাধীনতা। ইহার প্রকৃতি ইতর সৃষ্ট-সমূহের সাধারণ-পটুত্ব (Instinct) অপেক্ষা অতি উচ্চ অঙ্গের। এই স্বাধীনতা প্রকৃতির নিয়মানুসারে চালিত হইয়াই স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে। প্রকৃতির মধ্যে সত্য ও মঙ্গলের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকায় এই স্বাধীনতা তদনুযায়ী শুদ্ধ ও শুভপ্রদ হইবে। অনেক সময়ে অন্যায় ও যথেচ্ছাচার পরায়ণ মানব প্রকৃতির বিরোধী হইয়া এই অমূল্য স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে। সুতরাং স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে মানুষকে দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিয়া বিবেকের অনুযায়ী মঙ্গলের পথে চলিতে হইবে। অনেক সময়ে মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তি রিপুর বশে চলিয়া তাহাকে বিপথে লইয়া যাইয়া অনেক দুর্দ্দশাপন্ন করে। এখানে প্রকৃতপক্ষে ঐ রুচি ও প্রবৃত্তির অপচয় ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাহাতে এরূপ না হইয়া রুচি ও প্রবৃত্তির এরূপ সার্থক ও শুভাবহ ব্যবহার হইতে পারে যাহা আমাদিগকে অনাবিল ও অকৃত্রিম স্বাধীনতার অধিকারী করিতে পারে, তাহার প্রতি আমাদের যত্নপর হওয়া আবশ্যক।

উৎকৃষ্ট দেহমনের অধিকারী বলিয়া মানুষমাত্রকেই শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এক মুহূর্ত্তও তাহার শরীর নিষ্ক্রিয় থাকে না, মনও এক-মুহূর্ত্ত চিন্তাশূন্য হয় না। এক প্রগাঢ় সুষুপ্তিকালে তাহার শরীর ও মন বিশ্রামলাভ করে। কিন্তু তখনও প্রকৃতি কর্ম্মের অতি মৃদু সাড়া দিয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই সে প্রকৃত জীবন ধারণ করিয়া থাকে এবং শান্তি ও সুখের অধিকারী হয়;—কারণ প্রকৃতির সত্ত্বা এবং সুনিয়তির মূলে কর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই হেতু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই কর্ম্ম-বিমুখ, আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তি সংসারে অতি বিমর্ষভাবে কালযাপন করে এবং কোন শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি প্রকৃতির নিয়মের প্রতিকূলে চলিয়া সুখ ও স্বাধীনতা লাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রকৃতির মধ্যে কর্ম্মের চিরন্তন প্রবর্ত্তনা রহিয়াছে বলিয়া মানবকে জীবনপথে সর্ব্বদা কর্ম্মনিরত থাকিতে হয়। যাহাতে মানব প্রকৃত কর্ম্মী বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যাহা প্রকৃতির সুনিয়মিত ও শুভপ্রদ পথে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকে, যাহার অনুশীলনে ক্রমে মহত্তর ও অমূল্যভাবরাজি উদ্ভূত হইয়া মানবকে প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া তাহাকে মুক্ত, আনন্দময়ের সত্ত্বায়

উপনীত করে, সেই কর্ম্মযোগের প্রবর্ত্তনা সম্বন্ধে সর্ব্বোপনিষদের সার 'গীতা'র মধ্যে আমরা অতি ধ্রুব ও প্রকৃষ্ট বাণী শুনিয়া থাকি। সেখানে এই কর্ম্মের ব্যাপকতা ও তাহার মধ্যে শীর্ষে শীর্ষে ক্রমোন্নীত জ্ঞান ও ভক্তির গুরুত্ব ও মাধুর্য্যের বাণী প্রকৃতির উদ্দেশ্যের সূচনা ও কর্ম্মের উৎকর্ষের ঘোষণা করে।

'গীতায়' কর্ম্মযোগের প্রসারতা কীর্ত্তিত করিয়া ও উহার সার ও ভূষণ স্বরূপ জ্ঞান ও ভক্তি যোগের উচ্চাবস্থার কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া মানবকে প্রকৃতির বিধানে শুভপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠানক্রমে পূর্ণ, অকৃত্রিম ও আনন্দময় সত্ত্বা লাভ করিবার জন্য অপূর্ব্ব আহ্বান বিদ্যমান রহিয়াছে। মানব প্রকৃতির বিধানে চলিয়া কর্ম্মমার্গে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপে যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মাচরণ করিতে পারেন, তাহারা অতি লাভবান হইয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে 'গীতা'কে অবলম্বন করিয়া চলিলে সহজেই সুফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সহজ যুক্তি ও নিপুণতা সহকারে ও পূর্ণরূপে বিষয়ের অবতারণায় 'গীতা' শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই জন্য 'গীতা' হইতে কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তির মূলসূত্র সম্পর্কিত কয়েকটি অমূল্য বাণী এখানে উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবলম্বন রূপে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগের সম্বন্ধে উপদেশ দানের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

৫। তৃতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকাল সংসারে থাকিতে পারে না; প্রকৃতির নিয়মে সকলেই আপনা হইতেই কর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই কর্ম্মের অনুসরণ করিবার জন্য ভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন;—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্ কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥"

৮। ৩য় অঃ।

অর্থাৎ তুমি নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ। কর্ম্ম ব্যতিরেকে এমন কি তোমার সংসার-যাত্রাই সিদ্ধ হইবে না।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ প্রকৃতির এই কর্ম্ম-প্রেরণাকে সামান্য সারবান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ইহার সত্ত্বা ও আনুসঙ্গিক সত্যকে অস্বীকার করিতে পারেন না,—বরং জ্ঞান সহকারে এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে ভগবান্ বলিতেছেন,—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥"

৩৩। ৩য় অঃ।

অর্থাৎ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুকূল কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সমস্ত সৃষ্ট জীবাদি প্রকৃতির বশে কার্য্য করিয়া থাকে। নিগ্রহ (নিষেধবিধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) ইহাদের কি করিতে পারে? অর্থাৎ এরূপে কর্ম্ম নিরোধ করা যায় না।

এক্ষণে, আমরা কর্ম্মের সত্ত্বা ও উহার উপযোগিত্বের নিদর্শন পাইলাম। এখন কথা এই যে মানবের ভিতরে যে সমস্ত প্রবৃত্তি রহিয়াছে, উহাদিগকে প্রকৃতির অনুকূল ও জীবনের শুভানুধ্যায়ী উপায়ে ব্যবহার পরিচালিত করিতে পারিলে মানবের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণরূপে বজায় থাকে; নতুবা তাহার লোপ হইয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে আনয়ন করিবে। মানব যাহাতে পূর্ণ, তৃপ্ত, স্বাধীন ও আনন্দময় জীবনের অধিকারী হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে প্রকৃতিবিহিত কর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইবে। যাহাতে সর্ব্বসুখের মূল স্বাধীনতা বজায় থাকে তজ্জন্য তাহাকে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে যাহাতে সে বুদ্ধি ও বিবেচনাপূর্ব্বক প্রকৃতির সহিত সুপরিচিত হইতে পারিবে, প্রকৃতির মূলে যে সত্য, যে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে তাহার উদ্দেশে তাহাকে লইয়া যাইবে।

সুতরাং পূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তাহাকে জ্ঞানী হইতে হইবে। এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার পক্ষে মানবকে উপযুক্ত করে। ভগবান বলিতেছেন,—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। ৩৩। ৪র্থ অঃ। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং এই জ্ঞান কর্ম্মের সুপরিণতি ও তাহার ভূষণস্বরূপ। ভগবান্ আরও বলিতেছেন—"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু

লোকেষু কিঞ্চন।" ২২। ৩য় অঃ। অর্থাৎ 'হে পার্থ! এই ত্রিভুবনে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই * *.—

কিন্তু তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি।' এই কথার উদ্দেশ্য এই যে সংসারে নিয়ত প্রকৃতির বশে মানবকে কর্ম্মের অধীন থাকিতে হইবে; অথচ কর্ম্মফলের মোহের অতীত হইতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞান-যোগের অধিকারী হইতে পারিলে যে কেবলমাত্র ঐহিক শান্তিলাভের পথ সুগম হইবে তাহা নহে, পরন্তু উত্তরোত্তর উন্নতিমার্গে অধিরূঢ় হইয়া মানবাত্মা পরাশান্তি লাভের যোগ্য হইতে পারিবে। তখন মানব এমন অবস্থায় উন্নীত হইবে যে সংসারে সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় কর্ম্মের অনুসরণ করিয়াও কখনও কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। ইহা মানব-জীবনের অতি উচ্চাবস্থা। কেবলমাত্র যাহারা ভগবৎভক্তি প্রণোদিত হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারাই পরাশান্তিলাভের উপযোগী হন। অভিজ্ঞতা সহকারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐহিক সুখশান্তিলাভ সুগম হইয়া থাকে, কিন্তু তখনও ঐহিক মায়ামোহের বন্ধন হইতে মানব মুক্তিলাভ করিয়া অতুল মানবত্বের অধিকারী হইতে পারে না যে পর্য্যন্ত না সে মায়ামোহকেও অতিক্রম করিতে না পারে। এরূপ করিতে হইলে উৎকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হইতে হয়, যে জ্ঞানে মানবকে মাত্র ঐহিক সুখশান্তি দান করিতে পারে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানমূলক যে উৎকৃষ্ট জ্ঞান তাহা মানবকে লাভ করিয়া একেবারে সংসারের যাবতীয় তুচ্ছ বৈভবের ঊর্দ্ধে আত্মার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। রাজর্ষি জনক রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়াও মুক্তহৃদয়ে বলিতে পারিয়াছিলেন,—"মিথিলায়াং বিদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন"—"সমস্ত মিথিলা নগরী পুড়িয়া গেলেও আমার কিছুই নষ্ট হইবে না।' কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানযুক্ত হইয়া তিনি আত্মাকে মোহমুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। বিষয় ও তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি সত্যের অনুসরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানব এরূপে মায়ামোহরূপ প্রমাদোত্তীর্ণ হইয়া পরাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ উচ্চজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিলে মানব সংসারের যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও মোহ হইতে ক্লেশ ভোগ করে না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে এইরূপ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন ;—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥"১৮।৪র্থঅঃ।

অর্থাৎ—যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপাররূপ সাংসারিক কর্ম্মসত্ত্বেও আত্মাকে দেহাদি ভিন্ন (ঐহিক সুখদুঃখাদির অতীত) বলিয়া কর্ম্মবর্জ্জিত (কর্ম্মজনিত মোহাদিমুক্ত) উপলব্ধি করেন, আর যেখানে মানব বুদ্ধিপূর্ব্বক, নিষ্কাম হইয়া চিত্তকে ফলাকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন, সেখানেও তাহার এই নিবৃত্তিপ্রযত্নকে কর্ম্মের রূপান্তর মাত্র বলিয়া জানেন তিনি আত্মার বিশেষত্ব জানিতে পারিয়াছেন; সুতরাং তিনি জ্ঞানী, এবং মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ; তিনিই যোগী ও সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। ভগবান্ আরও বলিতেছেন ;

"যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।

আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥" ৪১। ৪র্থঅঃ।

অর্থাৎ—হে ধনঞ্জয়! যোগযুক্তমন হইয়া (অর্থাৎ কর্ম্মফলে নিস্পৃহ হইয়া) কর্ম্মের অনুষ্ঠান যে করে এবং জ্ঞানযুক্ত হইয়া সমস্ত সংশয় (মায়ামোহাদি) হইতে যে মুক্ত হয়, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্ম কখন বন্ধন (নিপীড়িত) করিতে পারে না। সুতরাং

"ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।"৪২।৪র্থঅঃ অর্থাৎ হে ভারত! এই মায়ামোহের সংশয় ভেদ করিয়া (যোগযুক্ত হইয়া) অভ্যুত্থান কর।—এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পাইলেন।

এক্ষণে আমরা দেখি যে পরাশান্তি লাভের পক্ষে উৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগের প্রয়োজন। ইহাই আত্মাকে জানিতে অবসর দেয় ও মানবকে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও উহার উদ্যমের রহস্য বুঝিতে উপযুক্ত করে। অনন্ত জগৎ ও চিরনবীনা প্রকৃতির সর্ব্বত্র এক মহানুপ্রাণতা মানব তখন অনুভব করিতে পারে। প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের অন্তরালে যে চিরসত্য ও চিরসুন্দর বিরাজ করিতেছে, মানব তখন তাহার ধারণা করিতে পারে ও তাহার মনোভৃঙ্গ ঐ অতুল মকরন্দ-রসের আস্বাদনে আপনাকে সার্থক করে।

ভগবৎসত্ত্বার অনুভবে জীবনে আস্থাবান্ ও ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া, অতুল শান্তি ও সুখের অধিকারী হইয়া মানব জীবনকে ধন্য করিবে। তখন বিশ্ব তাহার নিকট আনন্দ নিলয় স্বরূপ। প্রকৃতির সর্ব্বত্র আত্মাভিব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থায় সে উপনীত হইবে। তাহার অন্তঃকরণ সন্তোষের আগার ও জীবন পাপের অতীত হইবে। বিশ্বপ্রকৃতিতে আস্থাবান্ ও সর্ব্বোতভাবে ভগবৎ-ভক্তিপরায়ণ হইয়া সে অপার আনন্দসাগরে অবগাহন করিবে।

ভগবান্ ভক্তিযোগের উদ্দেশের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥"

১৪।১২শ অঃ

অর্থাৎ—সতত সন্তুষ্ট, প্রমাদ-হীন, সংযত স্বভাব, দৃঢ়-নিশ্চয়, আমাতে অর্পিত-চিত্ত এবং আমাতেই স্থাপিত-বুদ্ধি মদীয় ভক্ত আমার প্রিয়। এই বাক্যে আমরা ভক্তিমান মানবের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সত্যনিষ্ঠার নিদর্শন ও উহার ফলে তাহার পরম গতির বিষয় ধারণা করিতে পারি। বস্তুতঃ যে মানব এইরূপ উচ্চ অবস্থায় আপনাকে উন্নীত করিয়াছেন তাহার নিকট সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম বলিয়া প্রতি-ভাত হয়। মহামতি অর্জ্জুনও সমগ্র বিশ্বকে ভগবৎ সত্ত্বায় পরিপূর্ণ দেখিয়াছিলেন,—

"তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥"

১৩। ১১শ অঃ।

অর্থাৎ—তখন অর্জ্জুন নানাপ্রকারে বিভক্ত সমগ্র জগৎ দেবদেব ভগবানের শরীরে একত্র দেখিলেন। এরূপে তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃত ভক্ত যে তাহার পক্ষে এরূপই সম্ভব। ভক্তিগত চিত্তে তিনি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই তিনি প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ, গন্ধ ও সঙ্গীতের মধ্যেই সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিবেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আপনাকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে স্থাপিত করিতে পারিয়া-ছেন, অথচ কোন বিষয়েই বিধাতৃবিহিত স্বভাবের অতিক্রম করেন নাই। তিনিই আপনাকে প্রকৃত সুখী করিতে পারিয়া ছেন। এরূপ ব্যক্তির জীবন সুস্থ অকৃত্রিম ও প্রমাদ-মুক্ত। এরূপ ব্যক্তিই প্রকৃতির বশে কর্ম্মে রত থাকিয়া জ্ঞানযোগে আত্মাকে মোহ প্রমাদ হইতে রক্ষা করিয়া আত্মজ্ঞানসহকারে সৎ ও সুন্দরের ধারণায় উপনীত হইতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়-কুসুম বিকসিত হইয়া মহিমাময়ের মধুর হইতেও মধুর মহিমাধারায় সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব বর্ণ গন্ধাদি সম্পদ লাভে আপনাকে সার্থক করিবে। ইহাই নিষ্ঠাবান্ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ভক্তের চরম পরিণতি! যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কর্ম্ম-জ্ঞান ও ভক্তির পবিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে। জীবনে এরূপ মহাসুযোগ লাভ করিতে যত্নপর হওয়া আমাদের একান্ত বিধেয়। ভগবান্ করুণ যেন কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিধারা আমাদের জীবনে অমৃত সিঞ্চন করিয়া আমাদিগকে সার্থক ও সঞ্জীবিত করে।

শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ

গৃহ-শিক্ষক

টারপিন একটী ক্রিমিনাশক ঔষধ

সাউদারণ ক্লিনিক নামক মেডিক্যাল পেপার বলিতে-ছেন, প্রাতে খালি পেটে ৫ হইতে ১০ ফোঁটা উৎকৃষ্ট টারপিন তৈল চিনি কিম্বা দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে নিশ্চয়ই কৃমি মরিয়া যায়।

তারপিন তৈল ১ চামচ পরিমাণ দুগ্ধে এবং কিঞ্চিৎ ক্যাষ্টর অয়েলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে (Tape worm) বা ফিতার ন্যায় ক্রিমি মরিয়া যায়।

পালা জ্বর

এদেশের তেলাকুচার পাতা থেঁতো করিয়া কাপড়ে

একটা পুঁটুলী করিয়া পালার দিন শুঁকিলে ১ দিন অন্তর পালাজ্বর ভাল হয়। পরীক্ষা করা উচিত।

অথবা—

আঁস্সেওড়ার পাতা জ্বর আসার পূর্ব্বে দুই কানে বাঁধিয়া দিলে একদিন অন্তর পালাজ্বর ভাল হয়।

হিকা বন্ধ করিবার উপায়

১। শশার আঁতির রস খাওয়ান।

২। তাল শাঁশের জল।

৩। ছারপোকা পোড়াইয়া তাহার ঘ্রাণ লওয়ান।

ত্র্যাহিক জ্বরের ঔষধ

কুমিরে পোকার মেটে বাসা ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য হইতে কচি ছানা বাহির করিয়া কলার ভিতর পুরিয়া খাওয়াইয়া দিলে ত্র্যাহিক জ্বর ভাল হয়।

জ্বর

নিসিন্দার মূল হাতে বাঁধিলে সর্ব্ববিধ জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

পালাজ্বর

বক ফুল বা শ্বেত অপরাজিতার পাতা হাতে করিয়া রগড়াইয়া কাপড়ের পুটলী করিয়া পালার দিন অতি ভোরে বা জ্বর আসার পূর্ব্ব হইতে শুঁকিতে আরম্ভ করিলে জ্বর হয় না।

"উপরোক্ত মুষ্টিযোগগুলি স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত। তিনি প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে অল্প ২ বৎসর মাত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। "কাজের লোকে" প্রকাশকের জন্য তিনি তাঁহার প্রায় ৫০ বৎসরের সংগৃহীত দেশীয় ঔষধের একখানি খাতা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। সাধারণে তাহা প্রকাশিত হয়, ইহাই তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমরা সময় সময় তাঁহার সেই শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাই। তিনি একজন সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও ছিলেন।"

পুস্তক রক্ষার উপায়

ভারতবর্ষে উইপোকা, আরসোলা ইন্দুর প্রভৃতি বহু জীব পুস্তকের শত্রু। বহু মূল্যবান পুস্তক ইহাদের উদরে চিরতরে লয় পাইয়া যায়। যদি নিম্নলিখিত মিশ্রণটী কোমল তুলি দ্বারা পুস্তকের মলাটে এবং কিয়ৎ পরিমাণ সেলাইয়ের নিকট পর্য্যন্ত মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত শত্রুগুলির গ্রাস হইতে পুস্তকগুলি রক্ষা করা যাইতে পারে।

রেকটীফায়েড্ স্পিরিট	১ আউন্স
করোসিভ্ সবলাইমেট	১০ গ্রেণ
কর্পূর	২০ গ্রেণ
ফট্‌কিরি (সোড়া)	১ চিম্‌টীপরিমাণ।

কাপড়ের কালীর দাগ

কাপড় রুমালে যদি লিখিবার কালীর ছিটা লাগে, তাহা হইলে সেই স্থানটা তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধে ডুবাইয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া কাচিয়া দিলেই দাগ উঠিয়া যায়।

কদলী সংরক্ষণ

কলাকে বহুদিন রাখিতে পারিলে ইহা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে। সে সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে বিশেষরূপে আলোচনা করিব। সহজ উপায়ে কেমন করিয়া কদলী সংরক্ষণ করা যাইতে পারে, তাহাই দেখাইতেছি

কদলীকে গাছ হইতে কাটিয়া আনিয়া ঘরে অর্দ্ধপক্ক করিয়া লইয়া ছাল ছাড়াইয়া ৪ ভাগে লম্বা লম্বা করিয়া চিড়িয়া ফেলিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় একটি পরিষ্কার মাচান করিয়া তাহার উপর দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দিতে হয়, বা যেরূপ পাঁউরুটি সেকিবার উনান, সেইরূপ উনানে যেরূপে রুটী সেকা হয়, এইরূপ উত্তাপ দ্বারা কলার মধ্য হইতে এক প্রকার শর্করা নির্য্যাস বাহির হইয়া পড়ে, তাহাই উত্তাপ পাইয়া দানাইয়া কলার গাত্রে একটা কোটিং এর মত আবরণ হইয়া দাঁড়ায়। তাহা দ্বারাই বৎসরাধিককাল কদলী অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়। এইরূপে রক্ষিত কদলী জর্ম্মাণী প্রভৃতি নানা স্থানে যেখানে কদলী জন্মে না, তথায় পাঠান যাইতে পারে। একবার "ক্যাপিট্যাল"এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আগামীবারে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব। "কাজের লোক"

জ্ঞান ও ইমান

(পুরস্কার রচনা)

হেমন্তের ঘন কুয়াসাজাল ভেদ করিয়া উষার প্রথম কনকরশ্মি তখনও ধরণীর বক্ষচুম্বনে অধিকারী হয় নাই। ধূমায়িত শৈলশিখরের উপরিস্থিত পাদপরাজি তখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই স্বল্পান্ধকার বৃক্ষের তলদেশে আপাদমস্তকাবৃত লেফটেনাণ্ট অমলেন্দু রায় নীরবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাটে গভীর চিন্তার রেখা। মাঝে মাঝে দূরবীক্ষণ সাহায্যে অদূরস্থিত শত্রুপরিখার দিকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। ধীরে ধীরে একজন সৈনিক আসিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইল। রায় চক্ষু তুলিবামাত্র সুবাদার গোবর্দ্ধন সরকার সামরিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া নীরবে হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। লেফটেনাণ্ট বলিলেন, "সরকার, এখানে এসে বস—কি ঠিক করলে বল—না, তোমায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না—পরামর্শদাতা বন্ধুভাবেই তোমাকে ডেকেছি—আমি একা কিছু ঠিক করে উঠতে পারছি না।" দু একটী কথাবার্ত্তা হইল মাত্র,—উভয়েই ঘোর চিন্তামগ্ন। তখন সূর্য্যোদয় হইতেছে, সম্মুখস্থ দ্রাক্ষালতাবহুল ফ্রান্সের ক্ষুদ্রপল্লীর কিয়দংশ ও অদূরে শত্রুপরিখা দেখা যাইতে লাগিল। ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি ক্ষুদ্রতম দুর্গে বসিয়া এই দুই বঙ্গীয় যুবক অকূল চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়াও গভীরতম সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছিল না। ঠিক সেই সময়ে একটী বৃদ্ধ পারাবত উড়িয়া আসিল। রায় তৎক্ষণাৎ তাহার পদস্থিত লিপি খুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন, "২৪ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ কর, নতুবা তোমাদের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না।" কর্ণেল জন্সন শত্রুবাহিনীকে হঠাইয়া দিয়া এই ক্ষুদ্র ঘাঁটীর ভার পঞ্চাশজন মাত্র ভারতীয় সৈনিকের অধিনেতা লেফটেনাণ্ট রায়ের উপর দিয়া যান। আবার শত্রুসৈন্য দুর্গ পরিবেষ্টন করিয়াছে। আজ পনের দিন তাহারা অবরোধে। শত্রুপক্ষ চায় তাহাদের আত্মসমর্পণ, কারণ তাহা হইলে সামরিক অনেক গোপনীয় তথ্য জানিতে সক্ষম হইবে। লেফটেনাণ্ট রায় উপায়হীন, যুদ্ধ করা অসম্ভব, সৈন্য মুষ্টিমেয়। শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিবারও উপায় নাই,—কারণ অপর পক্ষ বাহির হইতে দৃঢ় লোহার বার দ্বারা দুর্গের ক্ষুদ্র দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। রসদ ফুরাইয়া গিয়াছে—সৈন্যরা ভাল করিয়া এক বেলাও আহার করিতে পাইতেছে না। অথচ কর্ণেলের নিকট হইতে প্রেরিত খবরের কোনও উত্তর আসে নাই। প্রার্থিত সৈন্যও আসিয়া পৌছায় নাই। রায় আত্মসমর্পণের ভাণ দেখাইয়া দেরী করিতেছিলেন, যদি সৈন্য আসিয়া পৌছে। কিন্তু সে আশাও লুপ্ত প্রায়।

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন "সরকার, উপায় কি? শত্রু চায় আত্মসমর্পণ।" গোবর্দ্ধন গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিলেন "অসম্ভব, তা'হলে ফ্রান্সের বিশেষ ক্ষতি—আমাদের কর্ত্তব্যের অবহেলা—সমস্ত কাগজপত্র জার্ম্মানদের হাতে পড়িবে, সমস্ত অভিসন্ধি সমস্ত প্লান তাহারা জানিবে।"

"তাহা আমি অনায়াসে পুড়াইয়া ফেলিতে পারি।"

"কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ করিতে পার না। অমানুষিক অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ফলে সৈন্যদের নিকট হইতে অনেক কথা বাহির করিয়া লইতে পারে, তাহাতে সমস্ত মিত্রবাহিনীর সমূহ বিপদ—আমরা রাজদ্রোহী ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"তা হলে শেষ অবলম্বন মৃত্যু।"

"হাঁ, ঠিক তাই।"

অমলেন্দু বলিলেন, "কিরূপে?"

গোবর্দ্ধন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে রায়কে উপায় বলিয়া দিলেন।

লেফটেনাণ্ট চমকিয়া উঠিলেন—"অসম্ভব! ন্যায় ও বিবেকের বিরুদ্ধ!"

"এই হচ্ছে বীরোচিত মরণ ও একমাত্র উপায়।"

"এই একমাত্র উপায়?"

"একমাত্র ও প্রকৃষ্ট।"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া অমলেন্দু বলিলেন, "উত্তম। কিন্তু শত্রুপক্ষ যেন এ অভিসন্ধি না জানিতে পারে, তাদের খবর পাঠাও—কল্য প্রত্যূষে আত্মসমর্প্পণ করিব।"

সুবেদার বৃদ্ধ পারাবতের সাহায্যে খবর পাঠাইতে চলিয়া গেলেন। অমলেন্দু বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন আজ তিনি এই ক্ষুদ্রবাহিনীর নেতা হইয়া রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। কত জনক-

জননী ভগিনী বনিতাকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করিতে চলিয়াছেন! আজ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে মাতৃভূমির ছবি ভাসিয়া উঠিতেছিল। পিতামাতার অপরিসীম স্নেহ, ভ্রাতা-ভগিনীর ভাল বাসা, সরমজড়িতা বঙ্গবালার অনাবিল প্রেম, প্রাণপণ সেবা, মধুর শ্যামলিমায় ঘেরা বাঙ্গলার সেই ক্ষুদ্র পল্লী, সেই তটিনীর নীরে কৌমুদীরশ্মির চঞ্চল ক্রীড়া, পুষ্প সৌরভ পূরিত মলয়ানিল! পল্লীবাসীর সৌজন্য, বান্ধবের প্রীতি! হায়, সেইখানে মৃত্যুতেও সুখ—কবির কাম্য তাহা, প্রবাসীরও কাম্য তাহা। আজ এই পঞ্চাশজন ভারত-বাসীকে দেশের গৌরব রক্ষার জন্য, রাজার গৌরব রক্ষার জন্য, জনকজননী বক্ষশূন্য করিয়া বিদায় দিয়াছে—ভ্রাতা-ভগিনী আত্মীয় বন্ধু হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, প্রেমময়ী জায়া অন্তরের তীব্র জ্বালা দমিত করিয়া অমঙ্গল অশ্রু গোপন করিয়া হাসি মুখে বিদায় দিয়া আশা পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, কবে আবার তাহাদের চির-বাঞ্ছিত হৃদয়সর্ব্বস্ব জয়রশ্মিমণ্ডিত মস্তকে গৃহে ফিরিয়া আসিবে!

লেফটেনাণ্টের চক্ষে অশ্রু চক্ চক্ করিয়া উঠিল! কতগুলি বক্ষে শেলাঘাত করিতে তিনি আজ উদ্যত।

গোবর্দ্ধন পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, "কি ভাবছ ইন্দু।"

"ভাবছি—ভাবছি সৈনিকের ব্রত কত কঠোর, কত লোকের প্রাণে আজ আমি আঘাত দিতে যাচ্ছি!"

"তুমি হিন্দুর ছেলে হয়ে একথা বলছ ইন্দু? তুমি যে নিমিত্ত মাত্র! আর মৃত্যুর দ্বারে দাড়িয়ে আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবা ঠিক নয়। সৈনিককে হৃদয় কঠোর করে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। চিন্তার তার অবসর নাই।"

"কিন্তু তাদের অবস্থার কথাও না ভেবে ত থাকতে পারি না। শোক ক্রমে অপনোদন হবে নিশ্চয়। পৃথিবীর লোক আবার কাজের মধ্যে ডুবে যাবে। জনকজননী হয় ত অন্য সন্তানের মুখ চেয়ে কতকটা সান্ত্বনা পেতে পারেন। কিন্তু যাদের একটী ছেলে—আর এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী বিধবাদের কথা—স্বামীই যে তাদের সর্ব্বস্ব!"

—"কুরুক্ষেত্রের কথা ভেবে দেখ, কত মানবের অকাল-মৃত্যু ঘটেছিল। আর রাজপুতানার কথা ভেবে দেখ, তাদের নারীরা কি করত?"

অমল বলিল "আগুনে পুড়ে মরত না হয় জহর ব্রত পালন করত।"

গোবর্দ্ধন বলিলেন, "হিন্দু বিধবার পন্থা ব্রহ্মচর্য্য, স্বামীর স্মৃতি বক্ষে লয়ে পরজন্মে মিলনের প্রতীক্ষায় বসে থাকা—এ আদর্শ মহান্।"

"নিঃসন্দেহ! আর হিন্দু নারীর এই সতীত্ব ভারতকে পৃথিবীর চক্ষে অতি উচ্চ সম্মানের স্থান দিয়ে রেখেছে।"

ঈষদ্ধাস্যে গোবর্দ্ধন বলিলেন, "মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে সে সম্মানিত আদর্শের চিন্তায় কোনও লাভ নেই। এখন সৈন্যদের প্রতি কি হুকুম তাই বল।"

রায় বলিলেন, "তাদের মধ্যে মিথ্যা খবর রটনা করে দাও যে কালই আমাদের সৈন্য রসদ সব এসে পৌছিবে—আজ তাদের উৎসব—কেবল স্ফূর্ত্তি—মাত্র রাত্রে বারুদ ঘরের সামনে বড় চৌতারার উপর সকলে সমবেত হবে—সমস্ত রাত্রি শুধু আনন্দ!"

গোবর্দ্ধন চলিয়া গেলেন। অমলেন্দু ভাবিতে লাগিলেন "আশ্চর্য্য লোক এই গোবর্দ্ধন! এখনও মুখে হাসিটি লাগিয়া আছে—চিন্তার রেখাটি পর্য্যন্ত নাই। মৃত্যুকে যে বন্ধু মত আলিঙ্গন করে, সেই ত প্রকৃত মানুষ!"

(২)

ক্ষুদ্র দুর্গে ক্ষুদ্রসমষ্টি মাত্র সৈন্যদের মধ্যে যথাসম্ভব আনন্দ উৎসব চলিতেছিল। গীত বাদ্য ক্রীড়া গল্পে সকলে বিভোর। হায়, তাহারা যদি জানিত, এই উৎসবই পার্থিব জীবনের শেষ উৎসব, কি গুপ্ত কালাগ্নি ইহার অন্তরালে লুক্কায়িত! অস্তমিত সূর্য্যের পানে চাহিয়া রায় ও গোবর্দ্ধন বসিয়াছিলেন। বিকাল চারটা বাজিতে না বাজিতে কুয়াসায় আবৃত পাণ্ডুর রবি অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িলেন গোবর্দ্ধন বলিলেন, "দেখেছ ইন্দু, এ দেশের সূর্য্যাস্ত আমাদের দেশের সঙ্গে কত তফাৎ! বাস্তবিক বাঙ্গালার সূর্য্যাস্ত সব সময়ই উপভোগের জিনিশ। কি বিমল আনন্দদায়ী পল্লীর সেই মনোরম সন্ধ্যা! সীমন্তিনীদের শঙ্খরোল দীপ প্রদর্শন, তুলসীমঞ্চে প্রদীপপ্রদান করিয়া ঈশ্বরের নিকট ভক্তি প্রণতঃ মস্তকে গৃহস্থের মঙ্গলপ্রার্থনা—সে দৃশ্য, আহা কি যে প্রাণস্পর্শী!" ইন্দু কোন উত্তর না দিয়া পকেট হইতে একখানি ক্ষুদ্র পকেট পঞ্জিকা বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখ গোবর্দ্ধন, আজ কি দিন। আজ বাঙ্গালার কি আনন্দোৎ

সব। আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ভ্রাতাভগিনীর সেই প্রীতি-সম্মিলন, ভ্রাতার উন্নতি কামনায়, দীর্ঘায়ু কামনার জন্ত ভগিনীর এই প্রার্থনা—এ আর কোন দেশে আছে কি? এই দিনে আমাদের দেশে ভ্রাতাভগিনীদের অন্তঃকরণে যে কি ভাবের সঞ্চার হয়, কি আনন্দ ধারায় তাহারা পরিস্নাত হয়, পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আজ বাঙ্গালার সমস্ত ভগিনীরা যমরাজ ও যমুনাকে অর্চনা করিয়া, প্রীত করিয়া ভ্রাতার দীর্ঘায়ুপ্রার্থনা জানাচ্ছে, ভগবচ্চরণে ভ্রাতার সুখের কামনা জানাচ্ছে, আর ভ্রাতারা ভগিনীর আশীর্ব্বাদ দেবীর মঙ্গলবাণীর মত ভক্তি প্রণতঃ মস্তকে পুলকিত হৃদয়ে গ্রহণ করছে। গোবর্দ্ধন! আজ আমরা দূর বিদেশে মৃত্যুকে সেইদিনই আলিঙ্গন করতে যাচ্ছি, যে দিন স্বদেশে দূর পল্লিগ্রামে ভগ্নীরা আমাদের দীর্ঘায়ু কামনা কচ্ছে! আমাদের অভাবে অশ্রুমোচন করে ভগ্নি গাত্রে ঘৃত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে অন্তরের সহিত আমাদের আশীর্ব্বাদ করছে, অদৃষ্টের একি নিষ্ঠুর তীব্র পরিহাস!"

গোবর্দ্ধন চুপ করিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে পকেট হইতে গীতাখানি বাহির করিয়া পড়িতে পড়িতে বলিলেন, "কর্ত্তব্য পিছন দিকে চেয়ে চলতে জানে না, সে দেখে সামনে!"

"আজ যদি আমাদের মন থেকে অতীতের সমস্ত স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যেত!" বলিয়া লেফটেনান্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। গোবর্দ্ধন পাঠ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "কিন্তু সেও কি অনেকটা আমাদের হাতে নয়? অতীতের চিন্তা কর্ত্তব্যের পথে কণ্টকস্বরূপ। সব ভুলে যাও, সব ভুলে যাও, শুধু সামনের দিকে চাও—আগে চল—আগে চল!"

রায় বলিলেন, "অসম্ভব, মনুষ্যহৃদয় বড় দুর্ব্বল। আজ এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে আমি গৃহের সুখস্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তবুও একটা সুখের কথা আমার মনে হচ্ছে এই যে আমি আর একজনের জীবন নিজের সঙ্গে জড়িয়ে চিরকালের জন্য দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে যাচ্ছি না—কিন্তু তুমি—"

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। রায় আবার বলিলেন, "গোবর্দ্ধন! আমি তোমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি! তুমি ধীর, স্থির, কোন চিন্তার তরঙ্গও যেন তোমার মনে উঠছে না। সার্থক তোমার গীতা পাঠ, আশ্চর্য্য তোমার শিক্ষা! গোবর্দ্ধন বলিলেন, "আমি ত মূর্খ। শিক্ষিত তোমরা, আমি নিজের খেয়ালে চলি। জানিনা ঠিক পথে চলছি কি না। কিন্তু আমি মাত্র একটা পথ জানি, সেটা কর্ত্তব্যের পথ, মনুষ্যত্বের পথ, তার কাছে আমি সমস্ত সুখ শান্তি বলি দিতে পারি।" অস্ফুটস্বরে রায় বলিলেন, "তুমিই প্রকৃত মানুষ।"

গীতা পাঠ সমাপন করিয়া গোবর্দ্ধন উঠিলেন। "এবার একবার সৈন্যদের পরিদর্শন করিতে হইবে," বলিয়া চলিয়া গেল। রায় ভাবিতেছিলেন, "মূর্খ! এই প্রকৃত মূর্খ তার পরিচয় বটে। অমলেন্দু নিজে বিলাতে শিক্ষিত, সেইখান হইতে কমিশন প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে আসিয়াছেন। কিন্তু রায় ভাবিতেছিলেন, গোবর্দ্ধন তাহার চেয়ে কত উচ্চে,—সে প্রকৃত মানুষ। অথচ সে তারই মুখে শুনিয়াছে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ার জন্য অভিভাবক কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত, সমাজ কর্ত্তৃক নিন্দিত ও সহপাঠীদের ঘৃণার পাত্র হইয়া উদরান্ন সংস্থানের জন্য সামান্য চাকরী গ্রহণ করিয়া কোনরূপে দিনপাত করিতেছিল। হায়! মানব, তুমি দেখ শুধু বাহিরটা, অন্তরের পরিচয় চাও না! প্রকৃত শিক্ষা কি তা জানিতে চাও না। বিদ্যার পরিমাণ কর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মাপ কাঠিতে। যাকে তোমরা মূর্খ অকর্ম্মণ্য বলিয়া ত্যাগ কর, সে কতটা কাজের, তার মধ্যে কতখানি হৃদয়, কতটা গভীরতা, কত বড় সহৃদয়তা ও মনুষ্যত্ব আছে, তার পরিচয় জানতে চাও না।

(৩)

দীর্ঘ অবরোধে বদ্ধ অদ্ধাশনক্লিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে একটা গভীর ক্লান্তি ও অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছিল। আজ একটু আশার খবর পাইয়া তাহাদের হৃদয় পুলকে নাচিয়া উঠিতেছিল। কাল হয়ত নূতন ফৌজ আসিয়া পড়িবে, তাহাদের মুক্তি হইবে। মুক্তির আনন্দ, ভবিষ্যতের সুখের কল্পনা, শান্তির ছবি, হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল। মুক্তি নাও হইতে পারে,—হয়ত বা ঘোরতর যুদ্ধ হইবে, কিন্তু তাও ঢের ভাল। এরূপভাবে বন্দী অবস্থায় মৃত্যুর চেয়ে সম্মুখ যুদ্ধ বাঞ্ছনীয়।

ভারতসৈনিক চায় সম্মুখ সমরে প্রাণ দিতে, স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্য ও দৈহিক শক্তির পরীক্ষা দিতে কিন্তু অন্ধকারে বদ্ধাবস্থায় মূষিকের মত প্রাণত্যাগ—অসহ্য সে চিন্তা। তাই

কল্য প্রাতে যুদ্ধের আশায় মুষ্টিমেয় ভারত সৈনিকের হৃদয়ে এত আনন্দ। সেনাপতির আদেশে সৈনিকগণ তাহাদের জাতীয় সঙ্গীত ও ক্রীড়ায় প্রমত্ত রহিয়াছে। অমলেন্দু ও গোবর্দ্ধন সৈন্যদের পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। জাঠ, মারাঠা, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, রাজপুত সব দেশেরই ২৪ জন সৈনিক আছে। তাহাদের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া লেফটেনান্ট রায়ের বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সুবেদার রূপসিং অভিবাদন করিয়া বলিল, "গোস্তাফি মাপ কিজিয়ে লেফটেনান্ট সাহেব। হাম লোককো খবর মিলা কাল কার্ণেল সাহেবকা পাশসে নায়া ফৌজ আওঙ্গে, কাল ফজির লড়াই হোগা সচ্।"

উত্তরে লেফটেনান্ট বলিলেন, ওইরূপই খবর পাওয়া গিয়াছে, কাল যেন লড়াইয়ের জন্য সকলে প্রস্তুত থাকে। আজ রাত্রে ছুটী—কেবল আনন্দ।

"বহুৎ খুব হুজুর! লড়াইকো আস্তে তৈয়ারী হাম লোকতো হ্যয়ই।" রূপসিং অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। রায় তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কাল ফৌজ না আসিয়া পৌছায় ত কি করা যাইবে? শত্রু পক্ষ চায় যে আমরা আত্ম সমর্পণ করি।

রূপসিং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "নেহি নেহি জান কবুল ওঃ কভি নেহি হোনে সক্তা! এইসা খাড়াই মরেগা, তবভি নেহি।"

"বহুত ঠিক! যাও আভি!"

রূপসিং অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। গোবর্দ্ধন অমলেন্দুর পানে চাহিলেন। তাহার অর্থ—দেখিলে ত সৈনিকদের মনের ভাব। রূপসিং এক কথায় অমলেন্দুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি এতক্ষণ মনের কাছে অপরাধী সাজিয়া বসিয়াছিলেন। এখন বুঝিলেন কিছুই অন্যায় করিতেছেন না। অমলেন্দু চিন্তামগ্ন ভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সৈনিকদের যুগপৎ সানন্দ চীৎকারে ক্ষুদ্র দুর্গটী মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

উভয় বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল আবার ঘন্টা খানেক পরে। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘন কুয়াসা তরুরাজিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। অমলেন্দু দূর হইতে দেখিলেন, বৃক্ষকাণ্ডে দেহ হেলাইয়া অন্ধকারে গোবর্দ্ধন চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তাহার হাতে কতকগুলি ফটো। অমলেন্দুর বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠিল। হায় মানব, কত দুর্ব্বল তোমার হৃদয়! অতীতের স্মৃতি কাহাকে না ব্যাকুল করিয়া তোলে? মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া কে না একবার এই ধরণীর পানে শেষবার চাহিয়া দেখে। অমলেন্দু ধীরে ধীরে ডাকিলেন, 'গোবর্দ্ধন!' গোবর্দ্ধন চমকিয়া উঠিয়া তাহার নিকট আসিলেন।

"কি ভাবছিলে গোবর্দ্ধন?"

"কিছু না, জীবনের শেষসন্ধ্যা উপভোগ করে নিচ্ছিলুম।"

শেষ সন্ধ্যা! অমলের বুকের উপর দিয়া কি একটা আশাময় প্রবাহ ছুটিয়া গেল! সে শুধু বলিল "হুঁ"।

কিছুক্ষণ পরে লেফটেনান্ট বলিলেন, "আজ যদি আমি আমার সৈন্যদের লড়াইয়ের হুকুম দিতে পারতুম! যদি তারা সব যুদ্ধে মরত তা হ'লে আমাকে বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত হ'তে হ'ত না।"

গোবর্দ্ধন বলিল "কিন্তু উপায় নেই তা জান। বাইরে থেকে ফটক বন্ধ। আমরাও ভেতর থেকে ফটক বন্ধ করে দিইছি।"

"কে আমি ত জানি না- এর কারণ?"

"ও জান বৈকি? তোমার হুকুম নেওয়া হয়েছিল, বোধ হয় ভুলে গেছ। কারণ শত্রু পক্ষ যদি ভেতরেও ঢুক্‌তে চায়, তা হ'লে তাদের ফটক ভেঙ্গে ঢুক্‌তে হবে তাতে দু পাঁচ মিনিট সময় লাগ্‌বে, আমাদের কিছু সুবিধা হতে পারে।"

"দু পাঁচ মিনিটে ত আর সৈন্যরা প্রস্তুত হতে পারে না।"

"সেই জন্য আমাদের সৈন্যরা সর্ব্বদাই সজ্জিত থাকে। আজ বহুদিন পরে স্ফূর্ত্তি করবার হুকুম পেয়ে আজ তারা হাতিয়ার খুলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে! কি যে স্ফূর্ত্তি কচ্ছে তারা তা আর বলা যায় না।"

"কিন্তু বেচারারা জানে না যে তাদের পেছনে দু জন গুপ্ত ঘাতক গভীর পরামর্শে নিমগ্ন। আচ্ছা গোবর্দ্ধন, শত্রুপক্ষরা আমাদের আক্রমণ কচ্ছে না কেন?"

"তাতে তাদের লাভ? তা'হলে ত আমরা বন্দী হব না, যুদ্ধ করে মরব। তাই ওরা চাচ্ছে যাতে আমরা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে আত্ম সমর্পণ করি।"

পরক্ষণেই ঈষদ্ধাস্যে গোবর্দ্ধন আবার বলিলেন, "কিন্তু এই বাঙ্গালী জাতটার মাথাও কম নয়—কিস্তির পরে মাত বাঁচাবার জন্য ঢের চাল ভেবে বার করতে পারে।"

(৪)

ফটকের পার্শ্বেই বারুদ ঘর, তাহার সম্মুখে সিমেন্ট করা পরিষ্কার অনেকখানি স্থান। সেখানে মশাল জ্বালাইয়া সৈন্যগণ নৃত্যগীত বাদ্য ও ক্রীড়ায় বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। গোবর্দ্ধন তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতেছিল। অমলেন্দু সেখানে আসিল। লেফটেনাণ্টকে দেখিয়া সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হইল। কিন্তু রায় যখন তাহাদের সহিত যোগ দিলেন, তখন আর কাহারও কোন দ্বিধা রহিল না। দূরে কতকগুলি সৈনিক পাক করিতেছিল। পুরা রসদ আজ তাহারা পাইয়াছে, কয়েকদিন পরে সকলে এক সঙ্গে পূর্ণ-উদর আহার করিতে পাইবে, তাহারা অতি যত্নে পাক করিতেছিল। অনেক রাত্রে আহারাদি প্রস্তুত হইলে লেফ্‌টেনাণ্ট, জমাদার, সুবাদার সামান্য সৈনিক সকলেই এক সঙ্গে আহার করিল। রসদ ঘরে সামান্য পরিমাণে যে সুরা ছিল, আজ লেফটেনাণ্ট সুরাপায়ী সৈনিকদের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা যেন স্বর্গ হাতে পাইয়াছিল, আনন্দস্রোত আর বাধা মানিতেছিল না। রাত্র গভীর হইয়া আসিতেছিল সকলেই ক্রমে একটু ক্লান্ত হইয়া আসিতেছিল—এমন সময় গুড়ুম হঠাৎ কামানের ভীষণ আওয়াজে সকলেই চমকিয়া উঠিল। ওকি! তারপর মুহুর্ম্মুহু কামানের তীব্রধ্বনি দূর হইতে অতি সন্নিকটে—ঠিক ফটকের পাশে! সৈন্যগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল! অল্প সংখ্যক সুরাপানে বিভোর ছিল; তাহারা ভীতিব্যঞ্জক চীৎকার করিয়া উঠিল। গোবর্দ্ধন ও অমলেন্দু চকিত হইয়া উঠিলেন। অমলেন্দু বলিলেন, "গোবর্দ্ধন! শত্রুপক্ষ বোধ হয় আর দেরী করিল না।"

গোবর্দ্ধন বলিলেন, "উঃ, কি ভুলই করিয়াছি, আজ আশা-পূর্ণ হইত, আজ আমরা যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারিতাম। এখন কোন সৈন্যই প্রস্তুত নয়। প্রস্তুত হইতে যে সময় লাগিবে তৎপূর্ব্বে আমরা আক্রান্ত হইব। আক্রান্ত হইলে আমরা অধিকাংশই বন্দী হইব। সর্ব্বনাশ সব মাটী সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল।"

সৈন্যগণ প্রস্তুত হইবার জন্য হাতিয়ার ঘরের দিকে যাইবার হুকুম প্রার্থনা করিল। কিন্তু প্রস্তুত হইবার সময় কই? আবার ভীষণ কামান গর্জ্জন। ভিতর হইতে ফটক খুলিবার জন্য বাহির হইতে হুকুম আসিল। কেহ উত্তর দিল না—সব নির্ব্বাক্! তখন অগ্নিময় গোলক লৌহ কবাটের উপর ভীষণ শব্দে পতিত হইতে লাগিল। গোবর্দ্ধন দেখিলেন, এখনই ফটক ভাঙ্গিয়া সৈন্য প্রবেশ করিবে, অধিকাংশই বন্দী হইবে, আর সময় নাই। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "সৈন্যগণ—(এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে! কিন্তু তৎপূর্ব্বে, একটী মৃৎকলস দেখাইয়া বলিল)—ইহা হইতে সুমিষ্ট সরবৎ লইয়া সকলে ইংরাজরাজের জয় ঘোষণা করিয়া পান কর, ক্লান্তির অপনোদন হইবে।" লেফটেনাণ্ট হুকুম দিলেন, সকলেই পানপাত্র ভরিয়া সরবৎ লইল। সুবাদার গোবর্দ্ধন ও লেফটেনাণ্ট অমলেন্দুও পাত্র ভরিয়া সরবৎ লইলেন। সৈন্যগণ ইংরাজরাজের জয় ঘোষণা করিয়া সরবৎ পানান্তে হাতিয়ার লইতে ছুটিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল, কেহ আর অগ্রসর হইতে পারিল না; একে একে সব মাটিতে মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া গেল, মৃত্যুর করাল ছায়া সকলের বদনে গাঢ়ভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় বিরাট শব্দ করিয়া দুর্গের লৌহ-কবাট ভগ্ন হইয়া পড়িল। গোবর্দ্ধন বলিলেন "অমলেন্দু আর দেরী নয়, আমরাও হয় ত বন্দী হইতে পারি—ওঃ বন্দী হওয়া ভারত সৈনিকের ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল!" গোবর্দ্ধন বিষাক্ত সরবৎ পান করিলেন, এক মিনিটের মধ্যে অমলেন্দুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। "অমল—বিদায়—ঈশ্বর"—আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলনা; চেতনা লুপ্ত হইল। এই শবরাশির মাঝে লেফটেনাণ্ট পানপাত্র হাতে তখনও দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিছুই যেন তাঁহার বোধগম্য হইতেছিল না। মস্তকটী যেন কে জোর করিয়া পেষণ করিতেছিল। দুর্গদ্বার দিয়া সৈনিক প্রবেশ করিতেছিল, মনে হইতেছিল, অতি নিকটে নিকটে—যেন কার করস্পর্শ—কে যেন বলিল, "লেফটেনাণ্ট রায়, এত ডাকাডাকি করিলাম ফটক খোল নাই কেন?" একি স্বপ্ন না বিভীষিকা! তৎক্ষণাৎ সে পূর্ণপাত্র বিষাক্ত-সরবৎ পান করিল। কাচনির্ম্মিত পানপাত্র হস্তচ্যুত হইয়া সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে কে যেন তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া ডাকিল, "লেফটেনাণ্ট রায়!" অতি

কষ্টে অমলেন্দু চক্ষু খুলিল—সার্চ্চ লাইট হস্তে ওঁকে ও ? ও ত শত্রু নয়, তাঁহাদেরই কর্ণেল !

কর্ণেল বলিলেন, "শত্রু সৈন্য পরাজিত, আজ তোমাদের মুক্তি। এত ডাকাডাকিসত্ত্বেও ফটক খোল নাই কেন ? বৃথা আশঙ্কায় আমাকে ফটক ভাঙ্গিতে বাধ্য হইতে হইল "

অতি কষ্টে রায় বলিলেন "বড় দেরী কর্ণেল—বড় দেরী, সব শেষ—একটু আগে খবর —"

কর্ণেল সম্মুখে চাহিয়া বুঝিলেন, যাহাদের মুক্তি দিতে আসিয়াছেন, তাহাদের আত্মা বহু পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়া স্বর্গের পথে প্রয়াণ করিয়াছে।

কর্ণেল বলিলেন "ছিঃ লেফটেনাণ্ট ! কেন এ উন্মাদের মত কার্য্য করিলে ?"

অমলেন্দুর সমস্ত দেহ বিষের প্রক্রিয়ায় অবশ হইয়া আসিতেছিল, অতি কষ্টে বলিল—"কোন উপায় ছিল না—নিজের হাতে বিষ দিয়েছি। শত্রু চায় আত্মসমর্পণ। ভারত সৈনিকের কাছে আত্মসমর্পণ অধর্ম্ম—"

কর্ণেল নির্ব্বাক্ !

মৃত্যুক্ষীণকণ্ঠে অমল বলিলেন, "ভারত সৈনিক প্রাণ দেয়, কিন্তু ইমান দেয় না।"

কর্ণেলের বক্ষের উপর তাহার দেহ লুটাইয়া পড়িল। সৈনিকগণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। মেজর রুথফোর্ডের দিকে চাহিয়া কর্ণেল বলিলেন, "আশ্চর্য্য এদের বীরত্ব! অদ্ভুত এদের কার্য্যকলাপ !"

মেজর বলিলেন, "ভারতবাসীর বীরত্বের কথা শুনিয়াছিলাম, আজ চক্ষে দেখিলাম। ধন্য সেই দেশ, যে দেশ এরূপ বীরসন্তান প্রসব করে !"

বৃদ্ধ কর্ণেল অমলেন্দুকে বক্ষে জড়াইয়া তাহার মৃত্যু-পাংশু মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তরুণ তপনের প্রথম কিরণরশ্মি সেই বিগতপ্রাণ বঙ্গবীরের মস্তকে যশের গৌরব মুকুট রচনা করিতেছিল।

শ্রীশান্তিকুমার রায় চৌধুরী

অনন্ত মিলন

কে বলে, 'প্রাণের আড় নয়নের আড়ে ?'
চোখের আড়ালে, আহা, মোহিনীমুরতি
হৃদয় মন্দিরে পশি জাগায় আরতি !
অন্তরে পেয়েছি আজি তাই আমি তারে !
দেশকালে খণ্ডিত সে দেহের মিলন ;
দেহের পতনে তাই আত্মায় আত্মায়
হয় চির সম্মিলন ; এ মিলনে, হায়,
নাহি অবসাদ, নাহি বিরহ-বেদন !

আজি সারা বিশ্ব মোর মিলনভবন,
চির রাত্রি চির দিন—মিলন বাসর,
শূন্যে ধরাতলে আজি সে রূপ সুন্দর,
স্বপনে জাগ্রতে তারি স্মৃতি অনুক্ষণ !
জড়ের মিলন সে ত দারুণ বন্ধন,
আত্মায় আত্মায় সেই সুখ সম্মিলন !

শ্রীদুর্গাচরণ মিত্র

মেঘনাদ বধে সীতা ও সরমা এবং বৃত্রসংহারে শচী ও ইন্দুবালা

মেঘনাদবধের সীতা এবং বৃত্রসংহারের শচী উভয়েই ভাগ্য বিপর্য্যয়ে সমতুল্যা, উভয়েই আজন্ম সুখপালিতা, উভয়েই স্বগৃহ হইতে নির্ব্বাসিতা। আজন্ম ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিতা হইয়াও নিয়তির কঠোর বিধানে সমস্ত ঐহিক সুখ হইতে উভয়েই বঞ্চিতা, আবার উভয়েই শত্রু-হস্তে বন্দিনী এবং উভয়েই শত্রুকর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা এবং বিপদ্‌গ্রস্তা। কাজেই কবির তুলিকায় উভয়ের চরিত্রই প্রায় একই ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, সীতা মরজগতের জীব, শচী অমরার অধিবাসিনী। রাজপুরী আর অরণ্যের মধ্যে এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে

বৈষম্য কতদূর আমরা জানি না। সীতা রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন, শচীর বাসস্থান স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে দুঃখকে জয় করিতে পারে, সেই প্রকৃত সুখী, দুঃখ জয়ের ক্ষমতা যেখানে সেই খানেই চরিত্রের উৎকর্ষ। ঐশ্বর্য্য এবং বিলাসিতায় যে সুখ পাওয়া যায়, সে সুখকে সীতা কখনও আমলেই আনে নাই। সীতা সরমার নিকট তাঁহার বনবাসের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, সে চিত্র পাঠে ইহা বুঝা যায় না, তিনি অযোধ্যায় অধিক সুখী ছিলেন না বনবাসেই তাঁহার সুখ বেশী। সীতা সরমাকে বলিতেছেন—

"ছিনু মোরা, সুলোচনে! গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রী, মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু, কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে।
ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ! রাজার নন্দিনী
রাজকুলবধূ আমি, কিন্তু এ কাননে
পাইনু সরমা সই, পরম পিরীতি।
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী বনচর মধু নিরবধি,
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ। কোন্ রাণী, কহ শশীমুখি!
হেন চিত্ত বিনোদন বৈতালিকগীতে
খোলে আঁখি?"

বনবাস সীতাকে কোন ক্লেশ দিতে পারে নাই, কারণ তাহা যে শারীরিক দুঃখ। কায়িক ক্লেশকে যে জয় করিতে পারে, দুঃখের মধ্যে যে সুখকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, সেই ত প্রকৃত দেবী। অন্যদিকে শচী চপলাকে বলিতেছেন

"বল আর কতদিন এবেশে হেন শ্রীহীন
থাকি বল মরতে পড়িয়া?"

অন্যত্র শুনিতেছি—

"মানবের এ আগারে থাকি যেন কারাগারে
পুড়িয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে;
অতি গাঢ়তর বায়ু আই ঢাই করে আয়ু
বুক যেন নিবদ্ধ নিগড়ে।
নয়ন ফিরাতে ঠাঁই কোথাও নাহিক পাই,
শূন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে;
সুখে নাহি দৃষ্টি হয়, চারিদিক বহ্নিময়,
আগুণে রেখেছে যেন ঢেকে!
হায়! এ মাটির ক্ষিতি পায়ে বাজে নিতি নিতি,
শিলা যেন কঠোর কর্কশ;
শুনিতে না পাই ভাল শব্দ যেন সর্ব্বকাল
কর্ণমূলে ঝটিকা-পরশ।
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি কেমনে শরীর রাখি?
সখিরে! সকলি হেথা স্থূল;
নিত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নরকুল?
অমর, মরণ নাই, কত কাল, ভাবি তাই
এত কষ্টে এখানে থাকিব!
যখন ভাবিলো সই তখনি তাপিত হই
চিরদিন কেমনে সহিব?"

এই বিষয়ে উভয়ের চরিত্র তুলনা করিতে গেলে, সীতার চরিত্রের মাধুর্য্য অধিক ফুটিয়া উঠে। তবে দুইটী বিষয় ভুলিয়া গেলে শচীর প্রতি এই স্থানে অবিচার হয়। প্রথমটী এই যে, সীতা স্বেচ্ছায় এই নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন শচীকে বাধ্য হইয়াই স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যবাসে আসিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, সীতা স্বামী সহভিব্যাহারিণী, শচী স্বামী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্না। এই স্থানেই শচী ও সীতার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি হয়। এবং সেই জন্যই ইঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্রের উপর নিজ নিজ অবস্থার প্রভাবকে বেশী দূর টানিয়া দেখা যায় না। কিন্তু তথাপি যেন মনে হয়, সীতার চরিত্রই আমাদিগকে অধিক মুগ্ধ করে। সীতা সংসারের সমস্ত জিনিসের উপরেই পতিসেবাকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। যতদিন পতি তাঁহার সহচর, ততদিন পার্থিব কোন ক্লেশই

তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। সমস্ত দুঃখের মধ্যে সীতার সেই এক চিন্তা—পতিপদ ধ্যান। লঙ্কায় বন্দিনী অবস্থায় সীতা রাজৈশ্বর্য্য পুনরায় পাইতে চাহেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন—

"হায় সখি আর কিলো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এপোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পাদুখানি আশার সরসে
রাজীব নয়নমণি ?"

মেঘনাদ বধে সীতাকে যখনই দেখিতে পাই, তখন নম্রতা ও দয়ার আধার এবং স্বামীগতপ্রাণা একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। মনে হয় যেন পতি ভিন্ন সীতার কোনো পৃথক অস্তিত্ব নাই, সীতার চরিত্রের এই মাধুর্য্যটুকু আমরা শচীর চরিত্রে দেখিতে পাই না। মর্ত্ত্যবাসের সময়ে চপলার সহিত কথোপকথনের সময় ইন্দ্রের সহিত বিচ্ছেদকে তাহার প্রধান দুঃখ বলিয়া শচী প্রকাশ করে নাই। শচী গর্ব্বিতা দেবেন্দ্র-মহিষী, তাহার ন্যায্য অধিকার পরহস্তগত, তাহার রাজৈশ্বর্য্য শত্রুভোগ্য, শচীর দুঃখ এই। শচী বলিতেছেন—

"সাজেলো আমার সাজে আমার সপ্তকীবাজে
ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়,
আমার মুকুট রত্ন অমরে করিত যত্ন
কুবের আনিয়া দেয় তায় !"

এই গর্ব্বিতা শচীকে অপমান করিতে প্রয়াস পাইয়া ঐন্দ্রিলা শচীর দুঃখের মাত্রাকে অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সীতার দুঃখ অন্য রকমের, সাধ্বী পত্নীর পতিবিচ্ছেদ এবং সতীত্বের প্রতি অবমাননা। সীতার দুঃখই শচীর দুঃখ হইতে অধিক এবং পাঠকের সহানুভূতি স্বতঃই সীতার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়।

রমণীসুলভ দয়া এবং স্নেহে সীতা এবং শচী উভয়েই সমতুল্যা, কিন্তু শত্রুর জন্য শোক প্রকাশ করিতে সীতার মত কেহই পারে নাই। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর সীতা বলিতেছেন—

"মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে
আর কত রক্ষোরথি কে পারে গণিতে ?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে ! বসন্তারম্ভে হায় লো
শুকাল হেন ফুল !"

রুদ্রপীড়ের মৃত্যুতে শচীর দুঃখ হইয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু সেই দুঃখ, ইন্দ্রজিৎ বধে সীতার দুঃখের সহিত তুলনা হইতে পারে না। রুদ্রপীড় শচীর আশ্রিতা ইন্দুবালার পতি, ইন্দ্রজিৎ সীতার কেহই নহে। এইরূপ দেখিতে পাই, শচী ও সীতার চরিত্র তুলনা করিলে শচী গর্ব্বিতা দেবরাজমহিষী-রূপে এবং সীতা পরদুঃখকাতরা পতিপরায়ণা সরলা রমণীভাবেই ফুটিয়া উঠেন। অবস্থার সাদৃশ্যে প্রকাশ্যভাবে উঁহাদের চরিত্রের একতা উপলব্ধি হইলেও বিভিন্ন কবির তুলনায় দুই চরিত্র বস্তুতঃ ভিন্ন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতা ও শচীর চরিত্রের বাকী অংশটুকু সরমা ও ইন্দুবালার চরিত্রবিশ্লেষণে ফুটিয়া উঠিবে।

সরমা ও ইন্দুবালা দুইজনেই শত্রুকুলবধূ, শত্রুপুরীতে দুই বন্দিনীর জন্য ইঁহাদিগের প্রাণই কাঁদিয়াছে। সরমা সন্তর্পণে গোপনে অশোক বনে গিয়া সীতার সহিত দেখা করিয়া আসিতেন। যখনই দেখিতেন, দুরন্ত চেড়ীর দল সীতাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বেড়াইতেছে, সেই অবসরে তিনি তাঁহার বেদনাপূর্ণ হৃদয় খানি লইয়া সীতার নিকট আসিতেন: সরমা সীতাকে বলিতেছেন—

"দুরন্ত চেড়ীরা
তোমারে ছাড়িয়া, দেবী, ফিরিছে নগরে
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে।
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর ; করিলে আজ্ঞা সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি !"

ইহাতে সরমার করুণ হৃদয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। মিষ্ট-ভাষিণী সীতার কথা শুনিতে তাহার অসীম আগ্রহ। কিরূপে সীতা বন্দিনী হইলেন, রামের বনবাসের কথা, তাঁহার স্বয়ম্বরের কথা, যখনই যাহা শুনিতে চাহিয়াছেন, সীতা তখনই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। আর সীতা যখন তাঁহার দুঃখের কথা বলিতে বলিতে অশ্রুজলে ভাসিয়াছেন, সরমার অশ্রুবারিও তাহার সঙ্গে মিশিয়াছে।

একস্থলে আছে—

"এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে,
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে।"

সীতা তাঁহার কাহিনী বলিতে নিজের দোষটুকুও বাদ দেন নাই। মায়াবী হরিণের চীৎকারে যখন তিনি লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার ফলেই আত্মকৃত দোষে মুক্তকণ্ঠে বন্দিনী, ইহা তিনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এই স্থানে, যখন সরমা রাক্ষস রাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

"কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ অলঙ্কার বুঝিতে না পারি?"

তখন সীতা বলিতেছেন—

'বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখী!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিলা
বনাশ্রমে।"

শত্রু বলিয়া তাহার উপর অমূলক দোষারোপ করেন নাই। সীতা তাহার কাহিনী বলিতে বলিতে যখন কাঁদিয়াছেন শুনিবার প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও সরমা সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন—

"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা যদি পাও মনে,
দেবী, থাকতবে কি কাজ স্মরিয়া?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।"

অন্যস্থলে সরমা আবার বলিতেছেন—

"ক্ষম দোষ মম
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে
হায় জ্ঞানহীনা আমি"

অনেক স্থলে সরমা সীতাকে সান্ত্বনা দিতেছেন—

বিধির ইচ্ছা তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা। সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি, বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিভুবনজয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে
শবাহারী জন্তুপুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শবরাশি! কাণ দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ শর্ব্বরী তব।"

এই সান্ত্বনা বাক্য বলিতে কি সরমার প্রাণে আঘাত লাগে নাই? রাক্ষস বংশ সবংশে নির্ব্বংশ হইবে এই বাক্য তাঁহার বুকে কি শেলসম আঘাত করে নাই? তাহার পুত্র কি এই রাক্ষস বংশেরই নয়? রাক্ষস বংশ লোপের সঙ্গে তাহার পুত্রও যে তাহার বক্ষ ছাড়িয়া যাইবে এই কথা মর্ম্মঘাতী হইলেও পরদুঃখকাতরা সরমা সীতার দুঃখের সান্ত্বনার জন্য বলিয়াছেন, যদিই বা সীতা ইহাতে একটু সান্ত্বনা পান, হউক না তাঁহার পক্ষে মর্ম্মঘাতী। ইহাতে তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

যাঁহার জন্য এতখানি অনর্থ তাহার সহিত নিজের পুত্রীর বধূর গোপনে সাক্ষাৎ এ কথা রাবণ রাজা শুনিতে পাইলে আর রক্ষা নাই। বিশেষতঃ বিভীষণ রামের পক্ষপাতী হইয়াছে, তাহার ফলে সে বিতাড়িত। এখন যদি সরমা সীতার সান্নিধ্য চায় তবে রাক্ষসপতির ক্রোধের সীমা থাকিবে না সেই ভয়ে সরমা সন্ত্রস্তা, তিনি সীতাকে বলিতেছেন

"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে
রঘুকুল-কমলিনী, কিন্তু প্রাণপতি
আমার রাঘবদাস। তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ পড়িব সঙ্কটে।"

এস্থলে তর্ক হইতে পারে, যে সরমা সীতার প্রতি দয়া প্রকাশ না করিবে কেন? এই যুদ্ধে সরমার স্বামীর প্রাণের ত কোন আশঙ্কা নাই, তিনি ত রামের আশ্রয়ে আছেন, রাবণ হইতে তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু পুত্র যে রাবণের পক্ষেই যুদ্ধে যাইতেছে।

দয়া, করুণা নিজ স্বার্থের দিক চাহিয়া হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না, দয়া স্থানাস্থান পাত্র কাল বিবেচনা করে না, যাহার দুঃখে অভিভূত হয়, তাহার উপরই বর্ষিত হয়, সে শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক। যখন মেঘনাদ বধ হইবার পর প্রমীলা সহমরণে যাইবার জন্য প্রস্তুত, হাহাকারে লঙ্কাপুরী নিনাদিত, দূরে নিভৃতে অশোক বনে সীতা সরমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন ইন্দ্রজিতের বধের ও প্রমীলার সহমরণের সংবাদ পাইলেন, তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় এই শোক-কাহিনী শুনিয়া শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া গেল, নিজের প্রতি তাঁহার ধিক্কার হইল, তিনি সরমাকে বলিয়াছিলেন,

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ সখি! নিবাইলা সদা
প্রবেশি যে গৃহে হায় অমঙ্গলারূপী
আমি পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা
থ, বনবাসী
বনবাসী কুলক্ষণে! দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্র শোকে সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ পক্ষে ভীম ভুজ বলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিল দানব বালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে বসন্তারম্ভে, হায়লো শুকাল
হেন ফুল!"

সরমা তখনও সীতাকে তাঁহাদের দোষ দেখাইয়া সান্ত্বনা দিতেছেন —

কহকি রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণ-ব্রততী
বক্ষিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘবমানস-পদ্ম এ রাক্ষস দেশে?
নিজ কর্ম্ম দোষে মজে লঙ্কা অধিপতি!

ইহাতে কি তাহার বুক বিদীর্ণ হয় নাই? পুত্র মম ইন্দ্রজিতের মৃত্যু কি তাহার প্রাণে শেলাঘাত করে নাই! তাহার পুত্রের নিধনও ত হইয়া গিয়াছে। তবুও নিজের কষ্ট গোপন রাখিয়া সীতাকে সান্ত্বনা দিয়াই আসিতেছেন।

সীতা যেমন শত্রুপুরীতে আসিয়া সরমাকে সান্ত্বনাদাত্রী পাইয়াছিলেন, শচীও ইন্দুবালা ঠিক সেইরূপ নহে; পরন্ত শচীরই ইন্দুবালাকে সান্ত্বনা দিতে হইয়াছে, কাব্যের ভাবে ইন্দুবালা ও সরমার বয়সের অসামঞ্জস্য আছে। সরমা সন্তানের জননী গৃহিণী,ইন্দুবালার বধূ অবস্থা,সরলা বালিকা। সীতা ও সরমা সখীত্ব স্থাপনের যোগ্যা, শচী ও ইন্দুবালা মাতা কন্যা সম্পর্কের যোগ্যা; ইন্দুবালাও সরমার মতন শচীর দুঃখে দুঃখিনী, শচীকে মর্ত্য হইতে আনিতে যাইতেছে শুনিয়া রতির নিকট তাহার কতই না আক্ষেপোক্তি। তিনি রতিকে বলিতেছেন,—

"আমি ও রমণী রমণীও শচী
তবে তিনি কেন তায়
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায়?
কি হবে শচীর পতি কাছে নাই
মহাবীর পতি মম?
আমিও যগুপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম।
ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে
আমার (ই) হৃদয় কাঁপে,
না জানি একাকী গহন কাননে
শচী ভাবে কত তাপে!
ঐন্দ্রিলগ্রহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ?
বক্ষাও ঈশ্বরী দানব মহিষী
দাসী চাহে—জন্মে সেহ।
আমারে না কেন কহিলা মহিষী
আমি সেবিতাম তাঁয়
পরে নাকি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায়?"

কি সুন্দর কথাগুলি? তারপর রতির মুখে শচীর সৌন্দর্য্য ও গুণাবলীর কথা শুনিয়া ইন্দুবালা দুঃখে অভিভূত হইয়া বলিতেছেন—

"আমারে লইয়া কন্দর্প কামিনী
চল সে পৃথিবী পর,
হইতে দিব না বিদয় তাঁহারে
ধরিব পতির কর,
আমার বিনয় নারিবে ঠেলিতে
রাখিবে আমার কথা,
নারীর বিনয় পতির নিকটে
কখনও নহে অন্যথা।
এত সাধ তার করিবারে রণ
সে সাধ মিটাব আমি

শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী,
কি পৌরুষ তার বাড়িবে না জানি
রমণীর প্রতি বল
চল, রতি, চল, লইয়া আমারে
যাব সে নন্দনীতল।

সরলা বালিকা সে, তাহার সাধ্য কিছুই নাই, মনের ব্যথা প্রকাশ করিয়াই শুধু তাহাকে নীরব হইতে হয়। তখন সে শচী বন্দিনী হইয়া আসিলে প্রাণপণ যত্নে তাহার কষ্ট ঘুচাইয়া দিবে বলিয়া নিজেকে প্রবোধ দিত, এবং রতি যখন তাহার স্বামীকে নিষ্ঠুর বলিয়া নিন্দা করিত, তাহাও প্রাণে বড় বাজিত, যখন রতি বলিয়াছিল—

"পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন ?"

সে তাহার উত্তরে বলিয়াছিল—

"বলোনা ওকথা মন্মথ প্রেয়সী
তুমি সে জাননা তাঁয়।
দেখ না কি কভু শৈল অঙ্গে কত
স্বাদু নীর ধারা ধায়
শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে
বীর তিনি রণপ্রিয়,
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়,
যাব শচী পাশে করিব শুশ্রূষা
যাতে সাধ দিব আনি,
মহিষী কিঙ্করী হইতে দিব না
কহিনু নিশ্চিত বাণী !"

সরলা বালিকা বুঝিত, এই সব করিলেই বুঝি শচীর মনঃকষ্ট দূর হইবে। সরমার মতন ইন্দুবালার, শচীর নিকট গোপনে যাওয়ার, সুবিধা ছিল না। শচীর মতন সীতার অন্তঃপুর হইতে কোন অত্যাচারের ভয় ছিল না, শচীকে বন্দিনী করা, বৃত্র ও রুদ্রপীড় মনে মনে ইহা দোষাবহই মনে করিত। কিন্তু ঐন্দ্রিলার অভিপ্রায় সিদ্ধি করিবার জন্যই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এখানে অন্তঃপুরই ছিল শচীর বিচারের স্থান। ঐন্দ্রিলার চেড়ীর দল সর্ব্বদা তাহাকে লাঞ্ছনা দেওয়ার সুযোগ খুঁজিত। তা ছাড়া কখন না জানি ঐন্দ্রিলার অত্যাচার শচীর উপর আসিয়া পতিত হয় সেই ভয়েই শচী শঙ্কিতা। যেখানে বন্দিনীকে কিরূপ দণ্ড দেওয়া হইবে, তাহার জল্পনা কল্পনা হইত, সেই অন্তঃপুর হইতে কোন সহানুভূতিপূর্ণ লোকের বন্দিনীর নিকট যাওয়া কিরূপ সম্ভব ? টের পাইলে উদ্যত রোষ ভ্রূ অগ্রে তাহারই উপর আসিয়া পড়িবে। সেও তো আবার তাহাদেরই অত্যাচার ভয়ে কম্পিতা। সীতার পক্ষে রাবণের অন্তঃপুরে তেমন ভয়াবহ ছিল না। মন্দোদরী প্রভৃতি, সীতাকে আনিয়াছে বলিয়া এই সর্ব্বনাশ,—ইহার জন্য তাঁহার প্রতি রুষ্ট ছিলেন—কিন্তু তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করিবার কল্পনা তাঁহাদের মনেও আসিত না। অনেক সময় রাবণের অত্যাচার হইতে সীতাকে তাঁহারা রক্ষাই করিয়াছেন। কাজেই সরমার সীতার নিকটে যাওয়ার সুবিধা ছিল। তাহার ভয় ছিল বাহিরে রাক্ষসরাজের, আর ইন্দুবালার ভয় ছিল অন্তঃপুরের।

ইন্দুবালাও সরমার মতন শচীর নিকট স্বর্গের কাহিনী, শচীর আত্মকাহিনী সব শুনিতে চাহিত, শচীও তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। শশুর ভয়ে ভটস্থা, স্বামীর যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য মনঃক্ষুণ্ণা ইন্দুবালার মনোবেদনা ক্ষালনের জন্য শচী কন্যার মতন স্নেহে তাহাকে মধুর বচনে নানা কথায় ভুলাইয়া রাখিত। যেদিন ঐন্দ্রিলা শচীর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পদ উত্তোলন করিয়াছিল এবং ইন্দুবালাকে শচীর নিকট দেখিয়া তাহাকে বন্ধন করিতে গিয়াছিল, সেদিন হইতেই শচী ও ইন্দুবালা সুমেরু শিখরে স্থানান্তরিতা হয়, আর ইন্দুবালা শচীরই আশ্রিতা হয়

রমণী সুলভ স্নেহ ও দয়া বৃত্রসংহারের ইন্দুবালার চরিত্রে অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। বীরপত্নী ইন্দুবালার পক্ষে শত্রুপীড়ন অসহ্য। পতিকে কত নিষেধ করিয়াছে, পরপীড়নে পতির বিতৃষ্ণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু অবলা রমণীর সাধ্য কতটুকু ? ইন্দুবালার অদৃষ্টে কবি কঠোর দুঃখ বিধান করিয়াছেন, কিন্তু শত দুঃখের মধ্যেও ইন্দুবালাকে কোমলতা ও স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি রূপেই আমরা দেখিতে পাই। সরমাও পরদুঃখ কাতরা, ন্যায়ের পক্ষপাতিনী। সীতার দুঃখ দেখিয়া নিজে কাঁদিয়াছে। কিন্তু কবির তুলিকায় যেন ইন্দুবালাই অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি ইন্দুবালাকে বস্তুতঃ "চারুকোমলতারূপে" ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীমতী সুবর্ণলতা দাশগুপ্তা সরস্বতী

ভালবাসা

ভালবাসা ছেলে খেলা নয় প্রেমময়,
ছুটে এসে লুটে পড়া বুকে ;
নয়নে নয়ন রাখি প্রেম-সুধা পান করা
নিমেষে আপন হারা সুখে।

সে যে, চাতকের বুকভেঙ্গে নীল নভঃ হতে
ঝরে পড়া দুটী ফোঁটা জল,
বজ্র হেনে বিরহের তপ্ত অশ্রু মথি'
ভালবাসা কঠোরে কোমল।

শ্রীনরেন গাঙ্গুলী

সত্য রক্ষা

(পুরস্কার রচনা)

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সারাদেহে মনে ক্লান্তি ও অবসাদ লইয়া সনাতন যখন তাহার ক্ষুদ্র আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আঙ্গিনার ঘন পল্লবযুক্ত আম গাছটার গাঢ় সবুজবর্ণকে সন্ধ্যার নীলাভ ধূসর ছায়া আরও গাঢ় করিয়া তুলিতেছিল। এতক্ষণ গ্রীষ্মের বাতাস কেবল উত্তাপ ছড়াইতেছিল। মায়ের স্নেহ কোমল স্পর্শে উত্তেজিত দুরন্ত শিশু যেমন ঠাণ্ডা হইয়া আসে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধস্পর্শে তপ্ত বাতাসটাও তেমনি ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে-ছিল। সনাতন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই সন্ধ্যার বাতাস সনাতনের ঘর্ম্মাক্ত কপালে ও বুকে তাহার শীতল স্পর্শ বুলাইয়া দিল। সে একবার রুদ্ধদ্বার কুটীর পানে চাহিয়াই শান্ত ধূসর আকাশ পানে চোখ দু'টা স্থির করিয়া রাখিল। তবুও তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়া তাহার দৃষ্টি আবিল করিয়া দিল। বুকের অসহনীয় দারুণ চাপা ব্যথাটা বুকের কঠিন পাঁজর ভাঙ্গিয়া নিশ্বাসরূপে উথলিয়া উঠিল। সারা-দিনের দিন-মজুরের খাটুনি নেশার মত খানিকটা তাহাকে মাতাইয়া রাখিত বটে, কিন্তু আসন্ধ্যা নিঃসঙ্গ শুব্ধ রাত্রিটায় তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া তাহার পিতৃহৃদয়ের বিপুল বেদনা ও ক্ষোভ যেন প্রবল প্রতাপে জয়যুক্ত হইয়া উঠিত।

সনাতন কোমরে জড়ানো গামছা খানা খুলিয়া লইয়া চোখের জল ও গায়ের ঘাম মুছিয়া ডোবার জলে হাত পা ধুইল, তারপর দরজা খুলিয়া ঘরের ভিতরে গেল। ঘরের এক পাশে একখানা ছেঁড়া ময়লা বিছানা। একটা মেটে কলসী, গোটা দুই হাঁড়ি, একখানা ভাঙ্গা পিতলের থালা, এমনি কএকটা আসবাব ঘরের একোণে সেকোণে এলো মেলো পড়িয়া থাকিয়া গৃহস্বামীর অমনোযোগ ও দারিদ্র্য সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছিল। জানালা শূন্য ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ঘনাইয়া আনিতেছিল। সনাতন কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালাইয়া টীকা ধরাইয়া তামাক সাজিয়া হুকাটি লইয়া বাহিরে আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরিষ্কার আকাশে সোণার ফুলের মত দু'চারিটা তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। উঠানের একপাশে তুলসীমঞ্চ, মঞ্চের দুই ধারে দু'টি বেলফুলের গাছ। দীর্ঘ ছয়মাসের অযত্নেও সেই গাছে ফুল ফুটিয়াছে। নক্ষত্রের মৃদু আলোকে ফুটন্ত বেলফুলের অম্লান শুভ্রতা দেখা যাইতেছিল। উঠানে যে অনেক দিন ঝাঁট পড়ে নাই, তুলসীমঞ্চ অনেক দিন নিকান হয় নাই, তা দেখিলেই বুঝা যায়। ছয়মাস পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র গৃহিণীর পরিচ্ছন্নপ্রিয়তা এবং ক্ষুদ্র দু'খানি হাতের সেবানৈপুণ্যে এই কুটীরখানি ছবির মত সুন্দর ছিল। আজ সে কুটীরলক্ষ্মী কোথায়—কতদূরে! সনাতনের চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল। সে উঠানে একপাশে দুর্ব্বার উপর বসিয়া হুকা টানিতে লাগিল।

সনাতন বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। বায়স্কোপের উজ্জ্বল ছবির মত অতীতের কত ছবিই তাহার চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল। তরুণ জীবনে সে

নববধূ ও তরুণ আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই উঠানের আলিপনার উপরে আসিয়াই দাঁড়াইয়াছিল। পিতামাতার সুগভীর স্নেহ ও কল্যাণ ইচ্ছা মাথা পাতিয়া লইয়া সে নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে সেই ক্ষুদ্র গৃহের কর্ত্তৃত্বটুকু তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া মা বাবা স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তিনটি মৃত সন্তান প্রসবের পর যে দিন স্ত্রী গৌরীকে তাহার কোলে তুলিয়া দিল, সেদিন সে সেই শিশু কন্যাটিকে দেবতার শ্রেষ্ঠতম প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ মনে করিয়াই কি নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল! ক্রমে ক্রমে গৌরী হামাগুঁড়ি দিতে শিখিল। প্রায় সারাদিন সে তাহার নধর গৌর দেহখানি ধুলি মলিন করিয়া এই উঠানেই হামাগুঁড়ি দিয়া ফিরিত। পিতা যখন সন্ধ্যাকালে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিত, তখন সে তাহার কচি মুখে একরাশ হাসি লইয়া লতার মত নমনীয় ছোট হাত দু'খানি বাড়াইয়া পিতার হাঁটু জড়াইয়া ধরিত। শ্রান্ত পিতা এই অভিনন্দনের অমৃতসিঞ্চনে কাজের সমস্ত ক্লেশ মুহূর্ত্তে বিস্মিত হইয়া কন্যাকে বুকে লইয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহার কচিমুখ ভরিয়া দিত। মাতার মুগ্ধ দৃষ্টি পিতাপুত্রীর মিলন দৃশ্য হইতে আর ফিরিতে চাহিত না। খানিক পরে যেন চেতনা পাইয়া স্ত্রী একটুখানি হাসিয়া সনাতনকে বলিত, "মেয়েকে সোহাগ ক'রেই কি আজ পেট ভরবে? হাত মুখ ধোবে না? খাবে দাবে না?" সনাতন খাইতে বসিলে মেয়ের দুরন্ত ও অবাধ্যতা সম্বন্ধে স্মিতমুখে স্ত্রী কত নালিশই তাহার কাছে করিত। সনাতন শাসনচ্ছলে কখনও মেয়ের গালে মৃদু টোকা মারিত, কখনও পিঠে হাত বুলাইত। এমনি করিয়া সুখাবেশময় স্বপ্নের মত পাঁচটি বছর শেষ হইল। তারপর একদিন বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে সুখের অতৃপ্ত পিপাসা লইয়া স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় মাখিয়া অশ্রুমুখী মেয়েটিকে স্বামীর কোলে রাখিয়া স্ত্রী চির বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। হায়, নির্ম্মম যম! গরিবের সুখটুকু তোমার সহিল না। মা-হারা গৌরীকে বুকে লইয়া সনাতন এই বিয়োগের জ্বালাও খানিকটা জুড়াইয়াছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মেয়েটিকে মায়ের অভাব ভুলাইয়া রাখিবার এবং প্রতিপালন করিবার সম্পূর্ণ ভার সনাতনের উপরেই পড়িল। কাজেই তাহার শোক করিবার বা অন্য কাজ করিবার বেশী অবকাশ রহিল না।

তারপর ধীরে ধীরে দিনে দিনে কেমন করিয়া যে গৌরীর মধ্যে মাতৃত্বের প্রচুর মমতা ও সেবাপরায়ণতা বিকশিত হইয়া উঠিল, সনাতন তাহা বুঝিতেই পারিল না। কিন্তু সমগ্র অন্তর দিয়া এটা সে বেশ অনুভব করিতে পারিল যে, তাহার বৃদ্ধা লোকান্তরিতা মায়ের আত্মা বারো বছরের বালিকা গৌরীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন আর সে পিতার হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া অভ্যর্থনা করিত না বটে, কিন্তু পিতার জন্য রান্না করিয়া পিতার ফিরিবার আধ ঘণ্টা আগেই জল, গামছা, হুঁকা, কলিকা, তামাক, টীকা প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিয়া, সেই শুষ্ক নির্জ্জন কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া থাকিত। সম বয়স্ক মেয়েদের পুলক চঞ্চল লোভনীয় সঙ্গ অথবা খেলাধূলা এই প্রিয় কর্ম্ম হইতে তাহার চিত্ত এক দিনও একটু খানিও বিমুখ করিতে পারিত না। তাহার সতর্ক দৃষ্টি কেবল সনাতনের সুখসুবিধা সন্ধান করিয়াই ফিরিত। তাহার ধ্যান-রাজ্যটুকু সনাতনের কল্যাণ চিন্তনেই ব্যাপৃত থাকিত। গরমের সময়ে সনাতন খাওয়া দাওয়ার পর গৌরীকে লইয়া এই উঠানে আসিয়া বসিত। গ্রামের শিরোরত্ন মহাশয় প্রত্যহ বৈকালে তাঁহার চণ্ডী মণ্ডপে বসিয়া রামায়ণ মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণাদি পাঠ করিতেন। পাড়ার অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা শ্রোতাশ্রোত্রী সেখানে উপস্থিত থাকিত। অবকাশ পাইলে সনাতনও সেখানে মাঝে মাঝে যাইত। শিরোরত্ন মহাশয়ের মিষ্টস্বরের সরল ব্যাখ্যা সনাতনকে বড় খুসী করিত। সে উঠানে বসিয়া বসিয়া গৌরীকে সেই সব পুরাণের কাহিনী শুনাইত। কেমন করিয়া সত্য রক্ষা করিতে হয়, কেমন করিয়া অতিথি সেবা করিতে হয়, কেমন করিয়া গুরুজনকে ভক্তি করিতে হয়, কেমন করিয়া ভগবানের পূজা করিতে হয়, তাহা শিরোরত্ন মহাশয়ের মুখে যেমন শুনিত, গৌরীর কাছেও তেমনি করিয়া বলিত। গৌরী নিঃশব্দে শুনিতে শুনিতে সনাতনের বুকে, পিঠে, পায় হাত বুলাইতে থাকিত। গৌরীর পরিপূর্ণ হৃদয়ের মৌন স্নেহ সনাতনের অন্তরে বাহিরে এমন করিয়াই প্রত্যহ তৃপ্তি ও আনন্দ বর্ষণ করিত।

গ্রামের জমিদারের ছেলের জন্মতিথিতে জমিদারগৃহিণী পাড়ার ছেলে মেয়েদের নূতন কাপড় ও মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেন। প্রত্যেক বছর গৌরীও জমিদার বাড়ী নিমন্ত্রণ পাইত। নিম্নশ্রেণী প্রজা সনাতনের মেয়ে কেন যে জমিদার-

পত্নীর সুনজরে পড়িয়াছিল, বলা যায় না। গৌরী নিমন্ত্রণ পাইলেও জমিদার বাড়ী যাইতে চাহিত না। এবার সনাতনের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে অনিচ্ছাসত্বেও সে জমিদার বাড়ীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। সনাতন বৈকালে উঠানে বসিয়া বাঁশ চাঁচিতেছিল, মৃদু পায়ের শব্দ শুনিয়া সে পিছনে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, গৌরী জমিদার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জমিদারগৃহিণীর দেওয়া মেঘলা রঙের সাড়ীখানি তাহার শুভ্র দেহবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সাড়ীর উজ্জল চওড়া লাল পাড়টি তাহার ঘাড়ের উপর দিয়া বুকে আসিয়া লতাইয়া পড়িয়াছে। সেই পাড়ের ধারে এক গোছা চুলও শিথিলভাবে পড়িয়া আছে। চাহিয়া চাহিয়া সনাতনের দৃষ্টি প্রশংসায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সাজিলে গুজিলে গরিবের মেয়েকেও এমনি সুন্দর দেখায়! সনাতন বলিল, "তোর চুল এমন সুন্দর ক'রে কে আঁচড়ে দিলে মা?"

লজ্জিত আরক্ত মুখ নত করিয়া গৌরী কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "জমিদার গিন্নী দিয়েছেন। আমার চুল গুলো রুখো দেখে কি গন্ধ তেলও মাখিয়ে দিয়েছেন। আমার ভারি লজ্জা করছে বাবা।"

সনাতন হাসিয়া বলিল, "লজ্জা কি? কাপড় খানায় তোকে বেশ মানিয়েছে গৌরী।"

গৌরী সেকথায় কাণ না দিয়া দ্রুতপদে ঘরে যাইয়া তাহার আধ ময়লা মোটা কাপড় খা পড়িয়া প্রসন্ন মুখে বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দর কাপড় খানা ছাড়িয়া রাখায় সনাতন একটু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। সে তাহার এই ক্ষুদে মায়ের স্নেহের শাসনের মধ্যেই আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল, তাহার উপর শাসন চালাইতে অভ্যস্ত ছিল না। ধনীর প্রসাদ যে এই বালিকার দারিদ্র্যগর্ব্বকে আহত করিয়াছিল, তাহা সে তলাইয়া বুঝিতে পারিল না। তাই গৌরী যখন তাহার কাছে বসিয়া এই কাপড় খানা লইয়া কি করিবে, সে সম্বন্ধে নিজে প্রশ্ন করিয়া নিজেই মীমাংসা করিতেছিল, তখন সে এক রকম চুপ করিয়াই রহিল।

বর্ষাকালে মজুরী বড় একটা জুটে না। গত বর্ষার শেষভাগে সনাতন প্রায় দিন কুড়ি কাজ অভাবে ঘরে বসিয়া ছিল। কিছুদিন বা প্রতিবাদীদের নিকট হইতে, কিছুদিন বা দোকান হইতে ধারে জিনিস আনিয়া সনাতনের দিন চলিতেছিল। কিন্তু আর চলে না। কাল হইতে আজ দুপুর পর্য্যন্ত গৌরীর মুখেও এতটুকু খাবার উঠে নাই। ভগবান্ যদি খাবারই না দেন, তবে সন্তান দেন কেন? বিশ্বের পিতা ত পিতার মর্ম্মবেদনা ভালরূপই বুঝেন। সকাল হইতে দুপুর বেলা পর্য্যন্ত ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণরত বিষণ্ণ প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া সনাতন চুপ করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতেছিল। তাহার কলিকার আগুণ কখন যে নিবিয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, তাহা সে টেরও পায় নাই। বাপকে ঘণ্টা দুই বসিয়া ভাবিতে দেখিয়া গৌরী আসিয়া বলিল, "বাবা, ধ্রুবের গল্পটা আবার বলনা, আমার তা ভাল মনে নেই।"

সনাতন গৌরীর কথার জবাব দিতে যাইয়া দেখিল, সেই বর্ষার জলে ভিজিতে ভিজিতে গ্রামের ডাক্তার বিপিনবাবু আসিতেছেন। বিপিনবাবু দাওয়ায় পা দিতেই বাপ ও মেয়ে মহাবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপিনবাবু উঠিয়া বলিলেন; "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বোস, বোস।" মুখে কিছু না বলিলেও এহেন সময়ে ডাক্তারবাবুর আগমনের কারণ জানিবার জন্য গৌরী ও সনাতন মনে মনে একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গৌরী উঠিয়া তাড়াতাড়ি বিপিন বাবুর পা ধুইতে এক ঘটী জল ও বসিতে এক খানা পিঁড়ি আনিয়া দিল। ডাক্তার বাবু পিতা পুত্রীর মানসিক ভাবটা বুঝিতে পারিয়া পা ধুইয়া স্থির হইয়া বসিয়া কিছু মাত্র ভূমিকা না করিয়াই বলিলেন, "এ সময়ে আমাকে দেখে তুমি খুব আশ্চর্য্য হয়েছ সনাতন? আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি। তুমি বোধ হয় শুনেছ, রায়দের সঙ্গে আমার একটা মোকদ্দমা বেধেছে। বেটারা এমন পাজি যে, সাক্ষ্য দেবার জন্য গাঁয়ের প্রায় সব লোক ঘুষ দিয়ে নিজেদের পক্ষে নিয়েছে। তোমার কাছে এসেছি এই জন্যে যে, তোমাকে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে। মোকদ্দমার তারিখ—"

সনাতন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "সেকি! আমি ত তার কিছুই জানিনে। কি সাক্ষী দেব?"

"তোমার নিজের কিছু বল্‌তে হবে না। আমি যা শিখিয়ে দেব, তাই বল্লেই হবে।"

"মিছে কথা বল্‌তে পারব না ডাক্তার বাবু। আপনি বেরাম্মন—দেবতা, মিছে কথা বল্‌তে বল্‌বেন না।"

"আরে বোকা, এরকম মিছে কথা বল্‌তে কোন দোষ নেই। এ না বল্লে কি সংসার চলে? আর আমি কি তোমায় শুধু মুখে মিছে কথা বল্‌তে বল্‌ছি?"

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু পকেট হইতে দশটা টাকা বাহির করিয়া সনাতনের কাছে রাখিলেন। সনাতন টাকা কয়টা ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া নম্র কণ্ঠেই বলিল, "টাকা আপনি রেখে দিন। মিছে কথা আমি কিছুতেই বল্‌তে পারব না।"

সনাতন তামাক সাজিতে ঘরে আসিলে গৌরী তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ডাক্তার বাবুর সাক্ষী হবে? সনাতন মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "ভয় নেই মা, আমি মিথ্যা কথা বলব না।"

সনাতন তামাক সাজিয়া হুকার জল ফিরাইয়া ডাক্তার বাবুর হাতে দিলে তিনি বলিলেন, "মুখের মত নিজের ক্ষতি করো না, ভেবে দেখ। মোকদ্দমা শেষ হলে আরো দশ টাকা পাবে।"

এক কুড়ি টাকা! সে যে সনাতনের প্রায় তিন মাসের আয়! ঘরে খাবার কিছুই নাই, আর ধার পাইবারও উপায় নাই। সনাতন কিছুক্ষণ ভাবিল, তারপর প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কঠিন হইয়া বলিল, "আমা দ্বারা এ কাজ হবে না ডাক্তার বাবু।"

সনাতনের স্বরে তাহার দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় পাইয়া সেই বর্ষার প্রচুর সিক্ত বায়ুর মধ্যেও ডাক্তার বাবুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তড়াক্ করিয়া উঠিয়া "স্পর্দ্ধিত ছোট লোক," "ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির," সুমধুর সম্ভাষণে সনাতনকে আপ্যায়িত করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

ইহারই মাস তিনেক পরে একদিন গৌরীর প্রবল বেগে জ্বর আসিল। তৃতীয় দিনের গভীর রাত্রে গৌরী রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ভুল বকিতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে, বিশেষতঃ সনাতনের মত সঞ্চয় হীন মজুরের ঘরে টাকা বা চিকিৎসক কিছুই সুলভ নহে। সনাতন মনে করিয়াছিল, দু' একটা উপবাস দিলেই গৌরীর জ্বর সারিয়া যাইবে, এমন ত কতবার গিয়াছে। কিন্তু আজিকার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত স্নেহ-কাতর পিতৃ হৃদয় আর স্থির থাকিতে পারিল না। সনাতন তুলসী তলা হইতে কিছু ধূলি আনিয়া গৌরীর কপালে মাখিয়া দরজা ভেজাইয়া নিঝুম রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই ডাক্তারের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। গ্রামের একমাত্র কবিরাজ সেদিন গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন, সনাতন তাহা জানিত। সুতরাং একমাত্র ডাক্তার বিপিন বাবুর কাছেই তাহাকে যাইতে হইল। সে যখন ডাকাডাকি করিয়া ডাক্তার বাবুকে ঘুম হইতে জাগাইয়া তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রু বিকৃত কণ্ঠে গৌরীকে একবার দেখিয়া একটু ঔষধ দিবার প্রার্থনা জানাইল, তখন ডাক্তার বাবু একান্ত কঠিন স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এত রাত্রে আমি যেতে পারব না, আমার অসুখ করবে। তুই এসেছিস বুঝলে আমি কিছুতেই দরজা খুলতাম না।"

সনাতনকৃত সেই সাক্ষ্যদানে অসম্মতির অপমানের ঝাঁজটা তখনও ডাক্তার বাবু ভুলিতে পারেন নাই। সনাতন অবিশ্রান্ত চোখের জলের সঙ্গে সেই একই প্রার্থনা জানাইয়া বলিতে লাগিল, "দয়া করুন! ডাক্তার বাবু, আমি চিরকাল আপনার চরণের দাস হ'য়ে থাকব।"

ডাক্তার বাবু বিরক্ত হইয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া এই ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিলেন। সনাতন বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিহ্বলের মত বাড়ী ছুটিয়া আসিল। তখন গৌরী অনেকটা স্থির হইয়া আসিয়াছিল। আসন্ন-মৃত্যু-বিবর্ণা কন্যার মাথাটি কোলের উপর রাখিয়া সনাতন তাহার নিত্য পূজ্য দেবতাকেই মনে মনে ডাকিতে লাগিল। উষার শীতল বায়ুর সঙ্গে গৌরীর প্রাণ বায়ু মিশিয়া গেলে সে শান্তভাবেই মৃত দেহের সৎকার করিতে উঠিল। * * *

কে বলে গৌরী বাঁচিয়া নাই? সনাতনের দৃষ্টি যে তুলসী মঞ্চের পানে স্থির হইয়া প্রণতা গৌরীকেই দেখিতেছিল। ঐ যে গৌরীর লুণ্ঠিত আঁচলখানা বাতাসে নড়িতেছে। সনাতন সংজ্ঞা হারার মত উঠিয়া গৌরীকে ধরিতে যাইয়া পড়িয়া গেল। পতনের আঘাতটা তাহাকে বুঝাইয়া দিল, গৌরী আর এ সংসারে নাই! সে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সহসা বহুলোকের মিলিত উচ্চকণ্ঠে "আগুন" "আগুন" রব উঠিল। সনাতন চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, উত্তর দিকের আকাশ আগুনের আলোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সে গোলমাল ও আলো লক্ষ্য করিয়া তীর বেগে ছুটিল।

গৃহস্বামী ঘরের মূল্যবান দ্রব্যাদি বাহির করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র শিশু পুত্র যে একখানা ঘরের চাল ও বেড়াও যে আগুনে গ্রাস করিতেছিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। দু' একজন, যাহারা সত্যই আগুন নিবাইতে চেষ্টিত ছিল, তাহারাও সে কথা জানিতে পারে নাই। ছেলের মা'র আর্ত্ত চীৎকার কর্ম্মী ও অকর্ম্মণ্য লোকের চীৎকারে ডুবিয়া যাইতেছিল। ছেলের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কএকজন স্ত্রীলোক ছেলের মাকে এমন শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল যে, তাঁহার ঘরের মধ্যে যাইয়া ছেলে আনা দূরের কথা, তিনি নড়িতেও পারিতেছিলেন না। নড়িতে পারিলেও সেই জলন্ত ঘর হইতে ছেলে বাহির করা তাঁহার শক্তিতে কুলাইত না। তবু ছেলের সঙ্গে পুড়িয়া মরিবার জন্য মা আকুল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। সনাতন আসিয়া সেইখানেই প্রথম দাঁড়াইল। সে মুহূর্ত্তে ব্যাপারটা বুঝিয়া ছুটিয়া জলন্ত ঘরের মধ্যে গেল। যখন সে অদগ্ধ দেহ শিশুটিকে বুকে চাপিয়া নিজের দগ্ধ দেহ লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন শিশুর পিতা বিপিন বাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শিশুটিকে তাহার মায়ের কোলে দিয়া সনাতন বলিল, "খোকা কি ও ঘরে ঘুমিয়েছিল? বড় জোর কপাল আপনার মা। আমি যেয়ে দেখলাম, খোকা ভয়ে অজ্ঞানের মত খাটের ওপর ব'সে আছে। ভাগ্যিস, বিছানাটায় আগুন লেগেছিল না, নইলে——"

ভীত স্বরে বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সনাতন, তুমি কি ক'রে এই আগুনের মধ্যে ঢুকলে?

সনাতন বলিল, "মাঠাকুরুণকে যখন ছেলের জন্যে কাঁদিতে দেখলাম, ডাক্তারবাবু, তখন আমার গৌরীর মুখখানাই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আগুনের কথা মনেও হয়নি।"

ডাক্তার বাবু আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, আমারি নিষ্ঠুরতায় তোমার একমাত্র মেয়েটি বিনা চিকিৎসায় মারা গেল!"

জ্বলন্ত গৃহের আকাশচুম্বী অনল শিখার মতই একটা কথা সনাতনের বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতে উদ্যত হইল, প্রাণপণ বলে সে তাহা চাপিয়া রাখিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "সে জন্যে দুঃখ করবেন না বাবু, দেবতার মনে আর আমার অদেষ্টে না ছিল, তাই হয়েছে। দেবতার বিধান অমান্য করিনি,—সত্য রক্ষা করতে পেরেছি, এই সান্ত্বনা নিয়েই জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দেব। বলিয়াই সনাতন দ্রুতপদে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা

অশ্রু

স্বধু চাই একবিন্দু অশ্রুজল; আর
কিছু নহে; এ ধরার আর যাহা আছে,
সকলিতো মাটী আর ছাই, এবে তার
সকলিতো কলুষিত পঙ্কিলতা মাঝে।
স্বধু এই অশ্রু, চির পবিত্রতা, চির
অকলঙ্ক মাখা। ভাবুকের, প্রেমিকের,
ভক্তের লোচনে, চির মন্দাকিনী নীর!

লভিয়া জনম যথা শীর্ষে পর্ব্বতের
নির্ঝরিণী, প্রক্ষালিয়া শুষ্ক শিলামূল,
ধৌত করি মৃত্তিকা কর্দ্দম যায় নিয়ে,—
এই অশ্রু, পুণ্যস্পর্শে ধরায় অতুল,
পবিত্রতা ঢেলে দেয় পাপ-বিনিময়ে।
(তাই) মৃত্যুর মহান্ পথে পূত সুনির্ম্মল।
(স্বধু) একবিন্দু প্রেম-অশ্রু,—পথের সম্বল!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক

পূজার তত্ত্ব

(গল্প নহে—সমালোচনা)

যে সময়ে হিন্দুগৃহস্থ কন্যার বাড়ী পূজার তত্ত্ব পাঠাইতে ব্যস্ত ও অধিকাংশস্থলে বিব্রত, ঠিক সেই সময়ে আমার সমপাঠী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাদ্বয়ের—অতএব আমার কন্যাস্থানীয়াদিগের তৈয়ারি দশখানি গল্পের বই* উপহার বা তত্ত্ব পাইয়াছি। এ যে প্রচলিত নিয়মের একেবারেই উল্টা। আশীর্ব্বাদ করি, রামানন্দ বাবুর কন্যাদ্বয়—শ্রীমতী শান্তা দেবী ও শ্রীমতী সীতা দেবী—দীর্ঘজীবিনী ও চিরসুখিনী হইয়া এইরূপ আনন্দদান করুন।

পূর্ব্বে পত্রান্তরে শ্রীমতী ইন্দিরা (সুরূপা) দেবী ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী দুই ভগিনীর আখ্যায়িকাবলির সমালোচনা করিয়াছি। তবে সে স্থলে দুই ভগিনীর গ্রন্থ একসঙ্গে পাই নাই। এবার এক সঙ্গেই দুই ভগিনীর গ্রন্থরাজি সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যে Bronte নাম্নী তিন ভগিনী আখ্যায়িকা-রচয়িত্রী ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য-প্রভাবিত বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও তেমন উন্নতির অবস্থা আসে নাই, তাই যদিও আমাদের সাহিত্যে দুইটি স্থলে দুইভগিনীর আবির্ভাব হইয়াছে, তথাপি তিনভগিনীর আবির্ভাবে আমাদের সাহিত্য আজও ধন্য হয় নাই। (ইংরেজী-কবিতা লেখিকা অরু দত্ত ও তরু দত্ত দুই ভগিনীও এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।) 'প্রবাসী'তে ক্রমশঃ প্রকাশিত একটি গল্পের নিম্নে 'সংযুক্তা দেবী' নাম দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, ইনিই বুঝি শান্তা দেবী ও সীতা দেবীর তৃতীয়া ভগিনী, কিন্তু এখন বুঝিতেছি দুই ভগিনীতে যখন একযোগে আখ্যায়িকা রচনা করেন, তখনই ইহারা 'সংযুক্তা'। ইংরেজী সাহিত্যে দেখিয়াছি ভাই-ভগিনীতে বা স্বামিস্ত্রীতে মিলিয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু যতদূর মনে পড়ে দুইভগিনীতে মিলিয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরেজী সাহিত্যে নাই। অতএব ভগিনীদ্বয়ের এই সাহিত্য-সাহচর্য্য সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার বলিতে হইবে।

যে সব পুস্তক দুই ভগিনীতে মিলিয়া লিখিয়াছেন, সেগুলির কে কোন্ অংশ লিখিয়াছেন, অনুমান ও বিচার-শক্তির সাহায্যে ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহি না। পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া উভয়ের কৃতিত্বের পরিমাপ করিবারও প্রয়োজন দেখি না। উভয় ভগিনীই বিদুষী (গ্রাজুয়েট), উভয়েরই রচনা সুখপাঠ্য, উভয়েরই কল্পনা, বর্ণনা, চরিত্রসৃষ্টি, গল্পের গঠন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়। বর্ণনায় বাহুল্য নাই, পাত্রপাত্রীদিগের কথাবার্ত্তায় বাজে বকুনি নাই, ঘটনা-পরম্পরায় বেখাপ্পা ব্যাপার নাই, সবই সংযত, সমঞ্জস, সুন্দর। ইহা কলাকুশলতার পরিচায়ক।

সব বইগুলিরই ছাপা কাগজ বাঁধাই উত্তম। শিশুপাঠ্য বই তিনখানিতে ও 'হিন্দুস্থানী উপকথা'য় কয়েকখানি করিয়া ছবি আছে। ছবিগুলি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ৺উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর অঙ্কিত ও তাঁহার ছাপাখানায় মুদ্রিত, ইহা বলিলেই আর নূতন করিয়া প্রশংসার প্রয়োজন নাই। প্রথমে শিশুপাঠ্য বই তিনখানির কথা বলিয়া পরে অন্যগুলির কথা বলিব, কেন না শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপনীত হইতে হয়।

হুকাহুয়া, আজব দেশ, নিরেট গুরুর কাহিনী

প্রথমখানিতে 'নিগ্রোদের মধ্যে প্রচলিত শেয়াল খরগোষ প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প ইংরেজী হইতে সঙ্কলিত।' দ্বিতীয়খানি 'ঠিক অনুবাদ নহে, আমেরিকার একটি গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত।' তৃতীয়খানি একজন সাহেবের তামিল ভাষায় লিখিত একটি গল্পের আর একজন সাহেবের কৃত ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ। অনুবাদের অনুবাদ, সুতরাং সাত নকলে আসল খাস্তা হইবার কথা। কিন্তু তাহা হয় নাই, অনুবাদ কোথাও আড়ষ্ট, কৃত্রিম বা টেনে বোনা নহে, বরং এমন স্বাভাবিক ও প্রাঞ্জল যে লেখিকা জানাইয়া না দিলে অনুবাদ বলিয়া ধরা পড়িবার

*শ্রীমতী শান্তা দেবী প্রণীত—ঊষসী, সিঁথির সিঁদুর, স্মৃতির সৌরভ, হুকা হুয়া। শ্রীমতী সীতা দেবী প্রণীত—বজ্রমণি, ছায়াবীথি, আজব দেশ, নিরেট গুরুর কাহিনী। উভয়-ভগিনী প্রণীত—উদ্যানলতা, হিন্দুস্থানী উপকথা।

আশঙ্কা ছিল না। এই বইখানিতে বোকামির কতকগুলি হাস্যকর গল্প আছে, দুই একটি বাঙ্গালা দেশেও চলিত আছে। কাহিনীটিতে হয়ত হিন্দুসমাজের এক শ্রেণীর মন্ত্রগুরুর মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া একটু বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু মিশনরি-ধরণে হিন্দুসমাজের এই গলদের উপর অজস্র গালিবর্ষণ নাই। যেটুকু বিদ্রূপ আছে তাহা হিন্দুরও উপভোগ্য। যাহা হউক, ইহা যদি ত্রুটি বলিয়াও বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ইহার জন্য দায়ী মূল গল্পের লেখক ও ১নং অনুবাদক—দুইজন সাহেব (প্রথম ব্যক্তি পাদরি); বর্ত্তমান লেখিকা ইহার জন্য দায়ী নহেন।

হুক্কা হুয়া'য় কোথাও বা "শেয়াল ধূর্ত্তের কাহিনী, কোথাও বা শেয়ালের উপর দমবাজীর কাহিনী। আমাদের প্রাচীন পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের ও বহু প্রচলিত গল্পের ধরণের—বিদেশী বলিয়া ঠাহর হয় না। 'আজব দেশে' খড়ের মানুষ কাগতাড়ুয়া, টিনের মানুষ টিং টিং সিং, কাঁদুনে সিং, পিঁপড়েদের রাণী, অদ্ভুত জানোয়ার ভুঁড়বো, উড়ুক্কু বানর, সবুজ মানুষ, যাদুকর, ডাইনী বুড়ী প্রভৃতির আজগুবী গল্প। এই বই দুইখানিরও ভাষা সরল স্বাভাবিক; অনুবাদ, অনুকরণ বা অনুসরণ বলিয়া বোধ হয় না। তিনখানি বইই শিশুদিগের হাস্য-কৌতুকের, কল্পনা-কৌতূহলের যথেষ্ট খোরাক যোগাইবে ও তাহাদিগের মন হরণ করিবে। কোথাও নীতি-উপদেশের উপসর্গ নাই, গুরু-গম্ভীর চাল নাই, ঠিক যেন ছোট ছোট ভাই বোনকে লইয়া বড় দিদি গল্প বলিয়া ঘুম পাড়াইতেছেন। শিশুরা বই তিনখানি হাতে পাইয়া কি আনন্দ লাভ করিবে তাহা কল্পনা করিতে গেলে 'পঞ্চাশোর্দ্ধ' সমালোচকেরও আবার শিশু কাল আসিয়া পড়ে। (পাঠক হয়ত বলিবেন, second childhood!) বড় দুঃখ হয়, শিশুশিক্ষা, নীতি-বোধ প্রভৃতির পাষাণ-চাপে পিষ্ট হইয়া আমাদের বাল্যসুলভ কল্পনাবৃত্তি অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে, এমন কল্পনালীলাময় আনন্দপ্রদ গল্প পাঠে আমাদের বাল্য-কল্পনাবৃত্তির সমুচিত তুষ্টি ও পুষ্টি হয় নাই।

হিন্দুস্থানী উপকথা

এখানিও অনুবাদ। রায় বাহাদুর ৺শ্রীশচন্দ্র বসু বি এ বিদ্যার্ণব 'সেখ চিলি' ছদ্মনাম ধারণ করিয়া যে Folktales of Hindustan নামক মনোহর গল্প পুস্তক রচনা করেন, ইহা তাহারই অনুবাদ। গল্পগুলি সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বিখ্যাত ষ্টেড্ সাহেব এগুলিকে 'আরব্যোপন্যাসের মত মনোহর' বলিয়াছিলেন। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য অব্যাহত আছে, ইহা বলিলেই আমাদের সমালোচনা শেষ হইবে।

পূর্ব্ববর্ণিত তিনখানি বই শিশুজনের মনোহারী। পরে যেগুলির কথা বলিব, সেগুলি যুবজন-মনোহর। 'হিন্দুস্থানী উপকথা' সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ইহা বালবৃদ্ধযুবা সকলেরই চিত্তাকর্ষক। (গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠক হয়ত বলিবেন, নিদ্রাকর্ষক)

এইবার যুবজন-মনোহর গল্প-পুস্তকগুলির কথা তুলিব। এক 'বজ্রমণি' ছাড়া সব কয়খানির নামই কবিত্বময়, রোম্যান্স-জড়িত, মধুর মোলায়েম। অধিকাংশ গল্পে (বিশেষতঃ যেগুলি রোম্যান্টিক শ্রেণীর সেগুলিতে পাত্র-পাত্রীদিগের নামও কবিত্ব মাখা—যথা উষা, চিত্রা, সুনন্দা, সুরমা, বিদ্যুৎবরণী, দীপিকা, মঞ্জরী, মঞ্জুলিকা, সাগরিকা, ইন্দ্রলেখা, মণি, সুপ্রিয় ইত্যাদি। বজ্রমণির অধিকাংশ গল্পই নিদারুণ ট্র্যাজেডি, এই জন্যই বোধ হয় ইহার বজ্র কঠোর নাম। এখানি ও 'ছায়াবীথি' 'উষসী' 'সিঁথির সিঁদুর' ছোট-গল্পের সমষ্টি। 'উদ্যানলতা' উভয়ভগিনীর বড় গল্প অর্থাৎ আখ্যায়িকা রচনার একমাত্র প্রয়াস। গল্পগুলি প্রায় সবই পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে পাঠ করিয়াছি। তথাপি দ্বিতীয়বার পাঠ করিতে বিশেষ ক্লান্তিবোধ করি নাই। 'স্মৃতির সৌরভ' জর্জ্জ এলিয়টের একটি গল্পের অনুবাদ। একে জর্জ্জএলিয়ট্, তাহাতে আবার অনুবাদ, গ্রন্থকর্ত্রী মাফ করিবেন, এখানি পাঠ ও পাঠান্তে সমালোচনা করিতে সাহস করি না। বাকীগুলির একে একে সমালোচনা করিতেছি। ছোট গল্পগুলির মধ্যেও কয়েকটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ আছে। সেগুলিকে দেশী ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা হয় নাই, বিদেশী ধরণই বজায় রাখা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা মন্দ নহে। তবে বিদেশী নামগুলি হয়ত তদ্দেশবাসীর কাণে শ্রুতি মধুর, কিন্তু আমাদের কাণে শ্রুতি কঠোরই ঠেকে। বিদেশী মুদ্রা 'ফ্র্যাঙ্ক' 'সু' ও যেন কাণে বেসুরা বাজে। (অথচ 'পয়সা'র উল্লেখও আছে।) 'রাজা শুক্রবার,' 'আমার আঁচল' প্রভৃতি দুই একটি অনুবাদ আপত্তিজনক।

স্থানান্তরে লিখিয়াছি, "জীবনসংগ্রামের কঠিন পীড়নে

সুকুমার কাব্যপ্রিয়তা, নিরবচ্ছিন্ন ভাবপ্রাণতা, কমল-বিলাসীর ভাবের নেশা, আর বাঙ্গালীর ধাতে সহিতেছে না। সুতরাং আমাদের রুচি বদলাইয়াছে। * ইহার দরুণ আজ কাল বাঙ্গালী লেখকেরা কল্পনার আসমানী লোক ছাড়িয়া বাস্তব জীবনের সুখ দুঃখ বর্ণনা করিতে ব্রতী হইয়াছেন। Idealism এর protest স্বরূপ Realism এর উদ্ভব হইয়াছে।' কিন্তু মানবহৃদয়ে রোম্যান্সের বীজ অমর অক্ষয়, ইহার প্রভাব অপরাজেয় অপরিম্লান, ইহা জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত মানবের নীরস হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দের ধারা ঢালিয়া দেয়। তাই ইংরেজী-সাহিত্যে দেখিতে পাই ডিকেন্স থ্যাকারের বাস্তববর্ণনার বাড়াবাড়ির পর আবার ষ্টিভেন্সন্ রোম্যান্সের অবতারণা করিয়া আখ্যায়িকা জগতে নূতন আনন্দের উৎস ছুটাইয়াছেন। সমালোচ্য পুস্তক-গুলির অধিকাংশ গল্পই (Realism) বাস্তবতার ভিত্তির উপর গঠিত হইলেও কয়েকটি রোমান্টিক শ্রেণীর গল্পও আছে। আর এই গুলিতেই লেখিকাদ্বয়ের হাত খুলিয়াছে ভাল। খুলিবার কথাও বটে। কেননা তাঁহারা তরুণ-বয়স্কা, চিত্তে কল্পনালীলা ভাবপ্রবণতা এখন বেগবতী, জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা এখনও তাঁহাদিগের হয় নাই। বাস্তব জীবনের গল্প গুলিতেও তাঁহারা রোম্যান্টিক রীতির অনুসরণে সাদাসিধে সাধারণ জীবনের ভিতরেও সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও করুণরসের সঞ্চার করিয়াছেন। বেশীর ভাগ গল্পই করুণ রসাত্মক। ইহাতে শেলীর সেই অমর বাক্যই প্রতিফলিত; Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

সিঁথির সিঁদুর

এই পুস্তকে এই নামের প্রথম গল্পটি ডায়েরির আকারে লিখিত স্বামিবিড়ম্বিতা নারীর করুণ কাহিনী। তবে গল্পের শেষদিকে যে লজ্জাকর ব্যাপারটি আছে তাহা রুচির দিক্ হইতে বিচার করিলে একটু নিন্দনীয়, মহিলা লিখিত পুস্তকে না থাকিলেই যেন ভাল হইত (যদিও লেখিকা যথা-স্থানে যথেষ্ট reticence—সঙ্কোচের পরিচয় দিয়াছেন।) 'মাতামাতি' গল্পের আখ্যানবস্তু ইংরেজী হইতে গৃহীত হইলেও ঠিক যেন আমাদের ঘরোয়া কথার মতই হইয়াছে, ইহার অন্তর্নিহিত করুণ রস ও গভীর প্রেমের খেলা সুন্দর। সাধারণ মানবজীবনে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও কাব্যরসের ইহা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। 'আঁধারের যাত্রী' গল্পের করুণরস মর্ম্মস্পর্শী। শেষ গল্প 'পরাজয়' মর্ম্মস্পর্শী করুণরসে অভিষিক্ত, এইটিই বোধ হয় পুস্তকের শ্রেষ্ঠ গল্প। 'তামাকের পাইপ' গল্প একটি বালকের বাল্যলীলা, হাস্যরসে আরম্ভ, বুড়া ঠাকুর দাদার নিবিড় স্নেহের কোমল স্পর্শে ইহার পরিণতি। 'রাণীর বজরা'ও পূর্ব্বেরটির ন্যায় বিদেশী গল্প, করুণ রসাত্মক। 'শিক্ষার পরীক্ষা' ও 'ময়ূরপুচ্ছ' গল্প দুইটি হাস্যরসাত্মক, তবে ভিতরে ভিতরে করুণ রসের অন্তঃ-সলিল প্রবাহ আছে, কেন না প্রথমটিতে অনূঢ়া বালিকার প্রতি মাতা ও অন্যান্য নারীর ব্যবহার দেখিলে হৃদয় ব্যথিত হয় ও দ্বিতীয়টিতে সেকাল ও একালের দ্বন্দ্বে বালিকাবধূর বিড়ম্বনা পাঠকের কাছে হাস্যরসের বস্তু হইলেও তাহার কাছে মর্ম্মান্তিক। উভয় গল্পেই পল্লীনারীদিগের বাস্তব বর্ণনা উপভোগ্য, বিশেষতঃ 'শিক্ষার পরীক্ষা' গল্পে রেল পথের যাত্রিণী প্রৌঢ়া তারাদিদির চিত্রটি এত graphic যে সন্দেহ হয়, লেখিকা ইঁহার সহযাত্রিণী ছিলেন ও চুপি চুপি ইঁহার ভঙ্গী নোট করিয়া লইয়াছিলেন। গত স্কুলের মেয়ে 'শোভা'ই স্বয়ং লেখিকা নহেন ত?

ছায়াবীথি

'ছায়াবীথি'তে 'মাকাল ফল' ফরাসী গল্পের অনুবাদ, হাস্যরসাত্মক। 'সুন্দরীর চরণকমলে'ও ফরাসী গল্পের অনুবাদ, ইহার কল্পনালীলা মনোহর। 'ভ্রষ্টতারা' 'রামলীলা' 'অর্টিন্ পাখী' 'স্পর্শমণি' 'পুষ্পদূত'—বাকী পাঁচটি গল্পই করুণরসাত্মক। 'ভ্রষ্টতারা'ই বোধ হয় পুস্তকের শ্রেষ্ঠ গল্প, ইহাতে বরপণের অত্যাচারের দুইটি ঘটনা আছে, যেটি প্রধান সেটিতে নায়িকার জীবন ইহার ফলে ব্যর্থ ও পরিণাম বিষময় হইল। 'রামলীলা'য় কর্কশ বাস্তবতার বেষ্টনীর মধ্যে শিশু হৃদয়ের অভিমান ও মাতৃহৃদয়ের মর্ম্মান্তিক ব্যথার চিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে। 'স্পর্শমণি' সাধারণ জীবনের ভিতর রোম্যান্সের সুন্দর দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে, 'পুষ্পদূত' খাঁটি রোম্যান্সের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সেই রাজকন্যা ও রাজ-পুত্রের কথা, সেই বসন্তোৎসব, সেই ফুলবন ও ফুলবাণ, সেই দু'জনের দৈবাৎ অনুকূল অবস্থায় অন্যোন্য দর্শনে প্রেম, বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় প্রেমিকের পুনঃ পুনঃ 'পুষ্পদূত' প্রেরণ,

* কাব্যহব', খাজড়ী-দেবী প্রবন্ধ, ১১১ পৃঃ

ঋতু অনুসারে উপগার কুসুমের ক্রম, অটল প্রেমের জন্ম আহত রাজপুত্রের বন্দীদশা—সবই চির রোম্যান্স-রাজ্যের মধুর রসের উপাদান।

বজ্রমণি

'বজ্রমণি'তে'চোখের আলো'খাঁটি রোমান্স্। 'স্মৃতিরক্ষা' বাস্তবজীবনের (বিধবা বালার) করুণ কাহিনী। 'পথের দেখা' গভীর-করুণরসাত্মক বিফল প্রণয়কাহিনী। 'রূপান্তর' গভীর-করুণরসাত্মক। 'আলোফুল' যেন প্রাচীন গ্রীসের mythologic যুগের কল্পনার মলয়-বাতাসে ফুটিয়াছে। ইহার কল্পনা ও রূপকের আভাস সুন্দর। শেষ গল্প 'সাথী' মার্কিণ লেখক ব্রেট হার্টের একটি উৎকৃষ্ট গল্পের উপযুক্ত অনুবাদ। এই পুস্তকের সব কয়টি গল্পই সুন্দর।

উষসী

উষসীতে 'সুনন্দা' রোম্যান্টিক প্রেমের করুণ কাহিনী। নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্য নায়িকার আত্মবলিদানের চিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে। 'পৌনপার্ব্বণ' সাধারণ জীবনের করুণ কাহিনী, স্নেহময়ী বৌদিদি ও অভিমানী ক্ষুদ্র দেবরের চিত্র মর্ম্মস্পর্শী। 'পিতৃদায়' ও সাধারণ জীবনের ঘটনাত্মক, বরপণের অত্যাচারে গল্পের কেন্দ্রস্থানীয়া নায়িকার নারীত্বগৌরবের উজ্জ্বল চিত্র। 'আনন্দ প্রদীপ' গ্রীসের mythologic age এর কাহিনীর ন্যায় কল্পনালীলাময়ী। 'সুনীল' আকাশ ও 'শ্যামা' ধরণীর পরিণয়কাহিনী। ইহার আর্ট অনবদ্য। 'ময়না' ব্রেট্ হার্টের একটি সুন্দর গল্পের সুন্দর অনুবাদ, সাধারণ জীবনের কাব্যরসের সুন্দর দৃষ্টান্ত। শেষ গল্প রূপকথা রূপকথার মতই মনোরম, খাঁটি রোম্যান্সের সুন্দর নিদর্শন। এ রাজ্যে সবই রোম্যান্টিক—আহত নায়কের চিকিৎসায় তিক্তস্বাদ ঔষধ, বিকটগন্ধ প্রলেপ বা উৎকট অস্ত্রোপকরণের প্রয়োজন হয় না। পেয়—শুধু সুগন্ধি সরবত, ঔষধ শুধু চন্দনপ্রলেপ, আর চিকিৎসা—অস্ত্রোপচারের পরিবর্ত্তে সুন্দরীর কোমল হস্তমর্দ্দন। রাজপুত্র ও চিত্রকরকন্যা চিত্রার রোম্যান্টিক করুণকাহিনী আগাগোড়া এই সুরে সুরবাঁধা। তবে এই রোম্যান্সের কোমল পদাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত অংশটি কেমন বেসুরা বাজে। 'দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে কুমারের অনুচর আর দুইদের পা ক্ষয়ে যাবার যো হয়েছে। বেচারা গোপালভট্ট ত খড়ি পেতে পেতে হাতে কড়া পড়িয়ে ফেলেছেন।' রোমান্সের মধুররসের সঙ্গে এই ক্ষীণ ধারার হাস্যরস ঠিক মিল খায় না।

এই ধরণের সমালোচনা পাঠ করিয়া অনেকে হয় ত বলিবেন, ইহা সমালোচনা নহে, সূচি বা নির্ঘণ্ট-মাত্র। আমরা তাহা অস্বীকার করিতেছি না। পাঠকবর্গ গল্পগুলি পাঠ করিয়া সেগুলির রস গ্রহণ করুন, আমাদের এই অনুরোধ, আমরা কেবল 'দিক্‌মাত্র প্রদর্শন' করিতেছি। বারান্তরে বাকী বইখানির কথা বলিব।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গবেষণা

কোথায় ছিল স্বর্ণলঙ্কা—
সিংহলে কি সুমাত্রায়?
বোরনিয়ো, না যবদ্বীপে?
অথবা অষ্ট্রেলিয়ায়?

কিম্বা কালে সাগর-জলে
হয়ে গেছে মগ্ন লীন?
শত যোজন দূরত্বটা
বাজে কথা, ভিত্তিহীন!

রূপক মাত্র বায়ু-পুত্র
লম্ফে হ'ল সিন্ধু পার;
সেতুবন্ধ যাহার কীর্ত্তি
শিল্পী বটে চমৎকার।

তাও কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্
পণ্ডিতেরা বলেন যে,
আছে যাহা ভগ্নাবশেষ
ভূভাগেরই অংশ সে।

সম্ভবতঃ এক সময়ে
লঙ্কা এবং ভারতের
মধ্য জুড়ি, সেতুর মত,
বক্ষ চিরি সাগরের

আছিল এক মস্ত বড়
যোজক, সিন্ধু-সংযুগে
হয়ে গেছে যাহার দন্ত
লুপ্ত আহা, কোন্ যুগে!

রামায়ণের বৃদ্ধ কবি
সিদ্ধ ভাব বর্ণনায়,
তারি সূত্রে সেতুর চিত্র
আঁকি গেলা কল্পনায়।

অসভ্য ঠিক রাক্ষসেরা,
কিন্তু ছিল কোন্ জাতি?
নয়ত তারা কুর্দ্দ, কুকী,
আবর, ভীলের জ্ঞাতি?

তীর, ধনুকে দক্ষ বটে
এরাও তাদের মত;
সুরায়, মাংসে পুষ্ট দেহ—
ধুমার পাহাড় যত।

রামের সৈন্য ঋক্ষ, কপি,
বিশ্বাসেরি যোগ্য নয়;—
উড়িয়া কি মালদ্বীপের
আদি জাতি সুনিশ্চয়।

ক'রে অনেক গবেষণা,
যুক্তি-শাস্ত্র আলোড়ন,
ক'রে গেছেন এ সিদ্ধান্ত
প্রত্নতত্ত্বাভিজ্ঞ গণ।

আমি কিন্তু আরও ভেবে
বুঝিয়াছি বাস্তবিক,
রামায়ণের গল্পটাই
আগা গোড়া কাল্পনিক।

ভূকর্ষণে সীতার জন্ম—
লক্ষ্মীরূপা শস্যদার,
তারেই হরে অনার্য্যেরা
লয়ে যেত সিন্ধু-পার।

পরে কোন আর্য্যপুত্র
পরাক্রমে মহেষাস,
শস্যাভাব ও অত্যাচারে
দেখি দেশে সর্ব্বনাশ

দাক্ষিণাত্য বিজয় করি,
লয়ে তারি সৈন্যগণ,
করেছিল সাগর-পথে
রক্ষ-সাথে মস্ত রণ।

সোণার লঙ্কা কথাটা কি—
বুঝা অতি শক্ত নয়,
চাইলে আজো সিন্ধুপারে
সাদৃশ্যটা দৃষ্ট হয়।

শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী

দৈবের চক্রান্তে

সে প্রায় কয়েকবৎসর হইল একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্যামবাজারের ট্রামের ডিপোর নিকট ট্রাম হইতে নামিবামাত্র দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া বলিলে,"মহাশয়, আমরা একটু মুস্কিলে পড়েছি, আপনি যদি আমাদের একটু উপকার করেন বড় ভাল হয়।" আমার বাড়ী যদিও শিবপুরে, ইহার পূর্ব্বে শ্যামবাজার কখনও যাই নাই। কারণ জীবনের অধিকাংশ কালই পিতার সহিত পশ্চিমাঞ্চলে কাটাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে যখন বাটী

আসিয়াম, তখন কার্য্যোউপলক্ষে সহরের অন্যান্য স্থানে অনেকবার যাইতে হইয়াছে, কিন্তু শ্যামবাজারে আসিবার কখনও প্রয়োজন হয় নাই। এবার যখন শেষ গোরখপুর গিয়াছিলাম, তখন শ্যামবাজার নিবাসী এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়। বিদেশে স্বদেশবাসীর সহিত পরিচয় এত মধুর যে বাটী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারই সহিত দেখা করিব বলিয়া শ্যামবাজার যাত্রা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের কথা শুনিয়া মনে করিলাম, ইহারা বোধ হয় ভদ্রবেশধারী জুয়াচোর; ইহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে এস্থান আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং সেই জন্যই কোন এক কুমৎলবে আছে। কিন্তু তাহাদের কথার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "কি বলুন, আপনাদের কি করিতে হইবে?" তখন ভদ্রলোকদিগের একজন একটী অদ্ভুত প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, প্রায় এক ঘণ্টা হইল আমরা এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছি, আমাদের বাড়ী ভবানীপুর। ঐ যে দূরে ওই শাদা তেতলা বাড়ীটা দেখিতেছেন, যাহার নীচে একটা ডাক্তারখানা রহিয়াছে, ওই বাড়ীতে ছয়টার সময় আমাদের কোন বন্ধুর জন্য কনে দেখিতে যাইবার কথা আছে। আরও তিন চারিজনের আসিবার কথা ছিল। কিন্তু দেখুন ছয়টা বেজে গেছে, এখনও কারও দেখা নাই। আমরা যে পাঁচ ছয়জন যাইব এ সংবাদ উঁহাদিগকে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ ছয়জনের স্থানে দুইজন মাত্র যাওয়া বড় খারাপ দেখায়। আপনি আমাদের সমবয়স্ক। আমাদের বন্ধুভাবে পরিচয় দিয়া যদি আমাদের সঙ্গে যান বড় উপকৃত হই।"

আমার বয়স তখন বাইশ তেইশ বৎসর। প্রথমে ত কনে দেখার লোভ, তারপর দক্ষিণহস্তের কিছু ব্যবস্থাও থাকিতে পারে। এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে বড় হাসি আসিল; অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কন্যাকর্ত্তারা বেশ আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের কেহই বুঝিতে পারিলে না যে আমি বরের একজন বন্ধুর প্রক্সি। পাত্রী দেখবার সময় আসল বন্ধুদুটী প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া কনেকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তুলিলেন। আমি কিন্তু বরাবরই চুপ করিয়া আছি, পাছে ধরাপড়ি। অবশেষ একজন ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন, "কই, আপনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না?" আমি আর কি বলি, কেবল মাত্র বলিলাম, "আপনাদের সুধাকে মুখখানা একটু তুলতে বলুন।" এই কথা শুনিয়া কনে আমার মুখের দিকে চাহিয়াই হাসিয়া ফেলিল। দেখিলাম, সুধার লজ্জ একটু কম, কিন্তু বেশ সুন্দরী।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই ব্যাপারটার গল্প করিতে ছাড়িলাম না। অনেকেই বেশ হাসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মত সৌভাগ্য তাদের কখনও ঘটে নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। যাহা হউক, দশ বারদিন কাটিয়া গেল; ব্যাপারটা অনেকটা ভুলিয়া গেলাম। প্রথম দুই একদিন যেমন কেবলই মনে পড়িত, এখন আর তা হয় না; মাঝে মাঝে মনে পড়ে—আর একটু হাসি। একদিন প্রাতঃকালে বসিয়া আছি। পিয়ন গোটাকতক চিঠী দিয়া গেল। তাহার মধ্যে লালরং এর খামের মধ্যে একখানা পত্র। সেইটার দিকে আগে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম পত্রখানা রিডাইরেক্ট হইয়া আসিতেছে। প্রথমে শ্যামবাজারের বন্ধুর ঠিকানায় গিয়াছিল; তিনি ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। পত্রখানা নিমন্ত্রণ বলিয়া সহজেই অনুমিত হইল। খুলিয়া দেখি তাহার মধ্যে সাধারণ একখানা কাগজ; তাহাতে লেখা আছে—"দীনেশবাবু, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও দৈবের চক্রান্তে আপনি আমার বন্ধুস্থানীয় হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার বাটীর ঠিকানা জানা না থাকায় বিবাহের রাত্রে নিমন্ত্রণ করিতে পারি নাই—তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন কি? কল্য রবিবার সন্ধ্যায় প্রীতিভোজন। দয়া করিয়া যদি আসেন বিশেষ বাধিত হইব। ইতি নৃপেন্দ্র।"

চিঠী খানা পাইয়া আবার একটু হাসিলাম। ব্যাপারটা যে আরও বেশীদূর গড়াইবে তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। এখন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির বাটীতে নিমন্ত্রণে যাই কি না ভাবিতে লাগিলাম। শেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। ভবানীপুরে যেস্থানে ট্রাম হইতে নামিলাম, সেখানে সামনেই দেখি একখানা পুস্তকের দোকান। কত রকম রংএর বাঁধান নানারকম পুস্তক সাজান রহিয়াছে। সেগুলা দেখিয়া একটা কথা মনে উদিত হইল। নৃপেনবাবু পত্রে লিখেছিলেন,

দৈবের চক্রান্তে আমি তাঁহার বন্ধুস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছি। বাস্তবিকই দৈবের এক অসাধারণ ষড়যন্ত্রে আজ আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও সুপরিচিতের ন্যায় নৃপেনবাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণে চলিয়াছি। নৃপেনবাবুও আমায় চেনেন না, আর তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী সুধার নিকটও আমি অপরিচিত; স্মৃতির ক্ষীণরেখা একটা তাঁহাদিগের নিকট রাখিয়া দিবার জন্য একটা বই কিনিলাম। অন্যমনস্কভাবে কি লিখিতে গিয়া 'দৈবের চক্রান্তে' এই কথা দুইটী পুস্তকের প্রথম পত্রে লিখিয়া ফেলিয়া তাহার নীচে আমার নামটা লিখিয়াই তাড়াতাড়ি নৃপেনবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই দুই জন বন্ধু ও আরও কতিপয় বন্ধুর সহিত একটা স্বতন্ত্র গৃহে বসিয়া সময়োপযোগী গল্পে যোগ দিয়াছেন। যাইবামাত্র তাঁহারা উঠিয়া আসিয়া আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। তাঁহারা না থাকিলে আমাকে একটু মুস্কিলে পড়িতে হইত।

খাওয়া দাওয়ার পর সকলে বউ দেখিতে গেল, আমিও তাঁহাদের সহিত যাইলাম। আমি নৃপেন বাবুকে চিনিয়া লইয়াছি, কিন্তু তিনি বোধ হয় আমাকে তখনও চেনেন নাই। তাহার কারণ তিনি সে সময়ে আমাদের খাওয়া দাওয়া লইয়া যেরূপ ব্যস্ত ছিলেন তাহাতে আমি তাঁহার চক্ষে অপরিচিত হইলেও আমি যে কে তাহা জানিবার সময় পান নাই; অথবা তিনি বোধহয় একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে বন্ধুভাবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এবং নিমন্ত্রণে যোগ দিবার আমার যে সম্ভাবনা আছে একথা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। যাহা হউক, যে গৃহে বউ ছিল, নৃপেনবাবুও আমাদের সঙ্গে সেখানে গেলেন। শ্যামবাজারে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এখানেও বউ সেইরূপ মুখ নামাইয়া বসিয়া আছে। একজন বন্ধু বলিয়া উঠিলেন 'নৃপেন, মুখখানা তুলে ধর'। নৃপেন বাবু সে কথায় প্রতিবাদ করিতেছেন, এমন সময় আমিও বলিয়া ফেলিলাম, 'নৃপেন বাবু বউকে মুখখানা একটু তুলতে বলুন না।' বোধ হয় নৃপেন বাবুর উপর দর্শকদের এরূপ অযথা অনুরোধ শুনিয়া বউ স্বতঃই মুখখানা একটু তুলিল। মুখে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। অনেকেই সেটা লক্ষ্য করিল। একজন নির্লজ্জ বন্ধু বলিল, "নৃপেন আজ তোমার বউএর হাসি মুখ দেখে চল্লুম, আসছে বছর তোমার তোমার ছেলের ভাতের সময় যেন তোমার হাসমুখ দেখতে পাই।" অনেক বউএর হাতে কত কি উপহার দিল, আমিও আমার বইখানা দিয়া চলিয়া আসিলাম।

ইহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রায় আট নয় বৎসরের পরের কথা বলিতেছি। একদিন—বেলা তখন প্রায় দশটা—আমি একটা ঘরে বসিয়া পুরুলিয়ার কোন একটি বন্ধুকে একখানা পত্র লিখিতে ব্যস্ত। আমার অতর্কিতে সে ঘরে আমার কাকার ছেলে হারাণ যে কখন প্রবেশ করিয়াছে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ আমার কাপড়ের আঁচল ধরিয়া হারাণ বলিল, "বড়দা আমিও তোমার সঙ্গে যাব।" হারুকে দেখিলে আমার সকল কাজ বন্ধ হইয়া যায়। আমি তখনও অবিবাহিত। কয়েকটী বিবাহিত জীবনের শোকদুঃখময় সংসার দেখিয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। ভাবিতাম বিবাহ না করিয়া যতদিন চলে তত দিনই সুখের। হৃদয়ের ভালবাসার বৃত্তিগুলি কিন্তু সংযত করিয়া রাখিতে পারি নাই। তাহারা সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া হারুর উপর পড়িয়াছিল। সে আমার সঙ্গে খাইতে না বসিলে আমার ভাল খাওয়া হইত না, রাত্রে আমার পার্শ্বে না শুইলে আমার ঘুম আসিত না। হারাণকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া বলিলাম, 'কোথা যাবে হারু? কই আমি ত এখন কোথাও যাচ্ছি না।' সে অমনি বালকসুলভ চপলতায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'না যাবে না বই কি? বাবা বলছিলেন তুমি এবার পূজোর সময় পুরুলেতে বেড়াতে যাবে। আমিও তোমার সঙ্গে যাব বড়দা।' আমি বলিলাম, 'আচ্ছা আমি যেদিন যাব তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।' হারাণ উৎফুল্লচিত্তে এ শুভসংবাদ তাহার পিতাকে দিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে ছুটিল।

হারাণের বয়স তখন পাঁচ বৎসর। তাহাকে যে আমি এত বেশী ভাল বাসিতাম, তাহার আর একটা বিশেষ কারণ এই যে সে মাতৃহীন। আমার কাকা ভাগলপুরে চাকরি করিতেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। এই জনাই বোধ হয় তাঁহাকে সংসারে অনেকটা আস্থাহীন দেখিতাম। যাহা হউক, অবশেষে বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কাকার সংসারে হারাণের শুভ আগমনে কাকার হৃদয় প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। কিন্তু,

বিধাতা কাহার কপালে সুখ লিখেন নাই। হারাণের জন্মের ঠিক দুই বৎসর পরে আমার কাকীমার মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনা ভাগলপুরেই ঘটিয়াছিল। আমি তখন শিবপুরের বাটীতে। ইহার পর কাকা পেন্সন লইয়া সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে হারাণকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি হা হুতাশেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে হারাণকে একটু আধটু আদর করিতেন।

পুরুলিয়া আসার তিন চারি দিন পরে একখানা বাঙ্গালা সংবাদ পত্র লইয়া পড়িতেছি। বলা বাহুল্য, হারাণ আমার সঙ্গে পুরুলিয়া আসিয়াছে এবং স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের অবস্থাও কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে এই জন্য অনেক উপরোধ করিয়া কাকাকেও এখানে লইয়া আসিয়াছি। কাগজের একটা বিজ্ঞাপনের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল। বিজ্ঞাপনদাতা জানাইতেছেন, "গত মঙ্গলবার রাঁচী আসিবার পথে আমার পত্নী 'হারানিধি' নামক এক খানি বাঙ্গালা পুস্তক ট্রেনে হারাইয়াছেন। কোন এক বিশেষ কারণ পুস্তকখানি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। ঠিক সেই পুস্তকখানির অভাবে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। যদি কোন ভদ্রলোক পুস্তকখানির সংবাদ দিতে পারেন আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব। পুস্তকখানির উপহার পৃষ্ঠায় 'দৈবের চক্রান্তে' এই কথা দুইটী লেখা আছে।" বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া বহুদিনের একটা স্মৃতি আমার মনের মধ্যে সহসা উদিত হইল। ট্রেনে আসিবার সময় গদীর নীচে একখানা পুস্তক পাই। সেই গাড়ীতে আমরা তিন জন ছাড়া আর কোনও আরোহী ছিল না। অগত্যা সেই পুস্তকখানি আমার ট্রাঙ্কে তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি বইখানা বাহির করিয়া দেখি একটী পাতার এক কোণে লেখা আছে 'দৈবের চক্রান্তে—দীনেশ'। কি আশ্চর্য্য! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক অভাবনীয় ঘটনাসূত্রে আমিই যে একটী সামান্য বস্তু স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ একজনকে উপহার দিয়াছিলাম, আজ তাহা আমারই হস্তে ভগবানের এক অপূর্ব্ব কৌশলে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদিনে বুঝিলাম, উপহার পৃষ্ঠায় যে কথা দুইটী লিখিয়াছিলাম তাহা বিশ্বনিয়ন্তা স্বয়ং আমার লেখনীতে আবির্ভূত হইয়াই লিখিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তকখানির দুই একটী পাতা উল্টাইতে দেখিলাম কে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লাল কালীতে লিখিয়াছে 'ভগবন্, তোমারি অসীম লীলায় পুস্তকখানি যেমন আমার হস্তে আসিয়াছে, তোমার লীলাময় নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমার হারানিধিকে তেমনি ফিরাইয়া দেও'। দুইবার, তিনবার এই কথাগুলি পড়িলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহার পরদিন এক বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রাঁচী যাইবার কথা ছিল। বিজ্ঞাপনদাতা নিজের পুরা নাম না দিয়া ডাক্তার ব্যানার্জ্জি লিখিয়াছেন। নৃপেন বাবুই যে বিজ্ঞাপন দাতা তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। নৃপেন বাবুর যে বৎসর বিবাহ হয় তখন তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। বুঝিলাম এখন তিনি ডাক্তারি পাশ করিয়া হয় ত রাঁচীতে প্র্যাকটিস্ করিতেছেন। যাহা হউক রাঁচী যাইয়া যে এবার তাঁহার সহিত একটু বিশেষ আলাপের সুবিধা হইবে তাহা ভাবিয়া একটু আনন্দিত হইলাম।

যে দিন রাঁচী যাইলাম তাহার পরদিন প্রাতঃকালে পুস্তকখানি সঙ্গে লইয়া বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট বাটীর সন্ধানে বাহির হইলাম। বাটীখানি খুঁজিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হইল না। যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। নৃপেনবাবু রাঁচীতে ডাক্তারী করেন। একটা ঘর হইতে গোটা কতক লোক শিশিতে ঔষধ লইয়া বাহির হইল। তাহার মধ্যে আরও কতকগুলা লোক বসিয়া আছে আমি আস্তে আস্তে সেখানে গিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিলাম। নৃপেনবাবু রোগী লইয়া বড় ব্যস্ত। এই কয় বৎসরে তাঁহার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে জানা না থাকিলে যাহাকে একদিন রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য দেখিয়াছি তাহাকে এত বৎসরের পর দেখিলে কিছুতেই চিনিতে পারিতাম না। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও কিছু বলিবার সুযোগ পাইলাম না। অবশেষে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া ডাক্তার বাবুর নিকট দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন 'হাঁ বলুন, আপনার কি হইয়াছে?' আমি বলিলাম 'আজ্ঞে—আমার অসুখ নয়।' তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন 'ও আপনার বাড়ীতে কল্ দিতে এসেছেন বুঝি—তা বলে যান আপনার বাটীর ঠিকানা। তবে দেখুন এ বেলায় অনেক কল্ আছে, সময় করতে পারব না; ও বেলায় ২টা হইতে ৩টার মধ্যে আপনার বাড়ী যাব'।

আমি ত মহা বিপদে পড়িলাম। একটু হাসিয়া বলিলাম, 'দেখুন' আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে একটু কথা আছে।' তিনি বলিলেন, 'ও প্রাইভেট কেস্? আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন।' অগত্যা আমাকে অপেক্ষাই করিতে হইল। হাতের রোগী যখন অনেক কমিয়া আসিল, তাঁহার ডিস্পেনসারী গৃহের সংলগ্ন একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে যাইবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলাম, 'দেখুন' আপনি সংবাদ পত্রে যে বিজ্ঞাপন—'তিনি অমনিই বলিয়া উঠিলেন,'ও আপনি পুস্তকখানি পাইয়াছেন? ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে রোগী মনে করিয়া অযথা এতক্ষণ বসাইয়া রাখিয়াছি। উঃ! আপনি আমার যে কি উপকার করিলেন, তা ভগবানই জানেন। শত ধন্যবাদ মহাশয়!' এইরূপ নানা কথায় তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি একটু লজ্জিত হইলাম। বলিলাম, 'দৈবের অনুগ্রহে আমি পুস্তকখানি পাইয়াছি। আমার কর্ত্তব্য মাত্র পালন করিয়াছি। এজন্য আপনি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমাকে লজ্জিত করিবেন না। তবে এই পুস্তকখানি আপনার পত্নীর এত প্রিয় কেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।' তিনি বলিলেন, 'ও সে অনেক কথা। আমার এখন সময় বড় কম। আপনি যদি বৈকালে এখানে একবার আসেন বড় উপকৃত হইব। আর এককথা—বৈকালে আপনার এখানে জল যোগের নিমন্ত্রণ রহিল। আমার এ অনুরোধ রক্ষা না করিলে আমি বড়ই দুঃখিত হব।' বৈকালে যাইতে স্বীকৃত হইয়া বাসায় ফিরিলাম। বেলা ৪টার সময় নৃপেনবাবুর বাড়ী গেলাম। যাইবামাত্র তিনি সাদর অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। বহুকালের পুরাতন বন্ধুর মত দুইজনে একসঙ্গে খাইতে বসিলাম। নৃপেনবাবুর পত্নী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া আমাদিগকে খাবার দিতে লাগিলেন। খাইবার সময় নৃপেনবাবু দুই তিনবার আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইলেন। কি উদ্দেশ্যে তাকাইতেছেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। খাইতে খাইতে তিনি বলিলেন, 'পুস্তকখানি ফিরিয়া পাইবার আশা আমি একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম। আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিলেন। এক বড় অভাবনীয় সূত্রে আমার পত্নী পুস্তকখানি উপহার পাইয়াছিলেন; এই বলিয়া তিনি ঘটনাটী বিবৃত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'এই ব্যাপারটা লইয়া আমি আমার পত্নীর নিকট একদিন গল্প করি। তাহার পর আমার পরিচিত বন্ধুটীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সে আমাকে কয়েক বার অনুরোধ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার বাটীর ঠিকানা আমার জানা ছিল না। শ্যামবাজারে তাঁহার এক বন্ধু বাস করিতেন, তাঁহার বাটীতে একদিন গিয়া দেখি তিনি কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন।' এই কথার পর আমি আমার পরিচয় আর লুকাইয়া রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম 'আচ্ছা ডাক্তার বাবু, আপনি আমায় চিনিতে পারেন?' তিনি বলিলেন 'আপনাকে? কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। হাঁ, আপনার নামটী জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।' আমি বলিলাম, 'আমিই আপনার অপরিচিত বন্ধু সেই দীনেশ।' ঠিক এই সময়ে নৃপেন বাবুর পত্নী একটা বাটি করিয়া কি লইয়া আসিতেছিলেন। হাত হইতে পড়িয়া যাওয়ায় লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। নৃপেন বাবু খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'দেখুন, ভগবানের কি অদ্ভুত কৌশল? আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পাইয়াছি।' খাওয়ার পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'আমার বিবাহের চারি বৎসর পরে একটী পুত্র হয়। আমার কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সমস্ত অবসাদটুকু তাহার মুখ দেখিলে ভুলিয়া যাইতাম। ভগবান আমাদের কপালে এত দুঃখও লিখিয়াছেন তাহা তখন একবারও মনে উদিত হয় নাই। আমি তবুও আমার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অনেক সময় ভুলিয়া যাই, কিন্তু আমার স্ত্রী সর্ব্বদাই হা হুতাশে দিন কাটান।' আমি বলিলাম, 'দেখুন মানুষের যেখানে কোন হাত নাই সে বিষয়ে বৃথা দুঃখ করায় কোন ফল নাই। ভগবান নিয়েছেন, তিনিই আবার আপনাকে অনেক পুত্র দিবেন।' তিনি বলিলেন, 'না মহাশয় আমারই সম্পূর্ণ দোষে তাহাকে হারাইয়াছি। সে বৎসর ভাগলপুরে একটা বড় মেলা হয়। আমরা তখন ভাগলপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার পুত্রের বয়স তখন দুই বৎসর। একদিন মেলা দেখিতে বাহির হই। জনতার মধ্যে ছেলেটিকে হারাইয়া ফেলি। তাহার পর কত অনুসন্ধান করি, কিন্তু

আমার কপালের দুঃখ কে ঘুচাইবে? ওই দেখুন ছেলেটির ফটো রহিয়াছে। প্রত্যেক পুলিশের নিকট উহার ফটো পাঠাইয়া দিয়া অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া ছিলাম। প্রত্যেক খবরের কাগজে উহার ফটো দিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। কিন্তু সে কি আর এতদিন বাঁচিয়া আছে? আমি ত একেবারেই আশা ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু কি জানি কেন আমার পত্নীর দৃঢ় বিশ্বাস যে একদিন আমরা তাহাকে ফিরিয়া পাইব। আপনার প্রদত্ত পুস্তকখানিই তাঁহার এ বিশ্বাসের মূল। একটী অপহৃত বালকের কাহিনী অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। যে অবধি আমার পুত্র নিরুদ্দিষ্ট, সেই হইতে এই পুস্তকখানি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছে, এবং যেখানে যান পুস্তকখানি লইয়া যাইতে ভুলেন না। সময়ে সময়ে তাঁহার বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া যখন সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করি তখন পুস্তকখানি দেখাইয়া দিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন কিছুই আক্ষেপ নাই, কারণ আবার পাব। গ্রন্থকারের অনুগ্রহে অপহৃত বালকটির পিতামাতা আবার তাহাকে ফিরাইয়া পাইয়াছিল—কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমিও সেইরূপ ভাগ্যবান্ হইব ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। আমার স্ত্রীর আশ্বাসবাণী শুনিয়া এত দুঃখের মাঝেও সময়ে সময়ে আমার হাসি পায়।' ডাক্তার বাবু হঠাৎ উদাস নয়নে একবার ফটোর দিকে তাকাইলেন। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমি তাঁহার কথা শুনিয়া যাইতেছিলাম। আমিও ফটোর দিকে চাহিলাম। আমার হৃদয়টা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া তিনি আর বেশী কিছু বলিলেন না। দুই একটী কথার পর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সেইদিনই রাত্রি ৮ টায় সময় পুরুলিয়া পৌঁছিলাম, একেবারে কাকার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তিনি একখানা পুস্তক লইয়া হারুকে পড়াইতেছেন। হারাণ মাঝে মাঝে একটা যে কোন পুস্তক লইয়া 'আমি পড়িব' বলিয়া ঝোঁক ধরিত। সে সময় তাহাকে কিছু না পড়াইলে আর নিস্তার ছিল না। আমাকে দেখিয়া কাকা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'কই, আজ ত তোমার আসবার কথা ছিল না।' আমি বলিলাম, 'আপনার নিকট একটু বিশেষ কাজের জন্য আসিয়াছি। কাকা, আমায় ক্ষমা করিবেন, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। হারাণকে আপনি কোথায় পাইয়াছেন? বলুন কাকা, আমার মনে এক বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।' তিনি খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'বলিস্ কি দীনু! পাগলের মত কি বল্‌ছিস্।' আমি উদ্বেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, 'আমার মনে হয় হারাণ আপনার পুত্র নয়। আমি তার বিশিষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। আমি উহার শৈশবের প্রতিকৃতি আজ দেখিয়া আসিয়াছি। হাঁ, ঠিকই ত সেই মুখ—'। আমাকে আর বলিতে হইল না। কাকা আমার মুখ দুইটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে দর দর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'উঃ! শোন দীনু—যে কথা এতদিন কেবল আমিই জানিতাম, তার আভাস আজ তুই কোথা হতে পেয়ে এসেছিস্ দেখছি। মনে করেছিলাম এক উপযুক্ত অবসরে তোকেই কেবল সেই কথা জানাইয়া যাইব। কিন্তু এখন আর গোপন করায় কোন ফল নাই। তোমার কাকীমার মৃত্যুর ঠিক এক ঘণ্টা পরে আমার পুত্রটীও মারা যায়। শ্মশান হইতে ফিরিবার সময় দেখি ভাগলপুরের একটা মাঠের মধ্যে একটা মেলা বসিয়াছে। দেখিলাম, জনতার বাহিরে একটু দূরে দুই আড়াই বৎসরের শিশু বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহার সুন্দর মুখ খানি দেখিয়া আমার সন্তপ্ত প্রাণে না জানি কেন আবার একটু স্নেহের সঞ্চার হইল। আমি শিশুটীকে লইয়া আসিলাম এবং নিজের পুত্ররূপে পালন করিতে লাগিলাম। পরে সংবাদপত্রে তাহার ছবি সম্বলিত বিজ্ঞাপন দেখিলাম। মনে চৌর্য্যপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাকে তাহার পিতামাতার নিকট ফিরাইয়া দিলাম না। মাঝে মাঝে মনে হইত কেন আবার তাহাকে সংসারের বন্ধন স্বরূপ জুটাইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইত, না, হারাণ ত আমারই ছেলে; সে না থাকিলে যে আমি অন্ধ হইতাম। দীনেশ, আজ সমস্ত কথা তোমাকে বলিলাম। কিন্তু স্থির জেনো, হারাণ আমারই ছেলে—তার অপর কোন পিতামাতা থাকিতে পারে না।' এই কথা বলিয়া হারাণকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া অজস্র চুম্বনে তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

রাত্রেই রাঁচি যাইবার একখান ট্রেন ছিল। হারাণকে

লইয়া সেই রাত্রেই রাঁচি আসিলাম। অবশ্য কাকাকে ইহার কিছুই বলিয়া আসি নাই। তিনি যখন নিদ্রিত, তখন হারাণকে লইয়া আসি। রাঁচি হইতে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া বুঝাইব মনে করিয়া ছিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে হারাণকে কোলে করিয়া নৃপেন বাবুর বাটীর দিকে অগ্রসর হইলাম। নৃপেনবাবু তখনও ডিস্‌পেনসারী গৃহে আসেন নাই। রাস্তার দিক হইতে বাটীতে প্রবেশ করিবার একটা দরজা ছিল। সে দিকে গিয়া দেখিলাম, নৃপেন বাবু তাঁহার স্ত্রীর সহিত প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছেন। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই, 'ডাক্তার বাবু এই এনেছি' বলিয়া হারাণকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাঙ্গনের উপর বসিয়া পড়িলাম। তাঁহার স্ত্রী দৌড়িয়া আসিয়া আমার কোল হইতে হারাণকে টানিয়া নিলেন। তাহার পর সেই দৃশ্য সকলের চক্ষেই সেই অশ্রুর ধারা—সকলের হৃদয়েই সেই প্রবল আন্দোলন—জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। আর ভুলিতে পারিব না সেই কাতর আহ্বান - যখন সেখান হইতে চলিয়া আসি তখন মাতার কোল হইতে হাত বাড়াইয়া 'বড়দা' আমায় নিয়ে যাও, বলিয়া হারাণের সেই কাতর প্রার্থনা ?

পুরুলিয়া আসিয়া কাকাকে দেখিতে পাইলাম না; তাঁহার বিষয়ে কেহ কোন কথাও বলিতে পারিল না। মনে করিলাম আমাকে ও হারুকে দেখিতে না পাইয়া তিনি হয় ত শিবপুরে চলিয়া আসিয়াছেন। সেখানে আসিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পাইলাম না। অনেক স্থলেই অনুসন্ধান করিয়াছি—আজ পর্যান্তও তাঁহার কোন সন্ধান পাই নাই।

মনের ঔদাস্যে যখন মাঝে মাঝে জাহ্নবীসৈকতে আসিয়া বসি তখন সান্ধ্যসমীরে কোথা হইতে 'বড়দা আমায় নিয়ে যাও' বলিয়া একটা করুণ সুর আমার শ্রুতি যুগলের নিকট ঝঙ্কৃত হয়—আর সঙ্গে সঙ্গে দুইটী কথা আমার নয়নের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে—সে দুটী হইতেছে 'দৈবের চক্রান্তে'।

শ্রীক্ষুদিরাম গঙ্গোপাধ্যায়

মিলন-স্মৃতি

জীবনের দীর্ঘপথে মনে হয় ক্ষণিকের তরে
　　হে প্রেয়সী, মানসী আমার!
অকস্মাৎ অতর্কিতে পেয়েছিনু তোমা বক্ষ ভরে
　　মুহূর্ত্ত ভুলিতে হাহাকার!
অনন্ত অম্বরে যথা দু'টী ক্ষুদ্র জলদের কণা
　　যাত্রা-পথে করি কোলাকুলি,
কোথা পুনঃ ভেসে যায় আত্মহারা একাকী উন্মনা
　　ক্ষণ-দেখা বুঝি পথ ভুলি'।
হেমন্তি কি হে বাঞ্ছিতা! এ বিশাল বসুন্ধরা তলে
　　এক শান্ত শিশির-সন্ধ্যায়,
মঙ্গল-উৎসব মাঝে মনে হয় যেন স্বপ্ন-ছলে
　　মিলেছিনু তোমায় আমায়!

ব্রীড়ানত মুখোপরে হেরিলাম দেব বালিকার
　　কি সারল্য পবিত্রতা মাখা,—
মনে হল চিত্তে তব ঘুচাতে এ প্রাণের আঁধার
　　পুণ্য-প্রেমে পূর্ণ শশী আঁকা!

নিরমম সংসারের বিষ-দগ্ধ নয়নসম্মুখে
　　সহিল না এত সুখ মোর,
বিস্তারি' সহস্র ফণা সর্প হেন কি ক্রূর-কৌতুকে
　　মর্ম্মে মম দংশিল কঠোর!
সে দংশনে সে আঘাতে বজ্র বুঝি ভস্ম হয়ে যায়,
　　নীলকণ্ঠ মানে পরাজয়!
জান তুমি হে কল্যাণী, দাঁড়াইনু হাসি' উপেক্ষায়
　　ও হৃদয়ে লভিয়া আশ্রয়!

ক্ষুদ্র বুকে এত সুধা ছিল তব বিশল্যকরণী !
জুড়াইতে বিক্ষত পরাণ ;—
সংসারের শক্তিশেল ব্যঙ্গ যাহে দিবস রজনী
উদ্ভাসি' সৌভাগ্য জ্যোতিষ্মাণ !

সত্য আমি প্রিয়তমে ! কি বিশ্বাস নির্ভর তোমার
করেছিল নির্ভীক আমায়,—
তব ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা জেলেছিল অন্তর মাঝার
ধ্রুবজ্যোতিঃ সান্ত্বনা আশার !

৩

অনন্তকালের স্রোতে বর্ষ এক কতটুকু প্রিয়ে !
ওইটুকু আমারি সম্বল ।—
তারপর কোথা তুমি নাহি পাই বিশ্ব অন্বেষিয়ে
সারা চিত্তে জ্বলে দাবানল !

শূন্য গৃহ ! শূন্য প্রাণ শূন্য ধরা—নিষ্ঠুর সংসার —
দশদিক্ নিস্তব্ধ নির্জ্জন ! —
অন্তরে বাহিরে যেন ঘনীভূত অমাবস্যার
নামিয়াছে ভীষণ প্লাবন ।

এ আঁধারে আত্মহারা লক্ষ্যহারা শান্তিহারা হয়ে
সর্ব্বশক্তি হারায়েছি আজ,—
অশ্রুর গৈরিক চাপি' জীর্ণ দীর্ণ উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে
বিলুণ্ঠিত তপ্ত মরু মাঝ !

কে দিবে আশ্বাস আজি—শ্রান্ত প্রাণ জুড়াব কোথায়-
কোথা পাব ব্যথার আশ্রয়,—
আনন্দ-উৎসব-শেষে দুরাগত-বংশীধ্বনি প্রায়
স্মৃতি শুধু কাঁদে বক্ষময় !

৪

জীবন সঙ্গিনী অয়ি ! পড়ে আছে সুদীর্ঘ জীবন
চিহ্ন তব হেথা কিছু নাই !—
অন্তর্হিত ছায়া কুঞ্জ অকস্মাৎ মরীচি' মতন
রেখে শুধু অতৃপ্ত তৃষ্ণায় !

ক্ষণিকের হাসি খেলা ক্ষণিকেতে হল সমাপন
একি স্বপ্ন—একি গো কল্পনা—
সত্য তোমা পেয়েছিনু মোর শত সাধনার ধন !
বল মাগো একান্ত আপনা ?

নহে নহে ভ্রান্তি কভু ! এখনো যে তোমারি পরশ
সারা চিত্তে করি অনুভব,—
ভগ্নমঞ্জুষার কোণে লেগে আছে করিতে বিবশ
নিরুদ্দিষ্ট কস্তুরী-সৌরভ !

অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী অয়ি দেবী, প্রেমময়ী মম !
আজ তুমি ধ্যানের বন্দিতা,—
তোমারি মিলন-স্মৃতি জপমাল্য দিব্য নিরুপম
মুমূর্ষুর শান্তিদাত্রী 'গীতা' !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

সট্‌কার মহিমা

সে বার পাঁচ বৎসর পর গভর্মেণ্টের "একান্ত বাধ্য চাকর" অনেক লেখালেখি করিয়া পূজার ছুটির সহিত তিন মাসের প্রিভিলেজ লিভ্ পাইলাম। প্রতি বৎসর বড়-দিনের ছুটিতে দার্জ্জিলিং যাইয়া পাহাড়ের প্রতি আমার কেমন একটা বীতস্পৃহা জন্মিয়া গিয়াছিল; সেবার ভাবিলাম ছুটিটা সমুদ্রের ধারে কাটাইব। যথা সময়ে সহাধ্যায়ী বন্ধুপ্রবর অখিলকে লিখিয়া পাঠাইলাম যে শনিবার দিন তাহার অতিথি হইব। অখিলচন্দ্র পুরীতে ডাক্তারী করে; প্র্যাক্‌টিসটা প্রায় তাহার একচেটে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শনিবার দিন রাত্রে যাইয়া পুরী পৌঁছিলাম; অখিলচন্দ্র আমাকে পাইয়া আহ্লাদে আটখানা। দিন সাতেক পুরীতে বাস করিয়া সরকারী নেমির নিষ্পেষণে চূর্ণ প্রায় অস্থি ক'খানা যেন একটু সতেজ হইয়া উঠিল। এখানে পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট একটা দুঃখের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদিন প্রাতে আমি হাত মুখ ধুইয়া বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়িত

অবস্থায় আছি এমন সময় অখিলের ছ' বছরের ছেলেটি বীনানিন্দিত স্বরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জেঠা বাবু, তুমি ডিম খাবে ?" আমি ত্রাস্ত উঠিয়া তাহার সুন্দর মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ওরে সর্ব্বনেশে ছেলে, অমন কথা বলিস্‌নে, আমি তোর কাকাবাবু!" খোকার 'জেঠাবাবু' ডাক শুনিয়া আমার হৃৎপিণ্ড প্রায় নিথর নিস্পন্দ হইয়া আসিতেছিল। ছেলেটা বলে কি না, জেঠাবাবু! কি সর্ব্বনাশ! আমি অখিলের বয়োজ্যেষ্ঠ এ কথা শুনিলে কোন অভাগা আমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিবে? যাহা কিছু আশা আছে, তাহাও প্রায় লোপ হইয়া যায়, কি ভয়ানক! কতক্ষণ পরে খোকা আবার আসিয়া আমাকে কহিল, "জেঠাবাবু, মা বল্‌ছেন, তিনি তোমার বিয়ের যোগাড় ক'রে দেবেন, তুমি ভেবো না।" আমি খোকার অত্যাচারে ও সুরমার উৎপাতে বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। অখিলচন্দ্র বাসায় ফিরিলে আমি বেশ গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলাম "অখিল, আর তোমার বাসায় আমার থাকা চল্‌ছে না।" আমার অভিযোগ শুনিয়া সুরমা ভিতর হইতে খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অখিল তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল, একটা কিছু তামাসার ব্যাপার হইয়াছে। সস্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন, কি হ'য়েছে দাদা ?

"দাদা! তুমিও আরম্ভ কর্‌লে? চল্লুম্ তোমার বাসা থেকে,"—বলিয়া আমি রাগে গড় গড় করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম, আর এ দিকে সুরমার হাসি দেখে কে? অখিলচন্দ্র আমাকে ধরিয়া পুনরায় চেয়ারে বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে কি হয়েছে, বল না ছাই।"

"কি আর হ'বে ভাই,—আরে ছিঃ ছিঃ,—দাদা! শেষটায় কি না তোমরা সকলে মতলব করেছ আমাকে আইবুড়ো ক'রে রাখা,—আর তোমার বাড়ী থাক্‌ছি নে।"

অখিল খুব একচোট হাসিয়া বলিল, "অরে তোর ভয় নেই। সিভিল্ লিষ্টের ঠিকুজি ত আছে, তোর ভয় কি? আর তা' না হয় আমি তোর হ'য়ে এজাহার দেব।" আমি কতকটা আশ্বস্ত হইয়া আমার বুক বাঁধিলাম। আহারান্তে অখিলের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলাম কটক বেড়াইতে যাইব। সুরমার শিক্ষামত খোকা আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল—"জেঠাবাবু, পালিও না যেন।" আমি খোকার দু'গালে দুটি চুম্বন অঙ্কিত করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

(২)

কটকে আমার পরিচিত কোন বন্ধু না থাকায় ডাক্ বাংলায় আসিয়া উঠিলাম। মনে করিয়াছিলাম ঐ দিনই মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া সহর দেখিতে বাহির হইব, তারপর সন্ধ্যার গাড়ীতে আবার পুরী ফিরিয়া যাইব; কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। আমার নির্ব্বাচিত কুঠুরিতে আর একটি ভদ্রলোক ছিলেন, তিনিও আমার মত কটক পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া একখান চেয়ার টানিয়া বসিতেই ভদ্রলোকটি খাটিয়াতে উঠিয়া বসিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনার কোথা হ'তে আসা হ'ল?"

"কোলকাতা, সম্প্রতি পুরী হ'তে!"

"জিনিষ পত্র?"

"আজ্ঞে, আজই চলে যাব; কেবল সহরটা দেখে যাব।"

"আমারও তাই। আমিও আজ ওয়াল্‌টেয়ারে যাব। এখানে দীনবন্ধু বাবু পীড়িত হয়ে পরিবর্ত্তন এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেম; আহা ভদ্রলোক ভারি কষ্ট পেয়েছেন।"

"কি অসুখ?"

"মাথার যন্ত্রণা; যাকে বলে লেবার পেইন্।" আমি ভদ্রলোকটির কথা শুনিয়া হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না; বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "লেবার পেইন সে কি?"

"আজ্ঞে হাঁ, দীনবন্ধু বাবু কাষ্টম্ হাউসের বড় বাবু কিনা; লেবার বড্ড বেশী, তাই মাথায় ঐ যন্ত্রণা হ'য়েছে; ডাক্তারদের পরামর্শ মত ছুটি নিয়ে চেঞ্জে এসেছেন। আর এসে অবধি বড়ই অসুবিধায় পড়েছেন। আজ ক'দিন হ'ল তাঁদের চাকরটা চলে গেছে; উড়ে দেশ, একটা চাকরও পা'বার যো নেই।"

আমি কেবল মাথা নাড়িয়া যাইতেছিলাম। ভদ্রলোকটি তাঁহার বক্তৃতা থামাইলে আমি বাধ্যক্রমে প্রবেশ

করিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমি সহর দেখিতে বাহির হইব, ভদ্রলোকটি আমার বাহির হইবার উদ্যোগ দেখিয়া বলিলেন, "আপনি বেরুচ্ছেন্, তা আমিও আপনার সঙ্গেই চলি; একবার দীনু বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।" ভদ্রলোকটি আমার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। কিছু দূর যাইয়া ভদ্রলোকটি "এই বাড়ী" বলিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন কবাট খুলিয়া অবতরণ করিয়া কহিলেন "নমস্কার, তবে আসি মশাই।" আমিও দু'হাতে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। গাড়ীটা যথারীতি অগ্রসর হইতেছিল, দেখিলাম, ভদ্রলোকটি দরজার কড়া ধরিয়া খুব নাড়িতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি সহর দেখিয়া ডাক্ বাংলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোকটি তাঁহার জিনিষ-পত্র সহ গায়েব! বারান্দাস্থিত ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় সটকা টানিতেছিলাম, হঠাৎ আমার মাথায় কেমন একটা অ্যাডভেন্চার খেলিল। কতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম, খানসামাকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, আমি রাস্তায় জুতা যোড়া একটা গাছের গোড়ায় রাখিয়া চশমা যোড়া খাপ নিবদ্ধ করিয়া, নগ্নপদে দীনবন্ধু বাবুর বাসার ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ভিতরে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইতেছিল না। ভিতরে প্রবেশ করি কি না করি, এই দ্বিধাটা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বেই, ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল "কে?" আমি প্রথমটা বেশ একটু থতমত খাইয়া গেলাম, তাহার পর সাম্‌লাইয়া ফটক পার হইয়া চেয়ারে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটিকে বলিলাম "আজ্ঞে শুনলুম, আপনাদের চাকরের দরকার আছে?" ভদ্রলোকটি বেশ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "এ দিকে এস।" আমি অগ্রসর হইলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

আজ্ঞে, ছেরামপুর।

"এখানে আর কারো বাসায় চাকুরী করেছ?"

"আজ্ঞে না। আমি এখানে নূতন এয়েছি। পুরী ৺জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েছিলেম, গাড়ীতে আমার সব চুরি হ'য়ে গেছে, তাই এখানে নেবে পড়েছি; যদি অনুগ্রহ ক'রে আমায় রাখেন তবে দু'এক মাস চাকুরী ক'রে, পথ খরচটা যোগাড় করতে পারি।"

"শ্রীরামপুরে কোথায় চাকুরি করতে?"

"আজ্ঞে, আমি বিশ্বনাথ রায়, কোলকাতার হাইকোর্টের উকিল, তাঁর বাসায় আজ সাত বছর হ'লো চাকুরি কচ্ছি।"

"ও,' বেশ, এখানে থাকতে পারো; মাইনে চাও কত?"

"আজ্ঞে, বিদেশে বিপন্ন অবস্থায় যা পাই তাতেই রাজি।"

"তিন টাকা আর খাওয়া পাবে; দেখ যদি হয়, তবে থাক।"

আমি সম্মতি দিয়া অনায়াসে ভৃত্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আমাদের অদূরে একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া চেয়ারে বসিয়া কারপেট্ বুনাইতেছিল; চাকুরিটা বেশ প্রস্‌পেক্‌টিভ্ বোলে, আমি বেশী আগ্রহ করিতেছিলাম!

(৩)

চাকুরিতে ত বহাল হইলাম; কিন্তু আমার বড়ই ভয় হইতেছিল, যে কাজগুলি সব করিয়া উঠিতে পারিব কি না। আমি দীনবন্ধু বাবু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার কন্যা উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গৃহিণীর হুকুম অপেক্ষা করিতে-ছিলাম। দীনবন্ধু বাবুর স্ত্রী আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতেছিলেন, যথা, চা বানাইতে পারি কিনা, কাপড় কাচিতে পারি কিনা, জুতা ব্রুস্ করিতে পারি কিনা ইত্যাদি। আমি সমস্ত গুলিতেই 'আজ্ঞে হাঁ'র' ডিটো দিয়া যাইতে লাগিলাম। গৃহিণী আমাকে প্রাঙ্গনস্থিত এক রাশ বাসন দেখাইয়া বলিলেন, "এগুলি মেজে ফেল দিকি।" আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; প্রথম পরীক্ষাই এত কঠিন! আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া বাসনে হাত লাগাইতেই উষা বলিল, "চায়ের বাসনগুলি আগে মেজে দেও, তোমার নাম কি?"

"নবকান্ত।"

মনে করিলাম চাকুরী সার্থক, উষা প্রথমে নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছে। সেই উৎসাহে বাসনগুলি মাজিয়া উঠিলাম। পরদিন ভোরে উঠিয়া আমি ফটকের সামনে বসিয়াছিলাম, উষা ডাকিল, "নবকান্ত।" প্রথম ডাকটা আমার কাণে পৌঁছিল না, উষা দ্বিতীয়বার ডাকিল "নবকান্ত!" আমি চমকিয়া উঠিয়া, 'আজ্ঞে' বলিয়া ভিতরে গেলাম। উষা আমার হাতে একটা চায়ের পেয়ালা দিয়া বলিল, "বাবুকে

উপরে দিয়ে এসো।" গত রাত্রে কক্ষস্থিত অস্পষ্ট আলোকে উঁহার মুখখানা তত ভালরকম দেখিতে পাইয়াছিলাম না; প্রভাত সূর্য্যের হেমরাগরঞ্জিত উঁহার মুখখানা দেখিয়া আমার চিত্ত যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যেন বিকল বোধ হইতেছিল। আমার হাত হইতে পেয়ালা পড়িয়া গেল। উঁনি খুব যন্ত্রণাসূচক একটা 'উহু' করিয়া কতকটা সরিয়া গিয়া বসিয়া পা খানা দু'হাতে চাপিয়া ধরিল। আমি চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম, কি করিব ঠিক করিতে না পারিয়া, ঘরের কোণে একটা হাঁড়ীতে এক হাঁড়ী আল্‌কাতরা ছিল তাহার সমস্তটা উঁহার পায়ে ঢালিয়া দিলাম। "দূর হ' গাধা" বলিয়া উঁনি স্থানান্তরে চলিয়া গেল; আমি নেগাৎ বোকার মত এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলাম। উঁনি উঠিয়া দেয়ালে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গৃহিণীর কাছে গেল; আমি ভাবিতেছিলাম, এই বেলা চম্পট দেই, কিন্তু তখনি ডাক পড়িল, "নবকান্ত!" আমি চোরের মত ধীর পদে গৃহিণীর সম্মুখে হাজির হইলাম; গৃহিণী—"করেছিস্ কি সেকুব" ইত্যাদি বলিয়া আমাকে গালাগালি করিলেন, আমি নতশিরে সব হজম করিয়া ফেলিলাম। মনে মনে বলিতেছিলাম, হায় Bengal Secretariat, তোমার Registrar সাহেবের দুর্দ্দশা দেখ। আর ভাবিতেছিলাম মট্‌কার কি অপার মহিমা!

বেলা নয় টার সময় শুনিলাম কর্ত্তা মথুরা বেড়াইতে যাইবেন, সঙ্গে আমাকেও যাইতে হইবে। আমি দীনবন্ধু বাবুর দেরাজ হইতে একখানা খাম ও চিঠির কাগজ চুরি করিয়া অখিলকে একখানা পত্র দিলাম যে কোন বন্ধুর সহিত মথুরা বেড়াইতে চলিলাম, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরিব। বাসা হইতে রওনা হইবার সময় উঁনি আমাকে সতর্ক করিয়া দিল যে ঐ দিনকার প্রাতের কাণ্ডের মত আর একটা বিভ্রাট না করিয়া বসি। আমি গাড়ীতে উঠিবার সময় একবার উঁহার ভরা যৌবনাক্রান্ত অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানা প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। দ্বিতীয় দিন আমি দীনবন্ধু বাবুসহ মথুরায় পৌছিলাম। মথুরায় কয়েকদিন থাকিয়া শিরঃপীড়া ক্রমশঃ অনেকটা উপশম হইতেছে দেখিয়া দীনবন্ধু বাবু ঠিক করিলেন সেখানে আরো কতকদিন অবস্থান করিবেন। কিন্তু অষ্টম দিবস বেলা ১২টার সময় তার যোগে উঁহার ভয়ানক পীড়ার সংবাদ পাইয়া আমরা ঐ দিন কটক অভিমুখে রওনা হইলাম। যেদিন রাত্রিতে আমরা কটক পৌছিলাম সে দিন উঁহার অবস্থা এত খারাপ হইয়া গিয়াছে যে ডাক্তারগণ প্রাণের আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সিভিল সার্জ্জন তখনও বাসায় উপস্থিত ছিলেন; রমেন বাবু, এসিস্‌টেণ্ট সার্জ্জন, দীনবন্ধু বাবুকে বলিতেছিলেন যে রক্তাভাবে রোগিনী অত তাড়াতাড়ি খিন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—তখন একমাত্র উপায় ছিল, Transfusion of blood দীনবন্ধু বাবুর তখন মাথার স্থিরতা বিন্দুমাত্রও ছিল না; কেবল মাত্র উদাস আর্দ্র কণ্ঠে "আমার উঁহাকে বাঁচান্" বলিয়া রমেন বাবুর দু'টি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিলেন। রমেন বাবু দীনবন্ধু বাবুকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "কি করবো, এখন আর উপায় নেই; একমাত্র Transfusion of blood ছাড়া আর অন্য চিকিৎসা নেই, কিন্তু সে blood কোথা হ'তে পাই? আপনার যে শরীর তা'তে কিছু হ'বার যো নেই; আপনার স্ত্রীরও প্রায় তাই; কি করি, দেখি ডাক্তার সাহেব বোল্‌ছেন, একবার সেলাইন্ দিয়ে দেখি।" রমেন বাবু দীনবন্ধু বাবুকে তদবস্থায় রাখিয়া ফটকের দিকে যাইতেছিলেন; আমি তাঁহাকে যাইয়া বলিলাম "ডাক্তার বাবু, আমি রক্ত দিলে হয় না?" ডাক্তার বাবু আমার দিকে বিস্ময়পূর্ণ অথচ আনন্দোৎফুল্ল চোখে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কোন ব্যারাম পীড়া নেইত?" আমি বেশ দৃঢ় স্পষ্ট স্বরে বলিলাম "আজ্ঞে না।" "আচ্ছা এসো" বলিয়া ডাক্তার বাবু আমাকে বসিবার ঘরে নিয়া সিভিল সার্জ্জনকে বলিলেন যে আমি রক্ত দিতে স্বীকৃত হইয়াছি এবং ডাক্তার সাহেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রমেন বাবু পরীক্ষার্থে আমার রক্ত লইলেন। রাত্রিতে পরিচর্য্যার্থে রহিলেন ডাক্তার বাবুর এসিস্‌টেণ্ট একটি যুবক এবং গৃহিণী। এদিকে দীনবন্ধু বাবুর মাথার যন্ত্রনা আরো বাড়িয়া গেল; আমি যথা সাধ্য সেবা যত্ন করিতেছিলাম এবং গৃহিণীও আসিয়া মাঝে মাঝে স্বামীর খবর লইয়া যাইতেছিলেন। সে রাত্রি ঐ ভাবেই কাটিল। পর দিন বেলা ৬॥০টার সময় ডাক্তার সাহেব রমেন বাবুকে সঙ্গে করিয়া বহু যন্ত্রাদিসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারগণ উঁহার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া কি বলেন এবং আমার রক্ত গ্রাহ্য হইবে কিনা

জানিবার জন্য আমার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। কতক্ষণ পর গৃহিণী আসিয়া আমাকে নীচে যাইতে বলিলেন ; তিনি ততক্ষণ কর্ত্তার কাছে থাকিবেন। আমি দ্রুত পদে নীচে আসিতেই রমেন বাবু আমাকে একটা ইজি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিতে বলিলেন। উষার পার্শ্বে আর একখানা বিছানা ছিল, ডাক্তার সাহেব আমাকে তাহার উপর শুইতে বলিলেন। আমি শুইলে ডাক্তার সাহেব নিজে আমাকে ক্লোরফরম দিতে লাগিলেন, রমেন বাবু নাড়ী দেখিতেছিলেন।

(৪)

প্রায় আধ ঘণ্টা পর যখন আমাকে জ্ঞান করানো হইল তখন শুনিলাম উষা অতি ক্ষীণকণ্ঠে জল চাহিতেছে। রমেন বাবুর মুখ খানা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নবাই, তোমার কেমন বোধ হচ্চে ?"

"একটু দুর্ব্বল বোধ কচ্ছি।"

"কিছু খাবে ?"

"আজ্ঞে না, উনি কেমন ?"

"খুব ভাল ; তুমিই ত ওঁর প্রাণ দিলে।" ডাক্তার বাবুর কথাগুলি শুনিয়া আমার মনে হইতেছিল, এক লম্ফে যাইয়া উষার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার মলিন মুখ খানা দেখি, কিন্তু শরীর এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে একবার উঠিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া উঠিতে পারিলাম না। পরদিন আমার অনেকটা ভাল বোধ হইল, আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। উষাও সেদিন অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল ছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা উষার অবস্থা অনেকটা ভাল জানিয়া দীনবন্ধুবাবু প্রকৃতিস্থ হইয়া যখন নীচে আসিলেন তখন আমাকে শায়িত দেখিয়া তাঁহার নেত্রপ্রান্তে অশ্রুরাশি উছলিয়া উঠিল। আমার মাথায় হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নবা, তুই পূর্ব্ব জন্মে আমার পরম সুহৃদ ছিলি।" সেদিন দীনবন্ধু বাবুর কপোল-বাহী তপ্তঅশ্রু আমার মাথায় পড়িয়া আমার জীবনকে ধন্য করিয়া দিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমি বেশ সারিয়া উঠিলাম; আমি অনায়াসে ঘরের বাহির হইয়া বেড়াইতে পারিতাম। উষাও ক্রমশঃ ভাল হইতেছিল, পঞ্চম দিবসে উষাকে অন্নপথ্য দেওয়া হইল। একদিন সন্ধ্যাগমে যখন দিবালোক দিগন্তে মিশিয়া যাইতেছিল, আমি চিরাভ্যস্ত ভৃত্যের মত কর্ত্তার বিছানা করিতেছিলাম, উষা একখানা ইনভ্যালিড্ চেয়ারে শায়িত ছিল, আমার দিকে একটি কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল "নবা, তুই যে আমার জন্য রক্ত দিতে গেলি, যদি তুই মরে যেতিস্ ?" প্রত্যুত্তরে আমার মনে হইতেছিল বলিয়া ফেলি—তোমার জন্য জীবন দিতেও স্বীকৃত—প্রকাশ্যে বলিলাম, "মরে গেলে যেতাম ?"

"তুই বিয়ে করিস্ নি ?"

স্বগত বলিতেছিলাম,—এবার করিব। প্রকাশ্যে বলিলাম "না।"

"তোর মা বাপ্ নেই ?"

"আছে।"

"হতভাগা।"

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আমি পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিয়া আসিয়া দেখিলাম গৃহিণী ঘরের বাহির হইতেছেন। আমাকে দেখিয়া অতি আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে নবু ?" আমি অন্য কোন জবাব না খুঁজিয়া পাওয়াতে বলিলাম, "আজ্ঞে না, দেখতে এলাম বাবু উঠেছেন কি না।" গৃহিণী নীচে চলিয়া গেলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উষা তখনো নিদ্রিতা; তাহার রোগ ক্লিষ্ট মুখে স্বপ্নাবেশে হাসির রেখাগুলি শীর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ে মিলিয়া যাইতেছিল ; আমি অতি কষ্টে একটা লোভ সম্বরণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে রাস্তায় পড়িয়া দ্রুত চলিয়া আসিলাম। তখন পুরী পেসেঞ্জার প্লাটফরমে দাঁড়াইয়াছিল ; আমি গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম, অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অখিলের বাসায় যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন অখিল বাসায় ছিল না ; নচেৎ খালি পায়ে আসার দরুন একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইত,—হয়ত একটা মিথ্যা কথা বলিয়া নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করিতাম,—যথা, গাড়ীতে চুরি গিয়াছে।

অখিল বাসায় আসিয়া আমার কাতর চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—উপস্থিত বুদ্ধিতে বলিয়া ফেলিলাম, জ্বর হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমুদ্রের পারে বসিয়া অস্তগামী সূর্য্যের সমুদ্রবক্ষে সংস্র উপাধানযুক্ত রক্তশয্যা দেখিতেছিলাম উষার সুন্দর মুখখানা আমার স্মৃতিপথে যেন অযাচিত ভাবে স্বতঃ শত মাধুরী স্নাতঃ হইয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল ; প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি উষার মধুর স্মৃতির কাছে সুদূরপরাহত

হইয়া যাইতেছিল। আমি অখিলকে একটা ছোট্ট রকম ভূমিকা করিয়া আদ্যোপান্ত বলিলাম। অখিল সমস্ত শুনিয়া "তবেরে হতভাগা" বলিয়া, আমার পৃষ্ঠদেশে বিরাট এক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, "দাঁড়া, তোর কিছু ভাবতে হ'বে না আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" কথাটা আমাদের দু'জনার মধ্যেই সম্প্রতি চাপা রহিল। মাসাধিক কাল পুরীতে অতিবাহিত করিয়া আমি কাঁঠালপাড়ার বাড়ী আসিলাম।

(৫)

সেদিন বুধবার; আমি আপিস্ হইতে বাড়ী ফিরিয়া একেবারে উপরে চলিয়া যাইতেছিলাম, দেখিলাম নীচে বসিবার ঘরে আমার পিতৃদেবের সহিত বসিয়া একজন আগন্তুক কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমি গলফাঁসটা খুলিতেছিলাম এমন সময় ভৃত্য আসিয়া খবর দিল বাবা আমাকে ডাকিতেছেন। আমি ক্ষিপ্রপদে চলিয়া আসিয়া চোগা চাপ্‌কান্ পরিহিত দীনবন্ধু বাবুকে তথায় দেখিয়া বেশ একটু থম্‌কিয়া গেলাম। দীনবন্ধু বাবু আমার প্রতি একটা অতি সরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার চাহিলেন। তাঁহার চাহনির ভাবে বুঝিলাম তিনি আমার চেহারার মধ্যে নবার সাদৃশ্য, গোঁপ অভাবে এবং চশমা থাকা গতিকে, অনুমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই, তদুপরি বেশ ভূষার পারিপাট্যে আমাকে নবা বলিয়া চিনিতে না পারাটাই খুব সম্ভব। সম্বন্ধের প্রস্তাব হইতেছে শুনিয়া আমি অতি সহজেই বুঝিলাম ইহা অখিলের কাণ্ড, আমি অতি ধীর ও শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম; ক্ষণেক পর বাবা বলিলেন "যাও কাপড় ছাড় গিয়ে।" রাত্রিতে শুনিলাম পরদিন বাবা দীনবন্ধু বাবুর কন্যাকে দেখিতে যাইবেন। আমি অখিলকে Thanks (ধন্যবাদ) দিয়া এক পত্র লিখিলাম। দুই দিনের মধ্যে সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক হইল।

যথা সময়ে কলিকাতায় খুব সমারোহের সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর প্রায় মাসাবধিকাল পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিয়া উষা আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে আসিল। কয়েকদিন পর আমাদের পরিবারের অন্যান্য সকলেই কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে গেলেন; কলিকাতার বাড়ীতে রহিলাম আমি এবং উষা। একদিন সন্ধ্যার পর পীস্ কোম্পানী হইতে আনিত এক জোড়া গোঁপ পরিধান করিয়া এবং যথাযোগ্য পোষাক প'রিয়া বেমালুম নবকান্ত সাজিয়া আমার ড্রেসরুম্ হইতে বাহির হইয়া শোবার ঘরে যেখানে উষা বসিয়া আলমারীর জিনিষ পত্র সাজাইতেছিল, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইয়া একটা কাসি দিতেই উষা আমার দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হাঁরে, নবা যে; কোত্থেকে এলি?" আমি স্বর একটু বিকৃত করিয়া বলিলাম, "আমাকে মনে আছে?" "তোকে মনে নেই, তুই যে আমার প্রাণ দিয়েছিলি," একটা ভূমিকা ধরণের কিছু করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া অনভিজ্ঞ প্রণয়ীর মত আমি একেবারেই বলিয়া ফেলিলাম, "তা হ'লে আমি তোমার প্রাণেশ্বর?" উষা কোপাবিষ্টা হইয়া আমার দিকে একটা খুব বড় রকমের ভ্রূকুটি করিল। আমি পুনরায় বলিলাম "কেমন, তা নয়?"

"দূর হ' হতভাগা, বে'রো এখান থেকে!"

"কেন রাগ কচ্ছো; শুধু একটিবার মাত্র আমাকে প্রাণেশ্বর বল," বলিয়াই দু'হাত বাড়াইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম; উষা পিছন দিকে সরিতে সরিতে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বেয়ারা!" আমি যেন খুব ভয় পাইয়াছি, এমন একটা ভাব দেখাইয়া একটু পিছনে সরিয়া গিয়া গোঁপটা টানিয়া লইয়া বলিলাম, "বেয়ারাকে আর ডেকো না, আমি যাচ্ছি।" দেয়ালের গায়ে বাতি ছিল, তাহার আলোটা আমার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, উষা বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "একি, তুমি?" আমি একটু হাসিয়া চসমাটা নাকে বসাইয়া সমস্ত খুলিয়া বলিলাম এবং উষার সন্দেহ দূর করিবার জন্য হাতের দাগটা দেখাইয়া বলিলাম, "উষা, নবকান্তের প্রতিদান গলাধাক্কা?" উষা ছুটিয়া আমার বুকের উপর পড়িয়া সেই পুরাতন প্রচলিত প্রথায় আমার ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিয়া দিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঈষ্টলীন

সপ্তম পরিচ্ছেদ। কর্ণীবিবির গৃহস্থালী

জুলাই মাস, আকাশে মেঘ নাই, সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। গির্জ্জার ঘড়ীতে আটটা বাজিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গির্জ্জার ঘণ্টা ঢং ঢং ঢুং ঢাং শব্দে ঘোষণা করিল, আজ রবিবার, ভজনায় সকলে প্রস্তুত হও! কর্ণীবিবি তাঁহার গৃহ হইতে দ্রুত বাহির হইলেন। সাধারণতঃ রবিবারে সকালেই তিনি দিনের মত সাজসজ্জা করিয়া বাহির হন, কিন্তু আজ অতি মোটা রকম একটা ঘরোয়া পোষাক মাত্র তাঁহার পরিধানে। এই পোষাকটা আবার তাঁহার মার আমলের— একেবারেই সেকেলে। তবে কর্ণীবিবি একালের হাল্‌কা ফ্যাসানকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া চলিতেন। এই

পোষাকে ইহাও বুঝা যাইতেছিল গৃহস্থালীর অনেক কাজ কর্ণীবিবির এখনও বাকী. তাহা না সারিয়া রবিবারের পোষাকী বেশ তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। নিজের গৃহ হইতে বাহির হইয়া সোজা সামনের বারান্দাটা পার হইয়া কর্ণীবিবি আর্কিবাল্ডের ঘরের দরজায় এমন কয়েকটা ঘা দিলেন যে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ তাহাতে হইতে পারে। তেমনই উচ্চ গলা তুলিয়া ডাকিলেন, "আর্কিবাল্ড! ওঠ—ওঠ!"

নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে গৃহ মধ্য হইতে উত্তর হইল, "উঠিব! কেন? এখনই কেন? বেলা যে মোটে আটটা!"

"আটটা হউক কি ছটাই হউক এখনই তোমাকে উঠিতে হইবে। ব্রেক্ ফাষ্ট (প্রাতরাশ) তৈরী। এখনই সারিয়া ফেলিতে হইবে। বড় গোলমালে পড়িয়াছি।"

বলিয়াই কর্ণীবিবি নীচে নামিয়া ব্রেক্‌ফাষ্টের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরটি বেশ ফিট্ ফাট্ সাজান আছে, ব্রেক্‌ফাষ্ট আসিলেই হয় গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে কর্ণী-বিবির রসনা যেমন চলিত, চক্ষুর সতর্ক দৃষ্টিও তেমনই তীব্র ভাবে সর্ব্বত্র ফিরিত, এতটুকু ক্রটিও তাহা এড়াইত না। জানালাগুলি সব খোলা, নিখুঁৎ ধবধবে পর্দ্দাগুলি মৃদু বাতাসে দুলিতেছে,—চারিদিকে তিনি চাহিলেন, চক্ষে পড়িল একটু ধূলা একস্থানে রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ রন্ধনশালায় গিয়া উপস্থিত হইলেন,—জয়িস্ কতখানি শূকরের মাংস সেঁকিতেছিল তীব্রস্বরে কর্ণীবিবি কহিলেন, "কাজে এত গাফিলি কেন তোমার জয়িস্? ব্রেক্‌ফাষ্টের ঘর ঝাঁট দেও নাই?"

"ঝাঁট দিই নাই! ওমা সেকি! আপনার চোখ কোথায় ছিল মেম সাহেব?"

"সেই ধূলার উপরে! যাও, তোমারও চোখ দুটা নিয়া তার উপরে ফেল দেখিতে পাইবে,—আর ঝাঁটাও লইয়া যাইও। অমন ময়লা ঘরে আমি বসিতে পারি না। আজ সকালে একটু বেশী কাজের চাপ পড়িয়াছে, আর অমনই তুমি গা ছাড়িয়া দিয়াছ!"

কথাটা একেবারেই মিথ্যা, জয়িসের কাজেই একটু রাগ হইল, সে উত্তর করিল "বলেন কি মেম সাহেব? আমি কি বসিয়া আছি? সেই পাঁচটায় উঠিয়াছি, যে দুজনের কাজ সব সময় মত বেশ সারিয়া ফেলিতে পারি, পাছে আপনি কোনও ক্রটি ধরেন। ব্রেক্‌ফাষ্ট ঘর রোজই আমি খুব সাবধানে ঝাঁট দিই, আজও দিয়াছি। তবে আপনি বলিয়াছিলেন, জানালা সব খুলিয়া রাখিও; তা রাস্তার ধূলা ত একটু উড়িয়া আসিবেই।"

জয়িস্ ঝাঁটা লইয়া বাহির হইল। তখন মোটা মোটা ভার ভারিক্কা মাতব্বরের মত একটি পরিচারক আসিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

"কি পিটার? কি চাও?"

"সাহেব কামাইবেন,—একটু গরম জল, মেম সাহেব।"

কর্ণীবিবি উত্তর করিলেন, "না এখন সে সব হইবে না। তাঁকে গিয়া বল, খাবার তৈরী, এর পর কামাইবেন।"

পিটার চলিয়া গেল। কর্ণীবিবি গিয়া ভ্রাতার অপেক্ষায় ব্রেক্‌ফাষ্ট ঘরে বসিলেন।

আগের দিন রাত্রিতে পাচিকার সঙ্গে কর্ণীবিবি বড় ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছিলেন। পাচিকাটিরও মেজাজ ছিল কড়া, সমান সমান উত্তর সে করিল। কর্ণীবিবি তখনই তাকে এক মাসের নোটিস্ * দিলেন। পাচিকাও উত্তর করিল, "একমাস নোটিস্ লাগিবে না। বেতন আমি চাই না, এখনই আমি চলিলাম।" বলিয়াই সে অমনই বাহির হইয়া গেল। কর্ণীবিবিও বলিলেন, মাগী গেল না, বাড়ীর বালাই দূর হইল! রবিবারে চাকর চাকরাণী, কুলীমজুর গরু ঘোড়া কাহাকেও খাটাইবে না, খৃষ্ট ধর্ম্মের এই আদেশ আছে। কর্ণীবিবির তাই কড়া পণ ছিল, রবিবারে চাকর বাকরদের নিতান্ত যাহা না করিলে নয়, তার বেশী কোনও কাজ করাইবেন না। রবিবারের আহার্য্য শনিবারে রাত্রিতেই যতদূর প্রস্তুত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তার ব্যবস্থা তিনি করিতেন। কি কি খাবার এই ভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পাচিকাকে তিনি আদেশ দেন। পাচিকা তা করে নাই, তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া বলে গিয়াছে। কর্ণীবিবি তাহা ধরিয়া ফেলেন, আর তাই লইয়াই ঝগড়া বাধে। একে কথা শোনে নাই, তাহাতে আবার মুখে মুখে সমান তেজে জবাব করিয়াছে, ভৃত্যাদির পক্ষে এতদূর ধৃষ্টতা তিনি কখনও মার্জ্জনা করিতে পারিতেন না। পাচিকা গিয়াছে, আবার ঘরের অন্য সব কাজ যে করিত, সেই দাসীটিও একদিনের ছুটী নিয়া কোথায় গিয়াছে। কাজেই সংসারের কাজকর্ম্মের বড় একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিয়াছে, নিজের হাতেই সব সামালাইয়া নিতে হইবে।

গরমজল না পাইয়া ঠাণ্ডা জলেই ক্ষৌর কর্ম্মাদি সমাধা করিয়া যথাযোগ্য পরিচ্ছন্ন বেশেই কার্লাইল ব্রেক ফাষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলেন,—অপরিচ্ছন্নভাবে লোকসমক্ষে বাহির হওয়া তিনি নিতান্তই অপছন্দ করিতেন। ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আটটায়ই কেন আজ ব্রেকফাষ্ট করিতে হইবে?"

ভগ্নী উত্তর করিলেন "অনেক কাজ যে আমার আছে। সকাল সকাল ব্রেকফাষ্ট না হইলে গির্জ্জায় যাইবার আগে সব সারিয়া উঠিতে পারিব না। রাঁধুনীটা চলিয়া গিয়াছে।"

"চলিয়া গিয়াছে! কেন?"

ঝগড়ার কথা ভ্রাতাকে সব বলিয়া কর্ণীবিবি শেষে

* ভৃত্যাদিকে বিদায় করিয়া দিতে হইলে, এক মাসের নোটিস্ দিতে হয়, অথবা একমাসের বেতন দিয়া বিদায় করিয়া দিতে হয়। ভৃত্যেরাও একমাসের নোটিস্ না দিয়া মনিবকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না, গেলে পাওনা বেতন কাটা যায়।

কহিলেন, "রান্না বান্না সব ত আজ আমাকেই করিয়া রাখিতে হইবে।"

"কেন, জয়িস্ পারে না ?"

"জয়িস্ ত ভারী রান্না জানে! তার সে রান্না আমার টেবিলে চলিবে না। বার্বারা আবার আজ এখানে আসিবে। বাপ তাকে কাল খুব গালাগালি দিয়াছে। আমাকে বলিল, তার মন ভাল না, দিনটা আজ এখানে কাটাইতে পারিলে বাঁচে। তাই বলিয়াছি আসিতে। কি হইয়াছিল জান ?"

"না, কি ?"

"কতগুলি কি বাহারের সাজপোষাক সে ফরমাস দিয়াছিল। বাড়ী আসিতেই জাষ্টিসের চক্ষে তা পড়ে! আর কোথায় যাইবে ? যা মুখে আসিল, তাই বলিয়া গালি দিলেন। খুব হইয়াছে! অত ঠমক কেন বাপু তোর! ঐ শুনিতেছ কেমন ঘণ্টা বাজিতেছে ?"

কোনও বিবাহে কি অন্য উৎসবে গির্জ্জার ঘণ্টা যেমন বাজে, সেণ্টজুডের গির্জ্জা হইতে তেমনই জাঁকাল ঘণ্টার ধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছিল। কার্লাইল চমকিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, বিস্মিতভাবে কহিলেন "কেন, কি হইয়াছে ? আজ উৎসব কিসের ?"

কর্ণেলিয়া উত্তর করিলেন, "আর্কিবাল্ড, তোমার বয়সে আমরা অনেক বেশী চালাক চতুর ছিলাম। জান না লর্ড মণ্টসেভার্ণ আসিয়াছেন, তাঁর সম্মানের জন্যই সেণ্টজুডের গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিতেছে।"

"ওহো! তাই বটে! ঈষ্টলীনের পিউ * হইল সেণ্টজুডের গির্জ্জায়।"

ঈষ্টলীন এখন কার্লাইলের সম্পত্তি, অতি গোপনেই তিনি ইহা ক্রয় করিয়াছিলেন। এখনও কথাটা বাহিরে প্রকাশ হয় নাই। পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে এই আশঙ্কায়, অথবা পৈতৃকগৃহের প্রতি মমতাবশতঃ লর্ড মণ্টসেভার্ণ এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে শেষ দুই এক সপ্তাহ তিনি আসিয়া এখানে থাকিবেন। কার্লাইল ইহাতে সম্মত হন। কন্যা এবং পরিজনবর্গসহ লর্ডমণ্টসেভার্ণ ঠিক পূর্ব্বদিন ঈষ্টলীনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

লর্ডমণ্টসেভার্ণের আগমনে ওয়েষ্টলীন ভরিয়া যেন একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বড়লোকের বাসগা বলিয়া ওয়েষ্টলীনের একটা গর্ব্ব ছিল। অনেকেরই মনে হইল লর্ড সাহেব বুঝি স্থায়ী ভাবেই এখন ঈষ্টলীনে বসতি করিবেন,—নারীদের মধ্যে সাজ পোষাকেরও প্রচুর আড়ম্বর আরম্ভ হইল। কেবল বার্বারা হেয়ারকে নয়, ওয়েষ্টলীনবাসিনী আরও অনেক যুবতীকেই পিতার কঠোর তাড়না এজন্য সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ব্রেকফাষ্ট হইল। ওবেলা ডিনারের জন্য ভাল যা কিছু রাঁধিতে হইবে যাহা নাকি জয়িসের হাতে ভরসা করিয়া দেওয়া যায় না, সব নিজে রাঁধিয়া গুছাইয়া রাখিয়া যথাসময়ে কর্ণীবিবি গির্জ্জায় যাইবার জন্য যথাযোগ্য পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইবেন। বরাবরই তিনি সাধাসিধা রকম অথচ পরিচ্ছন্ন পোষাকই পরিতেন, আজও তাই পরিলেন। লর্ড মণ্টসেভার্ণ আসিয়াছেন বলিয়া বেশ ভূষায় কোনও অতিরিক্ত আড়ম্বর যে তিনি করিবেন না, একথা বলাই বাহুল্য।

ভ্রাতার সঙ্গে কর্ণীবিবি কেবল বাড়ীর বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়াছেন, দেখিলেন বার্বারা অতি জাঁকাল সাজ সজ্জায় যেন রাস্তা আলো করিয়া এইদিকে আসিতেছে। মাথায় গোলাপী রেশমী ছাতি, তার নীচে গোলাপী টুপী, টুপীর পিছনে লম্বা একটা গোলাপী পালকের ছড়, ফুলতোলা ধূসর রঙ্গের গাউন, আর হাতে সাদা দস্তানা, বার্বারা সাজ সজ্জার সকল বাহার ক্রমে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল।

"বোকা মেয়ের ঠাট দেখনা!"

কর্ণীবিবি বার্বারার দিকে চাহিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। বার্বারার কাণে অবশ্য এই মন্তব্য প্রবেশ করিল না—যেন নিজের গরবেই ধীরে ধীরে সে আসিয়া ইঁহাদের সম্মুখীন হইল।

কর্ণীবিবি বলিয়া উঠিলেন "বাহাবা বার্বারা! বাপ গালি দিয়াছে সাধে ? সূর্য্যের আলোকে ও যে কালো করিয়া তুলিয়াছে তোমার পোষাকের ঝকঝকে বাহারে!"

বার্বারা যেন একটু লজ্জা পাইয়া উত্তর করিল, "আমার চেয়েও কত বেশী বাহার করিয়া কত জনে আজ গির্জ্জায় যাইতেছে। ওয়েষ্টলীনের মেয়েরা সব যেন আজ পণ করিয়াছে লেডী ইজাবেলকেও পোষাকের বাহারে ছাড়াইয়া উঠিবে। পোষাকের দোকানে আজ যদি একবার গিয়া দেখিতেন মিস্ কার্লাইল!"

"বটে! যার ঘরে যত পোষাকের বাহার আছে, সব বুঝি আজ গির্জ্জায় গিয়া জমাট হইবে ?" একটু হাসিয়া কার্লাইল এই কথা বলিলেন।

বার্বারা উত্তর করিল, "তা ত কাজেই! লর্ড সাহেব আর তাঁর মেয়ে যে আজ গির্জ্জায় আসিবেন।"

"ধর, তিনি যদি ঠিক পেকমতোলা ময়ুরটি সাজিয়া নাই আসেন ?"

"দামী পোষাকের কথা যদি বল তবে নিশ্চয়ই তা আসিবেন।"

"যদি তিনি আদবে গির্জ্জায় নাই আসেন ? হায় হায়! এই সব টুপী আর পালক সব বৃথাই আজ হইবে।"—

কার্লাইল হাসিয়া উঠিলেন। কর্ণীবিবি কহিলেন, যাই বল বার্বারা, তাঁহারাই বা আমাদের কে, আমরাই বা তাঁহাদের কে ? কখনও হয়ত দেখাসাক্ষাৎও হইবে না।

---

* সম্ভ্রান্ত পরিবারদের জন্য গির্জ্জার, রেলিংএ ঘেরা পৃথক পৃথক আসনের বন্দোবস্ত থাকে। এগুলিকে পিউ (Pew) বলে।

ওয়েষ্টলীনের সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ আমরা গায় পড়িয়া আমাদের ঈষ্টলীনে ঘেঁসা ভাল দেখায় না। লর্ড সাহেব আর লেডী ইজাবেলও সেটা পছন্দ কখনও করিতে পারেন না।"

বার্বারা একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে উত্তর করিল, "বাবাও তাই বলিলেন। টুপীটা কাল তাঁর চক্ষে পড়ে, আমি একটা ওজুহাত দেখাইয়া বলিলাম, তাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে ত যাইতে হইবে, তাই টুপীটা কিনিয়াছি। তিনি ধমকাইয়া বলিলেন, ওঁরা ত আর যেমন তেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদার নয় ? ওয়েষ্টলীনের সাধারণ গৃহস্থভদ্রলোকরা তাঁদের বাড়ীতে দেখা করিতে যাইবে, এতটা ভরসা আমি কিসে করিলাম ? টুপীর সঙ্গে এই পালকটা দেখিয়াই তিনি আগুন হইয়া ওঠেন।"

"মাগো! কতখানি লম্বা দেখ না! যেন নিশান উড়িতেছে!"

ভ্রূকুটি করিয়া কর্ণীবিবি টুপীর সঙ্গে ঝুলান পালকটির দিকে চাহিলেন।

বার্বারা সেদিন কার্লাইলদের পিউতে গিয়াই বসিবে স্থির করিয়াছিল। পিতার কাছে গিয়া বসিতে তাহার ভয় করিতেছিল। কি জানি তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। হয়ত উপাসনার সময় চুপিচুপি ছুরী দিয়া পালকটি তিনি কাটিয়া ফেলিবেন, টুপীটি একেবারে মাটি হইয়া যাইবে।

কেবল গিয়া তাঁহারা বসিয়াছেন, তখন অপরিচিত প্রবীণ-বয়স্ক একটি ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গে একটি যুবতী গির্জ্জায় প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকটির ললাট কুটিল রেখায় কুঞ্চিত, কেশ শুভ্র, আর যেন পায়ের ব্যাথায় একটু খোঁড়াইয়া হাটিতে-ছেন! বার্বারা ব্যগ্রভাবে এদিক ওদিক একবার চাহিল। কই, তাঁরা কই! ইঁহারা কিছু লর্ড মণ্টসেভার্ণ আর লেডী ইজাবেল হইতেই পারেন না। মেয়েটির পোষাক যে একেবারে সাদাসিধা রকম। একটা মলমলের ছিটের গাউন, আর মাথায় সাধারণ মত একটা খড়ের টুপী মাত্র। রবিবারে ছাড়া অন্য কোনও দিন ঘরে এক কর্ণীবিবির মাথায়ই অমন একটা টুপী দেখা যাইতে পারে। তবে এই জুলাই মাসের গরম দিনের পক্ষে ঐ পোষাকটি বেশ আরামের পোষাকই বটে। কিন্তু ওই যে—গির্জ্জার চোপদার যে তাঁহাদের নিয়া ঈষ্টলীনের পিউতে বসাইয়া দিল!

বার্বারা কর্ণীবিবির কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কারা ?"

"লর্ড সাহেব আর লেডী ইজাবেল!"

বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রে বার্বারা কর্ণীবিবির দিকে চাহিল, কহিল, "ওমা, ওই লেডী ইজাবেল! রেশমী পোষাক নাই, পালক নাই,—জাঁকাল কিছুই যে নাই! গির্জ্জায় যত মেয়ে আসিয়াছে, সবার চেয়ে যে লেডী ইজাবেলের পোষাক সাদাসিধা!"

"হাঁ, জাঁকাল পোষাকে যারা বাহার করিয়া আসিয়াছে, এই ধর যেমন তুমি একজন, তা তোমাদের সব পোষাকের চেয়ে অনেক বেশী সাদাসিধা বই কি ? লর্ড সাহেবের চেহারা অনেক খারাপ হইয়া গিয়াছে। আর ওই লেডী ইজাবেল, কি সুন্দর মিষ্ট চোক্ দুটি ওর! ওই চোক্ দুটি একবার যে দেখিয়াছে, সেই ওঁকে যেখানে যতদিন পরেই দেখুক, অমনই চিনিবে। ওঁর মার চোক-দুটিও ঠিক ওই রকম ছিল।"

সত্যই, আহা, লেডী ইজাবেলের ওই চক্ষু দুটি— কেমন একটা বিষাদের ম্লানতার মধ্যে কি অপূর্ব্ব মাধুরী তার—যে একবার দেখিয়াছে, সে আর তাহা ভুলিতে পারিবে না! বার্বারা হেয়ার বার বার সেই চক্ষু দুটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল! মনে মনে কহিল, "আহা, কি সুন্দর উনি! তার ওই পোষাকটি—হাঁ, সাদাসিধা হইলেই ও সম্ভ্রান্তমহিলারই যোগ্য বটে! ছি! নিশানের মত লম্বা এই লালপালকের ছড়টা কেন যে আমি পরিয়া আসিয়াছি! আর সবাই আমরা কি বিশ্রী জাঁক করিয়াই যে আসিয়াছি! না জানি উনি কিই মনে করিতেছেন আমাদের!"

ভজনা হইল,—সকলে বাহির হইলেন। লর্ড সাহেব লেডী ইজাবেলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজে উঠিতে যাইবেন, তখন কার্লাইলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন,—ঈষ্টলীন যে কিনিতে পারে মফঃস্বলের উকীল হইলেও সমানভাবে সামাজিক আপ্যায়ন তাঁহাকে করা যায় বই কি ?

কার্লাইল লর্ড সাহেবের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া টুপীটি খুলিয়া লেডী ইজাবেলের দিকে চাহিলেন। লেডী ইজাবেল মধুর হাসিয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন।

লর্ডসাহেব কহিলেন, "আপনার সঙ্গে অনেক কথা আমার আছে। যদি বিশেষ কাজ কিছু না থাকে তবে আসুন,—দিনটা আজ আমাদের ওখানেই থাকিবেন।"

কার্লাইল একটু ফিরিয়া কহিলেন, "কর্ণেলিয়া আজ আর বাড়ীতে ডিনারে আমি আসিব না। লর্ডমণ্ট-সেভার্ণের বাড়ীতে যাইতেছি। আসি তবে বার্বারা ?"

কার্লাইল গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন,—গাড়ী চলিয়া গেল। দিনের আলো বেশ উজ্জ্বল আভায় সেদিন দীপ্তি পাইতেছিল, কিন্তু বার্বারার পক্ষে সব যেন অন্ধকার হইয়া গেল! আহা, সে যে আজ কার্লাইলদের বাড়ীতে থাকিবে, কিন্তু সে বাড়ীর আনন্দ ও আলোক—কার্লাইল যে চলিয়া গেল!

পথে যাইতে যাইতে বার্বারা জিজ্ঞাসা করিল, "লর্ডমণ্ট-সেভার্ণের সঙ্গে আর্কিবাল্ডের এত চেনা পরিচয় কিসে হইল ? লেডী ইজাবেলের সঙ্গেও ত বেশ চেনা শুনা হইয়া গিয়াছে।"

কর্ণীবিবি উত্তর করিলেন, "আর্কিবাল্ডের প্রায় সব

লোকের সঙ্গেই চেনাশুনা আছে। কয়মাস হইল আর্কিবাল্ড যে লণ্ডনে যায়, লর্ড সাহেবের সঙ্গে অনেক দেখাশুনা তার হয়। লেডী ইজাবেলের সঙ্গেও দুই চারিবার দেখা হইয়াছে। আহা, কি সুন্দর মুখখানি ওর!"

বাবারা কোনও মতে কর্ত্রীবিবির সঙ্গে দিনটা কাটাইয়া তাঁর নিজের হাতে রাঁধা মাংসপিষ্টকাদি গলাধঃকরণ করিয়া গৃহে ফিরিল।

ওদিকে ঈষ্টলীনে বড় আনন্দেই কার্লাইলের দিনটা কাটিল। একে ত লর্ডের গৃহে ভোজের আড়ম্বর, রাজভোগ্য খাদ্য পানীয়ের, সাজ সজ্জার অপূর্ব্ব বিভ্রম—তার উপরে টেবিলের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মূর্ত্তিমতী মাধুরী সেই লেডী ইজাবেল।

আহারাদির পর কার্লাইল লর্ড সাহেবের সঙ্গে তাঁহাদের বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন—সহসা যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া তিনি বসিলেন! পাশের একটি ঘর হইতে বড় মধুর সঙ্গীতধ্বনি যেন সকল স্থূল বৈষয়িক কোলাহলকে অভিভূত করিয়া বহিয়া আসিতেছিল!

লর্ড সাহেব কহিলেন,—"ইজাবেল গাহিতেছে। তার গানে এমন আশ্চর্য্য একটা মাধুরী আছে যা সচরাচর শোনা যায় না। তার গলার সুরটি বড় কোমল আর বড় মৃদু তাই বোধ হয় এত মিষ্ট লাগে। বেশী জমজমে গলা আমার কাণে তেমন মিঠা লাগে না। ইজাবেলের হাতের বাজনাও বড় কোমল আর বড় মৃদু—ঠিক যেমন ওর গলাটি! বাজনার সুরে আর গলার সুরে এমন চমৎকার বেশ মিলিয়া যায়! আপনি গান বাজনা কেমন ভাল বাসেন কার্লাইল সাহেব?"

কার্লাইল উত্তর করিলেন,—"ওস্তাদরা আমাকে গালি দেয়, বলে ভাল গানবাজনার সমজদারী মোটেই আমার নাই। কিন্তু এই গান—খুবই মিঠা লাগিতেছে! এমন আমার শুনি নাই!"

ইজাবেল একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি গান গাহিল।—কার্লাইল সেই সঙ্গীত সুরাপানে যেন বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে কত রাত্রি যে হইল, সেদিকে তাঁহার লক্ষ্যই কিছু ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেন্ সাহেবের কন্সার্ট।

কথা ছিল, দুই সপ্তাহ মাত্র লর্ড মণ্টসেভার্ণ ঈষ্টলীনে থাকিবেন। কিন্তু সেই দুই ঘণ্টা অতীত না হইতেই তাঁহার ব্যারাম অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িল। সদয় কার্লাইল তাঁহাকে জানাইলেন যতদিন প্রয়োজন ঈষ্টলীনেই তিনি থাকিতে পারেন, এজন্য কোনও কুণ্ঠা বোধ যেন না করেন। এই বাড়ে এই কমে,—এই ভাবে তিন মাস চলিয়া গেল, অক্টোবর মাস আসিয়া পড়িল। তখন ব্যারাম একটু কমিল, এবং লর্ড সাহেব শীঘ্রই ঈষ্টলীন ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। লর্ড সাহেব গৃহে প্রায় প্রত্যহই কার্লাইল আসিয়া হাসি গল্পে তাঁহাকে প্রমোদে রাখিতেন। একদিন না আসিলে, লর্ড সাহেবের মনে হইত, সন্ধ্যাটা বৃথায় গেল। এই লর্ড পরিবারে একেবারে একজন ঘরোয়া লোকের মতই কার্লাইল হইয়া উঠিলেন।

কেন্ নামে অতি দরিদ্র একজন সঙ্গীত কলাবিৎ ওয়েষ্টলীনে বাস করিত। ভজনার সময় সেণ্ট জুড গির্জ্জার অর্গিণ সে বাজাইত, আর কিছু কিছু সঙ্গীত শিক্ষা লোককে দিত। সাতটি সন্তানসহ পরিবার প্রতিপালন তার পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। দেনাও অনেক হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুতেই আর চলে না। তখন কেন্ একদিন একটা কন্সার্ট দিয়া কিছু টাকা তুলিতে পারে কিনা তাই ভাবিল। কিন্তু কে পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া তার কন্সার্ট শুনিতে আসিবে? দয়া করিয়া দুই একজন আসিতে পারে। কিন্তু তাতে কি লাভ হইবে? হয় ত খরচই উঠিবে না।

ইতি মধ্যে লেডী ইজাবেলের পিয়ানোকে সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য ঈষ্টলীনে কেনের ডাক পড়িল। এ সুযোগ কেন ছাড়িল না,—লেডী ইজাবেলকে তার দুঃখের কথা জানাইয়া প্রার্থনা করিল, তিনি তাঁহার পিতাও দয়া করিয়া তার কন্সার্টে একবার দেখা দিবেন। কেন্ জানিত, ইঁহারা যাইবেন এটা প্রচার করিতে পারিলে ওয়েষ্টলীন ভাঙ্গিয়া সব লোক তার কন্সার্টে আসিবে।

ইজাবেল তার পিতাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল। পিতা অগত্যা স্বীকার করিলেন, একবার গিয়া ঘুরিয়া আসিবেন।

বৈকালে কার্লাইল যখন আসিলেন, ইজাবেল কন্সার্টের কথা তুলিল।

কার্লাইল কহিলেন, "কেন্ বড় দুঃসাহস করিতেছে। লোকসান হইয়া শেষে আরও বিপদে সে পড়িবে!"

"কেন, তা কিসে আপনি মনে করেন?"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "কি জানেন লেডী ইজাবেল, ওয়েষ্টলীনে কারও গুণের আদর নাই, অন্ততঃ এখানকার কোনও লোকের। কেনের দুঃখের কথা সেই কতকাল ধরিয়া লোকে শুনিতেছে, এখন আর ওকথা কেউ মনেই বড় করে না। কেনের কন্সার্টে লোক আসিবে না। কিন্তু বিদেশী কোনও ওস্তাদ—কটমটে একটা নাম যা নাকি মুখে কারও বাহির হয় না—এই রকম কেহ তার দল লইয়া যদি ঘটা করিয়া আসিত, কন্সার্ট তার যেমনই হউক, ওয়েষ্টলীনের লোক দলে দলে গিয়া ভিড় করিত।"

"কেন্ কি বড় গরীব? খুবই গরীব?"

"খুবই গরীব! এক রকম খাইতে পায় না বলিলেই হয়।"

"খাইতে পায় না! সে কি! তার মানে—কি যথেষ্ট খাইতে পায় না?"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "কেবল রুটিটা হয়ত যথেষ্ট পায়, কিন্তু ভাল পুষ্টিকর আর কিছু খাবার খুব কমই তার জোটে! গির্জ্জায় অর্গিন বাজায়, তাতে বৎসরে ত্রিশ পাউণ্ড পায়, আর গান বাজনা শিখাইয়া যৎসামান্য কিছু উপরি আয় হয়। স্ত্রী আছে, কতকগুলি ছেলেপিলে আছে, তাদের সব খাওয়াইয়া তবে ত নিজে খাইবে। মাংসের আস্বাদ যে কি সেটা বোধহয় এক রকম এখন সে জানেই না।"

তপ্তশলাকার মত বড় তীব্র একটা বেদনা লেডী ইজাবেলের অন্তরে গিয়া বিঁধিল। আহা, দুঃখী এই ভদ্রলোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—এক ঘণ্টা তার গৃহে ছিল—তার কাজ করিতেছিল—হয় ত ক্ষুধার তাড়নায় তার উদর তখন জ্বলিতেছিল! ঘরে তাদের কত খাবার, কেন কিছু সুখাদ্য তাকে আনাইয়া দিল না? মুখের একটা কথা বাহির করিলেই ত প্রচুর একটা উপাদেয় ভোজেই যে সে দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত কেনকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিতে পারিত! ছি—ছি! কেন এ কথাটা তার মনে হয় নাই!

কার্লাইল কহিলেন, "আপনি অমন ভার হইয়া বসিয়া রহিলেন যে!"

ইজাবেল উত্তর করিল, "মনে বড় একটা পরিতাপ হইতেছে! যাক্, কোনও উপায় আর নাই। কিন্তু এই স্মৃতি বড় গভীর একটা কাল দাগের মতই আমার মনে বহিয়া যাইবে।"

"সে কি! কি হইয়াছে!"

"থাক্, আর সে কথা তুলিয়া কি হইবে? হাঁ, কার্লাইল সাহেব, আপনাদের ওয়েষ্টলীনের লোক সব কেমন? গরীব একটি ভদ্রলোক এত ক্লেশ পাইতেছেন, আর কেহই একটু সাহায্য করিবেন না যে এই দুঃখের ভার একটু লাঘব এঁর হইতে পারে?"

কার্লাইল একটু হাসিয়া কহিলেন, "কেহ কেহ টিকিট কিনিবে। এই যেমন আমি একজন। তবে কন্সার্টে যাইব কি না, বলিতে পারি না। খুব অল্প লোকই যাইবে।"

"তা যাইবে কেন? গেলে যে এই গরীব ভদ্রলোকটির উপকার হইবে! পাঁচজনে গেলেই দেখাদেখি আর দশজনে যায়। যা হ'ক্, আমি দেখাইব, সহৃদয়তা আমি ওয়েষ্টলীনের কাছে শিখি নাই। কন্সার্ট আরম্ভ হইবার একটু আগেই আমি যাইব, আর শেষ সঙ্গীতটি না হইয়া গেলে উঠিয়া আসিব না। ওয়েষ্টলীনের যদি এতই গরব হয় যে কেনের কন্সার্টে গেলে মান থাকিবে না। ভাল আমি দেখাইব, আমার সে গরব নাই, আমার মান ইহাতে যায় না।"

"আপনি যাইবেন! বলেন কি লেডী ইজাবেল?"

"তাই ত বলিতেছি—আমি যাইব, বাবাও যাইবেন। আমি কেনকে কথা দিয়াছি আমরা যাইব।"

কার্লাইল কহিলেন, "বটে! আপনি যাইবেন এটা যে দেবতার একটা বরের মতই হইবে। একবার যদি লোকে জানিতে পারে, লর্ড মণ্টসেভার্ণ ও লেডী ইজাবেল আজ কন্সার্টে যাইবেন, ঘরে যে আর দাঁড়াইবার একটু স্থান থাকিবে না।"

আহ্লাদে ইজাবেল লাফ দিয়া উঠিল,—হাত তালি দিয়া গৃহের চারিদিকে তালে তালে পা ফেলিয়া একটা পাক দিয়া কহিল, "বাহাবা! বাহাবা! লর্ড মেণ্টসেভার্ণ আর লেডী ইজাবেল আজ কত বড় দুইজন লোক! তা আপনাকে কিন্তু এর জন্যে খুব খাটিতে হইবে কার্লাইল সাহেব।"

"হাঁ, যা বলেন করিব।"

"বাবা বলেন, ওয়েষ্টলীনে মাতব্বর লোকই আপনি। আপনি যদি একবার লোককে জানান আপনি যাইবেন, অনেক লোক তবে যাইবে।"

কার্লাইল একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমি সকলকে বলিব আপনি যাইবেন। কেনের উপকার তাতেই হইবে। তবে কি জানেন লেডী ইজাবেল, এ কন্সার্টে বড় একটা প্রমোদ কিছু প্রত্যাশা করিবেন না।"

"ও একটা ডুগ্‌ডুগি হইলেই যথেষ্ট হইবে! বাবাকেও তাই বলিয়াছি। গান বাজনার কথা ত ভাবিতেছি না, ভাবিতেছি দুর্ভাগ্য এই কেনের কথা। আপনার খুব দয়া আছে কার্লাইল সাহেব। আপনার মুখের দিকে চাহিলেই তা বোঝা যায়। তা সত্যই আপনি যতদূর পারেন এর জন্য চেষ্টা করিবেন।"

কার্লাইল তার পরদিন অনেক টিকিট বিক্রী করাইয়া, সর্ব্বত্র এই কন্সার্টের সুখ্যাতি প্রচার করিলেন—এতই চমৎকার এই কন্সার্ট যে লর্ড মণ্টসেভার্ণ আর লেডী ইজাবেল পর্য্যন্ত যাইতেছেন! কেনের বাড়ীর দরজায় টিকিটের জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।

কার্লাইল বাড়ীতে গিয়া দুখানি টিকিট কর্ণীবিবির সম্মুখে রাখিলেন।

"একি! কন্সার্টের টিকিট! আর্কিবাল্ড! সত্যই কি তুমি গিয়া এই কন্সার্টের টিকিট কিনিয়া আনিয়াছ?"

কার্লাইল চুপ করিয়া রহিলেন। কেবল এই দুখানা নয়, নিজের পয়সা দিয়া দিয়া তিনি সেদিন আরও অনেক টিকিট কিনিয়াছেন, লোককে দিয়াছেন।

কর্ণীবিবি কহিলেন, "এই দুইটুকু বাজে কাগজের টুকরা—তার জন্য দশটা দশটা শিলিং ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছ! পয়সা কড়ির ব্যাপারে তুমি কি এম্নি হ্যাবুব! আক্কেল তোমার একটু কবে যে হইবে জানি না।

তোমার টাকা কড়ি দেখিতেছি আমার হাতে সব রাখিতে হইবে।"

"কার্লাইল উত্তর করিলেন, যা খরচ করিয়াছি আমার তাতে কিছুই আসিবে যাইবে না কর্ণেলিয়া। কিন্তু কেনের কথা—আর তার দুঃখী ছেলেপিলেদের কথা একবার ভাবিয়া দেখ ত! পেটে যে তারা দুটি খাইতে পায় না।"

"আঃ! ভারি ত! কেনের নিজের তা আগে ভাবা উচিত ছিল। গরীবরা বিয়ে করিবে, এক পাল ছেলে পিলে হইবে—তার পর দ্বারে দ্বারে গিয়া কাঁদিবে, ওগো দয়া কর গো দয়া কর! কেন, দয়া চায় লজ্জা করে না! গালি দিয়া তাদের বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত।"

"সে যাই হ'ক, টিকিট দুখানা পয়সা দিয়া কেনা হইয়াছে এখন তা নষ্ট করিয়া লাভ কি! তুমি চলনা আমার সঙ্গে কার্ণেলিয়া?"

"হাঁ, সেই খালি ঘরে খালি বেঞ্চিতে দুটো ভিজা হাঁসের মত গিয়া বসিয়া থাকিব, আর ঘরের কয়টা বাতি আছে, তাহা গণিব! রাত্রিটা খাসা আমোদেই কাটিবে।"

"খালি বেঞ্চিতে বসিতে হইবে না। মণ্টসেভার্ণ যাইবেন। ওয়েষ্টলীনে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। টিকিটের জন্য বেজায় হুড়া হুড়ি লাগিয়াছে।"

বলিতে বলিতে কর্ণেলিয়ার টুপীটির দিকে কার্লাইলের দৃষ্টি পড়িল। কহিলেন, "একটা ভাল টুপী আনিতে পাঠাইব নাকি কার্ণেলিয়া? ঐ টুপী পরিয়া গেলে সে কেমন দেখাইবে।"

কর্ণীবিবি আগুন হইয়া উঠিলেন।

"তুমি তবে নাপিতের দোকানে গিয়া তোমার চুল কোঁকড়িয়া নিয়া এস না, আর তোমার কোটে গিয়া একটা সাদা সাটিনের ঝালর লাগাইয়া আন। অবাক্ কাণ্ড! ঐ ত কনসার্ট—হইবে, একটা বাঁদরের কিচিমিচি! দশ শিলিং দিয়া টিকিট কেনা হইয়াছে, আবার নূতন একটা বাহারের টুপী না কিনিলে চলিবে কেন?"

কার্লাইল আর বাগবিতণ্ডা না করিয়া আফিসে চলিয়া গেলেন। পথে দেখিলেন লর্ড মণ্টসেভার্ণের গাড়ী যাইতেছে, লেডী ইজাবেল তার মধ্যে। গাড়ী থামাইয়া প্রফুল্ল হাসি মুখে ইজাবেল কহিল, "আমি নিজেই কেনের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, টিকিট কিনিতে। সবাই দেখিবে আমি টিকিট কিনিতে নিজে আসিয়াছি,—খুব লোক হইবে। নয় কার্লাইল সাহেব?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই।"

বৃহস্পতিবারে কনসার্ট হইবে। শনিবারেই লর্ড মণ্ট সেভার্ণ ঈষ্টলীন ত্যাগ করিয়া যাইবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে, যাইবার আয়োজন সব আরম্ভ হইল, কিন্তু সেই বৃহস্পতিবার সকলেই হঠাৎ তাঁহার ব্যারাম আবার বড় বাড়িয়া পড়িল।

কনসার্টে তিনি নিজে আর যাইতে পারেন না। কিন্তু এমন করিয়া কথা দিয়াছে, না গেলে সেটা বিশ্রী দেখাইবে, তাই অগত্যা ইজাবেলকে তিনি যাইতে অনুমতি দিলেন।

বৈকালের দিকে তাঁহার যন্ত্রণা বড় বেশী হইয়া উঠিল. কিন্তু ইজাবেল সেটা টের পায় নাই, কনসার্টে যাইবার আয়োজনে বড় ব্যস্ত ছিল। সাদা রেশমী লেসের একটা গাউন আর ঘরের সব হীরার অলঙ্কারগুলি পরিয়া খুব জাঁকাল সাজে সে আজ কেনের কনসার্টে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। পিতাকে তার সাজ দেখাইয়া বিদায় নিতে গেল।

"কেমন বাবা, কেমন হইয়াছে!"

স্ফীত আরক্ত চক্ষু দুটি তুলিয়া লর্ড সাহেব কন্যার দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—আহা, এ যে উজ্জ্বল এক দেবী মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! অতুল উজ্জ্বলরূপ, তার উপরে অতি উজ্জ্বল ওই বেশ ভূষা—কণ্ঠে, বক্ষে, বাহুতে, আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশদামে হীরক গুলি যেন ঝক্ ঝক্ জ্বলিতেছে! আনন্দে কপোল দুটি উজ্জ্বল রক্তরাগে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে! তাঁহার মনে হইল, এমন উজ্জ্বলমূর্ত্তি তিনি আর কোথাও কখনও দেখেন নাই!

বিস্মিত দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, "ইজাবেল! একি করিয়াছ? গ্রাম্য একটা কনসার্টে যাইবে, তাতেই এত সাজ সজ্জা! তোমার কি বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে?"

ইজাবেল্ একটু হাসিয়া কহিল, তা বাবা আমি ইচ্ছা করিয়াই আজ এমন সাজিলাম, ওয়েষ্টলীনের লোকদের আমি দেখাইতে চাই, দরিদ্র কেনের কনসার্টকেও অবজ্ঞা করিনা, খুব জাঁকাল সাজে যাইবার যোগ্যই মনে করি।"

"সবাই যে তোমার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিবে?"

"তা থাক্। বেশ ত, আমি আসিয়া তোমাকে সব বলিব।"

সহসা যন্ত্রণায় লর্ড সাহেব বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইজাবেল্ চমকিয়া উঠিল, কাছে গিয়া কহিল, "বাবা! খুব বেশী কষ্ট হইতেছে তোমার? তবে থাক্, আমি যাইব না।"

"না—না, যাও! তুমি থাকিয়া আর কি করিবে? হঠাৎ বড় একটা কামড় দিয়া উঠিয়াছিল, এখন গিয়াছে! যাও, তুমি যাও! কথা বলিলে, আমার আরও ক্লেশ হইবে। আর এখানে তোমাকে থাকিতেও আমি দিব না। যাও মা! হাঁ, কার্লাইলকে যদি দেখ, বলিও, কাল সকালে যেন একবার আসেন।"

ইজাবেল চলিয়া গেল।

বার্বারাও কনসার্টে যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। জাষ্টিস্ হেয়ার তাহাকে লইয়া কার্লাইলদের বাড়ীতে আসিলেন, একত্র হইয়া তাঁহারা যাইবেন। একখানা

গাড়ী ডাকিবার কথা হইল। কিন্তু কর্ত্রীবিবি বলিয়া উঠিলেন, "আবার গাড়ী কেন, কেন আমাদের পায় কি হইয়াছে? কতই বা দূর? আর এমন সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি, হাঁটিয়াই ত বেশ যাওয়া যাইবে।"

কার্লাইলের সঙ্গে এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় হাঁটিয়া যাইবে, বার্বারা ইহাতে অতি আনন্দিতই হইল।

জাষ্টিস্ হেয়ার আর কর্ত্রীবিবি আগে, আগে আর তাঁহাদের কিছু পশ্চাতে বার্বারা আর কার্লাইল—বার্বারা কহিল, "তোমার দেখাই যে এখন আর বড় পাই না আর্কিবাল্ড!"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "ঈষ্টলীনে যে সর্ব্বদা যাইতে হয়। লর্ড সাহেব বড় বাহির হইতে পারেন না,—আমাকে না পাইলে, বলেন, তাঁর মোটে ভালই লাগে না। শনিবারেই তিনি চলিয়া যাইবেন। আমারও তখন অবসর হইবে।"

পাদ্রি লিট্‌ল সাহেবের বাড়ীতে কাল তোমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা কেবল পথ চাহিতে ছিলাম, তুমি কখন আস, কখন আস?"

"কেন, লিট্‌ল্ সাহেবকে ত আমি বলিয়াছিলাম, ঈষ্টলীনে আমার নিমন্ত্রণ আছে।"

"কেউ কেউ বলিতেছিল, একেবারে ঈষ্টলীনেই তোমার বাড়ী ঘর করিয়া তুমি নিলে পার। সেখানে যে এত টান তোমার কিসের, তাই সকলে বলাবলি করিতেছিল। ইজাবেল ভেন্ যদি 'লেডী ইজাবেল' না হইতেন, তবে তুমি যে তাঁরই জন্য সেখানে এত যাওয়া আসা কর, এমন সন্দেহও তারা করিতে পারিত।"

"বটে! এ সব কথাও হয়! সত্যই আমি বড় বিস্মিত হইতেছি বার্বারা, যে তুমিও এই সব কথা বলিতেছ।"

বুকভরা অভিমানের আবেগ কথঞ্চিৎ দমন করিয়া বার্বারা উত্তর করিল, "তারাই বলিতেছিল, আমি ত কিছু বলি নাই। হাঁ, সত্যই কি লেডী ইজাবেল খুব ভাল গান করেন? ওরা বলিতেছিল, তাঁর গান নাকি একেবারে স্বর্গের সঙ্গীতের মত।"

কার্লাইল হাসিয়া কহিলেন, "কর্ণেলিয়ার কাছে এ কথা একবার বলিয়া দেখিও কেমন ধমক খাইবে। আমি একদিন বলিতেছিলাম, লেডী ইজাবেলের মুখখানি যেন দেববালার মত—"

"বটে! তুমি কি তাই মনে কর আর্কিবাল্ড? তাই বলিয়াছিলে?" বিবর্ণ বিশুষ্ক মুখখানি উচু করিয়া বার্বারা কার্লাইলের দিকে চাহিল।

কার্লাইল তাহা বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া তেমনই হাসিয়া আবার কহিলেন, "হাঁ, ঐ রকমই কি একটা কথা বলিয়াছিলাম ঠিক মনে নাই। আর কোথায় যাইব? কর্ণেলিয়া সে যে ধমক একটা দিয়া উঠিল! হাঁ, রিচার্ডের আর কোনও খবর পাইয়াছ বার্বারা?"

"না। বলিয়া গিয়াছিল, চিঠি লিখিবে, কিন্তু লেখে নাই, বোধহয় ভয় পায়?"

ক্রমে তাঁহারা টাউনহলে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কন্‌সার্ট সেইখানেই হইবে। বড় লোকের ভিড় হইয়াছিল। লেডী ইজাবেলের সঙ্গে কার্লাইলের দেখা হইল, কার্লাইল শুনিলেন লর্ডসাহেবের ব্যারাম হঠাৎ আজ আবার খুব বেশী হইয়াছে, তাই তিনি আসিতে পারে নাই।

কন্‌সার্ট আরম্ভ হইল। গ্রাম্য কন্‌সার্ট যেমন হয়—অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। বার আনা আন্দাজ হইয়াছে, এমন সময় ঈষ্টলীনের একটি লোক আসিয়া দরজার কাছে উঁকি দিল। কার্লাইল কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের লেডী সাহেবরা কোথায় বসিয়াছেন, বলিতে পারেন?"

"ওই একেবারে ওধারে—বাজনার সাম্‌নেই!"

"তাই ত! কেমন করিয়াই বা এই লোক ঠেলিয়া তাঁর কাছে যাইব! লর্ড সাহেবের অবস্থা যে বড় খারাপ, যান যান এমন নাকি হইয়াছে!"

কার্লাইল চমকিয়া উঠিলেন। লোকটি কহিল, "খুব খারাপ, আর সে কি চীৎকার করিতেছেন, শুনিলে ভয় করে। তাই ত গাড়ী লইয়া আমি আসিয়াছি লেডী সাহেবকে এখনই বাড়ী নিয়া যাইতে হইবে!"

"আচ্ছা, আমি গিয়া এখনই তাঁকে লইয়া আসিতেছি?"

কার্লাইল লোক ঠেলিয়া লেডী ইজাবেলের কাছে গিয়া চুপি চুপি কহিলেন, "আপনার বাবার অসুখ কিছু বাড়িয়াছে। তিনি আপনাকে নিতে গাড়ী পাঠাইয়াছেন। চলুন, আপনাকে আমি বাহিরে পৌছাইয়া দিই।"

ইজাবেল হাসিয়া কহিল, "ও, বুঝিয়াছি, বাবার চালাকী! পাছে, আমার ভাল না লাগে, ত্যক্ত বিরক্ত বোধ করি, তাই তাড়াতাড়ি আমাকে নিতে পাঠাইয়াছেন! না, আমি এখন যাইব না! বেশ লাগিতেছে, শেষ হউক, তখন যাইব।"

"না, না! সত্যই তাঁর ব্যারাম বড় বাড়িয়া পড়িয়াছে!"

ইজাবেল একটু উদ্বিগ্ন হইল, কিন্তু তেমন একটা ভয়ের ভাব দেখা গেল না। কহিল, "তবে এই গানটা শেষ হউক, এখন উঠিয়া গেলে একটা গোলমাল হইবে।"

"তা হউক,—সে জন্য আপনি কিছু ভাবিবেন না। আপনার আর দেরী করা উচিত নয়!"

ইজাবেল তখনই উঠিয়া কার্লাইলের হাত ধরিল, কার্লাইল লোক ঠেলিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। সকলেই বিস্ময়ে তাঁহাদের দিকে চাহিল। সবচেয়ে বেশী বিস্ময়ে চাহিল, বার্বারা। সে বলিয়া উঠিল, "আর্কিবাল্ড ওঁকে কোথায় লইয়া যাইতেছে?"

(ক্রমশঃ)

হিন্দুসমাজ ও জাতিভেদ

অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুসমাজ জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—মূল এই চারিটি শ্রেণী, জাতি বা বর্ণের বিভাগ প্রাচীন সমাজধর্মের নিয়ন্তৃগণ স্বীকার করেন এবং এই বিভাগটি ধরিয়া তাঁহারা সমাজবিন্যাস করেন। ইহার মধ্যে বর্ণ কথাটার ঠিক অর্থ কি ভাল বুঝা যায় না। শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ—যথাক্রমে এই চারি জাতির লোকের গায়ের বর্ণ বা রঙ ছিল এরূপ একটা কথা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গায়ের রঙের ঠিক এইরূপ একটু তফাৎ ছিল এমন প্রমাণ কিছু নাই। শ্বেত ও কৃষ্ণ এইরূপ দুই জাতি পৃথিবীতে দেখা যায়। মঙ্গোলীয় জাতিকে পীতবর্ণ বিশেষণ দেওয়া হয়। তাহাদের রঙ কিছু পীতাভ হইলেও ঠিক পীত নহে। আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের রঙ নাকি তাম্রাভ ছিল—তাহাকেও ঠিক রক্তবর্ণ বলা যায় না। যাহাই হউক ভারতের ক্ষত্রিয় যে আমেরিকার আদিম অধিবাসীর ন্যায় ছিলেন অথবা বৈশ্য মঙ্গোলীয়দিগের ন্যায় ছিলেন, ইহাও সম্ভব নয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য বরং এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন শ্রেণী আর্য্যবংশীয় এবং আর্য্যগণ সকলেই গৌরবর্ণ ছিলেন। শূদ্র সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত এই যে ভারতের যে সব কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসিরা নবাগত আর্য্যদের কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া আর্য্যসমাজে নিম্ন স্থান পায়, তাহারাই শূদ্র। আদিম শূদ্র খুব সম্ভব তাহারাই হইয়াছিল। পরে বোধ হয় আর্য্যসন্তানদের মধ্যেও যাহারা বুদ্ধি বিদ্যা ও শক্তিতে হীন তাহারাও শূদ্রদের সঙ্গে মিলিয়া মিশ্রিত একটা শূদ্রজাতির সৃষ্টি করে। পরবর্ত্তী শূদ্রদের বিবরণ যাহা পাওয়া যায় তাহাতে রূপে যে তাঁহারা সকলেই উচ্চতর তিন জাতি অপেক্ষা নিতান্ত হীন ছিল এরূপ মনে হয় না।

যাহা হউক আর্য্য গৌর এবং শূদ্র কৃষ্ণ একথা স্বীকার করিয়া নিলেও বর্ণ হিসাবে দুইটি জাতি আমরা পাই। রক্ত ও পীত এই দুই জাতি পাই না। তবে এই চারিবর্ণের অর্থ কি?

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'চতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।' এই শ্লোকার্দ্ধে ইহার অর্থে একটা সূত্র বোধ হয় পাওয়া যায়। চারিবর্ণের কর্ম্মবিভাগের কথাটা সকলেরই পরিচিত। এই কর্ম্মের মূল উৎস হইল 'গুণ'। হিন্দু তত্ত্ববিদ্‌গণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই মূল তিন গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। মানব প্রকৃতির পার্থক্য তাঁহাদের মতে এই তিন গুণের তারতম্যে হয়। এই তিন গুণের সম্পর্কে তিন বর্ণের কথাও তাঁহারা বলেন। গুণের সঙ্গে এই বর্ণের কথাটা বোধ হয় রূপক। শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই তিনবর্ণ এই তিন গুণ হইতে আসিয়াছে, অথবা গুণের স্বভাবজ রূপ। সুতরাং সত্ত্বগুণ প্রধান বলিয়া ব্রাহ্মণ শ্বেত, রজোগুণ প্রধান বলিয়া ক্ষত্রিয় রক্ত, আর তমোগুণ প্রধান বলিয়া শূদ্র কৃষ্ণ, স্বভাবের রূপকচ্ছলে হয়ত এইরূপ বলা হইয়াছে। বৈশ্যের স্বভাব রজঃ ও তমো গুণের মিশ্রণ জাত। লাল ও কাল মিশিলে ঠিক পীত হয় না। তবে রূপকচ্ছলে হয়ত পীত কথাটা এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, গায়ের রঙের হিসাবে না হইলেও এই রূপকের ভাষায় বোধ হয় চারি জাতির এই চারিটি বর্ণ নাম হইয়াছে।

প্রথমে এই চারি জাতি ছিল, তাহা হইতে এখন বহু জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই জাতিবিভাগটা খুব কড়া নিয়মের অধীনও বটে। এক জাতীয় লোকের পক্ষে অন্য কোনও জাতিভুক্ত হইবার যো নাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে সূত্রধরের বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকার্জ্জনে বাধা নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ কেহ সূত্রধর জাতিভুক্ত হইতে পারে না। আর প্রত্যেক হিন্দুগৃহস্থ কোনও না কোনও জাতির অন্তর্ভুক্ত,—সামাজিক অনুষ্ঠান তাহাকে সেই সেই জাতির আচার নিয়ম অনুসারে করিতে হয়। কোনও না কোনও জাতির মধ্যে নন, হিন্দুগৃহস্থ এরূপ কেহ নাই। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া যিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারই কোনও জাতি নাই, পৈতৃক জাতির পদবীও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। এই সন্ন্যাসীরাও আবার বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সন্ন্যাসে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়, গুরু

যে সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীও সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হন, পিতৃ-পদবী ত্যাগ করিয়া সেই সম্প্রদায়ের পদবী গ্রহণ করেন, সেই সম্প্রদায়ের আচার নিয়ম অনুসারে চলেন, সুতরাং এই সন্ন্যাসীদের মধ্যেও একটা জাতিভেদ আছে। তবে সেটা বংশগত নয়, কারণ সন্ন্যাসীদের নির্ব্বংশ হইতে হয়। জনক-সুত পরম্পরায় নয়, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায়ের জীবনধারা বহিতে থাকে। আর যে জাতির গৃহস্থই হউক, সন্ন্যাসীসম্প্রদায়সমূহের প্রবেশদ্বার তার সম্মুখে উন্মুক্ত।

হিন্দুসমাজের এই জাতিভেদটা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং পাশ্চাত্য বিদ্যার শিষ্য ভারতসন্তানগণও সকলে অতি নিন্দা করিয়া থাকেন। এই জাতিভেদই যে হিন্দুর সকল অবনতির প্রধান কারণ, ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়াই ইঁহারা ধরিয়া নিয়াছেন।

নিন্দিত ও ধিক্কৃত যতই হউক, এই জাতিভেদটা হিন্দু সমাজের একেবারে মজ্জাগত। হিন্দুসমাজ বলিলেই বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, বিভাগ অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ আচার নিয়মের অনুগত—আবার সমান কতকগুলি সাধারণ ভাব, ও সংস্কারের অধিকারী, নীতির অনুসারী বিরাট বিচিত্র এক সমাজকে বুঝায়। এই ভেদের বিরোধী বহু প্রভাব ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ন্যূন পক্ষেও ৫।৬ হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুসমাজ ভারতে তার এই জাতিভেদ লইয়াই বর্ত্তমান আছে। অনেক উলটপালট—অনেক ভাঙ্গা-গড়া হইয়াছে—এই বিভাগের ও বিভিন্ন জাতি সমূহের নিয়ম পদ্ধতি কত রকম রকম আকার ধারণ করিয়াছে, আচার অনুষ্ঠানের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু জাতিভেদটি ঠিক আছে।

এই সমাজ বিন্যাসের জীবনীশক্তি যে কত প্রবল, ভিত্তি যে কত গভীর, কত দৃঢ়, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। জাতিভেদ তুলিয়া দেও বলিলেই, ইহা উঠিয়া যাইবার নয়। প্রায় সহস্র বৎসর ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবও জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া ফেলিতে পারে নাই। ফিরিঙ্গীশিষ্য নাগরিক বাবুদের প্রাণহীন দুইটা মুখের কথায় দুইদিনে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে না। হয়ত কখনও ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু তখন ইহা হিন্দুসমাজ থাকিবে না,—অন্য রূপ শ্রেণী বিভাগে অন্য একটা জনসংঘ হইবে। এই যে শ্রেণী বিভাগের কথা বলিলাম, মানব-সমাজে ইহা স্বাভাবিক, সকল দেশের সকল সমাজেই আছে। মুশলমান যে এমন সাম্যবাদী, সেই মুশলমান সমাজেও শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিভাগ আছে। আহারে ও উপসনায় সমতা যতই রক্ষিত হউক, বংশগত, কুলগত, ধনগত, পদগত পার্থক্য অনেক বিষয়ে মুসলমানও মানিয়া চলেন, কারণ মানুষ ইহা না মানিয়া পারে না।

জাতিভেদের বর্ত্তমান আচার নিয়মের সংস্কার বহু হইতে পারে, হওয়াও প্রয়োজন। কিন্তু হিন্দুসমাজ যতদিন আছে, এই জাতিভেদও ততদিন বর্ত্তমান থাকিবে। কারণ ইহা কতকগুলি স্বাভাবিক নীতির অভিব্যক্তির ফল।

কি কি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক নীতির ক্রমাভিব্যক্তিতে জাতিভেদ হিন্দুসমাজে এমন মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, তার তত্ত্বগুলি ভাল করিয়া আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সকল দিক আগে ভাল করিয়া দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ইহার বিচার করিতে হইবে। তার আগে বিদেশীর শিখান গোটা দুই বাঁধা বুলী ধরিয়া কেবল 'মনু পরাশরকে' গালি দেওয়াটাই ঠিক হইবে না। আজকাল 'হক না হক' প্রাচীন এই বুড়া দুইটিকে অনেকেই গালি দিয়া থাকেন, যেন দেশের ঘাড়ে শয়তান হইয়া ইঁহারা চাপিয়া বসিয়া আছেন! 'মনু পরাশরের' পুলিশ নাই, সিপাহী নাই, জেলখানা নাই, ফাঁসীকাঠও নাই,—টোলও: তাঁহাদের আইন দেশশুদ্ধ লোককে জোর করিয়া ধরিয়া কেবল পুঁথি পড়াইয়া সকলের বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দিতেছে না। দেশের শিক্ষিত লোকেরা যদি বুঝিয়াই থাকেন, ইঁহারা শয়তানের মত ঘাড়ে বসিয়া আছেন, দল বাঁধিয়া ঠেলিয়া ফেলিলেই পারেন। কে তাঁহাদের কি করিতে পারে? এত বড় একটা দলের জাতি মারিবে, এমন ভট্টাচার্য্য কোথায় কে আছে? আর সেইটুকু 'মনু পরাশর'ই বা সত্য আজ কোথায়? যাঁহারা গালি দেন, তাঁহারা কি 'মনু পরাশরের' নামে প্রচলিত শাস্ত্রগ্রন্থ দুখানি পড়িয়া দেখিয়াছেন? পড়িয়া থাকিলে কি বলিতে পারেন, হিন্দু-সমাজ এমন অন্ধভাবে 'মনু পরাশরের' বিধি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতেছে কেন? 'মনু পরাশরের' আমলে জাতিভেদ ছিল, তার আগেও ছিল, এখনও আছে,—কিন্তু এই তিন

আসলে সেই ভেদের রকমটা যে কত তফাৎ তফাৎ, তাহা কি তাঁহারা একটু বিচার করিয়া কখনও দেখিয়াছেন? কেন যে বরাবর এই সমাজে এই জাতিভেদটা আছে, আর কেন যে যুগে যুগে তার রকমটা এমন বদলাইয়াছে, কিন্তু মূল জিনিসটি যায় নাই, সেইটাই ত আমাদের বিচার করিয়া দেখিবার কথা।

সেই কথাই কিছু বলিতে চাই। রকমটার বদলানর কথা এখন থাক্। আগে এই ভেদের তত্ত্বটাই আমাদের বুঝিয়া দেখা দরকার।

একটা কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, মানুষ সব সমান, সব এক ঈশ্বরের সন্তান, ভাই ভাই, সকলে সমানভাবে মিলিয়া মিশিয়া সমান ভাই ভাই হইয়া এই পৃথিবীতে থাকিবে।

কিন্তু কথাটা যে ভাবে যে অর্থে বলা হয়, তাহা ঠিক কি? কথাটার জোরে যে দাবী করা হয়, সে দাবী সত্য চলে কি?

ঈশ্বর সকল মানুষকে সমান এক ছাঁচে ঢালিয়া সমান মাপে সব শক্তি দিয়া এই পৃথিবীতে পাঠান নাই। বিশ্বব্যাপী এক চিদ্‌বস্তুর মধ্যে মহামায়া (বা যে নামেই হউক, কোনও কিছু একটা শক্তি) অশেষ বৈচিত্র্যে এই জগৎ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জাগতিক সকল বস্তুতে যেমন বৈচিত্র্য রহিয়াছে, মানবের মধ্যেও তেমনই বৈচিত্র্য দেখা যায়। কবে এই পৃথিবীতে মানবরূপ জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল, অতি পণ্ডিতও কেহ বলিতে পারেন না। তবে বহু বহু যুগ যুগ তার পর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আদিম বর্ব্বরতার যে চিত্র পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন, সে বর্ব্বরতা এখনও এ পৃথিবীর মানবের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। অতি উন্নত মানব সমাজ—এখন যেমন দেখিতে পাওয়া যায়,—অতি প্রচীন কালেও তেমন ছিল। প্রাচীন সকল জাতিই অতি বর্ব্বর ছিল, আর একটা ক্রমাভিব্যক্তির ধারায় সকলেই উন্নত হইয়া উঠিতেছে, বাস্তবিক তা নয়। কোনও কোনও বিষয়ে আধুনিক উন্নতিশীল জাতিরা প্রাচীন উন্নত জাতি সমূহ যে ভিত্তির পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তার উপরে তাঁহাদের জ্ঞানের বিচিত্র ইমারৎ তুলিয়াছেন। কিন্তু এই ভিত্তি না পাইলে এত সহজে এই ইমারৎ তুলিতে পারিতেন কি? ক্ষেত চষিয়া ধান বুনিয়া সেই ধানের নূতন বীজ হইতে চাউল করিয়া তার ভাত রাঁধিয়া বেশ খাওয়া যায়, ইহা যাহারা বাহির করিয়াছিলেন, মানবের আধুনিক কত বিচিত্র উপাদেয় খাদ্য ব্যবস্থার গোড়া পত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। বাহাদুরী তাঁহাদেরও বড় কম নয়। এই ভাতের উত্তরাধিকার যারা লাভ করিয়াছে বড় কম লাভ তারা করে নাই। ভাত পাইয়াছিল, তাই শেষে পোলাও পিঠা সকলে তাহারা খাইতে শিখিয়াছে। কেবল ভাত নয়, ভাতের বুদ্ধির উত্তরাধিকারও তারা পায়,—সেটা আরও বড় কথা। প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণ শূন্যের আবিষ্কার করিয়া দশমিক-গণনা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান গণিত বিজ্ঞান খুবই উন্নত, কিন্তু এ উন্নতির প্রধান ভিত্তি গাড়িয়াছিল একেবারে কাচামাটিতে এই দশমিক-গণনায়। কোনও কোনও বিষয়ে আবার প্রবীণকে নবীন এখনও অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। মিসরের পিরামিডের মত অমন আর একটি জিনিশ কি আধুনিক যুগে কোথাও কেহ গড়িয়াছেন?

"ওঁ" পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে॥

এই যে বাণী প্রাচীন ভারতের ঋষির মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহার অপেক্ষা বড় কোনও কথা আধুনিক জগতে কেহ কি কখনও বলিতে পারিয়াছেন?

আর এই যে উন্নতির গর্ব্ব—আধুনিক বিশেষ কোনও কোনও জাতিকে ইহা ভৌতিক শক্তিতে অতি শক্তিমান্ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জগদ্‌বাসী মানবজাতির সুখশান্তি ও মঙ্গল তেমন কিছু বাড়াইয়াছে কি? নিজেদের মধ্যেও সুখশান্তি ও মঙ্গল কিছু প্রতিষ্ঠা করিয়াছে কি? ঘরে বাহিরে কেবল ত বিকট একটা আসুরিক লোভেরই নির্ম্মম কাড়াকাড়ি চলিতেছে! মানবের মঙ্গলপ্রতিষ্ঠা যদি মানবসমাজের উন্নতির প্রধান লক্ষণ হয়, তবে এই উন্নতিকে ঠিক উন্নতি বলিতে পারা যায় কি?

যাক, কথায় কথায়—অনেক দূর বোধ হয় বিপথে গিয়া পড়িলাম। বলিতেছিলাম যে হিসাবেই ধরা যাউক্ অতি উন্নত আবার অতি অবনত—আর মধ্যবর্ত্তী যত রকম স্তর হইতে পারে, সব রকম মানব এই মানবসমাজে প্রাচীন কালেও ছিল, এখনও আছে। মানবসমাজ

কথাটাই বোধ হয় ঠিক কথা হয় না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় মানবের বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞান শক্তি আচার নিয়ম পরিমার্জ্জনা প্রভৃতি গুণে এবং দৈহিক রূপে এতই পার্থক্য যে এক সমাজ এই কথাটাই বলা তাহাদের পক্ষে ঠিক যুক্তিযুক্ত হয় কি না সন্দেহ। আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া মালয় দ্বীপপুঞ্জের কৃষ্ণকায় কুরূপ আদিম বর্ব্বরজাতি সমূহ, আর শ্বেতাঙ্গ সুরূপ সুসভ্য ইয়োরোপীয়—এই দুইটী চরম দৃষ্টান্তের কথাই সকলে ভাবিয়া দেখুন। ইহাদের সমান এক সমাজ ভুক্ত বলিয়া কেহ মনে করিতে পারেন কি?

বিভিন্ন জাতির মধ্যেই যে কেবল এই বৈষম্য তা নয়, এক জাতির মধ্যেও অশেষ এইরূপ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। রূপে গুণে চরম উন্নতির ছাপ আবার একেবারে বর্ব্বরতার ছাপ, পরন্তু এই দুই চরমের মধ্যবর্ত্তী অশেষ রকম ছাপ এক দেশে এক সমাজে, এক নগর ও গ্রামবাসী লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মানবজাতির প্রকৃত অবস্থাটা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এবং মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সত্য আমাদের স্বীকার করিয়া নিতেই হইবে যে প্রকৃত পক্ষে মানুষ সব সমান নয়। জাতিতে জাতিতে কেবল নয়, প্রত্যেক জাতির মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও বিচিত্র বৈষম্য বর্ত্তমান। দুইটি জাতিতে বা দুই ব্যক্তিতে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি, পরিমার্জ্জনা, চরিত্র, আচার নিয়ম ও জীবন যাত্রার প্রণালীতে যেখানে পার্থক্য বেশী, সেখানে এক-দেশবাসী বা পরস্পর প্রতিবেশী হইলেও সমান সামাজিক সম্বন্ধে তারা মিশিতে পারে না। এই বৈষম্য যতদিন রহিবে, ততদিন তারা মিলিতে পারিবে না,—কিন্তু বৈষম্য যদি দূর হয়, মিলিবার পক্ষে স্বাভাবিক কোনও বাধা অবশ্য থাকে না। কোনও কোনও বিশেষ কারণে, কোনও কোনও বিষয়ে কিছু বাধা মানিয়া চলিলেও সাধারণ বান্ধবতার সম্বন্ধে, কর্ম্মের সহযোগিতায় কোনও বাধা থাকে না। এ দেশের ভদ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয়ই শিক্ষায় দীক্ষায়, শক্তিতে ও পরিমার্জ্জনায় সমান, প্রচলিত প্রথা মানিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধে কখনও আবদ্ধ হন না বটে,—কিন্তু আর সকল বিষয়ে অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধবতা, সকল কর্ম্মে সমান সহযোগিত্ব ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। অশিক্ষিত অজ্ঞ হীনবৃত্তিক ব্রাহ্মণের সঙ্গেই বরং শিক্ষিত পরিমার্জ্জিত উচ্চবৃত্তিক ব্রাহ্মণ একাসনেও বসিতে চান না। কিন্তু সমশিক্ষিত সম-পরিমার্জ্জিত সমবৃত্তিক কায়স্থের সঙ্গেও এক ফরাসে এক তাকিয়ার গায়ে গায়ে গড়াগড়ি করেন; এক হুঁকায় তামাক খান, এক পাত্রে আহারও অনেকে করেন। সমানে সমানে এই সমতা আবার বড়তেছোটতে এই তফাৎ, ইহা স্বাভাবিক, হাজার জাতিভেদের মধ্যেও ইহা থাকিবে, হাজার সাম্যনীতির মধ্যেও ইহা দেখা দিবে।

তবে সমতা কি সমান অধিকার মানবে মানবে কি একেবারেই কোথাও থাকিবে না? হাঁ, থাকিবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও বিষয়ে থাকিবে, থাকা উচিত। তবে যেখানেই থাকিতে পারে, স্বাভাবিক এই নীতির সঙ্গে অবিরোধী হইয়াই থাকিতে পারে।

রাজদ্বারে সমান অপরাধে বড়ছোট সকলেরই বোধ-হয় সমান বিচার, সমান দণ্ড হওয়াই উচিত। বরং বড় যে তার দণ্ড কিছু বেশী হইলেই বোধ হয় ভাল হয়, কারণ, শিক্ষা দীক্ষায় ও বুদ্ধি-বিবেচনায় সে বড়, অপরাধ তার পক্ষে অধিক নিন্দনীয়। তবে এরূপ একটি মতও আছে যে নিন্দনীয় বলিয়াই ছোটর সঙ্গে তাকে সমান দণ্ডনীয় করা ঠিক নয়। বড় যে, মানী যে, লোকনিন্দা, সামাজিক গ্লানিই তার পক্ষে মরিবার বেশী হইয়া থাকে। হীন যে, কঠোর দণ্ডব্যতীত তাহাকে সুনীতির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখা যায় না। ইহার একটা মীমাংসা করিয়া ফেলা বড় সহজ নয়। দুই দিকেই বলিবার অনেক কথা আছে।

আরও একটি বিবেচনার কথা আছে। ছোট যে, সে ছোট যতদিন থাকিবে, বড় কেহ তাহার সঙ্গে সমানভাবে মিশিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া বড়র পক্ষে ছোটকে চিরকাল ছোট করিয়া রাখিবার প্রয়াসও সঙ্গত হইতে পারে না। অনেক ছোট এমন আছে—যাহারা স্বভাবতঃই ছোট, চিরকাল ছোটই থাকিবে। যেমন আফ্রিকার অষ্ট্রেলিয়ার, মালয় দ্বীপপুঞ্জে আদিম বর্ব্বর জাতি সমূহ। কত হাজার বৎসর ধরিয়া কত কত বড় জাতি কত উন্নত বিদ্যার উন্নত শক্তির পরিচয় দিলেন,—কত বিদ্যা, জ্ঞান, উন্নতধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইল, কিন্তু তারা সেই আদিকাল হইতে এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে। কিন্তু আবার এমন ছোটও আছে, যারা হয়ত কোনও বাধায় বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই,—সে বাধা দূর হইয়াছে, বড় হইয়া

এখন উঠিতে পারে, তার প্রয়াসও করিতেছে। বড় হইবার শক্তি ও প্রয়াস যেখানে আছে, হাজার ছোটরও বড় হইবার অধিকার সেখানে আছে। এই অধিকার তারা ভোগ করিবে। বড়রা আপনাদের স্বার্থের জন্য তাদের চাপিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু রাখা অন্যায়।

মানবে মানবে যে সমতা, যে সমান অধিকার, তাহা এইখানে—এই পর্য্যন্ত। তাহার বেশী সাম্য মানিয়া নেওয়া যায় না।

এইখানে আরও একটি কথাও আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক। কি ব্যক্তি, কি জাতি—যারা বড় হয়, হইয়াছে বা হইতে পারে, সব যে ঠিক একই দিকে, একই ভাবে, একই মাপে বড়, তা নয়। ইহার মধ্যেও অশেষ বৈচিত্র আছে। কোনও ব্যক্তি বা জাতি সমান ভাবে সকলদিকে বড় হয় না,—এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায় নাই। যারা যে দিকে, যে ভাবে, যে মাপে বড়, তাদের অধিকারও তদনুরূপ হইবে। যে দিকে, যে ভাবে, যে মাপে যাদের শক্তি বিকাশ হয় নাই, সেইদিকে সেই ভাবে, সেই মাপে তাদের কোনও অধিকার থাকিতে পারে না। ধরিয়া দিলেও সে অধিকার তারা পরিচালনা করিতে পারে না,—বিভ্রাটও অনেক ঘটে। সুতরাং বড় একটা বৈষম্য জাতিতে জাতিতে এমন কি এক জাতিভুক্ত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেখা যায়। এই সব কারণেও এক সমাজের মধ্যেই নানা রকম শ্রেণীবিভাগ প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই ঘটে। মুখের কথায় সমতা মানিলেও কার্য্যতঃ প্রকৃত সমতা কিছু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় না।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদের বিচার এই সব কথা ধরিয়া আমাদের করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরও কথা এ সম্বন্ধে আছে, ক্রমে যথাপ্রসঙ্গ আমরা তাহার আলোচনা করিব।

সকলের আগে একটি অতি বড় কথা আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে এই যে ভারতবাসী হিন্দু—সকলেই 'রেস' (race) হিসাবে এক জাতি নহেন এবং সামাজিক এক হিন্দু নামে অভিহিত হইলেও race-culture বা জাতিগত উন্নত সংস্কারের অধিকার সকলের এক রূপ নহে।

ইংরেজিতে 'race' (রেস্) বলিতে যাহা বুঝায়, বাঙ্গালা 'জাতি' কথাটারও মৌলিক অর্থ তাহাই। কিন্তু বর্ত্তমানে এই 'জাতি' কথাটার প্রয়োগ অতি ব্যাপক ও বৈশিষ্টবিহীন। ইংরেজি race, nation, tribe, caste, kind, species—সকল কথার অর্থেই 'জাতি' শব্দটি প্রযুক্ত হয়। বিশেষ ভাবে, race, nation, tribe বা caste প্রভৃতি বুঝাইতে পারে, এরূপ বিশেষ বিশেষ কথা কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং মধ্যে মধ্যে এই সব ইংরেজি কথা আমাদের ব্যবহার করিতে হইবে। আর এই যে কথাটা এখন তুলিয়াছি তার প্রসঙ্গে 'জাতি' কথাটা আমরা race হিসাবেই ব্যবহার করিব।

প্রাচীন কালের কথাই আমরা আগে বলিব—যখন এই সামাজিক বর্ণভেদের প্রবর্ত্তন প্রথম হইয়াছিল। আর মূল তত্ত্বও তাহা হইতে বুঝিব।

বিচক্ষণ প্রত্নতাত্বিকগণের সিদ্ধান্ত এই, যে আর্য্যজাতি ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকের কোনও অঞ্চল হইতে সিন্ধুনদী পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন,—প্রথমে পঞ্চনদ অঞ্চল অধিকার করিয়া ক্রমে উত্তর ভারতে এবং পরে দক্ষিণভারতে আপনাদের রাজ্য ও সভ্যতা বিস্তার করেন। গঙ্গা যমুনার তীরবর্ত্তী অঞ্চলেই প্রথমে তাঁহাদের বড় বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলই তাঁহাদের সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ও সকল উন্নত সাধনার প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠে। এই অঞ্চলের নামও হয় তাই আর্য্যাবর্ত্ত। এই আর্য্যজাতি দেহে সুরূপ ও গৌরবর্ণ ছিলেন,—উচ্চ সংস্কার, ধীশক্তি ও বিদ্যার অধিকারী এবং উন্নত আচারের অনুবর্ত্তী ছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইঁহাদের এই উন্নত অবস্থাকে primitive civilisation বা আদিম সভ্যতা—অর্থাৎ বন্য বর্ব্বরতা অতিক্রম করিয়া কেবল সভ্যতালোকে প্রবেশের অবস্থা—বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। বেদের মন্ত্রসমূহ যাঁহাদের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল,—সভ্যতালোকে তাঁহারা কেবল প্রথম প্রবেশ করেন নাই। উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত কিছু পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ হইলেও তাহাতে যে সব চরিত্র, যে সুনীতির আদর্শ, যে সব তত্ত্ব, দর্শন ও উচ্চ জ্ঞানালোচনা দেখা যায় এবং তাহাতে উচ্চ সংস্কার, ধীশক্তির ও সাধনার যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা কোনও বাল জাতির মধ্যে সম্ভব হয় না।

উন্নত এই আর্য্যগণ ভারতে যখন বসতি আরম্ভ করেন, বহু বন্য বর্ব্বরজাতি তখন ভারতে বর্ত্তমান ছিল। ইহারা বিদ্যা বুদ্ধি ও আচার নীতিতে আর্য্যদের অপেক্ষা অতি হীন ছিল, আর দেহের রূপেও অনেক নিকৃষ্ট ছিল। দেহে ও মনে, সংস্কারে ও আচারে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট দুই জাতির কথা বলায় কেহ মনে করিবেন না যে মানবের মানবত্বকে অবজ্ঞা করিয়া আমি কোনও কথা বলিতেছি। তবে এই বিভেদটা সত্য এবং বর্ত্তমান কালেও পৃথিবীতে বহু দৃষ্টান্ত ইহার দেখা যায়।

আর্য্যগণ যখন ভারত অধিকার করেন, অনার্য্যদের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম ইঁহাদের হয়। উন্নত আর্য্যরাই বিজয়ী হইয়া শেষে দেশকে আর্য্যভূমি করিয়া তুলেন। পরাভূত অনার্য্যগণ কেহ দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নিল—কেহ আর্য্যদের অধীনতা গ্রহণ করিল।—ঐতিহাসিকগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন এবং মিথ্যাও বলেন না। অনেক প্রমাণ ইহার পাওয়া যায়। আর্য্য অধিকার বিস্তারের সঙ্গে ক্রমে বহু বর্ব্বর অনার্য্য সম্প্রদায় আর্য্যদের অধীনতা স্বীকার করে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা যেমন নাকি শ্বেতাঙ্গ ফিরিঙ্গী * জাতি সমূহের আগমনে ও অধিকার বিস্তারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে,—আর্য্য জাতির অধিকার বিস্তারে ভারতের অনার্য্যগণ সেরূপ ভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই। এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যেমন আর্য্য জাতির অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে, সেই সেই অঞ্চলের অনার্য্য জাতি সমূহ যেমন আর্য্যদের শাসনাধীন আসিয়াছে, আর্য্যরাও তেমন তাহাদের আপনাদের সমাজের গণ্ডীর মধ্যে মধ্যে একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যথা সাধ্য ও যথা সম্ভব তাহারা আর্য্যদের ধর্ম্ম ও আচারনীতির অবলম্বন করে, কিন্তু আর্য্যদের সমান হইয়া উঠিতে পারে না। সহজে তা সম্ভবও হয় না। এদিকে ইহাও সম্ভব নয় যে আর্য্যের সমান সামাজিক ভাবে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবেন। উন্নত ও অবনত প্রকৃতির দুইজাতি একদেশের অধিবাসী হইতে পারে, কিন্তু সমান সামাজিক ভাবে তাহারা মিলিতে পারে না। অবনত জাতি উন্নত সংস্কারে ও আচারের অধিকারে উন্নত জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে না, আবার উন্নত জাতিরও সর্ব্বদা এই সতর্কদৃষ্টি ও চেষ্টা থাকে, এরূপ মিশ্রণে তাহাদের হীনতা কিছু না ঘটে।

তাই বিজিত অনার্য্যগণ আর্য্য অধিকারে এবং আর্য্য সমাজে স্থান পাইল বটে, কিন্তু এই স্থান হইল একটা নিম্ন স্তরে। প্রাচীন ভারতে প্রথম জাতিভেদ ইহাই,—Race এবং race cultureএর দারুণ প্রভেদ ইহার মুল কারণ। বর্ণ ভেদের এই পার্থক্যটাকে আমরা racial নাম দিতে পারি। আর 'বর্ণ' যদি গায়ের রঙের অর্থে করা যায়, তবে আদিম ও প্রকৃত বর্ণভেদ ইহাই বটে, এবং ভারতে 'সাদায় কালোয়' প্রথম ভেদ ইহাই ঘটিয়াছিল। আর্য্যে অনার্য্যে এই ভেদই ক্রমে প্রাথমিক দ্বিজ শূদ্রে ভেদ হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমান জগতে ইহার অনুরূপ এক ভেদ দেখা দিয়াছে প্রধানতঃ আফ্রিকায় এবং কতক পরিমাণে আমেরিকায় মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা ভরিয়া শ্বেতাঙ্গ ফিরিঙ্গী জাতি সমূহের বড় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। নিগ্রো জুলু হটেণ্টট প্রভৃতি বহু বহু কৃষ্ণকায় বর্ব্বর ও বন্য জাতি এই সব অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। ফিরিঙ্গীর বসতি ও অধিকার বিস্তারে তারা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে না। একই দেশে উন্নত শ্বেতাঙ্গ ফিরিঙ্গীর এবং বর্ব্বর কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইজাতির অবস্থান ঘটিয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক এই যে বিভেদ তাহা সম্পূর্ণ ভাবেই বর্ত্তমান আছে। ফিরিঙ্গীতে নিগ্রোতে সমান সামাজিক সম্মিলন হয় না, পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে রাষ্ট্রীয় আইনও অনেক আলাদা রকম। নিগ্রোরাও খৃষ্টান হইয়াছে, এক জগৎপিতা ঈশ্বরের সন্তান সকল মানবই সমান ভাই ভাই, খৃষ্টধর্ম্মের এই নীতি সত্ত্বেও এক গির্জ্জায় পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গীর ও নিগ্রোর সেই এক পিতার ভজনায় যোগ দিবার ব্যবস্থা নাই। নিগ্রোদের গির্জ্জা সব আলাদা, ফিরিঙ্গীর গির্জ্জায় তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। নিগ্রোদের কোনও ফিরিঙ্গী যাজক পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গীর যাজকতা করিতে পারেন না। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যেরূপ

* ফিরিঙ্গী কথাটা কোনও অবজ্ঞা সূচক অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। পশ্চিম এসিয়ায় ইয়োরোপীয়দের সাধারণ নামই ফিরিঙ্গী, 'ফ্রাঙ্ক' কথাটার অপভ্রষ্টরূপ। মধ্যযুগের প্রারম্ভে 'ফ্রাঙ্ক' জাতিই ইয়োরোপের অতি প্রবল ছিল। তাই এই নামটাই এসিয়ায় প্রচলিত হইয়াছে।

আছে, জল-অনাচরণীয় জাতিসমূহের যাজকতা যে ব্রাহ্মণরা উচ্চতর জাতীয়দের নিকট তাঁহারা জল অনাচরণীয়। এই সব ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজে 'বর্ণ ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত, আফ্রিকায় নিগ্রোযাজক ফিরিঙ্গী পাদ্রীও সেইরূপ 'বর্ণ ব্রাহ্মণ'। তবে সে দেশের জাতিভেদে খাওয়া ছোঁয়ায় কোনও বাধা নাই, আমাদের সঙ্গে এই যা তফাৎ।

আমেরিকাতেও আদিম অধিবাসীদের বংশধর কিছু কিছু এখনও বর্ত্তমান। তাহা ছাড়া কৃষ্ণকায় নিগ্রো-দাসেদের বংশধরও অনেক দেখা যায়। আফ্রিকার ন্যায় সেখানেও সাদায় কালায় কঠোর ভেদ রহিয়াছে। সাদার কড়া ব্যবস্থা আপনাদিগকে কালার সংস্রব হইতে রক্ষা করেন। সামাজিক সম্মিলন ত হয়ই না, শ্বেতাঙ্গের হোটেলে পর্য্যন্ত নিগ্রো গিয়া খাইতে পারে না, শ্বেতাঙ্গ ছেলেদের বিদ্যালয়ে নিগ্রো ছেলেরা পড়িতে পারে না।

অনেকে হয়ত বলিবেন ইহা ভাল নয়। এতটা ভাল নয়, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে উন্নত ও অবনত, রূপে ও গুণে, দেহে ও মনে সংস্কারে ও আচারে, একেবারে আকাশ পাতাল তফাৎ দুইজাতি সমান সামাজিক ভাবে মিশিতে পারে না, মিলিতে চায় না। উচ্চতর যারা তারা সাবধানে আপনাদের উচ্চতা রক্ষা করিতে চায়।

ভারতে আর্য্যে অনার্য্যে অথবা দ্বিজে শূদ্রে যে ভেদ পরস্পর হইতে বহুবিষয়ে বিচ্ছিন্ন যে দুই বর্ণের বা জাতির অস্তিত্ব তাহাও এই কারণে এই ভাবে হইয়াছিল। আফ্রিকা আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে সাদায় কালায় ভেদে যতটা কঠোরতা এখন দেখা যায় প্রাচীন ভারতে আর্য্যে-অনার্য্যের, দ্বিজ শূদ্রের ভেদে এরূপ কঠোরতা বর্ত্তমান ছিল না। আর্য্য সমাজে শূদ্র অনেক বেশী সুখে ছিল। সামাজিক ভাবে না মিশিলেও শূদ্রদের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য ভারতীয় আর্য্যেরা অনেক বেশী যত্ন করিতেন, শূদ্রের প্রতি তাঁহাদের ব্যবহারেও করুণা অনেক বেশী ছিল। শূদ্র সম্বন্ধে যে সব বিধি ব্যবস্থা পাওয়া যায়, তাহাই তার প্রমাণ। আর্য্যগণ শূদ্রের কন্যা পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া ঘরে আনিতেন,—যদিও শূদ্রের ঘরে কন্যা দিতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন। নীচ কুলের কন্যা ঘরে আনা সেই কন্যাকে উপরে তুলিয়া আনা,—আর কন্যা নীচকুলে দেওয়া আপন সন্তানকে নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহে যে পার্থক্য ছিল, তাহার কারণ এই। আকৃতি, প্রকৃতি, সংস্কার এবং আচারনীতিতে অর্থাৎ race এবং race cultureএ বিভিন্ন, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি কর্ম্মশক্তি ও সভ্যতায় প্রায় সমকক্ষ, এইরূপ দুইজাতিও ঘটনাচক্রে এক দেশের অধিবাসী হইয়া পড়িতে পারে। এরূপ অবস্থায় মিশ্রণ অপেক্ষা পৃথক থাকার প্রবণতাই বেশী দেখা যায়। বিজেতা বিজিতের সম্বন্ধ যদি এই দুই জাতির মধ্যে হয়, তবে বিজিত জাতি বিজেতার সঙ্গে মিশিতে কিছু আগ্রহশীল হইলেও বিজেতা জাতি আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতেই চায়। বর্ত্তমান জগতেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এসিয়ার আর্য্য, সেমিটিক ও চীন জাপ প্রভৃতি মোঙ্গল জাতি সমূহ শ্বেতাঙ্গ ফিরিঙ্গী হইতে এই ভাবে অনেকটা পৃথক রকমের হইলেও ধী বিদ্যা ও সংস্কারে কিম্বা কুলগৌরবে হীনতর নহেন। শ্বেতাঙ্গরা যতই হীন বলুন, আমরা একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বিচারেও পরাভূত হইব না। কিন্তু যেসব অঞ্চলে ইয়োরোপীয় ও এসিয়াবাসী একত্র বাস করিতেছেন, সেখানে সমান সমাজিক সম্মিলন ঘটে না। ইয়োরোপীয়েরাই অনেক স্থলে পার্থক্যটা বেশী কঠোর ভাবে রক্ষা করিয়া চলেন। যাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন,—তাঁহারা তাহাদেরও সঙ্গে সমান সমাজ ভুক্ত হয় না।

প্রাচীন ভারতের আর্য্য হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে অনেক বেশী উদারতা দেখাইয়াছেন। অনার্য্য দ্রাবিড় জাতি দাক্ষিণাত্যে বড় একটা প্রবল উন্নত জাতি ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে যখন আর্য্য অধিকার বিস্তৃত হইল,—উন্নত এই অনার্য্য দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে তাঁহারা মিলিয়া গেলেন। বর্ব্বর অনার্য্যেরা সর্ব্বত্র নিম্নতর শূদ্রের স্থান পায় বটে, কিন্তু দ্রাবিড় জাতি race ও race cultureএ বিভিন্ন হইলেও উন্নত বলিয়া সমান সামাজিক সম্বন্ধে আর্য্যেরা তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া এক জাতি এক সমাজ হইয়া যান। দ্রাবিড় অঞ্চলে আর্য্য অনার্য্য পৃথক দুইটি জাতি নাই। মিশ্রিত আর্য্য-দ্রাবিড় সমাজেও আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুদের ন্যায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের বা জাতির অভ্যুদয় হয়। মহর্ষি অগস্ত্য ও পরশুরাম দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতায় ও আর্য্য

সমাজধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসমাজ ইঁহাদিগকে সকল বিদ্যার, সকল শাস্ত্রের গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। মাদ্রাজ বিভাগে এই মিশ্রণে দ্রাবিড় জাতির সংখ্যাধিক্য এতই বেশী ছিল যে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য সমাজনীতির অনুবর্ত্তী হইলেও জনসাধারণের ভাষা এখনও দ্রাবিড়ী।

কেবল দ্রাবিড় জাতির সম্বন্ধেই যে এই উদারতা আর্য্য হিন্দুগণ দেখাইয়াছিলেন, তা নয়। পরবর্ত্তী কালে যবন, শক, পারদ, পহ্লব, হূন্ প্রভৃতি বহু শক্তিশালী বিদেশী জাতি ভারতের নানা স্থানে রাজ্য ও বসতি স্থাপন করেন, ভারতীয় হিন্দুগণ ইঁহাদিগকেও আপনাদের মধ্যে মিশাইয়া নিয়াছেন। গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে, চারিবর্ণের মধ্যেই যথাযোগ্য স্থান ইঁহারা লাভ করিয়াছেন।

পার্শী ও মুসলমান এই দুই জাতি হিন্দু সমাজে মিশেন নাই। তার প্রধান কারণ, ভারতবাসী হিন্দুর সঙ্গে এক ধর্ম্ম ভুক্ত ইঁহারা হন নাই। ধর্ম্মে যেখানে এত বেশী তফাৎ, এবং ধর্ম্মনীতি যেখানে সামাজকে নিয়ন্ত্রিত করে সেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দুই জাতি একেবারে মিশিয়া এক সমাজভুক্ত হইতে পারে না।

আরও একটি কারণ আছে। পার্শিরা অতি ছোট একটি সম্প্রদায় এবং কঠোর ভাবে আপনাদের বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মুশলমানের সঙ্গে মিলন সম্ভব হইত, হিন্দু মুশলমান হইলে। মুশলমানের সেদিকে যথেষ্ট আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল। কিন্তু,হিন্দুর স্বধর্ম্মানুরাগ অতি প্রবল। আর বিজয়ী মুশলমান প্রভাবে হিন্দুর ধর্ম্মগত ও সমাজগত বৈশিষ্ট লুপ্ত না হয়, তার জন্য কঠোর আচার নিয়মে হিন্দুর জাতি ও সম্প্রদায় গুলিকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। জাতিভেদের যে বর্ত্তমান rigidity তাহা মুশলমান বিজয়ের পরেই আরম্ভ হইয়াছে, তার আগে ইহা অনেক elastic ছিল।

এই প্রবন্ধে আজ আমরা কেবল জাতিভেদের (racial) দিকটাই মোটামুটি আলোচনা করিলাম। ইহার সামাজিক (social) এবং ব্যবসায়িক (economic) আরও প্রধান দুইটি দিক আছে। পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

চতুরঙ্গ

(১

"ঠাকুমা—ঠাকুমা—ও ঠাকুমা !"

দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে সারা গ্রামখানি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয় হৃষ্টপুষ্ট বালক প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া পিতামহীকে ডাকিল।

নয়নতারা তাঁহার শয়নগৃহে মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া বসিয়া একখানি মলিন উই-কাটা রামায়ণ হাতে করিয়া গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতেছিলেন। পৌত্রের আহ্বানে চকিত হইয়া পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া বলিলেন, "কে রঙ্গ ?—আয়, এখানে আয়।"

বালকের নাম চতুরঙ্গ ; পিতামহী আদর করিয়া 'রঙ্গ' বলিয়া ডাকেন।

চতুরঙ্গ দাওয়ার উপর উঠিয়া নিতান্ত নিরীহের মত ধীরে ধীরে পিতামহীর কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নয়নতারা স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি ?"

চতুরঙ্গ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ।"

"ঐ তাকের ওপর 'তারের ঢাকা' চাপা দুধ আছে, খেয়ে নে।"

চতুরঙ্গ লাফাইয়া উঠিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া বিরক্তভাবে বলিল, "আমি কি কচি খোকা যে দুধ খেয়ে থাকব ! দুধখেয়ে আমার পেট ভরবে না, ভাত দাও বল্‌চি।"

"হাঁড়িতে ভাত নেই।"

"তোমার পাতের ভাত রাখনি ?"

"আজ মনে ছিল না, ভুলে গিয়েছি।"

"তবে রায়েদের আমবাগানে চেষ্টা দেখিগে।" বলিয়া চতুরঙ্গ গমনোদ্যত হইল।

নয়নতারা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না না, ওকাজ করিস্ নে, দাদা—পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে।"

"চতুরঙ্গ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "বলুক গে।"

"মালী যদি দেখতে পায়, মার ধোর করবে।"

চতুরঙ্গ কল্পনায় ক্রোধ দেখাইয়া হুঙ্কার দিয়া বলিল, "হুঁঃ! আমায় মারবে ঐ উড়ে জন্তুটা! একচড়ে তাকে শুইয়ে দিতে পারি।"

নয়নতারা কোমলস্বরে বলিলেন, "ছি, দাদা, পরের জিনিষ কি নিতে আছে?"

"ক্ষিদে পেলে খুব নিতে আছে।"

"কে বল্লে?"

"আমি বল্‌চি।"

"তুমি ছেলেমানুষ, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।"

"আল্‌বৎ আছে। সেদিন গুরুমশাইয়ের তামাক ফুরিয়ে গিয়েছিল, হরিশ ভাঁড়ারীর কাছে গিয়ে বললুম, একটুখানি তামাক দাও, গুরুমশাই খাবেন; হরিশ দিলে না, কাযেই বুদ্ধি খেলিয়ে হরিশকে একটু অন্যমনস্ক করে খপ্ করে খানিকটা তামাক তুলে নিয়ে কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে ফেললুম, তারপর সুবিধে বুঝে গুরুমশাইকে তামাকটা দিয়ে এলুম; গুরুমশাই তাই দেখে বললেন, আমার মত বুদ্ধি পাঠশালায় আর কারু নেই।"

নয়নতারা একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "আজকাল হাটে বাজারেও চুরি কর্ত্তে শিখেচিস্?"

"হরিশ দিলে না কেন? দিলে ত কখনো চুরি কর্‌তুম না।"

নয়নতারা বলিলেন, "থাক্, তুই একটু সবুর কর্, আমি উনানে আগুন দিয়ে গরম গরম পরোটা ভেজে দিচ্ছি।"

চতুরঙ্গ চঞ্চলনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "সবুর-টবুর করতে পারব না, ক্ষিদেয় পেট জ্বলচে।"

নয়নতারা বিরক্তভাবে বলিলেন, "অতই যদি তোর ক্ষিদে, তবে আমায় খা!"

"হুঁ, মানুষে বুঝি মানুষ খেতে পারে, রাক্ষসে খায়।"

নয়নতারা অসহ্য ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দূর-হয়ে যা পোড়ারমুখো লক্ষীছাড়া ছেলে,—দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে!"

চতুরঙ্গ পিতামহীর রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। তড়াক্ করিয়া একলাফে উঠানের উপর পড়িয়া আর একলাফে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া চতুরঙ্গ এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া পিতামহীকে রান্নাঘরে দেখিতে পাইল। পা টিপিয়া অতি সন্তর্পণে সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। নয়নতারা দ্বারের দিকে পিছন করিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন, পৌত্রকে দেখিতে পাইলেন না। চতুরঙ্গ বেশ করিয়া একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া নিঃশব্দে মাটিতে বসিয়া পড়িল। উনানে টগ্‌বগ্ করিয়া ভাত ফুটিতেছিল, মাঝে-মাঝে দু'-চারটি ভাত ছিটকাইয়া উনানের মধ্যে পড়িতেছিল, চতুরঙ্গ সেইদিকে চাহিয়া আজিকার অপ্রীতিকর ঘটনাটি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। অদূরে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর তাহার প্রিয় বিড়ালটি চক্ষু মুদিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। অন্যদিন হইলে সে বিড়ালটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া, স্বহস্তে তাহার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া আদর-আপ্যায়নে অস্থির করিয়া তুলিত। কিন্তু আজ সে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করিল না।

ভাতের হাঁড়ীতে জল কমিয়া যাওয়ায় শোঁ। শোঁ। আওয়াজ হইতেছিল; নয়নতারা উঠিয়া হাঁড়ীতে একঘটি জল ঢালিয়া দিলেন। তারপর স্বস্থানে ফিরিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইলে, যখন এই নিস্তব্ধতা একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, চতুরঙ্গ তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া একটা হাই তুলিয়া বলিল, "আমি এসেছি।"

নয়নতারা মুখ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

চতুরঙ্গ নিজের অজ্ঞাতসারে চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "ভাত খেতে।" বলিয়াই তার মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

নয়নতারা সহজস্বরে বলিলেন, "ভাত চড়িয়েছি হয়ে এল বলে; সকালকার ডাল আছে, শুধু একটা তরকারী করতে হবে।"

চতুরঙ্গ একটু আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের তরকারী?"

"আলু পটল কুমড়ো দিয়ে একটা ঘ্যাঁট।"

"আচ্ছা আমি বল্‌চি, তুমি চট্ করে রেঁধে ফেল।"

পিতামহীর সহজ ভাব ভঙ্গী দেখিয়া চতুরঙ্গ ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মস্তিকের অনন্তভাণ্ডার আলোড়িত করিয়াও সে ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না।

আহারাদির পর চতুরঙ্গ পিতামহীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর মা, তুমি আমায় আর বক্‌লে না যে?"

নয়নতারা সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তোকে কি বক্‌তে পারি দাদা? তখন বড্ড রাগ হয়েছিল কিনা, তাই—"

বেদনার উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

চতুরঙ্গ পিতামহীর গায়ের কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, "ঠাকুমা তুমি আমায় খুব ভালবাস, না?"

নয়নতারার নয়নমণি বিশ্বম্ভর যে দিন পূর্ণ যৌবনে অপূর্ণ বাসনা লইয়া এক অলঙ্ঘনীয় নিষ্ঠুর আদেশে কোন এক সুদূর অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করিল, সে আজ নয় বৎসরের কথা—চতুরঙ্গের বয়স তখন চারি বৎসর মাত্র। তারপর বৎসর না যাইতে বিশ্বম্ভরের সতী সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করিল। পুত্র বিয়োগে শোকে দুঃখে নয়নতারার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর পুত্রবধূ যখন বালকপুত্রকে রাখিয়া সংসার ছাড়িয়া গেল, তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ভগ্নশরীরে কি করিয়া পৌত্রের লালন পালন করিবেন এই চিন্তায় তিনি বিকল হইয়া পড়িলেন। তবে দিন চলিয়া যায়, কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। নয়নতারার দিনগুলিও 'যেন তেন প্রকারেণ' চলিয়া যাইতে লাগিল। পাঁচবৎসরের বালক ক্রমে ত্রয়োদশ বর্ষীয় কিশোরে পরিণত হইল।

পৌত্রের প্রশ্নে পিতামহীর বক্ষ আলোড়িত করিয়া এই সকল পুরাতন কথা জাগিয়া উঠিল। অতি কষ্টে উচ্ছ্বলিত অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ, দাদা।"

(২)

পরদিন অতি প্রত্যুষে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া নয়নতারা 'বাসি' ঘরদুয়ার ঝাঁট দিয়া ও গোবর নিকাইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিলেন। তারপর গাত্রে ও মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্কন্ধে একখানি গামছা ফেলিয়া স্নান করিতে বাহির হইলেন। চতুরঙ্গ তখন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

পথে নয়নতারাকে দেখিতে পাইয়া রায়বাবুদের ভৃত্য রামধন নিকটে আসিয়া বলিল, "শুনেচ ঠাক্‌রোণ, তোমাদের রঙ্গর কাণ্ডখানা?"

পৌত্র আবার কি নূতন বিপত্তি ঘটাইয়াছে, জানিতে উৎসুক হইয়া নয়নতারা প্রশ্ন করিলেন, "কেন, রঙ্গ কি করেছে?"

"তালপুকুরের পুবদিকে বাবুদের যে আম বাগানখানা আছে, সেই বাগানের ভেতর ঢুকে রঙ্গ কাল্‌কে বড় দৈরাত্ম্যি করে গেছে। কর্ত্তা বাবু আমাদের বকে-ঝকে কুরুক্ষেত্তর লাগিয়ে দিয়েচেন। আমরা কি করব বল, তোমাদের রঙ্গর সঙ্গে যে পেরে ওঠা দায়!"

"তুই ঠিক জানিস্ রঙ্গ এ কাজ করেছে?"

"মালী বল্লে, আশপাশের আরো দুচার জন লোকে বল্লে, একথা কি মিথ্যে হতে পারে?"

"তবে চল্ আমার সঙ্গে।" বলিয়া নয়নতারা গৃহাভিমুখী হইলেন। রামধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উভয়ে যখন গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, চতুরঙ্গ তখন প্রাঙ্গনস্থিত পেয়ারাবৃক্ষের উপর উঠিয়া মহানন্দে অর্দ্ধপক্ক পেয়েরাগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছিল। নয়নতারা কর্কশ স্বরে বলিলেন, "নেমে আয়!"

চতুরঙ্গ রামধনকে দেখিয়া ব্যাপারখানা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, বিনাবাক্যব্যয়ে বৃক্ষ হইতে পিতামহীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নয়নতারা তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কাল রায়বাবুদের আমবাগানে গিয়েছিলি?"

চতুরঙ্গ রামধনের পানে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া বলিল, "হু।"

"ক'টা আম চুরি করেছিলি?"

"চুরি করব কেন? আমপেড়ে মালীর নাকের ওপর ধরে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে খেলুম।"

"ক'টা আম খেলি?"

"দুটো।"

নয়নতারা ধমক্ দিয়া বলিলেন, "মিথ্যে কথা!"

চতুরঙ্গ প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জবাব দিল, "খাঁটি সত্যি কথা। তারপর একটু থামিয়া বলিল, "অতক্ষণ ধরে আতি পাতি করে খুঁজলুম, কোন গাছেই তো আম দেখতে পেলুম না। আর গাছগুলোরই বা দোষ কি, এতো আর আমের সময় নয়। ভাগ্যিস্ বারমেসে গাছটায় দুটো আম পাওয়া গেল, নইলে শুধুহাতে ফিরতে হত!"

আঁচলে একটা টাকা বাঁধা ছিল, নয়নতারা সেটা খুলিয়া লইয়া রামধনের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই টাকাটা তোদের বাবুর হাতে দিস্। রঙ্গ আম খেয়েছে, তার দাম।"

রামধন একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল, "বাবু ত দাম চান নি, টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও, ঠাক্‌রোণ।"

নয়নতারা বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, তাকি হয়? পরের জিনিষ না চেয়ে নিয়ে খেয়েছে, দাম দিতে হবে বৈকি।"

রামধন টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বলিল, "তবে আসি, ঠাক্‌রোণ।" বলিয়া চতুরঙ্গর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই গলা খাটো করিয়া উপদেশচ্ছলে বলিল, "দাদাঠাকুরের একটা বে দিয়ে দাও, দুদিনে শুধরে যাবে'খন।"

বিনা পরিশ্রমে একটি রজতমুদ্রা লাভ করিয়া রামধন হৃষ্টচিত্তে প্রতিগমন করিল।

নয়নতারা তখন পৌত্রকে গম্ভীরস্বরে আদেশ করিলেন, "এখানে নাকখৎ দে।"

পিতামহীর আদেশ চতুরঙ্গ বিনা আপত্তিতে, পালন করিল। নয়নতারা তখন, বেলাটা কত হইয়াছে নির্দ্ধারণ করিবার জন্ম সূর্য্যের প্রতি একটিবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পুষ্করিণী ঘাটের দিকে পদচালনা করিলেন।

(৩)

দিন তিনচার পরে চতুরঙ্গ যখন একদিন মধ্যাহ্নে রান্না ঘরের দাওয়ার উপর আহার করিতেছিল, নয়নতারা একথা সে-কথার পর বলিলেন, "রঙ্গ, তোর বিয়ের একটা সম্বন্ধ এসেছে, তারা দেবে থোবে বেশ, আর মেয়েটিও দেখতে খাসা! তুই কি বলিস্?"

চতুরঙ্গ মুখের মধ্যে একগ্রাস ভাত প্রবেশ করাইয়া বলিল, "আমি বিয়ে করব না।"

নয়নতারা একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"বৌ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে।"

"কে বল্লে?"

"কেন, ও বাড়ীর ভবী পিসির সঙ্গে বড় বৌদির নিত্যি ঝগড়া হয়, তুমি জান না?"

নয়নতারা হাসিয়া বলিলেন, "দূর পাগল! সবাই কি সমান? আর সে একটা পুঁটকে মেয়ে, মোটে সাত বছর বয়েস, সে আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ব্বে কি রে?"

"আচ্ছা, ঝগড়া যদি না করে, তবে বিয়ে করতে রাজী। কিন্তু"—

"কিন্তু আবার কি?"

"কিন্তু বলে রাখছি, তুমি যদি বৌকে বেশী বেশী খাবার দাও, আর বড় বড় দেখে মাছ দাও, তাহলে আমি চেঁচিয়ে মেচিয়ে রসাতল করব।"

নয়নতারা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা; তাই হবে। তোকেই সব জিনিষ বেশী দেব।"

সেই দিনই আহারাদির পর নয়নতারা হীরু ভট্টচায্যির গৃহিণীকে বলিয়া আসিলেন, যে রঙ্গ বিবাহ করিতে অস্বীকৃত নহে, বিবাহের দিনস্থির করা হউক।

* * * *

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে হীরু ভট্টচায্যির সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা ক্ষীরোদার সহিত চতুরঙ্গর বিবাহ হইয়া গেল। নয়নতারা হীরুভট্টচায্যিকে বলিয়া কহিয়া ক্ষীরদাকে কিছুদিনের জন্ম নিজের কাছে রাখিলেন।

কি জানি কেন, ক্ষীরোদার সহিত চতুরঙ্গর বনিবনাও হইল না, প্রায়ই 'খিটি-মিটি' বাধিতে লাগিল। আহার করিতে করিতে বক্রদৃষ্টিতে ক্ষীরোদার পাতের মাছটী দেখিয়া লইয়া চতুরঙ্গ লাফাইয়া উঠিয়া বলে, "আমার পাতের মাছ ছোট, আমি খাব না।" নয়নতারা যদি বলেন, "তোর-টাই বড়, ক্ষীরিরটা ছোট" অমনি চতুরঙ্গ চিলের মত ছোঁ মারিয়া ক্ষীরোদার মাছটী তুলিয়া লইয়া নিজের মাছটীর সহিত তুলনা করিয়া দেখে; যদি একচুল এ-দিক ও দিক হইল, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকে না; ভাত ছড়াইয়া,

চীৎকার ও লম্ফঝম্প করিয়া বাড়ী মাথায় করে। নয়নতারা বিব্রত হইয়া পড়েন। পৌত্রকে শান্ত করিয়া পুনরায় তাহাকে আহারে বসাইতে হয়ত একটা বেলা কাটিয়া যায়।

(৪)

নয়নতারা একমাসের কড়ারে ক্ষীরোদাকে রাখিয়াছিলেন। আগামী কল্য হীরু ভটচাযি্য কন্যাকে লইয়া যাইবেন। নয়নতারা তাই আজ বাজার হইতে উৎকৃষ্ট মৎস্য তরীতরকারী প্রভৃতি আনাইয়াছেন,—ইচ্ছা, পৌত্রবধূকে মনের সাধ মিটাইয়া খাওয়াইবেন।

বৈকালে পাঠশালা হইতে ফিরিয়া পুস্তকগুলি সশব্দে মেঝের উপর ফেলিয়া চতুরঙ্গ বলিল, "ক্ষিদে পেয়েচে।"

নয়নতারা রান্নাঘর হইতে একবাটি পায়স আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "ক্ষীরি কাল বাপের বাড়ী চলে যাবে কি না, তাই আজ রাত্তিরে একটু খাওয়ার আয়োজন করব। এখন এই পায়সটুকু খেয়ে ক্ষিদেটা শান্ত কর্, তারপর রাত্তিরে দুজনে মিলে পেট ভরে খাবি এখন।"

সজোরে পায়সের বাটি দূরে ঠেলিয়া চতুরঙ্গ মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমি তোমার কেউ নই, ক্ষীরিই তোমার সব!"

"কেনরে?"

চতুরঙ্গ ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলিল, "ক্ষিরীকে নিত্যি ঘটা করে খাওয়ান হচ্চে, আর আমার বেলায়——"

কথা আর শেষ হইল না, কান্নার ঢেউ আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

নয়নতারা সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছি দাদা, কাঁদিতে নেই! ক্ষীরি চলে যাচ্ছে, কদ্দিন পরে আবার আসবে তার ঠিক নেই, ওকে যদি আজকের দিনে একটু ভালমন্দ না খাওয়াই, লোকে বলবে কি?"

চতুরঙ্গ এবার যেন একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, "সে কথা যাক্; ক্ষীরি চলে গেলে আমায় একদিন ভাল করে খাওয়াবে?"

"নিশ্চয়।"

"তিন সত্যি কর।"

"খাওয়াব—খাওয়াব—খাওয়াব!"

চতুরঙ্গ জানিত, পিতামহীর কাছে এই তিন সত্যের মার নাই। উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "ক্ষীরি চলে গেলে দিব্যি মজা করে খাওয়া যাবে, না ঠাকুমা?"

পিতামহী হাসিয়া বলিলেন, "কি পেটুক ছেলে গা!"

চতুরঙ্গ তখন বিনানুরোধে পায়সের বাটি মুখের কাছে ধরিয়া এক নিমেষে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

এমন সময় চতুরঙ্গর সহপাঠী বন্ধু ভোলা আসিয়া ডাকিল, "রঙ্গ, রঙ্গ, বাড়ী আছিস্?"

"আছি।" ঝনাৎ করিয়া পায়সের বাটি আছড়াইয়া ফেলিয়া এক লাফে চতুরঙ্গ বাহির হইয়া গেল।

দুই বন্ধু যখন গলা ধরাধরি করিয়া আঁকা বাঁকা পথ দিয়া মাঠের দিকে চলিতেছিল, সেই সময় বেণীবন্ধনে সিদ্ধহস্তা প্রতিবেশিনী বিন্দু মাসীর নিকট হইতে ক্ষীরোদা চুল বাঁধিয়া ফিরিতেছিল। পথের উপর বরকে দেখিয়া হাততালি দিয়া বলিল, "কাল্‌কে আমায় বাবা নিতে আসবে, আমি কেমন চলে যাব, তুই তো যেতে পাবি নি।"

চতুরঙ্গ মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, "তোদের বাড়ীতে আবার মানুষ যায়, এঁদোপড়া বাড়ী কোথাকার।"

ক্ষীরোদা মুখ লাল করিয়া বলিল, "হুঁ, তা বৈকি?"

চতুরঙ্গ তাচ্ছিল্যভরে বলিল, "যা যা, তোর সঙ্গে আমি কথা কইতে চাইনে। তুই বিদেয় হলে আমার হাড় জুরোয়! ঠাকুমা কি বলেচে, শুনেচিস্ তো?"

ক্ষীরদা মুখ গোঁজ করিয়া বলিল, "কি বলেচে?"

"তুই চলে গেলে আমায় একদিন ভাল করে খাওয়াবে।"

ক্ষীরোদা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আঁচল উড়াইয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, "কবে একদিন খেতে পাবে, তাই আবার বড়াই করতে এসেচে! ছি ছি ছি!...... আমি কেমন আজ রাত্তির বেলায় লুচি, পায়েস, সন্দেশ—"

চতুরঙ্গ এবার যেন একটু অপমানিত বোধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ক্ষীরোদা আমোদ অনুভব করিয়া আহারের ফর্দ্দ ততই আওড়াইয়া চলিল, "মোচার ডাল্‌না, আলুর দম, মাছের কালিয়া, আনারসের চাট্‌নি——"

সেখানে দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদার ঠাট্টা বিদ্রূপ পরিপাক করা চতুরঙ্গর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।

ভোলা চতুরঙ্গর চেয়ে তিন বৎসরের ছোট। যে রঙ্গর নাম শুনিলে গ্রাম শুদ্ধ ছেলেরা 'থরহরি কাঁপিতে থাকে, সেই প্রবল-প্রতাপ অশিষ্টদমন রঙ্গর সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা সাত বৎসরের ক্ষুদ্রবালিকা কি করিয়া নির্ভীক চিত্তে কলহ করিতেছে, ইহা ভাবিয়া বিস্ময়ে সে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। চতুরঙ্গ সজোরে তাহাকে একটা. ঠেলা দিয়া অগ্রসর হইল।

অমনি ক্ষীরোদা হাততালি দিয়া বলিয়া উঠি "হেরে গেল, দুও! দুও!"

ভোলা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, "ওটা কেরে?"

চতুরঙ্গ মনের রাগ বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিয়া গুম্ হইয়াছিল। উত্তর করিল, "কে জানে, ঠাকুমা কোত্থেকে একটা জানোয়ার ধরে এনেচে?"

ভোলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই যে বড় চুপ করে রয়েচিস্?"

চতুরঙ্গ হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিয়া বলিল, "দাঁড়া ক্ষীরি ঝি

"আমি ঝি আর উনি নবাবপুত্ত্র,—মরে যাই!" বলিয়া পরক্ষণেই চতুরঙ্গর মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সে চমকিয়া উঠিল।

পথিপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড আমড়া গাছ ছিল, তারই একটা ডাল ঝুঁকিয়া পরিয়া ঈষৎ দুলিতেছিল। তড়াক্ করিয়া এক লাফ দিয়া চতুরঙ্গ ডালটা ধরিয়া ফেলিল, অমনি মড় মড় করিয়া ডালটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। চতুরঙ্গ তখন সেই ডালটা হাতে করিয়া সদর্পে ক্ষীরদার সম্মুখে আসিয়া বলিল, তোর বড্ড বাড় হয়েছে, একবার তার পরখ করে নিই।" বলিয়া ডালটা ঘুড়াইয়া সপাং করিয়া ক্ষীরদার কপালের উপর আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই কপাল চিরিয়া ভলক্ দিয়া রক্ত ছুটিল। চতুরঙ্গ সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ডালটা ফেলিয়া হন হন করিয়া পা চালাইয়া দিল। ভোলা বেগতিক দেখিয়া পুর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

"ওরে বাবারে—মেরে ফেল্লেরে—বরটা কি পাজীরে—"

যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে ক্ষীরোদা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

চারিঘণ্টা কাল বাঁশবাগানের মধ্যে মশকের নির্দ্দয় অত্যাচার বীরের মত সহ্য করিয়া চতুরঙ্গ যখন বাহিরে আসিল, তখন গ্রামখানি নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। চাঁদের আলোয় পথ দেখিয়া মৃদু পদে সে বাড়ীর দিকে চলিল।

একেবার সটান বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না; যদি কেহ জাগিয়া থাকে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সতর্ক পদে বাড়ীটি একবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভিতরকার খবর জানিতে চেষ্টা করিল।

কথোপকথনের শব্দ শোনা যাইতেছে না, ইহাতে বুঝিল, দুজনেই শুইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু নিদ্রিত কি জাগ্রত; সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। একটু এধার ওধার ঘুরিয়া চতুরঙ্গ অতি সন্তর্পণে বাড়ী ভিতর প্রবেশ করিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিল, শয়ন কক্ষে আলোর ক্ষীণ রশ্মি দরজার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া উঠানের উপর পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে। দুই এক পা অগ্রসর হইয়া দেখিল, দাওয়ায় নয়নতারা নিদ্রামগ্না। পা টিপিয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া আস্তে আস্তে শয়ন কক্ষের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা ভেজান ছিল, একটু ফাঁক করিয়া দেখিল, ক্ষীরদা তক্তপোষের উপর অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া লইয়া নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দরজা পূর্ব্বের মত ভেজাইয়া রাখিল। তারপর আস্তে আস্তে, তক্তপোষের নিকট আসিয়া ঘুমন্ত ক্ষীরোদাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, "ক্ষীরি, ওঠ্—ওঠ্।"

ক্ষীরোদা চোখ মেলিয়া চতুরঙ্গকে দেখিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "যা আমার কাছে আসিস্‌নি বল্‌চি।"

চতুরঙ্গ ধপ্ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া অনুতপ্তভাবে বলিল, "আমার ওপর রাগ করলি, ক্ষীরি?"

ক্ষীরোদা কোন জবাব না দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

চতুরঙ্গ সস্নেহে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কথায় বলে রাগের নাম চণ্ডাল। রাগের মাথায় একটা কুকর্ম্ম করে ফেলেচি, আমি ক্ষমা চাচ্ছি।"

ক্ষীরোদা একটু রাগিয়া বলিল, "যা, আর ঢঙ করতে হবে না!"

"আচ্ছা, আমি এই তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি করচি, আর কখনো তোর সঙ্গে ঝগড়া করব না।"

ক্ষীরোদা এবার একটু নরম হইল। চতুরঙ্গর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "কখনো না ?"

"কখনো না !"

"ঠিক তো ?"

"ঠিক।"

"আমায় ভালবাসবি ?"

"নিশ্চয়।"

"তবে আমিও তোকে এবার থেকে ভালবাসব। তুই ভারী দুষ্টু!" বলিয়া ক্ষীরোদা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত বি, এ

নন্দন পাহাড়

(২০)

দুনিয়ার ছোট বড় সকল ব্যাপারেরই কর্ত্তা যিনি, তাঁহার বিচার অতর্কিতে কোন্ পথে কখন আসিয়া পৌঁছে, তাহা জানিবার পূর্ব্বেই তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে বসিয়া, মানুষ যে কতখানি দুঃসাহসের পরিচয় প্রদান করে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়!

এই অতি তুচ্ছ নগণ্য কীটের স্পর্দ্ধিত গর্ব্ব দেবতার দেউলকে স্পর্শ করিয়া বাড়িয়া উঠে, এবং বিশ্বরাজের সিংহাসনকেও অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে!

মানুষ যে এতখানি সাহস করে, গর্ব্বে এমন অন্ধ হইয়া উঠে, সে কি শুধু ভিতরে ভিতরে এই কথাটা জানে বলিয়াই, যে, ঐ করুণামৃতের ভাণ্ডার তাহার কোনও অপরাধই উজাড় করিয়া দিতে পারিবে না।

কত অপরাধই তো মানুষ করে, কিন্তু কই, তিনি তো কৃপণের মত ওজন করিয়া, হিসাব করিয়া তাঁহার করুণামৃত পরিবেশন করেন না!

কিন্তু তবু কি মানুষ বুঝিতে চাহে ?

সে তাহার ভ্রান্তি নিয়াই গর্ব্ব করে;—অন্ধদৃষ্টি পর-কলায় ঢাকিয়া নিজেরই রচিত নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরিয়া মরে!

ওরে, এ যে কত বড় অপরাধ, তাহা বুঝিবার ক্ষমতাই কি তাহার আছে ?

কত দিক্ দিয়াই তো কত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু আজ যখনই মনে হইতেছিল, সকল অপরাধকে মার্জ্জনা করিয়া যদি তিনি ঐ ক্ষুদ্র বালকের প্রাণটুকু ফিরাইয়া দেন তখনই আবার কে যেন অন্তরের মধ্য হইতে সাড়া দিয়া কহিতেছিল—

"ওরে অন্ধ, ওরে তুচ্ছ,—তুই এমনি করিয়াই তো তোর অপরাধের বোঝা বাড়াইয়া তুলিস্! বিশ্বের সকল বেদনার আর্জি তাঁহার কাছে পৌছিবার পূর্ব্বেই যে তিনি, সকল শুভ, সকল মঙ্গলকে মানুষের দিকে প্রেরণ করিয়াছেন! ওরে, তুই যে লেখা বুঝিবি না, তা' শুধু নীরবে দেখিতেই থাক্। তার পর একদিন মানবের অমৃত ভাণ্ডারের মধ্যে তোর সকল তুচ্ছতাকে ডুবাইয়া, লুটাইয়া দিস্! তোর সকল বেদনার শান্তি সেইখানে; সকল হাহাকারের পরিসমাপ্তিও ঠিক সেই জীবন মৃত্যুর সীমান্ত রেখার কাছটীতে!

"ওরে সকল বাধা বন্ধনের শৃঙ্খল ভাঙ্গিলেই তো তোর মুক্তি!—তবেই ত তোর ছুটি!"

ভোরের আলো কখন ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সংবাদ এই শোকাচ্ছন্ন ঘরটীর মধ্যে তখনও পৌছায় নাই!

কিন্তু পিসীমা অজিতের বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া যখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"তোমরা হ'লে কি ? ডাক্তার কি বলেছে, তাই নাকি একেবারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে ? আর সত্যি এ কথা ভুললে চল্‌বে কেন, যে কবিরাজ ডাক্তারের উপরেও বড় একজন কেউ রয়েছেন, যাঁর ইচ্ছায় সবি হ'তে পারে! বাছা এমন হয়ে পড়েছে বলেই যে ও আর সারবে না, তা' কি কেউ বল্‌তে পারে ? মানুষের বোঝ্‌বার বাইরে এমন ঢের ব্যাপার রয়েছে,

যার ব্যবস্থা শুধু তিনিই করেন, এবং মানুষ তা' কোনও দিনই বুঝতে পারবে না !" তখন এই কথাটা মনে করিয়াই আমার মন বিপুল বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, যে, এমন করিয়া সকল মানুষের চিন্তার ধারা ঠিক্ একই পথ ধরিয়া চলে কেমন করিয়া ?

আমার মনে হইতেছিল, যখন আর কিছুই করিবার নাই ঠিক সেই মুহূর্ত্তটীতে, আমরা সকলেই যেন একটা অপ্রত্যাশিতের জন্য বসিয়া রহিয়াছি ! এবং সেই অপ্রত্যাশিত যে কোন পথ ধরিয়া আসিবে তাহাও যেমন আমরা জানি না, ঠিক্ তেমনি এ কথাটাও জানি না, যে, সে কোন্ আকার ধরিয়াইবা এই দুর্দ্দিনে দেখা দিবে !

কিন্তু তবু তো অনির্দ্দিষ্টের যাত্রীর মতই তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে ।

যাহাকে জানি না, এবং যাহাকে মোটেই আশা করি নাই, ভিতরে ভিতরে তাহারই আগমনের জন্য কখন যে অন্তর প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও বুঝা যায় না ত !

কিন্তু এতটুকু ইঙ্গিত, এতটুকু আভাষ পরিপূর্ণ ভাবেই জানাইয়া দেয়, যে, হাঁ, সে আসিয়াছে !

তাই পিসিমা যখন কহিলেন, "ওরে, এই বয়সে আমি কতই তো দেখলাম ;—আমি ঠিক্ জানি ঠাকুর কোন্ পথে তাঁর অনুগ্রহ পাঠান তা' মানুষ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও জান্তে পারে না ।"—তখন আমি এতটুকুও বিস্ময় অনুভব করিলাম না।

পিসিমা কহিলেন, "আমাদের এক জ্ঞাতির বাড়ীতে হয়বিত বলে একটী ছেলের ব্যামো হ'ল, বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ জবাব দিয়ে গেল ; যখন এমনি অবস্থা ; ছেলেরা সব তার সেবা কচ্ছিল ; ছেলেমানুষ সব, ঘুমের চোখে ওষুধ খাওয়াতে ভুল করে খানিকটে তারপিন্ খাইয়ে দিল ; আধঘণ্টার মধ্যে তার পেট পরিষ্কার হয়ে গেল ; নাড়ীর ভাব বদলে গেল ;—ছেলেটী বেঁচে উঠল ! ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়েও তো তিনি তাঁর দয়া মানুষকে জানাতে ছাড়েন না ! যাকে তিনি কোলে তুলে নেবেন, মানুষ হাজার চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারবে না, আর যাকে তিনি রাখ্বেন, তাকে বিষ খাইয়েও মানুষ মারতে পারবে না !

তারপর অজিতের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে রমাপ্রসন্ন বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার এতখানি বয়সে আমি কতইতো দেখলাম ; কতই ভুগলাম ; কিন্তু তার ফলে একটা কথা আমি ঠিক্ জেনে রেখেছি, যে, মানুষের মনের মত এমন সত্যি সাক্ষি আর কেউ দিতে পারে না ! এমন করে খাঁটী কথাটীও আর কেউ জানিয়ে দিতে পারে না ! কত রকম করেই মনের এই জানানকে অস্বীকার করে দেখেছি, কিন্তু এ কখনই চুপ করে থাকেনা, এর যা' বল্বার বরাবরই বলে যাচ্ছে, মানুষ মেনে চলুক, আর নাই চলুক ! স্নেহে, উদ্বেগে মানুষ অনেক সময়েই তাকে ধর্তে না পারলেও সে কিন্তু ঠিকই সাড়া দিয়া যায় ! তোমরা ওর কাছে বসে, ওর রোগ কাতর মলিন মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে যা' শুন্তে পাওনি, আমি একটু দূরে থেকে, ওই পূজোর ঘরে বসে, সে খবরটা ঠিকই ধরতে পেরেছি !—আমি বলে যাচ্ছি, আজ' সেরে উঠ্বেই ! তুই ওঠ্ বিনু ;—বৌমা তুমিত ওঠো ; অমন করে হাত পা' ভেঙ্গে বসে থাক্লে চল্বেনা ! দরজা জানালা গুলি খুলে দাও, বাইরের আলো বাতাস ঘরের ভিতর আসুক ! ঠাকুরের দয়া কোন্ পথ ধরে আস্বে তা'তো আমরা কেউই জানিনে !"

রমাপ্রসন্ন বাবু অজিতের শয্যা পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন । সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটী কথাও বলেন নাই । মাঝে মাঝে অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন এবং পরক্ষণেই দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছেন ।

এই ধ্যান পরায়ণ মূর্ত্তিরদিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছি ; কেবলি মনে হইয়াছে, কতখানি শক্তি ঐ স্নেহ ব্যাকুল পিতার হৃদয়ে ভগবান্ তুমি দিয়াছ ! কেনইবা এই দুরূহ পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া এমন করিয়া সেই শক্তির পরিচয় তুমি গ্রহণ করিতেছ ।

এখন পিসিমার কথা শুনিয়া রমাপ্রসন্ন বাবু কহিলেন, "আপনি ঠিক্ বলেছেন, দিদি, তাঁর দয়া যে কোন্ পথে আস্বে তা' আমরা কেউই জানিনে ! অজিত আমাকে তো যথেষ্ট সময়ই দিয়েছে ; এ কয়দিন ঠাকুরের পায়ের কাছে আমার সকল প্রার্থনাই তো জানিয়ে রেখেছি । দানের উপর যে, দিদি, কোনও দাবীই নাই, আমরা এই কথাটা ভুলে যাই বলেই তো যত অনর্থ বেড়ে ওঠে । আমি ওর

বিছানার পাশে বসে বসে এই কথাটাই আজ বেশ করে জেনেছি, যে আমাদের সকল প্রার্থনা, আব্দার, সকল ক্রটী বিচ্যুতি তাঁর কাছে নিবেদন করে দিয়েই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়াটাই ঠিক্। কিন্তু তা' কি পারি? পারিনে বলেই তো যত গোল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরবেই রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "ওর মাথায় একটু পায়ের ধুলো দিয়ে আপনি আপনার পূজোর ঘরেই ফিরে যান, আমাদের মধ্যে অন্ততঃ এমন একজন থাকা দরকার যিনি তাঁর পায়ের কাছে আমাদের সকলের প্রার্থনাই একাগ্র হয়ে জানাতে পার্‌চেন।

বৌ-দিদি ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দিয়াছিলেন। ভোরের কোমল, শুভ্র অরুণ লেখা শয্যার প্রান্তে পড়িয়া হাসিতেছিল।

টেবিলটার উপরকার দাগকাটা কাঁচের শিশিগুলির মধ্যে নানারঙ্গের ঔষধ রহিয়াছে। খানিকটা আলোক শিশিগুলির উপর পড়িয়া বিচিত্র রঙ্গের ছায়া টেবিলের সুনীল মখ্‌মলের উপর ও দেওয়ালের গায়ে ফেলিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকার যে সব করুণ দৃশ্যের উপর একটা অস্পষ্ট আবরণ দিয়া রাখিয়া প্রকৃত অবস্থাটাকে পরিষ্কার বুঝিতে দেয় না, দিনের আলোকে তাহা, নিষ্ঠুর সত্যের মতই, অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে।

এই ভোরের আলোকপাতে যখন ঘরের ভিতরকার সমস্ত জিনিষগুলিই হাসিয়া উঠিল, ঠিক্ তখনই অজিতের রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখেরদিকে চাহিয়া সকলেই ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিল!

সুজাতা কখন বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। এখন ফিরিয়া আসিয়া একটা গোলাপ অজিতের মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে দিতে, তাহার মুখের উপর পড়িয়া বলিয়া উঠিল—

"ও অজি, ও আমার অজি, ভাইটি, তুমি ভিতরে ভিতরে কত পথ এগিয়ে গেছ, তা' তো আমি রাতের অস্পষ্ট আলোয় বুঝ্‌তে পারিনি।"

সুজাতার কথা শুনিয়া ঘরের মধ্যে একটা বিপুল শোকের তরঙ্গ বহিয়া গেল।

বৌ-দিদি সুজাতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া নিজেই কাঁদিয়া অস্থির হইলেন।

রমাপ্রসন্ন বাবু বামহাতে একবার মুহূর্ত্তের জন্য কপালের দুইটা পাশ টিপিয়া ধরিলেন; তার পর বাহিরের নির্ম্মল স্নিগ্ধ আলোকদীপ্ত আকাশের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে অজিতের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

শেষরাত্রি হইতেই ইজি চেয়ারটায় উপর পড়িয়া ছিলাম। একবার হাতলের পাশে মুখ সরাইয়া কোটের হাতায় চোখ মুছিয়া লইলাম; তার পর উঠিয়া আসিয়া বৌদিদির মাথা ধরিয়া নাড়া দিয়া ডাকিলাম, "বৌদি"—

কিন্তু কণ্ঠস্বর একেবারেই অশ্রুরুদ্ধ হইয়া গেল। দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া আসন্ন ক্রন্দন বেগটাকে রোধ করিতে যাইয়া একেবারেই কাঁদিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু মন্দন পাহাড়, রুদ্রের বৃষভের মতই, যাঁহারা বুকের ভিতর চাপিয়া বসিতেছে, সেই রমাপ্রসন্ন বাবুর অশ্রুহীন চোখের দিকে চাহিয়া ঘরের মধ্যে থাকা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

বাহিরে যাইবার জন্য দুয়ারের দিকে ছুটিয়া আসিতেই বাধা পাইলাম।

দুয়রের কাছেই আলবার্ট আসিয়া পড়িয়াছে। খানিকটা সূর্য্যালোক তাহার গৌর দেহটার উপর পড়িয়া তাহাকে আলোকস্নাত দেবদূতের মতই দেখাইতেছিল।

আল্‌বার্ট কহিল, "আমি আসিয়াছি।"

এ যেন আশার বাণী বহন করিয়া এইমাত্র কোন অজানা দেশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে!

হাঁ, তুমি আসিয়াছ, ভাইস! হে দেবদূত! তুমি আইস! আমরা বুঝি এতক্ষণ তোমারই আশা পথ চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছি! তুমি যদি আসিয়াছ, তোমার আশার বাণী শুনাও!

আল্‌বার্ট ঘরের মধ্যে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে কহিল, "দিদিমণি, ভোরের গাড়ীতে আমার কাকা এখানে এসে পৌঁছেছেন! ভারতবর্ষ দেখেননি। তাই দেখ্‌তে এসেছেন। লণ্ডনের খুব বড় ডাক্তার তিনি; অজির কথা তাঁকে আমি সব বলেছি! যদি অমত না হয় তাঁকে এনে এখনি ওকে দেখান যায়! অজি' আমার ভাইয়ের মত, ওর এমন অসুখ, তাই জেনে ওকে

দেখ্‌তেও স্বীকার হলেন। আমি সাইকেলে ছুটে এসেচি!"—

আল্‌বার্ট তখনও পথশ্রান্তিতে হাঁপাইতেছিল। সুন্দর সুগৌর মুখখানি বর্ণসুষমায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে!

বিপদ যখন একেবারেই সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই আল্‌বার্ট তাহার অভয় ও আশার বাণী লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

রমাপ্রসন্ন বাবুর মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কোনও কথা না বলিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন!

বৌদিদি কহিলেন, "ওরে মাণিক ভাই আমার, একবার তুই সুজাতাকে বাঁচিয়েছিস্! এবার তোর খেলার সঙ্গী অজি'কে রক্ষা কর!—ওরে, তিনি কি আস্‌বেন,—এত দয়া কর্‌বেন?"

বৌদিদি উঠিয়া তাহার কাছে আসিবার পূর্ব্বেই আল্‌বার্ট একবার অজিতের ম্লান, পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিল, তারপর ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিল, "তোমার অনুমতি পেলেই হ'ল, আর আমি কিছু চাইনে তো দিদিমণি!"

সঙ্গে যাইবার জন্য দ্রুতপদে বাহির হইলাম। আমার ডাক কাণে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আল্‌বার্ট সাইকেল ছুটাইয়া মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

পিসিমা একবার সকলের মুখের দিকে স্মিত মুখে চাহিয়া কহিলেন, "ওরে তোরা অত উতলা হস্‌নে! যিনি এত কাণ্ড করচেন, তিনি কোন্ পথে কি করচেন তা' আমরা কেউই তো জানিনে। তবে শুধু এই টুকুই জেনে রাখ, তিনি যা কর্‌বেন তার মধ্যে ভুল চুক একটুও নেই! দরকার মত সবই ঠিক্ ঠিক্ ঘটে যাবে!"—বলিয়াই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

একটু পরেই দেখা গেল ডালিতে কিছু পূজোপকরণ লইয়া ঝির সঙ্গে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বৌদিদি কহিলেন, "উনি বুঝি বাবার মন্দিরে চ'লে গেলেন!"—

রমাপ্রসন্ন মৃদুস্বরে কহিলেন, "ওঁর সঙ্গে যেয়ে যদি শঙ্করের পায়ের কাছে সব সুখ দুঃখ নিঃশেষে নিবেদন করে দিতে পার্‌তাম তবেই ঠিক হত";—তারপর নিজের মনে মনেই কহিলেন, "তা' পারি কই!—পারি কই, এত দুর্ব্বল তুমি আমায় করেছ ঠাকুর!"

প্রায় পঁচিশ মিনিট পরেই এক বিরাট্ শ্বেতকায় পুরুষ সাইকেল হইতেই সিঁড়ির উপর নামিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি দ্রুতপদে বারান্দার উপর আসিতেই আল্‌বার্ট তাহার সাইকেল হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "ইনি আমার কাকা সার্ এড্‌ওয়ার্ড লুকাস্!—কাকা, ইনি—মিঃ বিনয় মুখার্জি!"—

শক্তিশালী বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল; কিন্তু একখানি সুদৃঢ় হস্তের প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে আমার হাতখানা পৌঁছিতেই বুঝিলাম, সেই হাতের অধিকারী বিপুল শক্তিশালী; এবং তাঁহার পরম শুভ্র উত্তপ্ত হাতখানার মধ্যে আমার এমন সুপুষ্ট হাতখানাও একটি শিশুর হাতের মতই ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে!

কিন্তু ঐ হস্তের অধিকারী যে কতখানি অমায়িক ও হৃদয়বান্, তাহা তাঁহার প্রথম কথাতেই বুঝিতে পারিলাম। সার্ এড্‌ওয়ার্ড আমাকে কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়াই কহিলেন,—

"সুপ্রভাত! এর পরে আলাপ পরিচয়ের আনন্দ অনুভব করা যাবে! চলুন, রোগী দেখিব!"

ঘর হইতে মেয়েরা বাহির হইয়া গেলেন। সার্-এড্‌ওয়ার্ড অজিতের শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া পড়িয়া প্রায় দশ মিনিট্ পর্য্যন্ত নানা প্রকারে পরীক্ষা করিলেন।

তার পর উঠিয়া আসিয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া কহিলেন, "আল্‌বার্টের কাছে রোগের অবস্থা সবই শুনে নিয়েছি; সেই জন্যেই এত তাড়াতাড়ি চলে এলাম এখন আর একটা মিনিটও নষ্ট করা ঠিক হবে না। তবু একটা কথা জানুন।—এর অসুখ আজ ঠিক আট—দিন?"—

উৎকণ্ঠিতস্বরে কহিলাম, "হাঁ"—

"জ্বর হয়েই অজ্ঞান হয়েচে?"—

"হাঁ।"

"কোনো ঔষধেই কাজ দেখায় নি?"

"না!"

—"ক্রমেই রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি ধীরে ধীরে জ্বর কমে যাচ্ছে?"—

যন্ত্র চালিতের মতই কহিলাম, "ঠিক তাই!"—

—"জ্ঞানের একটু লক্ষণও কোন দিন দেখায় নি?—"

"না।"

"বেশ, আর আমি কিছু জানতে চাইনে! আপনারা সবাই এর আপনার জন নিশ্চয়ই?"

"হাঁ,"—

সার্ এড্ওয়ার্ড আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন "আমার ত্রিশ বৎসরের ডাক্তারীর অভিজ্ঞতার মধ্যে শুধু দুটী এমনি কেস্ পেয়েছি—একটি বাঁচেনি; একটি রক্ষা পেয়েছিল।"—

—"এর সম্বন্ধে কি মনে করেন?"—

"কিছু মনে করিনে; বাঁচা না বাঁচা ভগবানের হাত। চেষ্টা করে দেখ্তে পারি। কিন্তু একমাত্র উপায় আছে এবং এখন থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে সেই ব্যবস্থা না কর্তে পার্লে, রক্ষা করার আর কোনও উপায়ই আমি জানিনে।"—

আগ্রহপূর্ণ স্বরে কহিলাম, "সার্ এড্ওয়ার্ড, এখানে যে কয়টী প্রাণী আমরা আছি এর প্রত্যেকেই এই বালকের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে; কি কর্তে হবে, বলুন"—

একটু হাসিয়া সার্ এড্ওয়ার্ড কহিলেন, "ঠিক্ প্রাণ দিতে হবে না, তবে কাছাকাছি কিছু দিতে হবে!"—

—"কি?"—

দুয়ারের কাছে অতুল ও অনিলকে দেখা গেল।

সাহেব গম্ভীর মুখে দুয়ারের দিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, "এর শরীর এখনি নূতন রক্ত ভরে দিতে হবে,—কে দেবে?"—

একটুকু দ্বিধা না করিয়া, একটু হাসিয়া কহিলাম, "এই কথা—আমি দেব!—আপনি বন্দোবস্ত করুন।"—

কথাটা যেন কতই ক্ষুদ্র, ও তুচ্ছ মনে হইল, এবং এত অল্প দাবী মিটাইতে পারিলেই যদি মরণের দেবতাটির ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়,—তবে আর কি?

দুয়ারের কাছেই বৌদিদির অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখখানি দেখা যাইতেছিল! তার পাশে আর একখানি অত্যন্ত ম্লান মুখ, বৌদিদির উচ্ছৃঙ্খল, সংসর্পিত চুলের গোছার আড়াল দিয়া, মেঘান্তরিত মলিন, শশাঙ্কের মতই একটু একটু দেখা যাইতেছিল!

অজিতের পীড়ার প্রথম দিন সুজাতার কাতর, করুণ দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে বলিয়াছিলাম, অজিতের জন্য শেষ রক্ত বিন্দুও দিতে প্রস্তুত আছি।

অদৃশ্য দেবতাটি সেদিন বুঝি একটু হাসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার হিসাবের খাতায় সেই কথাটাকে খতাইয়া রাখিয়াছিলাম!

আজ এই মুহূর্ত্তে তাঁহার দাবী জানাইয়া দিলেন এবং হ্যাণ্ডনোটের দাবীর মতই এটা চাহিবা মাত্র পরিশোধ করিয়া দিতেই হইবে! তাহা না পারিলে নিজের অন্তরের মধ্যে যে দরবার নিশিদিন খোলা রহিয়াছে, আর কাহারও কাছে রেহাই পাইলেও তাহার কাছে তো কোন মতেই রেহাই পাইব না!

সাহেব আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিলেন তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, "খুব কঠিন কথা;—বড় শক্ত কথা!"—

একটু আগেই তো বলেচি, আমরা সবাই এর জন্য প্রাণ দিতে পারি, সেটা শুধু মুখের কথাই বলিনি তো, সার এড্ওয়ার্ড!—বলিয়াই একটু হাসিলাম।

"বেশ আপনার গায়ের জামাটা খুলে ফেলুন তো."—

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অতুল ও অনিল এতক্ষণ কথা শুনিতেছিল। এইক্ষণ অগ্রসর হইয়া সাহেবকে নমস্কার করিয়া কহিল, "আমরাও যে কোনও সাহায্য কর্ত্তে পারি আমাদেরও পরীক্ষা করে দেখুন না, সার এড্ওয়ার্ড!"

সাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন, "এ বাঙ্গালী জাতটাই একটা অদ্ভুত জাত; এরা স্নেহের টানে সবই কর্ত্তে পারে, লণ্ডনে থাকৃতেও সে পরিচয় যথেষ্ট পেয়েচি!"—

সার্ এড্ওয়ার্ড আর কোনও কথা না বলিয়া একে একে আমাদের তিন জনকেই পরীক্ষা করিলেন।

রমাপ্রসন্নবাবু কহিলেন, "সাহেব, এটি আমারি ছেলে; ছেলে মানুষ এদের কষ্ট না দিয়ে আমাকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন্!"

ইতিমধ্যে অনিলের মুখে বৌদিদির ও সুজাতার আর্জি আসিয়া পৌছিল।

সার এড্ওয়ার্ড স্মিতমুখে কহিলেন, "আপনাদের কাজ

দিয়ে হবে না; মিষ্টার মুখার্জিকে দিয়েই আমার কাজ চল্‌বে! এঁদের মধ্যে ইনিই যথেষ্ট সবল।"

সার্ এড্‌ওয়ার্ডের কথা শুনিয়া মনে হইল, এতদিন ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া শরীরটাকে যে সবল করিয়াছিলাম, আজি তাহা সার্থক ও সম্পূর্ণ হইয়াছে!

অনিল মলিন মুখে কহিল, "আমাদের দিয়ে কোনও কাজই হবে না, সার্ এড্‌ওয়ার্ড?"

"হাঁ, হবে বই কি! ভাল ডাক্তার অন্ততঃ দুইজন দরকার। ঘড়ি ধরে পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় নিন্, বাইরে সাইকেল্ আছে; ছুটে চলে যান। মনে থাকে যেন এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কাজ আরম্ভ কর্‌ব!—আমার ব্যাগটা?"

আল্‌বার্ট সিঁড়ির উপর হইতে একটা সুদৃশ্য ব্যাগ্ লইয়া আসিল। কতকগুলি আবশ্যকীয় জিনিষের নাম লিখিয়া এক খণ্ড কাগজ অনিলের হাতে দিলেন। অতুল ও অনিল সাইকেল লইয়া বাহির হইয়া গেল। সার্ এডোয়ার্ড আর একবার জানালার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিয়া কহিলেন, "মনে থাকে যেন মাত্র বত্রিশ মিনিট সময় পাবেন।"

রমাপ্রসন্ন বাবু একখানা চেয়ারের উপর অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন, বোধ হয় আমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না।

সার এড্‌ওয়ার্ড কহিলেন, "আপনি ওদিককার একটা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমি না ডাক্‌লে আস্‌বেন না।"

সাহেব ক্ষিপ্র, নিপুণ হস্তে কতকগুলি কাজ সারিতেছিলেন, আল্‌বার্ট দ্রুত হস্তে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল।

বৌদিদির পাশ দিয়া যাইবার সময় রমাপ্রসন্ন বাবু একটু দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা লক্ষ্মী,——"

তারপরই তাঁহার দুই কপোল বাহিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু নামিয়া আসিতে লাগিল।

আজ আট দিনের মধ্যে তাঁহার চোখে অশ্রুর এতটুকু আভাসও কেহ দেখে নাই। কিন্তু আজ কেন যে তিনি কোনো মতেই অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না, তাহা আমাদের কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

তাঁহার অশ্রুমুখী 'মা লক্ষ্মী' যখন দুই হাতে তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিলেন, "আপনি কিছু ভাব্‌বেন না, বাবা! যিনি এমন সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়ে তুল্‌চেন, তিনিই সকলের মুখ রক্ষা করবেন।"—তখন তিনি বৌদিদির মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, "না, কি আর ভাব্‌ব মা! আর ভেবে বা কি করতে পারি, মা লক্ষ্মী?"—এর পর তিনি এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিলেন না। আমার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই ডাক্তার সেন ও বোস্‌কে লইয়া অতুল ও অনিল ফিরিয়া আসিল। তখন সার্ এড্‌ওয়ার্ড সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়া কোট ও ওভারকোটটা আল্‌নায় ঝুলাইয়াছেন, এবং অজিতের শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন।

এই মুহূর্ত্তে, সেই বিরাট শ্বেতকায় পুরুষকে আর আমার সার্ এড্‌ওয়ার্ড বলিয়া মনে হইল না! মনে হইল, দেবাদিদেব মৃত্যুঞ্জয় মরণাহত অজিতের শিয়রে সকল পীড়া ও বেদনা হরণ করিয়া লইবার জন্যই স্বশরীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন!

তখন বৌদিদি ঈশারায় আমাকে কাছে ডাকিলেন। তাঁহার মুখখানি একটু ম্লান; চোখের কোণে অশ্রু লাগিয়া রহিয়াছে! দেখিলেই মনে হয়, বুকের ভিতর কোথায় দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে; এবং ঐ সিক্ত চক্ষুপল্লবের নিম্নেই অশ্রুর প্লাবন লুকাইয়া রহিয়াছে।

বৌদিদি আমার মুখের দিকে তাঁহার অশ্রুসজল দুই চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "মনের ভিতর থেকে আমি ঠিকই জান্‌চি, ঠাকুরপো, এ সব ভালর জন্যেই হচ্ছে, কিন্তু তবু স্বস্তি কি পাচ্ছি? ওরে, এম্‌নিই দুর্ব্বল মন, ভগবানের অনুগ্রহের এত পরিচয় পেয়েও মনকে বাঁধ্‌তে পারা যে এত কঠিন তা' তো আজকার মত এমন করে আর কোনো দিনই বুঝতে পারিনি, বিনু! মনের মধ্যে যা' কিছু উঠ্‌চে, সে সবই তাঁর পায়ে পৌঁছে দেওয়ার মত আবশ্যকতা আজকের চেয়ে এমন বেশীও তো আর কোনো দিনই হয়নি! কিন্তু তবু কি মন বোঝে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

কোনও কথা বলিয়াই শেষ করা আজ যে বৌদিদির পক্ষে কতখানি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছিলাম।

আঁচলে একবার চোখ দুইটী মুছিয়া ইয়া মুহূর্ত্ত পরেই

কহিলেন, "তোমাকে আর বেশী কি বলব, ভাই !—মা মঙ্গলচণ্ডী তোমাকে রক্ষা করবেন

কিছু বলিতে যাইতেছিলাম ; কিন্তু সার্ এড্ওয়ার্ডের শান্ত গভীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "আমরা প্রস্তুত, মিঃ মুখার্জ্জি !"

দুই হাতে বৌদিদির পায়ের ধূলা লইলাম, দুয়ারের পাশেই সুজাতা ছিল, চকিত দৃষ্টিতে তাহার ম্লান মুখের দিকে চাহিলাম।

সুজাতার অশ্রুসজল দুই চক্ষের করুণ দৃষ্টি টুকু আমার উত্তপ্ত, অতৃপ্ত, চক্ষু দুইটার মধ্যে ভরিয়া লইয়া পর মুহূর্ত্তেই অজিতের শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

একটু মৃদু হাসিয়া কহিলাম.—"আমি প্রস্তুত, সার্ এড্ওয়ার্ড !"

(২১)

ঠিক কখন যে সব মধুময় হইয়া গেল তাহা জানি না !

কিন্তু বড় মধুর লাগিতেছিল !

কোথায়, কোন্ লোকে, সবুজ আলোক দীপ্তির মধ্যে একা আমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছি ! অদূরে সবুজ ক্ষেত্রের উপর, সবুজ আলোকের মধ্যে রাশি রাশি—ফুল ফুটিয়াছে। সবুজ মখমলের উপর কেহ যেন সযত্নে চুনিপান্না বসাইয়া রাখিয়াছে ! পাতার আগায় শিশিরবিন্দু সবুজ আলোকে রঙ্গিণ হইয়া রহিয়াছে !

ফুলের পাশে বিচিত্র প্রজাপতি ফুলের মুখের মদিরা চুম্বন করিয়া নৃত্যচঞ্চল গতিতে ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে ! সবুজ ক্ষেত্রের পাশে পাশে নির্ম্মল, শুভ্র পথের রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে !

আকাশ নক্ষত্র বিহীন ! শুধু সবুজ আলোক তরঙ্গের খেলা চলিয়াছে ! আলোক তরঙ্গের শীর্ষে, স্বর্ণকিরীটের মতই, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সোণালি রঙ্গের জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিতেছে,—বিচ্ছুরিত হইতেছে !

দূরে, অতি দূরে, অনন্ত সুন্দর সিন্ধু তাহার মৃদুস্নিগ্ধ আনন্দ কল্লোলে, রুদ্ধদ্বার দেবমন্দিরে আরতির বাজনার গভীর নির্ঘোষের মতই, আকাশ, বাতাস পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছে !

নিঃসঙ্গ পথটার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছি ! ঐ দূর সিন্ধুর যাত্রীশূন্য বেলাভূমি যেন আমার জন্যই উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে !

সিন্ধুর উর্ম্মিকল্লোল শুনিয়া শুনিয়া ওর সীমা-রেখারই কাছে কোন্ এক পর্ব্বতশিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে !

বাঁশীর সুর তাহারই কাছে কাছে, বেলাভূমির পথটির উপর দিয়া বাজিয়া বাজিয়া ফিরিতেছে !

এ সেই চিরপরিচিত ভিখারীর বাঁশীর সুর ! বিশ্বের গোপন বেদনার কাহিনীটি এখানেও বহন করিয়া আনিয়াছে কি ?

কিন্তু ঐ নিঃসঙ্গ দীর্ঘ পথটা অতিবাহন করিয়া, ঐ পাহাড়ের পাদদেশে, ঐ অনন্ত সুন্দর সিন্ধুর বেলাভূমিতে কেমন করিয়া যাইয়া দাঁড়াইব !

কে আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে ?

বাঁশী তাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, উজাড় করিয়া স্বর ছড়াইতেছিল, এবং কখন সেই বেলাভূমির উপর দিয়া, সেই সবুজ ক্ষেত্রের কোমল আলোকদীপ্ত পথটা অতিবাহন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে !

চাহিয়া দেখিলাম, ভিক্ষুকের মলিন চীর খসিয়া পড়িয়াছে,—সুন্দরের মনোমোহন বেশের অন্তরাল দিয়া চির কিশোর দেবতাটীর অপূর্ব্ব রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে !

সুন্দরের বাঁশী বাজিতেছিল,—

"ওগো তুমি আইস !—তুমি আইস ! ও যে নন্দন পাহাড়, বাঁশীর সুরে পথটী ধরিয়া এই চিরসুন্দরের দেশে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তোমারই অপেক্ষায় ঐ অনন্ত-সুন্দর সিন্ধুর তীরে জাগিয়া রহিয়াছে !—তুমি আইস,—ওগো, তুমি আইস !"

কোমল পথের উপর দিয়া বাঁশীর সুরের পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছি,—দ্রুত ! আরও দ্রুত !—ঐ নন্দর পাহাড় !

মধুর ! বড় মধুর ! বাঁশীর সুরে সুরে মধু ক্ষরিত হইতেছিল ! আকাশ, বাতাস, আলোক, বাঁশীর সুরের মদির নেশায় পাগল হইয়া উঠিয়াছে !

কাহার মৃদু সুরভি নিশ্বাস ক্লান্ত ললাটের উপর আসিয়া লাগিতেছে ? কাহার স্নিগ্ধস্পর্শ মাথার উপর স্নেহের পরিচয় রাখিয়া যাইতেছে ? কাহার স্নেহস্রাবী দৃষ্টি মুখের উপর অনিমিখ্ হইয়া রহিয়াছে !

কে ও?—ও কে গো?

আর একখানি মুখ, দূরে দূরে আড়ালে আড়ালে দেখা যাইতেছিল! বড় সুন্দর মুখখানি! ক্ষুদ্র অধরপল্লবের বান্ধুলি পুষ্পরাগ ম্লান হইয়া উঠিয়াছে! দুইটী কালো চোখ অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে; তবু সেই চোখের স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকু আমারই মুখের দিকে নিমেষ শূন্য-হইয়া রহিয়াছে! যেন কতদিনের নিবিড় পরিচয়,—কত জন্ম-জন্মান্তরের অবিচ্ছিন্ন কাহিনী, করুণ বেদনা, ওই দৃষ্টি বহন করিয়া আনিয়াছে!

ও কাহার মুখ,—কাহার মুখ!

চক্ষু খুলিয়া চাহিলাম!

বৌদিদি শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতেছিলেন। মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার দুই চক্ষের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

অদূরে একটা চেয়ারের উপর অনিল শুইয়া ছিল।

বৌদিদি ধীরে ধীরে কহিলেন, "অজি' বেশ ভাল আছে, ঠাকুরপো!—কোন ভয় নেই আর!"

অবসাদে আমার চক্ষু দুইটার পাতা মুদ্রিত হইয়া আসিল। দুয়ারের কাছে ভিখারীর বাঁশী কোমল সুরে বাজিতেছিল।

সেই সুরের মধ্যে আমার সুন্দরের বাঁশীর সুরের রেশটি লাগিয়া রহিয়াছে!

আর একবার চক্ষু খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম। ভোরের মৃদু আলোক সমস্ত আকাশটাকে সুনীল ও স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া প্রভাতের অরুণালোকদীপ্ত "নন্দনপাহাড়" দেখা যাইতেছিল, হরিৎ প্রান্তরের উপর দিয়া সংসর্পিত পথটী কোন্ অজানা পল্লীর দিকে চলিয়াছে। দূরের প্রাচীরবেষ্টিত বাড়ীগুলির উপর সূর্য্যালোক পড়িয়া হাসিতেছিল। পল্লবে, পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, স্নিগ্ধ অরুণ লেখা শিশুর নির্ম্মল শুভ্র হাসিটুকুর মতই লাগিয়া রহিয়াছে!

এই নির্ম্মল আলোকের মেলার মধ্যে, জাগিয়া উঠিয়াই যে কথাটি প্রথমেই জানিলাম, তাহা আমার কাছে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের মতই মনে হইতে লাগিল! কিন্তু এতই দুর্ব্বল, যে ঐ পরম আনন্দের সংবাদটিকে অভিনন্দন করিয়া দুটা কথা বলিব, এমন শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট ছিল না! একটী ক্ষুদ্র অসহায় শিশুর মতই দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছি; এবং বিপুল অবসাদ সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

চোখের প্রান্ত দিয়া অশ্রুর বিন্দু গড়াইয়া আসিতেছিল! বৌদিদি সযত্নে অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, "আজ ভগবানের আশীর্ব্বাদ তো সব দিক্ দিয়েই পেয়েছি, ঠাকুরপো! আজ তোমার সকল অশ্রু আনন্দা-শ্রুতে পরিণত হোক্ এবং জীবনের সকল যুদ্ধে এমনি করেই জয়ী হও!"

হাত বাড়াইয়া পায়ের ধুলা লইব, এমন শক্তি ছিল না, তাই চুপ্ করিয়াই পড়িয়া রহিলাম।

ঝি আসিয়া ডাকিল, বৌদিদি উঠিয়া গেলেন।

হঠাৎ অনিল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া আমার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইল। অনিলের মুখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিতেই সে একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "নারীর কালো চোখ যে সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে বিস্ময়কর, তা আমি আর অস্বীকার করিনে বিনয় বাবু! আজ আপনাকে শুধু একটা কথা জানিয়ে দিয়েই আমার যা' বল্‌বার আছে তা' শেষ করে ফেল্‌ব!"

অনিল যে কি বলিবে তা' আমি বুঝিতে না পারিলেও, একটু বুঝিয়াছিলাম, সে, ঠিক্ এই বিশেষ মুহূর্ত্তটীতে বৌদিদির ঐ নূতন ধরণের আশীর্ব্বাণীর মধ্যে অনেকখানি গভীর অর্থ লুক্কায়িত ছিল! তাই বিস্মিত দৃষ্টিতে অনিলের মুখের দিকে চাহিতেই সে তেমনি হাসিমুখে কহিল, "মাপ কর্‌বেন বিনয়বাবু! কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ রেখে কথা বলাটা আমার মোটেই আসেনা! ওটা আমার কোষ্ঠীতে লেখেই নি! জীবনে রোমান্স জিনিশটাকে একেবারে বাদ্‌দেওয়া চলে কিনা তার কৈফিয়ৎ নিজের মনের কাছেও যখন আজ আর দেব না বলে ঠিক করেছি, তখন ও নিয়ে বিচার বিতর্ক একেবারেই কর্‌ব না। কিন্তু এটা ঠিক্, আমাদের উভয়কেই সুজাতার দিক্ দিয়েই বিচার কর্‌তে হবে!"

হঠাৎ অনিলের কণ্ঠের স্বর অত্যন্ত মৃদু হইয়া গেল এবং সে ধীরে ধীরে কহিল, "কথাটা বল্‌তে হল বলে কিছু মনে কর্‌বেন না, বিনয়বাবু।—কিন্তু আজ যখন আমি ছাড়া এ খবরটাকে আর কেউ আপনার কাছে পৌঁছে দিবে না,

তখন সব বলে ফেলাই ভাল! আমি নিঃসন্দেহই জেনেছি সুজাতা আপনাকে পেলেই ঠিক সুখী হবে"—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অনিল একবার মুহূর্ত্তের জন্যই স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পর একটু হাসিয়া কহিল, "তখন এর মধ্যে আর কোনও তর্ক বা দ্বিধা থাক্‌তে পারে না।—দাবীর কথা তো থাক্‌তেই পারে না;—কারণ এ কথার বিচার তো আমাদের নিজেদের দিয়ে করাটা মোটেই চল্‌বে না, বিনয় বাবু!—সুতরাং এর মীমাংসা আজ এখানেই মিটে গেল! রমাপ্রসন্ন বাবুকেও আমি সব কথা জানিয়ে মুক্তি দিয়েছি,"—

তার পর আর একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমি এক নিশ্বাসে তো আমার সব কথাই জানিয়ে দিলাম,—এখন আমার ছুটি; এই চব্বিশটা ঘণ্টা যে আমি কতখানি উদ্বেগের মধ্যেই কাটিয়েছি,—তা' শুধু আমার সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন!—শুধু আপনার চোখ্ খোলার প্রতীক্ষায় এই চেয়ারটার উপরই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি, বিনয় বাবু!" বলিয়াই অনিল হাসিতে লাগিল।

আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

হাসির শাণিত ছুরিতে চিরিয়া চিরিয়া ও যে ওর বুকের ভিতরটা কতখানি ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা মনে করিয়া সত্যই আমি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম!

তবু সেই বেদনার পরিমাণ আমি কতটুকুই অনুমান করিতে পারিয়াছি। আমি কি এমনি করিয়া হাসিমুখে স্বহস্তে নিজেরই হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিঁড়িয়া আর একজনের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিতে পারিতাম!

ও যে আজ হাসিমুখে কতখানি দিয়া গেল, তাহা মনে করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

চোখের পাতা দুইটা অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ অনিল যে সেখানে আছে তাহা ভুলিয়া গেলাম। বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও আমার চোখের সম্মুখে লুপ্ত হইয়া গেল।

দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া নিজের মনেই বলিয়া উঠিলাম, "না আমি তো পার্‌তাম না এম্‌নি ক'রে নিজের হাতে সব ভেঙ্গে ধুলায় মিশিয়ে দিতে!"

অনিল চলিয়া যাইতেছিল, দুয়ারের কাছেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে কহিল, "পার্‌তেন বই কি, বিনয় বাবু। আপনি যখন সুজাতাকে ভালবাসেন, তখন নিশ্চয়ই পার্‌তেন।"

পরমুহূর্ত্তেই সিঁড়িগুলি পার হইয়া প্রাঙ্গণের পথটি অতিবাহন করিয়া, অনিল চলিয়া গেল।

বৌদিদি দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "ইঃ, একেবারেই ঘেমে গেছ যে!" বলিয়া একটা পাখা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

আমি কোনও কথা না বলিয়া অবসন্নভাবে চক্ষু বুজিয়াই পড়িয়া রহিলাম।

দুঃখের ও সুখের বেদনায় চঞ্চল একটা বিপুল তরঙ্গ বুকের ভিতর আন্দোলিত হইতেছিল।

—মনে হইল, এ যেন সেই অনন্ত সুন্দর সিন্ধু আমারই বেদনা চঞ্চল বুকের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

ভিখারীর বাঁশীটি তখনও সুর তুলিয়া বাজিয়া বাজিয়া পথে পথে ফিরিতেছিল।

বৌদিদি আর কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সেই স্নেহ কোমলা নারীর মৃদুস্নিগ্ধ স্পর্শ আমার শিরায় শিরায় অমৃত সঞ্চারিত করিতেছিল।

(২২)

বিকালের দিকে আল্‌বার্ট ও সার এডওয়ার্ড আসিয়াছেন।

বাহিরের বারান্দার উপর বসিয়া সার্ এডওয়ার্ড রমাপ্রসন্ন বাবুর সহিত কথা বলিতেছিলেন। আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ঈজিচেয়ারের উপর আমাকে শায়িত করিয়া অজিতের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

সুজাতা অজিতের পার্শ্বেই বসিয়াছিল। উঠিয়া বৌদিদির কাছে যাইয়া দাঁড়াইল; মুখ ফিরাইতেই সুজাতার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িল।

সুজাতার ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়াছে। বৌ-দিদি তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "ওলো, যা' না, জানিয়ে আয়, যে তোর কান্না থেমে গেছে। কতই তো কাঁদ্‌লি; কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ তো তা জান্‌ল না রে!"

সুজাতা মৃদু হাসিয়া কহিল, তুমি জান্‌লেই হ'ল, দিদি!

আর কাউকে জান্‌তে হবে না। তুমি যেমনটি ক'রে চোখের জল মোছাতে পার, আর কি কেউ তা' পারে

বলিয়াই সুজাতা লজ্জিত মুখে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে যে আর কোথাও না যাইয়া ঠিক কবাটের আড়ালটিতেই রহিয়া গেল, সে খবরটা বৌদিদির কিম্বা আমার অগোচর রহিল না

কিন্তু ক্ষমা জিনিশটা বৌদিদির কাছে মধ্যে মধ্যে একান্তই দুর্লভ হইয়া উঠিত। একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওরে, জানে কি না দেখিস্। তোর চোখ্ পান্‌সে দেখ্‌লেই যে কুরুক্ষেত্র বাধাবে, তার কাছটিও তখন ছাড়্‌বিনে। কিন্তু তুই যে কাঁদ্‌লি, ঠিক্ পাবেন বিনু মুখুয্যে যখন ওঁর বিশ্বের জাহাজ তলিয়ে যাবে ঐ তোর চোখের জলের নীচে।"—

আল্‌বার্ট অজিতের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল এবং মৃদু মৃদু হাসিতেছিল!

এমন সময়ে পিসিমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার ভাঁড় হইতে বৈদ্যনাথের চরণামৃত সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিলেন।

আল্‌বার্ট কহিল, "কই পিসিমা, আমার মাথায় দিলেন না?—"

পিসিমা হাসিয়া কহিলেন, "ওমা, দেব না! তোমার ভিতর দিয়েই তো, বাছা, আমার দেবতাকে এম্‌নি সত্যি করে দেখ্‌তে পেলাম! তিনি যে মরণকেও জয় কর্‌বার জন্যই তোমাকে কোন্ দেশ থেকে এনে এখানে আমাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন! তোমার ভিতর দিয়েই তো তাঁর অভয়মূর্ত্তিও দেখ্‌লাম, মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির পরিচয়ও পেলাম।"—বলিয়াই পিসিমা আল্‌বার্টকে একেবারে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

আজ কোনো শুচিতার দোহাই দিয়া আর তাঁহাকে দূরে রাখা যাইত না।

মানুষের জীবনে এমন সব ব্যাপার ভগবানের ইচ্ছায় আসিয়া পড়ে যাহা তাহার ভেদ-বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া সকলকেই আপনার গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া লইতে শিখাইয়া দেয়!

তারপর একটু হাসিয়া, সকলের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "ওরে, আমি—বলিনি', ঠাকুর কোন্ পথ দিয়ে তাঁর দয়ার পরিচয় দেন, তা' আমরা কিছুই জানিনে! তিনি প্রাণের আগ্রহকে কোনও দিনই ঠেলে ফেলেন না, এটাও যেমন সত্যি, সকল ব্যাপারের মধ্যেই যে তিনি মঙ্গলকেও লুকিয়ে রাখেন, তা'ও তেম্‌নি ঠিক! তাঁর সকল ব্যবস্থাই মাথা পেতে নিতে হবে; তবেই তো জীবনের সব ব্যাপার কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাবে।"

অজিত কখন চক্ষু খুলিয়া, এই-ই প্রথম,—বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতেছিল। সকলের আগেই বৌদিদি তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি শয্যার কাছে গেলেন এবং অজিতের মুখের কাছে মুখ নিয়া স্নেহপূর্ণ মৃদু কণ্ঠে ডাকিলেন,——

—"অজি,"—

অজিত চক্ষুর পাতা নাড়িয়া উত্তর দিল।

দুয়ারের কাছে কখন রমাপ্রসন্ন বাবু আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তাহার দুই চক্ষুর পাতা চোখের জলে ভিজিয়া উঠিয়াছে! তাঁহার অশ্রু ম্লানদৃষ্টি সন্ধ্যার রঙ্গিন্ আকাশের দিকেই নিবদ্ধ ছিল!

যে নিষ্ঠুর বিপদ্ পাষাণ স্তূপের মতই এতদিন সকলেরই বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, কখন তাহা নামিয়া গিয়া "নন্দন পাহাড়ে" পরিণত হইয়াছে, এবং আমাদের প্রত্যেককেই যখন তাহার শীতল পুষ্প-গন্ধবাহী-বায়ু-প্রবাহে নন্দিত করিল, ঠিক তখনই সেই নিষ্ঠ, প্রিয়দর্শন যুবককে আমার মনে পড়িল, যে সুজাতার দিকে চাহিয়াই হাসির অন্তরালে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া গিয়াছে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

সম্পূর্ণ

পুস্তক পরিচয়

সুনীতি বিকাশ ১ম ও ২য় ভাগ

পঞ্চম মান ও ষষ্ঠ মানের জন্য দুইখানি বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ্য পুস্তক শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত—বিখ্যাত আশুতোষ লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। গদ্য পদ্য দুই রকম পাঠ্যই পুস্তক দুইখানিতে আছে।

শ্রীযুত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, আধুনিক বাঙ্গালার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি ও সুলেখক—বঙ্গ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত সকলেই ইঁহার নাম জানেন,—ইঁহার কবিতা যে কত মধুর ও চিত্তস্পর্শী, কেমন সরল প্রাঞ্জল ভাষায় কি সুন্দর ভাব সমূহ ব্যক্ত হইয়া পাঠক মাত্রেরই প্রাণে গিয়া তাহা স্পর্শ করে, সেই সব ভাব জাগাইয়া তোলে, তাহা নূতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি না।

পাঠ্য পুস্তক সমূহ বেশীর ভাগই কোনও চিন্তাশীল উচ্চ ভাবের অধিকারী, সুলেখকের রচিত নহে। বালকগণ কোনও মতে অতিকষ্টে তাহা পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া আসে, কিছু ভাব ও সার গ্রহণ করিতে পারে না সুতরাং উপকৃত বিশেষ হয় না। জীবেন্দ্রবাবুর পুস্তকে যে সেরূপ কোনও ত্রুটি নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। পুস্তক দুখানি পড়িয়া আমরা বড় সুখী হইয়াছি। গদ্য পদ্যে প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি সবই তাঁহার মধুর হাতের রচনা, কেবল শিক্ষকের বেতের ভয়ে নয়, সানন্দ সাগ্রহে ঘরে পড়ার বইগুলির মতই জীবেন্দ্র বাবুর সুনীতি বিকাশ ছেলেরা পড়িবে।

পাঠ্য পুস্তক এই রকমই হওয়া চাই, এই রকম সব বই-ই ছেলে মেয়েদের পড়াইলে তারা কিছু শিখিতে পারে মাথা নষ্ট তাহাদের হয় না। উচ্চ মধ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক-বর্গকে আমরা অনুরোধ করি এই বই দুখানি তাহারা একবার দেখুন, দেখিয়া ছেলেদের জন্য চাহিয়া নিন। ইহাতে বাধা কিছুই নাই। পুস্তক দুখানি পাঠ্যরূপ Text Book Committeeর অনুমোদিত। মূল্যও মোটে সাড়ে ছয় আনা করিয়া।

নানা কথা

একসের রেশমের জন্য ২,৩০০ রেশম পোকার দরকার।

—o—

আধসের ওজনের মাকরসার জালের জন্য ২৭,৬০০ মাকরসার প্রয়োজন হয়।

—o—

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের পিকউইক পেপারস্ নামক উপন্যাসে ৩৬০টি চরিত্রের বর্ণনা আছে।

—o—

সারাগোসা সাগরে শেওলা এত অধিক যে স্থানে স্থানে বড় বড় জাহাজের গতিরোধ হয়।

—o—

জর্ডন নদী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বক্র। সোজা পথে ৬০ মাইল অতিক্রম করিতে ইহা ২২০ মাইল ঘুরিয়াছে।

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তিমি মাছের চামড়া সব চেয়ে পুরু। স্থানে স্থানে ইহার চামড়া দুই ফিটেরও অধিক পুরু।

—o—

বিলাতে হাউস্ অব্ কমন্সের নিজস্ব একটি পোষ্টাফিস্ আছে। সভার কার্য্য যখন চলিতে থাকে, তখন ইহাতে ২৫ লক্ষেরও অধিক চিঠিপত্র আসে ও যায়। ইহা ব্যতীত অসংখ্য টেলীগ্রামও আসে যায়।

—o—

গত মহাসমরে ৮০০,০০০ জাপানী সৈন্য নিযুক্ত হয়। তন্মধ্যে মোটে ৩০০ সৈন্য হত হয়।

—o—

জাপানে এখনও একটি জাহাজ বানাইবার স্থান আছে, যাহা ১৯০০শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। (বেঙ্গালী)

৬ষ্ঠ বর্ষ   মাঘ- ১৩২৬   ১০ম সংখ্যা।

বসন্তে

জাগহি বীণাপাণি ;
উদারচ্ছন্দে   পরমানন্দে
ঝঙ্কার বীণা-খানি !
স্পন্দিত হ'ক   নীরব চিত্তে
জাগ্রত নব-আশা
অম্বর ভেদি   মহান্ রুদ্র
গর্জ্জি উঠুক ভাষা ;
কোটী অন্তরে   কর প্রতিষ্ঠা
কমল আসন খানি ;
শীর্ষে শীর্ষে   নবীন দৃপ্তে—
জাগৃহি বীণাপাণি !

উন্মাদ কর সবে ;—
মধু সঙ্গীত   রুদ্ধ করিয়া
ভীম গম্ভীর রবে।
দীপ্ত দীপক রাগিণী ভঙ্গে—
জাগুক চেতনা জড়ের অঙ্গে
হউক লুপ্ত——   ভেদ দ্বন্দ্ব
মিথ্যা জ্ঞানের ভাণ ;
কুটীরে, হর্ম্ম্যে,   মর্ম্মে—মর্ম্মে
উছলি উঠুক বাণ !

ভুলাক আপনা পর,—
সুখের তৃষ্ণা   ভোগের তন্দ্রা
স্বার্থ-সাজান ঘর।
যজ্ঞের ধূম ছাইয়া গগন,
করুক বিশ্ব সাধনা মগন,
ভোগ-মরু করি   সরস প্লাবিত,
প্রেমজাহ্নবী ধারা,
শ্মশানে শবের   চিতারেণু মাঝে,
আনুক পুলক সাড়া !

জাগহি বীণাপাণি ;
জাগ্রত কর—   উত্থিত কর
নিদ্রিত কোটী প্রাণী !
রাগিণী নাচিয়া বীণার ছন্দে
চল বিভঙ্গ--মারুত মন্দে
মর্ত্তের সাথে   স্বর্গের ধারা,
যুক্ত করুক আনি,
কল্পের আশা—   পূর্ণ করিতে
জাগহি বীণাপাণি।

শ্রীকালিদাসী দেবী।

বিবিধপ্রসঙ্গ

ভারতসম্রাটের ঘোষণা

এবার বড়দিনের কেবল আগে ভারতসম্রাট মহামান্য পঞ্চম জর্জের নামে এক ঘোষণাপত্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতের শাসনভার যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে বৃটিশ রাজশক্তি স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন, তখন ইঁহার স্বর্গীয় পিতামহী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামেও এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়,—ইতিহাসে তাহা পড়িয়াছি। মহারাণীর ভিক্টোরিয়ার জীবনের অনেক কথা আমরা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। তিনি অতি সহৃদয়া, উদার-স্বভাবা ও সাধুচরিত্রা নারী ছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগতভাবে ভারতবাসী প্রজা সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের পর যে সব নূতন অধিকারের আশার বাণী ঘোষণা করিয়া নূতন শাসনের যুগ আরম্ভ হয়, ভারতবাসী মনে করিয়াছিল, এই সব আশার কথা এ যুগে অক্ষরে অক্ষরে সফল হইবে। এই শাসনের সঙ্গে মহারাণীর ব্যক্তিগত সম্বন্ধও যথেষ্ট আছে, এই বিশ্বাসে শাসনাধিষ্ঠাত্রী রূপেও তাঁহার উপরে ভারতবাসী বড় গভীর একটা ভরসা রাখিয়াছিল। ঘোষণাপত্রের কথাগুলির মধ্যেও মহারাণীর সহৃদয়তার পরিচয় যে কিছু না পাওয়া যায়, তা নয়। বৃটিশ রাজশক্তির সর্ব্বোপরি কর্ত্রী বলিয়া মহারাণী পরিচিত হইলেও প্রকৃত কার্য্যকর কর্তৃত্ব যে তাঁহার ইহাতে কিছু ছিল না, খাস বৃটিশ প্রজাবর্গের প্রতিনিধিসভার মোট অভিপ্রায় অনুসারে প্রধান রাজপুরুষগণই যে আসল কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিয়া থাকেন, এ কথটা সাধারণ ভারতবাসী তখন ভাল করিয়া বুঝিত না। তাই বহুদিন পর্য্যন্ত তাহারা মনে করিত, মহারাণী যখন ঘোষণা করিয়াছেন, সব অধিকার তারা পাইবেই,—আর তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তাহাদের সকল দুঃখের সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকার হইবে। ক্রমে যখন দেখা গেল, ঠিক তা হয় না,—আর ঘোষণাপত্রে যে সব অধিকারের ভরসা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও পাওয়া যাইতেছে না,—তখন ভারতীয় জননায়কগণ কিছু মুখর হইয়া উঠিলেন,—ঘোষণাপত্রে প্রচারিত অধিকার দাবী করিতেও আরম্ভ করিলেন। ভারতীয় প্রধান রাজপুরুষ কেহ কেহ এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তার মর্ম্ম এই যে ও সব কথা অনুসারে ঠিক কাজ হইতে পারে না। ভারতবাসী তখন ইহাও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে রাজপুরুষগণের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া রাজার সহৃদয়তা থাকিলেও মহারাণী কিছু করিতে পারেন না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যে শ্রদ্ধা ভারতবাসী তাঁহাকে করিত, সে শ্রদ্ধা সমানই ছিল। মহারাণীর রাজত্বকালেরও এই সময়ে অবসান হয়। তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদে সর্ব্বত্রই যে কত বড় একটা আন্তরিক বেদনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সে কথা এখনও স্মরণ আছে। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উৎসবে আপনা হইতেই ভারতবাসী যে কিরূপ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও বেশ মনে পড়ে।

রাজার প্রাণ কেমন, অভিপ্রায় কিরূপ, প্রজার হিত-কল্পে প্রবৃত্তি বা শক্তি কিরূপ আছে, তাহার পরিচয় পাইবার সুযোগ বৃটেনের খাসবৃটিশ প্রজারই অতি কম হয়,—দূরস্থ ভারতবাসী আমাদের ত কথাই নাই। কারণ শাসন-কার্য্যে রাজার স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই। রাজকীয় কোনও উক্তিতেও তাঁহাকে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের রাজনীতির অনুকূল কথাই বলিতে হয়,—প্রত্যেকটি কথা সেই রাজনীতির উদ্দেশ্যের দিকে সাবধান লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হয়। কিন্তু ইহার মধ্য হইতেও যেটুকু বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয়, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সহৃদয় ও উন্নতচেতা পুরুষ। আর ইহাও মনে হয়, তাঁহার হাতে যদি ভারতশাসনের কর্ত্তৃত্ব থাকিত, আমাদের অধিকার লাভের পথ আরও সহজ ও প্রশস্ত হইত। মনুষ্যত্বের এই মহৎগুণের জন্য এবং রাজকীয় এই উন্নতি বুদ্ধির জন্য আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধায় অভিনন্দিত করিতেছি।

ঘোষণার প্রথম কথা শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে। বৃটিশ পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান নেতা বৃটিশরাজ্যের মন্ত্রিবর্গ নানা

বিবেচনায় ভারতবাসী প্রজাকে এখন শাসন কার্য্যে যেটুকু অধিকার দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, তাই দিয়াছেন, এবং পার্লামেণ্টে আইন পাশ করিয়া রাজার মুখে তার সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

এখন ইহাতে আমরা কি পাইলাম, কি কি সুবিধা হইল ১৯১৭ সনের সেই ২০শে আগষ্টের আশার বাণী সফল কিছু হইল কিনা, তাহা লইয়া বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইতেছে। এক দল বলিতেছেন, যথেষ্ট পাইয়াছি। আর কি? এখন ইহাই বেশ। এইটুকু বেশ দখল করিয়া নিই, পরে আরও পাইব। আর একদল বলিতেছেন, এ কিছুই এমন হয় নাই। ইহাতে লাভ কিছুই হইবে না,—আর অনেক বেশী এখনই আমাদের পাওয়া উচিত,না হইলে সুবিধাও হইবে না।

ইহার আলোচ্য কথা অতি জটিল ও সূক্ষ্ম। তার মধ্যে আমরা যাইতে চাই না। যাওয়াও নিষ্প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, এক প্রধান রাজপুরুষগণের মূল উদ্দেশ্যের উপরে,—আর নির্ভর করিতেছে, ভারতবাসীর অধিকার নিবার ও রাখিবার যোগ্যতার উপরে। ভারতবাসী প্রজাবর্গ ক্রমে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়া, প্রজার পূর্ণাধিকারে উন্নত শক্তিমান্ মানুষ হইয়া বৃটিশসাম্রাজ্যের বড় বল ও সহায় হউক, ইহা যদি বাস্তবিক প্রধান রাজপুরুষগণের প্রকৃত লক্ষ্য হয়, আর শাসননীতি সেই ভাবেই পরিচালিত হয়, তবে আজ যতটুকুই আমরা পাইয়া থাকি, তাহার উপর দাঁড়াইয়া সহজে শীঘ্রই আরও পাইব, শেষে সবই পাইব। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি সেরূপ না হইয়া অন্যরূপ কিছু হয়, তবে আইনের ভাষায় আরও অনেক বেশী দিলেও তাহা ব্যর্থ হইতে পারে,—অন্ততঃ ব্যর্থ করিতে পারেন, এরূপ শক্তি তাঁহাদের হাতে বেশ আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সেই ঘোষণাও ত প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে। তবে সেটা ছিল কেবলই ঘোষণা, আইন নহে। আর এটা আইন। কিন্তু রাজপুরুষগণ যেখানে অতি শক্তিমান্, আর বহু পদস্থ ও প্রতিপত্তিশালী প্রজা যেখানে তাঁহাদের অতিশয় প্রসাদাকাজ্ক্ষী, সেখানে তাঁহাদের অভিপ্রায় সেরূপ হইলে এরূপ আইনও বেশ ব্যর্থ হইতে পারে।

তবে ভারতীয় প্রজার মধ্যে সত্যই যদি রাষ্ট্রীয় উচ্চ অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া থাকে, আর তার জন্য যে সাধনা যে ত্যাগ আবশ্যক, তাহা যদি তাঁহারা করিতে পারেন, রাজপুরুষগণ ন্যায্য অধিকার হইতে চিরদিন তাঁহাদিগকে বঞ্চিত রাখিতে পারিবেন না। তবে ইঁহারা অনুকূল হইলে অধিকারলাভ যত সহজ হইবে, প্রতিকূলতায় অবশ্য তাহা হইতে পারে না।

ঘোষণা পত্রের দ্বিতীয় কথা, রাষ্ট্রীয় অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত বা আবদ্ধ ব্যক্তিগণের মুক্তি। অবশ্য একেবারে খোলসা খালাস পত্র দেওয়া হয় নাই। হয়ত ভারতের শাসনভারপ্রাপ্ত প্রধান রাজপুরুষবর্গের অভিপ্রায় বা শাসন দায়িত্বের প্রয়োজন নিরপেক্ষ ভাবে এরূপ খোলসা খালাসের হুকুম রাজার মুখে দেওয়াটা সমীচীন হয় না। তবে এই অভিপ্রায় কি এবং প্রয়োজনই বা কতখানি আছে, তাহা আগে বুঝিয়া পড়িয়া লওয়াও যে একেবারে অসম্ভব হইত তাহা নয়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা যায় না। কতজন এবং কে কে ছাড় পাইল, কতজন আটক রহিল,—তার একটা হিসাব নিকাশ হইয়া গেলে, তবেই বুঝা যাইবে, ঘোষণার এই আশার বাণী বাস্তবিক সফল হইল কি না।

শেষ পঞ্জাবের কথা। পঞ্জাবে রাজসেনানীগণকর্ত্তৃক নিরস্ত্র শত শত প্রজার যে এই নির্ম্মম হত্যা, আরও কত অতি ঘৃণ্য অপমানটা হইয়া গেল, তার সম্বন্ধে একটি কথাও ঘোষণায় নাই। ইহাতেও অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। হাণ্টারকমিটির তদন্ত ও মন্তব্য প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে রাজদরবার হইতে কিছু বলা সঙ্গত কি না তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। তবে এই প্রসঙ্গে ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেবও যে দুই একটা ইঙ্গিত প্রকাশ্য সভায় না করিয়াছেন তা নয়। ভাল, হউক হাণ্টার কমিটির তদন্ত শেষ। কিন্তু তার পর? ভারতগবর্ণমেণ্ট আগেই ত একটা মুক্তির আইন পাশ করিয়া নিয়াছেন। খাস বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? এই আইনের মানরক্ষা করিয়া চলিবেন, না তার নিরপেক্ষ হইয়া ন্যায় বিচার করিবেন।

ডায়ার প্রমুখ সেনানীবর্গের সাক্ষ্য সকলেই পড়িয়াছে। সেই হত্যা, সেই মর্ম্মান্তিক মরণাধিক অপমান, ভারতসন্তানের প্রতি অতি হীন সেই পশুর মত ব্যবহার,—আর তাহাই যে বেশ করা হইয়াছে, ভারতবাসীরা ইহারই যোগ্য, এই সব সদম্ভ অবজ্ঞার উক্তি—ঘন জলন্ত রক্তের দাগের

মতই ভারতবাসীর প্রাণের পরতে পরতে গিয়া পড়িয়াছে! বৃটিশ রাষ্ট্রনায়কগণ এক দাগ কি মুছিয়া ফেলিতে চাহিবেন? সহজে তা পারিবেন? কোনও লক্ষণ ত তার এখন পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না।

ব্যাপারটা কেন এত গভীর ও তীব্রভাবে আমাদের প্রাণে গিয়া বিঁধিয়াছে? সমান দুইপক্ষে যুদ্ধের সময়ও পরাজিতের প্রতি বিজেতার এরূপ ব্যবহার ন্যায় কি করুণা, কোনও ধর্ম্মেরই অনুমত নহে। বিজেতার অমানুষিক অত্যাচার চিরদিনই পৃথিবীর ইতিহাসে নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়াছে। বিদ্রোহী প্রজাও পরাভূত হইলে ন্যায়বান্ হৃদয়বান্ কোনও রাজা তাহাদের এরূপ নির্ম্মমভাবে পশুর ন্যায় হত্যা করেন না, এত জঘন্য অপমান করেন না। আর পঞ্জাবে কি হইয়াছিল? যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে, এই ব্যবহারের গর্ব্ব করিয়াছে, তাহারাও পাঞ্জাবের দাঙ্গাকে বিদ্রোহ বলিতে পারে নাই। যে কমিটি হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাকে Disorders Enquiry Committe. অর্থাৎ দাঙ্গাহাঙ্গামার অনুসন্ধান-কমিটি নাম দিয়াছেন। Rebelion বা বিদ্রোহ এ আখ্যা এ গোলমালকে দেন নাই। এই Disorders বা অশান্তি যাহারা ঘটাইয়াছিল, উপদ্রব যাহাই তারা করিয়া থাক, অস্ত্র তাহাদের ছিল না। লাঠি ঠ্যাঙ্গা ইট পাটকেল যাই তাহারা ব্যবহার করুক, ইংরেজ রাজের কামান বন্দুক, আর এরোপ্লেনের বোমার কাছে তাহা কি? এসব দাঙ্গা ফাঁকা আওয়াজেই বন্ধ হইয়া যায়। অগত্যা দুই চারিটা গুলি হয় ত ছুড়িতে হয়। কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগের সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড—পাঁচীরে ঘেরা বাগানে একমাত্র দ্বার আগলাইয়া নিরস্ত্র ভীত পলায়নপ্রয়াসী সেই বৃহৎ জনতার উপরে সেই অবিরল গুলিবৃষ্টি, উঃ! ইহাও কি রাজকর্ম্মচারী কেহ নির্ভয়ে প্রজার উপরে করিতে পারে? আর তাই লইয়া সেই দম্ভ! যা করিয়াছি, বেশ করিয়াছি, গুলি না ফুরাইলে আরও করিতাম, এমনই করিয়া এ সব লোকদের জব্দ করিতে হয়,—এই সব উক্তি! সভ্যতাগর্ব্বিত আধুনিক যুগে কোথাও, কেহ এই নৃশংসতা করিয়া আবার তাহা এমন আস্ফালন করিয়া বলিতে পারে?

ভাল, হাণ্টার কমিটির তদন্ত শেষই হউক, দেখা যাক, কি হয়

মহাত্মা গান্ধির উক্তি—
সত্যগ্রহ কি?

(নায়ক, ২৬শে পৌষ।)

হাণ্টার-কমিটী বর্ত্তমান সময়ে আহম্মদাবাদের অশান্তি সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন। গত ৯ই জানুয়ারী হাণ্টার-কমিটীর নিকট মিঃ জীবনলাল দেসাইর জবানবন্দী শেষ হইবার পর মিঃ গান্ধির সাক্ষ্য লইয়া হয়। মিঃ গান্ধি তাঁহার বক্তব্য বিষয় লিখিত বর্ণনায় জানাইয়াছেন। সত্যগ্রহ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, নায়ক হইতে তাহা নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সত্যগ্রহ ও জড়ভরত-নীতি, প্রতিরোধ

"সত্যগ্রহ এবং জড়ভরত-নীতির (Rassive resistance) মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে,—উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু যতটা তফাৎ, সত্যগ্রহ এবং জড়ভরত-নীতিতেও ততটাই পার্থক্য রহিয়াছে। জড়ভরত-নীতি দুর্ব্বলের অস্ত্ররূপে ধরা হয়, কাহারও উদ্দেশ্য লাভের অভিপ্রায়ের জন্য শারীরিক শক্তি বা জুলুম প্রয়োগ তাহা হইতে বাদ পড়ে না; পক্ষান্তরে সত্যগ্রহ মহাশক্তিশালীর অস্ত্ররূপে গণ্য করা হয়, তাহার ভিতরে যে কোনও রকমের বা যে কোন আকারে জুলুমের প্রয়োগ বাদ থাকে। দক্ষিণ আফরিকাতে ভারতবাসীরা যে শক্তি আট বৎসরকাল ব্যবহার করিয়াছিল, সেই শক্তির নাম প্রকাশ জন্য সত্যগ্রহ আখ্যা আমিই প্রদান করি, এবং সেই সময় ইউনাইটেড কিংডমে ও দক্ষিণ আফরিকায় জড়ভরতের নীতি নামে যে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহারই প্রভেদ চিহ্নিত করিবার জন্য আমি দক্ষিণ আফরিকার আন্দোলনটার নাম 'সত্যগ্রহ আন্দোলন' রাখি। ইহার ধাতুগত অর্থ "সত্যে নিশ্চল থাকা," কাজেই সত্যের শক্তিকে ধারণ করিয়া তাহার উপর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা। আমি ইহাকে "প্রেমশক্তি" ও "আধ্যাত্মিক শক্তি" নামেও অভিহিত করিয়াছি। প্রাচীনতম যুগে এই সত্যগ্রহের প্রয়োগ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং সেই অধিকারের মূলে এই সত্যই নিহিত ছিল যে, সত্যের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, এবং তাহা করিলে কাহারও শত্রুর প্রতি জোর জুলুম চলিবে না—ধৈর্য্য এবং সহানুভূতি দ্বারা তাহার ভুলভ্রান্তি হইতে শত্রুর উপর জয়লাভ করিতে হইবে

কারণ যাহা একজনের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই অন্যের নিকট ভুল বলিয়া মনে হইতে পারে। আর ধৈর্য্য অর্থে আত্মকষ্ট। কাজেই এই শিক্ষার মূলতত্ত্বের বিকাশ এই ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে, কাহারও শত্রুর উপর কষ্টভোগ প্রয়োগ না করিয়া নিজের উপর কষ্টভোগ রাখিয়া সত্য রক্ষা করিতে হইবে।

সিভিল রেজিষ্টান্স বা নাগরিকের স্পষ্ট প্রতিরোধ।

"রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যায় আইনের আকারে যে ভুল করা হয়, লোকের পক্ষে প্রধানত তাহার প্রতিবাদের বা বিরুদ্ধাচারণ করার জন্যই লড়াই চলিয়া থাকে। যখন আবেদন করিয়াও আইন-দাতার ভুল সংশোধন করাইয়া লইতে তুমি অসমর্থ হইবে, তখন সেই ক্ষেত্রে যদি তুমি ভুল মানিয়া লইতে ইচ্ছা না কর,তবে তোমার পক্ষে প্রতিকারের এই উপায়ই কেবল খোলা থাকিবে যে, হয় তোমার মতে তাহাকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বাধ্য করিতে হইবে, নতুবা আইন ভঙ্গ করিবার জন্য শাস্তিকে আহ্বান করিয়া লইয়া তোমার নিজের শরীরে কষ্টভোগ করিয়া তাহাকে বাধ্য করিতে হইবে। কাজেই শিষ্ট ভাবে আইন অমান্য করা বা শিষ্ট-ভাবে প্রতিরোধ করা রূপেই প্রধানতঃ সত্যগ্রহ প্রকাশ পায়। ইহা এক ভাবে শিষ্ট বা সিভিল বলিতেছি, কেননা ইহা অপরাধকজনক বা ক্রিমিন্যাল নহে। যাহারা অপরাধ-জনক কার্য্য করিয়া আইন ভঙ্গ করে, তাহারা ছলনা বা শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কপট ভাবে তাহা ভাঙ্গিয়া থাকে এবং শাস্তি এড়াইবার জন্য তাহারা চেষ্টা করিয়া থাকে ; কিন্তু যাহারা শিষ্ট ভাবে প্রতিরোধ চালায় তাহারা সেইরূপ কার্য্য করে না। সে যে রাজ্যে বাস করে, সেই রাজ্যের আইন কখনও সে ভয় মনে রাখিয়া মান্য করে না ; তাহার আইন মান্য করিবার কারণ এই যে, সে তাহা তাহার দেশের ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করিয়া থাকে। কিন্তু এমন ঘটনা উপস্থিত হয়—সাধারণতঃ ক্বচিৎ কদাচিৎ সেইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে—যখন কতকগুলি আইনকে সে এতই অন্যায় আইন বলিয়া মনে করে যে, তাহা মানিয়া চলা অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। তখনই সে প্রকাশ্যে এবং শিষ্টভাবে সেই সকল আইন ভাঙ্গিয়া তাহা অমান্য করিয়া থাকে এবং সেই আইন ভঙ্গের দরুণ শাস্তি সে অন্যায় ভাবে ভোগ করে এবং এই ভাবে আইনদাতাদের কার্য্যের বিরুদ্ধে সে তাহার প্রতি-বাদ তালিকাভুক্ত করে। এ রকমের অন্য সকল আইন অমান্য করিয়াও সে ষ্টেট বা রাজ্যের সাহচর্য্য করা হইতে বিরত থাকিতে পারে এবং তাহার পক্ষে সেই পথও খোলা থাকে। অবশ্য যে সকল আইন ভঙ্গ করিলে তাহাতে নৈতিক অবনতি ঘটায় না, সেই সকল আইনই অমান্য করার পথ তাহার পক্ষে মুক্ত থাকে। সত্যগ্রহের সৌন্দর্য্য এবং কার্য্য-সম্পাদিকা শক্তি এতই বড় এবং তাহার উপদেশ অনুসরণ করা এতই সরল ও সহজ যে, তাহা বালকবালিকাগণের নিকটও প্রচার করা যায় বলিয়া আমার মত। চুক্তিবদ্ধ ভারতবাসী সাধারণতঃ যাহাদের বলা হয় (যে সকল ভারতবাসী বিদেশে চুক্তিবদ্ধ কুলীরূপে কার্য্য করে) তাহাদেরই হাজার হাজার পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাগণের নিকট আমি এই সত্যগ্রহ প্রচার করিয়াছিলাম এবং তাহার ফল খুবই মনোরম হইয়াছিল।"

জাতীয় ইজ্জৎ

গত সংখ্যায় আমরা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নূতন বিদঘুটে ইংরেজি 'ভাড্‌লোক্' নাম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া-ছিলাম। আমাদের 'Gentleman' বলিতে প্রস্তুত নন, এইরূপ এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদের দেওয়া এইনাম আমরা অম্লান-বদনে ব্যবহার করিতেছি। আমাদের জাতীয় ইজ্জতের দরদ যে কত কম, ইহা তার একটি দৃষ্টান্ত। আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পুতুল (Idol)—দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধে অতি অবজ্ঞাসূচক একটা ইংরেজি কথা। দেবমূর্ত্তির পূজা সম্বলিত ধর্ম্মকেও তাঁহারা idolatry বা পুতুলপূজা বলিয়া অতি হীনচক্ষে দেখিয়া থাকেন, নিকৃষ্ট বলিয়া খুব নিন্দাও করেন। তাঁরা করেন করুন। সাকার উপাসনা যাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাও দেবমূর্ত্তিকে idol বলিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুসন্তান যখন এই idol কথা ব্যবহার করেন, তখন কি একটুও তাঁহাদের মনে হয় না, নিজেদেরই পূজ্য দেবমূর্ত্তিকে তাঁহারা কতদূর অবজ্ঞা করিতেছেন! আদালতে হিন্দু উকিল হাকিমের মুখে সর্ব্বদাই idol কথাটি ব্যবহৃত হয়। হিন্দুর পরিচালিত

খবরের কাগজেও সর্ব্বদা এই কথাটি দেখা যায়। দেববিগ্রহ *idol* বা পুতুল নয়, মূর্ত্তি বা image এবং idol কথাটির ব্যবহারে যদি তাহারা আপত্তি করেন এবং image কথাটি ব্যবহার করিতে জিদ করেন,—তবে সাহেবহাকিমও কি কেহ idol কথা মুখে আনিতে পারিবেন ? কিন্তু নিজেদের ইজ্জৎ নিজেরা যদি আমরা না বুঝি, নিজেরা যদি রাখিতে না চাই, পরে কেন বুঝিবে ? পরে কেন রাখিতে চাহিবে ?

এদেশে চিরদিনই কিছু আর এখনকার খেতাবী রাজা রাণীদের মতই রাজা-রাণী ছিলেন না। বড় বড় দেশ তাঁহারা স্বাধীন ভাবেই শাসন করিতেন। কিন্তু ইংরেজের লেখা ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গল্পের বইতে কচিৎ কখনও king or queen নামে তাঁহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই raja or rani (রাজা বা রাণী) নামে তাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে। যেন king or queen বলিতে যাহা বুঝায়, এদেশের রাজা-রাণীরা তাহা কখনও হইতেই পারেন না।—যেন আমাদের দেশের রাজা-রাণীরা ইয়োরোপের chief বা chieftain ও তাঁহাদের লেডীদের মতই সব ছিলেন,—ইঁহাদের বেশী মর্য্যাদা তাঁহাদের দেওয়াই যায় না!

লংম্যান ম্যাকমিলান, ব্লাকি প্রভৃতি পুস্তকব্যবসায়ী-গণের প্রস্তুত ইংরেজি পাঠ্য পুস্তক সকল বহু ইস্কুলে এখন পড়ান হয়। দেশী ব্যবসায়ীদের বই অপেক্ষা এদের বই অনেক বেশী চলতি হইয়াছে। এই সব পুস্তকে অনেক ছবি আছে,—দেশীয় জীবনের যত কিছু চিত্র, সব অতি নিকৃষ্ট ছাঁচ হইতে নেওয়া। এই সব ছবির রাজারাও যেন এক একটি সাহেব বাড়ীর চাপরাসী কি দারোয়ান, আর রাণীরা যেন বাজারের এক একটী ভুজাওয়ালী! একখানা পুস্তকে পদ্মিনীর-ছবি দেখিয়াছিলাম,—ঠিক যেন এক মেম সাহেবের আয়া, অথবা কলিকাতার রাস্তায় যে পশ্চিম দেশীয়া ভিখারিণীরা নাচিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়—তাদেরই একজন কেহ। ইহারাও হয়ত রাজপুত। কিন্তু তাই বলিয়া রাজপুত রাণীদেরও যে সেদেশের ভিখারিণীর মত হইতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। এই পদ্মিনীর জন্য যদি বাদসাহ আলাউদ্দিন ক্ষেপিয়াছিলেন, আর এত রক্তপাত করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার রুচির প্রশংসা বড় করিতে পারি না। তবে সেই ছবিতেই সাহেববাড়ীর চাপরাসীর মত যে আলাউদ্দিন বসিয়া আছেন, তিনি এই আয়ারূপিনী পদ্মিনীতেই মজিতে পারেন বটে!

মধ্যে মধ্যে ইয়োরোপীয় নর নারীর চিত্রও আছে, সেগুলি সব ইয়োরোপের উৎকৃষ্ট ছাঁচ হইতে নেওয়া।

বালকেরা এই সব বই প্রথমে পড়ে। এই সব চিত্র দেখিলে তাহাদের কোমল মনে আপনা হইতেই এই সংস্কার জন্মিবে যে আমরা অতি নিকৃষ্ট এক জাতি, আর ইয়োরোপীয়েরা কত উৎকৃষ্ট! একথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবার কোনও দরকারই হয় না যে আমরা সত্যই অতি হীন সব জীব, আর ইয়োরোপীয়েরা সব স্বর্গের দেবপুরুষ!

কই, এ সব বই সম্বন্ধে কোনও আপত্তির কথাই ত কখনও শোনা যায় না। এ সব বই জাতীয় ইজ্জৎ বোধ থাকিলে ছেলেদের হাতে যে একেবারেই কেহ দিতে পারে না!

আমাদের নিত্যকার চালচলনেও কত এমন ইজ্জৎ-হীনতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়! গঙ্গোপাধ্যায়-সন্তান মিষ্টার গাঙ্গুলী নামে পরিচিত হইতে পারিলে যেন সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করেন? গাঙ্গুলী মহাশয় কেহ তাঁহাকে বলিলে তিনি মনে করেন, তাঁহাকে নামাইয়া একেবারে পচা কাদা-মাটিতে ফেলা হইল! মিষ্টার গাঙ্গুলী কেহ হয়ত বা গাঙ্গুলী মহাশয়টা কখনও মতে হজম করিতেও পারেন! কিন্তু মিসেস্ গাঙ্গুলীকে কেহ গাঙ্গুলী গিন্নী বা গাঙ্গুলী ঠাকরুণ ডাকিলে—সর্ব্বনাশ আর কি! এ অপমান কখনও ক্ষন্তব্য হইতে পারে কি? আবার এই মিসেস্ গাঙ্গুলী যদি লেডী গাঙ্গুলী হন, তবে স্বর্গের 'দেবী' পদও তিনি কামনা করিবেন না! মর্ত্ত্যেও ত তাঁহারা 'দেবী' নামে আখ্যাতা। কিন্তু 'মিসেস' আর 'লেডী'র পায়ের তলে 'দেবী' লুটাইয়াও যে ধন্য হয়!

এই 'মিষ্টার আর মিসেস' খেতাব—এদেশেরই 'মহাশয় ও 'গৃহিনী'র ঠিক অনুরূপ ইংরেজী কথা,—সমান অর্থসূচক। 'ঠাকুরাণী' 'দেবী' তার অনেক উপরে। কিন্তু দেশের ভাষায় ভাষিত কিনা, তাই তাদের ইজ্জৎ গিয়াছে

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রক্ষার উপায় কি ?

"বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণসন্তানগণ সংসারের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া এইরূপ দিশহারা হইয়াছেন। নদীয়া জেলার বিল্বপুষ্করিণীর প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশ পর্য্যন্ত অর্থাভাব অনুভব করিতেছেন। ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য অবস্থাপন্ন লোকদিগের মতিভ্রম বশতঃ সাহায্য দান করিতে দেখা যায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র শিক্ষা ছাড়িয়া নানা ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। দেশের দৈন্যদশা হেতু হিন্দুসাধারণের যে কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম ও পূজাদি কার্য্য হয়, তাহাতে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ পরিবারের ভরণ পোষণ হয় না। এ কালের ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রশিক্ষায় মনোযোগ দেন না। কেবল চাকুরী চাকুরী করিয়া গোল্লায় যাইতে বসিয়াছেন। সেকালের নবদ্বীপের প্রত্যাগত পণ্ডিতের এখন আর পোষায় না। পণ্ডিতের এখন বহুরূপ। এক শ্রেণীর নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পেটের জন্য না করিতে পারেন এমন কার্য্য নাই। একালের বাড়ী বাড়ী অন্বেষণ করিয়া দেখ, নারায়ণ পূজা বিলুপ্ত হইয়াছে। এই দুর্ম্মূল্যের দিনে সংসারনির্ব্বাহের জন্য খাটুনিতে ব্রাহ্মণ-বাড়ী হইতে পূজা অর্চ্চনা উঠিয়া যাইতেছে, বড়ই বিপদের কথা। ব্রাহ্মণেরা মুচি বাড়ী পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ লইয়া থাকেন এবং তথায় আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। বেশ্যালয়ের পৌরহিত্যও করেন। ইহা কল্পনা নহে, প্রত্যক্ষ দৃশ্য ঘটনা। পরন্তু ব্রাহ্মণসন্তান পাচকের কার্য্য লইয়া কর্ত্তার ইঙ্গিতে মুর্গী পর্য্যন্ত হজম করিতেছেন। তাই মনে হয়, ব্রাহ্মণবংশের আর উন্নতি হওয়ার আশা নাই। আমরা হিন্দুধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য করিতেছি। আশা করি ব্রাহ্মণরক্ষার উপায় কি—মহামণ্ডল তাহার চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মণ রক্ষা করিবেন।" (কাশীপুর নিবাসী ১০ই অগ্রহায়ণ)

উপায়—আগে ব্রাহ্মণ নিজে, তারপরে সমাজ। সমাজকে আপনার মহত্বে ব্রাহ্মণকে টানিয়া আনিতে হইবে। সংক্ষেপে কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ করিতেছি।

১। আধুনিক বিদ্যা ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। প্রাচ্য সাহিত্যদর্শনাদির সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যদর্শনাদিও তাঁহাদের পড়িতে হইবে। পড়িয়া তুলনা করিয়া যুক্তির দিক হইতে তাঁহাদের লোককে দেখাইতে হইবে, ভারতের বিদ্যা ভারতের নীতি জগতের আর কোনও জাতির বিদ্যা ও নীতি হইতে নিকৃষ্ট নহে। যুক্তির দিক হইতেও ভারতের বিদ্যা ও নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা যায়। তাই প্রতিপন্ন করিয়া লোককে দেখাইতে ও বুঝাইতে হইবে। কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিলে আজকাল লোকে মানিবে না। অন্ধভাবে এখন কেহ কিছু মানিতে চায় না। হিন্দুর ধর্ম্ম ও নীতি সে ভাবে মানিবারও প্রয়োজন হয় না। তারপর যাহা কিছু সংস্কৃত শ্লোকে রচিত হইয়াছে, তাহাই উৎকৃষ্ট শাস্ত্রবাক্য বলিয়া প্রচার করিলে চলিবে না। বিচার করিয়া বাছিয়া লইতে হইবে, কি প্রকৃত শাস্ত্র কি তাহা নয়।

২। যুগের প্রয়োজনানুসারে পুরাতন বিধি ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। বিলাতী শিক্ষা বাবু সংস্কারকদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। হইবেই, কারণ তাহা সংস্কার নহে, সমাজকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলার চেষ্টা। হিন্দুসমাজের কেহ তাহারা নন, সুতরাং সংস্কারের অধিকারীও নন। সুশিক্ষিত উন্নতচেতা, উদার, তেজস্বী, স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্, অথচ অন্ধ বিশ্বাসী নন, এরূপ ব্রাহ্মণকেই সমাজসংস্কারের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণসমাজ ও মহামণ্ডল উভয়েই এসম্বন্ধে ভুল পথে চলিতেছেন।

৩। এই ব্রাহ্মণকে আপাততঃ স্বাধীনবৃত্তিক হইতে হইবে। দান দক্ষিণার উপরে বর্ত্তমান যুগে নির্ভর করিলে চলিবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণকে লোভী ধনীর চাটুকার এবং ধনীর খেয়ালের অনুবর্ত্তক করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আত্মমর্য্যাদা বোধের অভাব তাঁহাদিগকে সকলের কাছেই হেয় করিয়া ফেলিতেছে। স্বাধীন তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চাই, গর্ব্বিত ধনীর দ্বারস্থ যাঁহারা হইবেন না, হিন্দুনামধারী অনাচারী ধনীকে যাঁহারা অস্পৃশ্য পশুবৎ ত্যাগ করিবেন, ইঁহাদের প্রদত্ত স্বর্ণস্তূপও যাঁহাদের কাছে অমেধ্যবৎ পরিত্যাজ্য হইবে।

ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা থাকিবে, বিদ্যার্থীদেরও বড় মঙ্গল হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার ধারা ফিরিয়া যাইবে।

৪। ইঁহারা যদি যাজকতা ও দীক্ষাগুরুর বৃত্তি গ্রহণ করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানে আধুনিক হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবেন। তা' যদি পারেন সকল দুর্গতি আপনিই ক্রমে সারিয়া আসিবে।

ঠিকে অধ্যাপক

"কোন কোন বেসরকারী কলেজে ঠিকে অধ্যাপক রাখিয়া অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। যাহারা বি-এল পড়িতেছেন অথবা বি এল পাস করিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করার অভ্যাস করিতে চাহেন, সেরূপ তরুণবয়স্ক যুবকবৃন্দকে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ সামান্য বেতন দিয়া সংগ্রহ করেন। উহাঁদের পূজার বা গ্রীষ্মের অবকাশের সময়টার বেতনও দিতে হয় না। ইহাঁরা পাঠ্য পুস্তকের নোট অপর কাহারও নিকট সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ক্লাসে প্রতিলিখনের ন্যায় 'কমা' পূর্ণচ্ছেদ, পর্য্যন্ত বাদ না দিয়া পড়িয়া যান, এবং ছাত্রগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। (এডুকেশন গেজেট ১২ই অগ্রহায়ণ)

টিপ্পনী—কলেজের কাণ্ড আজকাল যেরূপ, তাহাতে কিছুই বিচিত্র নয়। বিদ্যাদানে এ ব্যবসাদারী, হায়, কতদিন আর চলিবে!

বঙ্গ জননীর অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য

"একখানি মার্কিন পত্রে লিখিয়াছে যে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া ২০০ মাইল দূরে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিলে যে ভূভাগ তাহার অন্তর্গত হয়, তাহার ন্যায় ধনোৎপাদনে উপযোগী স্থান ভূমণ্ডলে কুত্রাপি নাই। ভূমি উর্ব্বরা; বৃষ্টিপাত যথেষ্ট; চাউল এবং পাট অপর্য্যাপ্ত জন্মে। অভ্রের খনি এরূপ কোথাও নাই। ওয়েল্‌সে তিন হাজার ফুট নিম্নের কয়লা এখন উত্তোলিত হইতেছে। বাঙ্গালার কয়লা ওরূপ গভীর খনিতে তেমনি উৎকৃষ্ট। এখন উপরের কয়েক শত ফুটের কয়লায় "আঁচড়" দেওয়া হইতেছে মাত্র। মৃত্তিকাদি মিশ্রিত যে অবিশুদ্ধ লৌহ ধাতু এখানে পাওয়া যায়—অন্যত্র অপেক্ষা তাহাতে অনেক অধিক পরিমাণ লৌহ থাকে। কলিকাতা অচিরেই বোম্বাই প্রভৃতি অপেক্ষা বড় বন্দর হইয়া উঠিবে।"

(এডুকেশন গেজেট ১২ই অগ্রহায়ণ)

সব সত্য, কিন্তু আমরা যে মানুষ নই। প্রকৃতি অনেক দিয়াছেন কিন্তু অকৃতি সন্তান আমরা নিতে জানিনা। তাই আমাদের মায়ের দান বিদেশীরা বাস্ক ভরিয়া লুটিয়া নিতেছে।

ভারতে বন্য জন্তুর প্রভাব

"সমগ্র ভারতে গত বর্ষে ব্যাঘ্রদংশনে এক হাজার, নেকড়ে বাঘ ও ভল্লুকের আক্রমণে তিনশত আটত্রিশ, চিতা বাঘের দংশনে তিনশ পাঁচিশ, কুম্ভীর দংশনে একশ' চুরানব্বই এবং সর্পাঘাতে বাইশ হাজার ছয়শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অস্ত্র আইনের কড়াকড়িই যে বন্য জন্তুর প্রভাবের প্রধান কারণ এ কথা বলাই বাহুল্য!"

(খুলনা বাসীর ৬ই অগ্রহায়ণ)

রাজনৈতিক দ্বীপান্তর

ভাই পরমানন্দ

"আন্দামানে যে সমস্ত রাজনৈতিক অপরাধী নির্ব্বাসিত হইয়াছেন—তাঁহাদের জীবন-যাত্রার একটি করুণ ইতিহাস ভাই পরমানন্দ তাঁহার পত্নীকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার ভিতর হইতে বেশ পাওয়া যায়। মিঃ এণ্ড্রুস্ তাঁহার এক আধুনিক প্রবন্ধে এই পত্রখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরাও তাহা আমাদের পাঠাকবর্গকে উপহার দেওয়ার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

'আমরা এখানে কিরূপ আছি তাহা আমার শেষ পত্রে তোমাকে জানাইয়াছি। ছোটখাট রকমের লাঞ্ছনা এবং অপমান প্রতিনিয়ত যে কত সহ্য করিতে হয়, তাহা না বলাই ভাল। কারণ এগুলি ছাড়িয়া দিলে জেল ত আর জেল হয় না। সামাজিক বা নৈতিক কোন অপরাধ না করিলেও কোন সদয় ব্যবহার যে পাইব, তাহারও আশা করি না। আমাদের প্রধান দুঃখ এই যে, সমস্তটা জীবন অথবা জীবনের বেশীর ভাগটাই শুধু নির্ব্বাসিত হইয়াই নহে, জেলেও পচিয়া কাটাইতে হইবে। খুনী, চোর, বদমাইসদের অবস্থাও আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল। ভারতবর্ষে তাহারা মুক্তি পায়, এখানেও প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করে। উদাহরণ স্বরূপ, ধর, আমি যদি অন্য কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া এখানে আসিতাম, তবে আমাকে জেলে পচিতে হইত না—জেলের বাহিরে গীতার ভাষ্য লিখিয়া হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে পারিতাম। সাধারণ অপরাধীরা যদি কোন অন্যায় করে, তবে তাহাদের আবার বিচার হয় এবং একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদিগকে জেলে থাকিতে হয়। ১২ হাজার নির্ব্বাসিতের ভিতর দ্বিতীয় বারের অপরাধের জন্য জেল খাটিতেছে এরূপ এক হাজার জন মাত্র কয়েদী আছে—এবং ইহারাই আমাদের সব সময়ের সঙ্গী। তুমি হয়তো মনে করিতেছ, ইহাই সব। তাহা নহে, আরও আছে। এখানকার বিধি-ব্যবস্থা শাসননিয়মের অধিকাংশ দণ্ডিতেরাই করিয়া থাকে। শিক্ষিত এবং কর্ম্ম-কুশল অপরাধীরা এক চোটেই এসব অধিকার হাতে পায়। কিন্তু আমাদের তাহাতে কোনও আশা নাই। এই যে পার্থক্য, ইহাই আমাদের জীবনকে আরও লজ্জাকর আরও দুর্ব্বহ করিয়া তোলে। দিবারাত্রি খুনে ডাকাতদের সহিত যেখান হইতে মুক্তি নাই—মুক্তির আশাও নাই—সেই কারাগারের ভিতর কাটাইয়া দেওয়া! ইহাই তো আমাদের ভবিষ্যৎকে চির অন্ধকারময় করিয়া রাখিয়াছে। এই সীমাহীন নৈরাশ্যই সমস্ত দুঃখের চরম দুঃখ! কিন্তু আমি তাহার জন্য ক্ষোভ করি না। দেশকে ভালবাসাই আমার অপরাধ। দুঃখ ভোগ না করিয়া কে কবে ভালবাসিতে পারিয়াছে!" (হিন্দুস্থান)

(বরিশাল হিতৈষী।)

'রায়ত' ও জমিদার

কিছুকাল হইল, বাঙ্গলায় একটি রায়তসম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই সমিতির মুখপত্রস্বরূপ একখানি সাপ্তাহিক পত্র চলিতেছে। সকল সম্প্রদায়েরই উন্নতি নির্ভর করে সেই সম্প্রদায়ের স্বকীয় উদ্যমের উপরে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায় শক্তির বিকাশ ব্যতীত এরূপ কোন উদ্যম সম্ভবই হয় না—তার সফলতার কথাত বিবেচনার মধ্যেই আসিতে পারে না। আর এই সমবায় শক্তির আশ্রয়ই হইতেছে এইরূপ সম্মিলনী, সুতরাং রায়ত সম্প্রদায়ের এই নবজাত সম্মিলনীকে আমরা আদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

কিন্তু 'রায়ত' পত্রিকায় যাহা লেখা হইতেছে, তাহাতে মনে হয় সম্মিলনীর লক্ষ্য যাই থাক, তার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সুপথে পরিচালিত হইতেছে না। এবং এই প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, তবে রায়ত সম্প্রদায়ের মঙ্গল ত কিছুই হইবেই না, দেশের ও সমাজেরও গুরুতর একটা অমঙ্গল ঘটিবে, যাহার প্রতিকার রায়তসম্মিলনীর নেতৃবর্গের পক্ষেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। কাঁটা যেখানে সেখানে সহজেই ছড়াইয়া আসা যায়—কিন্তু সেই কাঁটা শেষে সব তুলিয়া আনা সুসাধ্য হয় না। দেহে বিষ ঢুকাইয়া দেওয়া বেশ যায়, কিন্তু সেই বিষের ক্রিয়া যখন দেহ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, রোধ করিয়া দেহে আবার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনা দুঃসাধ্য—অনেক সময় অসাধ্যই হয়।

বাঙ্গালায় রায়তের সংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী, এবং রায়তের শ্রমেই দেশের অন্ন অনেক পরিমাণে উদ্ভূত হইতেছে, একথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া রায়তের স্বার্থই দেশের সর্ব্ব-প্রধান স্বার্থ,—দেশের ধন দেশের সকল সুখ সচ্ছন্দতা সকলের আগে রায়তের ভোগ্য হইবে এমত হইতে পারে না। আর এই স্বার্থে অন্য যে, কোনও সম্প্রদায়ের স্বার্থ হইতে কিছু বাধা উপস্থিত হইবে, তাহাই রায়তের শত্রু, তাহাদের দমন করা আবশ্যক, ইহাও সুবুদ্ধির কথা নয়। সমাজ একাঙ্গ বা একপ্রধানাঙ্গ বস্তু নহে। বহু অঙ্গের সমবায়ে সমাজ শরীর গঠিত হইয়াছে, সকলেরই যথাযোগ্য ক্রিয়া আছে। সকলেরই যথাযোগ্য স্থান সমাজ শরীরে রহিয়াছে। বিভিন্ন অঙ্গ সকলেই সকলের উপর নির্ভর করে, সকলেই সকলকে সহায়তা করে।

কোনওটি নহিলেই যখন অপর কোনওটির চলে না, তখন কাহারও প্রয়োজন অবজ্ঞেয় নহে। বিভিন্ন অঙ্গ পরস্পর সহযোগী। এই সহযোগিতার অনুভূতি ও তজ্জাত, প্রীতির সম্বন্ধই সমাজ শরীরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই সহযোগিতার পরিবর্ত্তে যদি বিরোধ প্রকাশ পায়, বুঝিতে হইবে সমাজশরীরে বিষ ঢুকিয়াছে, তার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। পরস্পর বিধান কোনও অঙ্গই সবল থাকে না, যথাযোগ্য কর্ম্ম সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারে না। আবার দেহের কোন্ অঙ্গ কত বৃহৎ, কেবল তাহা ধরিয়াও সমাজ জীবনে তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করা চলে না। চক্ষু অতি ছোট, কাণ অতি ছোট, রসনাও অতি ছোট। কিন্তু এই তিনটি অঙ্গ যদি নষ্ট হয়, বৃহৎ দেহপিণ্ড একেবারে অকর্ম্মা হইয়া পড়ে। মাথা ছোট, হাত ছোট, পা ও ছোট, কিন্তু দেহের কাণ্ডটা ইহাদের প্রত্যেকের তুলনায় অনেক বড় ও ভারী। কিন্তু ইহাদের বাদ দিলে কি একেবারে ক্ষীণ করিয়া ফেলিলে কাণ্ডটা কি কাজ এমন করিতে পারে, আবার ইহাদেরও কাহারও কাণ্ডটা হইতে ছাড়াইয়া নিলে মরিয়া যায়, কাণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া থাকিয়া ইহারা আপন আপন কাজ করিতেছে।

কেবল রায়তের পক্ষে নয়, সকল সম্প্রদায়েরই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধে সর্ব্বদাই এই কথাগুলি মনে করিয়া চলা উচিত।

আর্থিক ব্যাপারে তিনটি সম্প্রদায়ের সংস্রবে রায়ত-বর্গের সর্ব্বদা আসিতে হয়, জমিদার, মহাজন আর উকিল মোক্তার। আর্থিক সম্বন্ধও যাহা কিছু তাহাও রায়তের ইঁহা-দের সঙ্গে। রায়ত পত্রিকায় এই তিনটি সম্প্রদায়ের উপরেই সর্ব্বদা আক্রমণ দেখা যায়। জমিদারের সঙ্গেই রায়তের আর্থিক সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক এবং ইঁহাদের উপরেই রায়তের আক্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আর এই আক্রমণের ধরণ এমন, যেন জমিদার সম্প্রদায়ের সঙ্গে রায়তের

স্বাভাবিক একটা শত্রুতার বা স্বার্থ বিরোধের সম্বন্ধই রহিয়াছে, ইঁহাদের দমন হইলেই রায়তের সুখ হইবে,-- ইঁহারা ছোট হইলেই রায়ত বড় হইবে। এই কথাটাই যেন 'রায়ত' সর্ব্বদা রায়তবর্গের মনে জাগাইয়া রাখিতে চান। 'রায়তে'র ও লেখার ভঙ্গীতে স্বতঃই রায়তবর্গের মনে জমিদারের প্রতি সকল শ্রদ্ধা দূর হইয়া দারুণ একটা বিদ্বেষের ভাবই সৃষ্টি করিতে পারে।

এখন এই কথাটা একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক।

উকিল মোক্তারের জীবিকাই হইল লোকের মামলা মোকর্দ্দমার পরিচালনা। মামলা মোকর্দ্দমা লইয়া কেহ যদি উকিলে মোক্তারের কাছে যায়, মোকর্দ্দমা করিও না, আমাকে পয়সা দিও না, লক্ষ্মী ছেলেটি হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও, এই কথা বলিয়া মক্কেলকে, তাঁহারা বিদায় করিয়া দিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। দোকানে খরিদ্দার গেলে দোকানদার বলে না, বলিতে পারে না, আমার জিনিশ কিনিয়া কেন পয়সা নষ্ট করিবে ?, ঘরের পয়সা ঘরে নিয়া রাখ। বরং তার জিনিশ যাতে বেশী করিয়াই খরিদ্দার কিনে, তাহারই চেষ্টা সে করে। দোকানদারের সঙ্গে খরিদ্দারের যেমন সম্বন্ধ, উকিলমোক্তারের সঙ্গেও মক্কেলের সম্বন্ধ সেইরূপ। তবু এরূপ উকিল মোক্তারও দেখা যায়, মক্কেলের অবস্থা বুঝিয়া মামলামোকদ্দমা অনেক মিটাইয়াও দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসার কথাই বলিতে হইবে।

মফঃস্বলের আদালতে দেখা যায়, বেশীর ভাগ মক্কেলই রায়ত শ্রেণীর। প্রত্যেক আদালত গৃহের সম্মুখে যেন ইহাদের এক এক হাট মিলিয়া বসে। ইহার কারণ কি ?

রায়ত চাষের সময় চাষ বাস করে, ফসলের সময় ফসল তোলে, বৎসরের বাকী সময়টা তাদের যথেষ্ট অবসর থাকে। আজ কাল পাটের মরসুমে রায়তের হাতে টাকাও বেশ যায়। শিক্ষা নাই, শিক্ষার উপযোগী উন্নত কোনও কর্ম্মাভিনিবেশ নাই,—টাকা সঞ্চয় করিয়া অন্যান্য ব্যবসায়ে লাগাইয়া উন্নতি লাভ করিবার মত আকাঙ্ক্ষা এবং বুদ্ধিও তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় বিবাদ বিসম্বাদ ও মামলামোকর্দ্দমা করা,আর সেই মামলামোকর্দ্দমা উপলক্ষে সহরে যাতায়াত করা, এই সব দিকেই তাদের বড় ঝোঁক হয়,—করিতে করিতে শেষে ইহাই একটা অভ্যাসের মত দাঁড়ায়। এমন কথা আমরা বলিতেছি না যে সকল রায়তেরই প্রচুর অর্থাগম হইতেছে এবং সকলেই সেই অর্থ লইয়া কেবল মামলা মোকর্দ্দমা করে। তবে রায়তের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই যে বেশ অর্থাগম হয়, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই, এবং পয়সা যাহাদের হাতে হয়, তারাই মোকদ্দমা করে। মোকর্দ্দমা করিতে তারাই সহরে গিয়া উকিলমোক্তারের দ্বারস্থ হয়,—উকিল মোক্তারেরা গ্রামে গ্রামে গিয়া তাহাদের ছলে ভুলাইয়া বা বলে টানিয়া মামলা করিতে সহরে লইয়া আইসেন না।

রায়তের এই ক্ষতি নিবারণ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা রায়তরা যাতে বিবাদ বিসম্বাদ না করে, যা অনিবার্য্য তাও নিজেদের মধ্যেই মিটাইয়া লইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা। উকিল মোক্তারকে গালি পাড়িলে কি হইবে ?

তারপর মহাজনদের কথা। মহাজনরা চড়া সুদে রায়তদের টাকা ধার আর খুব কড়া ভাবে তা আদায় করিয়া, এবং এই অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে দরিদ্র রায়তরা অনেকেই বৎসরের পর বৎসর মহাজনদের দায়িক রহিয়া যায়। এখানেও মহাজনদের প্রতি বিদ্বেষে রায়তদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কিছু নাই। রায়তদের মধ্যে মাতব্বর যাঁহারা, যাঁহাদের সচ্ছলতা আছে, তাঁহাদের একটা ব্যবস্থা করিয়া দরিদ্র দায়িক রায়তদের ঋণমুক্ত করা উচিত এবং আর যাহাতে তারা দায়িক না হয়, তারও চেষ্টা করা উচিত। অজ্ঞতাহেতু অনেকে আবার বড় বেহিসাবী। হাতে টাকা আসিলেই তাহা অপব্যয় করিয়া ফেলে, এই অজ্ঞতা যাতে কিছু দূর হয়, আর একটু হিসাবী তারা হয়, তাহাদের হিতকামী ব্যক্তিবর্গের সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। মহাজনদের গালি না দিয়া 'রায়ত' পত্রিকা যদি এই সব উপদেশ রায়তদের দেন, তাহা হইলে তাহাদের উপকার বেশী হইতে পারে। মহাজনরা সুদ বেশী নেয়, তা সত্য। কিন্তু বিপন্ন রায়ত অসময়ে ও অভাবে টাকা ধার পাইয়া উপকৃতও যে কিছু না হয়, তা বলা যায় না। এই বিদ্বেষের উত্তেজনায় রায়তরা যদি অত্যাহিত একটা কিছু করে, আর মহাজনরা তাহাতে তাহাদের টাকা ধার দিতে বিরত হয়, তবে কি রায়তদের খুব সুবিধা হইবে ? মহাজনরা তাহাদের টাকা খাটাইবার পথ অনেক পাইবে, না হয়

সুদ কিছু কম তাদের হইবে? কিন্তু রায়তরা যখন তখন প্রয়োজন মত টাকা ধার কোথায় পাইবে।

গবর্মেণ্ট Co-operative Credit society করিয়া রায়তদিগকে এই কঠোর ঋণ জাল হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিতেছেন। 'রায়ত' পত্রিকা যদি রায়তবর্গের প্রকৃত মঙ্গল চান, তবে এই সব Co-operative Credit Society-এর তত্ত্ব যাহাতে রায়তরা বুঝিতে পারে,সে সবের আশ্রয় আগ্রহে গ্রহণ করে, সেই সব society আরও দ্রুত তাহাদের মধ্যে বিস্তৃত হইতে পারে,এই সব কথা ধরিয়া প্রবন্ধ লিখুন,—এই সব উপদেশ রায়তদের দিন। তবে এ সব কিছু কঠিন, গালি দেওয়াটা বেশ সোজা, আর গালিটা জমেও ভাল। কিন্তু বড় একটি সম্প্রদায়ের মঙ্গলের দায়িত্ব যাঁহারা হাতে নিয়াছেন, তাঁহাদিগকে একটু কষ্টই করিতে হইবে। এই সোজা পথটা যে বড় সর্ব্বনেশে পথ্।

শেষ জমিদারদের কথা। জমিদারের সঙ্গে রায়তদেব সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, অপরিহার্য্য। রায়ত ইচ্ছা করিলে, উকিল মোক্তার হইতে 'দশ হাত দূরে', আর মহাজন হইতে 'শত হাত' দূরে—সরিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু জমিদার হইতে এক হাতও সরিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং জমিদারের প্রতি রায়তের বিদ্বেষ, দারুণ একটা শত্রুতার ভাব, একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। অথচ, 'রায়ত' পত্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রোশ এই জমিদার সম্প্রদায়ের উপরে। জমিদারের প্রতি অতিশয় একটা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব প্রজার মনে যাহাতে সৃষ্টি হয়, এ জন্য যেন 'রায়ত' একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

অনেক জমিদার অত্যাচারী, খাজনা ছাড়া আরও অনেক উপরি আদায় জবরদস্তী করিয়া রায়তের কাছে অনেকে করিয়া থাকেন, এ কথা সত্য। আবার রায়তের হিতার্থী, অনেক রকমে রায়তের অনেক মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন, এরূপ সহৃদয় জমিদারও বিরল নহেন। জমিদারে রায়তে দারুণ একটা বিদ্বেষ ও বিরোধের ভাব সৃষ্টি হইলে, জমিদারেরই কেবল অসুবিধা হইবে, তা নয়,—রায়তেরও অনেক অসুবিধা হইতে পারে। আর অত্যাচার অবিচার জুলুম জবরদস্তী এক সমাজভুক্ত লোকের মধ্যে যেখানে হয়, তার প্রতিকারের উপায় এই বিদ্বেষ ও বিরোধ নহে। রায়তের অজ্ঞতা যদি দূর হয়, তবে কোনও জমিদারই তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইবেন না। এখনও দেখা যায়, একটু অবস্থাপন্ন, কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত, পাঁচজন যাকে মান গণে, এরূপ প্রজাকে জমিদার ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা খাতিরই করেন, অত্যাচার অবিচার জুলুম কিছু করেন না, করিতে ভরসাও পান না। এইরূপ রায়তের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়, এইরূপ সব মাতব্বর রায়ত যদি অজ্ঞ ও দরিদ্র রায়তবর্গের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে একটু শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন, তাহাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন, এ সব অত্যাচার আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে। এই সব মাতব্বর রায়তদের সঙ্গে জমিদারের যদি সৌহার্দ্দের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, আর বিরোধ বিদ্বেষ অপেক্ষা প্রীতি ও সহযোগিতার সম্বন্ধই যদি প্রবল হয়, তবে ইহা আরও সহজ হইবে।

কেবল বিরোধের বিষ না ছড়াইয়া এই দিকে যদি 'রায়ত' মনোনিবেশ করেন, তবে কি অনেক ভাল হয় না? কিন্তু রায়তবর্গের উন্নতিসাধন এবং উন্নত রায়তের সঙ্গে জমিদারের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন, এ সব কাজও বড় শক্ত। কিন্তু শক্ত হইলেও ইহাই করিতে হইবে। একটি কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, জমিদারে রায়তে সম্বন্ধটা অপরিহার্য্য। যাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ অপরিহার্য্য, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ বিরোধ কোনও পক্ষেরই শুভকর হয় না। রায়তের মনে জমিদারের প্রতি বিদ্বেষের ভাবটা দাঁড়াইয়া গেলে, জমিদারের মনেও একটা প্রতিবিদ্বেষের সৃষ্টি করিবে। খোঁচা দিলে উল্টা খোঁচা খাইতে হয়। রায়ত যদি জমিদারকে জব্দ করিতে চায়, অবজ্ঞা করে, বিদ্বেষ করে, জমিদাররাও তার শোধ তুলিতে যে না পারিবেন, তা নয়।

'রায়ত' কি চান? ভয় দেখাইয়া গালি দিয়া, রায়তকে বিদ্রোহী করিয়া জমিদারকে ভাল মানুষ করিবেন? ইহাতে কখনও ভালমানুষী কিছু দেখাইলেও তলে তলে অনেক অনিষ্ট শক্তিমান্ করিতে পারে। রায়তের তুলনায় জমিদারের শক্তি অনেক বেশী।

আর হইতে পারে, জমিদারের হাত হইতে রায়তের একেবারে মুক্তি। কিন্তু তাহাতে কি রায়তের বড় বেশী সুবিধা হইবে? রাজস্ব রায়তকে দিতেই হইবে। এদেশের

ভূমির মালিক রাজা,—রায়ত ভূমি চাষ করে, উৎপাদিত দ্রব্যের একাংশ রাজাকে দেয়, তাহাই রাজস্ব। সকল প্রজাকেই নিজ নিজ আয়ের কিয়দংশ 'রাজস্ব' বা tax বলিয়া রাজসরকারে দিতে হয়। রায়তের বৃত্তি চাষ, সুতরাং চাষের আয় হইতে কিছু রাজস্ব তাকে দিতেই হইবে। রাজা ভূস্বামী না হইলেও, এই রাজস্ব প্রজা বলিয়া তাহারা দেয়। জমিদার কে? এদেশের জমিদার-বর্গ রাজসরকার হইতে নিযুক্ত রাজস্ব আদায়ের একরূপ গোমস্তার মত,—তবে বেতনের পরিবর্ত্তে গবর্মেণ্ট ইঁহাদের সঙ্গে অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এক বা একাধিক পরগণা এক একজন জমিদারের হাতে দিয়াছেন। জমিদার নির্দ্দিষ্ট একটা রাজস্ব গবর্মেণ্টকে দিবেন, আর রায়তদের নিকট হইতে যাহা পারেন, আদায় করিয়া নিবেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাঙ্গলার জমিদারের সঙ্গে স্থায়ী এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নেওয়ায় জমিদাররা বাঙ্গলায় একটা বংশানুক্রমিক ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের মত হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ এক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নানা রকমে দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। তবে সে সব আলোচনার মধ্যে এই প্রসঙ্গে যাইবার সম্ভাবনা নাই। আর তার প্রয়োজনও নাই। আমাদের দেখিতে হইবে, এই জমিদার সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বাঙ্গলার রায়তদের পক্ষে হিতকর কি অহিতকর হইয়াছে?

মধ্যবর্ত্তী এই জমিদার সম্প্রদায় না থাকিলে, রায়তদের রাজসরকারের খাসদখলে আসিতে হইবে। রাজস্ব আদায় করিবে তখন রাজসরকারের কর্ম্মচারীরা।

ধরুন, দেশে জমিদার নাই। সব রায়তই গবর্মেণ্টের খাসদখলে বাস করে, সাক্ষাৎভাবে রাজসরকারে খাজনা দেয়। উপরি আদায় হয়ত হইবে না। কিন্তু বছর বছর অথবা কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর রাজসরকার যদি খাজনার হার বাড়াইয়া দেন, তবে রায়ত কি করিতে পারে? জমির গুণ বাড়িল, শস্যের দাম বাড়িল,—কিন্তু ইহা হইতে বেশী যে আয় উপসত্ব হইবে, তার বেশীর ভাগই রাজসরকার নিতে পারেন,—প্রজার অতি দীন গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র থাকিতে পারে। যতই সে খাটুক, তার বেশী নাও পাইতে পারে।

বাঙ্গলার বাহিরে অনেক অঞ্চলে চিরস্থায়ী জমীদারীর বন্দোবস্ত নাই। কয়বৎসর অন্তর অন্তর রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হয়। এই সব নূতন বন্দোবস্তে রাজস্বের হার সাধারণতঃ বাড়ান হয়, কারণ চাষে আর্থাগম ক্রমেই বেশী হইতেছে। ফলে রায়তের অবস্থা একটুও উন্নত হইতেছে না। আগেও যেমন ছিল, এখনও সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের বেশী তাহাদের কিছুই থাকে না। শস্যাদির মূল্যবৃদ্ধিতে অধিকতর আর্থাগম যাহা হয়, বেশীর ভাগই রাজসরকারে যায়।

কিন্তু বাঙ্গলার অবস্থা অন্যরূপ। জমিদারের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে—রাজস্বের হার বাড়াইতে আর পারেন না। তবে পথকর প্রভৃতি নূতন উপায়ে জমিদারের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর কিছু কিছু গবর্ণমেণ্ট নিয়া থাকেন। যাহাউক, যেমন জমিদারের দেয় রাজস্ব গবর্মেণ্ট বাড়াইতে পারেন না, তেমন জমিদাররাও প্রজাকে সহজে উৎবাস্ত না করিতে পারেন, প্রজা তার জমিতে মৌরিস সত্বে ভোগ দখল করিয়া, থাকিতে পারে, উপরি আদায় কিছু না হয়, এই জন্যও অনেক আইন গবর্মেণ্ট করিয়াছেন।

তাই অন্যান্য দেশের তুলনায় বাঙ্গলার রায়তের অবস্থা অনেক ভাল। পাটের চাষের বিস্তার ও শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হেতু যে লাভ, তাহার ফলভোগী জমিদার অপেক্ষা রায়ত-রাই বেশী হইতেছে। অনেক স্থানে উত্তরোত্তর রায়তদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণও বেশ দেখা যাইতেছে।

জমিদার উঠিয়া গেলে আর রায়ত সব খাস দখলে আসিলে এ সুবিধা রায়তবর্গের থাকিবে এরূপ বলা যায় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেখানে নাই, সেখানে রায়তের যে চিরস্থায়ী দুর্গতি, বাঙ্গলার রায়তেরও সেই দুর্গতিই হইতে পারে।

শেষ আর একটি কথা বলিতে চাই। এই যে সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইহা নূতন একটা বিলাতী পাপ। ব্যবসায়ী ধনী মহাজন আর দরিদ্র শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য অঞ্চলে বড় একটা বিদ্বেষবিরোধের ভাব চলিতেছে। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলেই সোয়ালিজম্ বোলশেভিজম্ প্রভৃতি সমাজবিধ্বংসী শক্তিসমূহ প্রকট হইতেছে। ইয়োরোপে ব্যবসায়ী ধনী মহাজন ও দরিদ্রশ্রমজীবী সম্প্রদায়ে যে সব বিরোধের কারণ আছে, এদেশে জমিদারে রায়তে সেরূপ বিরোধের কারণ কিছু নাই। কিন্তু এই বিদ্বেষে ও বিরোধে বোলশেভিক বিপ্লবের মত একটা বিপ্লব এদেশেও দেখা দিতে পারে। তাহা রায়তের পক্ষেও শুভ হইবে না।

বর্ষার গান

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী

আহা! আইল মধুর বরষা,—
নব প্রাণ পাইল তৃষিত তরুলতা,
নিকুঞ্জ হ'ল হরষা!
নব-জলধর হেরি গগনে,
চাতক-চাতকী গায় সঘনে,
কেতকী কদম ফুটে কাননে,
শিখী নাচে হরষা!

আহা! আইল মধুর বরষা,—
আমারি হৃদয়-নিকুঞ্জ আজি
হবে না কি শ্যাম সরসা?
থল থল জল নদী কূলে কূলে,
ছল ছল জল তরু পাতে ফুলে,
আহা! এমন বরিষায় কে রবে একা হায়
বহিয়া গম্ভীর তিরিষা॥

—————

আস্থায়ী

০ ১

মা পা II { জ্ঞা -া রা সা । রা মা মা পা I মা ধাপা পা -া ।

আ হা আ ০ ই ল ম ০ ধু র ব র ষা ০

৩ ০ ১

। -া -া } পা পা । পা -র্সা -না র্সা । র্সা- -া র্রা -া I

০ ০ ন ব প্রা ০ ণ্ পা ই ০ ল ০

২´ ৩ ০

I র্সা -া ণা ণা । ধা পা মা পা । মা মা -া ণা ।

তৃ ০ ষি ত ত রু ল তা নি কু ন্ জ

১ ২´ ৩

। ধা পা -া মগা I পা -া মা -া । -া -া মা পা II

হ ল ০ হ ০ র ০ ষা ০ ০ ০ "আ হা"

অন্তরা

০ ১ ২´

II { পা পা পা পা । পা ধা না না I না না র্সা -া ।

ন ব জ ল ধ র হে রি গ গ নে ০

৩ ০ ১
। -া -া -া -া । না র্সা র্রা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা -র্সা I
০ ০ ০ ০ চা ত ক চা ত কী গা য়

২´ ৩ ০
I ণা ণা ণা -ঝা । -া -া -া {-া} । পা র্সা না- র্সা I
স ঘ নে ০ ০ ০ ০ ০ কে ত কী ক

১ ২´ ৩
। র্সা -া র্সা র্রা I র্সা ণা ধপা -মা । মা -া ণা -া ।
দ ম্ ফু টে কা ন নে০ ০ শি খী ০ ০

০ ১ ম ২´
। ধা -া পা -া । মা মা -া গা I পা -া -া মা ।
না ০ চে ০ সু খে ০ হ র ০ ০ ষা

৩
। -া -া মা পা II
০ ০ "আ হা"

সঞ্চারী

ম ০ ১
[মা পা II { মজ্ঞা -া রা সা । সা -া রা রন্‌া] I
সা সা II { রা -া জ্ঞা জ্ঞা । মজ্ঞা -া রা সরা I ন্‌া ন্‌া সা -া ।
আ হা আ ০ ই ল ম০ ০ ধু র০ ব র ষা ০

৩ ০ ন ১
। -া -া -া -া } । সা র্সা -া র্সা । র্সা -া র্সা র্রা I
০ ০ ০ ০ আ মা ০ রি হৃ ০ দ য়

২´ ৩ ০
। র্সা ণা -া ণা । -া -া ধা পা । মা ণা ধা পা ।
নি কু ঞ্জে ০ ০ আ জি হ বে না কি

১ ২´ ৩
মা -া মা পা I পা মা -া -া । -া -া মা পা II
শ্যা ০ ম স র সা ০ ০ ০ ০ "আ হা"

আভোগ

	০				১				২´			
II {	পা	পা	পা	পা ।	পা	ধা	না	না I	না	র্সা	র্সা	র্সা ।
	থ	ল	থ	ল	জ	ল	ন	দী	কূ	লে	কূ	লে

	৩				০				১			
।	না	র্সা	র্রা	র্জ্ঞা ।	র্রা	র্সা	র্সা	র্রা ।	র্সা	-া	র্সা	ণা I
	ছ	ল	ছ	ল	জ	ল	ত	রু	পা	০	তে	কু

	২´				৩				০			
I	ণা	-া	মা	-া ।	-া	-া }	মা	মা । {	পা	র্সা	র্সনা	র্সা ।
	লে	০	০	০	০	০	আ	হা	এ	ম	ন০	ব

	১				২´				৩			
।	র্সা	র্সা	-া	র্রা I	র্সা	ণা	ণা	ধা ।	পা	মা	-া }	মা ।
	রি	ষা	০	য়	কে	র	বে	এ	কা	ম	ন০	ব

	০				১				২´			
।	ণা	ণা	ধা	-া ।	পা	মা	।	মগা I	পা	মা	-া	-া ।
	হি	য়া	গ	০	ভী	র	০	০তি	রি	ষা	০	০

	৩			
।	-া	-া	ম	পা II II
	০	০	"আ	হা"

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি এল। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

রক্তহোলী

১

নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উদ্যানের এক প্রান্তে বসিয়া ভনাঙ্গসী তৃপ্তচিত্তে উমুল (অহিফেন) সেবন করিতেছিলেন।

জয়ৎসী ডাকিল, "মহারাজ!"

"চোপ্‌রাও! কে মহারাজ! আমায় ত তারা অনেক দিন বুন্দির এই শৈলশৃঙ্গে নির্ব্বাসিত ক'রে গেছে। আমি কিন্তু বেশ আছি! তোমাদের মহারাণী কেমন আছেন?"

বলিয়াই কোটার নির্ব্বাসিত রাজা ভনাঙ্গসী অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুদুটী বারবার, বিস্তারিত করিয়া জয়ৎসীর দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাইতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"এই কি বীরশ্রেষ্ঠ রাণা জয়ৎসীর বংশধরের পরিণাম!"

"কেন হে গড়মিল্ হচ্ছে নাকি? বল!"

"মহারাজ!"

"কেন চেঁচাচ্ছ মিছে? আর বিশেষ যে নামটা আমি আদৌ পছন্দ করি না বলেই কোটার সামন্তসভায় তোমাদের রাণীর দেওয়া নির্ব্বাসন দণ্ডটাই বেছে নিয়েছি। মহারাজ টহারাজ ছেড়েই কথা কও না।"

"সর্দ্দার সন্তানকে ক্ষমা করুন, মহারাণীকে ক্ষমা করুন; কোটার বড় বিপদ।"

"বিপদ! তোফা, ক্যাবাৎ, কোটার বিপদ! কেন, আবার কেউ নেশাখোর মাতাল গজিয়েছে নাকি? যাও, যাও পাঠিয়ে দাওগে। একাটি আর ভাল লাগে না। নেশায় তেমন আরাম মেলে না। সাথী চাই, সাক্‌রেদ্ চাই, তবে নেশায় আরাম। হবে আমার সাক্‌রেদ্ জয়ৎ,— এমন মজা জানলে না মন্ত্রী!"

"আমায় পরিহাস ক'র্‌বেন না প্রভু! আমি আপনার দাসানুদাস।"

"আমার না মহারাণীর?"

"মহারাণী আপনারই নামে রাজ্য শাসন কচ্ছেন,—"

"তাই নাকি? তবু ভাল! জয়ৎ,—" কি বলিতে গিয়া ভনাঙ্গসী কথা ফিরাইয়া কহিলেন,—"কি জান জয়ৎ, কেউ কারও অধীন, আমি তা মানি না। সবাই মানুষ, সব সমান। আজ তুমি চাকার উপরে, কাল আর তা থাকছ না। বোঁ বোঁ করে সারা বিশ্ব ঘুরছে এ ঘূরণপাকে সবাইকেই এক একবার ক'রে উপর নীচ করতে হচ্ছে;—যাও জয়ৎ, তোমরা যা ভালবাস, তাই নিয়ে থাকগে। আমি নেশা ভালবাসি, তাই আমি কোটার রাজ্য ছেড়ে নেশার রাজ্য নিয়েছি। এখানেও কেন আবার আমায় জ্বালাতে এয়েছ?"

"মহারাজ!"—জয়ৎসী আবার ডাকিল।

"আবার বিদ্‌ঘুঁটে নাম? রাগিও না জয়ৎসী।"

"প্রভু! কোটাবাসীর আরাধ্য দেবতা!"

"ওকি কাঁদছ নয় জয়ৎ? স্বরটা যেন ভারি শুন্‌লেম না? মনে কোরোনা যে অতটাই নেশায় খেয়েছি যে চোখ চাইতে পার্চ্ছিনি। পারি। তবে চোখ চাইলে চোখ খুললে নেশা কেটে যায়, মজা টুটে যায়। তাই বুঝ্‌লে জয়ৎ, তাই—"

"মহারাজ, কোটার বিনীত প্রার্থনা—"

"না, ঠিক তুমি কাঁদছ! না কাঁদলে অমন স্বর হয় না। হুঁ! চাঁদ, করিমচাঁদ!—করিম কে জান জয়ৎ? জাঠ, জাঠ আমার অনুচর, সহচর, বন্ধু সখা—সব। এই নির্জ্জন বনবাসে আমার একমাত্র সহায়, সম্পদ সর্ব্বস্ব! রাজপুত নয়—হিন্দু নয়—জাঠ, মুসলমান। নেমকহারাম নয়, ইমানদার। রাজপুত, আমার জাত, জাহান্নামে যাক্! বিস্মৃতির অতলতলে বিলীন হয়ে যাক। এয়েছিস্ চাঁদ?—চল্ আমায় নিয়ে চল,—বল জয়ৎ কি তুমি বলবে! শুনব বল। যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ি,সংক্ষেপে বলে ফেল।"

কি ভাবিয়া জয়ৎসী উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া কহিল,—"আমার যা বক্তব্য এখানেই আমি ব'লে যাচ্ছি মহারাজ! পাঠান সর্দ্দার কেশর খাঁ বিরাটবাহিনী নিয়ে কোটা অবরোধ করেছে। মহারাণী তাই এ বিপদে আপনাকে নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন। মহারাজ, কোটা যায়, কোটার সর্ব্বস্ব যায়—চলুন প্রভু। আপনার আদেশ আমরা প্রাণপণে পালন করবো।"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! নেশাখোর মাতাল কি অসি ধরতে জানে? দেখ্‌ছ, চোখ বুজে আছি। সেই অসি হয়ত নিজের ঘাড়েই পড়বে। বাপ্! ওসব জানিনা জয়ৎ। চোখ বুজে চোখ্ বোজাতে জানি, চোখ চেয়ে চোখ লাল কর্‌তে ভুলে গিয়েছি। জানতেমও কোনও দিন। তাই বুঝি কোটার সামন্তসভায় কোটার সর্দ্দারগণ, তোমাদের মহারাণী আমার সহধর্ম্মিণী—আমার—যাক্—নেশা মাথায় মাতালের খেয়াল—রাগ কোরোনা জয়ৎ! যাও ফিরে! আর দ্যাখ আবার কোনদিন আমায় জ্বালাতে এসো না। পাঠানদের থাকে কেউ উমুলখোর, দাওগে পাঠিয়ে। জালা ভরতি উমুল রেখেছি, কেশর খাঁর বিরাট বাহিনী ডুবিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব।"

ততক্ষণে আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। ততোধিক বিষাদ-অন্ধকার বুকে লইয়া জয়ৎসী অন্ধকার পার্ব্বত্য পথে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল।

করিমের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া যাইতে যাইতে ভনাঙ্গসী কহিলেন, "পাঠান এসেছে আমি কি ক'রবো বলতো চাঁদ?"

আত্মবিস্মৃত ভাবে করিম তখনও ভাবিতেছিল,— "কাহাকে কি ভাবিয়াছি এতদিন? এযে মহারাজ!!! কিন্তু একি রহস্য এঁর?"

দূরে কাহার অশ্ব পদধ্বনি কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে কহিলেন—"ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে—যাক্। বড় দাগা দিয়েছে আমায়! বড় বুক ভেঙ্গে গিয়েছে আমার! আমার মুখ কে চেয়েছিল সেইদিন, যেদিন—না থাক, কিছু না, চল্ করিম!"

২

"উৎসবে ব্যসনে চৈব" রাজপুতগণ সকলেই উমুল পান করিতেন। কিন্তু কোটার অধিপতি মহারাজ ভনাঙ্গসী এতদূর নেশাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোটাবাসী সর্দ্দারগণ সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে বিদ্রোহের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মহারাণী কেতনকুমারী বহু চেষ্টা করিয়াও মহারাজকে নেশা সেবনে বিরত করিতে পারিলেন না। সর্দ্দারসঙ্ঘ অভিন্নমতে সকলেই মহারাজের নির্ব্বাসন দণ্ড প্রচার করিলে, বীর-নারী কেতনকুমারী শিশুপুত্র ডুনঙ্গের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া স্বহস্তে কোটার রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কোটাবাসী তাঁহাকে মায়ের মতন ভক্তি করিত, তাঁহার আদেশ দৈববাণীর মত মানিত। নিপুণহস্তে কেতনকুমারী কোটার রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন—ইহারই কিছুদিবস পরে পাঠান কেশর খাঁ তাহার বিরাটবাহিনী লইয়া কোটার দ্বারে হানা দিয়া বসিল। কেতনকুমারী শেষবার আর একবার মহারাজের কাছে মন্ত্রী জয়ৎসীকে প্রেরণ করিয়া ধীরচিত্তে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলেন। রুদ্ধদ্বার দুর্গের বাহিরে পাঠান কামান সাজাইয়া বসিল।

গুপ্তদ্বারপথে জয়ৎসীকে আসিতে দেখিয়াই কেতন কুমারী কহিলেন, "তিনি? মহারাজ?"

রুদ্ধকণ্ঠে জয়ৎসী কহিল, "এলেন না মা।"

"এলেন না,—কোটার এই মরণ বিপদের কথা শুনেও এলেন না?"

এক হস্তে চোক্ষের জল মুছিয়া জয়ৎসী ভাঙ্গা গলায় কহিল,—"না মা।"

"তবে আর কি করব আমি? আমাকেও রেহাই দাও তোমরা জয়ৎ। তোমাদের কোটা তোমরা নাও, আমায় বিদায় দাও। জয়ৎ, চেয়ে কি দেখছ? প্রাণ নেই, হৃদয় নেই, শুধু কর্ত্তব্য লাগিয়ে একটা অতি কঠোর মূর্ত্তি তৈরী করেছিলেম, শোকানলে বুকের মাঝখানে পাঁজর ক'খানা আমার—ওঃ—"

"স্থির হও মা। কুমারের কথা মনে কর মা, তারই মুখ চেয়ে এতকাল যে কঠোরতম ব্রত পালন করেছ, সে ব্রত উদ্‌যাপন তোমাকেই কর্ত্তে হবে যে মা। কোথায় যাবে? কোটাবাসীর এই জীবনসন্ধ্যায় তাহাদের ফেলে কোথায় যাবে মা? শিশুকুমার ডুনঙ্গকে কে বাঁচাবে? কোটার এ বিপদে আমাদের কে রক্ষা করবে মা?

"আমি কি করব? শক্তি কোথায় পাব? আমার শক্তি আমার ধমনীর শোণিত স্রোত—আমি পারব না জয়ৎ! আমায় ক্ষমা কর। পাঠানের কামানের গোলায় দুর্গদ্বার ভগ্নপ্রায়—পার দ্বার খুলে যুদ্ধ দাও, না পার দুর্গ ছেড়ে দাও! পাঠানের কামানের আগুন বিধাতৃ জড়িত বজ্রাগ্নির মত এ শূন্য বুকের উপর জ্বলে উঠুক, পুড়ুক, পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক!" বলিতে বলিতে কেতনকুমারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। দুই চক্ষে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ধীরে ধীরে জয়ৎসী ডাকিল,—"মা!"

"বল!"

"দুর্গের সমস্ত শিশু ও রমণীদের নিয়ে তুমি কেতনগড়ে চলে যাও, আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি—যদি পারি।"

"আমি যাব? না জয়ৎ, হয় না তা। ডুনঙ্গকে নিয়ে তুমিই যাও। মুষ্টিমেয় এই সৈন্য লয়ে আমি একবার যুঝে দেখি। ডুনঙ্গ রইল, পার, রাজপুত করে গড়, না পার তোমার কটিতে ছুরিকা রইল।"

"কুমারকে তবে কে বাঁচাবে মা? দুগ্ধপোষ্য শিশু তোমায় ছাড়া কেমন করে জীবন ধারণ করবে মা?"

কেতনকুমারী নীরবে কতক্ষণ কি ভাবিয়া কহিলেন,—"তবে চল জয়ৎ, এ দুর্গ শূন্য করে সবাই এবার কেতনগড়ে চলে যাই। এবার আমরা বড়ই শক্তিহীন, বড় অপ্রস্তুত। বৃথা প্রাণক্ষয় হবে। যে কয়জন যাবে, সে কয়জন থাকলে পরে এর চেয়ে অনেক বেশী কাজ হ'বে।"

"সবাই পালাবো মা? দেখতাম একবার"—

"কোন ফল হবে না জয়ৎ। রুদ্ধ দুর্গে বসে এ কয়দিন আমি তাই শুধু ভেবেছি। দুর্গের সমস্ত রসদ অস্ত্রভাণ্ডার

নিয়ে আজই পশ্চাতের পার্ব্বত্য পথে কেতনগড়ে চলে যাই এস।—কি ভাব্‌ছ তুমি? শৃগালের মত পলায়নে প্রাণরক্ষা ক'রে, এত বড় অপমান বরণ ক'রে নেব, জন্মভূমি কোটা পাঠানের পায়ে বিলিয়ে দেব, মাতৃস্থান বিদেশীর পদদলিত হবে, জন্মাগত সিংহবিক্রম ভুলে রাজপুত আত্মরক্ষা-ব্যাকুল-চিত্তে মুষিকের মত স্থান হতে স্থানান্তরে পালিয়ে ফিরবে—নয়? জয়ৎ, জানত, আমার পিতা ছিলেন তোমাদেরই মত বীর রাজপুত, আর মা ছিলেন, কুটনীতি-পরায়না মাহারাঠা। দুটোতেই আমি গঠিতা হয়েছি। কথা শোন, প্রস্তুত হবে চল। দেখবে একদিন জয়ৎ, এমনই আর একটা বিস্ময়পূর্ণ গৌরবাভিযানে কেতনকুমারী আবার এ দুর্গে প্রবেশ করবে। সেদিন জয়ৎ আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অস্ত্র খুলে নিও।"

জয়ৎসী বাহির হইয়া গেল। অনিচ্ছা সত্বেও কোটা-বাসী কেহই রাণী মাইজীর আদেশ অমান্য করিতে পারিল না। একটা অনৈসর্গিক প্রহেলিকা বোধে কোটাবাসী সকলেই রাণীমাইজীর দিকে চোখ তুলিয়াও চাহিতে পারিত না।

* * * * *

পাঠানের গোলা দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পরিত্যক্ত কোটার বুকের উপর জ্বলিয়া উঠিল,—পাঠানগণ দুর্গ দখল করিল।

দুর্গ তোড়নে উঠিয়া পাঠানসেনানী পরিদর্শন কালে কেতনকুমারী একদিন একবার মাত্র পাঠান সর্দ্দার কেশর খাঁর দৃষ্টিপথে পতিতা হইয়াছিলেন। কেশরখাঁ সেই অলোকসামান্য সুরত্‌ দর্শনে আত্ম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। দুর্গময় তিনি সেই রমণীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোথায় পাইবেন?

পাঠানগণ যে যাহার মনোমত বাসস্থান দখল করিল।

কেশর খাঁ রাজ্যের রশ্মি গ্রহণ করিলেন।

৩

উদ্যানের ফুটন্ত গোলাপগুচ্ছ ছাড়িয়া পশ্চিমের রক্তিমালো অদূরস্থিত বনফুলগুলির উপর দিয়া সরিয়া যাইতেছিল। পল্লী হইতে বহুদূরে এই নির্জ্জন পর্ব্বতারণ্যে এই ক্ষুদ্র প্রাসাদখানিতে, মহারাজ, করিম এবং করিমের পত্নী ও পুত্র এবং একজন মালী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। প্রভুর প্রীত্যর্থে করিম একজন মালী রাখিয়া পাহাড়ের গায়ে ছোট একখানি উদ্যান সাজাইয়া ছিল। মাঝে মাঝে পল্লী হইতে উমুলখোরেরা কেহ আসিয়া মহারাজের প্রসাদ লইয়া যাইত, কিন্তু তাহাও বড়ই কদাচিৎ। যতদূর চক্ষু যায়, যতদূর পর্য্যন্ত কাণে শোনা যায়, সব শূন্য নীরব নির্জ্জন। কেবল প্রভাতে সন্ধ্যায় বনবিহঙ্গমের অস্ফুট কাকলী, দূরে গভীর অরণ্যে কখনও বা পার্ব্বত্য ভীল কোল কোটীয়ার শীকারোল্লাস, শিকারী তাড়িত বন্য বরাহের আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাইত না।

একখানি প্রস্তরবেদির উপর পশ্চাতের একটী বৃক্ষ কাণ্ডে হেলিয়া বসিয়া ভনাঙ্গসী ডাকিলেন, "করিম!"

বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে মহারাজের দিকে তাকাইয়া করিম বসিয়াছিল,—জবাব দিল।

মহারাজ কহিলেন,—"আচ্ছা, কি বলিস্ করিম, কেশর খাঁ জিতেছে, নয়?"

করিম চুপ করিয়া রহিল। ভনাঙ্গসী আবার কহিলেন, "কি বলিস্, খুব প্রতিশোধ নিয়েছি আমি। কেমন মজা!! কিন্তু করিম এত সব যুদ্ধবিগ্রহে দুনঙ্গ—দুনঙ্গকে জানিস্ চাঁদ? আমার—না যাক্—সে আর নেই, কেমন?"

করিম গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া কহিল,—"মা থাকতে ছেলের দুঃখ ঘটতে পারে কি জনাব?"

"কে, কেতন? হোঃ! কেতন সে কি আর আছে? তুই ভাব্‌ছিস্ চাঁদ, গোঁয়ার চণ্ডী, চটে মটে কোথায় পড়ে মরেছে। মরেছে—আহা, না না চাঁদ, ভারি অবাধ্য ভৃত্য। এত বলি তোকে, শুনবি না তুই। যা, সুরা নিয়ে আয়। চাই আমি বিস্মৃতি—অতি সুন্দর মধুময় বিস্মৃতি! হাঁরে করিম, তোর ছেলে আছে ত?"

"আছে জনাব।"

"আছে? তোর তাকে দেখ্‌তে সাধ হয় না?"

"জনাবের মেহেরবাণীতে আমি যে এখানে জরু ছাওয়াল নিয়েই আছি জনাব।"

"যা তোর ছেলে নিয়ে আয়।"

করিম চলিয়া গেল। ভনাঙ্গসী বেদির উপর অর্দ্ধ-প্রসারিত দেহে পশ্চিমের অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ

রশ্মিটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নাঃ—এই ভাল. উমুল কা পিয়ালা !"

করিম তাহার শিশু পুত্র রহিমকে লইয়া মহারাজের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। রহিম দুই হস্ত নাড়িয়া পিতার পৃষ্ঠে ও বক্ষে চাপড়াইয়া ডাকিল,—"বাপ জান !"

ভনাঙ্গসী চমকিয়া ফিরিয়া কহিলেন, "এই তোর ছেলে ? বাঃ, বেশ ত ! আয় !"

প্রসারিত হস্তে ভনাঙ্গসী আবার ডাকিলেন, "আয় !" সরল শিশু রহিম মহারাজের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভনাঙ্গসী রহিমকে সজোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া শিশুর মুখ চুম্বন করিলেন। করিম বিস্মিত সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। দূরে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া রহিমপত্নী অঞ্চলাগ্রে চক্ষু মুছিয়া লইল। রহিম সেই দৃঢ় আলিঙ্গনের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। মহারাজ নিজ কণ্ঠহার রহিমের গলায় পরাইয়া দিয়া কহিলেন,—"জানিস্ রহিম, ভুনঙ্গ এমনি ঝাঁপিয়ে পড়ত এমনি সে—না কিছু নয়, নিয়ে যা, করিম—যা নিয়ে যা, দাঁড়াসনি যা,—আমার বীণা নিয়ে আয়, যা !"

করিম ভয়ে বিস্ময়ে ত্রস্তপদে রহিমকে লইয়া চলিয়া গেল। ভনাঙ্গসী অধিক মাত্রায় সুরা সেবন করিতে লাগিলেন।

গীত বাদ্য তিনি উমুলের মতই ভালো বাসিতেন। করিম বীণা আনিয়া দিল। ভনাঙ্গসী মুদ্রিত নেত্রে বীণা বাজাইয়া গাহিতে লাগিলেন ; সুরে ঝঙ্কারে নিখিল বিরহের অব্যক্ত বেদনা সুন্দরবনানীর পরপারে প্রকৃতির করুণ-হৃদয়ে প্রতিধ্বনি ফুটাইয়া তুলিল।

তন্ময় ভনাঙ্গসী কিম্বা করিম কেহই লক্ষ করিল না বহুদূর হইতে কাহার অশ্বপদধ্বনি কোথায় আসিয়া থামিল। কেহই লক্ষ্য করিল না,—অশ্বারোহী কখন আসিয়া তাহাদেরই পশ্চাতে মূক মুগ্ধ হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সঙ্গীত থামিল। হস্তের বীণা আবিলতায় থামিয়া পড়িল। ভনাঙ্গসী ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—"চাঁদ।"

উভয়েই কাঁদিতেছিলেন ; করিম বস্ত্রপ্রান্তে অশ্রু মুছিয়া কহিল,—"মুনিব।"

"দাও সুরা।"

পশ্চাত হইতে অশ্বারোহী ডাকিলেন, "মহারাজ।"

"আবার কেন ও নাম ? ভুলে যাও, ভুলতে দাও, তুমিও অবাধ্য আমার ?"

করিম ফিরিয়া দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিল ? কে এই তেজোদৃপ্তা রমণী !

রমণী আবার দৃঢ়কণ্ঠে ডাকিলেন, "মহারাজ !"

ভনাঙ্গসী এইবার বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "একি !!! কেতন কুমারী !! তুমি এখানে এই অভাগার কুটীর দ্বারে কেন মহারাণী ? আদেশ কর। এও ছেড়ে যেতে হবে ? বল মহারাণী, যাই চলে দূরে, আরও দূরে, দিগন্তের পরপারে ; চল মহারাণী !"—কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। কেতনকুমারী ছুটিয়া আসিয়া মহারাজের পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিলেন, "স্বামী, প্রভু, আরাধ্য দেবতা আমার" তাঁহারও অশ্রুর উৎস খুলিয়া গেল,—উভয়েই নির্ব্বাক, মূক মুহ্যমান হইয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে মস্তক তুলিয়া কেতনকুমারী ডাকিলেন,—"মহারাজ !"

"কেতন !"

"চলুন প্রভু।"

"চল, হাঁ যাই", বলিয়াই ভনাঙ্গসী উঠিয়া আবার বসিয়া কহিলেন,—"কোথায় যাব তোমার সঙ্গে কেতন ?"

"কেতনগড়ে,"

"কোটার দুর্গ গেছে ?"

"গেছে মহারাজ, কোটার দুর্গে পাঠান তাঁর মস্জিদ্ নির্ম্মাণ ক'চ্ছে, চলুন মহারাজ কেতনগড়ে। সমস্ত কেতন-গড় আপনার প্রত্যাবর্ত্তনে উজ্জীবিত হ'বে। আমরা সেই পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেব।"

"হাঃ হাঃ হাঃ। কেতন, যাও ফিরে যাও। ভনাঙ্গ আজও শোধরায়নি যে তোমাদের মহারাজপদের উপযুক্ত হতে পারবে !"

"আমায় ক্ষমা করুন স্বামি ; আমরাই ভুল বুঝেছিলেম। আমায় ক্ষমা করুন, সর্দ্দারসভাকে ক্ষমা করুন প্রভু।" বলিয়া কেতন কুমারী ভনাঙ্গসীর হস্ত ধরিয়া বিনীত করুণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ভনাঙ্গসীর প্রাণে কিসের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল। গদগদ স্বরে কহিলেন,— "কেতনকুমারী ! কেন তুমি এয়েছ আবার আমার স্মৃতির তারে এ নিখিল ব্যথার ঝঙ্কার ফুটিয়ে তুলতে, কেন আজ আবার—না ? যাও ফিরে

যাও! মারাঠানন্দিনী, সিংহাসন রাজ্য সম্পদ, প্রাণের দুলাল দুনঙ্গ, আমার সর্ব্বস্ব তোমাদের দিয়ে আমি এই নির্জ্জন অরণ্যপ্রান্তে এই পার্ব্বত্য উপত্যকায় এই নির্জ্জন কুটীর বেছে নিয়েছি। কোলাহল ভাল লাগে নাই, তাই আপনাকে অটুট অচল নিস্তব্ধতায় ডুবিয়ে রেখেছি। তোমরা যা ছিলে তোমরা তা আছ; তোমরা যা চেয়েছিলে, তোমরা তা পেয়েছ, আবার কেন? চাঁদ, দাও সুরা। মহারাণী কেতনকুমারী, সমস্ত কোটার প্রাসাদে কি একটুও জায়গা হ'ত না আমার? একার একটা প্রাসাদ চাই, একার একটা সাম্রাজ্য চাই, নইলে কি মাতালের চলে না? যাও, আসিও না। ইচ্ছা হয়, এই মাতালের এই পর্ণ-কুটীরে আজ রাত্রিটার মত থেকে কাল প্রভাতে আবার ঘোড়াটা ছুটিয়ো। ঘোড়াটারও খুব মেহনৎ হয়েছে নিশ্চয়ই। "চাঁদ!"

"মুনিব!"

"*কই দিলে না সুরা? দাও, ব্যস্! থাকবে কেতন?*"

কেতনকুমারী একটা অতি বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিলেন। ভনাঙ্গসী আবার কহিলেন,—"ভাবছ না কেতন, যে এ একটা কত বড় অপদার্থ। আমি কিন্তু ভাবছি কেতন তুমি কেন পুরুষ হয়ে জন্মিয়েছিলে না? দিকপাল হতে পারতে।"

কেতনকুমারী করিমের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার নাম, চাঁদ?"

"আজ্ঞে!"

"এস আমার সঙ্গে। মহারাজ!"

"বল শুধু মাতাল।"

"বিদায় দিন"

"হ্যাঁ তবে চল্লেই। আজই এই রাত্রিতে?"

"হুঁ আচ্ছা যাও।"

কেতনকুমারী অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ভনাঙ্গসীর পায়ে প্রণতা হইয়া কহিলেন, "চল করিম পথটা আমায় একটু দেখিয়ে দেবে এসো!"

করিম একবার প্রভুর দিকে চাহিয়া পরে কহিল,—"চলুন মা।"

উভয়েই তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। সুরাপাত্র হস্তে ভনাঙ্গসী শূন্যনয়নে কেতনকুমারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেতন একবার ফিরিয়া চাহিয়া আবার কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া গিয়া সহসা ছুটিয়া আসিয়া ভনাঙ্গসীর পায়ের উপর পড়িয়া সরোদনে কহিলেন; "স্বামী! ইষ্ট দেবতা আমার। একবার মুখতুলে চাও প্রিয়তম! আমার দিকে না তাকাও, দুধের বাছা দুনঙ্গের কথা মনে কর। আমাদের আর কে আছে নাথ! আমি যা করেছি তোমাদেরই জন্য করেছি একদিন বুঝবে। রাজ্য সিংহাসনে আমার কি প্রয়োজন? আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম মোক্ষ সবই যে তুমি, একমাত্র তুমি। ক্ষুণ্ণ অসন্তুষ্ট সর্দ্দারদের হাতে রাখতে, আমাদেরই দুনঙ্গের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক রাখতে, আমিই এই পথ নিয়েছিলেম,—আমায় ক্ষমা কর নাথ।"

ভনাঙ্গসী তাড়াতাড়ি পাত্র নিঃশেষ করিয়া কহিলেন, "আবার কেতন! কেতন—না, চাঁদ, না কেউ নয়। না—সব ছল, সব মিথ্যা, সব স্বার্থপর। স্বয়ং স্রষ্টা স্বার্থপর। কেন নইলে এই ভেদাভেদ। এত বৈষম্য! এত পার্থক্য!! যাও আসিও না—না—না ওকথাই নয়, আবার ওঃ—" বলিয়াই ভনাঙ্গসী বক্ষ চাপিয়া টলিতে টলিতে উদ্যানের অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন।

কেতনকুমারী অনেকক্ষণ সেই প্রস্তরবেদীর উপর মস্তক রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। দুই চক্ষে শ্রাবণের ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর বেদি নিম্নের ধূলিকণা মাথায় তুলিয়া কহিলেন—"চল চাঁদ!"

ছল ছল চক্ষে করিম কহিল, "আজ রাত্রেই যাবেন মা? এই অন্ধকারে—"

কম্পিতকণ্ঠে কেতনকুমারী কহিলেন, "যে দিনগুলি প্রতিদিন প্রতিপলে আমায় মৃত্যুর দেশে টেনে নিচ্ছে, সে দিনগুলোতে আমার কতটুকু আলো আছে চাঁদ?"

"তবে একটু দাঁড়ান মা, আমার অশ্ব এনে আমি না হয় কেতনগড় পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"কোন প্রয়োজন নেই চাঁদ, আমি আসতে পেরেছি, যেতে কি আর পারব না? আর মহারাজ একা, আছই যখন তুমি, ছেড়ে কোথায় যেও না। কি জানি! বাহিরের কোন ভয় নাই—সুদক্ষ প্রহরী সর্ব্বক্ষণই তোমাদের উপর দৃষ্টি রেখে ফিরছে। তাদের মুখেই আমি নিত্য তোমাদের সংবাদ নিই।"

"লোক রয়েছে,—আমরা একদিনও জান্‌লেম না।"

"সাবধান! মহারাজকে একথা বোলোনা! এস, তোমায় আমি আরও কয়েকটা কথা বলে যাব। আশা করি, আমার কথা মত কাজ করবে তুমি।—"

"বলুন মা।" ক্ষণিক নীরব থাকিয়া করিম আবার কহিল, "একটা কথা বলব মা?"

"বল।"

"মহারাজকে এই নির্ব্বাসনে রাখ্‌বার——"

"কি উদ্দেশ্য? করিম, মানুষ তার মনের ছবিখানি যখনই দেখ্‌তে পায়, তখনি অসীম নিবিড় নির্জ্জনতা তার সম্মুখে,—চতুর্দ্দিকে জমাট বেঁধে থাকে! প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি প্রকৃতির বুকে প্রতিবিম্বিত হয়, সে আত্মপ্রকটিত মূর্ত্তি নিজেই সে তখন সুন্দর সুশোভিত পবিত্র করতে ব্যাকুল হয়ে উঠে। আমায় লুকোতে পার, প্রকৃতিকে পারবে না ত চাঁদ! বিবেক যে তাঁর সতর্ক প্রহরী। বিশ্বের কোলাহলে বিবেকের ডাক তলিয়ে যায়; নির্জ্জন নীরবতার আবার তারই স্বর তারস্বরে বাজ্‌তে থাকে! প্রবৃত্তি তখন বিবেকের পায়ে লুটিয়ে পড়ে।" উভয়েই পার্ব্বত্য উপত্যকা পথ ধরিয়া নামিয়া চলিলেন। ভনাঙ্গসী দূর অতি দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া সহসা স্বীয় কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আবার ভনাঙ্গ, খবরদার! যাচ্ছে, যাক্‌—তোমার কি?"

৪

সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিয়াই প্রহরী দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল। অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়ৎ কোথায়?"

"প্রাসাদেই আছেন।"

"পররাষ্ট্র হতে এসেছে কেউ?"

"আজ্ঞে না। একজন পাঠান শুধু এসেছে।"

"পাঠান! হুঁ" বলিয়াই একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদের সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কেতন কুমারী কহিলেন, "এত শক্তিহীন, এত কাপুরুষ আজ রাজস্থান! সাহায্য ভিক্ষা করলেম, কেউ সাহায্য করলে না। এ শুধু এই উমুলের প্রভাব,—নেশায় মানুষ এত নির্জ্জীব হয়ে পড়ে। এই অহিফেন এত অকর্ম্মণ্য অলসের দীক্ষা গুরু।

জয়ৎসী তাঁহারই অপেক্ষায় কাণ পাতিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কহিল, "এই যে এসেছেন মা। পাঠান কেশর খাঁর এক দূত তোমারই প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় বসে আছে;"

"কেশর খাঁর দূত? এত রাত্রে?"

"অনেকক্ষণ এসেছে মা।"

"কই সে?"

"বিশ্রাম কক্ষে, এই পত্র নিয়ে এসেছে সে!"

"দেখি।"

জয়ৎসীর হাত হইতে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে করিতে কেতনকুমারীর গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিলেন, "কি, কেতনকুমারী যাবে——"

কৌতূহল প্রশমিত করিতে না পারিয়া জয়ৎসী কহিল, "কি লিখেছে পাঠান?"

কেতনকুমারী কোনই প্রত্যুত্তর না করিয়া দূর অতিদূর আকাশের পানে শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। কি কি যেন ভীষণ সংকল্প তাহার মনের মধ্যে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল; কতক্ষণ পরে কেতনকুমারী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "শঠে শাঠ্যং!" পরে জয়ৎসীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "জয়ৎ, ডাক সে দূতকে। না — চল আমিই যাচ্ছি।" বিস্মিত কেতনের দিকে চাহিয়া জয়ৎসী কহিল, "তুমি সেই পাঠানের সাক্ষাতে যাবে মা?"

কেতনকুমারী একটু হাসিয়া কহিলেন, "জয়ৎ, নারীত্বের গণ্ডী আমি অনেক পেছনে ফেলে চলে এসেছি। তাই আজ আমি কেতনগড়ে, আর আমার প্রাণ মন সর্ব্বস্ব বুন্দির শৈলশৃঙ্গে পড়ে আছে। কোটার সিংহাসনে আমার ভুনঙ্গকে আমিই অভিষিক্ত করবো। ভুনঙ্গের যে আর কেউ নেই জয়ৎ।"

পাঠান দূত কক্ষগাত্রে বিলম্বিত একখানি অতি-মনোরম আহেরিয়া চিত্রের দিকে চাহিয়াছিলেন। কেতনকুমারী গম্ভীর রাজোচিৎ কণ্ঠে কহিলেন, "তুমিই এসেছ পাঠান সর্দ্দারের পত্র নিয়ে?"

পাঠান দূত সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া কহিল, "মহারাণী যথার্থ অনুমান করেছেন। আমিই এসেছি।"

"পত্রে যাই তিনি লিখে থাকুন, তাঁকে বলো বিবাহ হতে পারে না।"

জয়ৎসী ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল। কেতনকুমারী তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আরও বলো তবে তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি। তিনি যখন শত্রুতা ভুলে মিত্রভাবে আমার সাক্ষাৎ কামনা করেছেন, আমি তাতে অসম্মত হইব না। সর্দ্দারকে আমার সেলাম জানিয়ে বলো দূত, আগামী ফাগোৎসবে আমরা তাঁর সঙ্গে হোলী খেল্‌তে যাবো। সে দিন আমাদের জাতের সবাই শত্রুতা ভুলে যায়, মিত্রভাবে আলিঙ্গন দেয়, কেতনগড়ের সমস্ত যুবতী রমণী আমার সহচরীদের নিয়ে আমরা সে দিন সর্দ্দারের সঙ্গে হোলী খেলে আমাদের সেলাম জানিয়ে আস্‌ব। কিন্তু একটা কথা—যদি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন?"

"প্রতিভূ কেশর খাঁর প্রাণ থাকবে মহারাণী, মুসলমান ইস্‌লামের নামে মিথ্যা বলে না।"

"তোমার কথায় ত হবে না দূত, আমাদের মান ইজ্জৎ—"

"ইস্‌লামের নামে শপথ করে বল্‌ছি মহারাণী, খোদার কসম্ কেউ তোমাদের কেশ স্পর্শও কর্‌বে না।"

"তোমার সর্দ্দার তোমার এ শপথ-পালন কর্‌বেন ত?"

"মহারাণী, দুনিয়ার ইস্তারৎ, আমিই পাঠানসর্দ্দার কেশরখাঁ, আমি শপথ করে বল্‌ছি খোদার কসম্।"

মহাবিস্ময় লুকাইয়া রাখিয়া কেতনকুমারী কহিলেন, "আপনিই প্রবল পরাক্রান্ত পাঠান সর্দ্দার কেশরখাঁ?

"আমিই মহারাণী! বান্দার সেলাম গ্রহণ করুন বিবি।"

"সেলাম। উত্তম, তবে এই কথা রইল। সেইদিন প্রস্তুত থাক্‌বেন। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন আপনার কথার—"

"কোন চিন্তা নেই মহারাণী, কেশর খাঁর জান্ জামিন রইল। মুসলমান নয়। সেলাম বিবি! আজ তবে বিদায় হই।—সেলাম!"

প্রসন্ন মনে কেশরখাঁ চলিয়া গেলেন। জয়ৎসী কহিল, "এমন সুযোগ পেয়ে—"

কেতনকুমারী সে কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "কেশর খাঁই শুধু একজন পাঠান নয় যে কোটার দুর্গ জয় করেছে।"

"কিন্তু মা, এ তুমি যা বল্লে, বল, যা এ শুধু ব্যঙ্গ-পরিহাস?"

"এ প্রতিশোধ জয়ৎ, এইই তার প্রারম্ভ। অনেক রাত্রি হয়েছে। বিশ্রাম করগে যাও।" বলিয়াই কেতন কুমারী কক্ষান্তরে প্রস্থান করিয়া ধাত্রীর ক্রোড় হইতে চুনজকে গ্রহণ করিয়া নিদ্রিত পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন, "তোর মুখখানি দেখলেই আমার দেহে শক্তি পাই। তুইই আমার রণভেরী, আমার পথের আলো। নইলে বাপ,—কেতন কুমারী কি ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভোরের আকাশে একটী একটী করিয়া তারকার দল আঁধার তলে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। কেতনকুমারী ঘুমন্ত শিশুকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তখনও তেমনিই জড় প্রতিমার মত বসিয়া রহিলেন।

৫

কোটায় ফিরিয়া কেশর খাঁ মহাসমারোহে হোলী উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রাসাদ সংলগ্ন রম্য উপবনে হোলী খেলা হইবে। কেশর অজস্র অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন।

ধাকুর খাঁ কহিলেন,—"এ বিরাট আয়োজন কিসের কেশর?" উল্লাস আনন্দে অধীর কেশর কহিলেন, "হোলী খেলা হবে দাদা!"

"হোলী খেলা! কার?" "কেতনকুমারীর আর তার যত সহচরীর। রমজানের চাঁদের মত তারা সেদিন আলোর ধারায় ছড়িয়ে পড়বে, আমার জানে আসমানে জমিনে।"

"অকপট চিত্তে রাজপুতের শঠতায় ভুলে এসেছ কেশর?"

"শঠতা!! কি বল দাদা! দেখনি ত তাকে,—সে কি শঠ হতে পারে? পারে না। দেখনি যে। আমি দেখেছিলুম কোটায় তোড়ন মঞ্চে, আবার দেখে এসেছি কেতনের প্রাসাদকক্ষে। সুরতের প্রাণময়ী কবিতা! হাফেজ তা আক্‌তে পারেনি। দুনিয়া আর তা দেখাতে পারেনি।"

"বড় ভুল বুঝে এসেছ কেশর।"

"তর্ক থাক্ দাদা, শোন তোমায় বলি। যদি তাকে পাই, সিংহাসন রাজ্য সম্পদ তুমি নিয়ো, আমায় ফুরসুত হ'বে না। ছুটোই দেখবার মত ফুরসুত হবে না। কাকে দেখ্‌ব? কর্ম্ম বহুল এই সাম্রাজ্য, না জানে আসমানে সেই সুরৎময়ী সিরাজি?"

"কেশর, ভাল করে ভেবে দ্যাখ—"

"কেন বকৃছ দাদা? খুসী হয় সেই চাঁদের হাটে সওদা কর্ত্তে প্রস্তুত হওগে যাও।—সুরতের বেচা কেনা সুরৎ থাকা চাই, কিস্মৎ জানা চাই, কিস্মৎ থাকা চাই।"

"যদি আমার কথা একান্তই না শোন কেশর, তবে এক কাজ কর, সুসজ্জিত সৈন্যদের আদেশ দিয়ে রাখ—"

"সৈন্য সুসজ্জিত কেন?"

"সাবধানের মার নেই কেশর—"

ক্ষতি নেই, পিয়ারীর পরোয়ানা, অত্যাচার না হয়। মূর্খ বর্ব্বর সৈনিকের দল! নির্ম্মম অত্যাচারী তারা। ক্ষতি নেই—ক্ষতি নেই! তারা সব আসবে ক'জন রমণী আর আমরা বুঝি সেজে থাকৃব কটা জানোয়ার? তারা আসবে চাঁদের ঠাণ্ডা জোছনার অফুরন্ত তরঙ্গ তুলে আমরা বুঝি থাকৃতে পাষাণ স্তূপের কঠোরতা নিয়ে? ভেসে যাওয়া চাই! সরসীর মৃদু কম্পিত জলে মৃণালের মত নেচে ওঠা চাই। এই ত মালেকানা, শোন দাদা আমার আদেশ। —সেই ফাগোৎসবের দিন কোন পাঠান অস্ত্র ধারণ কর্ত্তে পারবে না, যোদ্ধৃবেশ পর্য্যন্ত পরতে পারবে না। ক্ষুদ্র পিপীলিকাটিও সে দিন যে বধ করবে, আমার হুকুম, তারই প্রাণদণ্ড হবে। দোসরা নেই। যাও—প্রচার করে দাও।"

"কেশর, সাম্রাজ্য লুটে নেওয়া যত সহজ, সংরক্ষণ তত সহজ নয়। এটা ছেলে খেলা নয়।"

"সেদিনের সেই হোলী, সেও ত একটা ছেলে খেলা নয়। রাজপুতানী আর পাঠানের প্রেম কৌতুক এ যে খোদার রাজ্যের দরার দূত। একটা সুখের স্বপ্ন। এতে এ দুর্গ যায়—কেশর নূতন দুর্গ দখল করবে।"

"কেশর—"

"যাও দাদা"

"বুঝেছি পাপের ধন এমনি যায়।"

"যায়—যাক্। রাজ্য বটে—পাঠানের, কিন্তু এ রাজ্যের প্রাণ কেতনের। নেয় সে নেবে। সুখের জন্য দুনিয়া। দুনিয়ার সে সেরা জহরৎ।"

৬

"কেন আর ভাল লাগে না চাঁদ! উমুল আর ভাল লাগে না কেন?"—কিন্তু তুমি কি বল্‌লে যেন। বলত আবার।"

করিম বলিতে লাগিল, "মা যদি সর্দ্দারদের ছেড়ে আপনার সঙ্গে চলে আসতেন, কোটা আরাজক থাকৃত না, নিশ্চয়ই উপযুক্ত কোন সর্দ্দার কোটার সিংহাসন দখল করে বসতেন। কুমার বাহাদুর বড় হলে রাজ্য পাওয়ার কোনই আশা থাকত না।"

"হুঁ।"

"তিনি জানেন মালিক, এই নেশার আবল্য আপনার বেশী দিন থাকবে না। তাই তিনি আপনার অনুপস্থিতিতে কোটার সর্দ্দারদের হাতে রেখেছেন।"

"তাতে কি হবে?"

"মহারাজ ফিরে গেলে আবার সমস্ত কোটা জনাবের পায়ে শির নত করবে। যাকে তারা দেবীর মত ভক্তি করে, মায়ের মত ভালবাসে। কোটার রাজ্য আজ তিনিই চালাচ্ছেন।"

"চাঁদ, তুমি ত পাগল। কিন্তু, নাঃ, ছনক্ক রাজা হয়—হোক। আমি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। সে আমার—না চাঁদ, তুমি বড় গোল বাঁধিয়ে দিচ্ছ। বড় অবাধ্য তুমি। কেতন এসে যাওয়ার পর থেকেই তুমি যেন মহা পণ্ডিত হয়ে গেছ। যাও! যাক্, ওসব কথা তুলোনা কখনও আর। সুরা আন—না তাও ভাল লাগে না। আমার বীণা আন চাঁদ, আমি গান গাইব। জান চাঁদ, আমি গাইতেম, কতদিন কেতন আমার পার্শ্বে অভিভূতার মত বসে থাকত. কাণ পেতে শুনত—নাঃ—একি জ্বালা—জ্বালাতন করলে! যাও নিয়ে এস, জলদি।"

* * * * *

৭

কেতন গড়ের দুর্গশীর্ষে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে রমণী মূর্ত্তি কহিলেন, "কিসের ভয়?"

"বিশ্বাসঘাতক পাঠান"—

"তিনশত বীর রাজপুত থাকবে, তারা পারবে না এক-দল পাঠানকে পরাজিত কর্ত্তে?"

"রাজপুতানী বলুন।"

"আমি বলি রাজপুত। তোমরাই কেতনকুমারীর সঙ্গে যাবে তিনশত রাজপুত বীর যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ কৌশলী; রমণীর বেশে। এখন বুঝতে পারছ জয়ৎ, এ হোলীর কি উদ্দেশ্য?"

"যোদ্ধা রাজপুত—রমণীর বেশে!"

"ক্ষতি কি? শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।—আর তোমরাও ভীষণ দর্শন গোঁফ দাড়ীগুলো কামিয়ে পূর্ব্ব পলায়ন জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করবে।"

"অদ্ভুত, অপূর্ব্বকৃত ছল! বুঝতে না পেরে এতক্ষণ ঘৃণা করেছি তোমায়, ক্ষমা কর মা।"

"ক্ষমার দেনা পাওনা এখন নয়। যাও আমার আদেশ ঘোষণা কর। কেতনগড়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণ নিপুণ তিনশত সাহসী বীর যোদ্ধা, যারা ক্রীড়া সামগ্রীর মত প্রাণ নিয়ে খেলতে পারবে, তাদের একত্র হতে বল। আমি স্বহস্তে তাদের যোদ্ধৃবেশের উপর রমণীর ঘাঘ্‌রা পরিয়ে দেবো। পরশু ফাগোৎসব। কালই নিশা শেষে আমাদের রওয়ানা হ'তে হবে। আরও একটা কাজ তোমায় কর্ত্তে হবে। শুনবে এস।"

* * * *

৮

"পারব চাঁদ, অনভ্যাসে ভুলে গিয়েছি; দাও তুমি।" বলিয়াই ভনাঙ্গসী অশ্বারোহণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "এই স্বাখ, এইবার? অভ্যাস নেই, ঘোড়াটাও খুব কাহিল হয়ে গেছে।"

"হবে না জনাব? যার যে কাজ। অলস থাকলেই অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে।"

"তা হবে, তবে চাঁদ আমার অস্ত্রগুলো—সব মর্‌চে ধরে অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছে, নয়?" "যেতো, আমি প্রতিদিন শান্ দিয়ে পরিষ্কার করে রাখি তাই।"

"কেনহে, তোমার আবার ও বদ্‌খেয়াল হয় কেন?"

"দেখবেন? আনব?"

"কি হবে এনে? আচ্ছা আন, দেখি কেমন তুমি পরিষ্কার কর্ত্তে জান! আগে একটু চেলে দিয়ে যাও।"

করিম চলিয়া গেল। ভনাঙ্গসী পূর্ণ পাত্র হস্তে বলিতে লাগিলেন, "ভাল লাগে না আর, আমার মানুষের প্রাণটা কেবলি সমাজ সমাজ বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছে। বড় একা আমি—বড় নির্জ্জন এই স্থান। এই যে এনেছ দেখ্‌ছি। বাঃ বেশ পারত্!!"

করিম ভনাঙ্গসীর অব্যবহৃত অস্ত্রগুলি তাহার সম্মুখে রাখিয়া কহিল, "পারি কি?"

"সুন্দর! এই তরবারী কতদিন,—না না নিয়ে যাও, লাগবে হাতে। পুরাণ কিছু চোখের সামনে আনতে এত বারণ করি তোমায়! বড় অবাধ্য তুমি!"

করিম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল,—"চলুন না জনাব, ওই বনে শীকার কর্ত্তে যাবেন!"

"শীকার! মৃগয়া! আজ যে ফাগোৎসব, আজ বুঝি আমি প্রাণীহত্যা করব? পাগল! আর আমি পারব না চাঁদ।"

"ফাগোৎসবের উপযুক্ত মস্ত বড় একটা মৃগয়ার দিন এসেছে মহারাজ, বলিতে বলিতে জয়ৎসী ভনাঙ্গসীর পায়ের উপর আসিয়া পড়িল। ভনাঙ্গসী চমকিয়া পিছাইয়া গেলেন জয়ৎসী কহিল, "রক্ষা করুন মহারাজ, বড় বিপদ।"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ভনাঙ্গসী কহিলেন, "কি বিপদ? আমি কি করবো তার?"

জয়ৎসী ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "দুর্ব্বৃত্ত পাঠান বিশ্বাসঘাতকতা করে মহারাণী মাকে হরণ করে নিয়েছে। শীঘ্র চলুন মহারাজ, মহারাণীকে রক্ষা করুন।"

"কি বলছ তুমি! চাঁদ, দাও দুম্মা, জলদি! আরও! সৈনিক কেতনগড়ে এমন কেউ ছিল না, কারও কটিতে ছুরিকাও ছিল না?"

"বিশ্বাসঘাতকতা মহারাজ, কেউ বুঝতে পারিনি।"

রাণীমা আর্ত্ত চিৎকারে বলতে বলতে গেছেন, "আমার মহারাজকে খবর দিও! কেউ আমার মহারাজ স্বামী বীরোত্তম স্বর্গগত জয়ৎসীর বংশধর, সিংহবিক্রম

ভনাঙ্গসীকে জানিও, পাঠান তাঁর কুলস্ত্রী, তাঁর প্রিয়তমা পত্নী পতি-অন্তপ্রাণা কেতনকুমারীকে বলপূর্ব্বক ধরে নিয়ে গেছে। সতী উদ্ধার যদি না হয়, সতী প্রাণত্যাগ করবে নিশ্চয়, কিন্তু তাতে মহারাজের নামে বিষময় অকীর্ত্তি রটিত হ'বে। ভনাঙ্গসী কাপুরুষ স্ত্রীরক্ষণে অনুপযুক্ত ভীরু দুর্ব্বলাধম বলে রাজবারার শিশুটী পর্য্যন্ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিবে। সতীর মর্ম্মান্তিক ক্লেশে, সতীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে মহারাজের পিতৃ পিতামহগণ, মহারাজের বুকের রক্ত আদরের দুলাল দুলঙ্গ সবাই নিরয়গামী হ'বে।"

"সৈনিক! ভনাঙ্গসী মরেনি এখনও; চাঁদ, দাও —অশ্ব, আমার অশ্ব, অস্ত্র তীর ভল্ল, তরবারী, সাজাতে জানো চাঁদ? কেতন আমায় সাজিয়ে দিত দাও, সুরা আর একটু! চল সৈনিক।"

একটা যেন দৈবপ্রেরণায় উত্তেজিত জাগ্রত সিংহ ভনাঙ্গসী বিদ্যুৎ বেগে অশ্বারোহণ করিয়া তীব্রকশাঘাতে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। জয়বংশী কহিল, "তোমারই সাধনার এ ফল চাঁদ।"

করিম চাঁদ কহিল, "দাঁড়াও আমিও যাব।"

যাইতে যাইতে জয়বংশী কহিয়া গেল—"দাঁড়াও আগে হোলী খেলা হোক, তোমায় এসে নিয়ে যাবো বন্ধু,—তোমার উপকার বিস্মৃত হ'ব না আমরা।"

৯

সম্মান সূচক বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সানুচরা কেতনকুমারী উৎসব স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেশর খাঁ মহাসমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন। বহু অর্থ ব্যয়ে কেশর উদ্যান খানিকে অতি মনোহর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। কেতনকুমারী কেশর খাঁর সহিত সারা উদ্যান ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। হোলী খেলা আরম্ভ হইল। রাজপুতগণ কুঙ্কুম ছুড়িয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিল। পাঠানরা সকলেই সুরাপান করিতেছিল, তাহারাও যথাশক্তি রাজপুতাদির অনুসরণ করিতে লাগিল। সহসা কেতনকুমারী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ভেরী বাহির করিয়া ফুৎকার করিলেন;—"মাইজীকি জয়"রবে তিনশত রাজপুতবীর ঘাঘরার ভিতর হইতে অসি বাহির করিয়া লইল। কেতনকুমারী হুঙ্কার করিলেন, "প্রতিশোধ নাও রাজপুত! মায়ের ভক্ত সন্তানবৃন্দ, মায়ের মান রক্ষা কর!"

বিস্মিত বজ্রাহত কেশর খাঁ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে একবার চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, উদ্যানময় পাঠানশোনিতের স্রোত বহিতেছে। কেশর খাঁ ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "বিশ্বাসঘাতক রাজপুত এই-ই তোমাদের হুলিখেলা! এই-ই ধর্ম্ম!"

ব্যঙ্গস্বরে কেতনকুমারী কহিলেন, "একটা ঘুমন্ত জাতির শান্তি হরণ কর, তাহাদের আহার্য্যটুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নেওয়া, তোমার কোন ধর্ম্ম পাঠান? মনে পড়ে কোটা অবরোধের দিন? আজ তার প্রতিশোধ।"

"উপরে তোমার এত সুরৎ ভিতরে তোমার এত কুৎসিত? বুঝতে পারিনি, বাহিরের এই সৌন্দর্য্য শুধু অগ্নগিরির জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস।" বলিয়াই কেশর প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন, কেতনকুমারী পথরোধ করিয়া কহিলেন, "কোথায় যাবে? মেষের মত তোমাদের বধ করবো—"

ঠিক সেই সময়ে দুইজন অশ্বারোহী প্রাঙ্গন কম্পিত করিয়া সেইস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম অশ্বারোহী কহিলেন, "একি কেতন, কেশর অস্ত্রহীন, অস্ত্র নিতে দাও! এই নাও কেশর খাঁ!" প্রসারিত হস্তে অশ্বারোহী কেশর খাঁর দিকে তরবারী অগ্রসর করিয়া ধরিলেন। কেশর খাঁ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "কে তুমি দোস্ত্?"

অশ্বারোহী সহাস্যে করিলেন, "আমিই তোমার পরম শত্রু। এসো পাঠান, দাও রণ। পণ, কোটার সিংহাসন! রাজপুত বীরবৃন্দ! আমি এসেছি, আমি শোধরেছি, আমায় —আমায় ক্ষমা কর। আমি আবার তোমাদের।" সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে তিনশত রাজপুত বলিয়া উঠিল, "আমরা তোমারই. মহারাজ! জয় মহারাজ! ভনাঙ্গসীর জয়! জয় মহারাণী মাইজীকি জয়!" কেতনকুমারী বিস্ফারিত নেত্রে এতক্ষণ ভনাঙ্গসীর দিকে চাহিয়াছিলেন, এইবারে কহিলেন, "প্রতিশোধ নাও তবে পুত্রগণ। মহারাজ ফিরে এসেছেন, রাজভক্ত রাজপুত! ভক্তি উপহার দিতে কোটার সিংহাসন চাই।"

আকাশ কাঁপাইয়া আবার নিনাদিত হইল "জয় রাণী-মাইজীকি জয়!" ক্রুদ্ধ কেশর খাঁ প্রবল আক্রমণ করিলেন। কয়েকজন মাত্র সৈন্য সজ্জিত করিয়া লইয়া ধাকুর খাঁও আসিয়া যোগদান করিলেন। এইবার প্রকৃত সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু বিজয়দৃপ্ত, কৃতসংকল্প সেই রাজপুত সেনানীর সঙ্গে কতক্ষণ পারিবে তাহারা? অনতিবিলম্বেই পাঠানগণ সকলেই কেহ হত কেহ আহত হইয়া পতিত হইল। কেহ কেহ প্রাণভয়ে পলায়নও করিল। কেতনকুমারী স্বয়ং কেশর খাঁকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কেশর কহিলেন—"তুমি সরে যাও কেতন! বড় ভালবেসেছি পিয়ারী, আমার হাত কেঁপে উঠচে!"

"লড়াই রাখ, পার দাও রণ, না পার—পালাও।"

সহসা কেশরখাঁর হস্ত হইতে তরবারী পড়িয়া গেল। কেতনকুমারী দৃঢ় মুষ্টিতে কেশরের হস্ত ধরিয়া কহিলেন—এইবার পাঠান সর্দ্দার, যদি তোমায় বধ করি? উদ্যানময় চেয়ে দেখ, একজন পাঠান নেই তোমার আর্ত্ত কণ্ঠে একটু জলও দেবে।"

কেশর নির্ভীক কণ্ঠে কহিলেন,—"কর বধ। সুধু বুঝ্‌তে পারিনি—ভাবতে পারিনি—তোমায় ভুলতে পারিনি তাই, নইলে—"

ভনাঙ্গসী আসিয়া কহিলেন—ছেড়ে দাও কেতন; কেন আর? কেশর খাঁ! তোমার আত্মীয়স্বজন পত্নী পুত্র কন্যা যে কয়জন এখনও জীবিত আছে তাদের সঙ্গে নাও, যত ইচ্ছা অর্থ নাও, যথা ইচ্ছা চলে যাও। কেউ তোমাদের পথ রোধ করবে না।"

"ভিক্ষা—দয়া!" বলিয়া কেশর ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন।

কেতনকুমারী কহিলেন, "কি আর করবে পাঠান সর্দ্দার? ইচ্ছা ক'র্‌লে তোমায় বধও ক'র্‌তে পারি—কিন্তু বধ করবো না তোমায়। যাও, তুমি মুক্ত। এস মহারাজ, আজ একবার সবাই মিলে তোমায় প্রণাম করি। এই রণজয়ে আজ যত না আনন্দ, তোমার প্রত্যাবর্ত্তনে আমাদের তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ, অনেক বেশী সুখ।" বলিয়া কেতনকুমারী ভূমিষ্ঠা হইয়া ভনাঙ্গসীকে প্রণাম করিলেন।

ভনাঙ্গসী কহিলেন, "চাঁদ আমার চোখ ফুটিয়েছে কেতন। আগে তোমায় বুঝ্‌তে পারিনি। চাঁদের ডাকে জেনেছি আমি। কেতন, আমি চললেম। চাঁদ আমার জন্য ব্যাকুল হয়ে বসে আছে।"

জয়ৎসী সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"আপনি থাকুন মহারাজ। আমি যাচ্ছি তাকে নিয়ে আসতে।"

"যাবে জয়ৎ? যাও তবে। তার ছেলেটীকেও নিয়ে এস! জান কেতন, কবিমের ছেলেটিকে দেখে আমি তুনঙ্গের কথা ভাব্‌তেম। রহিমকে বুকে করে তুনঙ্গকে ভুলে থাক্‌তেম।" বলিয়া ভনাঙ্গসী কেশরখাঁর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"কই কেশরখাঁ ভুলে যাও ভাই, যুদ্ধান্তে রাজপুত উমুল পান করে, তোমরা সুরার সেবক। তা ও নেশাটায়ও আমি অনভ্যস্থ নই। এসো ভাই, সিরাজি পান করে দেহের শ্রান্তি, মনের ক্লান্তি দূর করি। খুব বিস্মৃতি এনে দেয় এই নেশা গুলো। নেশার সুধু নিন্দেই ক'রোনা কেতন। নেশা ছিল বলেই আমি বেঁচে ছিলুম।

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেশর খাঁ প্রবাহিত রক্ত স্রোতের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সম্পূর্ণ স্বপ্নোত্থিতের মত সনিশ্বাসে কহিলেন,—"কেতনকুমারী, এইই তোমার ফাগোৎসব? এইই তোমাদের হোলী?"

কেতনকুমারী কহিলেন,—"রাজপুতানী আর পাঠানের হোলী এই রকমেই হয় কেশর খাঁ। তাঁদের ফাগোৎসবে কি সুধু কুঙ্কুমে মেটে? পাঠানের সাথে এ রাজপুতানীর—রক্তহোলী—"

ধীর পদবিক্ষেপে রক্তধারায় পদ সিক্ত করিয়া পাঠান সর্দ্দার কেশর খাঁ নতাননে দুর্গের বাহির হইয়া গেলেন।

অতুলানন্দ রায়।

বিনিময়

(১)

কাশী নরেশের কুমার দেখিবে
আজি বৈশালী বিশাল পুরী,
উল্লাসে সুখে সজ্জিত যেন
সজ্জিত-শোভা নগর জুরি।
পথে পথে শ্যাম নবীন তোরণ
আম্রের শাখা কণক ঘটে।
পুরনারিগণ করে বন্দনা
বলে এ মূর্ত্তি দেখার বটে।

(২)

সকল ভবনে বিপুল সজ্জা
একটি ভবনে আঁধার রাশি
সেথা কি পশেনি পুলক তুফান
জমেছে লজ্জা বিষাদ রাশি,
এই ভবনেরি গৌরব ওই
নব যুবরাজ পরের ছেলে,
ত্রিতল ভবন ধন আভরণ
বিনিময়ে পিতা অনেক পেলে

(৩)

স্বর্ণ না থাক পর্ণ কুটীরে
ছিল যে শান্তি ইন্দু মুখে,
বক্ষে মুকুতা, দুঃখ কি ছিল
ভীম দারিদ্র সিন্ধু বুকে।
আজিকে ফোটে না কুঞ্জে কুসুম
লতিকা হয়েছে শুষ্ক জানি
ফুল ফুরায়েছে কি হইবে লয়ে
বৃথা কণকের পুষ্পদানী।

(৪)

ওই যুবরাজ চমকি দাঁড়ায়
ওই যে চাহিল উর্দ্ধ পানে
ওই কে রমণী আশীষ করিল
নয়নের জলে দুর্ব্বাধানে,
গেল যুবরাজ নগর হেরিয়া
ধুলি উড়াইয়া অশ্বখুরে,
পড়িল জননী মূর্চ্ছিত হয়ে
উচ্চ ত্রিতল হর্ম্ম্য চুড়ে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ঈষ্টলীন্

নবম পরিচ্ছেদ

শব গ্রেফ্তার

শুক্রবার প্রত্যুষে লর্ড মণ্টসেভার্ণ দেহত্যাগ করিলেন,—সেইদিনের মধ্যে সর্ব্বত্র এমন কি লণ্ডনে পর্য্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হইল। শনিবার রাত্রিপ্রভাতেই অসংখ্য পাওনাদার আসিয়া ঈষ্টলীন পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। সামান্য পাঁচ পাউণ্ড দশ পাউণ্ড হইতে পাঁচ হাজার দশ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত অশেষ রকম দাবী লইয়া সকলে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের কোলাহল—কাহারও কড়া দাবী, কাহারও গালাগালি শোক সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে যার পর নাই সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল!

তখনও কফিন্ * আসে নাই,—মৃতদেহ শয্যায় পড়িয়া আছে। ইজাবেল্ নিঃশব্দে দরজাটি খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কেমন ভয় ভয় তার করিতেছিল,—নিঃশব্দে নত মুখে ধীরে ধীরে শয্যার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

* একরূপ কাঠের বাক্স। ইহার মধ্যে শ্বেতবস্ত্রাবৃত শবদেহ রাখিয়া সমাহিত করা হয়।

হঠাৎ চাহিয়া দেখিল, দুইটি কঠোরদর্শন অপরিচিত লোক মৃতদেহের দুইধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইজাবেল চমকিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, নিকটবর্ত্তী পল্লীর দুইটি বাজে লোক বুঝি মরা দেখিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে। একবার মনে হইল খানসামাকে সে ডাকে, কিন্তু কি ভাবিয়া ইহাদের দিকে চাহিয়া ধীরস্বরে জিজ্ঞাসিল, "তোমরা কি চাও ?"

একজন উত্তর করিল, "মিস্ সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল। তা আমরা যা চাই, সেটা অন্যায় কিছু নয়।"

এমন ভঙ্গীতে কথাটা তাহারা বলিল, আর এমনভাবেই চাপিয়া বসিয়া রহিল, যেন সত্যই তাহাদের বড় একটা দাবী সেখানে আছে।

ইজাবেল আবার জিজ্ঞাসিল, "কেন তোমরা এখানে আসিয়াছ ? কি করিতেছ এখানে ?"

বাঁহাতের বুড়া আঙ্গুলটি ঘুরাইয়া মৃত লর্ড সাহেবের দেহটি দেখাইয়া একটি লোক উত্তর করিল, "আপনিই ইঁহার কন্যা—তা আপনাকেই সব বলিতে পারি মিস্ সাহেবা। শুনিলাম আর কোনও আত্মীয় উপস্থিত নাই। আমরা বড় একটা কঠোর কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। সেই কর্ত্তব্যটা কি জানেন ? ইঁহাকে হেফাজতে রাখিতে হইবে।"

ইজাবেল কিছুই বুঝিতে পারিল না, বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

লোকটি আবার কহিল, "আমাদের মনিবের কাছে ইনি একরাশ টাকা ধারেন। তিনি আমাদের পাঠাইয়াছেন শবটা গ্রেফ্তার করিতে, আমরা কাজেই তাই করিয়াছি।"

কি সর্ব্বনাশ ! ইহাও কি সম্ভব ! শব গ্রেফ্তার করিতে আসিয়াছে। শব গ্রেফতার ! এমন কথাও ত সে কখনও শুনে নাই ! এখন কি হইবে ? কি সে করিবে ! বুকে যেন তার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল,—মুখ একেবারে পাংশু হইয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে ইজাবেল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

গৃহের ভারপ্রাপ্তা প্রধানা পরিচারিকা মিসনবিবিকে সিঁড়ির নিকটে দেখিয়া ইজাবেল ছুটিয়া গিয়া দুই বাহুতে তাকে জড়াইয়া ধরিল,—কাঁদিয়া কহিল, "ঘরে ঐ যে লোক দুটা !"

"লোক ! কে লোক লেডী সাহেবা ?"

"জানিনা, ঘরে আসিয়া ওরা বসিয়া আছে। বলে বাবাকে গ্রেফ্তার করিতে আসিয়াছে।"

যারপর নাই ভীত ও বিস্মিত হইয়া মেসনবিবি দেখিতে গেল ব্যাপার কি। ইজাবেল সিঁড়ির রেলিংএর উপরে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইল। নীচে বড় একটা গোলমাল তখন হইতেছিল,—বহু লোক কোলাহল করিয়া কঠোর কর্কশ স্বরে নানারকম অভিযোগ করিতেছে। ইজাবেল কাণ খাড়া করিয়া শুনিল। খানসামা কাহাকে বলিতেছে, "কেন লেডীসাহেবার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছ ? তাহাতে কি লাভ হইবে ? লর্ড সাহেবের দেনা পাওনার কথা তিনি কিছুই জানেন না। একেই তিনি দারুণ শোকে মরার মত হইয়া আছেন, তার উপরে আবার খাঁড়ার ঘা কেন দিবে ?"

অতি কঠোরভাবে কে উত্তর করিল, "তাঁর সঙ্গে দেখা আমার করিতেই হইবে। তিনি যদি এত বড়ই রাজকন্যা হইয়া থাকেন যে নীচে নামিয়া দুই একটা কথার জবাব দিতে পারিবেন না, আমাদের কাজেই তাঁর কাছে গিয়া উঠিতে হইবে। এতগুলি লোক আমরা এমন করিয়া ঠকিয়াছি, এখন কাউকে সে কথাটাও আমরা বলিতে পারিব না ? লেডীসাহেবা ছাড়া আর কেউ নাই ? তাঁকেও বলিতে পারিব না--ভারি ত' আহ্লাদ ! আমাদের টাকা ত তাঁর জন্যেও ঢের খরচ হইয়াছে ! যদি তিনি না আসেন আর আমাদের কিছু না বলেন, তবে বলিব ভদ্রমেয়ের মত মানও তাঁর নাই, মনও তাঁর নাই !"

ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে লেডী ইজাবেলের বুক ভরিয়া উঠিল, অতি কষ্টে কোনও মতে আত্মসম্বরণ করিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। খানসামাকে ডাকিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "এসব কি ? বল, আমাকে সব খুলিয়া বল !"

খানসামা কহিল, "লেডীসাহেবা দোহাই আপনার, ঐ সব ইতর লোকদের সামনে আপনি কখনও যাইবেন না ! কিছুই আপনি করিতে পারিবেন না। আমার

কথা শুনুন, আপনি উপরে চলিয়া যান। ওরা একবার দেখিতে পাইলে আর রক্ষা থাকিবে না। কার্‌লাইল সাহেবকে আমি খবর পাঠাইয়াছি, তিনি এখনই আসিবেন।"

"বাবা কি ওদের সবার কাছেই টাকা ধারিতেন?"

"হাঁ লেডী সাহেবা, তাই বোধ হয় হইবে।"

আর কোনও কথার অপেক্ষা না করিয়া দৃঢ়, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ইজাবেল ডিনার হলে গিয়া প্রবেশ করিল। সেই-খানেই অধিক লোক জমিয়াছিল, আর বড় বেশী গোলমাল হইতেছিল। সহসা ইজাবেলকে উপস্থিত দেখিয়া সকলেই চুপ করিল। পিতৃশোকাতুর সরলা এই বালিকা, স ত কিছুই জানে না, এ সব দাবী দাওয়ার কথাও কিছু বুঝিবে না, আপনা হইতেই এই সত্য অনুভব করিয়াই যেন সেই মুহূর্ত্তেই সকলে নীরব হইল,—অভিযোগের কোনও কথা কেহ মুখ খুলিয়া বলিতে পারিল না।

দুঃখে ও গ্লানিতে বুক ভরিয়া গিয়াছিল,—ধীরে ধীরে কম্পিতকণ্ঠে ইজাবেল কহিল, "কে বলিতেছিল তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত। আমি আসিয়াছি; বল, কি চাও তোমরা আমার কাছে?"

তখন তারা তাদের পাওনার কথা বলিতে আরম্ভ করিল। রাগিয়া আগুন হইয়া নয়, ধীর শান্তভাবে কার কি পাওনা তারা জানাইল। শুনিতে শুনিতে এমন হইল ইজাবেল আর শুনিতে পারে না। কত পুরাতন বড় দেনা, কত দোকানদারের বাকী পাওনা মাসিক খরচেরও কত খুচরা হিসাব,—কিছুরই টাকা দেওয়া হয় নাই—সব বাকী—সবাই কেবল পাইবে!

ইজাবেল কি উত্তর দিবে? কি কৈফিয়ৎ ইহার আছে? পরিশোধের কি ভরসা সে কাকে দিতে পারে? স্তব্ধভাবে একবার ইহার একবার উহার মুখের দিকে সে চাহিতে লাগিল, দৃষ্টিতে বড় দারুণ একটা ব্যথা আর গ্লানি প্রকাশ পাইতে লাগিল।

একটি লোক—কতকটা ভদ্রলোকের মত দেখিতে—শেষে বলিল, "আসল কথা কি জানেন লেডী সাহেবা, আমরা—অন্ততঃ নিজের কথা এই বলিতে পারি—আমি—আপনাকে ক্লেশ দিতে এখানে আসিতাম না। অনেকেই আমরা কাল বৈকালে লর্ড সাহেবের উকিলের বাড়ী গিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁরা বলিলেন, এক পয়সাও কাহকেও দিতে পারেন না,—তবে বাড়ীর আসবাব পত্র বেচিয়া যদি কিছু পাওয়া যায়। এ অবস্থায় যারা আগে আসে তাদের ভাগ্যেই কিছু মিলে। কাজেই ভোরে আসিয়াই আমি একটা ক্রোক দিয়াছি।"

আর একটি লোক বলিয়া উঠিল,—"আপনার আগে আমরা ক্রোক দিয়াছি। কিন্তু দেনা যা, তার কাছে এ সব আস্‌বাবপত্র কি? টেম্‌স্ নদীর কাছে এক বাল্‌তি জলের সমানও হয় না।"

ইজাবেল কহিল, "কিন্তু আমি কি করিতে পারি? তোমরা কি করিতে বল আমাকে? আমার ত টাকা কড়ি কিছু নাই। আমি—"

আর একটি লোক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "না লেডী সাহেবা, আপনি কি করিবেন, আপনার কিছুই নাই। যা শুনিলাম, তা যদি সত্য হয়, আপনার সর্ব্বনাশ আমাদের চেয়েও বেশী হইয়াছে। মাথা রাখিতে পারেন এমন একখানি ঘর আপনার নাই। একটি গিনি এমন নাই যা আপনার নিজের সম্পত্তি।"

অতি কঠোর স্বরে আবার কে বলিয়া উঠিল, "সকলকে ঠকাইয়াছে! হাজার হাজার লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। পাকা জুয়াচোর ছিল এই লোকটা।"

সকলে 'হিস্' 'হিস্'* করিয়া উঠিল। একজন সরলা কোমলা বালিকাকে এরূপ অপমান করিবে, এরূপ লোক ইহাদের মধ্যেও অতি কম ছিল। কিন্তু এই 'হিস্কার' সত্ত্বেও সেই লোকটি আবার বলিল, "তা একটি কথা আপনাকেই বলিতে হইবে। এমন কিছু নগদ টাকা কি ঘরে নাই যাতে—"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কার্লাইল সাহেব গৃহে প্রবেশ করিলেন,—কঠোর কর্ত্তৃত্বের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি? কি চাও তোমরা?"

কেহ কেহ উত্তর করিল, "আপনি যদি এই পরিবারের বন্ধু কেহ হন, তবে অবশ্য জানেন আমরা কি চাই। ঢের টাকা পাওনা আছে, তাই চাই আমরা।"

---

* অন্যায় অসঙ্গত কথা কেহ কিছু বলিলে শ্রোতৃবর্গ মুখের শিসে 'হিস্' 'হিস্' (hiss) শব্দে তাহাকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করে।

টাকা চাও ত এখানে কেন আসিয়াছ? এখানে আসিয়া গোলমাল করিতেছ, কে টাকা দিবে? লণ্ডনে উকিলদের কাছে কেন যাও না ?"

"তা ত গিয়াছিলাম। তারা জবাব দিয়া দিল, এক পয়সাও নাই, কেহ কিছু পাইবে না।"

"সে যাই হ'ক, এখানেও কিছু পাইবে না। আমি বলিতেছি, এখনই তোমরা এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাও।"

এই এক কথারই যে তারা সেই মুহূর্ত্তে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, ইহা কিছু সম্ভব নয়। সেরূপ লক্ষণও কিছু দেখা গেল না। স্পষ্ট তারা বলিল, টাকা না পাইলে তারা বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না।

কার্লাইল ধীর দৃঢ় স্বরে উত্তর করিলেন, "যদি না যাও, তার ফলভোগ তবে করিবে। আমি জানাইতেছি পরের গৃহে তোমরা অনধিকার প্রবেশ করিয়াছ। এই বাড়ী লর্ড সাহেবের ছিল না—কয় মাস আগে তিনি ইহা বিক্রয় করিয়াছিলেন।"

কেহ হাসিয়া উঠিল,—কেহ বলিল, এ সব বাজে চালাকী তারা অনেক দেখিয়াছে।

কার্লাইল কহিলেন, "প্রমাণ করা যাইবে না, এমন কথা নিতান্ত আহাম্মক ছাড়া কেহ বলে না। আমি সত্য এই কথা শপথ করিয়া তোমাদের জানাইতেছি, এই বাড়ী আর বাড়ীতে যাহা কিছু আছে সব কয়মাস হইল আইনতঃ অন্যের অধিকারে গিয়াছে। লর্ডসাহেব সেই নূতন মালিকের অনুমোদনে এই বাড়ীতে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিন বাস করিতেছিলেন মাত্র। যাও, তাঁর উকিলদের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, ইহা সত্য কি না।"

"কে কিনিয়াছে এই বাড়ী ?"

"ওয়েষ্টলীনের কার্লাইল সাহেব। তাঁর নাম বোধ হয় কেহ কেহ তোমরা শুনিয়া থাকিবে।"

হাঁ, কেহ কেহ তাঁহার নাম জানে বটে। একজন বলিল, "জানি জানি—খুব ধড়িবাজ এক উকিল,—তার বাপও তাই ছিল।"

"হাঁ আমিই সেই কার্লাইল বটে। আর তোমরাই বলিতেছ খুব ধড়িবাজ উকিল আমি, তা এটা জানিও ধড়িবাজ উকিল আমি এত টাকা দিয়া এই বাড়ী যখন কিনিয়াছি, আগে বেশ করিয়া জানিয়া নিয়াছি, কারও কোনও দাবী দাওয়া এ বাড়ীতে নাই। কারও উকিল ভাবে বাড়ী আমি কিনি নাই, নিজের টাকায় নিজের জন্য কিনিয়াছি। ঈষ্টলীন্ এখন আমার।"

"কিনিয়াছেন ত, টাকা সব দেওয়া হইয়া গিয়াছে ?"

"হাঁ, গেল জুন মাসে যখন বাড়ী কেনা হয়, সব টাকা তখনই দেওয়া হইয়াছে।"

"টাকা তবে কি হইল ?"

"সে আমি জানি না। লর্ডমণ্টসেভার্ণের বৈষয়িক ব্যাপারের কোনও খবর আমি রাখি না

কেহ কেহ বলিল, "এও ত আশ্চর্য্য বটে। বাড়ী তাঁর নয়, অথচ তিন চার মাস এই বাড়ীতে তিনি ছিলেন !"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "এটা এমন আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নয়। বাড়ী আমার হাতে ছাড়িয়া দিবার আগে শেষ কয়টা দিন তিনি এখানে আসিয়া থাকিতে চান। আমি তাহাতে আপত্তি করি না। এর মধ্যে তিনি খুব পীড়িত হইয়া পড়েন, কাজেই এ পর্য্যন্ত আর যাইতে পারেন নাই। এই আজই তিনি চলিয়া যাইবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল।"

"বাড়ীর সব আসবাবও আপনি কিনিয়াছেন বলেন ?"

"হাঁ, সব। প্রমাণ তোমরা পাইবে, আমার কথায় সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। যাই হ'ক, এ আমার বাড়ী আমার উপরে কোনও দাবী দাওয়া তোমাদের নাই। তাই বলিতেছি, তোমরা এখনই সব বিদায় হও।"

কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনেশে জুয়াচোর ছিল এই লর্ড বেটা।"

কার্লাইল উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন, "তিনি যাই থাকুন, তাঁর কন্যাকে অপমান করিবার কোনও অধিকার তোমাদের নাই। আমার ধারণা ছিল, ইংরেজ নামে যে পরিচয় দেয়, সে এরূপ ঘৃণিত কাজ করিতে পারে না। লেডী ইজাবেল চলুন, আপনার এখানে থাকিবার কোনও দরকার নাই। ইহাদের সম্বন্ধে যা করিতে হয়, আমি করিব।"

এই বলিয়া কার্লাইল ইজাবেলের হাত ধরিলেন। কিন্তু ইজাবেল একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মনে তার বড় আঘাত লাগিয়াছিল। তার পিতা যে ইহাদের সম্বন্ধে

কত বড় অন্যায় করিয়া গিয়াছেন তাহা সে বড় তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিল। দুটি কথা ইহাদিগকে না বলিয়া, ইহাদের কাছে মার্জ্জনা না চাহিয়া, সে যে যাইতে পারে না। ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল——

"আমি আর কি বলিব? কিছুই আমি জানিতাম না। বাবার বৈষয়িক অবস্থার কথা কেহই ত আমাকে কিছু বলে নাই। বোধ হয়—আমার কিছুই নাই। যদি থাকে, সব তোমাদিগকে ভাগ করিয়া দিব। যদি কখনও আমার টাকা হয়, জীবনে কখনও যদি পারি, তোমাদের সব পাওনা শোধ দিতে পরিলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

সব পাওনা! হায়, সব পাওনা যে কি ইজাবেল তার কি জানে? তবে এমন সময় এমন কাহারও মুখে এই কথা একেবারে বৃথা যায় না।—সকলেরই প্রাণ এই অসহায়া বালিকার প্রতি করুণায় তখন পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কার্লাইল ইজাবেলকে গৃহের বাহিরে লইয়া গেলেন,—কহিলেন, "লেডী ইজাবেল, আমি আগে বুঝিতে পারি নাই। ঘুণাক্ষরেও যদি কিছু জানিতে পারিতাম, আজ এই গ্লানি আপনাকে সহিতে হইত না। তা আপনি কি একা উপরে যাইতে পারিবেন, না মেসন বিবিকে ডাকিব?"

"না, তাকে আর ডাকিতে হইবে না, নিজেই পারিব। কোনও অসুখ ত আমার করে নাই,—তবে বড় ভয় পাইয়াছি, আর বড় ব্যথা পাইয়াছি মনে। কিন্তু এও যে সব নয়!—উপরে-বাবার ঘরে—দুটি লোক বসিয়া আছে——"

"সে কি?"

"আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তারা বলে—বাবাকে তারা গ্রেফতার করিয়াছে।"

"কি সর্ব্বনাশ! ইহাও কি সম্ভব?"

"আচ্ছা, আমি দেখিতেছি। এখনই তাদের দূর করিয়া দিব। আপনি উপরে যান, এই লোকগুলিকে আগে বিদায় করিয়া দিয়া আসি।"

অনেক ঝগড়াঝাঁটি করিয়া শেষে লোকগুলি বিদায় হইল। কি করিবে? বাড়ী কার্লাইলের—অনধিকার প্রবেশের নালিশ করিলে, সত্যই তাহাদের একটা ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে।

কিন্তু শব গ্রেফতার করিয়া যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদিগকে নড়ান গেল না। কার্লাইল তাহাদের পরোয়ানা দেখিলেন। তিনি নিজে কখনও এরূপ ব্যাপার দেখেন নাই। তবে তাঁহার পিতার আমলে নাকি কোন্ বড় পাদ্রীর শব কবরের মুখ হইতে পাওনাদারেরা গ্রেফ্তার করিয়া আনিয়াছিল! তারা শক্ত হইয়া বলিল, তাদের দাবী অনেক, লর্ড সাহেবের উত্তরাধিকারী ভেন্ সাহেব না আসা পর্য্যন্ত তারা কিছুতেই শব ছাড়িয়া যাইবে না।

অগত্যা নূতন লর্ড মণ্টসেভার্ণ রেমণ্ড ভেন্ (মিসেস্ এমা ভেনের স্বামী) আসিয়া পৌছা পর্য্যন্ত কার্লাইল অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বিদায়

পরদিন বৈকালেই নূতন লর্ড মণ্টসেভার্ণ আসিয়া পৌছিলেন। দোকানদারদের পাওনা, চাকরবাকরদের বাকী বেতন, তাহাদের শোকপরিচ্ছদের ব্যয়, সব তিনি দিলেন। পারিবারিক উকিলদের সাহায্যে শবও খালাস করিয়া নিয়া সমাধির ব্যবস্থা করিলেন।

ইজাবেলের জন্য তাহার পিতা বাস্তবিক কোনও সম্বলই রাখিয়া যান নাই। ইষ্টলীন ও ইষ্টলীনের সকল সাজ-সরঞ্জাম এখন কার্লাইল সাহেবের সম্পত্তি। হীরা-জহরতের যত অলঙ্কার ছিল তা সব পারিবারিক সম্পদ, মিসেস্ ভেন্ বা নূতন লেডী মণ্টসেভার্ণ এখন তার অধিকারিণী। দুই দিন আগেও যে সমুজ্জ্বল হীরকভূষণে ভূষিত হইয়া ইজাবেল কেনের কনসার্টে গিয়াছিল, তাহা এখন এমা মণ্টসেভার্ণের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিবে, ইজাবেলের আর তাহা স্পর্শ করিবারও অধিকার নাই। পিতার সমাধির সময় যে শোকপরিচ্ছদ তাকে ধারণ করিতে হইয়াছিল, তার ব্যয় পর্য্যন্ত রেমণ্ড মণ্টসেভার্ণ বহন করেন। এক তার নিজের কাপড় চোপড় কেহ কাড়িয়া নিতে পারে না, তাই মাত্র তার ছিল।

ইহাতেও ইজাবেল তেমন ক্ষুব্ধ হয় নাই। কিন্তু এখন যে নূতন লর্ডের গৃহে লেডী এমা মণ্টসেভার্ণের কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহাকে থাকিতে হইবে, তাই ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। এমার চরিত্র সে জানিত বেশ, পিতার

একমাত্র আদরের কন্যা সে, আজ এমা মণ্টসেভার্ণের হাতে পদে পদে তাকে কত লাঞ্ছনা কত অপমান সহিতে হইবে! সমস্ত চিত্ত তার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। একবার মনে হইল দরিদ্রকন্যার মত খাটিয়া সে খাইবে, আর কিছু না জোটে একটু রুটি আর জল মাত্র খাইয়া সে জীবন ধারণ করিবে। তবু লেডী মণ্টসেভার্ণের অধীনে তার গৃহে গিয়া থাকিবে না। এমন সব কথা ভাবে অনেকে,—কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা হয় না। কি কাজ সে শিখিয়াছে? কোথায় গিয়া কি কাজ সে করিবে? সম্ভব হইলেও, তার অভিভাবক এখন লর্ড রেমণ্ড মণ্টসেভার্ণ, তিনি তা তাকে করিতে দিবেন কেন? উপায়ান্তর ইজাবেল কিছু দেখিল না,—বুকভরা দুঃখে অজস্র অশ্রুধারা ঢালিয়া সে কাঁদিল। হায়, কাঁদিবে না—সে আর কি করিতে পারে?

এদিককার গোলমাল সব মিটিল, উকিলদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ, অনেক কাজকর্ম আছে, বিষয়সম্পত্তি সব এখন বুঝিয়া নিতে হইবে,—লর্ড মণ্টসেভার্ণকে এখনই একবার লণ্ডনে না গেলে নয়। বন্দোবস্ত করিলেন, তিনি রওনা হইয়া গেলেই ইজাবেল তাঁহার বাসভবন মার্লিংগড়ে যাইবে।

লর্ড মণ্টসেভার্ণ যখন যাত্রা করিবেন, কার্লাইল সাহেব আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে কি কথাবার্তা ছিল, তাহা শেষ করিয়া তিনি ইজাবেলকে ডাকিলেন, কহিলেন, "ইজাবেল, আমার আর সময় নাই। এখনই যাত্রা করিতে হইবে আমাকে বলিবার কিছু আছে?"

ইজাবেল কি বলিতে গিয়া চুপ করিল,—কার্লাইলের দিকে একবার চাহিল,—তিনি উঠিয়া গিয়া একটা জানালার কাছে বাহিরের দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন।

লর্ড সাহেবের গাড়ীর সময় প্রায় হইয়াছে,—যাইবার জন্যই বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইজাবেলের এই কুণ্ঠা তিনি লক্ষ্য করিলেন না। তাহাকে নীরব দেখিয়া নিজেই কহিলেন, "তবে বলিবার কিছু নাই বোধ হয়। যাহাহউক, তুমি কিছু ভাবিও না। খানসামাকে বলিয়া গেলাম, সেই সব বন্দোবস্ত করিয়া তোমাকে নিয়া যাইবে। পথে কিছু খাইয়া নিও,—সন্ধ্যার আগে মার্লিংগড়ে পৌছিতে পারিবে না। আর মিসেস্ ভে—হাঁ, লেডী মণ্টসেভার্ণকে বলিও, তাড়াতাড়িতে কোনও চিঠি লিখিতে পারিলাম না। লণ্ডনে পৌছিয়াই লিখিব।"

ইজাবেল দাঁড়াইয়া রহিল। কি বলিবে, অথচ তা বলিতে পারিতেছিল না,—মুখের ভাবে সেটা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল।

"কি, কিছু বলিবে? বল না?"

ইজাবেল আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আপনাকে ত্যক্ত করিতে—চাই না। তবে—তবে—আমার হাতে—কিছুই নাই।"

"তাই ত,—আমি যে তা ভাবিই নাই মোটে। এ সব ত—জানিও না কিছু—আচ্ছা, দেখি।"

পকেট হইতে একটা থলে তিনি বাহির করিলেন,—খুলিয়া দেখিয়া কহিলেন, "ইজাবেল, আমারও হাতে নগদ এখন বেশী কিছু নাই। সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। পথখরচের উপরে সামান্য কিছু আছে। তা এই তিন পাউণ্ড এখন নেও। তোমার পথখরচ সব খানসামার হাতে দিয়াছি। আপাততঃ এতেই চালাইয়া নিও। মার্লিংগড়ে পৌছিলেই যা লাগে লেডী মণ্টসেভার্ণ দিবেন। তবে তাঁকে বলিও, নহিলে—তিনি ত জানেন না, তোমার হাতে কিছু নাই।"

দুইটা পাউণ্ড আর দুইটা আধ পাউণ্ড বাহির করিয়া তিনি টেবিলের উপরে ফেলিয়া দিলেন; কহিলেন, "তবে আসি দিদি। মার্লিংগড়ে নিজের বাড়ীর মতই সচ্ছন্দে থাকিও। আমিও শীঘ্র আসিতেছি।"

লর্ড মণ্টসেভার্ণ চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া কার্লাইল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ইজাবেল তখন কেবল সেই মুদ্রা কয়টি তুলিয়া নিতেছে, লজ্জায় ও দুঃখে মুখখানি তার একেবারে শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, উজ্জ্বল সেই রক্তাভা হায়, কোথায় চলিয়া গিয়াছে!—

ইজাবেল কহিল, "কার্লাইল সাহেব, একটা অনুগ্রহ আমাকে করিবেন?"

"কি, বলুন। যা বলিবেন, তাই করিব।"

দেড় পাউণ্ড কার্লাইলের দিকে সরাইয়া দিয়া ইজাবেল কহিল, "কেন, সাহেবকে এই দেড়পাউণ্ড দিবেন। আমার দাসীকে তার পাওনা তখনই চুকাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম'

কিন্তু সে দেয় নাই। একপাউণ্ড টিকিটের দাম, আর আধ পাউণ্ড পিয়ানোতে সুর বাঁধিবার মজুরী। আপনি এই টাকাটা তাকে দয়া করিয়া দিবেন। চাকর চাকরাণীদের কাহাকেও বলিলে, কে জানে তারা হয় ত ভুলিয়া যাইবে, উদ্যোগ করিয়া দিবে না।"

কার্লাইল কহিলেন, "কেন্ পিয়ানোতে সুর বাঁধিতে পাঁচশিলিং করিয়া নেয়, আধ পাউণ্ড কেন দিতেছেন?"

"অনেকক্ষণ তার লাগিয়াছিল। কাজও কিছু বেশী করিয়াছিল। আর—আর—তাকে কিছু খাইতে দিই নাই, সে দুঃখটাও ভুলিতে পারিতেছি না। এ আর বেশী কি? তার পয়সার অভাব বোধ হয় আমার চেয়েও বেশী। তাকে দিতে হইবে, তাই,—নইলে বোধ হয় লর্ড মণ্টসেভার্ণের কাছে এখন কিছু চাহিতে পারিতাম না। যদি—তা না চাহিতাম, কি করিতাম জানেন?"

"কি?"

"আপনাকেই বলিতাম। শেষে আমার হাতে টাকা হইলে শোধ দিতাম। একবার তাই ভাবিয়াছিলাম। আপনার কাছে চাহিতেও বোধ হয় এত কষ্ট আমার হইত না।"

"আমি কৃতার্থ হইলাম। আর কিছু আপনার জন্য করিতে পারি?"

"না, আপনি যথেষ্ট করিয়াছেন।"

একটা গাড়ী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, ইজাবেল চাহিয়া দেখিল, তার জিনিশপত্র তাহাতে তোলা হইয়াছে, আর তার পারিচারিকা মার্ভেল্ একা পাশে বসিয়া আছে।

ইজাবেল কহিল, "আমার বিদায়ের সময় আসিল। এখন তবে আসি কার্লাইল সাহেব। হাঁ, একটি ভার আপনাকে দিয়া যাইব। সোণালী রুপালী কতকগুলি ছোট মাছ কিনিয়াছিলাম——"

"সে গুলি কেন নিয়াই যান না?"

"লেডী মণ্টসেভার্ণের গৃহে। না, না তা পারি না। আপনার কাছেই সেগুলি রাখিয়া যাইতেছি। দুই এক-টুকরা রুটি তাদের কাচের গোলাটার মধ্যে ফেলিয়া দিবেন।"

বলিতে বলিতে ইজাবেলের চক্ষু দুটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

কার্লাইল কহিলেন, "আপনি বসুন একটু।"

'না—না! আর কেন? এখন যাই।"

স্নেহে ইজাবেলের হাতখানি ধরিয়া কার্লাইল লইয়া আসিলেন। বাড়ীর পুরাতন চাকর চাকরাণীরা সকলেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তারাও আজ সকলে বিদায় হইয়া যাইবে। বাল্যাবধি সকলেই তাকে বড় স্নেহ করিয়াছে। আজ তাদের ছাড়িয়া যাইতেছে, প্রাণ যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। ইজাবেল হাত বাড়াইয়া দিল,—কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিদায়ের দুটি সম্ভাষণ কাহাকেও করিতে পারিল না, কাহাকেও দুটি মিষ্ট কথা বলিতে পারিল না; তাদের স্নেহে সে কত সুখে ছিল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া হাতখানি একবার তুলিয়া নীরবে বিদায় নিয়া ইজাবেল গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

কার্লাইল তাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া খোলা দরজার কাছে দাঁড়াইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে ইজাবেল রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল, "অনেক দয়া আপনি করিয়াছেন, কার্লাইল সাহেব, কিন্তু ধন্যবাদ দিতে আপনাকে পারিলাম না। কেন পারিলাম না—তা আপনি সবই বুঝিতেছেন,—"

কার্লাইল কহিলেন, "কি আর করিয়াছি? বাস্তবিক কিছু করিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইতাম। যে সব দুঃখ গ্লানি আপনাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, তা একটুও যদি আমি নিবারণ করিতে পারিতাম, জীবন আমার ধন্য হইত। হয়ত আর দেখা হইবে না—"

"কেন হইবে না? লর্ড মণ্টসেভার্ণকে ত আপনি বলিয়াছেন, দেখা করিবেন।"

"কোনও কার্য্য উপলক্ষে হয়ত দেখা হইতে পারে। তবে তার সম্ভাবনা বড় কম। আপনাদের জীবন আর আমাদের জীবন যে একেবারে আলাদা পথেই চলিবে। যাই হ'ক, প্রার্থনা করি ভগবান্ আপনাকে মঙ্গলে রাখুন।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পিতার কথা, আর যে সুখের গৃহ জীবনের মত ছাড়িয়া যাইতেছে তার কথা, মনে করিয়া ইজাবেলের চক্ষু দুটি ভরিয়া অবিরল অশ্রুধারা বহিতেছিল,—আর কার্লাইলের করুনার কথা মনে হইয়া কৃতজ্ঞতায় তার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

কতদূর গিয়া হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়িল, কোলের উপর একটুকরা মোড়া কাগজ পড়িয়া আছে। তুলিয়া খুলিয়া দেখিল, একখানা একশ পাউণ্ডের নোট।

একি! এ নোট কোথা হইতে আসিল? আর কিছু নয়—কার্লাইল কোনও কৌশলে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার সময় তার হাতে দিয়াছিলেন। হাঁ তাই, আর কি হইতে পারে? ইজাবেলের চক্ষু মুখ লাল হইয়া উঠিল। ঘৃণায় লজ্জায় রোষে চিত্ত পরিপূর্ণ হইল। ধিক্! এত বড় অপমান কার্লাইল সাহেব তাকে আজ করিতে পারিলেন! কিন্তু ক্রমে তার মনে পড়িল, গত কয়দিন কত স্নেহে নিতান্ত আপনার জনের মত কত যত্ন, দারুণ এই বিপদে অযাচিতভাবে কত অনুগ্রহই তাকে তিনি করিয়াছেন। ইজাবেলের মনটা নরম হইল। সে যে আজ একেবারে অসহায়, পরের গৃহে আশ্রিতা, আশ্রয়দাতার দয়ার দান ব্যতীত একটি কপর্দ্দকও তার নাই, সব ত কার্লাইল জানেন। জানিয়া কৌশলে তাকে এই সাহায্য তিনি করিয়াছেন। মনে মনে কার্লাইলের অসাধারণ উদারতার প্রশংসা না করিয়া সে পারিল না।

কিন্তু সে কি করিবে এখন? এই নোট কিছু সে নিতে পারে না। ছি! তাও কি হয়? যদি ডাকে নোটখানি ফেরৎ পাঠাইয়া দেয়, কার্লাইল সাহেব মনে বড় ব্যথা পাইবেন। সে ভাবিল যখন আবার দেখা হইবে, তাঁহাকে বলিয়া বুঝাইয়া নিজের হাতে নোটখানি তাঁকে ফিরাইয়া দিবে।

এদিকে লর্ড মণ্টসেভার্ণ যথাসময়ে লণ্ডনে পৌঁছিলেন। যে হোটেলে তাঁহারা সাধারণতঃ থাকিতেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন লেডী মণ্টসেভার্ণও আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহাদের পুত্র বালক উইলিয়ম। লেডী মণ্টসেভার্ণ কহিলেন, উইলিয়মের শরীর ভাল নয়—তাই তাকে লইয়া কয়দিনের জন্য তিনি বেড়াইতে আসিয়াছেন।

লর্ড মণ্টসেভার্ণ কহিলেন, "এখনই বলিয়া আসিয়াছ এমা কাজ ভাল হয় নাই। ইজাবেল যে মালিংগড়ে গেল।"

"ইজাবেল! সে সেখানে গিয়াছে কেন?"

লর্ড সাহেব বুঝাইয়া বলিলেন, "পিতা ইজাবেলকে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গৃহে আশ্রয় ব্যতীত তার আর গত্যন্তর নাই।"

লেডী মণ্টসেভার্ণ একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন।

"আমাদের ঘরে আমাদের সঙ্গে থাকিবে! না, সে কখনও হইবে না!"

"উপায় যে আর নাই এমা। সে কোথায় যাইবে? কোথায় থাকিবে? তাকে ত ফেলিয়া দিতে পারি না আমি। কাজেই এই বন্দোবস্ত করিয়াছি। আজ সে মালিংগড়ে গেল।"

দারুণ ক্রোধের আবেগে লেডী মণ্টসেভার্ণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অগ্নিনয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শোন রেমণ্ড! আমি স্পষ্ট বলিতেছি, আমার সংসারে ইজাবেল থাকিতে পারিবে না! দুই চক্ষে আমি তাকে দেখিতে পারি না। কেন তুমি তার কথায় ভুলিয়া গেলে? কেন এমন বন্দোবস্ত করিয়া আসিলে?"

লর্ড সাহেব উত্তর করিলেন, "কারও কথায় আমি ভুলি নাই এমা! ইজাবেল কি আর কেহ এমন কোনও অনুরোধও আমাকে করে নাই। নিজেই আমি এই বন্দোবস্ত করিয়াছি। এ ছাড়া কোথায় সে যাইবে?"

"যেথায় খুসী যাক্, আমি তার কি জানি?"

লর্ড সাহেব কহিলেন, "রাগে তোমার মাথার ঠিক নাই এমা। ধীরভাবে কথাটা একটু ভাবিয়া দেখ। আর কোনও আত্মীয়স্বজন তার নাই। মৃত লর্ডের উত্তরাধিকারী আমি, সংযত জীবন হইলে আরও দীর্ঘকাল তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, আরও বিশ বৎসরের মধ্যে হয় ত এ সম্পত্তি আমি পাইতাম না। এখন তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে অনাথা ইজাবেলকে আশ্রয় দিতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমি বাধ্য। এটা কি বোঝ না তুমি?"

"না, তা বুঝি না। কিসে তুমি বাধ্য? আমার সংসারে তাকে আমি থাকিতে দিব না!"

লর্ড সাহেব উত্তর করিলেন, "মালিংগড়ে সে গিয়াছে, নিজের বাড়ী ঘরের মতই গিয়া সেখানে উঠিয়াছে। যখন সেখানে যাইবে, তাকে রাস্তার বাহির করিয়া দিতে পারিবে? তাকে হয়ত দরিদ্রাশ্রমে * আশ্রয় নিতে হইবে, না হয় কিছু মাসহারার রাজদরবারে আবেদন করিতে হইবে। লোক-সমাজে তা হ'লে মুখ দেখাইতে পারিবে? সবাই যে তোমাকে ধিক্ ধিক্ করিবে।"

লেডী মণ্টসেভার্ণ এই কথাগুলি সত্য অনুভব করিলেন। ইহার প্রতিবাদে তখন আর কিছু বলিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার চক্ষু মুখ ফাটিয়া যেন জলন্ত আগুন বাহির হইতে লাগিল।

মণ্টসেভার্ণ কহিলেন, বেশীদিন "তাকে লইয়া তোমার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। ইজাবেলের মত সুন্দরী মেয়ের বিবাহ হইতে বেশী দেরী হইবে না। তার মত অমন শান্ত মিষ্টস্বভাবের মেয়েও আমি আর কোথাও দেখি নাই। কেন যে তার উপরে তোমার এত রাগ আমি বুঝিতে পারি না। যাই হোক, তার মুখ দেখিলে আর স্বভাবের মধুরতার একটু পরিচয় পাইলে, তার যে সম্পদ কিছু নাই এ কথা অনেকেই মনে করিবে না, সহজেই তাকে বিবাহ করিতে চাহিবে।"

"প্রথম যে চাহিবে তাকেই তার বিবাহ করিতে হইবে। যাতে তা হয়, তাই আমি এখন দেখিব?"

স্বামীর কথায় ক্রুদ্ধা এমা এইমাত্র উত্তর করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মালিংগড়ে ইজাবেল।

মালিং গড় বলিয়া যে কোনও গড় ছিল, আর সেই গড়ে এই ভেন্ পরিবার বাস করিতেন, তা নয়। কখনও হয়ত ঐ নামে একটা গড় এখানে ছিল, অধুনা মালিং গড় একটি সহরের নাম মাত্র. আর সেই সহরের নিকটেই ইঁহাদের কিছু ভূ-সম্পত্তি আর বাড়ী ছিল।

লর্ড ও লেডী মণ্টসেভার্ণ যথা সময়ে মালিং গড়ে ফিরিয়া আসিলেন। লর্ড সাহেব সহৃদয় লোক ছিলেন, কর্ত্তব্য-বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল, সস্নেহ শিষ্ট ব্যবহারে ইজাবেলকে তিনি আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু একথা একরূপ

* নিতান্ত নিঃসম্বল যদি কেহ কোনও মতে আপনাকে প্রতিপালন করিতে না পারে, তাহাদের জন্য প্রত্যেক গ্রামে ও সহরে একটি করিয়া আশ্রম আছে। স্থানীয় গৃহস্থদের উপরে poortax বা 'দরিদ্রকর' নামে একটা কর আদায় হয়, তার দ্বারা এই গুলির খরচ চলে। সমর্থ ব্যক্তিদের সেখানে কিছু কিছু কাজ করিতে হয়,—আর অসমর্থ যারা, তারা বিনাকর্ম্মেই আশ্রয় পায়। এই আশ্রম গুলিকে ইংরেজিতে Work House বা মজুরীর আশ্রম বলা হয়।

বলাই বাহুল্য যে লেডী মণ্টসেভার্ণের দুর্ব্ব্যবহারে দশ বার দিনের মধ্যেই ইজাবেল একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বাড়ীর গৃহিণী আশ্রিত কাহারও উপরে অতি বিরূপ হইলে, অবিরত কত খুঁটিনাটি ব্যাপারে যে বিরাগের পাত্রকে ক্লেশ দিতে ও অপমান করিতে পারেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। লেডী মণ্টসেভার্ণ কিছু ত্রুটি এ সম্বন্ধে করিতেন না। সহিতে না পারিয়া নির্জ্জনে ইজাবেল কাঁদিত, আর আগুনভরা বুকে কেবলই ভাবিত, এই গৃহ ছাড়িয়া সে কি আর কোথাও যাইতে পারে না?

লেডী মণ্টসেভার্ণ বিশেষ সুরূপা ছিলেন না, কিন্তু রূপের গর্ব্ব বড় বেশী ছিল। স্বভাবের বড় একটা দুর্ব্বলতা এই তাঁহার ছিল যে সুরূপ যুবক মাত্রই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আদর আপ্যায়ন করে, এটা তিনি বড় বেশী চাহিতেন। ইহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা হাসি রঙ্গে দিন কাটাইতে পারিলে বড় আনন্দে তিনি থাকিতেন, ইহাদের পাইলে বড় বাড়াবাড়িই তিনি করিতেন। তবে নামে পাছে একটা কলঙ্ক রটে, এজন্য বিশেষ সতর্কতা তাঁর ছিল, তাই এই সব রঙ্গকৌতুকে ও আমোদপ্রমোদে একাবারে সীমা ছাড়াইয়া যাইতেন না। ইহার উপর আবার অতি সঙ্কীর্ণ-চিত্ত ও স্বার্থপরায়ণা তিনি ছিলেন। কোনও বিষয়ে প্রতি-যোগিনী কাহাকে মনে করিলে বিদ্বেষের বিষে তাঁহার মন পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। পাছে তাঁহার অপেক্ষা অধিক আদর কোনও যুবক করে, এই ভয়ে সুন্দরী কোনও যুবতীকে কখনও তাঁহার গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ করিতেন না। যার আদর তিনি চান, এরূপ কোনও যুবককে কোনও সুন্দরী আকৃষ্ট করিয়াছে, দেখিলে তাকে তিনি কখনও ক্ষমা করিতেও পারিতেন না। ইজাবেল অসাধারণ রূপবতী, বয়সেও সে তরুণী। সুতরাং যে সব যুবকগণের সম্মিলন তাঁহার গৃহে হইত, সকলেই অতি আগ্রহে ইজাবেলের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে চাহিত, তাকেই বেশী আদর আপ্যায়ন করিত। এরূপ ঘটনা আগেও তিনি দেখিয়াছেন,—ইজাবেলের প্রতি তাঁহার দারুণ বিরাগের প্রকৃত রহস্যই ইহা। তাঁহার গৃহে ইজাবেল থাকিলে চক্ষের উপরে এরূপ যে অহরহ ঘটিবে, তা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, তাই ইজাবেল তাঁহার গৃহে থাকিবে শুনিয়াই এমন আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বড়দিনের সময় কয়েকজন আত্মীয়বন্ধু গৃহে অতিথি হইয়াছিল। ইহারা সকলেই প্রায় যুবক, স্বভাবতঃই ইজাবেলের সঙ্গেই বেশী মিলিত মিশিত, লেডী মণ্টসেভার্ণকে উপেক্ষা করিয়া তাকেই বেশী আদর আপ্যায়ন করিত। লেডী মণ্টসেভার্ণ একেবারে আগুন হইয়া যাইতেন। একদিন সহিষ্ণুতা ও শিষ্টতার সীমা ছাড়াইয়া নিভৃতে তিনি মুখের উপর ইজাবেলকে বলিয়া ফেলিলেন, নিতান্ত একটা আপদ বালাই এর মত সে তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছে। আর কোনও উপায় নাই বলিয়াই ইহা তিনি বরদাস্ত করিতেছেন।

ক্রমে এপ্রিল মাসে ইষ্টারের * উৎসব আসিল। লর্ড মণ্টসেভার্ণ তখন কিছুদিনের জন্য ফ্রান্সে বেড়াইতে যান। এদিকে লেডী মণ্ট সেভার্ণের বৃদ্ধা মাতামহী মিসেস্ লেভিসন্ তাঁহার নাতি কাপ্তেন ফ্রান্সিস্ লেভিসনকে লইয়া মালিংগড়ে কয়েকদিনের জন্য বেড়াইতে আসিলেন। লেডী মণ্ট-সেভার্ণের মাথায় যেন বাজ পড়িল। ফ্রান্সিস্ লেভিসন তাঁহার মামাত ভাই—কিন্তু অতি সুরূপ বলিয়া ইহাকে তিনি বড় পছন্দ করিতেন *। বড় দিনের সময়ও ফ্রান্সিস্ লেভিসন আসিয়াছিল। তখনও ইজাবেলের প্রতি তার একটা বিশেষ আকর্ষণ দেখা গিয়াছে। এখন সেটা আরও বেশী দেখা যাইতে লাগিল, সর্ব্বদাই সে ইজাবেলের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, তার সঙ্গে হাসি গল্প করিত, বাগানে তাকে লইয়া বেড়াইত।

এই সব দেখিয়া ঈর্ষার জ্বালায় এমা মণ্টসেভার্ণ একেবারে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। আর যেকেহ যাহা কিছু করুক ফ্রান্সিস্ লেভিসন ইজা-বেলকে ভালবাসিবে, তাঁকে উপেক্ষা করিয়া কেবল ইজাবেলকে লইয়াই থাকিবে, ইহা একেবারেই তিনি সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। কেন বুড়ী মাতামহী মরিতে এখানে আসিয়াছিল? তাই না ফ্রান্সিস্ আর ইজাবেল এখন মিলিবার মিশিবার সুযোগ পাইতেছে! হায়, তাঁহার সমস্ত হীরাজহরতের অলঙ্কার গুলি দিয়াও যদি তিনি মাতামহীকে দূরে রাখিতে পারিতেন!

একদিন বৈকালে ইজাবেল বালক উইলিয়মকে লইয়া বাগানে বেড়াইতে বাহির হইল। ফ্রান্সিস্ লেভিসন গিয়াও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। ফিরিয়া যখন তারা আসিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ডিনারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। লেডী মণ্টসেভার্ণ পাগলের মত ছটফট করিতে-ছিলেন, রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া গিয়াছিলেন। অপেক্ষা আর করিতে না পারিয়া ইজাবেলের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সময় আর নাই, ডিনারের জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে হইবে, দাসী মার্ভেল ইজাবেলের চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিল। উইলিয়ম তার কোলের কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

লেডী মণ্ট সেভার্ণ গৃহে প্রবেশ করিয়াই অগ্নিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"বাগানে বেড়াইতেছিলাম।"

* মানবের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যীশুখৃষ্ট ক্রুস্ বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনদিন পরে তাঁহার সমাহিত দেহ উঠিয়া স্বর্গে চলিয়া যায়। এই ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ এপ্রিল মাসে 'ইষ্টার' উৎসব হয়।

* ইংরেজ সমাজে এরূপ সম্বন্ধে বিবাহও হইয়া থাকে। সুতরাং মামাত পিসতাত, কি খুড়তাত, জেঠতাত ভাইবোনেদের মধ্যে প্রেমের খেলা একেবারে বিরল নহে।

"এই যে কেলেঙ্কারী করিতেছ, একটু লজ্জা করে না তোমার?"

"সে কি! আপনি একি বলিতেছেন!"

লেডী মণ্টসেভার্ণ তখন মুখ খুলিয়া দিলেন। উগ্র-স্বভাবা নারী যখন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যায়, তখন তাঁহারা না বলিতে পারে এমন কথা নাই।

"ঘরে তোমাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছি, এই যথেষ্ট। একটু আক্কেল তোমার নাই, সেই ঘরে এত বড় একটা কেলেঙ্কারী আবার তুমি করিতেছ! তিন ঘণ্টা তুমি ফ্রান্সিস্ লেভিসনের সঙ্গে বাগানের ঝোপে গিয়া লুকাইয়াছিলে। সে আসিয়াছে অবধি কেবলই তার সঙ্গে ছেনালী করিতেছিস্। বড়দিনের সময় সে আসিয়াছিল, তখনও তার সঙ্গে এই রকম ছেনালীই করিয়াছিস্।"

এই রকম অতিবিশ্রী, অনেক গালাগালি লেডীমণ্টসেভার্ণ দিলেন। সব কথা লেখা যায় না, তবে তার সংক্ষিপ্ত ও শিষ্ট চুম্বক এই।

ইজাবেলও একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। ছি ছি ছি! তার দাসীর সম্মুখে এই অপমান। মার্ভেলের হাত হইতে চুল ছাড়াইয়া নিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আমি ছেনালী কিছু করি না, কখনও কাহারও সঙ্গে করি নাই। বিবাহিতা নারীরা তা করিয়া থাকে আমরা ওসব জানি না। আর এ বাড়ীতে ছেনালী যদি কেউ করে, সে আপনি নিজে। আপনার মত বিবাহিতা নারীদের পক্ষে এটা যত দোষের, আমাদের পক্ষে তত নাও হইতে পারে।"

সোজা এই সত্য কথাটা লেডী মণ্টসেভার্ণের অন্তরে গিয়া বড় তীব্র আঘাত দিল,—সে আঘাতে বুক ভরিয়া যেন বজ্রাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল,—হিতাহিত বুদ্ধি লোপ পাইল, ডান হাত তুলিয়া প্রচণ্ড বেগে ইজাবেলের বাম গালে তিনি এক চপটাঘাত করিলেন! সহসা এই আক্রমণে ইজাবেলের মাথা ঘুরিয়া গেল;—প্রতিবাদে বা প্রতিরোধে সে কিছু বলিতে বা করিতে পারিবার আগেই বাঁ হাতের তেমনই আর একটা তীব্র আঘাত তার ডান গালেও পড়িল! যাতনায় ইজাবেল চিৎকার করিয়া উঠিল—ত্রাসে ও গ্লানিতে থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। মার্ভেল ভয়ে ও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া হাত দুটি তুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বালক উইলিয়ম এমন চিৎকার করিয়া উঠিল, যেন নিজেও সে অতবড় মার আর কখনও খায় নাই। লেডী মণ্টসেভার্ণ তার কাণে এক ঘুসি দিয়া ঘর হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিলেন।

অপমানটা বড়ই লাগিয়াছিল,—সারা রাত্রি বুক ভরিয়া আগুন জ্বলিতেছিল, সারারাত্রি সেই আগুনের জ্বালায় উত্তপ্ত অশ্রু ঢালিয়া ইজাবেল কাঁদিল। আর ত সে এ বাড়ীতে থাকিতে পারে না! কিন্তু হায়, কোথায় যাইবে? এ পৃথিবীতে কোথায় আর তার আশ্রয় একটু মিলিবে, হায়, পিতার কবরের পাশে আজ যদি একটু স্থান সে পাইত। একবার মনে হইল, পলাইয়া সে ফ্রান্সে চলিয়া যাইবে, লর্ড মণ্টসেভার্ণের কাছে তার এই অপমানের কথা জ্ঞাপন করিবে। আবার মনে হইল, বৃদ্ধা মিসেস্ লেভিসনের কাছে একটু আশ্রয় সে প্রার্থনা করিবে,—না হয় মেসন বিবির কাছে যাইবে, যে ভাবেই হউক, তার সঙ্গে থাকিবে। কিন্তু রাত্রি যখন পোহাইল, বুঝিল ইহার কিছুই সম্ভব নয়। কিন্তু এখানেও যে আর থাকিতে সে পারে না!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মুক্তি

মার্ভেল তার সকালের খাবারটা উপরেই তার ঘরে লইয়া আসিল। উইলিয়াম ভেনও চুপি চুপি আসিয়া তার কাছে বসিল,—সরল বালক ইজাবেলকে বড় ভালবাসিত।

লেডী মণ্টসেভার্ণ ফ্রান্সিস্ লেভিসনের সঙ্গে কোথায় বেড়াইতে বাহির হইলেন।

উইলিয়ম কহিল, "মা কোথায় গেল,—চল ইজাবেল, আমরা এখন নীচে গিয়া একটু বসি।"

উইলিয়মের হাত ধরিয়া ইজাবেল নীচে নামিয়া আসিল। একটি ভৃত্য একখানি কার্ড আনিয়া ইজাবেলের হাতে দিল, ইজাবেল দেখিল, কার্লাইল সাহেব আসিয়াছেন। এমন সময় আজ হঠাৎ কার্লাইল আসিয়াছেন,—দুঃখের মধ্যেও ইজাবেল বড় একটা স্বস্তি বোধ করিল। কার্লাইল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—ইজাবেল স্মিতমুখে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "আপনি এখন আসিবেন, তা ভাবি নাই। দেখা হইল, বড় সুখী হইলাম।"

কার্লাইল কহিলেন, "এক মক্কেলের কাজে কাল হঠাৎ এখানে আসিতে হইয়াছে। ভাবিলাম, এত কাছে আসিয়াছি, একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাই। লর্ডমণ্টসেভার্ণ ত ফ্রান্সে গিয়াছেন শুনিলাম।"

"হাঁ—তা মনে আছে ত আমি বলিয়াছিলাম।" বলিতে বলিতে ইজাবেলের মনে পড়িল সেই নোট্‌খানির কথা। সে থতমত খাইয়া গেল। হায়, সে যে সে নোট্‌খানি ভাঙ্গাইয়া কতক তার খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, না করিয়াই বা কি করিবে? লেডী মণ্টসেভার্ণের কাছে খুচরা হাত খরচের জন্য টাকা চাহিবে, তা যে সে কিছুতেই পারে নাই। লর্ড মণ্টসেভার্ণও এ কয় মাস বাড়ীতে বড় একটা আসিতে কি থাকিতে পারেন নাই। ইজাবেলের এই কুণ্ঠা কার্লাইল লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারিলেন না। উইলিয়ামের দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "বড় দিব্য ছেলেটি ত, কে এ?"

"লর্ড ভেন,—লর্ড মণ্টসেভার্ণের পুত্র।—ইনি কে জান উইলিয়াম? ওয়েষ্টলীনের কার্লাইল সাহেব। বড় ভাল লোক ইনি,—অনেক ভাল আমার করিয়াছেন।"

উইলিয়াম সরল দৃষ্টিতে কিছুকাল কার্লাইলের মুখ পানে চাহিয়া রহিল, শেষে কহিল, "আপনি ইজাবেলের অনেক ভাল করিয়াছেন? বেশ, তাহ'লে আপনাকে আমি খুব ভালবাসিব।"

"হাঁ, অনেক ভাল—অনেক উপকার আমার করিয়াছেন।" বলিতে কার্লাইলের দিকে ফিরিয়া সলজ্জ আনতমুখে ইজাবেল কহিল, "কার্লাইল সাহেব, আমি কি বলিব জানি না,—আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তবে—আমার—আমার—সেটা খরচ—"

কার্লাইল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ওকি! আপনিও কি বলিতে যাইতেছেন? আমি ত কিছুই জানিনা। হাঁ, আপনাকে যেন কেমন রোগা রোগা দেখাইতেছে।"

ইজাবেল উত্তর করিল "ঈষ্টলীনে যেমন ভাল ছিলাম, এখানে কি তাই থাকিব?"

"ভরসা করি সুখেই এখানে আছেন?"

হঠাৎ এই প্রশ্নটা কার্লাইল জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন। ইজাবেল চমকিয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কার্লাইল দেখিলেন, দৃষ্টিতে বড় নিরাশ একটা বেদনার ভাব ব্যক্ত! তাঁহার প্রাণ একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। ইজাবেল ধীরে ধীরে কহিল, "না, বড় দুঃখেই এখানে আছি। আর এখানে থাকিতে পারি না। সারারাত কাল বসিয়া ভাবিয়াছি, কোথাও আর যাইতে পারি কিনা। কিন্তু ভাবিয়া কূল পাইলাম না। এই পৃথিবীতে আমার যে একজন বান্ধবও নাই।"

উইলিয়াম ভেন বলিয়া উঠিল, "ইজাবেল আমাকেও বলিয়াছে সে চলিয়া যাইবে। কেন জানেন? মা কাল রাগিয়া ওকে বড় মারিয়াছে।"

"চুপ উইলিয়ম!" ইজাবেলের মুখখানি আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল।

উইলিয়ম সে নিষেধ গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, "দুই গালে সে কি দুই চড়! ইজাবেল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমিও কাঁদিয়া উঠিলাম। মা তখন আমাকেও মারিল। মার্ভেল আমার ধাইকে কি বলিয়াছে জানেন? ইজাবেল খুব সুন্দর কিনা, তাই মা—"

ইজাবেল আর থাকিতে পারিল না। উইলিয়মের মুখ চাপা দিয়া ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল। বস্তুতঃ ছেলেপিলেদের কাণের কাছে কোনও গোপনীয় কথা বলিতে নাই। তারা যা শোনে মনে করিয়া রাখে। যেখানে যা বলিতে নাই তাই বলিয়া ফেলে।

কার্লাইলের চক্ষু মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অতি ক্ষুব্ধস্বরে তিনি কহিলেন, "সব কি সত্য লেডী ইজাবেল? হায়, সত্যই যে এমন কোনও বন্ধু আপনার দরকার, যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে।"

ইজাবেল উত্তর করিল, "কি করিব? অন্ততঃ লর্ড মণ্টসেভার্ণ ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এ দুঃখ আমাকে সহিয়া থাকিতেই হইবে।"

"তারপর?"

"তারপর কি হইবে, কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তিনিই বা কোথায় আর আমাকে রাখিবেন? কিন্তু এখানেও যে আমি আর থাকিতে পারি না।" বলিতে বলিতে চক্ষু দুটি ইজাবেলের অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল।

কার্লাইল কহিলেন, "আহা, যদি কোনও সাহায্যও আমি করিতে পারিতাম। কিন্তু কি করিতে পারি আমি?"

"কিছুই না। আপনি আর কি করিতে পারেন?"

"কিন্তু তবু—কিছু যদি করিতে পারিতাম—কৃতার্থ হইতাম আমি। ঈষ্টলীনও—সত্যকথা বলিতে কি—খুব সুখের গৃহ আপনার পক্ষে ছিল না। কিন্তু এখানে যে সে সুখটুকুও আপনার নাই।"

"সুখের ছিল না! বলেন কি কার্লাইল সাহেব? বড় সুখে যে আমি সেখানে ছিলাম। জীবনে, হায়, অমন সুখের গৃহ আর বুঝি কখনও আমার হইবে না।"

কার্লাইলের মুখে কি একটা কথা আসিল,—বুক ভরিয়া কি যেন ভাবের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল, মুখখানি ভরিয়া ঘন রক্তিমাভা দেখা দিল। একটু চাপিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, "লেডী ইজাবেল, এক উপায় মাত্র আছে, যাতে আপনি আবার ঈষ্টলীনে ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তা বলিতে আমি ভরসা পাইতেছি না।"

ইজাবেল বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাই ত, ইনি কি বলিতে চান?

কার্লাইল কহিলেন, "লেডী ইজাবেল! যা আমি বলিব

হয়ত খুবই অসঙ্গত হইবে! যদি আপনি অসন্তুষ্ট হন, নিঃসঙ্কোচে আমাকে নিষেধ করিবেন। আমি কি সাহস করিয়া এই প্রার্থনা আপনাকে করিতে পারি, ঈষ্টলীনের কর্ত্রী হইয়া আপনি আবার ঈষ্টলীনে যান?"

"ঈষ্টলীনের কর্ত্রী হইয়া ঈষ্টলীনে যাইব! সে কি?" ইজাবেল সত্যই কার্লাইলের কথার মর্ম্মটা অনুধাবন করিতে পারে নাই।

কার্লাইল কহিলেন, "হাঁ, ঈষ্টলীনের কর্ত্রী—অর্থাৎ আমার পত্নীর অধিকারে——"

ইজাবেল যেন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন একটা সম্ভাবনাও কখনও তার মনে হয় নাই। ইজাবেল কার্লাইলকে অতি শ্রদ্ধা করিত, ছোটভগ্নী যেমন সরল বড় ভাইকে বড় একজন সহায় ও বান্ধবের মত দেখে, তেমনই তাঁকে দেখিত। বড় ভাইকে যেমন ছোটভগ্নী তার সব দুঃখের কথা মন খুলিয়া বলে, তেমনই মন খুলিয়া কার্লাইলকে সে তার দুঃখের সব কথা বলিতেছিল—কোনও কুণ্ঠা কোনও সঙ্কোচ অনুভব করে নাই। কার্লাইলের স্ত্রী—না, এমন একটা কথার আভাসও যে তার মনে কখনও জাগে নাই, সেরূপ কোনও ভাবও সে কার্লাইলের প্রতি অনুভব করে নাই।

একেবারে অপ্রত্যাশিত, চিন্তার অতীত, চিত্তের কামনার বিপরীত এই প্রস্তাব যখন কার্লাইল উপস্থিত করিলেন, মনটা প্রথমেই তার যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কার্লাইল তার হাতখানি ধরিয়া কথা বলিতেছিলেন, হাতখানি সে একটু টান দিল। কার্লাইল ছাড়িয়া দিলেন না, বরং আর এক হাতেও ইজাবেলের অন্য হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন। সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাণভরা যে প্রেমের আবেগ তিনি এতদিন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মুক্ত হইল, আকুলস্বরে তাঁহার সরল প্রাণের সকল স্নেহময় প্রেমের কথা তিনি ইজাবেলের সমীপে নিবেদন করিলেন। কাব্যনায়কের চপল-রসোদ্বেলতা তার মধ্যে কিছু ছিল না; কিন্তু এমন একটা ধীর গম্ভীর সহজ সরসতা তাহাতে ছিল, ধীরবুদ্ধি নারী মাত্রেরই প্রাণ—যাহা স্পর্শ করিতে পারে, আর তাহার মনে এই অনুভূতি জাগ্রত করে, এই প্রেমের অধিকারিণী হইলে কত সুখে সে থাকিবে। কিন্তু ইজাবেলের ঠিক তা হইল না,—তার চিত্তের সমক্ষে আর একজনের মোহন মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল! আহা, সে যদি এই সব প্রেমের কথা আজ বলিত, তার প্রেমের আশ্রয়ে তাকে গ্রহণ করিতে চাহিত, তবে তখনই হয় ত কৃতার্থ চিত্তে সে বলিয়া ফেলিত, "হাঁ, তাই হউক।"

সহসা লেডী মণ্টসেভার্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন, দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ব্যাপার কি। এমন একটা কঠোর তীব্রদৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন, যেন এই দৃশ্যের একটা কৈফিয়ৎ তিনি চান।

ইজাবেলের হাত ছাড়িয়া দিয়া কার্লাইল অগ্রসর হইলেন। ইজাবেল কোনও মতে একটু আত্মসম্বরণ করিয়া কার্লাইলকে জানাইল, "ইনি লেডী মণ্টসেভার্ণ।"

কার্লাইল নমস্কার করিয়া কহিলেন, "লর্ড মণ্টসেভার্ণ আমাকে জানেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তিনি বাড়ীতে নাই। আমি কার্লাইল।"

লেডী মণ্টসেভার্ণ কার্লাইলের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন, হাঁ, লোকটি সুপুরুষ বটে! কিন্তু এই সুপুরুষের এত আদর তিনি না পাইয়া যে ইজাবেল পাইল, ইহাতে একটু রাগও তাঁহার হইল। কহিলেন, "হাঁ, আপনার নাম আমি জানি,—তবে এটা জানিতাম না, ইজাবেলের সঙ্গে আপনার এত বেশী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছু আছে।"

কার্লাইল কহিলেন, "লেডী সাহেবা, লেডী ইজাবেলের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কোনওরূপ বেশী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার ছিল না। তবে যাতে তা ঘটে, সেই প্রার্থনাই আমি করিতেছিলাম। তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব আমি করিয়াছি।"

লেডী সাহেবা বাস্তবিকই তখন ইহাতে বেশ একটা আনন্দ বোধ করিলেন। তাঁহার চক্ষের বিষ ইজাবেলকে দূর করিবার বড় সহজ সুন্দর একটি পথ তিনি দেখিলেন। প্রসন্ন মুখে কহিলেন, "কৃতজ্ঞচিত্তেই আপনার এই প্রস্তাব ইজাবেলের গ্রহণ করা উচিত। সরলভাবেই আপনাকে বলিতেছি কার্লাইল সাহেব, কারণ আপনি জানেন তার অমিতাচারী পিতা তাকে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছেন। বিবাহ—বিশেষ উচ্চঘরে বিবাহ তার পক্ষে বড় সহজ হইবে না। ঈষ্টলীন শুনিয়াছি সুন্দর যায়গা।"

"হাঁ,—তবে খুব বড় যায়গা নয়

লেডী মণ্টসেভার্ণ তখন ইজাবেলের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তা লেডী ইজাবেল কি বলেন ?"

তাঁহাকে কোনও উত্তর না দিয়া কার্লাইলের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ইজাবেল কহিল, "কয়েকঘণ্টার সময় আমাকে দিবেন ? আমি একটু ভাবিয়া দেখিতে চাই।"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "আপনি যে আমার এই প্রস্তাব ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন, ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। তবু একটু আশার কথা ইহাতে আছে। বৈকালে আমি আবার আসিব।"

ইজাবেল বাহির হইয়া গেল। লেডী মণ্টসেভার্ণের সঙ্গে কার্লাইলের এসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনেক কথা হইল। বিবাহের একটা বৈষয়িক দিকও আছে। কি ভাবে সংসারের বন্দোবস্ত হইবে, পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া দম্পতি চলিতে পারিবে কি না, স্বামীর অভাবে স্ত্রীর জন্য আর্থিক ব্যবস্থাদি কিরূপ হইবে, এ সবও ভাবিতে হয়, আলোচনা করিতে হয়। লর্ডমণ্টসেভার্ণ অনুপস্থিত, সুতরাং ইজাবেলের অভিভাবিকা রূপে লেডী মণ্টসেভার্ণেরই এ সব কথার একটা আলোচনা করা উচিত হয়,—তাই তিনি করিলেন।

ওদিকে ইজাবেল তার ঘরে গিয়া অনেক ভাবিল,—কিন্তু ভাবিয়া সহজে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। সে এখনও সরলা বালিকা মাত্র,—জটিল বৈষয়িক ব্যবস্থাদি কি হইবে, হইতে পারে, বা হওয়া উচিত, এ সব কথা তার মনেও কিছু উঠিল না। সামাজিক পদমর্য্যাদায় কার্লাইল যে তার সমকক্ষ নন, একথাও তার বড় মনে পড়িল না। লর্ড মণ্টসেভার্ণের কন্যারূপে ঈষ্টলীন তার যে গৌরব ছিল, কার্লাইল স্ত্রী রূপে সে গৌরব থাকিবে না,—বড় ঘরের জাঁকজমক লোকজনের সমারোহ এ সব কিছু সেখানে আর ঘটিবে না, মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থের উপযোগী শান্ত জীবন যাপন করিতে হইবে, তার মত অভিজাতা অত বড় লর্ড দুহিতার পক্ষে সেটা তেমন তৃপ্তিকর নাও হইতে পারে, এ সব কথাও তার মনে পড়িল না। এই মাত্র সে বুঝিল, ঈষ্টলীনের গৃহিণীরূপে নিতান্ত অসুখে সে থাকিবে না বরং তার বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা সেটা অনেক বেশী সুখেরই হইবে।

কার্লাইল সাহেবকে তার বড় ভাল লাগিত, তাঁর সঙ্গে সময়টাও তার বেশ কাটিত। বস্তুতঃ ফ্রান্সিস লেভিসনের প্রতি তার চিত্তটা যে কেমন একটা মোহের টানে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তা যদি না হইত, হয়ত ক্রমে কার্লাইলকেই সে প্রেমের চক্ষে দেখিত। যাহাই হউক, লেডী মণ্টসেভার্ণের অধীনে এই কঠোর দাসত্ব হইতে মুক্তি সে যদি লাভ করে ঈষ্টলীন তার স্বর্গবাসের মত হইবে। আর সব দিকেই ত ভাল,—কিন্তু ঐ যে একটা খট্‌কা—ফ্রান্সিস্ লেভিসন। তাহা যে কিছুতেই দূর করা যায় না। মনটা সে ভাল করিয়া আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। না, কার্লাইলকে সে ঠিক ভালবাসে না! ভালবাসে—বোধ হয়—ফ্রান্সিস্ লেভিসন-কেই। আহা, সে যদি আজ তাকে বিবাহ করিতে চাহিত! কিন্তু হায়, কেন সে ফ্রান্সিস্ লেভিসনকে দেখিয়াছিল? যদি না দেখিত—এই টান যদি তার না জন্মিত—কত সুখী আজ সে হইত!

এমন সময় মিসেস্ লেভিসন আর লেডীমণ্টসেভার্ণ দুইজনে তার সেই নিভৃত গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইজাবেল দেখিল লেডী মণ্টসেভার্ণের ত কথাই নাই, মিসেস লেভিসন পর্য্যন্ত এই বিবাহসম্বন্ধ সব রকমে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। উভয়েই ইজাবেলকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য অনেক করিয়া বলিলেন। মিসেস্ লেভিসন্ এ পর্য্যন্ত বলিয়া ফেলিলেন, বড় ঘরের ফোকর ছোকরা গুলা কার্লাইলের কাছে কিছুই নয়। তাদের এক ডজন একত্র করিলেও একটা কার্লাইল হয় না!

ইজাবেল শুনিল, কিন্তু কিছু বলিল না, দ্বিধায় তার মনটা একবার এদিকে একবার ওদিকে ঝুঁকিতে লাগিল। সব সে বুঝিল,—কিন্তু ফ্রান্সিস লেভিসন যে দারুণ একটা বাধার মত পথে দাঁড়াইয়া, সে বাধাটা কিছুতেই সে দূর করিতে পারিতেছিল না। ক্রমে দিনটা কাটিয়া বৈকাল আসিল,—তখনও মাথাটা তার এই দারুণ দ্বিধার সঙ্কটে ঘুরিতেছিল, জানালার পথে সে দেখিল, কার্লাইল সাহেব আসিতেছেন; ধীরে ধীরে ইজাবেল নীচে নামিয়া আসিল। তখনও একবার একবার তার মনে হইতেছিল, আরও একটু সময় সে চাহিয়া নিবে।

নীচে নামিয়া সে দেখিল, ফ্রান্সিস লেভিসন দাঁড়াইয়া।

বুকটা তার বড় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল, না আর কাহাকেও বিবাহ করা তার উচিত হইবে না।

ফ্রান্সিস লেভিসন হালকা ভাবে হাসিয়া কহিল, তোমার সৌভাগ্যে তোমাকে সম্ভাষণ করিতেছি ইজাবেল। কার্লাইল খাসা লোক।”

ইজাবেল চমকিয়া তার দিকে চাহিল।

“চমকিয়া উঠিলে যে! সব জানি আমি। এমা সব বলিয়াছে। তা বেশ হইয়াছে। ঈষ্টলীন খাসা যায়গা,—তুমি সুখে থাক, এই কামনা করি।”

ইজাবেল ঈষৎ কম্পিত স্বরে উত্তর করিল, “আগেই এই কামনা? যদি তা নাই ঘটে?”

“বটে! আচ্ছা, তবে আমার এ কামনা এখন তুলিয়া রাখিলাম, যতদিন না তোমার মনের মানুষটি না আসে। তবে আমার সে ভাগ্য কখনও হইবে না। বিবাহ আমার পক্ষে অসম্ভব। পয়সা কড়ি তেমন নাই, আশাও বড় কিছু দেখিতেছি না। প্রজাপতির মত উড়িয়া বেড়ান ছাড়া আমাদের আর গতি নাই, হয়ত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাটাইয়া দিতে হইবে।”

এই বলিয়াই সে চলিয়া গেল। ইজাবেল স্পষ্ট তখন তার অভিপ্রায় বুঝিল। আর একটি কথাও প্রথম তার মনে গিয়া আঘাত করিল—ফ্রান্সিস্ লেভিসন লোক ভাল নয়, শঠ, নির্ম্মম!

ঠিক তখনই কার্লাইল গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইজাবেল চাহিয়া দেখিল। না, ইঁহার মধ্যে শঠতা কি নির্ম্মমতা কিছু নাই, অতি সরল সহৃদয় লোক ইনি। কার্লাইল দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া ইজাবেলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইজাবেল কিছু বলিতে পারিল না,—তার মুখখানি বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছিল।

কার্লাইল কহিলেন, “তারপর, আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ করিবেন?”

“হাঁ—কিন্তু—” ইজাবেল থামিয়া গেল,—এক ভাবের উপরে আর এক ভাবের তরঙ্গ তার চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল।—এই সংঘর্ষের বেগ একটু চাপিয়া দিয়া ইজাবেল কহিল, “কিন্তু—একটি কথা আমি বলিব—”

“বলিবে—বলিবে! তার জন্ম এত ব্যস্ত কেন? আর কথা যাই থাক্ তার জন্য এত তাড়া কিছু নাই। ইজাবেল! আজ তুমি যে কি সুখী আমাকে করিলে, তা বলিতে পারি না।”

বলিতে বলিতে স্নেহে ইজাবেলের হাতখানি ধরিয়া একখানি কৌচ নিয়া তাকে বসাইলেন, নিজেও পাশে বসিলেন।

ভাবের আবেগে ইজাবেলের চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল, একটি কথা এখনই আমার বলা উচিত—তা বলিতে হইবে। আমি, ‘হাঁ’ বলিলাম—কিন্তু—কিন্তু—আমি এখনও—বড় হঠাৎ প্রস্তাবটা আসিয়াছে—আমি—আমি—আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করি—ভক্তি করি—কিন্তু—কিন্তু—ঠিক ভালবাসিতে এখনও পারি নাই।”

কার্লাইল একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, যে “সে একেবারেই সম্ভব নয়। পারিলেই আমি বরং বিস্মিত হইতাম। তবে—আশা করি ক্রমে তোমার ভালবাসা আমি লাভ করিতে পারিব। নয় ইজাবেল?”

“হাঁ—ভরসা করি—তা হইবে।”

কার্লাইল ইজাবেলকে স্নেহে তাঁহার কাছে টানিয়া নিলেন,—ইজাবেলের মুখে ভাবী-স্বামীরূপে গৃহীত প্রেমিকের অধিকারে প্রথম চুম্বনটি দিয়া কহিলেন, “ইহাই যে আমি চাই ইজাবেল,—বেশী আর কিছু নয়।”

পরদিনও কার্লাইল আসিলেন। স্থির হইয়াছিল, বিবাহ অতি শীঘ্রই হইবে। তার বন্দোবস্তের সব কথা বার্ত্তা সব হইল। বিদায়ের সময় কার্লাইল কহিলেন, “উপায় নাই ইজাবেল, কয়েকটা দিন আর অপেক্ষা করিতেই হইবে। তোমাকে যে এখানে রাখিয়া যাইতেছি, প্রাণটা বড় কাঁদিতেছে! আহা, একেবারেই যদি তোমাকে সঙ্গে নিয়া যাইতে পারিতাম!”

ইজাবেল কহিল, “আহা, তা যদি হইত, কি সুখীই আমি হইতাম। এখানে যে আমি আর থাকিতে পারি না।”

বিদায়ের সময় বাস্তবিকই ইজাবেলের প্রাণটা কার্লাইলের আশ্রয়লাভের জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

সংযম

(যৌবনে)

অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা—প্রিয় শিষ্য। আদর্শ চরিত্রের কতটা কাছাকাছি হইলে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এরূপ সম্মান পাওয়া যাইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। অর্জ্জুনের অন্যান্য গুণের উল্লেখ না করিয়া কেবল সংযমের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও দেখা যায় তিনি মহাসংযমী। যুধিষ্ঠিরের ব্যসনাশক্তি, যাহা পাণ্ডবদিগকে অশেষ দুঃখের মধ্যে ফেলিয়াছিল, অর্জ্জুন সে সমস্ত দুঃখ অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংযম তাঁহাকে ভ্রাতৃমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দেয় নাই। দ্রৌপদীর বিবাহব্যাপারে কুন্তীর অশ্রুতপূর্ব্ব আদেশও তাঁহাকে সংযমভ্রষ্ট করিয়া মাতৃআজ্ঞা অবজ্ঞা করিতে দেয় নাই। উর্ব্বশীর অভিসারেও তাঁহাকে সংযমচ্যুত করিতে পারে নাই। এই সংযমী অর্জ্জুনও কোন সময়ে কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "হে কৃষ্ণ, মন বড়ই চঞ্চল—বড়ই অজেয়—বড়ই দুর্নিবার। বায়ুর চলাচল রোধ করা যেমন অসাধ্য, মনের চাঞ্চল্য রোধ করাও তেমনি অসাধ্য মনে হয়।" উত্তরে কৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা শুনিতে অতি সহজ, কিন্তু কার্য্যে অতি কঠোর। অথচ মনকে সংযত করিতে হইলে ঐ উপায় ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই। তিনি বলিলেন, "মন যে চঞ্চল এবং দুর্নিগ্রহ তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা তাহাকে বশে আনা যাইতে পারে।" এ অভ্যাস কিরূপে জন্মে? কৃষ্ণ বলিতেছেন, "মন বিক্ষিপ্ত হইয়া যে যে বিষয়ে যায়, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া পুনঃ পুনঃ আত্মাতে স্থির রাখিতে হইবে।" কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তখন আত্মা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। এই জন্য মনকে আত্মাতে স্থির রাখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই উপদেশে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনকে বিষয়ান্তর হইতে ফিরাইয়া আনিয়া পুনঃ পুনঃ ঈপ্সিত বিষয়ে আরোপ করাই অভ্যাস। মন যখন পরধনলোলুপ, তখন তাহাকে সবলে সেখান হইতে সরাইয়া আনিয়া অন্য সৎচিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সরাইয়া আনিলেও সে যক্ষের মত সেই ধনের আশেপাশে ঘুরিতে চাহিবে, কিন্তু তাহাকে পদে পদে বাধা দিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মন যখন ক্রোধে উন্মত্ত—রক্ত-পিপাসু; তখনও তাহাকে তেমনই করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া শান্তিতে স্থাপিত করিতে হইবে। যখন অসঙ্গত রমণীসৌন্দর্য্যপিপাসু, তখনও তাহার সেই শাস্তি, সেই নিগ্রহ। পদে পদে নিগৃহীত করিয়া তাহাকে মানুষের মত করিতে হইবে। এই নিগ্রহের অভ্যাস বাল্যকাল হইতে হওয়া উচিত, কেন না যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেহ যেমন সুস্থ সবল এবং উন্নত হইয়া ওঠে, মনও তেমনি সবল, বিচারশীল এবং ভাবপ্রবণ হইয়া ওঠে। তখন মানুষ পিতামাতার হাত ধরিয়া চলিতে চাহে না—সে আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এক দিকে যেমন আত্মনির্ভরতা ও বিচারশক্তি বাড়িয়া উঠে, অপরদিকে সমস্তগুলি মনোবৃত্তি তেমনি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। ভালটা তাহাকে যেমন সবলে আকর্ষণ করে, মন্দের প্রলোভনও তাহাকে তেমনি চঞ্চল করিয়া তোলে। শৈশবে যাহার হৃদয়ে সংযমের গোড়াপত্তন না হইয়াছে, সমস্ত বিচারশক্তিও তাহাকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারে না। সংস্কারের অভাবে মনের গলি-ঘুঁচির মধ্যে যেখানে পবিত্রতার আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সেই সকল স্থান হইতে সহস্র প্রকারের প্রলোভন দিবারাত্র চাহনিতে ইঙ্গিতে তাহাকে মুগ্ধ করিবার জন্য উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। অসংযতমনা যুবকের পক্ষে সে প্রলোভন উপেক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া যাহাদের বাল্যে সংযম শিক্ষা হয় নাই, তাহাদিগকে যে যৌবনে হতাশ হইয়া চেষ্টাবিমুখ হইতে হইবে তাহা নহে। পথ যত যত দুর্গম হইবে, চেষ্টা তত আন্তরিক তত প্রবল হওয়া চাই, এবং উদ্যম ও অধ্যবসায়কে তত অটল ও অবিচলিত রাখিতে হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর 'পক্ষীরাজ' ঘোড়াটিকে বাগ মানাইতে কিছুমাত্র কৃতিত্ব বা পৌরুষ আবশ্যক করে না—কৃতিত্ব ও পৌরুষ হইতেছে তেজস্বী ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে বাগ মানাইয়া রাখা। কার্য্য যত কঠোর, তাহার সাধনা তত ক্লেশকর, কিন্তু তাহার সিদ্ধি সুখপ্রদ। মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় ও

মন, অতিশয় দুর্দ্দমনীয়—যৌবনে তাহারা আরও দুর্দ্দমনীয় হয়। কিন্তু যতই দুর্দ্দমনীয় হউক না কেন, ইহারা একেবারে অজেয় নহে। প্রতিপদে ইহাদিগকে নির্জ্জিত করিয়া তবে বিজয়ী হইতে হইবে। সে বিজয়ের চেষ্টাকে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে জাগ্রত করিয়া রাখিতে হইবে। এ যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক মনুষ্যকে সমস্ত জীবনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া থাকিতে হইবে। এই যে যুদ্ধ, এই যে চেষ্টা, ইহাই সংযম। এই সংযম মানবের সর্ব্বশুভপ্রদ। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে ইহা সমভাবে আচরনীয়।

যদিও মনই সমস্ত মানসিক এবং দৈহিক কার্য্যের নিয়ন্তা, তাহা হইলেও সেই সমস্ত কৃতকার্য্যের ফলস্বরূপ যে সুখ দুঃখ তাহা কেবল মনই ভোগ করে তাহা নহে। শরীরও তাহার অংশী এবং ফলভোগী। শারীরিক দুঃখও অভ্যাস এবং সংযমদ্বারা দূর করা যাইতে পারে। শীত, উষ্ণ, রৌদ্র বৃষ্টি শরীরের ক্লেশ জন্মায়, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা শরীর এগুলিকে বিনাকষ্টে সহ্য করিতে পারে। অর্থাৎ অভ্যাসের ফলে, শরীরের এরূপ অবস্থা জন্মে যাহাতে শীতোষ্ণাদি ক্লেশ অনুভূত হয় না। এই বাংলা দেশের মধ্যে জল বায়ু, শীত গ্রীষ্ম, রৌদ্র বৃষ্টি, সর্ব্বত্রই প্রায় সমান। সমান হইলেও কিন্তু বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর লোক সমভাবে এই রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। যাঁহারা ভদ্রশ্রেণীর লোক, তাঁহাদের শীতগ্রীষ্ম অভেদে, রৌদ্র উঠিলেই ছাতা চাই, গ্রীষ্মের জন্য পাখা চাই, স্থান এবং অবস্থা বিশেষে বরফ জল, সোডা, লেমনেড্ সরবৎ প্রভৃতি নানা প্রকার পানীয়ের আবশ্যক হইয়া পড়ে। ঐ গুলির অভাবে শরীর ক্লেশ অনুভব করে। অথচ দেখিতে পাই, এক শ্রেণীর লোক চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে মাথায় কিছুমাত্র আবরণ না দিয়া অক্লেশে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছায়াহীন মাঠে কাজ করিতেছে। সূর্য্যের কিরণ তাহাদিগের দেহ হইতে যেন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। গ্রীষ্ম এবং রৌদ্রের ক্লেশ তাহারা অনুভবই করিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে কে সুখী তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হয় না। একজন কাতর, বিপন্ন, কাপুরুষ, পরাধীন, আর একজন স্বাধীন, প্রকৃতিকে জয় করিয়া বিজয়ী বীরের মত নির্ভীক যোগস্থ ঋষির মত নির্ব্বিকার। বর্ষার বাতাস, শীতের হিম, গায়ে লাগিবার ভয়ে একজন ঘরের ক্ষুদ্র ছিদ্রটি পর্য্যন্ত ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া কোনও মতে আতঙ্কে দিন কাটাইতেছে, আর একজন বর্ষার অজস্র ধারা মাথায় ধরিয়া, মাঘের শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া বিরাট পুরুষের মত অটল রহিয়াছে। কে সুখী তাহা কি বলিতে হইবে? এই যে স্বাধীন ভাব, এই যে যোগস্থ অবস্থা এবং তজ্জনিত যে সুখ, তাহার সাধনা অতি সহজ। সে বিজয়ের পথ অভ্যাস। যাহা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে সম্ভব, তাহা অপরশ্রেণীর পক্ষেও সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে চাই কেবল অভ্যাস। এ অভ্যাস বাল্যকাল হইতে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই ভাল। যৌবনেও ইহা অসাধ্য নহে। ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, রৌদ্র বৃষ্টি হিম সহ্য করিতে শিখিতে হয়। এক কি দুই বৎসর পরে দেখা যাইবে ভদ্রলোকও তাঁহার সমস্ত ভদ্রতা রক্ষা করিয়া কৃষকের মত রৌদ্রবৃষ্টিসহিষ্ণু হইয়াছেন। তখন তিনি ছাতা না হইলেও শুখিয়া যাইবেন না,—শীতেও জমিয়া যাইবেন না।

কেবল শীতগ্রীষ্ম কেন, সর্ব্বপ্রকার দৈহিক ক্লেশই ধীরে ধীরে অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করা যাইতে পারে। ইহাতে শরীর দৃঢ় কর্ম্মঠ এবং নীরোগ হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন সুস্থশরীর ভিন্ন ধর্ম্মসাধন হয় না। কথাটা অতি সত্য, শরীর সুস্থ না হইলে মনের প্রসন্নতা জন্মে না এবং মন প্রসন্ন না হইলে ধর্ম্মাচরণও সম্ভব নহে। ধর্ম্মের নামে যদি কেহ বানপ্রস্থের চিত্র মনে আঁকিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠেন, কিম্বা শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মত নীরস জীবন যাপনের কঠোরতায় কাতর হইয়া পড়েন, তিনি যেন মনে রাখেন যে, তাঁহার মত গৃহীও গৃহে থাকিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া গৃহাশ্রমে ধর্ম্মই পালন করিতেছেন। এই গৃহধর্ম্ম পালন করিতেও সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু শরীরের আবশ্যক। গৃহধর্ম্মের পথ ও পুষ্পমণ্ডিত নহে। গৃহ ধর্ম্মের অর্থ বিলাস নহে, উহা কঠোর কর্ত্তব্য পালন। নিস্তেজ, দুর্ব্বল, অক্ষম এখানে পদে পদে পরাজয়ের অপমানে লাঞ্ছিতই হইবে। বিজয়ীর সম্মান পাইতে হইলে অন্তরে ও বাহিরে বীর হইতে হইবে।

শরীরকে শীতাতপ সহিষ্ণু করিতে হইলেই পরিচ্ছদের সংযম আপনা হইতেই আসিবে। ভোগ এবং বিলাস

সংযমের বিরোধী। পরিচ্ছদের বিলাসও সংযমের বিরোধী। এই জন্য স্বাস্থ্য এবং শীলতা রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক, পরিচ্ছদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তাহার বেশী কিছু করিতে গেলেই ভোগ বাসনা এবং বিলাস উদ্দীপ্ত করিবে। সুতরাং পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও যুবকদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। বালকেরা তাহাদিগের অভিভাবকের রুচি অনুসারে চালিত হয়, সুতরাং তাহারা পথভ্রান্ত হইলে সে দোষ অভিভাবকদিগের। কিন্তু যুবকেরা এ বিষয়ে নিরঙ্কুশ। কাজেই সমস্ত ত্রুটি এবং স্খলনের জন্য তাঁহারা নিজেরাই দায়ী। যুবকেরা স্বাধীন। তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া। যাহাদিগের সংস্পর্শে তাঁহাদিগকে আসিতে হয়, তাহাদের রুচি বিভিন্ন, কার্য্য বিভিন্ন, ধর্ম্ম বিভিন্ন, বুদ্ধি বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যুবকেরা অনেক সময়েই তাঁহাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন। স্বাধীনতা, সংযমের বন্ধন কাটাইলেই যথেচ্ছাচারে পরিণত হয়। সুতরাং যুবকদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে, অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হইবে। আমাদিগের মধ্যে একটা প্রবৃত্তি আছে যাহা আমাদিগকে অনুকরণ করিতে শিখায়। অনুকরণ প্রবৃত্তি আমাদিগকে ভাল হইতেও শিখাইয়েছে আবার ময়ূরপুচ্ছশোভ দাঁড়কাক হইতেও শিখাইয়েছে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এই প্রবৃত্তিটা এখন আমাদের মধ্যে একটা ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যাধি তাহার কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মত সহস্র বাহু দিয়া আমাদিগকে এমন করিয়া আকড়াইয়া ধরিয়াছে যে, আমরা কিছুতেই তাহার আলিঙ্গন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না। শুনা যায় এক জাতির সাপের চোখে এমন মোহিনীশক্তি আছে যে, দৈবদুর্ব্বিপাকে কোন জীব তাহাদের নিকটে যাইয়া পড়িলে, সে শক্তি এড়াইয়া কিছুতেই পলাইতে পারে না, বরং মুগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আমরাও এই সহস্রশীর্ষ নাগিনীটার মোহে এমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি যে, বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল তাহার দিকে অগ্রসরই হইয়া যাইতেছি, মৃত্যুও বোধ হয় অদূরে দাঁড়াইয়া আমাদের অপেক্ষা করিতেছে; কেন না পেটে না খাইয়াও বাবুগিরি করিবার স্পৃহা আজকাল সমাজের সকল স্তরেই দৃঢ়মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অর্থনৈতিক দিকটা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় পরিচ্ছদ-সমস্যা একটা সমাজসমস্যা সৃষ্টি করিতেছে। কাব্য-কারেরা বলেন, মৃত্যুর কাছে ছোটবড়, ভালমন্দ, উচ্চ নীচ, সব সমান। কিন্তু পরিচ্ছদ বোধহয় সমীকরণ মাহাত্ম্যে মৃত্যু অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। ইহার আবরণের মধ্যে থাকিয়া, নীচ উচ্চ হয়, অভদ্র ভদ্র হয়, নির্ধন ধনী হয়, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হয়। যাহাকে পথে দেখিলে লোকে শঙ্কিত হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, উপযুক্ত আবরণের অন্তরালে থাকিলে সে গৃহের মধ্যেও সাদরে আহুত হয়। ফলে, ইহা পাত্রাপাত্র, ভদ্রাভদ্রের ভেদ ঘুচাইয়া সমাজকে খিচুড়িতে পরিণত করিতে যাইতেছে। অসংগত পরিচ্ছদ-স্পৃহা একদিকে আমাদিগকে অমিতব্যয়ী করিয়া দরিদ্র করিতেছে, আর একদিকে অসাধুকে সাধুর সম্মান দিয়া সমাজের নৈতিক অবনতি সম্পাদন করিতেছে। সমুদ্র পার হইতে যে ফ্যাসানের স্রোত আমাদের দেশকে প্লাবিত করিতেছে, তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে অনেকটা শক্তি, অনেকটা সাহসের আবশ্যক। ফ্যাসানকে অবহেলা করিয়া কয়টি যুবক ফ্যাসানপ্লাবিত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহস করেন? কিন্তু পরিবারের মঙ্গলকল্পে, সমাজের মঙ্গলকল্পে এবং আত্মার মঙ্গলকল্পে, এ সাহস দেখাইতেই হইবে। এ সাহস দেখাইতে হইলে, বিদ্যাসাগরের মত দৃঢ় এবং সাহসী হইতে হইবে। বালির বাঁধ বৃষ্টি বিন্দুর আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু পাথরে লাগিলে মহাসমুদ্রের তরঙ্গও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, সুখ পরাভূত করিয়া, পরাজিত হইয়া নহে।

কি অশনে, কি বসনে, কি ভূষণে আমাদিগের মধ্যে উৎকট বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। ইহা আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে অপব্যয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আয় অপেক্ষা আমাদের ব্যয় দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে। "আয় বুঝিয়া ব্যয় করিও" কথাটা যদিও নিতান্তই খাঁটি স্বদেশী জিনিষ, তাহা হইলেও এখন যেন ওটা আমাদের একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। দৈবাৎ কখনও উহার সহিত দেখা হইলে আমরা নিতান্ত ঘৃণায় পাশ কাটাইতে চাই। কেবল যে ঐ কথাটাকেই আমরা অবজ্ঞা করি তাহা নহে; যে উহাকে মানিয়া চলিতে চায় তাহাকেও আমরা সু-নজরে দেখিতে পারি না। ফল কথা, সকল প্রকারের স্বাস্থ্য

এবং অন্যান্য শারীরিক এবং সামাজিক দাবী দিবারাত্র নানা ভঙ্গিতে আমাদের সম্মুখে হাত পাতিয়া এমন তারস্বরে "দেহি", "দেহি", করিতেছে যে, আমাদের মাথা ঠিক রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আয়ের গণ্ডীর মধ্যে ব্যয়কে আর চাপিয়া ঠাসিয়া কিছুতেই আটকাইয়া রাখা যাইতেছে না। উত্তপ্ত বয়লারের মধ্যের বাষ্পরাশির মত সে কেবল মুক্ত হইবার জন্য পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দেশ বিদেশের নূতন নূতন বিলাস ব্যসন যতই ইন্ধন যোগাইতেছে, অবরুদ্ধ ব্যয় ততই অস্থির, চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। সীমালঙ্ঘন করিবার জন্য চাঞ্চল্য আমাদের জীবনের সর্ব্বদিকে যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। আহারে, বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, বাক্যে ব্যবহারে সীমালঙ্ঘন করিবার জন্য আমরা ব্যস্ত। এই অমিতাচারে যেমন ব্যক্তিগত শক্তির অপচয় হয়, তেমনি জাতির শক্তিরও অপচয় হয়। পৃথিবীর যে সমস্ত জাতির সংস্পর্শে আমাদিগকে থাকিতে হইতেছে, তুলনায় আমরা তাহাদের অপেক্ষা প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই দুর্ব্বল। দুর্ব্বলকে সবলের সংঘর্ষে টিকিয়া থাকিতে হইলে, তাহাকে শক্তি সংরক্ষণ করিতে হইবে, নতুবা ধ্বংস অনিবার্য্য। সংযম দ্বারা যেমন নৈতিক বল সংরক্ষণ প্রয়োজন, তেমনি দৈহিক এবং আর্থিক বল সংরক্ষণও আবশ্যক।

খাদ্য, দৈহিক বল রক্ষার প্রধান অঙ্গ। খাদ্যাখাদ্যের বিচারে, বল এবং স্বাস্থ্যই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বৎসরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬০ দিন যাহা খাইয়া দেহ রক্ষা হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহাই খাদ্য। অবশিষ্ট ৫ দিন যদি মাংস, কালিয়া, পোলাও খাওয়া হয়, তাহা কেবল জিহ্বার তৃপ্তির জন্য—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নহে। আমাদের প্রধান খাদ্য ডা'ল, ভাত, মাছ তরকারী, দুগ্ধ এবং ঘৃত। প্রত্যেক যুবকই দুই-চার মাস লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবেন, ইহার মধ্যে কোনগুলিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সেই গুলি ভিন্ন অন্য সমস্ত তিনি ত্যাগ করিতে পারেন। খাদ্যের পরিমাণও ঠিক করিয়া লওয়া কঠিন কার্য্য নহে। আমরা দেহরক্ষার জন্যই বা কতটুকু খাই, এবং লোভে পড়িয়াই বা কতখানি বেশী খাইয়া ফেলি, তাহা খাইবার সময়েই বেশ বোঝা যায়। সুতরাং কতটুকু খাইলে সংযমভ্রষ্ট হইতে হয় না, তাহা নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিই বলিয়া দেয়।

জিহ্বা যে কেবল খাদ্য দ্রব্যের লোভে উদরে দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে তাহা নহে, উহা বাক্যবাণেও অগ্নিকাণ্ড বাধাইতে পারে। মানুষের ঐ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়টুকুতে যে কত বিষ আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। উহার সামান্য একটু আন্দোলনে, শান্তিময়ী পৃথিবী নররক্তে রঞ্জিত হইয়া যায়, উহার একটু আঘাতে চিরসুখী চিরদুঃখী হইয়া পড়ে, উহার সামান্য কণ্ডুয়নে, হিংসা দ্বেষ, প্রতিহিংসা, ক্রোধ, মানুষের বুকে খুনীর রক্তচক্ষুর মত জ্বলিয়া ওঠে। অসংযত জিহ্বার আঘাতের মত মর্ম্মন্তুদ বেদনা বোধ হয় জগতের কোন নারকীয় অস্ত্রে নাই। কিন্তু সংযত হইলে এই জিহ্বাই আবার সতর্ক প্রহরীর মত, প্রত্যেকটি অসঙ্গত কথার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। তখন উহা বিষের পরিবর্ত্তে সুধা সিঞ্চন করে। তখন উহা কত আশাহীনের কাণে আশার বাণী শুনায়, কত ব্যথা কাতর হৃদয়ে শান্তি আনিয়া দেয়, কত তপ্ত বক্ষ, সমবেদনায় স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। তখন উহা হইতে ভগবানের করুণার অমৃত-কাহিনী ক্ষরিত হইয়া জগৎ তৃপ্ত করে।

পরিচ্ছদের সংযমে মানুষকে নিরহঙ্কারী করে; আহার সংযমে, মানুষকে শুদ্ধ, সন্তুষ্ট এবং নির্লোভ করে; বাক্‌সংযমে মানুষকে অক্রোধী করে।

সংযম শিক্ষার জন্য প্রত্যেক যুবক যুবতীর কতগুলি আদর্শ চরিত্র সর্ব্বদা সম্মুখে রাখা উচিত। আমাদের দেশে এরূপ আদর্শের অভাব নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। একটা চলতি কথা আছে, "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" স্বর্গবাস সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ থাকিলেও, অসৎসঙ্গে যে সর্ব্বনাশ হয়, তাহাতে বোধ হয় কাহারো সন্দেহ হইবে না। সঙ্গ বলিতে কেবল মানুষেরই সঙ্গ নহে। অসৎ চিন্তা এবং অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠও অসৎসঙ্গ। যাহা কিছু ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তির মূলে আঘাত করে, যাহা কিছু সমাজ-শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ করে, তাহাই অসৎ, তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। 'বটতলা' সাহিত্য সর্ব্বদেশেই আছে এবং সর্ব্বদেশেই তাহা আত্মার কল্যাণের জন্য সমভাবে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ইহা মানুষকে পশু করে, কিন্তু একখানি "ধর্ম্মতত্ত্ব" যে জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া ধর্ম্মভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করে, একখানি "গীতাঞ্জলি"র "তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে" বলিয়া যে চিরন্তন সত্যের

সন্ধান বলিয়া দেয় একখানি "পারিবারিক প্রবন্ধ" যে পারিবত্র গার্হস্থ্যনীতি শিক্ষা দেয়—তাহা মানুষকে দেবতা করে।

মানুষই বল, আর পুস্তকই বল, ইহারা নিত্যসঙ্গী নহে। মনই হইতেছে মানুষের নিত্যসহচর। মন দিবারাত্র সহস্র প্রকারের কল্পনা বিবিধ বৈচিত্রে সাজাইয়া অন্তরেন্দ্রিয়ের সম্মুখে ধরিতেছে এবং বাহেন্দ্রিয়কে তাহার জন্য লোলুপ করিয়া তুলিতেছে। কয়জন লোক এই উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাগুলিকে মানুষের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে সাহস পায়? ফরাসি মন্টেইন্ বলেন, "জগতের প্রত্যেকটি মানুষ যদি সরলভাবে আপন আপন মনের কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেককেই অন্ততঃ পাঁচ ছয় বার করিয়া ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হয়।" কথাটা যে কত সত্য তাহা বুঝিতে হইলে কেবল একবার নিজের মনের দিকে চাহিতে হয়। এরূপ কুচিন্তাগুলিকে কেবল "চিন্তা-মাত্র" বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। সমাজশাসনের আইনে যে চিন্তার জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হয়, সে চিন্তার জন্য ভগবানের অখণ্ড ন্যায় যে কোন শাস্তি বিধান করে নাই, তাহা মনে করা নিতান্তই ভুল। পুনঃ পুনঃ কুচিন্তার দ্বারা যে নৈতিক অবনতি জন্মায় তাহার ফল অমোঘ। প্রত্যেক যুবকযুবতী এই কুসঙ্গীটিকে দূরে রাখিবেন। কুচিন্তা হইতে মনকে মুক্ত রাখিতে হইলে যে বড় বেশী কিছু সাধনার আবশ্যক তাহাও নহে। আলস্যের রুদ্ধ বায়ুতে ইহা আগাছার মত বাড়িয়া ওঠে। জগতে কার্য্যের অভাব নাই। এই কর্ম্ম সমুদ্রের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দাও, দেখিবে লঘু কুচিন্তা তোমাকে ধরিতে না পারিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশ, কর্ম্মের দেশ। এখানে কর্ম্ম-বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষের জন্যও কর্ম্মের বিধান আছে। আমাদের গৃহে সহস্র কর্ত্তব্য আমাদের মুখ চাহিয়া আছে, সহস্র নিরন্ন ক্ষুধার তাড়নে আর্ত্তকণ্ঠে আমাদের সম্মুখে হাত পাতিয়া রহিয়াছে, সহস্র প্রিয়বিচ্ছেদকাতর নরনারী দীন-নয়নে আমাদের কাছে সান্ত্বনা চাহিতেছে, সহস্র অসহায় পাপের পঙ্কে ডুবিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিতেছে। চারিদিকে কর্ম্ম সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছে, এ কি বসিয়া বসিয়া স্বপ্ন দেখিবার সময়? চিন্তা-সংযমের এমন প্রশস্ত রাজপথ পড়িয়া থাকিতে যে ঘরের কোণের রুদ্ধ বায়ুতে পড়িয়া মরে, তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

লোভ ক্রোধ অহঙ্কার প্রভৃতি যদি মনকে উত্তেজিত করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের সংমিশ্রণে যে সকল ভাব জন্মে, তাহারাও মনকে উত্তেজিত করিতে পারিবে না। যেখানে লোভ নাই, ক্রোধ নাই—সেখানে হিংসা দ্বেষ আসিতে পারে না; মানুষ নিরহঙ্কার, অবিনয়ী হইতে পারে না। কিন্তু সংসারে নিরহঙ্কার কয়জন এবং বিনয়ীই বা কয়জন? অহঙ্কার আমাদের সমস্ত "অহম" টুকুকে পূর্ণ করিয়া আছে। রূপের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার, বংশের অহঙ্কার বুদ্ধির অহঙ্কার, অনন্ত পাপরাশি বুকে পুষিয়া যে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেই তাহারও অহঙ্কার। প্রত্যেকটি মনোবৃত্তির কার্য্য কেবল অহঙ্কারের বুদ্বুদে স্ফীত। যতদিন এই অহঙ্কার থাকে, ততদিন মানুষ আপনাকে জানে না। সে কুৎসিৎ হইয়াও আপনাকে সুন্দর মনে করে এবং মূর্খ হইয়াও আপনাকে পণ্ডিত মনে করে, নিষ্ঠুর হইয়াও আপনাকে দয়ালু মনে করে, ঘোর অত্যাচারী হইয়াও আপনাকে ন্যায়বান্ মনে করে। আপনার সহস্র স্খলন পতন তাহার চোখে পড়ে না। ইহা কি শোচনীয় মোহান্ধ অবস্থা! কিন্তু এ মোহের আবরণ কিসে যায়? আত্মানুসন্ধান ইহার ঔষধ। জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্য, প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি বাক্যকে নির্ম্মমভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার প্রকৃত মূল্য কি? এইরূপ পরীক্ষা করিতে হইলে, আপনাকে অপরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। একটু স্থির হইয়া দেখিতে গেলেই বুঝিতে পারিবে যে বুদ্ধির অহঙ্কারে তুমি আপনাকে এত বড় মনে করিতেছ, তাহা কত তুচ্ছ কত সামান্য। এইরূপে পরীক্ষায় দেখিতে পাইবে, হয়ত একজন মুটের মধ্যে যে সত্যপ্রিয়তা আছে, তোমার মধ্যে তাহা নাই; একজন ধীবরের মধ্যে যে সরলতা আছে, তোমার মধ্যে তাহা নাই, কিম্বা একজন চর্ম্মকারের মধ্যে যে উদারতা ও স্বার্থত্যাগ আছে, তোমার মধ্যে তাহা নাই। এমনি করিয়া দেখিতে পাইবে, রূপে, গুণে, জ্ঞানে এমন শত শত লোক আছেন যাঁহারা তোমার অনেক উচ্চে। তখন তোমার মিথ্যা অভিমান কোথায় থাকিবে? এই অভিমান যে দিন যায়, মানুষ সেইদিন বুঝিতে পারে, তাহার স্থান কোথায়। সেই দিন সেই জ্ঞানের মধ্য দিয়া সে যে দীনতা অনুভব করে, তাহাই বিনয়।

অসংযত লোভ ক্রোধ অহঙ্কার যুবক যুবতীদিগের যে অনিষ্ট করিতে না পারে, এক অসংযত কামপ্রবৃত্তি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অনিষ্ট করে। যৌবনেই ইহার উন্মেষ এবং যৌবনেই ইহার প্রাবল্য। এই জন্য ইহার সংযম শিক্ষাও যৌবনেই করিতে হইবে। পূর্ব্বে আমাদের সমাজে এই সংযম শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ছিল। প্রত্যেক যুবকের ইহা আচরণীয় ছিল। এখন শিক্ষার সেই অপূর্ব্ব লোকহিতকর পদ্ধতি লোপ হইয়াছে। পদ্ধতি লোপ পাইলেও, সেই মহৎ সত্য আমাদের মধ্য হইতে লোপ পায় নাই। সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে, সর্ব্বকার্য্যে, কায়মনোবাক্যে কামপ্রবৃত্তিকে ত্যাগ করাই ব্রহ্মচর্য্য। অবিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য্য—বিবাহিত জীবনকে সংযমের দ্বারা গৌরবান্বিত করে।

প্রকৃত স্নেহ, প্রেম ভালবাসা, ভগবানের অনন্ত স্নেহ, অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত ভালবাসার আভাস মাত্র। উহারা মনকে ঈশ্বরাভিমুখ করে। ঈশ্বরাভিমুখ হওয়াতেই তাহাদের সার্থকতা। মনোবৃত্তিগুলি ঈশ্বরাভিমুখ করিতে হইলে সংযম ভিন্ন আরও একটি বস্তুর আবশ্যক, সেটি অনুশীলন। সংযম সাধারণতঃ ইতর প্রবৃত্তিগুলির সীমা নির্দ্দেশ করে। অনুশীলন উচ্চতর প্রবৃত্তি গুলিকে বিকশিত করিয়া ভগবানের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করে।

সংযম, অনুশীলন, নিবৃত্তি সমস্তই সম্ভব; যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে। সেই বিশ্বাসই মানুষকে জীবনের সমস্ত কার্য্যের মধ্য দিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই জন্য জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্য এরূপ হওয়া উচিত, যেন তাহা ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। জ্ঞান মন ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু করিবে, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা কিছু করিবে তাহা যেন ব্রহ্মার্পণের উপযুক্ত হয়। ইহাই সংযম।

(বার্দ্ধক্যে)

এই ত গেল যৌবনের কথা। কিন্তু বার্দ্ধক্যে যাঁহাদের সংযম শিক্ষা দিতে হয়, তাঁহাদের উপদেষ্টা হওয়ার মত বিড়ম্বনা বুঝি আর নাই। যে বয়সে কয়েকটা পক্ক কেশের জোরে, অতি গুরু বিষয়কেও অভিজ্ঞতার নামে বৈতরণী পার করা যায়, সে বয়সে সংযমের কথা শুনাইতে গেলে, উপদেষ্টারই যে অকালে বৈতরণী পার হইবার সম্ভাবনা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেন না কথাটা গুরুতর হইলেও অসংযত বৃদ্ধের পক্ষে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা থাকিলেও, আজীবনের অভ্যস্ত পথটাকে ত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিবার মত শক্তি, উৎসাহ এবং দৃঢ়তা থাকে না। জীবনব্যাপী সাধনা, যাহা সমস্ত প্রবৃত্তি গুলিকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া দিয়াছে, সেই সাধনার মূল উচ্ছেদ করিতে হইলে অস্ত্রোপচার এত গভীর করিতে হয় যে, তাহাতে রোগীর প্রাণসংশয় হইতে পারে। কিন্তু তথাপি যাহা লইয়া মনুষ্যত্বের গৌরব, তাহার জন্য মৃত্যুপণ করিতে হইবে।

যিনি বাল্যে এবং যৌবনে অসংযত জীবন যাপন করিয়াছেন, তিনি কি সম্বল লইয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হন তাহা দেখিবার বিষয়। মানুষের সম্বল দেহ, মন, অর্থ। যিনি স্বেচ্ছাচারী, বার্দ্ধক্যে তাঁহার জীর্ণ দেহ এবং ভগ্নস্বাস্থ্য ভিন্ন আর কি থাকে? বয়োধর্ম্মে, বল, বীর্য্য, তেজ, সাহস আপনা হইতেই কমিয়া যায়। অপব্যবহার করিলে তাহা একেবারেই লুপ্ত হয়। অর্থ যে কত চঞ্চল, তাহা অনাদিকাল হইতে কাব্যে গাথায় বলা হইতেছে। চাক্ষুষও দেখিতে পাই, অপব্যয়ী লক্ষপতির সন্তান কেমন সহজে অনায়াসে সমস্ত বিষয় উড়াইয়া দিয়া তরুতল আশ্রয় করিতেছে। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া রাখিতে হইলে, নিতান্তই তাহার বাহন পেচকটির মত ধীর হইয়া, বিলাসের প্রদীপ্ত আলোক পাছে চোখে লাগে এই ভয়ে, গৃহের কোটরে চোক বুজিয়া থাকিতে হয়। নতুবা বিলাসের রঙ্গিন্ আলোকে চক্ষু দুইটা একবার রঙ্গিয়া উঠিলে, চঞ্চলাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। সুতরাং সমস্ত জীবন ভরিয়া যিনি এই রঙ্গিন্ নেশায় ভোর ছিলেন, বার্দ্ধক্যে যখন তিনি চোক্ মুছিয়া চাহিয়া দেখিবার অবসর পান, তখন দেখিবেন লক্ষ্মী অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন। দেহ এবং চিত্ত সম্বন্ধে ত এই অবস্থা; মানসিক অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। অভ্যাস যেন সমস্ত মনকে একটা লোহার ছাঁচে এমন করিয়া আটকাইয়াছে যে তাহার আর পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। অবস্থাটা নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও দুর্ব্বল ইচ্ছা, কিছুতেই সে ছাঁচটাকে ভাঙ্গিয়া মনকে মুক্ত করিয়া দিতে পারে না। মানুষ, যাহার বীর্য্য অসীম, বিক্রম অনন্ত, যাহার জ্ঞানের সীমা কোথায় এখনো কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই, সেই

মানুষের একি দুর্দ্দশা! কিন্তু চেষ্টা করিলে, সাধনা করিলে, এ অবস্থা হইতেও, মানুষ আপনাকে রক্ষা করিতে পারে। হতাশ হইয়া, স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে চলিবে না। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে হইবে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে সেনাপতিরা সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ছোটখাট বক্তৃতা করিয়া থাকেন। যাঁহার ভাষা যত প্রাণস্পর্শী, উন্মাদনাময়, যুদ্ধজয়ের পক্ষে তাহা ততই উপযোগী! বহুশত বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভে, সর্ব্বজয়ী অর্জ্জুনের হস্ত হইতে যখন সংশয়ে ভয়ে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছিল, তখন যে অপূর্ব্ব আশার বাণী অর্জ্জুনকে তাহার ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, আজিও সেই বাণী সমস্ত সংশয়ী, সমস্ত ভীরু কাপুরুষদিগকে গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছে, "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ"—ক্লীব হইওনা। আমরা মানুষ তাই মানুষের মত হইবার জন্য তাঁহার পাঞ্চজন্য যুগে যুগে নিনাদিত হইয়া বলিতেছে,—"নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে, ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।" পাঞ্চজন্যের গম্ভীরধ্বনি সমস্ত নৈরাশ্য ডুবাইয়া মানুষের কাণে কাণে বাজিতে থাকুক, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য কোথায় চলিয়া যাইবে! সামান্য রিপু কয়টা এক মুহূর্ত্তে নির্জ্জিত, নিধ্বস্ত হইবে।

ক্লৈব্য ত্যাগ কর—ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর, শত্রু পদদলিত হইবে, ইহাঅপেক্ষা আশার বাণী বৃদ্ধের পক্ষে আর কি হইতে পারে!

ভগবানের নিয়মের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত মঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধের বার্দ্ধক্যই তাহার সংযম শিক্ষার নবীন চেষ্টায় অনেকটা সহায়তা করে, মৃত্যুর অদূরে দাঁড়াইলে বৃদ্ধের সমস্ত অসংযত সংস্কারের কঠোরতার মধ্যেও এমন একটা নিরাশ্রয় ভাব এবং অজ্ঞাত ভীতি জাগিয়া ওঠে, যাহা তাহার অসহায় মনটিকে ভগবানের জন্য আকুল করিয়া তোলে। এই আকুলতাই বৃদ্ধের সম্পদ, ইহাতেই সে সমস্ত জীবনের অভ্যাসকে জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করিবার শক্তি পায়! বার্দ্ধক্যে এই আকুলতা স্বাভাবিক, যৌবনে ইহা কদাচিৎ লক্ষ্য হয়।

মানুষ যতই উচ্ছৃঙ্খল, যতই ধর্ম্মদ্বেষী, যতই পাপকর্ম্মী হউক না কেন, মৃত্যুর "বিজয়োদ্ধত ধ্বজপটের" সম্মুখে দাঁড়াইলে, সে কেমন যেন বিহ্বল হইয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। সেই বিহ্বলতার মধ্যে সে অজ্ঞাতসারে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। সুতরাং বৃদ্ধের দীর্ঘকালের অভ্যাসে বিকারগ্রস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সুস্থ করিতে যতটা আয়াস আবশ্যক বলিয়া মনে করা যায়, ভগবানের মঙ্গল বিধানে প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ততটা আয়াস করিতে হয় না। যৌবনের উচ্ছ্বাস আবেগ বৃদ্ধের মধ্যে থাকে না, যৌবনের অনমনীয় দৃঢ়তাও বৃদ্ধের মধ্যে থাকে না। সুতরাং পরিবর্ত্তনের জন্য যুবককে যত কঠোর যুদ্ধ করিতে হয়, বৃদ্ধকে তত কঠোর যুদ্ধ করিতে হয় না। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি যখন শিথিল হইয়া পড়ে, তখন, দুর্ব্বল মনেও নূতন প্রলোভনে আকৃষ্ট হইবার মত সজীবতা থাকেনা, জীর্ণ শরীরেও রিপুর ভোগপাত্র বহন করিবার শক্তি থাকে না। সে কেবল যৌবনের অর্জ্জিত অভ্যাসের শক্তিতে, আজন্মপরিচিত নির্দ্দিষ্ট পথে কোন প্রকারে গড়াইয়া যাইতে থাকে। কিন্তু সম্মুখে একটা কিছু বাধা উপস্থিত হইলেই যে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। তাহাকে বলে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবার শক্তি তাহার থাকে না। লালসার বেগ যখন এত নিস্তেজ, তখন তাহাকে জয় করা বড় বেশী কঠিন নহে। ঐ সময়ে অল্প চেষ্টাতেই যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা এরূপ সামান্য চেষ্টা করিতেও অপারগ, ভগবান্ তাহাদিগকেও ত্যাগ করেন নাই। কেননা, সচরাচর দেখা যায়, যাহারা অপরিমিত সুরাপায়ী দীর্ঘকাল পরে সুরার উপরে তাহাদিগের আপনা হইতেই একটা অতৃপ্তি জন্মিয়া যায়। যাহারা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরবশ, এক সময়ে তাহাদের মনেও ঐরূপ একটা অবসাদ এবং অতৃপ্তি জাগিয়া উঠে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথমভাগের সপ্তম অধ্যায়ে গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন, "ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সুখ? ভাল, তাই হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি যে এই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে না—যদি কেহ করে, আমি গুণাগারি দিব! কিন্তু তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া দিতে হইবে, তুমি লিখিয়া দিবে যে, আর ইহাতে সুখ নাই বলিয়া ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। প্রাপ্তি, তৃপ্তি,

রোগ, মনস্তাপ, অায়ুক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোনরূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন রাজি আছ?" শিষ্য সভয়ে উত্তর করিল, "দোহাই মহাশয়ের, আমি নই। প্রত্যেক অমিতাচারীকে একদিন না একদিন বলিতেই হইবে, আর ইহাতে দুঃখ নাই।" কিন্তু এ অবস্থাতেও প্রবল অভ্যাস, তাহাদিগকে সবলে টানিয়া পূর্ব্বের পথেই লইয়া চলে। মানুষ যখন এইরূপ অসহায় হইয়া একেবারে অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে, তখন প্রতিকার তাহার নিজের সাধ্যাতীত। তখন এমন একটি বন্ধুর আবশ্যক যিনি তাহাকে ঘৃণা না করিয়া, তাহার সঙ্গে বিরক্তি সহ্য করিয়াও, সস্নেহে হাত ধরিয়া এই গভীর পঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইতে ইচ্ছুক। এরূপ বন্ধু পাইলে অনেক অমিতাচারী আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, কিন্তু এরূপ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অন্ধও আছে যে বন্ধুর সাহায্যকেও তিক্ত অনুভব করে এবং মৃত্যুকেই তাহার চরমবন্ধু বলিয়া বরণ করিয়া লয়। রোগ যখন এইরূপ উৎকট, তখন তাহার আর প্রতিকারের আশা নাই। এইরূপে যাহারা আত্মঘাতী হইতেছে, তাহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে তাহারা বাল্যে, এবং যৌবনে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা জীবিতই থাকুন, আর স্বর্গেই যান, সমাজের অভিসম্পাত রাহুর মত তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিবে।

(শেষ কথা)

সে কালের সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংযম অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু একালে তাহা ক্রমেই সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণ কি?

যাহাকে আমরা "সেকাল" বলি, তাহার পরে বহুশত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং 'একালের' বয়সও নিতান্ত দশ-বিশ বৎসর নহে। অনন্তকালের তুলনায় শিশু হইলেও ইহা অনেক শতাব্দীর শেষ দেখিয়াছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ 'একালের' মধ্যে আমরা এমন কিছু উদ্ভাবন করিতে পারি নাই, যাহার জন্য আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারি। একটা কিছু গৌরবের কথা বলিতে গেলেই আমরা সেকালের দিকে ফিরিয়া চাই। 'সেকাল' তাহার অক্ষয় ভাণ্ডার আমাদের জন্য অনন্ত গৌরবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কীর্ত্তিশূন্য আমরা দূর হইতে তাহা দেখিয়াই তৃপ্ত হই। জ্ঞান, ভক্তি, সংযম, সাধুতা, পরার্থতা, বলবীর্য্য, সাহস, স্নেহ, প্রেম, দয়া, যাহা লইয়া মনুষ্যত্বের গৌরব, তাহার একটা উদাহরণ দিতে হইলেই আমাদিগকে সেকালের ভাণ্ডার হইতে ধার করিয়া লইতে হয়! একাল একেবারে রিক্ত, নিঃসম্বল। কিন্তু যে অক্ষয় ভাণ্ডারের নিকটে আমরা কথায় কথায় ঋণী, যে ধর্ম্মমার্গ এবং সমাজতন্ত্র, সেই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিল, সে গুলির উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা তাহা দেখিবার বিষয়! এক সম্প্রদায়ের লোক, অতীতকে সম্মান করিলেও, তাহাকে বর্ত্তমানের অনুপযোগী বলিয়া একেবারে ত্যাগ করিতে চাহিলেন। তাঁহারা আপনাদের প্রভাব বলে, নূতন সৃষ্টি গঠন করিতে উৎসুক। তাঁহাদের আত্মশক্তিতে অতি বিশ্বাস প্রশংসনীয় হইলেও, তাঁহাদের দুঃসাহসিকতা প্রশংসনীয় মনে হয় না। কেন না, যে পুরাতন ধর্ম্ম ও সমাজনীতি সহস্র সহস্র বৎসরের অশেষ বিপ্লব ও অশান্তির আঘাতেও আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দেয় নাই, তাহার প্রত্যক্ষ অমোঘ শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, অনিশ্চিতকে আশ্রয় করা, সহজবুদ্ধিতে সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সেই পুরাতন হইতে আমরা যতই দূরে সরিয়া পড়িতেছি, ততই আমাদের সামাজিক সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে এবং সর্ব্বদিক্ হইতে কেবল দৈন্যই অনুভব করিতেছি, তখন আর সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না। কিন্তু সেই পুরাতন আচারপদ্ধতিগুলিকে অবিকৃত ভাবে বর্ত্তমান সমাজে আনিয়া উপস্থিত করিলে, অনেকেই হয়ত শঙ্কিত হইয়া উঠিবেন। বাস্তবিকই সেকালের ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর কঠোর সাধনা, গৃহীর বাল্যে এবং যৌবনে ব্রহ্মচর্য্য, বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ, একালের সংযমহীন বিলাসপ্রিয় দেহ ও মনকে যে ভয়ে বিহ্বল করিয়া দিবে তাহাতে সংশয় নাই। পাশ্চাত্য জগতের নূতন সভ্যতা কিন্তু আমরা অনেকটা নির্ভয়ে গ্রহণ করিতে যাইতেছি। অবশ্য এই নবীন সভ্যতা, আমাদিগের শুষ্ক, জীর্ণ, সমাজ বৃক্ষটির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পরগাছার মত গজাইয়া উঠিয়া, শ্যামলতা আনিয়া দিয়েছে সত্য, কিন্তু যত দিন প্রাচীন বৃক্ষটি কোন ক্রমে আপনার সজীবতা রক্ষা করিতে পারিবে, পরগাছার শ্যামলতা তত দিনই থাকিবে, যখন পরগাছাগুলি গাছটীর মর্ম্মরস

নিঃশেষে শুষিয়া লইবে, সে দিন তাহার মৃতদেহ হইতে শুষ্ক পরগাছাগুলিও শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে। যাহা মর্ম্মে রস-সঞ্চার না করিয়া রসশোষণ করে, তাহা মৃত্যুকেই আহ্বান করে। এই জন্য এই পরগাছাগুলির উপরে বেশী আস্থা স্থাপন না করিয়া, যাহাতে বৃক্ষটির রসবাহী মূলগুলি অক্ষত থাকে, সেই দিকেই আমাদের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের ধর্ম্ম এবং সমাজতন্ত্রের নিয়মগুলি যাহা আমাদের একেবারে নিজস্ব, যাহার প্রভাবে আমরা এত দিন টিকিয়া আছি, তাহার উপর আমাদের গভীর আস্থা থাকা উচিত। এই আস্থাই কালে আমাদিগকে তপঃ, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, সমস্তই শিক্ষা দিবে। অতীতের গৌরবকে নিজস্ব বলিয়া আমরা গৌরব অনুভব করিলেও, তাহার পন্থাগুলির উপরে আমাদের যে নাড়ীর টান, তাহা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে! এই টানকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

শ্রীকিশোরীলাল দাশগুপ্ত।

অটল নির্দেশ

প্রভু,
পূরিল বিধান তব
তোমার বজ্র পড়িল যখন শির পাতি তাহা লব।
তোমার নির্দেশ করিয়াছি হেলা
পথে প্রান্তরে করিয়াছি খেলা
আজকে তোমার দণ্ড হেরিয়া কেমনে শিহরি ডরে!
দিবসের শেষে নিশার মতন
এ বিধি তোমার চির পুরাতন
দণ্ড বরিতে আছি তাই দেব দাঁড়াইয়া জোড় করে।
প্রভু, পূরিল নির্দেশ তব
না নমি বলিলা তাহার নিকট কেমনে মানুষ হবো।

আমি—বিদ্রোহী সুত প্রভু
বড় অভিমানী, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা মাগিবে না তবু।
মম অপরাধ বিফল সাধনা
ডাকিয়া আনুক বজ্রবেদনা
'ক্রোধ সংহর' বলিব না তবু দহিয়া বাঁচিবে পুনঃ
"ব্যথা সহিবার দাও হে শক্তি
শ্রীচরণে যেন টলে না ভক্তি,
শাস্তিকে বিধিয়া দাওহে সুমতি শেষ নিবেদন শুন'।
প্রভু পূরিল নির্দেশ তব
তোমার বজ্র নামিল যখন শির পাতি তাহা ল'ব।

শ্রীকালিদাস রায়।

গৃহ শিক্ষক

গার্হস্থ্য শিল্প

সীরপ প্রস্তুত প্রণালী

যষ্টীমধুর সীরপ

ইহা সুমধুর এবং পিপাসা শান্তিকারক।

জল ... ৪৫ ভাগ
যষ্টীমধুর মূলের কুটী ৭॥০ ভাগ।

১৫ মিনিট অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া অন্য পাত্রে ঐ জলটুকু বা ডিককশনটা ঢালিয়া লইয়া তাহাকে পুনরায় অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া যখন ২৭ ভাগ আন্দাজ থাকিবে, তাহাতে ৩০ ভাগ মধু দিয়া পুনরায় অগ্নিতে চড়াইয়া গলাইয়া এবং ফুটাইয়া লও। যেন দানাইয়া না যায়। তাহা শীতল স্থানে রাখিয়া ঠাণ্ডা হইলে বোতলে পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত কর। যষ্টী মধু পিপাসা নাশক, সর্দ্দী তরলকারক, স্নিগ্ধ এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক। আয়ুর্ব্বেদে ইহার বহু প্রশংসা আছে

আনারসের সীরপ্

উৎকৃষ্ট সুপক্ক আনারসের ছাল ও চক্ষুগুলি ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া একটী প্রস্তরের বা মাটীর বা কাষ্ঠের পাত্রে রাখিয়া দাও। তাহার পর একটা কাষ্ঠের উদোখল মুশলে সেই আনারস গুলিকে থেঁতলাইয়া ফেল, এবং সেই থেঁতলান আনারস গুলিকে বেশ নূতন কাপড়ের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া তাহার রস বাহির করিয়া লও। সিম্পল বা সাদা সিরাপ প্রস্তুত করিয়া এই আনারসের রসটা তাহাতে দিয়া অল্পক্ষণ ফুটাইয়া লইয়া শীতল স্থানে নামাইয়া রাখ। তাহার পর বোতলে পুরিয়া লেবেলাদি দিতে হইবে।

২য় প্রকার।

যদি ফল না দিয়া ফলের এসেন্স দিয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিবে হইবে।

Oil of Pine apple	1 dr.
Tartaric acid	1 dr.
Simple syrup	6 Pt.

একত্র মিশ্রিত করিলেই হইবে। এই উপায়ে কলার, বেদানার এবং অন্যান্য বিবিধ ফলের এসেন্স মিশ্রিত করিয়া বিবিধ প্রকার সীরপ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সীরপের বোতল খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খুব সাদা হওয়া চাই। এদেশে কমলা লেবু, পাতিলেবু, আনারস, বেদানা, কলার সীরপই সাধারণে অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। বিলাতে নানাপ্রকার ফলের সীরপ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সেই ফলের এসেন্স দিয়া প্রস্তুত হয়।

গোলাপের সীরপ্

সাদা সীরপ	১ গ্যালন
Essence of Rose	১ আউন্স

ইহাকে ঈষদম্লস্বাদযুক্ত করিতে হইলে সামান্য সাইট্রিক এসিড্ গলাইয়া মিশ্রিত করিয়া দিতে পারা যায়। গোলাপী রং করিতে হইলে Prepared Cochineal দিয়া রং করিতে হয়।

(কাজের লোক।)

বাড়ীতে অনেকে আচার তৈয়ারি করেন, কিন্তু রাখিতে না-জানার দরুণ আচার প্রায়ই খারাপ হইয়া যায়। শিশি বা বোতলে আচার ভরিয়া, ময়দার আঠা একখানা মসৃণ কাগজের দুই পিঠে মাখাইয়া, ছিপি আঁটা আচারের শিশির মুখের দিকে সেই কাগজখানা জুড়িয়া দিবেন। কাগজখানা যেন শিশির অনেকটা অংশ ঢাকিয়া রাখে। ইহাতে বায়ু প্রবেশ বন্ধ হয়।

(এডুকেশন্ গেজেট ২৮শে কার্ত্তিক)।

রঙ ফর্সা করিবার উপায়।

Take

Blanched almond	2 oz
Sweet almond	1 oz

booat to paste and add distilled water one quarter, mix well, strain and put into bottle. Add Corrosive sublimate in powder 20 grains dissolved in two table-spoons of spirit of wine, and shake well. Wet the skin with this, either by means of the corner of a napkin or the fingers.

(কাজের লোক।)

গৃহ চিকিৎসা।

কাঁকড়া বিছার কামড়ে মধু

Dr. Chalke, Civil Surgeon of Nagapatam Madras, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড নামক পত্রে কাঁকড়া বিছার কামড়ে মধুর উপকারিতার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দষ্ট স্থানে মধুর প্রলেপ দিবা মাত্রই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া যায়।

ডাক্তার আরও বলিয়াছেন যে, যদি মধু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে চিনিকে খুব ঘন করিয়া জল দিয়া গুলিয়া লাগাইলেও উপকার হইবে। অভাবে গুড় লাগাইয়া দিলেও উপকার হয়। "That the application of honey to the affected part acts best by producing almost instant releif."

ডাক্তার সরকার তাঁহার "Calcutta Journal of Medicine" নামক পত্রিকায় উহার নীচে মন্তব্য করিয়াছেন যে, We may add that treacle and brandy are almost as efficacious as honey or sugar" অর্থাৎ গুড় এবং ব্রাণ্ডী মিলাইয়া আহত স্থানে দিলেও ঐ রূপই উপকার পাওয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হোমিওপ্যাথিক Ledum সেবন করাইলেও যন্ত্রণার আশু শান্তি হইয়া থাকে। (কাজের লোক)।

আরসোলার গুণ

আরসোলা আমাদের দেশে অতি ঘৃণিত এবং অনিষ্টকারী জীব বলিয়া সকলেই আরসোলার উপর বিরক্ত। কিন্তু এই আরসোলা অবস্থা বিশেষে মানবের জীবনরক্ষক রূপে আজ পরিচিত হইতেছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ভগবানের সৃষ্ট কোন জীবই অনর্থক নহে। আরসোলাকে ইংরাজীতে বলে কক্রোচ্।

রুসিয়া দেশে এই আরসোলা ড্রপসী বা শোথের অতি প্রিয় ঔষধ বলিয়া পরিচিত।

সেণ্টপিটার্সবর্গের প্রসিদ্ধ ডাক্তার পি, বগোমলো (Dr. P Bogomolow) ইহা বহুমূত্র, হৃদরোগ এবং শোথরোগে প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্যরূপ সুফল পাইয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথিক Blatta Orientalis হাঁপানী রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। ডাঃ বগোমোলো বলেন, ইহা ব্যবহার করাইয়া ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া শোথ আরোগ্য হয়। তিনি বলেন, আরসোলাকে চূর্ণ করিয়া ৫ হইতে ১০ গ্রেণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োগ দ্বারা ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব বৃদ্ধি হইয়া শোথ এবং প্রস্রাবের সহিত আলবুমেন বা শ্বেতসার অন্তর্হিত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

ইহা টিংচার, এবং ইন্‌ফিউজন রূপেও ব্যবহার হইতে পারে। Boston Journal of Chemi try বলেন যে, ক্যান্থারাইডিসের মত ইহা মূত্র যন্ত্রের প্রদাহ উৎপন্ন করে না। ডাক্তার বগোমলো এই আরসোলা হইতে এক প্রকার সারাংস প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাহার "Anti-hydropia" নাম দিয়াছেন, which is their (cockroaches') active principle.

আমরা শুনিয়াছি, চীনেরা আরসোলা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের দেহ দেখিলে বোধ হয় না যে, ইহাদের মধ্যে প্রস্রাবের পীড়া বা হৃদরোগ আছে। (কাজের লোক)

একটি আশ্চর্য্যের কথা

একজন বিদেশী লেখক বলিতেছেন, "একটা কাচের পাত্রে খানিক জল ভরিয়া তাহার মধ্যে একটি জোঁককে যদি রাখিয়া দেওয়া হয় তবে তাহার দ্বারা আবহাওয়া গণনার কাজ সুচারুরূপে চলিয়া যাইবে। আকাশে যখন ঝড় বৃষ্টির কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না, জোঁক তখন পাত্রের তলায় নিশ্চেষ্টভাবে গুটিশুটি মারিয়া পড়িয়া থাকিবে। দিন-দুপুরের আগে বা পরে যখন বৃষ্টির সম্ভাবনা, জোঁক তখন পাত্রের উপরে উঠিয়া আসিবে এবং আকাশ পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত সেখান হইতে নামিবে না। ঝড়ের সম্ভাবনা থাকিলে, যতক্ষণ না ঝড় আসে, ততক্ষণ সে অস্থিরভাবে তাড়াতাড়ি চারিদিকে ঘোরা-ফেরা করিতে থাকিবে। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকিলে জোঁকের সর্ব্বাঙ্গে একটা যন্ত্রণাসূচক আক্ষেপবিক্ষেপ প্রকাশ পাইবে—উপরন্তু, কয়েকদিন আগে হইতেই সে পাত্রের জলশূন্য শুষ্ক-স্থানে গিয়া বাসা বাঁধিবে। কুয়াসার সময়েও সে পাত্রের তলায় নিশ্চলভাবে পড়িয়া থাকে।

(হিন্দুস্থান)

নগ্ন

নগ্ন ছিল এ পরাণ প্রভাত বেলায়
অসঙ্কোচে মত্ত ছিল হেলায় খেলায়
যে দিন মধ্যাহ্নে তুমি দেখা দিলে আসি
তদবধি হেরি নিজে বড় লাজ বাসি
আজি এই সন্ধ্যাবেলা পুনঃ নগ্ন আমি
হেরিলে তোমারে আর লাজ নাহি স্বামী।

কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ

সপ্তম অধ্যায়

পাঠকবর্গ পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'পলিটিক্যাল এজেন্সির নাম অবগত হইয়াছেন। আমরা এক্ষণে সেই পলিটিক্যাল এজেন্সি, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন (Indian union) ও রিলিফ সোসাইটী (Relief society) সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উল্লেখ করিব। সেই সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকা কিরূপে সাপ্তাহিক হইতে দৈনিক হইয়াছিল, তাহাও বলিব। প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক যে শিশিরকুমারের ভগ্ন স্বাস্থ্যই ইণ্ডিয়ান লীগের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল। দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের অগ্রজ মহারাজা সার লছমীশ্বর সিং বাহাদুর অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া, তাহার সম্পাদক শিশিরকুমারের সহিত পরিচয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ হইতে স্বীয় হস্তে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক একদিন তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটরীকে শিশিরকুমারের নিকট প্রেরণ করিলেন। শিশিরকুমার এই সময় সাধারণ লোকদিগকে লইয়া একটী জাতীয় সমিতি গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন। দ্বারবঙ্গেশ্বরের সাদর আহ্বানে তিনি মহারাজা বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এই জাতীয়সমিতি গঠনের সঙ্কল্প করিলেন। সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে দেশের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। এই কথোপকথনে শিশিরকুমার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মহারাজা বাহাদুরের হৃদয় উদারতায় পূর্ণ এবং স্বদেশসেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। এই প্রথম সাক্ষাতের সময় শিশিরকুমার ও মহারাজা লছমীশ্বর সিং বাহাদুরের মধ্যে সাধারণ ভাবে দেশের কথা আলোচিত হইয়াছিল; শিশিকুমার জাতীয়সমিতি গঠনের কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিবার সুযোগ পা'ন নাই। তিনি একদিন হঠাৎ অবগত হইলেন যে, মহারাজা বাহাদুর কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বীয় অভিপ্রায় মহারাজা বাহাদুরকে জানাইতে না পারায় শিশিরকুমার বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। মাহারাজা বাহাদুর হঠাৎ যেমন কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ হঠাৎ আবার একদিন কলিকাতায় আগমন করেন। শিশিরকুমারও সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও মহারাজা লছমীশ্বর সিং নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। আহারান্তে তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন; শিশিরকুমার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বহির্ব্বাটীতে আগমন করিয়া সাদর অভ্যর্থনায় শিশিরকে আপ্যায়িত করিলেন। উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া শিশিরকুমার তাঁহার সংকল্পিত জাতীয় সমিতি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এই প্রসঙ্গে দেশের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিতে করিতে স্বদেশ প্রেমিক শিশিরকুমারের হৃদয় উথলিয়া উঠিল; তাঁহার নয়ন যুগল হইতে কয়েকবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। স্বদেশসেবক শিশিরকুমারের ভাব লক্ষ্য করিয়া মহারাজাবাহাদুর মুগ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন,—"শিশির বাবু, আমার দ্বারা দেশের কি উপকার হইতে পারে বলুন।"

শিশির—"দেশের সাধারণ জনসম্প্রদায়কে তাহাদিগের দুরবস্থার কথা বুঝাইতে না পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হওয়া অসম্ভব। সাধারণ লোকদিগকে লইয়া আমি মহারাজা বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এক জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করি।"

মহারাজা—"শিশির বাবু, প্রকাশ্যভাবে যদি আমি রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করি, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট আমার উপর যে অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

শিশির—"রাজনৈতিক ব্যাপারের সংস্রবে থাকা যদি আপনার অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনি দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন। ইহাতে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে।"

মহারাজা—"বেশ, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই; আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

শিশির—"আপনি প্রথমে একটী 'মিল' প্রতিষ্ঠা করুন।"

মহারাজা—"আমি প্রতি বৎসর মিলের জন্য চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সম্মত আছি। কিন্তু আপনাকে মিলের কার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" শিশিরকুমারের পরামর্শ অনুসারে, মিল প্রতিষ্ঠার জন্য, বোম্বাই হইতে জনৈক বিশেষজ্ঞকে আনাইয়া সম্ভাবিত ব্যয়ের একটী হিসাব প্রস্তুত করা হইল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন অজ্ঞাত কারণে মিল প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান

ইণ্ডিয়ান লীগের জীবনান্তের পূর্ব্বেই ভারত সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশপূজ্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম হইতেই ইহার জীবনস্বরূপ ছিলেন। ভারতবাসী মাত্রেরই কল্যাণ কল্পে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরই সভা; নিরক্ষর জনসাধারণ ইহার সংস্রবে আসিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিশিরকুমার সাধারণ লোকদিগকে লইয়া একটী সমিতি গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার মনোমোহন ঘোষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শিশিরকুমার জাতীয় সমিতি গঠনে মনোমোহন বাবুর সাহায্য লাভ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মনোমোহন বাবু শিশিরকুমারকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাগ্মীবর লালমোহন ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থাভাব হইয়াছিল। শিশিরকুমার এ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ অর্থ প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি দ্বারবঙ্গেশ্বর লছ্মীশ্বরকে জানাইলেন যে, লালমোহন পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ করিতে পারিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইবে; কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ তিনি ভালরূপ চেষ্টা করিতে পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় মহারাজা বাহাদুর যদি তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলে দেশের একটী মহৎ উপকার হইবে। দ্বারবঙ্গেশ্বর তিন হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন। শিশিরকুমার সানন্দে এই সংবাদ মনোমোহন বাবুকে জ্ঞাপন করিলেন। মনোমোহন বাবু বলিলেন] ["মহারাজার উদারতার জন্য] বিশেষ [বাধিত হইলাম, কিন্তু শুনিয়াছি, মহারাজা বাহাদুর প্রতিজ্ঞা করিবার সময় যে তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, প্রতিজ্ঞা পূরণের সময় তাঁহার বড়ই অভাব লক্ষিত হয়।"] শিশিরকুমার মনোমোহন বাবুকে বলিলেন,—আপনি চিন্তিত হইবেন না, আমি শীঘ্রই টাকা আদায় করিয়া দিতেছি। তিনি দ্বারবঙ্গেশ্বরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, লালমোহনকে সাহায্য করা যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তিনি যেন তাঁহার প্রতিশ্রুত সাহায্য সত্বর প্রেরণ করেন। মহারাজা বাহাদুর অবিলম্বে তাঁহার প্রতিশ্রুত চাঁদা শিশিরকুমারের নিকট প্রেরণ করিলেন। লালমোহনকে এইরূপে সাহায্য করিয়া শিশিরকুমার মনোমোহন বাবুর সহানুভূতি লাভ করিলেন।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদারদিগের সভা; ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভা। কিন্তু দেশের প্রকৃত শক্তিস্বরূপ সাধারণ লোকদিগের কোনও সভা ছিল না। শিশিরকুমার ইহাদিগের জন্য একটী সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার টি, পালিতের আফিস গৃহে এক সভার অধিবেশন হয়। মনোমোহন, উমেশচন্দ্র প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে হাইকোর্টের উকিল বাবু মহেশচন্দ্র সেন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে বলিয়াছেন যে, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বর্ত্তমান থাকিতে আবার একটী নূতন সমিতির প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা নাই। সভ্যগণের মধ্যে একজন প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়ান লীগ থাকিতে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা যেমন দোষাবহ নহে, সেইরূপ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বর্ত্তমানে অন্য কোন সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। যাহা হউক উক্ত সভায়, সাধারণ জনসাধারণকে লইয়া একটী জাতীয় সমিতি গঠিত হইবে স্থির হইল।

শিশিরকুমার একদিন দ্বারবঙ্গেশ্বরকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। [প্রত্যুত্তরে মহারাজা বাহাদুর সম্মতি জ্ঞাপন] করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সন্ধ্যা আটঘটিকার সময় শিশিরকুমার, মনোমোহন বাবু প্রভৃতি বাটজন বাঙ্গালী দ্বারবঙ্গেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজার প্রাইভেট

সেক্রেটরী দ্বারদেশে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। এই উপলক্ষে মহারাজা বাহাদুর স্বীয় বাড়ীখানি আলোকমালায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সৎকারে তাঁহার অতিথিগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলের মুখপাত্র স্বরূপ মনোমোহন বাবু মহারাজা বাহাদুরের নিকট আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া, দেশের প্রকৃত শক্তিস্বরূপ সাধারণ জনসম্প্রদায়কে লইয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় একটী জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শিশিরকুমার পূর্ব্বে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে মহারাজা বাহাদুর তখন সম্মতিদান করিতে পারেন নাই, এ কথা পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি অসম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি প্রস্তাবিত সমিতিতে যোগদান ও সাহায্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। একটী সাধারণ সভায় সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে স্থির হইল। [illegible] খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ তারিখে এলবার্ট হলে দ্বারবঙ্গেশ্বরের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন (Indian Union) নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। নবপ্রতিষ্ঠিত সমিতির জন্য একালে মহারাজা বাহাদুর দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠার পর, তাহার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের কোন পদগ্রহণে সম্মত হন নাই। দ্বারবঙ্গেশ্বর সভাপতি ও মিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমিতির সম্পাদক মনোনীত হইলেন। ইহাদিগের সহিত মনোমোহন, শিশিরকুমার প্রভৃতি মনস্বিগণ সভ্য হইলেও ইহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। উমেশচন্দ্র স্থায়ীভাবে হাই-কোর্টের ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল মনোনীত হইলে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার স্থলে সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গেশ্বর দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত সভ্যগণের নিকট হইতেও নিয়মিত চাঁদা আদায় হইত; সুতরাং কোন কালেই ইউনিয়নের অর্থাভাব ঘটিত না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের ঔদাসীন্যই ইউনিয়নের অস্তিত্ব লোপের কারণ হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কোনও কার্য্য করিতেন না এবং সভ্যগণকেও কোন কার্য্য করিবার সুযোগ দিতেন না। ক্রমেই সভ্যগণের মধ্যে বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সভায় যোগদানেও বিরত হইলেন। উমেশচন্দ্র ও শিশির-কুমারের ভগ্নীপতি কিশোরীলাল সরকার মহাশয় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ইউনিয়নের কার্য্য পরিচালন জন্য যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা উপেক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। শিশিরকুমার ইহাতে প্রাণে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন।

পলিটিক্যাল এজেন্সি

ইংলণ্ডে ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটি (British Congress Committee) নামে একটী সমিতি আছে, ইহা বোধ হয় পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সার উইলিয়ম ওয়েডারবরণ (Sir William Wedderburn) ইহার জীবন স্বরূপ ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্রিটিশ কংগ্রেসকমিটি ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের কথা সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের বিলোপের পর শিশিরকুমারের হৃদয়ে আর এক ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার বুঝিয়াছিলেন যে স্বায়ত্বশাসন লাভ কিম্বা শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকের জন্য সাধারণ ভাবে আন্দোলন করা অপেক্ষা এদেশে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের কথা পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিয়া আন্দোলন করিলে দেশের অধিক উপকার হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে ইংলণ্ডে 'পলিটিক্যাল এজেন্সি' নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই এজেন্সির উন্নতিকল্পে উমেশচন্দ্র, দাদাভাই নওরজী প্রভৃতি জন্মভূমির সুসন্তানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সার উইলিয়াম ওয়েডারবরণ যেমন কংগ্রেস কমিটির জীবনস্বরূপ ছিলেন, মিষ্টার উইলিয়ম ডিগ্‌বি সেইরূপ পলিটিক্যাল এজেন্সির জীবনস্বরূপ ছিলেন। শ্রীযুক্ত মতি বাবু কিরূপে মিষ্টার ব্রাড্‌লকে ভারতবন্ধু করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের অত্যাচার ও অবিচারের কথা এখান হইতে বিশদরূপে লিখিয়া মিষ্টার ডিগ্‌বির নিকট পাঠান হইত এবং মিষ্টার ডিগ্‌বি সেই সকল কথা পার্লামেণ্টে আলোচনা করিবার জন্য ব্রাড্‌লকে বুঝাইয়া দিতেন। সিবিলিয়ান পুরুষেরা পলিটিক্যাল এজেন্সিকে বিশেষ ভয় করিয়া

চলিতেন। মিষ্টার এইচ্, এ, ফিলিপ্স্ (H. A. Philips) ময়মনসিং ও রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। স্বাধীনচেতা মহারাজা সূর্য্যকান্তের সহিত তাঁহার কয়েকবার সংঘর্ষ হইয়াছিল। ফিলিপ্সের অত্যাচারের ভয়ে জেলাবাসিগণ সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কেবল গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে মিশিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা রিভিউ (Calcutta Review) নামক পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার তিনি তাঁহার পত্রিকায় মিষ্টার উমেশচন্দ্র ও জাতীয় মহাসমিতিকে গালাগালি করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার ও মতিলাল অমৃতবাজার পত্রিকায় মিষ্টার ফিলিপ্সের এই অন্যায় ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা এবং পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিবার জন্য মিষ্টার ডিগ্‌বিকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বাধ্য হইয়া কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পার্লামেণ্টে কোন বিষয়ের আন্দোলন করিতে হইলে তাহা কিরূপভাবে করিতে হইবে, শিশিকুমার এখান হইতে সমস্ত স্থির করিয়া দিতেন; এমন কি তিনি অনেক সময় প্রশ্ন পর্য্যন্তও ঠিক করিয়া দিতেন। পারিশ্রমিক স্বরূপ মিষ্টার ডিগ্‌বিকে অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস হইতে মাসিক ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পাঠান হইত। এই টাকা যাঁহাদের অভিযোগের কথা পার্লামেণ্টে আলোচনা হইত, তাঁহাদের নিকট হইতেও সাময়িক চাঁদা হইতে পাঠান হইত। পাইওনিয়র পত্রিকা এই পলিটিক্যাল এজেন্সীকে অবজ্ঞাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

পলিটিক্যাল এজেন্সী দ্বারা বহু উপকার সাধিত হইলেও কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ স্বস্ব সমিতির জন্য টাকা আদায় করিয়া বেড়াইতেন। নাটোরের সহৃদয় জমিদার রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় পলিটিক্যাল এজেন্সীর সাহায্য কল্পে একবার ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দান করিয়াছিলেন। মতি বাবু রাজার নিকট হইতে এই অর্থ আনিবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই মর্ম্মে একখানি পত্র দেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ দেশের যে কোন হিতকর কার্য্যে ইচ্ছামত এই টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।" রাজা যোগেন্দ্রনাথ সেইরূপই পত্র দিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে, কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কোন কোন সভ্য রাজার নিকট চাঁদার জন্য গমন করেন। রাজা যোগেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বেই মতি বাবুর নিকট ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দিয়াছেন, আর কিছু দিতে পারিবেন না। এই সময় পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ কংগ্রেসের এজেন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি একদিন অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে উপস্থিত হইয়া শিশিরকুমার ও মতি বাবুকে বলিলেন,—"নাটোরের রাজা যোগেন্দ্রনাথ যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন, তাহা আপনারা এখনই আমার হস্তে প্রদান করুন। উক্ত টাকা কংগ্রেসের হাতে না দিয়া আপনারা প্রতারণা করিয়াছেন।" শিশিরকুমার ও মতি বাবু হাসিলেন; পণ্ডিতজীর অপ্রীতিকর বাক্যে তাঁহারা দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইলেন না। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ সম্ভবতঃ রাজার এই ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দানের বিশেষ বিবরণ অবগত নহেন। রাজা যোগেন্দ্রনাথ উক্ত টাকা পলিটিক্যাল এজেন্সীতে দিয়াছেন, মতি বাবু পণ্ডিতজীকে ইহা বুঝাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অযোধ্যাপ্রসাদ কিছুতেই তাহা বুঝিলেন না। তিনি বিরক্তির সহিত অফিস পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন,—"অদ্ভুত কথা বলিতে বিস্ময় নাটোরের রাজা যোগেন্দ্রনাথ প্রদত্ত ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মসাৎ করিয়াছেন।" শ্রীযুক্ত মতি বাবু তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া পণ্ডিতজীর উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ব্যাপার ক্রমশঃই গুরুতর হইতেছে দেখিয়া বারিপ্রাসের সুপ্রসিদ্ধ উকিল বাবু গুরুপ্রসন্ন সেন অযোধ্যাপ্রসাদ ও মতিলালকে নিরস্ত করিয়া রাজার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দানের প্রকৃত কথা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অযোধ্যাপ্রসাদ কিছুতেই নিরস্ত হইবার নন। শেষে এই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য মিষ্টার হিউম ও মিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে মধ্যস্থ নিযুক্ত করা হইল। তাঁহারা অমৃত বাজার পত্রিকা অফিসে উপস্থিত হইলে মতি বাবু রাজা যোগেন্দ্রনাথের পত্রখানি তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ তখন নীরব হইলেন।

ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী

সুশৃঙ্খলার রাজ্য শাসন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ বিবেচনার সহিত আইন প্রণয়ন করা যেমন আবশ্যক, প্রণীত আইন অনুসারে কর্ম্মচারিগণ শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন কিনা, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও সেইরূপ কর্ত্তব্য। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ আইন বিগর্হিত কার্য্য করিয়া প্রজাবৃন্দের উপর অত্যাচার, অবিচার ও উৎপীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হন না। এই সকল অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য শিশিরকুমারের যত্নে ও চেষ্টায় ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের প্রথমভাগে ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইহার কার্য্য বিবরণীতে এইরূপ লিখিত আছে.—"এই সোসাইটী অনেক বিচক্ষণ হিন্দু সাধুর উপদেশে গঠিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন,—ইংরাজেরা তোমাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমাদের মঙ্গল কামনা করেন; তোমাদের সুশাসনের সহিত তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেরই স্বার্থ জড়িত। তাঁহাদিগকে তোমাদের অভাবের কথা জ্ঞাপন করিয়া, তোমাদের ন্যায্য অধিকার নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অবিশ্রান্তভাবে প্রার্থনা কর। আইনসঙ্গত উপায়ে অবিচলিতভাবে আন্দোলন করিলে তাঁহারা প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেই কার্য্যে ব্রতী করিতে হইবে। সভ্যগণকে বিশেষভাবে আত্মত্যাগী হইতে হইবে। কোন সভ্য সাধারণের সমক্ষে আপনার প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারিবেন না। দাম্ভিক ও আত্মপ্রাধান্যপ্রতিষ্ঠাকারীকে সভাপদ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। স্বীয় কার্য্যতৎপরতা দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে জীবনশক্তি সঞ্চারিত কর। সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিলে ভগবান তোমার পরিশ্রম সার্থক করিবেন।" শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সোসাইটীর) সম্পাদক ছিলেন। আমরা তাঁহার ও শ্রীযুক্ত মতি বাবুর নিকট অবগত হইয়াছি যে শিশিরকুমারকেই 'হিন্দু সাধু' (Hindu sage) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাগবাজারে অমৃতবাজার পত্রিকার আফিস গৃহেই ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে সোসাইটীর প্রতিনিধিগণ সোসাইটীর কার্য্যের সহায়তা করিতেন। ইংলণ্ডে মিষ্টার উইলিয়ম ডিগ্‌বি প্রথমে কিছুদিনের জন্য ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর এজেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন। কার্য্যাধিক্য বশতঃ তিনি পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে মিষ্টার ডবলিউ এস্ কেইন মহোদয় ১৮৯৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত সোসাইটীর অবৈতনিক এজেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন; মিষ্টার কেইনের অভিপ্রায় অনুসারে ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী ইংলণ্ডের এংলো ইণ্ডিয়ান টেম্পারেন্স এসোসিয়েসনের (Anglo Indian Temperance Association) অঙ্গীকৃত করা হইয়াছিল। সোসাইটীর সদস্যগণ প্রত্যেক বিষয়ে, শিশিরকুমারের পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন। শিশির কুমারের হৃদয় এবং মস্তিষ্ক বিশ্রাম জানিত না। দেশের অভাব, জাতীয় দুর্গতি এবং অত্যাচার অবিচার দেখিলেই প্রতিবিধান সঙ্কল্প তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত সেই জন্যই তিনি নানা ভাবে, নানা উপায়ে, সমাজের কল্যাণের জন্য সভা সমিতি সৃজনের চেষ্টা করিতেন। এই ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী তাঁহার বেদনানুভূতেরই ফল। ইহা যে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে হয়; আমরা নিম্নে কয়েকটী কার্য্যের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

জেলসংস্কার—কারাগারের বন্দিগণের দুরবস্থা শিশিরকুমারের হৃদয়কে বিগলিত করিয়াছিল। প্রতীকারের আশায় তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। এখানে আন্দোলনে বিশেষ কোনও ফল হইতেছে না দেখিয়া, শেষে ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী শিশিরকুমারের নির্দ্দেশমত জেলখানার কয়েদিগণের দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিয়া, ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে একটী রিপোর্ট প্রকাশ করেন এবং সেই রিপোর্টের কয়েক খণ্ড ইংলণ্ডে হাওয়ার্ড এসোসিয়েশনে (Howerd Association) প্রেরণ করেন। উক্ত এসোসিয়েশনের সম্পাদক রিপোর্টের এক খণ্ড ভারত সচিবের হস্তে প্রদান করিয়া তাহার সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। লর্ড কিম্বর্লি (Lord Kimberly) রিলিফ সোসাইটীর রিপোর্টটী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলে একটী

জেল কমিটি গঠিত হয় এবং রেভিনির্উ বোর্ডের তদানীন্তন সিনিয়র মেম্বর মাননীয় ডি আর লায়াল সি, এস, আই মহোদয় তাহার প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন। অনুসন্ধান কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য জেল কমিটি ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী হইতে শ্রীযুক্ত মতিবাবু ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে জেল পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। মতি বাবু ও হীরেন্দ্র বাবু জেল পরিদর্শন করিয়া কয়েদিগণের অভাব অভিযোগের কথা কমিটীর নিকট বর্ণনা করিতেন। আমরা তাঁহাদের প্রেসিডেন্সী জেল পরিদর্শনের বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু প্রেসিডেন্সী জেল পরিদর্শন করিতে যাইবেন জানাইয়া তদানীন্তন জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার ডোনাল্ডসনকে পত্র লিখিলেন। পরিদর্শকদ্বয়ের পত্র পাইয়া সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব যে নির্দ্দিষ্ট দিবসে জেলের সকল কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যথাসময়ে মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু প্রেসিডেন্সী জেলে উপস্থিত হইলেন। মিষ্টার ডোনাল্ডসন তাঁহাদিগকে যথারিতি অভ্যর্থনা করিরা ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে সহস্রাধিক কয়েদী বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় কার্য্য করিতেছিল। কাহারও মুখে একটী কথা নাই; সকলেই আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত। মতিবাবু আশ্চর্য্য হইয়া মিষ্টার ডোনাল্ডসনকে বলিলেন,—"একসঙ্গে এতগুলি কয়েদী কার্য্য করিতেছে; কাহারও মুখে একটী কথা নাই; ইহারা কি সকলেই বোবা?"

মিষ্টার ডোনাল্ডসন প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"বোবা কেহই নহে। এত্যধিক কয়েদীকে একত্রে লইয়া সুশৃঙ্খলায় কার্য্য করিতে হইলে একটু কঠোরতা আবশ্যক এবং সেই কঠোর নিয়মের ফলেই কয়েদিগণ সুসংযত হইয়াছে।"

মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু মিষ্টার ডোনাল্ডসনের সহিত সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে গমন করিতেছেন, এমন সময় মতিবাবু দেখিলেন যে, একটী কয়েদী যোড় হস্তে কাতর নয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার জন্য যেন আদেশ প্রার্থনা করিতেছে। মতিবাবু তাহাকে দেখিয়া সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লোকটী এরূপ ভাব দেখাইতেছে কেন? বোধ হয় আমাদিগকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করে।"

ডোনাল্ডসন—"এখনই উহাকে বেত্রাঘাত করা হইবে সেইজন্য এইরূপ ভাব দেখাইতেছে।"

মতিবাবু—"বেত্রাঘাত করা হইবে কেন? উহার অপরাধ কি?"

মিঃ ডো—"লোকটা বড়ই দুষ্টপ্রকৃতি; কোনদিনই উহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে পারে না।"

মতিবাবুর ইঙ্গিতে কয়েদীটি তাঁহার নিকট আগমন করিল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার কার্য্য করনা কেন?"

কয়েদী—"ধর্ম্মাবতার! একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যথাশক্তি আমি আমার কার্য্য করিয়া থাকি। অনেক সময় আমাকে এরূপ কার্য্য দেওয়া হয়, যাহা আমার সাধ্যাতীত; সুতরাং আমি তাহা সম্পন্ন করিতে পারি না। এই অপরাধে বেত্রাঘাতে আমি জর্জ্জরিত।"

মতিবাবু জেলের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেবকে বলিলেন, "মিষ্টার ডোনাল্ডসন, আপনিত এই কয়েদীকে বেত্রাঘাত করিয়াও সংশোধন করিতে পারিলেন না। আমার মনে হয়, কঠোরতা অপেক্ষা সদ্ব্যবহার দ্বারা দুষ্ট প্রকৃতি লোককে শীঘ্রই সংশোধন করা যায়। আপনি এই লোকটীর প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়া দেখুন, সে নিশ্চয় ভাল হইবে।"

মিষ্টার ডোনাল্ডসন—"আপনাদের এই পরিদর্শনের সম্মানার্থ আমি উহার প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশ রহিত করিলাম। উহার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া দেখি কি ফল হয়।"

কয়েদীটি নীরবে, করুণ দৃষ্টিতে শ্রীযুক্ত মতিবাবুর প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় কার্য্যে প্রস্থান করিল।

মিষ্টার ডোনাল্ডসন্ শেষে পরিদর্শকদ্বয়কে রন্ধন-শালায় লইয়া গেলেন। কয়েদীগণের আহার্য্য দেখিয়া মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরিস্কার চাউলের অন্ন, উৎকৃষ্ট মুগের ডাইল ও অন্যান্য আহার্য্য বস্তুর আয়োজন দেখিয়া তাঁহারা সহজেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারা পরিদর্শনে আগমন করিবেন বলিয়া কেবল সেই দিনেরই জন্য এরূপ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। মিষ্টার ডোনাল্ডসন পাত্র হইতে কতকটা ডাল তুলিয়া লইয়া খাইতে খাইতে বলিলেন, "আহা কি সুন্দর রান্না হইয়াছে।' তাঁহার

ব্যাপার দেখিয়া মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মিষ্টার ডোনাল্ডসন বলিলেন,—"আপনারা মনে করিতেন যে কারাগারের কয়েদীগণের আহারের বড়ই কষ্ট হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাদের আহারের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা ত আপনারা স্বচক্ষে দেখিলেন। আপনারা একখানি সার্টিফিকেট দিন।"

মতিবাবু—"গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা ভাল থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। আজ আমরা জেলপরিদর্শনে আসিব বলিয়াই আপনারা আহারের এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যহই এইরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। অদ্যকার ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা কোনও রূপ সার্টিফিকেট দিতে পারিব না।"

শ্রীযুক্ত মতিবাবুর কথা শুনিয়া সাহেব অবাক্; তিনি নিরুত্তর রহিলেন। মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু শেষে কয়েদিগণের পায়খানার দুরবস্থার কথা সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেবকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন। ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর পক্ষ হইতে মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু জেলকমিটির নিকট কারাগারে কয়েদিগণের আহারের ও পায়খানার কষ্ট ও অত্যধিক মৃত্যুর কারণ অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। রিলিফ সোসাইটীর যত্নে ও চেষ্টায় কয়েদিগণের আহারের ও পায়খানার কষ্ট কতক পরিমাণে দূর হইয়াছিল এবং তাহাদের পরিশ্রমের সময়ও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বালাধুন হত্যার মোকদ্দমা (The Baladhun Murder case)—একবার আসামে জনৈক ইয়োরোপীয় চা-করকে হত্যাকরার অপরাধে চারিজনের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এবং তিন জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়। দায়রাজজের বিচারফলে দেশে উত্তেজনা ও অসন্তোষের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। এই বিচারের বিরুদ্ধে আসামীগণ হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিল, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উপযুক্ত উকিল কিম্বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে পারে নাই। শেষে তাহাদের নিম্ন আদালতের উকিল ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর নিকট তাহাদের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া সাহায্য-প্রার্থনা করেন। নিরপরাধগণকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সোসাইটী যত্নবান্ হইলেন এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া আসামীগণের পক্ষসমর্থনের জন্য উপযুক্ত ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে আসামীগণ মুক্তিলাভ করিল। পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়রা জজ যেরূপভাবে এই মোকদ্দমা পরিচালন করিয়া চারিজনের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা ও তিনজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের ব্যবস্থা করেন, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তৎপ্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী এই বিচার-বিভ্রাটের কথা মিষ্টার কেইনের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়া পার্লামেণ্টেও আন্দোলন করিয়াছিলেন।

মিষ্টার বিটসন্ বেল।—মিষ্টার বিটসন্ বেল যখন খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় স্থানীয় এক জমিদারের জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহাকে এক গ্লাস দুগ্ধ দিতে অস্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন। ঘটনাটি তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর স্যর চার্লস ইলিয়টকে জানান হইলে তিনি তাহার কোনও প্রতিবিধান না করিয়া বরং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মিষ্টার বেলের এইরূপ অন্যায়ের প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী ঘটনাটী ভারত গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন করিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট মিষ্টার বেলকে তাঁহার অন্যায় কার্য্যের জন্য তীব্র তিরস্কার করিলেন।

No conviction, No promotion।—গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাগুণে ফৌজদারী বিভাগের শাসন কর্ত্তাদিগের মধ্যে এইরূপ একটা ধারণা হয় যে, ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে যিনি যত শাস্তি দিতে পারিবেন, তাঁহার তত উন্নতি হইবে। ইহাতে অনেক সময় বহু নির্দ্দোষ লোক অকারণে শাস্তি পাইত। এই শ্রেণীর শাসনকর্ত্তৃগণ সুবিচারের দিকে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা আপনাদিগের উন্নতির দিকেই অধিক পরিমাণে লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যে ধর্ম্মভীরু হাকিম ছিলেন না তাহা নহে। একবার একজন জেলাজজ এই প্রকার বিচার বিভ্রাটের প্রতি মহামান্য হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকার করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া হাইকোর্ট ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে মতানৈক্য হয়। হাইকোর্টের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে দেশের যে ভীষণ ক্ষতি হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া শিশির-

কুমারের নির্দেশমত ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিবার জন্য আবশ্যক সংবাদাদি ইংলণ্ডে জনৈক মেম্বরের নিকট প্রেরণ করেন। ভারতসচিব সকল কথা অবগত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। শেষে তাঁহার ব্যবস্থা গুণে হাইকোর্টই জয়লাভ করিয়াছিলেন।

এইরূপে ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী শিশিরকুমারের উপদেশ মত দেশের অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা

হরিমাইতি নামক জনৈক নিম্নশ্রেণীর লোক তাহার একাদশ বর্ষীয়া স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছিল; ফলে বালিকাটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হরি আইন অনুসারে অভিযুক্ত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে এই লোমহর্ষণ ব্যাপারের পুনরভিনয় না হয়, সে জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৮৯১ খৃঃ অঃ ১৯শে মার্চ্চ তারিখে "সম্মতি আইন" (Age of Consent Bill) নামে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সার এ, স্কোবল (Sir A, Scoble) এই আইনের সৃষ্টি কর্ত্তা। এই আইনের বিধান অনুসারে স্ত্রীর বয়স দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ না হইলে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ; আইন ভঙ্গ করিলে স্বামীর দশবৎসর কারাবাস কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের ব্যবস্থা আছে। হিন্দু-সমাজের বহুব্যক্তি এই আইন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। গভর্ণমেণ্টের আইন মানিয়া চলিতে হইলে অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে সুতরাং নূতন আইনের প্রতিবাদ করা আশু কর্ত্তব্য বলিয়া এদেশীয় কোন কোন সংবাদপত্রে বিশিষ্ট আন্দোলন চলিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা পূর্ব্বেই দৈনিক হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান মিরর সম্মতি আইন সমর্থন করায় ইহা ব্রাহ্মদিগের পত্রিকা বলিয়া অনেকেরই ধারণা জন্মিয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন সাপ্তাহিক ছিল। দেশে যখনই কোন একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটিয়াছে, অমৃতবাজার পত্রিকা তখনই তাহা অবলম্বনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। সাপ্তাহিক পত্রিকায় আশানুরূপ আন্দোলন হইতেছে না দেখিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, এই দুঃসময়ে যদি দেশে একখানি হিন্দু দৈনিক পত্রিকা থাকিত, তাহা হইলে দেশের মহদুপকার হইত। কথাটী শিশিরকুমারের হৃদয়ে বড়ই বাজিয়াছিল। তিনি এই অভাব দূর করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। একখানি দৈনিক পত্রিকা পরিচালন করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা ব্যয় করা পত্রিকা পরিচালকগণের পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শিশিরকুমারের মনে একবার জাগিয়া উঠিত, যেরূপেই হউক তিনি তাহা সম্পন্ন করিতেন। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি সহোদরগণের সহায়তায় সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি ১৮৯২ খৃঃ অঃ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই দৈনিকে পরিণত করিলেন। দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা দেখিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছিলেন, "আমরা দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকাকে অভিনন্দন ও ইহার সফলতা কামনা করি। আমাদের সহযোগী যদি পূর্ব্বের ন্যায় সাহসিকতা রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের মহদুপকার করা হইবে।" *

প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে দেশে যে একটী প্রবল আন্দোলন হইবে, অমৃত বাজার পত্রিকা গভর্ণমেণ্টকে তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছিলেন। যাঁহারা সম্মতি আইন সমর্থন করিবেন শিশির কুমার অমৃত বাজার পত্রিকায় তাঁহাদিগকে ও সম্মতি আইনের সৃষ্টিকর্ত্তা সার এ স্কোবলকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"If a husband is sent to jail for life or for ten years, what will become of his girl wife? Who will protect her then? Who will feed her? What will be her fate? She will be a miserable creature for life; perhaps she will die a harlot Will she not curse then the philanthropist, who in going to protect her from a fanciful danger will make her miserable for life?

"Suppose Sir A, Scoble sits as a judge and a husband and girl wife are hauled up before him He sends the husband to jail for ten years and then the girl tells him, 'Benevo

* "We welcome the Amritabazar Patrika on its devolopment into a daily board sheet and wish its every success in the new existence. If our contemporary continues to do his duty to his country as boldly, loyally and faithfully as he has done in the past, great good will certainly be done to our country's cause." Hindu Patriot.

lent Judge! I am a girl of eleven and therefore very foolish. I agreed to what my husband proposed. Indeed I was not aware of the existence of any law about this matter. You now send him to jail. Can you provide me with another husband? Why do you make me miserable for life? Who will protect me now? Who will maintain me? And who can make me happy in life except my husband? You profess to be my friend and a philanthropist, Why do you make an innocent girl who is your object of tender care, miserable for life?" What reply will Sir A Scoble give her?"

অর্থাৎ—"স্বামীর প্রতি যাবজ্জীবন কিম্বা দশ বৎসরের কারাবাসের আদেশ হইলে, তাহার বালিকা পত্নীর অবস্থা কি হইবে? কে তাহাকে রক্ষা করিবে? কে তাহাকে আহার দান করিবে? তাহার অদৃষ্ট কি হইবে? সে চিরকালের জন্য দুর্দ্দশাগ্রস্তা হইবে এবং হয়ত বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিতা হইবে। তাহার যে হিতৈষিগণ তাহাকে কাল্পনিক বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় তাহাকে জনম দুঃখিনী করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা কি তাহার অভিশাপগ্রস্ত হইবেন না?

"মনে করুন, সার এ, স্কোবল্ বিচারপতিরূপে আসীন এবং তাঁহার সম্মুখে একটী স্বামী ও তাহার বালিকা পত্নী বিচারের জন্য উপস্থিত। বিচারে স্কোবল্ স্বামীকে দশ বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরণ করিলেন। তখন সেই বালিকা পত্নী যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'সদাশয় বিচারপতি! আমি একাদশবর্ষীয়া বুদ্ধিহীনা বালিকা। সত্যই আমি তোমাদের আইন অবগত নহি; আমি আমার স্বামীর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছিলাম। তুমি আমার স্বামীকে কারাগারে প্রেরণ করিলে, কিন্তু তুমি কি আমাকে দ্বিতীয় স্বামী প্রদান করিতে পার? কেন তুমি আমাকে চিরদিনের জন্য দুঃখিনী করিলে? কে আমায় রক্ষা করিবে? কে আমায় ভরণপোষণ করিবে? আমার স্বামী ব্যতীত কে আমাকে জীবনে সুখী করিবে? তুমি আমার হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দাও, আমি তোমার স্নেহের পাত্রী, তবে কেন তুমি আমার জীবন চিরদিনের জন্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিলে? সার এ, স্কোবল্ এ প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিবেন?"

প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেবল সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে নহে, গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করা হইবে, ইহা দেখাইবার জন্য অমৃত বাজার পত্রিকা লিখিয়াছিলেন,—

"The inert people of India can be moved by two means, viz. by meddling with there religion and meddling with their women. It is apprehended that this measure has the effect of meddling with both. That their will be a convulsion about this matter we believe; that their will be any lawlessness we do not believe. What we further believe is that the measure will create a sore in the heart which will remain there unnoticed by both the people and the Government. But if any attempt made hereafter to bring the law under operation, the sore will break out afresh. The Government is wise. It will do what is proper. We can only give it our honest advice.

অর্থাৎ—"ভারতবাসী নির্জ্জীব হইলেও যখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্মে ও রমণীগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তখন তাহাদের সে নির্জ্জীবতা দূর হইবে। বর্ত্তমান আইন এই উভয় ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিতেছে। আমাদের মনে হয়, এই উপলক্ষে দেশে একটা মহা হাঙ্গামা উপস্থিত হইবে। তবে তাহাতে কোন আইন বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই নূতন বিধি সাধারণের ও গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে ভারতবাসীর হৃদয়ে যে ক্ষত উৎপাদন করিবে, তাহা আইন কার্য্যকর করিবার চেষ্টা হইলে পুনরায় নূতন হইয়া উঠিবে। যাহা সঙ্গত, বিচক্ষণ গভর্ণমেণ্ট তাহাই করিবেন, আমরা কেবল সৎপরামর্শ প্রদান করিতে পারিব।"

গভর্ণমেণ্টের ভাব লক্ষ্য করিয়া শিশির কুমার বড়দুঃখে অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন:—"The people of india do not know now who their masters are. Are they the subjects of the Queen or the British Committee to whom the Viceroy referred? Is the Viceroy the High Priest

of the Hindus? Is the Queen's Proclamation a hoax and a snare? Is the irresponsible British Committee to rule the Viceroy?"

অর্থাৎ—"ভারতবাসিগণ, বর্ত্তমানে তাঁহাদের এখনও বিধাতা কে, তাহা অবগত নহে। তাহারা কি মহারাণীর প্রজা? বড়লাট বাহাদুর এই ব্রিটিশ কমিটীকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। বড়লাট বাহাদুর কি হিন্দুদিগের প্রধান যাজক? মহারাণীর ঘোষণা পত্র কি প্রবঞ্চনাপূর্ণ? বড়লাট বাহাদুর কি দায়িত্বজ্ঞান হীন ব্রিটিশ কমিটী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবেন?"

প্রস্তাবিত বিধির প্রতিবাদ জন্য গড়ের মাঠে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। দলে দলে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন উন্মত্তের ন্যায় বড়লাট বাহাদুরের বাটীর চতুর্দ্দিকে বিরিয়া দাঁড়াইয়া যখন কাতর স্বরে "ধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম রক্ষা কর" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন যে দৃশ্য হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। আন্দোলনে কোনও ফলোদয় হইতেছে না দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ বিপদ হইতে উদ্ধারের আশায় কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে এক মহাপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই মহাপূজার অভাবনীয় ব্যাপারও বর্ণনা করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা ঘোরতর আন্দোলন করিলেও কোন-ফল হয় নাই; গভর্ণমেণ্ট জন সাধারণের অভিমত পদদলিত করিয়া 'সম্মতি আইন' বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আইন বর্ত্তমানে কার্য্যকর দেখা যায় না। বঙ্গবাসী পত্রিকাও এই আইনের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। ইহার স্বত্বাধিকারী সম্পাদক ম্যানেজার ও মুদ্রাকর আইন অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

আধুনিক বঙ্গের অন্যতম নায়ক শিশিরকুমার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সকলে ভাই ভাই হইতে না পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। ধর্ম্মের অভ্যুদয়েই দেশের জাগরণ এবং সেই জন্যই তিনি ধর্ম্মের উন্নতি বিধানে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শিশিরকুমারের ধর্ম্মজীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্যভার শ্রীযুক্ত বাবু মতি-লাল ঘোষ মহাশয়ের উপর পতিত হয়। প্রাচীন ঋষিগণ লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে ও পর্ব্বত গহ্বরে আরাধনা করিয়াও আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম সাধনে আত্মনিয়োগ করিবার পর হইতে শিশিরকুমার অধিকাংশ সময়ই তাঁহার জনবিরল বৈদ্যনাথ দেওঘরের বাটীতে অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু বাহিরে অমৃতবাজার পত্রিকার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পত্রিকার প্রবন্ধাদি লিখিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পত্রিকার গ্রাহকগণ পত্রিকা পাঠ করিতে করিতে প্রবন্ধের মধ্যে যখনই কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেন, তখনই তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, প্রবন্ধটী শিশিরকুমারের লেখনী নিঃসৃত। তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকা দেশের কি পরিমাণ উপকার করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, পাঠকবর্গ তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমার যেমন শিশিরকুমারের হৃদয়ে দেশের ও সমাজের কার্য্যকারী সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, শিশিরকুমারও সেইরূপ সহোদর মতিলালকে স্বদেশ সেবায় অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। শিশিরকুমারের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়াই শ্রীযুক্ত মতিবাবু অমৃতবাজার পত্রিকার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। নির্ভীকতা তেজস্বিতা ও ন্যায় নিষ্ঠা শিশিরকুমারের ন্যায় তাঁহারও চরিত্রে পরিস্ফুট এবং সেই জন্যই বঙ্গের শাসন কর্ত্তারা অনেক সময় তাঁহার সহিত শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় মতিবাবুকে প্রায়ই লাট ভবনে আহ্বান করিতেন। আমাদের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তা লর্ড রোনাল্ডসেও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বাহাদুর, যুবরাজরূপে, যখন কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় তিনি শ্রীযুক্ত মতিবাবুকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রদান করিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। যুবরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী সার ওয়ালটার লরেন্স (Sir W. Lawrence) শিশিরকুমারের

বন্ধু ছিলেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা নিয়মমত যত্ন সহকারে পাঠ করিতেন। যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করিলে অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী ও ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা যাহাতে তাঁহার নিকট না পৌঁছায় তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল বলিয়া একটা জনরব উঠিয়াছিল। কিন্তু সার ওয়ালটার লরেন্স প্রত্যহই যুবরাজকে অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিতে দিতেন। সার ওয়ালটার লরেন্সের নির্দ্দেশ মত অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত মতি বাবু একদিন (গভর্ণমেণ্ট হাউসে) লাট প্রাসাদে উপস্থিত হন। সেখানে যুবরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী সার ওয়ালটারের সহিত নানা কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সার ওয়ালটার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন ?" মতিবাবু শুনিয়া অবাক্ হইলেন। যাহা হউক সার ওয়ালটার তাঁহাকে যুবরাজের নিকট লইয়া গেলেন ও তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। যুবরাজ মতিবাবুর করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলে মতিবাবু বিনীত ভাবে বলিলেন,—"করমর্দ্দন করিলে আমাদের ভাবী সম্রাটের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত করা হইবে না।" তিনি যুবরাজকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া সজল নয়নে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—"May it please your Royal Highness: Humble as I am, I am greatly honoured by this interview. I shall ever remember it with gratitude. Now I am in the presence of our future king Emperor. Permit me to say that poor India is in a bad way. It needs protection at your Royal Highness' hands, for you are our future sovereign, Pray don't forget Indians but remember that they are as much yours as the forty millions of England. What they need most is the genuine sympathy of their rulers."

অর্থাৎ "যুবরাজ ! আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনি আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমি ইহা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব। ভারতের অবস্থা অতীব শোচনীয়, ইহাই আমি আমাদের ভাবীসম্রাটের নিকট বলিতে চাই। আপনি আমাদের ভাবী সম্রাট ; ভারতবর্ষকে আপনি রক্ষা করুন। ভারতবাসীকে বিস্মৃত হইবেন না ; ইংলণ্ডের চারি কোটি প্রাণী যেমন আপনার, ভারতবাসীরাও সেইরূপ আপনার, ইহা স্মরণ রাখিবেন, এই আমার প্রার্থনা। শাসনকর্ত্তাদিগের প্রকৃত সহানুভূতিই ভারতবাসীগণের প্রধান অভাব।"

শ্রীযুক্ত মতিবাবুর ভাব লক্ষ্য করিয়া যুবরাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সার ওয়ালটার লরেন্স যুবরাজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিও বিচলিত হইয়াছিলেন। যুবরাজ মতিবাবুকে উঠিতে বলিয়া প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলিয়াছিলেন :—

"I am very pleased to come accross you. You want an assurance from me that I will not forget the Indians. Well, I assure you, I sha'l not and cannot forget the Indians. I shall ever remember them and make it a point to tell my father how immensely gratified I have been with the magnificent reception you people have given me. It shall also be my pleasant duty to tell my father that you are in need of wider sympathy. I carry with me very happy impressions about India."

অর্থাৎ "আপনার সহিত সাক্ষাতে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ভারতবাসীকে আমি বিস্মৃত হইব না। আপনি আমার নিকট হইতে এই আশ্বাস বাক্য প্রার্থনা করেন—আমি ভারতবাসীকে ভুলিব না, ভুলিতে পারিব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। আমি চিরদিন তাহাদিগকে স্মরণ করিব। আপনার দেশবাসিগণ মহাসমারোহের সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন এবং তাহাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহাও আমি আমার পিতৃদেবের নিকট নিবেদন করিব। শাসনকর্ত্তাদের নিকট হইতে আপনারা যে অধিকতর সহানুভূতির আশা করিয়া থাকেন, ইহাও আমি আমার পিতাকে জানাইব। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার বড় সুন্দর ধারণা হইয়াছে।"

যুবরাজ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া গিল্ডহলে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি সেই বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, শাসনকর্ত্তারা যদি ভারতবাসীদিগের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে ভারতশাসন আমাদের পক্ষে অতি সহজ হইবে।

বঙ্গদেশে অন্তরীণের (Internment) ব্যাপার লইয়া বহু

পরিবারের যে হাহাকার উঠিয়াছে, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতি বাবু অমৃতবাজার পত্রিকায় ঘোরতর আন্দোলন করিয়া যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। ভারতে স্বায়ত্তশাসনের (Homerule) অধিকার লাভের জন্য আসমুদ্র হিমাচল যে আন্দোলন চলিতেছে, মতিবাবু সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা। সপ্ততিবর্ষের অধিক বয়স হইলেও তাহার উদ্যম যুবকগণেরও অনুকরণীয়। দেশের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত বলিয়াই ভগবান তাঁহাকে মঙ্গল হস্তে রক্ষা করিতেছেন। শিশিরকুমার যেমন মতিবাবুকে মানুষ করিয়াছিলেন, মতি বাবুও সেইরূপ শিশিরকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র পীযূষকান্তিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। মতি বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত গোলাপ লাল ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ পত্রিকার কার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত। আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও অমৃতবাজারপত্রিকা স্বীয় পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিয়া দেশের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন।

শিশিরকুমারের সংসর্গের ফলে তাঁহার পরিবারস্থ পুরুষগণ যে তেজস্বী হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণও কিরূপ তেজস্বিনী হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। ঘটনাটী গিরিডির উকিল শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে আমরা অবগত হইয়াছি। সতীশ বাবুর পিতা ৺বরদাকান্ত রায় যশোহরের পুলিশ সব্‌ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। সেই সময় ৺বসন্তকুমার মিত্র তথাকার পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। একদিন শিশিরকুমারের সহধর্ম্মিণী, বসন্ত বাবুর স্ত্রী ও বরদাবাবুর স্ত্রীর সহিত নানা বিষয়ের আলাপ করিতেছেন, এমন সময় বরদা বাবুর স্ত্রী শিশিরকুমারের সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন,—"আপনার স্বামী যেরূপভাবে সংবাদ পত্র লিখিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার জেল হওয়া অসম্ভব নয়। আপনি বোধ হয় সেজন্য সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন।" শিশিরকুমারের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "ভয় কিসের? তিনি যদি জেলে যান তাহা হইলে তাঁহার সহোদরগণ কাগজ চালাইতে পারিবেন। আর তাঁহারা সকলেই যদি জেলে যান, তাহা হইলে আমরা, মেয়েরা, তাঁহাদের জেল হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কাগজ চালাইব। কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহারা কখনও বিচলিত নহেন, আমরাও নহি।" এ উক্তি যে শিশিরকুমারের সহধর্ম্মিণীরই উপযুক্ত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

(সম্পূর্ণ)

শ্রীমন্মথনাথ বসু

প্রতীক্ষা

মনের মাঝে একটী কথা জাগ্‌ছে শুধু বারংবার,
গগন-কোণে একটী তারা সন্ধ্যারাণীর উপহার!
কখন যে সে আসবে ফিরে শূন্য গৃহ পূর্ণ করি'
অকূল মাঝে ভাসবে আবার ঘাটে বাঁধা জীর্ণ তরী

একটী কথা একটু হাসি আঁখির দিঠি একটু খানি,
সকল ব্যথা ভুলিয়ে দিত সত্য আমি সত্য জানি!
দীনের ঘরে হীরার কণা বৃষ্টি হত হাজার ধারে,
বুকের মাঝে নিবিড় করে নিশায় যবে পেতাম তারে

কত দুঃখের নিধি সে মোর, সাথী সে মোর সুখের কত!
সাগর-ছেঁচা পরশমণি করুণ সোনা প্রেমের ব্রত!
জীবন-যাগে পুণ্য-চরু সখী সে-মোর অন্বেষি,—
অন্ধ আঁখি নূতন আলো পেল ও মুখ বারেক হেরি'!

আজকে সে যে অনেক দূরে—শ্যামল কোলে পল্লীমার
হেথায় আমি একলা পড়ে বহিগো শুধু হৃদয়-ভার!
কখন হেথা ফুটবে ফুল, কখন পাখী গাইবে গান,
পথের পানে পলক হারা গুমরে মরে সকল প্রাণ!

শ্রীনীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

মুসলমান স্পেন

সূচনা

খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর প্রথম ভাগে মহম্মদ আরবে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বহু বাধা বিঘ্ন, অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে মহম্মদ ইস্‌লাম ধর্ম্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সমগ্র আরব দেশ ইস্‌লাম-একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়াছিল। ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আরবের অধিবাসীগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে (clan) বিভক্ত ছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর সদাসর্ব্বদাই যুদ্ধ বিরোধ চলিত। এই যুদ্ধ বিরোধ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন আরব কবিগণ যে উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা আঁধার যুগের (Dark Age) আরবের ইতিহাস জানিতে পারি। যাহা হউক ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবদেশের অধিবাসীগণের মধ্যে জাতীয়ত্বের উন্মেষ হইল। ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইল।

মহম্মদের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে আবু বকর ও ওমর জনসাধারণ কর্ত্তৃক ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্যের কর্ণধার নির্ব্বাচিত হইলেন। এই খালিফাদ্বয়ের অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ চেষ্টায় আরব ও তৎপার্শ্বস্থ দেশ সমূহ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত আরবদিগের শক্তির সম্মুখে গ্রীক সাম্রাজ্য কম্পিত হইল, পারস্য সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।

খালিফা ওস্‌মানের সময় হইতেই মুসলমানদিগের মধ্যে গৃহ বিবাদ আরম্ভ হয়। ওস্‌মান ও আলির বিরোধ ও মহরমের শোচনীয় কাহিনী সকলেরই সুবিদিত। ওস্‌মান ও আলির বিরোধ হইতেই ইস্‌লাম জগতে সীয়া ও সুন্নী নামে দুইটি পরস্পর বিরোধী প্রবল দলের সৃষ্টি হইল।

আলির হত্যার পর ইস্‌লাম সাধারণতন্ত্রের লোপ হইল। ওমিয়াদ বংশীয় মোয়াবিয়া সমস্ত ক্ষমতা আপন হস্তে লইয়া প্রবল রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। দামাস্কাস্ ইস্‌লাম সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল। এই সময় পারস্য, এশিয়া মাইনরের কতক অংশ, সিরীয়া, প্যালেষ্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও মিশর ইস্‌লাম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়, স্পেনে মুসলমান সাম্রাজ্য ও সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এসিয়ায় ওমিয়াদ ও আবাসিদ সাম্রাজ্যের আলোচনা আমরা এ প্রবন্ধে করিব না।

(১) স্পেন বিজয়

রোম সাম্রাজ্য পতনের প্রাক্কালে বহু অসভ্য জাতি ইয়োরোপ রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানা দেশ জয় করিয়া তথায় বহু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভিসিগথ (Visigoths) জাতি স্পেন দেশ জয় করিয়া এক রাজ্য স্থাপনা করে। ভিসিগথগণ প্রায় দুইশত বৎসর স্পেনে রাজত্ব করে। রোম সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এই অসভ্য দুর্দ্ধর্ষ জাতি কোমল ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠিল। রোমীয় সভ্যতার সকল দোষ গুলিই তাহারা গ্রহণ করিল।

স্পেন জয় করিবার কিয়ৎকাল পরেই ভিসিগথ জাতি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু রোমীয় সভ্যতার প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান দিগের মধ্যে ধর্ম্ম বন্ধন শিথিল হইতেছিল। নানারূপ পাপ ও কদাচার সমাজদেহে প্রবেশ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও সমাজকে জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ধনীর উৎপীড়নে দরিদ্র লোক ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ বংশের যথেচ্ছাচারে দেশে অশান্তির বীজ রোপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে রডারিক স্পেনের রাজা হন। তাঁহারই রাজত্বকালে মুসলমানগণ স্পেন আক্রমণ করে। মুসলমানদের স্পেন আক্রমণ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। কাউন্ট জুলিয়ান স্পেন সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি তাঁহার কন্যা ফ্লোরিণ্ডাকে রাণীর সহচরীদের মধ্যে শিক্ষা পাইবার নিমিত্ত রাজধানীতে প্রেরণ করেন। রাজা রডারিক এই স্থানে তাঁহার কন্যাকে অপমান করেন। ফ্লোরিণ্ডা পিতার নিকট সকল কথা পত্র দ্বারা ব্যক্ত করিয়া প্রতিশোধ লইতে বলেন।

কাউন্ট জুলিয়ান এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য আরব সেনাপতি মুসার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুসা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলে জুলিয়ান তাঁহাকে স্পেন আক্রমণের পথ প্রদর্শন করেন। এই গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকে ঐতিহাসিক সন্দেহ করেন। কিন্তু একথা সত্য যে কাউন্ট জুলিয়ানের সাহায্যেই প্রথমে মুসলমানগণ স্পেনে প্রবেশ করেন।

এই সময় আফ্রিকায় ইস্‌লাম সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আরব সেনাপতি মুসা আফ্রিকার শাসন কর্ত্তা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে প্রথম বিজয়ী ইস্‌লামের গতিরোধ হইল। মুসা শস্যশ্যামলা স্পেনের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং স্পেন জয়ের জন্য খালিফা ওয়ালিদের আদেশ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু খালিফা স্পেনের ন্যায় অজানিত দূরদেশে মুসলমানগণ বিপদগ্রস্ত হইতে পারে বিবেচনা করিয়া মুসার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। এই সময় কাউন্ট জুলিয়ান কন্যার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মুসার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি নানা প্রকারে স্পেনের ঐশ্বর্য্যের কাহিনী শুনাইয়া মুসাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। মুসা পুনরায় স্পেন আক্রমণের জন্য খালিফার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই স্পেনের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিবার জন্য তারিফের (Tarif) অধীনে অল্পসংখ্যক সৈন্য স্পেনে পাঠাইলেন। তারিফ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্পেনের অরক্ষিত অবস্থার কথা জ্ঞাত করিলেন। ইতিমধ্যে খালিফার নিকট হইতে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া স্পেন আক্রমণের অনুমতি আসিল। মুসা স্পেন বিজয়ে কৃতসংকল্প হইলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসা তারিক (Tarik) নামক এক সেনাপতির অধীনে সাতসহস্র সৈন্য স্পেন বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। তারিক স্পেনের যে স্থানে সৈন্য লইয়া অবতরণ করেন সেই স্থান তাঁহার নামানুযায়ী জেবেল-তারিক বা জিব্রাল্টার হইয়াছে। রডারিক তখন রাজ্যের উত্তর ভাগে পার্ব্বত্য বাস্ক্ (Basques) জাতির সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। মুসলমান আক্রমণের সংবাদ পাইয়াই তিনি সসৈন্যে দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গোয়াদালেত্ নদীর তীরে ভীষণ যুদ্ধ হয়। সাতদিন যুদ্ধের পরে রডারিক পরাজিত হন। স্পেনের সিংহাসন মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইল।

রডারিকের পরাজয়ের পরে তারিক দ্রুত রাজধানী টলেডোর দিকে অগ্রসর হইলেন। বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে সৈন্যগণকে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন নগরের দিকে প্রেরণ করিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই কর্ডোভা, আর্কিডোনা, মালাগা, এলভিরা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর মুসলমান হস্তে পতিত হইল। ইতিমধ্যে তারিক টলেডোর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রডারিকের পক্ষীয় স্পেনের অভিজাতবর্গ টলেডো রক্ষার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া অ্যাষ্টুরিয়াসের পর্ব্বতময় অঞ্চলে পলায়ন করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে তারিকের বিজয়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া মুসা নিজেও স্পেনে উপস্থিত হইলেন। তারিক ও মুসার মিলিত শক্তির সম্মুখে স্পেন সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এইরূপে প্রবল স্পেন সাম্রাজ্য দমাস্কাসের খালিফের অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত হইল।

মুসা ও তারিকের মৃত্যুর পর মুসলমান শাসনকর্তাগণ ফ্রান্স বিজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭১৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ আরবদিগের হস্তে পতিত হইল। নারবোন্ নগর আরব অধিকৃত ফরাসী প্রদেশের রাজধানী হইল। মুসলমানগণ ক্রমশঃ ফ্রান্সের উত্তর ও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ৭৩০ খৃষ্টাব্দে নারবোনের শাসনকর্ত্তা আবদর রহমান সমস্ত গল (ফ্রান্স) বিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একুইটেইন ও তৎসহিত বোর্দো নগর আরবহস্তে পতিত হইল। বিজয়ী আবদর রহমান সসৈন্যে টুর্সের (Tours) দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই সময় কার্লোভিন্জিয়ান বংশীয় চার্লস্ মার্টেল ফ্রান্সের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। টুর্সের প্রান্তরে এক ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাতদিন তুমুল যুদ্ধের পর মুসলমান সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। আবদর রহমান যুদ্ধে নিহত হইলেন। টুর্সের যুদ্ধ পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধের উপর ইউরোপের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল। মুসলমানগণ এই যুদ্ধে জয়ী হইলে সমস্ত ইউরোপ মুসলমানের পদানত হইত, মুসলমান ধর্ম্ম সমস্ত জগতে প্রতিষ্ঠিত হইত।

টুর্সের পরাজয় ইউরোপে মুসলমান বিজয়ের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিল। ইহার পর হইতেই মুসলমান সাম্রাজ্য ক্রমশ কমিয়া স্পেনের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। ফ্রান্স শীঘ্রই মুসলমান অধীনতাপাশমুক্ত হইল। কিন্তু ফ্রান্সের রাজগণ মুসলমান শক্তির সম্যক পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও মুর (মুসলমান)দিগের আক্রমণ করিয়া স্পেন হইতে তাড়াইয়া দিতে সাহস করেন নাই। এই সময় স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই অন্তর্ব্বিবাদের সুযোগ পাইয়া সম্রাট সার্লাম্যান মুরদিগকে আক্রমণ করেন। প্রথম কয়েক বার তিনি আংশিকভাবে সফল ও হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া স্পেন ত্যাগ করেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

(২) স্পেনের অবস্থা প্রথম—যুগে মুরশাসন।

টুর্সের যুদ্ধের পর মুরগণ প্রায় তিনশত বৎসর নির্ব্বিবাদে স্পেনে রাজত্ব করেন। এই তিনশত বৎসরের মধ্যে তাঁহারা স্পেনে এক অপূর্ব্ব সভ্যতার সৃষ্টি করেন। এই সভ্যতার নিকট ইউরোপ যে কি পরিমাণে ঋণী তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

স্পেনের উত্তরাংশ পর্ব্বতময়। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ গুলিতে মুরকর্ত্তৃক তাড়িত স্বাধীনতাপ্রিয় খৃষ্টানগণ আশ্রয় লইয়াছিলেন। বহু চেষ্টাতেও মুরগণ তাঁহাদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই। খৃষ্টানগণ ঐ পার্ব্বত্যপ্রদেশ গুলিতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

স্পেনের উর্ব্বর দক্ষিণাংশ মুরদিগের অধীনেই রহিল। এই দক্ষিণ অংশকে তাহারা এণ্ডালুসিয়া বলিত।

রাজ্যজয় করা সহজ সাধ্য হইলেও রাজ্যশাসন সকল সময়ে সহজ সাধ্য হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে বিজেতা কঠোর শাসননীতির প্রবর্ত্তন করিয়া বিজিতদিগকে নির্য্যাতন করেন। কিন্তু মুরদিগের শাসননীতি অতি উদার ছিল। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বিজিতদিগের প্রতি তাহারা কোনও কঠোর অত্যাচার করেন নাই। প্রজারা অতি সন্তুষ্টচিত্তে মুসলমান অধিকারে বাস করিত। এমন কি মুরগণ স্পেনীয়দিগকে যে শান্তি ও সুখ দিয়াছিল স্বদেশীয় রাজার অধীনেও তাহারা এত সুখে বাস করে নাই। ঐতিহাসিক Lane pool বলিয়াছেন "...never was Andalusia so mildly, justly and wisely governed as by her Arab conquerors" আর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন, "under the Moors...the people were on the whole contented...and far better pleased than they had been when their severe gns belonged to the same religion..." যুদ্ধাবসানে রাজ্যে যখন শান্তির প্রতিষ্ঠা হইল তখন স্পেনবাসীগণ বুঝিতে পারিল যে তাহারা বিজেতাদিগের অধীনে অনেক সুখে ও শান্তিতে থাকিতে পারিবে এবং আপন আপন ধর্ম্মপালন করিতে পারিবে। আরব শাসনকর্ত্তাদিগের কঠোর শাসনে দেশে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল।

এক্ষণে আমরা মুরশাসনের মূল নীতির আলোচনা করিব। বিজেতা মুরগণ স্পেনের আভ্যন্তরিক শাসন কার্য্যে বিশেষ কোনও হস্তক্ষেপ করিলেন না। বিজিত জাতির পুরাতন আইন কানুন বিচারালয় ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলই অব্যাহত রহিল। বিজিত জাতির মধ্য হইতেই অনেকস্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তাহারাই নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার করিতেন, রাজস্ব আদায় করিয়া রাজসরকারে প্রেরণ করিতেন। সার্ব্বজনীন ইস্লামের অধীনে ধনী দরিদ্র সকলকেই সমান হইতে হইল। খৃষ্টান রাজগণের অধীনে যেরূপ সাধারণশ্রেণীদিগের (citizen class) রাজ্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইত, মুসলমান শাসনে তাহারা সে ভার হইতে একরূপ নিষ্কৃতি পাইল। তাহাদিগকে মাত্র "জিজিয়া" কর দিতে হইত,—তাহাও অতি অল্প। ইহা ব্যতীত কৃষিযোগ্য জমির সত্ব যাহারা ভোগ করিত তাহাদিগকে "খারাজ" (land tax) কর দিতে হইত। 'জিজিয়া' কর আয়ের অনুপাতে দিতে হইত। মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই এই জিজিয়া কর দিতে হইত। 'খারাজ' কর জমির উর্ব্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তির অনুপাতে স্থির হইত এবং ইহা মুসলমানকেও দিতে হইত। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে যাহারা যে জমি ভোগ করিত বিজয়ের পরেও মুসলমানগণ তাহাদিগকে সেই জমি ভোগ করিতে দিয়াছিল। কেবল মাত্র গির্জ্জার সম্পত্তি এবং যাহারা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল তাহাদের সম্পত্তিই রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। কৃষকগণ নির্ব্বিবাদে পূর্ব্বের মতই তাহাদের জমি চাষ করিয়া জীবনযাপন করিতে লাগিল। মোটের উপর একমাত্র জিজিয়া গ্রহণ ব্যতীত মুর অধীনে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে অন্য কোনও প্রভেদ বড় রহিল না।

মুরগণ বিজিতদিগের ধর্ম্মের পরেও কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই। খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ পূর্ব্বের মতই ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। মুরগণ জোর করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও মুসলমান করেন নাই। মুরগণের অধীনে ক্রীত দাস প্রথা উঠিয়া গেল। ইস্লাম ধর্ম্মে ক্রীতদাস রাখা নিষেধ। মহম্মদ একস্থানে বলিয়াছেন যে "যাহারা তাহাদের দাসদের প্রতি অত্যাচার অথবা অবিচার করিবে তাহারা স্বর্গে যাইতে পারিবে না।" খৃষ্টান প্রভুদের অধীনে ক্রীতদাসদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ইতর প্রাণীদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যবহার তাহারা পাইত। কিন্তু মুসলমানদিগের অধীনে তাহারা সাধারণ লোকের মতই সুখে বাস করিত।

এইরূপ সুশাসনের ফলে দেশ শান্তিপূর্ণ ছিল,—প্রজাগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিত। মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে ধর্ম্মগত ও জাতিগত প্রভেদ কমিয়া আসিতেছিল। ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সকলেই সমান অধিকার পাইত। সকল মুসলমানই সমান ইহাই ইস্লাম ধর্ম্মের বিশেষত্ব। বহু খৃষ্টান, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে বিবাহাদি হইতে লাগিল। ইহার ফলে এক নূতন মুসলমান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এই নূতন মুসলমান সম্প্রদায় হইতে পরে মুসলমানদের মধ্যে ঘোর অন্তর্ব্বিবাদের সৃষ্টি হয়।

(৩) কর্ডোভারাজ্য—ওমিয়াদ্ রাজবংশ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আরবদিগের স্পেনে আগমনের কিয়ৎকাল পরেই তাহাদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ আরম্ভ

হয়। এই অন্তর্ব্বিবাদ যে কেবলমাত্র স্পেনেই বর্ত্তমান ছিল তাহা নয়। এশিয়ার সাম্রাজ্যের মধ্যেও ঐরূপ অন্তর্ব্বিবাদ বর্ত্তমান ছিল। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইত। এক শ্রেণী (clan) অন্য শ্রেণীর প্রভুত্ব সহজে মানিতে চাহিত না। রাজশক্তি যখন প্রবল থাকিত তখন দেশে কতকটা শান্তি থাকিত। কিন্তু রাজশক্তি দুর্ব্বল হইলেই দেশে অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িত। অনেক সময় খলিফাগণ কোনও প্রবল শক্তিশালী শ্রেণীর সাহায্যে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। কিন্তু বিপক্ষ শ্রেণী সামর্থ্যে প্রবল হইলে তাহারা পূর্ব্ব খলিফার প্রাণ সংহার করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত রাজবংশ হইতে খলিফা নির্ব্বাচন করিতেন। তারপর সাম্রাজ্য বহুবিস্তৃত হইলে এবং দ্রুত গমনাগমনের সুবিধা না থাকিলে, দুর্ব্বল রাজশক্তির অধীনে দূরবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ প্রায় স্বাধীনভাবেই শাসন কার্য্য চালাইতেন। সুবিধা পাইলেই শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেন।

প্রায় একশত বৎসর রাজত্বের পর ওমিয়াদ রাজবংশের বিলোপ সাধন করিয়া আবাসিদ্ বংশীয় আবুল আব্বাস এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ওমিয়াদ্ রাজবংশের বিলোপসাধনের পূর্ব্বেই স্পেনের শাসন কর্ত্তাগণ একরূপ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। এশিয়ার ন্যায় স্পেনেও বিভিন্ন মুসলমান শ্রেণীর ভিতর যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইত। যখন যে শ্রেণী প্রবল হইত তখন সেই শ্রেণী হইতে শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইতেন। অনেক সময় আফ্রিকা হইতেও শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, কারণ স্পেন আফ্রিকার শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ প্রদেশ ছিল। ইস্লাম্ সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় স্পেনেও ঘোর অরাজকতা বিরাজমান ছিল এবং এই অরাজকতার সুযোগ লইয়া খৃষ্টান শক্তি উত্তর স্পেনে প্রবল হইয়া উঠিতে ছিল।

আবাসিদ্ রাজবংশ ইস্লাম্ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ওমিয়াদ রাজবংশের যাহারা জীবিত ছিলেন তাহাদের বিলোপ সাধনে যত্নবান হইলেন। ওমিয়াদ্ রাজবংশের বহু লোক নূতন বংশের আজ্ঞায় নিহত হইলেন। অতি অল্প কয়েকজন পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

এই সময় স্পেন প্রদেশে ওমিয়াদ্ রাজবংশের পক্ষের লোক খুব প্রবল ছিল। এইজন্য আবাসিদ্গণ কর্ত্তৃক তাড়িত ওমিয়াদ্ পক্ষীয় বহু লোক স্পেনে আসিয়া আশ্রয় লইল।

ওমিয়াদ্ রাজবংশীয় আব্দর্ রহমান আবাসিদ্গণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হন। কিন্তু আফ্রিকা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া তিনি স্পেনে ওমিয়াদ্ পক্ষীয়দিগের নিকট লোক পাঠাইলেন। ওমিয়াদ্ পক্ষীয় কয়েকটি শ্রেণী তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি স্পেনে উপস্থিত হইলেন। স্পেনের শাসনকর্ত্তাকে যুদ্ধ পরাস্ত করিয়া ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আব্দর্ রহমান স্পেনে নূতন এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই রাজ্যই কর্ডোভা রাজ্য নামে পরিচিত। কর্ডোভা নগর রাজধানী হইল। আবাসিদ্গণ বহু চেষ্টাতেও স্পেন পুনরধিকার করিতে পারিলেন না।

এই গোলযোগের সুযোগে স্পেনের বহু নগর স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। কিন্তু আব্দর্ রহমান সকলকে পরাস্ত করিয়া কর্ডোভা রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইত্যবসরে সার্লিমান স্পেন আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া অবশেষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

আব্দর্ রহমানের মৃত্যুর পর হিসাম কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতি শান্ত প্রকৃতি ও দয়ালু রাজা ছিলেন। শিক্ষার প্রসার কল্পে তিনি দেশ বিদেশ হইতে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের কর্ডোভায় আনয়ন করেন।

হিসামের মৃত্যুর পর আরও কয়েকজন রাজা কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় খৃষ্টানশক্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সুবিধা পাইলেই তাহারা কর্ডোভা রাজ্য আক্রমণ করিতেন।

৮২২ খৃষ্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় আব্দর্ রহমান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কর্ডোভা নগরের নানা প্রকার উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মুসলমান রাজগণ বিধর্ম্মী প্রজাদিগের ধর্ম্মের উপর কোনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। খৃষ্টানগণ স্বচ্ছন্দে নিজেদের ধর্ম্মপালন করিতেন, ধর্ম্মযাজকগণ ইচ্ছামত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। কিন্তু কেহ মুসলমান ধর্ম্মের গ্লানি প্রচার করিলে অথবা পয়গম্বর মহম্মদের নিন্দাবাদ করিলে সে কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত। কিন্তু এই সময় কয়েকজন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ইস্লাম ধর্ম্মের গ্লানি প্রচার করিতে লাগিলেন এবং মহম্মদের নিন্দাবাদ প্রকাশ্যে করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহাদের দেখাদেখি বহু খৃষ্টান ইস্লাম ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। ইউলোজিয়াস্ নামক একজন ধর্ম্মযাজক সমস্ত লোককে ইস্লাম ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বহু খৃষ্টান ইস্লাম ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। এই ব্যাপারে সুলতান যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়াছিলেন। তাহার আদেশানুসারে বিচারক কাজিগণ খৃষ্টানদিগকে ঐরূপ কার্য্যে বিরত থাকিতে অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না।

অবশেষে সুলতান প্রধান প্রধান খৃষ্টান ধর্ম্মযাযকগণের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভা খৃষ্টানদিগকে এরূপ কার্য্যে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল হইল না। অবশেষে ইউলোজিয়াস্ রাজাদেশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর ক্রমে ক্রমে ইহার অবসান হয়। এই ব্যাপার সম্বন্ধে একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, "This is a foolish suicide of the christians. They had no grievance against their rulers except that they are rulers."

ইহার পর কয়েকজন দুর্ব্বল সুলতান কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাদের সময় রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। উত্তরে খৃষ্টানগণ কয়েকটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। একটু একটু করিয়া তাহারা ঐ সকল রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছিল। ইহা ব্যতীত কর্ডোভা রাজ্যের স্থানে স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কর্ডোভারাজ্য প্রায় ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল। বহু নূতন মুসলমান রাজ্য স্পেনে স্থাপিত হইল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পরস্পরের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিত। আপন আপন স্বার্থের জন্য কোনও কোনও রাজ্য খৃষ্টান রাজাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া জাতীয় কল্যাণের মূলে কুঠারাঘাত করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। এই সুযোগে লিয়ন, এরাগণ, ক্যাষ্টাইল, ন্যাভার প্রভৃতি খৃষ্টান রাজ্যগুলি প্রবল হইয়া উঠিল।

ঘোর অরাজকতায় যখন সমস্ত রাজ্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল সেই সময় তৃতীয় আবদর রহমান কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহন করেন। ইহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সুদক্ষ নরপতি কেহই কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহন করেন নাই। রাজ্যারোহণকালে তাঁহার বয়স মোটে ২১ বৎসর হইয়াছিল। রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি কঠোর হস্তে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া কর্ডোভারাজ্যের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনেন। তাহার কঠোর শাসনে শীঘ্রই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হইল।

রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই খৃষ্টান রাজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাটিয়া গিয়াছিল। রাজা হইয়া তিনি শাসন নীতির আমূল পরিবর্ত্তন করেন। এ যাবৎ কাল অভিজাত বংশীয়েরাই রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় হেন্রীর ন্যায় সুলতান আবদর রহমান অভিজাত শ্রেণীর স্থানে বিচক্ষণ সাধারণ লোক শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই সকল লোক তাহাদের উন্নতির জন্য রাজার উপরেই নির্ভর করিতেন, কাজেই বিদ্রোহের কথা তাহারা মনেই আনিতেন না। ইহা ব্যতীত সুলতান সৈন্যবিভাগেরও নানা উন্নতি বিধান করিয়া রাজশক্তি অত্যন্ত প্রবল করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্পেনের উত্তরাংশের লিওন, ন্যাভার প্রভৃতি খৃষ্টান রাজ্যগুলি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আবদর রহমান এই রাজ্যগুলির উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বহুবার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও তিনি এই সকল রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনে সক্ষম হইলেন না। যাহা হউক তাঁহার শেষ জীবনে অনেক খৃষ্টান রাজ্য তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিত। এই স্থানে একটি কথা বলা আবশ্যক। সুলতান তৃতীয় আবদার রহমানই সর্ব্বপ্রথমে খালিফা উপাধি গ্রহণ করিয়া এশিয়ার সহিত স্পেনের সমস্ত সম্পর্ক লোপ করিয়া দেন।

আবদার রহমানের রাজত্ব কালেই কর্ডোভা রাজ্য শক্তি ও গৌরবের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে। বহু রাজ্য হইতে তাঁহার দরবারে দূত উপস্থিত হইত। জর্ম্মাণী, কন্‌ষ্টান্টিনোপল, ফ্রান্স প্রভৃতি খৃষ্টানরাজ্য হইতেও তাঁহার নিকট দূত (ambassador) প্রেরীত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে কর্ডোভা নগর শিক্ষা ও বাণিজ্যের এক বিরাট কেন্দ্র হইয়াছিল।

খালিফা আবদার রহমানের মৃত্যুর পর কর্ডোভার ওমিয়াদ্‌রাজ বংশ দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল। আবদার রহমানের পুত্র দ্বিতীয় হাকাম লেখাপড়া লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি রাজধানীতে এক বৃহৎ পুস্তকাগার স্থাপনা করেন। এই পুস্তকাগারে প্রায় চারি লক্ষ খণ্ড পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি ছিল। এই পুস্তকাগার পৃথিবীর প্রাচীন বৃহৎ পুস্তকাগারগুলির মধ্যে অন্যতম। তিনি রাজ্যশাসনেও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হিসাম দ্বাদশ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেন। ইহার সহিতই ওমিয়াদ্ রাজবংশ শেষ হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। অতি শীঘ্র নানারূপ বিশৃঙ্খলা রাজ্যমধ্যে উপস্থিত হইল। ইতি মধ্যে আবি আমির নামক এক সাধারণ কর্ম্মচারী নিজের দক্ষতায় ও রাজমাতা সুলতানা অরোরার সাহায্যে শীঘ্র রাজ্যের একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। আবি আমির আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে যুদ্ধে এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উচ্ছেদ করিয়া রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। অতঃপর তিনি আল্ মনসুর নাম গ্রহণ করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ওমিয়াদ্ রাজবংশ বিলুপ্ত হইল। যাহা হউক আল্ মনসুরের সময় কর্ডোভা আবার শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। আলমনসুরের মৃত্যুর পর কর্ডোভারাজ্য অতিদ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, আল মনসুরের পর কয়েকজন দুর্ব্বল সুলতান কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাদের রাজত্বকালে আবার অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হয়। এই সময় দেশ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে আবার বিভক্ত হইয়া গেল। বহু রাজবংশের অভ্যুত্থান ও পতন হইল। কর্ডোভারাজ্য

চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। সেভিল্, মালাগা, গ্রানাডা প্রভৃতি বহু নূতন নূতন মুসলমান রাজ্য নূতন নূতন রাজবংশের অধীনে কর্ডোভার ধ্বংশের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল রাজ্য পরস্পর যুদ্ধ বিরোধেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিত।

এই অরাজকতাও যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগে খৃষ্টান রাজাগুলি ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া মুসলমান রাজাগুলি গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। লিয়ন, ক্যাষ্টাইল ও য্যাষ্টুরিয়াস রাজ্যত্রয়ের অধিপতি ষষ্ঠ আল্‌ফন্‌সো এক মুসলমান রাজাকে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য দান করিয়া সকলেরই ধ্বংশের পথ পরিস্কার করিয়া দিতে লাগিলেন। খৃষ্টান শক্তি যখন এই রূপে অতি প্রবল আকার ধারণ করিতেছিল তখন মুসলমান রাজগণ আপনাদিগের সমূহ বিপদ বুঝিতে পারিয়া আফ্রিকার আল্‌মোরেভাইড্ (Almoravide) ও আল্‌মোহেড্ (Almohade) সুলতানদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আফ্রিকার মুসলমান শক্তির সাহায্যে আরও কিছুকাল স্পেনে মুসলমান শক্তি অব্যাহত রহিল। কিন্তু অন্তর্বিবাদে তাহাদের শক্তি একেবারে নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত প্রবল খৃষ্টান শক্তির গতিরোধ করা মুরদিগের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইল। অতি অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত স্পেন খৃষ্টান রাজাদের করতলগত হইল। কেবলমাত্র স্পেনের দক্ষিণভাগে গ্রাণাডারাজ্য মুরদিগের অধীনে রহিল। প্রায় দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত গ্রাণাডার সুলতানগণ প্রবল খৃষ্টান শক্তির বিরুদ্ধে আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার রাজত্বকালে গ্রাণাডারাজ্য কালের অতল গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। গ্রাণাডার সহিত স্পেন হইতে মুসলমান সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও মুছিয়া গেল।

এই প্রবন্ধে আমরা মুসলমানরাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আগামী প্রবন্ধে আমরা মুসলমান সভ্যতা ও ইউরোপীয় সভ্যতার উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীনির্ম্মলেন্দু দাশ গুপ্ত।

হিন্দুসমাজ ও জাতিভেদ

(২)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে প্রাচীন সমাজপদ্ধতির বিরোধী কতকগুলি নূতন নীতির বহুল প্রচার হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত এই সব নীতি ইয়োরোপীয়দের বুদ্ধি একেবারে অধিকার করিয়া ছিল। মানুষ সব সমান, সর্ব্ববিষয়ে সকলের সমান অধিকার, প্রত্যেক মানবের ব্যক্তিত্বের মহিমার প্রতিষ্ঠাই সকলের উপরকার কথা। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অধিকার সকলে ভোগ করিবে,—কেবল এইটুকু দেখিতে হইবে, কোনও একব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্তির এইরূপ অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করে। এইজন্যই মানবের সমাজ বা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়াছে। গোড়াতে ব্যক্তি মানব সব মিলিয়া পরামর্শ করিয়া এই সমাজ বা রাষ্ট্রের পদ্ধতিরূপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া নিয়াছে। সমাজ বা রাষ্ট্র এই হিসাবে বিভিন্ন মানব সমূহের মধ্যে একটা Contract এর মত। এই মতবাদের নামই হইতেছে, Social Contract Theory, সুবিখ্যাত ফরাসী সুধী রুসো ইহার প্রধান প্রবর্ত্তক। প্রত্যেক মানব তার পুরা অধিকার অব্যাহতভাবে ভোগ করিতে পারে, রাষ্ট্র বা সমাজরূপ সমষ্টিশক্তি মাত্র সেইটুকু দেখিবে, তা ছাড়া তার অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতা নাই।

কিন্তু ক্রমে বিভিন্ন মানবসমষ্টি এবং প্রত্যেক সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যষ্টি মানবের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া এই মত আধুনিক সুধীগণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কয়েকটি কথা তাঁহারা এখন স্বীকার করিতেছেন, যথা—(১) পৃথিবীর মানবসমাজ বিভিন্ন প্রকৃতির বহু সমষ্টিতে বিভক্ত। (২) বিভিন্ন শক্তি সাধনা ও সাধনার ফললব্ধ উন্নতিতে এই বিভিন্ন সমষ্টির মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্তমান। (৩) আবার প্রত্যেক মানবসমষ্টি আবার গুণকর্ম্মাদি অনুসারে বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণীতে বা অঙ্গে বিভক্ত। (৪) যেমন বিভিন্ন সমষ্টিতে, তেমনই প্রত্যেক সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মানবের মধ্যেও বহু রকম পার্থক্য বর্তমান। (৫) প্রত্যেক মানবসমষ্টির ইতিহাসে, ব্যক্তিজীবনে বাল্য যৌবন এবং বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর ন্যায় একটা ক্রম পরিণামের ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। (৬) সমষ্টিতে সমষ্টিতে একটা সংঘর্ষ অবিরত চলিতেছে, যে সমষ্টি অধিকতর শক্তিশালী, দুর্ব্বলতরকে অভিভূত করিয়া তাহাই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (৭) সুতরাং প্রত্যেক মানবসমষ্টি এক একটি Organism অর্থাৎ শরীরী জীবের ন্যায়। (৮) প্রত্যেক জীবদেহে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ বর্ত্তমান, বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন কর্ম্ম সাধন করিয়া সমগ্র শরীরকে যেমন রক্ষা করিতেছে, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ তেমনই বিভিন্ন কর্ম্মসাধন করিয়া সমাজকে রক্ষা করিতেছে। সকলের আকারপ্রকার ও গুণকর্ম্ম ঠিক এক নহে, অথচ সকলেরই যথাযোগ্য স্থান সমাজশরীরে আছে। কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারে না, সকলেই সকলকে সাহায্য করিতেছে, সকলেই সকলের সাহায্যে নিজ নিজ কর্ম্ম সমাধা করিয়া সমগ্র সমাজকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিয়া রাখিতেছে। (৯) সমাজ যখন organism বা

শরীরী জীবের ন্যায় বস্তু, তখন সমগ্র সেই সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা কোনও বিশেষ অঙ্গের কল্যাণ বড় হইতে পারে না —অঙ্গভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ত কথাই নাই।

বিশেষ বিশেষ মানবসমষ্টিকে যদি Organism বা শরীরী জীবের অনুরূপ বস্তু বলিয়া ধরা হইল, তার লক্ষণগুলিও অবশ্য তাহাতে থাকিবে। ইহা স্বীকার করিয়া নিলে, ব্যক্তির সর্ব্বপ্রাধান্য তখনই ভিত্তিহীন হইয়া পড়িল। এক এক ব্যক্তি সমাজশরীরের এক এক অঙ্গের অধীন, আর সেই অঙ্গ আবার সমগ্র শরীরের অধীন! যে যার অধীন, তার মঙ্গল বিধানের অধীন হইয়া তাকে চলিতেই হইবে। তবে ব্যষ্টি মানবকেও একেবারে 'কিছু না' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ব্যষ্টি মানবে ও শক্তির ও কামনার প্রাবল্য বড় কম নয় —আত্মাই জীবরূপ ধরিয়া ব্যষ্টি মানবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। সে তার আকাঙ্ক্ষিত সুখ-ভোগ করিতে দুর্দ্দম আগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠে। তাহাকে চাপিয়া রাখাও সর্ব্বদা বড় সহজ ব্যাপার হয় না। কিন্তু এই সমষ্টিতেও আবার সেই আত্মা বিরাট্‌রূপে প্রকাশমান,— সমষ্টিও তার কল্যাণসাধনে তেমন আগ্রহশীল। তাই ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির, জীবের সঙ্গে বিরাটের, বড় একটা সংঘর্ষও আবহমান কাল হইতে চলিতেছে।

এই বিরোধের নিষ্পত্তি কিসে হইবে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির অধিকার, ব্যষ্টির ভোগ ও সমষ্টির মঙ্গল, এই উভয়ের সীমারেখা যে কোথায় পড়িবে, তার কোনও সমাধান পাশ্চাত্য সুধীগণ এখনও করিতে পারেন নাই। রুসো প্রমুখ পণ্ডিতগণ সমষ্টিকে একেবারে ব্যষ্টির অধীন বা স্বার্থ-সাপেক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক সমাজ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আবার বলিতেছেন, না, সমষ্টি ব্যষ্টির অধীন বা তার স্বার্থসাপেক্ষ নহে, শরীরী জীবের ন্যায় তার পৃথক একটা অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহা ব্যষ্টি অপেক্ষা গরীয়ান্, ব্যষ্টিকে যাহা আপনার মধ্যে রাখিয়াছে – তার স্বার্থ সকলের বড় কথা। অথচ ব্যক্তিকেও একেবারে নাকচ করিয়া দিতে তাঁহারা পারিতেছেন না। তার কথাটাও যে একেবারে ফেলিবার কথা নয়, ইহাও তাঁহারা অস্বীকার করেন না। কিন্তু দুয়ের মঙ্গলে দুয়ের একটা সামঞ্জস্য যে কিসে হইবে, সেই থানে তাঁহারা থই পাইতেছেন না। এক আধুনিক Socialism বা Collectivism ব্যষ্টিকে একেবারে সমষ্টির অধীন করিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু তাহাও যে সমষ্টির পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে না, ধীরবুদ্ধি পণ্ডিতবর্গ একবাক্যে এ কথা বলিয়া থাকেন।

এরূপ একদল লোক এখনও আছেন, যাঁহারা ঠিক রুসোপ্রমুখ পণ্ডিতবর্গের মতানুবর্ত্তী না হইলেও ব্যষ্টির স্থানই প্রধান বলিতে চান। কোনওরূপ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বন্ধন যাহা ব্যষ্টির সমগ্রভোগে বাধাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, সব তাঁহারা ছিন্ন করিয়া ফেলিতে চান। কিন্তু ইঁহাদের কথা ভাবুক বা কবির খেয়াল, বাস্তব জগতে চলিতে পারেনা বলিয়াই ধীরবুদ্ধি পণ্ডিতগণ উড়াইয়া দেন।

ইউরোপের সমাজতত্ত্ববিৎগণ ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ উপলক্ষ্যে এইরূপ নানারকম আলোচনা করিতেছেন। কেবল একটা মোহন ভাবব্যঞ্জিত কথার ধুয়া না ধরিয়া, কঠোর সত্যের অনুসন্ধান করিয়া তার উপরে আপনাদের মতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী। কিন্তু আমরা অত সব অনুসন্ধান ও বিচারের মধ্যে যাইতে চাই না। রুসোর Social Contract বাদের অথবা আধুনিক ভাবুক বা কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাদের উপর উপর গোটা কত কথা লইয়া খুব হৈচৈ করিয়া থাকি। সেই গোটাকত কথা ধরিয়াই অবিরত হিন্দুসমাজবিধানকে আক্রমণ করি। ইহার মধ্যে সমাজতত্ত্বের স্বাভাবিক নীতি কিছু আছে কিনা, থাকিতে পারে কিনা, তাহা একবার একটু পরীক্ষা করিয়া কি বিচার করিয়া দেখা একেবারেই প্রয়োজন বলিয়া মনে করি না।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'চতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।' কথাটাকে একেবারে বাজে বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া আমরা একটু তলাইয়া ভাবিয়া দেখিলেও পারি। 'গুণ' কথার অর্থ কি এবং বর্ণের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ ইহার হইতে পারে, গত সংখ্যায় প্রকাশিত পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা তার আলোচনা কিছু করিয়াছি। গুণ এবং গুণাশ্রিত কর্ম্মের হিসাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই চারি বর্ণ এদেশের সমাজধর্ম্মসংস্থাপক-গণ স্বীকার করিয়াছেন। সকল দেশের মানবপ্রকৃতি যদি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে গুণকর্ম্মহিসাবে এই চারিটি বিভাগ যে স্বাভাবিক ইহা আমাদের মনে হইবে। স্বভাবতঃই যাঁর শান্তভাবে থাকিয়া জ্ঞানানুশীলন বা ধর্ম্মসাধনা করিতে চান, অর্থাৎ স্বভাবে ও কর্ম্মে সাত্ত্বিক, এরূপ লোক সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এরূপ লোকও অনেক আছেন, যাঁহাদের স্বভাবে রাজসিকতাই অতি প্রবল,—দেহে ইঁহারা বলিষ্ঠ, প্রাণভরা উদ্দাম শৌর্য্যবীর্য্য, সুযোগ পাইলেই সমর বিলাসী হইয়া উঠেন, লোক-শাসনেও বড় একটা আগ্রহ ও শক্তি দেখা যায়। আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন, স্বভাবতঃই ব্যবসায়বুদ্ধি যাঁহাদের প্রবল, ব্যবসায়ে ধনাগমের যোগ্যতাও সহজেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে, মনের প্রবৃত্তি ও শক্তি সেইদিকেই ধাবিত হয়। শেষ আর এক রকমের লোক বিস্তর আছে, ইহার একটি যোগ্যতাও যাহাদের নাই, বাঁধানিয়মে অথবা অন্যের-অধীনে দৈহিক শ্রম মাত্র করিতে পারে। এই চারিটি শ্রেণীকেই এদেশে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নাম দেওয়া হইয়াছে।

একেবারে স্পষ্ট রেখাটানায় ভাগকরা, এইরূপ চারিটি শ্রেণীর লোক যে মানবসমাজে রহিয়াছে তা নয়। মানব স্বভাব বড় জটিল, বড় রহস্যময়,—বিভিন্নগুণের অন্তর্বিস্তর

মিশ্রণও বেশ দেখা যায়। ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষাত্রবীর্য্য, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কিছু ব্রহ্মণ্যভাব, এইরূপ প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই অন্য এক বা দুই বর্ণের কিছু কিছু ভাব অনেক দেখা যায়। কিন্তু অল্পবিস্তর এই মিশ্রণ সত্ত্বেও কেহ বা ব্রহ্মণ্যে (অর্থাৎ জ্ঞানে বা ধর্ম্মে) কেহ বা ক্ষাত্রধর্ম্মে (শৌর্য্যে), কেহ বা বৈশ্য-ধর্ম্মে, (ব্যবসায় বুদ্ধিতে) আবার কেহ বা শূদ্রধর্ম্মে (অর্থাৎ দৈহিক শ্রমসাধ্য কর্ম্মে মাত্র) প্রধান, এইরূপ লোকই সর্ব্বত্র দেখা যায়। তাই গুণকর্ম্মের পার্থক্য অনুসারে মানবসমাজ মোটের উপর এই চারি প্রকৃতির লোকে বিভক্ত, একথা আমরা ধরিয়া নিতে পারি। এই বিভাগ অবলম্বনে অধিকারভেদে সমাজবিন্যাস হওয়া উচিত কিনা, সে কথা আলাদা। কিন্তু স্বাভাবিক এই বিভাগটি অস্বীকার করা বড় সহজ নয়। মানবসমাজের মঙ্গলের পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্ম্ম কি তাহার হিসাব যদি আমরা করি, তাহা হইলেও সর্ব্ববিধ কর্ম্ম মোট এই চারি প্রকারের কর্ম্মেই একটা ভাগ করা যায়।

মানব সমাজকে Organism বলিলে, ইহাও বলিতে হইবে, অন্যান্য সকল Organism এর মত ইহাতে বিভিন্ন কর্ম্মসাধনের উপযোগী বিভিন্ন অঙ্গ আছে। সেই কর্ম্ম এই চারি প্রকারের এবং এই চারি প্রকারের কর্ম্মসাধনের উপ-যোগী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিটি শ্রেণীও আমরা দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং এই চারিশ্রেণীকে সমাজ-শরীরের চারিটি অঙ্গ বলিয়াই আমরা ধরিয়া নিতে পারি। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বিরাটপুরুষের দেহে এই চারিটি অঙ্গের কথাই আছে। এই বিরাট পুরুষরূপী সমাজশরীর।

সমষ্টিরূপ সমাজ Organism, আবার ব্যষ্টি রূপ জীব-দেহও Organism। কিন্তু তাই বলিয়া এই দুই Organism যে সর্ব্বাংশে একরূপ, একধর্ম্মী হইবে, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। বিভিন্ন সমাজের এক একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে, বিভিন্ন কর্ম্ম সাধনোপযোগী বিভিন্ন অঙ্গের সমবায়ে ইহা গঠিত, প্রাকৃতিক নিয়মে জীব দেহের জন্ম জীবন ও মৃত্যুর ন্যায় ইহার অভ্যুত্থান উন্নতি ও অবসানের একটা ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তাই সমাজকে Organism বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্যষ্টি জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গের ও কর্ম্মের যেমন একটা শক্ত বাঁধা নিয়ম আছে, সমাজদেহে তাহার অস্তিত্ব স্পষ্ট ধরা যায় না। ব্যষ্টি জীবদেহে হাত পা হয় না, পাও হাত হয় না,—মুখ বুক হয় না, বুকও মুখ হয় না। কিন্তু যে সব কোষে (cellএ) এক অঙ্গ গঠিত, তাহা অন্য অঙ্গীয় কোষের প্রকৃতি ধরিয়া সেই অঙ্গ হইতে সরিয়া গিয়া অন্য অঙ্গকে পুষ্ট করে কিনা, তাহা জানি না। তবে এটা দেখা যায়, কোনও বিশেষ এক অঙ্গ অধিকতর পুষ্ট হইয়াছে, অন্য কোনও অঙ্গ হয়ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। সমাজদেহেও এটা দেখা যায় যে কোনও এক অঙ্গের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি অন্য অঙ্গে গিয়া স্থান গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তাহা করিলেও চারিটি এই অঙ্গ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিবে। যাহা হউক, সমষ্টি Organism ও ব্যষ্টি Organism এর মধ্যে প্রকৃতিগত মোট একটা সমতা দেখা যায় বটে, তবে সকল বিষয়ে সবই যে একেবারে সমধর্ম্মী একথা বলা যায় না।

সমাজের বিভিন্ন অঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ কি হইবে, কি হইলে ভাল হয়, এক অঙ্গের ব্যক্তিবিশেষ যোগ্য হইলেই অন্য অঙ্গে স্থান নিতে পারে কিনা, সে কথা আলাদা। মোট এই কথাটিই আমরা দেখাইতে চাই, সমষ্টিরূপে Organism যে সমাজ, তাহাতে বিশেষ বিশেষ গুণকর্ম্ম অনুসারে প্রধান প্রধান চারিটি অঙ্গ আছে,—যাহাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি নাম এদেশে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত এবং তদনুরূপ গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই যে উক্তি—'চতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ'—কিছুই একেবারে বাজে কথা বলিয়া অবজ্ঞা করিবার বস্তু নয়।

আর একটি এইখানে বলা আবশ্যক। সমাজের সংহতিশক্তির বড় একটি রূপ হইতেছে রাষ্ট্রশক্তি বা ষ্টেট (state)। পাশ্চাত্য অঞ্চলে সমাজের রাষ্ট্ররূপটাই এমন ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, যে পাশ্চাত্য সুধীবর্গ 'রাষ্ট্র'কেই সমাজের সংহতিশক্তির সর্ব্বোচ্চ এমন কি এক-মাত্র বিকাশ বলিয়াই মনে করেন। এ দেশের প্রাচীন ঋষিদের দৃষ্টিতে বিরাটপুরুষ বা সমাজ রাষ্ট্রের উপরে,—রাষ্ট্র বা state ইহার অঙ্গীয় শক্তি বিশেষ মাত্র। রোমীয় চার্চ্চ (Roman Church) এক সময়ে রাষ্ট্র বা ষ্টেটের উপরে ধর্মশাসনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, রাষ্ট্রের উপরে সমা-জের প্রাধান্য যে কি বস্তু, তাহা রোমীয় চার্চ্চের নেতৃবর্গ কিছু অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ভাবটা তেমন স্পষ্ট ভাবে ইউরোপে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। এই ধর্ম্ম বা নীতি অবলম্বনে সমাজবন্ধনের চেষ্টাও ইউরোপে সফল হয় নাই। কথাটা কিছু কঠিন ও জটিল। বিস্তৃত আলোচনায় আপাততঃ ক্ষান্ত রহিলাম। তার বিশেষ প্রয়োজনও হলে নাই। সমাজের রাষ্ট্ররূপের পরীক্ষা যদি আমরা করিতে যাই, তবে মোটামুটি দুটী ভাগই আমরা দেখিতে পাইব,—শাসক ও শাসিত—ruling এবং ruled—বিখ্যাত মনীষী চক্রবর্ত্তী স্পেন্সার এই দুই ভাগের নাম দিয়াছেন—Regulative এবং Regulated.

প্রাচীন হিন্দুসমাজে রাষ্ট্র বা State এর বিধি ব্যবস্থা আলোচনা করিলে আমরা দেখি, সমাজের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অঙ্গ প্রধানভাবে শাসক এবং বৈশ্য ও শূদ্র অঙ্গই শাসিত। যেসব গুণকর্ম্ম লইয়া ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম্ম, রাষ্ট্রে সেই সব গুণকর্ম্মই শাসকের গুণকর্ম্ম। বৈশ্য ও শূদ্র অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ

বিশেষ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র ধর্মের অধিকারী হইলে রাষ্ট্রে তাঁহারা শাসকের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। তা ছাড়া [illegible] ব্যাপারে রাজারা যখন প্রধান প্রকৃতিবর্গের অভিমত গ্রহণের জন্য তাঁহাদের মহাসভা আহ্বান করিতেন, চারিবর্ণেরই প্রধান ব্যক্তিগণের সম্মিলন তাহাতে হইত। মহাভারতে বর্ণিত আছে, মহারাজা যযাতি জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর পরিবর্তে কনিষ্ঠ পুরুকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় প্রকৃতিবর্গের অনুমোদন চান, এবং সেই সভায় চারিবর্ণের লোকেরই সমাগম হইয়াছিল। মহারাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার সময়ও চারিবর্ণের প্রধানদের [illegible] এইরূপ সভা করিয়াছিলেন।

রাজার অমাত্য সভা বা Executive Council এর মধ্যেও বৈশ্য শূদ্রের প্রতিনিধি কেহ কেহ থাকিতেন। তবে শাসনকার্য্য প্রধানভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নেতৃত্বেই চলিত।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে ইয়োরোপের [illegible] কি বলেন, ইয়োরোপীয় সমাজেও এই চারি অঙ্গের কোনও রূপ দেখা যায় কিনা, তাহাও একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কারণ, শিক্ষাগৌরবে ভারতের [illegible] আছেন, যাঁহারা এদেশের কোনও কথার মূল্য [illegible] কিছুই দেখিতে পান, যতক্ষণ না ইয়োরোপীয় [illegible] ইয়োরোপীয় সমাজের অবস্থা তাঁহার [illegible] করেন। তা ছাড়া কোনও একটি বিষয় যে [illegible], তাহা কেবল একদেশের একজাতির কথা [illegible] ঠিক হয়। অন্য দেশে ও অন্যজাতির মধ্যে কি [illegible] করিয়া দেখিতে হয়।

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো [illegible], মানুষের স্বভাবে মূল তিনটি গুণ দেখা যায়। [illegible] তিনটি গুণকে তিনি rational ([illegible] সুবুদ্ধিক ধীর) spirited (তেজোময়) এবং [illegible] (বাসনা বশ) এই তিনটি বিশেষণে [illegible] একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে এই গুণ তিনটি প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণের ব্যাখ্যাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরই অনুরূপ। সুবুদ্ধির ধীরতা (reason) [illegible] তেজ (Spirit) বা রজোগুণকে, তেজ (Spirit) বা তমোগুণ বাসনা (desire) বা তমোগুণকে শাসন করিবে ইহাই যেমন সাধুনীতি, তেমনই মানবের সংহতিরূপ যে আদর্শ State বা রাষ্ট্র তাহাতেও এই বিধি হওয়াই যুক্ত যে সত্ত্বধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানী রাষ্ট্রশাসনে নেতৃত্ব করিবেন, রজোধর্ম্মাশ্রিত যোদ্ধৃবর্গ রাষ্ট্ররক্ষা করিবেন, এবং তমোধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ যাহারা ব্যবসায় বাণিজ্যে ধনাগমে ব্যাপৃত থাকিবে এবং দৈহিক শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে, তাহারা প্রথম দুই শ্রেণীর শাসন মানিয়া চলিবে। সংক্ষেপ কথায় প্লেটোর মত এই যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের প্রাধান্য অনুসারে মানবসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র (বৈশ্য ও শূদ্র উভয়ই প্লেটোর মতে তমোগুণাশ্রিত) এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং সমাজের রাষ্ট্র বিধানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই শাসনের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, এবং বৈশ্য ও শূদ্র তাঁহাদের শাসনাধীনতা মানিয়া চলিবেন। রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ইয়োরোপে বর্ত্তমান এই যুগের সূচনা হয়। ইহার প্রথমভাগটা ইয়োরোপের ইতিহাসে সাধারণতঃ মধ্যযুগ নামে পরিচিত। ইয়োরোপীয় সমাজ এই যুগে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

(১) Clergy যাজক সম্প্রদায় (২) Aristocracy বা অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় (৩) বণিক শিল্পী প্রভৃতি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (৪) ক্ষুদ্র কৃষক ও মজুর সম্প্রদায়। প্রথম যাজক সম্প্রদায় ব্যতীত আর তিনটি সম্প্রদায়ই বংশানুক্রমিক ছিল। ২য় ও ৩য় শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরাই বিশেষ একটা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যাজক হইতেন। যাজকদের অবিবাহিত থাকিতে হইত। সুতরাং বংশানুক্রমিক কোনও যাজকজাতির অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা ছিল না। যাহাহউক, এই চারিটি সম্প্রদায়ই সমাজের স্বাভাবিক চারিটি বিভাগ বা চারিবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহাদের কর্ম্মও মোটের উপর এই চারিবর্ণের কর্ম্মের অনুরূপ ছিল। 'রাষ্ট্র' বা শাসনকার্য্য Clergy ও Aristocracy অর্থাৎ ইয়োরোপের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরই কর্ত্তৃত্বেই চলিত। এক বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা নির্দ্দেশের কালে প্রজাবর্গের যে রাষ্ট্রসভা হইত, তাহাতে মাত্র প্রথম তিন বর্ণ বা শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গের সম্মিলন হইত, চতুর্থ শ্রেণীর নয়। এই সব শ্রেণীগুলি ইয়োরোপে এষ্টেট্ (Estate) বা সামাজিক স্থায়ী অঙ্গ নামে অভিহিত হইত। প্রজাদের এই সব রাষ্ট্রসভার নামও ছিল, 'এষ্টেট্স্ জেনারেল' (Estates General) অর্থাৎ সমাজ বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের সাধারণ সম্মেলন।

আধুনিক যুগের প্রথমাংশে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমাজ-বিন্যাস সাধারণতঃ এইরূপই ছিল। তবে প্রাচীন নীতির বিরোধী কতকগুলি নূতন প্রভাব এই যুগে দেখা দেয়। ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন এই বিন্যাস ভাঙ্গিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যেও যে এইরূপ একটা বিভাগ অনেক পরিমাণে না দেখা গিয়াছে তাহা নহে।

যাহাহউক, প্রাচীন হিন্দুসমাজ সংস্থাপকগণ সমাজের স্বাভাবিক এই চারিটি অঙ্গ বিভাগের উপরে কিরূপভাবে সমাজ বিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহার ফল হিন্দুসমাজের উপরে কি দাঁড়াইয়াছে, এবং ইয়োরোপেই বা বর্ত্তমান সমাজ-বিন্যাসের ধরণ কিরূপ হইয়াছে,—যে সব নূতন প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে, নূতন নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহার ফলাফলই বা কি দেখা যাইতেছে, পরে অন্য এক প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

হাজার টাকা

১

বিধুভূষণ বাবুর একমাত্র পুত্র তারাপ্রসন্ন। বিধুভূষণ বাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ, তেজারতি ব্যবসা করিয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকেন। গ্রামে তাঁহার নামও যথেষ্ট ছিল, কারণ তিনি "এক নম্বরের" সুদখোর ছিলেন। তাঁহার চোখের পর্দ্দা আদৌ ছিল না, স্বভাবতঃই তাঁহার অর্থলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল। কি করিলে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়—ইহাই তাঁহার একমাত্র মানসিক চিন্তা ছিল। দিনকতক হইল ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইয়াছে। ভাবনার সাগরে কোন কুলকিনারা না পাইয়া তিনি নিরুপায় হইয়া ভাসিয়া চলিতেছিলেন, সহসা তাঁহার উপযুক্ত পুত্রকে সম্মুখে পাইয়া এই অকুলে কুল পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, পুত্রের বিবাহে কিছু টাকা উপার্জ্জন করিতে পারি। জগতের নিয়মই এই যে, যাঁহারা চিরকালই বাসনানুযায়ী ফল পাইয়া থাকে, তাহাদের বাসনা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এমন কি অসম্ভবও সম্ভব করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। আমাদের বিধুভূষণ বাবুরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া লৌহ-সিন্দুক পূর্ণ করিয়াছিলেন। শেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পুত্রের সাহায্য লইলেন, পুত্রের বিবাহ এখন অতি আবশ্যক ভাবিয়া চতুর্দ্দিকে ঘটক নিযুক্ত করিলেন। তারাপ্রসন্নের বিদ্যাশিক্ষা ছাত্রবৃত্তিতেই শেষ হইয়া গিয়াছিল; কারণ বিধুভূষণ বাবু বুঝিতেন যে হিসাবটা ঠিক করিয়া করিতে পারিলেই লেখাপড়ার চূড়ান্ত হইয়া গেল। তারাপ্রসন্ন এখন বাড়ীতে বসিয়া সামাজিক শিক্ষা লাভ করিতেছে। আধুনিক সভ্যসমাজে প্রবিষ্ট হইবার আশায় ছোটবড় চুল করিয়া ছাঁটিয়া তাহাতে লম্বা টেড়ীরও সংযোগ করিয়াছে; সৌখীন জুতাও কিনিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তবু তাহাকে দেখিলে কিজানি কেন ভদ্রবংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। রংটী মসীনিন্দিত, মুখের সম্মুখের দাঁত দুইটি বহির্গত, হাত পা গুলি লম্বা লম্বা—ইত্যাদি নানা কারণে তাহার সাজপোষাকও ঢাকা পড়িয়া যায়। এ সব তাহা ঢাকিতে পারে না।

বিধুভূষণ বাবুর নিযুক্ত ঘটকগণ অনেকগুলি পাত্রীর সন্ধান করিয়া আসিল। অনেকে পাত্র দেখিতেও আসিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই পাত্র মনোনীত করিলেন না, যদিও দুই একজন এ বিবাহে স্বীকৃত হইলেন তাঁহারাও বিধুভূষণের 'খাঁই' দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ নগদ 'হাজার টাকা', সুতরাং পুত্রের বিবাহ হইল না, বিধুভূষণ বাবুও প্রমাদ গণিলেন।

(২)

একদিন প্রাতঃকালে বিধুভূষণ বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া পুত্রের সহিত গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় একটী ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এইটি কি বিধুভূষণ বাবুর বাড়ী?"

বিধুভূষণ বাবু বলিলেন, "হাঁ মশাই, আমার নামই বিধুভূষণ!"

অপরিচিত ভদ্রলোকটী সাগ্রহে উত্তর করিলেন, "মশাই আমি অনেকদূর থেকে আপনার কাছেই এসেছি। আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।"

বিধুভূষণ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "কি?"

ভদ্রলোকটি বিনীতভাবে কহিলেন, "মশাই, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত হ'য়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আপনাকে আমার এ দায় উদ্ধার করতেই হবে।"

বিধুভূষণ বাবু এতক্ষণ ইহাই খুঁজিতেছিলেন। অনেক দিন পুত্রের কোন সম্বন্ধ না আসাতে তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আশাটুকু ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছিল,—সহসা আপনা আপনি এক সম্বন্ধ আসিল দেখিয়া লুপ্তপ্রায় আশাটুকু আবার জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "বেশত বেশত, সেত খুব ভাল কথা। আপনাকে যদি কুটুম কর্ত্তে পারি, তাহা হইলে ভাবব আমার কপাল ভাল। আমার একটি কথা আছে। তা কর্ত্তে পারবেন কি? আমাকে 'হাজার টাকা' নগদ দিতে হবে, আর আমি কিছু চাই না।"

হাজার নগদ শুনিয়া আগন্তুকের মুখ শুকাইয়া গেল,

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "মশাই, আমি গরীব মানুষ, একটু দয়া কর্বেন। আর এখনও ত পাত্র দেখা হয় নাই, দেখে শুনে যা হো'ক ঠিক করা যাবে।"

বিধুভূষণ বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "মশাই, এত কাতর হবার কোন কারণ নেই, দেখলেই আপনার পছন্দ হ'য়ে যাবে, আর কোন কথা ব'লবেন না। ঐ দেখুন, আমার ছেলে বসে রয়েছে, দেখুন কেমন সুন্দর চেহারা।"

বিধুভূষণ বাবু আঙ্গুল বাড়াইয়া সুঠাম পুত্রকে দেখাইয়া দিলেন। আগন্তুক গৃহে প্রবেশ করিবার সময় তারাপ্রসন্নকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বাটীর ভৃত্য ভাবিয়াই হউক অথবা অন্য কিছু কারণেই হউক, তিনি আর সেদিকে দৃক্‌পাতও করেন নাই। যখন শুনিলেন এইটি বিধুভূষণ বাবুর পুত্র, তাঁহার ভাবি জামাতা, তখন একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তারাপ্রসন্নও এতক্ষণ নিস্তব্ধে বসিয়াছিল, যখন বিধুভূষণ বাবু পুত্রকে দেখাইয়া দিলেন, পুত্রও তখন একবার আসিয়া ভাবী শ্বশুরের চরণে প্রণাম করিল। সম্যক্ জিজ্ঞাসায় আগন্তুক তারাপ্রসন্নের বিদ্যা বুদ্ধি সকলই জানিতে পারিলেন, এবং কিছুই না বলিয়া হতাশভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিধুভূষণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল মশাই?"

আগন্তুক কহিলেন, "উত্তর দেব অখন।"

৩

একমাস চলিয়া গিয়াছে, একদিন বিধুভূষণ বাবু বারান্দায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন; এমন সময় ডাকহরকরা আসিয়া "বাবু চিঠি" বলিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। বিধুভূষণ বাবু কলিকায় সজোরে এক টান দিয়া হুঁকাটি হাত হইতে নামাইয়া দরজার নিকট ঠেস দিয়া রাখিলেন। তারপর পত্রের আবরণখানি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া একবার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িলেন, পত্রখানি এইরূপ:—

শ্রীপুর
৫ই মাঘ, ১৩১৭ সাল

মহাশয়,—

পাত্র পছন্দ হইয়াছে, আমি হাজার টাকা দিতে সম্মত আছি আপনি আসিয়া পাত্রী দেখিয়া যাইবেন। আশাকরি পাত্রী আপনার পাত্রের অনুপযুক্ত হইবে না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিতে আসিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে একখানি পত্রের দ্বারা জানাইবেন, ইহার মধ্যে একখানি টিকিট পাঠাইলাম। দিনস্থির করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন। বোধ হয় ইহাতে আপনার কোন অসুবিধা হইবে না। ইতি—

শ্রীরামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
শ্রীপুর, দেওয়ানজী ষ্ট্রীট।

বিধুভূষণ বাবু পত্রখানি পড়িয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা! ছেলে কি আর অমনি মানুষ কর্ত্তে হয়, তাতে আয় কত। মানুষ বোঝেনা তাই চেঁচিয়ে মরে—অমনি বে দোবো, ব্যাস্ একদিন মেয়েটা দেখে আসা যাক্, তারপর বিবাহটা লাগিয়ে দেওয়া যাবে অখন।" আনন্দে অধীর হইয়া তিনি হুঁকাটি লইয়া গিন্নীকে সুসংবাদ দানে সুখী করিতে গেলেন। গিন্নী শুনিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে, তবে দেরী ক'র না। আজ কালের মধ্যেই একখানি চিঠি লিখে দাও, আহা তারাটা যেন উদাসী হয়ে রয়েছে। কোনদিন হয়ত মনের দুঃখে ছাই মেখে গেরুয়া প'রে বেরিয়ে যাবে, মুখ ফুটে ত আর বলতে পারে না, দেরী ক'রোনা, যাও হয়ত দেরী ক'রলে আবার ফস্‌কে যাবে।"

বলা বাহুল্য যে বিধুভূষণ বাবু ইহাতে অমত করিলেন না।

একদিন বিধুভূষণ বাবু কন্যা দেখিতে গেলেন। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, এরা কোত্থেকে হাজার টাকা দেবে? তাইত! এদের কি কিছু মতলবে আছে নাকি? যাই হোক্ না কেন, আমি বিধুভূষণ বাঁড়ুয্যে; আমায় ঠকাবার যোটি নাই, আমি পাকা কাজ ক'রে যাব, যা'তে ফাঁকি দিতে না পারে।

পাত্রী দেখা শুনা শেষ হইয়া যাইবার পর বিধুভূষণ বাবু কন্যার পিতাকে বলিলেন, "মশাই আপনাকে একটি কাজ কর্ত্তে হবে।" কন্যাকর্ত্তা সবিনয়ে কহিলেন, "কি বলুন?" বিধুভূষণ বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আজ আপনাকে একখানি এক আনার টিকিটের উপর লিখে দিতে হবে, যে বিবাহ রাত্রে আপনি আমাকে নগদ হাজার টাকা গুণে দেবেন, নইলে—"

পাত্রীর পিতা রামপ্রসাদ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ও, এই কথা, তার আর কি? তবে এইটুকু দুঃখ ভদ্রলোকের কথা আপনার বিশ্বাস হ'ল না। আপনি কি ভেবেছেন যে আমি আপনাকে ফাঁকি দেব?"

বিধুভূষণ বাবু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "না, তবে কি জানেন, এই টাকাকড়ির বিষয় একটু পাকাপাকি হ'য়ে থাকাই ভাল নয় কি?"

রামপ্রসাদ বাবু বলিলেন, "বেশ ত, আপনি যেমন ভাল বিবেচনা ক'র্‌বেন তেমনই হবে

আর কোন কথা না কহিয়া রামপ্রসাদ বাবু বিধুভূষণের কথামত কার্য্য করিয়া দিলেন। বিধুভূষণ বাবুও বিবাহের দিনস্থির করিয়া মহানন্দে দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্‌জাণ্ডারের মত গর্ব্বিত মনে গৃহে ফিরিলেন। ২৭শে মাঘ বিবাহের দিনস্থির হইল।

(৪)

আজ ২৭শে মাঘ, বিধুভূষণ বাবু সবান্ধবে পুত্রসহ বেহাই মহাশয়ের বাটী উপস্থিত হইলেন। বিধুভূষণ বাবুকে রামপ্রসাদ বাবু মহাসমাদরে বসাইয়া বিবাহের পূর্ব্বেই একটী থালায় করিয়া সহস্র মুদ্রা তাঁহার সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন, বিধুভূষণ বাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া সকল গুলিই গণনা করিয়া সাবধানে আপনার ব্যাগ মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া রামপ্রসাদ বাবুকে সেই চুক্তি পত্রখানি ফিরাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, "মশাই, আপনার মত বেহাই পেয়ে আমার জীবন সার্থক হ'ল। এমন বেহাই কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?"

রামপ্রসাদ বাবু ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার কথার সমর্থন করিলেন। যথাসময়ে কন্যাসম্প্রদান কার্য্য শেষ হইয়া গেল, বরযাত্রীগণও আহারাদি সমাপন করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। বিধুভূষণ বাবু সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে বরযাত্রীদিগকে বিদায় দিয়া বেহাইয়ের অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া, বসিয়া বসিয়া তাম্রকূট ধ্বংস করিতে লাগিলেন, আর আকাশের দিকে চাহিয়া পুত্রকে ধন্যবাদ দিয়া আকাশ-কুসুম রচনা করিতে লাগিলেন।

সহসা একটী ভদ্রলোক ত্বরিতপদে তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নিবাস কোথায়?"

বিধুভূষণ বাবুর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তিনি একটু রাগতভাবে বলিলেন, "কেন বলুন ত? আপনার সে খোঁজে আবশ্যক কি?"

ভদ্রলোকটী না রাগিয়া বলিলেন, "মহাশয় কি জাতি?"

বিধুভূষণ বাবু হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "আমি কি আবার একটা জাতি নাকি? আপনি ত আচ্ছা লোক!"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "ভুল হ'য়ে গেছে" মশাই, ওরকম হয়েই থাকে, কিছু মনে ক'র্‌বেন না। জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলুম কি, মশাই কি জাতীয়?" বিধুভূষণ বাবু গর্ব্বিতভাবে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ব্রাহ্মণ"।

ভদ্রলোকটী চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "এঁ্যা ব্রাহ্মণ?" বিধুভূষণ বাবু এতক্ষণ বাবুটীর আকৃতি দেখিতেছিলেন, তিনি চমকাইয়া উঠিতেই বিধুভূষণ বাবু বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই কোন একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মশাই, হয়েছে কি?"

ভদ্রলোকটী হতাশভাবে কহিলেন, "আর মশাই! আপনি ক'ল্লেন কি? আপনি ব্রাহ্মণ হ'য়ে এক যুগীর মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের বিবাহ দিলেন। এতদূর অধঃপতন!"

ভদ্রলোকটী এক গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিধুভূষণ বাবু এতক্ষণ নিস্তব্ধে কেবল কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁ্যা যুগীর মেয়ে, বলেন কি? না না!"

ভদ্রলোকটী একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তবে কি মশাই আপনার সঙ্গে চালাকি ক'র্ত্তে এসেছি? পাত্রীর পিতার বাড়ী এখানে নয়, আমাদের দেশে, আর নামও রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নয়, এখানে নাম ভাঁড়িয়ে বামুন বলে পরিচয় দিয়ে আছে। আজ তার মেয়ের সঙ্গে একটা বামুনের ছেলের বিয়ে শুনে ভাঙ্গর জন্যে এলুম। কিন্তু এসে দেখি সবই হয়ে গেছে। আমার কথা বিশ্বাস না হয় আপনার নূতন বেহাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার সাম্‌নে কিছুতেই মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই বিধুভূষণ বাবুর নূতন বেহাই কি কার্য্য উপলক্ষে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু নবাগত ব্যক্তিটীকে দেখিয়া যেন সরিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু বিধুভূষণ বাবু সক্রোধে তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, আপনার এ কিরকম

ব্যবহার? আপনি যুগী হয়ে কিনা ব্রাহ্মণের সহিত কুটুম্বিতা করিলেন?" বেহাই মহাশয় বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "মশাই, আমার জাতির কথা ত আপনি পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করেন নি। আপনার টাকার সঙ্গে সম্পর্ক, আপনি হাজার টাকা চেয়েছিলেন, তা সে টাকা পেয়েছেন ত; তবে আর রাগ কর্ব্বার কারণ কি।"

পূর্ব্বের ভদ্রলোকটী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "হাজারটাকা! মশাই আপনি হাজার টাকা নিয়েছেন? টাকাটাই কি শেষে আপনার বড়? জাতটা কিছুই নয়? ব্রাহ্মণের এ প্রবৃত্তি কবে থেকে হ'ল জানি না, যাই হোক এ কথা আমি চেপে রাখ্‌ব না প্রকাশ করে দেব, ছি ছি!" বিধুভূষণ বাবু ভীত হইয়া গেলেন, তিনি নম্রভাবে বলিলেন, "মশাই চেঁচামেচি কর্ব্বেন না, পাশে অনেকে শুয়ে আছেন, তাঁরা শুনতে পেলে আমার গ্রামে বাস করা দায় হয়ে উঠবে,—"

ভদ্রলোকটী হাসিয়া বলিলেন, "তার জন্যে আমার আর ভয় কি? আমি শুনাব বলেই এসেছি, যাতে তাঁরা শুনতে পান, আমি সেই চেষ্টা কর্ব্বো, আর সব জায়গায়, এমন কি আপনার দেশে পর্য্যন্ত গিয়ে বলে আস্‌বো যে আপনি যুগীর মেয়ে ঘরে এনেছেন।"

বিধুভূষণ বাবু তাঁহার দুটী পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "মশাইগো, ক্ষমা করুন, আমি না জেনে শুনে এমন কাজ করেছি।"

ভদ্রলোকটী একটু সরিয়া গিয়া মৃদু হাস্য সহকারে কহিলেন "তা, তা; আমি চেপে রাখতে পারি, যদি আমাকে ঐ হাজারখানি টাকা ফেরৎ দেন, নতুবা কিছুতেই নয়।"

বিধুভূষণ বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, ভদ্রলোকটী অস্থির হইয়া কহিলেন, "দেবেন কিনা সাফ্ কথা বলুন।"

বিধুভূষণ বাবু বিষাদক্লিষ্ট-বদনে পুনরায় সেই হাজার টাকা তাঁহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন ভদ্রলোকটী রামপ্রসাদ বাবুকে বলিলেন, "দেখলি মজা, কেমন আদায় হলত?"

রামপ্রসাদ বাবু কহিলেন; "হাঁ, টাকা ত আদায় হল, এখন মেয়ে পাঠাবার কি করি?"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "তার জন্য ভাবনা কি, সে বন্দোবস্ত আমি কর্ব্বো, অবিশ্যি ওরা শুন্‌বেন যে আমরা ব্রাহ্মণ তখন কি আর মেয়ে না নিয়ে যাবে? আর যদি নাই নিয়ে যায় তখন আমি দেখবো। থাক্, আহা, এখন তোমার বেহাইয়ের মনের ভিতর কি রকম হচ্ছে।"

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সিদ্ধ-সাধনা

(১)

সুধা তোমারি স্নেহের মূরতি খানিরে
হেরেছি কতই স্বপনে
কত তোমারি ছবিটী দেখিতে দেখিতে
জেগেছি প্রভাত-তপনে;
আমি কত,—তোমারি চরণ ধ্যান-সমাধিতে
ধ'রেছি হৃদয়ে গোপনে!

(২)

আমি মানস-নয়নে,—সুখেতে বিভোর,—
হেরেছি যে পদ যতনে,
আজ আঁখি-নীরে ভাসি,—কোন্ ফুলে তায়
সাজাব' মনেরি যতনে?
আমি তাই,—অশ্রু-পূত-আঁখি, হৃদয়েতে আজ
বসানু সে হৃদি-রতনে!

(৩)

হের, গত-বন-শোভা-গুল্ম-বিমণ্ডিত,—
ভগ্ন-পীঠ-ম্লান- বরণি
মোর জীর্ণ দেহ;—সে যে জাগিল আবার
পরশি তোমার চরণি!
তাই মোর,—'সিদ্ধ-সাধনার' গরবের ধন,—
সেধে নেবো আজ মরণি!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্‌-এ।

পূজার তত্ত্ব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উদ্যানলতা

পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'উদ্যানলতা' বড় গল্প বা আখ্যায়িকা-রচনায় উভয় ভগিনীর একমাত্র প্রয়াস। বিস্ময়ের বিষয়, উভয়ের সমবেত চেষ্টাতেও পুস্তকখানি হালের অন্যান্য লেখিকার রচিত আখ্যায়িকাগুলির মত "দলে পুরু" হয় নাই। (এমন কি, বড় অক্ষরে ছাপা সত্ত্বেও!) অবশ্য পুস্তকের কলেবরের অনুপাতে রচনার উৎকর্ষাপকর্ষের পরিমাপ করা যায় না, তথাপি যেন মনে হয়, লেখিকাদ্বয়ের বড়-গল্প-রচনায় প্রথম প্রয়াস বলিয়া আখ্যান-বস্তু অল্পেই ফুরাইয়াছে। আখ্যায়িকাখানিতে (double plot) যোড়া আখ্যান-বস্তু ও অবান্তর বর্ণনা নাই, ইহাও পুস্তকের আয়তনের ক্ষুদ্রতার অন্যতম কারণ। যাহাহউক, কাব্য-কলা, কুশলতা, চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি গুণ ইহাঁরা আয়ত্ত করিয়াছেন—এই পুস্তকে ও ছোট গল্পগুলিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন আখ্যায়িকাখানি হইলেও বেশ মনোজ্ঞ ও রসবৈচিত্র্যময় হইয়াছে।

পুস্তকের নামরহস্য বুঝিতে হইলে দুষ্মন্তের শকুন্তলা-সম্বন্ধীয় মন্তব্য স্মরণ করিতে হইবে—'দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈ রুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।' আখ্যায়িকার নায়িকা 'মুক্তি' পল্লীজাতা বনলতা নহে, নগরের তথা সংস্কারক-সমাজের সভ্যতার মধ্যে লালিতা পালিতা ধনিগৃহের উদ্যানলতা। কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মসমাজের পাত্রপাত্রী লইয়া আখ্যায়িকা-রচনার রেওয়াজ হইয়াছে। ইহার কারণ 'প্রেমের কথা' শীর্ষক 'ভারতবর্ষে' ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষভাগে নির্দ্দেশ করিব। এই শ্রেণীর অনেক নভেলে পাশাপাশি হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের পাত্রপাত্রীর চরিত্র-চিত্রণ করা হয়, উভয় আদর্শের একটু তুলনার চেষ্টাও হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা', শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা', শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অশ্রু', শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দত্তা' ও ক্রমশোবিস্তারী 'গৃহদাহ' এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। আলোচ্যমান আখ্যায়িকাও এই শ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মেরা কোন কোন ক্ষেত্রে আপত্তি করেন যে আখ্যায়িকালেখক হিন্দু সমাজের লোক, ব্রাহ্মসমাজের রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, সুতরাং তিনি প্রতিকূল ধারণার ঝোঁকে যে চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা যথাযথ হয় না, পক্ষপাতদোষদুষ্ট হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা বলিবার যো নাই। লেখিকাদ্বয় ব্রাহ্মকন্যা সুতরাং ইহা একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রের মতই বিশ্বাসযোগ্য। আবার হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে অনেক পুরা-ব্রাহ্ম ও আধা-ব্রাহ্ম লেখক এমন সকল কথা বলেন যাহা অতিশয়োক্তিদোষদুষ্ট। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে লেখিকাদ্বয় অনেকটা সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহা প্রশংসার কথা।

এই পুস্তকে অনূঢ়া যুবতী মুক্তিকে লইয়া পল্লীসমাজে, বিশেষ করিয়া মেয়েমহলে, যে আন্দোলন ও সমালোচনার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু সমাজের উপর বিদ্রূপ বেশ ফুটিয়াছে। ('ময়ূরপুচ্ছ' গল্পে এইরূপ আর একটি বিবরণ আছে, এই পুস্তকে তাহার উপরও রং চড়ান হইয়াছে।) পক্ষান্তরে, প্রচণ্ড সংস্কারক শিবেশ্বরের চরিত্র-চিত্র স্কুলের মেয়েদের ও শিক্ষয়িত্রীদিগের কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণ,পল্লীগ্রাম হইতে ধীরেনের সহিত মুক্তির পলায়নের পর একত্রবাস লইয়া ব্রাহ্মমহিলা ও পুরুষদিগের তীব্র আলোচনা, এগুলিও উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে এবং এগুলিতেও একটু চাপা বিদ্রূপের আভাস পাওয়া যায়। লেখিকাদ্বয় নিজের সম্প্রদায়কেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিবেশ্বরের চরিত্রই ধরা যাউক। আমরা (হিন্দুরা) টিটকারী দিই যে ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী, অথচ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মসংস্কারকদিগের নামগুলিও একেবারে নিছক পৌত্তলিকতাপূর্ণ,— যথা, রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ। তাঁহারা অন্যান্য কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নামগুলিও বর্জ্জন করেন না কেন? শিবেশ্বরের এক বন্ধুও ঠিক এই টিপ্পনী কাটিয়াছিলেন। কিন্তু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে ঐ নাম জাহির হইয়া গিয়াছে বলিয়া পরিবর্ত্তন চলিল না। যাহা হউক, তিনি স্ত্রীকন্যা ও আশ্রিত বালকের নামের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন

ও সেগুলিকে কুসংস্কার-বিবর্জ্জিত নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া ছাড়িলেন! শিবেশ্বর প্রচণ্ড সংস্কারক, বিপত্নীক হইয়া আবার বিবাহ করিতে অনুরুদ্ধ হওয়াতে তিনি জননীকে বলিয়া বসিলেন, "তুমিও ত একছেলে কোলে করে বিধবা হয়েছিলে।" (৭৫-পৃঃ) ইহাকেই বলে নারী ও পুরুষে সমদর্শিতা! অথচ শিবেশ্বর সমাজসংস্কারের একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী যন্ত্র নহেন, তাঁহার প্রাণ আছে, হৃদয় আছে, মৃত পত্নীর প্রতি অবিচলিত প্রেম, কন্যাস্নেহ, উদারতা, সরলতা ইত্যাদি গুণে চরিত্র মণ্ডিত। শিবেশ্বরের বৃদ্ধা মাতা মোক্ষদা দেবীর চরিত্রে পুত্র ও পৌত্রীস্নেহের সহিত হিন্দুর আচারনিষ্ঠার সঙ্ঘর্ষ হৃদয়স্পর্শী। তাঁহার ভ্রাতা দুর্দ্ধর্ষপ্রকৃতি হিন্দু সমাজপতি শ্যামকিশোরের চরিত্রটি উপভোগ্য। আবার সংস্কারক-সম্প্রদায়ের মিসেস্ ঘোষ, কর্ত্তব্যপরায়ণ টীচার মিস্ দত্ত প্রভৃতির চিত্রও কম উপভোগ্য নহে। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে লেখিকাদ্বয় উভয় সমাজের চিত্রাঙ্কনে অনেকটা সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা সমালোচক হইয়াও অতটা নিরপেক্ষতা দেখাইতে পারিতেছি না। ষোড়শী মুক্তি 'হেসে বাবার গায়ে ঢলে পড়্‌ল' (১১০ পৃঃ ও ১৪৮ পৃঃ) ইত্যাদি দৃশ্য আমাদের চক্ষে বড়ই বিসদৃশ ঠেকে। ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'নয়নতারা' আখ্যায়িকায়ও এইরূপ বিসদৃশ দৃশ্য আছে।

যাক্, অপ্রিয় আলোচনা ছাড়িয়া এক্ষণে গল্পের মধুর রস-উপভোগের চেষ্টা করি। পূর্ব্ববর্ণিত শিবেশ্বর, মোক্ষদা দেবী প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলি প্রতিমার আশে-পাশে শোভা পাইতেছেন; গল্পের বাঁধুনির জন্য, উপযুক্ত atmosphere প্রস্তুত করার জন্য, প্লটে জট পাকাইবার জন্য, ইহাদিগের প্রয়োজন। আসল আখ্যান একটি প্রণয়কাহিনী, নায়িকা শিবেশ্বরের কন্যা মুক্তি, নায়ক শিবেশ্বরের গৃহে প্রতিপালিত অনাথ বালক জ্যোতি (জ্যোতিঃ?), প্রতিনায়ক জ্যোতির সহাধ্যায়ী এবং মুক্তির ঠাকু'মার স্বগ্রামবাসী ও স্বজাতীয় ধীরেন। বাল্যাবধি নায়ক-নায়িকার একত্রবাসে প্রণয়ের উদ্ভব হইল; ফষ্টিনষ্টি হাসিঠাট্টা মান অভিমান অনুযোগ কৃত্রিম কোপ প্রভৃতির ভিতর দিয়া বাল্য হইতে যৌবনে প্রণয় বদ্ধমূল হইল; তবে জ্যোতি বিদেশে গেলে মুক্তির হৃদয়পটে অঙ্কিত জ্যোতির আলোক-চিত্র যেন একটু ম্লান হইল (২০৫ পৃঃ ও ৩৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহার কারণ, অবস্থাগতিকে বারে বারে ধীরেনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাহার নিকট নানাভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়ায়, শেষে মুক্তির চরম বিপদে (শ্যামকিশোরের চক্রান্তে মুক্তির জোর করিয়া বিবাহ দেওয়ার চেষ্টায়) ধীরেন তাহাকে উদ্ধার করায়, ধীরেনের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল ও ধীরেনের প্রতি একটু প্রীতির সঞ্চারও হইয়াছিল। যাহা হউক, জ্যোতির প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির সহিত এই প্রীতির দ্বন্দ্বে পুরাতন প্রীতিই শেষে বিজয়িনী হইল। ধীরেনের হতাশ প্রণয় আমাদের হৃদয় মথিত করে বটে, কিন্তু আশা হয় যে এই উন্নতহৃদয় কর্ম্মিষ্ঠ যুবক কর্ম্মসমুদ্রে ডুবিয়া শান্তি ও শক্তি সঞ্চয় করিবে ও টেনিসনের Locksley Hallএর হতাশ প্রণয়ীর মত অনুভব করিবে,

> 'O, I see the crescent promise of my spirit hath not set.'

মুক্তির হিন্দুমতে বিবাহ দেওয়ার চক্রান্ত ও এই বিপদ্ হইতে মুক্তির মুক্তি খুব sensational ব্যাপার বটে, ইহার বর্ণনাও খুব graphic হইয়াছে। তথাপি বলিব, sensationalism লেখিকাদ্বয়ের বিশিষ্টতা নহে, নায়িকার হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণই তাঁহাদিগের বিশিষ্টতা। মুক্তির বাল্যলীলা ও স্কুল-বোর্ডিং-বাসের বর্ণনাও খুব graphic; Charlotte Bronteর বর্ণিত Jane Eyre এর বালিকা-জীবনের বিবরণ অপেক্ষা কোনও অংশে কম graphic নহে। (মুক্তি ও জেন্ আয়ারের বাল্য ও বোর্ডিং-জীবনের ঘটনাবলি অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের)। এসব স্থলে বর্ণনা যেন প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট বলিয়া ভ্রম হয়। Charlotte Bronteর বেলায় উহা সত্যসত্যই নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ। এক্ষেত্রেও মনে হয়, ইহা অন্ততঃ কিয়দংশে অভিজ্ঞতালব্ধ।

দোষ-পরিচ্ছেদ

সরস প্রণয়কাহিনীর আলোচনার পর ব্যাকরণের কচকচি নিতান্তই নীরস ঠেকিবে; তবে আমাদের মাষ্টারী স্বভাব, (স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে), ভুল ধরার বদ অভ্যাস মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, আর ভুল দেখিলেই হাত নিসপিস করে, কাটিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং পুস্তকগুলির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পেন্‌সিলের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছি। (অবশ্য

অধিকাংশই ছাপার ভুল।) তবে রীতিমত ফিরিস্তি দাখিল করিয়া পাঠকের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিতে চাহি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লেখিকাদ্বয় গ্র্যাজুয়েট। তথাপি তাঁহাদিগের রচনায় ব্যাকরণ-বিভীষিকার অভাব নাই। অভাব থাকিবার কথাও নহে। কেননা যখন পুরুষ গ্র্যাজুয়েটদিগের রচনায়ই অজস্র ভুল দেখা যায়, তখন ইঁহাদিগের কাছ হইতে বেশী কি আশা করা যায়? অথচ এই পুরুষ-প্রবরগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, অধ্যাপক, পরিচালক ইত্যাদি! কতকগুলি ভুল বাঙ্গালার ধাতসহা হইয়া গিয়াছে, প্রতীকারের উপায় নাই। এমন কি, অনেকে সেগুলিকে সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার বিভিন্নতার নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদিগের সহিত তর্ক করিবারও আর মুখ নাই, কেননা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ফতোয়া দিয়াছেন যে, সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালা ভাষার basic language ভিত্তিভূত ভাষা নহে। বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত শুনিতে হইবে!

'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় বিচারিত সকল শ্রেণীর ভুলই পুস্তকগুলিতে আছে। (১) বিসর্গবিসর্জ্জন ও তাহার ফলে 'বক্ষশায়ী' 'চক্ষুশালিনী' প্রভৃতি প্রয়োগ। 'প্রাণমন' লেখা বা 'মন প্রাণ' আলাদা আলাদা করিয়া লেখা চলুক আপত্তি নাই, কিন্তু সমাসে একটানে ছাপিতে হইলে 'একতান মনঃপ্রাণ'। 'মনমোহন' দেখিয়া মোহিত হইলাম, অন্য লেখকের রচনায় 'মন্মোহন' ও সম্মোহিত করিয়াছে! (২) অধিকাংশ স্থলে হসন্তচিহ্ন-লোপ ('জাগ্রত' ত ক্লাসিক হইয়া পড়িয়াছে।) ভভভূতির 'নমোবাকং' শিরোধার্য্য করিয়া 'বাক' সম্বন্ধে আমরা নির্ব্বাক্ থাকিব, কিন্তু 'দিক' দেখিয়া দেখিয়া দিক্ হইয়া গিয়াছি। (৩) বিশেষ্য-বিশেষণে অসমলিঙ্গতা ('বাসন্তী দিন' 'সর্ব্বগ্রাসী শুভ্রতা' 'পরস্পর-বিরোধী চিন্তা' ইত্যাদি)। 'ধৈর্য্যশীলা শ্রোতা'র বেলায় (উদ্যানলতা ১৩৯ পৃঃ) বোধ হয় 'শ্রোতা'র লতার সদৃশ আকার দেখিয়া স্ত্রীলিঙ্গভ্রম হইয়া থাকিবে। (৪) সন্ধির নিয়মের ব্যতিক্রম। ('বিদ্যুৎবরণী' 'উৎগ্রীব' 'বাক্‌দত্তা' 'বিপদ্‌-কালে' ইত্যাদি)। 'জ্যোতিচ্ছটায়' সন্ধির ছটার খুব ঘটা, কিন্তু বিসর্গহীন 'জ্যোতি' ধরিয়া সন্ধি করা হইয়াছে। (৫) সমাসের নিয়মের ব্যতিক্রম। (মহারাজা, শশীপুর, বিঘ্নকারীরূপে, প্রহরীরক্ষিত, পক্ষীরাজ)। অনেকে বলেন, বাঙ্গালায় 'রাজা' 'শশী' 'পক্ষী' শব্দ, রাজন্, শশিন্, পক্ষিন্ নহে। আচ্ছা, তবে 'নবজামাতসুলভ' যখন, তখন 'জামাতৃদ্বয়' আবার কেন? সমাসে পরপদ না হইয়া 'দ্বয়' কিরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। (৬) বিশেষণের বিশেষ্যবৎ প্রয়োগ (যথা সুগন্ধি, এসেন্স অর্থে) ও বিশেষ্যের বিশেষণবৎ প্রয়োগ (মৌন, গোপন), ফলে 'মৌনতার' আবির্ভাব। সাহিত্যরসিকগণ বলেন, এখন আমাদের রুচি মার্জ্জিত হইয়াছে, ('হরিদাসের গুপ্তকথা' শ্রেণীর) 'গুপ্তকথা'র দিন গিয়াছে। একথা মানি; কিন্তু ব্যাকরণেও কি সেইজন্য 'গুপ্তকথা' 'গুপ্তভাণ্ডার' 'গুপ্ত বিদ্যা'র দিন গিয়াছে? 'গোপন কথা' 'গোপন ব্যথা', 'গোপন কক্ষ' 'গোপন বেদনা' 'গোপন বিদ্যা' (গোপন করার বিদ্যা নহে) চলিবে? 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় 'চতুর্থী কন্যা' লইয়া রঙ্গ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি শুধু অর্দ্ধশিক্ষিত কন্যাকর্ত্তার নিমন্ত্রণ-পত্রে কেন, বিদুষী-দিগের রচনায়ও ইহার চল হইল। 'সিঞ্চন' 'সৃজন'ত ক্লাসিক, 'উপরন্ত' 'সচকিত' 'মহিমাময়ী,' সম্বোধনে 'তপস্বি' স্ত্রী কয়েদী অর্থে 'বন্দিনী' 'মুদ্রিত' অর্থে 'মুদিতা' এসব প্রচলিত প্রয়োগ ইহাদিগের রচনায় দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলাম। 'যেখানের' না যেখানকার? 'আরেক' কি হরেকের পাশে বসিবে? 'উত্যক্ত' না উত্তক্ত? 'সুঁড়ি' না শুঁড়ি (শৌণ্ডিক)? 'স্বর্ণসুযোগ' রগড় করার উদ্দেশ্যে লেখা যাইতে পারে, কিন্তু গম্ভীর রচনায়ও চলিবে কি? চশমা 'পরা' আজকাল মেয়েপুরুষের ফ্যাশান বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগকে 'চশমিত' (উদ্যানলতা ১২৭ পৃঃ) বলিলে চমৎকৃত না হইয়া চমকিত হইতে হয় না কি?

ইহা ছাড়া ছাপার ভুলও প্রচুর। এবিষয়ে লেখিকা-দিগের একটু অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অশিক্ষিতা 'ময়নাসুন্দরী'র হাতের লেখায় যেরূপ ভুল স্বাভাবিক, শিক্ষিতা মহিলার মুদ্রিত রচনায় সেরূপ ভুল বড়ই অশোভন —যদিও সেগুলি কম্পোজিটারের বা প্রুফ-রীডারের দোষে ঘটে। সমাসে অধিকাংশ স্থলেই দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান আছে। অনেক সময়ে ইহাতে অর্থগ্রহের বিঘ্ন বা বিলম্ব ঘটে। আবার 'অধিষ্ঠাত্রী দেবী' 'পরমা সুন্দরী' এ দুইটি স্থলে ব্যবধান নাই, অথচ এগুলিতে যখন বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয় রহিয়াছে, তখন সমাস হয় নাই বুঝিতে হইবে। 'তুলি' (তুলি) 'আহুত' (আহৃত অর্থে), 'কৃষ্ম' (কৃষ্ণ), 'জিগেগষ' (ষত্ব) 'চিহ্ন' (ণত্ব) 'কৃপ্ন' (ণত্বের অভাব) 'ভাণ' (pretence অর্থে ণত্ব) এগুলি ছাপার ভুল অবশ্য? (ভান—pretence, ভাণ—দৃশ্যকাব্যবিশেষ, আমরা ত এইরূপ জানি)। 'জ্ঞাতিগুষ্টি' না লিখিয়া অবিকল সংস্কৃত 'জ্ঞাতিগোষ্ঠী' না হয় বাঙ্গালা উচ্চারণানুসারে 'জ্ঞাতগুষ্টি' লেখাই সঙ্গত নহে কি? 'হটাৎ' প্রায় একশত জায়গায় দেখিয়াছি, কোন কোন গল্পে পাতায় পাতায় আছে; 'হঠাৎ' দুই এক স্থলে আছে। কাঁনি, সোনা, বেনে, এসব স্থলে ণত্বের অভাব কি ঠিক—বিশেষতঃ (বণিক্) বেনের বেলায়? যাতৃ হইতে 'যা' জায়া হইতে নহে, তবে 'জা' কেন? 'পুঁজি' (পুঞ্জ) দীর্ঘ ঊ ও 'যুঁই' (যূথিকা) হ্রস্ব উ কেন? 'সিঁথির সিঁদুর' না সীঁথির (সীমন্ত) সিঁদূর (সিন্দূর)? 'ভীষণ' 'ভীমে'র মত 'ভীড়' কেন? (কোথাও কোথাও ভিড়ও আছে)। অবশ্য এটি সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ নহে, যা খুসি বাণান করিলে আটক নাই।

শুনিয়াছি একজন প্রতিভাশালী লেখক 'ভুল' লিখিয়া প্রুফ-রীডারকে সদর্পে বলিয়াছিলেন, 'আমার ভুল ভুলই থাকিবে।' 'ভীড়ু'ও কি সেই দলে ভিড়িবে?

লেখিকাদ্বয় ক্ষমা করিবেন, পূজার ছুটিতে হাত-মুখ দুই-ই কামাই যাওয়াতে তাঁহাদিগের রচনাকেই একসার-সাইজ-পেপারের সামিল করিয়া ভুল কাটিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ ও বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে একটা লেক্‌চারও দিলাম। মাষ্টারীর নেশা ছুটিতেও ছুটিয়া যায় না।

কার্ত্তিক, ১৩২৬। শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত বারের প্রবন্ধে ৭৪৩ পৃষ্ঠায় দুইটি স্থানে mythologic না হইয়া mythopoeic হইবে, 'অন্ত্রোপকরণ' না হইয়া অস্ত্রোপচার হইবে, 'হস্তমর্ষন' না হইয়া হস্তামর্ষন হইবে ও 'দিক্‌মাত্র না হইয়া দিঙ্মাত্র হইবে। আর কয়েকটি সামান্য সামান্য ভুল পাঠকবর্গ সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন।

রঙ্গ-কৌতুক

(১)

ভদ্রলোক—আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ কি বল দিকি?

যুবক—রায় মশায় বলছিলেন আপনার নাকি পদবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু আপনি ত দেখছি দুপায়েই হাঁটছেন।

(২)

কবিরাজ মহাশয়ের নাম ডাক খুব। লোকটি শাস্ত্রেও নাকি অদ্বিতীয়। রাইচরণ আসিয়া বলিল, "ক'বরেজ মশায়,ছেলেটার আজ দু'দিন ধ'রে ঘুষ্‌ঘুষেজ্বরহচ্চে। কাশীও একটু একটু আছে। দয়া করে একবার দেখেন যদি।"

দেখ্‌বো বইকি বাবাজী নিশ্চয়দেখব। বস ঐখানে, তাড়া-তাড়ি কি?—কি খোকা,কোন কেলাসে পড়চো বল দেখি।"

রাইচরণ—আজ্ঞে এই ত সবে চার বছরে পড়েচে এখনও পাঠশালে দিইনি—

কবিরাজ—লেখাপড়া শেখাওনি, মুখ্যু করে রেখেচ? তা'হলে বাপু আমি রোগ সারাব কি করে? জানইত শাস্ত্রে লেখা আছে "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম।"

ছেলে ভাবিল তাহাকে লেখাপড়া না শিখানর জন্য কবিরাজ মহাশয় লাঠি মারিয়া তাহার পিতার মুখ ভাঙ্গিয়া দিবার মতলব করিতেছেন। সে রাগিয়া গিয়া বলিল, বাবা, বাড়ী চল। ও শালা কব্‌রেজের ওষুধ খেয়ে কাজ নেই।"

রাইচরণ—মুখপোড়া ছেলে, কবরেজ মশায় হলেন "শালা"! মেরে হাড় গুড়িয়ে দেব না। শীগ্‌গির হাত জোড় কর।"

কবিরাজ—আহা, কিছু বলো না। এতে এমন দোষের কথা কি হয়েচে। শাস্ত্রেই ত বলেচে—

"অমৃতং বালভাষিতম্।"

(৩)

জজ—তুমি বাদীর সাক্ষী কি প্রতিবাদীর সাক্ষী?

চাষা—বাদী প্রতিবাদী কি হুজুর?

জজ—বাদী প্রতিবাদী জাননা! তুমি দেখচি নেহাইত চাষা।

বাদী প্রতিবাদী বুঝাইয়া দেওয়া হইলে জজ সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "ছিদাম যে দামুকে মেরেছিল তুমি দেখেছিলে?"

চাষা—হাঁ হুজুর।

জজ—তুমি তখন কোথায় ছিলে?

চাষা—আজ্ঞে হুজুর, জোয়াল ঘাড়ে জোলার ধারেই দাঁড়িয়ে ছিলুম।

জজ—জোয়াল ঘাড়ে জোলার ধারে! সে আবার কি?

চাষা—হুজুরও দেখচি অনেক কথা জানেন না।

(৪)

ভট্টাচার্য্য—চিরকালটা পরের সর্ব্বনাশ করে মোটা হলে, এর পর তোমার কষ্ট দেখে শেয়াল কুকুরে কাঁদবে।

ধনী ব্যক্তি—টাকা কি অমনি জমে ভট্‌চাজ্?

ভট্টাচার্য্য—তাত জমে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাপের বোঝা জমাচ্চ যে।

ধনী—জমাচ্চি—খরচ ত করচি না তাহলেই ভাল। মুনীরাই বলেছেন,"লক্ষ্মী নাবসীদতি"। সঞ্চয় করচি কষ্ট পাব কেন?

(৫)

ভদ্রলোক—মহাশয়ের নিবাস কোথায়?

১ম ব্যক্তি—আজ্ঞে, পলতা।

ভদ্রলোক—আপনার?

২য় ব্যক্তি—মূলোজোড়।

ভদ্রলোক—মশায়ের?

৩য় ব্যক্তি—বেগুন বাড়ী।

ভদ্রলোক—আপনার ও কি তাই?

৪র্থ ব্যক্তি—আজ্ঞে, না, আমার বাড়ী কলাগাছি। আপনার?

ভদ্রলোক—(গম্ভীর ভাবে) সুক্‌তুনি।

(৬)

বড় বাবু—Marlow সাহেবের আফিসে গেলে তোমার কুড়ি টাকা মাহিনা বাড়ত, তাত বুঝচি কিন্তু কি করি বল—এই বজেটের সময়ে তোমার মত একজন পাকা কাজের লোককে ছেড়ে দিই কি বলে—

কেরাণী—আজ্ঞে, আমি ত এমন কিছু হাতি ঘোড়া কাজ করি না। সকাল থেকে সন্ধ্যের ভেতর বড় জোর এক পাতা ঠিক দিলুম, কোন দিন তাও দিই না।

বড় বাবু—তাই নাকি? তা'হলে সুপারিশই বা করি কি করে?"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রবাসী (masthead)

৬ষ্ঠ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩২৬ | ১১শ সংখ্যা

বসন্ত-রাণী

শীতের কুহেলি কালো কুন্তল
ধীরে বিমোচন করি
সহাস-মধুর মুখ খানি লয়ে
দাঁড়াল কে মার মরি !
কণ্ঠে শোভিছে পঞ্চ-লহর
মঞ্জুল ফুল-মালা,
কোমল-উজল তনু খানি তার
ভুবন করেছে আলা।
চঞ্চল-চির চরণ-নূপুর
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু,
ছন্দে ছন্দে এ কি নর্ত্তন !—
কম্পিত কম-তনু ;
কোকিল-কাকলি নিন্দিত করি,
নন্দিত করি প্রাণ,
বিশ্বের শত-মাধুরী জড়িত
একি গান, একি গান !
আলো-রঙ্গীন চারু-অঞ্চল
চঞ্চল মৃদু-বায় ;
বর-তনু বেড়ি' মত্ত মধুপ
গুঞ্জন গীতি গায়।
মৃদুল হাস্যে বিভোর বিশ্বে
পুলক প্লাবন ছুটে—
শীত-জর্জ্জর মৃত ধরণীর
পরাণ লইল লুটে !
দুঃখ-দৈন্য বিষাদ-কালিমা
জীবন-পরশে নাশি'
বসন্ত-রাণী দাঁড়ায়ে গরবে—
মুগ্ধ নিখিল-বাসী।

শ্রীউমাপ্রসন্ন দে।

বৃন্দাবন চন্দ্র

বৃন্দাবন চন্দ্র তুমি,
ব্রজ বনিতানন্দ,
ইন্দিবর নিন্দি পদে,
ক্ষরিছে মকরন্দ।

বংশী মুলে ঈষৎ বায়,
দাঁড়ায়ে নীপ কুঞ্জ ছায়,
দিয়াছ ভরি তরুণী ধরা,
গাহি ললিত ছন্দ।

কৃষ্ণসার আসিছে ছুটে,
বৎস পড়ে চরণে লুটে,
ভুলিয়া যায় সিংহ করি,
হিংসা ভরা দ্বন্দ্ব।

মূর্ত্তি তব অঙ্গে ধরি,
যমুনা ধায় নৃত্য করি,
শীর্ষে ঢালে কুসুম রেণু,
মলয়ানিল মন্দ।

আয়ত আঁখি সজল করি,
ভুলিয়া দধি মন্থ মরি,
ইন্দুমুখী আহিরী প্রিয়া,
যাচিছে তনু গন্ধ—

মুগ্ধা ধরা অবশ হ'য়ে,
রয়েছে তব আনন চেয়ে,
হৃদয় দিনু চরণে তব,
বৃন্দারক বন্দ্য,
বৃন্দাবন চন্দ্র তুমি
নিখিল জনানন্দ।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

গরীবের উপায় কি ?

একটা প্রবচন এদেশে প্রচলিত আছে—'যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।' এবার মাঘের শেষে পর্জ্জন্যদেব বেশ বৃষ্টি দিয়াছেন,' কিন্তু দেশ কি 'ধন্য রাজার পুণ্য দেশ' তাহাতে হইবে? এদেশের কৃষিসম্পদ বহু পরিমাণে দৈবের উপর নির্ভর করে। দৈব যদি সময়ে সুজল দেন, ভূমি 'সুফলা শস্যশ্যামলা' হইয়া উঠে,—লোকে বলে, এবার বড় সুবৎসর। দৈব যেবার বিরূপ হন, সময়ে সুফল না হয় বা অসময়ে অতিজল ঘটে, ফলশস্য নষ্ট হয়, লোকে ভীত হয়, বলে, বড় দুর্ব্বৎসর এবার আসিল। এবার বর্ষার জল মন্দ হয় নাই, তারপর 'কাতেন'ও আশানুরূপ হইয়াছে, এখন মাঘের শেষেও বেশ বর্ষণ হইয়াছে। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বেও দৈবের এরূপ আনুকুল্য দেখা গেলে, দেশ ভরিয়া আনন্দের ধ্বনি উঠিত, সুবৎসরের আশায় সকলে উৎফুল্ল হইত, দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটিত,—আহা, সে পেট ভরিয়া তার দেশমাতার প্রসাদ পাইবে। কিন্তু এবার এমন বৎসরেও সে আনন্দ কোথায়? সে আশা কোথায়? দরিদ্রের মুখে সে হাসি কোথায়? দৈব যতই অনুকূল হউন, তার সুবৎসর, হায়, বুঝি চিরদিনের মতই ফুরাইয়া গেল। নূতন চাউলও ৯।১০ টাকায় আজ মণ বিকাইতেছে! গত বৎসরের দারুণ অন্নক্লেশেও সে কোনও মতে জীবন ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু দৈবাশীর্ব্বাদ-সলিলে অভিষিক্ত এই সুবৎসরেই বা তার ক্ষুধিত উদরের অন্ন কোথায়?

অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে মধ্যে মধ্যে চিরকাল এদেশে দুর্ব্বৎসর আসিয়াছে। কিন্তু উপর্য্যুপরি দুইচারিটা দুর্ব্বৎসর কালও ঘটিয়াছে, এরূপ বড় দেখি নাই। দেশের সাধারণ অবস্থা এমন যে একটা দুর্ব্বৎসরের কষ্টই অল্প লোকেই সহিতে পারে। তবু লোকে সহিয়াছে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া আগামী সন ফসল হয়ত ভাল হইবে, তখন হয়ত এ দুঃখ দূর হইবে। বহু দরিদ্র দুর্ব্বৎসরে ঘটি বাটি বেচিয়া খায়। একটা বৎসর ত? তারপর আবার সুদিন আসিবে। কিন্তু কতই ঘটি বাটি এদেশে গরীবের ঘরে আছে। সুবৎসর আর যে কখনও দেশে আসিবে, এমন ত সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই যে দুর্ব্বৎসর আরম্ভ হইল, ইহাই হয়ত এযুগ ভরিয়া স্থায়ী হইয়া রহিবে। দরিদ্রের তবে উপায় কি? এক বৎসর, দুইবৎসর, যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া আধপেটা খাইয়াও যদি সে বাঁচে, তৃতীয় বৎসর কি খাইয়া বাঁচিবে? কিসে, কোথা হইতে তার টাকা আসিবে?

সব দেশেই এক এক সময়ে ব্যবসায়িক ও আর্থিক অবস্থায় এমন এক একটা পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহাতে দেশে চলতি টাকার পরিমাণ বাড়ে এবং ফলে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মে হয়, ইহার কোনও প্রতিকার নাই, এই বর্দ্ধিত মূল্য কম করা আর যায় না। ইহার একমাত্র উপায় লোকের আর্থিক আয় বাড়ান, যাহাতে তারা স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত মূল্য দিয়াও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে পারে। আমাদের দেশেও গত ২৫।৩০ বৎসরের ব্যবসায়িক ও আর্থিক অবস্থার এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং ক্রমে প্রায় সকল দ্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্যবসায়ে যাহারা নিযুক্ত থাকে, তাহাদের আর্থিক আয় সহজে বাড়ে। অন্য বৃত্তিতেও যাদের কাজের চাহিদা (demand) বেশী, তারাও দল বাঁধিতে পারিলে মজুরীর হার বাড়াইয়া নিতে পারে। কিন্তু বাঁধা বেতনে যারা চাকরী করে, আর চাকরী যত হইতে পারে, তার তুলনায় চাকরী চায় এমন লোকের সংখ্যা যদি খুব বেশী হয়, তবে তারা সহজে প্রয়োজনমত আয় বাড়াইতে পারে না। আরও পারে না এইজন্য যে তাদের মধ্যে দলবাঁধাও সম্ভব হয় না। তখন ইহারা অতি চঞ্চল হইয়া উঠে, নূতন নূতন কর্ম্ম অবলম্বনে অধিকতর পরিশ্রম করিয়া, আয় বাড়াইবার চেষ্টা করে। সেই সব কর্ম্মের সুযোগ যদি ঘটে, তবে ক্রমে ইহারাও যথাপ্রয়োজন আয় বাড়াইতে পারে। যতদিন না পারে, আর কোনও মতেও যদি না পারে, ক্লেশের অবধি ইহাদের থাকে না। বাঁধা বেতনে কেরানীগিরি ও স্কুল মাষ্টারী করিয়া যে সব দরিদ্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক জীবিকানির্ব্বাহ করেন, বাঙ্গালার স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিহেতু তাঁহারাই প্রধান ভাবে বড় ক্লেশ পাইতেছিলেন। তবে তাঁহাদেরও আয় ক্রমে কিছু কিছু বাড়িতেছিল।

এই মূল্যবৃদ্ধি যদি স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকিত, তবে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বোধ হয় তাঁহারা প্রায় সামলাইয়া উঠিতে পারিতেন।

কিন্তু গত বৎসর দুই ধরিয়া যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক সীমা ছাড়াইয়া অনেক দূর উঠিয়া গিয়াছে। ইহার তাল সামলাইয়া উঠা ইঁহাদের ত কথাই নাই, আরও অনেক সম্প্রদায়ের পক্ষে দুঃসাধ্য। স্বাভাবিক কারণে যে মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা হয় ধীরে ধীরে, একটু একটু করিয়া। ইঁহাদের মধ্যেও অনেকে কতক পরিমাণে তার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যদি এরূপ দ্বিগুণেরও অধিক বাড়িয়া যায়, তবে তার সঙ্গে সামলাইয়া চলিতে পারে কয়জনে? অস্বাভাবিক অবস্থা ব্যতীত ইহা ঘটে না,—সাধারণ লোকের আয়ও সহসা দ্বিগুণ হইয়া উঠিতে পারে না। তবে সাধারণতঃ এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দীর্ঘকাল থাকে না। বিপর্য্যয় যে কারণে ঘটিয়াছে, তাহা দূর হইলে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আইসে, লোকের দুঃখ দূর হয়।

এত বড় যুদ্ধ একটা হইয়া গেল। ইহাতে পৃথিবীময় ব্যবসায়াদির যে দারুণ একটা বিপর্যায় ঘটিয়াছিল, ইহা সকলেই অবগত আছেন। তারজন্য যুদ্ধের সময় বহু দ্রব্যের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। কিন্তু উপায় ছিল না, লোকে সহিয়াছে। বৎসরাধিককাল যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক্রমে হইতেছে। হইবারই কথা। দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমে কমিয়া অচিরে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসিবে, এরূপ আশা লোকে করিতেছিল। কিন্তু লক্ষণ যাহা দেখিতেছি, তাহাতে সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা বড় কম।

এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ভিতরকার আসল রহস্য কি, বুঝিয়া উঠা কঠিন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহিরের কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া প্রধান কারণটা কতক যে অনুমান না করা যায় তাও নয়।

বাঙ্গালার কাপড়ের বাজার মাড়োয়ারী বণিকদের হাতে। চাউলের বাজারও গত বৎসর হইতে তাহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। কাপড় আর চাউল, দুইটিই সব চেয়ে লোকের এমন প্রয়োজনীয় জিনিষ, যাহা না হইলে এদেশে কাহারও চলে না। বিলাসিতার দ্রব্যাদি সস্তা হইলে লোকে কেনে, দাম বেশী হইলে কেনে না। সুতরাং তাহা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে চাহিলে তার দাম যতদূর সম্ভব কম রাখিতে হয়। বস্তুতঃ বাঙ্গালার বাজারে আমরা দেখিতে পাই, সখের জিনিস যা তার দাম তেমন চড়ে নাই। চাউল কাপড় প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর খুব চড়িয়াছে, এবং এই চড়া দরই রহিয়া যাইতেছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার যদি দল বাঁধা সহজ হয়, এরূপ ভাবের বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া পড়ে, তবে অতি লাভের আশায় দর তারা চড়াইয়া রাখিতে পারে। কারণ লোকে সর্ব্বস্ব দিয়াও অন্য সকল সচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়াও এই সব দ্রব্য কিনিবে, যতদিন তার হাতে কিনিবার মত একটিও পয়সা থাকে। সুতরাং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বাজারযোগান যাহারা হাত করিয়া ফেলিতে পারে, তাহারা যতদূর সম্ভব তার দর চড়াইয়া রাখিতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্তও পৃথিবীতে বিরল নহে। আমেরিকায় প্রায় সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বাজারযোগান দৃঢ়ভাবে দলবদ্ধ বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে। এই সব দলকে ট্রাষ্ট (trust) বলে। ইহারা প্রয়োজন হইলে উৎপাদন ও আমদানী কম করিয়াও দ্রব্যের দর চড়া করিয়া রাখে। ইহাদের ধনবল ও সংহতিশক্তি এত বেশী যে নূতন কোনও ব্যবসায়ীর পক্ষে তাহাদের অধিকৃত ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া প্রতিযোগিতার প্রভাবে দর কমান একেবারে অসম্ভব।

এতদিন ছিল না,—গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে প্রধান ভাবে কাপড়ের ও চাউলের বাজারে মাড়োয়ারী বণিকগণ একরূপ ট্রাষ্টের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময় আমদানী কমিয়া যায়, কাপড়ের দর বাড়ে। গত বৎসর পূজার পর প্রথম যখন যুদ্ধ স্থগিত হইবার সংবাদ আসিল, কাপড়ের বাজার অনেক নামিয়া গেল। কিন্তু, হয় ত লোকের স্মরণ আছে, মাড়োয়ারী বণিক সভা (Murwari Chamber of Commerce) ইহার কিছু দিন পরে তাঁহাদের এক অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত করেন যে শীঘ্র তাঁহারা নূতন কাপড় আমদানী করিবেন না। তখন কাপড়ের দর আবার চড়ে। সেই চড়া দর আজ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। বাজার মাঝে মাঝে একটু নামে, একটু ওঠে,—কিন্তু কিসে নামে কিসে উঠে, কাপড়ের সাধারণ বাঙ্গালী দোকানদাররাও

বুঝিতে পারে না। হয় ত তুলার দাম, মুজুরী প্রভৃতি কিছু বেশী এখনও পড়ে,—তাই কিছু চড়া দর স্বভাবতঃও ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু বাজার একেবারে যাদের হাতে, তারাও যখন অতিলাভের আশায় দর চড়া রাখিতে পারে, এসুযোগ দয়া করিয়া তারা ছাড়িবে এরূপ মনে করা যায় না। তারপর চাউলের কথা। গত বৎসরও চাউল খুব সুলভ ছিল। যুদ্ধ শেষ হইলে জাহাজের পথ যখন নিষ্কণ্টক হইল, যুদ্ধক্লিষ্ট দেশসমূহে খাবারের টান খুব পড়ে, মাড়োয়ারী ব্যপারীরা প্রচুর চাউল কিনিয়া চালান দিতে আরম্ভ করে। দেখিতে দেখিতে চাউলের দর চড়িয়া যায়। এই বণিকরা ইহাতে নূতন এক সুযোগ পাইল। তাহারা অবশ্য দেখিল, দেশে উৎপাদিত সমস্ত চাউল কিনিয়া ফেলিতে পারিলে, বিদেশেও অধিক মূল্যে চালান দেওয়া যায়, দেশেও অধিক মূল্যে বেচা যায়। তাহাদের ধনবল আছে, তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধি আছে, ব্যবসায়ের যোগ্যতাও আছে।—বাধা কিছুই নাই। কেন তাহারা চাউল কিনিয়া বাজার হাত করিবে না? শুনিয়াছি অনেক স্থানেই ফসলের সময় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা গিয়া ক্ষেতে থাকিতেই সব ধান কিনিয়া ফেলিয়াছে। তারপর নিজেরাই মুজুর রাখিয়া সেই ধান কাটাইয়া মাড়াইয়া নৌকা বোঝাই করিয়া লইয়া আসিয়াছে! এবারকার নূতন ফসল প্রায় সব ইহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এখন ইহারা যত খুসী অধিক দরে বিদেশে চালান দিতে পারে, দেশের বাজারেও ছাড়িতে পারে!

সকলেই আমরা চক্ষের উপরে দেখিতে পাইতেছি, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা টাকায় ফাঁপিয়া উঠিতেছে। কলিকাতার ভূ-সম্পত্তি অতি দ্রুত তাহাদের হাতে গিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গলার জমিদারীও অনেক তাহাদের হাতে যাইতেছে। এই ধনবলে ক্রমে সকল ব্যবসায়ই তাহাদের হাতে গিয়া পড়িতেছে। অচিরে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের বাজারেই মাড়োয়ারী বণিকগণ ট্রাষ্টের মত হইয়া উঠিবে।

কেহ কেহ বলিতে পরেন, সকলেরই ব্যবসায়বাণিজ্যে সমান অবাধ অধিকার আছে। তারা যদি দেশের সকল ব্যবসায়বাণিজ্য অধিকার করে, কে বাধা দিতে পারে? বাঙ্গালী পারে ত করুক না?

দেশের ব্যবসায়বাণিজ্য অত্যধিক ধনলিপ্সু বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া যদি পড়ে, আর তাহারা যত খুসী দর নেয়, তবে জনসমাজের অধিকাংশ লোককেই যারপরনাই ক্লেশ পাইতে হয়। ক্লেশ অসহনীয় সীমায় গিয়া উঠিলে লোকে ক্ষেপিয়া উঠে, নানারূপ অশান্তি দেখা দেয়—সমাজবিধ্বংসী শক্তিসমূহ প্রকট হইতে থাকে। ইয়োরোপে Socialism Bolshevism প্রভৃতি উপদ্রবের উদ্ভব এইকারণে ঘটিয়াছে, এ দেশেও ঘটিবে।

ধর্ম্মশাসন একরূপ লুপ্ত হইয়াছে, রাজশাসন এখন দেশ-রক্ষার ও সমাজরক্ষার একমাত্র উপায়। এই দারুণ সঙ্কটে বর্ত্তমানে লোকে রক্ষা পায়,—ভবিষ্যতে গুরুতর অশান্তি ঘটিয়া সমাজধ্বংস না হয়, রাজশক্তিরই ইহা দেখা সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য।

স্বাভাবিক এবং অপ্রতিবাধ্য কারণে মূল্যবৃদ্ধি যতটা হইয়াছে, তাহার উপায় নাই। কিন্তু ধনবান্ ও সংঘবদ্ধ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অতিলিপ্সা হেতু যে পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিকারসাধনে রাজশক্তির অধিকার আছে। কেবল অধিকার আছে তা নয়, রাজশক্তির বড় একটি ধর্ম্মও ইহা।

অবিলম্বে ইহার অনুসন্ধান এবং যথোচিত ও যথাসম্ভব প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। নতুবা বোলশেভিক্ বিপ্লব সহস্র চেষ্টায়ও বন্ধ করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। সম্ভব হইলেও স্বর্ণপ্রসূ ভারত অচিরে শশ্মানভূমি হইবে। কতিপয় প্রভূত ধনী আর অসংখ্য নিরন্ন দীন ভিখারী, ইহা কোনও দেশের পক্ষেই মঙ্গলের অবস্থা নহে। অনাহারে অর্দ্ধাহারে দুর্ব্বল ক্ষীণদেহ, জীবনীশক্তি জীর্ণ, নিত্য নূতন সাংঘাতিক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব, মাসে অসংখ্য লোকের অসহনীয় ক্লেশের পর অকাল মৃত্যু—হায়! সোণার ভারত! শেষে তোমারও এই দশা হইল।

নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না

যে অবস্থা দেশে আসিয়া পড়িয়াছে, তার আশু একটা প্রতিকারের উপায় গবর্মেণ্টকে করিতেই হইবে। লোক রক্ষা যদি রাজধর্ম্ম হয়, তবে অতি ঘোর এই অমঙ্গল, দলবদ্ধ বলবান্ অর্থলিপ্সু ব্যবসায়ীদের নির্ম্মম নিষ্ঠুর এই পেষণ হইতে দরিদ্র প্রজাবর্গের রক্ষার উপরে বড় ধর্ম্ম রাজার আর এখন হইতে পারে না। বসন্ত,

প্লেগ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতে লক্ষ লক্ষ লোক যে মরিতেছে, তাহার প্রতিকার কতক সাধ্য, কতক অসাধ্য ও দৈবায়ত্ত। সাধ্য উপায় অবলম্বন করাও যেমন রাজধর্ম্ম, অস্বাভাবিক ও অন্যায় এই ব্যবসায়িক স্বার্থপরতায় সুজল সুফল দেশেও যে দারুণ এই অন্নকষ্ট ও বস্ত্রকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে অসংখ্য দরিদ্র প্রজাকে রক্ষা করাও তেমনই রাজধর্ম্ম। আধি ব্যাধির যতটা দৈবায়ত্ত তাহাও নিদারুণ এই অনবস্ত্র ক্লেশ দূর হইলে কতক নিবারিত হইতে পারে। প্রচুর অন্নভোগে এবং যথোপযুক্ত বস্ত্রাবরণে রক্ষিত হইলে লোকের জীবনী-শক্তি বাড়ে। দৈব বাহিরে যতই বিরূপ হউন, জীব তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বলে সে বিরূপতা বহু পরিমাণে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে। দেশের অধিকাংশ লোক খাইয়া পরিয়া সুখে আছে, ইহাই সকল দেশের সকল সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলের অবস্থা। যদি সম্প্রদায় বিশেষের অবাধ অন্যায় বলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, তবে সে বলে বাধা দিয়া তার আপাততঃ একটা প্রতিকার করিতে পারেন রাজা। স্থায়ী প্রতিকার হইতে পারে, যদি সমাজ এমন কোনও ধর্ম্মশাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে সম্প্রদায়বিশেষ অপরাপর সম্প্রদায়কে এমন করিয়া পিষিয়া ফেলিবার মত শক্তি আয়ত্ত করিতে না পারে। সে ধর্ম্মশাসন দেশে একদিন ছিল, আজ আর নাই। শীঘ্র যে হইবে, তারও কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় যাহারা পিষ্ট হইতেছে, তাহাদেরই সচেষ্ট হইতে হইবে, যাহাতে তাহারা এমন শক্তিমান্ হইয়া উঠে, যে এরূপ পেষণ কেহ তাহাদের না করিতে পারে। বস্তুত তারা এরূপ সচেষ্ট না হইলে কোনও রাজশক্তির সাধ্য নাই, কেবল আইন করিয়া চিরকাল তাহাদের রক্ষা করিতে পারে।

ইংরেজরাজত্ব দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ইংরেজ বণিকগণ দেশের বহু ব্যবসায় অধিকার করিয়া দেশের অর্থ শোষণ করিয়া নিতেছেন,—এ কথা বহুদিন অবধি কত রকমে শুনিতেছি। বিদেশী এই বণিকগণের এই ব্যবসায়িক শোষণের বিরুদ্ধে কিছুকাল যাবৎ বাঙ্গালীর একটা 'স্বদেশী' ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রেরণায় 'স্বদেশী' প্রচেষ্টাও একটা দেখা দিয়াছে। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ধরণে শিক্ষিত বাঙ্গালীরাও নানারূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন। বাঙ্গালীও চতুর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া কেবল কেরাণীগিরিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে হয়ত প্রতিযোগিতায় ইংরেজ বণিক তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিত না। কারণ বাঙ্গালা তার নিজের দেশ ইংরেজ অপেক্ষা সে অল্পে সন্তুষ্ট, অল্পে সংসার চালাইতে পারে, আর দেশের আব হাওয়ায় ইংরেজের অপেক্ষা অল্প খাইয়া, অল্প পরিয়া, ছোট ঘরে থাকিয়া, অনেক বেশী খাটিতে সে পারে। তার পর ইংরেজ এদেশে বাঙ্গালীর প্রচুর সহায়তা ব্যতীত কোনও ব্যবসায় চালাইতে পারে না। তাই যতই দোষ আমরা ধরি, এ কথাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, ইংরেজবণিকগণ প্রচুর মূলধন আনিয়া বহু ব্যবসায়ের পত্তন এদেশে করায় অনেক বাঙ্গালীর জীবিকার সংস্থান হইতেছে। ইহাদের ব্যবসায়ের মধ্যে থাকিয়া বাঙ্গালী ইহাদের ব্যবসায়ের ধরণ শিখিতেছে, ইহাদের ব্যবসায় অবলম্বনও করিতেছে।

ইংরেজ বণিক্ এদেশে বহু কারখানায়, রেলে ও অন্যান্য বহুকার্য্যে যে মূলধন স্থায়ীভাবে এদেশে ফেলিয়াছে, তাহা তুলিয়া লইয়া দেশে যাইতে পারিবে না, নিজেরাও দেশের বুক জুড়িয়া দেশের ভূমির মালিক হইয়া স্থায়ীভাবে বসতি করিতে পারিবে না। যে ব্যবসায়ের পত্তন তারা করিয়াছে, দেশের লোকের সাহায্যে তাহা চালাইতে হইবে, দেশের ধন বাড়াইবে, কতক নিজেরা নিবে, কিন্তু বেশীর ভাগ তারজন্য দেশের লোককে দিতে হইবে।

সুতরাং ইংরেজব্যবসায়ীদের আগমনে বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক ও আর্থিক লাভ লোকসানের হিসাব ধরিলে লাভের ভাগটাও একেবারে নগণ্য হয় না।

কিন্তু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের কথা আলাদা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় তারা কতকটা আলগা ভাবে ছিল, কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে প্রধানভাবে কাপড়ের ব্যবসায় তারা করিত, অন্যান্য কতিপয় ব্যবসায়েও কিছু কিছু হাত দিয়াছিল। কিন্তু গত দুই চারি বৎসরের মধ্যে অতি দ্রুত, অতি ব্যাপকভাবে, তাহাদের ব্যবসায় বাঙ্গালায় বিস্তৃত হইতেছে। কাপড়ের বাজার প্রায় একটা 'ট্রাষ্টে'র মত তাহাদের হাতে গিয়াছে, বাঙ্গালার ভূমিতে উৎপন্ন

ফলশস্যাদির বাজারও একেবারে তাহাদের হাতে গিয়া পড়িল। বাঙ্গালার ভূমিস্বত্বের উপরেও তাহাদের দারুণ লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। এককথায় বাঙ্গালার সার ধন যাহা কিছু, বাঙ্গালীর আহার্য্য পরিধেয় যাহা কিছু, সব একেবারে এই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়া পড়িতেছে।

মাড়োয়ারী ব্যবসায়ে চতুর, কর্ম্মঠ, কঠোর ক্লেশসহিষ্ণু। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তারা বাঙ্গালী অপেক্ষা সহজে যাইতে পারে, সর্ব্বত্র গিয়া বসিতে পারে, বাঙ্গালী অপেক্ষাও অল্প ব্যয়ে বেশী ক্লেশ সহিয়া থাকিতে পারে। ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর সহায়তাও তাদের প্রয়োজন হয় না। যাহা কিছু দরকার সর্ব্বত্র নিজেরা গিয়াই নিজেদের বুদ্ধিতে নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের হাতেই করিতে পারে। দিনদিন তাহাদের ধনবল এমনই বাড়িতেছে, যে প্রচুর অর্থ ছড়াইয়া সব তারা এমনভাবেই দখল করিয়া ফেলিতে পারে, এবং ফেলিতেছে, যে কোথাও বাঙ্গালীর আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না।

ইংরেজবণিক বাঙ্গালীর যে প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহা অপেক্ষা অনেক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে, এই মাড়োয়ারী বণিক্। ইংরেজবণিকের বিরুদ্ধে যে "স্বদেশী প্রচেষ্টা' বাঙ্গালী করিতে চাহিতেছে, তার অপেক্ষা অনেক বেশী 'স্বদেশী প্রচেষ্টা' বাঙ্গালীর অচিরে প্রয়োজন হইবে, মাড়োয়ারী বণিকের বিরুদ্ধে। নতুবা বাঙ্গালীর পরিণাম হইবে একেবারে মাড়োয়ারীর দাসত্ব। সে দাসত্বের পীড়ন ইংরেজ বণিকের দাসত্বের পীড়ন অপেক্ষা অনেক বেশী কঠোর হইবে।

আবার মাড়োয়ারীর প্রবল লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে বাঙ্গালার ভূমিস্বত্বের উপরেও। ব্যবসায়ে বাঙ্গালীকে পেষণ করিয়া যে প্রভূত ধনসম্পদ মাড়োয়ারীর হাতে গিয়া জমিতেছে, তাহার বলে বাঙ্গালার ভূমির মালিক মাড়োয়ারী সহজেই হইতে পারিবে। ব্যবসায় মাড়োয়ারীর দখলে, ভূসম্পত্তি মাড়োয়ারীর দখলে, কেবল Capital Aristocracy নয়, বাঙ্গালার Landed Aristocracy'ও মাড়োয়ারী হইবে। ধনবান্ বণিক যদি আবার জমিদার হইয়া বসে,—ক্ষাত্রবল আর বৈশ্যবল যদি প্রধানতঃ এক সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া পড়ে, তবে তার পেষণ দেশের সম্প্রদায়ের পক্ষে সহিয়া ওঠা, একেবারে দুঃসাধ্য। তাই বলিতে হয়, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বড় শোচনীয়।

রাজশক্তি চেষ্টা করিলে আপাততঃ দারুণ এই ক্লেশ কতক পরিমাণে নিবারণ করিতে পারেন। কিন্তু স্থায়ী মঙ্গল চাহিলে, বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালায় সুখে থাকিতে চায়, তবে তাকে বিশেষ সতর্ক ও সচেষ্ট হইতে হইবে। বাঙ্গালীকে বিশেষ উদ্যমে সকল রকম ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে হইবে। কেবল ইংরেজের ধরণে নয়, মাড়োয়ারীর ধরণেও ব্যবসায় তাকে করিতে হইবে। বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রযত্নে বাঙ্গালীর সহায়তা করিতে হইবে। ব্যবসায়ের সংরক্ষণে যাহা কিছু প্রয়োজন, আয়াস স্বীকার করিয়াও বাঙ্গালীর তাহা করা দরকার হইবে। সোজা এক কথায় এই বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীকে নূতন স্বদেশীব্রত ধরিতে হইবে, মাড়োয়ারীর পেষণ হইতে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবার জন্য। বিদেশী বণিকদের সঙ্গে যে সংগ্রাম, তার চেয়ে অনেক কঠোরতর সংগ্রাম বাঙ্গালীকে এখন করিতে হইবে, মাড়োয়ারী বণিকের সঙ্গে।

কথাটা বড় বিশ্রী শুনায়, বড় সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়। মারোয়ারী ভারতবাসী, তার বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর 'স্বদেশী পণ'— ইহাও কি একটা কথা! হউক না মাড়োয়ারী বাঙ্গালার বড়, হউক না তারা বাঙ্গলার মহাজন, বাঙ্গলার জমিদার,— বাঙ্গলাতেই ত তারা বসতি করিবে, কালে হয় ত বাঙ্গালীই হইয়া যাইবে। ক্ষতি কি?

হাঁ, ক্ষতি আছে। প্রথম, বংশানুক্রমিক প্রাচীন ভূস্বামী সম্প্রদায়, যাঁরা শুধুই ভূস্বামী, ব্যবসায়ী নয়, তাঁরা লোপ পাইয়া নূতন এক ব্যবসায়িক সম্প্রদায় দেশের ভূস্বামী হইয়া উঠিলে, তাহা প্রজার পক্ষে সুখের হইবে না। প্রাচীন ভূস্বামীগণ খাজনা নেন, প্রজার ব্যবসায় দখল করেন না। কতকটা রাজার মত প্রজার হিতসাধনও করেন, তাঁদের ধরণ আলাদা, তাঁদের কৌলিক অনুষ্ঠানাদি, তাঁদের আড়ম্বর, প্রজার অনেক উপকারেও আইসে। বড় বড় স্থায়ী হিতকর প্রতিষ্ঠানও তাঁহাদের বদান্যতায় হইতে পারে কিন্তু ব্যবসায়ী ভূস্বামীর লক্ষ্য থাকে, শুধুই অর্থসঞ্চয়ের দিকে, কেবল খাজনার টাকা জমাইয়া নয়, সকল ব্যবসায়ও অধিকার করিয়া।

বাঙ্গালীর সমাজবিন্যাস যেরূপ তাহাতে মাড়োয়ারীর

সঙ্গে বাঙ্গালীর সামাজিক মিশ্রন সম্ভব নয়। মাড়োয়ারী হইতে পারে, বাঙ্গালার পৃথক সম্প্রদায়, যাহারা অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িক প্রভু মাত্র। তারপর বাঙ্গলা বাঙ্গালীর দেশ, বাঙ্গলার ফলে শস্যে, বাঙ্গলার ধনে, বাঙ্গালীর দাবী সকলের উপরে। বাহিরের কেহ যদি বাঙ্গালীকে বঞ্চিত করিয়া তাহা কাড়িয়া নেয়, আত্মরক্ষার চেষ্টা বাঙ্গালীকে করিতেই হইবে।

কেবল তাহাই বা কেন? এই দেশের, একই সমাজের সম্প্রদায়বিশেষ যদি অত্যধিক ধনবলে অপরাপর সম্প্রদায়কে তাদের আর্থিক দাসত্বে পরিণত করিতে প্রয়াসী হয়, তবে সেই সব সম্প্রদায়ের আর্থিক মুক্তির জন্য এরূপ সচেষ্ট না হইলেই চলে না।

বসন্তের প্রতিকার

(১)

বসন্তের প্রতিকারের জন্য কলিকাতার স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তা ডাঃ ক্রেক সাহেব নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

(১) কোনও বাড়ীতে বসন্ত হইলেই স্বাস্থ্যপরিদর্শককে খবর দিতে হইবে।

(২) সমস্ত লোকেরই টিকা লওয়া উচিত। এমন কি গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং সদ্যজাত শিশুকেও নির্ব্বিঘ্নে টিকা দেওয়া যাইতে পারে।

(সকলের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত, সময়ে টিকা নেওয়া বসন্ত রোগের সম্বন্ধে প্রধান প্রতিষেধক উপায়)

(৩) বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক। সুতরাং রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ করা উচিত। তাহা সম্ভব না হইলে বাড়ীতে দোতালা কিম্বা তেতালার কোনও নির্জ্জন ঘরে রাখা কর্ত্তব্য। ছাতের উপরে চালা বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেই সব চেয়ে ভাল হয়।

(৪) রোগীর ঘরের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কোনও দ্রব্যাদি রাখা উচিত নহে।

(৫) রোগীকে যাহারা পরিচর্য্যা করিবেন, তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ অযথা রোগীর ঘরে প্রবেশ করিবে না। পরিচর্য্যাকারীগণ যখন রোগীর ঘর ত্যাগ করিবেন, তাহারা শরীর ও বস্ত্রাদি প্রতিষেধক দ্বারা ধৌত করিবে।

প্রতিষেধক বিনামূল্যে কর্পোরেশন আফিসে পাওয়া যাইবে।

(৬) রোগীর শরীরে মাছি বসিতে দেওয়া উচিত নহে, ঘরে মাছি বেশী থাকিলে মশারী ব্যবহার করা উচিত, মাছি বসন্তের বীজ অন্য স্থানে বহন করে।

(৭) রোগীর ব্যবহারের বাসন পাত্রাদি আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে এবং আলাদা স্থানে ধৌত করিতে হইবে।

(৮) রোগী বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলেই সেইগুলি অন্ততঃ আধ ঘণ্টা গরম জলে ফুটাইয়া পরে আবার ব্যবহার করিতে দিবে।

(৯) রোগী আরোগ্য হইলে অথবা মরিয়া গেলে তাহার ব্যবহৃত বিছানা এবং কাপড় আলাদা রাখিবে। প্রতিষেধক দ্বারা পরিষ্কার করা হইলে পরে ধোপাবাড়ী দিতে হইবে। প্রতিষেধক ব্যবহারে দ্রব্যাদির কোনও প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

(১০) রোগীর বাড়ীর অন্যান্য লোকের কাপড় ও আধ ঘণ্টা গরম জলে ফুটাইয়া পরে ধোপার বাড়ী দেওয়া উচিত।

(১১) রোগী যত দিন একেবারে ভাল না হইয়া যায় তত দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মানুসারে চলা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নিম্নে আয়ুর্ব্বেদ মতে বসন্তের প্রতিষেধক কতকগুলি ঔষধের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা কবিরাজ ভিষকবাচস্পতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী এল্, সি, পি, এস্ কবিশেখর মহাশয়ের কথিত।

১। প্রত্যহ কণ্টকারীর মূল এক আনা, নিমপাতা ৫।৬টি ও গোলমরিচ তিনটি একত্র যোগে সামান্য জল সহ বাটিয়া খাইলে বসন্ত হইবার কোন ভয় থাকে না।

২। বসন্তরোগ প্রাদুর্ভাব সময়ে প্রত্যহ প্রাতঃকালে

আধ তোলা হেলেঞ্চার রস সহ আধ আনা রুদ্রাক্ষ ঘষিয়া খাইলে বসন্ত আক্রমণ করিতে পারে না।

৩। উচ্ছে করলা ভাজা বা সিদ্ধ করিয়া হউক অভিরুচি মত প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে খাইলে রোগ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ব্রাহ্মীশাকের রস আধ তোলা, কাঁচা হলুদের রস আধ তোলা ও মধু বিশ ফোটা একত্রযোগে খাইলে বসন্ত হয় না।

৫। বাসক পাতার রস একতোলা কণ্টকারীর মূল চূর্ণ এক আনা একত্র যোগ করিয়া খাইলে বসন্ত হয় না।

৬। কাঁচা হলুদ এক ভরি, ইক্ষুগুড় এক ভরি, একযোগে চিবাইয়া খাইলে শীতলারোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; ইহা কেবল বসন্ত প্রতিরোধক তাহা নহে রক্ত পরিষ্কারক ও মেহনাশক।

৭। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে জর হইলে বসন্তরোগ বা হামাদি হওয়ার আশঙ্কা থাকে কিন্তু জরের প্রথম অবস্থা হইতেই মোচার রসে শ্বেতচন্দন ঘসিয়া খাইলে অথবা পুটপক্ক বাসক পাতার রস বা মধু কিম্বা জাতিপত্রের রস অর্দ্ধতোলা যষ্ঠীমধু চূর্ণ ⁄৹ আনা ইহার যে কোন একটী খাইলে বসন্ত হয় না অধিকন্তু বসন্তের বিষ শরীরে প্রবেশ করিলেও নষ্ট করে।

৮। বসন্ত প্রাদুর্ভাব সময়ে এক সিকি ওজনে কাটা-নটের শিকড় ও তিনটী গোলমরীচ একএযোগে বাটিয়া সপ্তাহে দুই দিন কবিয়া খাইলে বসন্ত আক্রমণের ভয় থাকে না—আবারস্থ বিষ নষ্ট করে, ইহা শূন রোগেরও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বিষ।

৯। উল্লিখিত ঔষধ বসন্ত বা হাম দেখা দেওয়ার পূর্ব্ব হইতে ব্যবহারে শরীরস্থ বিষ নষ্ট করে, বসন্তাদি আক্রমণের ভয় থাকে না, পুনঃ বসন্ত ব হাম গায়ে দেখা দেওয়ার পরও ব্যবহারে মারাত্মক ভয় হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়।

১০। কটিদেশে তামা বা হরিতকী বীজ ধারণ করিলে গৃহের চালে মনসার ডাল দুইটী পতাকাযুক্ত রাখিলে সে বাটীতে বসন্ত হয় না।

পরলোকগত ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট আর্থার স্মিথ্ আর ইহজগতে নাই। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ তিনি এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমস্ত জগতের এক মহা ক্ষতি হইয়া গেল। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের গৌরবময় অতীত কাহিনী জগতের লোক জানিতে পারিয়াছে। তিনিই প্রথমে প্রাচীন ভারতের এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই আমরা জানিতে পারিয়াছি। তিনিই এ বিষয় পথপ্রদর্শক, তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতের অনেক লুপ্ত কাহিনী উদ্ধার করিয়াছেন। মহাত্মা স্মিথের এই কার্য্যের জন্য সমস্ত ভারত তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। নিম্নে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী দিলাম।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আয়রল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডাব্‌লিন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ডাব্‌লিন নগরে ট্রিনিটি কলেজে (Trinity College এ) তিনি অধ্যয়ন করেন। উক্ত কলেজেই তিনি কয়েক বৎসর ভারত ইতিহাস ও হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি অক্সফোর্ডে ভারত ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ব্বিস্ বিভাগে কার্য্য করেন। প্রথমে এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পরে কমিশনার ও সর্ব্বশেষে যুক্ত প্রদেশের চীফ্ সেক্রেটারীর পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ অংশ প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার ইতিহাস রচনায় অতিবাহিত করেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ব্যতীত তিনি অন্যান্য পুস্তকও রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রাচীন ভারত সিংহলের সুকুমার শিল্পকলা (History of Fine Art in India and Ceylon), মোগল সম্রাট আকবরের ইতিহাস (Akbar, the Great Mogal Emperor) এবং অক্সফোর্ড হিষ্টরী অব্ ইণ্ডিয়া (Oxford History of India) নামে ভারতের ইতিহাস বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

১৯১৮ সাল রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটি তাঁহাকে একটি সুবর্ণ পদক দিয়া সম্মানিত করেন।

ভুল ভাঙ্গা

(১)

"কি করে এমন মত বদলে গেল বল্‌তো?" শোভা মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে অনেক কথা।" "তবু দয়া করে একটু বলনা শুনি। যাকে আত্মদান করতে যাচ্ছ তার কথাটাই একটু শোনাও।" "আচ্ছা দাঁড়াও কবাটটা বন্ধ করে আসি।" শোভা উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া বসিল। সুনীতি তার হাতখানা টানিয়া বলিল, "এইবার আরম্ভ কর ভাই।" শোভা মৃদুস্বরে বলিল, "তোর মনে আছে বোধ হয় মিঃ ঘোষের সঙ্গে যখন আমার বিয়ের কথা উঠেছিল তখন আমি কি রকম ক্ষেপে উঠেছিলাম। মার একান্ত ইচ্ছা হয়েছিল তাঁকেই আমি বিয়ে করি, কিন্তু আমি তখন"—বাকিটুকু সুনীতি সহাস্যে বলিয়া ফেলিল, "অশোক রায়ের রূপমুগ্ধা!" শোভা হাসিয়া বলিল, "ওরকম করলে বলব না কিন্তু।"

"না, কিছু করব না আর, বল্‌, বল্‌।"

"মিঃ ঘোষ আর রায় তখন দুজনেই প্রায় আমাদের বাড়ী আসতেন। মিঃ ঘোষ শান্তপ্রকৃতির লোক, নিজের মতটাকে কখনো প্রবল করে প্রচার করেননি। কিন্তু মিঃ রায় গল্পে গানে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। কথা বলবার শক্তিও তাঁর খুব ছিল, তর্কে তাঁকে হারানো আরও শক্ত ছিল। মিঃ ঘোষ যখন রায়ের কাছে পরাস্ত হতেন, তখন দেখতুম, মিঃ রায় চকিতে একবার আমার দিকে চেয়ে চোখ ফিরাতেন। তর্কে মিঃ রায় জয়লাভ করলে আমার মনে খুবই আনন্দ হত। জানিনা এই রকম নিত্যকার কথাবার্তায় মনটা কিরূপে মিঃ রায়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী হয়ে উঠল। এই সময় মা একদিন আমায় বললেন, মিঃ ঘোষ সেদিন তোমার বাবাকে বলছিলেন, আমাদের যদি মত হয় তো তিনি তোমায় বিয়ের কথা বলবেন। আমাদের খুব মত আছে, যদি তিনি তোমায় এর মধ্যে কিছু বলেন ত আশা করি কোন অমত করবে না।" আমি অত্যন্ত চমকে গেলাম, মাকে বললুম, "না মা, মিঃ ঘোষকে আমি বিয়ে করতে পারব না।" মা বিস্মিত হয়ে বললেন, "কেন, ঘোষ তো খুব ভাল ছেলে শোভা, তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে আমরা ভাগ্য বলে মানব।" "না মা, আমি সে মুখচোরা ভীরুকে কিছুতেই বিয়ে কর্ত্তে পারব না, তোমরা আমায় সে অনুরোধ করো না।" মা আমায় আরো অনেক বুঝিয়ে শেষে দুঃখিত হয়ে উঠে গেলেন। আমি মনে মনে মিঃ রায়ের সঙ্গে ঘোষকে তুলনা করে হেসে ফেললুম। মিঃ ঘোষের আশা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, হাঁ যদি মিঃ রায়"—শোভা কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া হাসিয়া উঠিল। সুনীতি হাসিয়া বলিল, "আর দুষ্টুমি কর্ত্তে হবে না।" "কিছু দিন পরে বাবার জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে একটা ভোজ দেওয়া হল, তা'তে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তোর মনে আছে বোধ হয় সেদিন আমাদেরি দুজনের উপর গাইবার ভার পড়েছিল। আমি যখন ব্যস্তভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে বেড়াচ্ছিলাম, তখন মিঃ রায়ের উজ্জ্বল চোখের উপর হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়েছিল; সে চোখে কি মুগ্ধদৃষ্টি! আমি যেন জড়সড় হয়ে গেলুম।

গাইবার সময় অর্গ্যানটার কাছে দেখি, মিঃ রায় নিবিষ্টচিত্তে স্বরলিপির খাতা দেখছেন। বুকের দ্রুত স্পন্দন সংযত করে বাজাবার উদ্যোগ করলুম, এমন সময় তিনি খুব মৃদুস্বরে বললেন, আজ আপনাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!' পলকে আমার শরীরখানা কেঁপে উঠল।

মিঃ রায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "রাগ করলেন নাকি?" আমি মৃদু হেসে মুখ ফিরিয়ে দেখি, কিছু দূরে মিঃ ঘোষ আমাদের দিকেই চেয়ে আছেন। আমি চাইতেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি বিষম লজ্জিত হয়ে পড়লুম। সেদিন গান বাজনা মোটেই জমল না। কিন্তু মিঃ রায়ের প্রশংসাবাদে মন ভরে উঠল।

(২)

কয়েকদিন অতীত হল,—সেই কথাটি ভুলতে পারলুম না—কি সুন্দর দেখাচ্ছে মিসদত্ত! অমৃত ভরা এই কটি কথা সর্ব্বক্ষণই বীণাধ্বনির মত কাণে বাজতে লাগল। তাঁর সকল কথাই যেন আমার কাণে মোহমন্ত্র ঢেলে দিত। যেদিন তিনি না আসতেন, আমার চোখে যেন দিনের আলো

নিভে আসতো! একদিন তিনি একখানা বই আমার সমুখে ধরে বল্লেন, মিসদত্ত, গান শোনার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বইখানা নিবেদন করতে চাই।' আমি সেখানা নিয়ে হেসে বল্লুম, বেশ তো আমি আপনার কৃতজ্ঞতা মঞ্জুর করলুম। তিনি একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আমার কৃতজ্ঞতা শুধু এইটুকু নয়, সবটুকু মঞ্জুর করতে পারবেন তো?' আমি লজ্জায় সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলুম।

সুখস্বপ্নে হৃদয় যখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তখন একদিন মিঃ ঘোষ পাণিপ্রার্থনার আবেদন-খানি পেশ করলেন। পূর্ব্বেই একথা জানতুম বলে অনেক সুবিধা হয়েছিল। আমি নম্রভাবে প্রত্যাখান করলুম। তখন তাঁকে কি বলেছিলুম তার কিছুই মনে নেই। শুধু তার শুষ্ক বিবর্ণ মুখ আর রুদ্ধকণ্ঠের সেই কয়েকটি কথা, মিসদত্ত, আর আপনাকে বিরক্ত করবার কিছু নেই, আমায় মাপ করবেন।—সে স্বরে কত যে বেদনা, কত যে অশ্রু ঝরে পড়িতেছিল, তা' তখন লক্ষ্য করিনি। কিন্তু পরে সেই করুণ কথাগুলি যেন সাপের মত কামড়ে বিষে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার পর কিছুদিন আমরা মিঃ ঘোষের কোন সংবাদ পেলুম না। মিসেস বসুকে জান তো? তিনি মিঃ ঘোষের এক সম্পর্কিতা বোন হন। আমরা একদিন তার কাছে শুনলুম যে মিঃ ঘোষ নাকি পল্টনে ঢুকে মেসোপটেমিয়ায় যাবেন। এমনি হৃদয়হীনা আমি যে শুনে প্রথমটা আমার হাসি এসেছিল। প্রেম-প্রত্যাখাত হয়ে যুদ্ধ যাত্রা! এতো নভেলেই পড়ি, আবার চোখেও দেখতে হল! মিঃ রায় তো ঘোষের যুদ্ধযাত্রা উপলক্ষে খুব ঠাট্টা করলেন; সেদিন তাঁর রসিকতায় কেউ উৎসাহিত হতে পারলেন না। বাবাতো একেবারে স্তব্ধ! তাঁর সেই স্তব্ধতা দেখে কাঁটার মত ব্যথা বাজছিল।

যদি সেখানে মিঃ ঘোষের কিছু হয় তো তার জন্য আমিই দায়ী; নিশ্চয়ই তিনি যুদ্ধযাত্রার মতলব ঠিক করে রেখে আমার উমেদারী করতে আসেন নি। মনটা যেন কিছুতেই স্থির হচ্ছিল না।

এর পর হঠাৎ একদিন দুপুর বেলায় মিঃ ঘোষ আমাদের বাড়ীতে এলেন। বাঙ্গালীপল্টনের খাকী সুটে তাঁর বলিষ্ঠ উন্নত বীরমূর্ত্তি যেন মহিমায় জল্ জল্ করছিল। তিনি বললেন, "কাল আমি রওনা হচ্ছি, তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম।" মা, বাবা তাঁকে সাদরে সস্নেহে অভিনন্দন করলেন। আমার যেন স্বরবদ্ধ হয়েছিল, একটি কথাও বলতে পারলুম না। শুধু মনে আছে তিনি চলে যাবার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কত দিনে ফিরবেন মিঃ ঘোষ? তিনি একেবারে চমকে উঠলেন। তাঁর শান্ত কালো চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে মৃদুস্বরে বললেন, নাই বা আর ফিরলুম মিস দত্ত। অজ্ঞাতে আমার মাথা অপরাধীর মত নীচু হয়ে গেল। তিনি সম্ভ্রমভরে নমস্কার করে গেট থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রতি নমস্কার করতে আমার হাতে উঠল না, আমি যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলুম।

(৩)

শোভা নীরব হইল। সুনীতি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?" "বলছি,—মিঃ ঘোষ চলে যাবার পর মিসেস্ বসুও আমাদের বাড়ী আসা একরকম ছেড়ে দিলেন; কাজেই আমরা অনেকদিন পর্য্যন্ত মিঃ ঘোষের কোন সংবাদ পেলুম না। দিন কতক পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে বিস্ময়ে, বেদনায় আমাকে মুহ্যমান করে দিলে।

আমাদের ক্লাশের সুধাকে তোমার মনে আছে বোধহয়, তিনি মিঃ রায়ের ভাইঝি হন। তাঁর বিয়ের সময় আমরা সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম। গাড়ী থেকে নামতেই দেখলুম মিঃ রায় হাস্যমুখে অগ্রসর হয়ে এলেন। তিনি সাদর অভ্যর্থনায় আমাদের বসিয়ে চলে গেলেন; ব্যস্ততায় কোনো কথা কইবার অবসর হল না।

উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোয়, ফুটন্ত ফুলের শোভায় বিবাহ-সভা যেন ইন্দ্রসভার মত বোধ হচ্ছিল। আমার চোখে সবচেয়ে মিষ্ট লেগেছিল, বরকন্যার সুন্দর মুখের সলজ্জ প্রীতিপূর্ণ মৃদু হাসির আলোটুকু! কনের কাণে কাণে সখীরা কি মন্ত্র পড়ে দিচ্ছিল, আর তার সুন্দর শুভ্র মুখখানা গোলাপী রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে উঠছিল।

নির্ব্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেল। আমি উৎসবের জনতা ছেড়ে একটু খোলা জায়গায় বেড়াব মনে করে বাড়ীর সামনের ছোট বাগানখানির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। তখ

চাঁদের আলোয় পুষ্পগন্ধাকুল সজ্জিত বাগানখানা যেন নন্দনের এক অংশের মত তৃপ্তিপ্রদ হয়েছিল।

একখানা বেঞ্চে বসে পড়লুম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় অন্তর জুড়িয়ে গেল! সহসা কাদের পদশব্দ ও মৃদুকণ্ঠের গুঞ্জনধ্বনি এসে কাণে পৌঁছিল, ফিরে দেখি কে দু'জন বাগানের মধ্যে আসছেন। আমি ত্বরিতে একটা বড় কামিনী ঝোপের আড়ালে সরে গেলুম; ইচ্ছা ছিল পিছন দিয়ে ঘুরে ওদের অলক্ষিতেই চলে যাব। এমন সময় আমি সেই অস্ফুট চন্দ্রালোকে স্পষ্টই দেখতে পেলুম, মিঃ রায় একটি মেয়ের হাত ধরে আমারি পরিত্যক্ত বেঞ্চখানায় এসে বসলেন। একি কাণ্ড! পলকে আমার সর্ব্বশরীরের রক্ত তপ্ত হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল; কিন্তু পা নড়ল না। তাঁদের কথা বার্ত্তার প্রত্যেক অংশটি কাণের মধ্য দিয়ে অন্তরে এক একটা ধাক্কা দিয়ে যেতে লাগল। শুনলুম মিঃ রায় বললেন, "আর কতদিন কষ্ট দেবে রাণী? আজ উত্তর দাও!" মেয়েটি আমার অপরিচিতা! তিনি সুক্ষমিহিসুরে বললেন, "আপনি বড্ড দুষ্টু হচ্ছেন মিঃ রায়।" মিঃ রায় সযত্নে তার হাত দুটি তুলে ধরে বল্লেন, "তুমিই আমায় এমন করে তুলেছ রাণী, এখন আর—" আর শুনতে পারলুম না, সর্ব্বাঙ্গ আগেই ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল; এই নিদারুণ বিশ্বাসহীনতায় শ্বাসপ্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল,—চলে যাবার জন্য প্রাণপণে আত্মসংযম করে পা বাড়ালুম, কিন্তু পারলুম না।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো, লজ্জায়, ঘৃণায়, ভয়ে চোখ খুলতে পারি নি; কি জানি যদি আবার সে দৃশ্য দেখতে হয়! এমন সময় কার একখানি কোমল কম্পিত হাত ধীরে ধীরে মাথার চুলে অমৃতস্পর্শ লাগিয়ে দিলে; চোখ খুলে দেখি একখানি ব্যগ্র ব্যাকুল মুখের অশ্রু-সজল করুণ চোখ দুটি গভীর স্নেহে চেয়ে আছে! সে আমার মার মুখ! আমি আমার ঘরেই শুয়ে আছি। এতক্ষণ যা বুকের ভিতরে তরঙ্গ তুলে বেড়াচ্ছিল, সেই অশ্রুভরা চোখের একটু সহানুভূতিতে বাইরে এসে আছড়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ কান্নার পর হৃদয় শান্ত হল। কেন কাঁদলুম, মা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, শুধু তাঁর সর্ব্বংসহা স্নেহময় মাতৃবুকে মাথাটা চেপে ধরে পরম পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ দাও মা।"

(৪)

সেদিন সেখানে অচেতন হবার পরে কি কাণ্ড হয়েছিল, সকলে কি ভেবেছিলেন, সে সব কল্পনা ক'রে লজ্জায় মরে গেলুম। কিছুদিন কারু সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। শুনলুম, মিঃ রায় একদিন দেখা করতে এসেছিল। কি ভয়ানক নির্লজ্জতা! তার নামে দেহ মন যেন বিষম তিক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই মধুর মনোভাব দারুণ ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। সত্য বটে, সে কোন দিন স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে নি; কিন্তু বাকিও ত কিছু রাখে নি! আমার মন তার খেলার জিনিস হয়ে গিয়েছিল। ধিক্, কি অপদার্থ আমি! একদিন সত্যই মিঃ রায় এসে দেখা করলেন সামান্য দুই একটা কথার পর আমি উঠে এলুম; তার ছায়ার স্পর্শেও প্রবল ঘৃণায় সর্ব্বদেহ কেঁপে উঠছিল, আশ্চর্য্য! পূর্ব্বের কোন ভাব তখন তার মধ্যে ছিল না, হয় ত অনেক দিনই ছিল না, মোহমুগ্ধ আমি লক্ষ্যই করিনি। আমার অসুস্থ হওয়ার সংবাদটা বোধহয় সকলেই জেনেছিলেন, একদিন মিসেস বসু আমার স্বাস্থ্য-সংবাদ নিতে এলেন। নানা রকম কথার পরে তিনি বল্লেন, "সতীশ প্রত্যেক চিঠিতেই আপনাদের কথা লেখে, বোধহয় আপনাদের স্নেহ সে সৈনিক জীবনের কঠোরতার মধ্যেও বিস্মৃত হয় নি।" আমাদের স্নেহ? আমার হাসি এসেছিল। তিনি আবার বল্লেন, "সেখানে তার স্বাস্থ্য ভাল নেই, আস্তে বল্‌ব, তারও উপায় নেই, কি হবে ঈশ্বরই জানেন!" ভ্রাতৃবৎসলা স্নেহময়ীর আর্দ্রদৃষ্টির সাম্‌নে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়্‌লুম। তবে কি মিসেস বসু ভিতরের কথা সব জানেন? আর মিঃ ঘোষ—তিনিও কি সেই রকম স্নেহই করেন? মাথাটা গোলমাল হ'য়ে গেল। মিঃ ঘোষের একাগ্রতায় আগে বরং বিশ্বাস ছিল, এখন যেন সমস্ত পুরুষজাতির সাধুতায় আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। মিসেস বসু আমায় একদিন যেতে ব'লে বিদায় গ্রহণ করলেন। আজ আবার নূতন ক'রে মিঃ ঘোষের করুণ দৃষ্টিটুকু মনে পড়্‌ল।

মিসেস বসুর কথা মত কয়েক দিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। আমাকে দেখে তিনি খুব খুসি হয়ে উঠ্‌লেন। আজ আগেই মিঃ ঘোষের কথা ফেলে বল্‌লেন, "সতীশ সেখানে খুব নাম ক'রে ফেলেছে শুনেছেন, তার

কথা কাগজেও বেরিয়েছে।" আমি জানালুম যে কোন কাগজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই, তিনি অনেকক্ষণ কত এলোমেলো গল্প ক'রে হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "মিসদত্ত, যদি রাগ না করেন তো আজ আপনাকে একটি কথা বলি।" আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "এ কথা বলছেন, বয়োজ্যেষ্ঠা আপনি, একটা বল্লে আমার রাগ হওয়া শোভন নয়।" তিনি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, "তবে বলি, আজ সতীশের চিঠি পেয়েছি, সেখানা পড়ে বড় মনঃক্ষুন্ন হয়েছি। আপনাদের কথা সে সকলই আমায় জানিয়েছিল। আপনাকে ভোলবার জন্যই যে সে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, সে বোধহয় বুঝতে পেরেছেন। মিস্ দত্ত, কি রত্ন যে আপনি হেলায় বিসর্জ্জন দিয়েছেন, তা' বোঝেন নি; আমার ইচ্ছা তার চিঠিখানা আপনি পড়ে দেখুন।" তিনি একখানা বইএর মধ্য হ'তে মোটা লেফাফা ভরা চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "পড়ুন।" আমি খুলে দেখলুম, পরিষ্কার জ্বলজ্বলে অক্ষরে বাংলাভাষায় গোটাকতক লাইন লেখা—"দিদি, তোমর চিঠি পেলুম। তুমি যেমন আমার চিঠির জন্য অস্থির হ'য়ে ওঠ, আমিও তদ্রূপ। মিস দত্তর অসুখ লিখেছো, কেমন আছেন জানিও।

আমার মন পরিবর্ত্তিত হয়েছে নাকি জানতে চেয়েছো? অসম্ভব! আমার মনের ব্যবহার দেখে আমিই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। যাকে ভোলবার জন্য এতদূর এসেছি, এখন দেখছি সে আমার সঙ্গেই এসেছে। বিশ্রামের সময় সে যেন ছবির মত অন্তরে ফুটে ওঠে, আমার সমস্ত ক্লান্তি কোথায় মিলিয়ে যায়, প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে! তাকে ভুলতেও চাই না আর, মনে হয় তাহলে যেন আত্মহত্যা করতে হবে।

চিঠি দিও, আমি ভাল আছি।

স্নেহের সতীশ।'

একি! আমি তো এতদূর ভাবিনি। সত্যই কি মিঃ ঘোষ এতদূর অগ্রসর হয়েছেন! আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। "তাকে ভুলতে চাই না!" নিস্ফলতার জন্য একি ঐকান্তিকী কামনা! জীবনে এমন আশ্চর্য্য আর কখনো হয়নি। চিঠিখানা রেখে দিলুম। কণ্ঠ দিয়ে 'আশ্চর্য্য' শব্দটী অস্ফুটস্বরে নির্গত হয়ে গেল। মিসেস্ বসু একটু আবেগের সহিত বললেন, "শুধুই একটু আশ্চর্য্য? একটু অনুতাপ, একটু সহানুভূতি, কিছুই নয়? এমন আকুল ভালবাসার বদলে শুধুই একটু আশ্চর্য্য?" আমি নির্ব্বাক্। তিনি একটু স্তব্ধ থেকে আবার বলে উঠলেন, "মিস দত্ত, শক্তিমান্ সচ্চরিত্রের প্রণয়, একনিষ্ঠ ভক্তের ঈশ্বর পূজার মত বলে বর্ণনা করা হয়; যে মেয়ে বিধাতার আশীর্ব্বাদের সেই নির্ম্মল শুভ্রফুলটিকে পদদলিত করে, তাকে বুদ্ধিমতী বলতে পারি না। কি অমূল্য জীবন একটা নষ্ট হয়ে গেল!"

তাঁর তীক্ষ্ণ কথাগুলি মৃত্যুবানের মত আমার বক্ষভেদ করে গেল।

(৫)

হৃদয়ে গুরুভার নিয়ে ঘরে ফিরলুম। ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণ যেন আহত পাখীর মত মৃতবৎ হয়ে বক্ষ-পঞ্জরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। ভাববার শক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই রকমে কতদিন কেটে গেল। এর মধ্যে সংসারে কত পরিবর্ত্তন ঘটে গেল।

ক্লাসের মেয়েদের অনেকেই প্রণয়ের খর্পরে পড়ে লেখা পড়া ছেড়ে সংসার সাগরে তলিয়ে গেলেন; আমি শুধু পড়া ছেড়ে একটা অবলম্বন স্বরূপ মাষ্টারি আরম্ভ করলুম। শুধু সংসার কেন, এই মহাবিপ্লবের পরে আমার অন্তরও একটু একটু করে অনেক বদলে গেল।

মিঃ ঘোষের কথা মনে পড়লে অসহ্য অনুতাপে বুক জ্বলে উঠতো। তিনি এত ভাল বেসেছিলেন, আর প্রতি-দানে আমি তাঁকে মৃত্যুর দরজায় পাঠিয়েছি। সময় সময় এই অনুতাপের তীব্র জ্বালা বিদ্যুৎ বিকাশের মত হৃদয়ের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করে দিত। প্রায়ই মনশ্চক্ষুর সামনে দূর প্রবাসী সৈনিকের বিষণ্ণ মুখচ্ছবি ফুটে উঠে চক্ষু জলে ভাসিয়ে দিত; প্রাণটা হায় হায় করে উঠতো।

অন্তরে বেদনার আগুন বয়ে সংসারে মানিয়ে চলা বড় শক্ত।

কিন্তু আবার এও স্বীকার করি, এত দুঃখ, এত যন্ত্রণার মধ্যে যখন মনে পড়তো, একজন আমায় এমন করে ভাল-বাসে, তখন গর্ব্বে ও সুখে অধীর হয়ে উঠতুম। তাঁর গভীর

স্নেহ স্মরণ করে শ্রদ্ধায় মাথা নেমে পড়তো। মানুষের হৃদয়ে সব ভাবই অদ্ভুত!

এই রকম সুখদুঃখের পরস্পর বিরোধী তরঙ্গে পড়ে দীর্ঘ এক বৎসর কেটে গেল।

একদিন হঠাৎ মিসেস বসুর নিকট হতে খবর পেলুম, মিঃ ঘোষ অত্যন্ত আহত হয়ে সেখানকার হাঁসপাতালে আছেন। সেই জন্য মন খারাপ থাকায় তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেন নি। মিঃ ঘোষ একটু সারলেই তিনি তাঁকে যেমন করেই হ'ক আনাবেন। আহত! কিরূপ আহত? সাংঘাতিক নয়তো! ইত্যাদি নানারকম ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়লুম। এতদিন পরে কি ঈশ্বর আমার গর্ব্বের উপযুক্ত প্রতিফল দিলেন? সাহস করে মিসেস বসুর কাছে গিয়ে কোনও খবর নিতে পারলুম না, কিজানি যদি কিছু মন্দ সংবাদ পাই। মিসেস বসু কিন্তু, জানিনা কেন, মিঃ ঘোষের সংবাদটি আমায় পাঠাতে ভুল করতেন না।

তাই প্রায় ৪।৫ সপ্তাহ পরে একদিন একখানা চিঠি পাঠালেন, "সতীশ একটু ভাল আছে বটে, কিন্তু তার বাম হাত খানা এখনো সারেনি। কাল সে এসে পৌছবে।"

কাল! একেবারে এত শীঘ্র! এতটুকু লেখা পড়েই শ্রান্তিতে আমার ঘাম ছুটে গেল।

তার পর ৩।৪ দিন পরেও তাঁর কোন খবর নিতে সাহস হল না। মা একদিন দেখে এসে বললেন, "মিঃ ঘোষ বড় রক্ষা পেয়েছেন, জীবনের আশঙ্কা নেই বটে, তবে হাতখানা এখনো সারেনি। ভদ্রতা হিসাবেও তোমার একবার গিয়ে দেখা করা উচিত শোভা।"

উচিত তো বটে, যেতে যে সাহস হয় না। শেষে একদিন ভদ্রতার তাড়নে কিংবা অন্য কিছুতে কিনা জানি না, অনেক সাহসে বুক বেঁধে মিসেস বসুর বাড়ীর দিকে যাত্রা করলুম। দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন আমার শক্তিও হ্রাস হয়ে আসছে।

কোন মতে অবাধ্য মনকে শান্ত করে তাঁদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লুম, বারান্দায় উঠে দেখি বামদিকে কে একজন পিছন হয়ে একখানা ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন; তাঁর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একখানা হাত চেয়ারের হাতার উপর দেখা গেল।

আমি থমকে গেলুম। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করে পাশ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালুম।

তিনি চকিত হয়ে বলে উঠলেন, "একি!" আমি যথাসাধ্য পরিষ্কার গলায় বললুম, "মিঃ ঘোষ, আপনি বোধহয় এখন ভাল আছেন।" বেশ বুঝতে পারলুম, তিনি তাঁর বিস্ময় দমন করতে করতে চাপা গলায় বললেন, "হাঁ, ভাল আছি বৈকি, বসুন।" আমি বসলুম। কি কথা অতঃপর কওয়া যেতে পারে সেটা ঠিক করতে অগত্যা একটু চুপ করে রইলুম। তিনি এবার বেশ সহজ স্বরেই বললেন, "আপনিও অসুখে পড়েছিলেন নাকি?"

"কৈ, না তো।" "দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে তাই।" আমার কৃশতার উল্লেখ সকলকেই করতে শুনেছি, কথাটা চাপা দিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করলুম, "কি করে আহত হলেন বলুন তো?" তিনি বেশ উৎসাহভরে সে সব গল্প আরম্ভ করলেন। আমাদের দু'জনের আলাপ সহজ হয়ে এলো। গল্প শেষে তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমি সেখানে কেমন যুদ্ধ করছি আপনারা ভাবতেন?" অন্তরের দারিদ্র্য ভার ঢাকার ইচ্ছায় আমি কপট রসিকতা এনে বললুম, "ভাবতুম সিংহনাদে রণস্থল প্রকম্পিত করে অশ্বপৃষ্ঠে মহাবীর প্রতাপসিং লম্ফ ঝম্ফ করে"—

"কে লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করেছে এখানে?" বলতে বলতে হাস্যমুখী মিসেস বসু এসে উপস্থিত হলেন। আমায় দেখে খুব খুসী হয়ে বললেন, "এই যে মিসদত্ত, কি গল্প হচ্ছে আপনাদের?"

"মিঃ ঘোষের বীরত্ব বর্ণনা করছি আমি।" ক্রমে সেখানে নানা গল্পের অবতারণায় হল।

মিঃ ঘোষের পাণ্ডুবর্ণ রুগ্নমুখের ক্লান্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে বেশ আনন্দজ্যোতি ফুটে উঠছিল। মিসেস বসু সন্তুষ্ট চিত্তে বললেন, "আজ তুমি ভালই আছ সতীশ, নয়?

ফেরবার সময় মিসেস বসু বললেন, "মধ্যে মধ্যে আসবেন মিস দত্ত।" আমি হেসে বললুম, "হাঁ আসব বৈ কি, যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক বর্ণনাই যে বাকি।"

মিঃ ঘোষ মৃদু হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "রুগ্ন সৈনিককে আক্রমণ করা উচিত নয় মিসদত্ত।" অকস্মাৎ তাঁর দিদিটি বোকামি করে বলে ফেললেন, "কিন্তু এই আক্র

মণই যে সৈনিকের ওষুধ বলে মনে হয়।' আমি মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে পালিয়ে এলুম।

(৭)

আবার যাওয়ার অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা সত্বেও মিসেস বসুর সে পরিহাসের কথা মনে প'ড়ে লজ্জায় আর তাঁর বাড়ী যেতে পারলুম না।

কয়েক দিন পরে যেন আমার মনের গোপন বাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তেই একখানা চিঠি পেলুম। "সতীশ সেরেছে; সেই জন্য একটু খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছি, আজ সন্ধ্যায় নিশ্চয় আসবেন।"

নির্লজ্জভাবেই স্বীকার কর্‌ছি যে, চিঠিখানা পেয়ে খুব আনন্দিত হয়ে উঠ্‌লুম।

সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সুসজ্জিত হ'য়ে মিসেস বসুর বাড়ী হাজির হলুম

তিনি সাদর অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌লেন, "মিস দত্ত, গানের ভার আপনার।" অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে বল্‌লেন,"আপনার গান সবাই পছন্দ করেন যে, দয়া ক'রে গাইতে হবে।" তার পর পাছে দয়া প্রকাশে কৃপণতা হয়, তাই যেন উত্তরের অপেক্ষা না রেখে সত্বর প্রস্থান করলেন।

মিঃ ঘোষ তখন বন্ধুবর্গের মধ্যে ব'সে যুদ্ধস্থানের গল্প আরম্ভ করেছেন। আমায় দেখে উঠে এসে মৃদুস্বরে বল্‌লেন, "মিস দত্ত, আপনি যে আমার বীরত্ব বর্ণনায় সিদ্ধমুখ, সেটা কি এঁদের জানিয়ে দেব?" "না, আজ আপনাকে কিছুতেই আত্মপ্রশংসা শুন্‌তে দেব না।" "তবে হয় তো আর আমার আত্মপ্রশংসা শোনা হবে না।" তাঁর রহস্য-পূর্ণ কণ্ঠে করুণ সুর বেজে উঠ্‌ল। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?" "আমি দুই একদিন পরেই একবার রেঙ্গুনে যাচ্ছি, সেখানকার কারবারটা দেখা হয়নি অনেক দিন।"

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম। বুকে একটা গভীর ব্যথা বেজে উঠ্‌ল; এখনি এত শীঘ্র চ'লে যাবেন!

আমার সমস্ত প্রফুল্লতায় অকস্মাৎ পক্ষাঘাত ধ'রে গেল। তিনি তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার মুখে ফেলে যেন কিসের অনুসন্ধান করছিলেন।

আমি ত্বরিতে সেখান থেকে চলে গেলুম।

রাত্রে অনেকক্ষণ গানবাজনায় পরিশ্রান্ত হ'য়ে মিসেস বসুর ছোট কুঠুরীর মধ্যে বিশ্রাম কর্ত্তে ঢুকে দেখি মিঃ ঘোষ একখানা চেয়ারে বসে সামনের টেবিলটার উপর মাথা রেখে নিঃস্পন্দভাবে আছেন। আমি থম্‌কে দাঁড়ালুম, একি নিদ্রা না আর কিছু? বোধহয় আমার শাড়ীর খস্ খস্ শব্দে তিনি মুখতুলে আমায় দেখে চম্‌কে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন। আমি বিষম লজ্জায় ফিরে আস্‌ছি, তিনি ব্যগ্রভাবে বলে উঠ্‌লেন, "বসুন, বসুন মিস দত্ত!" বিস্মিত হয়ে ফিরে দেখ্‌লুম, তাঁর দীর্ঘ কালো পক্ষ্মে অশ্রু বিজড়িত রয়েছে! একি তবে আমারই জন্য? আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল। নীরবে একখানা চেয়ারে বসে পড়্‌লুম। তিনি কিন্তু চলে গেলেন না। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লেন, "আজও একবার ক্ষমা চেয়ে আপনাকে সেই কথাই বল্‌ব মিস দত্ত!"

সে কণ্ঠস্বরে কতখানি মিনতি ভরা তা বোঝাবার ভাষা আমার নাই। কি নিষ্ঠুর আমি, এই প্রেমময় বুকে শেলাঘাত কর্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই নি! আমার দুই চোখ ভ'রে জল এলো; তাঁকে যে দীর্ঘ এক বৎসর ধ'রে কতখানি ভাল বেসেছি, আজ তা আমার নিজের কাছে প্রকাশ হয়ে গেল।

তিনি মৃদুকণ্ঠে বস্‌লেন, "বুঝেছি, এবার তুমি আমায় ফেরাতে পার্‌বে না।" কি গভীর বিশ্বাস! অশ্রুতে আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেল। তিনি ন হয়ে এবার আমার হাতখানা তাঁর ঘর্ম্মাক্ত কম্পিত হাতের মধ্যে নিয়ে বল্‌লেন, "আমার কথার উত্তর দাও শোভা।" তাঁর মুখে আমার নামটা এত মিষ্ট শুন্‌লুম, মনে হ'ল ওনাম আমার নয়।

আমি অশ্রু-অন্ধ দুই চোখের ঝাপ্সা দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "কত কষ্ট দিয়েছি, বল আগে ক্ষমা করলে!"

"ক্ষমা তো করতে পার্‌ব না আমি, শাস্তি দেব।" পরক্ষণেই তাঁর প্রসারিত বাহু দুটির মধ্যে পিষ্ট হয়ে গেলুম, আমার কাণের কাছে তখনও মৃদুস্বরে বাজছিল, "তোমার পাবার জন্যে জগতের কোনও দুঃখ কষ্টকে আমি গ্রাহ্য করি না।" আমি বুঝি তখন চৈতন্য হারিয়েছিলুম।

কতক্ষণ পরে জানি না তিনি আমায় অল্প নাড়া দিয়ে বল্‌লেন, "চল, দিদিকে প্রণাম ক'রে আসি।"

মিসেস বসুকে দু'জনে প্রণাম করতেই তিনি স্নেহ-সজল কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, "এ আমি জানতুম।"

সুনীতি শোভাকে এক ঠেলা দিয়া হাঁকিয়া বলিল,

"সাবাস!" তার চোখে কিন্তু দুই বিন্দু অশ্রু টল্ টল্ করিতেছিল।

শ্রীপ্রতিভা দেবী।

সে নয়

সেই কাঁকণের কন্‌কনানি
চিনি আমি চিনি
এতো সে নয়! এতো সে নয়!

বাতাস তখন চল্‌তো না
আকাশ নয়ন মেল্‌তো
ফুলের কুঁড়ির দল গুলি যে
নিজে নিজেই খুল্‌তো
এতো সে নয়! এতো সে নয়!

কোকিল তখন ডাক্‌তো না
ডাকার নিয়ম ভুল্‌তো
ধরার বুকের গোপন কথা
নীরবতায় ফুট্‌তো
এতো সে নয়! এতো সে নয়!

রূপালি নাচ্ নাচ্‌তো না
নদীর জলের নীলায়
আপনি চাঁদা থাক্‌তো চেয়ে
দেখে আপন ছায়ায়
এতো সে নয়! এতো সে নয়!

সেই কাঁকণের কন্‌কনানি
শুনি আমি শুনি
এতো সে নয়! এতো সে নয়!

রক্ত আমার রণ্‌রণিয়ে
উঠ্‌ছে বেজে সেই তালে
হিয়ায় আমার গুন্ গুনিয়ে
বাজ্‌ছে যে তা সবকালে
এতো সে নয়! এতো সে নয়!

সেই আকাশের তলে গো আর
সেই নদীটির ধারে
তেমন করে' বাজ্‌লে কাঁকণ
বাজতো হিয়ার তাঁরে
এতো সে নয়! এতো সে নয়!

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

খেয়াল

১। সন্ন্যাসী।

আমার সঙ্গে এক সন্ন্যাসীর পরিচয় ছিল। ভারী নাম সে সন্ন্যাসীর—খুব বড় তপস্বী তিনি। ভগবানের নাম গান করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত; আর যখন তিনি নাম গান করতেন, তখন তাঁর সমস্ত বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেত——তিনি কাঠের মত শক্ত হয়ে যেতেন——চারদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া, রৌদ্র বাতাস কিছুতেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাক্‌ত না। তিনি মনের আনন্দে সব ভুলে নামামৃত পান করতেন।

আমি বুঝেছিলাম তাঁর মাহাত্ম্য——সময়ে সময়ে তাঁর মাহাত্ম্যের জন্য মনে মনে হিংসাও হতো। আমি তাঁকে বুঝেছি, তিনি কেন আমাকে বুঝতে চান না বা পারেন না? আমার বড় সাধ তিনি আমাকে বুঝুন; আমার যেন কোনও দোষ বা নিন্দা না করেন কোথাও; তাঁর সঙ্গে আমার হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হোক।

তিনি আমিত্বকে জয় করতে পেরেছেন—আমিও মনে হয় পেরেছি জয় করতে আমার আমিত্বটাকে। অবশ্য আমার আমিত্বের দিক থেকে চাই না তাঁর হৃদয়ে অধিকার স্থাপন করতে। তাঁর আমিত্ব তাঁর কাছে যেমন, আমার আমিত্ব আমার কাছে তার চেয়ে বেশী দুর্ব্বহ ও অপ্রিয় হতে পারে। তিনি সেই অমৃতেরই সন্ধান পেয়েছেন যা পান করে তিনি আমিত্বটাকে ভুলতে পেরেছেন—কিন্তু আমিও তো ভুলতে পারি যদিও সব সময় ঠিক রাখতে পারি না।

তিনি মিথ্যা বলেন না——আমিও কখনও মিথ্যা বলি না। তবে আমারও তাঁতে তফাৎ কোথায় বল দিকিন।

২। সমুদ্রের উপরে।

(টুর্গেনিভ হইতে)

আমি হামবার্গ থেকে লণ্ডনে যাচ্ছিলাম—ছোট জাহাজখানি। আমরা দুজন মাত্র যাত্রী——আমি আর একটী বানরী। হামবর্গের এক ব্যবসায়ী তাঁর জনৈক ইংরাজ অংশীদারের নিকট উপহার স্বরূপ সেটি পাঠাচ্ছেন।

ডেকের ওপর একখানা আসনের পায়ের সঙ্গে শিকল দিয়া বানরীটি বাধা। সারাক্ষণ কেবল সে অস্থিরতা দেখাচ্ছে ও মাঝে মাঝে মরণ সুরে ডাকৃছে।

যখনই আমি তার পাশ দিয়া যাই সে তার কাল ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে ন্যায় ও করুণ ভাবে প্রায় ঠিক মানুষের মতই আমার দিকে তাকায়। আমি তার হাতখানা ধরে মাঝে মাঝে তার কাছে বসামাত্রই চেঁচানি ও ছটফটানি তার বন্ধ হয়ে যায়।

একটা গভীর নিস্তব্ধতা। অশান্ত সমুদ্র স্থির, শান্ত, নিশ্চল। চারদিকে ঘন কুয়াসায় সব ঢেকে গিয়েছে——সমুদ্রটাকে ছোট স্বল্পপরিসর মনে হচ্ছে। একঘেয়ে দৃশ্যে চোখ দুটো শ্রান্ত করে তুলেছে। সূর্য্যের আলো ঘন কুয়াসার মধ্যে পড়ে মলিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্যের আলো বেশ উজ্জ্বল দেখা গেল—চারিদিক তাঁর কিরণ মেখে যেন হেসে উঠ্‌ল।

জাহাজের গলুই থেকে আরম্ভ করে চলেছে সূর্য্যের রশ্মি অনন্তের সন্ধানে, রেশমের ভাঁজের মত ভাঁজ ফেলে কোথাও উঁচু হয়ে কোথায়ও নীচু হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে। জাহাজের জলকাটা চাকার আবর্ত্তনে সমুদ্রের জল আলোড়িত হয়ে উঠেছে—সাদা ফেণপুঞ্জ জলের ঢেউএর ওপর নেচে বেড়াচ্ছে—জলের ঢেউগুলো দোলার মত দোল খেয়ে আঁকা-বাঁকা পথে কুয়াসার মধ্যে নিজেদের কোথায় হারিয়ে ফেল্‌ছে।

বানরীটার ঘ্যানঘ্যানানীর মত জাহাজের পেছন থেকে ছোট ঘণ্টাটির আওয়াজ বারবার শোনা যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে এক একটা কুমীর জলে ভেসে উঠে পাক খেয়ে অনন্ত বারিধিতে ডুবে যাচ্ছে।

আর জাহাজের কাপ্তেনটি সূর্য্যপক্ক মুখখানা পেঁচার মত করে একটা ছোট পাইপ টান্‌ছেন ও মাঝে মাঝে মহা বিরক্তি ভরে নিশ্চল সমুদ্রের জলে থুথু ফেল্‌ছেন। আমি কাপ্তেনকে সমুদ্রসম্বন্ধে নানাকথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। এমন অসভ্যভাবে তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন যে আর অধিক প্রশ্ন করা যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করে বানরীটার কাছে ফিরে এলাম।

আমি তার কাছে বসা মাত্র সে ঘ্যানঘ্যানানী ও লাফালাফি বন্ধ করে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

ঘন কুয়াসার জন্য ঠাণ্ডা বোধ হ'চ্ছিল, কেমন শরীরটা জড় জড় বোধ হ'চ্ছিল ও স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি ও বানরী পাশাপাশি বসে ছিলাম।

এ সব মনে পড়ে এখনও আমার হাসি আস্‌ছে, কিন্তু তখন আমার মনের অবস্থা ছিল অন্যরূপ।

আমরা একই মাতার সন্তান—একই বংশে জন্ম——আমার মনে বেশ একটা তৃপ্তি বোধ হতো—ভ্রাতার কাছে ভগিনী যেমন আনন্দ পায় বানরীটিও সেইরূপ আমার সঙ্গসুখে আনন্দ বোধ করতো।

৩। কি সুন্দর কি তাজা গোলাপ ফুলগুলি।

(টুর্গেনিভ হইতে)

অনেক দিন পূর্ব্বে কোথায় যেন একটী কবিতা পড়েছিলাম। তখন তেমন সেটা মনে ছিল না——কেবল প্রথম সারিটীর কথাই আমার মনে বেশ গেঁথে গিয়েছিল!——'কি সুন্দর কি তাজা গোলাপ ফুলগুলি!'

এখন শীত—জানালাগুলোয় পর্য্যন্ত বরফ জমে শক্ত হয়ে উঠেছে। ঘরে একটা মোমবাতীর আলো কোনও রকমে অন্ধকার দূর করছে। এক কোণে আব্যবস্থিতভাবে বসে আছি আর মনের মধ্যে কেবলই বেজে উঠ্‌ছে কবিতার সেই প্রথম সারি—

'কি সুন্দর, কি তাজা গোলাপফুলগুলি!'

আমার মনে হচ্ছিল এক বাগানবাড়ীর নীচু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা ধীরে ধীরে রাত্রির কোলে ঘুমিয়ে পড়্‌ছিল——গরম বাতাস মিনিয়নেট ও লাইমব্লসমের গন্ধে মাতাল হয়ে বয়ে যাচ্ছিল। আর জানালার উপর দেহভার রক্ষা করে, হাতের উপর মাথা রেখে একটী রমণী সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখ্‌ছিল; মনে হচ্ছিল এক একটা নতুন নতুন তারা উঠ্‌ছে তাই দেখবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কি সারল্য তার মুখে মাখান! স্বপ্নবিভোর অক্ষিপল্লবে কি অনির্ব্বচনীয় দীপ্তি! জিজ্ঞাসু ওষ্ঠাধর কি নির্ম্মল! অক্ষুব্ধহৃদয়ে কি শান্তি কি তারুণ্য! কি পবিত্রতার মুখের ভাব। তার সঙ্গে কথা কইবার সাহস আমার নাই——কিন্তু সে আমার প্রিয়, অতি প্রিয়—তাকে দেখ্‌লে আমার মনে কি চাঞ্চল্যই না উপস্থিত হয়!

'কি সুন্দর, কি তাজা গোলাপফুলগুলি!'

ঘরে অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে আসছিল। মোমবাতীটির ক্ষীণ আলোক বাতাসে নাচ্ছিল আর দেওয়ালে আলো ও ছায়া খেলা কচ্ছিল। বাইরে বরফ পড়ার ঠক ঠক্ শব্দ ভেসে আসছিল, আমার মনে—বার্দ্ধক্যপীড়িত মনে কেবল সেই কথাই আসছিল।

"কি সুন্দর, কি তাজা গোলাপফুলগুলি!"

আবও কত চিত্র আমার মনে আস্‌ছিল। গাঁয়ের সেই আনন্দপূর্ণ গতজীবনের কথা। দুইটি মাথা লম্বা লম্বা সোণার বরণ চুলে ছাওয়া——তাদের উজ্জ্বল চোখ দিয়া বেয়াদপেরা আমার দিকে তাকাচ্ছে. চাপা কৌতুকের হাসিতে তাদের লাল গণ্ড কেঁপে উঠ্‌ছে, গভীর প্রেমে দুহাত জোর করা, তরুণ বয়সের প্রাণ খোলা কথা, একজন আর একজনের কথাকে ছাপিয়ে যেতে চেষ্টা কর্‌ছে, আর দূরে—একটু দূরে উষ্ণগৃহে অপটু তরুণ চম্পক-অঙ্গুলির স্পর্শে পিয়ানোটী বেজে উঠ্‌ছে, বাড়ীতে কি আনন্দের তুফান ঢেউ খেলে যাচ্ছে! আবার মনে আসছে—

"কি সুন্দর, কি তাজা গোলাপফুলগুলি!"

বাতীটা খানিকটা কেঁপে নিবে গ্যাল। কে কাস্‌ছে অমন বিশ্রী ভাবে? ওঃ আমার বৃদ্ধ বয়সের সাথী—বহুদিনের সঙ্গী বৃদ্ধ কুকুরটা——পায়ের কাছে পড়ে সে কাঁপছে——শীতে ঠক্ ঠক করে কাঁপছিল, জমে যাবার যোগাড়!——সবাই আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—মৃত্যুর আকর্ষণে——তাই ভাবছি।

'কি সুন্দর, কি তাজা গোলাপফুলগুলি!'

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

কাঞ্চী বা কর্ণফুলী

পুণ্যতোয়া কাঞ্চী অয়ি! অয়ি চট্টলার
স্নেহ-প্রবাহিনী!
যুগান্তের পূত স্মৃতি সারা বক্ষে লয়ে নিতি
তুলিতেছ অনুক্ষণ কি মহা রাগিণী!
আত্মভোলা মহেশ্বর সে কবে হায়,
দক্ষ-যজ্ঞালয়ে,
জীবন-তোষিণী প্রিয়া সতী-ব্রতে বিসর্জ্জিয়া
সংহার মূর্ত্তির বেশে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে,
প্রচণ্ড ঝঙ্কার সম মথিয়া ভুবন
তাণ্ডব-চরণে,
কিবা অপার্থিব-স্নেহে মৃতা দাক্ষায়িণী-দেহে
রক্ষিলেন স্কন্ধোপরে সযতনে যতনে!
প্রেমের প্রকট রূপ উদ্ভাসি ত্রিলোক
হ'ল দীপ্যমান,—
পুণ্যতোয়া কাঞ্চী অয়ি! আপনা বিস্মৃতা হই'
করেছিলে তুমি বুঝি ত্রিশূলীর ধ্যান!
চক্রী নারায়ণ-চক্রে তাই যবে দেবী,
একান্ত ধারায়,
সতীর নির্ম্মল কায় উদ্ধারিতে বসুধায়
অজ্ঞাতে পড়িল খসি' পূর্ণ শশী প্রায়!
সতী-দেহ-স্পর্শ-পূত চারু কর্ণপুর
হৃদয়ে তোমার,
তখনি কেমন করে অলক্ষ্যে পড়িল ঝরে
ধ্রুব আশীর্ব্বাদ হেন বিশ্ব-দেবতার!
পুলক-তরঙ্গ বক্ষে উঠিল নাচিয়া
অপূর্ব্ব মধুর—
বিচিত্র সঙ্গীত তানে অগ্রসিলে সিন্ধু পানে
উদ্দেশে বন্দিয়া বুঝি দেব চন্দ্রচূড়!
অয়ি দিব্যা স্রোতস্বতি! সেই শুভক্ষণে
জাহ্নবী প্রতিমা জ্ঞানে বরিলেন তোমা প্রাণে
গাহিলেন অবগাহি' গায়ত্রী মোহন!
অয়ি কাঞ্চি! কর্ণফুলি! সেই দিবসের
সে গীতি-লহর,
আজো বুঝি চিত্তে তব জাগে সদা অভিনব
বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে প্লাবি' চরাচর!
তাই তব শ্যাম-তটে দীর্ঘ নিশিদিন
একাকী বসিয়া,
ক্ষীণ-প্রতিধ্বনি তার চাহি শুধু বার বার
মরম-বীণার তারে তুলিতে ধ্বনিয়া!
ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে তব স্বচ্ছ নীরে
যুগে যুগে কত,
চারি মহাধর্ম্মাশ্রিত ভক্ত কবি অগণিত
সাধিলেন সুবিমল পারত্রিক-ব্রত!
তাঁহাদের পুণ্যশ্বাস, পূত পদধূলি,
সমীরে সৈকতে,
আজো বুঝি হর্ষ ভরে অলক্ষিতে খেলা করে
বিতরি' কল্যাণ-শান্তি মুমুক্ষু জগতে!

মুগ্ধ চিত্তে ভাবি সদা কি সুধা প্রবাহ
এনেছ বাহিয়া,—
তোমার যুগল তীরে স্নিগ্ধ ছায়া আছে ঘিরে
বিটপী-বল্লরী-অঙ্কে সুখে ঘুমাইয়া!
ডাহুক কুরর শ্যামা তুলিতেছে তান
তব নৃত্য-তালে,—
কোথা গোচারণ কালে সুরের সুষমা ঢালে
রাখালরাজের বাঁশী বাজায় রাখালে!
প্রসারিত শস্যক্ষেতে উড়িছে কোথায়
অঞ্চল রমার,—
পল্লী বধূ, পল্লী বালা, করে কোথা বিশ্ব আলা
রচিয়া নিভৃত কুঞ্জ মায়া-মমতার!

পার্ব্বতী মাতার তুমি স্নেহ দ্রবময়ী
অয়ি কর্ণফুলি!
সাধ যায় তব তটে হেরি অনন্তের পটে
প্রাণের দেবতা কোথা আছে দীনে ভুলি'!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

চারিটী প্রশ্ন ও তাহাদের সমাধানে স্বভাব শিক্ষা

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় সহসা এক ভীষণা রাক্ষসী আসিয়া প্রশ্ন করিল—

১। এখন আছে পরে থাকিবে।

২। এখন আছে পরে নাই।

৩। এখন নাই পরে হবে।

৪। এখনও নাই পরেও নাই।

চারিটী দৃষ্টান্ত সহ উক্ত চারি অবস্থার সমর্থন না করিতে পারিলে আমি সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিব। রাক্ষসীর এই কথা শুনিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত ও বিশুষ্কতালু হইল। পণ্ডিত কালিদাস সাত দিনের সময় লইলেন এবং তিন দিন পরে আসিয়া আমার সঙ্গে চারি দিন বিদেশ ভ্রমণ করিতে হইবে বলিয়া রাক্ষসীকে বিদায় দিলেন। তিন দিন গত হইলে, রাক্ষসী আসিল। তখন কালিদাস ছদ্মবেশে এবং রাক্ষসীকে মানুষ আকার ধারণ করিতে বলিয়া এক সঙ্গে বহির্গত হইলেন।

প্রথম দিন এক ধনীর গৃহে উপস্থিত হইয়া কালিদাস ধনীকে কহিলেন,—"মহাশয়, আমরা অতিথি।" ধনী মহাসমাদরে সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন ও পাদ্য দিলেন। তখন কালিদাস কহিলেন,—মহাশয়, অগ্রে বলুন, আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিবেন, তবে আসন গ্রহণ করি। প্রার্থনা এমন গুরুতর নহে। ধনী কহিলেন,—"মহাশয়গণ, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দীনের কুটীরে আগমন করিলেন, তবে আদেশ করুন কি করিতে হইবে, আমার সাধ্য হইলে অবশ্য তাহা সম্পাদন করিব। কালিদাস কহিলেন,—অন্য কিছু নয়—ধর্ম্মকর্ম্ম। তার জন্য অগ্রে কিছু অপমান স্বীকার করিতে হইবে, পরে একটা জলাভাব স্থানে একটা পুষ্করিণী খনন কারণ কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। ধনী প্রফুল্ল মুখে কহিলেন,—মহাশয় এত অতি উত্তম কার্য্য! ইহার নিমিত্ত যাহা কিছু সাহায্য করিব, সে ত আমার অর্থের সার্থকতা! সে আমার পরম সৌভাগ্য। তবে আমি বেশী দিতে পারিব না, পঞ্চাশটী টাকা মাত্র দিব। অপমানের কথা কি বলিলেন, তাহা বুঝিলাম না—আজ্ঞা করুন।

কালিদাস কহিলেন,—সে আর বেশী কিছু নয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না! আপনার প্রত্যেক গণ্ডে দুই দুই করিয়া চপেটাঘাত করিব। তখন ধনীত অবাক। এ কিরে বাপ! দিব বলিয়াও ত বিষম বিপাকে পড়িলাম। না দিলে প্রতিভঙ্গ জন্য নিরয়গামী হইতে হইবে। নতুবা এ প্রকার উৎপীড়ন কে সহ্য করিতে পারে? অতিথি বিমুখ হইলেও ঘোর অনর্থের বিষয়। করিই বা কি? তবে একটী কথা, ধর্ম্মার্থে কষ্ট সহ্য করিতে হয়। ধর্ম্ম ত হইবে। এই স্থির করিয়া ধনী কহিলেন, মহাশয়গণ আপনাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। অর্থ লউন এবং চপেটাঘাত করুন। তাহার পর অতিথি দুই জনে আহারান্তে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে ধনী মহাশয় কহিলেন,—কেন আপনারা আমার স্বীকৃত অর্থ গ্রহণ করিলেন না বা চপেটাঘাত করিলেন না। কালিদাস কহিলেন,—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার দানকার্য্যও সম্পন্ন হইয়াছে; এক্ষণে আমরা আসি।

বাহিরে আসিয়া কালিদাস কহিলেন, দেখ রক্ষ, এই যে ধনী, ইহার 'এখন আছে পরে থাকিবে।'

দ্বিতীয় দিন কালিদাস ও রাক্ষস অন্য বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক অপর স্থানের অন্য এক ধনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন,—হে ধনীন্, আমরা অতিথি। সে ধনীত ধনী! ধনী অথচ যুবক! রংএর গোলাম! কে তার কাছে টিকে? সকলেকেই সে চাপা দিতে চায়। বারংবার সম্বোধন করার পর কহিল,—কি তোমরা বলিতে চাও? কালিদাস কহিলেন,—মহারাজ, আর কিছুই নয়, একটা লোকহিতকর কার্য্যের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতে এসেছি। কোন ধর্ম্মের অংশ দিতে এসেছি। কিছু অর্থ দান করিতে হইবে। ধনী যুবক সরোষে কহিলেন,—'কি তোমরা পুনঃ পুনঃ এক কথায় বিরক্ত কর,'—আমার বাবার বিষয়, আমারই কুলায় না, তোমাকে দিতে গেলাম কেন হে! তোমাদের যদি ধর্ম্মে এত টান তবে খেটে, কি বুদ্ধি খাটিয়ে পয়সা রোজগার ক'রে সবটা দাওগে না কেন? পরকে এজন্য কষ্ট দেওয়া কেন? আমার কি নিজেদের কার্য্য নাই? এই দেখ সেদিন, আমার একমাত্র পুত্রের—হ'ল না—

হ'ল না, ক'রে পুত্রের অন্নপ্রাশনে অনেকগুলি টাকার মন্ত লাগিল; পাঁচজন ইয়ার বন্ধু আছে—পাঁচ জায়গায় আমার পসার প্রতিপত্তি আছে—মানসম্ভ্রম রক্ষা চাই ত! তোমাদের ধর্ম্মের ভাগ দিতে আমি তোমাদিগকে ডাকিতে চাই না; আমি এখন নিজের ধর্ম্মই রক্ষা করিয়া উঠিতে পারি না। আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা! স্পষ্ট কাজ! এই সেদিন আমার পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন এক ব্রাহ্মণ-পুত্র একখানা লুচি অপচয় করেছিল ব'লে তাকে তথা হ'তে দূর ক'রে দিয়াছিলাম। আমি কিছু অপচয় সহ্য করিতে পারি না। তোমাদের ও কথা আমি শুনি না! ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রছ—তোমরাই ধর্ম্ম করগে।

তাঁরা উভয়ে বাটীর বাহির হইলেন। পরে কালিদাস রাক্ষসীকে কহিলেন, দেখ এই যে ধনী, ইহার 'এখন আছে, পরে নাই'।

তৃতীয় দিন উভয়ে একব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত। সে সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া নিজের দিনপাতের যোগ্য কিছু চাউল সংগ্রহ করিয়া এইমাত্র ঘরে উপস্থিত হইয়াছে। অতিথির আগমন দেখিয়া সে দীনব্যক্তি অতি ব্যস্ত হইয়া বসিতে দুইখণ্ড ছিন্ন আসন ও পাদধৌতের জন্য দুইটী ভাণ্ডে জল দিলেন। তখন পণ্ডিত কালিদাস কহিলেন, এই বৃহৎ নগর মধ্যে কোনস্থানে একটু-স্থান না পাইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। কিছু আহার্য্য পাইব ত? ও কি?' ঐ তোমার পোঁটলাতে কি আছে? দরিদ্র কহিল, ও আমার ভিক্ষার ঝুলি, আজ ভিক্ষা করিয়া ঐ চাউলগুলি পাইয়াছি; কালিদাস কহিলেন,—'উহাতে যদি হয় দুজনের, তিনজনের হইবে না ত! দরিদ্র কহিল, তবে না হয় আমি খাইব না। কালিদাস কহিলেন, তবে আমাদের খাওয়া হইয়াছে। তারপর তিনজনেই সে চাউলে আহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন।

বাহিরে আসিয়া কালিদাস রাক্ষসীকে কহিলেন,—দেখ, এই যে ব্যক্তি, ইহার 'এখন নাই, পরে হইবে'।

চতুর্থ দিন রাক্ষস ও পণ্ডিত কালিদাস, উভয়ে অনুরূপ বেশ ভূষা ধারণ করিয়া অপর একব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহার চারিদিকে দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় (ধনীদের বেশধারী) তাহাকে একশত টাকা দান করিলেন। পরে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজে ও মানববেশধারী রাক্ষসী, দুইজনে অতি দীনহীনের বেশ ধরিয়া গিয়া তাহাকে কালিদাস কহিলেন,—'আমরা দুজনে আজ তিনদিন উপবাসী; ব্রত নিয়মে নয়, অন্নাভাবে উপবাসী, বাস্তবিক গঙ্গাজল বই তিনদিন আজ আমাদের উদরে কিছু যায়নি! তাই কিছু ভিক্ষা চাই। আমাদের জঠরজ্বালা নিবারণ করিয়া দুই জীবকে রক্ষা কর।

তখন সে দরিদ্র কহিল, একি জ্বালা! আমি কোথায় কি পাব? আমাকে কেউ কখন কিছু দেয় না। আমি দিতে পাব কোথা? কেউ কি দিয়ে দেখেছ? গচ্ছিত ধন তোমার আমার কাছে আছে? আমি খাবার কোথায় পাব!

কালিদাস কহিলেন, বেশী না হয়, চারিটা পয়সা দিলেও চলিবে। দরিদ্র তখন আরও রুক্ষবাক্যে কহিল—'তোমাদের ভিক্ষা করিতে লজ্জা হয় না? আমি কোথায় পাব? আমার এক পয়সা নাই।'

কালিদাস ও রাক্ষস তখন উভয়ে তাহার বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কালিদাস কহিলেন দেখ, এই যে ব্যক্তি, ইহার 'এখনো নাই, পরেও নাই'। রাক্ষস যথাযথ উত্তর পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাই বলি স্বভাবেই জগৎ সাধ্য, আবার স্বভাব দোষেই সহজে সকল হ'তে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

(প্রসূন)

শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল।

বসন্তের আগমনে

বসন্ত এসেছে ওগো বসন্ত এসেছে বনে
জানি আমি সব জানি,
বসন্তের ধীর স্রোত বহে যে আমার মনে
অতুল পুলক আনি।
ছুটিয়া এসেছে উজ্জল আলোক ধারা
সমীরের স্রোত এসেছে যে পথহারা
সহসা এসেছে কোকিল কূজন
বিরহীর বুকে গভীর বেদন——হানি।
বসন্ত এসেছে ওগো বসন্ত এসেছে বনে
জানি আমি সব জানি।

মধুর-সুরভি-স্নিগ্ধ এসেছে কুসুম চয়
সকল কানন মাঝে
মুখর বিহগ কণ্ঠে কুঞ্জ ভবন ময়
কল সঙ্গীত বাজে।
মুক্তি ছড়ায় দখিন হাওয়ার বেগ
উল্লাস আনে চঞ্চল কাল মেঘ
শান্তি বিতরে প্রকৃতির হাস
তৃপ্তি জাগায়ে সুনীল আকাশ——রাজে।
সবুজ পত্র পল্লবে মলয় পবন সনে
করে কত কাণাকাণি,
বসন্ত এসেছে ওগো বসন্ত এসেছে বনে
জানি আমি সব জানি।

শ্রীসচ্চিদানন্দ সেন গুপ্ত

মুসলমান স্পেন

মুর সভ্যতা

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা স্পেনে মুসলমান সভ্যতা ও ইউরোপের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। স্পেনে মুর সভ্যতা প্রধানতঃ কর্ডোভা ও গ্রাণাডা, এই দুইটি রাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কর্ডোভার বহু সুলতান জ্ঞানের বিস্তারে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। কয়েকজন সুলতান জ্ঞানানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কর্ডোভার ধ্বংশের উপরে যে সকল খণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও শিক্ষা বিজ্ঞানের যথেষ্ট সমাদর ছিল। গ্রাণাডা স্পেনে মুসলমানদিগের শেষ স্বাধীন রাজ্য। প্রবল খৃষ্টান শক্তির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বহু পণ্ডিতবর্গ গ্রাণাডায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি ইসলামের অমূল্যরত্নের মধ্যে পরিগণিত।

স্পেনে যখন মুরগণ এক অপূর্ব্ব সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছিল তখন ইউরোপের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। রোমীয় সভ্যতার ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে জ্ঞানের প্রদীপ কয়েক শতাব্দীর জন্য একেবারে নির্ব্বাপিত হয়। বহু দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর জাতি দুর্ব্বল রোমসাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন করিয়া বহু খণ্ড-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহাদিতে এই সব রাজ্য সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিত। এই সকল বর্ব্বর জাতির রাজত্ব কালে ইউরোপে যে ধ্বংসের লীলা চলিয়াছিল তাহার ফলে ইউরোপ হইতে রোমীয় সভ্যতার প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইল। ইহাই হইতেছে ইউরোপের আঁধার যুগ (Dark Ages)। ইউরোপ যখন এইরূপ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যতার লীলাভূমি বর্ব্বর জাতির আবাসভূমি ছিল, যখন কনষ্টান্টিনোপলে রোমীয় সভ্যতার আলোক প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়া আসিয়াছিল তখন স্পেনে মুর সভ্যতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। একজন ঐতিহাসিক কর্ডোভার সভ্যতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "...when all Europe was plunged in barbaric ignorance and strife, Cordova alone held the torch of learning and civilisation

bright and shining before the western world." মুর সভ্যতার আলোকরশ্মি ইউরোপকে আবার বাঁচাইয়া তুলিল।

(১) কর্ডোভা ও গ্রাণাডা—স্থাপত্য ও সুকুমার শিল্প

বৃক্ষ যেমন বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া উঠে, তেমনি একটি নূতন জাতিরও যতই বৎসর চলিয়া যায়, ততই জাতীয় জীবনের নানা অঙ্গের সম্প্রসারণ হয়। মহম্মদের মৃত্যুর পর ইস্‌লাম সাম্রাজ্যও ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সাম্রাজ্য ও ধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামের জাতীয়ত্ববোধ আরও দৃঢ় ও পরিস্ফুট হইল। ইহারই ফলে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে,—কি স্থাপত্য, কি সাহিত্য দর্শন গণিত কি সুকুমার শিল্পকলা—সকল দিকেই উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ইস্‌লাম অধিকৃত সকল দেশেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্পেনে মুরগণ প্রায় ৮০০ শত বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। এই কালের মধ্যে স্পেনে মুর সভ্যতা যে কতদূর বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয় আমরা আরব ঐতিহাসিকদিগের বিবরণ হইতে জানিতে পারি। প্রথমে স্থাপত্য ও সুকুমার শিল্পের কথা বলিব। আরব ঐতিহাসিকগণ কর্ডোভা ও গ্রাণাডা নগরদ্বয়ের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইতে হয়। এখন পর্য্যন্তও এই দুই নগরে যে ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

একজন আরব লেখক কর্ডোভাকে 'এণ্ডালুসিয়া রাণী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ এক বাইজান্টিয়াম্ (কনষ্টান্টিনোপল) ব্যতীত তৎকালে ইউরোপে সৌন্দর্য্য ও শিক্ষাবিজ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ নগর কর্ডোভার ন্যায় আর ছিল না।

কর্ডোভা নগর এক বিরাট প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। রাস্তাঘাটগুলি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার ছিল। গোয়াদেলকুইভার নদীর তীরে এই নগর অবস্থিত ছিল। নদীর দুই তীর সুরম্য প্রাসাদে সুসজ্জিত ছিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিরাট হর্ম্ম্যরাজি নগরের শোভা বর্দ্ধন করিত। সুলতান প্রথম আব্‌দর রহমান সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই নগরের শোভা বর্দ্ধনে যত্নবান হন। তিনি নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে নগরে পরিষ্কার পানীয় জল আনিবার জন্য এক জল প্রণালী নির্ম্মাণ করেন। এই জলপ্রণালী সীসার নল দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। স্থানে স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য ও পিত্তলের জলাধার ছিল। নগরের মধ্যে অনেক স্থানে সুন্দর কারুকার্য্যময় মার্ব্বেল পাথরের জলাধারও ছিল। সমস্ত নগরে ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানে প্রচুর পরিমাণে পানীয় জলের সরবরাহ ছিল। কর্ডোভা নগরের আয়তন সম্বন্ধে একজন আরব লেখক বলিয়াছেন যে ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪ মাইল ও প্রস্থে ৬ মাইল। এই বিরাট নগর বহু মস্‌জিদ, প্রাসাদ, উদ্যান প্রভৃতিতে সুশোভিত ছিল। নগর বহুভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগে বাজার, মস্‌জিদ্, সাধারণ স্নানাগার প্রভৃতি ছিল। সুলতান প্রথম আবদর রহমান যে মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন তাহা এখনও ভ্রমণকারী দিগের বিস্ময় উৎপাদন করে। খালিফা তৃতীয় আবদর রহমান আর একটী বিরাট জল প্রণালী নির্ম্মাণ করেন। নিকটবর্ত্তী পাহাড় সকল হইতে জল আসিয়া সহরের মধ্যস্থ কৃত্রিম বিরাট জলাধারে জমা হইত। সেই স্থান হইতে সহরের সমস্ত জল সরবরাহ করা হইত। এই জলাধারের মধ্যে একটি সোনার পাতে মোড়া সিংহের মূর্ত্তি ছিল। তাহার মুখ দিয়া ফোয়ারার ন্যায় চতুর্দ্দিকে জল ছড়াইয়া পড়িত। এই সিংহের পার্শ্বে এক প্রকাণ্ডকায় মনুষ্য মূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইয়া সিংহের মস্তকে জল ঢালিয়া দিতেছে।

সুলতান প্রথম আবদর্ রহমান নির্ম্মিত রুসাফার উদ্যান তখন সমস্ত ইউরোপের আদর্শ উদ্যান বলিয়া বিবেচিত হইত। সুলতান সিরিয়া হইতে খেজুর বেদানা ও অন্যান্য বৃক্ষ আনয়ন করিয়া এই উদ্যান সুসজ্জিত করিয়া স্বদেশের স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখেন। সুলতান বহুদূরবর্ত্তী দেশ হইতেও নানাজাতীয় বৃক্ষ আনয়ন করেন। ইহা ব্যতীত সুলতান বহু মস্‌জিদ ও স্নানাগার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। স্থপতি বিদ্যায় মুরদের সমকক্ষ আর কেহ বোধ হয় তখন পৃথিবীতে ছিল না। গোয়াদেল্‌কুইভার নদীর উপর বহু সেতু ছিল। তন্মধ্যে একটি সেতু অতি প্রশস্ত ছিল। এই সেতু ১৭টি খিলানের (arches) উপর অবস্থিত ছিল। ওমিয়াদ রাজ

বংশের অধীনেই কর্ডোভা গৌরবের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে। এই সময় কর্ডোভার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দশলক্ষ। এই বিরাট নগরে মোটের উপর ৩,৮০০ শত মস্‌জিদ্‌ ও ৬০,০০০ হাজার প্রাসাদ ছিল। অন্যান্য বাস গৃহের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ ছিল, ৮০,০০০ দোকান ও ৭০০ শত সাধারণ স্নানাগার ছিল। ইহা ব্যতীত বহু হোটেল ও সরাই ছিল।

আরব ঐতিহাসিকেরা সুল্‌তান প্রথম আবদর রহমান নির্ম্মিত মস্‌জিদ্‌ ও তৃতীয় আবদর রহমান নির্ম্মিত রাজ-প্রাসাদের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে মুরগণ স্থপতি বিদ্যায় ও সুকুমার শিল্পকলায় যে কতদূর উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক পরিচয় আমরা পাই। উক্ত মস্‌জিদ্‌ সম্বন্ধে একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে ৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আবদুর রহমান মস্‌জিদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, ৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাহার পুত্র সুলতান হিসাব ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদন করেন। ইহাতে ৮০,০০০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এই মস্‌জিদ্‌ মুরশিল্পের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। দৈর্ঘ্যে এই মস্‌জিদের ৩১টি খিলান এবং প্রস্থে ১৯টি খিলান ছিল। স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য মণিমুক্তা খচিত ১২৯৩টি স্তম্ভ এই মস্‌জিদের শোভা বর্দ্ধন করিত। বেদীটি (pulpit) অতি সুন্দর হস্তিদন্ত ও দামী সুন্দর কাঠে নির্ম্মিত ছিল। ইহাও নানা মণিমুক্তা খচিত ছিল। প্রার্থনার পূর্ব্বে হস্তপদাদি ধৌত করিবার জন্য মস্‌জিদের অভ্যন্তরেই চারিটি জলের ফোয়ারা ছিল। দিবারাত্র ফোয়ারা দিয়া জল পড়িত। মস্‌জিদের পশ্চিম পার্শ্বে গরীব লোকদিগের থাকিবার জন্য ঘর ছিল। সেখানে তাহাদের জন্য খাদ্য ও পানীয় থাকিত। বহু শত পিতলের প্রদীপ মস্‌জিদ্‌ আলোকিত করিত। রমজানের মাসে মস্‌জিদের ভিতর ২৪ সের ওজনের এক চর্ব্বির বাতি দিবারাত্র প্রজ্জলিত থাকিত।

আর একজন আরব লেখক তৃতীয় আবদুর রহমানের নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সুলতানের প্রিয়তমা বেগমের নামে এই রাজপ্রাসাদের নামানুকরণ হয়। ইহার নাম ছিল "আজ জহ্‌রা" বা "সৌন্দর্য্যের রাণী"। এই প্রাসাদের চারিপার্শ্বে একটি নগর নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদ ও নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবার ২৫ বৎসর পরে সুলতানের মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র আরও ১৫ বৎসরের চেষ্টায় ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধান করেন। এই প্রাসাদ ও নগরের নির্ম্মাণ কার্য্যে ১০,০০০ লোক অনবরত পরিশ্রম করিত। প্রত্যহ ৬০০০ খণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর কাটা ও পালিস্‌ করা হইত। দ্রব্যাদি বহনের জন্য ৩০০০ হাজার ভারবাহী জন্তু ব্যবহৃত হইত এবং প্রতিবৎসরের রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ এই কার্য্যে ব্যয়িত হইত। এই প্রাসাদে ৪০০০ হাজার স্তম্ভছিল। ইহার মধ্যে বহুস্তম্ভ কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাট কর্ত্তৃক উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল। রোম কার্থেজ প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও নানারূপ দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল। লোহা ও পিত্তলের নির্ম্মিত প্রায় ১৫০০০ হাজার দরজা এই প্রাসাদে ছিল। আরব লেখকগণ সুলতানের দরবার গৃহের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। এই গৃহের ছাত ও দেওয়াল স্বর্ণ ও মার্ব্বেল পাথরের নির্ম্মিত এবং গ্রীক সম্রাট কর্ত্তৃক প্রেরিত আশ্চর্য্য কারুকার্য্য খচিত একটি ফোয়ারা গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিত। দরবার গৃহের মধ্যস্থলে একটি মার্ব্বেল পাথরের চৌবাচ্চা ছিল। ইহা পারদ (mercury) দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। এই চৌবাচ্চার চতুর্দ্দিকে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত ৮টি দরজা ছিল। এই সব দরজাগুলি সোণা ও মণিমুক্তা খচিত ছিল। সূর্য্যকিরণ এই চৌবাচ্চার মধ্যে পড়িয়া এক অনির্ব্বচনীয় শোভার সৃষ্টি করিত।

প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর উদ্যান ছিল এই উদ্যান নদীর তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। বহু ফোয়ারা ও কৃত্রিম ঝরণা উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিত। প্রাসাদ হইতে মস্‌জিদ্‌ পর্য্যন্ত একটি সুন্দর পথ ছিল। এই পথ অতি দামী কার্পেট দিয়া আচ্ছাদিত থাকিত।

এই প্রাসাদে প্রায় ১৪০০০ হাজার পুরুষ চাকর ছিল এবং প্রায় ৬০০০ হাজার দাসী ছিল। তিন হাজার যোদ্ধা এই প্রাসাদের প্রহরীর কার্য্য করিত। এই প্রাসাদের শোভা ও সম্পদের কথা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। দেশ বিদেশ হইতে ভ্রমণকারীগণ কর্ডোভায় আসিয়া এই প্রাসাদ দেখিত।

এ পর্য্যন্ত আমরা কর্ডোভার কথাই আলোচনা করিয়াছি এখন আমরা গ্রাণাডার কথা আলোচনা করিব। গ্রাণাডা

রাজ্যের যখন অভ্যুদয় হইল তখন মুরদিগের গৌরব রবি প্রায় অস্তমিত হইয়া আসিয়াছে। স্পেনের মাত্র দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশ লইয়াই গ্রাণাডা রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যেও ৩০টি বড় সহর, ৮০টি সুরক্ষিত ক্ষুদ্র নগর ও কয়েক হাজার গ্রাম ছিল। ইহা হইতেও গ্রাণাডার সমৃদ্ধির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। রাজধানী গ্রাণাডা নগর তৎকালে ইউরোপের এক প্রধান নগর মধ্যে গণ্য হইত। নগরের চতুষ্পার্শ্বে সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। দারো (Darro) নদী নগরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছিল। নদীর দুই পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর উদ্যানশোভিত প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। নগর প্রবেশের জন্য ২০টি ফটক ছিল। প্রাচীরের স্থানে স্থানে এক হাজারের অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ (tower) ছিল।

সুলতান বিন্ উল-অহ্মর নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ অল্-হম্‌রা বা 'লাল প্রাসাদ' গ্রাণাডা রাজ্যের মুকুটমণি স্বরূপ। লোকে ইহাকে দৈত্য নির্ম্মিত বলিত (this fabric of the geni)। এই প্রাসাদ নির্ম্মাণে মুরগণ যে স্থপতি বিদ্যা ও সুকুমার শিল্পকলার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। নানাবর্ণের মূল্যবান প্রস্তর, বহুমূল্য ধাতু ও মণিমুক্তা দ্বারা এই প্রাসাদ অলঙ্কৃত ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত লেখক ওয়াসিংটন আর্ভিং প্রিন্স ডলগোরুকির (Dolgorouki) সহিত অল্‌হম্‌রা দেখিতে আসেন। তিনি এই প্রাসাদ সম্বন্ধে অতীব রমণীয় বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে যে স্পেন সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ এই প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বলিয়া ছিলেন যে "Ill-fated was the man who lost all these."

(২) শিক্ষা ও বিজ্ঞান

এ পর্য্যন্ত আমরা মুর স্থাপত্য ও সুকুমার শিল্পকলার আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে মুরগণ কতদূর সহায়তা করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে মুরগণ কতদূর কি করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিভাগেই মুরগণ আপনাদের কৃতিত্বের সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন। কর্ডোভা ও গ্রাণাডা রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক সহরেই বহু সাধারণ পাঠাগার ছিল। ইহা ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক সহরেই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। একজন ঐতিহাসিক এসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "Cordova contained innumerable libraries, and rich people, however illiterate, spared no labour and expense in amassing books ....." কর্ডোভার সুলতানগণও শিক্ষার প্রসারকল্পে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। সুলতান হাকাম দেশ বিদেশ হইতে বহু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে কর্ডোভায় আনয়ন করেন। সুলতান হাকামের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিন্ খাল্‌দুন বলেন যে "সুলতান শিক্ষাবিজ্ঞানের খুব সমাদর করিতেন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে আশাতীত পুরস্কার দিতেন। তিনি কর্ডোভায় এক বিরাট পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি এই পাঠাগারে ছিল। এই পাঠাগারে চারি লক্ষ খণ্ড পুস্তক ছিল। সুলতান নানাদেশ হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া এইস্থানে রাখেন। একজন রাজকর্ম্মচারী এই পাঠাগার পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। সুলতান হাকামের সময় কর্ডোভায় নানা দেশ হইতে পুস্তকাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইত। সুলতান যে কেবলমাত্র পুস্তক সংগ্রহই করিতেন তাহা নহে, তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সকল দেশের পণ্ডিতই তাহার নিকট সমান আদর পাইত। ধর্ম্মের জন্য নির্ব্বাসিত বহু পণ্ডিত তাহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন।"

মুর শাসনাধীনে স্পেনে শিক্ষাবিজ্ঞানের সকল বিভাগেই যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সমস্ত রাজ্যময় সাধারণ শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমস্ত লোকেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানিত। ঐতিহাসিক Dozy বলেন "In spain almost everybody knew how to read and write, whilst in Christian Europe, save and except the clergy, even persons belonging to the highest ranks were wholly ignorant." Dozyর এই উক্তি হইতে মুরগণ সমসাময়িক খ্রীষ্টানদিগের হইতে যে কতদূর উন্নত ছিলেন তাহার পরিচয় আমরা পাই।

সুলতান হাকাম শিক্ষার প্রতি এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে অর্থাভাবে যাহারা শিক্ষা পাইত না তাহাদের জন্য

কর্ডোভানগরে ২৭টি বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। দুস্থ ছাত্রগণ বিনা পয়সায় এখানে পাঠ করিত এবং তাহাদের পাঠ্য পুস্তকও রাজ সরকার হইতে দেওয়া হইত।

কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর প্রাচীন প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম। বহু দেশ বিদেশ হইতে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবর্গ এইস্থানে অধ্যয়নের জন্য আগমন করিতেন। এই সময় কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। ঐতিহাসিক Lane pool বলেন যে "Her professors and teachers made her the centre of European culture; students would come from all parts of Europe to study under her famous doctors……"

কর্ডোভার ন্যায় গ্রাণাডার সুলতানগণও শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রসার কল্পে অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন। গ্রাণাডার বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউরোপে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন কার্য্য রাজ সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। একজন অধ্যক্ষের (Rector) অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন কার্য্য সমাধা হইত। উপযুক্ত হইলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। একজন ঐতিহাসিক বলেন যে "Real learning, in the estimation of the Arabs, was of greater value than the religious opinion of the literate." মুসলমান স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে প্রতিবৎসরই একটি বাৎসরিক সম্মেলন হইত। এই সময় কবিগণ আপন আপন রচনা এই স্থানে পাঠ করিতেন এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ বক্তৃতা করিতেন।

একজন ইউরোপীয় লেখক মুসলমান স্পেনের শিক্ষা বিভাগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "মুরদিগের শিক্ষাবিভাগ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সাধারণ বিদ্যালয়াদি লইয়া একটি বিভাগ গঠিত হইয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর লোক এই স্থানে সাধারণ ভাবের লেখাপড়া শিখিত। বড় বড় বিদ্যালয় (academy) লইয়া আর একটি বিভাগ গঠিত হইয়াছিল। এই স্থানে উচ্চাঙ্গের জ্ঞানালোচনা হইত। সুসভ্য আরব দিগের জ্ঞানমন্দিরে ইউরোপের অসভ্য জাতি সমূহ আসিয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের জ্ঞানালোক পাইয়া, স্বদেশের অজ্ঞান তিমির দূর করিবার প্রয়াস পাইত। দূর ইটালী ফ্রান্স, জর্ম্মাণী ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে বহু লোক জ্ঞানের অনুসন্ধানে কর্ডোভা, সেভিল, টলেডো, জেন এবং মালাগার বিদ্যালয়ে আসিয়া সমবেত হইত। বিখ্যাত পণ্ডিত এবেলার্ড (Abelard), বাথের (Bath) সন্ন্যাসী (monk) মর্লে এবং মাইকেল স্কট মুসলমান স্পেনে বিদ্যার্জ্জন করিতে আসিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র গ্রাণাডা রাজ্যেই ৭০টি সাধারণ পাঠাগার, ১৭টি কলেজ ও ২০০শত সাধারণ বিদ্যালয় ছিল।"

ইউরোপের শিক্ষা ও বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ বলিয়া মুসলমান স্পেন ইসলাম জগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ শাস্ত্র, রসায়ণ ও চিকিৎসা শাস্ত্র, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, বল বিজ্ঞান (mechanics) প্রভৃতি সকল রকম বিষয়েই মুরগণ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

গ্রীস ও রোমের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার মুর পণ্ডিতগণের যত্নেই পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এভেরোস্ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত মুর দার্শনিকের উল্লেখ করিয়া একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে "……formed the chief link in the chain which connects the philosophy of ancient Greece with that of mediæval Europe." পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্যের বহু পণ্ডিত এই স্পেনেই জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাহাদের যশঃ সৌরভ মুসলমান স্পেনকে পৃথিবীতে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

(ক) কাব্য-সাহিত্য

আরবজাতি চিরকালই কবিতাপ্রিয়। ইস্লামের অভ্যুদয়ের বহুকাল পূর্ব্বেও আরবদেশে বহু উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছে। কাব্য ও সঙ্গীতের প্রতি এই আসক্তি ইসলামের জাতীয় চরিত্রে একটি বিশেষত্ব। বহু মহিলাকবিও ইসলাম জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমান স্পেনে ইতর ভদ্র প্রায় সকলেই কাব্যের চর্চ্চা করিতেন। "The whole Moslem world seemed given over to the Muses……"ঐতিহাসিক Lane poolএর এই উক্তি হইতেই সঙ্গীত ও কাব্য সকলের যে কত প্রিয় হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। নিম্নে আমরা কয়েকজন মহিলা কবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

(১) নজ্‌হুন্—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত মহিলা কবি। ইতিহাস ও অন্যান্য সাহিত্যেও ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ইহঁার পিতার নাম আবু বকর্ আল-ঘসানি।

(২) জইনাব ও হামদা—এই ভগ্নিদ্বয় জিয়াদ নামক পুস্তক বিক্রেতার কন্যা,—গ্রাণাডার নিকটে বাস করিতেন। বিন্ উল অব্বার তাঁহার তুহ্ফৎ উল্-কাদিম নামক গ্রন্থে ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে এই ভগ্নিদ্বয় ইস্‌লামের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। ইঁহারা বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাব্য ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্য ও নানা বিজ্ঞানে ইঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। শান্ত ও সংযত ভাবে পণ্ডিতগণের সহিত সদা সর্ব্বদাই মিশিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

(৩) হাফ্‌সা ও কালাইয়ে—ইহারা গ্রাণাডায় বাস করিতেন।

(৪) সোফিয়া—ইনি সেভিল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি উচ্চ শ্রেণীর কাব্য রচনা করেন। বক্তৃতা শক্তিতেও ইনি বিখ্যাত ছিলেন। সুন্দর হস্ত-লিপির জন্য সমস্ত মুসলমান স্পেন ইঁহার প্রশংসা করিত।

(৫) মারিয়া—বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। ইহাকে "আরবের করিন্না" বলা হইত।

(৬) হাসানা আল-ইয়াতমা ও উম্-উল-উলা—ইহারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। গোয়াদালাক্সারা (Gudalaxara) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের রচনা অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

(৭) আল্ আরুজিয়ে—ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশে একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক মহিলা কবি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান

বহু ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পণ্ডিত মুসলমান স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে বিন্ হয়ান্ আবু ওবেদুল্লা আল-বক্‌রি, বিন্ বুস্‌খুওয়াল, বিন্ উল খাতিব (উজির লিসান্ উদ্দিন) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বিন্ হয়ান স্পেনের দুইখানি ইতিহাস রচনা করেন। তন্মধ্যে একখানি দশখণ্ডে এবং অপরখানি ৬০ খণ্ডে সমাপ্ত।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) আবু বকর্ মহম্মদ বিন্ ইয়াহিয়া। সাধারণতঃ তিনি বিন্ বাজা নামে পরিচিত। ইউরোপীয়গণ তাঁহার নাম এভেন্ পেস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সারাগোসা নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক গণিতজ্ঞ জ্যোতিষী ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে ফেজ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(২) বিন্ তুফেল্—মুরদিগের মধ্যে একজন বিখ্যাত দার্শনিক। ইনিও বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। আল্‌মোহেদ্ বংশীয় সুল্‌তান আবু ইয়াকুব ইউসুফ তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে রাখিয়াছিলেন। ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে মরক্কো নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৩) বিন্ জুহ্‌র্—ইউরোপে আভেন্ জোয়ার নামে পরিচিত। সেভিল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশের প্রায় সকলেই পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। ইহার পিতা আবুমারওয়ান্ আবদুল্ মালিক আল্‌মোহেদ বংশের প্রথম সম্রাট আবদুল মোমিনের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। বিন্‌জুহর্‌ও সুলতান ইয়াকুব আল-মনসুরের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৪) আবুল কাসিম খালাফ—আল্‌বুকাসিস্ নামে ইউরোপে বিখ্যাত। একাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। ইনি অস্ত্র চিকিৎসায় যে সকল নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাহা বর্ত্তমান সময়েও পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

(৫) বিন্ বেতার—প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যাপারদর্শী। ইনি ঔষধের জন্য বৃক্ষগুল্মাদির অনুসন্ধানে সমস্ত প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও এক অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত।

(৬) বিন্ রুসদ—ইউরোপে আভেরোস্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দার্শনিক হিসাবে ইহার সমকক্ষ বোধ হয় স্পেনে

কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। গ্রীকদর্শন প্রভৃতির আলোচনার জন্য ইহার খ্যাতি আছে। ইহার পিতা ও পিতামহ এণ্ডালুসিয়ার প্রধান কাজি বা বিচারক ছিলেন। ১১০৯ খৃষ্টাব্দে ইনি সেভিল নগরের কাজির পদে অধিষ্ঠিত হন। ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে কর্ডোভার কাজি হন, ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

অন্যান্য বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ও মুসলমান স্পেনের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু দ্রব্যাদির জন্য ইউরোপ মুসলমানদিগের নিকট ঋণী। টেলীগ্রাফ, সময় নিরূপণের জন্য পেণ্ডুলাম বা দোলকের ব্যবহার, দিগ্দর্শন যন্ত্র (Mariners' Compass) দূরবীক্ষণ প্রভৃতি সমস্তই প্রথমে মুসলমানগণ আবিষ্কার করেন। একজন ইউরোপীয় লেখক এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "The Spanish Saracens taught us the use of the pendulum in the measurement of time; and also of the telegraph, though not with all the speed and effect of modern improvement." আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে "It is unquestionable that a great number of the inventions which at the present day add to the comforts of life, and without which literature and arts could never have flourished, are due to the Arabs."

(৩) কৃষি ও শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্প ও বাণিজ্যে মুসলমানদের সমকক্ষ জাতি বোধ হয় তৎকালে পৃথিবীতে আর ছিল না। ইস্‌লাম বণিক সম্প্রদায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই যাতায়াত করিতেন। নানা দেশ হইতে ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যের জন্য ইসলাম অধিকৃত দেশসমূহে সদাসর্ব্বদা আগমন করিতেন। কর্ডোভা ও গ্রাণাডা রাজ্যে বহু বন্দর ছিল। সেই সমস্ত বন্দর সর্ব্বদাই দেশ বিদেশ হইতে আগত জাহাজে পূর্ণ থাকিত। কর্ডোভা ও গ্রাণাডার সুলতান দিগের বাণিজ্যার্থ বৃহৎ নৌবাহিনী ছিল। ঐতিহাসিক আর্ম্মিআলি এক স্থানে বলিয়াছেন যে "The ports of Ahmarite king dom (গ্রাণাডা) swarmed with shipping of Europe, Levant and Africa, and its capital, as the chief centre of a remarkable commercial activity had become the common city of all nations." ইহা ব্যতীত গ্রাণাডা রাজ্যে জেনোয়া ও ফ্লোরেন্সের বাণিজ্যোপনিবেশ স্থাপিত ছিল। রাজ সরকারের বাণিজ্যপোতবাহিনী ব্যতীত প্রত্যেক বন্দরের নিজস্ব বাণিজ্যপোতবাহিনী ছিল। প্রত্যেক বন্দরে "ধাসাব" বা আলোকস্তম্ভ (light house) ছিল। সুলতানগণ বহির্বাণিজ্যের খুব উৎসাহদাতা ছিলেন।

বহুশিল্পজাত দ্রব্যও মুসলমান স্পেনে প্রস্তুত হইত। এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইত। সিল্ক ও অন্যান্য পশমের দ্রব্য স্পেনে যথেষ্ট প্রস্তুত হইত। রেশম ও পশমের দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য স্পেন বিশেষ বিখ্যাত ছিল। কথিত আছে যে একমাত্র কর্ডোভা নগরেই একলক্ষ তিরিশ হাজার তন্তুবায় ছিল। এল্‌মিরা নগর রেশমজাতদ্রব্য ও কার্পেটের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু এল্‌মিরা ও মালাগার বন্দর হইতে ফ্লোরেন্স নগর, অনেক দ্রব্য আমদানী করিত। মৃন্ময় ও চীনামাটির (porcelain) পাত্র নির্ম্মাণেও মুসলমান স্পেনের সমকক্ষ আর কোনও দেশ ছিল না। মুর অধিকৃত মেজরকা দ্বীপ এই সব মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মুরগণ মৃন্ময় পাত্রের উপর স্বর্ণ ও পিত্তলের উজ্জ্বলতা দিতে পারিতেন। এই মেজরকার পাত্র হইতেই ইটালীয় মৃন্ময়পাত্রের নাম হইয়াছে 'মেজোলিকা'।

কাচ ও পিতল কাঁসার কারুকার্য্যময় পাত্রাদিও মুরগণ প্রস্তুত করিতেন। এল্‌মিরা নগরে এই সব দ্রব্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইত। সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার প্রস্তুতেও মুরগণ আপনাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহাদের প্রস্তুত স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিমুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এখনও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদির জন্য মুসলমান স্পেন সবিশেষ প্রসিদ্ধ। মুর নির্ম্মিত অত্যাশ্চর্য্য কারুকার্য্যময় নানারূপ দ্রব্যাদি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সামান্য সামান্য দ্রব্যাদিতেও কারুকার্য্য করা থাকিত। সেই সময়ের কারুকার্য্য করা চাবি এখনও অনেক পাওয়া যায়; তরবারির বাঁটে মুরগণ স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা নানা কারুকার্য্য করিত।

লৌহ ও ইস্পাত বহু পরিমাণে স্পেনে পাওয়া যাইত। ইহা দ্বারা নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হইত। টলেডো

ও গ্রাণাডার তরবারি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্ম্ম ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্রের জন্য এল্‌মিরা সেভিল, মুরসিয়া ও গ্রাণাডা প্রভৃতি নগর সুবিখ্যাত হইয়াছিল।

কাপড়ে রং করিবার দক্ষতার জন্য মুরদিগের ন্যায় আর কেহ ছিল না। নীল (indigo) দ্বারা কাল রং করিবার প্রথা মুরগণই প্রথমে আবিষ্কার করেন।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রেশম, তুলা, পারদ, লৌহ, জলপাইর তৈল, রেশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি, নানা প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যাদি, চুম্বকপ্রস্তর, রসাঞ্জন (antimony), অন্যান্য ধাতু, চিনি, লাক্ষা, নানাপ্রকার তৈল, গন্ধক, প্রবাল, মূল্যবান প্রস্তর ও ঔষধ দ্রব্যাদি মুসলমান স্পেন হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত। ইহা ব্যতীত নানা প্রকার চর্ম্ম নির্ম্মিত দ্রব্যাদিও রপ্তানী হইত। এই সব চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের নিয়ম ইউরোপের অন্যান্য দেশ বহুপরিমাণে মুরদিগের নিকট হইতেই পাইয়াছেন। "মরক্কো" ও 'কর্ডোভান্' চর্ম্ম এখনও মুর দিগের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

মুরগণই প্রথমে কাগজ ও বারুদ প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিয়ম স্পেনকে শিক্ষা দেন।

কৃষির দিকে মুসলমান সুলতানগণ চিরকালই বিশেষ দৃষ্টিদান করিতেন। কৃষির উন্নতির জন্য সরকার হইতে নানা উপায় অবলম্বন করা হইত। কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য জলসেচন বিভাগ (Irrigation department) ছিল। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ এবিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। উচ্চ ও কঠিন জমি যন্ত্রদ্বারা সমভূমি করিয়া কৃষিযোগ্য করা হইত। সমস্তদেশ জলপ্রণালী (aqueduct) ও খাল প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। কারমোনার জলপ্রণালী (aqueduct) দ্বারা বহুদূর হইতে জল আনীত হইত।

মুরগণই প্রথমেই স্পেনে ইক্ষু, ধান্য, অন্যান্য ফলের গাছের চাষ আরম্ভ করেন। আরব হইতে বেদানা খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষ আনয়ন করিয়া স্পেনে রোপণ করেন। এল্‌বুফেরা প্রদেশে বহুপরিমাণে ধান্যের চাষ হইত। ওলিভা ও গ্যাণ্ডিয়া প্রদেশ তুলা ও ইক্ষুর চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। জেরেস্, গ্রাণাডা ও মালাগায় প্রচুর আঙ্গুর উৎপন্ন হইত। সমস্ত এণ্ডালুসিয়া ভরিয়াই জলপাইর চাষ হইত। ১২৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফার্ডিনাণ্ড যখন সেভিল্ অধিকার করেন তখন উক্ত প্রদেশেই কয়েকলক্ষ জলপাই বৃক্ষ ছিল, এবং এবং জলপাইর তেল প্রস্তুত করিবার জন্য প্রায় একলক্ষ কল বর্ত্তমান ছিল। ইহা হইতেই মুসলমান স্পেন কৃষিতে কতদূর উন্নত ছিল তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪) শাসন পদ্ধতি

বিভিন্ন স্বাধীন মুসলমান রাজ্যসমূহের শাসনপদ্ধতি এশিয়াসাম্রাজ্যের শাসনপদ্ধতির অনুকরণেই চলিত। মুসলমানস্পেনের শাসনপদ্ধতিও প্রায় ঐ নিয়মেই সম্পাদিত হইত। মুরদিগের শাসনপদ্ধতির সাধারণ বিবরণ আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সুলতান সমস্ত রাজ্যের উপরে কর্ত্তা ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সকল কার্য্যই করিতে পারিতেন। কিন্তু কার্য্যতঃ রাজ্যশাসনের সমস্ত ভার মন্ত্রীদের হাতেই ছিল। এই সকল মন্ত্রীদের সাধারণ ভাবে 'উজির' বলা হইত। প্রত্যেক উজিরের হস্তে এক একটি পৃথক বিভাগ ন্যস্ত থাকিত। চারিটি প্রধান বিভাগ ছিল।

(১) রাজস্ব বিভাগ (Finance)
(২) পররাষ্ট্র বিভাগ (Foreign Affairs)
(৩) দণ্ড বিভাগ (Administration of Justice)
(৪) সমর বিভাগ (Supervision of Army)

মন্ত্রীপরিষদের (Privy Council) সমস্ত সভ্যই 'উজির' নামে অভিহিত হইতেন। পরিষদের সভাপতিকে 'প্রধান উজির' (Grand Vizier) বলা হইত। 'হাজিব' বা রাজগৃহাধ্যক্ষই (Chamberlain) সচরাচর প্রধান উজির পদ পাইতেন। ইহার অনেক ক্ষমতা ছিল। সময় সময় রাজার নামে প্রধান উজির অনেক আদেশ প্রচার করিতেন।

মন্ত্রী ব্যতীত রাজ্যশাসনের জন্য বহু সেক্রেটারী (Secretary of State) নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদিগকে কাতিব্ উদ্-দওয়াল বলা হইত। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার একজন রাজকর্ম্মচারী বা কাতিব্-উজ্-জিমানএর হস্তেঃন্যস্ত ছিল। সাহিব উল্-আস্‌গাল উপাধিধারী একজন কর্ম্মচারী রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন করিতেন। প্রকৃত পক্ষে ইনিই রাজস্ব

বিভাগের কর্ত্তা বা মন্ত্রী ছিলেন। এই কর্ম্মচারীকে গ্রাণাডা রাজ্যে "ভকিল" বলা হইত।

বিচারালয়ে কাজিগণ বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মুসলমান স্পেন ইহাদের অতি সম্মানের চ'ক্ষে দেখিত। এই স্থানে প্রধান কাজিকে রাজার কাজি না বলিয়া কাজি উল্-জমায়েৎ অথবা প্রজাদিগের কাজি বলা হইত।

মুসলমান স্পেনের পুলিশ বিভাগও অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্ত্তাকে সাহিব্ উস্-সুর্তা বলা হইত। কর্ডোভার সুলতানগণের অধীনে ইহার বিপুল ক্ষমতা ছিল। কর্ডোভার ধ্বংসের পরে ইহার ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট বা নগরাধ্যক্ষকে সাহিব উল্-মেদিনা বলা হইত। ইহারা নগরের কাজির অধীন ছিলেন। 'মুতাসিব' নামক একজন উচ্চরাজকর্ম্মচারী প্রত্যেক নগরেই থাকিতেন। ইহার কার্য্য অতি দায়িত্বপূর্ণ ছিল। বাজার, ব্যবসায় বাণিজ্য, প্রজাদিগের চরিত্র, পুলিশের কর্ত্তব্য পালন প্রভৃতি সকল বিষয়ের দিকেই ইহার দৃষ্টি রাখিতে হইত।

রাত্রিতে যাহাতে চুরি বা অন্য কোন উপদ্রব সহরে না হয় তাহার জন্য একদল পুলিশ রাত্রিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহারা দিত। ইহাদিগকে আদ্-দারাবুন্ বলা হইত। ইহাদিগের সহিত কুকুর, অস্ত্রশস্ত্র ও লণ্ঠন থাকিত।

রাজ্য শাসনপ্রণালীর সাধারণ বিবরণ আমরা দিয়াছি। এক্ষণে সৈন্য বিভাগ ও নৌ বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। এশিয়া সাম্রাজ্যে যেরূপ সৈন্য বিভাগ গঠিত ছিল, ইস্লাম অধিকৃত সমস্ত দেশেই সেইরূপভাবে গঠিত বিভাগই ছিল। সমস্ত লোককেই সৈন্য বিভাগে লওয়া হইত। শ্রেণী (clan) হিসাবে সৈন্যদল গঠিত ছিল। আরব সৈন্যদল অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিলে সুলতান তৃতীয় আবদর রহমান ইহাদিগকে বশীভূত রাখিবার জন্য শ্লাভ, ফ্রাঙ্ক, লম্বার্ড প্রভৃতি বিদেশীয় লোক লইয়া একটি সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। এই দলকে তিনি নিজের অধীনে পার্শ্বচর স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। ইহাদের সাহায্যে তিনি অনেক বিদ্রোহদমন করেন। সুলতান আল্মনসুরও সৈন্য বিভাগে নানা নূতন নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়া সৈন্য বিভাগকে কঠোর শাসনাধীনে রাখেন।

আফ্রিকার মুসলমান সুলতানদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ হইত বলিয়া কর্ডোভার সুলতানগণ একটি নৌবহর গঠন করেন। রাজস্বের অধিকাংশই কর্ডোভার সুলতানগণ নৌবহরের জন্য ব্যয় করিতেন। নৌবহরের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তাকে আমীর উল্-মা বা সাগরাধ্যক্ষ বলা হইত। আমীর উল্‌মাকে ইউরোপে তখন আল্মিরান্ত্ বলা হইত। এই কথা হইতেই আধুনিক এড্মিরাল্ কথা আসে। তৃতীয় আব্দার রহমানের সময় ইহার নাম ছিল কায়েদ্ উল্-অসাতিল বা নৌবহরাধ্যক্ষ। ওমিয়াদ্ ও আল্মোহেদ্ সুলতানদিগের নৌবাহিনী ইউরোপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইত। ঐতিহাসিক বিন্ খালডুনের মতে এই নৌবাহিনীর অবনতি ও অভাবই মুসলমান শক্তি-ধ্বংসের প্রধান কারণ।

(৫) মুরচরিত্র ও বীরধর্ম্ম (Chivalry)

আরবের প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিল। বিজিত শত্রুর প্রতি কৃপা তাহারা কদাচিৎ করিত। নারী জাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাও তাহাদের ছিল না। নারীজাতি উপভোগের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত। যুদ্ধে নিহত স্বামীর মৃতদেহের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার স্ত্রীকে বিজেতা বিবাহ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিত না। ইস্লাম ধর্ম্মের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত নীতি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

মুসলমান স্পেনে মুরদিগের চরিত্রালোচনা করিলে আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। মধ্যযুগে ইউরোপে যে বীরধর্ম্মের (chivalry) প্রভাব আমরা দেখিতে পাই, মুরদিগের মধ্যেও সেই বীরধর্ম্মের প্রভাব প্রবল ছিল। বীর বিজিত শত্রুর প্রতি মুর সুলতানগণ কদাচিৎ দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। পরাজিত খৃষ্টানরাজগণের প্রতি সুলতানগণ রাজায় রাজায় যেরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছেন। লিয়নরাজ সান্চো যখন রাজ্য হইতে দেশবাসী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলেন তখন তিনি তাঁহার পিতামহী টোটাকে লইয়া খালিফ তৃতীয় আব্দার রহমানের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুলতান পূর্ব্ব শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সাহায্য প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। তাঁহারই সাহায্যে সান্চো রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন।

মুরগণ নারীজাতিকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারী জাতিও তাহাদের ভক্তি ও সম্মানের পাত্র ছিল। ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম আল্‌ফন্‌সোর রাণী একবার এজেকা দুর্গে মুরগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়েন। কথিত আছে যে তিনি সহায়হীনা নারী কর্ত্তৃক রক্ষিত দুর্গ মুরগণ আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদের বীরধর্ম্মের নিন্দা করিয়া তিরস্কার করেন। মুরগণ এই ন্যায় তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া রাণীর নিকট সসম্মানে ত্রুটি স্বীকার করিয়া অবরোধ উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। ঐতিহাসিক রিণাড (Reinaud) লিখিয়াছেন যে "It was at this period that the chivalrous ideas commenced to develop themselves, joined to an exalted sense of honour and respect for the feeble sex." ঐতিহাসিক ভিয়ারডট (Viardot) বলেন যে মুরদিগের এই বীরধর্ম্ম হইতেই মধ্যযুগের ইউরোপে বীর ধর্ম্মের জন্ম হয়।

মুর যোদ্ধাগণের সহিত খৃষ্টান যোদ্ধাগণের তুলনা করিলে মুরদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। খৃষ্টান যোদ্ধাগণ অতি নৃশংস প্রকৃতির ছিল। শিক্ষার অভাবে তাহাদের ভদ্রভাব একেবারেই লুপ্ত হইয়াছিল। তাহারা যুদ্ধপ্রিয় ও অত্যন্ত বর্ব্বর প্রকৃতির ছিল। বীর ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ভাবের সম্বন্ধে তাহাদের কোনই জ্ঞান ছিল না। অর্থের জন্য তাহারা সমস্ত কার্য্যই অবাধে করিতে পারিত। জীবন যাপনের জন্য যুদ্ধ ব্যবসাই তাহাদের একমাত্র উপায় ছিল।

অন্যপক্ষে মুর যোদ্ধাগণ বীরধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিল। প্রায় সকল মুরই শিক্ষিত ছিল। তাহারা কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতির চর্চ্চা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিত। যুদ্ধের সময় বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা সম্মানের বলিয়া বিবেচনা করিত। নানাপ্রকারের রমণীয় ভাবগুলি মুর চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল। লেনপুল (Lanepool) তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "Their intellectual tastes were unusually fine and delicate......They were romantic, imaginative poetical, speculative and would bestow on a well turned epigram what would have sufficed to pay a regiment of soldiers." এই কথাটি হইতেই মুর চরিত্রের বিশেষত্ব আমাদের বোধগম্য হইবে।

মধ্যযুগে ইউরোপে যেমন নানাপ্রকার শস্ত্রক্রীড়া ও কৃত্রিম যুদ্ধ (tournament) প্রদর্শন হইত, মুসলমান স্পেনেও তাহা প্রচলিত ছিল। বহু দূর দেশ হইতে খৃষ্টান বীর (knight) গণ মুরদিগের সহিত এই ক্রীড়ায় যোগদান করিতে আসিতেন। মুরবীরগণ তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মুসলমান রমণীগণ অনেক সময়ে এই ক্রীড়া স্থলে উপস্থিত হইয়া বীরগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন।

(৮) নির্য্যাতন ও নির্ব্বাসন—মুর সভ্যতার অবসান

গ্রাণাডার পতনের পর হইতেই খৃষ্টান শক্তি মুরদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। কার্ডিনাল জিমেনিস মুসলমান ধর্ম্মের উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বিধর্ম্মীদিগের আত্মাকে নরকের অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি রাণী ইসাবেলার আদেশে নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেন। জোর করিয়া মুসলমানদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা জিমেনিসের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল। অত্যাচার প্রপীড়িত মুরগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে তিনি নৃশংসভাবে তাহাদিগকে হত্যা করেন। একটি মসজিদে বহু বিপন্ন নারী ও বালক বালিকাগণ আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার আদেশে বারুদের সাহায্যে সেইমসজিদ উড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি আদেশ করিলেন যে মুসলমানধর্ম্ম যাহারা পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইবে না তাহারা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে। বহু মুর স্পেন ত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা এই আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিল তাহারা প্রায় সকলেই নিহত হইল। মুর সভ্যতা ও শিক্ষার বহু নিদর্শন খৃষ্টানদিগের অত্যাচারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল।

সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে সমস্ত মুরকে তাহাদের রীতিনীতি ও ভাষা ত্যাগ করিয়া রাজার ভাষা ও আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। অত্যাচারে উন্মত্ত হইয়া মুরগণ বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অবশেষে সম্রাট তৃতীয় ফিলিপের আদেশে

সমস্ত মুর তাহাদের গৌরবময় স্বদেশ হইতে চিরকালের জন্য বিতাড়িত হইল। একজন মুরও স্পেনে অবশিষ্ট রহিল না।

এমনি করিয়া স্পেনকে যাহারা সৌভাগ্য ও গৌরবের উচ্চতম সোপানে তুলিয়াছিল তাহাদের শেষ হইল। যে সুখ ও সৌভাগ্য মুর অধীনে স্পেন পাইয়াছিল তাহা চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল। তারপর কত শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সে সম্পদ, সে ঐশ্বর্য্য স্পেন এখনও ফিরিয়া পায় নাই। কখনও পাইবে কিনা তাহাই বা কে বলিতে পারে। স্পেনীয় ঐতিহাসিক Conde তাঁহার স্বদেশের ইতিহাসে মুরদিগের নির্ব্বাসনের কথা উল্লেখ করিয়া এক স্থানে লিখিয়াছেন "An eternal gloom envelopes the countries which their presence had brightened and enriched. Nature has not changed; she is as smiling as ever; but the people and religion have changed. Some mutilated monuments still dominate over the ruins which cover a desolate land; but from the midst of these monuments, of these old ruins comes the cry of Truth, Honour and Glory to the vanquished Arab, and misery for the conquering Spaniard." এইরূপে মুর-সভ্যতা, যাহা একদিন জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে সভ্যতা সমস্ত পৃথিবীর আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল, যে সভ্যতার সমকক্ষ ইউরোপের আর কোনও সভ্যতা হইতে পারে নাই, যে সভ্যতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল, তাহার অবসান হইল। এই অবসানের সঙ্গে সঙ্গে স্পেন চিরকালের জন্য গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল।

শ্রীনির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত।

ফাল্গুন স্মৃতি

রাগে রাগে রাঙা মুখ
ফিরেছে ফাল্গুন
সেই সে কোকিল ডাকা
ফুল পরিমল মাখা
দোদুল কুসুমে অলি
ডাকা গুণ গুণ
নন্দনের গন্ধ মাখা
ফিরেছে ফাল্গুন।

প্রেমানন্দে রাঙা মুখ
সেই সে চাঁদিনী সাঁঝে
ন্যাড়া পোড়া শিখা মাঝে
প্রিয় খোলা সাথী সনে
হৃদি প্রেমারুণ
ফিরেছে সে স্বপ্ন ঘেরা
মধুর ফাল্গুন।

রঙে রঙে রাঙা বুক
ফিরেছে ফাল্গুন
বাঁশ বনে চোঙা কাটা
পিচকারী ত্যানা আঁটা
রঙ নিয়ে ছুটো ছুটী
জীবন তরুণ
ফিরেছে সে মাতোয়ারা
মদির ফাল্গুন।

ভাগে ভাগে রাঙা শির
ফিরেছে ফাল্গুন
শুধু ফাগ ছোড়া ছুড়ি—
দোল তলা হুড়াহুড়ি—
গুরুজনে দেখা পেলে
ভয়ে মুখ চুন
মনে হাসি, চোখে জল
ফিরেছে ফাল্গুন।

হেসে কেঁদে রাঙা চোখ
ফিরেছে ফাল্গুন
সকলই নবীন রাগে
নাচেরে নয়ন আগে
মরম চিতায় শুধু
স্মৃতি পুড়ে খুন
বুকে বুকে জেলে আগ
ফিরেছে ফাল্গুন।

প্রিয়জনে মেগে মেগে
কাঁদেরে ফাল্গুন
সে জ্বালায় নাহি দুখ
পুড়িবে পুড়ুক বুক
আশাহত চিতানল
জ্বলুক দ্বিগুণ
যুগে যুগে হেসে কেঁদে,
আসিও ফাল্গুন।

শ্রীগোবিন্দলাল মিত্র।

সরস্বতী

(সত্যঘটনা-অবলম্বনে লিখিত)

(১)

আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণে আফিসের ফেরতা ঘরমুখো হরি বাবু বড় ফাঁপরে পড়িলেন। প্রায় বারো আনা রকম পাড়ি জমাইয়াছেন এমন সময় হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ছাতায় মাথা আট্‌কান যায় কিন্তু জুতা আট্‌কান যায় না; আজকালকার কালে ভগবানের গড়া মাথা অপেক্ষা চর্ম্মকারের গড়া জুতার দরদই বেশী, কেননা মাথা ভিজিলে সহজে মুছিয়া শুকাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু জুতা ভিজিলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া পড়ে। অথচ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জামা-কাপড়ের বেলায় যা' কিছু বাহুল্য থাকুক, জুতার বেলায় এক প্রস্থর বেশী আর দুই প্রস্থ কপালে যোটে না। জুতা হাতে করাটাও হালফ্যাশানের ভদ্রলোকের পক্ষে যেন কেমন বেয়াড়া দেখায়। এই জুতা-সমস্যায় পড়িয়া অগত্যা হরিবাবু একটি বাড়ীর দরজা খোলা দেখিয়া অসঙ্কোচে দরজার ভিতর গিয়া দাঁড়াইলেন। নীচে লোকজনের সমাগম নাই, কিন্তু উপরের বারাণ্ডা হইতে একজন আগন্তুকের দরজায় প্রবেশ লক্ষ্য করিল। হরি বাবুর উপরদিকে চাওয়া অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তিনি সেটা জানিতে পারিলেন না।

একটু পরে একজন ঝি আসিয়া বলিল, "বাবু, এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন? উপরে গিয়ে বস্‌বেন আসুন।" হরিবাবু সারাদিন কলম পিষিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কোথায় বাড়ী গিয়া গা-পা ছড়াইয়া একটু আরাম করিবেন ও শ্রান্তিহারিণী তামাকুদেবীর প্রসাদে ক্লান্তি দূর করিবেন, তা' না এই দুর্য্যোগ উপস্থিত। এমন অবস্থায় তিনি এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিলেন। উপরে উঠিয়া দেখিলেন, একটি ঘরের ভিতর দিয়া আর একটি ঘরে যাইতে হয়, প্রথম ঘরটিতে বিশেষ বেশী আসবাব নাই, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরটির সাজসজ্জা ও গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চেহারা দেখিয়া হরিবাবু বুঝিলেন এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেন দুই পা পিছাইয়া যাইবার ভাব দেখাইলেন। গৃহস্বামিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আপনি ভদ্রলোক, কষ্ট পাচ্ছেন দেখে ঝিকে উপরে ডেকে আন্‌তে বলেছি। আমার কোন কু-মতলব নেই। এ ঘরে আস্‌তে যদি আপত্তি থাকে, তা' বেশ ঐ ঘরেই বসুন।"

এই বলিয়া সে একখানি সুদৃশ্য ও সুপরিসর গালিচা বিছাইয়া দিল ও বলিল, "আমার গুরুদেবের ব্যবহারের জন্যে এই আসন কিনেছি, কোন দ্বিধা বোধ না ক'রে এই আসনে বসুন।" হরিবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে রমণীর প্রদত্ত আসনে বসিয়া পড়িলেন। রমণী তখন ভরসা পাইয়া বলিল, "আকাশের যে রকম গতিক, আপনাকে অনেকক্ষণ বস্‌তে হ'বে বোধ হ'চ্ছে। জামাটামা ছাড়ুন, ঝিকে দিয়ে মাজাঘষা পেতলের ঘটীতে জল আনিয়ে দিচ্ছি, হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হ'ন। আর তামাক অভ্যেস আছে কি?" হরি বাবু শেষের কথাটায় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। তখন রমণী বলিল, "গুরুদেব আস্‌বেন ব'লে নতুন হুঁকো-ক'ল্‌কে কিনে রেখেছি, আপনি তাইতে তামাক সেবা করুন, ঝি সেজে দিচ্ছে। গুরুদেবের জন্যে আবার হুঁকো-ক'ল্‌কে আনালেই হবে।"

হরিবাবু নাহুঁ নাহুঁ করিয়াও শেষটা রমণীর নির্দ্দেশমত সব কাযই করিলেন। তখন আর একটু সাহস পাইয়া রমণী বলিল, "আপনার আফিসের কাপড়চোপড় দেখ্‌ছি; সারাদিন খাটুনির পর অবিশ্যিই ক্ষিদে-তেষ্ঠা পেয়েছে, যদি অনুমতি করেন, ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে ডাব আর সন্দেশ আনিয়ে দিই, একটু জলযোগ করুন।" "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্" বুঝিয়া রমণী ঝিকে ডাকিয়া ভিতরের ঘরে লইয়া গিয়া পয়সা দিল ও কি কি আনিতে হইবে বলিয়া দিল। এ সব স্থানের ঝি-চাকরের এমন তরিবৎ যে বাদলাবৃষ্টি ঝড়ঝাপটা বজ্রাঘাতেও তাহারা মনিবের ফরমাশ খাটিতে অবহেলা করে না। আর ঝির জুতা ভিজিবারও ভয় নাই!

একটু পরে ঝি ফিরিল। হরিবাবু তাহার হাত হইতে সন্দেশ ও মুখকাটা ডাব লইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা দমন করিলেন ও আর এক কিস্তি গম্ভীরভাবে তামাকুদেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

ক্রমে দুর্য্যোগের অবসান হইল। তিনিও আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। যাইবার সময় কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল, রমণীকে আতিথ্যের জন্য

ধন্যবাদ দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না। রমণী তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্য্যন্ত গেল ও সপ্রতিভভাবে বলিল, "তবে আসুন বাবু, দেরীর জন্যে ঘরের লোকে না জানি কত ভাব্‌ছে! আবার কবে আ—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "এই দেখুন বাবু, কেমন বদ অভ্যেস হয়ে গেছে, কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম। যাক্‌, কিছু মনে করবেন না।" হরিবাবু হাঁ না কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘাড় গুঁজিয়া দরজার বাহির হইয়া গেলেন।

(২)

হরিবাবু গৃহ ফিরিলে গৃহিণী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত দেরি যে! বৃষ্টিতে আফিসের বা'র হ'তে পারনি বুঝি?" তিনি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "বৃষ্টির জন্যে পথে আট্‌কা পড়েছিলাম।" মোটের উপর সত্য কথাই বলিলেন, কোথায়, কি বৃত্তান্ত, গৃহিণীও জিজ্ঞাসা করিলেন না, তিনিও ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। আজ বড় ক্ষুধা নাই, একটু রাত্রি করিয়া আহারাদি করিব—এইমন্তব্য প্রকাশ করিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িলেন, ও হাতমুখ ধুইয়া নুতন করিয়া ধূমপানে মন দিলেন। অমৃতে কি কখন অরুচি হয়? তাহাতে আবার এক্ষেত্রে তামাকু গৃহিণীর শ্রীহস্তের সাজা। রাত্রে আহারাদির পর গৃহকর্ম্মবিরতা গৃহিণীর সঙ্গে কিছুক্ষণ প্রেমালাপের পর নিদ্রার শরণ লইতে উন্মুখ হইলেন। কিন্তু সুনিদ্রা হইল না। থাকিয়া থাকিয়া অতিথিসেবাপরায়ণা নবপরিচিতার যত্ন-আদর ও অতিথির নিষ্ঠারক্ষার জন্য আগ্রহ, এই সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের হাবভাব সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল, ইহার চরিত্রে তাহার বিপরীত ধরণ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সেই রমণীর প্রতি কেমন একটা শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

যাহা হউক, প্রাতে উঠিয়া যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ও স্নানাহার করিয়া তিনি আফিসে গেলেন। কিন্তু সেদিন অন্যদিনের মত চাপিয়া আফিসের কাম করিতে পারিলেন না, কেমন যেন অন্যমনস্ক! মনে কেবলই সেই রমণীর আদর-যত্নের কথা উঠিতে লাগিল। মোহের এই ত প্রকৃতি!

আফিসের ছুটি হইলে অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে ঠিক সেই বাড়ীর দরজায় তাঁহার গতিরোধ হইল। আজ দেবদুর্য্যোগ নাই, তবুও একবার সেখানে আশ্রয় লইতে মন টানিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি 'ঝী, ঝী,' বলিয়া ডাকিলেন। গলার সাড়া পাইয়া ঝী আসিল না, কিন্তু গৃহস্বামিনী বারাণ্ডায় বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল ও একটু চমকিত হইয়া মৃদুমধুরস্বরে বলিল, "উপরে আসুন, ঝী দোকানে গেছে।"

হরিবাবু এই কোমল আহ্বানে উৎসাহের সহিত সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলেন এবং বরাবর ভিতরের ঘরেই গেলেন। আজ আর রমণী তাঁহাকে গুরুদেবের আসন দিল না, একখানি চেয়ারে বসিতে বলিল। আসন-গ্রহণান্তে হরিবাবু গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "কাল তোমার আদর-যত্নে বড় আপ্যায়িত হয়েছি, তখন ধন্যবাদ দিতে পারিনি, তাই আজ সেই ত্রুটী শোধ্‌রাতে এসেছি।" রমণী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একটু মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে হাত-মুখ ধুইতে জলের ঘটী সরাইয়া দিল এবং ধূমপান ও জলযোগের ব্যবস্থা করিল; তবে আজ ঘরের তৈয়ারি খাবার—বাজারের নহে। হরিবাবু খাবার খাইতে একটু মৃদু আপত্তি করিয়া শেষে জিনিষগুলির সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

জলযোগান্তে গৃহস্বামিনীর তৈয়ারি তামাক টানিতে টানিতে শয্যাপার্শ্বে হারমোনিয়ামটা দেখিয়া তিনি একটু আব্দারের সুরে বলিলেন, "বাজনাটা দেখে' লোভ হচ্ছে একটু গান শুনি। আমার এ অনুরোধটা না রাখ্‌লে অতিথি-সৎকারে ত্রুটি থেকে যা'বে কিন্তু।" রমণী দ্বিরুক্তি না করিয়া আবার একটু মৃদু হাসিয়া যন্ত্রে সুর দিয়া কীর্ত্তন ধরিল এবং উপরি উপরি ৩।৪টি বিরহ গাহিয়া তাহার পর চাবিটা বন্ধ করিয়া দিল।

গানের রেশ যতক্ষণ কাণে রহিল, ততক্ষণ হরিবাবু কেমন এক রকম হইয়া থাকিলেন। তাহার পর ধ্যানভঙ্গ হইলে বুঝিলেন, রমণীর অনেকটা সময় লইয়াছেন, তাঁহারও অনেক বিলম্ব হইতেছে, তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রমণী বাধা দিল না। কেবল কল্য যে কথাটা 'অর্দ্ধোক্তে' চাপিয়া গিয়াছিল, অদ্য সেই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিল, "আবার কবে আস্‌বেন?" হরিবাবু জড়িতকণ্ঠে কি একটা জবাব দিলেন তাহা ভাল করিয়া শুনা গেল না।

(৩)

সেই দিন হইতে প্রায় প্রত্যহই হরিবাবু আফিসের ফেরতা এইখানে 'চিত্তবিশ্রাম' করিতে আসিতেন, দু'দণ্ড বসিতেন, দু'টা গান শুনিতেন, দু'টা মিষ্টালাপ করিতেন, (মিষ্টমুখও কোন্ না করিতেন ?) ও পরে বিদায় লইতেন। ক্রমে তিনি রমণীর নাম-পরিচয় পাইলেন ; নামটিও সার্থক, কেননা পতিতা সরস্বতী দেবী সরস্বতীর কৃপায় গীতবাদ্য-নিপুণা, অর্থাৎ 'রূপে লক্ষ্মী' না হইলেও 'গুণে সরস্বতী'। রমণীও তাঁহার নামধাম সংসারের কথা সবই জানিয়া লইল। হরিবাবু ঘরে ফিরিয়া অক্ষুধার ও বিলম্বের কি কৈফিয়ত দিতেন জানি না, জানিলেও সে মিথ্যাচারের, কৈতববাদের পরিচয় দিতে চাহি না। গৃহিণী আমৃতা আমৃতা উত্তর শুনিয়া আকারে-ইঙ্গিতে ব্যাপার বুঝিয়াও, ইহা লইয়া আর খোঁচাখুঁচি করিলেন না, স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্য ও ধীরতার সহিত সহ্য করিয়া গেলেন।

এইভাবে অনেকদিন সারস্বতকুঞ্জে সুখ-সম্মিলন চলিল। কতদিন কে জানে ? 'বৎসরেই কি কালের পরিমাণ হয় ?'—

তাহার পর একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল, দুর্দ্দিন পড়িল। হরিবাবু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলেন, আফিস যাওয়া বন্ধ হইল,সুতরাং আফিসের ফেরতা গান শোনার পাটও বন্ধ হইল। কয়েকদিন অদর্শনে সরস্বতী বিমনাঃ হইয়া উঠিল ; ঠিকানা জানা ছিল, সে আর থাকিতে না পারিয়া কৌশলে সংবাদ-সংগ্রহের জন্য ঝীকে হরিবাবুদের পাড়ায় পাঠাইল। ঝী আসিয়া যে সংবাদ দিল তাহাতে সে বসিয়া পড়িল। যা হক্, কতকটা সামলাইয়া লইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সে নিজেই রোগীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। গৃহিণী অপরিচিতা নারীকে শুষ্কমুখে ও ব্যাকুলকণ্ঠে স্বামীর পীড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, হয়ত একটু সন্দেহও করিলেন। কিন্তু যে কালের ছায়া তখন পড়িয়াছে, তাহাতে আর বিস্ময়-বিদ্বেষের বিশেষ অবসর ছিল না, তিনি কোন প্রশ্ন না করিয়া রমণীর প্রার্থনামত তাহাকে স্বামীর রোগশয্যাপার্শ্বে লইয়া গেলেন।

হরিবাবু তখন বাক্‌শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্তু সরস্বতীকে কাছে পাইয়া তাঁহার রোগক্লিষ্ট বিশীর্ণ বদনমণ্ডলে যে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিল ও পরক্ষণেই দুই চক্ষুঃ দিয়া যে অশ্রু-ধারা ঝরিতে লাগিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া গৃহিণী ব্যাপারটা সবই বুঝিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন আর গৃহিণীর বিরাগ-বিদ্বেষ-রোষ-অভিমানের সময় নহে। সরস্বতী বিষণ্ণমুখে রোগীর শয্যাপার্শ্বে কাষ্ঠমৌভাবে বসিল এবং সেবার ভার গ্রহণ করিল। চাপাগলায় গৃহিণীকে বলিল, "দিদি, এখন বেশী কথার সময় নয়। আমি প্রাণ-পণে এঁর সেবা করব। এমন রুগী ফেলে' রোজ বাড়ী যাওয়া চল্‌বে না। আমাকে দু'বেলা দু'মুঠো দিও। আর যা'তে ভাল ডাক্তার দেখান হয়, তা'র ব্যবস্থা কর। টাকার জন্যে ভেবো না।"

সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার আনা হইল, চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি হইল না, কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ দাঁড়াইল ; কেবল কষ্টে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। হরিবাবু নিঃসন্তানা নিঃসহায়া গৃহিণীর পানে যখনই চাহিতেন, তখনই তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইত, দুই চক্ষুঃ জলে ভরিয়া উঠিত। তাঁহার অবর্ত্তমানে গৃহিণীর কি দশা হইবে—শুধু ভদ্রাসন বাড়ীখানি ও প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ডের কিছু টাকা ভরসা—এই ভাবনা তাঁহার রোগযন্ত্রণাকেও ছাপাইয়া উঠিল। সে কথা তিনি গৃহিণীকে কিছুতেই বলিতে না পারিয়া একদিন গৃহিণীর অসাক্ষাতে সরস্বতীকে বলিয়া ফেলিলেন। সে মৃদুস্বরে বলিল, "ভয় কি, আপনি সেরে উঠ্‌বেন, অত ভাব্‌বেন না। আর যদি মন্দটাই হয়, তবে দিদির জন্যে আপনি মন খারাপ কর্‌বেন না, সে ভার আমার রইল, এবিষয়ে তাঁকে কোনও কষ্ট পেতে দেব না।" তখন হইতে রোগীর মুখখানা যেন একটু প্রসন্ন হইল, কিন্তু কালরোগে তাঁহাকে অব্যাহতি দিল না। সেই রাত্রেই পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা গৃহলক্ষ্মীকে ও শিরোদেশে উপবিষ্টা পতিতাসরস্বতীকে কাঁদাইয়া তিনি কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেলেন।

(৪)

শ্রাদ্ধাদির পরে শোকের প্রথম বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে অভাগিনী বিধবা বিধবাবেশধারিণী সরস্বতীকে বলিলেন, "বোন, আমার ইচ্ছে বাড়ীখান বেচে ও আফিসের টাকা তুলে' নিয়ে কাশীবাস করি। তুমি আর কতদিন

আমার কাছে পড়ে' থাকবে ?" সরস্বতী ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "দিদি, তুমি তীর্থযাত্রা করবে, বাধা দেব না। কিন্তু এই বাড়ীই আমার মহাতীর্থ, আমি এবাড়ী ছাড়তে পারব না। দশজন পাড়ার লোক ডেকে বাড়ীর ন্যায্য দাম ঠিক কর, আমিই তোমাকে সে দাম দেব। তবে ইচ্ছে ছিল, যে ক'দিন এ পোড়াপ্রাণ থাকবে, তোমার মত সতীলক্ষ্মীর সেবা করে' পূর্ব্বজন্মের ও এ জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব, কিন্তু দয়াল ঠাকুর আমার কপালে তা' লেখেন নি ?"

কথাটা শুনিয়া বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। পরে বলিলেন, "বোন, তুমি যে বলছ এ বাড়ী আমাদের মহাতীর্থ, তা' বটে। আমারও ইচ্ছে করে, তাঁর চরণ স্মরণ করে, এইখানেই পড়ে' থাকি, কিন্তু আফিসের সামান্য টাকায় ত পোড়া পেটে কুলোবে না। আরও কতকাল বাঁচতে হ'বে তা' কে জানে ? তাই বাড়ী বিক্রী করতে চাই।" সরস্বতী উত্তর করিল, "দিদি, তোমার যদি এই বাড়ীতে থাকা মত হয়, তবে সে জন্যে ভাবতে হ'বে না। আমি তা'র ব্যবস্থা করব। আমি ত তোমার আশ্রয়েই থাকব, আমার বাড়ীখানার আর দরকার কি ? সেইখানাই বেচে ফেলি। তুমি এতে অমত করোনা, লক্ষ্মী দিদি, সে বাড়ী আমার পৈত্রিক—পাপের ধনের নয়। তুমি অনুমতি দাও, সেই বাড়ীবেচা টাকা সুদে খাটালে দুটো বিধবার পেট বেশ চলে' যাবে।"

হয় ত অন্য সময়ে হইলে বিধবা এ প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন; কিন্তু আর মনের জোর নাই। তাহা ছাড়া সর্ব্বদা সরস্বতীর সংসর্গে থাকিয়া, তাহার স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া, তাহার সেবা পাইয়া, তাঁহার মনটা আর তাহার দিকে বিমুখ ছিল না। তিনি গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "সরি, তুই আর জন্মে আমার বোন ছিলি ! তোর যা ভাল বোধহয় তাই কর, আমি কোনও কথা কইব না।"

এই কথাবার্ত্তার পর সরস্বতী পাপের অর্জ্জিত সমস্ত অর্থ অনাথাশ্রমে দান করিল ও বাড়ী বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইল শুধু তাহাই সম্বল করিয়া দুই জনের জন্য পুঁজি করিল। সে যতদিন বাঁচিয়াছিল, বিধবার নিয়ম পালন করিয়া ও 'দিদি'র সেবা করিয়া কাটাইয়াছিল। তাহার পর একদিন হতভাগিনীর জীবন-বর্ত্তিকা নিবিল; সে 'দিদি'র চরণে মাথা রাখিয়া, তাঁহার ক্ষমাভিক্ষা করিয়া, মহাযাত্রা করিল। বিধবা সেই যুগল শ্মশান-স্মৃতি হৃদয়ে বহন করিয়া আরও কিছুদিন দারুণ মনঃকষ্টে জীবন কাটাইয়া শেষে পরলোকে পতির সহিত মিলিত হইলেন। কে জানে সেখানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ন্যায় উভয়েই স্বামি-নারায়ণের পদসেবার অধিকার পাইয়াছিলেন কি না। *

---

* 'নারায়ণে' (শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৬) 'গণিকাতন্ত্র সাহিত্য'-শীর্ষক প্রবন্ধাবলিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে 'পতিতার-মসীময় চরিত্রেও অতিকিত ভাবে একটা শুভ্র রেখার আবির্ভাব হয়, কালোমেঘের কোলে অকস্মাৎ একটু ঝিকিমিকি করে, প্রকৃত প্রেমের প্রভাবে পতিতার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, ইত্যাদি ব্যাপার রোম্যাণ্টিক রীতির প্রভাবে সাহিত্যে প্রকটিত হইতেছে। ইহারই সমর্থন-কল্পে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত দুইটি প্রকৃত ঘটনা-অবলম্বনে 'লক্ষ্মী' ও 'সরস্বতী' নামে দুইটি গল্প লিখিয়াছি। প্রথমটি কার্ত্তিকের 'মালঞ্চে' প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটি প্রকৃত ঘটনা হইতে বুঝা যায়, প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'হরিণ ভাণ্ডারী' গল্পে পতিতা দুর্গার চরিত্র-সংশোধন নিতান্ত কবিকল্পনা নহে, এরূপ ব্যাপার বাস্তবজীবনেও ঘটে। এইটুকু দেখানই আমার উদ্দেশ্য। গণিকাতন্ত্রে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার গল্প-রচনার উপযুক্ত কল্পনা ও আর্ট নাই সুতরাং এই ভোঁতা তুলিকায় অঙ্কিত লক্ষ্মী-সরস্বতী জলধরবাবুর নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত দুর্গার পার্শ্বে স্থান পাইবে, এরূপ দুরাশা করি না।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাণের প্রবাহ

অজানা দেশের বারতা বহিয়া
আকুল-পবন ছুটিয়া আসে,
গোপন প্রেমের মধুর পরশে
কাননে কোমল কুসুম হাসে।
গগনের কোলে তারকার আলো,
সাগরের বুকে উর্ম্মি রাশি,
সহসা সকল বন্ধন টুটি
উচ্ছল-প্রেম আসে গো ভাসি!
কে জানিত ওগো কোকিল-কূজনে
এত সঙ্গীত গোপনে রাজে,—

ফাল্গুন-পরশে নীরবতন্ত্রী
পঞ্চমে পুনঃ পুলকে বাজে।
তেমনি সহসা মানব হিয়ায়
ভাবের প্রবাহ আসে গো ছুটে,
অজানা আলোর পুলক লভিয়া
হৃদয়-কমলে অমান ফুটে।
ভাবের জোয়ারে ভেসে যায় প্রাণ,
সে কি কল্লোল চিত্তমাঝে;
সঙ্গীত শত বন্ধন টুটি
অন্তরে যেন আপনি বাজে!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

ইতিহাসের লক্ষ্য

বর্ত্তমান অতীতের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস আমাদের নিকট অতীতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। অনেকে খুব জোরের সহিত বলেন যে ইতিহাস সত্যের মুখোস পরিয়া মিথ্যাকেই প্রচার করিয়া থাকে। বর্ত্তমানের মধ্যেই অতীতের অভিজ্ঞতা আপনাকে পরিণতির দিকে চালিত করিতেছে। ইতিহাসচর্চ্চার দ্বারা অতীতের সমস্যাসমূহের অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শক্তি নষ্ট করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া, আমরা-তাহার সমস্যা বিধানে প্রয়াসী হইব।

কিন্তু যখনই ভবিষ্যতের যে কোনও সমস্যার মীমাংসার জন্য আমরা প্রয়াসী হই, তখনই আমাদিগের মন বারবার অতীতের অভিজ্ঞতার বাজারে সেগুলিকে যাচাই করিতে বসে।

আমরা মুখে স্বীকার না করিলেও যখনই কোনও রাষ্ট্র-নৈতিক অধিকারের প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত হয়, তখনই ইয়োরোপের প্রজামণ্ডলী যে কঠোর সংগ্রামের দ্বারা রাষ্ট্রীয় শক্তিকে লোকমতের অধীনে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার দিকে আমরা চোখ ফিরাইয়া তাকাইতে বাধ্য হই। ইংলণ্ডের Magna Chartaর সময় হইতে পার্লেমেণ্টের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা আমাদের জাতীয় সংগ্রামে কেবল যে আশান্বিত হই তাহা নহে। তে মাথার মোড়ে দাঁড়াইয়া যখন আমরা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ি তখন আমাদের গন্তব্য পথ সম্বন্ধে আমরা তাহার নিকট হইতে যে প্রেরণা ও ইঙ্গিত লাভ করি, তাহার মূল্য বড় অল্প নহে।

সম্রাট্ আওরঙ্গজেব ইতিহাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পিতা শাহজাহান ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীনকালে সাম্রাজ্য গঠন ও তাহার শাসন ব্যবস্থায় পারসীকেরা সুচতুর ছিল। শাহজাহান পারস্য সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাদের ভ্রান্তিগুলি হইতে নিজের সাম্রাজ্যকে মুক্ত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। অনেকেরই বিশ্বাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিলে আওরঙ্গজেবের মত বুদ্ধিমান্ সম্রাট্ স্বহস্তে স্বীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ বপন করিতেন না।

এই কথা উঠিতে পারে যে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জাতির সম্মুখে বিভিন্ন প্রকারের সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ কালে বিশেষ জাতির মধ্যে সেগুলি সীমাবদ্ধ বলিয়া বর্ত্তমানে তাহার মূল্য খুবই কম। তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই প্রত্যেক মানুষের যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, সেকথা আমি স্বীকার করি। জগতের এই সৃষ্টিরহস্তে সামঞ্জস্যের যে একটা মধুর সঙ্গীত প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, প্রত্যেক মানুষই তাহার সহিত নিজের বিশেষ সুরটীকে যুক্ত করিবে, ইহাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের পরস্পরের মধ্যে একদিকে যেমন একটা বিশিষ্টতা আছে, তেমনি পক্ষান্তরে আবার একটা ঐক্যও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সকল মানুষের মধ্য দিয়া একটী আদর্শ মনুষ্যের ভাবকে আমরা অনুভব করি। তাহারই নাম জাতি-মনুষ্য, ইংরেজীতে যাহাকে বলে Humanity. এই অখণ্ড ঐক্যের বোধ আমাদের অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছে বলিয়াই Humanityর আইডিয়া আমাদের অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে একথা যেমন সত্য প্রত্যেক জাতির পক্ষেও একথা তেমনি প্রযোজ্য। প্রত্যেক জাতিরও একদিকে যেমন একটা বিশিষ্টতা আছে, অপর দিকে সে আবার জগতের সমক্ষে এমন কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া যায় যাহা কাল ও স্থানের গণ্ডীর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে।

ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাচীন ধারার (Tradition) প্রত্যেক জাতির মধ্যে সভ্যতার এক একটা বিশেষ দিক্‌ পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। বিভিন্ন জাতির বিধিবিধান ও বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি বাহির হইতে কেহ গড়িয়া দেয় না। সেগুলি ভিতর হইতে বাড়িয়া ওঠে।

জাতি বিশেষের মধ্যে যে আইডিয়া, ভাষা ও জীবন-যাত্রার যে বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে পাই—তাহা বিভিন্ন ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক কারণে ভিতর হইতে গড়িয়া ওঠে। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা আরও পরিস্ফুট করিতে চাই। দুইটী শক্তি প্রাচীন যুগে ভারতীয় সভ্যতাকে একটা বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। প্রধানতঃ একদিকে ইহার ভৌগলিক অবস্থান—হিমালয়, ভাগীরথী ও ভারত মহাসাগর ইত্যাদি—অপরদিকে ধীসম্পন্ন আর্য্যদিগের শুভাগমন। ভৌগলিক অবস্থানের সহিত আর্য্যদিগের মানসিক শক্তির যোগে ভারতীয় সভ্যতা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিল। আদিম অধিবাসীদিগের আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্ম নবাগত আর্য্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নবীন রূপ ধারণ করিল। কিন্তু এই জাতীয় বিশিষ্টতা কেই একান্ত করিয়া দেখিলে চলিবে না। বিচিত্র সভ্যতার বিভিন্ন দীপশিখা একটী অনির্ব্বচনীয় ছন্দে সামঞ্জস্য লাভ করিয়া বিশ্বদেবতার আরতি করিতেছে। কোনও এক জাতির পক্ষেই সভ্যতার ষোল আনা বাহাদুরী গ্রহণ করিবার দাবী চলিতে পারে না।

ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতি নানা বিষয়ে পরস্পরের আদান প্রদানের দ্বারা একটী সাধারণ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে যাহার নাম ইয়োরোপীয় সভ্যতা। যেখানে ফরাসী, জার্ম্মেন ও ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় সেইখানে তাহা জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডীকে ছাড়াইয়া গিয়া সর্ব্ব-জাতির সম্পদ হইয়াছে। এই বিষয়ে লর্ড মর্লী মহোদয়ের অভিমত আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

How disastrous would have been the gap, if European history has missed the cosmopolitan relation of ideas from France ; or poetry, art, science of Italy ; or science, philosophy, music of Germany ; the grave heroic types, the humour, the literary force of Spain * * * The poetic beauty, civil life, human pity,—immortally associated with the past of England in western world's illuminated scroll. It is not one tributary, but the co-operation of all, that had fed the waters and guided the currents of main stream.

ইয়োরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে লর্ড মর্লী যাহা বলিয়াছেন, সমগ্র মানব সভ্যতার ক্ষেত্রেও তাহা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। অতএব একথা খাটে না যে একজাতির সভ্যতায় অপরের কোন সম্পর্ক নাই। অথবা কোনও জাতি যদি মনে করেন যে সভ্যতার যাহা কিছু চরম সত্য তাহাতে সেই জাতিই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তবে তাহাও বাতুলের প্রলাপের মত অমূলক।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে

যাহা অনাবশ্যক আমরাই তাহার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিয়াছি, একথা সত্য নহে। অপরাপর জাতির ইতিহাসের মধ্য দিয়া সে সকল আইডিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে জানিতে হইবে এবং তাহার প্রতি আমাদের রুদ্ধ দ্বারকে শ্রদ্ধার সহিত উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। সেই সঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে,—আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে একটা ভাব ও চিন্তার ধারা—কখনও নব বর্ষার উচ্ছ্বাসময়ী স্রোতস্বতীর মত বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গীতে বিপুল বেগে আত্মপ্রকাশ করিয়া, এবং কখনও বা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত জাতীয় দুর্গতির অন্তরালে অতি ক্ষীণভাবে আত্মরক্ষা করিয়া—ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত রাখিয়াছে তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

ইতিহাসের বিরোধী দল ইয়োরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী গেটের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন "The only form of truth is poetry" কাব্যই হইতেছে সত্যের একমাত্র প্রকাশ। একথাটী আংশিক সত্য বটে কিন্তু একান্ত সত্য নহে। গ্রীক্ সভ্যতার প্রাণধারা আমরা যেমন তাহার কলাবিদ্যা ও কাব্যের মধ্যে দেখিতে পাই, রোমীয় সভ্যতার বিশিষ্টতা তাহার legislationএ বিশেষরূপে আমাদের গোচরীভূত হয়, তেমনি ভারতীয় সভ্যতার চিন্তার ধারাকে আমরা তাহার দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর দিয়া সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি। কোনও জাতিকে জানিতে হইলে সাহিত্য, দর্শন, আর্ট তাহার সমাজ ও ধর্ম্মনীতি সকল দিক যাচাই করিয়া দেখিলেই—সে জাতির মর্ম্মস্থান কোথায় এবং মানব সভ্যতার পরিণতির সংগ্রামে সে কি অক্ষয় সম্পদ দান করিল—তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায়।

বর্ত্তমান যুগে অনেক ঐতিহাসিক নিজেদের কোনও রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্মনৈতিক সংস্কার বা থিওরীকে ইতিহাসের মধ্যে জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। এইরূপ ঐতিহাসিক লেখকের সমালোচনা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। কিন্তু কেবলমাত্র ঘটনা বিবৃতির দ্বারাও ইতিহাস রচনা করা যায় না। রাজ রাজরার কীর্ত্তিকাহিনীও যথার্থ ইতিহাস নহে। রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর বাহিরে বরং জাতির যথার্থ পরিচয় সহজে লাভ করা যায়। সুবিখ্যাত ইতিহাস সমালোচক একটন্ (Lord Acton) সাহেব বলিয়াছেন "History derives its best virtue from the regions beyond the sphere of state."

এমন দেখা যায় যে অনেক ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঘটনা বিবৃত করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াও, ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া যে আইডিয়াগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না।

বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ ও রাষ্ট্রীয় ঘটনাপুঞ্জের সহিত সমাজগত আইডিয়া সমূহের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। কোনও এক সময়ে, কোনও একদল মানুষের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ঘটনা সমূহকে অবলম্বন করিয়া কোন্ কোন্ আইডিয়া আত্মপ্রকাশ করিল তাহাই প্রধান দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। বিভিন্ন যুগে ভারতীয় সভ্যতা যে সকল আইডিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে নানাবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে আমাদের তাহাই অনুধাবন করিতে চেষ্টা করা উচিত।

যথার্থ ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ ভাবে সংস্কার-মুক্ত হইয়া সত্য অনুসন্ধান করিবেন এবং নির্ভীকচিত্তে সেই সত্যকে লোকসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবেন। এই উন্নত আদর্শ লইয়া যাহারা কোনও জাতির অতীতের আলোচনায় মনোনিবেশ করিবেন তাহারাই সেই জাতির সভ্যতার মূল ধারাটী লাভ করিতে সমর্থ হইবেন এবং সেই ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

প্রশান্তি

তখন অপরাহ্ণ! সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে ক্ষীণতোয়া স্রোত ধারা পায়ে হাটিয়া পার হইয়া ওপারের উচ্চ বিস্তীর্ণ মাঠ দিয়া পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হইলাম। স্থান বহুলোকাকীর্ণ; সকলেই সান্ধ্যভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগত। নানা বয়সের নরনারী স্ফূর্ত্তিসহকারে পথে, চলিয়াছে। আত্মবিস্মৃত হইয়া কখন যে আমি সন্ধ্যার অন্ধকারে স্থগিতগতি হইয়া সান্নিধ্যের এক শিলাখণ্ডে দেহের ভার রক্ষা করিয়াছি তাহা আদৌ বুঝিতে পারি নাই। তখন ম্লান উদাস গগণের কোলে অসংখ্য তারকারাশি চাহিয়া একটা স্নিগ্ধ শান্তিময় অনুভূতির সাড়া দিতেছেন; আবিলতার মাঝখানে প্রাণের একটা কিনারার ইঙ্গিত করিতেছে। আমি কতক্ষণ যে মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রকৃতির অবস্থার সামনে আমার বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের একটা মৌন মীমাংসায় নিস্পন্দভাবে মগ্ন ছিলাম জানি না।

যখন গাছের আড়াল হইতে চন্দ্রলেখা বাহির হইয়া কৌমুদী-ধারায় প্রকৃতির সর্ব্বত্র প্লাবিত করিয়া দিল, তখন স্থান নীরব ও নির্জ্জন!

ক্রমে ক্রমে আমার দৃষ্টি আকাশ, তারা ও চাঁদ ছাড়িয়া সম্মুখের পথের পানে প্রসারিত হইল। দেখিলাম অদূরে অস্পষ্ট আলোকে শুভ্র বসনাবৃত একটী মনুষ্যমূর্ত্তি ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নাধবল পথে অগ্রসর হইতেছে। নিকটে আসিলে দেখিলাম কৌমুদী-মণ্ডিত স্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে একটী গোপবালার স্মিত আননের জ্যোতিঃ আমার পানে ন্যস্ত হইয়াছে;—একটী মেষশিশু ত্বরিতপদে বালিকার অনুগমন করিতেছে।

আমার মুগ্ধ হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে একটা গভীর প্রাণের সাড়া অনুভব করিলাম। উঠিয়া দাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে পথবর্ত্তিনী কিশোরীর পার্শ্বে গিয়া পৌছিলাম।

সে মুখ তুলিয়া সরল মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন ফির্‌ছেন আপনি?" বলিলাম, "হাঁ, ফির্‌ছি।" হৃদয়ের সকল উন্মুখ বৃত্তিই যেন আমার কথার সঙ্গে সায় দিল। বালিকা বলিল "চলুন, এই পথে আমাকেও ঘরে যাইতে হইবে।"

আমরা একত্র অগ্রসর হইলাম।

উর্দ্ধে রজতমণ্ডিত আকাশে নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র হাসিতেছে। নিম্নে শ্যামল প্রান্তরের মাঝে ধবল গ্রাম-পথ আঁকিয়া বাকিয়া গিয়াছে। দূরে অল্পসলিলা স্রোতস্বিনী রজত-সূত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্নিগ্ধ পবন-হিল্লোল আমাদের শরীরের উপর দিয়া মন্দ মন্দ বহিয়া যাইতেছে। বালিকার কুন্তল ও আমাদের উভয়ের বসন-প্রান্ত তাহাতে আন্দোলিত হইতেছে; এবং নিরীহ মেষ-শিশুটী ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আমাদের মাঝখানটা দখল করিয়া বসিয়াছে।

প্রকৃতির এই প্রাণ ঢালা হাসি ও আদরের মাঝে এক অপূর্ব্ব সৌরভে আমার সকল হৃদয় ভরিয়া গেল! সকল শিহরণ ও কুটিল রোমাঞ্চ মিলাইয়া গিয়া বালিকার সরল মুক্ত সত্তায় আমার আত্মার স্বরূপ জাগিয়া উঠিল!

স্রোত-ধারার নিকটে আসিয়া আমরা পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন গন্তব্য পথ লইলাম। হৃদয়-ক্ষেত্রে যে নির্ম্মল স্রোত-ধারা জাগিয়া উঠিল, তাহা চিরকাল আমার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের কল্লোলে বহিয়া চলিবে!

শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ, বি-এ।

গরীবের একটি দিন

(A day for the poor হইতে

একজন দরিদ্র মিস্ত্রি যে ইট পাথরে তৈরী গারদে রাত দিন হট্টগোলে কেবল খেটে মরে তারো পক্ষে একটি দিন প্রয়োজন হয়—যেদিনে, তার মন চায় বিশ্রাম, চায় আনন্দ, ঐ একটি দিনে সেও যেতে চায় নদীর কিনারে শ্যামল বনের তরুছায়ে। ঐ দিনে সে চায় নিশ্চিন্ত মনে আনন্দের হাসি হাসতে, ছেলে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করিতে, প্রিয়ার কাছে বসতে। এই দিনে ছেলে মেয়ে এবং প্রিয়তমার সঙ্গে শান্তিতে হাসি গল্পের ভিতর দিয়ে সে পরের দিনের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের জন্য শক্তি সংগ্রহ করে। ঐ একটি দিনে তার সস্ত্রী, যে কেবল সংসারে খেটে খেটেই শ্রান্ত তারো মন চায় দেয়ালের বন্ধন ভেঙ্গে বাহিরে তরুণ সূর্য্যালোকে যেতে—মুক্তবায়ুতে নিশ্বাস নিতে। তারো প্রাণ চায় ঐ দিনে পর্ব্বতের পাদদেশে সমুদ্রের তীরে বিজনে নিজের ছোট শিশুটিকে বুকে নিয়ে সোহাগে চাপড়াতে এবং সেই একটি দীর্ঘ দিনকে আনন্দের স্বপ্ন কল্পনায় ভরে তুলতে।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

গৃহ শিক্ষক

কতিপয় হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থা

Dyspepsia and constipation.—রোগীর বয়স ২৮, কোষ্ঠবদ্ধতাসহ অজীর্ণতায় প্রায় ॥ বৎসর ভুগিতেছেন। তিনি বলেন, প্রাতঃকালে তাঁহার মুখের আস্বাদ অতিশয় খারাপ বোধ হয়। আহারের ৪।৫ ঘণ্টা পরেও তিনি ভুক্তদ্রব্যের উদ্গারে ভুক্ত দ্রব্যের আঘ্রাণ পাইয়া থাকেন। পাকস্থলী দুর্ব্বল, পরিপাক করিবার শক্তি মাত্র নাই। পাকাশয়ে ভার বোধ, অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট বায়ু নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধতা অথচ বারম্বার মলত্যাগ প্রবৃত্তি, কিন্তু বাহ্যে যাইলে আশানুরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। শেষ রাত্রে নিদ্রাভাব—রাত্রি ৩টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া আর ঘুম হয় না। কিন্তু প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ এবং নিদ্রা। নিরুৎসাহ, উচ্চাশাহীনতা, হস্ত এবং পদ ঠাণ্ডা বোধ। উদরাধ্মান এবং হৃদিস্পন্দন, সর্ব্বদা রাগ রাগ ভাব, খিটখিটে স্বভাব। Nux V. 200 এক মাত্রা দেওয়া হইল।

যেহেতুক রোগী ইতিপূর্ব্বে অনেক অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিয়াছিল, নকসের পাকাশয়ে গুরুত্ব, শেষ রাত্রে নিদ্রা হীনতা, প্রাতে উপসর্গের বৃদ্ধি, হস্ত পদ শীতল এবং খিট্‌খিটে স্বভাব এইগুলি বিশেষ লক্ষণ।

৮ দিন পরে রোগী আসিয়া বলে যে, তাহার অবস্থা খুবই ভাল হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে সে উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। রোগীকে কেবল শয়নের পূর্ব্বে মাত্র ১ মাত্রাই ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল।

HINTS.

Toothache from decayed teeth—Mercurious Viv.

ক্ষয় প্রাপ্ত দন্ত শূলে ম্যারকিউরস্ ভাইভস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

Consumtive should use pure olive oil freely.
(Homes Envoy. *April,* 1907.)

It is asserted that Natrum Mur. is a good remedy for nightmare.

Dr. Thomas Simpson in "Homeopathic World" says ;—Phosphorus 6 is the remedy for worst cases of Nose-bleed or from extracted teeth.

ঠোঁট ফাটা, মুখের কোন ফাটা ও ক্ষততে এন্টিম ক্রুড্ ৬ ব্যবহারে আরোগ্য হইবে।

অত্যধিক গলা শুকাইয়া যায়, এমন শুষ্ক যে তাহাতে মনে হয় যেন গলা চিরিয়া যাইবে।

সাঙ্গুইনারিয়া নাইট্রেট ৩ ব্যবহারে আরোগ্য হইবে।

উরুদেশে বেদনা, ঠাণ্ডার সময়ে বৃদ্ধি, চলিয়া যাইলে বৃদ্ধি, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব দ্বারা সারিয়া যায়। ৩০ শক্তির ১ মাত্রাই যথেষ্ট।

ছেলে স্নান করাইতে যাইলে বিরক্ত হয় এবং কান্দে। বয়স্ক ব্যক্তির স্নানে অপ্রবৃত্তি, ইহা সলফারের লক্ষণ। ১ মাত্রা সলফার দিলেই এসকল যাইবে।

"Nervous Dyspepsia" one day food is easily digested and next day causes distress, try Kali Carb.

Intense itching all over the whole body may find relief in Acidum Sulphuricum.

When Influenza i. e. Grippe is prevalent, a few doses of Arsenic Alb. is the preventive.

ইনফ্লুয়েঞ্জার সময়ে ২।১ মাত্রা আর্শেনিক ব্যবহারে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাশীতে গেলেই প্রস্রাব বাহির হইয়া পড়ে, লক্ষণে কষ্টিকম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্নায়ু শূল—যেখানে বেদনা এবং যন্ত্রণা অতিশয় অধিক, সেখানে সাইলেসিয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—(The Remedy.)

একোনাইটের কাশী short, dry and hoarse কাশী ছোট ছোট অতিশয় অধিক বার এবং কষ্টদায়ক এবং তাহাতে স্বরভঙ্গতা আনয়ন করে।

অনেকলোকের অসুখের সময় খাবারের গন্ধে ভয়ানক বমি আসে (Nausea at the smell of food) কলচিকম ৩ ব্যবহারে আরোগ্য হইবে।

শিশুদের গগল বাহির হওয়া (Prolapsus of retum) এলোজ ৩ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ দেখা যায় না। সকালে ও সন্ধ্যায় ১ মাত্রা দিলেই আরোগ্য হইবে।

দুঃস্বপ্ন

(১)

মোহিত স্ত্রীর হাতখানি নিজের মধ্যে লইয়া মিনতি ভরা সুরে বলিল, "লক্ষ্মীটি, পুরী যেতে আর অমত করোনা।"

শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে পদ্মা খানিকটা উত্তপ্ত ভাবেই বলিল, "যাবনা আমি পুরী। দেখো, এখানেই আমার শরীর ভাল হ'য়ে যাবে। তোমার ডাক্তার কি আমার শরীরের খবর আমার চেয়ে বেশী জানে নাকি?"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "তাও কি সম্ভব? শরীর-বিজ্ঞানটা আর স্বাস্থ্যতত্ত্বটা তোমার কাছেই ডাক্তারকে শিখে যেতে বলব এখন।" এই পরিহাসে পদ্মা রাগিয়া চট করিয়া মোহিতের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। মোহিত দুইহাত বাড়াইয়া পদ্মাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "ছি! অমন করোনা। তোমার শরীর যে কি হয়ে গেছে, সে তো তুমি বোঝনা। ডাক্তারের উপদেশ তোমাকে মানতেই হবে, চেঞ্জে যেতেই হবে।"

মোহিতের নিবিড় স্পর্শে ও আদরে পদ্মার বিদ্রোহভাবটা মুহূর্তে গলিয়া গেল। সে বলিল, "পুরীতে একলা আমি থাকব কি ক'রে?"

"একলা কেন থাকবে পদ্মা? ঝি, চাকর, বামুন থাকবে। তা ছাড়া, তোমার সেখানে পৌঁছবার আগেই মাসিমা সেখানে যেয়ে নূতন সংসার গুছিয়ে ঠিক করে রাখবেন। সেই রকম বন্দোবস্ত ত করেছি। তোমার কোন অসুবিধে হবে না।"

"তুমি বলছ, দু'মাস আমাকে পুরী থাকতে হবে। তুমি তো দু'মাসের মধ্যে একটি বারও সেখানে যাবে না।"

"কে বল্লে তা? মাস দুই পরে আমি দু'মাসের ছুটী নিয়ে তোমার অতিথি হ'য়ে থাকব যেয়ে পুরী। এখন ত ছুটি পাব না। আসল কথা হচ্ছে, তুমি আমাকে না দেখে দু'মাস থাকতে পারবে না। আগে সে কথা বল্লেই হ'ত।"

"ইস্! তোমায় দেখতে না পেলে ম'রে যাব আর কি? দু'মাস তো দূরের কথা, দু' যুগও তোমায় না দেখে থাকতে পারি আমি।"

মোহিত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পদ্মা যে তাহাকে ছাড়িয়া কেমন থাকিতে পারে, সে তা জানে। আট বছরের এত টুকু মেয়ে পদ্মা যখন বধূ হইয়া আসে, তখন মোহিতই ছিল তাহার একমাত্র খেলার সাথী। শ্বশুরশাশুড়ীর সস্নেহ সোহাগপ্রাচুর্য্যের মধ্যে সে মা বাপের জন্য কাঁদিবার অবসর বড় পাইত না। সে যে স্ত্রী, সে খবরটা তাহার মনের সীমানায় পৌঁছিবার বহুপূর্ব্বেই খুনসুটি খেলা, ঝগড়াঝাটির ভিতর দিয়া মোহিতের সঙ্গে সে প্রাণের গাঢ় সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া উঠিতেছিল। খেলার সাথী স্বামীটিকে ছাড়িয়া সে বেশীদিন বাপের বাড়ীও থাকিতে পারিত না। শাশুড়ীর শাসনভয়ে সে কতবার যে লুকাইয়া লুকাইয়া মোহিতের পড়ার ঘরে যাইয়া কুল পেয়ারা পাড়িবার ফরমাসে অথবা খেলার অনুরোধে মোহিতকে বিব্রত করিয়া তুলিত, তাহার অন্ত ছিল না। মাঝে মাঝে পদ্মার এই উপদ্রবে মোহিত পদ্মাকে ধমক দিত। মোহিতের সে ধমকে পদ্মার চোখ জলে ভরিয়া উঠিত এবং সে তাহার পুষ্ট গাল দু'টি দারুণ অভিমানে ফুলাইয়া ঘর হইতে চলিয়া যাইত। তখন মোহিতের চোখ গভীর মনোযোগের ভাবে খোলা বইয়ের পৃষ্ঠায় বদ্ধ হইয়া থাকিলেও একান্ত অবাধ্য কাণ দু'টা কোন পরিচিত পায়ের মলের ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনিবার জন্যই বার বার উন্মুখ হইয়া উঠিত। কিন্তু চোখ ও কাণ এই দু'টা ইন্দ্রিয়ের এতটা অনৈক্যে তাহার মন নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক থাকিতে পারিত না; কারণ, স্কুলের মাষ্টারের তর্জ্জন গর্জ্জনের শব্দ ঠিক পদ্মার মলের শব্দের মত ছিল না।

মোহিতের পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে প্রেমের কোন তত্ত্ব নিহিত না থাকিলেও এবং তাহার বয়স ও বুদ্ধি তখন প্রেমচর্চ্চার আদপে যোগ্য না হইলেও ক্লাসে পড়ার সময়েও ঝাঁকরা চুলে আধ ঢাকা একখানি হাসিভরা মুখ তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া তাহাকে অন্যমনা

করাইয়া মাঝে মাঝে কনেনোযোগের মধ্যে 'সারে'র বকুনি খাওয়াইত। বাল্যের ঝগড়া ঝাঁটি, হাসি খেলার ভিতর দিয়া দু'টি প্রাণের বাঁধ খুব শক্ত হইয়াই উঠিয়াছিল। আজ মোহিতের মা বাপ বাঁচিয়া নাই, পদ্মাই তাহার সর্ব্বময়ী গৃহিণী; সচিব সখীও বটে।

কয়েক মাস নানারকম অসুখে ভুগিয়া পদ্মার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাই ডাক্তারের পরামর্শে মোহিত তাহাকে পুরী পাঠাইতে ব্যগ্র। স্ত্রীর সুখ সুবিধার জন্য বিধবা নিঃসন্তানা মাসীকেও পুরী রাখিতে প্রস্তুত হইল।

নির্দ্দিষ্টদিনে মোহিত পদ্মাকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিল। বাহির হইতে মোহিত বাসায় ফিরিয়া আসিলে পদ্মাই চিরকাল তাহার জামা জুতা খুলিয়া লয়। পদ্মার সেই নিত্যকার কাজটির মধ্যে সে কিছু কোন অসাধারণত্ব খুঁজিত না। আজ চাকর যখন বাবুর জামা জুতা খুলিয়া লইল, তখন বাবুর হয় ত মনে হইল, মানুষ যে সুখ ভোগে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, সে সুখের অভাব না হইলে মানুষ তাহার মূল্য ঠিক করিতে পারে না। খাওয়ার সময়ে পদ্মার অনুপস্থিতি এবং তাহার এটা সেটা খাওয়ার জন্য কখনো বা অনুরোধ, কখনো বা কড়া হুকুমের অভাববোধ মোহিতের চোখের পাতা ভিজাইয়া দিল। সে মনে মনে নিজের পৌরুষকে ধিক্কার দিয়া আধপেটা খাইয়া উঠিয়া পড়িল।

(২)

পুরীতে মোহিতের ভাড়াকরা বাড়ীর দরজায় পদ্মার গাড়ী থামিলে মোহিতের মাসী অন্নদা কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া পদ্মা ঘরে উঠিল। বাড়ীখানি সমুদ্রতীরে এবং বেশ সুন্দর। পদ্মার প্রণত শিরে হাত বুলাইতে বুলাইতে অন্নদা স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "তোমার শরীর তো খুবই কাহিল হ'য়ে গেছে মা।"

পদ্মা অন্নদার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সিঁড়ি বহিয়া উপরের বারান্দায় উঠিয়া দেখিল, সিঁড়ির ঠিক উপরেই একটী মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। অন্নদা মেয়েটির পানে চাহিয়া বলিলেন, "মাধু, বৌমাকে প্রণাম কর্।"

মেয়েটি নত হইয়া পদ্মাকে প্রণাম করিল। পদ্মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাসিমা, এটি কে ?"

অন্নদা সনিশ্বাসে ভারি গলায় বলিলেন, "মাধুরী-আমার ভাসুরের মেয়ে। দু'বছরেরটি রেখে এর বাপ মা মারা গেলেন, সেই হ'তে আমিই ত একে পালছি।" পদ্মা এইবার মাধুরী নামধারিণী মেয়েটির পানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। অপরূপ রূপসী! পুষ্পিত পল্লবিত নববসন্তের লাবণ্য ও মাধুরী লইয়া বিধাতা তাহাকে গড়িয়াছেন। কিছুক্ষণ মাধুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়া পদ্মার মনে হইল, তাহার ভিতরটাও বুঝি বাহিরের মত মিষ্ট। পদ্মার ক্লিষ্ট ভারাক্রান্ত চিত্ত খানিকটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। এইসব রকমে সুন্দর মেয়েটির সঙ্গ নিশ্চয়ই তাহার আরামদায়ক হইবে।

ভাসুরের মৃত্যুর পর অন্নদা এতদিন শুধু মোহিতের আর্থিক সাহায্য অবলম্বন করিয়া স্বামীর ভিটায় আছেন বটে, কিন্তু পদ্মার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। তিনি থাকেন সুদূর পল্লীতে, আর পদ্মা পাঁচ ছয় বছর মোহিতের সঙ্গে কলিকাতায় আছে। শাশুড়ী বধূতে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে বেশী দিন লাগিল না। পদ্মা মহা উৎসাহে কএক দিন অন্নদার সঙ্গে ঠাকুর দর্শন করিয়া বেড়াইল।

একদিন দুপুর বেলা পদ্মা অন্নদার পাকা চুল তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যত দিন এখানে থাকব, আপনি ততদিন এখানে থাকবেন ত ?" অন্নদা বলিলেন, "থাকব বৈ কি মা। বাড়ীতেও মোহিত খেতে দেয়, এখানেও সেই তো দিচ্ছে, বেশীর ভাগ রোজ ঠাকুরদর্শন করছি। ছেলের বৌ কেমন জিনিস তা জানিনি ত এতদিন। তোমায় কাছে পাব, সেও ত কম কথা নয়।"

"আপনার মাধুরী কিন্তু বেশ মেয়ে মাসিমা। ওর বয়স কত ?"

"চোদ্দ। বিয়ের বয়স ত উতরে গেল, ওর অদৃষ্টে কি আছে ভগবান জানেন।"

"মাধুর ভাল বিয়েই হবে, লক্ষ্মীর মত রূপ।"

"শুধু রূপে কি হবে বৌমা ? ছেলেরা হয় ত রূপ দেখে বিয়ে করতে চাইবে, কিন্তু ছেলের বাপেরা তো বিনি টাকায় রাজি হবে না।"

এমন করিয়া নানা কথায় বেলা শেষ হইয়া আসিল। পদ্মা নিজের চুল বাঁধিয়া মাধুর চুল বাঁধিয়া দিল। তারপর দু'জনে কাপ ড় ছাড়িয়া বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইল। উপরে

গাঢ় নীল আকাশ, নীচে গাঢ় নীল সমুদ্র। দুই-ই স্বচ্ছ, দুই-ই সীমাহারা। শান্ত সাগরজলে স্নান করিয়া বাতাস বেশ শান্ত ভাবেই বহিতেছিল, বেলা শেষের অপ্রখর রৌদ্র সাগরের ঢেউয়ের মাথায় চড়িয়া হীরার মুকুটের মত ঝল মল করিতেছিল। দিগন্তে—যেখানে আকাশও সাগরের নীলিমা মিশিত হইয়া গিয়াছে, পদ্মা সেই খানে দৃষ্টি স্থির করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনিট দুই কোন মতে পদ্মার নির্ব্বাক্ ভাব সহ্য করিয়া মাধুরী বলিয়া উঠিল, "বৌদি, অমন ক'রে কি দেখছ তুমি?"

"পদ্মা একটু চমকিয়া বলিল, সমুদ্র।"

মাধুরী বিস্ময়ের হাসি হাসিয়া বলিল, "মাগো, সমুদ্র তোমার এত ভাল লাগে! মা আর তুমি পুরীর যতই সুখ্যাত করনা কেন, এর চেয়ে আমাদের গ্রাম আমার ঢের ভাল লাগে।"

পদ্ম বলিল, "বাড়ীর জন্যে তোমার মন কেমন করে নাকি?"

"মাঝে মাঝে করেই ত।"

"তুমি লেখা পড়া জান মাধু?"

"একটু একটু জানি, পাঠশালায় কিছুদিন পড়েছিলাম। কিন্তু তুমি যে সব বই পড়, আমি তার কিছু বুঝিনে।"

"বুঝতে চেষ্টা করনা কেন? কাল থেকে তুমি পড়বে।"

"কে পড়াবে আমায়? তুমি নাকি?"

পদ্মা মাধুরীর সুন্দর কালো চোখ জোড়ার বিস্মিত চাহনি দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ, আমিই পড়াব।" পদ্মা মোহিতের ছাত্রীও বটে। স্ত্রী বিদুষী বলিয়া বন্ধুমহলে একটু গর্ব্ব করিতেও সে ছাড়িত না। তাহার স্ত্রী ত খালি "দুর্গেশ নন্দিনী," "স্বর্ণলতা" পড়িয়াই সাহিত্য চর্চ্চা শেষ করে নাই, সে যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের সমগ্র রচনার সঙ্গে কয়েক খানা ইংরেজী নভেলও পড়িয়া ফেলিয়াছিল। সে মাসিক পত্রিকার শুধু গল্পই খোঁজে না, এমন কি, প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় রচনাও সাগ্রহে পড়িয়া থাকে।

(৩)

মোহিত যে দিন পুরীতে আসিল, মাধুরী সে দিন কহিল, "বৌদিদি, তুমি আজ কেবলি হাসছ।"

পদ্মা বলিল, "কেন বল দেখি?"

মাধুরী বলিল, "নিশ্চয়ই মোহিত দা তোমায় কোন মজার গল্প বলেছেন। নয় কি?"

মাধুরীর এই আবিষ্কারে পদ্ম আরও খানিক হাসিল। মাধুরী মেয়েটি বয়সের হিসাবে তেমন চালাক নয়। সে এই পুরীর বাড়ীতেও পাঁচবছরের শিশুটির মত ছুটাছুটি ও খিল খিল উচ্চ হা[illegible] জন্য অনেকবার ভর্ৎসনা লাভ করিত। মাধুরীর [illegible] বুদ্ধি শুদ্ধি হই[illegible] না বলিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতে[illegible] মাধুরীর এই শিশুসুলভ চাঞ্চল্য ও সরলতা পদ্মার [illegible] মাধুরীর দি[illegible] আকৃষ্ট করিত। পদ্মা সস্নেহে মাধুরীর [illegible]তে কুঞ্চিত গোলাপি গাল দুটি টিপিয়া দিয়া বলিল, "[illegible] করছে দেখে আয় ত।" মাধুরী ছুটিয়া চলিয়া গে[illegible]

পদ্মা রাত্রে শুইতে [illegible] মোহিত [illegible] গম্ভীর ভাবে বলিল, "পদ্মা, পুরীতে [illegible] আমি বড় ব্যথা পেয়েছি।"

পদ্ম বিস্মিত ও ঈ[illegible] শঙ্কিত হ[illegible] বলিল, "সেকি! কেন?"

"বিরহে মানুষ [illegible] হয়ে যায়, এটা হচ্ছে, সনাতন নিয়ম। আর তুমি [illegible], আমায় ছেড়ে এসেও সবল সুস্থ হ'য়ে উঠছ। এ[illegible] কি প্রমাণ হচ্ছে না যে, তুমি আমায় ভালবাস না?"

"ওঃ, এই তোমার [illegible] কারণ? আমি তোমায় ভালবাসি' এ কথা ত [illegible] কখন বলিনি তোমায়। যাক্ তুমি কদ্দিনের ছুটি নিয়ে [illegible] নইলে সে ত বল্লে না।"

"দু' দিনের ছুটি নি[illegible]।"

"অর্থাৎ দু'মাসের। [illegible] দু' [illegible] পরে আমি কিন্তু কলকাতা যাব।"

"আচ্ছা, সে তখন [illegible], ট্রেনে বড় [illegible] হ'য়ে এসেছি। কপালে এ[illegible] বাঁধে দাও না, লুমুই।"

বলিয়াই মোহিত পদ্মার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। পরদিন পদ্মা ও মাধুরী ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া রান্না ঘরে ঢুকিল। পাচক ঠাকুর তাহার রাজত্ব বেদখলের উপক্রম দেখিয়া কর্ত্রীর উপর দরদ দেখাইবার জন্য যথেষ্ট মৌখিক আপত্তি প্রকাশ করিলেও হৃষ্ট মনে রান্না ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এক দিনের মুক্তিও ত তুচ্ছ কথা নয়। পদ্মার নিষেধ সত্বেও মাধুরী দু'একটা রান্না না

করিয়া ছাড়িল না। পদ্মাকে কিছু কিছু নূতন রান্না করিতে দেখিয়া সে সে সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন করিতে লাগিল। রান্না শেষ হইলে সে পদ্মার হুকুম মত সোৎসাহে লাফে লাফে সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া যাইয়া পাঠ নিরত মোহিতকে চমকাইয়া দিয়া বলিত, "মোহিত দা, রান্না হয়েছে, খেতে আসুন।"

এই নিঃসঙ্কোচ আহ্বানে মোহিত একটু আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আগুনের উত্তাপে রক্তাভ মাধুরীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ পানে মোহিতের মৌন প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি কএক মুহূর্ত্তের জন্য অবিচল হইয়া রহিল।

মোহিত ও অন্নদার ঘোরতর আপত্তি মৃদু হাসির সহিত নিঃশব্দে উপেক্ষা করিয়া পদ্মা চিরাভ্যাস মত মোহিতের কাযগুলি নিজের হাতে করিয়া যাইতে লাগিল। আর তাহার সকল কাযে মাধুরী ছায়ার মত তাহার সঙ্গে থাকিত। এমনি করিয়া মাসখানেক কাটিয়া গেল।

একদিন খুব ভোরে মাধুরী পদ্মার ঘরে ঢুকিয়া ভয়ার্ত্তস্বরে বলিল, "বৌদিদি, কাল রাত্তিরে মার বড্ড জ্বর হয়েছে সারারাত ছটফট্ করেছে। কতবার তোমাকে ডাকতে চেয়েছি; কিছুতেই মা ডাকতে দিলে না। এখন একবার দেখে যাও।"

পদ্মা তাড়াতাড়ি অন্নদার ঘরে গেল। অন্নদার অত্যন্ত উত্তপ্ত ললাট ও রক্তচক্ষু দেখিয়া সে একটু ভীত হইল। বলিল, "মাসীমা খুব যাতনা পাচ্ছেন?"

অন্নদা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন। "কিসের যাতনা? একটু জ্বর হয়েছে, উপোস দিলেই সেরে যাবে। মেয়েটা বুঝি তোমায় ব্যস্ত ক'রে তুলেছে? তুমি যাও মা, মোহিতের চা করগে।" পদ্মা উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু চা করিতে নয়। অল্পক্ষণ পরেই মোহিতকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। মোহিত দেখিয়া শুনিয়া ডাক্তার ডাকিতে উঠিল, অন্নদার নিষেধ গ্রাহ্য করিল না।

তিন চারদিনের মধ্যে অন্নদার রোগ বড় বাড়িয়া গেল। পদ্মা বলিল, "এখন আর একলা মাধুকে রাত্তিরে মাসীমার ঘরে রাখা যায় না। ছেলেমানুষ, সে রোগীর কি করতে জানে? আজ থেকে রাত্তিরে আমি মাসীমার ঘরে থাকব।"

প্রবল আপত্তির সহিত মাথা নাড়িয়া মোহিত বলিল, "সে হ'তেই পারে না পদ্মা। তোমার শরীর—কত চেষ্টায় একটু ভাল হয়েছে—রাত জাগলে কি আর থাকবে? দিনের বেলায় তুমি, আর রাত্তিরে আমি থাকব মাসীমার কাছে।"

মোহিত কোন মতেই পদ্মাকে রাত্রি জাগরণ করিতে দিল না। মোহিত ও পদ্মার সেবাযত্নে, চিকিৎসা ও পথ্যাদির বন্দোবস্তে অন্নদা অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতেন। পরান্নভোজী বিধবার মূল্যহীন জীবনের জন্য এত কেন?

রাত এগারটা বাজিলেই মাধুরী মোহিতকে বলিত, "দাদা, এখন আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন না। পরে আপনাকে জাগিয়ে দিয়ে আমি ঘুমব।" মোহিত বলিল, "তুমিই আগে ঘুমিয়ে নাওনা মাধু।" ফলে কেহই ঘুমাইত না। মোহিত যখন চঞ্চলা হাস্যময়ী মাধুরীকে ম্লানমুখে স্থিরভাবে অন্নদার শিয়রে বসিয়া থাকিতে দেখিত, তখন এই মা বাপ-হারা মেয়েটির জন্য দুঃখে করুণায় তাহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিত। কাজেই রোগিণী ঘুমাইলে সে নিজে বিশ্রাম না করিয়া নানারকম গল্পে মাধুরীর মন তাজা করিতে সচেষ্ট হইত। সাত আট রাত্র জাগরণের পরে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই মোহিতের একান্ত নিদ্রাতুর চক্ষু বুজিয়া আসিয়াছিল। ঘড়ির ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনিয়া মোহিত চকিতে সোজা হইয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল, অন্নদা ঘুমাইতেছেন, তাঁহার বালিশে ছড়ান রুক্ষচুলের উপর মাধুরীর চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে। এই দৃশ্যটা মোহিতকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সে মাধুরীর কাছে যাইয়া হাত ধরিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া বলিল, "কেঁদোনা, মাসীমা ভাল হ'য়ে উঠবেন।"

মাধুরী কান্নার বেগ সামলাইতে না পারিয়া মোহিতের পায়ের কাছে মেঝে লুটাইয়া পড়িল। মোহিতের সমগ্র মন সমবেদনায় উথলিয়া উঠিল। শোকার্ত্তা বালিকাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মেঝে বসিয়া মাধুরীর লুণ্ঠিত মাথাটি কোলে তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।

দুই সপ্তাহ ধরিয়া মোহিত, পদ্মা ও মাধুরী অন্নদাকে লইয়া যেন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে। কিন্তু তাহাদের ক্লান্তি হীন সেবায় রোগিণীর চিত্ত যথা সম্ভব প্রফুল্ল ও প্রসন্ন

থাকিলেও যমকে বিমুখ করিতে পারিল না। একদিন দুপুর বেলা অন্নদা মাধুরীর মাথাটি বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন, "তোকে যেদিন বুকে পেয়েছি মাধু, হাজার দুঃখ পেয়েও সেদিন থেকে আর মরণ কামনা করিনি। তোকে ছেড়ে আমার মরণেও সুখ নেই। কিন্তু আজ তোকে ছেড়ে যে যেতেই হবে। ভাল হ'য়ে থেকো মা, আর কি বলব?" তারপর মোহিত ও পদ্মার পানে চোখ ফিরাইয়া বলিলেন, "মাধুকে তোমাদের হাতে রেখে গেলাম। ওরত আর কেউ রইল না।

সন্ধ্যার শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে হরিনাম করিতে করিতে অন্নদা শান্ত ভাবে চক্ষু বুজিলেন।

(৪)

তিন চারি মাস হইল মোহিত পদ্মাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। মাধুরীও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে। মোহিত মাধুরীকে তাহার পিতৃ-জ্ঞাতিদের কাছে পাঠাইতে চাহিয়াছিল।* অবশ্য তাহার বিবাহের ব্যয় এবং বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত খোর পোষ মোহিতই দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পদ্মা তাহাতে রাজি না হইয়া বলিয়াছিল, "মাসিমা ত ওকে আমাদের কাছেই রেখে গেছেন। আমাদেরই দেখে শুনে বিয়ে দিতে হবে।"

পদ্মার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে চলিবার মত বল মোহিতের কখনও ছিল না, তখনও হয় নাই। কাযেই মাধুরীকে সঙ্গে আনিতে হইয়াছে।

একদিন পদ্মা মোহিতকে বলিল, "মাধুর বিয়ের কি করলে?" মোহিত আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া চুল বিন্যাস করিতে করিতে বলিল, "কি আর করব? তুমি যেমনটি চাও, তেমনটি ত সহজে পাওয়া যায় না।"

"আমি কি রাজপুত্র চাই নাকি?"

"তা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ব'লেই চাচ্ছ না। তোমার মনের মত ঘর বর ত মাধুকে নিতে চায় না।"

"গয়না টাকা শুদ্ধ অমন সুন্দর মেয়েও নিতে চায় না!"

"চাইবে কেন? হাজার রূপ গুণ থাকলেও সে যে পরান্নপালিতা। জেনে রেখো, আমি চেষ্টার ত্রুটি করছিনে।" বলিয়াই মোহিত জামা গায় দিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। পদ্মা বলিল, "এই আফিস থেকে এলে, এখনি আবার কোথা যাচ্ছ?"

"অনন্ত বাবুর ওখানে কায আছে" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মোহিত বাহির হইয়া গেল। পদ্মা স্তব্ধ ব্যথিত হইয়া শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে মাধুরী আসিয়া বলিল, "ওকি, বৌদিদি, তুমি যে একলাটি রয়েছ, মোহিত দা কোথায়?"

পদ্মা চোখ না ফিরাইয়াই বলিল, "বেরিয়ে গেছেন।"

"ওমা, এখনি! আজ কাল তাঁর হয়েছে কি? এখন আর আফিস থেকে এসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে তেমন গল্প করেন না কেন? আমার সঙ্গে তো কথা বলাই এক রকম বন্ধ করেছেন। পুরীতে দেখেছি, জোর ক'রে তোমাকে কাছে বসিয়ে রেখে কেবলি গল্প, কেবলি হাসি তামাসা করেছেন। প্রথম প্রথম এখানেও তো সেই রকম দেখেছিলাম। এখন হলো কি মোহিত দার?"

মাধুরীর কথা শুনিয়া পদ্মা শিহরিয়া উঠিল। মোহিতের ভাবান্তর এতই স্পষ্ট, এমনই অদ্ভুত যে, মাধুরীর মত মেয়েও তাহা লক্ষ্য করিয়াছে! স্বামীর পরিবর্ত্তনের ব্যথা পদ্মার অন্তর আহত করিয়াছে। সেই রক্তাক্ত ক্ষতজ্বালায় পদ্মা ভিতরে সর্ব্বদা জ্বলিয়া মরে। কেন এমন হইল? কার দোষে? বাল্যেই মোহিত তাহার হৃদয় মথিত করিয়া যে অমৃত ভাণ্ডের অধিকার পদ্মাকেই দিয়াছিল, পদ্মা আজ কেন সে অধিকারচ্যুত হইতেছে? সে অধিকার যে পদ্মা জীবন-মূল্যে কিনিয়াছে। তাহার অভাবে পদ্মা ত একেবারেই নিঃস্ব, রিক্ত। সে তাহার অন্তরের গভীর গোপন বেদনা চোখের জলের সঙ্গে কতদিন দেবতার পায় নিবেদন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি হইল? তাহার নিয়তির মতই দেবতারাও নিষ্করুণ। আজ সে এ সম্বন্ধে মোহিতের সঙ্গে স্পষ্ট আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসা করিয়া লইবেই লইবে।

রাত্রি বারোটায় মোহিত ফিরিল। পদ্মা তাহার জামা জুতা খুলিয়া লইয়া তাহার কাছে বসিয়া দু'চারিটা কথা বলিয়া তাহাকে খাওয়াইতে বসাইল। মোহিতের খাওয়া হইয়া গেলে পদ্মা তাহাকে পাণ দিল। মোহিত পাণ লইয়াই শুইয়া পড়িল। পদ্মা দরজা বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিল। মোহিত বলিল, "ওকি, তুমি খেলে না?"

"খাবনা, শরীরটা ভাল নেই।"

"কি অসুখ করেছে? কৈ, আমায় কিছু বলনি ত?"

"কিদে পায়নি, অসুখ আর কি করবে?"

"এত তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে দিলে কেন?"

আলো থাকিলে পদ্মা যে কিছুই বলিতে পারিবে না। বলিতে বলিতে যদি তাহার চোখ হইতে জল পড়ে? বেদনায় যদি তাহার মুখ রক্তশূন্য—বিবর্ণ হইয়া যায়? কি লজ্জা! এখন সে মোহিতকে এতটা দুর্ব্বলতা দেখাইতে পারিবে না। পদ্মা মোহিতের পায়ের কাছে বসিয়া শান্ত ভাবে বলিল, "একটা কথা বলবে?"

মোহিত শিহরিয়া উঠিল। শুষ্কস্বরে বলিল, "কেন বলব না?"

পদ্মা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিল। তারপর মৃদু দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে, আমায় বল। তুমি ত কোনদিন কিছু লুকোওনি আমার কাছে।"

মোহিত সহসা সজোরে পদ্মার হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধপ্রায়স্বরে বলিল, "পদ্মা, পদ্মা, এখনত আমি তোমার কাছে কিছু লুকুতে পারিনে। তোমার কাছে সব কথা বলবার জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠেছে। আমি মহা অপরাধী,—আমি—আমি—"

"স্থির হও। অতটা অধীর হ'লে কেন? আমি জানি, তুমি মাধুরীকে ভালবাস।" পদ্মার ধীরকণ্ঠে উচ্চারিত এই কথায় মোহিত বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পদ্মাও তবে তাহাকে আর ভালবাসে না! নহিলে এই কথাটা উচ্চারণ করিতে যে তাহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়া যাইবার কথা। পদ্মা মোহিতের পায় হাত বুলাইতে বুলাইতে একান্ত সহজভাবে বলিতে লাগিল, "যেদিন প্রথম মাধুকে দেখেছি, সেইদিন আমিও তাকে ভালবেসেছি। তুমিও তাকে ভালবাস জানি। আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি তাকে বিয়ে কর। আমরা দু'জনে মিলে তোমায় সুখী করিতে চেষ্টা করব। বল, বিয়ে করবে?" মোহিতের বিচলিত আর্ত্তকণ্ঠে শ্রুত হইল, "ক্ষমাকর! ক্ষমাকর! না, না, শাস্তি দাও! কিন্তু পদ্মা, অমন—"

"তাতে দোষ কি? দুই বিয়েত পাপ নয়, কতলোকে ক'রে থাকে। তুমি যে আত্মদমন করতে চেষ্টা করেছ, তাও আমি জানি। রাগ ক'রে তোমায় বিয়ে করতে বলছিনে। বিয়ে করতেই হবে তোমাকে" বলিতে বলিতে পদ্মা ঈষৎ নত হইয়া মোহিতের পাখানা বুকে চাপিয়া ধরিল।

(৫)

পদ্মার পাঁচ সাতদিন গেল মোহিতকে বিবাহে রাজি করাইতে।

পদ্মা কি স্বামীর সুখের জন্য এই ত্যাগটুকু করিতে পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। মোহিত মাধুরীকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, একি স্বপ্ন, না সত্য? সত্যই। কিন্তু এ সত্যের রূপ বড় কঠোর। এই সত্যের দুঃসহ নির্ম্মমতায় তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কে যেন দারুণ বেদনায় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে। ছি! কি হীন এই দুর্ব্বলতা! সে এই বেদনা বহন করিবে তাহার একান্ত প্রিয় স্বামীর জন্য, অন্যের জন্য নয় ত! কিন্তু মাধুরীর মত তো এখনও জানা হয় নাই। তারজন্য বেশী ভাবিতে হইবে না। পদ্মা যাহা ভাল বোঝে, মাধুরীও তাহাই ভাল বুঝিবে।

মাধুরী তাহার একরাশ কালোচুল সুশৃঙ্খল রাখিবার জন্য লাল রেশমী ফিতাটি লইয়া মাথায় বাঁধিতেছিল, কিন্তু বার বার চেষ্টা করিয়াও পদ্মার মত সুন্দর করিয়া বাঁধন দিতে না পারিয়া ব্যর্থতায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এমনি সময়ে পদ্মা যাইয়া তাহাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মাধু, আমি আর তোকে কোথাও যেতে দেব না, আমার বোন হ'য়ে আমাদের ঘরেই থাক্‌বি তুই! কি বলিস্‌?"

বৌদিদির বোন! বড় মজার কথা! মাধুরী তাহার স্বাভাবিক উচ্চহাস্যে ঘরখানি তোলপাড় করিতে উদ্যত হইয়া সহসা পদ্মার মুখপানে চাহিয়া অবাক্‌ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সব রকম দ্বিধা, সঙ্কোচ, ব্যথা চিত্ত হইতে কাড়িয়া ফেলিবার বিপুল চেষ্টার চিহ্ন একটি মুহূর্ত্তের জন্য পদ্মার মুখ চোখে এত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছিল যে, মাধুরীও আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না। সে এই দু'মাসে পদ্মার এমন মুখ দেখে নাই। সে বিস্ময়াপ্লুতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ করেছে তোমার?"

পদ্মা মৃদুস্বরে বলিল, "নারে।"

"তুমি না আমায় বল্‌ছিলে, মিছে কথা বলতে নেই। এখন নিজেই বলছ?" পদ্মা অন্তরে লজ্জিত হইয়া বলিল,

"তোর ইতিহাস শেখা হ'য়েছে মাধু?" মাধুরী সোৎসাহে বলিল, "হয়েছে, খুব হয়েছে। জিজ্ঞেস করনা।" বলিয়াই ছুটিয়া গিয়া টেবিল হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসখানা টানিয়া আনিয়া পদ্মার হাতে দিল। পদ্মা ইতিহাস খুলিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া অন্ত কাজে চলিয়া গেল।

আট দশদিন পরে পদ্মার দাদা পদ্মাকে লইতে আসিলেন। পিতার কঠিন পীড়া, পদ্মাকে যাইতে হইবে। পদ্মার অনুপস্থিতিতে সংসারে কি হইবে না হইবে, সে সম্বন্ধে পদ্মা ঝি চাকর ও স্বামীকে বার বার নানা উপদেশ দিয়া যাওয়ার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিল। পদ্মা হেঁট হইয়া পিতার জন্ত নানারকম ফল এবং নিজের নিতান্ত দরকারী জিনিসগুলা টাঙ্কে গুছাইয়া রাখিতেছিল। মোহিত যে অনেকক্ষণ তাহার পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা টের পায় নাই। নিশ্বাসের শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, "চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? বোস না।" মোহিত পদ্মার কাছেই মেঝে বসিয়া পড়িল। তারপর ফলের ঝুড়ি হইতে আঙ্গুরের বাক্সটা তুলিয়া লইয়া নাড়িতে নাড়িতে নত দৃষ্টি হইয়া মৃদু জড়িতস্বরে বলিল, "মাধুরীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ তো?"

পদ্মা বলিল, "না। ব্যামোর বাড়ীতে তার আদর যত্ন হবে না। আর অতবড় মেয়ে পাড়াগাঁয় নিয়ে গেলে নিন্দেও হ'তে পারে। শ্বশুরের আমলের ঝি, আমাদের আপনার লোক, তার সঙ্গে মাধু এ কটা দিন থাকতে পারবে। ঝিকে বলেছি, মাধুর ঘরে শুতে।" তারপর হাসিয়া বলিল, "তোমারও ভয় নেই, তোমার ওপর আমার অবিশ্বাস নেই।"

অবিশ্বাস নাই! কথাটা তীব্র কষাঘাতের মত মোহিতের চিত্ত আহত করিল। সে আড়ষ্ট নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

রাত্রের ট্রেণে পদ্মা পিত্রালয়ে রওনা হইয়া গেল।

(৬)

একমাস পরে মোহিত পদ্মাকে আনিতে ষ্টেশনে গেল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া পদ্মা মোহিতের কাছে বাসার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, কলিকাতার জনসমুদ্র হইতে মোহিত মাধুরীর এক দূর সম্পর্কীয় কাকা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে এবং দিন পঁচিশেক হইল, মাধুরীকে সেই কাকার বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছে পদ্মা ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে মোহিত বলিল, "রাগ কর কেন? বিকেল বেলাই তাকে আনা যাবে পদ্ম।"

পদ্মা বাসায় পৌঁছিয়া স্নানাহারের পর খানিকটা বিশ্রাম করিয়া মাধুরীকে আনিতে লোক ও গাড়ী পাঠাইয়া দিল।

কর্ত্রীর অভাবে ঘরের জিনিসপত্র সব বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া পদ্মা ঘরগুলি সাজাইতে গুছাইতে লাগিয়া গেল। পদ্মার কাজ সারিতে চারিটা বাজিয়া গেল। চারিটার পর গাড়ীর শব্দ শুনিয়া সে বারান্দায় রেলিং ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নীচে গাড়ী আসিয়াছে, গাড়ীর কাছে মোহিত দাঁড়াইয়া আছে; অবগুণ্ঠিতা মাধুরীর সঙ্গে এক সুন্দর সুসজ্জিত যুবা গাড়ী হইতে নামিতেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পদ্মার চোখ ও মনের বিহ্বলতা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়া মাধুরী ও সেই যুবা আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। সে চাহিয়া দেখিল, সেই প্রণত তরুণ তরুণীর পিছনে বিচারকের কাছে দণ্ডপ্রার্থীর ভাবেই মোহিত দাঁড়াইয়া আছে। পদ্মার বিহ্বলতা ও স্তব্ধতা ভাঙ্গিবার জন্ত মোহিত যুবককে বলিল, "এস অতুল, আমরা ঐ ঘরে বসি।"

মোহিতের সঙ্গে যুবক চলিয়া গেলে মাধুরী ঘোমটা খুলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া পদ্মাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "ওকি, বৌদিদি, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মূর্চ্ছা গেলে নাকি? কথা বলছ না কেন? কি হয়েছে তোমার?" পদ্মা যেন গভীর নিদ্রা হইতে ধড়মড়িয়া জাগিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "কখন এলে?"

মাধুরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই তুমি বাপের বাড়ী থেকে জ্বর বিকার নিয়ে এসেছ।"

পদ্মা সামলাইয়া লইয়া মাধুরীর সীঁথির সিন্দুর রেখাটির পানে ভাল করিয়া আর একবার চাহিয়া বলিল, "কেমন আছিস? কবে, কি রকমে তোর বিয়ে হলো বল দেখি?"

পদ্মার প্রশ্নের উত্তরে মাধুরী যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই—পদ্মা চলিয়া যাওয়ার পাঁচ ছয়দিন পরে মোহিত মাধুরীকে এক কাকার বাড়ী রাখিয়া আসিল। অচেনা কাকার বাড়ী যাইতে মাধুরী আপত্তি করিলে মোহিত তাহাকে এমন ধমক দিল যে, সে তাহা সাতজন্মেও

ভুলিতে পারিবে না। কাকার বাড়ী দশ বারোদিন থাকার পরে মোহিত যাইয়া কাকাকে বলিল, কাল মাধুরীর বিবাহ হইবে। পাত্র তাহার বন্ধু অতুল, বি, এল, পাশ করিয়া আলিপুরে প্র্যাক্টিস করিতেছে। সে এতদিন বিবাহে একান্ত অনিচ্ছুক ছিল, মোহিতের অনুরোধ ও জিদে হঠাৎ বিবাহে মত দিয়াছে। কাল ছাড়া এক মাসের মধ্যে বিবাহের ভাল দিন নাই। ততদিন দেরী করিলে অতুলের মত বদলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং যথাশাস্ত্র বিবাহ কালই কাকার বাড়ীতে হইবে, বিবাহের ব্যয় মোহিতই দিবে। বিবাহের অন্যান্য অনুষ্ঠান পদ্মা আসিয়া করিবে। অগত্যা কাকাকে রাজি হইতে হইল এবং যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়া গেল। শুনিতে শুনিতে জলে পদ্মার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল। "তোর গায় ত নতুন গয়না কোনও দেখছি নে।" বলিয়া পদ্মা চলিয়া গেল। নিজের কয়েকখানা অলঙ্কার লইয়া পরে ফিরিয়া আসিয়া সে তাহা মাধুরীকে পরাইয়া দিল। তারপর তাহার ললাট চুম্বন করিয়া মনে মনে বলিল, "পতিসোহাগিনী —পতিব্রতা হও।"

নূতন জামাইএর আদর আপ্যায়ন এবং খাবার তৈয়ারী করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রি বারোটার পর পদ্মার সঙ্গে মোহিতের নির্জ্জনে দেখা হইলে মোহিত বলিল, "পদ্ম, তুমি চ'লে গেলে দু'দিন কেবল ব'সে ব'সে জীবনের অতীত ও বর্ত্তমান ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে মনে হলো; আমি যে তোমাকে ছাড়া আর কারুকে ভালবেসে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি, তাকি সত্য? এই ভাবনায় দশবারোদিন পরে নিশ্চয় ক'রে বুঝলাম, এই ব্যাপারটা আগাগোড়া দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন মুক্তির আনন্দে আমার সারা মন ভ'রে উঠল। তারপর যা করেছি, তাত জেনেছ। তুমি কি আমার দুঃস্বপ্নের কথা কখনো ভু'লে যেতে পারবে না?"

পদ্মা তাহার কোমল দেহটা কোন মতে টানিয়া আনিয়া মোহিতের পায় ফেলিয়া দিতেই মোহিত তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। পদ্মা স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। তারপর কান্নার বেগ থামিলে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "মাধুকে তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশী ভালবাস, তাই আমাকে না জানিয়েই অতুলবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছ। তুমি নিজে বিয়ে করলে যে তাকে সতীনের জ্বালায় জ্বলতে হতো, এই ভয়েই তুমি তার বিয়ে দিলে, সে কি আমি বুঝিনে?"

"এমন গূঢ় তত্ত্বটা টেনে বের করলে! এত বুদ্ধি তোমার!" বলিয়া মোহিত বহুকাল পরে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল!

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা

সহানুভূতি

(ইংরাজী হইতে)

পড়িনু দৈন্য জনিত দুঃখ ঘোরে
ধনী আত্মীয় হেরিয়ে আমার ব্যথা,
সুখবিধ করি কিছু টাকা দিয়া মোরে
রক্ষা করিল কহিল না মিঠে কথা।

সুসময় এলো রহিল না সেই দিন
কহিনু সবারে দানের কথাটি তার,
ধন্য হৃদয়ে পরিশোধ করি ঋণ
নেমে গেল মোর হৃদয়ের গুরু ভার।

শোক নিদারুণ উপজিল তার পর
গরীব বন্ধু আসিল শুনিয়া তাহা,
বক্ষে ধরিয়া শিরে সে বুলাল কর
শিয়রে আমার রাত্রি জাগিল আহা।

তার কথা বুকে জাগিতেছে নিশিদিন
কৃতজ্ঞতায় চোখে বহে যায় বান,
টাকাকড়ি হলে শোধা যায় বটে ঋণ
অপরি শোধ্য কর্জ্জ এই দান।

শ্রীকালিদাস রায়

সংস্কারকের দুঃস্বপ্ন

হরিহরবাবু একজন বড় সমাজসংস্কারক। হিন্দু সমাজের কোথাও এমন একবিন্দু গলদ নাই, যাহা তাহার তীব্র আক্রমণের বিষয়ীভূত হয় না। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—এ সমাজকে তাহার বহুদোষ হইতে মুক্ত করিয়া আদর্শ-সমাজে পরিণত করিবেন। এইজন্য অনেক সময় তিনি অন্য কর্ত্তব্য কাজ ছাড়িয়াও সমাজসংস্কারের জন্য বক্তৃতা দিতে ছুটেন। পিতার সঞ্চিত অর্থের কৃপায় অন্নাভাব না থাকায়, তাহার বক্তৃতার স্রোতে বাধা পড়িবার তেমন কোনও কারণ কোনও দিন ঘটে নাই।

সেদিন ছিল রবিবার। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে 'টাউন হলে' একটা বড় সভা হইবে। সকাল বেলাতেই কয়েকজন লোক আসিয়া হরিহরবাবুকে বক্তৃতা করিবার অনুরোধ করিয়া গেলেন। হরিহর বাবুও বিশেষ উৎসাহের সহিত স্বীকার করিলেন।

তাহার স্ত্রী প্রমীলা সমস্ত শুনিয়াছিলেন। লোক কয়জন চলিয়া গেলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের বক্তৃতা দিতে যাবে গা?"

হরিহরবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "বিধবা বিবাহের। আমাদের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজে বিধবাদের উপর কি অত্যাচারটাই না হয়! একটা উপায় আমাকে করিতেই হবে।"

প্রমীলা হাসিয়া স্বামীর স্কন্ধে হস্তারোপণ করিয়া বলিলেন, "তুমি কি সত্য সত্যই মনে কর হিন্দুবিধবার ফের বিয়ে হওয়া উচিত? নিজের কারও বিয়ে দিতে হ'লে বোঝা যেত।"

"কি বোঝা যেত? আমি কি দিতুম না মনে কর? আমি যদি এখন মরে যাই, তা'হ'লে তোমারও—"

প্রমীলা স্বামীকে একটা ধাক্কা দিয়া তাহার কথায় বাধা দিল, মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "ছি! কি যে বল ছাই!"

হরিহরবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অন্যায় কি বল্‌ছিলুম? যা' সত্য, যা ন্যায়, তাই বল্‌ছিলুম।"

প্রমীলা কৃত্রিম রোষে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁগো, হাঁ! খুব সত্যি খুব ন্যায্য কথা বলেছ! ওরকম বল্‌বে ত আমি চল্‌লুম।"

এই বলিয়া প্রমীলা চলিয়া যাইতেছিল। হরিহরবাবু বলিলেন, "প্রমীলা, যেওনা, শোন শোন।" প্রমীলা তবু ফিরিল না দেখিয়া, নিজে উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে টানিয়া আনিলেন। হরিহরবাবু হাসিতে লাগিলেন, প্রমীলার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

বৈকাল বেলায় যথাসময়ে হরিহরবাবু বক্তৃতা দিতে গেলেন। সেদিন তিনি এমন উত্তেজনাময় বক্তৃতা করিলেন, যে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। হিন্দু-বিধবার বিবাহ হওয়া যে সম্পূর্ণ উচিত, বিধবাবিবাহ না হওয়ায় যে হিন্দু সমাজের নানারূপ ক্ষতি হইতেছে, এখনও সাবধান না হইলে যে আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। তাহার বক্তৃতার সময় শেষে শ্রোতৃমণ্ডলী বারবার করতালি প্রদান করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিল, বক্তৃতান্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া উল্লাস-ধ্বনি শোনা গেল, দুই একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উঠিয়া হরিহরবাবুর করমর্দ্দন করিয়া তাহার প্রশংসা করিলেন। হরিহরবাবু বাহিরে কোনও আনন্দ প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু তাহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল! তখন বাটীতে যাইয়া স্ত্রীকে এই সংবাদ দিবেন ভাবিয়া তিনি মনে মনে ছটফট করিতে লাগিলেন।

সভাভঙ্গের পর একরূপ সংজ্ঞাহারা হইয়া তিনি আনন্দোৎফুল্ল মনে বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। হঠাৎ একখানি মোটর পিছনের দিকে শব্দ করিয়া উঠিল। হঠাৎ এরূপে আক্রান্ত হইয়া তাহার আনন্দের নেশা একরূপ ছুটিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া যেমন তিনি সরিতে যাইবেন, অমনি এক খানি দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়ীর সহিত বিষম ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গেলেন। পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। এক হাতের কব্‌জির হাড় সরিয়া গেল। কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফুটপাথের উপর লইয়া গেলেন। একখানি গাড়ী ডাকা হইল। তাহাকে মেডিকেল কলেজে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইতেছে, এমন সময় ভদ্রলোকদের শুশ্রূষায় তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি বাড়ী যাইতে চাহিলেন। ভদ্র-লোকেরা তাহাকে ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন এবং

একজন তাহার সঙ্গে তাহার বাটী পর্য্যন্ত যাইয়া তাহাকে বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

তাহার অবস্থা দেখিয়া প্রমীলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। প্রমীলা তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে চাকর পাঠাইলেন। যতক্ষণ ডাক্তার না আসিলেন, ততক্ষণ তিনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে হরিহরবাবু আর একবার সংজ্ঞা হারাইলেন।

ডাক্তারবাবু আসিয়া বলিলেন, "Brain এ আঘাত লেগেছে; তবে সেটা সহজেই সেরে যাবে; সেজন্যে ঔষধ দিচ্ছি। কিন্তু হাতখানা বড় বেশীরকম fracture হয়েছে; সেজন্যে chloroform করা দরকার হবে। কাল আমি কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে করে এসে সব ঠিক করে দিয়ে যা'ব।" এই বলিয়া ডাক্তারবাবু ঔষধ লিখিয়া দিয়া ও ব্যবহারের উপদেশ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমীলার নিকট হইতে চারিটী টাকা আনিয়া চাকর তাহার হাতে দিল; তিনি বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

ঔষধ আসিলে প্রমীলা ডাক্তারের উপদেশ মত কাজ করিতে লাগিলেন। হরিহরবাবুর আর মূর্চ্ছা হইল না। মাথা অনেক ভাল হইল। কিন্তু chloroform করিয়া তবে হাত ঠিক করিতে হইবে শুনিয়া তাঁহার বড় ভয় হইল। তাহার ভয় হইতে লাগিল, chloroform করিলে হয়তো তাহার মৃত্যু হইতে পারে। প্রমীলা যথেষ্ট সান্ত্বনা দিলেন; কিন্তু তাহার ভয় কিছুতে গেল না। তিনি বলিলেন, "কি হ'বে তা'হলে প্রমীলা?"

"কিসের কি হ'বে? তুমি এমন করছো কেন? আর কি কাউকে chloroform করে না?"

"না, তা' বলছি না। তোমার কথা ভাবছিলুম্। তা' আমি যদি মরে' যাই, তুমি ফের বিয়ে ক'রো।"

প্রমীলা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে উঠিয়া গেলেন। হরিহরবাবু পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, সে ভাবনার কুল কিনারা নাই।

পরদিন যথা সময়ে compounderকে সঙ্গে করিয়া ডাক্তারবাবু আসিলেন। তিনিও হরিহর বাবুকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিলেন। তাহার পর তাহাকে chloroform করা হইল। অল্পে অল্পে তাহার সংজ্ঞালোপ হইল; তখন তাহার মনে হইতে লাগিল: —————

তাঁহার মৃত্যু হইল। ছেলে কোলে করিয়া প্রমীলা কাঁদিতে লাগিলেন। প্রমীলার কান্না দেখিয়া তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইয়াছে—সান্ত্বনা দিবার উপায় নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রমীলা কাঁদিলেন। তারপর ডাক্তারবাবু আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবুকে তাহার স্ত্রীর হাত ধরিতে দেখিয়া, তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, শরীরের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু উপায় নাই—তাহার যে মৃত্যু হইয়াছে! ডাক্তারবাবুর সান্ত্বনায় প্রমীলার কান্না থামিল। প্রমীলার দিকে আগ্রহ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল ডাক্তারবাবুর হাড় মাস গুঁড়া করিয়া দেন; কিন্তু উপায় নাই।

পরদিন বৈঠকখানা ঘরে প্রমীলা ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ডাক্তার বাবু আসিলেন। প্রমীলা তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ডাক্তারবাবু আসিয়া প্রমীলার নিকটে বসিলেন। প্রমীলার ছেলে ডাক্তারবাবুকে নিকটে বসিতে দেখিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইল। ডাক্তারবাবু তাহাকে মায়ের নিকট হইতে লইয়া আদর করিতে গেলেন; কিন্তু সে কাঁদিয়া উঠিল। ছেলেকে প্রমীলার নিকট ফিরাইয়া দিয়া ডাক্তারবাবু তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। প্রমীলার স্বামীর মৃত্যুতে তিনি সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন। প্রমীলা তাহা শুনিয়া দু' একবার চোখে অঞ্চল দিল মাত্র; কিন্তু অশ্রুপাত করিল বলিয়া মনে হইল না। উঃ! কি পাপিষ্ঠা, কি নিষ্ঠুর! ক্রমে ডাক্তারবাবু প্রমীলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; প্রমীলাও মৌন সম্মতি জানাইল। ডাক্তার বাবুর গলাটা তাঁহার টিপিয়া ধরিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি যে মৃত! ডাক্তার বাবু প্রমীলার হাত ধরিয়া উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোনও উত্তর না করিয়া আস্তে আস্তে ডাক্তারবাবুর স্কন্ধে মাথা রাখিলেন। উঃ! এ যে অসহ্য! কিন্তু এ আবার কি! ডাক্তারবাবু দুই হাতে সাদরে প্রমীলার মুখ তুলিয়া ধরিয়া অধরে চুম্বন করিলেন।

আর সহ্য হইল না। হরিহরবাবু চীৎকার করিয়া উঠিল, "প্রমীলা; মনে থাকে যেন তুমি বিধবা; বিধবার বিবাহ ভুল!"

আস্তে আস্তে হরিহরবাবু সংজ্ঞালাভ করিলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—তাহার মাথার কাছে ঘোমটা দিয়া প্রমীলা বসিয়া বাতাস করিতেছেন; তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে। ডাক্তারবাবু একটু দূরে একখানি চেয়ারে বসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন।

শ্রীকৃষ্ণকুমার রায়

প্রোষিতভর্ত্তৃকা

শীর্ণ মলিন তনুখানি দৈন্যভারে নত,
শান্তি বিহীন চিত্তে জাগে চিন্তা শত শত;
অশ্রু বিকল আঁখির তারা,
বহে যুগল আকুল ধারা,
থাক' কেবল আত্মহারা লয়ে পূজা, ব্রত,
কান্ত-কুশল-বাঞ্ছাময়ি!—শঙ্কিতা সতত।

পৃষ্ঠে তোমার দুঃখে লুটে রুক্ষ এলো কেশ,
শুষ্ক তোমার বিম্বাধরে লুপ্ত হাস্য লেশ,
কণ্ঠে তোমার নীরব বীণা,
ভূতল' পরে দৃষ্টিলীনা;
সকল ভোগে উদাসীনা, তপস্বিনী-বেশ,
প্রিয় তোমার নির্জ্জনতা, পুণ্য-পূত দেশ।

পাঁকের ধ্বনি শুনি তব মর্ম্ম কেঁপে উঠে,
মলয়ানিল স্পর্শে কভু ঘর্ম্ম-ধারা ছুটে;
জ্যোৎস্নালোকে, ফুলের বাসে
পাঁজরভাঙ্গা আকুল শ্বাসে
রুদ্ধ হৃদয় মিলন-আশে বক্ষ-মাঝে লুটে,
প্রাবৃটে যেন, শিখীর ডাকে কর্ণে কাঁটা ফুটে।

নিদ্রা বিহীন নিশা আনে স্বপ্নে বিভীষিকা,
উষার আগে শয্যা ছাড় শান্তি-সমাপিকা;
গৃহস্থালীর সকল কাজে
তোমার শঙ্খ-বলয় বাজে,
তোমার সিঁথি-সিঁদুর সাজে সতীত্বের শিখা,
বিষণ্ণতার মূর্ত্তি ওগো প্রোষিতভর্ত্তৃকা!

শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী

বঙ্গভাষা এবং বাঙ্গলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকবর্গ

[চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ]

নিবেদন

[বন্ধুগণ, অদ্যকার সভায় সভাপতির কাজ করিতে অনুরোধ করিলে পর, আমি ভাবিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় লইয়াছিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্বন্ধে আমার বলিবার দু'একটি কথা আছে। এবং বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের নিকট নিবেদন করিবারও কিছু আছে। তাই আমি এ সভাপতির ভার আমার পক্ষে গুরুতর হইলেও গ্রহণ করিয়াছি। যে সকল কথা সময়ে সময়ে মনে উঠিয়াছিল, সেগুলি ভাল করিয়া গাঁথিয়া দিতে পারি নাই। কথাগুলিও বেশী নয়, তারও আবার কিছু কিছু রাখিয়া দিলাম। গাথনী শিথিল হইয়াছে। সব কথা আপন আপন স্থানে যে ঠিক হইয়া বসিয়াছে তাহাও নয়। অল্প সময়ে যাহা পারিলাম, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট। এই সুযোগ যে পাইলাম, তাহার জন্য আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।]

জীবনী শক্তির পরেই শব্দশক্তি। আচার্য্য সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় পদার্থ-নিষ্ঠ স্পর্শশক্তি বা সকল পদার্থেই sensation power প্রত্যক্ষ করিয়া জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। এই স্পর্শজ্ঞান-শক্তিকেই যদি জীবনী শক্তির বীজ ধরিয়া নিই, তবে সকল পদার্থেরই জীবনী শক্তি উৎপন্ন হয়। এই ভুবনময় জবনীশক্তির ন্যায় শব্দশক্তিও ভুবনময় কি না, সে বিতণ্ডা রাখিয়া দিই।

গোচরীভূত শব্দ যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই কথা বলি। জড়পদার্থের শব্দশক্তির প্রসঙ্গ এ পর্য্যন্ত কেহ উত্থাপন করেন নাই। উদ্ভিদ্‌রাজ্যেও শব্দশক্তির সত্বার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। জীবজন্তুর মধ্যেও "শব্দশক্তি" সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি কত জন্তুর শব্দ এখনও মনুষ্যের প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। এই জন্যই জীবনী শক্তির পরে "শব্দশক্তি"র আসন প্রদান করিলাম।

শব্দ মাত্রই কোন কিছু প্রকাশ করে। আর এক কথায় অভিজ্ঞ জগতে কিছু জানায় বা অর্থ প্রকাশ করে বলা যাইতে পারে। দুটি জড় পদার্থ—একটি যখন আর একটীর উপরে পড়ে বা পরস্পরকে ঘর্ষণ করে তখনও শব্দ উৎপন্ন হয়। সে শব্দও মানবলোকে এমন কি জীবলোকে একটা তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া যায়। শব্দপাতে জীবের শব্দ শক্তি আকৃষ্ট হইয়া একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। কিন্তু সে শব্দ আকস্মিক—জড় পদার্থের স্বতঃ প্রকাশিত ধর্ম্ম নয়। শব্দ শক্তি তাহাদেরই সম্পত্তি, যাহারা স্বতঃই শব্দ করিয়া থাকে।

শব্দ শিক্ষা দান করে। যাহারা শব্দ করে তাহারা শব্দ করিয়া কিছু প্রকাশ করে, কিছু লাভ করে, অন্যেরাও সে শব্দ শুনিয়া কিছু বোঝে ও কিছু করে। শব্দ নিরর্থক নয়—জগতে কোনও শব্দ নিরর্থক নয়। শব্দ শিক্ষালাভের একটি উপায়—একটি প্রধান উপায়—একমাত্র উপায় বলিলেও ক্ষতি নাই।

শব্দ শক্তি প্রকাশ করে। "যে জাতি বা যে, যত অধিক শব্দ করে তাহার শক্তি তত অধিক।" অতি সন্দিগ্ধ সঙ্কুচিত হৃদয়ে আমি এই তত্ত্বের একটি সূক্ষ্ম রেখা পাত করিলাম। অন্য কেহ এই সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়াছেন কি না, কিছু বলিয়াছেন কি না, কোন পরীক্ষা করিয়াছেন কি না, আমি সে সম্বন্ধে সম্যক্ অনভিজ্ঞ। পশু অপেক্ষা পক্ষী জাতি অধিক শব্দ করে, এই জন্য পশু অপেক্ষা পক্ষীর শক্তি অধিক। ভ্রমর, মাছি প্রভৃতি পতঙ্গেরও শব্দ শক্তি কম নয়। মনুষ্যের শব্দ শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই জন্য মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্—অনেক জন্তু হইতে শরীর সামর্থ্যে দুর্ব্বল হইয়াও মানুষ পৃথিবীর রাজা।

আমার সিদ্ধান্তটুকু আরো একটুকু ব্যাখ্যা করিব। আমাদের পরিচিত পক্ষিরাজ্যে কাক সর্ব্বাপেক্ষা বাচাল—প্রাতে কাকা রব, সন্ধ্যায় কাকা রব, দিনের বেলায় যেখানে সেখানে কাকা রব, এমন কি চন্দ্রনক্ষত্রশালিনী রজনীতেও মাঝে মাঝে কাকা রব নিশীথের গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া দেয়। কলিকাতার ন্যায় বড় নগরের তো কথাই নাই, ক্ষুদ্র নগরগুলি, বড় বড় আকাশ পর্য্যন্ত সারাদিন কাকা রবে মুখরিত থাকে। এই জন্যই কাক পক্ষীর মধ্যে বহুভাষী বা অধিক শব্দকারী। পক্ষীর মধ্যে কাকেরই বুদ্ধি বা শক্তি বেশী। "পক্ষধূর্ত্তো বায়সঃ" বলিয়া প্রাচীন কাল হইতেই পক্ষী মধ্যে বায়সের বুদ্ধির প্রখরতা স্বীকৃত হইয়াছে। অরণ্যে শৃগাল প্রহরে প্রহরে প্রহরী, প্রহরে প্রহরে কিছুক্ষণ চারিদিক ধ্বনিত করিয়া শব্দ করে বলিয়া প্রসিদ্ধ। তারপরও বিশেষ বিশেষ কারণে শব্দ করিয়া থাকে। কাকের ন্যায় সেও 'অরণ্যে জম্বুকো ধূর্ত্ত' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আরণ্য জন্তুর মধ্যে শৃগাল এবং পক্ষীর মধ্যে কাক ধূর্ত্ততার সিংহাসনে আসীন হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধি বল বেশী। অনুরূপ বানর। চেঁচামেচির উদাহরণ স্থল বানর। ডারুইনের মতে বানর মানুষেরই আদিরূপ। নানারূপ কথায় কাক শৃগাল ও বানর তিন জাতিরই বিচিত্র বুদ্ধির প্রশংসা আছে। তিন জাতিতেই শব্দশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

কেহ কেহ মনে করেন, পশুপক্ষীর শব্দ নিরর্থক কোন ভাব প্রকাশ করে না। যাঁহারা পশুপক্ষীর প্রকৃতি মনোযোগ করিয়া পাঠ করেন, তাঁহারা বিপরীত সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হন। উহাদের প্রত্যেকটি শব্দ কোন না কোন ভাব প্রকাশ করে। তবে অনেকটাই মনুষ্যের জ্ঞানের সীমার বাহিরে পড়িয়া থাকে। মানুষ অত সময় দিয়া সে সকলের মর্ম্মভেদ করা আবশ্যক মনে করে না।

শব্দের বিচিত্রতা আর একটি মাপ-কাঠী। যে জাতির মধ্যে নানারূপ শব্দসম্পত্তি আছে, সে জাতির মধ্যেই প্রখরতা বেশী, অর্থাৎ সে জাতিই অধিক উন্নত বলা যাইতে পারে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ অভেদে এই সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। পশু জাতির মধ্যে গো ও মেষের এক একটি মাত্র শব্দ বলিলেই হয়। সেই একই শব্দেরই হ্রস্ব দীর্ঘ বা স্বর বৈষম্য দ্বারা নানাভাব প্রকাশ করে। গোমাতা বা গো বৎসে একই "হম্বা" শব্দে কখন ক্ষুধা কখন পিপাসা, কখন দুধের ভারাধিক্য, কখন ভয়, কখন আহ্লাদ, কখন বা বৎসকে ডাকা, কখন বা মাকে ডাকা প্রকাশ করে। মেষ ও ছাগল প্রভৃতিও সেইরূপ। এই জন্য "গোমূর্খ" শব্দটার উৎপত্তি—গরু মূর্খ বলিয়া মানব সমাজে পরিচিত। এইরূপ এই কারণে "হস্তি মূর্খ" শব্দেরও জন্ম হইয়াছে।

শব্দ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই একথা পরিত্যাগ করিব। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে শব্দের উচ্চারণ বা শ্রুতিভেদ। বিলাতের কাকের ও আমাদের দেশের কাকের এক শব্দ নয়—উহাদের শব্দের ভিতরে একটুকু প্রভেদ আছে। বাজারের কাক ও গ্রামের কাকের মধ্যেও সেইরূপ স্বর বৈষম্য ধরা পড়ে। আবার শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ভেদে একই ব্যক্তির স্বর একটু একটু ভিন্নাকার ধারণ করে। লোকের স্বর শুনিয়া রাত্রি কতক্ষণ তাহার একটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মে। আবার লোকের মনের ভাবও স্বরের ভিন্নাকার গঠন করে। শোকে দুঃখে আনন্দে বিষাদে লোকের স্বর মনের অবস্থা প্রকাশ করে। যেমন শব্দ, তেমনি স্বরও ভাবব্যক্তির একটা নিদান।

"শব্দগুণ আকাশঃ" বলিয়া প্রাচীন সাক্ষ্য আছে।

আকাশ শব্দ বহন করে যেমন সত্য, তেমনি আপনার অবস্থানুযায়ী শব্দ ঘোষণা করে। এই জন্য শীত গ্রীষ্ম বর্ষার আকাশ একই জনের একই শব্দের একটুকু পৃথক ধ্বনি accent রচনা করে। এইরূপ প্রত্যুষ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, নিশিথ বিভিন্ন সময়েও বিভিন্ন ধ্বনি হইয়া থাকে, এইরূপ মুক্তাকাশে, মেঘাবৃত আকাশে, বৃষ্টির আকাশে ধ্বনির একটুকু একটুকু পরিবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ ধ্বনি দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা ও ভাব সকলই প্রকাশ করে, শব্দ স্বরধ্বনি তাহার বাগযন্ত্র এক অংশ তিনটি লইয়া "শব্দশক্তি।" শব্দ শক্তির এক অংশ তাহার মানসিক ভাব এবং আর এক অংশ যে আকাশ তাহা বহন করে, সেও তাহার অস্তিত্বটুকু তাহাতে ঢালিয়া দেয়।

মানুষ জগতের রাজা। মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের ভাষা বলিতে নারাজ। কেবল মানুষ যাহা বলে তাহাই "ভাষা" বলিতে রাজি। ইহাতে শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার নাই, ব্যাকরণও উহার কর্ণধার নয়। "অমৃতম্ বালভাষিতম্" বলিয়া বালকের আধখানা ভাঙ্গাকথাও ভাষার মধ্যে গণিত। সেই সংস্কৃত যুগেও "প্রাকৃত" নাম লইয়া অশিক্ষিত ও মেয়েদের কথা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে "আপনি আস" প্রভৃতি কথা চাষার মুখ বিগলিত বলিয়া ভাষা বলিয়া গৃহীত হইতেছে। সুতরাং "ভাষা" কেবল ব্যাকরণশুদ্ধ বাক্যাবলী নয়, কেবল জ্ঞানী পণ্ডিতের কথা নয়, পণ্ডিত মূর্খ, নরনারী, শিশু বৃদ্ধ, চাষী ভূষা পর্য্যন্ত যাহা বলে তাহাই ভাষা। সমগ্র মানবসমাজ "ভাষার" ভিত্তি ভূমি। রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী গরীব, জ্ঞানী অজ্ঞানী অভেদে সকলেরই সমুদ্র বন্ধনে কাঠবিড়ালীর ধূলিকণা দানের ন্যায় কিছু দিবার অধিকার আছে, কিছু দিয়াছে ও দিতেছে।

মানুষ যেমন সমস্ত জীবজাতিকে সরাইয়া দিয়া "ভাষা"র অধিকার নিজে গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ মানুষের মধ্যেও শিক্ষিত জনগণ বা পণ্ডিতগণ আপামর সাধারণকে সরাইয়া দিয়া ভাষার অধিপত্য বা কর্ণধারত্ব গ্রহণ করিয়া চাষা ভূষা মুটে মজুর হাড়িডোম প্রভৃতিকে সরাইয়া দিয়াছেন। সকলের মুখে লাগাম দিয়া—ব্যাকরণ রূপ লাগাম দিয়া বলিয়াছেন, এখনও বলিতেছেন, তোমরা ওরূপ বলিতে পারিবে না, আমাদের মত শুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ আমাদের ভাষায়ই তোমাদের কথা বলিতে হইবে। ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের ইহা একরূপ—একরূপ কেন সর্ব্বথা স্বার্থপরতা বা আত্মগর্ব্ব।

পণ্ডিতেরা গর্ব্ব করুন, শিক্ষিতেরা গণ্ডী রচনা করুন, ব্যাকরণরূপ বাঁধ দিন; কিন্তু কিছুতেই ভাষাকে গণ্ডীর ভিতর রাখিতে পারেন নাই ও পারিবেন না। সমগ্র মানবসমাজ যাহার ভিত্তি, সকলেই যাহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে ধূলিকণার মত কিছু দিয়া সাহায্য করিয়াছে, তাহাকে কেহই নিয়মিত করিতে পারে নাই, পারিবেও না। জন জন যাহার

কর্ত্তা, সকলেই সেখানে চচক, সেখানে কর্ণটি কাহারো হাতে নাই,—সকলেই দাঁড় টানে। কর্ণটী এক অদৃশ্য শক্তির হাতে থাকে। তাঁহাকে আদ্যাশক্তি বল, ভগবান্ বল, মহা প্রজ্ঞা বল, তাঁহারই হাতে ভাষারথের রশ্মি, তিনিই তাহা নিয়মিত করেন, মানুষ ঘোটকের মত কেবল তাহা টানে। তাহাতে পথ আগায়, ভাষা বহ্বায়ত হয়, পুষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা সকলের মুখে লাগাম দিয়া ও ভাষাকে গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে পারেন নাই, তাহার সাক্ষী ব্যাকরণে ঋষিবাক্য নিপাতন প্রভৃতি এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে কবি সময়সিদ্ধ ও দোষপরিচ্ছেদ আদি। এ ত লিখিত ভাষার, কথিত ভাষার ত কথাই নাই।

সমগ্র মানবভাষার নিদান যাহা, বাঙ্গালা হিন্দি, উড়িয়া, মাহারাট্টা, ইংরেজী পারসী প্রভৃতি খণ্ডভাষার নিদান তাহা। সমষ্টিতে যে কারণ ব্যাষ্টিতেও সেই কারণ। প্রতি ভাষারই আদি কারণ বা উৎপত্তির স্থান সেই আদি পুরুষ।

মানুষ দাঁড় টানিলে কি রথ টানিলেও তাহাদের একটা কার্য্য আছে—ভাষায় একটা স্থান আছে। পশু পক্ষীর ভাষা থাকিলেও তত্তৎ ভাষায় তাহাদের কোনও স্থান নাই। তাহাদের ভাষা সহজাত বা instictue; যাহা আছে তাহাই, বুদ্ধি নাই। অন্ততঃ মানুষ তাহাদের ভাষার অঙ্গে এক একটা রেখা পাত করিয়া রাখিয়াছে বলিতে পারি। পশু পক্ষী প্রভৃতির ভাষা instinct বা সংস্কার—বুদ্ধিবিহীন চিরকালই একইরূপ। তত্বটা সত্য হউক কি না হউক, মানুষ সে বিষয় এখনও নূতন অনুসন্ধান করিতে সময় পায় নাই, কিংবা অভিলাসী হয় নাই। মানুষ অনন্তমুখীন। তাহার শরীরের বার্দ্ধক্য হইলেও শক্তির বার্দ্ধক্য বা অন্ত নাই।

সব বিষয়েই মানুষের শক্তি ক্রমোন্নতি বা evolution এর অধীন। মানুষের ভাষাও ক্রমবিকাশের নিয়মে বাড়িয়াছে এবং নিরন্তরই বাড়িবে। মানুষের জ্ঞান ভাব ও শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও বর্দ্ধিতায়ন হইয়া আসিতেছে। মানুষের উন্নতির শেষ নাই ভাষার উন্নতিরও শেষ নাই। বাঙ্গালী জাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি হইতেছে এবং চিরকালই হইবে। উন্নতি যত দ্রুতগামী ভাষার প্রসারও তত বেগবান্ হইবে।

সৌরজগতে দুইটি শক্তি কার্য্য করিতেছে—একটীর প্রভাবে গ্রহগুলি কেন্দ্রস্থ সূর্য্যের দিকে আসিতেছে, আর একটীর প্রভাবে কেন্দ্র হইতে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই দুইটি শক্তির ইংরেজী নাম centripetal কেন্দ্রানুগ আর একটী centrifugal কেন্দ্রাতিগ শক্তি। এই দুইটী শক্তির প্রভাবে সৌরজগতের গ্রহগুলি গতিপথে নিয়মিত, বার্ষিক আহ্নিক গতি বর্ষ ঋতু দিনরাত সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে। এই দুইটি শক্তি সর্ব্ববিধ সৃষ্টিকার্য্যে এমন কি মানুষের উন্নতি সাধনেও ব্রতী রহিয়াছে। এই দুইটি শক্তিকে অন্তভাষায় বলিলে যোগ বিয়োগ বা ভাঙ্গন গড়ন বলা যাইতে পারে। সৌরজগতের বিধানে দুইটী শক্তি ঐ যুগপৎ কার্য্য করে; কিন্তু অন্যত্র একবার যোগ একবার বিয়োগ, একবার গড়ন আবার ভাঙ্গন, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পাদিত হয়। কিন্তু নিরন্তরই দুইটী শক্তি চলিতেছে। Centrapetal force কে যোগ বা গড়ন, এবং centifugal force কে বিয়োগ বা ভাঙ্গন বলিতেছি। এক শক্তিতে সকলে মিলনের দিকে আসে বা মিলিত হয়, আর এক শক্তিতে সমুদয় সরিয়া যায় বা বিভিন্ন হয়। এই যোগ বিয়োগ বা ভাঙ্গন গড়নের ভিতরেই সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বা evolution কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। ভাষার উন্নতিও এই সাধারণ নিয়তির বাহিরে নয়।

এক দম্পতি সমগ্র মানবজাতির আদি পুরুষ এই মতে এখন আর পণ্ডিত মণ্ডলীর আস্থা নাই। ভিন্ন ২ দেশে বিভিন্ন দম্পতির উদ্ভব এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিই পৃথিবীময় হইয়াছে, ইহাই এখন প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের সিদ্ধান্ত। তাহারা ৫টী গোষ্ঠীতে মানবজাতিকে পরিণত করিয়াছেন। কাজেই পাঁচ গোষ্ঠীর পাঁচ রকমের ভাষা হইতে পৃথিবীতে এত গুলি ভাষা বা কথার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন পৃথিবীর ভাষার বা কথার (language or dialectএর) সংখ্যা প্রায় তিন হাজার হইবে। মৌলিক এক বা পাঁচ গোষ্ঠীই হউক, উহাদের হইতে তিন হাজার গোষ্ঠী ও তিন হাজার ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত যোগ বিয়োগের ব্যবস্থানুসারেই এতগুলি গোষ্ঠী ও এতগুলি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। কখন ভিন্ন হইয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত কোন ভাষা আপনি আপনাতে আত্ম স্বভাবে পুষ্ট হইয়াছে। আবার কখন বা অন্য ভাষার সঙ্গে যুক্ত হইয়া নূতন শক্তি লাভ করিয়া বেগবতী হইয়াছে।

ভাষার উন্নতি তদ্ভাবী মানবসমাজের উন্নতির সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত। জাতীর উন্নতির সঙ্গে ভাষার হরিহর-আত্মা সম্পর্ক।

একজাতি ভাঙ্গিয়া যেমন নানাজাতি হইয়াছে, তেমনি এক ভাষা ভাঙ্গিয়া নানা ভাষা হইয়াছে। আবার নানা দেশ অধিকার উপলক্ষে, বাণিজ্যউপলক্ষে বা অন্য কারণে নানাজাতি নানা ধর্ম্ম যেমন মিলিয়াছে, তেমনি তাহাদের ভাষা কখন বা মিলিয়া এক হইয়া, কখন বা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন রূপে গড়িয়াছে। সকল ভাষাই এই রূপ ভাঙ্গাগড়নের নিয়মে উন্নতি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা-ভাষাও এই সাধারণ নিয়তির অধীনে গঠিত ও উন্নত হইয়া আসিতেছে। ভাষা কন্যার ন্যায় শৈশবে জননীর কোলেই লালিত পালিত হয়; কিন্তু যতই বয়স হয় ততই সে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া আপনার পথ আপনি বাহির করিয়া সে পথে চলিতে থাকে। সংস্কৃত বাঙ্গলার মাতা কি মাতা-মহী কি প্রমাতামহীই হউক, বাঙ্গলা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই অন্যপথ গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্যই শৈশবে পণ্ডিতমণ্ডলী সংস্কৃতের পথে বাঙ্গলাকে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, শিশু কন্যার ন্যায় সেও সে চেষ্টা শিরোধার্য্য করিয়াছিল। যাঁহারা সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভালই করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সময়োচিত হইয়াছিল। কিন্তু বহুকাল যেমন কন্যা জননীর পশ্চাৎ অনুসরণ করে না, বাঙ্গলাও সেরূপ বহুকাল জননীর বা মাতামহীর পাছে পাছে ঘুরে নাই। সে তাহার তারুণ্যের উন্মেষ। সে সময়ে একদল তাহাকে চিরাগত গতিতে আর একদল ভিন্ন গতিতে লইয়া চলিলেন। এই টানাটানিতে বাঙ্গলা আত্মনিয়তির পথ আপনি বাহির করিয়া চলিল

ইহাতে দোষগুণের কথা নাই—গতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা। শাস্ত্রে কোন বস্তুর গতি জন্মাইবার জন্য কখন বা সমুদয় শক্তি একদিকে, কখন বা দুই কি ততোধিক দিক হইতে শক্তি প্রযুক্ত হইয়া বস্তুটীকে কারোদিকেই নয়—অচিন্তিত নূতন পথে লইয়া যায়। বাঙ্গলা ভাষার গতি সম্বন্ধেও এই রূপই হইয়াছে। আমি জন্মকাল হইতে বাঙ্গলার গতি নির্ণয়ে চেষ্টা করিব না। আমার সহিত ৭০বৎসরের বাঙ্গলার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমি সে কালের কথাই কিছু বলিব। আমি যখন বাঙ্গলা পড়িতে আরম্ভ করিলাম, তখন শিশুবোধ, শিশুশিক্ষা, নীতিবোধ, চরিতাবলী, বাহ্যবস্তু, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি কয়েকখান মুদ্রিত বই ছিল। মোটের উপর অঙ্গুলি গণনায় তিন চারি বার গণিয়া আসিলেই সেগুলির গণনা হইত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ১০।১২ জনের অধিক গ্রন্থকার ছিলেন না। অধিকাংশই সংস্কৃতকলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক, এক অক্ষয়কুমার দত্তই তাহার মধ্যে বাদ ছিলেন। সুতরাং সে সময়ের বাঙ্গলা যে সংস্কৃতের কোলেই থাকিবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। বাঙ্গলা সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া দিয়া, বাঙ্গলা বিভক্তি যোগ করিয়া, সংস্কৃত শব্দগুলি বিন্যাস করিলেই তদানীন্তন বাঙ্গলা হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত সংস্কৃত শিক্ষায় বঞ্চিত ছিলেন, কাজেই তাঁহাকে স্বতন্ত্র পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইল। সে পথ হইল কথিত বাঙ্গলা সংস্কৃতের সঙ্গে বন্ধুতার পথ। বাঙ্গালী অল্প সংস্কৃত ও কিছু ইংরেজী জানিলে যে পথ হয় অক্ষয়কুমারের সেই পথ হইল। আর এক পথ দেখিলাম, যখন টেকচাঁদ ঠাকুরের ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' পড়িলাম। সে পথ কলিকাতার কথিত ভাষার পথ—বাঙ্গালী ইংরেজী পড়িলে যাহা হয়। হুতুম পেঁচার নক্সায় সে পথটি আরো ফুটিয়া উঠিল। সুতরাং আমার প্রথম অবস্থায় বাঙ্গলার তিনটি পথ দেখিয়াছিলাম, প্রথমটী বিদ্যাসাগরের বা সংস্কৃতানুগা বাঙ্গলা, ২য়টী অক্ষয়কুমারের বা মধ্যস্থা বাঙ্গলা, ৩য়টী আলালী বা দেশজা বাঙ্গলা। এই তৃতীয় প্রকারের বাঙ্গলায় বাঙ্গলা আপনার পথ আপনি খুঁজিতে প্রথম প্রবৃত্ত হইল। আর এককথায় বলিলে বলিব, বাঙ্গলা সংস্কৃতকে বলিল, আমি আর তোমার পথে চলিব না। আমি আপনার পথ আপনি বাহির করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে আলালী পথ রূপান্তরিত হইল। বিদ্যাসাগরের বাঙ্গলা মাতৃনুগা বালিকা, অক্ষয়কুমারের বাঙ্গলা বালিকা বটে কিন্তু দেশী বসন পরিহিতা; আলালী বাঙ্গলা বয়স্কা ও স্বতন্ত্রা, বঙ্কিমী বাঙ্গলা তরুণী ও সুসজ্জিতা। আলালী বাঙ্গলা প্রথম ইংরেজী প্রভাব পাতের ফল; বঙ্কিমী বাঙ্গলায় সে প্রভাবের জীবন্ত প্রকাশ। দেশী বাঙ্গলায় আত্মহারা হইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে মিশার ফল বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলা বা সাধু বাঙ্গলা। সেই বাঙ্গলার দেশী বাঙ্গলার উপরে টানের ফল অক্ষয়কুমারী বাঙ্গলা। বাঙ্গলার উপরে ইংরেজী

প্রভাবে বাঙ্গালী ভাষার উৎপত্তি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাহার পরিণতি, সংস্কৃত দেশী ও ইংরেজীর মিলন।

বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বোক্ত অবস্থা ত্রিতয় হইতে স্বতন্ত্র। বাঙ্গলা এখন না সংস্কৃত না ইংরেজী না উভয়ের মিশ্রন জাত কোন কিছু গ্রহণ করিতেছে। অথচ সকলই গ্রহণ করিতেছে, তথাপি আপন একটি পথ লইয়াছে, নিজের পায় নিজে দাঁড়াইয়াছে। সে শক্তি বাঙ্গালী মাত্রকেই গ্রহণ করাতে ও প্রতি বাঙ্গালীকেই আদর করাতে জন্মিয়াছে।

আমি যদি কিছু বলি, তাহাও বাঙ্গালীমাত্রকেই বলিতে হইবে, বাঙ্গালী চাষা যদি কিছু বলে তাহাও আমরা সকলে শুনিব বাঙ্গালী জাতির মহামিলনে এই নূতন বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে। নূতন বাঙ্গলা ভাষাও বাঙ্গালী জাতির মহামিলন জাত অমৃত ভাষা।

এই ভাষায়, রাজা প্রজা, মুটে মজুর, চাষা ভূষা, সকলেরই স্থান আছে ও থাকিবে। বাঙ্গালার সমস্ত জেলার প্রাদেশিক ভাষার সমন্বয় হইবে। এক দেশের শব্দ, আর এক দেশের শব্দকে আদর করিবে।

বাঙ্গালা ভাষার এই নূতন আকারে গঠনের প্রবৃত্তি অনেক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রথমে সঙ্গোপনে ছিল, এখন ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেকেই অজ্ঞাত ও জ্ঞাতসারে এই ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছেন।

তাঁহাদের নাম ও কার্য্য বাঙ্গলাভাষার সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী ইতিহাসলেখকগণ বিবৃত করিতেছেন, আরো বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবেন। আমি বাঙ্গালা ভাষায় সমগ্র বাঙ্গালীর ভাষাকে গ্রহণের ভাব সার রবীন্দ্রনাথের ভিতরে প্রজ্জ্বলিত দেখিতেছি। এই জন্য এই পথ রবীন্দ্রনাথের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। আমি রবীন্দ্রনাথের কথা গত ২০এ বৈশাখের সঞ্জীবনী হইতে দিতেছি।—

"বঙ্কিমের কাল হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে; কিন্তু সে কোন্ প্রাদেশিক ভাষা? তাহা ঢাকা অঞ্চলের নহে। তাহা কোনো বিশেষ পশ্চিম বাঙলা প্রদেশেরও নয়। বাংলাদেশের রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটী ভাষা। সকল ভদ্র ইংরাজের এক ভাষা যেমন সকল প্রাদেশিক ভাষাকে ছাপাইয়া বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, এও সেইরূপ। এ ভাষা এখন যেমন সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করিলেই ইহার ব্যাপ্তির সীমা থাকিবে না। সমস্ত দেশের লোকের চিত্তের ঐক্যের পথে কি ইহার কোন প্রয়োজন নাই? পুঁথির ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা কখনই পূর্ণশক্তি লাভ করিতে পারে না।" এই যুগ মহামিলনের যুগ, সর্ব্বপ্রকার অমিল ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্বের প্রতি আদর করিয়া এক বিস্তীর্ণ মিলনক্ষেত্রে সকলে মিলিতেছে। বাঙ্গলা ভাষাও ছোট বড় সকল গণ্ডী ছাড়িয়া এক উন্মুক্ত মহাক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে। আমরা সকলে মুক্তহৃদয়ে ইহাকে আদর করি এবং ভগবানের প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করি। আপন আপন কথায়, লেখায় ও বলায় যে মুক্তভাব আমাদের প্রকাশিত হউক, ভগবান এই আশীর্ব্বাদ করুন। বাঙলা ভাষার কথা বলিয়া বাঙলাসাহিত্যের কথাও কিছু বলা আবশ্যক। দুইটীই এক বোঁটায় দুইটী ফুল ও প্রাণে প্রাণে বাঁধা। আমি বাঙ্গালী, আমরা সকলেই বাঙ্গালী। বাঙ্গলা আমাদের পরস্পর পরিচয়ের উপায়, বাঙ্গালাতে আমরা চিন্তা করি ও ভাব বিনিময় করি। তাই আজ এই পুণ্যাহে আমরা পূর্ব্বাপর বাঙ্গালী জাতিকে স্মরণ করি, বাঙ্গালীর জীবিত ও স্বর্গগত লেখকদিগকে স্মরণ করি, তাঁহাদের লেখায় ও কথায় আমরা যে বর্ত্তমান প্রকৃতির বাংলা ভাষার উত্তরাধিকারী হইয়াছি তাহা সংযত হৃদয়ে উপলব্ধি করি। তাঁহারা ভাষারাজ্যে মহাশৃঙ্গের মত বাঙ্গলা ভাষাকে রচনা করিয়া আমাদের জন্য রাখিয়াছেন। আমরা আজ সেই সুগঠিত শৃঙ্গকে "আমাদের" বলিয়া আদর করিয়া সকলকে শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এখন সমুদয় বাংলা গ্রন্থকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমিও অভেদে বাঙ্গালা বইগুলি বাংলা সাহিত্যের মধ্যে গণনা করিতেছি। অতীতের সাক্ষী ইতিহাসের মুখে বৈষ্ণব কবিগণকে আদি

বাংলার গ্রন্থকার বলিয়া জানিতে পাই। ইতিহাসের আদি কাল হইতে কেবল ধর্ম্ম গ্রন্থই লিখিয়া রাখিবার নিয়ম সকল ভাষায়ই চলিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ মহাজনগণ আত্ম-বক্তব্য সাধারণের জন্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাই নূতন বইর জন্ম হইয়াছে। তারপর পণ্ডিত মণ্ডলী আত্ম-প্রতিভাজাত তত্ত্ব ভবিষ্যৎ বংশের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া নূতন ২ গ্রন্থের জন্ম দান করিয়াছেন। মুদ্রা যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে গ্রন্থ-প্রণয়ন যার তার হস্তগত ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের খনির আবিষ্কার হইয়াছে। লোকের অতটুকু কিছু বলিবার থাকিলেও একখান গ্রন্থ হইয়াছে। গ্রন্থরচনা ব্যবসায়ের মধ্যে গণিত হইয়াছে অবধি উহার প্রবল প্রবাহ ছুটিয়াছে। গ্রন্থরচনা প্রতিভাশালীদের একচেটিয়া না থাকিলেও শিক্ষিত সমাজের সীমারেখা অতিক্রম করে নাই। শিক্ষিতেরাই গ্রন্থ লিখেন, আবার অনেকে গ্রন্থ লিখিয়াও শিক্ষিত সমাজে গণিত হন। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে :—প্রথম ধর্ম্ম-জাত, দ্বিতীয় প্রতিভা-জাত, তৃতীয় ব্যবসায়-জাত; এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ দেখিতে পাই। প্রত্যেক ভাষায় এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ আছে। নিরবচ্ছিন্ন অর্থের জন্য যে বইর জন্ম সে বই সন্ধ্যফুলের মত জন্মিয়াই মরিয়া যায়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন যে বইর নিদান উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরেই তাহা অন্তর্দ্ধান করে। সনাতন সত্য, তত্ত্ব বা প্রতিভা যে গ্রন্থের ভিতরে আছে, তাহাই চিরস্থায়ী হয়; এবং নিরন্তর সমাজ-বৃক্ষের মূলে জল সেচন করে, জীবিত রাখে, বর্দ্ধিত ও শোভিত করে। সাহিত্যের জীবন্ত চিত্র সমাজ। সাহিত্যসমালোচনায় কোন সমাজ কিরূপ তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন প্রাচীন কালের তেমনি বর্ত্তমান কালের।

বাঙ্গলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী সমাজে উহার ছাপ রহিয়াছে ও ফল ফলিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শাক্ত ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, চৈতন্যের ধর্ম্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মই আত্ম আত্ম ভাব ও শক্তি দান করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে বর্দ্ধিত ও শক্তিশালী করিয়াছে। নানা ভাষা হইতে অনূদিত গ্রন্থগুলিও বাঙ্গালাকে ও বাঙ্গালী জাতিকে সৌভাগ্য-শালী করিয়াছে। বাঙ্গলা সংবাদ পত্র ও বাঙ্গলা কাগজ প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব কিছু ২ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রদান করিতেছে। প্রচারক ও উপদেষ্টাগণ উপদেশ ও বক্তৃতার শিক্ষকগণ শিক্ষালয়ে সহস্র বাঙ্গলাসাহিত্যের বীজ বপন করিয়া যাইতেছে। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য এখন ভারতীয় ভাষা সমূহের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এবং জগতের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সহোদর রূপে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

উন্নত চরিত্র প্রতিভাশালী লোকেরা ভাষার সাহিত্য রচনা করেন। আবার সে সকল সাহিত্য পড়িয়া লোক উন্নত ও প্রতিভাশালী হয়। সাহিত্যের মূলে প্রতিভা বা ভগবদ্দত্ত শক্তি রহিয়াছে। সেই শক্তিরই লীলা ক্ষেত্র সাহিত্য। চিত্তের মুক্ত ভাব যত হয় প্রতিভাও তত ফুটিয়া উঠে। যত প্রতিভা তত সাহিত্যের প্রসার। লোক যত মুক্ত হইবে—যত পরকে আপনার, পরকীয়কে আত্মীয় করিবে, যত মুক্তাকাশে অবস্থান করিবে, যত অনন্ত দেবতার উপাসক হইবে—ততই তাহার প্রতিভা ও সাহিত্যিক ভাব প্রসারিত হইবে। এই মাপ-যন্ত্র দিয়াই কোন গ্রন্থ সাহিত্য ভাণ্ডারে চিরজীবিত থাকিবে তাহার জন্ম পত্রিকা রচনা করা যাইবে। ইহার সাক্ষ্য বঙ্গীয় সাহিত্যে আমরা এখনও পাইতেছি এবং ভবিষ্যৎ বংশ পরেও পাইবে।

আমি বাঙ্গলা ভাষা ও বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রথম স্তরের সাধারণ কথা বলিলাম। দ্বিতীয় স্তরে লোকের নাম, গ্রন্থের নাম, বিশেষ কথা বলিবার স্থান। আমি সে স্তরের কথা প্রবন্ধের বাহুল্য ভয়ে এবং বিতণ্ডার ভয়ে পরিহার করিলাম। কোন ২ বিষয়ে মত বৈধ অবশ্যম্ভাবী—প্রতিজনই আপন ২ জ্ঞানের প্রদীপ হাতে লইয়া প্রত্যেকটী বিষয় দর্শন করেন। বৈচিত্র্য সৃষ্টির মূল মন্ত্র—যেমন সূর্য্যের রশ্মির ভিতরে কত রঙ্, আমার মত আর একজন হইবেন যে মনে করে সে কেবলই আত্মদর্শী। আমাদের বৈচিত্র্যকে আদর ও শ্রদ্ধা করিয়া সকল বৈচিত্র্যের সঙ্গমস্থানে পৌঁছিয়া উহাদের মহামিলন দেখিতে হইবে। এই জন্য সকলেরই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটুকু স্থান রাখিতে হইবে। যাহারা সেরূপ স্থান রাখেন না বা রাখিতে পারেন না, তাহারা কখন ঈর্ষায় কখন বা অহংকারে নিরতিশয় কষ্ট ভোগ করেন।

বাঙ্গলার পরম সৌভাগ্য যে বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক-খানা বই, কতকগুলি বক্তৃতা ও উপদেশ ও গীতি ভারতের অন্য ভাষায় এবং বিদেশী কোন কোন ভাষায় অনূদিত

হইয়া উহার গৌরব বাড়াইয়াছে। এবং সেই জন্যই বাঙ্গলা সমগ্র শিক্ষিত সমাজে দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা প্রতিভার আদরও হইয়াছে। এখন যাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে চান, সাহিত্য তত্ত্ব জানিতে চান, এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিতে চান, তাঁহারা আদরপূর্ব্বক বাঙ্গলা শিক্ষা করেন ও বাঙ্গলা সাহিত্য পড়েন। বাংলায় এমন প্রতিভাশালী লোক জন্মাইয়াছেন যে তাহাদের তত্ত্ব জানিবার জন্য কেহ বাংলা শিখিতেছেন। এইরূপ নানা কারণে বিদেশী শিক্ষিতেরা বাঙ্গলা পড়েন, ইহা বাংলার গৌরবের কথা। বাঙ্গলা সাহিত্য এখন আর বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই বদ্ধ নয়। সমস্ত জাতির, অতি অল্প হইলেও ইহার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সুতরাং উহাকে এখন বাঙ্গালীর ভাষার সীমার মধ্যে রাখা সঙ্গত হইবে না। সমগ্র শিক্ষিত জাতির বা সমগ্র মানব জাতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহার সাহিত্যিক ভাণ্ডার বড় করিতে হইবে, চিন্তা বড় করিতে হইবে, ভাব বড় করিতে হইবে।

বাঙ্গালীর গবেষণাজাত নূতন তত্ত্ব সকল যতই বাঙ্গলায় লিখিত হইবে, উহার আদর ততই বাড়িবে, জগতের ঝোঁক ততই উহার দিকে আসিয়া পড়িবে। তবে এখন সেরূপ অবস্থা হইয়াছে কি না সর্ব্ববাদি সম্মতরূপে তাহার সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মূল গ্রন্থ না হইলেও আবিষ্কারকের হস্তে বঙ্গদেশের বা ভারতের উপযোগী করিয়া উহার এক সংস্করণ বাঙ্গালায় লিখিত হইলে বাঙ্গলার উপাদেয়তা বাড়িয়া যাইবে।

ইংরেজী এখন ভারতের সাধারণ ভাষা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে কেবল বাঙ্গালীদেরই সভা—শ্রোতা বক্তা উভয়ই বাঙ্গালী, সেখানে বাঙলাকে স্থান দান করিতে হইবে। দু একজন, বিদেশীর অনুরোধে ইংরেজী না বলিয়া বাঙলা বলিলে বিদেশীরও বাঙলা শিখিতে ও বুঝিতে চেষ্টা জন্মিবে। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বক্তারা সেরূপ করিলে শীঘ্রই উহা কার্য্যে পরিণত হইবে। বাঙলা দেশ বাঙলার ক্ষেত্র, ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে, কথা বার্ত্তা কহিতে, চিঠি পত্র লিখিতে কাজ কর্ম্ম করিতে সর্ব্বদা সে কথা জাগরূক থাকিবে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার আসন দান করিয়া জলাশয়কে সাগর করিয়াছেন। এইরূপ মর্য্যাদা বাঙলা উত্তরোত্তর শিক্ষিত সমাজের নিকট লাভ করিয়া সবল হইবে।

প্রাচীন বাঙলা পণ্ডিত মণ্ডলীর এক চেষ্টা ছিল। তাঁহারা ছোট কথাটি বাক্যের বহু আবরণে জড়াইয়া দুর্ব্বোধ করিয়া রাখিতেন। এই জন্য প্রাচীন বাঙ্গলা, বুঝিতে যতই অবোধ্য হইত, ততই উহা লেখকের বা বক্তার গৌরব বাড়াইত। ইহার স্থূল অর্থ এই—পণ্ডিতেরা স্ব স্ব বক্তব্য টুকু কেবল পণ্ডিতের জন্যই বলিতেন বা লিখিতেন। মণিমন্ত্র মহৌষধের ন্যায় সাধারণকে অন্ধকারে রাখিয়া আত্মমর্য্যাদা ও প্রাধান্য বাড়াইয়া লইতেন। কেবল ভাষায় নয়, সর্ব্ববিষয়েই এইরূপ জটিলতাময় গোপনভাব ছিল, সকল দেশেই ছিল। এখন সে কাল নাই, এখন সকল বিষয়ই সকলের নিকট মুক্তভাবে প্রচার করিবার ও সকলকে গ্রহণ করাইবার সময়। তাই প্রহেলিকাময় ভাষা সহজ কথায় পরিণত হইয়াছে। সকলে যাহাতে সহজভাবে অল্প কথায় বুঝিতে পারে তাহাই ভাষার মানদণ্ড হইয়াছে।

বাক্যাড়ম্বর পূর্ণ লেখা বা বক্তৃতা কেহ ভালবাসে না। লম্বা কথায় ক্ষুদ্রভাবও কেহ পছন্দ করে না। সময়ের মূল্য বাড়িয়াছে, মানব জীবনেরও মূল্য বাড়িয়াছে। এখন বাক্যসর্ব্বস্ব হইয়া কাল কাটান দুঃসাধ্য। এই জন্য মূলতত্ত্বটী, দুচার কথায় শুনিতেই সকলে ভালবাসে। জগতের গতি অন্ততঃ সে দিকে বলিতে পারি। অল্প কথায়, সহজ কথায় অনেক বল বা লিখা এখন ভাষার গৌরবের বিষয়, সাহিত্যেরও গৌরবের বিষয়।

বাঙ্গলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের মাহাত্ম্য ইহাতেই বাড়িবে। ভাষার জন্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধি বা উন্নতি হয় না। সেইরূপ সাহিত্যের জন্যও হয় না। সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে থাকিলেই সাহিত্যের উন্নতি হইবে। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা যত বাড়িবে, লোকের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি যত হইবে, মৌলিক গবেষণা যত হইবে, সমাজে ধর্ম্মভাব যত জাগ্রত হইবে ভাষার শব্দ-সম্পত্তি ততই বাড়িয়া যাইবে, সাহিত্যের প্রসার বাড়িবে। অন্তরের ভাব ভাষায় নিত্য নূতন ধারায় বহিয়া সাহিত্যের স্রোতো সৌন্দর্য্য, প্রগাঢ়তা, প্রখরতা বৃদ্ধি করিবে।

লোকের বা সমাজের জীবন্ত উন্নত মূর্ত্তিটি সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়া পরবর্ত্তীদিগকে উন্নত করিবে। এই জন্য লেখকগণ দায়িত্ববিহীন হইয়া যা তা লিখিলেই পরবর্ত্তীদের জন্য গরল সঞ্চয় করিয়া যান এবং পরবর্ত্তীরা তাহা পান করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে।

প্রতি ভাষারই মৌলিক লেখকগণ সাহিত্যের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া যান, অনেকেই টীকা টীপ্পনী করিয়া তাহার উপরে তৈলের প্রক্ষেপ দান করেন। আবার অনেকের কেবল অনুসরণ বা অনুকরণ করাই কাজ। কিছু না কিছু নূতন থাকিলে সে বই সাহিত্যের ভাণ্ডারে থাকিতে পারে না। বাঙ্গলা প্রতিভাশালী লেখকগণের লিখিত সাহিত্য লইয়াই মাথা উঠাইয়াছে এবং তাহা লইয়াই বাঁচিয়া থাকিবে, বাড়িবে ও গৌরবান্বিত হইবে। এখানে মৌলিক লেখকগণের নাম করিতে ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলার সাহিত্যের প্রসারিত ক্ষেত্রে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাটুকু লইয়া হস্ত প্রসারণ করিতে সাহস হইতেছে না, কয়েকজনের নাম করিলেও অনেকের নামই পড়িয়া থাকিবে। বড় বড় সাহিত্যিকদিগের নাম আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত। আমরা সকলেই এখন প্রাণে প্রাণে মিলিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। যাঁহাদের ছবি এ পর্য্যন্ত পটে পড়ে নাই তাঁহাদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করি।

আর একটী কথা বলিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, বহুদূরে তাহা ফেলিয়া আসিয়াছি। কথাটি গণ্ডীর বাহিরে পড়িল। কথাটী এই—অন্য ভাষার শব্দ আমরা কিরূপে গ্রহণ করিব? সংস্কৃত ধাতু দিয়া না বাঙ্গলা কথায় গড়িয়া লইব? না সে ভাষার কথাটী অবিকল গ্রহণ করিব। আমি পূর্ব্বেই আমার কথা বলিয়াছি—যেটি সহজ অল্পাক্ষর অন্ততঃ কয়েকজনের বোধগম্য তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সংস্কৃতের বা বাঙ্গলার পক্ষপাত-পরিশূন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজ যে বিজাতীয়, জাতে তুলিয়া লইলে কালই সে "আমার" হইবে।

বড় বড় ভাষাগুলি সকলেই বিশ্ব-প্রেমিক—যত পারে পরকে আপনার করিয়া লয়। নির্ব্বিশেষে পরের শব্দ, পরের ভাব, পরের রীতিনীতি এমন কি পরকীয় শক্তি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লয়। কোন ভাষার সহিত অপর ভাষার যত মিশামিশি হয় ততই এইরূপ আদান প্রদান হয়। বর্ত্তমান সময়ে কত জাতি, কত ভাষা কত ভাব নানাদিক হইতে বাঙ্গলায় আসিয়া মিলিতেছে। এ সময়ে কোন একটা গণ্ডী রচনা করিয়া বাঁধা দেওয়া কাহারো সাধ্যায়ত্ত নয়। পার্শির সহিত মিশিয়া বাঙ্গলা কত শব্দ সম্পদ্, ভাব সম্পদ্ লাভ করিয়াছে। আবার ইংরেজদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া ইংরেজী হইতে বাঙ্গলা যে সর্ব্ববিষয়ে নূতন সম্পদলাভ করিতেছে ও করিবে, ইহা কি বাঙ্গলার সৌভাগ্য নয়? বিশ্ব মিলনে বিশ্বপ্রেমের সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী রচনার চেষ্টা কেবল বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হইবে।

আবিষ্কর্ত্তা বা তত্ত্ব-নির্ণায়ক প্রথম যে ভাষায় স্বীয় তত্ত্বের যে নাম প্রদান করেন, দ্বিধা না করিয়া সকল ভাষায়ই সেই নাম গ্রহণ করিলে কোন জাতিতে কোন ভাষায় উহার প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে সে তত্ত্বটিও থাকিয়া যায়। যেমন পর রাজ্য গ্রহণ ভিন্ন রাজ্য বড় হয় না, সেইরূপ অসঙ্কোচে পরভাষার ভাল যাহা গ্রহণ না করিলে বাঙ্গলা ভাষাও বড় হইবে না। ভাষাতে জাত বিচার একেবারে উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

শব্দ ভাষার মূল, এই জন্য শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সাহিত্য ভাষার প্রসারিত বক্ষঃ। এই জন্য বঙ্গ সাহিত্যের কথা বলিতে যাইয়া শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাষার মধ্য দিয়া সাহিত্যে পৌঁছিয়াছি। গঙ্গার কথা বলিতে গঙ্গোত্তরী হইতে সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত বলাই ভাল; তাহা হইলে কিছু অধিক বলা হইল না। যা কিছু পড়িয়া রহিল বলা যাইতে পারে না। বঙ্গ সাহিত্যে অনেকে অনেক বলিয়াছেন, লিখিয়াছেন, আরো বলাও লিখা হইবে। আমারও বলার আরো রহিল, তাহা থাক। বাঙ্গলা সাহিত্যিকগণের একটী কথা বলিয়াই আজ সমাপ্ত করিব। সে কথাটি সাহিত্যিকগণের মধ্যে দলাদলি বা জিগীষার ও কুৎসার কথা।

বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন "উদয়োন্মুখী প্রতিভার নিত্য বিদ্বেষিণী ঈর্ষা।" আমি একটুকু যোগ করি—"প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার নিত্য বিদ্বেষণী উদয়োন্মুখী প্রতিভা" "নিত্য" শব্দটি উভয় এই অতিশয়োক্তি। সেটি পরিত্যাগ করিলে, প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার ও উদয়োন্মুখী প্রতিভার মধ্যে যে ঈর্ষা সেটা ঐতিহাসিক কথা হয়। এই ঈর্ষা কখন

ব্যক্তিগত হইয়া কখন বা দল গত হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যিক-গণের হৃদয় ও বাঙ্গলা সাহিত্যকে কলঙ্কিত করিতেছে! আমি বাঙ্গলা সাহিত্যের তেমন কিছু না হইলেও আমার হৃদয় পর্য্যন্ত ব্যথিত করে! এই ব্যথার ভাগী যে কেবল আমিই তা নয়, বাঙ্গালী মাত্রই তজ্জন্য ব্যথিত হৃদয়! বোধ হয় বাঙ্গলার সীমানা ছাড়িয়া ও এই ব্যথার ব্যথী অনেক লোক পাওয়া যাইবে! এই মহামিলনের যুগে দলাদলি কি নিন্দা কুৎসা কিছুই শোভা পায় না। বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্র ও এখন এমন প্রসারিত হইয়াছে যে এখানে সকলেরই স্থান আছে; তবে একটুকু সামঞ্জস্য করিয়া লইলেই হয়—ঠেলাঠেলি করা সকলের পক্ষেই বিড়ম্বনা ও শিক্ষার কালিমাময় অভিনয়!

এক মহাপ্রাণ বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মাত্রকেই এমন কি বিদেশীকে পর্য্যন্ত আদরে আহ্বান করিয়া সপ্রেমে যথাযোগ্য স্থানে বসাইতেছে। আমার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু এই মহাপ্রাণে ঢালিয়া দিয়া আজ তৃপ্ত ও সুখী হই। আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলিয়া, বাঙ্গলা সাহিত্যিকগণের সঙ্গে মিলিয়া বঙ্গবাসী সকলের সঙ্গে মিলিয়া এই মহাপ্রাণকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হই। বাঙ্গালী জাতিতে, মহাপ্রাণতা, মহা ভাব ও মহাশক্তির অবতরণ হউক।

অদ্য এই পুণ্য তীর্থে সকলে দাঁড়াইয়া বিগত বৎসর যে সকল বাঙ্গালাভাষার সাহিত্যিক কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়াছেন তাঁহাদের এবং আমাদের চট্টগ্রামের বিখ্যাত-নামা রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস C. I. E. মহাশয়ের ও মহিলা কবি শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীর পুণ্য স্মৃতি মিশাইয়া তাঁহাদের সকলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিতেছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীরাজেশ্বর গুপ্ত

নবমত

প্রাণটা কেমন কেমন করে
বইছে জলো হাওয়া
পড়ছে মনে এমনি দিনে
নবমতে যাওয়া।

নূতন ছাওয়া নৌকাখানি
অখিল দাদা মাঝি,
বিদায়েরি প্রথম ব্যথা
উঠলো প্রাণে বাজি
পড়ছে মনে সেই সে মায়ের
সজল চোখে চাওয়া
মনটা কেমন কেমন করে
বইছে জলো হাওয়া।

সুদূর থেকে গ্রামের রেখা
তালীবনের শির,
হরগড়ানে নদীর ঘাটে
ছেলেমেয়ের ভিড়।

'জল-কুমারী'র পূজা দেখা
অজয় নদীর দহে,
রাঙা জলের লহর দেখে
শিউরে উঠা ভয়ে।

মনে পড়ে রাখালগণের
ঝাঁপিয়ে পড়ে নাওয়া,
মনটা কেমন কেমন করে
বইছে জলো হাওয়া।

পড়ছে মনে গলুই দিয়ে
অপর তরী দেখা,
ভাবী আমার ঘর কন্যার
কতই ছবি আঁকা।
শঙ্কা এবং সরম ভরা
একটী ছোট বুক,
তাহার মাঝে আচ্ছাদিত
সেই সে প্রিয় মুখ,

পড়ছে মনে দাঁড়ের তালে
মাঝির গীতি গাওয়া,
প্রাণটা কেমন কেমন করে
বইছে জলো হাওয়া।

বাট্টটা বরষ কাটলো হেতা
আজকে আমি বুড়ি,
ফুল হয়ে আজ পড়ছে ঝরে
সে দিনকারি কুঁড়ি।

যেতেই হবে এবার জানি
বড় নদীর পার
থাকবেনাক পিতার স্নেহ
করুণ নয়ন যার।
সথায় ছেড়ে শান্তিতে মোর
হবেইনা যে যাওয়া
প্রাণটা কেমন কেমন করে
বইছে জলো হাওয়া

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নীলা

উভয় ভ্রাতায় কি একটা কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

জ্যেষ্ঠ বলিলেন,—"বৃথা রাজপুতজীবন ধ্বংস করা আমার উদ্দেশ্য নহে,—কিন্তু কার্য্যানুরোধে যদি তাহা আবশ্যক হয়, তবে আমি নিরুপায়।"

কনিষ্ঠ সালের রজাব্ নিরুত্তর। জ্যেষ্ঠ গয়াসউদ্দীন তোগলক্ আবার বলিলেন,—"আমি কর্ত্তব্যকে মানবীয় স্নেহ প্রবৃত্তির রাখিয়াকিছে [illegible] থাপকর্ত্তব্যকান বাধাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি;—কিন্তু, তার পূর্ব্বে, ষষ্ঠ দিন যুদ্ধেই বুঝিতে পারিব, আমি রাণাকন্যাকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করিতে পারিব কি না।"

ক্রমাগত পাঁচ দিন যুদ্ধ করিয়াও যখন তোগলক্ বীর গয়াসউদ্দীন ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্য ভট্টগড়ের রাণা মল্লভট্টীকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে, বা তাঁহার কন্যা নীলা দেবীকে বন্দী করিতে পারিলেন না,—তখন তাঁহাকে একটু চিন্তান্বিতই হইতে হইল।

রাণার ক্ষুদ্র দুর্গ ও তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র গ্রাম সমষ্টিকে যে তিনি ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্ত্তেই ধূলিসাৎ করিতে পারিতেন, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহই হয় নাই,—তবে রাণা মল্লের কন্যা নীলা দেবীকে যে তিনি জীবন্ত ধৃত করিতে পারিতেছেন না, এই তাঁহার চিন্তার বিষয়।

যদি আর একদিন মাত্র যুদ্ধ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তবে দুর্গাবরোধের সপ্তম দিনে তাঁহার আর কোন দ্বিধাই থাকিবে না।

তাই পঞ্চম দিবসের যুদ্ধের পর গয়াসউদ্দীন তোগলক্ নিজ শিবিরে বসিয়া এখন কর্ত্তব্য কি তাহাই চিন্তা করিতেছেন; নিকটে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিপা সালের রজাব। তাঁহারা রাজপুত "জাত" বংশের দৌহিত্র।

তখন খৃষ্টীয় ১২৯৭। সুলতান আলাউদ্দীন খিলিজির রাজত্বকাল।

খিলিজি বংশের প্রাধান্য যে প্রায় আলাউদ্দীনের সঙ্গেই অবসান হইবে একথা গয়াসউদ্দীনের মনে তখনই উদয় হইতেছিল,—তারপর, রাজপুত—ও—তুর্কী জাতির সন্তান ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী বীর তোগলক্ বংশ দিল্লীর সিংহাসনে বসিবে, ইহাও তাঁহার সংকল্প। কিন্তু তোগলক্ বংশের বিজয় পতাকা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, রাজপুত ও তুর্কী শোণিত সম্মিলিত এরূপ বীর সন্তান তখনও যথেষ্ট নাই।

গয়াসউদ্দীন তোগলক্ তখন আলাউদ্দীনের অধীনে দীপালপুরের শাসনকর্তা। এই রাজপুত জাতির উপর সশস্ত্র দৃষ্টি রাখাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল।

রাণা মল্লভট্টী ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইলেও তিনি

রাজপুত বীর। তাঁহার কন্যা নীলা দেবী অসামান্যা রূপসী, সর্ব্বগুণ সম্পন্না।

তোগলক্ বংশের ভবিষ্যৎ প্রসারিণী সম্ভাবনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, গয়াসউদ্দীন্ স্থির করিলেন এই রাণা-কুমারীর সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সালের্ রজ্জাবের বিবাহ দিবেন। সালের্ রজ্জাব্ তখনও অবিবাহিত।

রাণার নিকট গয়াসউদ্দীন এই বিবাহ বিষয়ে দূতমুখে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। গর্ব্বিত রাণা তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য তো করিলেনই, তার উপর এরূপ ঘৃণার সহিত উত্তর দিলেন, যে গয়াসউদ্দীনকে অস্ত্র সাহায্যেই তাহার প্রত্যুত্তর দিতে হইল।

সহসা রাণার শাসিত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া গয়াস-উদ্দীন তোগলক্ এক বৎসরের সমস্ত রাজস্ব তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া চাহিয়া বসিলেন। রাণামল্ল তাহা দিতে অস্বীকার করায়, গয়াসউদ্দীন সসৈন্যে রাণার ক্ষুদ্র প্রদেশ ও তাঁহার দুর্গ অবরোধ করিলেন।

একটা ক্ষুদ্র শক্তি,—তোগলক্ শাসনকর্ত্তা তাহার ধ্বংসের জন্য বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা অনাবশ্যক মনে করিলেন; স্থির করিলেন, প্রথমে পরিমিত সংখ্যক সৈন্য নিয়োজিত করিয়া ছয় দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবেন; তাহাতে যদি রাণাকে অবনত এবং রাণা-কন্যাকে ধৃত করিতে না পারেন, তবে সপ্তম দিনে তিনি তাঁহার অধীনস্থ বিপুল বাহিনী চালনা করিয়া রাণার রাজ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত ভূপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিবেন।

সপ্তম দিবস সম্বন্ধে গয়াসউদ্দীনের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল

ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন যুদ্ধে রাণার সৈন্যগণ যথেষ্ট বীরত্বই দেখাইয়াছেন; কিন্তু প্রবাদ বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা রাণার ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল।

কত রাজপুতবীর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন, কত রাজপুত নারী অগ্নি প্রবেশ করিলেন। আজ যুদ্ধের পঞ্চম দিন, মধ্যে কেবল ষষ্ঠদিন, সে দিনতো যুদ্ধক্ষম রাজপুতবীর সমস্তই নিঃশেষিত হইবে, তার পরই সেই সপ্তম দিন,—সে দিন প্রভাত সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট অক্ষম প্রজা ও রমণীগণ অগ্নি প্রবেশ করিবেন, স্থির হইয়াছে।

তাই যুদ্ধের পঞ্চম দিবস সন্ধ্যার পর একদিকে তোগলক্ বীর গয়াসউদ্দীন, অপর দিকে রাজপুত বীর রাণামল্ল, উভয়েই নিজ নিজ আবাসস্থলীতে বসিয়া ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন। উভয়ের চিন্তাপ্রণালী বিভিন্নমুখী।

পঞ্চম দিন রাত্রিতে রাণা সায়ং সন্ধ্যাদি সমাধা করিবার পর তাঁহার মাতার সহিত চিন্তিত মনে কথোপকথন করিতেছেন।

"মা, আপনি কি স্থির করিলেন?"

"আমাদের পথ তো পূর্ব্ব হইতেই স্থির আছে,—অগ্নি-প্রবেশ। কিন্তু নীলার কি হইবে?"

"আহা, নীলা এখনও কিছু জানে না, কি জন্য এই যুদ্ধ হইতেছে!"

পিতা এই কথা বলিবামাত্র, তখনই নীলা আসিয়া উপস্থিত।

নীলা পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এই যুদ্ধ হইতেছে,—বলিবে না?"

রাণার মাতা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"তোমার জন্যই যে, দিদি!"

"আমার জন্য? আমি এই জনক্ষয়ের মূল?"

রাণা কন্যার নিকট এইবার সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন।

নীলার মনে হইল, অগ্নিপ্রবেশ করিলেও তাঁহার পক্ষে বুঝি যথেষ্ট করা হইবে না। মনে মনে নিজের উপর একটা তীব্র ধিক্কার অনুভব করিলেন।

তাঁহার মনে হইল, তাঁহার জন্যই পিতা এতদূর কেন করিলেন? নীলাতো বেশ স্বচ্ছন্দেই দুর্গাভ্যন্তরে সুখ-ক্রোড়ে শায়িতা রহিয়াছেন, কিন্তু এদিকে তাঁহারই জন্য এত অনর্থ সৃষ্ট হইয়াছে! মনে হইল,—রাজপুত নারীর আত্ম-ত্যাগ কত বড় ধর্ম, তাঁহার তুচ্ছ সৌন্দর্য্যের জন্য, তুচ্ছ একটা মানবদেহের জন্য পিতৃরাজ্য ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, কত শত রাজপুত বীর, রাজপুত নারী, প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন! সপ্তম দিবসের প্রভাতে আরও কত শত রাজপুত নারী অগ্নিপ্রবেশ করিবেন। তার অপেক্ষা তিনি আত্মজীবন উৎসর্গ করিবেন, পিতৃরাজ্য রক্ষা করিবেন।

নীলা যে রাজপুত নারী,—তিনি তো আনন্দ সহকারেই অগ্নি প্রবেশ করিতে পারেন, কিন্তু তখনই মনে হইল, তাঁহাকে জীবিতা না পাইলে তো তোগলকের প্রতিজ্ঞা সপ্তম দিনে ভীষণ ভাবেই পালিত হইবে!

তার চেয়ে, তাঁহার আজ যাহা কিছু আছে, সমস্তই কি তিনি পরহিতের জন্য, পিতৃরাজ্য রক্ষার জন্য, ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনিতো হিন্দুরমণী,—পিতা তাঁহাকে যাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিবেন, তাঁহাকেই তো তিনি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে পারিবেন,—তা তিনি যিনিই হউন না কেন। আর সেই দেব পূজায় তাঁহার সমস্ত দেহ মনটাকে যদি "বলি" দিতে হয়, তাহাতেও কি তিনি সক্ষম নন?

তখনই নীলার আবার মনে হইল,—"কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একবার—"

অকস্মাৎ একটা উন্মাদকারী সম্ভাবনায় নীলার মুখ-মণ্ডল উজ্জ্বল হইল, রাজপুত নারীর বীরত্বের আদর্শ মনে পড়িয়া তাঁহার সমস্ত দেহ মধ্য দিয়া একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল।

যে জীবন ইচ্ছা করিলেই ত্যাগ করা যায়, তাহাকে বাধ্য হইয়াই যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে সে যে কেবলই কোন মতে "জীবন রক্ষার" জন্য নয়; নীলা এ কথা তোগলক্ শত্রুকেও বুঝাইয়া দিবেন।

নীলা তখন জোড় করে পিতৃদেব ও পিতামহীর পদতলে বসিলেন।

"পিতা, পিতামহি,—আপনারা আমার দেবতা; আমার সামান্য কিছু ভিক্ষা আছে।"

উভয়ে বলিলেম, "কি?"

"আমার প্রথম ভিক্ষা আমি আগামী পরশ্ব যুদ্ধের সপ্তম দিবসের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই তোগলক্ শিবিরে আত্ম সমর্পণ করিতে চাই। সকলকে এইমাত্র বলিবেন তোগলক একজন রাজপুত বালিকাকে ধরিয়া লইয়াছে।"

রাণামল্ল ও তাঁহার মাতা শিহরিয়া উঠিলেন।

তারপর আত্মদমন করিয়া নীলা আবার বলিলেন,—"আর আমার দ্বিতীয় ভিক্ষা,—আমার আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে একবার———"

কথা বলিতে নীলার কণ্ঠরুদ্ধ হইল।

রাণা ও তাঁহার মাতা নীলার হৃদয়ের ভাষা বুঝিতে পারিলেন।

তখন রাণামল্ল ও তাঁহার মাতা উভয়েই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, উভয়েই সমস্বরে বলিলেন,—"রাণা কন্যার উপযুক্ত বাক্য!" উভয়ে আনন্দাশ্রু নয়নে নীলাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিন বিস্ময়ান্বিত রাজপুত ও তোগলক্ সৈন্যগণ দেখিল,—অশ্বপৃষ্ঠে রণবেশে সজ্জিতা বীরকুমারী! তিনি রাজপুত সেনানীর অর্দ্ধাংশ পরিচালনা করিতেছেন। অপর অর্দ্ধাংশ আজ চালনা করিতেছেন স্বয়ং বীরবর রাণামল্ল।

তখন কাহারও সংশয় রহিল না,—ভীষণ সংগ্রামের আজই চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে।

উল্লাসে ক্ষুদ্র রাজপুত বাহিনী হুঙ্কার দিয়া উঠিল; আজ তাহাদের ধমনীতে তাহারা কি এক নূতন শক্তির উদ্দাম উত্তেজনা অনুভব করিল,—যেন তাহাদের মৃত্যু হইলেও আজ তাহারা ধন্য হইবে!

তোগলক্ বীর গয়াসউদ্দীন ও তাঁহার ভ্রাতা সালের রজাবের ধমনীতে রাজপুত শোণিত গর্ব্বের উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। গয়াসউদ্দীন তখন মনে মনে স্থির করিলেন, আজ যাহাই হউক, সপ্তম দিবসের সম্বন্ধে তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা তিনি প্রত্যাহার করিবেন। সালের রজাব মনে করিলেন,—এই বীর নারীর জন্য জীবনদান অতি সামান্য বিষয়!

অশ্বপৃষ্ঠে নীলা আসিয়া তোগলক্ বীরদ্বয়কে অসিহস্তে সম্ভাষণ করিলেন,—"আজি আমরা পিতা পুত্রী রণক্ষেত্রে উপস্থিত; সাধ্য হইলে যাঁহার ইচ্ছা তিনি আমাকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিতে পারেন।"

নীলা অপাঙ্গে একবার সালের রজাবকে দেখিলেন,—"বীরপুরুষ!"

ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাণামল্লের চালিত রাজপুত বাহিনীকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন গয়াসউদ্দীন, আর নীলার আক্রমণের প্রতিরোধ ভার লইলেন সালের রজাব।

উভয় পক্ষে সৈন্য ক্ষয় হইল; কিন্তু আঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও কোন পক্ষ কাহাকে ও পশ্চাৎপদ করাইতে পারিলেন না।

নীলা একবার সালের রজাবকে রণশ্রান্ত মনে করিয়া অস্ত্র সংবরণ করিলেন।—

সালের রজাব একবার নীলাকে অন্যমনস্কা দেখিয়াও তাঁহাকে আঘাত করিলেন না।—

তখন পার্শ্বস্থ রণস্থলী অংশে রাণামল্ল ও গয়াসউদ্দীন তোগলক উভয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছিলেন,—কিন্তু তথাপি অপরাংশে সংঘটিত এই ক্ষুদ্র বিষয়টী তাঁহাদের কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

তোগলক বীর গয়াসউদ্দীন তখন বলিলেন,—

"ধন্য বীরত্ব! আজ যুদ্ধ সমাধা হইল।"

তারপর আবার গয়াসউদ্দীন হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন,—

"নীলা দেবীর জয়! রাণামল্লের জয়!"

তখন সম্মিলিত রাজপুত ও তোগলক কণ্ঠে সেই ধ্বনি পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাণার কণ্ঠ তখন অশ্রুরুদ্ধ।

* * * * *

সালের রজাবের সহিত নীলাদেবীর বিবাহ হইলে নীলার গর্ভে একমাত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ভারত ইতিহাসে বিখ্যাত দিল্লীর সুলতান্ ফিরোজসা তোগলক্। ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার উদার ব্যবহার ও আর্য্যনীতির অনুসরণ-প্রবৃত্তি স্মরণ করিলে বোধ হইবে তাঁহার ধমনীতে আর্য্য রক্ত প্রবাহ ও রাজপুত জননীর পদপ্রান্তে অর্জ্জিত তাঁহার বাল্যশিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

"কি লিখিব"

কি লিখিব তাই শুধু ভাবি সারা দিন।
কি কথা বুকের মাঝে উঠিছে ফুলিয়া,
প্রকাশিতে বুঝি তারে ভাষা শক্তি হীন,
অথবা অবোধ আমি বুঝিনা বলিয়া।
হৃদয়ে যে দেছে ধরা, স্নেহের বন্ধনে
পারিনা বাঁধিতে তারে কেন ভাবি হায়,
ভ্রমিতেছি কত কাল যাহার সন্ধানে.
ভাষার কণ্ঠহার পরাতে গলায়।

কেজানে কোথায় থাকে বলেনা কাহারে
আপ ন সে কাছে আসে সেধে ধরা দেয়
বসে থাকে আলো করি হৃদয় মন্দিরে
সাধিলে ধরিতে গেলে হাসিয়া পলায়।
সে কিকথা, সে কিভাব কে কবে আমারে
হৃদয়ে রহেছে তবু চিনিনা তাহারে।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

ঔরঙ্গজেবের পত্র

(গৌহাটি শাখার নবম বার্ষিক অধিবেশনে
লেখক কর্তৃক পঠিত)

সুদীর্ঘ পঞ্চাশৎ বর্ষ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিবার পর নব্বই বৎসর * বয়সে সাহান্ সাহা, বাদশাহ গাজী ঔলমগীর মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া, তাঁহার প্রিয়তম পুত্র আজিম শাহকে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন, তাহাই আজ আমরা পাঠক-সম্প্রদায় সমীপে নিবেদন করিতেছি। এত দিন যে বৃদ্ধের ইঙ্গিতে ভূরি ভূরি অসাধ্য কার্য্য নিমেষে সাধিত হইয়াছে; আজ সেই অসীম প্রতাপশালী বৃদ্ধ বাদশাহ বিস্ফারিত নেত্রে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া পরের অনুগ্রহের ভিখারী! যে বৃদ্ধের ভয়ে এত দিন "বাঘে গরুতে" একঘাটে জলপান করিয়াছে,—আজ সেই বৃদ্ধ

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ঔরঙ্গজেবের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৯১ বৎসর ১৩ দিন।

নিশ্চল, উত্থানশক্তি বিরহিত, তাঁহার আদেশ দিবার ক্ষমতা নাই। জগতের এই-ই নিয়ম।

মৃত্যুকাল অতি ভীষণ কাল। এই সময় মহাপাপীরও চমক ভাঙ্গিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অজস্র পাপরাশি মস্তকে ধারণ করিয়া সংসারে সদর্পে বিচরণ করিয়াছে, এবং আপনাকে এক দিবসের জন্যও পাপী মনে করে নাই;—সেও এই নিদারুণ সময়ে উপনীত হইলে, তাহার স্বেচ্ছাকৃত অপকীর্ত্তির কথা একে একে মানসপটে জাগরিত হইয়া, তাহাকে বিষম চিন্তান্বিত করিয়া তুলে। আজ আমাদের ঔরঙ্গজেব, দুনিয়ার মালিক বাদশাহ সেই দশায় উপনীত।

ছলে বলে ও কৌশলে ভ্রাতৃগণের নিপাত সাধন করিয়া, বৃদ্ধ ও রুগ্ন পিতাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করিয়া, নিজে ময়ূর-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, ঔরঙ্গজেব না জানি কতই আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। সহোদরগণকে নিপাত করিয়াও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহাদের বংশ পর্য্যন্তও চিরদিনের তরে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কেবল নিজের সন্তানগণ ব্যতীত বোধ হয় এমন একজনও জীবিত ছিল না, যাঁহার ধমনীতে তৈমুরের উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইত।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী জাহানারা পূর্ব্বাপর দারার পক্ষপাতিনী ছিলেন বলিয়া, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে পর্য্যন্ত কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরিশেষে, এই গরীয়সী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-শালিনী, কুটিল রাজনীতিপরায়ণা এবং বিদুষী মহিলার অচল অটল প্রতিজ্ঞা এবং নিষ্কাম পিতৃভক্তি দর্শন করিয়া, ঔরঙ্গজেব মনে মনে লজ্জানুভব করিয়া, তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া রং-মহালে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাঁহার অনুকম্পায় তিনি আগ্রার দরবারের যাবতীয় গুপ্ত কথা সুদূর দাক্ষিণাত্যে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেন, এবং বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, যাঁহার কৌশলে তিনি সম্রাট নাম ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই কনিষ্ঠা ভগিনী রৌশেন-আরাকেও বিষপ্রয়োগে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন! ঔরঙ্গজেব কৃতঘ্নতার চরম পরাকাষ্ঠা জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন!

জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহাম্মদকে তিনি গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়াছিলেন। এত করিয়াও ঔরঙ্গজেব এই সুদীর্ঘ রাজ্যভোগ করিলেও তাঁহার নিম্নলিখিত পত্র খানি পড়িলে বোঝা যায় যে, তিনি বোধ হয়, এক দিবসের জন্যও নিজেকে সুখী অনুভব করেন নাই।

ঔলমগীর জীবনে কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি সাধারণ ব্যক্তিগণকে যদিও মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করিতেন, তথাপি পুত্রগণ অথবা উচ্চপদস্থ আমীর ও ওমরাহগণকে কদাচ বিশ্বাস করিতেন না। পক্ষান্তরে, এই অবিশ্বাসের জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর মোগল-সিংহাসন নানারূপ বিশৃঙ্খলায় উপনীত হইয়া, শেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল নানা প্রকার যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যের দ্বাদশবর্ষব্যাপী সমর-কাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবনের শেষভাগে এই যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁহাকে কঠিন পীড়ায় আক্রমণ করে। নিয়তির কঠোর তাড়নায় আগ্রার রঙমহালের রত্ন-খচিত শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, সুদূর আহম্মদনগরের শিবিরের শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহাকে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।* কে জানিত যে, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ঔরঙ্গজেবকে রাজধানীর বহু দূরে কালসাগরে পতিত হইতে হইবে।

প্রাণপাখী-দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিবার অনতিপূর্ব্বে বিচক্ষণ ঔরঙ্গজেব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহামাদাবাদে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। বার্দ্ধক্যে উপনীত, বাতজ্বরব্যাধিতে আক্রান্ত পিতা সাজাহানের উপর তিনি যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন,—তাহার কথা মানস-পটে উদিত হওয়ায় তিনি ভীত ও চমকিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের দ্বারায় তাঁহার যদি ঐরূপ দশা ঘটে, এই ভাবিয়া অশীতিবৃদ্ধের প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে রোগশয্যায় শয়ন করিয়া, রাজকার্য্যের ছলে পুত্র আজিমকে মালব এবং কামবক্সকে বিজাপুরে গমন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয় তেজস্বী পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, অনিচ্ছাসত্বেও নিজ নিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। পুত্রগণকে দূরে প্রেরণ করিয়া বৃদ্ধ কতকটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মৃত্যু

* ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারী ঘটে। আহম্মদনগরে তাঁহার নশ্বর দেহ চিরসমাহিত করা হয়।

নিশ্চিত তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে তিনি পুত্র আজিমশাহকে নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিয়াছিলেন :—

"তোমার কুশল হউক। আমার জীবন এবং তোমার জীবন অভিন্ন। বার্দ্ধক্য আগমন করিয়াছে। দুর্ব্বলতা আমাকে অধিকার করিয়াছে, এবং শারীরিক বল আমাকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি এ পৃথিবীতে পথিকের ন্যায় আসিয়াছি আবার পথিকের ন্যায় গমন করিতেছি। সময় ক্ষমতার অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু কেবল দুঃখ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমি রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক (রাজা) অথবা রক্ষাকর্ত্তা ছিলাম না। আমার মূল্যবান্ সময় বৃথায় অতিবাহিত হইয়াছে। আমার সংসারে (হৃদয়ে) আমার একজন পরামর্শদাতা (বিবেক) ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি (এখানে উপদেশাবলী) আমার ক্ষীণ দৃষ্টিতে অদৃশ্য ছিল। জীবন অস্থায়ী, জীবন (আত্মা) দেহ হইতে একবার বাহির হইলে তাহা শূন্যে মিশাইয়া যায় ; ভবিষ্যতের যত আশা ভরসা সমস্ত অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। আমার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু শরীরের কয়েক খানি অস্থিমাত্র চর্ম্মে আবৃত রহিয়াছে। আমার পুত্র (কাম বক্স), যদিও বিজাপুরের দিকে গমন করিতেছে, তথাপি সে আমার নিকট রহিয়াছে, এবং তুমি আমার পুত্র, আমার আরও নিকটে অবস্থান করিতেছ। প্রশংসার পাত্র শাহ্ আলম আমার নিকট হইতে বহুদূরে ; আমার পৌত্র (আজিম-ওস্মান), কর্ম্মসূত্রের ফলে হিন্দুস্থানের দ্বারে উপনীত

"আমার শিবির ও সৈন্য সামন্ত আশ্রয়শূন্য, চকিত— আমারই ন্যায় অভিভূত এবং পারদের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কাঁপিতেছে। তাহারা তাহাদের নেতৃ বর্জ্জিত'—তাহাদের প্রভু আছে কিনা তাহারা জানে না। এসংসারে আমি সঙ্গে করিয়া কিছুই আনি নাই, এবং মনুষ্যের দোষ ব্যতীত আমারও সঙ্গে আর কিছুই যাইতেছে না। আমার আত্মার সংগতির জন্য আমি ভীত, আমার কপালে যে শাস্তি লেখা আছে, সেই ভয়ানক শাস্তি আমাকে অবনত মস্তকে ভোগ করিতে হইবে। যদিও, ভগবানের ন্যায়বিচার ও করুণার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তথাপি আমার কৃতকার্য্যের জন্য আমার অন্তঃকরণ ভয়শূন্য হইতেছে না। কিন্তু যখন আমি এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিব, আমার নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইবে। যাহা হয় হউক, আমি আমার জীবন-তরী সাগরের ঢেউয়ে ভাসাইয়া দিয়াছি। যদিও নিয়তির বিধান অনুসারে আমার শিবিরাদি রক্ষার ব্যবস্থা হইবে, তথাপি আমার পুত্রগণের ব্যবহার এবং উদ্যম দেখিয়া, আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তাহারাই সমুদয় অধিকার করিবে। শেষ আশীর্ব্বাদ আমার পৌত্রকে (বেদার বক্স) গ্রহণ করিতে বলিও। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু উপায় নাই। বেগম (বোধ হয় উদিপুরী) * অত্যন্ত শোকার্ত্তা,—তাহাদের উপায় পরমেশ্বর। স্ত্রীলোকদের স্থূল বুদ্ধির অকারণ ভাবনায় কেবল হতাশ ভাব আনয়ন করে। বিদায়! বিদায়!

এইপত্রখানি পড়িলে ঔরঙ্গজেবের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক মাত্রেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, ঔরঙ্গজেব বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণদর্শী, বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সমুদয় সদ্গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার নিষ্ঠুর কার্য্য-কলাপের উপর দৃষ্টি করিলে, সেগুলি ঘোর তমসাবৃত

---

* এই বেগম কে? মুসলমান সম্রাটদিগের পত্নীগণকে (বিবাহিতা) বেগম বলিত। পরিজনবর্গেরা উপাধিধারিনীর নাম সংযুক্ত করিয়া ডাকিত ; যথা 'উদিপুরী বেগম' ইত্যাদি। সম্রাটগণের বহু পত্নী থাকিত। তন্মধ্যে, বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা অথবা অন্তের পরীণীতা, (উপপত্নী) এই প্রকারের বহু নারী সম্রাটের খাস মহলে বসতি করিতেন। সম্রাট ২।৪ জন ব্যতীত অপরাপর স্ত্রীলোকগণকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। যাঁহারা তাঁহার অতি প্রিয়পাত্রী, তাঁহাদিগকেই সম্রাট 'বেগম' বলিয়া ডাকিতেন। সম্রাটের (ঔরঙ্গজেবের) মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার বেগমের মৃত্যু হয়। তাঁহার সাজাহানের কন্যা হইলেও, তিনি 'বেগম' উপাধি পাইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ ভগিনী রৌশেন-আরা বেগমের ১৬৭১ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা জেব-উন্নেসার মৃত্যু ১৭০১ খৃঃ অব্দে হয়। ঔরঙ্গজেবের উল্লিখিত বেগম বোধ হয় (উদিপুরী)। উদিপুরী আর্ম্মেনিয়জাতীয়া। ঔরঙ্গজেব ইঁহাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। ইতিহাসে তাঁহার অনেক বেগমের কথা পাওয়া যায়। যোধপুরী রাজপুতানী, এবং গুলনেয়ার নাম্নী বেগমকেও সম্রাট ভালবাসিতেন। উল্লিখিত বেগম এই দুইজনের মধ্যেও একজন হইতে পারেন

'Memoirs of Eradut Khan" Scotts' History of the Decan. হইতে এই পত্রখানি উদ্ধৃত

হইয়া যায়। ঔরঙ্গজেব এক নিজের মন ব্যতীত অপর কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। প্রকৃত পক্ষে, এই অবিশ্বাসের জন্য তাঁহাকে এই বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ণধার হইয়া, একাকী উহা শাসন করিতে হইয়াছে। সাম্রাজ্য রক্ষার মোহে তাঁহাকে অনেক পৈশাচিক কার্য্য করিতে হইয়াছে। যদি তিনি এইরূপ সন্দিগ্ধান্তঃকরণ না হইতেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্য বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার দ্বারায় কদাচ এই প্রকার গর্হিত কার্য্যসমূহ সাধিত হইত না। বরং রাজ্যের প্রভূত মঙ্গলই সাধিত হইত, এবং তাঁহার চরিত্র সুন্দররূপে জগতের সমক্ষে প্রতিভাত হইত।

রাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণের দিক দিয়া, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া সমালোচনা করিলে, ঔরঙ্গজেবকে উচ্চাসন প্রদান করিতে হয়। পাঠান রাজত্বকালের কথা ছাড়িয়া দিলাম;—এবং যে মোগলযুগকে ভারতের "স্বর্ণ-যুগ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও অন্যায় মনে হয় না,—সেই মোগল-যুগের এক দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো আকবর বাদশাহের রাজ্যশাসনপ্রণালী ঔরঙ্গজেবের শাসনপ্রণালী অপেক্ষা অধিক সুন্দর ছিল না। কোন কোন বিষয়ে ঔরঙ্গজেবের শাসন-সংরক্ষণ, 'আইন-কানুন' অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সংবাদ পত্রের প্রচলন যথেষ্ট ছিল। এই সংবাদ পত্র সমূহ তাঁহার প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাগণের রাজধানীস্থিত স্বতন্ত্র বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের দ্বারায় লিখিত হইত এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়ভাবে, এমনকি, শাসনকর্ত্তাগণেরও অগোচরে সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত সংবাদ সংগ্রহের জন্য বেতনভোগী দূত রাখা হইত, তাহারা সংবাদ বহন করিয়া, লেখককে জানাইত। সম্রাট সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া, শাসনকর্ত্তাগণের কৈফিয়ত চাহিতেন। শাসন-কর্ত্তাগণ প্রজাবর্গের উপর অযথা অত্যাচার করিলে, উৎকোচ গ্রহণ অথবা অন্য কোন প্রকার গর্হিত আচরণ করিলে, সম্রাট তাঁহাদের দণ্ডিত করিতেন, অথবা স্থানান্তরিত করিতেন;—এমন কি, সময়ে সময়ে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিতেও দেখা গিয়াছে। নিম্নলিখিত পত্রখানি ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাদেশিক কোন শাসনকর্ত্তাকে স্বহস্তে লিখিত হইয়াছিল;

"অবগত হইলাম যে, নূতন স্থাপিত আওরাঙ্গাবাদ ও বাহাদুরপুরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী জনপদ বড়ই বিপদ-সঙ্কুল হইয়াছে। প্রশস্ত রাজপথে দস্যুগণের অবিরত গতিবিধি থাকাতে ব্যবসায়ী ও পথিকগণ এই রাজপথ যাতায়াতের পক্ষে নিরাপদ বলিয়া মনে করে না। এই রাজপথের অতি নিকটেই আমার সৈন্যগণ অবস্থিতি করে—তথাপি ইহার এইরূপ অবস্থা। জানিনা, রাজধানী হইতে সুদূর প্রদেশে অবস্থিত জনপদের অবস্থা কি ভীষণ! রাজ্যের এই অবস্থা দেখিয়া, সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, গোয়েন্দাগণ রাজ্যের যথার্থ ঘটনা তোমাকে জানায় না। সুতরাং সংবাদসংগ্রহকারী নূতন দল তুমি শীঘ্রই নিযুক্ত করিবে, এবং পুরাতন সংবাদ-বাহীদিগের অমনোযোগিতায় রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হওয়ায়, তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবে। এই সকল বিদ্রোহী দস্যুগণের যথাবিহিত শাস্তি দিবার জন্য একদল সুদক্ষ সৈন্য অবিলম্বে প্রেরণ করিবে। রাজ্যের বিশৃঙ্খলাজনিত অপবাদ কত দিন শুনিতে হইবে তাহা জানি না।"

উপরোক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে লিখিত পত্রখানি পাঠ করিলে, ঔরঙ্গজেবের প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রকার বহু মিষ্ট এবং কঠোর ভৎসনাপূর্ণ পত্রাবলী ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা দেখিলে, সম্রাট ঔরঙ্গজেব নিজের পুত্রগণকেও কঠোর তিরস্কার করিতে পরাঙমুখ হইতেন না। একস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার পৌত্র আজিমওসমান যখন বাঙ্গালার সুবাদার, এবং তাঁহার অমনযোগিতায় কোন সময়ে রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, সম্রাট তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া, বিদ্রূপের সহিত লিখিয়াছিলেন;—

"A yellow turban, rose-coloured garments, suited but ill with a beard of forty-six years' growth. He also explained that the monopoly, which he had dignified with the name of "soudai Khas" * was nothing less than individual insanity and public oppression, and to evince to his subjects that he would not sanction any act of injustice, even by his sons, or grandchildren and he struck off 500 horses from the prince's military rank."

অন্য একস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, সুবাদার

* "সুদাই খাস" ফারসী কথা,—অর্থ ব্যবসা।

আজিম-ওস্মানের সহিত বাঙ্গালার দেওয়ান মুর্শিদকুলিখাঁর মনোমালিন্য ঘটিলে, তিনি দেওয়ানকে বিপদে ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, এবং এসংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে, তিনি দেওয়ানের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, কিরূপ কঠোর পত্র পৌত্রকে লিখিয়াছিলেন, পাঠক তাহাই দেখুন সম্রাট লিখিয়াছিলেন :—

"He sent an order to Azeem-oshan, ; severely reprimanding him ; and threatening him that if the smallest injury was offered, either to the person or to the property of Moorshed Cooly Khan, he, although his grandchild should be answerable for it. He further commanded the prince immediately to quit Bengal, and to fix his residence in the province of Behar.

ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঔরঙ্গজেবের কি কঠোর বিচার!

ঔরঙ্গজেব স্বয়ং প্রত্যহ বিচারাসনে বসিয়া বিচার কার্য্য সমাধা করিতেন। অনেকের ধারণা, যে বিচারপ্রার্থী অতি দরিদ্র হইলে, সম্রাটের নিকট তাহার আবেদন করা একপ্রকার অসাধ্য হইত, এবং তাহার অভিযোগের প্রতিকার হওয়া দূরে থাকুক, তাহা মনেই থাকিয়া যাইত। আমরা যতদূর জানি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দরিদ্র ব্যক্তির আবেদন সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইতে বিলম্ব ঘটিত না। সম্রাটের কঠোর আজ্ঞায় বিচারবিভাগে উৎকোচ গ্রহণের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল ; সুতরাং কি ধনী কি দরিদ্র, কাহাকেও সম্রাটের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া, কর্ম্মচারীবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না।

ঔরঙ্গজেবের বিচার পক্ষপাতিত্বদোষশূন্য ছিল। ন্যায়ের মর্য্যাদা তাঁহার কাছে অক্ষুণ্ণ থাকিত। আগ্রার ময়ূর সিংহাসনে বসিয়া তিনি সমুদয় রাজ্যের উপর খরতর দৃষ্টি রাখিতেন। যেখানে অবিচার, যেখানে উৎপীড়ন অথবা যেখানে অত্যাচার দেখিতেন—তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতেন। যাঁহার দোষে এই সকল ঘটিত, তিনি শাসন-কর্ত্তাই হউন, আর সাধারণ ব্যক্তিই হউন, আত্মীয়ই হউন, অথবা অনাত্মীয়ই হউন, কেহই তাঁহার কঠোর শাসনে শাস্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রজাপালন, শাসনপদ্ধতি এবং ন্যায় বিচার অতুলনীয় ছিল। আমরা ইতিহাস আলোচনা করিয়া, তাঁহার যে সমুদয় সদগুণাবলীর বিবরণ প্রাপ্ত হই, তাহা বাস্তবিক প্রশংসনীয় এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার অন্যান্য পাপাচারের কথা আলোচনা করিতে ভুলিয়া যাই। ভারতের মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে প্রজাপালনে ঔরঙ্গজেব যে অদ্বিতীয় ছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। *

বারান্তরে আমরা ঔরঙ্গজেবের অপরাপর কার্য্যাবলীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীনিরঞ্জন সান্যাল।

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইয়াছি :—

Scott's History of Decan, Dow's History's of Hindusthan, Brigg's Feristha, Elphinstane History of India, Stewarnt's History of Bengal, Latiff's Agra (Historical and Descriptive), Berneir's Travels in Hindusthan, Alumgeer nameah, ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৭—১৩১৮।

পুরাণ কাহিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে যোষিৎ সঙ্গের দোষ এবং হরি, ব্রাহ্মণ ও পুরাণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবানের পুরাণরূপত্ব এবং পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে কালকালে জ্ঞানোপায় বর্ণিত আছে। পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে প্রথমে হরিমন্দিরলেপন মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া দণ্ডকের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। পুরাকালে দ্বাপরযুগে দণ্ডক নামে এক চোর ছিল। সে ব্রহ্মস্বহারী,

মিত্রদ্রোহী, অসত্যভাষী, ক্রূর, পরস্ত্রীগমনে রত, গোমাংসাশী, সুরূপ, পাষণ্ডজন সঙ্গকারী এবং শ্রুতিচ্ছেদী ছিল। সে একদা বিষ্ণুমন্দিরে চুরি করিবার জন্ত গমন করিয়াছিল; মন্দিরের দ্বারদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক মন্দিরের ভূমিতে নিজ পদসংলগ্ন কর্দ্দম পুঁছিয়াছিল। তাহার সেই কর্ম্মেই সেই ভূমি কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হইল। দণ্ডক তাহার পর লৌহশলাকার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সুমনোহর পর্য্যঙ্কে রাধার সহিত অচ্যুত পীতাম্বরকে শায়িত দেখিল এবং প্রণামান্তে নিষ্পাপ হইল। তাহার পর কালসর্প দংশনে দণ্ডক পরলোক গমন করে। যমালয়ে লইয়া যাইবার পর চিত্রগুপ্ত যমরাজকে সমস্ত উপাখ্যান বর্ণন করেন। যম তখন দণ্ডককে কনক নির্ম্মিত আসন প্রদান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে কার্ত্তিকমাস মাহাত্ম্য এবং হরি গৃহে দীপদান ফল বর্ণনা করিয়া মূষিকোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ নামে একজন শুচি দ্বিজ ছিলেন। তিনি একদা কার্ত্তিক মাসে ঘৃতপূর্ণ দীপ দান করিয়াছিলেন। একটী মূষিক সেই প্রদীপের ঘৃত খাইতে আরম্ভ করিলে প্রদীপ একটু উজ্জ্বল হইয়াছিল। এই প্রদীপ বোধন করায় ঐ মূষিক নিষ্পাপ হইয়াছিল।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে জয়ন্তী ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে নিঃসন্তান হওয়ার কারণ এবং সন্তান লাভের উপায় বর্ণন করিয়া শ্রীধর রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ত্রেতা যুগে শ্রীধর নামে অপুত্র ও ধনবান্ এক রাজা ছিলেন। কি করিলে পুত্র জন্মিবে মহামুনি ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ব্রাহ্মণকে সবস্ত্র কুষ্মাণ্ড ও সদ্বর্ণ বৃষ দান করিয়া বাল ব্রত করিতে, গৌরী কন্যা দান করিতে এবং পুরাণ শ্রবণ করিতে বলেন। তাহা করায় তাঁহার এক বর্ষের মধ্যেই পুত্র জন্মিয়াছিল।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ে হরি মন্দিরে চূণলেপনাদি সংস্কার-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া চঞ্চলাপাঙ্গী গণিকার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাকালে দ্বাপর যুগে চঞ্চলাপাঙ্গী নাম্নী এক সুশোভনা, সুকেশী, হরিণীনেত্রা, সুমধ্যা, চারুহাসিনী বারনারী ছিল। সে একদা ধনাকাঙ্ক্ষায় জনসঙ্গ কামনা করিয়া এক দেবালয়ে গমন করিয়াছিল। সেখানে তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া তাহার অবশিষ্ট চূণ দেবমন্দিরের নিম্ন ভিত্তিতে পুঁছিয়াছিল দেবালয়ে নিজ অভিলাষ পূর্ণ হইল না দেখিয়া সে নগরে ফিরিয়া আসিল এবং একজন জারের সহিত সঙ্কেত করিল। রাত্রিতে সঙ্কেত স্থানে গমন করিল, কিন্তু সেখানে তাহার কান্ত আসিল না। সঙ্কেত স্থানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। দেবালয়ের ভিত্তিতে চূর্ণ পুঁছিয়াছিল বলিয়া তাহার পাপসমূহ নষ্ট হইল এবং দেহান্তে সে বিষ্ণুলোকে গমন করিল।

চত্বারিংশ অধ্যায়ে রাধাষ্টমী ব্রত এবং লীলাবতীর উপাখ্যান বর্ণিত আছে। পুরাকালে লীলাবতী নাম্নী এক সুন্দরী বারনারী ছিল। সে দেবালয়ে জনসাধারণকে রাধাষ্টমী ব্রত করিতে দেখিয়া সেই ব্রত করিয়াছিল। তাহার পর সে সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিল।

একচত্বারিংশ অধ্যায়ে সমুদ্রমন্থন বর্ণিত আছে। দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে লক্ষ্মী ব্রত বিবরণ এবং ভদ্রশ্রবা রাজার উপাখ্যান বর্ণিত আছে। পুরাকালে সৌরাষ্ট্রদেশে ভদ্রশ্রবা নামে এক রাজা ছিলেন এবং তাঁহার সুরতিচন্দ্রিকা নাম্নী এক ভার্য্যা ছিল। শ্যামবালা নাম্নী তাঁহাদের একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। একদিন লক্ষ্মী দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে রাজবাটীতে আসেন এবং দৌবারিকার নিকট রাজরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলেন। রাজ্ঞী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর সহিত সগর্ব্বে কথাবার্ত্তা বলেন, তাহাতে বৃদ্ধা তাঁহাকে গর্ব্বিতা বলিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া রাজ্ঞী ব্রাহ্মণীকে প্রহার করিলেন। শ্যামবালা তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন এবং তাঁহার নিকট ব্রতের বিষয় অবগত হইয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বর নৃপতির পুত্র মালাধরের সহিত শ্যামবালার পরিণয় হইয়াছিল। লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহে সিদ্ধেশ্বরশ্যামবালার গৃহ ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইল। এবং সুরতিচন্দ্রিকার দোষে ভদ্রশ্রবা লক্ষ্মীহীন হইয়া দারিদ্র্য দুঃখে অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া শ্যামবালা তাহার মাতাকে লইয়া গিয়া লক্ষ্মীব্রত সম্পন্ন করাইলেন। তাহাতে ভদ্রশ্রবার অভদ্র অবস্থা কাটিয়া গিয়াছিল।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে দীননাথ রাজা এবং চিত্রসেন রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাকালে দ্বাপর যুগে দীননাথ নামে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। কি করিলে পুত্র জন্মিবে এই বিষয় তিনি গালব মুনিকে জিজ্ঞাসা করায় মুনিবর নরমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য ব্যবস্থা দিলেন। রাজা উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠানসূত্রে বলির জন্য নরবালকের সন্ধানে দূতগণ প্রেরণ করিলেন। দূতগণ কৃষ্ণদেব নামক একটী ব্রাহ্মণ ও তাঁহার সুশীলা নাম্নী ভার্য্যা—তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া একটী বালক লইয়া যাইতে চাহিল। ব্রাহ্মণের তিনটী পুত্র। ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠপুত্রকে দিবেন না এবং ব্রাহ্মণী কনিষ্ঠ পুত্রকে দিবেন না বলিলেন। মধ্যম পুত্র পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ লইয়া দূতগণের সঙ্গে চলিয়া গেল। তাহারা বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রমের নিকটে আসিলে তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া দূতগণকে ব্রাহ্মণ পুত্রটীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। দূতগণ তাহা না করায় মুনিবর তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ বালকটীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য রাজাকে আদেশ করিলেন, রাজা ভীত হইয়া বালকটীকে ছাড়িয়া দিলেন। সন্তান হইবে বলিয়া মুনিবর রাজাকে বর প্রদান করিলেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাঁহার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলেন। বিশ্বামিত্রের বরে রাজার পুত্র জন্মিয়াছিল। পুরাকালে চিত্রসেন নামে এক মহাপাপপরায়ণ রাজা ছিল। সে অগম্যাগমন, ব্রাহ্মণের স্বর্ণ স্তেয়কারী, সদা সুরাতে তৃপ্ত এবং সতত বৃথা মাংসে রত ছিল। একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া এক ব্যাঘ্রকে হনন করিবার মানসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া ক্ষুৎপিপাসা ক্লেশে আকুল হইয়া যমুনাতটে উপনীত হইল। যেখানে স্বর্গকন্যাগণ ব্রত করিতেছিলেন। রাজা তাঁহাদিগের নিকট অন্ন প্রার্থনা করায় তাঁহারা তাঁহাকে উপবাসী থাকিয়া জন্মাষ্টমী ব্রত করিতে বলেন। রাজা ঐ ব্রত করিয়া সমস্ত পাপমুক্ত হইয়াছিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে ভীম নামক শূদ্রের এবং হেমপ্রভার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাকালে ভীম নামে একটী মহাপাপী শূদ্র ছিল। ভীম একদা এক ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব হরণ করিবার মানসে তাহার নিকট ছল পূর্ব্বক নিজের হীনত্ব জানাইয়া অন্ন ভিক্ষা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণের গৃহে আর কেহ ছিল না। ব্রাহ্মণ তাহাকে যথেচ্ছাক্রমে দ্রব্যাদি লইয়া আহার করিতে বলিলেন এবং সে সময়ে সমস্ত অপহরণ করিবার মানসে ব্রাহ্মণ সেবা করিবে বলিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ছল পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দিত এবং সেই জল পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিত। তাহাতে ভীমের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

পুরাকালে বল্লভ নামক ধনীর হেমপ্রভা নাম্নী এক সুন্দরী পত্নী ছিল। সে পরপুরুষে অনুরক্তা ছিল। একদা বল্লভ তাঁহার পত্নীকে জার সঙ্গ করিতে দেখিয়া যথোচিত ভৎর্সনা এবং প্রহার করিল। পত্নী একটী শূন্য গৃহে গমন পূর্ব্বক অন্ন জল স্পর্শ না করিয়া সুপ্ত হইয়া রহিল। দৈবাৎ সেই দিন বিষ্ণুর সর্ব্বপাপনাশন পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশী ব্রত ছিল। সেই উপবাসের ফলে হেমপ্রভা পাপনির্ম্মুক্ত হইল।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ে কালদ্বিজের এবং সুদর্শন বিপ্রের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাকালে করবীরপুরে কালদ্বিজ নামক এক মহাপাপী শূদ্র বাস করিত। সে পাপের ফলে নাগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। একদা আশ্বিন মাসে পৌর্ণমাসী দিনে সেই নাগ কতকগুলি খই এবং কড়ি বিল হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিল। তৎক্ষণাৎ দয়ালু হরি তাহার পাপ বিমোচন করিলেন।

ত্রেতা যুগে সুদর্শন নামে এক বিপ্র ছিল। সে শাস্ত্র নিন্দা করিত। পাপের জন্য সে গ্রাম্য শূকর হইয়া জন্মিল। তাহার পর কাকযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া বিষ্ঠা ভোজী হইল। পরে একদিন শ্রীহরির চরণোদক পান করিয়া সর্ব্বপাপ বিবর্জ্জিত হইল।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ে বিবিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, কার্ত্তিক মাসে রাধা দামোদরের সপর্য্যা ফল এবং কলিপ্রিয়ার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাকালে ত্রেতাযুগে শঙ্কর নামে সৌরাষ্ট্র দেশবাসী এক শূদ্র ছিল—তাহার ভার্য্যার নাম কলিপ্রিয়া ছিল। কলিপ্রিয়া সর্ব্বদা জারকাঙ্ক্ষিনী ছিল। একদা সে জারের সহিত পলাইয়া যাইবার পরামর্শ করিল। এবং রাত্রে অসি দ্বারা সুপ্ত স্বামীর শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক জারের নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত স্থলে গেল। সেখানে জারকেও মৃত দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে অন্য নগরে গমন করি। তথায় স্নানাদি

শুভ কার্ত্তিক মাসে রাধা ও দামোদরকে পূজা করিতে দেখিয়া সেও ঐরূপ পূজা করতঃ পাপ নির্মুক্ত হইল।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে কার্ত্তিক ব্রত বিধি, তুলসী মাহাত্ম্য, এবং তুলসীমূলগত জলপানে চণ্ডালের বৈকুণ্ঠ লাভ বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ে বিষ্ণু পঞ্চক, হরি নাম মাহাত্ম্য নামাপরাধ নিবারণ, পুরাণ পাঠ এবং শ্রবণের ফল ও পুরাণ পাঠ করাইবার বিধান বর্ণিত হইয়াছে।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা ও শপথ করার দোষ, প্রতিজ্ঞা পালন করার ফল, প্রতিজ্ঞা পালন না করার দোষ, দক্ষিণ হস্ত প্রদান পূর্ব্বক সত্য করিয়া তাহা না পালন করার দোষ এবং উহা প্রতিপালনের ফল, বীর বিক্রমের উপাখ্যান ও স্বর্গখণ্ডপাঠের এবং শ্রবণের ফল বর্ণিত আছে।

পুরাকালে কাঞ্চিপুরে বীরবিক্রম নামে এক শূদ্র ছিল। এক চণ্ডাল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া বীরবিক্রমের কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিল। তাহা শুনিয়া বীরবিক্রম বলেন, আমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ কর, কদাচ অন্যথা হইবে না। বীরবিক্রমের জ্ঞাতিগণ সকলে যথেষ্ট আপত্তি করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, যখন দক্ষিণকর দিয়াছি, তখন কখনই অন্যথা হইবে না। ইহাতে ভগবান্ স্বয়ং বীরবিক্রমের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সপরিবারে বৈকুণ্ঠ লইয়া গেলেন।

এই খানেই স্বর্গ-খণ্ড সমাপ্ত হইল।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দোল পূর্ণিমা

দোলের নিশি ফিরলো যখন,
খেলবো নূতন হোলি
ছিন্ন প্রাণের সম্মিলনে,
উঠবে আগুন জ্বলি!
জ্যোৎস্না ভরা নিঝুম রাতে,
সুপ্ত কদম তলে,
মিলন-মাগা ভক্ত কোটী
আসবে দলে দলে,
চরণ তলে দলন করি
সমাজ শাশন করা,
ক্ষুদ্র ভীম রুদ্র রূপে
মুক্ত বাঁধন হারা,
সুপ্ত যারা আজকে ভবে
ক্ষিপ্ত তারা হবে
ফাগের মত বক্ষ শোণিত
অর্ঘ্য করি লবে।
দোলের নিশি ফিরলো যখন,
দুলবে এবার প্রাণ
দুলবে গ্রহ চন্দ্র তারা,
দুলবে ধরা খান,
ভক্ত প্রাণের আকর্ষণে,
দুলবে ব্রজে হরি,
প্রেমের জোর নিরস ধরা
দিবে সরস করি!
অলোক ভূলোক উঠবে বাঁশি,
বিশ্ব দোলের সাথে,
স্বপন আবার সফল হবে,
আশীষ ধরি মাথে।
দোলের নিশি ফিরলো যখন,
ধরবো আবার গান,
বিষ্ণু চরণ দ্রব হবে
বইবে প্রেমের বান!
কালিয়েরী দম্ভনাশী
আবার হবে খেলা,
কংসপুরে ধ্বংস করি,
বসবে সুখের মেলা!
চিতায় রেণু সিত করি
শ্মশান পরে বয়ে
যমুনা গো উজান টানে
সবায় যাবে লয়ে!

অগ্নি যাবে গলি' তানে,
আঁধার হবে আলো—
শুক্ত ত্যাগ— রুধির ধারা
ফাগের মত ঢালো।
ফিরলো যখন দোলের নিশি,
শুক্ত আবার জাগো,—
শ্যামের পায়ে হৃদয় দিয়ে
সিদ্ধি জীবন মাগো।
কণ্ঠে আবার প্রণব জাগুক,
বক্ষে তেজের ধারা,
দীপ্ত নয়ন-লক্ষ্য পরে
হকরে পলক হারা!
বেদন যত-তন্ত্র বুকে,
মর্ম্মে-যত গান,
দোলের নিশায়—শ্যামের পায়ে
সকল কর দান।
ফিরলো যখন দোলের নিশি
খেলতে হবে হোলী,
দীপ্ত তেজে বিশ্ব পটে,
উঠতে হবে জ্বলি।
দোলের নিশি ফিরলো যখন'
বাঁচতে আবার হবে,
জয়ের নিশান গরব ভরে,
তুলবো আবার ভবে।
ওই-যে বাজে—শ্যামের বাঁশী,
ওই-যে আকুল গান,
সুপ্ত কেরে—জড়ের মতন
নাচেনা কার প্রাণ?
মরণ-দিয়ে বরণ-করি
অমর জীবন তরে,
ক্ষুণ্ণ কেবা খেলতে হোলি
আকুল আবেগ ভরে?
বিপদ বারণ—নীরদ বরণ
মাগছে-ফাগের দান,
যুগযুগান্ত সাধন মগন,
আয়রে সাধক প্রাণ!
দোলের নিশি ফিরেছে আজ,
বাজছে শ্যামের বাঁশী,
সত্য এবার হবেই স্বপন,
আঁধার সকল নাশি!

শ্রীকালিদাসী দেবী

ঈষ্টলীন্

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ডিলসাহেবের দুর্গতি।

ইস্কুলের কোনও ছেলে বড় একটা কিছু দুষ্টামি করিয়া পাছে ধরা পড়ে এই ভাবিয়া সংত্রস্তও সতর্কভাবে যেমন ঘরে ফেরে, কার্লাইল ঠিক যেন তেমনই ভাবে ওয়েষ্টলীনে ফিরিয়া আসিলেন। বরাবরই তিনি অতি সরল, কারও সঙ্গে লুকাচুরী কিছু করিতেন না,—তার কোনও প্রয়োজনও এ পর্য্যন্ত তাঁহার হয় নাই। কিন্তু এই বিবাহসম্বন্ধের কথা ঘুণাক্ষরেও কাহাকে কিছু জানাইতে তিনি ভরসা পাইলেন না। ভগ্নী কর্ণেলিয়া যে তাহার বিবাহই আদৌ পছন্দ করিবেন না, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। নিজে বিবাহিত হইয়া ভাইকে ছাড়িয়া তিনি স্বামীর সংসার করিতে যান নাই। ভাই যে এক্ষণ বিবাহ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া পৃথক সংসার করিবে, ইহাই বা তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? * আর যদিও ভ্রাতার বিবাহ

* বিবাহের পর ইয়োরোপে প্রত্যেক দম্পতিকে পৃথক একটা সংসার করিতে হয়, আর স্ত্রীই হন সেই সংসারের কর্ত্রী। মাতা বা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে তখন আলাদা হইয়া থাকিতে হয়। কারণ, তাঁহারা বধূর কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে পছন্দ করিতে পারেন না।

তিনি অনুমোদন কখনও করেন, লেডী ইজাবেলকে ভ্রাতৃ-বধুরূপে তিনি পছন্দ করিতেই পারেন না। তাহার মতে স্ত্রী হইবে,কাজের মেয়ে—পাকা গৃহিণী,—সুতরাং কার্লাইল বেশ বুঝিয়াছিলেন, ইজাবেলের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে একথা শুনিলে কর্ণেলিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিবেন এবং বিবাহে যাহাতে বাধা ঘটে, তার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিবেন। আর সে চেষ্টায় কে জানে বা কর্ণেলিয়া হয়ত সফল হইতেও পারেন। জিদ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া তেমন ভাবে লাগিলে, কোনও অভীষ্ট সাধন কর্ণেলিয়ার পক্ষে অসম্ভব বড় হয় না। বহুদৃষ্টান্ত তাহার তিনি দেখিয়াছেন। তাই কার্লাইল সব কথা চাপিয়া রাখাই সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন।

কেরু নামক এক সম্পন্ন পরিবার ঈষ্টলীন ভাড়া নিবেন এইরূপ কথা হইতেছিল, অনেক ভাড়া পাওয়া যাইবে,—কর্ণেলিয়াও তাহাতে অতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষ ঈষ্টলীনের বোঝাটাও তাহাতে ঘাড় হইতে নামে। কিন্তু কার্লাইল এখন সে বন্দোবস্ত রদ করিয়া দিলেন। কারণ বিবাহের পর তিনি নিজে, ইজাবেলকে লইয়া ঈষ্টলীনে থাকিবেন ইহাই স্থির করিয়াছিলেন।

মার্লিং গড় হইতে ফিরিবার পর প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল। বিবাহের তারিখ সন্নিকট হইয়া আসিল। বিবাহ হইবে, তারপর মধুমাস।* যথোপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করাইয়া কার্লাইল যাত্রার আয়োজন করিলেন। আগের দিন সন্ধ্যার সময় ডিনারের পর তাঁহাদের চা খাইবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় বার্বারা আসিল।

কর্ণেলিয়া কহিলেন, "আজ একটু আগেই আমাদের ডিনার § হইয়াছে,—কার্লাইল কাল সকালেই নাকি মার্লিং-গড়ে যাইবে। অনেক কাজ আছে, চা খাইবার অবসর হইবে না।

সময় মত সব গুছাইয়া ফেলিতে হইবে,—কার্লাইল ছট্ফট করিতেছিলেন, কহিলেন,—"আমার আজ চা না খাইলেও চলে। ঢের কাজ আছে, বড় দেরী হইয়া যাইতেছে।"

"না, তা চলে না! না খাইয়া যাইতে পারিবে না। এই দেখ বার্বারা!—আর্কিবাল্ডের রকমই আলাদা, মার্লিং গড়ে যাইতে হইবে,—কেন, একটু আগে আমাকে বলিতে হয় না? এই মাত্র বলিল ব'স বার্বারা।"

বার্বারা বসিল,—চা পান আরম্ভ হইল। তখন কর্ত্রীবিবি তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যাই, আর্কিবাল্ডের কাপড় চোপড় সব গুছাইয়া রাখিয়া আসি।"

কার্লাইল চমকিয়া ব্যস্তভাবে কহিলেন, "না না, তোমার যাইতে হইবে না—আমি নিজে সব গুছাইয়া নিব। পিটার আমার বড় তোরঙ্গটা আমার ঘরে নিয়া রাখ!"

"বড় তোরঙ্গটা! ওমা কেন, সে যে একটা আস্ত বাড়ীর মত মস্ত! সেটা আবার সঙ্গে টানিয়া নিবে কেন?"

"অনেক দরকারী কাগজপত্রও যে আছে——"

"তা থাক্ না,—সব আমি ছোট তোরঙ্গটায় পুরিয়া দিতে পারিব। সঙ্গে কি নিবে বল না? পিটার, ছোট তোরঙ্গটাই তুমি ওর ঘরে নিয়া রাখ।"

কার্লাইল পিটারের দিকে চাহিয়া অলক্ষ্যে একটু ইসারা করিলেন,—পিটারও তদ্রূপ অলক্ষ্য ইসারায় প্রভুকে জানাইল, বড় তোরঙ্গটাই সে নিয়া রাখিবে। কার্লাইল, কহিলেন, "না না কর্ণেলিয়া, তোমার কাপড় সব আমিই গুছাইয়া নিব। ওকি, ওকি কি করিলে?"

"দূর হ'ক্ ছাই! আঙ্গুলটা গেল! তোমার কাছে ষ্টিকিংপ্লাষ্টার * আছে না?"

"হাঁ, আছে! এই নেও।"

কার্লাইল তাঁহার পকেট বুক খুলিয়া একটু প্লাষ্টার বাহির করিয়া দিলেন। তাড়াতাড়িতে বড় খামে ভরা আটা একখানা পত্র পড়িয়া গেল।

"ও আবার কার চিঠি? মেয়েমানুষের হাতের লেখা যে! দেখি।" এই বলিয়াই কর্ণেলিয়া হাত বাড়াইলেন। কার্লাইল তাড়াতাড়ি চিঠি খানার উপরে হাত চাপা দিয়া কহিলেন, "ও একটা গোপন চিঠি, তুমি কেন দেখিবে?"

* বিবাহের পর মাসেক কাল নবদম্পতি অন্য কাজকর্ম সব বন্ধ রাখিয়া আনন্দে বিচরণ করে। এই কালটাকে Honeymoon 'মধুমাস' বলে।

§ ডিনারের কিছুকাল পরে চা খাইবার নিয়ম আছে।

* কোনও স্থান কাটিয়া গেলে আঁটার মত ঔষধ মাখান একরূপ পুরু কাগজ লাগান হয়। তার নাম ষ্টিকিংপ্লাষ্টার।

"গোপন চিঠি ?—গোপন চিঠি আবার কিসের ! আমি দেখিতে পারি না, এমন কোনও চিঠি তোমার থাকিতেই পারে না। কালকার ডাকে আসিয়াছে যে।" কর্ণেলিয়া আবার চিঠিখানি ধরিলেন।

'না না কর্ণেলিয়া, চিঠি নিও না, দেও!' বিস্মিত হইয়া কর্ণেলিয়া চিঠি ছাড়িয়া দিলেন,—কহিলেন, "কি আর্কিবাল্ড ? কি ব্যাপার কি ?"

"কিছুই না। তবে কারও গোপন কোনও চিঠি আর কারও নিয়া পড়া উচিত কি ?"

চিঠিখানা পকেটে তুলিয়া রাখিয়া কার্লাইল হাসিয়া উঠিলেন। বার্বারা চাহিয়া দেখিল, কার্লাইলের মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে, সেও বড় বিস্মিত হইল। মনটাও যেন কেমন করিয়া উঠিল। কার ও চিঠি ? স্ত্রীলোক কে কার্লাইলকে এমন একটা গোপনীয় চিঠি লিখিতে পারে ?

কর্ণেলিয়া কহিলেন, "আর্কিবাল্ড! ওই খামের উপরে হেন্ পরিবারের মোহরের মত মোহর দেখিলাম।"

"মোহর যাই থাক্, চিঠি আমি আর কাহাকেও দেখাইতে পারি না।"

কর্ণেলিয়া কিছু আর বলিলেন না। কিন্তু মনে মনে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। ভ্রাতার এরূপ ব্যবহার তিনি আর কখনও দেখেন নাই।

বার্বারা কহিল, "তুমি বুঝি লর্ড মণ্টসেভার্ণের বাড়ীতে যাইবে, তাদের সঙ্গে দেখা করিবে ?"

"হাঁ।"

"লেডী ইজাবেলের বিবাহ শীঘ্র হইবে নাকি ? তার কিছু শুনিয়াছ ?"

"অত খবর কে রাখে ?—হাঁ, তোমার চায়ে বুঝি চিনি আর একটু লাগিবে বার্বারা ?"

"হাঁ, আর অল্প একটু।"

কার্লাইল ব্যস্তভাবে চার পাঁচ দলা চিনি একেবারে বার্বারার চায়ের পেয়ালায় ফেলিয়া দেখিলেন।

কর্ণীবিবি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ! ওকি করিলে ?"

কার্লাইল বড় অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন. "তাইত! আমার খেয়ালই ছিল না। তা রাগ করিও না বার্বারা। আর এক পেয়ালা চা নেও।"

কর্ণীবিবি তীব্র স্বরে উত্তর করিলেন, "তা নিবে,—কিন্তু অতখানি চিনি আর এক পেয়ালা চা ত নষ্ট হইয়া গেল। তোমার হইয়াছে কি !"

নূতন এক পেয়ালা চা খাইয়াই বার্বারা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "বড় দেরী হইয়া গেল আমার। মা রাগ করিবেন। আর তাইত, রাত্রি হইয়া গিয়াছে যে। একা এখন গেলে মা কি বলিবেন।

কর্ণীবিবি কহিলেন, "তা আর্কিবাল্ড কেন গিয়া তোমাকে পৌছিয়া দিয়া আসুক না ?"

"তাইত, বড় দেরী হইয়া যাইবে যে। ডিল আফিসে আমার জন্য বসিয়া আছে। তা পিটারও ত গেলে পারে। আচ্ছা থাক্, আমিই যাইব। তাড়াতাড়ি কর বার্বারা, চল।"

দুই জনে পথে বাহির হইলেন। লেডী ইজাবেলের বিবাহ হইবে কিনা এ সম্বন্ধে বার্বারা অনেক প্রশ্ন করিল কার্লাইল অগত্যা এই মাত্র বলিলেন, শীঘ্রই হইতে পারে। কিন্তু কার সঙ্গে হইবে ? উত্তরটা কার্লাইল কৌশলে এড়াইয়া গেলেন। কথায় কথায় তাঁহার নিজের বিবাহের সম্ভাবনার প্রসঙ্গও বার্বারা তুলিয়া ফেলিল। কার্লাইল বলিলেন, তিনিও হয়ত বিবাহ শীঘ্র করিতে পারেন। কাকে করিবেন তাও হয়ত লোকে শীঘ্রই জানিবে। ক্রমে বাড়ীর কাছে পৌছিয়া কার্লাইল কহিলেন, "তবে তুমি এখন এস বার্বারা, আমি আর ভিতরে যাইব না। তোমার মাকে আমার নমস্কার জানাইও।"

বার্বারা কহিল, "আমার একটি কথা রাখিবে আর্কিবাল্ড ?"

"কি বল ?"

"তুমি যে গেল বছর আমাকে একটা হার আর লকেট দিয়াছিলে মনে আছে ?"

"হাঁ, তার কি ?"

"আমি সেই লকেটে রিচার্ডের, এনের আর মার চুল কিছু রাখিয়াছি। আরও একটু যায়গা এতে আছে। এই দেখ।" লকেটটি তুলিয়া বার্বারা দেখাইল

"হাঁ, আছে বই কি। কেন, তার জন্য কি ?"

"আমার বন্ধুদের—অর্থাৎ কিনা যাদের আমার খুব ভাল লাগে তাদের একটু একটু স্মৃতিচিহ্ন আমি এতে রাখিব ভাবিয়াছি। তোমার কিছু চুল যদি পাই—"

"আমার চুল!—হা—হা—হা! বল কি বার্বারা? আমার চুল ওখানে রাখিয়া কি হইবে?"

বড় ব্যথা পাইয়া ব্যথিত কম্পিত স্বরে বার্বারা কহিল, "আর কিছু নয় আর্কিবাল্ড, তবে—তবে আমার বড় বন্ধু যারা—যাদের—যাদের খুব ভাল লাগে আমার—তাদের স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে চাই।"

বার্বারার এই বেদনা—এই ভাবান্তর কার্লাইল যেন লক্ষ্যই করিলেন না। সহজভাবে হাসিয়া কহিলেন, "তা আগে কেন বলিলে না বার্বারা? এই ত কাল চুল ছাঁটিলাম, কিছু পাঠাইয়া দিতাম। পাগল যেন! আমি যেন কত বড়ই একটা লোক যে আমার একটু চুল তোমার ওই লকেটে না রাখিলেই নয়। যাক, আর মোটেই সময় নাই বার্বারা, এখন আসি। তুমি যাও, ভিতরে যাও।"

এই বলিয়াই কার্লাইল তাড়াতাড়ি করিয়া চলিয়া গেলেন। দুঃখে লজ্জায় অভিমানে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বার্বারা কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিল। আপন মনে কহিল, "ছি—ছি—ছি! আমি কি করিলাম—কি করিলাম! হায় আর্কিবাল্ডের মন কি এমনই নীরস—এমনই কঠোর! কিছুই কি সে বোঝে না? এ ভাব একটুও কি কখনও তার মনে জাগে না? না—না! আছে—আছে! হালকা ভাবে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া যাই বলুক, তার মনে এ কথা আছে! একদিন বলিবে। কথায় কথায় না আজই আর্কিবাল্ড বলিল সে শীঘ্রই বিবাহ করিবে, স্ত্রীও সে মনোনীত করিয়াছে! হায় আর্কিবাল্ড! যেদিন বিবাহ করিবে, বুঝিবে কত ভাল আমি তোমায় বাসি!"

তিন চারিদিন পরে ডিল সাহেব একখানি চিঠি হাতে করিয়া কর্ণীবিবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কয়েকটা নূতন মলমলের পরদা জানালায় টাঙ্গান হইয়াছিল, কর্ণীবিবি নিবিষ্ট ভাবে দেখিতেছিলেন, সেগুলি কেমন মানাইয়াছে। সুতরাং ক্ষুদ্রকায় ডিল সাহেব আদৌ তাঁহার দৃষ্টিগোচরই হইলেন না।

ডিল কহিলেন, "একটা চিঠি আছে মিস্ কর্ণেলিয়া। পিয়ন আফিসে দিয়া গিয়াছে। আর্কিবাল্ড সাহেবের চিঠি।"

একটু বিরক্ত ভাবে কর্ণীবিবি উত্তর করিলেন, "সে আবার লিখিয়াছে কি? কবে আসিবে তাই?"

"চিঠিটা পড়িয়াই দেখুন, আমার পত্রে ত আসিবার কথা কিছুই লেখেন নাই।"

কর্ণীবিবি চিঠিটা খুলিয়া পড়িলেন, পড়িয়া একেবারে স্তম্ভিত—মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া চেয়ারে হেলিয়া পড়িলেন! এরূপ স্তব্ধতা বা অবসাদ জীবনে কর্ণীবিবির কেহ কখনও দেখে নাই।

পত্রে এই লেখা ছিল,—

মার্লিং গড়, ১লা মে।

প্রিয় কর্ণেলিয়া,

আজ সকালে লেডী ইজাবেল ভেনের সঙ্গে আমার বিবাহ হইল। তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে এই সংবাদ মাত্র আজ তোমাকে জানাইলাম। বিস্তৃত বিবরণ কাল কি পরশু তোমাকে সব লিখিব,—তাতেই সব বুঝিতে পারিবে।

তোমার চিরস্নেহাধীন ভ্রাতা
আর্কিবাল্ড কার্লাইল।

কিয়ৎকাল পরে রুদ্ধকণ্ঠ যেন একটু মুক্ত হইল,—সেই অর্দ্ধমুক্ত কণ্ঠে এই একটি কথা মাত্র নির্গত হইল—'সব ভুয়া।"

নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় ডিল সাহেব দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা কর্ণীবিবি চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—

"সব ভুয়া—বাজে কথা! আমি বলিতেছি বাজে কথা! এক পায়ে হাঁসের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ যে! সব ভুয়া—একটা বাজে কথা—কেহ ফাঁকি দিয়াছে! নয় কি?"

ডিল উত্তর করিলেন "আমিও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছি, মিস্ কর্ণী কিন্তু কথাটা ভুয়া নয়। আমিও একটা চিঠি পাইয়াছি।"

"হইতেই পারে না। এমন একটা ঘটনা অসম্ভব! তিনদিন আগে সে যখন যায়, বিবাহ করিবে এমন কথাও সে তখন ভাবে নাই!'

"তা কি করিয়া বলিতে পারেন, মিস্ কর্ণী? আমরা কিসে বলিতে পারি যে তিনি বিবাহ করিতেই যান নাই। আমার ত মনে হয় তাই তিনি গিয়াছিলেন।"

দারুণ ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া কর্ণীবিবি বিকট চীৎকারে যেন গৃহ কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিবাহ করিতে গিয়াছিল! এত বড় আহাম্মক সে! হইতেই পারে না যে বিবাহ করিতে যাইবে—আরও ঐ পুতুলের মত লেডী মেয়েটাকে না না! তা হইতেই পারে না।"

এক টুকরা কাগজ কর্ণীবিবির সম্মুখে ধরিয়া ডিল সাহেব কহিলেন, "এই বিজ্ঞাপনটাও তিনি পাঠাইয়াছেন, এ অঞ্চলের সব খবরে কাগজে দিতে। বিবাহ যে হইয়াছে, তাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।"

কর্ণীবিবি কাগজখানা নিয়া পড়িলেন।—হাত একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়া বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কাঁপিতেছিল।

"১লা মে তারিখে মার্লিংগড়ে লর্ডমন্টসেভার্ণের পুরোহিত কর্তৃক ভূতপূর্ব্ব লর্ড মন্টসেভার্ণের একমাত্র কন্যা লেডী ইজাবেল ভেনের সঙ্গে ঈষ্টলীনের আর্কিবাল্ড কার্লাইল সাহেবের বিবাহ হইয়াছে।"

কর্ণীবিবি কাগজখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "কখনও তাকে আমি ক্ষমা করিব না! আর ওই মেয়েটা—তাকেও কখনও ক্ষমা করিব না। আমাদের গৃহে আমাদের কেহ বলিয়াও কখনও তাকে স্বীকার করিব না! মূর্খ! গণ্ড মূর্খ! লর্ড মন্ট-সেভার্ণের মেয়েকে বিবাহ করিল—যার জন্য কেবল জলের

মত তাকে পয়সাই খরচ করিতে হইবে! সেই একটা পুতুল—পালকে আর রেশমী পোষাকে সাজিয়া রাজ-দরবারে যায়, ছ হাত লম্বা ঘাঘরার ঝুল যার পিছনে চলে! মূর্খ! একেবারে মূর্খ!"

"মূর্খ! বলেন কি মিস্ কর্ণেলিয়া! আর্কিবাল্ড সাহেব মূর্খ!"

"মূর্খও ভাল! একেবারে দুষ্টবুদ্ধি উন্মাদ পাগল! নহিলে এমন কাজও সে করে! হায়, হায়! একটুও ঘুণাক্ষরে যদি বুঝিতে পারিতাম, আদালতে দরখাস্ত করিয়া পাগলাগারদে তাকে পাঠাইতাম! হাঁ করিয়া চাহিয়া আছ যে বুড়া ডিল! নিশ্চয় তা করিতাম! তখনই তাকে ধরাইয়া পাগলা গারদে পাঠাইতাম! হাঁ, কোথায় তারা এখন থাকিবে?"

"বোধ হয় ঈষ্টলীনে!"

আবার কর্ণীবিবি অতি বিকট এক চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

"কি! ঈষ্টলীনে! ঐ কেরুদের নিয়া একই সঙ্গে ঈষ্টলীনে থাকিবে! তুমিও কি পাগল হইয়া উঠিলে!"

"কেরুদের ত ঈষ্টলীন আর ভাড়া দেওয়া হইবে না! ঈষ্টারের পর আর্কিবাল্ড সাহেব মার্লিংগড় হইতে ফিরিয়াই কেরুদের জানান, ঈষ্টলীন তাঁদের ভাড়া দেওয়া হইবে না। বোধ হয় তখনই লেডী ইজাবেলের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়া আসেন, বিবাহের পর তাঁহারা ঈষ্টলীনেই থাকিবেন।"

কি সর্ব্বনাশ! ঈষ্টলীন ভাড়া দিবে না, নিজেরা বড় মানুষী করিয়া সেখানে থাকিবে! এখন উপায়। অসাড় ভাবে কিয়ৎকাল কর্ণীবিবি বসিয়া রহিলেন। সহসা লাফ দিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দৃঢ় পদক্ষেপে ঘুরিয়া ডিল সাহেবের পিছনে আসিয়া দুই হাতে তাঁহার কোটের কলার (collar) টা ধরিয়া প্রচণ্ডবেগে তাঁহাকে ঝাঁকিতে লাগিলেন। খর্ব্ব ক্ষীণদেহ বৃদ্ধ ডিল—একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া কয়েক মিনিট ধরিয়া সুদীর্ঘকায়া প্রচণ্ডা কর্ণীবিবির হাতে যেন একটা পুতুলের মত অসহায় অবস্থায় এই ঝাঁকুনি খাইলেন। ঝাঁকুনির প্রচণ্ডবেগে তাঁহার নিশ্বাস পর্য্যন্ত রোধ হইবার মত হইল!

"হতভাগা ধূর্ত্ত পাজি! তোমাকেও পাগলা গারদে পাঠান আমার উচিত ছিল! এই বজ্জাতী চালে তোমারও হাত আছে। তুমিই তাকে তাল দিয়াছ! সব তুমি জানিতে।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে লাঞ্ছিত ডিল কহিলেন, "না—না মিস্ কর্ণী, দোহাই ধর্ম্মের—আমি কিছুই জানিতাম না। আজ আফিসে সেই চিঠিতে এই খবর যখন পাই, আমি যেন আমাতে আর ছিলাম না, এমনই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম।"

"কেন সে এই সর্ব্বনাশ গিয়া করিল! ঐ হাভাতে লর্ডের মেয়ে—একটি পয়সা যার নাই—কেবল রাজকন্যার মত যাকে পালিতেই হইবে—তাকে গিয়া বিবাহ করিল! ঈষ্টলীন কেরুদের ভাড়া দেওয়া হইল না, এটা জানিয়াও হতভাগা, তুমি চুপ করিয়াছিলে! নিশ্চয়ই তুমি তাকে তাল দিয়াছ! এত বড় আহাম্মক সে হইতে পারে না যে রাজবাড়ীর মত ঐ ঈষ্টলীনে সংসার করিয়া থাকিবে!"

"দোহাই মিস কর্ণী, আগে আমি এর কিছুই জানিতাম না। আর জানিলেই বা কি? আমি ত তাঁর চাকর মাত্র। তিনি বিজ্ঞাপনে ঈষ্টলীনের কার্লাইল সাহেব বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে ঈষ্টলীনে তিনি নিজে থাকিবেন। আর সত্য বলিতে কি মিস কর্ণী, তা তিনি পারেন। আপনি ও জানেন, এ সামর্থ্য তাঁর আছে। তা যাই বলুন, ঈষ্টলীনই তাঁহার সম্পদ আর পদমর্য্যাদার যোগ্য বাসস্থান এখন হইবে। আর—আর—লেডী ইজাবেল, লর্ড সমাজের মেয়ে হইলেও বড় ভাল—বড় সুন্দর—বড় মিষ্টস্বভাবের মেয়ে তিনি। হাঁ!"

"এ আহাম্মুকীর ফল তাকে ভুগিতে হইবে!"

"ঈশ্বর যেন তা না করেন, এমন কুডাক ডাকিবেন না।"

"মূর্খ! মূর্খ! হায়! কিসে তাকে পাইয়াছিল যে এত বড় সর্ব্বনাশ একটা করিল!"

"যাই হ'ক মিস্ কর্ণী, আমি এখন আসি।—আফিসে অনেক কাজ আছে। আপনি যে আমাকে মিথ্যা দোষী মনে করিয়া এই লাঞ্ছনা করিলেন, ইহাতে বাস্তবিকই আমি বড় ক্ষুব্ধ হইতেছি!"

"আবারও করিব,—যদি আমার সামনে আর এস! যাও, দূর হও!"

ডিল চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ কর্ণীবিবি পাথরের মত বসিয়া রহিলেন। ক্রমে এই অসাড় ভাব দূর হইল, ধীরে ধীরে তিনি কি ভাবিয়া মাথা নাড়িলেন। একবার এ হাত, আবার ওহাত তুলিয়াও একটু নাড়াচাড়া করিলেন। মনে মনে যেন কি আলোচনা করিয়া একটা বুদ্ধি স্থির করিয়া তিনি নিতেছিলেন। আরও কিছুকাল গেল, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। টুপী আর শাল পরিয়া বাহির হইয়া হেয়ার সাহেবের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সংবাদ দিনের মধ্যেই ওয়েষ্টলীনে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। যে ভাই তাঁহার সর্ব্বস্ব, যাঁকে লইয়াই তিনি সংসার করিয়া আছেন, সেই ভাই সহসা এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাকে না জানাইয়া বিবাহ করিল, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে লইয়া এখন নূতন সংসার আরম্ভ করিবে, ইহা তাঁহার পক্ষে বড় একটা গ্লানির কথা। সুতরাং সংবাদটা তিনি নিজেই প্রথমে সকলকে জানাইবেন,—নতুবা তাঁহার মুখ থাকে না। তাই তখনই

তিনি বাহির হইলেন। সকলের আগে হেয়ার সাহেবের বাড়ীর দিকে চলিলেন, বার্বারাকে কথাটা আগে শুনাইতে। বার্বারা যে মনে মনে কার্লাইলের গৃহিণী হইবার বড় একটা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। তাই গায়ের ঝালটা সর্ব্বপ্রথমে তাহার উপরে ঝাড়িতেই বড় একটা আগ্রহ তাঁহার জন্মিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই কর্ণীবিবি 'ওঃ' 'উঃ!' প্রভৃতি কতিপয় বেদনাব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

বার্বারা কহিল, "আপনার কি অসুখ করিয়াছে? না কোনও দুর্ঘটনা কিছু ঘটিয়াছে!"

"দুর্ঘটনা! হাঁ, তা বলিতে পার বটে! আমি আর আমাতে নাই। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে!, আর্কিবাল্ড———"

বার্বারা শিহরিয়া উঠিল,—কহিল, "আর্কিবাল্ড! ওমা, কি হইয়াছে তার? রেলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে নাকি? তার হাত পা ভাঙ্গিয়াছে?"

"হায়, হায়! তাই যদি ভাঙ্গিত! তবে ত ভালই ছিল! হাত পা তার ঠিক আছে, তাই ত এমন সর্ব্বনাশটা ঘটিল! না না বার্বারা, হাত পা ভাঙ্গা টাঙ্গা কিছু নয়, তার চেয়ে অনেক বড় বিপদ এ!"

কর্ণীবিবির ভাব সাব সে বেশ জানিত। বার্বারার তখন মনে হইল, বড় কোনও একটা আর্থিক ক্ষতির কারণ কিছু ঘটিয়াছে, দুই চারিটা সম্ভাবনার কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া শেষে কহিল, "বোধ হয় তবে ঈষ্টলীন সম্বন্ধে কিছু একটা হইয়াছে। কেরুরা বুঝি সেখানে আসিবে না?"

"না, তারা আসিবে না। তবে আমার বুদ্ধিমান্ ভাইটি নিজেই সেখানে যাইতেছেন। বলিব কি বার্বারা, আর্কিবাল্ড গিয়া আস্ত বলদের মত একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আসিয়া ঈষ্টলীনেই সংসার করিয়া থাকিবে।"

বার্বারার মুখখানি যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আর্কিবাল্ড ঈষ্টলীনে সংসার করিবে, আর সেই সংসারের গৃহিণী—আহা! বড় ঘন একটা রক্তোচ্ছ্বাস বার্বারার কপোল দুটি ভরিয়া উঠিল!

কর্ণীবিবি ইহা লক্ষ্য করিলেন।

"হুঁ—হুঁ! আহ্লাদে ত একেবারে আটখানা, থাক একটু, তখন বুঝিবে।"

মনে মনে এই মন্তব্য করিয়া কর্ণীবিবি কহিলেন, "এই সংবাদ যখন আজ সকালে পাইলাম, অকস্মাৎ যেন একটা বজ্রাঘাত মাথায় পড়িল। হতভাগা বুড়া ডিল খবর লইয়া আসে। তাকে ধরিয়া খুব ঝাঁকিয়া দিয়াছি।"

"ঝাঁকিয়া দিয়াছেন! ওমা, সে কি?"

"ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে তার হাড় দুটায় আর কিছু রাখি নাই। দু দিনে এ ঝাঁকুনি সে ভুলিতে পারিবে না! আর্কিবাল্ডের এই বজ্জাতী চালে সেই তাল দিয়াছে! জানিয়া শুনিয়া সব সে চাপিয়া রাখিয়াছিল। তার উচিত ছিল আমাকে আসিয়া সব বলা। ঐ দুটার নামে ষড়যন্ত্রের একটা মামলা করা যায় কিনা, তাই ভাবিতেছি।"

বার্বারা বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। কি হইয়াছে? কর্ণীবিবি কি বলিতে আসিয়াছে? সত্য যাহা ঘটিয়াছে, সেরূপ কোনও চিন্তা তার মনের কোণেও উঠিল না।

কর্ণীবিবি কহিলেন, "লর্ড মণ্টসেভার্ণের সেই কচি মেয়েটার কথা তোমার মনে আছে ত? এখনও যেন আমি চক্ষে তাকে দেখিতেছি—সেই যে কন্সার্টে আসিয়াছিল—সাদা ধব্ধবে রেশমী পোষাক—গা ভরা ঝক্ঝকে হীরার অলঙ্কার—ফুলান এলো চুল গুলো কাঁধ ভরিয়া পিঠ ভরিয়া পড়িয়াছে—যেন রূপকথার রাজকন্যা! তা সে যা আছে, তাদের ঘরে বেশ আছে। আমাদের তাকে পোষাইবে কেন?"

"কেন, তার কথা কেন? কি হইয়াছে?"

"আর্কিবাল্ড তাকে বিবাহ করিয়াছে!"

কর্ণীবিবির দুইচক্ষুর তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে সে বসিয়া আছে, একটু ভাবান্তরও তার ধরা পড়িবে। কিন্তু দারুণ এই আঘাতে আত্মসম্বরণ করা বার্বারার দুঃসাধ্য হইল। মুখখানি একেবারে পাংশু হইয়া গেল। কোনও মতে বলিয়া উঠিল,—"না—না! বলেন কি? ইহা সত্য নয়।"

"সত্য! একেবারে সত্য! কাল মার্লিংগডের গির্জ্জায় তাদের বিবাহ হইয়াছে। তখনও যদি জানিতাম, কালই গিয়া তাদের পৃথক করিয়া ফেলিতাম, যদিও বিবাহ হইয়া গিয়াছিল! তবে কাল যা সম্ভব হইত, আজ কিছু আর তা হয় না।"

বার্বারা আর সেখানে অপেক্ষা করিতে পারিতেছিল না। একবার প্রাণপণ চেষ্টায় তাকে সামলাইয়া নিতে হইবে। নতুবা কর্ণীবিবির সম্মুখে তার সকল নিরাশার বেদনা যে একেবারে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল, "আপনি একটু বসুন, মা চাকরদের একটা কথা বলিতে বলিয়াছিলেন, ভুলিয়া গিয়াছি। আমি আসি।"

বলিয়াই ছুটিয়া বার্বারা একেবারে তার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া—গৃহতলে আছড়িয়া পড়িল। দারুণ বেদনাময় একটা রোদন ধ্বনিও তার মুখে ব্যক্ত হইল। হায়, আজ যে তার জীবনের সকল আশা ফুরাইল—সকল আলো নিভিয়া গেল! উঃ—কি ভুল সে এতদিন বুঝিয়াছিল! সে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু আর্কিবাল্ড হায়, একটুও ত তাকে ভালবাসে নাই। তার কথা ত একেবারেই কিছু ভাবে নাই!

একটা দাসী নিকটে ছিল, বার্বারার সেই রোদন ধ্বনি শুনিয়াছিল,—ধীরে ধীরে সে গিয়া দরজাটি একটু খুলিয়া দেখিল, বার্বারা গৃহতলে পড়িয়া যেন অসহনীয় বেদনায় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। সে বুঝিল ব্যাপারটা কি, কিন্তু এ সময়ে গৃহে গিয়া প্রভুকন্যাকে কিছু বলা সঙ্গত হইবে না বুঝিয়া দরজাটি আবার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিল।

সে শব্দ বার্বারার কাণে গেল,—চমকিয়া সে চাহিল, আপনার অবস্থা সে স্মরণ করিল। না না, বুক তার একেবারে আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাহিরে যে তাকে শান্ত হইয়াই থাকিতে হইবে। ছি, লোকে কি বলিবে? দুঃখ যাহা পাইবার ত পাইল—ইহার উপর আবার এত বড় অপমানও কি সে আর সহিতে পারে?

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, চক্ষু মুছিল, মাথার চুলগুলি আবার হাত দিয়া ঠিক করিয়া নিল। কিন্তু তখনই আবার বুক ভরিয়া প্রবল বেদনার উচ্ছ্বাস উঠিল।

"বিবাহ করিয়াছে! আর একজনকে—আর একজনকে বিবাহ করিয়াছে! আর সেই আর একজন সে! উঃ! হৃদয়! বল ধর! ধৈর্য্য ধর! অন্ততঃ আজ তার ভগ্নীর সম্মুখে আমার মুখ রাখ!"

দৃঢ় প্রয়াসে মন স্থির করিয়া বার্বারা বাহির হইয়া আসিল। কর্ণীবিবির সম্মুখে সে যখন প্রবেশ করিল, মুখে তার একটু হাসিই বরং দেখা যাইতেছিল!

কর্ণীবিবি আবার তাঁহার দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

"যদি একটুও বুঝিতাম আগে সত্যই যোগাড় যন্ত্র করিয়া পাগলাগারদে তাকে পাঠাইতাম। এত আস্ত পাগলামো সে করিয়াছে! এযে দুর্গতি এখন তার হইবে, তার চেয়ে পাগলাগারদে দুবছর থাকাও তার ভাল ছিল। সে যে বিবাহই করিবে, তা কখনও ভাবি নাই। বড় হইয়াছে অবধি বরাবর তাকে সাবধান করিয়াছি, বিবাহ করিলেই খরচ বাড়িবে—টাকাকড়ি কিছু আর থাকিবে না।"

বার্বারা ধীরে ধীরে কহিল, "হাঁ, এটা যোগ্য বিবাহ হয় নাই।"

"যোগ্য বিবাহ! রূপ কথায় পরীর সঙ্গে দানোর বিবাহ যেমন হয়, এ ঠিক তাই হইয়াছে। ঐ অত বড় ঘরের অমন পরীর মত সুন্দর মেয়ে—সেই তার সব সাজ পোষাক হীরা জহরতের অলঙ্কার, আর আর্কিবাল্ডটা কি? ঠিক সেই রূপ কথার জঙ্গলী দানোর মত—একটা উকিল না বুনো ভাল্লুক!"

বার্বারা চুপ করিয়া রহিল,—মনে তাঁর এমন দারুণ বেদনা না থাকিলে এই উপমায় সে হাসিয়াই উঠিত।

কর্ণীবিবি বলিতে লাগিলেন, "তা আমি কি করিব তা ঠিক করিয়াছি। কয়দিন হইল ঈষ্টলীনে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, জমকাল সাজপরা পাঁচ ছয়টা চাকর চাকরাণী সেখানে ফর ফর করিতেছে যেন রাজবাড়ীর লোক! দেমাক কত! আমি কি জানি? ভাবিলাম কেরুরা বড়লোক তারা, হয়ত ঐ সব চাকরচাকরাণী রাখিয়াছে। যদি জানিতাম আর্কিবাল্ড তাদের রাখিয়াছে, তখনই তাদের বিদায় করিয়া দিতাম।"

বার্বারা নিরুত্তর।

কর্ণীবিবি আবার বলিলেন, "কালই গিয়া সে গুণাকে বিদায় করিয়া দিব। আমার লোকজন নিয়া গিয়া সেখানে থাকিব, আর নিজের বাড়ীটা ভাড়া দিব। ঐ লর্ডের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে; এমনিই ত খরচের অন্ত থাকিবে না। তার উপর ঐ সব চাকর চাকরাণী রাখিলে আর রক্ষা আছে? ঐ পুতুলের মত সাজান এক রত্তি একটা বড় লোকের মেয়ে—ওকে লইয়া আর্কিবাল্ড কি সংসারই যে করিবে। গৃহস্থালীর ও জানে কি? জানে ত কেবল সাজিয়া গুজিয়া বাহার করিয়া বেড়াইতে।"

বার্বারা কহিল, "তিনি কি তা পছন্দ করিবেন?"

"না করেন না করিবেন। তার জন্যে ত ভারি কেয়ার করি আমি! সে থাক্‌ বার্বারা, খবরটা দিয়া গেলাম। এখন আমি তবে উঠি। বলিতে কি বার্বারা, আর্কিবাল্ডের মৃত্যু সংবাদ পাইলেও বুঝি আমি এত ব্যথা পাইতাম না।"

বার্বারা বলিয়া ফেলিল, "আপনার বোধ হয় হিংসা হইয়াছে।"

"তা হইতে পারে! কেনই বা হইবে না। সেই এতটুকু ছেলে ছিল, মা ফেলিয়া গেল, আমি মানুষ করিয়া তুলিয়াছি। এখন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, সোহাগের বউ লইয়া ঘর করিবে, আমার চেয়েও সে তার বড় হইবে, এতে কার না হিংসা হয়? তোমার যদি এমন কিছু ঘটিত, তোমারও হইত!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লর্ডমণ্টসেভার্ণের বিস্ময়।

লর্ড মণ্টসেভার্ণ ফ্রান্সে ছিলেন। সংবাদপত্রে এই বিবাহের ঘোষণা পড়িয়া তিনিও যেন বজ্রাহতের ন্যায় হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। লণ্ডনে এক হোটেলে তখন লেডী ইজাবেল ও কার্লাইল সাহেব অবস্থিতি করিতেছিলেন। লর্ড মণ্টসেভার্ণ সেখানে গিয়া উঠিলেন। কার্লাইল বাহিরে কোথায় গিয়াছিলেন, ইজাবেল একা তখন ঘরে বসিয়াছিল।

"একি ব্যাপার ইজাবেল! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

সলজ্জভাবে ইজাবেল উত্তর করিল, "হাঁ, কয়দিন হইল বিবাহ হইয়াছে।"

"ঐ উকিল কার্লাইলের সঙ্গে! কেমন করিয়া ইহা ঘটিল?"

ইজাবেল সহজভাবে উত্তর করিল, "তিনি প্রস্তাব করিলেন, আমিও সম্মত হইলাম। ইষ্টারের সময় মালিং-গড়ে তিনি আসেন,—তখনই প্রস্তাব করেন। আমিও বড় বিস্মিত হইয়াছিলাম।"

"আমাকে কেন তবে কিছু জানান হয় নাই?"

"তা ত জানি না, লেডী মণ্টসেভার্ণ আর কার্লাইল সাহেব আপনাকে সব লিখিবেন এই ত কথা ছিল।"

লর্ড মণ্টসেভার্ণ উত্তর করিলেন, "না, আমি কিছুই জানি না। পত্র হয় ত পাই নাই, না হয় পাঠানই হয় নাই। তোমার পিতা সর্ব্বদা কার্লাইলকে ঈষ্টলীনে আসিতে দিতেন, তাতেই বোধহয় এমন বিসদৃশ একটা ঘটনা ঘটিল। তখনই বুঝি তাকে ভাল বাসিয়াছিলে।"

"না না! কার্লাইলসাহেবকে ভালবাসিব এমন কথাও তখন আমার মনে হয় নাই।"

"তা হ'লে—তুমি তাকে ভালবাস না?"

ইজাবেল কুণ্ঠিত ভাবে বলিল,—"না! তবে—তবে—তাঁকে এমনিই বেশ ভাল লাগে আমার। আর—আর—তিনি বড় ভাল।"

লর্ড সাহেব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। প্রেম ব্যতীত এরূপ বিসদৃশ বিবাহের তবে আর কি কারণ থাকিতে পারে? কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "কার্লাইলকে তুমি ভালবাসনা বলিতেছ, তবে ভালবাসা আর এমনি ভাল লাগা এর পার্থক্যটা কিসে বুঝিলে? আর কাহাকেও তুমি ভাল বাসিয়াছ ইহা কিছু সম্ভব হইতে পারে না।"

ইজাবেলের মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল,—নত মুখে কহিল, "স্বামীকেই এরপর ভাল বাসিতে পারিব।",

কিছু রহস্য ইহার মধ্যে আছে। সেটা তবে কি? আরও কি একটু ভাবিয়া লর্ড সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি ফ্রান্সে যাইবার পর মালিং গড়ে কে কে আসিয়াছিল?"

"মিসেস্ লেভিসন আসিয়াছিলেন।"

"পুরুষ কেহ? কোনও যুবক?"

হাঁ, ফ্রান্সিস্ লেভিসনও আসিয়াছিলেন।"

"ফ্রান্সিস্ লেভিসন, সর্ব্বনাশ! তাকে ত ভাল বাসিয়া ফেল নাই?"

সহসা এই প্রশ্নে ইজাবেল যেন কেমন থতমত খাইয়া গেল। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লর্ড মণ্টসেভার্ণ ইজাবেলের দিকে চাহিয়াছিলেন—এই ভাবান্তর তিনি লক্ষ করিলেন। কহিলেন, "ইজাবেল! ফ্রান্সিস্ লেভিসন অতি বদলোক। সাবধান। তার সংসর্গে কখনও আসিবে না—কোনও আলাপ পরিচয়ও যেন তার সঙ্গে রাখিবে না!"

ইজাবেল উত্তর করিল, "আলাপ পরিচয় যা ছিল, তা বন্ধই হইয়াছে, আর কখনও তার সংস্রবে আমি আসিব না।"

"কিন্তু এই বিবাহ তবে কি প্রকারে ঘটিল? কারণ যে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই কার্লাইল ফুস্‌লাইয়া তোমাকে ভুলাইয়া নিয়াছে।"

ঠিক এই সময়ে কার্লাইল সাহেব গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু লর্ড মণ্টসেভার্ণ যেন সেদিকে লক্ষ্যই করিলেন না। ইজাবেলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "ইজাবেল তুমি একটু বাহিরে যাও। কার্লাইল সাহেবের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

ইজাবেল উঠিয়া গেল। লর্ড মণ্টসেভার্ণ ঘুরিয়া কঠোর দৃপ্ত দৃষ্টিতে কার্লাইলের দিকে চাহিলেন। কহিলেন, "মহাশয়! এই বিবাহ কি প্রকারে ঘটিল? আপনার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা বুদ্ধি কি এতই হীন যে আমার অনুপস্থিতির সুযোগ দেখিয়া আমার পরিবারের মধ্যে ঢুকিয়া আমার আত্মীয়া লেডী ইজাবেল ভেন্‌কে ভুলাইয়া লুকাচুরী খেলিয়া আপনি বিবাহ করিয়া ফেলিলেন?"

কার্লাইল সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া নির্ভীক ভাবে মুখ তুলিয়া কহিলেন, "লর্ড সাহেব! লেডী ইজাবেল ভেনের সঙ্গে ব্যবহারে লুকাচুরী খেলা আমি কিছুই খেলি নাই। আর এখন লেডী ইজাবেল কার্লাইলেরও কোনও রূপ অমর্য্যাদা আমার আচরণে হইবে না। আপনি বোধ হয় ভুল সংবাদ কিছু পাইয়াছেন।"

"কোনও সংবাদই আমি পাই নাই। আমি ইজাবেলের একমাত্র অভিভাবক তার এই বিবাহের কথা সংবাদপত্রে প্রথম দেখিতে পাই।"

"যখন লেডী ইজাবেলের নিকট বিবাহের প্রস্তাব আমি করি—"

"মাত্র একমাস পূর্ব্বে—"

"হাঁ, মাত্র একমাস পূর্ব্বেই প্রস্তাব আমি করিয়াছি। কিন্তু লেডী ইজাবেল আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিবা মাত্রই আমি আপনাকে পত্র লিখি। কিন্তু এখন আপনার কথায় বুঝিতেছি, সে পত্র আপনি পান নাই।"

"সে পত্রে কি লিখিয়াছিলেন?"

"এই বিবাহের সম্বন্ধের কথা, আর আমার অভাবে লেডী ইজাবেলের সংসার চলিবার সব ব্যবস্থার কথা। আরও জানাইয়াছিলাম, আমাদের দুইজনের ইচ্ছা, অতি শীঘ্রই বিবাহ হয়।"

"কোন্ ঠিকানায় এই পত্র পাঠাইয়াছিলেন?"

"লেডী মণ্টসেভার্ণ আপনার কোনও ঠিকানা আমাকে দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, পত্র তাঁর কাছে দিলে তিনি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবেন। আপনি কোথায় আছেন, শীঘ্রই এই সংবাদ তাঁর কাছে আসিবে, এইরূপ তিনি বলিলেন। সুতরাং তাঁর কাছেই আমি পত্র দিই। তারপর এ সম্বন্ধে আর কোনও খবর আমি পাই না। লেডী সাহেবা মাত্র এই আমাকে জানান, আপনি আপত্তি করিয়া যখন কিছু লিখিলেন না, তখন

আপনার অনুমোদনই এই বিবাহে আছে, এইরূপ আমি ধরিয়া নিতে পারি।"

"যা বলিতেছেন, সত্য ?"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "লর্ড সাহেব ! অন্য যতই ত্রুটি আপনি আমার দেখুন, আমি মিথ্যাবাদী নই। আপনার সঙ্গে এই সাক্ষাতের পূর্ব্বে আমার এই ধারণাই ছিল যে আমাদের এই বিবাহের সম্বন্ধ আপনার অজ্ঞাত ছিল না।"

"যাহা হউক, এই কথার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা আমি করিতেছি। কিন্তু এই বিবাহ কি প্রকারে ঘটিল ? এমন বিশ্রী একটা তাড়াতাড়িই বা কেন করা হইল ? ইজাবেলের কাছে শুনিলাম, ইষ্টারের সময় আপনি প্রস্তাব করেন, আর তার তিন সপ্তাহ পরেই বিবাহ হইয়াছে।"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "যদি তা সম্ভব হইত, প্রস্তাব যেদিন করি, সেই দিনই বিবাহ করিয়া লেডী ইজাবেলকে আমি লইয়া আসিতাম। আমি যাহা করিয়াছি, তাঁহারই সুখ শান্তির দিকে চাহিয়া করিয়াছি।"

"কি রকম ! আশাকরি, খুলিয়া সব কথা আমাকে বলিবেন।"

"লর্ড সাহেব ! সে সব কথা আপনারা না শুনিলেই ভাল হয়।"

"ভাল মন্দের কথা আমি নিজেই বিচার করিব। আপনি বলুন।"

কার্লাইল অগত্যা তখন সকল কথা লর্ড মণ্টসেভার্ণকে জানাইলেন। শুনিয়া একেবারে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্তব্ধভাবে লর্ড মণ্টসেভার্ণ বসিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ হইয়া ধীরে ধীরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে মালিংগেড়ে যখন আপনি যান, এরূপ কোনও অভিপ্রায় আপনার ছিল না যে ইজাবেলের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবেন ?"

"না, যেরূপ অবস্থা আমি দেখিলাম, তাহাতে তখনই মাত্র এই কথা আমার মনে উঠে। আগে ইহা ভাবিও নাই।"

"হাঁ, আর একটা কথা জিজ্ঞাস করিতে চাই। আপনি কি ইজাবেলকে ভালবাসেন ?"

একটুকাল নীরব থাকিয়া কার্লাইল কহিলেন, "লর্ড সাহেব ! এমন অনেক কথা আছে, যাহা একজন পুরুষ কেহ অপর পুরুষের কাছে মন খুলিয়া সচরাচর বলে না। কিন্তু আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিব। হাঁ, লেডী ইজাবেলকে আমি সকল প্রাণে ভালবাসি। ঈষ্টলীনে প্রথম যখন তাঁহাকে দেখি, সেই অবধি তাঁহাকে ভালবাসিতেছি। কিন্তু আমরণ এই ভালবাসা নিজের অন্তরে আমি চাপিয়া রাখিতাম। লেডী ইজাবেল আমার পত্নী হইতে পারেন, এ কথা মনেও কখনও করি নাই, আর এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে না দেখিলে কখনও করিতাম না। তাঁহার সামাজিক পদমর্যাদা, কুলগৌরব যে আমার অনেক উপরে তা আমি বেশী জানি, এবং কখনও তাহা বিস্মৃত হইতাম না।"

"কিন্তু লর্ডদুহিতার যোগ্য মর্য্যাদায় আপনি ত তাহাকে রাখিতে পারিবেন না ?"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "ঈষ্টলীন্ তাঁহার গৃহ হইবে। বিশেষ আড়ম্বর কিছু না থাকিলেও বেশ সচ্ছন্দে তিনি সেখানে থাকিতে পারিবেন। সব কথাই লেডী ইজাবেলকে আমি তখন খুলিয়া বলিয়াছি। অসুবিধা বোধ করিলে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন। লেডী মণ্টসেভার্ণকেও সব বলিয়াছি। আমাদের সন্তান হইলে ঈষ্টলীন্ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র পাইবে। ব্যবসায়ে আমার যথেষ্ট আয় আছে। আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, লেডী ইজাবেল ঈষ্টলীন এবং বার্ষিক তিন হাজার পাউণ্ড আয় ভোগ করিবেন। এ সব কথাই আমার সেই পত্রে আমি লিখিয়াছিলাম। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ সে পত্র আপনি পান নাই।"

লর্ড সাহেব তখনই কিছু বলিলেন না, নীরবে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। কার্লাইল কহিলেন, "লর্ড সাহেব ভরসা করি, এখন বুঝিতে পারিতেছেন, এই ব্যাপারে লুকাচুরী খেলা আমি কিছুই খেলি নাই।"

লর্ড মণ্টসেভার্ণ হাত বাড়াইয়া দিলেন, কহিলেন, "কার্লাইল সাহেব, আপনি হয় ত লক্ষ্য করিয়াছেন, যখন আসি, আপনার হাত আমি গ্রহণ করি নাই। আপনি হয় ত এখন আমার এই হাত হাতে ধরিতে অস্বীকার করিবেন, যদিও গৌরবের সঙ্গে আমি এখন আপনার করমর্দ্দন করিতে চাই। নিজের কোনও ত্রুটি বুঝিলে সরলভাবে আমি তাহা স্বীকার করিতে পারি। এও সত্য আমাকে এখন স্বীকার করিতেই হইবে যে ইজাবেলের প্রতি আপনার ব্যবহারে আপনার অসাধারণ করুণা ও মহানুভবতাই প্রকাশ পাইয়াছে।"

কার্লাইল হাসিয়া লর্ড সাহেবের হাত ধরিলেন। লর্ড সাহেব কহিলেন, "হাঁ, আমার স্ত্রীর সেই দুর্ব্ব্যবহারের কথা আর কেহ জানে না ত ?"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "সে কথা আমি কি ইজাবেল কাহাকেও বলিব না। এরূপ কিছু একটা ঘটিয়াছে, আপনিও কখনও তা মনে রাখিবেন না।"

দিনটা সেখানে কাটাইয়া সন্ধ্যাবেলায় লর্ড সাহেব বিদায় হইলেন। যাইবার সময় ইজাবেলকে কহিলেন, "ইজাবেল, যখন সকালে এখানে আসি, তোমার স্বামীকে ধরিয়া প্রহার করিব, এই রকমই আমার মনের ভাব তখন ছিল। কিন্তু এখন তাঁহার প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধা লইয়াই যাইতেছি। সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিও,—তোমার স্বামী অতি মহৎ লোক।" (ক্রমশঃ)

নারায়ণ

৬ষ্ঠ বর্ষ | চৈত্র—১৩২৬ | ১২শ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

খলিফাৎ আন্দোলন

খলিফাতের মর্য্যাদা ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয় সুন্নীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে।

ইতিহাসে কোনও ঘটনার বিবরণ সাজানগোজান ভাবে একস্থানে পাওয়া যায়। গত কয়েকবৎসর যাবৎ অতি দ্রুত গতিতে এমন সব ঘটনা ঘটিতেছে, মানব সমাজে এমনই একটা যুগান্তর হইয়া যাইতেছে যেমন নাকি জগতের ইতিহাসে অতি অল্পই হইয়াছে। এত অল্প সময়ে এতদূরব্যাপী এরূপ সব ঘটনা, এরূপ পরিবর্ত্তন আর কখনও এ পৃথিবীতে ঘটে নাই। সকল তথ্যের সম্যক সংগ্রহে ও নিরপেক্ষ আলোচনায় একটা সাজান গোজান ইতিহাস ইহার এখনও হয় নাই, সময়ও তার হয় নাই। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সঙ্গে যে বিভীষণ ও বিচিত্র ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তার ধারা এখনও চলিতেছে। কোন পথে কি ভাবে কোথায় গিয়া এর পরিসমাপ্তি হইবে, কেহই বলিতে পারে না। কি আগুনই জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কোথাও যদি একটু নেভে, কি নেভ নেভ হয়, আর একজায়গায় আর এক আকারে তাহা ধূমিয়া উঠে। সমস্ত জগৎব্যাপী কি এক অশান্তি আর অস্থিরতাই যে উপস্থিত হইয়াছে!—কোথাও কোনও দেশে যেন কার. একটু শান্তি নাই, নিকট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কেহ একটু নিশ্চিন্ত নয়। আমরা কোথায় আছি, কোথায় যাইতেছি, কি আমাদের নিয়তি, কিছুই আমরা কেহ বুঝিতে পারিতেছি না। মানবসমাজের অন্তরালে কি এক দানবীয় শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল—কিসের সাড়া পাইয়া সর্ব্বত্র প্রচণ্ড বিক্রমে তাহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই দানবিক অভ্যুত্থান কে দমন করিয়া জগতে আবার দেবশাসিত শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে, সেই দেবগণের অধিদেবতা যিনি তিনিই জানেন।

দেবীমাহাত্ম্যে দেখিতে পাই, শুম্ভনিশুম্ভ বধের পর দেবগণকে ভরসা দিয়া মহাদেবী বলিতেছেন,—

> "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি ।
> তদা তদা বতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ।"

দানবোত্থা বাধা কি এই জগতে ইহার অপেক্ষাও বড় আর কখনও হইয়াছিল? হায় মহাদেবী তুমি কি অবতীর্ণা হইয়া এই দানবীয় শক্তির পীড়ন হইতে তোমার জগৎকে রক্ষা করিবে না?

যাক্, তাঁহার কি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তিনিই জানেন।

অতি দ্রুতপর্য্যায়ে অতি বিচিত্র সব অমঙ্গল ঘটনা ঘটিতেছে। টেলিগ্রামে খবর আসে, দৈনিক পত্রিকায় বাহির হয়। সকল ঘটনা জোড়াইয়া তার একটা ক্রমিক ধারা, তার

কারণ বর্ত্তমান সময়ে—এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও গতি—ঠিক কাহারও মনে যথার্থ সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে।

এই যে খেলাফৎ আন্দোলনের কথা মোট এইটুকু আমরা বুঝি। কনষ্টান্টিনোপল সুন্নী খলিফাদের রাজধানী; সেই রাজধানী হইতে সুন্নী খলিফা তুর্কী মুসলমান তুর্কী সাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ইউরোপে পূর্ব্বে ইঁহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল। গ্রীক, সার্ভিয়া মন্টিনিগ্রো রুমানিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি ক্রমে স্বাধীন হইয়া ইউরোপীয় খৃষ্টান রাজ্য হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে বল্কান যুদ্ধ হয়, তার ফলে ইয়োরোপীয় তুর্কী রাজ্য আরও ছোট হইয়া পড়ে। কিন্তু এসিয়া মাইনর সিরিয়া আরব ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি পশ্চিম এসিয়ার মুসলমান দেশগুলি সব এতদিন সুলতানের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই সব অঞ্চলের অধিবাসী প্রায় সুন্নী মুসলমান; কেবল মেসোপটেমিয়া অনেক সিয়া মুসলমান বাস করেন। সিয়া মতের প্রধান কেন্দ্র এখন পারস্য দেশ, পারস্যের সংলগ্ন বলিয়া, এখানে সিয়া মুসলমানের বাস হইয়াছে। এই অঞ্চল 'ইরাক' নামেও পরিচিত। সিয়া মতের আবির্ভাব এই ইরাকেই হয়। তুর্কীর সুলতানকে সুন্নী মুসলমানেরা আপনাদের 'খলিফা' অর্থাৎ হজরৎ মহম্মদের প্রতিনিধি বলিয়া মানেন। মুসলমান ধর্ম্মানুসারে মুসলমান-সমাজপতি ইঁহারা। পররাষ্ট্রের প্রজা ইঁহাদের রাষ্ট্রীয়প্রভুত্ব না মানিতে পারিলেও, ধর্ম্মনীতির অনুমোদিত সমাজশাসনে ইঁহাদের প্রভুত্ব মানিতে পারে। সুন্নীদের মতে তাঁহাদের খলিফা এই তুর্কী সুলতানের কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে। তাহা এই মুসলমানের ধর্ম্মক্ষেত্র অর্থাৎ তীর্থাদি সম্বলিত দেশগুলির ইঁহার অধিকারে থাকিবে; ইঁহার temporal power অর্থাৎ পার্থিব ক্ষমতা অর্থাৎ রাজাধিকার এমন হইবে যাহাতে স্বাধীনভাবে এই ধর্ম্মক্ষেত্র ইনি শাসন করিতে পারেন। আরব অঞ্চলই প্রধানভাবে ইস্‌লাম ধর্ম্মক্ষেত্র সুতরাং ইহা খলিফার শাসনাধীনে থাকা চাই-ই।

কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর খলিফার এই অধিকার অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহাতে তাহা না হয়, খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্দেশ্য তাই। বলা বাহুল্য, ভারতীয় মুসলমান বেশীর ভাগই সুন্নী। বস্তুতঃ এত বেশী সুন্নী মুসলমান খাস তুর্কী সাম্রাজ্যেও বোধহয় নাই।

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে যে সব ঘটনা ক্রমে ঘটিয়াছে, যাহার ফলে এই আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। তার মোট একটা বিবরণ দিলে এই আন্দোলনের তাৎপর্য্য আমরা একটু পরিষ্কার বুঝিতে পারিব। যুদ্ধের সময় হইতে ঘটনা যে ভাবে ঘটিতেছে আর আর যে ভাবে তার সংবাদ আসিতেছে, তাহা হইতে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাই ধরিয়াই এই বিবরণ আমরা দিতে চেষ্টা করিব। ভুলচুক কোথাও হইতে পারে, কিন্তু কি করিব? কথাটা একটু আলোচনা করাও আবশ্যক, অথচ এ অবস্থায় একেবারে অভ্রান্ত হইয়া চলাও অসম্ভব।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরেই তুর্কী জার্ম্মাণীর সঙ্গে যোগ দিয়া বৃটিশ রাজের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। রাষ্ট্রীয় প্রভু এবং সমাজপতি দুইয়ের মধ্যে এই বিরোধে ভারতীয় সুন্নী মুসলমান প্রজাবর্গ বড়ই একটা সঙ্কটে পড়িলেন। ভারত হইতে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সমরাভিযানের প্রয়োজন হইল। ভারতীয় মুসলমান সৈনিকবৃন্দের সঙ্কট আরও বাড়িল। রাজার আদেশ যুদ্ধে যাইতে হইবে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে হইবে ধর্ম্মনীতিবিহিত সমাজপতির বিরুদ্ধে,—আবার এই যুদ্ধের ফলে হয়ত খলিফার ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অধিকারও ক্ষুণ্ন হইবে। মুসলমানের এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ আপন ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণের মত হয়। অথচ মুসলমান সৈনিক ভারতীয় সেনাকে পুষ্ট না করিলে এই যুদ্ধ চালান অসম্ভব। মেসোপটেমিয়ায় গিয়া বাধা না দিতে পারিলে তুর্কীজার্ম্মাণের সমবেত আক্রমণ হইতে ভারত রক্ষা করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

তখন রাজপ্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সত্যে বদ্ধ হইলেন যে সুলতানের সাম্রাজ্য, খলিফাতের শাস্ত্রবিহিত অধিকার সব অক্ষুণ্ন থাকিবে। ভারতে বৃটিশ রাজ্য রক্ষার জন্যই মাত্র এই অভিযান হইতেছে।

ভারতীয় রাজভক্ত মুসলমান প্রজা দলে দলে সৈনিক হইয়া যুদ্ধে গেল। এসিয়ায় যে বৃটিশ শক্তির জয়লাভ হয়, তাহা ভারতীয় সেনার বলবীর্য্যে, আর সেই ভারতীয় সেনার মধ্যে বহু মুসলমান সৈনিক ছিল।

যুদ্ধ শেষ হইল,—তুর্কী আত্মসমর্পণ করিল। ফরাসী দেশে বিজয়ী মিত্রপক্ষের শান্তির বৈঠক বসিল। যুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়া সিরিয়া এবং আরব বৃটিশ ফরাসী

শক্তির আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আরব দেশ মুসলমানের ধর্ম্মক্ষেত্র। সেখানে যুদ্ধের মধ্যেই একজন আরব রাজাকে বসান হইয়াছিল। শান্তির বৈঠকে গৃহীত self-determination mandatory নীতির দোহাই দিয়া মেসোপটেমিয়া বৃটিশ শাসনের এবং সিরিয়া ফরাসী শাসনের আয়ত্ত করা হইল।

কনষ্টাণ্টিনোপল পূর্ব্বে খৃষ্টান নগর ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোমীয় সম্রাট্ কানষ্টাণ্টাইন্ এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া রোমসাম্রাজ্যে একটি রাজধানী এখানে করেন। এই জন্য ইহার আর একটি নাম রোম বা রুম। এসিয়াবাসী মুসলমানেরা তুর্কী সুলতানকে রুমের বাদসাহ বলেন। পশ্চিম রোমসাম্রাজ্যের পতনের পর কনষ্টাণ্টিনোপল প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রাচ্য মণ্ডল অর্থাৎ Eastern বা Greek Church-এরও কেন্দ্র ইহা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং প্রাচ্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলের কেন্দ্রস্থান রূপে ইহা বর্ত্তমান ছিল। এই সময়ে তুর্কী সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয় এবং তুর্কীরা কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া এইখানে তাহাদের রাজধানী করে। পরে তুর্কীর সুলতানরা খলিফার পদও প্রাপ্ত হন এবং সেই অবধি এই কনষ্টাণ্টিনোপল বা রুমই ইস্লাম ধর্ম্মশাসনেরও কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

খৃষ্টান ইয়োরোপে যে মুসলমান তুর্কীর একটা রাজ্য আছে,—আর কনষ্টাণ্টিনোপলের মত অমন সুন্দর ও সৌষ্ঠবে প্রতিষ্ঠিত নগর যে মুসলমান রাজধানী হইয়া আছে, ইয়োরোপীয় খৃষ্টানগণ কোনও দিনই ইহা ভাল চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু এপর্য্যন্ত কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিবার সুযোগও কেহ পান নাই।

এই যুদ্ধে তুর্কীর পরাজয় ইয়োরোপে সম্প্রতি একটা ধুয়া উঠিয়াছে, এই নগর হইতে কেবল সুলতানের রাজপাট নয়, তুর্কীদেরই দূর করিয়া দেওয়া হউক। ইহাতে সমগ্র মুসলমান সমাজে ভীষণ অসন্তোষের উত্তেজনা জন্মে।

ভারত সচিব মণ্টেগু প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতি এই প্রস্তাবের বিরোধী হন। যুদ্ধে জিতিয়া একের রাজ্য অন্যে অধিকার করিয়া থাকেন,—অধিকৃত স্থান হইতে শত্রুপক্ষকে দূর করিয়াও দিয়া থাকেন। আবহমান কাল এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে এমন কিছু বলা যায় না। আর বলিলেই বা কি? খৃষ্টান কনষ্টাণ্টিনোপল একদিন মুসলমান তুর্কী অধিকার করিয়াছিল। আজ খৃষ্টান কোনও শক্তি পারিলে নিজের বাহু বলে কনষ্টাণ্টিনোপল দখল করিত,—মুসলমানের দুঃখ, অসন্তোষ কিছুই গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু সে ভাবে যে কিছুই হয় নাই। জর্ম্মাণীর প্রতাপে বিশেষ বিপন্ন মিত্রশক্তি ভারতীয় মুসলমান সেনার সাহায্যে এসিয়ায় এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। আর সাহায্য পাইয়াছিলেন, মুসলমানের ধর্ম্মগুরু সুলতানের অধিকার কিছু ক্ষুণ্ণ করা হইবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া। অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি ফরাসী কি ইটালী কি মার্কিন গবর্ণমেণ্ট দেন নাই, দিয়া ছিলেন ভারতশাসনের কর্ত্তা বৃটিশ রাজ প্রতিনিধি। বিলাতের মন্ত্রিসমাজ ও এই সত্যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বদ্ধ। মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, আরব প্রভৃতি অঞ্চলে তুর্কীর অধিকার লোপ করা হইয়াছে, তবু একটা অজুহাত ধরিয়া,—যদিও এ অজুহাতে ভারতীয় মুসলমান নেতৃগণ সন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু এখন কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে তুর্কীকে একেবারে বহিষ্কৃত করিবার পক্ষে এরূপ একটা অজুহাতও কিছু নাই। কোনও কারণ না দেখাইয়া প্রতিশ্রুত সত্যভঙ্গের মত [illegible] একটা কাণ্ড ঘটিলে, অন্যায় [illegible] হইলেও, ভারতীয় মুসলমান [illegible] পারিবে না,—ভবিষ্যতেও এরূপ সহায়তা আর তাঁহাদের হইতে পাওয়া দুর্ঘট হইবে।

এইসব বিবেচনায় এই প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব যাঁহারা মানেন, ভারতশাসনের দায়িত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ বৃটিশ মন্ত্রিবর্গ কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে তুর্কীকে উৎখাত করিবার প্রস্তাবে বাদী হইলেন।

শেষে এই কথা হইল কনষ্টাণ্টিনোপলে তুর্কীর রাজপাট থাকিবে,—তবে এসিয়া ও ইয়োরোপের মধ্যবর্ত্তী বস্ফোরাস প্রণালী সম্মিলিত অধিকারভুক্ত হইবে। কেবল তাই নয়, কনষ্টাণ্টিনোপলের চারিধারে তুর্কীর অধিকার যেটুকু এখনও আছে, সেখানেও সামরিক স্বার্থরক্ষা করিবার উদ্দেশ্য ঘাটিতে ঘাটিতে মিত্রশক্তি সমূহের সেনা মোতায়েন থাকিবে। বস্তুতঃ কনষ্টাণ্টিনোপলে খলিফার শাসন ইহাতে নামমাত্রে পরিণত হইবে।

ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড এক বৃটিশ নৌবহর বস্ফোরাসে গিয়া ঘাটি আগলাইল। কেন যে সহসা এত বড় একটা বহর সেখানে গেল,—ভাল করিয়া সেটা বোঝা যায় না। তুর্কীর মঙ্গলকামী যাঁহারা তাঁহাদের মনে স্বভাবতই ইহাতে বড় একটা আশঙ্কা হইতে পারে।

যুদ্ধে হার মানিতে বাধ্য হইলেও তুর্কী যে একেবারে মরিয়া রহিয়াছে, হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, তা নয়। 'নবীন তুর্কী' (The Young Turks) নামক একদল কিছুকাল যাবৎ আধুনিক আদর্শে তুর্কীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। যুদ্ধের ফলে যে দারুণ ক্ষতি তুর্কী সাম্রাজ্যের হইয়াছে, তাহা শোধরাইয়া নিবার জন্য এখন প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

এদিকে আবার সিরিয়াতেও একটি জাতীয় দলের অভ্যুত্থান হইয়াছে। (Self-determination) নীতি অনুসারে ফরাসীকে mandatory করিয়া সিরিয়ার শাসনভার হাতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সিরিয়ার এই জাতীয় দলের Self-determination এখন হইতেছে এই যে তারা স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারী হয়। দুই একটি টেলিগ্রামের আভাসে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে ইহারা 'নবীন তুর্কী' দলের সঙ্গে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সংযোগ ঘটিলে এই অঞ্চলে মুসলমান শক্তি বেশ প্রবল হইয়া উঠিতে পারে।

আর্ম্মেনিয়া অঞ্চল তুর্কীর অধিকারে। আর্ম্মেনিয়ান্ প্রজাও খৃষ্টান। তুর্কীরা ইহাদের উপর বড় অত্যাচার করে, এইরূপ কথা মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। সম্প্রতি আবার একটা সংবাদ বাহির হইয়াছে, তুর্কীরা বহু আর্ম্মেনিয়ান প্রজাকে হত্যা (massacre) করিয়াছে তুর্কীর পীড়ন হইতে ইহাদের রক্ষা করা দরকার এই কথা বলিয়া বহু ইংরেজ ও ফরাসী সেনা এসিয়া মাইনরে গিয়াছে। ওদিকে বস্ফোরাস প্রণালীতে যে প্রকাণ্ড একটা বৃটিশ নৌবহর গিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তুর্কী অঞ্চলে এই সেনা সমাগম দেখিয়া অনেকে ভীত হইয়াছেন। সম্মিলিত তুর্কী ও সিরিয়ার সঙ্গে ইংরেজ ফরাসীর ভীষণ একটা যুদ্ধ বাধিয়া উঠিতে পারে। তুর্কী সিরিয়ার অবস্থা এখন যেরূপ তাহাতে এই যুদ্ধের ফলে এসিয়াতে তুর্কী বা মুসলমান শক্তি একেবারে ধ্বংস হইতে পারে। বৃটিশ ফরাসী এখন মুক্ত,—ভারতীয় মুসলমানের সাহায্য ব্যতীতও এই যুদ্ধ চালাইতে পারেন। কনষ্টাণ্টিনোপল লইয়া এই কাণ্ড, ধর্ম্মক্ষেত্র আরব খলিফার অধিকার বহির্ভূত হইয়াছে,—আবার এমন একটা সংঘর্ষের সূচনা দেখা যইতেছে, যাহার ফলে এসিয়ায় প্রধান মুসলমান শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

মুসলমান মাত্রই এই সঙ্কট অনুভব করিতেছেন,—এবং সমূহ এই বিপদ হইতে তুর্কীকে রক্ষা করিয়া খালিফতের অধিকার ও মর্য্যাদা যাহাতে বজায় থাকে তার জন্য প্রাণপণ আন্দোলন করিতেছেন। বৃটিশ রাজশক্তির কাছেই তাঁহারা তাঁহাদের আবেদন জানাইতে পারেন,—তাঁহাকেই তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন, ভারতীয় প্রায় ছয় কোটি মুসলমান প্রজার প্রাণে কত বড় ব্যথা লাগিবে,—ইহাতে তাহাদের ধর্ম্মের মহিমার উপরে এত বড় আঘাত করিলে বৃটিশরাজের শাসনাধীনে সন্তুষ্ট হইয়াও তাহারা থাকিতে পারে না।

মুসলমানকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া মুসলমানসেনার সাহায্যে তুর্কী সাম্রাজ্যের মধ্যে এই শক্তি তাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া, এই শক্তির সদ্ব্যবহার করুন, খলিফাতের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখুন।

বাঙ্গালার চিনি

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ আর, এস্ ফিন্‌লো 'চিনি কমিশনের' নিকট সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে ইক্ষুচাষ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গের মোট ৪২৩৫০০ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মাত্র ২১৮০০০ একর জমিতে আখের চাষ করা হয়। পাটের চাষ বৃদ্ধি হওয়াতেই ইক্ষুর চাষ কমিয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জিলায় পাটের চাষ না হইলেও আখের চাষ হ্রাস পাইবার কারণ বুঝা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানই বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়; কাজেই তথায় ইক্ষু চাষের সুবিধা নাই। এক একর জমিতে পাটের চাষে বৎসর ১৮০ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ইক্ষু চাষে মাত্র ১৫০৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে। যে জমিতে ইক্ষু চাষ করা হয় তথায় আর কোন ফসল দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু পাটের

জমিতে প্রতি বৎসর দুইটী ফসল পাওয়া গিয়া থাকে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ৪৮০০০০ টন তাল ও খেজুরের চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে বঙ্গদেশে ১০০০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল। এক একর জমিতে ২৫০৮ খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা যাইতে পারে এবং তাহা হইতে অনূন ২৭৫ টন গুড় পাওয়া যায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি যে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে দেখা গিয়াছে যে, এক একর জমির খেজুর গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিলে তাহাতে মাত্র ৬৩৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গে ইক্ষু চাষ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। শৃগাল ও শূকর ইক্ষুর বিশেষ অনিষ্ট করে, এজন্য 'কৃষি-বিভাগ' পীতবর্ণের 'টানা' নামক আখের চাষই সমীচীন বলিয়া মনে করেন। কৃষকেরাও 'টানা' আখই পছন্দ করে?

মিঃ ম্যাকলিয়ড বলিয়াছেন যে জর্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান্ চিনির উপর শুল্ক বসাইবার পর হইতে খেজুরে চিনি ব্যবসায়ের কথঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। বৈদিশিক-চিনি-ব্যবসায়িগণের সহিত প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা না থাকিলে কৃষকগণ খেজুরের চাষে মনোযোগী হইবে।

(ঢাকা প্রকাশ)

পাটের চাষী সাবধান

যে সকল কারণে বাঙ্গালা দেশে পাটের চাষ আর লাভজনক হইতে পারিবে না, আমরা একাধিক বার সে সকল কথার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমাদের সকল কথা বাঙ্গালীর কাণে ভাল শুনায় নাই। যাহা হউক, এইবারে বাঙ্গালার পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রবীণ এংলো-ইণ্ডিয়ান সহযোগী 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' বিলাতের সংবাদদাতার পত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

"While the demands for Jute goods from all parts of the world is still increasing and prices are rising, the demand for raw-Jute has almost entirely ceased and prices are dropping. It would seem that there is far more Jute available than the trade is able to digest at the present price.—The supply is beyond the demand and therefore the price must come down."

অস্যার্থ :—পাটজাত দ্রব্যসমূহের প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সকল দেশেই উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে এবং মূল্যও চড়িতেছে ; পক্ষান্তরে কাঁচামালের (পাটের) আবশ্যকতা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে এবং মূল্যও কমিয়া যাইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্যবসায়ীদের যে পরিমাণ পাটের প্রয়োজন, তদপেক্ষা অনেক বেশী পাট উৎপন্ন করা হইয়াছে প্রয়োজন অপেক্ষা পাটের আমদানী অনেক বেশী। কাজেই দাম কম। অর্থাৎ বিলাতে পাট ক্রয় করিবার লোক নাই।

এই ত গেল বিলাতের সংবাদ ; তারপর আগামী বৎসর হইতে নারায়ণগঞ্জের শ্বেতাঙ্গ সওদাগরগণ পাট ক্রয় করিবার যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবেন বলিয়া আমরা গত একপক্ষ কাল যাবত সংবাদ পাইতেছি, তাহা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, অতঃপর খুব উৎকৃষ্ট পাটের দরও প্রতিমণ বড় জোর ১২।১৩ টাকার বেশী হইতে পারিবে না। তাই বলি, বাঙ্গালার কৃষক এখন সাবধান হও ; তোমার সকলগুলি জমিতে পাট বপন করিও না। এখন হইতে ধান, তিল ও ইক্ষুচাষের যোগাড় দেখ। তোমার যে পরিমাণ জমি আছে, তাহার মাত্র চারি ভাগের এক ভাগ জমিতেই পাটের চাষ করিবে, বেশী জমিতে নহে। পাটের মালিক তুমি, কিন্তু দর তার স্থির করিবেন বিদেশের বণিক।

(ঢাকা প্রকাশ)

ভারতের কৃষি

গত দুই বৎসর ভারতবর্ষে কোন শস্য কত উৎপন্ন হইয়াছে ও একার প্রতি কত পাউণ্ড হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

	১৯১৮—১৯	১৯১৭—১৮	১৯১৮—১৯	১৯১৭—১৮
	টন	সালে	একার প্রতি পাউণ্ড	একার প্রতি
চাউল	২,৩৬,১২০৯০	৩,৬২,৩৬০০০	৬৮৯	১০১৩
গম	৭৫,০২,০০০	৯৯,২২,৯০	৭০৭	৬২৬
ইক্ষু	২৩,৩৭,০০০	৮৩,১১০০০	১৮৫৬	২৬৪০
তিসি	২,২৯,০০০	৫,১৪০০০	২৬০	৩০৪
সরিষা	৭,৫৯০০০	১১.৫৩,০০০	৩৫১	৩৬২
তিল	২,৫৮,০০০	৩,৮১,০০০	১৬৫	১৯৯
চীনাবাদাম	৪,৯০,০০০	১০,৫৭,০৯০	৮৩৭	১২২৩
নীল	.৪৪০০০ হন্দর	১,২৭,০০০ হন্দর	১৬	২০
	থলি বস্তায়			
তুলা	৩৬,৭১০০৯ বস্তা	৪৫,৬৫০০ বস্তা	৭২	৬৪
পাট	৬৯,৪৬০০০ বস্তা	৮৮,৬৫০০০ বস্তা	১১১৩	১২৯৬
চা	৩৮,০৪,৫৯,০০০ পাউণ্ড	৩৭,১২,৯৬০০০ পাউণ্ড	৫৬০	৫৫৭

গত বৎসর চাউল, গম, ইক্ষু, সরিষা, তিল, পাট প্রভৃতি কম জন্মিয়াছিল, কাজেই উহাদের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

এক টন=২৭ মণ, এক পাউণ্ড=আধ সের, এক একার=৩ বিঘা হিসাবে ধরিলেই কত মণ কত সের শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

(কাজের লোক)

বিক্রমপুর-কুলীনসভা—গত ১২ই পৌষ রবিবার বিক্রমপুরের পশ্চিমপাড়া গ্রামে কুলীন সভার প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছাপুরা, পশ্চিমপাড়া, আটপাড়া প্রভৃতি গ্রামবাসী ফুলিয়া, খড়দহ ও সর্ব্বানন্দী মেলের নৈকষ্য ও ভঙ্গ কুলীনগণ এবং বংশজগণ এই সভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। পশ্চিমপাড়াবাসী শ্রীযুক্ত তারাকান্ত গাঙ্গোপাধ্যায় (শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী) মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে সমাজ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আলোচিত হইয়াছে। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, কুলীন সমাজের মধ্য হইতে কুলীন অকুলীন হওয়া এবং অকুলীন কুলীন হওয়ার পদ্ধতি দূর করিয়া কৌলিন্য সংশোধন করিতে হইবে। তজ্জন্য আপাততঃ দুইটী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক:—(১) এখন পর্য্যন্ত যাহারা কুলীন রহিয়াছেন, তাঁহাদের নামের তালিকা গ্রহণ; (২) যে সকল ঘটক অষ্টমপুরুষে বংশজ হয় বলিয়া ঘোষণা করেন, ভঙ্গ কুলীন ও বংশজগণ কর্ত্তৃক তাহাদিগের বর্জ্জন। এই কার্য্যসাধনের জন্য একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং বেলতলী স্কুলের শিক্ষক বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ সমিতির সম্পাদক ও ইছাপুরা স্কুলের শিক্ষক বাবু তরণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় বিক্রমপুর কুলীন সভার সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশাকরি সকল সমাজ বিক্রমপুর কুলীন সভার সিদ্ধান্ত সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিবেন।

(কাশীপুর নিবাসী)

টিপ্পনী

হিন্দু সমাজকে হিন্দু সমাজ রূপে রক্ষা করিতে হইলে, এই সব সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন। সংস্কারের অধিকারী ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সমাজভুক্ত, আচারনিষ্ঠ সমাজ নায়কগণ।

সমাজ সংস্কার যে ভাবে হওয়া উচিত, কুলীন সভা ঠিক সেই পথেই চলিতেছেন। পুরুষ পরম্পরাগত প্রাচীন জীবনের ধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইলেও সমাজ থাকে না,—আবার পুরাতন যত কিছু রোগ অনাচার, সব গায়ে ধরিয়া থাকিলেও জীবনের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

সকল জাতি ও সমাজের মধ্যেই এখন এইরূপ আন্দোলনের প্রয়োজন।

শিক্ষকের দুর্গতি

সদাশয় গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকগণকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য কতকগুলি

গুরু-ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল স্কুলের শিক্ষকগণও পরিদর্শক কর্ম্মচারীবৃন্দের ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমে আশানুরূপ সুফল লাভ সত্ত্বেও, সুদীর্ঘ ১৬।১৭ বৎসর কালের মধ্যে উক্ত স্কুলের শিক্ষকগণের কিছুমাত্র বেতন বৃদ্ধি হয় নাই।

গুরু ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসিক ১৮৲ দ্বিতীয় শিক্ষক ১০৲ ও তৃতীয় শিক্ষক ৮৲ হিসাবে বেতন পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে একদিকে, ভীষণ দুর্ভিক্ষের নিষ্পেষণ অন্য দিকে বস্ত্র ও সাংসারিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হওয়ায় এই অল্প বেতনভোগী শিক্ষকগণের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে এই সামান্য বেতনের উপর নির্ভর করিয়া বোর্ডিং সংশ্লিষ্ট বাসায় থাকিয়া সর্ব্বদা বোর্ডিং এর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। ইহার জন্য তাঁহাদের কোন প্রকার স্বতন্ত্র পারিশ্রমিকও দেওয়া হয় না।

এই ভীষণ অন্ন ও বস্ত্র সঙ্কট সময়ে এই স্বল্প বেতনভোগী শিক্ষকগণের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে।

এই অভাব দূরীকরণের জন্য আমরা বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর মিঃ হর্ণেল সাহেব বাহাদুর ও প্রজাবৎসল গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে মহোদয়ের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাদের মাননীয় দেশ-নায়কগণ ও অমৃতবাজার, বাঙ্গালী, হিতবাদী, মোহাম্মদী, সঞ্জীবনী, বসুমতী প্রভৃতি সংবাদপত্রের স্বাধীনচেতা সম্পাদক মহোদয়গণ "খুলনাবাসী"তে প্রকাশিত গুরু-ট্রেনিং স্কুলের দরিদ্র শিক্ষকগণের প্রকৃত অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আশানুরূপ আন্দোলন করিয়া যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের এই বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিয়া দেশের কতকগুলি দরিদ্র শিক্ষকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন।

বিনীত—মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা খাঁন।

(খুলনাবাসী)

ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী সার্প সাহেব হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন,—একজন কুলী ৮০ বার আনা রোজ পায়, কিন্তু একজন পাঠশালার গুরু মহাশয়ের দৈনিক উপার্জ্জন বড় জোর ।৶০ ছয় আনা! ইহার উপর আর মন্তব্য প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

(কাজের লোক)

বঙ্গের কারাগার

বঙ্গের কারাগার সমূহে ১৪১৬৯ জন কয়েদী বাস করিতে পারে, এখন এমন স্থান আছে। অধুনা কয়েদীর সংখ্যা ১৪০৫৭। এতন্মধ্যে ৬২১৩জন 'এ' শ্রেণীর, ৬১৩৯ জন "বি" শ্রেণীর। কারারুদ্ধদের মধ্যে হাজারকরা ৮৭৯৪ জন নিরক্ষর, ১২০৬ জনে লেখা পড়া জানে কয়েদীর শতকরা ৫৯·৪৯ জন মুসলমান, ৪০·১১ জন হিন্দু! অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কারাগারে এখন ৫০৬ জন বালক আবদ্ধ আছে। কারাগারে স্ত্রী-বিভাবে বন্দিনীর সংখ্যা ১৭৬। কারাগার সমূহে একণে বিচারাধীন ১০৬৬ ব্যক্তি আবদ্ধ আছে। কারারুদ্ধদের মধ্যে শতকরা ৭০·১৮ ব্যক্তিই ৬ মাস কিংবা উহার অল্পকালের নিমিত্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

(কাজের লোক)

গত যুদ্ধে জীবন ক্ষতি

মিত্র পক্ষে মারা গিয়াছে—

বেলজিয়ম	৪৪,০০০
আমেরিকা	১,১৪,০০০
ইংলণ্ড	৭,৬৯,০০০
গ্রীস	১২,০০০
ইটালী	৪,৯৪,০০০
রুমেনিয়া	৪০০,০০০
	৬,৬৯,০০০
ফ্রান্স	১৩৯৮,৫১৫
	৩৬,০০,৫১৫

আহত হইয়াছে এক ফ্রান্সেরই ২৯ লক্ষ লোক! অন্যান্য শক্তিদের আহতের সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি নিশ্চয় ৬০ লক্ষের অধিক আহত হইয়াছে, এইরূপ ধরিয়া লইতে পারা যায়। তাহা হইলে গত যুদ্ধে প্রায় এক কোটী লোক হতাহত হইয়াছে, কি ভয়ানক ব্যাপারই হইয়া গিয়াছে।

(সময়)

উত্তেজনার ফটোগ্রাফ

বিলাতের ডাক্তার ওয়ালার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে মানসিক উত্তেজনার ফটোগ্রাফ তোলা যায়। এই ফটোগ্রাফ বায়স্কোপের পটের উপরে ফেলিয়া, আপনি মানুষের মনের কথা ছাপার হরফে খোলা পুঁথীর মত আনায়াসে পড়িয়া যাইতে পারে। আপনার মন যে বিপরীত ভাবের ধাক্কা পায়, ডাক্তার ওয়ালারের যন্ত্রে তাহারও অবিকল প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। ভবিষ্যতে এই যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের মানসিক ব্যাধির নির্ভুল নিদান জানা যাইবে,—বর্ত্তমানে চিকিৎসা শাস্ত্র যেখানে একেবারেই অকেজো হইয়া আছে।

(ত্রিপুরা হিতৈষী)

বেঁচে থাকা

শুধু বেঁচে থাকা কিছু নয় ;—
মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়।
নিভৃতে সবার পেছনে,
এক কোণে পড়ি গোপনে,
বেঁচে থাকা কিছু নয় ;
বাঁচিতে হইলে বাঁচার মতই বাঁচিয়া থাকিতে হয়।
'আপনার গড়া কারাতে
বদ্ধ,—পারে না ছাড়াতে,
প্রতিদিন আরো পড়িছে জড়ায়ে—শেষ এর নাহি হয় ;
এরে কি জীবন কয় ?
এ যেরে কেবলি অন্ধকার,—
ভাল কি মন্দ চিনিতে ভার
আলোকের পানে পায়ে মা চাহিতে, সদাই কেবলি ভয়—
পাছে, কি জানি কী-ই বা হয়!
এর চেয়ে বলি মৃত্যুও ভালো—বাঁচা তাঁর কিছু নয়।
তবে, মরণের হবে জয় ?
মানুষ হইয়া মৃত্যুর কাছে মেগে লবে পরাজয় ?
দাঁড়ায়ে সবার আগেতে
আপনা হারায়ে জগতে
জীবনে বরিতে হয় ;
তবেই জীবন আসিবে রে তোর—মৃত্যুর নাহি ভয়।
রুদ্ধ লৌহ কারার
ভেঙে ফেলরে দ্বার,
বন্ধন-হারা-আত্মাকে আনি দেখাও জগতময়
হয় কি এ সমুদয়!
তখন, বন্ধ না লাগিবে ভালো,
পাইবে নূতন আলো,
কেবলি মুক্তি, কেবলি শান্তি, বিশ্ব হবে প্রাণময়—
আর—শুধু জ্ঞানময়!
বাঁচিয়া থাকা মানুষের তবে এরেই বলিতে হয়।

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী

মিলনের পথে

(১)

"কেন তুমি ভীত হচ্ছো বাবা? কিসের ভয়?" বলিয়া চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা বীরের ভঙ্গিমায় গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইল।

দেয়ালের গায় হাতের বর্শাটী হেলাইয়া রাখিয়া বৃদ্ধ ভগবতীদাস কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন,—"অবুঝ হোসনে ধীরা; তুই বড় হয়েছিস; রাজপুতনা আজ আর ঠিক আগেকার মত নেই মা। তাই তোকে নিয়ে যেতে মন আসছে না আমার। নইলে কতবার তোকে নিয়ে যাইনি?"

ধীরা মুখ ফিরাইয়া কম্পিত স্বরে কহিল,—"তুমি যাবে আর আমি একাটি ঘরে থাকবো,—তাইত আমি নিরাপদ হয়ে রইলুম, না? বিপদ আসে ত এখানেও আসতে পারে না বুঝি? না বাবা, আমার যেতে বড় মন কেমন করচে, আমি যাবো তোমার সঙ্গে, বল তুমি, বল।" বলিতে বলিতে ধীরা পিতার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া আবদার করা হাত দু'খানিতে তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

ভগবতীদাস সস্নেহে কন্যাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিলেন, "আচ্ছা ধীরা, চিরকালই কি তুই আমার সঙ্গে থাকবি? তুই যে মেয়ে। মেয়ে বুঝি শিকার কর্ত্তে বেরোয়?"

ধীরা পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া শুধু কহিল,—"আমি যে তোমার মেয়ে।"

ভগবতীদাস সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন,—"আরও মা, এবারকার আহেরিয়ায় বিদেশী পাঠান আমাদের সঙ্গে যোগদান করবে। নাগোর দুর্গাধ্যক্ষ পাঠান সর্দ্দার মজফ্ফর খাঁ সদলে এবার আহেরিয়া উৎসব কর্ত্তে বেরোবে; দলে তার কত পাঠান, তাতার। তাদের সঙ্গে কি মা তোমার যাওয়া ভাল দেখায়?"

ধীরা একবার পিতার বক্ষ হইতে মুখ সরাইয়া লইয়া সোজা হইয়া কহিল,—"বাবা, তাহলে কি তুমি বলতে চাও, পাঠান আজ এদেশে এসেছে বলে রাজপুত মেয়েরা তাদের বীর-সাধ সুখ সমস্ত ভুলে যাবে? আর তাদের পিতা মাতারাও তাদের এই শিক্ষাই দেবেন? এত খর্ব্ব এত অথর্ব্ব করে রাখবে তাদের?"—ধীরার কণ্ঠস্বর বদলাইয়া গেল। জ্বলন্ত চক্ষু দু'টি যেন একটা বর্ষণের মেঘে নিভিয়া গেল। স্বর্গগতা জননীর কথা মনে হওয়ায় ধীরার গর্ব্বিত শির আপনা হইতেই যেন তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রমাণ করিতে নত হইল। নিম্নস্বরে ধীরা কহিল, "মাত কই আমায় এ শিক্ষা দিয়ে যাননি। তিনি ত আমায় শিখিয়েছিলেন বীরব্রতাচার, দেখিয়েছিলেন বীর-অনুষ্ঠান। তিনি ত আমায় বলেছিলেন, 'ধীরা রাজপুতের দেশে রাজপুতের ঘরে জন্মেছিস, দেখিস মা রাজপুতের নাম ভুলিস নি যেন'।"

মৃতপত্নীর কথা মনে করিয়া বৃদ্ধেরও প্রাণ ব্যথিত হইল। মীরাকে ভগবতীদাস খুব ভালবাসিতেন। দুঃখ ও দৈন্যের গভীর অন্ধকারে মীরা আর ধীরার মুখ দু'খানিই স্বর্গীয় আলোকে তাঁহার জীবনের পথ আলোকিত করিয়াছিল। অশ্রান্ত অধীর শ্রমের পর সন্ধ্যায় যখন তিনি কুটীরে ফিরিতেন, একমাত্র এই মা ও মেয়ে দুটির স্নেহমধুর সম্ভাষণেই তিনি দিনের শ্রান্তি ভুলিয়া যাইতেন। দিবসের অশেষ ক্লেশের মাঝে ইহাদেরই কথা অজানা যেন একটা বিশ্বের শক্তি তাঁহার প্রাণে জাগাইয়া তুলিত। ভগবতী তখন নাগোরবাসী একজন দরিদ্র কৃষক। তাহার পর একটা কর্ম্মের যুগ চলিয়া গিয়াছে, এই দীর্ঘ-কাল ব্যাপী সাধনার কালে ধ্যানরত এই যাত্রিকের চক্ষে বিশ্রান্তির শান্তিময় দিকটা একদিনের তরেও দৃষ্ট হয় নাই। একদিনের তরেও তিনি আরামের আস্বাদ পান নাই। এক এক করিয়া কত দীর্ঘ দিন মাস ভগবতীর উপর কত বর্ষের গুরু ছাপ দিয়া অনন্তে বিলীন হইতেছিল।

* * * সেবার দেশে মহারাঠা বর্গীর ভয়ে হাহারব উঠিল। দেশময় একটা সরগোল পড়িয়া গেল। মারওয়ার-রাজ আদেশ করিলেন—"দেশের জন্য সবাইকেই অস্ত্র ধরিতে হইবে। সবারই দাঁড়াইতে হইবে।" লাঙ্গল

ফেলিয়া ভগবতী বীরভল্লে সজ্জিত হইয়া মীরার নিকটে বিদায় লইতে আসিল। ধীরা তখন দু'টি বৎসরের কুসুম কোড়কটি। বিদায় কালে মীরা গর্ব্বিত কণ্ঠে কহিল, "বীরব্রতে তুমি এবার রাজার সম্মান পাবে।"

ভগবতী ধীরার মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে মীরার ক্রোড়ে দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।—

* * উভয় পক্ষের ভেরী বাজিল; যুদ্ধ বাধিল; * *

নালোররাজ বিজয়ী হইলেন। বর্গীর ভয়ে দেশের শিশুটি পর্য্যন্ত চক্ষু বুজিয়া ছিল, আবার একসঙ্গে একরাশি পদ্মের মত সবাই চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মায়ের মুখে হাসি ফুটিল। বিজয়ী রাঠোরগণের সঙ্গে কৃষক ভগবতীদাস বিজয়মাল্যে ভূষিত হইয়া ফিরিলেন। ভগবতীর নির্ভীক বীরত্বদর্শনে মারওয়ার রাজ প্রীতমনে তাঁহাকে ভূমিয়ার পদে অভিষিক্ত করিয়া নালোর দুর্গের ১৫ ক্রোশ দূরে এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করিয়া ভগবতীকে সম্মানিত করিলেন। সেই দানপত্র আর অসি-ভল্ল-বর্ষা লইয়া অশ্বারোহণে ভগবতীদাস স্বীয় পর্ণকুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। ধীরা তখন অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া ধীরা তখন মীরার মানসসরসীর বুকে একটি মাত্র পদ্মকোরকের মত ফুটিয়া উঠিতেছে। ভগবতী বর্ষা ফেলিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া দুই হস্তে ধীরাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরার কৌতূহলভরা চক্ষু দু'টি চুম্বনে ভরিয়া দিলেন।

"কত বড়টি হয়েছিল মা আমার! দুটী বছরের দেখে গিয়েছিলেম, কেমন করে কোথা দিয়ে এই দীর্ঘ ছয় বৎসর কেটে গেছে, জানতেও পারিনি।"

মীরা একটা বিশ্বের আনন্দ চাপিয়া রাখিয়া ভগবতীর পায়ে প্রণাম করিল। মা'র দৃষ্টান্তে ধীরাও ধীরে ধীরে পিতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া মায়ের কাছে সরিয়া গেল। ভগবতী রাজার নামাঙ্কিত দানপত্রখানি মীরার হস্তে দিয়া কার্য্যান্তরে বাহির হইয়া গেলেন। ধীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে মা?"

"ওরে পাগলী, দেবতা, আমার স্বামী,-তোরই পিতা।"

"বাবা! বাবা!—কত দিন তুমি বাবারকথা বলেছ মা, এতদিনে তাঁকে দেখলাম। বাবা, তুমি আমায় এত ভালবাস!! এতদিনের এত যুদ্ধেও তুমি আমাদের কথা ভোলনি!"—ধীরা ভূমিষ্ঠা হইয়া পিতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে মাতা যেমন শিখাইয়া দিয়াছিল তেমনিভাবে আবার প্রণাম করিল। মীরা ধীরাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইল।

দরিদ্রের পর্ণকুটীর ছাড়িয়া ভগবতী পত্নী ও কন্যা লইয়া রাজদত্ত রহিণ দুর্গে চলিয়া গেলেন; দুঃখের পর কত সুখ, দারিদ্র্যের অবসানে সে কি সচ্ছলতার আনন্দ তখন!! প্রাংশুলভ্য যাহা ছিল, বীরত্ব প্রতিভায় কৃষক ভগবতীদাস আজ তাহাই পাইয়া রহিণের ভূমিয়া সর্দ্দার ভগবতীদাস রাও।—

সুখৈশ্বর্য্য যাঁহাদের উপভোগ্য, যাঁহাদের প্রাপ্য দাবী, বিধাতৃ বিচারে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা সুখের মাঝে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্রের সুখ বুঝি বিধাতারও অভিপ্রেত নয়। বৎসর অতীত না হইতেই সহস্র অপূর্ণ বাসনা লইয়া মীরা অকালে কালের অলঙ্ঘনীয় নিষ্ঠুর আদেশ পালনে কোন এক অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত পথে যাত্রা করিল। ধীরা তখন মাত্র নবম বৎসরের, আর ভগবতী দাস নিতান্তই ভগ্নপ্রাণ অতি দুর্ব্বল অকালবৃদ্ধ। * * *

কাল প্রবাহে সেদিনও চলিয়া গিয়াছে। কবে ধীরে ধীরে ভগবতীর সারাটি প্রাণ ব্যাকুল স্নেহে ধীরার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—নিজেও তাহা জানিতে পারেন নাই। মীরার কথা ভুলিয়া ধীরার মুখখানিই তিনি স্মৃতিপটে আঁকিয়া লইয়াছেন। প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি প্রভাতে, ধীরা যখন জানু পাতিয়া জোড় হস্তে মুদিতনেত্রে জননীকে স্মরণ করিত, সম্মুখের ভূমি মাতৃচরণ-রেণু জ্ঞানে চুম্বন করিত, তখন শুধু ভগবতী দূরে অন্তরালে থাকিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, কোনও দিন বা ছুটিয়া আসিয়া ধ্যানমগ্না ধীরার মুখের দিকে বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন, কোনও দিন ধীরাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুধারে স্মৃতির মূর্ত্তিটি সিক্ত করিয়া দিতেন। * * *

অভিনয়ের দৃশ্যাবলীর মতন প্রাণময়ী মূর্ত্তি লইয়া প্রস্থিত দিনগুলি এক এক করিয়া ভগবতীর চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত সুখ দুঃখের কাহিনী গাহিয়া যাইতে লাগিল। ভগবতী মুহ্যমানভাবে ধীরার দিকে চাহিয়াছিলেন।

কতক্ষণ পরে ধীরা আবার তেজোময়ীর স্বরে কহিল, "তোমার বীরত্বের কাহিনী মা আমায় শোনাতেন, মা'র মুখে সে সব কথা শুনতে শুনতে কত দিন আমার ক্ষুদ্র বুকের ভিতরে

আমি একটা অপার আনন্দ পেয়েছি। বাবা, তোমার সেই নির্ভীক বীরের ছবিখানি আমার চোখে এত মলিন করে দিও না,—মা যে আমার তোমারই বীরগাথার সুরে আমার এ প্রাণের তারটি বেঁধে দিয়ে গেছেন।"

কোন কথাই না বলিয়া ভগবতী অচঞ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত মৌনভাবে কাহার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন যেন।

দূরে শিকারীর উল্লাসধ্বনি শ্রুত হইল। আহেরিয়ার উৎসব-ভেরী বাজিল, প্রভাতপবনে সে গম্ভীর ধ্বনি প্রতি রাজপুতের প্রাণে জাগরণ বহিয়া আনিল।

ভগবতী রায় স্বপ্নোত্থিতের মত উঠিয়া ধীরার হাত ধরিয়া কহিলেন,—"এত দেরী হয়ে গেছে! আহেরিয়ার উৎসবরব শুনতে পাচ্ছিস্‌নি মা? আমায় বলতে হয়! সুজন! সুজন! অশ্ব—দুটি অশ্ব।"

সুজনমল দুটি অশ্ব সাজাইয়া আনিল।

ধীরা পিতার হস্তে বর্শা তুলিয়া দিয়া অনায়াসে অশ্বারোহণে পিতার পাশাপাশি অশ্ব ছুটাইয়া নিমেষে দূরে—অতি দূরে পর্ব্বতারণ্যে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেল।

২

আহেরিয়া; রাজস্থানের প্রতিটি রাজপুত আজ বরাহ-শিকার উৎসবে মত্ত। নালোর দুর্গাধ্যক্ষ পাঠান সর্দ্দার মজঃফর খাঁও রাজপুতের সহিত শত্রুতা ভুলিয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছেন।

পাঠান সকলেই রাজপুতবেশে রাজপুতগণের সহিত সমভাবে তীর বর্শা নিক্ষেপ করিতেছিল।

ভগবতী দাস মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ধীরাকে চোখের আড়াল করেন নাই। পাঠানগণ দু' একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে ধীরার দিকে চাহিয়াছে, ভগবতী সেই দৃষ্টির মধ্যে একটা উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত দেখিয়াছেন, তাই একবার ধীরাকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন,—"তুই আমার কাছ ছাড়া হোস্‌নে মা।"

"কেন বাবা?"

"না মা, যে বন, শিকার করতে এসে শিকারীর না মুখে পড়ি।"

"এই কথা? আমার হাতে বর্শা রয়েছে, তূণে এখনও যথেষ্ট তীর আছে,—তুমি ভয় ক'রোনা বাবা।"

কন্যার নির্ভীক প্রাণের পরিচয় পাইয়া ভগবতী হৃদয়ে বড় একটা গর্ব্ব অনুভব করিলেন। ধীরা আবার কহিল,—"আমি যে তোমার মেয়ে, আমি কি ছুটো বুনো মোষের ভয় করি?" তারপর অশ্বের রশ্মি টানিয়া কহিল,—"আজকার আহেরিয়ায় সব চেয়ে বড় বরাহটা আমার এই বর্শায় আমি বিদ্ধ ক'রবো বাবা।"

"সত্যই! পারবি মা?"

"দেখো তুমি, বিদ্ধ শিকার তোমার পায়ের উপর এনে ফেলবো যখন, তুমিও আমার শিকার ক'রবার তারিফ্‌ ক'রবে। নেও চল, সবাই শিকারের পিছনে ছুটেছে দেখ, আর আমরা দাঁড়িয়ে কেবল কথা কইব না। চল, ছুটি। নিভৃতে তোমার স্নেহের কথাগুলি ঘরে বসে আমি কাণ পেতে শুনব, আদেশ মাথা পেতে নেব। আহেরিয়া শিকারনৈপুণ্য দেখাবার রঙ্গমঞ্চ, এখানে ভাব্‌বার সময় কই! শিকার—শিকার, বাবা দেখ, তুমিও যদি আমার লক্ষিত শিকার লক্ষ্য ক'রে তীর ছোড়, তবে তখন তুমিও আমার শত্রু, এই ত আহেরিয়ার নিয়ম। নয় বাবা?"

ভগবতী দাস সহাস্যে কহিলেন—"হাঁ, মা।"

"খোঁজ শিকার, অশ্বের বল্গা ছেড়ে দাও।" বলিয়া ধীরা অশ্বের বল্গা শিথিল করিয়া কষাঘাত করিল। ফুলের বোঝায় কষ্ট নাই, শ্রান্তি নাই, বহিয়া শান্তি আছে, বহিতেই সবাই চায়। অশ্ব তীব্রবেগে নৃত্য চঞ্চলগতিতে ছুটিল।

*　　*　　*　　*

দৃষ্টির বাহির হইতেই ধীরা উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল,—"খবর্দ্দার! এ শিকার আমার! আমি এতক্ষণ বন থেকে শিকার বনান্তে তাড়িয়ে আস্‌ছি। কেউ এ দিকে এসো না, অন্য দেখ।" পলায়মান বরাহের পশ্চাতে ধীরা অশ্ব ছুটাইয়া আসিতেছিল। অপর দিক হইতে ভগবতীদাস সেই বরাহটাই লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন। দূর হইতে ধীরাকে দেখিতে পাইয়াই তিনি অশ্বের গতি সংযত করিলেন।

"ধীরা ছেড়েদে; দাঁড়া, এক্ষণিও বরাহ পর্ব্বতের নিম্নে উপত্যকায় নেমে যাবে; পারবিনি নীচে নাবিস্‌নি; অশ্বের

এমন শক্তি নেই যে এই খাড়া পথে বরাহের অনুসরণ করবে। ভয়ানক পথ! ছিটকে পড়ে প্রাণ হারাবি,—কাজ নেই মা।"

"তুমি দাঁড়াও বাবা, আমি ঠিক ওই বরাহ শিকার করে তোমায় দিচ্ছি। ধীরার বর্শার হাত এড়িয়ে পালাবে এমন বরাহ? ইস্! আমি আস্‌ছি বাবা, তোমার ভয় নেই!" বলিতে বলিতে ধীরা অনেকদূর চলিয়া গেল। বরাহ পর্ব্বতের নিম্নপথে প্রাণের ভয়ে ছুটিয়াছিল, ধীরা মত্ত বেগে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল।

পর্ব্বতের শীর্ষ হইতে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ভগবতীদাস বিস্ময়ের নেত্রে চাহিয়াছিলেন শুধু সেই দিকে, যে দিক দিয়া একটা অতি সঙ্কীর্ণ বিপদসঙ্কুল অসমান পথ পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া নিম্নে—অতি নিম্নে—গভীর অতলস্পর্শী নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। আর কিছুই তাঁহার দৃষ্টি পথে ছিল না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিখিলসংসার, ইহকাল পরকাল, স্বর্গ মর্ত্ত্য সমস্তই যেন ওই পথ ধরিয়া অনন্ত অসীম অন্ধকার পাতালে নামিয়া যাইতেছে বলিয়া তাঁহার বোধ হইল।

আর অপর আর একটা পর্ব্বত চূড়া হইতে আর একজন সশস্ত্র শিকারী বিস্ময়ে পলকবিহীন চক্ষে দেখিতেছিলেন, ভয়ার্ত্ত বরাহের পশ্চাতে পশ্চাতে অশ্বারূঢ়া নির্ভীক বলিকা, অশ্বের প্রতি পদক্ষেপে বালিকার পৃষ্ঠলম্বী কৃষ্ণ কুঞ্চিত বেণীবন্ধনহীন কেশরাশি বায়ুর হিল্লোলে উড়িতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ ছড়াইয়া পড়িতেছিল! আর সেই কৃষ্ণ আচ্ছাদনের অন্তরাল হইতে বালিকার উজ্জ্বল কণ্ঠহার সূর্য্যালোকে ঝলসিত হইয়া অন্ধকারে বিদ্যুতাগ্নির মত দেখাইতেছিল। পশ্চাত হইতে শিকারী তন্ময় চিত্তে সমস্ত চোখে তাহাই দেখিতেছিলেন।

অকস্মাৎ বরাহের পশ্চাত ধাবন করিয়া ধীরার সাহসী অশ্ব পর্ব্বতপ্রান্ত হইতে ঝম্প প্রদান করিল শূন্যে একবার এক মুহূর্ত্তের তরে দৃষ্ট হইল একটি বরাহ আর তাহার পশ্চাতে বর্শাহাতে অশ্বারূঢ়া এক শিকারোন্মত্তা বালিকা, কি সর্ব্বনাশ! একি দুঃসাহস বালিকার! এ যে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া লইল! হায় হায় হায়! শিকারী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ইয়া আল্লা!" তাহার পর অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া সেই মহাশূন্য লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন।

মানসিক দুর্ব্বলতা তাঁহার চক্ষের সম্মুখে একটা গাঢ় অন্ধকারময় যবনিকা ফেলিয়া দিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একাকার করিয়া দিয়াছিল; সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সেই যবনিকার অন্তরালে আর একটা আলোকরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ভগবতীদাস চক্ষু মুছিয়া আবার সেই উপত্যকা-গামী পথের দিকে চাহিলেন। "কোথায় ধীরা? কে ঐ পথে ছুটিয়াছে? কেও? পাঠান মজঃফর খাঁ নয়? সেই ত বটে! ধীরাকে এই পথে যাইতে দেখিয়াছে বুঝি? অ্যাঁ?"—ভগবতীদাস তরবারীর অনুসন্ধানে কটিতে হাত দিলেন। মুখমণ্ডল মস্তোকোপরি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মতই জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধের অবসন্নদেহ কোথা হইতে মত্ত মাতঙ্গের শক্তি কে আনিয়া দিল। ভীম শক্তিতে ভগবতী মজঃফরকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন; মহাশূন্যে সেই শানিত বর্শাফলক শ্বাপরের রণে ব্রহ্মাস্ত্রের মত জ্বলিয়া উঠিল। একবার উর্দ্ধে উজ্জ্বল সৌরমণ্ডলের দিকে চাহিয়া ভগবতীদাসও সেই পথে অশ্ব ধাবিত করিলেন।

সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। চতুর্দ্দিকে ঘন বনশ্রেণী। একটামাত্র সঙ্কীর্ণ পথ পর্ব্বত হইতে নামিয়া লোকালয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে। শুধু সেই পথে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দুটি একটি রশ্মি বৃক্ষপত্রান্তরাল হইতে পর্ব্বতের কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর আসিয়া পড়িয়া পার্শ্বস্থ অনতিবৃহৎ হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হইত। অতি অল্প উপর হইতেই পর্ব্বতশ্রেণীর সঙ্কীর্ণ প্রান্তদেশ চঞ্চুপুটের মত সেই হ্রদের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরা অশ্বসমেত সেই গিরিপ্রান্তর হইতে হ্রদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হ্রদের জল সশব্দে ফুলিয়া উঠিয়া উভয়কেই তাহার অতল গর্ভে লুকাইয়া ফেলিল। কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে (অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া) ধীরার মুখখানি নীলজলে শ্বেতপদ্মের মত ফুটিয়া উঠিল। দূরে কৃষ্ণ বরাহটাও ভাসিয়া উঠিল। শুধু অশ্বটারই কোনই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। অশ্বের অনুসন্ধানে ধীরা চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথায় অশ্ব? কিন্তু—"ওই যে—ওই যে শিকার!"

—পতনের গুরু আঘাত ভুলিয়া এক হস্তে সন্তরণে, এক হস্তে বর্শা লক্ষ্য ধরিয়া ধীরা বরাহের দিকে ছুটিল। বরাহ তীরে উঠিল, ধীরাও একটু দূরে জল ছাড়িয়া উঠিল। অনতিবিস্তৃত শ্যামল তীর, পশ্চাতেই গগনভেদী পর্ব্বতমালা। কোথাও একটু ছিদ্র পথ নাই যে পথে বাহির হইয়া যাইবে। ভয়ার্ত্ত বরাহ একবার পলায়নের শেষ চেষ্টা করিল; একবার পাহাড়ের গাত্র বহিয়া উপরে উঠিতে পড়িয়া গেল। ধীরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া একবার যেন শ্বাস সামলাইয়া লইতেছিল। উপায়ন্তর না দেখিয়া বরাহ এইবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুধার্ত্ত পরিশ্রান্ত বন্য বরাহ শোণিত লালসায় চক্ষু দুইটী জ্বলিয়া উঠিল। মুখর হাস্যে ধীরা সেই পাহাড় জঙ্গল জল কাঁপাইয়া তুলিল,—প্রতিধ্বনি সেই বদ্ধ উপত্যকায় গুম্ গুম্ করিতে লাগিল। বরাহ একবার শিহরিয়া উঠিয়া পরমুহূর্ত্তেই ধীরাকে লক্ষ্য করিয়া ঝম্পপ্রদান করিল। ততোধিক অল্পসময়ের ভিতর ধীরা তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বরাহকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া গেল। ঠিক একই সময়ে অন্তরাল হইতে কাহার একটি তীর বরাহের ললাটদেশে বিদ্ধ হইল। বিশৃঙ্খল চীৎকার করিয়া বরাহ একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরের মত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

ললাটের উপর হইতে সিক্ত কেশগুচ্ছগুলি সরাইতে সরাইতে ধীরা ছুটিয়া আসিয়া বিদ্ধ বর্শা তুলিয়া লইল।

পশ্চাৎ হইতে গম্ভীর অথচ কোমল মধুর কণ্ঠে মজঃফর খাঁ কহিলেন, "তবে আমিও আমার তীরটি তুলে নিই; এ শিকারের সম্মান সম্পূর্ণ তোমারই হোক। আমি এতে ভাগ বসাতে তীর ছুড়িনি। ক্রুদ্ধ বরাহ তোমায় লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়েছিল দেখেই তোমায় বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেম,—তখনই এ তীর ছুড়েছিলেম; তুলে নিচ্ছি।"

ধীরা কতকটা ভয়ে কতকটা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। সিক্ত বস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে ধীরার যৌবনোদ্মেষ, অপর্য্যাপ্ত রূপরাশি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িয়া ধীরার পদ ধৌত করিয়া একটানা স্রোতে হ্রদের জলে মিশিয়া যাইতেছিল। মজঃফর খাঁ তীরটি তুলিয়া লইয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে ধীরার দিকে চাহিলেন, ধীরা সেই দৃষ্টির সম্মুখে এতটুকু হইয়া গিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার মাত্র তাহাদের চারিচক্ষুর মিলন হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার আর ধীরার চোখ তুলিয়া চাহিতেও সাহস হইতেছিল না। বুকের মাঝখানে দ্রুত একটা স্পন্দনের তালে তালে পায়ের নীচের পৃথিবীও নাচিতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল।

মজঃফর ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিলেন সেই মোহনমূরৎ, তাহার পর কটিস্থ বংশী গ্রহণ করিয়া ফুৎকার করিলেন। নিস্তব্ধ বনরাজী সেই বংশী ধ্বনি শুনিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। আবার মজঃফর তিনবার বংশীধ্বনি করিয়া ধীরার দিকে সরিয়া আসিয়া কহিলেন, "তোমার পরিচয় পেতে পারি সুন্দরী ?"

ধীরা কোনই কথা না কহিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল।

মজঃফর আবার কহিলেন,—"অনুমানে বুঝতে পারছি তুমি কোন রাজপুত বালা, বুঝি স্বজনসঙ্গে আহেরিয়ায় এসেছিলে, পরিচয় জানলে আমি যথাসাধ্য তোমায় তোমার অভীষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে চেষ্টা কর্ত্তেম, এইমাত্র। মনে কোন দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা থাকলেও কোনই দুরভিসন্ধি নেই আমার।"

"থাক্ বা না থাক্ অসহায়া একাকিনী এই বালিকার সঙ্গে এই বাক্যালাপ রাজপুতের আচার বিরুদ্ধ বলে জানবেন, পাঠানসর্দ্দার।" বলিতে বলিতে ভগবতীদাস আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন. ধীরা একবার চমকিয়া কহিয়া উঠিল,—"পাঠান!!!"—আবার একবার চকিতে মজঃফরের মুখের দিকে তাকাইল। মজঃফর তখনও ধীরার দিকে চাহিয়াছিলেন, চোখে চোখ পড়িল, ধীরা আবার মুখ নামাইল,—দেহের সমস্ত শোণীত যেন দুই কর্ণ আর গণ্ডে জমাট বাঁধিয়া যাইতেছিল। ভগবতীদাস গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"চলে আয় ধীরা।"—ধীরা ধীরে ধীরে পিতার কাছে সরিয়া আসিল। মজঃফর খাঁ একটু হাসিয়া ভগবতীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভগবতীদাস প্রসারিত হস্তে বর্শাবিদ্ধ মজঃফরের উষ্ণীষটি তাহার দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "এই নিন আপনার শিরস্ত্রাণ পাহাড়ের উপর থেকে আপনাকেই লক্ষ্য করে আমি বর্শা নিক্ষেপ করেছিলেম।" ধীরা একটু কাঁপিয়া উঠিল। ভগবতী কহিতে লাগিলেন, "আপনি তীব্র বেগে নিম্ন পথে অবতরণ কচ্ছিলেন বলেই অব্যর্থ বর্শা আপনার উষ্ণীষ

বিদ্ধ করেছিল। পথে আসতে আমিই কুড়িয়ে এনেছি। এই নিন।"

তেমনি সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া মজঃফরে খাঁ ধীর হস্তে স্বীয় উষ্ণীষ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "রহিণ সর্দ্দার ভূমিয়া ভগবতীদাস, আজকের আহেরিয়ায় আমিই তবে তোমার শিকার ছিলেম, নয়? ভাল, আহেরিয়ায় নরহত্যা তোমাদেরই নিয়মবিরুদ্ধ বলে শুনেছিলাম। তা তোমরাই যখন সে নিয়ম গুলো করেছো, তোমরা ভাঙ্গতেও পার নিশ্চয়ই। সুন্দর! সুখী হলেম। তবু তুমি সরল, লুকাওনি।"

ভগবতীদাস মনে মনে লজ্জিত হইলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, "আর তুমি? আমি যদি তোমায় জিজ্ঞেস করি, কেন তুমি এই বালিকার অনুসরণ করেছ, কেন এই নির্জ্জনতম প্রদেশ পর্য্যন্ত তার পশ্চাদ্ধাবন করেছো? কেন এই বালিকার উপর অত্যাচার কর্ত্তে প্রয়াসী হয়েছিলে?"

"কেন? আমার উত্তর শুনবে ভগবতীদাস? বল্‌তে চাইনি; খোদা একদিন এর উত্তর দেবেন তোমারই এই মেয়ের মুখে। আর অত্যাচারের কথা বলছিলে নয়? সর্দ্দার, অত্যাচারই যদি করি, রক্ষা করতে পার?"

সমুচ্চ শিরে ভগবতীদাস কহিলেন, "এস, কর অত্যাচার! দেখ পারি কিনা,—মনে রেখো, রাজপুতের সম্মুখে কথা কইছ।"

"আর তুমিও স্মরণ রেখো প্রায় পঞ্চাশজন পাঠানের বিরুদ্ধে একক তুমি বৃথা এই আস্ফালন করছ। চেয়ে দেখ দেখি,—সাহস হয়?" অঙ্গুলী নির্দ্দেশে মজঃফর খাঁ পশ্চাতের প্রবেশ পথের দিকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার বংশিধ্বনি শুনিয়া তৎ সঙ্গীয় পাঠানগণ এক এক করিয়া সেই সঙ্কীর্ণপথে উপত্যকামধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। ভগবতীদাস সেইদিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার বীর হৃদয় টলিল না,—একটুও তিনি বিচলিত হইলেন না। জলদস্বরে কহিলেন,—"আহেরিয়ার নিয়ম ভেঙ্গে তবে সত্যই আজ নরহত্যা কর্ত্তে হল।"

মজঃফর খাঁ একবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন,—"যতই স্পর্দ্ধা করছ তুমি, নিজেও ঠিক বুঝতে পারছ, এখন যদি তোমায় আমায় যুদ্ধ হয়—তোমার পরাজয় সুনিশ্চয়। ইচ্ছা কল্লেই শুধু একটি ইঙ্গিতে আমি এই অন্ধকার মথিত করে প্রাণের আলোটুকু তুলে নিয়ে যেতে পারি। বলপূর্ব্বক তোমার কন্যাকে পাঠান দুর্গের বন্দিনী করতে পারি। কিন্তু তস্করের মত লুণ্ঠনে আমি পাঠানের নাম কলুষিত করব না। এ প্রাণের চিজের অনাদর করব না আমি। আহেরিয়ার নিয়ম মেনেই নিয়ে এ উৎসবে যোগদান করেছি, আজ আমি তার ব্যতিক্রম করবো না, শপথ করেছি। বৃথা তুমি আমায় অভিযুক্ত করেছিলে। তবে আমার একটা অনুরোধ—একটা প্রার্থনা মঞ্জুর তোমায় কর্ত্তেই হ'বে। ভগবতীদাস রায়, আমি তোমার এই কন্যার পাণিপ্রার্থী, বাহুবলে আমি যা মুহূর্ত্তে এখনই আমার করায়ত্ত কর্ত্তে পারি আমার সেই প্রার্থিত ধন তোমার হাত থেকে আমি স্নেহের দান ভেবে মাথা পেতে নেব। তুমি আয়োজন করগে যাও; সপ্তাহপরে আমার দূত তোমার উত্তরের জন্য প্রেরিত হবে, তুমি শুভাদন স্থির করে খবর পাঠিও। সেলাম ভূমিয়া, সেলাম সুন্দরী!"

এক এক করিয়া যেমন তাহারা আসিয়াছিল, মজঃফর খাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠানগণ তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

সেই নির্জ্জন উপত্যকা মধ্যে ভগবতীদাস বজ্রাহতের মত ধীরাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মৃত বরাহটার একটা কৃষ্ণ ছায়া হ্রদের জলের উপর পড়িয়াছিল। সেখানকার নীলকৃষ্ণ জলগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া পারের উপর আছড়িয়া পড়িয়া একটা অতি করুণ কাতর ক্রন্দন কম্পিত সুর সেই শুব্ধ বনানীর বায়ুপ্রবাহে ছড়াইয়া দিতেছিল। ধীরা তখন ভগবতীর বুকের উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। ধীরার জলমগ্ন অশ্বের মৃত দেহ তখন তাহাদের অনতিদূরে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

(৪)

রহিণ দুর্গে স্বীয় কক্ষে বসিয়া ভগবতীদাস গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন। মজঃফর খাঁর সংবাদবাহী দূত মহারাজের উত্তরের অপেক্ষায় বিশ্রামকক্ষে বসিয়া রহিয়াছে। সর্দ্দার বলিয়াছিলেন, সপ্তাহ পরে উত্তর দিতে হইবে। ছয়দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, আর একদিন মাত্র বাকী; এ

কয়দিনের অবিরাম চিন্তায় ভগবতীদাস কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

অতি সন্তর্পণে পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ধীরা অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ডাকিল—"বাবা!"

ভগবতীদাস মুখ ফিরাইয়া ধীরার দিকে চাহিলেন, ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, কণ্ঠে স্বর ফুটিল না। শুধু একখানা হাত ধীরার দিকে বাড়াইয়া দিলেন, ধীরা ছুটিয়া আসিয়া পিতার হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

"বাবা, বাবা, আমিই তোমায় মেরে ফেল্লুম!"

ভগবতীদাস কম্পিত হস্তে ধীরার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "কাঁদছিস্ মা? কেন? আমার বুকে মুখ লুকিয়ে থাক। তোর কিসের ভাবনা?"

অশ্রুসিক্ত মুখখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া ধীরা কহিল, আমার কথা আর আমি ভাবছিনি বাবা, এ কয়দিন খুব ভেবে দেখে আমি আমার চিন্তার শেষ করেছি। বাবা, আমিই তোমার একটা কুগ্রহ, আমি ভাবছি শুধু তোমার কথা। এত দুশ্চিন্তার ব্যথা তোমার মুখে এমন একটা ছাপ রেখে গেছে, তোমায় দেখে এ জীবমান দেশের ব'লে মনে হয় না যে বাবা। তোমার এত কিসের ভাবনা বাবা?"

"তবু ত, কই, কুল পাচ্ছিনি মা।"

"আমি বল্‌ব বাবা?"

"তুই কি কি বল্‌বি তোর মুখ দেখেই আমি তা বুঝতে পারছি মা। তবু বল—"

"বাবা, আমারই জন্য তোমার এই চিন্তার ভার। আমারই ভাবনায় তুমি এত অস্থির হ'য়েছ; আমিই তোমার এই দুঃসহ যাতনার মূল। বাবা, একটা অঙ্গ যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়, মানুষ তা স্বচ্ছন্দে কেটে ফেলে দেয় না কি? যদি অবশ্য তাতে সুফল ফলে। আমিও তোমার একটা ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ। তোমার এই অঙ্গ তুমিও কেটে ফেলে দাও না বাবা। রহিণবাসী সহস্র প্রজা নিরাপদ হোক। তাদের নিষ্পাপ রক্তপাত না হয়ে, অভিশপ্তা পাপগ্রস্তা আমারই এ পাপশোণিত মৃত্যুস্পর্শে পবিত্র হোক।"

ভগবতী কতক্ষণ ধীরার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া খুব বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ধীরা কখনও জীবনে তোকে অনাদর করেছি মা?"

"অনাদর! মা আমায় এত আদর কর্ত্তেন কিনা জানিনি। কেন বাবা, কেন একথা ব'লছ?"

সেকথার প্রত্যুত্তর না করিয়া ভগবতী তেমনি ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "আমায় ভালবাসিস্?"

কথা দুইটির মর্ম্ম বুঝিয়া ধীরা নিজেই লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল। কতক্ষণ সেইভাবে কাটিল।

ভগবতীদাস কহিলেন, "যা করি আমিই ক'রব। তুই কেন ভাবছিস্ মা? তুই শুধু আমায় ছেড়ে যাস্‌নি। সেদিন যদি তুই না যেতিস্, অবাধ্য না হতিস্ মা—এত বারণ করেছিলেম—" ভগবতী অতি উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

চোখের জলের একটা অফুরন্ত রেখা টানিয়া দিয়া ধীরা আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

৫

স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া ধীরা শয্যার উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "কেন আমি আগে পাঠান বলে জানিনি!" —তাহার পর নিজের কণ্ঠেরও কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া নিজেই আবার কহিল, "তোমায় আমি ভুলব না বাবা! আমি রাজপুতের মেয়ে, আমি তোমার মেয়ে, এজন্মে এর বেশী সুখ আমি চাইনি।"

গভীর নিশীথে তখন চাঁদ কোথা হইতে একরাশি সৌন্দর্য্যের আলো লইয়া অন্ধকারের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুই হস্তে সজোরে রুদ্ধ গবাক্ষটা খুলিয়া দিয়া ধীরা কতক্ষণ সেই আলোর সমারোহের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে সেই উধাও দৃষ্টি গুটাইয়া লইয়া হৃদয়মন্দিরে মাতৃমূর্ত্তির পায়ে লুটাইয়া দিয়া জননীর ধ্যানে মগ্না হইয়া রহিল।

মায়ের কথা মনে পড়িলে ধীরা এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইত! বাহ্য জগৎ তাহার চক্ষে তখন এমনই একটা আলোকমণ্ডিত হইয়া স্বর্গসুন্দরী জ্যোতির্ম্ময়ী মায়ের চরণতলে লুটাইয়া থাকিত। ধীরা সেই মহিমাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিত,—কখনও কণ্ঠ শব্দহীন,—ভাষাহীন প্রাণের কত গভীর প্রার্থনা,

গভীর স্নেহ প্রীতি ভক্তি গাঁথা পলকবিহীন দুটি চক্ষের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিত।

বহুক্ষণ পরে ধীরা ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিয়া একটা অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া কহিল—"মাগো!"

পশ্চাৎ হইতে পাঠান দূত কহিলেন,—"এতক্ষণ জানু পেতে বুঝি মায়েরই ধ্যান করছিলে,—আমি অবাক হ'য়ে তাই দেখছিলুম।"

ধীরা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। "কে তুমি?"

"আমি?—আমি পাঠানের দূত। তোমার পিতার উত্তর শুনতে এসেছি।—বিশ্রাম কক্ষে ব'সে ব'সে মাথায় কেমন কি ঝোঁক চেপে বসলো, খুঁজে খুঁজে একবার দেখতে এলেম তুমি কি করছো, শুনতে এলেম তোমার কি উত্তর। শোনাবে রাজকন্যা?"

ধীরা এতক্ষণ বিস্ময়ে ও ভয়ে কাঁপিতেছিল। আত্ম-সম্বরণ করিয়া কহিল,—"পিতার উত্তর পিতার মুখেই শুনবেন। আমারও ঐ একই উত্তর জানবেন। যান, এক্ষণি এস্থান পরিত্যাগ করুন। এখানে আপনার কি প্রয়োজন? শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ আপনি, আপনার বুঝে কাজ করা উচিত ছিল। এত রাত্রে একজন কুলবালার কক্ষে প্রবেশ করার অপরাধে যদি আপনারই জনাবের দরবারে আমি অভিযোগ করি?"—

একনিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া ধীরা হাঁফাইতে লাগিল।

পাঠানদূত একটু হাসিয়া কহিলেন,—"পাঠান সর্দার মজঃফর খাঁ তোমারই হস্তে এই বৃদ্ধের শাস্তির ভার তুলে দেন যদি, কি শাস্তি দেবে রাজকন্যা?"

ধীরা কোন কথাই কহিতে পারিল না। সহজ নিশ্বাসও সে ফেলিতে পারিতেছিল না। পাঠানদূত কহিলেন, "যাক্, সে শাস্তি দেওয়া না দেওয়ার ভার তোমারই থাক্। জরুরী তা নয়। দুর্গেশনন্দিনী, আমি তোমাকেই একবার মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, পাঠান সর্দারের সঙ্গে তোমার পরিণয়—"

কথাটা শেষ করিবার সময় না দিয়াই ধীরা কহিয়া উঠিল, "অসম্ভব, অমরত্বের মতন অসম্ভব। আমি রাজপুতের মেয়ে, রাজপুতের মত মরব।"

"তোমার পিতা যদি তোমায় পাঠানের হস্তে সমর্পণ করেন?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ধীরা কহিল, "ক'রবেন তিনি। সত্য! না—না—কখনই তিনি তা পারেন না। না, আমি পারতে দেব না। আমি বাধা দেবো। জীবনব্যাপি তিনি যে পুণ্যকীর্ত্তির প্রাসাদ গড়েছেন, এই পরিণয় একটা ভয়ানক ভূমিকম্পের মত তা ধূলিসাৎ ক'রে দেবে। না—কখনই তা হবে না!"

"কখনই হবে না!"

"স্বর্গের বিনিময়েও নয়,—এ জীবনে নয়।"

পাঠান দূত বড়ই কোমল কণ্ঠে কহিলেন। "কেন রাজকন্যা? এমন হয় নাকি? এমন হয়নি কি আর?"

কম্পিত কণ্ঠে ধীরা কহিতে লাগিল, "পাঠানদূত,—আমি যে আমার বাবার বড় আদরের মেয়ে। আমার স্বর্গগতা মা যে আমায় রাজপুতের দীক্ষায় দীক্ষিতা করে গেছেন। আমি যে হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর সমাজ ধর্ম্মের দাসী; আর তিনি, তিনি যে পাঠান মুসলমান; হতেই পারে না যে। প্রাণ, মান, ঐশ্বর্য্য, রহিণের দুর্গপ্রাসাদ—সর্ব্বস্ব যায়, তবুও যে তা হবে না। হয় না। বারাহাকুল প্রাণের রক্ত-স্রোতে পাঠান রাজপুতের মাঝখানে ব্যবধানচিহ্ন অক্ষুণ্ণ রাখবে। যান আপনি, প্রভাত পর্য্যন্ত পিতার শেষ উত্তর এই একই কথা শুনবার জন্য প্রস্তুত হোন গে। যান, দাঁড়াবেন না এখানে। এখনই এস্থান ত্যাগ করুন। আমার চিত্তের স্থিরতা নেই। মাথা ঘুরছে। সম্মুখের অসীম সসীম মূর্ত্তিতে বুকের উপর চেপে আসছে। একটানা অন্ধকারের জমাট একটা আচ্ছাদন নিখিলের নিখিল আলোক নির্ব্বাপিত করে দিচ্ছে। একি—একি—উঃ—মাগো!"

ধীরা দুই হস্তে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিতার মত শয্যার উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া গেল। পাঠান দূত বিস্মিতভাবে কহিলেন,—"একি স্বজাতি প্রেম না প্রেমে বিতৃষ্ণা? কি এ? এমনটি আর কখনও দেখিনি ত। পাঠান পারে না এমনি ত্যাগ ক'রতে? পারে না—পারব না আমি?" প্রপাত-স্রোতের মত একসঙ্গে অনেকগুলি মাতাল চিন্তার স্রোত পাঠানদূতের মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল। উন্মত্তের মত দুইহস্তে তিনি স্বীয় কেশগুচ্ছ টানিয়া

ধরিলেন। সেই আকর্ষণে মজঃফরের কৃত্রিম শুভ্রকেশরাশি খসিয়া পড়িল।

কক্ষের ভিতর হইতে চাঁদের আলো ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল, ভোরের বাতাস কাণে কাণে তখন প্রভাতের আগমনী বার্ত্তা গাহিতেছিল। কোন কথাই না ভাবিয়া মজঃফর খাঁ ধীরার দিকে চাহিয়াছিলেন।

"পাঠান দূত! তুমি পরজন্ম মান?" বলিতে বলিতে হঠাৎ ধীরা ফিরিয়া চাহিতেই চমকিয়া উঠিল—"একি! কে ও—তুমি—তুমি!"

গম্ভীরকণ্ঠে মজঃফর কহিলেন,—"পাঠান মানে, কি মানেনা জানিনা রাজকন্যা, আমি মানি।"

ধীরার বুকের ভিতরে উচ্চ চীৎকার উঠিল—"তুমি মান—তুমি মান?" লজ্জা ও ভয়ে কণ্ঠদ্বারে সে বাণীর মুখ চাপিয়া ধরিল, কথা বাহির হইল না। নতশিরে রুদ্ধ নিশ্বাসে ধীরা শুধু ভাবিতেছিল, "তবে যে এরই সঙ্গে এতক্ষণ কথা কয়েছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। যদি কেউ দেখে থাকে, না দেখে থাকে ত যদি এখনি কেউ এসে পড়ে, কি মনে ক'রবে? বাবা কি ভাববেন, বারাহাকুল কি ব'লবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।"

মজঃফর খাঁ কহিতেছিলেন,—"আগে যদিও জানতেম না, আজ আমি জানছি, জন্মান্তর বাদ—পরজন্ম আছে। জন্মার্জ্জিত পাপপুণ্যের ফলও আছে। রাজকন্যা, কেন তুমি একথা বল্‌ছো জানিনি, তবু বল্‌ছি আমি জানি! প্রাণে প্রাণে জানি। জন্মান্তর রহস্যই যদি না হ'বে তবে কেন শুধু মুহূর্ত্তের দর্শনে একজন এত আপনার হ'য়ে যায়? সেই মুহূর্ত্তের দেখা চিরমধুর রাখ্‌তে কেন তবে জীবনের সমস্ত সাধনা বিফল হয়ে যায়? সবাই পথিক; একজন কেন যেন এত পরিচিত, একজন কেন কেউ নয়? এই পরিচয় এই পথের দেখার নয়, এই পরিচয় প্রাণের পরিচয়। এ বন্ধন এই প্রেম, এই আকর্ষণ শুধু এ জন্মের নয়। জন্মজন্মান্তর পূর্ব্বের। দীর্ঘবরষের—প্রাক্তনের। জীবনের পথে শুধু এই পরিচয় নিয়েই চলেছি সবাই। কেউ চেনে, কেউ চিনেও চেনে না। চেনে না কে আছে রাজকন্যা!" মজঃফরের কণ্ঠস্বর ক্রমেই ধরিয়া আসিতেছিল। মজঃফর সে ভাব, সেই সজল চক্ষু লুকাইতে কটিবদ্ধ অসির হাতলটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নিজের মনের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করিয়া ধীরা শেষে বলিয়া ফেলিল,—"দয়া করে আপনি এখন যান।"

মজঃফর একবার গদগদ স্বরে ডাকিলেন, "ধীরা—" পরে কহিলেন,—"না, তোমার নাম ধরে ডা'কবার অধিকার আমার নেই রাজকন্যা। ঐ বেহেস্তের মালেক আমি নই। কিন্তু সুন্দরী, খোদার কসম; এ দুনিয়া, জমিন্ আসমান যদি একাকার হয়ে যায় তবু আমি তোমায় চাইব। তোমায় খুঁজব, তোমায় ভুলব না। এ জন্মে না হয়, জন্মান্তরেও না হয়, একদিন তোমায় পাব, তুমি আমারই, তুমি আমারই হ'বে।"—বলিতে বলিতে মজঃফর খাঁ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ধীরা একবার দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া, ফিরিয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল,—"একি বিষম পরীক্ষায় ফেলেছ আমায় ঈশ্বর! কেন আমায় রাজপুতের ঘরে পাঠিয়েছিলে? কেন বাবা তুমি এত ভালবাস আমায়!"

নিশি ভোর হইতে চলিল, ভগবতী দাস তখনও কক্ষময় তেমনই পদচারণ করিতেছিলেন। ভোরের তারাটি শুধু অনিমেষ আঁখিতে প্রভাত সূর্য্যের অপেক্ষায় চাহিয়াছিল।

পার্শ্বরক্ষক সুজনমল্ল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, প্রভু, "পররাষ্ট্র হ'তে দূতগণ ফিরে এসেছে, কেউ সাহায্য করিতে সম্মত নন।"

ভগবতী একবার কাতর দৃষ্টিতে সুজনের দিকে চাহিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "সুজন, সমস্যার মীমাংসা আমি করেছি। সমস্ত বারাহাদের সংবাদ দাও। এক্ষণই এই মুহূর্ত্তে, শুধু তারাই নয়, তাদের আত্মীয় স্বজন বান্ধব, সবাইকে প্রস্তুত হয়ে দুর্গদ্বারে সমবেত হতে বল। আমার এই পৈশাচিক দান আমি তাদেরই সমক্ষে দেব। তারা অমান্য করবে সুজন?"

বিনীত স্বরে সুজন কহিল,—"কেউ অমান্য করবে না রাজা। আপনার আদেশ তারা দেবাদেশ বলে জানে।"

সুজন চলিয়া গেল। ভগবতীদাস আপন মনে কহিতে লাগিলেন, "কি করব? দিল্লীতে তুর্কী সম্রাট, মজঃফর তুর্কী সর্দ্দার। আর আমি এত সামান্য এবং দুর্ব্বল একজন ভূমিয়া মাত্র। কেমন করে বাধা দেব? হাতে ধরে আমার হাতে গড়া রহিণ সেনাকে মৃত্যুর মুখে তুলে দেব? স্বহস্তে যাদের গঠন করেছি; অনন্য পার্ব্বত্য বারাহাকুল,

অজ্ঞানতর গভীর অন্ধকার থেকে স্বহস্তে যাদের মানুষের পথে এনে জ্ঞানের আলোয় দাঁড় করিয়েছি, স্বীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়ে আমার এ সাধের সৃষ্টি ধ্বংস করব? না, আমি পারবনা তা। বারাহার পতন আমি সহ্য করিতে পারব না।"

অন্তরাল হইতে ভগবতীর কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ধীরা কাঠ হইয়া যাইতেছিল—কম্পিত কণ্ঠে কহিয়া ফেলিল—"কি করবে?"

আত্মবিস্মৃত ভগবতী দাস তেমনি কহিতে লাগিলেন, "কি করব? পাঠানের হস্তে আমার ধীরাকে সমর্পিতা করে বারাহার রহিণ দুর্গ আমি বাঁচাব। শুধু এক ধীরার জন্য পাঁচশত ঘর বারাহা আমি উৎসাদন কর্ত্তে পারব না। ধীরা যাক, রহিণ থাকুক, বারাহাকুল নিরাপদ হোক। তারাও তো আমারই সন্তান!"

সর্ব্বাঙ্গে দেওয়ালের গায়ে এলাইয়া পড়িয়া ধীরা অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল,—"ভয়ে?"

"ভয়ে নয় কর্ত্তব্যের দায়ে। রাজার প্রাণে, রাজনৈতিক মীমাংসায়। একটা রাজ্য রাজবাটীর শান্তি শৃঙ্খলা, একটা বালিকার চেয়ে অনেক বেশী—অনেক বেশী!"

সেই কক্ষের বাহিরে ধীরার অস্তিত্বের কথাও তিনি জানিতে পারেন নাই। কথাগুলি তাঁহারই চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্কে বিবেকের বাণীবোধে তিনি আপন মনে উত্তর দিতেছিলেন। তাই ধীরা যখন আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি অভিমান? নিজেই যে তুমি এতে প্রাণান্তক দাগা পাবে। এত যাকে ভালবাস, এত পর করে দেবে তাকে? একেবারে ভুলে যাবে?"—ভগবতী দাস তেমনি তন্ময় ভাবে কহিলেন,—"ভোলা যদি প্রয়োজন হয়েছে আজ আমিও ভুলব।' এ আমারই প্রাক্তন ফল। এড়াব কেমন করে? ধীরা যেমন আদরের, রহিণবাসীগণও তেমনি আদরের তা ধীরা যেমন সন্তান তারাও ত তেমনি সন্তান? এ বুকে সবারই যে সমান অধিকার। তাদের রক্ষণ প্রতিপালনের ভার আমি যে স্বেচ্ছায় নিয়েছি;—"

"অত বড় একটা কর্ত্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাঁরাও শুধু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নাই—"বলিতে বলিতে সুজন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া ভগবতী দাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এসেছে তারা?"

"এসেছে প্রভু। সবাই তারা এসে শুধু দুর্গ দ্বারেই দাঁড়িয়ে নেই, মহারাজের অনুমতি না নিয়েই সবাই এই কক্ষেরই বাহিরে সমবেত হয়েছে। পাঠান কি চায় তারা জানতে পেরেছে, তাই তারা প্রস্তুত হয়ে এসেছে। আদেশ দিন রাজা!"

বহু বারাহা সেনা মহারাজের মুক্ত বাতায়ন বাহির হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আদেশ দিন রাজা!"

সেই মিলিত কণ্ঠনিনাদ দুর্গপ্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিয়া বাতাস কাঁপাইয়া দিল। ভগবতী দাস দ্বার খুলিয়া বারাহাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—"আমি যে স্থির করেছিলেম পুত্রগণ—" অভিমান ব্যথিত রুদ্ধপ্রায়, পাঁচশত মিলিত কণ্ঠে শুধু উচ্ছ্বসিত হইল,—"প্রভু!"

ভগবতী দাস ক্ষণকাল সেই মিলিত জনগণেরদিকে চাহিয়া কহিলেন,—"বারাহা কুল, এ একটা এমন যজ্ঞ, জেনো আহুতি যার বারাহার পঞ্চশত প্রাণ, ভস্মবিভূতি যার আমাদেরই অস্থি মাস মেদ। পারবে?"

এক সঙ্গে সবাই দৃঢ় কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"পারব! মানের চরণে প্রাণ বলি দেব—মান থাক, প্রাণ যাক। আমরা পারব।"

ভগবতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারবে!"

"প্রাণ দিতে আমরা পারব। তুমি শুধু আদেশ দাও, তুমি শুধু তোমার পিতার প্রাণটি ঘুম পাড়িয়ে রেখে বারাহার প্রাণ জাগিয়ে এস বাবা"—বলিতে বলিতে ধীরা সেই সমাগমের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বারাহাগণ আবার এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল "এই যে পেয়েছি। আয় দিদি, আমাদের মাঝখানে নেমে আয়, আমাদের বুক দিয়ে তোকে ঘিরে রাখব। এ বুকের প্রাচীর যদি ভেঙ্গেই যায়, মৃত্যু কবচে তোকে সাজিয়ে রেখে যাব, পাঠানের ক্ষমতা হ'বে না যে সে বর্ম্ম বিদ্ধ করবে। আয় দিদি!"

"আমি প্রস্তুত ভাই সব, আমিও মরতেই চাই।" বলিয়া ধীরা তাহাদিগের নিকটে আসিল, স্নেহপাগল বারাহাগণ ধীরাকে বেষ্টন করিয়া আবার উচ্চ চীৎকার করিল, "আদেশ দিন রাজা!"

সঙ্গে সঙ্গে ভগবতীদাসও কহিলেন, "সুজন, ডাক পাঠানের দূত কে। সপ্তাহ পূর্ণ হয়ে গেছে, উত্তর দিব আমি। কোথায় সেই বৃদ্ধ পাঠান?"

"বীর-অনুষ্ঠানে বার্দ্ধক্য তার ঘুচে গেছে রাজা। আমিই পাঠানের দূতরূপী, কি উত্তর দেবে দাও—" বলিয়া দূতবেশী মজঃফর খাঁ আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিস্ময় ভয় ব্যাকুলতা একসঙ্গে ভগবতীকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিয়াছিল। "একি পাঠানসর্দ্দার মজঃফর খাঁ তুমিই এসেছিলে বৃদ্ধ দূত বেশে?"

"আমিই এসেছিলাম রাজা। এই সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করতে একটুও ভীত হইনি। কেন জান? সে কথার উত্তর খোদাই জুটিয়েছিলেন, খোদাই মীমাংসা করেছেন। অন্তরের গুপ্ত বাণী অন্তরেই সমাহিত থাক্। কারও শুনে কোনও প্রয়োজন নাই। সর্দ্দার, তোমার উত্তর?"

ভগবতী বিস্ফারিত নেত্রে মজঃফরের দিকে তাকাইয়াছিলেন। মজঃফর আবার কহিলেন,—"বল সর্দ্দার, তোমার উত্তর একবার তোমার মুখে শুনতে চাই।"

নির্ব্বাক্ ভগবতীর চোকের পাতাটিও নড়িল না। বারাহাগণ বর্শা তুলিয়া অগ্রসর হইয়া কহিল—"রাজার উত্তর আমরাই দিচ্ছি।" মজঃফর একটুও বিচলিত না হইয়া কহিলেন—"ওই পাঁচশত বর্শার আঘাত সহ্য করবার মতন শক্তি এ বুকে না থাকলে, এ দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে সাহসী হতেম না বারাহাগণ!" পরে ভগবতীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"কই সর্দ্দার, উত্তর?"

সেই মিলিত সেনার বুকের মাঝখানের স্পন্দমান প্রাণটির মতন ধীরা পলকবিহীন নেত্রে, ব্যাকুল আগ্রহে মজঃফরের দিকে চাহিয়াছিল। সেই দিকে চক্ষু পড়িতেই মজঃফর খাঁ স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিলেন,—"তুমিও নেমেছ আমার বধ করতে! এই মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়। এ মৃত্যু চিরমিত্রের মত সেই আলোক রাজ্যের দ্বার খুলে দিবে, যেথানে আর পার্থিব বন্ধন তোমায় আমার কাছথেকে এত দূরে বেঁধে রাখতে পারবে না। মৃত্যুর অধিকারে জীবনের পরপারে আমি তোমায় পাব। রাজনন্দিনি! এ জন্মের মত দেলাম! প্রাণ ভরে আজ যত আঘাতের বেদনা নিয়ে যেতে পারি, ততই লাভ। এই দুঃখগুলিই সেদিন সুখ হয়ে ফুটবে। এই কান্নাই সেই দিন হাসি হয়ে ফুটবে। এই কান্নার ধ্বনিইসেই দিন সেই মহামিলনে মঙ্গল-গীতি গাইবে! আমার এ সমস্ত রক্তাক্ত ক্ষত মুখে সফলতার রক্ত শতদল প্রস্ফুটিত হ'বে! আজ আমি মরতেই চাই। প্রাণ ফুলে প্রেমের পূজায় বিঘ্ন শুধু জীবনের এই কদর্য্য আবরণ, এই আমার অস্পৃশ্য দেহ। মুক্ত বায়বীয় দেহে মনসিজ-প্রেম-অর্ঘ্য আমার তুমি গ্রহণ করো। তখন আর ফিরিয়ে দিয়োনা দেবি! সুন্দর, সু, সার্থক করো, সেই নিবেদন। সেদিন ঘৃণা করো না সুন্দরি।"—সহসা সুদূর পর্ব্বত শ্রেণী কাঁপাইয়া দিয়া মজঃফর খাঁ তুরীধ্বনি করিলেন। অদূরস্থিত বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে অগণিত পাঠান সেনা—"দিন্ দিন্" রবে সেই জনসমাগমের ভয় ও বিস্ময় জাগাইয়া তুলিল। ভগবতীদাস ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন "ধর, মজঃফরকে বন্দী কর!"

মজঃফর অসি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন কহিলেন, "বন্দী করবে? বন্দী ত হয়েই রয়েছি। ঐ পাঠান সেনা আসছে আমার মুক্তিদান করতে, বেহেস্ত থেকে হুরীর দল নেমে আস্ছে আমার মৃত্যুবর দিতে।"

ভগবতী অগ্রসর হইতেছিলেন, ধীরা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া কহিল, "না বাবা একটা চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি অর্জ্জনের পথে এত বড় একটা অন্ধকারের পাহাড় চাপিয়ে দিয় না। পাঠানসর্দ্দার একদিন আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, আহেরিয়ায় সেই নির্জ্জন গিরি উপত্যকায় অসহায়া একাকিনী পেয়েও আমার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, আমরা এতটা অকৃতজ্ঞ হ'ব না। অন্যায় সমরে তাঁকে বধ কর্ত্তে দেব না আমি। আমরা সবাই প্রস্তুত, বীরের মত লড়বো, বীরের শাস্তি বীরের মত দেবো।"

মজঃফর খাঁ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, "হাঃ হাঃ হাঃ! ভগবতীদাস! মনে পড়ে সেই হ্রদতীরে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমায় তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, কেন আমি সেই নির্জ্জনতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বালিকার অনুসরণ করে গিয়েছিলেম। কি উদ্দেশ্য ছিল আমার? আমি বলেছিলাম খোদা একদিন এ কথার উত্তর দেবেন, তোমারই মেয়ের মুখে। সর্দ্দার, শুনেছ উত্তর? মন্দ অভিপ্রায় ছিল না আমার!"—বলিতে বলিতে মজঃফর খাঁ চোখের পলকে স্বীয় সৈন্যের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

ততক্ষণে উভয় পক্ষীয় সৈন্য দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া

গিয়াছে। ভগবতীদাস সনিশ্বাসে কহিলেন, "সেই অপরাধের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো পাঠান সর্দ্দার।"

(৭)

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া অবিরাম যুদ্ধ চলিতেছিল। বিজয়-লক্ষ্মী চঞ্চল গতিতে যেন একবার বারাহার একবার পাঠানের হস্তগতা হইতেছিলেন। ভগবতীদাস, মজঃফর খাঁ এবং ধীরা তিন জনেই অক্লান্ত হস্তে প্রভূত সৈন্য নিহত করিতেছিলেন। * * *

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মজঃফর খাঁ একবার শেষ চেষ্টা করিতে বারাহার উপর প্রবল আক্রমণ করিলেন। বারাহাগণ সেই আক্রমণের গতি রোধ করিতে না পারিয়া পালায়নোদ্যত হইল।

মজঃফর স্বীয় সৈন্যের পুরোভাগে আসিয়া কহিলেন, "পাঠানের গতি রোধ করা যদি এতই সহজসাধ্য হত, পাঠান ভারতের রাজা হ'ত না।"

ওজস্বিনী ভাষায় উত্তেজিত করিয়া পশ্চাত হইতে ধীরা পরাজিতপ্রায় বারাহাগণকে আবার ফিরাইয়া দিল, আবার যুদ্ধ বাঁধিল, বারাহাগণ আবার উদ্বেল তরঙ্গের ন্যায় পাঠানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, আবার পাঠান প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইল।

ভগবতীদাস অমিত বিক্রমে রণক্ষেত্রময় ঘুরিতে-ছিলেন। এইবার মজঃফর খাঁর সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "এস পাঠান, দ্বৈরথ রণে রণ শেষ করি। বৃথা সৈন্য ক্ষয় কেন।"

"উত্তম। এস, পাঠান পরাঙ্মুখ হ'বে না;—দাও রণ; আমার পতনে তুমি যুদ্ধজয়ী আর তোমার পতনে আমি সর্ব্বজয়ী। এস! এস, তাই হোক।" বলিয়া মজঃফর খাঁ ভগবতীকে আক্রমণ করিলেন।

তাঁহাদিগেরই অনতিদূরে ধীরা অব্যর্থ হস্তে পাঠান সেনা বধ করিতেছিল। পিতা ও মজঃফরকে যুদ্ধে রত দেখিয়াই ধীরা চমকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শিথিল হস্ত হইতে সর্ব্বসহায় তরবারীখানি শুষ্ক পত্রের মত পদতলে লুটাইয়া পড়িল। পাঠানগণ ধীরাকে আক্রমণ করিল। উত্তেজনা-পূর্ণ কৌতুহলে ধীরা মজঃফরের দিকে চাহিয়াছিল, মজঃফর স্বীয় সৈন্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "খবর্দ্দার! কেউ ঐ বালিকাকে আক্রমণ কোরোনা! সব ক্ষান্ত হও। রমণীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কোরোনা সৈন্যগণ। অস্ত্র ধরে বীরের মত বালিকাকে রক্ষা কর!"

চক্ষের সম্মুখে প্রণয়াস্পদকে তদবস্থায় দেখিয়া মজঃফর খাঁ বড়ই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। সুপ্তির মত একটা অতি আবিল তন্ময়তা জাগরণের গায়ে ছড়াইয়া পড়িল। ভগবতীদাস তখনও তাঁহাকে সমান আঘাতে জর্জ্জর করিতে-ছিলেন। মজঃফর খাঁ শুধু আত্মরক্ষা করিতে করিতে কহিলেন—"আঘাতের এই বেদনাগুলি স্বেচ্ছাতেই আমি নিচ্ছি, ভূমিয়া। 'আমার এ পাঠানজীবন আমি আজ শেষ করতেই চাই' বলে এ যুদ্ধ এখনও স্থগিত হয়নি! একটা বিঘ্ন সে পথে ছিল, কণ্টকের মত আমার সাধনার ফুলটী এত দুষ্প্রাপ্য করে রেখেছিল—আমি পাঠান, আর প্রাণের পিয়ারী আমার তোমার কন্যা—রাজপুত, হিন্দু। এই ব্যবধান আমি লুপ্ত করে দেব। খোদার সৃষ্টি লয়ে খোদার পায়ে এ মিনতি জানাব আমি। খোদার রাজ্যে এই জাতীয়তার পার্থক্য নাই, সমাজ বন্ধন নাই, পাঠান-হিন্দু নাই; সবারই একই কিস্মত।"

অন্ধক্রোধে ভগবতী তখনও মজঃফরকে অস্ত্রাঘাত করিয়া কহিলেন, "সেই খোদার রাজ্যেই এ মিনতি জানাওগে, পাঠান! দেখবে সেখানেও পাঠান পাঠান, হিন্দু হিন্দু। হিন্দু ললনা পাঠানের পাওয়ার হাত থেকে কত দূরে!"

"কখনই নয়! এক কিস্মৎ। সব প্রাণ সেই একই প্রাণের রেণু পরমাণু। এক একটী নিঃশ্বাস নিখিলের সেই একই মহা বক্ষ হতে উঠে সেই বুকেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মক্কা আর বৃন্দাবন সেই একই মহাদেবতার আশীষ করুণায় অনুপ্রাণিত দুটী মহাতীর্থ ক্ষেত্র। সবাই যে যার নিজের বিশ্বাস নিয়ে চলেছ, ভূমিয়া। কিন্তু দেখবে সেদিন, এমন সুদিন যদি জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পার, যদি তাঁকে পাও, দেখবে হিন্দু, মহাশত্রু বিজাতীয় বিধর্ম্মী বোধে যাকে জীবনভোর শুধু ঘৃণার চক্ষে দেখেছ, সে তার জীবনের সমস্তটুকু গ্লানি তোমারই দেবতার পায়ে নামিয়ে দিয়ে তাঁরই ক্রোড়ে শান্তির আশ্রয় নিয়েছে! দেখবে হিন্দু, তোমার দেওয়া সবটুকু ঘৃণা লয়ে সেই তোমার

পূর্ব্বে প্রেমের কুসুম ফুটিয়েছে, প্রেমের দেবতা পেয়েছে। আমিও চল্লুম সেই মহাতীর্থে! হিন্দুগীর, এ অন্ধ বিশ্বাস ছাড়! মুসলমান অমানুষ নয়। তোমাদেরই মত প্রাণ—তোমাদেরই মতন মানুষ তারাও! হিন্দু মুসলমান দুটো নাম ভুলে যাও, দুটো দুটো জাতি ভুলে যাও; এক জাতি এক প্রাণ—একই দেশবাসী জন। এ নাম তুলে দিয়ে—দাও শুধু ভারতবাসী নাম। সেরেফ্ ভারতবাসী নামে একটা জাতি গঠিত হোক। কেন মিছে মায়ের ঘরে এত বিদ্বেষানল জ্বালিয়ে সন্তান-শক্তি এত বিক্ষিপ্ত এত দুর্ব্বল করে রাখবে! কতকাল ঘুমুবে আর। ভালবাস হিন্দু মুসলমানকে, ভাই বলে ভালবাস; দেখবে তারা তোমাদের অগ্রজের প্রাপ্য ভক্তি দেবে। তোমাদেরই পেছন থেকে তারা তোমাদেরই সম্মুখের বিপদগুলি বুক পেতে নেবে!"—বলিতে বলিতে মজঃফর খাঁ সংজ্ঞা-হারা হইয়া লুটাইয়া পড়িলেন। ভগবতী দাস মুখর হাস্যে প্রাঙ্গন কম্পিত করিয়া সহসা বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। উভয় পক্ষের সহস্রাধিক সৈন্যের মধ্যে শতাধিকও অবশিষ্ট ছিল না। সবাই এক সঙ্গে হাহাকার করিয়া উঠিয়া লুণ্ঠিত মজঃফরের চতুর্দ্দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। পার্শ্বস্থ একজন পাঠানের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া ধীরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "মাগো!" এতই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল সে, যে কথা কহিবার কিম্বা নড়িবারও শক্তি ছিল না তাহার।

পশ্চিমাকাশে শ্রান্ত সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছিলেন। বিদায়ের ম্লানরক্তিমা ব্যর্থ উচ্ছ্বাসে বৃক্ষচূড়ে, প্রাঙ্গনে, মজঃফরের মৃত্যুনিথর মুখখানিতে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে রক্তাক্ত চক্ষু দুইটি মেলিয়া মজঃফর ইঙ্গিতে একটু পানীয়ের প্রার্থনা জানাইলেন।

পাঠানগণ জলের জন্য চতুর্দ্দিকে ছুটিল। ভগবতী দাস স্বীয় জল পাত্র হইতে পানীয় ঢালিয়া মজঃফরের মুখে গলাইয়া দিলেন।

মজফঃফর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আর এই মহাদানের স্মৃতি নিয়ে চল্লুম ভূমিয়া, দেবতার পায়ে তোমার মঙ্গল কামনা জানাব। জীবনের এই শেষ বিদায় মুহূর্ত্তে একবার যদি তাকে দেখতে পেতেম, একবার—একটীবার—"

অবসন্ন শ্রান্ত দেহটা অতি কষ্টে বহিয়া লইয়া আসিয়া ধীরা মজঃফরের বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"বিদায় কে বলে? আমায় ফেলে তুমি কোথায় যাবে? এই ত সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, আজই আমাদের শুভ পরিণয়—প্রথম মিলন। অশ্রান্ত ঝঙ্কারে এই মহামিলন গীতি গেয়ে চল যাই—আমি তোমার, তুমি আমার! কার অভিশাপে গ্রহচ্যুত তারকার মত পথহারা, আলোহারা, সর্ব্বস্বহারা হ'য়ে ছিলেম। আবার পেয়েছি ফিরে! অভিশপ্তকাল কেটে গেছে।"

মজঃফরের সর্ব্বাঙ্গে শতাধিক ক্ষতমুখ হইতে শতমুখ স্রোতে উত্তাল শোণিত ধারা ফুটিয়া উঠিল, সেই রক্ত ধারায় ধীরার সর্ব্বাঙ্গ রক্ত-রঙ্গীন্ হইয়া গেল। একটা অনৈসর্গিক জ্যোতিতে মজফঃফরের চক্ষুদুটীর পরম উল্লাসে ধীরার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। বহুকষ্টে মজঃফর একবার মাত্র ডাকিলেন, "পিয়ারি! পিয়ারি! জন্মজন্মান্তরের পথে সঙ্গিনি আমার!"

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত নিহিত সমস্ত আলোকে জ্বলিয়া উঠিয়া মজফঃরের প্রাণের প্রদীপ নিভিয়া গেল।

ধীরা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"প্রিয়তম! প্রাণের দেবতা আমার!"

পাঠান রাজপুত সবাই বিস্মিত আতঙ্কে প্রণয়িযুগলের দিকে চাহিয়াছিল। ভগবতী দাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রোষকষায়িত নেত্রে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

রুদ্ধ ক্রন্দনকম্পিত কাতর কণ্ঠে ধীরা কহিল, "বাবা, এও আমারই প্রাক্তন ফল! আমাদের এই বন্ধন এক জন্মের নয়, এ জীবনের শুধু নয়! জন্ম জন্মান্তরের! ইনিই আমার পতি, আরাধ্য দেবতা। সেদিন প্রথমেই তাই সেই হ্রদতীরে প্রথম দর্শনে সমস্ত প্রাণ আমার অজ্ঞাতে দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। রাজপুতের ঘরে জন্মেছিলেম, এজন্মে তাই এই বিড়ম্বনা। রাজপুতের মত আমি রাজপুতের সঙ্গে মরলুম, দেবতার প্রাণে স্বহস্তে যে এতগুলো আঘাত দিয়েছি—এরও জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে ত হবে। বাবা, তুমি মনে কর আমি মরে গেছি। আমি জেনেছি, আমি আমার জীবনের আলো পেয়েছি।"

পাঠানগণ মৃত সর্দ্দারের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ধীরার প্রাণহীন দেহ তখন মৃত মজঃফরের দেহের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে;

ধীরার ওষ্ঠাগ্র তখন মজফ্‌ফরের অধরাগ্রে মিলিত হইয়া এই মহামিলন পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

ভগবতী দাস সনিঃশ্বাসে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যথিত উদাস দৃষ্টিতে সেই মহামৃত্যুমিলনদৃশ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নয়ন প্রান্ত হইতে এক এক করিয়া অবিরল অশ্রুবিন্দু ঝরা-শেফালীর মত পবিত্র আশীষ রূপে প্রণয়ি-যুগলের উপর ঝরিয়া পড়িল।

বিশ্বসংসার তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মৌন হইয়া গিয়াছে!

শ্রীঅতুলানন্দ রায়।

মধুচক্র

এক বাটীতে সুধা ও বিষ মধু এবং হুল্
বর অভিশাপ এক সাথেতে কাঁটা এবং ফুল।
এক সাথেতে শাস্তি ক্ষমা ভর্ৎসনা ও দান
এক সাথেতে রৌদ্র ছায়া মিলন এবং মান।
রোষের সাথে স্নেহের হাসি, কটাক্ষ ও লাজ,
যাত্রা গান ও ঠেলাঠেলি মেলার আসর মাঝ।
এক সাথেতে কঠোর ভাষা শুদ্ধ সরল মন
'আলাকুশী'র বেড়ায় ঘেরা পারিজাতের বন।
"মরুচিকার ব্যূহের মাঝে মানস সরোবর
সর্পে ঘেরা যকের টাকা, সলিল ঘেরা ঘর।
এ যেন রে বর্ম্মে বেড়া যোদ্ধনারীর বুক
যাদুকরীর জালের ফাঁদে পরী রাণীর মুখ।
এক সাথেতে মুক্তা এবং লবণ জলের ঢেউ
কবির সাথেই সমালোচক দেখবি তোরা কেউ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পুরাণ কাহিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পদ্মপুরাণের দ্বিতীয় খণ্ড ভূমিখণ্ড নামে অভিহিত। ভূমিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে সূতের প্রতি ঋষিগণের প্রহ্লাদ-চরিত্র জানিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে সূত নিম্নলিখিত-রূপ বর্ণনা করিলেন :—পুরাকালে দ্বারকাপুরীতে শিবশর্ম্মা নামে একজন বেদার্থকোবিদ যোগী বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র :—যজ্ঞশর্ম্মা বেদশর্ম্মা, ধর্ম্মশর্ম্মা, বিষ্ণুশর্ম্মা এবং সোমশর্ম্মা। শিবশর্ম্মা একদিন তাঁহার পত্নীকে ছল করিয়া প্রবলজ্বররোগে মৃত্যুমুখে পাতিত করিলেন। পুত্রগণ সকলেই পিতৃভক্ত—তাঁহারা মাতার মৃত্যুতে পিতার আদেশ জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিবশর্ম্মা প্রথম পুত্রকে ডাকিয়া তাঁহার মাতার সর্ব্বাঙ্গ নিশিতশস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া যত্র তত্র নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তাহা সম্পাদন করিলেন। তাহার পর শিবশর্ম্মা এক মায়ারমণী সৃজন করিয়া দ্বিতীয় পুত্রকে বলিলেন 'যে আমি অত্যন্ত কামপীড়িত হইয়াছি তুমি ঐ রমণীকে আমার নিকট আনিয়া দেও'। বেদশর্ম্মা রমণীকে পিতার বিষয় বলিলে রমণী বৃদ্ধের নিকট যাইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বেদশর্ম্মার সহিত রমণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। বেদশর্ম্মা পুনঃ পুনঃ পিতার ইচ্ছা পরিপূরণ করিবার প্রার্থনা করিয়া নিজের অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় তপঃপ্রভাবে দেবগণকে সেইস্থানে আবির্ভূত করাইয়া পিতৃভক্তির জন্য বরপ্রার্থনা করিলেন। দেবগণ তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। তাহার পর রমণী বেদশর্ম্মাকে বলেন যে 'আপনি নিজহস্তে স্বীয় মস্তক ছেদন

করিলে আমি আপনার পিতৃগামী হইব'। বেদশর্ম্মা তৎক্ষণাৎ স্বীয় মস্তক ছেদন করিলেন।

ভূমিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্মশর্ম্মা ধর্ম্মকে পূজা করিয়া মৃত ভ্রাতাকে জীবিত করাইলেন। তাহার পর শিবশর্ম্মা মায়ারমণীর সহিত সহবাস কামনায় পুত্র বিষ্ণুশর্ম্মাকে জরা নাশ করিবার অভিপ্রায়ে অমৃতানয়নে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়—

বিষ্ণুশর্ম্মা অন্তরীক্ষ পথে গমন কালীন ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মেনকা দোলারোহণপূর্ব্বক সুন্দর স্বর সংযোগে বীণাধ্বনির ন্যায় শিবশর্ম্মার পুত্রের সম্মুখে গাহিতে লাগিলেন। মেনকা বিষ্ণুশর্ম্মাকে তাঁহার সহিত রমণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণুশর্ম্মা কামাদি মহাদোষ সমূহ জয় করিয়াছেন ইহা মেনকাকে জানাইয়া ইন্দ্রলোকে গমনোদ্যত হইলেন। সহস্রাক্ষ বিষ্ণুশর্ম্মার আরও অনেক বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে বিষ্ণুশর্ম্মার ব্রহ্মতেজ দর্শনে প্রসন্ন হইলেন। পরে বিষ্ণুশর্ম্মা অমৃত আনয়ন করিয়া মৃত মাতাকে জীবিত করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়—

শিবশর্ম্মা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের অমৃতকুণ্ড রক্ষা করিবার ভার দিয়া সব পরীক্ষা করিলেন। মায়াবলে অমৃত অপহৃত হইয়াছিল। পরে যোগবলে শূন্যকুম্ভ অমৃতপূর্ণ হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়ে শিবশর্ম্মার পুত্রপ্রশংসা এবং সপত্নীক শিবশর্ম্মার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি বর্ণিত আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যৈশ্বর্য্য দর্শনে দনুর দুঃখ, দিতির বিলাপ এবং কশ্যপ কর্ত্তৃক দিতির সান্ত্বনা বর্ণিত আছে।

সপ্তম অধ্যায়ে কশ্যপকর্ত্তৃক দিতির নিকট পঞ্চমহাভূতেন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার গর্ভাগার প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ে দেহদুঃখানুভবে উদ্বিগ্ন আত্মার বৈরাগ্যসহ সমাগম বর্ণিত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়ে ধ্যানাবলম্বনে আত্মার দেহবন্ধ মোচন পুরঃসর স্বরূপাবগতি বর্ণিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণের কশ্যপের নিকট নিজ নিজ দুঃখ নিবেদন বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে পুত্রলক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্য তপঃ সত্য দান নিয়মাদির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ধর্ম্মশ্রবণ ব্যক্তিগণের বিবরণ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে পাপিমরণ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়ে পাপিদিগের মরণের পর যে নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তদশ অধ্যায়ে পুরাকালে রেবাতীরে বামনতীর্থে যে সোমশর্ম্মা দ্বিজ বাস করিতেন তিনি অপুত্রক থাকায় তাঁহার পত্নী সুমনার পরামর্শে যে মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট গমন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত আছে।

অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ অধ্যায়ে সোমশর্ম্মা এবং সুমনার তপস্যা করিয়া ভগবান শ্রীহরির নিকট পুত্র জন্মিবার বরলাভ করেন। তাঁহাদের সুব্রত নামে পুত্র লাভ হইয়াছিল।

একবিংশ এবং দ্বাবিংশ অধ্যায়ে সুব্রতের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। সুব্রত মাতৃগর্ভেই ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে সর্ব্বদা ভগবানের ধ্যান করিতেন। তিনি খেলা করিতে করিতে ভগবানকে দেখিতে পাইতেন। পরে তিনি বৈদূর্য্য পর্ব্বতে আত্মমন নিয়োগ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভগবান হৃষীকেশ সুব্রতের ভক্তিগুণে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। মহাত্মা সুব্রত অন্তকালে বৈষ্ণবলোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি কশ্যপগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ঐন্দ্রপদ লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপুর বিবরণ বর্ণিত আছে। পুরাকালে ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মার বরে সমগ্র জগতে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। দেবগণ তদ্দর্শন করিয়া যোগনিদ্রাগত নারায়ণের নিকট হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার বর্ণন করিলেন। তাহার পর জগৎপতি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে নিধন করেন। দিতি পুত্রশোকসন্তপ্তা হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। পরে মহাত্মা কশ্যপের বরে একটী তপোবীর্য্যময় বল নামক একটী সন্তান লাভ করিলেন। ইন্দ্র দিতিপুত্রকে বজ্রের দ্বারা নিধন করিয়াছিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়ে মহাত্মা কশ্যপ বলের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হইয়া একটী জটা ছিঁড়িয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং অগ্নিকুণ্ড হইতে বৃত্র নামক এক বীর্য্যবান পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। বৃত্র ইন্দ্রের বধের জন্য উদ্যত হইলে ইন্দ্র সপ্তর্ষিগণকে বৃত্রের সহিত বন্ধুত্ব করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র কপটতা ত্যাগ করিবে বলায় বৃত্র তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। একদা ইন্দ্র বৃত্রের বধোপায় স্থির করিবার জন্য পরমা সুন্দরী রম্ভাকে বৃত্রের নিকটে প্রেরণ করিলেন। রম্ভা দোলারোহণ করিয়া মধুর স্বরে বিশ্ববিমোহন গান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে কামাঙ্গলীলা রম্ভা বৃত্রকে মুগ্ধ করিয়া মধুমাধবী সুরাপান করাইলেন। অমনি মদমত্ত বৃত্রকে ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা নিহত করিলেন।

ষড়্বিংশ অধ্যায়ে শোকসন্তপ্তা দিতির নিকট সহস্রাক্ষ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া দিতিকে মাতৃসম্বোধনে মুগ্ধ করিলেন। ইন্দ্র একদা নিদ্রিতা দিতির গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ভকে সপ্ত সপ্তধা ছিন্ন করিলেন তাহাতে তীব্রপরাক্রমসম্পন্ন ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ উৎপন্ন হইলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—

মহামতি ব্রহ্মা সমগ্র দৈত্যদানবরাজ্যে প্রহ্লাদকে রাজরূপে স্থাপিত করিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—

পুরাকালে অত্রিবংশে অঙ্গ নামে অত্রিতুল্য এক প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহার বেন নামে এক পুত্র ছিল। বেন অতিশয় অহঙ্কারী ছিলেন। এজন্য একদা মুনিগণের সহিত তাঁহার বচসা হয়। তখন মুনিগণ বেনরাজের বাম ঊরু মন্থন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে ম্লেচ্ছজাতিগণের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর ঋষিগণ ক্রোধ ত্যাগ করিয়া বেনরাজের পাণিমন্থন করিতে লাগিলেন তাহাতে পৃথুরাজের উৎপত্তি হইল। একদা প্রজাগণ পৃথুরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে পৃথিবী আমাদের অন্নসমূহ গ্রাস করিয়া নিশ্চল রহিয়াছেন। পৃথুরাজা পৃথিবীকে নিহত করিবার জন্য উদ্যত হইলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়—

পৃথুরাজ পৃথিবীকে বধ করিতে নিরস্ত হইলেন। তিনি ধরিত্রীকে প্রজামণ্ডলী রক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাহাতে ধরিত্রী সম্মতা হইলেন। অনন্তর পৃথুরাজা ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা নানাবিধ মহাপর্ব্বত উৎসারিত করিয়া সর্ব্বস্থান সমান করিয়া দিলেন। তখন পৃথিবী শস্যশ্যামলা হইলেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

চুটকী

ঠাকুর্দ্দার মাথায় 'টাক্' দেখিয়া অষ্টম বর্ষীয় পৌত্র বলিল, "ঠাকুর্দ্দা তুমি কি এখনও বাড়ছ?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "নারে, কেন বল দিকিন্?"

পৌত্র, ঠাকুর্দ্দার মাথার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "কেন না আমি দেখছি যে, তোমার মাথাটা তোমার চুলকেও ছাপিয়ে উঠেছে।"

প্রভু তাঁহার হরিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার চাকুরিটী গিয়াছে; এবার আর সরু চাল না এনে যেন মোটা চালই আনা হয়।

ভৃত্য বাবুর জন্যে মোটা চাল এবং নিজের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে সরু চাল কিনিয়া বাজার হইতে ফিরিল।

প্রভু তাহা দেখিয়া বলিলেন, "ও কিরে! তোকে যে সরু চাল আনতে বারণ করলুম; তা আবার সরু চাল আনলি কেন?"

ভৃত্য বলিল "না বাবু, এই যে, আপনার জন্যে মোটা চাল এনেছি। আর আমার ত চাকরী যাই নি; তাই আমার জন্যে সরু চাল আনলুম।"

শ্রীঅনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পাগলের কথা

(১)

আমি পাগল। আমি কখনো হাসি, কখনো কাঁদি, কখনো লাফাই, কখনো ছুটে যাই—কিছু ঠিক্ নাই। লোকেও আমায় দেখে হাসে, কেউ বা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আমার কীর্ত্তিকলাপ দেখে, বলে—আমি নাকি বদ্ধ পাগল।

আজ আমি পাগল সত্যি, কিন্তু এমন একদিন ছিল সেদিন আমি পাগল ছিলুম না। আমায় দেখে আজ অনেকে হাসে, কিন্তু সে বিদ্রূপের হাসি আমার ভালো লাগে না। আমি চাই কান্না। শুধুই কান্না। আমার ইচ্ছে হয়, অশ্রুর প্লাবনে পৃথিবী ভাসিয়ে দি', একবার দেখি—আমি কত কাঁদ্‌তে পারি। এমন একটা দিন আমার জীবনে হ'য়ে গেচে—যেদিন আমি অনেককে কাঁদিয়েছিলুম। লোকে বলে কাঁদালেই নাকি কাঁদ্‌তে হয়; বুঝি সেই নিয়মেই আজ আমায় কাঁদ্‌তে হ'চ্ছে। দেখি জগতের বুকের ভেতর থেকে লক্ষহাসির ফোয়ারা ছুট্‌চে—কিন্তু তা' আমার দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় না। আমার ইচ্ছে হয়, আগুনের স্রোতের মতো তপ্ত, বজ্রের মতো শক্ত, বেহাগের সুরের মতো করুণ একটা প্রবল স্রোত পৃথিবী-বক্ষ ভেদ ক'রে উঠুক্—সারা জগৎটা একটা ভীষণ শ্মশান হ'য়ে যাক্। অশ্রুর বন্যায় ধুয়ে যাক্, আমিও সেই অশ্রুধারার সাথে আমার অশ্রুধার মিশিয়ে—ফুকারিয়া কেঁদে উঠি। আমার বুকে আজ একটা অত্যুত্তপ্ত, জলন্ত আগুনের পিণ্ড জ্বল্‌ছে—অশ্রুজলে সেটা ভিজে যাক্। ইচ্ছে হয়, বুকে এই যে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালার মতো একটা তীব্র, বিশ্বদাহী জ্বালা—সেটা অশ্রু দিয়ে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ ক'রে ফেলি। ওঃ! তাই যদি পারতুম—

কিন্তু, আমি পাগল হ'য়েছিলুম কেমন ক'রে শুনবে? না, বলতে পারবো না। বুক ভেঙে যায়, একটা জলন্ত বজ্র বুক ফেড়ে উঠতে চায়। কি ভয়ানক, কি উত্তপ্ত সে জ্বালা! বুকটা পুড়ে যদি ছাই হ'য়ে যেতো—

...শুনবেই সে কথা? ছাড়বে না? তবো শোন।

...তখন আমি খুব গরীব ছিলুম। শাকান্ন খেয়ে থাকবারো সামর্থ্য ছিল না। একবেলা খেতুম—তো আর এক বেলা উপোস করতুম। রোজ রোজ ছেলেমেয়েদের বিশুষ্ক ম্লান মুখ দেখে প্রাণটা আমার হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌তো। তাও ভাল ছিল। কিন্তু—

কিন্তু, এমন একটা দিন এসে পড়লো—যখন তাও জোটে না। ছেলেমেয়েদের হৃদয়ভেদী হাহাকার, তাদের করুণ কান্না আর আমার সহ্য হ'লো না। খেতে না পেয়ে সব চেয়ে ছোট মেয়েটী আমার—মরে গেল। মরে' গেল—আর আমার দিকে,—তার মায়ের দিকে—ফিরেও চাইলো না। কি করি? ওঃ। এত কষ্টও ভগবান আমার কপালে লিখেছিলেন।

সব সয়েছিলুম—আর পারলুম না। গুণহীন বাপের চোখের সাম্‌নে—গরীব বাপের গরীব মেয়ে মরে' গেল! এও কি সওয়া যায়?

তারপর,—

তারপর সেদিন সারাটা জগৎ জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছ্‌লো সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল জ্যোৎস্না তখন ধরণীর বক্ষে অসাড় দেহে ঘুমুচ্ছিলো। কিন্তু, আমি—আমি—সেই সৌন্দর্য্য ভরা রাতে—এক ভীষণতার ছবি আঁক্‌তে চ'ল্‌লুম। ওঃ!

জ্যোৎস্নায় ছাওয়া সুন্দর পৃথিবী মায়ের বুকে এক বাঁশঝাড়ের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলুম। জমিদার বাবুর সাথে একটা পরামর্শ চল্‌ছিলো। সে এক ভীষণ পরামর্শ!

জমিদার মহেশ বাবু আমায় চুপি চুপি ব'ল্‌লেন—"সনাতন, তোমায় ডেকেছি, একটা অতি গুপ্ত কথা আছে! সাবধান! কেউ যেন জানে না"—

আমার হৃদয়টা এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় দুরু দুরু করে কেঁপে উঠ্‌লো। শুনতে লাগ্‌লাম;—

"তোমায় অনেক টাকা দেবো—এক হাজার টাকা—যদি গোকুল রায়কে"—

আমার বুকটা আরো জোরে কেঁপে উঠ্‌লো। ওঃ—এ যে জমিদার বাবুর শত্রু গোকুল রায়ের কথা হ'চ্ছে, যে আমায় সেদিন রোগ শয্যার পাশে বসে' শুশ্রূষা ক'রে'—নিজে প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রে মৃত্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা

করেছিল। সে যে মহেশ বাবুর ঘোর শত্রু। তবে কি তাকে—

এক হাজার টাকা দেবো—যদি গোকুল রায়কে খুন করতে পারো। তুমি খেতে পাচ্ছনা—বড়লোক হ'য়ে যাবে। সাবধান, যেন ঘুণাক্ষরেও একথা প্রকাশ না হয়। খুব সাবধানে কাজ ক'রো। বুঝতেই তো পাচ্ছ—প্রকাশ হ'লে তোমারো সর্ব্বনাশ, আমারো সর্ব্বনাশ। কিন্তু, খুব ভালো ক'রে ভেবে ছাখো,—এক হাজার টাকা।"

আমার বুকটা কেঁপে উঠলো—শিউরে উঠ্‌লো। বাপ! খুন! বুকের মাঝে থেকে একটা ধ্বনি শুন্‌লুম—"সাবধান! আমিও বল্‌লুম "সাবধান!" কিন্তু বুকের মাঝে থেকে যে বল্‌লো—"একাজ ক'রোনা—সাবধান হও।" আমি বল্‌লুম—"করো—কিন্তু সাবধান!"

···এখনো সে কথা মনে করতে গা শিউরে ওঠে। সারাটা দেহ ছম্ ছম্ ক'র্‌চে। কিন্তু তখন আমার সাম্‌নে টাকার লোভটাই বড় হ'য়ে উঠেছিলো। একহাজার টাকা আমার চোখের সাম্‌নে ছায়াবাজীর মতো ঝক্ ঝক্ করে ঝিলিক্ খেলে যাচ্ছিলো। তবু,—বুকের ভেতর-থেকে-শোনা বাণী যেন একেবারে পায়ে ঠেল্‌তেও পার্‌ছিলুম না। ইতস্ততঃ ক'র্‌তে লাগ্‌লুম।

জমিদার বাবু হাঁক্‌লেন,—"দেড় হাজার!"

এইবার! এইবার! ক্ষুধার্ত্ত,—অশ্রুমুখ ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেতে পেয়ে মরা,—দিনরাত্ তাদের হাহাকার শুনে ব্যর্থ বেদনায় জ্বলে পুড়ে মরা,——না, দেড় হাজার টাকা এক মুহূর্ত্তে লাভ করা? কোন্‌টা শ্রেয়ঃ? এখন বুঝি কোন্‌টা শ্রেয়ঃ, কিন্তু তখন কি বুঝেছিলুম?

এই একমুহূর্ত্তের জন্ত একটা পাপ কাজ করা—একটু সাহস চাই; একটু বল—একটু শক্তি চাই। একমুহূর্ত্ত;—তারপর—অতুল সুখ! দেখলুম—ঐ দেড় হাজার টাকা! দে—ড়—হা—জা—র টাকা আমার সাম্‌নে জ্বলচে! ওই—ওই।

নাঃ! আর না!—বুকের ভেতর 'হাঁ' আর 'না' ছুটোর সংঘর্ষ লাগ্‌লো। দারিদ্র্যের তাড়নায়—টাকার লোভে এই পাপ কাজে স্বীকৃত হ'লুম।

জমিদার বাবু বল্‌লেন, "যাও—তবে আজই।"

আজই! আজই চাই—পিশাচ জমিদার! একটু দেরীও সইলো না!—যাবো,—যাবো? নাঃ—যাই, টাকা—টাকা চাই!

একখানা শাণিত ছুরী হাতে ক'রে চল্‌লুম।

(৩)

একটা গাছের ছায়ায় ঢাকা স্থানে গোকুল আর আমি কথা কইতে কইতে চলেছি। আমার কাছে ছুরী লুকোনা। হাঃ! হাঃ! টাকা—টাকা পাবো!

কিন্তু সেকি আমার মনের কথা জানতো? না। সে যে সরল বিশ্বাসে আমার সাথে এসেছিলো, সে যে দুদিন আগে আমায় মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলো—তাকে—তাকে খুন!—

ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠ্‌তে লাগলুম। এ কাজ যে আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন!...

···ওকি? না—পাতার মর্ম্মর শব্দ। ভয় কি?

ভয় কি নাই, নাই? আছে, আছে—ভয় আছে।

ওই যে—ও কি?—

না—পাখী ডাকচে—একটা নিশাচর পাখীর ডাক। সে ডাক্‌চে কেন?

হাঁা, তাই,—সে ডেকে বল্‌চে "ভয় আছে—ভয় আছে, সাবধান! সাবধান!"

ওই—ছায়া! ওঃ!—একি? কেবলি ও সব কথা মনে হয় কেন? পত্রের মর্ম্মর শব্দ, পাখীর ডাক, গাছের ছায়া—আমার মন কাঁপিয়ে তুলচে কেন? আরতো কখনো কাঁপেনা—আজ কাঁপে কেন? বুঝেচি—পাপীর মনে সর্ব্বদাই যাতে-তাতে ভয় হয়।

কেমন সুন্দর এই জ্যোৎস্নার-বন্যায়-ধোওয়া, গাছের-ছায়ায় ঢাকা—সুশীতল, সুষুপ্ত—নিস্তব্ধ ধরণী! এই সুন্দর চাঁদের আলো—গাছের ছায়া—তার মাঝে এ কি ভীষণতার দৃশ্য আঁকতে চলেছি?···আমি আর গোকুল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কথা কইছিলুম। হঠাৎ একলাফে তার সাম্‌নে গিয়ে—বুকে ছোরা বসিয়ে দিলুম। সে একবার ব'ল্‌লো—"অ্যাঁ—একি?" তারপর—সব শেষ!

হাঃ—হাঃ—হাঃ! এনেচি মহেশবাবু,—নেও-তোমার রক্ত এনেচি। খাও, রক্ত খাও—প্রাণ জুড়োও! হ'য়েচে —পূরেচে মনের সাধ?

কিন্তু,—না, এ বড় সাংঘাতিক—বড় ভীষণ! এক-জনকে এমন ক'রে মিছে কথায় ভুলিয়ে এনে এমন নির্ম্মম ভাবে হত্যা করা—কাজটা কি ভালো হ'লো? যে দুদিন আগে আমায় প্রাণপাত ক'রে বাঁচিয়েছে—তার সে উপকার ভুলে গিয়ে—এমন অকৃতজ্ঞ ভাবে তাকে খুন করা, এমন বিশ্বাসঘাতকতা,— কৃতঘ্নতা,— নরহত্যা — ওঃ! বড়

লক্ষ লক্ষ নরমুণ্ড, লক্ষ লক্ষ পিশাচ হেসে উঠ্‌লো! বড় ভীষণ! বড় ভীষণ! আর সইতে পারিনে। বুক জ্বলে যায়। ধূ-ধূ ক'রে আগুনের শিখা আমার বুকে জ্বল্‌চে। তপ্ত বজ্র বুক ভেঙ্গে চুরে দিচ্চে। গোকুলের প্রেতাত্মা—আমায় দেখে হেসে উঠ্‌লো—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

সবাই হাস্‌চে—বাবুগো—ওই দেখ হাস্‌চে।...শুনিয়েচি সব।...ওই পুলিশ আমায় ধর্‌তে আস্‌চে। পৃথিবী বিদ্রূপের হাসি হাস্‌চে। ওগো! তোমরা হেসোনা। হাসি আমার সয়না। কান্না চাই—কান্না চাই!

তবু হাস্‌চো—তবু,—তবু? ওঃ! আমার হৃদয়ে কি দাহ—বুঝ্‌বে কেমন ক'রে? তোমরা হাস্‌চো? আমি যদি কাঁদ্‌তে পার্‌তুম—

ওই—পুলিশ! ধ'রোনা—ধ'রোনা! এবার ছাড়ো! ...তবু ধর্‌তে আস্‌চো?...ধরোনা—ধ'রোনা!—পালাই-পালাই—এবার তবে ছুটে পালাই—!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গৃহ শিক্ষক

জলাতঙ্ক রোগে আকন্দ

ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগালে কামড়াইলে যদি শীঘ্র উপযুক্ত চিকিৎসা করান না হয়, তবে রোগী জলাতঙ্ক রোগ হইয়া প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কামড়াইবার ৬ সপ্তাহ হইতে ১০ সপ্তাহের মধ্যে এই রোগ দেখা দেয়। আবার কাহারও বা দুই বৎসরের পরে, আবার কাহারও বা দুই বৎসরের পরেও জলাতঙ্ক হইয়া থাকে।

কুকুরে কিম্বা শৃগালে কামড়াইবা মাত্র ভাল তারপিন্ তৈল দিয়া সেই স্থান ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। তৎপর কষ্টিক বা গরম লৌহ দ্বারা সেই স্থান পুড়াইয়া দিবে। সেই স্থানটি চিরিয়া খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিবে। তৎপরে কঁসোলিতে পাস্তুরের মতে চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দিলে নির্দ্দোষ ভাবে সারিয়া যাইবে।

জলাতঙ্ক সাংঘাতিক রোগ। এই সময়ে মুখ দিয়া যে লাল পতিত হয়, তাহা তীব্র বিষাক্ত। এইরূপ অবস্থায় নিম্নের মুষ্টিযোগটী বিশেষ ফলপ্রদ।

শ্বেত আকন্দের পাতার রস আধ পোয়া, কাঁচা নির্জ্জল দুগ্ধ আধ পোয়া, একটী নূতন সরায় মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দিতে হয়। সমস্ত দিনের মধ্যে রোগীকে নির্জ্জল দুগ্ধ এবং চিড়া ভাজা খাওয়াইয়া রাখিতে হয়। যদি সে দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ না সারে, তবে পরদিন ঐরূপ আর একবার খাওয়াইলে সারিবে। আকন্দের পাতার রসও তীব্র বিষ। রোগীর শরীরে বিষক্রিয়া না হইলে সে ব্যক্তি কিছুতেই উহা খাইবে না।

(সঞ্জীবনী)

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরী
গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর, (২৪ পরগণা)

কলার আঁশ

'কাজের লোক'

কলার পেট্‌কো হইতে একপ্রকার সিল্‌কের ন্যায় আঁশ বাহির হয়,তাহা দ্বারা যে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহা রেশমের ন্যায় সুচিক্কণ ও দৃঢ়। বাঙ্গালা দেশে এই একটী লাভজনক কার্য্যও উপেক্ষিত। বাঙ্গালায় প্রচুর কলাগাছ জন্মে। কিন্তু ইহার পেট্‌কো গুলি যে এত মূল্যবান্, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহে বলিয়া ইহা রন্ধন কার্য্যে, ধান্ সিদ্ধ করিতে,

জ্বালানীরূপে অপব্যবহৃত হইয়া যায়। যাঁহারা সামান্য মূলধনে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। আমরা "ইণ্ডিয়ান একোনমিষ্ট" পত্রিকা হইতে এই কলার আঁশ প্রস্তত করিবার কল কব্জাদিতে কত ব্যয় হইতে পারে, সাধারণের অবগতির জন্য তাহার একটা এষ্টিমেট উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ESTIMATE.

15 "Sri Ganapal" Patent Plantain Fibre Extractor No. 3 @ 45/- Each for Powder Driving.	675/-
1 Bullock Geer to drive 15 Machines ...	300/-
Shafting, Pulleys, Plummer block, accessories, Freight &c. for machineries and fitting up charges	100/-
Total Rs.	1075

দৈনিক এই কলে ১ হইতে ১।৷০ হন্দর উৎকৃষ্ট শুভ্র আঁশ বাহির হইবে। এই কল চালাইতে একজন মিস্ত্রী এবং ২০ জন বালক আবশ্যক। সামান্য মূলধন লইয়া এই সরঞ্জামেই বেশ কাজ চলিবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে Mr. A. G. Ganapatty Ayer, Mechanical Engineer, Ambassmudram এই ঠিকানায় লিখিয়া জানিতে পারেন। তিনি বহুদিন ঐ ঠিকানায় ছিলেন এবং আশাকরি এখনও আছেন।

বাঙ্গালায় কলার পেট্রোকোগুলি হইতে উৎকৃষ্ট ফাইবার প্রস্তুত হইতে পারে। কোন উদ্যোগী যুবককে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম।

দেশের বহু আয়কর দ্রব্য এইরূপেই অবজ্ঞাত হইয়া নষ্ট হয়, অথচ আমরা সামান্য বেতনের চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া অন্নকষ্টও ঘুচাইতে পারি না। আমাদের আত্মনির্ভরশীল হইবার প্রকৃতই সময় আসিয়াছে। অতঃপর এইভাবে চলিলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবে না।

কতিপয় ইতর জন্তু ও উদ্ভিদের আয়ু

Day fly	২৪ ঘণ্টা
ছারপোকা	৬ সপ্তাহ
প্রজাপতি	২ মাস
মশা, ডাঁশ ইত্যাদি	২ মাস
মক্ষিকা	৩ হইতে ৪ মাস
পিপিলিকা, ঝিল্লি, মধুমক্ষিকা	১ বৎসর
খরগোষ, মেষ	৬ হইতে ১০ বৎসর
শ্যামা, দোয়েল	১২ বৎসর
ব্যাঘ্র	১২ হইতে ১৫ বৎসর
ক্যানারী পক্ষী	১৫ হইতে ২০ বৎসর
কুক্কুর	১৫ হইতে ২৫ বৎসর
গবাদি	২৫ বৎসর
অশ্ব	২২ হইতে ৩০ বৎসর
ঈগল পক্ষী	৩০ বৎসর
হরিণ	৩৫ হইতে ৪০ বৎসর
শকুনী, গৃধিনী, সিংহ, ভল্লুক	৫০ বৎসর
দাঁড়কাক	৮০ বৎসর
হস্তী, কচ্ছপ, তোতা পক্ষী, pike এবং carp	১০০ বৎসর
আইভি লতা	২০০ বৎসরের অধিকতর কাল
এলম	৩০০ হইতে ৩৫০ বৎসর
লোকাষ্ট বৃক্ষ, ওক বৃক্ষ	৪০০ বৎসর
লিণ্ডেন বৃক্ষ	৫০০ হইতে ১০০০ বৎসর
দেবদারু (Fir tree)	৭০০ হইতে ১২০০ বৎসর
তাল জাতীয় গাছ	৩০০০ হইতে ৫০০০ বৎসর
অশ্বত্থ, বট, পাকুড়	৫০০০ বৎসরের অধিকতর কাল।

প্রিয়তম

আমার একজন বন্ধু একদিন তাহার জীবন ইতিহাসের একপৃষ্ঠা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। সে বলিল —

আমি যখন মস্কোতে পড়তুম, আমার দুর্ভাগ্যই বল আর সৌভাগ্যই বল, আমার ঘরের পাশেই একটী স্ত্রীলোক থাক্‌ত, তা'র চরিত্রটা কেউ তত ভাল ব'লে জান্‌ত না। জাতিতে সে পোল ছিল, সবাই তাকে টেরেষা বলে ডাকতে। বেজায় কাল, লম্বা, কাটখোট্টা, মর্দ্দা চেহারা, তা'র উপর আবার ছিল তা'র ঝোপ ঝোপ ভ্রূ, আর কুড়ুলে খোঁদাই খস্‌খসে মুখ। তার জানোয়ারের চোখের মত চক্‌চকে কাল চোখ, মোটা ভাঙ্গা গলার আওয়াজ, গাড়োয়ানের মত চালচলন হাবভাব ও মেছুনীর মত বেশ শক্তসমর্থ চেহারা আমাকে ভয় খাইয়ে দিত। আমি একদম উপরের তলায় থাক্‌তুম আর সে থাকত আমার সাম্‌নের ঘরখানিতে। সে যখন বাড়ীতে আছে বুঝ্‌তে পারতুম আমি কখনও আমার দরজা খোলা রাখতুম না। তবে তেমন তর খুব কমই হ'ত। মাঝে মাঝে হঠাৎ তা'র সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হয়ে যেত, আর হাসিতে তাহার মুখখানি ভরে উঠ্‌ত। কিন্তু আমার প্রাণ শুকিয়ে যেত, তবুও মনে হ'ত সে হাসিটা যেন বড় কষ্টের জিনিস। মাঝে মাঝে তা'কে মাতাল হতেও দেখেছি। আহা, তখন যে দৃশ্য হ'ত তা বড়ই চমৎকার। কি যে টল্‌টলে চোক, আলুথালু কেশ ও বীভৎস বিকট হাসি! এইরূপ অবস্থায় সে আমায় বলত—

"ছাত্রবাবু! কেমন আছেন?" তা'র ঐ বদমায়েসী কথা ও হাসিটার জন্য আমি তার উপর আরও বেশী বিরক্ত হয়ে পড়তুম্। এইরূপ সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণের হাত হইতে নিস্তার পেতে বাসাটা পরিবর্ত্তন করতে আমার বড়ই ইচ্ছা হত। কিন্তু আমি যে ছোট্ট ঘরখানিতে থাকতুম, সেটি আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। আমার জানালা হ'তে অনেকটা দূর পর্য্যন্ত দেখা যেত আর তলার রাস্তাটায়ও তেমন বেশী লোক চলাচল ছিল না—গাড়ী যাওয়া আসাও করত না। কাজেই আমি সব সহ্য করলুম্।

একদিন সকালে চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছি, আর কেন যে সেবেলা কলেজ কামাই করে ফেললুম তার একটা উপযুক্ত কারণ বাহির করতে চেষ্টা কচ্ছি, এমন সময় আমার দরজা খুলে গেল,—আর অমনি দরজাতে দেখলুম টেরেষার সেই বিরক্তকর মূর্ত্তিখানি ঠিক খাড়া রয়েছে। সে তার ভাঙ্গা গলায় বলিল,

"ছাত্রবাবু! ভগবান যেন আপনার মঙ্গল করেন।"

আমি বলিলাম,—"কি চাও?"—আর দেখিলাম তাহার মুখখানিতে কিসের যেন প্রার্থনাও এগিয়ে পড়বার আভাসে সন্তুষ্ট হ'য়ে উঠছে। বাস্তবিক তেমন ভাব তার মুখে কখ্‌খোনো আর দেখি নাই।"

টেরেষা বলিল, "এই আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে—যদি আপনি রাখতেন।"

আমি কিন্তু চুপ করে বসে রইলুম। আর মনটাকে সাহস দিতে লাগলুম। টেরেষা কিন্তু বেশ আস্তে সভয়ে কাতর ভাবে বলিল—"এই, বাড়ীতে আমার একখানা চিঠি দিতে হবে, সেই জন্যই এসেছি।" মনে মনে তাকে রসাতলে পাঠিয়ে এক লাফে টেবিলের কাছে গিয়া বস্‌লুম আর একটা কাগজ টেনে নিয়ে বললুম, "এসো, এখানটায় বসে বলে যাও যা লিখতে হবে।" সে ঘরের মধ্যে এসে মুখখানি আরও বিকৃত করে চেয়ারটায় বসে পড়ল, আর দোষী যেমন চেয়ে থাকে ঠিক তেমনি ভাবে আমার দিকে তাকাল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কার কাছে লিখতে চাও?"

সে বলিল—"শ্রীযুক্তবাবু বোলেস্ ল্যাণ্ড ক্যাসপুট, ওয়ারস' রোড, সহর সেণ্টসিয়ালা, এই ঠিকানায় যাবে।"

আমি ঠিকানাটা লিখে বলিলাম, "আচ্ছা, তাড়াতাড়ি বলে যাও কি লিখতে হবে।"

সে বলিতে লাগিল,—"প্রিয়তম বোলেস! হে মোর ভালবাসা, হে মোর বিশ্বস্ত প্রেমিক! দেবদেবীগণ তোমায় রক্ষা করুন। আমার সোণার মানুষ! তোমার প্রেমের এই নিঃসহায় ক্ষুদ্র পাখী কাঙ্গালিনী টেরেষাকে এত দিন একখানি চিঠিও দাও নাই কেন?"

তার কথা শুনে আমি প্রায় হেসে ফেলছিলুম আর কি! "নিঃসহায় ক্ষুদ্রপাখী, কাঙ্গালিনী টেরেষা!" এদিকে যে পুরো সাড়ে তিন হাতেরও বেশী লম্বা হয়ে পড়বে, এর উপর

আবার বজ্রমুষ্টি, আর দেহখানির ওজনটাও ত যেমন তেমন হবে না! আর গায়ের রং, তা দেখে ত মনে হয় ক্ষুদ্র পাখীটি সারা জীবন রান্না ঘরের চিমনীতেই কেটে গিয়েছে। মুখ খানি ধোয়াপোছা করবার অবকাশও একদিন তার যেন হয়ে ওঠে নাই। যাক্, অনেক কষ্টে হাসি চেপে বল্লাম, "আচ্ছা এ বোলেষ্টটি তোমার কে হয়?"

আমার ভুল হয়েছিল বোলেস্ বল্‌তে বোলেষ্ট বলে ফেলেছিলুম। তাই সে শোধরাইয়া বলিল—"বোলেস্, ছাত্রবাবু, বোলেস্। ও একজন যুবক—আমি তাকে ভালবাসি, সেও বাসে।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম, "যুবক!"

সে বলিল, "চম্‌কে উঠলেন যে ছাত্রবাবু! কেন আমার মত বালিকার কি একটি ভালবাসার যুবক থাকতে নাই।"

মনে মনে বলিলাম "চমৎকার! সে নাকি একটি বালিকা।" প্রকাশ্যে বলিলাম, "কেন থাকবে না। সবই ত ঘট্‌তে পারে। আচ্ছা, এই যুবকটি ত তোমায় অনেক দিন ধরে ভালবাস্‌ছে?" সে বলিল, "হ্যাঁ এই ছয় বৎসর ধরে।"

"আচ্ছা এখন চিঠিটা লেখা যা'ক্।"—এই বলে চিঠি লিখিয়া যাইতে লাগিলাম।

বাস্তবিক সত্যকথা বলতে গেলে আমার লেখিকা যদি টেরেষার মত অতখানি গুণবতী না হ'তেন, তবে নিশ্চয়ই খুব সুখী হতুম যদি বোলেসের স্থানটী আমি নিজে নিতে পারতুম।

চিঠি লেখা হ'য়ে গেলে নম্র তার সহিত নমস্কার করিয়া সে আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিল এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার কিছু কাজ করিয়া দিতেও চাহিল! আমিও তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কিছু করতে হবে না বলে দিলুম। তবুও সে আমার সার্ট পাজামা প্রভৃতি মেরামত করিয়া দিতে চাইল। এই হাতির মত মেয়েটা ঘরে আসায় লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে গিয়েছিলাম, তার উপর এই সব কথাতে পিত্ত আরও জ্বলে উঠল। তাই তা'র মুখের উপর জবাব দিলাম তার কাজের আমার একবিন্দুও প্রয়োজন নাই। আর কিছু না বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তার পর এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ চলিয়া গেল। এক দিন সন্ধ্যাবেলা জানালার কাছে বসিয়া শিস্ দিচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম কি প্রকারে এই মত সব ভাবনা চিন্তার হাত হ'তে একবারে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বড়ই বিরক্ত বোধ হচ্ছিল। আবহাওয়াটাও তখন বড়ই কদর্য্য ছিল তাই বাইরে যেতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। তাই শুধু অলস নিষ্কর্ম্মার মত বসে নিজের আশা ভরসা শোক দুঃখ ইত্যাদির কথাই বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাবছিলুম। তা'তে মনটা বড় উদাস ও দুঃখিতই হচ্ছিল, তবুও কিন্তু কোন কাজ কর্ম্ম করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এমন সময় দরজাটা খুলে গেল—কেউ এল বোধ হয়। ভগবান্ তোমায় ধন্যবাদ এইবার দুটো কথা বলে বাঁচা যাবে। ও হরি! এযে টেরেষা! সব স্ফূর্ত্তির আশা চুলোয় গেল। আমার হাতে তখন কোনও দরকারী কাজ আছে কিনা তাই সে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—"না—কি চাই?"

"এই আপনাকে আর একখানা চিঠি লিখতে অনুরোধ করব তাই এসেছি। দেবেন কি অনুগ্রহ করে?"

"আচ্ছা! বোলেসের নিকট ত?

"না, এবার তার নিজের জবানী একখানি লিখতে হবে।"

"কি বললে?"

"মাপ করুন ছাত্রবাবু! আমি বোকা নিরক্ষর কিনা, তাই ভাল করে প্রকাশ করতে পারি নাই। এ চিঠিটা আমার নয়। আমার এক পুরুষ বন্ধু আছে, তারই এই চিঠি। ঠিক বন্ধু নয়, হাঁ, তবে পরিচিত বটে। ঠিক আমার মত তার একটী প্রণয়িনী আছে, তার নামও টেরেষা। তাই সব গোল হয়ে যায়। অনুগ্রহ করে যদি ঐ টেরেষার নিকট একখানা চিঠি লিখে দিতেন।"

তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম, তার মুখখানা কষ্টে জড় সড় হয়ে গেছে, আর তার আঙুলগুলি কাঁপছে। প্রথমে বেশ একটু বোকা বনে গিয়াছিলাম, কিন্তু তারপর বুঝতে পারলুম তার অভিপ্রায়টা কি। আমি বলিলাম, "দেখ, সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে বোলেস্ ব'লে কেউ নাই। আর এই যে তুমি একটা টেরেষার কথা বলছ সে টেরেষাও নাই। তুমি শুধু শুধু এতক্ষণ আমায় একরাশ মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছিলে। শোন, আমার নিকট আর কখনও কিছু বলতে এসো না বলে দিচ্ছি। তোমার সহিত বন্ধুত্ব বাড়াইতে আমার কিছু মাত্রও ইচ্ছা নাই। বুঝলেত, আর কখনো এসো না।"

সহসা সে আশ্চর্য্য রকমের ভীত ও হতভম্ব হইয়া পড়িল। এক আধটু এদিক সেদিক নড়াচড়া করিয়াও সে স্থানটি ত্যাগ করল না। সংএর মত মুখ দিয়া বিন্দু বিন্দু থু থু ছিটাইতে লাগিল—মনে হইল সে যেন কি ব্যক্ত করতে ইচ্ছা করছে অথচ পারছে না। এর পর সে যে কি বলবে আর করবে, তাই দেখতে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাকে অসৎ পথে প্রলোভিত করিবার কুমতলবে যে সে এসেছে এই ভেবে বাস্তবিক অন্যায় করছিলাম। তার অভিপ্রায় যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ রহিল না।

"ছাত্রবাবু!" বলিয়া সে আরম্ভ করিয়াই সহসা আমায় নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। এতে আমার মনটা খারাপই বোধ হতে লাগল। আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম, সে কি করে, কোথায় যায়। সে তার দরজাটা বেশ জোরে ধাক্কা দিয়া বন্ধ করে দিল। বুঝিলাম গরীব বেচারী আমার উপর রেগে গেছে। ভাবতে ভাবতে ঠিক করিলাম ওর কাছে যাব, আর আদর করে ওকে আমার এখানে নিয়ে আসব। আর যাই বলুক না কেন, তাই লিখে দিব।

তার ঘরে প্রবেশ করে চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে দেখলুম সে একটা টেবিলের কাছে বসে আছে, কনুইর উপর ভর দিয়া দুই হাতে মাথা চেপে ধরে কি যেন সে ভাবছে।

"ওগো! শোন একবার।" বলে তাকে ডাকলুম। সে লাফিয়ে আমার দিকে ছুটে এল—তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। তারপর এসে আমার কাঁধের উপর দুই হাত রেখে ফিস্ ফিস্ করে, অর্থাৎ কিনা তার ভাঙ্গা গলার ভনভনানি দ্বারা যতখানি ফিস্ ফিস্ করা যায় ঠিক তেমন ভাবে বলে যেতে লাগল—"দেখ, এখন তোমায় ঠিক কথাটা বলে ফেলছি! তুমি যা ভেবেছিলে, তাই ঠিক। বোলেসও নাই টেরেষাও নাই। কিন্তু থাক্ বা না থাক্, তাতে তোমার কি যায় আসে? একটা কাগজের উপর কলম ঘুরিয়ে দুই ছত্র লিখে দাওয়া কি বিশেষ কোন কষ্টের জিনিস নাকি? আ! তুমিও দেখছি আর দশজনের মতনই! তোমার মত ছোট্ট সুন্দর ফুরফুরে চুলওয়ালা ছেলে—সেও! বাস্তবিক কেউ নাই, বোলেসও নাই, টেরেষাও নাই—শুধু আছি আমি। যাক্! এখনত সব কথা শুনলে, আশা করি এতে তোমার যথেষ্ট মঙ্গল হবে।

এইরূপ অভ্যর্থনায় আমি একদম হতভম্ব হয়ে গেলাম। বলিলাম—"আমায় মাপ কর। এ সমস্ত কি বলছ? সত্যই বোলেস্ যে নাই বলছ তা ঠিক?"

সে বলিল, "সত্যই বোলেস্ নাই।"

আমি বলিলাম, "আর ঐ টেরেষা বলেও কেউ নাই?"

সে বলিল, "না, টেরেষা বলেও কেউ নাই, আমিই শুধু টেরেষা।" আমি কিছু বুঝতে পারলুম না। তার দিকে শুধু তাকিয়ে রইলুম, আর ভয় হতে লাগল আমাদের মধ্যে কাহারও মাথা বোধ হয় গুলিয়ে গিয়েছে। সে কিন্তু আবার টেবিলের কাছটায় গিয়ে খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করিল। ফিরে এসে একটু যেন বিরক্ত ভাবে বলিল—

"বোলেসের নিকট চিঠি লেখায় তোমার মনে যদি আঘাত লেগে থাকে, তবে ধর, এই নাও তোমার সেই চিঠি। আমি আর কাউকে দিয়ে লিখে নেব এখন।"

আমি দেখিলাম তা'র হাতে আমারই লেখা সেই বোলেসের চিঠিখানা। একটু অবাক্‌ও হলেম, বিরক্তও বোধ করলেম। বলিলাম—"শোন টেরেষা—এ সবার মানে কি বল দেখি! আমি যখন একবার লিখেই দিয়েছি, তখন আবার সেই চিঠি অপরকে দিয়ে লেখাতে যাবে কেন? ওটা ত তুমি এখনও পাঠাও নাই দেখছি!"

"পাঠাব আবার কোথায়?"

"কেন, ঐ বোলেসের নিকট।"

"ও নামের ত কেউ নেই।"

আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। ইচ্ছা হল খানিকটা থু থু ওর সামনে ফেলে চলে যাই। যা' হউক, সে আমায় তখন ভাল করে বুঝিয়ে দিল। একটু বিরক্ত ভাবে সে বলে যেতে লাগল।

"কি ভাবছ? আমার কথা বিশ্বাস কর। বোলেস্ ব'লে সত্যই কেউ নাই।" এই বলে সে তার হাত দুখানি এমন ভাবে বিস্তৃত করিল যেন সেও বুঝতে পারছে না, কেন বোলেসের থাকতে নেই। সে আবার বলিল···"কিন্তু আমার ইচ্ছা হয়েছিল যেন বোলেস্ একজন বাস্তবিকই থাকে। আর দশ জনের মত আমি কি একটা মানুষ নই? হ্যাঁ, তবে আমি যে কি তা' আমি বেশ জানি। তবুও এটা আমি বেশ বুঝতে পারচি যে ঐ লোকটার নিকট চিঠি লিখে কারও অপকার করি নাই।"

আমি বলিলাম, "মাপ কর, কাকে চিঠি লিখে অপকার করনি?"

"কেন, বোলেসকে।"

"কিন্তু সেত আর নাই!"

সে বলিল, "আহা, সে না থাকলই বা। সে নাই, কিন্তু সে ত থাকতে পারত। আমি তার নিকট চিঠি লিখছি, এতেই মনে হয় সে যেন বাস্তবিকই আছে। আর টেরেষা সে ত আমিই। সে আমার নিকট একটা উত্তর দিল, আবার তার নিকট আমি লিখলাম—ঠিক এইরূপ চলল আর কি।"

অবশেষে আমি বুঝতে পারিলাম। তখন বেশ একটু দুঃখিত ও লজ্জিত হলেম ও মনের মধ্যে অশোয়াস্তি বোধ করলুম। ঠিক আমারই ঘরের পার্শ্বে এই তিন গজ দূরেও নয় এত কাছে এমন একটি মানুষ বাস করছে যার দুনিয়ায় ভালবাসবার, দুটো মিষ্টি কথা বলবার, 'আপনার ভাববার কেউ নাই। তাই ত সেই নির্বান্ধব মানুষটি নিজের জন্য একটি বন্ধু গড়িয়ে নিয়েছে!

সে বলিল, "আরও শোন। তুমি ত বোলেসের কাছে চিঠি লিখে দিলে। আমি সেই চিঠি আর একজনকে পড়ে শোনাতে বললুম। যখন তারা পড়ল, আমি শুনে ভাবলুম বোলেস্ নিশ্চয়ই আছে। তারপর তোমায় আমি বোলেসের জবানীতে টেরেষার অর্থাৎ আমার বরাবর একখানি চিঠি লিখতে বলেছিলাম। যখন ঐরূপ একখানা চিঠি লিখতে পারি তখন কি করি জান? আর একজনকে দিয়ে ওটা পড়াই—আর শুনে ভাবি বোলেস্ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। তখন আমার জীবনটা বেশ হাল্কা হয়ে পড়ে।"

সব কথা শুনে মনে মনে এই বোকা মানুষটাকে গোল্লায় পাঠালুম।

তখন থেকে নিয়ম মত সপ্তাহে দুই খানা চিঠি, একখানি বোলেসের নিকট, আর একখানি তার জবাব বোলেসের লেখা টেরেষার নিকট লিখতে লাগলুম। উত্তর গুলো খুব ভাল করেই লিখেছিলাম। সে তা শুনে ছোট্ট মেয়েটির মত কেঁদে আকুল হয়ে উঠত, মনে হত, তার প্রাণের দুঃখের কাহিনী তাহার ভাঙ্গা গলার ভিতর দিয়া গর্জ্জে উঠছে। এই কল্পনার বোলেসের নামীয় পত্র লিখে দিয়ে তার প্রাণ মন অভিভূত করে দেওয়ার জন্য প্রত্যুপকার স্বরূপ সে আমার জামা কাপড় মোজা প্রভৃতি মেরামত করে দিতে লাগল। এইরূপ লেখালেখি আরম্ভ হওয়ার তিন মাস পরে কিসের জন্য যেন পুলিস্ এসে তাকে জেলে পাঠিয়ে দিলে। এতদিন বোধ হয় সে নিশ্চয়ই মরে গেছে।"

তখন আমার বন্ধু সিগারেটের ছাই ঝেড়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—জীবনে মানুষ যতই তিক্ত বস্তুর জন্য অস্থির হয় ততই তার মিষ্ট জিনিসের বুভুক্ষা আর প্রীতিকর বস্তুর প্রতি লোভ বেশী করিয়া জাগিয়া উঠে। আর আমরা আমাদের রাশীকৃত ভোগের আবরণে বেষ্টিত থাকিয়া এবং নিজ নিজ পর্য্যাপ্ততার ধূমায়মান কুয়াসার মধ্য দিয়া ও আমাদের নিষ্পাপ চরিত্রদ্বারা প্রণোদিত হইয়া যখন এই সব মানুষকে বুঝতে যাই ও বিচার করি তখন এক বিন্দুও যথার্থভাবে পারি না।

আর সমস্ত জিনিসই এমন একটু বোকামী ধরণে ঘটিয়া যায় যে বেশ যেন একটু দুঃখের রেশ চারিদিকে ছড়াইয়া দেখা দেয়। আমরা বলি, ও'রা হচ্ছে ছোট লোক—পতিত জাতি। বাস্তবিক আমার জানতে ইচ্ছা হয় কেই বা ছোট আর কেই বা পতিত। প্রথমতঃ ত বেশ দেখতে পাই ঠিক আমাদেরই মত একই রকম হাড় মাংস রক্ত ও স্নায়ু দিয়ে ওদের শরীরটা গড়া রয়েছে। অথচ ঐ 'ছোট' ও 'পতিত' এই কথা দুটি দিনের পর দিন—চিরকালই বলনা কেন—কথিত হয়ে আসছে, আর আমরাও দিব্যি শুনে যাচ্ছি। কিন্তু এক শয়তানই বুঝতে পারে এই সব বলা কওয়ার মধ্যে কতখানি বীভৎসতা রয়ে গেছে। দিন দিন মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে উচ্চ বক্তৃতা ও উপদেশ শুনতে শুনতে আমরাও কি গোল্লায় যেয়ে বসি নাই? বাস্তবিক দেখতে গেলে ওদের মত আমরাও 'ছোট লোক'—'পতিত'। যতদূর বুঝতে পারি তাতে মনে হয় আমরা নিজ নিজ পর্য্যাপ্ততার মধ্যে ও নিজ নিজ উৎকর্ষতার স্থায়ী বিশ্বাসের গর্ত্তে এমন ভাবে ডুবে গিয়েছি যে উঠবার আশা খুব কম। যাক খুব বলেছি, আর বলতে চাই না। এগুলি বড়ই পুরাণ কথা—ঐ যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে ঠিক ঐ গুলির মত পুরাণ—এত বেশী যে ঐ সব সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে বাস্তবিক লজ্জাই বোধ হয়। তবে এটা খুব ঠিক যে এই সব কথা এত বুড়ো হয়ে গেছে যে আর নড়ছে ফিরছে না…ঠিক যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই একভাবে পাথরের মত স্থির পড়ে রয়েছে।*

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

---

* Maxim Gorky—Her Lover.

বিশ্ববাণী

"Why we are disappointed."

গত অক্টোবর মাসের Hibbert Journal এ L. P. Jacks উক্ত প্রবন্ধে তাঁর ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার বেশ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁর মতে সন্ধির সর্ত্ত পড়িয়া আমরা সকলেই অল্প বিস্তর হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। এমন কি শান্তিসংস্থাপকের দল নিজেরাও যে বড় সুখী হন নাই তা বেশ বোঝা যায়। এখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া যদি আমরা সন্ধির সর্ত্তকে "ভাল চোখে" দেখি, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ যে নিশ্চয়ই পরিণামময় হইবে এরূপ আশ্বাস তাঁহারা দিতেছেন। যে শান্তি অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহাকে "ভাল চোখে" দেখিয়া তবে সত্য ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাকে আমরা দূর হইতে প্রণাম করি। ইহা দ্বারা বিশ্ব-সভ্যতা বিন্দুমাত্রও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। বিশ্বসভ্যতা যুগধর্ম্মোপযোগী একটা সত্যবস্তু খুঁজিতেছিল; কিন্তু তাহার বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে। বিশ্বমানব একমাস অনিমেষ নয়নে প্যারিসের দিকে তাকাইয়া ছিল; কিন্তু একটা বিরাট ধাক্কায় তাহার আশার আলো নিভিয়া গিয়াছে।

একদল লোক আশা করিতেন যে এমন একজন "নরদেবের" আবির্ভাব হইবে যাঁহার উদার বাণী জগৎ শ্রদ্ধাবিনম্রশিরে মানিয়া লইবে। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের উপর অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এযুগের মানুষ বড় একজন নেতার জন্য লালায়িত হয় সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে যে সহজে তাঁহাকে মানিয়া চলিব না। আমরা উইলসনকে দোষ দিই না। একসঙ্গে এতগুলি বিভিন্নমতাবলম্বী স্বপ্রধান অন্যের কথা—কিছুতেই মানিব না গোছের লোক লইয়া কারবার করা বাস্তবিকই ভারি কঠিন ব্যাপার।

"সবুজ"-মতের সঙ্গে পুরাতন মতের যখনই কোন সংঘর্ষ ও অনৈক্য উপস্থিত হয় এবং সে দ্বন্দ্ব যদি বাহিরের চাপে তাড়াতাড়ি করিয়া মিটাইয়া লইতে হয় তাহা হইলে পুরাতনেরই যে সে ক্ষেত্রে জয়লাভ ঘটিয়া থাকে এটা ত জানা কথা। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। এই অল্প-কয়েক মাসের চেষ্টাতে, এমন কি যুদ্ধের দুঃখ কষ্টের দাহনে ব্যথিত মানবকে পুরাতন পথ হইতে নূতন পথে লওয়া যাইতে পারে এইরূপ যাঁহাদের ধারণা ছিল তাঁহারা মানব চরিত্র ঠিক অবগত নহেন। শান্তিসংসদের মূল মন্ত্রই ছিল—"অত্যধিক সতর্কতা"। পদে পদে তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা এবং শাস্তি প্রদান লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন। কাজেই বলিতে হয় তাঁহারা শান্তিসংস্থাপন-প্রয়াসী ছিলেন না—তাঁহারা ছিলেন শান্তিরক্ষাকামী!!'

সন্ধিটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) জাতিসংঘ (League of Nations) গঠনের প্রচেষ্টা (২) বিজিত শত্রুর প্রতি ব্যবহার। একসঙ্গে এই দুইটা জিনিষ বিচার করিতে যাওয়া অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। যদি একই মূলসূত্র, একই ভাব এবং একই মাপ কাঠিতে দুই জিনিষই বিচার করা হইত তাহা হইলে সে ছিল স্বতন্ত্র কথা। যদি সংঘগঠনে ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বাস, পরস্পরের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্দ্য সহায়তা করিয়া থাকে তাহা হইলে বিজিতশত্রুর প্রতি ব্যবহারে ক্রোধ, অবিশ্বাস, ভয় প্রভৃতি বিরোধীভাব প্রয়োগ করা অত্যন্ত মূঢ়তার কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক হাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য ও মিলনের রাখী বন্ধন করা ও অপর হাতে সকলের হিংসা ও ঘৃণার পাত্র একটা বিজিত জাতির উপর খাঁটি ন্যায়ের শাসন প্রয়োগ করা—দুইটাকে একই মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত করা—বিশেষ সাহস ও উদারতাসাপেক্ষ। এবং তাহাই এই ভীষণ রণনাট্যের উপযুক্ত মহান্ এবং বিচিত্র অবসান হইত।

হয়ত ইহাতে ভীরু কাঁপিয়া উঠিত। প্রতিহিংসা-পরায়ণের মগজ গরম হইত। খবরের কাগজের দল এক সঙ্গে ভীষণ চিৎকার করিয়া উঠিত,—কিন্তু বিশ্বসভ্যতার পাকা বনিয়াদ ইহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইত।

বিশ্বের কোনও বড় কাজই ভয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া গড়িয়া উঠে নাই। সেখানে চাই প্রকৃত সৎসাহস। মানবসমাজের বর্ত্তমান কর্ণধারেরা সকলেই সেই ভয়চালিত। এই ভয়ের ভাব মানবের মনে তখনই উপস্থিত হয় যখনই তাহার রাজ্য কিম্বা সম্পদের অতি বিস্তৃতি ঘটে। সন্ধির সর্ত্তে যতই আমরা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা ভবিষ্যতের জন্য

সাবধানতা ও সতর্কতা এবং বিশেষতঃ শাস্তির বহরের সহিত পরিচিত হই ততই যেন তাহার অন্তর হইতে সমগ্র মানবসমাজের উপর একটা চিরন্তন অবিশ্বাসের ক্রুর হাসি অট্টহাস্য করিয়া উঠে। যদিও জার্ম্মাণি সেই অবিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল, তাহা হইলেও অন্যান্য জাতিরা তাহার পরিধির বাহিরে পড়ে নাই।"

ইংরেজ শত্রুকে শাস্তি দিতে একটুও কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু শত্রুকে যুদ্ধক্ষেত্রে নতজানু করিতে পারিলেই সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিজিত শত্রুর প্রতি চরমশাস্তি প্রয়োগ করা—যাহাতে সে আর কখনও না উঠিতে পারে সেইভাবে পঙ্গু করিয়া দেওয়া তাহার আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, তাহাদের নিরপরাধ ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সেই শাস্তির ফল "উপভোগ" করান, খুবই বাহাদুরি হইতে পারে—কিন্তু শান্তির পথে উহাই কণ্টক। ইহাতে জাতির বীর্য্যাভিমানে ঘা লাগে—সাধারণ বুদ্ধির ইহা পরিপন্থী। ইংরেজ বিজিত শত্রুকে আত্মমর্য্যাদাশিক্ষা ও সাধনা লইয়া তাহার ছত্রচ্ছায়াতলে সমাসীন করায়—তাহাকে নির্বীর্য্য করে না কিম্বা ধ্বংসের পথে লইয়া যায় না। এই কৌশলেই শিখ ও বুয়ারজাতি আজ ইংরেজের বন্ধু।

জেনারাল স্মাট্‌স সেই শুভবুদ্ধিরই অমোঘ ফল।

আজ জার্ম্মাণ জাতিকে সম্বোধন করিয়া যদি বলা হইত সমস্ত বিশ্বমানবের পক্ষ হইতে,—যে তোমরা ভাবুক, তোমাদের যথেষ্ট শিক্ষা ও সাধনা আছে, সুন্দর মস্তিষ্ক আছে। তবে এস ভাই, তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া আজ বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য আমাদের সহিত আসিয়া সম্মিলিত হও—বিদ্বেষভাবকে দূর করিয়া, মনুষ্যত্বকে মাথায় লইয়া, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বিজয়কেতন উত্তোলিত করিয়া যদি আজ বলা হইত যে বিশ্বসেবার জন্য নিয়ে এসো তোমাদের সংগঠনপটীয়সী বুদ্ধি (faculty of organisation) তোমাদের মনের নিপুণতা ও ঐকান্তিকতা তোমাদের শৃঙ্খলানুযোদী জীবনপ্রবাহ এবং যে যে গুণাবলীর জন্য আজ তোমরা শিক্ষিত জাতি বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাক—আজ এস আমরা সকলে মিলিয়া অন্ধকারমগ্ন বিশ্বকে আলোকের পথে লইয়া যাই,—তাহা হইলে আজ বিশ্ব নূতন যুগের নবীন আলোকে ভাস্বর ও মহিমাময় হইয়া উঠিত।

যদি জার্ম্মাণির বড় সেনাপতিদের মধ্যে অন্ততঃ একজন জেনারাল স্মাট্‌সও আমরা পাইতাম তাহা হইলে জাতি সংঘের দরবারে চিন্তাশক্তির পুরোহিত হিসাবে সেই এক জনই আরও শত কোটি টাকা যুদ্ধের খরচা হইতে কিম্বা কাইজারের মস্তক হইতে অধিক মূল্যবান বলিয়া গ্রাহ্য হইত সন্দেহ নাই।

The Future of Indian Women

Mrs N. C. Sen,

(Asiatic Review)

উক্ত লেখিকা East India Associationএ ভারতের নারীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার মতে ভারতে সেই অতীত যুগেও নারী, পুরুষের মতই শিক্ষা লাভ করিবার অবকাশ পাইতেন এবং বিশ্বের কাজ হইতে বঞ্চিত হইতেন না। "অসতো মা সদ্গময়—" এই সরল সুন্দর প্রার্থনাটি মৈত্রেয়ীর শ্রীমুখোচ্চারিতবাণী। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজপুতমহিষী মীরাবাঈ তাঁহার রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বরের সাধনায় এবং বিশ্বমানবের উপকারের জন্য ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন। গৃহত্যাগী হওয়া মানে জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা নয়,—বরং সেই জগৎকে পূর্ণতর ও বৃহত্তররূপে ফিরিয়া পাওয়া—সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করা। ইহাই ছিল তখনকার শিক্ষার মাপকাঠি। ভারতের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারত ব্যক্তিত্বকে নষ্ট হইতে দেয় নাই। কাজেই ভারতে নারী ও পুরুষ পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল।

দেখা যায় সমগ্র বিশ্বে চিরকালই নারী পুরুষের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া আসিতেছে—এমন কি তাহাদের ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া ফেলিতেছে। পুরুষ সেই সুযোগে তাহাদের 'খেলার সামগ্রী'-ভাবে দেখেন এবং এমন কি তাহাদিগকে সাংসারিক কাজের যন্ত্রস্বরূপ মনে করেন। আমি একথা আজ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি; কিন্তু এমন কে আছেন যিনি আমার অভিযোগ অগ্রাহ্য করিতে পারেন?

সহস্র বৎসরের সভ্যতা, শিক্ষা ও সাধনা ভারতের নারীর মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাদিগকে

বাড়িবার অবকাশ দিলে তাহারা কেন স্বস্বশক্তি প্রভাবে ভারতকে গৌরবমণ্ডিত করিতে পারিবে না? তাহারা গৃহস্থালীক্ষেত্রে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ত আছেই, ভবিষ্যতে পুরুষের সঙ্গে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রেও তাহারা যোগদান করিবে।

"অচলায়তন" ভাঙ্গিয়া যাইতেছে!—কৃষ্ণযবনিকা অন্তর্হিত হইতেছে! নারী আজ তার কমনীয় ললাটে উন্মুক্ত আলোক ও বাতাসের স্নিগ্ধপরশ অনুভব করিতেছে—বিশ্বের আহ্বান আজ তাহাদের কর্ণে পৌছিয়াছে,—আজ তাহারা বিশ্বের বাহিরে নয়। আজ তাহারা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার জন্য উন্মুখ।

এমন সময় আসিতেছে যখন সকলেই নিজের নিজের প্রাপ্য দাবী অগ্রাহ্য হইতে দিবে না এবং সকলেই ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে—সমস্ত মিথ্যাবন্ধন তখন ছিন্ন হইয়া যাইবে—তখন "নিদ্রিত নারায়ণ" পূর্ণ ও জাগ্রৎ হইয়া উঠিবেন—বিশ্বের রাজ্যে কেহই তখন অপূর্ণ থাকিবে না।

আমাদের দেশের নারীর দুরবস্থার জন্য পুরুষের প্রাণ খুব কমই কাঁদিয়াছে। কিছু কিছু যে হইতেছে না এমন নয়। কিন্তু বাহিরের উদার ও বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গিনী ও সহায়িকারূপে নারীকে দাঁড় করাইতে এখনও ঢের কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রহিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের পুরুষ স্বাধিকার লাভে বঞ্চিত ছিলেন। আজ আশার অরুণ কিরণ দেখা যাইতেছে। নারীসম্প্রদায় এজন্য আজ আনন্দিত এবং তাহারা সেই মহৎ কার্য্যে পুরুষকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত; অধিকাংশ শিক্ষিতা রমণীর অন্তঃকরণে ঠিক একই দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা জন্মভূমির সেবা করিতে চায়—তাহার উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিতে এমন কি দেশের জন্য মরিতেও কুণ্ঠিতা নয়।

যে জাতি অখণ্ডভাবে বাড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই তাহাকে প্রকৃত সভ্য জাতি বলা চলে না। জাতির নারী-সম্প্রদায় পুরুষ সম্প্রদায়ের চেয়ে কোন বিষয়েই হীন নহে; বরং নারীর আসন অনেক উচ্চে,—কারণ নারীই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠদান মাতৃত্বের অধিকারিণী—"ভবিষ্যৎ মহাজাতি সংগঠনকারিণী"।

স্বদেশকে ভালবাসিতে হইলে সন্তানের উপযুক্ত জননী হইতে হইবে এবং যাহাতে আমাদের সেই সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হয় সেই জন্য আমরা চাই দেশের পুরুষের সাহচর্য্য এবং সহানুভূতি, উদারতা ও নির্ভীকতা এবং জাগ্রত মনুষ্যত্ব।

"The thoughts of men are widened"

(The Eugenics Review)

বিলাতে The World Association for Adult Education অর্থাৎ বিশ্বযুবকশিক্ষা সমিতি নামে একটি যুগধর্ম্মোপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং যে সমস্ত শক্তি এবং জন্মগত দাবী লইয়া মানুষের পূর্ণতম জীবন তাহাদিগের উন্মেষ ও বিকাশ সাধন করা। আজকাল এইরূপ সমিতির বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, কারণ মানুষ বিশ্বের উপকারের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত—বিশ্বসেবার জন্য তাহার প্রাণে একটা বিচিত্র ও অভিনব সাড়া পড়িয়াছে।

A. E. Zimmern এই সমিতির উদ্দেশ্য পত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে জীবনটাকে সমগ্রভাবে বুঝিতে ও উপভোগ করিতে চেষ্টা করা। তাঁহার মতে যে লিখিতে কিম্বা পড়িতে জানে না সে অশিক্ষিত নয়—অশিক্ষিত হইতেছে সেই যে জীবনের অনন্ত তীর্থযাত্রার কর্ম্মমুখর মহিমময় এবং উন্মুক্ত রাজপথের মাঝখান দিয়া অন্ধের মত এবং বোবার মত সঙ্গীহীন এবং বৈচিত্র্যবিহীন অবস্থায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।

শ্রীদিলদার।

বসন্ত বিদায়

বসন্ত আজ ডাক দিয়ে কয়
"প্রণাম লহ ধরণী,
দাও গো বিদায় ভুঁই-চাঁপা-জুই
মল্লি হৃদয় হরণী!

নীল-সাগরে পালটি তুলে,
হাওয়ার তালে দুলে দুলে,
ওই যে ভেসে আসছে কূলে
সুদূর দেশের তরণী!—

পিক্ পাপিয়া বিদায় দে'হ,
প্রণাম লহ ধরণী !"
বল্‌ছে বেলী—'সুপ্ত ছিলাম
অন্ধকারের কক্ষে গো,
সোণার কাঠির পরশ দিয়ে
জাগিয়ে কেন তুল্‌লে গো ?
আলোয়ভরা বিশ্ব মাঝে—
না-লা'গনু কোনই কাজে,
ক্ষণিক-জীবন কাট্‌ল লাজে
আশার স্বপন রচে গো।
দণ্ড দুয়েক সুখ্ লভিতে
জাগিয়ে কেন তুল্‌লে গো' ?
আমের মুকুল ব্যাকুল হ'য়ে
আকুল-সুরে বল্‌ছে গো,
'এমন করে বেদন দিতে
কেনই তবে আস্‌লে গো' ?

সবুজ পাতা হাঁক্ দিয়ে কয়,—
'বন্ধু ওগো—মদেক্ সদয়,
হরণ করে সকল হৃদয়
একি কেতন খেল্‌ছ গো' !
কোকিল কহে—'ফুট্‌ল না গান,
টুট্‌ল সুরের বীণা গো' !
করুণ-স্বরে বল্‌ছে ভুবন,—
'দণ্ড দুয়ের অতিথি !
ভুলিয়ে দিল সকল ব্যথা
উদাস-করা তো'র গীতি।
পরদেশী গো—আজ্‌কে তোমায়
বিদায় দিতে মন নাহি চায়,
এমন্ করে আর্ কে হিয়ায়
ঢাল্‌বে এত প্রেম্-রীতি ;—
বন্ধু আমার—বাঞ্ছিতধন,
হৃদয়-জয়ী অতিথি' !

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

রক্তের টান

(গল্প)

সুদাঘ গিরিবাস ছাড়িয়া এই সবে কয়টা দিন 'শীত আমাদের পল্লীগৃহের আনাচে কানাচে একটু আধটু উঁকিঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই প্রভাকরের প্রচণ্ড প্রতাপও একটু পড়িয়াছিল। সেই ক্ষোভে আজ মধ্যাহ্নে তিনি এ পাপময় কলিযুগটাকে একদিনেই একেবারে ভস্মসাৎ করিবার মানসেই যেন অধিকতর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছেন। বেচারা পল্লীরাণী, তাই অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া দুরন্ত ছেলেমেয়েদের লইয়া ভয়ে ভয়ে নিতান্ত ভাল মানুষটির মতই নিসাড় নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। একমাত্র কুড়ুলাই কেবল সমস্ত আতঙ্ক অগ্রাহ্য করিয়া, মধ্যে মধ্যে আপনার প্রভুত্ব ব্যঞ্জক স্পন্দিত কণ্ঠে চারিদিকটা একবার জমকাইয়া না দিয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

দ্বিপ্রহর প্রায় অতীত হইয়া আসিল। উঠানের কোণে ছায়া নামিল। তীর্থেশ্বরী উদ্বিগ্ন মনে একবার ঘর একবার বাহির করিতেছেন। শঙ্কর সেই কোন সকালে তহসিলে বাহির হইয়া গিয়াছে; বেলা গেল, ফিরিবার নামটিও নাই। এ দিকে বাড়ীর কাহারও খাওয়া হয় নাই। কেন না, ৺নারায়ণ এখনও অভুক্ত। বহুক্ষণ পুত্রের আশায় পথ চাহিয়া থাকিয়া তীর্থেশ্বরী ঠাকুর ঘরের বারান্দায় বসিয়া লাঠি হাতে, নৈবেদ্যাকৃষ্ট কাকের ভীতি উৎপাদনে মন দিলেন। পুব-পোতার খড়ো ঘরের বারান্দায় ছাতা রাখিবার শব্দ শোনা গেল। "উঃ! রাণী এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো।" মা ছুটিয়া আসিলেন—"এই যে বাবা এসেছিস ? ইস্ রোদে পুড়ে একেবারে ছাইবর্ণো হোয়ে গেছিস্ যে। এতক্ষণ কি কচ্ছিলি ?" রক্তবর্ণ শঙ্কর দাঁত খিঁচাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"কচ্ছিলাম তোমার মাথা আর কি ?"—পরক্ষণেই মায়ের

পা'র উপর মাথা কুটিয়া তেম্‌নি চেচাইতে লাগিল— "খাও! আমারে খাও! তুমি আমারে খাও! আমার মাথাটা আগে চিবিয়ে খাও! আমার হাড় জুড়োক!—"

ব্যাপারটা অতি মাত্রায় অস্বাভাবিক এবং আশ্চর্য্যকর হইলেও, মায়ের কিন্তু ততটা ঠেকিল না। কেননা, তিনি ইহাতে অনেক আগে হইতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার এ পুত্রটির অদ্ভুত কৃতিত্বের অনেক চিহ্ন এখনও তাঁহার শরীরে অনেক যায়গায় বিদ্যমান। আর পা'টা ত এখন একেবারে যেন বোধহীনই হইয়া গিয়াছিল।

দুই হাতে পুত্রের মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া তীর্থেশ্বরী স্নেহার্দ্র-মিনতির স্বরে কহিলেন—"ছিঃ বাবা! দুপুরবেলা অমন কর্ত্তে নেই। কি হোয়েছে যে তুই এমনি কোরে মিছেমিছি মাথা কুট্‌ছিস?" "হোয়েছে তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু!—ওঃ হতভাগাটা আজ নতুন বাড়ী তুলতে গ্যাছে! কি স্পর্দ্ধা হারামজাদার। মাথাটা তার এম্‌নি কোরে তুমিই তো খেয়েছ; নৈলে—" কার মাথা কি করিয়া খাইলেন খুব ভাল করিয়া না বুঝিলেও তীর্থেশ্বরী আর প্রতিবাদ না করিয়া কহিলেন— "হাঁ আমিই খেয়েছি। নে, তুই ওঠ্। ঠাকুরটিরে একটু তুর্গ দে।" শঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিল—"তুমি না তো কে? ডাকাতটা যখন মরে গেল, তখন তুমিই না খান পঞ্চাসেক চিঠি লিখে, তারপর তাকে একেবারে বাড়ী টেনে এনে ছাড়লে? বই পত্তর সব গোল্লায় গেল। নৈলে আজ লেখা পড়া শিখ্‌লে, গাধাটা অমনি জাহান্নামে যেত? তুমিই হচ্ছ শনি!—সব নষ্টের গুরু ঠাকুর! যাও আমার সুমুখ থেকে।" মা আর প্রতিবাদ করিলেন না; ফলটা তাহা হইলে যে ভয়ানকই হইবে, জানিয়া ধীরে ধীরে আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন। চেঁচাইয়া কহিলেন— উঠে যা! শঙ্কর, নেয়ে আয় বল্‌ছি।

শঙ্কর উঠিল। তাহার মুখের চেহারাটা তখন এমনি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল, যে কেহ সামনে আসিতেই সাহস করিল না। সোজা বৈঠক খানায় গিয়া দরজা দিয়া শঙ্কর শুইয়া পড়িল। আজ তাহার সমস্ত অন্তর দলিয়া পিষিয়া রুদ্ধ-স্মৃতির কপাট ভাঙিয়া, অতীতের একখানা জলন্ত ছবি নিমিলিত চক্ষু দুটির উপর ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সেই সুদূর শৈশবের অস্পষ্ট ম্লান আবছাওয়ার মত চিত্রখানি ব্যথার রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল, অন্তরের ফাঁকে ফাঁকে চাপা দেওয়া ছোট খাটো স্ফুলিঙ্গগুলি এক সঙ্গেই আজ সমস্ত বুকখানা জুড়িয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সে জ্বালা শঙ্কর সহ্য করিতে পারিল না; উপুর হইয়া পড়িয়া উপাধানে মুখ গুঁজিল। তপ্ত অশ্রুর সকল বাঁধ ভাঙিয়া গেল। শঙ্করের মনে প'ড়ল সেই ছেলেবেলাকার মধুঢালা দিনগুলি সেই চৈতন্য পণ্ডিতের পাঠশালা; দুই ভাইয়ে গলায় গলায় নিত্য যেখানে পড়িতে যাইত—একজনকে মারিলে আর একজনের চোখে জল আসিত একজনকে ভাল বাসিলে আর একজনের আনন্দে, গৌরবে বুক ভরিয়া যাইত। মনে পড়িল, সেই একদিন ঘরের কোণে টাঙানো হাঁড়ির গুড় চুরি করিতে গিয়া, কেমন করিয়া সের পাঁচ ছয় ঝোলা গুড় তাহার নাকে মুখে ঢালিয়া পড়িয়াছিল; আর তাহার স্নেহের ছোট ভাইটি আপনার কাপড় দিয়া সবটা মুছিয়া নিয়া সেই চিহ্নবশতঃ পিতার কাছে দাঁড়াইয়া একা একা মার খাইয়াছিল; ভুলেও তবু দাদার নামটা বলে নাই। কি ফুলের মত, ভোরের তারার মত সুনির্ম্মল সারল্যভরা স্নিগ্ধ ভালবাসায় দুইখানি কিশোর প্রাণ এক সঙ্গে গাঁথা ছিল। কি পবিত্র একগাছি পুষ্প পেলব প্রীতির ডোর তাঁহাদের হাসি খেলা ভরা শৈশবের প্রতি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তটিকে সোনার রঙে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। তারপর—যখন পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন, তখন দুই জনেই বালক। সেই ১৭ বৎসর মাত্র বয়সে শঙ্করের ঘাড়ে সমস্ত সংসারটার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটখাটো রকমের জোতদারির গুরুত্বটা দুর্ব্বহ বোঝার মতই আসিয়া চাপিয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরে তাহার প্রাণের 'ভুলু'কে বিদেশে পাঠাইতে গিয়া ভাইটির গলা ধরিয়া শঙ্কর ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। আর ভোলানাথ সাশ্রু নয়নে দাদার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া কহিয়াছিল—কেঁদোনা দাদা! আমি লেখাপড়া শিখে দেশেই ফিরে আসবো। দু'ভায়ে এক সঙ্গে মিলে গরীব প্রজাদের টাকা দিয়ে শিক্ষা দিয়ে মানুষ কোরবো। সে কথাটা শঙ্করের মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা ছিল। দৈববাণীর মতই সে কথাটা সে বিশ্বাস করিয়াছিল—কিন্তু আজ——কি বিচিত্র গতি এই জগতের!

ভোলানাথ মাম. বাড়ী থাকিয়া পড়িত! কত অসীম কষ্ট দুঃসহ ঝড় ঝঞ্ঝাবাত মাথায় নিয়া, সম্পত্তিলোভী কত প্রতারকের সঙ্গে দুর্জ্জয় সংগ্রাম করিয়া, প্রাণপণে শঙ্কর একাকী এ সংসারটুকুকে দুইহাতে সাপটিয়া রাখিয়াছিল। ভবিষ্যতে কত আশাই না মনে মনে করিয়াছে। তারপর বহুদিন পরে সেই শূন্য সংসারের বুকখানি জুড়িয়া প্রভাতের আনন্দরশ্মির মত যখন একখানি পুষ্পময় শিশুমূর্ত্তি ধীরে ধীরে আসিয়া উদয় হইল, তখন সেই সূতিকা গৃহের শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রাণই আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শঙ্কর সে উৎসবের মাঝে একটা মস্ত বড় ফাঁক দেখিয়া সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে নাই।

সে ফাঁক তাহার প্রাণের ছোট ভাইটি! এই শিশু পুত্রটির সোনার মত মুখখানি আধো আধো মিষ্টি স্বরটুকু দিয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদের কতকটা জ্বালা ভুলিবার একটু চেষ্টা করিবার আগেই সে পুতুলখানি একদিন নিতান্ত অবাধ্যের মতই পিতামাতার স্নেহের বন্ধন, ঠাকুরমার প্রাণের শৃঙ্খল সমস্ত ছিন্ন করিয়া নিঃশব্দে কোন অজানা দেশের পানে যাত্রা করিল। সেইদিন 'ভুলু'র জ্বালা নূতন করিয়া শঙ্কর আর একবার বড় তীব্র অনুভব করিয়াছিল। অতি দুঃখে মানুষ কাঠ হইয়া যায়। শঙ্করও তাই অবাক বিহ্বলতায় যখন জড়সড় হইয়া বসিয়া পড়িল, তখনই তীর্থেশ্বরীর অশ্রুসিক্ত পুনঃ পুনঃ চিঠিতে ভোলানাথ বাড়ী ফিরিয়াছিল। কিন্তু তখন সে যে একেবারে আর একজন হইয়া গিয়াছে, এ সত্যটা তাহার গম্ভীর উদ্ধত মেজাজ, বাবুয়ানা চাল চলতি, শুষ্ক মলিন মুখ, কোটর গত চক্ষু এবং বিরক্তিকর ব্যবহারটা দেখিয়া আর যে যাহাই ভাবুক না কেন, শঙ্কর একটিবারও কিছুই মনে করে নাই। সে তেমনি গিয়া ভাইকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। তারপর কত ঘৃণাজনক, দুঃখ জনক স্বভাবই না ভোলানাথের ভিতরে দিন দিন দেদীপ্যমান হইয়া সকলের মুখেই একটা দারুণ "ছি ছি" জাগাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু শঙ্কর ত একদিনের তরেও ভাইয়ের সম্বন্ধে এক তিল সন্দেহকে মনে স্থান দেয় নাই। আর আজ সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, যাহাকে ছেলেবেলা থেকে প্রাণ দিয়া, বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছে, সেই ভাই আজ তাহার শত্রু; আজ তাহারই বিরুদ্ধে দল পাকাইতে ব্যস্ত—আজ সে মা.তাই ছাড়িয়া ভিন্ন বাড়ী করিতে প্রস্তুত। হা ভগবান। এই কি জগতের রীতি? আর এই কি ছিল শঙ্করের আশা।

শঙ্কর অনেক ভাবিল। তারপর তাহার মর্ম্ম চিড়িয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। শঙ্কর উঠিয়া চোখ মুছিল—উপাধান তখন সিক্ত! কাঁদিয়া বুকের জ্বালা অনেকটা কমিয়াছিল। তখন সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই। মা বাহির হইতে কাঁদকাঁদস্বরে ডাকিলেন "শঙ্কর!" শঙ্কর লজ্জা পাইল; ভাবিল মা হয়তো তাহাকে আরও কতবার ডাকিয়াছেন, কিন্তু সে ডাক তাহার কাণে পৌছে নাই। স্বরটা যতদূর পারে স্বাভাবিক করিয়া "যাও! মা আমি যাচ্ছি" বলিয়া মা যাহাতে তাহার চোখ দুটি দেখিতে না পান এমনি ভাবে বাহির হইয়া গেল।

[খ]

তীর্থেশ্বরী ছিলেন ঐ এক রকমের লোক যাহারা হাঙ্গামাটাকে ভয় করিয়া চলে,—ঠিক যমেরই মত; আর কোনও স্থলে উহার সম্ভাবনা দেখিলেই নিবৃত্তির যেটা সকলের চেয়ে সহজ পথ চোখে পড়ে, তাহাই অবলম্বন করিয়া বসে। সেটা তুষ দিয়া আগুন চাপা দেওয়ার মত হইল কিনা, অথবা তাহা হইতে ভবিষ্যতে কোন বিষময় ফল ফলিতে পারে কি না, অতটা তাহারা একটিবারও তলাইয়া দেখে না। শঙ্কর ও ভোলানাথের দিন দিন পাকিয়া উঠা কলহ, মনোমালিন্য ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া এবং কোনো কোনো স্থানে পরস্পরের মধ্যে ভয়ানক একটা শত্রুতা সাধনের উদ্যোগ এবং সম্ভাবনা দেখিয়া তীর্থেশ্বরী বুঝিয়াছিলেন, এ সংসারের শান্তিদেবী চিরন্তরে অন্তর্ধান করিয়াছেন। দুই ভাইয়ের মনে মনে যে ভীষণ ফাঁক দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহা কস্মিনকালেও মিলিতে পারে না; বরং এক জায়গায় থাকিলে কখন যে ভয়ানক একটা মাথা কাটাকাটি হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতীকার একটা চাই-ই। সেই প্রতীকার খুঁজিতে গিয়া যেটা অতি সাধারণ, এবং বাংলার পল্লী গৃহস্থের চিরন্তন রীতি অর্থাৎ ভাই ভাই ঠাই ঠাই, সেটা ছাড়া আর কিছু তাঁহার বার্দ্ধক্যের মস্তিষ্কে যোগায় নাই। সে দিন যখন শঙ্করের মুখে

শুনিলেন, ভোলানাথ সোনাডাঙার নিত্যানন্দ মুখুয্যের বাড়ীর পাশে ঘর তুলিয়াছে এবং মুখুয্যে মহাশয়ের কন্যার পাণি গ্রহণের আশ্বাস পাইয়া তাঁহারই অঙ্গুলিচালিত কলের পুতুলের মত চলিতেছে. তখন দুঃখে, অভিমানে, গ্লানিতে তীর্থেশ্বরী ভাবিয়াছিলেন,—যাক্ 'হতভাগাটা দুই চার বিঘা জমি নিয়া যদি চুপচাপ করিয়া থাকে, তবে থাক্ ঐ ভাবে। আর হাঙ্গামায় কাজ নাই। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত মিলাইয়া যাইতে তাঁহার মুহূর্ত্তও লাগে নাই। এক মায়ের পেটের দুইটি ভাই এক বৃন্তে ফোটা দুইটি ফুল—একই উপাদানে গড়িয়া তোলা দুইখানি প্রাণ নিয়তির নির্ম্মম নিষ্পেষণে দুইদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, মায়ের প্রাণে তাও কি সয়? ইহারা যে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর গচ্ছিত ধন—তাহারি হাতে সঁপিয়া দেওয়া!

এ ক্ষুদ্র সংসারটুকু, এ সুন্দর বাড়ীঘর, জিনিষপত্র, সমস্তই তো তাহারই হাতের চিহ্ন! আজ যদি মায়ের চোখের সুমুখেই সবটা ছাড়াছাড়ি হইয়া, টুকরা টুকরা হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বুকখানাও যে ছিঁড়িয়া পিষিয়া যায়! বহু চেষ্টা করিয়াও তীর্থেশ্বরী এদিকে তাঁহার মনকে আর সজাগ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। অথচ অন্য কোনো পথও দেখিতে পাইলেন না। এদিকে ভোলানাথ কি করে, কোথায় থাকে, সে যেন একটা নির্ম্মম রহস্য! কোনও দিন চোরের মত বাড়ীতে ঢুকিয়া, চারিটি কিছু মুখে দিয়া, আবার তখনই বাহির হইয়া যায়, কোনও দিন বা আসেই না। "ভাত ফেলানো যায়" "বাবুর দেখা নাই," "গায়ে তো কিছু লাগে না," ইত্যাদি শ্লেষব্যঞ্জক বাক্য অহরহই প্রায় বড় বৌ'এর মুখ থেকে তীরের মতই তীর্থেশ্বরীর প্রাণে গিয়া বেঁধে। তা'র উপর শঙ্করের ব্যবহারটা আজকাল সত্যই অসহনীয়। কথাটা তাহার চিরকালই রূঢ় একেবারে রস কষ বর্জ্জিত। কিন্তু এখন কাজেও একটা ঔদাসীন্য দেখা গিয়াছে। ভোলার নাম সে শুনিতেই পারে না। ঘরগুলি পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়িতেছে। সেদিকে চাহিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলে, "যাক্ আমার কি! একখানা কুঁড়ে থাকলেই চলে যাবে।" কিন্তু মায়ের প্রাণে ত তাহা বুঝে না। তিনি চান, তাঁহার ছেলে দুইটি মিলিয়া মিশিয়া দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক! হায় রে পোড়া আশা?

এমনি যখন দুইদিক থেকে দুইটা প্রবল বহ্নি দিনে দিনে প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের সমবেত তাপ এক সঙ্গেই যে, গিয়া পড়িতেছিল একখানা বার্দ্ধক্যের বৈধব্যের জরাজীর্ণ শিথিল বক্ষের উপরে,—একথাটা কি কেউ ভাবিয়া দেখিয়াছিল! এমনি আগুন বাংলার পল্লীসমাজের ঘরে ঘরে—আর তাহার তীব্র জ্বালা, সে ত অভাগিনী বিধবা মায়ের চিরন্তন ন্যায্য অধিকার!

"মা!" "কে, বাবা! ভুলু এসেছিস্? আয়।" বলিয়া তীর্থেশ্বরী চোখ মুছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারেও সে অশ্রু ভোলানাথের চক্ষু এড়াইল না; কহিল—"তুমি কাঁদছ?—কাঁদ, কাঁদ, আরো কত কাঁদতে হবে, চিন্তা কি?"

তীর্থেশ্বরী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হাঁ, সে আমি সেই দিনই বুঝেছি, যে দিন তোমাদের মত সন্তান পেটে ধরেছিলাম।" ভোলানাথ উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তোমাদের—বোলো না; আমি তোমার কিছু কর্ত্তে যায়নি।"

"না! বাবা, আমি কারুরই দোষ দিই না—সকলি আমার ভালো।"—মায়ের এ প্রচ্ছন্ন ব্যথাটুক ভোলানাথের প্রাণে লাগিল না। একটু সরিয়া আসিয়া কহিল,—"যাক তারপর আমার কি কোরলে!" তীর্থেশ্বরী জিজ্ঞাসু ভাবে কহিলেন—"কি তোর?" ভোলানাথ তর্জ্জনীদ্বারা মাটিতে আঘাত করিয়া কহিলেন—দাদা আমার সম্পত্তির কোনো ভাগ দিতে রাজি কিনা, তাই আমি শুনতে এসেছি।" তীর্থেশ্বরী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুত্রের মাথায় উপর হাতখানা রাখিয়া কহিলেন,—দ্যাখ্ ভুলু, আমার মাথা খাস্ ওসব পাগলামো আর করিস্‌নে। পাঁচটা নয় সাতটা নয় শুধু তো দুটি ভাই—তাও যদি অমনি মারামারি কাটাকাটি কোরে মরিস, লোকে তা'হলে কি বোলবে বল্‌দিকি? ওসব খেয়াল ছেড়ে দিয়ে, আয়—দুই ভাই, ভাইয়ের মত থাক্। সেতো আর তোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না?"

ভোলানাথ গরম হইয়া কহিল "নাই বা দিলে! আমার

নিজের একটা আত্মসম্মান বোধ আছে তো! আমি তো আর কাণা খোঁড়া নই যে এমনি কোরে ভিখারীর মতো পড়ে থাকবো! এখানে আমাদের আছে কি? এ তো সব সৌঠানের সম্পত্তি; তাঁরি বাড়ীঘর তাঁরি সব!"

"তা হোলোই বা। সেই বা তোকে যেতে বলছে নাকি?"

"তা আকারে ইঙ্গিতে বলেন বৈকি?—তা ছাড়া দাদা তো আমার নামে যত সব কুৎসা বদনাম প্রচার কোরে বেড়াচ্ছেন; এখানে ওখানে ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেদিন মুখুয্যে মশাইকে কড়া কড়া শুনিয়ে এসেছেন— আমার ভাইকে আমি সম্পত্তি দিই বা না দিই তা' নিয়ে যেন কেউ মাথা ঘামাতে যায় না।—' তাঁকে উনি অমনি কোরে অপমান করবার কে!"

"অপমান কি! ওতো ঠিক কথাই বলেছে—তাঁর এমনি—"

"কেন বলবে!"

তীর্থেশ্বরী দেখিলেন পুত্রের মেজাজ ক্রমেই চড়িতেছে। তাই আর না বাড়াইয়া শান্তস্বরে কহিলেন—"থাক্ বাবা, আমি আর তর্ক কর্ত্তে চাই না। আমি বলি ওসব মতলব ছেড়ে দিয়ে এসো। আর তা' যদি না পার, আমার মাথায় আগে একটা কুড়াল মারো, তারপর করগে' যা' ইচ্ছে তাই। আর সয় না জ্বোকালে!" ভোলানাথ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "আমি কুড়াল মারতে চাইনে, আমি চাই সম্পত্তি। বলো দেবেন কি না?"

"তা' আমি কি জানি? সে তার সঙ্গে বোঝো গে"

"তুমি বলবে না তা'হলে?"

"না। এমন কথা তাকে আমি বলতে পারবো না।"

ভোলানাথ উঠিয়া ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—"হুঁ! আজ বুঝলাম তুমিও ঐ দলে। মুখুয্যে মশাই ত ঠিকই বলেছেন। তবে থাকো দেখি আমিই বা কি কর্ত্তে পারি।" ভোলানাথ চলিয়া গেল। তীর্থেশ্বরী চেচাইয়া ডাকলেন— "ভুলু শোন।" সে তেমনি ভাবে উত্তর করিল—"না, কিছু শুনতে চাইনে। যে মা এক ছেলের আশ্রয় নিয়ে আর এক ছেলের সর্ব্বনাশ কোর্ত্তে দ্বিধা করে না, তার মুখ-দর্শন করাও পাপ।"

"এই! কোথায় যাচ্ছিস্ রে! দাঁড়া ঐখানে আমি বলছি।" ভোলানাথের পায়ে যেন কে বেড়ি লাগাইয়া দিল। একবিন্দু নড়িবার শক্তিও রহিল না। একটি বার চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—দাদা। পরক্ষণেই তাহার মাথাটা মাটির দিকে এতটা ঝুকিয়া পড়িল, যে বহুচেষ্টায়ও সে আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। দাদা—এ সেই দাদা যাহার বুকে সে মানুষ। কৈ তথন তো এ বজ্রকঠোর কণ্ঠ সে শুনিতে পায় নাই। এত কাঠিন্য এত স্নেহ কি করিয়া একখানা প্রাণে স্থান পায়। মূর্খ বুঝিল না কাঠিন্য স্নেহেরই রূপান্তর। যে নির্দ্দোষ, যে সরল, প্রাণে যাহার পাপ নাই, স্নেহ তাহার কাছে চাঁদের মত স্নিগ্ধ, ফুলের মত কোমল। আর মন যাহার পাপী— অপরাধী সেই স্নেহই তাহার কাছে বজ্রের মত কঠিন— সিংহের মত আতঙ্ক এবং শাস্তির মত নির্ম্মম।

"মায়ের মুখ দর্শন কর্ত্তে নেই,—এই তুমি শিখেছ, গাধা!" বলিয়া শঙ্কর ধীরে ধীরে আসিয়া ভোলানাথের ঘাড়ের গোড়ায় ধরিয়া মায়ের কাছে লইয়া আসিল, কহিল— "যা! আগে মা'র পায়ে ধরে ক্ষমা চা, নইলে আজ যেতেই পাবিনি। মূর্খ তুমি মানুষ চেন না।"

ভোলানাথের কেন তাহার ইষ্টদেবতারও সাধ্য ছিল না—দাদার কথায় প্রতিবাদ করে। কিন্তু লজ্জা ঘৃণা ও অপমানে তাহার সমস্ত শরীরে যেন সহস্র সরিসৃপ চলিয়া বেড়াইতেছিল। নাক, কাণ, চোখ দিয়া আগুনের হল্কা ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। ভোলানাথ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।—শঙ্কর একটু হাসিয়া কহিল "হাঁ! নে এইবার এই চাবি। আমায় আজ একটু রাত থাকতে উঠেই জেলায় যেতে হবে। বাক্সে টাকা আছে। নিত্যানন্দ না কি কত পাবে সব চুকিয়ে দিয়ে আসবি।"

"আর ঘর তুলেছিলি, ভালোই হোয়েছে। আমি সেখানা ভেঙে রেখে এসেছি। আমাদের ইস্কুল ঘর খানা ঝড়ে উড়িয়ে নিয়েছে—ঐ খানা তুলে দিলেই ঠিক হবে। চা'ল কখানাও আনবার বন্দোবস্ত কোরে রাখবি আমি এসে ঘর তুলবো।" বলিয়া শঙ্কর একগোছা চাবি ভোলার সুমুখে ফেলিয়া দিয়া বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল। আরও কতক্ষণ তেমনি শুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া চাবিটা কুড়াইয়া লইয়া ভোলানাথ অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল।

[গ]

নিত্যানন্দের ক্রোধ এবার চরমে উঠিয়াছিল। সংসারে তাহার থাকার মধ্যে ছিল—শুধু স্ত্রী আর একটিমাত্র কন্যা। জমি জমা বা চাকরি বাকরি কিছুই ছিল না। পরের মোকদ্দমার তদ্বির করিয়াই তাহার স্বচ্ছন্দে চলিত। রামকে শ্যামের পিছনে, যদুকে মধুর পিছনে লাগাইয়া দিয়া, মাঝখানে বসিয়া নিজের পেট ভারী করা—এই ছিল তাহার ব্যবসা। এই প্রকারে যাহা আয় হইত, তাহাতে যে কেবল সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত তাহা নয় এর ওর নামে দুই এক নম্বর মিথ্যা দেওয়ানি তাহার লাগিয়াই ছিল। এতদ্ভিন্ন মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, উইল জাল করা, দাখিলা তৈরি করা ইত্যাদি কার্য্যে আমাদের নিত্যানন্দের সমকক্ষ দশ বিশ গ্রামের মধ্যে কেউ ছিল না। শঙ্করের পিতার মৃত্যুর পর পাঁচ সাতখানা জমির দাবীতে বহুদিন পর্য্যন্ত লড়িয়া অবশেষে যখন একটায়ও সফল কাম হইতে পারেন নাই, তখন অবধি ঐ শঙ্কর বেচারীর উপর তাহার ভীষণ জাতক্রোধ! বহুদিন পরে সেই বিদ্বেষ-সাধনের একটা মস্ত সুযোগ হাতে পাইয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দের একটা বিশেষ গুণ ছিল—বাক্‌পটুতা। বোধহয় স্বয়ং সরস্বতীকেও এ বিষয়ে তাহার কাছে হার মানিতে হইত। অর্জ্জুনের শর-সন্ধানেরই মত তাহার বাক্য-বাণ যখন যাহার উদ্দেশ্যেই নিক্ষিপ্ত হইত, তাহাকে সম্পূর্ণ বিদ্ধ না করিয়া ছাড়িত না। আর কোথায় কোন্ বাণের প্রয়োজন এ কথা তিনি যাহার উদ্দেশ্যে ছাড়িবেন তাহাকে দেখিয়াই বেশ বুঝিয়া নিতেন। সুতরাং তাহাকে একজন মোটামুটি ধরণের মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাহা হউক তাহার অব্যর্থ সন্ধানের ফলে, ভোলানাথের তরুণ হৃদয় অতি সহজেই বেশ মুইয়া পড়িয়াছিল। বয়সের সাগরে ভাটা লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দের একটা চিন্তা আসিয়াছিল, আপনার অভাবে স্ত্রী কন্যার কি গতি হইবে। এমন সময়ে ভোলানাথকে পাইয়া মুখুয্যে মহাশয় ভাবিয়া-ছিলেন, ইহাকে মধ্যে রাখিয়া যদি শঙ্করের কিছু হাত করা যায়, তবে ভোলানাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়া স্ত্রী কন্যার একটা 'গতি' করিয়া যাইতে পারিবেন। সেই জন্য ভোলানাথকে তিনি একটা পৃথক বাড়ী পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। কিন্তু মাঝখানে সেদিন শঙ্কর আসিয়া যখন মুখের উপরই তাহাকে কয়েকটা উত্তম মধ্যম শুনাইয়া তোলা ঘরখানি পর্য্যন্ত ভাঙিয়া রাখিয়া শাসাইতে শাসাইতে চলিয়া গেল, তখন নিত্যানন্দের ক্রোধ সত্য সত্যই চরমে উঠিয়াছিল। তাহার স্ত্রী কন্যার 'গতি' সম্বন্ধে সত্যই তিনি একটু সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দমিবার লোক আমাদের মুখুয্যে মহাশয় মোটেও নয়। তাই উঠিয়া বসিলেন। ভোলানাথকে দেখিতে পাইয়াই কহিলেন—"বাবাজি! একটু শক্ত হোতে হয় হে একটু শক্ত হোতে হয়। এ সব বিষয়-কর্ম্মে বুঝলেনা বাবাজি, শাস্ত্রে আছে—" শাস্ত্রে কি আছে না শুনিয়াই ভোলানাথ বলিয়া উঠিল—"আর শক্ত হোতে চাইনে মুখুয্যে মশায় এতদিন যা হোয়েছি, তাই যথেষ্ট। আপনার প্রাপ্য যা' ছিল, এই নিন্"—বলিয়া একখানা দশ টাকার নোট নিত্যানন্দের সুমুখে ফেলিয়া দিল। নিত্যানন্দ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাচ্ছল্যের ভরে কহিলেন—"তোমার টাকার প্রতি আমার কোনদিনও স্পৃহা নেই। ও তুমি নিয়ে যেতে পারো। আমি দেখছি তোমার মনের জোর। ধিক্ তোমার বয়সে! তোমরাই না চিৎকার কোরে বলে বেড়াও—স্বাধীনতা না পেলে মানুষের সত্যিকার শক্তিই নাকি জেগে উঠে না—আর নিজের কি স্বাধীনতা? না, স্ত্রীলোকের বাড়ীতে, স্ত্রীলোকের পদাশ্রিত হোয়ে ভিখারীর মত হাত পেতে পড়ে থাকা। ছিঃ লজ্জা হয়না তোমার! আমরা পাঁচজন তো লজ্জায় মরে যাই! এ রকম কাপুরুষ জানলে কি আর আমি এত মাথা ঘামাতে আসি?" একটু থামিয়া নিত্যানন্দ লক্ষ্য করিলেন, তাহার রাগ ঠিক ঠিকই লাগিয়াছে, তখনই আবার সুর বদলাইয়া লইলেন—"ভাখ বাবাজি, কাজটা এখন একেবারেই জলবৎ তরলম্। ১০ মাইল রাস্তার ৮ মাইলই পেছনে পোড়ে গ্যাছে। এত কাছে এসেও যে লেজ গুটিয়ে পালায় সে তো একটা বিরাট হস্তী মূর্খ একেবারে আস্ত ভীরু।" যৌবনের নবীন রক্তে আর যাহাই হউক—'ভীরু' কথাটা মোটেই সহ্য হয় না। কথাটা ভোলানাথের 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'। দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"কি কর্ত্তে বলেন তা' বলে?" মুখুয্যে খুসী হইয়া সহাস্য মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—হাঁ এই তো চাই! কাজ এখন খুবই সোজা।

একটা দিনের সামান্য একটু যত্ন সমস্ত ভবিষ্যৎটা উজ্জ্বল হোয়ে যাবে। তবে শোনো বাবাজি—" তারপর চাপা গলায় বহুক্ষণ ধরিয়া ভোলানাথের কাণে কাণে কি বলিলেন। ভোলানাথ একবার বলিয়া উঠিল—"দাদা—দাদা যে?" নিত্যানন্দ বাঘের মত লাফাইয়া উঠিলেন—"দাদা! যে দাদা নিজের ভাইকে সূচ্যগ্র পরিমাণ জায়গা দিতে নারাজ, সেই দাদা তো! তুমি বলে তাকে দাদা বল, আর কেউ হোলে—।" এবার ভোলানাথ সোজা হইয়া বসিল—দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—"আচ্ছা, তাই কোরবো মুখুয্যে মশাই, যা থাকে কপালে।"

আনন্দের একটা প্রবল উচ্ছ্বাসে যখন আমাদের সম্পূর্ণ বিহ্বল করিয়া দেয়, ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই যদি ঘটনা চক্রে সেই অকূল আনন্দরাশি সহসা মুছিয়া যাইবার কোন কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বেদনা ও নৈরাশ্যের যে গুরুত্বে আমাদের হৃদয় নুইয়া পড়ে, তাহা হইতে নিজেকে সংবরণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ানো সত্যই অতি শক্ত এবং দুঃসাধ্য। শঙ্কর ভোলানাথকে ধরিয়া আনিয়া ঠিক দুষ্ট ছোট ভাইটির মতই যখন তাহাকে মিষ্ট স্নেহের শাস্তিটুকু দিয়াছিল তখন আনন্দে এবং তৃপ্তিতে তীর্থেশ্বরী কথাটি পর্য্যন্ত বলিতে পারেন নাই। কিন্তু পরক্ষণেই যখন ক্রুদ্ধ অভিমানে সে কোথায় চলিয়া গেল, অনেক খোঁজ করিয়াও পাওয়া গেল না, তখন তীর্থেশ্বরীর মন এতটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে তিনি আর একদিন এ সংসারে তিষ্ঠিতে পারেন নাই। শঙ্করকে গিয়া বলিলেন "তুমি আমায় আমার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। এ সংসারে আমি একদণ্ডও টিকতে পারবো না।" জননীর এ উচ্ছ্বাসহীন গভীর অমাবস্যার অন্ধকারের মতই শঙ্করের সমস্ত প্রাণ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে বাহিরের রুক্ষ আবরণে ঢাকিয়া ফেলিয়া সে বলিয়াছিল—"যাও! তুমি গেলেই আমি বাঁচি। তুমি থাকতে এ সংসারের রক্ষা নেই। সব কুমন্ত্রণার শনিই হচ্ছ তুমি।" তীর্থেশ্বরীর বুকে এত দুঃখের পরে সে কথাটা নিদারুণ বাজিয়াছিল, কিন্তু অতিকষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া তিনি নির্ব্বাক হইয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে সত্যসত্যই তিনি ভাইয়ের সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। শঙ্কর একটি কথাও মায়ের সহিত কহিল না। আড়াল হইতে একদৃষ্টে মায়ের দিকে চাহিয়া ছিল। কিন্তু দুর্নিবার অশ্রুকে সেদিন থামাইয়া রাখিতে পারে নাই।

শঙ্করের সত্যিকার মূর্ত্তিখানি তীর্থেশ্বরীর চোখে লুকানো ছিল না। বাহিরের রূঢ়-কণ্ঠ, এবং নির্ম্মম আচরণের কঠিন আবরণে, ভিতরে যে একখানা মধুময় প্রীতিময় সুকোমল প্রাণ চাপা দেওয়া ছিল, এ সত্যটা শঙ্করের শত সাবধান সত্ত্বেও মায়ের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। ভাইয়ের চরিত্রে শঙ্করের যে কি প্রচ্ছন্ন গভীর বেদনা আর সেই বেদনাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই যে সে এত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছিল, তীর্থেশ্বরী তাহাও অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কেন যে সে ভোলানাথকে এক তিল জমি দিতে চায় নাই, তাহার ঘর ভাঙিয়া, নিত্যানন্দ ঠাকুরকে অপমান করিয়া আসিয়াছে, ঘরদ্বারে হাত দেয় নাই, পরন্তু মায়ের উপর অতি অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে—তাহার উদ্দেশ্য যে শুধু ভোলানাথের দৃষ্টি এবং তৎসঙ্গে তাহার হৃদয়কে আকর্ষণ করা, এ কথাও তীর্থেশ্বরীর অজানা ছিল না। তাই তিনি মনে মনে তাহার পুত্রটিকে প্রসংশা করিতেন এবং শত অপরাধেও তাহার উপর রাগ করেন নাই। কিন্তু সেদিনকার ঘটনায় সত্যই তাহার অভিমান হইয়াছিল।

কিন্তু মায়ের অভিমান কতক্ষণ? কলিকাতার ইটের খাঁচায় অবরুদ্ধ স্নেহের বন্যা অচিরেই সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গেল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সহরের নূতনরূপে বাড়ীর কথা ভুলিয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবেন। এ যে কারাগার। কোথায় সে পল্লীরাণীর অফুরন্ত আলো!—স্নিগ্ধ নির্ম্মল বাতাসটুকু—কোথায় সে অনন্ত মুক্ত আকাশ! চারিদিকে প্রাণঢালা মুক্তি! আশে পাশে অবাধ স্বাধীনতা! সে যে প্রকৃতিমায়ের শ্রেষ্ঠ দান—সকলের সমান অধিকার, আর এখানে সে দানেও কার্পণ্য আছে—সে দানেও ধনী দরিদ্রের বিচার আছে। কি ভীষণ এই সহর!

রাস্তার ধারে যখনই কিছু দেখিবার জিনিষ তাহার চক্ষে পড়ে, তখনই অন্তরদ্বারে বিদ্যুৎবেগে আসিয়া দাঁড়ায় 'রাণী'র একখানা দুষ্টোমি আর দুরন্তপনার জলন্ত ছবি। চুল ছিড়িয়া কীল মারিয়া ছুটাছুটি, লাফালাফি করিয়া কি ভীষণ দৌরাত্মটাই না তাহার এই ছোট্টো নাতনীটি করিয়া থাকে! কিন্তু তবু কি অসীম তৃপ্তি, কি প্রাণভরা আনন্দ

সে অত্যাচারে! কি অমিয়ভরা সে কচি মুখের 'ঠাকুর মা'! খাইতে বসিলে ভাত ছড়াইয়া জল ঢালিয়া গায়ে উচ্ছিষ্ট দিয়া কি অশান্তির সৃষ্টিই না সে রোজ করিত, কিন্তু তবু কি উদার শান্তি সে অশান্তিতে। কি নির্ম্মল সুখ সে দুঃখে। কি স্বচ্ছন্দ, নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য সে কর্ম্মপূর্ণ জীবনে।

তীর্থেশ্বরী ভাবিলেন—একটা জিনিষ এখানে ভাল। সহরের সংসারে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নাই। থাকিলেও কেহ মারামারি কাটাকাটি করিয়া ঝগড়া বিরোধ বাধাইয়া মাথা ফাটায় না! কিন্তু তবুও যেন এ মন্দ। কি অসহ্য এ মৌন জীবন। সারাদিন নিশ্চেষ্ট ভাবে নির্জ্জীব জড়ের মত পড়িয়া থাকা এ কি নিদারুণ অভিশাপ। যন্ত্র-চালিতের মত চিরকাল একঘেয়ে ভাবে নিজ নিজ কাজটুকু করিয়া যাওয়া দেবতার এ কি মর্ম্মান্তিক পরিহাস! ইহাপেক্ষা সে গোলযোগও বুঝি ভাল—তাহাতে আনন্দ আছে আর এখানে ত কিছুই নাই। ইহা ছাড়া সহরের আচার ব্যবহার ও তাহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা যা' তা খায়, সন্ধ্যা পূজা করে না। কিছুরই বাদ-বিচার রাখে না। মেয়েরা পর্য্যন্ত তাস খেলে, গান করে, বই পড়ে। এ সব কি? সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে একা একা নীরবে ছাদের পাশে বসিয়া তীর্থেশ্বরী ভাবিতেছিলেন—হায় ভগবান! এ নরককুণ্ড থেকে আমায় উদ্ধার করিবে কে? পিছনে জুতার শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই শঙ্কর আসিয়া একেবারে কোন ভূমিকা না করিয়াই বলিতে লাগিল—"আচ্ছা মা! তোমার কি কোনো আক্কেল পছন্দ আছে—না সব গোল্লায় গ্যাছে? সব যে ছেড়ে চলে এলে, এখন কি করে চলে তা' ভেবে দেখেছ? বুড়ো হোয়ে গেলে, তবু বুঝলে না—কি কোরে সংসার চালাতে হয়।" একটু সরিয়া আসিয়া কহিল—"হাঁ এই যে কাঁদছ। আমি তা' আগেই জানি। আর্দ্ধেকটা প্রাণ যে বাড়ীতে পড়ে আছে, সে খেয়াল তো নেই? আচ্ছা মানুষ! চল, বাড়ী চল।"

"চল্ বাবা। মা কালীই তোকে মিলিয়ে দিয়েছেন" বলিয়া তীর্থেশ্বরী নীচে নামিয়া আসিলেন।

[ঘ]

দারুণ পুত্রশোকের পর প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে না পারিলে মুখের যে ভয়ানক অবস্থা হয়, তেমনি ম্লান, শুষ্ক, দুঃখ-ক্ষোভ-গ্লানি পীড়িত একখানা মুখ ঝোপের আড়াল হইতে বাহিরে জোৎস্নায় আসিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি তখন ১১টা। প্রশান্ত প্রান্তরের প্রসুপ্ত বুকখানি জুড়িয়া পূর্ণ যৌবনা চন্দ্রিমা-রাণীর উছলিয়া পড়া চঞ্চল হাসি। দিগ্ দিগন্তে মুক্তাখচিত শুভ্র আঁচল বিছানো। তাহার উপর চারিদিকে জাগিয়া রহিয়াছে জ্যোৎস্নালোকিত নৈশ নিথর শান্ত নীরবতা।

সে আসিল; তাহার হাতে একটা কাগজের পুঁটুলি। ধীরে ধীরে তাহা রাখিয়া দিল। একদৃষ্টে আকাশের পানে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল। অন্তরের অন্তর থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস তাহার অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া আসিল। সে নিঃশ্বাসে সে নিজেই চমকিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তাহার কম্পিতকর যুক্ত হইয়া থামিল। কে ঐ ব্যথিত নির্জ্জন পথিক? আর কিসের তাহার ঐ শব্দহীন প্রার্থনা। সে যাহা চায় মুখ ফুটিয়া কেন বলে না? কিন্তু কি সুস্পষ্ট, অর্থযুক্ত ঐ দৃষ্টিটুকু যেন বলিতেছে—চাঁদ তুমি কতো সুন্দর—আর আমি কতো কুৎসিৎ! তুমি কতো সরল, আর আমি কতো কুটীল! তুমি কতো হাস; আর আমি সুধু কাঁদি। চাঁদ, তোমার মতো—"কি! এনেছ?"—কাহার প্রশ্নে পথিকের ধ্যান ভাঙিয়া গেল। কাগজের পুঁটুলিটা ধীরে ধীরে তুলিয়া নিয়া কহিল—"এনেছি।" "কই, দাও।" "আমার কাছেই থাক্।" আগন্তুক বিরক্ত হইয়া কহিল—"তুমি কোথায় রাখবে, কিইবা বুঝবে? দাও আমি তুলে রাখবো'খন।" পথিক তেমনি নির্ব্বাক দৃষ্টিতে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল। আগন্তুক বলিল—"তা'হলে, আমাকে দিয়ে বিশ্বাস হচ্ছে না? পাগল আর কি?"

"তা' কে বলেছে? আমার কাছে থাক্লে দোষ নেই তো কিছু?" বিরক্তির স্বরে এইটুকু বলিয়া পথিক আবার মাথা নীচু করিল।

"কেও?" পাশেই রাস্তার উপর হইতে সুউচ্চ গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। আগন্তুক আস্তে কোথায় সরিয়া পড়িল। কিন্তু পথিকের একটি পাও নড়িল না। কদলিপত্রের মত তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এ সেই কণ্ঠ, সেই বজ্রকঠোর গম্ভীর কণ্ঠ—যাহার কাছে সমস্ত শক্তি, সমস্ত তেজ সমস্ত আস্ফালন অন্তর্দ্ধান করে, এ সেই স্বর। জেলা-প্রত্যাগত শঙ্কর সাড়া না পাইয়া ধীরে

ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল, পথিকের কাছে আসিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। "এ কি? ভোলা যে! তুই এখানে কি কচ্ছিস্?" মুহূর্ত্তকাল উভয়ে নীরব। তারপর ছুটিয়া গিয়া দাদার পায়ের নীচে মুখ লুকাইয়া ভোলানাথ কাঁদিয়া ফেলিল—"দাদা! দাদা! আমায় ক্ষমা করবে? বলো আর রাগ করবে না?" শঙ্করের পূর্ব্বস্নেহ আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে যে ভাইয়ের বুকের অফুরন্ত স্নেহের মন্দাকিনী! তাহা ত কখনও শুকায় না। শুধু এতদিনের মৃদু প্রবাহে যে ক্ষুদ্র চড়াটা পড়িয়াছিল, আজ বিপুল উচ্ছ্বাসে তাহা ভাঙিয়া গেল। শঙ্কর আবেগভরে ভাইকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া সহসা কি ভাবিয়া নিজেকে সামলাইয়া নিল। কহিল "ওঠ্ চল্, বাড়ী চল দেখা যাবে কি হয়েছে।"

শঙ্করের গম্ভীর কণ্ঠের উচ্চ আহ্বানে তীর্থেশ্বরী বাহির হইয়া আসিলেন—"এই যে! এসেছিস্ বাবা! ক'তো রাত হোয়েছে। আমি একবার ঘর একবার বার কচ্ছি। ও কেরে শঙ্কর?"

"ভোলা, আর কে? সোনাভাঙার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিল, ডাকি, সাড়া নেই; কাছে যেতেই কেঁদে ফেললে। জিজ্ঞেস করদিকি ব্যাপারটা কি।"

মায়ের আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। ভোলানাথ এক নিমিষে মায়ের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া দুষ্ট ছেলের মতই কাঁদিয়া ফেলিল—"মা! আমায় ক্ষমা কর্ত্তে পারবে? আমি কি সর্ব্বনাশটাই তোমাদের কর্ত্তে যাচ্ছিলাম। আগে জানিনে মা, নিত্যানন্দ এমন জোচ্চোর। তারি পরামর্শে আজ, চুপি চুপি এসে দাদার বাক্স থেকে সমস্ত দলিল পত্তর চুরি কোরে নিয়ে যাচ্ছিলুম। নিত্যানন্দ সবটা হাত কর্ত্তে এসেছিল; কিন্তু মা! আমি দিইনি। দাদা আমায় ক্ষমা করবেন?" জননী, পুত্রের মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "দাদাতো তোকে চিরকালই ক্ষমা কোরে এসেছে ভুলু। তুই-ই তাকে চিনিস্‌নি।"

"এবার চিনেছি মা! আরো যে কি কো'রবো বলে আমি এসেছিলাম, মা গো, আমি তা মুখে আনতে পারবো না! ভেবেছিলাম যদি কেউ বাধা দেয়—" ভোলানাথ আর বলিতে পারিল না তাহার বস্ত্রের অন্তরাল হইতে একখানা উলঙ্গ ছোরা ঝনাৎ করিয়া পড়িল।

অবাক্ বিস্ময়ে কাঠ হইয়া সকলে চাহিয়া রহিল। সে গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শঙ্করের শান্ত দৃঢ় কণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিল—"অসম্ভব ভোলানাথ—একেবারেই অসম্ভব! ভাইয়ের বুকে ভাই কখনো ছুরি মারতে পারে—এ কথা তুই বিশ্বাস করিস্। এ যে রক্তের টান ভাই! প্রাণে প্রাণে দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল; সমস্ত ষড়যন্ত্র ঐখানে যেয়ে ঘা খেয়ে ফিরে আসে। মূর্খ জালিয়াৎ তার বুঝবে কি? তাই সে গে'ছোলো ভাইয়ের হাত দিয়ে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে! তুই কাঁদিস্‌নে ভুলু, আমি দেখে নেবো সে হারামজাদার ঘাড়ে কটা মাথা গজিয়েছে। পাজি মুখুয্যের পো'র ঘরে আগুন দেবো, ভিটে মাটি উচ্ছন্ন কোরবো। তারপর হতচ্ছাড়ার নাক, কাণ কেটে, মাথা মুড়ে, ঘোল ঢেলে তাড়াবো, এ দেশ থেকে। তা' যদি না পারি ত' তুই শঙ্কর চাটুয্যের নামে দশটা কুকুর পালিস্।"

রোষ-রক্ত চক্ষু দুটি দিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে সমস্ত উঠান কাঁপাইয়া শঙ্কর পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"কোথা-সে?—"

"Trailing clouds of Glory do we come,
From God, who is our Home."—Wordsworth.
(Immortality Ode)

(১)

আজ মলয়-মন্দ-শান্ত-মৃদুল বাতাসে
কেন পরাণ কাঁপিল হুতাশে?
কি-যে ফেলে আসিয়াছি,—সেই যে "সে-পারে,"—
কোথা-সে?

(২)

আজ ওই রজত-শুভ্র শীতল জ্যোৎস্না বিকাশে,
কত উল্লাস-লহরী প্রকাশে!
—তবু, মনে পড়ে আরো-বিমল চাঁদিনী
উঠেছিল কবে আকাশে!

(৩)

আজ মনে পড়ে সেই মলয়-কম্পিত-প্রভাতে,
যবে ব্যাকুল-পরাণ লোভাতে,—
ধরা সেজেছিল সেই হৃদি-বিমোহিনী
অমল-সুন্দর-শোভাতে।

(৪)

আজ মনে পড়ে যবে অলি-গুঞ্জরিত-পবনে,
বসি বিরল-মধুর-ভবনে,—
কত বিহগ-কূজন, নদী-কলতান,
সেই পশেছিল শ্রবণে।

(৫)

কত কেতকী-পরাগে ভ্রমর যাইত লুটিয়া,
বেল, যূথিকা থাকিত ফুটিয়া,
আর করিত বিভোর মদিরা-অলস,—
কুসুম-সৌরভ ছুটিয়া।

(৬)

মাঝে শরতের দিবা, নিদাঘের বায়ু আসিয়া,—
কবে দিয়েছিল সব নাশিয়া!
আজ "অতীত" আবার,—নব জাগরণে,—
"সুমুখে" দাঁড়ালো হাসিয়া!

(৭)

তাই আজিকে আবার শান্ত-বিভাবরী হেসেছে,
ধরা পুলক-প্রবাহে ভেসেছে,
আর কোন্ জগতের সুনিভৃত স্মৃতি
প্রাণের সমীপে ব'সেছে।

(৮)

তাই মলয় মন্দ-শান্ত মৃদুল বাতাসে
আজ আর কাঁদিনাকো হুতাশে।
কি যে ছেড়ে এসেছিনু, জানি যে "ও-পারে,"
কোথা সে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

হিন্দুর সমাজ-শরীর

(A Comparative study of Hindu Society as a Social Organism *)

ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানব—সাম্যের অধিকার

আমি কি বলিতে চাই? প্রথমেই এই একটি প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। সঙ্গে আরও গোটা দুই প্রশ্ন এই কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যা বলিতে চাই,—কেন, কি উদ্দেশ্যে তা বলিতে চাই। আর কি ভাবেই বা তা বলিতে চাই। কি বলিতে চাই, শ্রোতৃবর্গ যদি দয়া করিয়া বা ধৈর্য্য ধরিয়া আমার বক্তব্য শুনিতে পারেন, ক্রমে ভরসা করি তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

আগে তার কিছু আভাস দেওয়া সম্ভব হইলেও তার একটা চুম্বক দেওয়া বড় কঠিন, আর তার এমন প্রয়োজনও কিছু নাই। তবে কেন বলিতে চাই, আর কি উদ্দেশ্যে কি ভাবে বলিতে চাই, সে সম্বন্ধে সাধ্যান্ত একটু ভূমিকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে।

অনেকেই আমরা এই শ্লোক জানি এবং আবৃত্তিও করিয়া থাকি—

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদের 'হেমচন্দ্র বসু মল্লিক' বৃত্তিভোগী অধ্যাপক রূপে এই বিষয়ের আলোচনা আমি করিতেছি এবং ধারাবাহিক কতকগুলি প্রবন্ধ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জ্ঞান-প্রচার সমিতির অধিবেশনে পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ক্রমে প্রবন্ধগুলি মালঞ্চে প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বে এই সম্বন্ধীয় দুই একটি খণ্ড প্রবন্ধ মালঞ্চে বাহির হইয়াছে। তাহার কতক কতক অংশ এই প্রবন্ধে অবশ্য আসিয়া পড়িবে। মালঞ্চের পক্ষে ইহা কিছু পরিমাণে পুণরুক্তি দোষের মত হইবে। সে ত্রুটি পাঠকবর্গ আশা করি মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অতি প্রাচীন এক জাতির বংশধর, প্রাচীন এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী আমরা। কিন্তু এযুগে জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমাদের চক্ষুরুন্মীলিত করিতেছেন প্রায় সকল দিকেই পাশ্চাত্য গুরুবর্গ। পাশ্চাত্য কাব্য বিজ্ঞান দর্শনাদি যাহা আমাদের শিখিতে হয়, তাহার গুরুগিরি অবশ্য তাঁহারাই করিবেন। যদিও আমাদের কাব্যবিজ্ঞানদর্শনাদি যাহা শিখেন, তার জন্য আমাদের গুরুগিরির উপরে নির্ভর তাঁহারা করেন না। পণ্ডিতদের যে সাহায্য তাঁহারা নেন সেটা কতকটা মজুরীর মত, গুরুগিরি নয়! কতকটা শিক্ষার্থীর অভিধান বা Reference বই এর মত এই সব পণ্ডিতদের তাঁহারা ব্যবহার করেন। তত্ত্ব বুঝিতে যে দৃষ্টি আবশ্যক, গুরুর যাহা আসল দেয়, তাহা তাঁহারা এ দেশের পণ্ডিতবর্গের নিকটে চান না, নেনও না! সে দৃষ্টি তাঁহাদের নিজেদের সংস্কারের বা সহজবুদ্ধির। ইহা তাঁহাদের পৌরুষের পরিচয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমরা? পাশ্চাত্য বিদ্যার গুরুগিরিতে তাঁহাদেরই অধিকার আছে, সে বিদ্যা অর্জ্জনে তাঁহাদের গুরুগিরি স্বীকার করিতে আমরা পারি। আর করাটাই বোধ হয় ভাল। সে ক্ষেত্রে অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমাদের চক্ষু উপযুক্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় বোধহয় তাঁহারাই উন্মিলিত করিতে পারেন ভাল। কিন্তু এ যুগে আমাদের বড় দুর্ভাগ্য হইতেছে এই যে আমাদের বিদ্যার দিকে, অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমাদের চক্ষুরুন্মিলনের জ্ঞানাঞ্জনশলাকাটিও তাঁহাদের হাতেই গিয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের হাতেই পরিচালিত হইতেছে। আমাদের বিদ্যার আমাদের সভ্যতার তাৎপর্য্য আমরা সেই দৃষ্টিতে ততটুকুই দেখি, যে দৃষ্টি যতটুকু তাঁহাদেরই হাতের সেই জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় ফুটিতে পারে।

এক সময় ছিল, যখন প্রথম পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোক পাইয়া আমরা মনে করিতাম, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা যাহা কিছু, পাশ্চাত্য মণ্ডলে পাশ্চাত্য সুধীবর্গের অতুলনীয় প্রতিভায় জগতে তাহার বিকাশ হইয়াছে,—মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ যাহা কিছু, পাশ্চাত্য সভ্যতাতেই তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ক্রমে পাশ্চাত্য মনীষী কেহ কেহ ভারতে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইলেন, আগ্রহে তার আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

তাঁহাদের একটা সিদ্ধান্ত এই আছে যে আদিম মানব সভ্যতার সোপানে প্রথম আরোহণ করে চাষা হইয়া কথাটা যেন কেমন শুনাইল। তবে 'চাষা' কথাটা ঠিক এখনকার প্রচলিত চাষা কথার অর্থে কেহ নিবেন না। তাঁহারা বলেন, মানুষ প্রথমে একেবারে বুনো ছিল, বনের জন্তু ধরিয়া কাঁচা বা পোড়াইয়া খাইত, ক্রমে শান্ত পশু পালিতে শিখিল। পশুর দল নিয়া আজ এখানে কাল ওখানে আস্তানা করিত, কারণ পশুর খাদ্য ঘাস এক অঞ্চলে চিরকাল মিলে না, ঘাস জন্মাইতেও তারা জানিত না। এই অবস্থায় স্থায়ী ঘরবাড়ী করা সম্ভব নয়। থাকিত তারা তাঁবুতে। তবে কাপড়ের তাঁবু যারা করিতে পারে, তারা যে ঘাস জন্মাইতেও শেখে নাই, এমনটা মনে করা যায় না। কাজেই বোধ হয় লতাপাতার ছাউনি করিয়া তারা থাকিত। তাই ছিল তাহাদের তাঁবু। এই ভাবে আরও কত যুগ গেল, তারা পশুখাদ্য ঘাস, সঙ্গে সঙ্গে মানবখাদ্য অন্যান্য ফলশস্যাদিও জন্মাইতে শিখিল। তখন তারা চাষা হইল, গ্রাম পত্তন করিয়া স্থায়ী ঘরবাড়ী করিয়া বসবাস আরম্ভ করিল। এক স্থানে অনেক লোক বসবাস আরম্ভ করিলে মিলমিশেরও একটা বন্দোবস্ত করিয়া নিতে হয়, সুতরাং সমাজেরও সূত্রপাত হইল। সভ্যতার আরম্ভ হইল এই। বসিতে পারিলে শুইবার যায়গা হয়। ক্রমে এই প্রারম্ভ হইতে সভ্যতার আজ এতখানি উন্নতি হইয়াছে যে বিমানেও মানব আজ বেশ আরামে শুইতে পারে।

তবে একটা খটকা থাকিয়া যায়। শস্যাদি জন্মাইতে হইলে জমি চষিতে হয়, তার জন্য লাঙ্গল চাই। সুতরাং চাষা হইতে পারিবার আগে তাহাদের লাঙ্গল তৈয়ারী করা শিখিতে হইয়াছিল। ফসল কাটিবার কাস্তেও তাহাদের লাগিত। ভোঁতা পাথরের লাঙ্গলে জমিও চষা যায় না, তার কাস্তে দিয়া শস্যও কাটা হয় না। সুতরাং লোহা দিয়া তারা লাঙ্গল গড়িত, কাস্তে বানাইত। খনি হইতে লোহা তুলিয়া তাই দিয়া লাঙ্গল কাস্তে তৈরী করিতে

যারা পারিয়াছিল, তারা যে তখন চাষাও হইতে পারে নাই, কথাটা সত্য কেমন লাগে না? কেহ বলিতে পারেন, প্রথমে তারা কাঁচা মাটিতে বীজ ছড়াইত,—শস্য পাকিয়া উঠিলে গাছ হইতে হাতে ছাড়াইয়া নিত। শেষে অনেক পরে লাঙ্গল কাস্তে তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু পাকা চাষী হইবার অনেক আগে যে লাঙ্গল কাস্তে চাই, লতাপাতার তাঁবু গড়িতে কি ঘর বাঁধিতেও অস্ত্র কিছু লাগে। খটকা একেবারে যায় না। আরও দেখিতে পাই, দেশ ও জাতি বিশেষে আধুনিক এত বড়, উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব, সভ্য জাতিসমূহের সর্ব্বত্র এরূপ বিস্তৃতি সত্বেও, এখনও এই পৃথিবীতে আদিম সেই বুনো মানব আছে, প্রথম স্তরের চাষী মানব আছে, এই দুইয়ের অন্তর্বর্ত্তী আরও বহু স্তরের মানবও আছে। তাই মনে হয়, সভ্যতার ক্রম-বিকাশের যে পর্য্যায় ও প্রণালী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন, সেটা একেবারে ঠিক নাও হইতে পারে। ভারতীয় ঋষিগণ আর একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন। সে কথাটা এই, যে কল্পের পর কল্পে অনাদিকাল ধরিয়া সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। এক কল্পের অধিকৃত জ্ঞানের যে সংস্কার, পরবর্ত্তী কল্পে তাহার উচ্চ অধিকারী হইয়া কোথাও কেহ কেহ আবির্ভূত হন, সভ্যতার সূত্রপাত এই অধিকারের প্রভাবে তাঁহারাই করেন। যাক, এই দুই মতের তুলনামূলক কোনও সমালোচনা এ স্থলে করিব না,—এমনই যাহা বলিতেছিলাম, তাহা হইতে অবান্তর পথে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, আরও গেলে অসুবিধা হইবে। তবে ইঁহাদের এই মতটাও একেবারে 'কিছু না' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

আমাদের পাশ্চাত্য গুরু কেহ কেহ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে যখন পরিচিত হইলেন, বেদও তাঁহারা পড়িলেন। পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন, বিস্মিত হইলেন। অনেক-রকম হিসাব গণনা করিয়া দেখিলেন,—ইহাও তাঁহারা বুঝিলেন, আর্য্য জাতির এমন কি মানব জাতিরই—প্রাচীনতম সাহিত্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা ভারতের এই বেদ বা বেদের মন্ত্রসংহিতা। এই মন্ত্রসংহিতাকেই মাত্র তাঁহারা বেদ বলিয়া গণ্য করেন,—ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ্ প্রভৃতিকে বেদ বলেন না। যদিও আমরা বলি, সবই এক বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন ভাগ বা শাখা।

বেদ মানবজাতির প্রাচীনতম সাহিত্য, কিন্তু সেই প্রাচীন যুগের মানব, যাঁহাদের মুখে বেদবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহারা এই সব পণ্ডিতবর্গের মতে উচ্চ সভ্যতার ও পরিপক্ক জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হইতে পারেন না, যেহেতু তাঁহারা প্রাচীন। তাঁহারা প্রাচীন, সুতরাং সভ্যতার আদিম অর্থাৎ চাষের স্তরেই মাত্র তাঁহারা উঠিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের মন্তব্য তখন হইল, বৈদিক মন্ত্র সব 'চাষার গান।' কিন্তু 'চাষা' হইলেও তারা বড় খাসা চাষাই ছিল, নহিলে অমন সব গান কেমন করিয়া গাহিল। আদিম মানব—সভ্যতার মাত্র চাষের স্তরে উঠিয়াছে—বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহিমা, প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহের আশ্চর্য্য বিকাশ, আশ্চর্য্য শক্তি, মানবকে কত আনন্দ তারা দান করে, মানবের কত হিত কত অহিতও সংঘটন করিতে পারে, এই সব দেখিয়া তাদের সরল চিত্ত যে ভাবে অভিভূত হয়, যে সব উচ্ছ্বাস তাদের প্রাণ ভরিয়া উঠে, যে সব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, বৈদিক স্তোত্র সমূহে অতি সুন্দর চিত্তগ্রাহীরূপে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাই, এই ভাবে এই বৈদিক মন্ত্রসমূহের খুব তারিফ তাঁহারা করিলেন। আর বলিলেন, প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে বৈদিক যুগের আদিম চাষীরা প্রথমে দেবতা বলিয়া স্তবস্তুতি করিত,—পরবর্ত্তী স্তোত্রকারগণ ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই প্রাকৃতিক দেবতারা মূল এক বিশ্ব-শক্তির বা বিশ্বদেবতারই বিচিত্র সৃষ্টিব্যাপারে বিচিত্র বিকাশ মাত্র। কিছু পরে করিলেও এই সত্যটা অনুভব করা যে কত বড় উচ্চ ধীশক্তির লক্ষণ, কেবল আদিম চাষী মানবের পক্ষে সম্ভব নয়, এবং অন্যান্য আদিম চাষীরাও কেহ করিতে পারে নাই, এটা তাঁহারা সহজে স্বীকার করিলেন না। এই পর্য্যন্ত বলিলেন, পরবর্ত্তী মন্ত্ররচনার যুগে তাঁহারা আরও কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা মানবসভ্যতার অভিব্যক্তির অতি উন্নত অবস্থা নহে। যাহা হউক, বেদ উপনিষদ্ দর্শন ব্যাকরণ রামায়ণ মহাভারত কাব্য বিজ্ঞান ইত্যাদি যতই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল, ততই বেশী তাঁহারা ভারতের প্রাচীন বিদ্যার তারিফ করিতে লাগিলেন, না করিয়া পারিলেন না। কেবল তারিফ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত রহিলেন না,—জগতের সভ্যসমাজে

ভারতীয় বিদ্যার ও ভারতীয় সভ্যতার মহিমাও তাঁহারা প্রচার করিলেন। ভারতসন্তান আমরাও ভারতীয় বিদ্যা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আমাদের মনোযোগও সে দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা অতি কৃতজ্ঞ।

এ কৃতজ্ঞতা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে, তাঁহারা যে দৃষ্টিতে ভারতীয় বিদ্যা ও ভারতীয় সভ্যতার আলোচনা করিয়াছেন,—সে দৃষ্টি তাঁহাদের, আমাদের নয়, আমাদের হওয়া উচিত নয়। সেই দৃষ্টিতেই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি, বলিব আমরা অতি দীন, অত্যধিক হীন। পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সভ্যতাকে পাশ্চাত্য সুধীবর্গ মানবজ্ঞান ও মানবসভ্যতার উচ্চতম বিকাশ বলিয়া মনে করেন। এবং জগতের প্রাচীন অন্যান্য বিদ্যা ও সভ্যতার বিচার তাঁহারা সেই মাপকাঠি ধরিয়াই করেন। কেনই বা করিবেন না? ইহাই যে স্বাভাবিক। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁহাদের গুরুগিরির অধীন হইয়াছি,—তাঁহাদের দেওয়া দৃষ্টিতে আমাদের বিদ্যার, আমাদের সভ্যতার বিচার আমরা করি। যে দিকটার যতটুকু, যে ভাবে ভাল তাঁহারা বলেন, সেই দিকটার ততটুকু, সেই ভাবেই মাত্র ভাল আমরা দেখি! আমাদের প্রাচীন আচার্য্যগণকে গুরু বলিয়া আমরা মানি না,—তাঁহাদের দৃষ্টিতে কিছু দেখিতে চাই না। সে দৃষ্টি যে দৃষ্টির মত একটা দৃষ্টি হইতেই পারে, এই কথাটাই আমরা স্বীকার করি না!

ভারতীয় আচার্য্যগণের পন্থা অনুসরণ করিয়া ভারতীয় বিদ্যার ও সভ্যতার আলোচনা যে ভারতসন্তান কেহই করেন না, একথা আমি বলি না। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসী বলিলে যাঁহাদের বুঝায়, তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার শিষ্য। এ শিক্ষার মধ্যে ভারতীয় বিদ্যা ও সভ্যতার ইতিহাসের স্থান অল্প। এই টুকুও যাঁহারা অধ্যয়ন আলোচনা করেন, পাশ্চাত্য আচার্য্যবর্গের গুরুত্বের অধীন হইয়াই প্রায় করেন। তাই ভারতসন্তানের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে ভারতীয় বিদ্যার ও সভ্যতার আলোচনা ও বিচারের দৃষ্টান্ত বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য গুরুর শিষ্যত্বের প্রভাব পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু শিথিল হইলেও এখনও বড় কম নাই। ধরুন, বেদ বেদান্ত, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সব বিদ্যা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে দৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ বিদ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরাও সে গুলিকে সেই দৃষ্টিতেই উচ্চাঙ্গ বিদ্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তার অতিরিক্ত কোনও তত্ত্ব ইহার মধ্যে আছে কি না, ভাবি না। কিন্তু পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ এতদিন ইঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের পরে ভারতীয় ধর্ম্মসাধনার পদ্ধতিতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রভাব প্রধানভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য ধর্ম্মমত ও তাহার পদ্ধতির সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক রূপ একেবারেই খাপ খায় না। পরন্তু, তাঁহারা যে সব ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মের পদ্ধতি নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন, তাহার সঙ্গেই ইহার মিল দেখা যায় বেশী। তাই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, হিন্দুবুদ্ধির অতিবিকার তখন ঘটিয়াছিল,—পুরাণ এবং তার চেয়ে আরও বেশী তন্ত্র সেই বিকৃত-বুদ্ধির ফল!

এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য আচার্য্যগণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কয়েকটি মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ ছিল, অধ্যবসায় অতুলনীয় ছিল, গভীর আন্তরিক একটা দেশপ্রাণতার বোধও ছিল। কিন্তু ভারতীয় বিদ্যার ও সভ্যতার ইতিহাসের অনুশীলনে তিনি একেবারে পাশ্চাত্য আচার্য্যগণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। এইদিকে তাঁহার দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য গুরুগণের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় উন্মিলিত হইয়াছিল। তাই এই মন্তব্য তাঁহার লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে, নতুবা হইত না।

পৌরাণিক কাহিনী ও অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে তিনি এই বলিতেছেন—

"Such are the myths believed, and such are the religious rites practised by the descendants of those who sang the hymns of the Veda, and started the deep and earnest enquiries of Upanishads—"

তন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য এইরূপ—

"* * * * The works known as the Tantras—creations of

the last period of Hindu degeneracy under a foreign rule—give us elaborate accounts of dark, cruel and obscene practice for the acquisition of supernal powers. And, by an audacious myth, these strange products of "the mind diseased" were ascribed to the deity Siva himself! * * * *

To the historian the Tantra literature represents, not a special phase of Hindu thought, but a diseased form of the human mind which is possible only when the national life has departed, when all political consciousness has vanished, and the lamp of knowledge is extinct.

উদ্ধৃত বচনগুলি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ History of Civilisation in Ancient India হইতে উদ্ধৃত।

আমরাও এতদিন এই মতই পোষণ করিতেছিলাম। আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি প্রধানত: তান্ত্রিক—তাই হিন্দু ধর্ম্মটাই একটা বিকট ব্যাপার,—শ্রদ্ধার অনুষ্ঠানাদি পালন করিবার ত কথাই নাই, একটু শ্রদ্ধায় ইহার দিকে দৃষ্টি করিবার কি ইহার আলোচনা করিবারই প্রয়োজন যে কিছু থাকিতে পারে, তাহাও আমরা বড় মনে করি নাই। যে সব গৃহে এই সব অনুষ্ঠান সম্পন্ন কিছু হয়, তাহাও অজ্ঞ পুরোহিত ও অজ্ঞতরা প্রাচীনা নারীদেরই কতকগুলা বাজে ব্যাপার, আর বাজে খরচ—যাহা সহিয়া বহিয়া নিতেই হইবে, এইরূপ আমরা ভাবিতাম।

সম্প্রতি মহামনীষী জাষ্টিস্ উডরফ্ সাহেব তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তন্ত্রের তত্ত্ব সমূহের আলোচনা ও বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, এই তত্ত্ব বৈদিক তত্ত্বের একটা বিশেষ বিকমাত্র তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠান-সমূহও এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার একটা উৎকৃষ্ট সাধনা-প্রণালী। এখন আমরাও ভাবিতেছি, তাইত। তন্ত্র-শাস্ত্রটাও তবে এমন একটা উৎকৃষ্ট জিনিষ বটে। শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি, আশা করা যায়, তন্ত্রের দিকে এখন কিছু আকৃষ্ট হইবে এবং তন্ত্রমতপ্রধান বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মপদ্ধতিও হয়ত কিছু শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে ইঁহারা দেখিবেন। তবে সে দৃষ্টি উডরফ্ সাহেবের দৃষ্টিরই অনুসরণ করিবে। করুক, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আর মহাত্মা উডরফ্ সাহেব বিদেশী হইলেও, তাঁহার গ্রন্থ দুই একখানি পড়িয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তান্ত্রিক তত্ত্বের আলোচনা তিনি যেন ভারতীয় শুক্লপক্ষ ভারতসন্তানের দৃষ্টিতেই করিয়াছেন। এই গৃহে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান প্রচার সমিতির এই সব বক্তৃতা উডরফ্ সাহেবই আরম্ভ করেন। তান্ত্রিক 'শক্তিশাস্ত্র' বা 'মন্ত্রশাস্ত্র' সম্বন্ধে তিনি যে কয়েকটি বক্তৃতা এখানে করেন, তাহা শ্রোতৃবর্গের মধ্যে হয় ত অনেকেই শুনিয়াছেন। এবং যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা আমার এই কথা বোধ হয় সমর্থন করিবেন।

প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বড় একটি অঙ্গ হইতেছে, হিন্দুসমাজের অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির প্রকৃতি ও পরিণতিও পাশ্চাত্য সমাজের অভিব্যক্তির প্রকৃতি ও পরিণতি হইতে পৃথক রকম। পাশ্চাত্য সমাজ যে আদর্শ ধরিয়া যে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকেই স্বভাবত: তাঁহারা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবেন। হিন্দুসমাজের আদর্শ ও লক্ষ্য তাহা হইতে পৃথক্ কেবল নয়, বিপরীত বলিয়াই মনে হইবে। পাশ্চাত্য সুধীগণ হিন্দুর সমাজজীবনের এই গতিকে ক্রমিক অধোগতি বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহাদের মত ইহাই হিন্দু সভ্যতার অবনতির এবং হিন্দুশক্তির পতনের নিদান। তাঁহাদের শিষ্যবর্গ এদিকে আমরাও তাহাই বলি।

অথচ ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিন্দুসমাজ নামে একটা বিশাল মানবসমষ্টি অশেষ বৈচিত্র্য ও বৈষম্য এক ধরিয়া, যুগে যুগে বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, মূল এক প্রকৃতির কতক-গুলি লক্ষণসহ আজ পর্য্যন্ত ভারতে জীবিত রহিয়াছে। ইহার অশেষ ত্রুটি দেখান হইয়াছে ও হইতেছে। বহু আঘাত ইহার সঙ্গে পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। আভ্যন্তরিক ও বহিরাগত বহু বিরোধী শক্তি ইহাকে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজ যেন কল্পকল্পান্তজীবী বিরাট এক অক্ষয়বটের ন্যায় চারিদিকে তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া,—ভারতভূমির অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত তার অনন্ত অসংখ্য মূল দৃঢ় প্রোথিত করিয়া অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিকূল প্রভাবের স্পর্শ তার অঙ্গে কখনও লাগে নাই, একথা বলি না। কিন্তু ইহাকে অভিভূত, বিধ্বস্ত বা বিনষ্ট কিছুতেই করিতে পারে নাই। যাহা ঠেলিয়া ফেলা-

সম্ভব নয়, তাহা সে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে, আপনার অঙ্গভুক্ত করিয়া নিয়াছে। অঙ্গের রূপ ইহাতে মধ্যে মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, রূপের সঙ্গে স্বভাবের গুণও কিছু এদিক ওদিক হইয়াছে কিন্তু মোটের উপর সে তার আপন বিশিষ্ট অস্তিত্ব, বিশিষ্ট রূপ, বিশিষ্ট জীবন, রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে বড় প্রবল কতকগুলি প্রতিকূল প্রভাব ইহার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই সব প্রভাবও একেবারে সে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারিতেছে না। ইহাতেও তাহার রূপে ও গুণে পরিবর্ত্তন একটা হইতেছে, হইবেও। কিন্তু হিন্দুসমাজ তার বিশিষ্টতা হারাইয়া মানব-মহাসমুদ্রে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তার বিশিষ্ট জীবনের কোনও লক্ষ্য আর খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হইবে না, এরূপ সম্ভাবনা কিছু দেখা যাইতেছে না। সে সব অঙ্গে প্রবল আঘাত তার আসিয়া পড়িতেছে, সেই সব অঙ্গনিহিত শক্তিসমূহ আত্মরক্ষার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, আপন অন্তরে কোথায় কোন সত্য আছে যাহাকে মিথ্যা বলিয়া বাহিরের শত্রু চাপিয়া পিষিয়া ফেলিতে চাহিতেছে,—ব্যাকুল আগ্রহে সে তাহা খুঁজিতেছে সেই সত্যের বল জাগ্রত করিয়া তাহারই আশ্রয়ে, কেবল আত্মরক্ষা নয়, আত্মমহিমার প্রতিষ্ঠার জন্ম বড় একটা উদ্যম দেখা যাইতেছে। এ উদ্যমের লক্ষ্য ইহা নয়, যে যা যেমন আছে, তাই থাকিবে;—যেখানে যে রোগে দেখা দিয়াছে, সেই রোগই সে পুষিয়া রাখিবে। ইহার লক্ষ্য আপন সত্য যাহা আছে, তাহাই সে উদ্ধার করিবে, তার আশ্রয় ধরিয়া নূতনের সঙ্গে আপনাকে মানাইয়া নিবে।

ইহা প্রবল জীবনের লক্ষণ, অতি গভীর, অতি ব্যাপক একটা জীবনী শক্তির লক্ষণ। দুদিনের নয়, দুই চারি শতাব্দীর নয়, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বহু যুগযুগান্তরের অশেষ রকম প্রতিকূলতার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অতি প্রবল এই সুদীর্ঘ জীবনের এই অপূর্ব্ব সর্ব্বংসহ শক্তির পরিচয় ঐতিহাসিকগণ পাইয়াছেন, আমরাও দেখিতেছি।

এই জীবন কিসে আশ্রিত, এই শক্তির মূল কি? স্বাভাবিক ধর্ম্মের বড় কোনও সত্য ইহার আশ্রয় কিনা, ইহা আমাদের অনুসন্ধানের ও বিচারের বিষয় বটে। পাশ্চাত্য গুরুগণের সুরের ধুয়া ধরিয়া আমরা যে বলিতেছি, হিন্দু-সমাজ এখন out of date একটা old fossil মাত্র old Curiosity shopএ স্থান পাইবার যোগ্য, বর্ত্তমান উন্নতিশীল জীবনের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না,—ঠিক তা আমরা বলিতে পারি কি?

যাহাই হউক, এই শিষ্যত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভারতসন্তানের দৃষ্টিতে একবার ইহার দিকে আমাদের চাওয়া, ইহার প্রকৃতির ধর্ম্মটা কি তাহা একবার পরীক্ষা ও বিচার করিয়া দেখাটা আমাদের উচিত নয় কি?

বড় উচিত বলিয়াই মনে করি, তাই এই অনুসন্ধানে, এই পরীক্ষায়, এই বিচারে অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াও প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার প্রয়াস প্রাংশুলভ্য ফললোভে উদ্বাহু বামনের ন্যায় জানি। তবু হইয়াছি। আপনার দেশের ও সমাজের ধর্ম্ম যাহা, তার পক্ষে দুই কথা বলিবার অধিকার সকলেরই আছে, সে যতই ক্ষুদ্র হউক।

আমি আচার্য্য নই, প্রচারক নই, শাস্ত্রের পাণ্ডা বা সংস্কারকও নই। সে ভাবে কোনও কথাই আমি বলিব না। হিন্দুসমাজ দেশে থাকিলে ভাল হয় কি উঠিয়া গেলে ভাল হয়, তার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশও আমার উদ্দেশ্য নয়। হিন্দুসমাজ যদি থাকিবার হয় ত থাকিবে,—কেহ তুলিয়া তাকে দিতে পারিবে না। যদি যাইবার হয় ত যাইবে,—কেহ রাখিতেও ইহাকে পারিবে না। আর আজ আমার গোটাকত কথার উপরে যে ইহার থাকা না থাকা, ইহার ভালমন্দ যে কিছু নির্ভর করিতেছে, এত বড় স্পর্দ্ধাও আমি রাখি না।

ঐতিহাসিক সমালোচক কেহ যে ভাবে এই সব বিষয়ের আলোচনা করেন, সেই ভাবেই মাত্র ইহার এই আলোচনা করিতে আমি প্রয়াস পাইব। তবে আমি ভারতসন্তান, ভারতসন্তানের দৃষ্টিতেই আলোচ্য এই বিষয়টি আমি দেখিতে চেষ্টা করিব। ভারত সন্তান ভারত-সন্তান বলিয়াই অন্ধ নয়, তাহার দৃষ্টি সত্যের পথ যুক্তির পথ ছাড়িয়া, কেবল ভুল পথে, অযৌক্তিক শাস্ত্রশাসনের পথেই চলে না। কখনও তা চলে নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সমাজতত্ব, সমাজের রূপ ও প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে অনেক সনাতন নীতির আবিষ্কারও করিয়াছেন। সেই সব নীতি ধরিয়া সমাজ কি ভাবে আপনার স্বরূপ প্রকাশ

করে, করিলে ভাল হয়, এ সম্বন্ধে ও অনেক কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। তাঁহাদের কথাও আমাদের অবজ্ঞার বস্তু নয়। আদরে ও আগ্রহে শিখিবার ও বুঝিবার বস্তু। কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সত্যের সঙ্গে হিন্দুসমাজের মূল সত্যের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কি না, ইহা তাঁহারা তেমন ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। সেইটি আমাদেরই করিতে হইবে। মানবসমষ্টি নানা দেশে নানা আকার ধরিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছে—ভারতেও করিয়াছে, ইয়োরোপেও করিয়াছে। এবং ইয়োরোপে যে আকার এই সমষ্টি অধুনা ধরিয়াছে বা ধরিতেছে, তাহাই ইয়োরোপীয় সুধীবৃন্দ সামাজিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিণতি বলিয়া মনে করেন। অথচ অনেক এমন কঠিন সমস্যা তার মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, যাহার কোনও সমাধান তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, তাঁহারা সমষ্টির প্রকৃতি ও নীতি, সমষ্টি সঙ্গে ব্যষ্টির সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে যে সব কথা বলেন, সেই সব কথার সঙ্গে হিন্দু মনীষীদের কথার তুলনায় একটা আলোচনার চেষ্টাও আমরা করিয়া দেখিতে পারি। আর এই দুই দিকের কথা নাড়াচাড়া করিয়া যে সব সাধারণ নীতি আমরা ধরিতে পারি, তার দিক হইতে বিচার করিলে, অন্যান্য দেশে, বিশেষ ইয়োরোপে সমষ্টিরূপে মানবের অর্থাৎ মানব সমাজের যে বিকাশ হইয়াছে, তার সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় হিন্দুসমাজরূপ সমষ্টির স্থান কোথায় হয়, সেটাও একবার হিসাব করিয়া দেখা যাইতে পারে।

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত—individual এবং social-মানব জীবনের এই দুইটি দিক আছে। একটিও একটিকে বাদ দিয়া থাকিতে পারে না, চলিতে পারে না। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে সম্বন্ধ কি, ইহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি কি, পরস্পরসাপেক্ষ ধর্ম্ম কি, ব্যষ্টির সমষ্টির মধ্যে কি অধিকার, সমষ্টিরই বা ব্যষ্টির উপরে কি দাবী, উভয়ের মঙ্গল সমান না পরস্পর বিরোধী, বিরোধী হইলে কার মঙ্গলের গুরুত্ব বেশী, এই সব কথাই সমাজ তত্ত্বের-কথা, মানব জীবনের বড় বড় সমস্যার কথা। যেমন ব্যষ্টিতে, তেমনই সমষ্টিতে বহু বৈচিত্র দেখা যায়, আবার এই বৈচিত্রের মধ্যেও সমতার লক্ষণও অনেক আছে। কাজেই সমাজতত্ত্বের আলোচনা অতি দুরূহ। শুনিতে ভাল, শুনিলেই সত্য, সুন্দর ও উত্তম বলিয়া মনে হয়, আপাত চিত্তগ্রাহী এমন দুই চারিটা কথা একেবারে axiomatic truth বা সহজ সত্য বলিয়া ধরিয়া নিয়া সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও আলোচনা চলে না। সমাজতত্ত্ব কেন, কোনও তত্ত্বেরই ঠিক আলোচনা সে ভাবে হয় না। এই সব কথা যতই মনোজ্ঞ হউক, বাস্তবিক সত্য কিনা বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তবে তাহার প্রমাণ করিতে হয়। তবে এ সম্বন্ধে তথ্য অনেক সংগৃহীত হইয়াছে, তার আলোচনাও অনেক হইয়াছে। মানবের স্বভাব কি, স্বভাব ধর্ম্ম কি, ভারতে ও ভারতের বাহিরে বহু সুধী এ সম্বন্ধে অনেক মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা যাহারা এখন এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব, ইঁহাদের আলোচনা ও মন্তব্যের সহায়তা অবশ্যই গ্রহণ করিব। বাঁধা তৈয়ারী পথ যতদূর আছে, সে পর্য্যন্ত আলাদা নূতন পথ নূতন করিয়া তৈয়ারী করিবার আবশ্যক কিছু নাই।

ব্যষ্টি মানব সম্বন্ধে এইরূপ কয়েকটি কথা সর্ব্বদাই শোনা যায়।

প্রথম—মানুষ সব সমান, সব এক ঈশ্বরের সন্তান, ভাই ভাই, সকলে সমানভাবে মিলিয়া মিশিয়া সমান ভাই ভাই হইয়া এই পৃথিবীতে থাকিবে। সকলে সকল বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করিবে।

কিন্তু কথাটা যে ভাবে যে মুখে বলা হয়, তাহা ঠিক কি? কথাটার জোরে যে দাবী করা হয়, সে দাবী সত্য চলে কি?

'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, একামেবাদ্বিতীয়ম্'—ইহা ভারতীয় ঋষির মুখেই উচ্চারিত হইয়াছিল। হাঁ, মূলে সব এক; সেই এক হইতেই সব আসিয়াছে, কিন্তু আসিয়াছে কি ভাবে? 'এক আমি বহু হইব', এই বাণীতেই সেই তত্ত্ব নিহিত। একের যে বহুত্বে প্রকাশ্য পরিণতি, তাহাই হইল সৃষ্টি। এই বহুত্ব, একই রকম বহু বস্তুর সমবায় নয়।

ঈশ্বর সকল মানুষকে সমান এক ছাঁচে ঢালিয়া সমান মাপে সব শক্তি দিয়া এই পৃথিবীতে পাঠান নাই। বিশ্ব-ব্যাপী এক চিদ্বস্তুর মধ্যে মহামায়া (বা যে নামেই হউক, কোনও কিছু একটা শক্তি) অশেষ বৈচিত্রে এই জগৎ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, অথবা জগৎরূপে আপনাকে

প্রকাশ করিয়াছেন। জাগতিক সকল বস্তুতে যেমন বৈচিত্র রহিয়াছে, মানবের মধ্যেও তেমনই বৈচিত্র দেখা যায়। কবে এই পৃথিবীতে মানবরূপ জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল, অতি পণ্ডিতও কেহ বলিতে পারেন না। তবে বহু বহু যুগ তার পর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আদিম বর্ব্বরতার যে চিত্র পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন, সে বর্ব্বরতা এখনও এ পৃথিবীর মানবের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। অতি উন্নত মানব সমাজ—এখন যেমন দেখিতে পাওয়া যায়,—অতি প্রাচীন কালেও তেমন ছিল। প্রাচীন সকল জাতিই অতি বর্ব্বর ছিল, আর একটা ক্রমাভিব্যক্তির ধারায় সকলেই উন্নত হইয়া উঠিতেছে, বাস্তবিক তা নয়। কোনও কোনও বিষয়ে আধুনিক উন্নতিশীল জাতিরা প্রাচীন উন্নত জাতি সমূহ যে ভিত্তির পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তার উপরে তাঁহাদের জ্ঞানের বিচিত্র ইমারৎ তুলিয়াছেন। এই ভিত্তি না পাইলে এত সহজে এই ইমারৎ তুলিতে পারিতেন কি? ক্ষেত চষিয়া ধান বুনিয়া সেই ধানের নূতন বীজ হইতে চাউল করিয়া তার ভাত রাঁধিয়া বেশ খাওয়া যায়, ইহা যাঁহারা বাহির করিয়াছিলেন, মানবের আধুনিক কত বিচিত্র উপাদেয় খাদ্যব্যবস্থার গোড়া পত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। বাহাদুরী তাঁহাদেরও বড় কম নয়। এই ভাবে উত্তরাধিকার যারা লাভ করিয়াছে, বড় কম লাভ তারা করে নাই। ভাত পাইয়াছিল, তাই শেষে পোলাও পিঠা সকলে খাইতে শিখিয়াছে। কেবল ভাত নয়, ভাতের বুদ্ধির উত্তরাধিকারও তারা পায়। সেটা আরও বড় কথা। প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণ শূন্যের আবিষ্কার করিয়া দশমিক-গণনা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান গণিত বিজ্ঞান খুবই উন্নত, কিন্তু এই উন্নতির প্রধান ভিত্তি পড়িয়াছিল একেবারে কাচামাটিতে এই দশমিক-গণনায়। কোনও কোনও বিষয়ে আবার প্রবীণকে নবীন এখনও অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। মিসরের পিরামিডের মত অমন আর একটি জিনিশ কি আধুনিক যুগে কোথাও কেহ গড়িয়াছেন?

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

এই যে বাণী প্রাচীন ভারতের ঋষির মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহার অপেক্ষা বড় কোনও কথা আধুনিক জগতে কেহ কি কখনও বলিতে পারিয়াছেন কি? বুদ্ধি বা শক্তিতে গ্রীক্ প্রভৃতি প্রাচীন কোনও কোনও জাতি যে আধুনিক ইয়োরোপীয় জাতি অপেক্ষা উন্নত ছিলেন, অনেক বড় পণ্ডিত তাহাও স্বীকার করেন।

আর এই যে উন্নতির গর্ব্ব—আধুনিক বিশেষ কোনও কোনও জাতিকে ইহা ভৌতিক শক্তিতে অতি শক্তিমান্ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জগদ্বাসী মানবজাতির সুখশান্তি ও মঙ্গল তেমন কিছু বাড়াইয়াছে কি? নিজেদের মধ্যেও সুখশান্তি ও মঙ্গল কিছু প্রতিষ্ঠা করিয়াছে কি? ঘরে বাহিরে কেবল ত বিকট একটা আসুরিক লোভেরই নির্ম্মম কাড়াকাড়ি চলিতেছে! মানবের মঙ্গলপ্রতিষ্ঠা যদি মানবসমাজের উন্নতির প্রধান লক্ষণ হয়, তবে এই উন্নতিকে ঠিক উন্নতি বলিতে পারা যায় কি?

যাক, কথায় কথায়—অনেক দূর বোধ হয় বিপথে গিয়া পড়িলাম। বলিতেছিলাম, যে হিসাবেই ধরা যাউক্, অতি উন্নত আবার অতি অবনত—আর মধ্যবর্ত্তী যত রকম স্তর হইতে পারে, সব রকম মানব এই মানবসমাজে প্রাচীন কালেও ছিল, এখনও আছে। মানবসমাজ কথাটাই বোধ হয় ঠিক কথা হয় না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় মানবের বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞান শক্তি আচার নিয়ম পারিবারিক প্রভৃতি গুণে এবং দৈহিক রূপে এতই পার্থক্য যে এক সমাজ এই কথাটাই বলা তাহাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় না। আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া মালয় দ্বীপপুঞ্জের কৃষ্ণকায় কুরূপ আদিম বর্ব্বরজাতি সমূহ, আর শেতাঙ্গ সুরূপ সুসভ্য ইয়োরোপীয়—এই দুইটি চরম দৃষ্টান্তের কথাই সকলে ভাবিয়া দেখুন। ইহাদের সমান এক সমাজভুক্ত বলিয়া কেহ মনে করিতে পারেন কি?

বিভিন্ন জাতির মধ্যেই যে কেবল এই বৈষম্য তা নয়। এক জাতির মধ্যেও অশেষ এইরূপ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। রূপে গুণে চরম উন্নতির ছাপ, আবার একেবারে বর্ব্বরতার ছাপ,—পরন্তু এই দুই চরমের মধ্যবর্ত্তী অশেষ রকম ছাপ এক দেশে এক সমাজে, এক নগরবাসী ও গ্রামবাসী লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মানবজাতির প্রকৃত অবস্থাটা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এবং মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে

এই সত্য আমাদের স্বীকার করিয়া নিতেই হইবে, যে প্রকৃত পক্ষে মানুষ সব সমান নয়। জাতিতে জাতিতে কেবল নয়, প্রত্যেক জাতির মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও বিচিত্র বৈষম্য বর্ত্তমান। দুইটি জাতিতে বা দুই ব্যক্তিতে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি, পরিমার্জ্জনা, চরিত্র, আচার নিয়ম ও জীবনযাত্রার প্রণালীতে যেখানে পার্থক্য বেশী, সেখানে একদেশবাসী বা পরস্পর প্রতিবেশী হইলেও সমান সামাজিক সম্বন্ধে তারা মিলিতে মিশিতে পারে না। এই বৈষম্য যতদিন রহিবে, ততদিন তারা তা পারিবে না,—কিন্তু বৈষম্য যদি দূর হয়, মিলিবার পক্ষে স্বাভাবিক কোনও বাধা অবশ্য থাকে না। কোনও কোনও বিশেষ কারণে, কোনও কোনও বিষয়ে কিছু বাধা মানিয়া চলিলেও সাধারণ বান্ধবতার সম্বন্ধে, কর্ম্মের সহযোগিতায় কোনও বাধা কেহই মানে না। এ দেশের ভদ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয়ই শিক্ষায় দীক্ষায়, শক্তিতে ও পরিমার্জ্জনায় সমান, প্রচলিত প্রথা মানিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধে তাঁহা কথনও আবদ্ধ হয় না বটে,—কিন্তু আর সকল বিষয়ে অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধবতা, সকল কর্ম্মে সমান সহযোগিত্ব ইঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। অশিক্ষিত অজ্ঞ হীনবৃত্তিক ব্রাহ্মণের সঙ্গেই বরং শিক্ষিত পরিমার্জ্জিত উচ্চবৃত্তিক ব্রাহ্মণ একাসনেও বসিতে চান না। কিন্তু সমশিক্ষিত, সমপরিমার্জ্জিত সমবৃত্তিক কায়স্থের সঙ্গেও এক ফরাসে এক তাকিয়ার গায়ে গায়ে গড়াগড়ি করেন; এক হুঁকায় তামাক খান, এক পাত্রে আহারও অনেকে করেন। সমানে সমানে এই সমতা, আবার বড়তে ছোটতে এই পার্থক্য, ইহা স্বাভাবিক, হাজার ভেদের মধ্যেও ইহা থাকিবে, হাজার সাম্যবিধির মধ্যেও ইহা দেখা দিবে।

তবে সমতা কি সমান অধিকার মানবে মানবে কি একেবারেই কোথাও নাই কি থাকিবে না? হাঁ, আছে, থাকিবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও বিষয়ে থাকিবে, থাকা উচিত। তবে যেখানেই থাকিতে পারে, স্বাভাবিক এই নীতির সঙ্গে অবিরোধী হইয়াই থাকিতে পারে।

রাজদ্বারে সমান অপরাধে বড়ছোট সকলেরই বোধহয় সমান বিচার, সমান দণ্ড, হওয়াই উচিত। বরং বড় যে তার দণ্ড কিছু বেশী হইলেই বোধ হয় ভাল হয়, কারণ, শিক্ষা দীক্ষায় ও বুদ্ধি-বিবেচনায় সে বড়, অপরাধ তার পক্ষে অধিক নিন্দনীয়। তবে এরূপ একটি মতও আছে যে নিন্দনীয় বলিয়াই ছোটর সঙ্গে তাকে সমান দণ্ডনীয় করা ঠিক নয়! বড় যে, মানী যে, লোকনিন্দা, সামাজিক গ্লানিই তার পক্ষে মরিবার বেশী হইয়া থাকে। হীন যে, কঠোর দণ্ডব্যতীত তাহাকে সুনীতির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখা যায় না। ইহার একটা মীমাংসা করিয়া ফেলা বড় সহজ নয়। দুই দিকেই বলিবার অনেক কথা আছে।

আরও একটি বিবেচনার কথা আছে। ছোট যে, সে ছোট যতদিন থাকিবে, বড় কেহ তাহার সঙ্গে সমানভাবে মিশিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া বড়র পক্ষে ছোটকে চিরকাল ছোট করিয়া রাখিবার প্রয়াসও সঙ্গত হইতে পারে না। অনেক ছোট এমন আছে—যাহারা স্বভাবতঃই ছোট, চিরকাল ছোটই থাকিবে। যেমন আফ্রিকার অষ্ট্রেলিয়ার মালয় দ্বীপপুঞ্জের অনেক আদিম বর্ব্বর জাতি। কত হাজার বৎসর ধরিয়া কত কত বড় জাতি কত উন্নত বিদ্যার, উন্নত শক্তির পরিচয় দিলেন,—কত বিদ্যা, জ্ঞান, উন্নত ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইল, কিন্তু তারা সেই আদি কাল হইতে এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে। কিন্তু আবার এমন ছোটও আছে, যারা হয়ত কোনও বাধায় বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই, সে বাধা দূর হইয়াছে, বড় হইয়া এখন উঠিতে পারে, তার প্রয়াসও করিতেছে। বড় হইবার শক্তি ও সুযোগ যেখানে আছে, হাজার ছোটরও বড় হইবার অধিকার সেখানে আছে। এই অধিকার তারা ভোগ করিবে। বড়রা আপনাদের স্বার্থের জন্য তাদের চাপিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু রাখা অন্যায়।

মানবে মানবে যে সমতা, যে সমান অধিকার, তাহা এইখানে—এই পর্য্যন্ত। তাহার বেশী সাম্য মানিয়া নেওয়া যায় না।

এইখানে আরও একটি কথাও আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক। কি ব্যক্তি, কি জাতি—যারা বড় হয়, হইয়াছে বা হইতে পারে, সব যে ঠিক একই দিকে, একই ভাবে, একই মাপে বড়, তা নয়। ইহার মধ্যেও অশেষ বৈচিত্র আছে। কোনও ব্যক্তি বা জাতি সমান ভাবে সকলদিকে বড় হয় না,—এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায় নাই। যারা যে দিকে, যে ভাবে, যে মাপে বড়, তাদের অধিকারও তদনুরূপ হইবে। যে দিকে, যে ভাবে,

যে মাপে যাদের শক্তি বিকাশ হয় নাই, সেই দিকে সেই ভাবে, সেই মাপে তাদের কোনও অধিকার থাকিতে পারে না। ধরিয়া দিলেও সে অধিকার তারা পরিচালনা করিতে পারে না,—বিভ্রাটও অনেক ঘটে। সুতরাং বড় একটা বৈষম্য জাতিতে জাতিতে, এমন কি এক জাতিভুক্ত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই দেখা যায়। এইসব কারণেও এক সমাজের মধ্যেই নানা রকম শ্রেণীবিভাগ প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই ঘটে। মুখের কথায় সমতা মানিলেও কার্যতঃ প্রকৃত সমতা কিছু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় না।—

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও একথা স্বীকার করেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে অভিজাত সম্প্রদায়েও জনসাধারণে বড় অস্বাভাবিক ও সকল সুনীতির বিরুদ্ধ একটা বৈষম্য ফরাসী সমাজে বর্ত্তমান ছিল, উচ্চতর সম্প্রদায়ের অসঙ্গত অধিকারের ও ক্ষমতার পীড়নে দরিদ্র জন সাধারণের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। বৈষম্য যেমন উৎকট ছিল, তার বিরুদ্ধে সাম্যের অভ্যুত্থানও তেমনই উৎকট হইয়া উঠিয়াছিল। প্রমত্ত জনসাধারণ সকল স্বাভাবিক বৈষম্য, সকল উচ্চতা নিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সকলকে অস্বাভাবিক একটা সমতার স্তরে আনিয়া ফেলিতে চাহিল। আর সে যাহা ঘটিয়া ছিল, সব ভীষণ একটা প্রতিশোধেরই মত। বহু কাল ধরিয়া অভিজাত ফরাসী সম্প্রদায়ের উচ্চতর শক্তি ও ভোগাধিকার যে পীড়ন দারুণ জনসাধারণের উপরে করিয়াছিল, জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ভাবে বিদ্রোহী হইয়া একপুরুষেই যেন সুদে আসলে সব পীড়ন শোধ করিয়া তখন নিতে চাহিয়াছিল।

যাহা হউক এই উত্তেজনার অবসানে ধীরবুদ্ধি সকলেই বুঝিতে পারিল, এরূপ উৎকট সাম্য—মুড়ী মিছরীর একেবারে সমান দর—চলিতে পারে না। তবে রাষ্ট্রীয় সংস্থান ও তার বিধি ব্যবস্থায় সকলের সমান দাবী থাকা উচিত, ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইয়োরোপে ক্রমে সাম্যের এইটুকু দাবীই মাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। তবে রাষ্ট্রতন্ত্রে এ দাবী শুধু সমান ভোটের। এটা ঠিক সমীচীন হউক কি না হউক, কোনও মতে চলিতে পারে যত দিন অপরিপক্কবুদ্ধি জনসাধারণ বিজ্ঞ বিচক্ষণ উচ্চশ্রেণীভুক্ত নায়কগণের পরিচালনাধীনে থাকে। কিন্তু এ পরিচালনা যদি তারা অবজ্ঞা করিয়া স্ব-প্রধান হইয়া উঠে, নিজেরাই ইহাদের বিরুদ্ধে একটা দল বাঁধিতে পারে, তবে তার ফল যে বড় শুভ হয়, তা বলা যায় না। ইহার সূচনাও যে অধুনা না দেখা যাইতেছে তা নয়।

আর সমতা আছে, আইনে। সকল অপরাধে সকলের সমান বিচার সমান দণ্ড হয়। ইহাতে মোটের উপর ভাল বই মন্দ এমন কিছু হয়, তাহা বলা যায় না। এই দুইটি বিষয় ব্যতীত আর কিছুতেই কোনওরূপ সাম্য ইয়োরোপে ঘটে নাই, আর তা ঘটিতেও পারে না। একথা সকলে এখন বুঝিয়াছেন এবং স্বীকারও করিতেছেন। এই পর্য্যন্ত তাঁহারা বলেন, সমাজে সকলেই যোগ্যতানুসারে যে যাহা পাইতে পারে তাই পাইবে, তার তাহা পাওয়ার পথে কোনওরূপ বাধা থাকা উচিত নয়। একথায় কোনও দেশের কোনও সমাজের লোকের এমন কোনও আপত্তি চলে না। সমাজের বা সমষ্টির মোটে মঙ্গল বজায় রাখিয়া ব্যষ্টি মানব তার যোগ্যতা অনুসারে ভাগ্যলাভ করিবে, কর্ম্মানুযায়ী ফলের অধিকারী হইবে, ইহার বিরুদ্ধে কেইবা কি বলিতে পারেন—ইহা ছিল, আগেকার কথা।

Evolution বাদের আবিষ্কার ও প্রচারের পর কেবল ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে নয় সমষ্টিতে সমষ্টিতেও মানবের বৈষম্য যে স্বাভাবিক নিয়ম, ইহাই একরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে।

মানব সব সমান, ভাই ভাই, সকলের সমান অধিকার, এই সব কথাও ছোট কথা, তুচ্ছ করিবার কথা নয়, মহাপ্রাণ মানবপ্রেমিক মহাপুরুষদের মুখেই এই সব বাণী উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কখন কোন অবস্থায়, কেন হইয়াছে, অপেক্ষাকৃত উন্নত ও শক্তিমান্ যাঁহারা এবং উচ্চতর অধিকার-ভোগে যাঁহারা পুরস্কৃত হইয়াছেন, হীনতর ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-সমূহের আনুগত্যে ও সেবায় যাঁহারা অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা অনেক স্থলেই কিছু বেশী লোভী ও স্বার্থপর হইয়া পড়েন,—যাহারা ছোট আছে তাহাদিগকে ছোট করিয়া রাখিয়াই বড়র বড় সুখটুকু বড় ভোগটুকু চিরকাল দখল করিয়া রাখিতেই অনেকে চান। মানব স্বভাবের বড় একটা দুর্ব্বলতা এই, যে বিষয়েই যখন বড়র ও প্রবলের এই স্বার্থলিপ্সা ছোট ও দুর্ব্বলকে বড় পীড়ন করিয়াছে, বড় ছোট তাকে করিয়া রাখিয়াছে, তখনই বিশ্বকরুণার বিশ্বপ্রেমের অভিমানী ভগবান্ যিনি, এই করুনার এই প্রেমের অবতার হইয়াই যেন মানব সমাজে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, অথবা করুণার ও প্রেমের

ঋষি প্রেরণ করিয়াছেন,—তাঁহারা করুণার ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছেন। স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রেমের পীড়নের বিরুদ্ধে করুণার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রবল উচ্ছ্বাস মানবসমাজে যাহারা দিয়াছেন। ভেদ যখন স্বাভাবিক নিয়মের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, সাম্যমৈত্রী প্রবল ভাবে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। সমাজে বড় একটা উলট পালট হইয়াছে, আবার ক্রমে ধীরে ধীরে যথাসময়ে সমাজ তার স্বাভাবিক প্রকৃতিতে স্থিত হইয়াছে। ভারতে বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ইহার বড় দুইটি দৃষ্টান্ত। উভয়েই আধ্যাত্মিক সাধনায় আচণ্ডাল মনুষ্যের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কারণ ভারতের সমাজবিধানে তখন নিম্নতর বহু সম্প্রদায় এই সাধনার উচ্চ অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিল। যে প্রেরণা তাঁহারা আনিয়াছিলেন, দেশে তাহারা ক্রিয়া চলিতে থাকে। বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে শূদ্রের অধিকার ভারতে লুপ্ত হইয়াছিল,—শূদ্র বড় হীন হইয়াই পড়িতেছিল। সকল বর্ণকে সমান সাধনার অধিকার দিবার জন্য তখন বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক শৈব ও শাক্তধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়। মোট তান্ত্রিক ধর্ম্মেরই লক্ষ্য ও গতি এই দিকে। ব্রাহ্মণ-শূদ্র নর-নারী সকলেরই তান্ত্রিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদনে সমান অধিকার। ভারতে তখন শূদ্রের নিম্নে, শূদ্রেরও অস্পৃশ্য, আরও একটি সম্প্রদায় হইয়াছিল। অন্ত্যজজাতি নামে ইহারা পরিচিত। চতুর্ব্বর্ণের হিসাবে ইহারা অন্ত্য শেষ বা চতুর্থ বর্ণ হইলেও শূদ্রদের হইতে ইহাদের অবস্থা এতই তফাৎ ছিল যে, তন্ত্রশাস্ত্র ইহাদের পঞ্চম বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন, তন্ত্র মতের উচ্চতম সাধনায় ব্রাহ্মণাদি পাঁচ বর্ণের সকলেরই সমান অধিকার। এই সব মত যাঁহারা প্রচার করেন, এই সব মতানুসারে ধর্ম্মসাধনার পদ্ধতি যাহারা দেশে প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদের নাম সকলের পাওয়া যায় না। কিন্তু নামে আসে যায় কি? নামযশের প্রয়াসী তাঁহারা ছিলেন না, তাঁহাদের কর্ম্মের ফল সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আমরা দেখিতে পাইতেছি। সাধনার এই সমান অধিকার সত্ত্বেও, সামাজিক সম্বন্ধে বহু বৈষম্য হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান। এখন এই বৈষম্য কতটা স্বভাবিক, কতটা অস্বাভাবিক, কতটা অপরিহার্য্য, কতটা বা পরিহার্য্য, তাহার আলোচনার মধ্যে আপাততঃ যাইব না।

ইয়োরোপেও ভেদের বিরুদ্ধে সাম্যের প্রবল অভ্যুত্থান মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপে ভেদের প্রকৃতিতে এবং তার বিরুদ্ধে সাম্যের দাবীতে এবং সংগ্রামের ধরণে আমাদের সঙ্গে বড় একটা পার্থক্য আছে। ভারতে সমাজের শীর্ষস্থানের অধিকারী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ধর্ম্মগুরুত্বের ও সমাজনেতৃত্বের দাবী করিয়াছেন। কিন্তু পার্থিব ঐশ্বর্য্য, রাষ্ট্র শাসনের অধিকার, ভোগের আড়ম্বর এ সব কিছুই তাঁহারা চান নাই! বরং অশনে বসনে শয়নে ও বাসস্থানে অতি দীনতাই ছিল তাঁহাদের জীবনের আদর্শ। দেববৎ পূজা অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে তাঁহারা পাইয়াছেন।—নিম্নতর সম্প্রদায় সমূহের উপর তাঁহাদের এই উচ্চপদ ও সম্মান বজায় রাখিবার জন্য কঠোর সামাজিক বিধি তাঁহারা যাহাই করিয়া থাকুন, কোনও সম্প্রদায় তাহাতে উচ্চ তত্ত্বানুশীলনে ও উচ্চতর ধর্ম্মসাধনায়ই বঞ্চিত হইয়াছে, পার্থিব সম্পদলাভে বা সুখসচ্ছন্দতা ভোগে বঞ্চিত বড় হয় নাই, বরং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের বৃত্তি ও কর্ম্মের ব্যবস্থা তাঁহারা এমন ভাবেই তার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে কেহই না অন্নে বঞ্চিত হয়!

ভারতে ভেদের বিরুদ্ধে সাম্যের যখনই যে অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহার লক্ষ্য হইয়াছে আধ্যাত্মিক সাম্য, পার্থিব নয়।

কিন্তু ইয়োরোপে বড় ভেদ যাহা যখন হইয়াছে, তাহা পার্থিব সুখসম্পদভোগের অধিকার লইয়া, আর ভেদের বিরুদ্ধে সাম্যের যে বিদ্রোহ হইয়াছে, তাহারও লক্ষ্য হইয়াছে পার্থিব বিষয় ভোগের অধিকারে সমতা সংস্থাপন। ফরাসী বিপ্লব ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত। তার আগেও এরূপ, অভ্যুত্থানের প্রয়াস অনেক হইয়াছে। তাহারও লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ এই দিকে। বর্ত্তমানে Socialist ও Bolshevic অভ্যুত্থানের লক্ষ্যও এই। সামাজিক ভেদে বিষয়ভোগের অধিকারভেদ চিরদিনই ইয়োরোপে বড় কঠোর ছিল, বড় পীড়ন তাহা দরিদ্রকে করিত। সাম্যের সকল অভ্যুত্থানও তাই এই লক্ষ্যের দিকেই ঘটিয়াছে। একমাত্র ব্যতিক্রম Reformation যাহা দেখা যায়। কিন্তু এই অভ্যুত্থানও ঘটিয়াছিল, রোমীয় চার্চ্চের অত্যধিক ধনলিপ্সা ও পার্থিব বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা, পার্থিব শক্তি অধিকারের প্রয়াস হেতু। রোমীয় চার্চ্চের বা রোমীয় যাজকমণ্ডলীর

অর্থশোষণ চেষ্টায়, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অতিরিক্ত আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, প্রজামণ্ডলী, এমন কি রাজারা পর্য্যন্ত একেবারে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই প্রধানতঃ প্রথমে রোমীয় চার্চ্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা হয়। তাহা হইতেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়।

ভেদের প্রকৃতি এইরূপ, তার বিরুদ্ধে সাম্যের বিদ্রোহও এইরূপ। তাই এই সংগ্রামে বড় রক্তপাত, অশেষ রকম অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ইয়োরোপে দেখা গিয়াছে। কিন্তু ভারতে এই সংগ্রামে প্রাণহিংসার বিকটলীলা কখনও প্রকট হয় নাই। যখনই সংগ্রাম ঘটিয়াছে, পার্থিব সম্বন্ধে দেশের শান্তিও বিক্ষুব্ধ হয় নাই।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুর আশ্চর্য্য Toleration এর প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই Toleration এর বড় একটি কারণ ইহা। সামাজিক সংগ্রাম এদেশে যখন ঘটিয়াছে, ঘটিয়াছে আধ্যাত্মিক সাধনার অধিকার ও প্রণালী লইয়া, কাহারও পার্থিব স্বার্থে আঘাত করে নাই, রাষ্ট্রীয় সংস্থান বিক্ষুব্ধ করে নাই। ইহাতে যে পৈশাচিক রোষ ও প্রতিহিংসার বৃত্তি জাগ্রত হয়, তাহাও ভারতে হয় নাই।

অবশ্য দুই একটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও যে না পাওয়া যায়, তা নয়। কিন্তু সাধারণ অবস্থা যাহা ছিল, সর্ব্বদা যাহা হইত, তার কাছে এই ব্যতিক্রম একেবারেই নগণ্য।

যাহা হউক, সাম্যমতের অতিরিক্ত প্রচারে ও দাবীতে সামাজিক মঙ্গল তেমন বেশী ব্যাহত হয় না। কারণ স্বাভাবিক বৈষম্যের সত্যকে একেবারে চাপিয়া তাহা রাখিতে পারে না। সে সত্য অস্বাভাবিক সাম্যের উপরে অচিরেই আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। সাম্য যে ক্ষেত্রে যতটুকু স্বাভাবিক সেই ক্ষেত্রে ততটুকুই চলিবে, তার বেশী চলিতে পারে না। কোথাও এ পর্য্যন্ত চলে নাই।

কিন্তু সাম্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্যষ্টি মানবের স্বাধীনতার যে দাবী করা হয়, সেটা এমন সহজ একটা কথা নয়, কেবল সমষ্টির নয়, ব্যষ্টির হিতাহিত ও বহু পরিমাণে উহার উপরে নির্ভর করিতেছে।

এই স্বাধীনতা বা freedom—হইতেছে freedom of thought, freedom of conscience আর freedom of acion,—অর্থাৎ, প্রত্যেক মানবের প্রত্যেক বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে চিন্তা ও বিচার করিবার অবাধ অধিকার, ভাল মন্দ কি তাহা নিজে বুঝিয়া চলিবার অবাধ অধিকার, আর নিজের স্বার্থ রক্ষার ও উন্নতির জন্য নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করিবার অবাধ অধিকার। 'অবাধ' কথাটা ব্যবহার করিলাম, কারণ আর কোনও উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পাইলাম না। 'যথাসম্ভব অপ্রবাধ' বলিলে বোধ হয় ঠিক হইত। কারণ, এই দাবী যাঁহারা করেন, তাঁহারাও সমষ্টিরূপ সমাজকে একেবারে বাতিল করিয়া দেন না। তবে ইঁহাদের মতে ব্যষ্টি মানবের কথাই বড় কথা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সকল শক্তির সকল বৃত্তির পূর্ণতা এই পার্থিব জীবনে লাভ করিতে হইবে,—মানবজীবনের পূর্ণ সার্থকতাই নাকি ইহাতে। তবে সমাজও একটা রহিয়াছে, সমাজ হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির অনেক উপকার পাইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তির বহুস্বার্থ সমাজ রক্ষা করিতেছে, সুতরাং সমাজের মঙ্গল ও স্বার্থরক্ষার জন্য নিতান্ত যতটুকু প্রয়োজন, আপন স্বাধীন ইচ্ছামত চলিবার পথে ততটুকু বাধা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানিতে হইবে। ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় তাহা না মানে, সমাজশক্তির বলে তাহাকে বাধা দিবার অধিকার আছে। আপন স্বার্থরক্ষার জন্য সমাজ যে সব বিধি নির্দ্দেশ করে, সে সব বিধি ব্যক্তি কেহ লঙ্ঘন করিলে সমাজ তাহার দণ্ডবিধানও করিবে।

এখন এই সমাজের স্বার্থ কি, তার ব্যাপ্তি কতদূর? এই খানেই হইল শক্ত গোলের কথা। এই মতবাদী যাঁহারা, তাঁহারা বলেন, ব্যষ্টিহিসাবে সকলেরই সমান স্বাধীন ইচ্ছামত চলিবার অধিকার আছে, কিন্তু প্রত্যেককেই এমন ভাবে চলিতে হইবে যাহাতে তার কোন কার্য্যে অন্যের সমান অধিকার পরিচালনায় বাধা উপস্থিত না করে, একের স্বার্থসাধন চেষ্টা, সমান স্বাধীন অন্যের সমান স্বার্থে কোনও অনিষ্ট না করে,—এক কথায় প্রবল দুর্ব্বলের উপরে অন্যায় পীড়ন কিছু না করে। আরও যে সব বিষয়ে সকলের সমান স্বার্থ রহিয়াছে, সেই সব রক্ষা করিতে, তার উন্নতি সাধন করিতে, আপন আপন স্বার্থ যার যেটুকু ত্যাগ করা প্রয়োজন তাহাও করিতে হইবে। কিন্তু অন্যের সমান স্বাধীনতা ব্যাহত না হয়, আর সকলের সমান স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, এইটুকু মাত্র দেখিয়া

ব্যক্তিগত অন্যান্য সকল কর্ম্মে ও ভোগে পরিণতবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তি আপন ইচ্ছা মত চলিবে, ইহাতে সমাজের কোনও বাধা থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক মানবের civil ও political responsibilitlies & duties বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারই নিয়ন্তৃত্ব মাত্র সমাজের অধিকারে থাকিবে। moral duties যাহা, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এইটুকু কেবল দেখিতে হইবে, তার কোনও আচরণ সাধারণের বিরক্তিকর না হয়, অর্থাৎ public nuisance একটা সে না হইয়া উঠে। অপরিণত বয়সে সমাজ তার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া, যতটুকু যাহা করিতে পারে, তাই মাত্র করিবে। পরিণত বয়সে এ সব ব্যাপারে তার অধিকার কিছু নাই।

এখন কথা হইতেছে, সমাজের স্বার্থ ও মঙ্গল কি মাত্র এইটুকু? প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন তার শক্তির পূর্ণতা লাভ করিবার অধিকার আছে, সমাজেরও তাহা থাকিতে পারে না কি? ব্যক্তির যেমন একটা জীবন ও জীবনের লক্ষ্য আছে, সমাজেরও তাহা আছে কি না? সেই জীবনের সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের সম্বন্ধ কি? তার স্বার্থে ও ব্যক্তির স্বার্থে সীমা রেখা কোথায় পড়িবে? প্রত্যেক ব্যক্তির civil আর political responsibilities and duties মাত্র আদায় করিলেই সমাজের মঙ্গল পূর্ণ হয় কি না, না তার moral জীবনের উপরেও সমাজের কোনও দাবী আছে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত মঙ্গলের পক্ষেও তার প্রয়োজন আছে কিনা।

অনেক কথা বলিতে হয়, এই প্রবন্ধে সে আলোচনার মধ্যে আজ আর যাইব না, প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, একদিনের পক্ষে হয় ত বড় বেশী ভারীও হইয়া উঠিবে।

পরে এ সম্বন্ধে যথা সাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

পল্লীরাণী

পরশগীতিগন্ধে যাহার দিত নবীন জীবন আনি,
রাত্রিদিনে সাঁজ বিহানে শুনাত যে আশার বাণী
তুই কি মা সেই পল্লীরাণী?

যার নিরমল পীযুষ পিয়ে উঠত জীয়ে "জ্যান্তে মরা"
সুখে দুখে সবার তরে নয়ন যাহার অশ্রুভরা
তুই কি মা সেই শ্রান্তিহরা!

ভোরের বেলা প্রাঙ্গনে যার সপ্তরঙের ফুটত ফুল
পদ্ম ফোটার আগে শিশুর উন্মিলিত নেত্রকুল
সব যে হ'লো আজকে ভুল!

মন্দিরে যার সাঁজের বেলা উঠত কাঁসর ঘণ্টারোল
প্রদীপজ্বলা তুলসীতলা মুখর করি বাজত খোল
স্তব্ধ সে যে পূর্ণ কোল।

গরল ভরা আজ পয়োধর পরাণ হবে ওষ্ঠে ছুঁলে
অলিন্দে আর নাই আলিপন জ্বলে না দীপ বেদীর মূলে
জট ধরেছে রুক্ষচুলে,—

তড়াগে নাই হাঁসের খেলা বাজেনা আর বাঁশের বাঁশী
শ্মশান মা তোর সাধের ভূমি চারিদিকেই ধ্বংশ রাশি
জাগায় প্রেতের অট্ট হাসি।

শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্র।

পথের মাঝে

মনে পড়ে সেই অতীতের কথা—সেই শৈশবের স্বপন ও খেলা ধূলার মাঝ খান দিয়া জীবনের নির্ম্মল গোমুখী-ধারা তরতর ভাবে নাচিয়া বহিয়া গিয়াছিল। কতকাল চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে অতীতের স্মৃতি তাহার আপন গোপন

স্থানটী দখল করিয়া আছে। সন্ধ্যারপ্রত্যে প্রকৃতির লীলা প্রাঙ্গে মনে যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও মোহাবেশের সঞ্চার হইত, বনের পুষ্পলতায় যে অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যের সৌন্দর্য্য বিরাজ করিত, মলয়ের সে মদিরতা, মনের ভবিষ্যৎভাবনা-রাহিত্য, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের একান্ত স্ফূর্ত্তির কাহিনী এখন কেবল মাত্র কল্পনার এক সুখময় বিশ্রাম স্থল,—স্মৃতির আবেশময় জাগরণের সুখোন্মেষ মাত্র। বালক বালিকাগণে মিলিয়া মিশিয়া একত্র বিচরণ, খেলাধূলা, বনফুল সংগ্রহকরা—সে এক অনাবিল ও একটানা জীবনগঙ্গার বাল্যধারার উচ্ছল প্রবাহ বহিয়াছে! কালে সে ধারা আরও অগ্রসর ও বিশাল হইবে; মধ্যপথে অন্যান্য প্রবহমান ধারার সঙ্গে মিলিয়া পূর্ণগতিতে সাগরের দিকে ছুটিয়া যাইবে!

ক্রমে যতই বয়স বাড়ে, মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ হয়। কর্ত্তব্যের ধারণা জন্মে। তখন কর্ম্মজগৎ আপনা হইতেই দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়! বাল্যের স্নেহপোষিত ভাব রাশি বয়সে অতি রমণীয় হইয়া দেখা দেয়। কত আশা, কত উদ্যম, কত অনুরাগ যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়ায়। মুক্ত জীবনতটিনী সকল সৌন্দর্য্য, সকল সুষমা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকল ঘাট দিয়াই বহিয়া যায়। এই অনাবিল মুক্ত ধারার স্রোত কোথা হইতে আইসে?

মাতৃ স্তন্যপানের মধ্যে যে অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকি, যাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতার হৃদয়ের অনুপম মাধুর্য্য এই বৈচিত্র্যপূর্ণ, বর্ণ, গন্ধ ও রাগিনীময় জগতের সঙ্গে প্রাণকে একসুরে বাঁধিয়া দেয়,—সেই অনুপম সুধাধারাই আমাদের বন্ধহীন জীবন-যাত্রার মূলে রহিয়াছে। গগনে যে প্রথম চাঁদ দেখিয়াছি, তাহাতে মাতৃহৃদয়ের সোহাগের আবেগমাখা একটা নিদর্শন, স্নেহের সম্পদ্ ও হাসির আলোয় দীপ্তিমান্! তারার মালা,—সে যেন আমারি সুখশয়নের শিয়রে রাখা প্রীতির মালা! জলের তরঙ্গ যেন মাতার স্নেহের উচ্ছল আভাস,—তাই তটিনীকে আপনার বলি; তাহার অস্ফুট গুঞ্জনে সংশয় শুদ্ধ হয়, হৃদয় শান্ত হয়। মাতৃ হৃদয়ের চির নবীন ও অক্ষয় সুষমাই যেন বনরাজিতে ব্যাপ্ত; তাই তাহার শ্যামলতা মনোহর। মানুষকে ভালবাসি, কারণ এই অতুল স্নেহরস সকল প্রাণেই অমৃত ঢালিয়া দিয়াছে। তাই আমরা অমৃতের পুত্র; বন্ধন-হীনা, শ্যামা প্রকৃতির সঙ্গে একযোগে কালের মধ্যে অবস্থান করি!

ক্ষুদ্র, বদ্ধ, চেতনাহীন, উচ্ছৃঙ্খল—এরূপ সত্ত্ব অসম্ভব। যে পবিত্র মন্দাকিনীধারা এ জীবনের প্রাণ-স্বরূপ, তাহার নিকট একমাত্র অমৃতই সত্ত্বা, উহাই তাহার লক্ষ্য। বর্ণ, গন্ধ, সঙ্গীতের মোহ, মোহের আবিলতা সঞ্চারিণী শান্তোজ্জ্বল কিরণধারার নিকট আপনাকে ধরা দিয়া হার মানে। উদ্দাম পবন, ধীর শান্তমলয়ের ভাব ধারণ করে! গন্ধের মদিরতা ঘুচিয়া গিয়া আত্মারামের সুখকর সুরভিতে গিয়া পৌঁছে। বর্ণের কপটতা দূর হইয়া সৌম্য স্নিগ্ধ মূর্ত্তিকে ধারণার গোচর করে, প্রাণের নিকুঞ্জে বাঁশরীর রবে রাগিণীর মাধুর্য্যের বিকাশ হয়। তাহাতে সৎ, চিৎ, ও আনন্দের সত্ত্বার অভিষেক হয়।

মনে পড়ে যৌবনের কোন এক উদাস সন্ধ্যার দিনের কথা। নিখিল জগতে থাকিয়া থাকিয়া পবনহিল্লোল ভাসিয়া আসিতেছে,—তাহাতে কত বিচিত্রতার খেলা, ভাবের চাঞ্চল্য, দৃষ্টির তন্দ্রালসময় বিভ্রান্তপ্রয়াস মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া যাইতেছে! আকাশে রংএর মদিরতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে! থাকিয়া থাকিয়া বীণার ঝঙ্কারের অন্তরালে বিভোর ভাবরাশি উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে যে বকুলশাখা নুইয়া রহিয়াছে, অজ্ঞাত পদ-সঞ্চারে সেখানে উপস্থিত হইলাম,—মলয়ের গন্ধ মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল, ফিরিয়া দেখি সৌন্দর্য্যের মোহন রূপে সকল সুষমা, লাবণ্য ও মাধুর্য্যের সমন্বয়ে একটী জীবন্ত প্রতিমার সঞ্চার হইয়াছে,—তাহাতে কত আলো, কত গরিমার বিকাশ! মোহের উদাসরাগিণী মনোমধ্যে বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া আসিতে লাগিল। শেষ স্পন্দন যেন প্রাণকে আকুল করিয়া একটা অতৃপ্তি, একটা আকাঙ্ক্ষা একটা অভাবের সাড়া দিতে লাগিল। হৃদয়ের মুক্ত উদার ভাবের মধ্যে একটা স্তব্ধতা আসিয়া দাঁড়াইল। একটা সীমাবদ্ধ সত্ত্বা যেন মাথা তুলিয়া মনের সম্মুখ ভাগ দখল করিল। মুহূর্ত্তের জন্য মনের ইচ্ছা হইল যেন বলে, "আমি তোমাকেই চাই।" কিন্তু সে কি ক্ষণিকের! প্রবল তরঙ্গ যেন মুহূর্ত্তের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল,—কিন্তু পরক্ষণেই উচ্ছল প্রবাহে বাঁধ ভাসাইয়া নিয়া চির-অভ্যস্ত কল কল রাগিণীতে আপনার পথে আনন্দের বেগে বহিয়া যাইতে

লাগিল। ইহাই যে প্রকৃতির বন্ধন-হীন স্বরূপ! ইহার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর্ম্মের পথে চলিতে হইতেছে। কোথায়ও তাহার থামিবার অধিকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ভাবের মধ্য দিয়া তাহাকে ধ্রুব শাশ্বত জ্যোতিঃর দিকে অমৃতের দিকে ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে হইবে। এ জ্যোতিঃর ধারা সর্ব্বত্র সমান, কাহাকেও বাদ দেয় না। প্রেমের মন্দির অবারিত রহিয়াছে; হোমগন্ধ আকাশে, পবনে কাননে, ভুবনে, সকলকে আদৃত করিতেছে। আরতিধ্বনি বাজিয়া বাজিয়া মূল হৃদয়-তন্ত্রিতে আঘাত করিয়া মানবকে, সকল জীবকে, বিশ্ব-প্রকৃতিকে বিশ্ব-দেবতার প্রতি উন্মুখ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। সকল আবিলতা ঘুচাইয়া প্রকৃতির মধ্যে আনন্দের সাক্ষাৎকার পাইবার মূলে এই প্রকৃতির প্রেরণা রহিয়াছে। আমরা জগৎকে সুন্দর দেখি, আনন্দময় দেখি। যতই প্রকৃতির গূঢ় রহস্যের সঙ্গে আত্মার পরিচয় করাইতে পারি। এই আত্মা নির্ব্বাধ, ক্রীড়ারতা প্রকৃতির মত বন্ধন-ভয় হীন। এইরূপে প্রকৃত তনয়ের মত প্রকৃতির আশ্রয় লইতে পারিলে আমরা যে অকৃত্রিম মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ ধারার অধিকারী হইতে পারিব, তাহাতে আমাদের মনের সকল সংশয় জুড়াইয়া যাইবে, মুক্ত আনন্দের সঙ্গে হৃদয় আপনার সত্ত্বার বিনিময় করিবে। এই অনুপম স্নেহধারা আমরা শৈশবে প্রকৃতিরূপিনী গর্ভধারিণী জননীর স্তন্য ধারার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকি; ইহাতেই আমরা অমৃতের পুত্র। যতই কেন মধ্যপথে আমরা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হই না কেন, পরিশেষে একমাত্র পরাশান্তি—অমৃতই আমাদের গতি! এরূপভাবে জীবনের ধারা বহিতেছে!

ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য, সম্পদের মোহ আশে পাশে পথের ধারে পথিকের ধাঁধাঁ জন্মায়, কিন্তু তাহার সীমা অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতার মধ্যেই তাহার সমাধি। রুদ্ধ পথে স্রোতস্বতী বাধা পাইতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই সলীল-সঞ্চয়ে বিপুল উচ্ছ্বাসে বাধা উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়া যাইবে। বিস্তার যাহার লক্ষ্য, বিপুলতায় যাহার আনন্দ, মহিমার দৃশ্যে যাহার পুলক সঞ্চার হয়, তাহার নিকট সঙ্কীর্ণতার মোহ, বিলাসিতার নেশা, ভ্রান্ত আচার তিষ্ঠিতে পারে না,—উজ্জ্বল জ্যোতিতে পরাভূত হইয়া তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। আত্ম-অধিকারগত সম্পদ যাহার জীবিকার নিদান, জগতের সম্পদ্ যাহার অন্তর ও বাহিরের সুখ নিলয়, তাহার নিকট উভয়েরই সমান অধিকার, সমান আদর, কাহাকেও অবহেলা করিয়া তিনি আত্মাকে ক্ষুব্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন না। কত যে উৎসধারার অঙ্গ বাহিয়া বিধাতার করুণা ধারার রূপে প্রবাহিত হইতেছে, শ্যামল তরু-পল্লব, পুষ্প পত্রের গায়ে প্রাণ-জুড়ানো তাঁহার মোহন শীতল স্পর্শ জাগিয়া রহিয়াছে, বাতাস কাণে কাণে প্রাণের ভাষায় তাঁহার কাহিনীর মৃদু গুঞ্জন করিতেছে, গন্ধে তাঁহার মহিমা সৌরভের আভাষ আসে, ফল-সম্ভারে শ্রান্তিহরা, প্রাণের পোষক, অমৃতময় তাঁহার প্রীতির দান দেখা দেয়। আকাশ তাঁহার অনন্ত ব্যাপ্তি ও মহান্ সত্ত্বার নিদর্শনে মনে প্রগাঢ় বিস্ময় ও ভাবের সঞ্চার করে। রবি চন্দ্র তাঁহারি হাস্যময় আননের কিরণমাখা দৃষ্টি,—তাহাতে কত তেজঃ, কত কোমলতা! আমি যে সকল দানেরি পাত্র; সর্ব্বত্রই আমার আহ্বান, সকল স্থান হইতেই আত্মা আপনাকে পূর্ণ করিয়া লইবে। বিশ্বের আহ্বানে কেমন করিয়া আপনাকে রোধ করিতে পারি? কেমনে একদেশগত হইয়া কূপ-মণ্ডূকের মত অবস্থান করি; আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া মনুষ্যত্বের কথামাত্র সহ্য করি? তৃষ্ণা কি এতই প্রবল! অথবা সম্পদ্ কি কেবল বন্ধনের হেতু? দেহের সেবা কি আত্মারামের শক্তির অনুকূল নহে? একের হইতেই ত অপরের সুবিধা, কিন্তু ভ্রান্তদৃষ্টি মূঢ় বিষয়ীর অনুষ্ঠানে ভ্রান্তি ও দোষ আশ্রয় করে। তাঁহার করুণায় প্রাণকে সরস করিলাম; তাঁহার দানে সত্ত্বার বলাধান হইল; কিন্তু এখানেই আমি থামিতে পারি না; বিশ্বে তাঁহার উজ্জ্বল হাস্যরেখা যে আমার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিতেছে; কিম্বা যাহা কেবল আমার দৃষ্টিরই জন্য তাহাকে কেমন করিয়া নিবারণ করি, অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারি কই। ভ্রান্তি,—সে তো মুহূর্ত্তের, প্রাণের সম্বন্ধ চিরকালের; এখানে বাধা অতি তুচ্ছ, সিদ্ধি অতি প্রধান। মাতার অঙ্কে শুইয়া স্তন্যপানরত শিশু পানসুখের সঙ্গে সঙ্গে আরও কত যে স্বস্তি পায়! তাহার হৃদয় যে স্তন্য-পানে সুখ ছাড়া আরও কত সুখ, কত শান্তির আকাঙ্ক্ষা করে, যাহা না হইলে তাহার আত্মার সাধ অপূর্ণ থাকে! স্নেহের কোমল স্পর্শে তাহার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় সুখ পায়, সোহাগ বচনে তাহার হৃদয়ে শান্তি বিরাজ করে, নয়নের করুণা-

ধারা তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত মধুময় করে।' এই সব কমনীয় ভাবসম্পদ্ তাহার প্রাণ জগতে পূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তির বাণীর প্রচার করে। ঐরূপ, ঐশ্বর্য্যসম্পদরূপ— স্তন্যধারার সুস্বাদ গ্রহণাবসরে কি বিশ্ব-মাতার স্নেহময় স্পর্শ, বাক্য ও দৃষ্টির ঐকান্তিক প্রভাব হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারি? তুচ্ছ বিষয়-লোভ! মানব-চরিত্রের মধ্যে তোমার স্পর্শ কত অকিঞ্চিৎকর; চন্দ্রের মধ্যের কলঙ্ক তোমার তুলনায় কত বেশী, কারণ তাহা স্থায়ী। লোভ,—ইহা যে জীবনপথে স্বপনের মত,—কখন যে মিলাইয়া যাইবে! জাগরনের মধ্যে আনন্দময়ের সত্তাকে উপলব্ধি করিয়া আত্মার চরিতার্থতায় জীবন-নদীর সাগর-সমাগম সাধিত হইবে! ইহাই যে জীবনের বিচিত্রতা; অথবা ইহার স্বরূপ!

দ্বন্দ্বের অবসর অতি অল্প, কিন্তু মিলনের অবসর চিরন্তন ইহা মানুষের জন্মগত। মতভেদ, অভিজ্ঞতার তারতম্যে যতই বিচিত্রতা থাকুক না কেন, সকল আবরণের মধ্যে এক অচঞ্চল, নিরপেক্ষ সত্তা জাগিয়া রহিয়াছে। সেখানে এক মাত্র প্রেমের বাঁশরী বাজিয়া থাকে, এবং আলোর চ্ছটায় কেবলমাত্র প্রেমই সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। আত্মারাম এখানে আপনাকে পূর্ণরূপে বিস্তার করে,—কারণ ইহাই তাহার সাধের বিশ্রাম স্থল। এখান হইতেই সে রস গ্রহণ করিয়া আত্মাকে ধারণ করে। কালের সকল আবরণ এখানে তিরোহিত হয়। স্নেহসারে ভদ্র সর্ব্বত্র বিরাজ করে। সু-মানুষের এই মহামিলন-তীর্থে সকল সংশয়, বিরোধ, হীনতার স্থান নাই; অথবা পরশমাণিকের স্পর্শে রূপান্তরিত হইয়া ভদ্রতেই আত্মদান করে। জীবনের পথে এই প্রেমই সহায়, সকল আবিলতার মধ্যে ইহাই একমাত্র নির্ভরতার আধার। সম্পদে, বিপদে, আলো ছায়ায় এক মাত্র অকৃত্রিম সঙ্গী,—হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নিবাত, নিষ্কম্প আলোকের রাজ্যে জাগিয়া আছে। অফুরন্ত তাহার প্রতিভা, অসীম তাহার স্নেহ! আর্ত্তের দুঃখ দূর করিতে, ব্যথিতের হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে, অপূর্ণকে পূর্ণ করিতে, মানবত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জগতে প্রেমের অবতারণা। ইহাই প্রকৃতির প্রাণ। এই প্রাণের স্পন্দনেই মলয় মধুরে বহে, বিহগ মধুরে গায়, বনানীর শ্যামলতায় মধু, তটিনীর করুণা ধারায় মধু, আকাশে মধু, রবি, চন্দ্র, তারকায় মধু। কবে কোন শৈশবের প্রাক্কালে বিশ্বে জীবন-ধারার সঞ্চার হয়; অনাদি এবং অনন্ত এ ধারা বহিয়া চলিবে। কালে কালে যুগে যুগে কত লীলা কত বিচিত্রতা আসিয়া পথের মাঝে রংএর মোহে কত চিত্র আঁকিয়া দিবে, কত উচ্ছল ভাবাবেশের পুলক ঘটাইবে;—কিন্তু যে অনাবিল, সচ্ছন্দ-ভাবে আত্মা তাহার সোণার রথে রাজগৌরবে অনন্তের সন্ধানে আগুয়ান হইবে, সে বার্ত্তা, বিশিষ্টতা সকলকে অতিক্রম করিবে এবং সকল প্রয়াসকে এক মহান্ সার্থকতার দিকে টানিয়া নিবে। তটিনী আপনার সঙ্গে সঙ্গে সকল কল্লোল, সকল তরঙ্গ সাগরে বিলাইয়া দিবে। প্রাণের সকল রাগিণী প্রেমের মন্দিরে আশ্রয় নিবে। নূতনের হাটে চির পুরাতনের প্রাণের আহ্বান জাগিয়া উঠিবে—করুণ তাঁহার বাঁশরীর তানে। সকল দৈন্য সকল ক্ষুদ্রতা তোমার ভরিয়া উঠিবে তাঁহারি মহিমার দানে। স্নেহের মধুর পরশ তাঁহার জাগিয়া থাকিবে চিরদিন তোমারি পাশে। হে যাত্রী! ঐ যে মহিমার রশ্মি তোমার দিকে চাহিয়া আছে, উহাই তোমার লক্ষ্য, তোমার সাধনা এবং জীবনের মধুময় অবলম্বন, তোমারি পথের মাঝে।

শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ।

সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ

সাহিত্য যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহা কোন বাধা মানে না একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত দু'কূল ছাপিয়া চলিয়া যায়—এই সাহিত্য প্লাবনই দেশের সাহিত্য-ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া তোলে। এই অগাধ গতির উপরই সাহিত্যের প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। সাহিত্যের সেই উদ্দাম চাঞ্চল্যের প্রভাবে দেশে অনেক আবর্জ্জনা অনেক আবিলতা

আসে, বিশটা গুণের মধ্যে এই দু' একটা দোষকে বর্জ্জন করিয়া যাঁহারা সাহিত্যের পৌরোহিত্য করেন তাঁহাদের দ্বারাই উহার উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারিত হয় এবং এই প্রকারের সমালোচনাই সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত হয়। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে সাহিত্যের উন্মেষের পর কোন কোন বিশেষ যুগদ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হয়। কারণ পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সমালোচনা জন্মগ্রহণ করে। Caxtonএর মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পূর্ব্বে ইংরেজী নর্ম্মান ও পুরাতন স্যাক্সন্ ভাষার সহিত যুঝিতেছিল—ইংরেজী সাহিত্যের তখন পর্য্যন্ত ও একটা রূপ গড়িয়া উঠে নাই। তাই Caxtonএর বিভিন্ন পুস্তকের মুখবন্ধগুলিকেই ইংরেজী ভাষার প্রথম সমালোচনা বলিতে হইবে। কবি মনীষিগণ জগদ্‌গুরু সমালোচকগণ তাঁহাদেরই বাণীপ্রচারক। সমালোচকগণের মধ্যে সৃষ্টিক্ষমতা তত অধিক না থাকিলেও তাঁহারা পালনীশক্তির আধার। যাহা অস্পষ্ট তাহাকে তাঁহারা সুস্পষ্ট করেন, যাহা সূক্ষ্ম বলিয়া সাধারণের নিকট অপ্রকট তাহাকে তাঁহারা বিরাট করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত করেন, যাহা সংস্কারলভ্য তাহাকে অনুভব গম্য করেন। এমন করিয়াই সমালোচনা সাহিত্যে রস সঞ্চার করে। যাঁহারা সাহিত্যধারার প্রত্যেক স্রোত লক্ষ্য করিতে পারেন না তাহাদের সঙ্গে সাহিত্যের পরিচয় করিয়া দেওয়া সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার অভাবে দেশে অনেক অভিনব সম্পত্তি আমাদের নিকট অজানা রহিয়া যায়। সমালোচকগণ সাহিত্যিক এবং জনসাধারণের মধ্যবর্ত্তী। এই সাহিত্যরসিকগণ শববৎ তন্ময় হইয়া যে সত্য দর্শন করেন আমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করেন। এই ভাবেই Dryden এবং Schlegel প্রভৃতির সাহায্যে Shakespeareকে আমরা এতটা পাইয়াছি।

কবিতা, নাটক বা উপন্যাস জীবনের নানা দিক হইতে জন্মলাভ করে—সমালোচনা আবার কবিতা প্রভৃতিরই সন্তান—কবিতা নাটক প্রভৃতি লইয়াই তাহার সংসার। সমালোচকের কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত হইলেও বড় বিপৎসঙ্কুল। কবি বা গ্রন্থকার একটা তাড়নার প্রভাবে, প্রেরণার বলে অনেক দূর চলিয়া যান। কিন্তু সমালোচকের এ সুবিধা নাই। তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুভূতি এ দু'এর সামঞ্জস্য করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার ভাব প্রবল হইলে চলিবে না, বিচার বিমূঢ় হইলে তো একেবারেই সর্ব্বনাশ।

পূর্ব্বে সমালোচনা সাহিত্য সংসারে "ঘুঁটে কুড়ুনী" ছিল। বর্ত্তমানের ন্যায় তাহাতে সাহিত্যশ্রী ছিল না। গ্রীসদেশে ইহা অলঙ্কার শাস্ত্রের একটা অংশ বিশেষ ছিল এবং বক্তারাই ইহাকে বিশেষ করিয়া অভ্যাস করিতেন। তারপর অনেক দিন পরেও ইহা তেমন করিয়া আদর লাভ করে নাই। সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ Aristotleএর অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে সমালোচনার স্থান। রোমক আলঙ্কারিক Quintilian ইহাকে আদর করিলেও তাহা বহু পত্নীকের আদরের মতই; Longinus ইহাকে সম্মানদান করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে এমন একটা আড়ম্বরের ভাব আছে যাহাতে প্রকৃত বিষয়টা ছাড়িয়া সমারোহটাকেই বেশী করিয়া মনে পড়ে। আগেকার সমালোচনা শুধু কবিতারই এবং তাহাও আবার কবিতাতেই। ইহার দৃষ্টান্ত Horaceএর Ars Poetica. আর যদি গদ্যে সমালোচনা হইত তাহার ও বিষয় ছিল কবিতা যেমন Puttenhamএর Art of Poetry, Sidneyএর Apology for Poetry

বর্ত্তমান সময়ে সমালোচনার ক্ষেত্রের পরিসর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কাব্য, নাটক, দর্শন ইতিহাস সকল বিষয়েরই আলোচনা এখন সাহিত্যে স্থান লাভ করিতেছে। বর্ত্তমান যুগকে বিশেষভাবে সমালোচনার যুগই বলিতে হইবে। আমরা যাহা পাইয়াছি এখন সে সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিব। এতদিন শুধু দানের অজস্রতায় বিস্মিত হইয়াছি, এখন উপভোগ করিয়া সুখী হইবে। প্রকৃত সমালোচনার আনন্দ এই খানেই।

সমালোচনার প্রধানতঃ দুই কাজ বিচার (Judgment) এবং পরিচয় (Interpretation) যাঁহারা সমালোচনায় Deductive method অনুসরণ করেন তাঁহাদের মধ্যে বিচারের প্রভাব বেশী দেখিতে পাইব—আর Inductive methodএ পরিচয়শক্তির বিকাশ দেখা যাইবে। সমালোচকের Johnson বা Jeffreyর ন্যায় কেবল বিচার নিয়াই ব্যস্ত থাকা উচিত নয়, উহা সমালোচনার একটা দিক হইলেও মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সমালোচকগণ অনেক সময় বিষ্ণুকে ছাড়িয়া শিবের আরাধনাটাই ভালো করিয়া করেন

-রক হইতে সংহারের দিকেই তাঁহাদের বেশী ঝোঁক। তাঁহাদিগের ভাঙ্গাগড়া দুইটারই দরকার—তাঁহাদিগকে সব্যসাচিত্ব লাভ করিতে হইবে। ভাঙ্গার চাইতে গড়াটার দিকেই মনযোগ দিলে ভাল হয়। অনেক সময় সমালোচক প্রাচীন পন্থার—যে পন্থার সাহায্যে তিনি সারস্বত আরাধনা করিয়াছেন তাহারই সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত বলিয়া নূতনের প্রাপ্য সম্মানদান করিতে পারেন না। আবার আরম্ভের মধ্যে শেষকে দেখাও সব সময় সম্ভব নয় তাই অনেক সময় অন্যায় সমালোচনা হইয়া থাকে। কারণ Hours of Illness পড়িয়া Don Juan ও Childe Haroldএর কবিকে চেনা দুষ্কর। এই ভয়েই বোধ হয় Virgil তাঁহার Eclogueএ একস্থলে কহিয়াছেন "বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া আমার কবি প্রতিভা নষ্ট করিয়া ফেলিও না।"

Deductive সমালোচনার যুগ চলিয়া গিয়াছে। বিচারের সঙ্গে সমালোচনার এখন আর অঙ্গাঙ্গীভাব নাই। সমালোচনায় এখন Inductive ধরণেরই প্রাধান্য। বিষয়টি কি তাহাই এখন সমালোচকগণ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। এক বিষয় হইতে আর এক বিষয়ের তাহারা শ্রেণীগত (kind) পার্থক্যই স্বীকার করেন, ক্রম পারম্পর্য্যের (Degree) তাহারা বিশেষ হিসাব রাখেন না। Shakespeare এবং Moliere উভয়েরই নাটক জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—দু'এরই বিভিন্নভাবে প্রাধান্য আছে। বর্ত্তমানযুগের সমালোচক "বিষয়টি কি" তাহা না দেখিয়া "কি হওয়া উচিত" তাহা ভাবেন না। ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচনায় এই স্বাধীনতা প্রথম Dryden আনেন। আগের সমালোচকগণ সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে পূর্ব্বাচার্য্যগণের সূত্রের খবর লইতেন। যদি তাহাদের মতের সঙ্গে মিলিয়া যাইত তবেই ঠিক—নতুবা সাহিত্য হিসাবে তাহার কোন মূল্য থাকিত না। Shakespeareকে নিয়াও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সমালোচকগণ এই বিপদেই পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা Shakespeareএর মধ্যে অতুল কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন কিন্তু, তবুও কবিত্বের রাজসিংহাসনে তাঁহাকে বসাইতে পারেন নাই। Drydenই প্রথম নূতন পথ দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ফরাসী সমালোচক Boileau এই নূতন আলোকের সন্ধান পান নাই। তিনি Tassoর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন কারণ Tassoকে তিনি Horaceএর সূত্রের কোন কোঠার মধ্যে ফেলিতে পারেন নাই।

আজকাল অনেকে Landorএর একটা কথার দোহাই দিয়া থাকেন "Those who have failed as Writers turn Reviewers" কিন্তু যে সমালোচনা সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে তাহার বেলা একথা খাটে না। সাহিত্যিকগণই প্রকৃতপক্ষে সমালোচনার জন্মদাতা। Aristotle, Goethe, Boileau, Dryden, Addison, Colridge, প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশেও বঙ্কিমবাবুর সমালোচন-প্রতিভা সর্ব্ববিদিত এবং রবিবাবুর আধুনিক বিশ্ব সাহিত্য প্রভৃতিতে তাঁহার অনন্যসাধারণ সমালোচনা শক্তির পরিচয় পাই।

পূর্ব্বে Deductive সমালোচনার যে সবটাই মন্দ ছিল তাহা বলিতে পারি না। ঐ শ্রেণীর সমালোচকগণের একটা সমালোচনা পদ্ধতি ছিল। তাঁহারা chaucerকে কেন তত আদর করিতেন না Shakespeareকে কেন তত সম্মান করিতেন না তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। কিন্তু আজকালকার সমালোচনার বিশেষ কোন একটা রীতি নাই। আধুনিক সমালোচনা নাকি অধিক বিজ্ঞান সম্মত, কিন্তু মনে রাখিলে ভাল হয় যে বিজ্ঞান শুধু "কেন" বই উত্তর দিলে পূর্ণাবয়ব হয় না, "কেমন করিয়া" তাহার উত্তর দিতে হয়। আজকাল যত সমালোচক তত মত। "এটা কেন ভালো?" তাহার একমাত্র উত্তর "আমার ভালো লাগে।" কিন্তু এরকমের ভাল লাগাটা কখনও সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। বর্ত্তমানযুগে আমরা এই ভালো লাগার মধ্যে সমালোচনার একটা নূতন রীতির আভাস পাইতেছি। এই রীতিই সবটা নয় ইহার বাহিরে আমাদের আরো অনেক জানিতে ও বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমানের বন্ধনহীনতার প্রাচুর্য্যের মধ্য দিয়া আমরা একটা শৃঙ্খলতার সন্ধান পাইব তাহাতে পূর্ব্বের কঠোরতা থাকিবে না। এখনকার নমনীয়তাও থাকিবে না। এই দু'এর সংযোগে যে রীতির প্রচলন হইবে তাহাই সমালোচনার আদর্শ।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভাস্করাচার্য্য

বেদের সর্ব্বসমেত ছয়টি শাখা,—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।—জ্যোতিষ বিদ্যার দুইটি শাখা, গণিত এবং ফলিত জ্যোতিষ। ইহার মধ্যে গণিতই প্রধান, কারণ গণিত ব্যতীত ফলিত জ্যোতিষ অঙ্গহীন অবস্থায় থাকিয়া যায়। আমাদের দেশে প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা ও অধ্যাপনা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে; গণিত জ্যোতির্বিদ্যার প্রথম ও প্রধান সোপান "লীলাবতী"। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ ও এই গ্রন্থখানি আদরে পাঠ করিয়া থাকেন;—তাঁহারা এই পুস্তকের যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়াছেন। "লীলাবতী"র রচয়িতা ভাস্করাচার্য্যের স্থিতিকাল, জন্মভূমি ও অন্যান্য বিষয় লইয়া ভারতবর্ষ, য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ দেশান্তরে বিস্তর বাদ বিবাদ হইয়া গিয়াছে। আচার্য্যের জন্মভূমি কোথায় ছিল, কত বয়সে তিনি এই পুস্তকখানি প্রনয়ণ করিয়াছিলেন; এই গ্রন্থ রচনায় তিনি কোন কোন পুস্তক হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহা লইয়া ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিৎ বিদ্বানগণের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক হওয়া সত্বেও,—কেহ এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ভাস্করাচার্য্য ও তাঁহার রচিত "লীলাবতী" সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং এ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তিও প্রচলিত আছে। লীলাবতী শক সম্বৎ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে "ফৈজী"র উক্তিও প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সম্রাট আকবরের আজ্ঞায় ফৈজী ফারসী ভাষায় লীলাবতীর অনুবাদ করেন; অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে ফৈজী এইরূপ লিখিয়াছেন,—"ভারত সম্রাট আকবরের অনুরোধে আমি ফারসীতে লীলাবতীর অনুবাদ করিতেছি। ভাস্করাচার্য্যের "করণ-কুতূহল" হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার জন্মভূমি দক্ষিণ ভারতান্তর্গত "বিদুর" নগরে ছিল; পিতা পিতামহ প্রভৃতি বংশ পরম্পরায় ইহাঁরা উক্ত নগরের অধিবাসী ছিলেন। ১১০৫ শক সম্বতে ভাস্করাচার্য্য "করণ-কুতূহল" রচনা করেন; অতএব তিনি শক সম্বৎ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন।" কলব্রুক সাহেব আচার্য্যের স্থিতিকাল এবং তাঁহার নিবাসস্থান সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন। কলব্রুক (Colebrook) সাহেবের মতে;—আচার্য্য ১০৬৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন, ১১০৫ শকে তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর ছিল; খুব সম্ভব এই বয়সেই ইনি লীলাবতী রচনা করেন। কলব্রুক সাহেব ভাস্করাচার্য্য রচিত "গোলাধ্যায়ে"র "প্রশ্নাধ্যায়" প্রকরণ হইতে বিস্তর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আচার্য্য কর্ণাটের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সহ্যকুল-পর্ব্বতের নিকটস্থ "বিজর বিড" (বোধ হয় আধুনিক বেদর) নামক নগর নিবাসী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রীমহেশ্বরোপাধ্যায়ের বংশে শক ১০৬৩ সম্বতে তাঁহার জন্ম হয়।* এই সকল প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভাস্করাচার্য্য একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন; যদিও তাঁহার জন্ম বৎসর সম্বন্ধে কেহ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তাহা হইলেও ১০৫৫ শক হইতে ১০৭০ শক সংবতের মধ্যেই যে ভাস্করাচার্য্যের জন্ম হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমানে আচার্য্যের "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" সর্ব্বসাধারণে যেমন সাদরে পঠিত হইয়া থাকে, উহার রচনাকালেও ইহা এইরূপ সমাদরেই ভারতের সর্ব্বত্র পঠিত হইত। ভাস্করাচার্য্য জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক প্রনয়ণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে লীলাবতী, বীজগণিত, গোলাধ্যায়, গণিতাধ্যায় এবং করণ-কুতূহল বিশেষ প্রসিদ্ধ। আচার্য্য তৎকালিন ভারতের একজন মহাপণ্ডিত এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত শ্লোক সর্ব্বসাধারণে প্রসিদ্ধ আছে;—

> "অষ্টৌব্যাকরণানিষট্ চ ভিষজাং ব্যাচষ্ট তাঃ সংহিতাঃ
> ষট্ তর্কান গণিতানি পঞ্চ চতুরোবেদানধীতেশ্বরঃ।
> রত্নানাং ত্রিতয়ং দ্বয়ঞ্চ বিবুধে মীমাংসয়োরন্তরং
> সদ্ ব্রহ্মৈকমগাধবোধমহিমাসোঽস্যাঃ কবির্ভাস্করঃ॥

লীলাবতীর নামকরণ ও রচনা সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানাপ্রকার জনপ্রবাদ ও কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন,—আচার্য্য স্বয়ং লীলাবতী রচনা করেন

---

* Asiatic Researches, Vol, IX.

নাই, তাঁহার কন্যা লীলাবতীই এই গ্রন্থের রচয়িত্রী। তাঁহারা বলেন,—আচার্য্যের কন্যা লীলাবতী, বিবাহ হইবার পর বিধবা হন। কন্যার এই অকাল বৈধব্যে আচার্য্য অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হন। অতঃপর তিনি কন্যাকে স্বগৃহে রাখিয়া গণিতবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন; গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা পাঠান্তে লীলাবতী যখন উক্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী হন, তখন পিতার আজ্ঞানুসারে তিনিই এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই উক্তি নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এই গ্রন্থখানি যদি সত্য সত্যই আচার্য্যের কন্যা লীলাবতীর দ্বারা রচিত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, তিনি কেবল মাত্র এই পুস্তকখানি লিখিয়া, অন্য পুস্তক রচনায় কেন ক্ষান্ত হইলেন? জনপ্রবাদ অনুসারে এই পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক যে লীলাবতীর দ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না। কোন লেখকই একখানি পুস্তক লিখিয়া রচনাকার্য্যে বিরত হন না, সুতরাং লীলাবতী আচার্য্যের কন্যা কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই। কাহারও মতে,—কন্যা লীলাবতীর জন্ম পত্রিকায়, তাহার বৈধব্য যোগ দর্শনে, আচার্য্য কন্যাকে চিরকুমারী রাখা মনস্থ করেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করেন। কন্যার নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য, তাঁহার নামেই আচার্য্য এই গ্রন্থের নাম করণ করেন। এই কিংবদন্তি সত্য হইলেও এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। তবে এই গ্রন্থখানি যে আচার্য্যের দ্বারাই রচিত তাহা নিঃসন্দেহ। আবার কেহ কেহ বলেন,—ভাস্করাচার্য্যের পত্নীর নাম লীলাবতী ছিল, ইহাঁদের কোন পুত্র কন্যা না থাকায় আচার্য্যপত্নী সর্ব্বদা দুঃখিত এবং চিন্তিত থাকিতেন। তাঁহার চিন্তার প্রধান কারণ ছিল,—মৃত্যুর পর এসংসারে আমার স্মৃতি মানব হৃদয়ে কিরূপে চির অঙ্কিত থাকিবে। পত্নীর চিন্তা দূর করনার্থে, তাহার নাম সংসারে চিরজাগরুক রাখিবার জন্য, আচার্য্যপত্নীর নামানুসারেই তাহার রচিত পুস্তকের নামকরণ করেন। কিন্তু এই প্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। নাসীকের নিকট ডাক্তার ভাউদাজি একখানি তাম্রপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তাম্রপত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভাস্করাচার্য্য নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই, পুত্র পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি অনন্ত পথের পথিক হইয়াছিলেন। এক সম্প্রদায় বলেন,—ভাস্করাচার্য্য যখন গুরুগৃহে বিদ্যাধ্যয়নে নিরত ছিলেন, তখন গুরু তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং কুলীন দেখিয়া, নিজের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। গুরু-তনয়াও আচার্য্যের অনুরাগিণী ছিলেন। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য গুরুপুত্রীর পানী গ্রহণে অসম্মত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, গুরু পিতার ন্যায় এবং গুরুর পুত্রকন্যাগণ ধর্ম্মতঃ তাহার ভ্রাতা ও ভগ্নী তুল্য। সুতরাং গুরুতনয়ার পাণিগ্রহণ করা সহোরার পাণিগ্রহণ করার ন্যায়ই ঘৃণিত ও দোষাবহ। এইরূপ ভাবিয়া আচার্য্য গুরুতনয়ার পাণিগ্রহণে অসম্মত হন। আচার্য্য উক্ত সুন্দরীর পাণিগ্রহণে অস্বীকার করায়, তিনি আজন্ম কুমারী ব্রত ধারণ করেন। ভাস্করাচার্য্য এই সুন্দরীর স্মৃতিরক্ষার্থে, তাঁহারই নামানুযায়ী এই পুস্তকের লীলাবতী নামকরণ করেন। কিন্তু এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রথমতঃ ইহা কিংবদন্তি ও জনপ্রবাদ, দ্বিতীয়তঃ, যদি এই কিংবদন্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল গুরুকন্যাই আচার্য্যের অনুরাগিণী হন নাই; আচার্য্যও তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। জন-প্রবাদানুযায়ী এই ঘটনাটি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি গুরুতনয়াকে আচার্য্য ভালবাসিতেন তবে তাহাকে বিবাহ করিলেন না কেন? যেখানে উভয়ের উভয়ের অনুরাগী সেখানে বিবাহ হওয়াই সম্ভব ও সঙ্গত,—বিবাহ না হওয়াই অস্বাভাবিক। আচার্য্য গুরুকন্যাকে ভালবাসিতেন কিন্তু তথাপি বিবাহ করিলেন না, অথচ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহারই নামানুসারে, তাঁহার গ্রন্থের লীলাবতী নামকরণ করিলেন; ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞপাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। গুরুকন্যাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়া আচার্য্য অন্য স্থানে বিবাহ করিয়াছিলেন। যদি তিনি অন্য স্থানে বিবাহ না করিয়া গুরুতনয়াকে বিবাহ করিতেন ত কি দোষ হইত? অধিকন্তু তিনি তাঁহাকে ভালবাসিতেন। আচার্য্য যে গুরুতনয়াকে ভালবাসিতেন, তাহা এই কিংবদন্তি কথিত, গুরু তনয়ানামানুসারে আচার্য্য রচিত পুস্তকের লীলাবতী নাম করনই তাহার যথেষ্ট প্রমান। অতএব এই প্রবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তাহা নিঃসন্দেহ। লীলাবতী যে ভাস্করাচার্য্যের দ্বারাই রচিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং

এই গ্রন্থের নামকরণের মূলে যে কোন রমণীর সহিত সম্বন্ধ আছে, তাহা এই পুস্তকের নাম হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। ভাস্করাচার্য্য এবং তাঁহার রচিত লীলাবতী সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তর কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এখন দেখিতে হইবে যে, লীলাবতী বীজগণিত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় ভাস্করাচার্য্য কোন কোন প্রাচীন ভারতীয় বা বিদেশীয় পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কি, না?—কিম্বা আচার্য্য স্বয়ং বীজগণিতের জন্মদাতা বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কেহ? যদি তিনি স্বয়ং এই বিদ্যার উদ্ভাবনকর্ত্তা নহেন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, এই বিদ্যা আর্য্যগণের নিজস্ব বস্তু বা অন্য কোন জাতির নিকট হইতে আচার্য্য ইহা শিখিয়াছিলেন। যদিও সংস্কৃতে আচার্য্যরচিত বীজগণিত ব্যতীত ভারতে এ বিষয়ে অন্য কোন প্রাচীন পুস্তক নাই, তথাপি তিনি এই বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা নহেন। ফৈজী লীলাবতীর যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ লিখিত আছে, Bhaskara himself never pretends to be the inventor. He assumes no character but that of a compiler......Indeed, he was a man eminently skilled in the sciences he taught, অর্থাৎ আচার্য্য গণিতশাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি এই বিদ্যার জন্মদাতা নহেন, সংগ্রহ কর্ত্তা মাত্র। সুপ্রসিদ্ধ ভারতত্বান্বেষী ডেভীস সাহেব (Mr. Davis) ভাস্করাচার্য্য এবং তাঁহার রচনা সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। বিস্তর অনুসন্ধানের পর ইনি স্থির করিয়াছেন যে, লীলাবতী বীজগণিত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় ভাস্করাচার্য্য স্বয়ং উদ্ভাবনী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। আচার্য্য তাঁহার গ্রন্থাদি রচনায় তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানাস্থান হইতে সামগ্রী একত্রিত করিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন। এখন আর ঐ গ্রন্থ তিনখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, বা উহাদের নাম কি ছিল তাহাও জানিবার উপায় নাই। খুব সম্ভব গ্রন্থ তিনখানি কোন বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ছিল* এখন ডেভীস সাহেবের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, আচার্য্য তিনখানি পুস্তকের সাহায্যে গণিত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন—একথা তিনি কিরূপে জানিলেন? আচার্য্য তাঁহার গ্রন্থ রচনায় যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিবিদ্যাবিশারদ গ্রন্থকারের নিকট বিশেষ ঋণী, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু তিনি যে মাত্র তিনখানি পুস্তকের সহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন সন্তোষজনক প্রমান ব্যতীত একথা মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য নহি। ডেভীস সাহেব যদি এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ত উক্ত গ্রন্থত্রয়ের নাম জনসাধারণে প্রকাশ করিলে কি ক্ষতি হইত? আবার সাহেব মহোদয় বলিয়াছেন গ্রন্থ তিনখানি বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ছিল অথচ তিনি একথাও কোথাও বলেন নাই যে ঐ গ্রন্থ তিনখানি কোন ভাষা বা দেশের ছিল! এবিষয়ে ভারতে ভাস্করাচার্য্য রচিত গ্রন্থাবলিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ডেভীসকথিত পুস্তক তিনখানি অন্য কোন বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ছিল, তাহা হইলে এখন প্রশ্ন এই যে, উক্ত পুস্তকত্রয় কোন্ দেশ বা ভাষার পুস্তক ছিল?

যদি কেহ বলেন যে, আচার্য্য যে গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার গণিত সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রন্থাদি গ্রীক পণ্ডিত দ্বারা রচিত ছিল, তাহা হইলে এই মতের তিনি প্রতিবাদে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, গ্রীক জ্যোতির্ব্বেত্তা পীথাগোরস (Pythagoras) ও ডেমোক্রিটস্ (Democritus) ভারতবর্ষ হইতেই এই বিদ্যা শিখিয়াছিলেন আর্য্যগণ, গ্রীকগণের বহুপূর্ব্বেই বীজ এবং ব্যক্ত গণিতবিদ্যা উত্তমরূপে জানিতেন। আবরণিবাসীগণ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ও গ্রীকজ্যোতির্বিদ্যাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন। খলীফা অলমামুন সময়ে আরবে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাও প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে গ্রীকগণ এ বিদ্যা কাহাকে বলে তাহাও জানিতেন না। ইবন অসরা (Ibn Asra) ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ফৈজীও এই বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন, তাঁহার মতে;— বীজগণিত সর্ব্বপ্রথমে ভারতেই প্রচারিত হইয়াছিল।

গ্রীক্ পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমাদের প্রাচীন বীজগণিতে যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রযুক্ত হইয়াছে, ঠিক তদনুরূপ চিহ্ন

* Almost every trouble and expense would be compensated by the possession of three copious treatises on Algebra from which Bhaskara declares he extracted his Bijaganita and which in this part of India are entirely lost. Mr. Davis "on the Indian Cycle of 60 year's. Asiatic Researches. Vol. III.

ভাস্করাচার্য্যের পুস্তকেও প্রয়োগ করা হইয়াছে। বীজ-গণিতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন এইরূপ, ৩+২=৫, ডায়োফণ্টসের (Diophantus) পুস্তকে উক্ত চিহ্ন এইরূপ হইয়াছে ৩।২=৫। এই প্রভেদ বা রূপান্তর হইতে ইহা স্থির হয় না যে, ভারতবাসী গ্রীক্‌গণের অনুকরণ করিয়াছেন, বরং ইহাই স্থির নিশ্চয় হয় যে গ্রীক্ জ্যোতির্বেত্তাগণ আর্য্যগণেরই শিষ্য। ভারতীয় জ্যোতির্বেত্তাগণের স্থায় গ্রীক্‌গণ তাঁহাদেরই সাঙ্কেতিক চিহ্ন কিছু বিকৃত করিয়া নিজেদের পুস্তকে ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব ভারতবাসী যে গ্রীক্‌গণের নিকট হইতে এ বিদ্যা গ্রহণ করেন নাই, তাহা নিঃসন্দেহ এবং ভাস্করাচার্য্যও কোন গ্রীক্ পুস্তকের সাহায্যে তাঁহার গ্রন্থাবলি প্রণয়ন করেন নাই। গ্রীস ব্যতীত য়ুরোপের বিভিন্ন প্রান্তের ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত সম্বন্ধে, অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

লীলাবতী, বীজগণিত প্রভৃতি পুস্তকে যে সকল কঠিন সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে, সেই সকল প্রশ্নের মিমাংসা য়ুরোপ নিবাসী পণ্ডিতগণ সম্প্রতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত প্রশ্নগুলি কিরূপ এবং কোন্ কোন্ সময়ে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশবাসী পণ্ডিত মণ্ডলী উহা জ্ঞাত হইয়াছেন, ইহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি "ডি-লা-গ্রেঞ্জ" (De La-Grange) রচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন।* প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবেত্তা লেসলী সাহেব বলেন, ভাস্করাচার্য্য যে সকল পুস্তকের সহায়তায় তাঁহার জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধি পুস্তক রচনা করেন, সেই পুস্তক সকল ফারসি ভাষায় লিখিত ছিল। লেসলী সাহেবের মতে, হিন্দুগণ এই বিদ্যা পারস্তবাসীগণের নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন এবং পারস্য-বাসীগণ ইহা গ্রীক্‌গণের নিকট শিখিয়াছিলেন।† এখন প্রশ্ন এই যে, পারস্যে কোন সময়ে কেহ প্রসিদ্ধ ও বিচক্ষণ গণিতজ্ঞ হইয়াছিলেন কি? প্রাচীনকালে পারস্যে যে এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল, সে সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা নিদর্শন অদ্যাবধি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এ বিদ্যা সম্বন্ধে গ্রীক্‌গণের কৃতিত্বের কথা আমরা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আরববাসীকে আর্য্যগণ এই শাস্ত্র শিখাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই। আর্য্যগণের "শুল্ব সূত্র" লেসলী সাহেবের পাঠ করা উচিত ছিল; কিংবা যদি তিনি লীলাবতীর দ্বিতীয় খণ্ড পড়িতেন, তাহা হইলে উহার প্রথমাংশেই সাহেব বাহাদুরের ভ্রম দূর হইয়া যাইত। এ সম্বন্ধে আমরা সেই উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি:—"তত্রাদৌ ক্ষেত্র ব্যবহার আরম্ভতে। তত্রাপি ভুজকোটিকর্ণানাং জ্ঞানায় করণ সূত্রং সার্দ্ধ বৃত্ত ত্রয়ম্।" গ্রন্থের এই শব্দ কয়টি পড়িলে লেসলী সাহেব জানিতে পারিতেন যে, আর্য্যগণের সমস্ত সিদ্ধান্তই নিয়মবদ্ধ ছিল। উপরোক্ত প্রমাণাদি হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, আচার্য্য যে সকল পুস্তকের সহায়তায় তাঁহার জ্যোতিষ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এতদ্দেশীয় ভাষাতেই ছিল এবং ভারতবাসীই তাঁহার রচয়িতা। আর্য্যগণই বীজ ও পাটীগণিতের জন্মদাতা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাভারতেও এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে আর্য্যগণ নৌযোগে দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিতেন, শুভদিন ও শুভক্ষণে নৌচালন, ভূমিকর্ষণ, বাণিজ্য করণের রীতি ও প্রথা ভারতে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত শুভদিন ও শুভক্ষণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্যই নহে, সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং জ্যোতির্বিদ্যার আবির্ভাব বহুপূর্ব্বে ও সর্ব্বপ্রথমে ভারতেই হয় এবং বীজগণিতের জন্মও ঐ সময়েই হইয়াছিল। কারণ জ্যোতিষ ও বীজগণিত, এই দু'য়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বীজগণিত ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অতএব আর্য্যগণই জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা, এবং ভারত হইতেই এই বিদ্যা দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য ভারতীয় পুস্তকের সাহায্যেই তাঁহার জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

---

* যাহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Memoirs of Berlin. Vol. 29th দেখুন।—লেখক।

†—The natives of Hindoostan might have received instructions from the Persian Astronomers, who were themselves taught by the Greeks of Constaninople and stimulated to those scientific pursuits by the skill and liberality of their Arabian conquerors. Leslie's Elements. P. 985.

প্রেম

তুমি অসীম হইতে সসীমে আসিতে চাও!
আমি সসীম হইতে অসীমে যাইতে চাই।
তুমি শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া দাও।
আমি সকল হৃদয় তোমারে সঁপিতে চাই!

তুমি উদার সাগর তুলনা তোমার নাই!
আমি ক্ষুদ্র তটিনী অধীর তোমার তরে!
তুমি জোয়ারে জোয়ারে খুঁজিছ আমাতে ঠাঁই;
আমি ভাটাতে বিলাই আপনা উজাড় করে!

তুমি তরুণ তপন সুনীল গগন-ভালে!
আমি তৃণের শীর্ষে দোদুল শিশির-কণা!
তুমি আমার বক্ষে পশিছ কিরণ জালে!
আমি তোমাতে হারাতে হয়েছি আকুল মনাঃ।

ওগো, জীবন ভরিয়া কেবলি সারাটী বেলা
হয় তোমার আমার এমনি প্রেমের খেলা!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রাচীন জগতে নৌশক্তির ইতিবৃত্ত

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যে একটা আদিম মহাপ্লাবনের প্রবাদ আছে। তাহাতেই বোধ হয় নৌকার রীতিমত ব্যবহার ইতিহাসে আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে নৌকা ব্যবহারের বিশেষ উন্নতি ঘটিতে লাগিল। জাতি সমূহের মধ্যে আবার মিসরের চেয়ে প্রাচীন জাতি পাওয়া যায় না, ভারত বা চীন খুব প্রাচীন হইতে পারে, কিন্তু মিসরের মত প্রাচীনতার অত জলন্ত প্রমাণ রাখিয়া যাইতে পারে নাই। এমন কি মিসরের ইতিহাসের আরম্ভ কাল খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ৪২৪১ হইতে ৩৪০০ পর্য্যন্ত, আরও প্রায় সেই সময়কার মিসরীয় সভ্যতার চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত পুরাতন কালের প্রমাণ স্পষ্টত কিছু পাওয়া যায় নাই। সভ্যতার সর্ব্বতোমুখী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিসরে জলযুদ্ধেরও চর্চ্চা হইতে লাগিল।

কোন সময়ে যে ঠিক মিসরীয় সভ্যতায় জল যুদ্ধের প্রথম চর্চ্চা ঘটে তাহা জানা যায় নাই, তবে যে তাহা খুব প্রাচীন কালেই হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিসরীয় সভ্যতার প্রথম হইতে এই সেই দিন নেপোলিয়নের সময় পর্য্যন্ত নাইল নদীতেই যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। নদীতেই তাহাদের জল যুদ্ধের প্রথম বিকাশ ঘটিয়াছিল। ভারতের বেদেও, এইরূপ, আধুনিক সমুদ্র-বোধক "সিন্ধু" কথাটি নদীবাচক ছিল, 'সপ্তসিন্ধুন্' কথাটি বেদে ঐ সিন্ধু নদী ও তাহার শাখাগুলিকেই বুঝাইত। তবেই বেদে যদি জলযুদ্ধ বিশেষ কিছু থাকে ত সমুদ্র কোথায় পাইবে, এই নদীতেই উহা সাধিত হইত। মিসরেও যদি নদীতে যুদ্ধের প্রথম ঘটনা হইয়া থাকে, তবে তৃতীয় মিসরীয় রাজ বংশের সময়েই উহার প্রথম আরম্ভ বলা যায়, কারণ এই বংশ দক্ষিণ মিসর হইতে আসিয়া উত্তর মিসর অধিকার করেন কাজেই স্থলযুদ্ধের সঙ্গে জলযুদ্ধের সম্ভাবনা আছে। আরও এই দিগ্বিজয়ের যে রকম মহা সমারোহের বর্ণনা আছে, তাহাতে সর্ব্ববিধ যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। তৃতীয় বংশ এই বিজয়ের বর্ষকে 'উত্তর দেশের যুদ্ধ ও ধ্বংসের বর্ষ' বলিয়া চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছে। আরও মিসরে এই যুদ্ধের কিছু পরেই রীতিমত জলপ্রয়াণাদির কথা খোদিত লিপি ও চিত্রাদিতে পাওয়া যায়, এবং এই দুই ঘটনার মধ্যে মাত্র দুই শত বৎসরের ব্যবধান, খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ প্রায় ২৯৮০ হইতে ২৭৫০ মাত্র।

তবে এই সময়ে ইতিহাসে মিসরের সঙ্গে আর এক জাতির নাম পাওয়া যায়। এতদিনে জগতের ইতিহাসে মিসরের একাধিপত্য ছিল, সভ্যতার বিকাশ কার্য্যে সেই গাঢ় অতীতের তিমিরে আর এক জাতি যোগ দিয়াছিল।

এই জাতির আবার এক বিশেষত্ব ছিল এই সমুদ্র লইয়াই থাকা। মিসরীয় সভ্যতা যেমন, যতদূর জানা যায়, নদী লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল; ফিনিশিয়ার সভ্যতা সমুদ্র লইয়া। সমুদ্র যাত্রায় ফিনিশিয়া মিসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনেক ঐতিহাসিকের মত। কিন্তু ইতিহাসে যতদূর দেখা যায় তাহাতে বাণিজ্যেও ফিনিশিয়া সমুদ্র যাত্রায় মিসরের পূর্ব্ববর্ত্তী এই মত পোষণ করা যায় না। কেননা এই দুই শতাব্দীর মধ্যে মিসরে সমুদ্র পার হইতে বিস্তর বাণিজ্য দ্রব্য আসিতেছিল, নানারূপ গন্ধ দ্রব্য সমুদ্র পার হইতে আসিতেছিল এবং 'সমুদ্রপারবাসী' এই নাম মিসরীয়েরা অনেক জাতিকে দিতে ছিল, বিশেষতঃ এই ফিনিশিয় প্রভৃতিকে মিসর বিলক্ষণ চিনিত এইরূপ প্রমাণ খোদিতলিপি ভূর্জ্জ পত্রলিপি প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

ইতিহাসে মিসরীয় নৌযুদ্ধের প্রথম প্রকাশ্য প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় ২৭৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে। তখন মিসরের পঞ্চম রাজ বংশের বিপুল সভ্যতাস্রোত জাতিকে উন্নতির শিখরে লইয়া চলিয়াছে। এই বংশের চিত্র, স্থাপত্য, ও ভাস্কর্য্যকলা, ভাষা ও সাহিত্য এবং রাজ্যশাসনের সুবন্দোবস্তের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উহাকে সভ্যতার এক রকম শিখরারূঢ় বলিয়া ধরা যায়। এই বংশের প্রথম রাজা উশারকফে ও দ্বিতীয় রাজা সাহিউর মিসরীয় নৌশক্তির বিশেষ উন্নতি করেন। এই বোধ হয়, প্রাচীন সভ্য পৃথিবীর প্রথম জলযুদ্ধের জন্য প্রকাশ্যতঃ প্রস্তুত হওয়ার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিউরের যুগের দুইটি নৌপ্রয়াণের বিশেষ বিবরণ ও চিত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ফিনিশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম। আর সোমালি দেশের (প্রাচীন 'পান্ট') নামক রাজ্যের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়টি। প্রথম চিত্রটিতে মিসরীয় সমুদ্রগামী জাহাজ তাহাতে মিসরীয় নাবিকেরা, ফিনিশিয় বন্দীদের লইয়া দণ্ডায়মান। এই চিত্র ঐতিহাসিকদের মতে পৃথিবীর সর্ব্ব পুরাতন সামুদ্রিক পোত ও নৌযুদ্ধের চিত্র। চিত্র হিসাবেও ইহা পৃথিবীর সর্ব্ব পুরাতন; প্রায় ২৭৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইবে। প্রাচীন জগতে কি করিয়া এই নৌযুদ্ধের উৎপত্তি হইল তাহার কারণ নির্ণয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন মিসর ফিনিশিয়ার বাণিজ্য ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আবার কাহারও মত এই যে, মিসরীয় উপকূলে বিবিধ জাতি আক্রমণ করিতেছিল তাহার মধ্যে ফিনিশিয় নাবিক নৌবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া সাহায্য করিতেছিল। যাহাই হউক মিসরের কাছে ফিনিশিয় নাবিক হারিয়াছিলও বটে, কিন্তু অন্য জাতি ত দূরের কথা, মিসরও ফিনিশিয় নাবিককে মিসরীয় নৌবহরে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিল। ফিনিশিয়াজয়ের চেষ্টা মিসর বহুশতাব্দী ধরিয়া করিয়াছিল এবং যুগেযুগে পেশাদারী ফিনিশীয় নাবিক শুধু মিসর কেন নানা জাতির নৌযুদ্ধাদি করিয়া দিত। এই দুই জাতির নৌবিদ্যার মধ্যে এত রেষারেষী ছিল যে কে যে উহাদের মধ্যে বড় তাহা জানা যায় না।

সাহিউরের পরবর্ত্তী জল-প্রয়াণেই জগতের প্রাচীনতম নৌশক্তির মিসরে অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিল। ভূমধ্যসাগরে ত মিসরের সমকক্ষ ফিনিশিয়া নৌশক্তি বিরাজিত ছিল কিন্তু লোহিতসাগর প্রভৃতি অঞ্চলে সোমালি অর্থাৎ পান্ট দেশের দিকে মিসরের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হইলেও মিসরকে এই বাণিজ্য পথ খুলিবার সময়ে নানা জাতির সহিত অনেক নৌযুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায়। যেমন ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব-উপকূলে তেমনি মিসরের পূর্ব্বে লোহিত সাগরে মিসরীয় নৌশক্তির লীলা যে কোন্ সময়ে আরম্ভ, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে যে জন্য এই প্রয়াণ করিতে হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ স্বরূপ হইলে, এইরূপ যুদ্ধযাত্রা পূর্ব্বেই হইয়াছিল, তবে উল্লেখ নাই। হঠাৎ যে এই সময়ে এই বাণিজ্য পথের কথা মিসরে উদিত হইল, তাহা নহে। ফিনিশিয়ার মত না হইলেও, পান্ট অর্থাৎ সোমালি দেশ তৎকালে গন্ধদ্রব্যাদির জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। ভূমধ্যসাগরে যেমন ফিনিশিয়া অসভ্য জাতিদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে খ্যাতি লাভ করিতেছিল, তেমনি মিসর লোহিতসাগরে অসভ্যদিগের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিল। অতঃপর যুগে যুগে মিসরকে বাণিজ্যার্থ লোহিতসাগরে নৌবহর ভাসাইতে দেখা যায়।

এই দুই নৌশক্তির মধ্যে কে যে প্রবল তাহা বিচার করা অতি কঠিন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে মিসরকে অনেক বিষয়ে এই প্রাচীন ফিনিশিয়ারও গুরু বলিয়া ধরা হয়। এবং প্রথমেই মিসরের কাছে হারিবার,

ঐতিহাসিক বিবরণে বুঝা যায় যে ফিনিশিয়া নৌবিদ্যা মিসরের কাছে শিখুক আর নাই শিখুক, মাত্র সমকক্ষ ছিল। কারণ এই যুদ্ধের পর আবার মিসরের হাতে এক মহাযুদ্ধে ফিনিশিয়া প্রভৃতি হারিয়া গিয়াছিল। মিসরের ষষ্ঠ রাজবংশের সময়ে রাজা প্রেপমেপির মন্ত্রীপ্রবর ইউপি তাঁর কবর গাত্রে লিখিয়াছেন যে এই শত্রুগণের সমুদ্রতীর মিসরীয় নৌ বলে আক্রমণ করিল। পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরের সমস্ত নৌযুদ্ধনিপুণ জাতি মিসরীয় নৌশক্তির কাছে পরাস্ত হইল। কিন্তু এই সব নৌযুদ্ধেই কি, স্থলযুদ্ধেই কি, মিসরীয়েরা তখনও তেমন আগ্রহ দেখাইতে আরম্ভ করে নাই। প্রাচীনতম মিসরবাসীরা চাষবাসের শান্তিই বিশেষ বুঝিত, যুদ্ধযাত্রা বড় বুঝিত না, তবে রাজাদের খেয়ালের দাস হইয়া মাত্র তাহারা সে কার্য্যে যোগ দিত। এই সব নৌযুদ্ধ 'হচ্ছে হবে' এই রকম ভাবে চলিয়াছিল। তখনও মিসরে যুদ্ধ জীবিকার্জ্জনের উপায় হইয়া দাঁড়ায় নাই যে, পেশাদার সৈনিকে জলযুদ্ধ কি স্থলযুদ্ধ করিবে। তাই মিসরে তখনও, স্থলযুদ্ধের মত, নৌযুদ্ধেরও তেমন উন্নতি ঘটে নাই। তথাপি যে ফিনিশিয়া প্রভৃতি জাতি হারিয়া যাইত, তাহার কারণ এই যে, সে সমস্ত জাতির মধ্যে তেমন ক্ষমতা ছিল না, একতা ছিল না; পক্ষান্তরে মিসরে এক প্রবল রাজ্যের মহা শক্তির অস্তিত্ব ছিল।

সেই দূর অতীতের তিমিরে এই ভূমধ্য ও লোহিতসাগরে নৌযুদ্ধ লীলা সমুদ্রে হইতে লাগিল আর মিসরের মধ্যে নাইল নদীতে মিসরের দক্ষিণে নিউবিয়ার সহিত যুদ্ধে নৌকার ব্যবহার হইতেছিল। মিসরে চলাচলের পথই নাইল নদী, যদিও মধ্যে মধ্যে নাইলের জলপ্রপাত আছে তথাপি এক প্রপাত হইতে অপর প্রপাত পর্য্যন্ত নৌকায় যাওয়া আসা হইত। এইরূপে নদী ও সমুদ্রে মিসরীয় নৌযুদ্ধ চর্চ্চার স্থান হইয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া চলল। তখন অন্য কোন দেশই উঠে নাই, সভ্যতায় কাহারও নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। উত্তর কালের প্রাচীন আসিরিয়া প্রভৃতি দেশের কোন ঠিকানাই নাই। সে যে খৃষ্ট পূর্ব্বে ২৭৫০ হইতে ১৬৭৫ অব্দের যুগ। তখনও কোন পুরাতন জাতির পুরাণের আরম্ভ ঘটে নাই। ভারতের বৈদিক যুগ ত খুব জোর আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ১৪০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্তের বলিতে পারেন। গ্রীকদিগের 'ইলিয়ড' প্রভৃতি মহাকাব্য খুব বেশী হয় ত ১২০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রচিত ইহাই আধুনিক মত। আসিরিয়ার নিনাস ও সেমিরামিসের প্রবাদ কথা ত আরও পরের; কাজেই মিসরের সেই মহা আধিপত্যের যুগে, যখন থিবসের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন দক্ষিণে থিবস হইতে উত্তরে নৌকাযোগে রাজাদের আসিতে হইত, নৌযুদ্ধে উত্তরের বিদ্রোহাদি দমন করিতে হইত, দক্ষিণে মিসরীয় রাজধানী থাকাতে উত্তরে প্রায়ই নানা কারণে যুদ্ধ ঘটিত, তন্মধ্যে হিকসোস্ নামে এক জাতির আক্রমণ মিসরের ইতিহাসে বিখ্যাত। হিকসোসেরা যে কে তাহার যথার্থ তথ্য এখনও নিরূপিত হয় নাই তবে উহা যে ফিনিশিয় প্রভৃতি জাতি সমষ্টি, উহা যে নানা জাতির স্থলে জলে আক্রমণ তা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কারণ থিবসের সহিত বহুকাল ধরিয়া ইহাদের যুদ্ধ চলিল। শেষে যখন থিবস হিকসোসদের মিসর হইতে তাড়াইয়া দিল তখন মিসর কি নদীতে, কি সমুদ্রে নৌযুদ্ধের জন্য বিখ্যাত হইয়াছে। সেই মহা ব্যাপারের আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক সম্মত কাল ১৬৭৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ।

কিন্তু এই যুগের মধ্যে প্রাচীন জগতে এক তৃতীয় জাতির উত্থান ঘটিয়াছে,—এক তৃতীয় সভ্যতার বিকাশে পারস্য উপসাগরের শিরোভাগ দীপ্তি পাইতেছে। সেই টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মোহানায়, মিসরীয় নাইলের মোহানার মত, এক রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাজ্যের সমষ্টিতে গঠিত হইয়া কতিপয় হিরক খচিত মুকুট স্বরূপ ব্যাবিলন রাজ্য পারস্যোপসাগরের শিরে স্থান পাইয়া ক্রমশঃ সে সভ্যতার ইতস্ততঃ বিস্তৃতি ঘটাইয়াছে। এই রাজ্য, এ সভ্যতার উৎপত্তিকাল অনেকটা মিসরেরই মত পুরাতন। উহার এক বিখ্যাত রাজারই তারিখ প্রাচীন লিপি অনুসারে খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ৩৭৫০। কিন্তু হল প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ঐ তারিখকে ২৮০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ধরিয়া থাকেন। যতই হউক ঐ ব্যাবিলনের দিগ্বিজয় এই সময়ে একদিকে যেমন সিরিয়া অন্যদিকে তেমনি পারস্য উপসাগরে পৌঁছিয়াছিল; কাজেই নৌশক্তির চর্চ্চা মিসরের মত ব্যাবিলনেও বহু পূর্ব্বে ঘটে, তবে ব্যাবিলনের নৌশক্তির লীলা যেমন পারস্য উপসাগরে হইয়াছিল তেমন মিশরে বহুকাল অবধি ঘটে নাই। পারস্য উপসাগরের উত্তর উপকূলে একদিকে 'সমুদ্র দেশ' নামে রাজ্য অপর দিকে ইলাম রাজ্য। এই দুইটিকে আক্রমণ

করিতে ব্যবিলনের নৌশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু নানা রাজার দিগ্বিজয়ের ফলেও ব্যবিলনে যে নৌশক্তি উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। স্থলযুদ্ধেই প্রাচীনতম ব্যবিলনের কীর্ত্তি এবং উহা ১৭৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল

এই যে সমুদ্রদেশ নামে এক রাজ্যের উল্লেখ হইয়াছে উহা পারস্য উপসাগরের তীরে আসিবার পথে চিরদিন ব্যবিলনকে বাধা দিয়া আসিতেছিল এবং এই সময় এই রাজ্য হিটাইট নামে এক দিগ্বিজয়ী জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত ব্যবিলনকে অধিকার করিয়া লইল। এই রাজ্যের রাজাদের সময়ে ব্যবিলন স্পষ্ট নৌশক্তির চর্চ্চা করিয়াছিল কারণ এখন সমগ্র ব্যবিলন সাম্রাজ্য পারস্য উপসাগরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। এত দিন ব্যবিলনে সুমেরও সেমিটিক জাতিদ্বয়ের পরে পরে আধিপত্য হইতেছিল। প্রথমোক্ত সুমেরকে হলপ্রমুখ ঐতিহাসিকেরা ভারতের দ্রাবিড় জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ধরেন। উহাদের সময়ে প্রথমে লাগশ ও পরে উম্মার রাজকীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই উম্মার সময়ে ইলাম রাজ্যের সহিত ব্যবিলনের নৌযুদ্ধ মধ্যে মধ্যে হইতে আরম্ভ হয় এইরূপ লিপি সমূহ পাওয়া যায়। ইহাদের পর সেমেটিক জাতি উত্তর দিক হইতে আসিয়া এই সাম্রাজ্য অধিকার করে এবং ইলামের সহিত ব্যবিলনের চিরশত্রুতানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেও বাদ দেয় নাই। ইহাদের পর আবার এক অনার্য্য জাতি ব্যবিলনের সাম্রাজ্য অধিকার করিল, ইহারাই আর্য্যজাতির পূর্ব্বে আসেন। অনেক ঐতিহাসিকে প্রমাণিত করেন যে আর্য্য জাতির মহাভ্রমন যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক মহা অনার্য্য জাতির এই শেষ বিস্তার চেষ্টা ব্যবিলনে খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৭৪৫ এবং মিসরে ১৬৭৫ অব্দে পৌঁছিয়াছিল। ব্যবিলেন উহাদের নাম হিটাইট আর মিসরে হিক্‌সস্।

এতদিনে মিসর, ফিনিশিয়া, ব্যবিলনের সঙ্গে এক চতুর্থ জাতি প্রাচীন অনার্য্য সভ্যতায় যোগদান করিল। উহাদের আদিমবাস আধুনিক এসিয়া মাইনরের মধ্যভাগ আনাটোলিয়া প্রদেশ। উহাদের সভ্যতায় ব্যবিলনের সেমিটিক সভ্যতার নানা চিহ্ন পাওয়া যায়। উহারা সিরিয়ার উত্তর ভাগে ফিনিসিয়ার সহিত বহুকাল নৌবিদ্যাদিতে পারদর্শী হইতেছিল। কাজেই উহাদের সহিত যুদ্ধাদিতে রত হইতে হইত এবং আর এক শতাব্দীর মধ্যেই আমরা দিগ্বিজয়ী মিসরের সহিত হিটাইটদিগকে জলে স্থলে যুদ্ধ করিতে দেখিব। ফিনিশিয়ার মত একদিকে ব্যবিলনের অধীনস্থ অসভ্য জাতিদিগের সহিত ও অন্যদিকে গ্রীকদ্বীপপুঞ্জে হিটাইটদিগেরও সভ্যতা প্রচারও আসা যাওয়া হইতেছিল, তবে মিসরের সঙ্গে হিটাইট দিগের এতাবৎকাল অবধি কোন সম্পর্ক বিশেষ ছিল কিনা প্রমাণ পাওয়া যায় নাই কিন্তু ব্যবিলনের সহিত দস্তুর মত ছিল বলিতে হইবে কারণ ব্যবিলন এইদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। আরও অনেক ঐতিহাসিকের মনে হিটাইটদিগের সহিত ইটালির ইট্রাসকান জাতির সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। এইরূপে অন্ততঃ তৎকালীন সমস্ত প্রাচীন জাতির সহিত ইহাদের বাণিজ্য ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যুদ্ধ ঘটিত ইহা ধরা যাইতে পারে।

এই অনার্য্য মহাযুগের শেষভাগে মিসরে এক মহা নৌযুদ্ধের সংঘটন হইল। ইহাতে একবারে অনার্য্য অনার্য্যেই যুদ্ধ, এখনও অনার্য্য আর্য্যের যুদ্ধের আরম্ভ হয় নাই। এই মহা অনার্য্য নৌকীর্ত্তির অবসর এতদিনে ঘটিয়া উঠিল। মিসরের থিবস্ রাজ্য হিকসোস্‌দিগকে তাড়াইতে মনস্থ করিল। সেই যুগের বিস্তর লিপি হইতে প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রমাণ এক কবরের খোদিত লিপি। মিসরের মত অতপূর্ব্বের জলযুদ্ধ কোন দেশের লিখিত বিবরণে বিশেষ রকম পাওয়া যায় না। এই কবর লিপি মিসরীয় থিবসের রাজবংশের এক নৌসেনাপতির। ইহার নাম আমিস্, ইনি হিকসোস্‌দের বিরুদ্ধে মিসরীয় উদ্ধার যুদ্ধে নৌসেনার অধিনায়ক ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে এত পুরাকালে নৌসেনাপতির নামও অধিকন্তু এত বিস্তৃত কীর্ত্তিকলাপ কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডকে নেপোলিয়নের হস্ত হইতে রক্ষাকারী নেলসনের মত এই নৌবীর চূড়ামনির কাহিনী প্রাচীন জগতের সেই তিমিরাচ্ছন্ন ঐতিহাসিক গগনে ধ্রুব তারার মত দীপ্তি পাইতেছে। তৎকালীন মিসরে যে নৌবিদ্যার বিশেষত নৌযুদ্ধে কিরূপ উন্নতি করিয়াছিল তাহা এই খোদিত লিপি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। থিবস রাজের যে দস্তুরমত নৌবিভাগ ছিল এবং উহার বিরুদ্ধে যে হিকসোস্‌দেরও উপযুক্ত নৌশক্তির কথা উহাতে প্রমাণিত হয় তাহা প্রাচীন নৌযুদ্ধের ইতিহাসের উপযুক্ত বিষয়।

এই খোদিত লিপিতে পাওয়া যায় সে এই নৌসেনাপতির পিতাও মিসর রাজের নৌবিভাগের এক সেনানী ছিলেন। তাঁর সঙ্গেই ইনি প্রথমে নৌযুদ্ধাদি শিক্ষা করিতেন। ইহার জাহাজের নাম ছিল' গোবৎস'। ইনি নৌবহর লইয়া দক্ষিণ মিসরীয় থিবস নগর হইতে উত্তরে গিয়াছিলেন,তারপর হিকসোসদের রাজধানী স্বরূপ টেনি দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। জলে স্থলে অবরোধের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আর একখানি জাহাজের নাম পাওয়া গিয়াছে তাহা এই যে 'মিম্‌ফিসে রাজ্যাভিষেক'। তারপর নাইলের মোহনা স্বরূপ নদী সমূহের মধ্যে একটি বিস্তৃত স্থানে নৌযুদ্ধ সংঘটিত হইল। উহার প্রাচীন নাম 'টেনিরসাগর' আধুনিক নাম মেনজাল হ্রদ'। যুদ্ধে সাহসের জন্য রাজা ইহাকে খুব প্রশংসার 'পর এক স্বর্ণালঙ্কার দান করিলেন। যুদ্ধটি ঘটিয়াছিল দুর্গের দক্ষিণ দিকে এবং নৌযুদ্ধান্তে দুর্গ মিসরের দখলে আসিল। হিকসোসদের সঙ্গে মিসরের যুদ্ধ শেষ হইবার শেষ তারিখ অনেক ঐতিহাসিকের মতে ১৫৮০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ।

যেমন এইরূপে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে মিসরীয় নৌশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিল। হিকসোদের সঙ্গে যেমন নানা জাতির সংস্রবে মিসরীয় এই নৌশক্তির উত্থানে ভূমধ্যসাগরে বিপ্লবের সূচনা হইল তেমনি তৎকালীন প্রাচীন জাতির একপ্রান্তে আর এক নৌশক্তির উত্থানের সম্ভাবনা হইতেছিল। তখন জগতে আর্য্য জাতির দেশত্যাগরূপ মহাপ্রয়াণের আরম্ভ হইয়াছে। এই আর্য্য সভ্যতা স্রোত প্রথমেই ব্যাবিলনের সাম্রাজ্য অধিকার করিল। এইখানেই ইহার নাম হইল কেশি জাতি। উহা পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। এতদিনে সমুদ্রদেশ নামক রাজ্য ১৮৭৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে স্বাধীনতা লাভের পর এক নব জাতির অধীন হইল এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ফিনিশিয়ার মত পারস্যসাগরের উপকূলে এক অধীন রাজ্যে পরিণত হইল। উভয় রাজ্যই অধীন হইলেও বাণিজ্যে ও নৌবিদ্যায় পারদর্শী হইতেছিল। একের কাছে যেমন ইউরোপের রাজার অন্যের কাছে তেমনি এসিয়ার রাজার একচেটিয়া হইয়া উঠিল। ভারত প্রভৃতি দেশের দ্রব্য পারস্য উপসাগর দিয়া আসিয়া ইউফ্রেটিস পথে পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে পৌছিত। এই বাণিজ্যার্থ নৌবিদ্যার দ্বিতীয় লীলাভূমির বিশেষ উত্থানের কাল অনেক ঐতিহাসিকের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫৮০ অব্দের কাছাকাছি।

কিন্তু এই সময়ে মিসরের দিগ্বিজয় আরম্ভ হইল। তখন নাইল তীরে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অষ্টাদশ বংশীয় রাজগণের নাইল নদী, লোহিতসাগর আর পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধ গণ্ডি পার হইবার সময় আসিল। ফিনিশিয়েরা এসিয়া মাইনরের তীরে তীরে, কৃষ্ণসাগরেও বাণিজ্য করিত, উদ্দেশ্য মিসর ও ব্যবিলন সাম্রাজ্যকে 'টিন' ধাতু যোগান। বহুপূর্ব্ব হইতেই এই বাণিজ্য যাত্রা ফিনিশিয়ার দ্বারা সাধিত হইয়া আসিত, এখন দিগ্বিজয়ী মিসররাজ তৃতীয় থটমসিসের সময়ে মিসরীয় বাহিনী ফিনিশিয়ার নৌশক্তিকে নিজের তাঁবে খাটাইয়া কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত নৌযুদ্ধে অজেয় হইয়া আসিলেন। এই দিগ্বিজয়ের ফলে মিসরীয় খোদিত লিপি অনুসারে কৃষ্ণ ভূমধ্য ও লোহিত সাগর মিসরীয় নৌশক্তির অধীন হইল। তখন মিসরের বৃহতী নৌশক্তির পদতলে সিরিয়া প্রভৃতি বিস্তর পশ্চিমের জাতি, তিন সমুদ্র আর সাইপ্রাস ও গ্রীকদিগের যত দ্বীপপুঞ্জ আর সমুদ্র তীরবর্ত্তী দেশসমূহ দলিত হইল। এত দিনে প্রাচীন ইতিহাসে যেন তৎকালীন পৃথিবীর সমস্ত বাণিজ্য এক জাতির অধীন হইল। ক্রমে ব্যবিলনও মিসরের অধীন হওয়ায়, সংবাদ পাওয়া গেল, তখন একদিকে ভারতের অপর দিকে ইউরোপের বাণিজ্য মিসরের নৌশক্তির অধীন হইয়া পড়িল। জগতের বাণিজ্যে মিসরীয় আধিপত্য এইরূপে খৃঃপূঃ১৫৮০ হইতে মোটামুটি খৃঃপূঃ১৩০০ পর্য্যন্ত চলে।

এই সময়ের মধ্যে ফিনিশিয়ার সিডান রাজ্যের আধিপত্য ছিল। কিন্তু ফিনিশিয়ার কোন রাজ্যই কখনও বিদেশীয় আক্রমণে বিশেষ রকম বাধা দিত না, তাহারা বাণিজ্য করিতে পারিলে অধীনতা স্বীকার করিত। মিসরের অধীনে ফিনিশিয়া বাণিজ্য করিল। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকের মতে কি মিসর কি ব্যবিলন কি উত্তরকালের আসিরিয়া কি পারস্য কেহই বস্তুতঃ যাহাকে বলে নাবিক হওয়া তেমন ছিল না, উহারা সকলেই ফিনিশিয় নাবিক নিযুক্ত করিত। কিন্তু অপরের পক্ষে কি হয় বলা যায় না, মিসরের যেরূপ চিত্রাদি পাওয়া যায় তাহাতে উহারা ফিনিশিয়ার সাহায্য লইত বটে কিন্তু মিসরীয় খাঁটি নৌসৈন্যও ছিল এইরূপ বুঝা যায়। ক্রমে মিসরের মত ফিনিশিয়াতেও নৌশক্তির পতন হইয়া আসিল। সিডান রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া পড়িল এই সিডোনের জাহাজ সমূহই মিসরের জন্য কৃষ্ণসাগরের মত, দক্ষিণে লোহিতসাগরেও যুদ্ধাদি

করিয়া আসিত। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে এই সময়ে এক মহাশক্রর উৎপত্তিতে ক্রিমিয়ার কি ফিনিশিয়া উভয়ের নৌশক্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। এই মহাশক্রর অভ্যুত্থান প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৩০০ হইতে ১১০৯ অব্দ পর্য্যন্ত।

এতে দিনের মধ্যে আমরা ভারতে আর্য্যজাতিকে আসিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। কেবলমাত্র সাবিলনে ত আর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠার কথা বলাই হইয়াছে। অনার্য্য হিটাইটজাতির পার্শ্বেই আর্য্য মিটানি রাজ্যে দশরথ প্রভৃতি রাজার নাম পাওয়া যায়। আর ইউরোপে এই সময়ে গ্রীসে আর্য্যজাতির আগমন হইয়াছে, ইতালি প্রভৃতিতেও তদ্রূপ। কাজেই আর্য্যজাতির চাপে দক্ষিণ ইউরোপের আদিম অনার্য্যজাতিরা দেশত্যাগ করিয়া সমুদ্রে ও উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় লইতেছে। এই সব জাতি মিসরে সাধারণতঃ নিদিষ্ট জাতি নামে পরিচিতছিল। এই প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৩০ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এই সব জাতি রীতিমত নৌশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভূমধ্যসাগরে মিসর ও ফিনিশির নৌবলের ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। ইহার পূর্ব্বেও উহারা শত্রুতা করিত কিন্তু মিসরীয় জলপুলিশের ব্যবস্থায় বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু যাই মিসরের ক্ষমতার হ্রাস হইতে লাগিল, তেমনি সেই সবজাতির জলদস্যুগিরী মিসর প্রভৃতি দেশকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিল। এই সব জাতির সহিত মিসর নৌশক্তির এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল, এক দীর্ঘ খোদিত লিপিতে এই জলযুদ্ধের বিশদ বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। মিসর রাজ মারনেপ্তা জয়লাভ করিলেন, মিসরের বাণিজ্য কতকটা রক্ষিত হইল বটে, কিন্তু এই জাতিদের মিসরীয় সাম্রাজ্যে স্থান দিতে হইল, উহাদের বাসস্থান যে আর্য্যজাতিতে কাড়িয়া লইয়াছে কাজেই মিসররাজ উহাদিগকে ফিনিশিয়ার উপকূলে বাস করিতে দিলেন এবং উত্তরকালে উহাদের রাজ্য ফিলিস্টাইন রাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এইরূপ নূতন জাতিদের ঘন ঘন আক্রমণে ভূমধ্যসাগরে মিশর ও ফিনিশিয়ার নৌশক্তি নষ্ট হইয়া গেল। এই সব জাতি আর্য্য গ্রীসে 'পিলাসজি' নামে বিখ্যাত। ভূমধ্যসাগর পিলাসজি নৌবহরে পূর্ণ হইল। কিন্তু এই দুই শতাব্দীর মধ্যেই এই জাতিদের স্থায়ী বাসস্থান স্থির হইয়া গেল।

এই সময়ে প্রাচীন জগতে আর্য্য অনার্য্যের যুদ্ধ যুগ। এই সময় পৃথিবীর নানা মহা কার্য্যের কাল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন। এই সময়েই বেদ লেখার শেষ এবং রামায়ণ লেখার আরম্ভ এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। তাই বলিয়া এই সময়ে যে ভারতের বাণিজ্যের আরম্ভ তাহা বলা সঙ্গত নহে। মিসর অতি পুরাকাল হইতে লোহিত সাগর আর সোমালি দেশ হস্তগত করিয়া ভারতের দ্রব্য ক্রয় করিবার সুবিধা করে। সে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৭৫০ অব্দের ও পূর্ব্বের কথা। তারপর মিসরের রাজা ও রাণী পায়ই এই বাণিজ্য পথ রক্ষা করিবার জন্য নৌশক্তি গঠিত করিয়াছেন। রাণী হাতাসুর এই বিষয়ে চেষ্টার বিস্তর লিপি ও চিত্র পাওয়া গিয়াছে। কাজেই ভারতের বাণিজ্য দ্রব্য মিসরে আনিবার জন্য রীতিমত নৌশক্তি অবাধে আধিপত্য করিতেছিল। ক্রমে উত্তর দিকে মিসরীয় ও ফিনিসিয় নৌশক্তির পতন ঘটাতে এই দক্ষিণের ভারতের বাণিজ্যের প্রতি এই সময় হইতে অধিকতর চেষ্টা হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী এক মিসর রাজ ভূমধ্য সাগর হইতে নাইল নদী ও খালের সাহায্যে লোহিত সাগরে আসিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমশ মিসরের দুর্দ্দিন আরম্ভ হওয়াতে লোহিত সাগরেও নৌশক্তির হ্রাস হইতে লাগিল।

ভূমধ্য সাগরে আর্য্য নূতন গ্রীকজাতি ফিনিশিয়ার সাহায্যে মিসরের সভ্যতা কতক পরিমাণে গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু অনার্য্যজাতির সহিত উহাদের যুদ্ধের কথা মহা কাব্যাদি লিখিত হইতে লাগিল। এতদিনে ফিনিশিয়ার কৃষ্ণ সাগরে বাণিজ্য নষ্ট হইল। 'আরগোনাট' নামে এক দল গ্রীক প্রবাদ অনুসারে কৃষ্ণসাগরের অভিমুখে যাত্রা করিল। এই সময় হইতে বোধ হয় গ্রীকদিগের নৌশক্তির সহিত সংঘর্ষে আসিয়া ফিনিশিয়া কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে টিন প্রভৃতি ধাতুর সংগ্রহ করিতে যাওয়া ছাড়িয়া ভারতের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিল। গ্রীকদিগের নৌশক্তির আর এক প্রবাদের এক মহাকাব্য আছে। তাহা ইলিয়মের যুদ্ধ। ১১০০ শত গ্রীক জাহাজ এসিয়া মাইনরের উপকূলে বৃহৎ ইলিয়ম নগরে আসে। যুদ্ধ শেষে গ্রীকদিগের নৌশক্তি ভূমধ্য সাগরে অজেয় হইয়া উঠিল। তারপর এক গ্রীক নৌবীর অডিয়িসস্ সমুদ্র ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। আধুনিক জিব্রল্টার প্রণালী তখন গ্রীক নৌশক্তির কাছে নিকটবর্ত্তী

ডার্ডানালিস ও বস্‌ফরাসের মত বিখ্যাত হইয়া উঠিল। মিসরের নৌশক্তি তখন ভূমধ্যসাগরে কিছু কালের জন্য নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু ফিনিশিয়ার নৌশক্তি পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরে ক্রমে গ্রীকদিগের কাছে বড়ই বাধা পাইতে লাগিল।

এই সময়ে ফিনিশিয়ার কথা কিছু বলা আবশ্যক। জগতের এই প্রথম নৌজীবী জাতি, স্বাধীন বা অধীন, যে অবস্থায় হউক, যুগে যুগে নৌবিদ্যার জন্য খ্যাতিলাভ করিতেছিল। প্রাচীন জগতে নাবিক বলিতে এক মাত্র ফিনিশিয় জাতি বুঝাইত। বাকি সকলেই উহাদের শিষ্য বলিয়া মনে হয়। ফিনিশিয়ার সিডোন রাজ্যের পতনের পর, টায়ার নগর ফিনিশিয়ার নাম রক্ষা করিল, কিন্তু সিডোনের মত সৌভাগ্য আর এই ফিনিশিয় রাজ্যের ভাগ্যে ঘটিল না। কাজেই এই সময়ে ফিনিশিয় জাতির এক চিরস্মরণীয় যুগ। ডেঙ্গার ফিলিস্‌টাইন প্রভৃতি নবাগত জাতিদের আক্রোশে আর জলে গ্রীকদিগের রেশারিশিতে এই প্রাচীনতম নাবিক জাতির জীবন যাত্রা কষ্টকর হইয়া উঠিল। সিডোনের সময় হইতেই এই জাতি যেখানে বাণিজ্য করিত সেখানেই 'কুঠি' নির্ম্মাণ করিত, এখন হইতে সেই সব কুঠিতেই স্থায়ী ভাবে বাস করিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হইল। পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরে গ্রীকদিগের হাতে অপদস্থ হইয়া উহারা পশ্চিমভাগে আশ্রয় লইল। উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি ও স্পেনে ফিনিশিয়ার উপনিবেশ স্থাপিত হইল। এইরূপে পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরে ফিনিশিয় নৌশক্তির পতনে পশ্চিম ভূমধ্য সাগরে ফিনিশির নৌশক্তির প্রবল প্রতাপ আরম্ভ হইল। ফিনিশিয়ার টায়ার রাজ্য ক্রমে অধঃপতিত ফিলিসটাইন্ রাজ্যের ধ্বংস কর্ত্তা ইহুদি জাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল।

ইহুদিদিগের এতদিনে নৌশক্তির পালা আসিল। এই সময়ে মিসর দেশেরমধ্যেই গোলযোগ লইয়া ব্যস্ত কাজেই ফিনিশিয় রাজ্য টায়ার ও ইহুদিগণ যুক্তনৌশক্তির সৃষ্টি করিল। পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরে গ্রীকদিগের জ্বালায় কিছু বড় করিবার সুবিধা হইল না। কাজেই লোহিত সাগরের বাণিজ্য উভয়ের হাতে এক চেটিয়া হইতে লাগিল। ভারতের পণ্য দ্রব্য আনিয়া আরব সাগর হইতে একেবারে মিসরে আসিবার চেষ্টা পূর্ব্বে মিসর নিজেই করিয়াছিল সেই পুরাকালে মিসর পান্টদেশ জয় করিয়া এক বড় 'কুঠি' স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন সে মিসরের আর দর্প নাই। মিসর এক প্রকার মৃত, কাজেই ভারত হইতে সোজা লোহিত; সাগরে মাল আনিয়া ফেলিতে এই দুই জাতীয় নৌশক্তি নিযুক্ত হইল। কিন্তু এই কার্য্যের বিরুদ্ধে উভয়ের দুইটি মহা বিপদ উপস্থিত হইল। সেই সিরিয়া জাতি মিসরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজেদের মিসর রাজ সিসঙ্কের নেতৃত্বে সিরিয়া আক্রমণ করিল। ইহুদিরাজ বিখ্যাত সলোমনের যাবৎ সঞ্চিত ধন রত্ন মিসরের দ্বারা লুণ্ঠিত হইল। আর আসিরিয়া রাজ্য উভয়ের দৌরাত্ম্যে পারস্য উপসাগরে ও ইউফ্রেটিস্ নদী পথের বাণিজ্য নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, খড়্গ হস্ত হইয়াছিল। এই নূতন আসিরিয়া রাজ্য মহা সাম্রাজ্যে পরিণত হইতে আরম্ভ করে খৃষ্টপূর্ব্ব ১১০০ অব্দ হইতে, এবং এই সময়ে ইহা উভয়কে ভয়ানক রকম আক্রমণ করিল। সিডোনের মত এতদিনের ফিনিশিয় রাজ্য টায়ারেরও পতনের আরম্ভ হইল। উহার তারিখ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮৭৫ অব্দ হইবে।

এই সময়ে পশ্চিম ভারত প্রান্তে আসিরিয়ার মহা সাম্রাজ্য ভারত ও গ্রীকদিগের গল্পের যুগের সঙ্গে আসিরিয়ার গল্প যুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহাতে সেই রাজা নিনাস ও রাণী সেমিরামিসের প্রবাদের উৎপত্তি। এই রাণীর দিগ্বিজয় প্রবাদ মতে ভারতের সিন্ধু নদ হইতে মিসরের নাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং চারিদিকে দেশের দ্বারা ঘেরা আসিরিয়া রাজ্য, প্রবাদের এই রাণীর সময়েই সমুদ্র দেখিল. শুধু তাই নয়, চার চারটি সমুদ্রের বাণিজ্য এবং খাল ও নদী আসিরিয়া নৌশক্তির অধীন হইল। এই প্রবাদ মিথ্যা হইলেও, ইতিহাসে আসিরিয়ার প্রথম দিগ্বিজয়ী রাজা প্রথম টুকুলটি নিনিয়া ১১০৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে যে পারস্য উপসাগর ও পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের তীর ভূমিতে আসিরিয়া নৌশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিকের সন্দেহ নাই। তারপর মিসর যেমন প্রাচীন জগতের নৌশক্তির ইতিহাসে এতদিন আধিপত্য করিয়াছিল এখন আসিরিয়া সেইরূপ করিল। মিসর আসিরিয়ার অধীন হইলে, লোহিতসাগরের নৌশক্তি আসিরিয়ার হাতে আসিল। আর পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরে আসিরিয়ার ক্ষমতা বিস্তৃত হইল। এইরূপে প্রাচীন যুগের মিসরের মত এখন আসিরিয়া প্রাচীন যুগের প্রধান

নৌশক্তি হইয়া উঠিল। কিন্তু ফিনিশিয়ার নাবিক সেই নৌশক্তির পরিচালক হইয়াছিল, ইহাই অনেক ঐতিহাসিকের মত। আসিরিয়ার আধিপত্য খৃষ্টপূর্ব্ব ৬২৬ অব্দ অবধি ছিল।

এই ৮৭৫ ও ৬২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে জগতের আদিম নৌজীবী জাতির ইতিহাস বড়ই কৌতুহল জনক। আসিরিয়ার আক্রমণে ফিনিশিয় জাতি সাধারতঃ সেই মিসরীর আক্রমণের সময়ের মত, অধীন হওয়ার চির প্রতিষ্ঠিত প্রথা অবলম্বন করিল বটে কিন্তু ফিনিশিয় কতকগুলি স্বাধীনচেতা মনীষী অধীন স্বদেশ ত্যাগ করিল, নূতন ভয়াবহ স্থানেও স্বাধীন থাকিতে প্রস্তুত হইয়া উপনিবেশ স্থাপনে প্রস্থান করিল। এইরূপে উত্তর কালে রোমরাজ্যের মহা শক্র কার্থেজ রাজ্য ৮৭৫ অব্দের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। অনেক ফিনিশিয়াবাসী আসিরিয়ার অধীনে নাবিক হইয়া, আসিরিয়া নৌশক্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিল, বটে কিন্তু নূতন এক ফিনিশিয় জাতি পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে একাধিপত্য করিতে লাগিল। এসিয়ার টায়ার রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইতেছিল বটে, বার বার আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইতেছিল বটে, কিন্তু এই পশ্চিম ভূমধ্য সাগরে চতুর্দ্দিকের উপকূলে প্রতিষ্ঠিত ফিনিশিয় উপনিবেশ সমূহ শক্তিশালী হইল। ফিনিশিয় উপনিবেশ আফ্রিকা, স্পেন, সিসিলি, কর্সিকা সার্ডেনিয়া ও ইটালিতেও প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল এবং আসল ফিনিশিয়ার পূর্ব্বে টায়ারের মত এখানে কার্থেজ উপনিবেশই সকলের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিতেছিল।

এইরূপে পশ্চিম ভূমধ্যসাগর যেমন এক ফিনিশিয় হ্রদের মত মনে হইতে লাগিল তেমনি পূর্ব্ব ভূমধ্য-সাগর গ্রীকদিগের জিনিষ হইল গ্রীকদিগের বাণিজ্যে মিসর মাতিয়া উঠিতেছে। আসিরিয়ার ক্রমশঃ পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকগণ সিরিয়ার উপকূল পর্য্যন্ত উপনিবেশে পূর্ণ করিতে লাগিল। তারপর তৎকালীন বৃহৎ লিডিয়া রাজ্য এসিয়া মাইনরে বর্ত্তমান। তাহার সহিতও গ্রীক জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পশ্চিমে ও গ্রীকদিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইতে লাগিল ইতালির দক্ষিণ ভাগ ও সিসিলি দ্বীপ গ্রীক উপনিবেশে পূর্ণ হইয়া গেল। মিসর ও কার্থেজের মধ্যস্থলেও আফ্রিকার উত্তর ভাগ গ্রীক জাতির নগরে শোভিত হইল। এইরূপে কৃষ্ণ সাগর এবং ইতালি পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগর গ্রীক নৌশক্তির অধীন হইয়া রহিল। কিন্তু গ্রীকরাও ফিনিশিয়ের মত নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে নৌযুদ্ধে ও গৌরবে এথেন্সই শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল।

ভূমধ্যসাগরের নৌশক্তি যখন এইরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইল তখন সহসা পশ্চিম এসিয়ায় দুই মহা সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০৬ অব্দে আসিরিয়া সাম্রাজ্য আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া ব্যবলিন ও মিডিয়া রাজ্য দ্বয়ের মধ্যে বিভক্ত হইল। ব্যবিলন সিরিয়া পাইল। আর আসিরিয়া সাম্রাজ্যের উত্তর ভাগ মিডিয়া হাতে কৃষ্ণসাগর অবধি বিস্তৃত হইল। এইরূপে আসিরিয়ার পর ব্যবিলনের হাতে সিরিয়ার উপকূলে নৌশক্তি পরিচালিত হইল। পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরে ও ব্যবিলনের নৌশক্তি বিস্তৃত হইল। এইরূপে ব্যবিলন এখন ভারতের সহিত মিসর ও ইউরোপের বাণিজ্য নিজ নৌশক্তির আয়ত্বে আনিল। ব্যবিলনের মহাবল বিখ্যাত নরপতি নেবচাড্-নেজার যেমন আরব দেশের উপকূল অধিকার করেন তেমনি সর্ব্বত্র নৌবলের উন্নতির চেষ্টায় ছিলেন। ইহার খাল কাটিবার ব্যবস্থায় ব্যবিলন রাজ্যে নৌচর্চ্চার সঙ্গে বিবিধ বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকের মতে ব্যবিলনের এই নৌবিদ্যার উৎকর্ষও ফিনিশিয়ার নাবিকের চেষ্টায় সাধিত হইয়াছিল, তবে আসিরিয়ার পক্ষে সে কথা খাটিলেও ব্যবিলনের পক্ষে মিসরের মত উহা একেবারে অসম্ভব। দক্ষিণে ব্যবিলনের একাধিপত্য হইলেও পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরে কিন্তু গ্রীক নৌশক্তি অক্ষুণ্ণ রহিলই আর লিডিয়ার নৌবহর কি ভূমধ্য কি কৃষ্ণ উভয় সাগরেই এক ব্যবিলনের, অপরে মিডিয়ার, সমকক্ষ হইয়া রহিল। কিন্তু ভারতের সহিত বাণিজ্য এতদিনে দ্বিতীয়বার ব্যবিলনের হস্তগত হইল। এবং ভারত সমুদ্র পথে ব্যবিলনের এই নৌশক্তি খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০৬ হইতে দস্তর মত ৫৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত ছিল।

কিন্তু এই নূতন যুগের মধ্যে মিসর শেষবারের মত নৌশক্তির উদ্ধার করিল। ব্যবিলনের নেবচাডনেজারের পর ক্ষমতা যেমন কমিতে লাগিল তখন মিসরীর নৌশক্তি মিসর রাজ দ্বিতীয় নিকোর বুদ্ধি কৌশলে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মিসরের হইয়া ফিনিশিয়ার নৌব্যবসায়ীরা বাণিজ্যের জন্য নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে ছুটিলেন।

লোহিতসাগর আরবসাগর পার হইয়া মিসরীয় নৌবহর সমগ্র আফ্রিকা ঘুরিয়া জিব্রল্টার প্রণালী দিয়া তিন বৎসরে আবার মিসরে ফিরিল। আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করার ব্যাপার অনেক ঐতিহাসিকে বিশ্বাস করিতে চাহেন না, কিন্তু ফিনিশিয় নাবিকের সাহায্যে এ কার্য্য না হইবার ত কোন কারণ দেখা যায় না। আরও এই মিসর রাজ সেই পূর্ব্ববর্ত্তী মিসররাজ প্রথম সেতির নাইল নদী হইতে লোহিতসাগর পর্য্যন্ত খালের সংস্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সেই ভূমধ্যসাগর হইতে লোহিতসাগর জলে জলে আসিবার পথ পূর্ব্বে ছিল, সেই খাল আবার এই সময়ে কাটা হইতেছিল কিন্তু যুদ্ধ কুসংস্কারাদিহেতু এ সময়ে আর সে কাজ হইয়া উঠিল না। মিসর তখন ব্যবিলনের আক্রমণের ভয়ে ম্রিয়মাণ, ক্রমে পরবর্ত্তী মিসর রাজেরা ব্যবিলনের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে এক মহা একতার সৃষ্টির চেষ্টায় রহিল। তৎকালীন লিডিয়া ও গ্রীকদিগের সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইল। মিসর সাইপ্রস প্রভৃতি দ্বীপ জয় করিয়া প্রবল নৌশক্তির সৃষ্টি করিল। এবং গ্রীকদিগের বাণিজ্যের জন্য নাইল নদীর মোহানায় এক বিরাট বন্দরের উন্নতি মিসর রাজের সখ্যতায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপে তৎকালীন জগতে নৌশক্তির এক অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ব্যবিলনের ক্ষমতা পারস্য উপসাগর ও ইউফ্রেটিস আদি নদীতে অক্ষুন্ন রহিল। মিসর লোহিত সাগর, আরবসাগর ও পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে একরূপ একাধিপত্য করিল। লিডিয়া রাজ্য এসিয়া মাইনরের কূলে কূলে গ্রীকদিগের সহিত রেশারিশি করিতে লাগিল। এবং কৃষ্ণসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরে অবধি উহার নৌশক্তি গ্রীকজাতির বিরোধী হইয়া রহিল। মিডিয়া রাজ্য উত্তরে কৃষ্ণসার আর দক্ষিণে ভারতের নিকটবর্ত্তী সাগরে প্রবল থাকিল। ভারতের তীরে তীরে এই সমস্ত জাতির কুঠি স্থাপিত হইত। বেভেরু জাতক নামে এক ভারতীয় বৌদ্ধ যুগের পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহা অনেক ঐতিহাসিকের মধ্যে ব্যবিলনের নামে লিখিত বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহাতে পারস্য উপসাগরের সহিত খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দির ভারতীয় বাণিজ্যের কথা পাওয়া যায়। এইরূপে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম ভাগের ফিনিশিয় হ্রদে পরিণত হইয়াছিল এখন ফিনিশিয়ার সমকক্ষ আরবীয় প্রাচীন জাতি সমূহের এই ভারতীয় বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকায় উত্তর ভারতসাগর এক আরবীয় হ্রদের মত বোধ হইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরের মত, ভারতসাগরেও, ফিনিশিয় প্রাচীন কালীন বাণিজ্য লীলার অবসান ঘটিতে লাগিল। ভারতীয় কচ্ছদেশের বন্দর বড়কচ্ছই বোধ হয় এই সময়ের জগৎ প্রসিদ্ধ 'ওফির' নামে অভিহিত হইত। সেই মিসরীয় ইতিহাসে পূর্ব্বাবর্ত্তী কাল হইতে ভারতের যে নৌশক্তি এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল তাহা এই বৌদ্ধ যুগে, জাতক নামে পুস্তকাদির সাহায্যে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল বলিতে পারা যায়। ফিনিশিয়া ও সলোমনের সময়ে ভারতের নৌশক্তির পর এই সময়ে ভারতের কোন প্রদেশের বিখ্যাত নৌবহরের সংবাদ প্রমাণ স্বরূপ পাওয়া যায়। অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন প্রায় ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বঙ্গের রাজপুত্র বিজয় বঙ্গের নৌবহর লইয়া সিংহলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অধ্যাপকমহাশয়ের আবিষ্কৃত 'যুক্তি কল্পতরু' নামক নৌবিদ্যার গ্রন্থ যে ঠিক কোন সময়ের জিনিষ তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই, তবে সম্ভবতঃ এই সময়েই উহার অস্তিত্ব ছিল। কাজেই ভারতের নৌশক্তি এই সময়ে ব্যবিলন এবং ব্যবিলনের পতন কালে আরব রাজ্য সমূহের সমকক্ষ ছিল।

প্রাচীন জগতে যখন এইরূপ নৌশক্তির ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সময়ে হটাৎ এক নূতন জাতির উৎপত্তি ঘটিল। সম্ভবা খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে সাইরস নামে এক বীর পুরুষ মিডিয়া রাজ্যের ধ্বংস করিয়া পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন। এইরূপে ভারতের নিকট হইতে কৃষ্ণসাগরের তীর পর্য্যন্ত পারস্য শক্তির অধিকারে আসিল। তিন চারি বৎসরের মধ্যে দিগ্বিজয়ী সাইরস লিডিয়া রাজ্যের ধ্বংস করিয়া সমগ্র এসিয়া মাইনর হস্তগত করিলেন। এসিয়া মাইনরের কূলে কূলে পারস্য নৌশক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটিল। ইহাতে সেই লিডিয়ার সাহায্যকারী মিসর ও গ্রীক রাজ্য সমূহ পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধ আশঙ্কা করিতে লাগিল, কিন্তু ইহাদের পূর্ব্বেই ব্যবিলন সাম্রাজ্য পারস্যের অধীন হইল, সঙ্গে সঙ্গে ৫৩৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পারস্য উপসাগর, আরবসাগর, লোহিতসাগর ও পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের গ্রীকজাতি উভয়ে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও, মিসর ৫২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে পারস্যরাজ কেম্বেসিসের হস্তে পরাজিত হইয়া পারস্য সাম্রাজ্যের এক

প্রদেশে পরিণত হইল। এইরূপ সমগ্র পশ্চিম এসিয়ার যত সমুদ্রে পারস্য নৌবহরের নূতন লীলা আরম্ভ হইল। বাকি রহিল গ্রীক জগৎ। প্রাচীন জগতের যত জাতি পারস্যের অধীন হইয়া গেল, সিন্ধু নদী হইতে সাহারার ভীষণ মরুস্থলী পর্য্যন্ত পারস্যের অধীন হইল বাকি রহিল শুধু গ্রীক জাতি। প্রাচীন জাতিদের সমগ্র নৌশক্তি পারস্যের হস্তে আসিল—ব্যবিলন, আরব, মিসর সিরিয়া, লিডিয়া মিডিয়ার এবং এসিয়ার উপকূলস্থ গ্রীক রাজ্য-সমূহের নৌশক্তি পারস্যের হাতে পড়িল বাকি রহিল ইউরোপের গ্রীক দেশ ও দ্বীপসমূহ।

এতদিনে দুই আর্য্যজাতির নৌশক্তির ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এসিয়ার তীরে যে সব গ্রীক উপনিবেশ পারস্যের অধীন হইয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন গ্রীক-রাজ্য খড়্গ হস্ত হইয়াছিল। এই স্বাধীন দলের নৌশক্তির নেতা ছিলেন এক দ্বীপরাজ্য সেমসের রাজা পলিক্রেটিশ। ইনি মিসরের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু মিসরকে বাঁচাইতে পারিলেন না। এ দিকে নিজের ও অকাল মৃত্যুতে গ্রীক জাতির ও ভাগ্যলক্ষ্মী অস্থির হইলেন। ইহার নৌবহরে এক শত যুদ্ধের জাহাজ ছিল। সে সমস্ত ও যে কোথায় গেল ঠিক রহিল না। পারস্যরাজ ডেরিয়াস্ নৌসেতু দ্বারা হেলেস্পন্ট প্রণালী পার হইয়া ডেনিউব নদী হইতে মেসিডোনিয়া পর্য্যন্ত দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিলেন। গ্রীক জাতির উপর, পারস্যের এতদূর অগ্রসর হওয়া, দেখিয়া এসিয়ার অধীন গ্রীক রাষ্ট্রগুলিও বিদ্রোহী হইল এবং লেডিনামক স্থানে এক ভয়ানক নৌযুদ্ধে গ্রীক নৌশক্তি সম্পূর্ণরূপ পরাস্ত হইল। কিন্তু পারস্যের ক্ষমতা গ্রীকদিগের সহিত স্থল যুদ্ধে মারাথনের প্রসিদ্ধ প্রান্তরে প্রতিহত হইয়া গেল। তবে সে লুপ্ত ক্ষমতা, পরবর্ত্তী পারস্যরাজ জারএক্সেস্ থারমপলি গিরিসঙ্কটে অতি কষ্টে উদ্ধার করিলেন। পরে আবুচি মিসিয়মের জলযুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ ক্ষতি ঘটিলেও আথেন্সনগরী পারস্যের হস্তে দগ্ধীভূত হয়। কিন্তু এথেন্সের বীর থেমিসটোক্লিসের মৎলবে গ্রীকদিগের নৌবাহিনী সেলমিস্ নামক বন্দরের মহাযুদ্ধে জয়ী হইল। এই পরাজয়ের পর হইতে পারস্য নৌশক্তি আর ইউরোপের গ্রীক নৌবহরের সঙ্গে যুদ্ধে মাত্র দুই একবার আসিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই এইরূপে ইউরোপে পারস্যের নৌশক্তি পরাজিত হইলেও এসিয়ায় ও মিসরে অজেয় হইয়া রহিল। গ্রীক জাতিও ডেলস নামক স্থানে একতাবদ্ধ হইয়া পারস্যের পুনরাক্রমণ নিবারণের উপায় করিয়া রাখে, কিন্তু সাইপ্রাস ও মিসরে পারস্যের বিরুদ্ধে বৃথা বিদ্রোহকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে, পারস্য ও এক নীতির অনুসরণ করিয়া বহুকালের জন্য গ্রীক জাতিকে গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়া দিয়া, ৪৮০ হইতে ৩৩৪ খৃষ্ট পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত একাধিপত্য করে।

এই ৪৮০ অব্দে গ্রীক নৌশক্তি যেমন পারস্য নৌবহরের গতিরোধ করিয়া পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে বাঁচিয়া গেল তেমনি পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে গ্রীক উপনিবেশিকেরা সিসিলি দ্বীপে কার্থেজের প্রসার স্থগিত করিয়াছিল। ফিনিশিয়ায় সমস্ত উপনিবেশ ক্রমে ক্রমে কার্থেজের অধীন হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক উপনিবেশ সমূহের সহিত, ফিনিশিয় কার্থেজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে কার্থেজ রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্র ধিকি ধিকি উন্নতি করিতে থাকে এবং ফিনিশিয় নৌশক্তি এই নূতন জগতে আসিয়াও আবিষ্কারের জন্য ধাবিত হইল। দুটি বিখ্যাত নৌবীর হেনোও হামিলকো প্রাচীন জগতে প্রসিদ্ধ হারকিউলিসের স্তম্ভ নামক জিব্রলটার প্রণালী পার হইয়া একজন দক্ষিণে আফ্রিকার তীর ধরিয়া চলিলেন আর একজন উত্তরে স্পেন, ফ্রান্স ও বৃটন দ্বীপপুঞ্জের দিকে গেলেন। এ দিকে বাণিজ্য একাধিপত্য থাকিলেও ভূমধ্যসাগরে উদীয়মান রোম-রাজ্যের সহিত কার্থেজের সংঘর্ষ হইতেছিল, কিন্তু রোমের তখনও এমন ক্ষমতা হয় নাই যে কার্থেজের ক্ষমতার একটুও হানি করে। রোম ও কার্থেজের প্রথম সন্ধিপত্রগুলিতে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে কার্থেজের একাধিপত্য একরূপ মানিয়া লওয়া হইল ইহার তারিখ ৫০৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ। কিন্তু পরবর্ত্তী শতাব্দিতে কার্থেজের রাজলক্ষ্মী ক্রমশঃ চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। সেই শতাব্দীর প্রথমভাগেই ৪৮০ অব্দে সিসিলি দ্বীপে গ্রীক-দিগের কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ আরম্ভ করিল, কার্থেজের নৌশক্তির আধিপত্য পশ্চিম জগতে বহুকাল অক্ষুণ্ণ রহিল।

এইরূপে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পূর্ব্বজগতে পারস্য, মধ্যজগতে গ্রীক এবং পশ্চিম জগতে ফিনিশিয় কার্থেজের

নৌশক্তির প্রাবল্যের দিন। ভারতের নৌশক্তির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ ভারতের বাণিজ্যের রক্ষা করিত। তারপর আরবজাতি সমূহ পারস্যের অধীনে বাণিজ্যজীবী হইয়াছিল। ইউরোপে গ্রীকজাতিদিগের রাজ্য ও উপনিবেশ সমূহে গ্রীক নৌশক্তির উন্নতির সীমা রহিল না। একেবারে পশ্চিমে কার্থেজের নৌবল দেশ জয় করিতে করিতে স্থল যুদ্ধেও অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল। তখনও রোম রাজ্যের তেমন দিন আসে নাই, তখনও রোম উত্তর কালের ভাবী বিশ্ব বিজয়ী রাজ্য শিশুমাত্র। ইতালির পশ্চিম উপকূলে রোমের নৌশক্তি ধিকি ধিকি উঠিতেছিল। কার্থেজের সঙ্গে সন্ধির পর সন্ধিতে নিজেকে বাঁচাইতেছিল। তখন রোমের রাজ্যই ছিল মাত্র ইতালির খানিকটা এবং কার্থেজের ভয়ে রোম কাঁপিয়া উঠিত। রোম একে একে ইতালির রাজ্য সমূহ অধিকার করিয়া উঠিতে লাগিল এইরূপে বহুকাল কাটিয়া চলিল।

এদিকে দেখিতে দেখিতে গ্রীকজাতি প্রবল হইয়া উঠিল, মহাবীর আলেকজান্দার গ্রীকজাতির নেতা হইয়া পারস্য সাম্রাজ্যের ধ্বংস করিলেন খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩৪ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩২৬ এর মধ্যে সেই মহা গ্রীক বীরের হস্তে ভারতবর্ষের মগধ রাজ্য হইতে ইতালি ও কার্থেজের সীমা পর্য্যন্ত এক মহা গ্রীকসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তৎকালীন সমস্ত জ্ঞান সমুদ্রে গ্রীক বাহিনীর একাধিপত্য রটিল। কি ভারতসাগর, আরবসাগর, পারস্য উপসাগর, লোহিতসাগর, ভূমধ্যসাগরের অন্ততঃ পূর্ব্বভাগ এবং কৃষ্ণ সাগরে গ্রীক নাবিকের সীমা বিস্তৃত হইল। যেমন স্থলে গ্রীক অজেয় বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিল তেমন জলেও গ্রীকের নাম দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের এক গ্রীক উপনিবেশ হইতে অনেক ঐতিহাসিকের মতে প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩৩০ অব্দে এক নাবিকদল পীথস নামক এক গণিত শাস্ত্রবিদের নেতৃত্বে বৃটন দ্বীপে পৌঁছিয়াছিল। কার্থেজ এই গ্রীক যুগে বোধ হয় কিছু স্তম্ভিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য নানা বৃহৎ বৃহৎ গ্রীক রাজ্যে বিভক্ত হইল বটে কিন্তু মূলতঃ গ্রীকদিগের নৌশক্তি ভারত হইতে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত নামে মাত্র বিভক্ত হইয়া বিরাজিত রহিল।

কিন্তু এই খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে জগতের নৌশক্তির ইতিহাসে এক নূতন মহাশক্তির রীতিমত সাড়া পাওয়া যায়। খুব পূর্ব্বকাল হইতে ভারতীয় নৌবিদ্যা ও বাণিজ্যের কথা শুনা যায় এবং বিবিধ প্রমাণও পাওয়া যায় বটে এবং খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে উহার বিশেষ উত্থানের কথাও জানা যায় বটে কিন্তু এই সময়ে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উত্থানে ভারতীয় নৌশক্তির রীতিমত ব্যবস্থা, জগতের ঐতিহাসিক সমাজও কিছুতে অস্বীকার করিতে পারেন না। অধ্যাপক রাধাকুমুদ বাবুর এবং সঙ্গে সঙ্গে পূজ্যপাদ সুবন্ধু লেখক প্রায়ের কথা, ইংলণ্ডের এক মহা পত্রিকা 'স্পেক্টেটর', অতিরঞ্জিত বলিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সময়ের ভারতের নৌশক্তির কথা অগ্রাহ্য করা যায় না। ষষ্ঠ কি পঞ্চম খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দীর লেখক হেরোডোটাসাদির কথা এবং জাতকাদির প্রমাণেতে যদবা গায়ের জোর চলে কিন্তু একজনার আরিয়ান, মেগাস্থেন প্রভৃতি গ্রীক লেখকদিগের প্রমাণ সেইটিও করিবার নহে। ষ্ট্রাবোর মত কড়া লেখক, আর মৌর্য্য নৌশক্তির বন্দর প্রভৃতির নিয়মাবলী যে রকম ভাবে চাণক্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি ভারতীয় গ্রন্থেই পাওয়া যায় তাহাতে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর ভারতীয় নৌশক্তির কথা কাহারও সাধ্য নাই অস্বীকার করে। শুধু মৌর্য্য সাম্রাজ্যে কেন মেগাস্থিনিস প্রভৃতির লেখায় দক্ষিণ ভারতে পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যেও নৌশক্তি ও বাণিজ্যের প্রমাণের অভাব দেখা যায় না। এইরূপে সমগ্র ভারতের জলে কীর্ত্তিকেতু বিশেষ রকম উড্ডীয়মান হইল।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতের সম্রাট অশোকের শিলালিপি হতে জানা যায় যে স্থলে যেমন ভারতের সভ্যতা 'ধর্ম্ম' নামে দূরে দূরে প্রচারিত হইতে লাগিল, তৎকালীন প্রধান গ্রীক নৌশক্তির সহিত ভারতীয় নৌবলও সমকক্ষ হইয়া উঠিল। উহার শিলালিপিতে তৎকালীন যত বড় বড় গ্রীক রাজার নাম, এবং দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য, কেরল, সিংহল প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। উহাদের অনেকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধীন হয় এবং বাকি সকলে অন্ততঃ উহার সহিত সন্ধিবদ্ধ থাকে। কাজেই মৌর্য্য-নৌশক্তি এই সময়ে, পাণ্ড্য সিংহল প্রভৃতির নৌশক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপ ভারতের গৌরববর্দ্ধন করিতেছিল। কিন্তু কি মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অশোকের শিলালিপিতে পশ্চিমে গ্রীকদিগের আর দক্ষিণে ভারতের কথা পাওয়া যায় অথচ ভারতের পূর্ব্বে দেশসমূহের নামও দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে এতদিন ভারতীয় নৌশক্তি পশ্চিমেই বিস্তৃত হইতেছে, তখনও পূর্ব্বদিকে ভারতীয় শক্তির প্রসারণ ঘটে নাই তাহার কারণ বোধ হয় পশ্চিমে এখনও এমন কোন শক্তির উৎপত্তি ঘটে নাই যে ভারতীয় নৌশক্তির ধ্বংস করে। পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগর ছাড়িয়া পশ্চিমে গিয়া ফিনিশিয় বণিককে আশ্রয় লইতে হইয়াছে কিন্তু তখনও ভারতকে পশ্চিমের সভ্য জাতিদের সহিত বাণিজ্য হইতে বঞ্চিত করে এমন কোন জাতির উত্থান ঘটে নাই। কাজেই মৌর্য্যসাম্রাজ্যের পূর্ব্ব এসিয়ার সহিত কোন বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে পাণ্ড্য প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যের বাণিজ্য কিছু কিছু পূর্ব্বদিকে চলিতেও চলিতে পারে, কিন্তু বেশী ভাগ প্রায় সমস্ত ভাগ বলিলেও চলে ভারতীয় বাণিজ্য ভারতীয় নৌশক্তির প্রতাপে পশ্চিম সাগরেই বহুকাল ধরিয়া চলিতে লাগিল। উজ্জয়িনী সৌরাষ্ট্রে পাশ্চাত্য ভারতীয় বাণিজ্য ও নৌশক্তি পরিচালনের কেন্দ্রস্বরূপ

হইয়া উঠিতে লাগিল, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চাস্থল হইয়া দাঁড়াইল।

এইরূপে পশ্চিম ভারতসাগরে, যেমন ভারতীয় নৌবিদ্যার লীলাভূমি হইতেছিল, তাহার পার্শ্বেই ইউরোপ এসিয়া আফ্রিকার সন্ধিস্থলে সমুদ্র সমূহে গ্রীক নৌলীলা নানাগ্রীক রাজ্যের চেষ্টায় বিস্তৃত হইতেছিল, এই খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতেই জগতের এক ভাবী মহাসাম্রাজ্যের সূচনা হইতেছিল; ইহা রোমের উত্থান। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইতালি দলন করিয়া রোমরাজ্য ফিনিশিয়া উপনিবেশ কার্থেজের মহানৌশক্তির সংঘর্ষে আসিল এবং দীর্ঘকাল-ব্যাপী মহাযুদ্ধে জলে স্থলে কত জয় পরাজয়ের পর কার্থেজের ক্ষমতা রোমের নিকট নত হইল; এই মরণ বাঁচনের মহা সমরে কার্থেজের মহাবীর হানিবলের ভয়ে রোম স্থল যুদ্ধে কম্পিত হইত। তার পর জাহাজ ধরিয়া ফেলিবার এক আশ্চর্য্য ফন্দি রোমের নৌশক্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিল। প্রায় ছত্রিশ ফুট পরিমিত স্তম্ভ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শলা দেওয়া থাকিত এবং প্রত্যেক রোমক জাহাজ এই যন্ত্রের সাহায্যে কার্থেজের সমস্ত অধিকার রোমের নৌশক্তির হস্তগত হইল এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে কার্থেজের ক্ষমতা রোমের ভাগ্যে বর্ত্তিল! রোম স্থলে জলে অজেয় হইয়া উঠিল।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পশ্চিমদিকেও গ্রীক জাতি দিগ্বিজয় করে, এক গ্রীক মহাবীর পীরাস্ সসৈন্যে ইতালিতে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বদিকে এসিয়ার মত, পশ্চিমের দিগ্বিজয় ও গ্রীক বাহিনী অজেয় হইয়া উঠিল। রোমক সৈন্য যুদ্ধের পর যুদ্ধে হারিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে রোমের হাতে গ্রীকেরা হারিয়া গেল এবং পীরসের মৃত্যুর পর খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭২ অব্দে গ্রীকের পশ্চিম জয় ঘুচিয়া গেল। তারপর রোম কার্থেজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। এবং কার্থেজের ধ্বংস করিয়া এখন গ্রীকদিগকে শিক্ষা দিতে রোম মনোযোগ দিল। গ্রীকদিগের মধ্যে মেসিডন রাজ্যের ক্ষমতাতেই আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য বিস্তার হইয়াছিল, এখন রাজ্যের ধ্বংসের দিন। কাজেই রোম গ্রীকজাতির মধ্যে ভেদনীতির প্রয়োগ করিলেন তাহাতে গ্রীকজাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এইরূপে রোমের নৌশক্তি গ্রীকনৌবলেরও সমকক্ষ হইতেছিল।

পরবর্ত্তী শতাব্দীতে রোমের ক্ষমতা ভূমধ্যসাগরের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। সাগরটি যেন রোমের একটি হ্রদের মত হইল। একে একে লিগুরিয়া গ্যালদেশ, স্পেন, মেসিডন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ রোমের অধীন হইল। কৃষ্ণসাগর ও মিসরের উপকূলভাগ ভিন্ন, সমগ্র ভূমধ্যসাগর রোমের অধীন হইল। এতদিনের সেই প্রাচীনতম যুগের ফিনিশিয় নৌশক্তি এবং তৎকালীন গ্রীকনৌশক্তি রোমের পদানত হইল। কিন্তু এই খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেও গ্রীকনৌশক্তির কম অধিকার রহিল না। কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে, লোহিত-সাগর আরবসাগর পারস্য উপসাগর সমস্ত গ্রীকদিগের হাতে রহিল। তখনও মিসরাদি দেশে এক এক গ্রীকরাজা ছিলেন। বক্ত্রিয়ার গ্রীকরাজা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০ অব্দের কাছাকাছি কাবুল, পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত জয় করিলেন। ইহার পর প্রায় ১৫৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে আর এক গ্রীকরাজা মিনেন্দার ভারতীয় মৌর্য্যবংশের পরবর্ত্তী বংশকে আক্রমণ করিয়া পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত আসেন। এই পশ্চিমে যেমন রোমের হাতে, তেমনি ভারতের ধারে গ্রীকগণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৭০ অব্দ হইতে বর্ব্বর শকজাতির হাতে বশীভূত হইতে লাগিল। আর এই দুয়ের মাঝে গ্রীকজাতি যথোচিত পার্থিয়া জাতির কাছে বিধ্বস্ত হইল। পারস্যে এই ব্যাপারের পর আরব রাজাগুলিও এই সময় হইতে মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল।

এইরূপে ভারতে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের পতনে, পূর্ব্বে, কলিঙ্গরাজ কারভেলার ক্ষমতার কথা শুনা যায়, দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রজাতি স্বাধীন, আরও দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য কেরল ও সিংহল এবং গ্রীকদিগের অধীনে পশ্চিম উপকূলের অধিকাংশ ছিল। কিন্তু গ্রীকদিগের পতনে, শেষে শকজাতি সেই নৌশক্তির নিয়ন্তা হইল। সৌরাষ্ট্র শক নৌশক্তির কেন্দ্রস্থল। তাহার পার্শ্বেই পাণিয়া রাজা তারপর আরব রাজ্য সমুদায়। তৃতীয় খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দিতে ভারতের দক্ষিণ রাজ্য সমূহে অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ঘটিতেছিল। এই দক্ষিণ দেশের তামিল সভ্যতায় জাতি বিচার ছিল না। এবং তখনও প্রেতপূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু হিন্দু এবং জৈন ধর্ম্মের প্রচার চেষ্টা বহুকাল হইতে হইয়া আসিতেছিল। জাতি বিচার শূন্য এই রাজ্য সমূহ যে নৌবিদ্যার চর্চ্চায় সমস্ত লোকের সাহায্য পাইত, তাহা ভারতের প্রাচীন নৌশক্তি গঠনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু এতদিনে এই তিন ধর্ম্মের প্রসারে দক্ষিণ ভারতে এক নূতন জীবনের আবির্ভাব ঘটিল। তখন নূতন জাতিবিচার দৃঢ় রকম হইয়া দাঁড়াইল কিন্তু এই তামিল রাজ্য ত্রয়ের সে বাণিজ্য সে নৌশক্তির কথা ত দূরের কথা বরং বর্দ্ধিত হইল। দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে কেবল রাজ্যের রাজধানীও প্রধান বন্দর ছিল আধুনিক কোচিনের ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী ভেঞ্জি বা করুর নগর এই নগরে কবে যে উৎপত্তি এবং কতকাল যে স্থিতি তাহা সকলেরই বিবেচ্য। পর পর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে পাণ্ড্য রাজ্য। উহার রাজধানী ও প্রধান বন্দর ছিল মাদুরা। তার উত্তরে ছিল চোলরাজ্য। এই তিনটিই অশোকের সময়ে স্বাধীন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গ্রীক ও রোমক লেখকদের কাছে শুনা যায় যে এই তিনের মধ্যে চোলরাজ্যের পূর্ব্ব এসিয়ার দিকে নৌশক্তি বিস্তারিত হয়। এই সময়ে বোধ হয় প্রথম বিশেষ রকম বিস্তার

ঘটে। এই সময়েই বোধ হয় মৌর্য্য সাম্রাজ্য যুগের পর প্রথম রীতিমত ভারতীয় নৌবহর, চোল রাজ্যের কল্যাণে, বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া, ইরাবতী তীর, মালয় উপদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যার্থে বাহির হয়। ভারতীয় নৌশক্তি এই প্রথম রীতিমত পূর্ব্ব এসিয়ার দিকে ধাবিত হইল, কারণ এই খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই, স্মিত প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মতে, চোল রাজ্যের প্রথম ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা করিকালের নাম পাওয়া যায়। তবে প্রবাদ সমস্ত এই তিন রাজ্য সহোদরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা সম্রাট অশোকের বহু পূর্ব্বে হইতে পারে।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দি জগতের নৌশক্তির ইতিহাসে এক নূতন যুগের আরম্ভ করিল। রোমের সাম্রাজ্য কতকগুলি মহাবীরের চেষ্টায় প্রাচীন জগতের সমস্ত অংশ যেন বিস্তৃত হইল। মিথিয়াস্ সুলা, পম্পে এবং বিশ্ববিশ্রুত সিজারের তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। তৎকালীন ইংলণ্ড ফ্রান্স, স্পেন, আফ্রিকার সমগ্র উত্তর ভাগ, ইউরোপের সমগ্র দক্ষিণ ভাগ, এসিয়ার পশ্চিম অংশ পার্থিয় জাতির সীমা পর্য্যন্ত রোমক সাম্রাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইল। রোমক নৌশক্তি ইংলণ্ড ফ্রান্সের তীরে যেমন তৎকালীন নূতন জর্ম্মান নৌশক্তির শাসন করিত বিস্কে উপসাগর আটলাণ্টিক মহাসাগর, ভূমধ্য কৃষ্ণ ও লোহিতসাগরেও রোমের বিজয়পতাকা তেমনি সদর্পে নানা জাতীয় নৌশক্তিকে অধীনে রাখিত। এসিয়া মাইনরে পণ্টাস প্রভৃতি রাজ্য, আফ্রিকার মিসর এবং কৃষ্ণ-সাগর তীরে গ্রীক ভিন্ন নূতন নানা জাতির দমন হইল। তারপর সাম্রাজ্যের প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ তন্ত্র গৃহ যুদ্ধের পর গৃহ যুদ্ধে নষ্ট হইয়া গেল। কত স্থল যুদ্ধ ও নৌযুদ্ধের পর শেষ বারের মত একটিয়ম নামক স্থানের নৌযুদ্ধে গ্রীক যুদ্ধ শান্তি হইল। রোমের এই সুবিস্তৃত রাষ্ট্র নামেমাত্র প্রজা তন্ত্র থাকিল, কিন্তু বস্তুতঃ অক্টেভিয়সের সময় হইতে এক একটি সম্রাটের অধীন হইতে লাগিল। জলে স্থলে রোমের ক্ষমতা কে রোধ করিতে পারে। বিশাল রোমক সাম্রাজ্য ইউফ্রেটিস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, দুইটী চিরস্থায়ী নৌবহরে ভূমধ্যসাগরে রোমের বাণিজ্য রক্ষা করিতে লাগিল। এতদিনে আধুনিক ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মত রীতিমত নৌশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। রোমের সাম্রাজ্যের তখন শত্রু ছিল মধ্যইউরোপের জার্ম্মণির জাতি সমূহ আর ইউফ্রেটিস তীরে পার্থিয় প্রভৃতি রাজা, এই দুইয়ের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন সে সাম্রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিবার কিছুই ছিল না।

আর একটি বিষয়ে এই শতাব্দী চিরস্মরণীয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই সময় হইতে ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধের আরম্ভ ঘটে ইতিহাসে এই প্রথম চিন পর্য্যটক ভারতে আসিলেন। ইনি ভারতের বিষয় কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। আরও যদি ভারতের বিক্রমাদিত্যের যুগ এই সময়ে ধরা যায়, যদি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৬ অব্দই উক্ত সম্রাটের অব্দ মতে রাজত্বের আরম্ভকাল ধরা যায়, চীনের সহিত ব্যবসার বাণিজ্য ভারতের সঙ্গে এই সময়ে বেশ চলিতেছিল বলিতে হইবে, প্রমাণ কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের চীনাংশুকের কথা। আরও ভারতের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের দ্বিতীয় খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দির কলিঙ্গ নৌ-শক্তির সঙ্গে এই সময়ে বঙ্গের নৌ-শক্তির সাড়া পাওয়া যায়, প্রমাণ কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয় কালে রঘুর সহিত বঙ্গবাসীদিগের ভীষণ নৌযুদ্ধের কথা। এই সব যদি নাও ধরা হয় তাহা হইলেও চীনে নৌবহর যে বঙ্গোপসাগরে এবং ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করিত তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কাবেরী নদীর মোহানায় কাবেরী পদ্দিনং নামে চোল রাজ্যের রাজধানীও প্রধান বন্দর ছিল। তারপর পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী ও বন্দর মাদুরা। কিন্তু ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব বলেন যে এই শতাব্দীতে করকাই বন্দরই প্রাধান্য লাভ করে।

পূর্ব্ব এসিয়ার মত পশ্চিমে ভারতের এই সব রাজ্যের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের স্পষ্টাস্পষ্টি বাণিজ্য ও নৌশক্তির সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৮ অব্দে রোমের মহাবীর সুলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ২১০ বস্তা গন্ধদ্রব্য পুড়ান হইয়াছিল, এবং খৃষ্ট পূর্ব্ব ২০ অব্দে রোমের সম্রাট অক্টেভিয়াসের কাছে পাণ্ড্যরাজ এক দূত প্রেরণ করেন। এই সময় হইতেই বোধ হয় রোমের স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহে বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ দিকে মাগধীয় সাম্রাজ্যের সুঙ্গবংশ খৃষ্টপূর্ব্ব ৭২অব্দে, কণ্ববংশের হাতে পরাস্ত হইলেন। ৬৮অব্দে কলিঙ্গ রাজ করাওলাকে স্বাধীন হইতে সাহায্য করিয়া, ২৭অব্দে অন্ধ্রগণ মগধ জয় করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করে। ইহাদের সহিত সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের শকজাতির যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই শকদিগের পর পার্থিয়জাতির নৌশক্তি কিন্তু এই শক ও পার্থিয়দিগের স্বাধীনত্বে ঐতিহাসিকদিগের অনেকের সন্দেহ আছে। অধ্যাপক স্মিটপ্রমুখ মনীষীরা বলেন যে কুশান জাতির সম্রাট কনিষ্ক খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭অব্দে অভিষিক্ত হয়। এ আবার সেই বিক্রমাদিত্যের মতন ব্যাপার। যদি কনিষ্কেরা ইহাই তারিখ হয়, তাহা হইলে, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে এবং শক ও পার্থিয় জাতির উপর অনেকটা কুশান নৌশক্তির প্রতাপ ছিল। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের স্থলেও কনিষ্কের এই সময়ে রাজত্ব করার কথা বিশ্বাস কম লোকেই করে।

তার পরই আরব জাতিসমূহের নৌশক্তি। বহুপূর্ব্ব হইতে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু এতদিনে যেন উহাদের নাম বাহির হইয়া পড়িল কি আসিরিয়া কি ব্যাবিলন, কি পারস্য কি গ্রীক এবং এখন রোম এই সবের কাহারই সময়ে আরবগণ বশীভূত হয় নাই। সেই বিরাট মরুভূমির, দক্ষিণে, দক্ষিণ পশ্চিমে ও পশ্চিমে যে বাসযোগ্য তীরভূমি আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান তাহা পুরাকালে স্বাধীন জাতিসমূহের

আবাসস্থল ছিল। আসিরিয়া ও পরে ব্যবিলন রীতিমত চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু অনেক কষ্টে আরব উপকূলের বাণিজ্যকে পারস্য উপসাগরে আনিয়া নদীযোগে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে পাঠাইতে কিছুকাল পারিয়াছিল। পরে পারস্য সাম্রাজ্য সে চেষ্টাও করে নাই কারণ উহার ২০টি প্রদেশের মধ্যে আরবের নাম নাই। তার পর গ্রীকগণেরও তেমন চেষ্টা ছিল না আলেকজান্দারের নৌবহর ভারত হইতে পারস্য উপসাগরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল। আরব জাতিদের দেশের তিনটি প্রাচীন বিভাগের মধ্যে পশ্চিম ভাগকেই রোম জয় করিতে একটু চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পারস্য ও গ্রীক কাছের লোক হইয়াও যাহা পারে নাই বহুদূরের রোমের তাহা একরকম অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই তৎকালীন ফিনিশিয়া, গ্রীক, রোমক প্রভৃতির বণিকদের মধ্যে আরবীয় বণিকের ক্রমশঃ উন্নতি ঘটিতে লাগিল। গ্রীক, রোমক প্রভৃতির উপনিবেশের সহিত আরব উপনিবেশও ভারতের সিংহল প্রভৃতি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।

খৃষ্টের পর প্রথম শতাব্দীতে উক্ত ব্যাপারের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রাচীন গ্রন্থখানি ইরিথ্রিয় সাগর অর্থাৎ আরব ও লোহিতসাগরের সহিত ভারতের বাণিজ্যের কথা লিখিত আছে। উহাতে চোল, পাণ্ড, সিংহল, কেরল সিন্ধুদেশ পারস্য উপসাগরের মুখ, আরব উপকূল এবং লোহিতসাগর পর্য্যন্ত ভারত হইতে গ্রীক ও আরবেরা কিরূপ বাণিজ্য করিত তাহা জানা যায়। "এই সমস্ত স্থানের যত বাণিজ্য কেন্দ্র সমস্তই ইরিথ্রিয় সাগরের বাণিজ্য কথার লেখকের অবিদিত ছিল না।" উক্ত গ্রন্থকারকে গ্রীক জাতিয় বলিয়া ধরা হয়। এতদ্ভিন্ন রোমক লেখকও এই সময়ে বিরল নহে। প্লিনির লেখায় দেখা যায় যে, রোমের লোকে বিলাসের জন্য ভারতীয় দ্রব্য কিনিতে এত টাকা খরচ করিত যে উক্ত লোকের কাছে উহা অগ্রাহ্য হইয়া উঠে। উনি বলেন যে ভারতের জিনিষ কেনা রোমের এমন রোগ হইয়া দাঁড়াইল যে শতগুণ বেশী মূল্যেও লোকে উহা কিনিতে ছাড়িত না। এই লেখক খৃষ্টের পর ৭৭ অব্দে জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন ট্রেজান। আর বঙ্গদেশ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত কুশান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় কাডফাইসিস্। ভারতে এই কাডফাইসিসের রাজত্বে পূর্ব্ব এসিয়ার চীন সাম্রাজ্য ও পশ্চিম এসিয়ার রোম সাম্রাজ্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়ে এই চীন সাম্রাজ্য মধ্য এসিয়ার দিকে বাড়িবার উপক্রম করিল কুশান ও চীনে মিশিয়াও যুদ্ধ চলিল, তবে কুশান ও রোমের মাঝে শুধু পার্থিয়া জাতি সমূহ থাকাতে কেবল বাণিজ্যাদির সন্ধি স্থাপিত হইল। খৃষ্টীয় ৯৯ অব্দে ভারতীয় কুশান সম্রাটের নিকট হইতে দূত রোমের দরবারে উপস্থিত হন। এইরূপে তৎকালীন পৃথিবীতে তিন সাম্রাজ্যের নৌশক্তির রীতিমত সম্মিলন হইত বলিতে পারি, রোম ও কুশানের ত বাস্তবিক হইল, তবে চীনের নৌশক্তির সহিত কুশানের না হউক দক্ষিণ ভারতের তিনটি তামিল রাজ্যের বিশেষতঃ চোল রাজ্যের রীতিমত পূর্ব্ব এসিয়ার বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল জানা যায়।

"এই যুগের নৌব্যাপারের প্রমাণ স্বরূপ আর এক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। উহা টলেমি নামক এক গ্রীকের লেখা। উহাতে রোমক সাম্রাজ্য ও ভারতের অনেক ভূগোল বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ভারতের বিখ্যাত চম্পক নগর (বোধ হয় ভাগলপুর), বেনারস, পাটনা প্রভৃতির মত স্থানের নাম উক্ত গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। তারপর ভারতের করোমণ্ডল উপকূল পর্য্যন্তের বাণিজ্য কথা ইরিথ্রিয় সাগরের 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ সমূহে ভারতের সহিত কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম এসিয়া উভয় দিকের বাণিজ্য ও নৌবহরের কথা জানা যায়।"

কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্যের এই অসাধারণ উন্নতির আর এক কারণ এই যে এই সময়ে হেপিলস নামে এক নাবিক, পরবর্ত্তী কালের জগদ্বিখ্যাত মৌশুমী বায়ুর বাণিজ্য প্রবাহের কথা জানিতে পারেন। এই মহা আবিষ্কারে ভারত সাগরের বাণিজ্য আশ্চর্য্য রকম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতের সহিত পাশ্চাত্য জগতের বাণিজ্যের ইতিহাসে এই আবিষ্কারে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। আর নৌবহর ভারতে আসিতে তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য রহিল না, এখন হইতে মৌশুমী বায়ুতে জাহাজ ছাড়িয়া দিলেই মিসর হইতে একবারে মালাবার উপকূলে বাণিজ্যে বিখ্যাত তামিল রাজ্যত্রয়ে আসিয়া পৌছিত। দক্ষিণ মিসর হইতে শ্রাবণে জাহাজ ছাড়া হইত আর চল্লিশ দিনে মালাবার তীরে আসিয়া পড়িত আবার পৌষে ভারত হইতে ছাড়িয়া ভারতের মুক্তা, মসলিন, গন্ধদ্রব্য লইয়া রোমের সাম্রাজ্যে জাহাজ গিয়া পৌছিত।

শ্রীজয়গোপাল দত্ত বি এ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গৃহে আগমন

কর্ণীবিবি যা বলিয়াছিলেন, তাই করিলেন। নিজের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া পিটার এবং আর যে দুইজন দাসী ছিল, তাহাদের লইয়া তিনি ঈষ্টলীনে গিয়া বসিলেন। ডিলের বহু আপত্তি সত্ত্বেও কার্লাইল যে সব দাসদাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন।

কেবল একজন চাকরকে মাত্র রাখিলেন। চাকরাণীও একজন রাখিতেন। কারণ এটা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, ঈষ্টলীনের মত অত বড় একটা বাড়ীতে সংসার চালাইতে লোকজন কিছু বেশী লাগিবে। কিন্তু সে চাকরাণীটার টুপীর বাহার তাঁহার চক্ষে সহিল না।

বিবাহের প্রায় একমাস পরে এক শুক্রবারের রাত্রিতে কার্লাইল সস্ত্রীক গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কখন আসিয়া তাঁহারা পৌছিবেন, সংবাদ আগেই পৌছিয়াছিল। কর্ণীবিবি যথাসময়ে সিঁড়িবারান্দার সম্মুখে গিয়া দুইধারে দুইটি থামের মধ্যে দাঁড়াইলেন। খুব জাকাল একখানা চৌঘুড়ী গাড়ী বারান্দার দিকে আসিতেছিল,—দেখিয়া কর্ণীবিবি তাঁহার ঠোঁট দুখানি একটু চাপিয়া নিলেন। সুন্দর একটি কাল রেশমী পোষাক আর মাথায় নূতন একটি টুপী তিনি পরিয়াছেন। গত একমাসে মনের দারুণ ক্রোধটাও অনেক শান্ত হইয়া পড়িয়াছে,—বিষয়বুদ্ধিতেও তিনি অতি পরিপক্ক ছিলেন। এটা এখন বেশ বুঝিয়াছিলেন, যা হইয়াছে তাত হইয়াছেই,—ফিরান কিছু যাইবে না। ইহা লইয়া অনর্থক গোলমাল কিছু না করিয়া ইহার মধ্যে যতটা মানাইয়া লইয়া চলা যায়, তার চেষ্টা করাই এখন বুদ্ধির কার্য্য হইবে।

গাড়ী আসিয়া থামিল,—কার্লাইল ইজাবেলের হাতখানি ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে উঠিতেই দেখিলেন, কর্ণেলিয়া দাঁড়াইয়া।

"এই যে কর্ণেলিয়া! তুমি এখানে! বেশ বেশ! কেমন আছ? ইজাবেল, ইনিই আমার ভগ্নী।"

ইজাবেল হাত বাড়াইয়া দিল,—কর্ণেলিয়া আঙ্গুলগুলির মাথা মাত্র স্পর্শ করিয়া উচ্চারণ করিলেন,—

"আপনি, আশাকরি ভাল আছেন মেমসাহেব?"

ননদ ভাজেরা পরস্পর স্নেহে ভগ্নীর ন্যায় নাম ধরিয়াই ডাকে! অপরিচিতা বা অসম্পর্কিত নারীকেই 'ma'am' বা মেমসাহেব বলিয়া ডাকিবার রীতি। কিন্তু কর্ণেলিয়া ইজাবেলকে ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নন, তাই 'মেমসাহেব' বলিয়াই ডাকিলেন। পরন্তু কথা কয়টির মধ্যে স্নেহপ্রীতি আদর অভ্যর্থনাও কিছুরই কোন ধ্বনি উঠিল না।

কার্লাইল গাড়ীতে কি কেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাই আনিতে গেলেন। কর্ণেলিয়া ইজাবেলকে লইয়া একটি বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। একটি টেবিলে সেখানে Supper* বা নৈশ ভোজ্য কিছু সাজান ছিল। কর্ণেলিয়া কহিলেন, আপনি বোধহয় উপরে গিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িবেন, তারপর আসিয়া 'সাপার' খাবেন মেমসাহেব?"

তেমনই নীরস ঠন্ ঠনে শব্দে এই কথাগুলিও কর্ণেলিয়া উচ্চারণ করিলেন।

ইজাবেল উত্তর করিল,—"ধন্যবাদ! আমি নিজের ঘরেই যাইব,—সাপারের দরকার কিছু নাই,—আমাদের ডিনার হইয়াছে।

"তাহা হইলে এখন কি খাইতে চান?"

"আজ্ঞে, একটু চা, যদি—সুবিধা হয়—বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে আমার।"

---

* সন্ধ্যার পর ডিনারেই প্রচুর ভোজন হয়। তার কিছুকাল পরে চা খাইবার নিয়ম। পূর্ব্বে ডিনার মধ্যাহ্নে হইত সাপার হইত রাত্রিকালে। এখন দুপুরের পর লাঞ্চ নামে ছোটরকম একটা খাওয়া হয়, সন্ধ্যার পর পূরাভোজ ডিনার হয়, সাপার একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। তবে ডিনার না হইলে, অথবা বেশী আগে হইলে রাত্রিতে কিছু খাইতে হয়, তাকেই সাপার বলা হয়।

"চা ! ওমা, এত রাত্রে ! গরম জলই বোধ হয় নাই। এই রাত্রি এগারটায় যদি চা খান মেমসাহেব, আপনি যে একটুও ঘুমাইতে পারিবেন না।"

"আচ্ছা, থাক তবে, নাই হইল,—এর জন্য কাউকে আর ক্লেশ দিতে চাই না।"

কর্ণেলিয়া 'ছপ' করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন,—কেন তা তিনিই জানেন। সিঁড়িবারান্দায় ইজাবেলের খাসদাসী মার্ভেলের সঙ্গে তাহার একবার সাক্ষাৎ হইল। কথা কিছু হইল না,—পরস্পরের প্রতি মাত্র কঠোর ও অপ্রসন্ন একটা দৃষ্টির বিনিময় হইয়া গেল।

মার্ভেলের সাজ পোষাক বেশ একটু ফ্যাশানদুরস্ত ছিল, 'গাউনের ঘাঘারার পাঁচটা ঝালর' মুখে একটা 'ভেল' (মুখাবরণ বা ঘোমটা।) * আর হাতে একটি মিহি ছাতি!

ওদিকে ইজাবেল একখানি চেয়ারে বসিয়া একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিল। মনটা তার যেন কেমন নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে ঈষ্টলীনে নিজের বাড়ীতে আসিয়াছে এরূপ সে অনুভব করিতেই পারিতেছিল না। কর্ণেলিয়ার এই প্রীতিহীন, কঠোর—একেবারে পরের মত ব্যবহারটাও তার মনে বড় লাগিয়াছিল।

তখন কার্লাইল গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া অতি বিস্মিত ভাবে ইজাবেলের কাছে গিয়া কহিলেন,"ইজাবেল! একি! লক্ষ্মীটি আমার, কি হইয়াছে?"

ইজাবেল উত্তর করিল "কি জানি, বোধহয় বড় হয়রান হইয়া পড়িয়াছি। এই বাড়ীতে আসিয়া বাবার কথাও মনে পড়িল। এখন আমার ঘরে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারিলেই ভাল হয়। কিন্তু আমার ঘর এখন কোথায় তা ত জানি না আর্কিবাল্ড?

কার্লাইলও জানিতেন না, কোন ঘরগুলি ইজাবেলের নিজের ব্যবহারের জন্য ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। এমন সময় আবার তেমনই করিয়া কর্ণিবিবি গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "সবচেয়ে সেই ভাল ঘরগুলি—লাইব্রেরীর পাশেই। লেডীসাহেবা কি এখন উপরে যাইবেন? আমি তাঁকে লইয়া যাইব?"

কার্লাইল নিজেই তাহার হাত বাড়াইয়া দিলেন,—ইজাবেল উঠিল। কর্ণী বিবির পাশ দিয়া যাইবার সময় তার মুখের ভেল বা ঘোমটাটি একটু টানিয়া দিল।

"ওদিকের ঘর-বারান্দাগুলিতে আলো দেওয়া হয় নাই। সব যেন কেমন আঁধার, নিরানন্দ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। কার্লাইল কহিলেন, কিছুই, যেন ঠিকঠিকানা একটা নাই। সব কেমন গোলমাল হইয়া রহিয়াছে। চাকর বাকররা বোধ হয় আমার পত্রের মর্ম্ম ভাল বুঝিতে পারে নাই,—অথবা ভাবিয়াছিল আমরা আজ নয় কাল আসিব।"

মাথার টুপী খুলিতে খুলিতে ইজাবেল কহিল, "আর্কিবাল্ড, বড় হয়রান হইয়া পড়িয়াছি। মনটাও যেন দমিয়া যাইতেছে। আমি এখনই কাপড় চোপড় ছাড়ি;— নীচে আর নাই গেলাম।"

কার্লাইল ইজাবেলের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন,—কহিলেন, "নীচে আর নাই গেলাম! একি রকম ভঙ্গীর কথা ইজাবেল? ইচ্ছা না হয়, না যাইবে। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছে, এ তোমার নিজের বাড়ীঘর? ভরসা করি, খুব সুখের ঘরই এটা তোমার হইবে, লক্ষ্মীটি আমার। যাতে হয়, তাই যে আমি করিব।"

স্বামীর গায়ে হেলিয়া পড়িয়া ইজাবেল বড় ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কার্লাইল সস্নেহ আদরে তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মধ্যে মধ্যে তার উত্তোলিত মুখখানি চুম্বন করিলেন। আহা, তাঁহার প্রাণটি খাঁটি ছিল, অসীমস্নেহে ত ভরাছিল। এই সুকোমল সুন্দর ফুলটি তিনি লাভ করিয়াছেন, অতি যত্নে তাকে পোষণ করিবেন, বুক ভরা এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার ছিল। কিন্তু হয়ত তা পারিবেন না, যদি না তাঁহার ভগ্নীর কঠোর শাসন হইতে তাহাকে তিনি রক্ষা করেন। ইজাবেল এখনও তাঁহাকে ঠিক প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারে নাই। কিন্তু দিনে রাত্রে নিয়ত তার আন্তরিক ও গভীর কামনা এই ছিল, যে স্বামীর প্রতিই প্রেমে সে আকৃষ্ট হইতে পারে।

* মেমসাহেব কখনও কখনও এইরূপ একটা মুখঢাকা ব্যবহার করেন,—টুপীর সঙ্গে এটি ঝুলান থাকে। কখনও রৌদ্রে ধূলি প্রভৃতি হইতে মুখরক্ষা কখনও বা পরিচয় গোপনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। বিবাহের সময় কনেরাও খুব সুন্দর ও পাতলা একটি 'ভেল' পরেন টুপীর চারিধারে বুক পিঠ বেড়িয়া তাহা ঝুলান থাকে।

সে জানিত, তার প্রাণভরা প্রেমের পূজা পাইবারই যোগ্য তিনি।

নিকটেই মার্ভেলের কণ্ঠস্বর কাণে আসিল। ইজাবেল তাড়াতাড়ি মুখ ধুইবার গামলার কাছে গেল,—কতটুকু জল ঢালিয়া নিয়া চোখ মুখে দিল। মার্ভেল হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া এই অশ্রুপাত লক্ষ্য করে, এটা একেবারেই তার অভিপ্রায় ছিল না।

কার্লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু খাইবে ইজাবেল? একটু চা?"

"না, থাক্।" চায়ের কথায় কর্ণীবিবির সেই উত্তর ইজাবেলের মনে পড়িল।

"কিছু খাইবে বইকি? গাড়ীতে বলিতেছিলে না, তোমার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে!"

"একটু জল হইলেই হইবে। মার্ভেল আনিয়া দিব এখন।"

কার্লাইল বাহিরে গেলেন,—মার্ভেল লেডী ইজাবেলের পোষাক খুলিতে আরম্ভ করিল। সে তখন রাগে ফুলিতেছিল,—ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছিল,—এত অসুবিধা আর অপমান যেন সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। বিবাহের সময় হইতেই তার অসন্তোষের কারণ ঘটিতেছিল। সে বড় ঘরের মেয়ের খাসদাসী,—সুতরাং সাধারণ ভদ্রমহিলার মত তার একটা পদমর্য্যাদা আছে। কার্লাইল সাহেবের এমন কোনও ভদ্রলোকের মত খাস পরিচারক ছিল না, মধুমাসভ্রমণের সময় যে তাহার তত্ত্বাবধান করিতে পারে, যথোচিত আদর আপ্যায়নে তার চিত্তপ্রসাদন করিতে পারে। ইহাই ত যথেষ্ট অসুবিধার কথা। তা যা হউক, এক রকম করিয়া কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া সে এ কি দেখিতে পাইতেছে? উচ্চ শ্রেণীর সর্দ্দার চাকর চাকরাণী একদল নাই,—হাউস্ কিপার বা খাসভাণ্ডারিণী নাই,—কিছুই ত নাই! ইহার মধ্যে সে থাকে কি করিয়া? তারপর ঐ কর্ণীবিবি! ইতি মধ্যেই তাঁর সঙ্গে মার্ভেলের একটু মুখামুখিও হইয়া গিয়াছে।

সিঁড়িবারান্দায় মার্ভেল লেডী ইজাবেলের ব্যবহার্য্য ছোট একটি পুলিন্দা উপরে নিয়া যাইবার জন্য দৃপ্তভাবে লোক ডাকাডাকি করিতেছিল। কর্ণীবিবি বলিয়াছিলেন, সে নিজেও ত সেটা লইয়া যাইতে পারে? মার্ভেল নাকি জানিতে পারিয়াছিল এই ব্যক্তি কে? নতুবা এই অপমান সে কখনও সহিত না,—পুলিন্দাটি তাঁহার মাথায় ছুঁড়িয়া ফেলিত।

যাহা হউক, পোষাক খুলিয়া দিয়া, মার্ভেল জিজ্ঞাসা করিল,—"আর কিছু চাই লেডী সাহেবা?"

"না, তুমি এখন যাইতে পার।"

মার্ভেল চলিয়া গেল। একটি ঢিলা পোষাকে দেহ আবৃত করিয়া, সয়স একজোড়া চটী পায় দিয়া ইজাবেল একখানা পুস্তক লইয়া বসিল।

ওদিকে কার্লাইল তাঁহার ভগ্নীর কাছে গেলেন। কেহই আর খাবার খাইবে না বুঝিয়া কর্ণীবিবি তখন একাই আহারে বসিয়াছিলেন। ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ আসিলে সাপার খাইতে হইবে, তাই তিনি সেদিন একটু সকাল করিয়া ডিনারটা খাইয়াছিলেন। একটা মুরগীর ডানা উদরসাৎ করিতেছেন, এমন সময় কার্লাইল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন,—"কর্ণেলিয়া, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার চাকর বাকরদের কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, কেবল তোমার চাকর বাকরদেরই দেখিতেছি। তারা সব কোথায়?"

"চলিয়া গিয়াছে।"

"চলিয়া গিয়াছে? সেকি! তারা যে খুব ভাল লোক ছিল বলিয়াই জানিতাম।"

"হাঁ, খুব ভাল লোক ছিল বইকি! রবিবার হইলেও যা হক কথা ছিল শনিবারেই যে সাজসোজ্জাকের ঘটা তাদের দেখিলাম, যেন রাজবাড়ীতে কাজ করিতে আসিয়াছে! ঘর সংসারীরকাজে তুমি হাত দিতে আসিও না আর্কিবাল্ড। তাতে কেবলই ঠকিবে। হাঁ ঐ জিভটার এক টুকরা আমাকে কাটিয়া দেও।"

একটা ছুরী নিয়া তাই কাটিয়া দিতে দিতে কার্লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি অন্যায় তারা করিয়াছিল?"

তখন কর্ণীবিবি গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন আর্কিবাল্ড কার্লাইল! এত বড় একটা আহাম্মুকী শেষে গিয়া করিলে! বিবাহ যদি করিতে সাধ হইয়াছিল, তোমার নিজের সমাজে কি মেয়ে পাইতে না?"

কার্লাইল উত্তর করিলেন "আর কেন কর্ণেলিয়া? কেন আমি এ বিবাহ করিয়াছি সব কথা যতদূর তোমাকে

বলা যাইতে পারে—আগেই আমি জানাইয়াছি। এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনার মধ্যে যাইতে চাই না। এ কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, এ জন্য মাফ করিও আমাকে। হাঁ, চাকরবাকরদের কথা হ্‌ইতেছিল।—তারা কোথায় গিয়াছে ?"

কর্ণেলিয়া উত্তর দিলেন, "তাদের আমি ছাড়াইয়া দিয়াছি। কারণ, কেবল অতিরিক্ত একটা ভারই তারা হইত। চারজন চাকর চাকরাণী আমাদের বাড়ীতে আছে। লেডী সাহেবা লেডীর মত একজন খাসদাসীও আনিয়াছেন দেখিতেছি। এই ত পাঁচজন হইল। আমি এখানেই থাকিব।"

কার্লাইল যেন কেমন নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। ভগ্নীর ইচ্ছামত তিনি এতদিন চলিয়াছেন। কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন, তাঁহার ও ইজাবেলের পৃথক ভাবে থাকাই ভাল হইবে। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, "তোমার নিজের বাড়ী ?"

"ভাড়া দিয়াছি। আজ তারা বাড়ীতে আসিল। এখন কি ঈষ্টলীন হইতে আমাকে বাহির করিয়া দিবে, আর আমি ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়া থাকিব ? দুই সংসার করিয়া দুইদলে না থাকিলেও যথেষ্ট খরচ এখন তোমার হইবে।—বুদ্ধি থাকিলে তুমি বুঝিতে পারিতে, এ অবস্থায় আমি তোমার এই বাড়ীতে থাকিলেই তোমার সুবিধা হইবে। তোমার স্ত্রীই অবশ্য তোমার সংসারের কর্ত্রী থাকিবেন।—তার এ অধিকার, এ মর্য্যাদা আমি কাড়িয়া নিতে চাই না। তবে গৃহিণীগণের অনেক হাঙ্গামা হইতে সে অব্যাহতি পাইবে, একজন 'হাউস্‌-কিপারে'র কাজ আমার দ্বারা তার হইবে। গৃহিণীপণার কিছুই ত সে জানে না,—নিজেই এটা সুবিধা মনে করিবে। আমার ত মনে হয় না, গৃহস্থালীর কোনও কাজে একদিনও সে চাকর বাকর তার জীবনে খাটাইয়াছে।"

এমন সব যুক্তি দেখাইয়া কর্ণেলিয়া কথাগুলি বলিলেন যে কার্লাইলের সত্যই মনে হইল, এই ব্যবস্থাই খুব সুব্যবস্থা হইবে। ভগ্নীর বিচক্ষণতার উপরে বরাবর তাঁহার বিশেষ একটা আস্থা ছিল। তাঁহার কথামত চলিবার বাধ একটা অভ্যাসও তাঁহার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবু তাঁহার মনটা যেন কেমন খুৎ খুৎ করিতে লাগিল। কহিলেন, "হাঁ, ঈষ্টলীনে তোমারও সচ্ছন্দে থাকিবার জায়গা হইতে পারে বটে—"

"তার চেয়েও বেশী জায়গা এখানে আছে। আমার মনে হয়, এর আধা একটাও বাড়ীতেও আমরা সকালে বেশ থাকিতে পারি,—আর লেডী ইজাবেলের পক্ষেও তা বেমানান কিছু হয় না।"

"ঈষ্টলীন ত আমারই বাড়ী।" "তা বটে! তোমার ব্যাকুবিও যেমন তোমার নিজের।"

ইহার কোনও উত্তর না দিয়া কার্লাইল কহিলেন, "তা চাকর চাকরাণী আমি যতজন দরকার মনে করি রাখিব। আমার স্ত্রীকে তাঁর পদোচিত আড়ম্বরে আমি রাখিতে না পারি, তিনি যাতে বেশী সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, সেটা আমাকে দেখিতেই হইবে। গাড়ীঘোড়াগুলার জন্যই ত একজন লোকের দরকার হইবে——"

"কি বলিলে!"

কর্ণীবিবির যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

কার্লাইল উত্তর করিলেন,—"আমি সুন্দর একটা খোলা গাড়ী আর এক জোড়া ঘোড়া তার জন্য কিনিয়াছি। যে গাড়ীতে আমরা আসিলাম সেটা লর্ড মণ্টসেভার্ণের উপহার। ভাড়াটে ঘোড়াতেই আপাততঃ চলিবে। কিন্তু—"

"আর্কিবাল্ড! কি মহাপাপই তুমি যে করিতেছ!"

"পাপ ?"

"পাপ বই কি ? অনর্থক অপব্যয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল—দারুণ দুঃখ। ছেলেবেলা থেকে তোমাকে তা শিখাইয়াছি। মিতব্যয়ী হওয়া বড় একটা ধর্ম্ম,—অপব্যয় করাই পাপ।"

"হাঁ, সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করা পাপ বটে। আয় বুঝিয়া ব্যয় করা অপব্যয় নয়, আর তা একটা পাপও নয়। কেন ভয় পাইতেছ কর্ণেলিয়া ? আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় আমি কখনও করিব না।"

"তার চাইতে, বল না কেন, ভরা তহ্বিলের চেয়ে খালি তহ্বিলই ভাল। ঐ যে পিয়ানোটা আসিয়াছে, তাও কি তুমিই কিনিয়াছ ?"

"হাঁ, ঐ পিয়ানোটিই ইজাবেলকে আমি উপহার দিয়াছি।"

"কত দাম পড়িয়াছে ?"

"দাম যাই পড়ুক তাতে এমন আসে যায় না কিছু। এখানকার পুরাণ পিয়ানোটা ভাল নয়, তাই নূতন ভাল একটা কিনিয়াছি।"

"তবু দাম কত পড়িয়াছে শুনি?"

"একশ বিশ গিনি!"

'কি সর্ব্বনাশ!' কর্ণীবিবি দুইটি হাত আর চক্ষু দুটি উপরের দিকে নিক্ষেপ করিলেন! পিটার ঠিক এই সময়ে কিছু গরম জল লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল।—কার্লাইল উঠিয়া তাকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সরাব কোথায়?"

পিটার একবোতল শেরী ও একবোতল পোর্ট নামাইয়া দিল। কার্লাইল এক পাত্র প্রস্তুত করিয়া নিজে পান করিলেন, ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার জন্যও তৈরী করিব কর্ণেলিয়া?"

ভগ্নী উত্তর দিলেন "লাগে ত আমি নিজেই করিয়া নিব।—ওটা আবার কার জন্য? কার্লাইল আর একপাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"ইজাবেলের জন্য।" এই বলিয়াই পাত্রটি লইয়া কার্লাইল উপরে চলিয়া গেলেন। ইজাবেল তার আরাম কেদারাখানিতে যেন একেবারে উঠিয়া বসিয়াছিল—মুখ খানিও ঢাকা ছিল। স্বামীর পদশব্দ পাইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল।—কার্লাইল দেখিলেন, মুখখানি আরক্ত, চঞ্চলভাব, চক্ষুদুটি ত ছল ছল করিতেছে, সমস্ত শরীরও কাঁপিতেছে।

"একি!—কি হইয়াছে ইজাবেল?"

স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া ইজাবেল কহিল, "মার্ভেল চলিয়া গেল,—আর কেমন একটা ভয় যেন আমার হইল। ঘণ্টাটাও খুঁজিয়া পাইলাম না, যে কাহাকেও ডাকিব। আর, ভয় হইল, তাড়াতাড়ি এই চেয়ারটায় আসিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম,—ভাবিলাম কেউ হয় ত এখনই আসিবে।"

"আমি নীচে কর্ণেলিয়ার সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম—তাই দেরী হইল। কেন, এত ভয় পাইলে কিসে?"

"কিইবা বলিব? বড় লজ্জা করে। কত ভয়ের কথা ভাবিতেছিলাম! কিছু না, যত ভাবি তত ওই সব মনে আসে। আমাকে গালি দিও না আর্কিবাল্ড। বাবা এই ঘরে মরিয়াছিলেন কিনা, তাই—"

"গালি দিব! পাগল! গালি কেন দিব?"

ইজাবেল কহিল, "ঝি চাকরেরা বাদুড়ের কথা বলিত। কি জান, বাড়ীতে কেউ মরার আগে নাকি বাড়ীর চারিধারে মেলাই বাদুড় উড়িয়া বেড়ায়। বাবা যেদিন মরেন, সেদিনও খুব বাদুড় উড়িয়াছিল। একা ঘরে বসিয়া আছি, আমার কেমন মনে হইল, যদি জানালার বাহিরে বাদুড় আসিয়া থাকে। তখন আর বিছানার দিকে চাহিতেও পারিলাম না। মনে হইতে লাগিল যেন—বাঃ তুমি যে হাসিতেছ আর্কিবেল্ড।"

কার্লাইল সত্যই হাসিতেছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, এই সব ভয় কেহ পাইলে ভয়ের কথাগুলাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই ঠিক। হাসিতে হাসিতে তিনি ইজাবেলকে গরম জলে মিশান সেই সরাবটুকু পান করাইলেন। ঘর মেরামতের সময় ঘণ্টাটি অন্য একদিকে সরান হইয়াছিল, সেটি দেখাইয়া দিয়া একবার বাজাইলেন। কহিলেন, "এ ঘর কাল ছাড়িয়া দিও ইজাবেল। অন্যদিকে কয়েকটি ঘর বাছিয়া তোমার জন্য ঠিক করিয়া দিব।"

"না, না। এই ঘরই ভাল। বাবা এইখানে থাকিতেন, তাই যে আমার ভাল লাগিবে। আর ভয় পাইব না।"

মুখে বলিল বটে ভয় পাইব না। কিন্তু ভয় সে বড় তখনও পাইতেছিল। কার্লাইল দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। ইজাবেল দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। কহিল, "তোমার কি দেরী হইবে?"

"না, বেশী দেরী হইবে না, এই ধর ঘণ্টাখানেক।" বলিতে বলিতে তখনই ফিরিয়া বাহুতে তিনি ইজাবেলকে জড়াইয়া ধরিলেন। মার্ভেল ঘণ্টার শব্দ পাইয়া এদিকে আসিতেছিল। কার্লাইল তাহাকে বলিলেন, "মিস্ কার্লাইলকে গিয়া বল, আমি আজ আর নীচে যাইব না।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া মার্ভেল নামিয়া গেল।

কার্লাইল দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ইজাবেল মনে মনে কহিল "আহা, কত দয়া কত স্নেহ ইঁহার আমার প্রতি!"

রাত্রি পোহাইল।—ইজাবেল দেখিল, বড় অসুবিধা কিসে সে কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারে না। সবই যেন তার কেমন কেমন লাগিতে লাগিল। ব্রেকফাষ্ট প্রস্তুত

হইলে কর্ণীবিবি তাঁহার সেই অদ্ভুত সেকেলে পোষাকে আসিয়া একখানা চেয়ারে সোজা খাড়া হইয়া বসিয়াছিলেন। তারপর কার্লাইল আসিলেন। একটু পরেই ইজাবেল আসিল,—সুন্দর সুন্দর কাল ফিতায় ভূষিত বড় সুন্দর একটি আধা শোকের পোষাক তার পরা ছিল। *

"সুপ্রভাত মেম সাহেব! আশাকরি রাত্রে ভাল ঘুম হইয়াছিল আপনার?"

নবীনা ভ্রাতৃবধূকে কর্ণীবিবি এই বলিয়া প্রাতঃসম্ভাষণ করিলেন।

"ধন্যবাদ! হাঁ, বেশ ঘুমাইয়াছি।" এই প্রত্যুত্তর করিয়া ইজাবেল কর্ণীবিবির বিপরীত দিকে একখানি চেয়ারে বসিতে গেল। গৃহিণীদের স্থান টেবিলের মধ্যভাগে,—টেবিলের মাথা বা মোহরা (head of the table) ইহাকে বলে। কর্ণীবিবি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আপনার স্থান ঐখানে মেম সাহেব। তবে আপনি যদি বলেন, কাফি টাফি আমিই ঢালিয়া দিতে পারি,—আপনাকে ক্লেশ কিছু পাইতে হইবে না।"

ইজাবেল উত্তর করিল, "আপনি দিলেই ভাল হয়।"

অতি গম্ভীর ও কঠোর মূর্ত্তি ধরিয়া কর্ণীবিবি তাঁহার এই কর্ত্তব্যপালনে মনোনিবেশ করিলেন। আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, পিটার আসিয়া বলিল, "কসাই আসিয়াছে, আজ কি মাংস লাগিবে, তাই জানিতে চায়।" কর্ণীবিবি ইজাবেলের দিকে চাহিলেন, কারণ কি আসিবে না আসিবে তার আদেশ ত গৃহিণীরূপে সেই দিবে। তিনি আগেই কি বলিতে যাইবেন? ইজাবেল যেন বোকা বনিয়া গেল। কি বলিবে বুঝিল না, চুপ করিয়া রহিল। গৃহস্থালীর ব্যাপারে কি লাগে না লাগে এসব সে কিছুই জানিত না। সে বুঝিতেই পারিল না, কয়েক খণ্ড মাংস পাঠাইতে বলিবে না আস্ত একটা গরুই ফরমায়েস দিবে। কঠোরদর্শনা ননন্দা কাছে বসিয়া আছেন, তাই সে এত থতমত খাইয়া গেল। নতুবা স্বামীকেই জিজ্ঞাসা করিত, কি করিতে হইবে।

পিটার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইজাবেল অগত্যা আমতা আমতা করিয়া কহিল, "সেঁকা যায় আর সিদ্ধ করিয়া নেওয়া যায় এমন কিছু দিতে বল।"

অতি মৃদুস্বরে ইজাবেল এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিল, কার্লাইল একটু উচ্চস্বরে তাহারই পুনরুক্তি করিয়া পিটারকে জানাইলেন। গৃহস্থালীতে কি লাগে না লাগে তাহা তিনিও কিছু জানিতেন না।

কর্ণীবিবি লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'না! ইহাও নাকি বরদাস্ত করা যায়!' কহিলেন, "লেডী ইজাবেল এইরকম একটা ফরমায়েস দিলে, কসাই যে কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আজকে কি আসিবে না আসিবে, তার ফরমায়েস কি আমি দিব? সে মেছোনীও যে এখনই আসিবে।"

ইজাবেল বড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "তাই দিন। বড় ভাল হয় তাহা হইলে। আমি এসব কিছুই জানিনা, শিখিয়া নিতে হইবে। গৃহস্থালীর বোধহয় কিছুই আমি জানিনা।"

কর্ণীবিবি আর কিছু না বলিয়া সোজা বাহিরে চলিয়া গেলেন। পিঞ্জরমুক্ত পাখীটির ন্যায় আনন্দে ইজাবেল তার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল,—স্বামীর কাছে আসিয়া কহিল, "তোমার হইল আর্কিবাল্ড?"

"হাঁ, এই হইল। আঃ!—এই যে আবার কাফি পড়িয়া আছে!—হাঁ এই এক চুমুকেই এটা শেষ করিলাম। তার পর?"

"চল ময়দানে একটু বেড়াইগে।"

আর্কিবাল্ড উঠিয়া বাহুটি বাড়াইয়া দিয়া স্ত্রীর ক্ষীণ কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া, তাকে কাছে টানিয়া আনিয়া মধুর হাস্যে কহিলেন, "তার চেয়ে একবার চন্দ্রলোকে বেড়াইতে যাওয়ার কথা বলিলেও পার ইজাবেল। ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। একমাসের উপরে যে আফিসের কাজ কিছু দেখি নাই।"

ইজাবেলের চক্ষে জল আসিল,—কহিল, "আহা তুমি যদি আমার কাছেই থাকিতে পারিতে। আহা, সব সময়

* ইজাবেলের পিতার মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হয় নাই। আপন জন কেহ মরিলে, আগাগোড়া গভীর কাল রঙের পোষাক পরিয়া প্রথম বার মাস থাকিতে হয়। ইহার নাম deep mourning অর্থাৎ গভীর শোকের পোষাক, তার পর কয়েক মাস একটু হালকা কাল রঙের পোষাক ব্যবহৃত হয় অথবা কতক সরশ কাল আর কতক অন্যান্য রঙের থাকে, ইহার নাম half mourning বা আধা শোকের পোষাক।

কেবল আমার কাছেই যদি তুমি থাক! তোমাকে ছাড়া ঈষ্টলীন যে আমার ঈষ্টলীনের মতই লাগিবে না!"

"যতটা পারি, তোমার কাছেই যে থাকিব ইজাবেল। আচ্ছা, এস, আফিসে যাইতেছি,—ময়দান পার হইয়াই ত যাইব।—এস, আমার সঙ্গে এস।"

টুপী দস্তানা পড়িয়া ছাতাটি লইয়া ইজাবেল ছুটিয়া আসিল। দুইজনে বাহির হইলেন।

কার্লাইল দেখিলেন, তাঁহার ভগ্নীর প্রস্তাব স্ত্রীকে জানাইবার অতি উত্তম সুযোগ এই। কহিলেন, "কর্ণেলিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র থাকিতে চান, এখন এ সম্বন্ধে কি করিলে ভাল হয় তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। কর্ণেলিয়া থাকিলে সংসারের কাজে তোমার অনেক সাহায্য হইবে। কিন্তু অন্যদিকে আবার—কি জান—আমার মনে হয়—শুধু আমরা দুটিতে থাকিতে পারিলেই বেশ সুখে থাকিব।"

কঠোর মূর্ত্তি ওই কর্ণীবিবি তার উপরে মোতায়েন একটা কড়া পাহারার মত তার সংসারে থাকিবেন, কথাটা মনে করিতেও ইজাবেলের প্রাণটা দমিয়া পড়িল। কিন্তু যার পর নাই কোমলপ্রাণা সে ছিল। পাছে কর্ণীবিবি মনে কোনও দুঃখ পান, তাই আপত্তি কিছু করিতে পারিল না। কহিল, "তা তোমার আর মিস কার্লাইলের যেমন ইচ্ছা হয় তাই করিবে। আমার আপত্তি কি?"

কার্লাইল গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "ইজাবেল, এক্ষেত্রে তোমার যা ইচ্ছা তাই হইলেই ভাল হয়। সাংসারিক সকল ব্যাপারে সুবিধা বুঝিয়া তুমি যা করিতে চাও, সেই বন্দোবস্তেই আমি করিব। তোমার সুখই আমার জীবনের এখন প্রধান লক্ষ্য।"

কার্লাইল যে সরল চিত্তে এই কথা বলিলেন, ইজাবেল তাহা বেশ বুঝিল। তখন ইজাবেলের মনে হইল এরূপ স্নেহশীল স্বামীর তত্ত্বাবধানে থাকিতে পারিলে কর্ণেলিয়া কোন অশান্তিই তার ঘটাইতে পারিবে না। সে কহিল, তা থাকুক না?—কোন অসুবিধা আমার হইবে না।"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "তা বরং দুই একমাস দেখা যাইতে পারে। যদি অসুবিধা কিছু ঘটে তখন যা হয় করা যাইবে।"

ক্রমে ময়দানের ফটকের কাছে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলেন। ইজাবেল স্বামীর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আহা, যদি তোমার সঙ্গে গিয়া তোমার আফিসের কেরাণী হইয়াও থাকিতে পারিতাম। একা এখন এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে হইত না।"

কার্লাইল হাসিয়া কহিলেন, "তুমি লোভ দেখাইতেছ, আবার যদি বাড়ী পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে ফিরিয়া যাই কিন্তু তা যে এখন আর পারি না ইজাবেল। আসি তবে।"

স্নেহে স্ত্রীর করমর্দ্দন করিয়া কার্লাইল বিদায় হইলেন।

ইজাবেল ফিরিয়া আসিল। বড় বড় ঘরগুলির মধ্যে একা ঘুরিতে লাগিল,—সব যেন তার বড় খালি খালি লাগিতেছিল। তার পিতা যখন ছিলেন তখন ত এমন কখনও লাগিত না।

ইজাবেল শেষে তার পোষাকের ঘরে প্রবেশ করিল। মার্ভেল সেখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া একটা বাক্স হইতে কি কি জিনিশ বাহির করিতেছিল। ইজাবেলকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—কহিল, "একটা কথা আপনাকে এখন বলিতে পারি লেডী সাহেবা?"

"কি?"

মার্ভেল তখন তার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিল। এত অল্প লোক লইয়া এমন ছোট সংসারে তার পোষাইবে বলিয়া তার মনে হয় না। লেডী সাহেবা যদি অনুমতি করেন, তবে অনর্থক আর বিলম্ব না করিয়া সে চলিয়া যাইতে পারে। সেই দিনই যাইতে পারিলে তার সুবিধা হয়। অনুমতি পাইবে, এই ভরসায় তার জিনিশপত্রও সে বাহির কিছু করে নাই।

ইজাবেল উত্তর করিল, চাকর বাকর কিছু কম আছে। একটা ভুল হইয়া গিয়াছিল, শীঘ্রই তার সংশোধন হইবে। আর বিবাহের আগেইত তোমাকে বলিয়াছিলাম, কার্লাইল সাহেবের সংসার খুব বড় জাকাল একটা সংসার হইবে না।"

মার্ভেল উত্তর করিল,—"লেডীসাহেবা এটা আমি সহিয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু এই বাড়ীতে আমি——" মার্ভেলের মুখে আসিয়াছিল, ঐ সত মাগী—কিন্তু সামলাইয়া কহিল,—"ঐ মিস্ কার্লাইলের সঙ্গে একত্র থাকিতে পারি না। কি জানেন, লেডী সাহেবা তাঁরও মেজাজ ভাল না, আমারও মেজাজ ভাল না। কথায় কথায় ঝগড়াঝাটি বাধিবে।

না, লেডী সাহেবা, একরাশি করিয়া সোণা মাসে দিলেও এখানে আমি আর থাকিতে পারি না। যদি বলেন, চ'লতি এই তিন মাসের বেতন আমার কাটা যাইবে,তাতেও আমি রাজি আছি। তাই, আপনার জিনিশপত্র সব আমি গুছাইয়া রাখিতেছি। হইলেই আমাকে বিদায় দিবেন।"

ইহার পর আর মার্ভেলকে কিছু বলা ইজাবেল সঙ্গত মনে করিল না, যদিও এইরূপ একজন খাস পরিচারিকার অভাবে সে যে কি করিবে, তাও ভাবিয়া পাইল না।

"হাঁ, তোমার কত পাওনা হইয়াছে?" এই বলিয়া ইজাবেল তার দেরাজটি খুলিতে গেল।

"চলতি তিন মাসের শেষ পর্যন্ত?"

"না, এই আজ পর্য্যন্ত।"

"সেটা—ত হিসাব করিয়া দেখি নাই লেডী সাহেবা।"

একটুকরা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া ইজাবেল হিসাব করিয়া দেখিল। যা পাওনা হইয়াছে, মার্ভেলকে দিয়া কহিল,—"এও তোমাকে দেওয়া উচিত ছিল না মার্ভেল। আর কোথাও পাইতে না। আমাকে রীতিমত নোটিশ তোমার দেওয়া উচিত ছিল।"

মার্ভেল কাঁদিয়া ফেলিল। এরূপ স্নেহশীলা কর্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে বাস্তবিকই তার বড় দুঃখ হইতেছিল। কিন্তু এদিককার এসব অসুবিধাও যে সে সহিতে পারে না। কাঁদিয়া সে এই সব কথা বলিতে আরম্ভ করিল। ইজাবেল বাহিরে চলিয়া গেল।

মার্ভেল সেই দিনই চলিয়া গেল। যাইবার সময় জয়িস্ কহিল,—"এই ভাবে মনিবকে ফেলিয়া যাইতেছ তোমার একটু লজ্জা করে না?"

মার্ভেল উত্তর দিল। "তা কি করিব? মনিব খুবই ভাল, বেশ সুখেও ছিলাম, কিন্তু থাকিবার যে উপায় নাই।"

"অনুপায়েরই বা কি হইয়াছে! আমি ইহার মধ্যেই উপায় একটা করিয়া নিতাম।"

"তা তুমি হয়ত পারিতে। কিন্তু আমার কোমলপ্রাণে এত সহিবে না। আমার আর ঐ পাঁচ হাত লম্বা প্রতিমাখানির এক বাড়ীতে স্থান হইতে পারে না। বিদেশে কোনও সঙের যাত্রায় উহাকে নিয়া বেড়াইলেই ঠিক মানায়।"

সন্ধ্যার আগে ডিনারের জন্য পোষাক পরিতে ইজাবেল তার পোষাকের ঘরে গেল,—তখন জয়িস্ আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। কহিল,—"লেডী সাহেবা, আপনাদের মত বড় লেডীদের সাজ পোষাকের কাজে আমার তেমন হাত নাই, তবে মিস্ কার্লাইল আমাকে পাঠাইয়া দিলেন,—যদি কিছু সাহায্য আমার দ্বারা আপনার হয়।"

ইজাবেলের মনে হইল, ব্যবহার যেমনই হউক, কর্ত্রীবিবি সহৃদয়া ও সুবিবেচিকা বটেন।

জয়িস্ আবার কহিল,—"যতদিন ভাল লোক একজন না পান, চাবিটাবি যদি আমার হাতে দেন, আপনার সাজ পোষাকের হেফাজতী আমিই রাখিব।"

"চাবি! চাবির কথা ত আমি কিছুই জানি না। চাবি আমি কখনও রাখিও না।"

জয়িস্ চাবি খুঁজিয়া নিয়া কাপড় চোপড় বাহির করিল,—সময়োপযোগী পরিচ্ছদে ইজাবেলকে সাজাইয়া দিল।

ডিনারের এখনও কিছু বিলম্ব আছে। ইজাবেল ময়দানের ফটকের দিকে গেল। কার্লাইল ত এখনই আসিবেন,—তাঁর সঙ্গেই সে ফিরিয়া আসিবে। ফটকের কাছে গিয়া রাস্তার দিকে চাহিল, কিন্তু কই। তিনি ত আসিতেছেন না! ক্ষুণ্ণমনে ইজাবেল ফিরিল,—একটি গাছের ছায়ায় গিয়া বসিল। বৈকালে সেদিন বড় গরম হইয়াছিল। আধ ঘণ্টার পরে কার্লাইল ফিরিলেন। ময়দানের মধ্যে কতটুকু গিয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঐ যে গাছের ছায়ায় গাছের গুঁড়িতে হেলিয়া ইজাবেল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! ছাতাটি আর টুপীটি পায়ের কাছে পড়িয়া আছে। মাথার চুলগুলি চারিধারে গুচ্ছে গুচ্ছে লুটাইয়া পড়িয়াছে! ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিস্ফারিত, কপোল দুটি রক্তাভ, আহা! স্বর্গের একটি সরল বালিকার নিখুঁৎ ছবিখানি যেন ওই গাছতলে পড়িয়া! মুগ্ধ দৃষ্টিতে কার্লাইল এই মনোরম চিত্রের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আহা! এই রত্ন এই স্বর্গের ফুল, আজ তাঁহার! সমস্ত প্রাণ তাঁহার এই অনুভূতির আবেগে চঞ্চল স্পন্দনে নৃত্য করিতে লাগিল। মুখখানি ভরিয়া আনন্দের মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ ইজাবেল চমকিয়া উঠিল।

"এই যে আর্কিবাল্ড! আমি বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম?"

"তাইত। একা এখানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, কেউ যদি চুরী করিয়া নিয়া যাইত! কি সর্ব্বনাশ হইত বল ত আমার?"

ইজাবেল হাসিয়া কহিল, "কেমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম জানিনা। এখানে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, তুমি কখন আসিবে।"

বাহুতে ইজাবেলের বাহু ধরিয়া কার্লাইল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কহিলেন, "কি করিতেছিলে সারাদিন?"

"কি আর ছাই করিব? একবার পিয়ানোটায় দুটা ঘা দিই, একবার ঘড়ি দেখি, আর ভাবি কখন দিনটা যাইবে, তুমি আসিবে।"

একটু পরেই তাঁহারা গৃহে আসিয়া উঠিলেন। সিঁড়ি বারান্দায় কর্ণীবিবি দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতেছিলেন। ভ্রাতার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ডিনার তৈরী, আধঘণ্টা তোমাদের দেরী হইল।"

বলিতে বলিতে ইজাবেলের দিকে ফিরিয়া মন্তব্য করিলেন, "ভাবিতেছিলাম আপনি বুঝি হারাইয়াই গিয়াছেন মেম সাহেব।"

ইজাবেলের সঙ্গে কথায় কেন তিনি কেবলই এই 'মেম-সাহেব' কথাটা ব্যবহার করিতেছেন? ইজাবেল তাঁহার ভ্রাতৃবধূ; এ সম্বোধন একেবারে ভাল শুনায় না। তারপর তিনি প্রবীণা, ইজাবেল বালিকামাত্র। তাহাতেও এই সম্বোধনটা বড় বিসদৃশ লাগে। যখনই কর্ণীবিবির মুখে 'মেমসাহেব' কথাটা উচ্চারিত হইত, কার্লাইল একটু ভ্রূকুটি করিতেন। জন্সিস ভাবিত, কেবল মনের রাগেই কর্ণীবিবি অবিরত এই কথাটা ব্যবহার করেন। যাহা হউক আফিসের কাজ বলিয়া বিলম্বের একটা ওজুহাত দিয়া কার্লাইল তাঁহার পোষাকের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ইজাবেলও তাঁহার অনুগমন করিল। কিজানি কর্ণীবিবি আবার কি বলিবেন! সত্যই তার ভয় করিতেছিল। কার্লাইল দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, ঘরে ঢুকিতে তার বাধ বাধ ঠেকিল, দরজার চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"একি ইজাবেল! তুমি এখানে?"

"হাঁ, তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছি, তোমার হইল?"

"হাঁ, চল।" ইজাবেলকে লইয়া কার্লাইল ডিনার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন সকালে আবার আর একটা গোলমাল বাধিল। সেদিন রবিবার। গির্জ্জায় যাইবার জন্য কার্লাইল গাড়ী জুড়িতে আদেশ দিলেন। কর্ণীবিবি চটিয়া বাধা দিয়া কহিলেন, "একি করিতেছ আর্কিবাল্ড? আজ যে রবিবার। না, না,—এ কখনও হইতে পারে না।"

"কি হইতে পারে না?"

"রবিবারে ঘোড়া খাটান। (ইজাবেলের দিকে ফিরিয়া) আমি ধর্ম্ম মানিয়া চলি মেম সাহেব। রবিবারে ঘোড়া গরু কিছু খাটাইতে নাই। ধর্ম্মের আচার নিয়ম আমাকে শিখান হইয়াছিল, লেডী ইজাবেল।"

ইজাবেল বড় অসুবিধা বোধ করিল। এই রৌদ্রে সেণ্টজুডের পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইবে, হাঁটিয়া আবার আসিবে, সারাদিন সে আর মাথা তুলিতে পারিবে না। কিন্তু কর্ণীবিবির ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রতিও কোনরূপ আঘাত করিতে সে ইচ্ছা করিল না। চুপি চুপি স্বামীকে কহিল, "তা ধীরে ধীরে বরং হাঁটিয়াই যাইব। তাতে আর কি এমন অসুখ করিবে। কি বল?"

কার্লাইলও চুপি চুপি কহিলেন, "সে যা হয় তখন হইবে। সাড়ে দশটায় প্রস্তুত থাকিও।"

ইজাবেল বাহিরে চলিয়া গেল। কর্ণীবিবি কহিলেন, "উনি হাঁটিয়া যাইবেন ত?"

"না। এই রৌদ্রে হাঁটিয়া গেলে ইজাবেলের অসুখ করিবে। সেটা আমি কিছুতেই দিতে পারি না।"

"উনি কি চিনির পুতুল যে এই রৌদ্রেই একেবারে গলিয়া যাইবেন?"

কার্লাইল তেমনই কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন, "পুতুল দেটুতুল কিছু নন, অতি কোমল একটি পুষ্পলতিকা উনি—যাকে আমি বুকে ধরিয়াছি, আর যত্নে পালন করিব বলিয়া ভগবানের সমক্ষে শপথ করিয়াছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাই করিব।"

বলিয়াই কার্লাইল চলিয়া গেলেন।

বেলা সাড়ে দশটা হইল। গাড়ীতে ইজাবেলকে লইয়া কার্লাইল গির্জ্জাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহারা দেখিলেন, কর্ণীবিবি প্রকাণ্ড একটা ছাতা মাথায় দিয়া চলিয়াছেন। গাড়ী পাশ দিয়া চলিয়া গেল। কর্ণীবিবি ইহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

(ক্রমশঃ)

চিত্র ব্যাখ্যা

যাত্রী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ইহাতে শিল্পী মানব চরিত্রের জীবন-সন্ধ্যার একটা চিত্র ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শৈশবের প্রফুল্লতা—যৌবনের সজীবতা যখন বার্দ্ধক্যের ছায়ায় মলিন হয়, মানুষ তখন তাহা স্পষ্টতর করিবার জন্য একটা আশ্রয় খোঁজে।

চিত্রে বৃদ্ধাও তাহার অতীত কর্ম্মজীবনের স্মৃতিটা মনে করিয়া শেষ দিনের একমাত্র সম্বল—লোটা, লাঠী ও মালা গাছটী আশ্রয় করিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। তুলিকায় বৃদ্ধার মুখে বার্দ্ধক্য রেখার ভিতর দিয়া একটা ব্যাকুলতা ও সমস্যার ছায়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নিকটে পবিত্র তুলসী-তলের শেষ প্রদীপটী সময়ের সঙ্কীর্ণতা জ্ঞাপন করিতেছে।

বিশ্বরাজ্যের এ অবশ্যম্ভাবী যাত্রা প্রত্যেক যাত্রীকেই অবস্থাবিশেষে করিতে হয়।

সংগ্রহ বৈচিত্র

ফকির হলেন আমীর

বিলি ট্যাটেমের জন্ম, দরিদ্র শ্রমজীবীর ঘরে। তাঁহার পিতা একখানি বজরার অধিকারী ছিলেন। ট্যাটেমের বয়স যখন তের বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে একখানি জাহাজের বালক-ভৃত্যের পদে ভর্ত্তি করিয়া দেন। যৌবন-বয়সে ট্যাটেম একটি জাহাজের কার্য্যালয়ে সামান্য কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করেন। সে-সময়ে অন্যান্য সাধারণ কর্ম্মচারীর মত তাঁহার মধ্যেও কিছুমাত্র অসাধারণত্ব ছিল না। কেরাণীর পদে তিনি সুদীর্ঘ সতেরো বৎসর কাল একই ভাবে কাটাইয়া দেন। কিন্তু বাহিরে তাঁহার কোন বিশেষত্ব প্রকাশ না পাইলেও, এই কয় বৎসরের মধ্যে তিনি মনে মনে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে অর্থসঞ্চয় করিয়া অবশেষে তিনি সুযোগ পাইবা মাত্র "Tatem Steamship Company" নামে একটী জাহাজের ব্যবসার সূত্রপাত করিলেন। তাঁহার সুনামে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই অর্থ-সাহায্য করিয়া উক্ত ব্যবসায়ের মূলধন বাড়াইয়া দিলেন। ক্রমে ট্যাটেমের ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল। ফলে কুড়ি বৎসর আগে যে ট্যাটেম কেরাণীর পদে মাসিক একশত টাকা বেতন লাভ করিতেন, আজ সেই ট্যাটেম যশ অর্থ ও রাজসম্মানে ভূষিত হইয়া লর্ড গ্লেন্‌লি নামে দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। লর্ড গ্লেন্‌লি এখন কোটিপতি এবং জাহাজের ব্যবসায় ছাড়া আরো অনেকগুলি বিখ্যাত

ব্যবসায়েও তিনি লক্ষ লক্ষ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। স্বাবলম্বন, পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি যে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে, লর্ড গ্লেন-লির জীবনই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মাতৃত্বের মহিমা

আমাদের অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে যে, সন্তান প্রসব করিলে স্ত্রীলোকের অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। অনেকের মতে প্রসব যন্ত্রণায় রমণীর স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং পরমায়ু কমিয়া যায়। কিন্তু ইউরোপের বিখ্যাত ডাক্তাররা এ সব কথা মানেন না, তাঁহাদের মত একেবারে উল্টো। তাঁহারা অনেক আলোচনার পর বলিতেছেন, যে রমণী যত বেশী সন্তান প্রসব করে, সে রমণী তত বেশী দীর্ঘ-জীবনী হয়। সমাজের নিম্ন স্তরের গরীব মেয়েরা এবং কুলি মজুর শ্রেণীর রমণীরা (অবশ্য যাহারা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে না) অনেক বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। গড়পড়তার হিসাবে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে, সন্তানের জননীদের জীবন বন্ধ্যা রমণীদের চেয়ে যথেষ্ট দীর্ঘ হয়। ইহার কারণ কি? যখন কোন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করেন, তখন সন্তান পালনের জন্য প্রকৃতি তাঁহাকে অতিরিক্ত জীবনী-শক্তি দান করেন। সন্তানবতী রমণীরা দেহের সমস্ত মাংসপেশী সঞ্চালন করিবার যে সুবিধা পান, সন্তানহীনা রমণীদের সে সুবিধা একেবারেই থাকে না। কেবলমাত্র এই ব্যায়ামই সন্তান জননীকে দীর্ঘজীবিনী করিতে পারে। ডাক্তারেরা আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেক রমণী পঁয়ত্রিশের আগে অধিকাংশ সন্তান এবং অনেক রমণী পঁয়ত্রিশের আগে অল্প সন্তান প্রসব করেন। ইঁহাদের প্রথম দলই দীর্ঘজীবিনী হন। বলা বাহুল্য, অস্বাস্থ্যকর স্থানে এবং উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে যে-সব রমণী জননী হন, প্রকৃতির সাহায্যেও তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে পারেন না।

বিবিধ

১। গড়ে স্ত্রীলোকের পাঁচ বৎসর আগে পুরুষের চুল পাকিয়া যায়।

২। পৃথিবীর আর সমস্ত দেশের চেয়ে জাভাদ্বীপেই বেশী বজ্রপাত হয়।

৩। কালিফোর্ণিয়ার একটি সহরে ফায়ারব্রিগেডের অধ্যক্ষ উড়ো-জাহাজে চড়িয়া কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করেন।

৪। "মসলেম আউটলুক" নামে লণ্ডনে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা মুসলমানদের কথা আগ্রহের সহিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এই পত্রিকাখানি বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

৫। মহামারীর জীবাণু চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিবার পক্ষে তপ্ত ও আর্দ্র বাতাস সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। গ্রীণল্যাণ্ডের বাতাস শুষ্ক ও শীতল,—সেখানে সংক্রামক রোগও নাই।

৬। ভাগ্যে প্রজাপতিদের সমস্ত ডিমই ফোটে না। কারণ প্রজাপতিদের শতকরা দশটি ডিমও যদি ফুটিত, তবে পৃথিবীতে এত বেশী প্রজাপতি হইত যে গাছপালার সমস্ত পাতাই তাহারা খাইয়া ফেলিত।

৭। বিলাতের খুব রঙিন প্রজাপতির পাখনা সোনায় বাঁধাইয়া লইয়া, রমণীরা এখন অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করিতেছেন।

৮। যাঁহাদের কোটের মখমলের কলারের রং জ্বলিয়া যায়, তাঁহারা যদি অ্যাল্‌কোহল ও বুরুসের সাহায্যে কলারটি ঘসিয়া দেন, তাহা হইলে তাহা আবার পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

৯। তুলোর কামিজের চেয়ে পাট বা শনের (linen) কামিজ বেশী ঠাণ্ডা। শীতকালে তাহা ব্যবহার না করাই ভালো।

১০। পেপারমিণ্ট, লবঙ্গ ও রাই এ-সব জিনিস মানুষের হজম-শক্তি বাড়াইয়া তোলে।

১১। গুঁড়ানো গন্ধক ছড়াইয়া দিলে জলের চেয়ে বেশী সহজে আগুন নিবানো যায়। নর্দ্দমা ও ড্রেণ হইতে যদি দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে, তবে ফুটন্ত গরম জলে বেশ করিয়া সোহাগা গুলিয়া লইয়া সেখানে ঢালিয়া দিবেন। গন্ধ আর থাকিবে না।

১২। সারা পৃথিবীতে প্রতি বৎসরে লেড্‌পেন্সিল নির্ম্মিত হয়, সর্ব্বশুদ্ধ ২০০,০০০,০০০,০০০,০। তাহার মধ্যে কেবল আমেরিকায় সর্ব্বশুদ্ধ ৬৫০,০০০,০০০ পেন্সিল প্রতি বৎসরে নির্ম্মিত হয়।

১৩। গত যুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে পঞ্চাশ হাজার মাত্র গোলা প্রস্তুত হইত। —"ট্রিবিউন"

১৪। সমস্ত পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ১,৫৪,৩০,০০০ জন ইহুদী আছে। বিলাতে ইহুদীর সংখ্যা তিন লক্ষ।

১৫। জাপানের রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে পুরাতন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব সাতশত বৎসর আগে এই রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠা। জাপানের বর্ত্তমান সম্রাটের আগে, তাঁহার একশো একুশ জন পূর্ব্ব-পুরুষ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন।

১৬। মিসরের নীলনদে যেমন নানা জাতের মাছ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন নদ-নদীতে তেমন পাওয়া যায় না।

১৭। প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোম দেশে কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে মাছেদের ডিম পাড়ানো হইত।

অন্নদার প্রতি

ভেদিয়া বিশ্বের মর্ম্ম উঠে হাহাকার, শত [illegible] যায় প্রাণ,
মানবের গৃহ মাঝে পশুর চীৎকার দানবের অনল নয়ান।
কোথা স্নেহ; কোথা প্রেম; করিছে নর্ত্তন রণরঙ্গে
পিশাচ দানব
বেদনা আতুর কণ্ঠে করিছে ক্রন্দন অসহায় দুর্ব্বল মানব ;
নিখিলের চতুর্দ্দিকে মৃত্যু[illegible]ত চলে দুর্ভিক্ষের নাহি অবসান,
স্নেহময়ী মা আমার বসি পদতলে এবার কে শুনাইবে গান
উৎসবের লাগি অই বাজে ঢাক ঢোল রবে তার মুখর অম্বর ;
এ শুধু বাহিরে হাসি অন্তরের [illegible] নিশিদিন ব্যথায় জর্জ্জর।
এ শুধু দিনান্তে মাগো অম্বুদের ফাঁকে অস্তগামী সূর্য্যরশ্মি-হাসি
ক্ষণ-সুখ তারপর ছেয়ে আসে আঁথে প্রলয়ের অন্ধকার রাশি।

(২)

নিখিল-জননী ওগো আয় একবার ভরি লয়ে অনন্ত অঞ্চলে
নিরন্নের তরে অন্ন, ব্যথা ঘুচাবার স্বর্গ-রেণু রাঙা পদ তলে
ভুলে যা বারেক মাগো, সন্তানের দোষ, রিক্তধনী স্পৃশ্যনীচ সবে
বিলায়ে [illegible] অন্ন মাগো, খুলি স্নেহকোষ স্নেহের সে মহান গৌরবে।
দিওনা দিওনা মাগো, রুদ্র শাস্তি [illegible] ভিখারী দেখ পথের কিনারে
ছিন্ন কন্থা পরিধান দরিদ্র মাতার বক্ষে ভাসে দুখ অশ্রুধারে।
অঙ্কে তার ক্ষুদ্র শিশু নগ্ন দেহ খান
অন্নাভাবে অস্থি-চর্ম্ম-সার
মরণ পূর্ব্বাহ্নে হায় মেলিয়া নয়ান
মাতা পানে চাহে বার বার

* * * *

খুলেদে জননী ওগো স্নেহের ভাণ্ডার
ঘুচে যাক তাপিতের ব্যথা।
উৎসবপ্রাঙ্গনে কেন ঝরে অশ্রুধার
তুমি যদি আছ জগন্মাতা।
মূর্খ মোরা তাই করি রাত্রি আর দিন, ছোট বড় জঘন্য বিচার
মানুষেরে প্রতিদিন ক'রে রাখি হীন, শ্রেষ্ঠ করি জাত ও আচার।

* * * *

ধর্ম্মের বেদীর কাছে করি ধর্ম্ম ভান অধর্ম্মেরে দিওনা মুকুট
মায়ের চরণে হায় সবাই সমান ; সত্য সেথা রহুক অটুট,
স্বার্থের নিয়ম দিয়ে গড়িওনা হায় জননীর পূজার বিধান
জননীর স্নেহ কাছে সবাই লুটায় নাহি সেথা অধম, প্রধান,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর শূদ্র ও কৃষাণ চণ্ড মুচী অস্পৃশ্য অধম
এক জননীর কোলে লভি একি প্রাণ একি ভূঁয়ে লয়েছে
জনম।
আয় তবে আয় ছুটে নীচ উচ্চ সবে
মা'র কাছে নাহি ছোট বড়
ভক্তির অঞ্জলি দিব প্রেমের গৌরবে
আয় ত্বরা হই সবে জড়।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।